দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

ষড়্‌বিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

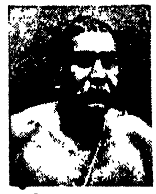
সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—



ভারতবর্ষ



আষাঢ়—১৩৪৫

প্রথম খণ্ড	ষড়বিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

জৈন দর্শনে জ্ঞান

প্রিন্সিপাল শ্রীকালীপদ মিত্র

জৈন দর্শনে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে। যথা—(১) মতি (২) শ্রুত (৩) অবধি (৪) মনঃপর্যয় (মনঃপর্যায়) ও (৫) কেবল।

মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্যয়কেবলানি জ্ঞানম্।

—তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র।১।৯॥

(১) পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও (২) মনের সাহায্যে সাধারণ মানব যে জ্ঞানলাভ করে, তাহাকে মতিজ্ঞান কহে। মনের অপর নাম—অনিন্দ্রিয় বা নো-ইন্দ্রিয়। প্রমাণ মীমাংসাবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে—"মনোঽনিন্দ্রিয়মিতি নো ইন্দ্রিয়মিতি উচ্যতে।"

জৈন দর্শনে ইন্দ্রিয় পাঁচ—শ্রোত্র, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্।—(স্পর্শরসগন্ধরূপশব্দ গ্রহণলক্ষণানিস্পর্শনরসনঘ্রাণ-চক্ষুঃশ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি—১, ১, ২১—প্রমাণ-মীমাংসা)।

মতিজ্ঞানের অপর নাম—অভিনিবোধ বা অভিনিবোধিক জ্ঞান। সমবায়াঙ্গ সূত্র (আগমোদয় সমিতি সংস্করণ, (৩) ইহার সমর্থন করে। আবশ্যক সূত্র বলে—

নো-আগমতঃ পঞ্চপ্রকারং জ্ঞানং, তদ্যেদম্—

আভিণিবোহিয়নাণং সুয়নাণং চেব ওহিনাণং চ।

তহ মণপজ্জবনাণং কেবলনাণং চ পংচময়ং॥

ভাষ্যকার অভিনিবোধিক জ্ঞানের যে ব্যাখ্যাগুলি দিয়াছেন তাহার একটিমাত্র দিতেছি—"ইন্দ্রিয়মনোনিমিত্তো যোগ্য-দেশাবস্থিত বস্তুবিষয়ঃ স্ফুটপ্রতিভাসো বোধবিশেষ ইত্যর্থঃ"।

মতিজ্ঞানের চারিটী ক্রম আছে—যথা (১) অবগ্রহ (২) ঈহা (৩) অবায় (অপায়) ও (৪) ধারণা।

(১) অবগ্রহ

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সামান্য জ্ঞান হয় তাহাকে অবগ্রহ কহে। আবশ্যকসূত্র বলে—

অত্থাণং উগ্গহণং অবগ্গহং তহ বিআলণং ঈহং।

ববসায়ং চ অবায়ং ধরণং পুণ ধারণং বেতি॥

জৈন প্রাকৃতে 'অবগ্রহ', 'উগ্গহ' (বিশেষাবশ্যক ভাষ্য) বা 'ওগ্গহ' (সন্মতি সূত্র, ৭৫ গাথা', উবগ্রসমালা, (বৃহৎ)

কল্পসূত্র, সমরাইচ্চকহা)। অকলঙ্ক তাঁহার তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকে অবগ্রহের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—'বিষয়বিষয়সংনিপাতসমনন্তরমাদ্যগ্রহণম্'। ইংরাজিতে ইহাকে perception (or taking up the object of knowledge by the senses) or 'bare concept' বলা যাইতে পারে। [বিষয়—'object of perception'; বিষয়িন্—perceiver of the object; সংনিপাত—'contact', i. e, taking up the object of knowledge (the first sense or perception) immediately following the contact or 'coming-together' of বিষয় and বিষয়িন্]।

'অর্থের' প্রথম গ্রহণই 'অবগ্রহ'। উহা দ্বিবিধ—(১) ব্যঞ্জনাবগ্রহ ও (২) অর্থাবগ্রহ। "ব্যজ্যতে অনেন অর্থঃ প্রদীপেন ইব ঘট ইতি ব্যঞ্জনং"। এই 'ব্যঞ্জন' কি? উপকরণেন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পরিণত দ্রব্য সকলের যে পরস্পর সম্বন্ধ বা সংপৃক্তি তাহাই ব্যঞ্জন; সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই অর্থ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায়, অন্যথা পারা যায় না; সেইজন্য সম্বন্ধ হইতেছে 'ব্যঞ্জন'। ভাষ্যকৃৎ বলিয়াছেন—

"বংজিজ্জই জেণত্থো ঘড়োব্ব দীবেণ বংজণং তং চ।
উবগরণিংদিয় সদ্দাই পরিণয়দব্বসংবংধো॥"

জৈনি বলেন (Outlines of Jainism. p, 63)—"with reference to Vyanjana or intermediating sensation, sense-knowledge is of only one kind—the avagraha kind. This is never manifested in the case of the eye or the mind." সম্বধ্যমান শব্দাদিরূপের 'অর্থের' অব্যক্ত রূপ পরিচ্ছেদ হইতেছে ব্যঞ্জনাবগ্রহ। ইহা জ্ঞানরূপ, কেবল সেই জ্ঞান অব্যক্ত। এই ব্যঞ্জনাবগ্রহ আবার চতুর্বিধ—শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও স্পর্শ—এই চতুর্বিধ ইন্দ্রিয় ভেদে; নয়ন ও মনকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাবগ্রহ হইতেছে—"সামান্যমাত্রানির্দেশ্য গ্রহণমেক সাময়িকমর্থাবগ্রহ ইতিভাবঃ"।

অবগ্রহের অপর আখ্যা—আলোচন, গ্রহণ বা অবধারণ।

(২) ঈহা

"অবগৃহীতেঽর্থে তদ্বিশেষাকাঙ্ক্ষণমীহা"; যথা পুরুষ ইত্যবগৃহীতে তস্য ভাষাবয়োরূপাদিবিশেষৈরাকাঙ্ক্ষণমীহা—যে বিষয় অবগৃহীত (perceived) হইয়াছে তাহার বিষয়ে বিশেষভাবে (আরও অধিক) জানিবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ((the readiness to know more of the things perceived or a desire for detailed knowledge) ।

"নিঅাসেনঃ ইহং", বিচারণম্-পর্য্যালোচনমর্থানামিতি অনুবর্ত্ততে, ঈহনমীহা, তাং ব্রুবতে ইতি যোগঃ, কিমুক্তং ভবতি? অবগ্রহাদুত্তীর্ণোঽপায়াৎ পূর্বঃ সদ্ভূতার্থবিশেষোপাদানাভিমুখোঽসদ্ভূতার্থপরিত্যাগাভিমুখো মতিবিশেষ ইতি। অবগ্রহের পরে এবং অপায়ের পূর্বে সদ্ভূতার্থকে গ্রহণ এবং অসদ্ভূতার্থকে পরিত্যাগ করে যে মতি তাহা 'ঈহা'।

কেহ কেহ সংশয়মাত্রকে ঈহা বলিয়া বর্ণন করেন, তাহা সমীচীন নহে। সংশয় হইতেছে 'অজ্ঞান'; কিন্তু মতিজ্ঞানের অংশ হইতেছে ঈহা; তাহা হইলে 'ঈহা' কিরূপে সংশয়মাত্র হইতে পারে? উক্ত হইয়াছে—

"ঈহা সংশয়মেত্তং কেঈ ন তয়ং তত্তজমন্নানং।
মঈনাণংসা চেহা কহমন্নাণং তঈ জুত্তং॥"

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। কুন্দকুন্দাচার্য্য তাঁহার পঞ্চাস্তিকায় সময়সারে (৪১) বলিয়াছেন—

"আভিণিবোধিসুদোধিমণকেবলাণি ণাণাণি পংচভেয়াণি।
কুমদিসুদ-বিভংগাণি য তিণ্ণি বি ণাণেহিং সংজুত্তে॥

অর্থাৎ আভিনিবোধিক (মতি), শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায় এবং কেবল—এই পঞ্চভেদ জ্ঞান। কুমতি, কুশ্রুত এবং বিভঙ্গ (অর্থাৎ অবধির অজ্ঞান) এই তিনটি অজ্ঞান ও জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত অতএব জ্ঞান অষ্টবিধ। কুন্দকুন্দের অনুসরণ করিয়া নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার দ্রব্যসংগ্রহে বলিয়াছেন—

ণাণং অট্ঠবিয়প্পং মদিসুদওহী অণাণণাণাণি।
মণপজ্জয় কেবলমবি পচ্চক্খ পরোক্খভেয়ং চ॥ ৫॥

কিন্তু অজ্ঞানকে বাদ দেওয়া উচিত, প্রত্যুত! জ্ঞান পাঁচ প্রকার।

ঈহার অপর আখ্যা—ঊহা, তর্ক, পরীক্ষা, বিচারণা, জিজ্ঞাসা।

(৩) অবায়

"বিশেষ নির্জ্ঞানাত্তা আত্ম্যাবগমনমবায়ঃ" (ভাষাদি-বিশেষ—নির্জ্ঞানাৎ তস্য যাথাত্ম্যেন অবগমনম্ অবায়ঃ দাক্ষিণাত্যোঽয়ং যুবা, গৌর ইতি বা)। আবশ্যকসূত্র বলে—"ব্যবসায়ঃ চ অবায়ঃ", বিশিষ্টোঽবসায়ো ব্যবসায়; নির্ণয়ো, নিশ্চয়োঽবগমঃ। অর্থাৎ অবগৃহীত এবং ঈহিত অর্থের নিশ্চিত যে জ্ঞান তাহা অপায়। অধ্যাপক ধ্রুব ইহাকে 'detailed knowledge' বলিয়াছেন। জৈনি বলেন—"It is finding out the perfection or otherwise (সম্যক্‌তা অথবা অসম্যক্‌তা) of a thing.'' অতএব ইহা সংশয়রহিত নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (ঠানাঙ্গ ৪,৪ ; নন্দিসূত্র)।

ইহার অপর নাম —অপবায়, অপগম, অপানোদ, অপব্যাধ, অপেত, অপগত, অপবিদ্ধ এবং অপনুত্ত।

(৪) ধারণা

'নির্জ্ঞাতার্থাবিস্মৃতির্ধারণা' —ভাষা, বয়স, রূপ ইত্যাদি বিশেষের দ্বারা যে পুরুষকে যথার্থরূপে নির্ণীত করা হইয়াছে, উত্তরকালে তাহাকে দেখিয়া সেই ব্যক্তিই এই —এইরূপ যে অবধারণ, তাহা ধারণা (holding the knowledge as a permanent possession in the mind).

আবশ্যক সূত্র বলে —"ধৃতির্ধারণম্ অর্থানামিতি বর্ত্ততে, পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনোঽবিচ্যুতি বাসনা স্মৃতিরূপং ধরণং পুনর্ধারণাঃ ভণ্যতে।"

ইহার অপর নাম—প্রতিপত্তি, অবধারণ, অবস্থান, নিশ্চয়, অবগম, অববোধ।

আযারাঙ্গ সূত্রে শ্রুতজ্ঞানকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

"শ্রবণং শ্রুতং—বাচ্যবাচকভাব পুরঃসারিকারেণ শব্দ-সংসৃষ্টার্থ গ্রহণহেতুরূপ-লব্ধিবিশেষঃ, শ্রুতং চ তজ্ জ্ঞানম্।" শব্দ শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া, কাহারও মুখের ভাব বা অঙ্গের ভঙ্গি দেখিয়া, বস্তুতঃ কোনও রূপ চিহ্নদ্বারা দ্যোতিত ভাব দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা শ্রুতজ্ঞান। ধর্ম পুস্তক পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাও শ্রুতজ্ঞান।

'অবধি'র ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে—(১) অব অধোঽধো বিস্তৃতং বস্তু ধীয়তে পরিচ্ছিদ্যতেঽনেনেতি অবধিঃ ; অথবা (২) অবধি মর্যাদা রূপিষ্বেব দ্রব্যেষু পরিচ্ছেদবাতয়া প্রবৃত্তিরূপা তদুপলক্ষিতং জ্ঞানমবধিঃ (৩) যদ্বা অবধানং — আত্মনোঽর্থ সাক্ষাৎকরণ ব্যাপারোঽবধিঃ। মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মা দ্বারা এই জ্ঞান উপলব্ধ হয়। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল তাঁহার 'দ্রব্য-সংগ্রহে' বলিয়াছেন —"psychic knowledge···knowledge in the hypnotic state may be cited as an example of Avadhi Jnana."

মনঃপর্যব জ্ঞানের ব্যাখ্যা—(১) মনসি মনসো বা পর্যবঃ, সর্বতো মনোদ্রব্য পরিচ্ছেদ ইত্যাদি ; পরের মন জানা (knowing ideas and thoughts of others—Mind-reading is an instance of this kind of knowledge.)

কেবল জ্ঞান —(১) "কেবলমেকমসহায়ম্ মত্যাদিজ্ঞান নিরপেক্ষত্বাৎ, মত্যাদি জ্ঞান নিরপেক্ষতা চ কেবল জ্ঞান প্রাদুর্ভাবে মত্যাদীনামসম্ভবাৎ···" (২) শুদ্ধং কেবলম্, (৩) সকলং বা কেবলং। প্রথমত এবা শেষ্ তদাবরণ বিগমতঃ সম্পূর্ণোৎপত্তেঃ, (৪) অসাধারণং বা কেবলম্ অনন্যসদৃশত্বাৎ, (৫) অনন্তং বা কেবলং জ্ঞেয়ানন্তত্বাৎ ··যথাবস্থিতা শেষভূত ভবদ্ ভাবিভাব স্বভাবাবভাসিজ্ঞানমিতি ভাবঃ।

শ্রুত ও মন পর্যয়ের বিভাগ আছে—নন্দীসূত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখানে তাহা আলোচনা করা যায় না।

এই পঞ্চবিধ জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। আভিনিবোধিক (মতি) ও শ্রুতজ্ঞান পরোক্ষ ; অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবলজ্ঞান প্রত্যক্ষ। ব্যাপ্ত্যর্থে 'অশূঙ্' ধাতু হইতে অক্ষ হইয়াছে ; জ্ঞানাত্মা দ্বারা সব 'অর্থ' (objects) ব্যাপিয়া থাকে, এই বলিয়া 'অক্ষ'। অথবা ওর্সেব অর্থকে পালন (ভুঙ্‌ক্তে, অশ্ ভোজনে) করে যে।

অক্ষঃ = জীবঃ (অক্ষঃ ভণ্যতে জীবঃ)। অক্ষের অর্থাৎ আত্মার পর যাহা তাহা পরোক্ষ। দ্রব্যেন্দ্রিয়গুলি ও দ্রব্যমন পুদ্‌গলময় বলিয়া (material objects) পর, অথবা পৃথক হইয়া বর্ত্তমান থাকে। সেইগুলি দ্বারা অক্ষের যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। অথবা পর — যে ইন্দ্রিয়াদি তাহাদের সহিত উক্ষা কিনা সম্বন্ধ (বিষয়-বিষয়ি ভাবলক্ষণ) হয় যে জ্ঞানে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিরূপ ? না ধূম হইতে অগ্নিজ্ঞানের ন্যায়।

এখন আভিনিবোধিক ও শ্রুত—এই দুই জ্ঞানের পরোক্ষতা কি করিয়া হইতেছে ? উত্তরে বলা হইতেছে—পরাশ্রয়ত্বহে। কেন না, দ্রব্যেন্দ্রিয় ও মন পুদ্‌গলময় বলিয়াতু

আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত, সেইজন্য ইহাদের আশ্রয়যোগে (উপজায়মান) যে জ্ঞান জন্মে তাহা আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে, কিন্তু পরম্পরালব্ধ সেইজন্য পরোক্ষ। কথিতও হইয়াছে—

অক্‌খস্‌স পোগ্‌গলময়া জং দব্বেংদিয়মনা পরা হোংতি।
তেহিংতো জং নাণং পরোক্‌খমিহ তমক্খাণং ব ॥

কুন্দকুন্দাচার্য্য তাঁহার প্রবচনসারে বলিয়াছেন—

পরদব্বং তে অক্‌খা ণেব সহাবোত্তি অপ্পণো ভণিদা।
উবলদ্ধং তেহি কধং পচ্চক্‌খং অপ্পণো হোদি ॥১।৫৭

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি পরদ্রব্য (এখানে দ্রষ্টব্য যে অক্ষ ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে); অর্থাৎ পুদ্‌গলময় কথিত হইয়াছে: আত্মার (চেতনা) স্বভাব সেগুলিতে বর্ত্তমান নাই। তাহাদের দ্বারা উপলব্ধ পদার্থ আত্মার কি করিয়া প্রত্যক্ষ হইবে?

জং পরদো বিণ্ণাণং তং তু পরোক্‌খ ত্তি ভণিদমট্ঠেসু।
জদি কেবলেণ ণাদং হবদি হি জীবেণ পচ্চক্‌খং ॥১।৫৮

পরের সহায়তায় পদার্থে (objects) যে বিশেষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু যে জ্ঞান মন ইন্দ্রিয়াদি পরদ্রব্যের সহায়তা বিনা কেবল আত্মারই সহায়তায় উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। (ইন্দ্রিয় মনো নিরপেক্ষমাত্মনঃ সাক্ষাৎ প্রবৃত্তমং প্রত্যক্ষমিত্যর্থঃ—আব, ভাষ্য)।

বৈশিষিকাদিগণ বলেন যে ইন্দ্রিয়গুলিই অক্ষ (মনক্ষমিন্দ্রিয়ং প্রোক্তম্, হৃষীকং করণং স্মৃতমিতি বচনাৎ)। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলির যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি তাহাই প্রত্যক্ষ (অক্ষং ইন্দ্রিয়ং প্রতিবর্ত্তত ইতি 'প্রত্যক্ষমিতি ব্যুৎপত্তেঃ)। অতএব সকল লোক প্রসিদ্ধ সাক্ষাদিন্দ্রিয়াশ্রিত ঘটাদিজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেন? না, ইন্দ্রিয়গুলির "উপলব্ধৃত্ব" অসম্ভব বলিয়া। অসম্ভব কেন? তাহারা অচেতন বলিয়া। তথা চাত্র প্রয়োগঃ—'যদ চেতনং তন্নোপলব্ধা—যাহা অচেতন, তাহা 'উপলব্ধা' হইতে পারে না, যথা 'ঘট'; দ্রব্যেন্দ্রিয়গুলিও অচেতন—'দ্রব্যেন্দ্রিয়াণি নির্বৃত্ত্যুপকরণানি...ইতি বচনাৎ; কিন্তু নির্বৃত্ত্যুপকরণ পুদ্‌গলময়, পুদ্‌গলময় সকলই অচেতন (পুদ্‌গলময়ং সর্বমচেতনম্...তস্মাদচেতনা পুদ্‌গলাঃ)। "উপলম্ভকত্ব" (perception) চেতনার ধর্ম, অচেতনের সে শক্তি নাই।

কিন্তু আমাদের সাধারণ প্রতীতি কি? ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষাৎ 'উপলম্ভকত্ব' কি মনে হয় না? মনে হয় না কি যে চক্ষু দুইটি রূপ, কান দুইটি শব্দ, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে? ইত্যাদি। কিন্তু প্রতীতি যাহাই হউক, ইহা মহামোহের দ্বারা অবষ্টব্ধ অন্তঃকরণপ্রসূত। মূর্খজন ইন্দ্রিয় ও আত্মার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়গুলিতে উপলব্ধৃত্বের আরোপ করিয়াছে কিন্তু নিগূঢ় সত্য হইতেছে এই যে আত্মাই শুধু উপলব্ধা। কিরূপে ইহা বুঝা যাইবে? উত্তরে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলেও তদ্দ্বারা উপলব্ধ অর্থের অনুস্মরণ হয়—ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। ধর, কেহ পূর্বে চক্ষু দ্বারা বিবক্ষিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে দৈবযোগে তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তবুও সে সেই পূর্বের 'অর্থ'কে স্মরণ করে। যদি চক্ষুই দ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে চক্ষুর অভাবে উপলব্ধ অর্থের অনুস্মরণ হইতে পারে না (হওয়া উচিত নয়)। কেন না চক্ষুর দ্বারা সেই অর্থের অনুভূতি হইয়াছিল, আত্মার দ্বারা নহে। চক্ষুই যদি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার অপগমে উপলব্ধ অর্থের অনুস্মরণ হয় কি করিয়া? কেন না, একজনের অনুভূত অর্থের স্মরণ অন্যের হইতে পারে না। যদি চক্ষুর নাশের কথা ছাড়িয়াই দিই, আর ধরি যে চক্ষুই দ্রষ্টা—তাহা হইলেও তো আত্মার স্মরণ হইতে পারে না—একের অনুভূত অর্থের স্মরণ অপরের হয় না বলিয়া। অথচ আত্মারই স্মরণ হয়, চক্ষুর স্মর্তৃত্বের কথা কেহ লেখেন নাই; অতএব আত্মাই উপলব্ধা, ইন্দ্রিয় নহে। দ্রব্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ অর্থ দ্রব্যেন্দ্রিয়ের নাশ হইলেও আত্মাই অনুস্মরণ করে। অতএব, এখন ঠিক হইল যে আত্মাই উপলব্ধা?

কেহ কেহ আবার বলেন যে—যেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া আত্মাতে জ্ঞানের প্রবর্তন হয়, সেই হেতু সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান; কিন্তু তাহা ভুল।

নন্দাধ্যয়নসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তথা চ তদ্‌গ্রন্থঃ—"পচ্চক্‌খং দুবিহং পন্নত্তং, তং জহা-ইংদিয় পচ্চক্‌খং চেতি"—। সত্য বটে, কিন্তু ইহা লোক ব্যবহার মানিয়া (অপেক্ষা করিয়া) উক্ত হইয়াছে, পরমার্থতঃ তাহা নহে। যে জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়কে আশ্রয়

করিয়া, অপর ব্যবধানরহিত হইয়া, উদিত হয়, তাহা লোকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ব্যাপারেও যে জ্ঞান, যেমন ধূমাদিকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি আদি বিষয় উদিত হয় তাহা লোকে পরোক্ষ বলিয়া কথিত হয়, কেন না সেখানে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপার অসম্ভব। পরন্তু যেখানে ইন্দ্রিয়েরও অপেক্ষা না করিয়া আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জাত হয়, তাহাই পরমার্থতঃ (প্রকৃত সত্যরূপে) প্রত্যক্ষ জ্ঞান—তাহাই হইতেছে অবধি আদি তিন প্রকার।

অতএব দেখা গেল যে লোকব্যবহারে ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানকে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়, বাস্তবিক তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। নন্দাধ্যয়নের পরবর্তী সূত্র পর্যালোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। পরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে তথায় উক্ত হইয়াছে—"পরোক্খং দুবিহং পন্নত্তং, তং জহা—আভিনিবোহিয়নাণং সুয়নাণম্" ইত্যাদি। সেখানে শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির আশ্রিত অবগ্রহাদির কথা বলা হইয়াছে এবং আভিনিবোধিক জ্ঞানকে অবগ্রহাদিরূপ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে যদি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত জ্ঞান সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তবে কেন অবগ্রহাদি জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে? অতএব পূর্বে ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানকে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হইয়াছে তাহা সাংব্যবহারিক, পরমার্থতঃ সত্য নহে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

একন্তেন পরোক্খং লিংগিয়মোহাইয়ং চ পচ্চক্খং।
ইংদিয় মনোভবং জং তং সংববহার পচ্চক্খং॥

প্রকৃতপক্ষে অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। মতি ও শ্রুত পরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু লোক ব্যবহারে তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ। সেই জন্য প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পারমার্থিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া পরবর্তী দার্শনিকগণ অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সিদ্ধসেন দিবাকর তাঁহার ন্যায়াবতারে এই নূতন সংজ্ঞা উদ্ভাবন করেন, পরে জিনভদ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সংজ্ঞার পারমার্থিক প্রত্যক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) সকল (কেবল জ্ঞান) ও (২) বিকল (অবধি ও মনঃপর্যায়)।

তদ্বিকলং সকলং চ। তত্র বিকলমবধিমনঃপর্যায়জ্ঞানরূপ-তয়া দ্বেধা। সকলং তু কেবল জ্ঞানম্। (প্রমাণ-ন্যায়তত্ত্বালোকালঙ্কার ২,১৯,২০,২৩)

ন্যায়াবতারে আছে—

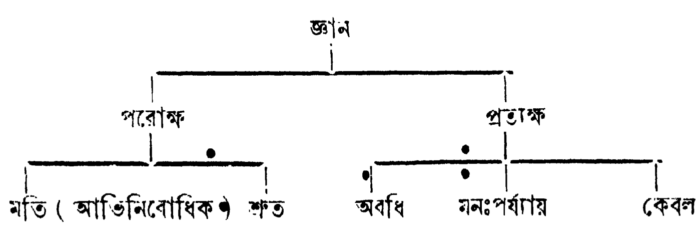
সকলাবরণ মুক্তাত্ম কেবলং যৎ প্রকাশতে।
প্রত্যক্ষং সকলার্থাত্ম সততপ্রতিভাসনম্ ॥২৭॥

"তৎ-সর্বথাবরণ বিলয়ে চেতনস্য স্বরূপাবির্ভাবো মুখ্যং কেবলম্।" "তত্তারতম্যেঽবধিমনঃ পর্যায়ৌ চ।" —প্রমাণ-মীমাংসা, ১, ১, ১৫ ও ১৮।

জৈন দর্শনে প্রমাণ মাত্র দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। কিন্তু সিদ্ধসেন দিবাকর প্রত্যক্ষের নূতন মানে করেন, যেমন—প্রত্যক্ষের মানে ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ জ্ঞান ও পরোক্ষের মানে অনুমান ইত্যাদিলব্ধ জ্ঞান। বৌদ্ধ-যোগাচার দর্শনের যুক্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত তাহার এই উদ্ভাবনার প্রয়োজন হয়। ধর্মকীর্তিই প্রথমে প্রত্যক্ষকে "অভ্রান্ত" বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু সিদ্ধসেন দিবাকর প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দুইকেই 'অভ্রান্ত' বলিয়াছেন। (অনুমানং তদভ্রান্তং প্রমাণত্বাৎ সমক্ষবৎ।৫।)। এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইব না। পরোক্ষ জ্ঞানেরও পঞ্চবিধ বিভাগ হইয়াছিল—যথা স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান, তর্ক, অনুমান ও আগম। ইহার আলোচনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, অতএব এইখানে ক্ষান্ত হইতেছি।

প্রবন্ধের সারাংশ

১। (জৈন আগম মতে)



২। (উমাস্বাতির তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের মতে—সঙ্ক্ষিপ্ত)

জ্ঞান

- পরোক্ষ
  - মতি
    - জ্ঞান
    - অজ্ঞান (কুমতি)
  - শ্রুত
    - জ্ঞান
    - অজ্ঞান (কুশ্রুত)
- প্রত্যক্ষ
  - অবধি
    - জ্ঞান
    - অজ্ঞান (বিভঙ্গাবধি)
  - মনঃপর্য্যায়
  - কেবল

৩। (উত্তরকালের জৈন-ন্যায়দর্শনের মতে)

প্রমাণ

- প্রত্যক্ষ
  - সাংব্যবহারিক
    - ইন্দ্রিয় নিবন্ধন
    - অনিন্দ্রিয় নিবন্ধন
      - অবগ্রহ
      - ঈহা
      - অবায়
      - ধারণা
  - পারমার্থিক
    - সকল
      - কেবল
    - বিকল
      - অবধি
      - মনঃপর্য্যায়
- পরোক্ষ
  - স্মরণ
  - প্রত্যভিজ্ঞান
  - তর্ক
  - অনুমান
    - স্বার্থ
    - পরার্থ
  - আগম

আত্মীয়া

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

সেদিন অকুতোভয়ে উঠিলে ভাসিয়া
জনশূন্য সিকতায় সাগরের পরী,

উপলবন্ধুর বেলা ত্বরিতে উত্তরি'
যে শিলাফলকে আমি ছিলেম বসিয়া
সেথা আসি পার্শ্বে মোর বসিলে নীরবে
চির-পরিচিতা সম, লজ্জাকুণ্ঠাহারা
সরল নিরাবরণে, নয়নপল্লবে
ঝরিল অজানা ভাষা ঝরণার পারা।

মগ্ন-চেতনায় মোর উঠিল বুদ্‌বুদি'
অন্তর্গূঢ় কোন্ বাণী, কভু যাহা মুখে
ফোটে নাই কোনোদিন। তুমি আঁখি মুদি'
হাতখানি রাখি হাতে শুনিলে তা সুখে।
বুঝিলাম একদিন ছিনু সিন্ধুবাসী,
স্বদেশী বঁধরে দেখা দিলে কাছে আসি।

ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পত্রাদি

বাতি নিবাইয়া গৌরী শয্যায় শয়ন করিল, অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিলনা; মস্তিষ্কের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু যেন দুই বিপক্ষ দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে হানাহানি করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল।

বুকজোড়া এই অশান্ত অন্ধ সংগ্রাম সে কেবল একটিমাত্র দুষ্প্রাপ্য নারীকে কেন্দ্র করিয়া—তাহা ভাবিয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে একটা চাপা বেদনাবিদ্ধ শব্দ বাহির হইল—উঃ! কস্তুরী আজ বাসক-সজ্জায় সাজিয়া নব-বধূর মত দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর—সে তাহাকে দেখিয়াও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির সমস্ত সান্ত্বনা ছাপাইয়া এই দুঃসহ মনঃপীড়াই তাহার হৃৎপিণ্ডকে পিষিয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল—পালাইয়া যাই! চুপি চুপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের দেশে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়া যাই। সেখানে দাদা আছেন, বৌদিদি আছেন—ভুলিতে পারিব না? এই মায়াপুরীর মোহময় ইন্দ্রজাল হইতে মুক্তি পাইব না! না পাই—তবু ত প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব; পরস্ত্রীলুব্ধ মিথ্যাচারীর জীবন-যাপন করিতে হইবে না!

কিন্তু—

পালাইবার উপায় নাই। তাহার হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা। সে ত ঝিন্দের রাজা নয়—ঝিন্দের বন্দী। আরব্ধ কার্য শেষ না করিয়া, একটা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ওলট-পালট করিয়া দিয়া সে পালাইবে কোন মুখে? নিজের দুঃখ তাহার যত মর্ম্মভেদীই হোক, একটা রাজ্যকে বিপ্লবের কোলে তুলিয়া দিয়া ভীরুর মত পালাইবার অধিকার তাহার নাই; পালাইলে শুধু সে নয়, সমস্ত বাঙালী জাতির মুখে কালী লেপিয়া দেওয়া হইবে।—না, তাহাকে থাকিতে হইবে। যদি কখনো শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে পারে তবে তাহার হাতে কস্তুরীকে তুলিয়া দিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বিদায় লইতে পারিবে—তার আগে নয়।

সমস্ত রাত্রি গৌরী ঘুমাইতে পারিল না; মোহাচ্ছন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবৎখানার বাজনা শুনিয়া গেল। ভোরের দিকে একটু নিদ্রা আসিল বটে, কিন্তু নিদ্রার মধ্যেও তাহার মন অশান্ত সমুদ্রের মত পাষাণ প্রতিবন্ধকে বারবার আছাড়িয়া পড়িয়া নিজেকে শতধা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

বেলা আটটার সময় বজ্রপাণি আসিয়াছেন শুনিয়া সে জবাফুলের মত আরক্ত চোখ মেলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। চম্পা সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি চান তিনি?'

চম্পা গৌরীর মুখের চেহারা দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়াছিল, গিন্নীপনা করিবার সাহসও আজ তাহার হইল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল 'জানিনা।'

গৌরী বোধকরি বজ্রপাণিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি নিজেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌরীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—'একি! আপনার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? শরীর কি অসুস্থ?—চম্পা! ডাক্তার গঙ্গানাথকে খবর পাঠাও।'

চম্পা গমনোদ্যত হইলে গৌরী বলিল, 'না না—ডাক্তার চাইনা, আমি বেশ ভালই আছি। আপনি কি জরুরী কিছু বলতে চান?'

বজ্রপাণি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—'হাঁ—কিন্তু আপনার শরীর যদি—'

গৌরী শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—'আপনি ওঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মুখ-হাত ধুয়েই যাচ্ছি।—

চম্পা, আমার জন্যে এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ তৈরী করে আনতে পার?'

চম্পা একবার মাথা ঝুঁকাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আধঘণ্টা পরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌরী ভোজন কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রাত-রাশ টেবলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু সে তাহা স্পর্শ করিল না। চম্পা থালার উপর সরবতের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বাদাম মিছরি ও গোলমরিচ দিয়া প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই সহাস্যমুখে এক চুমুক পান করিয়া গৌরী বলিল, 'আঃ! চম্পা, তোমার জন্যেই ঝিন্দের রাজাগিরি কোনোমতে বরদাস্ত করছি; তুমি যেদিন বিয়ে হয়ে বরের ঘরে চলে যাবে, আমিও সেদিন ঝিন্দ ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাব।'

চম্পার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সে বলিল, 'রাজবাড়ী ছেড়ে আমি একপাও নড়ব না—আপনি যদি তাড়িয়ে দেন, তবু না।'

সরবতের পাত্রে আর এক চুমুক দিয়া গৌরী বলিল, 'তোমাকে রাজবাড়ী থেকে তাড়াতে পারি এত সাহস আমার নেই। বরঞ্চ তুমিই আমাকে তাড়াতে পার বটে। তুমি চলে গেলেই আমাকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যাতে না যাও তার ব্যবস্থা আমায় করতে হচ্ছে।—দেওয়ানজী, চম্পার বিয়ের আর কোনো কথা উঠেছে?'

বজ্রপাণি অদূরে কৌচে বসিয়াছিলেন; বলিলেন, 'হ্যাঁ, ত্রিবিক্রম ত অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছেন—'

'তাঁকে চেষ্টা করতে বারণ করে দেবেন। চম্পার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব—কি বল চম্পা?'

চম্পা কিছুই বলিল না। বিবাহের ব্যবস্থা বাবাই করুন আর রাজাই করুন, বিবাহ জিনিসটাতেই তাহার আপত্তি। সে ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু হাসি ভাল ফুটিল না।

রুদ্ররূপ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৌরী বলিল—'আর, রুদ্ররূপেরও একটা বিয়ে দিতে হবে। আমার আশেপাশে যারা থাকে তাদের আমি সুখী দেখতে চাই।' গৌরীর ঠোঁটের উপর দিয়া ক্ষণকালের জন্য যে ব্যথা-বিদ্ধ হাসিটা খেলিয়া গেল তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

কিন্তু গৌরীর কথার ইঙ্গিত রুদ্ররূপের কানে পৌঁছিল। তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল; সে ফৌজী কায়দায় শূন্যের দিকে তাকাইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় সর্দ্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। গৌরী নিঃশেষিত সরবতের পাত্র চম্পাকে ফেরৎ দিয়া মুখ মুছিয়া বলিল—'এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক। দেওয়ানজী, আরম্ভ করুন।'

বজ্রপাণি তখন কাজের কথা ব্যক্ত করিলেন। রাজ-বংশের রেওয়াজ এই, যে, যুবরাজের তিলক সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর ভাবী যুবরাজ-পত্নীকে বংশের সাবেক অলঙ্কারাদি উপঢৌকন পাঠানো হয়—এই সকল অলঙ্কার পরিয়া কন্যার বিবাহ হয়। এ প্রথা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই। শঙ্কর সিংকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে এই আশাতেই এতদিন বিলম্ব করা হইয়াছে। কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়; অদ্যই সমস্ত উপঢৌকন ঝড়োয়ায় পাঠানো প্রয়োজন। নচেৎ, এই ত্রুটির সূত্র ধরিয়া অনেক কথার উৎপত্তি হইতে পারে।

শুনিয়া গৌরী বলিল,—'বেশ ত। রেওয়াজ যখন, তখন করতে হবে বৈ কি। এর জন্যে আমার অনুমতি নেবার কোনো দরকার ছিলনা—আপনারা নিজেরাই করতে পারতেন।—তা' কে এসব গয়না-পত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? এ বিষয়েও রেওয়াজ আছে নাকি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা নিয়ে যাবে। অবশ্য তার সঙ্গে রক্ষী থাকবে।'

গৌরী বলিল, 'বেশ। রুদ্ররূপ চম্পার রক্ষী হ'য়ে যাক।—তাহলে দেওয়ানজী, আর বিলম্ব করবেন না—সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

বজ্রপাণি ও ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন। চম্পা মহানন্দে সাজসজ্জা করিতে গেল।

গৌরী মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া অনেকক্ষণ শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল—সম্মুখের বারান্দায় কেবল রুদ্ররূপ পায়চারি করিতেছে। গৌরী অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিল। রুদ্ররূপ কাছে আসিলে বলিল, 'সর্দ্দার কোথায়?'

'তিনি আর দেওয়ানজী তোষাখানার দিকে গেছেন।'

গৌরী তখন গলা নামাইয়া বলিল—'তুমি যাও, চম্পার

কাছ থেকে চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে এস। চুপি চুপি, বুঝলে ?'

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল। সদর হইতে লেখার সরঞ্জাম না আনাইয়া চম্পার নিকট হইতে আনাইবার কারণ কি তাহাও আন্দাজ করিয়া লইল। অন্দরের যে অংশটায় চম্পার মহল সেখানে রুদ্ররূপ পূর্ব্বে কখনো পদার্পণ করে নাই; একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে ঠিকানা জানিয়া লইল। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। একটু ইতস্তত করিয়া দরজায় টোকা মারিল, তারপর ভাঙা গলায় ডাকিল—'চম্পা দেঈ!'

কবাট খুলিয়া একজন দাসী মুখ বাড়াইল। রুদ্ররূপকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'কাকে দরকার সর্দ্দারজী!'

'চম্পা দেঈ আছেন?'

'আছেন। ঝড়োয়ায় যেতে হবে তাই তিনি সাজগোজ করছেন।'

রুদ্ররূপ বড় বিপদে পড়িল। চম্পাকে সে মনে মনে ভারি ভয় করে, এ সময় তাহাকে ডাকিলে সে যে চটিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে রাজার হুকুম। সাহসে ভর করিয়া সে বলিল, 'তাঁর সঙ্গে জরুরী দরকার আছে, তাঁকে খবর দাও। আর, তুমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাও।'

পরিচারিকা চম্পার খাস চাকরাণী, বাপের বাড়ী হইতে সঙ্গে আসিয়াছে; সে একটু আশ্চর্য্য হইল। একে ত অন্দর-মহলে পুরুষের গতিবিধি অত্যন্ত কম, তাহার উপর রুদ্র-রূপের অদ্ভুত হুকুম শুনিয়া সে থতমত খাইয়া বলিল, 'কিন্তু —, এত্তেলা তাঁকে আমি এখনি দিচ্ছি। কিন্তু—তিনি এখন সিঙার করছেন—'

রুদ্ররূপ একটু গরম হইয়া বলিল—'তা করুন—'

ভিতর হইতে চম্পার কণ্ঠ শুনা গেল—'রেওতি, কে ও? কি চায়?'

রেবতী দ্বার ভেজাইয়া দিয়া কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে গেল। রুদ্ররূপ অস্বস্তিপূর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে আবার দরজা খুলিল; রেবতী বলিল—'আসুন।'

রুদ্ররূপ সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর আর একটি ঘর, মাঝখানে পর্দ্দা। এই পর্দ্দার ভিতর হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া চম্পা দাঁড়াইয়া আছে, রুদ্ররূপকে দেখিয়াই বলিল—'তোমার আবার এই সময় কি দরকার হল? শিগ্‌গির বল, আমার সময় নেই। এখনো চুল বাঁধতে বাকি।'

রুদ্ররূপ রেবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল—'তুমি বাইরে যাও'—চম্পার প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—'ভারি গোপনীয় কথা।'

চম্পা মুখে অধীরতা সূচক একটা শব্দ করিল। রেবতীকে মাথা নাড়িয়া ইসারা করিতেই সে বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপনীয় কথা বলিতে হইবে, চীৎকার করিয়া বলা চলে না। রুদ্ররূপ কৈ মাছের মত কোণাচে ভাবে চম্পার নিকটবর্ত্তী হইল। চম্পা চোখে বোধ করি কাজল পরিতেছিল, প্রসাধন এখনো শেষ হয় নাই; সে কাজলপরা বাম চক্ষে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'কি হয়েছে?'

রুদ্ররূপের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে একবার গলা খাঁকারি দিয়া চম্পার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গদগদ স্বরে বলিল—'রাজা চিঠির কাগজ চাইছেন।'

'এই তোমার গোপনীয় কথা!'—রাগের মাথায় চম্পা পর্দ্দা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল; আবার তখনি নিজের অসম্পূর্ণ বেশ-বিন্যাসের দিকে তাকাইয়া পর্দ্দার ভিতর লুকাইল। ওড়না গায়ে নাই, শাড়ীর আঁচলটাও মাটিতে লুটিতেছে; এ অবস্থায় রুদ্ররূপের সম্মুখীন হওয়া চলে না—তা যতই রাগ হোক।

রুদ্ররূপ কাতরভাবে বলিল—'সত্যি বলছি চম্পা, রাজা বললেন তোমার কাছ থেকে চুপি চুপি চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে আনতে। বোধ হয় চিঠি লিখবেন।'

'তুমি একটা—তুমি একটা—' চম্পা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল—'তুমি একটি বুদ্ধু।'

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রুদ্ররূপ বলিয়া ফেলিল—'আর তুমি একটি ডালিম ফুল।' বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুণ্ড ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

চম্পা কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার সিন্দূরের মত মুখের পানে তাকাইয়া রহিল; তারপর পর্দ্দা আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল।

রুদ্ররূপ ঘর্ম্মাক্ত দেহে ভাবিতে লাগিল—পলায়ন করিবে কিনা। কিছুক্ষণ পরে চম্পার হাত পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—'এই নাও।'

কাগজ কলম লইয়া মুখ তুলিতেই রুদ্ররূপ দেখিল, পর্দ্দার ফাঁকে কেবল একটি কাজলপরা চোখ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ভড়্‌কানো ঘোড়ার মত সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল; হোঁচট খাইতে খাইতে রাজার কাছে ফিরিয়া গেল।

লেখার সরঞ্জাম লইয়া গৌরী বলিল—'তুমি পাহারায় থাক। যদি সর্দ্দার কিম্বা আর কেউ আসে, আগে খবর দিও।'

রুদ্ররূপকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া গৌরী চিঠি লিখিতে বসিল। দু'খানা কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবার পর সে লিখিল—

কৃষ্ণা,

তোমাদের কাছে আমার অপরাধ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে; তবু যদি সম্ভব হয় ক্ষমা কোরো। কস্তুরী কি খুব রাগ করেছেন? তাঁকে বোলো, আমি অতি অধম, তাঁর অভিমানের যোগ্য নই। এমন কি, তাঁর হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি আমাকে ভুলে যেতে পারবেন না কি? চেষ্টা করলে হয়ত পারবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন সে চেষ্টা করেন। ইতি

শঙ্কর সিং নামধারী হতভাগ্য

চিঠি লিখিয়া গৌরী নিজের কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। তারপর চম্পা যখন সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া তাহার হুকুম লইতে আসিল তখন সে চিঠিখানা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল—'যাও, কৃষ্ণার হাতে চিঠি দিও।' চম্পা বুকের মধ্যে চিঠি লুকাইয়া রাখিল।

অতঃপর শোভাযাত্রা করিয়া উপঢৌকন বাহীর দল যাত্রা করিল। চারিটি সুসজ্জিত হাতী; প্রথমটির পৃষ্ঠে সোনালী হাওদায় সূক্ষ্ম মসলিনের ঘেরাটোপের মধ্যে চম্পা বসিল। বাকী তিনটিতে অলঙ্কারের পেটারি উঠিল। ত্রিশজন সওয়ার লইয়া রুদ্ররূপ ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পশ্চাতে একদল যন্ত্র-বাদক ঝলমলে বেশ-ভূষা পরিয়া অতি মিঠা সুরে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে অনুসরণ করিল।

তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া গৌরী ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি বৈঠকে আসিয়া বসিলেন। বাহিরের কেহ ছিল না; অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ একথা-সেকথা হইবার পর গৌরী সহসা বলিয়া উঠিল—'ভাল কথা সর্দ্দার, ওরা আমার নাম ধাম পরিচয় সব জানতে পেরে গেছে।'

ধনঞ্জয় সচকিত হইয়া বলিলেন—'কি রকম?'

গতরাত্রে প্রহ্লাদ দত্তের দোকানে ও উদিতের বাগান বাড়ীর সম্মুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল গৌরী সব বলিল। টেলিগ্রামখানাও দেখাইল। দেখিয়া শুনিয়া ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে ধনঞ্জয় বলিলেন—'হুঁ, ওরাই আমাদের সব খবর পাচ্ছে দেখছি, আমরা ওদের সম্বন্ধে কিছুই পাচ্ছি না। যাহোক, ঐ হতভাগা স্বরূপদাসটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে আনতে হচ্ছে; ওই হল ওদের গুপ্তচর। আর, প্রহ্লাদ দত্ত যখন এর মধ্যে আছে তখন তাকেও সাপ্‌টে নিতে হবে। এরাই উদিতের হাত-পা, এদের শায়েস্তা না করতে পারলে উদিতকে জব্দ করা যাবে না।' বলিয়া বজ্রপাণির দিকে চাহিলেন।

বজ্রপাণি ঘাড় নাড়িলেন—'স্বরূপদাসকে সহজেই গ্রেপ্তার করা যাবে। সে ষ্টেট-রেলওয়ের চাকর, বিনা অনুমতিতে ষ্টেশন ছেড়েছিল এই অপরাধে তার চাকরি ত যাবেই, তাকে জেলে পাঠানোও চলবে। কিন্তু প্রহ্লাদ সাধারণ দোকানদার—তাকে কোন্ ওজুহাতে—' দেওয়ান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ধনঞ্জয় বলিলেন—'যাহোক, কোতোয়ালীতে খবর দিই তারা স্বরূপদাসকে ধরুক, আর, আপাতত প্রহ্লাদের ওপর নজর রাখুক—' তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

এই সময় একজন দ্বাররক্ষী আসিয়া খবর দিল যে শহর হইতে এক দোকানদার মহারাজের ক্রীত জিনিষপত্র পাঠাইয়াছে। ধনঞ্জয় সপ্রশ্ননেত্রে গৌরীর পানে তাকাইলেন, গৌরী বলিল—'হ্যাঁ—প্রহ্লাদের দোকানে কিছু জিনিস কিনেছিলাম।—এখানেই আনতে বল।'

একখানা বড় চাঁদির পরাতে রেশমের খুঞ্চেপোষ-ঢাকা দ্রব্যগুলি লইয়া ভৃত্য উপস্থিত হইল। আবরণ খুলিয়া সকলে সুদৃশ্য সৌখীন জিনিসগুলি দেখিতে লাগিলেন। গৌরী দেখিল, জিনিসগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাতির দাঁতের কৌটা রহিয়াছে যাহা সে কেনে নাই। সেটা তুলিয়া লইয়া ঢাকনি খুলিতেই দেখিল তাহার ভিতরে একখানি চিঠি।

গৌরী প্রথমে ভাবিল, পণ্যগুলির মূল্যের তালিকা;

কিন্তু চিঠি খুলিয়া দেখিল—বাংলা চিঠি। সবিস্ময়ে পড়িল—

দেবপাল মহারাজ,

আপনাকে বাংলায় চিঠি লিখিতেছি যাহাতে অন্য কেহ এ চিঠির মর্ম্ম বুঝিতে না পারে। আপনি কে তাহা আমি জানি।

কাল আপনাকে স্বচক্ষে দেখিয়া ও আপনার সহিত কথা কহিয়া আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এতদিন অন্য পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমি বাঙালী। আমি যদি আপনাকে সাহায্য না করি তবে এই বিদেশে আর কে করিবে? তাই, আজ হইতে আমি ওপক্ষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে পারিব না। যদি উহারা আমায় সন্দেহ করে তাহা হইলে আমার জীবন সঙ্কট হইয়া পড়িবে, আপনি বা আর কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমি গোপনে গোপনে যতদূর সম্ভব আপনাকে সাহায্য করিব। ও-পক্ষের অনেক খবর আমি পাই—প্রয়োজনীয় মনে হইলে আপনাকে জানাইব।

আপনাকে চিঠি লেখা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আরো বিপজ্জনক। তাই, চিঠিতেই সংক্ষেপে যাহা জানি আপনাকে জানাইতেছি। আপনি যদি আরো কিছু জানিতে চাহেন, এই কৌটায় চিঠি লিখিয়া কৌটা ফেরৎ পাঠাইবেন—বলিয়া দিবেন কৌটা পছন্দ হইল না।

উপস্থিত সংবাদ এই—আপনারা যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে চান তবে শীঘ্র শক্তিগড়ে গিয়া সন্ধান করুন। তিনি সেইখানেই আছেন। কেল্লার পশ্চিম দিকের প্রাকারের নীচে নদীর জলের চার-পাঁচ হাত উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালা আছে। ঐ জানালা যে ঘরের—সেই ঘরে শঙ্করসিং বন্দী আছেন। প্রায় সকল সময়েই তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখা হয়। তাছাড়া একজন লোক সর্ব্বদা পাহারায় থাকে।

ইহার অধিক আমি কিছু জানি না। এই চিঠি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পত্রপাঠ ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। মহারাজের জয় হোক। ইতি

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী চরণাশ্রিত শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত।

গৌরী চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া ভৃত্যকে বলিল—'এ সব জিনিস তুমি চম্পা দেঈর মহলে পাঠিয়ে দাও। যে-লোক এগুলো নিয়ে এসেছে তাকে বল, যদি কোনো জিনিস অপছন্দ হয় ফেরৎ পাঠানো হবে।'

ভৃত্য 'যো হুকুম' বলিয়া পরাত হস্তে প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি দুজনেই গৌরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন; ভৃত্য অন্তর্হিত হইলে ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, —'চিঠিতে কি আছে?'

গৌরী বলিল—'আগে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এস।'

দরজা বন্ধ করিয়া তিনজনে ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিলেন। গৌরী তখন প্রহ্লাদের চিঠি পড়িয়া শুনাইল। তারপর তিনজনে মাথা একত্র করিয়া নিম্নস্বরে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। অনেক যুক্তি-তর্কের পর স্থির হইল—যে কোনো ছুতায় শক্তিগড়ের নিকটে গিয়া আড্ডা গাড়িতে হইবে—রাজধানীতে বসিয়া থাকিলে কোনো কাজই হইবে না। উদিত সিং কেল্লায় তাঁহাদের ঢুকিতে না দিতে পারে কিন্তু কেল্লার বাহিরে যদি তাঁহারা তাঁবু ফেলিয়া থাকেন তাহা হইলে সে কিছু করিতে পারিবে না। তখন সেখানে বসিয়া স্থান কাল ও সুযোগ বুঝিয়া শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিবার একটা মতলব বাহির করা যাইতে পারে।

উপস্থিত দেওয়ান বজ্রপাণি রাজধানীতে থাকিয়া এদিক সামলাইবেন; ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ আরো সহচর সঙ্গে লইয়া গৌরীর সঙ্গে থাকিবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া যখন তাঁহারা শ্রান্তদেহে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তখনো তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন না। এই সময় সদরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া ধনঞ্জয় জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ময়ূরবাহন তাহার কালো ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতেছে। তিনি চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ময়ূরবাহন এসেছে! বসুন—উঠবেন না।'

তিনজনে আবার উপবিষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই দৌবারিক খবর দিল, ময়ূরবাহন জরুরী কাজে মহারাজের দর্শন চান।

গৌরী বলিল—'নিয়ে এস।'

ময়ূরবাহন প্রবেশ করিল। তাহার মাথার পাগড়ীর খাঁজে ধূলা জমিয়াছে—পাৎলা গোঁফের উপরেও ধূলার সূক্ষ্ম প্রলেপ; দেখিলেই বোঝা যায় সে শক্তিগড় হইতে সোজা ঘোড়ার পিঠে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অঙ্গে বা মুখের ভাবে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই। ঘরে ঢুকিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট

তিনজনকে দেখিয়া সে সকৌতুকে হাসিয়া অবহেলাভরে একবার ঘাড় নীচু করিয়া অভিবাদন করিল। বলিল—'সপার্ষদ মহারাজের জয় হোক।'

রাজার সম্মুখে আদব কায়দার যে রীতি আছে তাহা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন না করিয়াও ধৃষ্টতা প্রকাশ করা যায়। ময়ূরবাহনের বাহ্য শিষ্টাচারের ক্ষীণ পর্দ্দার আড়ালে যে বেপরোয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইলনা। তাহার দুই চক্ষে দুষ্ট কৌতুক নৃত্য করিতেছিল; রক্তের মত রাঙা ওষ্ঠাধরে যে হাসিটা খেলা করিতেছিল তাহা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ। তাহার কথাগুলার অন্তর্নিহিত গুপ্তশ্লেষ সকলের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল।

গৌরী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে ময়ূরবাহনকে অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু তাহার এই স্পর্দ্ধা গৌরীর গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল; সে অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলিল—'কি চাও তুমি? যা বলতে চাও শীঘ্র বল, সময় নষ্ট করবার আমাদের অবকাশ নেই।'

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি আরো বাঁকা হইয়া উঠিল; সে কৃত্রিম বিনয়ের একটা ভঙ্গি করিয়া বলিল—'ঠিক বলেছেন মহারাজ। রাজ্য ভোগ করবার অবকাশ যখন সংক্ষিপ্ত তখন সময় নষ্ট করা বোকামি। আমি কারুর সুখভোগে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনা, আমার জীবনের উদ্দেশ্যই তা নয়। কুমার উদিত সিং আপনাকে একটি নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন, সেইটে হুজুরে দাখিল করেই আমি ফিরে যাব। কোমরবন্ধ হইতে একখানা চিঠি লইয়া গৌরীর সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

গৌরী নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ ময়ূরবাহনের দিকে তাকাইয়া রহিল কিন্তু ময়ূরবাহনের চোখের পল্লব পড়িল না। তখন সে চিঠি লইয়া মোহর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

"ওরে বাংগালী নটুয়া, তুই কি জন্য মরিতে এদেশে আসিয়াছিস? তোর কি প্রাণের ভয় নাই! তুই শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পালইয়া যা—নচেৎ পিঁপড়ার মত তোকে টিপিয়া মারিব।

"তোর নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া তুই নটুয়ার নাচ দেখা—পয়সা মিলিবে। এদেশে তোর দর্শক মিলিবেনা।"

পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আরক্ত চক্ষে বলিল—'এ কি চিঠি?' বলিয়া কম্পিতহস্তে কাগজখানা ময়ূরবাহনের সম্মুখে ধরিল।

ময়ূরবাহন বিস্ময়ের ভান করিয়া চিঠিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তার পর, যেন ভুল করিয়াছে এমনভাবে বলিল—'ওঃ তাইত! ও চিঠিখানা আপনার জন্য নয়, ভুলক্রমে আপনাকে দিয়ে ফেলেছি। এই নিন্ আপনার চিঠি!' বলিয়া আর একখানা চিঠি বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। প্রথম চিঠিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া অবহেলাভরে গোলা পাকাইয়া ঘরের এক কোনে ফেলিয়া দিল।

গৌরী অসীমবলে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—'তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার।'

ময়ূরবাহন বলিল—'নিশ্চয়। শুধু বুড়ো মন্ত্রীর কাছে একটা পরামর্শ নেওয়া বাকি আছে।—দেওয়ানজী, বলতে পারেন, যারা রাজ-সিংহাসনে বিদেশী মর্কটকে বসিয়ে নাচ দেখে তাদের শাস্তি কি?'

গৌরী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলনা; গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—'চোপরও বদজাত কুকুরের বাচ্চা—নইলে তোকে ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার ডান হাতখানা সরীসৃপের মত কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সাপের মত চোখদুটা গৌরীর মুখের উপর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিল। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মুষ্টিতে যে জিনিসটি ছিল তাহা দেখিবামাত্র ময়ূরবাহনের হাত তরবারি হইতে সরিয়া গেল। সে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, সেই নির্ভীক বেপরোয়া হাসি। তার পর দেহের একটা হিল্লোলিত ব্যঙ্গপূর্ণ ভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। বজ্রপাণি এইবার সেটা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন—

"স্বস্তি শ্রীমন্মহারাজ শঙ্করসিং দেবপাদ জ্যেষ্ঠের নিকট অনুগত অনুজ শ্রীউদিত সিংয়ের সানুনয় নিবেদন—আমার জমিদারীতে সম্প্রতি হরিণ শূকর প্রভৃতি অনেক শিকার

পড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও যদি মহারাজ মৃগয়ার্থ শুভাগমন করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। অলমিতি।"

বজ্রপাণি পত্রটি নিঃশব্দে ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। গৌরী কিছুক্ষণ অসহ্য ক্রোধে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিল। ময়ূরবাহনের ধৃষ্টতা তাহার দেহ-মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; নূতন চিঠিতে কি আছে না আছে তাহা দেখিবার মত তাহার মনের অবস্থা ছিলনা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে ঝাঁপ

চম্পা যখন ঝড়োয়া হইতে ফিরিল তখন অপরাহ্ণ। কিস্তার ধারের বারান্দায় গৌরী মেঘাচ্ছন্ন মুখে বুকে হাত বাঁধিয়া পাদচারণ করিতেছিল। সঙ্গে কেহ ছিলনা। ময়ূরবাহনের শ্লেষ-বিদ্রূপ একটা কাজ করিয়াছিল; গৌরীর মনে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে যে আলস্যের ভাব আসিয়াছিল তাহাকে সে চাবুক মারিয়া একটু বেশীমাত্রায় চাঙ্গা করিয়া দিয়া গিয়াছিল। অপমান জর্জ্জরিত বুকে গৌরী ভাবিতেছিল—প্রাণ যায় যাক, শঙ্কর সিংকে ঐ ধৃষ্ট কুকুরগুলার কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আর কলা-কৌশল নয়, রক্তে সাঁতার দিয়া যদি এ কাজ সিদ্ধ করিতে হয় তাও সে করিবে। ময়ূরবাহনের মত স্পর্দ্ধিত শয়তানগুলাকে সে দেখাইয়া দিবে—বাঙালী কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত।

বাঙালী নটুয়া! ঐ কথাটাতেই তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। ময়ূরবাহনও উদিত সিংয়ের রক্ত দিয়া এ অপমানের লাঞ্ছনা যতক্ষণ সে মুছিয়া দিতে না পারিবে ততক্ষণ যে তাহার প্রাণে শান্তি নাই তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এই প্রতিহিংসার পিপাসার কাছে নিজের প্রাণের মূল্যও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল।

চম্পার পায়জনিয়ার আওয়াজ শুনিয়া গৌরী রক্তরাঙা চিন্তার আবর্ত্ত হইতে উঠিয়া আসিল। চম্পা কোনো কথা না বলিয়া নিজের আঙ্‌রাখার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। চিঠির উত্তর গৌরী প্রত্যাশা করে নাই, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেটা খুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহিরে ভারী নাগরার শব্দ শুনা গেল। গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা পকেটে পূরিল।

ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন; তাঁহার হাতে একখানা কাগজ। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কি সর্দ্দার?'

সর্দ্দার বলিলেন—উদিতের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে চিঠি লেখা হল। এটাতে একটা সহি দস্তখৎ করে দিন।'

গৌরী চিঠিখানা পড়িয়া দস্তখৎ করিতে করিতে বলিল—'কবে যাওয়া স্থির করলে?'

'এখনো স্থির করিনি। আপনি কবে বলেন?'

'কালই। আর দেরী নয় সর্দ্দার, যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের কাজকর্ম্ম চুকিয়ে দিয়ে আমি যেতে চাই, তা সে যেখানেই হোক—'

ধনঞ্জয় চকিতে চম্পার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'চম্পা, তুমি ক্লান্ত হয়েছ; কাপড়চোপড় ছাড়গে যাও।'

চম্পা প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা জানে না। যাহোক, কি বলছিলেন?'

'বলছিলাম, যেখানে হোক এবার আমি যেতে চাই—, তা পরলোক হলেও দুঃখ নেই। মনে একটা পূর্ব্বাভাস পাচ্ছি যে আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধের ঘোড়ার মত আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে; তোমাদের আস্তাবল থেকে তাকে এবার ছেড়ে দাও—সে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াক্। তারপর যা হবার হবে। যদি মৃত্যুই আসে তাতে আক্ষেপ করবার কিছু নেই; কারণ, জীবনটাকে আঙুরের মত তুলোর পেটারির মধ্যে ঢেকে রেখে বেঁচে থাকাকে আমি বেঁচে থাকা মনে করিনা।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া দুহাতে তাহার দুই স্কন্ধ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—'রাজা, আজ আপনার মন ভাল নেই। মৃত্যুকে কোন্ মরদ পরোয়া করে? মৃত্যু আমাদের কাছে খেলার বস্তু উপহাসের বস্তু—তার কথা বেশী চিন্তা করলে তাকে বড় করে তোলা হয়। সুতরাং মৃত্যুর কথা আমরা ভাববনা; আমরা ভাবব শুধু কাজের কথা, কর্ত্তব্যের কথা। যে দুশ্‌মন আমাদের বাধা দিয়েছে অপমান করেছে তাদের বুকে পা দিয়ে কি করে আমরা তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব—এই হবে আমাদের চিন্তা। শত্রুর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে যারা নিজের মৃত্যু চিন্তা করে তারা ত কাপুরুষ; বীর যারা তারা শত্রুর মৃত্যু চিন্তা করে।'

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল—সেই চিন্তাই আমি করছি সর্দ্দার এবং যতক্ষণ না চিন্তাকে কাজে পরিণত করতে পারব ততক্ষণ আমার রক্ত ঠাণ্ডা হবেনা।'

ধনঞ্জয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—বাস! এই কথাই ত আমরা আপনার মুখে শুনতে চাই। দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর আপনি—ঝিন্দে এসে আপনি যদি কারুর সামনে মাথা হেঁট করেন তাহলে তাঁর রক্তের অপমান হবে।'

গৌরীর মুখে এতক্ষণে সত্যকার হাসি ফুটিল; সে বলিল—'সর্দ্দার! আজ নিয়ে তুমি তিনবার দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম করলে। এবার কিন্তু তোমাকে বলতে হচ্ছে, ঝিন্দের সঙ্গে কালীশঙ্করের সম্বন্ধ কি এবং কেনই বা তাঁর বংশধর ঝিন্দে এসে মাথা উঁচু করে চলবে।'

'মাথা উঁচু করে চলবে—তার কারণ; কিন্তু আজ নয়, সে গল্প আর একদিন বলব। এখন অনেক কাজ। গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া বলিলেন—'তাহলে কালই যাওয়া স্থির? সেই রকম বন্দোবস্ত করি?"

'হাঁ।—কিন্তু একটা কথা। উদিত খামকা আমায় শক্তিগড়ে নেমন্তন্ন করলে—তার উদ্দেশ্য কিছু আন্দাজ করতে পারলে?'

'আপনি পেরেছেন?'

'বোধহয় পেরেছি।—আকস্মিক দুর্ঘটনা—কেমন?'

'হুঁ—আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তা হবে না।' বলিয়া ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন।

গৌরী দু'বার বারান্দায় পায়চারি করিল, তারপর পকেটে হাত দিয়া দেখিল চম্পার আনীত চিঠিখানা এখনো খোলা হয় নাই। সে একবার চারিদিকে তাকাইল—কেহ কোথাও নাই। একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু এখানে চিঠি খুলিয়া পড়িতে ভরসা হইল না—হয়ত এখনি কেহ আসিয়া পড়িবে।

নিজের ঘরে গিয়া গৌরী জানালার ধারে দাঁড়াইল—ঠিক জানালার নীচে দিয়াই কিস্তার গাঢ় নীল জল বহিয়া যাইতেছে—কলকল ছলছল শব্দ করিতেছে। গৌরী কম্পিত-বক্ষে চিঠি বাহির করিল, তারপর ধীরে ধীরে মোহর ভাঙিয়া পড়িল।

কৃষ্ণা লিখিয়াছে—

স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজ শঙ্করসিংয়ের চরণাম্বুজে দাসী কৃষ্ণাবাঈর শতকোটি প্রণাম। আপনার লিপির মর্ম্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। আপনি অনুরোধ করিয়াছেন, সখী যেন আপনাকে ভুলিয়া যান। প্রথমে মন কাড়িয়া লইয়া পরে ভুলিয়া যাইতে বলা—মহারাজের এ পরিহাস উপভোগ্য বটে। আগে আমার সখীর মন ফিরাইয়া দিন, তারপর ভুলিবার কথা ভাবা যাইবে। কিন্তু তাহাও কয় দিনের জন্য? আপনার কি আদেশ, বিবাহের পরও সখী আপনাকে ভুলিয়া থাকিবেন?

বুঝিতেছি, সখীর মনে ব্যথা দিয়া আপনি নিজেও কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? মানভঞ্জন করিলে দু'জনেরই মনের কষ্ট দূর হইবে তিনি ত কাছেই রহিয়াছেন—মাঝে শুধু ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান। অবশ্য একটা কথা গোপনে আপনাকে বলিতে পারি, মান-ভঞ্জনের পূর্ব্বেই আপনার পত্র দর্শনে সখীর অর্দ্ধেক অভিমান দূর হইয়াছে। মুখে হাসি ফুটিয়াছে; শুধু তাই নয় গানও ফুটিয়াছে। শুনিতে পাইতেছি তিনি পাশের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। গানটি কী শুনিবেন? মীরার দোহা—

মেরে জীবন মরণ কী সাথী
তোহে ন বিসাঁরি দিন রাতি।

আপনার ভুলিয়া যাওয়ার অনুরোধের জবাব পাইলেন ত? রাজা, আপনি কি আমার প্রিয়সখীকে গুণ করিয়াছেন? যাঁর অভিমান শত সাধ্যসাধনাতে ভাঙে না, আপনার এতটুকু চিঠির অনুতাপে সেই রাজরাণী গলিয়া জল হইয়া গেলেন?

ভাল কথা, আপনি বৈদ্যুতিক আলোটা কাল রাত্রে ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। সখী সেটিকে দখল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আজ রাত্রে বিশ্রামের পূর্ব্বে নিজের শয়ন কক্ষের জানালা হইতে তাহার আলো ফেলিয়া দেখিবেন, কিস্তার ব্যবধান পার হইয়া সে-আলো আপনার জানালা পর্য্যন্ত পৌছায় কিনা। আপনার শয়ন কক্ষের জানালা যে সখীর শয়নকক্ষের জানালার ঠিক মুখোমুখি তাহা চম্পা-বহিনের মুখে জানিয়া লইয়াছি। মধ্যে কেবল ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান।

অলমিতি।

* * * *

রাত্রি দশটার মধ্যে ঝিন্দের রাজপুরী নিশুতি হইয়া গিয়াছিল। কাল প্রভাতেই শক্তিগড় যাত্রা করিতে হইবে, তাই ধনঞ্জয় সকাল সকাল বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন; কেবল রুদ্ররূপ নিয়ম মত শয়ন কক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল।

দীপহীন কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া গৌরী বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়াছিল। কিস্তার জলে ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদের আলো পড়িয়া সোনালী জরীর মত কাঁপিতেছিল। নদীর উপর নৌকার যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল কিস্তার খরস্রোত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে—সেই মহাপ্রপাতের মুখে যেখান হইতে সে ফেনহাস্যে উন্মুখর কল্লোলে নীচের উপত্যকার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। যেন এমনি করিয়া তটহীন শূন্যতায় নিজেকে নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়াই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা।

গৌরী ভাবিতেছিল—আজ রাত্রিটা শুধু আমার! কাল কোথায় থাকিব, বাঁচিয়া থাকিব কিনা কে জানে? যদি মরিতেই হয়, মৃত্যুপথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইব না? কস্তুরীর মুখের দুটি কথা—তার গলা এখনো ভাল করিয়া শুনি নাই—শেষবার শুনিয়া লইব না? ইহাতে কাহার কি ক্ষতি?

'মেরে জীবনমরণ কী সাথী'—কথাগুলি গৌরীর স্নায়ুতন্ত্রীর উপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে—তোহে ন বিসাঁরি দিনরাতি, দিবারাত্রি তোমাকে ভুলিতে পারি না।—কাল গৌরী তাহার নবোদ্ভিন্ন অনুরাগ ফুলটিকে আঘ্রাণ না করিয়া অবহেলাভরে চলিয়া আসিয়াছিল, তবু সে অভিমান ভুলিয়া গাহিয়াছে—তোহে ন বিসাঁরি দিনরাতি। কার্ব্বায় বন্ধ গোলাপ আতরের চাপা গন্ধের মত এই অনুভূতি তাহার দেহের সীমা ছাপাইয়া যেন অন্ধকার ঘরের বাতাসকে পর্য্যন্ত উন্মাদ করিয়া তুলিল।

কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে। তবে? এখন আর সাবধান হইয়া লাভ কি? যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে—এখন কর্ত্তব্যবুদ্ধির দোহাই দিয়া সাধু সংযমী সাজিয়া সে কাহাকে ঠকাইবে? একদিন তিক্ত বিষের পাত্র ত তাহাকে কণ্ঠ ভরিয়া পান করিতে হইবে; তবে এখন অমৃতের পাত্র হাতের কাছে পাইয়া সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবে কেন?

ঝড়োয়ার প্রাসাদের দীপগুলি ক্রমে নিবিয়া গেল—কেবল একটি মৃদু বাতি দ্বিতলের একটি গবাক্ষ হইতে দেখা যাইতে লাগিল। গৌরী নির্ণিমেষ চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চাহিয়া চাহিয়া এক সময় তাহার মনে হইল যেন গবাক্ষের সম্মুখে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদূর হইতে স্পষ্ট দেখা যায়না, তবু তাহার মনে হইল—এ কস্তুরী। কিছুক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ বিদ্যুতের টর্চ্চ জ্বলিল; কিস্তার জলের উপর এদিক ওদিক আলো ফেলিয়া তাহার জানালার উপর আসিয়া স্থির হইল। আলো অবশ্য অতি অস্পষ্ট—কেবল নীহারিকার মত একটা প্রভা গৌরীর মুখখানাকে যেন মণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া দিল।

জানালার বাহির পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া গৌরী হাত নাড়িল। তৎক্ষণাৎ আলো নিবিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে আবার জ্বলিল, আবার তখনি নিবিয়া গেল। আলোকধারিণী যেন গৌরীর সহিত কৌতুক করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী ক্ষণকাল হেঁটমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সন্তর্পণে দ্বারের কাছে গিয়া পর্দ্দা ঈষৎ সরাইয়া উঁকি মারিল। রুদ্ররূপ দূরের একটা বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া না জানি কিসের স্বপ্ন দেখিতেছে। গৌরী নিঃশব্দে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল; তারপর আবার জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় আবার দুই তিনবার দূর গবাক্ষে আলো জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। গৌরী আর দ্বিধা করিল না। তাহার প্রিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, এস এস বলিয়া বারবার আহ্বান করিতেছে। সে মনে মনে উচ্চারণ করিল—কস্তুরী! কস্তুরী!

গায়ের জামাটা সে খুলিয়া ফেলিল। একটা পাগ্‌ড়ীর কাপড় জানালার পাশে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বাহিরের দিকে ঝুলাইয়া দিল। তারপর নগ্নদেহে সেই রজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া কিস্তার শীতল জলে নিজেকে নামাইয়া দিল—

ঝড়োয়ার রাজপুরী নিস্তব্ধ—অন্ধকার। কেবল কস্তুরীর ঘরে একটি মৃদু দীপ জ্বলিতেছে। দীপের আলোকে ঘরটি

সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—শুধু একটি স্নিগ্ধ ছায়াময় স্বচ্ছতার সৃষ্টি করিয়াছে।

পালঙ্কের ঠিক পাশেই মেঝের রেশমের গালিচার উপর কস্তুরী একটা হাত মাটিতে রাখিয়া হেঁটমুখে বসিয়া ছিল। গৌরী একটা শাল সিক্তদেহে জড়াইয়া পালঙ্কের উপর বাহুবাহু রাখিয়া কস্তুরীর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। অদূরে পর্দ্দা-ঢাকা দ্বারের পাশে কৃষ্ণা চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়াছে। জল হইতে উঠিবার পর গৌরীকে লইয়া কৃষ্ণা যখন কস্তুরীর ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন গুটিকয়েক কথা হইয়াছিল; কৃষ্ণা এই দুঃসাহসিকতার জন্য তাহাকে সস্নেহ-বিগলিতকণ্ঠে তিরস্কার করিয়াছিল। কস্তুরীর ঠোঁটদুটি বারবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কোনো কথা বাহির হয় নাই। শুধু তাহার নিশ্চল চোখ দুটির দৃষ্টিতে যে গভীর অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহাই গৌরীকে পুরস্কৃত করিয়াছিল। তারপর কথার ধারা কেমন যেন ক্ষীণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ তাহাদের পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপ্রতিভভাবে সরিয়া গিয়া পাহারা দিবার অছিলায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতনের সঙ্গে কস্তুরী চোখ তুলিয়া চাহিল, দু'জনের চোখাচোখি হইল। দুটি চোখ মাধুর্য্যের গাঢ়তায় গভীর—অন্যদুটি জিজ্ঞাসার ব্যগ্রতায় ব্যাকুল।

গৌরী অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কস্তুরী!'

কস্তুরী চোখ নামাইয়াছিল, আবার তুলিল।

গৌরী সাগ্রহকণ্ঠে বলিল—'কালকের অপরাধ ক্ষমা করেছ?'

একটুখানি হাসিয়া—কিম্বা হাসির আভাস—কস্তুরীর ঠোঁটের কোণ দুটিকে ঈষৎ প্রসারিত করিয়া দিল। কস্তুরী আবার চক্ষু অবনত করিল।

গৌরী আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল—'রাণি, আমার বুকের মধ্যে যে কি তুফান বইছে তা যদি দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতে তুমি আমাকে কী করেছ। তোমাকে দেখে আমার আশা মেটেনা, আবার বেশীক্ষণ দেখতেও ভয় করে—মনে হয় বুঝি অপরাধ করছি। আমার প্রাণের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যাই; যেখানে রাজ্য নেই, রাজা নেই, রাণী নেই—শুধু তুমি আর আমি। শুধু আমাদের ভালবাসা। কস্তুরী, তোমার ইচ্ছে করেনা?'

কস্তুরীর মাথা আর একটু অবনত হইল, নিশ্বাস পতনের শব্দের মত লঘু অস্ফুটস্বরে সে বলিল—'করে।'

সহসা হাত বাড়াইয়া কস্তুরীর আঁচলের প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া গৌরী বলিল—'কস্তুরি, চল আমরা তাই যাই।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার চট্‌কা ভাঙিয়া গেল! এ কি অসঙ্গত অর্থহীন প্রলাপ সে বকিতেছে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—'আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস—কৃষ্ণার চিঠিতে আজ তা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা জানবার জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কস্তুরি—'

কস্তুরী প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলিল।

গৌরী আবার আরম্ভ করিতে গিয়া থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে কৃষ্ণা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে; এখন তাহার দিকে চোখ পড়িতেই সে কস্তুরীর আঁচল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু যে প্রশ্নটা তাহার কণ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর জানিবার অধীরতাও তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিল—'কৃষ্ণা, তুমি একবারটি বাইরে যাবে? বেশী নয়—দু'মিনিটের জন্যে।'

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া একটু ভ্রূ তুলিল, গৌরীর দিকে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল—'আচ্ছা। কিন্তু ঠিক দু'মিনিট পরেই আমি আবার ফিরে আসব।'

কৃষ্ণা পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গৌরী তখন কস্তুরীর মুখের খুব সন্নিকটে মুখ আনিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'কস্তুরি, একটা কথার উত্তর দেবে কি?'

গম্ভীর আয়ত চোখদুটি গৌরীর মুখের উপর স্থির হইল—একটু বিস্ময়, একটু কৌতুহল, অনেকখানি ভালবাসা সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল। গৌরী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, কস্তুরীর যে-হাতখানা কোলের উপর পড়িয়া ছিল সেটা দু'হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল; একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল—'কস্তুরি, তোমার চোখের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার মন আর শাসন মানছে না, মনে

চ্ছ—; তবু তুমি একটা কথা বল। আমি যদি শঙ্কর সিং হতাম, ঝিন্দের রাজা না হতাম, তবু কি তুমি আমায় ভালবাসতে ?'

কস্তুরীর হাতটি গৌরীর মুঠির মধ্যে একটু নড়িল, গ্রীবা একটু বাঁকিল। একবার মনে হইল বুঝি সে উত্তর দিবে। কিন্তু সে উত্তর দিলনা, নিজের কঙ্কণের দিকে চাহিয়া রহিল।

গৌরী তখন আরো ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল—'কস্তুরী, মনে কর আমি ঝিন্দের শঙ্কর সিং নই, মনে কর আমি একজন সামান্য বিদেশী—কোনো দূর দেশ থেকে এসে হঠাৎ ঘটনাচক্রে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু কি তুমি আমায় ভালবাসবে ?'

কস্তুরী গৌরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার চোখদুটি একটু ঝাপ্সা দেখাইল। অধর যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। তারপর তাহার ধরা-ধরা অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'আমাকে কি পরীক্ষা করছেন ?'

'না না—কস্তুরী। কিন্তু তুমি শুধু বল যে তুমি আমাকেই ভালবাস—রাজ্যসম্পদ বাদ দিলেও তোমার ভালবাসা লাঘব হবেনা।'

ক্ষণকাল কস্তুরী নীরব রহিল, তারপর গৌরীর চোখে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আপনি যদি একজন সামান্য সিপাহী হতেন, আপনার পরিচয় ঝিন্দ ঝড়োয়ার কেউ না জানত, আপনি যদি অখ্যাত বিদেশী হতেন—তবু আপনি —আপনি আমার—"

'—তোমার ?'

'আমার মালিক।'

অকস্মাৎ কস্তুরীর চোখ ছাপাইয়া বুকের কাপড়ের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

'কস্তুরী!'—গৌরীর কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে হাত দিয়া কস্তুরীর চিবুক তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে আরম্ভ করিল—'তবে শোনো—আমি—'

ঠিক এই সময় দ্বারের পর্দা নড়িয়া উঠিল; কৃষ্ণা প্রবেশ করিল।

আর একটু হইলে দুর্নিবার আবেগের মুখে গৌরী সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত, কৃষ্ণার আবির্ভাবে সে থামিয়া গেল। কৃষ্ণা যেন তাহাকে কঠিন বাস্তব জগতে টানিয়া ফিরাইয়া আনিল। সে বাঁ হাতটা একবার চোখের উপর দিয়া চালাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণা আসিয়া হাসিমুখে বলিল—'হ্যাঁ, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। রাত দুপুরের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।'

গৌরীর গলার ভিতর যেন একটা কঠিন পিণ্ড আটকাইয়া গিয়াছিল, সে গলা ঝাড়িয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিল—'কাল সকালেই আমি শক্তিগড় যাচ্ছি—হয়ত আর—'

তাহার কথা শেষ না হইতেই কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল—'শক্তিগড় ?'

কস্তুরীর চোখের জল তখনো শুকায় নাই, কিন্তু তাহারই ভিতর হইতে নিমেষের জন্য কৌতুক-মাখানো দৃষ্টি কৃষ্ণার মুখের পানে তুলিল।

গৌরী বলিল—'শিকারে যাচ্ছি—কবে ফিরব বলতে পারিনা। হয় ত—'

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া বলিল—'হয়ত সেখানে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটতে পারে যা আপনি কখনো কল্পনাও করেন নি—কে জানে ?'

গৌরী কৃষ্ণার মুখের প্রতি অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাইয়া বলিল—'তা পারে।—আজ তাহলে চললাম।'

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। সতৃষ্ণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া গৌরী বলিল—'কস্তুরী চললাম। হয়ত—'

নৃত্যচঞ্চল চোখে কৃষ্ণা বলিল—'হয়ত শক্তিগড় থেকে ফেরবার আগেই আবার দেখা হবে। অত কাতরভাবে বিদায় নেবার দরকার নেই।'

গৌরী কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কৃষ্ণা বলিল—'চলুন, আপনাকে আমার ডিঙিতে করে আপনার ঘাটে পৌঁছে দিই।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তোমাকে আর কষ্ট দেবনা। আমি যেভাবে এসেছি সেই ভাবেই ফিরে যাবো।'

কস্তুরীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল, সে অতি মৃদুস্বরে বলিল—'কিন্তু—যদি কোনো দুর্ঘটনা—'

"কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না কস্তুরী—আমি এখন মরব না। যদি মরি ত শক্তিগড়ে গিয়ে—এখানে নয়।' বলিয়া গৌরী মাথা নাড়িয়া হাসিল।

কৃষ্ণা বলিল—'ও কি কথা! সখীকে মিছামিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন কেন?—চলুন।'

'চল কৃষ্ণা।'

দ্বারের কাছে গিয়া গৌরী ফিরিয়া দেখিল—কস্তুরী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই শেষ দেখা?

অন্ধকার ঘাটের পাদমূলে আসিয়া গৌরী কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যাকুলস্বরে বলিল—'কৃষ্ণা, হয় ত আমাদের আর দেখা হবেনা, এই শেষ দেখা। যদি আমাদের জীবনে এমন কোনো বিপর্যয় ঘটে যায় যা এখন তোমাদের কল্পনারও অতীত—তুমি কস্তুরীকে ছেড়োনা। সর্ব্বদা তার কাছে থেকো; তুমি কাছে থাকলে হয়ত সে শান্তি পাবে।' বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হায়! মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইত!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিনিয়োগ

পরদিন প্রভাতে শক্তিগড় যাত্রার কথা রাজসংসারে প্রচারিত হইল। চম্পা পূর্ব্বাহ্নে কিছু জানিত না, সংবাদ পাইয়া তাহার ভারি অভিমান হইল। যাত্রার আয়োজন সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, আজই যাওয়া হইবে—অথচ সে কিছু জানেনা! মুখ ভার করিয়া সে রাজার মহালের দিকে চলিল।

দ্বারের সম্মুখে রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে দেখিয়া চম্পা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—'রাজা আজ শক্তিগড়ে যাচ্ছেন, তুমি আগে থেকে জানতে?'

উদাসভাবে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রুদ্ররূপ বলিল—'জানতাম।'

'তবে আমাকে বলনি কেন?"

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া রুদ্ররূপ জবাব দিল—'দরকার মনে করিনি।'

চম্পা রাগিয়া বলিল—'দরকার মনে করনি। তোমার কি কোনোদিন বুদ্ধি হবেনা? এখন আমি এত কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নেব কি করে বল দেখি!'

রুদ্ররূপ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল—'তুমি তৈরি হবে কি জন্যে?'

অধীরস্বরে চম্পা বলিল—'বোকা কোথাকার! রাজার সঙ্গে আমাকে যেতে হবেনা?'

রুদ্ররূপ যেন স্তম্ভিতভাবে বলিল—'রাজার সঙ্গে তুমি যাবে? সে আবার কি?'

'পথ ছাড়ো। তোমার সঙ্গে আমি বক্‌তে পারিনা।'

রুদ্ররূপ রাজার ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'চম্পা, রাজার সঙ্গে তোমার যাওয়া হতে পারেনা।'

চম্পা অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ রুদ্ররূপের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—'তার মানে? রাজা কি কোনো হুকুম জারি করেছেন?'

'না। কিন্তু তোমার যাওয়া চলবে না।'

'কেন চল্‌বে না শুনি?'

'রাজা যে কাজে যাচ্চেন সে কাজে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।'

'বিপদের সম্ভাবনা? রাজা ত বেড়াতে যাচ্চেন।—আর, বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকে তবে ত আমি যাবই। আমি না গেলে তাঁর পরিচর্য্যা করবে কে?'

'চম্পা, জিদ্ করো না, আমরা বড় ভয়ঙ্কর কাজে যাচ্ছি। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে সব ভেস্তে যাবে। তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।'

'তোমার হুকুম নাকি?'

'হাঁ, আমার হুকুম।'

'তোমার হুকুম আমি মানিনা। তুমি আমার মালিক নও'—বলিয়া চম্পা সগর্ব্বে রুদ্ররূপকে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিল।

'চম্পা দেঈ!'

চম্পা চমকিয়া মুখ তুলিল। এমন দৃঢ় এত কঠিন স্বর রুদ্ররূপের সে কখনো শুনে নাই। দু'জনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে চম্পার চোখ নত হইয়া পড়িল। ঠোঁটদুটি ফুলিতে লাগিল, রুদ্ধ রোদনের কণ্ঠে সে বলিল—'আমি তাহলে যেতে পাবনা?'

রুদ্ররূপের কণ্ঠস্বরও কোমল হইল; সে বলিল—'না, এবার নয়। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে থাক।—আমরা শীঘ্রই ফিরে আসব।'

চম্পা হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একমুহূর্ত্তে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কোন ইন্দ্রজালে

এমন হইল? এতদিন চম্পা রুদ্ররূপকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে—আর আজ—

বশীভূতা চম্পা একবার জল-ভরা চোখদুটি রুদ্ররূপের মুখের পানে তুলিল। দর্প তেজ খরশান কথা—আর কিছু নাই। বোধহয় এতদিনে চম্পা প্রথম নারীত্ব লাভ করিল।

স্খলিত অঞ্চল মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে সে ফিরিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, স্বত্বাধিকারী প্রভুর মত রুদ্ররূপ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

* * * *

সিংগড় হইতে যে প্রাচীন পথ সিধা তীরের মত শক্তিগড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, কিস্তা নদীটি চপলগতি গঙ্গীর মত প্রায় সর্ব্বদাই তার পাশে পাশে চলিয়াছে। কখনো মোড় ফিরিয়া ঈষৎ দূরে চলিয়া গিয়াছে, আবার বাঁকিয়া পথের ঠিক পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে সেই পথ দিয়া গৌরী তাহার সওয়ারের দল লইয়া চলিয়াছিল। সবসুদ্ধ পঞ্চাশজন সওয়ার আগে পিছে চলিয়াছে, মধ্যে গৌরী, সর্দ্দার ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ। সওয়ারদের কোমরে তরবারি, হাতে বর্শা। রুদ্ররূপের কোমরে তরবারি আছে কিন্তু বর্শা নাই। ধনঞ্জয়ের কটিবন্ধে সর্দ্দারের ভারী পিস্তল। গৌরী প্রায় নিরস্ত্র, তাহার কোমরে কেবল সেই সোনার মুঠযুক্ত ছোরাটি রহিয়াছে; ঝিন্দে আসার প্রাক্কালে শিবশঙ্কর যেটি তাহাকে দিয়াছিলেন।

ঘোড়াগুলি মন্থর কদম চালে চলিয়াছে। দ্রুত যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই; এই চালে চলিলে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে শক্তিগড়ে পৌছানো যাইবে। একদল ভৃত্য তাম্বু ও অন্যান্য অবশ্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া সকালেই যাত্রা করিয়াছে; তাহারা বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত থাকিবে।

হেমন্তের মধ্যন্দিন সূর্য্য তেমন প্রখর নয়। মাঝে মাঝে পথের পাশে বৃদ্ধ শাখাপত্রবহুল পাহাড়ী বৃক্ষ একটু ছায়ারও ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাছাড়া কিস্তার জলস্পৃষ্ট বাতাস ভারি মোলায়েম ও স্নিগ্ধ। গৌরী এদিক একবারও আসে নাই; এতদিন একপ্রকার রাজপ্রাসাদেই অন্তরীণ ছিল। এই মুক্ত দৃশ্যের ভেতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল সেইদিনের কথা—যেদিন সে প্রথম ঝিন্দ ষ্টেশনে নামিয়া সিংগড়ের পথ ধরিয়াছিল।

বর্ত্তমান দৃশ্যটা ঠিক তাহার অনুরূপ না হইলেও স্মৃতি-জাগায় বটে। পথ ঋজু কিন্তু সর্ব্বদা সমতল নয়, সাগর ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। বামপার্শ্বের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কঙ্করপূর্ণ ও অমসৃণ। এখানে ওখানে দু'চারিটা কঠিনপ্রাণ পাহাড়ী গাছের গুল্ম। দক্ষিণে বিসর্পিল গতি কিস্তা। সবিশেষে সমস্ত পার্ব্বত্য দৃশ্যটিকে ঘিরিয়া বলয়াকৃতি নীল পাহাড়ের রেখা।

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া গৌরী কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রস্তরময় পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের সমবেত শব্দ, জিনের চামড়ার সরসর শব্দ, ঘোড়ার মুখে জিঞ্জিরের ঝিমঝিম্ শব্দ মিলিয়া একটি ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই ছন্দের তালে তালে গৌরীর মনটাও কোথা উধাও হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ কোনো চিন্তা মনের মধ্যে থাকে না অথচ অতি সূক্ষ্ম একটা লূতাতন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বিচিত্র আকৃতির ভঙ্গুর জাল বুনিতে থাকে—তাহার মানসিক অবস্থাটা সেইরূপ।

সর্দ্দার ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে তাহার দিবাস্বপ্নের জাল ছিঁড়িয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রুদ্ররূপ কখন পিছাইয়া গিয়াছে—কেবল ধনঞ্জয় তাহার পাশে রহিয়াছেন।

ধনঞ্জয় ভ্রূর উপর করতল রাখিয়া সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন; তারপর মৃদুস্বরে কতকটা আত্মগত-ভাবে বলিলেন—'আজ আমাদের অভিযান দেওয়ান কালী-শঙ্করের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ। দেড়শ বছর আগে কে ভেবেছিল যে ঝিন্দ রাজ্যের নাট্যশালায় তার বংশধরেরাই একদিন প্রধান অভিনেতা হয়ে দাঁড়াবে? আশ্চর্য্য।'

গৌরী বলিল—'এবার তোমার হেঁয়ালি ছেড়ে আসল গল্পটা আগাগোড়া বলতে হবে সর্দ্দার। আমাকে কেবল ভ্যাবাচাকা খাইয়ে চুপ করে যাবে—সে হবে না। নাও, এখন ত তোমার কোনো কাজ নেই, এইবার কালীশঙ্করের কেচ্ছা আরম্ভ কর।'

ধনঞ্জয় একটু হাসিলেন; বলিলেন—'বলছি। বলবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে; কারণ যে কাজে আমরা চলেছি তার ফলাফল যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত—'

'শেষ পর্য্যন্ত তোমার গল্প শোনবার জন্যে আমি বেঁচে না থাকতে পারি?'

'কিম্বা গল্প বলবার জন্যে আমি বেঁচে না থাকতে পারি। সবই সম্ভব। হয়ত আমরা দুজনেই বেঁচে থাকব, অথচ এ গল্প আর বলা চলবে না। তার চেয়ে এই বেলা সেরে রাখা ভাল।'

গৌরী একটু ভাবিয়া বলিল—'আমি এ গল্প শুনলে যদি কারুর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে তাহলে বলবার দরকার কি?'

ধনঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আপনার পূর্ব্বপুরুষ কালীশঙ্কর সম্বন্ধে একটা রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি; এমন কাজে আপনাকে ব্রতী করেছি যাতে জীবননাশের সম্ভাবনা। সুতরাং আমার কাছে আপনার একটা কৈফিয়ৎ প্রাপ্য। সে কৈফিয়ৎ যদি আমি না দিই, আপনি ভাবতে পারেন যে আমি আপনাকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছি।'

'বেশ, তাহলে বল।'

'আমি যে গল্প বলব তাতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হবে যে আপনি এ পর্য্যন্ত অধিকারবহির্ভূত কোনো কাজ করেন নি এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি—'

'ওকথা অনেকবার শুনেছি। এবার গল্প আরম্ভ কর।'

ধনঞ্জয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। গতিশীল সওয়ার দলের অশ্বক্ষুরধ্বনির ভিতর হইতে তাঁহার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর গৌরীর কানে আসিতে লাগিল। সে সম্মুখ দিকে তাকাইয়া শুনিতে লাগিল।

'গল্প আরম্ভ করবার আগে এ কাহিনী আমি কি করে জানতে পারলাম তা বলা দরকার। রাজপরিবারের এই গূঢ় কাহিনী জনসাধারণের জানবার কথা নয়; বোধ হয় বর্ত্তমানে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু দেওয়ান বজ্রপাণি জানেন, তাঁকে আমি বলেছি।

'জাতিতে বৈশ্য হলেও আমরা পুরুষানুক্রমে রাজার পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী—একথা বোধহয় আগে শুনেছেন। দেড়শ বছর আগে আমার উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ এই পদ প্রথম পেয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল শেঠ চন্দ্রকান্ত। তিনি কি করে তদানীন্তন মহারাজ ধূর্জ্জটি সিংহের অনুগ্রহভাজন হয়ে ক্রমে তাঁর বন্ধু ও পার্শ্বচর হয়ে উঠেছিলেন সে কাহিনী এখানে অবান্তর। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি ধূর্জ্জটি সিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

'কিন্তু রাজার পার্শ্বচর হয়েও চন্দ্রকান্ত বেনিয়া স্বভাব ছাড়তে পারেন নি। সে সময় বেনিয়া ছাড়া অন্য জাতের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না; হিসাব-কিতাব লেখার জন্য বেনিয়াদের লেখাপড়া শিখতে হত। চন্দ্রকান্ত হিসাব ত লিখতেনই, তার ওপর আর একটা জিনিস লিখতেন যা আজকের দিনে অমূল্য বলে পরিগণিত হতে পারে। সেটি হচ্চে তদানীন্তন রাজ-দরবারের দৈনন্দিন রোজ-নাম্চা। রাজসংসারের খুঁটিনাটি, রাজ অন্তঃপুরের জনশ্রুতি, দরবারের কেচ্ছা—সবই তাঁর গোপন দপ্তরে স্থান পেত। জীবনের শেষ পনের কুড়ি বছর তিনি নিয়মিত এই কার্য্যটি করেছিলেন।

'যাহোক, চন্দ্রকান্ত একদিন বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করলেন। তাঁর দপ্তর অন্যান্য হিসাবের খাতার সঙ্গে রক্ষা করা হ'ল। চন্দ্রকান্তের পর থেকে আমাদের বংশে লেখাপড়ার চর্চ্চা কমে গিয়েছিল। যাদের রাজার পাশে থেকে অস্ত্র চালাতে হবে তাদের আবার বিদ্যাশিক্ষার দরকার কি? কাজেই গত চার পুরুষের মধ্যে চন্দ্রকান্তের দপ্তর কেউ খুলে পড়লে না।

'আমিই প্রথম এই দপ্তর উদ্ধার করি। তখন আমার বয়স কম, কৌতূহল বেশী—চন্দ্রকান্তের রোজ-নাম্চা পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে মনে হল একটা উপন্যাস পড়ছি। সেই দপ্তরে দেওয়ান কালীশঙ্করের ইতিহাস পড়ি। পনের বছরের ইতিহাসের ভিতর থেকে কালীশঙ্করের জীবনকাহিনী জলজল করে ফুটে ওঠে। মনে হয়, চন্দ্রকান্ত যে কাহিনী লিখে গেছেন তার প্রধান নায়কই যেন কালীশঙ্কর।

'আর একটা জিনিস সেই দপ্তরের সঙ্গে পেয়েছিলাম। আপনি জানেন, হাতীর দাঁতের ফলকের উপর ছবি আঁকার জন্য ঝিন্দ চিরদিন বিখ্যাত। এখন প্রতিকৃতি আঁকার শিল্প লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু সে সময় মোগল যুগের শেষ দিকে এই শিল্পের খুব প্রচার ছিল। চন্দ্রকান্তের দপ্তরের সঙ্গে একতাড়া ছবি আঁকা ফলকও পেয়েছিলাম। ফলকের পিছনে চিত্রার্পিত ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। সে সময়ের অনেক বড় বড় লোকের ছবি ছিল। রাজা ধূর্জ্জটি সিংহের ছবি ছিল। কালীশঙ্করের ছবিও ছিল।

'তাই, কালীশঙ্করের চেহারা আমার জানা ছিল এবং

সেইজন্যই আপনাদের বাড়ীতে তাঁর তৈলচিত্র দেখেই আমি বুঝতে পারি যে এ কালীশঙ্কর ছাড়া আর কেউ নয়। সেই তীক্ষ্ণ চোখ সেই খড়্গের মত নাক একবার যে দেখেছে সে কখনো ভুলবে না।

'এতক্ষণে আমার কৈফিয়ৎ শেষ হল। এবার গল্পটা শুনুন। গল্পটা রোজনামচার দেড় হাজার পাতার মধ্যে ছড়ানো আছে; আমি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে বলছি।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বোধ করি গল্পটা মনে মনে গুছাইয়া লইলেন; তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'দপ্তরের দ্বিতীয় বছরে কালীশঙ্করের নাম প্রথম পাওয়া যায়। প্রথমে দেখি, রাজসভায় একজন বাঙালী লড়াক্ এসেছে; রাজাকে অনেক রকম অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। তারপর দেখি কালীশঙ্কর রাজভ্রাতাদের অস্ত্রগুরু নিযুক্ত হয়েছেন। রাজা তখন বয়সে তরুণ, বংশধর জন্মগ্রহণ করেনি।

'ক্রমে তিন মাস যেতে না যেতেই দেখতে পাই কালীশঙ্কর রাজসভার প্রধান ওমরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি শিকারে কি মন্ত্রণায় কি বিলাসব্যসনে কালীশঙ্কর না হলে রাজার একদণ্ড চলে না।

'কালীশঙ্করকে চন্দ্রকান্ত প্রথম প্রথম একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও কালীশঙ্করের সম্মোহন শক্তিতে বশীভূত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বৎসরের শেষাশেষি দেখি, চন্দ্রকান্ত তাঁর দপ্তরে 'ভাই কালীশঙ্কর' লিখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা দুজনে যেমন রাজার ডান হাত বাঁ হাত, তেমনি পরস্পর প্রাণপ্রতিম বন্ধু হয়ে উঠেছেন—কেউ কারুর কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করেন না।

'চতুর্থ বর্ষে রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী মারা গেলেন। এইবার কালীশঙ্করের চরম উন্নতি হল—রাজা তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর রাজ্যের কর্ণধার হয়ে উঠলেন। একজন বিদেশীর এই উন্নতিতে অনেকের চোখ টাটালো বটে কিন্তু কার্য্যদক্ষতায় কূটবুদ্ধিতে রায় দেওয়ানের সমকক্ষ কেউ ছিল না—তাই কেউ উচ্চবাচ্য করতে পারলে না। চন্দ্রকান্ত অবশ্য খুব খুশী হলেন। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে একজন অন্য জনের পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করতেন না।

'তারপর আরো দু'বছর কেটে গেল। এই সময়ে কালীশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—ঝিন্দের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের মিত্রতা-মূলক সন্ধি। তিনি এমন সুকৌশলে রাজার মর্য্যাদা রেখে এই কাজ সুসম্পন্ন করলেন যে রাজা রাজ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত শাসন পালনের ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন যাপন করতে লাগলেন; এইভাবে রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চলতে লাগল, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। কেবল একটি বিষয়ে রাজা এবং প্রজারা একটু নিরানন্দ—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত রাজার বংশধর জন্মগ্রহণ করল না। রাজার তিন রাণী—তিনজনেই নিঃসন্তান।

'রাজা হোম যজ্ঞ দৈবকার্য্য অনেক করলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না। হতাশ হয়ে রাজা শেষে মহাপণ্ডিত রাজগুরুর শরণাপন্ন হলেন।

রাজগুরু অনেক চিন্তার পর বললেন—'একটি মাত্র উপায় আছে।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় থামিলেন।

গৌরী সাগ্রহে বলিল—'তারপর—?'

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'প্রাচীনকালে নিয়োগ-প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল জানেন?'

স্তম্ভিত হইয়া গৌরী বলিল—'জানি—'

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—'ঝিন্দে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি নেই, কিন্তু অবস্থা বিশেষে নিয়োগ-প্রথা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। রাজবংশেই প্রায় দু'শ বছর আগে ঐ রকম ব্যাপার করতে হয়েছিল। গুরু নজির দেখিয়ে রাজাকে সেই পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন।

'ব্যাপারটা বোধ হয় এবার বুঝতে পারছেন?'

অস্ফুট স্বরে গৌরী বলিল—'কালীশঙ্কর—?'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়লেন—'প্রকাশ্যে এক মহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে—

'যজ্ঞ টীকা পরলেন রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর। রাজা, রাজগুরু আর স্বয়ং কালীশঙ্কর ছাড়া একথা আর কেউ জানলে না। এমন কি রাণী পর্য্যন্ত না। সেকালে অনেক রকম ওষুধ-বিষুধ ছিল—

'যাহোক, যথাসময় পাটরাণী পদ্মা দেবী এক কুমার প্রসব করলেন। রাজ্যে মহা সমারোহ পড়ে গেল; দেশ

দেশান্তর থেকে অভিনন্দন এল। রাজা ধূর্জ্জটি সিং কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে পারিলেন না; তিনি রাজপ্রাসাদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন।

'ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, রাজার মুখ ততই অন্ধকার হতে লাগল। একটা অসূয়ামিশ্রিত অবসাদের ভাব তাঁর প্রসন্ন চিত্তকে গ্রাস করে নিলে। সর্ব্বদাই ভ্রূকুটি করে থাকেন; সভায় হাসি মস্করার প্রসঙ্গ উঠ্‌লে ক্রুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।

'রাজকুমারের বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু রাজা কুমারকে স্পর্শ করেন না—ঘৃণাভরে তাকে নিজের সুমুখ থেকে সরিয়ে দেন। ওদিকে কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এমন হয়ে দাঁড়াল যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। আগে মুহূর্ত্তের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, এখন কেবল রাজকার্য্য ব্যপদেশে দেখা হয়। যে দু'চারটে কথা হয় তাও রাজকীয় ব্যাপার সংক্রান্ত। বয়স্যের সম্পর্ক ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল।

'এইভাবে দিন কাটতে লাগল। রাজকুমার হরগৌরী সিং বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। কুমারের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে রাজসভায় কাণাঘুষা আরম্ভ হল। কুমার যতই বড় হচ্ছেন, কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। সকলেই তা লক্ষ্য করলে। আড়ালে ইসারা ইঙ্গিত চোখ ঠারাঠারি চলতে লাগল।

'রাজা তখন মদ ধরেছেন, অষ্টপ্রহর মদে ডুবে থাকেন। সভায় যখন আসেন তখন চারিদিকে কিছুই লক্ষ্য করেন না; সভাসদরা নানাভাবে তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে, তিনি তাদের কথা শুনতে পান না; ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে বসে থাকেন।

'আরো কয়েক বছর কেটে গেল। রাজা থেকেও নেই, তাই সভাসদদের স্পর্দ্ধা ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল। কুমারের যখন আট বছর বয়স তখন এক কাণ্ড হল। একজন নির্ব্বোধ ওমরা রাজার সুমুখেই কুমারের চেহারা নিয়ে একটা বাঁকা ইঙ্গিত করলে, বললে—'কুমারের চেহারা যেমন দেওয়ান কালীশঙ্করের মত, আশা করা যায় বুদ্ধিতেও তিনি তেমনি প্রখর হবেন।'—রাজা অন্য সময় কিছুই শুনতে পান না, কিন্তু এ কথাগুলো তাঁর কানে গেল; এতদিনের রুদ্ধ গ্লানি অগ্ন্যুৎপাতের মত বেরিয়ে এল। তিনি সিংহাসন থেকে লাফিয়ে গিয়ে সেই ওমরার চুলের মুঠি ধরলেন, তারপর তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে নিলেন।

হুলস্থূল কাণ্ড! এই সময় কালীশঙ্কর দ্রুতপদে বাইরে থেকে এসে রাজার হাত ধরে বললেন—'মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।'

'রাজা ধূর্জ্জটি সিংহ কষায়িত চোখ কালীশঙ্করের দিকে ফেরালেন; তাঁর মুখ দেখে মনে হল কালীশঙ্করকেও বুঝি তিনি হত্যা করবেন। কিন্তু কালীশঙ্করের চোখের দৃষ্টিতে কি সম্মোহন শক্তি ছিল জানি না, রাজা তাঁর গায়ে অস্ত্র তুলতে পারলেন না। শুধু রক্তরাঙা তলোয়ারখানা দ্বারের দিকে দেখিয়ে বললেন—'যাও।'

'কালীশঙ্কর সভা থেকে ফিরে এলেন। সেই রাত্রে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গোপনে তাঁর মন্ত্রণা হল। কালীশঙ্কর কুশাগ্রধী লোক ছিলেন, অনেক আগে থেকেই তিনি এই দুর্য্যোগের দিন প্রতীক্ষা করছিলেন—তাই নিজের আজীবন সঞ্চিত টাকাকড়ি সব রাজ্যের বাইরে সরিয়ে ফেলেছিলেন। চন্দ্রকান্ত বললেন, কালীশঙ্করের পক্ষে আর এ রাজ্যে থাকা নিরাপদ নয়; রাজা নিজে তাঁকে হত্যা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু হত্যা করবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত হয়েছে—এ খবর তিনি পেয়েছেন। দুই বন্ধু সেই রাত্রে শেষ আলিঙ্গন করে নিলেন।

'পরদিন কালীশঙ্কর নিরুদ্দেশ হ'লেন। পনের বছর পরে ঝিন্দের রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের উপর যবনিকা পড়ে গেল।

'এর পরের যা ইতিহাস তা আপনার বংশের ইতিহাস। আমার চেয়ে আপনিই তা বেশী জানেন।'

ধনঞ্জয় নীরব হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি একবার গৌরীর কোমরে ছোরাটার উপর গিয়া পড়িল।

একাগ্রভাবে শুনিতে শুনিতে গৌরীর চিবুক বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছিল। সে এবার মুখ তুলিল; তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলিয়া গেল। সম্মুখে প্রায় দুই মাইল দূরে তখন শক্তিগড়ের পাষাণ চূড়া দেখা দিয়াছে, সেই দিকে তাকাইয়া সে যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল—'অর্থাৎ, শঙ্কর সিং উদিত সিং আর আমি—আমরা সকলেই কালীশঙ্করের বংশধর, জ্ঞাতি ভাই। চমৎকার!'

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বঙ্গের সাহিত্যাকাশে অপূর্ব্ব ভাস্বর
যা-কিছু মঙ্গলধর্ম্মী সত্য ও সুন্দর,
বঙ্কিম তাহারি নাম ;

জ্ঞান ও কল্পনা—
যুগ্মপাণি নিত্য যে-বা করিয়া বন্দনা
বাণীর মন্দিরতলে, অতন্দ্র নিষ্ঠায়
লভিলা মন্ত্রের সিদ্ধি ইষ্টসাধনায়।

বঙ্গভাষা গঙ্গাসম স্নিগ্ধ পূতধারে
স্বচ্ছন্দ জীবন লভি' রসের পাথারে
মিশে যা'র ভাগীরথী পুণ্য তপস্যায়,
সেই ত বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টির পৃষ্ঠায় !

ধর্ম্ম যা'র মর্ম্মকথা, কর্ম্ম যা'র বাণী,
বক্ষে প্রেম, চক্ষে ক্ষেম, সব্যসাচী পাণি—
বঙ্গের বঙ্কিম সেই শাশ্বত সুপ্রিয়,
—সে শুধু সম্রাট্ নয়, সে যে অদ্বিতীয়।

ইনিই কি তিনি ?

৺রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

প্রবন্ধ

(১) ঐতিহাসিক বিবরণ

যাঁহারা ঢাকা জিলার ভাওয়াল সন্ন্যাসীর চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ কাহিনী ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জীবনের বাস্তব উপন্যাস পাঠের রস গ্রহণ করিয়াছেন। শত বৎসরেও এমন ঘটনা ঘটেনা। এদেশে এরূপ ঘটনা বিরল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্র-নারায়ণ তদীয় দ্বিতীয়া রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া কর্ত্তৃক বিষাক্ত হইয়া মৃতবৎ হইলে তাঁহাকেও দগ্ধ করিবার জন্য চিতা সাজান হইতেছে···এমন সময়ে প্রবল বারিপাত হয়; তদবস্থায় সন্ন্যাসীরা আসিয়া রাজাকে লইয়া যায়।

ভাওয়াল ষ্টেটের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ :—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কুমার দার্জিলিং গমন করেন। তথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ তাঁহার আম রোগ ধরে এবং ঐ মে মাসে তিনি মৃতবৎ অবস্থায় শ্মশানে আনীত হন। সংকারের ব্যবস্থা হইতেছে, এমন সময়ে এক পশলা বৃষ্টি পড়ায় সকলে স্থানান্তরে যান। সেই সুযোগে সন্নিকটস্থ কয়েকটি সন্ন্যাসী কুমারের "শব" উঠাইয়া লইয়া যথোপযুক্ত শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তদবধি দ্বাদশ বৎসর কাল কুমার বাহাদুর সেই সন্ন্যাসীদের (নাগা সম্প্রদায়) সমভিব্যাহারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; এই দ্বাদশ বৎসরে একদিনেরও জন্য তাঁহার মনে পড়ে নাই···তিনি কে ও কি উদ্দেশ্যে কোথায় কাহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্মৃতি অল্পবিস্তর জাগরূক হওয়ায় তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে জয়দেবপুর গ্রামে (ঢাকা জিলা, ভাওয়াল এষ্টেটের রাজধানী) একটি "বাঁধের" নিকটে রাখিয়া যান। তদবধি ক্রমশঃ তাঁহার সকল পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া আসে···যেমন অভিজ্ঞান দর্শনে দুষ্মন্ত রাজার সকল সম্বিৎ শকুন্তলা সম্পর্কে ফিরিয়াছিল। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পাঞ্জাবী কৃষক

সুন্দরদাস নামে পরিচয় করাইয়া ভাওয়াল এষ্টেট সম্পর্কিত সকল দাবী হইতে নিরস্ত করেন। সরকারের একদেশীয় ও জবরদস্তি নিষ্পত্তি না মানিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আদালতে রমেন্দ্রকুমার বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী করেন; ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকার জেলা জজ তাঁহার সে দাবী সপ্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ডিক্রী দিয়াছেন।

যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা রাজা রুদ্রনারায়ণ ও রাজা রমেন্দ্রনারায়ণের উদ্ধারকারী সন্ন্যাসীগুলিকে পূর্ব্বজন্মের গুরুভাই বলিয়া অভিহিত করেন। আন্দুলের কোনও সুবিখ্যাত পরিবারে মুমূর্ষু যুবকের প্রাণরক্ষার্থে অপরিচিত ব্যক্তির অনাহূত আগমন ও চিকিৎসা ব্যাপারের মূলেও ঐরূপ জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হওয়ায় কৃষ্ণলাল নামক এক ব্যক্তি জাল-প্রতাপচাঁদ সাজিয়া আসিয়াছিল; আদালতের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। মুর্শিদাবাদ জিলার শক্তিপুর গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামে একটি যুবক সর্পাঘাতে মৃত বলিয়া কলাগাছের ভেলায় তাহার দেহ ভাসাইয়া দেওয়া হয়; তিন বৎসর পরে (জুলাই ১৯৩৪) গৈরিকধারী একটি যুবক ধীরেন্দ্র পরিচয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু বিমাতা কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হয়। ব্যাপার আর বেশীদূর গড়ায় নাই।

এগুলি হইল এতদ্দেশীয় ঘটনা। কয়েকটি বিলাতী ঘটনারও উল্লেখ করিতেছি :—

(১) Arnauld de Tilh নামক এক ব্যক্তি, Martin Guerre নামক অপর এক ব্যক্তির সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিত। শেষোক্ত ব্যক্তি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেন। বহুকাল পরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি Martin Guerreএর বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, সে এতদিন বিদেশে ছিল, এখন ফিরিয়া আসিয়াছে। পরমাশ্চর্য্যের বিষয় যে আনন্দাতিশয্যে মার্টিনের স্ত্রী আরণল্ডকেই মার্টিন বলিয়া সাব্যস্ত করেন। এই ভুল ভাঙিতে মার্টিনের স্ত্রীর তিনটি বৎসর লাগিয়াছিল।

(২) ১৮৭৭ সালে চৌর্য্যাপরাধে জন্ স্মিথ্ নামক একটি ইহুদী জেল-সোপরদ্দ হয়। ১৮৯৬ সালে কোনও অপরাধে ভ্রমক্রমে পুলিশ অ্যাডল্ফ্ বেক্ নামক একটি সুইডেনবাসীকে জনস্মিথ্ বলিয়া গ্রেপ্তার করে। আদালতে নিজ নির্দ্দোষিতার বিষয়ে বলা সত্ত্বেও যে পুলিশ কর্ম্মচারী আসল জন স্মিথ্‌কে গ্রেপ্তার করিয়াছিল সেই ভ্রম অস্বীকার করায় ও জোর করিয়া বেক্‌কে স্মিথ্ বলিয়া সনাক্ত করায় বেকের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯০৪ সালে বেক্ পুনরায় স্মিথ্ বলিয়া জেল সোপরদ্দ হয়; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই জেলের পুলিশ ইন্সপেক্টার ভ্রম ধরিতে পারেন এবং ১৯০৪ সালে বেক্ কারামুক্ত হন। জনসাধারণ যাঁহারা বেক্‌কে স্মিথ বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়ের মুখের আদল (আদর্শ) ও মাথার চুলের মিল দেখিয়া সাক্ষ্য দেন। হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ মহাশয় হস্তলিপিতে অসাধারণ সামঞ্জস্য পান। ইহুদীরা সুন্নৎ (circumcise) করেন অথচ বেকের তাহা ছিলনা, চিকিৎসকেরা এত বড় একটা বিষয়ে লক্ষ্যই করেন নাই। বেক্ alibi (তাৎকালিক তৎস্থানে অনুপস্থিতির দাবী) প্রমাণ করিতে চাহিলে উকীলরাও তাহা অগ্রাহ্য করে! বিংশ শতাব্দীতে সাক্ষাৎ বিলাতে যে এমন নিদ্দয় প্রহসন ঘটিতে পারে, কে তাহা বিশ্বাস করিবে? অথচ বেচারী বেক্‌কে দোর্দ্দণ্ড পুলিসরূপী শনিগ্রহের কোপানলে পড়িতে হইয়াছিল। বিলাতেও পুলিসের সাক্ষ্য অভ্রান্ত !!!

(৩) সার রজার টিচ্‌বোর্ণ একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; অকস্মাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জাহাজে চড়িয়া সেই যে বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না। বহু বর্ষ পরে এক ব্যক্তি ঐ পরিচয়ে ঐ ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হন। আসল সার রজার অতি সুন্দরভাবে ফরাসী ভাষায় বলিতে কহিতে পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার বামস্কন্ধোপরি একটি পুরাতন ক্ষতচিহ্ন ছিল এবং হস্তে উল্কি চিহ্ন ছিল। এই ব্যক্তির দেহে উহাদের কোনটি না থাকায় এবং ফরাসী ভাষায় সে অনভিজ্ঞ হওয়ায় সে জাল সপ্রমাণিত হয়।

(৪) হিংসবি ষ্টেটের মালিকের মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে মিসেস্ হিংসবি একটি চার বৎসরের পুত্রকে তাহারই স্বামীর ঔরসজাত পুত্র বলিয়া উপস্থাপিত করিলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ভাস্কর্য্যশিল্পী সার্ জর্জ ফ্র্যাম্পটনের সাক্ষ্যক্রমে সে দাবী অগ্রাহ্য হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ঘটনা জগতে বিরল বলিয়া আর দৃষ্টান্ত আমার পুঁজিতে নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, বিলাতে চার্লস্ পীস্ নামক একজনকে পাওয়া গিয়াছিল যে কোনও-

রূপ কৃত্রিম কৌশলের আশ্রয় না লইয়াই সুধু মুখভঙ্গি দ্বারা তাহার মুখের আদল ক্ষণে ক্ষণে এমন বিকৃত করিতে পারিত যে তাহার স্ত্রী পুত্র এবং সি-আই-ডি বিভাগের অতি-পরিচিত বিশেষজ্ঞরাও তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিতনা ! এই পীস্ সাহেব একবার জেল-সোপরদ্দ হন ; তাঁহার সময়ের জেলের কর্ম্মচারীরাও তাঁহার মুখভঙ্গিতে বিব্রত হইয়া পড়িত।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করিতে চাই :—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এথেল্ উইলিয়াম্‌স্ স্বামীর সঙ্গে কলহান্তে নিরুদ্দিষ্ট হন। দুইমাস পরে নদীতে ভাসমান একটি নারীর শবকে ফ্র্যাঙ্ক উইলিয়াম্‌স্ তাঁহারই স্ত্রীর শব বলিয়া সনাক্ত করেন। তৎপরে করোনার মহাশয়ের আদেশানুসারে এথেল্ মৃতা হইয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অকস্মাৎ সেই এথেল সশরীরে পতিগৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে থাকিলে কি হয়, আইনানুসারে তিনি—মৃতা !!! হাকিম ফিরিলেও, হুকুম ফিরেনা !!!

(২) কারণ কি ?

লোকরা জাল-লোক সাজে কেন ? ইহার প্রধান কারণ—অর্থাকাঙ্ক্ষা। একজন পেন্সনার মরিয়াছেন, তাঁহার পেন্সনসংক্রান্ত দলিলপত্র হস্তগত করিয়া সেই পেন্সন ভোগ—ইহার কথা পূর্ব্বে শোনা গিয়াছে। এই জন্য প্রত্যেক পেন্সন-ভোগীকে Life certificate (বা তিনি জীবিত আছেন, এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট্) দাখিল করিতে হয় ! ইন্সুরেন্স বা বীমা কোম্পানীতে মোটা অঙ্কের টাকা বীমা করিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মূল্যবান আসবাব ভাড়া করিয়া তদ্দারা গৃহ সুসজ্জিত করিয়া, দ্বারবান চাকর রাখিয়া, আত্মীয় স্বজনকে কিছু অর্থদান দ্বারা হস্তগত করিয়া হাসপাতাল হইতে মুমূর্ষু রোগীকে আনাইয়া, খুব ধূমধামের সহিত তাহার চিকিৎসা করাইয়া মৃত্যুকালে সাহেব ডাক্তারের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া বীমার টাকা আদায় করার কথাও সংবাদপত্রে কয়েকবার পড়া গিয়াছে। ধূমধাম সহকারে বাড়ী ও আসবাব ভাড়া করিয়া মোটা-বেতনের কর্ম্মচারী সাজিয়া ভাবী-শ্বশুরকে ঠকাইবার চেষ্টার কথাও শুনিয়াছি। বন্ধুপত্নীকে সরাইয়া দিয়া তাঁহারই ভাসমান লাশ সনাক্ত করিয়া, পরে সেই রমণীকে সম্ভোগ করার অনুরূপ বৈদেশিক দৃষ্টান্ত উপরে Arnauld de Tilhএর বিবরণে পাওয়া যাইবে। জীবিত পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া, এক ঘটি নহে এক কলসী অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা আমাকে বঞ্চনা করার দৃষ্টান্ত কখনো ভুলিবনা। যাহা হউক—সুখের বিষয় এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বিরল। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা কি চিকিৎসক, কি ব্যবহারজীবী, কি জনসাধারণ—সকলেরই পক্ষে শিক্ষণীয় হইয়া থাকিবে।

বৈদ্যক-ব্যবহারশাস্ত্র-গ্রন্থ (Medical Jurisprudence) প্রণেতা টেলার সাহেব বলেন যে বাহ্যতঃ একই চেহারাযুক্ত দেহের বিভিন্ন স্থানে একই ক্ষতাদি চিহ্নযুক্ত এমন কি একই নামের লোক একাধিকবার পাওয়া গিয়াছে ;—ইহা বাস্তব সত্য—কল্পনা নহে। তিনি আরো বলেন যে ভুল করিয়া নির্দ্দোষীকেও ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। বিলাতের "Perry Case" নামক ঘটনায় পেরীকে খুনের দায়ে উপর্য্যুপরি তিনজনের ফাঁসি হওয়ার পরে আসল পেরী সশরীরে উপস্থিত হয়। অনুরূপ অপর ঘটনায় ফাঁসির হুকুম হওয়ার পরে আসল ও জীবন্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয়। এদেশে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ অবস্থায় বিহারীলাল সিংহের পাঞ্জাবে (?) ফাঁসি হয়।

(৩) সনাক্ত করিবার উপায় কি ?

(ক) সাধারণ উপায়গুলি এই :—

অবৈজ্ঞানিক ভাবে যে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ সাহায্যে আসল ও জাল ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়, সেগুলি প্রধানতঃ এই :—

(১) আঁচিল, জড়ুল বা দৈহিক অস্বাভাবিকত্বসূচক চিহ্ন দ্বারা—যথা, কুশ-পা, টারা চোখ, জোড়া আঙুল বা ছয়টি আঙুল, চেরা-ঠোঁট, চেরা-তালু, বগলে কুঁচ্‌কিতে বা নিম্নোদরে স্তনের আবির্ভাব, মুখের অস্বাভাবিক গঠন প্রভৃতি। Gould & Pyle প্রণীত Anomalies & Curiosities of Medicine নামক পুস্তকে অসংখ্য ছবি ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

(২) আঘাত, অস্ত্রোপচার প্রভৃতি জনিত দাগ ; উপদংশ, টিউবারকুলোসিস্, ইচ্ছাবসন্ত, জোঁক বসান, যকৃত বা পীলা-দাগা, তড়কার ছ্যাকা দেওয়া, গুল বসান প্রভৃতি

জনিত অঙ্গবিশেষে স্থায়ী চিহ্ন সাহায্যে আসল ও নকল ব্যক্তিকে অনেক সময়ে প্রভেদ করা সম্ভবপর হয়।

(৩) ব্যবসায়ঘটিত কতকগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তৎসাহায্যে মানুষকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে; যথা, পাল্কী-বেহারাদের কাঁধে, কেরাণীদের দক্ষিণ মধ্যমাঙ্গুলের অগ্রভাগে, রুইদাসদিগের বুকে, সূত্রধরদিগের দক্ষিণ করতলে কড়া পড়ে।

(৪) বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেহে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন দৃষ্ট হয়; যেমন, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে সুন্নৎচিহ্ন, হিন্দুদের কর্ণ ও নাসাবেধ চিহ্ন প্রভৃতি।

(৫) চলনভঙ্গি, মুদ্রাদোষ, কণ্ঠস্বর, তোৎলামী, আধ আধ ভাষা, মুখের আদল—সনাক্ত করার বিষয়ে এগুলিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু অনেকে জানেন যে, ব্যাধির ফলে ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। অতএব এ প্রমাণগুলি অপর অবৈজ্ঞানিক প্রমাণের মত অকাট্য নহে।

(৬) বিদ্যার পরিচয়—অনেক স্থলে আসল লোক হইতে নকল লোককে সহজেই ধরিয়া দেয়। উল্লিখিত টিচ্‌-বোর্ণ মামলায় ও ভাওয়াল মামলায় ইহার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণশক্তির পরীক্ষারও মূল্য উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ অবৈজ্ঞানিক সাক্ষীর মূল্য খুব বেশীও নয় এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। কারণ প্রত্যেক সাক্ষীর স্মৃতিশক্তি, তুলনাশক্তি ও প্রকাশ শক্তি সমান নহে বলিয়া সাক্ষ্যদিগের মধ্যে নানা জটিল তর্ক উঠে—যাহার মীমাংসা করা অনেক সময়ে "কাজীর বিচারে" পরিণত হইতে পারে। এজন্য—

(খ) বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ কত রকমে হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলির মধ্যে যেগুলি অতীব সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয়-প্রায় এবং তজ্জন্য এদেশে এখনো আলোচিতও হয় নাই প্রথমেই তাহাদিগের বিষয়ে উল্লেখ করিয়া শেষের দিকে সাধারণ-বোধগম্য ও দেশপ্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় দিতেছি :—

(১) পৈশিক থলি হৃৎপিণ্ড যতবার সঙ্কুচিত হয়, ততবারই তৎকর্ত্তৃক সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তি উন্মুক্ত হয়। "ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ" নামক যন্ত্রে সেই বৈদ্যুতিক শক্তির গতি ও মাপ অঙ্কিত হইতে পারে। অধ্যাপক স্যার টমাস্ লিউইস্ বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড কর্ত্তৃক মুক্ত বিদ্যুত্তরঙ্গের ছবি তাহারই বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। কাযেই, যদি কোনও ব্যক্তির জীবনে পূর্ব্বে কোন দিন এই ছবি উঠান হইয়া থাকে, তবে উত্তরকালের ছবির সহিত তাহার মিল থাকিবার কথা।

(২) অনেকেই জানেন যে চক্ষু চিকিৎসকরা অন্ধকার গৃহে চক্ষের মধ্যে আলো ফেলিয়া চক্ষের ভিতরকার অংশের (Fundus Oculii) অবস্থা পরীক্ষা করেন। কেহ কেহ বলেন, মুখের আদল যেমন ব্যক্তিগত এই ছবিও তেমনি মাত্র ব্যক্তিগত। পূর্ব্বে এই চক্ষের অভ্যন্তরের ছবি যদি গৃহীত হইয়া থাকে, তবে পরে তৎসাহায্যে সেই ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়।

(৩) সকলেই জানেন যে আমাদের চর্ম্মে অতীব সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ী আছে—Capillaries জালক বা কৈশিক নাড়ী। প্রত্যেকের হস্তাঙ্গুলীর শীর্ষদেশে যেভাবে ঐ জালক বা কৈশিক নাড়ী সজ্জিত থাকে, তাহা তাঁহারই বিশেষত্ব। কাযেই অঙ্গুলীর মাথায় এক ফোঁটা cedar oil দিয়া তলা হইতে জোর আলো ফেলিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ব্যক্তিগত জালক নাড়ীর প্যাটার্ণ দ্রষ্টব্য।

(৪) মানুষ যখন স্থির থাকে, তখন পুরুষ হইলে প্রতি সেকেণ্ডে দশ রকমের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্যাটার্ণ তাহার মস্তিষ্ক কর্ত্তৃক মুক্ত হয়; ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে ছবিয়া দেখান যায়; নারীর মস্তিষ্ককর্ত্তৃক বিশ রকমের প্যাটার্ণ মুক্ত হয় ঐ সময়ের মধ্যে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের Good Health নামক আমেরিকান্ পত্রিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

(৫) প্রকোষ্ঠাংশে (forearm) শিরা (veins) দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকোষ্ঠে এই শিরার সজ্জা তাহারই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া বলা হয়।

(৬) এদেশে বাদসাহদিগের "পাঞ্জা" ছিল অনেকেই জানেন। সেটি অনেকটা মোহরেরই (seal) অনুকৃতি। সার উইলিয়াম হার্শেল নামক একজন জজ প্রায় বিশ বৎসরকাল আদালতের দলিলাদিতে অঙ্গুলির ছাপ (finger impression বা টিপ্-সহি) লওয়ার অভ্যাসের পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় বিশ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণের পরে, বার্টিলন্ নামক একজন ফরাসী সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাম হস্তের বাহু,

প্রকোষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির মাপ, চরণের মাপ, মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, দেহের দৈর্ঘ্য, কর্ণের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ—এই সমস্ত গুলির মাপ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সঙ্গে চক্ষুর তারকার বর্ণ, কর্ণের আকৃতি প্রভৃতিও লিখিয়া লইতেন। এই হইল পাশ্চাত্যদেশে প্রথম Criminal Anthropometryর সূত্রপাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে বিভিন্ন মাপক যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মাপের গরমিল প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। বেশীর ভাগ লোকরা দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করেন বলিয়া, মাপগুলি বাম হস্তেরই লওয়া হইত—কারণ কর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে হস্তের যথাক্রমে অবনতি ও উন্নতি অনিবার্য্য।

(৭) তৎপরে আসিল—Galton Henryর Dactylography বা finger print বা টিপসহির প্রথা। Henry সাহেব ছিলেন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং গ্যালটন্ লণ্ডনেরই ভাই। প্রায় একই সময়ে উভয়ে তথ্য প্রকাশ করেন বলিয়া এইটি ঐ ভাবে যুক্ত-নামে পরিচিত। একটি আতসী কাঁচ (magnifying lens) ধরিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ষিত ভূমির ন্যায় আমাদের অঙ্গুলি ও করতলে পর্য্যায়ক্রমে উঁচু আইলবৎ রেখা ও খাদ আছে। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই প্যাটার্ণের একচুল পরিবর্ত্তন হয় না। এমন কি কোন কোন স্থলে বংশানুক্রমিক এই একই প্যাটার্ণ বজায় থাকিতেও দেখা গিয়াছে। তর্জ্জনীর প্যাটার্ণ হরেক রকমের হয়; কিন্তু কনিষ্ঠাঙ্গুলের প্যাটার্ণ প্রায় হরেক রকমের হয় না। দৈবাৎক্রমে একব্যক্তির একটি আঙুলের ছাপ হুবহু অপরের ছাপের সমান হইতে পারে বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্রে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা একত্রে, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে একত্রে, বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে একত্রে, বাম হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্রে—এই ভাবে পাঁচটি জোড়া করিয়া আঙুলের ছাপ ধরা হয়। কি করিয়া এই পাঁচ জোড়া ছাপকে নামাঙ্কিত ও অঙ্কযুক্ত করিয়া C. I. D. কর্ত্তারা লোকদিগের ছাপ রাখিবার bureau স্থাপন করিয়াছেন; তৎসাহায্যে অভ্রান্তরূপে আসল ও নকল ব্যক্তিকে ধরিয়া দেন, তাহার বর্ণনা বড় জটিল বলিয়া আমি বিরত রহিলাম।

(৮) হস্তের মত চরণের ছাপও প্রামাণ্য।

(৯) যাঁহারা স্বাভাবিক আকৃতির ও সুস্থ তাঁহাদের বয়সের অনুপাতে দেহের দৈর্ঘ্য এবং ওজনের একটা নির্দ্দিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব বয়স, দৈর্ঘ্য বা ওজন যাহা হোক একটা পাইলে অপর দুইটা নিরূপণ করা অনেকটা সহজ হয়। এই বয়সানুপাতিক Height and Weight Ratioও সনাক্ত বিষয়ে সহায়ক।

(১০) দন্তের গঠন, দন্তের উপরে দাঁত-বাঁধানওয়ালার কারিগরি প্রভৃতি সাহায্যেও অনেক সময়ে নকল-ব্যক্তি ধরা পড়িয়া যায়।

(১১) চুলের আকৃতি প্রকৃতিও কতকটা সাহায্য করে। কিন্তু কলপ প্রভৃতির ব্যবহার সহজে ধরা পড়িলেও ক্ষণিক ধাঁধা উৎপাদন করে।

(১২) ফটোগ্রাফ সাহায্যেও আসল-নকল প্রভেদ করা সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফটোগ্রাফ তোলার তারতম্যে অনেক সময়ে যে অনেক গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; অর্থাৎ ফটোগ্রাফ বিশ্বাস্য প্রমাণ হইয়াও স্থলবিশেষে ফটোগ্রাফ ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তবে যদি একটি বংশের কয়েকটি ফটোগ্রাফের নেগেটিভ উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তাহার ছবি উঠান যায়, তবে মোটামুটি সেই বংশের ছেলে কি না, তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায় উক্ত আবছায়া আদল (আদর্শ) হইতে।

(১৩) যাহাকে বলে Blood Grouping Test—তাহাও সনাক্ত কার্য্যে পরম সহায়ক। সকলেই জানেন যে, মানুষের রক্তে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রক্ত রস (serum) ও রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles, বা সংক্ষেপে R B C) আমাদের লক্ষ্য। বহু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে কোনও একজনের রক্ত, অপর রক্তে মিশিলে হয় উভয়েই বেমালুম পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে; নতুবা নবাগত রক্ত যে ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়াছে তাহার R B C গুলিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া অধঃস্থ ও ধ্বংস করিয়া বসে। এই ভাবে যত রকমের মানুষ আছে, তাহাদের রক্তের এই দোষ গুণ হিসাবে, মানুষরা ছয়টি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—A বা II, B বা III, A B বা I, O বা IV, M ও N. পিতৃ ও মাতৃরক্ত হিসাবে সন্তানের রক্ত বিশিষ্ট শ্রেণীতে পড়ে। কাযেই আসল ও নকল ব্যক্তির এক এক বিন্দু রক্ত দ্বারা তাহারা একই কি পৃথক ব্যক্তি—তাহা নির্ণয় করা আজ খুবই সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই সমস্ত বিষয়ে কি বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর বেলা এইগুলি দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হয় নাই এবং কলিকাতা ব্যতীত অপর কোথাও এগুলি সম্ভবপর হয় কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, এবারকার মত বাহুল্যভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

বিমান কহিল—"সেই ত নির্য্যাতন! এখন আপনারাও যদি ওঁদের ত্যাগ করেন—"

"না বাবা, তা ক'র্‌বার ইচ্ছে ত নেই।"

"কিন্তু বাধ্য ত ওরা ক'র্‌ছে। না ক'র্‌লে যে ছেলের পৈতেই আপনার হবে না।"

"তাও হবে। দুঃখীর মা-বাপও ত ওপরে একজন আছেন। সে বন্দোবস্তও একরকম ক'রেছি।"

বিমান কহিল—"কি ক'রেছেন জানি না! যার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন, সবাই গিয়ে চাপ দিলে, সেও হয়ত শেষে ভড়্‌কে যাবে। আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, যদি গ্রহণ করেন, ছেলের পৈতে ত হবেই, এসব কথাও বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ যে নির্য্যাতিতা তরুণী—তাঁর জয়জয়কার পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবুজ দলেরও বড় একটা প্রতিষ্ঠা হবে, তার বিজয়দুন্দুভি চারদিকে বেজে উঠ্‌বে, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি সমগ্র দেশকে মুখরিত করে তুল্‌বে?"

রটন্তীর একটু হাসি পাইল। ইহারা কি বলে শুনিবার জন্য কৌতূহলও কিছু হইল। কহিলেন, "তা বল বাবা, শুনি তোমরা কি বল্‌তে চাও।"

বিমান কহিল, "সবুজ দল আমরা পৈতে-টৈতের প্রয়োজন কিছু স্বীকার করি না, বরং মানুষে মানুষে অন্যায় একটা ভেদের চিহ্ন ব'লে তার লোপই কামনা করি। তবে এইক্ষেত্রে যখন এই পৈতেটাই হ'য়েছে তরুণীর প্রতি ভীষণ এই নির্য্যাতনের একটা হেতু—তখন এইটে ধ'রেই এই নির্য্যাতনকে আমরা বন্ধ করতে চাই! কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুল্‌তে হয়। স্থির করেছি অনুষ্ঠানটা আমরাই করিয়ে দেব। শাস্তর-টাস্তর জানে এমন বামুনের ছেলেও আমাদের দলে আছে। সে এসে পৈতে দেবে, একটি পয়সা নেবে না, আমরা এসে গাঁয়ের সব তরুণদের এনেও খাওয়াব। কিছু আপনার লাগ্‌বে না। জিনিস-পত্তর আমরাই জুটিয়ে আন্‌ব।"

রটন্তী কহিলেন—"তা বাবা, আজকালকার ছেলে তোমরা, বলোস্তাদী কর, হাঁ, এমন ধারা একটা হৈ রৈ করতেও পার বটে। তবে এই কথাটা কি তাতে বন্ধ হ্‌বে? বরং আরও ডালপালা অনেক বেরোবে। ব্যাটা ছেলে—তোমরা একদিন এই ঘটা করে যে যার ঘরে চলে যাবে—মরণ হবে শেষে ঐ আবাগী মেয়েটার।"

"না না, তা হবে না। হ'তে আমরা দেব না, হবার সম্ভাবনা গোড়াতেই বন্ধ করে দেব। রাত্রি প্রভাতে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে মাল্য চন্দনে ভূষিত ক'রে ওঁকে নিয়ে আমরা বিরাট এক শোভাযাত্রায় বেরোব। উচ্চ জয়ধ্বনি করে পাড়ায় পাড়ায় প্রতি রাস্তায় ঘুরিয়ে আন্‌ব। স্তম্ভিত নরনারী বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বে। রসনা সব স্তব্ধ হবে! আজ অবজ্ঞা কর্‌ছে, শ্রদ্ধায় ওঁর পায়ে তখন সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হবে!"

খিল খিল করিয়া রটন্তী হাসিয়া উঠিলেন। বিমান একটু অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

"আপনি হাস্‌ছেন—"

"কি করব বাবা, হাসি পেল। হাঁ, তা ভুল বুঝে লোকে ঝুটো কথা বল্‌ছে, গোলমালও একটা বাধাচ্ছে, সেটা বন্ধ করবার চেষ্টা একটা করতেই হবে। তা এমন একটা বাহাদুরীও ত কিছু সে করে নি যে এত বড় ঘটা তাকে নিয়ে তোমরা করবে। আর সে ঘটারই বা রকম কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ?"

একটু দৃপ্তভাবে মাথা তুলিয়া বিমান কহিল—"অন্যায় সামাজিক শাসনে লাঞ্ছিত যে, এম্‌নি একটা অভিনন্দনের গৌরবের সমুচ্চ-শিখরে তাকে তুলে দিতে হবে। সমাজকেও বুঝিয়ে দিতে হবে তার এ শাসনের দিন চলে গিয়েছে। তরুণ তরুণীর জীবন তার স্বভাবের আনন্দে যে পথে যখন চল্‌তে চায়, স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিতে চ'ল্‌বে! কারও কোনও শাসন-প্রভুত্বের অধিকার তার ওপর নেই। অন্ধ ভ্রান্ত জীর্ণ প্রাচীনতা তবু যদি পথে এসে দাঁড়ায়, এম্‌নি ক'রেই ভেঙে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ধূলিসাৎ ক'রে ফেল্‌তে হবে। তরুণের ফাল্গুনোৎসব মুখরিত সজীব সবুজ সমাজ তখনই তার উপরে গড়ে উঠ্‌বে।"

"কি ব'ল্‌ছ বাবা, বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তা যাই তোমরা করতে চাও, তার সঙ্গে ঐ লতির কি? ওকে নিয়ে এত ঘটা কেন করতে চাইছ?"

বিমান উত্তর করিল—"তাঁর এই নির্য্যাতন যে প্রাচীনতার অসার দম্ভকে ভেঙে ফেলে তার সেই ধ্বংসাবশেষের উপরে আমাদের তরুণ ইমারৎকে গ'ড়ে তুল্‌বার বড় একটা সুযোগ আমাদের এনে দিয়েছে! তাঁর অতীত জীবনের অজ্ঞাত ঘটনার কোনও অনুসন্ধান, কোনও বিচার, আমরা ক'রব না। যে অভিযোগ ক'রে প্রাচীন আজ তাঁকে নির্য্যাতন

হ'য়েছে, তা সত্য হ'লেও আমরা ব'ল্‌ব অন্যায় ত কিছু হ'রেনই নি, বরং তরুণের ন্যায্য অধিকার ভোগে নবযুগের অগ্রগতিকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ঐ পুত্রটি—নবীন এই যুগের ভাস্কর প্রদীপ—অতি আদরে তার আবির্ভাবকে আমরা বরণ ক'রে নেব।"

"ছি ছি ছি! মায়ের ছেলে হ'য়ে এ কি সব কথা তোমরা বল্‌ছ বাবা? এই মান তোমরা ওকে দিতে এসেছ?"

"এই-ই মান। এই মান দিয়েই তরুণ আমরা নির্য্যাতিতা এই তরুণীকে অভিনন্দন ক'র্‌ব। বড় সুখী হ'তাম আজ যদি তিনিও মুখ তুলে আমাদের সঙ্গে বল্‌তে পার্‌তেন—"

"কে আপনারা? কেন আমাকে এই অপমান করতে এসেছেন? কে আপনাদের ডেকেছে?"

সহসা ঘরের বাহির হইয়া আরক্ত দৃপ্ত মুখখানি তুলিয়া লতা ইঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আসুন, আসুন, বন্দে কমরেড। অপমান? অপমান কি ব'ল্‌ছেন? উচ্চ মানে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা ক'র্‌তে যে সবুজকেতনের প্রতিনিধি আমরা এসেছি! এসেছি সবুজের প্রেরণায়—জীর্ণ, শুষ্ক এই গ্রাম যে আপনাকে নির্য্যাতন ক'র্‌ছে—"

"নির্য্যাতন! না, কোনও নির্য্যাতন কেউ এখানে আমাকে করে নি। এরা যা ক'র্‌ছে, তা ক'র্‌তে পারে। আমারই বড় একটা দুর্ভাগ্য এ অধিকার তাদের দিয়েছে।"

"দুর্ভাগ্য? না, দুর্ভাগ্য আপনার কিছু ঘটেনি। এ অধিকারও এদের কিছু থাক্‌তে পারে না। দুর্ভাগ্য? না দুর্ভাগ্য নয়, ভাগ্যই যদি ব'ল্‌তে হয়, বড় একটা সৌভাগ্যই—"

"চুপ করুন! ও সব কথা আর মুখে তুল্‌বেন ত মানীকে ব'ল্‌ব ঝেঁটিয়ে আপনাদের বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবে।"

"কিন্তু আপনি বুঝ্‌ছেন না। এই যে কালি এরা আপনার মুখে দিচ্ছে—"

"তার চেয়ে অনেক বেশী সত্যিকার অতি ঘন একটা কালি আপনারা আমার মুখে দিতে এসেছেন। তার তুলনায় এ কালিও আমি বড় গৌরব ব'লে মাথায় তুলে নিতে পারি।"

রটন্তী তখন বাহির হইয়া কহিলেন—"হাঁ, ঠিক বলেছিস্ লতি, বামুনের মেয়ে—হিন্দুর ঘরের মেয়ের মতই কথাটা ব'লেছিস্, এই যে কালি এরা দিচ্ছে—তুল্‌ বুঝে দিক আর যাই দিক্, দেশের ধর্ম্মে সমাজসামাজিকতার একটা গৌরব মানে ব'লেই দিচ্ছে। আর এঁরা যে সবুজদের ধ্বজা ওড়াতে এসেছেন, ওড়াতে পার্‌লে, তোকে ত ডোবালই, সঙ্গে সঙ্গে দেশ, ধর্ম্ম, সমাজসামাজিকতা সব ডুবল। তা বাবারা শুন্‌লে ত? তোমরা যদি বামুনই কেউ হও, আজন্ম সাবিত্রী পতিত হ'য়ে থাক্‌লেও তোমাদের মত বামুনের হাতের পৈতে আমার ছেলের গলায় উঠ্‌তে পারে না। আর তোমরা ত সত্যি পৈতে দিতে এসনি, এসেছ ঐ আবাগীকে নিয়ে বিতিকিচ্ছি একটা কেলেঙ্কারী ক'র্‌তে—যা না কি এই গাঁয়ের লোকের হাজার কথাতেও হ'তে পারে না। তা বাবা, তোমরা এখন এস গে। আমাদের ছেলের পৈতে—সে আমরাই যা হয় বন্দেজ ক'রে নেব। বলি শুনছ? (স্বামীর দিকে ফিরিয়া) মুখ বন্ধ ক'রে ত মাটির গড়া শিবঠাকুরটি হ'য়ে ব'সে আছ। আর আমরা ঘরের জননী—বাইরে থেকে কারা এসেছে—কোমর বেঁধে ঝগড়ায় নেমেছি। তা শিরোমণি ঠাকুর এসে পৈতে দেবেন। এখন উদ্যোগ আয়োজন শেষ কর।—তিনি তাঁর শিষ্যিদের নিয়ে এসে খাবেন। আর কেউ থাক্ না থাক্, ব'য়ে গেল। হাঁ!"

"কিন্তু—"

ইহার পরেও বিমান আবার কি বলিতে যাইতেছিল। একটু হাসিয়া যোগেশ বাড়ুয্যে কহিলেন—"আর কিন্তু-টিন্তু কিছু চ'ল্‌বে না বাবাজিরা।—দেখ্‌তে পাচ্ছো ত, তবু আড়ালে ছিলেন, এখন ত একেবারে সম্মুখ সমরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওদিকে আবার—ঐ যে বলে 'যার জন্যে করি চুরী সেই বলে চোর'—আমার ভাগ্নীটিও খাঁড়া তুলে এসে উপস্থিত!—অবস্থাটা বেশ একটু সঙ্গীনই হ'য়ে দাঁড়াল। তা বাড়ীতে বাবাজিরা এসেছেন—ভাল মানুষের মত চুপচাপ বসুন, তামাক-টামাক ইচ্ছে করেন করুন—চাল ডাল ঘরে যা আছে, খুসী হ'য়ে রেঁধে আপনাদের সেবা এঁরা ক'র্‌বেন। নইলে ঐ হাতে এখুনি যা ধ'র্‌বেন—"

রটন্তী কহিলেন—"তা সত্যিই ত। বেলা ত কম হয়নি নদী পার হ'য়ে এখন সেই নিতেইড্যাঙ্গা যাবে—একেবারে বেলা অস্ত হবে। তা বোস বাবারা বোস। এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি দুটি রেঁধে দিচ্ছি, খেয়েই যাও।—আ ত লতি—সদি আর কিছু কুটনা কুটে দিক্, তুই গিয়ে উনুনটা ধরিয়ে

দে ত—আমি চাল-ডাল ধুয়ে দু-ঘড়া জল এক্ষুণি তুলে এনে দিচ্ছি—"

বলিয়া ঘরের দিকে পা বাড়াইলেন। ত্রস্ত বিমান কহিল—"আজ্ঞে না, না, আমাদের জন্যে অত হাঙ্গামা কিছু ক'রতে হবেনা। চৌধুরী বাড়ীতে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে।"

বলিয়াই বিমান ও তাহার বন্ধুরা উঠিল। লতা সরিয়া দাঁড়াইল, যুবকরা পৈঠা বাহিয়া উঠানে নামিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া বিমান কহিল—"প্রাচীনতার মোহ তমসাচ্ছন্ন আপনারা আজ এ সুযোগ আমাদের দিলেন না। কিন্তু জানবেন, তামস যুগের শেষ হ'য়েছে। তরুণের অগ্রগতি কেউ আর রোধ ক'রে রাখতে পারবে না! পূর্ব্ব গগন, ঐ দেখুন, নবারুণের রক্তকিরণচ্ছটায় হেসে উঠেছে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভোরের পাখী আনন্দ সঙ্গীতে তাকে অভিনন্দন করছে! সুনীল মধ্যাহ্ন গগন দেখতে দেখতে ভাস্কর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সমুজ্জ্বল সুচঞ্চল সবুজতা সাগর নৃত্যে পৃথিবীর বক্ষে ঢেউ খেলে ছুটবে, আনন্দ নেশায় বিভোর হ'য়ে দিগ-দিগন্তে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে! বল—বল সবে—উঠাও গগনে ধ্বনি শত বেণু-বীণারবে—সমুচ্চ কম্বু-নিনাদে ভেরী তুরী পটাহ বাদ্যে—

—জয় তরুণের জয়। জয় সবুজের জয়!—ক্ষয়—ধূসর শীর্ণ প্রাচীনের ক্ষয়!—"

সমস্বরে অপর সকলে ধ্বনি করিল—"জয় তরুণের জয়! জয় সবুজের জয়! ক্ষয়—ধূসর শীর্ণ প্রাচীনের ক্ষয়।"

তারপর দম্ভে পা ফেলিয়া যুবকগণ চলিয়া গেল, ধূসর পুরাতন প্রাচীন মাটি তখনই যেন পদভরে তাহারা ভাঙিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতে চায়!

হি-হি করিয়া রটন্তী হাসিয়া উঠিলেন।

লতার মুখেও বিদ্রূপের একটু বক্রহাসি ফুটিল। যোগেশ বাঁড়ুয্যে কলিকাটি লইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। মন্দাকিনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া রহিলেন।—

(৬)

মাগো! মাগীর বজ্জাতী চাল দেখনা! শেষে গিয়া কিনা শিরোমণি ঠাকুরকে ভজাইয়াছে! আর কি বুকের পাটা! ঐ শিরোমণি ঠাকুর—যাঁর সম্মুখে মুখে তাদের রা'টি সরেনা—কোন্ সাহসে মাগী গিয়া এত বড় একটা কথা তাঁহার কাছে পাড়িল, আর কি বলিয়াই বা তাহাকে ভজাইল! তাই ত! হারামজাদী না পারে এমন কাজ নাই। বাড়ীতে আনিয়া ছেলের পৈতা দেওয়াইবে—এঁটো মুখ না করাইয়াই কি ছাড়িবে? আর বামুনের বাড়ী, আচার্য্য হইয়া ছেলের পৈতা দিবেন, ধরিয়া পড়িলে দুটি আহার না করিয়াই বা তিনি কি প্রকারে যাইবেন? এমন নয় যে নিজের হাতে একপাকে দুটি হবিষ্যান্নই মাত্র ভোজন করেন। তাহা হইলেও বা একটা ছুঁতা থাকিত।—এখন কি বলিয়া তিনি এড়াইবেন? এড়াইতেই যদি চাহিতেন, পৈতা দিতেও আসিতেন না।—তাইত? কি সঙ্কটেই অভাগী সকলকে ফেলিল! সকলকে জব্দ করিতেই না এই চাল চালিয়াছে। মাগী ঐ লতি কালামুখীকে দিয়াই রাঁধাইবে, তারই হাতের ভাত যেমন ঐ শিরোমণি ঠাকুরকে, তেমনই আর সকলকেও খাওয়াইবে!—এমনিই ত বকিয়া সকলকে কাটা কাটা করিতেছে, এখন আবার ঐ লতিটার হাতের ভাত যদি বাড়ীতে সকলকে আনিয়া খাওয়াইতে পারে, মাগীর দাপে গায়ে কেহ আর তিষ্ঠাইতেও পারিবেনা। নাক কাটার উপরে ঝামাঘসা! জাত্যন্ত যাহা হইবার তাহা ত হইবেই, তাহার উপরে আবার পথে-ঘাটে কত খোটার কথাও শুনিতে হইবে!—তা মিন্সেরা না খুসী গিয়া করুক, কত অনাচারই কত লোকে আজ কাল করে। ঐ লতি আর তার মা যদি গিয়া হেঁসেলে ঢোকে, জলস্পর্শও তাঁহারা গিয়া কেহ করিবেন না!

পরদিন বৈকালের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল, রাত্রি প্রভাতে যোগেশ বাঁড়ুয্যের ছেলের পৈতা হইবে, ভগ্নী ও ভাগ্নীকে সে ত্যাগ করিবেনা, আর স্বয়ং শিরোমণি ঠাকুর আসিয়া পৈতা দিবেন! মেয়ে মহলে এইরূপ অনেক কথাই তখন হইতে লাগিল। পাড়ার পুকুর ঘাটে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পাড়ায় পাড়ায় পথে পথে, ঘাটে ঘাটে, কখনও বা কোনও বাড়ীতে—যেখানেই প্রবীণাদের সঙ্গে প্রবীণাদের দেখা হইতে লাগিল, এই কথারই তীব্র একটা আলোচনা চলিতে লাগিল।

যোগেশ বাঁড়ুয্যে ভয় পাইতেছিলেন। কিন্তু রটন্তীর কড়া হুকুম অবহেলা করিতে পারিলেন না। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের বাড়ীতে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন; সকলেই ভার হইয়া রহিলেন, ভাল্মন্দ কোনও কথাই কেহ বলিলেন না—মাতব্বর

াহারা সন্ধ্যার পর কোনও এক বাড়ীর চণ্ডী মণ্ডপে একত্র ইয়া চুপি চুপি একটা পরামর্শ করিলেন।

শিরোমণি ঠাকুর স্বয়ং গিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন াহারা কিছু আর বলিতে পারেন না, সে ক্রিয়ায় গিয়া যোগ বেন না. ক্রিয়ান্তে শিরোমণি ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া মধ্যাহ্ন ভাজন করিবেন না। তবে ঐ মন্দাকিনী ও তাহার কন্যা—া দুটি নারী ? নারীমাত্র তারা—যোগেশ বাঁড়ুয্যের ঘরে যাক্ ক না যাক্—কোনও কাজে হাত দিক কি না দিক্—এসব কছু দেখিবারই প্রয়োজন তাঁহাদের নাই। তাঁহারা যোগেশ াড়ুয্যের গৃহেই নিমন্ত্রিত, মন্দাকিনীর গৃহে নহেন। হাঁ, ামাজিক সিদ্ধান্তের পর মন্দাকিনীর গৃহে যদি কোনও ক্রিয়া ইত, আর প্রকাশ্যভাবে যোগেশ বাঁড়ুয্যে গিয়া তাহাতে াগ দিত, তবে সে একটা বিবেচনার কথা হইত বটে। কিন্তু েরূপ কোনও ঘটনা ত ঘটিতেছে না, ঘটিবার সম্ভাবনাও াত্র কিছু দেখা যাইতেছে না। এক যদি আকস্মিক কানও পীড়ায় মন্দাকিনীর দেহ ত্যাগ হয় ত্রিরাত্রান্তে াদ্ধটা ত ঐ কন্যাকেই করিতে হইবে। তা—সে তখন ং ভবিষ্যতি তৎ ভবিষ্যতি।' আজ সে কথা ভাবিবার প্রয়োজন কিছু নাই। একটু দোমনা ভাব যাঁহার যাহাই থাক্, কলই একবাক্যে হইয়া গেল, ভগ্নী ও ভাগ্নী সম্বন্ধে প্রশ্ন আর কিছু করা হইবে না, সকলে গিয়া ক্রিয়ায় যোগদান করিবেন, াহারও করিবেন। কিন্তু একটা কথা একজনে তুলিলেন। ন্দাকিনী ও তাহার কন্যার সংস্রব তাঁহারা স্বীকার করিয়া নিতেছেন না বটে, কিন্তু সংস্রবটা ঘটিবেই। তাহারা যদি কহ বাহির হইয়া পরিবেশন করিতেই আইসে! তখন ত আর সত্য চক্ষু বুজিয়া কেহ থাকিতে পারিবেন না। ঐ যাগেশের স্ত্রী যেরূপ ব্যাপিকা ও চক্রিণী, এরূপ একটা ঘটনা অসম্ভব কিছুই নহে। হাঁ, কঠিন সমস্যা বটে! তবে ঐ শিরোমণি মহাশয় ত থাকিবেন, তিনি যাহা করেন তাহাই করা যাইবে। কথাই ত আছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" প্রশ্নকর্তা নীরব হইলেন। নীরবতা ব্যতীত এ অবস্থায় গত্যন্তর ত আর কিছু ছিল না।

বাস্তবিক লতার বিরুদ্ধে এই যে একটা আন্দোলন গ্রামে উঠিয়াছিল, সেটা নারীদের মধ্যেই প্রধানতঃ চলিত। পুরুষরা বড় বেশী আলোচনা ইহা লইয়া করিতেন না। ঘটনাচক্রে কথা একটা উঠিয়াছিল, একটু তোলাপাড়াও এখানে ওখানে কখনও হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ গুরু একটা অপরাধে অপরাধিনী বলিয়াও সকলে লতাকে মনে করিতে বড় পারিতেন না। রটন্তীর যে কলহ এই আন্দোলনটাকে এত বাড়াইয়া তোলে, সে কলহও তাঁহার ঘটিত নারীদের সঙ্গে, পুরুষদের কাহারও সঙ্গে নহে। পৈতা উপলক্ষে একটা সামাজিক বৈঠক যে তাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহাও নিজেদের চিত্তের দ্বিধার প্রেরণায় তত নহে, যত নাকি গৃহে গৃহে নারীদের রসনার তাড়নায়।

পুরুষরা সকলেই গেলেন—শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিয়াও আসিলেন—আর পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন; মন্দাকিনী কিম্বা তাহার কন্যা পরিবেশন করিতে বাহির ত হইলই না, তাহাদের চক্ষেও কোথাও কেহ দেখিলেন না। পরিবেশন করিল যোগেশ বাঁড়ুয্যের স্ত্রী ও তাহার কন্যা, যদিও কানে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে অন্ন-ব্যঞ্জন তাঁহারা ভোজন করিতেছেন পাকশালে মন্দাকিনী ও তাহার কন্যার হাতেই তাহা পাচিত হইয়াছে। তবু ভাগ্য পাকশালে তাহারা আটক পড়িয়াছে। নহিলে, কে জানে তাহারাই আসিয়া হয়ত পরিবেশন করিত। মনে মনে 'জগন্নাথের জয় জয়কার' করিয়া সকলে মনে ভাবিলেন, জাতিটা তাঁহাদের বাঁচিয়া গেল!

কিন্তু নারীদের জাতিটা এত সহজে বাঁচিল না, বাঁচাইতেও তাঁহারা চাহিলেন না। সন্ধ্যার পর প্রবীণা প্রতিবেশিনী কেহ কেহ পথে ডাকিয়া রটন্তীকে বলিয়াছিলেন, বাড়ীতে ওরা আছে, তা দুটি খায় থাক্, এমন আসে যায় না কিছু। বাহিরের অনাথআতুরও ত পাঁচজনে আসিয়া খাইবে। তা ওরা যেন একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকে, আর হেঁসেলে গিয়া না ঢোকে। রটন্তী উত্তর করিলেন—"বাড়ীতে দশখানা ঘর ত আমার নেই, ফাঁকে ফাঁকে কোথায় রাখব? আর হেঁসেলে ঢুক্‌বে না ত রাঁধ্‌বে কি উঠোনে?"

"ওমা! ওরাই গিয়ে রাঁধ্‌বে নাকি?"

"কে রাঁধ্‌বে? আমার এদিকে পাঁচটা কাজ র'য়েছে, হেঁসেলে গে' আট্‌কা থাক্‌তে পারি? মেয়েটা কাঁচা পোয়াতি—"।

"তা রাঁধ্‌বার লোক কি পাড়ায় আর কেউ নেই?"

রটন্তী উত্তর করিলেন—"ঘরে লোক থাক্‌তে পাড়ার

লোকের পায়ে ধ'র্‌তে কেন গেলাম? আর ওদের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন রাঁধুনীই বা পাড়ায় কে আছে? আসি মা, কাজের অন্ত নেই।"

বলিয়াই রটন্তী চলিয়া গেলেন, প্রতিবেশিনীরাও অতি অপ্রসন্নচিত্তে ফিরিলেন।

এমন হিতকথাও মাগী কানে তুলিল না! অসন্তোষটা ইহাতে বাড়িল বই কমিল না। পরদিন কেহ আসিলেন, কেহ আসিলেনই না। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারাও সকলে আহার করিলেন না। একটু ঘুরিয়া ফিরিয়াই চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, অম্লশূল, অন্তর্জ্বর ইত্যাদি কোনও না কোনও ব্যাধির আক্রমণে আহারে তাঁহারা অসমর্থা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অথবা গৃহে পতিপুত্রদেবরাদির গঞ্জনার ভয়ে নিতান্ত যে কয়েকজন এরূপ কোনও ওজুহাত দেখাইয়া যাইতে পারিলেন না—বসিয়া বিষবৎ অন্নব্যঞ্জন কিছু মুখে তুলিলেন বটে, কিন্তু ফিরিবার পথে পুকুরঘাটে স্নান করিয়া গেলেন। তাহাতেও গা ইহাঁদের ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল। অতটা অবশ্য হইত না, যদি একেবারে দল ছাড়া তাঁহারা না হইয়া পড়িতেন—যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও যদি অন্ততঃ পাতে বসিয়া হাতে ভাত করিয়া যাইতেন। ভয়ও একটু হইতেছিল, মাগীরা খোঁটা দিবে, বলিবে তাহাদের জাতি গিয়াছে।

সেদিনকার ব্যাপারটা যে ভাবে হউক, একরকম মিটিয়া গেল, কিন্তু লতার কথা লইয়া যে গোলমালটা গ্রামে উঠিয়াছিল তাহা মিটিয়া গেল না। রটন্তী তাঁহার পণরক্ষা করিলেন, লতা ও তাহার মাতা মন্দাকিনীকে ত্যাগ না করিয়াও পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার সমাধা করিলেন। সকলের পরমপূজ্য শিরোমণি মহাশয়কেও বাড়ীতে আনিয়া লতার হাতে পাক করা অন্নব্যঞ্জন ভোজন করাইলেন। কিন্তু একদিন শিরোমণি মহাশয়ের খাতিরে যেই যাহা করুক, নিষ্কুণ্ঠচিত্তে নির্দ্দোষ বলিয়া লতাকে কেহ স্বীকার করিয়া গেল না—ভবিষ্যতে গ্রামে কাহারও বাড়ীতে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে অন্য পাঁচজনের ন্যায় লতা ও তাহার মাতা নিমন্ত্রিতা হইবেন এমন কোনও সিদ্ধান্তও হইল না। লতা যে উপস্থিত আছে, এই সত্যটাকেই বরং কেহ স্বীকার করিতে চাহিলেন না। রটন্তী যে এমন একটা কৌশলে সকলকে জব্দ করিয়া ফেলিলেন, নারীদের আক্রোশ ইহাতে আরও বাড়িল। আরও কঠোর ভাবে প্রতিবেশিনীরা লতার সংস্রব বর্জ্জ করিয়া চলিতেন। ঘাটের পথে দেখা হইলে অতি সাবধা মুখ ফিরাইয়া একপ্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইতেন। ছায়া মাড়াইতেনই না, লতার গায়ের বায়ুর স্পর্শ লাগিল এরূ সন্দেহ হইলেও কেহ কেহ ভরা কলসীর জল তখনই ফেলি দিয়া আবার গিয়া কলসী মাজিয়া স্নান করিয়া জল তুলি আনিতেন। মন্দাকিনী যতই দুঃখ পাউক, ভাগ্যকে ধিক্কা দিয়া যতই পরিতাপ করুন, লতা কিছুই গ্রাহ্য করিত না নীরব উপেক্ষায় এ সব সহ্য করিয়াও মাতুল গৃহের আশ্র বাস করিতে পারিত। তারপর এত বাড়াবাড়িও বেশীদি কিছু আর থাকিত না। রটন্তীর প্রতি আক্রোশে যিনি যাহা করুন, এটা যে বড় অনাসৃষ্টি রকমের একটা ব্যবহা হইতেছে, তাহাও ইঁহারা ক্রমে অনুভব করিতেন। কি গ্রামে ইহারা থাকিতে পারিলেও খাইবে কি? টাক যখন ফেরত দেয়, কতকটা সাময়িক একটা উত্তেজনার বশে দিয়াছিল। দিয়া এ প্রবৃত্তি আর কখনও তাহার হয় নাই যে ফের আসিলে আবার রাখিবে, অথবা চিঠি লিখিয় মাসিক খরচটার বন্দোবস্ত করিয়া নিবে। হাতে সামান কিছু সম্বল ছিল, কিছুদিন চলিবে। ইতিমধ্যে কোনও কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া নিবে। গ্রামেও অনেক দুঃস্থ নারী ধান ভানিয়া জল তুলিয়া ভাত রাঁধিয়া কি মুড়ি ভাজিয়া চিড়া কুটিয়া তাহা বিক্রয়ে উদরান্নের সংস্থান কিছু কিছু করিয়া থাকে। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কাহারও বাড়ীতে গিয়া কাজকর্ম্মের সহায়ত করিলেও পাঁচদিন চলিয়া যায়। সকল রকম কাজকর্ম্মে বিশেষ যোগ্যতাও মাতাপুত্রী দুইজনেরই ছিল। জামা সেলাই কাঁথা সেলাই ইত্যাদি শিল্পেও নিপুণতা যথেষ্ট ছিল, তাহাতেও আয় কিছু হইতে পারে। লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছিল, ছোট ছেলেপিলেদের পড়াইতে পারিবে। আশা করিয়াছিল, এইরূপ নানারকম কাজে হয়ত কোনও মতে দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু এখন দেখিল, এরূপ কোনও কাজে কেহ কখনও তাহাদের ডাকিবেনা। রটন্তী যতই বলুন ক্ষুদকুঁড়া যাহা জোটে ভাগ করিয়া খাইবেন—কিন্তু ভাগ করা দূরে থাক্, নিজেদের মত দুটি ক্ষুদ কুঁড়ারও তেমন সংস্থান তাঁহাদের ছিলনা। সামান্য কিছু ধানী জমি ছিল, আট নয় মাসের খোরাকী তাহাতে হইত। আর একটু

ঠশালা ছিল, নগদ সামান্য কিছু তাহাতে আসিত। য়কটি ছেলেপিলে লইয়া অতি ক্লেশে যোগেশ বাঁড়ুয্যের াতিপাত তাহাতে হইত। ছেলের পৈতায় আবার ছু ঋণগ্রস্তও তাঁহাকে হইতে হয়। সুতরাং ভগ্নী ভাগ্নী ভাগ্নীপুত্র তিনটি পোষ্য পালন যে তাঁহার পক্ষে অসাধ্য, থা ঠাণ্ডা হইলে এই সত্যটা রটন্তী নিজেও বেশ উপলব্ধি রিলেন। লতা অতি তেজস্বিনী মেয়ে, সাধ্য হইলেও হাদের ভারবোঝা হইয়া থাকিতে চাহিবেনা ইহাও তিনি ঝতেন। এ সঙ্কটে এখন কর্ত্তব্য কি? কয়েকদিন গেল— া শেষে কহিল "চল মা কাশীতে যাই।"

"কা—শী—তে!"

"কি ক'রবে মা? এখানে ত আর চ'লবে না?

"বরং ক'লকেতায় চল্। পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজব। ্ব এমনি ধারা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে সে—"

"ক্ষেপেছ মা? ক'লকেতা—সে কি এতটুকু যায়গা? াথায় তুমি কাকে খুঁজবে! অসহায় ছুটি মেয়েমানুষ মরা—কি ক'রব?. কোথায় গিয়ে কার আশ্রয়ে দাঁড়াব? দনের তরে একটু ঠাঁই দেবে, এমন জনও ত কেউ আমাদের থায় নেই।"

মন্দাকিনী কহিলেন—"এত বড় সর্ব্বনাশটা ক'রে কোথায় লুকোল, অমনি ছেড়ে দেব? কিনেরা এর কিছুই বনা?"

"কি ক'রবে মা? যা হবেনা, তা হবেনা। ওসব ভেবে বল নিজেই পুড়ে মরা। কপালে যা ছিল, হ'য়েছে। না—না মা, কোনও উপায় আর নেই। ম'রতে ত পারি চল কাশী যাই। আর যে কোনও ঠাঁই, কোনও শ্রয়, এ পৃথিবীতে আমাদের নেই।"

"কাশীতেই বা কোথায় যাব? কোথায় গে দাঁড়াব? থাই বা কে আছে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?"

চক্ষু ছুটি লতার ছলছল করিয়া উঠিল। একটি নিশ্বাস পিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"বিশ্বনাথ আছেন, তিনিই আশ্রয় বন। কত অনাথা শুনেছি সেথায় আছে। আমাদের— মাদের কি একটু যায়গা হবেনা?"

মুখখানি ফিরাইয়া নিয়া লতা হাতে চক্ষু ছুটি পুছিল। াকিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—"হাঁ, আছে ছি কত হতভাগী। তাদের মত হয়ত একটু ঘর ভাড়া ক'রে কোথাও থাক্তে পারব। কিন্তু তারপর, কি ক'রব সেখানে? খরচ যা পাঠাত, তাও বন্ধ ক'রে দিলি—"

অতিকষ্টে কণ্ঠ সংযত করিয়া লতা উত্তর করিল—"অনাথা কত বামুনের মেয়ে রেঁধে সেখানে খায়—"

"যদি কেউ না রাখে? যদি এই জাতমারা অপবাদের কথা সেখানেও ওঠে?"

চক্ষু মুখ লতার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, একটু দম নিয়া শেষে কহিল—"ওঠে—তখন কপালে যা থাকে, হবে। যেতেই হবে মা। এখানে ত আর থাক্তে পারছ না? আর কোথাও যে যাবার যায়গা নেই।"

একটু ভাবিয়া মন্দাকিনী কহিলেন—"না—এখানে আর থাক্তে পারছি না। অপমান যদ্দূর হবার হ'চ্ছে। পথে বেরোনও অসাধ্যি হয়ে উঠেছে। তারপর খাবই বা কি? বউ যাই বলুক, সত্যি সে ক্ষুদকুঁড়োই বা কদিন আমাদের যোগাতে পারবে? আর কোথাও কেউ নেই—ঠাঁই একটু দিয়ে ছুটো দিনও আমাদের পুষ্তে পারে। কাশীতে কত অনাথা আছে, আমাদের ঠাঁইও হয়ত একটু হবে। তা এক কাজ ক'রবি লতি? খরচটা যে তাঁরা দিচ্ছিল দয়া ক'রে ত ভিক্ষে দিচ্ছিল না? দাবী তোর আছে তাই দিচ্ছিল। তা বরং চিঠি একটা লিখে দে—"

"না, আর তা পারব না মা!—ও কথাই আর তুলোনা। ওসব দাবী দাওয়ার কথা একদম ভুলেই যাও।"

"কেবল ভাত রেঁধে কি কুলোবে মা? ঘর ভাড়া দিতে হবে, ব্যামো পীড়ে আছে, ষাট্ ঐ ছেলেটা—"

"যা কুলোয়। আরও পাঁচজন আছে—তাদের যেভাবে দিন যায়, আমাদেরও যাবে।"

"তবে চল্। কিন্তু—নিয়ে যাবে কে?"

"মামাকে বল।"

যোগেশ বাঁড়ুয্যে শুনিয়া কহিলেন—"যেতেই যদি চাস্, রেখে আমি গিয়ে আস্তে পারি। কিন্তু—"

কিন্তু ছিল গৃহিণী রটন্তীর অনুমোদনের অপেক্ষা। বলা-বাহুল্য রটন্তী আপত্তি করিলেন। কহিলেন—"অমনিই ত ডাক ছেড়ে সবাই বল্তে থাক্বে, কালামুখ নিয়ে গাঁয়ে তিষ্ঠুতে পারলনা, কাশীতে গিয়ে ঠাঁই নিতে হ'ল, যেমন আর পাঁচজনকে হয়। অমন সর্ব্বনেশে কাজও ঠাকুরঝি ক'রোনা। জোর ক'রে মুখ তুলে থাক, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আর

এই মাগীদেরও বলি—সব যেন সিঙ্গী অবতার হ'য়ে উঠেছে! মিন্সেরা সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, কথাটিও কেউ আর ব'ল্‌ছে না। আর ঘরের মেয়েমানুষ—কুলের ল ল না—তোদের বাপু এত অনাসৃষ্টি কেন?"

মন্দাকিনী কহিলেন—"এ সব অনাসৃষ্টির জন্যে ত তত্তটা ভাব্‌তাম না বৌ। না হয় লোকের মাঝে বেরোতাম না, ঘরে ব'সেই থাক্‌তাম। কিন্তু ঘরে ব'সে থেকে ত পেট চ'ল্‌বে না। কাজকর্ম্ম বরং কাশীতে কিছু জুট্‌বে। কিন্তু এখানে—"

"বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে। আজ না বুঝুক কাল সবাই বুঝ্‌বে। শিরোমণি ঠাকুর দয়া ক'রেছেন, কদিন আর এ গোলমাল থাক্‌বে? তখন পথ একটা হবেই? তদ্দিন—তা আমরাও ত পেটে দুটি খাব—"

লতা বুঝাইয়া কহিল—গোলমাল যদি কখনও মেটেও, কতদিনে মিটিবে কেহই বলিতে পারেনা। ততদিন অতিরিক্ত তিনটি লোককে পোষণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। আর ক্ষতি এমন কি? দুঃখে পড়িয়া ভাল লোকও ত কত কাশীতে গিয়া থাকে, কাজকর্ম্ম করিয়া খায়। আর কাশীতে যত সহজে এরূপ কাজে উদরান্নের সংস্থান তাঁহারা করিতে পারিবে, গ্রামে কোনও অবস্থায় কখনও তাহা সম্ভব হইবেনা। লোকে কত কথাই ত বলিতেছে, নূতন আর কি বলিবে? কয়দিনই বা বলিবে? যাহাই বলুক, কি এমন তাহাদের আসিয়া যাইবে? সত্য কথাও যাহাদের সম্বন্ধে বলে, তাহাদেরই বা কি আসিয়া যায়? দুদিন বাদে কোনও কথাই আর থাকিবেনা। অনর্থক এইসব কথার তোলাপাড়া কতদিন আর কে করিবে? তাঁহাকে কিছুদিন লোকে খোঁটা দিবে। তা খোঁটার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি যথেষ্ট তাঁহার আছে। এখন রেলের পথ হইয়াছে, কতলোকে কাশী যায় আসে। সাধু পথে কি ভাবে তাহারা জীবনযাপন করিতেছে, সকলেই এ সংবাদ পাইবে। কোনও কথাই আর তখন থাকিবেনা। নিন্দার পরিবর্তে শ্রদ্ধাই বরং সকলে তাহাদের করিবে।

রটন্তী কহিলেন—"সবই বুঝি মা। কিন্তু আজ এইভাবে তোদের যে বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে, তা যে কিছুতেই বরদাস্ত ক'র্‌তে পারছিনি লতি!"

বলিতে বলিতে রটন্তী কাঁদিয়া ফেলিলেন। লতা কহিল—"কেঁদো না মামীমা। যে ভাবেই আজ যাই, গিয়ে যে উপায় নেই, ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান, মুখ তুলেই আবার একদিন আস্‌ব, তোমার কাছে এসে মধ্যে মধ্যে থাক্‌ব। তোমার মত বান্ধব যে আমার আর কেউ কোথাও নেই মামীমা।"

বুকে লতাকে জড়াইয়া ধরিয়া রটন্তী কহিলেন—"তবে যা মা।—বাবা বিশ্বনাথ মুখ তুলে চান, মুখ তুলেই যেন আবার একটি বারের তরেও আস্‌তে পারিস্। আর সত্যি বাড়ী ত তোর চিরদিনের বাড়ী নয়। এখানে থাকাও কিছু মানের কথা নয়। তোর যে বাড়ী, সেই বাড়ীই তোর বাড়ী হ'ক্। সেই বাড়ী থেকে সেই বাড়ীর গৌরব নিয়েই যেন একবার আস্‌তে পারিস।" ক্রমশঃ

আফ্রিদি মুলুকে

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

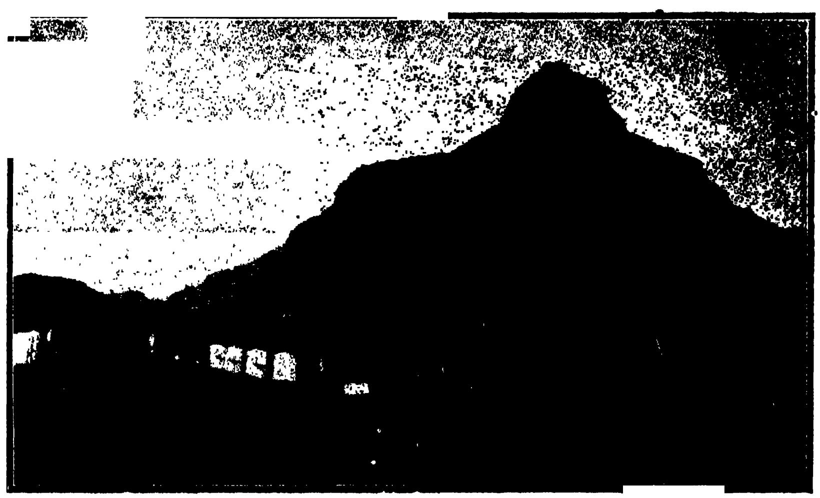
যদিও মানচিত্রে সমস্ত ভারতবর্ষের বুকেই লাল কালি দিয়ে ইংরেজের রক্তচক্ষুর চিহ্ন জগৎকে জানিয়ে দেওয়া হোয়েছে, তবু সত্যিই সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন নয়। এর উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কতকগুলি মুষ্টিমেয় দরিদ্র অসভ্য (?) লোক নিজেদের রক্ত দিয়ে এই লাল কালির কালিমা আজও ঠেকিয়ে রেখেছে। নিয়মিতভাবে কোটী কোটী টাকা ব্যয়ে আধুনিক যুদ্ধোপকরণের সমস্ত যন্ত্র ও শক্তি প্রয়োগ কোরে আজও ইংরেজ ভারতের এই সামান্য অংশ নিজেদের রক্ত পতাকার সুশীতল ছায়ায় এনে এই অসভ্য লোকগুলোকে সভ্যতার ও শান্তির আলো দিতে পারে নাই। এই পার্ব্বত্য মুষিকের দল বৃটীশ সিংহের বিরাট আস্ফালনকে তুচ্ছ কোরে আজও নিজেদের স্বাধীনতা শুধু বজায় রাখে নি

ইংরেজের কাছ থেকে নিয়মিত বার্ষিক কর আদায় করে। এই পার্ব্বত্য জাতিদের সঙ্গে সংগ্রামের সংবাদ দৈবাৎ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাও যখন ইংরেজ জেতে তখন—অথচ প্রায় প্রত্যহই ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রচুর অর্থ ও লোকব্যয়ে সংগ্রাম চোলেছে।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই যুদ্ধপ্রিয় স্বাধীন জাতিগুলি নানা উপজাতিতে বিভক্ত। পেশাওয়ারের নিকটবর্ত্তী জাতিগুলি আফ্রিদি' নামে পরিচিত। আফ্রিদি অঞ্চলের দক্ষিণ দিকের উপজাতিরা 'মাশুদ' ও অন্যান্য নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে ইপির ফকিরের অধিনায়কত্বে যে লড়াই চোলছে তা 'মাশুদদের'। কয়েক বছর আগে 'আফ্রিদি'-দের সঙ্গে ঘোরতর লড়াই চোলেছিল। এই লড়াইএর কারণ—ইংরেজের এই অঞ্চলে 'শান্তিপূর্ণ (?) অন্তর্নিবেশ' (Peaceful penetration)। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্যে ইংরেজ এই অঞ্চলটীর মধ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কোরতে চায়; যেখানে যেখানে ভারতের সীমানার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের সীমানা মিশেছে সেই সব জায়গায় নিজেদের সামরিক ঘাঁটী স্থাপন করা প্রয়োজন; কিন্তু এই উপজাতির দল নিজেদের সীমানার মধ্যে ইংরেজ-প্রভুত্ব স্বীকার কোরতে নারাজ—তারই ফলে চোলেছে অবিরাম সংগ্রাম। বহু ব্যয়ে এবং কষ্টে ইংরেজ কাবুল সীমান্ত পর্য্যন্ত একটী রেললাইন ও রাস্তা নিয়ে গিয়েছে। এইখানে 'ল্যাণ্ডিখানায়' একটী সেনা-নিবাস আছে এবং এই রাস্তা ও রেললাইন রক্ষার জন্য ভারত-সরকার পার্ব্বত্য আফ্রিদিদিগকে প্রতি বৎসর তিনলক্ষ টাকা কর দেন, যাতে তারা ঐ পথ বা লাইনে উপদ্রব না করে। তাছাড়া এই ২১ মাইল রাস্তা ও লাইন রক্ষার জন্য ১৬০০সশস্ত্র আফ্রিদি 'খাসাদার' আছে—যারা নিয়মিত মাসিক বেতন পায়।



জামরুদ ষ্টেশনের কাছে জামরুদ দুর্গ



লাইনের ধারে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ

এই একটী রাস্তা ছাড়াও সীমান্ত প্রদেশে আরও অন্যান্য রাস্তা তৈরী করা সীমান্ত রক্ষার নীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন। তদনুসারে ভারত-সরকার 'ছোরা' এবং 'কাজুরী' অঞ্চলে রাস্তা তৈরী কোরতে আরম্ভ করেন; তারই ফলে আফ্রিদির

লড়াই। দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ভারত সরকারকে এই পথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বর্জ্জন কোরতে হোয়েছে। এরোপ্লেন, বোমা, মেসিনগান, ট্যাঙ্ক সমস্তই এই অদ্ভুত সাহসী রণ-নিপুণ পার্ব্বত্য জাতির হাতে-তৈরী রাইফেলের কাছে পরাজয় মেনেছে। অবশ্য শোনা যায় যে আফ্রিদিরাই পরাজিত হোয়েছে না খেতে পেয়ে—কারণ এরা বড় গরীব। প্রস্তরময় হিন্দুকুসের বুক শস্যশ্যামলা নয়। যা কিছু জন্মায় তা' এরা ইংরেজ রাজ্যে এসে বিক্রী কোরে অন্নসংস্থান করে; কাজেই লড়াইএর সময় সমস্ত বৃটীশ প্রজার ওপর আদেশ জারী হোয়েছিল যে আফ্রিদিদের কাছে কেউ কিছু কিনতে বা বেচতে পাবে না; এই আর্থিক অবরোধের ফলে আফ্রিদিরা যথেষ্ট অন্নাভাবে পোড়েছিল; কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত তারা কাজুরী ও ছোরার রাস্তা তৈরী হোতে দেয় নি।



খাইবার গিরিবর্ত্ম ও টানেল

শৈশব থেকে রাজপুতদের মারাঠাদের বীরত্বগাথা শুনে আসছি, আজ আর তা প্রত্যক্ষ কোরবার উপায় নেই; তাই এই বিংশ শতাব্দীতে পরাক্রান্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যারা ল'ড়ছে এবং জয়ী হোয়েছে তাদের দেশ দেখবার আগ্রহ দমন কোরতে পারলাম না; পেশাওয়ার থেকে বেরিয়ে পোড়লাম—আমি ও বন্ধু বেণু ঘোষ।

পেশাওয়ারের একটা ষ্টেশন পর জামরুদ ষ্টেশন। এই লাইনে সপ্তাহে চারদিন (মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনিবার) ট্রেণ চলে। জামরুদে পৌঁছবার আগেই একটা চওড়া অগভীর পাহাড়ী নদী পার হোলাম—এর নাম "ছোরা নালা"। এই নালার পর থেকেই ইংরেজ সীমানা শেষ এবং 'আফ্রিদি মুলুক' সুরু। 'ছোরা' নালার ওধারে খুনজখম কি চুরি-ডাকাতি হোলে ইংরেজের পেনালকোডে তার বিচার হয় না; এখানে বন্দুক রাইফেলের লাইসেন্স লাগে না, শান্তিরক্ষার জন্য লাল পাগড়ী নেই। দুধারে ধূসর প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি, অদূরে পাহাড়ের পায়ের তলায় মিশে গেছে। এখানে সেখানে দুএকটা ছোট গ্রাম—গ্রামবাসীরা কাউকেই খাজনা দেয় না, কারুর শাসনই মানে না, নিজেদের রাইফেলই তাদের পেনালকোড; তাই এই অঞ্চলের অপর নাম no man's land। এই অশাসিত দেশের মধ্যে দিয়ে রেললাইন এবং তার প্রায় পাশে পাশে রাস্তা চোলেছে। এই রাস্তায় মোটর বাস পেশাওয়ার থেকে 'ল্যাণ্ডিকোটাল' পর্য্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করে। এই রাস্তাই 'খাইবার পাশ' এবং খাইবার উপত্যকার মধ্যে দিয়ে কাবুল পর্য্যন্ত চোলে গেছে।

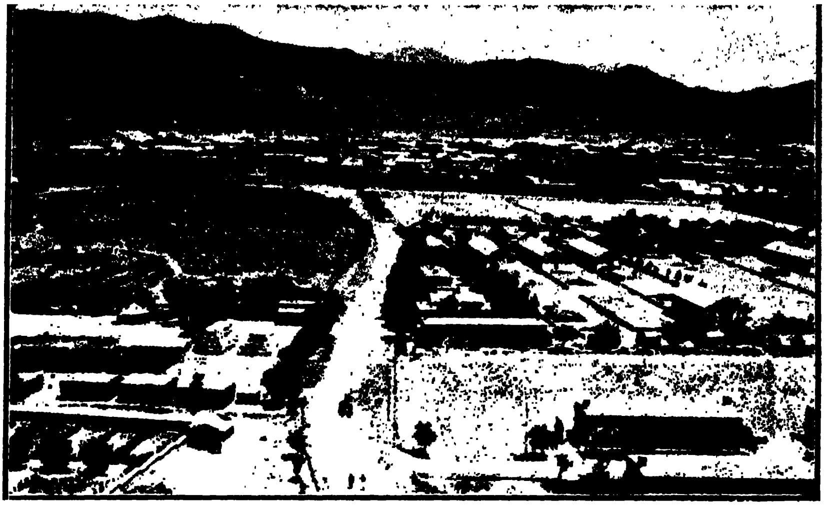
লাইন এবং রাস্তা রক্ষার জন্যে ইংরেজ যে তিনলক্ষ টাকা বার্ষিকী দেয়, তার সর্ত্ত এই যে যদি লাইন বা রাস্তার কোন ক্ষতি হয় বা এগুলির ওপর কোনখুন জখম কি রাহাজানি হয় তবে সেই এলাকার 'মালিক'কে দশ-হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। 'আফ্রিদির মুলুকের' কোন লোক যদি বৃটীশ সীমানায় এসে উৎপাত করে, তবে সেই অঞ্চলের 'মালিক'কে—হয় তাকে ধোরে দিতে হবে—নয়ত জরিমানা দিতে হবে। এই জরিমানা আদায় হয় বার্ষিকীর টাকা থেকে। এই অঞ্চলের আসামীদিগকে ইংরেজ রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে একবছর পর্য্যন্ত হাজতে রাখতে পারেন। এক একটী গ্রামের সর্দ্দারকে 'মালিক' বলে। এরা ইংরেজের কাছ থেকে মাসে সাত আট শ' থেকে হাজারের বেশী টাকা তঙ্খা পায়, তার পরিবর্ত্তে এরা ঐ তিন লাখ টাকা সকল আফ্রিদিদিগের মধ্যে ভাগ কোরে দেবার ভার নেয় এবং রাস্তার ও লাইনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে

দায়ী। এত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কাবুল থেকে যে সব বাণিজ্য-সম্ভার আসে সেগুলিকে প্রতি শুক্রবার বিশেষ পাহারায় ল্যাণ্ডিখানা থেকে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত আনা হয়। অন্যদিন কেউ এলে সে নিজের দায়িত্বে আসবে।

জামরুদ থেকে ল্যাণ্ডি-কোটাল ২১ মাইল পথ। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনের কাছেই একটা দুর্গ আছে এবং প্রায় প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ায় ছোট ছোট ঘরে (picket) সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। শুধু যে ইংরেজের প্রহরীই আছে তাই নয়, মাঝে মাঝে আফ্রিদিদের সেনানীও ইংরেজের চৌকী ঘরের সামনেই নিজেদের সীমানা চৌকী দিচ্ছে—ইংরেজ রাস্তা নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরছে কিনা খবর রাখছে।

পেশাওয়ার ছাড়বার আগে কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধু অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন এবং আফ্রিদিদের অমানুষিক নৃশংসতার অনেক গল্প বলেছিলেন; কাজেই একটা আতঙ্কিত ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমরা যাত্রা কোরেছিলাম। এঁদের অনেকেই বোলেছিলেন "খবরদার! সামনে ছাড়া আশে পাশে তাকাবেন না; তাকালেই কখন অলক্ষিতে একটা বুলেট এসে ধরাশায়ী কোরে দেবে। খবরদার! রাস্তা বা লাইন ছেড়ে নীচে নামবেন না, তাহলেই পৈতৃক প্রাণটা সেই বে-আইনীর দেশে রেখে দিতে হবে ইত্যাদি।" এই সব অমূলক উপদেশ ছাড়াও সংবাদপত্রে এবং ইংরেজ লিখিত উপন্যাস প্রভৃতিতে আফ্রিদিদের সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ বিবরণ পোড়েছিলাম তাতে এই জাতটা যে রাক্ষসেরই ভায়রা-ভাই এ সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না।

প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থামে, কাজেই নেমে আফ্রিদি যাত্রী এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে আগত কৌতূহলী দর্শকদের সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। সাড়ে ছয় কি সাত ফিট লম্বা জোয়ান চেহারাগুলো সত্যি বিস্ময় জাগায়; সাধারণতঃ সকলেই দরিদ্র, পরণে একটা ঢিলে পাজামা ও ঝুলওয়ালা



ল্যাণ্ডিকোটাল ছাউনি

পাঞ্জাবীগোছের জামা, মাথায় 'লুঙ্গী' (পাগড়ী), কারু পায়ে মোটা কাবুলী জুতো, কারুর তাও নেই; প্রায় সকলেরই



ষ্টেশনে একটি শিশু আফ্রিদি খানসামা

কিন্তু কোমরে রাইফেলের বুলেটের বেল্ট এবং কাঁধে রাইফেল। আফ্রিদি মাত্রই মুসলমান। বর্ত্তমানে সীমান্ত প্রদেশের

গোলযোগের অন্যতম কারণ হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ বোলে যে প্রচারকার্য্য চালান হোচ্ছে, এরা তা স্বীকার করে না। এরা বলে বহুকাল থেকে দু'চার ঘর হিন্দু আফ্রিদি মুলুকে শত শত মুসলমান বসতির মধ্যে বাস কোরছে, তাদের ওপর কোন জুলুম কখনও হয় নাই। মুসলমানরা ইচ্ছা কোরলে এই মুষ্টিমেয় হিন্দুদিগকে বহুদিন নিশ্চিহ্ন কোরে দিতে পারতো। —আসল কথা নিজেদের রাজ্যলোলুপতা ঢাকবার জন্যে ওটা ভারতসরকারের একটা ছল মাত্র, এটা অবশ্য তাদের বক্তব্য। সম্প্রতি 'মাশুদ'রা যে হিন্দুদিকে ধোরে নিয়ে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দিচ্ছে, তার কারণ হিন্দুবিদ্বেষ নয়, আসল



আফ্রিদিদের বাড়ী—চূড়াটি লক্ষ্য করুন

কারণ সেখানকার স্থানীয় সাধারণ হিন্দুমাত্রই ধনী ; এটা অবশ্য আমার শোনা কথা কাজেই কতদূর সত্য জানি না। তবে হালে সীমান্ত-গান্ধী ইংরেজ সরকারকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান কোরেছেন, তা থেকে মনে হয় হয়ত উক্ত যুক্তিই ঠিক।

ট্রেণখানা আঠারটী সুড়ঙ্গ ভেদ কোরে প্রায় তিন ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল (পেশওয়ার থেকে) রাস্তা এসে ল্যাণ্ডি-কোটাল (৩৪৯৫ ফিট) পৌছল। ল্যাণ্ডিকোটাল ষ্টেশনটী গার্ড আমাদিগকে বিদেশী দেখে (বোধ হয় ধুতি পাঞ্জাবী দেখে) নিজেদের মেস থেকে খাবারের ব্যবস্থা কোরে দিলেন এবং বহু সাধ্যসাধনার পর তবে দাম নিয়েছিলেন। লাইনটী শেষের দিকে একই পাহাড়ের একদিকে এঁকে বেঁকে উঠেছে, দু এক জায়গায় উপর্য্যুপরি ২।৩টী টানেল অর্থাৎ গাড়ী সেখানে আগে চোলছে না—শুধু এঁকে বেঁকে উঁচুতে উঠছে। ষ্টেসনগুলি দুর্গের মত, চারদিক পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, লোহার দরজা জানলা ; প্রাকারে গুলি চালাবার ব্যবস্থা। পাহাড়ী নদী থেকে পাম্প কোরে জল ষ্টেসনে দেওয়া হয় এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলোতেও সরবরাহ করা হয়—সাধারণতঃ গ্রামের 'মালিকদের' বাড়ীতেই জল দেওয়া হয়।

লাইন এবং রাস্তার ধারে আলি মসজিদ নামে একটী খুব প্রাচীন মসজিদ আছে—এইটীর পর থেকেই (১৩ নং টানেল থেকে) আসল খাইবার-গিরিবর্ত্ম আরম্ভ হোয়েছে। এখান থেকেই দুটী খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে শুধু একটী রাস্তা চোলেছে, তার আগে পাশে যাতায়াতের কোন উপায় নেই। এইখান থেকেই লাইনকেও ক্রমাগত পাহাড় কুঁড়ে চোলতে হোয়েছে—টানেলগুলো লম্বাও খুব। কিছুদূর গিয়ে খাইবার-গিরিবর্ত্ম আবার ক্রমশঃ প্রশস্ত হোয়ে খাইবার উপত্যকার মধ্য দিয়ে চোলেছে। ভারতের এই প্রাকৃতিক প্রবেশদ্বারটী মুষ্টিমেয় লোকে রোধ কোরে রাখতে পারে। সাধারণতঃ উটই এই দুর্গম পথের একমাত্র যান।

ল্যাণ্ডিকোটালেই আজকাল ট্রেণ থামে, তার আগে যায় না। এখানে একটী চমৎকার সুরক্ষিত উপত্যকায় বৃটীশ সেনানিবাস। এই পথের মধ্যে এইটাই সব চেয়ে বড় সেনানিবাস। চারদিকে দুর্গম পাহাড় ঘেরা একটী বিস্তৃত সমতলভূমিতে এই ছাউনী। যেন সমস্ত জায়গাটী সুউচ্চ পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, ঢুকবার ও বেরুবার জন্য ২।১টী স্বাভাবিক পথ আছে। শুধু সমতলভূমিটুকুই ইংরেজদের, তার আশে পাশে পাহাড়ের কোলে কোলে যে সব গ্রাম তারা স্বাধীন। শক্তিশালী বৃটীশ সেনার প্রতিবেশী হোয়েও তারা যে আজও অধীনতা স্বীকার করে নাই—এ আমাদের কাছে একটা বিস্ময়! এই সব গ্রামের দুচার জন অধিবাসীর সঙ্গে আলাপ হোল। তারা সাধারণতই দরিদ্র কিন্তু অন্তরের তেজ তাদের রাইফেলের গুলির মতই। আর কি অতিথিপরায়ণ ও

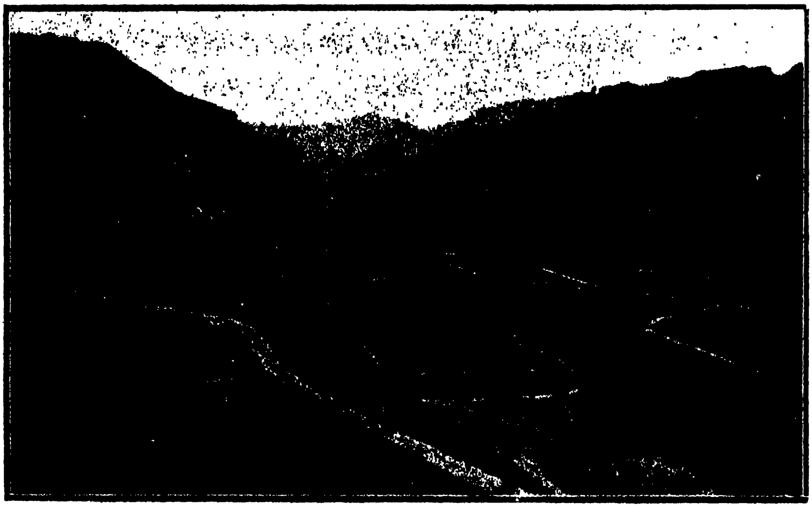
স দেখাচ্ছিল এবং নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল; দেখা হোলে পারিশ্রমিক স্বরূপ, তাদের একজনের হাতে রা একটা সিকি দিলাম, তারা নিলে না। আমরা লাম হয়ত অল্পে অসন্তুষ্ট, তাই আট আনা ও পরে এক । পর্য্যন্ত দিতে গেলাম। তারা জানাল আমরা বিদেশী, দের দেশ দেখতে এসেছি; আমাদিগকে সব দেখান দের কর্ত্তব্য, এর জন্যে আবার পয়সা কেন? অথচ ।ওয়ারে শুনেছিলাম এরা ছ'টা পয়সার জন্যে গুলি কোরে য মারে। ষ্টেশনে আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় একটী ফ্রিদি ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে জল এনে দিলে; তার বর্ত্তে পয়সা নিলে না। পেশাওয়ারে একজন উচ্চশিক্ষিত ান মহিলার সঙ্গে আলাপ হোয়েছিল। তিনি বোলে-লন "আমাদের জাত ন্ধে অনেক কুৎসা রটান য়েছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ রতেরই এক প্রদেশ অন্য দশ সম্বন্ধে ভাল খোঁজ র রাখেনা, বিদেশী ত গই না। বাঙলা সম্বন্ধে মাদের ধারণা বাঙালী ক মাত্রই বিপ্লব-বাদী। ব একথা ঠিক—পাঠানদের ত্র এবং শত্রুতা দুই-ই ষ্ক, সভ্যতার সংঘর্ষে দের মনের বৃত্তিগুলো াতা হয় নাই।" পেশাওয়ারের স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত ষ্ণচন্দ্র ঘোষ এম-এল-এ প্রায় ৩২ বৎসর পাঠান এবং ফ্রিদিদের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন; নিও বোলছিলেন "এমন অতিথিপরায়ণ জাত ভারতে র পাবেন না। তাছাড়া এরা ভারী পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ং সাধারণতঃ এদেশের চাষীরা বাংলার চাষীর চেয়ে ধনী।" ফ্রিদি মুলুকের মেয়েরা সবাই কালো আলখাল্লা এবং জামা পরে; এর কারণ সহজে অপরের লক্ষ্যভূত না য়া; পুরুষরাও একই কারণে সাদা কাপড়ের পরিবর্ত্তে টে বা ধুসর রঙের কাপড়জামা ব্যবহার করে; হয়ত গুলি ময়লা কম দেখায় সেটাও অন্যতম কারণ। মাঠে-ঘাটে সকলের অগোচরে থাকবার এই চেষ্টার কারণ নিজেদের ঘরোয়া শত্রুতা। এদের শত্রুতা বড় ভীষণ। এদের সাধারণ সাজাই হোল রাইফেলের বুলেট। হত ও হত্যাকারী পরিবারের মধ্যে সাত পুরুষ ধোরে শত্রুতা চোলবে, যদি তাদের মধ্যে যে দোষী সে জরিমানা দিয়ে কোন মধ্যস্থর মারফত ঝগড়া না মিটিয়ে ফেলে। ঠাকুর্দ্দায় ঠাকুর্দ্দায় ঝগড়া ছিল, তার প্রতিশোধ নাতিরা নিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। এই 'দুশমন'দের ভয়ে শান্তির সময় কোন আফ্রিদি পুরুষ বাড়ীর বার হয় না বা অচেনা কাউকে সহজে বাড়ী ঢুকতে দেয় না। বাইরের বাজার হাট বা অন্যান্য কাজকর্ম্ম মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা করে। স্ত্রীলোক এবং ন' বছর পর্য্যন্ত ছেলে অবধ্য। সাধারণতঃ ৯।১০



সাগাই ষ্টেশনের কাছে দুর্গ—পাহাড়ের মাথায় চৌকীঘর

বৎসরেই ছেলেরা রাইফেল কাঁধে নেয় এবং তখন আর তারা অবধ্য থাকে না। বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াইএর সময় কিন্তু এই গৃহবিবাদ থাকে না। তখন স্ত্রীপুত্রকে আফগানিস্থান বা 'তিরাই' অঞ্চলে (বৃটীশ-ভারতের বাইরে একটী শস্যশ্যামলা উপত্যকা…পেশাওয়ার থেকে প্রায় ৮০ মাইল) পাঠিয়ে দিয়ে, নিজেদের মাটীর বাড়ীগুলি শত্রুপক্ষের বোমার মুখে ছেড়ে দিয়ে এরা পাহাড়ের গায়ে গুহায় গুহায় আশ্রয় নেয়। রাস্তার ধারে ধারে এমনি অনেক গুহা চোখে পোড়ল। কঠিন পাহাড়ের বুকের এই গুহাগুলির মধ্যে থেকে আফ্রিদিরা অনায়াসে বিমানপোতের বোমা অগ্রাহ্য করে এবং অতর্কিতে শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পোড়তে পারে। গুহাগুলির

সামনে ছোট ছোট পাথরের দেওয়াল গাঁথা আছে, যাতে সামনে থেকে বোমা বা বুলেট সহজে ভেতরে না যায়। এ গেল বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের ব্যবস্থা। গৃহবিবাদের জন্যে তাদের প্রত্যেক বাড়ীতে একটী মাটীর উঁচু চূড়া আছে। এই চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকেই গুলি কোরবার ব্যবস্থা আছে; ভেতরে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে চূড়ার ওপরে উঠে আফ্রিদিরা এবাড়ী ওবাড়ীর সঙ্গে বা গ্রামে গ্রামে লড়াই করে। প্রত্যেক বাড়ীই (অনেক ক্ষেত্রে ২।৩টী বাড়ী) দেওয়াল দিয়ে কেল্লার মত ঘেরা।



ল্যাণ্ডিকোটাল ষ্টেশন ও খাইবার উপত্যকা

আফ্রিদিদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম, তাই অধিকাংশই অবিবাহিত। অনেক ৪০ বছরের প্রৌঢ়কে যদি জিজ্ঞাসা করেন "সাদী কোরেছ?" এক গাল হেসে সে জবাব দেবে "বিয়ের বয়স হোক।" স্ত্রীলোক দুষ্প্রাপ্য বোলেই দুর্মূল্য—এ অঞ্চলে স্ত্রীলোক কেনা বেচা চলে, বেশ চড়া দামেই। তবে স্ত্রীলোকের আদর নেই, উদয়াস্ত তাহাদিগকে সংসারের, কৃষির এবং বাইরের যাবতীয় কাজ কোরতে হয়।

আফ্রিদিদের মধ্যে কিছুদিন বাস কোরে তাদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি জানবার ইচ্ছা ছিল। ডাক্তার ঘোষ এবং পেশাওয়ারের জনৈক প্রতিপত্তিশালী শিখবন্ধু এর ব্যবস্থা কোরতে রাজী ছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে সে সুযোগ গ্রহণ কোরতে পারি নাই। ভবিষ্যতে যদি কারু সে সংকল্প থাকে, তাঁহাদিগকে সাবধান কোরে দিই, তাঁরা যেন নিজেরা আফ্রিদি মুলুকের ভেতর একলা না যান। এরা দরিদ্র এবং সবাই সাধু নয়, কাজেই সুযোগ পেলে বিদেশীর সমস্ত ছিনিয়ে নেয়। ইউরোপীয় পোষাক এ অঞ্চলে (ইংরেজ সীমানার বাইরে) বিপদেরই অগ্রদূত। কোন জানাশোনা লোকের মারফত কারু বাড়ীতে একবার অতিথি হোতে পারলে নিশ্চিন্ত—অতিথি রক্ষার্থ সেই পরিবার প্রাণ পর্য্যন্ত দেবে। যদি কারু চেনাশোনা লোক না থাকে, পেশাওয়ারে বাঙালী-বন্ধু বাঙালী ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষের দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত। তিনি সেখানে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁর সাহায্য প্রত্যেক বাঙালীই পাবেন বোলে বিশ্বাস।



সাতটি ফোঁটা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পত্নীক বিপিন মৈত্রের তিক্ত অন্তরাত্মায় অনুভূত হ'ল গত-তারুণ্যের চিরন্তন নিরাশা—তেহি নো দিবসাঃ গতা। ান যুগের চিত্ত-চিত্রকর ধ্রুব বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—ন শলাকা—উপেক্ষায় রাখলে প্রৌঢ় সম্মুখের টেবিলে—টায়ারা মামলার পেপার বুকের পার্শ্বে। নায়িকা কেতকীর দাহ-বিষাণ তখনও তার চিত্তাকাশে ধ্বনিত হচ্ছিল—রি না পারি না আর হে কঠোর হে নিষ্ঠুর। চিত্ত-পটে ট উঠ্‌লো নায়কের বাহুর ফাঁসে কেতকীর বাধা কণ্ঠ। রপর সুদক্ষ কথা-শিল্পীর বাক্-সংযম—ফোঁটা সপ্তকের . . . . . . নীরব প্রগল্‌ভতা।

ক্ষণ-মাহাত্ম্যে যাদের আস্থা নাই প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী পিন মৈত্র তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার, র্ক, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি বৃত্তির উপর তার াস ছিল প্রগাঢ়। আজ কিন্তু এই নবীন লেখকের সাতটি টা, রূপ-কথার সোনার কাঠির মত, তার দলিত শমিত াদৃত আদি-মধুর বৃত্তির ঘুম ভাঙ্গালে।

ক্ষণ-মাহাত্ম্য!

—জেনানা আয়া হুজুর।

—জেনানা?

দ্বারবান বল্লে—হাঁ হুজুর—জেনানা।

হাতে এক্‌সারসাইজের খাতা, খদ্দরের ঢাকাই সাড়ি, শস্ত ললাট আর এলো চুলের হামামদিস্তা খোঁপা—মৈত্র ায়ের অপ্রিয় চিরদিন। কিন্তু আজ—

—কি প্রয়োজন?

—আজ্ঞে আমি নায়ডু পাঠশালার প্রধান শিক্ষয়িত্রী—ক্ষার জন্য এসেছি।—হেসে বল্লে কুমারী চপলা রায়।

দূর হ'ক আইন—কঠোর নিরস—ভাবলে প্রবীণ। পরের ার পক্ষ-পাতিত্ব—পয়সার জন্য গুণ্ডামী বিদ্যা বুদ্ধি ও তির মুষল নিয়ে। কান্তবৃত্তি পাথর চাপা পড়ে বিবাদকে কার বৃত্তিরূপে বরণ করলে। চকিতে জীবন-রহস্যের কথা আত্মপ্রকাশ করলে আইনজ্ঞের মন-মন্দিরে।

ভিখারিণী যুবতী! অসহায়া কুমারীদের কল্যাণের জন্য ভিক্ষা না করলেই পারত সে—যার চাঁদপানা মুখ আর ঊষার আলোর মত হাসি। কিন্তু যখন ওরূপ কার্য্যে সুন্দরী আত্মবিস্মৃত তখন অগত্যা তার কাজে সহায়তা করতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হ'ল বিপিন মৈত্র।

তরুণী হেসে হেসে নানা কথা বল্লে—নারী জাগরণের সোনার স্বপন—দেশাত্মবোধের নিবিড় অনুভূতির মনোরম চিত্র আঁক্‌লে। উকীলের ঘরে অর্থ আনে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত। আজ সুকুমার ভাবকে তাচ্ছিল্য করতে পারলে না বিপিন। এক অব্যক্ত জ্যোতি কুমারীর চক্ষু হ'তে সটান পৌঁছিল তার প্রাণের অনাদৃত কোঠায়—যেথায় হাতপা-ভাঙ্গা অনেক মধুর ভাবের টুকরো পুঞ্জীভূত হ'য়ে গুমরিতেছিল। তার আযৌবন অরসিকতার অপবাদ কেনই বা অপসারিত হ'তে না পারে জীবনের অপরাহ্ণে! কে জানে?

অর্থ সাহায্য লাভ ক'রে চপলা প্রতিশ্রুত হ'ল সাতদিন পরে প্রত্যাবর্ত্তন করতে—নায়ডু পাঠশালার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন সম্পর্কে মৈত্র মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে।

সাতদিন অবসরমত বিপিন মৈত্র শিশুশিক্ষা বিষয়ক অনেক অভিনব প্রণালী আয়ত্ত করলে। যেদিন আলোচনা হ'ল কুমারী চপলা রায় বল্লে—আপনার অভিজ্ঞতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভগবান শুভ মুহূর্ত্তে আমাকে টেনে এনেছিলেন আপনার বাড়িতে।

—সেটা শুভ মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে—বল্লে বিপিন। —আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে আপনার অসীম উৎসাহ—ওর নাম কি—দেখুন মিস রায় আপনার ব্যবহার মধুর। আপনার কথা ভারি মিষ্টি।

খুব হাসলে তরুণী। বল্লে—আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান যশস্বী। আমি সামান্য—

—ছিঃ ওকথা বলবেন না। আপনি মহৎ কাজ করেন।

এক মাসের মধ্যে পাঁচবার সাক্ষাৎ করলে চপলা বি-পত্নীক বিপিন মৈত্রের সাথে। কর্ম্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক স্বপ্ন দেখলে বিপিন—জাগ্রত অবস্থায়। কুমার-সম্ভব পড়লে বিশ বৎসর পরে—মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গার কাহিনী। ভাব্‌লে তার আপনার সন্ন্যাসের কথা। আরে ছিঃ! শত আকাঙ্ক্ষা যাকে সংসারের নানা কুপথে টেনে নিয়ে যাচ্চে, তার মিথ্যা সন্ন্যাসের ভান নিরর্থক আত্ম-প্রবঞ্চনা।

তার কল্পনার নূতন সংসারে বিরাজ করতে লাগলো শ্রীমতী চপলা মৈত্র যার কুমারী নাম ছিল চপলা রায়। তার খদ্দর পরিণত হ'ল মিহি শান্তিপুর ও বুটিদার বেনারসিতে। তার নিটোল বাহু বাঁধা পড়ল কল্পিত রত্নালঙ্কারের আলিঙ্গনে।

একদিন সন্ধ্যাকালে এডভোকেট বল্লে—মিস্ রায়, একটু হাওয়া খেতে যাবেন?

—মন্দ কি? বেশ ফাগুনের হাওয়া দিচ্চে।

কিন্তু দোটানার প্রত্যুত্তর—প্রৌঢ় বুঝলে যে অনিচ্ছাকে দমন ক'রে তরুণী সম্মতিদান করছে।

পথে জিজ্ঞাসা করলে উকীল—আপনি খদ্দর পরেন কেন?

জাহ্নবীর জলে চাঁদের আলোর নৃত্য দেখছিল চপলা। সে বল্লে—খদ্দর স্বাধীন মনের প্রতীক। উপক্রত নারী চিরদিন সাজে পুরুষের মনস্তুষ্টির জন্য—বিজিত সেনাধ্যক্ষেরা যেমন রোমের বিজয়ী বীরের শোভাযাত্রার মহিমা বাড়াতো দৈন্যসজ্জা ক'রে।

সে তার দিকে তাকিয়ে হাসলে। তার গম্ভীর মুখ দেখে বল্লে—আপনি রাগ করছেন! নারীর কি একটা স্বতন্ত্র সত্তা নাই?

কম বুঝলে মানুষ কাবু হয়। অভিভূত হ'ল বিপিন। সে বল্লে—চপলা—মানে মিস রায়। তুমি—মানে—আপনি—

অপাঙ্গে তাকিয়ে হাসলে চপলা। সে বল্লে—আমাকে আপনি বলবেন না। চপলা বলবেন।

বিপিন উপলব্ধি করলে—তোমার ভ্রূকুটি-ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত—নামিল আঘাত। পাঁজর উঠিল কেঁপে—

ময়দানের নিরালায় অনেক কথা হল, জ্যোৎস্না ছড়ানো ঘাসের উপর। নানা প্রসঙ্গ—দেশের, দশের, সমাজের, দুনিয়ার।

নাহি জানি কখন কি ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দখিন করে। কুলায় প্রত্যাশি
সন্ধ্যার পাখীর মত।

বিপিন বল্লে—চপলা তুমি বিবাহ করবে না।

সরমে একটু গুটিয়ে গিয়ে সে বল্লে—প্রয়োজন হলে কর্ব্ব —যদি কোনো প্রবীণ যার প্রাণ হচ্চে নবীন—তরুণে কুহক স্পর্শে মানে—নীরবে চাঁদের দিকে তাকালে প্রবীণ।

—এমন লোককে বিবাহ কর্ব্ব কিনা জিজ্ঞাসা করছে প্রণয়ের লক্ষ্য—প্রাণ—চিত্ত।

এর পর? উপন্যাসের সাতটি নীরব বিন্দু বিজয়ি হ'য়ে তার ললাটকে শ্রীসম্পন্ন করলে।

কিন্তু তার আলিঙ্গনের ফাঁসে ধরা পড়লো না চ চপলা। বিজলীর মত সে সরে গেল। দূর থেকে বল্লে—f অন্ধকারের অন্তর ভেদ ক'রে কিন্তু ফুটে উঠলো তার : মধুর হাসি।

লজ্জিত বিপিন বল্লে—ক্ষমা কর চপলা। আমি—

—ছিঃ! ও কি বলছেন?—হেসে বল্লে চপলা। অ পাশাপাশি চললো তারা উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের উপর আর তাদের সাথে চললো—নারী অধিকার, স্ত্রী-শিক্ষা, কপির চাষ ও কুকুরের সহজ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আলোচনা

বিপিন মৈত্রের বুইক গাড়িতে তারা গেল চন্দননগর, ব ডায়মণ্ড-হারবার, বারাসত। সোনা-হেন মুখে চাহিত পাঠশালার জন্য মান-চিত্র, শিশু-ভারতী, শিশু সাহি বিপিন ধন্য হত পাঠশালাকে পুস্তকাদি উপহার দিয়ে।

ভালে জ্বলছিল শুক্র। তার নীচে অতি ক্ষীণ লালের রেখা দেখিয়ে দিচ্ছিল রবির বিদায় পথ।

—আমার এ রোগ কেন হ'ল বলতো চপলা?—জিজ্ঞাসিল উকীল।

—কি রোগ?—উৎকণ্ঠায় প্রতি-প্রশ্ন করলে মিস্ চপলা।

—কি রোগ? জিজ্ঞেস কর্চ্ছ চপলা? বুড়া বয়সের ধেড়ে রোগ।—বল্লে স্পষ্টবাদী। নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্লে বিপিন, তারপর—লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা করব ভেবেছিলাম চপলা। কে জানে—

ওঃ! এবার হাসলে চপলা। তারপর বল্লে—সেটা কি রোগ মৈত্তির মশায়? আমার মেসো মশায়ের ভাই ডাক্তার ছিলেন কিন্তু ওরকম রোগ—

—ছলনাময়ি! কুহকিনী! চালাকী!—বিপিন বজ্র-মুষ্টিতে ধরলে তার মণিবন্ধ। তার চক্ষে ছিল বহ্নি। শুষ্ক ওষ্ঠে বল্লে—পাষাণী।

তারপর তপ্ত হাতে এমন চাপ দিল তার কোমল করে যে তরুণীর ঢাকাই শাঁখা চূর্ণ হয়ে গেল।

—ওঃ কি করেন? ছাড়ুন।—বল্লে চপলা।

মুক্তি পেয়ে তরুণী বল্লে—চলুন গাড়িতে। আপনার জ্বর এসেছে। হাত ভীষণ গরম।

উত্তর দিলনা মৈত্র। চপলা তার ললাট স্পর্শ ক'রে বল্লে —সত্যই আপনার জ্বর হ'য়েছে। বাড়ি যান।

সে অতি ম্লান হাসি হেসে বল্লে—পরে যাব। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসি।

চপলা বল্লে—আমার কাজ আছে। অনুমতি দেন তো আসি।

বিপিন বল্লে—এস। স্বর যেন দূরস্থ কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির।

পরদিন ময়দানে তার সাক্ষাৎ পেলেনা চপলা। সে সন্ধ্যার পর তার বাড়িতে গেল।

—কেমন আছ?

—ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

তারপর চপলা বল্লে—পাঠশালার দু'হাজার টাকা জমেছে। একজন মাদ্রাজী বণিক সাতদিনের জন্য ঐ টাকা ধার চায়। সাতদিনে কুড়ি টাকা সুদ দেবে।

—শেষে সব না যায়—সুদের লোভে।

চপলা বল্লে সে ভয় নাই। লোকটা পরিচিত বড়লোক। সে সাতদিনের পরের তারিখ দিয়ে একখানা চেক দেবে দু'হাজার কুড়ি টাকার। সাতদিন বাদে সে চেক ব্যাঙ্কে দিলে টাকা পাওয়া যাবে।

অনেক জেরা করে উকীল বুঝলে ভয়ের কোনো কারণ নাই। তবে চপলার অনুরোধ কাজটা তার সম্মুখে হয়।

অগত্যা! পরদিন একজন মাদ্রাজী চেটী এনে হাজির করলে চপলা। ট্রিচিনপল্লী পীলে একখানা সাদা চেক দিলে বিপিন বাবুর হাতে। সে ইংরাজী জানে না। উকীল তাতে চপলার নাম লিখ্‌লে—যে নাম শত সহস্রবার লিখতে তার হাতে ব্যথা ধরে না। দু'হাজার কুড়ি অক্ষর ও অঙ্কে লিখলে। বণিক একে একে দু'হাজার টাকার নোট গুণে বামে দক্ষিণে ঘাড় নেড়ে সহি করে দিলে চেকে তার মাতৃভাষার অক্ষরে।

তারপর সাতদিন সাক্ষাৎ লাভ করলেনা উকীল শিক্ষয়িত্রী চপলা রায়ের।

মিঃ মুকুল সেন এম-এস সি নায়ডু পাঠশালার উপরের কক্ষে বসে মিস্ চপলা রায়ের সঙ্গে তর্ক করছিল। সে দিল্লীতে ডেমন্‌ষ্ট্রেটারের পদ পেয়েছিল। সে চায় চপলাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে দিল্লী যেতে। চপলা আরও ছ-মাস সময় চায় কারণ সে চলে গেলে নায়ডু পাঠশালার অবস্থা হ'বে শোচনীয়।

তাদের তর্কের আর একটা প্রসঙ্গ ছিল দু'হাজার টাকার।

চপলা বল্লে—সত্যি মুকুল। তহবিলে সাতশত টাকা আছে। আমি ছ'মাস পরিশ্রম করলে ভিক্ষার দ্বারা আরও দু'হাজার টাকা উপার্জ্জন করতে পারব।

—কি বলছ চপলা? হাতের দু'হাজার টাকা ফেলে? আমি মাদ্রাজী সাজলাম কি বৃথা?

হাসলে চপলা। বল্লে—ধরা পড়ে জেলে যাবে। ও টাকা আমি নেবানা।

গম্ভীর হ'ল মুকুল। সে বল্লে—তবে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হ'য়ে সুখী হও।

চপলা হাসলে।—বেশ! সেই কথাই ভাল। না মুকুল ছিঃ, কাজ নাই ও পাপের টাকায়।

—পাপের টাকা! ফৌজদারী আদালতে যত জরিমানার টাকা আদায় হয় সে সব পাপের টাকা!

—সে অর্থ-দণ্ড করে যে রাজা।

—আচ্ছা! চপলা একটা যুবতীর শ্লীলতা হানি করবার চেষ্টা করলে লোকের জেল হয়?

—তা হয় কাগজে পড়েছি।

—সে ক্ষেত্রে দু'হাজার কুড়ি টাকা কি বেশী শাস্তি! লোক জানাজানি হ'ল'না। লোকটার রে-ইজ্জত হ'লনা। কি ভাবছ তুমি? নায়ডু পাঠশালার শুভ- -

—তোমার মাথা! তোমার মুণ্ডু! তুমি চোর। —বিরক্ত হ'য়ে বল্লে চপলা।

কিন্তু অন্ধ প্রেম যে মুকুলকে অতি-মানব ক'রে চিত্রিত করেছে, সে জয়ী হ'ল। অগত্যা চপলা সুবোধ বালিকার মত লিখ্‌তে লাগলো মুকুলের আজ্ঞামত।

পরম পূজনীয়—

জ্যেঠামশায়। আপনি সেদিন একজন মাদ্রাজীকে ২০০০৲ টাকা ধার দিতে বল্লেন; আর আমাকে শপথ করে বল্লেন চেটী সজ্জন আমার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে আসবে সঙ্গে ক'রে আনবে কুড়িটি টাকা সুদ। আপনি নিজের হাতে চেক্ লিখলেন আর মাদ্রাজী সহি করলে। আপনার আশ্বাসে তাকে সাধারণের অর্থ দিলাম—পাঠশালার ভিক্ষায় পাওয়া নগদ দু'টি হাজার টাকা।

কিন্তু একি? চেক ব্যাঙ্কে পাঠালাম নির্দ্দিষ্ট দিনে। হরি! হরি! তারা বল্লে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনো কারবার নাই স্বাক্ষরকারীর। এই পাড়ার মাদ্রাজী বাসিন্দা মিঃ সুবর্ণ মনিয়মকে দেখালাম। তিনি বল্লেন—অক্ষরগুলার সঙ্গে তামিল, তেলেগু, মলয়ালম প্রভৃতি কোনো বর্ণমালার দূর-সম্পর্কও নাই। কে রসিকতা ক'রে মহেন্‌জোদারোয় পাওয়া হাঁড়ি কলসীর প্রতিকৃতি এঁকেছে সাতটা।

জ্যেঠামশায় আপনি বিজ্ঞ। আমি কমিটিকে কি বল্‌ব? দু'একজন পরামর্শ দিচ্ছে ব্যাপারটা পুলিসের হাতে দিতে। আমি কোন্ প্রাণে এমন অন্যায় করব জ্যেঠামশায়—আপনি যে আমার বাবার চেয়েও বয়সে বড়, তাইতো জ্যেঠামশায় হ'য়েছেন। কি করব বলুন তো।

কাল সকাল অবধি আপনার প্রতীক্ষায় থাকবো। তারপর কমিটিকে জানাবো। কি বলেন? পুলিস নিশ্চয় পিলের ঘাড় ধরে তাকে জেলে পাঠাবে। অমন লোকের জেলই ভাল বাসস্থান।

আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

প্রণতা—

চপলা।

পুঃ—আমার শাঁখার দাম—মাত্র একটাকা দু'আনা।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীর ললাটে সাতবিন্দু ঘাম ফোটালে পত্র।

পরদিন প্রত্যূষে তার মুহুরী নবীন মিত্র চপলা রায়কে দু'হাজার একুশ টাকা দু'আনার এক চেক দিয়ে ত্রিচিন-পল্লীর চেক নিয়ে এলো বিপিন মৈত্রের কাছে।

চপলা কিন্তু কৃতঘ্ন নয়। দু'দিন পরে সে একখানা আনন্দ বাজার পত্রিকা হাতে ক'রে হাজির হ'ল উকীলের পরামর্শ গৃহে। পরিধানে সেই প্রথম দিনের ঢাকাই খদ্দর, হাতে নূতন শাঁখা—শ্রীমুখে মধুর হাসি।

সে বিপিনের পদধূলি গ্রহণ করলে। তাকে লাল দাগ দেওয়া একটা প্যারা পড়তে দিলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিপিন পড়লে—

বদান্যতা—প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বিপিন কৃষ্ণ মৈত্র মহাশয় নায়ডু পাঠশালার তহবিলে এককালে দুই হাজার কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বেও তিনি নানাপ্রকারে এই বালিকা বিদ্যালয়ের সাহচর্য্য করিয়াছেন।

এবার বিপিনের রসবোধ ফিরে এলো। সে চেক্‌খানা বার ক'রে বল্লে—মহেন্‌জোদারোর চিত্রলিপিটা পড়েছ? এই অক্ষর সপ্তক।

চপলাকে স্বীকার করতে হ'ল—অক্ষর-সপ্তক সম্বন্ধে তার দারুণ অজ্ঞতা।

—একে লেখা আছে দেখ—বিপিন বড় বোকা!

—ছিঃ! আপনি বুঝি আমায় ক্ষমা করেননি জ্যেঠামশায়।

—সর্ব্বান্তঃকরণে।—বল্লে বিপিন মৈত্র।

ভারতে কার্পাস শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

কলকারখানার অবস্থা

যখন হাতের শিল্প নষ্ট হইতে চলিল, তখন লোকে কলকারখানায় মন দিল। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতবাসী যে অপর সকলের সহিত প্রতিপক্ষতা করিতে পারে তাহার প্রমাণ ভারতের কাপড়ের কল স্থাপনা ও তাহার প্রভূত উন্নতি হইতে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে ভারতে ৩৭০টী বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৩৮ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১০০ বৎসরে মাত্র ৩৭০টা কল দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত কিছুই নহে। কিন্তু কতগুলি বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম কথা, নানা অসুবিধার মধ্যে ভারতের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। বরাবরই শুল্ক প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পকে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে; এখনও তাহার শেষ হয় নাই। বিদেশী ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা থাকায় লোকে সাহস করিয়া কাজে নামিতে চায় না; কোন্ সময় কি আইনে পড়িয়া সর্ব্বনাশ হইবে সেই সন্দেহে লোক ত্রস্ত থাকে; ফলে দেশী কোম্পানীতে টাকা আসিতে চায় না। আজ যদি ভারতীয় চিনি বিদেশে রপ্তানীর উপায় থাকিত, দেশীয় কারখানাগুলির উপর বর্ত্তমান উচ্চ হারে ঘরোয়া শুল্ক (Excise) না বসিত তাহা হইলে ভারতবর্ষ আজ জগতের বাজার অনেকখানি দখল করিতে পারিত।

লাঙ্কাসায়ার যখনই দেখিয়াছে যে ভারতের কারখানা বৃদ্ধি পাইতেছে, তখনই চীৎকার করিয়া এখানকার আমদানী শুল্ক হ্রাস করিতে বলিয়াছে; তাহাতে যে ফল হয় নাই তাহা কেহ বলিবে না। এদেশের তুলার তন্তু দীর্ঘ না হওয়ায় সূক্ষ্ম সূতা তৈয়ারী করিতে বিদেশীয় তুলা আমদানী করিতে হয়। পাছে সেইরূপ তুলা আসিয়া দেশে সূক্ষ্ম সূতা হয় সেজন্য বিদেশী তুলার উপর শতকরা ৫ ভাগ শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হয়। যখন তাহাতেও হয় নাই, তখন ভারতে বিদেশীয় কারখানা আইন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিদেশী বণিক ব্যবস্থা দিয়াছে। কারখানা আইন (Factory Act) মন্দ নহে, কিন্তু যে উপলক্ষে তাহা ভারতে প্রবর্ত্তিত তাহার উদ্দেশ্য খুব সাধু নহে। এদেশে কারিগর মজুর সস্তা, সুতরাং আইন করিয়া যাহাতে মজুর বেশী কাজ করিতে না পারে, তাহার জন্যই ভারতে কারখানা আইন বলবৎ করা হইল। পার্লামেণ্টে বরাবরই আন্দোলন হইয়াছে যাহাতে বিলাতী বস্ত্র ভারতে বিনা শুল্কে যাইতে পারে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মোটা সূতা ও মোটা কাপড়ের উপর সকল শুল্ক রদ করা হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তুলাজাত সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করা হয়।

যখন দেখা গেল মোটা সূতা ও কাপড় ভারতীয় মিলগুলি তৈয়ারী করে এবং তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিলাতী কাপড় পারিয়া উঠে না, তখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যেমন ঐ জাতীয় অর্থাৎ মোটা কাপড় ও সূতার উপর আমদানী শুল্ক বসানো হইল; জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আসিল অর্থাৎ ভারতীয় মিলে প্রস্তুত ২০নং সূতা বা ততোধিক সূক্ষ্ম সূতার কাপড়ের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কিছু অদল বদল হইয়া দাঁড়াইল, ভারতীয় বস্ত্র ও বিদেশী বস্ত্র একই হারে অর্থাৎ শতকরা ৩॥০ টাকা শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিবে। এই অদ্ভুত আইন ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। ইহার মধ্যে নানা আইন আসিয়াছে এবং গিয়াছে, তাহার বিশদ বর্ণনা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবে, কিন্তু বলা বাহুল্য তাহার অধিকাংশই বিদেশী বণিকদের পক্ষে।

এই দারুণ দুর্বিপাকে পড়িয়াও আজ ভারতের মিল গড়িয়া উঠিতেছে। আজ ভারতবাসী তাহার পরিধানের অনেকখানি বস্ত্র নিজে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে। যে দেশে এককালে কার্পাস শিল্প জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে দেশে তুলা প্রচুর, কল চালাইবার কয়লা আছে, সস্তায় মজুর আছে এবং এত বড় বিরাট বাজার অতি সন্নিকটেই আছে, সেদেশে শিল্পের উন্নতি না হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রধান কারণগুলি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; এখন আমাদের সৎসাহস ও দেশপ্রেম যদি ভারতের বাজার পূর্ণরূপে দখল করিতে পারে তবেই উপায়।

ভারতে এখনও কার্পাসজাত দ্রব্যাদি সাড়ে সতেরো কোটী টাকার আসে; তন্মধ্যে ১৩ কোটী টাকার কেবল কাপড় প্রভৃতি। আড়াই কোটী টাকার উপর বুননের সূতা, ৭০ লক্ষ টাকার সেলাইয়ের সূতা, আর মোজা গেঞ্জি জাতীয় ৩৩ লক্ষ টাকার। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন উঠে যে আমাদের এখনও কিছুই হয় নাই। যাঁহারা হঠাৎ এই সংবাদ পাইবেন, তাঁহাদের নিকট এই বিরাট আমদানীর অতীত ইতিহাস কিছুই জানা নাই বুঝিতে হইবে। ১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর সওয়া ৭৩ কোটী টাকার তুলার মাল ভারতে আসিয়াছে। তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ৫০ হইতে ৬০ কোটী টাকার বস্ত্রাদি আসিয়াছে; গড়ে প্রতি বৎসর ৭৩ কোটী টাকার মাল আসিয়াছে; তাহা পরের ৫ বৎসরে গড়ে সওয়া ৬৮ কোটী টাকায় দাঁড়ায়, তাহার পর হইতে কমিয়াছে। নিম্নের অঙ্ক হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইবে :—

১৯১৯-২০ হইতে			
১৯২৩-২৪ গড়ে প্রতি বৎসর		৭৩	১৬ লক্ষ টাকা
১৯২৪-২৫ হইতে			
১৯২৮-২৯	,,	৬৮	২৫ ,,
১৯২৯-৩০	খৃষ্টাব্দে	৫৯	৪৯ ,,
১৯৩০-৩১	,,	২৫	২৬ ,,
১৯৩১-৩২	,,	১৯	১৫ ,,
১৯৩২-৩৩	,,	২৬	৮৩ ,,
১৯৩৩-৩৪	,,	১৭	৭৪ ,,
১৯৩৪-৩৫	,,	২১	৭৬ ,,
১৯৩৫-৩৬	,,	২১	১৫ ,,
১৯৩৬-৩৭	,,	১৭ ,,	৪৮ ,,

তুলাজাত বস্ত্রের মোট টাকা হইতে কাটা কাপড় (piece goods) অর্থাৎ পরণের কাপড়, জামার কাপড়, চাদর প্রভৃতির দাম আন্দাজ ৫ কোটী টাকা তফাৎ থাকে।

এই কলশিল্পের উন্নতি যে দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তবে কলকারখানা ভাল বা হাতের শিল্প ভাল, সে বিষয়ে এখানে তর্ক করিয়া লাভ নাই।

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের ৬০ কোটী টাকা হইতে আমদানী পর বৎসর সওয়া পঁচিশ কোটী টাকায় আসার একটা প্রধান কারণ দেশের মধ্যে জাতীয়তা আন্দোলনের প্রভাব অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন।

এই আমদানীর হ্রাসের অনুপাতে দেশের মিল সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম কল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এ শিল্প বেশী প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৫১ নাগাদ আবার নূতন করিয়া চেষ্টা চলিতে থাকে এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আরও ৬টী মিল স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দেই ভারতের মিল চালু হয়; কারণ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নূতন করিয়া প্রথম মিল স্থাপিত হইলেও কার্য্যকরী হইয়া উঠে নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৩, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪৭, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৫১, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৬, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৬৩, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১২৭, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫৬টী মিল স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উহা ২০৭টীতে দাঁড়ায়, ১৯১০—২২৩, ১৯১১-২৪১, ১৯১৮-২৬২, ১৯২৩-৩৩৬, ১৯২৯-৩৩৪, ১৯৩৪-৩৫২, ১৯৩৭-৩৭০। এই সংখ্যা হইতে সহজেই অনুমান হয় যে ভারতে কারখানা শিল্প ক্রমেই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

১৯০৬-১০ খৃষ্টাব্দে ৬৬টী মিল সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনে দেশী মিল বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আবার যখন নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন হয়, ১৯২১-২৫ খৃষ্টাব্দে ৮৪টী নূতন মিল স্থাপিত হইয়া গেল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে

মিলের প্রসার ও বৈদেশিক বাণিজ্য

ভারতে মিলের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বিশেষ কমিতে থাকে। কি ভাবে এই আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, তাহার অঙ্ক পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যেমন একধারে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী কমিয়াছে, অপর দিকে ভারতের মিলের সূতাও বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসরের হিসাব দেখিলে আমরা সহজেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব। ভারতবর্ষের মিলজাত সূতা ও সকল রকম বোনা কাপড়ের হিসাব :—

	সূতা (হাজার পাউণ্ড)	কাপড় (হাজার পাউণ্ড
১৯০৭—৮	৬১৩,৭৭২	১৮১,২৬৯
১৯১৬-১৭	৬৪৪	৩৫৪,৮০৮
১৯২৪-২৫	৭১৯,৩৯০	৪৫৮,৮৪০
১৯৩২-৩৩	৯৬৬,৩৭৩	৫৯০,২৫৮
১৯৩৪-৩৫	১,০০১,৪১০	৭৩৬,৬৪৯
১৯৩৫-৩৬	১,০৫৯,২৮৭	৭৬১,৫৫২
১৯৩৬-৩৭	১,০৫৪,১১৭	৭৬২,৩১৬

হিসাবে ধরিতে গেলে গত তিন বৎসরের হিসাব এইরূপ দাঁড়ায় :—

১৯৩৪-৩৫	৩৩৯ কোটী	৩৪ লক্ষ গজ
১৯৩৫-৩৬	৩৫৭ ,,	১৪ ,, ,,
১৯৩৬-৩৭	৩৫৭ ,,	২০ ,, ,,

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

কলকারখানায় প্রস্তুত সূতা ও কাপড়ের পরিমাণ যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, নূতন আইন প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় শিল্পকে নষ্ট করিবার চেষ্টা না করিলে অচিরে এখানেই প্রয়োজনের মত সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইবে। এখন বিদেশ হইতে ২ কোটী ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বৎসরে (১৯৩৬-৩৭) আসে ; তন্মধ্যে আবার ১ কোটী ১৩ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় অর্থাৎ ভারতে অবশিষ্ট ১ কোটী ৭২ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী সূতা পড়িয়া থাকে। ভারতের মিলগুলি যে ১০৫ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা তৈয়ারী করে (১৯৩৬-৩৭) তাহা হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বাহিরে যায়, অবশিষ্ট ১০৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারতে থাকে। অর্থাৎ ভারতের মিলগুলি ও হাতের তাঁতে ১০৫ কোটী ৯২ লক্ষ বা ১০৬ কোটী পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয়। বিদেশী সূতা যে একেবারে বিতাড়িত হইতে বসিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শতকরা ২ অংশেরও কম বিদেশী সূতা আমাদের ব্যবহারে লাগিতেছে।

কাপড়ের বেলায়ও প্রায় সেইরূপ অবস্থা, তবে ঠিক ঐরূপ নহে।

ভারতে প্রস্তুত	৩৫৭ কোটী	২০ লক্ষ গজ



অবশিষ্ট	৩৪৭ কোটী	৪ " "
আমদানী (বিদেশী)	৭৬ "	৪০ " "
তন্মধ্যে রপ্তানী	১ "	৭ " "
অবশিষ্ট	৭৫ "	৩৩ " "

ভারতবর্ষে মিলের কাপড় ৪২২ কোটী ৩৭ লক্ষ গজ থাকে, তন্মধ্যে দেশী ৮১.৫% আর বিদেশী ১৮.৫%।

যদি দেশের আবহাওয়া অনুকূল হয় তাহা হইলে এই ১৮.৫% অংশও ভারতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। কেবল তাহাই নহে ইদানীং ভারতীয় বস্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর পরিমাণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে।

	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭
	(হাজার)	(হাজার)	(হাজার)
গজ	৫,৭৬,৯৩	৭,১২,৫০	১০,১৬,৩৬
টাকা	১,৭৬,৭০	২,০২,৯৫	২,৬৩,২৮

আশা করা যায় ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের নিকট যাহারা তৈয়ারী কাপড় লয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ অংশ পড়ে :—

	টাকা	শতকরা
সিংহল	৮৯ লক্ষ	৩৩.৮
ষ্ট্রেট্স সেট্‌লমেণ্টস	৪৭ ,,	১৭.৭
ইরাণ	১৮ ,,	৬.৮
এডেন	৯½ ,,	৩.৪
আরব	৮ ,, ৪০ হাজার	৩.১
মরিসস	৭ ,, ৭৫ ,,	২.৯
ইরাক	৭ ,, ৩৬ ,,	২.৬

ইহা ছাড়াও বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জ, পর্ত্তুগাল অধিকৃত দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় রাজ্যসমূহ, টাঙ্গানিয়াকা, শ্যাম, সুদান প্রভৃতি সকলে কয়েক লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি লইয়া থাকে। এই সকল বাজারের দিকে লক্ষ্য দিলে সহজেই ভারতীয় কাপড়ের কাটতি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এখন ভারতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ভারতের তুলার বাজার যেরূপ মন্দা হইয়া যাইতেছে, তাহাতে রপ্তানী হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক। এখন যদি ভারতীয় মিলগুলি বেশী মাত্রায় ভারতীয় তুলা ব্যবহার করে, তাহা হইলে সমস্যা অনেকখানি দূর হইয়া যায়।

কলকারখানায় বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা

ভারতের মিলগুলি সকল প্রদেশে সমানভাবে স্থাপিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে পরাজিত করিয়াছে। যদিও বাঙ্গালায় কলিকাতার সন্নিকটে ভারতের প্রথম মিল স্থাপিত হয়, তথাপি এ বিষয়ে বাঙ্গালা বোম্বাই প্রদেশের বহু পিছনে পড়িয়া আছে। বোম্বাই প্রদেশের পার্সীদের অর্থ ও শিল্প প্রতিভা ইহার জন্যই মূলতঃ দায়ী। তুলা বোম্বাই প্রদেশ ঘিরিয়া বেশী মাত্রায় উৎপন্ন হয় এবং কয়লার অসুবিধা বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অধিক হইলেও, তাহারা বিদেশী কয়লা আনিয়া কাজ চালাইয়া লয়। কয়লার বিষয়ে বাঙ্গালার বিশেষ সুবিধা আছে, কিন্তু প্রায় আর সকল বিষয়ে সে পিছাইয়া পড়ে।

নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে প্রদেশসমূহের অবস্থা দেখা যাইবে। বর্ত্তমানে (১৯৩৬-৩৭) ভারতে—

মিল সংখ্যা ৩৭০

মূলধন—৩৯,৮২,৭০,০০০

মোট টাকু সংখ্যা (spindles installed)—৯৭,৩০,৭৯৮

তন্মধ্যে চলতি টাকু—৮৪,৪১,০০০

মোট তাঁত সংখ্যা (looms installed) ১,৯৮,০০০

তন্মধ্যে চলতি তাঁত—১,৭৭,১১১

মিলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ (৭৮৪ পাউণ্ড ওজনের গাইট) ১৫,৭৩,৩৭৬

মোট মজুর সংখ্যা—দৈনিক—৪,১৭,২৭৬

মোট সূতার পরিমাণ—১০৫ কোটী ৪১ লক্ষ পাউণ্ড

মোট কাপড়ের পরিমাণ—৭ কোটী ৮২ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩৫৭ কোটী ২০ লক্ষ গজ।

এক এক প্রদেশের লোক সংখ্যার সহিত তত্তৎ স্থানের মিল ও মিল-সরঞ্জামের শতকরা অনুপাত দেখান হইল :—

	লোক সংখ্যা শতকরা	মিল সংখ্যা শতকরা	মূলধন শতকরা	টাকু শতকরা	তাঁত শতকরা	তুলা শতকরা	মজুর শতকরা	সূতা শতকরা	কাপড় শতকরা
বাঙ্গালা	১৪.২	৭.০২	৫.৭	৩.২	৪.২	৩.১	৪.১	৩.৬	৪.৩৭
যুক্তপ্রদেশ	১৩.৬	৬.৭৫	৬.৪	৮.০৫	৫.৬	৯.৯	৭.২	১০.৯	৬.৬৩
মাদ্রাজ	১৩.২	১২.৭০	৯.৬	১২.৯	৩.৩	১৩.০	১১.৭	১২.৩	২.১৫
বিহার	৯.১								.০০৯
পঞ্চনদ	৬.৬	১.৮৫	.৩৭	.৫৩	.০৫	.৬৩	.৫	.৮	.৬৪
বোম্বাই	৬.২	৫৬.৭৩	৫৫.৮	৬১.৪	৭১.৬	৫৩.৫	৫৭.৯	৪৮.৬	৬৫.৭০
হায়দ্রাবাদ	৪.০	১.৬২	২.৫	১.২	.৯	১.৫	১.৪	স্বতন্ত্র হিসাব নাই	

মধ্যপ্রদেশ	৩'৪	২'১৬	৬'৪	৩'৩	২'৮	৩'৬	৪'১	৪ ৫	২'১
রাজপুতানা	৩'১	১ ৩৫	'৮৩	৮৪	'৯	১'৩	'৯৫	'৮	'১৩
আসাম	২'৪							স্বতন্ত্র হিসাব নাই	
মধ্যভারত করদরাজ্য	১'৯	৪'০৫	৬'৪	৪'০	৫'৬	৬'১	৫'৪	„	„
মহীশূর	১'৮	১'৮৯	২'১	১'৪	১'১	১'৯	১'৯	„	„
উড়িষ্যা	১'«							„	„
ত্রিবাঙ্কুর	১'৪	'০২	'০৫	'০৯	'০১	১'১	'০০১	„	„
বিরার	'৯	১'০৮	'৬৫	'৭৩	'৬	'৭১	'৯	„	„
দিল্লীপ্রদেশ	'১৭	১'৬২	১'৩	১'০	১'১	২'১	১'৫	২'৪	২'৩

সুতা এবং প্রস্তুত কাপড়ের হিসাব দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) ব্রিটিশ শাসিত ভারত (২) করদ ও ভারতে বিদেশীয় রাজ্য। শেষোক্ত অংশে ইন্দোর, মহীশূর, বরোদা, নন্দগাঁ, ভবনগর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, কোলাপুর, কোচিন, রাজকোট, রাটলাম, কচ্, পোরবন্দর, পণ্ডিচেরী, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি পড়ে।

বৃটিশ ভারতে সুতা ও কাপড়ের শতকরা ৮৪'৫ করিয়া পড়ে। অবশিষ্ট ১৫'৫% করদ ও অন্যান্য প্রদেশে পড়ে।

বাঙ্গলার লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের ১৪'২% হইলেও কাপড়, সুতা যথাক্রমে ৪'৩৭ ও ১'৬ অংশ প্রস্তুত করে। বোম্বাই বড় বুদ্ধিমান, লোকসংখ্যা ৬'২% হইলেও কাপড় ও সুতা প্রস্তুত করে যথাক্রমে, ৬৫'৭০% ও ৪৮'৬%। অনুপাতে, সুতা হইতেও কাপড় প্রস্তুত করে অনেকগুণ বেশী।

ভারতের মিলের আরও প্রসার লাভ করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে। ইহা দ্বারা কেবল যে ১৭ কোটী টাকার কার্পাস বস্ত্র, সুতা, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বস্তুর আমদানী বন্ধ করা যায় তাহা নহে, ভারতের বস্ত্রাদি ভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ভারতের সহিত যাহাদের বাণিজ্যের নিকট সম্বন্ধ আছে তাহাদের নিকট বিক্রয় করা যাইতে পারে।

ভারতের তাঁত

ভারতবর্ষের তাঁত সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলে ইহা একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভারত তাঁতের বস্ত্র দিয়াই জগতের শতলোকের অঙ্গাবরণ করিয়াছে, কারু ও শিল্প কার্য্যের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। এখন কলকারখানার শব্দে তাহের তাঁতের "ঠকঠকানি" চাপা পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু আজও যে তাহা লোপ পায় নাই, তাহারই কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আজ বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে কল অপেক্ষা তাঁতে বেশী কাপড় প্রস্তুত হইত। তাহার পর হইতে তাঁতের ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে। ঐ সালেও আন্দাজ ১১১ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কাপড় তাঁতে বোনা হইয়াছে, তখন মিলে মাত্র ৮১ কোটী ৪০ লক্ষ গজ কাপড় হইয়াছে। ১৯১০-১১ পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে, তাহার পর আবার তাঁতের চলন অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যেখানে ২০ কোটী পাউণ্ড সুতা তাঁতে লাগিত সেখানে উহা ৩১ কোটী পাউণ্ডে পৌঁছায়। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁতে ৩৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা লাগে এবং ১৪০ কোটী ৪০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষে, আন্দাজ ১৬৬ কোটী গজ কাপড় বোনা হইয়াছে। মিলে ঐ সালে কিঞ্চিদধিক ৩৮০ কোটী গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে ভারতের মোট ব্যবহারের সমস্ত কাপড়ের শতকরা ৫৭ ভাগ দেয় ভারতের মিল, ২৭ ভাগ দেয় তাঁত, আর বাকী আসে বিদেশ হইতে। সুতরাং তাঁত লোপ পাইয়াছে, এ কথা মনে করা নিতান্ত ভুল। ভারতে প্রস্তুত মোট কাপড়ের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ তাঁত হইতে পাওয়া যায়। তাঁত মরিতে পারে না, কারণ কয়েক রকমের বস্ত্র আছে, যাহা তাঁতে প্রস্তুত করা সহজ এবং সুলভ।

তাঁতে মূলধন লাগে সামান্য, অলস ভাবে বসিয়া থাকাকালীন কাজ চালানো যায়, যখন তখন ইচ্ছামত কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে মন দেওয়া যায়, পরিবারবর্গের সাহায্য লাভ করা যায়, ইত্যাদি ও অন্যান্য কারণে তাঁত ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে। সামান্য উন্নতি সাধিত হইলে ভারতবর্ষের তাঁত দ্বারা বহুলোকের জীবিকা অর্জ্জন হইবে এবং আবার ভারতের মিহি কাপড়, মসলিন প্রভৃতি জগতে সমাদর লাভ করিবে।



জার্ম্মাণীর পুনর্জন্ম—ইতিহাসের প্রতিশোধ

ডক্টর মণি মৌলিক

প্রবন্ধ

ভের্সাই সন্ধির চিতাভস্মের উপরে উঠিয়াছে জার্ম্মাণ জাতীয়-আকাঙ্ক্ষার অভ্রভেদী স্তম্ভ। বিস্মার্কের যে সাম্রাজ্য-স্বপ্ন কাইজারের ক্ষমতা-বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল মাদকতার অপরাধে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহা হিট্লারের স্বদেশ সেবায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভের্সাই সন্ধির যে কয়টি চুক্তিতে জার্ম্মাণীর লাঞ্ছনার আয়োজন ছিল, একটি একটি করিয়া তাহার প্রায় সব কয়টিই জার্ম্মাণী উপেক্ষা করিয়াছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, লোকার্ণো চুক্তি, রাইনল্যাণ্ডের নিরস্ত্রীকরণ, [illegible]ীর অঙ্গহানি ইত্যাদি সব কয়টি অধ্যায়ই ইতিহাসের কোঠায় প্রবেশ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর মত আত্মাভিমানী জাতি যে একটি যুদ্ধের আকস্মিক পরাজয়ের অপমানকে চির-কাল সহ্য করিতে পারে না, নাৎসি দল আর হিট্লারের অভ্যুদয় তাহাই প্রমাণ করে। হিট্লার জার্ম্মান্ সংগ্রামী-মনোভার প্রতীক মাত্র। নাৎসি বিপ্লবের অন্তরালে হিট্লারের ব্যক্তিত্ব ছাড়াও আর একটি প্রবল আদর্শবাদ আছে। তাহা জার্ম্মাণ যুব-শক্তির বীর-ধর্ম্ম। নাৎসিরা জার্ম্মাণীকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের লাঞ্ছনার অনেকগুলি চিত্র হইতেই মুক্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার প্রকৃত আদর্শ পর্য্যন্ত এখনও পৌছিতে



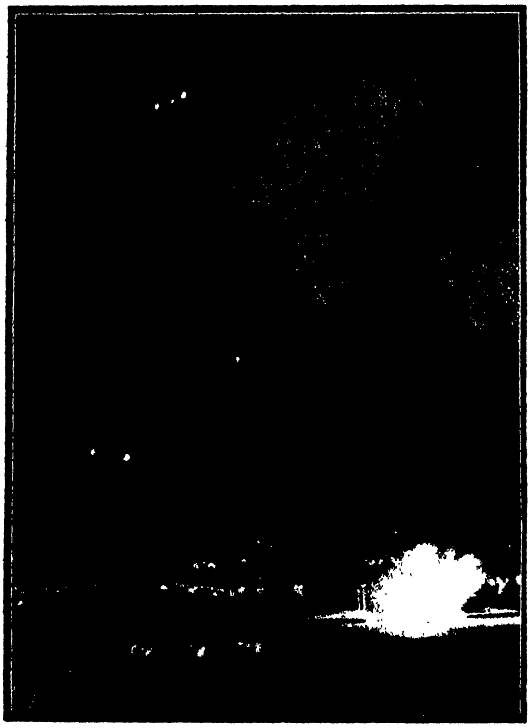
একটা জার্ম্মাণ সহরে শোভাযাত্রা



রাইসেনহালে বসন্ত উৎসব

পারে নাই। এই প্রবন্ধে সেই সমস্যা কয়টিরই আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র-পদ্ধতির সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যা এবং প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান ইয়ুরোপের গুরুতর সমস্যা-সমূহের অন্যতম হইতেছে গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর লুপ্ত উপনিবেশগুলির পুনরুদ্ধার। নাৎসি জার্ম্মাণীর উপনিবেশ-পদ্ধতির দুইটি দিক আছে—প্রথমতঃ, ইজ্জতের দিক, আর দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক সমস্যার দিক—বহির্বাণিজ্য, বিনিময় ইত্যাদি। এই কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা চলে যে



মধ্যযুগের হানসা লীগের সুন্দরতম রাজধানী লুবেক সহর

ইয়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে জার্ম্মাণীর স্থান অতিশয় উচ্চে, যদিও জার্ম্মাণরা মনে করে তাহারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাত। যে জাতি কিংবা দেশের প্রতি জার্ম্মাণদের একটু শ্রদ্ধা আছে সে হইতেছে ইংরেজ। ইংরেজের ধমনীতে জার্ম্মাণ রক্তের প্রাদুর্ভাববশতঃই হউক, আর খানিকটা ইংরেজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই হউক, জার্ম্মাণরা ইংরেজকে শ্রদ্ধা করে। জার্ম্মাণীর প্রতি ইংরেজের যে শ্রদ্ধা তন্মধ্যে যে একটু ভয় মিশ্রিত না আছে এমন নয়। ইংরেজ জার্ম্মাণীর চাইতে অনেক সহিষ্ণু, ব্রিটিশ রাষ্ট্র পদ্ধতির তাহাই প্রধান শক্তি;

কিন্তু ইংরেজ জার্ম্মাণ উচ্ছৃঙ্খলতাকে ভয় করে, কারণ জার্ম্মাণ উচ্ছৃঙ্খলতা ফরাসীর মত ভোগ-বিলাসী নয়, বীরত্ব-বিলাসী। জার্ম্মাণরা তাই বলিতে চায় যে ইয়ুরোপের সব নগণ্য শক্তিদেরও যদি বড় বড় উপনিবেশ থাকিতে পারে তবে জার্ম্মাণী কি দোষ করিল? যে বেল্‌জিয়ম নিজের শক্তিতে এক সপ্তাহও তাহার নিজের দেশকে রক্ষা করিতে পারে না তাহার নগণ্য লোকসংখ্যার জন্য কঙ্গোর মত বিশাল উপনিবেশের কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ যখন



বাডেনের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছেলেদের উৎসব ও ক্রীড়াকৌতুক

জার্ম্মাণীর মত বর্দ্ধিষ্ণু জাতি নিজের দেশের আঙ্গিনার মধ্যে মাথা রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাইতেছে না। বেল্‌জিয়মের মত হল্যাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা যায়। বেল্‌জিয়ম্ শিল্প-প্রধান দেশ, হল্যাণ্ড বাণিজ্য-প্রধান; কাজেই সেই দিক হইতে তাহাদের উপনিবেশের প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদেরই প্রতিবেশী প্রবল পরাক্রান্ত জার্ম্মাণী যে এক গণ্ডূষ জলের মত উহাদিগকে একদিনেই গলাধঃকরণ করিতে পারে, সে কেন 'কলনী'-হীন হইয়া জগতের সমক্ষে সকলের চাইতে অধম প্রমাণিত হইবে? অতঃপর, আফ্রিকা

জার্ম্মাণীর যে উপনিবেশ যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল, তাহার লোপও ভের্সাই সন্ধির একটি অঙ্গ বিশেষ। ভের্সাইর শেষ উত্তরাধিকার সমাধি-প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর অভিমানী আত্মার তৃপ্তি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণীর আর্থিক স্বাস্থ্যের জন্য এমন কতকগুলি উপনিবেশ চাই যেখান হইতে উহার কারখানাগুলির খোরাক জুটিতে পারে। এই কারখানাগুলির মধ্যে গোলা-বারুদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের কারখানাগুলিও ধরিতে হইবে। ইংরেজ ও ফরাসী এই কথার উত্তরে বলে যে এই সব কাঁচা মালগুলি (raw materials অথবা war materials) অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করিলেই ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। জার্ম্মাণী জবাবে বলে যে অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে তাহাকে দাম দিতে হইবে মার্কে (জার্ম্মাণ মুদ্রা) নহে, স্বর্ণে অথবা জার্ম্মাণ শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের রপ্তানীতে। জার্ম্মাণী যদি উপনিবেশ পায় তবে সেখানে তাহার নিজের মুদ্রায় কাঁচা মাল কিনিতে পারে। ইহা ছাড়া, যে সব দ্রব্য যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন তাহার জন্য অন্য কোন স্বাধীন দেশের উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ লড়াইয়ের সময় যে তথায় কাঁচা মাল ক্রয় করা চলিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।



সাইলেসিয়ার সাজসজ্জায় হাস্যমুখী বালিকাদ্বয়



নর্থ সির উপকূলে চাষী যুবক দম্পতি

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে যে আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের (autarchy) আন্দোলন চলিতেছে তাহার মূলেও এই সমস্যা। নিত্য-প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মাল কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত করিবার উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই, কিন্তু যে সব আহার্য্য দ্রব্য এবং রাসায়নিক উপকরণ জার্ম্মাণীর অন্যের সাহায্যে জোগাড় করিতে হইত, তাহার অধিকাংশই আজ জার্ম্মাণীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। বহির্বাণিজ্য ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সম্প্রতি যে কয়টি শক্তির সঙ্গে জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে জার্ম্মাণীর বহির্বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে যাইতেছে। ইতালো-জার্ম্মাণ ও জাপ-জার্ম্মাণ মিত্রতার প্রধান প্রেরণা আর্থিক, রাজনৈতিক নয়, ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে জার্ম্মাণীকে 'কলনী' ফিরাইয়া দিতে কেহই রাজী নহে। ইংরেজ ও ফরাসী বলে যে কলনী ফিরাইয়া

দিতে তাহাদের নিজেদের মত থাকিলেও উপনিবেশের প্রধান সম্প্রদায় সকল জার্ম্মাণ প্রভুত্ব চায় না ; উপরন্তু বিগত পনর যোল বৎসর সময়ের মধ্যে তথায় তাহাদের নূতন আর্থিক স্বার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা হস্তান্তরিত করিতে হইলে অনেক ওলট-পালট হওয়ার সম্ভাবনা। ইংরেজ ক্রমাগত জার্ম্মাণীতে তাহার প্রতিনিধি পাঠাইয়া যে অভিনয় চালাইতেছে তাহা শুধু জার্ম্মাণীকে অদ্যকার মত শান্ত রাখিবার জন্য। পনর বৎসর যাবৎ নিরস্ত্রীকরণের গান গাহিয়া ইংরেজের সমর আয়োজন পিছাইয়া পড়িয়াছিল ; অবশ্য আপেক্ষিক ভাবে—কারণ, যদিও ইংরেজদের গোলা-বারুদের কারখানাগুলি এতদিন নির্জীব ছিল না, তথাপি বিশ্ব-শান্তি সমস্যায় ইংরেজের মত স্বার্থ কিংবা দায়িত্ব অন্য কোনও শক্তির নাই। তাই আজ বিলাতে নতুন করিয়া যুদ্ধায়োজনের রব উঠিয়াছে, এতদিনের লঘু পাপের গুরু-প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণী জানে যে ইংরাজের পুনরস্ত্রীকরণের কল্পিত কাল (পাঁচ বৎসর) পূর্ণ হইলে পর তাহার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। অথচ জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আজ যুদ্ধ করাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু ইতালির উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা—এই শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গর্ব্বিত জার্ম্মাণীও সাহস করে না। কারণ ইতালির আর্থিক অবস্থা জার্ম্মাণীর চাইতে কোন অংশেই এখন ভাল নহে। ইথিওপিয়ার কল্পিত উর্ব্বর গর্ভে কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে আজ পর্য্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় নাই।

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-পদ্ধতির দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা—কয়েক লক্ষ জার্ম্মাণ নরনারী আজ বিদেশী সরকারের প্রজা। জার্ম্মাণ রাষ্ট্র (Reich) তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্মাণ সম্প্রদায় (Sudeten Germans) হেন্‌লাইনের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে তাহার সাফল্য কামনা করা আর চেকোস্লোভাকিয়ার এক অংশ জার্ম্মাণীকে ফিরাইয়া দেওয়া একই কথা। এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও যেহেতু ভের্সাই সন্ধির কীর্ত্তি, সেজন্য হিট্‌লারের তৃতীয় জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র (Third Reich) তাহাকে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণীর ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চায়। অষ্ট্রিয়াতেও বহু সংখ্যক জার্ম্মাণ প্রজা বাস করে।



উৎসবরত যুবক যুবতী সম্প্রদায় জার্ম্মাণী

তাহা ছাড়া, অষ্ট্রিয়ার ভাষা, লোক-সংস্কৃতি এবং কতক পরিমাণে জাতীয় ইতিহাস এমন ভাবে জার্ম্মাণীর সহিত জড়িত যে জার্ম্মাণীর আকাঙ্ক্ষা অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণ রাজ্যের সীমানার মধ্যে গ্রহণ করা। এই লোক-উদ্ধারের পদ্ধতির নামই (anschluss) আন্‌স্লুস্। চেকো-স্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়া উভয়েই এই পন্থার বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইহারা বিভিন্ন উপায়ে জার্ম্মাণ অভিলাষ অপূর্ণ রাখিয়াছে। চেক্ স্বাধীনতার রক্ষক জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ইংরেজ ও ফরাসী। বিশেষ

করিয়া ফরাসী—কারণ জার্ম্মাণীকে ইয়ুরোপে বন্ধুহীন করিয়া রাখা এবং চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত করিয়া রাখা ফরাসী পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ ছিল। সেইজন্য চেকোস্লোভাকিয়া, জুগোস্লোভিয়া ও রোমানিয়া এই তিনটি ছোট ছোট রাষ্ট্রকে একত্রীভূত করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল (Little Entente) লিট্‌ল্ আঁতাত। জার্ম্মাণী যাহাতে মধ্য ইয়ুরোপে, বলকান-জনপদে এবং ডানিয়ুব প্রদেশে



ব্ল্যাক ফরেষ্টের পরিচ্ছদ

ক্ষমতাশালী না হইয়া পড়ে সেইদিকে ইতালিও যত্নবান ছিল। সেই হেতু মুসোলিনী অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। যে সময়ে নাৎসি আন্দোলন ক্রমশঃ অষ্ট্রিয়াতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল অনেকটা ইতালির উপরে নির্ভর করিয়াই ভিয়েনার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দমন করিবার সাহস পাইয়াছিল এবং মুসোলিনীর সহানুভূতির উপর ভরসা করিয়াই ডাঃ ডলফসের মৃত্যুর পর অষ্ট্রিয়াবাসী রাষ্ট্রনৈতিকগণ বুক বাঁধিয়া রাজত্ব চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিছুদিন এই গুজবও শুনা গিয়াছিল যে মুসোলিনী অষ্ট্রিয়াতে হাব্‌সবুর্গ (Habsburg) বংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং যুবরাজ অটোকে ভিয়েনার গদীতে বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইহাতে ইতালির এই লাভ হইত যে জার্ম্মাণীর আর অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মুসোলিনীর অনুগত একটি রাজবংশ থাকিলে জার্ম্মাণীকে ইতালিয়ান সীমান্তের অনেকটা দূর হইতেই নিরীক্ষণ করা চলিত। জার্ম্মাণীর একান্ত বিরুদ্ধাচারে এবং অষ্ট্রিয়ার অনেক আভ্যন্তরীণ কারণে শেষ



স্পেভালডের চিরাচরিত বেশভূষায় কৃষক যুবতী

পর্য্যন্ত এই রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সফল হয় নাই; কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রোমে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে ইতালি অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা এবং হাঙ্গেরীর লুপ্ত সীমানার পুনরুদ্ধারে সমর্থন করে। এবিসিনিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতালি জার্ম্মাণীকে মধ্য ইয়ুরোপে দমন করিয়া রাখিবার আয়োজনে পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। কারণ জার্ম্মাণী একবার মধ্য এবং দক্ষিণ ইয়ুরোপে শক্তিশালী হইতে পারিলে ইতালির সাম্রাজ্য-কামনা সিদ্ধ হইবার কো

সম্ভাবনা ছিল না। একদিকে ফরাসী-রচিত ছোট রাষ্ট্র-সঙ্ঘ, আর অন্যদিকে ইতালির চক্রান্তের মধ্যে পড়িয়া জার্ম্মাণী হতাশায় হাবুডুবু খাইতেছিল। কিন্তু ইথিওপিয়ার যুদ্ধে সমস্ত রাজনীতি ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। ইতালির বিরুদ্ধে জেনিভা হইতে আর্থিক যুদ্ধ ঘোষণা হওয়াতে ইতালি অনন্যোপায় হইয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইল। শুধু তাহাই নহে, সেই ঘটনার সুযোগ লইয়া জার্ম্মাণী ভের্সাই সন্ধির কয়েকটি সর্ত্তকে ফুৎকারে আকাশে উড়াইয়া দিল। সেই হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত



বোহেমিয়ার উৎসবের বেশভূষা

যুদ্ধের পরবর্ত্তী মধ্য-য়ুরোপের সকল রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার জন্য যদিও ইতালির অনুরোধে জার্ম্মাণী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তবুও অষ্ট্রিয়া ইতালির উপর আর তেমন ভরসা করিতে পারিতেছে না। জুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালির সন্ধি এবং রোমানিয়াতে নাৎসি দলের জয় হওয়াতে লিট্‌ল্ আঁতাত একপ্রকার ভাঙিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

ফাসিষ্ট এবং নাৎসি বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ আদর্শবাদের ঐক্য থাকাতে ইতালি ও জার্ম্মাণীর মিলন এত দৃঢ় হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক ইয়ুরোপীয় রাজনীতির এইটাই প্রধান সমস্যা—শান্তি কি করিয়া বজায় থাকিবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া—ইহারা শান্তি চায় এবং শান্তি-বাদ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রচার করিয়া থাকে। ইতালি জার্ম্মাণী এবং তাহাদের বন্ধুবর্গও শান্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা যে একমাত্র নিরস্ত্রীকরণের মধ্য দিয়াই সম্ভব একথা তাহারা মানিতে চায় না। ইতালি এবং জার্ম্মাণী উভয় দেশই আজ কমুনিজ্‌ম্-এর বিরোধী। ইয়ুরোপীয়ান প্রতিভা এবং সমাজের পক্ষে কমুনিজ্‌মের যে কোন মূল্য নাই, এই কথাই ইহারা জোর গলায় প্রচার করিতেছে। কমুনিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সঞ্জীবিত রাখিবার জন্যই ইতালি ও জার্ম্মাণী স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিয়াছে এবং আজ জাপানের সঙ্গে মিতালি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়াতে রুশ প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, জার্ম্মাণী এই অজুহাতে বোহেমিয়াকে শাসন করিতে চায়, কিন্তু বোহেমিয়া-নিবাসী জার্ম্মাণগণই স্বীকার করে যে ওখানে কয়েকজন রুশ কর্ম্মচারী ছাড়া অন্য কোন রুশ প্রভাবই বর্ত্তমান নাই। আসলে চেকোস্লোভাকিয়ার উপরে ইয়ুরোপের শান্তি-সমস্যা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। বোহেমিয়ানদের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার আগে ইয়ুরোপে আবার অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে। চেকোস্লোভাকিয়াতে দ্বিতীয় স্পেন স্থাপিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। জার্ম্মাণীর শত্রুগণ কখনই এমন একটি সুযোগ নষ্ট হইতে দিবে না।

আজ ইয়ুরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি নির্ভর করিতেছে জার্ম্মাণীর মেজাজের উপরে। উপনিবেশের দাবী কতদূর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী আগাইতে পারে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে এই পর্য্যন্ত আশা করা যায় যে আপোষে আফ্রিকার কলনীগুলি ফিরিয়া পাইলে জার্ম্মাণী যুদ্ধ করিবে না। জার্ম্মাণীর জাতীয় পুনর্গঠনের পালা সুরু হইয়াছে মাত্র; ইহার ভিত্তি পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন অনিশ্চিত লাভের আশায় জার্ম্মাণী সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে না। গত দুই বৎসরে জার্ম্মাণীর ইজ্জত অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ভের্সাই সন্ধি এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার জার্ম্মাণ-বিরোধী কূট রাজনীতি নাৎসিদলের অসম সাহসিকতার কাছে হার মানিয়াছে। জার্ম্মাণী শান্তি ততটা চায় না যতটা চায় ইজ্জত; তাই ইংরেজ তাকে ভয় করে। জার্ম্মাণীর কাঁচা মালের অভাব

ততটা নহে যতটা আছে ইতালীর; জার্ম্মাণ বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দুনিয়ার সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তাই শান্তিকামী সকল জাতি আজ জার্ম্মাণীর মেজাজের দিকে তাকাইয়া আছে। ইংরেজ ও ফরাসীর এখন পর্য্যন্ত ভরসা এই যে জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা এখনও শোচনীয়। যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্যদের খোরাক জোগাড় করিতে হইবে; সেই সামর্থ্য জার্ম্মাণীর আজ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতির জন্য যে প্রকার চেষ্টা চলিয়াছে তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই সে যুদ্ধ-ক্ষম হইয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইতালির সঙ্গে মিত্রতার পর হইতে জার্ম্মাণীর অবস্থা মধ্য ইয়ুরোপে আবার প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অষ্ট্রিয়া ইতিমধ্যেই ডল্‌ফুসের হত্যাকাণ্ড ভুলিয়া গিয়াছে; জার্ম্মাণীর সঙ্গে আপোষ করা ছাড়া তাহার আজ স্বাধীনতা রক্ষার উপায় নাই। চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাহাদের জন্য পৃথক রেডিও ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। রাশিয়া আবার অন্তর্বিপ্লবের অভিশাপে পড়িয়াছে। রোমানিয়া রাশিয়ার ভয়ে আজ জার্ম্মাণীর অনুগত। পোলাণ্ডও কতক পরিমাণে তাই, যদিও ডান্‌জিগ্ লইয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে পোলাণ্ডের মতদ্বৈধ আছে। ইতালি আজ তাহার বন্ধু; সুতরাং জার্ম্মাণীর মেজাজ আজ গরম হইবারই কথা। যুদ্ধায়োজন—সামরিক এবং আর্থিক—পূর্ণ হইলেই জার্ম্মাণী কলনী-উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করিবে।

জার্ম্মাণী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জার্ম্মাণ মেজাজে এমন একটি চরম-পন্থী ভাব-বিলাস আছে যাহা এই জাতিটির প্যাগান্ অতীতের কথা মনে করাইয়া দেয়। জার্ম্মাণী যে ইয়ুরোপের সভ্যতায় এতখানি দান করার পরেও রাজনীতিতে এতটা পিছনে পড়িয়া আছে, তাহার কারণ জার্ম্মাণদের অসহিষ্ণুতা এবং অসীম আত্ম-নির্ভরতা। আজ সমগ্র জার্ম্মাণীতে হিট্‌লারের যে পূজা চলিতেছে তাহাকে প্যাগানিজ্‌ম্ বলিলেও চলে। জার্ম্মাণ যুবক-প্রাণে নাৎসি বিপ্লব যে বীরত্বের বাণী এবং জাতীয় গর্ব্বের মাদকতা ছড়াইয়াছে, ইয়ুরোপের শান্তির পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কারণ, গোলা-বারুদ নহে। জার্ম্মাণ যুবক প্রাণ লইয়া খেলা করিতে জানে, আর শিশুরা সেই আদর্শ লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। যে দেশের যুবক-শক্তি জাতীয় মর্য্যাদার জন্য মৃত্যুটাকে খেলার মত দেখিতে পারে, তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তাই ইয়ুরোপে আজ জার্ম্মাণীর মিত্রতাকে সবাই পরম সম্পদের মত দেখে, আর জার্ম্মাণীর শত্রুতাকেও শ্রদ্ধা করে।

* ৫।১।৩৮ তারিখে লিখিত।

পথিক

শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

আমার সময় নাই অতীতের তীরে
কাঁদিয়া ফিরিতে। মোর আনন্দের নীড়ে
গোলাপ কিংশুক ফোটা ডাক এলো আজি,—
বিচিত্রেরই বেণুধ্বনি উঠিয়াছে বাজি
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাহারি বারতা
বুকে করে কক্ষচ্যুত অতীতের ব্যথা

ভবিষ্যের সুখ স্বপ্নে হয়ে আত্মহারা
তাহারই রূপের ধারে মিশাইল ধারা।
অতীতের প্রাণহীন দেহ লয়ে নর
চলিতে পারেনা কভু যুগ যুগান্তর।
অতীতের দেহহীন প্রাণের মাধুরী
জেগে রয় ভবিষ্যের নিত্য বুক ভরি।

হৃদয়ে প্রকাশহীন শত শত সুর—
পথ চলি, দুপাশেই দুরন্ত সুদূর।

মৃত্যুর আলো

শ্রীআশালতা সিংহ

শিক্ষিত পরিবার। শ্বশুর সবজজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি পেন্‌সন্ লইয়াছেন। বড় ছেলে ডাক্তার, কলিকাতাতেই প্রাক্‌টিস করেন। মেজ ছেলেটি কিন্তু তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই, বি-এ পরীক্ষায় কয়েকবার ফেল্ করিয়া এখন বাড়ীতেই আছে। ইন্‌সিওরেন্সের দালালীর চেষ্টায় আছে। ছোট ছেলেটি বি-সি-এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বড় এবং মেজ দুই ছেলের বিবাহ হইয়াছে। বড় বৌ আই-এ পাশ। মেজ বৌ আই-এ পাশ করিয়া বি-এ অবধি পড়িয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে একত্রে সকলে থাকেন। বাড়ীতে আধুনিক চালচলন। বাড়ীর মেয়েরা বেণী দুলাইয়া স্কুলের বাসে চলিয়া ডায়োসেশন্ এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে পড়িতে যায়। শাশুড়ি আছেন, সকালবেলায় একবার তসরের কাপড় পরিয়া কোনক্রমে পূজা-আহ্নিক সারিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন ব্যবহারে তাঁহার লেশমাত্র সেকেলে ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি কারপোর রুটিও খাইতে আপত্তি ক'রেন না, বৌদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যান এবং ক্লাবের লাইব্রেরী হইতে বাংলা উপন্যাস আনাইয়া পাঠ করেন।

সকলেই মনে করিতে পারেন এরূপ শিক্ষিত পরিবারে নিশ্চয়ই সকলেই মার্জ্জিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং বৌয়ে শাশুড়িতে ঝগড়া কিংবা যায়ে যায়ে ঝগড়া কখনো হয় না। অথচ এ মনে হওয়া যে কত বড় ভুল মনে হওয়া, সে পরিবারে কিছুদিন বাস করিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। বাইরে হইতে অবশ্য বুঝিবার যো নাই। সভ্যজগতের সমস্ত কিছুই যেমন একটা কৃত্রিম মসৃণ আবরণে আবৃত হইয়া আপন আদিম আলঙ্কৃতাকে ঢাকিতে চেষ্টা করে তেমনই এ পরিবারের ঝগড়াও সভ্য ঝগড়া।

কথা কাটাকাটি হয়, হিংসার সতীব্র ঝলক ঝলসিয়া উঠে, তীব্র চাপা ক্রূর হাসির বিদ্যুত খেলিয়া যায়। কিন্তু জোরে জোরে ঝগড়া গালি শাপ শাপান্ত এ সকল নাই। লোকে মনে করে বড় কালচার্ড, খুবই উদার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীচতার গ্লানি ঈর্ষার বহ্নি কিছুমাত্র কম নয়। সে বরঞ্চ আরও বেশি।

সেদিন ব্যাপারটা হইয়াছিল এইরূপ। বড় বৌ ইন্দু তাহার ছেলে মেয়ের জন্য গরম কোট তৈয়ারী করাইবে বলিয়া জামার কাপড় কিনিতে বাজার যাইবার প্রয়োজনে সোফারকে ডাকিয়া গাড়ী বার করিতে বলিল। বড় মেয়ে মীরাও মায়ের সঙ্গে যাইবে। কাপড়চোপড় পরিয়া একেবারে তৈরী হইয়া মা ও মেয়ে নীচের তলায় নামিতে যাইতেছে এমন সময় শাশুড়ি তারাসুন্দরী ডাকিলেন, ও বড়বৌমা একবার শুনে যাও।

আবার হয়তো নূতন কিছু বরাত হইবে মনে করিয়া অপ্রসন্নচিত্তে ঈষৎ জ্রকুঞ্চিত করিয়া ইন্দু শাশুড়ির ঘরে গেল।

করে কোট করাতে হবে। (অতুল ও লিলি মেজবাবুর ছেলেমেয়ের নাম।) তা তুমি যখন নিজে বাজার যাচ্ছ তখন ওদের জন্যেও পছন্দ করে আনবে। হাঁা, আর তা দেখ, হয়তো তোমার হাতে বেশি কিছু না'ও থাকতে পারে। এই দশ টাকার নোট দু'টো নাও। যদি না কুলোয় আরও কিছু লাগে পরে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের জন্যেও যেন এ'নো বাছা। ভুলে ব'সে থেকো না। কিংবা দেরী হ'য়ে গেলো ব'লে না আনা-কোরো না।

বিরক্তিতে রাগে ইন্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। শাশুড়ির হাত হইতে নোট দু'খানা লইয়া নিঃশব্দে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

মীরা সিঁড়ির মুখে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। মাকে দেখিয়া বলিল, মা যাবে না? বারে, আর কত দেরী করবে? এরপর আমার আবার স্কুল আছে। মা, আমার ফারকোটটা কিন্তু আমাদের প্রাইজের আগেই করিয়ে দিতে হবে। সে বেশ হবে। আমি ফণীবাবুকে বলেচি, আজই বিকেলে দর্জ্জিকে খবর দিয়ে আসবেন।

ইন্দু গম্ভীরমুখে বলিলেন, আমার ভারি মাথা ধরেচে। আজ আর আমি বাজার যেতে পারব না। মীরা তুমি সোফারকে বলে এসো গাড়ী গ্যারেজে নিয়ে যাবে। আর আমার দরকার নেই।

মীরা নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল এবং ড্রাইভারকে গাড়ী তুলিতে বলিয়া দশ টাকার নোট দুইখানা লইয়া ঠাকুমার ঘরে গিয়া তাঁহাকে ফেরত দিয়া মায়ের মাথা ধরার কথা জানাইল এবং সেই কারণে তিনি যে যাইতে পারিলেন না সে কথাও বিজ্ঞাপিত করিল। শুনিয়া নাতনী শুনিতে না পায় এইরূপ মৃদু অস্ফুটস্বরে ঠাকুমা তাহার মন্তব্য করিলেন, "যত ঢং!"

ঘণ্টা দুই পরে গোটাকতক জরুরী 'কল' সারিয়া আসিয়া বড়বাবু শৈলেন যখন শয়নকক্ষে ঢুকিলেন তখন স্ত্রী নিতান্ত বিরসচিত্তে একটা সোফায় হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন। সকালবেলায় এমন অসময়ে স্ত্রীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া শৈলেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, শুয়ে যে বড়! তোমার শরীরটা কি আজ ভালো নেই নাকি?

স্বামীর প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বড় বাবু দার্শনিকের সুরে বলিল, আচ্ছা বলতে পারো তোমাদের বাড়ীতে এমন দু'রকম ব্যবহার কেন?

ভূমিকাটা কিসের ঠিক আন্দাজ না করিতে পারিয়া শৈলেন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাইটা খুলিতে লাগিল। একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বড়বৌ সকালবেলাকার ঘটনাটায় ডালপালা দিয়া বর্ণনা করিয়া বলিল, আচ্ছা ওদেরও ঠাকুমা আর মীরা নীলুরও ঠাকুমা। কিন্তু আমার

না. তাদের কথা কখনো ভাবতে দেখলুম না। কেন ওরা কি কেউ নয় না কি? সত্যি এক এক সময় আমি সহ্য করিতে পারি নে। এত একচোখোমি. এত দুই দুই ভাব কেন?

শৈলেন হ্যাট্ ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া কহিল. তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। অক্ষম ছেলের উপর মায়ের টান বরাবরই একটু বেশি হয়। ললিত নিজে বিশেষ কিছু করতে পারে নি। এতদিনে একটা ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট হয়ে সামান্য কিছু পাচ্ছে। স্বভাবতঃই তাই মায়ের ভাবনাটা ওদের জন্যেই সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে ভালোবাসার তফাতটা কোথায় দেখলে? ছি. এত ছোট কথায় চঞ্চল হতে নেই।

বড়বৌ কিন্তু স্বামীর কথায় আরও রাগিয়া উঠিয়া কহিল. স্ত্রী যে বলো তার মাথা মুণ্ডু নেই। মেজঠাকুরপো কিছু করতে পারলেন না. তার জন্যে তো আর আমরা দায়ী নই। ঠাকুর ওঁর পিছনেও কিছু কম টাকা ঢালেন নি। ক্ষমতা না থাকলে আর কি হবে। একচোখোমি করবার জন্যে ওটা কিছু স্বপক্ষে যুক্তি হ'লো না। আসলে মেজবৌ আরও শিক্ষিতা আরও সুন্দরীও নিশ্চয়। সবাই তাকে ভালোবাসে। আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েকে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না!

মেজবৌ কিরণময়ী নিখুঁত সুন্দরী। যখন বেথুনে থার্ডইয়ারে পড়িত তখন তাহার বিবাহ হয়। অনেকখানি আশা লইয়া এবাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু একটা আশাও সফল হয় নাই। স্বামী সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া এমনই মাতিয়া উঠিলেন যে উপর্যুপরি দু'ইবার ফেল করিয়া তৃতীয়বারে বিদ্রোহ করিয়া বলিলেন—আবার পড়িতে বলিলে বাড়ী ছাড়িয়া যেথানে খুসী চলিয়া যাইব। তখন কিরণের ছেলে ও মেয়ে হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ী অবস্থাপন্ন। তবুও চোখের সামনে বড় ভাসুর অজস্র রোজগার করিতেছেন, দিন দিন তাঁহার পসার বাড়িতেছে এবং বড় যা অযচ্ছল খরচ করিতেছেন ও সে খরচের একটা পয়সাও শ্বশুর বা শাশুড়ির অনুগ্রহলব্ধ নয় সমস্তই স্বামীর উপার্জ্জন। সে ক্ষেত্রে নিজের নিরূপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সমস্ত মনটা টন টন করিয়া উঠিত। নিজের যা ননদ শাশুড়ি এবং সমবয়স্ক সঙ্গিনীদের কাছে কিরণ প্রায়ই বলিত, মেয়েমানুষের রূপই বলো আর গুণই বলো—কিছুই কোন কাজে আসে না যদি না তার বরাত ভালো হয়। আমি এইটে এতবার দেখেছি যে রূপগুণের উপর আর আমার শ্রদ্ধা নেই। বলিতে বলিতে এমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই চুপ করিত যে ইহার অর্থ বুঝিতে আর কাহারও বড় বাকী থাকিত না। বুঝিতে পারিয়া শাশুড়ি ব্যথিত হইয়া উঠিতেন। সঙ্গিনীরা সমবেদনা বোধ করিত এবং বড় যা ইন্দু তাহার বক্র কটাক্ষপাতে মুখ কালো করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

কিরণ অন্য সবদিকে ভালো হইলেও বড় যা'য়ের সহিত ব্যবহারে এই কারণে অত্যধিক মাত্রায় আত্মমর্য্যাদাগর্ব্বশালিনী ছিল। বড় যা'য়ের মেয়ের দিবার সময় বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত, বড়দির কি ভাই এ জিনিস পছন্দ হবে? তবু গরীব কাকীমা দিয়েচে এই মনে করেও যদি ওঁর মেয়েরা নে'য়। সেই আমার ভাগ্য!

কিন্তু সেদিনের সেই কোট কেনার ব্যাপারটা সেখানেই সমাপ্ত হইল না। কিরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আপন হৃদয়ে ঝড় বহাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

শাশুড়ি বলিলেন. আমাকে চা তৈরী করে দিতে দিতে মেজবৌমা অমন করে উঠে চলে গেল কেন?

মেজমেয়ে তরলা বলিল—কেন উঠে যাবে না?…ওর মনে কষ্ট হয় না? যাই বলো বড়বৌদির এরকম ব্যবহার কিন্তু ভারি অন্যায়—।

কিরণ স্বামীকে আদেশ করিল—তুমি এখনই লিলি আর অতুলের জন্যে দু'টো গরম কোট্ কিনে নিয়ে এ'স। আমি যতই গরীব হই, নিজের ছেলেমেয়েকে দু'টো জামা নিজে কিনে দেবার মত সামর্থ্য আমার নিশ্চয়ই আছে। আর কিছু না থাক—

বলিতে বলিতে তাহার চোখে অশ্রু ছলছল করিয়া উঠিল এবং স্বামী সেই অশ্রুপ্লাবিত ঘনপক্ষ্মময় চক্ষুর দিকে চাহিয়া ললিত যখন কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না ঠিক সেই সময়ে দ্বারের বাহিরে জুতার আওয়াজ হইল। শৈলেন একটু কাসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে বাদামী রঙের কাগজে মোড়া একটা মস্ত পার্শেল। ভাসুরকে দেখিয়া কিরণ মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

খাটের উপর পার্শেলটা ছুঁড়িয়া দিয়া শৈলেন বলিল, ললিতের জন্যে একটা স্যুট্ আর লিলির জন্যে একটা ফারের অলেষ্টার নিয়ে এ'লাম। মেজবৌমা খুলে দেখুন পছন্দ হয়েচে কিনা।—তাহার পর শৈলেন দু'এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া আরও কি একটা বলিতে গেল, বোধহয় স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু সঙ্কোচে বলিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া ব্যস্ততার ভান করিয়া কহিল, যাই, আবার ভবানীপুরে দু'টো বালীগঞ্জে তিনটে আর পার্ক সার্কাসে চারটে কল আছে। দাঁড়িয়ে যে দু'দণ্ড গল্প করবো তার যো কি? নাঃ আর পারা যায় না। খেটে খেটে—

মিনিট পনের পরে তরলা ঘরে ঢুকিল—মেজবৌদি ও মেজবৌদি! এই দেখ মা লিলি আর অতুলের জন্যে দু'টো জামা অনাথদাকে আনতে দিয়েছিলেন। বেঙ্গলষ্টোর্স থেকে নিয়ে এ'লো। লিলির জামার রংটা কী ফাইন! দেখ, তোমার পছন্দ হয়েচে তো?

সেদিন বড়বৌ ইন্দু সারাদিন মাথা ধরায় শয়ন গৃহ ছাড়িয়া উঠিলেন না এবং তাঁহার স্বামী সারাদিন বালীগঞ্জ ভবানীপুর পার্কসার্কাস এবং টালীগঞ্জের 'কল' সারিয়া শ্রান্তদেহে বৈঠকখানা ঘরে রাত্রি যাপন করিলেন। সারাদিন খাটুনীর পর স্ত্রীর মুখোমুখি হইবার সামর্থ্য বা সাহস কোনটাই নিশ্চয় তাঁহার ছিল না।

যে বস্তু লইয়া এত গোলমাল এতখানি মনান্তর সেই কোটটা পরিয়াই লিলি খেলা করিতে করিতে সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ আসিয়া মাকে

মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা আগুনের মত গরম। শৈলেন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ব্যস্তভাবে মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—কি কতকগুলা ঔষধ নিজে কিনিয়া আনিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া আগে: আপন শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া কহিলেন স্ত্রীকে, ওগো, লিলি বোধহয় বাঁচবে না। তার খুব খারাপ টাইপের ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছে। তুমি যাও, মেজ-বৌমার ঘরে যেয়ে তার কাছে একটু ব'সোগে। আমি এখনই যাচ্ছি। ডাক্তার মুখার্জ্জিকে পরামর্শ করবার জন্যে ডেকেছি। তিনি এ'লেন বলে। ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। লিলি বাঁচিবে না। না-বাঁচা জিনিসটা যে কিরূপ তাহার এতখানি বয়স অবধি সৌভাগ্যবশত ভগবান তাহাকে জানিতে দেন নাই। তাহার নিজের ছেলেমেয়েরা সুস্থ শরীরে সবাই বাঁচিয়া আছে। মা বাবা ভাই বোন খুব নিকট সম্পর্কের স্নেহাস্পদ আত্মীয়স্বজনেরা সবাই বাঁচিয়া আছেন। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া সে কেমন বিহ্বলের মত মেজবৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেখানে তখন ডাক্তার মুখার্জ্জি আসিয়াছেন, তিনি রোগীকে ইঞ্জেকসন দিতেছেন। লিলির মুখ ইহারই মধ্যে কেমন বিবর্ণ হইয়া গেছে। থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস লইতেছে। মোমবাতির ক্ষীণ হলদে আলোয় সে-ঘরের সমস্ত জিনিস কেমন অদ্ভুত অপ্রাকৃত দেখাইতেছে। কিরণ মেয়ের শিয়রের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার স্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাহাকে মর্ম্মরগঠিতা প্রতিমার মত বোধ হইতেছে। কিরণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ একটা অনির্ণেয় ভয়ে ইন্দুর সারা শরীরটা দুলিয়া উঠিল। এখনই ঐ মেয়েটির মেয়ে মারা যাইবে! এ কেমন হয় যদি তাহার নীলু কিংবা মীরা অমনই তাহার চোখের সুমুখে একদিন—ইন্দু আর ভাবিতে পারিল না। দ্রুতপদে আসিয়া লিলির মাথার কাছে বসিয়া বলিল—ভয় কি মেজবৌ, আমি নিশ্চয় করে বলচি লিলি শীগ্‌গীর ভালো হয়ে উঠ্‌বে। তোমার কোনো ভাবনা নেই।

কিন্তু কিরণ কোন জবাব দিল না। সে একদৃষ্টে যেমন তাহার মেয়ের দিকে চাহিয়াছিল তেমনই চাহিয়া বসিয়া রহিল। বোধহয় কোন কথা তাহার কানে গেল না। শৈলেন এবং ডাক্তার মুখার্জ্জি পাশের ঘরে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিলেন রোগীর ঘর নিঃশব্দ। দেয়ালে ক্ষীণ আলোয় বড় বড় ছায়াগুলো কেমন করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। ইন্দুর মনে একটা দুর্জ্জয় বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। যে জীবন এতদিন তাহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটী কলহ বিবাদ ঈর্ষা দ্বেষ ভালোবাসা সমস্ত লইয়া একটা অখণ্ড জীবন্তবস্তু ছিল, সে চারিদিকের ঐ বড় বড় ছায়াগুলোর মত কখন্ পায়ের তলা হইতে সরিয়া গিয়া একটা মিথ্যা মরীচিকায় দাঁড়াইয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই সে হঠাৎ যেন দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মাঝে দাঁড়াইয়াছে। সেখানে উদাস চাঁদের আলোয় সমস্ত ধুধু করিতেছে। যেদিকে তাকানো যায় একটা অত্যন্ত কঠিন শূন্য নীরবতা ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। এই আবিষ্কারের দুঃসহতায় অনেকক্ষণ অবধি ভালো করিয়া সে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

লিলি যে কোটটা পরিয়া আছে তাহার কলারের দামী ফারগুলা বাতির আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সেইদিকে চোখ পড়ায় তাহার দৃষ্টি আর্দ্র হইয়া উঠিল। ঐ কোটটা কেন্দ্র করিয়া কত মান অভিমান কত ঈর্ষার অভিনয় হইয়া গেছে। অথচ হয়তো আর কয়েক ঘণ্টা পরে… আর কয়েক ঘণ্টা পরে কি? তাহার ভাবিতেও সাহস হয় না। লিলির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কোটটাও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। না না, এমন হয় না, হইতে পারে না। ডাক্তারদের ভুল তো এমন কতই হয়। ডাক্তারের কথাই কি সব সময় বেদবাক্য নাকি? টেবিলের উপর সাজানো ঐ মেজার গ্লাস, ওষুধের শিশি। আলনায় টাঙ্গানো ঐ শাড়ি জামা কাপড়, আলমারীর ঐ পুতুল, টিসেট, চিনামাটির ফুলদানি সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে উষ্ণ কোমল পটভূমিকা রচনা করিয়াছে—আরামে সজ্জায়, স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ—সেখানকার ভিত্তিভূমি কি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে——ডাক্তার মুখার্জ্জি একটা ইঞ্জেকসনের সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকিলেন। লিলির জামার হাতাটা তুলিয়া ইঞ্জেকসন দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরণ আতঙ্ক হইয়া ডাক্তারকে বলিল—আপনি অমন করে টান্‌বেন না, ওঁর লাগবে। একটু সবুর করুন আমি আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছি। মেয়েকে সে বিছানা হইতে সন্তর্পণে কোলে তুলিয়া লইল কিন্তু মুখার্জ্জিকে আর ইঞ্জেকসন্ দিতে হইল না। লিলির যেটুকু নিঃশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে বহিতেছিল তাহা সহসা থামিয়া গেল। ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন। কিরণ মেয়েকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—দিদি, এতক্ষণ ছটফট করে লিলি এই একটুখানি শান্ত হ'য়ে এই মাত্র ঘুমুলো। বট্‌ঠাকুরকে বলুন এখন আর ওসব ইঞ্জেক্‌সন দেয়া-দেয়া থাক। অন্ততঃ যতক্ষণ না ওর ঘুম ভাঙে।

শৈলেন কিছুকাল পর স্ত্রীকে বারান্দায় ডাকিয়া আনিয়া বলিল, হয়ে গেছে। কিন্তু মেজবৌমার কোল থেকে ওকে কেমন করে নামানো যায়। তুমি—বলিতে বলিতে সে অস্থিরচিত্তে মৃতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে ইন্দুও আসিল।

বাতির আলো তখন কলারের ফারের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া সর্পদংষ্টের মত বিবর্ণ মুখে ইন্দু স্বামীর দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া কহিল, তুমি কী বলচ! শুধু সম্মুখের ঐ বাতির আলোই কোটটার উপর আসিয়া পড়ে নাই, মৃত্যুর আলো আসিয়া পড়িয়া সমস্ত জীবনটাকে কি যেন একটা রঙে রাঙাইয়া দিয়া গেছে। যে আলোর সামনে দাঁড়াইয়া ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ ঈর্ষা মনান্তর সমেত প্রাত্যহিক জীবনযাপন এত অকিঞ্চিৎকর এমনই হাস্যকর মনে হইতেছে যে কেমন করিয়া সেটা সম্ভব হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছে না



কথা ঃ—শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

সুর ঃ মিশ্র—একতালা (বিলম্বিত লয়)

ওগো কিরণ-প্রতিমা, প্রেম-মধুরিমা,
শুভ্র জোছনা ধীর !
হেথা এলে কারে চাহি' সুধা-তরী বাহি'
ছায়াপথে উষসীর ?
হের, নীলিমের বুকে শশী উন্মনা—
পরশে তোমার রাঙে ধূলিকণা,
সন্ধ্যার তারা সম্বিত হারা,
আকুল সাগর নীর !
দোলে ফুল সুকুমার শ্যাম-লতা-হার,
দীপমালা রজনীর !

ওগো কার প্রেরণায় নামিলে হেথায়
রূপালি নিঝর-রেশে
ঢালো বিরহ বিধুর স্বপ্ন মেদুর
অবনী-কাজল-কেশে !
রাখি' উজল দীপালি গগন-বিতানে
আঁখি নত করি' চাও নিশা পানে—
পলকে উছলি' তিমির বিদলি'
হাসে তব উষা-তীর !
কার মিলন-স্মরণে বাজিছে চরণে
আলো-ছায়া-মঞ্জীর !

গা গা II { গমা গমপা ধনর্সা | ধনা নধা না | নর্র্সা নর্সা -া | (র্সনধা পমগা রগা) }
ও গো কি - র - - ণ প্র - তি মা - - - মা - - -

-া -া -া | না -া র্সনধা | পা মপা মা | গা -া মগরা | গমগা রসা -া
- - - প্রে - ম - ম ধু রি মা - - - - -

সা -া সরগমা | রা গা গপা | পা -া পমগা | রগা -া গগা | { মা মণা ধা
শু - ভ্র - জ্যো ছ না - ধী - - র্ - হেথা এ লে - কা

[পধর্সা]
র্সণধণা পধা -া | পমগা মা ধপধা | পগপা মগা -া | } না না না | র্সনধপা পা ধনর্সর্রা
রে - চাহি' - সু - ধা ত - রী - বাহি - - ছা য়া প থে - উ য -

র্সা -া -া | র্সনধপা ধপমগা -া II
সী - - - - র -

া নর্সা ধনা II { র্সা না ধপা | মা গা রা | গা পা পধনা | পধা র্রা র্সর্সা
- হে র নী লি মে - র বু কে , শ শি উ - - ন্ মনা

[পধনর্সা]
না র্সা র্সনধা | ধা না র্সনধা | পা ধা পা | ধনর্সা ধনা ননা | } পর্সা র্সা ণা
প র শে - তো মা - র্ রা ঙে ধূ লি - - কণা স ন্ ধ্যা

ণা ণধা পপা | { পা ধা পধা | পধণা র্রর্সনা (র্সা | ধর্সণা ণা ণা | ধণর্সা ণর্সণা ধপা)}
র তা - রা স ম বি - ত - - হা রা - স ন্ধ্যা র - তা - রা -

র্সর্সা | ধনা না না | ধপপা পগা মা | মনা ধনা ধনর্রা | র্সা র্সা ধনা |
হারা আ কু ল সা - গ র নী - - র্ আ কু ল

ধপপা পগা মা | পা -া -া | -া -া -া | া দা পদা | { মপা -া মগা |
সা - গ - র নী - - - - র্ , দো লে - ফুল - সু -

মা পা -া | সা গা গমা | পদপা (মগমা পদা) } , মগা -া | { না র্সা ধনা |
কু মা র্ শ্যা ম ল - তা - হা - র্ দোলে হা - র্ দী প মা

নর্সানধা পধা পমগা | গমপা ধনর্সা ধনা | -া -া র্সা | } ধনা না র্সানধপা | ধা ধর্রা র্সা |
লা - র জ - নী - - - - - র্ কি র ণ - প্র তি - মা

-া -া -া | র্সানধা পধপা মগা II
- - - মা - - -

| া া II { সা -া সন্া | রসা ন্া -া | সা গরা গা | মগরা সন্া -া | সা গা গা |
- - - কা র প্রে - র - ণা য়্ না মি লে হে - থা - য়্ রূ পা লি

গা মা পধা | ধা গা পমগরা | গা (রসন্া র্সা } ক্ষা ক্ষা | { ক্ষা ক্ষা পা | ক্ষা পা -া |
নি ঝ র - রে - - শে ও - গো ঢা লো বি র হ ..বি ধু র্

ক্ষা পা ধা | ক্ষাধপপা মা গ. | } মা গা রসন্া | সা গমা গা | ক্ষা রগক্ষাপা পা | -া পা পক্ষা |
স্ব প্ ন মে - দু র্ অ ব নী - কা জ ল কে - - শে - রা শি'

{ পা পনা ধা | ধর্সা র্সানধা পক্ষা | পা না নর্সর্রা | রনর্রা র্সা না | নগা মা পা | না র্সা র্গা |
উ জ্জ লী দী - পালি গ গ ন্ - বি - তা নে আঁ খি ন ত ক রি'

[র্সর্গর্পা র্মর্পর্মা র্গা |]

সর্রর্গর্মা র্গা র্রর্সানধা | না র্রর্সা -া | } { র্সা র্গা র্গা | র্গা র্মা র্গা | র্গা র্মা র্মর্গর্রর্গা |
চা - ও নি শা - পা নে - প ল কে উ ছ লি' তি মি র -

র্সর্রর্গর্মা র্মর্গর্রা র্সনর্সা | } র্সর্গা র্রা র্সা | নর্সা র্সগা মা | না -া -া | -া গনা -া |
বি - দ - লি' - হা সে ত ব উ ষা তী - র্ - কা র্

না র্সা র্রর্সাণধা | { ধা ণা র্সাণধপা | পা ধা ণধপা | মপা মা (গমপা |
মি ল ন - স্ম র ণে - বা জি ছে - চ - র ণে -

ধনর্সা ননা র্রর্সাণধা |) } গা | গা গসা গমা | পধা পমগা -া | গমপা ধনর্সা ধনা |
- মিল - ন - ণে আ লো ছা - য়া ম - ন্ জী - - -

-া -া -া | না না র্সানধপা | পা ধনর্সর্রা র্সা | -া -া -া | র্সানধা পধপা মগা | II II
- - র্ কি র ণ - প্র তি - মা - - - মা - - -

কেমন লাগে শূন্য ঘরে শূন্য বিছানায়?

শ্রীঅনুরাধা দেবী

বলতো দেখি রেখা,
বাদল রাতে একা—
কেমন লাগে শূন্য ঘরে শূন্য বিছানায়?

দম্‌কা ঝড়ো বায়ে
যখন সারা গায়ে
সজল দেয়া ঘুম ভাঙানো পরশ দিয়ে যায়!

কদম বনে ঘাসে—
ঝরা ফুলের বাসে,
সরমহারা পল্লীবধূ মুক্তা খুঁজে মরে।

মনটা তৃষাতুর,
কোন সে অতি দূর
পথের পানে চায় গোপনে, রইতে নারে ঘরে!

নিথর কালো সব,
নেইক কলরব;
পাশের ঘরে মঞ্জু বুঝি ঘুমেই অচেতন;

নরম বিছানায়
আগুন ধ'রে যায়,
বুকের মাঝে গুমরে ওঠে সঙ্গীহারা মন।

চুপটি ক'রে সই,
যতই কেন রই;
বুকের জ্বালা কোন মতেই নিব্‌বেনা সে জানি।

বালিশ দুটো পাশে,
তাঁরই গায়ের বাসে
মাতাল করে; যত্নে ধীরে বুকের পরে টানি।

বল্‌তে কারো কাছে
লজ্জা করে; পাছে
এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে তুচ্ছ লঘু ভাবে!

বুকের কথা চাপি,
চোখ যে ওঠে ছাপি;
সজল দুটি আঁখির কোণে তাঁরই ছবি ভাসে।

রাত্রি যত বাড়ে—
মনটা বারে বারে
শিউরে ওঠে বুকের তলে শীতের ছোঁয়া লেগে;

বাদল ঝরে যত,
একলা ঘরে তত
উতল হ'য়ে নিদ্রাহারা রই যে সখি জেগে।

চক্ষে ঘুমঘোর
ঘনায় যদি মোর,
হঠাৎ যেন ঠোঁটের পরে পরশ তাঁরি পাই;

চম্‌কে উঠে দেখি—
তাইত হ'ল এ কি!
শিথানে মোর শিথিল বাহু শূন্য কাঁদে হায়!

জাপানের পথে

যাদুকর—পি, সি, সরকার

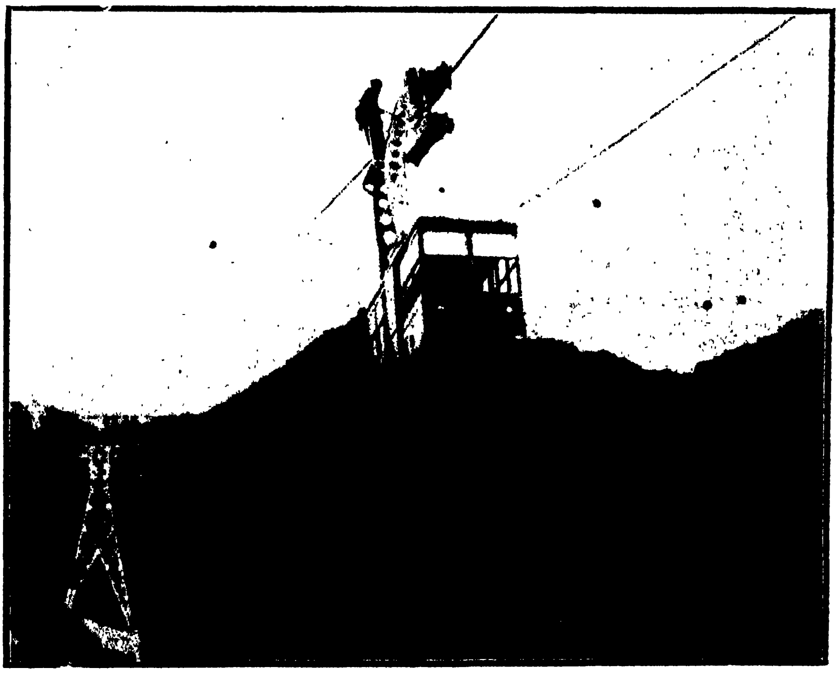
ভ্রমণ

কোবে

কোবে সহরে পৌঁছিয়া দেখি—সবই নূতন। সমস্ত ঘর-বাড়ীর আকৃতি গাছপালা এমন কি মানুষের আকৃতি সবই বদলাইয়া গিয়াছে। এ যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন—সবই চেনা অথচ সবই নূতন এবং সুন্দর। এই জাপান! জাপানে প্রবেশ করা মাত্রই ইহার স্বাতন্ত্র্য, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও নবীনতা প্রত্যেক বিদেশীয়ের চক্ষু আকৃষ্ট করে। এ যেন অমাবস্যার রাত্রিতে গভীর নিদ্রা হইতে জাগিয়াই হঠাৎ রাঙা আলোক-ধৌত প্রভাত-রশ্মি দর্শন।

কোবে জাপান বা নিপ্পনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর (অবশ্য 'ইওকোহামা'র পর)। জাপানের আমদানী, রপ্তানী কার্য্য এখানে খুবই ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে। বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখিলাম কোবে সহরে মোট রপ্তানী ও আমদানীর মূল্য ১,২৯১,-৬৬০,০০০ ইয়েন, ইহার মধ্যে রপ্তানী ৬৫০, ৫৪০,০০০ ইয়েন ও আমদানী ৬৪১,১২০,০০০ ইয়েন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই বন্দরটী কত বড়।

এখন আর জাপানকে 'জাপান' বলিলে চলিবেনা—'নিপ্পন' বলিতে হইবে। কারণ 'নিপ্পন' জাপানের জাপানী নাম। ইংরেজগণ ইহাকে 'জাপান' নাম দিলেও প্রাচ্য জগতে ইহা 'নিপ্পন' নামেই পরিচিত। সিঙ্গাপুরের পর হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি, অনেকেই 'জাপান' বলিলে চিনিতে পারেনা—'নিপ্পন' বা নিপ্পন বলিতে হয়। জাপানীরা নিজেদের দেশকে এই 'নিপ্পন' বলিয়া পরিচিত করিতে আনন্দ অনুভব করে—কারণ 'নিপ্পন' অর্থ "সূর্য্যোদয়ের দেশ" বা "যে দেশে সূর্য্য উঠে।" প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে অবস্থিত বলিয়া সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ মধ্যে উহারাই



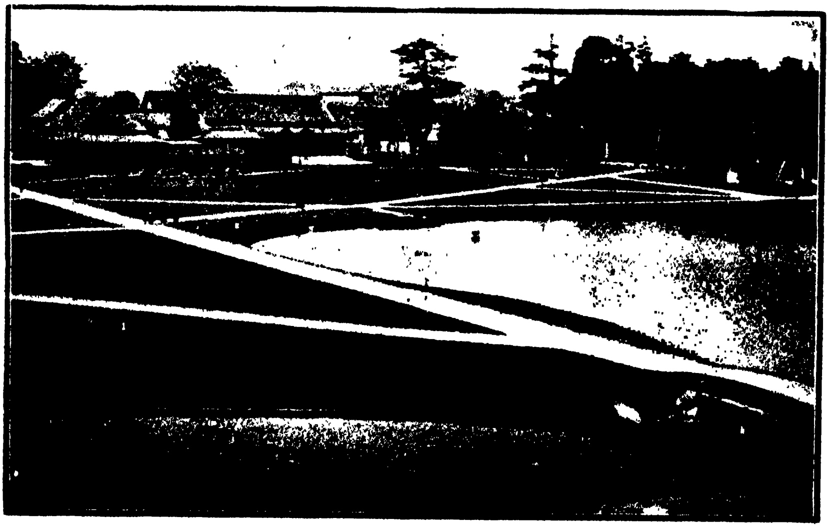
কোবে সহরের রোপওয়ে (Rope-way)

প্রথম সূর্য্যোদয় দেখে, তাই সে দেশের নাম বোধহয় 'নিপ্পন' (The Land of Rising Sun) হইয়াছে। কিন্তু জাপানীরা বলে "আমাদের সূর্য্য ঐ সূর্য্য নহে। উহা জাপানের বৈশিষ্ট্যের গৌরব রবি—যাহা আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল দিক দিয়াই সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডকে আলোকিত করিতে চলিয়াছে। ইহা জাপানের প্রাধান্যের সূর্য্য

—যাহা অচিরেই সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিতে চলিয়াছে। আমার মনে হয় উভয় মতই সমর্থনযোগ্য। কারণ ধন, মান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি এমনকি শক্তিতে জাপান আজ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। তাহাদের এই গর্ব্ব সর্ব্বাংশে শোভা পায়।

কোবে সহরে অবস্থানকালে ভারতীয় জাতীয় (কংগ্রেস) সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এ, এস, সহায় মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন এই নিয়া আলোচনা চলিতেছিল। মিষ্টার সহায় জাপানে একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান লোক—জাপানের বহু প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী হিসাবে কাজ করিয়া তিনি জাপানী মহলে আত্মক্ষমতার ও সৎগুণাবলীর বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জাপানে তাঁহার ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর এতটা প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য লাভের উহাই একমাত্র কারণ। জাপানীগণ এই দুইজন ভারতীয়ের বুদ্ধির ও মস্তিষ্কের সুফল বহুবারই পাইয়াছে কাজেই শতমুখে প্রশংসা না করিয়া পারেনা। আর একজন ভারতীয়ের আত্মত্যাগও জাপানীরা অবনত-মস্তকে স্বীকার করে, তিনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (প্রেম মহা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুবিখ্যাত (The Servant of Mankind)। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে এই তিনজন মহা-মানবের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল এবং দুই একজনের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল।

মিষ্টার সহায়কে কোবে সহরে জাপানপ্রবাসী ভারতীয়-দের 'মুকুটবিহীন রাজা' বলিলেও চলে। তিনি শুধু জাতীয় সমিতির সভাপতিই নহেন, মাঝে মাঝে জাপান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সহরে পল্লীতে সর্ব্বত্র স্কুলে স্কুলে ভারতীয় কৃষ্টি সভ্যতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি টোকিও ও কোবের কতকগুলি ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতি—ভারতীয় রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ দানের জন্য জাপানী কাগজসমূহের তিনিই প্রতিনিধি। তিনি নিজেও Voice of India নামক একটা 'ইংরেজী ও জাপানী' সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সুদূর ভারতবাসীর সর্ব্ববিধ সুখদুঃখের বাণী বিদেশে প্রচার করেন। তিনি নিজেই এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালক। টোকিও সহরে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও তাঁহার 'বিশ্বপ্রেম' দানের World Federationএর মুখপত্র আপন সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। মিষ্টার সহায় ও রাসবিহারীবাবু ভারতীয়দের বড় বন্ধু। রাসবিহারীবাবু টোকিও সহরে 'এশিয়া লজ' নাম দিয়া ভারতীয় ছাত্রদের খাওয়া থাকার জন্য জাপ-ভারতীয় প্রণালীর একটী সুন্দর হোটেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেখানে তিনিই অধিকাংশ খরচ বহন করেন বলিয়া—সমস্ত ঠাকুর-চাকরের মাহিয়ানা, বিছানা আসবাব খরচ, বাড়ী ভাড়া, লাইটভাড়া ও খাওয়া খরচ বাবদ মাসিক মাত্র ২৫৲ টাকা নেন। ইহাতে বহু ভারতীয় ছাত্র কম খরচে সেদেশে বিদ্যার্জ্জন করিতেছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সহায়ও অনুরূপ একটী হোটেল কোবে সহরে করিয়াছেন—উহার নাম 'ইণ্ডিয়া লজ'। এখানেও বহু ভারতীয় ছাত্র বসবাস করিতেছে। জাপানে এই হোটেলগুলি জাপানপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-দিগকে যে কতদূর সাহায্য করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। কারণ ভারতীয়গণ প্রথম সে দেশের অনভ্যস্ত চাউল খাইয়া প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়েন। তদুপরি তাহাদের মাছ—তরিতরকারি প্রস্তুতেরও উপায় বিভিন্ন। হলুদ, মরিচ, তৈল, ঘি প্রভৃতির প্রচলন জাপানে নাই। তাহারা চর্ব্বি



কোবে সহরের একটি নয়নাভিরাম ময়দান

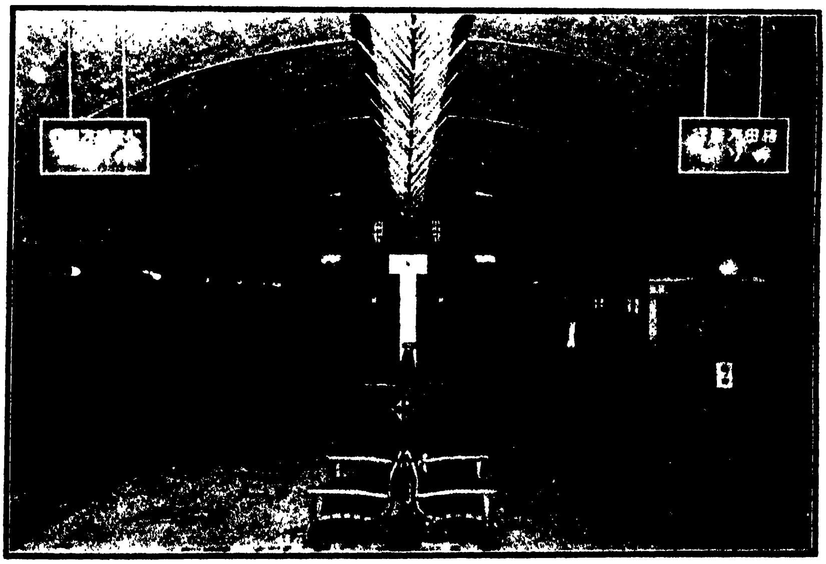
দিয়া 'নুনমাখান মাছ' ভাজা খায়। এইরূপ নানাপ্রকার বিশ্রী খাবার বাঙালী বা ভারতীয় ধাতে মোটেই বরদাস্ত হয়না। আমি ওশাকাতে জনৈক জাপানী ভদ্রলোককে 'গোহানে'র (ভাতের) বরফির সঙ্গে একটী আস্ত কাঁচা চিংড়ীমাছ খাইতে দেখিয়াছি। এমতাবস্থায় 'ইণ্ডিয়া লজ' ভারত হইতে নীত চাউল, হলুদ, সরিষার তৈল, ঘৃত প্রভৃতি দিয়াই নিরস্ত নহে, মিষ্টার সহায়ের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীযুক্তা সতী দেবী মাঝে মাঝেই স্বহস্তে রান্না করিয়া দিয়া আসেন। কোবে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এই সহায় পরিবার একটী পরম সহায়। শুধু ইহাই নহে, কোম্পানীতে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, ইউনিভার্সিটীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উমেদারী ও তদ্বির করা, সর্ব্বপ্রকার বিপদে সাহায্য করাও এই সহায় পরিবারের অন্যতম কাজ। মিষ্টার সহায় বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজী ও জাপানী প্রভৃতি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন। তিনি ভাগলপুরের লোক হইয়াও যখন অনর্গল বাংলায় কথা-বার্ত্তা বলিতে থাকেন তখন বলা দুষ্কর যে তিনি প্রকৃতই বাঙালী না ভাগলপুরী। দশ বৎসরাধিককাল জাপানে বাস করিয়া তিনি শুধু জাপানের ভাষাই নহে উহাদের রীতি-নীতি, চলন চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ই অবগত আছেন।

এই আনন্দমোহন সহায়ের 'Voice of India' অফিসে একদিন আলাপ করিতেছি এমন হঠাৎ রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের সঙ্গে পরিচয় হয়। কাবুলীদের ন্যায় ফর্সা রং ও ঐরূপ দৃঢ় শরীরের গঠন, লম্বা কোট গায়ে মাথায় গান্ধীটুপী, 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি, হাতে কতকগুলি কলা—এইভাবে তিনি অফিসে প্রবেশ করিলেন। আসিয়া সকলের হাতে একটা একটা কলা দিতে আরম্ভ করিলেন। অপরিচিত আমি—আমারও হাতে একটী দিয়া বলিলেন "খাইয়ে বাবুজী"; মিষ্টার সহায় আমার পরিচয় তাঁহার নিকট বলিতেই তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া অনেক প্রশংসার বাণী শুনাইলেন। তাঁহার কথার মূল অর্থ ছিল—"আমার কথা ইতিপূর্ব্বে বহু ভারতীয়



জাপানের পাহাড়ের গায়ে গাছের বিজ্ঞাপন

কাগজে, চীনের ও জাপানের কাগজে বহুবার দেখিয়াছেন। জাপানে আমার আগমন সংবাদও তিনি পাঠ করিয়াছেন—



মাটীর নীচে (underground) রেলগাড়ীর একটি ষ্টেশন

এইবার আমি যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপন মুলুকের সুনাম বৃদ্ধি করিয়া যাই।" পরে তাঁহার প্রদত্ত 'নাম-কার্ড'টা হইতে জানিলাম—তিনিই "রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ" সেই বিশ্বপ্রেমিক—যাহার কথা কতবার শুনিয়াছি। এই মহাপুরুষ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া স্বীয় আদর্শ অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে আজ প্রায় পথের ভিখারী।

"তিনি মরিবেন তবুও আদর্শভ্রষ্ট হইবেননা"—এই রাজোচিত গর্ব্ব তেজ তাঁহাকে এখনও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।



আধুনিক জাপানী তরুণী

ইঁহার দুঃখ দুর্দ্দশার অবধি নাই—সে কথা স্মরণ করিলে ব্যথা ও বেদনায় বুক হাহাকার করিয়া উঠে। একদিন মিষ্টার



কোবে সহরের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত থিয়েটার ষ্ট্রীট

সহায়কে বলিতেছেন—"ভাই আমার এই মেডেলটী বিক্রয় করিব—কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে।" মিষ্টার সহায় তাঁহার অভাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া তখনই কাগজে একটী 'সার্কুলার' দেন এবং ফলে আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা সাহায্য আসে। মিষ্টার সহায়ের সহায়তা তিনি ভুলিতে পারিবেন কি? রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ একজন আদর্শবাদীলোক। তিনি আদর্শ লইয়াছেন 'বিশ্বপ্রেম—Universal Brotherhood'। মানুষ সকলে ভাই-ভাই—সকলেই সকলের সমান, কোন উচ্চ নীচ থাকিবেনা। সেখানে রাজা প্রজা প্রশ্ন থাকিবেনা, দুর্ব্বল সবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবেনা, থাকিবে শুধু "World Federation." ইহাই প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণপাত করিতেছেন।

সে যাহাই হউক, আমি সামান্য যাদুকর, রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হাস্যকরই হইবে। তাই ঐ সমস্ত ত্যাগ করিয়া এইবার আসল স্থানটার কথা আলোচনা করিব। কোবে সহরে গেলেই মনে হয়, এ যেন কোন অমরাবতীর মহানগরীতে আসিয়া পৌছিয়াছি। রাস্তাঘাট শুধু প্রশস্তই নহে ঝকঝকে পরিষ্কার। তাহাতে চলিতেছে ট্রাম, ট্রলি, বাস, আর অগণিত রিক্সা ও মোটরকার। মাটীর নীচে, মাথার উপরে বিশেষ গতিশালী বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলিতেছে! অধিকাংশ রেল গাড়ীর ষ্টেশন মাটীর নীচে। এখানকার স্পেশাল (overhead or underground tube railway) বাদে সাধারণ যে সমস্ত ট্রেণ যাতায়াত করে উহাও বিশেষ ক্ষমতাশালী। জাপানের ট্রেণের সময়ানুবর্ত্তিতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং মেল বা পাঞ্জাব মেল ৮।১০ মিনিট আসিতে বিলম্ব হইতে পারে, ইহা শুনিলে জাপানীরা গল্প বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু প্রকৃত সত্যকথা অর্দ্ধ হইতে একঘণ্টা এমনকি কখনও কখনও দুই বা ততোধিক ঘণ্টা

বিলম্বের কথা বলিলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেনা। বাস্তবিক জাপানের ট্রেণের ন্যায় 'punctual train' আমি অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। কোবে হইতে টৌকিও যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—ট্রেণ আসার আর বিলম্ব কত—রেল-কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী প্লাটফরমের ঘড়ি দেখাইয়া বলিয়া দিলেন ২৫ সেকেণ্ড বাকী আছে। ওখানে সেকেণ্ডের হিসাবও চলে দেখিলাম, কারণ আন্দাজ ২৬ সেকেণ্ড পরই ট্রেণ সিঙা ফুঁকিয়া আসিয়া পড়িল। সাধারণ বাষ্পীয় রেলগাড়ীও তিন প্রকার—সাধারণ, দ্রুতগামী ও বিশেষ দ্রুতগামী। টিকিট কিনিতে হইলে প্রথমতঃ সাধারণ টিকিট কিনিতে হয়; আবার ইহার অতিরিক্ত টিকিটের পয়সা দিয়া আলাদা Express or Special Express টিকিট কিনিতে হয়। যে সমস্ত গাড়ীতে রাত্রি কাটাইতে হয়—তাহাতে sleeping berthএর বন্দোবস্ত আছে, তাহার জন্য আবার আলাদা টিকিট কিনিতে হয়। বিদেশী লোকজন জাপানীদের এই বিভিন্ন টিকিট লইয়া প্রথম প্রথম বিব্রতই হইয়া পড়ে, কারণ সবগুলি টিকিটই জাপানী ভাষায় ছাপা এবং আকৃতি সবগুলিরই একরূপ—কেবল রংএর পার্থক্য। একবার আমিও আমার এক বাঙালী বন্ধু বেশ অসুবিধাতেই পড়িয়াছিলাম। দুইজনে মিলিয়া টিকিট কিনিয়াছি—কোবে হইতে টৌকিও ও কোবে হইতে ইওকোহামা, রাত্রির গাড়ী এবং দ্রুতগামী (Express)। কাজেই দুইজনের মোট সংখ্যা টিকিট হইল ছয়টী—কিন্তু উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইবার সময় একজনে শুধু sleeping berthএর একটী টিকিট ও Expressএর দুইটী টিকিট লইয়াছি। অপরজন একটী sleeping berth টিকিট ও ইওকোহামা-টৌকিও দুইটী টিকিট লইয়াছেন। তিনি ঐভাবে ইওকোহামাতে নামিয়া গেলেন আমি চলিয়াছি টৌকিওতে। টৌকিওতে পৌঁছামাত্রই দেখি আমার ট্রেণের কামরার নম্বর ও সিট নম্বর খোঁজ করিয়া দুইজন রেল-কর্ম্মচারী দৌড়াইয়া আসিয়াছেন, আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন টিকিট দেখি'। আমি ঐ টিকিট তিনটি হাতে দিলাম উহা পাইয়া তাঁহারা হাসিয়া ফেলিয়াছেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে সব বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আমার বন্ধুর হাতে টৌকিওর sleeping berth এর টিকিট ছিল অথচ কোন Express টিকিট ছিল না, কাজেই তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে হইয়াছিল। ইওকোহামার রেল-কর্ম্মচারীরা ঐ বিষয় টেলিফোন করিয়া টৌকিও ষ্টেশনে জানাইয়াছিল এবং তাহারা আমার ঐ sleeping berth টিকিটস্থিত seat ও ট্রেণ নম্বর খোঁজ করিতে আসিয়াছিল। জাপানী ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকিলে প্রথমতঃ এইরূপ অসুবিধা অনেক বিদেশীয়কেই ভোগ করিতে হয়। তবে উহাদের রেলগাড়ী অত্যন্ত punctual বলিয়া অনেক সময় খুবই সুবিধা হয়। মনে করুন, রাত্রি-বেলায় একটী অচেনা নূতন সহরে যাইতেছি। সেই সহরে কখন পৌঁছিব—আর কয় ষ্টেশন বিলম্ব আছে জানিবার কোনও উপায় নাই; কারণ ষ্টেশনের নাম প্রায়ই জাপানী ভাষায় লেখা (অবশ্য ইংরাজীও আছে) এবং রাত্রিতে শীতের মধ্যে দরজা খুলিয়া দেখাও সম্ভবপর নয়। আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা চলে না, কারণ প্রথমতঃ অভদ্রতা—দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ঘুমাইয়া আছেন—জাগান অনুচিত। এমতাবস্থায়



কোবের 'মোটমাচী' নামক বাজারের সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক আলোক মণ্ডিত রাস্তা

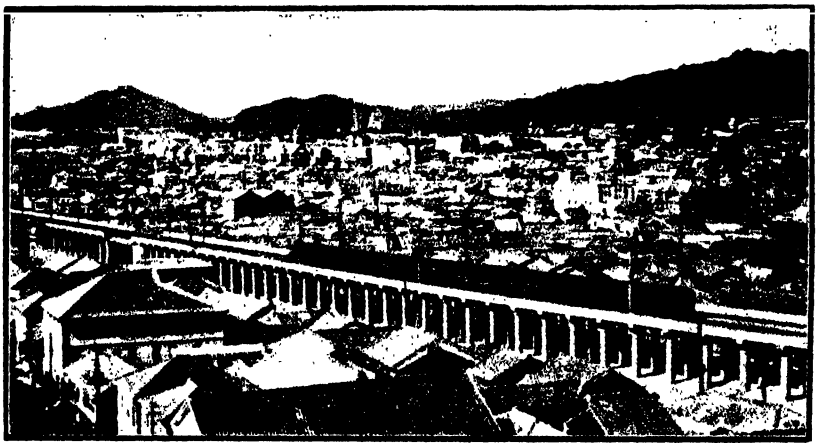
প্রথম প্রথম রেলের চাকর (boy)কে বলিয়া রাখিতাম এবং সময় হইলে সে জানাইত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা ঘড়ি মিলাইয়া লওয়া—যে অতটা অত মিনিটে যে ষ্টেশনে পৌঁছিবে সেখানে নামিতে হইবে—সেখান হইতে অতটা অত মিনিটেই যে গাড়ী ছাড়িবে সেই গাড়ীতে রওনা হইয়া ঠিক অতটার সময় আমার নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশন পাইব। আমাদের যেমন ষ্টেশনের নাম মনে রাখিতে হয় যে ঈশ্বরদি ষ্টেশনে বদলী করিয়া পরে দার্জ্জিলিং মেল ধরিতে হইবে। ওখানে ঐরূপ সাহায্যর, ঈশ্বরদি মুখস্থ না করিয়া ৮-৫০ মিনিট, আর ১০-৩৩ মিনিট



কোবের প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত

মুখস্থ রাখিলেই চলে, অন্তত আমি ত তাহাই করিতাম। রেলগাড়ীর boyরা খুবই নম্র ও উহাদের স্বভাব বড়ই সুন্দর। আরোহীদের মালপত্র গুছাইয়া রাখা, কোট ও জুতা 'ব্রাস' করা, জুতার ফিতা খুলিয়া ফেলা বা বান্ধিয়া দেওয়া—অনেক সাহায্যই উহারা করে। উহারা অত্যন্ত বিশ্বাসী। আরোহী-দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বকশিস আদায় করার ফন্দী উহারা ভাল জানে। এত কাজ করিয়াও উহারা কখনও বকশিস চাহে না, কিন্তু অধিকাংশ আরোহীই খুশী হইয়া কিছু কিছু দিয়া যায়। ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের কুলীর তুলনা করিলে লজ্জায় মাথা অবনত হয়। ষ্টেশনে ২৫।৩০ সের একটা বাক্স নামাইয়া উহারা কিরূপ অধিক মূল্য চাহিয়া বসে আর আরোহীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করে উহা সকলেই অন্ততঃ দুই একবার ভোগ করিয়াছেন। হাস্যকর বিষয় এই যে, এইরূপ কড়া পয়সা আদায় করিয়াও আবার উহারা জোর করিয়া বকশিস চায়। ট্রাম বাসের ব্যাপারেও তাই। কলিকাতায় বাসচালকের দুর্ব্যবহার কে না ভোগ করিয়াছেন—আর জাপানে বাসচালকের প্রশংসা কে না করিয়াছেন। বাসে উঠার পর তাহারা ধন্যবাদ দেয়, আবার চলিয়া আসার সময়ও ধন্যবাদ বিদায় বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। তাহারা যেন আরোহীকে সত্য সত্যই প্রবাদের 'গ্রাহক-না-লক্ষ্মী' বলিয়া বিবেচনা করে। রেলে চড়িবার আগে টিকিট করিয়া ভিতরে ঢুকিবার সময়ও 'গেটে' উহাদের লোক আছে—আগন্তুকদের বিশেষ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। সারি সারি মেয়ে সিঁড়ির নিকট দাড়াইয়া বলিতে থাকে—"আরিগাতো গোজাই মাস্তে"—অর্থাৎ "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।" জাপানী জাতিটাই অত্যন্ত নম্র, তাহারা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেই কতটা সহজসুলভ নম্রতা করিয়া জিজ্ঞাসা করে তাহা উপভোগের বিষয়। হয়ত একজনের নিকট শুনিতে পাইলাম—"মহাশয় বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" আমি বলিলাম 'করুন'। তিনি উত্তর দিলেন 'আপনাকে উপযুক্ত যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—নমস্কার, আপনার নাম কি? অর্থাৎ সম্মানিত মহাশয় কি ভারতবর্ষের লোক?" ইত্যাদি। উহারা ইংরাজী kindly কথাটা বেশ ব্যবহার করে। জানে উহা নম্রতার পরিচায়ক তাই কোবে মোটামাটি বাজারের একটী দোকানে সাইন বোর্ড দেখিলাম English kindly spoken. এইরূপ অদ্ভুত ইংরাজী পড়িয়া সকল বিদেশীই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। কলিকাতার বাসে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবী ড্রাইভার লিখিত এইরূপ ইংরাজী কখনও কখনও চক্ষুতে পড়ে। জাপানে হেয়ার কাটীং সেলুনে BUR-BUR, বা Head cut here প্রভৃতি পাঠ করিয়া কে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে বলুন? উহারা পকেটে করিয়া

একটা English to Japanese dictionary সর্ব্বদাই রাখে। কেহ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ডিক্সনারী খুঁজিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লয়—ইহাও বেশ উপভোগ্য। একবার একবন্ধুকে বলিলাম "Had you been to India? সে Had, you, India সবগুলির অর্থই জানিত, নূতন শব্দ পাইল been—ডিক্সনারী খুঁজিয়া bean অর্থ দেখিল 'সিম'; কাজেই বলিল—'yes'—I saw Indian bean. জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায়—সে উত্তর দিল প্রদর্শনীতে। জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কদর্থ করিয়া কতটা ভুল করিল—তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন? আর একবার একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—Where can I buy Visiting Card please? ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন—তার পর Dictionary দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—ওঃ All Right—please—kindly. অর্থাৎ তাঁহার মোটরে উঠিতে অনুরোধ করিতেছেন। মোটরে বহুদূর আসিবার পর তিনি এক পোষ্টাফিসে লইয়া গিয়া কিছু পোষ্ট কার্ড কিনিতে বলিলেন। তখন বুঝিলাম ভদ্রলোক Visiting Cardকে post card মনে করিয়াই এই ভুল করিয়াছেন। মানচিত্রের দিকে দৃক্পাত করিলেই বুঝা যায় যে সমগ্র জাপান একটী বক্র সূত্রের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসিতেছে। উহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে এই স্থানের আবহাওয়া নানারূপ হইবে; উহার উত্তরাংশ অতিশয় শীতল ও দক্ষিণাংশ অধিকতর উষ্ণ হইবে। ঋতুগত এই বৈষম্যের জন্য এখানে শাকসবজী জীবজন্তু প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারই পাওয়া যায়। ২৭,৯৪৭ মাইল দীর্ঘ এই ভূখণ্ডের অধিকাংশ স্থলই পর্ব্বতময় এবং উক্ত পর্ব্বতের অধিকাংশগুলিই আগ্নেয়গিরি। এই



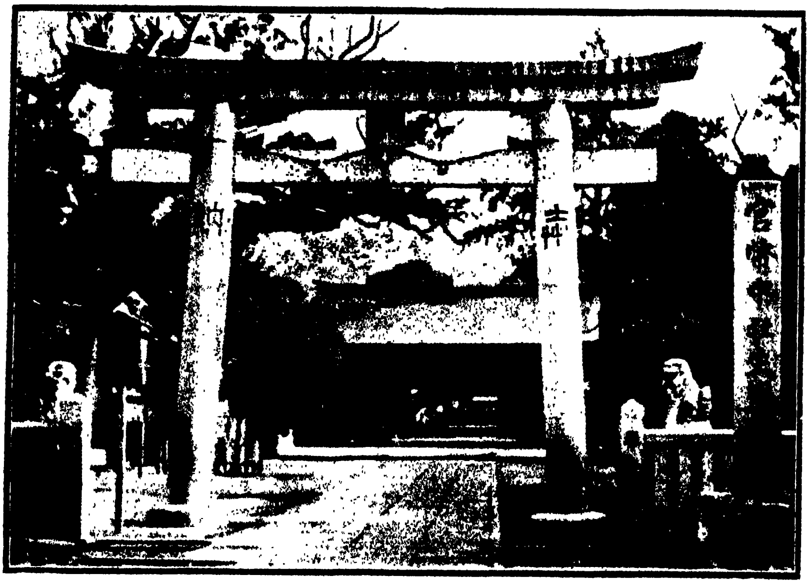
মাথার উপর দিয়া চলন্ত ট্রেণের (Overhead) রেল লাইন



জাপানে ভারতীয় সভ্যতার জ্বলন্ত প্রতীক 'বুদ্ধমূর্ত্তি'

আগ্নেয়গিরিই জাপানের উন্নতির মূলকারণ। আগ্নেয়গিরি আধিক্যহেতু এখানে ভূমিকম্প প্রায়ই হইতেছে। আজ তাহারা তাহাদের দেশকে এবং সহরকে একরূপ মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিল, কয়েক বৎসর পরে যখন প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে তখন সেখানে গড়িয়া উঠিবে নব-

পরিকল্পনায় নূতন তিলোত্তমা। জগতের সৌন্দর্য্যের যেখানে যেটুকু নিদর্শন আছে উহা তিল তিল করিয়া সবগুলি কুড়াইয়া নিজের জন্মভূমিকে তিলোত্তমা সাজাইতে ব্যগ্র। সেইজন্যই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবল ভূমিকম্পে যখন সমগ্র টোকিও নগরী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহারই ফলে আজ টোকিও পৃথিবীর তৃতীয় নগরী। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের পরই ইহার স্থান। ইহার সৌন্দর্য্য, আধুনিকত্ব ও বিশাল আয়তন দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি জাপানকে উন্নতির পথে উত্তরোত্তর টানিয়া লইতেছে। আগ্নেয়গিরির আধিক্যের দরুণ এখানে প্রচুর জলপ্রপাত, ফোয়ারা, হ্রদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এখানে খনিজ পদার্থও



জাপানীদের ধর্ম্মমন্দিরের তোরণ

প্রচুর পাওয়া যায়। ঐ জলপ্রপাত হইতে (Hydro-Electric schemeএ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বলিয়া জাপানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা অতটা সহজ ও সুবিধা। প্রত্যেক বাড়ীতেই বৈদ্যুতিক কুকার, হিটার, আলোক, টেলিফোন, পাখা প্রভৃতি এজন্যই রাখা সম্ভবপর। একবার টেলিফোন করিতে যেখানে সামান্য এক পয়সা ব্যয় হয়—সেখানে উহা কে না ব্যবহার করিবে। বিদ্যুত সরবরাহ অতটা সস্তা বলিয়াই জাপানের রাস্তা এত আলোক-মণ্ডিত—বৈদ্যুতিক এঞ্জিনসমূহ স্বল্প পয়সায় চালান সম্ভবপর কাজেই জাপানী মাল এত সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। তদ্ব্যতীত উহাদের খনির কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যাহার বলে উহারা অতি সহজেই সামরিক শক্তিতে বলবান হইতে পারিয়াছে। উহাদের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় অনুকরণীয়। ৬০ বৎসরের অনধিক কাল হইল জাপানে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত করা হয়। আর আজ এই কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীকাল মধ্যেই তাহারা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত জাতি। জাপানের শিক্ষিত লোকের গড় শতকরা আজ নিরানব্বইর উপর—অর্থাৎ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; অথচ ৬০ বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন সেদেশে হয় নাই। আজ জাপানে মোট ৪৭টী বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের হিসাবে পাওয়া যায় যে জাপানে ২৫,০০০ এরও অধিক শিক্ষাগার আছে এবং উহাতে ১২,৫৭১,০০০ এরও অধিক ছাত্র বিদ্যালাভ করিতেছে। তদুপরি শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষাদান শিখাইবার জন্য ১০৩টী নর্ম্মালস্কুল, ৪টী বিশেষ উচ্চ নর্ম্মালস্কুল ও ৫২টী বিশেষ শিক্ষাগার আছে। তদুপরি অন্ধদের জন্য ৭৮টী ও বধিরদের জন্য ৫৭টী—এইরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শিক্ষাদানের জন্য ১,৯১৭টী স্কুল আছে। শিক্ষার প্রতি উহাদের আগ্রহ কত বেশী ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আজ জাপানীদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা জগতের সম্মুখে মাথা অবনত করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের দেশভক্তি, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি দেখিবার বিষয়। আর বাঙালী আমরা উহাদের কার্য্যকলাপের হীন নিন্দা করিতে, উহাদিগকে 'অসভ্য বর্ব্বর প্রতিপন্ন করিতে আনন্দ পাই; কি আশ্চর্য্য! অথচ

উচিত। জাপানীরা আজ আত্মপর ভুলিয়া সমগ্রদেশবাসীকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে বলিয়াই উহাদের এত সামর্থ্য। নহিলে সামান্য বাংলাদেশের আয়তনের একটী দেশের লোক আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতির একটী কিছুতেই হইতে পারিত না। তাহাদের ভিতরে মনুষ্যত্বের প্রেরণা আসিয়াছে।—আর বাঙালী আমরা··· পরস্পর শুধু পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে ও হীন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত—দুর্ব্বার এবং আত্মঘাতী! সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদ ও হীন স্বার্থান্বেষণ আজ আমাদিগকে কোথায় টানিয়া লইতেছে? জাপান কি বাঙালীর নিকট চিরকাল 'অসভ্য' জাপানই থাকিবে—'নবীন' জাপানই থাকিবে? কৃষ্টিশিল্প, দেশভক্তিতে সে কি বাংলার তথা ভারতের আদর্শ হইতে সমর্থ নহে?

(ক্রমশঃ)

আত্মহত্যা

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

বস্তি। বাহিরে ঝড় বৃষ্টি। ঘরের এক কোণে একটা বালতীর উনুনে এক হাঁড়ী জল গরম হচ্ছে। তারই পাশে প্রায় বছর চল্লিশ বয়সের একটা লোক তামাক সাজ্‌ছে। বস্তির তুলনায় ঘরের চেহারা দেখে এদের অবস্থা ভাল মনে হয়। লোকটার নাম হাবুল। ডাকনাম হেবো। দেয়ালে একটা কেরোসিন তেলের ডিবে জ্বলছে।—

হেবো। আঃ মাগী বলে গেল এখুনি আসছি। দু'ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল তার উপর এই ঝড় বৃষ্টি। সঙ্গে আবার ছেলেটাকে নিয়ে গেল। মরবে দেখছি।

(বাহিরে দরজায় ধাক্কা। হুঁকোটা রেখে দরজার দিকে যেতে যেতে)

হেবো। যাক্—এসে পৌঁচেছে। যা বকুনিটা দেব।

(দরজা খুলে দিতে একজন লোক ঢুকল। কাঁধে একটা প্রকাণ্ড ঝুলি, হাতে মোটা লাঠি। ঝুলিটাকে মেজেয় নামিয়ে তার পাশে লাঠি রেখে সেখানেই বসে পড়ল)

হেবো। তুমি আবার কে হে?

পেঁচো। আমার নাম পঞ্চানন। টিন, শিশি, বোতল কিনি—বিক্রী করি। বৃষ্টিতে একটু তোমার কাছে আশ্রয় নিলুম।

হেবো। এটা কি মুসাফিরখানা পেয়েছ নাকি?

পেঁচো। বৃষ্টিটা থেমে গেলেই চলে যাব। টিনের কৌটা মাল অনেক রয়েছে। মরচে পড়ে গেলে কেউ নেবে না। না খেয়ে মরতে হবে। আজ প্রায় দশ মাইল হেঁটেছি।

হেবো। আচ্ছা তবে এখানেই একটু বস।

পেঁচো। (এগিয়ে গিয়ে) বেঁচে থাক। সকাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষিদেতে একেবারে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

হেবো। আমি যে কিছু খেতে বলব তারও উপায় নেই। আমাদের

পেঁচো। আহা। এই বৃষ্টিতে রাত্তিরে তাহলে ত' দেখছি তোমাদের উপোস করতে হবে।

হেবো। না—মানে ঠিক উপোস নয়। কিছু আছে তবে—

পেঁচো। তবে কি?

হেবো। মানে আমার তো কি বলে দেবার উপায় নেই।

পেঁচো। কেন—কেন?

হেবো। আর কেন? তাহলে কি আর আমার স্ত্রী রক্ষে রাখবে। জানতে পারলে, ওরে বাপ,—

পেঁচো। তোমার স্ত্রী তো খুব গোছালো হে।

হেবো। হাঁ। হাঁ গোছালো তো বটেই। পিঁপড়ে টিপে গুড় বার করে নেয়। তুমি তো ভায়া বিয়ে করনি?

পেঁচো। না ভাই—কই আর করলুম।

হেবো। বেঁচে গেছ। কপাল ভাল।

পেঁচো। মানে—বিয়েটা এতই খারাপ?

হেবো। খারাপ বলে খারাপ। আমার তো এক এক সময়ে মনে হয় আত্মহত্যা করি।

পেঁচো। আমার তো বড় কষ্ট। নাও নাও একটা বিড়ি ধরাও।

(দু'জনে দু'টো বিড়ি মুখে দিল। পেঁচো পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালবার চেষ্টা করলে—জ্বলল না)

পেঁচো। দেশলাই আছে—আমারটা একেবারে ভিজে জাব।

হেবো। দেশলাই আমার স্ত্রীর কাছে থাকে। তোমার একটা কাটি দাও ডিবেতে জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

(হেবো ডিবেতে কাঠি জ্বেলে আনল—দুজনে বিড়ি ধরাল)

হেবো। বেশ, বেশ—সে তো ভাল কথা—

পেঁচো। তোমার এই স্ত্রীর গল্পে মনে পড়ে গেল।

হেবো। তাই নাকি—গাও না শুনি।

পেঁচোর গীত

চাষাকে বললে এসে একদা যম দূত
তোর বউকে নিয়ে যাব ওরে গেঁয়ো ভূত।
বল্লে চাষা—"এ উপকার কর যদি তুমি
কালিঘাটের পাঁটার মাথি দেব তোমায় আমি।"
তাইরে নাইরে নারে না। তাইরে নাইরে নারে না।

হেবো। তার পর—

পেঁচোর গীত

চার ভূতেতে মনের সুখে টানতেছিল গাঁজা
মারতেছিল সবাই যত উজীর বাদশাহ, রাজা
পিলে তাদের চমকে গেল দেখে চাষার বউ
বল্লে—প্রভু নে যাও এরে নইলে বাঁচব না কো কেউ।
তাইরে নাইরে নারে না। তাইরে নাইরে নারে না।

বেহ্মদত্যি, চোবে ভূত দুই জনাতে মিলে
মানুষের মাথা নিয়ে যেথায় ভাঁটা খেলে
যেতে সেথায়—উঠল কেঁদে বল্লে—প্রভু এটা
আনিলে কেন নে যাও ত্বরা—মারচে পিটে ঝাঁটা।
তাইরে নাইরে নারে না।
তাইরে নাইরে নারে না।

হেবো। বেড়ে বেড়ে—তার পর—

পেঁচোর গীত

শেষে যখন নরকেতে উঠল তারা গিয়ে
ভূট সকলে দিল তখন তল্পি তল্পা নিয়ে
যমরাজ এসে বল্লেন রেগে—করছিস একি কাম ;
এমন চীজ আনলি কেন যার নরকেও হয় না স্থান।
তাইরে নাইরে নারে না। তাইরে নাইরে নারে না।

হেবো। খাসা হয়েছে। ভাগ্যিস ঘেঁচার মা শুন্তে পায়নি।

পেঁচো। ঘেঁচার মা কে?

হেবো। আমার স্ত্রী।

পেঁচো। অঁ্যা—ওঘরে আছে নাকি?

হেবো। না, না। থাকলে কি আর ও গান এতক্ষণ গাইতে পেতে—না এঘরে ঢুকতে পেতে। ছেলেটাকে নিয়ে বেলা থাকতে থাকতে গেছে। বল্লে "মাসীর বাড়ী যাচ্ছি—অনেক দিন যাইনি একবার দেখে আসি। এখনও তো এল' না।"

পেঁচো। ওরা আসবার আগে কিছু খেলে মন্দ হয় না, কি বল। (পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে) কাছে কোন দোকান থাকে তো রুটী আর মাংস নিয়ে এস। কি বল?

হেবো আধুলিটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

পেঁচো। কি দেখছ? আধুলিটা খারাপ নাকি?

হেবো। না, খারাপ নয়। একেবারে নতুন তাই দেখছিলাম।

পেঁচো। নতুন তো হবেই। এই তো সেদিন ছ'টা আধুলি তৈরী করলাম।

হেবো। তৈরী করলে—য়্যাঁ বল কি? জেলে যাবে যে!

পেঁচো। কেন? এটা কি জাল যে ধরবে।

(হেবো আধুলিটা বার বার মেজেয় ফেলে বাজাতে লাগল)

পেঁচো। আরে সন্দ হয় দোকানে গেলেই তো জানতে পারবে।

হেবো। না না—সন্দ কিসের। (গায়ে কাপড় দিয়ে) তুমি একটু বস'। আমি এখুনি খাবার নিয়ে আসছি। সামনের বড় রাস্তার ওপর দোকান।

(বেরিয়ে গেল। দরজা বাহির থেকে বন্ধ করতে গেল)

পেঁচো। ওহে শোন শোন—

হেবো। (এসে) কি—

পেঁচো। বাহির থেকে দরজা বন্ধ করছ কেন?

হেবো। মানে কে আবার ঢুকে পড়বে। আমাদের খাও দাওয়া একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

পেঁচো। কিংবা আমি সরে পড়তে পারি।

হেবো। (আমতা আমতা করে) হাঁ—তা-ও—কি বলে—আচ্ছা—এই এলুম বলে।

(দরজা দিয়ে ঘেঁচা ও তার মা শ্রীমতী টগর ঢুকল)

টগর। কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি।

হেবো। একজন—মানে—কি বলে (পঞ্চাননের দিকে দেখিয়ে এই ভদ্রলোক—

টগর। (ভাল করে তার দিকে দেখে) ভদ্দর লোক—মরি মরি—এই বুঝি তোমার ভদ্দর লোকের ছিরি—

পেঁচো। আমি শিশি বোতল বিক্রী করি। টিনের কৌটা বাক্স—

টগর। আমাদের এ সবের কোন দরকার নেই।

পেঁচো। আমি বৃষ্টিতে এখানে একটু আশ্রয় নিয়েছিলুম।

টগর। বেশ করেছিলে। এখন সরে পড়। বৃষ্টি থেমে গেছে।

(বাহিরে কড়্‌কড়্ আওয়াজ ও বৃষ্টি পড়ার শব্দ)

হেবো। এই বৃষ্টিতে কাউকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়াটা কি ভাল?

টগর। বলি, তবে এই বিষ্টিতে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?

হেবো। সামনের দোকান থেকে কিছু রুটী মাংস কিনতে যাচ্ছিলাম।

টগর। ওঃ। নবাব পুত্তুর যে। পয়সা কোথায় পেলে ?

হেবো। (পেঁচোর দিকে দেখিয়ে) উনি দিলেন।

টগর। উনি দিলেন। বেশ বেশ।

পেঁচো। বৃষ্টিতে ভিজছিলুম। তোমার কর্ত্তা আমায় আশ্রয় দিলে। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল—ভাবলুম কিছু আনাই, সকলে মিলে খাওয়া যাবে।

টগর। বটেই তো। বসুন বসুন।

হেবো। আমি তা হলে এবার যাই।

টগর। না, না, তুমি ব'স। (হাত থেকে আধুলি নিয়ে) ঘেঁচা তুই যা। তোর তো জামা কাপড় ভিজে গেছেই। শোন—মাংস আর রুটী আনবি। সঙ্গে একটু আচার, কাঁচালঙ্কা চেয়ে আনবি। আর খানা দু'এর তেলে ভাজা নিয়ে আসবি। বুঝলি। এই নে। (আধুলি দিলে)

(ঘেঁচা ঘাড় নেড়ে বুঝতে পেরেছে জানালে ও আধুলিটা নিলে)

পেঁচো। আধুলিটা ভাল কিনা দোকানীকে জিজ্ঞেস কোরো।

(ঘেঁচা চলে গেল)

টগর। একটু চা করে দেব না কি ?

পেঁচো। দিলে তো খুব ভাল হয়। অবিশ্যি যদি কিছু না মনে কর।

টগর। আপনাকে চা করে দেব এতো আমার ভাগ্যি।

(চা করিতে ব্যস্ত)

হেবো। আচ্ছা, তুমি তো ইচ্ছে করলেই বড়লোক হতে পার। তবে শিশি বোতল টিন বিক্রী কর কেন ?

পেঁচো। বড্ড ঝুঁকীর কাজ। দিনরাত পুলিশ এড়িয়ে চলতে হয়।

টগর। (চা'র মগ এগোতে এগোতে) পুলিশ এড়িয়ে চলতে ... মানে ?

পেঁচো। মানে খুব বেশী পয়সা করলে সন্দেহ করবে।

টগর। কেন !

হেবো। ও যে আধুলি করে।

টগর। "আধুলি করে"—সে আবার কি ?

হেবো। আধুলি তৈরী করে।

টগর। (ভীতা হয়ে) কি বল্লে—তৈরী করে। জেচ্চোর মিন্‌সে—আমার ছেলেকে পুলিশ ধরে—

পেঁচো। ধরবে না—ধরতে পারে না।

(খাবার জিনিস পত্তর নিয়ে ঘেঁচা ঢুকলো। মেজের ওপর রেখে দিলে)

ঘেঁচা। আমি এখুনি আসছি—

টগর। আবার এই বৃষ্টিতে কোথায় যাচ্ছিস্—

ঘেঁচা। এই এলুম বলে—আমার জন্যে খাবার রেখো। সব তোমরা খেয়ে ফেলো না— (প্রস্থান)

(টগর সকলকে খাবার দিতে লাগলো)

হেবো। আচ্ছা তুমি ইচ্ছে করলে তো অনেক আধুলি তৈরী করতে পারো।

পেঁচো। তা পারি কিন্তু করি না। ঠিক আমার যতটুকু দরকার সেইটুকু করি। মাংসটা বেশ হয়েছে হে !

টগর। আর একটু দেব।

পেঁচো। দাও—দেখো তোমাদের কম না পড়ে।

(টগর পেঁচোকে দু-টুকরো মাংস দিলে)

হেবো। জিনিস-পত্তর জোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হয়—না ?

পেঁচো। কি জিনিস ? টিন ?

হেবো। না, না, টিন কেন। অন্যটা।

পেঁচো। ওঃ সেইটা। না—সে এক জায়গা আছে—আমার জানা-শোনা লোক—আর একটু চা আছে ?

টগর। দিচ্ছি।

(পেঁচোর মগে হাঁড়ী থেকে একটু চা ঢেলে দিলে)

হেবো। সকলেই পারে।

পেঁচো। হুঁ। অবিশ্যি তোমার মত লোক পারবে না। একটু বুদ্ধি চাই।

হেবো। তোমার মতন।

পেঁচো। আর ভাই লজ্জা দাও কেন ?

হেবো। কেউ যদি শিখতে চায়—শিখিয়ে দেবে ?

পেঁচো। দিতেও পারি—নাও দিতে পারি। কে শিখবে—কত দেবে এসব না জানলে যাকে তাকে কি আর এসব শেখানো যায়।

হেবো। ধর যদি আমি শিখতে চাই।

পেঁচো। তোমাদের কথা আলাদা। এই বৃষ্টিতে তোমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছ। তোমাকে হয়ত বল্লেও বলতে পারি।

হেবো। কি নেবে ?

পেঁচো। আর একটু মাংস আর একখানা রুটী।

(টগর মাংস ও রুটী দিল। পেঁচো এক মনে খেতে লাগল—কোন উত্তর দিলেনা)

হেবো। আমি বলছি শেখাতে কি নেবে ?

পেঁচো। বলছি—খেতে খেতে কথা কইলে গলায় আটকে যাবে। হুঁ, কি বলছিলে শেখাতে কত নেব ?

হেবো। হ্যাঁ।

পেঁচো। তুমি কত দেবে বল না।

হেবো। তুমি কত চাইবে শুনে আমি হিসেব করে দেব।

পেঁচো। তোমায় যদি দিতে না দেয়।

হেবো। দিতে না দেয় মানে। আমিই তো কর্ত্তা।

পেঁচো। (টগরকে দেখিয়ে) আমি তো ভেবেছিলুম উনি।

টগর। আমাদের সংসারের কথায় তোমার থাকবার দরকার কি গা।

হেবো। আমার মনে হয় তোমার তো বিনা পয়সায় আমাকে শেখানো উচিৎ।

পেঁচো। আহা আমার সাঙাতরে। কেন চাঁদ?

হেবো। আমি তোমায় ইচ্ছে করলে পুলিশে দিতে পারি।

পেঁচো। তা পার।

হেবো। আর আমার তাই করা উচিতও।

পেঁচো। তাতে তোমার লাভ।

হেবো। আমার মন বলছে। ধর্ম্ম বলে একটা জিনিস আছে তো।

পেঁচো। ও আমরি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্টির রে।

টগর। ধর্ম্ম থাক না থাক্ তোমাকে ইচ্ছে করলে আমরা পুলিশে দিতে পারি।

পেঁচো। পুলিশ যখন প্রমাণ চাইবে?

হেবো। তোমার ঝুলিতে প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

(পেঁচো লাফিয়ে ঝুলির কাছে গেল। তার ভেতর থেকে একটা চার চৌকো কোটা বের করে নিয়ে এল।

পেঁচো। (কোটটা দেখিয়ে) যা কিছু প্রমাণ এই কোটটার মধ্যে আছে। পুলিশ ডাকবার আগেই আমি এটা শেষ করে দিচ্ছি।

হেবো। (উৎকণ্ঠার সঙ্গে) মানে—

পেঁচো। মানে উনুনে এই সব এখুনি পুড়িয়ে দেব, আর যদি আমায় বাধা দিতে চেষ্টা করো তো এই লাঠির বাড়ি (লাঠি তুলে) মাথা ফাটিয়ে দেব।

টগর। ওরে বাবারে খুন করলে রে—(চীৎকার।)

(বাহিরে দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ। পেঁচো লাঠি নামিয়ে রাখলে। হেবো দরজা খুলে দিতে পুলিশ ঢুকল)

পুলিশ। কি ব্যাপার—কিসের গোলমাল?

টগর। কিছু না জমাদার সাহেব। আমার ভাইকে একটা গল্প বলছিলুম। (বলে পেঁচোকে দেখিয়ে দিলে)

পেঁচো। নমস্কার জমাদার সাহেব। বসুন না। এই বৃষ্টিতে রাস্তায় বড় কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।

পুলিশ। তা আর বলতে। সমস্তক্ষণ বৃষ্টিতে টহল দিচ্ছি।

টগর। বৃষ্টিতেও টহল দিতে হয়।

পুলিশ। আর বল কেন? নিয়ম কানুন মানতে হবেই। আগে কুড়ি টাকা পেতুম। একদিন শীতকালে টহল দিতে দিতে পা ব্যথা হয়ে গেছে এমন সময় দেখি করিমশেখের ঘরে আলো জলছে। গিয়ে দেখি করিম আরও দু'চারজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে আর পাশা খেলছে। কে জানে কি করে ওপরওয়ালার কানে গেল। দিলে দু'টাকা মাইনে কমিয়ে।

পেঁচো। তোমাদের কাজটা তো তবে ভাল নয়। (একটা বিড়ি দিয়ে) নাও জমাদার সাহেব, একটা বিড়ি খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও।

পুলিশ। (বিড়ি টানতে টানতে) আর এ বস্তিতে সব জানা লোকের বাস। খুব বেশী হয় তো সিদ্ধি-গাঁজা-মদ। সবই গরীব ঘুস-ঘাসও নেবার উপায় নেই। উন্নতিরও কোন আশা নেই।

পেঁচো। অন্য জায়গায় কি বিশেষ সুবিধা হয়।

পুলিশ। আগে অন্য জায়গায় আমার ডিউটী ছিল। দেখি দুপুর বেলা একজন লোক রূপোর বাটী ঝিমুক মেয়েদের বিক্রী করছে। কি রকম সন্দ হোল। তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলুম। দেখা গেল, নিকেল রূপো বলে চালাচ্ছে। এক বছরের জেল হোল। আমার দশটাকা মাইনে বেড়ে গেল।

টগর। এই রকম জোচ্চোর, জালিয়াৎ ধরতে পারলে তোমাদের খুব উন্নতি হয়—হাঁ।

পুলিশ। তা হয় বই কি।

পেঁচো। যে সন্ধান দেবে তার কি লাভ হবে?

পুলিশ। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব ধন্যবাদ দেবেন—কিন্তু পাড়াপড়শী তার ধোপা নাপিত বন্ধ করে দেবে।

পেঁচো। আর যদি এমন লোক সন্ধান দেয় যে এই রকম জোচ্চুরী কারবারে ভাগ বসায়, তার কি হবে।

পুলিশ। সাজা হবেই, তবে একটু হাল্কা রকমের হ'তে পারে। কেন তোমার সন্ধানে আছে নাকি?

পেঁচো। না জমাদার সাহেব, আমি তো নতুন এখানে এসেছি। তবে ওর যদি থাকে (হেবোকে দেখিয়ে)—ওর আবার ধর্ম্মটর্ম্মর দিকে মতি আছে।

হেবো। না না—আমি আর কি জানি।

পেঁচো। ভেবে টেবে দেখ—

টগর। কি যে বল তোমরা তার ঠিক নেই। ওতো বলতে গেলে বাড়ী থেকে বেরোয় না। ওর সন্ধানে আর কি থাকবে।

পুলিশ। আমি জানি এ পাড়ায় ওসব সন্ধান পাওয়া যায় না আচ্ছা আমি উঠি। (পেঁচোকে) আর একটা বিড়ি দাও তো ভাই (পেঁচো বিড়ি দিল—পুলিশ ধরালে) (টগরকে) দেখ তো ? থামল কিনা?

টগর। (দরজা খুলে দেখে) হাঁ—পরিষ্কার হয়ে গেছে। উঠে পড়েছে।

পুলিশ। আমি তবে যাই—

পেঁচো। নমস্কার জমাদার সাহেব।

(পুলিশ চলে গেল। টগর গিয়ে দরজা বন্ধ করে এল)

হেবো। আরে যাও। আমি তো অম্নি ঠাট্টা করছিলুম।

পেঁচো। তোমার ঠাট্টা তোমাতেই থাক্। আমি এটাকে পুড়িয়ে ফেলি।

(কৌটোটা নিয়ে উনুনের দিকে গেল)

হেবো। (ব্যস্ত হয়ে) আহা কর কি, কর কি। মাইরি বলছি আমি কাউকে বলবনা। ভগবানের দিব্যি।

পেঁচো। তোমাদের কথায় বিশ্বাস কি ?

হেবো। চট কেন ? শোনো না। দু' টাকা দিলে শিখিয়ে দেবে ?

পেঁচো। (উচ্চৈঃস্বরে হেসে) দু' টাকা—চার আধুলি। পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

হেবো। আচ্ছা—চারটাকা।

পেঁচো। দশটাকার এক পয়সা কমে শেখাব না।

টগর। কোন দরকার নেই শেখবার। (হেবোকে) তোমার আক্কেলও হয় না। সেবার ছাগল বিক্রী করে কেমন ঠকেছিলে মনে আছে ?

হেবো। সব সময়ে সেই এক কথার খোঁটা ভাল লাগেনা। সেবার ঠকেছিলুম বটে—কিন্তু এবার তো আর সে সব কিছু নয়।

পেঁচো। ঝগড়াতে কাজ নেই। আমি চল্লুম।

হেবো। দাঁড়াও দাঁড়াও। আচ্ছা আমি দশটাকা দেবো, যদি আমায় এখুনি তৈরী করে দেখিয়ে দাও।

পেঁচো। আগে দশটাকা দাও তবে দেখাব।

হেবো। আচ্ছা এখুনি নিয়ে আসছি—

টগর। তুমি এখানেই থাক, আমি আনছি।

(টগর দেশলাই নিয়ে চলে গেল। পেঁচো পকেট থেকে কাগজ বার করে কি লিখতে লাগল। লেখার সঙ্গে সঙ্গে জিভ নড়তে লাগল)

পেঁচো। চকচকে আধুলি করবার উপায়টা লিখে দিচ্ছি।

(হেবো কাছে আসতেই চট্ করে কাগজটাকে মুড়ে কৌটার ভিতর পুরে ফেল্লে)

পেঁচো। থামো কর্ত্তা। আগে টাকা ছাড় তবে দেখ।

(টগর এসে নোটটাকে পেঁচোর হাতে দিল। সে তাড়াতাড়ি সেটা জামার পকেটে পুরে ফেল্লে)

পেঁচো। আচ্ছা এইবার আরম্ভ করি। একটা আধুলি দরকার —কারণ তার ছাপ চাই।

হেবো। আমার বালিশের তলায় বোধহয় একটা আছে—

টগর। আমি নিয়ে আসছি।

(টগর দেশলাই নিয়ে আবার চলে গেল)

পেঁচো। দেখতো উনুনে আঁচ আছে কিনা। না থাকে তো একটু দিয়ে দাও।

(হেবো পিছন ফিরে উনুনে ফু' দিতে লাগল। পেঁচো সেই সুযোগে ডিবেটা হাত দিয়ে নিবিয়ে দিলে। ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল)

পেঁচো। ঐ যা। আলোটা নিবে গেল। দেশলাই আছে ?

হেবো। ও টগর, ও টগর, চট করে দেশলাইটা নিয়ে আয়। বাতিটা নিবে গেছে।

টগর। (ভেতর থেকে) আসছি—

(টগর একটা জ্বালা মোমবাতি হাতে বেরিয়ে এল। এসে দেখলে দরজা খোলা। পেঁচো নেই। ঝুলি ও লাঠি অদৃশ্য হয়ে গেছে)

হেবো। আঁ—ব্যাটা চলে গেল। (ছুটে বাইরে গিয়ে আবার এসে) চারিদিকেই অন্ধকার। কোথাও তো তাকে দেখা গেল না।

টগর। বেশ হয়েছে। আরও যাকে তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দাও।

হেবো। কি করে জানব যে সে পালাবে। (কৌটোটা দেখে) যাক কৌটোটা রেখে গেছে।

টগর। দেখা যাক ভেতরে কি আছে।

(হেবো কৌটো খুলে ভেতর থেকে একটা পা ঘসবার ঝামা বের করলে)

হেবো। একটা ঝামা—উঃ ব্যাটা একেবারে আমাদের পথে বসিয়ে গেল।

টগর। (একটা কাগজ বের করে) দেখনা এটা কি ?

হেবো। (পড়লে) "ঝকঝকে আধুলি করতে হ'লে ময়লা আধুলি ঝামা দিয়ে ভাল করে ঘস্‌বে।"

টগর। কেমন হয়েছে। আমি তখনই জানি ব্যাটা জোচ্চোর। তবু দেখলুম তোমার বুদ্ধির দৌড় কতখানি। দশটাকায় একটা টিনের কৌটা, ঝামা, রুটী মাংস। খুব লাভ হয়েছে—আঁ ?

হেবো। টগর, কি হবে মাইরি। আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

(হেবো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্লে)

টগর। ছাগল বিক্রী করতে গিয়ে তোমায় আর এক জোচ্চোর জাল দশটাকার নোট দিয়েছিল মনে আছে ?

হেবো। (চীৎকার করে) ভাল লাগেনা—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এক কথা খালি ঘ্যানর ঘ্যানর। ভুলতে দিবি না।

টগর। (মুচকে হেসে) এইবার ভুলতে পারবে। তোমার বন্ধুকে সেই জাল নোটটা দিয়েছি।

(হেবো কিছুক্ষণ হাঁ করে টগরের দিকে চেয়ে রইল। পরে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল)

যবনিকা

— দুর্জ্জয় লিঙ্গে —

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শিলিগুড়ি হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে
ট্রেণশিশু ওঠে পাহাড়-পুরে !
আঁকা বাঁকা পথে আগুপিছু হেঁটে
কত গিরিচূড় আসিল ঘুরে !

কভু দম নেয় চড়াইয়ের বাঁকে
শিস্ দিয়া কভু ছুটিয়া নামে,
হেলিয়া দুলিয়া গিরি-বন-ঝোরা
ফেলিয়া তাহার ডাহিনে বামে !

লীলা-চঞ্চল দুরন্ত শিশু
ধূম্র উগারি' ছুটিয়া চলে
সদা সশব্দে শৈল বিদারি'
কৈলাস পানে কৌতূহলে !

স্থির অবিচল বীর তরুদল
স্তব্ধ তাহার স্পর্দ্ধা দেখে।
শৈল-সানুতে মেঘের প্রহরী
মাঝে মাঝে স্বধু উঠিছে হেঁকে !

ধ্যান-নিমগ্ন সেথা গিরিরাজ
তুষার-সমাধি-মহিমা মাঝে
প্রবেশাধিকার নাহিকো কাহারো
শান্তি-ভঙ্গ কারো না সাজে !

পৃথিবী মাটির, চূড়া পাষাণের,
গৌরীশৃঙ্গ সে হিমালয়—
মহিমা তাহার যুগ যুগ ধরি'
মানবের হিয়া ক'রেছে জয় !

অলঙ্ঘ্য শত পর্ব্বত শ্রেণী
প্রাচীরের মত ঘিরিয়া তারে
প্রহরী পবন, দ্বারী মেঘদল,
সেনা অগণন তরুর সারে !

হেথা কুলীশের অস্ত্র-আয়ুধ,—
সেনাপতি হেথা প্রভঞ্জন !
বাজে পিণাকীর বিষাণ-বাদ্য,
ঘোরে বিজলীর সুদর্শন !

প্রমথনাথের গুপ্তচরেরা
গুহায় গুহায় লুকায়ে থাকে,
ধ্বসাইয়া শিলা, খসাইয়া পদ,
অলখিতে যমপুরীতে ডাকে !

সেই ভীমপুরী হিমালয়-সানু-
সীমাদেশে হেরি মহিমা যা'র—
তুষার-কিরীট বিশাল সে গিরি-
রাজের চরণে নমস্কার !



শ্রীমধুসূদন

বনফুল

ভূমিকা

এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। যদি এ বিষয়ে কেহ আমাকে সাহায্য করেন কৃতজ্ঞ হইব এবং গ্রন্থের মূল সুরের বিরোধী না হইলে ভ্রমসংশোধন করিয়া লইব।

প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথা-মত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়-কালে—যদি অবশ্য ইহা কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিরতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি। যদি কোন দুঃসাহসী নাট্যসম্প্রদায় নাটকখানি অভিনয় করিতে অভিলাষী হন তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদা স্মরণে রাখেন এবং মেক-আপ সম্বন্ধে উদাসীন না হন—কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলি তিমিরাচ্ছন্ন পৌরাণিক চরিত্র নহে।

প্রথম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটি কক্ষ। কক্ষটি মহার্ঘ আসবাবপত্রাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকটি কেদারা কৌচও রহিয়াছে। একদিকে প্রাচীর গাত্রে একটি বড় আয়না বিলম্বিত। মধুসূদন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া 'টাই' খুলিতেছেন। তাঁহার জননী জাহ্নবী তাহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মধুসূদন ১৮ বৎসরের যুবক। কালো রঙ—পাতলা গড়ন—টানা চোখ। চোখে প্রতিভার ছটা। তাহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ। তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন। 'টাই'টা খুলিয়া ফেলিয়া তিনি একটি কৌচে বসিলেন। ১৮৪৩ খৃঃঅঃ ফেব্রুয়ারি।

মধু। মা, একটা কাউকে ডাকোনা—জুতোর ফিতে-গুলো খুলে দিক।

জাহ্নবী। (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—রঘু—

রঘু প্রবেশ করিল

মধু। (পা বাড়াইয়া দিলেন) ফিতেগুলো খোল—

রঘু বসিয়া ফিতা খুলিতে লাগিল

মা, তুমি আজ কলেজে মাত্র দু'টো পোষাক দিয়েছিলে কেন বলত! এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাকে।

জাহ্নবী। দিয়েছিলাম ত তিনটেই—তোমার বেয়ারা-গুলো একটা ফেলে গেছে দেখলাম শেষে—

মধু। Idiots! ওরে রঘু—বেয়ারাগুলোকে বলে দিস—আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে। আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর বঙ্ক ভোলানাথ আজ আসবে—মনে আছে ত! এখুনি আসবে তারা—

জাহ্নবী। হ্যাঁরে হ্যাঁ—সব মনে আছে আমার। তুই এখন আমার কথার জবাব দে।

মধু। বলেছি ত ও আমার দ্বারা হবেনা।

জাহ্নবী। বিয়ে করবিনা তুই?

রঘু বুট জুতা দুইটি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একজোড়া সুদৃশ্য চটি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন চটি পায়ে দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন

মধু। বলেছিত বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব!

জাহ্নবী। শোন ছেলের কথা একবার! কেন বাঙালীর মেয়ে কি দোষ করলে!

মধু। বাঙালীর মেয়ে! বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারেনা!

জাহ্নবী। ক্ষ্যাপা ছেলের কথা শোন একবার।

স-স্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

লক্ষ্মী সোনা আমার—সব ঠিক হয়ে গেছে! এখন কি আর অমত করলে চলে!

মধু। তা হয়না মা—এ আমি কিছুতে পারবনা।

জাহ্নবী। এতে না পারবার কি আছে বাবা—বেটা ছেলে বিয়ে করবি সে আর কি এমন শক্ত—

মধু। ভীষণ শক্ত

আয়নার সম্মুখে গিয়া কলারটা খুলিতে লাগিলেন

না হয় শক্তই—কিন্তু তুইত কোনদিন শক্ত কাজ করতে ভয় পাসনা। ছেলেবেলায় ভায়ের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে তুই পোষা পাখীর ছানাটা কেটে ফেলেছিলি মনে আছে? তুই সব পারিস।

মধু। (ফিরিয়া) তার সঙ্গে এর তুলনা দিচ্ছ তুমি মা! ভায়ের চেয়ে কি পাখীর ছানা বড়?

হাসিলেন

জাহ্নবী। বড় নয় তা মানি। কিন্তু অপর কেউ হলে পারতনা—তুই বলেই পেরেছিলি! তুই ইচ্ছে করলে না পারিস কি? ছেলেবেলায় যখন পাঠশালায় পড়তিস্—রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী বড় বড় বই কেমন অনায়াসে তুই পড়ে ফেলেছিলি! রামের কথা ভুলে গেলি?

মধু। ভুলিনি—কিন্তু যাই বল মা—তোমাদের শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন—কোন শ্রদ্ধা নেই তার প্রতি—

জাহ্নবী। ছি, ও কথা বলতে নেই বাবা—শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার—এ দেশের আদর্শ! ইংরেজি পড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি!

মধু। এতে আর ইংরেজি বাংলা কি আছে? ইংরেজি না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, খুব পণ্ডিত হয়েছ তুমি! এখন বিয়ের কি করি তাই বল!

মধু। বললাম ত আমি পারবনা! ও আট বছরের অচেনা খুকীকে আমি বিয়ে করতে পারবনা।

জাহ্নবী। তুই যে অবাক করলি বাছা। অচেনা মেয়েকেইত বিয়ে করে সবাই—আর আমাদের দেশে আট ন বছরেই ত বিয়ে হয়। সুন্দরী—সদ্বংশের মেয়ে—তোকে কি যা তা ধরে দিচ্ছি আমরা?—অচেনা আবার কি!

মধু। ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা কোথা রাখলাম—এই যে। গৌরকে দিতে হবে এটা।

জাহ্নবী। আমার কথার জবাব দে—

মধু। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথা?

জাহ্নবী। ওঘরে আছে— জবাব দিচ্ছিসনা যে আমার কথার!

মধু। (অধীরভাবে) বলেছি ত—পারবনা।

জাহ্নবী। উনি কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন 'না' বললে কি চলে বাবা?

মধু। কথা দিলে কেন তোমরা! কিছুতেই আমি এ বিয়ে করবনা!

জাহ্নবী। কিছুতেই না?

মধু। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ও কথা আমায় আর বলোনা কেউ! আমার ঢিলে পাজামা কোথা দাও—

জাহ্নবী। ওঘরে আছে—বললাম ত—

মধুসূদন পা-জামা পরিতে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। লিখে দিলাম চিঠি—ওরা সুবিধে মত এসে একদিন ঠিকঠাক্ করে ফেলুক। শুভস্য শীঘ্রম্—কি বল! শহরের যে রকম হাওয়া মধুকে আর বেশীদিন অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়—বিশেষত মধুর মত ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—কি বল।

জাহ্নবী। মধু কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়।

রাজনারায়ণ। রাজী নয়, মানে?

বিস্মিত হইলেন—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন

বিয়ের আগে ছেলেরা অমন বলেই থাকে!

জাহ্নবী। না, তা ঠিক নয়। এই ত এতক্ষণ তাকে বোঝাচ্ছিলাম—কিছুতেই রাজী নয় সে!

রাজনারায়ণ। (দৃঢ়তার সহিত) রাজী হতে হবে—সব জিনিসে ত আর আবদার চলেনা—সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো যায়না—

জাহ্নবী। ও যেরকম এক-গুঁয়ে, ধর যদি বিয়ে না করে—

রাজনারায়ণ। (সজোরে) যদি টদি নেই—করতেই হবে। রাজনারায়ণ মুন্সী যখন ঠিক করেছে তখন আর 'যদি'র স্থান নেই তার মধ্যে। ভাল করে' বুঝিয়ে বলো তাকে—

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ বলিয়া চলিলেন

সে কি মনে করে আমার কথার কোন দাম নেই ? কোন মাস ফিরিঙ্গির মেয়ের পাল্লায় পড়েছে আর কি ! সেদিন কে যেন বলছিল কেষ্ট বন্দ্যোর বাড়ীতে খুব যাতায়াত করছে আজকাল—ও সব চলবে টলবেনা—বুঝিয়ে বোলো—বুঝলে ?

জাহ্নবী। আচ্ছা বলব।

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুরা ত আজ আসবে এখানে খেতে—তাদেরই বলো ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় যেন যে সব স্থির হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো অসম্ভব। গৌরকে ডেকে বোলো—বুঝলে ? গৌরের কথা ও শোনে খুব—

ভৃত্য আসিয়া একটি আলবোলায় তামাক দিয়া গেল। রাজনারায়ণ নিকটস্থ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

তুমি ওদের সামনে আধহাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন ? ছেলের মত ওরা— মধু কোথা গেল ?

জাহ্নবী। ভেতরে আছে—

রাজনারায়ণ। তাকে ডেকে দাও ত—আচ্ছা থাক্। গৌরকেই ডেকে বোলো—বুঝলে ?

জাহ্নবী। বলব—

রাজনারায়ণ। কখন আসবে ওরা ?

জাহ্নবী। মধু ত বলছিল এখুনি আসবে—যাই আমি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে—

জাহ্নবী চলিয়া গেলেন—রাজনারায়ণ বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

রাজনারায়ণ। মধু দিন দিন বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। আজকাল কেষ্ট বাঁড়ুয্যের বাড়ী খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে—তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে শুনেছি। উহুঁ—এ ভাল কথা নয় ! বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গৌরবাবু, ভোলানাথবাবু, বঙ্কুবাবু এসেছেন—

রাজনারায়ণ। ও, এসেছে ওরা—আচ্ছা—ডেকে নিয়ে আয় এইখানে। আর মধুকেও খবর দে—

ভৃত্য চলিয়া গেল। একটু পরে গৌরদাস, ভোলানাথ ও বঙ্কু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলের পোষাক সেকেলে ধরণের। পরিধানে ধুতি, আজানুলম্বিত আচকান—মাথায় শামলা জাতীয় টুপি—সকলের গায়ে শাল রহিয়াছে

এস—এস—বস— তার পর খবর কি ? ভাল আছ ত সব ?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। তাহার পর—

রাজনারায়ণ। আচ্ছা তোমাদের mathematicsএর professor রিজ্‌সায়েব নাকি নেপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন শুনতে পাই ? কথাটা কি সত্যি ?

ভোলানাথ। তাই ত শুনেছি আমরা !

রাজনারায়ণ। তোমাদের Captain Richardson ও ত মিলিটারিতে ছিলেন—captain যখন, তখন নিশ্চয়ই ছিলেন।

বঙ্কু। আজ্ঞে হাঁ—

রাজনারায়ণ। যত সব Soldier এসে মাষ্টারি সুরু করেছে !—তাই বোধহয় তোমাদের চালচলনও মিলিটারি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। ভাল কথা—রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজটার এডিটার আজকাল তোমাদের স্কুলেরই একজন টিচার—না ?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—রামবাবু—রামচন্দ্র মিত্র সেটা চালান আজকাল—

রাজনারায়ণ। তোমরা লেখটেখ তাতে ?—মধু কি যেন লিখেছে তাতে শুনলাম। দেখবার আর ফুরসৎ পাইনি !

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও একটি শালের পাড় বসান দামী গরমের ওভার কোট

মধুসূদন। বাইরে একজন মক্কেল এসে বসে আছেন—

রাজনারায়ণ। তাই না কি ! জ্বালাতন করেছে ব্যাটারা। তোমরা তাহলে বস—আমি দেখি কে আবার এলেন ! এই নাও—

এই বলিয়া আলবোলার নলটা মধুসূদনের হাতে দিলেন ও মধুসূদন রাজনারায়ণের সম্মুখেই তাহাতে টান দিতে লাগিলেন

মধু, এদের ফিরে যাওয়ার জন্যে বেয়ারাদের বলে রেখেছ ত ? সন্ধ্যে হলেই পালায় ব্যাটারা।

মধুসূদন। তাদের থাকতে বলেছি—

রাজনারায়ণ। তোমরা তাহলে বস ! আমি যাই—

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) তোর হাতে উনি আলবোলার নলটা দিয়ে গেলেন যে! বাবার সামনে তুই তামাক খাস্!

মধু। My father minds not your common punctilios—তামাক ত ছেলেমানুষ—আমি যে মদ খাই তা-ও উনি জানেন। ভাল কথা, will you have drink, boys?

বঙ্কু। Oh yes—এ সম্বন্ধে আশা করি মতদ্বৈধ নেই—

মধু আলবোলার নলটা ভোলানাথের হাতে দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ও এক বোতল Liqueur ও কয়েকটি গ্লাস লইয়া আসিলেন

ভোলানাথ। (বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন) Grand!

বঙ্কু। মালটা কি?

ভোলানাথ। Liqueur.

মধু গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

সেবার তোমাদের বাড়ী পোলাও যা খেয়েছিলাম—জীবনে তা ভুলব না—চমৎকার। পাঁঠার মাংসের পোলাও আর আমি কখনও খাই নি!

মধু। আজও পোলাও হচ্ছে—

গৌরদাস। মাংসের নাকি—

মধু। হ্যাঁ।

গৌরদাস। আমি বৈষ্ণবের ছেলে—আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা! রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন!

বঙ্কু। বাবাকে জানাবার দরকার কি বাবা?

মধুসূদন সকলের হাতে এক এক গ্লাস Liqueur দিলেন ও নিজের গ্লাসটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

মধু। I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O
For her I sighed and e'er shall sigh
Tho' she shall ne'er be mine, O
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.
I drink her health.

মদ্যপান করিলেন

ভোলানাথ। I drink to Pilau—the Csar of all dishes.

বঙ্কু। I do the same.

গৌরদাস। My dear মধু—I drink to you.

সকলে মদ্যপান করিলেন

মধু। Here is your lavender my boy—I hope you got the পমেটম্ all right—Believe me I could not get the lavender that day. এখানকার দোকানদারগুলো হতভাগা—beggars—

ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা আনিয়া গৌরদাসকে দিলেন

গৌরদাস। Many thanks—

মধু। Needn't mention—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা গৌরবাবুকে ভেতরে ডাকছেন একবার—

গৌরদাস। আমাকে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ—

মধু। মাংস খাবি কিনা তাই জানতে চাইছেন হয়ত—

ভৃত্যের সহিত গৌরদাস ভিতরে চলিয়া গেলেন

(বঙ্কুর প্রতি) Have you seen my last sonnet in the Literary Gleaner?

বঙ্কু। (সোচ্ছ্বাসে) Oh yes. It is splendid—রিচার্ডসন সায়েব ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সে দিন—

মধু। রিচার্ডসনের প্রশংসা তুমি শুনলে কোথা থেকে?

বঙ্কু। আপিসে সেদিন মাইনে জমা দিতে গেছলাম—দেখলাম রিচার্ডসন সায়েব তোমার সনেটটা Kerr সায়েবকে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর তোমার তারিফ করছেন।

মধু। (সানন্দে) তাই না কি? Did Mr. Kerr say anything?

বঙ্কু। না—

মধু। He is a rogue and idiot combined—ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন। I don't like the fellow.

উপরোক্ত কথা-বার্ত্তার ফাঁকে ভোলানাথ "with your permission মধু" বলিয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া চুমুকে চুমুকে পান করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। খাবার আগেই অত বেশী টেনো না—খেতে বসে কেলেঙ্কারি করবে শেষকালে—

ভোলানাথ। (সহাস্যে) Don't fear—I am Bholanath। দু এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না—

গৌরদাস ফিরিয়া আসিলেন

মধু। মা ডেকেছিলেন কেন রে তোকে ?

গৌরদাস। তোর বিয়ের কথা বলছিলেন। তুই নাকি বলেছিস বিয়ে করব না! What non-sense is this ?

কথাগুলি মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন

মধু। I never talked more sense in my life !

আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন

গৌরদাস। বিয়ে করবি না ?

বঙ্কু। বিয়ে করবি না! This is unpoetic, my friend ! বিয়ে করবি না কিরে ! We are certainly anxious to get a Juno for our Jupiter.

মধু। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে) I don't mind getting a Juno. কিন্তু আট বছরের এক প্যান্‌পেনে খুকী is hardly a Juno, my boy.

ভোলানাথ। বুঝেছি—

মদ্যপান

মধু। কি বুঝেছিস্ ?

ভোলানাথ। বাঁড়ুয্যে সায়েবের বাড়ী থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি একদিন বন্ধু! I wish you good luck। কিন্তু গেহু ঠাকুরও যাতায়াত করছে—I warn you.

মধু। সে আর আমি জানি না ?—But he is for the elder and most probably he is going to marry her.

বঙ্কু। You mean—কমলমণিকে ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে খৃষ্টান হবে শেষে ? wonderful !

মধু। I think there is no harm in it.

গৌরদাস। Miss দেবকী ব্যানার্জির কথা সত্যি নাকি মধু ?

মধুসূদন কিছু না বলিয়া এক গ্লাস মদ ঢালিলেন ও ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। মধু, সত্যি নাকি ?

মধু একনিশ্বাসে সমস্ত মদটুক নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন

মধু। Yes, boys, I am in love—I have been fascinated by her ! বাঙালীদের ঘরে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি। রূপসী অনেক থাকতে পারে —কিন্তু আমি ভালবেসেছি তার রুচিকে তার কাল্‌চারকে—! তুমি ত জান ভাই গৌর, আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হ'ব—why আকাঙ্ক্ষা—a conviction. I know, I feel, I shall be a great poet. I shall cross the oceans and go to England—the land of Shakespeare and Milton। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I shall not rest—I shall soar up and up till I am tired and even then I shall soar.—আমার জীবনের যে সঙ্গিনী হবে she must be my true companion—I cannot marry a baby—simply I can't.

ভোলানাথ। Bravo, bravo—my boy.

মধু। না, ঠাট্টা নয়—if need be I shall run away—I shall run away to England. You all know what Pope said—to follow poetry one must leave father and mother. If necssary I shall leave mine.

গৌরের দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া

and if you inform my parents about this you are no friend of mine.

গৌরদাস। আমি inform করতে যাব কেন ?

বঙ্কু। এখনি যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে ওটি ত তোমারই লেখা ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। Miss ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে ?

মধু। No—Miss Banerji is not blue-eyed। কিন্তু আমি কল্পনায় যেন একজন কাকে দেখতে পাই—she is blue-eyed—she is not of this land—এ আমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী—একে হয়ত কোন দিন পাব না।

অস্ফুট স্বরে আবার আবৃত্তি করিলেন

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft, with disdain repaid
My fondness and affection, O.

গৌরদাস। Are you seriously in love with Miss Banerji?

মধু। Love ? ঠিক্ বলতে পারি না, I have a fascination for the girl, she is cultured.

গৌরদাস। কিন্তু এদিকে যে তোমার বাবা পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। It is already fixed up.

মধু। He must unfix it—এ বিয়ে আমি করব না—করতে পারি না—

বঙ্কু। আরে, একটা বিয়ে করবি তাতে হয়েছে কি ! এদেশে লোকে হামেসাই চার পাঁচটা বিয়ে করছে। তুইও না হয় একটা করে ফেল বাপ মার অনুরোধে—পছন্দ মাফিক পরে আবার করিস !

মধু। বাপ মায়ের চেয়ে যে আমার কাছে বড় সে আমায় মানা করছে। তার অবাধ্য আমি হতে পারি না—হবার ক্ষমতা নেই।

ভোলানাথ। সে আবার কে।

মধু। সে এই।

বলিয়া নিজের কপালে টোকা দিলেন

ভোলানাথ। (বঙ্কুর প্রতি) শুনলে ?

বঙ্কু। শুনলাম ত !

গৌরদাস। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ দেখে বড় কষ্ট হল—তাঁর মনে কষ্ট দিও না ভাই—

মধুসূদন কিছু না বলিয়া আরও খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

ভোলানাথ। যাকগে ওসব কথা—মধুর একটা গান শোনা যাক্।

গৌরদাস। A splendid idea! অনেকদিন গান শুনিনি তোর! গজল হোক একখানা—

মধু। এখন গাইতে ইচ্ছে করছে না ভাই—I am not in the proper mood for it.

বঙ্কু। গান ধরলেই—mood এসে যাবে—

গৌরদাস। হাঁ হাঁ—ধর—

মধু। শুধু গলায় শোন তাহলে—এস্রার ওপরে আছে।

ভোলানাথ। শুধু গলাতেই হোক, এস্রার দরকার নেই।

মধুসূদন গুন গুন করিয়া শেষে একটি ফারসী গজল ধরিলেন ও তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন

গান শেষ হইয়া গেলে—অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। চমৎকার! মধু, তুই বাঙলায় এগুলো লিখতে পারিস ?

মধু। বাঙলায় ? I hate Bengali Nevertheless, my friend, I shall write poetry and be a great poet. I have told you many times how I would like to see you write my life if I happen to be a great poet.

বঙ্কু। You are already a Pope in our college.

মধু। যদি ইংলণ্ড যেতে পারি—দেখিস আমি কত বড় কবি হব! England—the land where Shakespeare was born. By the by, how is our Newton—ভূদেব ? I am sorry I forgot to invite him to-day. I would like to give a grand dinner to all the members of the Mechanics Institute one day. How do you like the idea?

বঙ্কু। Simply grand.

ভোলানাথ। ভূদেব চটে আছে তোমার ওপর সেদিন তর্কে হেরে গিয়ে।

মধুসূদন। (সহাস্যে) কেমন সেদিন প্রমাণ করে দিই নি Shakespeare could be a Newton if he liked—কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও Newton Shakespeare হতে পারতেন না। কিন্তু না—ভূদেব চটে আছে আমার ওপর একথা বিশ্বাস করতে পারি না। He is great. গৌর তুই অমন চুপ করে বসে আছিস কেন ?

গৌরদাস। তোর মায়ের মুখটা মনে পড়ছে ভাই। মায়ের মনে কষ্ট দিস না তুই—মায়ের মনে কষ্ট দিলে জীবন সুখের হয় না!

মধুসূদন। My dear fellow—যা আমি পারব না তা আমাকে করতে বল কেন! আমি মায়ের জন্যে মরতে পারি—কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

গৌরদাস। সংস্কৃত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্রকে চেন?

মধুসূদন। The fellow who became বিদ্যাসাগর? চিনি—মানে? আলাপ আছে! He is a brilliant Brahmin.

গৌরদাস। তার মাতৃভক্তির গল্প শুনেছ?

মধুসূদন। (অধীর হইয়া) Please don't—সকলের মাতৃভক্তি যে একই ধরণের হতে হবে—সবাইকে যে নদী সাঁতরে মাতৃভক্তি দেখাতে হবে এ আমি বিশ্বাস করি না। Believe me, I love my mother in my own way and no less.

গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া

And I love you Gour—you, my dear G. D. Bysak, I love you with all my heart. I wish you were a girl.

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

গৌর। ঢের হয়েছে—ছাড়—ছাড়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবারের ঠাঁই হয়েছে—আপনারা চলুন—

মধু। যা যাচ্ছি—

ভৃত্য চলিয়া গেল

মধু। তোমরা এগোও—আমি এগুলো সামলে রেখে দিই—চাকরটার হাতে পড়লে আর কিছু থাকবে না এতে— গৌর, তুমি নিয়ে চল এদের—

গৌর। এস—

গৌর, বঙ্কু ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন। মধুসূদন মদের বোতল ও গেলাসগুলি দেওয়াল-আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেন। রাজনারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। এরা কোথা গেল?

মধু। ভেতরে খেতে গেছে—

রাজনারায়ণ। তুমি যাবে না?

মধু। যাচ্ছি—

গমনোদ্যত

রাজনারায়ণ। শোন—(মধু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) —তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে শুনেছ ত?

মধু। শুনেছি। কিন্তু ও বিয়ে আমি করতে পারব না—

রাজনারায়ণ। পারবে না মানে?

মধু। পারব না!

রাজনারায়ণ। You must. আমার বাড়ীতে থেকে আমার কথার অবাধ্য হওয়া অসম্ভব। আমার মুখের ওপর সোজা বললে—পারব না! I wonder at your cheek! ভাল করে ভেবে দেখ—ওসব ছেলেমানুষি ছাড়, It is no easy job to trifle with me—I give you time—কাল সকালে তোমার definite জবাব চাই।

ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

মধু। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) No. It is impossible

তিনিও ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক একটি কেদারায় উপবিষ্ট ও ধূমপানে রত। তিনি যে বৈষ্ণব তাহা তাহার বেশ-ভূষাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। গৌরদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান

রাজকৃষ্ণ। লোকের মত লোক ছিল বটে—হেয়ার সাহেব। লোকটা সেদিন মরে গেছে সমস্ত দেশটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। এই সব দুরন্ত ছোকরাদের এখন সামলায় কে!

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ডেভিড হেয়ার গামছা হাতে করে স্কুলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত—কোন ছেলেকে অপরিষ্কার দেখলে তার মুখ মুছিয়ে দিত! কলেজের ছোকরারা মিশনরিদের সঙ্গে মিশলে তাদের শাসন করে দিত। এখন সে সব করবে কে? (কিছুক্ষণ পরে) মিশনরিদের লেকচার খুব শুনছ ত!

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। আর, 'না'—(কিছুক্ষণ পরে) আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে কিন্তু তোমাদের চাল-চলন কেমন যেন—

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ওই তোমার বন্ধুটি—বড়লোকের ছেলে—পড়াশোনাতেও ভাল শুনেছি—কিন্তু কেমন যেন—

আবার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌরদাস। মধুর কথা বলছেন ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁা। তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি ওর সঙ্গে মিশে তুমি যেন কুপথে পা দিও না। সর্ব্বদাই মনে রেখো—ইংরিজিই পড় আর যা-ই কর সর্ব্বদা এটা মনে রেখো তুমি বৈষ্ণববংশের সন্তান! মধু বড়লোকের ছেলে যা করবে মানিয়ে যাবে। তুমি যেন ও সব অনুকরণ করতে যেও না।

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। কটা টাকা চাই তোমার ?

গৌরদাস। আজ্ঞে দশটা। দুখানা বই কিনতে হবে।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ত—

গৌরদাস। আজ্ঞে হাঁা—

রাজকৃষ্ণ। এই নাও—

ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন

—লেখাপড়া শেখা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে বাপ পিতামহের ধর্ম্মটা জলাঞ্জলি দিতে হবে এমনও কোন কথা নেই। ওই এক কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো জুটেছে—সৎ ব্রাহ্মণবংশের ছেলে—কি দুর্ম্মতি দেখ দিকি লোকটার। নিজে মজেছে—দেশসুদ্ধ লোককে মজাচ্ছে। ডিরোজিও সায়েব কড়মড়িয়ে মাথাটি খেয়ে গেছে ওর। ওই খিদিরপুরে তোমার মধুর বাড়ীর পাশেই থাকে এক ছোকরা —কি যে ছাই নামটাও ভুলে গেলাম—তাকেও শুনছি মজিয়েছে—

গৌর। নবীন ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ নবীন—নবীন মিত্তির—শুনছি ছোকরা খৃষ্টান হয়ে যিশু ভজছে। চেন নাকি তাকে ? মিশোনা ও সব নবীন-ফবিনের সঙ্গে—অতি বদ্ ছোকরা ওসব।

উত্তেজিতভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌর। আজ্ঞে না—আমি ত মিশি না ওর সঙ্গে—

রাজকৃষ্ণ। না মিশো না—খবরদার মিশো না—এই ফিরিঙ্গি ব্যাটারা এদেশে সুক্ষণে এসেছে কি কুক্ষণে এসেছে নারায়ণই জানেন!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খিদিরপুরের রাজনারায়ণ বাবু আইচেন—দেখা করবার লেগে—

রাজকৃষ্ণ। তাই নাকি ?—ডেকে নিয়ে এস—

ভৃত্য চলিয়া গেল

হঠাৎ রাজনারায়ণ এল কেন এ সময় !

রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

রাজকৃষ্ণ। এস ভায়া এস—খবর সব কুশল ত ?

রাজনারায়ণ। মধু এখানে এসেছে ?

রাজকৃষ্ণ। না—গৌরদাস মধু এসেছে নাকি ?

গৌরদাসের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন

গৌরদাস। না—

রাজনারায়ণ। আসে নি ? কোথা গেল তবে !

রাজকৃষ্ণ। বস, বস দাঁড়িয়ে রইলে কেন! বস। মধু ত আসে নি।

রাজনারায়ণ হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

রাজনারায়ণ। আসে নি ? আমি আশা করেছিলাম এখানেই পাব তাকে !

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার কি বল ত !

রাজনারায়ণ। মধু কোথা চলে গেছে কোন খবরই পাচ্ছি না—

রাজকৃষ্ণ। চলে গেছে ?

রাজনারায়ণ। কাল থেকে সে বাড়ী যায় নি। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব, ভাবলাম সে হয়ত কোন খবর দিতে পারবে। কিন্তু তোমরা কিছুই জানো না দেখছি।

গৌরদাস। আমি ত কিছু জানি না—মধু কাল থেকে কলেজেও যায় নি !

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। এ ত বড় বিষম খবর আনলে তুমি এখন উপায় ?

গৌরদাস। দেখি একটু খোঁজ করে—দেখি গিরীশের কাছে যদি কোন খবর পাই—

রাজনারায়ণ। বঙ্কু, ভোলানাথ, ভূদেব এরাও ওর খুব বন্ধু। হয়ত ওদের কারো কাছেও খবর পাওয়া যেতে পারে।

গৌরদাস। আপনি বসুন—আমি গিরীশের কাছে দেখি আগে—

চলিয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তামাক খাও—ওরে কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়—

রাজনারায়ণ। থাক্—তামাক খাব না—

রাজকৃষ্ণ। ও তুমি বুঝি বার্ডসাই খাও! বার্ডসাই খেয়ে দেখেছিলাম সেদিন। ও সব পোষায় না ভায়া আমার—

রাজনারায়ণ। না কিছু খাব না এখন—ভারি দুশ্চিন্তা হয়েছে—কোথায় গেল যে ছেলেটা!

রাজকৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা ত হবেই! হঠাৎ মধুর অন্তর্দ্ধানের কারণটা কি অনুমান কর? তার বিবাহ ত স্থির হয়েছে শুনলাম—

রাজনারায়ণ। ওই বিবাহ নিয়েই যত গোলমাল। মধু কিছুতে বিবাহ করবে না—অথচ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ কি রকম আব্দার বল দেখি!

রাজকৃষ্ণ নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন ও তাহার পর কথা কহিলেন

রাজকৃষ্ণ। আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) ওই কেষ্ট বন্দো—রামগোপাল ঘোষ—ওদের কি শিক্ষিত বল তুমি!

রাজনারায়ণ। শিক্ষিত বই কি।

রাজকৃষ্ণ। বিশ্বাস করি না আমি! যত সব আচার-ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার! মানুষ ত নয় মদের পিপে এক একটি!

রাজনারায়ণ। (সহাস্যে) কালের গতিকে রোধ করবার কারো সাধ্য নেই। ভাল কথা, রামগোপাল ঘোষ জর্জ টমসনের সঙ্গে জুটে খুব বক্তৃতা করছে আজকাল—শুনেছ তার বক্তৃতা? বক্তৃতা ভালই দেয়!

রাজকৃষ্ণ। ফৌজদারি বালাখানায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—না কি একটা হবে শুনছি! ব্যাপারটা কি হে! হবে কি সেখানে?

রাজনারায়ণ। রাজনীতির আলোচনা! টম্‌সন সায়েবের লেকচার শুনেছ?

রাজকৃষ্ণ। শুনেছি—লোকটা বাগ্মী বটে—

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়! দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এদেশে এনে এদেশের মহা উপকার করেছেন। এ রকম বক্তৃতা এদেশে কেউ কখনও শোনে নি—

রাজকৃষ্ণ। তা বটে—চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌সন ত একেবারে মেতে উঠেছে—

রাজনারায়ণ। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কি লিখেছে দেখেছ? যেন ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হচ্চে! কামানের ধ্বনিই বটে! (সহসা) কিন্তু গৌর ত এখনও ফিরল না ভাই! মনটা ভারি উতলা হয়ে উঠেছে। আমার সহধর্ম্মিণী ত অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ। ভাই, রাগ যদি না কর ত একটা কথা বলি তোমায়—

রাজকৃষ্ণ। কি কথা? বল, রাগ করব কেন?

রাজকৃষ্ণ। দেখ, তোমরাই অপরিমিত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। তুমি যথেষ্ট উপার্জ্জন কর—শহরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক—সবই ঠিক। তোমার ছেলেও খুব প্রতিভাশালী ছেলে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অতি-বর্ষণে ভাল ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায় অত্যধিক আদরে ভাল ছেলেও তেমনি বিগ্‌ড়ে যায়। ছেলেদের হাতে বেশী কাঁচা পয়সা দেওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে—

রাজনারায়ণ। তুমি ঠিকই বলেছ—কিন্তু কি করি বল। আমার গৃহিণীই ভাই যত নষ্টের মূল। আর দেখ তুমি বন্ধু লোক তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—গৃহিণী সম্বন্ধে আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে। তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা আমার পক্ষে সহজ নয়। তিনিই আদর দিয়ে দিয়ে মধুর সর্ব্বনাশটা করেছেন! বিশেষ আমার দুটি ছেলে প্রসন্ন আর মহেন্দ্র মারা যাবার পর মধুই হয়েছে তার নয়নের মণি। আমিও যে তাকে প্রশ্রয় দিই নি তা নয়—মানে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর সহসা বলিলেন

I mean he is my only son. গৌর এখনও ফিরছে না কেন বল ত! গিরীশ কে?

রাজকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ বলে কে একজন ওদের বন্ধু আছে। আজকাল ধর্ম্মের ভেকধারী নানারকম ছেলে-ধরা শহরে আছে কি না—সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। (কিয়ৎকাল পরে) এদিকে ক্রিশ্চান মিশনারি—ওদিকে আবার ঠাকুর-বাড়ীর 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতাপ! তত্ত্ববোধিনী সভা—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বেরুলো শেষকালে। তত্ত্ব না বুঝিয়ে আর ছাড়বে না। দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে দেবেন ঠাকুর শেষকালে স-পরিবারে ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়ল হে। রামমোহন আর ডিরোজিও ডোবালে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে। এখন দেখ তোমার ছেলে গিয়ে কোন দলে ভিড়ল কি না—

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখ শুষ্ক

গৌরদাস। শুনলাম মধুকে না কি পাদ্রিরা নিয়ে গেছে—খৃষ্টান করবে!

রাজনারায়ণ বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান করবে!

রাজকৃষ্ণ। দেখ! নিশ্চয়ই ওই কেষ্ট বন্দ্যো আছে এর ভেতর—এ কেষ্ট বন্দ্যো না হয়ে যায় না। সাংঘাতিক লোক! কিছুদিন আগে 'চন্দ্রিকা-প্রকাশে' বেরিয়েছিল মনে নেই? কার এক ছেলেকে ভুলিয়ে গাড়ী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল! উঃ এ যে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল ক্রমে! ছেলে-ধরা হয়ে দাঁড়াল।

রাজনারায়ণ দত্তের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল

রাজনারায়ণ। আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে খৃষ্টান করবে! স্পর্দ্ধা ত কম নয়! খুন করে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সিকে চেনে না ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওলা এনে আগুন ছুটিয়ে দেব। দেখি ত ব্যাটাদের কতদূর হিকমৎ। এস ত আমার সঙ্গে গৌর—কোথায় খবর পেলে তুমি—

গৌর। চলুন।

রাজনারায়ণ ও গৌর বাহির হইয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। গৌর তুমি আবার ফিরে এসো এখুনি।

গৌর। (নেপথ্য হইতে) আসছি—

তৃতীয় দৃশ্য

গোলদীঘি। দূরে এক ক্রিশ্চান পাদরি দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন এবং অনেক লোক ভীড় করিয়া তাহা শুনিতেছে। বক্তৃতা বিশেষ বোঝা যাইতেছে না—কিন্তু বক্তৃতার অদ্ভুত বাঙলা একটু আধটু শোনা যাইতেছে। ভীড় হইতে বেশ কিছু দূরে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র—বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব একটা ফাঁকা জায়গায় বসিয়া জটলা করিতেছেন। অধিকাংশই ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। পরিচ্ছদ নানা রকম। কাহারও পরিধানে ধুতি—কেহ ইজার চাপকান পরিধান করিয়া রহিয়াছেন—কাহারও বা সাহেবি পোষাক। দুই একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেটও রহিয়াছে। ইঁহারা পাদরির বক্তৃতায় মোটেই মনোযোগী নহেন

ভূদেব। My God—রিচার্ডসন আজ কি চমৎকার শেক্‌সপীয়রই পড়ছিল!—অদ্ভুত। মধুর জন্যে মন কেমন করছিল—সে শুনলে আত্মহারা হয়ে যেত। আচ্ছা, মধু কদিন থেকে কলেজে আসছে না কেন? যে গুজবটা শুনছি সত্যি নাকি—মধু নাকি ক্রিশ্চান হবে?

বঙ্কু। কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে—

ভোলানাথ। ইংরেজেরা আফগানিস্থানের লড়ায়ে জিতেছে—General Pollock has planted the British flag on Bala Hissar. These British people will conquer the best of us—মধুসূদন ক্রিশ্চান হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

রাজনারায়ণ। মধুর সঙ্গে অবশ্য তেমন ভাব নেই আমার—কিন্তু শুনেছি ইংলণ্ডে যাবার ওর ভয়ানক ইচ্ছে—কোন পাদরি ওকে যদি বিলেত নিয়ে যাবে আশা দেয়—he will jump at it.

একটি খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। ইংলণ্ড কেন—এই ভারতবর্ষেই খৃষ্টধর্ম্ম বরণ করবার স্বপক্ষে ওর প্রবল যুক্তি রয়েছে—lovely Miss Banerji!

ভূদেব। আচ্ছা, এ গুজবটা কি সত্যি?

বঙ্কু। সকলেই ত জানে—

ভোলানাথ। আরে মধু হ'ল রিচার্ডসন্ সায়েবের প্রিয়তম ছাত্র—তার হাতের লেখাটা পর্য্যন্ত নকল করতে চায়। এ বিষয়েও সে যে তাঁর অনুকরণ করবে আশ্চর্য্য কি? শুনেছ ত ক্যাপ্টেন সায়েবের কাণ্ড কারখানা!

হাস্য



ভূদেব। আমি সেদিনের কথাটা ভাবছি—

বন্ধু। কি কথা—?

ভূদেব। সেই যে মধু ফিরিঙ্গির মত চুল ছেঁটে এসে আমাকে দেখিয়ে বললে যে এর জন্য এক মোহর ব্যয় হয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম যে তুমি একজন জিনিয়াস্—তুমি যদি পাঁচচুড়ো সাতচুড়ো কি ন'চুড়ো কেটে আসতে নতুন কিছু হ'ত একটা। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের নকল করা তোমার মত প্রতিভাবান লোকের সাজে না! আমার কথাটা শুনে মধু যেন একটু বিরক্ত হল। ও যে ফিরিঙ্গি মহলে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে তাত জানতাম না তখন আমি—

হাসিলেন

বন্ধু। তুমি নিজে বামুন পণ্ডিতের ছেলে কি না—তাই তোমার মধুর চুল-ছাঁটা খারাপ লেগেছে। যাই বল—ওরকম চুল ছেঁটে আর সায়েবি পোষাকে মধুকে ভারি মানিয়েছিল!

ভূদেব। কি জানি—tastes differ—সে যাই হোক কিন্তু মধু ক্রিশ্চান হ'লে বড় অন্যায় হবে। সে তার বাপের একমাত্র ছেলে—তার এসব না করাই উচিত।

ভোলানাথ। Why not? Tell me—why not? The recent French Revolution in Europe has taught us equality—freedom of thought and many other things.

ভূদেব। But, my dear fellow, that is not the most recent thing—the most recent moral power in Europe is Prince Metternich. He believes in sovereignty.

বন্ধু। I wish Modhu were present here to silence you, Bhudeb. He alone can tackle you. রাজনারায়ণ তুমি একটু চেষ্টা কর না—you are good at history—কি পড়ছ' তুমি ওটা?

রাজনারায়ণ। বেঙ্গল স্পেক্টেটার—

ভোলানাথ। It has become a fine paper. Is it not Modern Bengal speaking? Ram Gopal Ghose, Peari Chand Mitra are really men of talents.

রাজনারায়ণ। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) এই যে আমাদের মধুময় গৌরদাস আসছেন—মধুর খবর কিছু পাওয়া যাবে।

গৌরদাস বসাক ও সহপাঠী হরি প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। খবর শুনেছ?

রাজনারায়ণ। সেইজন্যেই ত উদ্‌গ্রীব রয়েছি।

হরি। সবাই যখন জোটা গেছে—দাঁড়াও কিছু নিয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে।

ভূদেব। যা গুজব রটেছে সত্যি তাহলে?

গৌরদাস। বর্ণে বর্ণে—it has passed the stage of গুজব now. সে পাদরিদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে।

বন্ধু। আড্ডা নিয়েছে? This is something new.

ভোলানাথ। And fits Modhu admirably.

হরি নামক যুবকটি এক বোতল মদ, কয়েকটা ভাঁড় ও কিছু শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিলেন

ভূদেব ব্যতীত আর সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

বন্ধু। That's right. This was wanting.

ভোলানাথ। হরি রসিক লোক—এ না হ'লে আড্ডা জমে! এস সব বসা যাক—গোল হয়ে ব'স সব—মাঝখানে রাখ এগুলো। ভূদেব, এস না হে!

ভূদেব। না ভাই—please excuse me—তোমরা খাও—আমি দেখি।

সকলে গোল হইয়া বসিলেন ও শিককাবাব সহযোগে মদ্যপান চলিতে লাগিল

ভোলানাথ। Let us drink to Modhu first—the absent genius.

ভূদেব। গৌর—মধু পাদ্রির ওখানে আড্ডা নিয়েছে—এর মানে কি?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ সব খুলে বল দিকি—কোন্ পাদ্রি? ডফ্, ডলট্রি, না ব্যানার্জি?

গৌর। Details ঠিক জানি না ভাই। মধুর বাবা কিন্তু ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন।

রাজনারায়ণ। মানে?

গৌরদাস। তিনি নাকি লাঠিয়াল, সড়কি-ওলা সব আনিয়েছেন মধুকে পাদ্রির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

ভূদেব। I wish he would be successful.

বন্ধু। Tell me—why do you wish this? হরি তুমি সবটা খেয়ো না—বাঃ

হরির হাত হইতে খানিকটা মাংস কাড়িয়া মুখে পুরিলেন

রাজনারায়ণ। হরি হচ্ছে নীরব কর্ম্মী—কথাটি কইছে না—কাজ করে যাচ্ছে খালি।

হরি একটু হাসিয়া এক চুমুক মদ্যপান করিলেন

বন্ধু। ভূদেব—কথার জবাব দিলে না যে! Tell me why do you wish that Modha should not be Christian.

ভূদেব। কারণ মধুর মত রত্ন আমরা হারাতে প্রস্তুত নই।

বন্ধু। হারাতে মানে? রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে কি হারিয়ে গেছেন? মহেশ ঘোষ কি হারিয়ে গেছেন? দেবেন ঠাকুর ক্রিশ্চান না হোন ব্রাহ্ম হয়েছেন তিনি কি হারিয়ে গেছেন? What do you mean by হারাতে প্রস্তুত নই! We are all cowards—মধুর মত বুকের পাটা থাকলে আমরা সবাই ক্রিশ্চান হতুম!

ভোলানাথ। (একপাত্র পান করিয়া) Your views are narrow my dear Bhudeb—I must say.

রাজনারায়ণ। ক্রিশ্চান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিঁকতে পারে না!

ভোলানাথ। তাই বুঝি মশায়ের ব্রাহ্মসমাজে আজকাল গতিবিধি হচ্ছে!

ভূদেব কিছু না বলিয়া বিমর্ষমুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। আমি তর্ক করতে পারব না ভাই—আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগছে—আমার কান্না পাচ্ছে।

বন্ধু। Here comes the good Macduff—I mean গিরীশ।

গিরীশ ঘোষের প্রবেশ

গিরীশ। ওহে, খবর শুনেছ? মধু—

বন্ধু। (তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া) খৃষ্টান হয়ে গেছে—এই ত?

গিরীশ। গেছে কি না ঠিক জানি না—তবে হবে এটা ঠিক!

ভোলানাথ। Old news my boy—এ সব শুনেছি আমরা—এই নাও একপাত্র নাও, টেনে নতুন যদি কিছু বলতে পারো বল!

গিরীশ উপবেশন করিলেন

গৌরদাস। শুনেছিস মধুর বাবা নাকি লাঠিয়াল, শড়কিওলা আনিয়েছেন—পাদরিদের হাত থেকে মধুকে ছিনিয়ে নেবেন। শহরের অনেক বড়লোক নাকি সাহায্য করবেন বলেছেন—

গিরীশ। কিছু হবে না। আমার মামাও ত রাজনারায়ণ বাবুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এমন সময় রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে এসে হাজির—

বন্ধু। কেষ্ট বন্দো কি মধুকে জামাই করে ফেলেছে অলরেডি?

গিরীশ। আরে না—শোন না। তিনি বললেন লাঠিয়াল শড়কিওলার কর্ম্ম নয়। মধু খৃষ্টান হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে! সে খোকাও নয় বোকাও নয় যে পাদ্রিরা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজেই Lord Bishop-এর কাছে অনুরোধ করে কেল্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—I mean ফোর্ট উইলিয়ম্। ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে তারই রক্ষণা-বেক্ষণে সে আছে—যাতে কেউ তার অঙ্গস্পর্শ করতে না পারে! সে কি সোজা ছেলে!

বন্ধু। I admire him—

গৌরদাস। এ কি সত্যি?

গিরীশ। রেভারেণ্ড বাঁড়ুয্যে বললেন স্বকর্ণে আমি শুনেছি—

গৌরদাস। চল যাই—দেখা করে আসি।

গিরীশ। সেখানে ঢুকতে দেবে কি আমাদের?

বন্ধু। পাগল হয়েছ? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে। তার চেয়ে চল বাবা—বুলবুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে

ভোলানাথ। পেনিটির বাগানে ভাল বাচ খেলাও আছে আজ। কেল্লায় গিয়ে গোরার গুঁতো খাওয়ার

য়ে—বাচ খেলা দেখা ঢের ভাল। তোমরা যাও ত চল—াণীও যাবে বলেছে!

রাজনারায়ণ। কেল্লায় গিয়ে কোন লাভ নেই—প্রথমত কতেই দেবে না—secondly, it will be useless to rgue with Modhu. He will not listen to easons.

গৌরদাস। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

ভূদেব। Of course. চল আমি যাব।

উঠিয়া পড়িলেন

গৌরদাস ও ভূদেব চলিয়া গেলেন। বাকী সকলে বসিয়া জটলা করিতে লাগিলেন। তখনও দূরে অদম্য অধ্যবসায় সহকারে হাস্যকর ভাষায় পাদ্রি তাঁহার বক্তৃতা চালাইতেছেন

গিরীশ। আমিও যাই—

চলিয়া গেলেন

(ক্রমশঃ)

প্রথম আষাঢ়

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ

প্রথম আষাঢ় সব বরষার বোধন বাহিরে ঘরে ;—
পাগল প্রাণের নয়নের জল অঝোর ধারায় ঝরে।
　　দুলিয়া দুলিয়া কদম কেতকী
　　বাতাসের কানে কহিছে কতকি,
ময়ূর ময়ূরী মেলিয়া পেখম নাচিছে হরষ ভরে।
মুখর আজিকে আকাশ ভুবন ফটিক-জলের স্বরে॥

অধীর পবনে খোলে বার বার দখিনের বাতায়ন ;
হিম বারিকণা গৃহ-অঙ্গনে লুটে পড়ে অনুখন।
　　ওইতো অদূরে জানালায় বসি
　　এলোকেশী কোন্ তন্বী রূপসী—
জলদ লিপিতে লিখিছে বুঝিবা পরাণের নিবেদন।
বাতায়ন পথ রুধিতে আজিকে চাহেনা তৃষিত মন॥

দূরে দূরে কেন ফিরিতেছ ওগো! কবিরে গেছ কি ভুলে?
লাগিয়াছে কোন্ স্মরণের ঢেউ তোমার মনের কূলে।
　　কাজল সজল আঁখি কোণে তব
　　নেমেছে বাদল লীলা অভিনব,
বিজলী মাগিছে শরণ তোমার এলায়িত কালো চুলে।
কোন বিধুরার গোপন কাকুতি তোমার বেদনা মূলে?

কোথা সে রূপসী অলকাপুরীর? কোথা সে যক্ষবালা?
তোমার বুকে কি রেখে গেছে তারা অনাদি কালের জ্বালা?
　　কে আঁকিবে তব মরমের ছবি,
　　নাহি সে দরদী কালিদাস কবি ;
আমি গাঁথি সখি তোমার লাগিয়া ঝরা-বকুলের মালা ;
ব্যথা-যূথী-দলে বিজনে সাজাই নিবিড় মিলন ডালা॥

এসেছে আষাঢ়—প্রথম আষাঢ়—আষাঢ় কৃষ্ণতম ;—
ঘুচুক ধরার কল কোলাহল বারিধারে ঝলমল।
　　মুছে যাক আলো, নিভে যাক্ বাতি,
　　ঘনায়ে আসুক ঘন ঘোর রাতি,
লোকনয়নের আড়ালে মিলিব আকাশ ধরণী সম।
তুমি কাছে, তবু তোমার বিহনে কেন কাঁদে হিয়া মম॥

হোরেসের কাব্যাদর্শ

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

প্রবন্ধ

ইউরোপীয় সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমালোচনা জগতে হোরেস একরূপ একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার "কাব্যকলা" ঐ যুগের সাহিত্যিকদিগের নিকট একরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল। ইংরাজ কবি পোপের উপর হোরেসের কতখানি প্রভাব ছিল তাহা ইংরাজি সাহিত্যের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। ফরাসী সমালোচক বোয়ালুও হোরেসের কাছে কম ঋণী নহেন। হোরেসের কাব্যকলা বা 'আরস পোয়েটিকা'র বহুস্থানে অবশ্য এরিষ্টটলের প্রভাব সুস্পষ্ট, তবু হোরেসের পুস্তকে রচনা সম্বন্ধে বা কাব্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথাও আছে। আমার এই প্রবন্ধে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামতগুলি মোটামুটি বলিবার চেষ্টা করিব।

মূল বক্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে হোরেসের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। তাঁহার পুরানাম কুইনটাস হোরেসাস ফ্লকাস। তাঁহার জীবিতকাল খৃষ্টপূর্ব ৬৫ হইতে খৃষ্টপূর্ব ৮ পর্য্যন্ত। হোরেসের পিতা বিশেষ ধনী না হইলেও পুত্রকে ভালই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রোম নগরীতে পাঠ আরম্ভ করিয়া হোরেস এথেন্সে পাঠ সমাপন করেন। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর সময় তিনি এথেন্সেই ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় এবং তৎকালের অধিকাংশ যুবকের মত তাঁহার সহানুভূতিও ব্রুটাসের গণতন্ত্রদলের উপরই ছিল। এ্যান্টনি এবং অক্টেভিয়াসের বিরুদ্ধে ব্রুটাস যে সৈন্য সংগ্রহ করেন তাহাতে হোরেস যোগ দেন এবং সৈন্যদলের সহিত এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত আসেন। তাঁহার কোন পুস্তকে এই যুদ্ধে ব্রুটাসের পরাজয় প্রত্যক্ষদর্শীর নিপুণতায় বর্ণিত আছে। ব্রুটাসের এই পরাজয়ের পর রোমে ফিরিয়া হোরেস অনটনের মধ্যে পড়েন, কিন্তু এই অনটন তাঁর অন্তরের কাব্যশিখাকে নির্বাপিত না করিয়া উদ্দীপিতই করিয়াছিল। তারপর অবশ্য তিনি ধীরে ধীরে সম্রাট অক্টেভিয়াসের নজরে আসেন এবং ক্রমে গণতন্ত্র হইতে তাঁহার মত রাজতন্ত্রের দিকে পরিবর্ত্তিত হয়। তবে তিনি কখনও নীচ চাটুকার ছিলেন না ; সম্রাটকে বন্ধু পাইয়াও তিনি নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া আপন মনে কাব্য লক্ষ্মীর সেবা করিতেই ভালবাসিতেন।

হোরেস বিবাহ করেন নাই ; আপনার পরিচয় দিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি খর্বাকৃতি, চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই চুল তাঁর সব পাকিয়া গিয়াছিল, কিছু কোপনস্বভাব ছিলেন তিনি। প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিলেও শেষের দিকে জীবনকে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেন।

রোমক কাব্যজগতে তাঁহার স্থান অনেকের মতে ভার্জ্জিলের নীচেই। 'আরস পোয়েটিকা' ছাড়া তাঁহার চারিখণ্ড কবিতা পুস্তক (Four books of Odes) এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও চিঠি (Satires & Epistles) সর্বজনপরিচিত। এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিব না। আমাদের আলোচ্য কাব্য-কলা বা 'আরস পোয়েটিকা' তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। বন্ধু পিসোর পুত্রকে কাব্য পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই মূলত চিঠির আকারে এই কাব্য রচনা করেন। বন্ধুপুত্র যদি কবি নেহাতই হয় তবে যেন সে হোরেসের উপদেশগুলি মানিয়া চলে, হোরেসের এই ছিল উদ্দেশ্য।

হোরেসের মতে সাহিত্যের প্রথম কথা হইতেছে সম্পূর্ণতা ও একত্ব। প্রত্যেক কাব্যের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহার অংশের সহিত সমগ্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিবে। এরিষ্টটলে unity of theme and sentiment অর্থে যাহা বুঝি হোরেস সেই কথা প্রথম বলিয়াছেন। সমগ্র কাব্যটির জন্যই অংশের প্রয়োজন, কাজেই অংশগুলি সমগ্রের অনুযায়ী হইবে ; সমগ্রের পক্ষে যে অংশের সত্যকার প্রয়োজন নাই কাব্য-গঠনে তাহার স্থান নাই। হোরেস বলিতেছেন, "হইতে পারে নন্দন কাননের বর্ণনা তুমি ভালই করিতে পার ; কিন্তু তাহাতে কি হইবে যদি তোমার বর্ণনার বিষয় হয় এক নিমজ্জমান নাবিকের জীবনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। তোমার কাব্যের বিষয় যাহাই হউক, দেখিতে হইবে উহা যেন জটিল না হয় এবং সুসমঞ্জস হয়।"

হোরেসের পুস্তকের সকল স্থানেই মধ্যপথের সন্ধান পাই ; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার অনুসরণে ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কাব্য রচিত হয় তাহাতে এই মধ্যপথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি বলিতেছেন কবি তাঁর প্রকাশকে সংক্ষেপ করিতে গিয়া অর্থকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিবেন না, গম্ভীর করিতে অযথা শব্দপূর্ণ করিবেন না, অভিনবত্ব দেখাইতে গিয়া একটা আজগুবি অসম্ভব কিছুর অবতারণা করিবেন না। প্রকৃত কবি কাব্যকে সমগ্রভাবে দেখেন, খণ্ডিত ভাবে নয়। কাব্যের অংশের সৌষ্ঠব আনিয়া কি হইবে—যদি সমগ্র কাব্যটি অসুন্দর হয়। মানুষটা সুন্দর কি অসুন্দর তাহা বলিব তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়া। তাহার সুন্দর কালো চোখ, কুঞ্চিত কালো কেশদামের কে প্রশংসা করিবে যদি তার নাক হয় থেঁদা, পিঠে থাকে কুঁজ।

সাহিত্যের মধ্যে একটা সত্যরূপ দিতে হইলে লেখকের পরিচিত জগতে ফেরা উচিত, তাহার ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন বিষয়ে হাত দেওয়া উচিত নয়। কাঁধে কতখানি জোর তাহার পরিমাপ না করিয়া অন্যায় ভার কাঁধে তুলিলে বিড়ম্বিত হইতেই হইবে।

কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন যে সাধারণ কথাকেই এমন-ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহার নূতন অর্থ প্রতিভাত হয়। যে নূতন ভাবকে নূতন কথায় প্রকাশ করায় তাঁহার মতে কোন দোষ নাই কিন্তু তাহাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতে তিনি রাজী নহেন। সেই নূতন কথা কিন্তু প্রস্তুত করিতে হইবে তাঁহার মতে, পুরাতন গ্রীক শব্দ হইতে। এই উপদেশ অবশ্য রোমকদিগের জন্য, বাঙ্গালী কবিদের তিনি নিশ্চয় বলিতেন—নূতন কোন ভাবকে প্রকাশ করিতে যদি প্রচলিত কথা না পাও তবে সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে কোন শব্দ লইয়া তাহাকে নূতন চেহারায় ব্যবহার করিবার অধিকার তোমার আছে। এই সম্পর্কে তিনি অতিরিক্ত সংরক্ষণশীলদের বলিয়াছেন যে সাহিত্যকেও একটা বর্দ্ধমান জীবন্ত বস্তু বলিয়া মনে করিতে হইবে, ইহার বিকাশের পথ রুদ্ধ করিলে চলিবে না। গাছের পুরাতন পাতা খসিয়া যেমন নূতন পাতা গজায় তেমনি ভাষাতেও বহু পুরাতন শব্দ অপ্রচলিত হইয়া পড়িবে এবং বহু নূতন কথা প্রচলিত হইবে। সময়ের নিরপেক্ষ বিচারের কাছেই তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কথা চলিবে না তাহা আপনিই ঝরিয়া পড়িবে। এইখানে তিনি একটু কাব্য করিয়া বলিয়াছেন মানুষ এবং মানুষের রচিত যাহা কিছু তাহাতে সকলই কালবশে ধ্বংস হইবে। কালের সহিত যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি আমাদের সারথী হন। এটুকু আমার) তথাপি আমরা ভাবিব। তবে আমাদের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এত জিদ কেন?

বিষয় বস্তু অনুসারে ভাষা এবং ছন্দের পার্থক্য তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন করুণ-কাহিনী প্রকাশ করিতে হাল্কা শব্দ এবং লঘু ছন্দ চলিবে না; আবার হাল্কা বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা আমাদের ঘরোয়া শব্দ এবং হাল্কা ছন্দ। এই প্রসঙ্গে তিনি পুরাতনের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে হোমারের ছন্দই রাজা রাজড়ার কার্য্যকলাপ ব্যক্ত করিবার একমাত্র উপযুক্ত বাহন। অষ্টাদশ শতাব্দীর একঘেয়ে hexametre ছন্দ রচনার অন্যতম কারণ হোরেসের এই উক্তি।

কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাব্যের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা নয়, আনন্দ দেওয়া এবং পাঠককে লেখকের ইচ্ছামত অভিভূত করাও ইহার উদ্দেশ্য। কাব্যের সাফল্যের পরিমাপ হইবে, কাব্য পাঠককে কিরূপ-ভাবে অভিভূত করিল তাহা দেখিয়া। লেখক যদি পাঠকের মনে কারুণ্যের উদ্রেক করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাতে সমর্থ হন তবেই বুঝিলাম তাঁহার শ্রম সার্থক। লেখক যদি নিজেই কারুণ্যের দ্বারা অভিভূত না হইয়া থাকেন তবে তিনি অপরের মনে কারুণ্য উদ্রেক করিতে পারিবেন না। এই জন্যই লেখকের অভিজ্ঞতার বাহিরে যাইতে নিষেধ। চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে যে উপদেশ তিনি দিয়াছেন তাহা অতি সাধারণ। শিশু চরিত্র আঁকিতে গিয়া তাহাতে শিশুজনোচিত গুণ এবং বৃদ্ধ আঁকিতে গিয়া তাহাতে বৃদ্ধজনোচিত গুণাবলি দিতে হইবে। তাহা না হইলে রচনা অস্বাভাবিকতা দুষ্ট হইবে। তাঁহার মতে জীবনই হইতেছে লেখকের প্রকৃত শিক্ষক—সেইখান হইতেই লেখককে তাহার model লইতে হইবে, ভাষাও লইতে হইবে। লেখার মধ্যে জীবনের স্বাদ থাকিলে তাহার অনেক দোষই ক্ষমা করা যায়।

সাহিত্য, বিশেষতঃ নাটকের বিষয় বস্তু এবং তাহার গঠন সম্বন্ধে হোরেস পুরাতনের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে নাটকের গল্পভাগ পুরাণ এবং ইতিহাস হইতে লওয়া উচিত। যদি নূতন গল্প উদ্ভাবন করা হয় তবে উহা যেন স্বাভাবিক এবং সুসমঞ্জস হয়। সর্ব্বজনবিদিত চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন তিনি নিষেধ করেন অর্থাৎ রামচন্দ্রকে রামায়ণে চিত্রিত রামচন্দ্রের মতই দেখাইতে হইবে, রাবণকে রামায়ণের রাবণের মতই। যদি নূতন চরিত্র সৃষ্ট হয় তবে তাহার চরিত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুরূপ হয় যেন। নাটকে পাঁচ অঙ্ক না হইলে শ্রোতারা সন্তুষ্ট হইবে না; বিকট দৃশ্য না দেখাইয়া কোন ব্যক্তির মুখে বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়। আজকাল অবশ্য এই সকল মতামতের ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কোন সত্যকার মূল্য নাই, কারণ সাহিত্য রচনায় এ সকল নিয়ম এখন আর অনুসৃত হয় না।

হোরেস তাঁহার আপনার কালকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারেন নাই সত্য। কিন্তু তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা স্থানকাল নির্ব্বিশেষে সত্য। তিনি বলেন, কবির মন যখন অর্থলোভে আক্রান্ত হয় তখন তাঁহার নিকট আমরা ভাল কাব্য আশা করিতে পারি না। নূতন কবিদের রচিত কাব্যকে অন্ততঃ নয় বৎসর রাখিয়া দিতে তিনি উপদেশ দেন; কারণ পুস্তক প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার যে কোন অংশ বাদ দেওয়া যায় কিন্তু পুস্তক একবার প্রকাশিত হইলে কথা ফিরাইয়া লওয়া শক্ত। মনে রাখিতে হইবে তাঁহার সময় revised edition এর সুবিধা ছিল না। তাঁহার মতে যে রচনা অন্ততঃ দশবার পরিবর্ত্তন করা হয় নাই তাহা পাঠ করাই উচিত নয়।

কাব্যে নীতির স্থান সম্বন্ধে তখন হইতেই মতদ্বৈধ ছিল বুঝা যায়। কেহ বলেন কাব্যে নীতি না হইলেই নয়, আবার কেহ কাব্যে উপদেশ সহিতে পারেন না। হোরেসের মতে মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়। তিনি বলেন উপদেশ থাকিবে কিন্তু তাহা বেশ সংক্ষেপ হইবে যাহাতে সে উপদেশ মনের মধ্যে দাগ রাখিতে পারে। কাব্যে অবিশ্বাস্য যাহা তাহা পরিত্যাজ্য; বহুস্থানেই লেখককে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। পাঠকের বিশ্বাস ক্ষমতা অসীম নহে তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

তিনি সমালোচক হিসাবে lenient ছিলেন বলিতে হইবে; কারণ তাঁহার মতে কাব্যে কোন কোন ভুল ক্ষমা না করিলে উপায় নাই। মানুষের লেখনী কিন্তু সব সময়েই শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রস্তুত করিতে পারেনা। বাঁশীর সুর কি সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হয়—ধনু হইতে তীর কি প্রতিবারই লক্ষ্যবেধ করিতে পারে? যে কাব্য অধিকাংশ স্থানেই সুন্দর তিনি তাহার দু এক স্থানের দোষ ধরিতে প্রস্তুত নহেন। তবে এক ভুলই যদি লেখক বার বার করেন তবে তাঁহার হাতে লেখকের নিস্তার নাই। একটা বড় বই লিখিতে গিয়া লেখক মধ্যে মধ্যে একটু ঘুমাইয়া পড়িবেন বই কি—তবে হোমারের মত কবি যদি একবারও ঢুলেন তবে তাহার ক্ষমা নাই।

কাব্য রচনায় শিক্ষা ও প্রতিভা দুইএরই অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন। প্রতিভা না থাকিলে কেবলমাত্র শিক্ষায় কি হইবে? আবার শিক্ষা না থাকিলে কেবলমাত্র প্রতিভাতেও কিছু হইবে না। তিনি বলেন বন্ধুর বহুবাদে কাব্যের প্রকৃত মূল্য যাচাই হইবে না—হইবে প্রকৃত সমালোচকের দ্বারা। প্রকৃত সমালোচক তিনি, যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে রচনার দোষগুণ ধরাইয়া দিতে ইতস্তত করিবেন না। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাহা বিশেষ আনন্দদায়ক হইবে না ভাবিয়া বাদ দিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি Ars Poetica হোরেস শেষ করিতে পারেন নাই; প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের মত ইহাকে সাজাইয়া লিখিবারও অবসর পান নাই বলিয়া মনে হয়। একটা তাড়াতাড়ির ছাপ যে ইহাতে সুস্পষ্ট তাহা যে কোন পাঠকেরই নজরে পড়ে। তথাপি সমালোচকদিগের নিকট ইহা যে একটা অত্যাবশ্যকীয় বই তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ইংরাজ সমালোচক Saintsbury এই পুস্তকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সমালোচনা সাহিত্যে রোমকদিগের ইহা শ্রেষ্ঠ দান। তবে তিনিও ইহার চিন্তাধারাকে এলোমেলো এবং মতামতকে অতিশয়োক্তিবহুল বলিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কাব্য-বিচারে হোরেস মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় নিয়মানুরাগ দেখাইয়াছেন যাহা আজকালের কাব্য-বিচারে অচল। এ বিষয়ে তিনি এরিষ্টটলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। দু হাজার বৎসরের পূর্বের কোন ব্যক্তি যে সব বিষয়েই এই বিংশ শতাব্দীর মতামতের আভাস দিবেন সে আশা অত্যন্ত বেশি আশা। শতেক প্রকার গোঁড়ামি সত্ত্বেও তিনি যে কোন কোন বিষয়েও কাব্য সম্বন্ধে চিরকালের জন্য কিছু বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। তা ছাড়া তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটার প্রশংসা না করিয়াই পারা যায় না। সমস্ত পুস্তকটি দীপ্তিময় সহাস্য সংক্ষিপ্ত উক্তির যেন মুক্তাহার। তাঁহার মাত্র একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কথায় কথায় সমালোচকদের তিনি বলিয়াছেন শান দেওয়ার পাথর—নিজে কাটে না কিন্তু কাটবার অস্ত্রকে চোখা করে।

বসন্তের জয়গান

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

প্রবন্ধ

বসন্তকাল, ফুরফুরে হাওয়া বইছে, শুক্লাষ্টমীর শশী আকাশের নীল সাগরে একলা পাড়ি দিচ্ছে। দূরে পাপিয়ার গান কোন বিরহী বন্ধুর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে। বসন্তকালের এই ছবি দিকে দিকে দেশে দেশে জেগে ওঠে বছরের মধ্যে একটিবার। তখন আমাদের দেশে মদন-মহোৎসবের ধুম পড়ে যায়। বিদেশী কবি যুবক যুবতীর মিলন-মেলা দেখে বসন্তের জয় গান করে 'কবিতার বুক ভরে' দেন। মদনের নামে আজকাল আমরা একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। কিন্তু কাব্যে অলঙ্কারে সাহিত্যে মদন অতনু হয়েও বেশ রূপ ধরে' আছেন। এই মদনেরই সখা বসন্ত। বসন্ত এলে মদন কি কখনও বিলম্ব করতে পারেন? মদনের অভাবে বসন্ত বিফল, যৌবন বিফল, জীবনও কি বিফল নয়? বসন্তের আগমনে প্রথমেই মনে পড়ে প্রেমের কথা। Young men's fancies turn to thoughts of love. মদনই প্রেমের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। খৃষ্টানদের প্রেম অন্ধ, আমাদের প্রেম শুধু চক্ষু নয় সমস্ত অঙ্গই হারিয়ে ফেলেছে—তাই অনঙ্গ। জিত্‌ল কারা, ওরা না আমরা? আমাদের প্রেম অনঙ্গ বলেই তার সর্ব্বত্র অবাধগতি, অবারিত দ্বার। কানা হ'লে' কোন্‌ দিন হুঁচোট খেয়ে পড়তো কারও কানাচে। কিন্তু আমাদের অতনু অতর্কিতে মনের সমস্ত দ্বার দিয়ে বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে প্রাণের গহনে প্রবেশ করে' মাতিয়ে তোলে সর্বেন্দ্রিয়। অন্য দেবতা অল্পে তুষ্ট—যজ্ঞ কর, হোম কর, আগুনে ঘি ঢেলে দেও, ব্যস্‌। কিন্তু প্রেম-দেবতার হোমা-নলে সর্বস্ব আহুতি না দিলে তিনি তুষ্ট হন না। বিশ্বজিৎ বলে একটা যাগ আছে, তাতে সমস্ত সম্পদ্‌ উৎসর্গ করতে হয়, শুনেছি। কিন্তু সে যজ্ঞ কেউ বড় করে না। প্রেমের বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনেকে আপন স্বেচ্ছায়, অযাচিত ভাবে, আনন্দিত চিত্তে উদ্‌যাপন করে। তা কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না।

বাসন্তী সন্ধ্যায় সারস্বত সম্মিলনে আমি মদনসখ বসন্তের জয়গান করে' সজ্জনবৃন্দের সংবর্দ্ধনা করেছি। ঘটনাচক্রে প্রাকৃতিক অবস্থাসংঘট্টবশে যদি চাঁদের আলো না-ই থাকে, যদি উৎসব পিকপাপিয়ার মাঙ্গলিকে অভিনন্দিত না-ই হয়ে ওঠে, তা হ'লে কি আমরা বসন্তকে বিমুখ করে'

দায় করবো? পরমসুন্দর অতিথিকে আজ স্বাগত জানাতে পরাঙ্মুখ হবো? কেউ হয়ত বলবেন, এ বাদল রাতে বসন্ত রাগের স্থান কোথায়? মল্লারের মূর্চ্ছনা ঝরছে এ বাদল ধারার অবিরাম ঝরঝরে। তবে কি এই উৎসবের রূপালী যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমরা আঁধারে বিলীন হয়ে যাবো? কিন্তু বাদল? কিসের বাদল? বসন্তকে কে রোধ করতে পারে? বসন্ত যাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দুয়ারের কঠিন বাধায় পদে পদে প্রতিহত হয়, তাদের পক্ষে বসন্তের আগমন ব্যর্থ। তাদের জন্য ফুল ফোটেনা, কোকিল গাহেনা, বাঁশী বাজেনা। বসন্তকে যারা অন্তরাত্মা দিয়ে চেনে নি, তাদের পক্ষে জীবনে একটি মাত্র ঋতু বই দুইটি আসেনা। গ্রীষ্ম বসন্তশীত তাদের পক্ষে সবই সমান। বাদল ধারাও বাহিরের নয়। যেদিন গগনের বাদল ধারার মধ্যে সানাইয়ের সুরে সাহানা বাজে, সে দিন বর্ষা নামতে বহু, বহু বিলম্ব আছে

The April is in her eyes ; it is love's spring
And these the showers to bring it on.

Antony & Cleopetra

যার চাঁদনী যামিনীতে যে দিশাহারা, লগ্নভ্রষ্ট পথিক নয়নের জলে পথ দেখতে পায় না, তারই সত্যিকার বাদল নেমেছে জীবনে।* নয়নে বাদল, চিত্তে কাজল মেঘ, হৃদয়ে অশনিপাত শত, বর্ষা বাদল তারই পক্ষে। আর জীবনে যার আনন্দের ঝর্ণা 'ধারা' কুলু কুলু করে' বয়ে যায়, ফাগুনের মলয় পবন যার মনের কুসুমে সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে বয়, ভাবভ্রমরের মৃদু গুঞ্জরণে যার চিত্ত শতদলের সকলগুলি পাপড়ি একসঙ্গে উন্মীলিত হয়, শান্তির যূথিকা শুভ্র জোছনায় যার অন্তর্বহিঃ সমস্ত জগতের প্রতি অণুটি পুলকিত হয়ে ওঠে, তারই জন্যে বসন্ত, তারই খোঁজে বসন্তের বন্ধুর অভিযান। তারই জীবনের প্রতিটি রন্ধ্র বাঁশীর সুরে বেজে ওঠে বসন্তের আগমনে। বাহিরের দুর্দ্দিন তার গণনার মধ্যে আসতে পারে না। আজ সারস্বতগণের মিলনে সেই বসন্তের সমস্ত মধুটুকু বর্ষিত হোক। সার্থক হোক মিলন। বেজে উঠুক সবার প্রাণে আনন্দময়ের বাঁশী। ঐ বাঁশীর সুরেই ষড়ঋতু একসঙ্গে আবির্ভূত হয় ভুবনে। গগনে পবনে পলাশে ফাগে লাগে ফাগুনের আগুন। অনুরাগে অরুণ হয়ে ওঠে জগৎ। হিমালয় দেয় হিমের তুষারের মত গলে' চলে' যায় মিলনের মধুমতীর সন্ধানে। তবেই মিলন হয় মধুময়। তেমনি এই সারস্বত মিলন মধুময়, বসন্তময়, প্রেমময় হয়ে উঠুক।

ভারতীয় ঐক্যের রূপ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

(প্রবন্ধ)

ভারতে ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস একশ পঞ্চাশ বছরের ওপর হতে চললো এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী এক অবাধ প্রভুত্বময় শাসনের ছায়াতলে যে আমরা আজও দরিদ্র বঞ্চিত ও অশিক্ষিত আছি। এই গণতান্ত্রিক শাসনের যুগে একটা বিরাট মহাদেশে ইংরাজের এই যে অবাধ ও অপ্রতিহত কর্তৃত্ব—অনেকের কাছেই এটা একটা পরম বিস্ময়ের বিষয়। অথচ অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে, ভারত কোনও দিনই নিঃস্ব ছিলনা; খনিজ সম্পত্তি, কৃষিজাত দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ—ভারতে এ সবের কখনও অভাব হয়নি, আজও হয়নি। তবু ভারতের নরনারী এক অসহনীয় দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে; এর হাজার হাজার নরনারী অশিক্ষার অন্ধকারে অভিশপ্ত জীবন যাপন করে। জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই হলো বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানে ভারতের ভাগ্য-বিধাতারা পরম উদাসীন ও নির্লিপ্ত। ভারতের প্রকৃত আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের আজও কী শোচনীয় অজ্ঞতা! অতীতে এই ভারতের ধনৈশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে কত যে বিদেশী এর উপকূলে তরী ভিড়িয়েছিল তার সংখ্যা নেই। আজ দেড়শত বছর ধরে ইংরাজ-শাসনের অধীনে থেকে ভারত উপলব্ধি করেছে যে, সব কিছু থাকতেও তার অনেক কিছুই নেই। এই দেড়শত বছরে ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকার বিস্ময়কর পরিবর্তনের কাহিনী আমাদের কাছে আজ তাই স্বপ্নের মতই মনে হয়, যদিও আসলে তা স্বপ্ন নয়। শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক দিয়ে এই সব দেশ আজ ভারতের তুলনায় কত উন্নত, কত

নিশ্চিন্ত, কত বলিষ্ঠ। অশিক্ষিত জনসাধারণ, সীমাহীন দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সম্পদহীন নরনারী—এই হ'লো ইংরাজ-শাসিত ভারতের প্রকৃত অবস্থা। ইংরাজ শাসনের সুফল যে একেবারে কিছু ফলে নাই, সে কথা আমি বলিনে; তবে যা হোতে পারতো, আর তার তুলনায় যা হয়েছে তার পরিমাণ কত সামান্য।

অনেকে ভারতের বর্তমান অবস্থার জন্যে ভারতবাসীর ওপর দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু যে শাসনযন্ত্র পরিচালনে ভারতবাসীর সত্যিকারের কোনো হাত নেই, সেখানে এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যে আমাদের মোটেই দায়ী করা যায়না। দেশের এই সর্বতোমুখী দুর্গতি শাসকেরই লজ্জার, অপযশের বিষয়। ভারতে ইংরাজ-শাসন যে সার্থক হয়নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এদেশের বর্তমানের অবস্থা যা যে কোনো সুসভ্য শাসকের পক্ষে পরম অগৌরবের জিনিস। এর একমাত্র কারণ ইংরাজ আমাদের দেশে অতিথিরূপে আসেনি কোনোওদিন, দুয়োর ভেঙে দস্যু-রূপেই যে ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাই ভারতের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি বলেই শতাব্দীকাল ধরে ভারতের সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে এর প্রাণশক্তিকে একরকম নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু করেই ফেলেছে। সমগ্র দেশ হয়ে পড়েছে স্থবির, আপনার মধ্যেই আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয়না দূর দূরান্তরে।

এই যখন দেশের অবস্থা তখন এক অখণ্ড ঐক্যের রূপ আমরা কল্পনা করবো কেমন করে? আজ আমাদের জাতির ইতিহাস তাই অগৌরবের কালিমায় আবৃত। অনৈক্যের মরণ ফাঁস আজ জাতির গলায় তার প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। আমরা ভুলেই গিয়েছি যে মানব-সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য—সভ্যতার অর্থ হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন। তাইত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন পাশ্চাত্যের একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তি কৌতূহলভরে প্রশ্ন করে থাকেন—আজ যদি ইংরাজ-শাসন ভারতবর্ষ থেকে উঠে যায়, তাহলে স্বাধীন ভারত একতার ভিত্তিতে দাঁড়াতে সমর্থ কিনা? ভারতের জাতীয় জীবনের কাঠামো এত বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে, এত বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন আদর্শের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে যে, পূর্ণাঙ্গ ঐক্য আদৌ সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন আজ খুবই স্বাভাবিক।

একটা জাতির, একটা দেশের অখণ্ড ঐক্য সাধন সম্ভব হয় দুটো উপায়ে—communication ও transport। বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় দানই হলো এই দুটো। যুক্ত আমেরিকার অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ঐক্য একদিনে গড়ে ওঠেনি। আয়তনে ভারত আমেরিকার চেয়ে ছোট হলেও, লোকসংখ্যা ও জাতিসংখ্যায় আমেরিকার চেয়ে ভারত অনেক বড়। কিন্তু এই যানবাহন ও পরস্পরের চিন্তার আদান-প্রদানের সুবিধা ও সুযোগ নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে। ভারতের অতীত ইতিহাসে আমাদের এই দিক দিয়ে যথেষ্ট অপ্রতুলতা ছিল, কাজেই রাষ্ট্রীয় অনুভূতির ভিত্তিতে নিখিল ভারতের ঐক্য সাধনা কার্যতঃ রূপ না পেলেও,

ইংরাজ-শাসিত ভারতে আমরা যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দেখতে পাচ্ছি, সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এর চেয়েও বড় রকমের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যানবাহন ও পত্রাদি আদান-প্রদানের মধ্যযুগীয় প্রথা থাকা সত্বেও তখনকার ভারত যে বিরাট মহাভারতে পরিণত হয়েছিল তা ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন—Asoke indeed achieved unity two thousand years ago and built up an empire far greater than that of Britain in India to-day." (Oxford History of India—Vincent Smith.)। এমন কি সম্রাট অশোকের পরেও আরও দু-একজন সম্রাট বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টা অংশতঃ সাফল্যলাভ করেছিল। তবে এই সব প্রচেষ্টা কার্যতঃ স্থায়িত্ব লাভ করেনি, কারণ এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের ভৌগলিক ব্যবধান দূর করবার কোনো সুযোগ বা সুবিধা তখন ছিলনা। এদেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করবার সুবিধা প্রথম পেলাম এবং তারপর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের ভৌগলিক ব্যবধান ঘুচে যেতে লাগল। ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থায়িত্বের পথে সেই প্রথম অগ্রসর হলো।

খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে একতার বন্ধনে গ্রথিত করবার যে স্বপ্ন শিবাজী ও অশোকের ছিল ভারতে ইংরাজ শাসন সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলেছে কিন্তু সে শুধু নিজেদেরই সুবিধার জন্যে অর্থাৎ সে ঐক্যের অন্তরালে নিহিত ছিল শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ, ভারতবাসীর স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে চেয়ে ইংরাজ কোনও দিনই এই ঐক্য সাধনে সচেষ্ট হয়নি। তাইত ভারতের বর্তমান অবস্থা নিয়ে যাঁরা বিদ্রূপ করে থাকেন অথচ বিচার করে দেখেন না, তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না যে প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার যদি সম্ভব হতো, তা হলে ভারতে জাতীয় মহাসমিতির অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনই আজ ছিলনা। ইংরাজের গড়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ছায়াতলে বসে আমরা নিশ্চিন্তই থাকতাম। ভারতের নিজস্ব জাতীয়তাভাবের ভিত্তির ওপর বর্তমানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠেনি বলেই এই দেড়শত বছরের এই কৃত্রিম ঐক্য আমাদের দিক দিয়ে যেমন হয়েছে নিরর্থক, শাসকের পক্ষে এ তেমনি হয়েছে সার্থক ও লাভজনক।

প্রাচীন ভারতের ঐক্যবোধ মূলতঃ ছিল সংস্কৃতিগত অর্থাৎ cultural; অতীত ভারতে ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয়নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে রাখা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে ভারতের এই সংস্কৃতিগত ঐক্যের অন্তরালে এমন একটা

ও দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দা অপমানে।

ভনসেন্ট স্মিথ্ তাঁর 'Oxford History of India' বইতে স্বীকার ছন—'India beyond all doubt possessed a deep rlying fundamental unity far more profound either eographical isolation or by political suzerainty." তর প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা যাঁরা করে থাকেন তাঁরাই ন, যে ভারতের জীবনস্রোতে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যের প্রচ্ছন্ন ছিল, একাত্মীয়তার বন্ধন প্রাচীন ভারত জাতিধর্মনির্বিশেষেই র করে নিয়েছিল। যুগযুগান্তর ব্যাপী ভারতে চলেছিল এক ঐক্যের সাধনা ; ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকে কত জাতি, কত ভারতের উপকূলে এল, ভারতের জীবনধর্মে তাদের প্রভাব বিস্তার না, ভারত তার আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা বাইরের সমস্ত চিন্তা, সংস্কৃতি সাৎ করে নিল। কিন্তু তখন সংস্কৃতিগত যে ঐক্যবোধ ভারতের তে শিকড় গেঁধেছিল, তার পেছনে ছিল না রাষ্ট্রীয় সংহতি বা রাষ্ট্রীয় না। সংস্কৃতিগত ঐক্যের দিক দিয়ে জাতি সমৃদ্ধিবান ছিল। কিন্তু ন ছিল রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক দিয়ে। তাই ইতিহাসের পুরোগামিনী যখন শুরু হলো, দুর্দিন যখন এল এই দেশে, তখন সংস্কৃতির চলমান হলো অবরুদ্ধ, নিৰ্জীব হলো নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। উদ্ধত দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ। আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন কব্যবহারের অভ্যাস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্ব্বজনের প্রশস্ত রাষ্ট্রিক চেতনার পথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলো, খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার মাঝে ছন্ন করলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে। রাষ্ট্রগত ঐক্যের ক ভারত তাই হয়ে পড়লো অকিঞ্চিৎকর। সেদিনের চিন্তানায়কগণ মিলনের কথা বলেছিলেন, সে মিলন, সে ঐক্য মনুষ্যত্বের সাধনায়, বুদ্ধি অহঙ্কার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সাধনায় । মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম্ম আছে সেই নিত্য আদর্শ সে রেই উপযোগী ছিল। বর্ত্তমানের যুগ তার চেয়ে তখনকার চেয়ে অনেক দিয়ে জটিল হয়ে উঠেছে। সেদিনের আদর্শ তাই আজ তাই অনেক ত্রেই অচল। ভারতের ঐক্যের বার্ত্তা প্রাচীন যুগে যে বাণীতে ঘোষিত ছিল আজ সেই বার্ত্তা অন্য কথায় অন্য ভাবে আমাদের প্রচার ও পালন তে হবে।

ভারতের পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখন তাকালে চলবে না। নকার সংস্কৃতিগত ঐক্য আজকের দিনে আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য তে পারবে বলে মনে হয় না। ভারতের জাতীয়জীবনের ভগ্নভিত্তির ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরায় তা ও জড়তার প্রভাবে অনেকখানি স্থূলকায় হয়ে উঠেছে। আমাদের গ্রত রাষ্ট্রীক চেতনার দিনে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো এই সহস্র খাশ বন্ধন থেকে জাতীয়তার পঙ্কিল মনোবৃত্তিকে মুক্ত করতে নির্ভয়ে সর হওয়া। বিস্মৃতির গভীর তলদেশ থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ই হলো আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের তথা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কথা।

আগে বলেছি আজকের দিনে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ ইংরাজশাসকের কাছে ; তবে এ ঐক্যের লক্ষ্য ছিল শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধটাকে সজীব ও সুদৃঢ় রাখা। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এই ঐক্যের ভেতর দিয়ে দেখা দিল একটা উদ্দীপ্ত ও প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ বা ন্যাসনালিজম্। সংযুক্ত ও স্বাধীন ভারতের চিন্তা আজ এই জাতীয়তার ভাবধারাকে আশ্রয় করেই ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করেছে। এই জাতীয়তাভাব আমাদের মধ্যে আচমকা এসেছে বললে ভুল হবে—এই ভারতেরই মাটিতে হাজার বছর ধরে যে ঐক্যভাব পুঞ্জীভূত ছিল তারই স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে আজকের এই সুসংস্কৃত জাতীয়তাবোধ দেশের সমস্ত নরনারীর চিন্তাকে আশ্রয় করেছে। আমাদের শাসকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই জাগরণ। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁরা কিছুতেই এই জাগরণকে মেনে নিতে পারেন নি। নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম যে ঐক্যের পথে আমাদের নিয়ে চলেছে তার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সর্ব্বসংরিক্ত এই জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মূর্ত্তরূপ হলো কংগ্রেস। এই প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে আন্দোলন চলেছে তারই জঠর থেকে উদ্ভূত হয়েছে আজকের দিনের নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় ঐক্য। ভারতের এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তাই কংগ্রেসেরই ইতিহাস। ইংরাজের তথাকথিত সুশাসনের ছায়াতলে বসে ভারত যে কোনওদিন স্বায়ত্বশাসনের স্বপ্ন দেখবে না—এই ধারণাই ভারতবাসীর চক্ষে ইংরাজ শাসনকে আজ অনেকটা হীন করে তুলেছে। আমাদের স্বায়ত্বশাসনের যোগ্যতার বিচার করতে গিয়ে শাসকসম্প্রদায় পদে পদে যে ভুল করেছেন তাঁরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আজ এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়েছে। যে বিক্ষোভ ও বেদনার ভেতর দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য আজ তার লক্ষ্য সাধনের পথে চলেছে সেখানে আমাদের আরও তীব্র সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। দলগত ভেদ ও বৈষম্য যে এখনও নেই তা নয়, বরং এখনও সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা আমাদের অগ্রগতির পথে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে, তবু একটা অখণ্ড জাতীয়তাবোধ ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর ভেতর এমনই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে যে অদূর ভবিষ্যতে এসব জিনিস ঐক্যের অন্তরায় হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কংগ্রেস জাতীয়তার যে আদর্শ আজ দেশের নরনারীর সম্মুখে ধরেছে তা ভারতের ঐক্য সাধনাকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেনি, তাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করে দিয়েছে। তাই তো মুক্তিসংগ্রামের নরনারী আজ বলিষ্ঠ হাতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জয়পতাকা ধরে সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মত বহন করে নিয়ে চলেছে। জাতীয়তার বোধকেই ঐক্যের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করে তোলার যে গুরুভার দায়িত্ব আমাদের ওপর আজ ন্যস্ত হয়েছে তা যেন আমরা অবিচলিত ধৈর্য্যে বহন করি। আমাদের সম্মিলিত ঐক্য সাধনা নবীন ভারতকে যেন সব দিক দিয়ে জয়যুক্ত করে তোলে। *

* পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুমত্যানুসারে "Foreign Affairs" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত 'The unity of India' প্রবন্ধের সারাংশ। অনুবাদক—মণি বাগচি।

ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি

অতুল দত্ত

(রাজনীতি)

গত মার্চ্চ মাসে খ্যাতনামা বৃটীশ সাংবাদিক মিঃ ভারণণ্ বার্টলেট্ সাময়িকভাবে কলিকাতায় অবস্থানকালে বৃটীশ পররাষ্ট্র-নীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের ভীরুতায় শতকরা নব্বই জন ইংরাজ নিজেকে অবনমিত মনে করিতেছে।" বাস্তবিক পক্ষে গত কয়েক বৎসরকাল ধরিয়া বৃটেন্ তাহার পররাষ্ট্রনীতিতে যেরূপ ভীরুতা ও দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে প্রত্যেক আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজের পক্ষে নিজেকে অবনমিত মনে করা স্বাভাবিক। জাপান যখন মাঞ্চুকো অধিকার করে তখন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ধুরন্ধর বৃটেন্ নির্ম্মম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে, ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে ইটালীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে অর্থনীতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও সে সাহসী হয় নাই; অথচ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি অনুসারে চীন এবং আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে সে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাহার পর জার্ম্মাণী যখন একটার পর একটা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, তখন তীব্র প্রতিবাদ-জ্ঞাপন ত দূরের কথা—বৃটেন তাহার নিতান্ত অনুগত ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণীর সহিত নৌচুক্তি করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জার্ম্মাণীর উপনিবেশের দাবী সাময়িকভাবে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহাকে মধ্য-ইউরোপে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়াছে। আবিসিনিয়া-যুদ্ধের সময় বৃটেন্ কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু না করিলেও হাবসী-সম্রাট হাইলে-সেলাসীর পক্ষাবলম্বন করিয়া ইটালীর তৈল সরবরাহ বন্ধ সম্পর্কে শলাপরামর্শ করিয়াছিল, গরম গরম বক্তৃতাও করিয়াছিল। কিন্তু আবিসিনিয়া-যুদ্ধের পর ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বৃটেন্ ইটালীর সহিত ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে চুক্তি করিতে অগ্রণী হইল। তাহার পর যখন স্পেনে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল, তখন প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার প্রহসন চলিলেও ইটালী ও জার্ম্মাণীর রক্ত চক্ষুতে সন্ত্রস্ত থাকিয়া বৃটেন্ সর্ব্বদা প্রকারান্তরে স্পেনের বিদ্রোহী দলকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। বৃটেনের এই ক্রমবর্দ্ধমান দৌর্ব্বল্যের চরম প্রকাশ ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে। এই চুক্তি সম্বন্ধে অনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৃটেনের ন্যায় পাকা সাম্রাজ্যবাদী ও আন্তর্জ্জাতিক রঙ্গমঞ্চের পাকা অভিনেতার পক্ষে এই শোচনীয় দৌর্ব্বল্যের কারণ কি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, ফ্যাসিষ্ট শক্তির নিকট বৃটেন যদি এইরূপ হীনতা স্বীকার না করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইত; অথচ বৃটেন্ এক্ষণে কিছুতেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে চাহে না। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ, আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘর্ষে অবতীর্ণ হইবার মত সমরোপকরণ তাহার নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক মার্কিণ সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে, আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় ইটালীর তৈল সরবরাহ যদি সত্যই বন্ধ হইত, তাহা হইলে সে এক সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিকট মস্তক অবনত করিত। কিন্তু বৃটেন্ ইটালীর মস্তক অবনত না করাইয়া তাহার নিকট রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মস্তক অবনত করাইলেন এইজন্য যে ইটালীর রণপোত মল্টা আক্রমণ করিলে তাহার সহিত পনের মিনিটকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার মত গোলাগুলী বৃটীশ রণপোতে ছিল না। তাহার পর বৃটেনের অধিবাসীদের মন হইতে গত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও মুছিয়া যায় নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে যেরূপ বিমান হইতে বোমা বর্ষণের প্রাবল্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডের অসংখ্য নগর, এমনকি রাজধানী লণ্ডনও আর নিরাপদ নহে। গত নভেম্বর মাসে শান্তির প্রস্তাব লইয়া লর্ড হ্যালিফাক্সকে হিট্‌লারের নিকট পাঠাইতে প্রথমে মিঃ চেম্বারলেন্ আপত্তি করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, তখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার ইটালীকে শান্ত করিবার চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে। সে সময়ে মিঃ চেম্বারলেন্‌কে এই বলিয়া সম্মত করান হয় যে, জার্ম্মাণীর সহিত আর কোন সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কা নাই—এই

াগ দেশবাসীকে না দিতে পারিলে আগামী নির্ব্বাচনে ান গভর্ণমেণ্টের জয়ের আশা নাই।

উল্লিখিত দুইটী কারণ ব্যতীত ফ্যাসিষ্ট শক্তির নিকট নের হীনতা স্বীকারের আরও একটা বিশেষ কারণ ছ। গত কিছুকাল ধরিয়া ফ্যাসিজম্ ও বল্‌শেভিজম্ দুইটী মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গুলি দুইটী দলে বিভক্ত হইতেছে। বৃটেনের বর্ত্তমান নমেণ্টের মুখপাত্রগণ একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, দল গঠনের বিরোধিতা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ারা "দুই কূল" রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টাও করিয়াছেন। ন্তু ইহা তাঁহারা নীতি হিসাবে করেন নাই—অবস্থার কে বাধ্য হইয়াই করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বৃটেন্ ফ্রান্স, জেকোস্লোভেকিয়া ও সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ত হয়, একমাত্র তাহা হইলে ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট ঔদ্ধত্য করা সম্ভব। বিশেষতঃ এক্ষণে সোভিয়েট রুশিয়ার রিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু ধনিক-প্রভাবান্বিত শ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত অন্তরে রে মিলিত হওয়া ও সহযোগিতা করা কখনও সম্ভব । পক্ষান্তরে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের উপনিবেশ-ক্ষুধা প প্রবল, তাহাতে বিরাট উপনিবেশের অধিকারী ন্ তাহাদিগকে অন্তরের সহিত স্বাগত বলিয়া আহ্বান রবে কেমন করিয়া? বৃটেনের রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট রূপ দোটানায় পড়িয়া তাহাদের পররাষ্ট্রনীতিকে অত্যন্ত মঞ্জস্যহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ টনের এই অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা জানে; তাহারা বুঝে যে াহাদের অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যের বিরোধিতার জন্য বৃটেন্ খনও সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিলিত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে বৃটেনের রক্ষণশীল দলের মনোভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। রক্ষণশীল দল হিট্‌লার তাঁহার বন্ধু মুসোলিনিকে বল্‌শেভিজমের বিরুদ্ধে রক্ষা-াচীর স্বরূপ মনে করেন। মনে রাখিতে হইবে, হিট্‌লার াপনার স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যেকটী উপায়কেই বল্‌শেভিজমের রুদ্ধে রক্ষাপ্রাচীর আখ্যা দিয়া থাকেন। বৃটেনের রক্ষণশীল-লও হিট্‌লারের ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিতেই ইউ-রোপকে দেখিতেছেন। স্পেনের ফিউড্যালতন্ত্র-বিরোধী কম্যুনিষ্ট (Red) আখ্যা দিয়াছেন। জেকোস্লোভেকিয়ার উদারনৈতিক গভর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধিতে বৃটেনের রক্ষণশীল দল "লাল আতঙ্কের" স্বপ্ন দেখেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মঃ সতেঁ, দেল্‌বো ও লিওঁ ব্লুমের নেতৃত্বে ফ্রান্সে চরমপন্থীর ছদ্মা-বরণে কমুনিষ্টগণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই সম্পর্কে হার হিট্‌লারের প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েব্‌লসের প্রচারকার্য্য বৃটেনের রক্ষণশীল দলের মধ্যে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও করে নাই।

এক্ষণে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা-বলী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বৃটেনের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন্ বহুদিন হইতে ইটালীকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত সেপ্‌টেম্বর মাসে আলোচনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু তখন ভূমধ্য-সাগরে জলদস্যুর উৎপাত আরম্ভ হওয়ায় সমগ্র ইউরোপ—প্রকাশ্যে না হইলেও অন্তরে অন্তরে—ইটালীর উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। কাজেই তখন শান্তির আলোচনার কথা সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া যায়। তাহার পর গত নভেম্বর মাসে মিঃ চেম্বারলেন পুনরায় ইটালীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার গিল্ডহলের ও এডিনবরার বক্তৃতায় ইটালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি মানব চরিত্রের মহত্বে বিশ্বাসী। যে সকল জাতি আন্তর্জ্জাতিক বিধান মানিয়া চলিবে তাহাদিগের সহিত তিনি শান্তিতে বাস করিতে চাহেন। এই সময় আবার সুদূরপ্রাচীর সমস্যা ঘনীভূত হইয়া উঠে, ব্রাসেল্‌স্-সম্মিলনী আহূত হয়। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক বিধানের প্রতি "ভক্তি প্রণত" (?) ইটালীর সহিত মিঃ চেম্বারলেনের শান্তির আলোচনা তখনও সম্ভব হয় নাই। শুনা যায় মিঃ চেম্বার-লেন্ ব্যক্তিগতভাবে মুসোলিনিকে একখানি পত্রও লিখিয়া-ছিলেন।

বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেন জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিকট দৌর্ব্বল্য প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন। গত নভেম্বর মাসে তাঁহার অজ্ঞাতে লর্ড হালিফ্যাক্সকে জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন, এমন কি পদত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, প্রধানতঃ মিঃ ইডেনের বিরোধিতাই মিঃ চেম্বারলেনের পক্ষে

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে মিঃ চেম্বারলেন্ যখন ইটালীর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তখন মিঃ ইডেন্ প্রবল আপত্তি করিলেন। স্পেন হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য অপসরণ প্রসঙ্গ মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে ইটালীর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। মিঃ ইডেনের ধারণা ছিল, কোনরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন না করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তির তোষামোদে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ঔদ্ধত্য প্রশ্রয় পাইবে। তিনি কমন্স সভায় তাঁহার শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি অদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব—প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি দিন একটীর পর একটী আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘিত হইয়াছে—শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রগুলি বলপূর্ব্বক তাহাদের মনের মত রাজনীতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা সকলেই আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব-পালনের প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হইতেছি। বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দেশের পক্ষে দৃঢ়তা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।" মিঃ চেম্বারলেন্ পুনঃ পুনঃ শান্তির বাণী উচ্চারণ করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উদ্ধত ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়কে শান্ত না করিলে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই ভীরুতাপ্রসূত যুক্তির উত্তরে মিঃ ইডেন্ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "বিরুদ্ধ শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর সমক্ষে আমরা যদি আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে কখনই ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবে না।" মিঃ ইডেন্ বিশ্বাস করিতেন—ইটালী ও জার্ম্মাণী যতই বহ্বাস্ফোট করুক, প্রকৃতপক্ষে তাহারা অন্তঃসারশূন্য; আর্থিক অনটনে তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কাজেই বৃটেন্ যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই দুইটা শক্তি ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে।

যাহা হউক, গত নভেম্বর মাসের ন্যায় এইবার মিঃ চেম্বারলেন তাঁহার তরুণ পররাষ্ট্রসচিবকে পদত্যাগ হইতে নিরস্ত করিতে আর চেষ্টা করিলেন না। মুসোলিনিকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি এতদিন যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি আর মিঃ ইডেনের দিকে দৃক্পাত করিলেন না। মিঃ ইডেন্ পদত্যাগ করিলেন—হইতে অপসৃত হইল। তাহার পর বৃটীশ প্রতিনিধি লর্ড পার্থ ইটালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানোর সহিত নিভৃতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই আলোচনা কালে মধ্য-ইউরোপে অকস্মাৎ বিরাট রাজনীতিক ভূমিকম্প হইয়া গেল। কিন্তু এইবার বৃটীশ মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ অটল; তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া একাগ্রতার সহিত রোমের আলোচনা পরিচালিত করিলেন। দীর্ঘকাল আলোচনার পর গত ১৬ই এপ্রিল তারিখের শুভ সায়াহ্নে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিপত্রের স্পেন সংক্রান্ত অংশটা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। স্পেন সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে বৃটেনের প্রস্তাব অনুসারে ইটালী স্পেন হইতে আনুপাতিক সংখ্যায় স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ করিবে। নিরপেক্ষতা-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে এই অপসারণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। সমস্ত ইটালীয় সৈন্য অপসৃত হইবার পূর্ব্বেই যদি স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয়, তাহা হইলে ইটালী তৎক্ষণাৎ স্পেন হইতে অবশিষ্ট ইটালীয় সৈন্য এবং সমরোপকরণ ফিরাইয়া আনিবে। ইটালী ঘোষণা করিয়াছে যে স্পেন, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অথবা স্পেনের অধিকৃত মরক্কোর কোন অংশে সে অধিকার বিস্তার করিতে চাহে না; এই সকল অঞ্চলে কোন বাণিজ্যগত বিশেষ সুবিধা লাভ করাও তাহার ইচ্ছা নহে।

সংবাদপত্রের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষ আরাগণ উপত্যকায় অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। তখন এই গৃহ-যুদ্ধের গতি দেখিয়া সকলেই সরকারপক্ষের জয়ের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্পেনের প্রধান মন্ত্রী সিনোর নেগ্রীণের ভাষায় তখন "অধিকাংশ আন্তর্জ্জাতিক সংবাদপত্র স্পেনের সাধারণতন্ত্র ও তাহার অধিবাসীদিগের সমাধি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" ইঙ্গ-ইটালীয় আলোচনা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর—এমন কি রোমে যখন ইঙ্গ-ইটালীয় আলোচনা চলিতেছিল তখনও—ইটালী স্পেনে প্রচুর সমরোপকরণ এবং বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। প্রধানতঃ এই সমরোপকরণ ও ইটালীয় সৈন্যের সাহায্যেই

জেনারল ফ্রাঙ্কোর নিশ্চিত বিজয় সম্বন্ধে মুসোলিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; এইজন্য ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে স্পেনের বৈদেশিক স্বেচ্ছাসৈন্য ও সমরোপকরণ অপসারণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত সর্ত্ত যোজনায় তিনি আপত্তি করেন নাই।

স্পেনের কোন অংশে মুসোলিনী অধিকার বিস্তার করিতে চাহিবেন না ইহা স্বাভাবিক; কারণ স্পেনীয় জাতি কতদূর স্বাধীনতাপ্রিয় এবং ফ্রাঙ্কোর অধিকৃত অঞ্চলে ইটালীর প্রভাব সেখানকার অধিবাসীকে কতদূর বিক্ষুব্ধ করিয়াছে, তাহা তিনি জানেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক বৃটীশ সাংবাদিক স্পেনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হয়ত একদিন বিবদমান পক্ষদ্বয়ের সেনাপতিগণ নিজেদের বিভেদ ভুলিয়া সম্মিলিতভাবে জার্ম্মান্ ও ইটালীয় সৈন্যের বহিষ্কারে প্রবৃত্ত হইবে। এক সময়ে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, "স্পেনকে যত সহজে জয় করা (overrun) সম্ভব ইউরোপের আর কোন দেশকে এত সহজে জয় করা সম্ভব নহে; আবার স্পেনকে বশীভূত করা (conquer) যত শক্ত, অন্য কোন দেশকে বশীভূত করা তত শক্ত নহে।" মুসোলিনি তাঁহার দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এই উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে তিনি ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিট্‌লার জানেন—যুদ্ধের সময় স্পেন ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের নৌঘাটী ও বিমানঘাটীর গুরুত্ব কতখানি। তাঁহারা এ কথাও বুঝেন, স্পেনের ভূখণ্ডে তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইলেও তাঁহাদের আশ্রিত ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করিতে পারিবেন।

স্পেনে অবিলম্বে বিদ্রোহিপক্ষের নিশ্চিত জয়লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া মুসোলিনি স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরই স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সরকারপক্ষের সৈন্য অসীম বীরত্বের সহিত বিদ্রোহিগণের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতেছে। কাজেই মুসোলিনি এক্ষণে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির স্পেন সংক্রান্ত সর্ত্তটী কার্য্যে পরিণত না করিবার অছিলা খুঁজিতেছেন। ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির পর ফ্রান্সও ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে অগ্রণী হইয়াছিল। মুসোলিনি গত ১৪ই মে তারিখে অকস্মাৎ জেনোয়ায় এক সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান, কারণ- তাঁহার নিজের ভাষায়—"আমরা পরস্পরে ব্যূহের দুইটী বিপরীত দিকে অবস্থান করিতেছি—তাহারা বার্সেলোনার বিজয় আকাঙ্ক্ষা করে, আমরা ফ্রাঙ্কোর বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি।" ইটালীয় সংবাদপত্রগুলি এক্ষণে স্পেনের সরকারপক্ষে ফরাসী সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনয়নের অর্থ—মুসোলিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহেন না। স্পেন সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিতও যদি মীমাংসা হইয়া যায়, তাহা হইলে স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে পরে কোন আপত্তি তুলা আর শোভন হইবে না। কাজেই তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিরপেক্ষতা-সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটাইবার জন্য আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে, প্রধানতঃ ইটালী ও জার্ম্মাণীর আপত্তিতেই বৈদিশিক স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ প্রসঙ্গ লইয়া গত এক বৎসর কাল যাবৎ নিরপেক্ষতা সমিতিতে দীর্ঘসূত্রতা চলিতেছে।

বৃটেন্ ইটালীকে আশ্বাস দিয়াছে যে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আগামী অধিবেশনে সে আবিসিনিয়া সম্পর্কে উদ্ভূত অবস্থা "পরিষ্কার" করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। ইতোমধ্যে বৃটেন্ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কাউন্সিলে ইটালীর আবিসিনিয়া-অধিকারের বৈধতা স্বীকারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল: সে প্রস্তাব কাউন্সিলে গৃহীতও হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বৃটেনের এই শোচনীয় পরাজয় দেখিয়া মুসোলিনি নিশ্চয়ই পৈশাচিক আনন্দ বোধ করিতেছেন। আবিসিনিয়া-যুদ্ধের সময় হাবসী সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইটালীর বিরোধিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী হইয়াছিল বৃটেন্। তৎকালীন বৃটীশ পররাষ্ট্রসচিব স্যর সেমুয়েল্ হোর ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ লাভাল আবিসিনিয়ার যুদ্ধের মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আবিসিনিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটী অংশ ইটালীকে প্রদান করা হউক, অন্য অংশে সম্রাট হাই-লে-সেলাসী অধিষ্ঠিত থাকুন। তখন স্যর সেমুয়েলের স্বদেশবাসী এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। যে বল্ড্‌উইন্-মন্ত্রিসভা পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পররাষ্ট্রনীতিতে তাঁহারা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সঙ্ঘের

অত্যাচারী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা বৃটেনের অধিবাসী কিছুতেই সমর্থন করে নাই। হোর-লাভাল চুক্তির সর্ত্ত প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র বৃটেনে পররাষ্ট্র-সচিবের প্রতি এরূপ তীব্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইল যে, শেষ পর্য্যন্ত স্যর সেমুয়েল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পদ-ত্যাগের সময় স্যর সেমুয়েল্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে জনমত যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইবে, তখন অন্ততঃ আমার কোন কোন বন্ধু আমার কার্য্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন।" মাত্র দুইটী বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যেই বৃটেনের কি শোচনীয় অধঃপতন! আজ বৃটেন্ স্বয়ং যখন ইটালীর আবিসিনিয়া সাম্রাজ্য স্বীকৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন কমন্স সভায় শ্রমিক দলের ক্ষীণ প্রতিবাদ এবং লর্ড সভায় দুই এক জন সভ্যের ক্ষীণতর প্রতিবাদ ব্যতীত সমগ্র বৃটেনে অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল না! স্যর সেমুয়েলের বন্ধুগণ আজ শুধু তাঁহার কার্য্যের যৌক্তিকতাই উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য তাঁহারা এক্ষণে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘে আবিসিনিয়া সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপনকালে বৃটেন্ বলিয়াছিল যে, সঙ্ঘের অধিকাংশ সভ্য ব্যক্তিগত-ভাবে ইটালীর আবিসিনিয়া সাম্রাজ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কাজেই এক্ষণে সঙ্ঘের পক্ষে উহা স্বীকার না করা নিরর্থক। এই ক্ষেত্রে বৃটেন্ তাহার ধীরতা অবলম্বনের শক্তির পরিচয় দিয়াছে। ভারতবাসী আমরা বৃটীশ নীতির সহিত অপরিচিত নহি; আমরা জানি, কোন বিষয়ে জনমত যখন বিপক্ষে থাকে, তখন নানা অজুহাতে কালক্ষেপ করা বৃটেনের চিরন্তন নীতি। আজ প্যালেষ্টাইন সম্পর্কেও বৃটেন্ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। আবিসিনিয়া সম্পর্কেও বৃটেন্ এমন একটী সময়ের অপেক্ষায় ছিল, যখন রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য-রাষ্ট্রগুলির পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্তের ফলে ইটালীর আবিসিনিয়া অধিকারের বৈধতা-স্বীকৃতি একটী সংঘটিত-ব্যবস্থা (fait accompli) হইয়া দাঁড়ায়। মনে রাখিতে হইবে, ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ তাহাকে অত্যাচারী আখ্যা দিয়াছিল, সেই রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্যগণ যখন পৃথক্‌ভাবে ইটালীর আবিসিনিয়া বৃটেন্ প্রভৃতি সঙ্ঘের ধুরন্ধর সভ্যগণ কোন আপত্তি করে নাই।

ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে পূর্ব্বের ব্যবস্থা —অর্থাৎ এই সম্পর্কে গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বৃটেন্ ও ইটালীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা—মানিয়া চলিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, উভয়পক্ষ প্রচলিত ব্যবস্থা (status quo) মানিয়া চলিবেন। ইহা ব্যতীত ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল এবং আরব রাজ্যগুলি সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল এবং মিশর, সুদান, ইটালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকা, বৃটীশ সোমালিলণ্ড, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও উত্তর টাঙ্গানিকার শাসনব্যবস্থা ও সৈন্য-সমাবেশ সংক্রান্ত সংবাদ পরস্পরকে জানাইবার জন্য উভয়ে বাধ্য থাকিবেন। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর ও লোহিত-সাগরের নিকটে নৌঘাটী অথবা বিমানঘাটী স্থাপন সংক্রান্ত সংবাদও উভয়ে পরস্পরকে জ্ঞাত করাইবেন। ইটালী লিবিয়ার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছে। সৌদী আরব এবং ইয়েমেনের সার্ব্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বৃটেন্ মানিয়া লইয়াছে। এডেনের আশ্রিত রাজ্যে ইটালীর কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উভয়ে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, তাহারা অন্য পক্ষের স্বার্থের বিরোধী কোন প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইবে না।

ইদানীং ভূমধ্যসাগর এবং অদূর-প্রাচীতে ইটালী ও বৃটেনের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিলে চুক্তির উপরি-উক্ত সর্ত্তগুলির গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। গত কিছুকাল ধরিয়া ভূমধ্যসাগরে ইটালীর সহিত বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইতোমধ্যে ইটালী ভূমধ্যসাগরে নৌবহর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে; এল্‌বা ও টর‍্যাণ্টোয় নূতন নৌঘাটী স্থাপিত হইয়াছে এবং লিবিয়া ও ত্রিপলিতে ইটালীর সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। সর্ব্বোপরি বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ইটালীর বিমান ও সাব্-মেরিণের ঘাটী নির্ম্মিত হওয়ায় ভূমধ্যসাগর পথে সুদূর-প্রাচীর সাম্রাজ্যের সহিত বৃটেনের যোগসূত্র বিপন্ন হইয়া

অদূর-প্রাচীর আরবরাজ্যগুলিতে ইটালী ব্যাপকভাবে বৃটীশ ও ফরাসী বিরোধী চক্রান্ত আরম্ভ করিয়াছিল। ইটালীর অধিকারভুক্ত ডোডেকেনিস্, লিবিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় ৫০ লক্ষ মুসলমান অধিবাসীর বাস। এই অঞ্চলে মুসলমানদিগের "বন্ধু" সাজিয়া মুসোলিনি সমগ্র অদূর-প্রাচীর মুসলমানদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে লিবিয়ায় গমন করিয়া তিনি আরব নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাত করেন; ত্রিপলিতে ইস্‌লামের মর্য্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া বক্তৃতা করেন এবং উপহার স্বরূপ ইস্‌লামের তরবারি গ্রহণ করেন। বারি বেতার-বার্তা হইতে নিয়মিতভাবে আরবী ভাষায় বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইত। ইটালীর সংবাদপত্রগুলিতে বৃটীশ ও ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের আরবদিগের সম্পর্কে সত্য, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হইত। এই সকল সংবাদপত্র আরবরাজ্যে প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামায় যে ইটালীর গোপন হস্ত কার্য্য করিতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্যালেষ্টাইনের গ্রাণ্ড মুফ্‌তী সীরিয়ায় গমন করিয়া ইংরাজকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ যেন স্মরণ রাখে —এই সংগ্রামে আরবগণ একক নহে। গ্রাণ্ড মুফ্‌তীর এই "একক নহি" কথার অর্থ ইটালীর সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল সংবাদপত্রে প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং বৃটীশ-নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া নিয়মিতভাবে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

মুসোলিনি আরব নৃপতিগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইয়েমেনের ইমামের সহিত ইটালী গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি করিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই চুক্তি পুনরায় নূতন করিয়া স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে ইটালী ইমামের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ইয়েমেনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য উপকরণ সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইটালী হেজাজের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইব্‌ন্ সৌদের সহিত ইটালীর এই মর্ম্মে এক চুক্তি হইয়াছে যে, ইটালীর মুসলমান প্রজাগণ যখন মক্কা-তীর্থে গমন করিবে তখন ইব্‌ন্ সৌদ তাঁহাদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়েমেনের ইমাম্ ও ইব্‌ন্ সৌদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন ইটালী নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া উভয়ের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াছে।

এডেন উপসাগরের নিকটবর্ত্তী হাড্রমট্ রাজ্যে বৃটেন সম্প্রতি অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ইটালীর পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে এই অঞ্চলে বৃটেনের অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে আরব রাজ্যগুলিতে নানারূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল।

ভূমধ্যসাগর এবং অদূর-প্রাচীর রাজ্যগুলির উল্লিখিত ঘটনাবলীর কথা স্মরণ রাখিলে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির এই অঞ্চল সংক্রান্ত অংশের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই অঞ্চল সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ে ইটালীর নিকট হইতে আশ্বাস প্রাপ্তি বৃটেনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য ইটালীর এই অঞ্চল সংক্রান্ত কতকগুলি দাবী বৃটেন পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

চুক্তির একটা সর্ত্তে ইটালী বৃটেনকে এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়াছে যে সে টানা হ্রদের জল বন্ধ করিয়া নীল নদের ক্ষতি করিবে না। এই সর্ত্তটা বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৃটেন নীল-নদের উৎপত্তিস্থলে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া জয়ের পর হইতে টানা-হ্রদের উপর ইটালীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইটালী যদি এই হ্রদের জল বন্ধ করে তাহা হইলে মিশর ও সুদানের অধিবাসী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই টানা হ্রদ সম্পর্কে ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৃটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল।

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় সুয়েজ খালের অবাধ ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ব্ব ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছে। যতদূর মনে হয়, এই স্থলেই সুয়েজ খাল সম্পর্কিত চুক্তির শেষ নহে। গত আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল দিয়া সৈন্যপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইবার জন্য মুসোলিনিকে ২০ লক্ষ পাউণ্ড মাশুল দিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তদবধি তিনি সুয়েজ খাল কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগের বোর্ডে তাঁহার একজন মনোনীত ব্যক্তিকে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করাইতেছেন; সুয়েজ খাল কোম্পানী একণে ১৬ জন ফরাসী ডিরেক্টর, ১০ বৃটীশ, ১ জন

দীনেমার এবং ১ জন মিশরীয় ডিরেক্টর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। বৃটেনের দ্বারা ফ্রান্সকে প্রভাবান্বিত করাইয়া সুয়েজ খাল কোম্পানীর পরিচালনায় ইটালীকে আংশিক অধিকার দানের কথাবার্ত্তাও এই আলোচনায় হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ইটালীর সহিত চুক্তি করিবার জন্য বৃটেনই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সমগ্রভাবে চুক্তিটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই মনে হইবে, ইটালী যেন দয়া করিয়া কতকগুলি কার্য্য করিবে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একটা কার্য্য করিবে বলিয়া বৃটেনকে আশ্বাস দিতেছে; সমগ্র চুক্তিতে যেন ইহাই প্রধান কথা। এই আশ্বাস প্রাপ্তির প্রয়োজন বৃটেনের; কাজেই চুক্তির জন্য তাহার ব্যগ্রতা স্বাভাবিক। কিন্তু ইটালী এই আশ্বাস প্রদানে সম্মত হইল কেন? ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ ইটালীর অর্থনৈতিক অনটন। স্পেন তাহাকে শোষণ করিতেছে; আবিসিনিয়া এক সময়ে তাহাকে দারুণভাবে শোষণ করিয়াছে, এখনও নিয়মিত ভাবে শোষণ করিতেছে। মুসোলিনি তাঁহার নব-অধিকৃত সাম্রাজ্যের জন্য গর্ব্বে যতই স্ফীত হউন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই সাম্রাজ্য এবং স্পেন ইটালীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছে! এই জন্য ইটালী বৃটেনের নিকট হইতে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান চুক্তিতে এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হয় নাই; কারণ ইঙ্গ-ইটালীয় আলোচনা আরম্ভ হইবার সময় ইটালীকে ঋণ দান সম্পর্কে বৃটেনে দারুণ বিরোধিতা হইয়াছিল। এই সময়ে রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে আশ্বাস দিতে হইয়াছে যে, আসন্ন আলোচনায় ইটালীকে ঋণ দান সম্পর্কে কোন কথাবার্ত্তা হইবে না। কিন্তু বৃটেন নিশ্চয়ই ইটালীকে এই গোপন আশ্বাস দিয়াছে যে, জনমত প্রশমিত হইলে সে ইটালীকে অর্থনৈতিক সুবিধা দানে সচেষ্ট হইবে। এই আশ্বাস না পাইয়া ইটালী কখনই বৃটেনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় নাই। তাহার পর জার্ম্মাণীর অষ্ট্রিয়া-গ্রাস ইঙ্গ-ইটালীয় আলোচনার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তিতে সহায়তা করিয়াছে। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত হওয়ায় ইটালী একটু চিন্তিত হইয়াছিল এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মাণীকেই একমাত্র বন্ধুরূপে ধরিয়া থাকিতে সাহসী হইতেছিল না। কাজেই ইটালী তখন বৃটেনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছে।

দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসলে পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। একে ত গৃহিণীর আপত্তি ছিল, তাহার উপরে আমার রসচেতনায় বেদনা পাইতাম। শ্রী নাই, ছন্দ নাই, ভঙ্গি নাই, একটা পরুষ পুরুষ মূর্ত্তি রান্নাঘরের মধ্যে উঁচু হইয়া বসিয়া কাব্যহীন গদ্য হস্তে রন্ধন করিতেছে তাহা কল্পনা করিতেও ক্লেশ বোধ হইত। মনে হইত রান্নার যেন কান্নার সহিত একটা রসগন্ধী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, উহার মধ্যে কোনটাই কোন বাহ্যপ্রেরণায় ফুটিতে পারে না—হৃদয়ের অন্তঃস্থলতলে উচ্ছ্বসিত রক্ত-প্রবাহের তাপ এবং আকুলতার স্পর্শ না পাইলে রান্না মুখের না হইলেও মনের অপাঙ্ক্তেয় হইয়া যায় এবং কান্না নিতান্ত মুখ ভ্যাঙাইয়া বিদ্রূপ করিতে থাকে।

স্ত্রী রন্ধন করিতেন, দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম। মনে হইত এ যেন রন্ধন নহে ও যেন সুরপরীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। কয়লার উনুনের লুব্ধ কবি-দৃষ্টি প্রিয়ার মুখের উপরে তৃষ্ণায় লাল হইয়া উঠিত; কখনও ভিজে চুল পিঠের উপরে এলাইয়া দিয়া, কখনও স্নানাভাবে রুক্ষ ভাব লইয়া হাতা-খুন্তি হস্তে তিনি রন্ধন করিতেন; ওপাশে কেত্তি ক্রন্দন করিতেছে এবং রহিয়া রহিয়া ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ কল্ কল্ টুংটাং। তাহা ছাড়া শাড়ীর পাড়ের হাতছানি ও তনু অঙ্গে চারু রেখাবলীর অজস্র ইঙ্গিত আছে, মুখের হাসি আছে, ধোঁয়ার তাড়নায় চক্ষের জলেরও অভাব নাই।

কিন্তু তথাপি পাচক রাখিতে হইল। পাচিকা রাখিব ঐরূপ একটা কথার আভাস দিয়াছিলাম বটে, তবে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম—তিনি অস্বাভাবিক-ভাবে পদচ্যুত হইতে যদি বা স্বীকৃত থাকেন, তবু এক্ষেত্রে স্বাভাবিক-ভাবে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিতেও সম্মত নহেন। অর্থাৎ পুরুষ আসিয়া

গোবরলিপনা করিতেছে, রাঁধিতেছে, ভাত বাড়িয়া দিতেছে, এ যদি বা তাহার সহ্য হয়, তবু তাঁহার সংসারে অন্য কোন স্ত্রীলোককে উক্ত কর্ম্মে অধিকার ছাড়িয়া দিতে তাঁহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। সখের দলের থিয়েটারে নায়ক সাজিয়া পাড়ার গোঁফ কামান পরিমলকে প্রিয়া প্রিয়তমা ইত্যাদি বলিয়াছি এবং শুনিয়াছি চিকের আড়ালে বসিয়া স্ত্রী প্রসন্ন হাসি হাসিয়াছেন—কিন্তু ঐ স্থানে পরিমল যদি সত্যই আমাদের না হইয়া তাঁহাদের গোত্র হইত—তাহা হইলে কি তিনি সহ্য করিতেন? তিনি ছত্রপতি শিবাজীর মত ভীষণ হইয়া বেত্র বা ছত্র যাহা কিছু সম্মুখে পাওয়া যাইত তাহাই যত্র তত্র ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

সংসারে রন্ধনাদি ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা আসন্নপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, স্ত্রী তৃতীয়বারের জন্য মাতৃত্ব অর্জ্জন করিবেন এবং আমি দ্বিতীয় পিতৃত্ব বহন করিব এই ব্যাপার বাস্তবে ঘটিবার বিশেষ বিলম্ব ছিল না। তাহার উপরে গত বৎসর একমাত্র শ্যালিকার বিবাহ হইয়াছে, সে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই আসিবে এবং এইস্থানে কিছুদিন থাকিয়া দাম্পত্যবায়ু বহন করিয়া যাইবে বলিয়া চিঠি লিখিয়াছে। উপরন্তু অফিসে যদি ছুটী পাওয়া যায় তাহা হইলে কনিষ্ঠা ভগ্নী ও ভগ্নীপতিরও আসাম হইতে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বৈকালে বসিয়া চা খাইতেছি—পাথরের টেবিলটার এককোণে আমি যে অপরার্দ্ধ অধিকার করিয়া দ্বিপ্রহর-নিদ্রাস্পৃষ্ট ভারী চোখেমুখে, আলুথালু ও এলোমেলো অবস্থায় আমার স্ত্রী মঞ্জরী, দুইজনে মুখোমুখি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া আছি। আমার মনে হয় দিবারাত্রির সমস্ত সময়ের মধ্যে বৈকালের ঐ চা খাইবার সময়টাতেই আমরা উভয়ে উভয়ের নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম হইতাম। পশ্চিমের বন্ধ জানালাটার ফাঁক দিয়া টেবিলের মধ্যস্থলে একটা শীর্ণ রৌদ্ররেখা আসিয়া পড়িত, টেবিলের পাথরটা কাতর হইয়া সে দীপ্তির চাপা আভাসটুকু মঞ্জরীর মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিত, চায়ের পেয়ালা তুলিতে নয়ন মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিত—আমি তাহাকে বুঝিতে পারিতাম না, সেও আমাকে বুঝিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হইত না। মনে করিতাম ঐ শীর্ণ রৌদ্ররেখা বুঝি আমাদের ছিন্ন করিবার জন্যই উদ্যত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইত সমস্ত বিশ্বসংসার বুঝি মঞ্জরীর মত আলুথালু ও এলোমেলো হইয়া আসিতেছে। উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সমস্ত মনটা সহধর্ম্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিত এবং কেন বলিতে পারি না মনে হইত সেই সময়টা দৈনন্দিন জৈবিক আহারবিহারের বহু উর্দ্ধে, আকাশের দুইটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

চা খাইতেছি, এমন সময় বাহির হইতে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল পাচক আসিয়াছে। চাকরকে বলিলাম তাহাকে ঘরের মধ্যেই লইয়া আসিতে এবং স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিতে তিনিও কোন আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। অল্পক্ষণ পরে আগন্তুক চাকরের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রেশন্ মন্দ হয় নাই, তবে স্ত্রী নাকি বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন তাই তাঁহার মনে বিপরীত ক্রিয়া হওয়াটা আশ্চর্য্য নহে।

যেমন লম্বা তেমনি কৃশ। কিন্তু তবু প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যই তাহার চেহারার প্রথম কথা নহে। প্রথম ও শেষ কথা অন্যত্র—তাহার অপূর্ব্ব দন্তসম্পদে। দাঁতের উপরকার পাটী সুন্দর ঢাল রক্ষা করিয়া এমনভাবে এবং এতখানি বাহির হইয়া আসিয়াছে যে উপরকার ওষ্ঠ অতি কষ্টেও তাহার শেষটাকে নাগাল পাইতে পারে না। অর্থাৎ কি শীতে কি গ্রীষ্মে, প্রভাতে বা প্রদোষে, শোকে বা আনন্দে দাঁত তাহার দেখা যাইবেই এবং দস্তুরমত ভাল করিয়াই দেখা যাইবে। দাঁত অত্যন্ত পরিষ্কার এবং ঝক্ঝক্ করিতে করিতে ক্ষুদ্র ওষ্ঠান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নাসাগ্র পর্য্যন্ত নূতন ক্ষুরের মত একটা শাণিত আলো নিক্ষেপ করিতেছে।

মনে ভাবিলাম ভারতীর হস্তে বীণা থাকে, কেন না বীণা হইতে গীতকলার উদ্ভব, তেমনই পাচকের মুখে অতিদন্তসম্পদ একটী অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ, কেননা পাচকের শেষ কথা আহার্য্য এবং আহার্য্যের প্রথম কথা চর্ব্বনকলা এবং দন্ত হইতেই চর্ব্বনকলার জন্ম। বৈশ্যবুদ্ধি কানে কানে ফিস্ ফিস করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, একটা দন্তরক্ষণের আটা বা চূর্ণ তৈয়ারী করিয়া পথে ঘাটে ইহাকে দিয়া বিক্রয় করাইতে পারিলে বাণিজ্যে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু বিজ্ঞাপন দিবার কাজটা বিনামূল্যেই সাধিত হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি?" দুই হাত একত্র কপালে স্পর্শ করিয়া সে নত হইয়া নমস্কার করিল। কহিল, "আজ্ঞে আমার দুটো নাম। একটা ভালো নাম শ্রীযতীন্দ্র এবং আর একটা ডাক নাম হিমু। ডাকনামটা আমার ঠাকুমা রেখেছিলেন।"

মঞ্জরী হাসিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। হাসিটুকু শুধু পাচকপ্রবরের কথা কহিবার ভঙ্গি ও ধরণের জন্যই নহে, হাসির অন্য একটা কারণও ছিল। পাচকের ভাল নামটী অর্থাৎ যতীন্দ্র আমার নাম এবং বিবাহের পর অনেকদিন আমি আদর করিয়া মঞ্জরীকে হিমু বলিয়া ডাকিতাম। প্রথম যৌবনের মিলনোচ্ছ্বল দিনগুলিতে যখন প্রিয়া স্ত্রী পদে অবনত হইয়া পড়েন নাই, লোকে দেখিয়াছি প্রিয়ার নূতন নামকরণ করে এবং ছোট কথার ভিতর দিয়া বড় কথা ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় বলিয়া নামটী সাধারণতঃ দুই অক্ষরেরই হইয়া থাকে। মঞ্জরীর মধ্যে কেমন একটা অত্যন্ত স্নিগ্ধ ভাব অনুভব করিয়া তাহাকে প্রথমে ডাকিতাম হৈম হিমানী হৈমন্তী বলিয়া, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিমু বলিয়া ডাকিলেই মনে হইত বুঝি ভালবাসার হিমালয়শীর্ষে পৌঁছান গিয়াছে।

পাশের ঘরে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "দেখ মঞ্জরী, বামুন অনেক পাওয়া যা'বে, কিন্তু এ একাধারে তুমি ও আমি, এক চেয়ারে ঠেসাঠেসি করে গৌরী ও শঙ্কর, এ কোথাও মিলবে না। লোকে বলে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার চরম পরিণতি সন্তানে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন দম্পতি কি নিজেদের পরিণতি পাচকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে? এই ধর না, তুমি গেছ ও পাড়ার নেমন্তন্ন খেতে, তোমাহারা হ'য়ে শূন্যবাড়ীতে মনটা খাঁ খাঁ

আমি কাজে মফস্বলে গিয়েছি, তোমারও মন কেমন করছে। তুমি অবশ্য নাম ধরে ডাকবে না—স্বামীর নাম ধরতে নেই—তুমি ডাকবে "ওগো," না হয় "বাবু"। মঞ্জরী হাসিতে হাসিতে বলিল "তার চেয়ে দড়ী জুটবে না একটু গলায় দেবার?" তৎপরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "ওকে যেতে বলে দাও, ও রকম বামুন আমি রাখতে দেব না।" আমি ওকালতি করিবার উপক্রম করিতেই মঞ্জরী আবার বলিল "ও কখনো রাঁধতে পারবে না—কখনো কোথাও কাজ করেছে? ওরকম বিটকেল লোককে কেউ কখনো বাড়ীতে রাখবে না।" বাধা দিয়া আমি বলিলাম "বিলক্ষণ—কাজ করেনি কোথাও! ময়ূরভঞ্জ, নবাবগঞ্জ, অণ্ডাল, তালাণ্ডু কোন জায়গায় কাজ করতে আর বাকী নেই ওর।" গৃহিণী অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "বলেছে তোমাকে—জাতের খবর নিয়েছ?" বলিলাম "খাঁটী চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, তোমাদেরই পালটী ঘর। প্রয়োজন হ'লে তোমার সঙ্গে বিধবা কিম্বা সধবা বিয়েও চলতে পারবে।" রাগ করিয়া মঞ্জরী বলিল "যা তা বোলো না বল্‌ছি," কিন্তু রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ পাইল না, হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসিতে সাহস পাইয়া বলিলাম, "তোমার নিজের দাঁতে ব্যথা ফেলে তার অমন সুস্থ দাঁত দেখে তুমি হিংসায় রাগ করতে পার, কিন্তু জেনো—বাড়ীতে ঐ রকম একটা দন্তমান লোক থাকলে দন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হ'বে না। তা'ছাড়া ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তুমি অনায়াসে চুল বাঁধতে পার, আয়নার খরচ বেঁচে যা'বে।" মঞ্জরী রুষ্টদৃষ্টি হানিয়া এইবারে সত্যই রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং আমি পুনরপি শ্রীযতীন্দ্রের কাছে পাশের ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

সে যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত আমারই জয় হইল—পাচককে নিযুক্ত করিয়া ফেলিলাম। দেখা গেল মন্দ নির্ব্বাচন করি নাই, সত্যই সে নিপুণ রাঁধুনি। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজ করে এবং থোড়ের ছেঁচ্‌কী হইতে আরম্ভ করিয়া পোলাও মাংসের ডেক্‌চি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার ওস্তাদি হাতের পরিচয় পাওয়া গেল।

মুস্কিল বাধিল নাম লইয়া। সাধারণতঃ ঠাকুর বলিয়াই পাচককে আহ্বান করা হয়, কিন্তু মঞ্জরী তাহাতে স্বীকৃত হইল না, কেননা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে সে ঠাকুর বলিত। আমার নামে তাহাকে ডাকা হয় তাহাতেও মঞ্জরীর ঘোর আপত্তি। সেদিন খাইতে বসিয়াছি, আর একখানি মাছ লইব, ডাকিলাম "হিমু"। স্ত্রীকে ইদানীং ঐ নামে ডাকিতাম না, কিন্তু পাশের ঘর হইতে মঞ্জরীই প্রথমে আসিল। বলিল, "দেখ তুমি যদি ঐ নামে ওকে আবার ডাকবে, তা'হ'লে আমি তক্ষুনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।" দাম্ভিক হিমু আসিয়া মাছ দিয়া চলিয়া যাইবার পর মঞ্জরী আবার বলিল "ছি ছি, ঘেন্না করে না তোমার ওকে আমাদের সেই আদরের নাম বলে ডাকতে? ভালবাসা ভালবাসা বলে এত চেঁচাও, এই বুঝি তোমার ভালবাসা?"

মাছ খাইতে খাইতে ভাবিলাম কথাটা মিথ্যা নহে। আদরের ছোট একটা নামের মধ্যে অতবড় দাঁতের পাটীর স্থান মেলা সম্ভব হইবে না। কিন্তু কি দিয়া পাচককে ডাকা হইবে? নাম ত একটা চাই। মঞ্জরীকে বলিলাম, তা' হ'লে ওর একটা নাম রাখ"। কিন্তু মঞ্জরী কিছুতেই রাজী হইল না। বলিল, "বয়ে গেছে, আমার নাম রাখ্‌তে। ওকে দাঁত বলে ডাকলেই পার।"

মনে ভাবিলাম দাঁতের প্রতি এমন নিষ্ঠুর অপক্ষপাত মঞ্জরীর নেহাৎ অন্যায়। বলিলাম, "বেশ আমিই ওর নতুন নামকরণ করছি।" বলিয়াই পাচককে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম "দেখ আজ থেকে তোমাকে সবাই অন্য একটা নতুন নাম দিয়ে ডাকবে। তোমার কোন আপত্তি আছে?"

হিমু খুন্তি হাতেই চলিয়া আসিয়াছিল, সেটা শুদ্ধ হাতজোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমার আপত্তি থাকবে কেন? আপনারা আমাকেই যখন রেখেছেন, তখন একটা নাম রাখলে আপত্তি করবো কেন বাবু?"

বলিলাম "আজ থেকে তোমার নাম রইল দ্রৌপদী। আমাদের শাস্ত্রে আছে দ্রৌপদী খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, তাই জন্য কথায় বলে রন্ধনে দ্রৌপদী।"

যুক্ত হস্ত মুক্ত না করিয়াই পাচক বলিল "দ্রৌপদী? কোন দ্রৌপদী? সেই যার পঞ্চস্বামী ছিল?" মঞ্জরী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পাচক আবার বলিল, "দেখুন বাবু আপনি মনিব, আপনাকে মিথ্যা বলব না, বংশরক্ষার জন্যে তৃতীয়বার যাকে বিয়ে করিছি তারও নাম দ্রৌপদী। কিন্তু ঐ পঞ্চস্বামীর হাঙ্গাম আছে বলে আমি স্ত্রীর নাম বদলে দিয়েছি। তবে যাক, আমাকে ও নামে ডাকলে ক্ষতি নেই।"

আমি বলিলাম, "তবে ত আরও ভালই হ'ল হে! ঐ নামে ডাকলে তোমার স্ত্রীকে মনে পড়বে, সেটা তোমার ত ভাল লাগবারই কথা।" নীচের দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া দ্রৌপদী রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

মঞ্জরী আসিয়া ভৎসনা করিতে লাগিল, "বামুন চাকরের সঙ্গে ইয়ারকি করতে তোমার লজ্জা করে না? দু'দিন বাদে ওরা যে মাথায় চড়ে বসবে।"

বলিলাম, "পঞ্চপাণ্ডব পাঁচটা মাথার উপরে যাকে রাখতে পারেননি, তাকে মাথায় তুলতে পারাটা পৃথিবীর মধ্যে মাথা হ'য়ে দাঁড়াল।"

"ঐ দ্রৌপদীই তোমার মাথা খারাপ করবে" বলিয়া বিরক্ত হইয়া মঞ্জরী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

ইহার দুইচারিদিন পরেই আম্রমুকুল ও ফুল্লবকুলের পিছনে পিছনে দূরাগত দক্ষিণপবন ও কুহুচ্ছ্বাসের মত নব ফাল্গুনে আমার আমার বৎসরের শ্যালিকা বল্লরী সহকারটীকে বেষ্টন করিয়াই আসিয়া পড়িল। কার্য্যের চাপে ষ্টেশনে যাইতে পারি নাই, গাড়ী পাঠাইয়াছিলাম, অতএব আমার পড়িবার ঘরেই তাহার সহিত প্রথম দেখা। ঘরে ঢুকিতেই আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলাম:

এস বল্লরী, এসেছে ফাগুন,
দাউ দাউ জ্বলে তৃষ্ণা আগুন,"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া শ্যালিকা পদপূরণ করিয়া দিল। কহিল,

"গুঞ্জন করি এবারে আগুন—
লুব্ধ ভৃঙ্গ সম!

আমি বলিলাম—"না, না, এবার শুধু জাগা নয়, এবার আশা শেষ-স্পর্দ্ধী,

এবারে ভৃঙ্গ সুদূর পিয়াসী
গৌরীশৃঙ্গ পরশ তিয়াসী,
এবারে মধুর সঞ্চয়টুকু
নিশ্চয় জেনো মম !"

বল্লরী হাসিয়া বলিল—'চেষ্টা করুন, আশা মিট্‌তেও পারে !"

মঞ্জরী আসিয়া অনুযোগ করিল—"ওকে কাপড়চোপড় ছাড়তে দেবে ?"

দীর্ঘপথ অতিক্রমণের পর টেণ হইতে সদ্যনামা সুন্দরী নারীকে আমার বড় ভাল লাগে। মনে হয় সুদূর সামরিক যুগে ফিরিয়া গিয়াছি, কোন রাজকন্যাকে বুঝি দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত্র কাল ঘোড়ায় করিয়া অন্তঃপুর হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তার পর ছাড়িয়া দিয়াছে। এলোমেলো ভাব, জাগরণক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ, কেশে ও বেশে কয়লা ও ময়লা আমার কাছে অত্যাচারের গল্প বলে। বল্লরীকে দেখিয়া সেই কথাই আমার মনে পড়িয়া গেল। স্ত্রীকে বলিলাম—"দাঁড়াও মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কবিতা অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে। রেলের কাপড় ছাড়লেই কবিতা ফেল হয়ে যাবে।" বীণাপাণি মনোমধ্যে আবির্ভূতা হইলেন, বলিলাম :

"রেল হ'তে এল শ্যালিকা !
পেল্‌ পেল্‌ ভাব যেন অকরুণ,
বিলাস-দলিত মালিকা।
রেল হ'তে এল শ্যালিকা !"

বল্লরী ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল :

"উঁহু সাধ হয় গলে দিয়ে মরি—
ছেঁড়া কাপড়ের ফালিকা।
রেল হ'তে এল শ্যালিকা !"

বলিলাম—"ব্যঙ্গ নয়, শোন :

কষ্ট নিশার চখেমুখে ছাপ
রং ওঠা ঠোঁটে বেদনা প্রলাপ,
তন্দ্রাপীড়নে ঢুল্‌ ঢুল্‌ আঁখি
অর্দ্ধ মুদিত কলিকা !
রেল হ'তে এল শ্যালিকা !"

মঞ্জরী বলিয়া উঠিল—"থাম কবিপ্রবর, হ'য়েছে। রসালাপের অনেক সময় পাবে।"

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—"আরও একটু।" তৎপরে :

"তৃষিত বুঝি সে দুরন্ত রাজা
অপহরি দিল নিঠুর সাজা,
চখেমুখে কালী, এলোমেলো চুলে
এল বন্দিনী বালিকা।
রেল হ'তে এল শ্যালিকা !"

বল্লরী কলেজের পড়া মেয়ে—উত্তর দিল :

হায় গো পিয়াসী পাবে না যা' কভু
কেন হানো আঁখি তার পিছু তবু
কত কর নিল তস্কর রাজা
কেন কর' ব'সে তালিকা ?
রেল হ'তে এল শ্যালিকা !

এমন সময়ে কি একটা কাজে দ্রৌপদী আসিয়া উপস্থিত। রসভঙ্গ হইল সন্দেহ নাই, তবে মনে হইল শকুন্তলা নাটকে সেই যে মত্তহস্তী কমলবন মথিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমাদের কুঞ্জবনে বুঝি সেই মহাকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং আমরা কেবলমাত্র তাহার দাঁত দেখিতে পাইতেছি।

কিছুক্ষণ পরে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া ভিজে শিউলি ফুলটার মত বল্লরী আসিয়া প্রণাম করিল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"আরে কর কি ! প্রণাম কোরো না—প্রণাম পার্থক্যবাঞ্জক, পার্থক্য আমার সহ্য হ'বে না বল্লরী। আমি যে আমার সমস্ত পার্থক্য হারিয়ে ফেলবার জন্যে বন্যার নদীর মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছি"—পিছনে পিছনে বল্লরীর সহকার শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিল। মনে মনে বলিলাম "তোমার সঙ্গে সশঙ্ক-পার্থক্য থাকাই মঙ্গল।" বল্লরী পরিচয় করাইয়া দিল, "মুখুজ্জে মশাই, তুমি ত বিয়ের সময় গেলে না, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। ইনি আমার—" আমি বাধা দিয়া কহিলাম "তোমার টীকাকার। তুমি মহাকাব্য, আর ইনি তোমার মল্লিনাথ। কিন্তু জানো বল্লরী, আমি সম্প্রতি আমার নাম পরিবর্ত্তন করেছি। তুমি বল্লরী আর আমি সহকার।" শশাঙ্ক বলিল "তা হ'লে আমি ?" আড়চোখে মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া কহিলাম "মাভৈঃ, বিশ্বজগতে শশাঙ্কের অগম্য স্থান নেই, নব ফাল্গুনে মঞ্জরী যে আবার প্রস্ফুটিত হ'তে চায়, পাণ্ডুর মুখশ্রী নিয়ে সে তোমারই অপেক্ষা করছে।" মঞ্জরী চাপা গলায় বলিয়া উঠিল "নির্লজ্জ !"

আমাদের সাঁওতালি বালকভৃত্য বেণুয়ার বয়স দশ বৎসরের বেশী হইবে না। আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে তাহাদের বাড়ী। তিন বৎসরের বেশী হইল সে আমাদের কাছে আছে। একদিন কলেরা হইয়া বাপমা দুজনেরই মৃত্যু হয়—বড় ভাই আছে, ভাজ আছে, কিন্তু বেণুয়া সেখানে টিঁকিতে পারিল না—আমাদের সাঁওতালি চাকরের সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া পড়িল এবং মঞ্জরীকে পাইয়া বসিল। সুস্থ পুষ্ট দেহ, মনে হয় যেন কোন শিল্পী আন্তরিক আগ্রহে কাল পাথর কুঁদিয়া তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে। মাথায় প্রচুর ঢেউ খেলান চুল এবং মুখে হাসি অবিশ্রাম লাগিয়া আছে।

একটু আধটু লঘু কাজ করিত, কিন্তু সেজন্য মঞ্জরী তাহাকে তাগাদা করিত না। মা বলিয়া ডাকিত, কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছিল বেণুয়ার উপরে। বেণুয়া কলিকাতা দেখিবে বলিয়াছিল বলিয়া সেবার কলিকাতা যাইবার সময় মঞ্জরী বেণুয়াকে সঙ্গে লইয়া গেল এবং

শুনিয়াছি কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতে গিয়াছে, বেণুয়াকে আনন্দের ভাগ দিতে ভুল করে নাই।

কয়েক দিন পরে মঞ্জরী আসিয়া নালিশ করিল, দ্রৌপদী নাকি বেণুয়াকে দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া যায়, আড়ালে পাইলে তাহার উপর অত্যাচার করে, বেণুয়ার সকাল সন্ধ্যার জলখাবার নিজে খাইয়া ফেলে, বেণুয়াকে খাইতে দেয় না। মঞ্জরী বলিল, "নবাব, আদুরে গোপাল, বসে বসে গিলছে—এই সমস্ত বলে দিনরাত ছেলেটাকে দাঁত খিঁচোয়, দুপুরবেলা বেণুয়াকে দিয়ে পা টেপায়।" পরিশেষে বলিল "ও সমস্ত নবাবী আমার কাছে চলবে না, এই তোমাকে বলে রাখলুম। এর পরে আর কোনদিন ওকে বেণুয়ার সঙ্গে ওরকম করতে দেখলেই দূর করে তাড়িয়ে দেব। তখন তোমার দ্রৌপদীকে তুমি সামলো।"

মঞ্জরী চলিয়া গেলে বেণুয়াকে চুপি চুপি ডাকাইয়া আনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "বেণুয়া, দ্রৌপদী তোকে ভালোবাসে না?"

বেণুয়া বাঙ্গালা জানিত, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ বাবু, ভালবাসে। পয়সা দেয়, সেদিন আমাকে একটা গেঞ্জী কিনে দিয়েছে। কলকাতায় মা আমাকে যে বল কিনে দিয়েছেন, আমরা সঙ্গে ও খোকাবাবুর সঙ্গে সেই বল দিয়ে দ্রৌপদী দুপুরবেলা গোল্ গোল্ খেলে।"

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "তবে যে তোর মা বললে তোকে খাবার খেতে দেয় না?"

বেণুয়া বলিল—"তা দুদিন দেয়নি, দুদিন থেকে রাগ করেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

বেণুয়া বলিল, "আমাকে বলে বাবা বোলে ডাকতে, বলে ওর সব টাকাকড়ি ঘরবাড়ী আমাকে দিয়ে দেবে। আমি বাবা বলিনি তাই রাগ করেছে।"

সর্বনাশ! মঞ্জরীকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার উপরে দ্রৌপদীকে বাবা বলিয়া ডাকিলে মাথার উপরে বাঘের থাবা উদ্যত হইয়া উঠিবে, রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই বাবা বলিস না কেন?" কিন্তু হঠাৎ মঞ্জরী আসিয়া পড়িল এবং আমার কথার উত্তর না দিয়াই বেণুয়া পত্রপাঠ পশ্চাৎ প্রদর্শন করিল।

পরদিন সকালে আমি শশাঙ্ক, মঞ্জরী ও বল্লরী বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় বেণুয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। মঞ্জরীকে বলিল "মা, পুলের ওপরে বাবাকে ওরা মারছে।"

মঞ্জরী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকে"?

বেণুয়া তখনও হাঁপাইতেছে, বলিল, "বাবাকে"।

মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিল "কে তোর বাবা?" আমি গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছি, বেণুয়া বলিল, "দ্রৌপদী"।

মঞ্জরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কে, দ্রৌপদী? দ্রৌপদী তোর বাবা!" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল, পরে বলিল, "আমাকে মা বলে আর ডাকবি না, বুঝলি? মা বললে তোকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়াবো। যা যা বেরো আমার সুমুখ থেকে, যা তোর বাবার কাছে।" পরে আমার দিকে চাহিয়া আমাকে হাসিতে দেখিয়া মঞ্জরী অত্যন্ত রাগিয়া গেল। বলিল, "এ যে তোমার কাণ্ড, তা' আমি জানি। কিন্তু আমাকে কেন তুমি চাকর-বাকরদের সুমুখে এ রকম করে অপমান করবে?" আমি প্রতিবাদ করিলাম, বলিলাম, "তুমি মনে ভাবছো আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি, বেশ ওকেই জিজ্ঞেস কর।" বেণুয়া মুখ শুকাইয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, মঞ্জরী আবার তাহাকে তাড়া করিয়া গেল, "আবার দাঁড়িয়ে রইলি! যা বেরো—বেরিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। আজই আমি দ্রৌপদীকে তাড়াবো" বলিয়া শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জরী হাসিয়া ফেলিল।

কিন্তু ওদিকে ব্যাপার কি? বেণুয়া বলিয়াছিল দ্রৌপদীকে কাহারা নাকি মারিতেছে এবং সেই সংবাদ লইয়াই সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দ্রৌপদীকে অপমান করিতেছে—এ আবার কোন দুর্যোধনের দল? বেণুয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা গেল, তাহার মর্ম এইরূপ: বড় রাস্তার উপরে যে পাকা পুল, তাহারই এক পাশে দামোদরার পানের দোকান। দামোদরা বেণুয়াকে ভালবাসে, তাহার বদান্যতায় মাঝে মাঝে বেণুয়ার ওষ্ঠযুগল পানের রসে টুকটুক করিয়া থাকে। আজ হঠাৎ সকালবেলা দামোদরার ইচ্ছা হয় যে চুলছাঁটা শিক্ষা করিবে এবং সহরে একটা হেয়ার কাটিং সেলুন খুলিবে। একজন নাপিতের নিকট হইতে কাঁচি ও চিরুণী লইয়া বেণুয়ার মাথার উপরে তৎক্ষণাৎ দামোদরা প্রথম শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়া দেয় এবং তাহার হস্তের কাঁচি বেণুয়ার চুলের উপরে খাবলা খাবলা চিত্রাঙ্কণ করিতে থাকে। দ্রৌপদী বাজারে তরকারী কিনিতে গিয়াছিল, দামোদরার হস্তে পুত্রের মস্তকের ঐরূপ দুর্গতি দেখিয়া দামোদরার সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত দুর্যোধনের দল দ্রৌপদীকে ফেলিয়া সমস্ত তরকারী কাড়িয়া লইয়াছে এবং এমন সমস্ত শাস্তিবিধান করিয়াছে, যাহা নাকি মহাভারতের দ্রৌপদীকেও কোন দিন সহ্য করিতে হয় নাই।

মঞ্জরী বলিল—'বেশ হয়েছে, মেরে একেবারে হাড়গোড় চূর্ণ করে দেয় তা' হ'লে আমি খুসী হই।" কিন্তু পরমুহূর্তেই সশরীরে এবং অটুট হাড়গোড় লইয়া দ্রৌপদী আসিয়া উপস্থিত—"মা পায়েসের দুধটা জ্বাল দেব কি?" মঞ্জরী কথা কহিল না, আমি মঞ্জরীর কাছে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার একটা প্রয়াস করিলাম। কহিলাম, "দ্রৌপদী, তুমি বেণুয়াকে বলেছ তোমায় বাবা বলে ডাকতে?" দ্রৌপদী বলিল "আজ্ঞে বাবু দোষ ত নেই, ওর বাবা যখন নেই, তখন আমাকে বাবা বলতে ওর কিসের আপত্তি? তা' ছাড়া এই আসছে বোশেখে দু বছর পূরবে, ওর মত অতবড় আমার ছেলে ছিল বাবু—মরে গেছে! তাই ওকে বলেছিলুম, না হ'লে"—মঞ্জরীর তবু রাগ যাইতে চায় না, বলিল, "না, না, ওসব আমার বাড়ীতে হ'বে না।" দ্রৌপদী অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

দ্রৌপদী চলিয়া গেলে বল্লরী বলিল, "মুখুজ্যে মশাই, এই ডেমিগডটাকে কোথা থেকে জোটালে?"

বলিলাম, "ওটা আমাদের ইতালিয়ান কবি দাঁতে।

বল্লরী হাসিয়া শুধাইল, "কবি-প্রণয়িণী বিয়াট্রিস কই ? তাকেও আনাও—বিরহাবস্থায় রেখে দাঁতের আঁতে ঘা দিচ্ছ কেন ?"

বলিলাম, "বিয়াট্রিসের পোষ্ট এখনও খালি আছে, তুমি কিম্বা তোমার দিদি যে কেউ হ'ক্ দরখাস্ত দিতে পার, আশা আছে মঞ্জুর হ'বে। তবে আজকাল গল্পে, উপন্যাসে, সিনেমাতে দেখতে পাই— একজনকে নিয়ে দু বোনের লড়াই লেগে যায়। দোহাই তোমাদের, ওকে নিয়ে যেন তোমরাও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে ব'স না। তা' হ'লে আমাদের আর উপায় থাকবে না।"

বেণুয়ার পিতৃসম্বোধন বন্ধ হইল বটে, তবে দ্রৌপদীর মঞ্জরীর সহিত শুভদৃষ্টি হইল না। সেদিন আর এক নালিশ আসিয়া উপস্থিত— রান্নাঘরের সিকের উপর এক থালা চন্দ্রপুলি ছিল, কে সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। হাতের চুড়ী ও কলসী বাজাইয়া মঞ্জরী ঐ চন্দ্রপুলির অন্তর্ধান সম্বন্ধে এমন সব কড়া কড়া বলি ঝাড়িল এবং এমন সব প্রমাণ দিল, যে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে আমাদের দ্রৌপদী শুধু রন্ধননিপুণই নহে, বিলক্ষণ ভক্ষণপটুও বটে! বলিলাম, আরে করেছে কি! চন্দ্রপুলি খেয়েছে; তবে আর উপায় নেই।" বল্লরীকে বলিলাম, "জান বল্লরী, চন্দ্রপুলি নামে যে উপাদেয় মিষ্টান্ন, তার নামের মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকলেও কিছু কথা আছে। আকৃতিতে সে পূর্ণচন্দ্রের মত নহে, অতএব আসলে সেগুলি অর্দ্ধচন্দ্রপুলি। অর্দ্ধ চন্দ্রপুলি যে ভক্ষণ করেছে, মঞ্জরী যে তাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করবে, এ ত স্বাভাবিক কথাই। তবে গুরুভোজনের জন্য চন্দ্রপুলি না শেষ পর্য্যন্ত চান্দ্রায়ণ করিয়ে ছাড়ে।" মঞ্জরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল "তুমি ঐ বক্তৃতা নিয়েই থাক—" আমি বাধা দিয়া কহিলাম "না, না, বক্তৃতা নয়, এ জিনিস বক্তৃতার অনেক ঊর্দ্ধে! আমার আনন্দ হচ্ছে, আমি এইমাত্র একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর ওকে দ্রৌপদী ব'লে ডাকবার প্রয়োজন নেই—আজ আবার নতুন নামকরণের সময় এলো।" বল্লরীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি ওকে উর্ব্বশীর মত কেবল অভিশাপ দিচ্ছেন, তা' ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণে আমি স্কলারসিপ পেয়েছিলুম। এই মাত্র তোমার দিদি প্রমাণ করলেন— দ্রৌপদী আড়াই সের অর্দ্ধচন্দ্রপুলি গলাধঃকরণ করেছে, অতএব তার যে বৃহৎ নোলা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ দেখিনা। ব্যাকরণের মতে বৃহৎ নোলা যস্য সা বৃহন্নলা। আজ থেকে আর ওকে দ্রৌপদী বলে ডাকবার দরকার নেই—এখন থেকে ও বৃহন্নলা— তোমার দিদিরূপ প্রত্যাখ্যাত দ্রৌপদীর অভিশাপ পেয়ে ও এখন বৃহন্নলা, এবং তোমরা দুই বোনে এখন নির্ভয়ে ওর নিকটে নৃত্যগীত শিক্ষা করতে পার।"

মঞ্জরী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তোমার দ্রৌপদী ও বৃহন্নলাকে মালায় গেঁথে গলায় পর। ওকে বাড়ী থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা যদি না কর ত ওকে নিয়েই থেক, আমি আর এ বাড়ীতে থাকবো না।"

* * * *

মঞ্জরী মিথ্যা বলে নাই। পুত্র সন্তান প্রসব করিল বটে, তবে নিজেও গেল, সন্তানটীকেও ফেলিয়া গেল না। মা চলিয়া যাইবার ছয় মাস পরেই বেণুয়াও একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। রহিলাম আমি এবং বৃহন্নলা।

আমি আবার তাহাকে হিমু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

চক্রাবর্ত্ত

পুরী-চক্র

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

ভ্রমণ

ভ্রমণের আনন্দ পাঠকগণের সহিত ভাগ করিয়া আস্বাদনের নাম ভ্রমণকাহিনী রচনা। বড়োদা প্রাচ্যবিদ্যাসম্মিলনে যাইয়া, সুরাষ্ট্রে রৈবতক দেখিয়া, যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, ১৩৪১ সনের ভারতবর্ষের পাঠকগণের সহিত তাহা ভাগে আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। বৎসরেক পরে মহীশূর প্রাচ্যবিদ্যাসম্মিলনে যাইতে ভারতের প্রায় সমগ্র দক্ষিণপূর্ব্ব কূল দেখিয়া, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ, মাদুরা, ত্রিবাঙ্কুর, উটকামণ্ড হইয়া মহীশূর পৌঁছি। পরে মহীশূর রাজ্যের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া চক্রাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে বোম্বে ও বড়োদা হইয়া দিল্লী উপস্থিত হই। তথা হইতে মথুরা-বৃন্দাবন হইয়া আগ্রায় কিয়ৎকাল স্থিতি লাভ করি। পরে প্রয়াগধামে অর্দ্ধ-কুম্ভ দর্শনান্তে বারাণসী-গয়া হইয়া ঘরে ফিরি। এই চক্রাবর্ত্তের আনন্দ পাঠকগণকে পরিবেষণ করিতে বসিলাম,—আলস্য-জড়তা পুঞ্জীভূত হইয়া কর্ণের রথচক্রের মত গ্রাস না করা পর্য্যন্ত লেখনীচক্র চলিবে।

দুই বৎসর পরে ভ্রমণকাহিনী বলিবার একটা সুবিধা আছে। যাহা মনে রাখিবার মত, মনের উপর যাহা প্রকৃতই গভীর দাগ বসাইতে সমর্থ হইয়াছিল, আজ শুধু তাহাই মনে আছে। যাহার আকস্মিক আঘাত ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু যাহা বিদ্ধ করিয়াছিল অতি সামান্যই —তাহা এতদিনে বিস্মৃতিতলে তলাইয়া গিয়াছে। ছেলে-বেলায় বালবিধবা পিসিমার মুখে তাঁহার জগন্নাথ-যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে কত মেঘ-গম্ভীর বর্ষণমুখর রাত্রি নিরন্ধ্র আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে! অনেক বৎসর পূর্ব্বে পুরীযাত্রী এক জাহাজ সাড়ে সাত শত যাত্রীসহ ডুবিয়া যায়, আমার অপর এক পিসিমা সেই জাহাজে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "দোলেরে সাগর দোলে" কবিতা এই দুর্ঘটনার স্মরণে লিখিত। আমার বালবিধবা পিসিমাতা এই জাহাজডুবীর কাহিনীও আমাকে বহুবার শুনাইয়াছেন। বিশাল সিন্ধুতরঙ্গে বিপন্ন জাহাজের যাত্রীগণের আর্ত্তনাদ শিশুবক্ষকে এমন আন্দোলিত করিত, বিপদের অপ্রতিবিধেয়ত্ব শিশুহৃদয়ে এমন অস্বস্তির সৃষ্টি করিত, যে আজিও সেই ভাব স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারি। পিসিমার কাহিনীতে অবান্তরের বর্ণনা বাহুল্য ছিল না,—এখন বুঝিতে পারি, সুদূর তীর্থের যাহা যাহা তাঁহার তরুণী-হৃদয়ের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সেও সদ্যদৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতেন। অরিষ্টের মত, ভ্রমণের আনন্দ যত দীর্ঘ দিন স্মৃতিরসে নিমজ্জিত থাকে, ততই যেন তাহা মিষ্টতর হইতে থাকে।

মহীশূর প্রাচ্যবিদ্যাসম্মিলনের আহ্বান আসিল। কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত চিঠিপত্র লিখিয়া স্থির করিলাম, বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ছায়াচিত্রসহযোগে তথায় বক্তৃতা প্রদান করিব। সুদূর প্রবাসে যাত্রার পূর্ব্বে কাপড় চোপড় গুছান, সঙ্গে যাহা যাহা যাইবে তাহার তালিকা ধরা, ইত্যাদি কয়েক দিন আগে হইতেই চলিতে লাগিল।

বান্ধবীকে বলিলাম—"ওগো, যাবে নাকি ?"

বান্ধবী ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন,—"থাক্—আর লৌকিকতায় কাজ নাই! কত দেশই তুমি দেখিয়েছ—কত সুখই জীবনে করলাম"—তারপরে গুরুতর ঝটিকা ও বৃষ্টির উপক্রম আর কি!

বড়কন্যা বলিল,—"সত্যি, যাও না মা, ঘুরে-এস্ যেয়ে। তোমাদের ফিরতে মাস-দেড়মাসের বেশী তো আর দেরী হবে না! তা এ কয়টা দিন আমি তোমার ঘর সংসার সাম্‌লাব।"

অষ্ট সন্তানের জননী কিন্তু এ আশ্বাসে বিশেষ ভরসা পাইলেন না। বড় বাধা খোকন্—অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যা। এই চারি বৎসরের মাতৃগতপ্রাণা অসহায়া বালিকাকে ছাড়িয়া মা-ই বা কি করিয়া দূর বিদেশে দীর্ঘকালের জন্য যায়, সে-ই বা কি করিয়া মাকে ছাড়িয়া থাকে ?

বড়কন্যা খোকনকে কোলে লইয়া বলিল,—"হ্যাঁরে গজু, তুই আমার কাছে থাকতে পারবি না ?" তখন গজু কি কি জিনিস পাইলে মাকে ছাড়িয়া বড়দিদির নিকট থাকিতে পারে, তাহার একটা তালিকা দাখিল করিল। তালিকা মঞ্জুর হওয়া মাত্র সে মাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল!

কিন্তু সত্যই যখন মাকে ছাড়িয়া দিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন রেলওয়ে ষ্টেশনে মুখের হাসি বজায় রাখিবার জন্য এই শিশু বীরাঙ্গনার কি অদ্ভুত চেষ্টা! খোকনের হাসি মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে বাঁকিয়া যাইতে লাগিল—দুই গালের উপর দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া নামিল—উহার পিতা-মাতার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে জননী সন্তানগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, কঠিনহৃদয় জনকের চোখও ক্ষণে ক্ষণে ঝাপসা হইয়া উঠিতে লাগিল।

বান্ধবীর সহিত পূর্ব্বেই চুক্তি হইয়াছিল, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিব, অসুবিধা যদি কিছু হয় তাহা সহ্য করিতেই হইবে। ১৯৩৫এর ১৫ই ডিসেম্বর, ১৩৪২এর ২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, রওনা হইলাম। বড়দিনের বন্ধের কয়েক দিন বাকী আছে, তাই ষ্টীমারে এবং ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীতেও আরামে বিছানায় শুইয়াই কলিকাতা পৌছান গেল। শিয়ালদহ পৌছিয়া দেখি, জামাতাবাবাজী এবং বান্ধবীর সহোদর ষ্টেশনে উপস্থিত। যথাসময়ে জামাতাবাবাজীদের বাসায় পৌছাইলাম। বান্ধবীর সহিত দীর্ঘভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও দুই একবার হইয়াছিল—যদিও বর্ত্তমান ভ্রমণের মুখবন্ধেই তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে কোন দেশই তিনি দেখেন নাই! তাহাতে জানিয়াছি,—বান্ধবী সঙ্গে থাকিলে টিকিট কিনিয়া দেওয়া, গাড়ী ঠিক করিয়া দেওয় এবং যথাসময়ে উদরপূরণপূর্ব্বক আহার ভিন্ন আমার নিজস্ব

কর্ত্তব্য আর বড় বেশী কিছু থাকে না। এই নির্ভর ও বিশ্বাস কিন্তু কলিকাতার বাসায় পৌঁছিয়াই একটা ধাক্কা খাইল। শীত বেশী নহে দেখিয়া সাদা পাঞ্জাবী চাহিতেই ট্রাঙ্ক খুলিয়া বান্ধবী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। লংক্লথের পাঞ্জাবী সব কয়টাই ফেলিয়া আসিয়াছেন! ভুল যাহার কখনও হয় না, তাহার ভুল ধরিবার আনন্দে বেশ মুরব্বিয়ানা চালে গরম পাঞ্জাবী গায়ে দিয়াই কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু জামাতাবাবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জগদিন্দ্র তাহার মাঐমাতার উপর অগাধ ভক্তিমান, মাঐমার "নাকাল"ত্ব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত নহে। আমাকে ধরিয়া সে এক দরজীর দোকানে লইয়া গেল—বৈকালে যুগল পাঞ্জাবী তৈয়ার হইয়া আসিল; বান্ধবীর ভ্রাতা রাত্র দশটায় ধোপার দোকান হইতে তাহা ধুইয়া ইস্তিরি করিয়া লইয়া আসিল—বান্ধবী সগর্ব্বে তাহা ট্রাঙ্কে পূরিলেন!

ইহার পরে দীর্ঘ পাড়ির আয়োজন। জামাতাবাবাজী বড়দিনের বন্ধের সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি যোগ করিয়া ঢাকার বাসায় যাইয়া থাকিতে স্বীকৃত হইলে ঢাকার বাসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পরের দিন পুরী রওনা হইব, স্থির হইল।

রাত্রি সাড়ে আটটায় পুরী এক্সপ্রেস্ ছাড়িবে, তাই যথা-সম্ভব সত্বরতার সহিত আহারাদি শেষ করিয়া উহা ধরিতে চলিলাম। উঠাইয়া দিতে সঙ্গে চলিলেন, জামাতাবাবাজীর খুল্লতাত উপেনবাবু এবং তাঁহার পাঁচ বছরের ছেলে তপেন, জামাতাবাবাজী নিজে এবং বান্ধবীর ভ্রাতা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র। বিজয়চন্দ্র তাহার ওয়াচ্ দিয়া আমাকে কঙ্কণ পরাইয়া দিল এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে চামড়ার কঙ্কণের প্রবেশ নিষেধ অনুমান করিয়া স্প্রিংযুক্ত একটি ধাতব কঙ্কণ কিনিয়া আনিয়া দিল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়—তাহার প্রথম পরিচয় হাওড়া ষ্টেশনেই পাওয়া গেল। তৃতীয় শ্রেণীগুলি ভর্ত্তি দেখিয়া যখন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব কিনা তাহাই আকুল হইয়া চিন্তা করিতেছি, তখন একজন ক্রু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে বলিলেন—"আপনারা জায়গা পাচ্ছেন না? আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে।" ইঞ্জিনের নিকটবর্ত্তী একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী তালাবদ্ধ ছিল; তিনি তালা খুলিয়া দিলে আমরা উহাতে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং পাশাপাশি দুই বেঞ্চে দুখানা বিছানা করিয়া সকলে মিলিয়া গুলজার হইয়া বসিলাম। শ্রীমান তপেন মাঐমার সহিত পুরী যাইবে নিশ্চিত জানিয়া লেপ গায়ে দিয়া শুইয়াই পড়িল। গাড়ী ছাড়ে না কেন তাহা লইয়া সে বেশ অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সহসা তাহার পিতার মনে পড়িল, গাড়ীর তো এখনো খাওয়া হয় নাই, চলিবে কি করিয়া? গাড়ী যাইয়া বাড়ী হইতে খাইয়া আসুক, তপেনও যাইয়া উক্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি সমাধা করিয়া আসুক, তখন আর চলিতে সে আপত্তি করিতে পারিবে না। শ্রীমান তপেন এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া পিতার কোলে উঠিয়া চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়িলে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। জামাতা জ্যোতিন্ ও বান্ধবীর ভ্রাতা বিজয় করুণনেত্রে বিদায় গ্রহণ করিল। ঢাকা হইতে যাত্রার পূর্ব্বে ভগিনী-প্রতিমা সুহাসিনী কুসুমকুমারী বান্ধবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া একদিন বলিয়াছিল,—"বৌদি, তুই সত্যি তবে বুড়ো বয়সে হানিমুনে চল্লি?" বান্ধবী বলিয়াছিলেন,—"চল না তুমিও আমাদের সঙ্গে!" আজ সেই বুড়ো বয়সের হানিমুনে যাত্রার আরম্ভে সহসা কুসুমের হাসিমুখখানি মানসনয়নে ভাসিয়া উঠিল।

• •

সদাশয় ক্রু মহাশয়ের কৃপায় গাড়ীতে আর অন্য কেহ উঠে নাই—আমরা দুইটি প্রাণী গোটা গাড়ীখানি দখল করিয়া চলিয়াছিলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়াছে। বান্ধবী জানালায় কপোল বিন্যস্ত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন। অজ্ঞাত রাজ্যের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়াইয়া অনাগত অবশ্যম্ভাবী নব-পরিচয়ের পূর্ব্বাস্বাদরসে আমার মন ভরপূর! বালবৈধব্যের বজ্রাঘাত-দাহ ভুলিতে এই পথেই না পিসিমাতা জগন্নাথ দর্শনে ছুটিয়াছিলেন? একই লক্ষ্যে ভিন্ন পথে চলিতে গিয়া আমার আর এক পিসিমাতা অতল সলিলতলে শয়ন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন? এই পথেই না গৌরাঙ্গদেব বায়ুতাড়িত কদম্বরেণুর মত আকুল হইয়া প্রাণারামের খোঁজে অবিরাম ছুটিয়াছিলেন? জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র অসম্বরণীয় ভাবাবেগে সেই প্রেমোন্মত্তের সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—চাহিয়া দেখিলেন,—মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া বালগোপাল ভক্তের দিকে চাহিয়া

মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! স্খলিতাক্ষরে ভাবজড়কণ্ঠে অর্দ্ধশ্লোক পাঠ করিয়া সেই ভাবের পাগল অবশ হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

প্রভু বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল গোপালে॥

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সেদিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন॥
চক্রপ্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে॥
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বই অন্যে নাহি আর॥

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড।

সেই প্রেমময় অবতারের প্রেমসিক্ত পথে চলিতেছি, কিন্তু হৃদয়ে এমন ভয়ানক শুষ্কতা কেন? শুনিয়াছিলাম, যাহার হৃদয় যেভাবে ভরপুর থাকে, জগন্নাথ মূর্ত্তিতে সে তাহাই দেখে। দেবমূর্ত্তিতে প্রস্তরপিণ্ড দেখাই কি আমার এ জন্মের অদৃষ্টলিপি? শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলাম, বান্ধবী পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিলেন। খড়গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক কখন পার হইলাম, টেরও পাইলাম না। শেষ রাত্রে ঘুম পাতলা হইয়া আসিয়াছে, গাড়ী থামিয়া আছে, সহসা শুনিলাম—"আপনার নামটি কি বাবুজী?"

চমকিয়া উঠিলাম! দেখি, জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া এক পাণ্ডাপুঙ্গব খদিরকৃষ্ণ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে! অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে ভারী খাপ্পা হইয়া উঠিলাম।

"আমার নামটি দিয়া তোমার কি প্রয়োজনটি?"

"বাবু, আমরা জগন্নাথের পাণ্ডা, যাত্রীদের জগন্নাথজী দর্শন করাই।"

"আমি ধর্ম্ম করতে পুরী যাচ্ছি না, যাও, বিরক্ত করো না!"

পাণ্ডা চলিয়া গেল। আবার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় আবার—

"আপনার নামটি কি বাবুজী?"

একেবারে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম খুরদা-রোড ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়া আছে। বলিলাম—

"তোমার নামটি কি বলতো?"

"আমার নামটি হাল্লু ছড়িদার, বাবুজী।"

"উল্লু?"

"না বাবু, হাল্লু!"

"আচ্ছা হাল্লু, আমার নাম দিয়ে তোমার কি হবে? আমরা তো জগন্নাথদর্শনে পুরী যাচ্ছি না, আমরা দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছি। পুরীর সব যায়গা আমাদের দেখাতে পারবে?"

"খুব পারবো, বাবুজী। কিন্তু পুরী যেয়ে জগন্নাথ দেখবেন না এটা কি হয়? পুরীও দেখ্‌বেন, জগন্নাথও দেখবেন।"

"আচ্ছা বেশ, তাই হবে।"

"বাবুজী, অন্য পাণ্ডা কেউ এলে বল্‌বেন, আমার পাণ্ডা অমুক,—ছড়িদার হাল্লু। তবে আর কেউ দিক্ করবে না।"

হাল্লু চলিয়া গেল। ভাবিলাম মুক্তি পাইলাম। কিন্তু আবার দু'এক মিনিট পরেই—

"আপনার নামটি কি বাবুজী।"

ক্ষেপিয়া গেলাম। চেঁচাইয়া বলিলাম,—"ভাগো হিঁয়াসেঁ। নাম বল্‌ব না।"

পাণ্ডা লেশমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল,—"বাবু গোসা হচ্ছেন কেন? তীর্থস্থানে চলেছেন, রাগ করতে নেই।" গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে এ অত্যাচার থামিল।

ফরসা হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বান্ধবী উঠিয়া বসিলেন, আমিও উঠিয়া বসিলাম। বান্ধবী স্মিতহাস্যমুখী, অষ্ট-সন্তানের জননী অষ্টত্রিংশীর বয়স যেন একরাত্রেই বিশ বছর কমিয়া গিয়াছে! রেল লাইনের দুধারের দৃশ্যাবলী তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলাম। পুকুরের মধ্যে মন্দির—উড়িষ্যায় বলে চন্দনযাত্রার মন্দির—প্রায়ই চোখে পড়িতে লাগিল। সহসা চোখে পড়িল—বৃক্ষচূড়া অতিক্রম করিয়া জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে! শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল—ইহারই দিকে চাহিয়া না মহাপ্রভু দেখিয়াছিলেন বালগোপালমূর্ত্তি, তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!

পুরীতে একটা মিউজিয়ম আছে। উহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র রায় নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। উহা তাঁহারই সম্পত্তি। মিউজিয়মে মিউজিয়মে মাসতুত ভাই, তাই চেনা পরিচয় না থাকিলেও বীরেনবাবুর নিকট এক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। অনুরোধ ছিল, আমাদের জন্য যেন একটা বাসস্থান ঠিক করিয়া রাখেন। পুরী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই হাল্লু তৎপরতার সহিত আমাদের মালপত্র নামাইয়া কুলির মাথায় চাপাইয়া দিল। ষ্টেশনের দরজা পার হইতেই এক ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনিই কি বীরেনবাবুকে পত্র লিখেছিলেন?" 'হাঁ' বলিতেই তিনি বলিলেন, "বীরেনবাবু ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংএ আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন।" হাল্লু একখানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিয়া মালপত্র তাহাতে চাপাইল, আমরাও উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু এই সময়ই বেশ একটু গোলমাল বাধিল।

একজন সৌম্যমূর্ত্তি ত্রিপুণ্ড্রধারী পাণ্ডা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, আপনার বাড়ী কোথায়?"

প্রভাতবায়ুতে অথবা স্থানমাহাত্ম্যে মেজাজ ঠাণ্ডা ছিল, – বলিলাম, "ঢাকা জেলায়।"

পাণ্ডা বলিল—"ঢাকা জেলায় কোন গ্রামে বাবু।"

আমি বলিলাম,—"বিক্রমপুর পরগণায়, পাইকপাড়া গ্রামে।"

পাণ্ডা বলিল—"পাইকপাড়া গ্রাম তো আমার যজমান বাবু, হাল্লুর মনিব তো আপনার পাণ্ডা হ'তে পারে না।"

আমি একটু উষ্ণ হইয়া বলিলাম,—"আমি এখানে ধর্ম্ম করতে আসি নি, দেশ দেখ্‌তে এসেছি। হাল্লুকে আমি গাইড হিসেবে নিয়েছি, অন্য কোন পাণ্ডায় আমার কোন দরকার নেই।" গাড়োয়ানকে গাড়ী ছাড়িতে হুকুম দিলাম।

তখন নবাগত পাণ্ডা গাড়ীর সহিত দৌড়িতে লাগিল! পুরীর ঘোড়ার গাড়ী মন্থরগামী, পাণ্ডা সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে হাল্লুর সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। হাল্লুর পুরুষানুক্রমপ্রাপ্ত অধিকার, তাহা সে ছাড়িতে নারাজ। নবাগত পাণ্ডার সুদীর্ঘকালের অধিকার, সেও তাহা ছাড়িতে নারাজ!

পাণ্ডা দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল—"বাবু আপনি আমার গলা কেটে ফেলুন, তাতেও আমি স্বীকার। কিন্তু আমার যজমান হাল্লু ছিনিয়ে নিবে, এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। বাবু, পুরীধামের এ নিয়ম নয়, আপনি ধর্ম্মস্থানে এসে অধর্ম্ম করবেন না। আপনার নামটি বল্লেই আমার খাতা হতে আপনার পূর্ব্বপুরুষদের নাম আমি দেখাব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি!

ষ্টেশন হইতে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং প্রায় দুই মাইল হইবে। পাণ্ডা এই দুই মাইল রাস্তা গাড়ীর সহিত সমানে দৌড়িয়া আসিতেছিল! বোর্ডিংএর দরজায় গাড়ী থামিলে সে নিতান্ত মিনতি করিয়া বলিল—"বাবু একবার আপনার নামটি বলুন, আমি খাতা নিয়ে আসি।" আমি যতই বলি—আমি ধর্ম্ম করিতে আসি নাই, আমার একজন গাইডের প্রয়োজন মাত্র—ততই সে বলে—"বাবু আমার গলা কাটিয়া ফেলুন, তবু আমি যজমান ছাড়িব না।" অবশেষে কৌতূহলপরবশ হইয়া নাম বলিলাম এবং বলিলাম—"আন দেখি তোমার খাতা"!

পনর মিনিটের মধ্যেই বড় বড় তিন চারিখানা খেরো বাধা লম্বা মহাজনী খাতা চলিয়া আসিল। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, ভট্টশালী গোষ্ঠীর কে কবে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহা তো খাতায় স্বাক্ষরশুদ্ধ লিপিবদ্ধ আছেই, আমাদের গ্রামের এবং আশপাশের গ্রামের বহু পরিচিত পরিবারের নাম ঐ খাতা হইতে মিলিল! Indexing অর্থাৎ নামসূচীর এমন চমৎকার ব্যবস্থা পাণ্ডারা করিয়াছে যে পাইকপাড়া গ্রামের ভট্টশালীগণের নাম খাতা হইতে বাহির করিতে তাহাদের মোটেই বিলম্ব হইল না। এমন প্রমাণের পরে হাল্লু বিরসবদনে কিঞ্চিৎ বকশিস্ লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল, নবীন পাণ্ডা জয়গর্ব্বে আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসিল। স্নানাহারান্তে সাড়ে বারটায় সহর দেখিতে বাহির হইব বলিয়া এবং তখন ঘণ্টা হিসাবে ভাড়াচুক্তি একখানা গাড়ী লইয়া হাজির থাকিতে বলিয়া পাণ্ডাকে বিদায় দিলাম।

পুরীধাম কলিকাতা হইতে মাত্র দশ ঘণ্টার পথ, টাইম টেবলে দেখিলাম, দূরত্ব মাত্র ৩১০ মাইল। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা পৌছিতেও প্রায় অতটা সময়ই লাগে। কলিকাতা হইতে ভাড়া (তৃতীয় শ্রেণী) যতদূর মনে আছে, পাঁচ টাকার কিছু উপরে। এই অবস্থায় পুরীর মত বিচিত্র তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্যাবাস বাঙ্গালীর নিত্য পরিচিত হইবার কথা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা হয় না। নিজের হইতেই বুঝিতে পারি, জীবনের অর্দ্ধেকের বেশী পার হইয়া

আমার পুরীদর্শন ঘটিল। বাঙ্গালাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা, মেদিনীপুর,—এই কয়টি জেলা সমুদ্রের পারে অবস্থিত। বরিশাল সহর হইতে সমুদ্র ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে। চট্টগ্রাম হইতে তো সমুদ্র দেখা যায় বলিলেও চলে। খুলনা, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। কিন্তু সীমাহীন সাগরের মত স্বষ্টির এমন চিরনবীন মহাবিস্ময় শতকরা দুই একজন বাঙ্গালীও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণে যে মহাসমুদ্র, সে কথা আমরা দিব্য ভুলিয়া বসিয়া আছি। চট্টগ্রামের দক্ষিণতম সীমান্তে কক্সবাজার ভিন্ন সমুদ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইবার জন্য আর দ্বিতীয় স্থান বাঙ্গালা দেশে নাই—এই কথা ভাবিলে কি নিতান্ত বিস্ময়বোধ হয় না? পাশ্চাত্য দেশে স্বাস্থ্যান্বেষীগণের সমুদ্রস্নানের জন্য সমুদ্রপারে শত শত স্নানতীর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে,—অবসর পাইলেই ঐ সকল দেশের স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে মেয়ে দলে দলে ছোটে সমুদ্রজলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে, স্বাস্থ্যলাভ করিতে। আমাদের চিত্তবিনোদনেরও প্রয়োজন নাই, স্বাস্থ্যলাভ চেষ্টাও একটা অবান্তর কথা মাত্র। পয়সা যাঁহাদের আছে, নিজের দেশের দক্ষিণস্থ সমুদ্র ফেলিয়া তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে ছুটিতে হয় পুরী, গোপালপুর, ওয়ালটেয়ারে! বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণস্থ সমুদ্র অস্তিত্বহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা যুগলে পূর্ব্বে কক্সবাজারে সমুদ্র দেখিয়াছি এবং তথায় সমুদ্রস্নানও করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই দিনেকের পরিচয়ে সমুদ্রপিপাসা আমাদের একেবারেই মিটে নাই। পুরী ষ্টেশন হইতে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংএ যাইতে গাছপালা ও বাড়ী ঘরের ফাঁকে ফাঁকে তাই যখন মধ্যে মধ্যে অনন্তবিস্তার বারিরাশি চকিতে নয়ন-পথে পড়িতেছিল, তখন পুরাতন প্রিয় বান্ধবের সহিত পুনর্মিলনের আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে মন পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পাণ্ডার যজমান-দখলের বিবরণ লিখিতে যাইয়া এতক্ষণ আর বলিবার অবসর পাই নাই যে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিংটি একেবারে সমুদ্রের ধারে নির্ম্মিত, উহার ২৫।৩০ গজ দক্ষিণেই মহাসমুদ্র। আমাদের যুগলের বাসস্থান দেওয়া হইল তেতালায় একখানা নিরিবিলি কোঠায়। তেতালায় ঐ একখানিমাত্রই কোঠা, প্রকৃতপক্ষে ছাদের সিঁড়ি-কোঠা। উহার সংলগ্ন ছাত। কোঠায় অধিষ্ঠিত হইয়া ছাতে আসিয়া উভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ছাতের উপর হইতে উত্তরে জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া এবং সমগ্র পুরী সহরটি ছবির মত দেখা যাইতেছিল;—আর অব্যবহিত দক্ষিণেই দেখা যাইতেছিল, শ্বেতফেনপুঞ্জদ্বারা পুষ্পিতমস্তব; লক্ষ লক্ষ বন্দনা-গীতি-মুখর নীলতরঙ্গের চিরসুন্দর জগন্নাথের পদতলপ্রান্তলক্ষ্যে অশ্রান্ত অনন্ত প্রণতি অভিযান! পুরীধামে যাঁহারা জগতের নাথের মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা কবি ছিলেন, সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সৌন্দর্য্যদ্রষ্টাগণকে প্রণাম করি। তাঁহারা অনন্ত তুষারতীর্থ বদরিকাশ্রমে, হিমগিরির অভ্যন্তরে মানস-সরোবরে, আলিপুরদুয়ারের উত্তরস্থ জয়ন্তী শিখরে, লৌহিত্যতীরে কামাখ্যা পাহাড়ে ভুবনেশ্বরী চূড়ায়, চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতশীর্ষে, কক্সবাজারের পথে সাগর গর্ভস্থ আদিনাথশিখরে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তীর্থপ্রতিষ্ঠাদ্বারা পরবর্ত্তী জনগণকে সেই আনন্দের উত্তরাধিকারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বান্ধবী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"অঞ্জুর মত নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে!" অঞ্জু—শ্রীমতী অঞ্জলি বৎসরেক বয়স্কা নাতিনী—নৃত্যে, গীতে, চীৎকারে, কোলাহলে, আবদারে, অত্যাচারে ঢাকার বাসা মাতাইয়া রাখিয়াছিল। বান্ধবীর কথায় তাহার মুখখানি মনে পড়িয়া হৃৎপিণ্ডটা একটা মোচড় খাইল। বান্ধবী বলিলেন—"ছেলেমেয়েদের এমন সুন্দর যায়গা দেখাতে পারলাম না, ভারী দুঃখু হচ্ছে।"

সমুদ্র স্নানের জন্য তৈয়ার হইয়া উভয়ে ঘরে তালা দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। বোর্ডিংএর ম্যানেজারবাবু সঙ্গে নুলিয়া লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন যে, দু চার পয়সা দিলেই উহারা সযত্নে ধরিয়া স্নান করাইয়া দিবে। নুলিয়াদের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মসীকৃষ্ণ, সমুদ্রে জাল ফেলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য ধরা উহাদের ব্যবসায়। আমার নিজের জন্য একজন, বান্ধবীর জন্য দুইজন নুলিয়া ঠিক করিলাম। ঢেউগুলি গর্জ্জন করিতে করিতে গড়াইয়া আসিয়া যেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহার প্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইলাম।

কি মহাবিস্ময় আমাদের সম্মুখে! যুগ যুগ ধরিয়া বারি-

রাশির এই অনন্ত বিস্তার মানব হৃদয়কে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে—দেশে দেশে কবিগণ মহা-সমুদ্রের বন্দনা-গীতি রচনা করিয়াছেন। জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত ইহারই বক্ষে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমপাগল চৈতন্যদেব এই সৌন্দর্য্য সাগরেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। দূরে দূরে দেখা যাইতেছিল নুলিয়াদের ছোট ছোট ডিঙ্গিগুলি। পারে দাঁড়াইয়া কয়েকজন নুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত একটি বৃহৎ জালের দড়ি ধরিয়া টানিয়া জালটিকে উঠাইতেছিল। ঐ স্থানে কয়েকটি সিন্ধুশকুন উড়িতেছিল, এক একটি শকুন মধ্যে মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গে ছোঁ মারিয়া চঞ্চুতে একটি মাছ লইয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। বাহির সমুদ্রে কাল ধোঁয়া দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছিল, একটি জাহাজ যাইতেছে—সমুদ্র জলের বাঁকে জাহাজটি একেবারেই অদৃশ্য!

নুলিয়ার হাত ধরিয়া সমুদ্র তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলাম। নুলিয়া বলিল, ঢেউ আসিলে লাফাইয়া উঠিতে হইবে অথবা ডুব দিতে হইবে। আমি দুই চারি মিনিটেই কায়দাটা আয়ত্ত করিয়া নুলিয়ার হাত ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত আরামে স্নান করিতে লাগিলাম। তরঙ্গ-দুঃশাসন কিন্তু বান্ধবীকে কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর মত পাইয়া বসিয়াছিল। নুলিয়াদের শীলতা প্রশংসনীয়, তাহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বান্ধবীর হাত ধরিয়াছিল। আমি স্নান-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি, কাজেই নুলিয়াদিগকে অদূরে দাঁড়াইতে বলিয়া স্বয়ং নুলিয়ার পদ গ্রহণ করিলাম। তথাপি এই অবোধ অবলা কুষ্মাণ্ডের মত গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

ইন্দ্রনাথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বঙ্গের আকাশে যবে এলো মেলো মেঘ,
ঢাকা রবি, মেঘলা প্রভাত,
নিরানন্দ রাজ্যে মহা উৎসবের মত
এলে তুমি এলে ইন্দ্রনাথ!

অনাবিল শুভ্র হাস্যে আনন্দ বিদ্রূপে—
ভরে দিলে বাণীর অঙ্গন,
বিশুষ্ক মালঞ্চে আসি ফুটাইলে তুমি
বেলী যূঁই বকুল রঙ্গন।

উল্লাসের পিচকারী, কুঙ্কুমের রাগ
আকাঙ্ক্ষিত হোলির উৎসব—
রঞ্জিত ও মুখরিত করিল আবার
ত্যক্ত কুঞ্জ, কুটীর নীরব!

বঙ্গ ভারতীর ম্লান অবনত মুখে
স্নিগ্ধ হাস্য ফুটাইলে তুমি,
দেখালে নূতন করে হে রঙ্গ-রসিক
রঙ্গ ভরা এই বঙ্গভূমি।

তুমি ছিলে অকপট, উদার, স্বাধীন—
স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক,
হেসেছ ও হাসায়েছ গৌড়জনে তুমি
কাঁদায়েছ কাঁদি ততোধিক।

আর্য্য তুমি, হিন্দু তুমি, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ
নিজ ধর্ম্মে কি নিষ্ঠা অতুল,
সর্ব্ব সম্প্রদায়ে তব প্রীতি সর্ব্বজয়া
ধর্ম্মে ছিল সে প্রীতির মূল।

দূরদৃষ্টি হে কোবিদ্ তব জীবনের
কে করিবে মূল্য নিরূপণ?
বিপ্র ছিলে, কিন্তু ছিলে অস্পৃশ্যগণের
বন্ধু আর আপনার জন।

স্বার্থ লয়ে মগ্ন মোরা, তোমার গৌরব
বুঝিবার শক্তি নাহি হায়,
'হুজুক' হয়েছে প্রিয় আজি শ্রেয় চেয়ে
ব'রে' আনি অবমাননায়।

জাতি যায় অধঃপাতে, ধর্ম্ম অবজ্ঞাত,
সূচনা যে নিত্য যায় বুঝা
দিনে দিনে দিক্‌শূলেরা লভিছে সম্মান
দিক্‌পালেরা পায়নাক পূজা।

তব জন্মে ধন্য দেশ, ধন্য গোটা জাতি
সৃজিলে সাহিত্য অভিরাম,
জ্যোতির্ম্ময় হে ব্রাহ্মণ চরণে তোমার
করি আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম!

পঞ্চানন্দ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে

শেষের ক'দিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

সেদিন দুপুরে ঠাকুর এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে মাথার শিয়রে ; একমনে কাগজ প'ড়ছি। শরৎ গেছেন বাথ-রুমে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল কে কি ব'লবে ব'লে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। মাথা তুলে দেখি ঠাকুরের মুখ কালো !

কি হয়েছে ঠাকুর ?

ঠাকুরের মুখ থেকে কথা বার হয় না, শুধু ঢোক গেলে।

ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে বল্লাম : ব্যাপার কি ঠাকুর, কোন মন্দ খবর আছে ?

বাঁ-কাঁধের উপর মাথা ঠেকিয়ে—প্রায়, বল্লে : কি ক'রে বলি দাদু, ভারি মন্দ কথা…

উদ্বিগ্ন হ'য়ে বল্লুম : না বল্লেই বা উপায় হবে কি ক'রে ? জাগ্-স্বপটা চড়াতে ভুলেছ বুঝি ?

এমন সময় কালীকে চাকরেরা তুলে দিয়েছে ; সে এসে বল্লে : দাদু ঐ সর্ব্বনাশীকে বিদায় ক'রে দিন, ভারি অলুক্ষণে…

কে, কে সর্ব্বনাশী, কালী—

ঐ আপনাদের মুলতানী ধাড়িটা ! ব'লতে পারব না—কিন্তু ওকে বিদায় ক'রে দিন, নৈলে কেউ বাঁচবে না এ-বাড়ীর, তা আগেই বলে দিচ্ছি আমি…আপনি বেরিয়ে দেখুনসে একবার।

দেখে চক্ষুস্থির ! নিজের বাঁট থেকে নিজের দুধ টেনে খাচ্চে মুলতানী ! আত্ম-নির্ভরতার চরম !

বল্লুম : তোমার বাবুর পেয়ারের খাস মুলতানী। ওকে বিদেয় করা সহজ কালী ? এতদিন আছ, মানুষটিকে চেননি এখনও ? শেষকালে কি বাড়ী-ঘর ছাড়িয়ে ছাগল নিয়ে ওঁকে বনে পাঠাতে চাও !

অবাক্ হ'য়ে কাণ্ডখানা দেখচি। পিছন থেকে শরৎ কথা ক'য়ে উঠ্লেন :

এত ক'রে কি দেখছ হে ?

দেখছি তোমার মুলতানীর অপূর্ব্ব আত্ম-নির্ভরতা অভিনব প্রচেষ্টা !

নির্ব্বাক হ'য়ে খানিকটা দেখে ফিরে আসা গেল শরৎ চেয়ারের উপর ব'সে প'ড়ে একগাল হেসে বল্লেন অবাক্ করলে, এও যে আবার হয়, তা জানাই ছিল না এখন উপায় ?

চুপ ক'রে আছি।

অচিরে একটা উপায় না ক'রলে সুরেন, বাচ্চাটা বাঁচবে না !

কালী এগিয়ে এসে বল্লে : ওকে বেচে দিয়ে আসি বাবু—বাড়ীতে রেখে কাজ নেই !

পাগল হ'য়েছ কালী ? বামুনের ঘরে পোষা জীব-জ বেচ্‌তে আছে ? বিলিয়ে দিতে হয় দেব, বেচ্‌ব না এ প্রা থাক্‌তে। তোমায় দেব, নেবে ?

হাসিতে দু-গাল কুঁচ্‌কে গেল কালীর—তা অমি পেলে…

ওর একটা উপায় ভেবে-চিন্তে ঠিক কর…অত ছো জিনিস নিয়ে উতলা হ'লে চলে ?

কালী নেপথ্যে স'রে গেল। শরৎ আমার দিকে ফি বল্লেন : তাইত' কি করা যায় বলত ?

একটা থলি ক'রে…

তুমি জান না, ও রাতারাতি ফুটো ক'রে ফেল্‌বে চিবি চিবিয়ে, ওরা একখানা আস্ত কাপড় চিবিয়ে মেরে দি পারে—

তবে মুখে জাল দেওয়া…

না, না, ওতে জান্‌ওয়ারদের ভারি শাস্তি হয়…উঃ সে ভারি কষ্ট !

জানি আমি—ডাক্তারেরা আমাকে কামড়ানর পর আমার ভেলিকে অমনি ক'রে বেঁধে দিয়েছিল।…

তবে ?

দুজনে কিছুতেই কিছু ঠিক করা যায় না। এমন সময়, মুস্কিলাসান স্বয়ং উপীন তায়া এসে উপস্থিত।

শরৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লেন: ব্যস্, আর ভাব্তে হবে না, ঠিক লোকটি, ঠিক সময়ে…

উপীন আগ্রহভরে বল্লেন: কি, কি ?…

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে শরৎ বল্লেন: তুমি একটা কিছু না ক'রে দিয়ে গেলে…ও সব আমাদের বুদ্ধিতে কুলোবে না…

উপীন বল্লেন: টেপ্ আছে ?

শরৎ ডাক্লেন: কালী, ও কালী, আমার স্প্রীংএর টেপ্টা নিয়ে এস ত উপর থেকে, চট্ ক'রে যাও। লেখার ঘরে বাঁ-হাতি জান্লার উপর আছে।

টেপ্ এল। টানাটানি ক'রতেই ভিতরের স্প্রীংটা ছিট্কে মেজের উপর প'ড়ল গিয়ে।

দাও ত কালী, ওটাকে মেরামৎ ক'রে দি…

উপীন বল্লেন: আগে আমি মেপে আসি—ব'লে সেটাকে নিয়ে গিয়ে কি-সব মেপে-জুপে এসে বল্লেন: একটা ১৫″ × ১৫″ ইঞ্চি ভেনেস্তার খুব পাৎলা তক্তা, আর গোটা কয়েক স্ক্রু নিয়ে এস কালী; আর একটা ছুতোরমিস্ত্রি।

উপীনের মুখের দিকে চেয়ে শরৎ বল্লেন: মিস্ত্রী ? কি ক'রবে ?

সে আমি ব'লে দেব' অখন—তক্তাটার মাঝখানে একটা বড় গোল ফুটো ক'রে দিতে হবে কিনা !

আমি তা বুঝেছি উপীন; কিন্তু ছাগলটা রাতে—কি দিনেই, শোবে কি ক'রে ?

একটু ভেবে উপীন বল্লেন: তাহলে দুটো কব্জা চাই; আর গোটা বারো ছোট ছোট স্ক্রুও এনো কালী।

শরৎ বল্লেন, যাও ত কালী, উপীন-মামা যা যা বল্লেন বুঝলে তো ? ধাঁ ক'রে সাইকেলে ক'রে নিয়ে এস, এই নাও টাকা।…আর ছুতোরমিস্ত্রি ?—পাবে এখন কাউকে ?

কালী মাথা নেড়ে বল্লে: সন্ধ্যের পর সুশীলকে পাওয়া যেতে পারে।

শরৎ উপীনের দিকে চেয়ে বল্লেন: সে যত রাতই হোক্ উপীন, ওটি তোমাকে থেকে করিয়ে দিয়েই যেতে হবে।

উপীন ঘড়ি দেখে বল্লেন: তা হ'লে আমার একট কাজ সেরে আস্চি…

তা যাও, কিন্তু পালিও না, এসো নিশ্চয়…

উপীন তার বলার ভঙ্গিতে হাস্তে হাস্তে চ'লে গেলেন, এই এলুম ব'লে।

কালী ফিরে এলো; কিন্তু সুশীলের দেখা পেলে না।

তুমি তার বাড়ীতে ব'লে এসেছ, কালী ?

শুধু ব'লে এলে সে আস্বে না, সমস্ত দিন খেটে-খুটে এসে খেয়েই শুয়ে পড়ে ওরা, তাকে মোতায়েন হ'য়ে আন্তে হবে।

তাই করগে তুমি, আজকে কাজটা করাই চাই।

কালী চ'লে গেল।

একখানা করাৎ থাক্লে আমি নিজেই ক'রে দিতে পারতাম—বুঝেছ সুরেন, কাল একখানা করাৎ আর কিছু তোড়জোড় কিনে আন্তে হবে।—রেঙ্গুনে থাক্তে আমি নিজের হাতে চেয়ার টেবিল ক'রে নিয়েছিলাম …ভাগলপুরে রাজুর কারখানায় আমি রীতিমত ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম।

বল্লুম:—মনে আছে আমার; আমাকে একটা সুন্দর চিঠি রাখার স্প্রীং দেওয়া ফাইল ক'রে দিয়েছিলে।

আছে সেটা ?

না, দেখ্তে পাইনে।

আর সেই তে-পায়া চেয়ারখানা ?

সেটাও ত' দেখিনে…শুধু তোমার হাতের তৈরি কলম-দানটা আছে।

শরৎ বল্লেন: চল আজ দুটো বড় ফুলদানি কিনে আনিগে …ও ছোট দুটো বিশ্রী—ওতে বড় ফুল রাখা যায় না।

উপীন আর কালী এসে উপস্থিত।

কি কালী ?…

সুশীল আজ চারদিন বাড়ী আসেনি, বেলেঘাটায় কাজ গ'ছে চ'লে গেছে; ঠিকে-কাজ; শেষ না ক'রে ফিরবে না, —কবে ফিরবে, ব'লতেই পারে না কেউ…

যাক্ লেঠা চুকে গেল—শুনচো, আমরা বাইরে যাব, গাড়ি বার কর…

উপীন তবে আজ আর কি ক'রে হয়, তোমার কপাল ভাল।

কতদূর যাবে ?

এই—খানিকটা ঘুরে আসা···

উপীন চ'লে গেলেন।

ফুলদানি কিন্‌তে গিয়ে তার সঙ্গে এল প্রকাণ্ড হাঁড়ির এক হাঁড়ি লাল-নীল মাছ।

ফিরতে রাতই হ'য়েছিল। শরৎ এসেই লেগে গেলেন একটা চৌবাচ্চা পরিষ্কার করাতে চাকর নিয়ে। এদিকে খাস্ মুলতানীর ব্যবস্থাও চ'ল্‌লো। তার সাম্‌নের দুটো পায়ের পর থেকে পিছন পা পর্য্যন্ত চটের উপর চট দিয়ে মোড়ম্বা ক'রে বেঁধে' সেইখেন থেকে ল্যাজের উপর দিয়ে শিংএ একটা দড়ি খাটো ক'রে বেঁধে দেওয়া হ'ল; মুখটাকে বাঁটের দিকে অচল্ল করার দারুণ ইঞ্জিনিয়ারি! শেষটি শরতের খাস-হিক্‌মৎ।

ঘরে ফিরে এসে বল্লেন: কোন জিনিস কি আমার ভাগ্যে সোজা-সুজিতে শেষ হবে ? দেখ না একবার বখেড়া!

একটা তো খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই হ'লো শরৎ···

কি ?

লাল মাছের হাঁড়িটা তো না ভেঙ্গেই এলো—আমি তাই বাল্‌তির কথা ব'লছিলাম।

বাল্‌তিতে জল তেতে যায়, তুমি জান না—

ডিসেম্বর মাস, সে খেয়াল আছে ?

না, না, দেশে নিয়ে যাবার সময়।

তুমি ঐ হাঁড়ি ক'রে নিয়ে যাবে মাছগুলো দেশে? সর্ব্বনাশ!

ঠিক যাবে, তুমি কিচ্ছু ভেব না।

এমন সময় গোপাল এসে জিজ্ঞেস ক'রলে: বাবু, ছাগলটাকে কি দালানে রাখব ?

আরে, না, না: ও আমাদের সারা রাত ঘুমুতে দেবে না, চেঁচাবে। যা বাঁধা হ'য়েছে, ঠাণ্ডা কিছুতেই লাগ্‌বে না। গলিতেই থাক। বাচ্চাটাকে ঘরে দে, অন্যদিনের মত।

পরের দিন সকালে উঠে দেখা গেল যে বুকের একদিকের বাঁধন কেটে ছাগলটা একটা বাঁটের দুধ কিছু খেয়ে ফেলেছে। বাকিটায় আধসেরটাক দুধ হ'ল: কিন্তু সে দুধ শরৎ খেতে পেলে না: তাঁকে একটা বড় গ্লাসে বেরিয়াম গরম জলে গুলে দেওয়া হল।

এক্স-রের ঘোর অন্ধকার ঘরে ব'সে শরৎচন্দ্র ডাক্তারের অনুরোধে তাঁর রোগের ইতিহাসটি ব'লতে লাগ্‌লেন।

সে যেন একটা মন-মাতানো গল্প: নিখুঁত খুঁটি নাটি, তার অপূর্ব্ব স্তর-বিন্যাস এবং স্মরণ-শক্তির অদ্ভুত পরিচয়ে যাঁরা শুন্‌ছিলেন তাঁরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

সেদিনের পরীক্ষা চ'লছিল বেরিয়ামটা পেট থেকে অন্ত্রে যেতে কতক্ষণ সময় নিচ্চে!

কলের গুরু-গম্ভীর শব্দের মধ্যে শরতের অস্পষ্ট কঙ্কালসার ছবি যেন প্রেত-লোকের কথাই মনে করিয়ে দেয়! তাঁর ভয়-নেই, ডর নেই; শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই; অজস্র শোয়া-বসা-উঠা-দাঁড়ানতে। কিন্তু কথার আওয়াজে তাজা সহজ মানুষটি: মনে হয়, অটুট স্বাস্থ্য—এবং প্রচণ্ড উৎসাহী! তাই, আলোতে বেরিয়ে এসে তাঁর শীর্ণ মুখ, সাদা চুল, দুর্ব্বল শরীর দেখে আমরা যেন বুকে একটা রূঢ় ধাক্কা খেয়ে গেলাম। বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যে, এই রোগশীর্ণ মানুষটির সঙ্গে এত সময় কাটিয়ে এতখানি আনন্দ পেয়ে এলাম!

আপিসে গিয়ে শরৎচন্দ্র ক্যাপ্‌টেন মুখার্জ্জিকে জিজ্ঞেস ক'রলেন: ডাক্তার কি বুঝচেন ?

যতক্ষণ না ছবি দেখ্‌ছি ততক্ষণ কিছুই ব'লতে পারিনে।

তবুও কিছু কিছু চোখে দেখেও বুঝচেন ত ?

ডাক্তার যেন মুস্কিলে প'ড়ে গেলেন। কথার সম্বরণ চ'লতে পারে; কিন্তু মুখের উপর ভাবের ব্যঞ্জনা যেন ফুটিয়ে তোলে, যে-কথাটি চাপ্‌তে চান!

ডাক্তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্লেন: দেখুন, ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি—পরীক্ষা শেষ হ'লে একটা রিপোর্টে সমস্ত কথাই বলা হবে, তার আগে কোন মতামত দেওয়া ঠিক হয় না; তা ছাড়া হয়ত ভুল হবে। বুঝতে পারছেন···রুগীকে··· অবশ্য আপনার কথা আলাদা···

ডাক্তাররা ঠিক ধ'রতে পারছিলেন না শরৎকে। তিনি নিজের রোগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান্‌তে চাচ্ছিলেন না, ওর জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দিকটাই ছিল তাঁর প্রশ্নের লক্ষ্য। এই এক্সপেরিমেণ্টটা যাতে নির্ভুল হয় তাই তিনি উঠা-বসা-শোয়ায় এতটুকু আলস্য পর্য্যন্ত ক'রেন নি। সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়িয়েছে, সেইটে জেনে নেওয়া ছিল তাঁর জিজ্ঞাসার মূলে'।

কথাটার খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, বেরিয়ামের কতটুকু গেছে ইন্‌টেস্‌টাইনে?

মুখার্জ্জি একটু হেসে ফেলে বল্লেন, প্রায় কিছুই না—ওটার সবটাই যাবার কথা এতক্ষণে—প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা হ'য়ে গেছে।

তা হ'লে, শরৎ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মুখটা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে?

ডাক্তার দুজনেই হাস্‌লেন; মুখার্জ্জি বল্লেন: না, না, খুব বেশী দেরি ক'রে যাচ্চে।

তা হ'লে যা খাচ্চি, সেগুলোর কি হচ্চে?—পচে যাচ্চে ত পেটের মধ্যে?

তা যাচ্চে বৈকি!

মনে ক'রলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে···আচ্ছা, তবে এত ক্ষিদে, খাবার ইচ্ছে হচ্চে কেন?

আপনার সমস্ত দেহটা উপোসে না খেয়ে শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

উপায় ডাক্তার?

ষ্টমাক্ পাম্প দিয়ে ঐ পচা জিনিসগুলোকে বার ক'রে দিতে হবে—সকালে, দরকার হ'লে বিকেলেও।

নৈলে?

আপনি ভালো ক'রেই জানেন তার দুঃখু। নুন-জল খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি ক'রছেন কেন?

ম্লান হাসি হেসে শরৎ বল্লেন: সে যে কি দুঃখু ডাক্তার, তা' যার না হ'য়েছে—সে ছাড়া···

কথা শেষ না ক'রেই—শরৎ উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। ডাক্তারেরা গাড়ি পর্য্যন্ত এসে তুলে দিয়ে গেলেন।

কালী, চল একবার ব্যাঙ্কে, তার পর বড়বাজারে।

গাড়িতে শরৎকে অতিরিক্ত উৎফুল্ল দেখা গেল। হাতের নীলার আংটিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বল্লেন: 'ক'দিন খুলে রেখেছিলাম—সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল; আজকে অন্যরকম মনে হচ্চে—অন্ততো একটা পথ খুল্‌ছে, অসুখটা সত্যিকারের কি জান্‌তে পারা যাবে।

চাপা মানুষটি, সহজে মনের কথা খুলতে চান না; ওঁর কাছে কাছে চুপ ক'রে থাক্‌লে শেষ পর্য্যন্ত উপ্‌চে চুঁইয়ে যেটুকু আসে সেটুকু মনের একটু সত্যি কিছু। তাই কথার উত্তর না দিয়ে একটু হেসেই যেন সায় দিলুম।

হাস্‌চ যে?

তোমার কথা শুনে।

কেন?

নীলাটাই দেখছি—তোমার চেয়ে বড় হ'য়েছে আজকাল! কিন্তু আমি জানি, তুমিই বড়—তোমার ইচ্ছেতেই হয়েছে সুরু এই এক্সরে—তার এক তিলও বেশী স্বীকার করিনে; তাহ'লে আমাকেও তুলসীদাসের মতোই ব'ল্‌তে হয়:

পাথর পূজনে সে হরি মিলে তো
মৈঁয় পূজে পাহাড়'!

যদি একটা নীলাতে তোমাকে আজ এতখানি গুড্‌বয় ক'রে থাকে তো বাকি ন'টা আঙুলে পর না গুচ্চির নীলা আর পলা!···তোমার সেই দুর্দ্দান্ত সাহস কোথায় গেল—তাই শুধু ভাবি!

শরৎ আমার ডান হাঁটুর উপর হাত রেখে বল্লেন: কতদিন ভুগ্‌চি—তাও ভাবো···

ভাবি তাও;·· সেদিনের কথা মনে পড়ে—দাদার নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার গল্প শুনে ব'লেছিলে: ও-ভয় আমারও নেই বোধহয়···

মণি-মামার যে বিশ্বাস অটল ছিল, সুরেন! আমার খুঁটি, অসুখে অসুখে আল্‌গা হ'য়ে গেছে! তিনি কলেরায় ম'রেছিলেন···

কষ্টে অশ্রুসম্বরণ ক'রলাম—আহা! এমন কাঠও ঘুণে খায়!

শরৎ তোমার আর ব্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই, কষ্ট হবে।

শরৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, পারবে?

না পারার মত কি আছে? ব'লব, তিনি গাড়িতে আছেন···ওঁরা ভদ্রলোক, আর তোমার খাতিরও করেন খুব।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফিরে এলাম।

শরৎ বল্লেন: কেন যেতে দিলে না, ব'লব?

ব'লে লাভটা কি? জানাই তো আছে,···তুমি অসুস্থ।

না, তা ঠিক নয়, আমার চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হ'য়ে গেছে ব'লে।

তাই যদি হ'য়ে থাকে ত' ব্যাঙ্ক ত আর কুটুম্ব-বাড়ী নয়, ভয় কিসের?

না ভয়ের কথা নয়, লোকে তাকাবে বিশ্রী ক'রে, ব'লবে ও-কথা; তোমার ভাল লাগে না, আমার যেমন লাগে না।

হাস্‌লাম, বল্লাম: অভিন্ন-হৃদয়, এক-প্রাণ আর কি!

দেখ, একটা কথা বল্লে রাগ ক'রবে না?

সে রকম হ'লে ক'রব নিশ্চয়।

তবুও ব'লব: এ কথাটি কিন্তু তোমার রাখতে হবে।

আমোল দিলাম না।

শুনছ?

কি?

আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যেয়ো না; ক্রীমেটোরিয়ামে শেষ করিয়ে দিও।

তুমি হিন্দু, যদি আত্মীয়-স্বজনের আপত্তি হয়?

তোমার কথায় কেউ আপত্তি ক'রবে না, জানি আমি।

আপাততঃ এ প্রসঙ্গের কোন প্রয়োজন নেই।

তা' নেই; মনে হ'ল, তোমায় ব'লে রাখলাম। তারপর —সে তোমার অভিরুচি।

লোহাপটির অলিতে-গলিতে ঘুরে একটা চেনা-দোকান বা'র ক'রলেন, শরৎ। দেখ্‌লাম তারা চারিদিকে লোক ছুটিয়ে তাঁর বে-মক্কা ফরমাসের জিনিসগুলো সংগ্রহ ক'রে দিচ্চে।

বুঝলাম, শরতের খুব দেরি হবে; ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠেছে, যেন তেন প্রকারেণ ধনক্ষয়ম্ তো ক'রতেই হবে! নিজের একখানি ছোট কাঁচির দরকার ছিল, চুপচাপ্ স'রে প'ড়ছি, শরৎ ঠিক ধ'রেছেন: যাচ্চ কোথায়?

একখানা কাঁচি কিনে আনি।

কি কাঁচি?

দিশি, চুলকাটা কাঁচি।

আমার জন্যে একটা ছোট আর একটা বড় এনো।

চলেছি—কি চান মশাই, দোকানী হাঁকে: কাঁচি একখানা।

আসুন, পাবেন এখেনে।

বেশ যত্ন ক'রে বসিয়ে বল্লে: আপনি শরৎবাবুর কে হন?

কেন বলুন তো?

আপনাকে শিবপুরেও দেখেছি···

শিবপুরে আপনার বাড়ী?

উনি আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। কি অসুখটা ওঁর?

ডাক্তারেরা ঠিক ক'রতে পারেন নি।

কে-কে দেখ্‌চেন?

কুমুদবাবু, বিধানবাবু।

নিজের কাঁচি নিতে দেরি হ'ল না; কিন্তু শরতের পছন্দের জন্যে একরাশ—একটি লোকের হাতে পাঠিয়ে দিলেন, ভদ্রলোকটি।

শরৎ বল্লেন: তোমার চেনা দোকান?

আমার নয়, তোমারি, শিবপুরে বাড়ী।

বটে! তবে তো ঠকাবে দেখ্‌ছি—ব'লে দু'খানা কাঁচি নিয়ে, বল্লেন: যাও হে, দাম-টাম আমি দিতে পারব না; ব'লে দিও তোমার বাবুকে।

দেবেন না, বেশ তো। ব'লে লোকটা হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল।

এদিকে বিপুল জিনিস কিনে ব'সে আছেন শরৎ, করাৎ গোটা দুত্তিন, উকো ডজন খানেক, বাগানের জন্যে দিশি-বিলিতি খুরপি তো ছুরি তো প্রুনিং নাইফ···তার আর শেষ নেই!

ঘড়িতে দেখা গেল তিনটে;—কারুর নাওয়া খাওয়া হয়নি।

শরৎ বাড়ী চল—ফেরার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ; কালী বেচারা হয়ত কিছুই খায় নি···

আরে, তুমিও ত'; উঃ ভারি অন্যায় হ'য়েছে—চলো চলো···

জিনিসপত্র বাঁধা হ'চ্ছে—দোকানদার বল্লে: বাবু, এটা নেবেন না?

কিহে ওটা?

খাস্ বিলিতি; একেবারে আসল ইস্পাৎ···বিদেশে সঙ্গে থাক্‌লে—কোন কাজ আট্‌কায় না।

পছন্দ হবার মতো জিনিসটি! কুড়ুল আছে, হাতুড়ি আছে, কাঁটি তোলা আছে, পেঁচ-কষ—আরো কি সব; বুদ্ধি ক'রে ব্যবহার ক'রতে পারলে সব রকমের কার্য্যোদ্ধার ক'রতে পারা যায়। সবচেয়ে মনোরম তার বাঁটটা, ওকের তৈরি, মুঠিয়ে ধরার মত ক'রে উঁচু-নীচু করা, শক্ত, সুদৃশ্য এবং তার উপর সৌখিন! সাধ্য কি শরতের না বলার?

খান তিন চার নোট ফেলে দিয়ে শরৎ বল্লেন: নাও বাপু, হিসেব ক'রে দামটা, দেখো ঠকিও না, ঠিক ঠিক নিও; জুড়তে ভুল না হয়; আর ভাউচার চাইনে। টাকা ফেরৎ নিয়ে, না গুণে থলির মধ্যে ফেলে দৌড় দেন আর কি!

এই দিকে, আরে, কাঁচির দাম দাওনি যে···

কাঁচির দোকানের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতেই লোকটি লাফ মেরে নীচে এসে শরৎকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রলে। তারপর হাতজোড় ক'রে বল্লে: দাম নেব না; আপনাকে ব্যবহার ক'রতে দিয়েছি···

তাই কি হয় হে, দেখ কারুর কাছে ঋণী থাক্‌তে নেই, বিশেষ ক'রে আমার মতো বুড়ো, আর রুগ্নর ··নৈলে ফিরিয়ে দিচ্চি তোমার জিনিস···

সে হাত পেতে দাম নিয়ে আবার প্রণাম ক'রলে।

ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লেন: কালী, কালী, বড় অবেলা হ'য়ে গেল বাপু, তোমার খাওয়া হয়নি?

কালী হেসে বল্লে, পয়সা ছিল সঙ্গে, আমি খেয়ে নিয়েছি।

কালীর হাতে একটা আট-আনি দিয়ে বল্লেন: চল, চল, আর একটুও দেরি নয়।

গাড়ি ছুটল হাওয়ার বেগে।

আমার দিকে ফিরে বল্লেন: তোমায় আমি যে কি কষ্ট দিচ্চি···

ক্ষমা চাইচ?

লজ্জা করে; চাওয়া উচিত।

কিন্তু আর একজনের কাছে তোমার অপরাধ ঢের বড়···

কে সে?

নিজের কাছে—সবচেয়ে নিয়মে থাকা তোমারই উচিত···

আমার পেটে বেরিয়াম অচল হ'য়ে ব'সে আছে।

কিন্তু তোমার মুখটি পর্য্যন্ত ধোয়া হয়নি।

বাঃ মুখ ধুয়েছি বৈকি!

পাইখানা?

তাই তো!

স্নান?

শীত কাল; ওতে ক্ষতি নেই—তাই মাথাটা ধ'রেছে—কৈ দেখি, অ্যাস্‌পিরিণের শিশিটা!

বাড়ী ফিরে শরৎ বল্লেন: চল তাড়াতাড়ি ক'রে খেয়ে একটা ষ্টম্যাক্ পাম্প কিনে আনি। ওটার সবচেয়ে বেশী দরকার।

কেন?

দেখ, নুন-জল খেয়ে বমি ক'রতে ভারি কষ্ট হয়। ওটা হ'লে যখন ইচ্ছে—কি যখন কষ্ট হবে—তখনি পেটটাকে খালি ক'রে দেওয়া যাবে।

কিন্তু আজকালের মধ্যে ওটা ত' ব্যবহার করা চ'লবে না; কিনে আনা যেতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের মত না নিয়ে কিছু করা চ'লবে না।

এ অতি সহজ ব্যাপার; প্রতি কথায় কি কেউ ডাক্তার ডাক্‌তে পারে?—এর জন্যে ফের···

আজকে কিনে কাজ নেই।

কেন?

বেরিয়ামটা বার ক'রে দিলে কি ক'রে চলে, শরৎ?

একটু এদিক-ওদিক ক'রে এসে বল্লেন: চল তবে কুমুদের কাছে, তুমি যা' ব'লবে তা তো ছাড়বে না।

একটা দায়িত্ব আমার উপরে আছে তো? সেটাও তোমার বিবেচনা করা উচিত; যার অসুখ সে তো নাবালকের সামিল।

শরৎ হাস্‌লেন, বল্লেন, তবুও তুমি অনেকটা ঢিল দেও···

সেটা আমার দুর্ব্বলতা কিনা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে; হয়ত অন্যায় হয়, ক্ষতিই করি তোমার।

শরৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, বল্লেন: কোন নিয়ম কি শাসন যেন আমি কিছুতেই সইতে পারিনে। মনে হয় লাভ কি? যা হবার তা তো হবেই; কেউ কি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে?

তা' আমি তো দেখ্‌ছি সেই ছোটবেলা থেকে তোমার;

সেই পেয়ারা চুরি ; সেই রাতে রাজুর সঙ্গে ডিঙিতে পালান —কিন্তু শরৎ সেগুলো সব সুস্থ মানুষের ব্যাপার ছিল ; আজ আর তা হয় না।

শরৎ ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

বেশ মনে পড়ে আমার অসুখের সময়কার কথা : তোমার কাঠিন্যকে আমি সেদিন ভুল ক'রে নির্দ্দয়তা মনে ক'রেছিলাম ; কিন্তু এখন বুঝি, তার কতখানি দরকার ছিল ; হয়ত' তুমি সেদিন শক্ত না হ'লে আমার পক্ষে সেরে উঠা সম্ভব হ'ত না।

যেতে দাও ও-সব কথা, সুরেন ; এইটুকু বুঝি ; যা হবার তাই হয় ; আর সব-কিছু উপলক্ষ।

এ যে একেবারে অদৃষ্টবাদীর কথা !

আমি ? ঘোর অদৃষ্টবাদী, ভয়ানক মানি···

কিন্তু এই মতবাদ যখন মানুষকে পঙ্গু ক'রে দেয় তখন ফল হয় মারাত্মক !

হ'তে পারে ; কিন্তু তাও অবশ্যম্ভাবী···ওকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না !

বটে ! পুরুষকার মান না ? মানুষের চেষ্টার কোন মূল্য নেই ?

শরৎ আন্‌মনা হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

ডাক্তারের বাড়ী পৌঁছে শরৎ অনুযোগের সুরে বল্লেন : কুমুদ, আর তোমার চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনে, ব্যাপার কি ? আমায় পরিত্যাগ ক'রলে নাকি ?

একদিন গিয়ে আপনাকে সব কথা ব'লব ; ভারি মুস্কিলে প'ড়ে গিয়েছি।

সে কথা আমি জানি, কুমুদ···

কে ব'ললে আপনাকে ?

কেন, কিরণ এসেছিলেন : তুমি তো ঘরে বাইরে আউট্-ভোটেড হ'য়ে বড় মনের দুঃখে দিন কাটাচ্চ। আমাকে একটু সারতে দাও ত'—দেখ্‌বে কি করি তোমার জন্যে···আচ্ছা ডাকত বৌমাকে একবার—বাড়ী আছেন ? না নেমন্তন্ন ক'রতে বেরিয়েছেন ?

খান কতক চেয়ার দেওয়া হল বাইরে—আমরা সেখেনে গিয়ে ব'সলাম।

বৌমা এলেন।

বৌমা, আমি আগে সেরে উঠি তারপর বাপু তোমার মেয়ের বিয়ে হবে। আমি যেন কিছুতেই বাদ না পড়ি !

আপনি সেরে উঠ্‌বেন তদ্দিনে নিশ্চয়, সে তো এখনও অনেক দেরি···

দেখো বাছা, কথা রেখো !···কৈ কুমুদ কোথায় গেলেন, বাঃ !

কে রিং ক'রছিল···ঐ যে···

কুমুদ, আমাকে একটা ষ্টম্যাক পাম্প কিনে দাও···

কি ক'রবেন ?

আর কত দুঃখু সইব, ওটা থাক্‌লে কষ্ট হ'লে—নিজে নিজেই···

নিজে পারবেন কি ক'রে ?

পারব, পারব···তোমরা যতখানি আমাকে···মনে কর, তা নই কুমুদ, মোটেই তা নই ! তুমি ব'লে দাও ক' নম্বরের···

কাল বই দেখে ব'লে দেব।

কাল যাবে তা হ'লে ?

এবার থেকে, ল্যাবরেটারি থেকে ফেরার পর—পথে আপনাকে দেখে বাড়ী আসব।

তাই যেয়ো কুমুদ, না গেলে বড় কেমন-কেমন ঠেকে, কিছুতেই ভরসা পাইনে।

বর্ষণ-উন্মুখ জলভরা মেঘের মতো মুখখানি কুমুদ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

শরৎ বোধহয় দেখেও তা দেখ্‌লেন না। গাড়িতে ব'সে বল্লেন : ভারি ভালো···বোধহয় কণ্ঠরোধ হ'ল।

কালী চল।

ঐ যে ডাক্তারবাবু আস্‌চেন···

কি কুমুদ ?

আপনি একবেলা ক'রে না গিয়ে দুবেলা ক'রে যাবেন সেবাসদনে···ওরা ব'লতে সাহস করে নি···শীগ্‌গির হয়ে যাবে।

ওটা নামলে তো ; কম্‌প্লীট অবস্ট্রাক্‌শন···

কি বলেন যে আপনি—তাহ'লে জ্ঞান থাক্‌তো ?—যাবেন, দুবার ক'রেই।

কাল থেকে, আজ ত বলা নেই।

আমি ব'লে দিচ্ছি, মুখার্জ্জিকে।

বেশ।

ক্রমশঃ

দৃক্‌সিদ্ধি সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য

শ্রীষষ্ঠীচরণ সমাজদ্দার

জ্যোতিষ

জ্যোতিষশাস্ত্রালোচক ও জন্মপত্রিকাবিচারক মহোদয়গণের অনুগ্রহে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার বিশুদ্ধতা সাধারণের সমক্ষে নীত হইতেছে ও এই পঞ্চাঙ্গের আদর বাড়িতেছে। বিশেষতঃ ইংরেজীশিক্ষিত যুবকেরা ফলিত জ্যোতিষ চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলক পণ্ডিতবর্গ ও শিক্ষিত-সমাজ বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইলেও জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত সমবেতভাবে এই পঞ্জিকার তাদৃশ আদর করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তবে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই অন্যান্য পঞ্জিকার ভ্রান্তি অবগত হইয়া সে সকলকে সন্দেহনেত্রে দেখিতেছেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণের অব্যবস্থিতচিত্ত হইবার কারণ অনেকগুলি। তাহার মধ্যে বিশেষ একটী এই যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সহজে চিরাগত অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কষ্টসহকারে জ্যোতিষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। তাঁহাদের স্মৃতির পুস্তকে সামান্য জ্যোতিষের আভাস পান ও সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চিন্তা ও কল্পনাবলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। কজ্ঝটিকা আচ্ছাদনে অজানিত প্রদেশে ভ্রমণ করিলে যেমন পদে পদে পথভ্রম হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কেবল স্মৃতিগত জ্যোতিষজ্ঞান-চালিত-অনুসন্ধান পথাভিমুখী হওয়া সেইরূপ অপরিহার্য্য। জ্যোতিষের নূতন তত্ত্ব শুনিলে বা ভ্রান্তিবিবর্জ্জিত নূতন গণনাফল দেখিলে স্মার্ত্তগণ স্মৃতির পুস্তক খুলিয়া মিলাইতে চেষ্টা করেন। ভুলিয়া যান যে, আকাশের দৃশ্যমান ব্যাপারের সহিত গণনা-ফলের তুলনা আবশ্যক—স্মৃতির শ্লোকের সহিত নহে। এইরূপ অবৈজ্ঞানিক অভ্যাস ও আচরণে এই ফল দাঁড়ায় যে প্রাচীন ঋষিবচন ও খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণের বচন অনাদর করিতে হয়, আর না হয় তাহার বিকট ক্লিষ্ট ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্মার্ত্তমহোদয়গণের দিগ্‌ভ্রম হওয়াতে ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা লোপ পাওয়াতে একপ্রকার কুসংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দু জ্যোতিষ এক অভিনব পদার্থ। ইহার সহিত বিজ্ঞান বা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের কোন সম্বন্ধ নাই; ইহা ঋষিপ্রণীত আপ্তশাস্ত্র। এই ভ্রমবশতঃ কেহ সহজে পঞ্জিকাসংস্কারের পক্ষপাতী হইতে চাহেন না। এই কুসংস্কারের ফলেই স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা স্মৃতিকে জ্যোতিষের মুখাপেক্ষী না করিয়া জ্যোতিষকে স্মৃতির মুখাপেক্ষী করিতে চাহেন এবং ইহারই ফলে পাশ্চাত্য-জ্যোতিষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাও পঞ্জিকাসংস্কারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন ও সন্দর্শন দ্বারা পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরূপণ অবিধেয় মনে করেন; যাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমানাদি কোন স্বার্থ আছে তাঁহারা এই কুসংস্কারকে পুষ্ট করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করেন।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ কখনও জ্যোতিষকে আপ্তশাস্ত্র জ্ঞান করেন নাই। সর্ব্বদাই আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র যে দর্শনমূলক তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য ভাস্করাচার্য্যের মত নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের শ্লোকে শ্লোকে দৃক্‌প্রত্যয় নিহিত; অন্যান্য পুস্তক হইতে স্পষ্টতর ভাষায় ইঁহার দৃক্‌সিদ্ধ্যভিপ্রায় প্রকাশিত। জ্যোতিষশাস্ত্র যে দৃষ্টিমূলক, জ্যোতিষ যে আপ্তশাস্ত্র নহে, সে কথা ভাস্করাচার্য্য পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন। এই অসাধারণ ধীমান্ পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষের বেদাঙ্গত্ব অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু বেদাঙ্গ বলিয়া তিনি ইহাকে আপ্তশাস্ত্র বলিতেছেন না।

> বেদাস্তাবদ্ যজ্ঞকর্ম্মপ্রবৃত্তাঃ যজ্ঞাঃ প্রোক্তাস্তে তু কালাশ্রয়েণ
> শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাদ্ বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ ॥

কালাশ্রয়ে সাধিত যজ্ঞকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেন বেদ। সুতরাং যে শাস্ত্রদ্বারা কালজ্ঞান হয়, সেই জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ চক্ষু। এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ নিজকৃতশাস্ত্র বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

> অথ নিজকৃতশাস্ত্রে তৎ (রবেঃ) প্রসাদাৎ পদার্থান্
> শিশুজন গুণয়াহং বাঙ্ময়মাত্র গৃঢ়ান্।

শুধু তাহাই নহে গোলাধ্যায়ে স্পষ্ট জানাইতেছেন যে, তাঁহার পুস্তকে বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত আছে, যে সকল বিষয় পূর্ব্বাচার্য্যেরা আলোচনা করেন নাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ মনুষ্যকৃত শাস্ত্র, ইহাতে নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইতে পারে; নূতন বিষয় দেখিলে মনুষ্য সাধ্যমত পরিবর্ত্তন করিতে পারে এই কথা ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন। একটী উদাহরণ লইলে কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। অয়নগতি সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "তৎ কথং ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ নিপুণৈঃ অপি ন উক্ত ইতি বেৎ। তদাস্বল্পত্বাৎ তৈঃ ন উপলব্ধঃ। ইদানীং বহুত্বাৎ সাম্প্রতৈঃ উপলব্ধঃ। অতএব তস্য গতিঃ অস্তি ইতি অবগতম্।"* লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন যে সুনিপুণ জ্যোতির্ব্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত অয়নগতি স্বীকার করেন নাই বলিয়া এ গতি উপেক্ষা করিতে হইবে এমন কথা জ্যোতিষে হইতে পারে না। ব্রহ্মগুপ্তাদির সময় অয়নাংশ (সায়ন ও নিরয়ণ আদিবিন্দুদ্বয়ের অন্তর)

* Why then did not Brahmagupta and other learned astronomers speak of it? The accumulation was so small in their days as to escape observation. Now it is pretty large and has forced itself upon our notice. Thus we know that the Solstitial colure has a motion.

অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়াই উপলব্ধি হয় নাই। এক্ষণে পুঞ্জীকৃত অয়নগতি বিপুলায়তন হইয়াছে বলিয়া আমরা গতি বুঝিতে পারিতেছি।

অনেকে মনে করেন যে, জ্যোতিষ যখন বেদাঙ্গ, তখন সে শাস্ত্রে হস্তক্ষেপ অনুচিত। সে শাস্ত্র বেদসম অপরিবর্ত্তিত থাকাই সুব্যবস্থা। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিতেছেন। ইঁহার নিকট জ্যোতিষ ক্রমোন্নতিশীল শাস্ত্র। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা উপলব্ধ হইবে, তাহাই এ শাস্ত্রে গ্রহণীয়। যেমন "ন হি ক্রান্তিপাতো নাস্তীতি বক্তুং শক্যতে। প্রত্যক্ষেণ তস্যোপলব্ধত্বাৎ।" শুধু তাহাই নহে, "যদা যেহংশা নিপুণৈঃ উপলভ্যতে, তদা স এব ক্রান্তিপাত ইত্যর্থঃ।" ক্রান্তিপাত সম্বন্ধে কথাটা উঠিয়াছে বটে কিন্তু নিয়মটী সর্ব্ববিষয়ে প্রযোজ্য। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের 'কালভেদোঽত্র কেবলম্' বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য গ্রহণের উপদেশ হইয়া দাঁড়ায়। সৌরপুস্তক যাহা এক কথায় সারিয়াছেন, ভাস্কর তাহাই স্পষ্ট প্রাঞ্জলভাষায় লিখিয়াছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতির্বিদদের মত গ্রহণীয় একথা স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহার পুস্তক পাঠের পরে আর কেহ পঞ্জিকা সংস্কার বিরোধী হইতে পারেন না। তাঁহার পুস্তকের প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই কিছু না কিছু আছে যাহাতে পাঠক নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুগণ যে জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন তাহা সত্যই জ্যোতিষ। যে শাস্ত্র সকল দেশে সমভাবে পূজিত—আধুনিক জ্যোতির্নির্ণায়ধেয় অঙ্কজাল বা তাহার পোষকতা নহে। প্রত্যেক ছত্রেই দৃক্সিদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে সর্ব্বত্র দৃক্সিদ্ধ্যভিপ্রায় বিদ্যমান।

মধ্যাদ্যং দ্যুসদাং যদত্র গণিতং তস্যোপপত্তিং বিনা।
প্রৌঢ়িং প্রৌঢ়সভাসু নৈতি গণকো নিঃসংশয়ো ন স্বয়ম্।
গোলে সা বিমলা করামকলবৎ প্রত্যক্ষতো দৃশ্যতে।
তস্মাদস্ম্যপপত্তিবোধ বিষয়ে গোলপ্রবন্ধোদ্যতঃ॥

এই শ্লোকে বলা হইল যে গোলজ্ঞান বিনা জ্যোতির্বিদদের কোন মূল্য নাই। কিন্তু জ্যোতিষে দৃক্সিদ্ধির আবশ্যক না থাকিলে গোলজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হইত। গোলজ্ঞানের অপরিহরণীয়তার অর্থ এই যে গণনার দৃক্সিদ্ধিই গণকের একমাত্র লক্ষ্য। গোল কি পদার্থ তাহা বুঝাইতে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

দৃষ্টান্ত এবাবনিভ গ্রহাণাং সংস্থানমান প্রতিপাদনার্থম্।
গোলঃ স্মৃতঃ ক্ষেত্রবিশেষ এব প্রাজ্ঞৈরতঃ স্যাদ্গণিতেন গম্যঃ॥

এখানেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যথার্থ আকাশের জ্যোতিষ্ক-বৃন্দই গণকের লক্ষ্য; সেই সকল জ্যোতিষ্কের অবস্থান বুঝিবার জন্য গোলচক্রের আবশ্যক। গণনা অর্থে যদি সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি কোন পুস্তক-বিশেষের অঙ্কবিন্যাসমাত্র হইত, তাহা হইলে খগোলের প্রতিকৃতি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িত। ইহাতেও যদি কেহ বলেন যে ভাস্করীয় জ্যোতিষ নৌচালনের জন্য, তাহা হইলে আমাদের পূজ্য স্মার্ত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যে নিবন্ধকারগণ ভাস্করকে মানিয়া চলিয়াছেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রফলং পুরাণগণকৈরাদেশ ইত্যুচ্যতে।
নূনং লগ্নবলয়াশ্রিতং পুনরয়ং তৎ স্পষ্টখেটাশ্রয়ম্॥" *

কোষ্ঠীর ফল সঠিক দৃক্সিদ্ধ গ্রহাবস্থানের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা দৃক্সিদ্ধিবিরোধী তাঁহারা যে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণের মত অবহেলা করিতেছেন, তাহার সংশয় নাই। অথচ সাধারণের বিশ্বাস যে তাঁহারাই ভারতীয় জ্যোতিষের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। দৃক্সিদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন কথাই ভাস্করাচার্য্যের মনে স্থান পায় নাই। চন্দ্রের ভগণের উপপত্তি স্থলে আচার্য্য বলিতেছেন, "বিপুলং গোলচন্দ্রং কার্য্যং। * * * ততস্তদ্গোলচন্দ্রং সম্যগ্ ধ্রুবাভিমুখযষ্টিকং জলসমক্ষিতিজবলয়ঞ্চ যথা ভবতি তথা স্থিরং কৃত্বা, রাত্রৌ গোলমধ্যচিহ্ন-গতয়া দৃষ্ট্যা রেবতীতারাং বিলোক্য ক্রান্তিবৃত্তে যো মীনান্তস্তস্য রেবতী-তারায়াং নিবেশ্য মধ্যগতয়ৈব দৃষ্ট্যা চন্দ্রং বিলোক্য তদ্বেধবলয়ং চন্দ্রোপরি নিবেশ্যম্। এবং কৃতে সতি বেধবৃত্তস্য ক্রান্তিবৃত্তস্য চ যঃ সম্পাতস্তস্য মীনান্তস্য চ যাবদন্তরং তস্মিন্ কালে তাবান্ স্ফুটচন্দ্রো বেদিতব্যঃ। ক্রান্তি-বৃত্তস্য চন্দ্রবিম্বমধ্যস্য চ বেধবৃত্তে যাবদন্তরং তাবাংস্তস্য বিক্ষেপঃ। ততো যাবতীষু রাত্রিগত ঘটিকাসু বেধঃ কৃতস্তাবতীষ্বেব পুনর্দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্যঃ। এবং দ্বিতীয় দিনে স্ফুটচন্দ্রং জ্ঞাত্বা তয়োর্যদন্তরং সা তদ্দিনে স্ফুটা গতিঃ।" অতঃপর চন্দ্রোচ্চের উপপত্তিস্থলে লিখিলেন "এবং প্রত্যহং চন্দ্রবেধং কৃত্বা স্ফুটগতয়ো বিলোক্যাঃ। যস্মিন্ দিনে গতে পরমাল্পাঃ দৃষ্টাঃ তত্রদিনে মধ্যম এব স্ফুটচন্দ্রো ভবতি; তদেবোচ্চস্থানম্।" পুনরায় চন্দ্রপাতস্থলে "এবং প্রত্যহং চন্দ্রবেধাৎ দক্ষিণবিক্ষেপে ক্ষীয়মাণে যস্মিন্ দিনে বিক্ষেপাভাবঃ দৃষ্টঃ, ক্রান্তিবৃত্তে তৎস্থানং চিহ্নয়িত্বা তত্র যাবান্ বিধুঃ স ভগণাচ্ছুদ্ধঃ পাতঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্।" ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি আদ্যোপান্তই এইরূপ আদেশে গগনমার্গস্থ গ্রহাদিদর্শনাদেশে পরিপূর্ণ। যে কেহ বিনা আয়াসে আমাদের কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার পরেও কেহ যেন মনে না করেন যে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা দৃষ্টির সহিত সংস্রব রাখিতেন না। সমগ্র ইউরোপের স্বীকৃত শিক্ষাগুরু * ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পুস্তকের ছত্রে ছত্রে দৃক্সিদ্ধি সম্পাদন করিবার উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের জ্যোতির্বিদেরা দৃষ্টি অবহেলা করিতেন বলিলে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হয়, একথা যদি কাহারো ধারণা থাকে তাহা হইলে তিনি জানিবেন যে তাঁহাদিগকে এ অপগৌরব ভূষিত করিবার অবকাশ নাই। সেই ঋষিতুল্য প্রভূতধীসম্পন্ন মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ অমিশ্র সনাতন সত্য ভিত্তির উপর নিহিত। তাঁহাদের পূজার জন্য কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের আবশ্যক হয় না; সত্যনিষ্ঠা সত্যাশ্রয় সত্যানুসন্ধান দ্বারাই সেই দেবসম মহাত্মাগণের প্রীতি সম্পাদিত হয়।

---

* It is said by ancient astronomers that the purpose of the science is judicial astrology, and this indeed depends upon the influence of the horoscope, and this on the true place of the planets.

* His astronomy was known to the Arabs almost as soon as it was written and influenced their subsequent writings. The results thus became indirectly known in the West before the end of the 12th century. (Hist. of Math. W. W. R. Ball).

স্বপ্ন-গল্প

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এ গল্প আমি আমার আকৈশোর বন্ধু কুমারবাহাদুরের মুখে শুনেছি। যাঁকে আমি কুমারবাহাদুর বলছি, তিনি রাজপুত্র ছিলেন না; ছিলেন সুধু একটি পাড়াগেঁয়ে মধ্যবিত্ত জমিদারের একমাত্র সন্তান। তাঁর নাম ছিল কুমারেশ্বর, তাই কলেজে তাঁর সহপাঠীরা মজা করে' তাঁকে কুমার-বাহাদুর বলে ডাক্‌তেন। এই নামটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

সুধু কুমার নামটা কেমন নেড়া-নেড়া শোনায়—ওর পিছনে "বাহাদুর" এই লেজুড়টা জুড়ে দিলে নামটাও যেমন ভরাট হয়, কানও তেমনি সহজে তা' গ্রাহ্য করে। কেননা, কান তাতে অভ্যস্ত।

কুমারবাহাদুরও এই ডাকনামে কোন আপত্তি করেন নি। পড়ে-পাওয়া চোদ্দ-আনা কে প্রত্যাখ্যান করে—বিশেষতঃ যে জিনিস দাম দিয়ে কিনতে হয়, তা' অম্নি পেলে কে না খুসি হয়?

যদিও তিনি জানতেন যে, ও নামের ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে'; যে খোঁচা—যাদের খেটে খেতে হবে তারা, যাদের তা' করতে হবে না তাদের গায়ে বিঁধিয়ে সুখ পায়। ও একরকম কথার চিম্‌টি কাটা।

কুমারবাহাদুরের sense of humour দিব্যি সজাগ ছিল, তাই তিনি ছোটখাটো অনেক কথা ও ব্যবহার—ঈষৎ বিরক্তিকর হলেও ছোট বলেই হেসে উড়িয়ে দিতেন; যেমন আমরা গায়ে মাছি বসলে, তাকে উড়িয়ে দিই। পরশ্রী-কাতরতার উৎপাত মানুষমাত্রকেই উপেক্ষা করতে হয়, নইলে মানব-সমাজ হয়ে উঠত একটা যুদ্ধক্ষেত্র। বলা বাহুল্য শ্রী মানে সুধু রূপ নয়, গুণও বটে; সুধু লক্ষ্মী নয়, সরস্বতীও বটে।

তিনি B. A. পাস করবার পরে, অর্থাৎ কলেজ ছাড়ার পর বেশীর ভাগ সময় দেশেই বাস করতেন। পাড়াগাঁয়ে নাকি সময় দিব্যি কাটানো যায়; শিকার করে ও বিলেতি নভেল পড়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পয়লা নম্বরের বন্দুক ও নভেল সুধু বিলেতেই জন্মায়। সেই সঙ্গে জমিদারী তদারক করতেন। দেশে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিত, তখন তিনি তীর্থযাত্রা করতেন,—ঠাকুর দেখবার জন্য নয়, ঠাকুরবাড়ী দেখবার জন্য। দেবদেবীর ভক্ত তিনি ছিলেন না; ছিলেন architecture-এর অনুরক্ত। এও একরকম বিলেতি সখ। তাঁর জমিদারীর আয়ে এসব সখ সহজেই মেটাতে পারতেন। আর কলকাতায় যখন আস্‌তেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা করতেন। কেননা ইতিমধ্যে আমি হয়ে উঠেছিলুম তাঁর friend, philosopher and guide.

কিছুদিন পূর্ব্বে কুমারবাহাদুর হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন যা কথাবার্ত্তা হল—তাই আজ বলছি। এই কথোপকথনকেই আমি পূর্ব্বে বলেছি—গল্প। কিন্তু তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর যার নায়ক স্বয়ং তিনি, সে ঘটনা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তা অবলম্বন করে একটি ছোট গল্পও গড়ে' তোলা যায় না। তবে তিনি তাঁর মনের গোপন কথা এত মন খুলে বলেছিলেন যে, আমার মনে সেটি গেঁথে গিয়েছে। কুমারবাহাদুর তুচ্ছ জিনিসকে উপেক্ষা করতেন; কিন্তু সেদিন দেখলুম তিনি একটি তুচ্ছ ঘটনাকে খুব বড় করে দেখেছেন, বোধহয় সেটি নিজের কীর্ত্তি বলেই।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম—

—কেমন আছ?

—ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। শরীর ভাল, কিন্তু মন খারাপ।

—মন খারাপ কিসে হল?

—অর্থাভাবে।

—তোমার অর্থাভাব?

—হাঁ, তাই। এখন থেকে আমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে—এই ভয়ে মনটা মুষড়ে গিয়েছে।

—তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে?

—ভয় নেই! তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসি নি। তুমি সাহিত্যিক, দেবে কোত্থেকে?

—রসিকতা করছ ?

—না, আমি সত্যসত্যই প্রায় নিঃস্ব হয়েছি। এখন বেঁচে থাক্‌তে হলে, পরের অনুগ্রহে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে; যার শ্রুতিকটু নাম হচ্ছে ভিক্ষে করা। যদিচ অনেকেই তা করে। কেউ করে সরকারের কাছে মান ভিক্ষা; কেউ করে রমণীর কাছে প্রেম ভিক্ষা; আবার কেউ করে গুরুর কাছে জ্ঞান ভিক্ষা। আমি মনে করেছি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে এখন থেকে করব মুষ্টিভিক্ষা।

—আচ্ছা তা যেন হল, তোমার সম্পত্তি কি সব উড়িয়ে দিয়েছ ?

—না, গরু এখনও গোয়ালে আছে, কিন্তু দুধ দেয় না। অর্থাৎ জমিদারীর স্বত্ব আছে, কিন্তু উপস্বত্ব নেই।

—কারণ ?

—Economic depression।

—তাহলেও ত কর্জ্জ করতে পারো।

—কর্জ্জ দেয় ধনীলোকে, আর নেয় ধনীলোকে। ও এক-রকম স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে জুয়োখেলা। ভিক্ষে করে শুধু গরিব লোকে; আর আমি এখন গরিব হয়েছি। সুতরাং ও জুয়োখেলায় যোগ দেবার আমার আর অধিকার নেই। যে সম্পত্তি আজ আছে, তা' হয়ত সদর খাজনার দায়ে কাল বিকিয়ে যাবে।—এমন সম্পত্তি রেহান রেখে কে কর্জ্জ দেবে ? আর তা' ছাড়া মহাজনদের অবস্থাও তথৈবচ।

—তাহলে ধারও করতে পারবে না ?

—না। কর্জ্জের পথ বন্ধ, বলেই ত ভিক্ষের পথ ধরব মনে করছি। ইংরাজীতে একটা মহাবাক্য আছে—Beg, borrow or steal.

—তাই বুঝি beg করাটাই শ্রেয় মনে করেছ ?

—উপায়ান্তর নেই বলে। যদিচ জানি তাতে বিশেষ কোনও ফল হবে না। সামাজিক লোকের ভিতর fraternity নেই। equality'ও নেই, পরে হবে যখন তারা libertyতেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। Dictatorরা মানুষকে লেশমাত্র liberty দেন না।

—তাহলে borrow করতে পারবে না, beg করেও কোনও ফল হবে না। তবে করবে কি ?

—Steal আমি করব না। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম একবার করেছিলেম, তাতেই মনটা তিতো হয়ে রয়েছে।

—চুরি করেছিলে তুমি ?

—হ্যাঁ। এখন সেই চুরির মামলা শোন :

(২)

আমি সেকালে একবার দারজিলিং যাচ্ছিলুম—পূজোর পর; বোধহয় অক্টোবর মাসের শেষ হপ্তায়। পাগ্‌লা-ঝোরার কাছে এসে দেখি, সে যেন বাস্তবিকই ক্ষেপেছে—লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, গর্জ্জাচ্ছে—আর আমাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। শুনলুম ট্রেণ আর বেশী দূর এগোতে পারবে না। রেলের রাস্তা নাকি অতিবৃষ্টিতে খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। এ গাড়ী ছেড়ে খানিকটা হেঁটে মহা-নদীতে গিয়ে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। করতে হলও তাই। খানিকক্ষণ বাদে নামতে হল, তারপর জল কাদার ভিতর দিয়ে আধ মাইল পথ, পদব্রজে উত্তীর্ণ হয়ে মহানদীতে এসে আর একটি খালি গাড়িতে চড়লুম। আমি একা নয়—সঙ্গে ছিল অনেক সাহেব মেম।

সে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখি জনৈক পল্টনী সাহেব আগেভাগে সেখানে অধিষ্ঠান হয়েছেন। এতে অবশ্য আমি খুসী হলুম না। মেমেরা যেমন কালা আদমীদের সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠতে ভালবাসেন না—আমরাও তেমনি সাহেবসুবোদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে অসোয়াস্তি বোধ করি। রঙের তফাতে যে মানুষে মানুষে কত তফাৎ হয়, তা তুমি জান। কিন্তু অগত্যা সেই গাড়ীতেই উঠে পড়লুম। সেটা ছিল ফার্ষ্ট ক্লাস, আর আমার পকেটেও ছিল ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট। এক পা কাদা নিয়ে ঢুকতে ঈষৎ ইতস্ততঃ করছিলুম। কিন্তু চোখে পড়ল যে সাহেবটির পদযুগলও তদবস্থ। তাঁর পা আমার চাইতে ঢের বড়, জুতোও সেই মাপের; সুতরাং কর্দ্দমাক্ত হয়েছে তদনুরূপ। ট্রেণে চড়ার পর মাঝপথে গাড়ী থেকে নেমে, কিছুদূর পায়ে হেঁটে, আবার নতুন গাড়ীতে চড়া কষ্টকর নাহলেও বিরক্তিকর। আগের গাড়ীতে মালপত্র যেমন সুব্যবস্থিত থাকে, পরের গাড়ীতে ঠিক তা থাকে না; সবই ভেস্তে যায়। যা ছিল চড়বার

গাড়ীতে, তা মালগাড়ীতে চলে যায়; আর কোন কোন জিনিস মালগাড়ী থেকে বসবার গাড়ীতে বদ্‌লি হয়। এতেই মন খিঁচ্‌ড়ে যায়। ছোটখাটো অসুবিধে আসলে মস্ত বড় অসুবিধে। আমি মুখের ঘাম মুছতে আমার hand-bag থেকে একটি রুমাল বার করতে গিয়ে দেখি, সেটি অদৃশ্য হয়েছে। তাই কি করি—ভিজে মুখ ভার করে বসে থাক্‌লুম। চারপাশ কুয়াশার খদ্দরে ঢাকা; তাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার চোখে পড়ল না। যদিচ এই পথটুকুর চেহারা অতি চমৎকার। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড গাছ, যাদের একটিরও নাম জানিনে; অথচ দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। পৃথিবীতে অনেক জিনিসের নামই তার রূপ দেখ্‌তে দেয় না। কার্সিয়ং পৌছবার কথা বেলা এগারোটায়—কিন্তু বেলা একটা বেজে গেল, তখনও গাড়ী সে ষ্টেসনে পৌছল না। সেদিন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেজায়। একে বেলা হয়েছে, তার উপর আধ মাইল কাদার মধ্যে পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়েছে। তাই কার্সিয়ং পৌছিয়েই ষ্টেসনের restaurantতে খেতে গেলুম। এক পেট মাছমাংস খেয়ে যখন গাড়ীতে ফিরে এলুম, তখন গাড়ী ছাড়বার বড় দেরি নেই। গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি আমার cigarette caseএ একটিও cigarette নেই—ইতিমধ্যেই সব ফুঁকে দিয়েছি। আর আমি restaurant থেকেও সিগারেট কিনিনি, কারণ আমি জানতুম আমার hand-bagএ একটি পুরো সিগারেটের টিন আছে। শুধু ভুলে গিয়েছিলুম যে হ্যাণ্ডব্যাগটি হারিয়েছে। একটি সিগা-রেটের অভাবে আমার প্রাণ আই-ঢাই করতে লাগল। সিগারেটের নেশা গাঁজাগুলিচরসভাঙের মত নয়, কিন্তু নেশা মানে যদি মৌতাত হয়—তাহলে এ মৌতাত ইয়াদী। যদি মনে হল যে সিগারেট খাব তখন তা না পেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আশান। চোখে পড়ল সুমুখের বেঞ্চে সাহেবের একটি খোলা টিন আছে, আর সাহেব তখনও গাড়ীতে এসে ঢোকেন নি। Restaurantতে বসে whiskey পান করছেন। এই সুযোগে আমি অনেক ইতস্তত: করে সাহেবের টিন থেকে একটি সিগারেট চুরি করলুম। আর গাঁজার কল্কেয় গেঁজেল যে ভাবে দম দেয়, সেই ভাবে কসে' দম দিয়ে দু'চার টানে সিগারেটটি ফুঁকে দিলুম। তার কারণ সাহেব এসে যদি দেখেন যে সিগারেট খাচ্ছি, তাহলে হয়ত আমার চুরি বমাল ধরা পড়বে। যদিচ ধোঁয়া দেখে অথবা শুঁকে কেউ বলতে পারে না সিগারেটটি কার। কিন্তু অন্যায় কাজ করলে এমনি অনর্থক ভয় হয়। তা যে হয়, তা সেকালের লোকরাও জানতেন। মৃচ্ছকটিকে শর্ব্বিলক বসন্তসেনার গহনা চুরি করে এমনি অকারণ ভয় পেয়েছিলেন; তাঁর স্বগতোক্তি এই—স্বৈর্দোষৈ ভবতি হি শঙ্কিত মনুষ্যঃ। লোকে বলে চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। ধরা পড়বার কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও—চুরি করলে ভদ্রলোকের মনের শান্তিভঙ্গ হয়। সে যাই হোক্, আমি ধোঁয়ার শেষ ঢোক গিলেছি, এমন সময় সাহেবটি এসে তাঁর স্থান অধিকার করলেন। যখন তিনি খানাপিনা করে ফিরে এলেন, তখন দেখি তাঁর যে মুখ ছিল সাদা তা হয়েছে লাল—ক্রোধে নয়, মদে। তিনি ফিরে এসেই তাঁর টিন থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন—"try one of mine; you may like it."

আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম যে, আমি নিজে থেকেই চা'ব মনে করছিলুম।

—কেন?

—আমার সিগারেটের টিন হারিয়ে গেছে—আর আমি বসে বসে আঙুল চুষছি।

—কি সর্ব্বনাশ! দেও তোমার কেস—আমি সেটি ভরে দিচ্ছি।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর দান প্রসন্নমনে গ্রহণ করলুম।

গাড়ী দারজিলিংয়ের অভিমুখে রওনা হলে পর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—প্রধানতঃ দারজিলিংএর ...আবহাওয়ার বিষয়। কথায় কথায় শিকারের কথা এসে পড়ল। আমিও অকারণ পশুপক্ষী গুলি করে মারি শুনে, তিনি আমাকে তাঁর জাতভাই মনে করে মহা খাতির করতে লাগলেন। আর বললেন—তোমরা যদি সব শিকারী হয়ে ওঠ, তাহলে বাঙ্গালীরা আমাদের কাছে অত নগণ্য হয়ে থাকবে না। আমি বললুম—তার আর সন্দেহ কি? যদিচ মনে মনে তাঁর কথায় সায় দিলুম না।

আর একটু এগিয়ে দেখি যে, টুং ও সোনাদার মধ্যে রাস্তা এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল, আর সদ্য মেরামত হয়েছে। তাই ট্রেণ পা টিপে টিপে চলতে আরম্ভ করলে। আগে ছুটছিল ঘোড়ার মত, এখন তার হল গজেন্দ্রগমন। পাহাড়ী মেয়েরা দশবারো মণ ওজনের পাথর সব পিঠে ঝুলিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে আসছে ও পথের ধারে জড় করছে—আর সেই সঙ্গে মহা ফূর্ত্তি ক'রে গান গাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে এদের এই ব্যবহার দেখছি দেখে সাহেব বললেন—"এরা সব সিপাহিদের মা বোন ও স্ত্রী। এদের হাড় এত মজবুত না হলে কি বেঁটেখাটো গুর্খারা এমন মজবুত সিপাহি হতে পারত?"

তারপর একটি সতেরো আঠারো বৎসরের পাহাড়ী মেয়ে গাড়ীর কাছে এসে বললে, "সাহাব, একঠো সিগারেট মাঙতা।" সাহেব তিলমাত্র দ্বিধা না করে তাকে একটি সিগারেট দিলেন। মেয়েটি অমনি আহ্লাদে হেসেই অস্থির।

তারপর সাহেব বললেন, "পাহাড়ীদের আর একটা মস্ত গুণ এই যে, এরা ছিঁচকে চোর নয়। আমি কার্সিয়ংয়ে গাড়ীতে একটা খোলা টিন রেখে গিয়েছিলুম এই ভরসায় যে, এরা তার একটিও ছোঁবে না। ছিঁচকে চুরিতে ওস্তাদ হচ্ছে উড়েরা—cowardএর জাত কি না।"

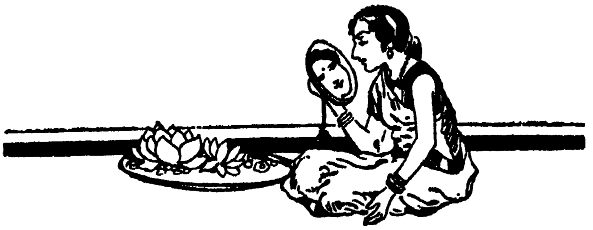
কথাটা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধলে, কিন্তু আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলুম না যে আমিও ত তাই করেছি। বাধলো আমার self-respectয়ে, কিন্তু মনে মনে নিজের উপর ঘোর অভক্তি হয়ে গেল।—

তার পর থেকেই মনস্থির করেছি যে, যদি beg করতে হয় তাও স্বীকার, কিন্তু steal আর প্রাণ থাকতে করব না। চুরির সুবিধে এই যে, তা গোপনে করা যায়; আর beg করতে হয় প্রকাশ্যেই। শাস্ত্রে বলে, "ন গুপ্তিরনৃতং-বিনা";—এই ত মুস্কিল। একবার চুরি করলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে তা গোপন রাখ্‌তে হয়। মিথ্যে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার ধাতে নেই—এক মজা করে' ছাড়া। তাই এখন থেকে ভিক্ষে জিনিসটে এস্তমাল করব।

এই বলে তিনি একটু হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলেন "সাহাব, একঠো সিগ্‌রেট মাঙতা"। আমিও একটু হেসে তাঁকে একটি সিগারেট দান করলুম।

তিনি তার নাম পড়ে বল্লেন—"না থাক্। যে সিগারেট একবার চুরি করে খেয়েছি, সেই সিগারেট আবার ভিক্ষে করে খাব না।"

এর পর তিনি নিজের পকেট থেকে সোনার উপর নীল মিনে-করা একটি জমকালো case বার করে একটি সিগারেট নিজে নিলেন, অপরটি আমাকে দিলেন এই বলে'—"Take one of mine, you may like it।" আমি সেটি নিয়ে তাঁর caseটার উপর নজর দিচ্ছি লক্ষ্য করে তিনি বললেন "এটি আমি বেচব না, জমিদারী বিকিয়ে গেলেও যোগ্য পাত্রে দান করব—অর্থাৎ সেই লোককে, যে ওটি ব্যবহার করবে না, সুধু বাক্সে বন্ধ করে রাখ্‌বে।" এই কথার পর তিনি নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। আমি বুঝতে পারলুম না তাঁর গল্পটি সত্য না বানানো। সুধু এইটুকু বুঝলুম যে, কুমারবাহাদুর যদি ফকিরও হন, ভিখারী তিনি কখনো হতে পারবেন না, অমন দুগ্ধপোষ্য মন নিয়ে।



মায়া-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত

এক

"আর ব'ক না দিদি, ঢের হয়েছে। তুমি যে-দিন জয়ন্তকে ছেড়ে থাকবে, সে-দিন কলি উল্টে যাবে।"

"হ্যাঁলো হ্যাঁ! থাম্—কেন পারি না—না কি?

"থাক্ আর বেশী কথা ব'ল না—বাবা! বিকেলবেলা, কি সন্ধ্যেবেলা, একবার আমাদের ওখানে গেলে তো; অমনি, যাই ভাই, যাই ভাই—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—উনি ব'সে আছেন। বিয়ে যেন আর কখন কা'র হয়না—কেবল তোমারি···"

"দেখব লো, দেখব! তোর আবার যখন বিয়ে হবে, তখন দেখবো।"

"হুঁ! বিয়ে করলে তো!"

"ইস্ তাই নাকি···মানব বুঝি!···

মাধুরীর মুখখানা একেবারে লাল হ'য়ে উঠল। তার দিদি হাসতে হাসতে বললে:

"কি লো পূর্ব্বরাগের আভা ফুটে উঠ্‌ল যে···আমার কাছে আর লজ্জা কেন···

"কখন না—ও কথা বললে, তোমার সঙ্গে আড়ি হ'য়ে যাবে।"

"তাই নাকি?"

"দেখো সত্যি বলছি, তা হ'লে তোমার সঙ্গে ভাব থাকবে না।"

কথাটা শুনে মিলনী একটু চমকে গেল। তখনি সামলে নিয়ে বললে:

"হ্যাঁরে রি! ভোলাদা ওখানে আসে?

"ভোলাদা বাবার ছবি আঁকছিল, কদিনত' আসেনি। আমাকে শেখান তো, ক-দিন বন্ধ হ'য়ে রয়েছে। ভারি খেয়ালী এমন eccentric, কিচ্ছু কোন ঠিক নেই।"

"যদি এর মধ্যে আসে, তবে আমার এখানে আসতে দিস তো?"

"আচ্ছা! কিন্তু সারাদিনটা তোমার এখানে রইলাম, তা তোমার সে উনিটী গেলেন কোথা?—তাঁর তো চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা গেল না।"

মিলনী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে মাধুরীর হাত-খানা টেনে নিয়ে তার মুখের পানে না চেয়ে চোখের পাতা নীচু করে বললে:

"কে জানে ভাই, সে আজকাল কেমন যেন হয়েছে। কখন্ আসে, কখন্ যায় ঠিক-ঠিকানা নেই।"

মাধুরী অবাক হ'য়ে তার দিদির মুখের পানে চেয়ে রইল। মিলনী আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে:

"আজকাল রাত্রে প্রায়ই সে বাড়ী থাকে না। পরশু সকালে একবার এসেছিল, তারপর আর আজও আসেনি বাড়ীতে।"

"তুমি কিছু বলনা? ব'কনা কেন?"

"বললে যদি শুনত—কত বকেছি, কোন কথার জবাবই দেয় না। বলে কাজ আছে—"

"তাঁর আবার কিসের কাজ?"

"বলে থিয়েটারে রিহার্স্যাল দিতে হয়—তাই রাত হ'য়ে যায়—ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি।"

"বেশ অছিলে তো—রিহার্স্যালে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি—থিয়েটার বুঝি, খুব ভাল বিশ্রামের জায়গা? কতদিন ধরে এ-রকম করছে?"

"সেই যে বইখানা থিয়েটারে প্লে হ'ল না—তারপর থেকেই।"

"সে ত' আজ প্রায় তিন-চার মাস হ'য়ে গেল। তা তুমি এতদিন বাবাকে বলনি কেন?"

"বাবাকে বলে কি হবে?"

মিলনী যেন একটু ভয় পেয়ে গেল।

"বারে! বাবাকে সে কত মান্য করে—তিনি কিছু বললে নিশ্চয়ই শুনবে।"

"সে কথা তাকে একবার শুনিয়ে ছিলাম, তাতে বললে: আমি কি কচি-খোকা যে, 'বাবাকে ব'লে দেব

বলে' ভয় দেখাচ্ছ? যাও—যাও···আমার যা খুসী তাই করব।"

"আমি আজ সব কথা বাবার কাছে বলব। দাঁড়াও···"

"নারে! বাবাকে এখন কিছু বলিস নি—তিনি শুনলে মনে কষ্ট পাবেন। কি মনে করবেন!"

"কষ্ট পাবেন! মানে···তুমি কি দিদি—এই তিন-চার মাস চুপ ক'রে রয়েছ—একবারও আমাদের কাকেও কিছু জানাওনি? নাঃ—My dear girl, you are too much touchy...rather silly."

"ওলো থাম্ তোর ইংরিজী বুক্‌নী রাখ—বিয়ে হ'লে বুঝতে পারবি সব কথা কি বাবার কাছে বলা যায়। সব কথা মা'র কাছেও বলা যায় না। বুঝলি!···"

"আমারও বুঝে দরকার নেই—আমি কিন্তু বাবা court থেকে এলেই বলব।"

"বাবাকে বলতে হবে না রে! বাবা সম্ভবতঃ সবই জানেন···"

"জেনে শুনে বাবা তাকে কিছু বলেননি?"

"বলেছেন কিনা ঠিক জানিনা···"

হলের বড় ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেল। মাধুরী উঠল।

"দিদি আমার দেরী হয়ে যাবে, ছটার সময় মাষ্টার-মশায় আসবেন। আমি আজকে যাই। তুমি কাল যাবে তো? জয়ন্তকে সঙ্গে ক'রে যেয়ো।"

"দেখি এখন আজ ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারছি নি। হ্যাঁ তোদের ওখানে মানব আসে?"

"অনেক দিন ত' আসেনি।"

"আমাদের এখানেও সেই 'প্লে'টার পর থেকে কই আর আসে নি।"

"তা হলে তুমি কবে যাবে? আমি আর সে-দিন কলেজ যাব না।"

"দু'চার দিনের মধ্যেই বোধহয় যাব। কিন্তু বাবার কাছে তুই এতকথা, এসব কিছু বলিস নি যেন।"

"আচ্ছা। তুমি যেয়ো কিন্তু—নইলে তোমার সঙ্গে আড়ি হ'য়ে যাবে। আর কখন তোমার বাড়ীই মাড়াব না।"

মাধুরী গিয়ে গাড়ীতে উঠল। মিলনী দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীতে ব'সে গাড়ী ছাড়বার সময় হাত নেড়ে মিলনীকে বললে: "cheerio!"

* * * *

বড়লোকের মেয়ে, বড় কৌন্‌সুলীর মেয়ে এরা দু'জন। বড় মিলনী, মাধুরী ছোট। মিলনীর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই স্বামী জয়ন্তর সঙ্গে তার অবনি-বনা সুরু হয়ে গেল। কেন যে দু'জনের ভেতর এমন গরমিল দেখা দিলে, তা দু'জনের কেউই কোন কিছু ঠিক বুঝতে পারলেনা। কেউ কাকেও এতদিনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে কিছু বললেও না। অথচ বিয়ের পর থেকে পরস্পরের এত বড় টান, এমন ভাব যে, লোকে বলাবলি করত, জয়ন্ত আর মিলনীর মিলনের মত মিলন আজকালকার ইঙ্গ-বঙ্গ টাকা-ওয়ালা বড়ঘরে প্রায় দেখাই যায় না। মিলনীর পিতা সর্বেশ্বর রায় প্রায়ই বলতেন: "আমার জামাই জয়ন্ত—অমন ছেলে কটা হয়?"

জয়ন্ত ধনীর ছেলে। জমিদার, ইংরেজীতে ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট। মিলনীও আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছিল, এমন সময় তাদের বিয়ের ফুল ফুটল।

বিয়ের পর থেকে বালীগঞ্জের নতুন বাড়ীতে তারা থাকত। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-অলা বাড়ী। চমৎকার সাজান। কোন ঘর জাপানী ধরণে, কোন ঘর ইংরেজী ধরণে, কোন ঘর ফরাসী ধরণে—সবুজ ড্রয়িং রুম, লাল ড্রয়িং রুম, নীল ড্রয়িং রুম। বেশ বড় লাইব্রেরী। ভাল ভাল ছবিতে ঘর-ভরা। দেয়ালের গায়ে বড়-বড় ফ্রেস্‌কো ছবি আঁকা। দাস-দাসী, মোটর, কিছুরই অভাব নেই। মিলনী দেখতে যেমন সুন্দরী, জয়ন্তও তেমনি সু-পুরুষ। দু'জনের ভাবও খুব। মিলনী জয়ন্তকে বলত:

তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে···

আর জয়ন্ত তার উত্তরে জবাব দিত বিদ্যাপতির ভাষায়

তুঁহুঁ মম জীবন, তুঁহুঁ মম সাধন

সত্যই ত' এত রূপ, এত গুণ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

মাধুরীর কাছে তার দিদি সকল কথা খুলে না বললেও, দিদির কথা শুনে গাড়ীতে যেতে যেতে তার মনে বেশ ধারণা হয়ে গেল যে, দিদি তার কাছে অনেক কথা লুকালে, সব বললে না—তবে এটা খুব স্পষ্ট যে, এদের আগের মত বনাবনি নেই। ভাল করে সব কথা সে না বুঝতে পারলেও আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে, বাঙ্গালীর মেয়ে; লেখাপড়া

শিখেছে, ভালমন্দ ইংরেজী নভেলও ঢের পড়েছে, নারীর সহজাত সংস্কার-বুদ্ধি দিয়ে সে এটা বেশ ভাল করে বুঝে গেল—ব্যাপার নিশ্চয়ই অতি গুরুতর হয়ে উঠেছে।

মাধুরী চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই জয়ন্ত বাড়ী এল। রুক্ষ চুল, আঁচড়ান হয়নি, কাপড়-চোপড় অপরিচ্ছন্ন, পাট-ভাঁজ নেই, এক জায়গায় খানিকটা লাল রঙ লেগেছে, কোঁচাটা আলগা খুলে-খুলে পড়ছে। চোখ লাল, কুঞ্চিত ভ্রূ, দৃষ্টির তীব্রতা নেই, সদা অসংযত চোখের তারা এক মুহূর্তও স্থির থাকছে না।

ঘরে ঢুকেই মিলনীকে জিজ্ঞাসা করলে: "টাকা কোথায়?"

"কিসের টাকা?"

"দাওয়ানজি বললে 'এই যে, কাকা পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন'?"

"হ্যাঁ, সে-টাকা শোভাবাজারে সুদের জন্যে কাল সকালেই দিতে হবে। দাওয়ানজী মশায় আমার কাছে টাকাটা রাখতে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ সে আমি জানি, ও টাকা আমার এখুনি দরকার। অত্যন্ত দরকার বুঝলে?"

"দেনার টাকা শোধ দেওয়াও ত অত্যন্ত দরকার।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বড় লোকে দেনা দেয় না, ছোটলোকে দেনা দেয়—দেনা এখন দিতে হবে না···দাও···দাও টাকাটা বার করে দাও···শীগ্‌গির

"আমার বাবা তাঁর বাপের দু'লক্ষ টাকা দেনা—ইন্‌সল্‌ভন্‌সীর টাকা সমস্ত শোধ দিয়েছেন—তা হ'লে আমার বাবা ছোটলোক···"

জয়ন্ত জিব কাটল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে:

"তিনি মহাপুরুষ, সেটা তাঁর পিতৃঋণ···যাক্ ও-সব শোনবার সময় আমার নেই···"

"একেবারে যে ঘোড়-সোয়ার, একটু না হয় বসলে—"

"আমার বসবার সময় নেই—দাও—দাও···"

"আচ্ছা আমি কি করেছি যে, আমার ওপর এমন করছ।"

"তুমি কিছুই করনি, কেউ কিছু করেনি—আঃ কেন গোলমাল কর।"

জয়ন্ত জামার ভিতর থেকে একটা ফ্লাস্ক বার করে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিলে।

"তুমি না আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করেছিলে··· যে···"

"আর মদ খাব না···"

"তবে যে আবার···"

"আর মুখ দেখাব না বলে।"

"দেখাবে না, না আর দেখবে না?"

"হুঁ—তা মানেটা ওই রকমই দাঁড়ায় বটে···"

"তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?"

"কেনর ঠিক জবাব দেবার এ সময় নয়, টাকাটা আগে বার করে দাও···"

"তা হলে আর আমার মুখ দেখবে না?"

"না দেখালেই বোধহয় ভাল হয়···"

মিলনী আর সেখানে দাঁড়াল না—অগ্রসর হ'য়ে পাশের আলমারী খুলে পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া জয়ন্তর হাতে দিয়ে, আবার জিজ্ঞাসা করলে:

"তাহ'লে আর মুখ দেখাবে না।"

"না দেখলেই বোধহয় ভাল হয়···চোখ খারাপ হয়ে গেছে, চোখ যদি ধুয়ে আবার পরিষ্কার দেখতে পাই···"

"না হ'লে আর দেখবে না? এইত?"

জয়ন্ত চুপ করে রইল।

ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত স্বরে মিলনী বলে উঠল:

"আমারও আর ইচ্ছে নেই।"

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে এক চোখ খানিক আধ-বোজা ভাবে—মিলনীর দিকে চেয়ে; চাপা বাঁকা-হাসি ঠোঁটের ফাঁকে এঁকে নিলে:

"ইচ্ছেটা যে তোমারও নেই, সে আমি জানতাম।"

"তুমি ত সবই জানতে···"

"হ্যাঁ জানতাম, সবই জানতাম···"

জয়ন্ত চলে যাচ্ছিল, মিলনী বললে "দাঁড়াও।"

"বল কি বলবে···সময় কার হাত ধরা নয়, কাল বয়ে যাচ্ছে···"

মিলনী রোষ-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল:

"কিসের কাল বয়ে যায়—মদের, না তোমার মীনার ···শুনি?"

জয়ন্ত একটু হাসলে :

"তাইত মেয়ে মানুষের সব রা-ই কাড়তে শিখেছ দেখছি। আবার ঝাঁঝও আছে !"

"শেখালেই মানুষ শেখে···শোন তাহ'লে এ বাড়ী আমায় ছাড়তে হয়।"

"অবিশ্যি···বাড়ীর জন্যেই ত মানুষ বাড়ীতে থাকে না—মানুষের জন্যেই থাকে—আর তোমার বাড়ীর অভাবই কি ?"

"আমাকে একটা সোজা কথা বলে যাও···"

"শক্ত কথা ত' জীবনে তোমাকে কখন বলি নি।"

"না তোমার একটা কথাও শক্ত নয়···একটা কথার জবাব দেবে ?"

"বল···"

"তাহলে আমার সঙ্গে আর···"

মিলনী আর কথা বলতে পারলে না, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল···

"ঠোঁট কাঁপছে কেন, জোর করে বল যে, তাহ'লে আমার সঙ্গে আর তোমার মিলন না, ছাড়া-ছাড়ি হ'ল। আমিও তাই বলি, কথাটা ভাল, এমন করে জড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই।"

"আচ্ছা তুমি কি চাও ?"

"অনেক কিছু···উপস্থিত কেবল টাকা···"

"কেবল টাকাই চাও—আর কিছু নয়···"

"হুঁ টাকা থাকলে, মদও হয়, মীনাও হয়···"

"কক্ষন না, কক্ষন না, তুমি মীনার নয়, তুমি আমার।"

মিলনী এতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করছিল, হঠাৎ আকুল হয়ে জয়ন্তর হাত দু'খানা চেপে ধরে কেঁদে উঠল। জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মিলনীর চোখের জল টপ্ টপ্ করে জয়ন্তর হাতের ওপর থেকে গড়িয়ে পায়ে পড়তে লাগল। জয়ন্ত তবুও কোন কথা কইলে না। শুধু আকাশের একটা কোণের দিকে, জানালার ভেতর দিয়ে যা দেখা যায়, সেই দিকে চুপ্ করে তাকিয়ে রইল—যেখানে আকাশ সূর্য্যাস্তের বর্ণিকাভঙ্গের খেলায় রক্তের মত লাল আর জ্বলন্ত আগুনের তীক্ষ্ণ জ্বালায় বিদগ্ধ।

মিলনীর হাত দু'খানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে জয়ন্ত সেই রক্তাভ আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে :

"ওই রকম জ্বলছে···নাঃ···"

কথাটা বলেই জয়ন্ত ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মিলনীও সঙ্গে সঙ্গে 'কক্ষন না, কক্ষন না' বলে ছুটে তার পিছনে যেমন যাবে, অমনি হোঁচট খেয়ে, দরজার চৌকাঠের ওপর পড়ে গেল ! বাঁদিকের কপালটা ছেঁচে নীল হয়ে সিঁথা পর্যন্ত দাগ হয়ে ফুটে উঠল।

আহতা ফণিনী যেমন ফোঁস্ করে ফণা তুলিয়ে ওঠে, মিলনীও তেমনি সোজা উঁচু হয়ে দাঁড়াল। কপাটের বাজুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে শুনলে, জয়ন্তর পায়ের শব্দ কার্পেট-পাতা 'সিঁড়ির ধাপে মিলিয়ে গেল। ফিরে ঘরের ভেতর এসে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখলে যে, বুড়া দাওয়ান রামশরণ চক্রবর্ত্তী ফটকের কাছে জয়ন্তকে কি বলতে গেলেন, জয়ন্ত কোন কথাই কানে নিলে না—শুধু হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ফটকের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভোলা, জয়ন্ত তার হাত ধরে টেনে বললে : "চল্ চল্ দেরী করিস্নি।"

মিলনী দেখলে ভোলার সঙ্গে জয়ন্ত চলে যাচ্ছে, করুণ কাতর তীব্র কণ্ঠে সে চীৎকার করে ডাকলে :

"ভোলাদা ! ভোলাদা ! শুনে যাও···শুনে যাও···"

ভোলা রায় থমকে দাঁড়াল, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে :

"দিদি ডাকছে শুনে আসি—ছাড়্···"

"না না শুনতে হবে না, চল্ চল্···"

"জয়া কাজটা ভাল হচ্ছে না, আমার সে ছোট বোনের মত, দোহাই জয়া, কি বলছে একবার শুনেই আসি···"

ভোলা দুর্ব্বল, জয়ন্ত বলবান। ভোলার হাত ধরে হীড়্‌-হীড়্ করে টানতে টানতে জয়ন্ত তাকে নিয়ে চলে গেল।

মিলনী জানালার পাশের চেয়ারের হাতালটা ধরে তিল-তিল করে বসে পড়ল। খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। তার মনে হল দেশ কাল ফুরিয়ে গেছে, সবটাই ফাঁক। আর জয়ন্তর সঙ্গে তার বিয়েটা সব চেয়ে বড় ফাঁকি।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। মিলনী চুপ করে সেই জানালার ধারে বসেই রইল। ঘরে ঘরে ধূপ ধূনা দিয়ে একশ-ডালের বিজলী বাতির ঝাড় জ্বলে উঠল। লক্ষ্মীর আবাহন শঙ্খ বাজল। মিলনী ঠিক তেমনি ভাবেই বসে রইল। ঘরে যে আলো জ্বলছে, সে জ্ঞান তার নেই, মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি তার কাণে পৌঁছল না। ফটকের মাথায় আলো জ্বলছে, সে আলো

তার চোখে পড়ল না। জানালার সামনের কামিনী গাছের ফুটন্ত ফুলের অশ্রান্ত মাদকতাভরা তীব্র সুবাস তার কাছে পৌছেও পৌছয় নি। সারাটা বাইরের জগৎ তার কাছে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। শুধু আলোর মাঝে অন্ধকারের একটা-একটা ঢেউ সমস্ত আলোকে কাল করে দিচ্ছে; আর মাঝে মাঝে পুরানো স্মৃতির তুলির আঁচড়, অন্ধকারের কষ্টিতে আগুনের-নিকষ-টানার দাগের মত দেখাচ্ছে।

মণি দাসী এসে বললে: "বৌদি! একলাটী বসে রয়েছ। দাদা কোথা গেল? এই যে দেখলাম—ওমা, তুমি কাপড় ছাড়লে না, চা খেলে না। শ্যামা দিদি বললে বৌঠাকরুণ আজ চুল বাঁধবে না। সে কি গো, লক্ষ্মীর ঘর, চুল না বাঁধলে এয়িস্ত্রী মানুষের যে অকল্যাণ হয়। রাত হতে চলল, খাবে না?"

মিলনী যেমন জানালার দিকে মুখ করে বসেছিল, তেমনি চুপ করেই তাকিয়ে রইল। মণি-ঝি থামবার পাত্রী নয়। আবার বললে:

"সকাল থেকে ত কিছুই খাওনি—ভাতে ত' শুধু একবার বসেছিলে, বোন-দিদি এল তার সঙ্গেও ত' কিছু খাও নি। ওঠ—হাত মুখ ধোও।"

মিলনী বিরক্ত হয়ে বললে: "আঃ কেন জ্বালাতন করছিস..."

মণি দাসী এবাড়ীর অনেক দিনের পুরানো ঝি। মিলনীর শ্বশুর-শাশুড়ীর আমলের লোক, সেও ঝঙ্কার দিয়ে গলা বার করে বললে: "জ্বালাতন আবার কিসের গা, সারা দিনটা ত' খেলে না, এক রকম উপোস করেই আছ, আমি কি আর খবর রাখি নি। আমাকে ধমক দিলে কি হবে..."

মিলনী আরো উত্তেজিতা হয়ে বললে:

"কেন মণি-দিদি, আমার কানের কাছে বকর-বকর করছিস্—আমার শরীর ভাল নেই, আমি কিছু খাব না—যা।"

"দাদার ওপুর রাগ করে বুঝি খাবে না?"

"বলছি আমার শরীর ভাল নেই—আমার ভাল লাগছে না..."

"তবে দপ্তরখানায় দাওয়ানজী-খুড়োকে খবর দিই... ডাক্তার এসে দেখুক—কি অসুখ..."

মিলনী এতক্ষণ মুখ না ফিরিয়েই কথা কইছিল, এবার অত্যন্ত রেগে মুখ ফিরিয়ে মণিদাসীকে বললে:

"তোর অত কথার দরকার কি, কাউকে কিছু বলতে হবে না, তুই যা এখান থেকে...যা বলছি..."

মিলনী মুখ ফিরাতেই মণিদাসী মিলনীর কপালের সেই ছেঁচা নীল দাগটা দেখতে পেলে। কপালটা ঢিপি হয়ে ফুলেছে—সুন্দর টক্‌টকে গোলাপী আভার রঙের ওপর নীল দাগটা ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠেছে। মণি ধীরে ধীরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে:

"মিনুদিদি! একি হয়েছে। ওমা, কপালটা যে ঢিপি হয়ে উঠেছে—কি করে লাগল?"

"আঃ বার-বার বারণ করছি—আমাকে বকাস নি—ত নয় কেবল বকাচ্ছে, জ্বালাতন..."

"বললে ত শুনব না, কি করে লাগল... হতভাগা ছোঁড়া বুঝি ধাক্কা মেরে ফেলে..."

"এত বড় কথা তুই আমার মুখের ওপর বলিস, তোর ত' ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়েছে..."

"আস্পর্দ্ধা বাড়বে না কেন, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, মাই খাইয়েছি, জয়া আমার পেটের ছেলের মত... আমার আস্পর্দ্ধা হবে না? কি যে বল..."

মণি তাড়াতাড়ি দেরাজের টানা থেকে ফরসা কাপড়ের টুকরো জলে ভিজিয়ে মিলনীর মাথায় জলপটীর মত বেঁধে দিয়ে, দেয়ালের গায়ের ইলেক্‌ট্রীক্ বেল টিপলে—একজন খানসামা নীচে থেকে ছুটে ওপরে এল:

"দাওয়ানজী-খুড়োকে খবর দে, বলগে বৌ-ঠাকরুণের অসুখ—শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে বল্..."

মিলনী এতক্ষণ শক্ত হয়ে ঠোঁটে দাঁত টিপে বসেছিল, মণি দাসীর এই সহানুভূতিতে সে কেঁদে ফেল্‌লে:

"কেন তোরা অমন করছিস, আমাকে কি একদণ্ড টেঁকতে দিবি না, মণি!"

মণি মিলনীর পায়ের কাছে গিয়ে বস্‌লে, তার পর বললে:

"বৌদিদি—অমন করলে কি ঘর চলে, শক্ত হতে হয়—বুঝতে পেরেছি জয়া ছোঁড়া..."

"না আমি হোঁচট লেগে পড়ে গিয়েছি, কেন তুই মিছি-মিছি দাওয়ানজী মশায়কে খবর দিলি..."

"বৌদি, আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন? ডবকা ছেলেকে সে মাগী গুণ করেছে, নইলে আমার সোণার চাঁদ ছেলে কখন অমন হয়। শক্ত হ'তে হবে বৌদি, শক্ত হতে হবে। রাশ আলগা দিলে পুরুষ মানুষে কি ঠিক থাকে, ওদের স্বভাবই ওই···ওর আর পণ্ডিত-মুখ্যু নেই, বড়লোক ছোট-লোক নেই—ওদের সবাই সমান। আলোচাল দেখলেই ভেড়ার মুখ চুলকোয়··এ ত জানা কথা···"

মণির কথায় মিলনী অত্যন্ত রেগে গেল। জয়ন্তর প্রতি তার যে প্রেম, যে শ্রদ্ধা, যে ভক্তি, যে আকর্ষণ, সমস্তটা ঘুরে গিয়ে একটা দাহতে পরিণত হয়ে উঠল। এত গ্লানি তার মনের ভেতর সঞ্চিত হয়ে উঠল যে, সে আর কোন কথা কইতে পারলে না। এইটাই বারবার করে তাকে পীড়া দিতে লাগল, তিনি তাকে তাচ্ছিল্য করে চলে গেছেন। সেটা এই দাস-দাসীদের কাছেও প্রকাশ হয়ে গেছে। নইলে এই রকম সব কথা আমাকে আজ মণি-দাসী শোনাতে পারে। এই কথা দাসী মহলে তোলাপাড়া করবে। তাঁর মর্য্যাদা রেখে আর ত' এরা কথা কবে না। ছিঃ!

মণি ঝি আপনার মনেই নানা কথা বলে যেতে লাগল। মিলনী সে কথায় কান দিলেও তার কোন উত্তর সে দিলে না, দিতে পারলেও না। এইটেই ঘুরে ঘুরে তার মনের দ্বারে এসে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল, ভালবাসা আমি কোন দিনই পাইনি, এ শুধু আমার সমস্ত নারীত্বকে তিনি অপমান করেছেন।

চাকরের কাছে খবর পেয়ে, রামশরণ চক্রবর্ত্তী ওপরে এসে "মণি দাসী! বৌমা কোথারে" বলে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"কি হয়েছে বৌমা! ইস্···তাইত টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। নাঃ ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর পারলুম না···দেখলাম তার হাতে নোটের তাড়া···"

"না দাওয়ানজী মশায় আমি হোঁচোট লেগে পড়ে গিয়েছি, ···মণির সবই বাড়াবাড়ি ডাক্তার এলে তাঁকে আর ওপরে পাঠাবেন না। টাকা তিনি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান নি—তিনি চেয়েছিলেন, আমি নিজের ইচ্ছায় টাকা গুনে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি···"

বৃদ্ধ রামশরণ একটু হেসে বললেন:

"তা বেশ করেছ কিন্তু কাল সকালে যে তাঁদের আসতে বলেছি—কথার খেলাপ হবে, কি বলব তাদের?"

মিলনী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে মণিকে ইসারায় যেতে বলে দিলে। মণি চলে গেল। মিলনী জিজ্ঞাসা করলে:

"সব শুদ্ধ কত টাকা দেনা?"

"দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকার ওপর তার ওপর, সুদও প্রায় সাত হাজার বাকী পড়েছে। জমিদারীর যা অবস্থা তাতে আদায় পত্তর নেই। জমিদারী রক্ষা করতে গেলে এ দেনা মাথায় করে রক্ষা হবে না।"

"কাকা মশায় কি বলেন?"

"তিনি যতদূর সাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু এত টাকা একসঙ্গে করা আজকের দিনে···"

"কলকাতার অন্য বাড়ীরও কি এমনি অবস্থা···"

"সে গুলো ছাড়ান তত শক্ত হবে না, কম টাকা···"

"ও···দেড়লাখ ছাড়া সে তবে আলাদা—সে আবার কত টাকা?"

"তা প্রায় হাজার তিরিশ হবে··"

"এতদিন আমাকে এ-সব কথা জানান নি কেন? আমি কি বাড়ীর কেউ নয়?"

বুড়ো রামশরণ একটু থমকে গিয়ে মেরুদণ্ড টান করে বললেন:

"সেকি কথা তুমি কেউ নয়, তুমিইত সব—বাড়ীর লক্ষ্মী।"

"তা হলে লক্ষ্মীর অজ্ঞাতে এত টাকা দেনা হ'ত না··· যাক্···ব্যাঙ্কে আমার নামে কত টাকা আছে?"

"কেন বৌমা সে কথা জিজ্ঞাসা করছ···সে টাকা ত'—"

"কি, খরচ হয়ে গেছে?"

"রাম···রাম···সে কি কথা, জয়ন্ত অনেক টাকা টেনে বার করে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে তোমার টাকায় কখন হাত দেয় নি।"

"সেইটেই ত' সব চেয়ে ভয়ের কথা দাওয়ানজী মশায়, সেইটেই ত সবচেয়ে বড় দুঃখু যে, আমার টাকা আর তাঁর টাকা আলাদা···"

"তা নয় বৌমা, তবে ও টাকাটা তোমার বাবা তোমার বিয়ের যৌতুক স্বরূপ দিয়েছেন, সেটাতে তোমার স্বামী হাত দিতে পারেন না—সেটুকু ধর্ম্ম-বুদ্ধি তার আছে।"

"বুঝতে পারলাম না দাওয়ানজী মশায়, এতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি

কোথা থেকে এল। বাবা আমাকে তাঁর হাতে দিয়েছেন, টাকাটা কি আলাদা করে বলেছিলেন…আর আমি তাঁর স্ত্রী, ঘরে টাকা থাকতে পরের কাছ থেকে টাকা ধার করা—আমাকে না জানান এটাই বা কোন্ ধর্ম্ম-বুদ্ধি থেকে এল? আমি কি এই এত-বড় বাড়ীতে পুতুলনাচের পোষাক পরে সেজে নেচে বেড়াবার জন্যে এসেছি।"

রামশরণ চক্রবর্ত্তী থত-মত খেয়ে গিয়ে বললেন :

"তা নয় বৌমা, তুমি ছেলেমানুষ—তাই তোমাকে…"

"আপনি আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর আমলের লোক—আপনিই বলুন আজ যদি আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ বেঁচে থাকতেন—তাঁকে আপনার কৈফিয়ৎ দিতে হত না?"

বুড়া রামশরণের চোখ জল্-জল্ করে উঠল…ভাবলেন তাইত, একরত্তি মেয়ে আমাকে ঘুরিয়ে বলে কৈফিয়ৎ দিতে …তারপর বললেন :

"আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার তোমার স্বর্গীয়া শাশুড়ীর যেমন ছিল, তোমারও তেমনি আছে ; কিন্তু আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বৌমা—তোমার যদি এতখানিই বুদ্ধি তাহলে, জয়া আজ এমন করে বেড়ায় কেন—একথা যদি, আমি জিজ্ঞাসা করি…

মিলনী একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কথাগুলো তাকে ছুঁচের মত বিঁধলে। উদ্ধতভাব কমিয়ে বললে :

"সে তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধির অভাব…আমি তাঁর স্ত্রী, সুখ-দুঃখের ভাগিনী, আমার কাছে তিনি অনেক কিছুই গোপন করেছেন। আপনি এক কাজ করুন, কাল সকালে ব্যাঙ্কে আমার নামে যত টাকা আছে সব বার করে আনবেন, আর আমার গায়ের গয়নাও অন্ততঃ লক্ষ টাকার ওপর হবে, শাশুড়ীর গয়নাও প্রায় দু'লাখ টাকার কম নয়। শাশুড়ীর গয়না রেখে, আমার গয়না বেচে আর ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে এই দেনা শোধ করে দিন!"

দাওয়ানজী একবার মিলনীর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁটটা একটু শক্ত করে বললেন :

"সে আমি পারব না, তোমার টাকা বা তোমার গয়নায় আমি হাত দিতে পারব না, তাছাড়া একথা সুজনবাবুকে জানাতে হবে…"

"কেন পারবেন না—আর কাকামশাইকেই বা জানাতে হবে কেন? স্বামীর ঋণ আমারি, ঋণ…আমি যেমন করে পারি শোধ দেব। তাঁর মান ইজ্জত, আমারি মান ইজ্জত।"

"সে কথা অবিশ্যি খুব সত্য কথা…"

"তবে, কেন এ দেনা, কোথাকার একটা বাঙাল দেশের কুৎসিৎ চেহারা পেটো-সা—সে এসে দেনার জন্যে হুমকী দেবে—নালিশের ভয় দেখাবে—আর আমি তাই সহ্য করব —তার চেয়ে গাছতলাও…"

"দেখ মা—তুমি দেশ-বিখ্যাত সর্ব্বেশ্বর রায়ের মেয়ে, তোমারি উপযুক্ত কথা এ বটে, কিন্তু আজ তুমি সব দেনা পরিশোধ করে দিলে, কাল আবার জয়া ফিরে বন্ধক দিতে পারে…"

"যাতে না পারে তার ব্যবস্থা করবেন…আর সে পরের কথা পরে হবে—এখন ত দেনাটা শোধ করুন।"

"আচ্ছা দেখি…"

"দেখি নয়, দাওয়ানজী মশায়, কাল যেন আর তাঁকে কেউ পরের কাছে ঋণী বলে—এ যেন আমায় আর শুনতে না হয়।"

বৃদ্ধ রামশরণের পিঠে কে যেন সজোরে একটা চাবুক মারলে। দাওয়ান হিসাবে যে তাঁর কিছু ত্রুটী হয়ে গেছে, মিলনীর কথায় সেটা স্পষ্ট ভাবেই তিনি বুঝতে পারলেন। আর কিছু না বলে তিনি নীচে চলে গেলেন।

মিলনী জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। এইটেই সব চেয়ে বেশী তাকে ব্যথা দিতে লাগল যে, তার অমন গুণের স্বামী তার হাতের বাইরে, তার অঞ্চলের ছায়া থেকে সরে গেছে—সবাই সেটা জেনেছে। এইটেই তার সব চেয়ে বেশী লজ্জার ও দুঃখের। ঘরের বিজলী বাতিগুলো পর্য্যন্ত যেন সেই কথাই বলছে, খালি একলা ঘর যেন সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আবার একটা নিঃশ্বাস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মিলনী অন্যমনে বলে উঠল…"উঃ জীবনটা কত দুঃখের!"

মণি-ঝি ঘরে আসতে গিয়ে, সেই কথাটা শুনতে পেলে, সেও বলে উঠল :

"কিসের দুঃখু তোমার বৌদি! দুঃখু মানুষের মাঝে মাঝে হয় বটে, তবে সবটাই ত' আর দুঃখু নয় বৌদি!"

মণিঝির এই সহানুভূতি মিলনী কিছুতেই মেনে নিতে পারলে না, সে অতি তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে বললে :

"আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে চলে যা। আমার ঘুম পেয়েছে।"

মণি হেসে বললে :

"ঘুম তার নিদের বাড়ী যাক্, আগে কিছু খেয়ে নাও দিকি···তারপর ঘুমিয়ো।"

"আমায় জ্বালাতন করিস্ নি বলছি মণি-দি, তুই আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যা।"

মিলনী খর-পদে তার শোবার ঘরে চলে গেল।

মণি-দাসীও ছাড়বার পাত্র নয়—নাছোড়বান্দা মানুষ। সে তাড়াতাড়ি এক বাটী দুধ ফল ও মিষ্টি নিয়ে এসে বকাবকি সুরু করে দিলে। তুমি না খেলে আমরা বাড়ীশুদ্ধ উপোস করে থাকব। যাও, খেয়ে নিয়ে তুমি শোও, আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।

মিলনী শুয়ে রইল, মণি তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মণির মনে হল মিলনী ঘুমিয়ে পড়েছে। মণি ঘরের আলো নিভিয়ে, সবুজ চাপা আলোটা জেলে মশারি ফেলে, দরজা বন্ধ করে মিলনীর দিকে তাকাতে তাকাতে বলে চলে গেল :

"আহা! বৌদি! মেয়েমানুষের সোয়ামির জ্বালার চেয়ে আর জ্বালা নেই, পোড়া পুরুষগুলোর সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, এমন সোনার-চাঁদ বৌ ফেলে কোন্ মড়ুই-পোড়া আবাগীর আঁচলে বাঁধা পড়ল গা। দেখতে পেলে পেঙরে বিষ ঝেড়ে দিতাম। দেখছি মাগী কত গুণ জানে—একবার দেখছি। তার গুণ-গান আমিই ঘোচাব।···দাঁড়া শতেক-খোয়ারীর ঝি, তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

দুই

মিলনী ঘুমায় নি। সহানুভূতির স্নেহপ্রলেপ তার শরীরে একটা অবসাদের সঙ্গে শুধু ঘুমের আবুল্লী এনেছিল। মণি-ঝির কথাগুলো তাই তার কাণে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুয়ের মাঝামাঝি ভাবে প্রবেশ করলে। সে সব ভুলে জোর করে ঘুমুতে চাইছিল। ঘুম তার এল না। সবুজ চাপা আলোয় সমস্ত ঘরখানা—সবুজের মায়ায় যেন মাখা-মাখি। বিছানা থেকে আরম্ভ করে ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র কাপড়-চোপড়—পর্দা—ছবি—সব সবুজের মায়ার খেলায় ডুবে আছে। ঘুমুতে সে আসেনি, এ ঘরে সে নিরিবিলি চিন্তা করতে এসেছে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেনা যে, তার স্বামী জয়ন্ত, যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যাকে ভাবলে প্রাণের কোন জায়গাটাই খালি থাকে না, যার অঙ্গের স্পর্শে সমস্ত শরীর পুলকিত হয়ে ওঠে, সে তাকে কেন ছেড়ে চলে যাবে, এটা কি কথা, কেন আমি তা হতে দেব। দেব না, কক্ষন না···আমাদের এ মিলনের মাঝে কোন্ জায়গাটায় আটকে খেলে, বাধা এল, যাতে সে আমার এমন হয়ে যাচ্ছে। কেন? কেন?

মিলনী এ প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই খুঁজে পায় না। ঘুরে ফিরে কেবলই তার নিজের প্রতি লজ্জায় অঙ্গ ভরে উঠতে লাগল। বার বার সে নিজেকে অবমানিত মনে করতে লাগল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এল। চাকর-বাকরদের কলরব, পথের কলরব, রাস্তায় মোটরের হর্ণ আর শোনা যায় না, শুধু ঝিঁঝিঁর অশ্রান্ত ঝাঁঝরের ধ্বনি, হাওয়ায় ঝাউগাছের ফিস্-ফিস্ ঝির-ঝির কথা—তাও ধীরে যেন মিলনীর কানে মিলিয়ে আসতে লাগল। ঘরের সবুজ আলোও চোখের পাতার ফাঁকে অন্ধকার হয়ে এল, এখন শোনা যায় শুধু নিজের নিঃশ্বাস, আর নিজের বুকের শব্দ—দেখা যায় শুধু স্বপ্ন···বোনা যায় শুধু অসংলগ্ন চিন্তার জালবুনানি।

বিছানার পাশে অভ্যাসবশতঃ হাত বাড়ালে, শূন্য শেজ, বাতাস সে জায়গা অধিকার করে আছে। যে দেহকে আকর্ষণ করবার, সে নেই। ফাঁকার মধ্যে নিজের হাতটাতে শুধু নিজের নিঃশ্বাস স্পর্শ করলে। মিলনীর বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেল।

জয়ন্ত ও মিলনীর বিয়ের পর থেকে উভয়ের ভালবাসার ভেতর দিন রাত্রির কোন ব্যবধান ছিল না। তাদের ভালবাসার সে স্বার্থলিপ্সা—দু'জনকে এমন করে পেয়ে বসেছিল, এমন একটা লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠনের কারবার চলেছিল যে, তাদের ভালবাসা পৃথিবীর অন্য কোন লোক বা সমাজ বা বাইরের কোন কিছুর কোন সম্পর্ক রাখে নি, রাখতে দেয় নি। ভালবাসার অঙ্গাঙ্গী যে ভোগ ও তার তৃপ্তির যা কিছু, তা তারা নিঃশেষে ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে আসছিল। ভবিষ্যতের

জন্য যে ভালবাসার আয়ুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এ কথা কোন দিনই তাদের মনে হয় নি, কোনদিন ভাবেও নি।

প্রথম মিলন, মিলনের প্রথম দিনের যে জাগ্রত অন্ধ আবেগ, যখন নর ও নারী এক হয়, তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভেতর নিজেকে হারিয়ে আবার আনন্দ-আস্বাদ ও ভোগ ছাড়া আর কোন চিন্তাই রাখে না। দেহ ও মনের প্রতি অঙ্গ ও অভঙ্গ দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, স্বাদ দিয়ে, আস্বাদ দিয়ে, অন্তরের শেষ অন্ত পর্য্যন্ত ডুবতে চায়, ডুবে যায়। তখন এমন একটা জগৎ, এমন একটা লোকে তারা বাস করে, যেখানে সামাজিক বা লৌকিক সভ্যতার আইন-কানুন বা বিধিনির্দ্দেশ কিছুই থাকে না, কিছুই মানে না। একটা ছন্দ-ভাঙা তালে-বেতালের জগৎ, প্রেমের প্রণয় ঘূর্ণী-খাওয়া নীহারিকার মত জগৎ—যেখানে তারা দু'জনে শুধু একলা, যেখানে তাদের দেহ ও মনের সমস্ত পদার্থগুলো তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে রস দিয়ে অবিশ্রান্ত সাধনা করছে, পরম লোভাতুর-ভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ লাভের জন্য···প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে সঙ্গের আসঙ্গ দিয়ে আত্মস্থ হোচ্ছে। জীবনটা তাদের কাছে শুধু প্রেমের একটানা স্রোতধারার মত বয়ে চলেছিল। যেন অফুরন্ত যৌবনবতী রতি ঘুমে জাগরণে তন্দ্রায় মোহ আবেশ মোহন কাম্য কামায়ণের স্বপনই দেখছে। বাইরে যে একটা জগৎ ছিল বা আছে, তাদের চোখের তারায় যে আলো-ছায়ার খেলা প্রতিভাত হ'ত না। তাদের নিজেদের মধ্যেই রঙের খেলা চলতে লাগল।

সমস্ত দিনগুলাই তাদের একটা দিনেরই মত। কালের জ্ঞান তাদের ছিল না। এক সূর্য্যোদয় থেকে আর এক পর্য্যন্ত যে কাল-জ্ঞান তার অস্তিত্ব-বোধ তাদের ছিল না। যেমন মধুর সকাল তেমনি মধুর রাত, তেমনি সাঁঝের বেলা। শুধু একটানা আনন্দ ও ভোগের স্রোত। ঘুমের নিভৃত গুহা থেকে যখনি তারা উঠেছে, তখনও সেই আলিঙ্গন বদ্ধ। সেই অধরের ফাঁকে মধুর কাম-কামনার সব-ভোলান প্রাণ-জাগান হাসি—সেই দু'জনের নিঃশ্বাস এক হয়ে যাচ্ছে—চোখ খুললে দু'জনে তাকাল, অমনি অধর অধরে মিলে গেল। পরস্পর পরস্পরের দেহের স্নিগ্ধ তাপের স্পর্শ—বিবাহিত জীবনের মাঝে যে অসংযত লজ্জাহীন নগ্ন সতীত্ব···আলিঙ্গনের উন্মাদনা—প্রণয়ের প্রেমও নেশার ঘোরে ম্যাডলাম—তারি ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটেছে। দিন তাদের কাছে প্রহর গুণে হত না, রাতে তাদের প্রহর ছিল না, ছিল শুধু একটা অশ্রান্ত আকুলভাবে সঙ্গলাভের অতৃপ্তি-ভরা পিপাসা। অগ্নিতে ঘৃত দিলে, সে অগ্নি যেমন ক্রমশই বিবর্দ্ধমান হয়, তাদের অতৃপ্তি তেমনি ভাবেই জ্বলে জ্বলে লোলুপ শিখায় বেড়ে উঠতে লাগল।

মিলনীর ঘুম সত্যি হয় নি। মাঝে মাঝে শুধু দীর্ঘশ্বাস পড়ে, আর ভাবে, কেন এমন হ'ল? কিছুতেই সে কারণ খুঁজে পায় না। ভালবাসায় যে এতখানি দুঃখ তা কে আগে জানত!

বিয়ের পর কিছুকাল এই ভাবেই তাদের জীবনধারা চলল। এই আনন্দের মাঝে জয়ন্ত লিখত কবিতা, শুনত মিলনী। যা লিখত, মিলনীর কানের কাছে সে যেন অমৃত-ধারার মত। জয়ন্ত একখানা নাটক লিখলে—নাম তার মায়া-কমল। আধুনিক প্রেমের গল্প। সেই নাটক শুনে মিলনীর কি আনন্দ। তার ইচ্ছা যে এ নাটক অভিনয় হয়। প্রথম কথা হ'ল যে ঠাকুর-বাড়ীর মত নিজেদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-আত্মীয়া নিয়ে তারা নিজেরাই অভিনয় করবে। কিন্তু তা ঘটে উঠল না।

জয়ন্তর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। দু'জনেই সমবয়সী ও ছেলেবেলাকার সহপাঠি। একজন মানবেন্দ্র দাস আর একজন ভোলা রায়। মানবেন্দ্র ধীর শান্ত গম্ভীর সুপুরুষ এবং বলশালী। শরীর বেশ দীর্ঘাকার। তার ওপর ধনী এবং বিদ্বান, রাজতন্ত্র-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে খ্যাতিও আছে, আর ভোলা রায় দেখতে কুৎসিৎ না হলেও সুপুরুষের চেহারা নয়—আধময়লা রঙ—রোগা চোয়াল বার করা ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা লম্বাটে গড়ন, মাথায় বড় বড় চুল পারিপাট্যহীন। ভোলা বেশ ভাল ছবি লিখতে পারে। নিয়ম করে কাজ বলে ছবি লেখে না, খেয়ালের বশেই চলে। মানবের পিতা নেই, মা আছেন, আর একটি বোন আছে তার নাম ইলা।

এই মানব ও ভোলা রায়, প্রায়ই জয়ন্তর এখানে আসত, সন্ধ্যার দিকে। মানবদের সঙ্গে মিলনীদের অনেক দিনের জানা—এক রকম খেলুড়ীরই মত; প্রায় এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে বললে একটুও ভুল হয় না। আর মানবের মা'র সঙ্গে মিলনীর মা'রও পরম-আত্মীয়তার মত বন্ধুত্বও আছে। মানবের পিতা ছিলেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

মানব যখন দশ বছর, ইলা যখন দু'বছর তখন তিনি হঠাৎ হৃদরোগে মারা যান। মানব ও ইলা তাদের মার চোখের ওপরই বড় হয়েছে।

মিলনীর বিয়ের পর মানব প্রথম প্রথম খুব বেশী যাতায়াত করত। ভোলাও প্রায় আসত। কখন ছবি বিক্রী করে যেত, কখন মদের টাকার অভাব হলে, স্পষ্ট জয়ন্তকে এসে বলত হয় মদ আনিয়ে দে, নয় টাকা দে—জয়া আজ আমার মদের টাকা নেই। কিছু দে। জয়ন্ত তখনি টাকা দিত, সঙ্গে সঙ্গে বলত এতবড় একটা জিনিয়াস্—তুই এমন প্রতিভাটাকে মদ খেয়ে নষ্ট করলি রে।

ভোলা বলত, "মদে নষ্ট হয় কে তোকে বললে? আমার হাতের ছবি কখন খারাপ হয় বলতে পারিস।"

"সেটা তোর গুণ নয় রে ভোলা, তোর হাতের গুণ··· কিন্তু এই রকম করে মদে ডুবে থাকলে কখন কি করবি বল দিকিনি? তাই শুনি?"

"করবার কিছু নেই রে জয়া, করবার কিছু নেই। যা কিছু করবার ছিল তা তোমার অবনীঠাকুরে আর নন্দলালে শেষ করে দিয়েছে। পরের আটচালায় যারা করে বাস তাদের আবার ছবি, তাদের আবার কবিতা তাদের আবার সাহিত্য—দে নে থাম্—বন্ধুত্বটা রেখেছি কি সাধ করে?"

"কি জন্যে রেখেছিস শুনি?"

বোনটাকে দেখলে বড় মায়া হয়—আর সত্যি কথা হ'ল, মদ ফুরলে কার কাছে যাই, নইলে তোর মত বড়লোক—কুনো বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কোন তালব্য···হ্যাঁ···"

ভোলা জয়ন্তর বন্ধুত্ব জীবনে কখন অনাদর করেনি। জয়ন্তও মনে-মনে জানত ভোলার মত পরম সখা তার জীবনে কেউ কখন হয় নি হবেও না। মিলনী ভোলাকে ভোলাদা বলে ডাকত আর ভোলা মিলনীকে দিদি বলত, কখন আমার বোনটী বলে আদর করত। ভোলার কথা শুনে জয়ন্ত হাসত। ভোলার অসাক্ষাতে বলত: "নিঃ! তুমি জাননা, ভোলার মত মানুষ পৃথিবীতে কদাচিৎ জন্মায়···ও যদি না মদ খেত। কত বড় প্রতিভা। সাধারণ মানুষের থাকের অনেক ওপরে।" ভোলার আরও একটা গুণ ছিল, সে খুব ভাল গান গাইতে পারত। কিন্তু ওই খেয়াল যখন তার নিজের ইচ্ছে হবে, না হলে কার সাধ্য তার মুখ থেকে রা কাড়াতে পারে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিলনী এই কথাটাই কেবল ভাবছিল—সেই সব পুরানো কথা—খুব বেশী পুরানো নয়, মাত্র বছর কেটে গেছে। এইত সেদিন—এর মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল।

বিয়ের পর থেকে একে একে দিনগুলো তার কি ভাবে কেটেছে, তা তার স্মৃতির পটভূমিতে ছায়া-আলোর খেলার মত রেখা টানতে লাগল। একটা অবান্তর ছবি বার বার তার মনের ভেতর আঁকা হয়, আবার মুছে যায়, আবার আঁকা হয়। সেই একটা গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। বিশেষ একটা কি বৈষয়িক কাজে জয়ন্ত বাড়ীতে ছিল না। বেলা তিনটার সময় খুব-জোর এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মিলনী একলা ঘরে। হঠাৎ কি খেয়াল হল—ছিপ নিয়ে বাড়ীর পিছনের পুকুরে মাছ ধরতে গেল। মস্ত বড় পুকুর চারিধারে বাগান ও ঝোপ। মিলনী একটা ফলসা-গাছের তলায় বসে ছিপ ফেললে। ফলসা-গাছের ডালগুলো ঝুলে প্রায় পুকুরের জলে গিয়ে পড়ছে। পাশে একটা বিলাতী একগাছে-নানা-রঙের ফুলের গাছ, ঘন-পাতার ঝোপ—বেশ আড়াল পড়েছে। এমন জায়গায় বসেছিল যেখান থেকে সহজে তাকে দেখা যায় না। বৃষ্টি হওয়া সত্বেও কেমন একটা দারুণ গরম গুমোট করে আছে। মাছ কিছুতেই খায় না, ফাতনা নড়ে না। মিলনী অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য্য সহকারে নিবিষ্ট হয়ে ফাতনার দিকে চেয়েই ছিল। হঠাৎ একটা মাছ টোপ গিলে ফাতনা ডোবালে। মিলনী ছিপ ধরে জোরে টান মারতেই, মাছটা ততখানি জোরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। মাছটা রুই, বড় মাছ, বঁড়শি বেঁধা-মুখে ছিপের টান খেতেই সে লাফ দিয়ে উঠ্‌ল জল থেকে প্রায় হাত-দেড়েক। সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে বেরিয়ে যেতে গেল যে পা হড়কে পাড়ের উপর থেকে মিলনী পড়ে গেল জলে। সে তখন চীৎকার করে উঠল। বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে বাগান—আসে পাশে চাকর-বাকর কি মালীরা সে দিকে কেউ নেই; সেদিন আরো কেউ ছিল না। মিলনী চেষ্টা করে ফলসা গাছের ডাল ধরলে। টানের চোটে ফলসার পলকা ডাল ভেঙে গেল মাছটাও তখন মিলনীকে আরো জলে টানতে লাগল। পুকুরের স্থানে স্থানে পদ্মদাম ও শ্যাওলা, বড়বড় ঝাঁঝি, সেগুলো মিলনীর অঙ্গে জড়িয়ে যেতে গেল। মাছটা গেঁথেছে ছিপ ফেলে দিয়ে আসতেও পারে না, আবার যত উপরে উঠতে চায় ততই পায়ে-গায়ে

সেই দামের লতার বেড় জড়িয়ে ধরে। মিলনী প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলে চাকরদের নাম ধরে, কারও সাড়া নেই। মাছ যত টানে ততই মিলনী একটু একটু করে বেশী জলে এগিয়ে পড়ে। তবু মাছের লোভে ছিপ ছাড়ে না শুধু চীৎকার ক'রে ডাকে! কেউ সাড়াও দেয় না।

তখনও রোদ একেবারে পড়েনি। মানব সেদিন এসেছিল জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করতে। জয়ন্তকে না পেয়ে মিলনীর খোঁজে বাড়ীর অন্দরের ঘরের দিকে এসেছিল। এমন সময় মিলনীর গলার স্বর, তার চীৎকার-করে-ডাকা মানবের কানে গেল। মিলনীর নিজস্ব নীল ড্রয়িংরুমের জানালাগুলো এই অন্দরের পুকুরের দিকে খোলা। মানব জানালার ধারে এসে দূর থেকে দেখে, মিলনী পুকুরে একটা ছিপ নিয়ে প্রায় বুক অবধি জলে—ডাকা-ডাকি করছে। মানব ছুটে নেমে এল। এসে তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলে ফেলে জলে নেমে, এক হাত দিয়ে মিলনীকে ধরলে। আর একটু হলেই মিলনী ডুব-জলে গিয়ে পড়ত। মানব এসে হাত দিয়ে ধরতেই মিলনী ভয়ে ছিপ ছেড়ে দিয়ে মানবকে ধরলে। মানব যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এমন দামের আর ঝাঁঝির দল যে কেবল পায়ে যায় জড়িয়ে। জোর করে মিলনীর হাত ছাড়িয়ে এক হাত দিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে অন্য হাতে ছিপশুদ্ধ অনেক কষ্টে মানব ডাঙায় উঠল। মিলনীর ওই জলে পড়ে যাওয়া মাছ ধরার আনন্দ উৎসাহ, সব নিয়ে যখন পাড়ের ওপরে এসে দাঁড়াল—তখন তার জামা ছিঁড়ে গেছে, বুকের খানিকটা অনাবৃত, ভিতরকার পরিচ্ছদ ছিন্ন—শাড়ীখানা লাল হয়ে গেছে, মাথাটা রিম-ঝিম রিম-ঝিম করছে। মানব মাছটাকে টেনে তুললে—ফিরে দেখে যে, মিলনীর শরীরটা তখন এমন এলিয়ে পড়েছে যে দাঁড়াতে আর পারে না। তাড়াতাড়ি এসে মিলনীকে ধরলে মাছ ফেলে। মিলনী তখন প্রায় মূর্চ্ছাগত। মানবের কোলের ওপর এলিয়ে পড়া দেহ, অনাবৃত বক্ষ, অসংযত বস্ত্র—সূর্য্য তখন ঘন গাছের আড়ালে—সন্ধ্যার মেঘের মধ্যে রক্তমুখ ডুবছে। বাগানটা সাঁঝের ছায়ায় ঢেকে এল। সেই অপরূপ রূপ—ভরা যৌবন, সন্ধ্যার ছায়া-ঘন নির্জ্জন পুষ্করিণী-তীর···মানবের বুকের ভিতর, তার ভিতর পর্য্যন্ত তোলপাড় হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মানবের মুখ নেমে এল—হঠাৎ মিলনী চোখ খুললে, মানব থতমত খেয়ে যেমনি জিজ্ঞাসা করতে যাবে বলে' মুখ তুললে—তুলেই সামনে দেখে কুঞ্চিত-ভ্রূ জয়ন্ত তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে—অধরে তার ঈষৎ চাপা হাসি—নাকের ফুঁপি বিস্তৃত হয়ে গেছে।

মিলনী ধড়মড় করে উঠে পড়ল—অসংযত বস্ত্র সংযত করলে—দাঁড়াতে গেল—টলমল করছে সমস্ত দেহ।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে :

"মাছটা ত আচ্ছা বেকুব—টোপটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেললে—এখন তপ্ত তৈল কটাহে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও মৎস্য। আর কেন?···ওকি তুমি যে চলতে পারছ না—কোথাও লেগেছে নাকি?"

মিলনী শুধু বললে :

"না, আমায় ধর, আমার মাথাটা কি রকম করছে।"

মানবের মুখখানা শাদা কাগজের মত রক্তহীন দেখাল।

জয়ন্ত মিলনীকে ধরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়ে মানবকে বললে :

"মানব, মাছটা নিয়ে এস···জয় তোমারি আজকে—এস কাপড়-চোপড় ছাড়বে।"

জয়ন্ত ও মিলনী চলে গেল।

মানব মাছটা হাতে করে নিলে, কিন্তু পা আর তার চলে না। হায় দুর্ব্বলতার একটা মুহূর্ত্ত!

মানব সোজা হয়ে মাছটা নিয়ে চলে আসবার সময় নিজেকে ধিক্কার দিলে···ধিক্—ধিক্ (ক্রমশঃ)



ব্রিগেড সার্জ্জন ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষ নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে কেমন করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে—ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক সময়ে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কি দেশে, কি বিদেশে—উভয় স্থানেই তিনি সমভাবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইহার পরে ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড হলসবরীর* (Hardinge Stanley Giffard) বৈমাত্রেয়-ভগ্নী Mary Lees Fane Giffardএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মেরী গিফার্ডএর প্রতিজ্ঞা ছিল, ডাক্তারী পরীক্ষায় উক্ত বৎসর যিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন,তাঁহারই সহিত তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। যে সময়ে বিলাতে হলসবরী-পরিবারের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সুতরাং এই পরিবারে বিবাহ করিয়া ডাঃ চন্দ্রের সম্মান বিলাতে বর্দ্ধিত হয়। এখানেও তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও Inspector General of Civil Hospitals রূপে কার্য্য করিয়াছেন। লেফ্‌টেনেণ্ট-কর্ণেল কেহ কেহ হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী তিনি ব্যতীত ব্রিগেড-সার্জ্জন হইয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজে মেটিরিয়া-মেডিকা ও ক্লিনিক্যাল-মেডিসিনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হৃদ্‌রোগ ও ফুস্‌ফুসের চিকিৎসাতেও একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর ডাঃ চন্দ্র জোড়াসাঁকোর সুবর্ণবণিক্-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহাদের বাড়ী ছিল, জোড়াসাঁকোয় ৺রমানাথ ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখে। পরে এই পরিবার ঝামাপুকুরে আসিয়া বসবাস করেন। এই চন্দ্র পরিবারেই সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী মেসার্স এস্, সি, চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা সুবলচন্দ্র চন্দ্রের জন্ম।

ডাঃ চন্দ্রের এক ভাই (মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র) ও এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী (চুনিমণি দাসী) ছিল। তাঁহার পিতার নাম বদনচন্দ্র চন্দ্র ও মাতার নাম ক্ষেত্রমণি দাসী। শৈশবেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন।

বাল্যে তিনি ডাফ্ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-ব্যঞ্জক মুখশ্রী ও বিনয়-নম্র ব্যবহার সহপাঠী ও শিক্ষক—সমভাবে উভয়ের নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ডাঃ ডাফের চিত্ত এই মেধাবী ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণধী ডাঃ ডাফ্ বুঝিলেন, উপযুক্ত সাহায্য ও সহায়তা পাইলে এই বালক যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। তারপর তিনি এই বালককে যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। বালকের আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দেন।

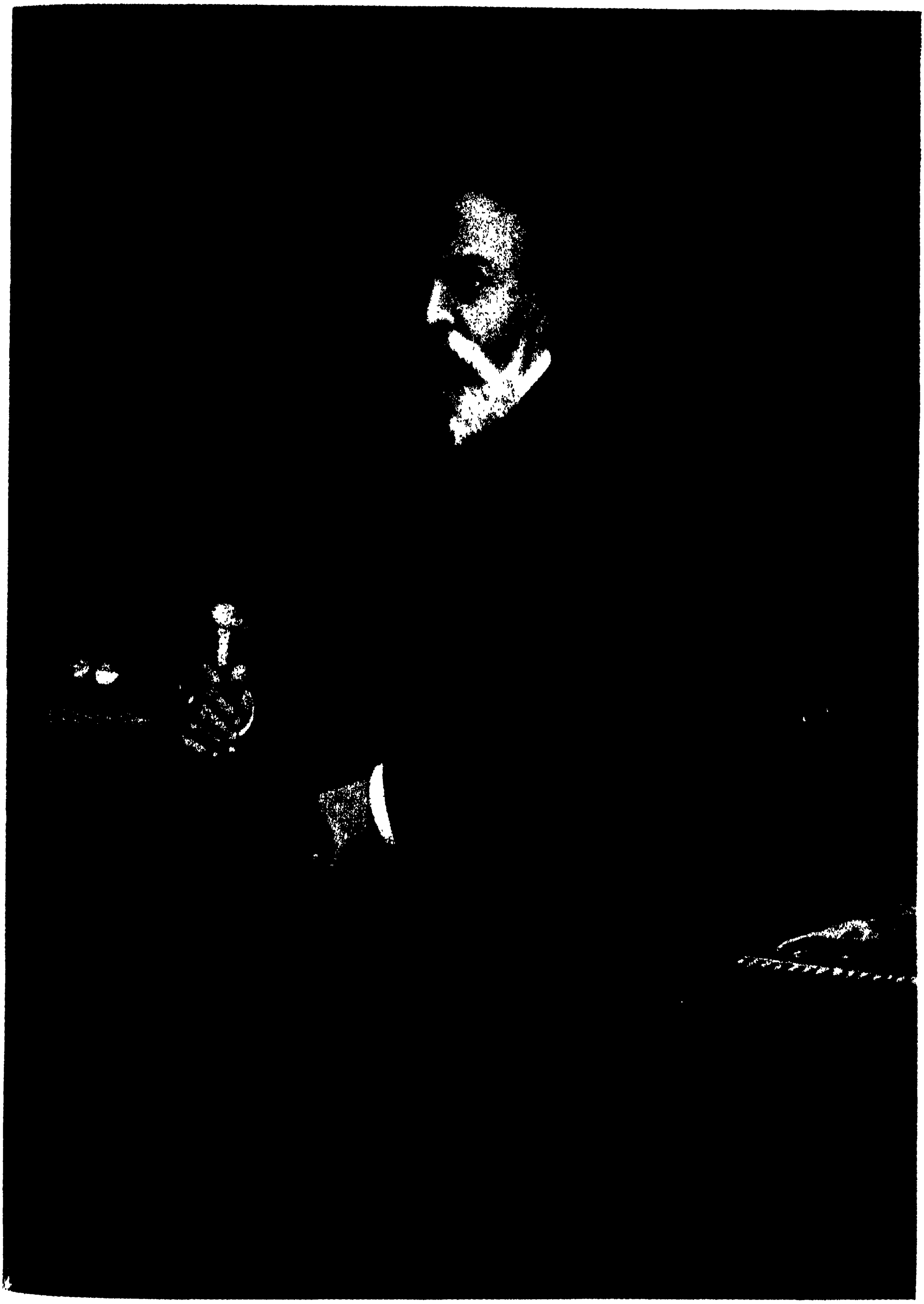
বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন পূর্ব্বক রাজেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ধাত্রী-বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাইয়া গুডিভ্ মেডেল পান। যে সময়ে (প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে) এখানে ভাল



গুডিভ্ মেডেল সম্মুখভাগ—পশ্চাৎভাগ

করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না, অথচ রাজেন্দ্রচন্দ্রের প্রবল বাসনা ছিল—এই

* Lord Halsbury lived in five reigns and rose from humble beginning to the highest positions in the State.—The Statesman, 24th November 1929.



বিদ্যায় উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বিলাতে যাওয়া। তাহার মনোভাব তিনি ডাঃ ডাফ্‌কে জানাইলে ডাঃ ডাফ্‌ কলিকাতা কেমিষ্ট্রি সোসাইটির সাহায্যে তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

বিলাতে যখন তিনি যান তখন তাঁহার বয়স একুশ কি বাইশ বৎসর। বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া তিনি ১৮৫৬।৫৭ খৃষ্টাব্দে M. R. C. P. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহা ব্যতীত প্রাণি-বিদ্যায় (Zoology) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি নিম্নলিখিত রৌপ্য-পদক পান। নিম্নে ঐ পদকের দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রদান করা হইল।



লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে জুলজির জন্য প্রাপ্ত পদক সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ

লণ্ডন ইউনিভারসিটি হইতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি নিম্নলিখিত সুবর্ণপদকখানিও লাভ করেন।



বিশেষ কৃতিত্বে জন্য প্রাপ্ত স্বর্ণপদক সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ

বিলাতে কিছুদিন চিকিৎসা করিবার পর তিনি রাজকীয় সৈনিক বিভাগের চিকিৎসার কাজ লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত) নিম্নলিখিত স্থানে কাজ করেন :—

১৮৫৮ খৃঃ—Indian Mutiny. Action with Firoze Shah on the banks of the Jumna.

১৮৬১ খৃঃ—Kooki Expedition.

১৮৬২-৬৩ খৃঃ—Cossiah and Jyanti Hills (Assam) Expedition.

ইহার পর তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই সাঁওতাল পরগণাস্থিত দেওঘরের সিভিল সার্জ্জন হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ হইতে নিরূপিত কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে ঐ পরগণার সাব্‌-এসিস্‌টাণ্ট কমিশনারের কাজও করিতে হইত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী তিনি সার্জ্জন মেজারের (Surgeon Major) পদে উন্নীত হন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তিনি এক বৎসর এগার মাস ২৮ দিনের ফার্লো লইয়া বিলাত গমন করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি মেদিনীপুরের সিভিল সার্জ্জন হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুলাই তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রায় সাত মাস কাজ করিয়া তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেটিরিয়া মেডিকা ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হন। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে Ex-officio 2nd. physician to the College Hospitalএর কাজও করিতে হইত।

এই সমস্ত গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াও Medical Inspector of Emigrants (Calcutta) ও অন্যান্য কার্য্যও তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইত।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন তিনি ছুটী লইয়া বিলাত যান, তখন তাঁহার সহযোগী চিকিৎসক ও বহু ছাত্র তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এখানে সেই অভিনন্দন-পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তিনি কিরূপ জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন :—

"...Suffice it to say, that from the commencement of your career, you have been placed in positions of trust and responsibility and have by your kind manners and great skill won the highest approbation of your official superiors and fellow-workers.

"We cannot let this occasion pass without placing on record our deep sense of esteem and regard for the patient trouble and indefatigable zeal with which you have always striven to discover the secrets of the most intricate diseases, and to serve with conscientiousness and sincere sympathy those that

were placed under your care; nor can we refrain from expressing our admiration and gratitude for the warm and enthusiastic interest, with which you have always sought to impress upon our minds the heavy and sacred responsibility that devolved upon us as students and votaries of medicine, while giving your clinical instructions by the bed-side of the sick and suffering.

"The kindness and affability which you have always displayed towards those, who have had the good fortune to work under you as House-Physicians, class assistants and and clinical clerks, and the readiness with which you have rendered every assistance to us as students and co-labourers in the field of medicine, have entitled you to our profound respect and sincere gratitude."

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী মেরী চন্দ্র পরলোক গমন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মে হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত ১৩ মাস তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী ডাঃ চন্দ্র ব্রিগেড-সার্জ্জন (Brigade Surgeon)এর পদে উন্নীত হন এবং ঐ বৎসরের ১৯এ আগষ্ট তিনি অস্থায়ী Inspector General of Civil Hospitals (Bengal) হন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যান এবং সেখানেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বিলাতে ও কলিকাতায় তাঁহার বহু সম্পত্তি ছিল। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় আট লক্ষ টাকা। ঐ সম্পত্তির কিয়দংশ বিলাতে ও এখানে (কলিকাতায়) দান করার পর বাকী সাত লক্ষ টাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও সহোদর মহেন্দ্রবাবু পান।

বিলাতে দুইটি হাসপাতালে তিন হাজার পাউণ্ড এবং এখানে মেডিকেল কলেজএ পঁচিশ হাজার টাকা তাঁহার সম্পত্তি হইতে দেওয়া হয়।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতলে প্রধান সোপানশ্রেণীর পশ্চিম-কোণে তাঁহার একখানি রঙ্গীন চিত্র আছে।*

* এই প্রবন্ধের উপকরণ সমূহের জন্য আমি কলিকাতা-নিবাসী ডাঃ চন্দ্রের ভাগিনেয়-পুত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত রামদাস দে মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

করুণা

দিলীপকুমার

(গান)

এসো মা আরতিময়ী পূজারী-পরাণপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলনসুরে।

অরুণ-আশীষ-রাগে
করুণা যেমন জাগে:
বাসনা-বাঁধনে এসো স্বপন-ফুলনূপুরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলনসুরে।

তুফানে যেমন তরী
চলে ধ্রুবতারা স্মরি':
লহ তব অভিসারে নিয়ে যাবে যত দূরে
বুকের বিরহবীণা বাজায়ে মিলন-সুরে।

দিয়ে উষা-করতালি
যেমন কিরণমালী
আলোর কবরী বাঁধে কালোর ছায়াচিকুরে:
বেসুরে এসো মা সাধে মাধুরী-মধুর সুরে।

দক্ষিণেশ্বর ১লা জুন, ১৯৩৮

রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ

(দিলীপকুমারকে লেখা)

(১৯৩৮)

কল্যাণীয়েষু—

বাসরে—সঙ্গীতশাস্ত্র মহার্ণব যে এমন দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল তা জানতুম না। কিন্তু ("সাঙ্গীতিকী"-তে) তুমি তোমার পালের জাহাজ ছুটিয়ে চলেছ অনায়াসে, তোমার কাপ্তেনিকে সাবাস। দূরের থেকে বাহাদুরি দিই, কিন্তু চ'ড়ে বসব যে তার পারানি দেবার সামর্থ্য নেই। এর থেকে একটা জিনিষ আবিষ্কার করা গেল—আমার প্রভূত অজ্ঞতা। খুশি হলুম তোমার স্পর্ধা দেখে। মনে পড়ল, আধুনিক ইরানরাজ মোল্লাদের আধিপত্যের পরে কী রকম প্রবল সম্মার্জনী প্রয়োগ ক'রে রাষ্ট্রবিধির পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের মোল্লাগিরির পরে একধার থেকে তুমি যে আগুয়ানী নীতি প্রয়োগ করেছ তাতে সনাতনী মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের আশঙ্কা করি। তা হোক, তোমাকে সাধুবাদ দিই।…"সাঙ্গীতিকী"-র ভাষা ও ভাবযোজনা খুব ভাল লাগল।…এ বইয়ের প্রয়োজন ছিল।…অনেক আলোচ্য বিষয় উদ্‌ঘাটিত করেছ। ভাষায় বেগ আছে রস আছে।… আমাদের বয়সে বকুনি বেশি হ'লেই শকুনি খবর পায়। তোমাদের মনের পক্ষে জনসমুদ্রের ঢেউ অত্যাবশ্যক। তোমাদের হাতে দেবার জিনিষ বাকি আছে ঢের—জনতার দাবিতে নিজের ভরা তহবিলের পরে নজর পড়ে। এক সময়ে জলসত্র যখন খুলেছিলুম কুয়োর জলের উচ্চতল ছিল উচ্চে, এখন এত নেবে গিয়েছে যে বালবার টেনে তুলতে বুকে খিল ধরে।…একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার দুঃখ বাড়াবার জন্যে তোমার নিষ্ঠুর উৎসাহ কেন? আমি যে প্রসন্নমুখে অক্লান্ত দাক্ষিণ্যে জনতাকে অভ্যর্থনা করি এটা ঘোষণা করা কি তোমার সজ্জনতা? আশা করি এখনো তোমার ছুটি ফুরোয় নি। নিভৃতবাসে ফেরবার পূর্বে একবার সগানে আমার আশ্রমে যাবে এই আমার বাসনা। বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নাম্‌ব। কিছু মেঘমল্লার জুগিয়ে দিয়ো। চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নি। শেষ নিদ্রার পূর্বে আর একবার স্পষ্ট চোখে জগৎটা দেখে যেতে চাই।

গীতিভারতীর বীণায় বঙ্গবাণীর একটা তার চড়াবার ব্যাপারে তোমাকে সপ্তরথীর তারস্বরবর্ষণ সইতে হবে একথা ভাবতে পারি নি বিশেষত সপ্তরথীরা যখন সবাই বাঙালী যে বাঙালী হিন্দুস্থানীকে ঠেলে ফেলে বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্র-সিংহাসনে চড়িয়ে জয়মাল্য না দেবার আক্ষেপে প্রায় হিষ্টীরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রের মতোই বাঙালীর চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! এই বাঙালীই একদিন বাঁকা ঠোঁটে কী রকম বক্রোক্তি বর্ষণ করেছিল যেদিন অবনীন্দ্র চিত্রকলাকে বাংলা দেশের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করেছিলেন! আজ বাঙালীর সেলামের ধারা ছুটেছে একমাত্র হিন্দুস্থানী গান-কর্তবের দিকে, সেদিন বাঙালী ভক্তবৃন্দের স্যালুটেশন উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছিল একমাত্র বিলিতি চিত্রলেখার অভিমুখে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটা কথা বাঙালী প্রায় আউড়িয়ে থাকে, বলে নিশ্চয়ই বাঙালী জাত অবতার বিশেষ, কিন্তু আত্মবিস্মৃত অবতার। বোধ করি গানের অবতারত্বে আজ তার সেই আত্মবিস্মৃতির ধাক্কা পড়ছে তোমারই পিঠে। ভয় নেই, আবার একদিন আসবে যখন এই অবতারের আত্মস্মরণ জেগে উঠবে, তখন হয়ত একেবারে দৌড়বে উল্টো মুখে। গোঁড়ামির মাদকতায় যারা বেহোঁষ থাকে তাদের এই দশাই হয়, একবার এপক্ষে তাদের রামে মারে, আর একবার ওপক্ষে মারে রাবণে। আমার কথা যদি বলো আমার রুচিটা কনের ঘরে মাসি বরের ঘরে পিসি, দুপক্ষের ভোজেই আমি লুচিসন্দেশ লুটি— মিঞাসাহেবদের মোগলাই খানায় যে রুচি নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু বাঙালী গিন্নিদের হাতের ঝোলঝাল সুক্তনিতে একটু বিশেষ রস পাই, আর হজমও হয় সহজে। এটা কেবলমাত্র রুচির কথা ব'লে আমি মনে করি নি, এর মধ্যে বাহাদুরীও আছে। একদিন বাংলার সমজদারেরা যখন নববাংলার চিত্রকলাকে হাস্যবাণে জর্জর করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন তার মধ্যে এই একটা অভিমান ছিল যে, তাঁরাই বিলিতি আর্ট বোঝেন ভালো, তাই র‍্যাফেলের নাম করতে তাঁদের দশম দশা প্রাপ্তি হোতো, আজ তানসেনের নাম করতে এঁদের চোখের তারা উল্টে পড়ছে, এর মধ্যে নিজেদেরই তারিফ করবার একটা ঝাঁজ আছে, যাদের বোধশক্তি যথার্থ উদার তাদের এই দুর্গতি ঘটে না।

অনেক বকুনি বকেছি, এইবার একটু আড় হয়ে পড়ি চৌকিটাতে—আর আশীর্ব্বাদ করি মার খেতে খেতেই তুমি অমর হও। ইতি—তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িকী

বর্ষারম্ভ—

১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ষড়বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। এদেশে সাময়িক পত্র পরিচালনার ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের এই ২৫ বৎসরের জীবন-সংগ্রামের কথা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক ও পৃষ্ঠপোষকের সহযোগিতায় আমরা গত ২৫ বৎসর কাল ভারতবর্ষ পরিচালনায় সমর্থ হইয়াছি, আজ ষড়বিংশ বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা ভবিষ্যতেও আমাদিগকে তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানে উৎসাহিত করিয়া সুপথে পরিচালিত করিবেন। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা আবার নূতন উৎসাহের সহিত নববর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম।

বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার—

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে বাংলার চলতি পঞ্জিকার সংস্কারার্থ একটি জনসভা আহূত হইয়াছিল। বাংলা মাসের দিনের সংখ্যা স্থিরীকৃত করিয়া যাহাতে সর্ব্বত্র একটা সমতা রক্ষিত হয় তজ্জন্য শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী একটি প্রস্তাব করেন। সমস্ত প্রস্তাবাদির নকল বাঙ্গালার সমস্ত স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও জ্যোতিষীবর্গের নিকট প্রেরণ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাবের পক্ষে সম্মতি জানাইয়া সভায় এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, "ভারতীয় মাস-গণনা কি রকম অদ্ভুত। মূলতঃ ইহা চান্দ্র-সৌর। বৈশাখের আরম্ভ হয় তখন যখন সূর্য্য মেষের প্রথম বিন্দুতে প্রবেশ করে এবং শেষ হয় যখন সূর্য্য মেষরাশির শেষ বিন্দু ছাড়িয়া বৃষ-রাশিতে প্রবেশ করে। কিন্তু মাসের নাম যে বৈশাখ তাহার কারণ—ইহার মধ্যে এমন একটি পূর্ণিমা আছে যে সময় চন্দ্র বিশাখায় অধিষ্ঠিত। চৈত্রের সমাপ্তিতে বৈশাখের আরম্ভ। চৈত্র মাসেও একটি পূর্ণিমা আছে যখন চন্দ্র চিত্রা-তারকায় অধিষ্ঠিত।......চৈত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা মেষের প্রথম বিন্দুটি পাই। ইহাকে আদিবিন্দু বলা যায়। বেদ হইতে জানা যায় যে চৈত্রের পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হইত।......

"চিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি রাশিতে সূর্য্যের স্থিতির গড়পড়তা গণনা করিলে আমরা এক মাসের আনুমানিক দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি। ইংরাজী মাসের মত যদি আমরা প্রতিমাসের দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিই তাহা হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—বিশেষ বাংলা ও আসামে সমতা রক্ষার পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। সৌরপদ্ধতিতে মাস গণনা করিলে এবং রাশিতে সূর্য্যের স্থিতি নির্দ্ধারিত করিতে গেলে বাংলার বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠের যে কোন একটি তারিখের সহিত আসামের তারিখের মিল হইবে না। ইহা হইতেই যত গোলমালের সৃষ্টি। বর্ত্তমানেও বাংলা পঞ্জিকায় অনেক অসামঞ্জস্য আছে। যদি সূর্য্য মেষের শেষবিন্দু দ্বাদশটি দ্বিপ্রহর রাত্রির পর ছাড়িয়া যায়— ঠিক বলিতে গেলে জ্যৈষ্ঠ মাস সেই ঘণ্টা হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা পঞ্জিকার মতে যে দিনটি জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিন হিসাবে গণনা করা উচিত ছিল তাহা বৈশাখেই থাকিয়া যায়। ইংরাজী কায়দায় মাসের দিন নির্দ্দিষ্ট করিলে এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

ইহার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি সংরক্ষণশীল মনোবৃত্তি, 'যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। গত ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক লিখিত এবং ভাদ্রে শ্রীযুত ভোলানাথ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল।





দুই ডিক্‌টেটারের সম্মিলন—সেণ্টো সেলী সহরে মুসোলিনীর সহিত হিটলারের সৈন্য পরিদর্শন



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্ট

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর হইতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৪,৮৫,০০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আর্থিক বন্দোবস্তের সময় গভর্ণমেণ্ট কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ১,৬০,০০০ টাকা অতিরিক্ত সাহায্যের দায়িত্ব লন ; তাহাতে কতকগুলি সর্ত্ত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকৃতির সর্ত্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। গভর্ণমেণ্ট সেইজন্য উহা পুনর্বিবেচনা করেন। একজন বিশেষ কর্ম্মচারী এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সাহায্য বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন সমিতির দ্বারা উপস্থাপিত এবং সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত যে অত্যাবশ্যক সংস্কারসমূহ উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে অর্থাভাবে সাধিত হয় নাই তাহা যথাসম্ভব শীঘ্র আরম্ভ হইবে ; অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোন্ প্রণালী কোন্ সময় গৃহীত হইবে তাহা সিনেট স্থির করিবেন ; (২) মেডিকাল এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি বৃদ্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিবে ; (৩) বিশেষ কর্ম্মচারী যে হিসাব করিয়া দিয়াছেন তাহার উপর আয় বৃদ্ধি পাইলেই অন্য কোন নূতন কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয় হাত দিতে পারিবে ; (৪) যে সমস্ত কার্য্যের জন্য এই সাহায্য দেওয়া যাইতেছে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার কোনটিই পরিত্যাগ করিলে চলিবে না ; অবশ্য বর্ত্তমানের এই ব্যবস্থার ফলে পরবর্ত্তীকালে বিশেষ কোন প্রয়োজনে যে অর্থসাহায্য করা হইবে না, এমন নহে।

বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহৃত—

যুক্তপ্রদেশ সরকার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে'র যে আদেশ দ্বারা 'পরাধীনোঁ কী বিজয় যাত্রা' পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন সেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এখনও কোন পুস্তকই অব্যাহতি পায় নাই। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বিহারে ছাড়া পাইলেও বাঙ্গালায় বন্দী হইয়াই রহিয়াছে—বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলীর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গালী মেয়ের কৃতিত্ব—

ডাঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী গৌরীরাণী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান বৎসরে সংস্কৃত এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



কুমারী গৌরীরাণী

যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুরে তাঁহারা থাকেন। কুমারী গৌরীরাণী কোন স্কুল বা কলেজে পড়েন নাই ; ম্যাট্রিক হইতেই তিনি প্রাইভেট্ পরীক্ষা দিয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উড়িষ্যা সরকারের পরিকল্পনা—

উত্তর উড়িষ্যার সমস্ত উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক এবং দক্ষিণ উড়িষ্যার অনুরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে একটা সমতা আনিবার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন : (১) উত্তর উড়িষ্যার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ এবং দক্ষিণ উড়িষ্যার অনুরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা এবং এমন একটি সার্ব্বজনীন পাঠ্যতালিকা রচনা যাহা সকল স্কুলে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। (২) ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে নিম্নতম খরচে নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে বিবেচনা এবং প্রাথমিক

শিক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অন্য এমন কোন প্রস্তাবের উত্থাপন যাহা পাঠ্যতালিকায় যুক্ত হইতে পারে এবং এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য সস্তা ও সুবিধাজনক বাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা; (৩) পাঠ্যতালিকা, স্থান-সংকুলান ও গৃহশিল্প সম্বন্ধে উপদেশ এবং শারীরিক ব্যায়াম সম্বন্ধে ওয়ার্দ্ধা কমিটির প্রস্তাব কতদূর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার বিবেচনা; (৪) পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক তৈয়ারীর পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে বিবেচনা; এই সম্বন্ধে ওয়ার্দ্ধা কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে।

শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাজ-সরকারের প্রচেষ্টা—

শিল্প-শ্রমিকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাদ্রাজ সরকার একটা উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনায় চেষ্টিত ছিলেন। এই সম্পর্কে তাহাদের অভিলাষ এই যে বড় বড় কারখানাতে বিদ্যালয়সমূহে শ্রমিকদিগের উপস্থিত থাকা চাকুরীর একটা সর্ত্ত হইবে এবং শিক্ষার খরচ কারখানা-স্বত্বাধিকারীরা বহন করিবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কের মজুরেরা যাহাতে লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখে তাহার ব্যবস্থা কারখানা-মালিকেরা করিবে এবং যাহাতে সমস্ত অশিক্ষিত মজুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত হয় তাহার দায়িত্ব লইবে। এইজন্য কর্ম্মনিয়োগের একটা সর্ত্ত হইবে এই যে—দিনে অথবা রাত্রে প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য শ্রমিকদিগকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কাজের সময়ের মধ্যেই কি প্রকারে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে তাহাও বিবেচিত হইতেছে।

হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন—

মাদ্রাজে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন হইতেছে; হিন্দী ভাষার সহিত কোন কোন প্রদেশের একটা নৈকট্য আছে, সেখানে এই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচার করার যতখানি যুক্তি আছে, মাদ্রাজে তাহার কিছুই নাই। তথায় হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের তিন জন সভ্যকে মাদ্রাজ পুলিশ ১০৯ ধারা ও সং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত করে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাহারা মিছিল ও সভ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করিতেছিল। সি-ডি-নায়াগম্ ও সন্মুগানন্দ নামে দুইজন এই বলিয়া মুচলেকা দেয়—মকোদ্দমা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা এই আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে। ইহারা জামীনে খালাস আছে—তৃতীয় ব্যক্তি পল্লডম্ পন্ন স্বামী বলিয়াছে সে আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর গৃহদ্বারে বসিয়া থাকিবে এবং উপবাস করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে রাখিয়াছেন।

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—

ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিব সার্ এন্-এন্-সরকার ছুটী লওয়ায় সার্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালীদিগের সৌভাগ্যের ও গৌরবের বিষয় এই পদটি বাঙালীরাই বরাবর অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা লইয়া কেন্দ্রীয় সভায় একবার অবাঙ্গালীরা প্রশ্নও তুলিয়াছিল কিন্তু সরকার স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন—আইনের ব্যাপারে ইহাদের উপযুক্ততা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সার্ মন্মথ কলিকাতা হাইকোর্টে থাকা কালীনও সাধারণের নিকট হইতে তাঁহার সুবিচারের জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার বিচারবুদ্ধিকে সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও মানিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ শরীফ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা তাঁহার রায়ের উপর নির্ভর করিয়াই সজ্ঘটিত হইয়াছে। বিচারে তাঁহার দৃঢ়তা বিশেষ করিয়া হিলি-মকোদ্দমায় প্রস্ফুট হইয়াছিল। ঐ রাজনৈতিক ঘটনায় চারিজন আসামীর ফাঁসীর হুকুম হয়—তাঁহার নিকট আপীল আসিলে তিনি চারিজনের ফাঁসীর-হুকুমই রদ করেন; ইহা লইয়া সরকার পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলও হয় কিন্তু সার্ মন্মথের রায়ই শেষ পর্য্যন্ত বজায় ছিল। সুতরাং এই পদটি উপযুক্ত আইনজ্ঞের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিহারে বাঙ্গালী বিদ্বেষ—

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিহার প্রদেশে বহু বাঙালী পরিবার পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নির্দেশ দিয়াছেন—'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' না থাকিলে কোনো বাঙ্গালীকে বিহার সরকারে চাকুরী দেওয়া হইবে না। সকলেই

আশা করিয়াছিল যে প্রাদেশিক অটোনমির যুগে 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের' কলঙ্ক জাতীয় জীবন হইতে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বিহারে বাঙ্গালী বিদ্বেষ ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ২৩শে মে রাঁচী ইউনিয়ন ক্লাব হলে এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পি, আর, দাস এক সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে ইহা সত্যই অগৌরবের বিষয় যে তাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে যাহা করিতেছেন তাহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। এক জাতি, এক আদর্শ, এক ভারত—এই যখন আমাদের নব জাতীয়তার আদর্শ তখন সামান্য দুই একটা চাকুরীর মোহে কেন এই প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা তাঁহাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিতেছে?" মিঃ দাসের কথা সমর্থন করিয়া আমরা বলি বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এই মনোবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়।

মিঃ শরীফের পদত্যাগ—

মধ্যপ্রদেশের অন্যতম কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ শরীফ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিধান অনুসারে পদত্যাগ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি জাফর হুসেন নামক জনৈক আসামীকে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি প্রদান করেন। উক্ত আসামী একজন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল। মিঃ শরীফের এই কার্য্য কংগ্রেস মহলে ও স্থানীয় জনসাধারণের মনে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে; ফলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার দেওয়া হয়। স্যার মন্মথ এই বিষয়ের তদন্ত করিয়া উক্ত মন্ত্রী মহাশয়ের পদত্যাগের জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটি স্যার মন্মথের নির্দ্দেশ গ্রহণ করেন এবং মিঃ শরীফকে পদত্যাগের জন্য কমিটির বিধান জ্ঞাপন করেন। মিঃ শরীফ কংগ্রেসের বিধান মানিয়া লইয়া যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

জাতি-সঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক সুধী সহযোগ কমিটির (International Cultural Conference), বার্ষিক সাধারণ সভায় স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের স্থানে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিবার জন্য জেনেভা হইতে আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আগামী ২৫শে জুন 'কার্থেজ' জাহাজে বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবেন। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়ের এই সম্মানে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি এবং আশা করি নিখিল জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য তিনি প্রচার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

পণ্ডিত জওহরলালের বিলাত যাত্রা—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার দুই ভগিনীসহ ইউরোপ গমন করিয়াছেন। এই সময় তিনি কেন বিলাত যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতজী বলেন—"সখের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিলাত যাইতেছি না। অথবা স্বাস্থ্যের জন্যও নহে—কেন না বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। এমন কি আমার মেয়েকেও দেখিবার জন্য যে যাইতেছি তাহা নহে। ভারতের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমার ইউরোপ যাত্রার একমাত্র অভিপ্রায়—ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করা। ভারতের সমস্যাকে আমি পৃথিবীর সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করি না এবং আমার মতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য পৃথিবীর সমস্যার সহিত যোগাযোগ রাখিতেই হইবে।"

উড়িষ্যা ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি—

উড়িষ্যা সরকার ব্যয় হ্রাস অথবা শাসনকার্য্য সরল করিবার জন্য একটি ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি এই কমিটি সাময়িক প্রথম রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে—এই প্রদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জীবিকার সাধারণ পরিমাপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন, দায়িত্বের অনুপাতে বেতন দান করিলে এই সকল উপযুক্ত লোককে আকর্ষণ করিবার ও তাহাদিগকে প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য

করেন যে এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চপদের বেতন মাসিক পাঁচশত টাকা হওয়া উচিত। উড়িষ্যায় মন্ত্রীমণ্ডলীর এই সব জনহিতকর উদ্যম প্রশংসনীয়।

যশোহরে হাঙ্গামা—

যশোহর-খুলনা রাজনীতিক কর্ম্মি-সম্মিলন উপলক্ষে যশোহরে যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহা সমগ্র কংগ্রেসের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন —"আমি আন্তরিকভাবে আশা করিতেছি যে, নরেশ সেনের এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে আমরা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।" এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া সুভাষচন্দ্র একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত, সন্তোষকুমার বসু ও সনৎকুমার রায় চৌধুরীকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি—যশোহরের জনসাধারণ এবং এই অপ্রীতিকর হাঙ্গামা সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দ তদন্ত কমিটিকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করিবেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আলোচনা—

সম্প্রতি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সাধনের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের জননায়কগণ আলোচনা চালাইয়াছেন। মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিত প্রথমে মহাত্মা গান্ধী, পরে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং পুনরায় মহাত্মা গান্ধী এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বা মুসলীম লীগের পক্ষ হইতে সরকারী-ভাবে এখনও কোনো বিবৃতি দেওয়া হয় নাই, কাজেই আলোচনার সূত্র কি ভাবে কোন কোন সর্ত্তের অলিগলি দিয়া চলিয়াছে তাহা সাধারণের পক্ষে জানিবার উপায় নাই। তবে এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা হইতে এই আলোচনা সম্পর্কে ভাসা-ভাসা কিছু খবর পাওয়া গিয়াছে। জিন্না-সুভাষ আলোচনা সম্পর্কে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে— "সুভাষচন্দ্র লীগ-সভাপতিকে অনুরোধ করেন—কোন্ কোন্ সর্ত্তে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন চাহেন তাহা মিঃ জিন্না যেন লিখিয়া জানান। ইহাতে মিঃ জিন্না বলেন যে সর্ত্তের কথা পরে হইবে এবং এই বিষয়ে কালি-কলমে কিছু লিখিয়া জানাইতে তিনি অনিচ্ছুক। মিঃ জিন্না বলেন সকলের আগে তাঁহাদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বোঝাপড়া হওয়া দরকার যে হিন্দুদের পক্ষ হইতে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিতে ইচ্ছুক। ইহা ভিন্ন মিঃ জিন্না আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বলেন—যে সকল প্রদেশেই মন্ত্রীসভা আবার নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে এবং এই নবগঠিত মন্ত্রীসভায় মুসলমান মন্ত্রীগণ লীগ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। বলাবাহুল্য কংগ্রেস সভাপতি অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের মনোভাব মিঃ জিন্নাকে জানান। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাকে যে অভিমত দেওয়া হয় তাহাতে বলা হয় যে নূতনভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে কংগ্রেস অসম্মত; তবে লীগের মনোনীত ব্যক্তিকে এই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে কংগ্রেস অসম্মত বা কুণ্ঠিত নহে। তাহার পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত শেষবারের কথাবার্ত্তায় মিঃ জিন্না নাকি মহাত্মাকে বলেন যে—এই আপোষ প্রসঙ্গ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তরে কংগ্রেসের পতাকা যেন উড্ডীন না করা হয়। একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলেই মিঃ জিন্নার সর্ত্তগুলি তাঁহার সংকীর্ণতার পরিচয় প্রদান করে। "হিন্দুর পক্ষ হইতে কংগ্রেস" মিঃ জিন্নার এই উক্তির অর্থ এই যে—কংগ্রেস মাত্র হিন্দুর জন্য এবং লীগ হইল শুধু মুসলমানের জন্য। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া বিকশিত হয় নাই—ইহা যে জাতিধর্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে এক অখণ্ড ঐক্যের সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছে—এই কথা মিঃ জিন্নার মত রাজনীতিজ্ঞ ধুরন্ধর কেমন করিয়া বিস্মৃত হইলেন? দফায় দফায় চুক্তি ও আপোষের গাঁথুনি দিয়া ঐক্যের সৌধ গড়িয়া তোলা যায়না। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা মিলন স্থায়ী হয় শুধু ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায়—বাঁচিবার তীব্র তাগাদায়; কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে শুধু ব্যবধানেরই সৃষ্টি হয় মাত্র। তবু আমরা আশা করি এই আলোচনা সফল হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমান একমন একপ্রাণে মিলনের পতাকাতলে দাঁড়াইবে।

প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলার সম্মান—

যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বেরিলীর টার্পেণ্টাইন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীযুত ধীরেন সিংহের পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা সিংহ



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে বোম্বাই কর্পোরেশন কর্তৃক অভিনন্দন প্রদান। রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা দিচ্ছেন



বোম্বাইয়ে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীদের সম্মিলন সভা



জুহুর সমুদ্রতটে ভ্রমণরত মহাত্মা গান্ধী, কুমারী সরস্বতী বাঈ ও মহাদেব দেশাই



সীমান্ত সফরে মহাত্মা গান্ধী ও সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ

...ক্তপ্রদেশে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম মহিলা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়াছেন।

বাঙালী চিকিৎসকের সম্মান—

মেডিকেল কলেজের ক্লিনিকেল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ এন-এন-দে লেফটন্যান্ট কর্ণেল হজের স্থানে মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনো ভারতবাসী মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। ডাঃ দে'র মত সুযোগ্য ব্যক্তির প্রতি এই সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আন্তর্জ্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতীয় নারী

এডিনবরার আন্তর্জ্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের উদ্দেশ্যে সিষ্টার সরস্বতী ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। সিষ্টার সরস্বতী কলিকাতায় মেয়েদের জন্য একটি মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন; তাই সম্মেলনের কার্য্য অন্তে তিনি ভিয়েনার হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং ইউরোপে স্ত্রীরোগ চিকিৎসালয়গুলির আধুনিক প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবেন। কলিকাতায় লেডী এজরা ও শ্রীযুক্তা কিরণ বসুও উক্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

বিদেশিনী মহিলার মহৎ কার্য্য—

মিস ম্যাক্সমানী পোর্টাজ নাম্নী জনৈকা বিদুষী গ্রীস-দেশীয় মহিলা দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া হিন্দু মিশন কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিতা হন এবং তাঁহার নাম রাখা হয় কুমারী সাবিত্রী দেবী। তিনি ইংলণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধিধারিণী। সম্প্রতি তিনি উক্ত মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দের সহিত হিন্দুধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে আসাম ভ্রমণ করিতেছেন। অপহৃতা বা অন্যপ্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্তা হিন্দু-রমণীদের উদ্ধার সাধন করাও তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা এই মহিয়সী মহিলার সৎকার্য্যের প্রশংসা করিতেছি।

টেলিফোন যন্ত্র নির্ম্মাতার মৃত্যু—

মিঃ গ্রেহাম বেল প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন। পরে রিসিভিং (বার্ত্তাগ্রহণ যন্ত্র) ও ট্রান্সমিটিং সেট (বার্ত্তা-প্রেরণ যন্ত্র) আবিষ্কার করেন মিঃ জর্জ্জ ফরেষ্ট নামক এক বৈজ্ঞানিক। সম্প্রতি ৯২ বৎসর বয়সে বেডফোর্ড সহরে মিঃ জর্জ্জ ফরেষ্টের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রদ্বারাই বর্ত্তমানে পৃথিবীতে টেলিফোনের ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিপূজা—

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বিভাগের উদ্যোগে বালী (হাওড়া) সরস্বতী পাঠাগারে জাতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবির প্রতিকৃতি মাল্য-ভূষিত করা হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই উৎসবে উপস্থিত হইয়া কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

কেন্দ্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ—

কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি জনৈক দাতা লক্ষাধিক টাকা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকালটি হইতেও এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ফ্যাকালটি কলিকাতার কয়টি আয়ুর্ব্বেদ কলেজকে একত্র করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটীও গঠন করিয়াছেন। লুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধার সাধনের পর তাহা জনপ্রিয় করিতে হইলে যে বিপুল উদ্যমের প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্য বর্ত্তমানে বহু ব্যক্তি উৎসুক হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও যাহাতে আয়ুর্ব্বেদের পরীক্ষা হয়, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। নূতন কেন্দ্রীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল দিক দিয়াই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

খেলা ধুলা

কলিকাতায় বর্ম্মাদল ঃ

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শেষকালে যদি বা বর্ম্মীজ-দল এলো, তারপরে আবার বিঘ্ন ঘটলো মহমেডানদের খেলা নিয়ে। মহমেডানরা তাদের নূতন মাঠে খেলতে চাইলে। তা হওয়া সম্ভব নয় কারণ পুলিস কমিশনারের অনুমতি কেবল ক্যালকাটার মাঠে খেলা হবে। তখন মহমেডানরা চাইলে তাদের মেম্বরদের জন্য কনসেশন, তা' না পাওয়ায় বর্ম্মাদলের সঙ্গে খেলতে তারা সম্মত হলো না। পূর্ব্বে শোনা যেতো, এখন বেশ পরিষ্কার জানা গেল যে, চল্লিশ বৎসর ধরে ক্যালকাটা ক্লাব তাদের সভ্যদের জন্য অর্দ্ধমূল্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনগুলি প্রত্যেক প্রদর্শনী ম্যাচে পেয়ে আস্‌ছেন, তাদের মাঠ ও গ্যালারী ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে। চ্যারিটির জন্য ঐটুকু ত্যাগও তারা করেন না। মোহনবাগান দলই মহমেডানরা ওঠবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় ছিল এবং কথায় কথায় তাদের অধিকাংশ দর্শনীয় খেলাগুলিই চ্যারিটি ঘোষিত হতো। তাতে তারা আপত্তি করে নাই—বিনা ওজরে, বিনা সুবিধায়, কোনরূপ কনসেশন না নিয়েই তারা এ পর্য্যন্ত খেলে এসেছে। ঐ সকল খেলা চ্যারিটি হওয়ায় তাদের মেম্বরদের বড় কম আর্থিক অসুবিধা ভোগ করতে হয় নাই। আর ক্যালকাটারা গ্রাউণ্ডের বিনিময়ে অর্দ্ধমূল্যে ভাল ভাল খেলা দেখবার সুবিধা ভোগ করেছেন চল্লিশ বৎসর ধরে এবং লীগ ও শীল্ডের দর্শনীয় অনেক খেলাই বিনা খরচায় দেখে আসছেন।



স বেলী
(ক্যাপটেন—বর্ম্মাদল)



কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন)
আই এফ এ, ভারতীয়



টেলর (ক্যাপটেন)
আই এফ এ



বা বা



আর্মষ্ট্রং

চৈনিক দলের সময় ক্যালকাটার বদান্যতার কথা প্রথম সাধারণের কর্ণগোচর হয়, তখনি আমরা আই এফ একে তাঁদের নিজস্ব মাঠ ও গ্যালারী ক'রবার কথা বলেছিলুম। প্রত্যেক চ্যারিটি খেলার জন্য বারশত আসন যদি অর্দ্ধমূল্যে ক্যালকাটাকে তাদের গ্যালারী ও মাঠের জন্য দিতে হয়, এবং কম পক্ষে যদি চারটি



কানুমুস্ত



উইলিন



বা গিন



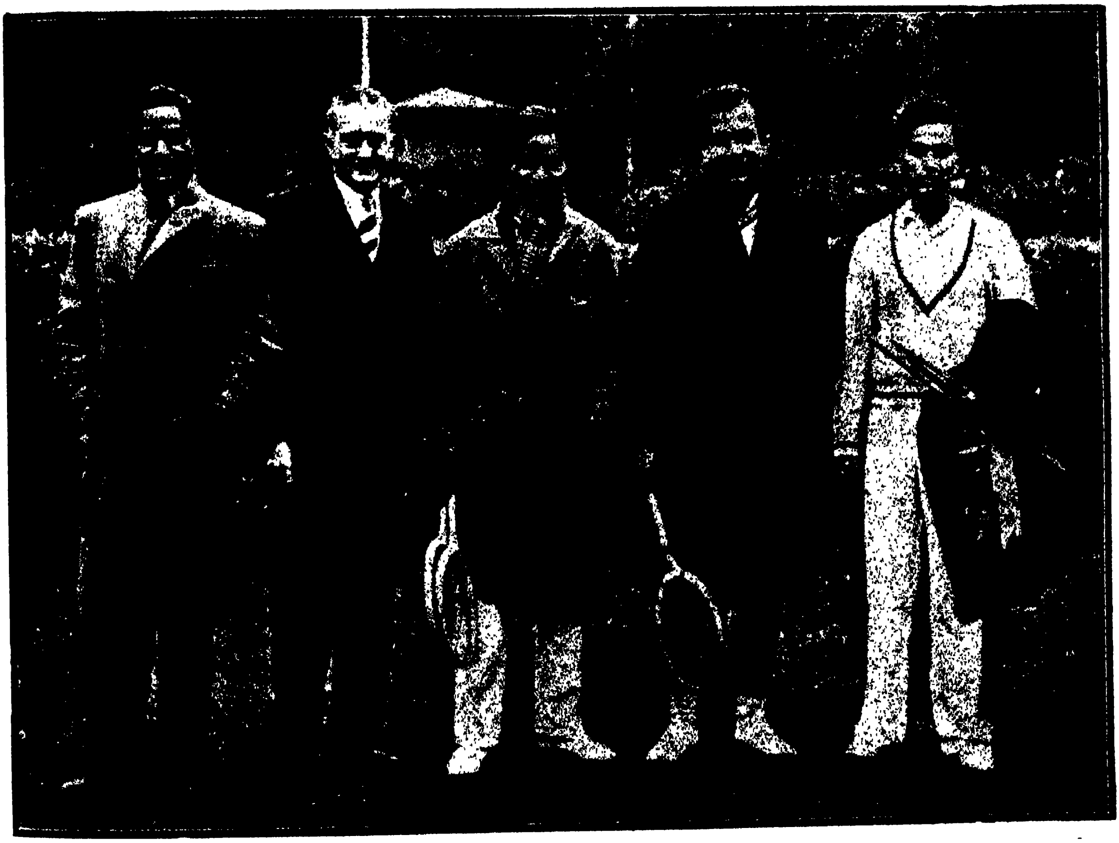
জি দীল্লা

চ্যারিটি বৎসরে হয়, তবে সাড়ে চার হাজার টাকা দাতব্য তহবিলের লোকসান হচ্ছে প্রতি বৎসরে।

মহমেডানরা নীতি হিসাবে ঐ সুবিধা না পেলে খেলতে অসম্মত হয়েছে। আমরাও এ বিষয়ে তাদের সমর্থন করি। মোহনবাগানের বদান্যতা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি অধিকারের জন্য অপরের দৃঢ়তাও প্রশংসা পাবার যোগ্য।

আই এফ এর সম্বন্ধে বক্তব্য, তাঁরা কোন দল মনোনীত করলে তারা যদি খেলতে সম্মত না হয় তবে তাঁদের কর্তৃত্বের মূল্য থাকে না। শোনা যায়, নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়রা মহমেডানদের বদলে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের সম্মিলিত দলের খেলা হয়। ক্যালকাটা সেই অর্দ্ধমূল্যের সুবিধা ভোগ করেছে, অথচ মোহনবাগানদের সদস্যদের পূরামূল্যে খেলা দেখতে হয়েছিল।

পূর্ব্ব রাত্র ও সমস্ত দিবসব্যাপী এমন প্রচুর বারিপাত হয়েছিল যে খেলা না হওয়াই উচিত ও শোভন হতো, যখন ইহা একটা দর্শনীয় প্রদর্শনীয় খেলা। শোনা যায়, আই এফ এ, মোহনবাগান ও হেডওয়ার্ড কোম্পানী খেলাবন্ধের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু একমাত্র ক্যালকাটা ক্লাব

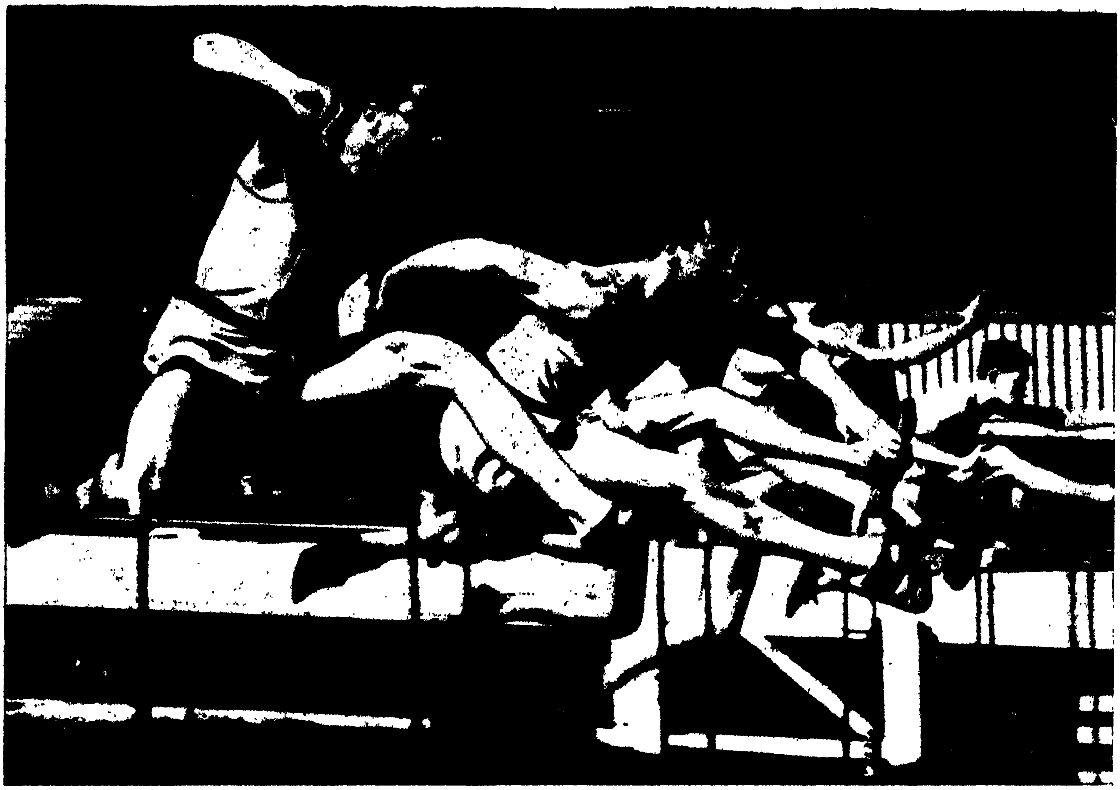


ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ, ইঁহারা বিলাতে ডেভিস কাপ খেলতে যান এবং বেলজিয়ামের নিকট ৪—১ ম্যাচে পরাভব স্বীকার করেছেন। (বাম থেকে)—যুধিষ্ঠির সিং, ব্রুক এডওয়ার্ডস্‌, রণভির সিং, গাউস মহম্মদ ও এম আলাম

যদি কোন কারণে খেলতে অপারক হয়, তবে তাদের পূর্ব্বে আই এফ একে জ্ঞাত করাতে হয়, নতুবা তাদের শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু মহমেডানদলকে বর্ম্মাদলের সঙ্গে খেলতে বলবার পরে যে কোন কারণেই হোক তারা অসম্মত হওয়ায় আই এফ এর যদি কিছু করবার না থাকে তবে তাঁদের এরূপ খেলার ব্যবস্থা মানে মানে পরিত্যাগ করাই সম্মাননীয় বলে মনে করি।

খেলা হবার পক্ষে মত দেওয়ায় তাঁদেরই ইচ্ছানুসারে ঐ দুর্য্যোগেও খেলা হয়। তা'হলে কি বুঝবো, ক্যালকাটা ক্লাবই কলিকাতার খেলাধূলার একমাত্র নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা। অথচ ক্যালকাটা দলের মাত্র চারজন খেলোয়াড় এই খেলায় যোগ দেবার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, মোহনবাগানের ছিল সাতজন।

মুসলমানরা যাতে বর্ম্মাদলের খেলা দেখতে না যায়' তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা হয়েছে—হ্যাণ্ডবিল বিলি এবং আদেশ করে ঢোকবার লাইন থেকেও মুসলমানদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মতামতের জন্য মহমেডানদের খেলতে রাজী না হওয়া অনুমোদন করা যায়, কিন্তু তাদের সম্প্রদায়কে খেলাতে



ইউনিভারসিটি এথ্লেটিক ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়নসিপ ও লণ্ডন এথ্লেটিক ক্লাব চ্যালেঞ্জ কাপ্সের
১২০ গজ বেড়া দৌড় বিজয়ী × ই ভি স্কোপ (অক্সফোর্ড সেণ্টিপিডস্)

যোগ দিতে বাধা বা অনুজ্ঞা দেওয়া অনুমোদিত হয় না। তবে নির্ব্বাচিত মুসলমান খেলোয়াড়রা কেন প্রথম দিনের খেলায় খেলেছিল? বোধহয়, শাস্তি পাবার ভয়ে। বয়কটের অর্থ কি কেবল টিকিট কিনে ভেতরে না যাওয়া —বেড়ার বাইরে থেকে মুসলমান জনস্রোত কিন্তু খেলা দেখেছে।

আই এফ এর ভবিষ্যতে ক্যালকাটাকে চ্যারিটি ম্যাচের জন্য বিনামূল্যে মাঠ ও গ্যালারী দিতে বাধ্য করান উচিত। তাতে তাঁরা রাজী না হ'লে যে দল বিনামূল্যে তাদের মাঠ ও গ্যালারী দেবে ভবিষ্যতে চ্যারিটি খেলা সেইখানে করান কর্ত্তব্য।

কোনরূপ কনসেশন কাহাকেও দেওয়া হবে না। যদি দেওয়া হয় তবে সকলকে দিতে হবে। যারা মাঠ-গ্যালারী দেবে, যারা খেলোয়াড় দেবে, তাদের সবাইকে। তাতে চ্যারিটীর অর্থ কম হলেও উপায় নেই। তথাপি সামঞ্জস্য রাখা বাঞ্ছনীয়, সকলকে সমান সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আই এফ এ ১ ঃ বর্ম্মা ০ ঃ

বর্ম্মা দলের কলিকাতায় তিনটি খেলা হয়। প্রথম খেলায় তারা আই এফ এর বাছাই দলের নিকট ১-০ গোলে পরাজিত হয়। আই এফ এ দল বেশ কৃতিত্ব দেখিয়ে জয়লাভ করে। কলিকাতার ক্রীড়ামোদী দর্শকরা বর্ম্মা দলের প্রথম দিনের খেলা দেখে বিশেষ-প্রীতি লাভ করতে পারেন নি বরং হতাশই হয়েছেন, বর্ম্মা দলের ঢক্কানিনাদিত নাম-ডাকের অনুযায়ী খেলার পরিচয় না পেয়ে। রহিম গোলটি প্রদান করে। ব্যাকে ই কার্ভে চমৎকার খেলেন এবং দাশ গুপ্ত দু'বার অত্যাশ্চর্য্যরূপে অবধারিত গোল রক্ষা

করেন। হাফব্যাকে জে লামসডেনের খেলা অত্যন্ত কার্য্যকরী হয়েছিল, তিনি রক্ষণভাগকে ও আক্রমণ ভাগকে সমান



সপ্তদশ বর্ষীয়া জাপানী বালিকা মিস কিমুকো নাকামরা ১৯৪০ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রাত্যহিক স্কেটিং অনুশীলন করছেন

সহায়তা করেছেন। বর্ম্মাদলের আদান-প্রদান ও নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া অতীব সুন্দর,বিশেষতঃ দক্ষিণভাগের উইলিন ও কানন্নুস্তের। বা বা তার সুনাম রক্ষা করতে পারে নি, পাগ্‌সলের তৎপরতা ও সটের প্রখরতা প্রশংসনীয়। বা সিনের গোলটি আটকান উচিত ছিল, বল হাতে পেয়েও সে ধরতে পারে নি। ব্যাকে দীম্মার খেলা উৎকৃষ্ট, হাফব্যাকে ফণ্টি সুন্দর ও স'বেলী মধ্যম খেলেছেন।

আই এফ এ:—রোজারিও (ই বি আর); পি দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) ও ই কার্ভে (পুলিস); হেণ্ডার্সন (কে ও এস বি), টেলার (ক্যালকাটা—ক্যাপটেন) ও জে লাম্‌সডেন (রেঞ্জার্স); সেলিম, রহিম (মহমেডান), আর লামসডেন (রেঞ্জার্স), ব্লাওয়ার (ক্যামারোনিয়ন) ও আব্বাস (মহমেডান)।

রেফারী:—জে চক্রবর্ত্তী।

বর্ম্মা ৩ ঃ মোহনবাগান-ক্যালকাটা ২ ঃ

দ্বিতীয় খেলা হয় মোহনবাগান-ক্যালকাটার সম্মিলিত দলের সঙ্গে, বর্ম্মাদল ৩-২ গোলে জয়ী হয়। পূর্ব্ব রাত্রের ও তিন ঘটিকার বারিপাত এবং খেলারম্ভের পূর্ব্বে পুনরায় ভীষণভাবে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় মাঠ অবিলম্বে জলায় পরিণত হয়। এইরূপ ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলকের আলোতে খেলা চলতে থাকে। বারিধারার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চলে না—মানুষ চেনা যায় না—ফুটবল খেলা হচ্ছে কি ওয়াটার পলো হচ্ছে বোঝা শক্ত। বর্ম্মারা জলেই ভাল খেলে থাকে। রেঙ্গুন কাষ্টমস শীল্ড খেলতে এসে যেদিন শুকনো হলো আর হেরে গেলো। যে ক'দিন জল পেলে দারুণ খেললে। বর্ম্মায় বর্ষাকালই বৎসরের মধ্যে বেশী। এদিনও বর্ম্মাদল জলের খেলায় তাদের সুনাম অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছে, তাদের খেলা অতি সুন্দর হয়েছিল। জলের মধ্যে তাদের আদান-প্রদানের নিপুণতা,



ইউনিভার্সিটি এথলেটিক্ ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়নসিপের পোল-ভল্টে এন ইন্ডার ১১ ফিট ৬ ইঞ্চি লাফিয়ে বিজয়ী হয়েছেন

আক্রমণের তীব্রতা ও বল আয়ত্বাধীনে রাখার কৌশল অতীব দর্শনীয় হয়েছে।

স্থানীয় দলের ফরওয়ার্ডে এস চৌধুরীর খেলা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল, ভিজা মাঠে বুট পায়ে খেলতে তিনি বিশেষ



এস চৌধুরী



বেণীপ্রসাদ

পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তারপরেই প্রেমলালের নাম করা যায়, তার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসা পাবার যোগ্য। হাফে বেণীপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে টেলরও ভালো খেলেছেন। ব্যাকে গ্রসম্যান মন্দ খেলেন নি, কিন্তু এস দত্তের (ছোট) খেলা ভাল হয় নি। তার বদলে কৃষ্ণধনকে নামান উচিত ছিল। নন্দ রায় চৌধুরী সুবিধা করতে পারে নাই। স্থানীয় দল দু'টি পেনালটি পায়; দীন্না চৌধুরীকে ফাউল করায় একটি এবং এল' ষ্ট্রেঞ্জ হ্যাণ্ডবল করার একটি। এস চৌধুরী পেনালটি দু'টিতে গোল করেন। বেণীপ্রসাদের ফাউল থেকে বর্ম্মা দল একটি পেনালটি পায় ও প্যাগ্‌সলে গোল করে। বা বা একটি ও পাগ্‌সলে আর একটি গোল দেয়। একটি খেলায় তিনটি পেনালটি হয়।

মোহনবাগান—ক্যালকাটা :—আর্ম্মষ্ট্রং; এস দত্ত (ছোট) ও গ্রস্‌ম্যান; বি মুখার্জ্জি, টেলর (ক্যাপ্টেন) ও বেণীপ্রসাদ; এন ঘোষ, ম্যাকে, রায় চৌধুরী, প্রেমলাল ও এস চৌধুরী।

রেফারী :—ষ্টাফ্ সার্জ্জেন রবিন্সন।

আই এফ এ (ভারতীয়) ১ : বর্ম্মা ১

তৃতীয় বা শেষ খেলা হয় আই এফ এর ভারতীয় একাদশের সঙ্গে এবং ১—১ গোলে ড্র হয়। ভারতীয় দল প্রথমার্দ্ধের তিন ভাগ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রায় সর্ব্বক্ষণ চেপে ধরেও এবং প্রত্যেকে বর্ম্মাদলের অপেক্ষা খেলার নিপুণতায় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করেও কেবল খারাপ সুটিংয়ের জন্য বহু অবধারিত গোল নষ্ট করায় জয়ী হতে পারে নি। বাঙ্গালোরের নামজাদা খেলোয়াড়দ্বয় মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ন সুবর্ণ সুযোগগুলি হেলায় নষ্ট করেছে।

এ দিনের খেলাটি ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল না, মেঘের ঘনঘটায় বারিপাতের সম্ভাবনাই অধিক সূচিত হচ্ছিল। আসন্ন দুর্য্যোগ উপেক্ষা করেও বিপুল দর্শক সমাগম হয়েছিল। পুরোভাগের খেলোয়াড়দের আক্রমণের তীব্রতায় বর্ম্মাদলের রক্ষণভাগ বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু সুযোগ সন্ধান সময় ও ঠিক মত সুট করার অপারকতায় গোল হয় নি। সকল বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে সাত দরিয়া পার হয়ে এসে ডাঙার কাছে ভরাডুবি হয়েছে বহুবার, সংযত চিত্তে উপযুক্ত সময়ে সজোরে গোলে বল চালনা করার অভাবে। আই এফ এ দল পেনালটি পেয়েও গোল দিতে পারে নাই। মুর্গেশের আত্ম-



পঞ্চদশ বার্ষিক এথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপের ৮০ মিটার বেড়া রেসে বিজয়িনী এস হুইটম্যান বেড়া লাফাচ্ছেন

বিশ্বাস ছিল না, সে দোমনা হয়ে একবার যেন লক্ষ্মীনারায়ণকে গোলটি মারতে বললে, সেও ভয় পেলে তখন নিরুপায় হয়ে বল তুলে দিলে একেবারে বা সিনের হাতে।

ফরওয়ার্ডে প্রসাদ এ দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, তা'র ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে বর্ম্মারা হিমসিম খেয়েছে। পাখী সেন অনভ্যস্ত স্থানে খেলেও চমৎকার সেণ্টার করেছে। করুণা ভট্টাচার্য্য সহযোগীদের মধ্যে সুন্দর আদান-প্রদান করে বহু বার আক্রমণের সূচনার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু গোলের মুখে এসে অব্যর্থ সন্ধানে প্রচণ্ড বেগে বল মারতে না পারায় সফলকাম হতে পারে নাই।

ব্যাকদ্বয়ের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তই শ্রেষ্ঠ। হাফব্যাকে বেণীপ্রসাদ শ্রেষ্ঠতর। গোলে হারাধন দত্ত বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে আসন্ন অবধারিত গোল রক্ষা করেছে, নইলে বর্ম্মাদল বিজয়ী হতো।



কে দত্ত

বর্ম্মাদলের পুরোভাগে পাগ্‌সলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, তার সুযোগ সন্ধানের ও প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে একাধিকবার ভারতীয় দলের পতন অনিবার্য্য বলে মনে হয়েছিল। পাগ্‌সলেই প্রথম গোল দেয়, আর একবার তার সট বারে লেগে ফিরে আসে।

রক্ষণভাগের সকল খেলোয়াড়ই সুন্দর খেলেছে। এদিন স'বেলী ও গোলরক্ষক বা সিন রক্ষণকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

বহুবার বহু সুযোগ নষ্ট করার পর খেলা শেষের মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে কে ভট্টাচার্য্যের পাশ থেকে বল পেয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ চমৎকার সটে গোল শোধ করে



পাগ্‌সলে



লক্ষ্মীনারায়ণ

আই এফ এ (ভারতীয়) দল :—কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল) ; পি দাশগুপ্ত ও আর মজুমদার (ইষ্টবেঙ্গল) ; বিমল মুখার্জ্জি (মোহনবাগান), বীরেন সেন (ইষ্টবেঙ্গল), বেণীপ্রসাদ (মোহনবাগান) ; বি সেন (ই বি আর), লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ (ইষ্টবেঙ্গল), কে ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস—ক্যাপ্‌টেন) এবং কে প্রসাদ (এরিয়ান)।

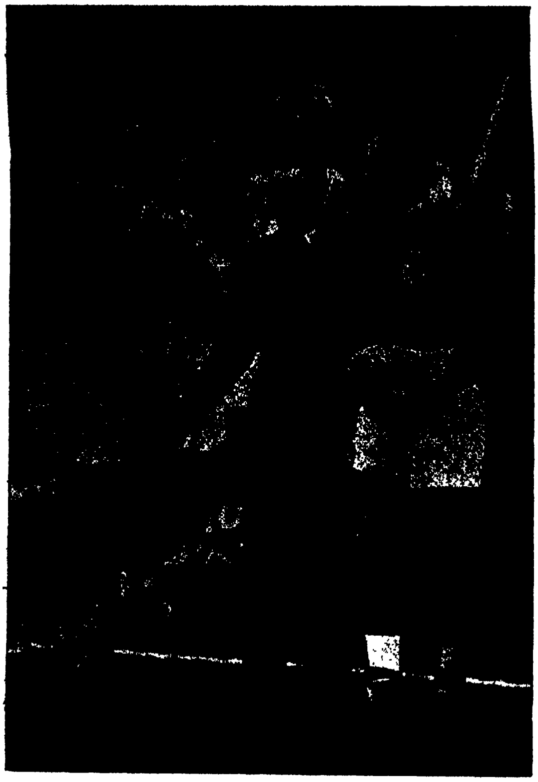
রেফারি :—সুশীল ঘোষ।

কলিকাতায় তিনটি ম্যাচেই বর্ম্মাদলের নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গুলি খেলেছেন :—

বা সিন্ (মিউনিসিপাল ক্লাব) ; দীম্না (পোষ্টাল) ও এল' ষ্ট্রেঞ্জ (রেঙ্গুন কাষ্টমস্) ; গার্লিং (বর্ম্মা রেলওয়ে), স'বেলী (রেঙ্গুন কাষ্টমস্—ক্যাপ্‌টেন) ও ফগাটি (মিউনিসিপাল ক্লাব) ; উইলিন (পুলিস), কা নু মু স্ত (পুলিস), বা বা (বর্ম্মা রেলওয়ে), পাগ্‌সলে (রেঙ্গুন কাষ্টমস্) ও রবার্টস (বর্ম্মা রেলওয়ে)।



নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতার ১০০ মিটার সন্তরণে বিজয়িনী কুমারী লীলা (মধ্যে), রমা (বামে) দ্বিতীয় ও সুধলতা (দক্ষিণে) তৃতীয়



ডন্ ব্রাডম্যান, অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন, রাগবী লীগ ফাইনাল খেলার পূর্ব্বে সালফোর্ড দলের সভ্যদের সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন

বিলাতে অষ্ট্রেলিয়া ঃ

অষ্ট্রেলিয়া—৭০৮ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

কেম্ব্রিজ—১২০ ও ১৬৩

অষ্ট্রেলিয়া তাদের বিলাতের চতুর্থ খেলাও ১ ইনিংস ও ৪২৫ রানে জিতেছে। তাঁরা একই ইনিংসে একটা ডবল সেঞ্চুরী ও তিনটা সেঞ্চুরী করেছে—হাসেট (নট আউট) ২২০, ব্যাডকক্ ১৮৬, ব্রাডম্যান ১৩৭ ; ফিঙ্গলটন ১১১।

চার শত রান ওঠে ২৭০ মিনিটে, পাঁচশত ওঠে ৩২০ মিনিটে ও ছ'শত ৩৮৫ মিনিটে। হাসেটের ২২০ রান করতে লাগে ২৬০ মিনিট, ৩৫টা চার ছিল। ব্যাড্ককের ১৮৬ রান হয় দু'শো মিনিটে, ১টা ছয় ও ২৯টা চার ছিল। চতুর্থ উইকেট সহযোগিতায় ২৬৫ রান হয় ১৮৫ মিনিটে।

কেম্ব্রিজ পক্ষে প্রথম ইনিংসে ইয়ার্ডলে ৬৭ ; ওয়েট ২৩ রানে ৫ এবং ও'রিলী ৫৫ রানে ৫ উইকেট নেয়। দ্বিতীয় ইনিংসে গিব্ (নট আউট) ৮০, ইয়ার্ডলে ২৯ ; ওয়ার্ড ৬৪ রানে ৬, ওয়েট ২২ রানে ৩, ও'রিলী ৪৯ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া—৫০২ (ব্রাডম্যান ২৭৮, হাসেট ৫৭, ফিঙ্গলটন ৪৪, ম্যাক্ক্যাব্ ৩৩, ওয়েট ২৬)।

এম সি সি—২১৪ ও ৮৭ (১ উইকেট)

ওয়াট (নট আউট) ৮৪, এড্রিচ্ ৩১, কম্পটন ২৩ ; এড্রিচ (নট আউট) ৫৩

খেলাটি বৃষ্টির জন্য তৃতীয় দিনে বন্ধ হওয়ায় ড্র হয়। এম সি সি নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। ব্রাডম্যান ইংলণ্ডে তাঁর দ্বিতীয় ডবল সেঞ্চুরী করলেন, ২৭৮ রান করতে ৫ ঘণ্টা, ৫৮ মিনিট লেগেছে, ১টা ছয় ও ৩৫টা চার ছিল। ইংলণ্ড পক্ষে স্মিথ ৩৯ রানে ৪ উইকেট এবং ১৩৯ রানে ৬ উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ব্যাটিংয়ে ওয়্যাট ও এড্রিচ কিছু কৃতকার্য্য হয়েছেন। ও'রিলী ৪২ রানে ৩, ফ্লিটউড্-স্মিথ ৬৯ রানে ৪ ও ম্যাক্কর মিক্ ৯ রানে ২ (২টা নো-বল) উইকেট নিয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়া—৪০৬ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ব্রাউন (নট আউট) ১৯৪, ব্যাডকক্ ৭২, ওয়েট ৪৩, ওয়াকার (নট আউট) ২৯ ; টিম্স্ ৬৮ রানে ৩, প্যাটরিজ ৮২ রানে ৩ উইকেট।

নর্থাম্পটন্স্—১৯৪ ও ১৩৫

নেলসন ৭৪, ব্রুক্স্ ৩৭, স্নোডেন ২৮, গ্রীণউড্ (রান আউট ২৪ ; গ্রীণউড্ ৪৩, জেম্স্ ২১, ব্রুক্স্ ১৫, প্যাটরিজ (নট আউট) ১৬ ; ওয়ার্ড ৭৫ রানে ৬ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ম্যাক্ক্যাব ২৮ রানে ৪, ওয়েট ২৮ রানে ৩, ফ্লিটউড্-স্মিথ ৫৫ রানে ২ উইকেট।



ওয়ার্ড

অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৭৭ রানে জয়ী হয়েছে। ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড তার লেগ-ব্রেক বলে ৩৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ব্রাডম্যান ভিজা মাঠে যে কিছুতেই সুবিধা করতে পারেন না, তা' পুনরায় প্রমাণিত করেছেন, মাত্র ২ রানে আউট হয়ে।

অষ্ট্রেলিয়া—৫২৮ ও ২৩২ (২ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ব্রাডম্যান ১৪৩, হাসেট ৯৮, ডবলিউ ব্রাউন ৯৬, ফিঙ্গলটন ৪৭, ওয়েট ৩৫, বার্ণেট (নট আউট) ৩৩ ;

ব্রাউন ১৪৭ রানে ৪, ওয়াটস্ ৬৯ রানে ৩, বেরী ৯২ রানে ২ উইকেট ; দ্বিতীয় ইনিংস, বার্ণেট (নট আউট) ১২০, ব্যাড্কক্ ৯৫ ; গ্রেগরী ১০ রানে ২ উইকেট।

সারে—২৭১ ও ১০৪ (১ উইকেট)

বার্লিং ৬৭, গ্রেগরী ৬০, বেরী ৩১, ফিস্লক্ ২৪, ওয়াট্স্ ২২ ; ও'রিলী ১০৪ রানে ৮, ওয়ার্ড ৯৬ রানে ২। দ্বিতীয় ইনিংসে, ফিস্লক্ ৯৩ ; চিপারফিল্ড ২০ রানে ১ উইকেট।

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। বিলাতে এই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ারা দ্বিতীয় ইনিংস খেললে। ব্রাডম্যান সারে দলকে ফলো-অন করাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দলের ফ্লিটউড-স্মিথ, চিপারফিল্ড ও ম্যাক্ক্যাব সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকায়, ব্যাট করাই মনস্থ করেন। প্রথম উইকেট সহযোগিতায় ২০৬ রান ওঠে।

অষ্ট্রেলিয়া—৩২০ (১ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ব্রাডম্যান (নট আউট) ১৪৫, ফিঙ্গলটন (নট আউট) ১২৭, ব্রাউন ৪৭ ; বয়েস ৩৯ রানে ১ উইকেট।

হ্যাম্পসায়ার—১৫৭

হিল (রান আউট) ২৪, আরনল্ড ২৩, ক্রীজ ২২ ; ও'রিলী ৬৫ রানে ৬, হোয়াইট ১৯ রানে ২ উইকেট।

খেলা বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন হয় নি। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পূর্ব্বে ব্রাডম্যান এক উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করলেও, লাঞ্চের পর খেলা আর আরম্ভ না হওয়ায় খেলা ড্র বলে ঘোষিত হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া—১৩২ ও ১১৪ (২ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

চিপারফিল্ড ৩৬, হাসেট ২২, ব্রাডম্যান ৫ ; সিম্স্ ২৫ রানে ৪, নেভেল ৩৮ রানে ৩ ও রবিন্স ২৭ রানে ২ উইকেট। ব্রাডম্যান (নট আউট) ৩০, ম্যাক্ক্যাব (নট আউট) ৪৮, ফিঙ্গলটন ৩২।

মিডলসেক্স—১৮৮ ও ২১ (০ উইকেট)

কম্পটন ৬৫, রবিন্স ৪৩ ; ম্যাক্করমিক ৫৮ রানে ৬, ও'রিলী ৫৬ রানে ৪ উইকেট।

খেলা ড্র হয়েছে। এই প্রথম অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে পেছিয়ে রইল। ১৯৩৪ সালে অষ্ট্রেলিয়া দল মাত্র একটি ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পেছিয়ে ছিল, সেটি লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ এবং ইংলণ্ডের কাছে ইনিংস ও ৩৮ রানে পরাজিত হয়েছিল। ব্রাডম্যান দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে এড্রিচকে মে মাসের মধ্যে সহস্র রান করবার সুযোগ দিয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়া—১৬৪ ও ২৫ (০ উইকেট)

ব্যাডকক্ ৫১, হাসেট ২৯, ও'রিলী ২৩ ; সিনফিল্ড ৬৫ রানে ৮ উইকেট।

গ্লষ্টার্স—৭৮ ও ১০৭

বি ও এ এলেন ৪১, বার্ণেট ১৫ ; ও'রিলী ২২ রানে ৬, ফ্লিটউড্-স্মিথ ৩২ রানে ৩ উইকেট। এলেন ৪২, নীল ২০ ; ও'রিলী ৪৫ রানে ৫, ফ্লিটউড্-স্মিথ ৩৯ রানে ৪।

অষ্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। তিনদিনের খেলা দু'দিন খেলা হয়, প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য হয় নি। ব্রাডম্যান খেলেন নি।



ও'রিলী

অষ্ট্রেলিয়া—১৪৫ ও ১৫৩

ব্রাউন ৫৫, হাসেট ২৬ ; ম্যাক্ক্যাব্ ৫০, ব্যাড্কক্ ২৩, ওয়ার্ড ২৩। ফারনেস্ ৪৩ রানে ৪, স্মিথ ২৫ রানে ৩, ষ্টিফেন্সন্ ২১ রানে ২ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে, নিকলস্ ২৫ রানে ৬, স্মিথ ৫৯ রানে ২ উইকেট।

এসেক্স—১১৪ ও ৮৭

উইলকক্স ৩৮, ইষ্টম্যান ২১ ; পিয়ার্স ২৩, উইলকক্স ২০। ওয়ার্ড ৫১ রানে ৭, ফ্লিটউড-স্মিথ ১৭ রানে ২ ; দ্বিতীয় ইনিংসে, ফ্লিটউড্-স্মিথ ২৮ রানে ৫, ওয়ার্ড ২৪ রানে ৪ উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়া ৯৭ রানে জয়ী হয়েছে। এ খেলায় একটিও সেঞ্চুরী হয় নাই। বোলারদের দিন গেছে, খেলা দু'দিনে শেষ হয়েছে।

ব্রাডম্যানের রেকর্ড ঃ

ব্রাডম্যান মে মাসের মধ্যে দু'বার সহস্র রান করে দ্বিতীয়বার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯৩০ সালে এই মাঠেই তিনি প্রথম দু'বার সহস্র রান করতে সক্ষম হন।

সাল	ইনিংস	নট-আউট	রান	সর্ব্বোচ্চ	এভারেজ
১৯৩০	১১	৩৪	১০০০	২৫২*	১৪৩·০০
১৯৩৮	৭	১	১০২১	২৭৮	১৭০·১৬

রাজপুতানা ক্রিকেট দল ঃ

রাজপুতানা ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে তাদের প্রথম খেলায় বেকেনহাম সি সিকে ৫১ রানে পরাজিত করেছে।

রাজপুতানা—১৫৪

(হাজারী ৬৬, কে বোস ২২, তাজামুল হোসেন ১৬, আব্বাস খাঁ ১৪, কে ভট্টাচার্য্য ১৩); কারডিউ ৪১ রানে ৫, সোয়ানটন ২৯ রানে ৩ উইকেট।

বেকেনহাম—১০৩

(হড্‌সন ২২, ক্রাং ১৯, হিল ১১, সোয়ানটন ১০); আজিম খাঁ ৩২ রানে ৭, হাজারী ১০ রানে ১, ভট্টাচার্য্য ১৬ রানে ১, তাজামুল হোসেন ১৩ রানে ১ উইকেট।

রাজপুতানা—৩৮৮ ও ২০ (০ উইকেট)

সারে গ্রাস্‌হপার্স—২১৯ ও ১৮৮

রাজপুতানা ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। বাঙ্গলার কার্ত্তিক বোস ১৩১ রান করে দর্শকদের বিশেষ আনন্দিত করেছেন। গোপাল দাস ৭৬, আব্বাস খাঁ ৬২, রামপ্রকাশ ৫২।

গ্রাস্‌হপার্স পক্ষে, রিম্‌বল্ট ৬৫, ওয়াটনে (রান আউট) ৬৪, সেলার ২৭; আজিম খাঁ ৬৮ রানে ৪, হাজারী ৩১


গোপাল দাস


রামপ্রকাশ

রানে ৩ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে, মেরিম্যান ৫৪, ডলেমোর (রান আউট) ৩৩, হাউল্যাণ্ড-জ্যাক্‌সন ৩০, রিমবল্ট ২৯। সিন্ধুর গোপাল দাস চাতুর্য্যপূর্ণ বল দিয়ে ৫৯ রানে ৬, হাজারী ৪২ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

রাজপুতানা—২২৬ ও ১৩৭ (৬ উইকেট)

কে বোস ৬০, হাজারী ৩৬, আজিম খাঁ ৩৭, কে ভট্টাচার্য্য ২৪; (পার্‌স্‌কে ৫৪ রানে ৫, হোয়াই হাউস ৩৭ রানে ২ উইকেট); আব্বাস খাঁ ৫৭, হাজারী (নট আউট) ৩৫; (ইয়ং ২২ রানে ২, মারে-উড্‌ ২১ রানে ২)

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি—৩৬৪ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); জে বি গে ১২৯, ওয়েব ৫৭, হোয়াইট হাউস ৪৫, মারেউড্‌ ৪৪; (রামজি ৬১ রানে ২, বেগ ৩২ রানে ২, হাজারী ৪৫ রানে ১, আব্বাস ২৩ রানে ১)

দু'দিনের খেলা সময়াভাবে ড্র হয়েছে। ভারতীয় দলের রান দ্রুত উঠেছে।

রাজপুতানা—৪০৬ ও ১৬২ (২ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

আব্বাস খাঁ ১০১, হাজারী ১১৭; কে বোস ৫৪, আব্বাস খাঁ ৬১ (নট-আউট) বোসের ৫০ রান ৪৮ মিনিটে ওঠে।

কেমব্রিজ—৪৫৬ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ৪৭ (০ উইকেট)

গিব্‌ ৬৪, কারিস্‌ ৬০, ল্যাংলে ১৩১, হিওয়ান ৬৯ (নট-আউট); রামজী ৯৬ রানে ৪ উইকেট।

কাৰ্ত্তিক প্রশংসিত ঃ

কার্ত্তিক বোসের খেলা সম্বন্ধে অক্সফোর্ড মেল লিখেছে,... "বোসের ব্যাটিং সুন্দর—আকারে ছোট-খাট কিন্তু প্রকৃতই ভাল ব্যাটস্‌ম্যান। * * * ইংলিস ক্রিকেটে এই তরুণ খেলোয়াড়ের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় অধিক নাই, *** Quick on his feet with strong wrists, he gets plenty of power into his strokes and has a perfectly straight bat for his defensive strokes ......There are not many better batsmen in English cricket than this youth with the wonderful eye, quickness of foot, and flexibility of wrist.


কে বোস


হাজারী

অষ্ট্রেলিয়া—ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট ঃ



ডন ব্রাডম্যান
(ক্যাপটেন—অষ্ট্রেলিয়া)



হ্যামণ্ড
(ক্যাপটেন—ইংলণ্ড)

১০ই জুন তারিখে নটিংহামে প্রথম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। ইংলণ্ড টসে জিতে প্রথম দিন ব্যাট করে ৪ উইকেটে ৪২২ রান তোলে। প্রথম উইকেট সহযোগিতায় বার্ণেট ও হাটনে মিলে ২১৯ রান করেছেন। বার্ণেট সাবলীলভাবে উইকেটের চতুষ্পার্শ্বে অতি সুন্দর কাট্ ও ড্রাইভিং করেছেন। তাঁর ১২৬ রান করতে ১৭৫ মিনিট লেগেছে, ১৮টা চার ছিল। ইহা তাঁর টেষ্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী, এবং ইংলণ্ডে প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁর পূর্ব্ব টেষ্ট সেঞ্চুরী হয় অষ্ট্রেলিয়ার এডেলেডে। হাটনের টেষ্টে প্রথম অবতরণে প্রথম সেঞ্চুরী হয়েছে। তিনি খুব ধৈর্য্য সহকারে খেলেছেন, তাঁর 'ফুট-ওয়ার্ক' চমৎকার। টেষ্টে প্রথম মনোনীত হয়ে যাঁরা সেঞ্চুরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন হাটন তাদের দলভুক্ত হলেন নবম সংখ্যায়। তাঁর শত রান করতে ২০০ মিনিট লেগেছিল। প্রথম ছয় করেছেন ওয়ার্ডকে পিটিয়ে। পঞ্চম উইকেটে পেণ্টার ও বিংশ বর্ষীয় নূতন তরুণ টেষ্ট খেলোয়াড় কম্পটনে মিলে ১৪১ রান ৯০ মিনিটে করলে বেলা শেষ হয়।

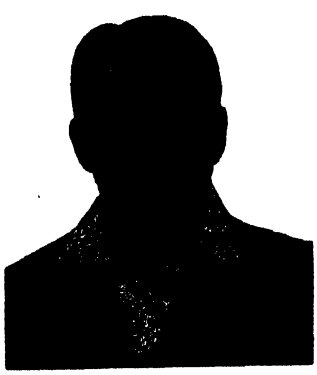
প্রথম দিন আঠার হাজার দর্শক খেলা দেখতে গিয়েছিল, মূল্য আদায় হয়েছে ১৪০৬ ষ্টার্লিং।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৬৫৮ রান তুলে প্রথম ইনিংস ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করেছে।

এ টেষ্টে নূতন কয়েকটি রেকর্ড স্থাপিত হলো :—টেষ্টের এক ইনিংসে ৪টি সেঞ্চুরি, তার মধ্যে একটি ডবল সেঞ্চুরী। ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ রান সংখ্যা—পূর্ব্বের সর্ব্বোচ্চ ৬৩৬ রান ১৯২৮-২৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে হয়েছিল। ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টার মাঠে সর্ব্বোচ্চ ৬২৭ (৯ উইকেট) ১৯৩৪ সালে হয়। পেণ্টারের ২১৬ (নট আউট) ১৯২১ সালে ওভালে মীডের ১৮৩ (নট আউট) রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল। পঞ্চম উইকেট সহযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ রান ২০৬ ওঠে।

পেণ্টার ৩৩০ মিনিটে ২১৬ রান করে নট আউট থাকেন, একটা ছয় ও ২৬টা চার ছিল। তিনি নানাবিধ 'ষ্ট্রোক' মেরে ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, মাত্র একবার ষ্টাম্প হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। কম্পটন বয়সে নবীন হলেও প্রবীণের মত ত্রুটিহীন ও চমকপ্রদ ব্যাট করেছেন, তিনিও টেষ্টে প্রথম অবতরণেই সেঞ্চুরী করলেন। তাঁর ১০২ রান করতে ১৩৫ মিনিট লাগে, ১৫টা চার ছিল।

দর্শক সমাগমেও রেকর্ড হয়েছে, পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ৩৫২৫০। বিশ্রামের সময় গেট বন্ধ করতে হয়।



সি এস বার্ণেট

অষ্ট্রেলিয়ার আরম্ভ ভাল হয় নাই। ফিঙ্গলটন ৩৪ রানে যান। ধুরন্ধর ব্যাট ব্রাডম্যান ও ব্রাউন ৫১ ও ৪৮ রানে আউট হয়েছেন। বেলা শেষে ৩ উইকেট খুইয়ে ১৩৮ রান ওঠে। ম্যাকৃক্যাব এবং ওয়ার্ড খেলছেন।

হ্যামণ্ড (ক্যাপটেন) ২৬, বার্ণেট ১২৬, পেণ্টার (নট আউট) ২১৬, হাটন ১০০, কম্পটন ১০২, এইম্‌স্ ৪৬, এডরিচ ৫, ভেরিটি ৩, সিন্‌ফিল্ড ৬, রাইট (নট আউট) ১ ; অতিরিক্ত ২৭ = মোট ৬৫৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) কে ফারনেস ব্যাট করেননাই, ইয়ার্ডলে দ্বাদশ পুরুষ আছেন।

ফ্লিটউড-স্মিথ ১৫৩ রানে ৪, ও'রিলী ১৬৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়া :—ব্রাডম্যান (ক্যাপ্‌টেন), ম্যাক্‌ক্যাব, ও'রিলী, ম্যাক্‌করমিক্, ব্রাউন, ফিঙ্গলটন, হাসেট্, ফ্লিটউড্-স্মিথ, বার্ণেট, ব্যাড্‌কক্, ওয়ার্ড ; ওয়েট (দ্বাদশ)।

লীগ খেলা ঃ

কলিকাতার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ খেলার প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং পুরোভাগে আছে, তারা ১২টি খেলে ১৫, মোহনবাগান ১২টি খেলে ১৪, কাষ্টমস ১৩টি খেলে ১৪, পুলিস ১১টি খেলে ১২, ও ইষ্টবেঙ্গল ১২টি খেলে ১৩ পয়েণ্ট করেছে ১১ই জুন পর্য্যন্ত। এ বৎসরও মহমেডানদেরই বেশী সুযোগ আছে চ্যাম্পিয়ন হবার, তথাপি নিশ্চয়তা নেই। শেষের দিকে ব্রাকেটে আছে এরিয়ান, ক্যালকাটা ও ভবানীপুর, সকলেরই ৯ পয়েণ্ট। এবার পয়েণ্টের ব্যবধান খুবই কম।

চ্যাম্পিয়ন মহামেডানদের প্রথমার্দ্ধেই তিনটি হার হয়েছে। প্রথম পুলিসের সঙ্গে ৪-৩ গোলে, দ্বিতীয় কালীঘাটের কাছে ১-০ গোলে, তৃতীয় ইষ্টবেঙ্গলের নিকট ২-০ গোলে। তবে এবার আর দর্শকদের মধ্যে মারামারি খুন-জখম হয় নি, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা জখম হয়েছিল। জুম্মা খাঁর বুটের আঘাতে মুর্গেশের গাল কেটে যায় এবং রহিমের লাথি লাগে দাশগুপ্তের পেটে। রেফারি রহিমকে ঐ জন্য সাবধান করে দেয়। খেলায় হারলেই মাথা যাদের খারাপ হয়ে যায়, তাদের খেলতে না নামাই উচিৎ। খেলায় হার-জিত আছেই। চিরদিন কোন দলেরই সমান বিক্রম থাকে না, থাকতে পারে না। এবার মহমেডানদের পূর্ব্বের সে দাপট নেই, খেলা অনেকাংশে পড়ে গেছে। তবু তাদের মধ্যে এখনও আদান-প্রদান ও বোঝা-পড়া অন্য দলের চেয়ে সুন্দর। তাদের জয়ী হবার উদ্যম ও আগ্রহ অপরিসীম।

মোহনবাগান ৯টি খেলা পর্য্যন্ত অপরাজেয় ছিল। অত্যন্ত খারাপ খেলায় পুলিসের কাছে তাদের প্রথম হার হয়। ভ্রমক্রমে পুলিসের কাছে তাদের হার হয়েছে ছাপা হয়েছিল গতমাসে, তাই শেষে সত্যে পরিণত হলো, এজন্যে আমরা বিশেষ দুঃখিত। মোহনবাগানের খেলা ভাল হচ্ছে না। ফরওয়ার্ডের আদান-প্রদানের, নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া ও সহযোগিতার বিশেষ অভাব। সময় ও সুবিধামত কেহই বল পাশ করে না। হাফব্যাক লাইনও বলশালী নয়। যোগজীবন দত্তের খেলা বিশেষ কার্য্যকরী নয়, তার গতি বড়ই মন্দ, একবার এগুলে আর পেছুতে পারে না। বেণীপ্রসাদ বর্ম্মাদলের বিপক্ষে যেরূপ প্রতিভা দেখিয়েছে সেরূপ খেলা লীগে একদিনও খেলতে পারে নি। বিমলের খেলা অনেকাংশে পড়ে গেছে। মোহনবাগানের ব্যাক-ভাগ্য চিরকালই ভাল ছিল, এবার তাও গেছে। সুধীর চাটুর্জ্জ্যে, সুকুল, গোষ্ঠ পাল, সন্মথের জায়গায় উপস্থিত দাঁড়িয়েছে দরবারী, সেট, কৃষ্ণধন। হারাধন দত্ত ক্লাব ছেড়ে দেওয়ায় নামজাদা দু তিনটি গোল রক্ষক দলে যোগ দিলেও তাদের খেলা সুবিধার হয় নি। ক্লাবের দ্বিতীয় বিভাগের গোলরক্ষক রাম ভট্টাচার্য্য এখন চমৎকার খেলছে। অনুশীলন দ্বারা আশা করি আরো যোগ্যতা লাভ করে হারাণো হারাধনের স্থান পূরণ করবে। ফরওয়ার্ডরা যতদিন সুযোগ পেলেই জোরে গোলে সট করতে না শিখবে ততদিন মোহনবাগানের জয়ের আশা সুদূর। যদি বা গোলে সট হয়, তা' এত আস্তে যে তাতে গোল হওয়াই আশ্চর্য্য। প্রেমলাল অক্লান্ত পরিশ্রমী, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম করায় এবং অনবরত হাফব্যাককে সাহায্য করতে নিজ স্থানচ্যুত হওয়ায় ফরওয়ার্ড হিসাবে তার খেলা আশাতীত হচ্ছে না। এন ঘোষের খেলা গতবারের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, বি রায় চৌধুরী তেমন সুবিধা করতে পারছে না। প্রসাদকে ছেড়ে দেওয়া ক্লাবের উচিত হয় নাই। সতু চৌধুরী যে কয়দিন খেলেছেন বেশই খেলেছেন, বিশেষতঃ জল কাদায়। নন্দ রায় চৌধুরী সেণ্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে যোগ্যতা ক্রমেই হারাচ্ছেন। বল ধরে আয়ত্বে আনতে আনতে বল তার অধিকারচ্যুত হয়।



আর ভট্টাচার্য্য

পুলিস বেশ উঠছিল, কাষ্টমসের কাছে না হারলে তাদের চ্যাম্পিয়নসিপের আশা খুবই ছিল। যে কোন স্থান থেকে বা যতদূর থেকে হোক তাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিল গোলে প্রচণ্ড সট করতে পারে। সেণ্টার ফরওয়ার্ডের সট এই রকম হওয়াই দরকার।

ইষ্টবেঙ্গলের বাঙ্গালোর খেলোয়াড় মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও গতবারের মতন দক্ষতা দেখাতে পারেন নাই। ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও রমেশ মজুমদার বেশ সুন্দর

খেলছে। গোলে কে দত্ত তার সুনাম রক্ষা করছে পূরো-মাত্রায়। আউটে করিম পূর্ব্বের ন্যায় পারছে না। প্রথম দিকে তারা কয়েকটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে, ভবিষ্যতের খেলাগুলিতে ভাল ফল দেখাতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হবার আশা তাদেরও সুদূর পরাহত নয়।

এবার নামার দিকেও বেশ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভবানীপুর কাগজে বেশ পুষ্ট দল মনে হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ খেলায় কৃতকার্য্য হতে পারছে না। রোসনলাল ও মামুদ থেকেও দল জয়ী হতে পারছে না। কোথায় গলদ কর্ত্তৃপক্ষ সন্ধান করুন। হাফে আহতবস্থায় অখিল আমেদকে না খেলানই উচিত। ক্যালকাটা কি এবার ডালহৌসীর সঙ্গে যোগ দেবে? তা' নইলে এরিয়ান ও ভবানীপুরের মধ্যেই নামবার প্রতিযোগিতা চলবে বলে মনে হয়।

সভ্যদের স্থান নিয়ে গোলযোগ ঃ

মোহনবাগানদের সঙ্গে খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবের কাছে সভ্যদের জন্য অধিক সংখ্যক আসন যাচ্ঞা করে না পাওয়াতে সভ্যরা মোহনবাগানদের অতিথিদের জন্য নির্দ্ধারিত ব্লকে কেহ আসন গ্রহণ না করে হেডওয়ার্ডদের গ্যালারীতে কতক সভ্য স্থান সংগ্রহ করেন।

মহমেডান স্পোর্টিংএর এরকম ব্যবহার করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। এ বৎসর না হয় নিজেদের মাঠ ও গ্যালারী হয়েছে। গত চার বৎসর তারা বিভিন্ন ক্লাবের গ্রাউণ্ডে অতিথিদের জন্য নির্দ্ধারিত ব্লকে স্থান পেয়ে এসেছে, কখনও কোন অভিযোগ বা গোলযোগ না ক'রে। আজ হঠাৎ তাদের অত্যধিক সংখ্যা আসন চাইবার কারণ কি? সমস্ত আসন না পাওয়ায় বাকী স্থান হেডওয়ার্ডের গ্যালারীতে পূর্ব্বের ন্যায় সংগ্রহ করলেই শোভন হতো।

মহমেডান খেলোয়াড়রা ক্লাব এন্‌ক্লোজার থেকে মাঠে অবতরণ না ক'রে হেডওয়ার্ডের গ্যালারী থেকে মাঠে খেল্‌তে আসে।

মোহনবাগানদের সভ্য সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক অধিক। তারা হোম ক্লাবদের দেয় সংখ্যক আসন বাদে হেডওয়ার্ড কোম্পানীর নিকট সভ্যদের জন্য বাকী আসন অর্থ বিনিময়ে ব্যবস্থা করে থাকেন। কোন ক্লাবই ভিজিটিং ক্লাবের সকল সভ্যের জন্য সীট দিতে পারে না। প্রত্যেকেই একটা ব্লক অতিথি ক্লাবের সভ্যদের জন্য দিয়ে থাকে। ক্যালকাটা ক্লাবকেও মোহনবাগান তাদের সকল সভ্যের স্থান দেয় না বা ক্যালকাটা মোহনবাগানদেরও দেয় না।

ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডানের প্রথম খেলাটি ইষ্টবেঙ্গল মাঠে হবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে মহমেডানদের মাঠে হয়। এখন বোধ হচ্ছে, মেম্বারদের সীট নিয়ে গোলযোগই ইহার কারণ। ইষ্টবেঙ্গলের নিজ মাঠ থেকে খেলা বদলাতে মত দেওয়া সমর্থন করা যায় না।

পরের মাঠে খেলা হলে একটু অসুবিধা সকলেরই হয়, কিন্তু তা' প্রসন্ন মনে সহ্য করতে হয়। একবার নিজের মাঠের সুবিধা, পর বার পরের মাঠের অসুবিধা ভোগ করতেই হবে। তা' নিয়ে রাগ-ঝাল করা শোভনীয় নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে মহমেডানরা এই নিয়ে লোক চক্ষে হাস্যাস্পদ হবে না।

সৈনিকদলের অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি ঃ

কে ও এস বির সঙ্গে মোহনবাগানের প্রথম খেলা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য স্থগিত হয়। রিটার্ণ ম্যাচ রাজার জন্মদিনে কলিকাতা মাঠে হয়, কারণ সৈনিক দু' দলই আই এফ একে জানান যে ক্যালকাটা মাঠই তাদের হোম গ্রাউণ্ড, অতএব রিটার্ণ ম্যাচ ঐ হোম গ্রাউণ্ডেই যেন খেলান হয়। খেলাটি শেষ হয়েছে অপ্রীতিকরভাবে। মোহনবাগানের দলের অদল বদল হয়েছিল, আঘাতের ও অসুস্থতার জন্য কয়েকটি খেলোয়াড় খেলতে পারে নাই। সৈনিক দল প্রথমেই মোহনবাগানকে চেপে ধরে। মনে হয়েছিল বুঝি বা সৈনিকেরা অনায়াসে জয়ী হয়ে যাবে। ক্রমে মোহনবাগান ধাতস্থ হয়ে বিপুলভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে এবং নবম মিনিটে জে ঘোষের পাশ থেকে রায় চৌধুরী একটি সুন্দর গোল দেয়। গোল খেয়েই সৈনিকদের মাথা গরম হলো এবং অন্যায়ভাবে ফাউল করে মারধর আরম্ভ করলে। মোহনবাগান পক্ষেও দু'একজন মাঝে মাঝে জবাব দিয়েছে। নিকল ইচ্ছাকৃত ফাউলের জন্য মাঠ থেকে দূরীভূত হলো, কিন্তু সেণ্টার ফরওয়ার্ড বিপুলকায় সীম, যে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী তাকে সতর্কও করা হলো না।

গোলরক্ষককে ছুঁলেই ফাউল হয়, গোলকিপারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে লাথি মারছে, রেফারি নির্ব্বিকার। ব্যাকের পশ্চাতে বুটের আঘাত করছে, ঘুঁষি তুলে তেড়ে যাচ্ছে, রেফারি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। সুশীল চ্যাটার্জ্জি সহ্য করতে না পেরে জবাব দিতে উদ্যত হলে রেফারি তাকে বিতাড়িত করলে কিন্তু অপর পক্ষকে কিছু বললে না।

রেফারি খেলা পরিচালনা করতে একেবারে অক্ষম হয়েছে। দোষীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করতে ভীত হওয়ায় অপরাধী দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিল। খেলা পরিচালনায় রেফারির শৈথিল্য ও অযোগ্যতায় ব্যাপার শোচনীয় হয়ে ওঠে। রেফারি যদি নির্ভীকচিত্তে দোষীকে দমন করতেন, অন্যায় আক্রমণকারীকে সতর্ক করে দিতেন এবং আদেশ অমান্যকারীকে মাঠ থেকে তৎক্ষণাৎ বহিভূর্ত করতেন, তবে গুণ্ডামি চরমে উঠ্‌তো না। রেফারির অক্ষমতায় মোহন-বাগানের নিরীহ খেলোয়াড়রা জখম হ'লো এবং আঘাতের ভয়ে তারা জয় থেকে বঞ্চিত হ'লো। এরূপ অপদার্থ রেফারিকে কেন প্রথম বিভাগের বিশিষ্ট ম্যাচ পরিচালনা করতে রেফারি এসোসিয়েশন মনোনীত করেন, বুঝিনে। ১৯২৭ সালে এইচ এল আই—ক্যালকাটার এবং ১৯২৪ সালে এরিয়ান-ক্যামারোনিয়নের সংঘর্ষ হয়েছিল বটে, কিন্তু তা' ক্ষণিকের জন্য। সমগ্র দলটি উন্মত্তের ন্যায় বল থাকুক আর না থাকুক মানুষ মারবার লক্ষ্যে ছুটেছে, এ রকম ব্যাপার পূর্ব্বে কখনও কলিকাতার মাঠে সঙ্ঘটিত হয় নাই।

মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা ভয়ে এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে শেষের দিকে তারা আক্রমণের প্রতিরোধ করতে সাহস পায় নাই, বাধা না দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল। সেই সুযোগে সৈনিক দল গোলটি শোধ করে। মার-ধর না করলে এ দিনের খেলায় মোহনবাগান আরো অধিক গোল দিতে পারতো, খেলার গতি দেখে বোঝা গিয়েছিল।

দেখা যাক, আই এফ এ কি প্রতিকার করেন। সুশীল চ্যাটার্জ্জির বিচার আই এফ এ করবেন এবং তিনি শাস্তিও পাবেন বোধ হয়। কিন্তু নিকপের বিচার করবার অধিকার আই এফ এর নাই। আর্ম্মি স্পোর্টসকে জানাবেন মাত্র, তাঁরা যা' করেন।

এই প্রসঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বারদের ব্যবহারে লজ্জায় মাথা নত হয়। তাদের দলের খেলার অধঃপতন হয়েছে সত্য, কিন্তু সভ্যদেরও যে এতদূর অধঃপতন হয়েছে তা' জানা ছিল না। সভ্যরা করতালি দিয়ে সৈনিক দলকে উত্তেজিত করেছে এবং খেলা শেষে তাদের অভিনন্দিত করেছে, যখন সৈনিকদলের লাইন্সম্যান মোহনবাগান খেলোয়াড়দের মারতে মাঠে গিয়েছিল এবং সৈনিক খেলোয়াড়রা ক্যালকাটার তাঁবু পর্য্যন্ত ধাওয়া করে রেফারিকে নির্যাতিত করেছে।

ক্যালকাটার মেম্বাররা এই রকম স্পোর্টিং দলের যে সমর্থক হতে পারে ইহা পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল। গরজ বড় বালাই। নিজেদের দলের খেলার চমক নেই, দর্শনীয় ম্যাচগুলি অন্যত্র হয়। হাতে-পায়ে ধরে সৈনিক দু' দলকে রিটার্ণ খেলা তাদের মাঠে খেলাতে রাজী করায় এই খেলা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। অতএব সে দলকে উৎসাহিত ও সম্বর্দ্ধিত না করলে চলবে কেন? কপালে আরো কত আছে!

এই ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত :—

* * * After the game the military linesman went to the field and all but came to blows with some of Mohun Bagan players. * * * * the referee being chased by some of military players. He was roughly handled near the C. F. C. tent and one of the players chased him as he ran for safety. Some spectators persuaded the military player to rejoin his comrades. —Statesman.

* * * that nothing would have happened had the K. O. S. B. centre-forward, chiefly to blame, been caught at the right moment when he was freely, regularly and purposefully employing the usual "heel-tapping" causing severe injuries to the barefooted Indian players. * * *

The soldiers almost to a man mercilessly hit the Indian players no matter where the ball was, near them or not. Even there were occasions when the ball was at the other end and an Indian player happened to pass by a military forward, he was kicked without any provocation. During this time of 'lawlessness' Mohun Bagan defence naturally became timid and gave in against physical force and taking advantage of that K. O. S. B. equalised.

—Amritabazar.

* * * Syme the centre-forward of the army team and Sweeny at inner-left were both too dangerous and in the name of foot ball the two were noticed making free use of their boots. At one stage Syme appeared to have lost his head. About then he ran amock in a mad spirit of retaliation. *** —H.S.

K. O. S. B's would never have obtained their equaliser had not the Mohun Bagan defenders betrayed their fright and given a wide berth to Syme who looked as though he would hack his way through by the wanton use of his boots. That was the tragedy of bare skin and bare boot.

—Hindusthan Standard.

ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়ার স্পোর্টিং রিপোর্টে আছে,—* * * one did not at all like the manner in which the referee was jeered and the K. O. S. B. players were cheered by these sportsmen in course and after the match Such unmerited applause did not only embolden the Military forwards to go for men rather than for the ball. * * *

ষ্টারের জিজ্ঞাস্য—"Has it ever struck them why in almost all cases of soccer fliascos either a Scottish Regimental team or Mohun Bagan side should be involved !" ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান নয়, আর মহমেডান স্পোর্টিং সৈনিক দলও নহে। তবে all cases of soccer fiascos যে মোহনবাগান ও স্কটিস্ সৈনিকদলে সর্ব্বদা হয় নাই তাও কি বোঝাতে হবে? আবার দ্বিতীয় editorialএ ঐ দিনই আছে,—Susil Chatterjee, deliberately slapped a player. * * * this led to the fraying of tempers on both sides, the soldiers being the more aggressive later on.

ষ্টেটস্‌ম্যানেও কিন্তু চড়ের উল্লেখ নাই, আছে—There was a scramble in the goal mouth and Sushil Chatterjee was given 'marching order' for a foul on Phillips.

সুশীল চড় মারে নাই, যে কারণেই হোক সে মাঠ থেকে বহিভূ'ত হবার আগেই সৈনিকরা মারধর করে খেলছিল, এবং তাদের একজন ইহার বহু পূর্ব্বে বিতাড়িত হয়।. তার পর থেকে তারা আরও দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে এবং এলোপাতাড়ি খেলোয়াড়দের মারতে থাকে, অন্য কাগজের সংবাদ থেকে তা প্রমাণিত হয়।

ষ্টারের লেখক জানে না যে কোন্ মাঠে খেলা হয়েছিল, তা মোহনবাগান মাঠের উল্লেখ করেছে এবং বাচ্চি খাঁর বিষয় উল্লেখে বোঝা গেছে যে কোথায় তার দরদ। এর বক্তব্য যে বাচ্চি খাঁর অপরাধ ছিল, merely an attempt at fouling—ঐ যদি mere attempt হয় তবে ফাউলটা কি রকম ভীষণ, তা' ভাববার বিষয়।

ষ্টারের মতে, রেফারি যে বাচ্চি খাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তা' নাকি মোহনবাগানের ট্রেনার বলাই চাটুর্য্যের রেফারির কানে কানে কথা বলার জন্য। বলাই কেন মাঠে গিয়ে প্রেমলালকে সাহায্য করে? পরে রহিমের বলদীপ্ত খেলার প্রকোপে বিমলও আহত হয় এবং বলাই প্রভৃতি গিয়ে তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে আসে তখনও কি বলাই রেফারির কানে কানে কথা কয়েছিল? কোন কিছু হলেই মোহনবাগানকে জড়ানো কেন? মোহনবাগানের সমর্থকরা মাঠে গিয়ে সৈনিক খেলোয়াড়দের কি মেরেছে, না খেলার পরে সৈনিকরা ছুরিকাঘাতে জখম হয়েছে, যে আই এফ এ মোহনবাগানকে উর্দ্দিপরা স্বেচ্ছাসেবক রাখতে বলবে? যদি বলতে হয় তো মহমেডানদের মতো সৈনিক দলকেই ঐ ব্যবস্থা করতে বলতে হবে, কারণ তারাই মারধর করেছে।

ফরাসী টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

ফরাসী টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের সেমি ফাইনালে মেঞ্জল (জেকোশ্লোভাকিয়া) ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে পুনসেক্‌কে (জুগো-স্লাভিয়া) হারিয়েছেন।



ফরাসী টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে ডোনাল্ড বাজ খেলছেন

বাজ (আমেরিকা) ৬-২, ৬-৩, ৬-৩ গেমে পালাডাকে (স্কুগো-স্লাভিয়া) হারিয়েছেন।

ফাইনালে বাজ (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে মেঞ্জলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সেমিফাইনালে ম্যাদাম ম্যাথিউ ৬-১, ৬-১ গেমে ম্যাদাম নিউফেল্ড-হাফকে এবং মিসেস লণ্ডি ৬-২, ৬-৪ গেমে ম্যাদাম কন্কারকিউকে হারিয়েছেন।



ম্যাদাম মেথিউ

ফাইনালে ম্যাদাম ম্যাথিউ ৬-০, ৬-৩ গেমে মিসেস লণ্ডিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নসিপ্ পেয়েছেন।

মানভাদার

হকি দল ঃ

কলম্বোতে মানভাদার হকিদল দ্বিতীয় খেলাতে ৭-০ গোলে সিংহলকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্দ্ধে ৩টি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৪টি গোল হয়, সুলতান খাঁ ২, লতিফ মীর ২, ফিরোজ খাঁ ১, ও হুসেন ১টি।

টোকিওতে অলিম্পিক ঃ

একজিকিউটিভ কমিটি ১৯৪০ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা টোকিওতে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই অক্টোবর হবে বলে স্থির করেছেন।

এম্পায়ার বিলিয়ার্ড ঃ

মেলবোর্ণে ভারতের খেলোয়াড় বেগ ১৫২৩-৮৪৫ পয়েণ্টে নিউইয়র্কের খেলোয়াড় অলবার্টসনকে হারিয়ে দিয়েছেন। বেগের ব্রেক্স্ হয়েছিল, ১০৮, ৯৪, ৮২, ৬৩, ৫৬, ৪৯ ও ১১১। অলবার্টসনের ৩৫, ৫৩ ও ৪১।

এস এল মসেস্ (নিউজিল্যাণ্ড) ১১৪১-১০৭৮ পয়েণ্টে এ এম বার্ককে (সাউথ আফ্রিকা) হারিয়েছেন।

কিংস্‌লে কেনারলে (ইংলণ্ড) ১৬৮৫-১২১১ পয়েণ্টে ক্লিয়ারলীকে (অষ্ট্রেলিয়া) হারিয়েছেন।

গত বৎসরের বিজয়ী রবার্ট মার্সাল (অষ্ট্রেলিয়া) ১৬২১-৩৭৪ পয়েণ্টে বার্ককে হারিয়েছেন।

অলবার্টসন ১০৯২-৮৯৪ পয়েণ্টে বার্ককে হারিয়েছেন।

মসেস্ ১৩৩৩-১০৬১ পয়েণ্টে অলবার্টসনকে পরাজিত করেছেন।

ক্লিয়ারী (অষ্ট্রেলিয়া) ১৭৭৯—৯৯৭ পয়েণ্টে এম এম বেগকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেছে।

ক্লিয়ারীর 'ব্রেক'—২০৪, ২০৩, ১০৬, ১০০, ৯৮, ৮৩, ৬৮, ৭৬, ৬৬ ও ৫৯।

বেগের 'ব্রেক'—৯০, ৮১, ৫০, ৮৮, ৬৪ ও ৬৭।

এভারেজ :—ক্লিয়ারী ৩৭ ; বেগ ২৮।

মার্সাল ২২৪৪—৯৭০ পয়েণ্টে বেগকে হারিয়েছেন।

মার্সালের 'ব্রেক'—১৪২, ১০৭, ৯২, ৮১, ৮০, ৭০, ৫৩, ২৬৫, ২৪৯, ১৭৫, ১১৪, ৭০ ও ৫৩।

বেগের 'ব্রেক'— ৪৩, ৫৯, ৫৩, ৫৯ ও ৫৩।

নব বর্ষ

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

বর্ষ এক গত হ'ল, পুন বর্ষোদয়
কালের মালিকা হতে ছিন্ন পুষ্পসম
ঝরি' পড়ে—রাত্তি' যায় নিশীথ-নিলয়,
জাগরণে ভ'রে ওঠে মধু-কুঞ্জ মম।

তবু কোন্ অচেতন নিশুতি-বিলাস
জপে আজো স্বপনের মদিরা-প্রহর,
স্তব্ধ করি' পিক-কণ্ঠ-মাধুরী-বিভাস
এ কোন্ বিরতি মাগে জনম-অম্বর !

ওগো অনাগত, তব অজানা জঠরে
মোর তরে সাজালে কি নীলিমা-বিতান ?
পূর্ণ-নিশা-উচ্ছলিত তারকা-অধরে
রতনে লিখেছ কি গো তমসা-প্রয়াণ ?
আসিবে না হে নবীন, মোর কুঞ্জমাঝে
অসীম-চুম্বনদীপ্ত ছন্দোময় সাজে ?

সিনেমা দেখা

বেণু

আপিস ঘরে মিষ্টার ও মিসেস্ ব'সে আছেন—দু'জনে বভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত। মিষ্টার চেয়ারটাকে টেবিল থেকে খানিক দূরে টেনে নিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টারির পাতা ওল্টাচ্ছেন, আর মিসেস টেবিলের ওধারে চেয়ারে বসে সদ্য-প্রাপ্ত খবরের কাগজ পড়ছেন বা পড়বার চেষ্টা করছেন।

তক্‌মাধারী বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে ঢুকে মিসেসের হাতে খবরের কাগজ দেখে একটু ইতস্তত করে মিষ্টারের দিকে এগিয়ে গেল। চিঠি ছেঁড়ার শব্দে মিসেস্ কাগজ সরিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে পুনরায় কাগজে মনোযোগ দিলেন।

—"বাঃ রে! শুনছো! এই দেখ রমেন কি পাঠিয়েছে"।

কাগজের পিছন থেকেই মিসেস আওয়াজ করলেন—কি?"

—"মেট্রোর ফার্ষ্ট ক্লাসের দু'খানা টিকিট—এই দেখো না।"

ব্যস্ত হয়ে কাগজ দূরে সরিয়ে মিসেস্ বললেন—"কই দেখি"। আবার তখনই জিগ্যেস করলেন "কবেকার?"

—"আজকে ছ'টার শো'র"···

মিসেস্ একদম crest-fallen। ভগ্নোৎসাহ হয়ে "এঃ" ধরণের একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করলেন।

—"কি হ'ল?"

—"আজ বিকেলে যে মিঃ রয় আর বাণীকে চা খেতে বলেছি।"

—"ও হোঃ! তাই তো! জ্বালালে দেখছি।" খানিকক্ষণ চুপ।—"তা এক কাজ করলে হয় না।"

—"কি কাজ?"

—"ফোনে বারণ করে দি।"

—"silly—invite করে বারণ করা যায়" ··মিসেস বিরক্ত হয়ে বললেন।

—"না, মানে, আমি বলছি, মানে একটা excuse দেখিয়ে"।

—"একটা ভাল মত excuse কি চট করে পাওয়া যাবে," মিসেস সন্দিগ্ধস্বরে বললেন।

মিষ্টার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।—"কেন যাবে না? এই ধর না আমার শরীর বিশেষ, মানে, একটু খারাপ···হ্যাঁ. হ্যাঁ সেই বেশ হবে। দাও চট করে মিসেস রয়কে ফোন করে"।

ফার্ষ্ট ক্লাশ সিটের লোভের সম্মুখে মিসেস্ বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না। এসে ফোন ধরলেন।

—"হ্যালো, কে? বাণী? হ্যাঁ তোমাকেই চাচ্ছিলাম; উমা কথা বলছি; শোন, দেখ আজকে সকাল থেকে ওঁর শরীরটা একটু খারাপ—না, না, serious কিছু নয়—সর্দ্দি জ্বর আর কি, এই একটু indisposed। হ্যাঁ, তাই বলছিলাম তোমাদের যদি খুব না অসুবিধা হয় ত I would have wished a postpe—···ও তাই নাকি? তা' হলে ত বেশ সুবিধাই হয়ে গেল। কত দিনের জন্য···Oh! I see! তা' হলে আজ যাই, doctor might come any moment; মিঃ রয়কে নমস্কার জানিও।···আচ্ছা।" রিসিভারটা রেখে মিসেস্ বেশ প্রশান্ত মনে স্থান দখল করলেন।

—বারণ করার দরকার ছিল না, কারণ মিঃ রয়কে আপিসের কাজে হঠাৎ বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল বিকেলে ফিরবেন।

—"প্রবীরকে আবার tour করতে হয় নাকি? তা'তো জানতাম না।"

* * * *

সাজগোজ করতে দেরী হয়ে গেল। পৌছে দেখেন আরম্ভ হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলে উঠতে দেখলেন—পাশের দুই সিটে মিষ্টার ও মিসেস প্রবীর রয় বিরাজমান। আট চক্ষুতে

মিলন বিশেষ সুখপ্রদায়ক হল না। সকলের মুখেই কাষ্ঠহাসি।

—"ওঃ হ্যালো প্রবীর", "হ্যালো," "এই যে নমস্কার, আপনারাও এসেছেন", "নমস্কার আপনার শরীর···আশা করি এখন ভালো বোধ করছেন"···"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ মানে হঠাৎ শেষ রাত্রিতে ঠাণ্ডা লেগে···", "নমস্কার", "নমস্কার" "আপনাকে বাইরে যেতে হ'ল না বোধহয়, না কালকে যাবেন ?" "নাঃ একেবারে cancelled হয়ে গেল last momentএ, তাই ঠিক করলাম···ফিরবার পথে আপনাদের ওখানে হয়ে যাব মনে করছিলাম," "হ্যাঁ, pardon ? Oh yes, rather, dont worry, it was nothing" "Well I hope so"···ইত্যাদি ইত্যাদি—

* * * *

পরের দিন রমেনের সঙ্গে দেখা।

—"হ্যালো, ধীরেশ, hope you enjoyed the show—did Mrs. Mitter like it ?"

"Oh ! immensely. তা' হঠাৎ দু'টো টিকিট পাঠিয়ে দিলে যে। নিজে এলে না কেন ?"

"আরে আর বল কেন ? দুই sis-in-lawকে নিয়ে যাচ্ছিলাম সস্ত্রীক—দু'জনেরই একসঙ্গে অসুখ, তাই আর যাওয়া হ'ল না। তোমাকে দুটো আর প্রবীরকে দুটো পাঠিয়ে দিলাম। তা' didn't you meet there ?—

মিষ্টার ধীরেশ মিত্র উত্তর দিলেন না।

আবেষ্টন

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বিশেষ বিশেষ গানের যে বিশেষ বিশেষ মর্য্যাদা আছে একথা সবাই মানবেন, কিন্তু সবরকম গানের মর্য্যাদা আমরা বোধ হয় রাখ্‌তে পারিনে। একটু পরিষ্কার কোরে বোলি—ওই যে বাউল গান গেয়ে যাচ্ছে ওর গানটা হয়তো আমার বাস্তবিক ভালো লাগ্‌চে, কিন্তু ও গান আমরা আমাদের সমাজে চালাতে পার্‌বোনা—আর যদিও চালাই তবে সেটা মানানসই হবে না—অর্থাৎ তার যথার্থ মর্য্যাদা থাক্‌বেনা। সব সময়েই যে থাক্‌বে না এমন কথা বোল্‌চি না, তবে না থাকাই স্বাভাবিক, এ সম্পর্কে আমি একবার অতি সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছি,—গল্পটা বোলি।

সেবার কিছুদিনের জন্য দেশে গিয়েছিলুম আমি একা, বহুদিন পরে দেশে এসে বেশ চমৎকার লাগ্‌ছিলো কিন্তু একটা অসুবিধেয় পোড়ে গেলুম। এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে মিশ্‌তে চাইলোনা। বেশির ভাগই অশিক্ষিত আর যাঁরা কিছু শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ কোর্‌লেন কিন্তু নানাকাজে আমার সঙ্গে মেশ্‌বার সুযোগ পেলেন না। সুতরাং একলা সময় কাটাবার জন্য আমাকে ইংরেজি, বাংলা গ্রন্থ বার কোর্‌তে হোলো। পূর্ব্বে কতকটা এ রকম আন্দাজ কোরেছিলুন বোলে আমি বোই আন্‌তে কসুর কোরিনি। প্রায় সমস্ত সময়টা আমি বাইরের ঘরে বোই পোড়ে কাটিয়ে দিতুম। একদিন সকালবেলা এম্‌নি বোই পোড়্‌চি এমন সময় একটি ভিখিরি এসে আমাকে নমস্কার কোরে একটা গান সুরু কোর্‌লে,—আমি তার গান শুনে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলুম। কী সুন্দর তার গলা আর কী সুন্দর সেই সুর ! একটা বাউল গোছের গান সে গাইছিলো—ভাষাটা খুব মার্জ্জিত নয়, কিন্তু কী বিরাট সেই সুরের ঔদার্য, এই মুক্ত আকাশ, আলো বাতাসের উদার বিশেষত্বটুকু তাতে প্রচুর ছিলো। যারা খাঁটি বাউল কিম্বা ভাটিয়ালি গান শুনেছেন, তাঁরা জানেন, এ গানগুলির আসল যা জিনিস সে হোচ্চে সুরের উদারতা, সমস্ত বাইরের মধ্যে যতটুকু মাধুরী, সুষমা, আনন্দ, বৈরাগ্য মিশে আছে, এসব গানেও ঠিক সেই পরিমাণে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

গানের শেষে আমি তার পরিচয় নিলুম—নাম পরেশনাথ, বাড়ি এদেশেই, কিন্তু বর্ত্তমানে আশ্রয়হীন ওর ওই

যন্তরটার নাম বোল্লে, 'রসমঞ্জরী', আমি তাকে আমার বাড়ির একটা ঘরে আশ্রয় দিলুম, সেখানে সে আপনারটা কোরেই খেতো—অন্য কিছু অনুগ্রহ সে নিতে চায়নি। আর এই অযাচিত দানের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে প্রতিদিন আমাকে একটা কোরে গান শুনিয়ে যেতো, অখ্যাত পল্লীকবির মানভঞ্জনের গান, মাথুরের গান, বৈষ্ণবদের গান, দেহতত্বের গান, এমন অনেক কিছুই সে আমাকে যত্ন কোরে শোনাতো। বাস্তবিক তার গান আমার বিশেষ পছন্দ হোতো, এইভাবে পরেশনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠছিল,—এমন সময় আমার সমাজ আমাকে দূরে টেনে নিলে।

একদিন দেখা গেল আমার কয়েকটি বিশিষ্টা আত্মীয়া কয়েকজন অতি আধুনিক আত্মীয় বন্ধুবর্গের সঙ্গে গরুর গাড়িতে ভারি ভারি মোট চাপিয়ে অবসর যাপন কোরতে এসে উপস্থিত হোলেন। চা-পর্ব, গানবাজ্‌না, আলাপ-রঙ্গে আমাকে তারা দূরে টেনে নিলে। বেচারা পরেশনাথ একটু বিব্রত হোয়ে উঠ্‌লো। প্রথমটা সে একদিন আমার ঘরে একটা উঁকি মেরেই পালাচ্ছিলো, কিন্তু আমি ডাক্‌বার পর কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়ালো। দেখ্‌লুম সে তার যন্তরটা আনেনি, বোল্লুম, 'বাজ্‌নাটা নিয়ে এসে বাবুদের একটা গান শুনিয়ে দে,' কিন্তু পরেশনাথ বাজ্‌না আন্‌তে গেল না, মুখ নিচু কোরে একটা গান ধোরলে। আমার মনে হয় আমার আত্মীয়ার অর্গ্যান শুনে ও আর ওর যন্তরটা আন্‌তে সাহস করেনি। বলা সত্বেও আন্‌লে না, তার কারণ বোধ হয় এই যে, তার বাজ্‌নাটাকে উপলক্ষ কোরে কোনো উপেক্ষা সে ঠিক্ সহ্য কোরতে পারবে না। সে যাই হোক্, ও গান শেষ কোরলে, বন্ধুরা প্রশংসা কোরলেন, কিন্তু অতি কষ্টে হাসি চেপে আমার খাতিরে কোরলেন। আমিও সেটা বুঝতে পারলুম এবং সেও সেটা বুঝ্‌তে পারলে, কিছু না বোলেই নমস্কার কোরে চোলে গেল। বন্ধুরা আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন,—'কোত্থেকে জোগাড় কোল্লে হে', আমি বোল্লুম, 'এখান থেকে।' 'বেশ, বেশ' বোলে বন্ধুরা হাস্‌তে লাগ্‌লেন। কথাটা আমার আত্মীয়াদের কানে উঠ্‌তেও বিলম্ব হোলোনা—তাঁরা আমাকে দয়া কোরে 'বোষ্টুম' উপাধি দিলেন। পরদিন পরেশনাথ আর একবার উঁকি মেরে গেল, আমি কিছু বোল্লুম না। আমার যে ঠিক্ চক্ষুলজ্জা হোচ্ছিল তা নয়, তবে মিছিমিছি একটা লোকের সাধনাকে নিয়ে হাসাহাসি করা আমার ভালো লাগ্‌ছিলো না। আমার বন্ধুরা বোল্লেন, "ওহে বাবাজী এসেছেন, তুমি না হয় শোনো, আমরা উঠি, ও রসে বঞ্চিত কিনা?" কিন্তু উঠে যেতে হোলো না, আমি ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলুম, পরেশনাথ দূরে চোলে গেছে। তার পর কয়েকদিন সকালে সে আর এলো না—চুপি চুপি তার ঘরে গিয়ে দেখি, সে তার রসমঞ্জরী নিয়েই মোরে পোড়েছে। ঘরে দুএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিকা বিক্ষিপ্ত, তার সৌরভ ঘরে তখনো কিছু কিছু ছিলো। আমার মনে হোলো সেই সকালের পর দিন দুই পরেশনাথ আর আসেনি। বুঝ্‌তে পারলুম পরেশনাথ আমাকে তার শ্রোতা হিসেবে ঠিক্ sincere বোলে ধোরে নিতে পারে নি—যদি পারতো তাহোলে হয় তো সে আমার সঙ্গে দেখা কোরে যেতো। হয় তো ও মনে কোরেছিলো যে সহরের ইংরেজি জানা লোক আমরা মাত্র খেয়ালের বশে দু একদিন তার গান শুন্‌তে চাই আর বেশি কিছু নয়। অবশ্য আমি তাকে এজন্য দোষ দিতে পারি নে, কারণ তার পক্ষে এরকম ভাবা স্বাভাবিক, কিন্তু তার আসল কথা হোচ্ছে এই যে, সে তার গানের মর্য্যাদাকে হীন কোরতে কিছুতেই রাজী নয়, তাই পাছে আমি তাকে ডাকি এই ভয়েই যেন সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু দিন দুয়েক্ পরেই পরেশনাথ আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এলো। আমি তাকে জিগ্যেস্ কোরলুম,—'আর আসিস্ নে কেন রে পরেশ?'

পরেশনাথ জবাব দিলে, 'আর তো আমার পোষাবে না হুজুর—এ বাবুরা বিলিতি যন্তর দিয়ে গায়, ওর চেয়ে আমি আর বেশি কি গাইবো?'

আমি বোল্লুম—'বাবুদের সঙ্গে তোর কি? তুই আমাকে তোর নিজের গান শোনাবি।'

'সে হয় না বাবু' পরেশ উত্তর দিলে 'ওতে আমার গান খুল্‌বে না।'

বাস্তবিক পরেশনাথের কথাগুলি আমার উদ্ধত বোলে মনে হোলো না। ওর দুঃখটা আমি বুঝলুম—ওরা যা চায় তা patronising নয়, সে জিনিসটা হোচ্ছে দরদ। এই দরদের অভাব ওরা কখনো সহ্য করে না। আমি বোল্লুম—'পরেশ, রাগ কোরেছিস?'—

পরেশনাথ জিভ কেটে লজ্জিত হোয়ে বোল্লে, 'তা কি কখনো কোরতে পারি বাবু তবে কথাটা কি জানেন? নিজের জিনিসকে খাটো করতে কেউ চায় না। কথাটা কি মিথ্যে বোল্লুম? আপনাদের গান বাজনা আমাদের গান বাজনাকে ঘা দেয় বাবু, সে আপনি যাই কেন বোলুন্ না।'

আমি চুপ কোরে রোইলুম। আমার বিশ্বাস কথাটা সে মিথ্যা বলেনি, আমাদের গানের এবং সুরের অহঙ্কার ওদের গানের গারল্যে আঘাত করে একথা কতকটা সত্য বোলেই আমি বিশ্বাস কোরি।

পরেশনাথ বোল্লে, 'বাবু আমাদের গান শুনে আরাম পাবেন, কিন্তু আমাদের গানের ভিতরে ঠিক্ ঢুক্‌তে পারবেন না। বোধ কোরি লেখাপড়া শিখেও আপনাদের সে ক্ষমতা নেই।'

এই স্পষ্ট কথার উত্তরে আমি আর ওকে কিছু বোল্‌তে পারলুম না। তার নির্ভীক্ উত্তরে ওর সাধনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হোলো। বুঝতে পারলুম আমাদের দেশের বাউল ভাটিয়ালি বেঁচে আছে কেবল এই শুদ্ধ সাধনার গুণেই।

পরেশনাথ আমাকে প্রণাম কোরে বেল্লে—'আমাকে বিদায় দিন্।'

আমি জিগ্যেস্ কোরলুম, 'থাক্‌বি কোথায়?'

পরেশনাথ বোল্লে, 'আপনার আশীর্ব্বাদে সে অভাব হবে না।'

আমি ওকে কিছু টাকা দিয়ে বোল্লুম, 'তোর কথা আমি বুঝেছি পরেশ। কিন্তু আমি চোলে যাবার পর আমার বাড়িতে এসে থাকিস্, তাতে অমত করিস্ নে।'

পরেশনাথ আর একবার প্রণাম কোরে চোলে গেল।

তারপর দেখতুম, অনেক শুক্লপক্ষ রাতে পরেশনাথ গ্রামের লোকদের নিয়ে মাঠে আসর বোসিয়েছে। আমার বাড়ির অর্গ্যানের ফাঁকে ফাঁকে তার গানের সুর আমাকে সম্মানিত কোরতো।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস 'শুভদা'—২৲
বনফুল প্রণীত নাটক "মন্ত্রমুগ্ধ"—১৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "তুরঙ্গ রোধিবে কে" (প্রথম খণ্ড)—২৲
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ কালিয়া প্রণীত উপন্যাস "বড় বউ ও উসী"—১৷৹
শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র প্রণীত জীবনী "দীনবন্ধু কথা"—।৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত নাটক "বিষ্ণুমায়া"—১৲
শ্রীঅজিতকুমার দে সম্পাদিত "বিশ্বাস করুন, চাই না করুন"—১৲
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক "শেষ দান"—১৷৹
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক "রাশিয়ার কথা"—।৹
শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "গোলকধাঁধা"—১৷৹
শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল প্রণীত "শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত"—৩৲
শ্রীবিমলাচরণ লাহা প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "গৌতম বুদ্ধ"—৫৷৹
শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দিগন্ত"
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মাটির মায়া"—১৷৹
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত বালক-পাঠ্য "জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা কথা"—
স্বামী যোগানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধন্ রহস্য" (উত্তর খণ্ড)
শ্রীমতী পুষ্প বসু প্রণীত গল্প গ্রন্থ "অলকা"—১৷৹

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs. G. D. Chatterjea & Sons at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিমল চৌধুরী | চিত্রকর ও সাহজাদা দারাসেকো | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



প্রথম খণ্ড | ষড়্‌বিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

কুমারসম্ভবে সৌন্দর্য্য ও দার্শনিকতত্ত্ব

শ্রীগণপতি সরকার

(প্রবন্ধ)

মহাকবি কালিদাস তাঁর "কুমারসম্ভবম্" নামক অপূর্ব্বকাব্যে উমার বিবাহ যে ভাষায় ও যে ভাবসম্ভারে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেমন অপূর্ব্ব, আবার ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা গল্পচ্ছলে তেমনি মধুর করিয়া শুনাইয়াছেন, যার আর তুলনা নাই।

মহাকবি কালিদাসের লেখার ভঙ্গি অদ্ভুত। তিনি প্রকৃতি পুরুষের মিলন গাহিতে চলিয়াছেন। অতি কঠিন বিষয়। ব্যাপারও গুরুতর। পিতামাতার বিষয়ে কথা বলা কত শক্ত তাহা বিবেচনা করুন। কালিদাস জগতের পিতা ও মাতার মিলন গাহিবেন। কি দুঃসাহস। কিন্তু কবিপ্রতিভা কি অত্যাশ্চর্য্য—কি অপূর্ব্ব। এত বড় বিষয় কি মধুর ভাবে, কি সরল গতিতে, কি অনবদ্যভাবে, কি অসামান্য কৌশলে, কি মহান্ ভাষায়, এই জটিল রহস্য কবি জগতে প্রচার করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন, আর জগজ্জনকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর এই অপার্থিব দানের সীমা নাই, ইহার পরিশোধও নাই। মহাকবির যে মা সরস্বতীর বরপুত্র আখ্যা আছে তাহা আখ্যা নহে, তাহা নিতান্ত সত্য; এ সত্য না মানিয়া লোকের উপায় নাই। বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ব্যতীত এ উপাখ্যান এ ভাবে প্রকট করে কার সাধ্য।

মহাকবি প্রথমেই উমার পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন। যিনি জগতের জননী, তাঁর জনকজননী তো যে সে হতে পারে না। তাই কালিদাস কত সতর্কতার সহিত দেখাইয়াছেন যে, উমার পিতা হিমালয় এবং মাতা মেনকা, তাঁহাদের এই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লওয়া সম্ভব কিনা! কি সতর্ক দৃষ্টিতে কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন। মহাকবি সেইজন্য বলিতেছেন, এই হিমালয় কে তা জানেন কি? তিনি শুধু "হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" (১।১)

[হিমালয় নামক পর্ব্বতরাজ] নন, তিনি আরও কিছু, তিনি হইতেছেন "দেবতাত্মা" (১।১)। পাছে লোকে ভুল করে যে হিমালয় না হয় সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতই হইল, সে তো জড়পদার্থ ব্যতীত আর কিছু নয়, তার আবার কন্যা হইবে কি? তাহা নিরসন করার জন্য কালিদাস বলিলেন যে, এই পর্ব্বতরাজ হিমালয় বাহ্যতঃ পাথরের সমষ্টি বটে কিন্তু তাহা প্রাণময়। ইহার মধ্যে বা ইহার উপর আধিপত্য করেন যে দেবতা, সেই অধিদেবতাই প্রকৃত হিমালয়। এই হিমালয় তো যেমন তেমন নয়—

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রী-ধরণ-ক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিত-যজ্ঞভাগং শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ।।১।১৭।

যজ্ঞীয় সামগ্রী জন্ম-প্রদান শকতি,
ধরণী-ধারণ-ভার ক্ষমতা অপার
হেরিয়া, দানিলা যাঁরে যজ্ঞভাগ আর
শৈল আধিপত্য নিজে ধাতা প্রজাপতি।

উমার যিনি জননী সেই হিমালয়ের পত্নী মেনকা—তিনিই বা কেমন—

স মানসীং মেরুসখঃ পিতৃণাং কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে।।১।১৮।

হন যিনি পিতৃলোক মানস-নন্দিনী
মেনকা নামিনী সেই মুনিরও বন্দিনী,
কুলশীলে সমতুল্যা বংশস্থিতি তরে
স্থিতিজ্ঞ সে মেরুসখা তাঁরে বিভা করে॥

যদিও মহাকবি অপার্থিব ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু মহাজনদিগের কার্য্য হইতেছে, অলৌকিক ঘটনাই বলুন বা যাই বলুন—লোকশিক্ষাপ্রদানে তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই উন্মুখ। সেইজন্য কালিদাস এখানে লৌকিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম তিনি মানিয়াছেন। আবার উমার বিবাহ ব্যাপার বর্ণনায় লৌকিক বিবাহে বর ও কন্যার জন্য যেরূপ নিয়ম পালন করা হয় তার কোন অংশই বাদ দেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে যে ভ্রাতৃযুক্ত কন্যা বিবাহে প্রশস্ত। সেইজন্য মহাকবি উমার যে ভ্রাতা ছিল তাহা দেখাইলেন—

অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকমম্ভোনিধিবদ্ধসখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্রশত্রাববেদনাজ্ঞং কুলিশক্ষতানাম্॥১।২০॥

মেনকা প্রসবে পুত্র মৈনাক সুন্দর,
নাগবধূভোগ্য যেই খ্যাত চরাচর,
সাগরের সনে যার বন্ধুতা অপার,
জানে না যে ব্যথা কিবা কুলিশ প্রহার।
ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ধরি বজ্র কাটিলা যখন
পর্ব্বতের পক্ষরাজিকুল নিধন॥

ইহার পরই কালিদাস উমার জন্মগ্রহণ বর্ণনা করিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন, এই উমা মেয়েটি ত যে সে মেয়ে নয়, এ সেই মেয়ে, যে মেয়েটি দক্ষরাজার কন্যা সতী নামে পূর্ব্বে পরিচিত ছিল এবং পিতা দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনেই দেহত্যাগ করেন—

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥১।২১॥

পতি-নিন্দা শুনি সতী জনকের মুখে
অপমানে দক্ষবালা প্রাণ ত্যজে দুঃখে;
যোগাবলম্বন করি ধরে পুন কায়া
মেনকার গর্ভে আসি ভবপূর্ব্ব জায়া॥

হিমালয়ের এই নবজাতা কন্যাটি যে সাধারণ মেয়ের মত নয়, তাহা তাঁর জন্মকালীন নৈসর্গিক অবস্থাই প্রকট করে—

প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥১।২৩॥

প্রসন্ন হইল দিক্ বাতাস নির্ম্মল,
শঙ্খধ্বনি সনে পুষ্পবৃষ্টি অবিরল,
কি স্থাবর কি জঙ্গম দেহধারী কিবা
সবার সুখের হলো উমা-জন্মদিবা॥

এইরূপ নিসর্গের অবস্থা মহাপুরুষদিগের জন্মকালেই হয়। এই পার্ব্বতী কন্যাটি মহাপ্রকৃতি, সুতরাং তাঁর জন্মকালে নৈসর্গিকপ্রভাব প্রকাশ হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক। এই কন্যাটি যে অসাধারণ তাহা তাঁর জনকজননীর বুঝিবার সুযোগ অল্পরূপেও হইয়াছিল। তাঁরা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে গিয়া দেখিলেন—

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্মবিদ্যাঃ॥১।৩০

হংসকুল আসে যথা শরতে গঙ্গায়,
ঔষধি প্রকাশে জ্যোতিঃ আপনি নিশায়,
বিদ্যা-শিক্ষাকালে তথা পার্ব্বতী সকাশে
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতবিদ্যা আসিয়া বিকাশে॥

এ লক্ষণ ত সাধারণ নয়। তারপর পার্ব্বতী যৌবনের কোঠায় পা দিলেন—

অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥১।৩১

ত্যজিয়া কৌমার যখনি বালা
ধরে সে যৌবন সুষমামালা,
কিবা শোভা দেহ ধরে যে তার,
বিনা আভূষণে ভূষিত কায়
না হয়ে যুবতী মদ আপনি
মাতাল করে যে সবে তখনি,
না হয়ে কামের কুসুম শর
শরক্রিয়া সাধে যুবা উপর,

কন্যা যৌবনে উপনীত হইলে শরীরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইল, সে সুষমা অসাধারণ, তাই কালিদাস বলিলেন—

সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
স নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ।১।৪৯

একত্র হেরিতে যতেক শোভা
আপনি বিধাতা হইয়া লোভা,
সকল উপমা দ্রব্যের সারে
যথাস্থানে দিয়া রচিলা তাঁরে।

এমন সময় একদিন খেয়ালবশে নারদ মুনি হিমালয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, হিমালয় তাঁর কন্যা পার্ব্বতীকে লইয়া বসিয়া আছেন।

তখন নারদ হিমালয়কে জানিয়ে দিলেন এ কন্যাটি যে সে নয়, ইনি দেবাদিদেব মহেশ্বরের ভার্য্যা হইবেন ; শুধু কি তাই, হরগৌরীরূপে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে একাঙ্গ হইবেন—

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য ॥১।৫০।

একদিন নেহারিয়া কন্যাটি তাঁহার
পিতৃপার্শ্বে, কামচারী কহিলেন তাঁয়
নারদ, সপত্নীহীনা প্রেমমহিমায়
হর-অর্দ্ধ-অঙ্গলাভ হইবে ইঁহার॥

দেবর্ষি নারদের বাক্য তো অন্যথা হইবার নয়, তাই হিমবান্ পার্ব্বতীকে যৌবনস্থা দেখিয়াও বরের অনুসন্ধানে নিবৃত্ত থাকিলেন—

গুরুঃ প্রগল্ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতমর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্ ॥১।৫১

কন্যার যৌবনকাল দেখিলা যখন
অন্যবর খুঁজিল না জনক তখন,
অনল ব্যতীত কভু মন্ত্রপূত ঘৃত
অন্য কোন তেজোপরি হয় কি অর্পিত।

বরের অনুসন্ধান করিবার হিমালয়ের তো আর আবশ্যক ছিল না। কে বর তাহাও তিনি নারদের মুখে জানিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি তিনি উপযাচক হয়ে মহাদেবকে কন্যাসম্প্রদানের কথা বলিতে পারেন না, কেননা—

অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে ॥১।৫২

মহাদেব করে নাই প্রার্থনা যথায়
দানেন কেমনে অদ্রি তনয়া তথায়,
অনুরোধ যদি নাহি রয় করি ভয়
ইষ্টতরে তথা সাধু উদাসীন রয়॥

মহাদেব স্বয়ং সম্ভ্রান্ত। হিমালয়ও সম্ভ্রান্ত। সুতরাং তিনি অনুরোধ করিলে যদি শিব তাঁর অনুরোধ রাখিতে না পারেন, এই ভয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তারপর বিশেষতঃ মহেশ্বর তাঁর প্রথমা পত্নী সতী বিয়োগের পর হইতেই সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, আর পুনর্ব্বার বিবাহের কথা মনেও আনেন না—

যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ ॥১।৫৩

দক্ষ-দত্ত-কায়া সতী কৈল বিসর্জন
পিতা রোষে পতিনিন্দা করিলা যখন,
সে অবধি সর্ব্বসঙ্গ ত্যজি পশুপতি,
দারান্তর গ্রহণের নাহি আর মতি।

তিনি হিমালয়ের এক মনোহরপ্রদেশে সংযতচিত্তে তপস্যায় মন দিয়াছেন—

তত্রাগ্নিমাধায় সমিৎসমিদ্ধং স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তরমষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার ॥১।৫৭

অষ্টমূর্ত্ত্যন্তর নিজ মূর্ত্তি সে অনল,
সমিধ আহুতি দিয়া সে অগ্নি-স্থাপন,
স্বয়ং বিধাতা যিনি দাতা তপ ফল,
কি জানি কি কামনায় তপস্যা মগন।

কত সুকৌশলে যেন কত গোপনে মহাকবি তাঁর সাধনার গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের বীজ এই শ্লোকের "কেনাপি কামেন তপশ্চচার" বাক্যে নিহিত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

মহাদেব তপস্যারত। এ অবস্থায় তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাবই বা কি করিয়া করা যায়। এ সময় বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ দেবাদিদেব কি উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছেন তাহা জানা যাইতেছে না। সেইজন্য চতুর হিমালয় বিবাহপ্রস্তাব শিবের নিকট না পাড়িয়া, তাঁর শুশ্রূষা উমা করিবেন, এই অনুমতি লইয়া কন্যাকে শিবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিলেন—

অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রয়তাং তনুজাম্ ॥১৫৮

ত্রিদশপূজিত যিনি অনর্ঘ্য মহেশ
অর্ঘ্য দিয়া অদ্রি তাঁরে করিয়া অর্চনা,
আদেশিলা তনয়ারে কর আরাধনা,
সখীসহ শুদ্ধভাবে বিভু প্রমথেশ।

মহাযোগী দেবাদিদেব মহাদেব স্ত্রীলোককে তপস্যার অন্তরায় জানিয়াও গৌরীকে তাঁর শুশ্রূষায় অনুমতি দিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই; কেননা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণ বিকারের বস্তুর সান্নিধ্যেই চিত্তবিকার হইতে নিজের সংযম পরীক্ষা করেন। বিকারের বস্তুর সম্মুখে নির্ব্বিকার থাকাই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ—

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরীশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥১৫৯

সমাধির বিঘ্নভূত জানিয়াও তাঁয়
দিলা শিব অনুমতি তবু শুশ্রূষায়,
বিকারের হেতু মাঝে যে জনার মন
না হয় বিকারপ্রাপ্ত সেই ধীর জন॥

যখন গিরিজা পুষ্পচয়ন হোমবেদী মার্জনাদিপূর্ব্বক মহাদেবের সেবায় নিরতা, তখন অন্যদিকে দেবতাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তারকাসুরের নিকট পরাভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বর্গরাজ্য তারকাসুর হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাঁহারা তখন অসুরের অত্যাচারে অতিমাত্র উৎপীড়িত হইয়া উপায় না পাইয়া তাঁহাদের শেষ উপায় পিতামহ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি পিতামহকে দেবগণের ও দেবাঙ্গনাদের দারুণ দুঃখের ও অসুর হস্তে লাঞ্ছনার করুণকাহিনী কহিলে পর, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের ভ্রষ্টশোভা ও হীন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দৈব মোচনের জন্য বলিলেন—

সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্। ২।৫৪

তোমাদের কামনা যা হইবে পূরণ,
কিছুকাল প্রতীক্ষায় করহ যাপন।

কারণ—

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রী র্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ২।৫৫

আমার বরেতে দৈত্য শ্রীমান্ এখন,
আমা হতে তার বধ হবে না কখন;
জান ত বিষের তরু করিলে বর্দ্ধন
পারা নাহি যায় তারে করিতে কর্ত্তন।

অতএব এক্ষেত্রে এই তারকাসুরকেও আমি বধ করিতে পারিব না। আর ঐ অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ একমাত্র মহাদেবের ঔরস পুত্র—

সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যতং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ ॥ ২।৫৭

যুদ্ধ-বিশারদ সেই তারক অসুর
রণে প্রবেশিলে রবে কে সম্মুখে তার,
একমাত্র শিববীর্য্যে জনম যাহার
সে ব্যতীত শক্তি ধরে কেবা হেন শূর।

সুতরাং তোমরা মহাদেবের পুত্রকে সেনাপতি কর, তাহা হইলেই তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে—

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈনাপত্যমুপেত্য বঃ।
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীর্বীর্য্য-বিভূতিভিঃ ॥ ২।৬১

তোমাদের সৈনাপত্য করিয়া গ্রহণ
শিতিকণ্ঠপুত্র স্কন্দ বীরের গৌরবে
বন্দীকৃত সুরাঙ্গনা বেণীর বন্ধন
করিবে মোচন বীর নাশি শত্রু সবে।

কিন্তু মহাদেবের তো পুত্র নাই। এখন তিনি তপস্যায় রত। তাঁহাকে উমার সহিত তোমরা বিবাহ দাও—

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাকৃষ্টুমযস্কান্তেন লৌহবৎ ॥ ২।৫৯

লৌহ আকর্ষয়ে যথা অয়স্কান্ত মণি,
তেমতি যতনে সবে সেই আত্মযোনি
সংযমস্তিমিত-মন শিবে আকর্ষিয়া
বিবাহ বন্ধনে বাঁধ উমা-রূপ দিয়া।

এই উমা ব্যতীত মহাদেবের তেজধারণের আর কাহারও ক্ষমতা নাই—

উভে এব ক্ষমে বোঢ়ুমুভয়োর্বীজমাহিতম্।
সা বা শম্ভো স্তদীয়াবা মূর্ত্তির্জলময়ী মম ॥ ২।৬০

শিব-জলময়ী মূর্ত্তি জগৎ ভিতরে
মম বীর্য্য ধরিবারে শুধু শক্তি ধরে।
তেমতি ভূতেশ তেজ করিতে ধারণ
উমা ভিন্ন অন্য নারী না ধরে ভুবন।

অতএব উমাকেই চাই এবং তাঁহার সহিত মহাদেবের বিবাহও হওয়া চাই। এই উমামেয়েটি হইতেছেন হিমালয়ের দুহিতা পার্ব্বতী—

তাং পার্ব্বতী ত্যাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ১।২৬

আভিজাত্য স্মরি তার যত বন্ধুজন
"পার্ব্বতী" বলিয়া নাম রাখিল তখন,
উ-মা বলি তপস্যায় মাতা নিষেধিলা,
সে অবধি উমা নামে বিখ্যাত হইলা।

আবার এই উমার অতি কঠোর তপস্যার জন্য "অপর্ণা" নামও হইয়াছিল—

"স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা, পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ম্বদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ৫।২৮

শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে তা খেয়ে তপস্যা করে,
কঠোর তপস্যা বলি পরিচিত মরতে।
প্রিয়ংবদা এ আহার ত্যজি সাধে তপ তার,
"অপর্ণা" বলিলা তাই পুরাবিদ্ জগতে ॥

উমার তো পরিচয় পাওয়া গেল যে তিনি গিরিরাজ-দুহিতা। এখন এই মহাদেবটি কে? তাঁর পরিচয় ব্রহ্মা বলিতেছেন—

সহি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ-পারে ব্যবস্থিতম্।
পরিচ্ছিন্নপ্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ২।৫৮

পরম জ্যোতির্ময় শম্ভু পরমেশ
তমোগুণাতীত যিনি ভূতেশ মহেশ,
অপার মহিমা তাঁর করিতে নির্ণয়
বিষ্ণু বা আমার কারু শক্তি নাহি হয়।

এই অসীম প্রভাবশালী পরম পুরুষের সহিত পরমা-প্রকৃতি উমার মিলন চাই, নহিলে সৃষ্টি হয় না, প্রলয়রূপী তারকাসুরের হাতে দেবতারা উৎখাত হইয়া গিয়াছে সুতরাং সৃষ্টিনাশ হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। তাই প্রকৃতি চঞ্চল হইয়াছে, পুরুষের সহিত মিলনের জন্য। তাহাই কবির অপরূপ ভঙ্গিতে মহাদেব ও মহাদেবীর মিলন লীলার ইঙ্গিত।

ভগবান্ লোকপিতামহ চতুরানন ইন্দ্রাদি দেবগণকে অসুর নাশের উপায় স্বরূপ মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিবার উপায় করিতে উপদেশ দিলেন এবং উঁহাদের যে পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিবে, সেই কুমারই তারকাসুরকে নিধন করিবে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে উমাদেবী নিত্য মহেশ্বরের সেবা করিতে যান। উমা বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি। আর তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের পত্নী। তাঁহাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঘটকালী হয় কি করিয়া? কারণ দেবাদিদেব মহাদেব এখন তপস্যারত। তিনি জিতেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ যোগীরাজ। তাঁহার নিকট বিবাহপ্রস্তাব করার উপযুক্ত কাল তো এ নয়। সুতরাং এই কাল তৈয়ারী করিতেই হবে। তিনি যদি তপস্যা ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব চলিবে। পাত্রীও উপস্থিত; কেবল অবসরের প্রতীক্ষা। তাই পরামর্শ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গের বিধান করিলেন। যদি কোন উপায়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হয় তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এইজন্য তিনি কামকে ডাকিলেন। কামের অপর নাম মন্মথ। মনকে মথন করে—মনের বিকার উপস্থিত করে। আর কাম অর্থেও কামনা। সুতরাং কাম ছাড়া তো আর উপযুক্ত কেউ নাই এই কাজে। দেবরাজের আহ্বানে কাম আসিলেন। দেবেন্দ্র তাঁহাকে সমাদরের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, নিজের আসনের নিকটে বসাইলেন। তখন অতিমাত্র অহঙ্কারে কুসুমধনু কামদেব নিজের বীরত্বের গর্ব্ব করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়া বলিয়া বসিলেন—

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেবলব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণেঃ ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ॥ ৩।১০

তোমার প্রসাদ পেলে কুসুমেষু অবহেলে
একমাত্র মাধবেরে লয়ে সহচর,
কিবা কব বেশী কথা পিনাকী হরেও তথা
পারি ধৈর্য্য হরিবারে হেন শক্তিধর।

এতক্ষণ ইন্দ্র ইহারই অন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আদেশ করিয়া কাজ করান, আর স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কাজ করায় অনেক প্রভেদ। যেথায় স্বেচ্ছায় কাজ হয় সে কাজ যত শীঘ্র ও সুন্দরভাবে হয়, আদেশে কাজ তত সুবিধা হয় না। এইজন্যই দেবরাজ অপেক্ষায় ছিলেন যে মন্মথ নিজেই শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিব বলে কিনা? যেই তিনি শুনিলেন যে কাম তাঁহারই "সঙ্কল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তিং" (৩।১১) সঙ্কল্পিত বিষয়েই স্বয়ংই স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছে, তখনি তিনি তাহাকে আরও বাড়াইয়া বলিলেন—

সর্ব্বং সখে! ত্বয্যুপপন্নমেতদ্ উভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্যমহৎসু কুণ্ঠং ত্বং সর্ব্বতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ৩।১২

সখে যা কহিলে আহা তোমায় সম্ভব তাহা,
বজ্র আর তুমি দুটি অস্ত্র শুধু মম;
তঁপস্যার সন্নিধানে কুলিশ পরাস্ত মানে,
সর্ব্ব ঘটে গতি তব সাধক উত্তম।

বিশেষ—

অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং কার্য্যে গুরুণ্যাত্মসমং নিযোক্ষ্যে ॥ ৩।১৩

তুমি যে কি শক্তিধর নহে তাহা অগোচর,
গুরু কাজে নিয়োজিত মম তুল্য মানি।

আর দেখ, তুমি যাহা বলিয়াছ, সকল দেবতারাও ত তাই তোমার কাছে চাহিতেছে—

"আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে, কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্নকল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশভুজামিদানীমুচ্চৈর্দ্বিষামীপ্সিতমেতদেব ॥ ৩।১৪

বৃষভধ্বজের প্রতি আছে তব বাণগতি
বলে ত মোদের কার্য্য মেনেই ত নিয়েছ।
শত্রু-করে উৎপীড়িত যজ্ঞভোজী দেব যত
তাদের প্রার্থনা এই বুঝিতে ত পেরেছ ॥

শিবকে জয় করিতে একমাত্র তুমিই পার। ইহার একান্ত দরকার হইয়াছে। কেন না তাঁহার ঔরসপুত্রই যে চাই—

"অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য জয়ায় সেনান্যমুশন্তি দেবাঃ ॥ ৩।১৫।

শত্রুর জয়ের আশা দেবহৃদে করে বাসা
শিবের নন্দনে তাই চায় সেনাপতি।

সেনাপতি না হইলে তারকাসুরকে জয় করাও যাইবে না। আর এই দেবসেনাপতি একমাত্র শিবের পুত্রই হইবেন, আর কেহ হইলে চলিবে না। সেইজন্য শিবেরই পুত্র চাই। কিন্তু শিব যে তপস্যায় মন দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে আবার সংসারী করিতে হইবে। সে কাজ যে কেবল তোমারই আয়ত্ব—

"স চ ত্বদেকেষু-নিপাতসাধ্যো, ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা ॥ ৩।১৫

ব্রহ্মেতে নিহিত মন সেই দেব ত্রিলোচন,
তব বাণ-সাধ্য তিনি, নাহি অন্য গতি।

আর শিব যাহাতে নগবালা গৌরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, এ কাজ তোমাকেই করিতে হবে; কেননা, স্বয়ং ব্রহ্মযোনি বলিয়াছেন যে, এই পার্ব্বতী ব্যতীত অন্য কোনও নারী শিবসমাগমের শক্তি ধারণ করে না—

"তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রয়তাং তনূজাং যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্যনিষেকভূমিঃ, সৈব ক্ষমেত্যাত্মভুবোপদিষ্টম্ ॥ ৩।১৬

যোগেতে মগন হয়, তবু কাম চেষ্টা কর,
হরগৌরী-পরিণয় সিদ্ধ যাতে হয়,
উপদেশ বিধাতার শিববীর্য্য ধরিবার
উমা ভিন্ন নারী নাই ত্রিভুবনময়।

আর তোমাকে এজন্য খুব কষ্ট স্বীকারও করিতে হইবে না, কেন না—

"গুরোর্নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্রকন্যা, স্থাণুং তপস্যন্তমধিত্যকায়াম্।
অন্বাস্ত ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ, শ্রুতং ময়া মৎপ্রণিধিঃ স বর্গঃ ॥ ৩।১৭

যতেক অপ্সরা মম গূঢ়চর নিরুপম
শুনেছি তাদের মুখে, অধিত্যকা দেশে,
তপস্বী সে মহাদেবে গিরিবালা সুখে সেবে
মূর্ত্তিমতী সেবা যেন জনক-আদেশে ॥

বুঝিয়াছ ত—

"তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্ ॥ ৩।১৯

শিবেরে করিলে জয় হবে দেব-অভ্যুদয়
অসাধ্য হবে কি সাধ্য? হে মীনকেতন!
তব প্রতি শরত্যাগে তব শক্তি শুধু জাগে
কৃতী তুমি দেব-আশা তোমাতে অর্পণ ॥

সুতরাং "তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্" (৩।১৮) শিববিজয়ে অভিযান কর এবং দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ কর। দেখ—

সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে কার্য্যং ত্রয়াণামপি পিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম্ম ন চাতি হিংস্রম্ অহোবতাসি স্পৃহণীয়-বীর্য্যঃ ॥৩।২০

যাচকরূপতে যত   দেবগণ সমাগত
তোমার সম্মুখে হের ওহে ফুলশর !
কার্য্য অতি হিতকর   জগতের সুখকর
সাধন করিবে তুমি ওহে ধনুর্দ্ধর !
কি কব অপূর্ব্ব কথা   হিংসা মাত্র নাই তথা
সাধিবে তোমার ধনু অথচ সেকাজ
অদ্‌ভুত বীরত্ব তব   শিবজয় অভিনব
তোমার গরিমা গাবে বীরের সমাজ।

এতে বসন্ত যে তোমার সহায় হইবে তা কি আর বলিতে হইবে—

মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্য্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ॥৩।২১

তব চির সহচর   মাধব যে মনোহর
নাহি বলিলেও হবে সহায় তোমার।
কেবা কহে সমীরণে   হও তুমি হুতাশনে
সহায়, বলত কাম কব কিবা আর ॥

দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রশংসিত, গৌরবান্বিত ও আদিষ্ট হইয়া মদন—

তথেতি শেষামিব ভর্ত্তুরাজ্ঞামাদায় মূর্দ্ধ্না মদনঃ প্রতস্থে।৩।২২

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি   মদন স্বীকার করি,
'যে আজ্ঞা তাহাই হবে' বলিয়া সে চলিল।

দেবরাজের আজ্ঞা পেয়ে মদন ত যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে স্বীকার করিয়া চলিয়া আসিল। অতঃপর—

স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ।
অঙ্গব্যয়-প্রার্থিত-কার্য্যসিদ্ধিঃ স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম ॥৩।২৩

মধু ও রতিরে লয়ে সবে একমত হয়ে
কামদেব ভয়ে ভয়ে অভিযান করিল।
দেহপাতে ক্ষোভ নাই কিন্তু কার্য্যে সিদ্ধি চাই
সম্বরিয়া হিমাচলে শিবাশ্রমে আসিল ॥

কাম তার পত্নী রতি ও সখা বসন্তকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের আশ্রমে চলিলেন।

কবি কালিদাস এখানে ছুটি পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি "সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ" এবং অন্যটি "অঙ্গব্যয়প্রার্থিত কার্য্যসিদ্ধিঃ"। কালিদাসের এইটাই বিশেষত্ব যে, ভবিষ্যতে কি হইবে, পূর্ব্বের সূচনামুখেই তাহার তিনি আভাস দেন। ইহা কিন্তু সহজে ধরা পড়ে না। এখানে এই যে "সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ" ভয়ে ভয়ে যাত্রা করিল—বলিয়া ব্যাপার যে গুরুতর তাহার ইঙ্গিত করিলেন এবং মদনও যে তাহা বেশ বুঝিয়াছেন তাহা "অঙ্গব্যয়প্রার্থিত কার্য্যসিদ্ধিঃ" অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন--কথাতেই বুঝাইলেন। মদন যে ভস্ম হইবে তাহার পূর্ব্বসূচনা কেমন চতুরতার সহিত করিয়া রাখিলেন। ইহাই কালিদাসের সৌন্দর্য্য বিকাশের একদিক।

মদন বুঝিয়াছেন যে অহঙ্কারের মত্ততায় কাজ ভাল করেন নাই। তাঁহার গর্ব্বের বিষয়টি সম্বন্ধে ভুলই হইয়াছে; কিন্তু একবার অগ্রসর হইয়া পড়িলে আর তো ফিরিবার জো থাকে না, সুতরাং আর উপায় নাই, এখন "অঙ্গব্যয়-প্রার্থিতকার্য্যসিদ্ধিঃ" শরীর থাক আর যাক—প্রার্থিত বিষয়ে কার্য্যসিদ্ধি চাই, তাই "সাশঙ্কম্" ভয়ে ভয়ে মদন মহাযোগীশ্বর মহাদেবের সেই "গঙ্গাপ্রবাহোক্ষিত-দেবদারু-প্রস্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভিগন্ধি" (১।৫৪) গঙ্গাতীরস্থ দেবদারু পরিশোভিত ও মৃগনাভির গন্ধে সুরভিত হিমালয়স্থ শিবের তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্মথ যেই সেখানে আসিলেন, অমনি তথায় "মধুর্জজৃম্ভে" (৩।২৪) বসন্তের জৃম্ভন অর্থাৎ আবির্ভাব হইল। যেস্থানের "তুষারসঙ্ঘাতশিলাঃ" (১।৫৬) শিলা সকল বরফে ঢাকা ছিল, সেখানে—

"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি"। (৩।২৬)

অমনি তখনি কিবা ধরিল মধুর বিভা
আমূল-অশোক পুষ্প কিসলয়ে ভরিল,

আমের গাছে বোল ধরিল, তাহাতে ভ্রমর উড়িয়া বসিতে লাগিল, কর্ণিকারের ফুল ফুটিল, পলাশ ফুলে বন লাল করিয়া ফেলিল। আর—

চূতাঙ্কুরাস্বাদ-কষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্ মধুরং চুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥৩।৩২

করি চূতাঙ্কুর পান কোকিল তুলিছে তান,
মধুর সে সুমধুর প্রাণ মন ভরিয়া ;
তাহে যেন হয় মনে মানিনীর মান-ধনে
আর রাখা যুক্তি নয় স্মর-বাক্য বলিয়া।

আর কি হইল—

তং দেশমারোপিত পুষ্পচাপে রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগত-স্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥৩।৩৫

রতিরে সহায় করি করে শরাসন ধরি
তথায় মদন যেই উপস্থিত হইল,
কাষ্ঠাগত রসাভাস অমনি ত সুপ্রকাশ,
কি স্থাবর কি জঙ্গমে দ্বন্দ্ব ভাব ধরিল ॥

এখানে কবির "কাষ্ঠাগত" শব্দের প্রয়োগ বড়ই সমীচীন হইয়াছে। যদিও 'কাষ্ঠা' অর্থে উৎকর্ষ, তথাপি ইহার ধ্বন্যাত্মক অর্থপ্রকাশ করিতেছে যে, বসন্তকালে কাঠেও রসসঞ্চার হয়। পশুপক্ষী তরুলতা এবং মনুষ্যের উপর বসন্তের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ ঘটে তাহাই এখানে কবি দেখাইয়া দিতেছেন যে, গাছের উপরে একটি ফুলের পাতায় ভ্রমর ভ্রমরী বসিয়াছে, আর ভ্রমরীকে আগে ফুলের মধু পান করাইয়া পীতাবশিষ্ট মধু স্বয়ং পান করিতেছে। ভূমিতে কৃষ্ণসার হরিণ নিজের শিং দিয়া প্রিয়তমা হরিণীর গা চুলকাইয়া দিতেছে, তাহাতে হরিণীর চোখ সুখে বুজিয়া আসিতেছে। জলাশয়ের মধ্যে হস্তিনী পদ্মগন্ধে সুগন্ধি জল খানিকটা নিজে পান করিল, আর খানিকটা জল শুঁড় দিয়া টানিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়তম হস্তীর মুখের ভিতর ঐ শুঁড় পুরিয়া দিয়া প্রিয়তমকে জলপান করাইতেছে। জলাশয়ের তীরে চক্রবাক পদ্মের মৃণালের অর্দ্ধেকটা নিজে খাইয়া বাকিটুকু প্রেয়সী চক্রবাকীকে দিতেছে। লতারূপিণী বধূরা যেন তাহাদের কুসুমগুচ্ছকার পীনোন্নত পয়োধর এবং আরক্ত পল্লবরূপ অধরে সুশোভিত হইয়া শাখারূপ বাহুপাশে স্বামীরূপ তরুগণকে জড়াইয়া ধরিতেছে। এমন কি, তপস্বীরা অকস্মাৎ অসময়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টাতে হৃদয়ের বিকৃত-ভাব দমন করিয়া মনকে সংযত করিয়া সামলাইতেছেন।

প্রকৃতি চারিদিকে শোভাময়ী ও মুখর হইয়া উঠিল। গান ও সুগন্ধে দিক্ আমোদিত হইল, কিন্তু মহেশ্বরের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি যোগীরাজ জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কি ইহাতে হয়—

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্ হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি ॥৩।৪০

এহেন সময়ে হর অপ্সরার মনোহর
সুমধুর গান শুনি ধ্যানস্থই রহিলা,
আত্মেশ্বর মহাজন নাহি তার কদাচন
সমাধির বিঘ্ন ভবে, কেবা নাহি কহিলা।

কিন্তু বসন্ত সমাগমে শিবের গণসমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। অমনি নন্দী শিবের তপোগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে সোনার বেত লইয়া ডান হাতে মুখে আঙ্গুল রাখিয়া সঙ্কেতে প্রমথগণকে চপলতা করিতে নিষেধ করিলেন। ফল অমনি ফলিল। নন্দিকেশ্বরের এই শাসনে—

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে ॥৩।৪২

তরু আর না কাঁপিল, ভ্রমর না গুঞ্জরিল,
পাখিগণ না কূজিল, মৃগ শান্ত হইল,
নন্দীর শাসনে হায় পটে আঁকা ছবি প্রায়,
সকল কানন দেহে ভীতি ভাব ধরিল।

বসন্তের যে এত প্রভাব সব থামিয়া গেল। ঋতু রাজের সমস্ত বিকাশ পটে আঁকা ছবির মত দেখাইতে লাগিল। শিবের এক অনুচরের অঙ্গুলি হেলনেই এই। তাই দেখিয়া মদন নন্দীর দৃষ্টি এড়াইয়া "আসন্নশরীরপাতঃ" (৩।৪৬) শরীর পাতের জন্যই যেন লুকাইয়া শিবের সমাধিস্থানে প্রবেশ করিলেন—

দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃ শুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥৩।৪৩

সম্মুখস্থ শুক্রে নর যাত্রায় ত্যজিয়া যায়
তেমতি নন্দীর দৃষ্টি পরিহার করিয়া,
ডালপালা সমাচ্ছন্ন নমেরু আশ্রয়ে কাম,
শিবের ধ্যানের স্থানে উপনীত আসিয়া।

মদন সেখানে দেবদারু বৃক্ষের বেদীতে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত "ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" (৩।৪৪) যোগনিরত ত্রিনেত্র দেবাদিদেবকে দেখিতে পাইলেন।

এখানে সেই যোগস্থ শম্ভুর বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি কালিদাস ভারতের যোগীদিগের ধ্যানাবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়—

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থির-পূর্ব্বকায়-মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে।৩।৪৫
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষ-নীলং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্॥৩।৪৬
কিঞ্চিৎ প্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈ র্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিত-পক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃত ঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ॥৩।৪৭
অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহ-মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্ নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।৩।৪৮
কপোল-নেত্রান্তর-লব্ধমার্গৈঃ জ্যোতিঃপ্ররোহৈ-রুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিক-সৌকুমার্য্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্ত-মিন্দোঃ॥৩।৪৯
মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তম্ আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥৩।৫০

উপবিষ্ট বীরাসনে তাহে স্থির পূর্ব্বকায়,
ঋজুদেহ অংস দুটি অবনত দেখা যায়,
ক্রোড়দেশে দুই হাত চিতভাবে অবস্থিত
প্রফুল্ল কমল যেন শোভায় বিরাজিত।৩।৪৫

ভুজঙ্গম বদ্ধ আছে জটাজুট সনে তাঁর,
দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র কর্ণে লগ্ন দেখি আর,
কণ্ঠের প্রভায় দেহ বিশেষ নীলাভ ধরে,
কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম উপবীত হৃদি পরে॥৩।৪৬

স্তিমিত নয়নে তারা অল্পমাত্র যায় দেখা,
বিরত হয়েছে মরি' ভ্রূভঙ্গ কুটিল রেখা,
চক্ষের পল্লব কিবা নিষ্কম্প হয়েছে স্থির,
নাসা অগ্র সন্নিবদ্ধ অধোদৃষ্টি দেখে ধীর।৩।৪৭

বৃষ্টিতেও ক্ষুব্ধ নহে যেমতে গো পয়োধর
তরঙ্গবিহীন যেন জলাশয় দীর্ঘতর,
বায়ুরে করিয়া রোধ রয়েছেন যোগীবর
নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখা সম মনোহর।৩।৪৮

কপোল ও নেত্র মাঝে পথটি ধরিয়া নিয়া
জ্যোতির প্রবাহ খেলে ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে গিয়া,
বিষতন্তু অপেক্ষাও ছিল যাহা সুকুমার
মলিন সে চন্দ্রকলা ললাটে বসতি যার।৩।৪৯

যে প্রবৃত্তি জনমায় নবদ্বারে রুধি তায়,
মনেরে হৃদয়ে বাঁধি সমাধির তপস্যায়,
ক্ষেত্রজ্ঞ যে জানিয়াছে অক্ষর বলিয়া যাঁর,
আপন আত্মার মাঝে যোগীরাজ দেখে তাঁর॥৩।৫০

কালিদাস যে যোগী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং এ রসের রসিক ব্যতীত এ বর্ণনা হয় না।

যে মদন দেবেন্দ্রের নিকট দেব-সভায় এত বড়াই এত আস্ফালন করিয়া আসিলেন তাহার অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়; তাহার তখন মনে মনেও শিবের হিংসা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, অধিকন্তু ভয়ে এমনই অভিভূত অবস্থা হইয়াছে যে, কখন যে তাহার ধনুর্ব্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে তাহা তিনি টেরও পান নাই—

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরাৎ মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপিস্বহস্তাৎ॥৩।৫১

দূর হতে সে মদন নেহারি সে ত্রিলোচন
হিংসা করে মনে তারে সে শক্তিও নাই,
ভয়েতে অসাড় কর পড়ে গেছে ধনুঃশর
কখন যে জানে না ত জ্ঞান কোথা ছাই।

যখন মন্মথের বলবীর্য্য একেবারে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, আর তাঁহার কোন সাড়া নাই, তখন সেই নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যানলকে উদ্দীপিত করার জন্যই যেন—

নির্ব্বাণ-ভূয়িষ্ঠ-মথাস্যবীর্য্যং, সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যাম্ অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥৩।৫২

মদনের বীর্য্য হায় নির্ব্বাপিত দেখা যায়
তাহারে বাড়াতে পুন যেন নগনন্দিনী,
অনন্ত যে রূপরাশি তা লয়ে উদিলা আসি
বনদেবী সখি সনে তথা মনোমোহিনী।

হিমাদ্রি-নন্দিনী গৌরী সেখানে দুটি সখী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া মদনের ধড়ে প্রাণ আসিল। কেন না,—এ ত যে সে রূপ নয়, এ একেবারে "বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী" (৩।৫৩) যেন সমস্ত বসন্ত সুষমার আধার, আবার কেমন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" (৩।৫৪) যেন অভিনব পল্লবসম্পন্না একটি লতা নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- সুন্দরী রতিও এ রূপের সামনে দাঁড়াইতে পারেন না—

তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্। (৩।৫৭)

রতি লজ্জা পায় যাঁরে নেহারি সে ললনারে
নিখুঁত সুন্দরী যিনি এ জগতীতলে।

তাঁহাকে দেখিয়া মদনের প্রাণে বল আসিল, এ রূপের সাহায্যে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার পুনর্ব্বার বিশ্বাস হইল,—

জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস"।৩।৫৭

জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বরে জিনিব এ ফুলশরে
পুন আশা কাম মনে জাগে কুতূহলে।

এইবার পুষ্পধন্বু "বাণগতিং বৃষাঙ্কে" (৩।১৪) বৃষভধ্বজের উপর তাঁহার ফুলশরের প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এদিকে—

"ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহার-ভূমিম্ ॥৩।৫৮

উমারাণী অতঃপর ভাবীপতি মহেশ্বর
আশ্রমের দ্বারে আসি উপনীত হইলা।

ঠিক সেই সময়েই—

"যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম।৩।৫৮

সেই কালে ভূতপতি হৃদাকাশে পরজ্যোতিঃ
নেহারি সমাধি ত্যজি তখনি ত উঠিলা।

তখন—

"তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্"।৩।৬০

অমনি নন্দিকেশ্বর প্রণমিয়া ভূতেশ্বর
সেবা তরে শৈলজার আগমন জ্ঞাপিল।

মহাদেবও অমনি—

"প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্।৩।৬০

তখনি কৈলাসপতি এই স্থানে আশুগতি
আন তাঁরে ভ্রূক্ষেপেতে অনুমতি দানিল।

অনন্তর পার্ব্বতী অভ্যন্তরে আসিয়া "মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভ-ধ্বজায়" (৩।৬২) মাথা নিচু করিয়া শিবকে প্রণাম করিলেন। "অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি" (৩।৬৩) "একমাত্র তোমাতেই আসক্ত থাকিবেন এমন স্বামী লাভ কর" বলিয়া শিব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর—

"অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনী-পুষ্করবীজমালাম্।৩।৬৫

পুতভোয়া মন্দাকিনী তাহে জাত কমলিনী
সে পুষ্কর বীজ লয়ে শুখাইয়া রোদেতে,
সেই বীজে গাঁথি মালা মনোমত গিরিবালা
সমর্পিলা মহাদেবে আরক্তিম করেতে।

শিব তাহা গ্রহণ করিতেছেন—

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।৩।৬৬

সেবায় সন্তুষ্ট মন সেই হেতু ত্রিলোচন
প্রীতিভরে নিতে মালা উপক্রম করিল।

এদিকে মদন শিবের প্রতি বাণ নিক্ষেপের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন গৌরী মালা দিতেছেন এবং ভোলানাথ তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই সময়টি তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট অবসর মনে হইল। অমনি "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" (৩।৬৪) "পতঙ্গ মরার তরে বহ্নিমুখে আসি পড়ে" মরিবার জন্যই যেন "উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ" (৩।৬৪) "উমার সমক্ষে হরে লক্ষ্য তার করিল"। লক্ষ্য করিয়াই—

সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্।৩।৬৬

অমনি অমোঘ বাণ সম্মোহন খরসান
লইয়া ধনুকে কাম তখনি ত জুড়িল।

এ যে অমোঘ বাণ—এ ত ব্যর্থ হইবার নয়, ফল ফলিবেই, সুতরাং—

"হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥৩।৬৭

ধৈর্য্যচ্যুত হন হর কথঞ্চিৎ অতঃপর
চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা অম্বুরাশি চঞ্চল;
উমামুখে ওষ্ঠাধর বিম্বফল রুচিকর
দৃষ্টি করে একবার শিব-আঁখি-কমল।

শিব উমার মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বাণ-প্রভাবে মহাযোগী যোগীশ্বরেরও এই দশা হইল। আর পার্ব্বতীর অবস্থা—

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবম্ অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্-বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত বিলোচনেন ॥ ৩।৬৮

অমনি উমার অঙ্গে ভাব ফুটে ওঠে রঙ্গে
নব কদম্বের মত কাঁটা দিল গায়,
সলজ্জ অপাঙ্গ-দৃষ্টি মরি কি মধুর সৃষ্টি
বঙ্কিম আননে বালা শিব প্রতি চায়।

যখন এই ব্যাপার ঘটিল, অটল যোগীন্দ্রও যখন টলিয়া উঠিলেন তখনি শিব নিজেকে সংযত করিয়া, কেন এমন হইল তাহার অনুসন্ধান করার জন্য চারিদিকে একবার চাহিলেন—

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতো বিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৩।৬৯

তখনি ত ত্রিলোচন　　বশেতে আনিল মন
জিতেন্দ্রিয় বলি তিনি বলে আকর্ষিয়া,
চঞ্চল কি হেতু মন　　বুঝিবারে সেইক্ষণ
দেখিলেন চারিদিকে নয়ন মেলিয়া।

অমনি শিব দেখিতে পাইলেন যে—

"স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারুচাপং প্রহর্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥ ৩।৭০

দেখে কাম দৃঢ় করি　　দক্ষিণ অপাঙ্গ পরি
টানিয়াছে গুণ তাহে ধনু গোল হয়েছে,
কাঁধ হয়ে গেছে নীচু　　বাম পা বেঁকেছে কিছু
আত্মযোনি প্রহারিতে সমুদ্যত রয়েছে॥

কামকে ঐ অবস্থায় দেখিবামাত্রই—

তপঃ পরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥ ৩।৭১

তপস্যার বিঘ্নে হায়　　ক্রোধ বৃদ্ধি হয়ে তায়,
ভ্রূভঙ্গে ভীষণ মুখ হরের যে হইল।
চেয়ে দেখা নাহি যায়　　সহসা অনল হায়
জ্বলিয়া তৃতীয় নেত্র হ'তে ছুটে চলিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

'রাহুর গতি-বৈষম্য' বিষয়ে আলোচনা

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্‌সি

প্রবন্ধ

গত বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় 'রাহুর গতি বৈষম্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে মূল বক্তব্য—রবিযুক্ত হইবার ১৩ দিন আগে হইতে ১৩দিন পরে পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এইরূপ বৎসরে ২৬ দিন করিয়া দুইবারে ৫২ দিন, রাহু ও কেতু বক্রগতি ত্যাগ করেন এবং মার্গী থাকেন। Astronomical Associationএ শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত একটি বক্তৃতার এইরূপ মর্ম্ম ৬ই এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভারতবর্ষের' আলোচ্য প্রবন্ধে লাহিড়ী মহাশয় নিজ উক্তির পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পাশ্চাত্য-কাল-জ্ঞান পঞ্জিকা অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ তারিখের রাহুর স্পষ্টাবস্থা ও মধ্যস্ফুট উদ্ধৃত করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রবন্ধ মধ্যে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় জ্যোতিষে ভারতীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা রাহু কেতুর আবশ্যকতা কম। ইহা সত্ত্বেও ভারতীয় জ্যোতিষের এই বিষয় কোনও মতামত তিনি উল্লেখ করেন নাই। প্রবন্ধোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে হিন্দু জ্যোতিষের কোনও মতামত উল্লেখ না করিয়া তিনি কেবল পাশ্চাত্য পঞ্জিকায় লিখিত কয়েকটি স্ফুট হইতেই এরূপ বিবর্ত্তন-পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যে যে দিনের স্ফুট পাশ্চাত্য পঞ্জিকা অনুযায়ী তিনি বিচার করিয়াছেন সেই সকল স্ফুট মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বীক্ষিত কি না এবং চাক্ষুষ পরীক্ষিত কি না তাহা জানা নাই। হিন্দু জ্যোতিষে রাহু কেতুর আবশ্যকতা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ হইতে অধিক। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে প্রবন্ধোক্ত মতবাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও আছে কি না সে বিষয়ে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। শশধর বাচস্পতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত জ্যোতিষকল্পদ্রুম নামক পুস্তকে গ্রহগণের দৃষ্টি বামাবর্ত্তে গণনা হয়, কিন্তু রাহু কেতুর দৃষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা করিতে হয়—এইরূপ উল্লেখ আছে। রাহুর দ্বাদশ দৃষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা করিতে হইলে মেষাদি গণনায় তাহার পরবর্ত্তী রাশিতে পড়িবে। রাহু চিরবক্রী বলিয়াই রাহুর দৃষ্টি সম্বন্ধে এই চির-বিশেষত্ব। মেষস্থ রাহুর দ্বাদশ দৃষ্টি বৃষে পড়িবে। বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসের মেষস্থ রাহুর দ্বাদশ দৃষ্টি প্রবন্ধের মতানুযায়ী কয়েকদিনের জন্য বৃষে না পতিত হইয়া মীনে পতিত হইবে। এরূপ মতের কোনও গ্রন্থে উল্লেখ কোথাও নাই। রাহুর চিরবক্রিতা তাহার দক্ষিণাবর্ত্তে দৃষ্টির কারণ। যদি কিছুকালের জন্য রাহু মার্গী থাকে তাহা হইলে তাহার দৃষ্টি দক্ষিণাবর্ত্তে হইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

প্রবন্ধ লেখকের মতে হিন্দু-জ্যোতির্বীগণ রাহুতে প্রদেয় সংস্কারের বিষয় অবগত ছিলেন না। কোনও গ্রহের প্রদেয় সংস্কার না জানা, সেই গ্রহের বিশেষ কোনও প্রকৃতি সম্বন্ধেও অজ্ঞতার কারণ হইতে পারে না। প্রতীচ্য মতে ফলিত (হিন্দু) জ্যোতির্বীগণ এ বিষয় সমাধান করিতে পারিলে ভাল হয়।

ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিগড়

ঝিস্তা নদী যেখানে দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিম্নের উপত্যকায় ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে কিস্তার উত্তর তীরে শক্তিগড় দুর্গ অবস্থিত। কিস্তার তীরে বলিলে ঠিক বলা হয় না; বস্তুত দুর্গটি উত্তর-তটলগ্ন জলের ভিতর হইতেই মাথা তুলিয়াছে। এই স্থানে কিস্তা অসমতল প্রস্তরবন্ধুর খাতের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, জলের ভিতর হইতে বড় বড় পাথরের চাপ মাথা জাগাইয়া আছে। এইরূপ কতকগুলি অর্দ্ধ-মগ্ন প্রস্তরশীর্ষের ভিত্তির উপর উত্তর তীর ঘেঁষিয়া শক্তিগড় দুর্গ নির্ম্মিত।

জলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শক্তিগড়ের চারিপাশে পরিখা খননের প্রয়োজন হয় নাই; কিস্তার প্রস্তরবিক্ষুব্ধ ফেনায়িত জলরাশি তাহাকে বেষ্টন করিয়া সগর্জ্জনে বহিয়া গিয়াছে। একটি সঙ্কীর্ণ সেতু খরস্রোতা প্রণালীর উপর দিয়া তীরের সহিত শক্তিগড় দুর্গের সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাই দুর্গপ্রবেশের একমাত্র পথ।

শক্তিগড় দুর্গটি আয়তনে ছোট। দুর্গের আকারে নির্ম্মিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচীর পরিখা-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। নিরুপদ্রব ভোগবিলাসের জন্যই বোধকরি অতীতকালের কোনও বিলাসী রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্গটি এমনভাবে তৈয়ারী যে মাত্র পাঁচজন বিশ্বাসী লোক লইয়া দুর্গের লৌহদ্বার ভিতর হইতে রোধ করিয়া দিলে অগণিত শত্রু দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইহা দখল করিতে পারিবে না। কিস্তার গর্ভ হইতে কালো পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাকার উঠিয়াছে; মাঝে মাঝে স্থূল স্তম্ভাকৃতি বুরুজ। প্রাকারগাত্রে স্থানে স্থানে পর্য্যবেক্ষণের জন্য সঙ্কীর্ণ ছিদ্র। বাহির হইতে দেখিলে দুর্গটিকে একটি নিরেট পাথরের সুবর্ত্তুল স্তূপ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গদ্বারের সম্মুখে প্রায় দেড়শত গজ দূরে ফাঁকা মাঠের উপর গৌরীর তাম্বু পড়িয়াছিল। মধ্যস্থলে গৌরীর জন্য একটি বড় শিবির; তাহার চারিপাশে সহচরদিগের জন্য কয়েকখানা ছোট তাম্বু। সবগুলি তাম্বু ঘিরিয়া কাঁটা-তারের বেড়া। ধনঞ্জয় কোনও দিকেই সাবধানতার লাঘব করেন নাই। এইখানে হেমন্ত অপরাহ্ণের সোনালী আলোয় গৌরী সদলবলে আসিয়া উপনীত হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে এতদূর আসিয়া গৌরী ঈষৎ ক্লান্ত হইয়াছিল; ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস অনেকদিন গিয়াছে। তাই নিজের তাম্বুতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ও কিছু জলযোগ করিয়া সে নিজেকে চাঙ্গা করিয়া লইল। ধনঞ্জয়ের দেহে ক্লান্তি নাই, তিনি আসিয়া বলিলেন—'উদিতের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় ঘাব্‌ড়ে গেছে। আমরা যে আসতে পারি তা বেচারা প্রত্যাশাই করে নি।—চলুন কিস্তার ধারে একটু বেড়াবেন; যায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই।'

দু'জনে বাহির হইলেন; রুদ্ররূপ তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। কাঁটাবেড়ার ব্যূহমুখে বন্দুক-কিরিচ-ধারী শান্ত্রীর পাহারা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনজনে দুর্গদ্বারের দিকে চলিলেন।

দুর্গের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই; প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কিস্তার তটে ঘন-নিবিষ্ট খড়ের চাল একটি গ্রামের নির্দ্দেশ করিতেছে। গ্রামের ঘাটে জেলেডিঙির মত কয়েকটি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঐ শক্তিগড় গ্রাম—ওটা উদিতের জমিদারী। ওখানকার প্রজারা সব উদিতের গোঁড়া ভক্ত।'

গৌরী বলিল—'কাছাকাছি কোথাও শস্যক্ষেত্র দেখছি না; এই সব প্রজাদের জীবিকা কি?'

'প্রধানতঃ মাছ ধরাই ওদের ব্যবসা। এ অঞ্চলে জনরা কি জোয়ার পর্য্যন্ত জন্মায় না, তা ছাড়া কুটীরশিল্প আছে—ওরা খুব ভাল জরীর কাজ করতে পারে।'

গৌরী দুর্গের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল—'দুর্গের সিংদরজা ত বন্ধ দেখছি; কোথাও জনমানব আছে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যাপার কি? কেউ নেই নাকি?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'আছে বৈকি! তবে বেশী

লোক নেই, গুটি পাঁচছয় বিশ্বাসী অনুচর আছে।—কিন্তু আপনি অত কাছে যাবেন না। প্রাকারের গায়ে সরু সরু ফুটো দেখতে পাচ্ছেন? ওর ভিতর থেকে হঠাৎ বন্দুকের গুলি বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়—পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল।'

দুর্গের এলাকা সাবধানে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে খানিকদুর গিয়া তাঁহারা কিস্তার পাড়ে দাঁড়াইলেন। কিস্তার জলে অস্তমান সূর্য্যের রাঙা ছোপ লাগিয়াছে; শক্তিগড়ের নিকষকৃষ্ণ দেহেও যেন কুঙ্কুমপ্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে। গৌরীর মনে পড়িল প্রহ্লাদের চিঠির কথা। এই দিকেই প্রাকার গাত্রে কোথাও একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে—সেই গবাক্ষ চিহ্নিত কক্ষে শঙ্করসিং অবরুদ্ধ। গৌরী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, এদিকে জল হইতে তিন চার হাত উপরে কয়েকটি চতুষ্কোণ জানালা রহিয়াছে; তাহার মধ্যে কোনটি শঙ্করসিংএর জানালা অনুমান করা শক্ত। জানালাগুলির নিম্নে ক্ষুব্ধ জলরাশি আবর্ত্তিত হইয়া বহিয়া গিয়াছে—নিম্নে নিমজ্জিত পাথর আছে। সাঁতার কাটিয়া বা নৌকা সাহায্যে জানালার নিকটবর্ত্তী হওয়া কঠিন।

দুর্গের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া গৌরী কিস্তার অপর পারে তাকাইল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই; নদীর অন্য পারে দুর্গের প্রায় সমান্তরালে একটি বেশ বড় বাগানবাড়ী রহিয়াছে। কিস্তা এখানে প্রায় তিনশত গজ চওড়া, তাই পরপার পরিষ্কার দেখা যায় না; তবু একটি উপবন-বেষ্টিত প্রাসাদ সহজেই চোখে পড়ে। বাগানের প্রান্তে একটি বাঁধানো ঘাটও কিস্তার জলে ধাপে ধাপে অবগাহন করিতেছে। এই বাগান ও বাড়ীতে বহুলোকের চলাচল দেখিয়া মনে হয়, যেন এই বিজনপ্রান্তে কোনও উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

গৌরী বলিল—'একটা বাগানবাড়ী দেখছি। ওটাও কি উদিতের নাকি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না। নদীর ওপারে উদিতের সম্পত্তি কি করে হবে—ওটা ঝড়োয়া রাজ্যের অন্তর্গত। বাগানবাড়ীটা ঝড়োয়ার বিখ্যাত সর্দ্দার অধিক্রম সিংএর সম্পত্তি; ওদিকটা সবই প্রায় তার জমিদারী।' তারপর চোখের উপর করতল রাখিয়া কিছুক্ষণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'কিন্তু অধিক্রমের বাগানবাড়ীতে এত লোক কিসের? অধিক্রম মাঝে মাঝে তার জমিদারীতে এসে থাকে বটে, কিন্তু এ যেন মনে হচ্চে কোনও উৎসব উপলক্ষে বাগানবাড়ী সাজানো হচ্ছে!—কি জানি, হয়ত তার মেয়ের বিয়ে!'

রুদ্ররূপ পিছন হইতে সসম্ভ্রমে বলিল—'আজ্ঞা হাঁ, অধিক্রম সিংএর মেয়ে কৃষ্ণা বাঈয়ের সঙ্গে হাবিলদার বিজয়লালের বিয়ে।'

গৌরী সচকিত হইয়া বলিল—'তাই নাকি! তুমি কোথা থেকে শুনলে?'

রুদ্ররূপ বলিল—'সহরে অনেকেই বলাবলি করছিল। শুনেছি, ঝড়োয়ার রাণী নাকি স্বয়ং এ বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন। কৃষ্ণা বাঈ রাণীর সখী কিনা।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কবে বিয়ে?'

'তা বলতে পারি না। বোধহয় পরশু।'

সে-রাত্রে কৃষ্ণা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইতে পারে, গৌরী এতক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল। বাপের জমিদারী হইতে কৃষ্ণার বিবাহ হইবে; রাণীও আসিবেন। সুতরাং এত কাছে থাকিয়া দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোনও বিঘ্ন নাই। অধিক্রম সিং কন্যার বিবাহে হয়ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারেন।

গৌরীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে একদৃষ্টে ঐ উদ্যানবেষ্টিত বাড়ীটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময় দূরে দুর্গদ্বারের ঝণৎকার শুনিয়া তিনজনই সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দুইজন অশ্বারোহী আগে পিছে সঙ্কীর্ণ সেতুর উপর দিয়া বাহিরে আসিতেছে। দূর হইতে অপরাহ্নের আলোকে তাহাদের চেহারা ভাল দেখা গেল না। ধনঞ্জয় শ্যেনদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'উদিত আর ময়ূরবাহন।'—তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; তিনি একবার কাঁটা-তার বেষ্টিত তাম্বুর দিকে তাকাইলেন। কিন্তু এখন আর ফিরিবার সময় নাই; উদিত তাঁহাদের দেখিতে পাইয়াছে এবং এই দিকেই আসিতেছে। তিনি গৌরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'ওরা আপনার কাছেই আসছে, সম্ভবতঃ দুর্গের ভিতর নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করবে। রাজি হবেন না। আর, সতর্ক থাকবেন; প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করবে না বোধহয়—তবু—। রুদ্ররূপ, তোমার পিস্তল আছে?'

'আছে।'

'বেশ। তৈরী থেকো। বিশেষভাবে ময়ূরবাহনটার দিকে লক্ষ্য রেখো।' বলিয়া তিনি গৌরীর পাশ হইতে কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্ররূপও পিছু হটিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল। দুজনে এমন ভাবে দাঁড়াইলেন যাহাতে উদিত ও ময়ূরবাহন আসিয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাঁহারা দুইপাশে থাকিয়া তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারেন।

উদিত ও ময়ূরবাহন ঘোড়া ছুটাইয়া গৌরীর দুই গজের মধ্যে আসিয়া ঘোড়া থামাইল; তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অবনতশিরে গৌরীকে অভিবাদন করিল। ধনঞ্জয় তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—'হুঁ—ভক্তি কিছু বেশী দেখছি।'

বাহ্য ব্যবহারে সম্ভ্রম প্রকাশ পাইলেও উদিতের মুখের ভাবে কিন্তু বিশেষ প্রসন্নতা লক্ষ্যগোচর হইল না; সে যেন নিতান্ত গরজের খাতিরেই বাধ্য হইয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে এতটা সম্মান দেখাইতেছে। বস্তুতঃ তাহার চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রোহপূর্ণ অসহিষ্ণুতার আগুন চাপা রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ময়ূরবাহনের মুখের ভাব কিন্তু অতি প্রসন্ন, তাহার কিংশুকফুল্ল অধরে যে হাসিটি ক্রীড়া করিতেছে তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ ঈষৎ অনুতপ্ত পারবশ্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সে যেন পূর্ব্বদিনের ধৃষ্টতার জন্য লজ্জিত।

উদিত প্রথমে কথা কহিল। একবার গলা ঝাড়িয়া লইয়া পাখীপড়ার মত বলিল—'মহারাজ স্বাগত। মহারাজকে সাহুচর আমার দুর্গমধ্যে আহ্বান করতে পারলাম না সেজন্য দুঃখিত। দুর্গে স্থানাভাব। তবে যদি মহারাজ একাকী বা দু' একজন ভৃত্য নিয়ে দুর্গে অবস্থান করতে সম্মত হন, তাহলে আমি সম্মানিত হব।'

গৌরী মাথা নাড়িল, নিরুৎসুক স্বরে বলিল—'উদিত, তোমাকে সম্মানিত করতে পারলাম না। দুর্গের বাইরে আমি বেশ আছি। ফাঁকা যায়গায় থাকাই স্বাস্থ্যকর, বিশেষতঃ যখন শিকার করতে বেরিয়েছি।'

উদিত বলিল—'মহারাজ কি সন্দেহ করেন দুর্গের ভিতরে থাকা তাঁর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর?' তাহার কথার খোঁচাটা চোখের অনাবৃত বিদ্রূপে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গৌরী উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ময়ূরবাহন হাসিতে হাসিতে বলিল—'অস্বাস্থ্যকর বৈকি। মহারাজ, আপনি দুর্গে থাকতে অস্বীকার করে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। দুর্গে একজন লোক সংক্রামক রোগে ভুগছে। আপনার বাহিরে থাকাই সমীচীন।'

গৌরী তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'সংক্রামক রোগটা কি?'

ময়ূরবাহন তাচ্ছীল্যভরে বলিল—'বসন্ত। লোকটা বোধ হয় বাঁচবে না।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'লোকটা কে?'

এবার উদিত উত্তর দিল; প্রত্যেকটি শব্দ দাঁতে ঘষিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'একটা বাঙ্গালী—চেহারা অনেকটা আপনারই মত। লোকটা আমার এলাকায় এসে রাজ-দ্রোহিতা প্রচার করছিল, তাই তাকে বন্দী করে রেখেছি।'

সংযতস্বরে গৌরী বলিল—'বটে।—কিন্তু তুমি তাকে বন্দী করে রেখেছ কোন্ অধিকারে?'

ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া উদিত বলিল—'আমার সীমানার মধ্যে আমার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে একথা কি মহারাজ জানেন না?'

গৌরী পলকে নিজেকে সামলাইয়া লইল, অবজ্ঞাভরে বলিল—'শুনেছি বটে।—কিন্তু সে-লোকটা যদি রাজদ্রোহ প্রচার করে থাকে তাহলে তাকে রাজ-সকাশে পাঠানোই উচিত ছিল, তার অপরাধের বিচার আমি করব।—উদিত, তুমি অবিলম্বে এই বিদ্রোহীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

উদিত অধর দংশন করিল। কুটিল বাক্য হানাহানিতে সে পটু নয়; তাই নিজের কথার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ক্রুদ্ধ-চোখে চাহিয়া কি একটা রূঢ় উত্তর দিতে যাইতেছিল, ময়ূরবাহন মাঝে পড়িয়া তাহা নিবারণ করিল। প্রফুল্লস্বরে বলিল—'মহারাজ ন্যায্য কথাই বলেছেন। কুমার উদিতেরও তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকটা হঠাৎ রোগে পড়ায় আর তা সম্ভব হয়নি। তার অবস্থা ভাল নয়, হয়ত আজ রাত্রেই ম'রে যাবে। এ রকম অবস্থাতে তাকে মহারাজের কাছে পাঠানো নিতান্ত নৃশংসতা হবে। তবে যদি সে বেঁচে যায়, তাহলে কুমার উদিত নিশ্চয় তাকে বিচারের জন্য মহারাজের হুজুরে হাজির করবেন।—কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা তার খুবই কম।'

গৌরী আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'লোকটা যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু বড় অন্যায় হবে। মৃত্যু বড় সংক্রামক রোগ, দুর্গের অন্য অধিবাসীদেরও আক্রমণ করতে পারে।'

অকৃত্রিম হাসিতে ময়ূরবাহনের মুখ ভরিয়া গেল। এই নিগূঢ় বাক্-যুদ্ধ সে পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছিল, এখন সপ্রশংস নেত্রে গৌরীর মুখের পানে চাহিল। উদিত কিন্তু আর অসহিষ্ণুতা দমন করিতে পারিল না, ঈষৎ কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—'ও কথা থাক। মহারাজকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করলাম—তিনি যদি সম্মত না হন, তাম্বুতে থাকাই বেশী স্বাস্থ্যকর মনে করেন, সে তাঁর অভিরুচি।' বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল।

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—'শিকারের কথাটা—'

উদিত ফিরিয়া বলিল—'হাঁ—। মৃগয়ার সব আয়োজন করেছি। আমার জঙ্গলে বরাহ হরিণ পাওয়া যায় জানেন বোধ হয়। যদি ইচ্ছা করেন, কাল সকালেই শিকারে বেরুনো যেতে পারে।'

গৌরী বলিল—'বেশ, কাল সকালেই বেরুনো যাবে।'

উদিত লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল, তার পর ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অবজ্ঞাভরে একটা—'নমস্তে' বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ময়ূরবাহন তখনও ঘোড়ায় চড়ে নাই। উদিত দূরে চলিয়া গেলে ময়ূরবাহন রেকাবে পা দিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—'আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' কথাগুলি সে এত নিম্নকণ্ঠে বলিল যে অদূরস্থ ধনঞ্জয়ও তাহা শুনিতে পাইলেন না।

গৌরী সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

ময়ূরবাহন পূর্ব্ববৎ বলিল—'এখন নয়। আজ রাত্রে আমি আসব। এগারটার সময় এইখানে আসবেন; তখন কথা হবে।—নমস্তে।' বলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িল; তারপর তাহার কশাহত ঘোড়া দ্রুতবেগে উদিতের অনুসরণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির ঘটনা

ছাউনীর দিকে ফিরিতে ফিরিতে গৌরী ধনঞ্জয়কে ময়ূরবাহনের কথা বলিল। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন 'আবার একটা কিছু নূতন শয়তানি আঁটছে।'

'তা ত বটেই। কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি?'

দীর্ঘকাল আলোচনা ও পরামর্শের পর স্থির হইল যে ময়ূরবাহনের সহিত দেখা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহার অভিপ্রায় যদিও এখনো পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না, তবু অনুমান হয় যে সে উদিতের সহিত বেইমানী করিবার মৎলব আঁটিয়াছে। ইহাতে রাজাকে উদ্ধার করিবার পন্থা সুগম হইতে পারে। গৌরী যদিও ময়ূরবাহনের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেই অনিচ্ছুক ছিল তথাপি নিজেদের মূল উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ দমন করিয়া রাখিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ধনঞ্জয় অন্য প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন গুপ্তচর দুর্গের সেতু-মুখে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন—যাহাতে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে কিনা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারা যায়। এমনও হইতে পারে যে কুচক্রী উদিত গৌরীকে হঠাৎ লোপাট করিয়া দুর্গে লইয়া যাইবার এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছে। উদিত ও ময়ূরবাহনের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।

রাত্রি এগারোটার সময় চর আসিয়া খবর দিল যে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে। তখন গৌরী রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাম্বু হইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার রাত্রি, নক্ষত্রের সম্মিলিত আলো এই অন্ধকারকে ঈষৎ তরল করিয়াছে মাত্র।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তিনজনে দাঁড়াইলেন। অদূরে কিস্তা কলধ্বনি করিতেছে, দুর্গের কৃষ্ণ অবয়ব একচাপ কঠিন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের মত আকাশের একটা দিক আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের পাদমূলে কেবল আলোকের একটি বিন্দু দেখা যাইতেছে, হয়ত উহাই শঙ্করসিংহের গবাক্ষ।

কিয়ৎকাল পরে সতর্ক পদধ্বনি শুনা গেল। পদধ্বনি তিন-চার গজের মধ্যে আসিয়া থামিল, তারপর হঠাৎ

বৈদ্যুতিক টর্চ্চ জ্বলিয়া উঠিয়া প্রতীক্ষমান তিনজনের মুখে পড়িল।

ময়ূরবাহন বলিয়া উঠিল—'একি! আমি কেবল রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

গৌরী ও রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া রহিল, ধনঞ্জয় ময়ূরবাহনের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণ করতলে পিস্তলটা আলোকসম্পাতে ঝকমক করিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু তোমার যা বলবার আছে আমাদের তিনজনের সামনেই বলতে হবে।'

'তা হলে আদাব, আমি ফিরে চললাম'—বলিয়া ময়ূরবাহন ফিরিল।

ধনঞ্জয়ের বাম হস্ত তাহার কাঁধের উপর পড়িল—'অত সহজে ফেরা যায়না ময়ূরবাহন।'

ময়ূরবাহন ভ্রূকুটি করিয়া ধনঞ্জয়ের হস্তস্থিত পিস্তলটার দিকে তাকাইল, অধর দংশন করিয়া কহিল—'তোমরা আমার আটক করতে চাও?'

'আপাততঃ তুমি যা বলতে এসেছ তা বলা শেষ হলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।'

'তোমাদের সামনে আমি কোনও কথা বলব না'—ময়ূরবাহন বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

'তাহলে আটক থাকতে হবে।'

'বেশ।—কিন্তু আমাকে আটক করে তোমাদের লাভ কি?'

লাভ যে কিছু নাই তাহা ধনঞ্জয়ও বুঝিতেছিলেন। তিনি ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তুমি রাজার সঙ্গে এই মাঠের মাঝখানে একলা কথা বলতে চাও। তোমার যে কোনও কু-অভিপ্রায় নেই আমরা বুঝব কি করে?'

এবার ময়ূরবাহন হাসিল, বলিল—'কি কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে? রাজা কি ক্ষীরের লাড়ু যে আমি টপ্ করে মুখে পুরে দেব।'

'তোমার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে।'

'তল্লাস করে দেখ, আমার আছে অস্ত্র নেই।'

ধনঞ্জয় কথায় বিশ্বাস করিবার লোক নহেন; তিনি রুদ্ররূপকে ডাকিলেন। রুদ্ররূপ আসিয়া ময়ূরবাহনের বস্ত্রাদি তল্লাস করিল, কিন্তু মারাত্মক কিছুই পাওয়া গেল না।

ময়ূরবাহন বিদ্রূপ করিয়া কহিল—'কেমন, আর ভয় নেই ত!'

ধনঞ্জয় আবার বলিলেন—'আমাদের সামনে বলবে না?'

'না'—ময়ূরবাহন দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল।

তখন ধনঞ্জয় কহিলেন—'বেশ। কিন্তু আমরা কাছাকাছি থাকব মনে রেখো। যদি কোনো রকম শয়তানির চেষ্টা কর তাহলে—' ধনঞ্জয় মুষ্টি খুলিয়া পিস্তল দেখাইলেন।

ময়ূরবাহন উচ্চৈঃস্বরে হাসিল—'সর্দ্দার, তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ। বয়সকালে তোমার ক্ষত্রিয়াণীকে বোধ হয় এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল করতে না। ক্ষত্রিয়াণী অবশ্য তোমার চোখে ধুলো দিয়ে—হা হা হা—'

হাসিতে হাসিতে ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

* * * *

টর্চ্চের আলো নিবাইয়া ময়ূরবাহন কিয়ৎকাল গৌরীর সঙ্গে ধীরপদে পাদচারণ করিল। রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাহাদের পশ্চাতে প্রায় বিশ হাত দূরে রহিলেন।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ময়ূরবাহন বলিল—'আপনার সব পরিচয়ই আমরা জানি।'

শুষ্কস্বরে গৌরী বলিল—'এই কথাই কি এত রাত্রে বলতে এসেছ?'

ময়ূরবাহন উত্তর দিল না; কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া যেন আত্মগত ভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল—'আপনার ভাগ্যের কথা ভাবলে হিংসা হয়। কোথায় ছিলেন বাংলা দেশের এক নগণ্য জমিদারের ছোট ভাই, হয়ে পড়লেন একেবারে স্বাধীন দেশের রাজা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পেলেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যার প্রেম। একেই বলে ভগবান যাকে দেন, ছপ্পর ফোড়্কে দেন। কিন্তু তবু পৃথিবীতে সবই অনিশ্চিত; অসাবধান হ'লে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীও রাস্তার ফকির বনে যায়। সুখ সৌভাগ্যকে যত্ন না করলে তারা থাকে না। তাই ভাবছি, আপনার এই হঠাৎ-পাওয়া সৌভাগ্যকে স্থায়ী করবার কোনও চেষ্টা আপনি করছেন কি? অথবা, কেবল কয়েকজন কজিরাজ কুচক্রীর খেলার পুতুল হয়ে তাদের কাজ হাসিল করে দিয়ে শেষে আবার পুনর্মূষিক হয়ে দেশে ফিরে যাবেন?'

ময়ূরবাহনের এই ব্যঙ্গপূর্ণ স্বগতোক্তি শুনিতে শুনিতে

গৌরীর বুকে রুদ্ধ ক্রোধ গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দিল না। ময়ূরবাহন একটা কিছু প্রস্তাব করিতে চায়, তাহা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া ঝগড়া করা নির্ব্বুদ্ধিতা হইবে। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত বল। তোমার বেয়াদপি শোনবার আমার সময় নেই।'

ময়ূরবাহন অবিচলিতভাবে বলিল—'কাজের কথাই বলছি, যা বললাম সেটা ভূমিকা মাত্র।' সে টর্চ্চ জ্বালিয়া একবার সম্মুখের পথ খানিকটা দেখিয়া লইল, তারপর আলো নিবাইয়া বলিল—'উদিতের সঙ্গে আমার আর পোট হচ্চে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

ময়ূরবাহনের কথার বিষয়বস্তুটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু তাহার বলিবার ভঙ্গি এমন অতর্কিত ও আকস্মিক যে গৌরী চমকিয়া উঠিল। ময়ূরবাহন বলিল—'স্পষ্ট কথা ঘোর-প্যাচ না করে স্পষ্টভাবেই বলতে আমি ভালবাসি। উদিত সিংহের মধ্যে আর শাঁস নেই—আছে শুধু ছোবড়া। তাই, ব্রেফ্ ছোবড়া চুষে আর আমার পোষাচ্চে না।'

গৌরী ধীরে ধীরে বলিল—'অর্থাৎ উদিতের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে চাও?'

ময়ূরবাহন হাসিল—'শাদা কথায় তাই বোঝায় বটে। আপনি বোধ হয় ঐ কথাটা বলে আমায় লজ্জা দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নিজের কোনও কাজের জন্যে লজ্জা পাবার অবস্থা আমার অনেকদিন কেটে গেছে।'

নীরস স্বরে গৌরী বলিল—'তাই ত দেখছি। চেহারা ছাড়া মানুষের কোনও লক্ষণই তোমার নেই। যাহোক, তোমার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নেই।—কি করতে চাও?'

ময়ূরবাহন কিছুক্ষণ কথা বলিল না। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা গেল না; তারপর সে সহজ স্বরেই বলিল—'আগেই বলেছি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন; আমার নিজেরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। মনে করুন আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি, তাহলে তার বদলে আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন না?'

'তুমি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে চাও সেটা আগে জানা দরকার।'

'সেটা এখনও বুঝতে পারেন নি?'

'না।'

'বেশ, তাহলে খোলসা করেই বলছি। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে ঝিন্দের গদীতে কায়েমীভাবে বসাতে পারি এটা অনুমান করা বোধ করি আপনার পক্ষে শক্ত নয়?'

'কি উপায়?'

'ধরুন, আসল রাজার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়। তিনি যে অবস্থায় আছেন তা প্রায় মৃত্যুতুল্য, তবু যতদিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন আপনি নিষ্কণ্টক হতে পারছেন না। আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি তাহলে আপনার রাস্তা একেবারে সাফ—আপনি যে শঙ্কর সিং নয়, একথা কেউ চেষ্টা করলেও প্রমাণ করতে পারবে না। সিংহাসনে আপনার দাবী পাকা হয়ে যাবে।—বুঝতে পেরেছেন?'

গৌরী বুঝিল; আগেও সে বুঝিয়াছিল। প্রলোভন বড় কম নয়। শুধু ঝিন্দের সিংহাসন নয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। তথাপি গৌরীর মন লোভের পরিবর্ত্তে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। স্বার্থে স্বার্থে এই প্রাণপণ টানাটানি, নীচতা চক্রান্ত নরহত্যার এই ঘূর্ণিপাক—ইহার আবর্ত্তে পড়িয়া জগতের অতিবড় লোভনীয় বস্তুও তাহার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিল। সে একবার গা-ঝাড়া দিয়া যেন দেহ হইতে একটা পঙ্কিল অশুচিতার স্পর্শ ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তারপর পূর্ব্ববৎ নিতান্ত নিরুৎসুক স্বরে বলিল—'তাহলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজাকে হত্যা করতেও তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার স্বার্থটা কি শুনি।'

ময়ূরবাহন বলিল—'আমার স্বার্থ গুরুতর না হলে এত বড় একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব আমি পরিকল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আমার অবস্থার কথা প্রকাশ করে বললে আপনি বুঝবেন যে আমার এই প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র ছলনা নেই—এ একেবারে আমার খাঁটি মনের কথা।' একটু থামিয়া ময়ূরবাহন সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—যেন অন্য কাহারও কথা বলিতেছে—'আমি একজন ঘরানা ঘরের ছেলে এ বোধ হয় আপনি জানেন। বিষয়-আসয় টাকাকড়িও বিস্তর ছিল, কিন্তু সে সব উড়িয়ে দিয়েছি। গত দু'বছর থেকে উদিত সিংয়ের স্কন্ধে চেপেই চালাচ্ছিলুম—কিন্তু এ ভাবে আর

আমার চলছে না। উদিতের রস ফুরিয়ে এসেছে; শুধু তাই নয়, গর্দ্দানা নিয়েও টানাটানি পড়ে গেছে। লুকোচুরি করে কোনও লাভ নেই, এখন আমি আমার গর্দ্দানা বাঁচাতে চাই। বুঝতে পারছি উদিতের মতলব শেষ পর্য্যন্ত ফেঁসে যাবে—কিন্তু আমিও সেই সঙ্গে ডুবতে চাই না। তাকে ঝিন্দের সিংহাসনে বসাতে পারলে আমিই প্রকৃতপক্ষে রাজা হতাম; কিন্তু সে দুরাশা এখন ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই—আপনি এসে সব ওলট-পালট করে দিয়েছেন।'

'এবার আমার প্রস্তাবনা শুনুন। এতে আমাদের দুজনেরই স্বার্থ সিদ্ধ হবে—অর্থাৎ আপনি ঝিন্দের প্রকৃত রাজা হবেন, আর আমিও গর্দ্দানা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকব।'

গৌরী বলিল—'তোমার প্রস্তাব বোধহয় এই যে, রাজা হবার লোভে আমি তোমার গর্দ্দানা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেব—কেমন?'

'প্রতিশ্রুতি।' ময়ূরবাহন মৃদুকণ্ঠে একটু হাসিল—'দেখুন, ও জিনিসের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। অবস্থা গতিকে মানুষ প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়; আপনিও হয়ত রাজা হয়ে প্রতিশ্রুতি মনে না রাখতে পারেন।—আমার প্রস্তাবটা একটু অন্য ধরণের।'

'বটে। কি তোমার প্রস্তাব শুনি।'

'আমার প্রস্তাব খুব মোলায়েম। আমি একটি বিয়ে করতে চাই।'

'বিয়ে করতে চাও!'

'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম পালন করবার আমার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?'

'আজ্ঞে না, স্থানকালপাত্র কোনটাই রসিকতা করবার অনুকূল নয়। আমি খুব গম্ভীরভাবেই বলছি। তবে শুনুন। ত্রিবিক্রম সিংয়ের মেয়ে চম্পা বাঈকে আমি বিয়ে করতে চাই। উদ্দেশ্য খুব সোজা—ময়ূরবাহনের গর্দ্দানার ওপর কারুর মমতা না থাকতে পারে কিন্তু ত্রিবিক্রম সিংয়ের জামাইয়ের গর্দ্দানার দাম যথেষ্টই আছে। চম্পা বাঈকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাতে সর্দ্দার ধনঞ্জয়েরও সঙ্কোচ হবে। তারপর, ত্রিবিক্রম সিংয়ের ঐ একটি মেয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েই উত্তরাধিকারিণী হবে। সুতরাং, সবদিক দিয়েই চম্পা বাঈ আমার উপযুক্ত পাত্রী।'

এই প্রস্তাবের কল্পনাতীত ধৃষ্টতা গৌরীকে কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক করিয়া দিল। চম্পা! অনাঘ্রাত ফুলের মত নিষ্পাপ চম্পাকে এই ক্লেদাক্ত পশুটা চায়। গৌরী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—'তোমার স্পর্দ্ধা আছে বটে!'

ঈষৎ বিস্ময়ে ময়ূরবাহন বলিল—'এতে স্পর্দ্ধা কি আছে! ত্রিবিক্রম আমার স্বজাতি, বংশগৌরবে আমি তার চেয়ে ছোট নয়, বরং বড়। তবে আপত্তি কিসের?'

গৌরী রূঢ়স্বরে বলিল—'ও সব আকাশ কুসুমের আশা ছেড়ে দাও। তোমার হাতে মেয়ে দেবার আগে ত্রিবিক্রম চম্পাকে কিস্তার জলে ফেলে দেবে।'

'তা দিতে পারে—লোকটা বড় একগুঁয়ে। কিন্তু আপনি রাজা—আপনি যদি হুকুম দেন তাহলে সে না বলতে পারবে না।'

'আমি হুকুম দেব—চম্পার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে! তুমি—তুমি একটা পাগল।'

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে বলিল—'বিনিময়ে আপনি কি পাবেন সেটাও স্মরণ করে দেখবেন।'

'ও—' গৌরী উচ্চকণ্ঠে হাসিল। তাহারা কিস্তার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে পঞ্চাশ হাত দূরে অন্ধকার দুর্গ; সেইদিকে তাকাইয়া গৌরী বলিল—'বিনিময়ে রাজাকে হত্যা করে তুমি আমার প্রত্যুপকার করবে—এই না?'

সহজভাবে ময়ূরবাহন বলিল—'এতক্ষণে আমার সমগ্র প্রস্তাবটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

গৌরী তিক্তস্বরে কহিল—'তুমি মনে কর ঝিন্দের সিংহাসনে আমার বড় লোভ?'

'মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া আর একটি লোভনীয় জিনিস আছে—ঝড়োয়ার কস্তুরী বাঈ—'

গৌরীর কঠিন স্বর তাহার কথা শেষ হইতে দিল না—'চুপ! ও নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না। এবার তোমার প্রস্তাবের উত্তর শোনো।—তুমি একটা নরকের কীট, কিন্তু আমাকে লুব্ধ করতে পারবে না। সিংহাসনে আমার লোভ নেই, যা ন্যায়ত আমার নয় তা আমি চাই না। পৃথিবীতে রাজ-ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বড় জিনিস আছে—তার

নাম ইমান। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। ময়ূরবাহন, তুমি আমাকে অনেকভাবে ছোট করবার চেষ্টা করেছ, তার মধ্যে আজকের এই চেষ্টা সবচেয়ে অপমানজনক। তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, ইচ্ছে করলে তোমাকে মাছির মত টিপে মেরে ফেলতে পারি, শুধু একটা হুকুমের ওয়াস্তা। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিদ্বেষ এত বেশী যে এভাবে মারলে আমার তৃপ্তি হবে না। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার দিন এখনো আসেনি, কিন্তু সেদিন আসবে—হুঁসিয়ার।'

গৌরী খুব সংযতভাবে ওজন করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু শেষের দিকে তাহার কথাগুলা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের অন্তর্গূঢ় গর্জ্জনের মত শুনাইল। সে চুপ করিলে ময়ূরবাহনও কিয়ৎকাল কথা কহিল না, তারপর ধীরে ধীরে কহিল—'আপনি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজি নন? এই আপনার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'ভেবে দেখুন—'

'দেখেছি। তুমি এখন যেতে পার।'

'বেশ যাচ্ছি। কিন্তু আপনি ভাল করলেন না।'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'

ময়ূরবাহন গৌরীর নিকট হইতে দুই তিন হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল; এবার সে ফিরিয়া টর্চ্চের আলো গৌরীর মুখে ফেলিল, বলিল—'না—ভয় দেখিয়ে শত্রুকে সাবধান করে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজি হলেই সবদিক দিয়ে ভাল হত। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না যে আপনার জীবন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে। উদিত সিং মরীয়া হয়ে উঠেছে; কোণ-ঠাসা বন-বেড়ালের সঙ্গে খেলা করা নিরাপদ নয়।'

গৌরী হাসিল—'এটা তোমার নিজের কথা, না উদিতের জবানি বলছ?'

'নিজের কথাই বলছি।'

'বটে। আর কিছু বলবার আছে?'

'আছে।' ময়ূরবাহনের স্বর বিষাক্ত হইয়া উঠিল—'দৈবের কথা বলা যায় না, আপনি হয়ত বেঁচে যেতেও পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন, ঝড়োয়ার রাণীকে আপনিও পাবেন না। শঙ্করসিংও পাবে না—তাকে ভোগদখল করবে উদিত সিং—বুঝেছেন?—হা—হা—হা—'

তাহার হাসি শেষ হইতে না হইতে দুর্গের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। কাঁধের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া গৌরী 'উঃ' করিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় পিছন হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'সরে আসুন! সরে আসুন!' ময়ূরবাহন হাতের জ্বলন্ত টর্চ্চটা গৌরীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে জলে লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

ধনঞ্জয় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিলেন—'চোট পেয়েছেন? কোথায়?'

গৌরী বলিল—'কাঁধে। বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু ময়ূরবাহনটা পালাল।'

অন্ধকার কিস্তার বুক হইতে ময়ূরবাহনের হাসি ভাসিয়া আসিল—'হা হা হা—'

ধনঞ্জয় শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু কোনো ফল হইলনা; আবার দূর হইতে হাসির আওয়াজ আসিল। তীব্রস্রোতের মুখে ময়ূরবাহন তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে বলিলেন,—'তুমি যাও; পুলের মুখে আমাদের লোক আছে, সেখানে যদি ময়ূরবাহন জল থেকে ওঠবার চেষ্টা করে, তাকে ধরবে।'

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় তখন গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার আঘাত গুরুতর নয়? সত্যি বলছেন?'

গৌরী বলিল—'এখন সামান্য একটু চিন্‌-চিন্‌ করছে। বোধহয় কাঁধের চামড়াটা ছিঁড়ে গেছে।

'যাক, কান ঘেঁষে গেছে। চলুন—ছাউনীতে ফেরা যাক।'

'চল।'

যাইতে যাইতে ধনঞ্জয় বলিলেন—'উঃ—কি ভয়ানক শয়তানি বুদ্ধি! নিজে নিরস্ত্র এসেছে, আর দুর্গে লোক ঠিক করে এসেছে। কথায়বার্ত্তায় আপনাকে দুর্গের কাছে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তারপর মুখের উপর টর্চ্চের আলো ফেলেছে—যাতে দুর্গ থেকে বন্দুকবাজ

আপনাকে দেখতে পায়। ব্যাপারটা ঘটবার আগে পর্য্যন্ত ওদের মৎলব কিছু বুঝতে পারিনি।'

'না। কিন্তু আমি ভাবছি, ময়ূরবাহন শেষকালে যা বললে তার মানে কি।'

'কি বললে?'

গৌরী জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল। বলিল—'কিছু না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার অগাধ জলে

পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া গৌরী একাকী তাহার খাস তাম্বুতে একটা কৌচে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল। তাম্বুটি বিস্তৃত ও চতুষ্কোণ, মেঝেয় গালিচা বিছানো। মাথার উপর ঝাড় ঝুলিতেছে; দেয়ালে আয়না ছবি প্রভৃতি বিলম্বিত। দরজা জানালাও পাকা বাড়ীর মত, ইহা যে বস্ত্রাবাস মাত্র তাহা কক্ষের আভ্যন্তরিক চেহারা দেখিয়া অনুমান করাও যায়না। খোলা বাতায়ন পথে নিকটবর্ত্তী অন্য তাম্বুগুলি দেখা যাইতেছে—প্রশান্ত প্রভাত রৌদ্রে বাহিরের দৃশ্যটা যেন চিত্রার্পিতবৎ মনে হয়।

গতরাত্রে গৌরী ঘুমাইতে পারে নাই। কাঁধের আঘাতটা যদিও সামান্যই তবু নিদ্রার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছে। তাহার উপর চিন্তা। বিনিদ্র রজনীর সমস্ত প্রহর ব্যাপিয়া তাহার মনে চিন্তার আলোড়ন চলিয়াছে।

অবশেষে এই দুশ্চিন্তা সমুদ্রমন্থন করিয়া মনে একটা সঙ্কল্প জাগিয়াছে। সেই অপরিণত সঙ্কল্পটাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় সে আজ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিল এমন সময় ধনঞ্জয় এত্তালা পাঠাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা খোলা চিঠি।

অভিবাদন করিয়া ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কেমন বোধ করছেন? কাঁধটা—?

গৌরী বলিল—'ভালই। একটু টাটিয়েছে—তা ছাড়া আর কিছু নয়।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আঘাত ভগবানের কৃপায় অল্পই, ব্যাণ্ডেজও যথাসাধ্য ভাল করে বাঁধা হয়েছে; তবু গঙ্গানাথকে খবর পাঠালে হত না? সে বৈকাল নাগাদ এসে পড়তে পারত।'

গৌরী বলিল—'অনর্থক হাঙ্গামা ক'রোনা সর্দ্দার। গঙ্গানাথের আসবার কোনও দরকার নেই।—তোমার হাতে ওটা কি?'

ঈষৎ হাসিয়া চিঠিখানা ধনঞ্জয় গৌরীর হাতে দিলেন—'উদিতের চিঠি। আমরা নাকি কাল রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর বন্ধু ময়ূরবাহনকে মেরে ফেলেছি; তাই আজ আর তিনি শিকারে আসবেন না।'

চিঠি পড়িয়া গৌরী মুখ তুলিল—'ময়ূরবাহন কি সত্যিই মরেছে নাকি?

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িলেন—'ময়ূরবাহন এত সহজে মরবে বলে ত মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই চিঠি লিখে উদিত আমাদের চোখে ধুলো দিতে চায়; ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরে গেছে। যদিও ফিরল কি করে সেটা বোঝা যাচ্চেনা। দুর্গের মুখে রুদ্ররূপ পাহারায় ছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে ঢুকতে পারেনি। তবে ঢুক্‌ল কোথা দিয়ে?'

'কিস্তার টানে সত্যিই ভেসে যেতে পারে না কি?'

'একেবারে অসম্ভব বলছি না। কিন্তু ভেবে দেখুন, সে আপনাকে খুন করে জলে লাফিয়ে পড়বে বলে কৃতসঙ্কল্প হয়ে এসেছিল। যদি তার দুর্গে ফেরবার কোনও পথই না থাকবে তবে সে অতবড় দুঃসাহসিক কাজ করবে কেন?'

গৌরী ভাবিয়া বলিল—'তা বটে। হয়ত জলের পথে দুর্গে ঢোকবার কোনও গুপ্তপথ আছে।'

'সেই কথা আমিও ভাবছি। ময়ূরবাহন যদি কিস্তার প্রপাতের মুখে পড়ে গুঁড়ো হয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে কোনো গুপ্তপথ দিয়ে দুর্গে ঢুকেছে। কিন্তু কোথায় সে গুপ্তপথ?'

'গুপ্তপথ কোথায় তা যখন আমরা জানিনা তখন বৃথা জল্পনা করে লাভ নেই। উদিত আমাদের বোঝাতে চায় যে ময়ূরবাহন মরে গেছে—যাতে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। তার মানে ওরা একটা নূতন শয়তানী মৎলব আঁটছে।—এখন কথা হচ্চে, আমাদের কর্ত্তব্য কি?'

সর্দ্দার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন—'কিছুইত ভেবে পাচ্ছি না।' দাবা খেলিতে বসিয়া ব্যক্তি এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে কোনো পক্ষই নূতন চাল দিতে সাহস করিতেছে না, পাছে একটা অচিন্তিত বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গৌরী হঠাৎ বলিল—'সর্দ্দার শঙ্করসিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে না পারলে কোনও কাজই হবে না। আমি ঠিক করেছি যে করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ভ্রূ তুলিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু কি করে দেখা করবেন?'

'ঐ জানালা দিয়ে। তাঁর অবস্থাটা জানা দরকার। বুঝছ না, আমরা যে তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা করছি একথা তিনি হয়ত জানেনই না। তাঁকে যদি খবর দিতে পারা যায় তাহলে তিনিও তৈরী থাকতে পারেন। তাছাড়া আমরাও তাঁর কাছ থেকে এমন খবর পেতে পারি যাতে উদ্ধার করা সহজ হবে।—আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে—'

'কি মৎলব?'

এই সময় রুদ্ররূপ প্রবেশ করিয়া জানাইল যে কিস্তার পরপার হইতে অধিক্রম সিং মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

আলোচনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। অধিক্রম সিং আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে একটি সুবর্ণ থালির উপর কয়েকটি হরিদ্রারঞ্জিত সুপারি। তিনি কন্যার বিবাহে ঝিন্দের মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন।

ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শিষ্টাচারসম্মত অত্যুক্তি ও বিনয়-বচনের বিনিময় চলিল। তারপর অধিক্রম সিং আর্জ্জি পেশ করিলেন। কন্যার বিবাহে দীনের ভবনে দেবপাদ মহারাজের পদধূলি পড়িলে গৃহ পবিত্র হইবে। অদ্য রাত্রেই বিবাহ। কন্যার সখী মহামহিমময়ী ঝড়োয়ার মহারাণী স্বয়ং আসিয়াছেন; এরূপক্ষেত্রে দেবপাদ মহারাজও যদি বিবাহমণ্ডপে দেখা দেন তাহা হইলে বর-কন্যার ইহজগতে প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকিবে না। ইত্যাদি।

আদব-কায়দা-দুরন্ত বাক্যোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে মহারাজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলে অধিক্রম সত্যই কৃতার্থ হইবেন। মহারাজ কিন্তু তাঁহার বাক্‌বিন্যাস শুনিতে শুনিতে ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, অধিক্রম থামিলে তিনি সজাগ হইয়া বলিলেন—'সর্দারজী, আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আপ্যায়িত হলাম। কৃষ্ণাবাঈ আর বিজয়লাল দুজনেই আমার প্রিয়পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। আজ রাত্রে আমার অন্য কাজ আছে।'

অধিক্রম নিরাশ হইলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইল। গৌরী বলিল—'আপনি দুঃখিত হবেন না। নবদম্পতীকে আমি এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি। তাছাড়া, স্বয়ং মহারাণী যেখানে উপস্থিত, সেখানে আমার যাওয়া না-যাওয়া সমান।'

অধিক্রম যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার অনুপস্থিতিতে শুধু যে আমরাই মর্ম্মাহত হব তা নয়, মহারাণীও বড় নিরাশ হবেন। আমি কৃষ্ণার মুখে শুনেছি তিনি আপনার প্রতীক্ষায়—' কুণ্ঠিতভাবে অধিক্রম কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন। রাজা-রাণীর অনুরাগের কথা, মধুর হইলেও প্রকাশ্যে আলোচনীয় নয়।

তবু অধিক্রম যেটুকু ইঙ্গিত দিলেন তাহাতেই গৌরীর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ দৃষ্টিহীন চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া বলিল—'অধিক্রম সিং, আজ আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত অন্য কখনও—আপনারা বোধহয় জানেন না, কৃষ্ণার কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু এবার সে ঋণ শোধ করতে পারলুম না। যাহোক, আশা রইল কখনো না কখনো শোধ করব।—আপনি দুঃখ করবেন না, বর-কন্যাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, তারা সুখী হবে।'

অগত্যা অধিক্রম ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিদায় লইলেন। গৌরী আবার জানালার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর গৌরী ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া দেখিল তিনি তাহার দিকেই তাকাইয়া আছেন; তাঁহার মুখে একটা নিতান্ত অপরিচিত কোমলভাব। এই লৌহকঠিন যোদ্ধার মুখে এমন ভাব গৌরী আর কখনো দেখে নাই।

ধনঞ্জয় নরমসুরে বলিলেন—'আপনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলেই পারতেন। অধিক্রম দুঃখিত হল।'

গৌরীর মুখে একটা ব্যঙ্গহাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল—'নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেই তুমি খুশী হতে?'

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে আমার দেখা হত যে! তাতেও কি তুমি খুশী হতে সর্দ্দার?'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'কিছুদিন আগে খুশী হতাম না—বরং বাধা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন!—আজ আপনাকে আর কস্তুরীবাঈকে একত্র কল্পনা করে মনে কোনো রকম অশান্তি বোধ করছি না; বরঞ্চ—আপনি না হয়ে যদি শঙ্কর সিং—' সহসা দুইহস্ত আবেগভরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ভগবানের কি অবিচার! কেন আপনি শঙ্করসিং হয়ে জন্মালেন না?'

বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে সর্দ্দারের এই ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ গৌরীরও বহুযত্নলব্ধ চিত্তের দৃঢ়তা যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাহার মনটা দ্রবীভূত হইয়া একরাশ অশ্রুর মত টলমল করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—'কী ক্ষতি হত পৃথিবীর—যদি আপনি শঙ্করসিং হতেন? আমি শঙ্করসিংয়ের বাপদাদার নিমক খেয়েছি কিন্তু তাই বলে মিথ্যে মোহ আমার নেই—শঙ্করসিং আপনার পায়ের নখের যোগ্য নয়। অথচ—যখন মনে হয় আপনি একদিন ঝিন্দ্ ছেড়ে চলে যাবেন, আর শঙ্করসিং ঝড়োয়ার রাণীকে বিবাহ করে গদীতে বসবেন—'

এবার গৌরী প্রায় রূঢ়স্বরে বাধা দিল, বলিল—'ব্যস! সর্দ্দার আর নয়, যা হবার নয় তা নিয়ে আক্ষেপ কোরোনা।—এস এখন পরামর্শ করি। আমার প্রস্তাবটা তোমাকে বলা হয়নি।'

ধনঞ্জয় যেন হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া নীরস কঠোরস্বরে বলিলেন—'বলুন।'

* * * *

মধ্যরাত্রির ঘড়ি বাজিয়া যাইবার পর গৌরী রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় চুপিচুপি শিবির হইতে বাহির হইলেন। ছাউনী নিস্তব্ধ—শিবির-বেষ্টনীর দ্বারমুখে বন্দুকধারী প্রহরী নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল।

পূর্ব্বরাত্রে যেখানে ময়ূরবাহন কিস্তার জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল সেইস্থানে আবার তিনজনে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোনো কথা হইল না, অন্ধকারে গৌরী নিজের গাত্রবস্ত্র খুলিতে লাগিল।

বহু আলোচনার পর কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গৌরী সন্তরণে দুর্গের নিকট যাইবে। সে সন্তরণে পটু, কিস্তার স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেনা। দুর্গের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যে-জানালার কথা প্রহ্লাদ বলিয়াছিল সে সেই জানালার নিকটবর্ত্তী হইবে। রাত্রে জানালায় সাধারণত দীপ জ্বলে, সুতরাং লক্ষ্য হারাইবার ভয় নাই। জানালা জল হইতে দুই-তিন হাত ঊর্দ্ধে, বাহির হইতে কক্ষের অভ্যন্তর একটু উঁচু হইলেই দেখা যাইবে। শব্দ হইবার আশঙ্কাও নাই, কিস্তার গর্জ্জনে অন্য শব্দ চাপা পড়িয়া যাইবে। গৌরী জানালা দিয়া কক্ষের অভ্যন্তর দেখিবে। রাজা সেখানে বন্দী আছেন কিনা এবং রাজার সহিত কোনও প্রহরী আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি না থাকে, তাহা হইলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবে। তারপর দুর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া রাজাকে উদ্ধারের আশ্বাস দিয়া ফিরিয়া আসিবে।

গৌরীকে এই সঙ্কটময় কার্য্যে একাকী পাঠাইতে সর্দ্দার ধনঞ্জয় প্রথমে সম্মত হন নাই; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ ও অধীর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গৌরীর মনের অবস্থা এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহাকে বাধা দিলে সে আরও দুর্নিবার হইয়া উঠিবে।

রুদ্ররূপ তাঁহাদের পরামর্শে যোগ দিয়াছিল কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে হাঁ-না কোনো মন্তব্যই প্রকাশ করে নাই।

গৌরী কাপড়-চোপড় খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কালো রংয়ের হাঁটু পর্য্যন্ত হাফ্-প্যান্ট্ ছিল; আর কোনো আবরণ নাই, ঊর্দ্ধাঙ্গ উন্মুক্ত। কারণ সাঁতারের সময় গায়ে বস্ত্রাদি যত কম থাকে ততই সুবিধা। অস্ত্রও কিছু সঙ্গে লওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই; তবু ধনঞ্জয় একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুপুরীর নিকটস্থ হওয়া অনুমোদন করেন নাই। অনিশ্চিতের রাজ্যে অভিযান; কখন কি প্রয়োজন হইবে স্থির নাই—এই ভাবিয়া গৌরী তাহার দাদার দেওয়া ছোরাটা কোমরে গুঁজিয়া লইয়াছিল। ইহা যে সত্যই কোনো কাজে লাগিবে তাহা সে কল্পনা করে নাই, একটা

সুদূর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া অনাবশ্যক বুঝিয়াও লইয়াছিল। নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ঐ ছোরা যে আজ নিয়তির ইঙ্গিতেই তাহার সঙ্গী হইয়াছে তাহা সে কি করিয়া জানিবে?

বস্ত্রাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া গৌরী অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করিয়া দেখিল রুদ্ররূপও ইতিমধ্যে গাত্রাবরণ খুলিয়া তাহারি মতন কেবল জাঙিয়া পরিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল—'একি রুদ্ররূপ!'

রুদ্ররূপ বলিল—'আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

গৌরী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। রুদ্ররূপ নিজ অভিপ্রায় পূর্ব্বাহ্নে কিছুই প্রকাশ করে নাই। সে অল্পভাষী, তাই তাহার মনের কথা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বোঝা যায় না। গৌরীর প্রতি তাহার অনুরক্তি যে কতখানি তাহা অবশ্য গৌরী জানিত, কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল যাত্রায় সে যে সহসা কোনো কথা না বলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা গৌরী ভাবিতে পারে নাই; তাহার বুকে একটা অনির্দ্দিষ্ট ভার চাপানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ হাল্কা হইয়া গেল। তবু সে বলিল—'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গেলে কি সুবিধা হবে—'

রুদ্ররূপ দৃঢ়স্বরে বলিল—'মহারাজ, আমাকে বারণ করবেন না। সুবিধা অসুবিধা জানি না, কিন্তু আজ আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।'

গৌরী তাহার পাশে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া একটু চাপ দিল, অস্ফুটস্বরে বলিল—'বেশ, চল। তোমাতে আমাতে যে-কাজে বেরিয়েছি তা কথনো নিষ্ফল হয়নি।—কিন্তু তুমি ভাল সাঁতার জানো ত?'

'জানি মহারাজ।'

'বেশ। এস তাহলে।'

কিস্তার পরপারে অধিক্রম সিংয়ের বাগানবাড়ীতে তখন সহস্র দীপ জ্বলিতেছে; মিঠা মৃদু শানায়ের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণার আজ বিবাহ। রাণী কস্তুরী ঐ দীপোজ্জ্বল ভবনের কোথাও আছেন; হয়ত তিনি আজিকার রাত্রে গৌরীর কথাই ভাবিতেছেন। তোহে ন বিসরি দিনরাতি—এদিকে শক্তিগড়ের কৃষ্ণমূর্ত্তি কিস্তার বুকের উপর দুস্তর ব্যবধানের মত দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে একটিমাত্র আলোকের ক্ষীণ শিখা দেখা যাইতেছে। শঙ্কর সিং হয়ত ঐ কক্ষে বন্দী। আর ময়ূরবাহন? সে কোথায়? সে কি সত্যই বাঁচিয়া আছে?

ধনঞ্জয় তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; গৌরী ও রুদ্ররূপ সন্তর্পণে জলে নামিয়া নিঃশব্দে দুর্গের দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

ইউরোপের চিঠি

ডক্‌টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পিএচ্‌-ডি

অনেক দিন চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। জেনেভায় আসবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। আমি জেনেভায় পৌচেছি। এখানে Relfs (রেলফস্‌) পরিবারে আছি। এঁরা আমাকে আহ্বান ক'রে এঁদের বাড়ীতে থাকতে দিয়েছেন। এদেশে কোন বিখ্যাত পরিবারের সাথে থাকলে এঁদের আচার-ব্যবহার বেশ জানতে পারা যায় এবং কিরূপে পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করে এঁরা চলেন, সেটা বেশ জানা যায়। এক একটা পরিবার এদেশে বড় সুন্দর।

আমি জেনেভায় পৌঁছতেই গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী আমাকে ষ্টেশন হ'তে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে পৌঁছে দেখি এক সমাধিমগ্ন মহাদেবের বিরাট ছবি। ছবিখানি বড়ই সুন্দর। এ ছবি দেখেই আমি মিঃ রেলফস্‌কে (Relfs) জিজ্ঞাসা করে জানলেম, এঁরা হিন্দু ধর্ম্মের 'পরে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। মিঃ রেলফস্‌ Theosophist ছিলেন। উপরের ঘরে উঠতেই আমাকে মিঃ রেলফস্‌ (Relfs) এক বর্ষীয়সী মহিলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি ম্যাডাম রোলিয়ার (Madame

Rollier) ; ইনি এখানকার তত্ত্ববিদ্যা সমিতির সম্পাদিকা। ম্যাডাম রোলিয়ার বল্লেন—আপনি ভারতবর্ষ হতে আসচেন, আমাদের শ্রদ্ধা নেবেন। আপনাকে দেখতে ও আলাপ করতে এসেছি। আমি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানালেম। তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে আমাকে তত্ত্ববিদ্যা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হবে বল্লেন। ম্যাডাম রোলিয়ার (Rollier) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। বিশেষতঃ বিহারের ভূমিকম্প সম্বন্ধে। তিনি আমাকে বললেন "আমরা এখান হতে অনেক সাহায্য পাঠিয়েছি।" আমি তাতে কৃতজ্ঞতা জানালেম। ম্যাডাম রোলিয়ারের (Rollier) কথা, এদের প্রাণের পরিসরতা এবং মানবপ্রীতির পরিচয় আমাকে আনন্দ দান করল। এঁদের দেশে এমন প্রাণবান লোক আছে যাঁদের দৃষ্টি সকল মানবের দুঃখ দূর করবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। এ বিষয়ে যেন এ দেশের মহিলারাই বেশী সজাগ।

এ পরিবারটী ছোট—গৃহস্বামিনী, গৃহস্বামী ও তাঁদের দুটী সন্তান। মেয়েটীর নাম 'সীতা,' ছেলেটীর নাম 'আনন্দ'। সীতার বয়স দশ, আনন্দের বয়স চৌদ্দ। এঁদের বাড়ীতে নাগপুরের পুরোহিত স্বামী এসেছিলেন। তিনিই এদের নামকরণ করে গিয়েছেন। এরা এরূপ নামে আহুত হয়ে বিশেষ আনন্দ বোধ করে। আনন্দ ও সীতা আমার চব্বিশ ঘণ্টার সাথী। কিরূপে আমাকে এরা সুখী করবে তাতেই এরা ব্যস্ত। অনেক দিন পরে এত ছোট বালকবালিকার সঙ্গ পেয়ে আমারও চিত্ত একটু সরস হলো। এরা ছেলে মানুষ হলেও, এদের ভদ্রতা, ধীরতা, কমনীয়তা ও সরসতা আমাকে দিনের পর দিন কত না আনন্দ দিয়েছে। শুভ্র ফুলের মত এরা যেমন পবিত্র, তেমনি স্নিগ্ধ। এ বিদেশে এদের স্নেহের ও স্পর্শের মূল্য যে কত তা বেশ অনুভব করেছি।

জেনেভায় পৌছানর পরদিনই গৃহস্বামিনী আমাকে League of Nations এ নিয়ে গেলেন। এখানে দুজন বাঙালী আছেন। Intellectual Co-operation Societyতে এঁরা কাজ করেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জী ও ডাঃ ঘোষের সাথে এদেশ সম্বন্ধে নানা কথা হ'ল। League of Nations এখনও গড়ে ওঠেনি। কল্পনা বিরাট, গড়ে উঠলে বিশ্বব্যাপী সভ্যতার একটা কেন্দ্র রচনা হবে। League এর সম্বন্ধে এদেশের লোকের একরূপই ধারণা নয়। League সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক কথাই বলেছেন। সে সব লেখা এঁদের Journal এ ছাপা হয়। অধ্যাপক Bergson, Gilbert, Murray প্রভৃতি League এর ভিতর দিয়ে বিশ্বশান্তির (World Peace) স্বপ্ন দেখছেন। কেউ কেউ বড় কিছু আশা করেন না—কারণ Leagueএর পেছনে কোন Sanction নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লক্ষ্য তার নিজেরই অভ্যুদয়ের দিকে। মানব সভ্যতার এখনও এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি, যাতে মানুষ তার রাষ্ট্রগত অধিকারের চেয়ে বিশ্বমানবের হিতের দিকে হবে তৎপর। বিশ্বমানব-বোধ এখনও মানুষের চিন্তায় ও কর্ম্মে স্ফুট হয় নি। রাষ্ট্রসংঘের সার্থকতা সেদিন বোঝা যাবে—যেদিন দেখা যাবে কোন প্রতাপশালী রাষ্ট্রের অত্যাচার হতে এ কোন জাতিকে মুক্তি দিতে পেরেছে। তবে রচনা হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ একটা বিশেষ রচনা। হয়ত একদিন একে অবলম্বন করে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সবই নির্ভর করে, মানুষের মুক্ত চেতনার ওপর। রাষ্ট্রবোধ—এ মুক্তির বোধ হতে অনেক দূরে। যেদিন মানুষের অভ্যুদয়ের বিকাশে বিশ্বাত্মা-বোধ হবে পূর্ণ, সেদিনই এ স্বপ্ন হবে প্রকৃত সত্য। মানুষ যত পরিমাণ মুক্তির জন্য হবে তৎপর, ততই তার সমষ্টির রূপকে ভাল করে বুঝতে হবে। সমষ্টির মুক্তি না হলে ব্যষ্টির বা জাতিরও মুক্তি হয় না। ইউরোপে এ সমষ্টিবোধ এখনও বেশ জাগ্রত নয়। ইউরোপের মানস দৃষ্টি এখনও জাতিতেই বদ্ধ। বিশ্বের মুক্তাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় অল্প বলেই মনে হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি এক হলেও জাতিগত বৈষম্যের ও অহংকারের সংকীর্ণতা এখনও ইউরোপ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, যদি সেই অভ্যুদয়ের ভিত্তি রচিত না হয় কোন গভীর অনুভূতির ওপর। বিজয় ও সম্পদ-শ্রী অনেক সময় দৃষ্টিকে সংকীর্ণ ক'রে তোলে।

জেনেভায় অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হ'ল। বিশেষতঃ সুধী সম্প্রদায়ের International সমিতির সম্পাদক Mr. Dessug এর সঙ্গে। লোকটী অত্যন্ত ভদ্র। ইনি Island of Cubaর Consul. ইনি প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ইনি ইনায়েৎ খাঁর প্রধান শিষ্য। একদিন আমাকে আহ্বান করে এঁর সমস্ত পরিবারের সঙ্গে আমার

পরিচয় করিয়ে দেন। জেনেভায় থাকাকালীন ইনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। ইনি যাতে প্যারীতে অধ্যাপক Bergsonএর সাথে আমার পরিচয় হয়, তার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে পত্রাদি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। একজন বিদেশী অতিথিকে কি পরিমাণ সাহায্য করতে হয় তা আমি এঁর কাছ থেকে বিশেষভাবে শিখেছিলাম। ইনি Romain Rollandর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেন।

একদিন দুপুরে আহারের পর Mr. Dessug এসে বল্লেন—'আপনার ভিলেনেভ যেতে হবে—Rolland চা-তে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি রওনা হলেম। লেকের একদিকে জেনেভা, আর এক দিকে ভিলেনেভ। ট্রেণে যেতে সময় লাগল প্রায় দুঘণ্টা। ভিলেনেভে লেকের এক কোণে Vila Olgaতে রেঁালা বাস করেন। তাঁর বাড়ী খুঁজে পেতে আমার বিলম্ব মোটেই হয়নি। দূর হতে একটী মহিলা—তারপর জানতে পারলাম Rollandর ভগিনী—আমাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর অনুসরণ ক'রে একটা ঘরে প্রবেশ করলেম। Rollandর গৃহে আরও দুজন মহিলা বসেছিলেন। আমি নমস্কার করতেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিনমস্কার করে আমাকে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন এবং ঐ দুটী মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহিলাদের ভেতর একজন বর্ষীয়সী ও একটী অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা।

Rollandকে দেখতে ক্ষীণকায়—চেহারাটী খুব দীপ্ত নয়। চোখ দুটী উজ্জ্বল। মুখখানি শান্ত সংযতভাবে পূর্ণ। রক্তহীনতার চিহ্ন মুখে সুস্পষ্ট। একটু হেসে হেসে আমার সঙ্গে কথা বল্তে লাগলেন। Rolland ইংরেজী জানেন না —কাজেই তাঁর ভগিনী আমাদের মধ্যে interpreter হলেন। ভগিনী চমৎকার ইংরেজী বলেন। প্রথমে Rolland গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভারতবর্ষের এই তিন মণিষীর ওপর তিনি খুব শ্রদ্ধাবান। একটু কথা হতে না হতেই তিনি বল্লেন—"চা প্রস্তুত, আসুন, আমরা ভেতরে যাই—"। চার টেবিলে অনেক কথা হতে লাগল। তিনি প্রথমেই আনন্দ প্রকাশ কর্লেন যে ভারত হতে আজকাল অনেকে—বিশেষতঃ Scholarরা এ দেশে আসছেন এবং এ দেশের মণিষীদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করছেন। কালিদাস নাগ, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতির সংবাদ নিলেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার ওপর Rolland বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাকে পৃথিবীর বর্ত্তমান ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা বলে মনে করেন। Rollandর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে, বিশেষতঃ তাঁর সুর জ্ঞান তাঁকে একটা অপার্থিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন করেছে। এজন্যই তিনি যেমন গেটে (Goethe) বিটোভেন (Bethoven)কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখে তাদের ওপর আকৃষ্ট হয়েছেন তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভেতরও তিনি তাঁর দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখেছেন যাতে তিনি এঁদের ওপরও অনুরক্ত হয়েছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে আমাকে বল্লেন—"বর্ত্তমান যুগের তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞানের একটা উৎস—এত সরল, সহজ; কিন্তু অনুভব শক্তিতে এত গরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তাঁর খ্রীষ্টের কথা মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষকে আকর্ষণ করবার শক্তির কথা উত্থাপন করে বল্লেন, ওরূপ শক্তি আমি Christ এর ভেতর দেখেছি—ওদের দেখবার ক্ষমতা অন্যরূপ। এঁরা মানুষের স্বরূপকে সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা বুঝে নেন্। আমি জিজ্ঞাসা করলেম—"আপনি কি Occult দৃষ্টিকে বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর করলেন—"হাঁ নিশ্চয়ই করি—যে জগৎ আমাদের সাধারণ বুদ্ধির নিকট বিকশিত, তার আর পরিধি কতটুকু। কতটুকু আনন্দই বা তা সঞ্চার করে। মানুষ যখন উর্দ্ধ চেতনা সম্পন্ন হয়, তখনই তার কাছে কত সূক্ষ্ম জগতের কল্পনা ভেসে আসে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্যোতি, আনন্দ—স্তরের 'পর স্তর সাজান আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হলে এগুলি আমাদের অধিকারের মধ্যে আসে।" এই বলে বল্লেন—"Bethoven এর নিকট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর ও সুরের কম্পন আসলে তা তিনি অলৌকিকরূপে গ্রহণ করতেন।" তিনি বল্লেন—"আমার খুব বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এরূপ অতীন্দ্রিয়ের জগৎ খুলে গিয়েছিল। তাঁর উপাস্য দেবের সঙ্গে কথা কওয়া, বিবেকানন্দকে চেতনার উর্দ্ধ স্তরে উন্নীত করা, সবই একটা অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেয়। Rolland এ জিনিসটাকে একটা শুধু বিশ্বাসেরই ব্যাপার বলে মনে করেন না—তিনি ভাবেন, এটাও একটা বিজ্ঞান, তবে সাধারণ বিজ্ঞানের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম।" আমি বল্লেম—"যোগে এরূপ অপার্থিব জ্ঞান দেয়। ভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যোগলব্ধ প্রজ্ঞা, যা মানস

প্রত্যক্ষে ধরা পড়েনা তা অতিমানসের বিষয়।" Rolland সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং বল্লেন—"শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে মনে হয় তিনি এরূপ রাজ্যে বিচরণ কচ্ছেন। সম্প্রতি তাঁর 'Riddle of the Universe' আমাকে পাঠিয়েছেন। পড়ে আমার মনে হ'ল তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম।" আমি বল্লেম—"অনেকেই কিন্তু তাঁকে বুঝতেই পারেন না।" Rolland বল্লেন—"খুবই সম্ভব; সকলেরই জগৎ তো এক নয়।"

Rolland এর পর বেদান্তদর্শনের কথার অবতারণা করে বল্লেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে বুঝতে আমার বেদান্ত দর্শন পড়তে হয়েছে। তোমার পুস্তক 'Comparative Studies in the Vedanta' আমাকে মায়ার স্বরূপ বুঝতে অনেক সাহায্য করেছে। German Transcendentalistদের এবং Indian Transcendentalistদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। German Transcendentalistরা তাঁদের দর্শনের মধ্যেই অবহিত—তাদের দৃষ্টি নিজেদের চেতনার ভেতর কার্য্যতঃ বিশ্বকে গ্রহণ করতে পারেনি। কার্য্যতঃ তারা জাতীয়তাকে ছেড়ে বিশ্বকল্যাণকে আহ্বান করতে পারেনি—জীবনে তাদের চিন্তা প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু ভারতের যারা Transcendentalist (অতীন্দ্রিয়বাদী) তাঁদের চিন্তা যেমন প্রাকৃত জগতকে অতিক্রম করেছে, তাদের জীবনের কার্য্যপরিধি তেমন দেশগত পরিধিকে অতিক্রম করেছে। তোমাদের সাহিত্য এরূপ বিশ্বদৃষ্টির কথায় পূর্ণ—'তুমি এ ভেদের কি কারণ মানবার'।" প্রশ্নটা গুরুতর।

সহসা আমার মনে একটা উত্তর এলো। আমি বল্লেম—"তত্ত্বানুসন্ধান ভারতবর্ষে সুধু বুদ্ধির বিলাস নয়—তত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ভারতের আচার্য্যেরা, বিশেষতঃ ঋষিরা সন্তুষ্ট হোতেন না। তত্ত্ব তাঁদের কাছে শুধু বিচারেই ধৃত হয়নি, বিচার পর্য্যবসিত হয়েছে অনুভূতিতে। অনুভূতিতে তত্ত্বটা দীপ্ত হলেই তা আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে—তা জীবনের ভেতর দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সত্যানুভূতি মানুষের অন্তরকে বিরাট বোধে ও ভাবে পূর্ণ করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যেরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এ জন্যই তাঁদের জীবন এক স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হত। কালিক দেশিক ধারণা হতে তাঁরা হতেন সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত। উদার সত্যের অনুভূতিতে জীবনের কল্যাণ ছন্দ তাঁরা বিশ্বময় দেখতে পেতেন। ভারতের দৃষ্টি বিশ্ব-দৃষ্টি। ভারতের ব্রহ্মবাদ ভারতবর্ষের জীবনকে গঠিত করেছে—এই সুর আজও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীজীর, শ্রীঅরবিন্দের ভেতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে বলেই এঁরা কর্ম্ম জগতে, ধ্যান জগতে, জ্ঞান জগতে নেতৃত্ব কচ্ছেন। এ জন্যেই বিবেকানন্দের বাণীকে পাশ্চাত্য দেশ বুঝতে চেষ্টা কচ্ছে। ভারতে সাধনার জীবন এমন স্তরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে শক্তির সঞ্চারকে ভুলে মানুষ হয় বিশ্ব-ছন্দের সঙ্গে পরিচিত।"

Rolland আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। বল্লেন—"তোমার উত্তর শুনে আমার খুব আনন্দ হল। এ দেশে জাতীয়তা হয়েছে ব্যষ্টি—যতবড় জ্ঞানী হন, তাদের কর্ম্মের পরিধি জাতির গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেনা। ভারতবর্ষের বড় বড় মনস্বীদের ভেতর এ বিশ্বসুর আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই সেদিন গান্ধীজি এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। কোথাও যেন এত বড় জাতির পরিচালকের ভেতর জাতীয়তার গন্ধ এতটুকুও নাই। কি উদার! কি প্রশান্ত! বিশ্বহিতে জীবন আহুতি দিয়েছেন। ভারতের কল্যাণে তিনি যতটা উদ্বুদ্ধ, বিশ্ব কল্যাণেও তিনি তার চেয়ে কিছু কম নন্। যে অহিংসনীতির সেবা কচ্ছেন, তাতেই বোঝা যাবে তাঁর কর্ম্ম প্রণালী রচিত হয়েছে বিশ্বপ্রেমের বেদিকার মূলে। বস্তুতঃ সত্যের সম্যক দৃষ্টি হলে, কর্ম্ম কখনও সুধু জাতীয়তাকে নিয়ে থাকতে পারে না। গান্ধীজির কাজ দেখে আপাততঃ মনে হয় তিনি সুধু ভারতেরই সেবা কচ্ছেন; কিন্তু একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে তিনি যে প্রণালীতে কর্ম্ম কচ্ছেন, তা কর্ম্মের বিশ্বনীতি। জগত হতে হিংসাকে দূরীভূত করবার কথা এসিয়া হতেই এসেছে। শাক্যসিংহ ও যীশুর এই একই কথা। এরূপ সার্ব্বভৌমিকতায় ভারতবর্ষ কত শ্রেষ্ঠ।"

এ বলেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ইতালী কেমন দেখে এলে? মুসোলিনীকে কেমন লাগল?"

আমি উত্তর করলেম—"একটা দেশকে এরূপ অল্পদিনের মধ্যে মুসোলিনী যেমন করে তুলেছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা সকলেই করবে। বিশেষতঃ ইতালীর আভ্যন্তরীণ নানা

বাদ বিসম্বাদ নষ্ট করে একটা জাতি গঠন করতে মুসোলিনীর শক্তির পরিচয় সকলেই পেয়েছেন। কিন্তু মনে হয় মুসোলিনীর মৃত্যুর পর এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি ইতালীর রাষ্ট্রের কর্ণধার না হলে হয়ত ইতালীর অভ্যুদয়ের গতি হ্রাস হবে।"

Rolland Fascismএর বিরোধী; তিনি dictatorship ভালবাসেন না, তাই বিশেষ কিছু না বলে বল্লেন—"মুসোলিনী মনে করেন, তিনি কখনও মরবেন না।"

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম—"তিনি ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যতের গতি কোন দিকে মনে করেন।" এ প্রশ্ন করতে তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"ইউরোপের ভবিষ্যত আমি বড় ভাল দেখিনে। ইউরোপে এখন প্রায় সর্ব্বত্রই dictatorship স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে আমি আভ্যন্তরীণ শান্তির কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয়, ইউরোপে আরও অশান্তির সৃষ্টি হবে।" এ কথাগুলি বলে চুপ করে রইলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে বল্লেন—"আমরা চাই সমস্ত জগতে একটা শান্তির বাণী প্রচার করতে। সমস্ত বিশ্বময় শান্তির বার্ত্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে মানুষ শান্তিকামী হয়। প্রত্যেক জাতিকে এরূপ শান্তিভাবাপন্ন করতে পারলে তবে আশা করা যেতে পারে যে মানব জাতি এরূপ আত্মহত্যা হতে বাঁচবে।"

কথাগুলি শুনে আমার খুব আনন্দ হল, কারণ ভারতে এরূপ শান্তির বাণী এক মহাপুরুষ প্রচার কচ্ছেন। কিন্তু আমি বল্লেম—"অনেক সময় শান্তির কথা কার্য্যকরী হয় না, যদি তার পিছনে শক্তি না থাকে। পৃথিবীতে এরূপ শান্তির প্রচার আরও হয়েছে, কিন্তু তার পিছনে শক্তি না থাকায় তা নষ্ট হয়ে গেছে।"

Rolland বল্লেন "ঠিক তা নয়, মানুষের ভেতর এমন কিছু আছে যা তাঁকে শান্তির ভাবনা হতে দূরে রাখে। মানুষ ঠিক শান্তির স্বরূপকে বোঝে না—যদি বুঝত, তবে অশান্তির সৃজন থেকে বিরত হতো। মানুষের ভেতর একটা এলোমেলো ভাব আছে বলেই মানুষের দৃষ্টি শান্তির ও মৈত্রীর দিকে থাকা বিশেষ দরকার। এদের ধরতে পারলে জীবনের ছন্দ এদিকেই ধাবিত হয়। তখন আপনি শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে ইউরোপে আমরা শক্তির কথাই শুনতে পাই—তাতে এমন কিছুই পাইনে যা জীবনের কোন গভীর অনুভূতির পরিচয় দেয়। জীবনের গঠন মূলে যে শক্তি বিরাজ করে, তার ভেতর আছে এমন একটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ সুর—যা পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে শক্তিগুলিকে সন্নিবেশিত করে' মনোরম সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কদের কথার ভেতর এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্যেই এক দল লোকের এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যারা সত্যিই জীবনের সৃজনশক্তিগুলিকে বেশ বুঝে' মানব সমাজের কাছে তা ধ'রে দিতে পারে। এর জন্যেই প্রত্যেক দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাবের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। যাদের চিন্তা সাময়িক প্রয়োজনে নিবদ্ধ থাকবে না —সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানব সভ্যতাকে কল্যাণের দিকেই অগ্রসর করিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে।"

আমি বল্লেম—"বিশ্বশান্তির কথাটা আজ এত বড় হয়েছে আমাদের সামনে, এইটে বড় আশার কথা। এতেই মনে হয় একটা নবীন সুর মানুষের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হচ্চে, কিন্তু এখনও তা স্পষ্ট হতে পারে নি। এর জন্য হয়ত অপেক্ষা করতে হবে। কালের সৃষ্টির ওপর একটা প্রভাব আছে—কাল পূর্ণ না হলে কোন সৃষ্টি পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না।"

Rolland উত্তর করলেন—"ঠিকই। ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যখনই সভ্যতার একটা দিক নির্ণয় হয়েছে, তখনই বিরুদ্ধ শক্তি হয়েছে কার্য্যকরী। এরূপ বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে খৃষ্টের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকার জগতেও এমনি শক্তির সন্নিবেশ হচ্ছে যে মনে হয় জগতে একটা অধ্যাত্মবিকাশের সময় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। আজ মানুষের এত শক্তি, কিন্তু মানুষের শান্তি নেই—এটা কি অস্বাভাবিক নয়?"

Rollandকে আমার বড় ভাল লাগল। এত বড় লোক, অথচ কেমন খোলা। বড়লোকের কোন ভান নেই; হৃদয়টা মানবপ্রেমে পূর্ণ।

রোঁলার ভগিনীর ভেতর একটা স্বাভাবিক প্রসন্নতা আছে। যেমন বিদুষী, তেমনি স্নেহশীলা ও বিনয়ী। এঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রমণীসুলভ কোমলতার সঙ্গে জীবনব্যাপী সাধনার স্থিতি বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছিল।

আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি Rolland ও তাঁর ভগিনীর কাছ হতে বিদায় নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। তখন চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া নেবে এসেছে। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল—সন্ধ্যার শ্যামল শ্রী দেখতে দেখতে আমি লেকের ওপরের রাস্তা দিয়ে চল্লেম। আমার হৃদয় তখনও ভরে ছিল—Rolland ও তাঁর ভগিনীর সঙ্গ-সুখের স্মৃতিতে। পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মণীষীর সাথে আলাপ করে বুঝেছিলাম, হৃদয়ের ব্যাপকতা ও বিশ্বের সাথে অভিন্নবোধই প্রতিভাকে করেছে এত দীপ্ত ও মধুর।

ঘাতে প্রতিঘাতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(৭)

টাকা যাহা আসিত, সব খরচ হইত না। যাহা বাঁচিত, মাসে মাসে লতা তাহা ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিত। প্রায় দুইশত টাকা তাহাতে হইয়াছিল, অলঙ্কার সামান্য যাহা ছিল, তাহাও অতি সাবধানে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটি বড় হইয়া উঠিবে, লেখাপড়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। তারপর ব্যারামপীড়া আছে, কখন কি অভাবে পড়িতে হয়, কিছুই বলা যায়না। তৈজস-পত্র যাহা ছিল, বৈধব্যের পর সঙ্গে সব লইয়াই মন্দাকিনী ভ্রাতৃগৃহে আসেন। এগুলি অতদূরে লইয়া যাওয়া যায়না, গেলেও হয়ত রাখিবার স্থান হইবেনা। মায়ে ঝিয়ে পরামর্শ হইল, আশু যে খরচ পত্রের প্রয়োজন হইবে, এইগুলি বিক্রয় করিয়াই যতদূর সম্ভব, তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। মন্দাকিনী তাই আরম্ভ করিলেন। কিছু সময় ইহাতে লাগিবে। গ্রাম অঞ্চলে অত সহজে এসব বিক্রয় হয়না। লোকেও গরজ দেখিয়া যো পাইয়া বসে। দুই টাকার দ্রব্য দুই সিকিতেও নিতে চায়না। দুঃখী ও অভাবগ্রস্তের সম্পত্তি বিক্রয়ের অবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ।

দুখানা থালা কে দেখিতে চাহিয়াছিল। বৈকালে একদিন মন্দাকিনী তাহা লইয়া বাহির হইলেন। পুকুর-পাড়ে আসিতেই বিন্দী তেলিনী নাম্নী প্রৌঢ়া এক গ্রাম্য বিধবার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেক সময় সে মন্দাকিনীর নিকটে আসিত; গল্পসল্প করিত; লতার ছেলেটিকে খেলা দিত, ঘরের দুই একখানা কাজ করিয়াও দিত। এক গাল হাসিয়া বিন্দী কহিল, "কোথায় যাচ্ছ গা দিদি ঠাক্‌রুণ, থালা নিয়ে ?"

"ঐ সীতুর মা দেখ্‌তে চেয়েছিল।"

"কিন্‌বে বুঝি ?"

"কে জানে বোন্ ? পছন্দ যদি হয়, দরে যদি বনে—"

"দেখি, থালা দুখানা একটু দেখি। আমি যাচ্ছিলাম, বলি, দেখি যদি ছোট একটু থালা কিন্‌তে পারি। কোন্ আবাগী সেদিন ঘরে ঢুকে থালাটুকু নিয়ে গেল—" বলিতে বলিতে বলিতে বিন্দী থালা দুখানা হাতে লইল। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া ভার পরীক্ষা করিয়া কহিল, "এই ছোট থালাটুকু কততে দিতে পার দিদি ?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "কি দাম হয় ব'ল্‌তে ত পারিনে। দেখি, ওরা কি বলে। দুঃখে পড়েছি, বোন, উচিত দাম ত কেউ দিতে চায় না।"

সশব্দে লম্বা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দী কহিল, "কপাল—কপাল! সব দিদি, এইখেনে লেখা আছে। নইলে আজ লোকেই বা যা ব'ল্‌তে নেই তা ব'ল্‌বে কেন, আর সব বেচে কিনে তোমাদেরই বা কাশীবাসে যেতে হবে কেন ? তা কপালের দোষে দায়ে ঠেকেছ, লোকেও গরজ দেখ্‌ছে। একটু ধম্মজ্ঞান কি এই পাপকলিতে কোথাও কারও আছে দিদি ? গরজ দেখ্‌ছে টাকাটার জিনিসে সিকেটাও কেউ দিতে চায়না। তা কত দাম হ'লে ওটা দিতে পার ?"

"তুই কি দিতে পারিস্ বল্। দেখি, যদি পোষায়—"

থালাখানি বিন্দী আবার একটু নাড়িয়া দেখিল, ভারটাও আবার একটু পরীক্ষা করিল। শেষে কহিল, "পুরোণো কাঁসা—তা ভারী টারী বেশ আছে। টাকাটেক দাম বোধহয় হ'তে পারে। কি বল দিদি ?"

মনে মনে মন্দাকিনী বড় হৃষ্ট হইলেন। আট আনার বেশী দাম এ লাগাৎ কেহ বলে নাই। আর বিন্দী কিনা একেবারেই একটাকা বলিয়া ফেলিল! মাগীর আক্কেল পছন্দ একটু আছে বটে। কহিলেন, "তা দিস্ বরং একটা টাকাই। টাকা কি সঙ্গে আছে ? এক্ষুণি নিয়ে যাবি থালাটা ?"

আবার এক গাল হাসি বিন্দীর মুখ ভরিয়া ফুটিল। থালাখানি মাটিতে রাখিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধা গিঁট খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। কহিল, "হাঁ দিদি-ঠাক্‌রুণ, সঙ্গেই একেবারে নিয়ে এসেছিলাম। ভাব্‌লাম দরে যদি বনে, একেবারে নিয়েই যাব। এই নেও।"

টাকাটি মন্দাকিনীর হাতে দিয়া থালাখানি তুলিয়া লইয়া বিন্দী আবার কহিল, "তোমাদের দুঃখের কথা দিদি ব'ল্‌তে ফুরোয়না, ভাব্‌তে বুক ফেটে যায়। ওমা, জামাই কি কারো নিরুদ্দেশ হয়না? ষাট, ঐ ছেলেটি কোলে আছে, কি সব ঘেন্নার কথাই না পোড়ারমুখো পোড়ারমুখীরা ব'ল্‌ছে! ধর্ম্মের দিকে চেয়ে দরদ ক'রে দুটি কথা বলে এমন মনিষ্যিই কি এ হতভাগা গাঁয়ে আছে? ঐ এক শিরোমণি ঠাকুর—গাঁয়ের দেবতা (যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া) ব'ল্‌তে হয়—সেদিন এসে পৈতে দিয়ে আবার খেয়েও গেলেন। তা হাজার হ'লেও বুড়ো হাব্‌ড়া মানুষ—পয়সা কড়িও এমন কিছু নেই—কি ক'র্‌বেন তিনি?"

"না, যথেষ্ট দয়া ক'রেছেন। আর কি ক'র্‌তে পারেন?"

"হাঁ, তাইত ব'ল্‌ছিলাম। সাধ্যি যদি থাকৃত, নিজের ঘরে নিয়ে তোমাদের রাখ্‌তেন। লোকের মুখও বন্ধ হ'ত। তা—সেটা ত আর হয়না।"

"না, তিনিও পারেন না। আর আমরাই বা কোন্ মুখে গিয়ে একথা তাঁকে বলি।"

"আর মানুষ ব'ল্‌তে গাঁয়ে আছেন ঐ চৌধুরী বাড়ীর সেজবাবু—বংশের মুখ উজ্জ্বল ব'ল্‌তে ওঁকে দিয়েই হ'চ্ছে। বিলেতে গিয়ে বড় উকিল—সেই কিনা বলে—হাঁ, বারুষ্টে হ'য়ে এয়েছেন—মুঠোমুঠো টাকা রোজগার করেন। যেমন বিদ্যে, তেম্‌নি ক্ষ্যামোতা—আবার প্রাণটাও তেম্‌নি দরাজ! এই ত দেশে যখন আসেন, গরীব দুঃখী লোক আমরা—দেখ্‌লেই এক গাল হেসে অম্‌নি ব'ল্‌বেন, ভাল আছ ত বিন্দু পিসী?"

ধীরে ধীরে মন্দাকিনী কহিলেন, "হাঁ, শুনেছি সে লোক খুব ভাল। দেশেও আসে যায় খুব। ভেবেছিলাম, একবার ওর কাছে যাব, বিলেতে ছিল, সেথায় যদি চেনাশুনো কারও কাছে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দিতে পারে—"

"ওমা, ভেবেছিলে যদি, তবে যাওনি কেন? খোঁজখবর—তা উনি মনে ক'র্‌লে নিয়ে দিতে পারেন বই কি? এইত, নিজেই সেদিন ব'ল্‌ছিলেন—"

"ব'ল্‌ছিলেন? কি ব'ল্‌ছিলেন বিন্দী?"

"এই ত সেদিন গিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ীতে—বাবুর বড় দয়া—যখনই আসেন, গিয়ে চাইলে কিছু দেন থোন। তা গিয়ে দাঁড়াতেই হেসে অম্‌নি দুটো টাকা ফেলে দিলেন। তারির একটা দিয়েই না থালাটুকু কিন্‌লাম। নইলে নগদ একটা টাকা কি আর আমরা অম্‌নি বের ক'রে দিতে পারি?"

"তা—কি ব'ল্লেন আমাদের কথা?"

"ওখানে ঐ রামবাঁড়ুয্যের ছেলে, য'তে বোস্, সারদা ঠাকুরের নাতি—ওরা সব ছিল কিনা—এই তোমাদের কথাই হচ্ছিল। এই যে বিতিকিচ্ছে একটা অত্যেচার তোমাদের ওপর হ'ল অনেক দুঃখু তা নিয়ে ক'র্‌লেন। শেষে বল্‌লেন, ওরা কাশী যাচ্ছে, কি ক'র্‌বে সেথায় গিয়ে? যায়গা ভাল নয়, কত রকম বিপদও হ'তে পারে। তা কাশী না গিয়ে যদি ক'ল্‌কেতায় গিয়ে থাকৃত, আমি চেষ্টা চরিত্তির ক'রে দেখ্‌তাম, জামাইটির খোঁজখবর পাওয়া যায় কিনা। কোন্ একটা আফিস্ থেকে টাকাও ত আস্‌ছিল—"

"হাঁ, সেখানে তেমন তদ্বির একটা ক'র্‌তে পার্‌লে, সে যে কে এটুকু খবর হয়ত পাওয়া যেত। আমিও একবার ভেবেছিলাম, ক'ল্‌কেতায় গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখি। তা কোথায় গে দাঁড়াব, কে তদ্বির ক'র্‌বে, জানাশুনো লোক ত কেউ নেই—"

"কেন গা, উনিই ত রয়েছেন। দয়ার শরীর—একটিবার যদি বল, উনিই সব ক'রে ক'ম্মে দেবেন।—তবে তোমাদের গে' থাক্‌তে হয় সেখানে, নইলে অত গরজ সত্যি হবেনা। কাজের মানুষ—খেতে শুতেই শুনেছি সময় হয়না।"

"কিন্তু থাক্‌ব গে কোথায়? কাশীতে আমাদের মত অনাথা মেয়ে মানুষ আর পাঁচজন র'য়েছে, কাজকর্ম্ম করেও খায়, বন্দেজ যা হয় একটা হবেই। কিন্তু ক'ল্‌কেতায়—"

"কেন, মস্ত বাড়ী ওঁর রয়েছে, কত লোকজন থাকে, খায় দায়, ভাবনা কি? না হয়, আলাদা ছোট্ট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রেই তোমাদের রেখে দেবেন। তবে খরচ পত্তর কিছু বেশী হবে। তা—দু'চার ছ'মাস—এই ধর জামাইটির খোঁজ যদ্দিন না হয়—উনিই কি চালিয়ে নিতে পারেন না?"

কথাগুলি—যেন কেমন কেমন লাগিল। এতটা উনি করিবেন—কেন? মন্দাকিনী দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আবার একগাল হাসিয়া বিন্দী কহিল, "কি ভাব্‌ছ দিদি ঠাক্‌রুণ? ভাবনার কিছু নেই। দু-তিনদিন

বাদেই ত উনি যাবেন, সঙ্গেই অম্‌নি তোমরা যেতে পার। বল ত আজই গিয়ে আমি সেজবাবুকে বলি।"

মন্দাকিনী শিহরিয়া উঠিলেন! ত্রস্তভাবে কহিলেন, "না না, ছি! তা কেন ব'ল্‌তে যাবি তুই? না, সে হয়না। আচ্ছা—একটু ভেবেই—বরং দেখি।"

"তা দেখ, ভাব্‌তে হয় বই কি? না ভেবে কি কোনও কাজ কারও ক'র্‌তে আছে? তবে ভাবনার এমন কিছু নেই। দয়া ক'রে উনি যখন ব'ল্‌ছেন খোঁজখবর ক'রে দেবেন—"

মন্দাকিনী কহিলেন, "তা খোঁজখবর যদি ক'রেই ও দিতে পারে, আমরা কাশীতে গিয়ে থাক্‌লেও ত পারবে। আমি বরং গিয়ে সব কথা ওকে বুঝিয়ে ব'লে আস্‌ব। ঐ যে আফিস্ থেকে টাকা আস্‌ত—ওরা বড়লোক, হয়ত খাতির একটু ক'র্‌বে, কি জোর ক'রেও চেপে ধ'র্‌তে পারবে। তা দয়া ক'রে যদি করে—"

"সে ত করবেনই। যা দরকার সব করবেন।—তবে বড় লোক—কাজকর্ম্ম মেলাই—খেতে শুতেই সময় হয় না—হয়ত তেমন গরজ হবে না, কি খেয়ালই এদিকে থাক্‌বে না। তবে তোমরা যদি কাছে গিয়ে থাক, আর তাগিদ টাগিদ সদা সর্ব্বদা কর, মনেও থাক্‌বে, গরজও হবে।"

"হুঁ—তা হবে বই কি? কিন্তু—আমরা—না বিন্দী, আমরা গিয়ে তার আশ্রয়ে থাক্‌তে পারিনে। ওখানে বাড়ী ক'রে দেবে—খরচ পত্তর সব চালাবে—এতই বা করবে কেন? একটু খোঁজ খবর ক'রে দেওয়া, তা সত্যি যদি দয়া থাকে—মন ক'র্‌লে এম্‌নিই কি তা পারে না?"

গালে হাত দিয়া বিন্দী কহিল, "ওমা, তুমি কি ভাব্‌ছ বল দিকিন দিদিঠাকরুণ? সেজবাবু—ছি ছি, অমন পাপ কথা কি মনেও কখনও আন্‌তে আছে? সে ধাতুরই মানুষ তিনি নন, সোনার লক্ষ্মী ঐ বউ ঘরে—মাথায় ক'রে তাকে রাখেন। আর কাচ্চা বাচ্চাও যাট্‌ কটি হ'য়েছে—ছি!—তাও কি হয় কখনও? দুঃখী ব'লে এত দয়া তোমাদের ক'র্‌তে চাইছেন, আর তুমি কি না—"

একটু অপ্রতিভ হইয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "না না, ঠিক তাও কিছু আমি ভাব্‌ছি নি। তবে কিনা—দেখ্‌ছিস্ ত, অদেষ্ট আমাদের বড় মন্দ—এম্‌নিই কত কথা হ'চ্ছে। এখন ওর সঙ্গে যদি যাই, ওর আশ্রয়ে গিয়ে এই ভাবে থাকি—"

"হাঁ, মন্দ দু কথা লোকে ব'ল্‌তে পারে বই কি? তা ঢাক ঢোল পিটিয়ে পাঁচজনকে জানিয়ে নেই গেলে। উনি ত দুদিন বাদেই যাবেন, চ'লে যান। শেষে তোমরা কাউকে নিয়ে গেলে—বাড়ীটাড়ী সব আগে ঠিক ক'রে রাখবেন—একটা চিঠি দেবে, ইষ্টেশনে লোক রাখবেন, সে তোমাদের সেই বাড়ীতে নিয়ে তুল্‌বে। কে জান্‌বে যে কোথায় গেলে, কোথায় রইলে?"

এদিক ওদিক চাহিয়া একটু চাপা গলায় বেশ একটু জোর দিয়াই বিন্দী এই শেষ কথাগুলি বলিল। কেমন একটা আতঙ্কে সমস্ত শরীর মন্দাকিনীর শির শির করিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। ওমা! মাগী বলে কি?—ভদ্রঘরের মেয়েমানুষ কেউ তা পারে? কহিলেন, "না না, তাও কি হয়? তুই কি ব'ল্‌ছিস্ বিন্দী?"

"বল্‌ছিলাম ত ভাল কথাই—আখেরে ভাল হ'ত। তা—তোমাদের ভাল—তোমরা যদি না বোঝ— বরং ভেবেই একটু দেখ না গো!"

"না, ভেবে আর কিছু দেখতে হবে না। তোর কাজে তুই এখন যা।"

বলিয়াই মন্দাকিনী পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল, টাকাটি ওকে ফেলিয়া দিয়া থালাখানি ফিরাইয়া নেন। কিন্তু খয়রাত ত নেন নাই; উচিত দামে থালা বেচিয়া নিয়াছেন। ফেরতই বা দিবেন কেন? কিন্তু টাকাটা হাতে রাখিতেও হাত যেন তাঁহার পুড়িয়া যাইতেছে! পথে শেষে এক ডোবায় তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

তখন মনে পড়িল, ঐ যে ছেলেরা সেদিন আসিয়াছিল, তাহাদেরও মুরুব্বি উনি! সর্ব্বনাশ! কি মতলব যে উহার আছে। ভালয় ভালয় এখন কাশীতে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে হয়। কিন্তু সেখানেও—না, বাবা বিশ্বনাথ আছেন; বড় দুঃখে, বড় বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় তাঁহারা লইতেছেন। এটুকু দয়াও তিনি করিবেন না? কেন তবে লোকে তাঁহাকে দয়াময় বলে?

এসব কথা মন্দাকিনী লতাকে কিছু বলিলেন না। আট দশ দিনেই জিনিসপত্র বিক্রের যাহা ছিল, যে মূল্যেই যেটা হউক, বিক্রয় হইয়া গেল। ভ্রাতার সঙ্গে মন্দাকিনী কন্যা সহ কাশীতে চলিয়া গেলেন।

(৮)

বাড়ীখানি মণিঠাকুরাণী নামে পরিচিতা কাশীবাসিনী প্রবীণা একজন বিধবার। ত্রিতলে দুইটি ঘরে নিজে থাকেন, দোতলায় ও একতলায় কয়েকটি ঘর ভাড়া দেন। এই আয়ে বেশ সচ্ছল ভাবেই তাঁহার চলে। লোকে বলিত, অনেক টাকার কোম্পানীর কাগজও বাড়ী-ওয়ালী বামুন গিন্নীর আছে। তবে নাকি বড় চাপা, সে কথা কাউকে ফাঁস করে না। চড়া দরে ঘর ভাড়া দিয়া কড়ায় গণ্ডায় সব ওয়াদা মত আদায় করিয়া লয়। বলে, নহিলে খাইব কি? উহাই আমার সম্বল। তা খাইতেই বা একটা বিধবার কত আর মাসে লাগে? তবে ব্রত-পূজায় কিছু খরচ করে। চারি বৎসর জগদ্ধাত্রী-ব্রত করিয়াছিল; গেল বৎসর আবার একটু দুর্গাপূজাও করিল। পুরো-হিতকে সোনার আংটি আর গরদের জোড় বরণ, আবার মহাষ্টমীতে নথ ও বেনারসী শাড়ীও পূজায় দিয়া বেশ ঘটা করিয়াছিল। তা নিজে পুণ্য করে, পরকালের জন্য সঞ্চয় করে। দুঃখী বলিয়া ভাড়াটিয়া কাহাকেও ত দয়াধর্ম্ম করিয়া দুটি পয়সা কখনও ছাড়িয়া দেয় না। দিলে পর-কালের কাজ কি তাহাতেই কিছু হয় না? যাহা হউক, ভাড়াটিয়া কি প্রতিবেশী, দুঃখে কি ঈর্ষায়, যেই যাহা বলুক, এই বিধবারই গৃহে নীচের তলায় একটি ঘর তখন খালি হইয়াছিল। এইটি ভাড়া নিয়া ভগ্নী ও ভাগ্নীর থাকিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যোগেশ বাঁড়ুয্যে দেশে ফিরিয়া গেলেন। কয়েকটা মাস কষ্টেসৃষ্টে চলিয়া যাইতে পারে, এমন সংস্থান অবশ্য হাতে ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বসিয়া খাইয়াও ত তাহা শেষ করিয়া ফেলা ঠিক হইবে না। কাজ করিয়া খাইতেই যখন হইবে, যত শীঘ্র আরম্ভ করিয়া হাতের সম্বল হাতে রাখা যায়, ভাল। কাজও পাচিকার বৃত্তি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। ছোট মেয়েদের পড়াইতে এবং কিছু শিল্প শিক্ষা দিতে লতা অবশ্য পারিত। কিন্তু কাশীবাস কতকটা প্রবীণপ্রবীণাদের বানপ্রস্থ গ্রহণের মত। এসব গৃহে ছোট ছেলে মেয়ে বড় থাকে না। অন্য কাজ কর্ম্ম করিয়া গৃহস্থ যাহারা এখানে বাস করে, তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নয়। যাহারা আছে, ছেলে-পিলেদের জন্য পয়সা খরচ করিয়া গৃহশিক্ষক রাখিবার মত অবস্থা তাহাদের কাহারও বড় নাই। তারপর কর্ম্মপ্রার্থী পাশকরা পুরুষ শিক্ষকও দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহাদের অতিক্রম করিয়া লতার মত একটি মেয়ের পক্ষে এরূপ শিক্ষকতা লাভ সহজে ঘটিতে পারে না।—সুতরাং আপাততঃ পাচিকাবৃত্তি গ্রহণই তাহাকে করিতে হইবে। সেই চেষ্টাই উভয়ে করিতে লাগিলেন।

মণিঠাকুরাণীর পাচিকাটি একদিন ঝগড়া করিয়া কাজ ছাড়িয়া গেল। নূতন পাচিকা তিনি খুঁজিতেছেন জানিয়া মন্দাকিনী গিয়া কাজটি চাহিলেন। মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "তুমি রাঁধ্‌বে বাছা! বল কি? কাশীতে এয়েছ—"

মন্দাকিনী কহিলেন, "কেউ আর ত্রিসংসারে নেই মা। মায়ে ঝিয়ে কাজ কর্ম্ম ক'রে খাব, তাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি।"

"কেন, তোমার মেয়েটি ত—ষাট্ সধবা। তা ওর সোয়ামী—"

"এই তিন চার বছর নিরুদ্দেশ মা। শ্বশুরকুলেও কেউ নেই।"

"আহা, এই কাঁচা বয়েস, কোলে ঐ ষেটের বাছাটুকু—বড় ত দুঃখী তোমরা! তা বাছা, ঘর ভাড়াটা দিতে পারবে ত? কি জান মা, এই সম্বল ক'রেই বাবা বিশ্বনাথের পায়ে এসে প'ড়ে আছি।"

"তা পারব মা। কাজ ক'রে দুটো খেতে পাই ত ঘর ভাড়াও দিতে পারব। দিতে ত হবেই। তুমি যদি দয়া ক'রে রাখ মা—"

"তা কেন রাখ্‌ব না মা, তা কেন রাখ্‌ব না? তবে—হাঁ, ভাল রাঁধতে পার ত বাছা? যা তা আবার ছাই মুখেও দিতে পারিনে। তাই নিয়েই না মাগীর সঙ্গে ঝগড়া হ'ল। কাল ত রাজরাণী রাগ ক'রেই চ'লে গেলেন। কত জনেই ওঁর রান্না খেয়ে মাইনে দিয়ে ওঁকে রাখবে! তা তুমি রাঁধতে পার ত ভাল?"

"দুটো একটা দিন খেয়ে দেখ মা; ভাল যদি না লাগে, রেখো না।"

"বেশ কথা ব'লেছ মা। হাঁ, বুদ্ধিমানের মেয়ের মতই কথাটা ব'লেছ। তা বেশ, রাঁধ, দুদিন খাই, তখন একেবারে পাকাপাকি একটা মাইনের বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

তা ভাল বামুনের মেয়ে ত তুমি? হাতে খাব—বামুনের মেয়ে—বিধবা—কাশীতে আছি—"

"হাঁ মা, ভাল বামুনের মেয়েই আমি। নইলে কি সাহস ক'রে এসে তোমার ভাত রাঁধতে চাইতাম?"

বলিয়া মন্দাকিনী তাঁহার কুলবংশ ও পিতৃপতি-পরিবারের বাস্তুভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। মণি-ঠাকুরাণীও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাককুশলতার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

হাঁ, বামুনের মেয়ে রাঁধে ভাল। কয়দিন ত গেল। ডাল, সুক্ত, ঘণ্ট, ডালনা, চচ্চড়ী, অম্বল—যাহা কিছু রাঁধিল, সব যেন মা অন্নপূর্ণার হাতের পরশে অমৃতময়! মণিঠাকুরাণী বড় হৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, "বেশ রাঁধ তুমি বাছা। সত্যি কথাও ব'লতে হয়, এমন রান্না খাইনি আর কখনও। তা মাইনে কি চাও?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "আমি আর কি বল্‌ব মা? তুমি যা দয়া ক'রে দেও—"

"তা দেখ, একলা একটা বিধবা আমি, কাজ এমন বেশী নয়, আর এক বেলাতেই ল্যাঠা চুকে যায়। ওকে ত তিনটে ক'রে টাকা দিতাম। তা তুমি বাড়ীতে আছ, খেও বরং আমার এখানে। তাতেও ত মাসে—ধর, চার পাঁচটা ক'রে টাকা তোমার বেঁচে যাবে।"

মন্দাকিনীর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। আঁচলে পুছিয়া কহিলেন, "খেতে চাইনে মা। ঐ মেয়েটি আর নাতিটি র'য়েছে—ওদের ফেলে—"

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। আর বলিতে পারিলেন না।

মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "তা বটে মা, তা বটে! ওদের কবে কি জোটে না জোটে, তার ত ঠিক কিছু নেই। আমার এখানে যা'হক পাঁচ রকম হয়। কি ক'রে তুমি তা মুখে তুল্‌বে? আর আমিই বা কি করি বল? ভদ্দর বামুনের মেয়ে তুমি বিধবা, নিজের হাতে রেঁধে-বেড়ে সব আমাকে দিয়ে যাবে, নিজে কিছু খাবে না, সেটাও কি ভাল হয়? আমারও ত মানুষের আত্মা র'য়েছে। না বাছা, সেটা আমার ভালই লাগ্‌ছে না। তবে এক কাজ বরং ক'রো। তোমার খাবারটা তুমি নীচে নিয়ে যেও। তার পর নাতিকে দিলে কি মেয়েকে দিলে কি নিজেও বা কিছু খেলে—কি বল, সেটা কি মন্দ হবে?"

চক্ষু মুছিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "বেশ, তাই হবে, মা।"

বলিতে বলিতে মন্দাকিনী একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। লক্ষ্য করিয়া মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "হাঁ, মাইনে ব'লে টাকা কিছু কিছু ধ'রে দিলেই তোমার সুবিধে হ'ত। তিনটে পেট—শাক ভাত যা যেদিন জুটত পেট ভ'রেই খেতে। তা নগদ কিছু এর ওপর ধ'রে দেওয়া—সেটা কি জান বাছা—বড্ড গায়ে লাগ্‌বে। তবে—বড় দুঃখে প'ড়েছ ঐ মেয়েটি আর নাতিটিকে নিয়ে—আর দুঃখ কার ভাগ্যে কি লেখা আছে কেউ ব'লতে পারে না। মানুষ যেদিন ম'ল সেই দিন ব'ল্‌তে পারে দুঃখু এড়িয়ে গেল।—তা বড় একটা মমতাও হ'চ্ছে—তোমার খাতিরে ঘর ভাড়াটা বরং ছেড়ে দিতে পারি। ওতেও ধরগে, তিনটে ক'রে টাকা তোমার মাসে বেঁচে গেল। আমারও এমন গায়ে লাগল না কিছু। ঘর ত মাঝে মাঝে খালিও থাকে। কি বল? এতে তোমার পোষাবে ত?"

কৃতার্থ হইয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "যথেষ্ট দয়া ক'র্‌লে মা। এর ওপর আর কি বল্‌তে পারি?"

মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "যদি পার বাছা, গতরে যদি কুলোয়, পাড়ার আরও দুই একজনকে রেঁধে দিতে পার। আমি খুব সকালেই খাই। কেউ দুপুরে, কেউ একেবারে শেষ বেলায় খায়। মাসে আরও পাঁচ ছ' টাকা তাতে হ'তে পারে। তা তোমার মেয়েটি কেমন রাঁধে?"

"খুব ভাল রাঁধে মা। আমার রান্না খেয়ে ভাল বল্‌ছ। এর চাইতে অনেক ভাল সে রাঁধে।"

"মাছ-টাছও রাঁধতে পারে ভাল?"

"হাঁ।—কেন পার্‌বে না? তাই ত বেশী রাঁধত। এই যজ্ঞি টজ্ঞি কারও বাড়ীতে হ'লে ওকে লোকে রাঁধতে কত ডাকত।"

মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "আমার এক খুড়তুত ভাসুরপো এখানে আছে, বেড়াতে এসেছে—ক'মাস থাক্‌বে। কল্‌-কেতার সে রাঁধুনীটি সঙ্গে আস্‌তে পারে নি। এখানেও ভাল রাঁধুনী পাচ্ছে না। বড় লোক তারা, ভাল যদি রাঁধতে পারে, খোরপোষ আর নগদ ১০।১২ টাকা ক'রেও মাইনে দিতে পারে।"

"বাড়ীতে আর কারা আছে ?"

"ঐ ত আমার ভাসুরপো আছে, বৌমা আছে, ছেলেমেয়ে কটি আছে, আর বড় ছেলের বউটি আছে—কোলে একটি মেয়ে। ছেলে এখানে নেই, ব্যারিষ্টারী করে কিনা, ছুটীতে আস্‌বে। তা ওরা সব ভাল লোক মা। কোনও ভয়-টয় নেই তোমার। নিশ্চিন্ত হ'য়ে মেয়েকে ওখানে কাজে লাগাতে পার। আর রাত দিন ত থাক্‌বে না, কাজকর্ম্ম সেরে দিয়েই চ'লে আস্‌বে। বেশী দূরেও নয়, এই ত দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই—গলি থেকে বেরুলেই দেখা যায়; রেতে বরং তুমি যেও, সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমিও ব'লে দেব, দরোয়ানটা এগিয়ে দিয়ে যাবে।"

"বেশ, তাই তবে ঠিক ক'রে দেও মা।"

"হাঁ, তাই দেব। আমি খবর নিচ্ছি, লোক বোধ হয় পায় নি। তার পর বিকেলে একেবারে তোমাদের সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাব। ব'লে ক'য়ে মাইনে যাতে দু টাকা বেশী হয়, তাই ক'রে দেব। ঢের পয়সা আছে, আর তোমরা হ'লে এমন দুঃখী লোক, কেন দেবে না—আর ও যদি এমন ভাল রাঁধ্‌তে পারে।"

"খাবার-টাবারও সব বেশ তৈরী করতে পারে।"

"তবে ত কথাই নেই।"

(৯)

পরদিন হইতেই লতা এই গৃহে অশনবসনসহ মাসিক দশ টাকা বেতনে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বেতন অন্ততঃ আর দুটি টাকা বাড়াইয়া দিবার জন্য মণিঠাকুরাণী অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সত্যই যদি ভাল রাঁধিতে পারে আর ব্যবহার ভাল হয়, একমাস পরেই বেতন আর দুই টাকা বাড়াইয়া দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহিণী কমলিনী তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই লতার অতি পরিপাটি রন্ধনে এবং তাহার চাইতেও তাহার সরল মধুর ও বিনীত ব্যবহারে সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বধূ ইলার সঙ্গে লতার বড় অন্তরঙ্গ একটা সৌহার্দ্দ্যের ভাবও জন্মিল। মাছতরকারী যাহা আসিত সব গৃহিণী লতার হাতেই ছাড়িয়া দিতেন, সেই ইঁহাদের রুচি বুঝিয়া যাহাতে যাহা ভাল হয় তাহাই রাঁধিত। ইলা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, কখনও কুটনা কুটিয়া দিত, কখনও রন্ধনও শিখিত। ক্রমে একেবারেই সে লতার গা-ঘেঁসা হইয়া উঠিল। লতা যখন বাসায় যাইত, ঘরে ইলার কিছুই ভাল লাগিত না। সকালে উঠিয়াই পথের দিকে চাহিত, আর ছটফট করিত, কখন তার লতাদি' আসিবে। আসিলে তবে তার কচি মুখখানিতে হাসি ফুটিত, মনটা শান্ত হইত। একটু বিলম্ব দৈবাৎ কোনও দিন হইলে, লতা বাড়ীতে পা দিবামাত্র পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত। শাশুড়ী দেখিয়া একদিন হাসিয়া কহিলেন, "নাঃ! এ বামুনের মেয়ে দেখ্‌ছি যাদু জানে! কি হবে বল দিকি এর পর পাগলী মেয়ে, পূজোর পর যখন ক'ল্‌কেতায় যাবি—"

"ইস্! লতাদিকে ছেড়ে গেলে ত?"

"তবে কি তুই একলা ওকে নিয়েই কাশীতে থাক্‌বি ?"

"কেন, দিদিকে নিয়ে যাব। যাবে না দিদি, আমাদের সঙ্গে ? ছেড়ে এখানে থাক্‌তে পারবে ?"

লতা একটু হাসিল। কমলিনী কহিলেন, "যেতে যদি পারত আমাদের সঙ্গে, তবে ত কথাই ছিল না। কর্ত্তা যে ডালতরকারীর বাটিতে হাতই দিতেন না, কিছু ফেলে এখন আর উঠ্‌তে চান না। বলেন যা মুখে দিই, তাই যেন অমর্ত্ত্যো।"

"তাই ত বল্‌ছি মা, লতাদিকে ফেলে কখনো যেও না। এই এক মাসেই বাবার শ্রী কেমন ফিরেছে। ক'ল্‌কেতায় গেলে শুকিয়ে আবার আধখানা হ'য়ে যাবেন, যদি সেই উড়ে-ঠাকুরটার হাতে গিয়ে খেতে হয়।"

"কি করব মা, আমার কি সাধ ওকে ফেলে যাই? যেতে যদি পারত, মাথায় করে নিয়ে যেতাম। তবে ওর মা র'য়েছে এখানে—"

"তিনিও বরং যাবেন, ঘরে ব্রত নিয়ম আছে, ঐ পিসীমা রয়েছেন, ছোট্‌ঠাকুমা আছেন—আবার লতাদির কখনও অসুখ বিসুখ হ'ল, কি ছুঁতে পারল না—"

"সে আর ব'ল্‌তে হবে কেন মা? অমন কাজের লোক একটি ঘরে থাক্‌লে কত উপকার হয়। খরচ—সে আর কি এমন বেশী? খুসী হ'য়ে কর্ত্তা সেটা চালিয়ে নিতেন—আরও তোর আব্দার। তা আমার খুড়শাশুড়ী কি তাকে ছেড়ে দেবেন? জোর ক'রে নেওয়াও আমাদের উচিত হবে না। —এই যে এস দিদি! দেও ত বৌমা, গামছাখানা এনে

দেও ত? ও ঝি, ঝি! ওলো ক্ষ্যান্ত দিদি এয়েছে, আমি গঙ্গা নাইতে গেলাম। কাপড়খানা আর ফুলের সাজিটা নিয়ে ঘাটে যাস।"

তেল মাখিয়া কমলিনী আগেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। প্রতিবেশিনী এই ক্ষান্তমণি আসিয়া ডাকিলেন; তাঁহার সঙ্গে স্নানে গেলেন। পথে এই কথাই উঠিল। ক্ষান্তমণি কিছু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। শেষে কহিলেন, "রাঁধে ত ভালই—যেমন মা, তেম্‌নি মেয়ে। নইলে রেঁধে খাইয়ে মণিঠাক্‌রুণকে খুসী রাখতে কোনও বামনী এ বাঙ্গালীটোলায় পারে নি। আর মন্দাঠাক্‌রুণের সুখ্যাৎ তার মুখে ধরে না।"

কমলিনী কহিলেন, "মেয়েটির কথা আর কি ব'লব দিদি—সব কাজেই এমন পাকা হাত বড় দেখা যায় না। আর যা বল, আপত্তি কিছুতে নেই। মুখে ঐ মিঠে হাসিটুকু লেগেই আছে। অমন লক্ষ্মী মেয়ে সত্যি চোকে কখনও প'ড়েনি। তবে কপাল মন্দ—"

"তাই ত দিদি, কিছুই বুঝতে পারিনি। মা মাগী ত বলে সোয়ামী নিরুদ্দেশ। তবে কেউ কেউ বলে—"

"ওমা, কি বলে আবার কারা?"

"দেশে নাকি থাক্‌তে পারে নি। জাতনাশা ব'লে দূর ক'রে দিয়েছে। কোলের ঐ যে ছেলেটা—"

"না না, দূর! সে হ'তেই পারে না। কুলোকের যত কুকথা—খেয়ে দেয়ে ত আর কাজ নেই। আমার খুড়-শাশুড়ী ওদের খবরটবর সব নিয়েছেন। ভাল বামুনের মেয়ে ওরা। তবে সোয়ামী নিরুদ্দেশ—সে ত আর ওর দোষ কিছু নয় দিদি? ফেলে গেলে কি ক'রবে? আহা, তাই না দুঃখে প'ড়ে অমন সোনার পিরতিমে—রাজার ঘর যে আলো ক'র্‌ত—সে কিনা পরের ঘরে আজ ভাত রেঁধে খাচ্ছে।"

"হাঁ, সে ত বটেই দিদি, সে ত বটেই। তবে কিনা লোকে বলে, ঐ ত সেদিন পাতালেশ্বরের বাড়ীউলী আতরদিদি আর নিতেই ঠাকুর ব'ল্‌ছিল, ঢাক ঢোল বেজে উঠল ব'লে! তবে কাশীতে নাকি সব চলে—"

"কে ঐ আতরমণি আর তার ভাড়াটে ঐ মাতাল নিতেই ঠাকুরটা? রামঃ! তারাও আবার ভদ্দর লোকের মেয়ের নিন্দে করে, আর তাও তোমরা শোন?"

"কথা কানে এলে দিদি কাজেই শুন্‌তে হয়। চিন্তে ঠাকুরঝিরা ওর ভাড়াটে কিনা, তাই যাই আসি মাঝে সাঝে।—নইলে আতরদি—রামঃ! পথে ঘাটে দেখা-শুনো হয়—দিদি ব'লে ডাকি, নইলে ওর বাড়ীর চৌকাঠ কখনও মাড়াই?—তা ঐ আতরদি ত তোমার খুড়শাশুড়ীর ওখানেও যায় আসে, মন্দা ঠাক্‌রুণের ঘরে গিয়েও বসে—"

"তা বসুক গে। বাড়ীতে একটা লোক এলে ত দূর দূর করে কেউ তাড়িয়ে দিতে পারে না? আর ঐ আতর কি আমাদের বাড়ীতেই আসে না? আসে। আসে, কি ক'রব?"

"না, তা ব'ল্‌ছি না! কোথায় সে না যায়? দুপুরে একটু গড়াগড়ি দিয়ে ত চক্কর দিয়েই বেড়াচ্ছে। কে জানে হয়ত কোনও কথার আভাসে কিছু আন্দাজ করে নিয়েছে। আবার ওদের দেশের ওদিক থেকেও নাকি কে এয়েছে, তার কাছেও হয়ত কিছু শুনেছে।"

"তার মাথা শুনেছে! সব মাগীর মনগড়া কথা। অমন বজ্জাত কি আর ভূভারতেও আছে? আর এই বাবা বিশ্বনাথের পুরীতে কত পাপই এসে জুটেছে। সাধে লোকে বলে ঘোর কলি!"

ক্ষান্তমণি মুখ ফিরাইয়া একটু মুচকি হাসিলেন। হাঁ, পাপ ত আসিয়া জুটিয়াছেই। যেমন আতরমণি, তেমনই ঐ মন্দাকিনী আর তাহার কন্যা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া ক্ষান্তমণি আর কিছু বলিলেন না। ধনীর গৃহিণী, দয়া করিয়া দিদি বলে, সাথে গঙ্গাস্নানে আসে, দেবালয়ে যায়। আবার ব্রত উপবাসে খাবারটাবারও কিছু পাঠায়। কখনও বা আস্ত দুইটি নগদ টাকা কি একজোড়া নূতন কাপড়ও দেয়। অপছন্দের কথা বেশী এরূপ স্থলে বলিতে নাই। দশাশ্বমেধ ঘাটে তখন দুইজনে আসিয়া পৌছিয়াছেন; স্নানার্থে গিয়া নীচে নামিলেন।

জলের কেবল উপরেই একটি ধাপে বসিয়া মন্দাকিনী সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছিলেন।

"এই যে দিদি ঠাক্‌রুণ! পেন্নাম হই। বলি, ভাল আছ ত তোমরা?"

চমকিয়া মন্দাকিনী চাহিয়া দেখিলেন, হাসিভরা মুখে তাঁহাদেরই গ্রামবাসিনী সেই বিন্দীতেলিনী দাঁড়াইয়া—একটি টাকা দিয়া যে তাঁহার নিকট হইতে একখানি থালা

কিনিয়াছিল এবং চৌধুরী বাড়ীর সেজবাবুর সাহায্য গ্রহণ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিল।

"কে, বিন্দী! ওমা, তুই কবে এলি?"

"এই ত কদিন হল এয়েছি দিদি ঠাক্‌রুণ, আমার ভাসুরপোর সঙ্গে।"

"ভাসুরপো!"

"আছে দিদি—আছে। তা—ভাসুরপোর সঙ্গে কাশী আসছি শুনে সবাই বলে,ওমা, তোর আবার ভাসুরপো কে? রাঁড় হ'য়ে ছেলেবেলা থেকে ত বাপের বাড়ীই আছিস্!—তা দিদি, পরের ঘরে ত একদিন গিয়েছিলাম, নইলে সত্যি রাঁড় হ'লাম কি করে? মাগীরা হেসেই কুটিপাটি! ছেল দিদি, সবই ছেল—ভাসুরও ছেল, দেওরও ছেল, শ্বউর-শাউড়ীও ছেল। তবে শাউড়ী বড় জ্বালা দিত, বাবা গিয়ে নিয়ে এল, আর পাঠাল না। তাদেরও ঘরে ছেল হাভাত, তত্ত্বপবর আর করে নি।"

"তা এখন—"

"ঐ বিন্দেবন ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে হ'ল কিনা সেই গাঁয়ে, আমাকে পাঠিয়েছিল মেয়েটির সঙ্গে। আমিও ভাবলাম, বলি যাই, শ্বশুরের ভিটেটা গে জন্মের মত একটি-বার দেখে আসি। দেখলাম এখন দুপয়সা হ'য়েছে, খেয়ে প'রে বেশ আছে। বাপ মার পিণ্ডি দিতে গয়ায় আস্‌বে, আমাকেও বল্লে, খুড়ীমা, তুমিও চল না, গয়া-পিণ্ডিটে দিয়ে আস্‌বে।"

"ও, তাই তাদের সঙ্গে এয়েছিস্?"

"হাঁ, দিদিঠাক্‌রুন। পিণ্ডিটাও দিতে হয়, আর তিথী-ধর্ম্মও ত জন্মে কখনও কিছু করিনি। ভাবলাম এমন সুবিধেটা যদি ঘটল, ছাড়ি কেন? মেয়েটিকে নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। এসেই একটু গোছগাছ করে রেখে আবার গেলাম। (চাপা সুরে) কয়েকটা টাকাও ছিল দিদি, ঘাট ক'রে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। তাও বের ক'রে নিলাম। ভাবলাম, গয়ায় যদি যাচ্ছি, কাশীতে গিয়েও ক'দিন থাকব। কাজকর্ম্ম যদি কিছু জোটে, এইখেনেই থেকে যাব—তোমরাও ত আছ। ভাসুরপোকে ব'ল্লাম, সে রেখে গেল। দেখি কদ্দিন, সুবিধে যদি না হয়, কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, কারও সঙ্গে আবার ফিরে যাব।"

"কোথায় আছিস্?"

"ঐ যে পাতালেশ্বরে আতরমণি ঠাক্‌রুণ আছে, তার বাড়ীতে একটু ঘর ভাড়া নিয়ে আছি।"

"ও, চিনি তাকে। আমাদের ওখানেও যায় আসে!"

"হাঁ, তোমাদের কথাও তার কাছে শুনেছি। বলে-ছিলাম, আমাকে একদিন নিয়ে যাও, দিদিঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তা এই আজ যাই কাল যাই করে ঠাক্‌রুণটির আর সময় হচ্ছে না। আজ ভাগ্যি ঘাটেই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।"

"তা দেশে সব আছে ভাল? আমার দাদা, বৌ—ছেলেমেয়েরা—"

"আছে সব ভাল। বৌঠাক্‌রুণও ব'লেন, কাশী যদি যাস্, আমার ননদের খবর নিয়ে আসিস্? তা, তোমরা ত দু'জনেই ভাল কাজে লেগেছ শুন্‌লাম।"

"হাঁ, একরকম চ'লে যাচ্ছে। তবে নতি যে বাড়ীতে কাজ করে, তারা ত বরাবর এখানে থাকে না—"

"শুনেছি, খুব ভাল লোক তারা। অনেক লোকজন বাড়ীতে কাজ করে। তা ব'লে কয়ে দিদিঠাক্‌রুণ, তাদের ঘরে কাজে কেন আমাকে লাগিয়ে দেও না? যদ্দিন আছে, করি—"

মন্দাকিনী কহিলেন,"ঐ ত গিন্নী গঙ্গা নাইতে এয়েছেন—"

ক্ষান্তমণি কানে কানে কহিলেন, "এই লোকটিই ওদের গাঁ থেকে এয়েছে। ঠিক খবর সব ওর কাছেই জান্‌তে পার দিদি।"

কমলিনী একটু ভ্রূকুটি করিলেন। বিন্দী কাছে গিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিল, "হাঁ, গিন্নী মা, আমি ঐ দিদিঠাক্‌রুণদের গাঁয়ের লোক—জেতে তিলী, ঘরের কাজ সব করতে পারব—"

একটু গম্ভীরভাবে কমলিনী কহিলেন, "আমাদের ঘরে লোকজন যা দরকার সব ত র'য়েছে বাছা—নতুন লোক আর কি হবে?"

"সে ত রয়েছেই মা, সে ত রয়েছেই। তবে ছেড়ে ছুড়ে যদি কেউ যায়—"

"সে যায় তখন দেখা যাবে।" বলিয়া কমলিনী কাপড় ছাড়িতে একদিকে সরিয়া গেলেন।

মন্দাকিনীর কাছে আসিয়া একটু মৃদুস্বরে বিন্দী কহিল, "হাঁ দিদিঠাক্‌রুণ, তুমি একটু বলে কয়ে—"

"আজই ত আর কিছু হবে না। খালি যদি হয়—সে তখন দেখব। তুই যা, এখন স্নান ক'রগে যা। বেলা হ'ল, সেরেসুরে আমাকে এখুনি গিয়ে আবার রাঁধতে হবে। গিন্নী সকাল সকাল খান।"

বলিয়াই মন্দাকিনী একটু ঘুরিয়া আচমন করিয়া নাকে আঙ্গুল দিয়া বসিলেন।

মাগী লোক ভাল নয়। কাশীতে আসিয়াও ইহাদের নিন্দা রটাইতেছে। কিন্তু কথাটার মূলে কি সত্য কিছু আছে? ফিরিবার পথে কমলিনীর মনে একটু খটকাও উঠিল। কথাটা তবে একেবারেই আতরমণির মনগড়া নহে। সত্যই দেশের একটি লোক আসিয়াছে, ওদেরও বেশ জানে। বলা তাঁহার উচিত হউক কি না হউক, এইরূপ কিছু একটা কথা সে অবশ্য বলিয়াছে। আতরমণি তাহাতে হয়ত ডালপালা কিছু জুড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ বিন্দীর সঙ্গে সহসা সাক্ষাৎকারে মন্দাঠাকুরাণীর মুখে ভয় কি অস্বস্তির ভাব ত এমন কিছু দেখা গেল না? তবে উহাকে দেখিয়া বিশেষ খুসী হইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কথা—তা সোমত্ত বয়েসের মেয়ে, সোয়ামী নিরুদ্দেশ, পাড়াগাঁয়ে মামারবাড়ী ছিল, মন্দ কথা দুই একটা অনর্থকও লোকে বলিতে পারে। কাশীতে আসিয়াছে। তা—সম্বল যাহা ছিল হয়ত ফুরাইয়া গিয়াছে, গাঁয়ে বসিয়া খাইবে কি, তাই আসিয়াছে। এখানে কাজকর্ম্ম করিয়া পেটে খাইতে দুটি পারে; কিন্তু গাঁয়ে পারে না। না, না, ওসব বাজে কথা। আর ঐ বামুনের মেয়ে—কি লক্ষ্মী—নষ্টভ্রষ্টও হইতেই পারে না—তাদের ধরণধারণই হয় আলাদা।

কমলিনীর এইরূপ চিন্তান্বিত নীরব গাম্ভীর্য্যের ভাব লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্তমণি কহিলেন, "তা ঐ মাগীকে ডেকে একটু খোঁজ খবর কি নেবে দিদি?"

মুখখানি কমলিনীর লাল হইয়া উঠিল। ভ্রূকুটি করিয়া একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "পাগল হ'য়েছ ক্ষ্যান্তদি! আমি যাব এই সব কুচ্ছোর কথা শুনতে ঐ মাগীকে ডেকে?—ওসব কিছু নয়। নিন্দে মন্দ—তা মেয়ে মানুষের কপাল—আরও অনাথা, কেউ নেই—লোকে তুল্লেই হ'ল? একজনে যদি এতটুকু ব'ল্লে, মুখে মুখে এতখানি হ'য়ে উঠল!"

"তা বটেই ত দিদি, তা বটেই ত। তবে তোমরা কিনা ওকে রাঁধুনি রেখেছ, হাতে খাচ্ছ—"

"দ্যাও দিদি, আর ও কথায় কাজ নেই। এই কাশীতে ঘরে ঘরে কত বামনী রাঁধে, কে কার কুলের খবর নিয়ে থাকে? চরিত্তির কার কি, তা বা কয়জনে দেখে? আর আমাদের ঐ বামুনের মেয়ে—না দিদি, তার সম্বন্ধে মন্দ কিছু চোকে দেখ্‌লেও আমি বিশ্বেস ক'রে নিতে পারব না।"

"যা ব'লেছ দিদি, বড় লক্ষ্মী মেয়ে! কাশীতে কত মেয়েই ত রেঁধে খায়। অমন আর দুটি দেখিনি।"

"আর ঐ যে মাগী, আতরমণির বাড়ীতে এসে ঘর ভাড়া নিয়েছে, ও যে আর একটা আতরমণি নয়, তাই বা কে জানে? আবার বলে আমাদের বাড়ীতে এসে চাকরী ক'রবে! ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার!"

বিন্দী যাহা বলিয়াছিল, তাহা কিছু সত্য হইলেও সব সত্য নহে। তাহার ভাসুরপুত্র সত্যই একজন ছিল, আর কেনই বা থাকিবে না? সে যে বিধবা, ইহাই অকাট্য প্রমাণ যে সত্যই তাহার বিবাহ একদিন হইয়াছিল, শ্বশুরের ভিটাও কোনও গ্রামে ছিল এবং সে ভিটায় শ্বশুর বংশধরও কেহ থাকিতে পারে। বিবাহের পর বালিকা কন্যা যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়, পরিচারিকাস্বরূপ কোনও স্ত্রীলোককে তাহার সঙ্গেও অনেকে পাঠাইয়া থাকে। বৃন্দাবনঠাকুরের কন্যার সঙ্গে সত্যই বিন্দী গিয়াছিল এবং বিন্দীর শ্বশুরের ভিটাও ছিল সেই গ্রামে। বিন্দী গিয়া দেখিল, তাহার এক ভাসুরপুত্র সেই ভিটায় প্রদীপ জ্বালিতেছে এবং ইহাও বিন্দী শুনিল যে সেই ভাসুরপুত্র পিতামাতার পিণ্ডদান করিতে শীঘ্র গয়াধামে যাইবে। চৌধুরী বাড়ীর মেজবাবু পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, বিন্দীকে কাশী পাঠাইবেন। লতার কলঙ্ক কাহিনী বাঙ্গালীটোলায় প্রচার হইলে আশ্রয় লাভ সেখানে তাহার পক্ষে কঠিন হইবে এবং হয়ত কোনও কৌশলে নিজের আশ্রয়ে তাহাকে আনিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রকাশ্য ভাবে বিন্দীকে পাঠাইতে পারেন না, একটা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বিন্দী আসিয়া এই সুযোগের সন্ধান তাঁহাকে দিল। বলা বাহুল্য সুযোগটা তিনি অবহেলা করিলেন না। খরচপত্র দিয়া ভাসুরপুত্রের সঙ্গে তাহাকে গয়া পাঠাইলেন। পিণ্ডদানে পতিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়া ভাসুরপুত্রের সঙ্গে বিন্দী কাশীতে আসিল। পাতালেশ্বরে তাহার পরিচিত কে ছিল, আতরমণির বাড়ীতেও একটি ঘর খালি পাওয়া গেল। সেইখানে খুড়ীমাতাকে রাখিয়া ভাসুরপুত্র দেশে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশঃ



কৌশিক *—তেতালা

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে ॥
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ-কৈলাস
বরাভয়-রূপে মা শ্মশানে করেন বাস,
কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেথানে
ঘুমাবি জননীর চরণ-তলে ॥
জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বালায়,—
তাহারে ডাকিছে মা, 'কোলে আয়, কোলে আয়'।
জীবনে শ্রান্ত ওরে, ঘুম পাড়াইতে তোরে—
কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম
স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

{ র্সা }
II সা র্সর্সা র্সা র্সণা | ণর্সণা ণদা দণা দা | ণদা -ণদা মা -া | মপা -া -জ্ঞমা-জ্ঞমা I
শ্ম শা নে জা ০ গি ০ ছে ০ শ্যা ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ মা

I জ্ঞমা -পা পদপা পমা | মজ্ঞা -মজ্ঞা রসা সা | ণ্সা দ্ণ্া সা মা | মা -া -া -া I
অ ০ ন্ তি ০ মে ০ স ০ ০ ন্ তা ০ নে নি ০ তে ০ কো ০ লে ০ ০ ০

I সা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা জ্ঞমা মা মা | জ্ঞা মা জ্ঞমা -পা | মজ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞরা -সা I
জ ন ০ নী শা ০ ন্ তি ০ ম য়ী ব সি য়া ০ ০ আ ০ ছে ঐ ০ ০

I সা জ্ঞা -া জ্ঞমা | মণা -দণা র্সা র্সা | ণা ণর্সা ণর্সণা ণদা | দণা -া -দা মা II
চি তা র্ আ ০ গু ০ ০ ণ ঢে কে স্নে হ ০ আঁ ০ ০ চ ০ লে ০ ০ ০

০ ১ + ৩
II মা পা মা জ্ঞা | মা মা মণা দা | ণা র্সা র্সদা ণা | ণর্সা -া র্সা -া I
স ন্ তা নে দি তে কো॰ ল্ ছা ড়ি সু খ কৈ॰ ॰ লা স্

০ ১ + ৩
I র্সা র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা জ্ঞা জ্ঞর্রা -র্সা | র্সা র্সর্রা র্রর্সাণ ণধা | ধা ণা ণা -া I
ব রা॰ ভ য়া রূ পে মা॰ ॰ শ্ম শা॰ নে ক॰ রে ন্ বা স্

০ ১ + ৩
I র্সা র্সজ্ঞা -া র্মা | র্মা র্মা র্মা -া | জ্ঞা -র্মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা জ্ঞর্রা জ্ঞর্রা -র্সা I
কি ভ॰ ॰ য়্ শ্ম শা নে ॰ শা ॰ ন্ তি তে যে খা॰ নে॰ ॰

০ ১ + ৩
I র্সা র্রর্সা র্সণা -া | ণা র্সণাদ ণদা মা | জ্ঞা মা পদা দণা | ণর্সা -া -া -া II [ ]
ঘু মা বি॰ জ ন নী॰ র্ চ র ণ ত লে ॰ ॰ ॰

০ ১ + ৩
II সা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞণ্া | সা জ্ঞা জ্ঞমা -া | মপা -া পদপদা মা | জ্ঞমা জ্ঞা মা -া I
জ্ব লি॰ য়া ম রি লি কে॰ ॰ সং ॰ সা॰॰॰ র্ জ্বা॰ লা ॰ য়্

০ ১ + ৩
I মা মা পমজ্ঞা জ্ঞা | মা মা মণা -া | ণা ণর্সা ণর্সা -া | র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞর্রা র্সা I
তা হা রে॰ ডা কি ছে মা॰ ॰ কো লে আ॰ য়্ কো॰ লে আ॰ য়্

০ ১ + ৩
I র্সা র্সর্মা জ্ঞর্মজ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞা র্রা র্রজ্ঞর্রর্সা | র্সা -র্রা র্রা র্রজ্ঞর্রা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
জী ব নে॰॰ শ্রা ন্ ত ও রে॰ ॰ ঘু ম্ পা ড়া॰ ॰ ই তে তো রে

০ ১ + ৩
I র্সা র্সর্রা র্রর্সা র্সণা | ণদা -া দণদা ম | জ্ঞা মা পদা দণা | ণর্সা -া র্সা -া II II [ ]
কো লে॰ তু লে॰ নে॰ য়্ মা॰ ॰ ম র ণে রি ছ॰ লে॰

* "কৌশিক" আর একটি অপ্রচলিত রাগ। এই রাগ এখন লুপ্তপ্রায়। "সংগীত সার-সংগ্রহে" যে বিংশতি আদি রাগের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে "কৌশিক" রাগের উল্লেখ আছে। যথা :—"........স্যাতাং কন্দর্প দেশাখ্যৌ কাকুভাস্তশ্চ কৌশিক :..." ইত্যাদি। ইহার ঠাট্ "আশাবরীর" ন্যায় এবং জাতি "খাড়ব-সম্পূরণ'। 'মধ্যম' বাদী। দেখা যায়, এই রাগে "মালকোশের" অঙ্গ বেশী পরিস্ফুট এবং যেখানে 'পঞ্চম' লাগান যায়, সেখানে "ধানশ্রী"র অঙ্গ ফুটিয়া ওঠে। কেহ কেহ ইহাকে "কৌশী" বা "কৌশী"-ও বলিয়া থাকেন।

আরোহী :—ণ্ স জ্ঞ ম, প ম, দ ণ র্স।

অবরোহী :—র্স ণ দ ম, প ম, জ্ঞ র স।

কাহারো কাহারো মতে ইহা "কাফী" ঠাটের রাগ। কিন্তু তখন ইহার নাম "কৌশিকী-কানাড়া"। ইহাতে "কানাড়া" ও "মালকোশে"র সংমিশ্রণ থাকে। "কৌশিকী-কানাড়া" এ-দেশে অপ্রচলিত নয়। ইতি—স্বরলিপিকার

অষ্ট্রিয়া ও মধ্য-ইয়ুরোপ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক ডি, এস্‌সি, পল্‌ (রোম)

প্রবন্ধ

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ অষ্ট্রিয়ার, জার্ম্মাণীর ও ইয়ুরোপের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। ঐ দিন অষ্ট্রিয়া নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের লোপ হইল, নাৎসি বিপ্লবের অন্যতম কাম্য বৃহত্তর জার্ম্মাণীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, আর ইয়ুরোপে স্বৈরাচার ও শক্তিবাদের বিরুদ্ধে অস্ফুট এবং অসহায় প্রতিবাদ উঠিল। কেহ বলিল—জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করিল, কেহ বলিল—জার্ম্মাণ পুনর্জ্জন্মের আর একটি অধ্যায় সমাপ্ত হইল। আর কেহ বলিল—আজ হইতে ইয়ুরোপে আর একটি মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর এত বড় দ্বৈত-সাম্রাজ্য মাত্র পঁচিশ বৎসর সময়ের মধ্যে এইরূপ ধূলিসাৎ হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়া অনেকেই হয়ত দুঃখ করিবেন ; মহাযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্য-লোপ সত্ত্বেও যে প্রায় এক কোটি অষ্ট্রিয়ান্ নরনারী তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল তাহার লোপ প্রাপ্তিতে সকলেরই ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। ভিয়েনা আজ আর ইয়ুরোপের প্রধান রাজধানীগুলির মধ্যে অন্যতম নয় ; আজ উহা একটি জার্ম্মাণ প্রদেশের রাজধানী মাত্র। দুনিয়ার সঙ্গে আজ অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রিক ও আর্থিক যোগাযোগ হইবে বার্লিনের মধ্যবর্ত্তিতায়। নাৎসি বিপ্লবের গুরু হের্ হিট্‌লারের জীবন-স্বপ্ন আজ সার্থক হইল। হিট্‌লার নিজে অষ্ট্রিয়াবাসী ; প্রথম যৌবনে ভিয়েনার কোন কারখানায় কাজ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার আত্মচরিতের প্রথম পাতাতেই অষ্ট্রিয়ার উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা ছিল ; আজ সেই প্রতিজ্ঞা দুনিয়াকে উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রতিপালন করিয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ভৌগলিক ও জাতীয় ঐক্য খানিকটা থাকিলেও ইতিহাসের দিক হইতে ইহাদের ঐক্যের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। বরং অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণীর বাহিরে রাখিবার জন্য বিস্‌মার্ক বিশেষ তৎপর ছিলেন। অষ্ট্রিয়ান্ ও জার্ম্মাণরা উভয়ে একই ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু ইহাদের চরিত্রে খুব গভীর প্রভেদ। জার্ম্মাণরা আদর্শবাদী, অষ্ট্রিয়ানরা আমোদপ্রিয় ; জার্ম্মাণী প্রোটেষ্ট্যান্ট্, অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক। হিট্‌লার নিজে ক্যাথলিক। হিট্‌লার যদি অষ্ট্রিয়ান্ না হইতেন তবে হয়ত "আন্‌শ্লুস্" (জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রিক পরিণয়) এরূপ শক্তি-ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া সম্পন্ন হইত না। ইহার কারণ এই যে জার্ম্মাণ-সেনা ও সমর-বিভাগ বলপূর্ব্বক অষ্ট্রিয়াকে বার্লিনের অধীনে আনিবার পক্ষপাতের বিরুদ্ধে ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে যে জার্ম্মাণ সমর-সচিব ফন্ ব্লম্‌বের্গ ও জেনারেল ফ্রিট্‌শ্ তাঁহাদের পদত্যাগ করেন তাহার প্রধান কারণ ছিল—নাৎসি দলের সঙ্গে অষ্ট্রিয়া-পদ্ধতি লইয়া জার্ম্মাণ সমর-বিভাগের মতদ্বৈধ ; তাই অষ্ট্রিয়ায় চরম-পন্থা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হিট্‌লার নিজেই জার্ম্মাণ সমর-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লইলেন এবং বের্ষ্টেস্‌গাডেনে (Berchtesgaden) অষ্ট্রিয়ান্ রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শুস্‌নীগ্‌কে ডাকিয়া যাহাতে অষ্ট্রিয়ান্ নাৎসিদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহার প্রতিশ্রুতি আদায় করিল। ইহার ফলে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য যত অষ্ট্রিয়ান নাৎসি কারাবাসে ছিল তাহারা মুক্তি পাইল এবং ঐ দলের নেতা ডাঃ সাইস্-ইন্‌কার্ট মন্ত্রিত্বে নির্ব্বাচিত হইল। তাহার পরের ঘটনা সকলেরই মনে থাকিবার কথা। বের্ষ্টেস্‌গাডেনের চুক্তির পর অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বত্র নাৎসি দলের বিপ্লব ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং সরকারের সঙ্গে এই দলের সঙ্ঘর্ষ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অষ্ট্রিয়ার প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ শুস্‌নীগ্ অতঃপর তাহার দেশবাসীকে একটি সাধারণ নির্ব্বাচনে আহ্বান করিল এবং তাহারা অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ও জার্ম্মাণীর সহিত মিলন ইহার মধ্যে কোনটাকে শ্রেয়ঃ মনে করে এই সম্বন্ধে ভোট দিতে বলিল। এই নির্ব্বাচনে যে নাৎসি দলের হার হইবে তাহা নিবারণ করিতে অষ্ট্রিয়ান্ নাৎসিগণ হিট্‌লারের শরণাপন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণ-সেনা অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিল। কয়েক ঘণ্টা কালের মধ্যে আন্‌শ্লুস্ সম্পন্ন হইয়া গেল। শুস্‌নীগ্ বন্দী হইল, সভাপতি মিক্‌লাস্ পদত্যাগ করিল এবং সাইস্-ইন্‌কার্ট অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রীর স্থান অধিকার করিল। ভিয়েনার সর্ব্বত্র উড়িল নাৎসি-দলের স্বস্তিক-জয়ধ্বজা। বার্লিন হইতে নাৎসি রাষ্ট্রনেতাগণ ভীড় করিল ভিয়েনার সরকারী দপ্তরে, আর অষ্ট্রিয়ার সকল সহরে প্রতিধ্বনিত হইল জার্ম্মাণ সেনার বিজয়ী পদক্ষেপ।

ইতালি তর্জ্জনী উত্তোলন করিল না ; ইংরেজ ও ফরাসী মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইল। মধ্য-ইয়ুরোপে ত্রাস এবং চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন অষ্ট্রিয়ান্ নাৎসিদল ডাঃ ডলফুস্‌কে হত্যা করে এবং ভিয়েনা দখল করিবার চেষ্টা করে তখন সমগ্র ইয়ুরোপে একটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ দেখা দেয়। দুঃসাহসী হিট্‌লারও ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পায় নাই। ষ্ট্রেসাতে অতঃপর এই ত্রিশক্তির মধ্যে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে নাৎসি দলের নৈরাশ্য উপস্থিত হয় এবং বার্লিনের কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে বলে যে অষ্ট্রিয়ার প্রতি তাহাদের কোন দাবী নাই। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-রক্ষায় ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের স্বার্থ ইতালীর চাইতে কম ছিল না। জার্ম্মাণীকে শত্রু পরিবেষ্টিত করিয়া

রাখা এবং এই প্রকারে শক্তিহীন করিয়া রাখা ফ্রান্সের সমস্ত মধ্য-ইয়ুরোপ পদ্ধতির মূলমন্ত্র। জার্ম্মাণীর বৃদ্ধি ইংরেজও পছন্দ করেনা, কারণ সমগ্র ইয়ুরোপে ইংরেজ যাহাকে শ্রদ্ধা করে এমনকি ভয় করে সে হইতেছে জার্ম্মাণী; এই জার্ম্মাণী একবার প্রতিপত্তিশীল হইয়া উঠিলে ইংরেজের সাম্রাজ্য-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে ইংরেজ তাহা জানে। ইতালী জার্ম্মাণীর সহিত চিরকাল শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। মূলতঃ সমস্ত ইয়ুরোপের ইতিহাসে যে একটি প্রধান দ্বন্দ্ব চিরকাল অশান্তি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা হইতেছে ল্যাটিন্ ও টিউটনিক সভ্যতার সংঘর্ষ। ইতালীতে জার্ম্মাণদিগকে এখনও অসভ্য বলা হইয়া থাকে এবং ঐতিহাসিকগণ ইহা প্রমাণ করিয়া থাকেন যে তিন তিন বার জার্ম্মাণী ইয়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে আঘাত করিয়া আসিয়াছে; প্রথমবার যখন রোমের সাম্রাজ্যভঙ্গে সহায়তা করে; দ্বিতীয়বার যখন ক্যাথলিক গির্জ্জা এবং পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মার্টিন লুথারকে প্রতিষ্ঠিত করে; তৃতীয়বার যখন গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। আজ যে ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং স্বৈরাচারের প্রতি সহানুভূতি দেখা যাইতেছে ইহাও জার্ম্মাণীর অপকর্ম্ম। এই মতবাদের বিরুদ্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে, কিন্তু ইতালীর সহিত জার্ম্মাণীর যে কোন আত্মিক পরিণয় সম্ভব নয় ইহা তাহাই প্রমাণ করে। জার্ম্মাণীও ইতালীর মধ্যে যাহাতে অষ্ট্রিয়ার মত অন্য একটি স্বাধীন দেশ বর্ত্তমান থাকে ইহাতে ইতালীরও স্বার্থ ছিল। সেইজন্য মুসোলিনী এমন কি অষ্ট্রিয়াতে যাহাতে পুরাতন হাবস্‌বুর্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহারও সমর্থন করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইহা ছাড়া মধ্য-ইয়ুরোপের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অংশ নিতে হইলে অষ্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব একান্ত প্রয়োজন। ফ্রান্স এবং ইতালী এই কথা ভাল করিয়া জানিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইতালী অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে তাহার মূলেও ছিল এই আর্থিক স্বার্থ। কিন্তু কেমন করিয়া অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই ত্রি-শক্তির সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজন ব্যর্থ হইল তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইতালী আফ্রিকায় সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন একজন অল্পবয়স্ক ইংরেজ মন্ত্রী ইতালীর বিরুদ্ধে আর্থিক শাসনের দণ্ডনীতি জেনিভার রাষ্ট্র-সঙ্ঘে উপস্থিত করে এবং ক্রমশঃ আর্থিক বয়কট ইতালীর বিরুদ্ধে কায়েম হয়। এই পদ্ধতির শেষ পরিণতি কি ইতালী তখন পরিষ্কারভাবে জেনিভাকে বুঝাইয়া দেয়। ইতালীকে শাসন করিতে গিয়া যে ইয়ুরোপের নৈতিক ঐক্যের ধ্বংস সাধন করা হইবে এবং ইয়ুরোপের শান্তি-সমস্যা আরও বিকৃত আকার ধারণ করিবে, জেনিভার কর্ণধারগণ তখন এই সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেন নাই। ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন অনন্যোপায় হইয়া ইতালী জার্ম্মাণীর সাহায্য প্রার্থনা করিল এবং জার্ম্মাণী শুধু ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিল। জার্ম্মাণীর সাহায্যে ইতালী আফ্রিকায় জয়ী হইল। কিন্তু জার্ম্মাণীর বন্ধুত্বকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। রোম আর বার্লিনের মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার কেন্দ্র স্থাপিত হইল। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা লোপ এই সহযোগিতারই অবশ্যম্ভাবী ফল। জেনিভার ইতালী-বিরোধী পদ্ধতি আজ সকলেই ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; মিষ্টার ইডেন্ পদত্যাগ করিয়া ফরাসী রিভিয়েরায় অবসর বিনোদন করিতেছেন, নূতন করিয়া ইংরেজ ও ইতালীর মধ্যে ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকা সম্পর্কে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতাকে ফিরিয়া পাইবার আর সম্ভাবনা নাই। হিট্‌লার তাহার মাতৃভূমিকে বৃহত্তর জার্ম্মাণীর সীমানার মধ্যে আনিয়া তাহার নেতৃত্বের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিগত ১০ই এপ্রিলের নির্ব্বাচনে অষ্ট্রিয়া হিট্‌লারের প্রতি যে বিশ্বাস দেখাইয়াছে তাহাতে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহার পদ্ধতি এবং কার্য্যকলাপ সঙ্গত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রিয়ায় ইতিমধ্যেই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। শিলিং এর বদলে মার্ক আজ অষ্ট্রিয়ার মুদ্রা; অষ্ট্রিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি জার্ম্মাণীর চার-বার্ষিকী প্ল্যানের সম্পাদনে সাহায্য করিতেছে; অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট তৈয়ারী করা আরম্ভ হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পরে অষ্ট্রিয়ার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ এত খারাপ হয় যে বহুসংখ্যক লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে সরকারের প্রতি বিরাগ জন্মে এবং ক্রমশঃ যখন নাৎসি প্রচার অষ্ট্রিয়াতে সুরু হয় তখন তাহারা একপ্রকার বিপ্লবী রূপ ধারণ করে। অষ্ট্রিয়াতে নাৎসি নীতির প্রসারের প্রধান কারণ তাহার আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য। আজ যে অষ্ট্রিয়াতে একদল লোক প্রকাশ্যভাবে জার্ম্মাণীর আগমনকে অভ্যর্থনা করিতেছে তাহারও মূলে আছে এই বিশ্বাস যে জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতায় হয়ত অষ্ট্রিয়ার আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। চাষীদের মধ্যে ও মজুরদের মধ্যে এই বিশ্বাস একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে। এদিকে জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া অধিকার করিতে পারায় সমস্ত মধ্য ইয়ুরোপের উপর তাহার আর্থিক প্রভুত্ব দাবী করিতে পারিবে। ডানিয়ুব এবং বলকান্ জনপদের সমস্ত দেশগুলিই এখন অষ্ট্রো-জার্ম্মান্ আর্থিক বাজারের উপর এতটা নির্ভর করিতে বাধ্য হইবে, যে তাহাদিগকে জার্ম্মাণীর প্রজা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, বুল্‌গারিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ইহারা সকলেই জার্ম্মাণীর কাছে কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিবে। ইতালীর সঙ্গে ইহাদের খানিকটা বাণিজ্য থাকিবে সত্য, কিন্তু ইতালীর নগদ দামে ক্রয় করিবার শক্তি এত সীমাবদ্ধ যে বিক্রেতাদের পক্ষপাতিত্ব ক্রমশঃ বৃহত্তর জার্ম্মাণী অভিমুখেই ধাবিত হইবে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই ইংরেজ ও ফরাসী ক্রমশঃ চেষ্টা করিবে যাহাতে মধ্য-ইয়ুরোপের ঐ দেশগুলির কাছ হইতে কিছু কিছু কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারে; নচেৎ ফ্রান্স যুদ্ধের পর এই বিশ বৎসর ধরিয়া লীট্‌ল্ আঁতাত নামক যে তিনটি ক্ষুদ্র শক্তির পরিপোষকতা করিয়া আসিতেছে তাহারা ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় আওতার বাহিরে আসিয়া পড়িবে। যদিও মনে হয় অষ্ট্রিয়ার মত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য দখল করাতে ইয়ুরোপে এমনকি ওলট্-পালট্ হওয়া সম্ভব—তবুও ইহা ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে ভিয়েনা হইতে সমস্ত মধ্য ইয়ুরোপের আর্থিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করা



শিল্পী—শ্রীযুক্ত অমিতকুমার রায় • মৎস্য অভিযান • ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

যত সহজ এত আর কোথা হইতেও নহে। ইহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার লোহা, কাঠ এবং তৈল জার্ম্মাণ অর্থনীতির প্রভুত সাহায্য করিবে; ইহার অর্থ, জার্ম্মাণীর যুদ্ধায়োজন আরও স্বাধীন পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবে। ইয়ুরোপে আজ রাশিয়া ছাড়া আর কাহারও লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি নাই; যুদ্ধায়োজনে লোকবলের হিসাবটিও জার্ম্মাণীর প্রভুত্বের স্বপক্ষে।

একটি মাত্র বিষয় লইয়া অষ্ট্রিয়াতে এখনও মতদ্বৈধের শেষ হয় নাই; অর্থাৎ ক্যাথলিকদের সমস্যা। ইহুদীদের উপর অত্যাচার হইবেই, তাহাতে বাধা দিবার মত কোন শক্তি অর্থাৎ সামরিক শক্তি বর্ত্তমান নাই; কিন্তু ক্যাথলিকদের পিছনে একটি প্রধান শক্তি রহিয়াছে ভ্যাটিক্যান্ অর্থাৎ পোপের রাজত্ব। নাৎসিদের ধর্ম্মজ্ঞান খৃষ্টানদের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। বিশেষতঃ ক্যাথলিকদের কাছে। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই লুথার সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্যটির ইঙ্গিত করা হইয়াছে, নাৎসিদের ক্যাথলিক-বিরোধের মূলেও আছে সেই একই অসহিষ্ণুতা। অনেকদিন হইতেই নাৎসি অসহিষ্ণুতার জন্য জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিকদের প্রতি অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। ডাঃ নীম্যোলারের বিচার পদ্ধতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই পুরোহিতটার অপরাধ ছিল, মানুষ অপেক্ষা ভগবানের আজ্ঞাকে তিনি বড় করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীতে বীর-পূজা আজ মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। রোমের পোপ যদিও যুদ্ধ করিতে অক্ষম, কিন্তু তাঁহার হাতে অনেকগুলি অস্ত্র আছে যাহা দ্বারা হিট্লারের ধর্ম্মের মন্ত্রী হের্ রোজেনবের্গ এর অত্যাচারে বাধা দিতে পারেন। ইতালীর ফাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট পোপের সহযোগিতা ছাড়া চলিতে পারে না; কাজেই ক্যাথলিকদের অত্যাচার যদি জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়াতে আরও অগ্রসর হয় তবে ইতালীর সঙ্গে জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িবে। সেইজন্য হিট্লার যে মাসে যখন রোম পরিদর্শনে আসিবেন তখন পোপের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া এই সমস্যাটির সমাধান করিয়া যাইবেন এইরূপ শোনা যাইতেছে।

নাৎসি বিপ্লবের প্রায় সবগুলি আদর্শই গত পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে একটি একটি করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। জেনিভার অপমান, লোকার্ণো সন্ধির লাঞ্ছনা, রাইন্‌ল্যাণ্ডে সমরায়োজন, জার্ম্মাণ যুবার বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এবং বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়া অধিকার, হিট্লারের পাঁচ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে এতগুলি অসাধ্যসাধন হওয়াতে জার্ম্মাণীতে তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু এখনও দুইটি আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে; প্রথমতঃ ইয়ুরোপে বৃহত্তর জার্ম্মাণীর বাহিরে যত জার্ম্মাণভাষী সম্প্রদায় আছে তাহাদিগকে জার্ম্মান্ রাষ্ট্রের মধ্যে ফিরাইয়া আনা; দ্বিতীয়তঃ, গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী যতগুলি উপনিবেশ হারাইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার। প্রথম সমস্যার অন্তর্গত জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই বর্ত্তমানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং ইতালীতেও খানিকটা আছে দক্ষিণ টীরোল্ অঞ্চলে।

এই দুইটি সমস্যার কোনটিই সহজ নয়। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পরে মুসোলিনী যে কয়টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টভাবেই তিনি বলিয়াছেন, যে ইতালীর উত্তর সীমান্ত যদি কেহ স্পর্শ করে তবে ইতালী তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে রোধ করিবে। হিট্লার মুসোলিনীকে এই সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছেন যে ইতালো-জার্ম্মাণ সীমানা অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র। কাজেই দক্ষিণ টীরোল্ এবং উল্‌ৎসানো অঞ্চলে যে জার্ম্মাণ সম্প্রদায় ইতালীয়ান্ শিক্ষায় পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা দিগ্বিজয়ী হিট্লারের পক্ষেও কঠিন হইবে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রায় ত্রিশ লক্ষ জার্ম্মাণ আছে। কিন্তু তাহাদের সকলেই হিট্লারের রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহে। এই প্রকাণ্ড জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের যে দল নাৎসিভাবাপন্ন তাহার নেতা হের্ হেন্‌লাইন্ কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই আন্দোলন চালাইতেছে। অষ্ট্রিয়ায় নাৎসি-সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদী সঙ্ঘ ছিল তাহারা ক্রমশঃ একদলভুক্ত হইয়া আসিতেছে—যদিও জার্ম্মাণ মজুর দল এখনও হেন্‌লাইন্ দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাজী হয় নাই। এই সমস্যার বিশদ আলোচনা করিতে হইলে চেক্-গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; তদুপযুক্ত স্থান এইখানে নাই। সুতরাং এইখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চেক্-পার্লামেণ্টে জার্ম্মাণদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণদের কোন কোন প্রতিনিধি মন্ত্রিত্বও করিতেছে। একমাত্র ভাবপ্রবণতার দিক ছাড়িয়া দিলে জার্ম্মাণদের অভিযোগ করিবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যাহাই হউক, নাৎসিদের পয়সায় এবং উৎসাহে চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্ম্মাণ আন্দোলন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়ার মত এত অসহায় নহে; অষ্ট্রিয়ার বন্ধু অনেক ছিল কিন্তু সামরিক মিত্রতার সন্ধি কাহারও সঙ্গে ছিল না; চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যদিকে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক মিত্রতার চুক্তি রহিয়াছে, অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়া যদি কোন তৃতীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে ফ্রান্স ও রাশিয়া তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে চেকোশ্লোভাকিয়াতে হিট্লার যদি অষ্ট্রিয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেন তবে ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টির মূলে ইংরেজ ও ফরাসীর যে কূটনীতি বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রয়োজন আজও রহিয়াছে; অর্থাৎ জার্ম্মাণী যদি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিতে পারে তবে মধ্য-ইয়ুরোপে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য বহুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণী রাশিয়ার এক অংশ আত্মসাৎ করিতেও দ্বিধা করিবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, যে চেক্ সমস্যাটি জার্ম্মাণীর পক্ষে অত্যন্ত জটিল; কিন্তু জার্ম্মাণ চরিত্রে এমন একটি চরমপন্থী বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য জার্ম্মাণী এখানেই থামিয়া যাইবে এমন কথা বলা যায় না।

কলনী পুনরুদ্ধারের ব্যাপারটি আরও দুঃসাধ্য। ইংরেজ আজ যে আবার নূতন করিয়া ইতালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে জার্ম্মাণীকে তাহারা আরও বাড়িয়া যাইতে দিতে ইচ্ছুক নহে।

ফরাসী তাহার গণতন্ত্রে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই রোমে ফরাসী প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে এইরূপ

আলোচনা চলিতেছে। যে ইথিওপিয়াকে লইয়া এত কেলেঙ্কারী হইয়াছিল আজ তাহারই সমাধি রচনায় ইংরেজ ও ফরাসীর গভীর উৎসাহ দেখা যাইতেছে; তাহা হইতেই বোঝা যাইবে ঐ দুইটি জাত শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে যে ইতালীর সাহায্য ছাড়া জার্ম্মাণীকে খর্ব্ব করিয়া রাখা কাহারও সাধ্যে নাই। বৃটেনের সঙ্গে ইতালীর নূতন সন্ধিসূত্রের আঘাতে হিটলারের একটু সন্দেহের সঞ্চার হইবে সত্য কিন্তু ইতালো জার্ম্মাণ বন্ধুত্ব নষ্ট হইবে না। এদিকে সকল দেশেই যুদ্ধের আয়োজন বিপুলভাবে চলিতেছে, অথচ শান্তিকামী সকলেই। ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালী এখন যুদ্ধ করিতে চায়না, কিন্তু জার্ম্মাণী যদি 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সাগরে ঝাঁপ দেয় তবে সকলকেই জলে নামিতে হইবে। ইয়ুরোপের শান্তি এবং দুনিয়ার শান্তি নির্ভর করে মাত্র একটি লোকের মেজাজের উপরে—তিনি নাৎসি-গুরু জার্ম্মাণ জাতির নেতা হের্ হিট্‌লার।

রোম, ১৫ ৪-৩৮

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধ

শার্ঙ্গদেব এইরূপে মূর্ছ্না, ক্রম ও তানের স্বরূপ পরিচয় করিয়া বলিয়াছেন :—

গান্ধর্বে মূর্ছ্নাস্তানাঃ শ্রেয়সে শ্রুতি নোদিতাঃ।
গানে স্থানস্থ লাভেন তে কূটাশ্চোপযোগিনঃ॥

শুদ্ধ মূর্ছ্না ও শুদ্ধ তান গান্ধর্ব নামক গীতের উপযোগী; আর কূটতানসমূহ 'গান' বা 'দেশী গীতের' উপযোগী। এই মূর্ছ্না ও তান শুদ্ধরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহা শ্রেয়োলাভের সুনিশ্চিত হেতুরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কোন্ শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে টীকাকার কল্লিনাথ যে স্মৃতিবচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি স্মৃতিবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

আগ্নিষ্টোমিক তানেন যৈর্নরৈঃ স্তূয়তে শিবঃ।
তে ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ॥

যে তানে ষড়্‌জ স্বর বর্জিত, সেইরূপ ষাড়ব তানকে আগ্নিষ্টোমিক তান বলে। এই আগ্নিষ্টোমিক তানে যাঁহারা ভগবান্ শিবের স্তব করেন, তাঁহারা ইহলোকে বিপুল ভোগ লাভ করিয়া পরলোকে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

'শিবসাযুজ্য' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকিলে ষাড়ব আগ্নিষ্টোমিক তানের এই মহিমা উদ্‌ভট কল্পনা বলিয়া মনে হয়। অতএব প্রাচীন ভারতের বর্ণিত এই 'শিবসাযুজ্য' নব্য ভারতের ধারণায় একটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারত জানিতেন—শিবতত্ত্ব কথার কথা নহে—পারমার্থিক বস্তু। বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সুপ্রযুক্ত তানের সাহায্যে এই 'শিবসাযুজ্য' লাভ বা জীবতত্ত্বের সহিত শিবতত্ত্বের সংযুক্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। নিরবয়ব নিস্পন্দ শিবতত্ত্বের উপরে—স্থির জলের উপরে তরঙ্গের ন্যায়—জীবের মন নিরন্তর বিক্ষেপ তরঙ্গে স্পন্দিত হইয়া থাকে। জগতের সর্বত্র লুক্কায়িতভাবে বিরাজমান ষড়্‌জ প্রভৃতি স্বরসমূহ বিশুদ্ধ মূর্ছ্না ও তানে পরিণত হইয়া স্বীয় রঞ্জনায় যখন গায়কের বিক্ষেপ প্রক্ষালন করে, তখন গায়কের একাগ্রচিত্ত নিস্পন্দ স্থির শিবতত্ত্বে পৌঁছিয়া থাকে। সুপ্রযুক্ত স্বর-লহরী শ্রবণে পশু পক্ষীও একাগ্র হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। এই একাগ্রতা পুনঃ পুনঃ মূর্ছ্না তান প্রভৃতি স্বর সাধনায় বদ্ধমূল হইলেই গায়ক শিবসাযুজ্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার পক্ষে ভগবদনুগ্রহে বিপুল ঐহিক ভোগলাভ করা অথবা পরলোকে শিবসাযুজ্য লাভ করা উদ্‌ভট কল্পনা নহে—বরং স্বাভাবিক।

যাহা হউক, এইবার আমরা সঙ্গীত-রত্নাকর বর্ণিত 'সাধারণ' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিকৃত স্বরের প্রয়োগে দেশী গীতির যে বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 'সাধারণ' শীর্ষক বিষয়টি রত্নাকরে আলোচিত হইয়াছে।

'সাধারণ—উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুটিকে সাধারণ বলা হয়; যেমন এই পুষ্করিণীটি রাম ও শ্যামের সাধারণ অর্থাৎ পুষ্করিণীটি রামেরও যেমন শ্যামেরও তেমনই অধিকারভুক্ত

সম্পত্তি। এইরূপে যে স্বর দুই পার্শ্ববর্তী দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই বিকৃত স্বরসমূহকে 'সাধারণ' স্বর বলে। সাধারণ প্রথমতঃ দুই প্রকার—স্বর-সাধারণ ও জাতি-সাধারণ। স্বর-সাধারণ আবার চারি প্রকার—কাকলি-সাধারণ, অন্তর-সাধারণ, ষড়জ-সাধারণ ও মধ্যম-সাধারণ।

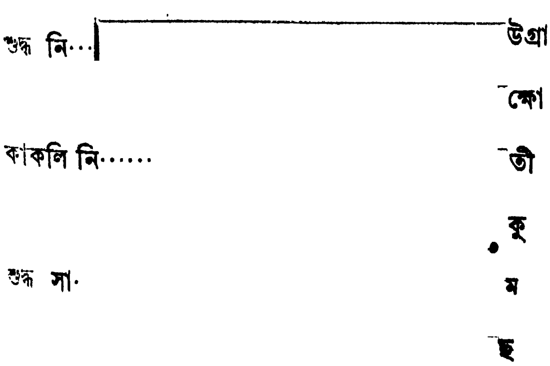
কাকলি-সাধারণ—শুদ্ধ নিষাদের দুই শ্রুতি ও শুদ্ধ ষড়জের দুই শ্রুতি হইতে যে চতুঃশ্রুতিক (চারি শ্রুতি সম্পন্ন) বিকৃত নিষাদ নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম কাকলি-সাধারণ এই কাকলি-সাধারণ কাকলি-নিষাদ নামেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাকলিসাধারণ প্রভৃতি সাধারণসমূহের শ্রুতি ব্যবস্থা পরবর্ত্তীচিত্রে প্রদর্শিত হইবে।

অন্তর সাধারণ—শুদ্ধ মধ্যমের দুই শ্রুতি ও শুদ্ধ গান্ধারের দুই শ্রুতি হইতে যে চতুঃশ্রুতিক বিকৃত গান্ধার নিষ্পন্ন হয় তাহারই নাম অন্তর সাধারণ। ইহা অন্তর-গান্ধার নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

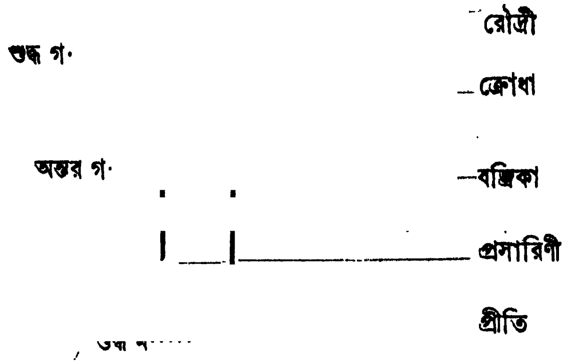
ষড়জ সাধারণ—নিষাদ যদি ষড়জের প্রথম শ্রুতিটি গ্রহণ করে আর ঋষভ ষড়জের শেষ শ্রুতিটি গ্রহণ করে ফলে ষড়জ স্বর অবশিষ্ট দুই শ্রুতি লইয়া নিষ্পন্ন হয়; এইরূপ বিকৃত ষড়জ স্বরকেই ষড়জ-সাধারণ বলে।

মধ্যম সাধারণ—এইরূপ গান্ধার যদি মধ্যমের প্রথম শ্রুতি ও পঞ্চম শেষ শ্রুতি গ্রহণ করে, ফলে অবশিষ্ট দুই শ্রুতিতে মধ্যম নিষ্পন্ন হয়, তবে এইরূপ বিকৃত মধ্যমকেই মধ্যম-সাধারণ বলে। মধ্যমগ্রামে এই মধ্যম-সাধারণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

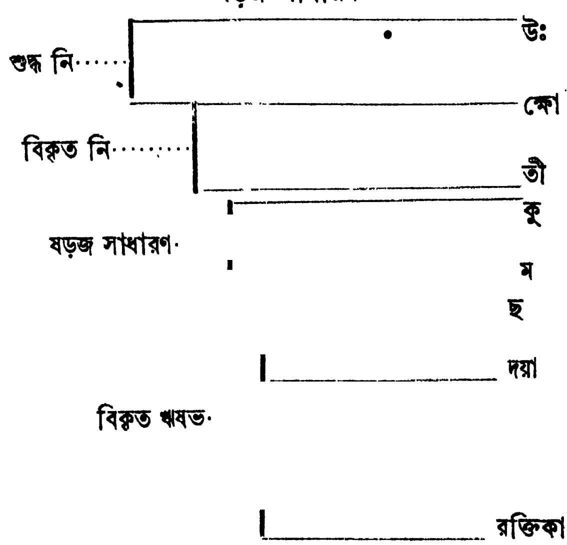
কাকলি-সাধারণ বা কাকলি-নিষাদ চিত্র



অন্তর-সাধারণ বা অন্তর-গান্ধার চিত্র

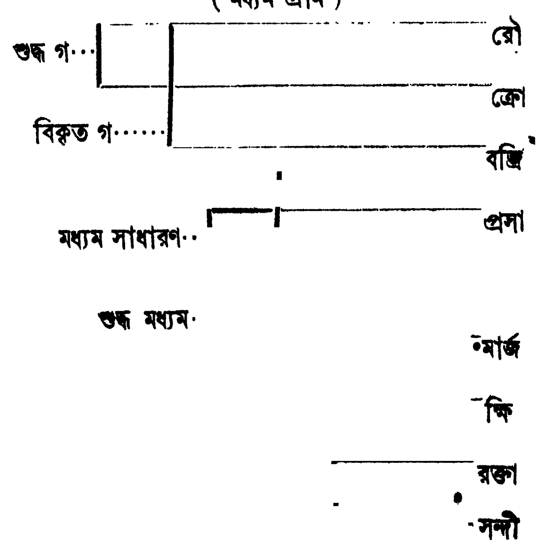


ষড়জ-সাধারণ



মধ্যম-সাধারণ চিত্র

(মধ্যম গ্রাম)



সাধারণ স্বরের প্রয়োগ পদ্ধতি—সাধারণ স্বরের প্রয়োগ বা ব্যবহার সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—(অবরোহ ক্রমে) 'সা' উচ্চারণ করিবার পরে ক্রমে কাকলি 'নি' ও 'ধা' উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মা গ্রামে 'মা' উচ্চারণ করিয়া অন্তর 'গা' ও 'রে' উচ্চারণ করিবে। অথবা ষড়জ ও কাকলি-নিষাদ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় ষড়জ উচ্চারণ করিবে। আর যদি ষড়জের পরবর্তী স্বরটি লুপ্ত বা বর্জিত থাকে, তাহা হইলে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী স্বরটি উচ্চারণ করিবে। অন্তর-গান্ধারের প্রয়োগেও এই নিয়ম অনুসরণ করিবে। ইহাই সাধারণ স্বরের প্রয়োগ-পদ্ধতি।

কৈশিক-সাধারণ ও গ্রাম-সাধারণ—ষড়জ-সাধারণ ও মধ্যম-সাধারণেরই অপর নাম কৈশিকসাধারণ। কারণ এই দুইটি সাধারণে চতুঃশ্রুতিক ষড়জ ও মধ্যম যখন পূর্বোক্ত প্রকারে দ্বিশ্রুতিক হয়, তখন এই দুইটি স্বরের ধ্বনি কেশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, এইজন্য তদবস্থায় ইহাদের নাম (কেশ+ ষ্ণিক=) কৈশিক-সাধারণ। এই দুইটি সাধারণের তৃতীয় নাম 'গ্রাম-সাধারণ'।

জাতি সাধারণ—এক গ্রাম হইতে উৎপন্ন দুই বা বহু জাতিতে যদি একটিই অংশ স্বর হয় এবং পূর্ব-বর্ণিত বর্ণের সাম্যে যদি একই প্রকার গান নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে দুই বা বহু জাতির সহিত সম্বন্ধ হেতু সেইরূপ গানকে 'জাতি-সাধারণ' বলে। কেহ কেহ একজাতি সমুদ্ভূত রাগ-সমূহকেই জাতিসাধারণ বলিয়া থাকেন।

বর্ণ—যদ্দ্বারা স্বর ও পদ প্রভৃতির বর্ণন বা বিস্তৃতি করা হয় তাহাকে 'বর্ণ' বলে। বর্ণ চারি প্রকার, স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী।

স্থায়ী বর্ণ—মৃদু বিরামসহ একটি স্বরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ বলে; যথা—সা সা সা রী রী রী ইত্যাদি।

আরোহী বর্ণ—আরোহ ক্রমে স্বরের বিস্তৃতিকে আরোহী বর্ণ বলে; যথা—সরিগ, রিগম, গমপ, মপধ, পধনি, ধনিস।

অবরোহী বর্ণ—অবরোহ ক্রমে স্বরের যে বিস্তৃতি তাহারই নাম অবরোহী বর্ণ; যথা—নিধপ, ধপম, পগম, মগরি, গরিস।

সঞ্চারীবর্ণ—স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহীবর্ণের মিশ্রণে স্বরের যে বিস্তৃতি তাহারই নাম সঞ্চারীবর্ণ, যথা—সারী, সারীগা, সানিধা, সারীগা ইত্যাদি।

যে গানে যে বর্ণের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, সেই গানে সেই বর্ণেরই নাম উল্লেখ করা সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়ম।

অলঙ্কার - বর্ণসমূহের বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতিকে অলঙ্কার বলে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থায়ী আরোহী প্রভৃতি বর্ণসমূহ যেরূপ পদ্ধতিতে সুসজ্জিত হইলে গীত অলঙ্কৃত হয়, তাহারই নাম অলঙ্কার। সঙ্গীতাচার্য ভরত বলেন—

শশিনা রহিতেব নিশা, বিজলেব নদী লতাবিপুষ্পেব।
অবিভূষিতেব কন্যা গীতিরলঙ্কারহীনা স্যাৎ॥

অলঙ্কার-বিহীন গীতি চন্দ্রালোকবিহীন নিশার ন্যায়, জলশূন্য নদীর ন্যায়, পুষ্পবর্জিত লতার ন্যায়, ভূষণহীন নারীর ন্যায় অমনোহর। সুতরাং গীতকে জনমনোহারী করিতে হইলে অলঙ্কার তাহার একটি প্রধান উপকরণ। শার্ঙ্গদেব অলঙ্কার-প্রকরণে মূর্ছনার প্রথম স্বরটিকে 'মন্দ্র' নামে ও ইহার দ্বিগুণ বা অষ্টম স্বরটিকে 'তার' নামে ব্যবহার করিয়াছেন; আর যে স্বরটি তিনবার লিখিত হইয়াছে, তাহাকে 'প্লুত' নামে ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রসন্ন' ও 'মৃদু' শব্দ ও মন্দ্র শব্দেরই সমানার্থক, এইরূপ 'দীপ্ত' শব্দটি তার-শব্দেরই সমানার্থক।

বর্ণ চারি প্রকার বলিয়া তাহার বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি-স্বরূপ অলঙ্কারও চারিভাগে বিভক্ত; যথা—স্থায়ীবর্ণগত অলঙ্কার, আরোহীবর্ণগত অলঙ্কার, অবরোহীবর্ণগত অলঙ্কার ও সঞ্চারীবর্ণগত অলঙ্কার। নিম্নে এই অলঙ্কারসমূহের অবান্তর ভেদ ও লক্ষণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে।

স্থায়ীবর্ণগত অলঙ্কার—স্থায়ীবর্ণগত অলঙ্কার সাত প্রকার; যথা—প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, ক্রমরেচিত, প্রস্তার ও প্রসাদ।

প্রসন্নাদি :—পূর্বে দুইটি মন্দ্রস্বর প্রয়োগ করিয়া যেখানে শেষে একটি তারস্বর প্রযুক্ত হয় তাহাকে 'প্রসন্নাদি' অলঙ্কার বলে; যথা—স স র্স।

প্রসন্নান্ত :—যে অলঙ্কারে পূর্বে দুইটি তারস্বর প্রয়োগ করিয়া শেষে একটি মন্দ্রস্বর প্রযুক্ত হয় তাহাকে 'প্রসন্নান্ত' অলঙ্কার বলে; যথা—র্স র্স স।

প্রসন্নাদ্যন্ত :—যে অলঙ্কারে আদি ও অন্তে দুইটি মন্দ্রস্বর

ও মধ্যে একটি তার-স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'প্রসন্নাদ্যন্ত' অলঙ্কার বলে ; যথা—র্স র্স র্স।

প্রসন্নমধ্য :—যে অলঙ্কারে আদি ও অন্তে তার স্বর ও মন্দ্রস্বর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'প্রসন্নমধ্য' অলঙ্কার বলে ; যথা—র্স স র্স।

ক্রম-রেচিত :—যে অলঙ্কারে অন্যূন তিনটি স্বরের সমবায়ে এক একটি কলা রচিত হয়, তাহার প্রথম কলার আদি ও অন্তে মূর্ছনার প্রথম স্বর ও মধ্যে দ্বিতীয় স্বর প্রযুক্ত হয়, দ্বিতীয় কলার আদি ও অন্তে মূর্ছনার প্রথম স্বর এবং মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর প্রযুক্ত হয়, তৃতীয় কলার আদি ও অন্তে মূর্ছনার প্রথম স্বর এবং মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর প্রযুক্ত হয়—এইরূপ তিনটি কলার সমাহারে যে অলঙ্কার রচিত হয়, তাহাকে 'ক্রম-রেচিত' অলঙ্কার বলে। যথা—প্রথম কলা স র স, দ্বিতীয় কলা স গ ম স, তৃতীয় কলা স প ধ নি স।

প্রস্তার—পূর্বোক্ত 'ক্রম-রেচিত' অলঙ্কারের তিনটি কলারই অন্ত্য স্বরটি যদি তার হয়, তবে তাহাকে প্রস্তার অলঙ্কার বলে ; যথা—স রি র্স র্স, গ ম র্স, স প ধ নি র্স।

প্রসাদ—পূর্বোক্ত প্রস্তার অলঙ্কারে যে ক্রমে তার ও মন্দ্রস্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যে অলঙ্কারে তাহার বিপরীত ক্রমে তার ও মন্দ্রস্বর প্রযুক্ত হয় (অর্থাৎ প্রথম স্বর তার ও অন্ত্যস্বরটি মন্দ্রভাবে প্রযুক্ত হয়) তাহাকে 'প্রসাদ' অলঙ্কার বলে ; যথা—র্স রি স, র্স গ ম স, র্স প ধ নি স।

আরোহীবর্ণগত অলঙ্কার

আরোহীবর্ণগত অলঙ্কার দ্বাদশ প্রকার ; যথা—বিস্তীর্ণ, নিষ্কর্ষ, বিন্দু, অভ্যুচ্চয়, হসিত, প্রেঙ্খিত, আক্ষিপ্ত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, উদ্গীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ ও বেণী।

বিস্তীর্ণ—মূর্ছনার প্রথম হইতেই দীর্ঘস্বরসমূহ যে অলঙ্কারে থাকিয়া থাকিয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাকে বিস্তীর্ণ অলঙ্কার বলে ; যথা—সা রী গা মা পা ধা নী।

নিষ্কর্ষ—যে অলঙ্কারে পূর্বোক্তরূপ বিলম্ব বা বিশ্রাম না করিয়া দ্রুতভাবে দ্বিরুক্ত স্বরসমূহ আরোহক্রমে প্রযুক্ত হয় তাহাকে নিষ্কর্ষ অলঙ্কার বলে ; যথা স স রি রি গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি।

(স্বরগুলি দুইবার স্থলে তিনবার বা চারিবার উচ্চারিত হইলে তাহাকে 'গাত্রবর্ণ' অলঙ্কার বলে ; যথা—স স স, রি রি রি, গ গ গ, ম ম ম, প প প, ধ ধ ধ, নি নি নি, স স স স, রি রি রি রি, গ গ গ গ, ম ম ম ম, প প প প ধ ধ ধ ধ, নি নি নি নি)।

বিন্দু—যে অলঙ্কারে প্রথম স্বরটি প্লুতভাবে তিনবার উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় স্বরটি হ্রস্বভাবে একবার উচ্চারণ করিতে হয়, এইরূপ তৃতীয় স্বরটি প্লুত ও চতুর্থ স্বর হ্রস্ব, পঞ্চম স্বর প্লুত ও ষষ্ঠ স্বর হ্রস্বভাবে উচ্চারণ করিয়া সপ্তম স্বরটি প্লুত নিয়মে তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে 'বিন্দু' অলঙ্কার বলে ; যথা—সা সা সা রি, গা গা গা ম, পা পা পা ধ, নী নী নী।

অভ্যুচ্চয়—যে অলঙ্কারে প্রথম স্বরটি উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় স্বর বর্জনপূর্বক তৃতীয় স্বর উচ্চারণ করিতে হয়, এইরূপ চতুর্থ স্বর বর্জনপূর্বক পঞ্চম স্বর, ষষ্ঠস্বর বর্জনপূর্বক সপ্তম স্বর উচ্চারণ করিতে হয় তাহাকে 'অভ্যুচ্চয়' অলঙ্কার বলে ; যথা—স গ প নি।

হসিত—যে অলঙ্কারে প্রথম স্বরটি একবার উচ্চারণ করিবার পরে দ্বিতীয় স্বরটি দুইবার—এইরূপ ক্রমিক বৃদ্ধির নিয়মে অবশিষ্ট স্বরগুলি উচ্চারিত হয়, তাহাকে 'হসিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সা রী রী গা গা গা মা মা মা মা পা পা পা পা পা ধা ধা ধা ধা ধা ধা নী নী নী নী নী নী নী।

প্রেঙ্খিত—যে অলঙ্কারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়যুক্ত তৃতীয়, তৃতীয়যুক্ত চতুর্থ, চতুর্থযুক্ত পঞ্চম, পঞ্চমযুক্ত ষষ্ঠ ও ষষ্ঠযুক্ত সপ্তম স্বরে ক্রমিক আন্দোলিত আরোহ হয়, তাহাকেই 'প্রেঙ্খিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—স রি রি গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি।

আক্ষিপ্ত—যে অলঙ্কারে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে একান্তরিত স্বর-যুগলের আরোহ হয়, তাহাকে আক্ষিপ্ত অলঙ্কার বলে, যথা—স গা গ পা প নী।

সন্ধিপ্রচ্ছাদন—যে অলঙ্কারের প্রথম কলাটি মূর্ছনার আদিস্থিত তিনটি স্বর লইয়া গঠিত, অন্য দুইটি কলা পূর্ব-কলার অন্তস্থিত স্বর হইতে ক্রমিক তিনটি স্বরে রচিত হয়, তাহাকে 'সন্ধিপ্রচ্ছাদন' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিগা গমপা পধনী।

উদ্গীত—মূর্ছনার আদি হইতে তিনটি স্বর লইয়া একটি কলা রচনা করিতে হইলে স্বর-সপ্তকের মধ্যে দুইটি কলা

(সরিগ ও মপধ) রচনা করা সম্ভবপর হয় ; যে অলঙ্কারে এই ত্রিস্বরাত্মক দুইটি কলার প্রত্যেকের আদিস্থিত দুইটি স্বর (স ও ম) তিনবার ও অন্যস্বরগুলি একবার উচ্চারিত হয়, তাহাকে উদ্গীত অলঙ্কার বলে ; যথা—স স স রি গা, ম ম ম প ধা।

উদ্বাহিত—যে অলঙ্কারে পূর্বোক্ত ত্রিস্বরাত্মক দুইটি কলার মধ্য স্বরটি তিনবার ও অবশিষ্ট স্বরগুলি একবার উচ্চারিত হয়, তাহাকে উদ্বাহিত অলঙ্কার বলে ; যথা—স রি রি রি গা, ম প প প ধা।

ত্রিবর্ণ—যে অলঙ্কারে পূর্বোক্ত ত্রিস্বরাত্মক দুইটি কলার আদিস্থিত স্বরগুলি একবার করিয়া আবৃত্তি করিবার পরে অন্ত্য স্বরটির তিনবার আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাকে 'ত্রিবর্ণ' অলঙ্কার বলে ; যথা স রি গ গ গা, ম প ধ ধ ধা।

বেণী—যে অলঙ্কারে পূর্বোক্ত ত্রিস্বরাত্মক দুইটি কলার তিনটি স্বরেরই তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাকে 'বেণী' অলঙ্কার বলে ; যথা—স স স রি রি রি গ গ গ ম ম ম প প প ধ ধ ধ।

পূর্বে 'নিষ্কর্ষ' অলঙ্কারের অবান্তর ভেদরূপে যে 'গাত্রবর্ণ' অলঙ্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে 'স' হইতে 'নি' পর্যন্ত সাতটি স্বরেরই তিনবার বা চারিবার উচ্চারণ করিতে হয় আর 'বেণী' অলঙ্কারে 'নি' স্বর বর্জন করিলে যে ছয়টি স্বর অবশিষ্ট থাকে, তাহা দুই কলায় বিভক্ত করিয়া উহাদের তিনবার মাত্র উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাই এই দুই অলঙ্কারের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য।

অবরোহী বর্ণগত অলঙ্কার

পূর্বোক্ত দ্বাদশটি অলঙ্কার অবরোহক্রমে নিষ্পন্ন হইলে তাহাকে অবরোহীবর্ণগত নামক অলঙ্কার বলে।

সঞ্চারী বর্ণগত অলঙ্কার

সঞ্চারীবর্ণগত অলঙ্কার পঁচিশ প্রকার ; যথা—মন্দ্রাদি, মন্দ্রমধ্য, মন্দ্রান্ত, প্রস্তার, প্রসাদ, ব্যাবৃত্ত, স্খলিত, পরিবর্ত, আক্ষেপ, বিন্দু, উদ্বাহিত, উর্মি, সম, প্রেঙ্খ, নিষ্কূজিত, শ্যেন, ক্রম, উদ্ঘাটিত, রঞ্জিত, সন্নিবৃত্ত-প্রবৃত্ত, বেণু, ললিত-স্বর, হুঙ্কার, হ্লাদমান ও অবলোকিত।

স্থায়ী আরোহী ও অবরোহীবর্ণের মিশ্রণে যে সঞ্চারীবর্ণ রচিত হয়, এই সঞ্চারীবর্ণগত পূর্বোক্ত পঁচিশ প্রকার অলঙ্কারের লক্ষণ যথাক্রমে নিম্নে লিখিত হইতেছে—

মন্দ্রাদি—যে অলঙ্কারের ত্রিস্বরাত্মক প্রথম কলাটি প্রথম তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর লইয়া রচিত, দ্বিতীয় কলা ২য় ৩য় ও ৪র্থ স্বরে, তৃতীয় কলা ৩য় ৫ম ও ৪র্থ স্বরে, চতুর্থ কলা ৪র্থ ৬ষ্ঠ ও ৫ম স্বরে, পঞ্চম কলা ৫ম ৭ম ও ৬ষ্ঠ স্বরে গঠিত, তাহাকে 'মন্দ্রাদি' অলঙ্কার বলে ; যথা—সগর, রমগ, গপম, মধপ, পনিধ।

মন্দ্রমধ্য—পূর্বোক্ত মন্দ্রাদি অলঙ্কারের পাঁচটি কলারই অন্তর্গত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর পরস্পর স্থান বিনিময় করিবার ফলে যে অলঙ্কার রচিত হয়, তাহাকে মন্দ্রমধ্য অলঙ্কার বলে। যথা—গসর, মরগ, পগম, ধমপ, নিধপ।

মন্দ্রান্ত—'মন্দ্রাদি' অলঙ্কারের পাঁচটি কলায় আদি ও অন্ত্যস্বর পরস্পর স্থান বিনিময় করিবার ফলে যে অলঙ্কার রচিত হয়, তাহাকে 'মন্দ্রান্ত' অলঙ্কার বলে ; যথা—রগম, গমর, মপগ, পধম, ধনিপ।

প্রস্তার—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম ও তৃতীয় এই দুইটি স্বর দ্বারা দ্বিস্বরাত্মক প্রথম কলা রচিত হয়, ঐরূপ দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বরে দ্বিতীয় কলা, তৃতীয় ও পঞ্চম স্বরে তৃতীয় কলা, চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্বরে চতুর্থ কলা, পঞ্চম ও সপ্তম স্বরে পঞ্চম কলা রচিত হয় তাহাকে 'প্রস্তার' অলঙ্কার বলে ; যথা—সগা, রিমা, গপা, মধা, পনী।

প্রসাদ—যে অলঙ্কারে পূর্ব পূর্ব স্বর পরবর্তী স্বরের আদিতে ও অন্তে প্রয়োগ করিবার ফলে এক একটি কলা রচিত হয়, এবং এইরূপ ছয়টি কলার সমবায়ে যে অলঙ্কার গঠিত হয় তাহাকে 'প্রসাদ' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিসা, রিগরী, গমগা, মপমা, পধপা, ধনিধা।

ব্যাবৃত্ত—যে অলঙ্কারের প্রথম তৃতীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বরে গঠিত (চতুঃস্বরাত্মক) কলায় পুনরায় প্রথম স্বরের আবৃত্তি হয় এবং অবশিষ্ট তিনটি কলা এক একটি স্বর বর্জন করিয়া (অর্থাৎ প্রথম স্বর স্থানে দ্বিতীয় স্বর স্থাপন করিয়া) পরে তাহার তৃতীয় দ্বিতীয় চতুর্থ স্বর উচ্চারণ করিবার পরে পুনরায় প্রথমোক্ত স্বরের আবৃত্তি হয়, তাহাকে 'ব্যাবৃত্ত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সা গ রি মা সা, রী ম গ পা রী, গা প ম ধা গা, মা ধ প নী মা।

স্খলিত—পূর্বোক্ত 'মন্দ্রাদি' নামক সঞ্চারীবর্ণগত

অলঙ্কারের ত্রিস্বরাত্মক (স গ রি প্রভৃতি) কলা পরবর্তী একটি স্বরের (মা প্রভৃতির) সহিত মিলিত হইয়া চতুঃ-স্বরাত্মক কলায় পরিণত হইবার পরে যদি অবরোহ ক্রমে আদিস্বর পর্যন্ত অবতরণ করে, তবে তাহাকেই 'স্খলিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সাগরিমা—মরিগসা। রিমগপা—পমগরী। গপমধা—ধমপগা। মধপনী—নিপধমা।

পরিবর্ত—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম স্বরটি দ্বিতীয় স্বর বর্জনপূর্বক তৃতীয় ও চতুর্থ স্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রথম কলা রচিত হয় এবং বর্জিত দ্বিতীয় স্বর আবার স্বীয় দ্বিতীয় স্বর বর্জনপূর্বক পরবর্তী দুইটি স্বরের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিতীয় কলার সৃষ্টি করে, এইরূপে অন্য দুইটি কলা ও গঠিত হয়, তাহাকে পরিবর্ত অলঙ্কার বলে ; যথা—সগমা, রিমপা, গপধা, মধনী।

আক্ষেপ—যে অলঙ্কারের ত্রিস্বরাত্মক পাঁচটি কলা স, রি, গ, ম, পা এই পাঁচটি স্বরের এক একটি স্বরকে আদিতে লইয়া রচিত হয়, তাহাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিগা, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী।

বিন্দু—যে অলঙ্কারে প্লুত বা তিনবার উচ্চারিত এক একটি স্বর পরবর্তী একটি স্বর স্পর্শ করিয়া পুনরায় স্বীয় উচ্চারণে এক একটি কলা রচনা করে, এইভাবে ছয়টি কলায় যে অলঙ্কার গঠিত হয়, তাহাকে 'বিন্দু' অলঙ্কার বলে ; যথা—সা সা সা রি সা, রী রী রী গ রী, গা গা গা ম গা, মা মা মা প মা, পা পা পা ধ পা, ধা ধা ধা নি ধা।

উদ্বাহিত—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম হইতে তৃতীয় স্বর পর্যন্ত আরোহের পরে দ্বিতীয় স্বরে অবরোহণে প্রথম কলাটি রচিত হয়, অন্য কলাগুলিও এক এক স্বর বর্জনপূর্বক এই ভাবেই গঠিত হয়, তাহাকে 'উদ্‌বাহিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিগরী, রিগমগা, গমপমা, মপধপা, পধনিধা।

উর্মি—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার আদি স্বরটি একবার উচ্চারণ করিবার পরে তাহার চতুর্থ স্বরটি প্লুতের নিয়মে তিনবার উচ্চারিত হয় এবং আদি ও চতুর্থ স্বর পুনরায় এক একবার উচ্চারিত হয় এইভাবে প্রথম কলা রচনা করিয়া এক এক স্বর বর্জনে অবশিষ্ট তিনটি কলা গঠিত হয়, তাহাকে 'উর্মি' অলঙ্কার বলে ; যথা—স মা মা মা স মা, রি পা পা পা রি পা, গ ধা ধা ধা গ ধা, ম নী নী নী ম নী।

সম—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম হইতে চারিটি স্বরের তুল্য আরোহ ও অবরোহে প্রথম কলা রচিত হয়, অবশিষ্ট তিনটি কলা এক এক স্বর বর্জনে এইভাবেই রচিত হইয়া থাকে, তাহাকে 'সম' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিগমা—মগরিসা, রিগমপা—পমগরী, গমপধা—ধপমগা, মপধনী—নিধপমা।

প্রেঙ্খ—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরের তুল্য আরোহ ও অবরোহে প্রথম কলা রচিত হয়, অন্য পাঁচটি কলাও এক এক স্বর বর্জনপূর্বক এই নিয়মেই গঠিত হইয়া থাকে তাহাকে 'প্রেঙ্খ' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরী-রিসা, রিগা-গরী, গমা-মগা, মপা-পমা, পধা-ধপা, ধনী-নিধা।

নিষ্কূজিত—পূর্বোক্ত 'প্রসাদ' অলঙ্কারের এক একটি কলার সহিত সেই সেই কলার আদি স্বরের তৃতীয় স্বর যোজনাপূর্বক পুনরায় আদি স্বর উচ্চারণে যে অলঙ্কারের কলাগুলি রচিত হয় তাহাকে নিষ্কূজিত অলঙ্কার বলে ; যথা—স রি সা গ সা, রিগরীমরী, গমগাপগা, মপমাধমা, পধপানিধা।

শ্যেন—যে অলঙ্কারে সরিগম এই চারিটি স্বর যথাক্রমে স্ব স্ব সংবাদী স্বরের সহিত মিলিত হইয়া চারিটি কলা রচনা করে, তাহাকে 'শ্যেন' অলঙ্কার বলে ; যথা—সপ, রিধ, গনি, মস।

ক্রম—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার আদি স্বরটি স্বীয় দ্বিতীয় স্বর, দ্বিতীয় তৃতীয় স্বর, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ স্বরের সহিত ক্রমে মিলিত হইয়া তিনটি কলায় পরিণত হয়, এই নিয়মে ঋ, গ, ম এই তিনটি স্বর ও তিনটি করিয়া কলা রচনা করিবার ফলে যে অলঙ্কার বারটি কলায় পূর্ণ হয়, তাহাকে ক্রম অলঙ্কার বলে ; যথা—সরি, সরিগ, সরিগম। রিগ, রিগম, রিগমপ। গম, গমপ, গমপধ। মপ, মপধ, মপধনি।

উদ্‌ঘটিত—যে অলঙ্কারে আরোহক্রমে মূর্ছনার প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর গান করিবার পর পঞ্চম স্বর হইতে চারিটি স্বর অবরোহ ক্রমে গান করিয়া যাহার প্রথম কলা রচনা করা হয়, এক এক স্বর ক্রমে বর্জন করিয়া অন্যান্য কলাগুলিও এই নিয়মেই গঠিত হয়, তাহাকে 'উদ্‌ঘটিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিপমগরী, রিগধপমগা, গমনিধপমা।

রঞ্জিত—'মন্দ্রাদি' অলঙ্কারের এক একটি কলা দ্বিগুণ করিবার পরে প্রারম্ভিক স্বরটি শেষে স্থাপন করিয়া যে অলঙ্কারের কলাগুলি রচিত হয়, তাহাকে 'রঞ্জিত' অলঙ্কার

বলে ; যথা—সগরিসগরিসা। রিমগরিমগরী। গপমগপমগা। মধপমধপমা। পনিধপনিধপা।

সন্নিবৃত্ত-প্রবৃত্তক—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার আদি ও তাহার পঞ্চম স্বর আরোহ-ক্রমে গান পূর্বক চতুর্থ হইতে তিনটি স্বরে অবরোহ করিয়া যাহার প্রথম কলা রচিত হয়, অন্যান্য কলাগুলি এক এক স্বর বর্জন করিয়া এই নিয়মেই রচিত হইয়া থাকে, তাহাকেই 'সন্নিবৃত্ত-প্রবৃত্তক' অলঙ্কার বলে ; যথা—সপামগরী, রিধাপমগা, গনীধপমা।

বেণু—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার প্রথম স্বরটি দুইবার গান করিয়া তাহার দ্বিতীয় চতুর্থ ও তৃতীয় স্বরের একবার গানে প্রথম কলা রচিত হয়, অন্যান্য কলাগুলি পূর্ববৎ এক এক স্বর বর্জন করিয়া এই নিয়মেই গঠিত হয়, তাহাকে 'বেণু' অলঙ্কার বলে ; যথা—সসরিমগা, রিরিগপমা, গগমধপা, মমপনিধা।

ললিত-স্বর—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার আদি দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বর গান করিয়া দ্বিতীয় স্বর হইতে দুই স্বরের অবরোহ দ্বারা প্রথম কলা রচিত হয়, অন্যান্য কলাগুলিও এক এক স্বর বর্জন পূর্বক এই নিয়মেই গঠিত হয়, তাহাকে 'ললিতস্বর' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিমরিসা। রিগপগরী। গমধমগা। মপনিপমা।

হুঙ্কার—যে অলঙ্কারের প্রথম কলাটি মূর্ছনার আদি ও দ্বিতীয় স্বর দ্বারা গঠিত হয় এবং অন্তে পুনরায় প্রথম স্বর ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি কলা এক এক স্বর ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং এক স্বর করিয়া অবরোহ হয় এবং সকল কলার অন্তে পুনরায় মূর্ছনার আদি স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'হুঙ্কার' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিসা, সরিগরিসা, সরিগমগরিসা, সরিগমপমগরিসা, সরিগমপধপমগরিসা, সরিগমপধনিধপমগরিসা।

হ্লাদমান—পূর্বোক্ত 'মন্দ্রাদি' অলঙ্কারের প্রত্যেক কলার অন্তে সেই সেই কলার আদি স্বর সংযুক্ত করিয়া যে অলঙ্কারের কলাগুলি রচিত, তাহাকে 'হ্লাদমান' অলঙ্কার বলে ; যথা—সগরিসা, রিমগরী, গপমগা, মধপমা, পনিধপা।

অবলোকিত—যে অলঙ্কারের চতুঃস্বরাত্মক চারিটি কলার আরোহ ও অবরোহের প্রথম স্বরটি স্বীয় দ্বিতীয় স্বর বর্জন করিয়া কলা রচনা করে, তাহাকেই 'অবলোকিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সগমামরিসা, রিমপাপগরী, গপধাধমগা, মধনীনিপমা।

সঙ্গীত-রত্নাকর রচয়িতা শার্ঙ্গদেব এইরূপে আরোহে সঞ্চারীবর্ণগত অলঙ্কার প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—অবরোহেও এই সঞ্চারীবর্ণগত অলঙ্কার হইতে পারে। তৎপর প্রাচীন সঙ্গীতাচার্যগণের স্বীকৃত আরও সাত প্রকার অলঙ্কার নির্দেশ করিয়া অলঙ্কার প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল পূরণের জন্য আমরা নিম্নে এই সাত প্রকার অলঙ্কারের লক্ষণ রত্নাকর-বাক্যের মর্মানুবাদ সহ উল্লেখ করিতেছি। সে সাত প্রকার অলঙ্কারের নাম—তারমন্দ্র-প্রসন্ন, মন্দ্রতার-প্রসন্ন, আবর্তক, সম্প্রদান, বিধুত, উপলোলক ও উল্লাসিত। নিম্নে এই সাতটি অলঙ্কারের লক্ষণ এবং প্রথম কলাটির আকৃতি প্রদর্শিত হইবে, অন্যান্য কলাগুলি পূর্ববৎ এক এক স্বর বর্জন পূর্বক লক্ষণানুসারে রচনা করিতে হইবে।

তারমন্দ্র-প্রসন্ন—আরোহে অষ্টমস্বর পর্য্যন্ত উঠিয়া যদি পুনরায় প্রথম স্বরে অবতরণ করা যায় তবে তাহাকেই 'তারমন্দ্র-প্রসন্ন' অলঙ্কার বলে ; যথা—সরিগমপধনি র্সা র্সা।

মন্দ্রতার-প্রসন্ন—মূর্ছনার আদি স্বর বা মন্দ্রস্বর হইতে অষ্টমস্বরে উঠিয়া যদি সাতটি স্বরে অবরোহ হয়, তবে তাহাকেই 'মন্দ্রতার-প্রসন্ন' অলঙ্কার বলে ; যথা—র্সা র্সা নিধপমগরিসা।

আবর্তক—আদি, দ্বিতীয় ও পুনরায় আদি স্বর—এই তিনটি স্বর দুইবার করিয়া গান করিবার পরে যদি এক একবার দ্বিতীয় ও আদি স্বরের গান হয়, তবে তাহাকেই 'আবর্তক' অলঙ্কার বলে ; যথা—সস রিরি সস রিসা, রিরি গগ রিরি গরী ; গগ মম গগ মগা, মম পপ মম পমা ; পপ ধধ পপ ধপা, ধধ নিনি ধধ নিধা।

সম্প্রদান—এই আবর্তক অলঙ্কারের প্রত্যেক কলার পরবর্তী দুইটি স্বর বর্জন করিলে যে অলঙ্কার নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই 'সম্প্রদান অলঙ্কার' বলে ; যথা—সস রিরি সস, রিরি গগ রিরি, গগ মম গগ, মম পপ মম, পপ ধধ পপ, ধধ নিনি ধধ।

বিধুত—যে অলঙ্কারে মূর্ছনার আদি স্বর ও একান্তরিত তৃতীয় স্বর এই দুইটি স্বরের দুইবার উচ্চারণে প্রথম কলা রচিত হয়, তৎপর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি স্বর দ্বারাও এই নিয়মে অন্যান্য কলা রচনা করা হয়, তাহাকেই 'বিধুত' অলঙ্কার বলে ; যথা—সগ সগা, রিম রিমা, গপ গপা, মধ মধা, পনি পনী।

উপলোল—মূর্ছনার প্রথম দ্বিতীয় এই দুই স্বর লইয়া একটি স্বর-যুগল এবং তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর লইয়া দ্বিতীয় স্বর-যুগল দুইবার করিয়া গীত হইয়া যাহার প্রথম কলা রচনা করে, অন্যান্য কলাগুলি এক এক স্বর বর্জনে এইরূপেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাকে 'উপলোল' অলঙ্কার বলে ; যথা, সরি গরি গরি, রিগ রিগ মগ মগ, গম গম পম পম, মপ মপ ধপ ধপ, পধ পধ নিধ নিধ।

উল্লাসিত—যে অলঙ্কারের প্রথম কলায় আদিস্বর দুইবার, তৎপর তৃতীয় প্রথম, পুনরায় তৃতীয় স্বর একবার করিয়া গীত হয়, অন্যান্য কলাগুলি এক এক স্বর বর্জনে এইরূপেই রচিত হইয়া থাকে, তাহাকে 'উল্লাসিত' অলঙ্কার বলে ; যথা—স স গ স গা, রিরি ম রিমা, গগ পগ পা, মম ধম ধা, পপ নিপনী।

শার্ঙ্গদেব এইরূপে (স্থায়ী বর্ণে ৭ + আরোহী বর্ণে ১২ + অবরোহী বর্ণে ১২ + সঞ্চারী বর্ণে ২৫ + অতিরিক্ত ৭ = ৬৩) তেষট্টি প্রকার প্রসিদ্ধ অলঙ্কার লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন। স্থায়ী আরোহী প্রভৃতি বর্ণ-সমূহে সাতটি স্বরদ্বারা বহুপ্রকার কলা রচনা পূর্বক অলঙ্কার রচনা করা যাইতে পারে ; সুতরাং অলঙ্কারের ইয়ত্তা নির্দেশ করা একপ্রকার অসম্ভব ; রত্নাকর তৎকালপ্রসিদ্ধ তেষট্টিটি অলঙ্কার লক্ষণ-সহকারে বলিয়াছেন।

কেন এত আড়ম্বর পূর্বক অলঙ্কারের স্বরূপ নির্ণয় করা হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—

রক্তিলাভ স্বরজ্ঞানং বর্ণাঙ্গানাং বিচিত্রতা।
ইতি প্রযোজনান্যাহুরলঙ্কার-নিরূপণে ॥

অলঙ্কার নিরূপণের ফলে শিক্ষার্থী স্বর-জনিত রক্তি বিষয়ে ও স্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, বর্ণ-সমূহের বিভিন্ন অঙ্গের বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও ধারণা অর্জন করেন।

সাতটা তেরো, রেলওয়ে

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

বাহুল্য কোলাহলবর্জ্জিত ছোট গ্রামখানি, কোনো রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। সংক্ষিপ্ত পথে আন্দাজ তিনমাইল দূরে নিকটবর্ত্তী সহর, সেটিও বিশেষ বড় নয়। গ্রামের বাসিন্দারা সহরের সুখসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আংশিক পাইয়া থাকে এবং সেইটুকুই যথেষ্ট সৌভাগ্য বলিয়া মানিয়া নেয়।

ধরণীনাথ এই গ্রামে স্কুলমাষ্টার, মাসান্তে কুড়ি টাকা তা'র প্রাপ্য। পাতায় কত লিখিতে হয় সে কথা সকলের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। বরং, সেটা অজ্ঞাত থাকাই ভালো।

প্রায় তিনবছর হইতে চলিল সে এখানে আসিয়াছে। মফঃস্বলস্থ কোন কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিবার পর কয়েক বৎসর এদিক ওদিক ঘুরিয়া, নানা চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কুত্রাপি কিছু জুটিল না, তখন সে এই গ্রামে আসিয়া এই স্কুলে মাষ্টারী নেয়। এখানেই যে বরাবর থাকিবে এমন ইচ্ছা হয় তো তাহার নাই, তবু স্ত্রী উমাকালী ও পুত্র মণির মুখ চাহিয়া সে টি'কিয়াই থাকে। সুযোগমত একাজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার বাসনা সে প্রায়ই প্রকাশ করে।

নিজ সুবিধার জন্য সস্তায় ধরণী একখানা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সাইকেল কিনিয়া নিয়াছে। সহরে তো হামেসাই যাইতে হইতেছে, সে ভাবে, এটা সৌখীনতা তো নিশ্চয়ই নয়, অপব্যয়-লোকসানও নহে ! বরং, লাভই !...

সহর পর্য্যন্ত এই তিন মাইল রাস্তা, দৈনিক না হউক, প্রায়ই যে তাহাকে যাইতে হয় একথা সত্য। আজ হয়তো নিজের একটা গেঞ্জি কিনিতে হইবে, কা'ল উমাকালীর জন্য এক শিশি তিল-তেল, তা'র পরদিন হয়তো স্কুলের সেক্রেটারী মহোদয়ের জরুরী তলব।...এমনি অনেক কিছু।

কষ্ট যে হয় না এমন নয়, তবু ধরণী সংসারটাকে যা' হোক্ একরকম করিয়া চালাইয়া নেয়। একে তো পাড়াগাঁ, বাজে খরচের হাঙ্গামা নাই বলিলেই চলে, তা'র উপর তা'রা স্বামীস্ত্রী দু'জনেই হিসাবী। ওদিকে তরিটা-তরকারিটা, শাকটা-সব্জিটা প্রায়ই ছাত্রবাড়ী হইতে উপহার আসে, গ্রাম্য সামাজিক সদ্ভাবে। তাহাতে গৃহস্থালী খরচের অনেকটা সাশ্রয় হয়। স্কুলে মণির মাহিনা লাগে না, সেও একটা আয়। একটি অবস্থাপন্ন ছেলের গৃহ-শিক্ষকতা করিয়াও কিছু আসে। সুতরাং, একরকম করিয়া তাহার সংসার চলে।...না চলিয়া উপায়ই বা আর কি !...

ছোট ভাই নরনাথ কলিকাতায় মেসে থাকে, ভালো কাজ করে। ভালো মানে, ধরণীর অপেক্ষা ভালো, ষাট্ টাকা মাহিনা। নরনাথের খরচ কম, সে অবিবাহিত। সেও দাদাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চায়, কিন্তু ধরণী সহজে তাহা নিতে চায় না। বলে : আহা, ও ছেলেমানুষ,

ক'লকাতায় থাকে! এ বয়সে ওদের কতরকম সখ, কত খরচ!… আমাকে দিলে ওর কি আর থাকে!…

অথচ নরনাথ তাহার অপেক্ষা মোটে তিনবছরের ছোট। ধরণী তাহার এই একমাত্র ভাইটিকে সত্যই বড় স্নেহ করে।

উমাকালীও বলে: আর আমাদের তো একরকম ক'রে চ'লেই যাচ্ছে! ঠাকুরপো' কষ্ট না পেলেই হ'ল!…

কাজেই, অশান্তি আর পাত্তা পায় না।…

নরনাথ কিন্তু শোনে না। প্রতিমাসেই সে নিজ হইতেই হয় কিছু টাকা, নয়তো কিছু জিনিসপত্র—অথবা জামাকাপড়, দাদার কাছে পাঠাইয়া দেয়। দাদার তাহাতে কত না আনন্দ, পাঁচজনকে ডাকিয়া সে কথা জানায়।

রেলওয়ে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জানকীবাবুকে ধরণী বলে: জানেন জানকীদা', অন্য কোন দেশ হ'লে আমার এই ভাইটা কত বড় হ'তে পারতো! এখানে যদি কোনদিন আসে, দেখবেন কেমন ছেলে! …এদেশে, বুঝলেন কিনা, গুণের আদর আর কোনও কালেই হ'ল না!…

ধরণীর অবসর সময়টা ষ্টেশনের হাতায় এই জানকীবাবুর সাথেই কাটে। জানকীবাবু প্রৌঢ়, মৃতদার—ধরণীর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে ছেলেমেয়েরা মাতুলালয়ে থাকে, তিনি সাহায্য পাঠান। সদানন্দ, সরল-প্রকৃতির ভদ্রলোক। এই অল্পবয়স্ক স্কুল-মাষ্টারটির প্রতি তিনি বড় অনুরক্ত।…

একটা কি পর্ব্ব উপলক্ষে ক'টা দিন ছুটি। সুতরাং এ কয়দিন ধরণীর প্রচুর অবসর।…

সকালবেলা কিছু খাইয়া মণি দলবলের সাথে ছুটাছুটি করিতে বাহির হইয়া যায়। উমাকালী একটা স্বচ্ছন্দ আলস্যের ভাব লইয়া ধীরে সুস্থে করিবার মত ঘরকন্নার কাজগুলিতে হাত দেয়। নিজ হাতে সাজা একটা পান গালে দিয়া ধরণীও জানকীবাবুর কাছে যাইবার জন্য আস্তে আস্তে রাস্তায় নামে।…

মাত্র দু' তিনমিনিটের পথ।…

ষ্টেশন গণ্ডীর মধ্যে পা পড়িতেই, জানলার ভিতর হইতে জানকীবাবু ধরণীকে দেখিতে পান। চীৎকার করিয়া অভ্যর্থনা করেন: এসো ভায়া এসো!…ছুটি বুঝি?…

জানলার মধ্য দিয়া ধরণীর চোখে পড়ে একজোড়া চশমার ঝলমলানি। সেইটাকেই উদ্দেশ করিয়া সে বলে: হ্যাঁ দাদা, ছুটি!…ছুটি না হ'লে কি আর এ সময়ে আমাদের আসা চলে!…

বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া টুলের উপর বসে। জানকীবাবুর একটু ব্যস্তভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে: গাড়ী আসছে নাকি?…মানুষের না মালের?…

জানকীবাবু মুখ না তুলিয়া চাপা হাসিয়া উত্তর দেন: ইলেভেন্ আপ্!…

তিনি জানেন, এই রেলওয়ে ভাষা শুনিলে ধরণী বিষম চটিয়া যায়!

হয়ও তা'ই। ধরণী উত্তেজিত হইয়া বলে: আপ্, ডাউন্ রাখুন দাদা!…পরিষ্কার ক'রে বলুন, কোন্ গাড়ী কোত্থেকে, কখন আসছে!…

আরে, ক'লকাতার গাড়ী, নটা-দু'য়ে যেটা এখানে আসে!…বলি, রেগে গিয়ে তা'ও কি ভুলে যাচ্ছো!…হাঃ হাঃ হাঃ…ব'সো ব'সো, টে নটা বিদেয় ক'রে দিয়ে আসি…

বলিতে বলিতে জানকীবাবু কোম্পানী প্রদত্ত কোটটা কাঁধে নিয়া বাহির হইয়া প্ল্যাট্ফর্ম্মে আসেন।

ধরণীও বাহির হয়। টেণের প্যাসেঞ্জার দেখিতে ছেলেবেলা হইতেই তাহার ভালো লাগে। তা'রপর এই পাড়াগাঁয়ে এ তো একটা রীতিমত আকর্ষণের বস্তু! ওই তো গ্রামের কত লোক আসিয়াছে, কত আসিতেছে…ছেলে বুড়ো!…তাহারা ট্রেণ দেখিবে, কলরব উপভোগ করিবে, বিচিত্র কত আরোহীর সাথে সস্মিত দৃষ্টি-বিনিময় করিবে!… বৈচিত্র্যহীন, নিরালা জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে কোলাহলের ক্ষণিক উৎসব, এই যে অনুভূতি উপভোগ, ইহা তাহারা চায়, তাহাদের ভালো লাগিবারই কথা।…

টেণ আসিয়া প্ল্যাট্ফর্ম্মে দাঁড়ায়। স্থানটি যেন সহসা মুখর, জীবন্ত হইয়া ওঠে।…

মোটে একটি মিনিট…তা'রপরেই ঘণ্টা, সবুজ নিশান, তীব্র বংশীধ্বনি।…ট্রেণ আবার চলিয়া যায়।…

জায়গাটা যেন আগের চেয়ে দ্বিগুণ ফ'াকা হইয়া পড়ে, লাইনটা খালি ধূ ধূ করিতে থাকে।…

চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া দিয়া সাড়ে ছ'খানি টিকেট হাতে জানকীবাবু ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসেন, কোট্টাকে একেবারে মাথার উপর চাপাইয়া। ধরণীও তাঁহার সাথে সাথে আবার ঘরে ঢোকে।…

তা'রপর আরম্ভ হয় দু'জনের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। বেলা যে বাড়িতে থাকে কথাবার্ত্তায়, সে কথা কাহারও মনে আসে না।…

পোষ্ট-আপিসের পিওন জানকীবাবুর ডাক দিতে আসিয়া ধরণীকে বলে: আপনারও একখানি চিঠি আছে, মাষ্টারবাবু!…বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড তাহার হাতে দেয়।

চিঠি পড়িয়া ধরণী প্রায় লাফাইয়া ওঠে। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে: শুনুন জানকীদা'!…নরু আসছে, আমার সেই ছোটভাই নরু, যার কথা আপনাকে কত বলেছি!…সুবিধেমত এখানে একবার আসতে চিঠি দিয়েছিলাম কিনা!…এ ছুটিটা ওদেরও হয়েছে দেখছি!…আজই সন্ধ্যের গাড়ীতে আসবে লিখছে…শুনছেন দাদা!…

জানকীবাবু নিজ হাতের চিঠিটা হইতে স-চশমা চোখ তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন: তা'ই নাকি, বেশ বেশ!…

ধরণী অকস্মাৎ যেন বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। খাপছাড়া ভাবে বলিয়া ওঠে: আচ্ছা, আমি তা' হ'লে যাই···বাড়ীতে খবরটা দিই গে !···আর হ্যাঁ, সন্ধ্যের গাড়ীটা এখানে ঠিক ক'টায় ধরে জানকী দা' ?···

জানকীবাবু চিঠি পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দেন: অ্যাঁ···সন্ধ্যের গাড়ীটা ? হ্যাঁ···উনিশটা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলেন: সাতটা তেরো, রেলওয়ে !···ওই গাড়ীতেই তোমার···

তাঁহার কথা শেষ হইবার আগেই ধরণী অসহিষ্ণুভাবে বলে: হ্যাঁ। আচ্ছা, তা' হ'লে আমাদের হ'ল গে কত ?···তেরো আর চব্বিশ··· তেরো আর চব্বিশ···

উৎসাহের আধিক্যে এই সোজা হিসাবটাও সে তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিতে পারে না।

জানকীবাবু চিঠি সমাপ্ত করিয়া বলেন: সাঁইত্রিশ।

ধরণী বলে: সাঁইত্রিশ। আমাদের হ'লো গে তবে সাতটা সাঁইত্রিশ।···আচ্ছা, আসি তবে জানকী দা'···

একটু অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইয়া বলে: এলেই ষ্টেশনে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো, দেখবেন একবার আলাপ হ'লে আর ছাড়বে না। ভারী আমুদে ছেলে কিনা !···আচ্ছা···

গৃহে ফিরিয়া ধরণী উমাকালীকে খবরটা জানায়। তা'রপর উপদেশ দেয়: ওবেলা রান্নাটা একটু ভালো ক'রতে হবে···আমি একবার দেখে আসি বড় মাছ-টাছ পাওয়া যায় কিনা।···

ঠাকুরপো' আসিবে—উমাকালীও ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কাকাবাবু আসিতেছে শুনিয়া মণি আনন্দে নাচিতে থাকে।···

দুপুরবেলা একটু বিশ্রামের পর, ঠিক আড়াইটা বাজিতেই ধরণী আবার উঠিয়া পড়ে। উঠিয়া ভিজা গামছাখানা কাঁধে নিয়া উমাকালীকে এটা-ওটা ফরমায়েস করে। বলে: এসেই কিন্তু চা চাইবে, সাথে অমনি একটু হালুয়াও ক'রে ফেলো।···আর শোনো, রাত্তিরে যদি লুচি-টুচি খায়, সে বন্দোবস্তও তো ক'রে রাখতে হয় !···

উমাকালী বলে: তুমি তা' হ'লে আমাকে জিনিসগুলো এনে দাও শীগ্‌গির ক'রে···

ছাতাটা নিয়া সুজি চিনি ময়দা ঘি প্রভৃতি আনিতে ধরণী বাহির হইয়া পড়ে।···

জিনিসগুলা লইয়া বাড়ীতে ফিরিতেই দৈবধর কুণ্ডুর সাথে দেখা। ধরণীকে দেখিয়া দৈবধর বলে: আপনাকে একবার জানকীবাবু ডাকছেন এখুনি।···

দৈবধর ওই গ্রামেরই লোক।

বলোগে যাচ্ছি, বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া ধরণী স্ত্রীকে আরো কিছু উপদেশ আদেশ দেয়। মণিকে ডাকিয়া বলে: রোদ্দুরে কোথাও বেরুস্ না যেন, বাড়ীতে থাক্‌বি বুঝলি !···

তা'রপর ফতুয়াটা গায়ে দিয়া, ছাতাটা লইয়া ধীরে ধীরে আবার ষ্টেশনের দিকে রওনা হয়।···

ঘরে ঢুকিতেই জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করেন: তোমার ভায়ের এই গাড়ীতেই আসবার কথা ছিল না ?···সকালবেলা তা'ই বললে না ?···

ধরণী বিস্মিত হইয়া বলে: হ্যাঁ, কেন বলুন তো !

জানকীবাবু যেন একটু গম্ভীর হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলেন: আউট্ রিপোর্ট দিতে দিয়ে কন্‌ট্রোলে একটা খবর পেলাম।···ইলেভেন্ আপ্ ট্রেণে একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট্ হয়েছে··· ডিরেলমেন্ট্।···অবশ্য, সব খবর ঠিক পাইনি !···ওই ট্রেণটাই সন্ধ্যেয় এখানে আসে কিনা, তা'ই তোমাকে ডেকে ভালো ক'রে জান্‌লাম, ওইটেতেই তোমার ভাই আস্‌ছে কিনা।···

ধরণী খবর শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়, শুষ্ককণ্ঠে শুধু বলে: অ্যাক্‌সিডেন্ট !···

জানকীবাবু জোর করিয়া কাশিতে থাকেন। জোড়াতালি দিয়া বলেন: হ্যাঁ···তবে মনে হয়, তেমন কিছু নয় !···কলিশন্ তো আর নয়···সামান্য ডিরেলমেন্ট্···হয়তো এমন কিছুই···

বলিয়া চশমাটা খুলিয়া কাশিতে থাকেন।

ধরণী ব্যাকুলভাবে বলে: ভালো ক'রে খবরটা পাবার কি কোনো উপায় নেই জানকীদা' !···

জানকীবাবু চশমাটা আবার পরিয়া চিন্তিতভাবে বলেন: কন্‌ট্রোলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু ছোট ষ্টেশন···জুরিস্‌ডিক্‌সনের বাইরে···ব্যাটারা বড় খিটখিট্ করে···ব'লতেই চায় না কিছু···

ধরণী বাধা মানে না। জানকীবাবুর হাত ধরিয়া বলে: জানকীদা', যেমন ক'রে হোক্, চেষ্টা করুন।

অগত্যা জানকীবাবু কন্‌ট্রোল ধরেন। বিস্তর বকাঝকা খাইলেন, কিন্তু ধরণীর মুখ চাহিয়া সহ্য করিয়া যান। কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে।···

জানকীবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া ধরণী চক্ষু বিস্তৃত করিয়া এক তরফের ভাব ও ভাষা হইতে যতটা পারে উদ্বেগাকুলচিত্তে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটা তাহার কাছে ক্রমশঃই ঘোরালো হইয়া ওঠে।···

কন্‌ট্রোল ছাড়িয়া জানকীবাবু বলেন: যা' ব'লেছিলাম, পয়েন্ট ঠিকমত না থাকায় গার্ডের গাড়ীটা আর তা'র পেছনের একখানা কামরা লাইন ছেড়ে যায়। সেই কামরাতেই একজনের যা' কিছু জখম বেশী, আর সব সামান্য।···

ধরণী যেন কিছুটা স্বস্তি পায়। তাহার মুখে একটু একটু করিয়া আবার রক্তের ছোপ ফিরিয়া আসে। তবু স্বাভাবিকতায় ফিরিতে খানিকটা সময় লাগিয়া যায়। মনকে প্রবোধ দেয়, এত কাম্‌রা থাকিতে নয় যে ওই কাম্‌রাতেই উঠিবে, এর কি মানে !···উঠিলেও তাহারই যে জখম হইবে, এমনই বা কোন্ কথা আছে !···ঠিক সময় মত আসিতে পারিলনা, এইটুকুই যা ক্ষতি।

ধরণী জানকীবাবুর সাথে অন্য কথা আরম্ভ করে। এ গাড়ীর

প্যাসেঞ্জারদের আসিতে কত দেরী হইবে, এই গাড়ীটাই আসিবে কিনা, যাদের জখম হইয়াছে, তাদের বিধি-ব্যবস্থা কি হইবে, ইত্যাদি।…

খানিক পরে, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে সে বাড়ী ফেরে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধরণী আবার ষ্টেশনে যায়। জানকীবাবুকে বলে: রাত্তিরে কিন্তু আমার ওখানেই খাবেন জানকীদা!…গাড়ী যদি লেট্ হয়, একটু না-হয় অপেক্ষাই করা যাবে, কি বলেন…

জানকীবাবু বলেন: বেশ।…ধরণী বসে।

হঠাৎ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে টেলীগ্রাম পিওন আসিয়া দরজার কাছে সাইকেল হইতে নামে। জিজ্ঞাসা করে: ধরণীবাবু…ধরণীনাথ চৌধুরী…আছেন এখানে?

ধরণী চম্‌কাইয়া ওঠে। জানকীবাবু জবাব দেন: হ্যাঁ, ইনিই। কেন?…

পিওন টেলীগ্রাম আর ফর্ম্ম বাড়াইয়া দেয়। ধরণীর নামে টেলীগ্রাম। বাড়ীতে খবর নিয়া এখানে আসিয়াছে।

ধরণী যন্ত্রচালিতের মত প্রসারিত ফর্ম্মখানিতে সহি করিয়া দেয়। পিওন প্রস্থান করিবার সাথেসাথেই ফস্ ফস্ করিয়া খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলে।…

তা'রপর পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানি কাগজের মত সাদা হইয়া যায়।…

জানকীবাবু তাহার হাত হইতে সেখানা নিয়া পড়িয়া ফেলেন। পড়িয়া তিনিও স্তম্ভিত হইয়া ধরণীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন।…

খবর আসিতেছে, ইতিপূর্ব্বে কথিত দুর্ঘটনার স্থান হইতে, হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ প্রেরক। সংক্ষিপ্ত সংবাদের মর্ম্ম এই: নরনাথ চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোক উক্ত দুর্ঘটনায় মাথার স্থান বিশেষে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। অবিরাম রক্তপাত হইতেছে এবং তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হওয়ায়, সাথের কাগজপত্র টিকেট প্রভৃতি দেখিয়া এই টেলীগ্রাম করা হইল।…

ধরণী পাগলের মত বলিয়া ওঠে: কি করবো এখন, জানকীদা'… বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।

জানকীবাবু সান্ত্বনা দেন: ভয় করবার খুব কারণ নাও থাকতে পারে। তুমি বরং এই সাড়ে ছ'টার গাড়ীতেই চলে যাও সেখানে, আমি তোমার বাড়ী দেখবো এখন। কোনও চিন্তা ক'রোনা…ভগবান আছেন…

সাহস দেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই যেন সাহস পাননা।

জানকীবাবুর উপদেশ মত ধরণী সাড়ে ছটার গাড়ীতেই চলিয়া যায় বটে, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া আসে একা, তাহার বড় আদরের ভাই নরনাথকে ইহজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া। অথচ, আগের দিন এই সন্ধ্যা সাতটা তেরোর গাড়ীতেই সেই নরনাথেরই কিনা আসিবার কথা ছিল…একটি ক্ষুদ্র পরিবারের জন্ত অজস্র আনন্দ সাথে লইয়া!…

এমনিই বুঝি হয়!…

মানুষের বুকে দুঃখ যদি সমানভাবেই চিরকাল বাসা বাঁধিয়া থাকে, জীবনের দুঃসহ ব্যথাবেদনাগুলিতে কালের স্নিগ্ধপ্রলেপ যদি না পড়ে, তবে মানুষ বাঁচে কি করিয়া!…ধরণীর বুকের ক্ষতেও আবরণ পড়ে, কিন্তু স্মৃতি যায়না। কাল তাহাকে সহিবার শক্তি দেয়, ভুলিবার শক্তি দিলনা।…

আরও দুই বছর কাটিয়া গিয়াছে। ধরণী সেই গ্রামে সেই মাষ্টার হইয়াই আছে। তাহার উৎসাহে আসিয়াছে একটা পূর্ণচ্ছেদ, আগ্রহে একটা নিবৃত্তি। কলের পুতুলের মত সে চলে ফেরে, কাজকর্ম্ম করে।

এই দু'বছরে তার সমস্ত অন্তর ভরিয়া তিলে তিলে জমিয়া ওঠে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। সমস্ত যন্ত্র জগতটারই উপর তাহার একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আসে…একটা প্রতিহিংসার বিদ্বেষ!…লোহালক্কড়, কলকব্জা প্রভৃতিকে সে রীতিমত ঘৃণামিশ্রিত ভয় করিতে থাকে! এমন কি যন্ত্রচালিত যান-বাহনাদির উপরেও সে হইয়া পড়ে পরিপূর্ণভাবে বীতশ্রদ্ধ!…

সাইকেলখানাতে আর তাহার চড়িতে ইচ্ছা হয়না। বলে: কবে আমায় খেয়ে ফেলবে!…সহর পর্য্যন্ত রাস্তাটা আজকাল সে প্রয়োজনে হাঁটিয়াই সারে। অবশ্য প্রয়োজনও তাহার এখন অনেক কম।

টে্রণের আখ্যা দিয়াছে, দানব!…লাইনটাকে বলে, নরকের পথ। যান্ত্রিক কোনও যানে চড়া সে একপ্রকার ছাড়িয়াই দেয়। অবসর সময়ে জানকীবাবুর ওখানে গিয়া বসে বটে, কিন্তু কোনও টে্রণ আসিবার সময় হইলেই সেখান হইতে চলিয়া আসে। সেই বিরাট লৌহমূর্ত্তি সে চোখে সহ্য করিতে পারেনা। বলে: হিংস্র, রক্তভুক্ দানব!…

গ্রামের লোকেরা কাণাঘুষা করিয়া বলাবলি করে: ম্যানিয়া!…

এমনি কাটে।…

সেদিন বিকালের দিকে এক গা' জ্বর লইয়া মণি স্কুল হইতে বাড়ী ফেরে। আসিয়াই শুইয়া পড়ে, অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরধ্বনি করিতে থাকে।

পাড়াগাঁয়ে অসুখ বিসুখ হইলে অত তাড়াতাড়ি চিকিৎসক ডাকিতে গেলে চলে না; সেটা অভাব কিংবা আলস্য, যে জন্যই হউক অনভ্যাস। রোগ যত কঠিনই হউক না কেন, দু'চারদিন দেখিতেই হয়।

এক্ষেত্রেও সেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। জ্বর কিন্তু ছাড়া পাইয়া বাড়িয়াই চলে এবং ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া পড়ে। সেই সাথে অন্য উপসর্গ গ্লানিও আসে।

চতুর্থ দিনে ধরণী গ্রামের অরুণবাবুকে ডাকিয়া আনে এবং তাঁহার হাতে মণির মরণ বাঁচন শুভাশুভ অর্পণ করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করে। অনন্তবাবু ডাক্তার, কিন্তু পাশ করা নয়!

কিন্তু রোগ কমিবার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। বরং বাড়ে বলিয়াই মনে হয়।…

বারো দিন পরে রোগীর অবস্থা দেখিয়া অনঙ্গবাবু ধরণীর প্রদত্ত গুরুভার আর একা-একা বহন করিতে অনিচ্ছা ও অক্ষমতা জানান। সরলভাবেই বলেন: সহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসুন, তাঁর সাথে পরামর্শ ক'রে যা' হয় করা যাবে বরং !…রোগের গতিকটা ভালো বোধ হচ্ছে না !…

ধরণী ভালোমন্দ বোঝে না, সকলের উপদেশই শোনে। উমাকালী ঘোমটা টানিয়া আসিয়া বলে: টাকার জন্যে ভেবো না। আমার হাতে কিছু আছে, তা' ছাড়া দু'একখানা গয়নাও তো আছে।…কি হবে আর ওসব দিয়ে !…

ধরণী বহুদিন পরে আবার সেই সাইকেলখানা ব্যবহার করে। নিজের জন্য করিত কিনা জানিনা, কিন্তু মণির জন্য না করিয়া পারে না।

অনেক টাকায় এবং অনেক কষ্টেই বলিতে হইবে, সহরের বড় ডাক্তারকে নিয়া সে ফিরিয়া আসে। মণিকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলেন: খারাপ হ'য়ে পড়েছে দেখছি, আরো আগে ডাকা উচিত ছিল।… যা' হোক্, ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। আজ ব্যবহার ক'রে কেমন থাকে কা'ল জানাবেন।…

বলিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন।

ধরণী সহর হইতে ওষুধ আনায়। যথারীতি উপদেশ মত চলে, খরচের দিকে তাকায় না। তবু বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন বোঝা গেল না, বরং শেষ রাত্রির দিকে মনে হয় খারাপের দিকটাই যেন বেশী।

ভোরে অনঙ্গবাবুকে খবর দিয়া ধরণী সহরের দিকে সাইকেল ছুটায়, ডাক্তারকে সংবাদ দিতে।

ডাক্তারবাবু যখন আসেন, তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। ভালো করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলেন: ইঞ্জেক্‌শন্ দিতে হবে। তা'তে যদি ভালোর দিকে যায়, তবেই মঙ্গল। লিখে দিচ্ছি, নিয়ে এসে রাখুন, আমি ওবেলা এসে নিজে দিয়ে যাবো। আর ওষুধটাও নিয়মিত খাওয়াতে থাকুন।…

ডাক্তারবাবুর সাথেই ধরণী সহরে আসে। সমস্ত অর্থাৎ তিনটা ডাক্তারখানা খুঁজিয়াও ইঞ্জেক্‌শন্ পাওয়া গেল না, এমনি দুরদৃষ্ট ! একজন শুধু বলিল: কা'ল পেতে পারেন।

ধরণী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া ডাক্তারবাবুর কাছে বসিয়া পড়ে। কান্নাহত গলায় বলে: বুঝেছি ডাক্তারবাবু, ও আমারই বরাত !… ছেলেটাকে আর বাঁচাতে পারবো না !…

ডাক্তারবাবু সাহস দিয়া বলেন: অত অধৈর্য্য হ'লে চলে না। এখানে না পাওয়া গেলে ক'লকাতা থেকে আনবার চেষ্টা ক'রতে হবে।

ধরণী হতাশ হইয়া বলে: সে কি ক'রে হয়, ডাক্তারবাবু ! আজ গিয়ে কালকের আগে কি ক'রে আসি !…ততক্ষণ যদি ও…

তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না।

ডাক্তারবাবু বলেন: আপনাকেই যে যেতে হবে এমন তো কোন কথা নেই ! ক'লকাতায় আপনার আত্মীয়-স্বজন বা জানাশোনা এমন কেউ নেই, যা'কে টেলীগ্রাম ক'রে দিলে, সে নিয়ে আসতে পারে ?

ধরণী ভাবে সেখানে এমন কে আছে, কে তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবে। মামাতো ভাই চারুর কথা মনে পড়ে…কিন্তু সে কি আসিবে !…আর তা' ছাড়া আছেই বা কে !…বলে: মামাতো এক ভাই আছে, আর তো কাউকে দেখছি না।…

ডাক্তারবাবু বলেন: তবে তা'র কাছেই ক'রে দিন। এখনই ক'রলে সন্ধ্যের গাড়ীতে পাওয়া যেতেও পারে। ততক্ষণ না হয় ওষুধের উপর রাখা যাবে…যা' হোক্ চেষ্টা ক'রতে হবে তো !…

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ধরণী বলে: তা' হ'লে ওর কাছেই করি, তা'রপর আমার বরাত।…আপনি দয়া ক'রে সব বুঝিয়ে একটু লিখে দিন ডাক্তারবাবু, আমার কিছু ভাববার আর শক্তি নেই !…

ডাক্তারবাবু লিখিয়া দেন, যেমন করিয়াই হউক অবিলম্বে এই ইঞ্জেক্‌শন্ অন্ততঃপক্ষে দুইটা নিয়া আসা চাই-ই, না হইলে মণি বাঁচে না। খরচের জন্য কোন চিন্তা নাই।

চারুর অফিসের ঠিকানায় জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইতে ধরণী পোষ্ট-আফিসের দিকে উদাসভাবে চলিতে থাকে।…

সারাটা দিন মণির অবস্থা খারাপই চলিল। ধরণীর আরো খারাপ। তা'র নাওয়া খাওয়া বন্ধ, চিন্তাশক্তি বিলুপ্তপ্রায়; বেলা যত যায়, তত তার আশঙ্কা বাড়িতে থাকে।…যদি চারু সময়মত টেলিগ্রাম না পায়…যদি পাইয়াও না আসে…যদি গাড়ী ধরিতে না পারে !…ভুলে টেলিগ্রামটা প্রিপেড্ করা উচিত ছিল, তবে এতক্ষণে অন্ততঃ কিছু জানা যাইত।

উমাকালী নীরবে মণির শিয়রে পাখা লইয়া বসিয়া থাকে। মণি যে তা'র চোখের একমাত্র মণি !…

ঠিক সন্ধ্যার সময় ডাক্তারবাবু আসেন।

তিনি আসিতেই ধরণী তাঁর উপর মণির ভার দিয়া ষ্টেশনের দিকে ছোটে। জানকীবাবুকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে: জানকী-দা', গাড়ী আসবার দেরী কত ?…

জানকীবাবু সবই তো জানেন। গাড়ী আসিতে তখনও বিস্তর বাকী, তবু বলেন: এই তো এলো ব'লে, ব'সো ব'সো !…

ধরণী বসে না, একা একা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পাগলের মত পায়চারী করিতে থাকে।

ঘুরিতে ঘুরিতে একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা, জানকীদা', গাড়ী যদি আজ এখানে না থামে !…এমন কি হয়নি কখনো জানকী-দা' ?…

জানকীবাবু ব্যথিতস্বরে বলেন: ছেলেমানুষ একেবারে ! গাড়ী কি কখনো না থেমে পারে, নিশ্চয়ই থামবে !…পাগলামো ক'রো না, একটু স্থির হ'য়ে ব'সো !…

ধরণী আবার হাঁটিতে সুরু করে। ভাবে, আচ্ছা, গাড়ী না হয় থামে

কিন্তু আজও যদি আবার তেমনি অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হয় কোথাও! যদি চারুকে তেমনি হাসপাতালে লইয়া গিয়া থাকে। নরু গিয়াছে, চারু যাইবে, সাথে সাথে হয়তো মণিও যাইবে…

ধরণী দাঁড়াইয়া পড়ে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলে: তবে আমিও যাবো!

ধরণীকে চেনা যায় না। অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে, সে যেন আর কেউ। চোখ দু'টি লাল, কোটরগত। শুষ্ক মুখখানি ভরিয়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চুলগুলি রুক্ষ, বিপর্যস্ত।

হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ অস্থির হইয়া ভাবে, এখানে এত সময় আমার থাকাটা অন্যায় হচ্ছে…যাই, দেখে আসি গে, মণির কি হ'ল!…এর মধ্যে যদি কিছু…

জানকীবাবুর কাছে গিয়া চোখ বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করে: গাড়ী আসবার আরো অনেক দেরী, না জানকীদা'?

জানকীবাবু বলেন: দেরী কোথায়, আর তো মোটে আটমিনিট! এসে একটু ব'সো ভাই!…

ধরণী আর বাড়ী ফেরে না বটে, কিন্তু বসিতেও পারে না, হাঁটিতেই থাকে।…

আটমিনিট কাটিতে আটমিনিটের বেশী লাগে না। এখনি ট্রেণ আসিবে, জানকীবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

ইঞ্জিনের সার্চ্চলাইটের আভা দেখা যায়, ক্ষীণ শব্দ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।…

ঘটা-ঘটা ঘট্‌-ঘট্‌, ঘটা-ঘটা ঘট্‌-ঘট্‌…

রেলওয়ে-সাতটা-তেরোর গাড়ী ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে ঢুকিতে থাকে।

অর্থাৎ, ধরণীদের সাতটা সাঁইত্রিশ।…

সমস্ত শক্তি চক্ষুতে নিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকখানি কাম্‌রার প্রত্যেকটি মুখের দিকে ধরণী দৃষ্টিক্ষেপ করে।

ধরণী না'…

এই যে, এই যে আমি চারু…ধরণী প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া ওঠে…সেইদিকে দৌড়াইয়া যায়।

গাড়ী থামিতে চারু নামিয়া আসে। ধরণীর চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করে: মণির খবর ভালো তো?

ধরণী বলে: না ভাই, বাঁচবে না ব'লেই মনে হচ্চে। তা'রপর জিজ্ঞাসা করে: ইঞ্জেক্‌শন্‌…ইঞ্জেক্‌শন্‌ এনেছিস্‌?…উদ্বেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে, দুইচোখে নামিয়া আসে অসীম উৎকণ্ঠা।

চারু বলে: এনেছি।

উত্তর শুনিয়া ধরণী আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে। অস্থিরভাবে বলে: চল্‌ ভাই চল্‌—দেরী হ'য়ে গেল বুঝি…

ইঞ্জেক্‌শন্‌ দিয়া ডাক্তার খানিকক্ষণ রোগীর অবস্থা দেখেন। পরে বলেন: আমি যাচ্ছি…যদি রাত্তিরে খারাপ হ'য়ে পড়ে, তবে তখনি খবর দেবেন, না হ'লে সকালবেলা জানাবেন, কেমন থাকে।…বলিয়া তিনি চলিয়া যান।…

ভগবান বুঝি মুখ তুলিয়া চাহেন। মণির অবস্থা রাত্রিতে ভালোর দিকেই ফিরিল।…

সকালের খবর ডাক্তারবাবুকে জানাইতে তিনি বলেন: এ যাত্রা তবে বাঁচবে ব'লে আশা করি।…ইঞ্জেক্‌শনটা পড়তে আর দু'একঘণ্টা দেরী হ'লে কি দাঁড়াত ব'লতে পারি না। আমার নিজেরই তো ভয় হচ্ছিলো!…বড্ড বাঁচল দেখ্‌ছি!…

একটু থামিয়া বলেন: ভাগ্যিস্‌, সন্ধ্যের গাড়ীতে ওটা এসে পড়েছিল!…যাক্‌, আমি একটু বেলায় গিয়ে বাকী ইঞ্জেক্‌শনটাও ক'রে দিয়ে আসবো। আর চিন্তা ক'রবার কিছু নেই!…

বলাবাহুল্য, মণি ক্রমশঃ সারিয়া ওঠে। আজ সে অন্নপথ্য করিল।…

সুন্দর দিনটা। বিকালের দিকে ধরণী রেললাইন বাহিয়া খানিকটা দূর বেড়াইতে যায়।

কিছুদূর গিয়া লাইন হইতে একটু তফাতে একটা কালভার্টের উপর বসে। সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠে, ধরণীর সময়ের খেয়াল থাকেনা।

সহসা তাকাইয়া দেখে ট্রেণ আসিতেছে…সেই সাতটা তেরো, রেলওয়ে, অর্থাৎ তাহাদের সাতটা সাঁইত্রিশের গাড়ী…

ঘটা-ঘট্‌ ঘট্‌-ঘট্‌…ঘটা-ঘট্‌ ঘট্‌-ঘট্‌…

ধরণীর সম্মুখ দিয়া আলোর মালা পরিয়া ট্রেণ চলিয়া যায়।

কি সুন্দর গতিভঙ্গি! ধরণী বিদ্বেষ ভুলিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। মনে মনে বলে:

হে যন্ত্ররাজ, তুমি বিচিত্র। তুমি প্রাণ নিতে পারো, আবার দিতেও পারো!…তুমি দানব—তুমি দেবতা; তুমি কুৎসিত—তুমি সুন্দর!… তোমাকে ঘৃণা করি, আবার…ধরণী যুক্তকর কপালে ঠেকায়…আবার তোমাকে নমস্কারও করি!…

ট্রেণ চোখের আড়াল হইয়া যায়। শুধু পিছনের বাতিটা রক্তচক্ষু মেলিয়া একদৃষ্টে ধরণীর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকে, তা'রপর সেটাও অদৃশ্য হইয়া যায়।…

ধরণী উঠিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিতে থাকে।…

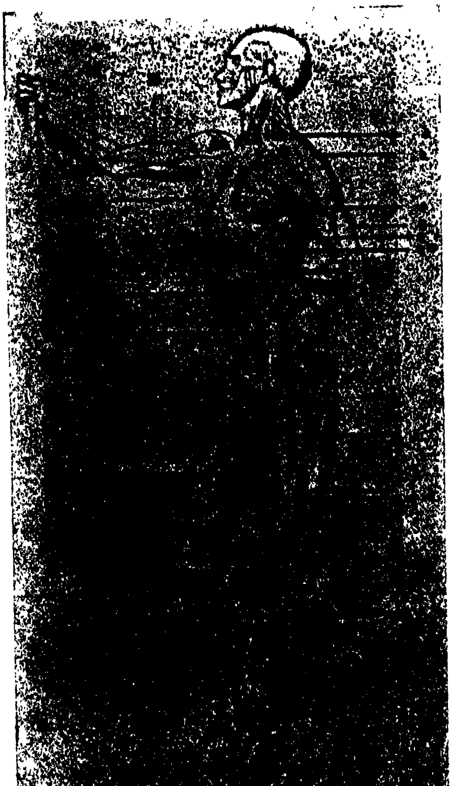
মাংসপেশী সঞ্চালন

শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রণ্-ম্যান্)

প্রবন্ধ

শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে আমাদের দেহ প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা—মধ্যকায় (Trunk), মস্তক (Head), দুইটি ঊর্দ্ধশাখা (Upper Extremities) এবং দুইটি অধঃশাখা (Lower Extremities)। বুক, পেট ও পিঠ—এই তিনটি একত্রে মধ্যকায়; দুই বাহু ঊর্দ্ধশাখা এবং পা দুটিকে একত্রে অধঃশাখা বলে। মাংসপেশীসমূহ শরীরের এই ছয়ভাগের অস্থিময় কাঠামোকে ঢেকে রেখেছে। দেহের বাইরে প্রথমে আছে ত্বক্ বা গাত্রচর্ম, তার নীচে মেদোধরা কলা, তারপর মাংসধরা কলা, তারপর স্তরে স্তরে মাংসপেশী আছে, একেবারে নীচে আছে অস্থিময় কাঠামো।

পেশীর সংখ্যা নিয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্বে



মাংসপেশীর পরিচয়

যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সুশ্রুত বলেন—৫০০; প্রতীচ্যের স্যাপে সাহেব (Mr. Sappey) বলেন—৫০১। থেন্ সাহেব (Mr. Thane) বলেন—৩১১। স্বতন্ত্র পেশীগুলি (Involuntary muscles) বাদ দিয়ে পরতন্ত্র বা ইচ্ছাধীন (Voluntary muscles) পেশীর সংখ্যা মোট ৪৮০; মাথায়—৮২টা, গ্রীবাদেশে—৮১টা, মধ্যকায়ে—১১১টা, ঊর্দ্ধশাখা দুটিতে—৯৮টা এবং অধঃশাখা দুটিতে—১০৮টা।

পেশীসকল মাংসময়। মাংস ও পেশীর কোন প্রভেদ নেই। পেশীর আকার স্থূলমধ্য রজ্জুর ন্যায় বা মোটা চাদরের ন্যায় এবং হৃদয়াদি স্থানে কোষের ন্যায়। সুশ্রুতে কথিত আছে যে "পেশীসকল সন্ধি, অস্থি, শিরা ও স্নায়ুসমূহকে আচ্ছাদন ক'রে থাকে এবং স্থানভেদে আবশ্যকমত কঠিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থির, মৃদু, মসৃণ ও কর্কশ হয়।" পেশীর প্রান্তদ্বয় অধিকাংশ স্থানে শক্ত দড়ির মত। ইহাদের কণ্ডরা (Tnedon) বলে। পেশীর কণ্ডরাগুলি সাধারণতঃ অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে।

পেশী দুই প্রকার; যথা—স্বতন্ত্র বা স্বাধীন (Involuntary) ও পরতন্ত্র বা ইচ্ছাধীন (Voluntary)। হৃদয়, আমাশয়, পাকাশয় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। এরা লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্ব্বদা আপনা-আপনি কাজ ক'রে যায়; কাহারও নির্দ্দেশের জন্যে বসে থাকে না। সুতরাং এদের দিকে দৃষ্টি তত না দিলেও চলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়াম করলে ইহাদের কাজ আরও ভাল হয়। দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশী (Biceps), ত্রিশিরস্কা পেশী (Triceps), উরচ্ছদা-গুর্ব্বী (Pectoralis Major), অংশচ্ছদা (Deltoid), দ্বিশিরস্কা ঔর্ব্বী (Biceps of the Thigh) জঙ্ঘাপিণ্ডিকাগুর্ব্বী (Calf-muscles) ইত্যাদি শরীরের বাহিরে অবস্থিত পেশীগুলি পরতন্ত্র বা ইচ্ছাধীন (Voluntary); ইহাদের ঠিকমত চালনা না করলে বড় ত হয় না, বরং ধীরে ধীরে ছোট হ'য়ে যায় এবং অপদার্থ

ও অক্ষম হ'য়ে পড়ে। বহুকাল রোগশয্যায় শায়িত ব্যক্তি রোগমুক্তির পর চলতে পারে না; তার কারণ—রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকার দরুণ শরীরের নিম্নভাগের কোন চালনা না হওয়ায় ঐ স্থানের পেশীসমূহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। দাঁড়াবার বা চলবার ক্ষমতা ফিরে পেতে হ'লে ঐ পেশীগুলিকে ধীরে ধীরে চালনা করতে হয়।

সুস্থ অবস্থায় ঐ পেশীগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়াম দ্বারা চালনা করলে পেশীর আকার বৃদ্ধি পায় ও দেখতে সুন্দর হয় এবং দৈহিক শক্তি বাড়ে। পরে ব্যায়াম দ্বারা বর্দ্ধিত পেশীকে সঞ্চালিত করা উচিত। অপুষ্ট ও আকারে ছোট পেশীকে সঞ্চালিত করলে উহার 'বাড়' কমে ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। কিন্তু ব্যায়াম-পুষ্ট পেশীকে কয়েকবার ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত ও শিথিল করলে ঐ পেশী আকারে বড় হয় এবং দেখতে সুন্দর হয়।

মাংসপেশীর পরিচয়

এই প্রবন্ধে যে সব মাংসপেশীর কথা বলা হয়েছে, নিম্নে তাদের নাম দেওয়া গেল :—

(১) পৃষ্ঠচ্ছদা (Trapezius), (২) অংসচ্ছদা (Deltoid), (৩) কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi), (৪) ত্রিশিরস্কা পেশী (Triceps), (৫) অরিত্রা অগ্রিমা (Sarratus Magnus), (৫ক) পর্শুকান্তরিকা (Intercostal), (৬) উরুদণ্ডিকা (Rectus Femur), (৭) উরুপ্রসারণী বাহ্যা (Vastas Externus), (৮) উরুপ্রসারণী অন্তঃস্থা (Vastus Internus), (৯) জঙ্ঘা-পিণ্ডিকা গুর্ব্বী (Calf muscles or Gastrocnemius), (১০) প্রকোষ্ঠ (Forearm), (১১) দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশী (Biceps), (১২) উরশ্ছদা গুর্ব্বী (Pectoralis Major), (১৩) উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominis), (১৪) উদরচ্ছদা (Obliqus), (১৫) দ্বিশিরস্কা ঔর্ব্বী (Biceps of the Thigh)।

শরীরের বাহিরে অবস্থিত ইচ্ছাধীন পেশীগুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইচ্ছামত চালনা করার নাম মাংসপেশী সঞ্চালন।

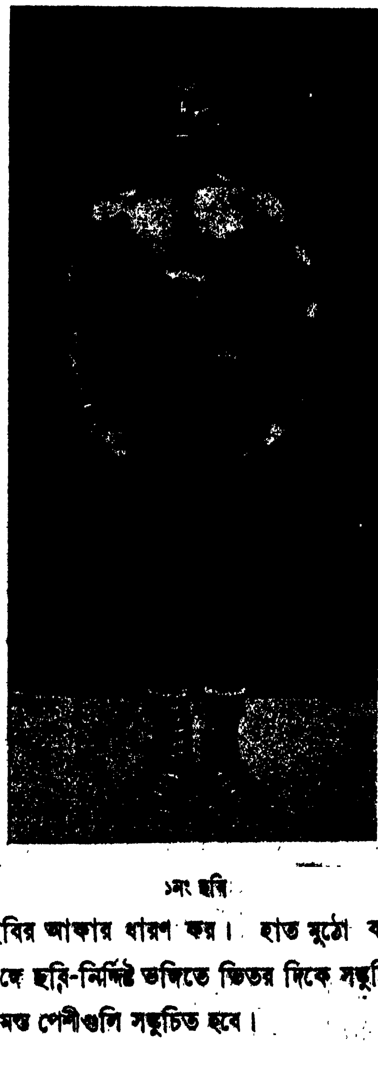
মাংসপেশীসমূহ শিথিলকরণ

একসঙ্গে মাংসপেশীসমূহকে শিথিল করা বড় শক্ত। প্রথমে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে নীচের দিকের সমস্ত পেশীগুলিকে শিথিল করতে চেষ্টা কর। সাধারণতঃ দেখা যায়, একটা পেশী শিথিল করতে গিয়ে অন্যটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য সতর্ক হওয়া, যাতে না কোন একটা পেশী শিথিল করতে গিয়ে আগেকার শিথিল করা পেশী না সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। যখন শিক্ষার্থী সমস্ত পেশী একসঙ্গে শিথিল করতে পারবে, তখন সে দেখতে পাবে, তার দেহ হাল্কা হ'য়ে গেছে এবং পায়ে কোন জোর নেই। এই অবস্থায় তাকে অল্প ধাক্কা দিলেই সে পড়ে যাবে।

পেশীসমূহ সঙ্কুচিত করণ

১ম উপায়

এইবার শরীরের সমস্ত পেশীকে (পা থেকে ক্রমান্বয়ে শরীরের উপরের দিকের পেশীগুলিকে) সঙ্কুচিত কর এবং



১নং ছবি

১ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। হাত মুঠো ক'রে কনুই থেকে ভেঙে ছবি-নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিতে ভিতর দিকে সঙ্কুচিত করলে হাতের সমস্ত পেশীগুলি সঙ্কুচিত হবে।

পেশী সঙ্কুচিত করবার সময় শিক্ষার্থী প্রায় দেখবে, তার অজ্ঞাতসারে, হয় কতগুলি পেশী শিথিল হ'য়ে রয়েছে, না হয়, সঙ্কুচিত পেশী আবার শিথিল হ'য়ে গেছে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য—যাতে প্রত্যেক পেশী সঙ্কুচিত হয় এবং সঙ্কুচিত পেশী অসাবধানবশতঃ না শিথিল হ'য়ে পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা।

এইরূপে সঙ্কুচিত করতে শেখা হ'লে পর একবার সমস্ত পেশীকে শিথিল কর এবং এই অবস্থায় ½ মিনিট অপেক্ষা ক'রে ১ নম্বর ছবির মত সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত কর এবং ½ মিনিট অপেক্ষা কর। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একবার শিথিল ও আর একবার সঙ্কুচিত করলে পরতন্ত্র বা ইচ্ছাধীন (Voluntary) পেশীগুলি শিক্ষার্থীর অধীনে আসবে। তখন সে ইহাদের ইচ্ছানুরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারবে।

২য় উপায়

হাত উপরে তুলে দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশী (Biceps) সঙ্কুচিত কর, নিশ্বাস নিয়ে আকুঞ্চন দ্বারা পেট খালি কর,



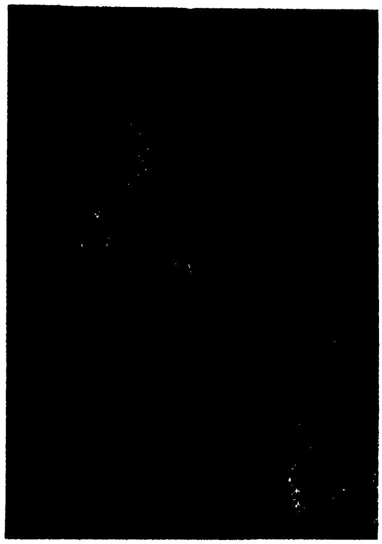
২নং ছবি

কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi) প্রসারিত কর এবং ২ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। এই সময় যাতে দেহের অধঃশাখা (Lower Extremities) সঙ্কুচিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখ।

উপরে বর্ণিত উপায়ে সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত হ'লে পর ½ মিনিট ২ নম্বর ছবির মত থেকে পরে হাত নামিয়ে পেশীগুলি শিথিল কর।

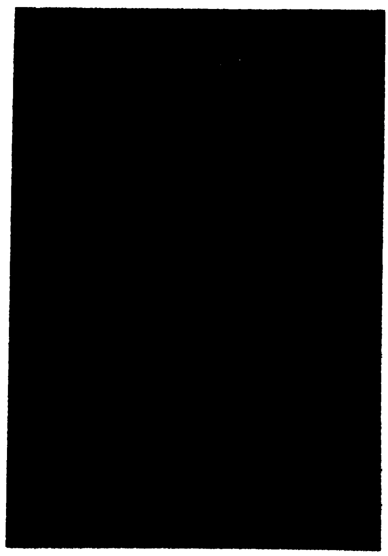
দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশী (Biceps) সঙ্কুচিতকরণ

মাংসপেশী শিথিল ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত মুঠো ক'রে কনুই থেকে ভেঙ্গে বুকের সম-কোণে (Right-



৩নং ছবি

angle) কর এবং দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশীকে (Biceps) সঙ্কুচিত ক'রে ৩ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। এইরূপে



৪নং ছবি

দ্বিশিরস্কা পেশীকে সামনে থেকে সঙ্কুচিত করা হয়। ইহার পিছন থেকে সঙ্কোচন দুরকম ভাবে হয়—১ম উপায় খুব

সহজ, ৩ নম্বর ছবির আকার ধারণ ক'রে বিপরীত দিকে ঘোরা (About Turn)। এতে পেশীকে তত ভাল দেখায় না। ২য় উপায় হচ্ছে—প্রকৃষ্ট উপায়। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ একটু বেঁকিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পেশী সঙ্কুচিত ক'রে ৪ নম্বর ছবির আকার ধারণ করলে দ্বিশিরস্কা পেশী দেখিতে অতি সুন্দর হয়।

দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশীর (Biceps) নৃত্য

ইহা খুব সহজ। তাড়াতাড়ি দ্বিশিরস্কা পেশীকে একবার সঙ্কুচিত আর একবার শিথিল করলে ইহা নৃত্য সুরু করে। শিক্ষার্থী মাথার উপর হাত দিয়ে মাংসপেশী শিথিল ক'রে দাঁড়াবে। পরে দ্বিশিরস্কা পেশী (Biceps) সঙ্কুচিত ক'রে ৩ নম্বর ছবির আকার ধারণ করবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১ বার সঙ্কুচিত আর ১ বার শিথিল কর। অভ্যাসের ফলে যখন দ্রুত সঙ্কুচিত ও শিথিল করতে পারবে, তখন শিক্ষার্থী দ্বিশিরস্কা পেশীকে (Biceps) নৃত্য করাতে সক্ষম হবে। এইরূপে কিছুদিন অভ্যাস করলে পর মাথায় হাত না দিয়ে সহজে ইহাকে নৃত্য করান যায়।

ত্রিশিরস্কা পেশী (Triceps) সঙ্কুচিতকরণ

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ধর। পরে কাঁধ উপর দিকে তোল। এইবার হাতের উপরের অংশ (কনুই থেকে অংসচ্ছদা Deltoid পর্য্যন্ত) বুক থেকে পিছন দিকে ঠেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের নীচের অংশ (কনুই থেকে কব্জি পর্য্যন্ত) সামনে টান। এই সময় যাতে হাতের উপরের অংশ কটিপার্শ্বচ্ছদার (Latissimus Dorsi) উপর ঠেস্ দিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখ। এই অবস্থায় ত্রিশিরস্কা পেশী (Triceps) সঙ্কুচিত করলে শিক্ষার্থী ৫ নম্বর ছবির আকার ধারণ করবে।



৫নং ছবি

প্রকোষ্ঠ (Forearm) সঙ্কুচিতকরণ

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নীচের হাত কনুই থেকে ভেঙে প্রকোষ্ঠ (Forearm) উপরের হাতের সম-কোণ (Right angle) ক'রে হাতের কব্জি বেঁকিয়ে প্রকোষ্ঠ (Forearm)



৬নং ছবি

সঙ্কুচিত কর এবং ৬ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। ছবিতে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের দ্বিশিরস্কা বাহবী পেশী (Biceps) চেপে থাকার দরুণ প্রকোষ্ঠ (Forearm) দেখতে আরও সুন্দর হ'য়েছে।

অংসচ্ছদা (Deltoid) সঙ্কুচিতকরণ

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলে কনুই থেকে ভেঙে কব্জি মাথার সঙ্গে সংলগ্ন রাখ। পরে কনুই একটু পিছনে ঠেল ও ৭ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর।

উরশ্ছদা-গুর্ব্বীর (Pectoralis Major) নৃত্য

শরীরের সমস্ত মাংসপেশী শিথিল ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। পরে হাত ঝাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে উরশ্ছদা—

গুর্ব্বী বা বুক (Pectoralis Major) একবার সঙ্কুচিত আর একবার শিথিল কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে কয়েকবার করলে উরশ্ছদা-গুর্ব্বী যেন নৃত্য করছে মনে হবে। যদি কেবল বাঁ দিকের পেশীকে নৃত্য করাতে হয়, তা হ'লে বাঁ



৭নং ছবি

হাত ঝাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের উরশ্ছদা-গুর্ব্বীকে দ্রুত সঙ্কুচিত ও শিথিল কর। ঠিক এই রকম ভাবে ডান দিকের উরশ্ছদা-গুর্ব্বীকে নৃত্য করান যায়। কিছুদিন অভ্যাস করবার পর হাত ঝাড়া না দিয়েও কেবল পেশী দ্রুত সঙ্কুচিত ও শিথিল ক'রে উরশ্ছদা-গুর্ব্বী বা বুকের পেশীকে নৃত্য করান যায়।

উরশ্ছদা-গুর্ব্বী (Pectoralis Major)
সঙ্কুচিতকরণ



৮নং ছবি

হাত নীচের দিকে ঝুলিয়ে দাঁড়াও। পরে নিশ্বাস নিতে নিতে হাতের উপরের অংশ দিয়ে উরশ্ছদা-গুর্ব্বী বা বুকের পেশীকে (Pectoralis Major) চাপ দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে সঙ্কুচিত কর। পরে ঐ পেশীকে সঙ্কুচিত অবস্থায় রেখে অসংচ্ছদা (Deltoid) উপর দিকে তোল এবং হাত উপরে তুলে ৮ নম্বর ছবির মত উভয় পার্শ্বে প্রসারিত কর। এই সময় যাতে না উরশ্ছদা-গুর্ব্বী শিথিল হ'য়ে যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখ।

উরশ্ছদা-গুর্ব্বীর (Pectoralis Major)
সম্মুখে নিক্ষেপ

শরীরের উপরের অংশ একটু পশ্চাতে হেলিয়ে দাঁড়াও। পরে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ৯ নম্বর ছবির মত সামনের দিকে



৯নং ছবি

প্রসারিত কর। এইবার নিশ্বাস নিতে নিতে উরশ্ছদা-গুর্ব্বীকে সঙ্কুচিত ক'রে সামনের দিকে প্রসারিত করবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের উপরের অংশ দিয়ে ইহাকে চাপ।

ছদা (Trapezius)
সঙ্কুচিতকরণ

হাত পিছনে বদ্ধ করে দাঁড়াও। পরে শরীরের উপরের অংশ সামনে একটু ঝুঁকিয়ে হাতে চাপ দিয়ে পৃষ্ঠচ্ছদাকে (Trapezius) নীচের দিকে টান এবং সঙ্গে সঙ্গে



১০নং ছবি

শরীরের উপরের অংশ একটু উপর দিকে তুলতে চেষ্টা কর। এইরূপ করলে পৃষ্ঠচ্ছদা (Trapezius) ১০ নম্বর ছবির মত সঙ্কুচিত হবে।

কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi) সঙ্কুচিতকরণ

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাত ১১ নম্বর ছবির মত তুলে পৃষ্ঠদেশ প্রসারিত ক'রে ত্রিশিরস্কা পেশীর (Triceps)



১১নং ছবি

উপরের অংশ দিয়ে কটিপার্শ্বচ্ছদাকে (Latissimus Dorsi) সঙ্কুচিত কর।

কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi), অরিত্রা অগ্রিমা (Seratus Magnus), পশু´কান্তরিকা (Intercostals), উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) একত্রে সঙ্কুচিতকরণ

হাত পরস্পরে বন্ধ ক'রে মাথার পিছনে রাখ। পরে



১২নং ছবি

১২ নম্বর ছবির মত শরীরের উপরের অংশ একটু সামনে ঝুঁকিয়ে উদরদণ্ডিকাকে (Rectus Abdominus) সঙ্কুচিত কর এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের কনুই মাথার একটু উপরে তুলে প্রথমে কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi), পরে অরিত্রা অগ্রিমা (Seratus Magnus) ও পশু´-কান্তরিকা (Intercostals) সঙ্কুচিত কর। এক সঙ্গে অনেকগুলি পেশী সঙ্কুচিত করতে হয়, তাই এই পদ্ধতিটা একটু সহজ। ধৈর্য্যসহকারে কিছুদিন এই রকম ভাবে অভ্যাস করলে শিক্ষার্থী উপরিউক্ত পেশীগুলিকে একত্রে সঙ্কুচিত করতে পারবে।

উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) প্রদর্শন

উদরদণ্ডিকা পেশী (Rectus Abdominus) নানা রকমে দেখান যায়। এখানে একটি সহজ উপায় প্রদত্ত হ'ল। শরীরের উপরের অংশ (কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত)



১৩নং ছবি

অল্প সামনে ঝুঁকিয়ে ১৩ নম্বর ছবির মত দাঁড়াও। পরে নিশ্বাস গ্রহণ করে উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) সঙ্কুচিত কর।

উদরপ্রাচীর প্রসারিতকরণ (Expansion of the abdominal wall)

উদরের মাংসপেশীগুলি শিথিল করে সাধারণ ভাবে দাঁড়াও। পরে নিশ্বাস নিয়ে উদর ফুলিয়ে প্রসারিত কর।

উদরপ্রাচীর উদরগহ্বরে প্রেরণ
(Depression of the abdominal wall)

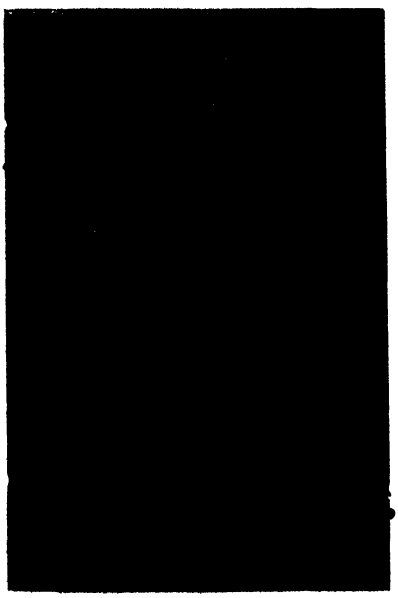
জানুর উপর হাত রেখে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে দাঁড়াও। এই অবস্থায় যাতে সমস্ত



১৪নং ছবি

পেশীগুলি শিথিল থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখ। পরে নিশ্বাস নিতে নিতে উদরের উপরের অংশ ১৪ নম্বর ছবির মত উদর গহ্বরের ভিতর টান।

উদরদণ্ডিকা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপন
(Isolation of the Rectus Abdominus)



১৫নং ছবি

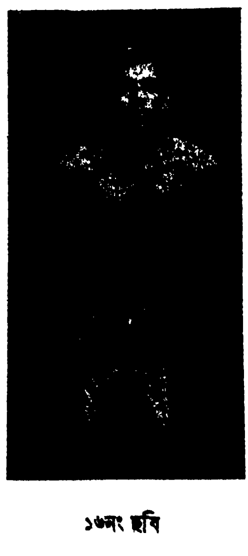
পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত উদর-প্রাচীর উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে ১৪ নম্বর ছবির মত দাঁড়াও। পরে হাত ১৫ নম্বর ছবির মত তল পেটের উপর রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) চেপে ধর এবং ইহাকে সঙ্কুচিত কর। এইরূপ করলে উদরদণ্ডিকাকে (Rectus Abdominus) ১৫ নম্বর ছবির মত উদরের ঠিক মাঝখানে Tug-of-warএর দড়ির মত দেখতে পাবে।

উদরদণ্ডিকা ভিতরে ও বাহিরে আনয়ন
(Rectus Abdominus inside—outside)

প্রথমে পূর্ব্বের নির্দ্দেশমত উদর প্রাচীর উদরগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে ১৪ নম্বর ছবির মত দাঁড়াও। পরে ১৫ নম্বর ছবির মত উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) সঙ্কুচিত করে বাহির কর। এই অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থেকে উদরদণ্ডিকাকে উদরের ভিতর টেনে নাও। এইরূপে তাড়াতাড়ি ক্রমান্বয়ে কয়েকবার অভ্যাস কর।

একদিকের উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপন

পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১৫ নম্বর ছবির মত উদর-দণ্ডিকা (Rectus Abdominus) বাহির কর। পরে উপরের শরীর (কোমর থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত) বাঁদিকে একটু



১৬নং ছবি

হেলিয়ে বাহাত দিয়ে বাঁদিকের উদরদণ্ডিকাকে চাপ দেওয়া বন্ধ করে একে শিথিল কর এবং ১৬ নম্বর ছবির আকার ধারণ

কর। এইরূপ করলে শিক্ষার্থী কেবল ডানদিকের উদর-দণ্ডিকা বাহির করতে পারবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে বাঁদিকের উদরদণ্ডিকা শিথিল করবার সময় ডান দিকের উদরদণ্ডিকা শিথিল না হয়ে পড়ে। ঠিক এই রকমভাবে ডানদিকে হেলে ডান হাত দিয়ে ডানদিকের উদরদণ্ডিকাতে চাপ দেওয়া বন্ধ করে বাঁদিকের উদরদণ্ডিকা সঙ্কুচিত করে বাহির কর।

উদরদণ্ডিকার আবর্ত্তন (Rolling of the Rectus Abdominus

উপরি উক্ত নির্দ্দেশমত তাড়াতাড়ি ক্রমান্বয়ে একবার বাঁদিকের উদরদণ্ডিকা শিথিল করতে করতে ডানদিকের উদরদণ্ডিকা সঙ্কুচিত কর, আর একবার ডানদিকের উদর-দণ্ডিকা শিথিল করতে করতে বাঁদিকের উদরদণ্ডিকা সঙ্কুচিত কর। এই রকম করলে উদরদণ্ডিকার আবর্ত্তন দেখতে পাবে।

উদরচ্ছদা (Obliqus) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপন

১৪ নম্বর ছবির মত উদরপ্রাচীর উদরগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দাঁড়াও। পরে তলপেট সঙ্কুচিত করে তলপেটের উভয়দিক শক্ত কর ও উদরচ্ছদা (obliqus) সঙ্কুচিত কর



১৭নং ছবি

এবং ১৭ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। পরে উদরচ্ছদা (obliqus) শিথিল করে ১৪ নম্বর ছবির মত দাঁড়াও। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তাড়াতাড়ি উদরচ্ছদা একবার সঙ্কুচিত আর একবার শিথিল করলে উদরচ্ছদা একবার ভিতরে যাবে আর একবার বাইরে আসবে মনে হবে—যেন উদরচ্ছদা (obliqus) নৃত্য করছে। এই কৌশল অভ্যাসকালে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন উদরদণ্ডিকা (Rectus Abdominus) না সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। খালি পেটে এই পদ্ধতি অভ্যাস করা উচিত।

একদিকের উদরচ্ছদা (obliqus) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপন

১৪ নম্বর ছবির মত উদরপ্রাচীর উদরগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দাঁড়াও। পরে ডানদিকের তলপেট শক্ত করে ডানদিকের উদরচ্ছদা (obliqus) সঙ্কুচিত কর।



১৮নং ছবি

এই সময় যাতে বাঁদিকের উদরচ্ছদা না সঙ্কুচিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ। এইরূপ করলে শিক্ষার্থী ১৮ নম্বর ছবির মত কেবল ডানদিকের উদরচ্ছদা (obliqus) বাহির করতে পারবে। ঠিক এইরকমভাবে বাঁদিকের উদরচ্ছদা বাহির করা যায়। আগের নির্দ্দেশমত ইহাকে ক্রমান্বয়ে তাড়াতাড়ি একবার সঙ্কুচিত আর একবার শিথিল করে নৃত্য করান যায়।

উদর প্রাচীরের আবর্ত্তন (Rolling of the abdominal wall)

সামনে একটু ঝুঁকে দাঁড়াও। উপরের পেট সঙ্কুচিত করে অল্প ভিতর দিকে টান। পরে সঙ্কুচিত অবস্থায়

উপরের পেট আস্তে আস্তে প্রসারিত করতে থাক। এইরূপ করলে পেটের সঙ্কুচিত অবস্থা ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে আসবে। যখন উপরের পেট প্রসারিত করে



১৯নং ছবি

পেটের সঙ্কুচিত অবস্থাকে নাভিকুণ্ডলের কাছে নিয়ে আসতে পারবে, তখন শিক্ষার্থী ১৯ নম্বর ছবির আকার ধারণ করবে (তলপেট ও উপরের পেট ফ্লান এবং নাভিকুণ্ডলের কাছে একটা খাঁজ লক্ষিত হবে।) পরে উপরের পেট আরও প্রসারিত করে পেটের সঙ্কুচিত অবস্থাকে যতদূর সম্ভব নীচে নামাও এবং ২০ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। এইবার



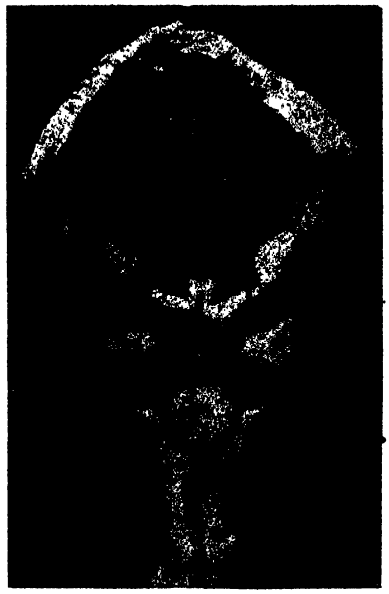
২০নং ছবি

উদরের সমস্ত পেশীকে শিথিল কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করলে মনে হবে উদরপ্রাচীর নৃত্য করছে।

পৃষ্ঠের মাংসপেশীসমূহ (Back muscles)

সঙ্কুচিতকরণ

বাঁহাত দিয়ে ডানহাতের আঙ্গুলগুলি ধর এবং হাত মাথার পিছনে রাখ। পরে স্কন্ধাস্থি দুটিকে পরস্পরের দিকে চেপে পৃষ্ঠের মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কুচিত কর। এইবার



২১নং ছবি

আগের সঙ্কুচিত পেশীগুলি যাতে শিথিল না হয়ে পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে হাত পিছনদিকে একটু হেলিয়ে মাথার যত উপরে পার তোল এবং ২১ নম্বর ছবির আকার ধারণ কর। তোলবার সময় হাত একবার দেহের ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে হেলিয়ে তুললে পৃষ্ঠের সমস্ত পেশী সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হবে।

পৃষ্ঠদেশ প্রসারিতকরণ

মুষ্টিবদ্ধ হাত কোমরের উপরে রাখ এবং স্কন্ধাস্থি দিয়ে কটিপার্শ্বচ্ছদা (Latissimus Dorsi) চেপে ইহাকে প্রসারিত কর। এই অবস্থায় হাতের কনুই একটু সামনে

টেনে স্কন্ধাস্থি প্রসারিত কর। এইরকম করলে শিক্ষার্থী ২২ নম্বর ছবির মত পৃষ্ঠদেশ প্রসারিত করতে পারবে।



২২নং ছবি

উরু পেশীসমূহ সঙ্কুচিতকরণ

উরুতে প্রধানতঃ তিনটি পেশী আছে, যথা—উরুদণ্ডিকা (Rectus Femur), উরুপ্রসারণী বাহ্যা (Vastus Externus), উরুপ্রসারিণী অন্তঃস্থা (Vastus Internus) সোজা হয়ে ২৩ নম্বর ছবির মত দাঁড়াও। পরে ডানপা



২৩নং ছবি

সামনে একটু প্রসারিত করে দিয়ে উরু পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত কর। এই অবস্থায় ডান পায়ের (গোড়ালি না বেঁকিয়ে) পাতা ডানদিকে বেঁকিয়ে সমস্ত পা ডানদিকে ঠেকাও। এইরূপভাবে বাম উরুও সঙ্কুচিত কর।

দ্বিশিরস্কা ঔর্ব্বী (Biceps of the thigh) সঙ্কুচিতকরণ

দু'পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। পরে সামনে একটু ঝুঁকে ডান পা, হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের গোড়ালি ২৪ নম্বর ছবির মত তোল। এইরূপ ভাবে বাঁ-পায়েও অভ্যাস কর। সামনে ঝোঁকার দরুণ টাল সামলাতে



২৪নং ছবি

অসুবিধা হলে শিক্ষার্থী প্রথমে লাঠি বা অন্য কিছু ধ'রে দাঁড়াতে পারে।

জঙ্ঘাপিণ্ডিকা (calf muscles) সঙ্কুচিতকরণ

পিছন ফিরে দাঁড়াও। পরে ২৫ নম্বর ছবির মত পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে গোড়ালি তুলে দাঁড়াও।



২৫নং ছবি

মাংসপেশী সঞ্চালন-শিক্ষার্থীর প্রতি কয়েকটি উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হল :—

(১) আরসির সামনে দাঁড়িয়ে মাংসপেশী সঞ্চালন শিক্ষা করা উচিত।

(২) কোন পেশী সঞ্চালনের সময় উহার আকার যতক্ষণ না প্রদত্ত ছবির মত হয়, ততক্ষণ প্রদত্ত উপদেশ অনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত। আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের পর কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থেকে পরে মাংসপেশীসমূহকে আল্গা ক'রে দেওয়া উচিত। এইরূপ প্রতি মাংসপেশীকে উপদেশ অনুসারে কয়েকবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করলে পর তবে মাংসপেশীকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সঞ্চালিত করতে পারা যায়।

(৩) মাংসপেশীকে সঞ্চালিত করবার সময় অত্যধিক জোর দিতে নেই, জোর দিলে পেশী শক্ত হ'য়ে যায়, ফলে উহাকে আর সঞ্চালিত করতে পারা যায়না।

(৪) অপুষ্ট পেশীকে সঞ্চালিত করলে উহার 'বাড়' কমে ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং অপুষ্ট পেশীর সঞ্চালন করা উচিত নয়।

(৫) প্রত্যহ অঙ্গমর্দ্দন বা মালিশ করা উচিত। ইহাতে পেশীগুলি নরম থাকে এবং ইচ্ছানুরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হ'তে সাহায্য করে।

(৬) খালি পেটে পেশী সঞ্চালন শিক্ষা করা উচিত।

এই প্রবন্ধের সমস্ত ছবি আমার শিষ্যদের। ৭ ও ১২ নম্বর ছবি শ্রীমান শৈলেশ্বর বোসের এবং ইহা ছাড়া আর সব ছবি শ্রীমান সচ্চিদানন্দ শেঠের। এই সমস্ত ছবি তুলেছেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দে।

ভারতের কৃষিসম্পদ—তূলার বীজ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

গত চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' তূলা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। তূলার ব্যবহার আজকাল আর লোককে বুঝাইয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু তুলার বীজ যে জগতের কত অদ্ভুত কাজে লাগে তাহার ধারণা অনেকেরই নাই।

যেখানে তুলা আছে, সেইখানেই তুলার বীজ আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বীজ হইতে তুলা ছাড়ানো এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তাহার পর তুলার ব্যবহার জানা আছে বলিয়া তুলা স্বতন্ত্র করিয়া লইবার পর দানাগুলি গৃহস্থের সংসারে এক জঞ্জাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল দানা একসঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিবার পর গৃহস্থ বিরক্ত হইয়া একদিন ঘরের কানাচে গাদা করিয়া ফেলিয়া দেয়; তখন জল পাইলে এক সঙ্গে অজস্র গাছ জন্মিয়া আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া বাড়িতে থাকে। পরে জন্তুর কৃপায় বা গৃহস্থের হঠাৎ একদিন বাড়ীর আশপাশ সাফ করিবার ইচ্ছার ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই আমাদের দেশে মোটামুটী তুলার বীজের প্রথম এবং শেষ পরিণতি।

তুলার বীজ কিন্তু এক দুর্ম্মূল্য বস্তু। ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে জানিলে কেবল যে আবর্জ্জনা দূর হয় তাহা নহে, ইহা হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন হওয়া সম্ভব। যাহারা সকল জিনিসের ব্যবহার জানে, তাহারা ইহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করে এবং ইহাকে নানা কাজে লাগায়।

সাধারণতঃ হিসাব করা হয়—তুলা ও তাহার বীজের অনুপাত ২ : ১, সুতরাং জগতে বহু সহস্র টন যে তুলা বীজ প্রতি বৎসর পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা কি ব্যবহার করি জানিনা, কিন্তু যাহারা নানা জিনিসের সন্ধান রাখে, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরই কয়েক লক্ষ টাকার তুলা-বীজ, তুলার খৈল লইয়া যায়।

কয়েক বৎসরের হিসাব এইরূপ :—

তুলাবীজ—

সাল	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৭৩০	৪৫,২১৫
১৯৩৬-৩৭	৯,০০৩	৫০১,৭৬৪
১৯৩৭-৩৮	৫,০০৮	৩,০৭,২৩৮

তুলার খৈল—

সাল	টন	টাকা
১৯৩৫-৩৬	৬,২১৩	২,৯২,১৪৭
১৯৩৬-৩৭	৯,০৯৬	৫,৪৩,৮৩৩
১৯৩৭-৩৮	৮,১৬৬	৫,৩৩,৫৪২

ইহার সমস্তটাই ইংলণ্ড লইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এ হিসাব কিছুই নহে। অনাদৃত অবস্থায় বহু সহস্র টন তুলাবীজ নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলাবীজ পাওয়া যায়,

তাহার তুলনায় এ রপ্তানী কিছুই নহে ; অথচ এদেশে তুলা-বীজের যে কোনও বিশেষ ব্যবহার আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই।

তুলাবীজের পরিমাণ

বর্ত্তমান সালের হিসাব দেওয়া সম্ভব হইলনা, তাহা ছাড়া এদেশে তুলাবীজের প্রকৃত হিসাব রাখা হয়না। তুলা যে প্রদেশে অধিক মাত্রায় জন্মায়, সেইখানেই বীজ বেশী পাওয়া যায়।

আন্দাজ করা হয় ভারতবর্ষে মোট ২৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টন তুলাবীজ পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে বৃটিশশাসিত ভারতে ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৬৫·৩ আর করদরাজ্যসমূহে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৩৪·৭ ভাগ হইয়া থাকে।

বৃটিশ ভারতের ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার টন প্রদেশ সমূহে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রদেশ	টন	শতকরা
পঞ্চনদ	৪,৫৮,০০০	১৯·৬
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৩,১৫,০০০	১২·৫
বোম্বাই	২,৯৩,০০০	১১·১
মাদ্রাজ	২,৫৯,০০০	৯ ৮
সিন্ধু	১,৪৮,০০০	৫·৬
যুক্তপ্রদেশ	১,০৫,৭০০	৪·০
ব্রহ্ম	৫০,০০০	১·৯
বঙ্গ	১৪,৫০০	·৬৬

তুলার পরিমাণ হিসাবেও পঞ্চনদের স্থান প্রথম ; বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

করদ রাজ্যের অংশ ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টন। তাহাকে নিম্নলিখিত-রূপে ভাগ করা যাইতে পারে :—

রাজ্য	টন	শতকরা য
বোম্বাই রাষ্ট্রসমূহ	৩,২২,০০০	১২·২
হায়দ্রাবাদ	২,৪০,৫০০	৯·১
পঞ্চনদ রাষ্ট্রসমূহ	১,৫৮,৬০০	৬·০
মধ্যপ্রদেশ রাষ্ট্রসমূহ	৭১,০০০	২·৭
বরোদা	৩৭,০০০	১·৪
রাজপুতানা	৩১,৭০০	১·২
গোয়ালিয়র	৩১,৫০০	১·২
খয়েরপুর	৮,০০০	·৩
মহীশূর	৪,৭০০	·১৮

ত্রিপুরা, রামপুর প্রভৃতি রাজ্যসমূহে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে বীজের পরিমাণ

তুলাবীজ এত প্রয়োজনীয় বস্তু যে, যে কয়েকটামাত্র জিনিসের আন্ত-র্জাতিকবাণিজ্যোপযোগী বস্তু বলিয়া হিসাব রাখা হয়, তুলা বীজ তাহার মধ্যে একটী। যে সকল দেশেই তুলা আছে, সে সকল স্থানে তুলার বীজও আছে। সে কারণে আমেরিকা তুলার ন্যায়, এ বিষয়েও জগতের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রকৃত হিসাব যে পাওয়া যায়না, সে বিষয়ে একপ্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। তথাপি মনে হয় ভারতবর্ষে যেরূপ হিসাব রাখা হয়, তাহা অপেক্ষা অন্যান্য দেশ কিছু ঠিক হিসাব রাখে।

হিসাব রক্ষকরা আন্দাজ করেন সারা পৃথিবীতে বৎসরে আন্দাজ ১ কোটী ৪০ লক্ষ ৭৮ হাজার টন তুলাবীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহার পরিমাণ যে নিতান্ত সামান্য নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

১.৪০,৭৮,০০০ টনের ভাগ এইরূপ :—

দেশ	হাজার টন	শতকরা অংশ
আমেরিকা যুক্তরাজ্য	৪৯,৪৫	৩৫·১
ভারতবর্ষ	২৬,৪৩	১৮·৭
চীন	১৯,৬০	১৩·৯
রুষগণতন্ত্র	১৫,৩৪	১০·৮
ব্রেজিল	৯,০১	৬·৪
মিশর	৮,৫১	৬·০
মেক্সিকো	১,৪৪	১·০
উগাণ্ডা	১,৩৮	·৯
আর্জ্জেণ্টাইন	১,৩৪	·৯
তুরস্ক	১,২৪	·৮
সুদান	৯৯	·৭

আমাদের দেশে কিছু কিছু তুলার তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে তুলার বীজ ব্যতীত তুলার খৈল যে রপ্তানী হয়, তাহাই কতকটা প্রমাণ। কিন্তু এই তৈল দেশে যে কি কাজে লাগে তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই। তবে বিদেশে যে এই তৈল বিশেষ আদৃত হয়, তাহা তাহার নানারূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায়।

বীজের আধুনিক ব্যবহার

বীজগুলি হইতে মোটামুটী তুলা ছাড়াইয়া লইবার পরও যে ক্ষুদ্র তন্ত বীজের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা আবার নূতন করিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম ঐ সামান্য পরিমাণ তুলাও ব্যবসায়ী নষ্ট করিতে চায়না। দ্বিতীয়, যতই তুলা লাগিয়া থাকিবে, তৈল নিষ্কাসনের পক্ষে ততই অনুপযোগী। এই জাতীয় তুলা হইতে জামা প্রভৃতির প্যাড (pad) দিবার ব্যবস্থা আছে ; তাহা ছাড়া মাল চালান দিতে কোনও বস্তু আঘাত হইতে রক্ষা করিতে এই তুলা ব্যবহৃত হয়।

বীজের কালো রঙের খোসাগুলি স্বতন্ত্র করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা সাধারণতঃ তৈল নিষ্কাসিত করিবার আগেই স্বতন্ত্র করা হয়। এই খোসা-গুলি ভাঙিয়া একপ্রকার ভূষির মত বস্তু প্রস্তুত করা হয়, তাহা গোজাতীর

পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাহারাও বা উহাকে চুল্লীতে দাহ্য-বস্তুরূপে ব্যবহার করে এবং উহার ভস্মকে অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করে। ঐ ভস্ম এক জাতীয় উৎকৃষ্ট সার পদার্থ; পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে এই খোসা হইতে বা পূর্ণ বীজ হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং যাহা আবর্জ্জনারূপে লোককে বিরক্ত করিতে পারে, উপায় জানিলে তাহাই অর্থাগমের সহায়তা করিয়া থাকে।

এই বীজ হইতেই তৈল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ইহার প্রধান কারণ, ইহাতে তৈল বেশ পরিষ্কার হয়। পরে ঐ খৈল গরুকে খাইতে দেওয়া হয় বলিয়া বীজের শাঁস হইতে খোসা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ঐ খোসার ব্যবহার আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। খোসা ছাড়াইয়া লইবার পর কোন স্থানে শাঁস হইতে ঘানি প্রভৃতির দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে প্রায় শতকরা ১২ হইতে ১৫ বা তত্যেধিক তৈল পাওয়া যায়; বলা বাহুল্য এই তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা স্বাদ ও বর্ণহীন। রন্ধনকার্য্যে ইহার বহুল ব্যবহার। বাজারে অলিভ অয়েল বলিয়া বা অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। মার্জ্জারিণ বা নকল মাখনের প্রধান উপকরণ ষ্টিয়ারিণ (Stearine) এই জাতীয় তৈল হইতে প্রাপ্ত হয়।

খোসা ছাড়াইবার পর, শাসগুলিকে সামান্য উত্তাপ দ্বারা তৈল বাহির করিবার সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে তৈলের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তৈলের গুণ বহু পরিমাণে হ্রাস পায়। শাঁসের ওজনের শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগও তৈল এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়।

তুলা-তৈলের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। অপরিষ্কৃত তৈল হইতে সাবান ও ময়লা ষ্টিয়ারিণ হইয়া থাকে।

প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তৈলের নাম দেওয়া হয় (১) Summer yellow oil: (২) Winter yellow oil.

প্রথম বিভাগে মোটামুটী সাবান, অলিভ অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত তৈল, cottolene বা তুলার তৈল, butterine বা নকল মাখন এবং রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত তৈল পড়ে।

দ্বিতীয় বিভাগে (winter yellow oil) তুলা তৈলজাত ষ্টিয়ারিণ, শূকর চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত বস্তু, মাখন ও বাতি পড়ে।

তাহা ছাড়া খনির মধ্যে ব্যবহারোপযোগী দীপ-তৈল প্রস্তুত হয়। কাঠের ক্ষয়-রোধ ও ইস্পাতের শক্তিরক্ষণের (steel tempering) বা খাঁটী ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এই গুণের জন্য ইহার আদর অত্যন্ত বেশী।

টার্কিরেড অয়েল (Turkey Red oil) নামক বস্তু এই তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। তন্তুজাত বস্ত্রের রঙ ধরাইবার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন।

তৈল বাহির করিয়া লইবার পরও যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। পশুখাদ্য হিসাবে খৈলের প্রচুর ব্যবহার আছে। গাভীর দুগ্ধবৃদ্ধির জন্য খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে শক্তিবৃদ্ধি করে বলিয়া হালের গরু মহিষকে দিনে তিনসের পর্য্যন্ত খাইতে দেওয়া হয়; ইহাতে সরিষার খৈল কম ব্যবহার করিলেও কোনও ক্ষতি নাই।

পশুখাদ্য ব্যতিরেকে জমির সার হিসাবে খৈলের ব্যবহার আছে। যাহাদের দেশে বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই ইহার সম্যক্ ব্যবহার জানে। গত সালেও ভারতবর্ষ হইতে অন্দাজ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের খৈল রপ্তানী হইয়াছে।

তুলাগাছের ডাঁটা হইতে একপ্রকার তন্তু পাওয়া যায়। পাতা ছাড়াইয়া ফেলিবার পর (Wyatt সাহেবের মতে), ৫ টন ডাঁটায় এক টন ছাল পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে আন্দাজ ১,৫০০ পাউণ্ড বা প্রায় দুই মণ তন্তু পাওয়া যাইতে পারে। পাটের পরিবর্ত্তে এই তন্তু সহজেই ব্যবহার করা চলে।

কার্পাস বৃক্ষের মূল-ত্বকের দেশীয় ঔষধরূপে ব্যবহার প্রচলিত আছে; তাহা হইতে এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আধুনিক ঔষধও প্রস্তুত হইয়াছে। আর্গটের পরিবর্ত্তে ইহাকে প্রয়োগ করা হয়। ইহা গর্ভস্রাবকারী, রজঃ-প্রবর্দ্ধক ও আশুপ্রসবকারক। আজকাল Decoctio of Cotton Root Bark ও Liq. Extract of Cotton Root Bark প্রভৃতি আর্গটের স্থলে চলিতেছে।

কার্পাস বীজের কথা আরও বলা প্রয়োজন। তুলার সহিত যে বস্তুর ২ : ১ অনুপাত, তাহার ব্যবহার করিতে না পারিলে স্বতঃই তুলার দাম বেশী পড়িয়া যায়। আমেরিকা এই বীজের বহুল ব্যবহার জানে বলিয়া তুলার দাম তাহারা কম ধরিলেও তাহাদের ক্ষতি নাই। যেটা আসল বস্তু তাহারই লোকে দাম ধরে, তাহার পর ঝড়্‌তি যাহা পড়িয়া থাকে তাহা হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভের। আমেরিকা যেভাবে তুলার বীজের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে তুলার মূল্যের সহিত তুলার বীজের মূল্য সমান ধরিলেও তাহাদের ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশে তুলার বীজের সম্যক মূল্য লোকে বুঝিতে পারিলে, সর্ব্বৈব মঙ্গল বুঝিতে হইবে।



শ্রীমধুসূদন

বনফুল

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী। রাজনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন—জাহ্নবী রোরুদ্যমানা

রাজনারায়ণ। এখন আর কাঁদলে কি হবে! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল। উঃ রামকমলের পরামর্শে কি কুক্ষণেই যে তোমাদের খিদিরপুরে এনেছিলাম—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার। (উচ্চৈঃস্বরে) প্যারি—প্যারি—

জাহ্নবী। প্যারি নেই, তাকে পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

রাজনারায়ণ। কোথায় পাঠালে তাকে? রোঘো, রোঘো—

রঘু নামক ভৃত্যের প্রবেশ

রঘু। কি বলছেন হুজুর

রাজনারায়ণ। বৈঠকখানায় মুহুরিকে জিগ্যেস্ করে' আয় যে যশোর থেকে কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছে কি না! শালাদের দেখাচ্ছি আমি!

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে?

রাজনারায়ণ। কি কথা?

জাহ্নবী। এ নিয়ে আর একটা অনর্থ বাধিয়ো না তুমি। তোমার দিশি লাঠি-ওলা কি কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পারবে?

রাজনারায়ণ। তুমি বল কি! বাঙ্‌লা দেশে লাঠির এখনও এত শক্তি আছে যে বন্দুক তার কাছে হার মেনে যাবে! আর তুমি কি মনে কর বন্দুক আমার নেই?—না, জোগাড় করতে পারি না? আগুন ছুটিয়ে দেব দেখো তুমি! বাঘের বাচ্ছা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের! রোঘো—রোঘো—

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছেন—লেঠেলরা সব এসেছে

রাজনারায়ণ। যা তুই—বসতে বল—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। (কম্পিতকণ্ঠে) আমার ভয় খালি মধুর জন্যে। মধু ত এখন ওদেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে ওরা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে। ওরা সব পারে—এক নীলকর সায়েব আমাদের গাঁয়ের একজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল!

রাজনারায়ণ। (রাগতকণ্ঠে) তাহলে কি করতে বল তুমি!

জাহ্নবী। আমি বলি ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে মধুকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

রাজনারায়ণ। বুঝিয়ে সুজিয়ে! আর্কডিকন্ ডলট্রি আর ব্রিগেডিয়ার পাউনি কি তোমার পদি-পিসি না শান্ত-মাসী যে বুঝিয়ে সুজিয়ে বললেই বুঝে যাবে? ওরা একমাত্র যুক্তি বোঝে যার নাম বাহু-বল!

জাহ্নবী। একবার দেখ না তুমি চেষ্টা করে—

রাজনারায়ণ। সে আমি পারব না! ওই ফিরিঙ্গি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় করে আমি বলতে পারব না যে আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া করে! এ অসম্ভব আমার পক্ষে!

জাহ্নবী। (সহসা রাজনারায়ণের পায়ে ধরিয়া) ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও! রাগ কোরো না আমার ওপর—আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তাহলে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি—শেষকালে কি মধুকেও হারাব!

রাজনারায়ণ। (সহসা দ্রবীভূত হইলেন) ওঠ—ওঠ—কি করছ! তুমি কি মনে কর মধু তোমারই ছেলে? সে আমার ছেলে নয়? ভুলে যাচ্ছ কেন মধু আমারও একমাত্র ছেলে—একমাত্র বংশধর। দেখি দাঁড়াও—মানে লেঠেলরা—বড় মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌ছি তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরের দিকে একটি ভিখারিণীর গান শোনা যাইতে লাগিল। একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল

দাসী। গুপ্তকবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরি মাগি এসেছে মা! সেই যে সেদিন বলছিলাম যার কথা—তুমি ডেকে আনতে বলেছিলে মনে নেই? ডাকব ওকে? তুমি অমন করে মন গুমরে থেকো না মা, তাতে ছেলের আরও অকল্যেণ হবে। ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে দেখো—। ডেকে আনি কেমন? একটু গান শোন—মন পরিষ্কার হয়ে যাবে!

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসী চলিয়া গেল ও ভিখারিণীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল

ভিখারিণী। জয় হোক মা—

দাসী। ভাল দেখে একটা গান গা দেখি! গুপ্তকবির সেই আগমনীটা গা—

ভিখারিণী গপুনি বাজাইয়া শুরু করিল

পুরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এলো ওই
অমনি পাগলিনী প্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে আমার উমা কি এলে
একবার আয় মা আয় গো করি কোলে
অমনি দুবাহু পাসরি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলি
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলি
কৈলাসেতে সবাই বলে উমা তোর কি মা নাই
অমনি সরমে মরে যাই
আমি বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

জাহ্নবী। ওকে চারটি ভিক্ষে দিয়ে দে!

দাসী ও ভিখারিণীর প্রস্থান ও তৎপরে রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণের প্রবেশ

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কি খবর বাবা!

প্যারীচরণ। আমরা অনেক কষ্টে কেল্লায় ঢুকেছিলাম—মধু এলো না।

জাহ্নবী। এলো না? আমার কথা বলেছিলি?

প্যারীচরণ। সব বলেছিলাম। কত বোঝালাম তাকে—সে কিছুতেই এল না। সেখানে ঢোকা কি সহজ ব্যাপার! আমাদের আগে গৌরদাসবাবু ভূদেববাবু গেছলেন—কিন্তু পাদ্রিরা মধুর সঙ্গে দেখাই করতে দেয় নি! ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল পর্য্যন্ত গেছলেন—তাঁকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দেয় নি। ব্যাটারা কি কম পাজি! কাকাকে বল, ব্যাটাদের নামে ঠুকে দিক এক নম্বর!

জাহ্নবী। আমার কথা বলেছিলি তুই ভাল করে বুঝিয়ে?

প্যারীচরণ। বলি নি? অনেকবার বলেছি—সেখানে বেশী কথা কইবার কি যো আছে? গোরা পাহারা—পাদরি—গিজগিজ করছে!

জাহ্নবী। মধু এলো না—!

নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের মধ্যে একটি কক্ষ। মধুসূদন সেই ঘরে একাকী পদচারণ করিতেছেন। তাঁহার হস্ত-দ্বয় পিছনে নিবদ্ধ—ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও গরম ওভারকোট। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিলেন ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। Dr. Corbyn—যাঁহার বাড়ীতে মধু অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন

Dr. Corbyn। The friend who called the other day has come again. Do you like to see him?

মধু। Who is he?

Dr. Corbyn। Some Gourdas Bysak.

মধু। Is there anyone else?

Dr. Corbyn। No, he is alone.

মধু। Please bring him—or rather send him.

Dr. Corbyn। [হাসিয়া] Allright.

Dr. Corbyn চলিয়া গেলেন ও একটু পরে গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৌরদাস আসিতেই মধু তাহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন

মধু। I am sorry—সেদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ভূদেব কোথায়? সে এলো না আজ?

গৌরদাস। না, সে আসতে পারলে না। মধু, তুই এ কি করলি ভাই!

মধু। (সহাস্তে) Please don't give moral lectures, my dear friend. Believe me—I could not help it.

গৌরদাস। Could not help it! তুই শেষে খৃষ্টান হবি—এ যে ভাবতেও পারি না!

মধু। Well, it requires a little imagination. তোমার ত সে বালাই নেই—So it is a surprise to you.

গৌরদাস। Really, it is a surprise to me—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি!

মধু। তোর কল্পনার দৌড় আর কতটুকু? একটা হাউইএ আগুন ধরিয়ে দেবার পর সে কি করবে কল্পনা করতে পারিস্?

গৌরদাস। তার মানে?

মধু। The rocket has caught fire my friend and it will shoot up. You cannot stop it by giving moral lectures.

গৌরদাস। Fireটা কি তাই ত বুঝতে পারছি না। Is it Miss Banerji?

মধু। Nonsense.—

গৌরদাস। তবে কি?

মধু। I don't know what it is exactly. But I won't be ruled over. I shall break through bonds. It is in my nature—it is in my blood. (একটু পরে) Nonsense.—Miss Banerjee, indeed!

গৌরদাস। সবাই তাই বলছে।

মধু। Let them.—

গৌরদাস। তোর মায়ের কথা একটুও মনে হল না!

মধু। (মিনতি করিয়া) Please don't. This is silly; (সহসা উত্তেজিত হইয়া) তোমরা পাঁচজনে এসে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবে তবে আমি সে কথা ভাবব why do you take me for such an inanimate thing? How dare you? Please let my private feelings alone—I curse them—I nurse them—but I shall never let them crush me. Do you know she haunts me? But I won't be dragged down—I shall stick to my principle. I will.

গৌরদাস। তোমার আবার principle আছে না কি? You have enough of sentiments, no doubt—কিন্তু principle?

মধু। My sentiments are my principle—

গৌরদাস। পিতামাতার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত?

মধু। আছে। কিন্তু পিতামাতারও ত আমার প্রতি একটা কর্ত্তব্য থাকা উচিত!

গৌরদাস। তার মানে?

মধু। They should let me go my own way—তাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন—প্রতিপালন করেছেন—ওইখানেই তাঁদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয়েছে—এর পর আমার জীবনের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত! আমার ambition অনেক বেশী। I shall go to England—I shall become a great poet—why shall I rot in this barbarous Hindu Society of Bengal?

গৌরদাস। আচ্ছা, তুই একবার বাড়ী ফিরে চল্ ত—মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে চলে আসিস্!

মধু। অসম্ভব—এখন আমি কোথাও যাব না।

গৌরদাস। কাউকে কিছু না বলে এমন ভাবে লুকিয়ে চলে আসাটা ঠিক হয় নি তোমার!

মধু। গৌর—তুমি বৈষ্ণব ত! তোমাদের চৈতন্যদেব যদি মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকতেন—খুব ভাল কাজ হত সেটা? Believe me, my dear Gourdas, the tremendous force which made him leave his hearth and home for something Great has driven me also to Christianity—একটুও বাড়িয়ে

বলছি না আমি। পাখী যখন ডিম ফুটে বেরোয় সে কি তখন খোসাটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারে? ডানা মেলে আকাশে তাকে উড়তেই হবে—this is life.

গৌরদাস। Well, then enjoy life—Good Bye.

মধু। (আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) না—না—রাগ করিস না ভাই গৌর। তোরাও যদি রাগ করিস—তোরাও যদি আমাকে না বুঝিস—তাহলে আমি দাঁড়াব কোথা ভাই! Please understand me. The women folk or their like may misunderstand me—but why should you! শোন—এইটে লিখেছি আজ This will be sung on the occaison of my conversion—ব'স্—ভাল করে—শোন্

পকেট হইতে কাগজটি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

1

Long sunk in Superstition's night
By Sin and Satan driven
I saw not, cared not, for the light
That leads the blind to Heaven

2

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me
I hasten'd to Eternity
O'er errors dreadful sea

3

But now, at length, thy grace, O Lord
Bids all around me shine!
I drink thy sweet, thy precious word,
I kneel before thy shrine!

4

I have broke Affection's tenderest ties.
For my blest saviour's sake;
All, all I love beneath the skies
Lord! I for thee forsake!

গৌরদাস। Can you really forsake?

মধু। মিল দিয়ে কবিতা লেখার ত ওই গোলমাল ভাই! You are forced to use words which you don't mean to! কেমন হয়েছে লেখাটা? (হাসিলেন)

গৌরদাস। Your poems are always good to me.

মধু। Don't be sulky, Gour—come,

Dr. Corbyn আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই গৌর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

Dr. Corbyn। Tea is ready.

মধু। (গৌরদাসকে) Will you have tea?

গৌরদাস। No, thanks. I shall go now.

Dr. Corbyn। I hope you will tell his father that we have kept his son as nicely as our means would permit. Are you not comfortable here Mr. Dutt?

মধু। Oh yes—thank you.

গৌরদাস। চললাম তাহলে—Good Bye

Dr. Corbyn ও মধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেলেন

Dr. Corbyn। Come, let us go. The tea is getting cold.

মধু। Yes, let us.

উভয়ে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্ত মহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—জাহ্নবী তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা ত রেখেছি—লেটেল শড়কিওলা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—হল না ত কিছুই! এই কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলেত গিয়ে খৃষ্টান হত তাহলেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হত না—শহরময় এমন ঢি ঢি' পড়ত না। দ্বারিকঠাকুর, রামমোহন রায়—শহরের দুজন ভদ্রলোক ত বিলেত গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড় আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ—কি করতে বল আমাকে তুমি!

জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু নতমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন

হাজারখানেক টাকাও তাকে পাঠিয়েছিলাম—যে খৃষ্টান হতে হয় বিলেত গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও ত সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে—আমি আর কি করব বল! একমাত্র ছেলে হলেও খৃষ্টান ছেলে আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুস্কিল—কথা বলছ না কেন—কি করতে বল আমাকে তুমি!

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি কিন্তু ঘরে নিতে পারি না! মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের যত বড় আঘাত দিয়েছে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্ত্তব্য সে ত করে নি।

জাহ্নবী। রাগ কোরো না—ভেবে দেখ—আমাদের কর্ত্তব্যও আমরা করি নি।

রাজনারায়ণ। করি নি? তার জন্যে না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি—তার জন্যে জলের মত অর্থব্যয় করেছি—

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্ত্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছি—মধু যে আজ এমন হয়েছে—তার জন্যে আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা আমি এখন গিয়ে পায়ে ধরে তার ক্ষমা চাই?

জাহ্নবী। না, তার ক্ষমা চাইতে হবে না—তাকেই তুমি ক্ষমা করো—তার ওপর রাগ করে থেকো না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। (উচ্চতরকণ্ঠে) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জল-পিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে—ধর্ম্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার—কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। (ব্যাকুলভাবে) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ। কোথা পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। (সভয়ে) মধুকে ডেকে আনতে—

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি—

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না—মাপ কর তাকে!

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না! খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদ্গতির পথ বন্ধ করেছে। সে আমার পুত্র নয়—শত্রু!

আবার উপবেশন করিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে তুমি? আবার তুমি বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ। বিয়ে করব!

জাহ্নবী। আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমার আর ছেলে হবে না। যদি বিয়ে করে আবার তোমার ছেলে হয় আমাদের দুজনেরই ভাল হবে। তুমি আবার বিয়ে কর—আমাদের সমাজে তাতে ত বাধা নেই!

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

রাজনারায়ণ। এ তুমি বলছ কি!

জাহ্নবী। ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি। তাছাড়া এতে মঙ্গলই হবে। তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। আমি তোমায় অনুরোধ করছি তুমি আবার বিয়ে কর—আবার নূতন পুত্র লাভ কর। মধু আমার একারই থাক—তাকে তুমি ক্ষমা কর শুধু—

রাজনারায়ণ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ক্ষমা কর—মানে? কি করতে হবে আমাকে?

জাহ্নবী। তার ওপর রাগ করে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজনারায়ণ। বেশ! তার জন্যে কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের ত স্থান নেই।—

বিশপ্‌স্ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে! খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি! (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবে ত? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম—ফেরত দিয়েছে! সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ!

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু করে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়ত হিন্দু হতে পারে—কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি। সে অনুরোধ আমায় ক'রো না—

উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা—মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথা?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ভেতরে এলো না—বলছে ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর—

জাহ্নবী। যা তুই—ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোষাক। মধু আসিয়াই জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন

মধু—মধু—বাবা আমার!

মধু। মা খুব রাগ করেছ তুমি? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়—আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ করো না!

জাহ্নবী। দুঃখ করব না? তুই বলছিস কি মধু! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না! আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করব না? না হয় বিয়ে তুই না-ই করতিস, খৃষ্টান হতে গেলি কেন!

মধু। খৃষ্টান হওয়া ত কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হতে চাই মা—খৃষ্টান না হলে বড় হওয়া যায় না। যিশুখৃষ্ট কত বড় লোক ছিলেন তা যদি জানতে তাহলে বুঝতে আমি কোন হীন কাজ করি নি। যিনি পরের জন্যে অনায়াসে—

জাহ্নবী। আমি কিছু বুঝতে চাই না বাবা! আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না। তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে বসে না খাওয়ালে যে তোর খাওয়া হয় না বাবা। এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই? কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছিলি—

অশ্রুপাত

মধু। চ্যাপ্‌লেন ডনের বাড়ীতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি?

জাহ্নবী। আজই চলে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা—ওরা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছে; ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার—

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। তুই এখানকার লেখাপড়া শেষ করে নে—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পরে হবে'খন।

মধু। বিশপ্‌স কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায়?

জাহ্নবী। পাবি কোথায়! এতদিন যেখানে পেয়েছিস সেখানেই পাবি!

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না!

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি—আত্মহত্যা করব আমি! (সস্নেহে) ছি বাবা অমন কথা বলতে নেই! পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত? কিসের? কোন পাপ ত করি নি!

জাহ্নবী। তা নাহলে সমাজে যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তাছাড়া আমি বিলেত যাবই—তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি করে? এ সমাজে ত বিলেত-ফেরতদেরও স্থান নেই!

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তাহলে?

মধু। অসম্ভব—প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? কি এমন পাপ করেছি!

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার—

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়াশোনা করতে রাজী আছি—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

জাহ্নবী নতমুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন

কেঁদো না মা—কাঁদছ কেন শুধু শুধু। কেঁদো না—কেঁদো না—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। আমি বড় হতে চাই—আজকাল খৃষ্টান না হলে বড় কিছু হওয়া যায় না। অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না—

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি ত যাই নি কোথাও—শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা—তুই ফিরে যায়—

উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন—অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন

মধু। মা—আমি এখন চললাম—

জাহ্নবী। এখনই?

মধু। হ্যাঁ—আবার আসব।

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্তের তাহলে—

মধু। ও কথা ব'লো না—তাহলে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রথম বিরতি

সপ্তম দৃশ্য

রেস্তোরাঁও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী কমলমণি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে একটি খবরের কাগজ—কমলমণি কার্পেট বুনিতেছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দেবকীর ইচ্ছেটা কি?

কমলমণি। (মুচকি হাসিয়া) তার ত খুবই ইচ্ছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর বাধাটা কি? মধুসূদন ত খৃষ্টান হয়েই গেছে—সুতরাং ধর্ম্মত আর কোন বাধাই নেই। তাহলে এবার লাগিয়ে দেওয়া যাক বিয়েটা—

কমলমণি। তোমার যে খুব উৎসাহ দেখছি!

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়! ল্যাজকাটা শেয়ালের গল্প শোন নি?

কমলমণি। শুনেছি। তা ল্যাজ নিয়ে থাকলেই পারতে নিজেদের সমাজে—ল্যাজের জন্যে যখন মনে মনে এত আক্ষেপ!

জ্ঞানেন্দ্র। ওই দেখ! রাগ করলে ত? নাঃ—খৃষ্টধর্ম্ম তোমাদের মনে এখনও যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে নি দেখছি! তোমরা যে মেয়েমানুষ সেই মেয়েমানুষই থেকে গেছ।

কমলমণি। তাত ঠিকই!—কিন্তু একটা কথা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে হয়!

জ্ঞানেন্দ্র। কথাটা কি?

কমলমণি। তুমি ত বড় হিন্দুবংশের সন্তান—বিশেষ করে 'রিফরমার' পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে—তুমি যে খৃষ্টান হয়ে গেলে সত্যি করে বুকে হাত দিয়ে বল দিকি কেবল কি আলোকের জন্যে?

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়! ফড়িং পর্য্যন্ত আলোর দিকে ছুটে আসে—আমরা ত মানুষ।

কমলমণি। হিন্দুধর্ম্মে কি আলোকের অভাব আছে বলতে চাও?

জ্ঞানেন্দ্র। (সামান্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) তুমি ব্যারিষ্টারি করবে?

কমলমণি। (সবিস্ময়ে) ব্যারিষ্টারি করব মানে?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হওয়ার কথা—আমি ভাবছি; আমি ব্যারিষ্টারি না পড়ে তোমাকে পড়ালে বেশী কাজ হবে!

হাসিলেন

কমলমণি। থাক্—ঢের হয়েছে! এদেশে মেয়েরা করবে ব্যারিষ্টারি? তাহলেই হয়েছে। এমনিই ত তোমাদের গুপ্ত-কবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখবে তাই নিয়েই তোমাদের কত আন্দোলন, খবরের কাগজে লেখালেখি মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা। সামান্য ইস্কুলে

পড়া নিয়েই এত কাণ্ড—ব্যারিষ্টারি করলেই হয়েছে! (একটু পরে) ভাগ্যে মিশনারিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে তাই এদেশের মেয়েদের বর্ণ-পরিচয় হচ্ছে। চোখ বুজে ভাবছ কি?

জ্ঞানেন্দ্র। গুপ্ত-কবির সেই ছড়াটা মনে করছি—দাঁড়াও—হ্যাঁ মনে পড়েছে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
এ. বি. শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।
আর কিছু দিন থাক রে ভাই
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বেড়ে লিখেছে কিন্তু—

কমলমণি। তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না যে!

জ্ঞানেন্দ্র। কি কথার?

কমলমণি। খৃষ্টান হয়েছ কেন? সত্যি করে বল ত।

জ্ঞানেন্দ্র। অন্ধকার থেকে আলোকে আসতে কে না চায়!

কমলমণি। (গম্ভীরভাবে) বিশ্বাস করি না।

জ্ঞানেন্দ্র। বিশ্বাস না করার হেতু?

কমলমণি। হেতু খুব স্পষ্ট। তুমি খৃষ্টান হয়েছ আমার জন্যে, আর মধুসূদনবাবু খৃষ্টান হয়েছেন দেবুর জন্যে! আলো টালো বাজে কথা।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমরাই ত আলো—কি মুস্কিল!

কমলমণি। ভারি খারাপ লাগে আমার!

জ্ঞানেন্দ্র। কি খারাপ লাগে?

কমলমণি। তোমাদের এই ভণ্ডামি। বাবা কিন্তু খৃষ্টান হয়েছিলেন ধর্ম্মের জন্য—বিয়ে করার জন্যে নয়।

জ্ঞানেন্দ্র। গুরুজন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না—

কমলমণি। তোমরা সব ভণ্ড!

জ্ঞানেন্দ্র। (হাসিয়া) শুধু ভণ্ড—গণ্ডগণ্ড!

পুনরায় কমলমণি কার্পেটে এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

কমলমণি। মায়েরই হয়েছে মুস্কিল! তিনি সেকেলে মানুষ—গোঁড়া বামুনের মেয়ে—কিছুতেই তিনি তোমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না! বেশী বাড়াবাড়ি তার বরদাস্ত হয় না কিছুতে। বাবা খৃষ্টান হবার পর কিছুদিন ত তিনি আসেনই নি বাবার কাছে—জান ত এ কথা?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি।

কমলমণি। এখনও তিনি মনে মনে গোঁড়া হিন্দুই আছেন। মা বলছিলেন, মধুসূদন খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, কায়স্থ ত! সেইজন্যে মায়ের মনোগত ইচ্ছে নয় যে দেবুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়!

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ—ভাগ্যে আমি তাহলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলুম বল!

কমলমণি। নিশ্চয়, অন্য জাত হলে মা কক্ষনো বিয়ে দিতে রাজী হতেন না!

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা তোমার বাবা যে একটি হিন্দু বিধবা যুবতীকে এনে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে বাড়ীতে জিইয়ে রেখেছেন সেটির গতি কি হবে?

কমলমণি। শুনছি গোপালবাবু তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। কে—গোপাল মিত্তির—the famous scholar?

কমলমণি। শুনছি ত। যাই বল বাপু—লেখাপড়াই শেখ আর যা-ই কর—তোমরা পুরুষরা ভারি হ্যাংলা!

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাংলা বললে একটু বেশী অবিচার করা হয় আমাদের ওপর। আমরা ঠিক কি জান? যাকে বলে Inquisitive! নতুন কিছু দেখলেই সেদিকে ছুটে যাই—সেটাকে উলটে পালটে নেড়ে চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় একবার বেলুন উড়েছিল—রবার্টসন সায়েব উড়িয়েছিলেন—উঃ সেদিনের কথাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে—সারা শহরময় সে কি হৈ চৈ—হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্‌কা পড়ে গেল—ব্যাপার কি—না, একটা বেলুন উড়বে!

কমলমণি। আমাদের বিয়ে করাটা তাহলে সেই বেলুন দেখার মত ?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে না, তা হতে যাবে কেন ? কি মুস্কিল ! আমাদের স্বভাবটা কি রকম তাই বলছিলাম—

কমলমণি। (মাথা নাড়িয়া) বুঝেছি—

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশভূষা হিন্দুভাবাপন্ন। পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি—মাথায় সিঁদুর—হাতে শাঁখা। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। তিনি আসিতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও কমলমণি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। কমলি—তুই দেখত মা গিয়ে—চায়ের সব আয়োজন ঠিক মত হল কি না। আমি বাপু পাড়াগেঁয়ে মানুষ ওসব চা-টা করা আমার ঠিক আসে না। ওঁর ত কলেজ থেকে আসবার সময় হ'ল। সব ঠিকঠাক করে দে মা তুই।

কমলমণি। (সহাস্যে) চাকরটাকে বল না—সে ত সব জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী। না বাছা—ও সব অনাচার আমি সইতে পারব না। মেলেচ্ছ চাকরের হাতে আমি খেতেও পারব না—কাউকে খেতে দিতেও পারব না। কি জাত তার ঠিক নেই !

কমলমণি। মা-কে নিয়ে আর পারা গেল না !

হাসিয়া চলিয়া গেলেন

বিন্ধ্যবাসিনী। তাছাড়া মেলেচ্ছই হোক আর যাই হোক—আমরা থাকতে চাকরে খাবার তৈরি করবে কেন—কি বল বাবা !

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ—তাত ঠিকই।

বিন্ধ্যবাসিনী। আচ্ছা বাবা—রাজনারায়ণবাবুর ছেলে মধুসূদন ত দেবুকে বিয়ে করতে চাইছে—শুনেছ বোধ হয় সে কথা !

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি। মধু ছেলে ভাল।

বিন্ধ্যবাসিনী। তা আমি জানি। কিন্তু শুধু ছেলে ভাল হলেই ত চলবে না—আরও অনেক জিনিস ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত—ওরা কায়স্থ। খৃষ্টানই হোক আর যা-ই হোক রক্ত ত বদলাবে না ! তার পর দ্বিতীয় কথা খৃষ্টান হওয়ার জন্তে ওর বাপ হয়ত ওকে ত্যাগ করবে। বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি করে ওকে—ওর হাতে কি মেয়ে দেওয়া উচিত হবে ?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার হাতে মেয়ে দিয়েছেন তাহলে কি করে ? আমিও ত বাবার মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টান হয়েছি।

বিন্ধ্যবাসিনী। তোমার কথা আলাদা ! কত বড় বংশের ছেলে তুমি ! তাছাড়া তুমি বিলেত যাবে—ব্যারিষ্টার হবে। মধু ত ছেলেমানুষ—লেখাপড়াই শেষ হয় নি এখনও ওর। মেয়ের ভবিষ্যৎ ত ভাবতে হবে।

জ্ঞানেন্দ্র। মধু পড়াশোনায় খুব ভাল—ও ছেলে উন্নতি করবেই। মধুর পড়াশোনার খরচ ত ওর বাবাই দিচ্ছেন। ত্যাজ্যপুত্র করবেন কেন ?

বিন্ধ্যবাসিনী। এখন না হয় খরচ দিচ্ছেন—কিন্তু ধর যদি তাঁর একটি ছেলেই হয়—তখন ? বিয়ে যখন করেছেন তখন ছেলে হবেই না বা কেন ?

জ্ঞানেন্দ্র। মধু যে রকম ছেলে ওর ঠিক উন্নতি হবে। উনি যদি বরাবর ওকে পড়ার খরচ দেন—আর দেবেনই বা না কেন—ত্যাজ্যপুত্র করার কোন কথা ত শুনি নি।

বিন্ধ্যবাসিনী। ত্যাজ্যপুত্র করতে আর কত দেরী লাগে—করলেই হল। কিন্তু আসল কথা কি জ্ঞান বাবা—আমরা নৈকষ্য কুলীনের বংশ—আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না !

জ্ঞানেন্দ্র। দেবকীর ইচ্ছেটা কি ?

বিন্ধ্যবাসিনী। মেয়ে ত মধুকে বিয়ে করবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছেন ! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা ! (সহসা) যাই দেখি ওরা কতদূর কি করলে—ওঁর কলেজ থেকে ফেরবার সময় হল। তোমাকে কি চা পাঠিয়ে দেব, না উনি এলে একসঙ্গে খাবে ?

জ্ঞানেন্দ্র। এক সঙ্গেই খাব।

বিন্ধ্যবাসিনী চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছনে লম্বা বেণী দুলিতেছে। মেয়েটি রূপসী। স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের কমনীয় চটুলতা তাঁহাকে আরও মনোহারিণী করিয়াছে। তাঁহার হাতে একটি পুস্তক রহিয়াছে—শেলির কাব্যগ্রন্থ

দেবকী। বাজি জিতেছি—টাকা দিন।—এই দেখুন—'our' রয়েছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি ? কই, দেখি !

দেবকী। এই যে—দেখুন,

পাঠ করিলেন

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are
those that tell of saddest thought

ই দেখুন পষ্ট লেখা রয়েছে—'our'। দু'জায়গাতেই াছে!

জ্ঞানেন্দ্র। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এটা কার edition? ামরা যে edition পড়েছিলাম তাতে দুটো 'our' ছিল া! দেখি।

দেখিলেন

দেবকী। বাঃ—যে editionই হোক না—শেলীর কবিতার কথা কি বদলে যাবে! বাজি জিতেছি আমি—টাকা দিন—ওসব চালাকি চলবে না!

জ্ঞানেন্দ্র। নাও, উপায় কি!

পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন

দেবকী। (উৎফুল্লকণ্ঠে) কেমন হারিয়ে দিলাম! ভারি যে তর্ক করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে!

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) আসল কথাটা বলি এবার তাহলে?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাব আমি আগেই জানতাম।

দেবকী। বাঃ—তাহলে বাজি রাখতে গেলেন কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাওয়ার জন্যে! শালীর কাছে হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা কি বিরাট আনন্দ আছে—তা তুমি কি বুঝবে! That lift of your brow and lilt of your tone, the flickering smile on those naughty lips—এ সবের দাম যে পাঁচ টাকার চেয়ে ঢের বেশী তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মধু would appreciate me.

দেবকী। যান—ভারি অসভ্য আপনি!

জ্ঞানেন্দ্র। হায়, সত্যিই যদি অসভ্য হতাম! এই সুসভ্য খৃষ্টানধর্ম্মের মস্ত একটা দোষ কি জান?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এতে বহু-বিবাহ করতে দেয় না!

দেবকী। কেন, দিলে কি করতেন আপনি? বহু-বিবাহ করতেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বহু না করি—অন্তত আর একটা ত করতামই। মধুকে তাহলে কি ঘেঁষ্‌তে দিই তোমার কাছে!

দেবকী। যান্—ভারি অসভ্য আপনি! এই নিন্ আপনার টাকা চাই না!

টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহিত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহন পাদ্‌রির পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। মধুসূদনের অঙ্গে কিন্তু অতিশয় চটকদার পরিচ্ছদ। সাদা সিল্কের কাবা—তদুপরি নানা কারুকার্য্য মণ্ডিত রঙীন শালের রুমাল। মাথায় উকিলদের ন্যায় শালের পাগড়ি। শালের রুমাল ও শালের পাগড়ি—বহুবর্ণ বিচিত্রিত। নানা রঙে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে

কৃষ্ণমোহন। (সহাস্যে) দেখ, মধুর কীর্ত্তি দেখ!

জ্ঞানেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ বেশ কেন! What is this?

মধু। (সগর্ব্বে) Why this is our own national dress! আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এই পোষাকই পরে। আমাকে collegiate costume যদি পরতে না দেওয়া হয়—I must put on our own dress. I think there is no harm in it.

কৃষ্ণমোহন। There is much harm. College is not the place for displaying your fancy dress.

জ্ঞানেন্দ্র। ব্যাপার কি!

কৃষ্ণমোহন। ও কিছু নয়—ব্যাপার মিটে গেছে। It is one of his whims—আর কি! (হাসিলেন) মধু ব'স—চা খেয়ে যেও। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া)Well, what's the matter?

মধু। Look at the cheek of Dr. Whithers—

our Principal! বলে কিনা তুমি নেটিব ক্রিশ্চান তুমি কালো ক্যাসক্ অর্থাৎ European collegiate costume পরে আসতে পাবে না—তোমাকে সাদা ক্যাসক পরতে হবে! Damn it. I told him straight that either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on my own national dress. I won't be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College!

জ্ঞানেন্দ্র। Right you are—তুমি এই পোষাকেই কলেজে গেছলে নাকি আজ?

মধু। Oh yes and there was a sensation!

জ্ঞানেন্দ্র। Very interesting—কি হল শেষ পর্য্যন্ত?

মধু। I think the authorities had to yield. Collegiate costume পরতে দিতে রাজী হতে হয়েছে!

জ্ঞানেন্দ্র। (মধুর পিঠ চাপড়াইয়া) বাঃ—এইত চাই!

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। ভেতরেই চা দেওয়া হয়েছে—মা আপনাদের আসতে বললেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। রাজপুত্র! দেখছ কি? রূপকথার real রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে! (মধুর প্রতি) পক্ষীরাজটা কোথা রেখে এলে বন্ধু!

মধু। (সবিস্ময়ে) রেখে আবার আসব কোথায়! পক্ষীরাজ কি আস্তাবলে থাকে না কি! সে থাকে এইখানে —(বুকে টোকা দিলেন) whether পক্ষীরাজ is carrying me or I am carrying পক্ষীরাজ that is a problem, indeed.

জ্ঞানেন্দ্র। সাধু, সাধু,—তোমরা নিভৃতে তাহলে একটু বিশ্রম্ভালাপ কর— আমি অপসৃত হয়ে পড়ি। ওখানে ত বিশেষ সুবিধে হবে না।

হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

মধু। কেমন দেখাচ্ছে বল ত আমাকে এই পোষাকে!

দেবকী। সুন্দর মানিয়েছে—সত্যি রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছে।

মধু। I wonder when my princess will awake!

দেবকী। শিগ্‌গির চল—ভারি লজ্জা করছে আমার—

মধু। তোমার লজ্জা লজ্জা মুখখানি ভারি সুন্দর দেখায়। আজ কুমারস্বামীর কাছে কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ছিলাম। তোমাকে দেখে তার দু' লাইন মনে হচ্ছে—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং

দেবকী। (হাসিয়া) আমি চললাম তাহলে!

মধু। না, যেও না—শোন তোমার বাবা মা আমাদের বিয়ের সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন তাত এখনও জানতে পারলাম না কিছু।

দেবকী। (মুচকি হাসিয়া) শুনলাম তুমি কায়স্থ বলে মা আপত্তি করছেন।

মধু। What! কায়স্থ! I am no more কায়স্থ now than she is Brahmin. We are all Christians —sailing on the same boat! Are we not?

দেবকী। মা ভয়ানক গোঁড়া যে!

মধু। But this won't do—I must have you. I must speak to Rev. Banerjee to-day.

দেবকী। না—আজ ওসব ব'লো না বাবাকে আমার সামনে—অন্য সময় ব'লো—ভারি লজ্জা করবে আমার! তুমি এস—আমি চল্লাম—

চলিয়া গেলেন

মধু। শোন—শোন—দেবকী—একটা কথা।

দেবকী। (নেপথ্য হইতে) এখন নয়—পরে। তুমি এসো—

ক্ষুব্ধ মধু দেবকীর অনুসরণ করিতে যাইবেন এমন সময় গৌরদাস বসাক আসিয়া প্রবেশ করিলেন

মধু। Hallo—গৌর—হঠাৎ এ সময়!

গৌর। I hope you will excuse this intrusion into your Heaven, my friend কলেজে গিয়ে তোমার খোঁজ না পেয়ে শেষে এখানে এলাম—শুনলাম তুমি রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জির সঙ্গে এইদিকেই এসেছ। I hope I am not unwelcome.

মধু। You are always welcome, Gour.

গৌর। কিন্তু তোমার এ কি বেশ! এই পোষাকেই লেজ যাও না কি আজকাল? অথবা দেবী আরাধনার জন্যে ই বৈচিত্র্য!

মধু। Leave my dress alone—সে অনেক থা—পরে বলব। বাড়ীর খবর কি? খিদিরপুরে গিয়েছিলে ার?

গৌর। হ্যাঁ—প্রায়ই যাই। তোমার বাবা আবার য়ে করেছেন শুনেছ ত?

মধু। শুনেছি। মা কেমন আছেন?

গৌর। Need you ask that? তিনি বেঁচে াছেন এই পর্য্যন্ত! মায়ের কথা থাক এখন—তোমার দিককার খবর কি! Are you seriously in love ith Miss Banerjee? Are you going to marry ıer?

মধু। I don't know whether I am seriously n love with her. But I want to marry her—he is a cultured girl—fit to be my ompanion.

গৌর। Are you not sure about your love?

মধু। I am not sure about anything now—Gour; আমি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব া ভাই তোকে। (সহসা তাহার দুইটি হাত ধরিয়া) াই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়! মামার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These ascals are treating me shabbily—বিলেত নিয়ে াবে আশা দিয়েছিল—but now they are very cold ıbout it—I have practically given up all ıopes. But go to England I must.

গৌর। খৃষ্টান হয়ে লাভ হয়েছে তাহলে বল!

মধু। লাভ যে হয় নি তা নয়—I have come in ontact with eminent scholars—I am studying Greek, Latin and Sanskrit—কিন্তু শান্তি নেই আমার—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই! আবার হিন্দু হওয়া যায় না! Is there no respectable way? প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না! That's a degrading process.

গৌর। ওসব কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই।

মধু। I know.

খানসামা-জাতীয় একটি ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সাহেব ডাকছেন—

মধু। হ্যাঁ যাচ্ছি—যাও তুমি—

ভৃত্য চলিয়া গেল

গৌর। তাহলে তুমি যাও—আমি আর একদিন আসব!

মধু। আসিস্—নিশ্চয় আসিস—please don't forget.

গৌর। আসব। যাই এখন—Good Bye (মুচকি হাসিয়া) wish you all success with Miss. Banerji.

সাহেবী কায়দায় করমর্দ্দন করিয়া গৌরদাস বিদায় লইতেছিলেন—
এমন সময় মধুসূদন তাহাকে আবার ডাকিলেন

মধু। গৌর—শোন ভাই।

গৌর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি?

মধু। তুই মাকে একটু দেখিস ভাই—বুঝিয়ে বলিস—যাস্ মাঝে মাঝে—বুঝলি?

গৌর। আচ্ছা—

গৌরদাস চলিয়া গেলেন। মধুসূদন তাহার প্রস্থানপথের দিকে
চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ক্রমশঃ



সিংহপুর বা বর্ত্তমান সিঙ্গুর

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

প্রবন্ধ

কিছুকাল পূর্ব্বে যেদিন ভূতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের নিকট বাঙ্গালাদেশ একটি অনতিপ্রাচীন প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল—সে সময় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘোষণা করিলেন—"বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত



সিঙ্গুর হইতে সংগৃহীত বাসুদেব মূর্ত্তি

প্রবল হইয়াছিল যে বঙ্গরাজ্যের একটী ত্যাজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ।"—পণ্ডিতগণের অভিমত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর বিজয়সিংহ পিতাকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সাতশত বাঙালী যোদ্ধা অনুচরসহ সুবৃহৎ অর্ণবযানে—দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় "তাম্রপর্ণি" বা লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং তদবধি লঙ্কা সিংহলবংশের রাজ্য বলিয়া সিংহল নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।* রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের উল্লেখ আছে, কিন্তু সিংহল নাই; পরবর্ত্তীকালে উহার লঙ্কানাম উঠিয়া গিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে সিংহল নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময় হইতে সিংহলের সহিত বাঙালার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং পরবর্ত্তী প্রাচীন বাঙালাকাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সিংহলের 'মহাবংশে' উল্লিখিত হইয়াছে যে মৌর্য্যবংশের অবসান সময়ে রাঢ়দেশে যে কয়েকটী রাজ্য বর্ত্তমান ছিল তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের খুল্লতাতপুত্র পাণ্ডুশাক্যের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়া রাজ্য ও সিংহলবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত নরপতিগণের এই সিংহপুর রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৈন হরিবংশেও পূর্ব্বভারতের দুইটী প্রধান নগর উল্লিখিত হইয়াছে, একটী গৌড় অপরটী সিংহপুর।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বর্দ্ধমানের ইতিকথায়" বর্দ্ধমান জেলায় সেরগড় পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে তাহারই তীরে সিংহপুর রাজ্য ছিল বলিয়া যে অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন—সিঙ্গুরের প্রাচীনত্বের আলোচনা করিলে সে অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। সিংহবাহুর রাজধানী সিংহরণ নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া মহাবংশে উল্লিখিত আছে। সিঙ্গুরে এ নামে কোন নদী না থাকিলেও এখানে প্রাচীন নদীরেখার বহু চিহ্ন বর্ত্তমান। বিপুলকায় সরস্বতী কয়েক শতাব্দীর মাঝেই স্থানে স্থানে যেরূপভাবে লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি নদীর চিহ্ন যে মুছিয়া যাইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

স্মরণাতীত কাল হইতে সরস্বতী নদীপথেই সমুদ্রযাত্রা

---

* Sinhapur, in the district of Hughly in Bengal, it was founded by Sinhabahu the father of Vijoy who conquered and colonised Lanka.
—The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India by Nandalal De.

হইত এবং প্রাচীনকালে সপ্তগ্রাম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সরস্বতী তীরেই বহু সমৃদ্ধ নগর ছিল এবং সরস্বতীতীরস্থ জনপদই পশ্চিমবঙ্গে অতি সুসভ্য ও সমৃদ্ধ ছিল। এই সরস্বতী তীরেই সিংহপুর রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। অদ্যাবধি সিঙ্গুরে সরস্বতীর চিহ্ন রহিয়াছে—কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বেও সিঙ্গুরে সরস্বতীর স্রোত বহিত। সিঙ্গুর ষ্টেশনের নিকট খননকালে একটী প্রাচীন ঘাটের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল—ইহারই নিকট একটী প্রাচীন বংশ অদ্যাবধি 'পারের বাড়ী' বলিয়া পরিচিত—এইস্থানে একটী পারঘাট থাকাই সম্ভব। কালীমন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন মন্দির এই সরস্বতী তীরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল : গ্রামের রাস্তাগুলি এই নদী-চিহ্ন-মুখী এবং জনপদও এই নদীতীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিঙ্গুরের বহুস্থানেই নৌকা বা অর্ণবযানের গলিত অংশবিশেষ পাওয়ার সংবাদ শোনা যায়—ইহাতেও সরস্বতীর মত কোন স্রোতবতী নদীপ্রবাহের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। সিঙ্গুরের একাংশের নাম জলাঘাটা; এইস্থানে মৃত্তিকা খনন-কালে বহুবার জলযানের নানা অংশ পাওয়া যাওয়ায়—এককালে এ অঞ্চল নদীগর্ভে ছিল বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসে সিঙ্গুর বা সিংহপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহেশ্বরদি পরগণায় ভোজবর্ম্মাদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার অক্ষর হাজার বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে লিখিত আছে—"হরির জ্ঞাতিবর্গ বর্ম্মাগণ সিংহ-বিবরতুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাম্রশাসনে জানা যায় যে ভাস্করসিংহ, ধর্ম্মাদিত্য, লম্বোদরসিংহ, ক্ষেমেশ্বর, হরিবর্ম্ম বা হরিশ্চন্দ্র সিংহ হুগলী জেলার সিঙ্গুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন।" বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেকগুলিতে জানা যায় যে বল্লালসেনকৃত কুলস্থানের মধ্যে সিংহপুর অন্যতম। পঞ্চাননের কুলকারিকায় জানা যায় যে অনাদিবর সিংহ আদিত্যশূর প্রদত্ত সিংহপুর হইতে কটক নগর পর্য্যন্ত ভূমি লাভ করিয়া সিংহপুরের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গঙ্গার কূল হইতে পশ্চিমস্থ সিংহপুরেই রাজাদেশে তাঁহার প্রথম বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; এখানে তিনি বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বহুস্থানের ন্যায় সিঙ্গুর হইতে এ সকল স্মৃতি আজ লুপ্তপ্রায়; কিন্তু সিঙ্গুরে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শনের আভাষ পাওয়া যায়—সুধীসমাজের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইলে ভবিষ্যতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সিংহলপাটন, ডাকপাটন, সিংভেড়ি, পলতাগড় প্রভৃতি নামগুলি সিঙ্গুরের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। নসীবপুরের দীঘি, নীলদীঘি প্রভৃতি প্রাচীন সুবৃহৎ দীঘিগুলিও সিঙ্গুরের অতীতের স্মারক। সিঙ্গুর অঞ্চলে মৃত্তিকা খনন কালে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়ার সংবাদ শুনা যায়; তন্মধ্যে পলতাগড়

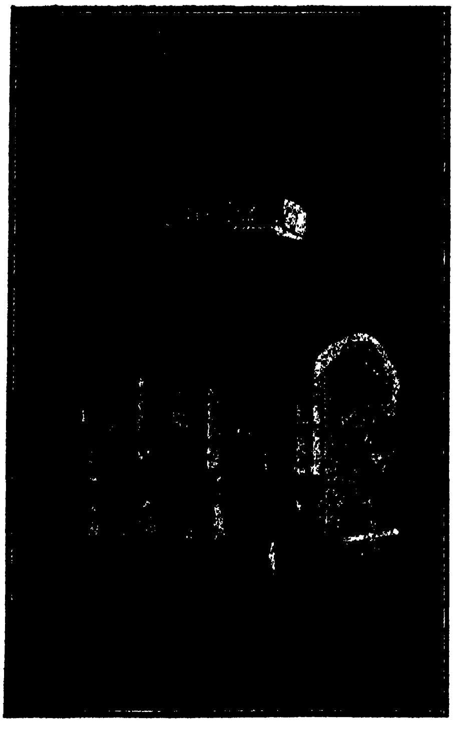


মনসা মূর্ত্তি

শীউপুকুরের ধারে একটী বটগাছের তলায় দুইটী প্রাচীন মূর্ত্তি আছে। একটী ভগ্ন বাসুদেব, অন্যটী অক্ষত সুন্দর মনসা-মূর্ত্তি। মনসার উপরের দুই হস্তে চামর—নিম্নের দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, বাম হস্তে আস্তিক মুনি উপবিষ্ট। মূর্ত্তিটী দেখিতে সুন্দর। চৈতন্যযুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে এই মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল—সে সময়ে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থে শত শত মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটী অপূর্ব্ব-পুরের একস্থানে খননকালে পাওয়া গিয়াছিল—রায় সাহেব

ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজার জন্য এইস্থানে রাখিয়া দিয়াছেন।

সিংয়ের ভেড়ী—বেড়াবেড়িতে একটী স্থান শালিবাহনের গড় বলিয়া পরিচিত। সাতগড়ার মাঠের সহিতও শালিবাহনের নাম জড়িত। এই সব ভগ্নস্তূপ খনন করিলে শালিবাহনের সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই সাতগড়ার মাঠে একটী পুষ্করিণী খননকালে প্রাচীন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছিল এবং একটী গাঁথনি দেখা গিয়াছে—এই গাঁথনির বড় ইটগুলি অনুমানে পাঠান আমলের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। এই গাঁথনি কতদূর বিস্তৃত তাহা গভীরভাবে খনন না করিলে জানিতে পারা যাইবে না। এই মাঠের একস্থানে মাটি-ঢাকা একটী ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধ্বংসের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেতগুলি একটু

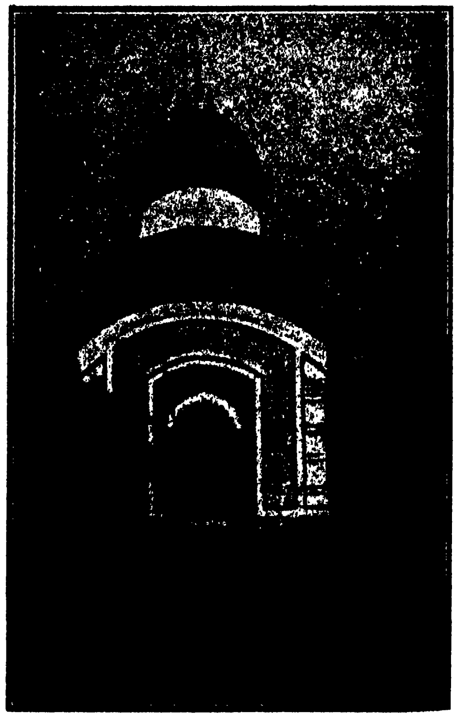


ডাকাতি কালী মন্দির

খুঁড়িলেই বহু ইট বাহির হয়—এই স্থান হইতে অনেক ইট লোকালয়ে গৃহনির্ম্মাণের জন্য নীত হইয়াছে। ইহা যে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন ধ্বংসের অবশেষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ধ্বংসস্তূপের একাংশ খননকালে ঘাট এবং জলযানের অংশ পাওয়া গিয়াছিল। এই ভগ্নস্তূপের কয়েকদিকে শুষ্কপ্রায় খালের মত জলাশয় দেখিয়া মনে হয় ইহা এককালে গড়ঘেরা ছিল। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে, এই স্থানে কোন রাজার সাতটী গড় ছিল এবং এই স্থান হইতে মৃৎপাত্র, আংটি, মোহর প্রভৃতি পাওয়ার কথা শুনা যায়। এই ধ্বংসের নিকট দুসতীনের পাড় বলিয়া একটী উচ্চ স্থান আছে—এই স্থানে মনসা পূজা হয়। এই স্থানে দুই সতীনের দুইটী পুষ্করিণী ছিল বলিয়া শুনা যায়—অদ্যাবধি পশ্চিমদিকের পুষ্করিণীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে সাতগড়ার রাজার দুই বিবাহ ছিল এবং এই পুষ্করিণী দুইটী তাহাদের স্নানের জন্য খনিত হইয়াছিল।

সিঙ্গুরে বহু প্রাচীন মন্দির আছে—দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও সিঙ্গুর যে কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল ইহা তাহারই পরিচয় স্বরূপ। তন্মধ্যে দুইটী মন্দিরের কথা উল্লিখিত হইল।

মল্লিকপুরের ডাকাতি কালী—। সিঙ্গুর ডাকাতির একটা প্রধান আড্ডা ছিল; ডাকাতেরা এক সময়ে এই



শিব মন্দির

কালীর পূজা করিত এবং সে সময়ে এ স্থানে নরবলি হইত বলিয়া জনশ্রুতি শুনা যায়। বর্দ্ধমানের রাজা এই মন্দিরের

নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিতে দেরী হওয়ায় জলঘাটা রঘুনাথপুরের মন্দির-নির্ম্মাতা মোড়ল-বংশ এই মন্দির করাইয়া দেন। রঘুনাথপুরের মন্দির ১৬৪৬ শকে নির্ম্মিত হয়—ইহাও তাহার সমসাময়িক। পরে এই মন্দিরের উপর বর্দ্ধমানরাজ মন্দির নির্ম্মাণ করান। রাস্তার অপরপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ছোট শিবমন্দির আছে—এই মন্দিরে মহাবীরেরও মূর্ত্তি পূজিত হয়। বর্দ্ধমান-রাজ কর্ত্তৃক পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর জমি দেবসেবার জন্য প্রদত্ত আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য, বিশেষভাবে ইহার দরজাটির কাঠের সূক্ষ্ম কারু মনোমুগ্ধকর। ১৩৪১ সালে মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের গান বাঁধনদার ভৈরব হালদার—সিঙ্গুরের অধিবাসী; এই কালীবাড়ীতেই তাহার আখড়া ছিল।

পুরুষোত্তমপুরে বিশালাক্ষী মন্দির ছত্রী ফতেসিং এই মন্দির নির্ম্মাণ করান; এই মন্দিরের পূর্ব্বে একটা পুষ্করিণী



বিশালাক্ষী মন্দির

অদ্যাবধি নির্ম্মাতার নাম বহন করিতেছে। রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কীয় চিত্র এবং সমাজ চিত্রে মন্দিরটীর ইটের কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর। এই সব ভগ্ন-মন্দিরের মৃত্তিকা-ফলকগুলি রেখার ইঙ্গিতে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে—ভক্ত বাঙ্গালী দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া এই সব মন্দির গাত্রে যে শিল্প সাধনা করিয়াছে তাহার মাঝে কত চিন্তার আভাষ ও সমাজের অভিব্যক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে!

পাঠান আমল হইতে সিঙ্গুরে অনেক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ক্ষেত্রী আসিয়া বাস করেন; তাহার মধ্যে কেহ কেহ সেনা বিভাগে কাজ করিতেন এবং বৃত্তিস্বরূপ ভূমি ভোগ করিতেন। অদ্যাবধি সিঙ্গুরে এই সকল প্রাচীন বংশের বহু বংশধরের বাস। সিঙ্গুরে বহু প্রাচীন মুসলমান বংশেরও বাস ছিল—মুসতাফপুর, হোসেনপুর, মহরমপুর, নামুদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নাম এবং প্রাচীন মসজিদগুলি তাহার নিদর্শন বহন করিতেছে—অদ্যাবধি সিঙ্গুরে বহু



দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি

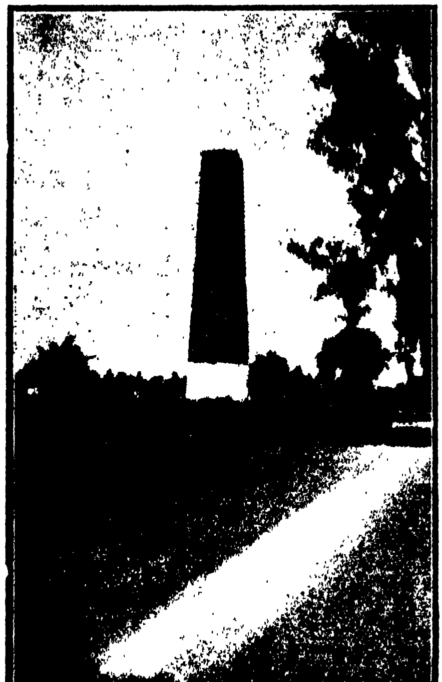
প্রাচীন মুসলমান বংশের বাস। সিঙ্গুরের প্রাচীন বংশের মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুদের বংশই প্রসিদ্ধ—এই বংশের সহিত সম্পর্কসূত্রে সিঙ্গুরে বহু প্রাচীন বংশের বাস আরম্ভ হয়। এককালে ইহাদের যেরূপ প্রতাপ ছিল, বিলাসের জন্য যেরূপ খ্যাতি ছিল আজ তাহার কিছুই নাই—সিঙ্গুরের কয়েক

স্থানে ইহাদের গড়বন্দী ভগ্ন প্রাসাদের চিহ্নমাত্র—ইহাদের পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় দ্বারকানাথ সাহী বর্ম্মণ প্রথমে সিঙ্গুরে আসিয়া নীলের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৎকালে. সিঙ্গুর নীল-চাষের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল অদ্যাবধি নীল দীঘি, নীলের পাহাড় প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গোপালনগরে অদ্যাবধি একটি নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারকানাথের অনেক জমিদারী ছিল; হাণ্টার সাহেবকৃত statistical account of Bengal-এ যে দ্বারকানাথ সিংহের নাম পাওয়া যায়—হয়ত ইহা তাঁহারই উল্লেখ। দ্বারকানাথের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে তাঁহার নাম খোদাই আছে এবং অদ্যাবধি জলাঘাটায় তাঁহার বসতবাটীর ভগ্নাংশ এবং সুবৃহৎ ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী দেখা যায়। দ্বারকানাথের দুই বিবাহ—প্রথম স্ত্রীর গর্ভে



বর্ম্মনদের শিবমন্দির

মহেন্দ্র ও রাধানাথ, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ব্রজনাথ, শ্রীনাথ ও যদুনাথ। রাধানাথের বর্ত্তমান বংশধর অবনীমোহন। ষ্টেশনের নিকট তাঁহাদের গড়-ঘেরা বাটীর ভগ্নাংশ, মন্দিরশ্রেণী ও অতিথিশালার ধ্বংসাবশেষ অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে। ব্রজবাবুর নির্ম্মিত ঘনশ্যামপুরে গড়ঘেরা বিরাট অট্টালিকা বর্ম্মণ বংশের গৌরবময় অতীতের স্মৃতি। ন-বাবু বা শ্রীনাথবাবু তাঁহার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার জন্য নবাববাবু বলিয়া খ্যাত ছিলেন—তিনি দেখিতেও অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। সিঙ্গুর থানার নিকট রেল লাইনের পার্শ্বে অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদের কোন চিহ্নই নাই, বর্ত্তমানে কেবল গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সিঙ্গুর ডাকাতির জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এই বাবুদের সহিত এককালে ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিয়া শুনা যায়। অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়তার



মারভ টেম্পল, ভোলার গির্জ্জা

জন্য এবং ভ্রাতৃ-বিরোধেই ক্রমে এ বংশের সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া আজ এ ভগ্নাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সিঙ্গুরের কায়স্থ মল্লিক বংশ এই বর্ম্মণ বংশের দেওয়ান হইয়া এই স্থানে বসবাস সুরু করেন—এই বংশের রামপ্রসাদ মল্লিক প্রথমে দ্বারকানাথের দেওয়ান হইয়া সিঙ্গুরে আসেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই বংশসম্ভূত। সুরেন্দ্রনাথের দানে সিঙ্গুর গ্রামে হাসপাতাল, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া সিঙ্গুর গ্রাম সমৃদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সিঙ্গুরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পোষ্টআফিস প্রভৃতি আছে।

সতী

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

সন্ধ্যার তখনও অনেক বাকী ; কিন্তু "আনন্দ-মন্দিরের" ঘরে ঘরে ইহারই মধ্যে যেন রাত্রির অন্ধকার ঘন হইয়া জমিয়া উঠিয়াছিল।

যেমন পল্লী, তেমনই তাহার "আনন্দ-মন্দির।" এ হেন গালভরা যাহার নাম তাহা আসলে একটি হোটেল মাত্র। মাসিক সাতটি মাত্র রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়েই থাকিবার একটু স্থান ও দুইবেলা ডালভাত খাইতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেক দরিদ্র ভদ্রলোকই এখানে সানন্দে বাস করিয়া থাকেন।

সেদিন বৈকাল পাঁচটার কাছাকাছি "হরিকুমার হাইস্কুলের" শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে এই "আনন্দ-মন্দিরেরই" একটি ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গায়ের আধময়লা জামাটি খুলিয়া দেয়ালে আঁটা র‍্যাকেটটির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়াই একখানি নোংরা শতরতালি দেওয়া কাঁথায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া তক্তাপোষের উপর সটান শুইয়া পড়িল। অন্ধকার শয্যায় শুইয়া সে কেবলই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর তাহাকেই খুঁজিতে আসিয়া তাহার বন্ধু বেণী ঘোষাল দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল, "মুখুজ্জে, বলি ও মুখুজ্জে—ঘরে আছ নাকি হে?"

জ্বরের ঘোরে সুরেন্দ্র এ আহ্বান শুনিতে পাইল না।

"তাইত! এ সময়ে ত মুখুজ্জে কোনদিন বাইরে যায় না। আর ঘর খোলা রেখে সে যাবেই বা কোথায়?" বলিতে বলিতে বেণী ঘোষাল ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল, আর ঠিক সেই সময়েই সুরেন্দ্র অস্ফুট কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, মাগো, একটু জল!"

"তাই বল," বেণী কতকটা যেন আশ্বস্তের মত বলিয়া উঠিল, "আবার কাঁথা নিয়েছে।" তারপর অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সুরেন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিয়া সে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মুখুজ্জে, ও মুখুজ্জে!"

এবার সুরেন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে শুষ্ক জিহ্বাটি ততোধিক শুষ্ক তালুতে ঠেকাইয়া বার দুই এক রকমের শব্দ করিয়া পরে কহিল, "কে, বেণী নাকি? এস, ভাই এস।"

"আবার জ্বর এসেছে বুঝি?"

"আর আসাআসি কি ভাই! এ ত লেগেই রয়েছে। কোনদিন একটু কম, কোনদিন বেশী। আজ একটু বেশী হয়েছে এই যা!" বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র জোরে কাশিয়া উঠিল।

বেণী কহিল, "তা আলোটাও জ্বালা হয়নি যে! চাকরটা কোথায় গেল?"

অনেকক্ষণ খুক্ খুক্ করিয়া কাশিবার পর একমুখ কফ মেঝের উপরেই ঢালিয়া দিয়া সুরেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে থামিয়া থামিয়া কহিল, "আর চাকর! সে কি আর আমার ঘরে আসে? আর আসবেই বা কেন? আমি ত আর তাকে যখন তখন বখ্‌শীশ দিতে পারি না!"

"তবে দেশলাইটিই দাও দেখি, আমিই আলোটা জ্বালি। ভর সন্ধ্যেবেলা—"

"তাও ত কাছে নেই। জামার পকেটে ছিল, তা সেটাও ত কোথায় যেন ছুঁড়ে ফেলেছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা; আমি খুঁজে দেখছি," বলিয়া বেণী অনেক খোঁজাখুঁজির পর হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিল। এতক্ষণ যে কদর্য্যতা অন্ধকারের আবরণের নীচে ঢাকা পড়িয়াছিল, এখন তাহা ম্লান আলোকে বড় সুস্পষ্ট হইয়াই যেন ফুটিয়া উঠিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বেণী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ইস্, কি নোংরাই হয়ে রয়েছে ঘরটা! তা চাকরটা না পারে, তুমিও কি এতে একবার ঝাঁটাটা বুলাতে পার না।"

সুরেন্দ্র লজ্জিতের মত উত্তর দিল, "পেরে উঠি না ভাই। এই ত শরীরের অবস্থা। ও সীটের মহেন্দ্রবাবু থাকতে আমার উপর দয়া ক'রে তিনিই এসব করতেন। তা যেমন দুর্ভাগ্য আমার, দিনসাতেক হল তিনিও দেশে গিয়েছেন।"

বেণী সুরেন্দ্রর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাল কথা বললে ত শুনবে না! বার বার বলছি মুখুজ্জে, বৌদিকে এখানে নিয়ে এস; ছোটখাট একটি বাসা কর। নিজের এই রকম শরীর, দেখাশোনা করবারও ত একজন লোক চাই!"

"আর দেখাশোনা!" সুরেন্দ্র গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "সাধ কি আর হয় না? হয়। কিন্তু সে সাধ এ জন্মে আর মিটবে না।"

"মিটালেই মিটে। আসলে তুমি চাও না, তাই।"

কতকটা বিরক্ত, কতকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সুরেন্দ্র কহিল, "কতবার আর তোমাকে বলব বেণী? আমার কি বাসা করবার মত অবস্থা? পঁচিশটি মাত্র টাকা ত বেতন; প্রতিমাসেই জ্বরের জন্য কামাই করতে হয় ব'লে তারও পাঁচ সাত টাকা কাটা যায়। যা হাতে তুলে আনতে পারি, তা দিয়ে ঢাকায় বাসা খরচ-চলে?"

বেণী গম্ভীরভাবে কহিল, "চালাতে হয় ভাই, চালাতে হয়। বুঝে চালাতে পারলে ওতেই চলে।"

সুরেন্দ্র তিক্তকণ্ঠে কহিল, "পৈত্রিক বাড়ীতে থাক, বাসাভাড়া দিতে হয় না, তাই এ রকম উপদেশ দিতে পার।"

বিরক্ত গম্ভীরমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর সে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজকণ্ঠে কহিল, "না ভাই, এই বেশ আছি। নিজের কষ্ট হয়, কিন্তু মাসে মাসে ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিয়েই ও দিকটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ও দিকে তারাও শান্তিতে থাকতে পারে। নাবালক ছেলেটা আছে—সে পাড়াগাঁয়ে টাটকা মাছ, তাজা শাক-সবজি ও খাঁটি দুধ খেতে পায়। এই ত আমার অসুখ। সবাই বলে যে এ যক্ষ্মা। ছেলেটাকে এর মধ্যে নিয়ে এসে তাকেও মারতে চাই নে।"

বেণী আবার ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর কহিল, "ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার স্ত্রী। আমি ত ভেবেই পাই নে যে কি ক'রে তোমার স্ত্রী তোমার এই অসুখের কথা জেনেও—"

"না ভাই, তাঁর দোষ নেই," সুরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, "তিনি কিছু জানেন না। আমি তাঁকে আমার কষ্টের কথা জানতে দিই নি, অসুখের কথাও নয়।"

"তাই বল," বেণী যেন আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, "হিন্দুর ঘরের সতী নারী, তিনি কিছুতেই স্বামীর এ অবস্থার কথা জেনেও তার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারেন না।"

একটু থামিয়া সে পুনরায় কহিল, "শোন মুখুজ্জে, তুমি যখন বৌদিকে কিছু জানাবেই না, তখন আমিই তাকে আসতে চিঠি লিখে দিই—"

"দয়া ক'রে ঐটি ক'রো না ভাই," বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র খপ্ করিয়া বেণীর হাত চাপিয়া ধরিল।

"কেন?"

সুরেন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "না ভাই; সুখের চাইতে আমার স্বস্তিই ভাল।"

ইহার পর বেণী আর তর্ক করিতে পারিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তবে আসি ভাই।"

"একটু দাঁড়াও, যখন এসেছ তখন একটা দরকারী কাজ ক'রে দিয়ে যাও," বলিয়া সুরেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিয়া কোঁচার খুঁট হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিল এবং উহা হইতে গুনিয়া পনরটি টাকা বেণীর হাতে দিয়া কহিল, "এই টাকা কয়টা আমার স্ত্রীকে মণি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিও। বেচারী আশাপথ চেয়ে রয়েছে। এই টাকা যাবে তবে সে ও মাসের ধার শোধ দেবে। অথচ আমার যা জ্বর এসেছে, দু'তিন দিন হয়ত আর বাইরে যেতেই পারব না।"

"আচ্ছা," বলিয়া বেণী টাকা কয়টি পকেটে রাখিল। সুরেন্দ্র বাকী টাকা কয়টি একবার গুনিয়া দেখিয়া ঈষৎ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "ঠিক আটটি টাকা হাতে রইল। এতেই এ মাসের খরচ চালাতে হবে। তা চালিয়ে নেব একরকম। অন্ততঃ একটি মাস আর বাড়ীর ভাবনা ত ভাবতে হবে না।"

(২)

রোগশয্যায় শুইয়া নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও সুরেন্দ্র মনে করিতেছিল যে সে ভালই আছে। গার্হস্থ্যজীবনের সুখ সে উপভোগ করিতে পায় না, কিন্তু উহার ছোট বড় সহস্র অশান্তিও তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। প্রিয়জনের অভাব ও দুঃখ প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বচক্ষে দর্শন করিবার যন্ত্রণা, তাহাদের ছোটখাট স্নেহের দাবী মিটাইতে না পারিবার দুঃখ, অসংখ্য আশাভঙ্গের নির্ম্মম বেদনা ও ভালবাসার অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া প্রবাসের নিঃসঙ্গ দুঃখময় জীবনেও সে একরকম শান্তিতেই আছে।

বদ্ধ নালার স্রোত ও আবর্ত্তহীন পঙ্কিল জলের চিরস্থায়ী নিরুদ্বেগ শান্তি। কিন্তু সহসা একদিন তাহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আসিয়া তাহার এ জন্মের সাধনার চরমপ্রাপ্তি এই শান্তিটুকুকেই নূতনত্বের মন্থনে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

মাঝে দুই চারিদিন অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিবার পর সেদিন আবার তাহার জ্বর আসিয়াছিল। তাই ছুটি হইবার অনেক পূর্ব্বেই সে স্কুল হইতে ছুটি লইয়া আসিয়া তক্তাপোষটির উপর আচ্ছন্নের মত শুইয়া পড়িয়াছিল, একাধিক লোকের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চক্ষু মেলিয়াই সে পলক ফেলিবারও শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

সে অপরিসীম বিস্ময়ে দেখিল যে তাহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, জ্যেষ্ঠা শালিকা সৌদামিনী, জ্যেষ্ঠ শ্যালক প্রাণনাথ ও সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র অরুণ তাহার শয্যার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিজের চক্ষুকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল যে সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কি করিয়া যে স্বপ্নের অনুভূতি এত সুস্পষ্ট হইতে পারে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল।

অথচ যাহাকে সে স্বপ্নালোকের জীব মনে করিয়া অবাক হইয়া গেল সেই হেমাঙ্গিনীই তাড়াতাড়ি তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো! কেমন আছ তুমি? ওগো—কথা বলছনা যে—"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ"—সুরেন্দ্র বিকারের রোগীর মত অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো, তুমি অমন করছ কেন? আমাদের—আমায় চিনতে পারছনা?"

"তাইত!" সুরেন্দ্র দুই হাতে দুই চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল, "এ সব তা'হলে সত্যি?"

প্রাণনাথ এবার তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "কি হে সুরেন? আমাদের চিনতে পারছনা?"

ইহার পর আর না চিনিবার উপায় রহিলনা। সুরেন্দ্র নিজের ইন্দ্রিয়কে আর অবিশ্বাস করিতে পারিলনা এবং পারিলনা বলিয়াই এতগুলি অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত সে চঞ্চল হইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রাণনাথ বাধা দিয়া কহিল, "আহা হা, ব্যস্ত হ'য়োনা ভাই।

সুরেন্দ্র কিন্তু অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "বসুন আপনারা, বসুন ;—আর বসতে দিইবা কি ? এ কি একটা—"

সৌদামিনী তাহার হাত ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "অস্থির হয়োনা ভাই। তুমি আগে বোস, তার পর আমরা বসছি।"

অতঃপর উহারই মধ্যে কোনও রকমে স্থান করিয়া সকলে উপবেশন করিল। সুরেন্দ্রের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নাই ; সে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি আগে শুনি। সকলে মিলে হঠাৎ এরকম—কোন তীর্থ-টার্থ নাকি ?"

"ছাই-তীর্থ !" হেমাঙ্গিনী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল ; "আমাদের তীর্থ করবারই সময় পড়েছে কি না ! কিন্তু তোমারই বা কি আক্কেল, বল ত ? এমন অসুখ, তার একটা খবরও কি দিতে নেই ?"

সৌদামিনী কহিল, "তবু ভাল। তোমাকে দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। চিঠি পেয়ে ভাবনায় আর বাঁচি নে। তিমু ত কেঁদে কেঁদে অন্নজল একরকম ছেড়েই দিয়েছিল।"

"অসুখ ?—চিঠি ?—আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না," বলিতে বলিতে সুরেন্দ্র বিহ্বলের মত সকলের মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

উত্তর দিল প্রাণনাথ। সে কহিল, "আমাদের উপর ভগবানের দয়া আছে ভাই। তোমার বন্ধু যেরকম চিঠি লিখেছিলেন—"

"বন্ধু ?—কোন বন্ধু ?"

"বেণী ঘোষাল—"

"ও, বেণী চিঠি লিখেছে !" সুরেন্দ্রের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন একখানি ঘন পর্দা সরিয়া গেল। সে হাসিতে খানিকটা কৌতুক, অনেকখানি লজ্জা ও ঈষৎ একটু আনন্দ মিশাইয়া কহিল, "কিন্তু রাস্কেলটা কি দুষ্টু ! সেদিন এত জোরে তাকে বারণ করলাম—"

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল, "দুষ্টু হবেন কেন ? তিনি ভদ্রলোক, আমাদের বন্ধু। অসুখ দেখে খবর দিয়েছেন—"

"অসুখ কোথায় গো ?" সুরেন্দ্র কহিল, "একটু জ্বর আর—" বলিতে বলিতেই তাহার কাশি উঠিল এবং উহাই দমন করিবার চেষ্টায় পেশী ও শিরার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে সে নিতান্ত অসহায়ের মত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী ছুটিয়া আসিয়া তাহার মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সরোদনে কহিল, "ওমা—ও দাদা—আমার কি হবে ? উনি যে কেমন ক'রছেন !"

যেন হৃদপিণ্ডেরই খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়া কফের সঙ্গে মেঝের উপর ঢালিয়া দিয়া সুরেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "না না, এ কিছু কি—ছু ন—য়—"

"কিছু আবার নয় !" হেমাঙ্গিনী অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল, "বেণীবাবু কি আর অমনি চিঠি লিখেছেন ? কিন্তু তুমি এখন থাম দেখি, ধরিল এবং অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া পরে উহাই পাখার মত করিয়া একহাতে হাওয়া করিতে আর একহাতে তাহার ললাট ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কি স্নিগ্ধ স্পর্শ ! কি সযত্ন সেবা ! কতদিন—কত সুদীর্ঘকাল কেহ এমন গভীর স্নেহে তাহার ললাট স্পর্শ করে নাই। সুরেন্দ্রের রোগতপ্ত দেহ দেখিতে দেখিতে যেন শীতল হইয়া গেল, উত্তেজিত স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হইল, আরামে চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যেই যে আরও দুইটি লোক উপস্থিত রহিয়াছে, ক্ষণকাল পর তাহা স্মরণ হইতেই সে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

হেমাঙ্গিনী কাতরকণ্ঠে কহিল, "উঠলে কেন ?"

সুরেন্দ্র উত্তর দিল, "ভারি ত অসুখ ! সামান্য জ্বর আর কাশি। এ ত আমার লেগেই রয়েছে। তার জন্য—আবার—হা—"

সাত বৎসরের বালক অরুণ উদ্‌ভ্রান্তের মত বড় বড় চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল ; এইবার সৌদামিনী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সুরেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যা না, অরুণ। তোর বাবার কাছে যা।"

সুরেন্দ্র দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়া ডাকিল, "আয় বাবা, আয়।"

অর্দ্ধেকটা দেহ পিতার ও বাকী অর্দ্ধেকটা মায়ের দেহের উপর ঢালিয়া দিয়া অরুণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবদারের স্বরে কহিল, "মা, ক্ষিদে পেয়েছে মা !"

সন্ধ্যা তখন প্রায় হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে তাহারই ঘন, কালো, সুদীর্ঘ ছায়া নামিয়া আসিতেছিল।

(৩)

'ক্ষুধা পাইয়াছে'—পুত্রের মুখের এই দুইটি মাত্র কথার ভিতর দিয়াই বাস্তব জীবনের যে মোটা দিকটা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল তাহাকে এতক্ষণ সে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে বুঝিয়া সুরেন্দ্র সহসা সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। "তাইত, আপনাদের খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই যে করা হয়নি !" বলিয়াই সে রোগশীর্ণ দুর্ব্বল দেহটিকে তৎক্ষণাৎ টানিয়া সোজা করিয়া তুলিল।

হেমাঙ্গিনী কহিল, "খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ত রাত্রের জন্য। এখন জলখাবার কিছু এনে দাও। এরা সেই কাল রাত্রে খেয়ে বেরিয়েছেন, তার পর দুমুঠো মুড়ি দিয়ে একটু জল খাওয়া হ'য়েছে মাত্র।"

"ঠিক, ঠিক ; আমি জলযোগের ব্যবস্থা করছি," বলিয়া সুরেন্দ্র টিনের একটি বাক্স খুলিয়া ক্ষুদ্র একটি থলিয়া বাহির করিয়া লইল।

তাহার জ্বর তখন বাড়িতেছিল, উহারই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সে একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

বোধ করি বা তাহার আরক্ত চক্ষু ও অস্থির পদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াই হইবে, প্রাণনাথ কহিল, "জ্বর গায়ে তুমি বাজারে যাবে

হেমাঙ্গিনীও কহিল, "ঠিকইত, তুমি থাক ; দাদাকে পয়সা দিয়ে দাও, উনিই সব কিনে আনতে পারবেন।"

"তা কি হয়?" সুরেন্দ্র সসঙ্কোচে কহিল—"একে অতিথি, তায় আবার বড় কুটুম ; তাকে কি বাজারে পাঠাতে পারি?" বলিতে বলিতে তাহার আরক্ত চক্ষুর কোণে কৌতুকের ক্ষীণ একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী আর বাধা দিলনা, কিন্তু স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "দিদির জন্য কিছু ফলটল এনো, উনি ত আর বাজারের খাবার খাবেননা।"

সুরেন্দ্রের ললাটে চিন্তার রেখা ঘনাইয়া উঠিল। সে কহিল, "তা না হয় আনলাম। কিন্তু রাত্রে? রাত্রে ওঁর খাবার কি ব্যবস্থা হবে? আর তোমরাইবা খাবে কি? হোটেলের রাঁধা জিনিষ খেতে পারবে সবাই?"

"আমরা পারব, কিন্তু দিদি পারবেন না। উনি যে বিধবা!"

"তবে কি হবে?"

হেমাঙ্গিনী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "আজ রাত্রের মত দুধ আর ফলেরই ব্যবস্থা কর? কিন্তু কাল সকালে আলাদা রাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

সমস্যা সহজ নহে। হৃদয় ও মার্জ্জিত সংস্কৃতির সঙ্গে ধনবিজ্ঞানের বাছা বাছা আইনগুলির ভীষণ সংঘর্ষ। বহুদিন পর যে প্রাণাধিক পুত্র কাছে আসিয়া ক্ষুধার তাড়নায় খাইতে চাহিয়াছে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। যে বিধবা ভদ্রমহিলা তাহার অসুখের সংবাদে বিচলিত হইয়া সহোদরার মতই সাগ্রহে তাহাকে সেবা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে তাহার জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই তাহাকে আপ্যায়িত করিতে হইবে। যে শ্যালক অতীতে সুরেন্দ্রকে বাড়ীতে পাইলেই রাজ-ভোগ খাওয়াইয়া রীতিরক্ষা করিয়াছে তাহার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। ইহার উপর আবার সহধর্ম্মিণীত আছেনই। ইহাদের সকলের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের থলিয়াটি খুলিয়া হিসাব করিতে করিতে সুরেন্দ্র একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। হোটেলওয়ালার গত মাসের প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার পর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার অধিকাংশের বিনিময়ে লুচি, মিষ্টি, রাবড়ি, দুধ ও ফল লইয়া সে যখন হোটেলে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার জ্বরের উত্তাপ অন্যান্য দিনের চেয়েও বাড়িয়া গিয়াছে।

কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলনা, তাহার মুখচোখ দেখিয়াই প্রকৃত অবস্থা অনুমান করিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনী শঙ্কিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওমা তোমার জ্বর আবার বাড়ল নাকি? শুয়ে পড় শীগগীর, শুয়ে পড়। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।"

সুরেন্দ্র তিক্তকণ্ঠে কহিল, "থাক, মাথায় হাত বুলাতে হবেনা। তুমি আগে এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও? আমি ততক্ষণ শুই।"

ছেঁড়া কাঁথাটির নীচে মাথাশুদ্ধ দেহটিকে প্রবেশ করাইয়া দিতে দিতে [illegible] রাখিল "ঐ ছানার অমৃতিটা যেন খোকাকে দিও। ওটা খোকা কিন্তু ইহারই মধ্যে অসংখ্য মশকের অসহ্য দংশনে কাতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সকলের আহারাদি শেষ হইবার পর যখন শয়নের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল তখন হেমাঙ্গিনী স্বামীকে ডাকিয়া কহিল, "যে মশা। খোকার জন্য অন্ততঃ একটা মশারি হ'তে পারেনা?"

"মশারি সঙ্গে আননি?" সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল।

হেমাঙ্গিনী কণ্ঠস্বরে ঈষৎ একটু ঝঙ্কার তুলিয়া উত্তর দিল, "বাড়ীতে আবার আমাদের কটা মশারি আছে যে দু'একটা সঙ্গে নিয়ে আসব?"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া গেল। সত্যই বাড়ীতে মশারি থাকিবার কথা নহে। মশারি কিনিবার জন্য কখনও সে অতিরিক্ত টাকা দিতে পারে নাই। আর দেশে তেমন মশা নাই বলিয়া এই কথাটা বিশেষ করিয়া কোনদিন তাহার মনেও পড়ে নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই ঐ দুধের বালককে সে ঢাকা সহরের মশককুলের করুণার উপর ফেলিয়া রাখিবার কথা ভাবিতে পারিলনা। নিজের রোগের কথা ভাবিয়া নিজের শয্যায় নিজের কাছে আনিয়া শোয়াইতেও সে সাহস পাইলনা। অবশেষে অনেক ভাবিয়া নিজেই সে শয্যা ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং ঘুমন্ত অরুণকে ঐ শয্যায় রাখিয়া সৌদামিনীকে সে একরকম জোর করিয়াই তাহার পার্শ্বে শোয়াইয়া দিল।

এমনিভাবে পুত্রের সম্বন্ধে সে রাত্রির মত সে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু মনটা তাহার তিক্তই রহিয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনী যখন তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস দিয়া তাহাকে মশকদংশন হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল তখন সে সুখী না হইয়া বিরক্তই হইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী স্বামীর ভাব বুঝিতে পারিলনা। অকারণে তিরস্কৃতা হইয়া ম্লানমুখে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর অবশেষে নিছক ক্লান্ত হইয়াই সে স্বামীর শয্যারই একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে সুরেন্দ্র যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল তখন দেখা গেল যে একরাত্রির মধ্যেই মশকদংশনে তাহার মুখ হামের রোগীর মত বিকৃত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াই হেমাঙ্গিনী শিউরিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা! কি হাল হ'য়েছে মুখের! তুমি যাও, এখনই আর একটা মশারি কিনে নিয়ে এস।"

সুরেন্দ্র কোন উত্তর দিলনা ; জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই সে হোটেলের ম্যানেজার রাইচরণের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাইচরণ তখন সবেমাত্র প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া হুঁকাটী হাতে লইয়া বসিয়াছে, এমন অসময়ে সুরেন্দ্রকে সে সবিস্ময়ে কহিল, "মাষ্টারবাবু যে! এত ভোরে কি মনে ক'রে?" কিন্তু পরক্ষণেই প্রয়োজনীয় কথাটা মনে পড়িয়া যাওয়াতে সে হাসিমুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "এসেছেন, ভালই হল। আজকাল আমার খুবই টানাটানি যাচ্ছে। আপনি ত সবে ওমাসের পাওনা টাকাটা চুকিয়ে দিয়েছেন? এ মাসের অর্দ্ধেক যেতে বসেছে,—এখনও একটি পয়সা আগাম দেননি। এরকম বাকী ফেললে



শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী   রাধা   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সুরেন্দ্র ম্লানমুখে ঈষৎ একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "হেঃ হেঃ—ম্যানেজারবাবু, বাকী পড়বেনা? মিটিয়ে দেব—ঠিক মিটিয়ে দেব। একটি প্রাইভেট টুইশন পাবার কথা হচ্ছে, হলেই—"

"হলেত দেবেন, বুঝলুম," রাইচরণ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এখন আমার চলে কিসে? আমার কি জমিদারী আছে?"

সুরেন্দ্রের কণ্ঠে উত্তর জোগাইলনা; সে মুখ ম্লান করিয়া চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণকাল পর রাইচরণই পুনরায় কহিল, "শুনুন মাষ্টার মশায়, আপনার অনেক অতিথি রয়েছে, দেখলুম। কিন্তু সকালবেলাতেই কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করে' বলে দিচ্ছি—আজ আর নগদ পয়সা না দিলে তাদের খাওয়াতে পারবনা? আপনার একার টাকাই আপনি দিতে পারেন না,—তার উপর আবার গণ্ডা গণ্ডা অতিথি!"

সুরেন্দ্র এই অতিথিদের সম্বন্ধে কথা বলিবার উদ্দেশ্যেই ভোরে উঠিয়া ম্যানেজারের ঘরে আসিয়াছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে রাইচরণ যখন নিজের বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দিল তখন আর ঐ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিবার তাহার মোটে ভরসাই হইল না। সে স্ফীর থলিয়াটি শূন্য করিয়া অবশিষ্ট একটি টাকা ও কয়েক আনা পয়সা রাইচরণের সম্মুখে রাখিয়া শুষ্ক অথচ সানুনয়স্বরে কহিল, "এখন এই নিন ম্যানেজারবাবু, ওবেলা আরও কিছু দেব। কিন্তু একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে' দিতে হবে। আমার বিধবা শ্যালীটি হোটেলের রান্না খাবেননা, তার জন্য আলাদা রাঁধবার ব্যবস্থা করে' দিতে হবে। আর চাল ডাল—"

"এসব করতে গেলে বেশী চার্জ্জ দিতে হবে মাষ্টারমশায়," রাইচরণ গম্ভীরমুখে কহিল, "প্রতি বেলায় জনপ্রতি আট আনা।"

সুরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল রাইচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই দেব।"

একে কয়দিনের একটানা জ্বর, তাহাতে মশার অত্যাচারে সমস্ত রাত্রি একপ্রকার অনিদ্রায় কাটিয়াছে, তাহার উপর আবার সকাল বেলাতেই ম্যানেজারবাবুর মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া এবং অর্থের ভাণ্ডটি উজাড় করিয়া তাহারই পায়ের কাছে ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইয়া সুরেন্দ্রের মন সমস্ত জগতের উপরেই বিষাইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া বেণীর বিরুদ্ধে তাহার ক্রোধ ও অভিমানের আর অন্ত রহিল না। সেই হতভাগাটাই যে বাড়ীর সকলকে খবর দিয়া আনাইয়া তাহার অভাব ও অশান্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ক্ষোভে ও রোষে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

তাই ঘরে ফিরিয়াই কাহারও দিকে না চাহিয়া বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া সে কহিল, "আমাকে এখনই স্কুলে যেতে হবে, এদিকের ব্যবস্থাটা তোমরাই করে' নিও।"

তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা না হইলেও হেমাঙ্গিনী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "সে কি গো? এই অসুখ নিয়ে যাবে তুমি স্কুলে পড়াতে? না, না হবে না? এখন দুদিন তুমি বিশ্রাম নাও, আগে ভাল হও, তারপর—"

সুরেন্দ্র তিক্তকণ্ঠে কহিল, "আমি ত আর জমিদার নই, যে ঘরে বসেই টাকা পাব।"

প্রাণনাথ কহিল, "জমিদারের কথা হচ্ছে না ভাই। প্রাণের চাইতে বড় আর কিছু নেই; সেই প্রাণটাকে বাঁচাতে হবে' ত!"

"আমার এ কচ্ছপের প্রাণ, সহজে যাবে না দাদা," বলিয়া সুরেন্দ্র তখনই জামা পরিতে আরম্ভ করিল।

হেমাঙ্গিনী ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কিন্তু একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও। কাল রাতে কিচ্ছু খাও নি, আজও না খেয়ে থাকবে?"

"জ্বর হলে উপোস করতে হয়," সুরেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দিল।

হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল, "উপোস করলে আবার শুয়েও থাকতে হয়। না না, তা হবে না; আমার মাথা খাও, একটু দুধ মুখে দিয়ে যাও।"

"দুধ?—দুধ কোথায়?"

"বাজার থেকে আনিয়ে নাও। তোমাকে নিজে যেতে হবে না, হোটেলের চাকর —"

"ও," বলিয়া সুরেন্দ্র কামিজের বোতাম আঁটিতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল, "এ জ্বরে দুধ খেতে নেই, ডাক্তারের বারণ আছে।"

হেমাঙ্গিনী কথাটা বিশ্বাস করিল, তাই আর কিছু বলিল না। কিন্তু ডাক্তারের কথায় তাহার ঔষধের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ওষুধ কোথায়? বার করে' দাও, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

শত তালি দেওয়া জীর্ণ বিবর্ণ জুতার ফিতাটি বাঁধিবার জন্য পায়ের দিকে চাহিয়া সুরেন্দ্র মৃদুস্বরে কহিল, "ওষুধ আমি খাই না।"

হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা দুইচক্ষু অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন নিবারণ করিতে করিতে অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ওষুধ খাও না, পথ্য খাও না, তবে কি খাও তুমি? পোড়া কপাল আমার, একে কি আরও না পুড়িয়ে ছাড়বে না?"

উত্তরে সুরেন্দ্র কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এমনই সময়ে হোটেলের চাকর দুইটি থালায় চাল ডাল ও সামান্য কিছু তরকারী ও মশলা আনিয়া মেঝের উপর স্থাপন করিল এবং সুরেন্দ্রকে জানাইয়া দিল যে কোণের ঘরে যে ভাঙা তোলা উনানটি পড়িয়া রহিয়াছে, উহাই পরিষ্কার করিয়া যেন রন্ধন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

অতিথি সৎকারের ঐ অতি সামান্য উপকরণের দিকে চাহিয়া দেখিয়া সুরেন্দ্রের ম্লানমুখ অধিকতর ম্লান হইয়া গেল। সে প্রাণনাথকে উদ্দেশ করিয়া অপরাধীর মত ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাতরকণ্ঠে কহিল, "তোমার ভগ্নীপতি বড় গরীব, পানুদা; এর বেশী আর কিছু জোটাতে পারলাম না।"

বলিয়া সে আর অপেক্ষা করিল না; পাছে সকলের সম্মুখেই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় সময় থাকিলেও তখনই সে স্কুলের নাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সেদিন সুরেন্দ্র স্কুলের কার্য্যে মোটেই মনোনিবেশ করিতে পারিল না। সাধারণ একটা কথার উপলক্ষে সে সহকর্ম্মী যতীনবাবুর সঙ্গে তুমুল কলহ করিল, দপ্তরীটাকে তাড়া দিতে গিয়া নিজেই তাহার নিকট তাড়া খাইল; একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারাতে একটি ছাত্রকে বেদম প্রহার করিল এবং স্কুলের ছুটি হইলেই গায়ে জ্বর লইয়াও মনের জ্বালা ঝাড়িবার জন্য তিন মাইল পথ হাঁটিয়া বেণী ঘোষালের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

বেণী সেইমাত্র আপিস হইতে ফিরিয়া মুখহাত ধুইবার আয়োজন করিতেছিল, সুরেন্দ্রকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে মুখুজ্জে? ব্যাপারখানা কি?"

তুবড়ীতে আগুন দিলে উহার খোলা মুখ হইতে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অবিরাম বেগে বাহির হইতে থাকে তেমনইভাবে সুরেন্দ্রের মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, "কাণ্ডজ্ঞানহীন বেকুফ কোথাকার! বিশ্বাসেরও কি একটু মর্য্যাদা রাখতে নেই? এই দুরবস্থা আমার—সেদিন পই পই করে' তোমায় বারণ করলাম;—তবু সংবাদ দিয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোককে—"

"হোঃ—হোঃ—হোঃ," হাসিতে হাসিতে বেণী ফাটিয়া পড়িবার মত হইল, "বৌদি এসেছেন বুঝি?—হোঃ—হোঃ—হোঃ—"

কিন্তু এত রঙ্গের প্রত্যুত্তরে সুরেন্দ্র বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "কেন? আমি তোমার কি ক'রেছি বেণী যে আমাকে এই বিপদে ফেললে? নিজের দেহটি নিয়েই আমার টিঁকে থাকবার শক্তি নেই, তার উপর এত সব ঝঞ্ঝাট! এখন আমি করি কি?"

সুরেন্দ্রের চক্ষে জল দেখিয়া বেণী অপ্রতিভ হইয়া গেল। হাসি থামাইয়া কতকটা অপরাধীর মতই কহিল, "তুমি এরকম করবে জানলে খবর দিতাম না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতে তোমার অসুবিধা কি হয়েছে? একা একা অসুখে মরছিলে, সেবাশুশ্রূষার জন্য—"

"রাখ তোমার সেবাশুশ্রূষা," সুরেন্দ্র কঠিনকণ্ঠে কহিল, "তুমিই এ বিপদ সৃষ্টি করেছ, এ থেকে আমাকে রক্ষাও তোমাকেই করতে হবে। এখন পাঁচটি টাকা হাওলাত দাও, নইলে হোটেলে না গিয়ে পথেই আমাকে বুড়ীগঙ্গায় ডুবে মরতে হবে।"

টাকার কথা শুনিয়াই বেণী গম্ভীর হইয়া গেল, কহিল, "টাকা! টাকা কি হবে?"

সুরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল, "তুমি আমাকে যে সেবাশুশ্রূষা ও আদরযত্ন এনে দিয়েছ তার দাম দিতে হবে। টাকা না হলে স্ত্রীপুত্র, শ্যালক শ্যালিকাকে খাওয়াব কি? আমার অবস্থা তুমি জান না? আমার কি সঞ্চিত টাকা আছে?"

বেণী মুখখানি অধিকতর গম্ভীর করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "আমার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয়! আমি অত টাকা কোথা থেকে দেব?"

সত্যই বেণীও দরিদ্র। সুরেন্দ্রের মতই সেও মাত্র পঁচিশ টাকা বেতনে এক সওদাগরী আপিসে চাকুরী করে। উহা দিয়াই তাহাকে স্ত্রী, দুইটি সন্তান ও এক বৃদ্ধা পিসীমাকে পালন করিতে হয়। পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিয়া বাড়ীভাড়া দিতে হয় না বলিয়াই সে কোনও প্রকারে এই অসাধ্যসাধন করিতে পারে। কিন্তু সংসারের খরচ কুলাইয়া আর কিছুই সে সঞ্চয় করিতে পারে না।

সুরেন্দ্র যে একথা জানে না তাহা নহে। কিন্তু গরজ বড় বালাই বলিয়াই জানিয়াও সে কেবল বেণীর নিকট হাতই পাতিল না, টাকার জন্য রীতিমত জিদই করিতে লাগিল। কিন্তু একদিকে বন্ধুর কাতর অশ্রুসজল অনুনয় ও অপরদিকে বন্ধুকে সাহায্য করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও উহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে বেণীর গৃহ হইতে একটিমাত্র রৌপ্য-মুদ্রার অতিরিক্ত আর কিছুই বাহির হইল না এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সুরেন্দ্রকে সেদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

পথে ঢাকা মেডিকেল হলের কম্পাউণ্ডার সুরেন্দ্রকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, "ও মাষ্টারবাবু, সেদিন একটা ওষুধ নিবেন বলেছিলেন—আমরা সেটা আনিয়েছি। আজ নিয়ে যান না!"

সুরেন্দ্র শুষ্কমুখে ঈষৎ একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, "আজ বড্ড ব্যস্ত আছি ভাই; তাছাড়া টাকাটাও সঙ্গে আনি নি। কাল কোন সময়ে নিয়ে যাব।"

হোটেলে ফিরিবার পর প্রাণনাথ বিশেষ কোনও ভূমিকা না করিয়াই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে কাজকর্ম্ম ক্ষতি করিয়া আর বেশী দিন তাহাদের থাকা চলে না এবং সুরেন্দ্র বাসা লইলেই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিতে পারে।

সুরেন্দ্র আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "সেই নচ্ছারটা বুঝি তোমাদের জানিয়েছে যে আমি ঢাকায় বাসা করব? অপদার্থ মূর্খ কোথাকার! না দাদা বাসা-টাসা হবে না। আর এ রকম অসুবিধার মধ্যে তোমাদের আমি বেশীদিন রাখতেও পারব না।"

সৌদামিনী সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি ভাই? এই দেহ নিয়ে তুমি এই জঘন্য হোটেলে পড়ে থাকবে? না না, তা হয় না। হিমু যখন এসেছে তখন বাসা তোমাকে করতেই হবে। একটু আচার নিয়ম, একটু সেবা-সুশ্রূষা না হলে তোমার চলবে না।"

সুরেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, "কুকুরের পেটে ঘি সইবে না দিদি। এখানে বাড়ীভাড়া যোগাবার সাধ্য আমার নেই।"

হেমাঙ্গিনী সজল চক্ষুর কাতর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া কহিল, "তোমাকে এই অবস্থায় রেখে আমি বাড়ীতে যেতে পারি?"

সুরেন্দ্রের বুকের মধ্যে সহসা যেন মহাসমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে উত্তর দিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

হেমাঙ্গিনী পুনরায় কহিল, "আমায় যে যেতে বলছ, এখানে তোমায় দেখবে কে?"

সুরেন্দ্র মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হোটেলের ঠাকুর চাকর রয়েছে, তারাই দেখবে। আর অসুখ যদি বেশী হয় তখন হাসপাতাল আছে।"

হেমাঙ্গিনীর দুই গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ; সে কাতরস্বরে কহিল, "এই কথা জেনে তারপর আমি দেশে গিয়ে আরামে থাকতে পারি ?" একটু থামিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে কহিল, "না গো, জিদ ক'রো না। তুমি একটি বাসা নাও ; আমাদের যা আছে তাই দিয়েই কোনোরকমে আমাদের চলবে।"

প্রাণনাথও সেই সুরেই সুর মিলাইয়া কহিল, "চলে যাবে সুরেন, কোনরকমে চলে যাবেই।"

এবার সুরেন্দ্র ধৈর্য্য হারাইল, কণ্ঠস্বর বেশ একটু উচ্চে তুলিয়া সে কহিল, "'কোনরকমে' মানে ? এখন যদিও বা একটু ওষুধ, একটু পথ্য জোটে, তখন তাও জুটবে না। সবই বাড়ীভাড়া দিতে যাবে। আমার চোখের সামনে ছেলেটা এক ফোঁটা দুধও খেতে পাবে না, তাই দেখে আমার নিজের চিত্তের শান্তি বাড়বে ? তোমার নরম হাতের মাথা টেপাতেই আমার গায়ের জ্বর আর পেটের ক্ষুধা দুইই মিটে যাবে, না ?"

স্বভাবশান্ত সুরেন্দ্রকে হঠাৎ এত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর পুনরায় ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমার এই ব্যারামে আমি কোন কাজেই আসব না ? একটু ওষুধ, একটু পথ্য—তাও আমি নিজের হাতে তোমার মুখে তুলে দিতে পাব না ?"

(৫)

কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে যাইতেই হইল।

সুরেন্দ্র কাহারও কথা রাখিল না। কিশোর পুত্রের সজল চক্ষুর নীরব কাতর অনুনয়, হেমাঙ্গিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য, সৌদামিনীর সস্নেহ অনুরোধ এবং প্রাণনাথের মৃদু ভৎর্সনা—এ সমস্তই সমভাবে উপেক্ষা করিয়া সে নিজের জিদই বজায় রাখিল এবং কোন অজুহাতেই যাহাতে তাহারা পরদিনও থাকিয়া যাইতে না পারে সেই জন্য স্কুল কামাই করিয়াও সে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিল। সব ঝঞ্ঝাট চুকাইয়া দিয়া যখন সে হোটেলে ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে।

সেই সরু, নোংরা, দুর্গন্ধময় গলির উপরে সেই আলো ও বাতাসের প্রবেশপথহীন বাড়ী এবং তাহারই কোনের দিকের সেই বাতায়নহীন ক্ষুদ্র কক্ষটি। আজও অসময়েই সন্ধ্যার অন্ধকার উহার মধ্যে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজ আর উহাতে সেই দিনের সেই কদর্য্যতা ছিল না। নারীর হস্তস্পর্শে ঐ গোশালার চাইতেও কদর্য্য কক্ষখানিও এই দুই দিনেই মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী নীচের রান্নাঘর হইতে ঝাঁটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়ালের কোনের মাকড়সার জাল ভাঙিয়া দিয়াছিল, কার্ণিশের ধুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল, মেঝে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়াছিল এবং বিশৃঙ্খল আসবাবপত্র গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল। সুরেন্দ্রের অমন যে জীর্ণ শয্যা আজ তাহারও আর সে কদর্য্য রূপ ছিল না। হেমাঙ্গিনী বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়াড় কাচিয়া দিয়াছিল এবং নিজের ও স্বামীর পুরাতন কাপড় দিয়া ছিন্ন কাঁথাটির সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া উহারই মধ্যে উহাকে যথাসম্ভব চলনসই করিয়া তুলিয়াছিল। দুইদিন পূর্ব্বেও বর্ণ, গন্ধ ও বিন্যাসের যে কদর্য্যতা আগন্তুকমাত্রকেই নিশ্বাস রোধ করিয়া হত্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, পরিপূর্ণ যৌবনের উষ্ণ রক্তকেও বরফ চাপা দিয়া জমাইয়া তুলিবার মত করিয়াছে, তাহা আজ আর এ কক্ষে নাই।

কিন্তু অন্তরে অপরিসীম তিক্ততা লইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল যে সেবা করিতে আসিয়া হেমাঙ্গিনী কেবল যে তাহাকে এ মাসের মতই নিঃসম্বল করিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তাহাকে ঋণের মধ্যেও ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। বেণীর নিকট হইতে একটি টাকা মাত্র ধার করিয়াই সে এবারকার মত মুক্ত হইবে ভাবিয়াছিল, আর সেই জন্যই সে হেমাঙ্গিনীকে অত তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার অত সতর্কতা সত্ত্বেও অত সহজে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। হেমাঙ্গিনীকে কেবল দেশে পাঠাইয়া দিবারই যে সমস্যা উহারই সমাধান করিতে গিয়া তাহাকে আরও বেশী ঋণ করিতে হইয়াছে।

দেশে যাইতে হইলে নৌকা ভাড়া করিয়া যাইতে হয় ; অন্যূন পাঁচটি টাকার কমে ভাড়া ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ চলে না। সুরেন্দ্র ইহা যে জানিত না তাহা নহে, কিন্তু সে আশা করিয়াছিল যে দেশে ফিরিয়া যাইবার খরচ হেমাঙ্গিনীর কাছেই আছে। তাই প্রথমতঃ তাহাকে সে এ সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়াও এ সম্বন্ধে ভয়াবহ সত্য কথাটা সে জানিতে পারিয়াছিল তখন—যখন সকল অনুনয় সকল অশ্রুজল ব্যর্থ হইবার পর হেমাঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া নীরস কঠিন কণ্ঠে বলিয়াছিল, "তবে দাও, নৌকা ঠিক করে' দাও।"

সুরেন্দ্র বলিয়াছিল, "তা দিচ্ছি ; কিন্তু কিছু আগাম দিয়ে আসতে হবে। একটি টাকা দাও।"

"টাকা !" স্বামীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী কহিয়াছিল, "টাকা কোথায় পাব ?"

সুরেন্দ্রের মাথার উপর হঠাৎ যেন নির্মেঘ আকাশ হইতে বজ্র আসিয়া পড়িয়াছিল ; সে কহিয়াছিল, "টাকা নেই ?"

হেমাঙ্গিনী মুখ নত করিয়া আঙুলের ডগায় শাড়ীর কোণটি জড়াইতে জড়াইতে মৃদুস্বরে উত্তর দিয়াছিল, "না।"

ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে আকাশের যে অবস্থা হয় তেমনই স্তব্ধ হইয়া সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ হেমাঙ্গিনীর সেই আনত মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তারপর কাল-বৈশাখীর মতই মাথা ঝাঁকিয়া পাগলের মত সে বলিয়া উঠিয়াছিল, "ফিরে যাবার টাকাও সাথে নিয়ে আস নি ? তুমি না আমার 'মর-মর' ব্যারামের খবর শুনে সেবা করতে এসেছিলে ? তাই বুঝি এতগুলি বোঝা আমার জন্য নিয়ে এসেছ ? মরবার সময়েও কি ক'রে

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্বামীর কাছ থেকে কতগুলি টাকা আদায় করা যায় তাই পরখ করতে এসেছিলে? ওঃ কি ভয়ঙ্কর সেবা প্রবৃত্তি! কি—"

বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বড় কাতরকণ্ঠেই কহিয়াছিল, "আমায় পাঠিয়ে দিচ্ছ দাও, কিন্তু অমন করে' আমায় দগ্ধে মেরো না। আমি টাকা কোথায় পাব? তুমি মাসে মাসে কি আমাকে দাও তা তুমি জান না? তা থেকে কি বাঁচে তা তুমি বোঝ না? সেদিন যে টাকা পাঠিয়েছ তা যে গত মাসের ধার শোধ করতেই ফুরিয়ে গেছে তা কি তোমার অজানা? তবে এ সময় কোথা থেকে আমার হাতে টাকা আসবে? আমার কি আছে? কত সোনা জহরৎ তুমি আমায় দিয়েছ যা বেচে তোমার জন্য আমি টাকা নিয়ে আসব? থাকবার মধ্যে ত এই দেহটি;—তাই নিয়ে এসেছি। আর কি আমি কোথায় পাব?"

উত্তেজনায় সুরেন্দ্রের দেহ তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিলেও উত্তরে সে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। সত্যই ত হেমাঙ্গিনীর কিছুই নাই। সঞ্চিত অর্থ তাহার থাকিতে পারে না; বিক্রয় করিয়া অর্থে পরিণত করিবার মত কোন উপকরণও কোনদিনই তাহাকে সে দিতে পারে নাই। এ কথা সুরেন্দ্রের চাইতে বেশী আর কেহ ত জানে না! তাই অভাবের জ্বালাবোধ তাহার যত তীব্রই হউক না কেন, হেমাঙ্গিনীকে সে আর ঐ সম্পর্কে তিরস্কার করিতে পারে নাই; আর বোধ করি বা সেইজন্যই তাহার জ্বালা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ টাকাও তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইয়াছিল। তাহার শেষ সম্বল, একমাত্র বিলাসসামগ্রী, প্রথম যৌবনে পিতার নিকট হইতে পাওয়া—তাঁহারই শেষ স্মৃতি—হাতের সোনার অঙ্গুরীটি পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিয়া উহাদের পথখরচ সে সংগ্রহ করিয়াছিল। এখন বিশেষ করিয়া সেই অঙ্গুরীটির কথা স্মরণ করিয়াই তাহার অন্তর জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। আর কি টাকা শোধ দিয়া ঐ অমূল্য সম্পদটি সে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? অতীতের অভাব, ভবিষ্যতের দায়িত্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া সে কোন ভরসাই করিতে পারিতেছিল না; আর সেই জন্যই তাহার অন্তর নিরন্তর হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছিল।

আধ ঘণ্টাখানেক এমনইভাবে কাটিয়া যাইবার পর বাহিরে বেণীর উল্লসিতকণ্ঠ শোনা গেল, "মুখুজ্জে, ও মুখুজ্জে; বলি বৌদি কোথায়? আফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব মনে করেছিলাম, তা বড়বাবু আজ রোজকার চাইতেও দেরী করিয়ে দিলেন।"

বেণী খুবই উল্লসিত হইয়া অনেকখানি পথ একরকম ছুটিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকার বিরাজ করিতেছে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। উল্লসিত কণ্ঠস্বরকে অনেকগুলি পর্দ্দা নীচে নামাইয়া আনিয়া সে কতকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "তাই ত, কেউ যে নেই দেখছি। এরা সবাই বাইরে গেলেন নাকি?"

এবার সুরেন্দ্র কথা কহিল, "না ভাই; এই যে আমি রয়েছি, এস।" তারপর সে দিয়ালশাই খুঁজিয়া আলো জ্বালিল।

উৎসুকদৃষ্টিতে সমস্ত গৃহখানি একবার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা নেই?"

সুরেন্দ্র মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

"সত্যই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

বেণী তৎক্ষণাৎ আর কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না। সুরেন্দ্র হুঁকার উপর হইতে কলিকাটি নামাইয়া তামাক সাজিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

বেণী পুনরায় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে যে কক্ষ সে দেখিয়া গিয়াছিল সেই কক্ষই আজ তাহার রূপ বদলাইয়াছে। কার্ণিশের কোণে, তাকের উপর ও দেয়ালের গায়ে আজ আর পথের ধূলি পুঞ্জ হইয়া জমিয়া নাই; কালির ঝুল ও মাকড়সার জাল দূর হইয়াছে; অনভ্যস্ত চক্ষু দিয়া শয্যার রূপ দেখিলে আজ আর সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠে না। হেমাঙ্গিনীর চেষ্টাতেই যে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছে তাহা বেণী না জিজ্ঞাসা করিয়াও বুঝিতে পারিল। সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কহিল, "ভুল করলে মুখুজ্জে। বৌদিকে পাঠিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ কর নি। রাখলে অনেকখানি শান্তি পেতে।"

সুরেন্দ্র উত্তর দিল না, নতমুখে টিকায় ফুঁ দিতে লাগিল।

বেণী কতক্ষণ আপন মনেই কহিল, "অদৃষ্টে নেই তাই চোখে দেখতে পেলুম না। কিন্তু যতটুকু হাতের কাজ তিনি রেখে গিয়েছেন তাই দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—বৌদি আমাদের লক্ষ্মী। অমন সতীলক্ষ্মীকে দূর ক'রে দিয়ে অন্যায় করেছ, সুরেন্দ্র!"

তথাপি সুরেন্দ্র উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল পর বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ মুখুজ্জে?"

সুরেন্দ্র কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইল; তারপর বেণীর মুখের দিকে চাহিয়া কি একরকমের অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যে আসচে জন্মে যেন সতীলক্ষ্মীই হতে পারি।"

এ কথার ভাবার্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বেণী হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

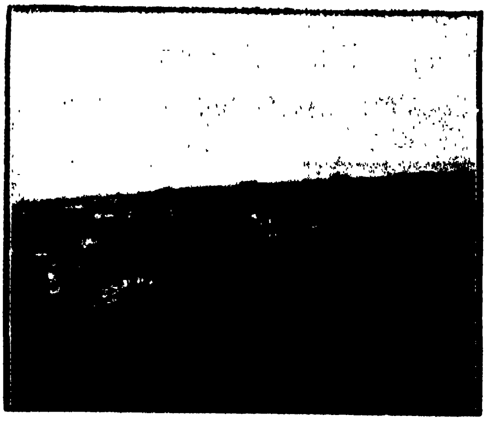


চীনা দস্যুদের হাতে

ভূপর্য্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

সে আজ বহু দিনের কথা। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তখন সমগ্র চীন ভ্রমণ করিয়া আমি সাইকেলে



পিকিন পর্ব্বতের উপর হইতে অসংখ্য বৃক্ষ মধ্যে পিকিন সহর

পিকিং পৌছিলাম; পিকিং চীনের একটী বহু পুরাতন রাজধানী; এইখানে আসিয়া আমি একমাত্র ভারতীয় সিন্ধু-প্রদেশের মিঃ ভিরুমলের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। পিকিং সহরটী বেশ বড়। লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষের মত। রাস্তা-ঘাটগুলি সব পিচের, তবে ধুলিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে ইহার রাজপথে চলা বেশ কষ্টকর। একদিকে ভীষণ গরম—অন্য দিকে গোবী মরুর ধূলি পথিককে বেশ একটু কষ্ট দেয়। তেমনি আবার শীত-কালে ভীষণ শীত, এত শীত যে কেবল মাত্র কলের জলই বরফ হয় না, নদীর জলও বরফ হইয়া ভীষণ শক্ত হয়। এমন কি অনেক বৎসর সমুদ্রজলও বরফ হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের Januaryর কথা—এক রজনীতে Gulf of Peichili একেবারে জমিয়া উঠিল, ফলে, মধ্যরাত্রিতে যে সব জাহাজ পিকিংএর বন্দর তিয়েন্‌ট্‌সিনের নিকট টাকুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল—সেইগুলিও আট্‌কাইয়া গেল। আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। তাই পরদিন Ice-breakerএর সাহায্য তলব হইল; কিন্তু Ice-breaker জাহাজগুলিও এই কঠিন জমাট বরফ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে পারিল না, জাহাজ তখন টাকু হইতে ১১ মাইল দূরে। অবশেষে একটী মোটর লরী এই জমাট সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের নিকট যায় ও সেখান হইতে আস্তে আস্তে যাত্রীদিগকে বন্দরে লইয়া আসে। এমনি ধরণের শীত উত্তর চীন ভোগ করে।

পিকিং-এ দেখিবার মত বিশেষ কিছু নাই, আছে মাত্র কয়েকটী মন্দির ও পুরাতন রাজপ্রাসাদ। মন্দিরগুলির মধ্যে পুরাতন লামা-মন্দির বেশ প্রসিদ্ধ। এই



চীনের বিরাট প্রাচীর—১৪০০ মাইল দীর্ঘ—পিকিন সহর হইতে ৪০ মাইদূরেল

বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে লিখিত কয়েকটী শব্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অক্ষরগুলি মনে হইল দেবনাগরী

অক্ষরের মত। কিন্তু তাহার ২১১টী অক্ষর ব্যতীত আর কিছুই আমার বোধগম্য হইল না। এই সহরের পিকিং পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটী মন্দিরে একটী দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম। অসংখ্য তাঁহার হাত। বুঝিতে পারিলাম না কোন্ দেবীর মূর্ত্তি, চীনেরা অনেকেই যদিও Buddhists ও Confusians—তবু তাহারা প্রায় সকলেই হিন্দুদের মত বহু দেবদেবীকে বিশ্বাস ও পূজা করে।

ঐ পাহাড়ের পাদদেশেই এক বিরাট হ্রদ। নাম তার Lotus Lake, এই জন্য সেই হ্রদে কেবল পদ্ম ফুলের গাছই দৃষ্টিপথে আসে। জলের উপরে ২।১টী ভাসমান রেস্তোরাঁ আছে,



পিকিনের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন লামা-মন্দিরে লামা পুরোহিতগণের প্রার্থনা

তাহা হ্রদের আরও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। হ্রদের চারি পার্শ্বেই বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী।

পিকিং পাহাড় হইতে যখন সহরের দিকে তাকাইলাম—তখন দৃষ্টিপথে আসিল কেবল অসংখ্য বৃক্ষ ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সহরের অট্টালিকাসমূহ। এ দৃশ্য অতীব মনোরম।

সহরটী একটী বিস্তৃত জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একটী সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। আবার ভিতরেও একটী প্রাচীর সহরকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। চীনের অন্যান্য সহরের মত এই সহরেও বৈদেশিক অধিকৃত একটী অঞ্চল ছিল; যেখানে এতাবৎকাল চীনা গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা ছিল না, এই অঞ্চলের নাম লিগেসান কোয়ার্টার। এই স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল, ইহার শাসনের জন্য দায়ী লিগেসন কর্ত্তৃপক্ষ; এই লিগেসনগুলির মধ্যে বৃটীশ ও আমেরিকানগুলির প্রতিপত্তি এ পর্য্যন্ত বেশী ছিল। প্রত্যেক লিগেসনই নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সৈন্য রাখিত, তবে হয়ত এখন পিকিং জাপানীদের অধিকৃত হওয়ার পর লিগেসনগুলির ক্ষমতাও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে।

সে যাহাই হউক এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া স্থির করিলাম বহির্মঙ্গোলিয়ায় যাইব। তথায় যাইবার আমার পাসপোর্ট ছিল—তবে ছিল না তথায় যাইবার ভিসা; তাই সিদ্ধান্ত করিলাম চীনের অন্তর্মঙ্গোলিয়া প্রদেশের রাজধানী কালগানে যাইব ও সেখানেই বহির্মঙ্গোলিয়ায় যাইবার জন্য ভিসার বন্দোবস্ত করিয়া লইব। তদনুসারে ১লা সেপ্টেম্বর সাইকেলে রওনা হইলাম কালগান অভিমুখে; সূর্য্যালোকদীপ্ত সেই সুন্দর প্রভাতে পার্ব্বত্য পথ দিয়া চলিলাম—সেই দিনই কালগান পৌছিব এই আশা। কালগান ও পিকিংএর দূরত্ব মাত্র ১১০ মাইল। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তার ছোট ছোট পাথরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। তদুপরি রাস্তাটীও বহু উঁচু নীচু পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে। তাই এমনি কদর্য্য রাস্তায় সাইকেলে চলিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে লাগিলাম। সমগ্র চীন দেশেই রাস্তার অবস্থা এমনি। আবার বহু জায়গায় রাস্তা বলিয়াও বিশেষ কিছু নাই; সমগ্র দেশে তখন মাত্র ১৫০০০ মাইল রাস্তা ছিল ও হাজার ১০ মাইল ছিল রেলপথ। এত বড় বিরাট দেশে যাতায়াতের এমনি অবস্থা দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। সে যাহাই হউক, আমি সেই পথেই অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে

একটী ছোট সহরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। সেখানেই একটী রেস্তোর"াতে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলাম। অবশ্য খাইবার সময় বেশ অসুবিধাই বোধ করিলাম। একে ত চীনা ভাষা জানিতাম না যে রে"স্তোরার লোককে আমার খাদ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিতে পারি, তদুপরি তাহাদের খাদ্য বিনা তৈলে ও বিনা মসলাতে রান্না হওয়ায় আমি আরও অসুবিধা বোধ করিলাম; তাই কোন প্রকারে কিছু জলযোগ করিয়া আবার রওনা হইলাম আমার গন্তব্য পথে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কালগান এখনও ত্রিশ মাইল দূরে। আমি পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিবার নিমিত্ত



চীনের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের মন্দির—মেরামত হইতেছে

দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। আমার উভয় পার্শ্বেই গভীর অরণ্যানীতে সমাচ্ছন্ন সুউচ্চ পর্ব্বতমালা। আমি তখন একটী পাহাড় হইতে নীচে নামিতেছিলাম। এমনি সময় অকস্মাৎ বন্দুকের আওয়াজ আমার কানে আসিল। আমি চমকাইয়া উঠিলাম। সাইকেলের গতি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার বন্দুকের আওয়াজ ও তৎসঙ্গেই একটী গুলী আসিয়া আমার সাইকেলে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সাইকেল লইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম। চেতনা আমার সম্পূর্ণ লোপ পাইল। ইহার পর কি ঘটিল—তা' আজও কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু চেতনা যখন আমার ফিরিয়া আসিল—তখন

দেখিলাম—একটী পাহাড়ের উপর একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে এম্বুলেন্সের খাটিয়ার উপরে শুইয়া আছি ও আমারই পার্শ্বে উপবিষ্ট সামরিক উর্দ্দি পরা একজন চীনা যুবক। তিনি আমার শুশ্রূষায় নিরত ছিলেন। আরও পাঁচজন বলিষ্ঠ সশস্ত্র চীনা সৈনিক ঘরখানার পাহারায় মোতায়েন ছিল। নিজেকে তখন এমনি অবস্থায় এইরূপ স্থানে দেখিয়া সাইকেলটী কিংবা ব্যাগটীর কথা তাহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস আমার হইতেছিল না। অদৃষ্টে কি ঘটিবে এই চিন্তায় আমার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। ভয়ে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম এবং নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সমগ্র শরীরে বেদনা হওয়ায় ঘুমাইতে



স্বর্গ-মন্দির—রাজবংশের মন্দিরের নিকটে অবস্থিত

পারিলাম না। রাত্রিটী যেন কিছুতেই কাটিতেছিল না। ঘুমের ঘোরে নানা রকম বিশ্রী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইল। উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইল; কিন্তু আমার পক্ষে সকলই অন্ধকার! সময় আর কাটিতে চাহে না। এক একটী মুহূর্ত্ত যেন এক একটী যুগ বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি—আলো বাতাসের পথ সকলই বন্ধ ছিল। তাই এই সুন্দর প্রভাতটীও মনে হইল অন্ধকার রজনী বলিয়া।

বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রাতঃকালীন মুখ হাত ধোয়ার কাজ সমাপন করিতে পারিলাম না; সে

যাহাই হউক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার শুশ্রূষাকারী চীনা যুবকটী আমার জন্য একটু জল লইয়া আসিল। ইহারই কিছুক্ষণ পর প্রবেশ করিল একজন ভীষণাকার লোক—দুইখানা আধা-সেঁকা রুটী ও কিছু তরকারী লইয়া। বেশী খাইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ ইহারাও অন্যান্য চীনাদেরই মত বিনা মসলাতে ও বিনা তেলে রান্না করিয়াছিল—তদুপরি ভয়েও আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কপালে উঠিয়া গিয়াছিল।

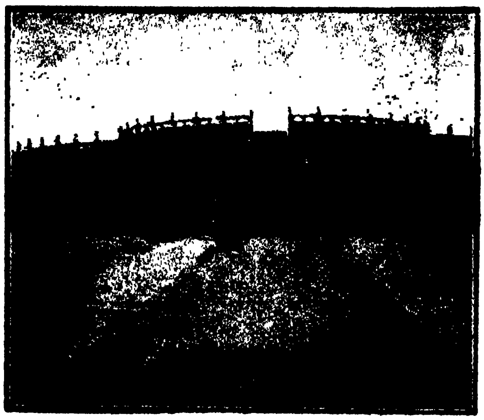
মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সশস্ত্র প্রহরীরা সকলেই ঘর হইতে চলিয়া গেলে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—চীনা যুবকটীকে—যে আমার সম্বন্ধে তাহাদের মতলব কি? কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। বোধ হয় সে ইংরাজী জানিত না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম।



বহু হস্তপদবিশিষ্ট চীনা দেবীর মন্দির; পিকিন পর্ব্বতের উপর অবস্থিত

তখন ঘোর সন্ধ্যা। প্রায় ১৫জন সামরিক উর্দ্দীপরা বলিষ্ঠকায় সৈনিক আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে তাহাদের অনুসরণ করিতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নির্দ্দেশ দিল। আমাকে তাহাদের মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহারা পার্ব্বত্য পথে যাত্রা সুরু করিল। রাস্তা বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। শুধু Bridle path দিয়াই চলিলাম। কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; তাই আর চলিবার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে যখনই বসিয়া পড়িলাম, তখনই অদৃষ্টে জুটিল তাহাদের লাথি। এমনি ভাবেই চলিয়া রাত্রিশেষে একটী ছোট পার্ব্বত্য গ্রামে আসিয়া তাহারা সমগ্র দিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিল। এখানেও আমাকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যায় তাহাদের আবার যাত্রা সুরু হইল ও রাত্রি প্রভাতে আর একটী জায়গায় তাহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিল। এই-ভাবে ক্রমাগত তিনদিন চলিবার পর তাহারা অবশেষে আমাকে তাহাদের কাপ্তেনের নিকট হাজির করিল।

সে ৫ই সেপ্টেম্বরের কথা। রাত্রি তখন ১০টা যখন আমি কাপ্তেনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি একটী পাহাড়ের উপর ছোট একখানি ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। কাপ্তেন দেখিতে বেশ সুন্দর। মুখে তাঁহার বেশ একটা কমনীয় ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি ছিলেন একখানি চেয়ারে বসিয়া। সম্মুখে ছিল একখানি টেবিল। ইহার উপর কয়েকখানি বই ও সংবাদপত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ



পিকিনস্থ স্বর্গ-মন্দিরের প্রাঙ্গণ—এখানে বলি হইয়া থাকে

করিল। পিছনে—দেওয়ালের গায়ে বেল্টের সঙ্গে একটী revolver ঝুলিতেছিল; তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে লেনিন ও ষ্টেলিনের দুইখানি ছবি রহিয়াছে—দেখিলাম। এমন জায়গায় এই ছবি দুখানি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। কারণ এতক্ষণ জানিতাম না যে আমি সাম্যবাদীদের হাতে বন্দী। তাহাদের ব্যবহারে মনে হইয়াছিল যে আমি জগৎ-বিখ্যাত চীনা-দস্যুদের হাতে পড়িয়াছি—যাহাদের ব্যবসায়ই কেবল মানুষ হরণ করিয়া যদি সম্ভব হয় টাকা পয়সা সংগ্রহ করা—নচেৎ তাহাদের মারিয়া ফেলা।

সাম্যবাদীগণের নাম মনে হইতেই মুক্তি পাইবার একটা ক্ষীণ আশা আমায় পুলকিত করিল—সমগ্র শরীরে একটা শিহরণ বোধ করিলাম। সে যাহাই হউক, ঐ ঘরে

প্রবেশ করিবামাত্রই কাপ্তেন আমাকে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী চেয়ারে বসিতে অঙ্গুলি হেলনে নির্দ্দেশ দিলেন। তারপর প্রথমেই ইংরাজীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি ভারতবাসী কিনা। ইহার পর একে একে অনেক প্রশ্নই করিলেন—যেমন—আমি কোথায় যাইতেছিলাম, আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি। সর্ব্বশেষে জানিতে চাহিলেন—আমি যে কোন গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর নই ও ঐ অঞ্চলে আমার ভ্রমণের পিছনে যে কোন অসদভিপ্রায় নাই—সে পক্ষে কি প্রমাণ আমার আছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইলাম যে তিনি যেন কাহাকেও আমার সুটকেসটী ওখানে আনিতে বলেন ও তাহাকে বলিলাম যে আমার বাক্সে এমন সব কাগজপত্র আছে—যদ্দারা আমি প্রমাণ করিতে পারি যে আমি একজন খাঁটি পর্য্যটক ও আমার ভ্রমণের পিছনে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি নাই। বস্তুতঃ আমি আমার সুটকেশের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে—তাহার কিছুমাত্র খবরও তখন পর্য্যন্ত জানিতাম না।

শীঘ্রই আমার বাক্সটী ওখানে আনা হইল। আমি তখন বাক্স হইতে আমার প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সহ মহাত্মাজীর চিঠিখানি তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিলাম। তখন আমার সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না; এবং তাঁহারা যে আমাকে শুধু সন্দেহবশে এতটা কষ্ট দিয়াছেন সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখে মহাত্মা গান্ধীর উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলাম মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা; কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিজের জীবনের সম্বন্ধেও আমাকে কয়েকটী কথা বলিলেন, তিনি চীনের কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। চীনের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যবস্থায় বিদ্বিষ্ট হইয়া তিনি বিপ্লবী হইয়াছেন।

অবশেষে তিনি আমাকে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদিগকে আদেশ দান করিলেন এবং আমাকে যে স্থান হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তাহাদিগকে যাইতে বলিলেন; আমাকে মুক্তি দান করিবার পূর্ব্বে এই সব কথা যাহাতে কাহারও নিকট ব্যক্ত না করি, সেজন্য আমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য আমি যতদিন চীনে ছিলাম, এ সম্বন্ধে কাহারও নিকট কোন কথা বলি নাই।

সাইকেলের কথা জিজ্ঞাসা করিবার আর আমার সাহস হইল না। তখন মনে মনে মুক্ত হইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তই যেন গণিতে লাগিলাম। যাহা হউক মুক্ত হইয়া বাক্স কাঁধে করিয়া পদব্রজেই চলিলাম পিকিংএর দিকে। কয়েক দিন পরে পিকিং পৌছিয়া আবার মিঃ ভেরুমলের আতিথ্য স্বীকার করিলাম। কয়েক দিন বিশ্রামের পর নূতন সাইকেলে আবার যাত্রা পথে বাহির হইয়া পড়িলাম—এবার মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া হইয়া চেরিফুলের দেশের দিকে।

রূপ-কথা

"সন্ধ্যামালতী"

ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হ'য়ে রাজা ও রাণী দূর প্রবাসে তাদেরই এক মালীর ঘরে আশ্রয় পেলেন। রাণী তখন আসন্নপ্রসবা, মালিনীও তাই।

কষ্টে উত্তেজনায় রাণী একটি শিশুর জন্ম দিয়ে সেই রাত্রেই মারা গেলেন—অসুস্থা মালিনীও প্রসবের সাথে সাথে সেই রাত্রেই মারা গেল—

ভাগ্যের হাত কে এড়াতে পারে! মালিনী কিম্বা মহারাণী?

রাজা প্রথমে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ও পরে বিষমজ্বরে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিলেন—এদিকে রাজ-অনুচরেরা অনেক অনুসন্ধানের পর এসে এদের নিয়ে গেল।

রাণীর যখন সন্তান-সম্ভাবনা তখন রাজ-দৈবজ্ঞ তাঁর হাত দেখে বল্লেন, পুত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা—

যদিও রাণী মৃত, রাজা জ্বরে আচ্ছন্ন; তবুও রাজপুরুষেরা আনন্দে

উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন ; বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত যুবরাজ, রাজ্যের ভাবী রাজা, শিশু রাজপুত্র তো জীবিত আছেন।

মালীর একমাত্র সন্তান মাতৃহারা উজ্জয়িনী—মালীর চক্ষের মণি, বক্ষের ধন—দিনে দিনে বড় হয় ; রূপ যেন আর ধরেনা—। অফুরন্ত স্বাস্থ্য রাজহাঁসের মত জলে খেলা করে, জলপরীর মত সাগরের বুকে ছোট ডিঙ্গী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ; গভীর অরণ্যে অনায়াসে বনের হরিণের মত ছুটে চলে—সারাদিনমান কাটে তার মুক্ত আকাশের তলে, গভীর অরণ্যে আর অগাধ সমুদ্রের বুকে।

কিশোর রাজপুত্র চঞ্চলকুমার, অন্তরঙ্গ হিরণ্ময়—অনুচর পরিজন নিয়ে বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে ; গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে—নগরের পর নগর অতিক্রম করে তাঁদের ক্লান্ত অশ্ব এসে নামল নির্জ্জন এক সমুদ্র প্রান্তের ক্ষুদ্র গ্রামে—

হিরণ্ময় বল্লে—চঞ্চল, আজ এখানেই বিশ্রাম করা যাক্—

চঞ্চলকুমার বল্লে—তাই হবে ; একদিন নয়—এখানেই আমরা থাকব ঐ পাহাড়ের মাথায়। সমুদ্রে করব স্নান, ঐ বনে করব মৃগয়া। কি অপূর্ব্ব সুন্দর মায়াময় এই ক্ষুদ্র গ্রামখানা ! এ গ্রাম কার ?

—মহারাজকুমার এ গ্রাম আপনারই রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বলে কখন আসা হয় না—ঐ পাহাড়ের কোলে বনের প্রান্তে মহারাজের বিশাল উদ্যান আছে, প্রবাস-ভবন আছে।

দিনের পর দিন যায়—চঞ্চলকুমার হিরণ্ময়—আর উজ্জয়িনীর বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়। সমুদ্র তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্নান করা—ছোট ভেলায় করে ভেসে যাওয়া—কি অশ্বত্থগাছের শিকড়ে ঝুল খাওয়া—সবতাতে দুই বন্ধু হেরে যান—উজ্জয়িনীর কাছে।

কিন্তু উজ্জয়িনীতো পারেনা—তীর মেরে সুদূর আকাশ থেকে উড়ন্ত হাঁস বিঁধে মাটিতে ফেলতে ! গভীর অরণ্যের ক্ষিপ্রগতি হরিণকে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধে মারতে !

চঞ্চলকুমার উজ্জয়িনীকে শেখায় তীর ছুঁড়তে, উজ্জয়িনী শেখায় ওকে উন্মত্ত তরঙ্গের সাথে খেলা করতে ; অজ্ঞাতে প্রণয় গাঢ়তর হ'য়ে আসে—রাজপুত্রে আর মালী-কন্যায়।

বৃদ্ধ রাজা বল্লেন, তিনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন এইবার রাজকুমারকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা যাক্।

রাজ্যের ধনী গরীব সকলের প্রিয়—রাজকুমার চঞ্চলকুমার।

উৎসব আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল রাজ্যময়। রাজা বল্লেন, শুধু যুবরাজ নয়, এই বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজকুমারের বিবাহ ও যুবরাজপদের অভিষেক সম্পন্ন হ'ক এক সাথে।

কত আয়োজন ; সমস্ত রাজ্য যেন জোয়ারের জলের মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে আনন্দে।

রাজকুমারের কাছে দূত গেল রাজার সাদর আজ্ঞা নিয়ে "অবিলম্বে প্রাসাদে ফিরে এস।"

চিন্তিত রাজকুমার উজ্জয়িনীর কাছে বিদায় চাইলেন—অশ্রুমুখী উজ্জয়িনীকে বল্লেন—এক মাসের মধ্যে ফিরে আসব।

মাতৃহীন রাজকুমারের সমস্ত অভিযোগ সইতে হয় বৃদ্ধা রাজমাতাকে—তাঁর বড় আদরের একমাত্র বংশধর।

রাজকুমার বল্লেন, আমি এ বিয়ে করব না।

তবে কোন্ বিয়ে ? অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা, অর্দ্ধেক রাজত্ব—এ সমস্ত চাওনা তবে কি চাও ?

ঐ মালীর মেয়ে—উজ্জয়িনীকে।

তাও কি কখনও হয় ! হ'তে পারে এমন অসম্ভব কথা কখনও। রাজার ছেলে কখনও মালীর মেয়েকে বিয়ে করতে পারে ? তুমি ভবিষ্যৎ রাজা।

আমি চাইনা রাজত্ব, চাইনা রাজকুমারী।

কিন্তু এ সম্ভব নয়—রাজা টের পেলে ঐ মালীর বংশ লোপ পাবে, ভিটে মাটীর সাথে মিশবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

গর্ব্বিত চঞ্চলকুমার কোষ থেকে অসি মুক্ত করে দীপ্তকণ্ঠে বল্লেন—তবে বৃথাই এতদিন এ অসির ভার বহন করেছি, বৃথাই তবে আমি রাজপুত্র হ'য়ে জন্মেছি, আমি শুধু ধনীর দুলাল নই আমি সৈনিক।

রাজা সংবাদ শুনে চিন্তিত হ'লেন ; রাজকুমারকে ডেকে বল্লেন, চল আমাদের প্রমোদভবনে নির্জ্জনে ব'সে আমি শুনতে চাই কি তোমার বক্তব্য। সমস্ত রাজপরিবার নদীতীরের প্রমোদভবনে এলেন—এদিকে রাজার গোপন মন্ত্রণায় বৃদ্ধ মন্ত্রী সেই প্রবাস-ভবনে মালীর কুটীরের উদ্দেশে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হ'লেন।

রাজা বল্লেন—তাও কি হয় ! ভেবে দেখ, বুঝে দেখ।

রাজকুমার বল্লেন—কেন হবে না ? শান্তনু-মহারাজা ধীবর-কুমারী মৎসগন্ধাকে বিবাহ করেছিলেন, আর তিনি হ'য়েছিলেন ঐ বিশাল রাজ্যের পাটরাণী। শাস্ত্রে আছে হীনকুলোদ্ভব হ'লেও কন্যারত্ন গ্রহণ করা যায়।

রাজা বল্লেন—সেই অতি পুরাকালের কথা ছেড়ে দাও ; এখন কি তা সম্ভব ? বংশের মান মর্য্যাদা নষ্ট হবে, এই অসম্ভব কল্পনা ত্যাগ কর।

বিতণ্ডা করে কি হবে—চঞ্চলকুমার রাজ্য ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। তবে তাই হ'ক ; এ রাজ্যে তোমার কোনও অধিকার থাকবে না যদি তুমি ঐ মালী কন্যার পাণিগ্রহণ কর।

অন্তরে রাজা স্থির করলেন—কৌশলে রাজকুমারের মন বশীভূত করতে হবে।

এদিকে মন্ত্রী তার সেনাদল নিয়ে মালীর ক্ষুদ্র কুটীর ঘিরে ফেলেছেন ; বিস্মিত বৃদ্ধ মালীকে বুঝিয়ে বলছেন—তোমার সমস্ত ক্ষতিপূরণ করব—তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করে যেতে হবে ; বহু দূর দেশে, সেখানে নূতন জমীজমা ঘরবাড়ী সমস্ত পাবে, যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী পাবে,

শুধু এ রাজ্যের সীমান্তের বাইরে কোন দূর প্রদেশে তোমায় যেতে হবে।

ফুলে ফুলে সেজে বনদেবীর মত উজ্জয়িনী আসছে—মধুর কণ্ঠে গাইছে বিরহের গান—যা সে শিখেছে তার প্রিয়তমেরই কণ্ঠ হ'তে—

নিজেদের ক্ষুদ্র কুটীরের চারিদিকে এত জনতা দেখে সে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়াল, ক্ষণেক পরে ছুটে এসে দাঁড়াল মালীর নিকটে।

বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রথমে বিস্মিত পরে চমকিত হ'য়ে উঠলেন—এ কে?

এ কে? ইনি কে?

আমার মেয়ে মন্ত্রী-মহারাজ—আমার মেয়ে।

কথনই নয়—তোমার মেয়ে এই! কোথায় পেলে এ মেয়ে?

মহারাজ আমার স্ত্রী একে জন্ম দিয়ে মারা গেছে, আর কোথায় পাব!

বিস্মিত মন্ত্রীর তখন স্মরণ হ'লো এই সেই সমুদ্রতীর—যেখানে ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হয়ে রাজা রাণী মালীর ঘরে আশ্রয় পান; এই সেই মালীর কুটীর—যেখানে রাণী সন্তান প্রসব করে মারা যান।

বৃদ্ধ মন্ত্রী একবার মালীর ও উজ্জয়িনীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—শিরে করাঘাত করে বল্লেন—ভাগ্যলিপি।

মালীর কাছে সমস্ত কথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, মন্ত্রী জেনে নিলেন—জন্মের সময় ঘরে কেউ ছিলনা; শুধু—যে চাঁড়ালনী মালিনীকে প্রসব করাতে এসেছিল, সেই রাণীকেও প্রসব করায়; তারপর মৃতদেহ দুইটির কাছ থেকে নবজাত শিশু দুটিকে সরিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে রাখে; পরদিন রাজপুরুষেরা এসে একটি শিশুকে নিয়ে যান, রাণীর মৃতদেহ ও অসুস্থ মহারাজের সাথে—।

মালীকে মন্ত্রী বল্লেন—সমস্ত কথা তুমি ভাল করে বুঝতে পারবে, চল প্রাসাদে মহারাজের কাছে।

চঞ্চলকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন একা। তিনি রাজ্য-ধনমান সমস্ত ত্যাগ করে আসছেন তাঁর প্রিয়তমাকে লাভ করতে—কোথায় কে! শূন্য কুটীর—প'ড়ে আছে শুধু অকুল সাগরের অশ্রান্ত কান্না।—

মন্ত্রী এসে রাজদর্শনের প্রার্থনা জানালেন। রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বিস্মিতকণ্ঠে বল্লেন—একি রূপকথা!

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ—আমি আপনার পিতার বয়সী, মহারাজের বিবাহের সময় আমিই কন্যা আশীর্ব্বাদ করেছিলাম; উৎসবে আনন্দে বহুবার মহারাণীর সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, এ হতভাগ্যই মহারাণীর মৃতদেহের সৎকার করেছিল। তাঁর সেই মধুর মূর্ত্তি ভুলবার নয়।

নিয়ে এস তবে ঐ উজ্জয়িনীকে, নিয়ে চল তবে আমার শয়নাগারে, যেখানে মহারাণীর আলেখ্য আছে, আর বৃদ্ধা মহারাজমাতাকেও নিয়ে চল।

সকলে বিস্মিত স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াল; রাণীর আলেখ্য যেন রূপ ধরে তা দর কাছে নেমে এল; সেই কপাল—সেই কুঞ্চিত কেশ, সেই চোখ, সেই নাক, রক্তাভ ঠোঁট—এমন কি সেই সুকুমার গণ্ডের কালো তিল, সেই মোহন তনুলতা!

রাজা মাথা নত করে দাঁড়ালেন, বৃদ্ধা রাণীর ব্যগ্র বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ল উজ্জয়িনী।

শূন্য কুটীরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রাজকুমার বুঝলেন—এ সমস্তই মহারাজের আজ্ঞায় তাঁরই কৌশলে ঘটেছে।

সেও রাজকুমার, সেও পুরুষ; কোষমুক্ত অসি দৃঢ় করে ধরলেন চঞ্চলকুমার। কোথায় লুকাবে! এ পৃথিবীর যেখানেই থাক্—সে খুঁজে বার করবেই উজ্জয়িনীকে।

বন্ধু হিরণ্ময় ও চঞ্চলকুমার বসেছেন গভীর পরামর্শে হিরণ্ময়ের প্রাসাদে।

এমন সময় রাজদূত এল রাজ আজ্ঞা নিয়ে, অবিলম্বে ফিরে এস—উজ্জয়িনী এখানেই আছে।

ক্রুদ্ধ রাজকুমার বুঝলেন এ কিছু নতুন কৌশল। তিনি লিখে পাঠালেন, আর কিছুই জানতে চাইনা, উজ্জয়িনীকে ফিরিয়ে চাই—যদি না পাই বাহুবলে তাকে উদ্ধার করব।

উজ্জয়িনী এখন রাজকুমারী। তার তনুলতা বনবিহঙ্গীর সাজ ত্যাগ করে রাজকুমারীর বেশে ঝলমল্ করছে—মণিমুক্তায় খচিত।

সখীদের সাথে সে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায় বসে দোলে, তার একটি মুখের কথায় শত দাস দাসী ছুটে আসে।

এত সুখেও উজ্জয়িনীর সুখ নেই কেন? মালীর মেয়ে হ'য়েছে রাজকুমারী, তবুও আনন্দ নেই! সুখ কি কেবল পর্ণকুটীরের ছায়ায়! আর নীলসাগরের বুকে! বন অরণ্যের অশ্বথ তলায়? রাজপ্রাসাদে সুখ নেই! কোথায় গেল বন্ধু চঞ্চলকুমার! রাজকুমারী সুখী নয়—সখী বিজনকুমারীকে ডেকে বলে—

সখী বিজন, কবে আসবে চঞ্চল? রাজা—মহারাজা—না, না, আমার পিতা—তাকে কি আসতে দেবেন না এ রাজ্যে? কেন দেবেন না? শুনছি মহারাজা তাঁকে সেনাপতি করে দেবেন।

—তবে কি মজাই হবে—আমরা আবার আগের মত, মৃগয়ায় যাব, ডিঙ্গীতে করে নদীতে ভাসব—সখী বিজন, তুমিও আমাদের সাথে আসবে।

না রাজকুমারী তোমার যে বিয়ে হবে।

আমি চঞ্চলকে বিয়ে করব।

ছি-ছি তা কি হয়—সে যে মালীর ছেলে—তোমার হবে রাজপুত্রের সাথে বিয়ে—যিনি ভবিষ্যতে হবেন এ রাজ্যের রাজা, তুমি হবে রাণী।

এক বিদ্রোহী দল নিয়ে চঞ্চলকুমার আসছেন। করবেন তিনি উদ্ধার উজ্জয়িনীকে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী নদীপারে বিদ্রোহী দলের সাথে ঘোর যুদ্ধ হ'লো—পরে রক্ষী সৈন্যদলের সাথে—বিজয়ী চঞ্চলকুমার নদীপারে নিজ সেনাদল নিয়ে বসেছেন—বিজিত রাজ-রক্ষী এসে সংবাদ দিল রাজসভায়।

মন্ত্রী বল্লেন—মহারাজ, প্রয়োজন হ'লে চঞ্চলকুমারের সাথে যুদ্ধ করতে হবে-ই—তার ভয়ে আমি ভীত নই ; কিন্তু অকারণ সৈন্যক্ষয়ে প্রয়োজন কি ? উজ্জয়িনী দেবী যে আমাদের রাজকুমারী—আর তিনি যে মালীপুত্র সেকথা চঞ্চলকুমারের অজ্ঞাত আছে এখনও, এই সংবাদ তাঁকে জানানো প্রয়োজন।

রাজদূত এসে বল্লে—মহারাজা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার সাথে কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনি ইচ্ছামত সৈন্য নিয়ে মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

খোলা তরবারী হস্তে সভার মাঝে চঞ্চলকুমার মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন—কি প্রয়োজন ?

উজ্জয়িনী মালীর কন্যা নন্—তিনি রাজকুমারী।

এও কি সম্ভব ! মিথ্যাকথা ? তবে এস ঘরে।

এই মৃতা রাণীর আলেখ্য, রাজকুমারী উজ্জয়িনীর মাতা।

বিস্মিত চঞ্চলকুমার সমস্ত ঘটনা শুনে—নতমস্তকে ফিরে চল্লেন।

মহারাজা স্নেহমাখাকণ্ঠে বল্লেন—চঞ্চল কোথায় যাও ? রাজকুমারীর সাথে বিবাহ নাই হ'ক—; তুমি এ রাজ্যের রাজা নাই হও। তবুও আমি তোমায় আমার পুত্র মনে করি—তুমি এ রাজ্যের সেনাপতি হও।

চঞ্চলকুমার মাথা তুলে বল্লেন—মহারাজ, আপনার অযাচিত করুণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ—যে রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেম, সেখানে রাজভৃত্য হ'তে পারব না।

চঞ্চলকুমার প্রাসাদ ত্যাগ করে ফিরে গেলেন।

রাজকুমারী উজ্জয়িনী বল্লেন—কে চায় রাজকুমারী হ'তে, রাজবধূ হ'তে ; আমি চাইনা রাজত্ব, চাইনা রাজপুত্র।

রাতের অন্ধকারে রাজকুমারী ছুটে চলেছেন—ঘুমন্ত রাজপুরী হ'তে, বহুকষ্টে দুর্গপ্রাকার লঙ্ঘন করে—দুর্গম পথ পার হ'য়ে—

"কভু বা পন্থ গহন ছুটিল
কভু পিছল ঘন পঙ্কিল
কভু সঙ্কট ছায়া শঙ্কিল
বঙ্কিম দুরগম
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া ওঠে।"

—রাত্রি তখন শেষ হ'য়ে এসেছে প্রায়, অস্তগামী চন্দ্রের ম্লানজ্যোৎস্না প'ড়েছে নদীর পারের পাহাড়তলীতে—

চঞ্চলকুমার গলার মুক্তারমালা হীরকাঙ্গুরীয় তাঁর বুকের মণিমুক্তা খচিত উজ্জ্বল গহনা খুলে দস্যু সর্দ্দারের হাতে দিয়ে বল্লেন—প্রয়োজন নেই আর যুদ্ধের, তোমরা ফিরে যাও।

দস্যুদল পার্ব্বত্য পথে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল—চঞ্চলকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়ালেন—যেতে হবে এ রাজ্য ছেড়ে, তাঁর উজ্জয়িনীকে ছেড়ে—চিরদিনের মত—

হঠাৎ অদূরে ও-কিসের শব্দ, কার নূপুরের ধ্বনি ! মুহূর্ত্তমধ্যে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত মণিমুক্তায় খচিত রাজকুমারী উজ্জয়িনী চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে এসে বিস্মিত চঞ্চলকুমারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চঞ্চলকুমারের ব্যগ্র বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ল উজ্জয়িনী—

সে রাণী হ'তে চায়না—চায়না রাজকুমারী হ'তে—

মণিপুরে দশদিন

শ্রীসুধেন্দু গুহ বি-এ,

ভ্রমণ

দশদিনের ছুটি পাইয়াছিলাম। বহুদিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীর ও মনকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। মনে নানা তর্কবিতর্কের পর স্থির করিলাম দেশভ্রমণে বাহির হইব। কিন্তু কোথায় ? আমার মন শিলং, দার্জ্জিলিং, পুরী, রাঁচি—এমন কি সুদূর সিমলা-রাওয়ালপিণ্ডীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি দিয়া অবশেষে মণিপুরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মণিপুরের পক্ষপাতিত্বের কারণও ছিল। মণিপুর আমার জন্মস্থান এবং আমার পিতামাতা এখনও সেখানে আছেন। আমার জীবনের প্রথম ১৭ বৎসর সেখানেই অতিবাহিত করিয়াছি।

আমার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয় শ্রীতেজেশ নাগকে পথের সাথী করিয়া সামান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া দুর্গানাম স্মরণ করিয়া সন্ধ্যা ৭৷৷০টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণের আশায় জানালা খুলিয়া দেখি বাহিরে ভীষণ অন্ধকার। অগত্যা নিরুপায় হইয়া কামরার যাত্রীদিগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলাম। প্রায় ১টার সময় ট্রেণ লামডিং জংসনে পৌছিল। জংসনের কলরবে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আমরা নামিয়া প্ল্যাটফরমে পায়চারী করিতে করিতে নানা শ্রেণীর ছোট বড় স্ত্রীপুরুষ যাত্রীদিগের ওঠা-নামা, কুলির সহিত বচসা এবং তাহাদের অকারণ ব্যস্ততা নীরবে উপভোগ করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে বাঁশীর আহ্বানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানিনা, ঘুম ভাঙিলে দেখি মণিপুর রোডে পৌছিয়াছি। সঙ্গিটিকে উঠাইয়া জিনিসপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। তখন ভোর পাঁচটা।

ষ্টেসনটির নাম মণিপুর রোড্ কিন্তু জায়গাটি ডিমাপুর বলিয়াই পরিচিত। এখান হইতে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল ১৩৪ মাইল। এই সম্পূর্ণ পথ মোটরে অতিক্রম করিতে হয়। মোটরের খোঁজ করিতে হইল না। ষ্টেসনেই মণিপুরী ড্রাইভারগণ যাত্রীর সন্ধানে আসে। চা পান শেষ করিয়া একটি নূতন দেখিয়া মোটরবাসে উঠিয়া বসিলাম। ৬টার সময় মোটর ছাড়িয়া দিল। থানার নিকট আসিতেই পুলিশ কর্ম্মচারী মণিপুর প্রবেশের অনুমতিপত্র (Passport) দাবী করিল। মণিপুর যাইতে হইলে এবং তথা হইতে বাহিরে আসিতে হইলেও বিদেশীমাত্রকেই ইম্ফালের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট হইতে ছাড়পত্র লইতে হয়। গৌহাটী হইতে রওনা হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা ছাড়পত্র আনাইয়াছিলাম। থানা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দক্ষিণদিকে কাছাড়ী রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। ডিমাপুর কোনও এক সময়ে কাছাড়ীদিগের রাজধানী ছিল। এই ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন ডিমাপুরের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির আর কোনও নিদর্শন এখন নাই। পথের দুইধারে কেবল গভীর ঘন অরণ্য—ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার পর ষ্টেসন হইতেও মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র গর্জ্জন শোনা যায়। ৭।৮ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তা এই গহন বন ভেদ করিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় ও প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। ডিমাপুর হইতে নয় মাইল আসিয়া গাড়ী থামিল। পুলিশ কর্ম্মচারী আরেক দফা ছাড়পত্র পরীক্ষা করিল। জায়গাটির নাম নিচুগার্ড। রাস্তার উপরে একটি ফটক (gate)। নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা বন্ধ করা হয়। সুতরাং এই সময়ের পর কোন গাড়ী এখানে পৌছিলে উহাকে ঐখানেই রাত্রিবাস করিতে হয়। নিচুগার্ড ছাড়িয়া কিছুদূর যাইয়া প্রকৃত পার্ব্বত্য-পথ আরম্ভ হইল। পাষাণে বাঁধানো পিচ-ঢালা অপ্রশস্ত রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া নাগা পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। ডান ধারে পাহাড়, আর বাঁ ধারে গভীর খাদ। এই উভয় সঙ্কটের মধ্য দিয়া গাড়ী হুহু করিয়া ছুটিতেছে। গাড়ী ধীরে ধীরে এই ভয়সঙ্কুল পথ পার হইয়া আবার পূর্ণ গতিতে ছুটিতে লাগিল। আবার সেই পাহাড় এবং খাদের দৃশ্য রাস্তার দুইপাশে বায়োস্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইতে লাগিল। মাঝে



মণিপুর রাজপ্রাসাদ—(শ্রীজিতেন্দ্র পুরকায়স্থের সৌজন্যে)

মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী নদী এবং ঝরণা "শব্দময়ী অপ্সর রমণীর" ন্যায় তাহাদের উচ্ছ্বসিত কল্লোলে দৃশ্যের সমরূপত্ব এবং স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়া যাত্রীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। এই ঝরণা এবং নদীগুলির শোভা অতুলনীয়। কোন্ অন্ধকার গহ্বর হইতে সদ্য-মুক্তিলাভ করিয়া "রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া" এবং "রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া" মহা উল্লাসে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডসমূহ সতর্ক প্রহরীর ন্যায় কারামুক্ত জলপ্রবাহের গতি রোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। বাধা পাইয়া

দারুণ রোষে স্ফীত হইয়া এই জলধারা আরও ভীষণভাবে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। মুক্তির আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে তাহার 'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে'?

প্রায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড নয়টার সময় আমাদের গাড়ী কোহিমাতে আসিয়া পৌছিল। কোহিমা নাগাপাহাড়ের রাজধানী—একটি ছোট্ট সহর, সাগরপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৫০০০ ফিট্‌। শিলংএর ক্ষুদ্রাকৃতি বলা যায়। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট পাহাড়ের মাথা বুক তলা ভরিয়া ছোট ছোট বাগানসমেত বাংলো, দোকানপাট, গবর্ণমেন্ট অফিস, আর রাস্তা; দূর হইতে লাল রং করা টিনের চালওয়ালা বাড়ীগুলি চমৎকার দেখায়। মনে হয় সারি সারি প্রকাণ্ড লাল পাখী ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে। কোহিমা ডিমাপুর হইতে প্রায় ৪৪ মাইল। এখানে



উৎসব বেশে নাগা

রাইফেলধারী গুর্খা সৈন্যের একটি পল্টন আছে। গাড়ী বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিল না; আবার চলিতে সুরু করিল। আবার সেই খাদ এবং পাহাড়। খাদগুলি স্থানে স্থানে অগভীর অরণ্যে পূর্ণ, আবার কোথাও বা সিঁড়ির মত কাটিয়া নাগারা তাহাতে শস্য রোপণ করিয়াছে। প্রতি ধাপের কিনারায় মাটি দিয়া উঁচু করিয়া বৃষ্টির জল আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রচুর কলাগাছ এবং বন্য বাঁশঝাড় দেখা যায়। পাহাড়গুলির কোন কোনটি গাছপালা এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ; কিন্তু অধিকাংশই সবুজ ঘাসে আবৃত, গাছপালার লেশমাত্র দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ২।১টি নেপালী পাহাড়ের কোলে মহিষ চরাইতেছে। লোকালয়ের বহুদূরে নির্জ্জন পাহাড়ে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মনের আনন্দে বাস করিতেছে। ইহাদের জীবন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের 'মাইকেলের' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে দূরে পাহাড়ের গায়ে নাগাপল্লীগুলি দেখা যায়। নাগা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই দেহ বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী—তাহাদের চোখেমুখে বীরত্বব্যঞ্জক দীপ্তি। বর্ণ গৌর, মেয়েদের গায়ে ঈষৎ লালচে আভা আছে। পরিধানে নিজেদের তৈরী সাদার উপর রং বেরংএর কাজ-করা মোটা কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত। মেয়েরা ঐরূপ একখণ্ড চাদর দ্বারা বুক পিঠ আবৃত করিয়া, হস্তদ্বয় বাহিরে রাখিয়া আঁট করিয়া কোমরে বাঁধিয়া ফেলে। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তাহারা শঙ্খের অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। কর্ণে বৃহৎ ছিদ্র করিয়া প্রায় দুই ইঞ্চি পরিধির এবং ঐরূপ লম্বা পাইপের মত একরূপ পিত্তলাভরণ ধারণ করে। তাহাদের কণ্ঠে বাঘ নখ, শূকরের দাঁত, হাড়ের এবং নানা রঙের কাঁচের মালা শোভা পাইতেছে। মেয়েদের হাতে পিতলের মোটা বালা। যাহারা অধিকতর বিলাসী এবং সৌখীন তাহাদের পরিধান-বস্ত্রে কড়ি খচিত দেখিলাম।

কোহিমা হইতেই শীত অনুভব করিতেছিলাম—এই জুলাই মাসেও। চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল। প্রায় ১০॥০টার সময় "মাও" গেটে আমাদের গাড়ী পৌছিল। "মাও" মণিপুর-ডিমাপুর রাস্তার ঠিক মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ এখান হইতে মণিপুর ও ডিমাপুর উভয়েরই দূরত্ব ৬৬ মাইল। গেট ১২।০টায় খুলিবে। কাজেই বিশ্রাম এবং খাওয়াদাওয়ার যথেষ্ট সময় পাইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া পা বাড়াইতেই আবার পুলিশ! চাহিবার আগেই পাশ বাহির করিয়া দিলাম। পাশ সম্বন্ধে পুলিশগুলি খুব সতর্ক দেখিলাম। রাস্তার ধারে বৃহৎ সাইনবোর্ডে মোটর এবং রাস্তা সম্বন্ধীয় আইনকানুন এবং উপদেশ লিখিত রহিয়াছে—প্রত্যেক গেটের পাশেই এইরূপ সাইনবোর্ড দেখিয়াছি। ইহাদিগের উপরে নরকঙ্কাল এবং অস্থিখণ্ড অঙ্কিত রহিয়াছে, অসাবধানতা বা অন্যমনস্কতার ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। এই সতর্কবাণীগুলি বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসুর রসভঙ্গ করিয়া দিতেছে। আরেকটি যায়গার কথা মনে পড়িল। সেটি ছিল ভারি চমৎকার! তিনদিকে তিনটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী অপরিসর ঢালু যায়গার মধ্য দিয়া ছলাৎছল ছলাৎছল

করিতে করিতে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে—তাহার উপর একটি সুন্দর সেতু। প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী কিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। প্রকৃতির এই শুভ্রশুচি সৌন্দর্য্যের শুচিতা নাশ করিয়া যমদূতের ন্যায় P. W. Dর একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গানো রহিয়াছে—তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"Do not stop here to admire beauty, it is dangerous." P. W. Dর লোকগুলি কি অরসিক!

আমি টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের লোক, তাই বিশেষ কোন সঙ্কোচবোধ না করিয়া ডাকঘরে গিয়া হাজির হইলাম। পোষ্টমাষ্টার নগেনবাবু সাগ্রহে এবং সানন্দে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই জনবিরল প্রকৃতির রম্য-নিকেতনে নগেনবাবুই একমাত্র বাঙালী, মেঘদূতের নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের ন্যায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছেন। তবে এক আনার খামের কল্যাণে কুর্চ্চিফুলের অর্ঘ্য ঘুষ দিয়া তাঁহাকে মেঘের দৌত্য প্রার্থনা করিতে হয় না। রাস্তার চড়াই উৎরাই এবং পেট্রলের গন্ধে আমার ঘন ঘন বমি হওয়াতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। নগেনবাবুর অমায়িক ব্যবহারে এবং মধুর আলাপে তদুপরি তাঁহার প্রদত্ত চা প্রভৃতির সদ্ব্যবহারে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলাম। অতপর বাহিরে আসিয়া নিকটেই একটি পাথরের উপর উপবেশন করিলাম। একটি পাহাড়ের চূড়া কাটিয়া সামান্য একটু স্থান সমান করা হইয়াছে; তাহারই উপর ডাকঘর এবং ছোট ছোট আরও ৩।৪টি ঘর। গজ দশেক দূরেই রাস্তা; রাস্তার ও-পাশে পাহাড়ের উপর ডিসপেন্‌সারী, ডাকবাংলো এবং মনিপুরী হোটেল। আর কিছুই নাই; কেবল পাহাড়। মাঝে মাঝে, পাহাড়ের বুকে নাগাপল্লীগুলি সাগরবক্ষে ধীবরের ডিঙ্গীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ঊর্দ্ধে অসীম নীলাকাশ আর নিম্নে শ্যামল শষ্পাবৃত অন্তহীন শৈলমালা দিগন্তে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—গেট খুলিয়া দিয়াছে। নগেনবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। গেটের দুইধারে মণিপুরযাত্রী এবং ডিমাপুরযাত্রী প্রায় ১০০ খানা গাড়ী জড় হইয়াছে। ডিমাপুরের গাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিলে মণিপুরযাত্রী গাড়ীসমূহ ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর সংখ্যা দেখিয়া কেহ মণিপুরযাত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করিবেন না। যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। এই গাড়ীগুলি মণিপুরে জাত ও বাহির হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যাদি বহন করে। গেটগুলির প্রয়োজনীয়তা বোধ করি এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন; দুই বিপরীত দিক হইতে পরস্পর দুই গাড়ীর যাহাতে সংঘর্ষ না হয় তাহার জন্য এই ব্যবস্থা।


ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে উর্ব্বশী দ্বীপ—গৌহাটী (এস-কে হাফেজের সৌজন্যে)

আমাদের গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। ৬৬·মাইল পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি—সম্মুখে আরও ৬৬ মাইল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ীগুলি আঁকা-বাঁকা পথে পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতরে উঠিতে উঠিতে পাহাড়ের শিখর পর্য্যন্ত উঠিল; আবার শিখরদেশ হইতে নামিতে নামিতে পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। মারাম, কাইরং, কাংপোকপী প্রভৃতি বড় বড় নাগাপল্লী ছাড়িয়া আসিয়া গাড়ী সেংমাই নামক একটি স্থানে থামিল। ইম্ফাল এখান হইতে আর

১২ মাইল। রাস্তার পাশেই মেয়েদের বাজার বসিয়াছে। "লোই" নামক অতি নিম্নশ্রেণীর মণিপুরী মেয়েরা মদ্য বিক্রয় করিতেছে। সেংমাইয়ের মদ্য প্রসিদ্ধ এবং নাগাদিগের অতি প্রিয়। মদ্যের ব্যবসা করিয়া 'লোইজাতি' অন্যান্য মণিপুরী ব্যবসায়ী হইতে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। মণিপুরীরা এই লোইদিগকে অত্যন্ত হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে এবং ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। ইম্ফাল যাত্রী ৩।৪ জন লোক উঠাইয়া লইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ৫টার সময় গাড়ী বাড়ীর দোরগোড়ায় আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল

পরদিন প্রাতঃকালে চা পানান্তে বাল্যবন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মণিপুরপ্রবাসী



গোবিন্দজীর মন্দির (দূর হইতে)

গবর্ণমেণ্ট বা ষ্টেটের কর্ম্মচারী বাঙালী ভদ্রলোকদিগের অধিকাংশই যে স্থানে থাকেন তাহা বাবুপাড়া বলিয়া পরিচিত। বাবুপাড়ার সেই আবাল্য পরিচিত বেঙ্গলী স্কুল, গার্লস্ স্কুল, থিয়েটার হল, ক্লাব, লাইব্রেরী, খেলিবার মাঠ প্রভৃতি দেখিয়া শৈশবের সুখময় স্মৃতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া মন আনন্দে আপ্লুত হইল; বাবুপাড়ার পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরিয়া উত্তরমুখী চলিতে লাগিলাম। মণিপুর-ষ্টেটের সেনানিবাস, ষ্টেট অফিস, থানা, ষ্টেট প্রিণ্টিং প্রেস ও লাইব্রেরী, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পিচঢালা রাজপথে আসিয়া পড়িলাম। বাঁধানো রাস্তার দুই ধারে সবুজ ঘাসে আবৃত আরও ৭।৮ হাত করিয়া খোলা যায়গা। এই অতি প্রশস্ত রাস্তার দুইধারে ঘন সন্নিবদ্ধ পপ্লার তরুশ্রেণী, টেলিগ্রাফের তার ও ইলেক্‌ট্রিক পোষ্ট-সমূহ রাস্তার সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরকারী অফিস ও সাধারণ ঘরবাড়ীগুলি উঁকি দিতেছে। প্রত্যেকটি গৃহ বা অট্টালিকার স্ব স্ব বিশিষ্ট রূপ ও গঠনবৈচিত্র্য পথিকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। আসামের অন্যান্য সহরের ন্যায় ঘরগুলি একঘেয়ে একই ধরণে তৈরী নহে। আরও কিছুদুর যাইয়া পলিটিক্যাল এজেন্টের বাসভবন ও তৎসংলগ্ন এজেন্সী অফিস ও ট্রেজারী দেখিতে পাইলাম। রাস্তার ডানদিকে বহুস্থান জুড়িয়া ব্রিটিশ ক্যাণ্টনমেণ্ট্। (4th Assam Gurkha Rifles এখানে অবস্থিত) ব্রিটিশের সহিত সংঘর্ষের পূর্ব্বে মণিপুরের রাজপ্রাসাদ এখানে অবস্থিত ছিল। তাহার নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। ক্যাণ্টনমেণ্টের পূর্ব্বদিকে ইম্ফাল নদী প্রবাহিত এবং অবশিষ্ট তিন দিকে প্রাচীন রাজাদিগের তৈরী পরিখা এখনও নীরবে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব্বে এই পরিখার সহিত ইম্ফাল নদীর যোগ ছিল এবং সর্ব্বদা জলপূর্ণ থাকিত। অধুনা ইহা শুষ্ক ও অগভীর এবং উক্ত নদীর সহিত সংযোগ রহিত। আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া পূবদিকে ক্যাণ্টন্-মেণ্টের মধ্য দিয়া চলিলাম। দুই ধারে সারি সারি ব্যারাক্। সৈন্যদিগের খেলার মাঠের সন্নিকটে প্রাচীন সিংহদ্বার বিষাদ মলিন ভগ্নজীর্ণ রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত সুউচ্চ প্রাচীরও রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীর বেষ্টিত পুরাতন রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই। তৎপরিবর্ত্তে cantonment officeএর বাবুদিগের কয়েকটি ঘর দেখা গেল। প্রাচীরের বাহিরে অতীতকালের গোবিন্দ-জীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির শঙ্খঘণ্টাধ্বনির পরি-বর্ত্তে রেজিমেণ্টের খলিফার সীবনযন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দে মুখরিত হইতেছে।

বৈকালে বাজারের দিকে রওনা হওয়া গেল। রাজপথে আসিয়াই দেখি পসারিণীরা কাতারে কাতারে দ্রব্যসম্ভারে বাঁশের ঝাঁপি পূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারের দিকে চলিয়াছে। পলো খেলিবার মাঠ, সিভিল হাসপাতাল ও মণিপুরের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জনষ্টন্ স্কুল পার হইয়া এমন একটি বিপুল জনতার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম যেখানে

আমাদের সহজ গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য; মনে হয় কোন মহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারী একত্র সমবেত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন উৎসবক্ষেত্র নহে, কোন আহূত মহাসভার অধিবেশনও নহে, ইহাই মণিপুরের দৈনন্দিন বড়বাজার। ২০।২৫ হাত লম্বা এবং ৩।৪ হাত চওড়া বেড়াশূন্য টিনের ছাওনিগুলি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটির পর একটি দেখা যাইতেছে। তাহার নীচে মণিপুরী পুরুষ ব্যাপারীরা মণিহারী দ্রব্যাদি এবং তৈরী পোষাকাদি বিক্রয় করিতেছে। ছাওনিগুলির বাহিরে উন্মুক্ত যায়গায় বাসন, বস্ত্র ও শাকসজ্জী বিক্রেতারা বসিয়া গিয়াছে। তিল ধারণের স্থান পর্য্যন্ত নাই। বাজারের পশ্চিম দিকে ক্ষুদ্র নম্বুল নদী প্রবাহিত। ইম্ফাল যে লোকসংখ্যা হিসাবে আসামের শ্রেষ্ঠ নগরী তাহা এই বাজারের জনসমাগম দেখিলেই বোঝা যায়। সহরতলীসহ ইম্ফালের লোকসংখ্যা ১৯৩১এর গণনা অনুযায়ী প্রায় ৯৬ হাজার। আর এই বাজারের ক্রেতাবিক্রেতার সংখ্যা প্রত্যহ ৫ হাজার হইতে ৮ হাজারের মধ্যে। ইহা ছাড়াও ইম্ফাল সহরে আরও ৩।৪টি দৈনিক বাজার আছে। প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের অধিকাংশই মেয়েলোক এবং তাহারা প্রত্যেকেই বিবাহিতা। অনূঢ়া মেয়েদের যদিও অবাধে চলাফেরার কোন সামাজিক বাধা নাই তথাপি রাস্তাঘাটে ও বাজারে তাহাদিগকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। ঐদিন বাজারে একটিও অনূঢ়া বয়স্থা মেয়ে আমার চোখে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহা তাহাদের স্বভাবজাত সুরুচি ও শীলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহার আরও একটি কারণ এই যে পিতামাতা উভয়েই বাহিরের কাজে নিযুক্ত থাকায় গৃহকার্য্যের ভার স্বভাবতই তাহাদের উপর পড়ে। মণিপুরী ভাষায় বিবাহিতা মেয়েকে "মৌ" এবং অবিবাহিতা মেয়েদিগকে "লেইসাবী" বলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক ভাষাতেই অনূঢ়া মেয়েদের যে শব্দে অভিহিত করা হয় তাহা বেশ অর্থপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর। ইংরেজী "maiden" ও বাংলা "কুমারী" উভয় শব্দই কমনীয় ও ভাবব্যঞ্জক। কিন্তু মণিপুরী "লেইসাবী" শব্দটি ভাবে ও ভাষায় ইহাদের আরও উপরে চলিয়া গিয়াছে। "লেইসাবী"র মূলগত (literal) অর্থ "বিকাশোন্মুখ পুষ্প"—blooming flower (লেই=ফুল, সাবী=বিকাশমানা)। মণিপুরী বিবাহিতা মেয়েদিগের মধ্যে সিন্দূর ব্যবহার-প্রথা নাই। কুমারী ও বিবাহিতার বেশভূষায়ও কোন পার্থক্য নাই। তাহাদের মধ্যে একমাত্র প্রভেদ অবিবাহিতেরা চুল বাঁধে না এবং তাহাদের সম্মুখ-ভাগের চুল কপালের উপর হইতে কান পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছাটা। বিবাহের পর চুলকাটা বন্ধ হয় এবং এলো খোঁপা বাঁধা সুরু হয়। বেণী বাঁধার প্রথা এ দেশে নাই। 'ফানেক' এবং 'ইনেফি' বা চাদর তাহাদের সম্পূর্ণ পোষাক। অধিকতর বিলাসী এবং অবস্থাপন্নরা অবশ্য ভেলভেটের জ্যাকেট ব্যবহার করে। আভরণের মধ্যে ছোট বৃত্তাকার একপ্রকার কানের অলঙ্কার; কাহারও কাহারও গলায় স্বর্ণহার এবং হাতে আংটী। অলঙ্কারের অল্পতা পুষ্পাভরণ-



'মাও'এর একটি নাগপল্লী

দ্বারা পূরণ করা হয়। ফুলের মধ্যে চাঁপা এবং পদ্ম বিশেষ সমাদর লাভ করে। উভয় ফুলই মণিপুরে প্রচুর জন্মে। প্রত্যেকের গলায় তুলসীর মালা এবং ললাটে শ্বেতচন্দনের পত্রলেখা। মণিপুরী মেয়েদের ফানেক সামান্য একটু পরিবর্ত্তনে আসামী ভদ্রঘরের মেয়েদের ব্যবহৃত 'মেখলা'তে রূপান্তরিত হইতে পারে। 'ফানেক' অত্যন্ত মোটা এবং স্তনদ্বয়ের উপরিভাগ হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লম্বিত। দক্ষিণ স্তনের উপরে ফানেকের এক প্রান্ত রাখিয়া বামবাহুর তল দিয়া লইয়া পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পুনরায় দক্ষিণ স্তনের উপর দিয়া লইয়া বাম স্তনের নিকট অপর প্রান্তটি গুঁজিয়া রাখে। সুতরাং ফানেকের এক ভাঁজ পিছনে এবং দুই

ভাঁজ সম্মুখে পড়িল। মুসলমান * মেয়েরাও প্রায় একরূপ বেশভূষা ব্যবহার করে; তবে বামস্তনের নিকট না গুঁজিয়া বিপরীত দিক দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া দক্ষিণস্তনের নিকট অঞ্চলপ্রান্ত গুঁজিয়া রাখে। সাধারণ ব্যবহারের ফানেক এবং চাদরের রং সাদা বা ঈষৎ গোলাপী অথবা হরিৎবর্ণের হইয়া থাকে। বিশেষ ব্যবহারের নিমিত্ত মূল্যবান ফানেক নানাবর্ণের ডোরাযুক্ত এবং সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যখচিত পাড়বিশিষ্ট। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু। অনেকের মস্তকে ভারী বোঝা সত্ত্বেও পীঠে ছেলে চাদর দিয়া বাঁধা। কঠিন পরিশ্রমের চাপেও তাহাদের মেজাজ (mood) অনাহত। চোখেমুখে ব্যস্ততার ছাপ আছে কিন্তু দুশ্চিন্তার কালিমা নাই। উঠা বসা চাল-চলনে ক্ষিপ্রতা, সতেজ এবং সপ্রতিভ ভাব।



নাগা মেয়েদের নৃত্য

নম্বুল এবং ইম্ফাল নদীর মধ্যস্থিত সহরের মধ্যাংশের (heart of the town) বিবরণই এ পর্য্যন্ত দিয়াছি। সহরের কেন্দ্রস্থান হইলেও ইহা জনবহুল নহে, বরং বেশ ফাঁকা। এই নদীদ্বয়ের অপর পার দিয়া মণিপুরীদিগের বসতি। এই সমস্ত অঞ্চলই বহু জনাকীর্ণ এবং গৃহসমূহ ঘনসন্নিবেশিত। পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলে মনে হয় অসংখ্য পিঁড়ি পাতিয়া রাখা হইয়াছে। বসতির এই ঘনত্ব ইম্ফাল বা য়ুম্ফাল নাম সার্থক করিয়াছে। য়ুম অর্থ ঘর এবং ফাল মানে পিঁড়ি। সাধারণ গৃহস্থের ঘর খড়ের ছাওনি দেওয়া। প্রত্যেক গৃহের বারান্দায় তাঁত রহিয়াছে। মণিপুরী মেয়ে সকলেই কাপড় বুনিতে জানে। গৃহের দ্বার এবং গৃহস্বামীর খাটের সৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য। অবস্থাপন্ন-মাত্রেরই বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির—তাহাদের নিজ শয়নগৃহ হইতে বৃহত্তর। বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় উৎসব এই মন্দিরসমূহে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সন্ধ্যায় যখন খোল করতাল সহযোগে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনপদাবলী গীত হয় তখন মনে হয়—বাংলা দেশের কোনও দেবমন্দিরের নিকট দিয়া চলিয়াছি।

বাবুপাড়ার নিকটবর্ত্তী ইম্ফাল নদীর পূর্ব্ব তীরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া প্রাচীরবেষ্টিত স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র সুরম্য মণিপুরের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। সিংহদ্বার দিয়া প্রাচীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে ফোয়ারা ও পুষ্পোদ্যান এবং ডানদিকে দরবার গৃহ। রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্‌ভাগে সুরক্ষিত ক্রিকেট খেলার মাঠ। বামদিকে রাজপুরীর অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির এবং তৎসংলগ্ন সুবিশাল নাটমন্দির। গোবিন্দজীর মন্দিরও রাজপ্রাসাদের ন্যায় শুভ্র। মন্দিরের উপরে সুবর্ণমণ্ডিত বৃহৎ গম্বুজদ্বয়ে সূর্য্যকর প্রতিভাত হইয়া দর্শকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়।

ইম্ফাল সহরে উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়া বিশেষ আগ্রহা-কর্ষক আর কিছু নাই। চিত্রার্পিতবৎ ইম্ফাল সহরের সাধারণ দৃশ্যই সমগ্রভাবে দর্শনীয় এবং উপভোগ্য। ইম্ফাল হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী ময়রাং নামক স্থানে অবস্থিত অতি বৃহৎ লোকতাগ হ্রদ একটি দেখিবার মত জিনিস। বর্ষার পর ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল ও প্রস্থে ৫ মাইল হয়। ইহার মধ্যস্থিত শৈলশ্রেণী ইহাকে অধিকতর মনোহর ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই পর্ব্বতসমূহেও লোকজনের বসতি আছে। জলের উপর ধীবরদিগের স্থায়ী ভাসমান কুটীর বায়ুতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ৪০ বর্গ মাইল ব্যাপী সমুদ্রবৎ জলরাশির এবং তন্মধ্যস্থ শৈলরাজির যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে ইংরেজ কবির অনুকরণে বলিতে হয় Moirang looks on the mountains and the mountains look on the sea. মণিপুর উপত্যকায় আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু হ্রদ ও জলাভূমি আছে। অবশ্য গ্রীষ্মকালে ইহাদের অধিকাংশ শুকাইয়া যায় কিন্তু বৃহত্তর হ্রদসমূহে সারা বৎসর ধরিয়াই জল থাকে।

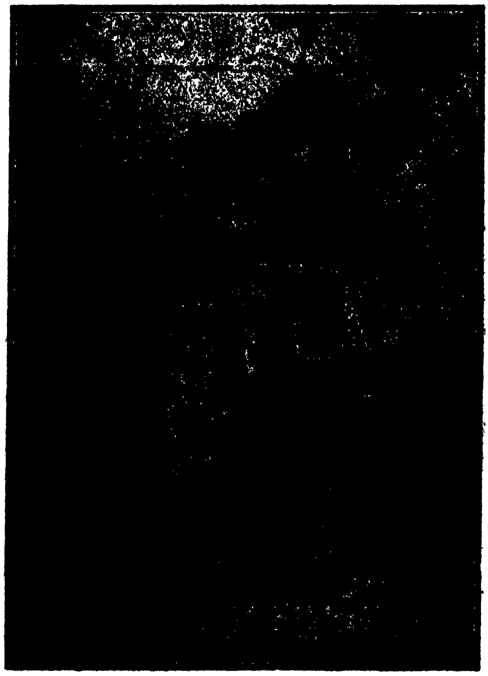
* মণিপুরে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। ইহারা কাছাড় হইতে আনীত মুসলমান বন্দীদিগের বংশধর।

শীতকালে হিমালয় অঞ্চলে অত্যধিক তুষারপাত হেতু মানস-সরোবর প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিয়া নানা জাতীয় হংসবলাকা কাতারে কাতারে এই হ্রদগুলি ছাইয়া ফেলে। মণিপুরে কয়েকটি লবণ হ্রদও আছে। তাহা হইতে মণিপুরের প্রয়োজনীয় লবণ উৎপন্ন হয়।

মৈতৈ সভ্যতার ক্রমবিকাশ

আসামের পূর্ব্ব-সীমান্তে মণিপুর দেশীয় করদরাজ্য অবস্থিত। ইহার উত্তরে নাগাপাহাড়, দক্ষিণে লুসাই পাহাড়, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে কাছাড় জেলা। মণিপুরের বর্ত্তমান আয়তন ৮৬৩৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে প্রায় আট হাজার বর্গমাইল পার্ব্বত্য অঞ্চল। পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্যস্থিত ডিম্বাকৃতি সাতশত বর্গমাইল-ব্যাপী সমতলভূমি মণিপুর উপত্যকা নামে পরিচিত। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণী মণিপুর উপত্যকাকে সুরক্ষিত ও বহির্জ্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র তিনটি পার্ব্বত্য দুর্গম পথদ্বারা উত্তরে নাগাপাহাড়, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে কাছাড়ের সহিত যোগ রহিয়াছে। মণিপুর পার্ব্বত্য অঞ্চলে নাগা ও কুকীদিগের বাস। উপত্যকার উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৬০০ ফিট এবং মণিপুরের সর্ব্বোচ্চ শৈলশৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় দশহাজার ফিট। অতি প্রাচীন-কাল হইতে—কত প্রাচীন কেহ বলিতে পারে না—সাতশত বর্গমাইলব্যাপী মণিপুর উপত্যকায় মৈতৈগণ বা মণিপুরীগণ আপন বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের অনার্য্য নাগা ও কুকীদিগকে পরাভূত করিয়া মণিপুর রাজ্যের সীমা বর্ত্তমান আয়তনে পরিণত করে। তাহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই; উহা জয় করিয়া অধিবাসীদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিত মাত্র। বর্ত্তমানকালেও মণিপুরীদিগের বসতি মণিপুর উপত্যকাতেই নিবদ্ধ। মণিপুরীরা আপনা-দিগকে মৈতৈ এবং মণিপুর উপত্যকাকে "মৈতৈলি াক" (মণিপুরীদিগের দেশ) বলে। আসামের কাছাড়, শ্রীহট্ট, হোজাই, গৌহাটী প্রভৃতি নানাস্থানে, ব্রহ্মদেশে, ঢাকা এবং নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে মণিপুরীদের উপনিবেশ আছে। মণিপুরের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ উপত্যকাবাসী এবং অবশিষ্ট দেড়লক্ষ পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মণিপুরীরা হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় এবং মণিপুরীদের স্বকীয় অক্ষরে (বর্ত্তমানে ইহারা বাংলা হরফ গ্রহণ করিয়াছে) লিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় যে মণিপুর পূর্ব্বে শিবের আবাসভূমি ছিল এবং ইহার প্রাচীন নাম ছিল শিবনগর। এই পুঁথিগুলি মণিপুরী পুরাণ বলিয়া খ্যাত। ইহার ভাষা এত প্রাচীন যে সাধারণের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য; বিশেষজ্ঞ ভিন্ন কেহ ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারে না।



নাগা দম্পতি (কোহিমার আঙ্গামী নাগা)

এই পুরাণে আরও বর্ণিত আছে যে মণিপুর এককালে গন্ধর্ব্বদিগের দেশ ছিল। মহাভারতে কথিত আছে—অর্জ্জুন মণিপুরের গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রবাহন কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। মহাবীর বভ্রুবাহন তাহাদিগের পুত্র। মণিপুরীরা বভ্রুবাহনের বংশধর সুতরাং ক্ষত্রিয়। তাহারা প্রত্যেকে নামের শেষে ক্ষত্রিয় উপাধি "সিংহ" ব্যবহার করে। মণিপুরী পৌরাণিক পুঁথিগুলিতে মূল্যবান ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে নিহিত আছে। পুরাণসমূহে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখিয়া সহজেই অনুমান

করা যায় যে এককালে মণিপুরে শৈবধর্ম্মের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। শিবপুত্র কার্ত্তিক ও গণেশকে "চৈরাপ" ও "গারদ" নামক মণিপুরী বিচারালয়ের দেবতা বলিয়া গণ্য করা হয়। রাজদ্বারে এই দুই দেবতার মূর্ত্তি সংস্থাপন প্রথা শৈবপ্রভাবের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম রাজার নাম পাখাংবা। ইহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী। এই সময়ে 'পলো' খেলার প্রচলন ছিল এবং মুদ্রার ব্যবহার ছিল।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা খগেন্‌বার সিংহাসন আরোহণ মণিপুরী ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। খগেনবার অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকালকে মণিপুরের সুবর্ণযুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; রাজা খগেন্‌বা পুরাতন সমাজ ভাঙিয়া



রথযাত্রা (শ্রীতেজেশ নাগের সৌজন্যে)

তাহাকে নবরূপ দান করেন। মণিপুরের বর্ত্তমান জাতীয় পোষাক খগেনবা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার রাজত্বকালে বহু চীনব্যবসায়ী মণিপুরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মণিপুরের প্রচলিত ধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক মণিপুরীদিগের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাদের নিকট হইতে মণিপুরীরা বারুদ তৈরীর এবং ইষ্টক নির্ম্মাণের প্রণালী শিক্ষা করে। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা খগেনবা মণিপুরে সর্ব্বপ্রথম বন্দুক নির্ম্মাণ করেন। আজিও কুকীদিগের মধ্যে স্বহস্তে বারুদ ও বন্দুক তৈরী প্রচলিত আছে। মণিপুরের সহিত ব্রহ্মদেশ, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সব সময়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। ত্রিপুরারাজ্য বহুদিন মণিপুরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নিয়মিতভাবে মণিপুররাজকে কর দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ গরীব নেওয়াজের রাজত্বকালে মহাপুরুষ শান্তদাস গোস্বামী মণিপুরে রামানন্দী ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই সময়ে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের এবং হনুমানের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। আজিও সেই মন্দিরে নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধর্ম্ম বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরেই মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে বাঙালী বৈষ্ণব-গোস্বামীরা মণিপুরে যাইয়া রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা তাঁহাকে এতদূর মুগ্ধ করে যে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র অকালে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাকী জীবন নবদ্বীপধামে অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পবিত্রদেহ শ্রীবাস ক্ষেত্রে দগ্ধীকৃত হয়। পরবর্ত্তী একশত বৎসরের মধ্যে বর্ম্মিগণ বহুবার মণিপুর অধিকারের চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবারই তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এই সময়ে ব্রিটিশদিগের সহিতও বর্ম্মিদিগের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামস্থ ব্রিটিশ রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত মণিপুরের প্রথম পত্রাদি আদান প্রদান আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ এবং মণিপুর বর্ম্মিদিগের আক্রমণ হইতে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা এবং সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহাই ব্রিটিশের সহিত মণিপুরের যোগাযোগের সূচনা। ইহার পর উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে রাজকুমারদিগের সিংহাসন লইয়া কলহ, রাষ্ট্রীয় অশান্তি এবং সর্ব্বশেষে মণিপুরের এই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটিশের হস্তক্ষেপ এবং তাহাদের সহিত মণিপুরীদিগের সংঘর্ষ ও তাহার শোচনীয় পরিণামের কথা অনেকেই জানেন। মহারাজ কুলচন্দ্র নির্ব্বাসিত হন এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনারেল ইংরাজের বিচারে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীঅষ্টোত্তরশতযুক্ত মণিপুরেশ্বর মহারাজ স্যর চূড়াচাঁদ সিংহজী বাহাদুর কে, সি, এস্, আঁই, সী-বি-ই, ভক্তরাজর্ষি, শ্রীকুঞ্জ সেবাবিনোদ, ধর্ম্মপালক, বীরচূড়ামণি, গৌরভক্তিরসার্ণব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি স্বনামধন্য

মহারাজ গরীব নেওয়াজের প্রপৌত্র-মহারাজ নরসিংহের প্রপৌত্র। ইনি আজমীর মেয়ো কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। মহারাজ চূড়াচাঁদসিংহের রাজত্বকালে কি শিক্ষায় কি বাণিজ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে মণিপুরের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহের রাজ্যভার গ্রহণের অনতিকাল পরেই নাগা ও কুকীরা কয়েকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি দক্ষতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়া মণিপুরে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইম্ফাল সহরে ২৩টি নিম্ন-প্রাথমিক, ৪টি উচ্চ-প্রাথমিক, ৪টি ছাত্রবৃত্তি (মাইনর) ও পাঁচটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এতদ্ভিন্ন মণিপুর উপত্যকা ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে আরও ১৬১টি প্রাথমিক এবং একটি মাইনর স্কুল আছে। ৫টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মেয়েদের এবং একটি বাঙালী ছেলেদের স্কুল। এই স্কুলে শিক্ষার বাহন (medium) বাংলা ভাষা। "বেঙ্গলী হাই স্কুল" মহারাজার আন্তরিক সহানুভূতি এবং যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য লাভ করিতেছে। মণিপুরে প্রাথমিক স্কুলে বেতন লওয়া হয় না কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নহে। শিক্ষানুরাগ বৃদ্ধির জন্য বহু বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইম্ফাল সহরে ষ্টেট্ সেনানিবাস, জেল এবং রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন হাসপাতাল ভিন্ন একটি সুবৃহৎ জেনারেল সিভিল হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন প্রায় ২৫০ রোগীকে এখান হইতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। কুষ্ঠাশ্রমে কুষ্ঠ-রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। Vaccine সহযোগে Anti-rabic চিকিৎসারও উত্তম ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিকযুগের জীবনযাত্রার উপাদানসমূহের অভাব ইম্ফাল সহরে নাই। বৈদ্যুতিক আলো, কলের জল, প্রথম শ্রেণীর রাস্তাঘাট, থিয়েটার, টকি-হাউস প্রভৃতি সমস্ত সুবিধাই মণিপুরীরা ভোগ করিতেছে। ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র State public Works Department রহিয়াছে।

মণিপুরের শাসনকার্য্য এবং রাজ্য পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে মহারাজার ইচ্ছাধীন। পাঁচজন সভ্য লইয়া গঠিত মণিপুর-দরবার মহারাজাকে সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একজন আই-সি-এস্ কর্ম্মচারী ধার লইয়া মণিপুর দরবারের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। ইহার বেতন ষ্টেট্ বহন করে। দরবারে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ মহারাজার অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ষ্টেটের ছোটখাট বিচারকার্য্য সদরপঞ্চায়েৎ এবং চৈরাপে হইয়া থাকে। ইহারা আমাদের দেশের Court of small causesএর সমতুল্য। দরবার ষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। সদর পঞ্চায়েৎ হইতে চৈরাপে এবং চৈরাপ হইতে দরবারে আপীল হইয়া থাকে। পাহাড় অঞ্চলের



রাসনৃত্যে গোপীবেশে মণিপুরী মেয়ে
(শ্রীতামাচৌ সিংহ এম-এ'র সৌজন্যে)

বিচারভার সব্‌ডিভিসনাল অফিসারদের উপর ন্যস্ত। সবডিভিসনাল অফিসারের কোর্ট হইতে প্রেসিডেণ্টের নিকট আপীল হইয়া থাকে। সবডিভিসনাল অফিসারের ক্ষমতা ব্রিটিশ-ভারতের প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সমান।

ইম্ফালে একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট থাকেন। ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি—ষ্টেট্ এবং গবর্ণমেণ্টের পত্রাদির আদানপ্রদান ইঁহার মারফত হইয়া থাকে।

মণিপুরীদিগের বর্ণ গৌর, দেহ বলিষ্ঠ এবং নাতিদীর্ঘ। মণিপুরী মেয়েদের মত ইহারাও পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, প্রাণবন্ত, আমোদপ্রিয় ও রসিক (witty)। জাপানী

শিল্পপ্রতিভা ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে এবং ইহাদের রুচি ও কৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর অনুরূপ। কুটীর শিল্প এবং চাউলের ব্যবসাই ইহাদের একমাত্র উপজীব্য। মণিপুরী মেয়েদের তৈরী কাঁথা, পরদা, বিছানার চাদর, পাগড়ী প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। তাহারা নানাপ্রকার পরদা সাহেবদিগের রাত্রির পোষাক আলখাল্লা প্রভৃতি তৈরী করিয়া সুদূর বিলাতেও চালান দিতেছে। তাহাদের তৈরী হাতীর দাঁতের লাঠি ছড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাহাদের এই উদ্যমে বিদেশের সহিত মণিপুরের বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে



১০ খাম্বা ও থইবীর মন্দির সম্মুখে নৃত্য (মণিপুরী শিল্পী অজ সিংহ অঙ্কিত চিত্রের ফটো)

তাহাদেরও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির উপরই মণিপুরের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। মণিপুরীরা কাঁসার বাসনও উত্তমরূপে তৈরী করিতে পারে। মণিপুরের চিঁড়াও প্রসিদ্ধ। মণিপুর হইতে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় চারিলক্ষ মণ এবং ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ মণ চাউল ও চিঁড়া বাহিরে রপ্তানি হইয়াছে।

মণিপুরীরা রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ। বৈষ্ণব-আচারনিষ্ঠা ইহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। মহারাজা বৃন্দাবনে এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নবদ্বীপের মন্দির চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত এবং ইহা নবদ্বীপে 'সোনার মন্দির' বলিয়া খ্যাত। নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের সুধীসমাজ মহারাজার ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নানা উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। রাজবাড়ীতে এবং অবস্থাপন্ন মণিপুরীদিগের গৃহে সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দোলযাত্রা মণিপুরীদিগের সবচেয়ে বড় উৎসব। উৎসবের বহুদিন আগে হইতেই তাহারা শুভ্রবসন পরিধান করিয়া মন্দিরে মন্দিরে হোলি গান গাহিতে থাকে। দুর্গোৎসবে বাঙালীদের যেমন ধূম হয় দোল উৎসবে মণিপুরীদের সেইরূপ আনন্দ। দোলপূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়দিন পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষগণ প্রাঙ্গণে হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে গীতসহকারে নৃত্য করিতে থাকে। কোনও প্রাচীন রাজার কীর্ত্তিকাহিনী এই গানগুলির বিষয়বস্তু। একজন গায়ক পদের প্রথমাংশ সুর করিয়া আবৃত্তি করে এবং সকলে মিলিয়া অবশিষ্ট পাদপূরণ করে। এইভাবে তাহারা তালে তালে পা ফেলিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। এই নৃত্যের নাম "কে-ক্রে-কে" বা "থাবাল চোংবা" (থাবাল = চন্দ্রালোক, চোংবা = নৃত্য)। বোম্বাই অঞ্চলের "গরবা" নৃত্যের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক প্রচলিত ব্রতচারী নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মণিপুরী রাসনৃত্য অপূর্ব্ব।

দোলের অব্যবহিত পরেই মণিপুরী পুরুষ ও রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় চারণের মুখ হইতে খাম্বা-থৈবীর দুঃখপূর্ণ করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী প্রেমকাহিনী শ্রবণ করে। এই কথকতার নাম "পেনা-তাবা"। চারণের হাতে একটি নারিকেলমালা গ্রথিত এবং ঘোড়ার লেজযুক্ত একতারার ন্যায় একটি বীণা থাকে, ইহার নাম পেনা।

মাঝে মাঝে এই বীণা ঝঙ্কৃত করা হয়। এই গাথাগুলি এত বড় যে প্রতি সন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন ক্রমাগত ৩।৪ ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়াও ইহা সম্পূর্ণ করিতে ২০।২৫ দিন লাগে। খাম্বা ও থৈবীর প্রেমকাহিনী ইহার মূল বিষয়বস্তু হইলেও তৎকালীন রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, রাজসভা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা ইহাতে আছে। কাহিনীর একঘেয়েমি দূর করিবার নিমিত্ত এবং শ্রোতাদিগের শোকাভিভূত মনকে লঘু করিবার নিমিত্ত dramatic relief হিসাবে মাঝে মাঝে হাস্যকর ঘটনা (Comic Interlude) সংযোজিত আছে।

মণিপুরীদের মধ্যে গন্ধর্ব্বমতে "love marriage" এবং বৈদিক মতে বিবাহ তুই-ই প্রচলিত আছে। পুরুষ ও মেয়ে পরস্পরে ভালবাসা হইলে পুরুষটি মেয়েকে একরাত্রে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে মেয়ের অনুমতি আছে জানিতে পারিলে সমাজ তাহাদের এই মিলনকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করে। দরিদ্রদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এই বিবাহই প্রচলিত কারণ ইহাতে কোনও প্রকার অযথা অর্থব্যয় নাই। ধনিকেরা ছেলেমেয়ের বিবাহ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী স্থির করে। সম্বন্ধ পাকাপাকি করিবার পূর্ব্বে বরপক্ষ হইতে কনের গৃহে কোনও কিছু উপলক্ষ করিয়া ৩ বার পান এবং মিষ্টদ্রব্যাদি পাঠান হয়। তৎপর প্রাথমিক কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া আত্মীয়বর্গকে জানান হয়। বিবাহরাত্রে সভামণ্ডপের মাঝখানে বরকনেকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের চাদরের খুঁট বাঁধা হয়। তৎপর মালাবদল এবং সপ্তপ্রদক্ষিণ হয়। পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে। ইহার পর বরকনে রান্নাঘরে প্রবেশ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টান্ন এবং পান খাওয়াইয়া দেয়। বিবাহ কন্যাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় এবং ছয়দিন পর একটি বিরাট ভোজে বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন রীতি পান-তাম্বুল উপহার দিয়া নিমন্ত্রণ প্রথা মণিপুরে এখনও প্রচলিত।

মণিপুরীরা খেলাধূলা অত্যন্ত পছন্দ করে। বীরোচিত এবং অত্যন্ত পরিশ্রমজনক খেলাই মণিপুরীদের জাতীয় খেলা—তন্মধ্যে কাংজাই, কুস্তী এবং পলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাংজাই কতকটা 'হকি' খেলার ন্যায়। বাঁশের গোড়া কাটিয়া বল তৈরী হয় এবং হকির মত গাছের ডাল কাটিয়া বা কাঠদ্বারা ঐরূপ তৈরী করা হয়। প্রতি দলে ৯ জন খেলোয়াড় থাকে। খেলার সময় বল হাতে লইয়া গোলের দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হওয়া যায়; আবার 'বল'-বহনকারীর নিকট হইতে বল কাড়িবার জন্য সময় সময় কুস্তী বাধিয়া যায়। এই খেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাংজাই অথবা বক্র লাঠি মাথার উপর ২।৩ বার ঘুরাইয়া লইয়া যখন বলের উপর আঘাত করা হয় তখন ঐ চলমান বল কাহারও গায়ে লাগিলে তাহার অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

'পলো' খেলাও এইরূপ বিপজ্জনক। বহুদিন হইতে মণিপুরে পলো খেলার প্রচলন আছে। অনেকে বলেন পলো খেলার উদ্ভাবক পারস্য দেশ। ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন বেশীদিন ধরিয়া নহে। কাজেই ইহা ধারণা করা যায় যে নিশ্চয়ই পারস্য হইতে মণিপুরে এই খেলার আমদানী হয় নাই। মণিপুরীদের ইহা সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং জাতীয় খেলা। মণিপুর পলো খেলার জনক বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও—একথা স্বীকার্য্য যে মণিপুর হইতে এ খেলা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে।

বাঙালী ও মণিপুরীর ঘনিষ্ঠতার কারণ যথেষ্ট আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসামের দুর্গম বনগিরি অতিক্রম করিয়া বাঙালী প্রচারক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী, কুঞ্জবিহারী…,নিধিরাম আচার্য্য এবং রামগোপাল বৈরাগী মণিপুরে আসিয়া সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার পর গম্ভীর সিংহ এবং নরসিংহের রাজত্বকালেও বরাহনগর, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙালী ব্রাহ্মণগণ মণিপুরী উপাধি গ্রহণ করিয়া মণিপুরে বসতি স্থাপন করে। মণিপুরী ব্রাহ্মণগণ ইহাদেরই বংশধর। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া মণিপুরী ও বাঙালীর প্রাণে প্রাণে যে যোগসূত্র গ্রথিত হইয়াছে তাহা কেহ খুলিতে পারিবে না। মণিপুরীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বাংলার গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি নবদ্বীপ ধাম, আসামের ৺কামাক্ষ্যা নহে। মণিপুরীদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রসাস্বাদ এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণলীলামাধুরী যতদিন তাহারা উপভোগ করিতে চাহিবে ততদিন মণিপুরীদের বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় থাকিবে।

ময়ূর-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মিলনী এই সব কথাই ভাবছিল। একবার উঠল। সবুজ আলোটাও যেন চিন্তাকে বাধা দিচ্ছে। মানুষের মন, বলা ত যায় না। এইটাই কি কারণ···তাই কি? কিন্তু সে রাত্রে ত' খুব হাসি ঠাট্টা করলে। মানব কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ছিল। কেন? তাঁর মনে কি তবে এইখানেই সন্দেহ? সে কি? কিন্তু মানব সেই ঘটনার পর থেকে আর বড় একটা এ বাড়ীতে আসেনা। ঘুম আর এল না। অন্ধকার ঘর—জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভোরের আলো এসে পড়েছে ঘরে। তারি আভায় ভোলার আঁকা জয়ন্তর ছবি—তেলরঙে আঁকা —মুখের একটা পাশ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিলনী খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে—হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে— বলে উঠল:

ওগো আমায় ত্যাগ কর না, ত্যাগ কর না···আমি যে শুধু তোমারই—কি আমার ভুল হয়েছে বল, তুমি, তুমিই তা শুধরে দাও।

ওই ঘটনার কিছুদিন পরে ভোলা একদিন মিলনীকে বলেছিল:

"দিদি! এমন করে জয়াকে আঁচলে গেরো দিয়েছ— গেরো খুলবে না বটে, কিন্তু আঁচল না ছেঁড়ে—ভাই ভাবি।"

আজ মিলনী সেই কথাটার অর্থ বুঝতে পারলে। খুলে গেল—না, আঁচল ছিঁড়ে চলে গেল। একটু পরেই ভোরের কাকলীতে বাগান ও বাড়ী মুখর হয়ে উঠল।

কয়েক মাস ধরেই মিলনীর এইভাবে একলা ঘরে দিন কাটছে। মুখ ফুটে সে কারো কাছে কোন কথা বলতে পারে না। কেননা বছরেক কাল ধ'রে সে সংসারের প্রায় সকল লোকের সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করেছিল। সন্ধ্যার বৈঠকে যখন জয়ন্ত কাব্যচর্চ্চা করত—সাহিত্য আলোচনা চলত, সে বৈঠকে শুধু বেশীর ভাগ এই দুই বন্ধু ছাড়া আর কারও স্থান ছিল না। স্কুল কলেজের পড়ুয়া কোন বান্ধবীর সঙ্গেও মিলনী বিশেষ কোন মেলা-মেশা রাখে নি। সন্ধ্যায় দেখত বায়স্কোপ সিনেমা, রাত্রে শুনত গান—কখন বা নিজে গাইত। পাখীর বাসা-বাঁধার মত বাসা-বেঁধে দু'জনে সেই বাসা আঁকড়ে বসেছিল, যেন এক জোড়া কপোত। আজ সে নীড় ছেড়ে একটা পাখী কোথায় কোন বনানীর অন্তরালে, কোন দূরে চলে গেল। সে নীড়টা আজ ফাঁক। মিলনীর কাছে সেই নীড়টা শুধু ফাঁকা বলে মনে হচ্ছিল না—সমস্ত জগৎটাই যেন ফাঁকা—সর্ব্বত্র খালি, বাইরে ভেতরে— সবই খালি।

আবার ঘুরে ফিরে জয়ন্তর চলে যাবার সময়ের কথাটায় তার প্রাণটা জলে-জলে উঠছিল: তবে কি তিনি আমায় সন্দেহ করেন। আমার ওপর সন্দেহ···এর চেয়ে যে মরা ভাল ছিল! তিনি শুধু আমার নারীত্বকে অপমান করেন নি—আমার আত্মা, আমার দেহ, আমার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত অপমান করেছেন। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন না কেন? আমার সত্য কথা বলবার দুঃসাহসের'ত অভাব নেই।"ভেতরটা জলছে"—কেন জলছে? জলার কাজ ত আমি কিছু করি নি। তুমি যদি মানুষ হ'তে, তাহ'লে বুঝতে আমার ভেতরেও কি দাহ!···না—না—না, আমা ছাড়া আর কার' সম্পর্কে তুমি কখনও আসতে পার না।

হায়, মানুষের মন, আর তার আসঙ্গ লিপ্সা, সুখ-ভোগের সাধ, আর কাম্য কামায়ন। সুখভোগ করতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে যাই যে—সেই সুখের ভোগ আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়, অভ্যাস আমাদের স্বভাবে অঙ্গাঙ্গীযুক্ত হ'য়ে যায়। যখন সেই ভোগস্পৃহা জীবনের সব চেয়ে বড় কাম্য হয়ে ওঠে, তখন জীবনের আর কোন লক্ষ্যই থাকে না। সে অভ্যাস ক্রমে নেশায় পরিণত হয়ে আসে, তখন ওই নেশা না-করা ছাড়া মানুষের আর কোন গতি থাকে না। অথচ নেশাটা যে জীবন নয়, তা মানুষ ভুলে যায়।

এই একমুখী ভোগ স্পৃহাই তাদের জীবন-দোলায় থামা খেয়ে গেল। তাই তাদের এ বিরহ-বিচ্ছেদ।

জয়ন্তও যে এই একই অবস্থায় পড়ে এ বিরহ-বিচ্ছেদের পথে এসে দাঁড়াল, ঠিক সবটাই তা নয়। জয়ন্ত

পিতৃ-মাতৃহীন ধনীর সন্তান। তার খুড়া সুজনবাবু তাকে মানুষ করে তোলেন। জয়ন্ত কবি, রসভোগাতুর কবি—রূপে-গুণে, বিত্তায়-ধনে, যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর আটকে বাঁধা হয়ে আছে। এমন সময় মিলনীর সঙ্গে হ'ল তার বিয়ে।

ছেলে-বেলা থেকেই সে সুখে-স্বচ্ছন্দে লালিত-পালিত; অভাব বলে যে কোন বস্তু আছে, কোন দিন সে জানতেই পারে নি। বাপ-মা না থাকার যে অভাব তা সুজনবাবু ও তাঁর স্ত্রী, জয়ন্তর খুড়িমা, কোন দিন সহজে তাকে কোন রকমে বুঝতে দেন নি। অথচ একটা জিনিষ তার বরাবর ছিল—পরের জন্য দুঃখবোধ। কেউ প্রার্থী হলে, সে কখন তাকে ফেরাত না। বন্ধু-বান্ধব পরিচিত-অপরিচিত যে কেউ তার কাছে প্রার্থী হত, সে কখন তার কাছ থেকে রিক্ত হাতে ফেরে নি। সে দানের মধ্যে এমন একটা সংগোপন ছিল যে মিলনী বা দাওয়ানজী, এমন কি সাধুচরণ খানসামাও কোন দিন তা টের পায় নি। স্বদেশীর পাণ্ডারা অনেক অজুহাতে তার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে গেছে হাজারে হাজারে। কেউ চরকা, কেউ কল, কেউ মেয়েদের স্কুল, মঠ-মন্দির, নারীরক্ষা বলে বহু অর্থ তার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। কেউ কোন কাজ করে নি, সরে পড়েছে; কেউবা চেষ্টা করতে গিয়ে লোকসান দিয়েছে—শেষে বড়লোকের ছেলে অপয়া বলে জয়ন্তকেই গাল দিয়েছে। স্কুল-কলেজে গরীব ছাত্রদের অর্থ দিয়ে, বই দিয়ে, পরিধেয় কাপড় দিয়ে, কারও কারও মেস-খরচা দিয়ে সাহায্য করে এসেছে। কিন্তু তার স্বভাবের মধ্যে কি একটা ছিল—যে কোন লোকই তাকে বেশী দিন সহ্য করতে পারত না। যারাই তার কাছে উপকৃত হয়েছে, তারাই সাধারণতঃ তাকে নিন্দা করেছে। বলেছি যে এই অর্থ সাহায্য করাটাও তার একটা বড়-মানুষীর—আভিজাত্যের অহংকার। এমনি করেই সে উঠেছিল গড়ে। এত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একমাত্র ভোলা কখন তার অসাক্ষাতে নিন্দা করেনি—কখন তার সঙ্গ ছাড়ে নি। এক শুধু ভোলাই জয়ন্তর সুখ-দুঃখ বন্ধুর মত ভাগ করে নিয়েছিল।

জয়ন্তের প্রখর ধীশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে অতিরিক্ত ভাব-প্রবণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে মন কষাকষি, এই যে কলহ, এর উদয় যে কোন্ হেতু, তা জয়ন্ত কোন দিনই প্রকাশ করে বলেনি। গোলটা বাধল নাটকখানার অভিনয়ের পর থেকে। নাটকখানা যখন অভিনয় হল তখন মিলনী ও জয়ন্তর অপূর্ব্ব আনন্দ। থিয়েটারের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা ও প্রযোজক জয়ন্তর এই বই নিয়ে অভিনয় করলেন। বই সাধারণের কাছে সুখ্যাতি পেলে না, থিয়েটারে আশা অনুরূপ ফল হ'ল না বলে থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তারাও বিরক্ত হলেন। আসলে সত্যিই নাটকখানা জমে উঠল না। দর্শকেরা—অর্থাৎ সাধারণ দর্শকেরা মুগ্ধ হতে পারে নি। অভিনেতার দলও মনক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁরা প্রযোজককে বললেন, আমরা তখনই বলেছিলাম যে এসব পণ্ডিতি নাটক কাব্যের দিন চ'লে গেছে—আপনি ত শুনলেন না। কেন এবং কার দোষে যে নাটকের সাফল্য হল না, সেকথা কেউ আলোচনা করলে না—তাঁরা লেখক জয়ন্তর ওপর বিশেষ বিরক্ত হলেন। কেননা আসল কথা হ'ল, বই ভালমন্দ নিয়ে নয়, আসল হ'ল টাকা। এ নাটকের অভিনয়ে তাঁরা তা বিশেষ কিছুই পেলেন না।

জয়ন্ত ভোলাকে বললে:

"দেখ ভোলা! তারা নিজেরা পারলে না অভিনয় করতে, দোষ হ'ল নাটকের।"

ভোলা হাসতে হাসতে বললে:

"অর্থাৎ নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।"

"না, তা বলচি নি; আমার কি মনে হয় জানিস, মানুষ চরিত্র-হীন আর মদ্যপ হ'লে কোন কাজ তার দ্বারা হয় না।"

"অর্থাৎ আমাকে ঘুরিয়ে গাল দিচ্ছিস? তা কথাটা জয়া আমার মনে ঠিক লাগল না। মাতাল বলে তোর প্রডিউসার যদি বিফল হয়ে থাকে—সেটা মদের দোষ নয়, তার শক্তির অভাব। কিন্তু অন্য লোকের বই ত সে-ই জমিয়েছে—নাম ডাক ত' তার কম নয়?"

"এ রস ফোটানর শক্তি তার নেই···"

"অর্থাৎ রসের পাক সে জানে না, তাই ভিয়েনের কড়ায় রস ধরে গেছে—ভাল, তা তুই কি করতে চাস শুনি।"

"আমি নিজে অভিনয় করব।"

"তা মন্দ কথা নয়—রবিঠাকুরও নাচেন। মহাজনেরা যা করেন, সেই পথেই ত চলতে হয়। তা কাদের নিয়ে থিয়েটার করবি শুনি?"

"তুই সব ঠিক কর, আমি দল বসিয়ে থিয়েটার করব—

নিজে রিহার্স্যাল দেওয়াব। তুই সিনারির productionএর ভার নে—আর আমি—গড়ে তোলবার ভার নেব।"

"কাজটা দেখছি খুবই তা হলে সুবিধের হবে।"

বলেই ভোলা হঠাৎ কৃষ্ণকমলের রাই উন্মাদিনীর গান ধরলে :

(সখি ! আমায় যেতে যে হবে গো
রাই বলে বাজিলে বাঁশী)—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিব···
সখি ! আমায় চলতে যে হবে গো—
বঁধুয়া লাগি পিছল পথে···

জয়ন্ত হাসলে, সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্ত ভাবে বললে :

"কি ন্যাকাম করছিস্।"

"ন্যাকাম নয় ধনমণি! শুধু ভোলারায়ের মদের খরচ বাড়বে—তুই(ই) যোগাবি···তবে তোর টাকা আছে দু-চার লাখ ছিনি-মিনি খেলতে চাস কেন? বারণ ত শুনবি নি, ও তোর কুষ্ঠিতে নেই···পথ অতি পিচ্ছিল···কাজ কি ভাই··· হড়্কাতেও পারে তলিয়েও যেতে পারিস—সে ভরসাও আছে।"

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে :

"তুই আমাকে কি পেয়েছিস?"

"একটা আস্ত···গ আর ধ বলব না···কেননা তুই first class-first···"

"ও সব বাজে কথা রাখ···"

"হুঁ! তা এ বুদ্ধিটা দিলে কে—বোনটি বুঝি···?"

মিলনী পাশে বসেছিল : সে বললে :

"না ভোলাদা···আমি বলি নি : "

"বলনি?"

"মাগো! তুমি কি! কখন বললাম। শোন ভোলাদা, আমি বলেছি যে তোমার producer যে মাতাল—অন্য কাকেও দিয়ে বইখানা play করাও···অমন চমৎকার বই···"

"দিদি তোমার শত্রুকে এ উপদেশ দিলে মন্দ হ'ত না—কিন্তু···"

জয়ন্ত বললে :

"দেখ ভোলা, ও সব বাজে কথা রাখ—তুই কালই এ বিষয়ে বন্দোবস্ত কর্। ওই যে হাউসটা খালি আছে, সেইটে ভাড়ার বন্দোবস্ত কর্···আর দেখ ওই যে অল্পবয়সী মেয়েটা আছে, যেটা সখি সেজেছিল, বেশ গান গায়, ওকে দিয়েই আমি সুরঙ্গমার পার্ট করাব।"

মিলনী কি একটা কাজে হঠাৎ কোন কথা আর না বলে অন্য ঘরে চলে গেল। ভোলা সেইদিকে তাকিয়ে বললে "হুঁ! হুঁ!···"

"কি হুঁ হুঁ করছিস বলনা···"

"দেখ ভাই, ওটি রাঘব-বোয়াল—আড়ে খায়। ল্যাজের ঝাপটায় তলিয়ে যাবি ভাই।"

"কেন মেয়েটা বেশ দেখতে না?"

"তাও নজরে লেগেছে দেখছি।"

হঠাৎ ভোলা চেঁচিয়ে উঠল: "দিদি! দিদি! ও বোনটি···!"

"কি ভোলাদা, আমায় ডাকছ?"

"হ্যাঁ দিদি! দু-দশটা টাকা জয়ার কাছে নিই—আর কোন শত্রুতা ত' কখন করি নি···তোদের ত অনেক আছে বোন্—শেষ আমার নেশা না ছাড়িয়ে জলগ্রহণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছ?"

মিলনী অবাকভাবে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বললে : "কেন ভোলাদা—আমায় এ সব···বলছ?···আমি এর কিচ্ছু জানি নে।"

এর কিছুদিন পরেই পুকুরঘাটে মাছধরার ওই ব্যাপারটা হয়ে গেল। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মিলনী তাকিয়ে দেখলে ভোর হয়ে গেছে। চারিদিকে আলো।

জয়ন্ত ভোলার বারণ ও বাধা মানল না। চটে গিয়ে একদিন বললে, "তুই যদি না করিস তবে আমি নিজেই সব করব।"

থিয়েটারের দল খোলা হল। হাউস নেওয়া হল। জয়ন্ত জলের মত অর্থ ব্যয় করতে লাগল। যে মন এতদিন জগৎ-সংসারকে দূরে রেখে মিলনীকে নিয়ে খেলা করছিল, আজ সে জগতের সম্পর্কে এই ভাবে এসে, কালের রঙ্গমঞ্চকে গণ্ডী দিয়ে ছোট করে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে নিলে।

এমন একটা সমাজের মধ্যে জয়ন্ত এসে পড়ল যে, যে-সমাজ সে কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারে না। স্ফটিকে যেমন জবার রঙের আভা পড়লে স্ফটিক লাল দেখায়,

তেমনি এই সব নতুন করে, দল করে, অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে রস-বিচার ও রসের খেলা দেখাতে গিয়ে, স্ফটিকের মত শুভ্র জয়ন্তকে রাঙিয়ে দিলে। যে বিশ্বাস, যে আনন্দ মিলনীর সঙ্গলাভে ও প্রেমের মধ্যে পেয়েছিল, যে জীবন-ধারার গতির মাঝে নিজের ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলতে গেল, সেটা অন্তহীন দোলার মাঝে শুধু একটা মুহূর্ত্ত—একবার এ-দিক—একবার ও-দিক। ব্যক্তিত্ব সেখানে জলের ফেনার মাথায় বুদ্বুদ মাত্র। সে যদিও বুঝতে পারলে যে, এটা মিলনীর জগৎ নয়—এ এক অতি বিচিত্র, অতি মনোরম, অথচ এত কদর্য্য যে মানুষ এখানে তিলমুহূর্ত্ত থাকতে পারে না; তবুও খেয়াল, তবু জেদ, অভিনয়ের স্পৃহা তাকে সে স্থান ত্যাগ করতে দিলে না।

দিনের পর দিন, অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অন্য থিয়েটার থেকে অভিনেত্রী ভাঙিয়ে আনে, টাকা ঢালে, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হয় না। যত অভিনয়ের ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল, ততই মিলনীর রূপ ও গৃহ-রঙ্গমঞ্চ দূরে সরে যেতে লাগল। ফল হ'ল এই যে, মিলনী রইল ঘরে পড়ে, আর জয়ন্ত শুধু সুরঙ্গমার পার্ট অভিনয় করবার কৌশল শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সময় ও সুযোগ পেয়ে জয়ন্তর ব্যক্তিত্বটাকে হাতের মুঠির মধ্যে ধরে মীনা মীন-কেতনের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলে।

ভোরবেলা ঘর থেকে বের হতেই মণি-ঝি এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। চিঠিখানা জয়ন্তর হাতে লেখা।

চিঠিতে লেখা আছে "আমার কাপড়-চোপড় সাধু-চরণকে দিতে বলবে। আমি অনেক ভেবে দেখলাম যে, আমাদের উভয়ের ছাড়া-ছাড়ি' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সেই একমাত্র সহজ উপায়।

ইতি···জয়ন্ত"

চিঠিখানা পড়ে জয়ন্তর হাতের লেখা নাম দেখে মিলনীর মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে নেমে মুখখানা সাদা কাগজের মত করে দিলে। সে কাঁপতে কাঁপতে মাটীতে বসে পড়ল। চোখের ওপর যেন একঝলক আঁগুন কে ঢেলে দিলে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা জলন্ত তামার কটাহের মত বোধ হল। কানে কোন শব্দ পৌঁছল না; ঘরদোর বাড়ী সব চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। খানিক পরে নিশ্বাস ফেলে বললে:

"আচ্ছা···আচ্ছা···আমার তবে কোন দামই নেই। সত্যই ত', এত কিসের মায়া! মেয়েমানুষের ভাগ্য কি চিরদিন ধরে পুরুষের হাতেই ওলটপালট হবে? আমি কি পুতুল নাচের পুতুল···আমার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই? আমি এত আরতি করে যে প্রদীপ জ্বেলেছিলাম, তুমি পুরুষ বলে তোমার পূজা করি বলে এক ফুঁয়ে সে প্রদীপ তুমি নিভিয়ে দেবে? দেখি ভাগ্য তবে কার হাতে?"

মিলনী সবলে উঠে দাঁড়াল। চিঠি পাবার পর মনে যে আকস্মিক আঘাত লাগল সে আঘাত উল্টো প্রতিক্রিয়া করে তাকে ক্ষুব্ধা রুষ্টা সিংহিনীর মত সবল করে দিলে। চিঠির কাগজ নিয়ে চিঠির উত্তর লিখলে:

"তোমার পত্র পেয়ে আমিও নিষ্কৃতি পেলাম"

মণিকে ডেকে চিঠিখানা দিয়ে বললে: "যে চিঠি নিয়ে এসেছে তাকে দিয়ে আয়, আর সাধুচরণকে বল, যে তাঁর কি সব কাপড়-চোপড় চেয়েছেন, পোষাক-ঘর থেকে বার করে দিতে···"

মণি বললে: "কাপড়-চোপড় পাঠিয়ো না বৌদিদি··· গাড়ী পাঠিয়ে দাও—ডেকে পাঠাও। ওমা! সোয়ামীর ওপর কি রাগ করে গা?···ঘর করতে গেলে অমন কত হয়—পুরুষ মানুষের ভেড়ার মত আলোচাল দেখে মুখ চুলকোনো স্বভাব···"

মিলনী এক ঝাঁকারি মেরে উঠল: "তোকে যা বলছি, তাই করগে···তোর অত কথার কি দরকার?"

মণি-ঝি চলে গেল।

মিলনীর অবস্থা তখন বনের শুখ্‌না গাছের মত, ভাব ও কথার ঘর্ষণে দাউ-দাউ করে দাবানল জ্বলে উঠেছে। কল্পনার প্রতি রেখাঙ্কনে প্রলয়ের বহ্নি-শিখা লকলক্ করে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, যাক্ ভালই হয়েছে, আমার স্বাধীনতা ফিরে এল। সত্যই ত কিসের ভালবাসা, কিসের প্রেম, কিসের বিয়ে···এ ত' সমাজের জোর-করা শেকল —এর কোন মানে নেই, কোন মূল্য নেই। য়ুরোপে ত' কত ডিভোর্স হচ্ছে, হোক্ তবে তাই হোক, ছাড়াছাড়িই হোক্।

একদিকে তার এই জ্বলন্ত রাগের অগ্নি-দাহন, অন্যদিকে ফুটন্ত অনুরাগ, অন্তরের ভিতরের অনুরাগের যে-মায়া,

সে-আত্মা কান্নাকে আশ্রয় ক'রে বুকের ভেতর থেকে শতধা হয়ে ফেটে বার হয়ে আসছে।

সে যেন কণ্ঠের কাছে এসে কণ্ঠকে রোধ করতে চায়। মিলনী সেই কান্নাটাকে চেপে আগুনের খেলা খেলবার জন্যে নিজেকে সোজা খাড়া করে তুললে। বড় ঘরের মেয়ে, আজকের লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, যে কখন কোন আঘাত পায় নি, এ আঘাতে তার ফণা তুলে উঠল। পদ্ম-গোখরোর বিচিত্র ফণার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রোষ-বহ্নি-জ্বালা-ভরা গর্জ্জন উঠল। মন্দার ঘর্ষণে যেমন কালকূট উঠে—এও তেমনি···।

জয়ন্ত মীনাকে নিয়ে বাইরে যে নাটকের মহলা দিতে ব্যস্ত হ'ল, যে অভিনয়-রূপ রূপসিন্ধু মন্থন করে লক্ষ্মী-শ্রী আনতে গেল, তাতে উঠল শুধু বিষ। বাইরে স্বরচিত কল্পিত নাটক যত জাগ্রত রূপ নিয়ে সজাগ হতে লাগল, ঘরে জীবন-স্রোতের মাঝে মিলনী আর একটা নাটককে ততই সজাগ করে তুললে। সেখানে সেটা অভিনয় নয়—সত্য। যেটার ওপর রূপাভিনয়ের আরোপ করেছিল, সে রূপ যে স্বরূপে আসবে, সে আভাস খেয়ালের বশে স্বপ্নেও জয়ন্তর চোখের 'পরে এল না।

শুধু যে নিজেরাই এই ভাঙনের খেলায় খেলুড়ে হয়ে উঠল তা নয়, বাইরে থেকে আশ-পাশের লোকেরাও জয়-পরাজয়ের হাততালি দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। মানুষের স্বভাবই এই—ভাল দেখলে ঈর্ষা করে—পরাজয় দেখলে হাত-তালি দিয়েই থাকে। মানুষ সাধারণত বাইরের রঙেই রঙিন হয়ে যায়।

মিলনী স্নান করে এল—ভাল কাপড় পরলে। রাজেন্দ্রাণীর মত মূর্ত্তিতে বাইরে এল। প্রাণের ভিতরে তখন তার ঝড় তুলছে। এক দিকে দুঃখ, এক দিকে রাগ, এক দিকে অনুরাগ, এক দিকে ঘৃণা—দুই বৈপরীত্যের দোলায় দোল খেতে লাগল। টেবিলের ওপর জয়ন্তর একখানা ছবি ছিল—ছবিখানা নিয়ে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আবার তখনি কুড়িয়ে নিয়ে ছল-ছল চোখে সেই ছবি দেখতে দেখতে নিজের বুকের ওপর অন্যমনে চেপে ধরলে। আবার দাঁড়াল তৈলচিত্রের দিকে, আগ্রহে তাকাতে তাকাতে মুখ বিকৃত করে অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

মণি-দাসী এসে ডাকলে: "বৌদি!"

মিলনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল:

"আমার চা দিয়ে গেলি নে যে···আমি কাল থেকে খাই নি জানিস নি, এত দেরী করলি যে···?"

মণি-ঝি একটু হাসলে: "এই ত এনেছি বৌদি!"

সে ভাবলে এ আবার কি! কাল খাওয়াবার জন্যে কত সাধাসাধি—কিছুতেই খেতে চাইলে না—আজ আবার এ কি রকম! কে জানে বাবা—বড়মানুষের ঝি-দের ধারাই আলাদা।

চা খাওয়া হ'লে বললে: "মণি, দাওয়ানজী মশায়কে বল্—ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর নিয়ে আসতে, আমি সই করে দিয়ে ভবানীপুরে যাব। আর আমার গাড়ী বার করতে বল্।"

রামশরণ চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে ব্যাঙ্কের খাতা-পত্র নিয়ে এসে সব বুঝিয়ে দিলেন। মিলনী সব সই করে দিলে। ব্যাঙ্কের খাতায় দেখা গেল যে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা ব্যাঙ্কে আছে, সুদ নিয়ে লাখ টাকা হবে। মিলনী তখন সেফ্ খুলে তার গায়ের সমস্ত গহনা বার করে দিয়ে বললে, "এগুলো বিক্রী করে আজকের মধ্যেই সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দেবেন। এক পয়সা যেন দেনা না থাকে।"

দাওয়ানজী বললেন: "একদিনে কি আর এই সব বিক্রী করা যায় বৌমা···এসব জিনিষ খরিদ করবার লোক ত হাটে বাজারে মিলবে না—দু-দিন দেখে-শুনে করতে হবে। তা ছাড়া কাজটা যুক্তিসঙ্গত বলে আমার মনে নিচ্ছে না। —এসব বহুমূল্য জিনিষ—সহসা হাতছাড়া করাও বুদ্ধিমানের কার্য্য হবে না।"

মিলনী অত্যন্ত রাগতভাবে বললে: "তবে কি ওই কাল পেট-মোটা বেঁটে পেটো সার চোখ-রাঙানি খেতে বলেন। না, দেনা আমি এক পয়সাও রাখব না। আমিত শাশুড়ী ঠাকরুণের গয়নায় হাত দিই নি। স্বামীর দেনা শোধ দিতে কার্পণ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি আজই এখনই ব্যবস্থা করুন। আমি এখুনি বাবার ওখানে যাচ্ছি। যদি এ গয়না আজ বিক্রী না হয়, বাবার কাছ থেকে টাকা আনিয়ে আজই সব শোধ করে দেব।"

"আচ্ছা বৌমা! তুমি যেমন বলবে, সেইমতই হবে। তবে বলছিলাম কি—বন্ধকী খতখানা তোমার নামে কিনে নিই না কেন? টাকা যখন তুমিই দিচ্ছ। আর বিষয়টাও তাহলে হাতের মধ্যে থাকে।"

"না—সে হবে না দাওয়ানজী মশায়! স্বামীর বিষয় স্ত্রীতে কেনে না। তার নামেই ফিরিয়ে নেবেন।"

"আচ্ছা তাই হবে।"

রামশরণ চক্রবর্ত্তী চলে গেলেন।

সেফ্‌টা বন্ধ করে নিশ্বাস ফেলে সে বললে:

"ভালই হল—আমি ত সরে যাবই, কিন্তু যে আমার এ দুর্দ্দশা করলে তাকে একবার দেখতে হবে। সেই বা কে, আর আমিই বা কে? আমায় ত্যাগ করে করুক—কিন্তু আমার তাকে অন্যের হতে দেব না—কখন না।"

গাড়ীতে হর্ণ দিলে: মিলনী তখনি রসা রোডে বাপের কাছে চলে গেল।

তিন

পিতা সর্ব্বেশ্বর রায় খুব বড় কৌন্‌সুলী। ছেলেবেলা থেকে কিন্তু একটু কবিভাবাপন্ন মানুষ। ফৌজদারী ও দাওয়ানী সকল রকমের মামলা মকদ্দমায় তাঁর খুবই সুযশ। প্রাণটা ছিল দরাজ খোলা আকাশের মত। বুদ্ধিও প্রখর ছিল, কিন্তু ভেতরে কোথায় ভাব-প্রবণতার সঙ্গে একটা কারুণ্য ছিল, যার জন্যে এত নাম ডাক সত্বেও লোকে তাকে sentimental বলতে দ্বিধা করত না। দেশ ও দেশের মানুষের ওপর তাঁর একটা অসীম স্নেহ ও মায়া ছিল। মানুষ অভাবে পড়ে দুঃখ পেলে সে অভাব মোচন করতে কোনদিনই তিনি কার্পণ্য করেন নি। মিলনীর বিয়ের আগের দিন এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ভদ্রলোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলে রায় সাহেব বললেন: আমারও যে কন্যাদায়।

"আপনার পক্ষে কন্যা যদি দায় হয়, তাহলে…"

সর্ব্বেশ্বর রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন:

"আচ্ছা কাল সকালে আপনি আসবেন, দেখি কি করতে পারি।"

তার পরদিন সেই ব্যক্তিকে হাজারটা টাকা নগদ দিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেল। প্রার্থী এলে তাকে কখন রিক্তহাতে ফিরতে হতনা।

মিলনী যখন এল তখন বেলা ন-টা। রায়সাহেব তখন তাঁর চেম্বারে বসে মামলার নথিপত্র পড়ছিলেন। ছল-ছল চোখে মিলনী আগেই সেই ঘরে গিয়ে ডাকলে: "বাবা!"

"কে রে! মিনু-মা? হঠাৎ সকালে এমন সময়, ভাল আছিস মা? জয়ন্ত?"

"ভাল আছে। বাবা একটা দরকারী কাজে এসেছি, বিরক্ত হবে না ত'?"

"দেখ দিকি! বিরক্ত হব…আরে! মিনু-মা—কি কথা বল ত। কি হয়েছে?"

"উনি অনেক দেনা করেছেন জানত'?"

সর্ব্বেশ্বর রায় একটু মুখ টিপে হাসি চেপে বললেন: "হুঁ! সবই জানি, মিত্তির কোম্পানীর মিত্তির আমায় বলেছে।"

"আমাকে তুমি যে বিয়ের সময় টাকা দিয়েছিলে, সে টাকা দেনা শোধের জন্যে সব আজ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে বলে সই করে দিয়েছি, এখন প্রায় লাখ টাকার দরকার; আমার গায়ের সব গয়না বেচে শোধ দিতে চাই। আমি দিব্যি করেছি আজই এ দেনা সব শোধ দোব। গয়না ত' এখুনি একদিনে বিক্রী হবে না, তাই…"

সর্ব্বেশ্বর রায় আবার একটু মুখ টিপে হাসলেন; আরদালী চান্‌কাকে ডেকে বললেন: "ওরে চেক্ বইখানা দে'ত।"

চান্‌কা চেক্ বই আনলে। রায়-সাহেব self-চেক্ লিখে সই করে মেয়ের হাতে দিলেন।

মেয়ে চেক হাতে নিয়ে বললে:

"আমি এখন যাই বাবা…"

"এস মা!"

"বাবা!"

"কি মা?"

"রাগ করলে?"

"পাগল মেয়ে। আরে জয়া আমার পর নাকি? তার দেনাও ত আমারি দেনা। তোদেরই ত' সব মা।"

"দাওয়ানজী বলছিলেন যে বন্ধকী বিষয়টা আমার নামে ফিরিয়ে নিতে।"

"তুমি কি বললে?"

"বলেছি—না, তাঁর নামেই ফিরিয়ে নেওয়া হোক্…"

"ঠিকই বলেছ মা, তুমি আর সে ত' তফাৎ নয়।"

"আচ্ছা, বাবা! আমি তবে এখন আসি।"

"এস মা—এস মা…"

মিলনী গিয়ে গাড়ীতে উঠল। মাধুরীর সঙ্গেও দেখা করলে না, মা'র সঙ্গেও দেখা করলে না। সর্ব্বেশ্বর রায়

যেমন নথি দেখছিলেন,তেমনি তাতেই মনোনিবেশ করলেন। গাড়ীখানা যখন ফটক থেকে বেরিয়ে গেল, তখন শুধু একবার মুখ তুলে চাইলেন। মনটায় তাঁর যেন কি একটা খটকা লাগল।

"চান্‌কা, তামাক দিয়ে যা।"

চান্‌কা তামাক দিয়ে গেল। প্রকাণ্ড আলবোলা বড়্ বড়্ শব্দে ডাকতে লাগল। সর্ব্বেশ্বর রায় চুপ করে মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। খানিক পরে ডাকলেন···"ললিত! ললিত!"

ললিত সর্ব্বেশ্বর রায়ের কেরাণী। আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। ললিত এল। সর্ব্বেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন:

"হ্যাঁ-হে, তুমি আজ মিত্তির কোম্পানীর ওখানে যেতে পারবে?"

"বিশেষ কাজ যদি থাকে তবে যেতে পারি। আজ ত' তিনটে কেশ রয়েছে। কোর্টে ত হাজির থাকতে হবে। আর মিত্তির সাহেবও তো কোর্টেই থাকবেন।"

"আজ সম্ভবতঃ জয়ন্তর একটা বড় transaction হবে। জয়ন্ত থাকবে না···দাওয়ান অবিশ্যি বিচক্ষণ ও পুরাতন লোক, তবু তুমি একবার থাকলে হয়ত ভাল হয়।"

"আচ্ছা, তাহলে নিশ্চয়ই যাব।"

"হ্যাঁ।"

"মিনু-মা এসেছিল দেখলাম, তখনি চলে গেল কেন? বাড়ীর ভেতর এলনা?"

"যায়নি না-কি? অঃ! তা আমিও জানি নি। বোধহয় ওই বিষয়ে তাড়াতাড়ি বলে চলে গেল।"

এমন সময় মাধুরী এসে জিজ্ঞাসা করলে:

"বাবা! দিদির গাড়ীর মত দেখলাম। কে এসেছিল, জয়ন্ত?

"না, মিনু একলা এসেছিল।"

"দিদি এসেই চলে গেল—ভেতরে এল না, মানে?"

"তাত' জানিনা মা।"

"এসে তোমার কাছে এল, অথচ বাড়ীর ভেতর এলনা। জয়ন্তর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে বুঝি?"

"কি কথা?"

"জয়ন্ত আজকাল নাকি বাড়ী থাকে না—সেই স্ত্রী-লোকটার ওখানেই নাকি থাকে?"

"তাত' জানিনা মা। তবে আমি ওই রকম শুনেছি বটে, মিনু ত' আমায় কোন্ কথা বললে না।"

"তোমার কাছে বলতে আমায় বারণ করেছিল বাবা, তাই আমি বলিনি; জয়ন্ত কেমন যেন হয়ে গেছে। প্রায়ই বাড়ীতে আসে না···কোথায় সেই থিয়েটারেই নাকি পড়ে থাকে। তুমি একবার জয়ন্তকে ডেকে পাঠিয়ে কিছু বল—এসব কি? দিদি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে।"

"তোমায় যদি মিনু বারণ করে থাকে বলতে, তবে এ সব কথা আমায় শোনালে কেন?"

"বারে, বাবা যেন কি? তোমার কাছে বলব না? তুমি তাকে ডেকে বল, তুমি বললেই সে শুনবে।"

"আমি কি পীর না প্যাগম্বর, যে আমি বললে আমার কথা সবাই শুনবে···"

"সবার শোনার ত' কথা বলি নি বাবা, জয়ন্তর কথাই বলছি। তোমার কথা জয়ন্ত শুনবেনা, এ কখন হতে পারে? নিশ্চয়ই শুনবে।"

"আচ্ছা!···তোর আজ কলেজ নেই?"

"আছে, একটু পরেই যাব।"

"হাঁরে, তোদের ক্লাসে কি গোলমাল হয়েছে—logicএর ক্লাসে? প্রফেসারের সঙ্গে?"

"কি করে শুনলে বাবা?"

"আমাকে রংরাজ বলছিল। কি ব্যাপারটা—কি করেছে তোদের প্রফেসার?"

"প্রোফেসার কিছু করেননি। ওই যে ইলা আমাদের সঙ্গে পড়ে না? ওই ইলাই হ'ল leader"—

"সর্ব্বেশ্বর রায় একটু হেসে বললেন leader মানে?"

"ওই-ত' দলের পাণ্ডা···"

"আর তোরা বুঝি সব সেঁথো···"

"করেছে কি—রোজই ওরা ক্লাসে হাসি-ঠাট্টা রঙ-ঢঙ্ করে, তাতে ক্লাসের lecture-এর বড় ক্ষতি হয়। তাই প্রফেসার সেদিন বললেন···এ রকম করলে ক্লাসে লেকচার দেওয়া অসম্ভব—প্রায়ই তিনি বলেন। ছেলেরাও বিরক্ত হয়, কিছু বলতে পারে না। দু'একটা টিপ্পনীও কাটে, গোলমাল হয়—সেদিন তিনি আর থাকতে পারলেন না—বললেন, either you leave the class or I···বলতেই ইলা একেবারে ফোঁস্ করে উঠল: বললে—'apology

করতে হবে'···দেখত বাবা কি অন্যায়। ইলা দলশুদ্ধ ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল···সঙ্গে সঙ্গে একটী ছেলেও protest করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। সেও বললে প্রোফেসার মেয়েদের insult করেছেন। অতএব তাঁর apology করা উচিৎ···"

"তারপর ?···"

"তারপর এই নিয়ে ইলা দল বেঁধে কলেজের Principal-এর কাছে—দরখাস্ত করে, সব মেয়েরা তাতে সই করেছে···"

"তুইও করেছিস না কি ?"

"না বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই···সেই জন্যে আমার সঙ্গে ওরা আর কথা কয় না, আমাকে ওরা সবাই boycott করেছে···"

"তা তুই দল ছেড়ে দিলি কেন ?"

"ওরা অন্যায় করছে বলে কি আমাকেও সেই অন্যায় করতে হবে ? সত্যি যদি কোন দোষ প্রফেসারের থাকত বুঝতাম, তা হলে নিশ্চয় আমিও protest করতাম। ওরা কেবল সিনেমার গল্প, কার চোখের পাতা আড়াই ইঞ্চি লম্বা—ইলাটা আবার obnoxious literature পড়ে···আমাদের ক্লাসের মেয়েগুলো যেন কি···আমাকে ক'দিন ধরে ঠাট্টা আরম্ভ করেছে। আমি obsolete—আমার উচিৎ ছিল হাতা-বেড়ী খুন্তি নাড়া—কপালে একটা উলকী পরা—এমনি কত কি···"

"Principal কি বললেন ?"

"তিনি উল্টে ধমকে দিয়েছেন ; তা ইলারা আবার Vice-Chancellor-এর কাছে application করেছে···"

ঘড়ীতে দশটা বেজে গেল।

মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠল, তার কলেজ যেতে হবে। সর্ব্বেশ্বর রায়ও স্নান-ঘরে চলে গেলেন। আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললেন :

"ললিত ! একবার ভোলা রায়ের খবর নিতে পার—সে কোথায় পটলডাঙ্গায় থাকে।"

"দরোয়ান তার বাড়ী জানে।"

"তাহলে দরোয়ানকে একবার বল, ভোলাকে বলে আসে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

* * * *

মিলনী বাড়ীতে ফিরে এসে দাওয়ানজীর হাতে চেক্ দিয়ে বললে :

"শুনুন দাওয়ানজী মশায় ! টাকার ত সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলাম—আজই যেন সব পরিশোধ করে লেখাপড়া করে নেবেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার নামে লেখাপড়া করানো বাবারও মত নয়। ওঁর নামেই ফিরিয়ে নেবেন। আর আপনি একবার আমাদের ভোলাদার খবর নিতে পারেন ? তাঁকে একবার ডেকে আনতে হবে, আমার বিশেষ দরকার আছে। আজই যদি···"

"ওই ভোলা রায়, ওই ত জয়ন্তকে এই রকম করে ফেলেছে, ওকে কেন বৌমা ? ··"

"ভুল করবেন না দাওয়ানজী মশায় ! ভোলাদা কিছুই করেন নি। ভোলাদার কোন অপরাধ নেই। ভোলাদা কখন কাকেও সৎ পরামর্শ দেওয়া ছাড়া অন্য পথে নিয়ে যায় না। তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। পারেন যদি সুবিধা হয়, বোধ হয় সাধুচরণ বাড়ী জানে, তাকেই একবার পাঠিয়ে দেবেন—দুপুর বেলার ভেতর হয়ত দেখা পেতে পারে।"

দাওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন : "কি বলে পাঠাব ?"

"শুধু আমি ডেকেছি, খুব দরকারী কাজ আছে, আজই যেন দেখা করেন। যদি দেখা হয় তবে সঙ্গে করে আনবেন।"

"আচ্ছা !"

"না হয় আমাদের গাড়ী নিয়েই যাক্ না কেন ? সরকারী গাড়ী ত' আপনি নেবেন—আমার গাড়ী নিয়ে যাক্।'

"আচ্ছা ভোলার কাছে লোক পাঠাচ্ছি !"

"এগারটা প্রায় বাজল। আপনি আজকের মধ্যেই এ কাজ করবেন—ফেলে রাখবেন না।"

"না বৌমা, ফেলে রাখব কেন। শোভাবাজারের লোক এসেছিল, তাদের বলে দিয়েছি দলিল-পত্র নিয়ে আমাদের এটর্ণির আফিসে যেতে, আমি এখনি ব্যাঙ্কে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, টাকা যখন সব যোগাড়ই হ'ল, তখন আর গয়নাগুলো বিক্রীর প্রয়োজন কি ?"

"এ টাকা আমি গয়না থেকে শোধ দেব বলে টাকা এনেছি···"

"তিনি কি আর ওই টাকার জন্যে তোমার কাছে গয়না নেবেন ?"

"না, আমার গয়না বেচে ও টাকা শোধ দিতে হবে।"

"আচ্ছা।"

দাওয়ান রামশরণ চক্রবর্ত্তী বললেন :

"বৌমা তোমার পুণ্যের জোরে জয়া আবার জয়া হবে!"

"সেই আশীর্ব্বাদই করুন!"

সারা দিন ধরে মিলনী তার বিয়ের আগের যে-সব চিঠি-পত্র জয়ন্তর সঙ্গে লেখা-লেখি হয়েছিল সেইগুলো পড়ে দেখতে লাগল। পড়তে লাগল বারবার ক'রে···আজকের এই ছাড়াছাড়ির যে-কারণ, সে-কারণ গোড়ায় ছিল কি-না, তাই সে অক্ষরের পর অক্ষর ধরে বিচার করতে লাগল। ভাবছিল, চলে যখন যাব, তখন এ চিঠিগুলো নিয়ে কি করব—সব পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু পুড়িয়ে না হয় ফেললাম, তাতেই কি সব মুছে যাবে? ক্ষতের দাগ দেহ থেকে মেলায় না, মনের ক্ষতের দাগ কি মিলিয়ে যাবে? এ মন, এ দেহ, কি এ জিনিষ, যে কিছুই ভুলতে পারে না। কেন পারে না! য়ুরোপে ত' ডিভোর্স হয়, আবার বিয়ে করে। হয়ে যাক্ তাহলে ডিভোর্স। কেন এমনই কি···আমাকে হত-শ্রদ্ধা করে একটা পথের মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটাবে? আমি অভিজাতের মেয়ে, আমার এই অপমান সহ্য করতে হবে? কেন নারী বলে···তার প্রাণ নেই, মন নেই, দেহ নেই, তৃষ্ণা নেই? আমি পাথর নয়—আমি জীবন্ত মানুষ—আমার মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। আমি আমার প্রেমকে মূল্য স্বরূপ দিয়েছি। তাকে তোমার অবহেলা! আচ্ছা!···আবার চিঠির তাড়া খুলে পড়্তে লাগল। তার ভেতর থেকে একখানা চিঠি তার নামে লেখা, হাতের লেখা মানবের। একি! এ চিঠি ত' সে কখন দেখেনি, এ চিঠি এর ভেতর কোথা থেকে এল? চিঠিখানা সে পড়তে লাগল :—

মিলনী!

আমায় ক্ষমা ক'র। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমার রূপ-যৌবন-ভরা দেহ যখন আমার কাছে অঘটন-ঘটনের মত এসেছিল, আমার মন, আমার তৃষ্ণাতুর মন সংযম রাখতে পারে নি। জয়ন্তকে আমার এই কথা জানিয়ো—আর ব'ল—সে যেন, যদি পারে, মার্জ্জনা করে। সম্ভবতঃ আর কখন তোমাদের চোখের সামনে মানব আসবে না।

ইতি—মানব

"এই তবে কারণ! ও! তাই জলছে···কিন্তু ভগবান জানেন কায়-মন-বাক্যে জ্ঞানতঃ আমি কোন অন্যায় করিনি···এতেই তোমার এত চাঞ্চল্য···তাই আমায় ত্যাগ ক'রে একটা পথের মেয়ে নিয়ে এই মিথ্যাকে তুমি সত্যি বলে মনে করেছ? তাই মানব আর এখানে আসে না, তুমিও তার নাম কর না, তার কথা কোনদিন বল না। আমায় বলতে পারতে, জিজ্ঞাসা করতে পারতে···ছিঃ তোমার মন এত ছোট, তা কোন দিন যে মনে করি নি।··· নাঃ···একটা পথের-মেয়ে আমাকে হারিয়ে দেবে। সে হবে না—কখন তা হতে দেব না। সত্য জানা উচিত ছিল—মিথ্যাকে সত্য বলে নিলে কেন?···"

চিঠিখানা আবার উল্টে-পাল্টে পড়লে—দেখলে অপর পৃষ্ঠার কোণে লেখা রয়েছে "চমৎকার confession," হাতের লেখা জয়ন্তর।

সাধুচরণ ফিরে এসে বললে···"ভোলাবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যের পর বউবাজারে 'জয়ভেরী' কাগজের আফিসে দেখা হতে পারে···যদি বউ-ঠাকরুণ হুকুম করেন, তবে সন্ধ্যার পর সেখানে খবর নেব কি?"

"আচ্ছা, সন্ধ্যের পর গাড়ী ঠিক রাখতে বলে—আমায় এসে খবর দিয়ো।"

"না, আমার স্বামী আমারি! আর কার' নয়, আমায় ত্যাগ করতে চায় করুক, কিন্তু অন্যকেও নিতে দেব না।"

অনেক ভাবনা চিন্তার পর মিলনী স্থির করলে—তাকে একবার দেখতে হবে। দেখব, দেখব সেই বা কে, আর আমিই বা কি? আজই দেখব···।

হঠাৎ মাধুরীদের গাড়ী ফটক দিয়ে বাড়ীর ভেতর এল। মিলনী চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে :

"কি—তুই যে হঠাৎ এমন সময়।"

"তুমি যে হঠাৎ বাড়ীতে বাবার কাছে গিয়ে তখুনি আবার চলে এলে—আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। কি হয়েছে দিদি।"

"বেরিয়েছিলাম, বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে চলে এলাম।"

"দিদি, সত্যি কি হয়েছে আমায় বল। বাবাকে জয়ন্তর কথা বলেছ?"

"না..."

"আমি সব বলেছি। না বললেও বাবা সবই জানতেন। তিনি ভোলাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"ভোলাদা কি করবে? তার কি অপরাধ?"

"ভোলাদাকে দিয়ে জয়ন্তকে ডেকে পাঠাবেন বোধ হয়। দিদি, তোমার হাতে ওটা কি?"

মিলনী মানবের চিঠিখানা হাতের ভিতর নিয়ে কাপড়ের অন্তরালে রাখছিল! হাত কেঁপে চিঠিখানা মাটীতে পড়ে গেল। মাধুরী কুড়িয়ে নিলে।

"দে—দে ও চিঠি তোর পড়বার নয়। পড়িস নি—দে..."

"কি আছে এতে আগে বল!"

"না, ও তোর জানবার দরকার নেই। ও মানবের চিঠি..."

"মানবের চিঠিতে এমন কি লুকোন কথা থাকতে পারে যে, আমি দেখতে পারি না..."

"কত কি থাকতে পারে...তোর দরকার কি?"

"দিদি, তুমি অমন উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন? আমি কি তোমার পর..."

"পর নয় ভাই—তুই ছেলেমানুষ...তোর এখন..."

"আহা, দিদি আমার কি বুড়ো মানুষ গো...দু-বছরের ত বড়...তার আবার claim কত...এ চিঠি আমার পড়বার দরকার আছে নিশ্চয়। মানবের এ-চিঠি পড়ায় যদি আমার অধিকার না থাকে, তবে নিশ্চয় এ চিঠিতে এমন কিছু আছে...যা আমাকে তুমি লুকোতে চাও। দিদি, বাবা একটা কথা বলেন জান, ভালই হোক, আর মন্দই হোক, লুকোন কোন জিনিসই ভাল নয়। আর আজ যা আমায় লুকোতে চাচ্ছ দিদি, কাল তা আর লুকোন থাকবে না; আমি মানবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই কথাটা বেরিয়ে পড়বে, তখন...?"

"মানব এ চিঠির কথা তোকে বলতে কক্ষণ পারে না..."

"কেন পারবে না...যদি না পারে তবে বুঝব, এর ভেতর অন্যায় কোন কথা আছে।"

"যাই থাকুক, ও চিঠি তোর পড়বার নয়। আমায় ফিরিয়ে দে...বলছি তোকে ও পড়তে হবে না..."

"যদি পড়তে না দাও, তবে সত্যি বলছি আমি এখনি বাড়ী গিয়ে মানবকে ফোন করে ডেকে এ চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করে সব জানব।"

"সে তোকে এ চিঠির কথা বলবে না, বলতে পারে না।"

"যে চিঠি তুমি আমায় দেখাতে পার না, মানব যার কথা বলতে পারে না, সে চিঠিতে নিশ্চয়ই কোন এমন গুরুতর কথা আছে যে..."

"যাই থাক, আমিও ও-চিঠি পড়তে দেব না..."

"Do'nt protest too much, my dear girl;—বুঝতে পারছ দিদি—যে এটা অন্যায়—এত যখন বারণ করছ তখন...it is silly..."

"আচ্ছা! আচ্ছা! থাম্...তোর silly sally রাখ্, দে ফিরিয়ে দে..."

"বেশ নাও, আমি পড়ব না, কিন্তু মানবকে ডেকে আমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করব। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে এই চিঠি নিয়েই জয়ন্তর সঙ্গে তোমার গোলমাল হয়েছে। তুমি যখন আমায় দেখতে দিলে না, তখন জয়ন্তকেও দাও নি..."

"সে আগেই পড়েছে..."

মিলনী চিঠিখানা ড্রয়ারের ভেতর রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে।

"আচ্ছা দিদি! এ চিঠি কতদিন আগেকার বল।"

"মাস তিনেকের ওপর..."

"এই তিন মাসই প্রায় মানব আমাদের ওখানে আসে নি। তোমার এখানেও আসে নি। কলকাতায় ছিল না। দিদি! আমি কোনস্থলীর মেয়ে...থাক গে, তোমার লুকোন কথা তোমারই থাক্—"

"আমিও ত' কোনস্থলীর মেয়ে..."

"সে কথা আর কেই বা অস্বীকার করতে পারে বল, তবে তুমি যে অত্যন্ত ভীতু এবং তোমার বুদ্ধি কম তার প্রমাণ পাওয়া গেল..."

"কিসে প্রমাণ হ'ল?"

"লোকের চিঠিতে, তার কথায়...নইলে...যাক্ গে, জয়ন্ত আর আসে নি?"

"তুই চলে যাবার পর এসেছিল সেইদিন, তারপরই চলে গেছে আর আসে নি। হ্যাঁরে, তুই বুঝি কলেজ থেকে আসছিস্?"

"হ্যাঁ···"

মিলনী ইলেকট্রিক-বেল টিপলে—একজন চাকর এল :

"মণিকে বলগে, চা আর খাবার আনতে···শীগ্‌গির যেন আসে, দেরী না হয়। চল্ আমরা ও-ঘরে যাই।"

"দিদির বুঝি আমায় এ ঘরে থাকতে দিতেই ভয় হচ্ছে··· পাছে কোন রকমে চিঠিখানা দেখে ফেলি···"

মিলনী রেগে উঠল : "দেখ—আমাকে অত ক'রে ঠাট্টা করতে হবে না—এই নে পড়্···"

চাবি খুলে ড্রয়ার থেকে মানবের চিঠিখানা বার করে দিলে :

"লুকোন কিছু নেই লো লুকোন কিছু নেই,···সত্যি হলেও ভয় পেতাম না···"

মাধুরী হাসতে হাসতে অতি আগ্রহে চিঠিখানা পড়লে। তার মুখখানা শক্ত হয়ে গেল···বললে "এ-সব কি? আর এ লেখাটা কি জয়ন্তর বোধ হয়। এই নিয়ে···"

"না, এ চিঠি আমি কোন দিনই দেখি নি। আজ ড্রয়ার খুলতে আমার হাতে পড়ল···তিনি কোনদিন আমায় এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি—চিঠিও আমায় দেখান নি।"

"কথাটা যে খুব খারাপ হ'ল···বাবা শুনলে কি মনে করবেন।"

"সত্যি কথায় কেউ ভয় পায় নাকি?"

"দিদি, আমি ছেলেমানুষ—তোমার চেয়ে কিন্তু এটা বুঝি যে এ সব কথা মানুষ অতি সহজে বিশ্বাস করে···"

"আমার যদি ঘুণাক্ষরেও মানবের সম্বন্ধে এ রকম কোন কথা মনে আসত, তা হলে নিশ্চয়ই সাবধান হতাম।"

মিলনী মাধুরীকে সেই পুকুরঘাটে মাছ ধরার কথা বললে।

"আমিও কোন রকমে তার সে ভাব ধরতে পারি নি···"

"এখন উপায়? আমি মানবকে ফোন করে ডাকি··· ডেকে বলি···"

"না-না···সে আরও খারাপ হবে···আগে ভোলাদা আসুক···"

"মানব যে এমন ইতর তা আমি জানতাম না···একজন বিবাহিতা স্ত্রী—তার ওপর এই রকম···"

"পুরুষে ওই রকমই হয় রে···পুরুষের প্রেম আমাদের জীবন, তাদের কাছে আমরা শুধু খেলার পুতুল···"

ইতিমধ্যে মণি-দাসী চা খাবার সব নিয়ে এল।

"ওমা, ছোড়দি কখন এলে গো···মা ভাল আছেন, বাবা ভাল আছেন?"

"তুমি ভাল আছ মণি-দি?"

"ভাল ত আছি দিদি—কিন্তু জয়াটা আর ভাল থাকতে দেয় কই—মানুষ-মুনুষ করলাম, বিয়ে-থা হল, ঘর-সংসার—তা নয় কোথায় পড়ে থাকে, বাড়ী আসে না, মদ খেয়ে সেদিন বৌদিকে ধাক্কা মেরে···"

মিলনী সেদিনকার মত আবার ঝঙ্কার ক'রে উঠল : "বললাম আমায় ধাক্কা দেয় নি—হোঁচট লেগে পড়ে গেছি··· হ্যাঁ, শুনিস কেন ওর কথা···তুই যা দিকিনি এখান থেকে। স্নানের ঘরে আমার ভাল কাপড়-চোপড় বার করে রাখ—আমি এক জায়গায় যাব।"

মণিদাসী চলে গেল।

মাধুরী বললে : "আমি তা'হলে মানবকে ডেকে···"

"না-না, আমি আগে ভোলাদার সঙ্গে দেখা করি, তারপর···"

"তুমি কি ভোলাদার ওখানে যাবে না কি? সেটা কি ভাল দেখাবে?"

"ভাল-মন্দ দেখাবার আর কিছু নেই মাধুরী—আমায় বাঁচতে হবে···লোকের ভয়ে আর নিজের লজ্জায় আমি মরতে পারব না—আমায় বাঁচতে হবে। আমার মনুষ্যত্ব, আমার নারীত্বকে বাঁচাতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি আসছি, তুই বোস। এক সঙ্গেই না হয় যাব।"

"তুমি আমাদের ওখানে যাবে এখন?"

"না, ভোলাদার সঙ্গে দেখা করব আগে—তারপর কি করব ভাবব।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—"না, তুই বাড়ী যা—যদি যাই তবে ভোলাদার সঙ্গে দেখার পর যাব।"

"কিন্তু তোমার উচিত কি—নিজে ভোলাদার কাছে যাওয়া?"

"না হলে তাঁকে আমি খুঁজে বার করতে পারব না।

এ চিঠি যদি আগে আমার হাতে পড়ত, তাহ'লে হয়ত এত গোলমাল হ'ত না। আজ এতদিন পরে এ চিঠি হাতে এসেছে। ঘটনার কারণ যে এই, তা কি আগে জানতে পেরেছি। ওঃ! ভোলাদাই ঠিক বলেছিল: ভয় যে কোন্ দিক দিয়ে আসে বোন, কেউ জানতে পারে না।"

"তুমি কি এ-সব কথা ভোলাদার সঙ্গে কইবে না কি?"

"পাগল! তিনি কোথায় আছেন, তাঁকে খুঁজে বার করা এক ভোলাদাই পারবে--"

"তাহ'লে মানবকে আমি কোন কথা বলব না?"

"না।"

"এ-রকম লোকের মুখ দেখতে নেই দিদি··"

"অত গাল দিস্‌নি লো, অত গাল দিস্‌নি···ফাঁদ পাতা, কে যে কোথায় ফাঁদে পড়ে—কেউ জানে না; পড়বার আগে পর্য্যন্ত কেউ কেউ তাও বোঝে না যে ফাঁদে সে নিজেই পড়বে। তুই তাহলে বাড়ী যা। মা বাবার কাছে কিছু বলিস নি কিন্তু এখন। যদি আজ না যাই তবে কাল সকালে নিশ্চয়ই যেতে হবে। তারপর দেখি। কেবল ভাবছি···তোর বিয়ে হয় নি, বেশ আছিস্—"

মাধুরী একটু হাসলে:

"আমি ত তোমার মত বোকা নয়, যে বলতেই অমনি নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করে গলায় বগলস পরব।"

"বোন্ বলছ বটে—কিন্তু যে পরেছে ছেকল—ছেকল যদি তার ছিঁড়ে যায়···"

"স্বাধীনতা ফিরে আসবে।"

"হায়! হায়! মেয়েমানুষের আবার স্বাধীনতা—পুরুষের 'ডিভোর্সে লজ্জা হয় না, কিন্তু মেয়েমানুষের হয়। স্বামী ত্যাগ করে আর একটা অন্য পুরুষের কাছে ডিভোর্সের পর—পুরুষে শুধু ঘেন্না করে না—নারীজাত তাকে ঘেন্না করে। পুরুষের হাজার দোষ মাপ হয়—নারীর একটা দোষের মার্জ্জনা নেই। যাক ও-ভাববার আর এখন সময় নেই। আমি এখন প্রস্তুত হই তবে।"

"তা হলে কাল তুমি আসছ?"

"নিশ্চয়—সকালবেলাই বোধ হয় যাব। এখানকার ব্যবস্থা ক'রে।"

মাধুরী চলে গেল। মিলনী কিন্তু এত কথার ভেতর জয়ন্তর ত্যাগের কথাটা কিছুতেই মাধুরীকে শোনাতে পারলে না। কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরলে। অনেকবার সে-কথা বলতে যাচ্ছিল, কিছুতেই বলতে পারলে না। ঘৃণা-রাগ-লজ্জা-অভিমান তাকে সে-কথা প্রকাশ করতে দিলে না। ঘটনার কারণ খানিকটা মাধুরী জেনে গেল, কিন্তু ঘটনার উপস্থিত পরিণতি সে জানতে পারলে না।

মাধুরীর সব চেয়ে বেশী রাগ হ'ল মানবের ওপর। মানবকে সে অত্যন্ত ভাল ব'লেই জানত; এই ব্যাপারটা তাকে তার মর্ম্মের ভেতর পর্য্যন্ত আঘাতে ভেঙে দেবার মত করে দিলে। তার কেবলই মনে হতে লাগল: ইতর, ইতর, ইতর···আমার সঙ্গে একবার দেখা হোক্ না···

মিলনী স্নানের ঘরে যাবার সময় মনে মনে ভাবলে: মন্দ কি। জীবনটা কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে প'ড়েছিল—একটা বৈচিত্র্য দেখা দিলে। এত শান্তির পর ঝড় ওঠাই ত' বেশ। তবু ভাল যে লড়াই করবার সুযোগ পেলাম; কিন্তু একি হ'ল ···লড়াই তাহ'লে আমাকে দস্তুর মতই করতে হবে। একদিকে মানব, একদিকে তুমি, একদিকে মীনা···লড়াই করব। জয় আমায় করতেই হবে।···জয় আমারই।

ক্রমশঃ



মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

জীবনী

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষ অতি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ নিজ অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা দেশের ও দশের উপকারজনক কার্য্যে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রামে ১২৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়, তাহাকে অতি দরিদ্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। সে অঞ্চলে তখনও উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম ছিল না। স্থানীয় একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মাধবচন্দ্রকে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিতে হয়। সাংসারিক অভাব তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জন ক্ষেত্রে আর অধিক অগ্রসর হইতে দেয় নাই। উক্ত পাঠ সমাপনান্তে তিনি সার্ভে শিক্ষা করিয়া সুদূর উড়িষ্যা প্রদেশে চাকরী লইয়া চলিয়া যান।

কিন্তু সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ বনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার পুষ্পের সুগন্ধে যথাকালে চারিদিক আমোদিত হইয়া থাকে। কাজেই মাধবচন্দ্রকে উড়িষ্যার মফঃস্বলে যাইয়া বাস করিতে হইলেও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা কখনও হ্রাস পায় নাই। তিনি কর্ম্মজীবনে যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মকুশলতা ও নিষ্ঠা দ্বারা উন্নতি লাভ করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য জ্যোতিষ শিক্ষাতেও আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানার্জ্জন করিতেছিলেন। ৫৮ বৎসর বয়সে সন ১২৯৫ সালে মাধবচন্দ্র কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ওভারসিয়ার হইতে এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁহার জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কলিকাতা শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ণোদ্যমে জ্যোতিষচর্চ্চায় মনোযোগী হইলেন। কঠোর শ্রমপূর্ণ চাকরী করিবার সময়েও তিনি তাঁহার অবসরগুলি বৃথা অতিবাহিত হইতে দেন নাই। যৌবনের প্রথম হইতেই গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণে কাটাইয়া দিতেন। পঞ্জিকার গণনার সহিত আকাশের গ্রহ সংস্থানাদির বৈষম্য প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পঞ্জিকার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতেন। কটকে অবস্থান কালে তিনি যে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক পাঠ করিতেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে আমরা একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক অধুনা বাঁকুড়া-নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নাম বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথাও সাধারণের অবিদিত নহে। তিনি লিখিয়াছেন—"মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি কখনও দেখি নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পুস্তক অনু-সন্ধানকালে কটক নর্ম্মালস্কুলের গ্রন্থাগারে বাপুদেব শাস্ত্রী কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক ইংরাজি অনুবাদ প্রাপ্ত হই। উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠাসমূহে পেন্সিল দিয়া চিহ্ন করা ছিল এবং পার্শ্বে বহু বিষয় লিখিত ছিল। স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেন—মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে পুস্তকখানি ক্রয় করা হইয়াছিল এবং তিনিই উহা পাঠ করিয়াছিলেন। তদবধি আর কেহ পুস্তকখানির প্রতি আকৃষ্ট হন নাই।" মাধবচন্দ্র শুধু পুস্তক ক্রয় করিতেন না; উপরের পত্র হইতে জানা যায় যে, সকল সময়ে তাঁহার পুস্তক ক্রয়ের সামর্থ্য থাকিত না, তিনি নানাস্থান হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহা পাঠ করিতেন। গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিনি কয়েকটি যন্ত্রও ক্রয় করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার করিতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন;



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চাকরী জীবনে তাঁহাকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, অবসর সময়েও তিনি সেইরূপই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্জিকার সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণ দৃক্‌সিদ্ধ না হওয়াতে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় একদল জ্যোতিষী ইউরোপীয় জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং ইউরোপীয় পঞ্জিকার সাহায্যে দেশে শুদ্ধ দৃক্‌সিদ্ধ-পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। পুণা ও কাশীধামের পণ্ডিতগণ পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তদ্দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে দৃক্‌সিদ্ধ জ্যোতিষ গণনা শিক্ষা দেওয়া হইত।

বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তেলিনীপাড়ার জমীদার মনোমোহনবাবু বাঙ্গালার পঞ্জিকাসমূহের ভ্রম বুঝিয়া সংবাদ-পত্রে সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার অল্পদিন পরেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি বিপুল শাস্ত্রালোচনার পর পঞ্জিকা-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এইজন্য সংস্কৃতকলেজভবনে জ্যোতিষীদিগের বহু সভা আহুত হইয়াছিল এবং 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে সংস্কারের পক্ষে বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিন্তু মহেশচন্দ্রের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। বহু আলোচনার পর এ বিষয়ে কার্য্য করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সদস্যগণ কোন কার্য্য না করিয়া নিশ্চেষ্টই থাকিয়া গেলেন। মাধবচন্দ্র ১২৯৫ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই মহেশচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে ও অধ্যাপক আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশে মনোযোগী হন ও ১২৯৭ সালে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। স্বর্গত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এ সময়ে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

দিনচন্দ্রিকা বা দিনকৌমুদী প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে ধারা-বাহিক পঞ্জিকা গণনা বিশেষ দুরূহ কার্য্য নহে; কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব প্রণালীতে পঞ্জিকা প্রণয়ন করা কিরূপ কঠিন, তাহা গণিতজ্ঞগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। মাধবচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা ছিল; তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে ভ্রান্ত পঞ্জিকানুসারে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না; সেজন্য তিনি বৃদ্ধবয়সে যুবকের মত উৎসাহের সহিত এ কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হইল তখন মাধবচন্দ্রের বয়স ৬০ বৎসর; যাহাতে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে এই বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রচলিত হয়, মাধবচন্দ্র সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালার খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মণীষীদিগকে তিনি বুঝাইয়া-ছিলেন যে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি ভ্রান্ত; সেই জন্যই সকলে তাঁহার সম্পাদিত নূতন পঞ্জিকা অনুসারে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পরিণত বয়সে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মাধবচন্দ্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তিনি সন ১৩১২ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা ১০৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

তাঁহার অনুরাগী বন্ধুগণের উদ্যোগে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ক্রমেই জনপ্রিয় হইতে থাকে। স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রের একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায় আজ বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছে। স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা বঙ্গবাসী হিন্দুর যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।



শেষের ক'দিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬)

এক্স-রে দু'বেলাই চ'ল্‌তে লাগল : তাই বাড়ী ছেড়ে উধাও হওয়ার উপায় নেই !

দীর্ঘ-বিলম্বিত চালে সেদিন শরৎচন্দ্র স্নানাদি সম্পন্ন ক'রে এসে দেখ্‌লেন, আমি একটা কি নিয়ে ব্যস্ত আছি।

কি ক'রছ হে ?

এই যেন তেন প্রকারেণ—কিঞ্চিৎ কালহরণম্‌···

উঁহু—কিঞ্চিৎ অর্থাগমের চেষ্টা ! আচ্ছা, আমিও ত' এ কাজ ক'রলেই পারি !

পারইত।

নিমেষে তোড়-জোড় এসে প'ড়ল। শরৎ লালুর কাহিনীটি শেষ ক'রে বল্লেন : এইবার একটা ভূতের গল্প···

হাসি চেপে বল্লাম : পাঁচকড়ি-মামার আদেশ এবং উপদেশ সম্পূর্ণ অতিক্রমণ ! বাস্তব থেকে একেবারে সমূহ গঞ্জিকায় ! বিজ্ঞান থেকে স্যর অলিভারের মত একেবারে ভূতে !···তার চেয়ে তোমার শেষের পরিচয়টা শেষ কর।··· বাংলায় ভূতের গল্পের অভাব নেই, আর তা' লেখার লোকেরও কম্‌তি নেই। তবে একটা কথা, যদি প্লটটা না গুলিয়ে গিয়ে থাকে··

হাস্‌লেন, বল্লেন : অনেকেই ও-কথা বলে : কিন্তু কিচ্ছু হারায়নি ; গুলোবার জিনিষ ত ও নয়।

এক্স-রে শেষ হ'লে ডানা মেলে একবার আকাশময় উড়ে নেবার ইচ্ছে হ'ল শরতের। কালী বাড়ীর দিকে ফিরতে যাচ্চে —না, না, কালী—আজ একটা লম্বা কোথাও চল···বল্লেন।

কোথায় যাবেন ?

চলত'—দেখা যাক্‌ কোথায় যাওয়া যায়। চৌরঙ্গীর মেট্রোর পাশে তামাকের দোকান থেকে একরাশ সিগারেটের টিন কিনে—বল্লেন, চল দেশে যাই—

নির্ব্বাক চুপটি ক'রে ব'সে আছি।

হাওড়ার পুলের একটু আগে একটা লাদাই গরুর গাড়ীর বলদ প'ড়ে যাওয়াতে গাড়ী জমে গেছে—পথ নেই। পাশে ডানহাতি পাম্পের দোকান—দেখে বল্লুম : পাম্প পাওয়া যায় এখেনে—একটা কেনার কথা ব'লছিলে না, তোমার বাড়ীর জন্যে ?

ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ, ব'লে শরৎ তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়লেন সেখেনে।

লক্ষ্মীপুজোর আরম্ভে শারদীয়ার উদ্‌যাপন, অনেক মানুষের একটা ব্যাধির মত থাকে। শরতের এটি ছিল একটু অতিরিক্ত পরিমাণে ! যাঁরা তাঁর বাড়ীতে গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু-কিছু জানেন।

বেতের লাঠিটি যদি সরু আর ছোট হয় ত' তাতে শরৎচন্দ্রের রুচি নেই। নিজে একহারা পাৎলা মানুষ হ'লে কি হয় ? দরবারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে ইজি-চেয়ারখানিতে স্যর আশুতোষের মত বিরাট-পুরুষও অনায়াসে পাশ ফিরতে পারেন ! গড়গড়ার জাট বনানীর দৃপ্ত শালের ভায়রা বল্লেও চলে। তার রবারের নলটিতে দিকচক্রের বিস্তৃতি—আর জলাধারে মহীপাল দীঘির অনুরূপ পরিকল্পনা ছিল না বল্লে শরতের উপর অবিচার করা হয়। তাঁর একটা-আধটা ফাউণ্টেন পেন পুলিশের বেটন হওয়ার স্বপ্ন দেখত ব'লে অনুমান হয়। পেন্‌সিলগুলোতে সাপ মারা চলে।

পাম্পের দোকানে ব'সে নাড়ু-গোপাল-গোছ ম্যানেজারটিকে শরৎ অঙ্ক কষিয়ে শীতকালে ঘামিয়ে তুল্লেন।

দেশের পুকুরে পাম্প বসিয়ে সারা পানিত্রাসের জলাতঙ্ক দূর করার সাধু, বৃহৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্যে ম্যানেজারের সঙ্গে আমারও কাল-ঘাম ছোটে আর কি !

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার উপর শ্রীমানের প্রগাঢ় অভিনিবেশ এবং প্রাণবান্‌ আগ্রহ দেখে মনে হয়ে গেল সেকালের একটি ইস্কুলের শেখা শ্লোক : প্রাজ্ঞ বিদ্যা এবং অর্থচিন্তার সময় আপনাকে অজর এবং অমর ব'লেই মনে করেন। কিন্তু

শ্লোকের সকরুণ শেষ অংশটি চাবুকের মত চম্‌কে দিয়ে গেল আমার মনটিকে: যেন দেখ্‌তে পেলাম চোখের সাম্‌নে মৃত্যুর করাল কালো হাতখানা শরতের সাদা চুলের উপর মুষ্টিবদ্ধ!

বল্লুম: দিন কি এখেনেই শেষ ক'রবে? তাড়া দিতে শরতের যেন হুঁস্ হ'ল; বল্লেন: কিন্তু এর একটা ঠিক ক'রে ত যেতে হয়?

লোকটি কচ্ছ-দেশীয় মুসলমান। দোকানে মাল-পত্র বিপুল।

বল্লাম: দু'-পাঁচদিনের মধ্যে মালপত্র তুলে বাড়ী চ'লে যাবার ভয় নেই। আর একদিন এলেই হবে।

দোকানদারের দিকে ফিরে বল্লেন: আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই পাঁচটা টাকা রাখুন; আর একদিন এসে অর্ডারটা ঠিক ক'রে দিয়ে যাব—আর মালগুলোকে নৌকয় চালান করার ব্যবস্থা করব। আজ সত্যিই বড় দেরি হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোকটি টাকা রেখে একখানি রসিদ লিখে দিলেন। বলা বাহুল্য যে শরৎচন্দ্রের গোণা দিনক'টার মধ্যে—দোকানে আসার আর অবসর হয় নি!

গাড়ীতে উঠে শরৎ বল্লেন: ভারি ভাত খাবার ইচ্ছে হচ্ছে আজ; চারটি ভাত দেবে না?

দেওয়া যেতে পারতো; কিন্তু অবেলা হ'য়ে গেছে ভারি। অবেলায় ভাত খেলে সহজ মানুষের গা-মাটি মাটি করে।

অবেলা? হেসে বল্লেন, আমার আবার অবেলা, ও আমার নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার।

কিন্তু সে সহজ অবস্থার কথা, শরৎ। বাড়ী পৌছতেই তো বাজবে চারটে; তারপর রান্না, দিন তো কাবার—রাত্তিরে ভাত তো কোনদিন খাওনা তুমি!

তা হোক্: দেশ থেকে আসার পর কতদিন ভাত খাইনি বল ত? আজ ভাত খাবই। চল একবার মার্কেটে যাই। কপি ভাতে আর মটর শুঁটি ভাতে দিয়ে ভাত আজ খাবই—যা' থাকে কপালে। তোমার এ ব্যবস্থা দিতেই হবে ক'রে। বেরিয়াম্‌টা পেট থেকে স'রে গিয়ে পেটটা বেশ খালি-খালি বোধ করছি।

বেশ, তাই হবে; কিন্তু একটা ষ্টমাক্ পাম্পের জোগাড় ক'রতে হবে। দরকার হ'য়ে যেতে পারে, ভাতটা তোমার একেবারে সহ্য হয় না কিনা।

কেন, ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জি তো ভাতের কথাই বল্লেন।

তা সত্যি ব'লেছেন; কিন্তু উনি ত জানেন না—দেশে থাক্‌তে কি দু:খ্‌খু গেছে তোমার ভাত খেয়ে!

শরৎ চুপ ক'রে রইলেন। পাশে ব'সে বুঝলাম, এ মানুষের কারুর কর্তৃত্ব সহ্য হয় না। কিন্তু কঠিন কর্ত্তব্য আমার।

বল্লুম: বড়-মাকে আনিয়ে নিলে হয় না?

নাঃ।

কেন?

তার আগে চল একটা হাসপাতালে গিয়ে অপারেশনটা করিয়ে নি।

ওর মোটেই দরকার আছে কিনা, ছবিগুলো না দেখ্‌লে—কেউ ব'লতে পারে না।

আমি পারি।

কি ক'রে?

আমার ইন্সটিংক্ট বলে…আর ঐটি আমার কোন দিন ভুল করে না…বরাবর দেখে আস্‌ছি।

এ-কথা তোমাকে অনেকবার ব'লতে শুনেছি; আর বহু-ক্ষেত্রে ভুল হয়নি ব'লে দেখেছি এবং বিশ্বাসও করি।

শরৎ একটু হাল্‌কা হ'য়ে ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বল্লেন: চল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে গিয়ে দু-এক দিনের মধ্যে কাটিয়ে ফেলা যাক্…তুমি কাছে থাক্‌লে মেয়েদের আনার কিচ্ছু দরকার নেই। ওরা শুধু হাউ-মাউ ক'রে…

দুজনেই কেমন অন্যমন হ'য়ে গেলাম।

খাওয়ার পর শরতের চেহারাটা কেমন ধাঁ ক'রে ব'দলে গেল। লক্ষ্য ক'রছি, কিচ্ছু ব'লছি না। কিছুক্ষণ আই-ঢাই করার পর বল্লেন: তোমার কথা ঠিক। ভাত আমার মোটেই সহ্য হয় না। চল, একটা পাম্প কিনে নিয়ে আসি।

খানিকটা বেড়িয়ে—তারপর।

গাছ, বীজ, ফুল সংগ্রহ ক'রে আমরা কুমুদবাবুকে ধরলাম তাঁর লেবরেটারিতে

কই আমার পাম্প কই, কুমুদ? না হয় নম্বরটা ব'লে দাও—নিয়ে যাই। আজ ভাত খেয়ে ভাল নেই—হয়ত রাতে তুলে দিতে হবে।

ওটা নিয়ে কি ক'রবেন—না দেখিয়ে দিলে—দু-একবার···

ওটা চালাতে পারব না—এত আনাড়ি নই আমরা কুমুদ ···তুমি নম্বরটা ব'লে দাওনা! তার পরেরটা আমরা বুঝব।

এখন বাড়ী ফিরচেন ত? চলুন আমিও যাচ্চি···আচ্ছা দেখি আমার এখেনে একটা ছিল···

জিনিষটা দেখার জন্যে শরৎ ব'সলেন।

পাম্পের জীর্ণ মলিন চেহারা দেখে কুমুদবাবু লজ্জা পেয়ে বল্লেন: না, না, এতে হবে না···আচ্ছা আপনারা এগিয়ে যান্ আমি এক জায়গায়—মিনিট পনর—দেরি হবে না—এলাম ব'লে।

নিশ্চয় অনিবার্য্য কারণে কুমুদবাবু আস্তে পারলেন না।

রাত বারোটা আন্দাজ ঘুম ভেঙে গেল। উপরে যেন কি একটা গোলমেলে ব্যাপার চ'লেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি একটি ছোট্ট জল-চৌকির উপর শরৎ ব'সে; পরণে একখানি ছোট কাপড়। হাতদুটো হাঁটুর উপর রেখে বমি করার চেষ্টা চ'লচে।

জানতুম যে সেখেনে কারুর যাবার উপায় নেই, তাই সোজাসুজি গিয়ে লেখার ঘরে বসলাম। খানিক পরে শরৎ এসে বল্লেন: তোমায় ডাকিনি, নুন গরমজল খেয়ে বমি করছিলাম, নৈলে ঘুম হবে না।

সকালে কুমুদবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর বাগানে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন। বাড়ীর আর কেউ উঠেছে ব'লে ত মনে হল না। চোখ দেখে মনে হ'ল কুমুদবাবু রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারেননি।

বল্লুম, কি ব্যাপার, আমায় ব'লবেন না?

কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ওঁর প্লেটগুলো আমরা দেখেছি···

তারপর?

ক্যান্‌সার হ'য়েছে···(কুমুদবাবু যেন আর ব'লতে পারেন না)···লিভারটাও···হয়ত' খেয়ে গেছে···পেটের অনেকখানি বাদ দিতে হবে···

বাঁচার আশা?

বাষ্প-বিজড়িত চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন: সে আশা—নেই—দুরাশা···

খানিকক্ষণ দুজনে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম!

কুমুদবাবু বল্লেন: চলুন বসা যাক্‌গে।

অপারেশন?

প্লেটগুলো নিয়ে একবার বিধানবাবুকে দেখিয়ে আসুন। উনি ললিতবাবুকে দেখাবেন। তারপর—সবাই মিলে গিয়ে একটা কিছু স্থির করা যাবে।

আর দেরি করা চলে না, বল্লাম: রাত্রে ভারি কষ্টে কেটেছে···

ভাত খেতে দেবেন না।

কথা শোনার কি মানুষ?

দেখি, ব'লে বই খুলে বল্লেন, এখানা ওঁরই জন্যে কিন্‌লুম···

কিছুক্ষণ বই দেখে বল্লেন, এ আপনারা বাজারে পাবেন না, দেখেশুনে আমি এনে দেব দু-একদিনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে ঠেকান দায়।

আচ্ছা, আজ দুপুরে গিয়ে আমি সব বুঝিয়ে আস্‌ব··· মুস্কিল, আমি কিছুতেই যেন আর গিয়ে উঠ্‌তে পারিনে··· আর একটা এগ্‌জামিনেশন দরকার··ষ্টমাক্ কণ্টেণ্ট্‌সের অ্যানালিসিস্···ওটা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্চে না।

বল্লুম: তা হ'লে ক্যান্‌সার সম্বন্ধে আপনাদের এখনও সন্দেহ আছে?

তা' বড় একটা নেই—তবে এতে আর সন্দেহের কোন পথই থাক্‌বে না।

এটা আবার, কোথায় হবে?

ডাক্তার দাশগুপ্তের ল্যাবরেটারিতে—সে ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। আপনি শুধু ব'লে দেবেন, আমি দুপুরে একবার যাব।···প্লেটগুলো আনার ব্যবস্থা আপনি যত শীগ্‌গির পারেন, করুন।

শরৎ এদিকে চীন-জাপানের যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন। বল্লেন: ওরা দিয়ে যাবে, তোমার যেতে হবে না···মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্লেন: কি বলেন কুমুদ?··· হোপ্‌লেস্?

কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে বল্লুম: প্লেটগুলো বিধান-বাবুকে দিয়ে আস্‌তে হবে যে···

হবে না, ওদের সব্বারই দেখা হ'য়ে গেছে···আমার ভয় হচ্ছিল যে, আমার মুখ আমার মনের কথা ধরিয়ে দেবে—তাই পালিয়ে আত্ম-রক্ষা ভিন্ন উপায় ছিল না—নীচে নেমে এলাম।

দুপুরে কুমুদবাবু ফোনের উপর দিয়ে কাজ সারলেন: দিনের আলোয় ধরা পড়ার ভয়ে বোধ হয়।

রাত্রে ক্যাপ্‌টেন মুখার্জ্জিকে সঙ্গে ক'রে এলেন কুমুদবাবু। বুঝলাম একলা আসার সাহস হয় নি।

দুজনেই বল্লেন—অপারেশনটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

উত্তরে শরৎ বল্লেন: দেখ কুমুদ, এর আর কোন পরামর্শের দরকার নেই, নতুনতর পরীক্ষার প্রয়োজনও দেখিনে। তুমি যদি কাল বল, কালই আমি রাজি আছি, —মামাকে সঙ্গে ক'রে তোমার চিত্তরঞ্জনে গিয়ে উঠ্‌চি—তুমি অপারেশনটি ক'রে দাও।···আমি খুব ভাল ক'রে জানি এই কলকাতায় তোমার মত দক্ষ সার্জ্জেন আর দুটো নেই—তোমার মনের জোরের কথা আমার জানা আছে—তোমার নিজের উপর বিশ্বাস দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম তোমার ছেলের কেসে। আর হাঙ্গাম বাড়িও না—সেটি যখন তুমি ম্যানেজ্ ক'রেছ—তখন এটি নিশ্চয় পারবে কুমুদ! আমি তোমায় অভয় দিচ্চি।···আমি মেয়েমানুষ নই—টেবিলে মারা যাবার কোন সম্ভাবনা নেই আমার!—দরকার হয় লিখে দেব যে আমার সম্পূর্ণ দায়িত্বে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তুমি অপারেশন করছ—কাল দশটার সময় মামাকে সঙ্গে ক'রে চিত্তরঞ্জনে গিয়ে উপস্থিত হব, তুমি কেটে-কুটে যা ক'রতে হয় ক'রো—আর কারুকে ডাক্‌তে হবে না—আমার কথা রাখ কুমুদ!

কুমুদ পাথরের মূর্ত্তিটির মত ব'সে রইলেন।

কৈ কোন কথা কও না যে?

আমি পারব না।

কুমুদ, এ কাজ তোমাকে বাদ দিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না।

লোকে আমায় বলবে কি?

মানে অপারেশন টেবিলেই···এই তো তোমার আশঙ্কা? —আমি জানি সে ভয় একেবারে নেই···তুমি যখন নিজের ছেলের···

আমার একটা ছেলে ম'রলে আর একটা হ'তে পারে; কিন্তু একটি শরৎচন্দ্র গেলে আর একটি হবে না।

যাবার হ'লে সে তোমার হাত দিয়েও যেতে পারে—বিধান কি ললিতবাবুর···

কিন্তু আমার দ্বারা—ব'লে কুমুদবাবু ঘন ঘন মাথা নাড়লেন।

ওঁরা চ'লে গেলে শরৎ খানিক পরে বল্লেন: যা বুঝচি, অপারেশনে বিশেষ কোন ফল হবে না···বৃথা এখেনে ব'সে লাভ কি? চল, কাল বাড়ী চ'লে যাই···কথার উত্তর দিলাম না।

তুমিও যে কথা কও না!

বাড়ীতে, কি ক'রতে?

শান্তিতে···

আত্মহত্যা ক'রতে চাও? তার জন্যে আমার দরকার কোথায়?

শরৎ চেয়ারের উপর চুপটি ক'রে প'ড়ে রইলেন।

ঠাকুর এসে ব'ল্লে—ফোনে ডাক্‌চেন কুমুদবাবু দাদুকে।

কি কুমুদবাবু?

দেখুন, ডাক্তার দাশগুপ্তকে ফোন ক'রে ঠিক ক'রে নিন্, কাল যাতে ওটা হ'য়ে যায়, আমি খবর দিয়েছি।

আচ্ছা ব্যবস্থা ক'রছি।

ফিরে দেখি শরৎ পিছনে দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে চেয়ারে ব'সে শরৎ ডাক্তার দাশগুপ্তকে ডাক্‌লেন। উত্তর এল তিনি শুয়ে প'ড়েছেন। যাক্, লেঠা চুকে গেল, ব'লে শরৎ ফোনটা রেখে দিলেন।

ডাঃ দাশগুপ্তের ল্যাবরেটারিতে যাবার জন্যে সকালে সেদিন শরতের বাড়ীতে সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেল!

মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে ভগবান চারিদিক দিয়ে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। যে সকালে ওঠে সে বলে: আহা! কি সুন্দর! কি আনন্দ সকালে উঠার! আবার যে বেলায় উঠে সে বলে: বাঃ কি মধুর সকালের ঘুমটি! তার রসাস্বাদন যে ক'রলে না—ব্যর্থই জীবন সে হতভাগার! দুঃখ—যে সকালে উঠে তার বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাক্‌তে হ'লে, আর যে বেলায় উঠে তার সকালে উঠতে হ'লে!

ডাঃ দাশগুপ্ত উঠেন সকালে, তাই তাঁর নির্দ্দেশগুলো সেই মতই হল। অতএব সেদিন শরতের বাড়ী অতি প্রত্যুষে কলরবে মুখরিত হ'য়ে উঠল। কালীকে বার বার ব'লে দিলেও তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। শরৎ বল্লেন: দেখ, সে কোন চায়ের দোকানে আছে—এখেনে এলেই পারত'···গাড়ী সাতটার সময় উপস্থিত হ'ল কুমুদবাবুর বাড়ীতে; তাঁর আমাদের সঙ্গে যাবার কথা। গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার পর গাড়ী অচল। কত কেরামতি ক'রলে কালী: কত লম্ফ, কত ঝম্ফ—কিন্তু গাড়ী বলে যেন: পাদমেকম্ ন গচ্ছামি! শরৎ আমার কানে কানে বল্লেন: এ নিমিত্তের সূচনা! অবশেষে কুমুদবাবুর গাড়ীতে রওনা হ'তে হ'ল এবং যেতে অনিবার্য্য দেরি! দাশগুপ্ত আর অপেক্ষা ক'রতে পারেন নি! ব'লে গেছেন: পাঁচ মিনিটে ফিরচেন। ডাক্তার এবং নার্সদের পাঁচ-মিনিট আর এক মিনিটগুলো সামুদ্রিক 'নটে'র মতই; একটু দীর্ঘ পরিসরের ব্যাপার! কুমুদবাবুর কাজ ছিল এবং শরতের কঠিন সব প্রশ্নের ঠেলায় চ'লে গেলেন। আমাদের একান্তে আলাপ সুরু হ'ল।

শরৎ বল্লেন: দেখ, এখেনে যতীন আবার কি সব লেঠা বাধায়; কিন্তু সুরেন, গাড়ীটা আমাকে অব্যর্থ জানিয়েছে··· এ-সবের মানে আছে, ইঙ্গিত আছে···নিশ্চয়···

এ আর এমন নতুন কথা কি শরৎ? চিরকালই মানুষ আমাদের দেশে হাঁচি-টিক্‌টিকি মেনে এসেছে এবং আস্‌চে। দুর্ব্বল মনের এইতো অভ্রান্ত লক্ষণ। তোমার অসুখে অসুখে মন হ'য়ে গেছে ভয়-বিকৃত। কৈ, কুমুদবাবুর কিছু মনে হয় না, আমারও ত হ'ল না; অমন কতদিন কত জায়গায় হ'তে দেখছি। মোটার বিগড়ে যাওয়া আজকালকার দিনে একটা অত্যন্ত সাধারণ নিত্যদিনের ঘটনা—যার আছে সেই ব'লবে—এ নিয়ে মাথা বেগড়ালে চলে না; কিন্তু তোমার কথা হ'য়েছে সম্পূর্ণ আলাদা···

শরৎ বল্লেন: জীবনী-শক্তি ফুরিয়ে এলে এমনি হয় বোধ হয়। কিন্তু এও তোমায় ব'লে রাখছি যে—তুমি দেখো মিলিয়ে পরে যে এ যাত্রায় আমার আর কিছুতেই রক্ষা নেই।

ডাক্তার দাশগুপ্ত এসে পড়াতে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

দেরি হ'ল যে বড়?

সে অনেক কথা যতীন···

আমায় খেতে দিচ্চ কি? কিচ্ছু যে খেয়ে আসিনি! কৈ তোমার গোপালের ভোগ কৈ? কতদিন তোমার বাড়ী খেয়েছি—মনে আছে দেশবন্ধুর সঙ্গে?

এটা হ'য়ে যাক্ দাদা—পরে সে সব ব্যবস্থা হবে একদিন···

কেন সন্দেশ খেয়ে বুঝি এ পরীক্ষা হয় না। কি দিচ্চ তবে?

ওট্ মীল, দাদা!

কেন?

ওইটেই আপনার সবচেয়ে সুটেবল্ ব'লে।

আমার দিকে চেয়ে খাটো গলায় শরৎ বল্লেন: দেখেছ সুরেন—একেই বলে শনি, কিছুতেই কি তোমার কথা শুনলাম!

পরিচ্ছন্ন পাত্রে এলো খাবারটি তৈরি হ'য়ে! তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে শরৎ দাশগুপ্তর সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগলেন।

দেখ যতীন, দেখ্‌তে রোগা হ'য়ে গিয়েছি; কিন্তু জোর তো আমার কিচ্ছু কমেনি। মনে হয়, দেশ থেকে যা' এসেছিলাম তার চেয়ে অনেকটা সেরেওছি। জোর ত কমেনি; বরং বেড়েছে।

এই বয়সে জোর কমার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ওজন ক'মে যাওয়ার দরকার, নৈলে অথর্ব্ব হ'য়ে যেতে হবে যে।··· শরীরের ভার ক'মে না গেলে হাঁটা-চলার স্ফূর্ত্তি কি ক'রে পাওয়া যাবে?

এইবার আমাদের ষ্টমাক্ পাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'ল সর্ব্ব-প্রথম। একটা মোটা কেঁচোর মত রবারের নল গিলে গিলে পেটের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে রাখা হল, আর পনর মিনিট অন্তর কিছু কিছু পিচকিরি দিয়ে পাম্প ক'রে বার ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্চে—দেখার জন্য কোন কোন জারক রস কতখানি পরিমাণে বার হ'চ্চে।

ঘণ্টা তিনেকের পর চারিদিকে কাজ-কর্ম্ম সেরে দাশগুপ্ত এসে তাঁদের সেকালের কথা জুড়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, শরৎ ব্যস্ত হচ্ছেন; বল্লেন: কৈ কুমুদ তো এলেন না···আজ যে আমার গাড়ী নেই···

দাশগুপ্ত একগাল হেসে বল্লেন, বাঃ আমি কাজ সেরে ব'সে আছি···আমি পৌঁছে দেব। চলুন, এতক্ষণ বলেন নি কেন?

বেশ যতীন, চল তোমার বাড়ী গিয়ে উঠি গে···ছ'জনে আজ তোমার গোপালের প্রসাদ পাব।

আজ নয় দাদা! আজ আমার বাড়ীতে বড় ভিড়; সদলে গুরুদেব এসেছেন। একদিন কীর্ত্তন শোনাব, আর সেইদিন···

আচ্ছা যতীন, সন্দেশ খেলে আমার ক্ষতি হ'তে পারে?

চিনির অংশটা কমিয়ে সন্দেশ বেশ চ'লতে পারে।

গাড়ী চল্‌চে।

আচ্ছা যতীন, ভীম নাগের সন্দেশ ভাল, না দ্বারিকের?

দুই সমান দাদা, তবে আমরা সেকেলে, ভীম নাগের বরাবরের খ'দ্দের···বাস্তবিক, লোকটার কোন সম্মান হ'ল না—এত হতভাগা দেশ আমাদের, ওর একটা ষ্ট্যাচু ক'রে দেওয়া উচিত গড়ের মাঠে—কি খাবারই ক'রে গেছে।

গাড়ী এসে ভীম নাগের দোকানের সামনে দাঁড়াল।

শরৎ বল্লেন: সুরেন, যা ওদের বেষ্ট আছে—তা দাম যতই হয়—এক টাকার নিয়ে এস।

বাড়ী পৌঁছে শরৎ বল্লেন: এর সঙ্গে গরম গরম মটরশুঁটির কচুরি হ'ত! দেখ না, কুমুদকে ফোন করে।

কুমুদবাবু বাড়ী ফেরেন নি; অগত্যা সন্দেশেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। কিন্তু ঠিক পাঁচটার সময় যেতে হ'ল কুমুদবাবুর বাড়ী।

মটরশুঁটির কচুরি শুনে কুমুদবাবু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বল্লেন: ঘিয়ে ভাজা একেবারে চল্‌বে না। আমি গিয়ে বুঝিয়ে ব'লে আসব। আপনি প্লেটগুলো বিধানবাবুকে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।

বাড়ী ফিরে দেখি শরৎ অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে উঠোন থেকে বারান্দায় আর বারান্দা থেকে উঠোনে—অধীর হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কালী সঙ্কুচিত হ'য়ে দূরে দাঁড়িয়ে—পরশু? কাল আমার একখানা গাড়ী চাই···আমি···

কালী চ'লে গেল।

আমাকে শুনিয়ে বল্লেন: কাল সকালেই বাড়ী যাচ্চি···

কথার জবাব না দিয়ে টবে নূতন-পোতা গাছগুলো দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

কথা কও না যে?

যাবে তো যাবে—কি ব'লব?

বেশ, তুমি থাক, আমি ঘুরে আসি।

আমিও যাব। ন'টার গাড়ীতে ভাগলপুর চ'লে যাব। আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। তোমার আত্মনিধন দেখার ইচ্ছে নেই।

তুমি বুঝতে পারছ না, দেশের জন্যে কি ছট-ফট ক'রছে আমার মন।···একবার যাওয়া চাই।

কয়েকজন বন্ধু এলেন। আমি রাস্তায় চ'লে গিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

বন্ধুরা চ'লে গেলেন। ঠাকুর এসে বল্লে: বাবু ডাক্‌চেন, দাদু।

তা'হলে বাড়ী যাওয়া হয় না।

না, ওঁদের আনিয়ে নেও।

কি ক'রতে আস্‌বে ওরা এখন?

বা-রে! ছেলেপুলেদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে আজ বাদে কাল··গোপাল যাচ্চে টাকা পাঠিয়ে দাও···

অপারেশনটা হ'য়ে যাক্ না।

পাগল! এত বড় ব্যাপার একদিনের নোটিশে···হ'তে ক'রতে মাসখানেক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ততদিন টিক্‌চিনে···

ওটি তোমার অমূলক ভয়···

না, না, সুরেন, ডাক্তারদের মান্দ্রাজ যাবার আগে যা হয় একটা হ'য়ে যাক্···

বেশ—দেখি তার চেষ্টা।

কাল এগারোটার মধ্যে টাকা দিয়ে যাবার কড়ারে সেবাসদন থেকে এক্স-রে প্লেটগুলো নিয়ে বাড়ী আসার ভরসা হ'ল না। সটান্ গেলাম কুমুদবাবুর বাড়ী। জানি তিনি বাড়ী নেই, দরওয়ান ত আছে!

দেখ দরওয়ান, মাইজির জিম্মায় দিয়ে দাওগে। ডাক্তার-বাবু দেখলে, আমি নিয়ে যাব।

বাড়ী ফিরতেই দেখি, শরৎ ওত পেতে ব'সে আছেন প্লেটগুলোর প্রতীক্ষায়।

কৈ আন্‌লে না?

না, টাকা নিয়ে যাইনি কিনা।

কত টাকা বলে?

বত্রিশ।

টাকা দিয়ে ও আমি কিছুতেই নেব না।

টাকা তা' হ'লে আমি দেব। তোমার ত' দেখ্‌ছি মাথা খারাপ হ'য়েছে।

তা তুমি যাই কর, আর যাই বল—টাকা দিয়ে আমি কিছুতেই নেবনা এই আমার শেষ কথা।···

অসুস্থ মানুষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রব না ব'লে ঘর থেকে বার হ'য়ে চ'লে গেলাম ; এবার বাড়ীর কাছাকাছি নয়—একেবারে দেশ-প্রিয় পার্কে।

ফিরে এসে দেখ্‌লাম। সদলে প্রকাশ এসে গেছেন।

কি প্রকাশ, আজ কি ক'রে এলে ?

ওরে বাপ্‌রে! আপনার একটা খামে আর একটা পোষ্ট কার্ডে চিঠি পেয়ে ত' বৌদি···আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে দিলে···আর মামা, আমাদের কি থাক্‌তে মন চাইছিল ?···উঃ আপনি বাঁচিয়েছেন···

তারপর দাদাটি কোথায় ?

দাদাকে তখন দেখে কে ? ছাগল, ময়ূর, গাছ-পালা, গ্যালারি, এক চৌবাচ্ছা লাল মাছ, একঘর ফুল—এই সব দেখিয়ে সবাইকে থ' ক'রে দেবার মতবল।

কুমুদবাবুর বাড়ী থেকে প্লেটগুলো নিয়ে বিধানবাবুকে দিয়ে আসা যে কত কঠিন তা সহজে অনুমান ক'রে উঠ্‌তে পারা যায় না। শরতের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করাই অসম্ভব। কে কবে রাত্তির একটার সময় লুকিয়ে বাড়ী এসে ধামাচাপা ভাত খেয়ে শুয়ে প'ড়ল, সে খবরটুকুও তাঁর আছে।

প্লেটগুলো নিয়ে বাড়ী ঢুকে দেখ্‌লাম, শরৎ তখনও নামেননি সেদিন।—আমাদের বসার ঘরে ছেঁড়া মাসিক, সাপ্তাহিক আর দৈনিকের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বাইরের দিকে এসেছি, ফিরে দেখি: শরৎ সেই ঘরে ঢুকেছেন!—ও ঘরের দিকে কোনদিন তাঁকে চেয়ে দেখ্‌তেও দেখিনি এর আগে।

সম্মুখ-সমরের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে অগ্রসর হ'য়ে বল্লুম :—আঃ! এ ঘরে কি ক'রতে ঢুকেছ তুমি? নোংরা ঘর—এখনি চাকরদের সঙ্গে রাগারাগি করতে থাকবে!

আমার বীরভাব দেখে শরৎ কেমন দ'মে গেলেন ; বল্লেন : মনে করছি এই ঘরটা তোমার জন্যে ঠিক করিয়ে দেব, তোমার একটা আলাদা ঘর নৈলে।

সে পরে হবে—আগে সার ত তুমি! চল, চল, চা খাইগে, বিধানবাবুকে ধরতে হবে···

শরৎ বাক্য ব্যয় না ক'রে নিজের জায়গায় ব'সে তামাক খেতে লাগ্‌লেন, ভালো ছেলেটির মতো।

উঠে গিয়ে গেটের তালাটা লাগিয়ে দিয়ে এলাম ঘরটায়। ফোনে বিধানবাবুর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ক'রলুম : তিনি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত থাক্‌বেন।

প্লেটগুলো দেখে বিধানবাবু বল্লেন, ও আমি দেখেছি—ললিতবাবুকে···

আচ্ছা রেখে যান্‌।

বল্লুম : শরৎ ব্যস্ত-বাগীশ, কোনদিন হঠাৎ বাড়ী চ'লে যেতে পারেন—একটা কিছু তাড়াতাড়ি···

মানে, অপারেশন করাতে হ'লে ললিতবাবুকে দিয়েই—আচ্ছা আপনি কুমুদকে ব'লে যান—আজ আটটার সময় দেখা ক'রতে—একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেলা যাবে।

বেলা দশটা হবে—তখন এলেন ললিতবাবু, বিধানবাবু আর কুমুদবাবু।

শরৎকে শুইয়ে, বসিয়ে, চিৎ ক'রে, কাৎ ক'রে, মানে যত রকমে হতে পারে, থাব্‌ড়ে, টোকা মেরে—পরীক্ষা হল।

তার পর, ব্যাধির ইতিবৃত্ত কথা-সাহিত্যিক বিবৃত ক'রলে তিনজনের নিভৃতে পরামর্শ সভা ব'সল।

সেই সময় সমস্ত বাড়ীটাই যেন থম্‌কে গিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইল ; কি যেন একটা ভয়ঙ্করের প্রতীক্ষায় দম বন্ধ হ'য়ে গেছে সবারি! এঁরাই ত' ডাক্তারদের মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের মত!

সর্ব্ব প্রথমে আমার ডাক প'ড়ল। নবমীর সদ্য-স্নাত নিরীহ প্রাণীটির মত কম্প্র-বক্ষে এক-পা এক-পা ক'রে অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ললিতবাবু বল্লেন : অপারেশনই স্থির···

এটি স্বয়ং রোগীকে বলুন না কেন? তিনি ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত ওর জন্যে।

তখন তিন জনে আবার ঘরে গেলেন। ঢুক্‌তেই শরৎ বল্লেন : কেন আপনারা ইতস্তত ক'রছেন, কালই কেটে দিন···

ঘরের কোণ হতে একখানা কুড়ুল তুলে নিয়ে বিধানবাবু মেঘ-মন্দ্র স্বরে বল্লেন : শুয়ে পড়ুন, এখুনি কাজ শেষ ক'রে যাই।

মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন সেই ঘরের মধ্যে সকলের মুখের হাসি—রঘুবংশের গুহান্ধকারে পশুরাজের দংষ্ট্রার মতই—সেই ঘরের বিষাদের অন্ধকারটাকে নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়ে গেল!

কুড়ুলখানি আমার হাতে দিয়ে বিধানবাবু ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন।

ললিতবাবু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই—কুমুদবাবু বল্লেন : ফি, ফি আসুন।

শরতের মুখের দিকে চাইলাম—

মাথা নেড়ে : নো ফি।

কুমুদবাবুকে বল্লুম : টাকা বার করা নেই। কুমুদবাবু আমার হাতে বত্রিশ টাকা দিয়ে বল্লেন : দিয়ে দিন্ আপনি।

থ্যাঙ্কস্...

ফিরে আস্তেই শরৎ বললেন : ও টাকাও আমি দেব না।

দিও না। ব'লে হাস্তে লাগ্লাম।

শরীরটা ভাল ছিল না ব'লে স্নান করিনি। একটা খাতা নিয়ে কি লিখ্‌চি—শরৎ বেলা বারোটার সময় প্রাতঃকৃত্য সারতে উপরে গেছেন : হঠাৎ কাপড় চোপড় প'রে নেমে এসে বল্লেন : চল, চল, ব্যাঙ্কে যেতে হবে, হাতে কিচ্ছু নেই।

উদ্যোগ পূর্ব্বাহ্নেই হচ্ছিল, গাড়ী বার ক'রে কালী অপেক্ষা ক'রছে—শরৎ বার থেকে ডাক্‌চেন : এসো সুরেন।

ফিরতি পথে ষ্টমাক্ পাম্প কিনে শরৎ বল্লেন : চল, কুমুদের কাছে ওয়ার্কিংটা দেখে আসি গে।

কুমুদবাবু তখনি এসে ঘুমিয়েছেন, ওঠাতে মানা ক'রে এসে বল্লুম শরৎকে—উঠ্‌তে দেরি হবে, এইমাত্র শুয়েছেন, একটু...

তবে তুমি থাক, আমি চলি।

বেশ।

বেলা চারটের পর কুমুদবাবু নেমে এসে যেন চ'মকে গেলেন : একি! না খেয়ে ব'সে আছেন?

খাব না কেন...স্নান করিনি কিনা!

তাড়াতাড়ি চা জলখাবার এল।

পাম্প দেখিয়ে বল্লুম : এতে চ'লবে? আমাকে ওয়ার্কিংটা শিখিয়ে দিন্।

ও সবচেয়ে শক্ত গলার মধ্যে পুরে দেওয়াটা। আজ নিশ্চয় ন'টার সময় যাব।

না হয়, ফোন ক'রে মনে করিয়ে দেব।

বেশ, তাই ক'রবেন।

ফিরে দেখ্‌লাম, শরৎ নীচের ঘরেই আছেন। বড়মা এলেন ছুট্‌তে ছুট্‌তে, বল্লেন : মামা! এ আপনার কি কাণ্ড? সাড়ে চারটে বাজে, তিনটে অবধি সব আপনার আশায় ব'সে...কেউ খায়নি।

কাজ প'ড়লে এম্নি হয় বড়-মা!

সেই রাত্তির চাট্টের সময় চা একটু খেয়েচেন।

আমি হাসি। বলার বা কি আছে!

শরৎ বল্লেন : আমার আগে তুমিই যাবে টেঁসে।... এরা সব এম্নি!

কিচ্ছু ভয় নেই, আমার উপস দরকার হ'য়েছিল যে আজ!

ষ্টমাক পাম্পের মোটা নলটা আমাকে ত' চিন্তাকুল ক'রে তুল্‌লে! ওটা গলার মধ্যে যাবে কি ক'রে? কিন্তু শরতের উৎসাহের অবধি নেই! একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পেটের আবর্জ্জনাকে ইচ্ছামত দূর ক'রে দেওয়ার কাল্পনিক সুবিধা আয়ত্তের মধ্যে প্রায় এসে প'ড়েছে—দুশ্চিন্তার চেয়ে প্রফুল্লতাই তাঁর মুখে ফুটে উঠ্‌ল!

প্রকাশ পাম্পের পরিচর্য্যা সুরু ক'রে দিলেন। গরম জলে বার কয়েক ফোটান হল। প্রকাণ্ড পটের মধ্যে হীটার দিয়ে জল ফুট্‌চে টগ্-বগ্!

এদিকে অচিরে পেট পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়ার আশু-আশায় প্রবল উৎসাহে চ'লেছে মটর-শুঁটির টাট্‌কা কচুরি! চিঁড়ে, কে কেমন ভাজতে পারে, কার বাড়ীতে কেমন ভাজা হয়, তার পর্য্যালোচনাসহ এক্সপেরিমেণ্ট! কাজেই পেটের চাপ ক্রমেই বেড়ে উঠে!

ও প্রকাশ, ও খোকা, তুই একবার কুমুদকে ফোন ক'রে বল—চট্ ক'রে ঘুরে যেতে...বুঝলি?

কুমুদবাবুর কোন সাড়া নেই। এদিকে পেটে রীতিমত অস্বস্তি—আমার ডাক প'ড়ল।

সাইফন্ প্রিন্সিপ্‌লটা মনে আছে ত ?

আছে।

আচ্ছা, আমাকে ডিমন্সট্রেট্ ক'রে দেখাতে পার ?

পারি। কিন্তু ঐ নল তোমার পেটের মধ্যে যাবে কি ক'রে ?

সে আমি বুঝব, এক সেকেণ্ডে ঢুকিয়ে দেব, দেখ না। তুমি দেখাও বাল্‌তি এনে।

টুল এল, বালতি এল, মোড়া এল, জল এল—মামার বিজ্ঞানের ঠেলায় বাড়ীশুদ্ধ লোকের ত্রাহি মধুসূদন, ওষ্ঠাগত প্রাণ!

টুলের বাল্‌তি থেকে মাটির উপরকার বাল্‌তিতে রবারের নল দিয়ে জল চালিয়ে দেওয়াতে নিউটন ফ্যারাডে কি জগদীশচন্দ্রের দরকার হয় না; অতএব আমার দিকের এক্সপেরিমেণ্ট হল নিখুঁত।

কিন্তু সেই মোটা নলটা পেটে চালিয়ে দিতে শরৎ হ'লেন গলদ-ঘর্ম্ম!—সহজে ছাড়বার ছেলেও নন, হিম-সীম খেয়ে গেলেন। এদিকে হার-স্বীকার করাও ত যায় না!

হঠাৎ উল্কাগতিতে কুমুদশঙ্করের প্রবেশ!

বিপুল জলরাশির সঙ্গে সন্দেশ-গোলা, কচুরির টুক্‌রো আর চিঁড়ে-মুড়ি যেন বানের মুখে ভেসে আসতে লাগ্‌ল!

গাড়ীতে উঠার সময় কুমুদবাবু বল্লেন: এ রকম হ'লে ত ভারি মুস্কিল। ওঁকে একটা নার্সিং হোমে নিয়ে যেতেই হবে। বাড়ীতে আর একদিনও রাখা উচিত নয়!

নার্সিং হোম!

শরৎচন্দ্রের বিজাতীয় ভয়ের বস্তু! তাঁর এক ধনী মাতাল-বন্ধুকে তাঁদের গৃহ-চিকিৎসক—বেশী অত্যাচার ক'রলেই ভয় দেখাতেন: তোমাকে এইবার নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেব।

শরৎকে নার্সিং হোমের কথা বল্লে তিনি যেন ফণা উদ্যত ক'রে উঠেন! কে ব'লবে সে কথা তাঁকে?

ডাক্তারেরা হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছেন। শক্তি আসছে ক'মে: আর অন্যায় আব্দার জিদ যেন প্রলয় মূর্ত্তি ধ'রে উঠ্‌ছে!

অপারেশন হয় কি ক'রে? ডাক্তারদের সমূহ ইতস্তত—ওদিকে ব্যাঙ্কের টাকা যাচ্চে হু হু ক'রে ফুরিয়ে!—অপারেশন কারুর মতে দেড় হাজার টাকার কমে নয়; কেউ বলেন: হাজারে সেরে দিতে পারি।

বুদ্ধি আর চলে না। কি করি! দেখি, গেট দিয়ে ঢুক্‌চেন একটি সুদর্শন যুবা।

আপনি আর একদিন এসেছিলেন না?

হাঁ, শরৎবাবু কেমন আছেন?

তেমনিই।

একটা কথা ব'ল্‌তে চাই, আপনি নার্সিং হোমের কথা ব'লছিলেন না?

ব'লছিলাম বটে।

আমার একটি আত্মীয়ের নার্সিং হোম আছে।

বাঙালীর নার্সিং হোম আছে? বাঃ ভারি ভালো খবর দিলেন ত'। কোথায়, কত দূরে?

দেখ্‌তে চান তো নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এখন একটু কাজে যাচ্চি—এগারোটার সময় আমাকে খবর দিলে আস্‌তে পারি।

আপনার ঠিকানা?

আপনাদের ড্রাইভার চেনে, আমার নাম—ঐ যে কালী!

কালী, চেন ত?

বাঃ আমাদের বাড়ীর কাছেই যে দাদু!

তিনি চ'লে গেলেন।

ঘরে এসে বল্লুম: শরৎ, তোমার একটা ভারি ভুল আছে।

কি?

বাঙালীর নার্সিং হোম ত আছে।

আছে নাকি? আম ত জানিনে!

এই তো বাবুটি ব'লে গেলেন।

তুমি গিয়ে একবার দেখে আস্‌তে পার? তাদের কি সব ব্যবস্থা; কি চার্জ্জ···

তা আর পারিনে?

তবে যাও চ'লে।

এগারটার সময় যাব ব'লে দিয়েছি।

কালীকে ব'লে দাও, বাড়ী চ'লে না যায়।

প্রকাশকেও নিয়ে যাব সঙ্গে—

বেশ তো!

বেলা বারোটা আন্দাজ ক্যাপটেন চ্যাটার্জ্জির পার্ক-নার্সির হোম দেখে ফিরলাম। ক্যাপ্টেনটি আমাদের স্নেহ-ভাজন সুশীল, সম্পর্কে নাতি হয়।

অকূল সমুদ্রে যেন কূল পাওয়ার মত হচ্চে। ঠিক করে এলাম, ৩১শে ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া টেরাসের ৪ নম্বর বাড়ীতে যাব। এই দিন আষ্টেক কোন রকমে কাট্‌লে হয়!

দাশগুপ্তকে সকালে গিয়ে রাতের খবর দি। তিনি আসেন গোলাপ ডালিয়ার তোড়া নিয়ে; তাঁর কথায় হাসিতে ভরসা আছে, স্নিগ্ধতা আছে—আবার কোথায় একটা কাঠিন্য—পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই।

আমাদের কপাল গুণে তিনি হ'লেন পীড়িত, এলেন চক্রবর্ত্তী মশাই।

দিন গুণছিঃ কবে আস্‌বে ৩১শে। ভারি একলা মনে হয়। শরৎ বলেন, ৩১শে?

সুরেন, ঐদিন আমার সব শেষ!

কেন?

আমি জানি।

আজকাল, একটু বেশী মানচ, বিজ্ঞান থেকে একেবারে ফলিত জ্যোতিষে, না?

না, দেখো তুমি!

ভয় পেয়ে যাই। বীজুবাবু হাজারিবাগে। চিঠি দিয়ে দিলামঃ আমি যে আর সাম্‌লে উঠ্‌তে পারছিনে বীজু-বাবু—যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এস!

সেদিন সন্ধ্যের পর এলেন মুকুলবাবু সস্ত্রীক।

লেখার ঘরে এসে বসলাম। খানিক পরে আমার ডাক প'ড়ল।

সুরেন, তোমার কাছে মুকুলের অনেক গল্প ক'রেছি—ইনিই শ্রীমান্ মুকুল দে, আর ইনি শ্রীমতী বীণা···মুকুল, ইনি আমার সুরেন মামা!

শরৎ বীণার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, আমরা লেখার ঘরে গিয়ে ব'সলাম।

মুকুল বল্লেনঃ দাদাকে ব'লেছি মামা, একবার সায়েব ডাক্তার দেখাতে চাই। তারাই বা কি বলে দেখা যাক্ না?

সে রকম ডাক্তার তোমার জানা আছে?

আছে, ম্যাকে ডাক্তার আমার জীবন-দান ক'রেছে। কাল সকালে তার কাছে গিয়ে এগারটা বারোটার সময় নিয়ে আসব।

মুকুলরা চ'লে গেলেন।

সকালের দিকটা ঘর-দোর পরিষ্কার হ'তে লাগল সায়েবের নামে।

শরৎকে গিয়ে বল্লুমঃ তোমার দাড়িটা পরিষ্কার করিয়ে দি?

কে দেবে?

কেন? একটা নাপিত ডাকা যাক।

তুমি আমার জিনিষ-পত্রগুলো এগিয়ে আমাকে ঠিক ক'রে শুইয়ে দাও। দেখি, না পারলে—ডেক নাপ্‌তে।

কামাতে গিয়ে কেটে যাওয়াতে শরৎ রেগে আগুন হ'য়ে উঠলেন।

রাগ আর কিছুতেই ক'মতে চায়না। অবশেষে আমি চ'লে গেলাম অন্য ঘরে।

বড়মা এলেন, মামা! আপনিও রাগ ক'রলেন?

না, কেন?

ওই যে বাবু ব'লছেন, আপনি ভাগলপুর চলে যাচ্চেন।

তা কখনও যাওয়া যায় এই অবস্থায়?

বড়-মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।—বল্লেনঃ আপনি ও-ঘরে চলুন।

গেলাম। শরৎ আমার হাত ধ'রে ব'ল্লেনঃ রাগ ক'রেছ?

কিসের রাগ? দোষ ত' আমারই—ব্লেড্‌টা ফিট্ ক'রে দেওয়া উচিত ছিল।

মুকুল আর বীণা সকাল থেকে রিং ক'রছেন। কেমন আছেন দাদা? এখন কি ক'রছেন? কি খেলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষকালে মুকুল জানালেন, ম্যাকে আস্‌বেন একটার সময়।

যথা সময় সায়েবকে সঙ্গে ক'রে মুকুল এসে উপস্থিত হ'লেন।

ডাক্তার ম্যাকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা ক'রে—বাইরের বসার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আলাপ ক'রলেন :—

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির অবস্থা অত্যন্ত ভয়জনক। যে কোন মুহূর্ত্তে সামান্য উত্তেজনায় তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। এর বহু পূর্ব্বে ওঁকে কোন নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

বল্লুম : নার্সিং হোম সম্বন্ধে ওঁর কতকগুলো এমন অভিমত আছে যার জন্যে ওঁকে এ পর্য্যন্ত নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি : তবে সম্প্রতি তাঁকে রাজি করা গেছে : ৩১শে পার্ক নার্সিং হোমে যাবার কথা আছে!

সায়েব অনেকক্ষণ ভেবে বল্লেন : ৩১শে ওঁকে কিছুতেই সরান সম্ভব হবে না। আজকে যাবার ব্যবস্থা হ'তে পারে না?

না, আজকে পার্ক নার্সিং হোম যাচ্ছে তার নতুন বাড়ীতে ; ৩১শের আগে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

মিষ্টার গাঙ্গুলী—আমার একান্ত অনুরোধ ওঁকে আজ যে-কোন উপায়ে কোন নার্সিং হোমে নিয়ে যান····

তা হ'লে আপনাকে সাহায্য ক'রতে হয়।

বেশ, আপনারা এদিকে ব্যবস্থা করুন, আমি একটি নার্সিং হোম ঠিক ক'রে এখুনি ফোন্ ক'রব।

সায়েব চ'লে গেলেন।

শরতের ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মুকুল, প্রকাশ আর আমি রইলাম।

আমার দিকে ফিরে বল্লেন : কি বলে সায়েব, সুরেন? হোপ্‌লেস তো?

সায়েবের একান্ত অনুরোধ,তোমাকে আজই কোন নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া।

বুঝেছি, ৩১শে টুলেট হবে : বলিনি তাই কি আমিও? কিন্তু সুশীলের ওটা তো আজ তৈরি নেই···আজকে হয় কেমন ক'রে?

মুকুল বল্লেন : দাদা আমি সায়েবকে পাঠিয়েছি—নার্সিহোম ঠিক ক'রে এখুনি রিং ক'রবে।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠতেই মুকুল ছুটলেন। ফিরে এসে বল্লেন : সায়েব ঠিক ক'রে বাড়ী গেলেন খেতে··· কোন অসুবিধে হ'বেনা দাদা।

দিনে দিতে হবে কত ক'রে মুকুল?

পনের—দাদা।

স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ ভেবে বল্লেন : মামাই সব ঠিক ক'রবেন। তাঁর মত হ'লে আমার আপত্তি নেই।

বল্লুম : সায়েবের সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার মনে হ'য়েছে—এখুনি যাওয়া শুধু উচিত নয়, একান্ত আবশ্যক।

তবে নিয়ে চল।

এই মহা-প্রস্থানের জন্যেই যেন যে ব্যাগ্‌টি তিনি কিনে এনেছিলেন তাতে নতুন কোট, পায়জামা, রুমাল, তোয়ালে সাজান হ'তে লাগল—নতুন মোজা জুতো বার হ'লো···

আমরা পাশের ঘরে চ'লে গেলাম।

মিনিট পনরর মধ্যেই বাড়ী জুড়ে মেয়েপুরুষের মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে গগনভেদী কান্নার রোল উঠল!

ছুটে বেরিয়ে এসে দেখি, বাড়ীর সবাই শরতের বিছানায় মাথা রেখে কান্না সুরু ক'রে দিয়েছে—ওগো কেন তুমি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্চ···ওগো কোথায় যাচ্চ তুমি···

মুকুল প্রকাশকে নাড়া দিয়ে বল্লেন : ছিঃ একি প্রকাশ!···

শরৎ মেজের উপর দাঁড়িয়ে পায়জামার ফিতেটা কোমরে টেনে দিচ্ছিলেন—তিনি ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

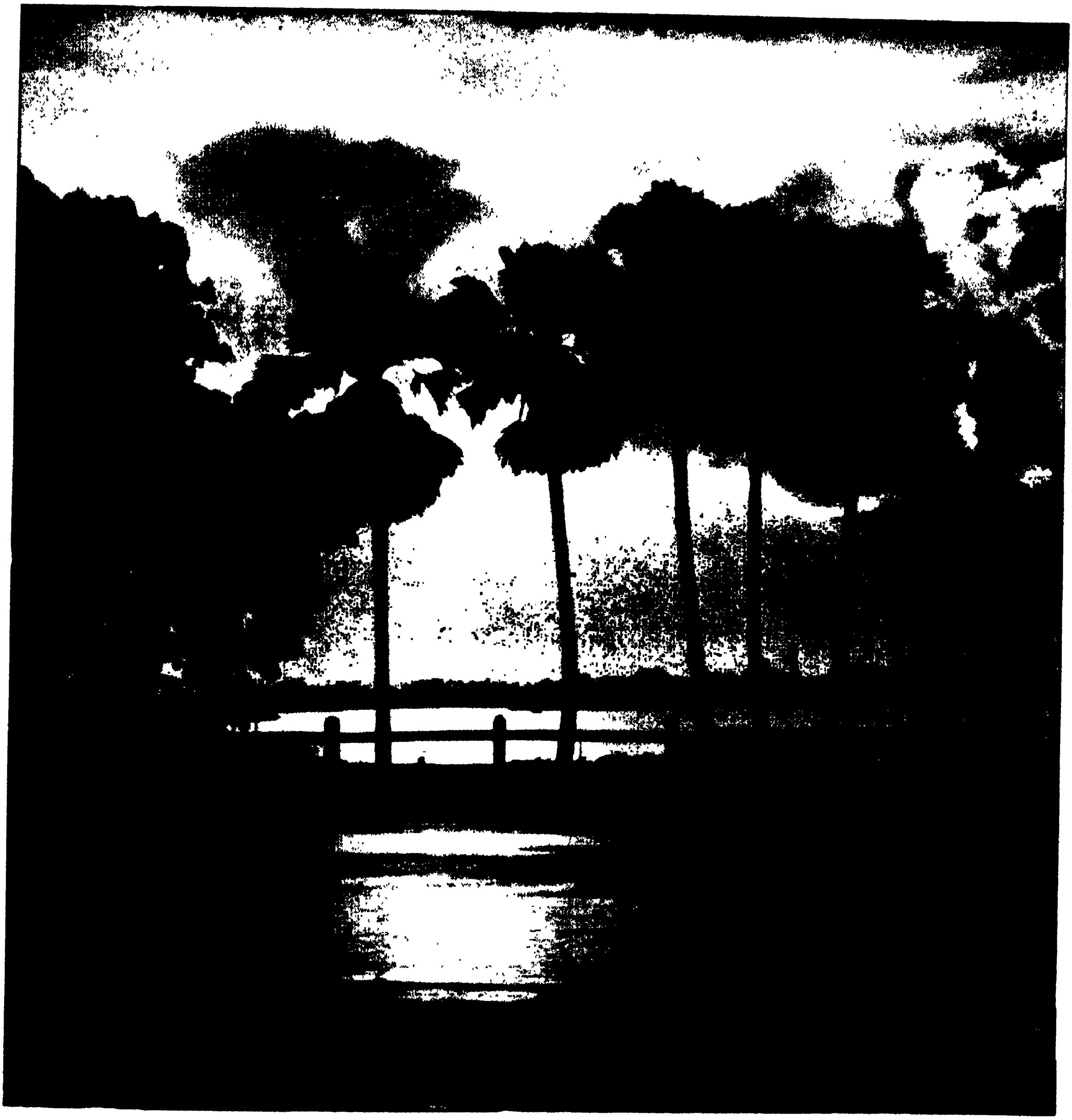
সামান্য চেষ্টার পর জ্ঞান হ'ল—মুকুল জিজ্ঞেস ক'রলেন : পারবেন যেতে দাদা?

পারব, কাঁদতে মানা কর।

বল্লুম : মুকুল ম্যাকেকে ডাক : সঙ্গে ডাক্তার থাকা উচিত···

অল্পক্ষণের মধ্যে ম্যাকে এসে প'ড়লেন। ধীরে ধীরে ডাক্তারের গাড়ীতে মুকুল আর প্রকাশের মধ্যিখানে ব'সে শরৎ তাঁর নতুন জুতো, নতুন মোজা—নবতর পোষাকে, নতুন ব্যাগে কাপড়-চোপড় ভ'রে নিয়ে, সুদূরের মহা-পথে রওনা হ'লেন বাড়ী ছেড়ে! পাড়ার লোক কাতারে কাতারে ভটস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পথে! সবাই ব'লছে : আহা! সেরে ফিরে আসুন আবার নিজের বাড়ীতে!

নার্সিংহোম সম্বন্ধে শরতের যে সব ভয় ছিল এটিতে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান! লাট-বেলাটের গাড়ী



নাম তাল পল্লব বিজনে
নাম জল ছায়া ছবি সৃজনে
—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—অজয় সেন, কলিকাতা



আয়ার সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি—ডাক্তার ডগ্লাস্ হাইড্ অভিষেকের পরে ডবলিন্ প্রাসাদে 'গার্ড অব্ অনার' পরিদর্শন করিতেছেন। ডাক্তার হাইডের বয়স ৭৮ বৎসর, তিনি কবি ও রাজনীতিক



ডিউক্-অব্-উইণ্ডসর ভার্সাই নগরে "রু-ডি-উইণ্ডসর" নামে একটি রাস্তার উদ্বোধন করিতেছেন ; সঙ্গে ভার্সাইর মেয়র, একজন সিনেটর ও ডাচেস্-অব্-উইণ্ডসর

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলাম : আভিজাত্য আছে ! হয়ত অভ্যাসের প্রশ্রয় না দিয়ে আরোগ্য ক'রে তোলার ব্যবস্থা কঠোর হ'লেও উদ্দেশ্যটি অসাধু নয়।

বিরোধ বাধল শরতের সঙ্গে প্রায় উদ্যোগপর্ব্বেই।

সিগারেট কেশ থেকে একটা বার ক'রে সবে ধরিয়েছেন শরৎ, আমরা এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত—সিস্টার যেন চমকে উঠলো। ক্ষিপ্র পায়ে গিয়ে ডাঃ ম্যাকের নোটটা প'ড়ে এসে' অতি অবলীলাক্রমে শরতের মুখ থেকে সেটা খুলে নিয়ে: এখন না ডক্টর চ্যাটার্জ্জি—তোমার ডাক্তার সিগারেট সম্বন্ধে অনুমতির ছাড় রেখে যায় নি···ওবেলা ডাঃ ম্যাকে এলে··· এই বলার মধ্যে কিছুমাত্র অভদ্রতা ছিল না : কিন্তু একটা অপূর্ব্ব তেজস্বিতা আর অটল গাম্ভীর্য্য ! শরৎ স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। তখনি বুঝলাম, বিদ্রোহী একেবারে ক্ষিপ্ত ! সন্ধ্যের সময় মেয়েরা এলেন দেখতে। সঙ্গে একটি ছোট্ট গ্লাসে তরলীকৃত কালাচাঁদ। সেটি খাইয়ে টেবিলের উপর যেই রাখা হ'য়েছে অমনি চিলে ছোঁ মারার মত নিয়ে চ'লে গেল সিস্টার। আবার খানিক পরে—দেখা গেল যথা-স্থানেই আছে গেলাসটি !

ম্যাকে এলেন একটু রাতে—আমার কাছে বসে বল্লেন : মিষ্টার গাঙুলি, নার্সিং হোমে ভিড় ক'রে দেখতে আসার নিয়ম নেই। অন্য রোগীর সুবিধে অসুবিধেও দেখতে হবে। বল্লুম : সে ঠিক সায়েব ; কিন্তু আজকে ডক্টর চ্যাটার্জ্জির কেশটা একটু বিবেচনার নয় কি ? আর, আমাদের মেয়েরা একটু ভাব-প্রবণ—তা বোধ হয় জান। সে কথা, সায়েব বল্লেন, আমি ওঁদের জানিয়ে দিয়েছি ! ···সিগারেট্টা আমার নির্দ্দেশ মত দিনে একটা কি বড় জোর দুটোর বেশি চ'লবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হার্টটা একটু উন্নতি করে—আর—ব'লতে ব'লতে সায়েবের মুখটা জবা ফুলের মত টকটকে হ'য়ে গেল—আফিংটা চ'লবে না ; আমি ওষুধ দিচ্চি—ইন্জেকশন দরকার হয় দেব ;—ওটা চ'লবে না অমন ক'রে দেওয়া !·· এগুলোর সম্বন্ধে একটু অবহিত হ'তে হবে, অনুগ্রহ ক'রে···মিঃ দেকেও ব'লে দি···ব'লে সায়েব রিং ক'রলেন। মুকুল এলেন, তখন প্রায় ন'টা। শরতের সঙ্গে দু'-একটা কথা কইতে কইতে আমাদের নিষ্ক্রমণের নোটিশ প'ড়ে গেল ! পরের দিন সকালে ম্যাকে হাসতে হাসতে বল্লেন : ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি আজ অনেকটা ভাল।···কাল সকালে কঃ ডেনহ্যাম হোয়াইটকে দেখাতে চাই—কি বলেন ?

বেশ তো তাই হোক্।

মুকুলের বাড়ী গিয়ে প্রকাশ আফিংএর জন্যে দীর্ঘ ওকালতি করলেন। মুকুল আমাদের সঙ্গে ক'রে ম্যাকের আপিসে গেলেন ; কিন্তু সায়েব কোন কথাই শুনতে চান্ না ! শরতের কাছে গিয়ে তাঁকে বলা হল ; তিনি অনেকক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে ব'ল্লেন : মুকুল, তুমি কি ব'লতে চাও ? বিধান কুমুদ ডাক্তারি জানে না ? প্রকাশকে ডেকে বল্লেন : যারা মজা দেখতে আসচে—তাদের মানা ক'রে দিস্···বুঝেচিস্ ?

পরের দিন সকালে কঃ ডেনহ্যাম হোয়াইট অতি পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে কেশ হোপ্লেস্। নার্সিং-হোমে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। শরৎ বল্লেন : আজ-কের মধ্যে যদি সুশীলের নার্সিং হোমে না নিয়ে যাও ত' আমি মাথা খুঁড়ে মারা যাব।

শরৎ, বাড়ী ফিরে চল।

না, না, বাড়ী যাব না। সুশীলের নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করগে। পথে দাঁড়িয়ে আবার ভাব্না ভাব্চি ! কালী এল গাড়ী নিয়ে, বল্লে : দাদু কুমুদবাবু যে এসেছেন ! কুমুদবাবুকে নিয়ে ফিরে এলাম। শরতের সেই এক কথা। কুমুদ যাও ত' সুশীলের নার্সিং হোমটা দেখে এস। কুমুদবাবুর পছন্দ হ'ল। রাত আটটা-নটার সময় বীজুবাবুর সঙ্গে শরৎ এলেন—চার নম্বর ভিক্টোরিয়া টেরাসে। বাঙালীর কর্ত্তৃত্বে এসে তাঁর মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল !

শেষ যে লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে আসছে, তা বুঝতে কারুর বাকি রইল না ! পচুবাবুর ফুলের তোড়ার বড় বড় গোলাপগুলোর গালভরা হাসি, আর প্রাণমাতান গন্ধ ;— খাঁচার মধ্যে এতটুকু ছোট কেনারির সুরের অবিশ্রান্ত ফোয়ারার অজস্র ধারার তলায়—মৃত্যু যেন মহাকালের মৌনীর মধ্যে দিনের অক্ষমালা একটি একটী ক'রে গুণে শেষ করে চলেছে ! অটল তার পদ-বিক্ষেপের, অমোঘ ভঙ্গি ! বিধানবাবু এলেন রাত আটটার পর ! কাছে এসে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন : কি কষ্ট হচ্চে, দাদা ?

কষ্ট তো আমার কিছুই নেই···

তবে ?

তেষ্টা, তেষ্টা—আমার বুক জুড়ে আছে মরু-ভূমির ছাতি-ফাটা তেষ্টা, ডাক্তার!

যারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখেনে—তারা অলক্ষ্যে চোখ মুছতে লাগল!—বিধানবাবু রুমাল বার ক'রে নাক ঝাড়ার অজুহাতে বারান্দায় চ'লে গেলেন!

অবশেষে সুশীলের মন্ত্রণা-ঘরে আমাদের ডাক প'ড়ল।

আমার মুখের দিকে অশ্রু-সরস বিশাল দুটি চোখ ফেলে বিধানবাবু বল্লেন: আর দু-তিন দিনের অপেক্ষা—আমাদের আর কিছুই করার নেই···কিন্তু কঠিন কর্ত্তব্য এখন আপনাদের!

কি এখন আমরাই বা করতে পারি?

একটিমাত্র পথ খোলা আছে—সেটি অপারেশন, আমরা—ডাক্তারেরা জোর ক'রতে পারিনে, কেননা নিরেনব্বোই পার্সেণ্ট চান্স টেবিলে শেষ হওয়ার—দেখুন মামা—আপনারা বিবেচনা ক'রে!

ডাক্তারের গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লাম: তেষ্টার কি হবে?

চলুন আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি।

দাদা! এই রুমালের মধ্যে বরফ চুষে—জলটা কিন্তু পেটে না যায়, ফেলে দেবেন?

শরৎ ঘাড় নাড়লেন।

অনেক রাত্রে কুমুদবাবু এলেন। আমায় নিভৃতে ডেকে বল্লেন: বিধানবাবু চান অপারেশন, আপনারা কি ঠিক করলেন?

বাড়ীর মত হবে না। আপনি কি বলেন কুমুদবাবু?

এক একবার মনে হচ্ছে ক'রে দিলে হয়; কিন্তু···

শরৎ যদি লিখে দেন?

তা কি উনি দেবেন?

চলে যাবার সময় কুমুদবাবু আমায় চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বাইরে কারা দাঁড়িয়ে?

ছেলের দল হবে।

ফিরে এসে তাঁর অর্ডার বইএ লিখে গেলেন—ঘরে নার্স ছাড়া আর কেউ যাবে না। মুখে নার্সকে বল্লেন: তোমার ডিস্ক্রীশন ইউজ্ ক'রবে অবশ্য!

গাড়ীটা ভেতরে আনেন নি। গাড়ীতে উঠে বল্লেন: আজ আপনি থাকুন এখেনে।

বেশ।

রাত্তির চাট্টের সময় শরতের ঘরের দোর খুলে দেখি, শরৎ বেশ জেগে আছেন।

শরৎ বল্লেন: ও বাইরে দাঁড়িয়ে কে?

মিঃ গাঙ্গুলি।

ভেতরে ডাক।

আমাকে ভিতরে ডাকলে সিস্টার।

কিন্তু তুমি জান ডাক্তারের মানা।

আমার ডিস্ক্রীশন আছে। ভেতরে গেলাম।

বাড়ী যাওনি? কোথায় শুয়েছিলে, সুরেন?

গাড়ীতে।

কেন পাশের ঘরে?

আমার নাক ডাকে যে।

শরৎ হাসলেন: ঠিক্, একদিন আমার ঘুম ভেঙে গেছলো···আমার মাছ কটা ম'রেছে?—

সামান্য, দুটো একটা···

পাখীটাকে আনতে মানা ক'রেছি···আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে কবে?

তুমি যবে যেতে চাইবে, কাল ত' ব'লে দিয়েছ, আজ যাবে—বড় মা তার ব্যবস্থা ক'রছেন···

বাড়ী যাব না।

কেন?

আমি আজ আছি কেমন?

খুব ভাল; সব দিক দিয়ে।

আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্লেন: ব্লাফ্ দিচ্ছ?

তোমাকে তা' দিই না।

জানি তা।···তবে বিধানের কথা শোন, না—আজ অপারেশনটা করিয়ে দাও!

তুমি কি ষ্ট্যাণ্ড ক'রতে পারবে?

ঐ এক তোমাদের কথা! আমি কি···

লিখে দিতে পার?

কুমুদকে ডেকে নিয়ে এস। তাকে কিছু ব'ল না—তা হলে সে হয়ত আসবে না।

বেশ।

গাড়ী ত' আছে।

আছে।

চ'লে যাও।

কুমুদবাবু এলেন।

কুমুদ, আজ অপারেশনটা ক'রে দাও—আমি ভাল আছি, ষ্ট্যাণ্ড ক্'রতে পারব।

আচ্ছা দেখি, বিধানবাবুকে ডাকি। কুমুদবাবু অফিসে গেলেন।

শরৎ লিখে দাও, এই কলম, এই চশমা, এই প্যাড্।

আমি তো সব কথা লিখ্তে পারব না সুরেন। তুমি লিখে দাও, আমি দস্তখত ক'রে দেব।

বল, আমি লিখি :

আই টেক্ অপ্ অন্ মিসেল্ফ্ অল্ রেস্পন্সিবিলিটি অফ অপারেশন এণ্ড রিকোয়েষ্ট ডক্টর কে, এস, রায় টু অপারেট অন্ মি···

কাগজখানি এগিয়ে দিলাম। শরৎ বড় বড় ক'রে লিখে দিলেন :

উইথ অল্ সেন্সেস্ এণ্ড কারেজ ইন্ট্যাক্ট্।

এস, চ্যাটার্জ্জি।

কুমুদবাবুকে কাগজখানা দিয়ে বল্লুম এই নিন্।

তিনি প'ড়ে বল্লেন : আই অ্যাম ফীলিং হেল্···ললিত বাবুকে ডাকি, সঙ্গে নি ?

নিশ্চয়।

তিনটের সময় অপারেশন শেষ হ'য়ে গেল।

সুরেন, আজ তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।

কি খাবে ? লিকুইড ছাড়া ত' কিছু দেবার উপায় নেই···মনে আছে তোমার অপারেশন হয়েছে ?

আছে।

মুখ দিয়ে খাওয়া বন্ধ।

কেন ?

বমি হ'লে ষ্টীচ্ কেটে গেলে আর রক্ষে হবে না।

বেশ টিউব দিয়ে—তুমি খাইয়ে দাও !

খেয়ে শরৎ ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

রাত সাড়ে দশটার সময় ললিতবাবু এলেন—রোগী দেখে খুশী !

বল্লেন : কাল সকালে যদি এমনি পাই ত' বাড়ী ফেরার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

তিনটে রাতে রিং করলাম—মিস্টার চ্যাটার্জ্জি কেমন ?

ও ! মিষ্টার গাঙ্গুলি ! এখনি এস···ভারি গোলমাল···

গিয়ে দেখি, শরৎ বমি ক'রছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে।

বেরিয়ে এসে বল্লাম : মিষ্টার—তুমি তোমার ডিস্-ক্রীশনের অপব্যবহার ক'রেছ।

শরৎ ! শরৎ !

চোখ চাইলেন—কি হ'য়েছে শরৎ ?

যন্ত্রণা, ভীষণ, জীবনে এমন হয়নি—কখন—ও—ও···

কালের রুদ্র করাল মূর্ত্তি !

দিন কাটে না আর ! লোকযাত্রার শেষ নেই—

কিছুতেই আর ও-ঘরে ঢুকতে পারিনে। বীজুবাবু বুক দিয়ে প'ড়ে আছেন।

গভীর রাত্রে বীজুবাবু ডাক্লেন।

কি শরৎ ?

আমি যে ম'রে যাচ্চি—দেখ্তে পাচ্চ না ?···

ওরা কারা ?

ইসারা ক'রলাম—প্রকাশ কাছে এলেন ; দাদা !

প্রকাশ—আমি ম'রে যাচ্চি······ভালো ক'রে, উঁচু ক'রে শুইয়ে দিতে শরৎ ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

আবার ডাক—বীজুবাবু বল্লেন—ডাক্চেন আপনাকে—

কি শরৎ ?

আমাকে দাও, আমাকে দাও···

কি আমার তাঁকে দেবার মত ছিল ! কি তিনি শেষ চেয়ে—চোখ বুঝলেন—আমার কাছে !

আজও যে ভেবে পাইনে !

সমাপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক

আজ হইতে এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পর এক শত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র 'বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক উৎসব' সম্পাদিত হইতেছে। গত ১০ই আষাঢ় হইতে দিবসত্রয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রধান উৎসব হইয়া গিয়াছে—প্রথম দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে পরিষদের সভাপতি মণীষী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সভা হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহার উদ্বোধন করেন। ১১ই আষাঢ় সকালে কলিকাতার বহু সাহিত্যিক কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহে গমন করিয়া ঋষির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন। ঐ দিন ও তৎপর দিন সন্ধ্যায় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল। বাঙ্গালার সকল স্থানেই বঙ্কিম উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং সুখের বিষয়, তাহা হইতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমানে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণের সভাপতিত্বে চন্দননগরে, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে চুঁচুড়ায় ও ধানবাদে এবং শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে হাওড়া-আমর্ত্তায় উৎসব হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর বিস্মৃত হইবার বস্তু নহে; এই উৎসবের উপকারিতা আর কিছু থাক বা না থাক, ইহা সমগ্র জাতিকে বঙ্কিমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া ধন্য হইবে এবং মৃতপ্রায় বাঙ্গালী জাতি নবভাবের আস্বাদ লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হইবে ও দেশের মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি।" তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—"সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত প্রথম উপায়—ইতিহাস অধ্যয়ন। কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃপিতামহের নাম জানে না এবং এমন দুই একটি হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়। হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে, মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।" নিজের প্রশ্নের উত্তরেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"মুসলমানেরা স্পেন হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই। * * * ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল; এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ—(১) পাঞ্জাব (২) সিন্ধুসৌবীর (৩) রাজস্থান (৪) দাক্ষিণাত্য (৫) বাঙ্গালা।" তিনি লিখিয়াছিলেন—"যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধ চরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি সে দেশের ইতিহাস নাই।" তাই তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে বলিয়া-

ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে ও বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কথনও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।" তিনি হিন্দুকে তাহার গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য উড়িষ্যার প্রস্তরমন্দির দেখিয়া লিখিয়াছিলেন —"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—সেই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত, বিকম্পিতচেলাচঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলন স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপ প্রেম গর্ব্ব সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত-রত্নহারা, পীবর যৌবন ভারাবনতদেহা— তন্বীশ্যামাশিখর-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—মধ্যক্ষামাচকিতহরিণী প্রেক্ষণা-নিম্ননাভি—এই সব স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, উপনিষদ এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।"

স্বদেশের প্রতি এই যে অনুরাগ, ইহা না বুঝিলে বঙ্কিম-চন্দ্রকে বুঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সকল বিভাগে, কি কথাসাহিত্য, কি ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি বিজ্ঞান, কি দর্শনে—তাঁহার প্রতিভার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগে পরবর্ত্তীগণের গতিপথ সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়, উহাতে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে বালবিধবা কুন্দ ও রোহিণীর চিত্র তিনি অঙ্কিত করেন। বালবিধবার বিবাহ ভাল কি মন্দ সে সমস্যার কোন উত্তর না দিয়া তিনি দেখাইয়া-ছিলেন, বাঙ্গালা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমস্যা কত জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে। গোবিন্দলালের চরিত্রের অধঃপতন এবং 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের আত্মোৎসর্গে তিনি দেখাইয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়জয় ও চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কল্যাণ প্রসূত হয় না। 'রাজসিংহ' 'সীতারাম' প্রভৃতিতে তিনি হিন্দুর গৌরবগাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সকল উপন্যাসেই তিনি ধর্ম্মের জয় দেখাইয়াছেন, সকল উপন্যাসেই একটি উচ্চ নীতি অনুসৃত হইয়াছে, অথচ তজ্জন্য সাহিত্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেম ধর্ম্মে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং 'দেবী চৌধুরাণীতে' গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্মশক্তিতে আস্থাবান বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল পণ্ডিতগণের ভ্রূকুটী গ্রাহ্য না করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি নূতন পথে পরিচালিত করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশ



বঙ্কিমচন্দ্র

করিয়াছিলেন। এই 'বঙ্গদর্শন' দ্বারা যে মহাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি শুধু নিজে লিখিতেন না, লেখক তৈয়ারী করিয়া লইতে জানিতেন। তাই তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' লেখকগণের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তাঁহার সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র তাঁহারই মত বাঙ্গালা

ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে চারি বৎসরকাল 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়া কেবল কথাসাহিত্য পাঠকগণকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করেন নাই, 'লোকরহস্য,' 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাংখ্যদর্শন' ও বিবিধ সমালোচনা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী-পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনের' সাহিত্য-সমালোচনা বাঙ্গালা-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। সুলেখকগণ যেমন তাঁহার প্রশংসা পাইয়া পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিতেন, সাহিত্যের আবর্জ্জনা আনয়নকারীরা তেমনই তাঁহার সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া রাণীকুঞ্জ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতেন।

শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নিকট হিন্দুধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার প্রতিভাতীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রে 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। কাহারও কাহারও মতে 'কৃষ্ণচরিত্র'ই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কিন্তু উহা কি রক্ষণশীল হিন্দু কি ব্রাহ্ম কেহই পাঠে সন্তোষ গোপন করিতে পারেন নাই।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বৈদিক-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় সে বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মণীষী রমেশচন্দ্র দত্ত যখন হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া হিন্দুশাস্ত্র প্রকাশে অগ্রসর হন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহাভারত ও ভগবদ্‌গীতা অংশের সঙ্কলন ভার লইয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

একদল লোকের বিশ্বাস যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন, তিনি মুসলমান-বিরোধী ছিলেন; কিন্তু নিম্নে উদ্ধৃত তাঁহার লিখিত কয়টি লাইন পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে সে ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট।"

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পুনরায় আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন; আজ যে বাঙ্গালী জাতি আবার নিজের ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইয়াছে, সে শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়া গিয়াছেন। লোকশিক্ষার কথা প্রসঙ্গে তিনি কথকতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর ৫০ বৎসর অতীত হইলেও আজও তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন—"লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল, আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরি বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্ব-পালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য—যে অহিংসা পরম

ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? দেশীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে।"

বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ হইবে বা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া এখনও দেশে নানারূপ বাগবিতণ্ডা হইয়া থাকে। আমরা এখানে 'মৃণালিনী' হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বর্ণনা তুলিয়া দিয়া তাঁহার লিখিত ভাষার রূপ দেখাইব। দেখা যাইবে, বঙ্কিমের ভাষা অপূর্ব্ব—মনোহর। তিনি লিখিয়াছেন —"অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরের বেদীর উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবাল মণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনক-কিঙ্কিণী সংবেষ্টিত বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। একদিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ বিভূষিত অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিল। অন্যদিকে মহাসত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌলিক, গৌল্মিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাবধানতা রক্ষা করিয়াছে। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে, কুশাসন মাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।"

গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করিতে হয়; তদ্ভিন্ন গতি নাই। বঙ্কিমকে বুঝাইতে হইলে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৪৪ বৎসর পরে আজ তাঁহার লেখা যতই পড়া যায়, ততই মনে হয় যে আজ পর্য্যন্ত এরূপ আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। এমন বিশ্বতোমুখী প্রতিভা বুঝি আর কাহাতেও সম্ভব নহে। তিনি সমগ্র জীবন যে মাতার সন্ধান করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, সেই মাতৃ-সন্ধানের পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার মাতৃরূপ দেখাইয়া আমরা এই নিবন্ধ শেষ করিলাম। তাঁহার কমলাকান্ত বলিয়া গিয়াছে—"আমি এক কালসমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দপবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত রত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রুমর্দ্দিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি এই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম সেই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই মাতৃমূর্ত্তির সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে সাধনা করিতে শিখিয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কমলাকান্তে এই মাতৃরূপ সকলকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই মাতৃরূপের সন্ধান পাইয়াই বাঙ্গালী জাতি মৃণ্ময়ী মাতাকে চিন্ময়ীরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করে—কমলাকান্ত প্রকাশিত হওয়ার ১০ বৎসর পরেই জাতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার মূর্ত্তি গড়িয়াছিল। তাহার পর ৫০ বৎসরেরও অধিককাল চলিয়া গিয়াছে; তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আমরা সাধনা করিয়া চলিয়াছি; সিদ্ধি দূরে কি অদূরে—তাহার হিসাব লইবার সময় এখনও আসে নাই। তাই আজও জাতি বঙ্কিমের ভাষাতেই জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে সেই মাতার বন্দনা করিয়া বলে—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি, মন্দিরে মন্দিরে।

বন্দেমাতরম্।

সাময়িকী

খ্যাতনামা সংবাদিক নিরুদ্দেশ—

'ফরোয়ার্ড' ও 'এডভান্স' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সুপণ্ডিত ব্যারিষ্টার প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ঐদিন তিনি তাঁহার ভবানীপুর ৩নং বাল্মীক ষ্ট্রীটস্থ বাসা হইতে যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, তদবধি তাঁহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধমাতা ও পুত্রকন্যাদি বর্ত্তমান। তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মত একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির এইরূপ নিরুদ্দেশ হওয়া বাস্তবিকই বিশেষ দুঃখের বিষয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের আগামী অধিবেশন এবার জলপাইগুড়ীতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সে জন্য ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যালকে সভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সম্পাদক করিয়া জলপাইগুড়ীতে একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং আবশ্যক কার্য্যাদি আরম্ভ করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ী ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউটের পার্শ্বস্থ বিস্তৃত মাঠে সম্মিলনের অধিবেশন ও প্রদর্শনী করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে; কংগ্রেস নেতারা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া সকলকে সম্মিলনের কথা জানাইতেছেন। জলপাইগুড়ী চা-ব্যবসায়ের কেন্দ্র এবং রাজসাহী বিভাগের সদর বলিয়া তথায় বহু লোক বাস করেন; কাজেই সেখানে যে সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে—

৫০ বৎসরেরও অধিককাল দেশসেবায় রত থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় দেশনেতা খাপার্দে মহাশয় গত ২রা জুলাই ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বাসস্থান অমরাবতী নগরে পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রথম জীবনে উকীল ও পরে ৪ বৎসর সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন। তিনি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত 'দাদা সাহেব' বলিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে যখন কংগ্রেস হয়, তখনই এই দাদাসাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের সময় তিলক, ডাক্তার মুঞ্জে ও লালা লাজপৎ রায়ের সহিত খাপার্দেও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর বহুকাল তিনি দেশসেবায় নানা ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন। রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় দিল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের তীব্র প্রতিবাদের কথা দেশ কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরদিন স্মরণ করিবে।

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী—

স্বদেশী যুগের সুপ্রসিদ্ধ নেতা মৈমনসিংহবাসী হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় গত ২৬শে জুন লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যৌবনকাল হইতেই তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় নেতারূপে সর্ব্বজনপরিচিত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৮১৮-এর ৩ আইনে বন্দী হইয়া ৫ বৎসর কাল আটক ছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তিনি কিন্তু অসুস্থ শরীর লইয়াও কংগ্রেসের কাজে যখনই যাহা প্রয়োজন হইত, তাহা সম্পাদনের ত্রুটি করিতেন না।

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি—

রামকৃষ্ণমিশন ও বেলুড়মঠের সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী পরলোকগমন করায় স্বামী শুদ্ধানন্দ মিশন ও মঠের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বহুকাল



বাড়ীর পথে

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী



পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বার্সিলোনা (স্পেন) পরিদর্শন—সঙ্গে তাঁহার সেক্রেটারী মিস বাটলীওয়ালা ও স্পেনের দুই জন মন্ত্রী



ন্যাজি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া হইতে বিতাড়িত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক—বিরাশী বৎসর বয়স্ক ডাক্তার সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড্‌—
কেবলমাত্র আসবাব পত্র, লাইব্রেরী এবং গ্রীক ও মিশরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি লইয়া লণ্ডনে যাইবার অনুমতি পাইয়াছেন

মঠের সেক্রেটারী ছিলেন এবং বহুদিন উদ্বোধন পত্র সম্পাদন করিতেন। গৃহস্থাশ্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম ছিল সুবোধ চক্রবর্ত্তী; এম-এ পাশ করিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্বামী শুদ্ধানন্দের বয়স ৬৪ বৎসর।

কর্পোরেশনের অনাচার দূরীকরণ—

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর উপর অত্যাচার হইলে সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য এক বিশেষ কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল। গত ২৩শে মে তারিখে কর্পোরেশনের সভায় উক্ত কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাতে কমিটীর নিম্নলিখিত নির্দ্দেশগুলি গৃহীত হইয়াছে—(১) কর্পোরেশনের স্বার্থের জন্য উপযুক্ত নোটীশ দিয়া অস্থায়ী শিক্ষাসচিব শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টার শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও লণ্ঠন লেক্‌চারার শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র মিত্রকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে। (২) শ্রীমতী শান্তিনিয়োগী ও শ্রীমতী উষা রায়—কর্পোরেশনের এই দুইজন শিক্ষয়িত্রীকে আর চাকরীতে রাখা হইবে না। (৩) শিক্ষক শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মণ্ডলকে সতর্ক করিয়া অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হইবে। (৪) শিক্ষাবিভাগের চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য একটি পরামর্শ-কমিটী গঠিত হইবে। (৫) কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহাদের নাম ধামের একটি তালিকা রাখা হইবে। (৬) প্রতি ওয়ার্ডেই কর্পোরেশনের বালিকা বিদ্যালয়গুলির কার্য্য পরিদর্শনের জন্য বিশিষ্ট মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহারা অবশ্য কর্পোরেশন হইতে কোন অর্থ পাইবেন না। কর্পোরেশনের একটি বিভাগের অনাচার সম্বন্ধে তদন্তের পর কর্পোরেশনকে এইরূপ যে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা করিতে হইল, তাহা দুঃখের বিষয়। অন্যান্য বিভাগে যে অনাচার নাই এমন কথা বলা যায় না। কাজেই কর্পোরেশনের সকল বিভাগকে ক্রমে ক্রমে অনাচারমুক্ত করিতে পারিলে কলিকাতাবাসীর আর কোন অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল—

কলিকাতার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ জোড়াসাঁকোর শীল পরিবারের হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয় গত ২৮শে জুন ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৺আশুতোষ শীল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র এবং ৺ভুনীচাঁদ শীলের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি সেতার, হার্ম্মোনিয়াম, সুরবাহার ও



হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল

কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলনের সকল অধিবেশনেই তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যায়ামেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বদান্য বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুই পুত্র বর্ত্তমান।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

ইতিপূর্ব্বে যখন আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হয়, তখন এমন কতকগুলি জেলাকে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেখানে প্রায় সমস্তই বাঙ্গালাভাষা-ভাষী লোক বাস করে। ঐ জেলা-

গুলিকে যাহাতে বাঙ্গালার সহিত পুনরায় সংযুক্ত করা হয় সে জন্য বহু আন্দোলন হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সম্প্রতি পার্লামেণ্টেও ভারত-সচিব বলিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তিতে ভারতে প্রদেশ গঠনের ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। কিন্তু বিহার ও আসামে বাঙ্গালীদের প্রতি ঐ দুই প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের যে প্রকার মনোভাব দেখা যাইতেছে, সে জন্য বাঙ্গালাভাষা-ভাষী লোকদিগকে বাঙ্গালার মধ্যে ফিরাইয়া আনার প্রয়োজন দেখা যায়। ঐ দুই প্রদেশে বাঙ্গালী-দিগকে বিদেশী বলিয়া মনে করা হয় এবং সরকারী চাকরী বা ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। বিদ্যালয়েও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদান ব্যবস্থা রহিত করার চেষ্টা চলিতেছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির এই মনো-ভাবের জন্য বাঙ্গালাভাষা-ভাষী স্থানসমূহ অবিলম্বে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে যদি বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি একটী সন্তোষজনক আপোষের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীরা যাহাতে পূর্ব্বের মত নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে, সে জন্য সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

কংগ্রেস ও বাঙ্গালার মুসলমান—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বাঙ্গালার কয়েকটি জেলায় ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে আশার বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন—"মুসলমান জনসাধারণের নিকট আমি আশাতিরিক্ত সাড়া পাইয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে মাদ্রাজের জষ্টিশদল ও বোম্বায়ের অব্রাহ্মণ দলের ন্যায় বাঙ্গালার মুসলমানগণ অবিলম্বে কংগ্রেসের ভিতরে আসিবেন।" পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের পর সুভাষচন্দ্রের এই আশা যেন ব্যর্থ না হয়।

কর্পোরেশনের নূতন শিক্ষাসচিব—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী শিক্ষাসচিব শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ৩০শে জুন চাকরী হইতে অপসারিত হওয়ায় ১লা জুলাই হইতে কর্পোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টার সত্যানন্দ রায় শিক্ষাসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল যুবক দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্যানন্দ-বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং সমাজসেবকরূপে কলিকাতায় সুপরিচিত। তাঁহার এই পদপ্রাপ্তিতে সকলেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২শে জুন বুধবার রাঁচীতে ৬৫ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে স্বদেশী যুগের নেতারূপেই সমধিক পরিচিত ছিলেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির সহিত ৩ আইনে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ২১ বৎসর বয়সে তিনি গণিতে এম-এ পাশ করেন। পরে ডাফ কলেজ, টাঙ্গাইল কলেজ ও বরিশাল কলেজে অধ্যাপকের কাজ করার পর নির্ব্বাসিত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাসন হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলে গভর্ণমেণ্টের বাধায় তিনি আর বরিশালে অধ্যাপক হইতে পারেন নাই; কিন্তু সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে সিটি কলেজে অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। ঢাকা জেলার বাহেরক তাঁহার জন্মভূমি। সকল কার্য্যই তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিত। তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র ও চারিটি বিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন—

কংগ্রেসের গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে মহাকোশল প্রদেশের একটি গ্রামে আগামী বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন

হইবে। সম্প্রতি মহাকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী স্থির করিয়াছেন যে জব্বলপুর তহশীলে ত্রিপুরী গ্রামের নিকট একটি মাঠে কংগ্রেস-নগর নির্ম্মাণ করা হইবে। ত্রিপুরীতে পুরাকালে কালচুড়ি রাজাদের রাজধানী ছিল। স্থানটি জব্বলপুর সহর হইতে ১০ মাইল, মার্ব্বেল পাহাড় ও নর্ম্মদা জলপ্রপাত হইতে তিন মাইল। জি-আই-পি রেলের ভেড়াঘাট ষ্টেশন হইতে উহা মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি যে মনোরম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার নিকটে বহু প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বস্তুও বিদ্যমান। কাজেই আগামী কংগ্রেস তাহার স্থান-মাহাত্ম্যের জন্যও বহু দর্শককে আকৃষ্ট করিবে।

বাঙ্গালা হইতে বিতাড়ন—

একদিকে যেমন রাজবন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনই দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি একটুও কমান হয় নাই। সম্প্রতি কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার মুক্ত-আসামী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ বক্‌শী ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শচীন্দ্রবাবু ও যোগেশবাবু উভয়েই সর্ব্বজনপরিচিত; যোগেশবাবুর মাতাও মৃত্যুশয্যায়। তথাপি এই দুই ব্যক্তিকে কেন যে অতি অল্প সময় দিয়া বাঙ্গালা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল, তাহার কারণ বুঝি না। কোন ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতির ফলে কি দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১লা জুলাই হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রমথবাবুর মত মেধাবী ছাত্র খুব কমই দেখা যায়; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। গত ২৬ বৎসর তিনি এম-এ বিভাগে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপনা করিতেছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সভায় সদস্য আছেন। দেশের নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাহার সংযোগ আছে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের সদস্য হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রমথনাথ স্বর্গত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিপ্লবী নেতা সর্দ্দার পৃথ্বী সিং—

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলায় সর্দ্দার পৃথ্বী সিং দণ্ডিত হন; কিছুদিন আন্দামান বাসের পর তিনি মাদ্রাজ রাজমহেন্দ্রী জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। গোপনে থাকিয়া বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি স্কুলে তিনি ব্যায়াম শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। পরে আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া রুশিয়া গমনকালে তিনি ধরা পড়েন ও অনেক আন্দোলনের পর মুক্তিলাভ করিয়া চীনে চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে তিনি রুশিয়া ও অন্যান্য বহু দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন এবং গত ২০শে মে গান্ধীজির নিকট নিজ পরিচয় দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গান্ধীজি তাঁহাকে পুলিসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বটে, তবে যাহাতে তিনি শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন, সেজন্য গান্ধীজি চেষ্টা করিতেছেন। পৃথ্বী সিংএর জীবন বহু আশ্চর্য্য ঘটনায় পূর্ণ।

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র ও শরদিন্দুনাথ ঠাকুরের পুত্র রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর গত ২রা জুলাই শনিবার মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি শৈশবে প্রফুল্লনাথের পিতৃবিয়োগ হইলে পিতামহের আদরে প্রফুল্লনাথ বড় হইয়াছিলেন। বাল্যকালে যাঁহারা তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন তাঁহারা বাঙ্গালা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী লেখক স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ কথামৃত রচয়িতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট প্রফুল্লনাথ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন এবং রাজনীতি চর্চ্চারও যোগদান করিয়াছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য হন এবং পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উহার

সম্পাদক এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মধ্য দিয়া তিনি জমীদার ও প্রজার বহু সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহাতেই তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত দেহান্ত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল। তিনি বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও অতি সাধুপ্রকৃতির ও সরল লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার একজন আদর্শ জমীদারের অভাব হইল।

ইন্দ্রনাথ স্মৃতি-উৎসব—

গত ১৪ই মে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ গঙ্গাটিকুরী গ্রামে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে তাঁহার স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। এ যুগের যুবকগণের নিকট ইন্দ্রনাথ তেমন পরিচিত না হইলেও এককালে যে ইন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিবার জন্য সমগ্র বাঙ্গালা উৎসুক হইয়া থাকিত, তাহা তৎকালীন কাহারও অবিদিত নহে। 'পঞ্চানন্দ'-ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথবাবু সেকালের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসী'তে প্রতি সপ্তাহে যে হাস্যমধুর অথচ কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করিতেন, তাহা আজও পাঠককে তাঁহার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গির জন্য মুগ্ধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রনাথের প্রথম রচনা "কল্পতরু" পাঠ করিয়া সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্য্যে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোমের সমকক্ষ; হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত; ইন্দ্রনাথবাবু পরদুঃখকাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, সুরুচিবিরোধী নহেন। * * * কল্পতরু বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।" ইন্দ্রনাথ রচিত "ভারত উদ্ধার" বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারও ব্যঙ্গের অন্তরালে বুকভাঙ্গা রোদন ছিল। সেকালে 'ভারত উদ্ধার' প্রত্যেক যুবকই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিরাম'ও বঙ্গবাসীর উপহাররূপে সর্ব্বজন আদৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের রসরচনার পরিচয় প্রদান সহজকার্য্য নহে। যিনি তাহা না পাঠ করিবেন, তিনি তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন। ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেন; হিন্দুধর্ম্ম ও আচারে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তিনি তাঁহার অর্জ্জিত সমগ্র সম্পত্তি দেবসেবা ও সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। স্মৃতিসভার দিন কলিকাতা ও বর্দ্ধমান হইতে প্রায় শতাধিক ইন্দ্রনাথ-ভক্ত ইন্দ্রনাথের বাসভবনে সমবেত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের শিষ্য বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীযুত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাগত অতিথিগণকে উপযুক্তভাবেই আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। এরূপ স্মৃতি-উৎসব সচরাচর দেখা যায় না। পূজ্যের পূজা করিলে পূজকেরই জীবন সার্থক হয়। সেদিন ৩০ বৎসর পরে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের পূজা করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে।

রাস্তা নির্ম্মাণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা—

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে রাস্তা নির্ম্মাণ বাবদ প্রাপ্ত মোট ৪৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা অব্যয়িত অবস্থায় মজুত ছিল। ঐ বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও ঐ বাবদে ১লক্ষ ১৩ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ টাকা হইতে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মাত্র ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন; কাজেই, গত ১লা এপ্রিল তাঁহাদের হাতে ৩২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মজুত ছিল। কেন যে ঐ অর্থ গত বৎসরে ব্যয় না করিয়া মজুত রাখা হইয়াছে, তাহার সঙ্গত কোন কারণ দেখা যায় না। পথনির্ম্মাণ বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীও আছেন। এবার শুনা যাইতেছে, ঐ টাকা ব্যয়ের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

তাঁহার দ্বারাও যদি উপযুক্ত কার্য্য না হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট ত জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলির মারফত ঐ অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাঙ্গালা দেশে যে পথের অভাব আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস, এ বৎসর আর গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন না থাকিয়া ঐ তহবিলের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রজাসাধারণের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

বাঙ্গালায় সেচের পরিকল্পনা—

সেচের ব্যবস্থা দ্বারা পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে কৃষির কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহা যাঁহারা ঐ ব্যবস্থা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বুঝা সহজসাধ্য নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটি সেচের বৃহৎ পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। দামোদর ও গঙ্গা (হুগলী) নদীর মধ্যবর্ত্তী বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার সর্ব্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা করাই এই পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য। দামোদর নদের তীরে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলকে বর্ত্তমান জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করা হয়; সে জন্য বন্যাজলের পলিমাটী হইতে বঞ্চিত জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। ঐ সকল জমী রক্ষা করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা স্থির করেন; শীঘ্রই যাহাতে এ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ হয়, সেজন্য সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেখা যাউক, ফল কি হয়।

ধান চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা দেশে ধানই সর্ব্বপ্রধান কৃষিপণ্য। বাঙ্গালায় যে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর আবাদী জমি আছে, তন্মধ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমীতেই ধানের চাষ হয়। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে ধানের মূল্য ছিল মণ প্রতি ২ টাকা হইতে ২ টাকা ৪ আনা। গত মার্চ্চ মাসে তাহা কমিয়া ১ টাকা ১০ আনা হইয়াছে। সেজন্য বাঙ্গালার কৃষকদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ঐ দামে ধান বিক্রয় করিলে কৃষকের লাভ হওয়া দূরে থাক, চাষের খরচও উঠে না। সেজন্য যাহাতে ধানের দাম নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্ধারিত হয়, সেজন্য বর্ত্তমানে সরকারী চেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে কোন কর্ত্তব্য নাই, এমন নহে।

ফলের চাষের উন্নতি—

সিন্ধু প্রদেশের মীরপুরখান নামক তালুকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কৃষি-উদ্যানে কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর এবার প্রচুর পরিমাণে আল্‌ফান্‌সো আম ফলিয়াছে। ঐ আম পূর্ব্বে শুধু বোম্বায়েই ফলিত। এখন সিন্ধুর সর্ব্বত্র ঐ আমের গাছ বসান যাইবে। ঐ প্রদেশে অপর এক ভদ্রলোকের চেষ্টায় তাঁহার বাগানে প্রচুর আঙ্গুর জন্মিয়াছে। সিন্ধুদেশে যাহাতে নাগপুরী কমলালেবু জন্মে, সেজন্যও চেষ্টা চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশ ফলপ্রসূ বলিয়া খ্যাত ছিল; কিন্তু এখন ফলের জন্য বাঙ্গালাকে সকল সময়েই পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এদেশে কি উৎকৃষ্ট ফল-সমূহের চাষবৃদ্ধি করিবার জন্য উৎসাহী কর্ম্মী পাওয়া যায় না?

মহাজন আইন পরিবর্ত্তন—

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যে মহাজনী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বন্ধকসূত্রে প্রদত্ত ঋণের সুদ শতকরা ১৫ টাকা ও বিনা বন্ধকীতে প্রদত্ত ঋণের সুদ শতকরা ২৫ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। বর্ত্তমানে ঐ সুদের হার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে—একদল লোক সুদের হার যথাক্রমে ৫ টাকা ও ৯ টাকা এবং অপর দল যথাক্রমে ৬ টাকা ও ৯ টাকা করার চেষ্টা করিতেছেন। সুদের হার কমিলে তাহা ঋণ-গ্রহীতার পক্ষে সুখ ও সুবিধার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের পক্ষে এত অল্প সুদে ঋণ সংগ্রহ করা কি সম্ভব হইবে? এ বিষয়ে ভারতীয় বণিক সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই আমরা সমীচীন মনে করি; সুদের হার যথাক্রমে ৯ টাকা ও ১২ টাকা করা হইলে বোধহয় কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাহা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সুদের প্রায় অর্দ্ধেক হইবে।

কৃতী ব্যবসায়ীদ্বয়ের মৃত্যু—

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের দুইজন কৃতী ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে বাঙ্গালার ব্যবসাক্ষেত্রের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। (১) সলিসিটার এন, কে, রায়চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘকাল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর ডিরেক্টার ছিলেন এবং বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানীর চিফ্‌ এজেণ্টরূপে তাঁহার নাম ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ছিল।

(২) এডভোকেট মাধবগোবিন্দ রায় মহাশয় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ডিরেক্টার ছিলেন। তিনিও সুদীর্ঘকাল ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় তুলা-চাষ বৃদ্ধি—

বাঙ্গালায় কাপড়ের কলওয়ালাদিগের যে সমিতি আছে তাহার সভাপতি মোহিনীমিলের শ্রীযুত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক সভায় বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলায় এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে চেষ্টা করিলেই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতে পারে। কাজেই যে সব স্থানে পাট চাষের সুবিধা নাই, সে সব স্থানে তুলার চাষই লাভজনক। পাট চাষে বিঘা প্রতি ৪ টাকা ১২ আনা আয় হয়, আর তুলা চাষে বিঘা প্রতি ১২ টাকা ৪ আনা আয় হয়। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১০ হাজার টাকা ও কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির প্রদত্ত ১০ হাজার টাকা—মোট ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাঙ্গালায় তুলা-চাষ বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করা হইবে। কলওয়ালা সমিতি এই অত্যাবশ্যক বিষয়টিতে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; কারণ ইহার ফলে শুধু তাঁহাদের নহে, বাঙ্গালার দরিদ্র কৃষকদিগেরও লাভের সম্ভাবনা আছে।

জাপানের রপ্তানী হ্রাস

জাপান অন্যায়ভাবে চীন দেশকে আক্রমণ করায় পৃথিবীর সকল সভ্য দেশই জাপানী পণ্য বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছে। এই বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে জাপান হইতে বিদেশে পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ গত ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৬ ভাগ, জানুয়ারীতে ১৭ ভাগ ও ফেব্রুয়ারীতে ১৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জাপানী দ্রব্য ব্যবহার করিত; তথায়ই ঐ দ্রব্য ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কমিয়াছে। কিন্তু জাপান তাহাতে দমিবার পাত্র নহে। তাহারা নিম্নলিখিতরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া বিদেশের বাজারে তাহাদের মাল চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুইডেনের দেয়াশলাই ভাল বলিয়া তাহার বেশী কাটতি হয়। জাপানীরা তাহাদের একটি দ্বীপের নাম রাখিয়াছে 'সুইডেন' এবং সেখানকার তৈয়ারী দেয়াশলাই 'সুইডেনের তৈয়ারী' মার্কা দিয়া বিদেশে চালাইতেছে। তাহারা রেশম বস্ত্র নির্ম্মাণের একটি শিল্পকেন্দ্রের নাম 'ম্যাক্লেস্‌ফিল্ড' রাখিয়া সেখানকার রেশম 'ম্যাক্লেস্‌ফিল্ড'-রেশম নামে চালাইতেছে। ব্যবসায়ের মধ্যেও কিরূপ দুষ্টবুদ্ধি খেলা করে, তাহা উপরের দুইটি উদাহরণ হইতেই বেশ বুঝা যায়।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া এবার কয়েক মাস দার্জ্জিলিংএর নিকটস্থ কালিম্পংয়ে বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কালিম্পংয়ে অত্যধিক বর্ষা নামায় তিনি গত ৫ই জুলাই বোলপুর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে এবং শীঘ্রই তিনি পুনরায় কালিম্পংয়ে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি এক্ষণে তাঁহার দেশ-বাসীবৃন্দকে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—"বন্ধুবর্গ ও জনসাধারণের সহিত পত্রব্যবহার এবং তাঁহাদের অন্যান্য অনুরোধ রক্ষা আমার জীর্ণ শরীর ও মনের পক্ষে দুরূহ হওয়াতে এই সমস্ত দায়িত্বভার হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সকলের নিকট আমি সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আমার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি ২৬শে জুন ১৯৩৮।" রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সুস্থ হইয়া দেশ ও দশের সেবায় নিযুক্ত থাকুন, আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাহা প্রার্থনা করি।

ভিক্ষুক সমস্যা ও তাহার সমাধান—

কলিকাতা সহরে রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকরা সহরময় রোগের বীজাণু ছড়াইয়া থাকে—এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভিক্ষুক-দিগের বাসস্থান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। কর্পোরেশনের বর্ত্তমান মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কিন্তু তিনি জানাইয়াছেন যে জল-নিকাশের উন্নততর প্রণালী নির্ম্মাণের জন্য কর্পোরেশনকে সম্প্রতি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে; সে জন্য

কর্পোরেশনের সাধারণ তহবিল হইতে ভিক্ষুকদিগের জন্য গৃহনির্ম্মাণে অর্থব্যয় করা চলিবে না। সে জন্য মেয়র মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন, সকল শ্রেণীর লাইসেন্স ফি শতকরা সাড়ে ১২টাকা হারে বাড়াইয়া বার্ষিক সওয়া লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করা হইবে এবং তদ্দারা ভিক্ষুক-নিবাস নির্ম্মাণ করা হইবে। কর্পোরেশনের কত অর্থ যে অপব্যয়িত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং সেই অপব্যয়ের কথা সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই এ অবস্থায় কর্পোরেশন যদি ঐ অপব্যয় বন্ধের ব্যবস্থা করিয়া সওয়া লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলার থাকিত না। কিন্তু লাইসেন্স ফি বাড়াইলে তাহা বহু দরিদ্র ব্যবসায়ীদিগের অসুবিধার কারণ হইবে। কাজেই আমাদের অনুরোধ এ বিষয়ে সম্যক বিবেচনার পর কর্পোরেশনের কর্ত্তারা যেন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

বৃন্দাবনী

শ্রীনিরুপমা দেবী

নৈদাঘ উষা

অদূর কালীয় দহে ঘন বন মাঝে
সুপ্ত শিখী শিখিনীর নীপ নেত্রে বাজে
ঈষৎ পিঙ্গলালোক ঘন 'কেকা' রবে
বাজিল "মঙ্গলারতি" ষড়জ ভৈরবে
বৃন্দাবনে বনে বনে।

কির পিক শুক
তাপশীর্ণ কদম্বের ডালে জাগি মূক,
ভয়ে ভয়ে কেহ তুলে মৃদু সুরে গান।
দীর্ঘ দিবসের দাহে তপ্ত বায়ু প্রাণ
অশান্ত রজনী বুকে লভেনি আশ্বাস
এখনো আতপ্ত ঘন ছাড়িছে নিশ্বাস।

পিঙ্গল আলোকে ছায় ক্রমে নভতল
ম্লান চন্দ্র, দীপ্ত তারা জ্বলিছে কেবল
পুরাতন মন্দিরের সুউচ্চ চূড়ায়
সনাতন গোস্বামীর 'আদিত্য টিলায়'।

বিশীর্ণা যমুনা দূরে বালুকার চরে
পাতিয়া অন্তিম শয্যা যেন মোহ ভরে।
সহসা উঠিল জাগি "জয় রাধে" রব
বৃন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে, জলস্থল সব
মুহূর্ত্তে সজীব হ'ল!

বাজিল 'মঙ্গল'
মৃদঙ্গ মন্দিরা সহ কণ্ঠ কোলাহল
মন্দিরে, বৈষ্ণব "ঠোরে!" স্নিগ্ধ হয়ে বায়
"মদনমোহন" "বাঁকা বেহারী" চূড়ায়
উড়ায় পতাকা!

জ্বলে "শ্রীঅষ্টসখীর"
মঙ্গল প্রদীপ "রাধা রাসবেহারীর"।
"জয় রাধে রাধে" রব ব্যাপী বৃন্দাবন
নৈদাঘ পীড়িত ব্রজে জাগালো জীবন।

জল যাত্রা

হে গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন!
দারুণ দাহের পরে একি আয়োজন

প্রদোষেতে জল হোলী ! শত উৎস মুখে
স্নিগ্ধ বারি নির্ঝরিয়া, মাঝে তার সুখে
স্নান করি নিজে, আর ব্রজবাসী দলে
ভিজাও নির্মম করে হাসি কুতূহলে !

নিদারুণ নিদাঘের বহ্নিজ্বালা মাঝে
ডুবাইয়ে দীর্ঘ দিন শেষ-জ্যৈষ্ঠ সাঁঝে
সাজাইয়ে এই 'জল' যুদ্ধ অভিযান
খেলিতে তোমার সনে করিলে আহ্বান !
ধূলিপাংশু রৌদ্রদগ্ধ তাম্র দিগন্তর
গভীর কাজল মেঘে হল স্নিগ্ধতর,
বুকে স্বর্গহাসি রূপে দামিনী বিকাশ
শিহরি শিখিনী করে কলাপ প্রকাশ !

শ্যামলিমা-হারা 'ব্রজ' ঊর্দ্ধ মুখে চায়
তাপদগ্ধ বুকে ধরি সেই শ্যামছায় !
দীর্ঘ বিরহের একি হল অবসান ?
বুকে জাগে যুথি কদম্বের অভিযান
'কল কল' 'ঝরঝর' জলযান মুখে
তব "বারিবাণ" পড়ে ব্রজধাম বুকে !

দীর্ঘ দাহ স্মৃতি তার ভুলায়ে নিমিষে
ভিজাও ডুবাও তারে বিষাদে হরিষে।

"মাধুকরী"

হ'ল দিন শেষ, ঘন উড়ায়ে গোধূলী
ফেরে ব্রজে ধেনুদল।
স্কন্ধে জীর্ণ ঝুলি
বাহির হ'লেন ধীরে 'বিরক্ত বৈরাগী'
নিরালা কুটীর ত্যজি ! সারা নিশি জাগি
সুদৃঢ় ভজনে, পুনঃ দিবস ত্রিযাম
সেই "এক রস" পানে জপি এক নাম
যাপি, চলেছেন এবে "মধুকর ব্রতে"
ব্রজবাসী দ্বারে দ্বারে "টুক্" ভিক্ষা ল'তে।

কানন-শিখিনী শিখী আসি স্নেহ ভরে
দাঁড়াইল পথে, গাভী ঘন হুহুঙ্কারে
বেড়িল সে দেহ, বৎস চাটে হাত আসি,
চলেন সরায়ে তাহাদেরে স্নেহে-হাসি।

ললাটে তিলক চিহ্ন, অঙ্গে আঁকা নাম,
করে জপমালা, জিহ্বা মগ্ন অবিশ্রাম
এক রস পানে ; পথে জ্ঞানী মানি দূরে
ধূলায় লুটায়ে শির রহে কর যুড়ে।
স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে মাত্র তুষিয়া সবারে
"জয় রাধেশ্যাম" রবে ব্রজবাসী দ্বারে
দাঁড়ালেন সাধু !
"রাধেশ্যাম" রবে ছুটি
গৃহস্থ সাদরে আনে শুষ্ক খণ্ড রুটি !
সেই 'টুক্' ক'টি গৃহে লয়ে মাধুকরী
গৃহে-পথে চলিলেন মঙ্গল বিতরি'
শুভ দৃষ্টি পাতে, নামে ; যেন মধুকর
চলে মধুচক্রে গুঞ্জি প্রিয় নামাক্ষর।



খেলা ধুলা

অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড—৬৫৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়া—৪১১ ও ৪২৭ (৬ উইকেট)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করতে হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাডম্যান নিজের প্রতিভাকে খর্ব্ব করেও দলকে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে বিচক্ষণতা ও অতি সতর্কতার সঙ্গে খেলে সময় কাটিয়েছেন। দুর্দ্ধর্ষ বোলার ভেরিটির বল থেকে অপর ব্যাটস্‌ম্যানকে যতদুর সম্ভব সরিয়ে রেখে নিজে তার বলের সম্মুখীন হয়ে ১৪৪ নট আউট থেকে গেছেন বেলা শেষে। ব্রাউন ১৩৩ এবং ম্যাককাব ৩৯।



হ্যামণ্ড—ব্যাট করছেন



এম জে ম্যাক্‌কাব

প্রথম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেট ১৯৪ রানে পড়ে যাবার পরে, ম্যাক্‌ক্যাবের ও শেষ-চার উইকেটের মিলিত চেষ্টায় ২১৭ রান ওঠে। ধুরন্ধর ব্যাট হাসেট, ব্যাড্‌কক ও ব্রাডম্যানের পতনের পর ম্যাক্‌ক্যাব যেন দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার যশ ও সম্মান রক্ষা করতে নেমেছে। ম্যাক্‌ক্যাব্‌ ১৫০ রান ১৯০ মিনিটে, পরের ৮২ রান ৫২ মিনিটে এবং শেষ ৭৫ রান ৩০ মিনিটে করেছেন। তাঁর পূর্ব্ব টেষ্টের রান সংখ্যা—১৯৩৪ সালের ট্রেণ্টব্রিজের টেষ্টে ৬৫ ও ৮৮; ১৯৩৭ সালের এডেলেডের টেষ্টে ৮৮ ও ৫৫। তিনি এ পর্য্যন্ত ৩৬টা টেষ্টে ৫০টা ইনিংস খেলে মোট ২৬২৬ রান করেছেন, তার মধ্যে ৬টা সেঞ্চুরী,—

১৮৮ (নট আউট) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সিডনীতে ১৯৩২ সালে,

১৩৭... ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যানচেষ্টারে ১৯৩৪ সালে,

১৪৯...দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডারবানে ১৯৩৫ সালে,

১৮৯ (নট আউট) দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোহান্স-বার্গে ১৯৩৫ সালে,

১১২...ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ণে ১৯৩৭ সালে,

২৩২...ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নটিংহামে ১৯৩৮ সালে।

ম্যাক্‌ক্যাব্‌ তেজস্বিতার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ষ্ট্রোক দিয়েছেন, সুন্দরভাবে



বার্ণেট

ড্রাইভিং কাটিং এবং লেগে মেরে সকল রকমের বোলিংকেই ব্যর্থ করেছেন। তাঁর ফুটওয়ার্ক ও ষ্ট্রোকের দ্রুততায় ফিল্ড-ম্যানরা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল এবং বোলাররা জব্দ হচ্ছিল। রাইটের সুন্দর বোলিং রেকর্ড ম্যাক্‌ক্যাব নষ্ট করে দিলে। তাঁর খেলায় পেণ্টারের খেলাও ম্লান হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম জুড়ি ব্রাউন ও ফিঙ্গলটন খেলা ড্র করার অভিলাষে ঠেকিয়ে খেলতে সুরু করে। ফিঙ্গলটন ৪০ করে ১৩৭ মিনিটে এবং ব্রাউন ৫১, ১৬০ মিনিটে। দর্শকরা ধৈর্য্য হারিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে। ফিঙ্গলটন তাদের ব্যারাকিংয়ের প্রতিবাদে খেলতে অসম্মত হয়ে মাঠে বসে পড়ে।



ডন্‌ ব্রাডম্যান ব্যাট কর্‌ছেন

ব্রাডম্যান মোটেই ঝুঁকি নিতে চান নি। কিন্তু মনে হয়, অত্যন্ত ক্লান্ত ইংলণ্ডের বোলারদের বলেও তাঁরা সহজ রান নিতে সাহসী না হয়ে ভুলই করে-ছিলেন। ঝুঁকি না নিয়েও অনেক ক্ষেত্রেই আক্রমণশীল হওয়া যেতো। ব্রাডম্যানও ড্র করবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ধীরে খেলেছেন। দর্শকমণ্ডলীর ব্যারাকিংয়ের প্রতিবাদে তাঁকেও খেলতে অসম্মত হ'তে হয়েছিল, তার পরে তারা ব্যঙ্গ করে প্রত্যেক মারে উল্লাস দেখিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াদের মনে থাকে যেন ব্যারাকিংয়ে তারা ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক উপরে! ব্রাউ-নের ১৩৩ রান ৩০৫ মিনিটে এবং ব্রাডম্যানের শত রান ২৭০ মিনিটে হয়। দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতায় ১৭০ রান ওঠে ১৮৫ মিনিটে, তবুও অষ্ট্রেলিয়ার রান ওঠার গতি সর্ব্বাপেক্ষা মন্থর নয়, কারণ ১৯৩৩ সালে ব্রিসবেনে ইংলণ্ডের স্কোরের গতি ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৩৫ রান।

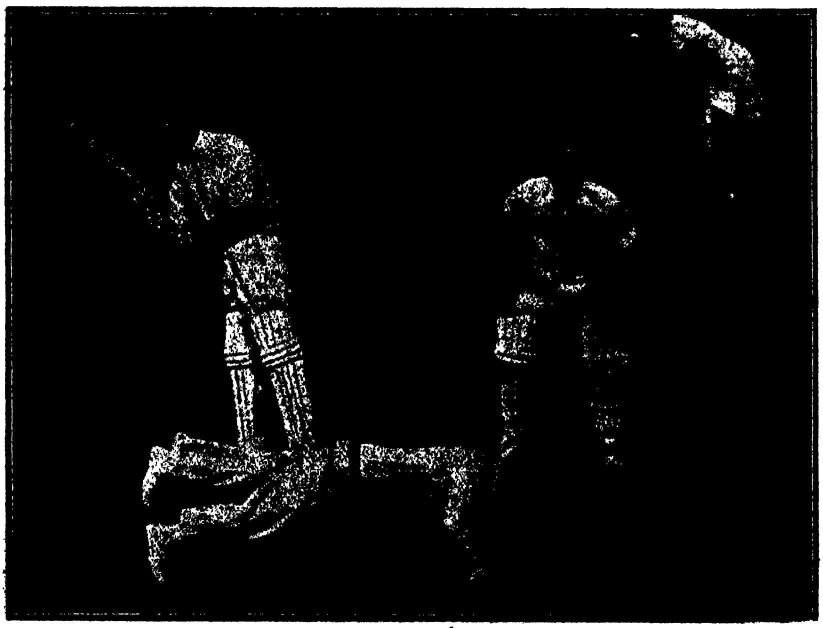
প্রথম টেষ্টে ২৪ উইকেটে ১৪৯৬ রান উঠেছে চারদিনে। ১৪০টি ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় মোট রান সংখ্যা ১১৭,৫৫২, ইংলণ্ডে হয়েছে ৫০,৬৬৯, আর অষ্ট্রেলিয়ার ৭৬,৮৮৩, তার মধ্যে ১৯৭টি শত রান আছে।



ফ্লিটউড-স্মিথ

ব্রাডম্যান ১৩টি সেঞ্চুরী ক'রে হব্‌সের ১২টি সেঞ্চুরীর রেকর্ড ভঙ্গ করলেন, হ্যামণ্ডের ৮টি সেঞ্চুরী হলো। এ্যাংলো-অষ্ট্রেলিয়ান টেষ্টে ব্রাডম্যানের মোট রান ৩৬০১, যদিও হব্‌সের অপেক্ষা ৩৫ রান কম, কিন্তু হব্‌সের হয়েছিল ৭২ ইনিংসে, আর ব্রাডম্যানের হয়েছে মাত্র ৪২ ইনিংসে।

এ্যাংলো-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টের ১৪০টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার



নটিংহামে প্রথম টেষ্টে হ্যামণ্ড ও'রিলীর বল লেগে পিটেছেন

দু'টি জয় এখনও বেশী রইল, ইংলণ্ড জিতেছে ৫৪, অষ্ট্রেলিয়া ৫৬ এবং ৩০টি সমান-সমান হয়েছে।

ইংলণ্ড

প্রথম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

এল হাটন···এল্-বি, ব ফ্লিটউড্ স্মিথ		১০০
সি জে বার্ণেট···ব ম্যাক্‌করমিক্		১২৬
ডবলিউ জে এড্‌রিচ্···ব ও'রিলী		৫
ডবলিউ আর হ্যামণ্ড···ব ও'রিলী		২৬
ই পেণ্টার···	নট আউট	২১৬
ডি কম্পটন···কট ব্যাড্‌কক্, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		১০২
এল এইমস্···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৪৬
এইচ ভেরিটি···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৩
আর এ সিন্‌ফিল্ড···এল-বি, ব ও'রিলী		৬
ডি ভি পি রাইট···	নট আউট	১
	অতিরিক্ত···	২৭

(৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) মোট··· ৬৫৮

কে ফারনেস ব্যাট করেন নি।

উইকেট পতন :

২১৯, ২৪০, ২৪৪, ২৮১, ৪৮৭, ৫৭৭, ৫৯৭ ও ৬২৬

বোলিং :— অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ফ্লিটউড্-স্মিথ	৪৯	৯	১৫৩	৪
ও'রিলী	৫৬	১১	১৬৪	৩
ম্যাক্‌করমিক	৩২	৪	১০৮	১
ম্যাক্‌ক্যাব্	২১	৫	৬৪	০
ওয়ার্ড	৩০	২	১৪২	০

অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

জে এইচ্ ফিঙ্গলটন···ব রাইট		৯
ডবলিউ এ ব্রাউন···কট এইমস্, ব ফারনেস্		৪৮
ডি জি ব্রাডম্যান···কট এইমস্, ব সিন্‌ফিল্ড		৫১
এস জে ম্যাক্‌ক্যাব্···কট কম্পটন্, ব ভেরিটি		২৩২
এফ ওয়ার্ড···ব ফারনেস্		২
এ এল হাসেট···কট হ্যামণ্ড, ব রাইট		১
সি এল ব্যাড্‌কক্···ব রাইট		৯
বি এ বার্ণেট··কট রাইট, ব ফারনেস		২২
ডবলিউ জে ও'রিলী···কট পেণ্টার, ব ফারনেস		৯
ই এল ম্যাক্‌করমিক··ব রাইট		২
এল ও'বি ফ্লিটউড-স্মিথ···	নট আউট	৫
	অতিরিক্ত ···	২১

মোট···৪১১

উইকেট পতন :

৩৪, ১১১, ১৩৪, ১৪৪, ১৫১, ১৯৪, ২৬৩, ৩১৬, ৩৩৪ ও ৪১১

বোলিং :— ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
রাইট	৩৯	৬	১৫৩	৪
ফারনেস	৩৭	১১	১০৬	৪
ভেরিটি	৭·৩	০	৩৬	১
সিন্‌ফিল্ড	২৮	৮	৫১	১
হ্যামণ্ড	১৯	৭	৪৪	০


রাইট (কেণ্ট)


ফ্লিটউড্-স্মিথ


ভেরিটী


কে ফার্‌নেস্



লর্ডসের ক্রিকেট মাঠ—ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা হয়েছে

অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন···কট হ্যামণ্ড, ব এডরিচ্		৪০
ব্রাউন···কট পেণ্টার, ব ভেরিটি		১৩৩
ব্রাডম্যান···	নট আউট	১৪৪
ম্যাক্‌ক্যাব্···কট হ্যামণ্ড, ব ভেরিটি		৩৯
ওয়ার্ড···	নট আউট	৭
হাসেট···কট কম্পটন, ব ভেরিটি		২
ব্যাড্‌কক ব রাইট		৫
বার্ণেট···এল-বি, ব সিনফিল্ড		৩১
	অতিরিক্ত ···	২৬
(৬ উইকেট)		মোট···৪২৭

উইকেট পতন :

৮৯, ২৫৯, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৬৯ ও ৪১৭

বোলিং :— ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

ভেরিটি	৬২	২৭	১০২	৩
ফারনেস	২৪	২	৭৮	০
হ্যামণ্ড	১২	৬	১৫	০
রাইট	৩৭	৮	৮৫	১
সিন্‌ফিল্ড	৩৫	৮	৭২	১
এডরিচ্	১৩	২	৩৯	১
বার্ণেট	১	০	১০	০

দ্বিতীয় টেষ্ট :

ইংলণ্ড—৪৯৪ ও ২৪২ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়া—৪২২ ও ২০৪ (৬ উইকেট)

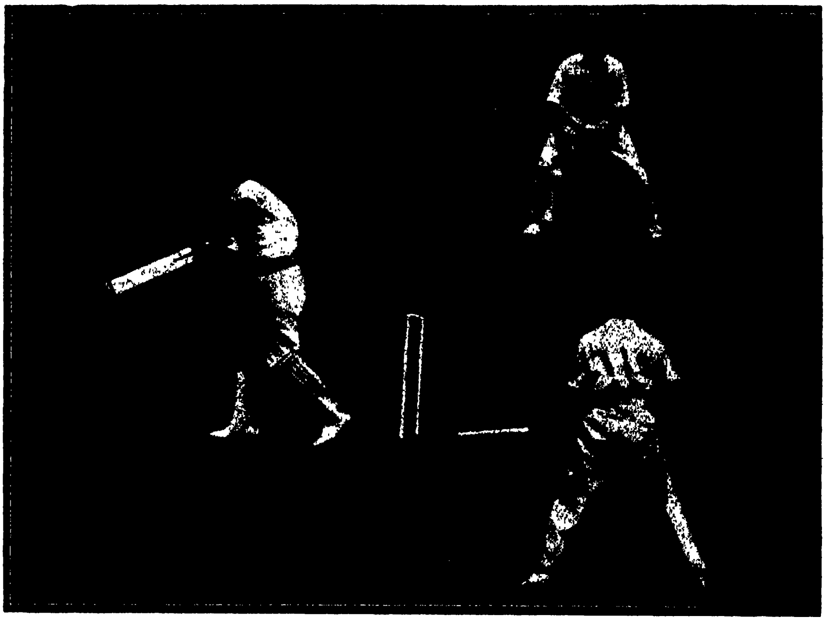


দ্বিতীয় টেষ্টের তৃতীয় দিনে ও'রিলী ৪২ রান করে ফারনেসের বলে বোল্ড হয়েছে

২৪শে জুন লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়ে ২৮শে জুন সময়াভাবে ড্র হয়েছে।

১৯৩৪ সালে এখানে ওয়্যাট ইংলণ্ড পক্ষে টসে জয়ী হন, এবারও হ্যামণ্ড টসে জয়ী হলেন। কম্পটন, হাটন ও এড্‌রিচ হতাশ করলে। ম্যাক্‌করমিক্ ৩১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে দুর্য্যোগ সৃষ্টি করলে। হ্যামণ্ড, পেণ্টার ও এইমসের সম্মিলিত চেষ্টায় ইংলণ্ডের ৪০৯ রান উঠলো ৫ উইকেটে

প্রথম দিনে। হ্যামণ্ড-পেণ্টার সহযোগিতায় চতুর্থ উইকেটে রান ২২২ উঠলে নব রেকর্ড সৃষ্টি হ'লো। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৫১, ফ্রাই-জ্যাকসনের ১৯০৫ সালে ওভালে। ষষ্ঠ উইকেট সহযোগিতায় হ্যামণ্ড ও এইম্সে ১৯৩০ সালের ওয়্যাট-সাট্‌ক্লিফের রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। হ্যামণ্ড ২৪০ রান করে ম্যাক্‌কর্‌মিকের বলে বোলড হয়েছেন। তিনি ছ'ঘণ্টা খেলেছেন এবং ৩২টা চার করেছেন। ব্রাডম্যান প্রথম ইনিংসে ভেরিটির বলে মাত্র ১৮ রান করে আউট হন। ব্রাউন এবারও অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে ২০৬ রান করে (নট আউট) থেকে। হাসেট দু'ইনিংসে তবু কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, কিন্তু ব্যাড্‌কক্ এ টেষ্টেও অকৃতকার্য্য হয়েছে। ব্রাডম্যান দ্বিতীয় ইনিংসে ১০২ করে নট আউট থাকেন। তাঁর ১৮ রান হ'লে, হব্‌সের এ্যাংলো-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টের সমষ্টি ৩৬৩৬ রান অতিক্রমিত হয়, উপস্থিত অষ্ট্রেলিয়ার সমষ্টি দাঁড়ালো ৩৭২১ রান। হব্‌সের সমষ্টি রান উঠেছিল ৭১ ইনিংসে, কিন্তু ব্রাডম্যানের সমষ্টি উঠেছে মাত্র ৪৭ ইনিংসে। হ্যামণ্ডের টেষ্ট সমষ্টি দাঁড়িয়েছে ২৫৪৯।



লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেষ্টে ২৪০ রান করবার পরে হ্যামণ্ড ম্যাক্‌করমিকের বলে বোল্‌ড হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ফিরে দেখছেন



দ্বিতীয় টেষ্টে পেণ্টার ক্লিটউড্-স্মিথের বল পিটিয়ে জনতার মধ্যে ফেলে ছয় করেছেন

হ্যামণ্ড তাঁর পায়ে আঘাত পেয়েছেন এবং এইমসের কড়ে আঙুলের হাড় ভেঙেছে। শেষের দিকে ইংলণ্ডের বিপদ ঘনীভূত হয়েছিল, এক সময় অষ্ট্রেলিয়ার জয়ী হবার ক্ষীণ আশা দেখা দেয়। নবীন কম্পটনের গৌরবময় ব্যাটিং এবং ওয়েলার্ডের সহায়তা ইংলণ্ডকে রক্ষা করেছে, যেমন ও'রিলী অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে করেছিল। ব্রাডম্যানের দ্বিতীয় ইনিংস খুব নিখুঁত ও নিরাপদ ছিল, তিনি ভেরিটি ছাড়া সকল বোলারদের তাচ্ছিল্য করেছেন।

দু'টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দেখে প্রতীয়মান হয়, টসের উপর দলের জয়-পরাজয় বহু পরিমাণে নির্ভর করছে। শুক্‌নো মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার জয়ের আশা অধিক। কিন্তু ভিজা মাঠে ইংলণ্ডই প্রাধান্য করবে। সুদক্ষ বোলারদের অভাবে চার দিনে খেলা সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

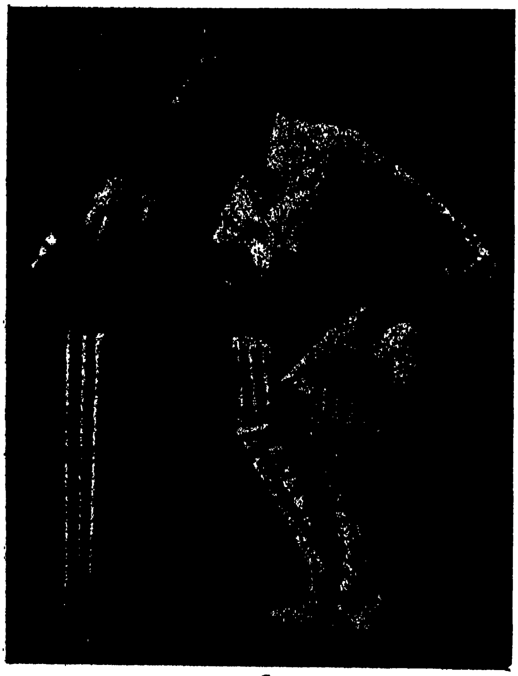
টেষ্ট খেলার সময় বাড়ান অত্যাবশ্যক হয়েছে, অষ্ট্রেলিয়ারা শেষ পর্য্যন্ত খেলার পক্ষে। কিন্তু এবার ঐ নিয়মে খেলা হ'লে, নিশ্চয়ই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হতো। ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনমণ্ডলীর চেয়ারম্যান স্যর পেল্‌হাম পাঁচদিন ব্যাপী টেষ্টের সমর্থক। ভেরিটি ও ব্রাডম্যানের প্রাধান্য নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতায় খেলাটি খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল।

দ্বিতীয় টেষ্টের প্রথম দিনে লর্ডসের মাঠে ৩৩,৮০০ দর্শকের আগমন রেকর্ড।

ইংলণ্ড

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

এস জে বার্ণেট…কট ব্রাউন, ব ম্যাক্‌করমিক্		১৮
এল হাটন…কট ব্রাউন, ব ম্যাক্‌করমিক্		৪
ডবলিউ জে এডরিচ্…ব ম্যাক্‌করমিক্		০
ডবলিউ আর হ্যামণ্ড…ব ম্যাক্‌করমিক্		২৪০
ই পেণ্টার…এল-বি, ব ও'রিলী		৯৯
ডি কম্পটন…এল-বি, ব ও'রিলী		৬
এস এইমস্…কট ম্যাক্‌করমিক, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৮৩
এইচ্ ভেরিটি…ব ও'রিলী		৫
এ ডবলিউ ওয়েলার্ড…কট ম্যাক্‌করমিক্, ব ও'রিলী		৪
ডি ভি পি রাইট…ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৬
কে ফারনেস…	নট আউট	৫
	অতিরিক্ত …	২৪
	মোট…	৪৯৪



এইমস্

উইকেট পতন :

১২ (হাটন), ২০ (এড্‌রিচ), ৩১ (বার্ণেট), ২৫৩ (পেণ্টার), ২৭১ (কম্পটন), ৪৫৭ (হ্যামণ্ড), ৪৭২ (ভেরিটি), ৪৭৬ (ওয়েলার্ড), ৪৮৩ (এইমস্) ও ৪৯৪ (রাইট)

বোলিং :— অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ম্যাক্‌করমিক্	২৭	১	১০১	৪
ম্যাক্‌ক্যাব্	৩১	৪	৮৬	০
ফ্লিটউড্-স্মিথ	৩৩·৫	২	১৩৯	২
ও'রিলী	৩৭	৬	৯৩	৪
চিপারফিল্ড	৯	০	৫১	০



ম্যাক্‌করমিক্



চিপারফিল্ড

ইংলণ্ড

দ্বিতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

বার্ণেট…কট ম্যাক্‌ক্যাব, ব ম্যাক্‌করমিক		১২
হাটন…কট ম্যাক্‌করমিক, ব ও'রিলী		৫
এড্‌রিচ্…কট ম্যাক্‌ক্যাব্, ব ম্যাক্‌করমিক্		১০
হ্যামণ্ড…কট পরিবর্ত্তক, ব ম্যাক্‌করমিক্		২
পেণ্টার…	রান আউট	৪৩
কম্পটন…	নট আউট	৭৬
এইমস্…কট ম্যাক্‌ক্যাব্, ব ও'রিলী		৬
ভেরিটি…ব ম্যাক্‌করমিক্		১১
ওয়েলার্ড…ব ম্যাক্‌ক্যাব্		৩৮
রাইট…	নট আউট	১০
	অতিরিক্ত …	২১
	(৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) মোট…	২৪২

কে ফারনেস্ ব্যাট করেন নি।

উইকেট পতন :

২৫ (বার্ণেট), ২৫ (হাটন), ৪৩ (এড্রিচ্), ৬৪ (ভেরিটি), ৭৬ (হ্যামণ্ড), ১২৮ (পেণ্টার), ১৪২ (এইমস্) ও ২১৬ (ওয়েলার্ড)

বোলিং :— অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ম্যাককরমিক্	২৫	৫	২৭	৩
ও'রিলী	২৯	১০	৫৩	২
ম্যাককাব্	১২	১	৫৮	২
ফ্লিটউড্-স্মিথ	৭	১	৩০	০

অষ্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

জে এইচ ফিঙ্গলটন · কট হ্যামণ্ড, ব রাইট		৩১
ডবলিউ এ ব্রাউন···	নট আউট	২০৬
ডি জি ব্রাডম্যান···ব ভেরিটি		১৮
এস জে ম্যাক্ক্যাব্···কট ভেরিটি, ব ফারনেস		৩৮
এ এল হাসেট···এল-বি, ব ওয়েলার্ড		৫৬
সি এল ব্যাড্কক্···ব ওয়েলার্ড		০
বি এ বার্ণেট···কট কম্পটন, ব ভেরিটি		৮
এ জি চিপারফিল্ড···এল-বি, ব ভেরিটি		১
ডবলিউ জে ও'রিলী···ব ফারনেস		৪২
ই এল ম্যাককরমিক্···কট বার্ণেট, ব ফারনেস		০
এল ও' বি ফ্লিটউড-স্মিথ···কট বার্ণেট, ব ভেরিটি		৭
	অতিরিক্ত ···	১৫
	মোট ···	৪২২

উইকেট পতন :

৬১ (ফিঙ্গলটন), ১০১ (ব্রাডম্যান), ১৫৩ (ম্যাক্ক্যাব্), ২৭৩ (হাসেট), ২৭৩ (ব্যাড্কক্), ৩০৭ (বার্ণেট), ৩০৮ (চিপারফিল্ড), ৩৯৩ (ও'রিলী), ৩৯৩ (ম্যাক্-করমিক্) ও ৪২২ (ফ্লিটউড-স্মিথ)

বোলিং :— ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ফারনেস	৪৩	৬	১৩৫	৩
ওয়েলার্ড	২৩	২	৯৬	২
রাইট	১৬	২	৬৮	১
ভেরিটি	৩৫'৪	৯	১০৩	৪
এড্রিচ্	৪	২	৫	০

দ্বিতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন···কট হ্যামণ্ড, ব ওয়েলার্ড		৪
ব্রাউন···ব ভেরিটি		১০
ব্রাডম্যান···	নট আউট	১০২
ম্যাক্ক্যাব্···কট হাটন, ব ভেরিটি		২১
হাসেট···ব রাইট		৪২
ব্যাড্কক্···কট রাইট, ব এড্রিচ		০
বার্ণেট···কট পেণ্টার, ব এড্রিচ		১৪
	অতিরিক্ত ···	১১
(৬ উইকেট)	মোট ···	২০৪

উইকেট পতন :

৮ (ফিঙ্গলটন), ৭১ (ব্রাউন), ১১১ (ম্যাক্ক্যাব্), ১৭৫ (হাসেট), ১৮০ (ব্যাড্কক্) ও ২০৪ (বার্ণেট)

বোলিং :— ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

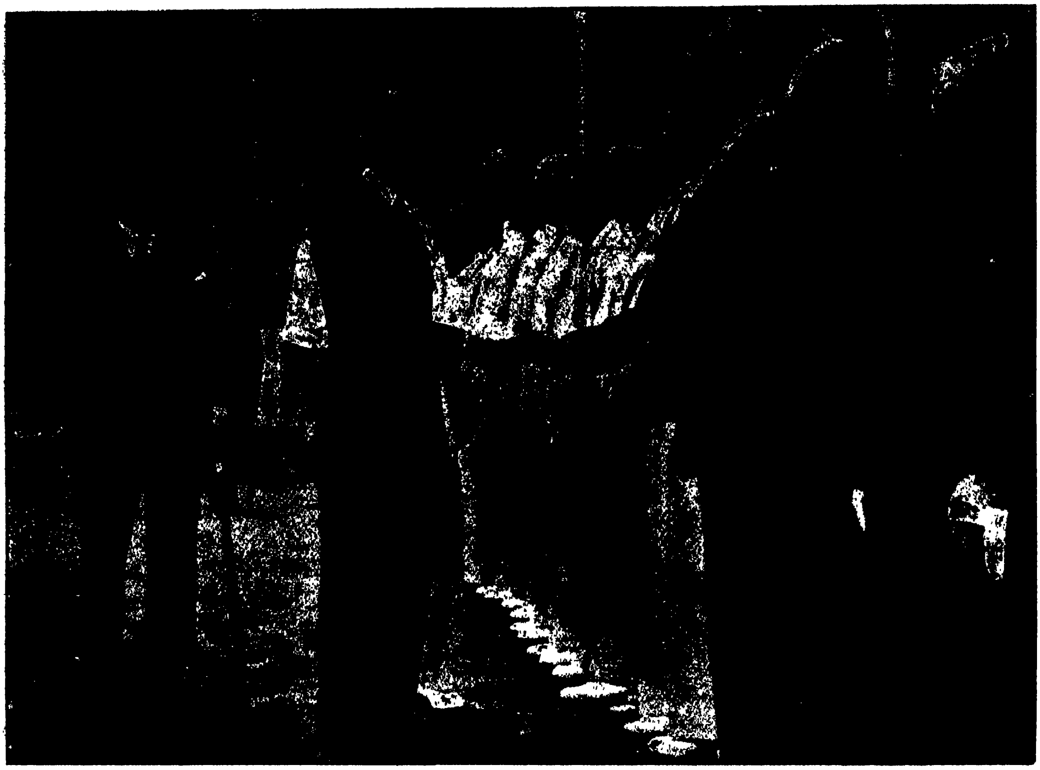
ফারনেস	১৩	৩	৫১	০
ওয়েলার্ড	৯	১	৩০	১
ভেরিটি	১৩	৫	২৯	২
রাইট	৮	০	৫৬	১
এড্রিচ্	৫'২	০	২৭	২



ফিঙ্গলটন



এ এল হাসেট



দ্বিতীয় টেষ্টে লর্ডস মাঠে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন

কোরিন্থিয়ান্সের অভিযান ঃ

ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান ফুটবল দল পৃথিবী পরিভ্রমণ করে প্রায় আট মাস পরে স্বদেশ বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। কোন ফুটবল দলই ইতিপূর্ব্বে এরূপ দীর্ঘ পর্য্যটন করে নাই। এই অভিযানে তারা মোট ৯৫টি ম্যাচ খেলেছে, জিতেছে ৬৯, ড্র করেছে ১৮ ও পরাজিত হয়েছে ৮। খেলার কৌশল ও নিপুণতায় ভারতে বিশেষ সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও তাদের জয়-পরাজয়ের তালিকা সত্যই রেকর্ড স্থষ্টি করেছে।

ফিলিপাইন দ্বীপে গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য তাদের ফুটবল খেলা রাত্রিকালে হয়েছিল ফ্লাড-লাইটে। সেখানে আমেরিকার প্রথায় খেলা হয়। এই নিয়মে খেলোয়াড় বদল করা চলে, এক সময়ে সমস্ত ফরওয়ার্ডই বদলে গেলো। ফিলিপাইনদের খেলার প্রণালী সাধুসম্মত নয়, কিন্তু তাদের দ্রুততা ও সামর্থ্য বিস্ময়কর।

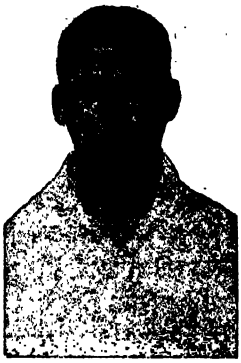
চীনদেশের ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক দলের অনেক খেলোয়াড়দের গঠিত দলের সঙ্গে তারা খেলেছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড লি ওয়াই টং, ভারতবাসী যাঁর খেলায় চমৎকৃত হয়েছিল, তিনি এখন খেলতে অক্ষম হয়েছেন পায়ে সাংঘাতিক আঘাতের জন্য। ভারতবর্ষে ৪৭ দিনে আট হাজার মাইল ভ্রমণ করে এবং ৩২টি ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে তারা পরাজিত হয়। সাংহাই, জাপান ও বর্ম্মায় তারা মোটেই জিততে পারে নাই।

তাদের বিভিন্ন দেশে খেলার সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে
ইউরোপে	৫	৩	২	০	১০	২
ইজিপ্টে	৪	২	১	১	৬	৪
ভারতবর্ষে	৩২	২৭	৪	১	৬৯	১১
বর্ম্মায়	২	০	১	১	১	২
মালয়ে	১৬	১৪	২	০	৫১	১০
কোচিন চীনে	৩	২	১	০	৬	২
হংকংয়ে	৬	৪	২	০	১৮	৬
ফিলিপাইন্‌সে	৮	৪	২	২	১৬	৬
সাংহায়ে	১	০	০	১	০	৩
জাপানে	১	০	০	১	০	৪
হনোলুলুতে	১	১	০	০	১০	
ক্যালিফোর্নিয়াতে	৪	২	২	০	৯	৫
কানাডাতে	১১	৯	১	১	৪১	১৪
	৯৫	৬৯	১৮	৮	১৩৯	৭৫

ইস্‌লিংটনের গোলদাতৃগণ :

শেরউড	৭০
ট্যারাণ্ট	৪৩
রেড	২৫
ব্রাডবারী	২০
ব্রেথওয়েট	২০
জে মিলার	১৯
এভারী	১২
ডবলিউ মিলার	১০
পিয়ার্‌স্‌	৮



শেরউড

৪ঠা জুন তারিখে সাউদামটনে ভ্রমণকারী দল অবতরণ করলে বিলাতের ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সরকারীভাবে তাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বে যখন তারা এই অভিযানে বহির্গত হয়, এফ এ কোনরূপ উৎসাহ দেন নাই। প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার পিক্‌ফোর্ড বলেন, "You have carried Association football round the world. We are proud of you."

ম্যানেজার মিষ্টার টম্‌ স্মিথ ভারতবর্ষের খেলার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "In India the players of most teams were barefooted, * * * They are amazingly quick on their feet, but the best players we met were the Burmese. They had all the artistry of the Indians, and as they wore boots they could shoot harder and better."

বোম্বাই লীগ চ্যাম্পিয়ান ঃ

চেশায়ার রেজিমেণ্ট এবারও বোম্বাইয়ের হারউড লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারা বোম্বাই ইউনাইটেড ক্লাবকে ১৭টি গোল প্রদান করে লীগ খেলায় গোল প্রদানের রেকর্ড স্থাপন করেছে। চেশায়ার পক্ষে কিগ্যান্স ১০, সার্টন ৩, ব্লেনী ২, টেসিম্যান ও পেনিংটন একটি করে গোল দিয়েছে।

বার্ষিক ইণ্টার-ন্যাসনাল খেলা ঃ

বার্ষিক ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল খেলায় ইউরোপীয় দল ১ গোলে ভারতীয় দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। এরূপ নিকৃষ্ট খেলা পূর্ব্বে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এ খেলাটির ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। একটি কারণ অযোগ্য খেলোয়াড় নির্ব্বাচন, অন্য কারণ ইউরোপীয় দলসমূহের শক্তি হ্রাস। দর্শক সমাগম এত অল্প হয়েছিল যে মাত্র ৪০২৮৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে। পরিচালনাও নিকৃষ্ট। কোন পক্ষই ভাল খেলতে পারে নাই, খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনার অভাব ছিল। তৃতীয় বিভাগের লীগ খেলাও ইহাপেক্ষা দর্শনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক হয়। ইউরোপীয়রা দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু ভাল খেলে এবং খেলার গতি ও যোগ্যতানুযায়ী জয় তাদেরই প্রাপ্য। গত বৎসর ভারতীয় দল ১ গোলে বিজয়ী হয় এবং গত পূর্ব্ব বৎসর খেলা ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছিল।



ইউরোপীয় ও ভারতীয় লীগ দলের ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল খেলায় সম্মিলিত খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্যাল

ভারতীয় দল : ওসমান (মহমেডান); এস দত্ত (মোহনবাগান), পি দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) ; জন (কালীঘাট), বি সেন (ইষ্টবেঙ্গল), ভৌমিক (কাষ্টমস) ; এন ঘোষ (মোহনবাগান), কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন-কাষ্টমস) মুর্গেশ (ইষ্টবেঙ্গল), সাবু (মহমেডান) ও প্রসাদ (এরিয়ান)

ইউরোপীয় দল : এডেন (ক্যালকাটা) ; গ্রস্ম্যান (ক্যালকাটা) ও ই কার্ভে (পুলিস) ; টেলর (ক্যাপটেন-(ক্যালকাটা), ম্যাক্‌ইওয়ান (ক্যামারোনিয়ন) ও জে লামসডেন (রেঞ্জার্স) ; জে মিলস্ (পুলিস), ড্রিসকল (ক্যামারোনিয়ন), হেণ্ডারসন (কে ও এস বি), রিয়ার্ড (ক্যালকাটা) ও ফিণ্ডলে (পুলিস)

রেফারী : বলাই চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীর ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, কলম্বের ষ্টাডিয়মে পৃথিবীর ফুটবল কাপ্ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও প্রেসিডেণ্ট লেব্রুণের উপস্থিতিতে ইটালী ৪-২ গোলে হাঙ্গারীকে পরাজিত করেছে। ইটালীর প্রচণ্ড বেগ ও সোজা প্রণালী হাঙ্গারীর সুদক্ষ সম্মিলনকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। সেমিফাইনালে ইটালী ২-১ গোলে ব্রেজিল এবং হাঙ্গারী ৫-১ গোলে সুইডেনকে হারায়।

অষ্ট্রেলিয়ার অভিযান ঃ

অবশেষে আই এফ এ সম্মত হতে বাধ্য হলেন যে শীল্ড খেলার পরে অষ্ট্রেলিয়ায় আই এফ এ দল প্ররিত হবে। কারণ,—"* * * in view of the fact that some of the leading Indian and European clubs are now of the opinion that the team should not be sent in the middle of July thereby minimising the importance of the I. F. A. Shield."

লীগ ও শীল্ড খেলার সময় বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানর বিপক্ষে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার টুরে খেলোয়াড় প্রেরিত হয়েছিল। মোহনবাগানের শ্রীযুক্ত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইষ্টবেঙ্গলের শ্রীযুক্ত সুরেশ তালুকদারের খেলোয়াড় পাঠানর বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও সেই অভিযান বন্ধ হয় নাই। এবার কিন্তু শীল্ডের পর অষ্ট্রেলিয়ায় খেলোয়াড় প্রেরণ স্থিরীকৃত হয়েছে। কেন—মহমেডান স্পোর্টিং তাদের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার শাস্তি দেওয়ার জন্ম কি? আই এফ এ সেবারও জনমতে কর্ণপাত করেন নাই, এবারও করবেন না নিশ্চয়ই। জাতীয় সম্ভ্রমের ধার তাঁরা ধারেন না। অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধিনিষেধ আছে, তা নিদারুণ অপমানকর এবং আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই মত হোচ্ছে যে, সেখানে আই এফ্ এ ভারতীয় দল প্রেরণ করে ভারতের জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণই করবেন।

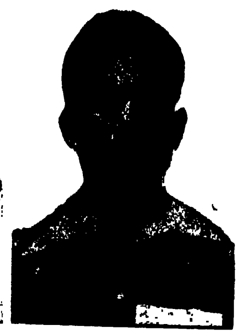
আগষ্ট মাসে সম্ভবতঃ সম্মিলিত খেলোয়াড় দল প্রেরিত হবে। যোগ্যতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তাদের প্রিয়পাত্র হিসাবে যেন নির্ব্বাচন না হয়। দেশের ও দশের মুখরক্ষা যাতে হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

রেফারিং ঃ

প্রতি বৎসর রেফারিং ক্রমশঃ আরো নিকৃষ্টতর হচ্ছে। কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করছি। মহমেডানদের ক্যালকাটার বিরুদ্ধে রহিমের গোলটি সম্পূর্ণ অফ-সাইড থেকে হয়। লাইন্সম্যান পতাকা নেড়ে রেফারির দৃষ্টি



মিলস্ (পুলিস)



এ রসিদ খাঁ (মহমেডান)

আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারে নাই। রেফারি ছিল সার্জ্জন রবিন্সন।

মোহনবাগান-মহমেডানদের দ্বিতীয় খেলায় রেফারি সুশীল ঘোষের পরিচালনায় বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত না হ'লেও মহমেডানদের সমর্থকদের আক্রমণ থেকে তাকে প্রাণ রক্ষা



নিধু মজুমদার



মুর্গেশ

করতে হয় সার্জ্জেনদের সহায়তায়। অস্থায়ী লাট ও তাঁর সপারিষদ মন্ত্রীদের চক্ষের সম্মুখে মুসলমান জনতা বেচারী রেফারী ও লাইন্সম্যানকে তেড়ে যায়। মহমেডানদের

সমর্থকদের এইরূপ মনোবৃত্তি অতীব নিন্দনীয়। মোহনবাগানরা বরং একটা প্রাপ্য পেনালটি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

মহমেডানদের পরের খেলাতে যখন সেই রেফারিকে পুনরায় খেলা পরিচালনা করতে দেখা গেলে, বাঙ্গালী দর্শকরা সত্যই বিস্মিত হলো, তার প্রাণের মায়া না দেখে। অল্পক্ষণ খেলা চলবার পরে, বোঝা গেল যে তিনি প্রাণ বাঁচাবার অন্য সহজ পন্থা বেছে নিয়েছেন। এ দিন যে সেই একই ব্যক্তি খেলা পরিচালনা করছেন, তা' চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেতো না। রেল দলের বিপক্ষে প্রথম গোলটি বল গোলে প্রবেশ না করলেও গোল নির্দ্দেশিত হ'লো। সেণ্টার ফরওয়ার্ড বি করকে পেনালটি সীমানার মধ্যে রসিদ অবৈধভাবে পাতিত না করলে সে গোল দিতো, তথাপি রেফারি পেনালটি দেন নাই বা দিতে সাহস করেন



প্রেমলাল (মোহনবাগান) জে ঘোষ (মোহনবাগান)

নাই। অনেক অফ-সাইডও দেওয়া হয় নাই। তৃতীয় গোলটিও রহমৎ পুরা অফ-সাইড থেকে করে। এদিন সামাদ ও হক্ মোটেই খেলেন নাই! এদিন তাঁদের না নামানই নির্ব্বাচন কমিটির উচিত ছিল।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিখেছেন,—The Referring was no bright feature of the afternoon's football. There had been a demonstration against Referee S. Ghosh following Saturday's match between Mahomedan Sporting and Mohun Bagan. Could it have been that he was suffering from its after effects? His decisions were hardly convincing on Monday and two of the goals that he awarded were bitterly criticised.

ইষ্টবেঙ্গল-পুলিসের খেলায় বীরেন সেনের হ্যাণ্ডবল এবং রবিনসনের হ্যাণ্ডবল রেফারির দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পুলিসের প্রথম গোলটি সম্পূর্ণ অফ-সাইড থেকে হয়েছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ও নন্দীকে অবৈধভাবে ঝিলস্ ও ডি মেলো ধাক্কা মারলেও পেনালটি দেওয়া হয় নাই।

ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে মহমেডানদের দ্বিতীয় খেলায় মহমেডানদের প্রথম গোল অফ্-সাইড থেকে হয়। ইষ্টবেঙ্গলের রাখাল মজুমদারের সুন্দর সট্‌টি ওসমান গোলের ভিতর ধরে। জুম্মা খাঁ পিছন থেকে ইচ্ছাকৃত লাথি মেরে মুর্গেশকে আহত করলেও রেফারি তাকে মাঠ থেকে বাহির বা সতর্ক করে দেয় নাই। রসিদ খাঁকে ফাউল খেলার জন্য সতর্কিত করাও হয় না। এদিনে রেফারি ছিলেন ইউ চক্রবর্ত্তী।

এদিনের খেলা সম্বন্ধে মহমেডানদের ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়ার বিবরণে তারাও লিখতে বাধ্য হয়েছে;—

*** But their tactics were at times rather unnecessarily vigorous, Osman was cool and resourceful in keeping his charge in tact, but at the same time it must be said that he had brought off a save from R. Mozumdar from behind the goal line. *** East Bengal took the whole of the first half to get into their stride and when they did settle down their forwards caused more worries to the Champions' defenders than did the rival forwards to their own backs and goalkeeper in the first half.

অমৃতবাজার লিখেছেন,—*** he (Murgesh) was deliberately tripped from behind by Jumma Khan in the procsss of making a solo dash ahead and looked almost bound for a goal. The referee should have turned Jumma off the field for such a deliberate charge.

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিখেছেন,—*** But Rashid Khan was often found going for the man instead of the ball and should have been cautioned by Referee on more occasions than one,

শীল্ড খেলা ঃ

১২ই জুলাই থেকে শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। শ্রুত-অশ্রুত, দেশী-বিদেশী, সামরিক-বেসমরিক ৪৫টি দলের নাম আই এফ এ কর্ত্তৃক প্রতিযোগিতার জন্য অনুমোদিত হয়েছে। যোগ্যতার বিষয়ে বিশেষ বিবেচিত না হলে নাম অনুমোদিত হবে না বলে পূর্ব্বে ঘোষিত হয়েছিল। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দলেরই প্রাধান্য এবার বেশী। বাইরের দলের শক্তি সম্বন্ধে না হয় দ্বিমত থাকতেও পারে, সকল স্থলে ঠিক বিচার না হ'তেও পারে, কিন্তু

স্থানীয় দল সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে না। সতন্ত্র ক্লাব, মারওয়ারী ক্লাব, কুমারটুলী, সুবারবন, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি কলিকাতার দ্বিতীয় বিভাগের দলদের নাম অনুমোদন করা শুধু দল সংখ্যা ও অর্থাগম বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মফস্বলের কয়েক দল কয় বৎসর থেকে আসতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তারা অতীতে কোন প্রকার উৎকর্ষতা দেখাতে পারে নাই, তথাপি তাদের নাম এবারও নেওয়া হয়েছে। গতবারের বিজয়ী সামরিকদল ব্যতীত একটিও নামজাদা সামরিকদল তালিকায় নাই, যার উপর শীল্ড জয়ের আশা করা যায়। তালিকা দেখে তীব্র প্রতিযোগিতা বা উৎকৃষ্ট প্রদর্শনের আশা করা যায় না।

তালিকা সৃজনেরও বেশ অভিসন্ধি প্রতীয়মান হয়। উপরিভাগে অতি বাজে দলের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং এবং নিম্নার্দ্ধে অপর সব দলগুলিকে অকত্রিত করে যেন স্বেচ্ছায় সাজান হয়েছে। নক-আউট টুর্ণামেণ্টের 'ড্রইং' ব্যালট-প্রথায় হওয়া উচিত, তাতে যার ভাগ্যে যে পড়ে। কিন্তু তালিকা দেখে মনে হয় যে সে প্রথায় করা হয় না।

রাজপুতানা ক্রিকেট দল ঃ

অর্থাভাবে রাজপুতানা ক্রিকেটদলের বাকী বারটি খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে। ওয়াহিদ-উদ্-বেগ ম্যানেজার ও দলের পাণ্ডার বক্তব্য, যে ৬৩ ও ৫৯ ষ্টার্লিং দেনা দু' হোটেলের। অর্থাভাবে বিপদ ঘটে নাই, তবে যে প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ জমা রেখে তাঁরা অভিযানে বাহির হয়েছিলেন, তাদের অব্যবস্থায় এই বিপদ ঘটেছে। ইণ্ডিয়া অফিস সমগ্র দলের প্রত্যেকের কাছ থেকে বণ্ড নিয়ে অর্থ দেওয়ায় ভারতীয় দলটি ফিরে আসতে পারছে; ২৩শে জুলাই তাঁরা ভারতে পৌছাবে।

ক্রিকেট বোর্ডের নিকট অর্থ সম্বন্ধে গ্যারান্টি বা কোন উপযুক্ত ব্যাঙ্কে অর্থ জমা না রেখে, ভবিষ্যতে যাতে কোন দল বিদেশে যেতে না পারে, সে বিষয়ে ক্রিকেট বোর্ডের যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত। অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করে কোন দল ব্যক্তিগত ভাবেও যাতে ভারতের বাইরে যেতে না পারে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের আগামী সভায় এই প্রস্তাব করতে বাঙ্গলা ও আসাম এসোসিয়েশন প্রতিনিধিকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন জেনে আমরা তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।



দ্বিতীয় টেষ্টের দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের ফিল্ডস্‌ম্যানেরা অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট রক্ষক বার্ণেটকে ঘিরে ধরেছে, কারণ বার্ণেট সোজা ব্যাটে ঠেকিয়ে যাচ্ছে

লীগ খেলা ঃ

প্রথম ডিভিসন লীগ খেলা ১৮৯৮ সাল থেকে চলে আসছে। তখন ৮টি ইউরোপীয় দল প্রতিযোগিতা করে, গ্লাষ্টারস্ ২৪ পয়েণ্ট করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৮৯৯ সালে

ক্যালকাটা ১৭ পয়েন্ট করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯০০ সালে রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্ ২৬ পয়েন্ট করে অপরাজিত রেকর্ড স্থাপন করে, মাত্র ২টা খেলায় ড্র হয়। ১৯০১ সালে তারা পুনরায় নূতন অপরাজিত রেকর্ড স্থাপন করে, সকল খেলাতেই জয়ী হয়ে ২৮ পয়েন্ট লাভ করে এবং গর্ডন্‌স্ ১৯০৮ সালে ও ব্লাকওয়াচ ১৯১২ সালে, একটিতেও না হেরে ও সকল ম্যাচে জিতে।

অপরাজিত রেকর্ড করেছে,—৯৩ হাইলাণ্ডার্স ১৯০৩ সালে, একটি খেলা ড্র; কিংস্ ওন্ ১৯০৫, ৪টি ড্র; ক্যালকাটা ১৯১৬, ৮টি ড্র; ক্যালকাটা ১৯২২, ১টি ড্র; ১ম নর্থ ষ্টাফোর্ড ১৯২৭, ৪টি ড্র।

তখন প্রথম ডিভিসনে ভারতীয় দলদের প্রতিযোগিতা করতে দেওয়া হতো না।

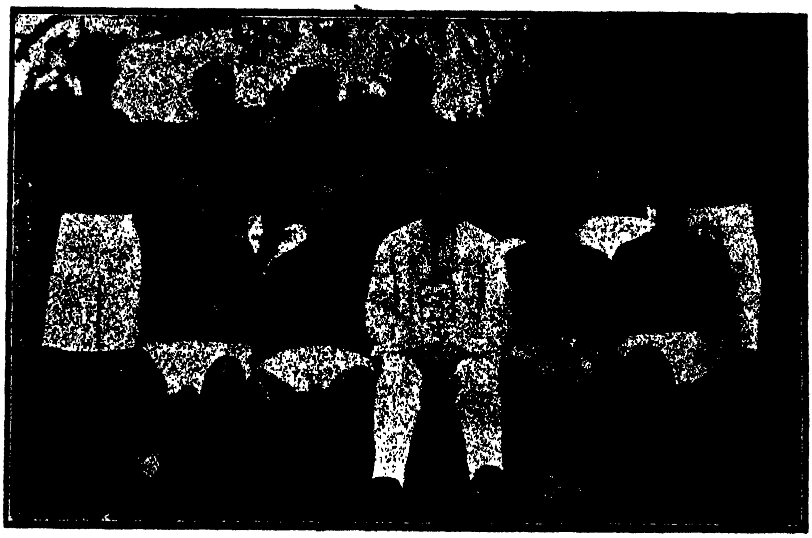
দ্বিতীয় বিভাগ লীগে ১৯১৪ সালে ৯১ হাইলাণ্ডার্স 'বি' ২৭ পয়েন্ট করে প্রথম হয়। মোহনবাগান ও মেজারার্স 'বি' সমান ২২ পয়েন্ট করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলে তাদের মধ্যে পুনরায় খেলা হয় এবং প্রথম দিন ১-১ গোলে ড্র হয় ও দ্বিতীয় দিনে মেজারার্স ২-১ গোলে জয়ী হয়ে প্রথম বিভাগে খেলবার অধিকার অর্জ্জন করে। কিন্তু ১৯১৫ সালে ৬২ আর জি এ মিলিটারী দল প্রথম ডিভিসনে না খেলায় মোহনবাগান প্রথম ডিভিসনে খেলতে অনুমতি পায় এবং ঐ বৎসর চতুর্থ স্থান অধিকারী হয় ১৫ পয়েন্ট করে। মেজারার্স ৯ পয়েন্ট করে ষষ্ঠ স্থান পায়। তখনও প্রথম বিভাগে ৮টি দল ছিল।

মোহনবাগান ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৫ সালে দ্বিতীয় হয়ে রাণার্স আপ্ পায়। ১৯২০, ২১ সালে চ্যাম্পিয়ন থেকে ২ পয়েন্টের এবং ১৯২৫ সালে মাত্র ১ পয়েন্টের তাদের ব্যবধান ছিল।

১৯১০ সালে ডালহৌসী ও কাষ্টমসের সমান পয়েন্ট ২০ হলে, গোল এভারেজে ডালহৌসী চ্যাম্পিয়নসিপ পায়। কিন্তু ১৯২৬ সালে নর্থ ষ্টাফোর্ড ও ক্যালকাটার সমান পয়েন্ট হলে, পুনরায় খেলায় নর্থ ষ্টাফোর্ড জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নসিপ পায়।

১৯৩২ সালে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিসনে ওঠে এবং ৩২-৩৩ সালে চ্যাম্পিয়ন থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট ব্যবধানে রাণার্স আপ্ পায়। ১৯৩৫ ও ৩৭ সালেও রাণার্স আপ্ হয়। ১৯৩৭ সালে ভবানীপুরও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ব্রাকেটে রাণার্স আপ্ হয়েছিল।

মহমেডান স্পোর্টিং ১৯২৮ সাল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলছে দেখা যায়। ১৯২৮ ও ২৯ সালে তারা ১০ ও ৮ পয়েন্ট করে একেবারে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করলেও তৃতীয় বিভাগে নামে নাই। ১৯৩৩ সালে কে আর আর 'বি' ৩৭ পয়েন্ট করে প্রথম হয়। মহমেডান ২৯ করে দ্বিতীয় এবং রেঞ্জার্স ও পুলিস ২৮ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মহমেডান প্রথম ডিভিসনে খেলতে অনুমতি পায় এবং ১৯৩৪ সাল থেকে ৩৮ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নূতন রেকর্ড স্থজন করেছে। কিন্তু অপরাজিত হতে একবারও পারে নি।



দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন কলিকাতা রেঞ্জার্স দল।
দশ বৎসর পরে ইহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলো ছবি—জে কে সান্ন্যাল

২৭শে জুন, ভীষণ বারিপাত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বিভাগের লীগ খেলা হয়। মাঠের লাইন ধুয়ে গিয়েছে, পেনালটির সীমানা বোঝা যায় না, লোক চেনা ও খেলা দেখা দুর্ঘট মুষল ধারায় বারি বর্ষণের জন্য, তবুও খেলা চলেছে।

এদিন ভবানীপুর দলেরই বিশেষ দুর্ভোগ হয়েছে সৈনিকদলের বিপক্ষে খেলে। তাদের বিরুদ্ধে ৪টি পেনাল্টি দেওয়া হয় এবং সৈনিকদল রেকর্ড স্কোর করতে সক্ষম হয় ১০টি

গোল করে। পূর্ব্বে রেকর্ড ছিল, ক্যামারোনিয়নের ৯ গোলে ই বি রেলওয়ের কাছে হার।

পুলিসের কাছে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের দু'বার পরাজয় ঐতিহাসিক রেকর্ডের সমান গণ্য হবে। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক বৎসরই তারা একটা না একটা দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এক দলের কাছে লীগের দু'টি খেলাতে হার তাদের এই প্রথম, এবং এরূপ শোচনীয় হারও এই প্রথম। ৫-১ গোলে পরাজয়



পি দাসগুপ্ত রাখাল মজুমদার

তাদের পূর্ব্ব চার বৎসরের গৌরবময় অভিযানে গাঢ় কালিমা লিপ্ত করেছে। কালীঘাটও ১ গোলে লীগ-চ্যাম্পিয়ন মহামেডানকে হারিয়েছে।

নবাগত শিশু পুলিসের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য—লীগ-চ্যাম্পিয়ন দলকে এবং গত বৎসরের ও এ বৎসরের লীগ-চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দল ও মোহনবাগান দলকে পরাজয় করার কৃতিত্ব তারা অর্জ্জন করেছে।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা ১-১ গোলে দু'বারই ড্র হয়েছে। পুলিসের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ খেলে ২-০ গোলে হারায় ইষ্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নসিপের আশা যায়।

তাদের সঙ্গে মহমেডানদের দ্বিতীয় খেলাটি চ্যারিটি করা হয়। বিপুল জনসমাগম হয়েছিল, বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১৫৮৮১৲। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড বারিপাতের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের জয়াশা ক্ষীণ হয়ে যায়। প্রথমার্দ্ধে মহমেডানরা তাদের চেপে ধরে এবং একটি গোল দেয়। অনেকের মতে রহিম অফ্‌সাইড ছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল মহমেডানদের বিশেষ কোণ ঠেসা করেও গোল শোধ দিতে পারে না। শেষ তিন মিনিটের সময় উপরন্তু আর একটা গোল খায়। রাখাল মজুমদারের সট ওসমান গোলের ভিতর থেকে ধরে, রেফারি কিন্তু গোল দেয় না। ঐ গোলটি দিলে খেলা ঘুরে যেতো। ইষ্টবেঙ্গলের মন্দভাগ্য বশতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে তের মিনিটের সময়ে মুর্গেশ বল নিয়ে জুম্মাকে কাটিয়ে বেরুলে জুম্মা পেছন থেকে ইচ্ছাকৃত ফাউল দ্বারা তাকে ভূতলশায়ী করে। মুর্গেশ হাঁটুতে আঘাত পায় এবং তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। রেফারির জুম্মাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে জুম্মাকে সতর্ক করে দেওয়াও হয় নাই। প্রথম খেলাতেও জুম্মার জুতার আঘাতে মুর্গেশের কপাল কেটে গিয়েছিল। নন্দীকে ইচ্ছাকৃত ফাউল করার জন্যও রসিদ খাঁকে সতর্কিত করা হয় নাই।

মহমেডানদের সঙ্গে খেলায় বিপক্ষ খেলোয়াড়দের অঙ্গহানি হবার অধিক সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সেই ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষ পক্ষের ফরওয়ার্ডরা বল ছেড়ে সরে যায়, আর আক্রমণকারীকে ব্যঙ্গ হাস্যে দন্ত বিকসিত করতে দেখা যায়। রেফারিং কড়া না হওয়ায় খেলা বিপদজনক হয়ে উঠ্‌ছে।

কাষ্টমস তাদের শেষ খেলায় মহমেডানদের ১-০ গোলে পরাজিত করে সমান ৩০ পয়েণ্ট করায় উভয়কে আর একটি খেলা খেলতে হয় চ্যাম্পিয়নসিপ মীমাংসার জন্য। গোল এভারেজ হিসাবে কাষ্টমসের চ্যাম্পিয়নসিপ্ প্রাপ্য ছিল। বাচ্চি খাঁ রেণ্টনকে স্বেচ্ছাকৃত ফাউল করার জন্য মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। দেখা যাক, এবার আবার ক'দিনে তার শাস্তি মকুব হয়!

প্রিমিয়ার ইউরোপীয় ক্লাব ক্যালকাটা মাত্র ১৫ পয়েণ্ট করে শেষ স্থান অধিকার করায় নিয়মানুযায়ী গত বৎসর থেকে দ্বিতীয় ডিভিসনে তাদের খেলতে হবে। তবে অনিয়মই আজকাল নিয়মে দাঁড়িয়েছে। খুব সম্ভব কর্ত্তারা নূতন বিধি প্রয়োগে বা আইনের প্যাঁচ বের করে ডালহৌসীর মতন ক্যালকাটাকে প্রথম বিভাগে রাখবার চেষ্টা করবেন।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

মহমেডানস্পোর্টিং নিষ্পত্তি খেলায় ১-০ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়ে ১৯৩৮ সালেও লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইহা তাদের উপর্য্যুপরি পঞ্চম চ্যাম্পিয়ন-বিজয়।

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে এবার রেঞ্জার্স ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তারা আগামী বৎসর প্রথম বিভাগে খেলবে।

প্রথম বিভাগ লীগের ফলাফল :

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
কাষ্টমস	২২	১১	৮	৩	২৯	১৫	৩০
*মহমেডান	২২	১৩	৪	৫	৩৮	২০	৩০
পুলিস	২২	১২	৩	৭	৩৫	২১	২৭
ইষ্টবেঙ্গল	২২	৮	৯	৫	২৪	১৬	২৫
মোহনবাগান	২২	৬	১২	৪	১৯	১৫	২৪
ই বি আর	২২	৭	৯	৬	২৮	২৩	২৩
কালীঘাট	২২	৫	১১	৬	২১	২৭	২১
এরিয়ান	২২	৭	৬	৯	২২	৩৩	২০
ভবানীপুর	২২	৭	৫	১০	২৬	৩৮	১৯
কে ও এস বি	২২	৫	৫	১২	২৬	৩১	১৫
ক্যামারোনিয়ন	২২	৪	৭	১১	১৯	৩৩	১৫
ক্যালকাটা	২২	৪	৭	১১	৯	২৩	১৫

উইটম্যান কাপ ঃ

আমেরিকা ৫-২ ম্যাচে বৃটেনকে পরাজিত করেছে। আমেরিকার ইহা অষ্টম উপর্য্যুপরী বিজয়। ১৯৩১ সাল থেকে আমেরিকা বিজয়ী হয়ে আসছে।

বিজয়িনী

মিসেস উইলিস্-মুডি ৬-০, ৭-৫

মিসেস উইলিস্-মুডি ৬-২, ৩-৬, ৬-৩

মিসেস ফ্যাবিয়ান ও মিস মার্ব্বল ৬-৪, ৬-২

মিসেস ফ্যাবিয়ান ৫-৭, ৬-২, ৬-৩

মিস মার্ব্বল ৬-৩, ৩-৬, ৬-০



ডাচেস্ অফ্ কেণ্ট উইটম্যান কাপ আমেরিকা দলের ক্যাপ্টেন মিসেস উইটম্যানকে প্রদান করছেন

উইম্বলডন টেনিস ঃ

ফাইনালে বিশ্বের ও আমেরিকার ১নং খেলোয়াড়



ব্রুসেল্সে ডেভিস কাপের ডবলসে গাউস মহম্মদ ও সোহানী বেলজিয়মের বিপক্ষে খেলছেন

ডোনাল্ড বাজ ৬-১, ৬-৩, ৬-৩ গেমে বিশ্বের ৪নং এবং ইংলণ্ডের ১নং খেলোয়াড় হেনরী উইলফ্রেড অষ্টিনকে অতি সহজেই পরাজিত করে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

অষ্টিনের ইহা দ্বিতীয় উইম্বলডন ফাইনাল। ১৯৩২ সালে এইচ ই ভাইন্সের (আমেরিকা) কাছে তিনি ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে মিসেস উইলিস্-মুডি ৬-৪, ৬-০ গেমে মিস্ জ্যাকবকে পরাজিত করে অষ্টমবার বিজয়িনী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মিসেস মুডি ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালে প্রথম উইম্বলডন ফাইনালে ওঠেন। গতবার বিজয়িনী ছিলেন মিস ডি ই রাউণ্ড।

মিক্সড ডবলস্ ফাইনালে ডোনাল্ড বাজ ও মিস মার্বেল ৬-১, ৬-৪ গেমে হেঙ্কল ও মিসেস্ ফ্যাবিয়ানকে হারিয়েছেন। গতবারও ইহারা বিজয়ী ছিলেন।

পুরুষদের ডবলস্ ফাইনালে বাজ ও মেকো ৬-৪, ৩-৬, ৬-৩, ৮-৬ গেমে হেঙ্কল ও মেটাক্সাকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

৮ই জুলাই ম্যানচেষ্টার মাঠে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হবার কথা ছিল, কিন্তু বরুণদেবের অত্যধিক করুণা বিতরণের জন্য একদিনও খেলা হতে পারে নাই। ১৮৯০ সালে এই ম্যানচেষ্টার মাঠেই বৃষ্টির জন্যই টেষ্ট খেলা হয় নাই।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "মৃগতৃষ্ণা"—১৷৹
শ্রীপ্রতিমা ঘোষ প্রণীত গল্প পুস্তক "স্মৃতির আলো"—১৷৹
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—২৲
শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রকাশিত "জীবনী কোষ" দ্বিতীয় খণ্ড—৫৲
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বঙ্কিম পরিচয়"—৸৹
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিষের ধোঁয়া"—২৲
শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী প্রণীত কবিতা পুস্তক "সাধের বীণা"—১৷৹
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত নাটক "চক্রধারী"—১৲
শ্রীমতী সুরুচিবালা রায় প্রণীত উপন্যাস "মীরা"—২৲
শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত নাটক "শান্তনু"—১৷৹ ও রক্তাঞ্জলী—১৷৹
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত রহস্য পুস্তক "পাতালের ডাক"—১৷৹
শ্রীপ্রভাবতীদেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "অন্তরালে"—২৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেব্যা প্রণীত "তীর্থচিত্র"—৸৹
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "খুনে জমীদার"—৷৶৹
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত "সুন্দর বনের শিকারী"—৷৹
শ্রীমতী জীবনবালা দেবী প্রণীত কবিতা পুস্তক "বাণী বিজয়"—১৲
শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক "না"—১৷৹
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতা পুস্তক "নীরাজন"—১৲
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত "তীর্থযাত্রা"—১৲
শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ প্রণীত "ভারতের রাষ্ট্রবিধি ১৯৩৫"—১৲
কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থ "সুরের ঝরণা"—১৷৶৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৩ আশ্বিন হইতে ৺দুর্গা পূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের ভাদ্র সংখ্যা ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট, আশ্বিন সংখ্যা ২০ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ৩ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে! বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কাপি ভাদ্রের জন্য ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই, আশ্বিন জন্য ৬ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট, এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২৩ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পরে আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভা:

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs. G. D. Chatterjea & Sons at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



প্রথম খণ্ড | ষড়্‌বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

হিমালয়

দিলীপকুমার

(স্তবগাথা)

ললাটে যাহার উষা-উষ্ণীষ, নয়নে যাহার ধ্যানের মন্ত্র,
নিষ্কলঙ্ক-স্বপ্নে মগ্ন গভীর, চির-অনন্ততন্ত্র !
নীল-অভিসার-বৈরাগী, চাহো ধূসর ধরায় করুণাচক্ষে।
মূর্ছামলিন দীনহীন তরে উচ্ছল প্রেম যাহার বক্ষে !

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর-শঙ্খ :
শুনি' যার গান মন্ত্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।

চরণে যাহার গতিমৃদঙ্গে বাজে অসাঙ্গ নির্ঝরনৃত্য,
অন্তর যার মৌননিথর, স্থিতিসুন্দর, শান্তিদীপ্ত।
নটীবিদ্যুৎ জপি' যার কোটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধায় গমকগঙ্গা,
কণ্ঠে যাহার বজ্রবহ্নি, মেখলা—শ্যামলী ফুলতরঙ্গা।

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর-শঙ্খ :
শুনি' যার গান মন্ত্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।

বিরহ যাহার প্রাণের পাথেয়, মিলন যাহার প্রাণপরীক্ষা,
সর্বংসহ বৈভবী, দিলে ক্ষমার তীর্থে দানের দীক্ষা।
সর্বমণির মঞ্জুষা হ'য়ে সর্বহারা যে অভয় লক্ষ্যে,
নিঃসঙ্গ উদাসীন হ'য়ে সর্বসঙ্গী প্রণয়ে সখ্যে।

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর-শঙ্খ।
শুনি' যার গান মন্দ্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।

তোমার নীলিমানন্দ হেরিয়া মর্ত্যম্লানিমা জাগে আনন্দে,
শুনিয়া তোমার আলো-ওঙ্কার ছায়াব্যথা কাঁপে পুলকছন্দে।
ঝঙ্কার তব শুনিয়া পঙ্ক পঙ্কজে পেল সুরভিমুক্তি,
বন্দনে তব-সন্ধ্যাবিলাসী লভিল অরুণ-গরবী-শক্তি।

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর শঙ্খ।
শুনি' যার গান মন্দ্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।

দেশে দেশে আশা-সঙ্গমে কত উঠেছে পড়েছে জীবনযাত্রী :
তোমার দুরাশা হে অপরাজেয়, স্পর্ধিল আজো নিরাশারাত্রি।
ভূমিতরে ভূমিকম্পে মরিল কত প্রমত্ত রক্তরঙ্গে :
তুমি আজো ডাকো সুজলা-সুফলা-বনানী-করুণা ধরিয়া অঙ্কে।

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর-শঙ্খ।
শুনি' যার গান মন্দ্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।

যুগে যুগে মোরা ধাই হায়, করি' ছোট সুখদুখ প্রাণের পণ্য :
ধ্রুব-আশে ভুলি অধ্রুব তাই রহি মায়া-বন্ধন-বিষণ্ণ।
তব অম্বর-দুন্দুভি-দীপে দেবাদিদেবের ঘোষিল তূর্য :
তাই চিরদিন তব অমলিন তুষার-কিরীটে জ্বলিল সূর্য।

তামস-তন্দ্রা ভাঙো হে, বাজাও আকাশ-উধাও শিখর-শঙ্খ।
শুনি' যার গান মন্দ্রমহান্ ভীরু হিয়া হবে নির্বিশঙ্ক।



বিজ্ঞান ও অব্যক্ত জগৎ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডি-এস্‌সি, পি-আর-এস্

প্রবন্ধ

আধুনিক বিজ্ঞানে এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যন্ত্রসহযোগে পরীক্ষণ প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বিজ্ঞানে অনুমান ও শ্রুতিমূলক প্রমাণ বহুল পরিমাণে গ্রাহ্য হইলেও পরীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুলাংশে প্রত্যক্ষমূলক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষিতব্য, তাহার ধর্মগুণ বিচার হইতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরূপিত হয় এবং যাথার্থ্য নির্ণয়ার্থ সেই তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় কল্পনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয় নাই। যুক্তিপূর্ণ কল্পনার সাহায্যেই ক্রমবিবর্ধমান হইয়া বিজ্ঞান বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। বিজ্ঞান জগৎ হইতে কল্পনার পরিপূর্ণ নির্বাসন সম্ভবপর নহে।

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটী-তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে দুই বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনাদ্বয়ের যৌগপদ্য (Simultaneity of events) তাহাদের অন্যতম। যেহেতু এই যৌগপদ্যের জ্ঞান একই পরীক্ষককে গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং একস্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দূত প্রমুখাৎ স্থানান্তরের বিবরণ গ্রহণ ব্যতিরেকে তাহার গত্যন্তর নাই। কারণ যুগপৎ দুই স্থানে উপস্থিত থাকা যে কোন পরীক্ষকের পক্ষে অস্বাভাবিক। সুতরাং যৌগপদ্য-জ্ঞানলাভে দূতের সহায়তা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আর এই দৌত্যকার্যে আলোক রশ্মির ন্যায় অতি দ্রুতগ (যাহা সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল চলে) দূত নিয়োজিত করিলেও ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই সংবাদ দূর স্থানে পৌছিবে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কলিকাতা সহরে প্রতিদিন বেলা এক ঘটিকার সময় কেল্লা হইতে তোপধ্বনি করা হয় ও তাহা শ্রবণ করিয়াই কলিকাতাবাসী প্রত্যহ ঘড়ীর সময় নির্দেশ করে। কিন্তু এই ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় বিবেচ্য। প্রথমতঃ, বেলা যে এক ঘটিকা হইল সে সংবাদ কেল্লায় পৌছে আলীপুরের মানমন্দির হইতে। তথা হইতে তাড়িৎ শক্তির সহায়ে কেল্লায় সংবাদ প্রেরণ করিতে অতি সামান্য হইলেও কিছু সময় অতিবাহিত হয়। তাহা এত সামান্য যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সেই সময় কোন হিসাবেই আসে না। তাহা হইলেও আলীপুরে যে মুহূর্তে এক ঘটিকা হইল সেই মুহূর্তে কেল্লা হইতে তোপ-ধ্বনি হইল এরূপ বলিলে তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য হইবে না। সংবাদটী মানমন্দির হইতে কেল্লায় পৌছিতে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহাই উভয় স্থানের এক ঘটিকা-জ্ঞাপক সময় মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এখন কেল্লা হইতে যে শব্দ-দূত দিকে দিকে এক ঘটিকা সময় ঘোষণা করিল তাহাও পরিমিত গতি। সুতরাং উহা লাল বাজার পৌছিবার একটু পরে শ্যামবাজার পৌছিবে। সুতরাং এই দুই স্থানে তোপধ্বনি শ্রবণে ঘড়ীতে যে একই সময় নির্দেশ করা হইল, তাহাতেও পার্থক্য হইল। প্রকৃত এক ঘটিকা সময়ের নির্দেশ আলীপুর মানমন্দির দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে বিভিন্ন স্থানে এক ঘটিকা সময়ের যথার্থ জ্ঞান পাওয়া গেল না। বস্তুত রিলেটিভিটী তত্ত্বে দেশ ও কাল এক নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। ইহাদের একটীকে বাদ দিয়া আর একটীকে বুঝা চলে না। সর্বপ্রকার জ্ঞানের পারম্পর্যেই কাল নিরূপিত হয়, আবার অনুভূতিসকলের পারম্পর্যই দেশজ্ঞান উৎপাদন করে।

এইরূপে দেখা যায় যে দুই স্থানে সংঘটিত দুইটী ঘটনার যৌগপদ্যের যথার্থ প্রমাণ কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং এই যাথার্থ্য পরীক্ষাসাপেক্ষ নহে। আইনষ্টাইনের মতে এই যৌগপদ্য পরীক্ষায় অপ্রামাণ্য বলিয়াই অযৌক্তিক, সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানে উহার স্থান হইতে পারে না। এইখানেই বিরোধের সূত্রপাত হইল।

দার্শনিক বলেন যে, এই যে যৌগপদ্যের কথা হইতেছে

ইহা একটী প্রত্যয় (concept) মাত্র। তোমার বিজ্ঞানে ইহাকে পরীক্ষা প্রমাণে গ্রহণ করিতে না পারিলেও বিশুদ্ধ প্রত্যয় হিসাবে ইহার কি কোনই মূল্য নাই? কোন কোন দার্শনিক এই প্রত্যয়কে অধ্যাত্ম বিদ্যার পর্যায়ে ফেলিতে চাহেন, কারণ এই বিদ্যায় প্রত্যয় মাত্রেই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার কোন হেতু নাই। কিন্তু অন্ত সর্বত্র কোন প্রকার অতীন্দ্রিয় বস্তুর আলোচনা অবান্তর ও অবৈজ্ঞানিক।

আবার পদার্থবিদ্‌গণের সকলেই যে আইনষ্টাইনের যুক্তি মানিয়া চলেন তাহাও নহে। তাঁহার স্বপক্ষীয়গণের মতে অতীন্দ্রিয় বস্তু মাত্রেই অসৎ। যে বস্তু সর্বতোভাবে অজ্ঞেয় তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না ও তাহার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগও অবিধেয়। আবার বিপক্ষীয়েরা আইনষ্টাইনের মতকে বাতুলের প্রলাপ বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

এই যৌগপদ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের কেহই মূর্খ বা বাচাল নহেন। সুতরাং ইঁহাদের বিসংবাদের বিষয়বস্তুটী বুঝিতে চেষ্টা করা অন্যায় হইবে না। বিজ্ঞান সুসংবদ্ধ ও ন্যায়ানুমোদিত নিয়মে প্রতিষ্ঠিত। কোনও প্রত্যয় কেন এমন হইবে—যে অন্যত্র ধারণার যোগ্য হইলেও পদার্থ বিজ্ঞানে তাহার প্রয়োগ অর্থহীন বাতুলতা মাত্র? যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর এই প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমে দেখা যাউক যৌগপদ্য জ্ঞানের বিপক্ষে কি আলোচনা করা যায়। যদি এমন কোন প্রত্যয় গ্রহণ করা যায় যাহা মানসজগতে সার্থক হইলেও পরীক্ষা প্রয়োগে ব্যক্ত করা যায় না, তাহা হইলে এরূপ বহু প্রত্যয় উদ্ভাবিত হইতে পারে। আমি বলিলাম, "আমার টেবিলের পাশে শনিঠাকুর বসিয়া আছেন ও ইহা তোমার ধারণার বিষয় হইলে জগতের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ বুঝিতে পারিবে।" এই বাক্যে যাহা ঘোষণা করা হইতেছে তাহা না মানিলে বাক্যটীর কোন প্রকার আলোচনারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন "কৈ, আমি ত শনিঠাকুর দেখিতেছি না"—তাহার উত্তর হইবে, "কারণ তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি অদৃশ্য"। যদি বলেন, "শনির অস্তিত্বে জগতে অমঙ্গলের কারণ নিরাকৃত হয় কি প্রকারে"? উত্তরে আমি বলিব "শনির স্বভাবই ঐরূপ ও তাঁহার কর্মের সহিত তাঁহার চিনিবার উপায়ের কোন সম্বন্ধ নাই।" যদি বলেন "শনি কি?" আমি বলিব, "আরে সে তো সবাই জানে, অতি সহজ কথা, তবে আমি ঠিক প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।" এখন যদি বলেন, "আমি জানি না"—তবে আমি বলিব, "আপনি পদার্থবিদের ন্যায় কথা বলিতেছেন না।" দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যৌগপদ্য তথ্য সম্বন্ধে তর্কের ইহাই সার মর্ম। দার্শনিকেরা বলেন দুই বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনার যৌগপদ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তথাপি এই বিষয় ধারণা করা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "ধারণাটী কি?" তাঁহারা বলেন "এ অতি সহজ কথা সকলেই জানে।" কিন্তু উত্তরে পদার্থবিদ্ যখন বলেন যে তিনি জানেন না; তখনই তাঁহাকে জানান যায় যে তিনি বাতুলের ন্যায় কথা বলিতেছেন।

এক্ষণে কথা এই যে, এই অজ্ঞেয় ও অদৃশ্য বস্তু শনি-ঠাকুরকে বিজ্ঞান বা দর্শন কেহই চাহেন না। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় কি উপায়ে? যাঁহারা বাদ দেওয়ার পক্ষে তাঁহারা বলেন যে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর কাল্পনিক গুণধর্মাদি অস্বীকার করিলেই সেই বস্তু পরিত্যক্ত হয়। তাহাতে এই দাঁড়ায় যে সৎবস্তু মাত্রেই ব্যক্ত বা ব্যক্তের ভাষায় বর্ণনীয়। ইহার ব্যতিক্রম করিলেই পূর্বের শনি-ঠাকুরের সমস্যা উপস্থিত হইবে। যাঁহারা শনিকে বাদ দেওয়ার বিপক্ষে, তাঁহারা বলিবেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কিছুই তুমি মানিতে চাহ না, কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে যাহাকে তুমি অতীন্দ্রিয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ, তাহার ধারণা করার মত কোন উপায় তোমার নাই। হয়ত পূর্বে আদিম যুগে সেই উপায় তোমার ছিল, কিন্তু জীবন ধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিলোপ ঘটিয়াছে। তার পর ধর—যাহাকে তুমি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ কর তাহাই কি তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পার? সীতারাম বা মোহনলালের বীরত্ব তুমি প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার কর কি? অথচ তোমার প্রস্তাবিত সৎবস্তুর সংজ্ঞায় ইহারা অসৎ ব্যতীত আর কি? অতএব তোমার প্রস্তাবিত নীতিতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। শনিকে দূর কর তাহাতে কোন

আপত্তি নাই, কিন্তু আধেয় ফেলিতে গিয়া আধারকেও ত্যাগ করিয়া বসিও না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—উভয় পক্ষেরই বিশ্বাস যে জগতে এমন কিছু আছে যাহার সন্ধান এখনও মিলে নাই। প্রয়োজন হইয়াছে সেই অজ্ঞাতের সন্ধান করা। অতীন্দ্রিয়ের সংজ্ঞায় বাতুলের কল্পনা প্রভৃতের স্থান হইতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা যথার্থ শ্রুতি বা আপ্তবাক্য তাহার স্থান করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে কোন বস্তু আমাদের নিকট অব্যক্ত থাকিতে পারে।

১। ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্যজনিত অসামর্থ্য ও তাহাকে সাহায্য করার মত যন্ত্রের অভাব।

২। ইন্দ্রিয়াভাব বা ইন্দ্রিয় সক্ষম হইলেও নৈসর্গিক প্রতিবন্ধকতা।

৩। বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তিহীনতা।

জ্যোতির্বিদেরা বলেন যে চন্দ্রের এক পৃষ্ঠই সর্বদা পৃথিবীর দিকে মুখ করিয়া আছে। আমরা চিরকালই চন্দ্রের সেই একই পৃষ্ঠ অবলোকন করিতেছি। বাস্তবিক চন্দ্রমণ্ডলের অপর পৃষ্ঠের কি অবস্থা তাহা জানিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের নাই, কিংবা অসমর্থ ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করার মত কোন যন্ত্রও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে অব্যক্ততার প্রথমোক্ত কারণের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি।

আবার ইন্দ্রিয়াভাবে অন্ধের বর্ণজ্ঞান হয় না ও ইন্দ্রিয় সক্ষম থাকিলেও অন্ধকারে কোন্ বস্তু লাল, কোন্‌টী সবুজ তাহাও কেহই বলিতে পারে না। কারণ এই যে, আমাদের বর্ণজ্ঞান সূর্যালোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে। সূর্যালোকে কোন বস্তু উদ্ভাসিত হইলেই তাহার বর্ণ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সেই অভাব ইন্দ্রিয় সাহায্যে পূরণ হয় না। ইহাকে অব্যক্ততার দ্বিতীয় কারণের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

কেহ যদি শৃগালের শিং দেখিয়াছে বলে, তবে তাহা অবিশ্বাস্য—কারণ এই বিষয় নিতান্ত যুক্তিহীন। ইহাই তৃতীয় প্রকার অব্যক্ত।

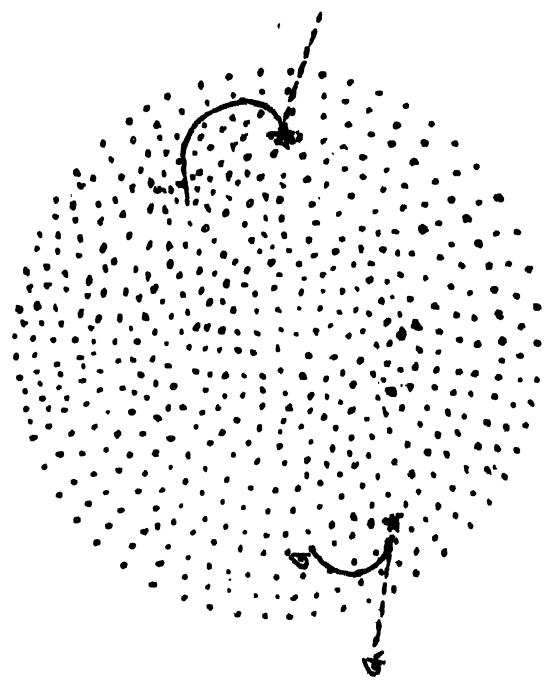
উপরের এই শ্রেণী বিভাগ অন্য প্রকারেও আলোচনা করা যায়। ধরা হউক, আমরা বিশ্বজগৎ পর্যবেক্ষণের উপযোগী যাবতীয় উপায় আবিষ্কার করিয়া দেখিয়াছি, সেই সকল উপায় সম্বন্ধেও তন্ন তন্ন সন্ধান পাইয়াছি; তাহা হইতে আমরা আরও অভিনব উপায়ের কল্পনা করিতে পারি। সেই কল্পিত উপায়ের সাহায্যে যে সকল নূতন তত্ত্ব ব্যক্ত হইবে তাহাই উপরের দ্বিতীয় প্রকার অব্যক্ত। আর সত্য বা কল্পিত কোনও প্রকার উপায়ই যাহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না তাহাই তৃতীয় প্রকারের অব্যক্ত। আবার উপায় বিষয়ে এইরূপ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইয়াও প্রচলিত উপায়সমূহ যথাযথ প্রয়োগ করিয়া যাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, তাহাই প্রথম প্রকার অব্যক্ত। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অব্যক্তের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে হইলে সর্বজ্ঞ আখ্যা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ সর্বজ্ঞ না হইলে আমরা কি প্রকারে ইহা জানি—বর্তমানে যে প্রতিবন্ধকতার জন্য চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ অদৃশ্য রহিয়াছে, কোনও উপায়ে তাহা দূর হইলে প্রকৃতি আবার কোন নূতন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবেন না। তাহা হইলে চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় কারণে অদৃশ্য। আবার যখন বলি যে কোন বস্তুর গতি বলিতে তাহার আপেক্ষিক গতিই বুঝি—কারণ নিরপেক্ষ গতি (absolute motion) প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতায় অব্যক্ত—তখনও আমরা নিজেকে সর্বজ্ঞই মনে করি। কারণ অধুনা-পরিজ্ঞাত আলোক-চুম্বক-শব্দাদি বিজ্ঞান সহযোগে সংগঠিত কোন উপায় সাহায্যেই নিরপেক্ষ গতি ব্যক্ত না হইলেও দূর ভবিষ্যতে কার্যোপযোগী উপায় যে আবিষ্কৃত হইবে না তাহা সর্বজ্ঞ ব্যতীত কে বলিতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদি আমাদের সর্বজ্ঞতা গুণ পরিহার করি, তাহা হইলে অব্যক্ত বস্তু মাত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—(১) যুক্তিহীন অব্যক্ত (২) প্রাকৃতিক নিয়মে অব্যক্ত।

এক্ষণে দেখা যাউক, পদার্থবিদ্‌গণ কি রীতিতে অব্যক্তের শ্রেণী বিভাগ করেন। চন্দ্রের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দুইটী পৃষ্ঠ আছে, একথা পদার্থবিদ্‌গণ অস্বীকার করেন না। ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার শক্তি না থাকিলেও কার্য্য-কারণ সহযোগে তৎস্থলে নানা পদার্থের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া পদার্থবিদ্ তাহাদের গুণধর্মও বিচার করিয়া থাকেন। অধুনা আবিষ্কৃত অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও শূন্যে যে স্থানে দৃষ্টি চলে না—আমাদের ছায়াপথের বাহিরেও—জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব

পদার্থবিদ্ অস্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এই সকল বস্তু উপায়াভাবে অব্যক্ত। তাঁহাদের ব্যবহৃত উপায়সমূহ যদি আশানুরূপ কর্মকুশল হইত কিংবা সেই সকল উপায় যথোচিত ব্যবহার করার শক্তি তাঁহাদের থাকিত, তবেই ঐ সকল অব্যক্ত ব্যক্ত হইত। সুতরাং উপায় ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে পদার্থবিদ্ নিজেকে যে সর্বজ্ঞ মনে করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞান যুক্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ তাহার স্থান উহাতে নাই। কিন্তু কতকগুলি অব্যক্ত উপায় আছে যাহা উপরের শ্রেণী বিভাগে ধরা দেয় না। প্রবন্ধের প্রথমেই উক্ত ঘটনার-নিরপেক্ষ-যৌগপদ্যই (absolute simultaneity of events) তাহার দৃষ্টান্ত। কি প্রতিবন্ধকে নিরপেক্ষ যৌগপদ্য অব্যক্ত তাহার আলোচনা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সহায়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই আলোকের প্রয়োজন। দুই বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনার যৌগপদ্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দুইটী ঘটনাই একই মুহূর্তে চাক্ষুষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আলোক পরিমিত গতি ও আইনষ্টাইনের রিলেটিভেটী তত্ত্বে আলোক অপেক্ষা দ্রুততর গতি কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ কোন প্রকার অসীম গতি উপায়ের সাহায্য ব্যতীত নিরপেক্ষ যৌগপদ্যের সার্থকতা নির্ধারণের উপায় নাই। রিলেটিভিটী আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোকের অসীম গতিই ধারণার বিষয় ছিল। সুতরাং কোন প্রকার অসীমগতি উপায়ের কল্পনা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। আমরা স্বচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে এমন উপায়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে যাহা অসীম গতিতে ধাবমান হইয়া নিরপেক্ষ যৌগপদ্য প্রত্যক্ষের বিষয় করিবে। এইভাবে উপায়াভাবে অব্যক্তের পর্যায়ে ফেলিয়া এই বিষয়ও পদার্থবিদ্ গ্রহণ করিতে পারেন।

এইক্ষণে আরও রহস্যময় আর একটী প্রত্যয়ের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহারও মূলে সেই রিলেটিভিটীতত্ত্ব। বর্তমান শতাব্দীতে একটী প্রত্যয় এই দাঁড়াইয়াছে যে বিশ্বজগৎ শান্ত বটে, কিন্তু উহার সীমা কোন প্রকারেই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না (universe is finite but boundless)। রিলেটিভিটী তত্ত্বানুযায়ী আমাদের পরিচিত জড়ের ন্যায় আলোক রশ্মিরও ভর (mass) আছে। সুতরাং ভরের সাধারণ নিয়মানুসারে কোন অতি গুরুভার বস্তুর সন্নিকট দিয়া প্রধাবিত হইলে, মধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়ায় আলোকের সরল গতির বিচ্যুতি ঘটিবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। পূর্ণসূর্যগ্রহণের সময় কোন নক্ষত্র হইতে প্রধাবিত আলোক সূর্যের সন্নিকট দিয়া গমন সময়ে সরল পথ দিয়া যে বিচ্যুত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে। মনে করা হউক, শূন্যে আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার শক্তি আমাদের আছে। তাহা হইলে অবাধে বিচরণ করিতে করিতে চিরকাল আপনাকে নক্ষত্ররাজি কিংবা নীহারিকা বেষ্টিত দেখিব। কিন্তু সর্বদাই যে নব নব তারকা বা নীহারিকা দর্শন করিব তাহা নহে; বারংবার পুরাতনের পরিচিত মুখ দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব। ইহার অর্থ অধ্যাপক মিল্‌নে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।



মনে করা যাউক, অসীমশূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি তারকা ও নীহারিকার মধ্যে "ক" দর্শক অবস্থান করিতেছে। মধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে "ক" কখনও চিত্রের বাহিরে শূন্যে যাইতে পারিবে না। কারণ চলিতে গেলেই তাহাকে চিত্রে প্রদর্শিত তির্যক্ পথের অনুরূপ পথে চলিতে হইবে। আবার আলোক সহায়েই নানা বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষীভূত

হয় ও আমরা তাহাদের পরস্পর ব্যবধান নির্ণয় করিতে পারি। নানা নক্ষত্র হইতে বিচ্ছুরিত আলোকও মধ্যাকর্ষণে অভ্যন্তরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া "ক" দর্শকের দৃশ্যের সীমা নির্দেশ করিবে। ছবিতে প্রদর্শিত তারকারাজির বাহিরে আর কোন জ্যোতিষ্ক বা গগনচারী অন্য কোন পদার্থ রহিয়াছে কিনা তাহা জ্ঞাত হওয়া দর্শকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই ভাবে মনে হয়, বিশ্বজগৎ অসীম হইয়াও দর্শকের নিকট সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সীমা নির্ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নক্ষত্রশোভিত আকাশে কোন্ স্থানে সে রহিয়াছে তাহাও "ক" বলিতে পারে না। "ক" "খ" বা কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত কোন দর্শক সকলেই নিজেকে একইরূপে নক্ষত্রবেষ্টিত দেখিবে। "ত" তারকার আলোক মধ্যাকর্ষণহেতু তির্যক্ পথে "খ" দর্শকের চক্ষে পতিত হইয়া দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইবে। তাহার মনে হইবে যে "ত" তারকার আলোক দেখিতেছি। আমরা যে নিয়মে দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন করি ইহাও তদ্রূপ। দর্শকের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তু যেন সম্মুখে দর্পণের পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বিশ্বজগৎময় ঘুরিয়া বেড়াইলেও আমরা কখনও তাহার সীমায় উপনীত হইতে পারি না। যত বেগেই ধাবমান হইয়া যে স্থানেই উপস্থিত হই না কেন, সর্বদাই চতুর্দিকে প্রায় একই প্রকার সজ্জিত জ্যোতিষ্করাজি দেখিতে পাইব। এইভাবে সান্ত হইয়াও বিশ্ব আমাদের নিকট অনন্ত। নক্ষত্রখচিত সসীম দেশের বহিঃস্থ দেশ সম্বন্ধে কোন প্রকার সংবাদ অবগত হওয়া কিংবা ইহার সীমাদেশে উপনীত হওয়া সর্বপ্রকারে অসম্ভব। আমাদের নিকট বিশ্বের ঐ অংশের কোন সার্থকতাই নাই। সুতরাং এই সসীম সান্ত অংশকেই আমরা দেশ বা space বলিব। কিন্তু তাই বলিয়া সীমার বাহিরে আর কিছু নাই তাহা বলিব না। কারণ ঐ স্থানে কোনও কিছুর অস্তিত্ব যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। ঠিক একই ভাবে নিরপেক্ষ যৌগপদ্যও কল্পনার বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

এখন প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করা যাউক। এক পক্ষে বলা হয়, যাহা কিছু যুক্তি-বিরুদ্ধ বা প্রকৃতি হিসাবে অজ্ঞেয় নহে, তাহাই সার্থক। যাহা সৎ, তাহা পরিচিত উপায় সহায়ে জ্ঞেয়, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসৎ। কারণ, কাল্পনিক প্রত্যয়সমূহ বিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর শেষ থাকিবে না। ক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞান বিপথে চালিত হইবে। অপর পক্ষে বলা হয়, এই ভাবে পদার্থবিদ্ আপনাকে উপায় বিষয়ে সর্বজ্ঞ মনে করিতেছেন। কারণ যাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হিসাবে অজ্ঞেয়, তাহা সর্বথা অজ্ঞেয় হইলেও প্রকৃতিবিরুদ্ধ অজ্ঞেয় সম্বন্ধে সেই যুক্তি প্রযোজ্য হয় না। প্রকৃতি সুবিশাল, তাহার সামান্য অংশের জ্ঞানও পদার্থবিদ্ আহরণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আর উহা প্রকৃতিসঙ্গত, এ প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ইহাই অতি গুরুতর সমস্যা, আর এ সমস্যা শুধু পদার্থ-বিজ্ঞানের নহে। জড়-বিজ্ঞানে বস্তু-জগতের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু মানবের চিন্তাধারার অন্যান্য শাখায়ও এই সমস্যা অল্প নহে। যে স্থলেই দৃশ্যময় জগৎকে দর্শক হইতে স্বতন্ত্র সত্তারূপে মনে করা যাইবে, সেই স্থলেই এই সমস্যার উদ্ভব হইবে। এই স্বতন্ত্র বিশ্বই বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। ইহাতে যাহা আছে তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গিয়াই সমস্যায় পতিত হইতে হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানের বাহিরেও বিশ্বের যে অংশ রহিয়াছে, তাহা চিরকাল অব্যক্ত থাকিবে—এ প্রকার বিশ্বাস অতিশয় দুঃসাহসিক ও ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। আবার এই ঔদ্ধত্য প্রকাশে বিরত হইলে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধিৎসাই এক হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়। কারণ, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে আমরা যে জ্ঞান আহরণ করিব তাহা অনন্ত ও চির-অজ্ঞেয় অংশের মূলনীতিরই সমর্থক হইবে। কিন্তু যদি এমন বিবেচনা করা যায় যে আমাদের আহৃত জ্ঞানই সত্য—আর বিশ্ব-সংসার সেই জ্ঞানে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত মাত্র, তাহা হইলে সমস্ত চিত্রই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। নূতন চিত্রে পূর্ববর্ণিত সমস্যার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। যাহা কিছু ব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে গ্রহণ করাই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মূল সূত্র স্থির করিতে হইবে ও তাহার সাহায্যেই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। এরূপে চলিলে, কাহাকেও সর্বজ্ঞ আখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে না। কারণ তাহা হইলে দর্শক হইতে স্বতন্ত্র কোন বিশ্ব-জগৎ থাকে না। পদার্থবিদ্ পর্যবেক্ষণের সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন—এ কথাও বলিতে হয় না কিংবা সর্বজ্ঞতার ঔদ্ধত্যও প্রকাশিত হয় না। বাস্তবিক পর্যবেক্ষণের উপায় অনন্ত; তাহার সামান্য কয়েকটী মাত্র বৈজ্ঞানিকের আয়ত্ত। অধুনা পরিচিত উপায় সহায়ে বিশ্বের যে জ্ঞান আহৃত হইবে তাহাই বর্তমানের পক্ষে বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান। কিন্তু নূতন নূতন উপায়ের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বও ক্রমে বৃহত্তর হইতে থাকিবে।

তুষার-মামী

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

আমাদের প্রতিদিনকার পথে কত ঘটনা ঘটে, কত মানুষ আসে যায় ; যারা পথ হ'তে সরে যায় তাদের কাউকে আমরা একেবারে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই ; আবার কাউকে কখনো সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারিনে ; কারণে অকারণে মনে পড়ে যায়, আর হারাণোর ক্ষতিটা যেন বড় বেশী লাগে। কত তীব্র অনুভূতি কোমল হয়ে আসে, সন্ধ্যামেঘের মত আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। আবার তুচ্ছ কোন ঘটনা চিরদিনের মত মনে দাগ রেখে যায়।

ছোট বেলার কথা ভাবতে গেলেই আমার সব প্রথম মনে পড়ে তুষার-মামীর কথা। তিনি সকলের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অসাধারণ ছিলেন, আর তাঁর সেই সাদা পাথরে গড়া প্রতিমার মত মুখে এমন একটা মহিমময়ী ভাব ছিল, যা আমাকে অভিভূত করে দিত। কিম্বা সেটা হয়তো আমার অভিভূত হবারই বয়স! নইলে সকলেই তো তুষার-মামীকে দেখেছে ; মুগ্ধ হওয়া দূরের কথা, সকলের মুখেই তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনেছি। আমার অন্য মামীরা বলতেন 'তুষার বৌ'য়ের নাকি অত্যন্ত অহঙ্কারী স্বভাব। কেউ বলতেন রূপের, কেউ বলতেন বিত্তের। তা' ছাড়া আর তো অহঙ্কার করবার ভগবান তাঁর জন্যে রাখেন নি কিছু। আমি তাঁকে দেখি আমার মামার বাড়ীতে এক রকম আশ্রিতার মত। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিদের বৌ তিনি, স্বামী নাকি তাঁর তখন নিরুদ্দেশ। বুড়ো এক শ্বশুর ছিলেন ; আমার মামার বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে তাঁদের পুরোণো আমলের দোতলা কোঠা অনেক জায়গা ভেঙে চুরে গিয়েছে—সেইখানে তুষার-মামী প্রতিদিন দুবেলা শ্বশুরকে খাবার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসতেন। পরের অন্ন গ্রহণ করতে তাঁর লজ্জা ছিল না, কিন্তু পরের বাড়ী এসে প্রতিদিন পাত পেতে খেতে তাঁর নাকি অপমান বোধ হ'ত। রান্নাঘরের পিছন দিয়ে একটা রাস্তা ছিল, সেই খান দিয়ে গেলে তুষার-মামীদের বাড়ী খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেত। রান্নাবান্না শেষ হলেই ভাত বেড়ে নিয়ে বাড়ীর একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে তিনি শ্বশুরকে খাওয়াতে যেতেন, একদিনের জন্যও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। পরে শুনেছিলাম তুষার-মামীর শ্বশুর, মায় ঐ ছোট কাকা নাকি ভয়ানক মাতাল ছিলেন বলেই মামী সেখানে থাকতে পারতেন না। সত্যি তাঁর রাজরাণীর মত গম্ভীর মুখের ভাবে আশ্রিতার দীনতা একেবারেই স্পর্শ করত না। তাই পরের বাড়ী থাকাটা যেন তাঁকে মোটেই মানাত না। আমার ছেলে বয়সের কল্পনাপ্রবণ মনে মনে হ'ত—ইচ্ছে করলেই তুষার-মামী এখুনি অদ্ভুত একটা কিছু করে ফেলতে পারেন ; সকলে দেখবে "যা'কে আমরা নেহাৎ সাধারণ মেয়ে বলে ভেবেছি" সে এক ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা। শ্বেত হস্তী এসে পিঠে তুলে নিয়ে যায়। এমন আরো সব রূপকথায় পড়া ঘটনার সঙ্গে তুষার-মামীকে মিলিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করেছি।

তুষার-মামীকে আমি দেখেছিলাম মাত্র মাস চারেক ; তারপরই তাঁর জীবন নাট্যের শেষ যবনিকা পড়ে গেল। বাবার সঙ্গে থাকতাম দূর প্রবাসে, জ্ঞানে প্রথম বাংলাদেশে আসি তের বছর বয়সে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মার আবার সন্তান-সম্ভাবনায় বাবা ব্যস্ত হয়ে আমাদের মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেন। দাদামশাই দিদিমা তখনো বেঁচে। আসবার সময় আমার যে কি একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তা' বর্ণনাতীত। ছোটবেলার জীবনটা আমার বেশীর ভাগ কেটেছে গল্পের বইয়ের মধ্যে—তাই সব জিনিষে কল্পনার রং চড়িয়ে দেখা আমার স্বভাব' ছিল। তাই এই প্রথম মামার বাড়ী যাওয়া ও বাংলা দেশ দেখার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল তা' আমার বয়সের মেয়েরা ঠিক অনুভব করতে পারবে না। মাকেও দেখলাম ; বাসা থেকে আসবার আগে ক'দিন ধরে যে বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাব ঘিরে রেখেছিল সেটা গাড়ীতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কমে এল। খানিকটা দূর যেতেই বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের কথায় ছোট বেলার খুঁটিনাটি গল্পে একেবারে মেতে উঠলেন। বাবা প্রথমটা না হুঁ করে উত্তর করছিলেন, এক সময় দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট হ'ল। আহা আমরা না হয় নতুন জায়গায় যাবো, কত সব নতুন কিছু দেখবো বলে এত আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু বাবাকে তো আবার দু'দিন পরে এই পথ দি'য়ে একলা ফিরতে হবে। আমাদের মীরাটের বাসায় বাবা আছেন, অথচ আমরা নেই একথা যেন ভাবাই যাচ্ছিল না। কিন্তু মার আনন্দেও দোষ দেওয়া যায় না ; মা নাকি এই ন বছর পরে বাপের বাড়ী যাচ্ছেন। যেমন আমার তেমন তো তাঁরও বরং আরো বেশী—ভাই বোন দাদা দিদি আরো কত কি তাঁর আছে যা আমার নেই।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর মার সঙ্গে চুপি চুপি গল্প করতে করতে—মামার বাড়ীর প্রায় সকলকেই চিনে নিলুম এবং মনে সন্দেহ রইলনা, দিদিমা দাদু মামা মাসীদের কথাতো ছেড়েই দাও, গ্রামের সকলের সঙ্গেও যেন আর নতুন করে পরিচয় করতে হবেনা।

মার নতুন ঠানদি 'রাঙাখুড়ি' 'পদ্মদিদি' 'বিপিন ভাইপো' 'ওবাড়ীর ছোটকাকা' আর রাজীব দাদাকে অনায়াসেই চিনে ফেলতে পারবো। এমন কি সন্দেশের দোকানে চিন্তামণি ময়রাটাকে পর্য্যন্ত, যদি বেঁচে থাকে। মা তো বলেন তখনই খুব বুড়ো ছিল। মা বললেন, চিন্তামণির ছোট ছেলে লালমোহনের সঙ্গে মা নাকি ছোটবেলায় অনেক খেলেছেন। আশ্চর্য্য রকমের অবাক হয়ে যাই। মার এখনকার এই জীবনের সঙ্গে এ কথাটাকে যেন কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না।

মায়ের এদিকটা যেন একটা চাবি দেওয়া বন্ধ বাক্স ছিল, হঠাৎ ডালা খুলে গিয়ে সব এক সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এত কথাই বা মার সঙ্গে কবে কইতে পেয়েছি? সেখানের সেই রুটিন বাঁধা সময়ে লেখাপড়া, সেলাই গান, ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে মাকে যতটুকু পেতাম তাতে সম্পূর্ণতা ছিলনা। কোন কোন ভদ্রমহিলা বেড়াতেও আসতেন মাঝে মাঝে, তাঁদের সঙ্গে মার যা গল্প সে আমি মুখস্থ বলে দিতে পারতাম—এমনি কেতাদুরস্ত একঘেয়ে কথাবার্ত্তা।

মামার বাড়ী গিয়ে কি করতে হবে না হবে, সে সবও কিছু শিক্ষা হ'ল। যদিও সেটা নেহাত গণ্ডগ্রাম নয়—কলকাতারই কাছাকাছি একটা জায়গা, তবু বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে তো আমাদের দূর দূরান্তর প্রবাস-জীবনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ।

গাড়ী থেকে নেমেই সেটা কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। আমরা আসবো বলে পাড়ার অনেক লোক মামার বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কারণ মার বাপের বাড়ী আসাটা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গাড়ী থেকে নামতেই একটু কেমন যেন হাসাহাসির ভাব দেখলাম সকলের মধ্যে; দমে গেলাম বেশ কিছু। একেই তো আমার মুখচোরা স্বভাবের জন্যে এত লোক দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তার পর এই হাসাহাসি। পরে জেনেছিলাম বাবার আদর করে দেওয়া প্রকাণ্ড 'ডল্‌টা' কোলে করে নামাই নাকি আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছিল। এতবড় লম্বা মেয়ে ফ্রক্ পরে চুলে 'রিবন্' বেঁধে পুতুল কোলে করে গাড়ী থেকে নামা—এসব দিকের লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকবে মা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। বাবা ফিরে যাবার পর আমি বেশীর ভাগ সময়ই শাড়ী পরে কাটিয়েছি।

প্রণাম আশীর্ব্বাদ নানারকম কাণ্ড কারখানা একটু কমতেই দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—মেয়ে যে তোর মাথা ছাড়াল কমলি। খুব তো মেম্ তৈরি করছিস দেখছি. সায়েব জামাই পাবি তো? মা হাসলেন।

দিদিমাকে দেখলে মোটেই মনে হয়না আমার মায়ের মা। ছোটখাট রোগা গড়ন, খনখনে গলা। তবে বেশ হাসিখুসি ভাব, মোটের উপর মন্দ লাগলো না। এই সময় প্রথম দেখি তুষার-মামীকে, একটা থামের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন; এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললেন—'চল মীরা হাত মুখ ধোবে। মাকে সুন্দরী বলে আমার মনে মনে বেশ কিছু গর্ব্ব ছিল, তুষার-মামীকে দেখে সে গর্ব্ব অনেকটা কমে গেল; ওঁর এই তুষারের মত সাদা রঙের জন্যই নাকি এই নাম। বড় হয়ে মনে হত মনটাও তাঁর ছিল চির-তুষারাবৃত।

তাঁর সঙ্গে ঘরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তিনি আমার হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে একটা আলমারীর মাথায় তুলে রেখে বললেন—এটা এখন এখানে থাক্, পরে খেলা কোরো—বুঝলে? এস মুখ ধুয়ে জামা টামা ছাড়বে; শাড়ী নেই তোমার?

বললাম—আছে আমার স্যুটকেসে, কিন্তু সিল্কের।

সিল্কের? আচ্ছা তা' হোক, তোমরা অনেকদিন পরে এসেছ কিনা, নানা রকম লোক আসবে দেখতে, শাড়ী পরে থাকলে বেশ দেখাবে কেমন?

নেহাৎ বোকা ছিলাম না, উদ্দেশ্য যে খালি ভাল দেখানোতেই নয়, কিছু কিছু বুঝলাম। সেই মুহূর্ত্তেই তুষার-মামীকে খুব আপনার মনে হল।

এই তুষার-মামীর কথা মার মুখে আগে শুনিনি, মোটে নাকি সাত বৎসর তাঁর বিয়ে হয়েছে, তার পক্ষে কিন্তু একটু বড়ই দেখায়। মার সেই রাজীব দাদার স্ত্রী ইনি। রাজীব মামা নাকি চিরকালই একটু উড়ো উড়ো স্বভাবের। অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে হঠাৎ বাড়ীর লোককে না জানিয়ে এই বিয়ে করে আনেন। হয়তো মামীর অসাধারণ রূপ তার কারণ। তারপর কিছুকাল বেশ ভাল ভাবে নাকি সংসার করেছিলেন, চাকরীও করেছিলেন কিছুদিন! তবে বাপ মাতাল বলে বাপের সঙ্গে তাঁর বনত না; মাঝে মাঝে ঝগড়া করে পালিয়ে যেতেন। এখন প্রায় একবৎসর হ'ল আর আসেন নি।

গ্রামে রাষ্ট্র যে সন্ন্যাসী হয়ে নাকি এক সাধুর সঙ্গে চলে গেছেন। কিন্তু তলে তলে সকলেই বলতো স্বদেশী দলে নাকি যোগ ছিল তাঁর, পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু মামীকে আর কেউ ভাল চক্ষে দেখতে পারলনা, যেন এই দুর্ঘটনার জন্য মামীই দায়ী। মামীর শ্বশুরও দুটিবেলা খেতে বসে এমন সব দুর্ব্বাক্য বলতেন—আমার রাগে মনে হ'ত—মামী যদি ভাত নিয়ে না আসেন বুড়ো না খেয়ে শুকিয়ে থাকে তো বেশ হয়। আমি আসার পর থেকেই সঙ্গে আসাটা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্যে দাঁড়িয়েছিল। এই পথটুকু মামীকে একলা নিজস্ব করে পাবো সেই লোভে। এক একদিন রাত্রে বুড়ো এমন 'বে-এক্তার' হয়ে থাকতেন যে খাবার ছড়িয়ে বাটি গেলাস ছুঁড়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করতেন; মামীর কিন্তু বিরক্তি দেখিনি; তিনি নিঃশব্দে বাসনগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতেন। আমি প্রায় জিগ্যেস করতাম, মামীমা, তোমার রাগ হয়না? তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন। সকলের থেকে তাঁর হাসিটা যেন আলাদা ছিল। কেমন লজ্জা করতো। কোনদিন বা বলতেন—গুরুজনের ওপর কি রাগ করতে আছে? সহ্য করতে হয়।

এই শিক্ষাই তো তাঁর ছিল; কিন্তু শেষকালটায় যা করলেন তা' যেন রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে রইল আমার কাছে।

আমার নিজের বড়মামীকে কিন্তু মোটেই ভাল লাগতোনা। সব সময়ে তাঁর মুখে চোখে একটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাব লক্ষ্য করেছি। মার সঙ্গে অবশ্য তাঁর পরিহাসেরই সম্বন্ধ; কিন্তু পরিহাস আর উপহাস এক জিনিস নয়, সেটা তখনই বেশ বুঝতে পারতাম।

আমি সর্ব্বদা তুষার-মামীর কাছে থাকতে ভালবাসতাম বলে বড়মামী প্রায়ই নানারকম কথা বলতেন—একদিন স্পষ্টই বললেন, বিদুষী কন্যাবতীর কাছে দিনরাত্তির থেকে থেকে মেয়েটির তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল ঠাকুরঝি। এইবেলা সাবধান হোয়ো। আমি তো বাড়ীর একটা মেয়েকেও ওদিক মাড়াতে দিই না।

মা হেসে বললেন—তুষার-বৌ নাকি তোমার কাজ বেশ জানে, তাই

শেখে ভাই ; লেখাপড়ার দফা তো গয়া হচ্ছে বসে বসে, একটা কাজের যদি চর্চ্চা থাকে মন্দের ভাল।

বড়মামী মুখ টিপে হেসে—ভাল হলেই ভাল, বলে চলে গেলেন। মার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম, কিন্তু মা বারণ করলেন না কিছু।

আর একদিন দিদিমার বোনঝি, মার পদ্মদিদি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—দিনরাত ও ছুঁড়ির সঙ্গে ফুসফুস্ গুজ্ গুজ্ করিস কিসের জন্য ? 'ছেলে' 'ছেলের' সঙ্গে থাকবে, তা নয় সমবয়সী খেলুড়িদের সঙ্গে ঠ্যাকারে কথাই কওয়া হয়না। দিনরাত বুড়োমাগীর ল্যাজ ধরে থাকা। ওর সঙ্গে মিশোনা বাছা, পেটে ওর অনেক শয়তানী।

আমার কিন্তু মনে হ'ল আসলে তুষার-মামীর দোষ ছিলনা ; রাজীবমামা চলে যাওয়াতে উনি গলগ্রহ হয়েছিলেন বলেই সকলের জাতক্রোধ।

সমবয়সীদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করে দেখেছি—কোথায় যে বাধে বুঝতে পারিনা, কিন্তু মিশতেও পারিনি। তাই সকলের বারণ সত্বেও আমার এই নিরাপদ আশ্রয়টি আঁকড়ে ধরে রইলাম। মা বলতেন তুষার-মামী স্বামীকে দেবতার মত দেখেন। তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না কিন্তু কিছু যেন অনুভব করতাম ; কখনো কোনো সময়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে রাজীবমামার কথা উঠলে মুখটা যেন তাঁর আলো হয়ে উঠতো। একদিন বললেন—মীরা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে, তুমি এখানের মেয়েদের মত পাকা নও ; এইরকম সরল মেয়েই আমার পছন্দ হয়।

অথচ বড়মামী মেজমামী যখন তখন বলতেন—এতবড় মেয়ে তোমার কি 'ন্যাকা' ঠাকুরঝি ?

তুষার মামীর গলায় একটা লকেট দেওয়া সরু সোনার চেনহার ছিল। আমার যেমন সব সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন ছিল—একদিন বললাম—আচ্ছা মামীমা, রাজীবমামা কি রকম দেখতে ছিলেন ? মামী একটু ইতস্তত করে লকেটটা খুলে দেখালেন। ছোট্ট ফটো, ভাল বোঝা গেল না, মুখটা তো ভালই মনে হ'ল। মামী লকেটটা বন্ধ করে মাথায় ঠেকিয়ে সেমিজের মধ্যে নামিয়ে দিলেন ; তার পরই অন্য কথা পেড়ে সে কথা চাপা দিয়ে ফেললেন। নিজেকে প্রকাশ করতে চাইতেন না তিনি মোটেই। রাজীবমামা যে তাঁকে এত দুঃখের মধ্যে ফেলে রেখে গেছেন, তার জন্য অনুযোগ করতেন না কখনো। মাসের মধ্যে দুটি দিন ছিল তুষার-মামীর ছুটি ; ওঁর শ্বশুর সহরে যেতেন পেন্সন আনতে ; কোন্ বন্ধুর বাড়ী উঠতেন জানিনা, পরদিন আসতেন। পেন্সন যা' পেতেন তা'তে নাকি তাঁদের দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতো ; শুধু মদ খেয়ে নষ্ট করতেন বলেই ওঁদের এত কষ্ট।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা হ্যারিকেন হাতে করে তুষার-মামী আমায় বললেন—মীরা একবার যাবে আমার সঙ্গে ও বাড়ী ?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—কেন আজকে তো ছোট ঠাকুর্দা নেই ?

তা' হোক—এমনি চল না, ঠাকুরঘরে আলো দিয়ে আসবো আজ লক্ষ্মীপুজো কিনা।

আমরা বেরুচ্ছি, পদ্মমাসী হেঁকে বললেন—কি গো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভরসন্ধ্যে বেলা ?

এত সামান্য কথায় ভয় পাবার কি আছে ! দেখলাম তাঁর মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললেন—আজ লক্ষ্মীপুজো, ঠাকুর ঘরে একবার 'সন্ধ্যেদীপ' দেব, তাই—

আমরা বেরুতেই শুনলাম পদ্মমাসীর গলা—'লক্ষীর' কপাল আজ ফিরলো লো বড়বৌ। বলে না সেই "রাখালী কত খেলাই দেখালি।" সাতজন্মে তো এসব হুঁস্ হয় না। দু'টি ধিঙ্গিই হয়েছেন সমান। কমলি মেয়ের আপেরটি খেলে। আরো কি বললেন কে জানে, আর শুনতে পেলাম না।

আমিও কিন্তু সেদিনকার ব্যবহার তার বুঝতে পারলাম না। ওবাড়ী গিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে, ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দিয়ে, বেরিয়ে এসে মামীমা হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন—তুমি একবারটি এখানে একলা থাকতে পারবে মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে আমি শুধু ওপরটা দেখে আসবো !

সত্যি কথা বলতে কি এই অন্ধকার পড়ো-বাড়ীর দিকে চেয়ে আমার সাহসে কুলোল না, ভয়ে ভয়ে বললাম, আমিও যাই না ! মামীমা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, না না, লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে তুমি আলোটা নিয়ে থাকো, আমি এমনি যাচ্ছি একবারটি—পারবে না ? কি মিনতির স্বর।

বুকের রক্ত হিম হয়ে এলেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। মামীমা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরে যখন এলেন, স্পষ্ট দেখলাম হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। গলার স্বরও কাঁপা, বললেন—মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে—আমি ওপরে গিয়েছিলাম বোলো না কাউকে ? তুমি যদি আমায় একটুও ভালোবাসো, বোলো না, তা'হলে ভয়ানক বিপদ হবে। বলবে না বল, এই আমার হাত ছুঁয়ে বল।

এরকম কথাবার্ত্তা তাঁর মুখে কখনো শুনিনি ; ঘাড় নেড়ে রাজী হলাম, কিন্তু মনের মধ্যে খট্‌কা থেকে গেল। গেলেই বা ওপরে, নিজেরই তো বাড়ী, এতে দোষ কি ? আজো বুঝতে পারিনা—কি হয়েছিল সেদিন। আরো একদিন ছোট ঠাকুর্দাকে ভাত দিয়ে আমায় বললেন—মীরা একটু দাঁড়া আসছি আমি, বলে ওঁদের যে একটা গোয়ালের চালা ছিল তার পাশ দিয়ে কোথায় চলে গেলেন। যখন এলেন, দেখি মুখ রাঙা চোখ ছলছলে ভারী। আর চুলে গায়ে ছোট ছোট খড়ের কুটি লেগে রয়েছে ; মুখ দেখে প্রশ্ন করতে সাহস হ'লনা—মনে হ'ল খড়ের গাদায় পড়ে কেঁদেছেন নাকি।

ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি—বাড়ীর যেন কি রকম একটা বিশ্রী থমথমে ভাব—সকলেই চুপ। মা আমাকে ডেকে বারণ করে দিলেন—তুষার-মামীর ঘরে যেন না যাই বা তাঁর সঙ্গে না মিশি।

একটু পরে বড়মামী এলেন আমাদের ঘরে, বললেন—দেখলে তো ঠাকুরঝি, তখনি বলেছিলাম ? তোমার ভাই, মাথা মন, ও সব বুঝতে পারেনি। ওই দুঃখে রাজীব ঠাকুরপো দেশত্যাগী হ'ল ; নইলে অমন সুন্দরী

বৌ—আপনি পছন্দ করে বিয়ে করলে' মানুষ কি আর অমনি ছেড়ে চলে যায় ?

মা গম্ভীরভাবে বললেন—কি জানি বড়বৌদি, মানুষ চেনাই দায়। প্রতিমার মত মুখ ; দেখে কে বলবে তা'র ভেতরে পাপ আছে।

বড়মামীর দেখলাম যেন খুব খুসী খুসী ভাব, বললেন—ওগো ওই রূপ দেখে সবাই মজে। জন্ম জন্ম যেন এমনি কুচ্ছিত হই বাবা। হুঁঃ।

ছোটদের কাছে কেউ কিছু না বললেও দেখলাম—জানতে কারুর বাকী নেই ব্যাপারটা! আমিই বোকা। মামাতো বোন বিভা আমারই বয়সী হবে—আমায় চুপি চুপি বললে জানিস—তুষার-কাকী রাত্তিরে চুপি চুপি কোথায় চলে গিয়েছিল, ভোর বেলা এসেছিল।

আমি থতমত খেয়ে বললাম—তাতে কি হয়েছে ভাই? বিভা খিলি শেলি ঠেলাঠেলি করে হাসতে লাগলো, বললে—কি বোকা রে 'মিরিটা'? তুষার-কাকী 'খারাপ মেয়ে' মানুষ! ওই জন্তেই তো আমরা মিশিনা বুঝলি ?

'খারাপ মেয়েমানুষের' অর্থ ভাল করে বোধগম্য হবার বুদ্ধি আমার ছিলনা তখন ; তবু কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

রান্নাঘরে দুধ খেতে গিয়ে দেখি পদ্মমাসী রান্না চাপিয়েছেন। অন্যদিন তুষার-মামীই রান্না করেন। আমার কেন জানিনা চোখে জল' এল—দুধ না খেয়ে পালিয়ে এলাম।

পদ্মমাসী পিছন থেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন—চলি গেলি ক্যান্ লা! দুধ খেয়ে যা? বাব্‌বাঃ কম্‌লির মেয়ে যেন ধিঙ্গি—অবতার। রূপসী হ'লেই অনেক ঠাট্ হয়।

তুষার-মামীর ওপর একটা অবোধ অভিমানে আমার সমস্ত দিন বারে বারে চোখে জল আসছিল। কেন তিনি অত ভাল হয়েও 'খারাপ মেয়ে মানুষ' হলেন? যদি খারাপ মেয়েমানুষ হলেন, কেন আমাকে অত ভাল-বাসলেন? সমস্ত দিন তুষার-মামীকে কেউ খেতেও ডাকলে না। একবার একবার দেখছিলাম ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটায়, যেখানে রাজ্যের পুরোনো লেপ তোযোক ভাঙা বাক্স টাক্স গাদা করা আছে—চুপ করে বসেছিলেন জানলায়। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন সেই অশোক বনে সীতার ছবিটা।

সারাদিনই বাড়ীতে একটা চাপা কথাবার্ত্তা, তলে তলে কি যেন সব কাণ্ড ঘটতে লাগলো।

সন্ধ্যেবেলা আমার বিভা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে—জানিসরে, তুষার-কাকীকে আর আমাদের বাড়ী রাখা হবে না। দাদুটাদু সব্বাই বলেছেন। আমি বাইরের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে শুনলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। দাদু বললেন 'খারাপ দৃষ্টান্ত' নাকি, দৃষ্টান্ত মানে কি রে!

আমার তখন মানে বলবার অবস্থা নয়। কানে একটি কথা বাজছিল 'এবাড়ীতে আর রাখা হবে না'। বললাম—তা'হলে কোথায় থাকবেন?

বিভা অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বললে—যেখানে ইচ্ছা। ছোট্‌দাদুও ত বলেছে—বাড়ী ঢুকলে জুতো পেটা করবো হারামজাদিকে—

বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে বোধ হয়।

পরদিন সকালে কিন্তু আর কিছু চাপাচাপি থাকল না ; তুষার-মামী নাকি নিজেই চলে গেছেন রাত্রে। শুধু তাই নয়, দিদিমার বাক্স থেকে নাকি দশটা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছেন ; এখন যার যা ইচ্ছে হ'ল তাই বলতে লাগলো। বিন্দু ঝি পর্য্যন্ত বললে ওমার পেটে পেটে অনেক 'ছেনালি' গো—আমি বলি উনি ঘরের বৌ, আমি ঝি মনিস্যি—বললে ভাল দেখাবে না ; এই ক'দিন আগে রেতের বেলা দেখি কাপড়ের তলায় কলাপাতে মুড়ে কি নিয়ে হন্ হন্ করে চলেছে পুকুর ঘাটের পানে। আমি বলি—হেঁগা বৌদিদি, রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছো? দেখে যেন ভুত দেখলে এমন চম্‌কানি, বল্লে 'এই ছেলেদের এঁটোপাত কখানা নিয়ে একেবারে ঘাটে যাচ্ছি গা ধুতে। রান্নার পর গা না ধুলে ঘুম আসে না, যা গরম।" আমি বলি হবেও বা, কিন্তু কেমন বাবু সন্দ হ'ল। চোখে না দেখলে তো কিছু বলতে নেই মা। কে না কি পাড়ার একজন গিন্নি একদিন ভাঙা শিব মন্দিরের ওখানে লুকিয়ে দুজন মানুষকে কথা বলতে শুনেছিলেন—এমনি আরো সব ছাই পাঁশ কথা। এর পর একবাক্যে স্থির হয়ে গেল, ওরকম খারাপ স্ত্রীলোক গ্রামে আর নেই! বিদেয় হয়েছে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। না হলে নাকি গাঁয়ের সর্ব্বনাশ হ'ত।

কিন্তু গ্রাম থেকে বিদেয় তিনি হ'ননি ; একটু বেলা হ'লেই সে কথা জানা গেল।

'চৌধুরীদের চণ্ডিমণ্ডপ' বলে একটা ভাঙা মতন দালান ছিল মামার বাড়ীর কাছে ; তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল তুষার-মামীকে। কড়ির গায়ে ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার যে বড় আংটা লাগান ছিল তাতেই দড়ির ফাঁস লাগিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলছেন। সে কি বীভৎস! অত সুন্দর মুখ ওরকম হয়ে যায়—এ শুধু দেখেছি বলেই বিশ্বাস করতে পারি।

তারপর যেন একটা ঝড় বয়ে গেল মামার বাড়ীর ওপর দিয়ে। পুলিশ এল, দারোগা এল। পাড়ার লোক ভেঙে পড়লো। মামারা ছুটোছুটি করতে লাগলেন। মাকে সকলে বারণ করেছিল দেখতে, তবু নাকি ছাত থেকে দেখেছিলেন। ভয়ে কেবল কেবল মূর্চ্ছা হ'তে লাগলো মার ; ভোর রাত্রে শুনলাম, আমার নাকি একটি ভাই হয়েছিল মরা। মার শরীরও খুব খারাপ। অনেক ডাক্তার আসতে লাগলো। এর জন্তও সবাই তুষার-মামীকে দায়ী করতে লাগলো। আমারও তখন সে কথা মনে হয়েছিল ; ভাইটিকে দেখতে পেলাম না বলে এত কষ্ট হয়েছিল যে তুষার-মামীকে হারানোর দুঃখ কমে গেল। রাগ হলো তাঁর ওপর, তিনি এই সব কাণ্ড না করলে তো মার কিছু হ'তনা? বড় হয়ে বুঝেছি, যার যা নিয়তি তা' ঘটবেই, যা'র কপাল মন্দ সেই নিমিত্তের ভাগী হয় মাত্র।

তুষার-মামী এমনি দুর্ভাগিনী ছিলেন, যে মরেও কারুর করুণা পেলেন না।

এর পরই আমরা বাবার সঙ্গে মীরাটে চলে এলাম। মার অসুখ শুনেই ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন—আসবার সময় দিদিমা কাঁদতে লাগলেন; বললেন "বাবা, বড় মুখ করে রেখে গিয়েছিলে—আমার কপাল মন্দ তাই এমন হ'ল।" বাবা অবশ্য মুখে বললেন—আপনি কি করবেন যা' ভাগ্যে ছিল হবে তো? কিন্তু আর কখনো পাঠান নি আমাদের মামার বাড়ীর দেশে, যা' গিয়েছি কলকাতায় ছোটমামার বাড়ী।

মা একদিন তুষার-মামীর কাহিনী বলেছিলেন বাবাকে, বাবা কিন্তু শুনে বললেন—তোমাদের নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে, মন্দ হ'লে গলায় দড়ি দেবেন কেন? চলে গেলেও তো পারতেন?

মা বললেন—হয়তো সাহস হয়নি, নয়তো যার ভরসায় যাবে সে উপযুক্ত নয়।

বাবা বললেন—তা'কে ভাল হবার সুযোগ না দিয়ে লাঞ্ছনা করে সকলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে! তুমি সৎসাহস দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারলে বুঝতুম।

মা হাসলেন; বললেন—দেখনি তাই বলছো। তাহলে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই গলায় দড়ি দিতে হ'তো।

বাবা কি উত্তর দিলেন শুনিনি; বললেন—মীরা একগ্লাস জল আনো।

এসে আর সে কথা শুনলাম না।

রহস্যময়ী তুষার-মামী আমার কাছে চিররহস্যই রয়ে গেলেন। কত দিন চলে গেল, আজো মামার বাড়ীর সেই রান্নাঘরের রোয়াকটা স্মরণ ক'রলেই মনে হয়—তুষার-মামী মুখ বাড়িয়ে হেসে বলছেন—কি মীরা দুধ খাবে? মুখ ধোওয়া হয়েছে?

ধব্‌ধবে মুখ—আগুন তাতে রাঙা হয়ে উঠেছে, আর সেই ফটো দেওয়া লকেটটা সকালের রোদ প'ড়ে ঝকঝক করছে। সেই প্রতিমার মত মুখ, সে কি কলঙ্কিনীর?

মৃত্যুমলিন বীভৎস ভয়ানক মুখ সে যেন আর কারোর—আমার তুষার-মামীর নয়।

কিছুদিন পরে দিদিমার চিঠিতে জানলাম, রাজীব মামা নাকি নিজে ইচ্ছে করে পুলিশে ধরা দিয়েছেন, মরুকগে যাক্‌, কে তাঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামায়?

তুষার-মামীই যখন নেই, তখন আর—?

চক্রাবর্ত্ত

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভ্রমণ

(পুরীচক্র, পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বোর্ডিংএ ফিরিয়া দেখি, সমস্ত গায়ে লবণ জমিয়া গিয়াছে, কাজেই ফিরিয়া মিঠা জলে গা ধুইয়া ফেলিতে হইল। সমুদ্র-জল যাঁহারা আস্বাদ করেন নাই, তাঁহাদের জানিবার জন্য এইখানে লেখা দরকার যে সমুদ্রের জল তীব্র লবণাক্ত, মুখে লইয়া কুলকুচা করিলে লবণের ঝাঁজ জিহ্বায় বেশ অনুভূত হয়। লবণ তৈলাক্ত পদার্থকে নষ্ট করে, নিমন্ত্রণ শেষে এজন্য অনেকেই পাতের লবণটুকু হাতে রগড়াইয়া হাতের ঘি-তৈল উঠাইয়া ফেলেন। সমুদ্র-স্নানে গায়ের চামড়া একেবারে খড়খড়ে সাফ হইয়া যায়। খোসপাঁচড়া যাঁহাদের আছে, দুচারদিন সমুদ্রস্নানেই তাঁহাদের খোস পাঁচড়া সারিয়া যায়।

বোর্ডিংএ আহার ও বাসস্থানের জন্য জনপ্রতি দৈনিক দেয় ২৲। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর হার, প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু পুরী সহরে এত ভাল ভাল ধর্ম্মশালা আছে যে, ধর্ম্মশালায় উঠিয়া জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাইয়া অতি অল্প খরচে তীর্থবাস করা চলে। পুরী দেখিয়া ভুবনেশ্বর যাইয়া আমরা শ্রীযুক্ত হাজারীমলের ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম। তথায়ই শুনিয়াছিলাম যে পুরীতেও হাজারীমলের ধর্ম্মশালা আছে। ভুবনেশ্বরে হাজারীমলের ধর্ম্মশালা প্রাসাদোপম অট্টালিকা, নবনির্ম্মিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পুরীর ধর্ম্মশালা নাকি ভুবনেশ্বরের ধর্ম্মশালা অপেক্ষাও ভাল। ধর্ম্মশালায় উঠিলেই থাইসিস্‌ লাফাইয়া ঘাড়ে পড়িবে, এই আশঙ্কা যাঁহাদের না আছে, তাঁহাদের ধর্ম্মশালায় উঠাই কর্ত্তব্য।

বোর্ডিংওয়ালা দ্বিতীয় শ্রেণীতে খাওয়াইল কিন্তু বেশ,—অনেকগুলি পদ এবং প্রচুর মৎস্য সহযোগে। ইহার পরে

দীর্ঘ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মৎস্যাহার এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। পাণ্ডার ছড়িদারকে সাড়ে বারটায় আসিতে বলিয়াছিলাম, আসিল প্রায় পৌনে ছুটায়। ছড়িদার দিন-চুক্তি একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আনিয়াছিল, যতদূর মনে পড়িতেছে দেড় টাকায়। এই গাড়ীতেই পুরীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটায় ফিরি।

প্রথমেই গেলাম বীরেন রায়ের মিউজিয়মে। বীরেনবাবু বোর্ডিংএ আসিয়া পূর্ব্বেই আলাপ-পরিচয় করিয়া গিয়াছিলেন। ভদ্রলোক ঠিকাদারী ব্যবসায় করেন এবং সেই কার্য্যে উড়িষ্যা দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছেন। প্রত্নপ্রীতিবশতঃ ভগ্ন প্রাচীন কীর্ত্তি এবং হাতের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সংগ্রহই এখন Roy's Museum হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিউজিয়মটি ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং হইতে অল্পই দূরে, আমরা যাইতেই বীরেনবাবু আমাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

এক জন ব্যক্তিমাত্রের চেষ্টায় যে কতখানি গড়িয়া উঠিতে পারে, রায়ের চিত্রশালা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রায়ের চিত্রশালায় অভগ্ন এবং উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তির সংখ্যা অল্প, ভগ্ন মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির ভগ্নাংশের সংগ্রহই প্রচুর। তালপাতায় লেখা প্রাচীন উড়িয়া-পুঁথি বিস্তর দেখিলাম, কতকগুলি বাঙ্গালা পুঁথিও আছে। সময়ের অল্পতা বশতঃ বাঙ্গালা পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিলাম না। অর্থাভাবে বীরেনবাবু উপযুক্ত পণ্ডিত দ্বারা পুঁথিগুলির তালিকা করাইতে পারিতেছেন না, পুঁথিগুলি বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে। নবগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশে যদি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠাকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়, তবে রায়-চিত্রশালাকে কেন্দ্র করিয়া উহা গঠিত হইলে বীরেন রায়ের জীবনব্যাপী পরিশ্রম সার্থক হয়। আমি উড়িষ্যার মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি সবিনয়ে এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি।

বান্ধবী বীরেনবাবুর গৃহিণীর সহিত আলাপে মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গাড়ীতে চড়িলাম এবং জগন্নাথের মন্দিরদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটা, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—মোটেই কবিত্বের সময় নহে। তথাপি হঠাৎ মনে পড়িয়া গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল যে এই দরজায়ই না আমাদের বাঙ্গালার প্রেমের অবতারটি প্রাণের আবেগে সঙ্গীগণকে পিছনে ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ?—

আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর রায়॥

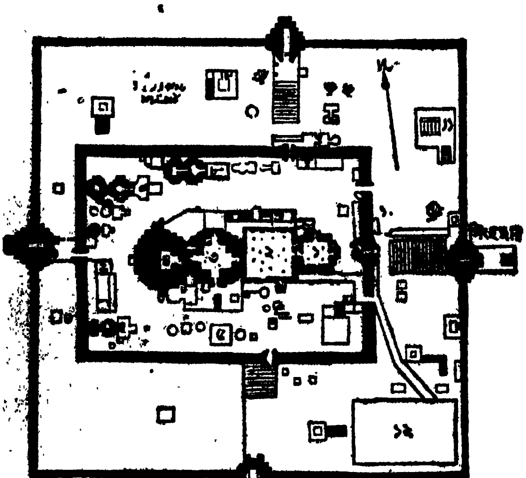


মার্কণ্ডেয় সরোবর

স্থির হই বসিলেন প্রভু সবা লয়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে॥
মুকুন্দ বলেন, তবে আগে তুমি যায়।
ভাল বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মত্ত সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেমজলে॥

ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেইকালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।



জগন্নাথের মন্দিরের স্থিতির নক্সা—(৺মনোমোহন গাঙ্গুলীর পুস্তক প্রদত্ত নক্সা হইতে—শ্রীযুত গুরুদাস সরকারের 'মন্দিরের কথা' পুস্তকে প্রদত্ত)

প্রিয়তমের সহিত মিলনক্ষণে অন্যের উপস্থিতি গৌরচন্দ্রের ভাল লাগিল না, তাই সঙ্গীগণের অনুমতি লইয়া মত্ত সিংহ-গতিতে তিনি একা জগন্নাথ দর্শনে অগ্রসর হইলেন। জগন্নাথ দেখিয়া ভাবাবেগে হুঙ্কার করিয়া প্রিয়তমকে বক্ষে ধরিবার জন্য তিনি লম্ফ প্রদান করিলেন। জগন্নাথের প্রতিহারীগণ বেত লইয়া প্রভুকে মারিতে উঠিল। ভাগ্যক্রমে রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম এই সময় জগন্নাথের মন্দিরে ছিলেন। চৈতন্য এই সময় ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। নিজের গাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সার্ব্বভৌম চৈতন্যের দেহকে রক্ষা করিলেন, প্রতিহারীগণ রাজপণ্ডিতকে দেখিয়া, তাঁহার নিষেধ শুনিয়া, দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু প্রভুর মূর্চ্ছা তো আর ভাঙ্গে না! সার্ব্বভৌম তখন স্থির করিলেন, নিজের বাড়ীতে এই প্রেমপাগল গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসীকে লইয়া যাইবেন :—

আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বলে ভাই পরিহারিগণ।
সবে তুলি লহ এই পুরুষ রতন॥
পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥

পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণ যেন অন্ন যায় লয়া॥
এই মত প্রভুরে আনেন লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি॥
সিংহদ্বারে নমস্কারি সর্ব্বভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥

যেই সিংহদ্বার দিয়া ভাবাবেগে অচৈতন্য চৈতন্যের দেহ বহিয়া প্রতিহারীগণ সার্ব্বভৌম গৃহে লইয়া গিয়াছিল, সেই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অভিনীত এই অতিলৌকিক অভিনয় চিত্র মানসনয়নে প্রত্যক্ষবৎ ভাসিয়া উঠিল। সিংহদ্বারে প্রকাণ্ড এক প্রস্তরস্তম্ভ, 'অরুণস্তম্ভ' নামে খ্যাত। দ্বার হইতে মন্দির প্রাঙ্গণ অনেকটা উঁচু—অনেকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছিতে হয়। উড়িষ্যায় সমস্তগুলি মন্দিরের সম্মুখেই নাটমন্দির থাকে। নাটমন্দিরে প্রবেশের মুখেই প্রস্তরে একটি ক্ষয়িত স্থান দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল—চৈতন্য মহাপ্রভু এইস্থানে দাঁড়াইয়া কনুইতে ভর দিয়া জগন্নাথ দেখিতেন। ভাবাবেগ অসম্বরণীয় হয় দেখিয়া তিনি ইহার বেশী আর অগ্রসর হইতেন না। দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ কনুইর ঘর্ষণে ঐ স্থান ক্ষয়িয়া গিয়াছিল, সেই চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। ঐতিহাসিকের

মন সর্ব্বদা সন্দেহপরায়ণ, তথাপি ঐ স্থানে মস্তক অবনত করিলাম। তখন জগন্নাথ দেখিবার সময় নহে, দূর হইতে যথাসম্ভব দর্শন করিয়া মন্দির দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দির দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড মন্দির, চূড়ার দিকে চাহিতে ঘাড় পৃষ্ঠদেশে যাইয়া সংলগ্ন হয়। কিন্তু ভিখারীদের জ্বালায় বড় অস্থির করিয়া তুলিল। আর দেবতার নাম করিয়া পয়সা ধরিবার ফাঁদ এখানে সেখানে সর্ব্বত্র পাতা। আমরা ছেলেবেলায় খালে মাছ ধরিবার জন্য চাই পাতিতাম; দেবমন্দিরের আশেপাশে অমনি যেন চাই পাতিয়া রাখিয়াছে। এক কাক এই কুণ্ডে পড়িয়া মরিয়া স্বর্গে গিয়াছিল, অতএব দাও এখানে এক পয়সা—ওখানে সুভদ্রা অমুক করিয়াছিল, অতএব—ইত্যাদি। পাণ্ডারা যে যার চাইএর নিকট দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। আমরা কোথাও বড় বিশেষ ধরা দিলাম না দেখিয়া তাহারা আমাদিগকে ইংরেজীপড়া নাস্তিক ইত্যাদি বিশেষণ প্রদান করিতে লাগিল। ইংরেজী জ্ঞানে সত্যই ইহাদের ব্যবসায়ের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে, কাজেই ইংরেজী বিদ্যার উপর ইহাদের ক্রোধ স্বাভাবিক।



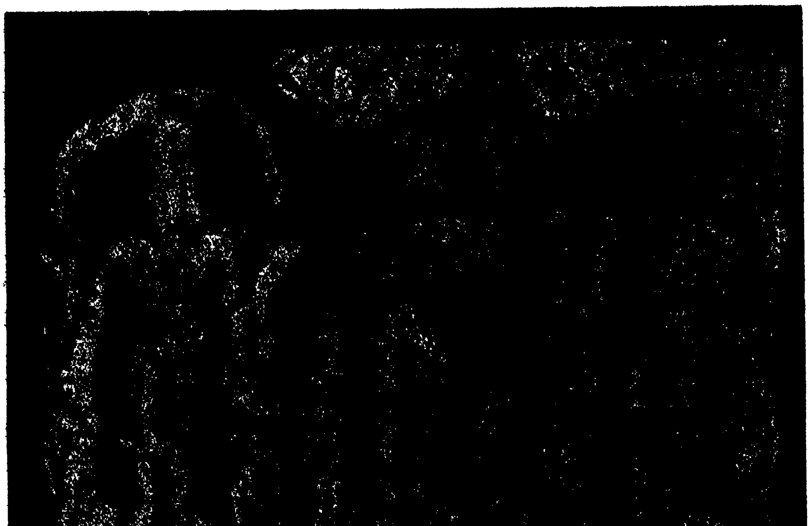
জগন্নাথের মন্দির, জগমোহন, বিমান ও ভোগমন্দির (প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে অরুণ স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)

(৺মনোমোহন গাঙ্গুলীর Orissa and her remains হইতে)

মন্দির গাত্রে নানা স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তি বসান, উহাদের কয়েকটি ভাস্কর্য্য গৌরবে গরিষ্ঠ। কিন্তু এক শ্রেণীর প্রস্তর-মূর্ত্তির উপদ্রবে যুবতী ভগিনী, কন্যা বা পুত্রবধূ লইয়া জগন্নাথের মন্দির পরিক্রমা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। মন্দির গাত্রে অসংখ্য বীভৎস মিথুন-মূর্ত্তি, এত বীভৎস যে উহাদের দিকে চাহিতে চক্ষুর বিবমিষা উপস্থিত হয়। মনে পড়ে, "পুরাতন প্রসঙ্গে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়, এই মিথুন-মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মণীষীগণের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক লেখায়ও দেবমন্দিরগাত্রে মিথুন মূর্ত্তির অস্তিত্ব-ব্যাখ্যা পড়িয়াছি বলিয়া যেন মনে পড়িতেছে। শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা নাকি এই যে, বজ্রপতন নিবারণের জন্য দেবমন্দির গাত্রে মিথুন-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। কারণ যাহাই হউক, এই মূর্ত্তিগুলি লোকলোচনের অদৃশ্য করিবার জন্য আন্দোলনের সময় আসিয়াছে। কলা-কুশলতা, ভাবসমৃদ্ধতা অনেক সময় অশ্লীলতাকে সহনীয় করিয়া তোলে। কলিকাতায় নাহারদের বাড়ীতে বৌদ্ধ-দেবতা হেবজ্রের একখানি যুগল মূর্ত্তি আছে, কলা-গৌরবে উহার অশ্লীলতা ডুবিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ মন্দির গাত্রের অশ্লীলতা স্থূল, বর্ব্বর, পীড়াদায়ক—উহার মধ্যে সমর্থনযোগ্য কিছুই নাই। আমি কণারকের মন্দির এই যাত্রায় দেখিতে পারি নাই। উহাতে নাকি অশ্লীল মূর্ত্তির পরিমাণ জগন্নাথের মন্দিরের অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশীই হইবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতা আপন গৌরবে শুদ্ধ—অন্তরাত্মার মত, বাহিরে মন্দির গাত্রে পৃথিবী তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও বীভৎসতা লইয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ সমস্ত চিত্ত-চাঞ্চল্যকারী দৃশ্যাবলি দেখিয়াও যাহার চিত্ত চঞ্চল না হইবে,

তাহারই মন্দিরের অভ্যন্তরের দেবদর্শনে অধিকার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু জীবনের গোপন বীভৎসতা তো আমরা রাস্তায় ঘাটে দেখাইয়া বেড়াই না, মন্দির গাত্রেই বা তাহা দেখাইতে যাইব কেন ?

পুনঃ পুনঃ সংস্কারে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীনত্ব-চিহ্ন লুপ্তপ্রায়—এমন কি প্রাচীন মিথুন-মূর্ত্তি খসিয়া পড়িলে তাহার স্থানে নূতন মিথুন-মূর্ত্তি দুচারখানি লাগান হইয়াছে দেখিলাম। চতুষ্কোণ মন্দির-প্রাঙ্গণের আয়তন ২২২ গজ ×২৯৩ গজ এবং প্রান্তে উহা উচ্চ প্রকার দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকার স্থানে স্থানে প্রায় ১৬ হাত উচ্চ—প্রায় দুর্গ-প্রাকারেরই মত। মির্জ্জা নাথন প্রণীত বাহার-ই-স্তায় নামক পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসর, পুরুষোত্তম দেব যখন খুরদা ও পুরীর রাজা, তখন জাহাঙ্গীরের সেনাপতি রাঠোর বীর কেশোদাস মারু দেবদর্শনছলে জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া এই প্রাকারবেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গণকে দুর্গবৎই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং পুরুষোত্তম দেবের বিপুল বাহিনীকে বিমুখ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধকাহিনী পাঠকগণের কৌতূহলজনক হইবে অনুমান করিয়া নিম্নে ঐ বিবরণের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।



বলদেব—একানংশা কৃষ্ণ—— লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একানংশা মূর্ত্তি

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরম্ভে বাঙ্গালায় সুবাদার ছিলেন মানসিংহ। মানসিংহকে সরাইয়া জাহাঙ্গীর স্বীয় ধাত্রীপুত্র কুতবুদ্দিনকে বাঙ্গালায় সুবাদার করিয়া পাঠান। শের আফগানের হস্তে কুতবুদ্দিন নিহত হইলে বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বাঙ্গালায় সুবাদাররূপে প্রেরিত হন। কিন্তু বাঙ্গালার জলবায়ুর গুণে তিনিও শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালায় মোগল-শাসন লুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁকে বাঙ্গালায় সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইসলাম খাঁ রাজমহল হইয়া বাঙ্গালা জয়ে অগ্রসর হইলেন। উড়িষ্যার কর্ম্মচারীগণ জাহাঙ্গীর কুলির মৃত্যুর পরে উড়িষ্যা ছাড়িয়া রাজমহলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারাও ফিরিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করিল। উড়িষ্যার কর্ম্মচারীগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কটক পর্য্যন্ত পৌছিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই দলের অন্যতম সেনাপতি ছিল কেশোদাস মারু। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই মোগল সেনাপতিগণ নিরাপদ আশ্রয় কটক ছাড়িয়া নড়িতে নারাজ ছিলেন। কেশোদাস মারু কিন্তু স্থির করিলেন, তিনি অলস মোগল-সেনাপতিগণের সাহায্য ছাড়া একাই পুরী জয় করিবেন। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণসহ জগন্নাথ দর্শনছলে পুরী যাত্রা করিলেন এবং দেবদর্শন সমাপ্ত করিয়া পুরীর মন্দির অধিকার করিয়া বসিলেন। পুরীর মন্দিরকে দুর্গে পরিণত করিয়া তিনি আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। দুই তিন কোটি টাকা মূল্যের দেবসম্পত্তি তিনি আত্মসাৎ করিলেন এবং আরও লুক্কায়িত অর্থাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য পাণ্ডাদিগকে ধরিয়া তিনি বেত লাগাইতে আরম্ভ করিলেন।

খুরদার রাজা পুরুষোত্তম দেবের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি এই দুঃসাহস ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য কেশোদাস মারুকে ভালরকম শিক্ষা দিবার জন্য দশ হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য রথ ও তিন চারি লক্ষ পদাতিক লইয়া অগ্রসর হইলেন। রথে রথে তিনি পুরীর মন্দির ঘিরিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, বর্ষার জন্য মোগল-সেনাপতিগণ কেহই কেশোদাসকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না। কাজেই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ধর্ম্মস্থানের অপমানকারী এই উদ্ধত রাজপুতকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবার এই চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ রাঠোরবীরের বুদ্ধিকৌশলে পুরুষোত্তমের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কেশোদাস বাঁশের গায়ে পুরাতন নেকড়া ইত্যাদি জড়াইয়া তাহাতে তৈল ও ঘি ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন এবং সেই অগ্নি-পিণ্ডগুলি পুরুষোত্তমের রথগুলিতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। রথ ও রথী উভয়ই বিনষ্ট হইল। অবশেষে পুরুষোত্তম কেশোদাসের সহিত অপমানজনক সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

বাহিরের প্রাকারের পরে আবার ভিতরের এক ক্ষুদ্রতর প্রাকারের অভ্যন্তরে মূলমন্দির অবস্থিত, সঙ্গীয় নক্সা পরলোকগত মনোমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত Orissa and Her Remains নামক প্রামাণ্য পুস্তকে প্রদত্ত নক্সা অনুসারে প্রস্তুত। ইহা হইতে মূল মন্দির ও তাহার চারিদিকের ক্ষুদ্রতর মন্দিরসমূহের অবস্থিতি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মন্দিরে যখন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল উহা দক্ষিণ-দ্বারী। মনোমোহনবাবু প্রদত্ত বর্ণনা পড়িয়া বুঝিতেছি উহা পূর্ব্বদ্বারী। অপরিচিত স্থানে কত সহজে দিক্‌ভুল হয়, এই ব্যাপার তাহারই দৃষ্টান্তস্থল।

নক্সায় দেখা যাইবে, উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের মত জগন্নাথের মন্দিরও চারিভাগে বিভক্ত। মূল মন্দির, যাহার অভ্যন্তরে দেবমূর্ত্তি বিরাজ করেন, তাহার নাম বিমান। আমলকশীর্ষ এই মন্দির আকাশ পানে বহু দূর উঠিয়া গিয়াছে মনোমোহন বাবু যন্ত্র সাহায্যে মাপিয়াছিলেন, উহার উচ্চতা ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। দিল্লীর কুতবমীনার ২৪২ ফুট উচ্চ, কলিকাতার অক্টারলনী মনুমেণ্ট ১৬৫ ফিট উচ্চ। ইহা হইতেই জগন্নাথের মন্দিরের আপেক্ষিক উচ্চতা সম্বন্ধে ধারণা হইবে। নক্সায় বিমানের ভিত্তি ৪নং দ্বারা চিহ্নিত।

বিমানের পূর্ব্বে জগমোহন বা দর্শনগৃহ অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেবদর্শন করেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে বিমানের বহির্দ্দেশ দেবদেবী মূর্ত্তিতে আবৃত, অশ্লীল মিথুনমূর্ত্তিগুলি মাত্র জগমোহনের বহির্দ্দেশেই দেখা যায়। নক্সায় জগমোহনের ভিত্তিচিত্র ৩নং দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে।

জগমোহনের পূর্ব্বে নাটমন্দির এবং তাহারও পূর্ব্বে ভোগ-মণ্ডপ, যথাক্রমে ২নং ও ১নং দ্বারা চিহ্নিত। ভোগমণ্ডপের বহির্দ্দেশে খাঁজে খাঁজে বহুবিধ স্ত্রীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

মূলমন্দিরের চারিদিকে অবস্থিত এবং নক্সায় প্রদর্শিত মন্দির ও স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মনোমোহনবাবুর বিবরণ অনুসরণে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

৫নং। মুক্তিমণ্ডপ। জগমোহনের দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তন ৩৮ × ৩৮ ফিট। ১৬টি প্রস্তরস্তম্ভের উপর স্থাপিত চূড়াসমন্বিত খোলা ঘর। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই প্রকোষ্ঠে বসিয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা করেন।

৬নং। বিমলা দেবীর মন্দির। প্রাঙ্গণের দক্ষিণপশ্চিম কোণে অবস্থিত। বিমলা দেবী শক্তিমূর্ত্তি, তাঁহার মন্দির তান্ত্রিকগণের মিলন স্থল। তান্ত্রিকগণের মতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রীই বিমলা দেবী, জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব মাত্র। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে মাত্র ছাগবলি সহকারে বিমলা দেবীর পূজা হয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৎসরে এই একদিনই মাত্র ছাগবলি প্রদত্ত হয়।

৭নং। লক্ষ্মীর মন্দির। এই প্রাচীন মন্দিরটি বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ-সমন্বিত ক্ষুদ্রাকৃতি পূর্ণাঙ্গ মন্দির। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মাত্র এই মন্দিরেই প্রকৃত প্রাচীন ভাস্কর্য্য নিদর্শনসমূহ অবিকৃত আছে।

৮নং। ধর্ম্মরাজের মন্দির। অভ্যন্তরস্থ মূলমূর্ত্তির নাম ধর্ম্মনারায়ণ বা সূর্য্যনারায়ণ। এই মন্দিরে একটি ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তিও রক্ষিত আছে। ধর্ম্মনারায়ণ প্রকৃতপক্ষে সপ্তাশ্ব-সমন্বিত সূর্য্যমূর্ত্তি।

৯নং। পাতালেশ্বর মন্দির। লিঙ্গমূর্ত্তি, অনেকখানি নীচে নামিয়া মূর্ত্তির দর্শন মিলে।

১০নং। আনন্দ বাজার। এই স্থানে প্রসাদ বিক্রয় হয়।

১১নং। স্নান বেদী। স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তিকে এই বেদীর উপরে আনিয়া স্নান করান হয়।

১২নং পাকঘর। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এই স্থানে পাক হয়।

১৩নং বৈকুণ্ঠ। ধনশালী ভক্তগণকে পাণ্ডাগণ এই দ্বিতল দালানে বাস করিতে দেয়।

মন্দির প্রাঙ্গণে ছোট ছোট আরও কয়েকটি মন্দির আছে, বাহুল্যভয়ে উহাদের আর উল্লেখ করিলাম না। জগন্নাথের মন্দির উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গের নির্ম্মিত। নির্ম্মাণ বৎসর ঠিক জানা যায় না, তবে উহা খ্রীষ্টাব্দের ১১০০ সনের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে হইবে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাব কি পরিমাণ আছে, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্ত্তি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের প্রতীক কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিতে চাই না। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জগন্নাথমন্দিরে আমি বৌদ্ধগন্ধী কিছুই লক্ষ্য করি নাই। ধর্ম্মনারায়ণের মন্দিরে রক্ষিত ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি পূজ্য মূল-মূর্ত্তি নহে, ভিন্ন স্থান হইতে আনীত বলিয়াই মনে হয়। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৯৩৬ সন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) মনস্বী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দেখাইয়াছেন যে একানংশা নাম্নী দেবীর পূজা ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ইনি আদ্যাশক্তি এবং যশোদা গর্ভজাতা যোগমায়া দেবীর সহিত অভিন্না এবং সেই হেতুতে কৃষ্ণের ভগিনী—বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের সহিত ইঁহার পূজা অতি প্রাচীন-কাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎ-সংহিতায় কৃষ্ণ-বলদেবের মধ্যে একানংশা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে হইবে বলিয়া বিধান দেওয়া আছে। ইনি কটিসংস্থিতবামকরা, দক্ষিণ হস্তে ইনি পদ্ম ধারণ করেন।

একানংশা কার্য্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্মধ্যে।
কটিসংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদ্বহতী॥

বৃহৎ-সংহিতা, ৫৮ অধ্যায়, ৩৭ শ্লোক

ঘোষ মহাশয়ের মতে এই ত্রিমূর্ত্তিতে একানংশাই মূল দেবতা, কৃষ্ণ-বলরাম তাঁহার আবরণ দেবতা মাত্র। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার মধ্যে সুভদ্রা যে শক্তিমূর্ত্তি, স্কন্দপুরাণে দেবীসূক্ত অনুসারে তাঁহার পূজার বিধান দেখিয়াই তাহা বোধগম্য হয়। কাজেই একানংশা ও সুভদ্রা অভিন্ন এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। কালক্রমে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে জগন্নাথের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণ্ডারা অদ্যাপি বলিয়া থাকে যে তান্ত্রিকগণের উপাস্য বিমলা দেবীই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ৫৮ অধ্যায়ে বিষ্ণু বিধান দিয়াছেন, যে এই সুরা-মাংস বলিপ্রিয়া দেবী নবমী তিথিতে সপশুক্রিয়া পূজ্যা। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা দেবীর অদ্যাপি পশুবলি সহকারে পূজা হয়। এই বিমলা দেবীর মূর্ত্তি আমি ভাল করিয়া দেখিয়া আসি নাই—কাজেই বর্ণনা দিতে পারিলাম না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এই বিমলা পূজাই একানংশা পূজার অবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামেও তথায় অদ্যাপি সুপ্রাচীন জগন্নাথ-একানংশা-বলরামের পূজাই হইতেছে। ভৈরবী চক্রে যে হিসাবে জাতিবিচার নিষেধ, "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ"—বিমলা দেবীর চক্রস্থিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সেই হিসাবেই জাতিবিচার নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। জগন্নাথ-মন্দির হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা হইবে। দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখাইবে পাণ্ডার সহিত এই বন্দোবস্ত ছিল। জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর দিয়া ঘুরিয়া গাড়ী মার্কণ্ডেয়-সরোবরে চলিল। মার্কণ্ডেয়-সরোবরের পাড়ে গাড়ী হইতে নামিয়া সরোবরের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলাম! প্রকাণ্ড সরোবর, চারিটি পাড়ই জল পর্য্যন্ত পাথরে বাঁধান। পাথর-গুলিতে সিঁড়ি কাটা অর্থাৎ চারি পাড়েই উপর হইতে জল পর্য্যন্ত থাকে থাকে কেবলি ধাপ নামিয়া গিয়াছে। সরোবরের পাড়ে দাঁড়াইয়া অভিভূত আচ্ছন্নের মত সমস্ত অনুভূতি ব্যাপিয়া কেবলি এই সত্য জাগিতে লাগিল যে এই সরোবর আমার পূর্ব্বপরিচিত! আমি বহুবার স্বপ্নে এই সরোবর বা অনুরূপ সরোবর দেখিয়াছি! আমি ইহার জলে স্নান করিয়াছি, ইহার ঘাটে বসিয়া কাপড় কাচিয়াছি, ইহার ঘাটে স্নানকোলাহলরত বহু নরনারীর মেলা দেখিতে দেখিতে যেন পাখীর মত উড়িতে উড়িতে ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছি। অতিলৌকিকে অনর্থক অবিশ্বাস না

থাকিলেও অতিসহজ বিশ্বাসও আমার নাই। কাজেই পূর্ব্বজন্মে উড়িষ্যাদেশবাসী ছিলাম এবং মার্কণ্ডেয় সরোবর তীরে বাস করিতাম, এই সোজা পথ ধরিয়া এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা আমি করিতে চাহি না। কিন্তু এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাই বা কি, তাহাও তো খুঁজিয়া পাই না! মানুষের ইন্দ্রিয় এত সহজে প্রতারিত হয় যে নিজের অনুভূতি সম্বন্ধেও ঠিক সত্য কথাটাই বলিতে পারিতেছি কিনা সেই বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া সহজ নহে। যাহা হউক, অনুরূপ আরও দুই একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটিয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিব—মনোবৈজ্ঞানিকের গবেষণার হয়ত কিছু বস্তু জুটিতে পারে।

১৯১১ সনের ঘটনা, তখন এম-এ ক্লাশে পড়ি এবং ঢাকা কলেজের দক্ষিণে ক্ষুদ্র একটি বাসা করিয়া আমরা চারিটি ছাত্র থাকি। সেই সময় বেচারামের দেউড়ী নামক রাস্তায় ঢাকা কলেজের একটি মেস ছিল, আমি পূর্ব্বে কোনদিন সেই মেসে যাই নাই। এক বন্ধুর প্রয়োজনে তাহার সহিত সেই মেসে যাই। বাড়ীটি মুসলমান পাড়ায়, বাড়ীর দরজায় পা দিয়াই আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! এই বাড়ী আমার পূর্ব্বপরিচিত, এই বাড়ীর প্রত্যেক আনাচ-কানাচ আমি চিনি! ঐদিকে পায়খানা। আমি দেখিতেছি না, তথাপি আমি জানি, বাড়ীতে ঢুকিয়াই চোখে পড়িবে, মোটা থাম-ওয়ালা এক বারাণ্ডা, বারাণ্ডার কার্ণিসে ফুলের টব—বারাণ্ডার থামগুলি ধরিয়া ছেলেমানুষের মত আমি যেন কত ঘুরিয়াছি। শৈশবে এই বাড়ী আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখিতাম—পরিণত বয়সে আর বড় দেখি নাই। আজ হঠাৎ এই বাড়ী দেখিয়া সমস্ত কথা স্মরণপথে সমুদিত হইল!

কয়েক বৎসর আগের ঘটনা, একদিন ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্বপ্ন দেখিলাম, গ্রামের বাড়ীতে যেন কে মারা গিয়াছে—আবছায়া আবছায়া—ভাল দেখা যায় না। সেই অর্দ্ধ অন্ধকারে যেন অতি চুপচাপ শ্রাদ্ধশান্তি হইতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই, ছায়াবাজির ছায়ার মত যেন সকলেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলা-ফিরা করিতেছে! সারাদিন এই স্বপ্নের কথা ভুলিয়াছিলাম। রাত প্রায় ৯॥টায় খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় গ্রামের বাড়ী হইতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি? এমন অসময়ে কেন? জিজ্ঞাসায় জানিলাম, আমার এক জ্যেঠতুত ভ্রাতার বসন্ত হইয়াছে—অবস্থা খারাপ, ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকাতে ডাক্তারের জন্য আসিয়াছে। অমনি প্রভাতের স্বপ্নের কথা স্মরণে পড়িল—অমনি বলিলাম—"জিতু, ডাক্তার লইয়া যাও, কিন্তু ধনদাদা বাঁচিবেন না। আজই প্রাতে আমি এই রকম স্বপ্ন দেখিয়াছি!" শুনিয়া জিতুর মুখ শুকাইয়া গেল। বড় বড় ডাক্তার দুজন লইয়া জিতু বাড়ী রওনা হইয়া গেল—তিন চারিদিন পরেই খবর পাইলাম, ধনদাদা মারা গিয়াছেন। আমাদের বাড়ীতে ধনদাদাই সকলের চেয়ে বেশী উপার্জ্জনশীল ছিলেন এবং বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যু প্রকৃতপক্ষেই গুরুতর শোচনীয় ব্যাপার হইয়াছে।

২৭শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৪৪ সন—ইংরেজী ১১ই জুলাই, ১৯৩৭। সপরিবারে খুড়তুত ভ্রাতা শ্রীমান জগদীশের বিবাহে চলিয়াছি। ঢাকা হইতে ট্রেণে ১১ মাইল নারায়ণগঞ্জ—তাহার পরেই নৌকা করিয়া শীতললক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী বাহিয়া খালে ঢুকিয়া ২।৩ মাইল দূরেই আমাদের গ্রাম। নারায়ণগঞ্জ নামিয়া বেশ বড় একখানা ঘাসী নৌকা করিলাম। লম্বা সূক্ষ্মাগ্র নৌকাগুলিকে এ অঞ্চলে ঘাসী নৌকা বলে। উহা দ্রুত চলে এবং ঢেউ কাটিয়া অনায়াসে পথ করিয়া লয়। সপরিবারে নৌকায় চড়িলাম। নৌকা ছাড়িবামাত্র উপলব্ধি করিলাম, এই দৃশ্য ও অবস্থা আমার পূর্ব্বপরিচিত। কি ঘটিবে, আমি আগেই জানি। এখন নদীতে বেশী ঢেউ দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু শীঘ্রই জোরে বাতাস এবং ঢেউ উঠিবে—নৌকা বিপন্ন হইবে—আরোহীরা ভয় পাইয়া কান্নাকাটি করিবে—অবশেষে নির্ব্বিঘ্নে নৌকা যাইয়া পরপারে পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী ঘটনা অবিকল আমার অনুভূতির অনুরূপ ঘটিয়াছিল। বিবাহান্তে বিদায় লইয়া যখন ঢাকা রওনা হইব, তখন আবার অনুভব করিলাম, এই বিদায় দৃশ্যও আমার পূর্ব্ব পরিচিত—এমন কি এখনই জগদীশের দিদিমা যে সেই দিনটা থাকিয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিবেন এবং আমরা থাকিব না, তাহাও আমি আগেই জানি। দিদিমা সত্যই অনুরোধ করিলেন এবং আমরা থাকিলাম না, চলিয়া আসিলাম।

আমার জীবনে প্রবলভাবে অনুভূত এই চারিটি ঘটনার

বিবরণ আমি যথাসম্ভব যথাযথভূত বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণের অনেকেই হয়ত নিজেদের জীবনে অনুভূত অনুরূপ ঘটনা স্মরণ করিতে পারিবেন। কারণ সেইদিন Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ পড়িয়া জানিতে পারিলাম—এই রকম অনুভূতি আমার একারই হয় না—অন্যেরও হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সনের August মাসের Modern Review পত্রিকায় Mr. P. Spratt নামক ভদ্রলোক Concluding Notes on Jail Psychology নামক প্রবন্ধে নিজের অনুরূপ অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"All this time also, a new symptom showed itself···On several occasions, sometimes very vividly, it flashed across my mind that I had foreseen the situation in which at that moment I found myself." PP. 154-155

বহুদিন পূর্ব্বে, যতদুর মনে পড়িতেছে সম্ভবতঃ রাজসাহীর মনোবৈজ্ঞানিক শশধর রায় মহাশয়ের এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম যে আমাদের মস্তিষ্ক যে মাথার দুই ধারে দুই ভাগে অবস্থিত, এই অনুভূতির কারণ তাহাই। কোন কোন সময় স্নায়বিক শক্তির জড়তা বশতঃ কোন ঘটনার অনুভূতি মস্তিষ্কের একধারে অনুভূত হইবার সূক্ষ্মতম সময়াংশের পরে অপরধারে অনুভূত হইয়া পূর্ব্বপরিচিতবৎ বোধ হয় অর্থাৎ এই অনুভূতি অলৌকিক কিছু নহে, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রসূত মাত্র। মানুষের শরীরটা এবং মস্তিষ্কও যে ডান ও বাঁ এই দুইভাগে বিভক্ত, শরীরতত্ত্ববিৎ মাত্রেই সেই কথা জানেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, শরীরের একধার ঘামিতেছে, অপর ধার শুষ্ক আছে। মাথার একধার বেদনায় টনটন্ করিতেছে, অপর ধার সুস্থ আছে। কাজেই এই ব্যাখ্যায় প্রায় সন্তুষ্ট হওয়া চলে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, দৃষ্টবৎ ভবিষ্যৎটাও মিলিয়া যায় যে! ধনদাদার মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ সত্যই ঘটিল। নৌকাযাত্রায় কি হইবে পূর্ব্বেই দেখিলাম—পরে আধ ঘণ্টা ধরিয়াই মিলাইয়া দেখিলাম। দিদিমা কি বলিবেন, পূর্ব্বেই জানিলাম। স্বপ্ন এইরূপে আমার জীবনে বহুবার ফলিয়া গিয়াছে—অনেকের জীবনেই ফলে। তবে কি ভবিষ্যৎটা একেবারে নির্দ্দিষ্ট? নচেৎ পূর্ব্বে স্বপ্নে তাহা দেখি কি করিয়া? ভবিষ্যৎটা নির্দ্দিষ্ট, এই মতবাদের উপর ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। আমরা কি শুধু বাঁধা পার্ট মাত্র চোখ-বাঁধা বলদের মত অভিনয় করিয়া যাইতেছি? অভিনয় যাহাতে না থামাইয়া দিই, তাহারই জন্য মায়ামোহের অন্ধকার দ্বারা চোখ আবৃত?—যাক্, অনধিকার চর্চ্চা অনেক হইয়াছে—আর করিলে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় লাঠি লইয়া তাড়া করিবেন।

পাণ্ডা বলিল, সামনের একখানি কোঠায় যমের মাসী, যমের পিসী আছেন। শুনিয়া ভারী খুসী হইলাম!—এ মহিলাদের সহিত পরিচয় করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে যমপুরীতে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। যমদূতের নির্য্যাতনের ফাঁকে ফাঁকে নাড়ুটা মোয়াটা প্রসাদ পাওয়া যাইতে পারে। ঢুকিয়া দেখি পাশাপাশি বসান কষ্টিপাথরের কয়েকখানি মূর্ত্তি, বেশ সুগঠিত—নিপুণ ভাস্করের রচনা। একটু চাহিয়াই চিনিতে পারিলাম, মূর্ত্তিগুলি ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃকা মূর্ত্তি। এই নিপুণগঠন মূর্ত্তিগুলির ছবি এই পর্য্যন্ত কেহ ছাপিয়াছেন বলিয়া জানি না। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বসুর দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। দেখা গেল—সম্ভ্রান্ত ঘরেই যমের পিসীমাসীগণ পড়িয়াছিলেন এবং মুরব্বীর জোরেই যমের এত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ!

(ক্রমশঃ)

শরীরের সহিত অপরাধের সম্বন্ধ

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

প্রবন্ধ

বাস্তবিক পক্ষে শারীরিক বিকলাঙ্গের সহিত অপরাধের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। বহু পুরাকাল হইতেই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষেও গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতির সহিত মানুষের মনের যে বিকৃতির সম্ভাবনা, সে কথা দৈনন্দিন প্রচলিত প্রবাদ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন আমরা বলি "কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া"। সত্যই যাহারা চোখে দেখে না, তাহাদের শ্রবণশক্তির প্রাখর্য্য হইয়া থাকে। অন্ধ-গায়কদের জীবন আলোচনা করিলে উক্ত বিষয়টী বিশদরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আরও একটী প্রবাদের কথা বলি—"কালো বামুন আর বেঁটে মুসলমান" এদের কাউকেই বিশ্বাস করিবে না। প্রবাদের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে, কেবল বলিতে চাই যে মানুষ আকৃতি হইতে তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে চায়। প্রঃ ফেরি বলেন যে আর সব ভুল হইতে পারে কিন্তু খুনী আসামীকে অন্যান্য অপরাধী হইতে খুব শীঘ্রই ধরা যাইতে পারে। কয়েকটী চিহ্নও তিনি নিশ্চিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, যদ্বারা খুনী আসামীকে সহজেই ধরা যাইতে পারে। চিহ্নগুলি এইরূপ—যেমন কপাল চাপা চোয়াল খুব বড়, দৃষ্টি ভীষণ, বিবর্ণ এবং পাত্‌লা ঠোঁট। (১) লম্বে াসোর মতে অপরাধীদের মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে। যখন কোন এক শ্রেণীর অপরাধী সংশোধনের পথে যায় তখন তাহার প্রকৃষ্ট চিহ্নগুলিও বিলুপ্ত হয়। এমন কি দেখা যায় যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মত হইয়া যায়, তাহাদের কোন চিহ্নই আর থাকে না। আমাদের দেশে অথবা বিদেশে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠরূপে বিদ্যমান্ থাকা সম্বন্ধে অনেকেই একমত। এইবার দেখা যাউক যে আকৃতি দেখিয়া চরিত্র নির্দ্ধারণের জন্য কোন্ কোন্ বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে—ফিজিঅগ্‌নমি বা মুখের ভাব দেখিয়া মানুষের মনের সন্ধান করার বিজ্ঞান, সিরোম্যান্সি বা পামিষ্ট্রি যদ্বারা মানুষের হস্তরেখা দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়, অনিকোম্যান্সি বা নখের গঠন দেখিয়া মানবের প্রকৃতি বোঝা; মেটোপোস্‌কপিও ফিজিঅগ্‌নমির মত চেহারা দেখিয়া চরিত্র বিশ্লেষণের বিজ্ঞান। অপথালমস্‌কপি বা চক্ষের বিভিন্ন রূপহেতু চরিত্রের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করার শাস্ত্র, পেডলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানসমূহ আকৃতি হইতে চরিত্র স্থির করিত। খুব আধুনিক বিজ্ঞান ক্যালিগ্র্যাফি বা হস্তলিপি দেখিয়া মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বলা। ডিস্‌রেলির মতে যেমন মানুষের কয়েকটা কাজ স্বাভাবিক, সেই রকম লেখাও স্বভাবগত এবং লেখা দেখিয়া মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারা সম্ভব। ১৮০৬ খৃঃ অঃ "Anatomy of Expression" এনাটমি অব্ এক্সপ্রেসন নামক একখানি পুস্তক ফ্রান্সের এক বিখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানবিদ্ প্রকাশ করেন। ডারউইনও পরে "Expression of the Emotions" "এক্স্‌প্রেসন্ অব্ দি ইমোসন্‌স্" নামক একখানি পুস্তক লেখেন; তাহাতে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রত্যেক মংসপেশীর বিভিন্নাবস্থা কি ভাবে ঘটে। গ্যালেন মস্তিষ্কের গঠন এবং তাহার বিশ্লেষণ লইয়া পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন যে মস্তিষ্কের যে কয়টী ভাগ আছে তাহার কোন একটী অংশ যদি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় অথবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে মানুষের সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে মানুষের দেহের সঙ্গে মনের অতি নিকট সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দেহ-মন যে নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ এ কথা আমাদের নিজেদের জীবনেও উপলব্ধি করা যাইতে পারে—কাজেই অধিক বলার প্রয়োজন বিশেষ বোধ করি না। আমাদের শরীর খারাপ হইলে আর কাজে মন লাগে না। রাগ হইলে মুখের বিকৃতি হয়, চোখের দৃষ্টি অসাধারণ ভাব ধারণ করে, ভয় হইলে মুখের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায়, দুঃখ হইলে কোথা হইতে চোখে জল আসে, হাসির কথা হইলে মানুষ হাসিয়া ফেলে। এ সব হইতে বোঝা যায় যে মনের অবস্থার সঙ্গে দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে—ঠিক এই ভাবেই দেখান যাইতে পারে যে মনের ভাবের ছাপ মানুষের দেহে থাকিয়াই যায়; অবশ্য কোথাও কোথাও নিয়মের ভঙ্গও হইতে পারে। সেই ছাপটী পরিলক্ষণ করিয়াই আজ অতগুলি বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুমতে যে সামুদ্রিক শাস্ত্র দেখা যায়—তাহাতেও চেহারার পার্থক্য অনুপাতে চরিত্র বিশ্লেষণের নিয়ম লিখিত আছে। ইহাও সত্য যে হস্তরেখা এবং মানুষের আকৃতি তাহার চিন্তা এবং চরিত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কাজেই ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে শরীরের সঙ্গে অপরাধের নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান্।

এই বিষয়ে দু'একটী নীতি বা সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। থিওরি অব্ এটেভিজ্‌ম্ অথবা জন্মগত দোষ সম্বন্ধে যে সূত্র লম্বে াসো

(১) মুত্রামানিয়া পিলাইয়ের লিখিত "প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ ক্রিমিনলজি," পৃঃ ১০৪।

বলিয়াছেন তাহা সকলের মতে ঠিক না হইলেও, অনেক সত্য উহার মধ্যে নিহিত আছে। লম্‌ব্রোসোর থিওরি বা সিদ্ধান্তটী নিম্নলিখিত দুইটী অনুমানের উপর নির্ভর করে ; যথা :—

(ক) জন্মগত অপরাধীরা সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। তাহারা বিশদভাবে একটী শ্রেণীভুক্ত, কারণ তাহাদের আঙ্গিক ও কার্ম্মিক অসামঞ্জস্য এবং বিশিষ্টতাই তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছে।

(খ) তাহাদের বিশিষ্ট শ্রেণীর উৎপত্তি হইল জন্মগত বা পূর্ব্বপুরুষ হইতে।

লম্‌ব্রোসোর সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা তিনটী লক্ষণ দেখিতে পাই। প্রথম হইল অপরাধীর দল সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক, কারণ তাহাদের বিশিষ্ট চালচলন এবং চরিত্রই তাহাদিগকে নিম্ন-সাধারণ স্তরে লইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এবং তাহাদের কর্ম্মধারার মধ্যে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ম্মধারার মূলে মনের এবং অনুভূতির অনেকটা প্রভাব বর্ত্তমান আছে। কাজেই যদি বলি দেহ ও মনের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা-হেতু একটা অপরটাকে পরিচালিত করিয়া চলিতেছে, তাহা হইলে অতিরিক্ত কিছু বলা হইল না, বরং যাহা সহজ সত্য তাহাই জ্ঞাপন করা হইল। তৃতীয়তঃ কর্ম্মপন্থার পার্থক্য ও সেই কর্ম্ম-প্রেরণার মূলে দেখা যায় যে পূর্ব্বপুরুষের প্রভাব রহিয়াছে। জন্মগত বিকার প্রকৃষ্টভাবে তাহার চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষের প্রকৃতির মূলে জন্মগত প্রভাব যে অধিক পরিমাণেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে সাধুর পুত্রও অপহরণ করিয়াছে, আবার অসাধুর পুত্রও ভাল হইয়াছে।

১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ হইতে "থিওরি অব্ ডিজেনারেসি" বা অধোগতির সিদ্ধান্তটী মরেল নামক অপরাধতত্ত্ববিদ্ প্রথমে প্রচার করেন। তিনি বলেন মানুষের দৈহিক ক্ষয়ের জন্যই মানসিক অবনতি হয় এবং মানসিক গতির বিভিন্নতা অনুযায়ী অপরাধীরা সাধারণ হইতে পৃথকভাবে গণ্য হয়। এই যে ক্ষয় বা অধোগতি ইহা স্থির বা চঞ্চল হয়, সাঙ্ঘাতিক বা মৃদু-ভাবাপন্নও হইতে পারে। কোন কোন লেখক বলেন, স্নায়বিক ক্ষয় হেতু মানসিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় এবং মানসিক দুর্ব্বলতাই অপরাধীর চিহ্ন। মনের প্রধান ঘাঁটী হইল স্নায়ুমণ্ডলে—সেইজন্য জন্মগত অপরাধীর অপরাধিত্ব স্নায়ুদোষঘটিত বলিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন। একটী লেখকের কথা এখানে উল্লেখ করা যাউক "Benedict assigns crime to a native nervous psychic debility which produces exhaustion in all works and creates thirst for low pleasures." ম্যারো বলেন—সেণ্ট্রাল নার্ভাস্ সিসটেম্ বা স্নায়বিক মণ্ডল নিয়মিতভাবে পুষ্ট হয় না বলিয়াই ঐরূপ অবনতিকর কার্য্যে প্রবণতা আসে। কোভালুইকি বলেন অপরাধের কারণ "প্যাথলজিক্যাল"। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে স্তরগুলির সমাবেশ আছে তাহার তারতম্যেই সাধারণ বা অবনতিকর অবস্থার উৎপত্তি হয়। বেনেডিক্ট "সেক্স ক্রাইম" বা যৌন-অপরাধের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন "নিউরাস্থেনিয়া" বা স্নায়বিক বিকৃতি হইতে মানসিক বিকৃতি হয় এবং সেই জন্য মানুষ অস্বাভাবিক যৌন-অপরাধে লিপ্ত হয়। নিউরাস্থেনিয়া রোগে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই হইল প্রধান লক্ষণ। অনেকে বলেন—জন্মগত মস্তিষ্কের বিকৃতি—যাহাকে ঠিক উন্মত্ততা বলা চলে না—তার কারণ পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা। যদি মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তরটী আক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্থায়ী উন্মত্ততা হয় ; কিন্তু যদি নিম্নস্তর আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অস্থায়ী মানসিক বিকৃতি আসে। অপরাধতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে সমস্ত অপরাধ বা আইনভঙ্গকারী বাহ্য-কর্ম্ম মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি না থাকিলে হয় না। বাস্তবিক "থিওরি অব্ ডিজেনারেসি" এবং "থিওরি অব্ এটেভিজম্" বিশেষ পৃথক নহে। প্রথমটী—মানুষের দৈহিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ। দৈহিক দুর্ব্বলতা এবং মানসিক দুর্ব্বলতা উভয়েই দেখা যায়—যে জন্মগতও হইতে পারে ; যেমন ধরুন "Congenital insanity" বা পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত উন্মত্ততা বা জন্মগত উন্মত্ততা এবং সাময়িক উন্মত্ততা। যেটা পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা "থিওরি অব্ এটেভিজম্"এর মধ্যে আসে। কাজেই দুটী সিদ্ধান্তই পরস্পরের সহিত অন্তর্জড়িত। "থিওরি অব্ এটেভিজম্" অনুসারে প্রত্যেক অপরাধের মূলেই পূর্ব্বপুরুষের কোন না কোন সংস্পর্শ থাকে ; কিন্তু "থিওরি অব্ ডিজেনারেসি" অনুসারে প্রত্যেক অপরাধের সঙ্গে ঐরূপ পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এটেভিজমের মতে জাতির ক্রমোন্নতির ধারণা প্রবল, কিন্তু ডিজেনারেসির মতে জাতির অবনতি এবং লোপ পাওয়ার ধারণা প্রবল। "The author of 'Insanity in India' states that the stigmata of degeneration are common to insanes, idiots imbeciles, epileptics, hysterics, neurotics, prostitutes, paupers, criminals. deaf-mutes and those who are born-blind. Hence they really signify the reverse of progress. If progress means development and strength, degener cy means deterioration and weakness."

শেষ সিদ্ধান্তে লম্‌ব্রোসো আবার বলিয়াছেন যে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় "এপিলেপ্‌সি" নামক রোগ হইতেই অপরাধের সূত্রপাত হয়। লম্‌ব্রোসোর তথ্যটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল "What struck Lambroso and others of his school as indicative of the epileptic origin of congenital criminality was that the seizure is in some cases replaced only by fits of rage and ferocious actions not accompanied with loss of consciousness. This led to the inference that delinquency may be a form of epilepsy attenuated or masked so far as motor attacks are concerned but aggravated by criminal impulses." এপিলেপ্‌সিতে সব সময়ে মানুষ জ্ঞান না হারাইয়া হঠাৎ একটা রাগের বা হিংসার কাজ করিয়া ফেলে। তাহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে মানুষ যখন কোন পাপ বা অন্যায় কার্য্যে ব্যাপৃত হয় তখন এই রকম একটা "ফিট্"

অর্থাৎ হঠাৎ-আসা প্রেরণার বশীভূত হইয়া করে—সেটার জন্য তার চিন্তা করার সময় বা অবকাশ থাকার কথা আশা করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ জীবনে যাহা দেখা যায় তাহা হইতে লম্বোসোর থিওরি অব্ এপিলেপ্সিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগযুক্ত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহাকে ইংরাজিতে বলে cold-blooded murder অর্থাৎ সজ্ঞান হত্যা—সে ব্যাপারে এপিলেপ্‌টিক ফিট্ হওয়ার জন্য হত্যা করিয়াছে বলিলে হাস্যাস্পদ হওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই হয় না। মানুষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, জালিয়াতি প্রভৃতি যাহা করিতেছে তাহার অধিকাংশই মস্তিষ্কের পরিচয় জ্ঞাপক এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই বলিলে ভুল হইবে। লিণ্ডেনবার্গের পুত্র অপহরণ একবার নয় কয়েকবার ধরিয়া এবং শেষে তার জীবন নাশ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে অপরাধ সাহিত্যে আমেরিকায় তাহা উজ্জ্বল থাকিবে। আমাদের দেশেও "পাকুড় মার্ডার কেস" সকলেরই পরিজ্ঞাত। এ সব স্থলে এপিলেপ্সি অথবা এটেভিজ্‌ম্ সিদ্ধান্ত মোটেই খাটে না, বরং ডিজেনারেসির সিদ্ধান্ত কতকটা প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত নীতি বা সিদ্ধান্তগুলি সমালোচনার দিক হইতে কতটা সত্য তাহা দেখা যাউক। একদল বলেন অপরাধ হইতেছে সামাজিক ব্যাপার। কাজেই সময় ও স্থান হিসাবে তাহার পার্থক্য যথেষ্ট আছে। এটেভিজ্‌ম্ বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত রোগের মত অপরাধ যে পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য হইত যদি আমরা অপরাধকে একমাত্র Anti-social বা অসামাজিক কার্য্যান্তর্গত বলিয়া পরিগণিত করিতাম। সতীদাহ-প্রথা এককালে আমাদের দেশে সামাজিক কেন ধর্ম্মের পর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়া চলিত ছিল, কিন্তু আজ তাহা ভারতীয় ক্রিমিন্যাল আইনের সেক্সন্ অনুযায়ী অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে কাহারও স্ত্রী যদি অপর পুরুষের সঙ্গে বিহার বা নৃত্যাদি করিয়া ফেরে, তাহা হইলে সমাজের চোখে তাহা বিসদৃশ এবং সে ত্যাজ্য, কিন্তু তাহাই আবার সাগরপারের পশ্চিম দেশে সামাজিক আচরণ বা Social Custom। কাজেই অসামাজিক কার্য্য আর অপরাধবিজ্ঞানের ক্রাইম এক জিনিষ বলিয়া ধরা যায় না, হয়তো দু'একটা অসামাজিক কাজকে আমরা অপরাধ বলিতে পারি—সবটাকে নয়। বেশ্যাবৃত্তি যদিও অসামাজিক, কিন্তু আইন-বিরুদ্ধ নয়, মদ খাওয়া যদিও অসামাজিক (অন্ততঃ আমাদের দেশে) তাহা আইনবিরুদ্ধ নহে। মিথ্যা কথা বলা অসামাজিক বটে, কিন্তু আইন লঙ্ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে কোন দোষ হয় না—ইত্যাদি সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যদ্বারা প্রমাণ করা যাইবে যে অপরাধ শুধু অসামাজিক কার্য্য নহে। ইংরাজীতে "ক্রাইম" শব্দের অর্থ ভায়লেশন অব্ ল বা আইন-ভঙ্গকারী অপরাধই প্রকৃত "ক্রাইম"। যদি শাস্তির দিক হইতে বিচার করি তাহা হইলে রাষ্ট্র যে সব কার্য্যকে দোষণীয় বলিয়া ধরিয়াছে তাহাকেই তো অপরাধ বলিব। তবে বলিতে পারেন যে রাষ্ট্র এবং সমাজ এদের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প; কারণ রাষ্ট্র হইল বৃহত্তর সমাজ মাত্র; তাহা হইলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু রাজনীতির মতানুসারে সমাজ এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন না হইলেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে, একটা আর একটার অন্তর্গত। থিওরি অব্ ডিজেনারেসি সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অপরাধতত্ত্ববিদ্ এসাফেনবার্গ (Aschaffenburg) বলেন "Most serious of all is the fact that we are unable to exactly define what must be recognised as a mark of degeneration." ডিজেনারেসান বা অধঃপতনের নিশ্চয় চিহ্নস্বরূপ আমরা কোন্ কোন্ জিনিষকে ধরিতে পারি ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। যে যে অসামঞ্জস্য সাধারণ ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য এবং যাহার বর্ত্তমান হেতু কর্ম্ম-জগতে আলোড়ন আসে এবং যাহার দ্বারা মানুষকে দমনশক্তিচ্যুত করিয়া ফেলে তাহাই অধঃপতনের চিহ্ন বলিয়া ধরিতে পারি। কিন্তু "normal man" অথবা সাধারণ মানুষের চিহ্ন কি? কাহাকে "normal" বা "সাধারণ" বলিয়া ধরিব এবং কাহাকে সাধারণ স্তরের উচ্চে বা নিম্নে গণ্য করিব প্রভৃতি বহু প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার পর থিওরি অব্ এপিলেপ্সি সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া এসাফেনবার্গ (Aschaffenburg) বলেন সকল অপরাধীর মধ্যে কাজেই এপিলেপ্সির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। তবে যদি কোন অপরাধী ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য এপিলেপ্সির লক্ষণ পাওয়া যায়। এপিলেপ্সি হইল স্নায়বিক রোগ, আর ক্রিমিন্যালিটি অথবা অপরাধ হইল মনের রোগ। অবশ্য কয়েকটা বিশেষত্ব উভয়ের মধ্যেই দেখা যায় যে সমান—তাহার মধ্যে মনের গতির বিভিন্নতা খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। জিনা ফেরেরো একটা উদাহরণ দিয়াছিলেন যে কোন এক অপরাধী একসময়ে ভাবিত সে নেপোলিয়াম, আবার আর এক সময় মনে করিত পদানত ক্ষুদ্র দাসমাত্র। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল এপিলেপ্সি রোগের প্রভাব অপরাধীদের উপর কতটা। সাধারণ জীবনে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—উক্ত নীতির মূলতঃ কোন বিশেষ দাম দেওয়া যায় না। ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেস অথবা জালিয়াতি ধরুন, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া যখন উঠিয়া গেল তখন যে সব লোকের নামে জুয়াচুরীর দোষ পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহই এপিলেপ্সি রোগী নহেন এ বিষয় নিশ্চয় জানা গিয়াছে। এপিলেপ্সি রোগের প্রক্রিয়া অনুপাতে অতদিন ধরিয়া কার্য্য-সাধন করার ধৈর্য্য অপরাধীর থাকা একেবারেই সম্ভাবনা নাই। শ্রীরামপুরের ইন্সিওরেন্স জাল মোকদ্দমায় যে সব লোক ধৃত হইয়াছিল তাহারা বহুদিন যাবৎ ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; কাজেই নিশ্চয় হইয়া বলা চলে যে এপিলেপ্সির উৎপাত তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান্ ছিল না।

এইবার দেখা যাউক প্রত্যক্ষভাবে কোন রোগ কি কি অপরাধের সৃজন করে। Dementia precox নামক রোগে মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়। যখন কেহ এই রোগে আক্রান্ত হয় তখন সে আর দরজার বাহিরে যাইতে চাহে না, কাহারও সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে ভালবাসে না, কোন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে যাইতে ইচ্ছুক হয় না। আত্মহত্যার জন্য দিবারাত্র

ভাবে এবং নানারকম কুমতলব মনে মনে নির্দ্ধারণ করে। এই রোগ হইতে অপহরণ করা এবং পলাতক হওয়ার অপরাধ উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের সিফিলিস্ হইতে paresis প্যেরেসিস রোগ জন্মায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই নানাবিধ স্বপ্ন দেখে। খুব ধনী লোকের ছেলেও ছোট জিনিষ অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, সমাজের মধ্যে দিবারাত্র লজ্জাকর ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে, ভদ্রতার লেশমাত্র রাখিতে চাহে না এবং অসম্ভব পানাসক্ত হইয়া পড়ে। যাহারা Melancholiacs (মেলাঙ্কোলিয়াক্স্) তাহাদের কেবল ইচ্ছা সব জিনিষই ঘুচিয়া শেষ হইয়া যাউক—সেইজন্য তাহারা হত্যা, বাড়ীতে অগ্নিদান প্রভৃতি অপরাধে ব্যাপৃত থাকে। Hypomania হাইপোম্যানিয়া রোগের চিহ্ন হইল—রোগী অতিরিক্ত কামপ্রবণ হইয়া পড়ে, অনেক রকম জটিলতা সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, চুরি এবং মানুষকে ঠকান তাহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের মত হইয়া পড়ে। Hysteria হিস্টিরিয়া বা মৃগি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বিশেষ একটা অন্যায় কাজ করিতে পারে না। তাহাদের মানুষকে অসম্ভব ভয় দেখানোর স্বভাব থাকে। ঝগড়া বিবাদ করা, অশ্লীলতার প্রশ্রয় লওয়া, অপরের নামে দোষারোপ করা এবং যৌন অপরাধ করাই এই রোগের প্রধান চিহ্ন। যে সব মৃগি মানসিক মাত্র ও যাহাদের বৈলক্ষণ্য শরীরের মধ্যে প্রকাশিত না হয় সে রকম মৃগি রোগ সমাজের পরম অকল্যাণকর। মানুষকে প্রতারণা করিবার জন্য এমন অদ্ভুত মিথ্যা কথা বলিতে পারে যে তাহা কহতব্য নহে। প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাথা-ধরা বা ঘাড়ে-ব্যথা প্রভৃতি হঠাৎ-আসা অসুখ ভোগ করিতে দেখা যায়। Congenital idiocy (কন্‌জেনিট্যাল ইডিঅসি) বা জন্মগত জড়তা সাধারণতঃ পাহাড়ে দেশে অধিক দেখা যায়। কখনও কখনও পুরুষানুক্রমেও ইহার চলতি দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় এই রোগ প্রচলিত দেখা যায়। Pellagra (পেলাগ্রা) নামক চর্ম্মরোগে যখন মানুষ আক্রান্ত হয় তখন সে হয় অপরের প্রাণ নিতে চায়, না হয় সে নিজের প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিতে চায়। যখনই তাহারা জল দেখে, তাহাদের ডুবিয়া মরিতে বাসনা হয়। মানসিক এপিলেপ্সি—যাহার দৈহিক কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—তাহাও বড় সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির। "What may be regarded as a dangerous factor of criminality is psychic epilepsy." Gina ferrero (জিনা ফেরেরো) একটী উদাহরণ দিয়াছেন যে অনেক ক্ষেত্রে Psychic epilepsy সাইকিক্ এপিলেপ্সির রোগী প্যারিস হইতে রোমে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছে অথচ তাহার একেবারে সংজ্ঞা হয় নাই। Psychic epilepsy সাইকিক এপিলেপ্সি অনেক সময়েই আমাদের চোখে পড়ে না, কারণ রোগীর চেহারা ও দৈনন্দিন স্বভাব হইতে কোন কিছুই বোঝা যায় না। লম্ব্রোসো একটী ঘটনা বলেন যে সে স্থলে Misdea (মিস্‌ডিয়া) নামক একজন সৈনিক হঠাৎ তাহার উচ্চতম কর্ম্মচারীর জীবন সংহার করে এবং যাহারা তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আটজনের প্রাণ বিনাশ করে। ঠিক তার পরই সে ঘুমাইয়া পড়ে—যখন জাগিয়া উঠিল তখন আর পূর্ব্বেকার কোন কথাই সে স্মরণ করিতে পারিল না। যদি এপিলেপ্সি উন্মত্ততা রোগের সহিত সম্মিলিত হয় তাহা হইলে রোগী অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। একটী স্ত্রীলোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল—একদিন যখন রুটী কাটিবার দরকার হইয়াছিল সে তাহার নিজের ছেলেকে রুটী ভাবিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলিয়াছিল।

লম্ব্রোসো, কোলাসাসি (সিসিলিস্থে) এবং গ্যারোফ্যালো প্রভৃতির গবেষণার ফলে বোঝা যায় যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং দৈহিক অপ্রকৃতিস্থতা হেতু মানুষের মনেরও বিকৃতি হয়। অপরাধীর মনের বিশিষ্টতাসমূহ যে সাধারণ লোকের মত নহে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। অপরাধের অপেক্ষা অপরাধীকে পরীক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমাদের বস্তুনিষ্ঠভাবে অপরাধতত্ত্বের আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সকল সভ্যদেশেই অপরাধ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছে কিন্তু আমরা এখনও কোথায় আছি তাহা বলা কঠিন। After-care Association "আফ্‌টার কেয়ার এসোসিয়েসন" নামক যে অনুষ্ঠান কলিকাতায় আছে তাহা হয়তো অনেকেই জানেন না। উক্ত অনুষ্ঠানে অপরাধীদের আইনানুসারে বন্দীজীবন শেষ হইবার পরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বহু অপরাধীকে সামাজিক জীবনে ফিরাইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন লোককেই দেখিলাম না উক্ত অনুষ্ঠানটীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেখানে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব লইয়া গবেষণা করিয়া তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইয়াছে। এখন আমাদের জাগরণের দিনেও যদি সমাজকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে না পারা যায় তাহা হইলে সভ্যতা হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা সাজে না, যাহারা সত্যই দৈহিক বা মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়া অপরাধীর জীবন যাপন করে তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া কোন ফলই হইবে না। দেবতার মন্দিরে দেবত্বকে ফিরাইয়া আনাই মানুষের কাজ, পশুত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া অমানুষিকতা।



ত্রিচিনাপলী ও শ্রীরঙ্গম্

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভ্রমণ

করোনেশনের ছুটি উপলক্ষে আমাদের দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখতে যাওয়া ঠিক হ'লো! মে মাসের অসহ্য গরম, কিন্তু উপায় কি? নানা প্রদেশ হতে কুনূরে আগত হেল্থ-অফিসারেরা তিন মাস পরেই চলে যাবেন, আর আমরাও সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকবো; সে পর্য্যন্ত বড় ছুটীও আর ছিল না, সুতরাং রাজার অভিষেকের ছুটীই প্রশস্ত বলে মনে হলো! ডাক্তার মিত্র, নায়ক ও চ্যাটার্জ্জি বন্ধুদের সঙ্গী পাওয়া যাবে জেনে মিসেস্ পাল গররাজি হতে নিমরাজি এবং অবশেষে নিমরাজি হতে 'নিম'শূন্য অবস্থায় রাজিই হলেন। আমার মনে হয় অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের লোভ না দেখালে তাঁকে হয়ত কিছুতেই এ সময়ে ভ্রমণে রাজি করানো যেতো না! আমরা ৮ই মে সাড়ে তিনটার সময় নীলগিরি এক্সপ্রেস্এ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাত্রা কল্লু'ম। কুনূর হতে মেটুপালায়াম্ সমস্ত পথটি ডাক্তার মিত্র একাই বক্তার স্থান এবং আমরা সকলে নীরব শ্রোতার স্থান অধিকার করেছিলুম। আমাদের এই ভ্রমণ-যাত্রায় চ্যাটার্জ্জির আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং ডাক্তার মিত্রের ভাষায় বলতে হয়, এজন্য নাকি তাঁর দু'রাত ঘুম হয় নি। কথাটা অবশ্য অতিরঞ্জিত, বলাই বাহুল্য।

মেটুপালায়ামে পৌছে আমি 'তিন হাজার মাইলের কুপন' বই কিনতে চাইলুম কিন্তু তা' পাওয়া গেল না, অগত্যা পরবর্ত্তী জংশন পদোনূর পর্য্যন্ত টিকেট করে 'মেটুপালায়াম্-ত্রিচি' লেবেল-আঁটা গাড়ীর একটি কামরা অধিকার কল্লুম স-পত্নী আমি; বন্ধুত্রয় অন্য কামরায় গেলেন। পদোনূরে পৌছে অনেক চেষ্টা করে মোটে একখানা টিকিটের কুপন বই পাওয়া গেল, আমি তাই নিয়ে ত্রিচি পর্য্যন্ত দুখানি টিকিট কেটে ফিরে এলুম। দেড় হাজার মাইলএর কুপন বই মোটে দুখানি ছিল, তিনখানা না পাওয়াতে বন্ধুদের আর কুপন বই কেনা হলো না।

আমাদের গাড়ীগুলি 'ব্লুমাউন্‌টেন্ এক্সপ্রেস্' ইরোড স্টেশনে কেটে রেখে গেল। সেখানে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়িয়ে রৈল, তারপরে জানি না গভীর রাত্রিতে কখন গাড়ী আমাদের নিয়ে আবার ত্রিচিনাপলী জংশনে রেখে গেছে, কারণ আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভোরবেলা, তখনো অন্ধকার আছে, তখন চ্যাটার্জ্জি এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে আমরা স্টেশনএ যাবো কিনা। প্রতিমা তখনও নিদ্রিত, তাই বল্লুম আমরা অত ভোরে যাবো না, পরে যাবো। বন্ধুরা তখন কুলীদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে গিয়ে হাজির হলেন স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে। আমরা



ত্রিচির সাধারণ দৃশ্য —মন্দিরের উপর হইতে গৃহীত— চিত্রের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের গোপুরম্ দেখা যাইতেছে

প্রত্যূষে প্রায় সাতটা পর্য্যন্ত গাড়ীতেই বিশ্রাম করে কুলী ডেকে পরে গিয়ে হাজির হলুম প্রতীক্ষা-গৃহে। মন্দিরে যেতে হবে বলে বন্ধুরা ভোর বেলাই স্নান করে নিলেন, কিন্তু আমরা দুজন ওকাযটা দুপুর বেলার জন্য মুলতুবী রেখে শুধু প্রাতরাশটা সেরে নিলুম অত্যাবশ্যক বিবেচনায়। অতঃপর একখানা ট্যাক্সি ডেকে বন্দোবস্ত করে আমরা বের হলুম ত্রিচিনাপলীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে।

ত্রিচিনাপলী অথবা 'ত্রিচি' মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটি প্রসিদ্ধ নগরী এবং মাদ্রাজের পূর্বেই ইহার স্থান। জনসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ এবং চুরুটের জন্য বিখ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'ত্রিচি' প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে, কারণ তদানীন্তন রাজা ছোক্কনাথ (ইনি সুপ্রসিদ্ধ রাজা তিরুমল নায়কের পৌত্র) ১৬৬২-১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মাদুরা হতে রাজধানী 'ত্রিচি'তে স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানেই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে রাজত্ব আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরেই 'ত্রিচি' নায়ক রাজাদের হাত হতে খসে পড়ে নবাবদের হাতে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে 'ত্রিচি'র তৎকালীন নবাবের বিনামূল্যে দান-করা ভূমিতে, তেন-সি-এফ-শুয়ার্জ কর্ত্তৃক এখানকার



ত্রিচির সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ, পাহাড় ও মন্দির।
পাহাড়ের উপর গণপতির মন্দির

বিখ্যাত ক্রাইষ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়। এরই সন্নিকটে মিলিটারী সমাধি স্থান অবস্থিত। 'ত্রিচি' জংশন স্টেশনের নিকট সেন্ট জন্ গীর্জ্জা বলে আর একটি গীর্জ্জা আছে, এরই অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিশপ হেবারের সমাধি স্থান আছে। খানিক দূরে দক্ষিণে সোনার পাহাড় ও ফকির পাহাড় বলে দুটি পাহাড় আছে। এই শেষোক্ত পাহাড়ের উপরই লরেন্স ও ক্লাইভের অধীন ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে ফরাসী সৈন্যের যুদ্ধ হয়। সোনার পাহাড়ের উপর দক্ষিণ ভারতীয় রেলের কেন্দ্রীয় কারখানা অবস্থিত; কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সব রকমেরই আছে এবং প্রত্যহ প্রায় পাঁচ হাজার লোক কায করে। কারখানার চারিদিকে মজুরদের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট বাড়ী তৈরী করা হয়েছে এবং শীগ্‌গিরই এটা একটা ছোটখাটো শহরে পরিণত হবে বলে মনে হয়। কারখানাটি স্থাপনের জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

আমরা বের হয়ে প্রথমেই গেলুম 'ত্রিচি'র দুর্গ এলাকায়। দুর্গের প্রাকার অনেকদিন পূর্ব্বেই নষ্ট হয়ে গ্যাছে, তবু স্থানটি 'ত্রিচি' ফোর্ট বলেই পরিচিত। আমরা শহরের উত্তরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাজির হলুম ত্রিচিনাপলী পাহাড়ে। এটিই 'ত্রিচি'র সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়, দুর্গ ও মন্দির (Rock, fort and temple) বলে পরিচিত। আমরা পথে গাড়ী রেখে সিংহদ্বার (গোপুরম্) দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাহাড়ের নীচের সমতল স্থানে প্রবেশ কল্লুম। পথের দুপাশেই পূজার সাজসরঞ্জাম, ফল, মূল, ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি বিক্রয়ের স্থান। আমরা সেখান হতে 'ডালি' কিনে একজন বামুনের মাথায় চাপিয়ে প্রায় এক ফার্লং এগিয়ে গিয়ে পৌছলুম পর্ব্বতের আভ্যন্তরীণ মন্দিরের সোপান দ্বারে। পাহাড়টি সম্মুখস্থ রাজপথ হতে ২৬০ ফিট উঁচু। সেই দরজা হতে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সিঁড়ি আর সিঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এত সিঁড়ি দেখে শ্রীমতী প্রতিমা বিমর্ষ হয়ে বল্লেন "ওরে বাপ্ রে, এত উপরে উঠ্‌বো কি করে?" আমি সাহস দিয়ে বল্লুম "যে করে রাজগিরএ পাহাড়ের উপর এবং দিল্লীতে কুতবমিনারে চড়েছিলে! সে ত শুধু সখের জন্য, আর এ ধর্ম্মকর্ম্ম করতে পুণ্যসঞ্চয়ে।" বন্ধুরাও আশ্বাস দিলেন, সুতরাং আমরা একধাপ দুধাপ করে চড়তে আরম্ভ কল্লুম। কত লোক উপরে উঠছে, আবার দু-একজন নেমেও আসছে। যারা উপরে যাচ্ছে তাদেরই কষ্ট বেশী। খানিক পরে পরেই বিশ্রামের স্থান আছে, তা না হলে চড়াই খুব কষ্টকর হয়ে উঠ্‌তো! তা সত্বেও খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পত্নী হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটুর উপর হাত রেখে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন, 'আর পারি না' বলে। বন্ধুরা ভরসা দিচ্ছিলেন "এই হয়ে গেল" বলে, আর আমি আশ্বাস দিচ্ছিলুম কবিতা আওড়িয়ে—

"Standing at the foot of a hill,
gazing at the sky

How can you get up 'darling'
if you never try."

প্রতিমা কিন্তু তাতে যে বিশেষ ভরসা পাচ্ছিলেন তা মনে হল না, কারণ কষ্টিপাথরের মত বিমর্ষ মুখ করে বলছিলেন "রাখ বাবু, তোমার কবিতা!" কিন্তু ততক্ষণে ক'মিনিট বিশ্রাম হয়ে গেছে তার, তাই পুণ্যসঞ্চয় লোভে আবার চলতে আরম্ভ কল্লেন। এরকম-করে প্রায় পৌনে দু'শো সিঁড়ি বেয়ে আমরা গিয়ে একতলার মন্দিরে পৌছলুম। আমাদের সকলেরই পা ধরে গিছলো, তাই আমরা খানিক দাঁড়িয়ে পথের দুপাশে আঁকা কতকগুলি ছবি দেখে বিশ্রাম করে নিলুম। শিবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি গল্প ছবির সাহায্যে বিবৃত করা হয়েছে। একটি মেয়ে সর্ব্বদা ভক্তিভরে শিবের পূজো করতো। তার বিয়ে হওয়ার পর সে যখন অন্তঃসত্ত্বা হলো ও ছেলে হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হলো তখন সাহায্যের জন্য মেয়ে তার বুড়ী বিধবা মাকে চিঠি লিখলে! বুড়ী পোটলা-পুটুলী মাথায় নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে পদব্রজে যাত্রা করলে; কিন্তু তখন কাবেরী নদীতে ভীষণ বন্যা, সুতরাং কিছুতেই নদী পার হতে না পেরে ওপারে আটকে গেল। এদিকে মেয়ের প্রসব-বেদনা উপস্থিত, মেয়ের প্রাণ মায়ের জন্য ছট্‌ফট্ কর্চ্ছে, এমন সময় দেখা গেল মা এসে উপস্থিত! মা অতি যত্নসহকারে মেয়েকে প্রসব করালে এবং সদ্যঃজাত শিশুকে সুস্থ তনয়ার কোলে দিয়ে চলে গেল। প্রায় দুদিন পরে এসে মা আবার উপস্থিত হয়ে দুঃখ করতে লাগলো, যে কাবেরী নদীর বন্যার জন্য সে আসতে পারে নি ঠিক সময়ে। তখন মেয়ে বুঝতে পার্লে যে তাঁর ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেবই তার মায়ের ছদ্মবেশে তার দুঃসময়ে এসে সাহায্য করে গেছেন। তখন মাতা ও কন্যা যুক্তকরে শিবকে পূজো করতে আরম্ভ কর্লে। তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব তাদের দেখা দিলেন ও বরদান কল্লেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমরা দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলুম; সুতরাং পায়ের ব্যথাও খানিকটা কমেছে বলে মনে হলো। আমরা তখন মন্দিরের একতলায় ওদিকে ছাদের উপর খানিকটা খোলা জায়গা ছিল, যেখান হতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়, সেখানে এসে দাঁড়ালুম। সম্মুখেই অনতিদূরে মন্দিরে প্রবেশের সিংহদ্বার ঠিক রাজপথের উপর, তাকে একটা ছোট প্রবেশ পথের মত দেখাচ্ছিল। সম্মুখেই পথ দিয়ে চলছে অসংখ্য জনতা, মনে হচ্ছিল যেন দলে দলে খেলা-ঘরের পুতুলেরা চলা-ফেরা কচ্ছে। সময় সময় দুচারখানা মোটরগাড়ী হর্ণ বাজিয়ে যাওয়া আসা কচ্ছিল, তাদের হর্ণের শব্দ অতি ক্ষীণভাবে কানে আসছিল; ঐ গাড়ীগুলি ঠিক খেলার গাড়ীর মতই দেখাচ্ছিল! ডাক্তার মিত্র এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় 'ত্রিচি'র সাধারণ দৃশ্যের একটা ছবি নিলেন।

আমরা এখান হতে আবার আর একটা প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে উপরে চড়তে আরম্ভ কল্লুম। ফটকের একপাশে একটা বড় শীলমোহর করা পিতলের ঘড়া নিয়ে একজন লোক বসেছিল। পাশেই একটা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, এখানে মন্দিরে প্রবেশের মূল্য নগদ একপয়সা করে জন পিছু দিতে



শ্রীরঙ্গমের মন্দির—বামপার্শ্বে গোপুরম্ দেখা যাইতেছে

হবে। আমরা কলসীর মধ্যে উপরের ফুটো দিয়ে পাঁচটি পয়সা ছেড়ে দিয়ে তবে উপরে যাবার—মস্তক সঞ্চালনরূপ ছাড়পত্র পেলুম। আবার উঠতে হচ্ছে, সুতরাং আমাদের গতি ক্রমশঃই মন্দীভূত হচ্ছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে হচ্ছিল, এ যেন পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণের অবস্থা! পশ্চাতে কিন্তু তালপাতার সেপাইএর মত ঝুঁটি মাথায় ও অতি মলিন বসন পরিহিত, ততোধিক মলিন উপবীত গায়ে বামুন মুটেটি আমাদের পূজার ডালি নিয়ে লম্বা লম্বা কাঠির মত পা ফেলে বেশ উপরে উঠে আসছিল; আমাদের মত তার যে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে এমন মনে হলো না।

মিসেস্ পাল পোনর বিশ ধাপ উঠেই একবার দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কচ্ছিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ তাকে ঠেলে দিচ্ছিল দুরারোহ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ মন্দিরের দিকে! এ ত আর রাজগির পাহাড়, কি কুতবমিনার, কি লক্ষ্ণৌয়ের কাউন্সিল চেম্বারের উপর নয় যে খোসামোদ করে তুলতে হবে তাকে! এ যে ঠাকুরের মন্দির, সুতরাং যত কষ্টই হউক, উঠ্‌তেই হবে! সুতরাং বন্ধুরা "এই হয়ে গেল, ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে" বলে তাকে যতক্ষণ আশ্বাস দিচ্ছিলেন, আমি ততক্ষণে নির্ব্বাকভাবে সকলের আগে উপরে উঠ্‌ছিলুম, পশ্চাতে তাকাবার বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না বলে। ডাক্তার মিত্র এক দুই করে সিঁড়ি গুণে গুণে উপরে উঠ্‌ছিলেন। অবশেষে আমাদের দুরারোহণ যখন



জম্বুকেশ্বর শিবের মন্দির

শেষ হলো গিয়ে পাহাড়ের উপর সিদ্ধিদাতা গণপতির মন্দিরে, তখন শুনলুম ডাক্তার মিত্র দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলছেন "তিনশো একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ—" অর্থাৎ নীচে হতে উপরে উঠতে আমরা তিনশো তেতাল্লিশটি সিঁড়ি ভেঙে এসেছি, তার মধ্যে শেষ প্রায় পঞ্চাশটি পাহাড় কেটে করা হয়েছে এবং তার উপরে শাদা কালোয় এমন রং করা হয়েছে যে মনে হয়, শাদা কালোর চৌকা কাটা যেন একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে রাখা হয়েছে মন্দিরের সম্মুখে!

গণেশের মন্দিরটি খুব বড় নয় এবং চারদিকে বেশ একটা বারান্দা আছে। এই বারান্দায় দিনরাত চব্বিশঘণ্টা ধূ ধূ করে হাওয়া লাগে। আমরা যখন গিয়ে উপরে পৌছলুম তখনও ধূ ধূ করে হাওয়া বইছিলো, সুতরাং সেখানে পাঁচমিনিটের মধ্যেই আমাদের এত উপরে উঠার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এবং আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌লো এক অভিনব মনোহর দৃশ্য! মন্দিরের একদিকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ গাছ লতাপাতা যেন একটা সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে দিগন্ত প্রসারিত করে, তারি মাঝে খরস্রোতা কাবেরী নদী একটি রূপোলী রেখা টেনে দিয়েছে আঁকাবাঁকাভাবে সেই সবুজ আস্তরণের বুকে! অন্যদিক হতে স্পষ্ট দেখা যায় শ্রীরঙ্গম্, ঠিক একটা দ্বীপের মত; এমন কি শ্রীরঙ্গমে প্রসিদ্ধ মন্দিরের 'গোপুরম্'টি পর্য্যন্ত স্পষ্ট নজরে পড়ে। আর একদিক হতে সমস্ত 'ত্রিচির' সাধারণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক এরোপ্লেন হতে নেওয়া ছবির মত! সুতরাং এ রকম নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য এবং দেহস্নিগ্ধকর মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে যে পর্ব্বতারোহণের ক্লান্তি ক'মিনিটের মধ্যেই দূর হ'য়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বন্ধুরা সাধারণ দৃশ্য ক্যামেরা-গত কর্ব্বার অনেক চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু তা' সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌লো না, কেন না এত ছোট ক্যামেরায় হয়ত অতদূরের জিনিস কিছুই স্পষ্ট উঠবে না বলে বন্ধুরা ছবি নিতে ভরসা কল্লেন না।

অতঃপর আমরা মন্দিরে পূজো দিতে গেলুম। দক্ষিণ ভারতের কোন মন্দিরে পূজো দেওয়া এই আমাদের প্রথম; সুতরাং ঘন কৃষ্ণ মসীবর্ণ পুরুতের ঠাকুরের গায়ে ঠুকে নারকেল ভাঙ্গা থেকে মুখে লোহার কড়াই আর কাঁকর একসঙ্গে মিশিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ এবং পঞ্চপ্রদীপ সাহায্যে হস্ত দেহের অপরূপ ভঙ্গিতে আরতি সকলই অত্যন্ত অভিনব ও বিসদৃশ ঠেকছিল! যাক্ মন্ত্রের একটি বাক্যও বোধগম্য না হলেও আমরা প্রসন্নচিত্তে পূজা শেষ করে নীচে নেমে এলুম শিবের মন্দিরে! গণেশের মন্দিরে পাণ্ডার ভীড় ছিল না কিন্তু এখানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আট দশজন পাণ্ডা পিছনে লেগে 'প্রাণটা কণ্ঠাগত' করবার মতই করে তুলেছিল আর কি? অতি কষ্টে তাদের দূরে রেখে আমরা আমাদের বামুন-মুটেটিকে প্রদর্শক করে ঢুকলুম, দিনে-দুপুরেও অন্ধকার শিবের মন্দিরে! দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম যে আমাদের গণেশের মন্দিরের পুরুতটিও আগেই

কোন পথ দিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন ঠিক সময়েই! মন্দিরের অতি স্তিমিত আলোকে ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া গেল; এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! উঁচুতে বোধহয় প্রায় ৭।৮ ফিট হবে মনে হলো, পূজারী বামুনকে অতি ক্ষুদ্র বামন বলে মনে হচ্ছিল লিঙ্গের সম্মুখে! একে ত অন্ধকার, তাতে আবার গরম হাওয়া, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে উঠেছিল, তাই বন্ধুরা ও পত্নী যখন ভক্তিগদ্‌গদভাবে পূজায় ব্যস্ত তখন আমি চুপি চুপি বেরিয়ে এলুম মন্দির হতে নাটমন্দিরে এবং এসে দাঁড়ালুম পাহাড় কেটে তৈরী একটা জানালার পাশে, যেখানে একটু আলো ও বায়ুর প্রবেশ আছে! পবনদেব ও সূর্য্যদেবের এই ক্ষীণ করুণাটুকুর সংস্পর্শে এসে মনে হলো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম; খানিকক্ষণ পরে পূজা শেষ করে যখন বন্ধুরা ও পত্নী ফিরে এলেন নাটমন্দিরে, মনে হলো যেন তাঁরা এইমাত্র স্নান করে এলেন! পত্নী ভর্ৎসনার সুরে বল্লেন—"মন্দিরে এসে তোমার এ কি কাণ্ড! পূজো শেষ না হতেই বেরিয়ে এসেছো!"

'গতিক মন্দ' দেখে কবিবরের শরণাপন্ন হয়ে বল্লুম "পত্নীর পুণ্যে পতির পুণ্য নহিলে কষ্ট বাড়ে!" সতীর্থ চ্যাটার্জ্জি-বন্ধু পত্নীকে বল্লে "ও চিরকালই ঐ রকম, আপনাকেই ওরটা পুষিয়ে নিতে হবে!"

এরপর আমরা গিয়ে ঢুকলুম পার্ব্বতীর মন্দিরে। এখানেও সেই পাণ্ডার দল! অনেক কষ্টে তাদের হাত হতে নিজেদের বাঁচিয়ে বন্ধুরা ও পত্নী পূজা দিতে মন্দিরে ঢুকলেন। আমি অনেক অনুনয় ও অনুরোধ সত্ত্বেও 'অন্ধকূপ-হত্যা'র (?) পুনরভিনয়ে রাজী না হয়ে মন্দিরের বাইরে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই ওরা পূজা দিয়ে ফিরে এলেন, সকলেরই গলায় এক এক ছড়া করে লম্বা গোলাপ ফুলের পাপড়ির মালা! যাক্, এভাবে পূজার গুরুকার্য্য শেষ করে আমরা আবার নীচে নামতে আরম্ভ কল্লুম। নীচে নামতে নামতে ডাক্তার মিত্র বল্লেন "হয়ে গ্যাছে!"

আমি প্রশ্ন কল্লুম "কি হোল!"

জবাব দিল চ্যাটার্জ্জি—"আর কি, তোমাদের ছবি!" ঝতে পাল্লুম স-পত্নী-আমি নামছি, তাই বন্ধুরা ক্যামেরাগত করেছেন! কিন্তু হলে কি হবে, মন্দিরের অভ্যন্তরে এত কম আলোকে ছবি উঠতে পারে না, তা' আমি বেশ ভালই জানতুম। তাই প্রতিমাকে ক্ষুণ্ণ না হতে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম "ও ছবি উঠবে না, ভয় নেই!" হয়েছিলও তাই ঠিক! বন্ধুদের চেষ্টা সেবার সফল হয়নি!

যাক্, নীচে এসে প্রতিমা বল্লে—"ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে;" ডাবের খোঁজ কল্লুম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে যেখানে যেদিকে চোখ পড়ে ফলভার-অবনত নারকেল গাছ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না, সেখানে অনেক চেষ্টা করেও ডাব পাওয়া গেল না; তখন অগত্যা লেমনেডেই কায সারতে হলো!

আমরা আবার মোটরে চড়ে রওয়ানা হলুম শ্রীরঙ্গম্-এর পথে! শ্রীরঙ্গম্ 'ত্রিচি' হতে প্রায় ৮।৯ মাইল দূরে, কাবেরী নদীর উপর সেতু আছে, তা পার হয়ে যেতে হয়। শ্রীরঙ্গম্-এর প্রায় তিন দিকেই নদী, এজন্য স্থানটি একটি দ্বীপের মত! আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই গিয়ে পৌছলুম শ্রীরঙ্গম্-এর বিখ্যাত মন্দিরের সম্মুখে! তারপরেই নাটমন্দিরে, সেখানে অসংখ্য দোকানপাট, মনে হয় যেন একটা বাজার! সেগুলি পার হয়ে ধ্বজস্তম্ভের কাছে পৌছতে হয়। এগুলি পিতলের উপর সোনার রং করা এবং দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরেই একটি করে আছে। তারপরেই মন্দিরের দ্বারে একটি বিশাল বৃষ-মূর্ত্তি! ওগুলি পার হয়ে খানিকটা ঘুরে তবে আসল মন্দিরে পৌছান যায়! মন্দিরের দ্বারে সেদিন কি পর্ব্বোপলক্ষে ভীষণ জনতা এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ! সম্মুখেই মাথার উপর ঝুলানো প্রকাণ্ড একটা তামার হাঁড়ী, তাতে দর্শক ও ভক্তেরা টাকা পয়সা যার যা' খুসি ছুঁড়ে ফেলছে। দেখা-দেখি আমরা কিছু ছুঁড়ে ফেল্লুম তার মধ্যে; এই ফেলাতে ঠুং ঠাং করে যা' শব্দ হচ্ছিল বেশ লাগছিল কানে! আমাদের চারিদিকে ভীষণ জনতা। হঠাৎ দেখতে পেলুম, মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলবার উপক্রম হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল জনতার ঠেসাঠেসিও এত বেশী হয়ে উঠলো, যে আমাদের ক'জনকে শ্রীমতী প্রতিমাকে ভীড়ের ঠেলা হতে বাঁচাতে হাতে হাত ধরে চারিদিকে দাঁড়াতে হলো। এমন সময় হঠাৎ মন্দিরের দ্বার একবার খুলে নিমেষের জন্য আবার বন্ধ হয়ে গেল! ভক্তেরা—কি একটা চীৎকার করে উঠ্‌লো! আমাদের ভাগ্যে, শুধু সিংহাসনের চূড়া ছাড়া, রঙ্গশয়নে ভগবান্ দর্শন আর ঘটলো না! শুনতে পেলুম,

সেদিনে ভগবানের দর্শন পেলে নাকি মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। যাক্, শায়িত ভগবান দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় ভাগ্যে ছিল না; কেন না সেদিন আর দ্বার খুলবে না, তাই ঘটলো না; তবে যদি সিংহাসনের চূড়া দর্শনে কোন পুণ্য থাকে, তবে হয়ত খানিকটা আমরা পেতেও পারি এই সান্ত্বনা নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম মন্দির হতে। নাটমন্দিরে এসে পত্নী এ কিনবো ও কিনবো বলে বায়না ধল্লেন। বন্ধুরা বল্লেন "এই সর্ব্বনাশ, এবার দেরী হয়ে যাবে!" কিন্তু পত্নী নাছোড়! অগত্যা বন্ধুত্রয় শীগ্‌গির শীগ্‌গির শেষ কর্ব্বার উপদেশ দিয়ে নিরুপায়ভাবে অনুমতি দিলেন। প্রতিমা যা' দেখেন, তাই পছন্দ, কিনতে চান; সুযোগ বুঝে দোকানীরাও যা' খুসী দাম হেঁকে বসে! এরকম করে, এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে, চন্দনকাঠের পুতুল, বেতের সাজি, দক্ষিণ ভারতের ঠাকুর-দেবতার ছবি ইত্যাদি অনেক কিছুতে চারখানা হাতে তিল ধারণের আর স্থান রৈল না। তখন পত্নী নিরস্ত হলেন; কিন্তু ওঃ হরি! কোথায় বন্ধুরা! তারাও যে দেখছি এ-দোকান হতে ও-দোকানে গিয়ে কোমর বেঁধে দর কসাকসি কচ্ছেন! আমি তাড়া দিলুম "ভীষণ বেলা হয়ে গেল, আর কত?" বন্ধু চ্যাটার্জ্জি অনুনয়ের সুরে বল্লে "ভাই এই হলো বলে!" আরো পোনর মিনিট চলে গেল, তখন প্রতিমা সুযোগ পেয়ে বল্লেন "এ কি! আপনারাই ত দেরী কচ্ছেন!" ডাক্তার মিত্র ও নায়ক ক্রীত পোটলা-পুটুলি সামলাতে সামলাতে বল্লেন "এই এলুম বলে!" কিন্তু এই করতে করতে আরও পোনর মিনিটের আগে আমরা গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌তে পাল্লুম না। তারপর ব্যস্তভাবে গাড়ীতে বসতে গিয়ে বেচারা চাটুয্যের দেবদেবীর ছবিখানাই আমার দেহের চাপে গেল ভেঙে!

শ্রীরঙ্গম্ হতে আমাদের গন্তব্যস্থল হ'ল, 'ত্রিচি'র জম্বুকেশ্বরের মন্দির। ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে আমরা প্রায় পোনর কি বিশ মিনিট পরেই পৌছলুম সেখানে! এখানেও মন্দিরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে সুউচ্চ গোপুরম্। তা' পার হয়ে অনেকেটা পথ রোদে হেঁটে তবে শিবের মন্দিরে গিয়ে পৌছতে হয়। মাথার উপরে রোদ খাঁ খাঁ কচ্ছে, আর বেলা দুটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে প্রতিমার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল; সুতরাং রোদের মধ্যে শুধু পায়ে অত দূর হেঁটে যেতে হবে দেখে তার আর পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ পর্য্যন্ত ছিল না। সুতরাং এবার পুণ্য সঞ্চয়ের ভার পড়লো পতির উপর, অর্থাৎ "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" কবিবাক্য তিনি শিরোধার্য্য কল্লেন, গোপুরমের ছায়ায় গাড়ীতেই বসে থেকে! আমরা বন্ধুচতুষ্টয় মন্দিরের দিকে খানিক এগিয়ে গিয়েই আর ধীরে সুস্থে যেতে পাল্লুম না, একেবারে ডবল মার্চ্চ করতে হলো; কারণ প্রখর গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যতাপে মন্দির প্রাঙ্গণের বালুকারাশি এত গরম হয়েছিল যে আমাদের মনে হচ্ছিল পায়ে বুঝি এখুনি ফোস্কা পড়বে! তাই দীর্ঘশ্বাসে ছুটে মন্দিরে ঢুকতে হলো! এখানকার জম্বুকেশ্বর শিব কাশী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানের মত মন্দিরের অভ্যন্তরে মাটির নীচে স্থাপিত। সেখানে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয় এবং একটা ছোট পাথরের দরজা দিয়ে দেব-স্থানে পৌছতে হয়। একে ত নীচে, তাতে আবার অন্ধকার, সুতরাং অনবধানতাবশতঃ দ্বারের নীচু পাথরের চৌকাঠে গেল আমার মাথা ঠুকে! আর একটু হলে মাথার খুলিই ভেঙে যেতো বোধ হয়। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল—তাই যত শীগ্‌গির সম্ভব দেব-দর্শন শেষ করে আমি এক নিশ্বাসে বেরিয়ে এলুম ও দীর্ঘশ্বাসে প্রাঙ্গণ পার হয়ে এসে গাড়ীতে বসলুম। বন্ধুরা ভক্তিভরে পূজা শেষ করে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলেন, তারপরেই প্রাঙ্গণে এসে জ্বলন্ত উনুনের উপর গরম বালিতে যেমন করে খৈ ফুট্‌তে থাকে ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে পৌছলেন গাড়ীতে। পত্নী তখন অতি বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লেন "ওই জন্তেই আমি যাইনি।" পুণ্য সঞ্চয় করতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয় বৈকি—এই বলে বন্ধুরা মনকে আশ্বস্ত কচ্ছিলেন। অবশেষে রোদে তেতেপুড়ে পেটে জ্বলন্ত হুতাশন নিয়ে যখন স্টেশনে এসে পৌছলুম, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন।

ভোরে আমাদের স্নান করা হয় নি, তাই কাপড় তোয়ালে নিয়ে বাথ্‌রুমে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় অন্য বাথরুম্ হতে বেরিয়ে ডাক্তার মিত্র বল্লেন "আপনারা যদি আজ স্নান করতে পারেন তবে বুঝবো আপনি প্রকৃতই বীর পুরুষ ও বন্ধুপত্নী বীরজায়া।" ব্যাপারটা বুঝতে পাল্লুম, কিন্তু তবু অন্ততঃ হাত মুখ না ধুলেই নয়, তাই বাথরুমে ঢুকতে হলো! আমি হাতে জল ঢেলেই দেখি তা' একেবারে টগ্‌বগ্ করে ফুটছে! ওদিক থেকে মেয়েদের স্নানের কামরা

হতে পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম "ওরে বাপ্‌রে, এ জলে চাল ছেড়ে দিলে এখুনি ভাত হয়ে যাবে!" আমি ডেকে বল্লুম "নিজেকে সেদ্ধ করে কাজ নেই, কোন রকমে মুখ হাতপা ধুয়ে চলে এস!" প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে হাতমুখ ধুয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। খাঁটি ব্রাহ্মণের হোটেলে পুরী-লুচীর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল; অতঃপর তাই দিয়ে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, একরকম ভূরিভোজনই হলো বলতে হবে।

তারপর ঘণ্টা দুই ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে বসে ছটফট্ কল্লুম; তাকে কিছুতেই বিশ্রাম বলা চলে না, কারণ ঘরের উত্তাপ মানুষের শরীরের উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশী ছিল! অবশেষে যখন রোদ পড়ে এলো, তখন সবাই মিলে পায়ে হেঁটে বের হলুম বেড়াতে! প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ফিরে এসে আবার স্নানের ঘরে ঢুকলুম। ততক্ষণে জলের উত্তাপ অনেকটা নেমে এসেছিল, তবু তাকে ঠাণ্ডা বলা চলে না। তাতেই স্নান করে বেশ একটু সুস্থ বোধ কল্লুম। তারপর নৈশাহার শেষ করে ধীরে আস্তে ও সুস্থে গিয়ে হাজির হলুম প্ল্যাটফর্ম্মে, সেতুবন্ধ রামেশ্বর-গামী গাড়ীর প্রতীক্ষায়।

দ্বিজশঙ্করের সত্যনারায়ণের পাঁচালী

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্‌-এ

প্রবন্ধ

আদিতে সত্যনারায়ণ বৈষ্ণবের দেবতা ছিলেন, পরে অবৈষ্ণব কর্ত্তৃকও তাঁহার পূজা ব্যাপকভাবে বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছিল। এমন ভাগ্য সকল ঠাকুরের হয়না। অথচ দেবতা-হিসাবে ইনি বৈকুণ্ঠস্থিত বিষ্ণুর বা ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণের লৌকিক সংস্করণ মাত্র। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ২৩৩-৩৬ অধ্যায়ে ইঁহার ব্রতকথা বর্ণিত আছে। ইহাতে তাঁহাকে 'জনার্দ্দন' 'অতুলতেজসম্পন্ন বিষ্ণু' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া থাকিলেও এবং দেহান্তে তাঁহার ভক্তগণের 'বিষ্ণুপুর' প্রাপ্তির কথা উল্লেখ থাকিলেও, শাক্তের মঙ্গলচণ্ডী ও চণ্ডীতে যতখানি পার্থক্য, বৈষ্ণবের সত্যনারায়ণ ও নারায়ণে অন্ততঃ ততখানি পার্থক্য।

ইঁহার পূজার উৎপত্তি কখন হইয়াছিল জানা যায় না, কিন্তু মূল স্কন্দ-পুরাণে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে এই অধ্যায় চতুষ্টয়ও যে প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী যোজনা, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতির উপাখ্যান, অথবা ভবিষ্যপুরাণের অক্ষয়-তৃতীয়া, দুর্ব্বাষ্টমী, দধিসংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রতকথাগুলি তুলনীয়। বিশেষ কথা, স্কন্দ-পুরাণের সকল সংস্করণে সত্যদেবের ব্রতকথা নাই, আছে মাত্র বঙ্গদেশীয় সংস্করণে।

কিন্তু কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা মোটেই নিরাপদ নয় যে, বঙ্গদেশেই এই পূজার প্রথম উৎপত্তি বা এই অধ্যায় কয়টির রচনা জনৈক বঙ্গদেশীয় কবির। উপাখ্যানে বর্ণিত স্থানগুলি একটিও বাঙ্গালার নয়। কবির মতে সত্যদেবের ভক্তগণ থাকিতেন কাশীপুরে, থাকিতেন সিন্ধুতীরে ইত্যাদি। কালিদাস বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসাইয়া উজ্জয়িনীবাসী হইয়াছেন। সেইরূপ 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র কবি কৃষ্ণমিশ্র রাঢ়াপুর ও ভূরিশ্রেষ্ঠির উল্লেখ করিয়া বাঙালী হইয়াছেন। এই নীতি অনুসারে সত্যনারায়ণের ব্রতকথার কবির পশ্চিম-ভারতবাসী হওয়া প্রয়োজন। আরও দ্রষ্টব্য, উপাখ্যানের পাত্রদিগের নামগুলিও 'উল্কামুখ', 'বংশধ্বজ' ইত্যাদি। কবি বাঙালার হইলে কি তাঁহার হৃদয়ে এক ফোঁটা বাঙালী-জন-সুলভ কোমলতা ছিলনা?

কিন্তু কবির নিবাস যে দেশেই হোক্, তাঁহার রচিত উপাখ্যান অবলম্বনে বিগত ২৫০।৩০০ বৎসরের মধ্যে বাঙালা ভাষায় বহু গণ্য ও নগণ্য কবি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথম কারণ, পাঁচালী লিখিবার সহজসাধ্যতা। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতির পুঁথি লিখিতে যে পরিমাণ শ্রম, সময় ও পাণ্ডিত্যের আবশ্যক, সেই তুলনায় একটি ক্ষুদ্র ও সহজ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া লাচারী-ত্রিপদী-পয়ারাদিতে পৃষ্ঠা আট-দশ-বার ব্যাপী একখানি খণ্ডকাব্য লেখা কঠিন নয়। বরঞ্চ এত সোজা যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পনের বৎসর বয়সেই এক বা একাধিক সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়া সমাদর পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, গত তিন্ শতাব্দীর মধ্যে পূজার বহু বিস্তৃতি। দেশে ঠাকুরের পূজার যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছিল, কাজেই কবির পর কবি-পাঁচালী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে দেবতার যত বেশী আদর ও প্রতিষ্ঠা, তাঁহার সম্বন্ধে রচিত সাহিত্যের পরিমাণ তত বেশী হওয়ার কথা।

কিন্তু এই পাঁচালী-সাহিত্যটা বুঝিবার আগে, মূল গল্পটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে দেখা দরকার।

চারিটি অধ্যায়ে চারিটি স্বতন্ত্র গল্প, কেবল প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির সম্বন্ধ আছে। প্রথম গল্প কাশীপুরের (বারাণসীর) এক ব্রাহ্মণের—কি করিয়া ব্রাহ্মণ জঠরের জ্বালায় ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সত্যনারায়ণ তাঁহাকে দারিদ্র্যনাশের উপায়-স্বরূপ সত্যনারায়ণের ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং কি করিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিমাসে ব্রত-পালন করিয়া সর্ব্বসম্পদ লাভ করিলেন। দ্বিতীয় গল্প বলে, এই ব্রাহ্মণ হইতে এক কাঠুরিয়া ব্রতের মহিমা অবগত হইয়া সেই অবধি যথাবিধি ব্রতপালন করিয়া ইহলোকে ধনবান ও পুত্রবান হইল এবং দেহান্তে সত্যপুরে বা বিষ্ণুলোকে গমন করিল। তৃতীয় গল্পটি অপেক্ষাকৃত বড়। উল্কামুখ নামে জনৈক রাজা ও তাঁহার রাণী একদিন সিন্ধুতীরে সত্যনারায়ণের ব্রত করিতেছিলেন। এক নিঃসন্তান বণিক বাণিজ্য-যাত্রাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া সিন্ধুতীরে নৌকাস্থাপন পূর্ব্বক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ভক্তিসহকারে কি করিতেছেন?" রাজার উত্তর শুনিয়া বণিক অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সত্যদেবের পূজা করিলেন এবং অচিরেই তাঁহার পত্নী লীলাবতীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল। বণিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, কন্যা কলাবতীর বিবাহ সময়ে নানা উপচারে সত্যদেবের পূজা করিবেন। কিন্তু বয়স্থা হইলে কলাবতীকে কাঞ্চননগরের এক বণিকপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া বণিক জামাতাসহ চন্দ্রকেতু রাজার নগরে বাণিজ্য করিতে চলিয়া গেলেন, প্রতিজ্ঞাটা আর রক্ষা করা হইল না। সত্যদেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। কঠোর দুঃখে পতিত হইবে বলিয়া তিনি বণিককে শাপ দিলেন। পরের ঘটনাগুলি যথাক্রমে—এক চোরের চন্দ্রকেতু-রাজার ধন হরণ করিয়া পশ্চাদ্ধাবমান রাজদূতের ভয়ে বণিকের বাসস্থানে সেই ধন ফেলিয়া দিয়া পলায়ন, রাজদূতদিগের স-জামাতা বণিককে চোর সন্দেহে বন্ধন ও কারাগারে নিক্ষেপ, বণিকের অপরাধে তাঁহার নিজগৃহে লীলাবতী ও কলাবতীর অশেষ দুঃখ, পরে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সত্যনারায়ণের ব্রত-কথা শুনিয়া কলাবতী ও তাহার মাতার সেই ব্রতের অনুষ্ঠান এবং সত্যদেবের সন্তোষ। সন্তুষ্ট হইয়া সত্যদেব বন্দীদ্বয়কে সত্বর মুক্ত করিয়া দিতে রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া বণিক ধনরত্নপূর্ণ তরণী লইয়া গৃহগমনোদ্দেশ্যে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভক্তিপরীক্ষার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর বেশে সত্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকাতে কি আছে?" বণিক পরিহাস করিয়া বলিলেন, "লতাপাতা।" ক্রুদ্ধ সত্যদেবও কহিলেন, "তথাস্তু"। এই বচনের যাথার্থ্য অবলোকন করিয়া বণিক কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছাগত থাকিবার পর জামাতার পরামর্শে সেই সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া নানারূপ স্তুতি করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দন পরিতুষ্ট হইলে বণিকের নৌকাও পুনরায় ধনরত্নে পূর্ণ হইল। এদিকে দূতমুখে বণিকের আগমন-বার্ত্তা জানিয়া হর্ষান্বিতা লীলাবতী সত্যদেবের পূজা করিলেন, কিন্তু কলাবতী আর এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। পূজান্তে প্রসাদ না লইয়াই স্বামী-সন্দর্শনে গমন করিলেন। কোনও দেবতাই এত অবজ্ঞা সহ্য করিতে পারেন না, সত্যদেবও করিলেন না; কলাবতীর স্বামীকে নৌকাসহ জলমগ্ন হইতে হইল। বণিক প্রভৃতি সকলে তখন ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিলেন এবং কলাবতী গৃহে আসিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলে কাঞ্চননগরের বণিকপুত্রের উদ্ধার সাধন হইল। বাকী জীবনটা বণিক প্রতি পূর্ণিমায় ও সংক্রান্তিতে সত্যদেবের ব্রত করিয়া অশেষ ভোগসম্পন্ন হইয়া অবশেষে ত্রিগুণাতীত সত্যপুর প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থ এবং শেষ গল্পানুসারে—বংশীধ্বজ নামে রাজা মৃগয়ার্থ বনে গিয়া তথায় গোপগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সত্যদেবের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ফলে শতপুত্র এবং সমস্ত বৈভব হারাইলেন। পরে পুনরায় গোপগণের নিকট গিয়া সত্যদেবের পূজা করিয়া পুত্র ও ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপুর গমন করিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২০, নং ৫২১, পৃঃ ৬১) কবি জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যের সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর পরিচয় প্রসঙ্গে মুন্শী আবদুল করিম মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই পুঁথিখানি কমলাতন্ত্রের সংস্কৃত ভাষায় সত্যনারায়ণ ব্রতকথার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ"। একথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে, স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড ব্যতীত আর একখানি গ্রন্থও বাঙ্গালায় সত্যদেবের পাঁচালী-সাহিত্যের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কমলাতন্ত্র দেখি নাই, তাহার আখ্যানভাগে কি আছে না আছে তাহাও জানি না. কিন্তু মুদ্রিত বা হস্তলিখিত যতগুলি সত্যনারায়ণের পুঁথি এ পর্য্যন্ত চোখে পড়িয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই রেবাখণ্ডের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

অবলম্বন বলিতেছি, কারণ কোনখানিই ঠিক মূলের অনুবাদ নয়। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৮, পৃঃ ১৯৪-২০০) দ্বিজ বিশ্বেশ্বরের পাঁচালী ছাপা হইয়াছে, সম্ভবতঃ এইখানিই প্রকাশিতগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূলানুগত, কিন্তু ইহাতেও কবি নিজস্ব মুন্সিয়ানা কিছু কিছু দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বিজ বিশ্বেশ্বর এবং সম্ভবতঃ আরও ২।১ জন ব্যতীত বাঙালার সত্যদেবের পাঁচালীকারদের বিশেষত্ব হইতেছে যে, তাঁহারা মূলের চতুর্থ গল্পটি একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। আর এক বিশেষত্ব, মূলের গল্পগুলি যেরূপ ছাড়া-ছাড়া—তাঁহারা পাঁচালীতে তৎপরিবর্ত্তে বাকী তিনটি গল্পের একটা ক্রম-সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন একটি বড় গল্পের তিনটি অংশমাত্র। আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রথম দুইটি গল্পকে যেন-তেন-প্রকারেণ সমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় গল্পটির উৎকর্ষসাধনে প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক যত্নবান হইয়াছেন। এই জন্যই সাধারণতঃ এদেশে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা লীলাবতী-কলাবতীর উপাখ্যান বলিয়া পরিচিত। বাঙালাদেশে যে পাঁচালীখানি চলে বেশী, তাহার রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, রামেশ্বরী পাঁচালী সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা মূল-বহির্ভূত এবং উহার সত্যদেব আগে সত্যপীর, পরে সত্যনারায়ণ। তা ছাড়া, বাঙালী রামেশ্বর মূল উপাখ্যানকে

কিছুমাত্র স্বদেশী ছাপ দিতে প্রয়াস পান নাই। কেন ভট্টাচার্য্য রামেশ্বরের পাঁচালী বাঙালার হিন্দুদের নিকট শতাধিক বৎসর হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে বুঝি না।

আলোচ্য প্রবন্ধে দ্বিজশঙ্করের পাঁচালীর পরিচয় দিব। ইহার যে দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় দুইখানিই খণ্ডিত। তবে এই দুইখানি মিলাইয়া সমগ্র উপাখ্যানের অন্ততঃ চারিভাগের তিনভাগ উদ্ধার করিতে পারিতেছি, শেষের একভাগ বা তদপেক্ষা অল্পাংশ পাওয়া গেল না। সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে রচিত অসংখ্য পাঁচালীর মধ্যে কাব্যের দিক দিয়া এখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এমন কথা সহসা বলিতে পারি না; কিন্তু উৎকৃষ্টগুলির মধ্যে এখানে যে অন্যতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিতে বসিয়াও দ্বিজশঙ্কর কবি-হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বিজয়রামের পুত্র যে শঙ্কর বন্দ্য'র রামায়ণের অনুবাদের কয়েক কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', অনুবাদশাখা দ্রষ্টব্য) ও বর্ত্তমান পাঁচালী লেখক দ্বিজশঙ্কর অভিন্ন কিনা বলা যায় না। কিন্তু যে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত সত্যদেবের পাঁচালী বটতলার একাধিক প্রকাশক রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পাঁচালীর সহিত একত্র ছাপিয়াছেন, সেই পাঁচালী ও বর্ত্তমান পাঁচালী এক নয়। "৺শঙ্করাচার্য্য ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত" বলিয়া যে পাঁচালীখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোনও জ্ঞাত শঙ্করাচার্য্যের রচনা নয়।

আলোচ্য পাঁচালীর একটি ভণিতায় পাইতেছি, "রচিল শঙ্কর কবি, অভয়াচরণ সেবি, কলাবতী রূপের বর্ণন।" হয় দ্বিজশঙ্কর শাক্ত ছিলেন, না হয় 'অভয়া' তাঁহার মাতার নাম। ইহার অধিক তাঁহার অন্য কোনও পরিচয় জানি না।

সত্যদেবের অধিকাংশ পাঁচালীকারের ন্যায় দ্বিজশঙ্করও ব্রাহ্মণের এবং কাঠুরিয়ার প্রথম গল্পদ্বয়কে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়াছেন। তারপরে লীলাবতী-কলাবতীর উপাখ্যান আরম্ভ।

"লক্ষপতি সদাগর, গৌড় নগরে ঘর, বাণিজ্য করিয়া যায় দেশে।
কাঠুরিয়া নানা ফুলে, সত্য পূজে নদীকুলে, সদাগর তাহারে জিজ্ঞাসে॥
কোন দেব পূজ সভে, পুজিলে কি ফল হবে, নানা দ্রব্য দিয়া উপহার।
কাঠুরিয়া বলে বাণি, পুজি সত্য গুণমণি, কামনার সিদ্ধি অবতার॥
বলে সাধু লক্ষপতি, সুতাসুত এক যদি, কৃপা করি দেন নারায়ণ।
তবে সত্যধ্যে (?) যাইয়া, কুল-পুরোহিত লইয়া সীর্ণ দিব সওয়া লক্ষণ মন॥
কামনা করিয়া গেল, নিজপুরে উত্তরিল, থাকে সাধু সদা হৃষ্টমতি।
তাহাতে সত্যের বরে, কন্যা এক হইল ঘরে, নাম রাখে তাহার কলাবতি॥"

মূল উপাখ্যানে সদাগরের কোনও নাম দেওয়া নাই; রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, কবিবল্লভ (বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৯১) প্রভৃতি কয়েকজনের মতে, তাঁহার নাম সদানন্দ। কিন্তু বণিকের 'সদানন্দ' নাম অপেক্ষা 'লক্ষপতি' বা এই জাতীয় নাম বেশী উপযোগী। এইজন্য বহু পাঁচালীকারই এই নাম পছন্দ করিয়াছেন। দ্বিজ রামভদ্র প্রণীত একখানি খণ্ডিত পাঁচালীও আমার নিকটে আছে, ইহাতে সদাগরের নাম 'ধনেশ্বর'। 'লক্ষপতি সদাগরে'র 'গৌড়নগরে' ঘর ছিল, দ্বিজ-শঙ্করের এই কথাতে নূতনত্ব আছে। মূলের বণিক থাকিতেন সিন্ধুতীরে।

ইহার পর, কলাবতীর রূপ বর্ণন :—

"তাহার দুখানি পদ, শোভে জেন কোকনদ, নখর কেবল হিমকর।
প্রবেশ করিতে ঘরে, সম্ভমে দেখিয়া তারে, তিমির লুকায় পাইয়া ডর॥
কেশরি জিনিয়া মাজা, অতি সুগঠন ধজা, কমল মৃণাল বাহুতালি।
সুপক্ক দাড়িম বিজ, তাহার সমান দ্বিজ, শোভে জেনো মুকুতার বলি॥
রামরম্ভা জিনি উরু, মদন কামান ভুরু, পক্ক বিম্ব অধর জ্যোতি।
কমলে খঞ্জন জেন, বদনে নয়ন তেন, সর্ণগুঞ্জ জিনিয়া মূরতি॥
বদন শরদ শশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি, শোভে যেন বিজলি বিশেষ।
খগপতি নাসা জিনি, গমনেতে কুঞ্জরিণী, চমরী চামর জিনি কেশ॥
চরণে নূপুর বাজে, কটিতে ঘুঙ্গুর সাজে, গলে শোভে গজমতি হার।
গজদণ্ড শঙ্খ হাতে, নীল চুনি বসা তাতে, আর কতো আছে অলঙ্কার॥
জিনিয়া তপন, সুবর্ণ কঙ্কণ, শঙ্খের উপমা নাই।
খড়িা পশু শাখা, তাহার নাহি লেখা, হিরা বসা ঠাঁই ঠাঁই॥
পক্ক বিম্ববর, জিনিয়া অধর, দশন ভ্রমর পাতি।
নাসিকার উপরে, ঝলমল করে, বেসর মউর সাতি॥
কনক কঙ্কণ করে, নখরেতে সুধাকরে, দর্পণ অঙ্গুরী ভাল সাজে।
কনক রচিত ঝাঁপা; লোহিত পাটের থোপা, সুবর্ণ অঙ্গদ বাহু মাঝে॥
নিতম্ব উপরে বেণি, জেমত অসিত ফণি, মউরে খাইতে করে আস।
কাঞ্চনে রচিত লতা, অঞ্চলে মুকুতা গাঁথা, পরিধান করে হেমবাস॥
সম্মুখ মণ্ডল বাজে, নাসিকায় বেসর সাজে, নীলবাসে যেন বিনোদিনী।
বৃদ্ধলোকে দেখি কহে, এ কন্যা মানুষী নহে, বুঝি হবে ইন্দ্রের নাচনি।
কপালে কনক সিঁথি, অলকা মুকুতা পাতি, করপদ কমলে বদন।
কুঙ্কুম কস্তুরি অঙ্গে, ষট্‌পদ উড়িছে গন্ধে, কর্ণে শোভে ত্রিবিধ কুণ্ডল॥
ললাটে সিন্দূর ছবি, জেন প্রভাতের রবি, রূপ দেখি ঝুরে কতজনা।"

এই চারুচিত্রখানি যেমন বিশদ তেমনই নিপুণ। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডী-কাব্যে বিবাহের পূর্ব্বে খুল্লনার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়।

একাদশ বৎসর অতিক্রম হইয়া যায়, তবু কন্যার বিবাহ হইল না, সদাগর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তখন—

"ঘটক ডাকিয়া আনি, লীলাবতি বলে বাণি, শুন ঘটক আমার বচন।
পাত্র কুছিত (কুৎসিত) হলে, মোর দুঃখ জাবে মৈলে,
তোমা প্রতি রহিবে গঞ্জন॥
শুনি লক্ষপতি কয়, কৈশর বয়েস হয়, সুবুদ্ধি সুন্দর গুণবান।
আমার গৃহেতে রয়, অন্য স্থানে নাহি জায়, তারে আমি কন্যা দিব দান॥"

মাতা ও পিতা তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়া কন্যার জন্য নিজের নিজের অন্তর-কথা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া ঘটক কাঞ্চননগরের শঙ্খপতির

সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্রের নিবাস যে কাঞ্চননগরে ছিল একথা মূলেও আছে, কিন্তু 'শঙ্খপতি' নামটি বাঙ্গালার পাঁচালীকারদের যোজনা।

শঙ্খপতি সম্বন্ধে কবি বলেন—

"অশেষ গুণের ধাম, পাত্র অতি অনুপাম, বিভা হবে তাহার সঙ্গতি।"

এই স্থানে পুঁথির প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। শঙ্খপতির বিবাহের উদ্যোগে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষপতি স্বজন লইয়া লিখন (পত্র) লিখিয়া দেশে দেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিমন্ত্রণ পাইয়া জ্ঞাতি ও বন্ধুজন সুন্দর বেশে তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। কবি তারপর আগত নারীগণের নাম ও রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"কমলা কামিনী ভৈরবী ভবানী কেশরি কেশরীবতি।
জমুনা আনন্দী মাধবী কালিন্দী সুধামুখী সরস্বতী॥
পদ্মিনী চিত্রিণী নীলপদ্ম জিনি নয়ান জুগল সাজে।
চরণে নুপুর কটিতে ঘুঙ্গুর অতি সুমধুর বাজে॥
চরণে নুপুর অতি সুমধুর অঙ্গুরি তাহার পাসে।
বিচিত্র বসন কনক বসন কটিতট মাঝে ভাসে॥
অতি অনুপাম মুকুতার দাম প্রবাল তাহার মাঝে।
তাহার উপর হেমের জিঞ্জির, প্রসন্ন হৃদয়ে সাজে॥
* * * * *
চন্দন বিন্দু শোভে যেন ইন্দু সিন্দুরের বিন্দু ভালে।
রবি সুধাকর দোঁহার উদয় হইল একই কালে॥
করবির মাঝে নানা ফুল সাজে ভ্রমরা উড়িছে তায়।
বাসিত আতর সভার অম্বর মাধুরি চলনে জায়॥"

কবি আতরের উল্লেখ করিতেছেন; নূরজহাঁ (১৬১১-১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ) নাকি গোলাপী আতরের স্রষ্টিকর্ত্রী। কবির বয়স তাহা হইলে কত?

ইহার পর ব্রাহ্মণ-বাড়ী হইতে জল সাধিয়া আনিবার পালা—

"সাধুর সুন্দরি, কুলা মাথে করি, চলিল সভার আগে।
আর এক নারি, কাঁখে হেমঝারি, তাহার পশ্চাদ্ভাগে॥
দ্বিজ বাড়ী গিয়া, উলধ্বনি দিয়া, প্রথমে সাধিল জল।
দিয়া গুয়া পান, করিয়া সন্মান, আশীষ পাইলা ফল॥
জায় তারপর, বাহ্মণের ঘর, স্থির করি উপাদান।
বণিক সন্মনি, জল সাধি আনি, তাম্বুল করিলা দান॥
বৈদ্যের ভবনে, জল সাধি য়ানে, পদজ তারপরে।
সাধুর সুন্দরি, কুলা মাথে করি, জল সাধি আনি ঘরে॥"

তারপর বরের বিবাহ-যাত্রার কথা—

"ইদিকে বরের কথা শুন বন্ধুজন।
নিমন্ত্রণ করিআ য়ানে কুটুম্ব সজ্জন॥
বিবাহ করিতে যায় সাধু শঙ্খপতি।
কত সত লোক জায় তাহার সংহতি॥
হস্তিতে ঘোটকে কেহ, কেহ মরজানে।
পদব্রজে যায় কেহ আপনা সাজনে॥
বিচিত্র নিসান উড়ে দেখিতে তামাসা।
উঠের উপরে বাজে দারুণ ধামসা॥
রায়বেস্থাগণ কত জায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঢাল খাঁড়া হাতে ঢালি জায় থাকে থাকে॥
ধনুকি চলিল কত জমের দোসর।
ধনুকের পৃষ্ঠে বাঁধা হাড়িয়া চামর॥
হাউই ভুইচাপা চরখি লোটন সিতাহার।
আতস লইয়া যে সাজিল মালাকার॥
নর্ত্তকী নর্ত্তক নৃত্য করে নানা তান।
গন্ধর্ব্ব সদৃশ জন করে বাদ্যগান॥
এতেক সাজনে শঙ্খপতির গমন।
বাদ্য বাজে কত সত তাহে দেহ মন॥
নাগারা দুন্দুভি ভেরি ভেড়ু করতাল।
পাখোয়াজ বনসিঙা পুরে মহাতাল॥
সাহিনি মোহনি বেণি রবাব মৃদঙ্গ।
জোড়ঘাই মাদল বাজে দগড়ের সঙ্গ॥
কাঁশি ঘণ্টা শঙ্খ বাজে তুরমতি (?) সানাই।
ঢোল ঢাক বাজে কত লেপাজোখা নাই॥
ডুমডুম ডম্বুর বাজে শুনিতে রসাল।
ধ্যা ধ্যা ধামসা বাজে ডক্ক করতাল॥
বিং বিং সাবিন্দা বাজে দোতার উদার।
ঢোলক মন্দিরা বাজে কি কহিব তার॥
খঞ্জরি খমক বিনা কপিলাস পীনাক।
উত্তম বাজনা বাজে, বাজে জয়ঢাক॥
আপন সভাবে বাজে বড় বড় কাড়া।
আষাঢ়িয়া মেঘ জেন দিয়া জায় সাড়া॥
পণক গমক গদা বাজে সপ্তস্বরা।
জগঝম্প সিঙা বাজে অমৃতের ধারা॥
সরসোঙনা (?) মোচঙ বাজে ভেমচা উদরে।
এতেক বাজায় বাদ্য সাধুর গোচরে॥"

কবিকঙ্কণ ধনপতির, বিজয়গুপ্ত লখীন্দরের ও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের বিবাহের শোভাযাত্রার ও উৎসবের যে বর্ণনা দিয়াছেন, এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত একাসন পাইবার যোগ্য।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল। তৃতীয় খণ্ডে কবি বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহের পর বন্ধুজনের স্ব স্ব গৃহে গমন-বার্ত্তা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিয়া সদাগরের স-জামাতা বাণিজ্যোপলক্ষে বিদেশ-যাত্রার বিবরণ দিতেছেন,

"লক্ষপতি শঙ্খপতি, যাত্রা করি শীঘ্রগতি, বাণিজ্যেতে করিলা গমন।
আপনার নিজঘাটে, নৌকার উপরে উঠে, সপ্ততরি করিয়া সাজন॥

ঊর্দ্ধে নিশান উড়ে, নৌকায় দামামা পড়ে, দাড়ি মাঝি বসে সারি সারি।
কর্ণধারে সারি গায়, সঙ্গে মেলি পুরে সায়,আগে আগে চলে পালোআরি॥
বিংশতি দিবস পরে, কেদারমাণিক্যপুরে, দুই সাধু উত্তরিল আসি।
বাজারে করিয়া ঘর, বুঝে সাধু দরবর, ভাও দেখি মনে অভিলাসি॥"

কবি এই স্থানে একটি ভাল সুযোগ হেলায় হারাইয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে গৌড় হইতে কেদারমাণিক্যপুর পর্য্যন্ত পথের একটি সুন্দর ছবি দিতে পারিতেন। মূল উপাখ্যানে 'কেদারমাণিক্যপুর' নাই, চন্দ্রকেতু-রাজার নগরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করার কথা আছে। কিন্তু বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্র হইতে মুদ্রিত 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'য় পাইতেছি, সিন্ধু সমীপে রমণীয় রত্নসারপুরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রকেতুরাজার নগরে বণিক বাণিজ্য করিতে গেলেন। যাহা হউক, কেদারমাণিক্যপুরের উল্লেখ আরও ২।১ খানি বাঙালা পাঁচালীতে আছে। কিন্তু ইহা কোন্ স্থান তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শঙ্কর-কবি, বোধ করি, লক্ষপতিকে 'কেদারমাণিক্যপুরে'র পরিবর্ত্তে 'সিংহলে' লইয়া গেলে বাঙালার স্থায়ী প্রবাদের মর্য্যাদা বেশী রক্ষা করিতে পারিতেন।

তারপরে বণিক নবাগত-স্থানে গিয়া কোন কোন দ্রব্য ক্রয় করিলেন, তাহার একটা তালিকা দেওয়া আছে,—

"প্রথমে স্মরিয়া হরি, আপন কল্যাণ করি, নানা দ্রব্য কিনে সদাগর।
রূপা সোণা হিরা মণি, প্রবাল মাণিক্য চুণি, নানাবর্ণ অমূল্য প্রস্তর॥
কৈনে মণি সূর্য্যকান্ত, দীপ্তের নাহিক অন্ত, চন্দ্রকান্ত চন্দ্রের সমান।
নীলকান্ত বহুমূল্য, পদ্মরাগ পদ্মতুল্য, মরকত মণির প্রধান॥
বস্ত্র কেনে নানা জাতি, উড়নি আড়ানি আদি, ঘণ সুখি অধিক প্রকার।
কেনে সাড়ি কামতাই, যাহার তুলনা নাই, খিরদ গরদ পট্টবাস॥
চিরাসর বন্দ পাগ, লোহিত যাহার রাগ, গোস্পেস কিনিল সুন্দর।
খিরিমা পামরি জরি, ভোট পট্টু দৃষ্টি করি, জামা নিমা কেনে বহুতর॥
কেনে করি-দন্ত আসা, কনকে রচিত পাসা, অষ্টবল রজতে জড়িত।
নীলবর্ণ ছক আঁকে, কলাবতু থাকে থাকে, ঘন মেঘে যেমত তড়িত॥
অস্ত্রকেনে সদাগর, অস্ত্র নাহি তার পর, বন্দুকের অখণ্ড প্রতাপ।
বারানসা জোমধার, হিরা-বসা তলআর, উত্তম বনাত তার খাপ॥
কিনিল ত্রিপুর ঢাল, পিত্তলের সাজআল, খঞ্জর কামান তির অসি।
সুলফি ধকড়া টাঙা, লোহা-বাঁধা হাড়ভাঙ, কেনে সাধু বান অর্দ্ধ-শশি॥
অগুর কস্তুরি আর, চন্দন গন্ধের সার, কিনে সাধু হাড়িয়া চামর।
গঙ্গাজল সত গোটা, বিচিত্র মউর মুঠা, লাল পাখা পরম সুন্দর॥
কর্পূর জায়ফল লঙ্গ, এলাচি কতেক রঙ্গ, দারচিনি কেতকি খদির।
কেনে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বিচিত্র যাহার রঙ্গ, পঞ্চধারে রহে জার নীর॥
হরিহর করি আদি, তৈল কেনে নানা জাতি, নিবারণ করএ জাহে তাপ।
তৈল কেনে অনুপাম, হিমসাগর জাহার নাম, সিবা ভরা আতর গুলাপ॥
আর জত দ্রিব্ব দেখে, সকল কিনিয়া রাখে, গজমুক্তা কেনে সাবধানে॥"

এই তালিকার কতকগুলি কথাই অবোধ্য। কিন্তু 'কামতাই সাড়ি' ও 'ত্রিপুর ঢাল' এই দুই শব্দ দ্রষ্টব্য। আর দ্রষ্টব্য 'হরিহর তৈল'। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবি 'নারায়ণ তৈল' এবং বিষ্ণুতৈল-এর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'হরিহর তৈল' আর কোনও কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

শঙ্কর কবির পাঁচালীতে তারপরে কেদারমাণিক্যপুরের রাজবাটিতে চুরি, ফকিরের বেশে সত্যনারায়ণের কোটালকে চোরের সন্ধান প্রদান, স-জামাতা লক্ষপতির বার বৎসরের তরে রাজার বন্দিশালায় গমন, গৌড়ে লীলাবতী-কলাবতীর অসীম দুঃখভোগ, জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা দেখিয়া ঠাকুরের পূজার জন্য মাতা-পুত্রীর আয়োজন, ইত্যাদির অবতারণা আছে। পূজার উদ্দেশ্যে যে সকল পুষ্প চয়ন করা হইয়াছিল, তাহা একবার দেখিয়া লইতে পারি,—

"দ্রোণপুষ্প চন্দ্রমুনি, অতুল বরণখানি, নানা পুষ্প তুলিল সেউতি।
কবরি কেতকি (? কি) কুন্দ, কোকনদ মুচকুন্দ, কাঞ্চন কেশর জাতি জুতি॥
সর্ব্বজয়া দুই বুটি, অশোক কস্তুরি ঝুটি, আর্কপুষ্প জয়ন্তি মরাল।
গাঁরিব কদম্ব দল, অতিশয় সুকমল, তরুলতা কুসম বিধান॥
মল্লিকা মালতি জবা, ওচ (? তুচ) পুষ্প তোলে কিবা, সিউলি পিউলি নাগেশ্বর।
পারোলি মাধবি আদি, সন্ধ্যামুনি বিষ্ণুপদি, স্থলপদ্ম কুটজ টগর॥
তোলে পুষ্প সূর্য্যমুনি, অতুল বরণখানি, গন্ধরাজ পলাশ গন্ধিনি।
তোলে শতদল পদ্ম, বিরেক জাহাতে রঙ্গ, ভুমিচাঁপা অতি সুগন্ধিনি॥
দুলাল অপরাজিতা, করবি লোহিত সিতা, বকপুষ্প বাকস বকুল।
দূর্ব্বা তুলসিদল, আনিআ জাহ্নবীজল, চন্দনে ভূসিত করি ফুল॥"

এই পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সত্যদেব জামাতা-সহ বণিককে মুক্ত করিয়া দিতে কেদারমাণিক্যপুরের অধিপতিকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। মুক্তি পাইয়া লক্ষপতি যথাশীঘ্র সপ্তডিঙা সাজাইয়া গৌড় যাত্রা করিলেন।

"জামাতা সহিতে, উঠিল নৌকাতে, লইয়া সকল দাড়ি।
জয়ধ্বনি করি, উঠিল কাণ্ডারি, গাইতে লাগিল সাড়ি॥
উত্তম অম্বর, লইয়া সদাগর, বন্দিলা সভার মাথে।
একেতো গাবর, বাহিবার সাগর, সিরপা পাইল তাথে॥"

সেকালে বাঙালীর পাগড়ি পরিবার দৃষ্টান্ত। নৌকা চলিল, কিন্তু—

"দেখি সত্যপির, হইলা অস্থির, সাধু যায় প্রাণ ধনে।
ফকিরের ছলে, জাইয়া দেখি তারে, করে কিনা করে মনে।"

ফকিরবেশী সত্যনারায়ণের প্রশ্নের উত্তরে বণিক উত্তর দিলেন তাঁহার নৌকাতে লতাপাতা আছে।

পুঁথি এইখানেই খণ্ডিত। পরে কি হইল মূল উপাখ্যান দেখিয়া অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া সম্ভবপর। কিন্তু দ্বিজশঙ্কর মূলের চতুর্থ গল্পটি পরিত্যাগ করিয়াছেন কিনা তাহা আন্দাজ করা দুরূহ।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(১১)

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। ইলা গিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিল। লতা আগেই গিয়া উনুনে পাখা করিতেছিল। ছলছল চোখে ইলা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। ফিরিয়া একটু হাসিয়া লতা কহিল, "কি বৌঠাকরুণ ?"

"হাঁ বামুনদিদি, মা ব'ল্লেন সত্যিই কি তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ? তোমায় ছেড়ে কি ক'রে থাকব বামুন-দিদি ?" বলিতে বলিতে ইলা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

হাসিয়া লতা কহিল, "পাগল আর কাকে বলে ? সে ভাবনা আজই কেন ? আরও ত ক'মাস তোমরা আছ ?"

"মোটে দু'তিন মাস। সে ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে যাবে। তারপর—"

"তারপর—সে তখন বোঝা যাবে ? আজই তার জন্যে চোখের জল ফেল্‌ছ বৌঠাকরুণ ?"

চক্ষু মুছিয়া ইলা কহিল, "তাহ'লে যাবে বল।"

যাওয়া যেন ঠিকই হইয়া গেল। আশ্বস্তির একটু হাসিও মুখে ফুটিয়া উঠিল।

লতা কহিল, "যেতে কি আমার অসাধ কিছু থাক্‌তে পারে, বৌঠাকরুণ ? এই ত সবে মাস দেড়েক তোমাদের এখানে আছি। মনে হয় এ আমার আপন বাড়ী—তোমরা যেন আমার জন্ম জন্মের আপন জন ! তোমাদের ঘরে যদি থাক্‌তে পাই, মনে হবে তার চাইতে সুখের কিছু আর হ'তেই পারে না আমার।"

"তবে বল, সত্যিই যাবে ?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "মাকে ফেলে যে যেতে পারিনে বৌঠাকরুণ।"

"কেন, তিনিও যাবেন। বাড়ীতে পিসীমা আছেন, ছোটঠাকুমা আছেন—দুজনেই বিধবা। আরও একজন আছেন ঠান্‌দি। বাবার কি সম্পর্কে মাসীমা হন।"

"তাঁরা কোথায় ? কাশীতে আসেন নি যে ?"

"আস্‌বেন। পূজো হয় কিনা দেশে—তাই তাঁদের সেথায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। পূজোর পরেই আস্‌বেন।"

"পূজোয় তোমরা দেশে যাও না ?"

"একবার গিয়েছিলাম—ঐ যেবার বিয়ে হ'ল। দেশে আমায় নিয়ে ওঁরা সবাই গিয়েছিলেন। তবে বাবার নাকি দেশের জল হাওয়া সয় না, তাই উনি কাশীতেই প্রায় আসেন। পূজো হয়—তা কে দেখে শোনে বল ? তাই ওঁদের পাঠিয়ে দেন। পূজোর পরেই ওঁরা এখানে চ'লে আসেন।—তবে গেল বছর সকাল সকাল আমরা ফিরে যাই, তাই আর আসেন নি।"

"হুঁ—তা পূজো দেখ্‌তে দেশে যেতে কি তোমার ইচ্ছে হয় না ?"

"তা হয়। কিন্তু যেতে যে দেন না, কি ক'র্‌ব বল ? খুব জ্বরজ্বাড়ি নাকি সেখানে হয়, তাই যেতে দেন না। বাবার যদিও বা মত একটু হয়—উনি কিছুতেই রাজি হন না। তা তুমি ত দেশে থাক্‌তে বামুনদিদি, খুব জ্বরজ্বাড়ি হত, নয় ? হ'লে কি ক'র্‌তে ? কত লোক ত দেশে থাকে। তারা কি ক'রে ?"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "কি ক'র্‌বে ? দেশ ছেড়ে ত সবাই কাশীতে আস্‌তে পারে না। হয় যখন, ভোগে; আবার শীত প'ড়লেই বেশ সেরে সুরে ওঠে। ফের বর্ষা তক্‌ আবার ভালই সবাই থাকে।—তবে দেশে জ্বরজ্বাড়ি যে সব যায়গাতেই হয়, তা নয়। এই ত আমার মামার বাড়ী—যেখানে আমরা ছিলাম—বেশী জ্বরজ্বাড়ি কখনও দেখি নি।"

"খুব ভাল গাঁ বুঝি ? ওঁরা ত বলেন, গাঁয়ে ঘরে কেবল জ্বরজ্বাড়ি—সেথায় যেতে নেই। ছুটীছাটাতে পশ্চিমে এলেই শরীর ভাল থাকে।"

"তা থাক্‌তে পারে। কিন্তু পশ্চিমে তাই ব'লে বছর বছর কয়জনে আসতে পারে ?"

"ঢের লোক ত আসে। গাড়ীগুলোতে উঃ—সে কি ভিড় !—যদি দেখতে-"

হাসিয়া লতা কহিল, "তুমি দেখ নি বৌঠাকরুণ, নইলে দেশের দিকে যে গাড়ীগুলো যায়, ভিড় তাতেও বেশী বই কম হয় না।"

"ওমা! এত ভিড় ক'রে সবাই দেশে যায়! জ্বর-জ্বাড়িতে মরে না?"

"ভোগে কেউ কেউ—তবে এ জ্বরে মরে না বড় লোকে। মরণ কোথায় না আছে? আর রোগপীড়ে—সে কি পশ্চিম অঞ্চলেই নেই? প্লেগবসন্ত—বাঙালার কোনও গাঁয়ে নেই ব'ল্লেই হয়।—বসন্ত ডুটো চারটে যাই যেখানে হ'ক্, প্লেগের মড়ক বাঙালার কোনও গাঁয়ে কখন হ'য়েছে ব'লেও শুনি নি।"

"না, ঐ জ্বরের কথাই কেবল শুনি।"

"সেও যেখানে হয়, বর্ষায় সুরু হয়, ভাদ্র আশ্বিনে বাড়ে, আবার পূজোর পর ক্রমে কম্‌তে থাকে। তার পর কটা মাস বেশ খরখরে শুক্‌নো—লোকেও বেশ ভাল থাকে। এই পশ্চিম অঞ্চলে গরমের দিনে শুনেছি বেশী বেলায় লোকে ঘর থেকে বেরোতে পারে না, দোর জানালা সব বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকে। বাঙালার কোনও গাঁয়ে ভরা গ্রীষ্মেও এত গরম কোথাও পড়ে না। আর হু হু ক'রে কি মিঠে হাওয়াই বইতে থাকে! দুপুরবেলায়ও দোর খুলে কি ঘুমটাই যে লোকে আরামে ঘুমোয়!"

"বাঃ!"

"তবে জ্বরজ্বাড়ি ক'টা মাস হয়। তা—তাই ব'লে কি দেশ ছেড়ে সবাই কোথাও চ'লে যেতে পারে? প্লেগ বসন্ত যখন দেখা দেয়, পশ্চিম অঞ্চল ছেড়েই বা কে কোথায় যায়? ব্যামোপীড়ে সময়ে সময়ে হয় ব'লে কোনও দেশই ত লোকছাড়া হয়ে খালি প'ড়ে রয়নি? ক'ল্‌কেতা ছেড়ে বাঙালা দেশের ভেতরে কখনও বড় যাওনি। যদি যেতে দেখ্‌তে পেতে, গাঁয়ের পর গাঁয়ে কত লোক র'য়েছে—কত বাড়ীঘর বাগানক্ষেত, কত হাট বাজার, নদী নালায় কত নৌকো, রাস্তায় রাস্তায় কত গরুর গাড়ী—দেখনি তাই জান না। এই যে সব লোক—তাদেরই না কেউ কেউ চাকরী কর্‌তে সহরে আসে।—আপনার জন সব র'য়েছে, ছুটীতে বাড়ী ঘরেই যায়। আর কি আনন্দের সাড়াই তখন বাড়ীতে বাড়ীতে প'ড়ে! এই বাঙালায় শুনেছি চার কোটির ওপরে লোকের বসতি। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী চ'ড়ে ক'টি আর তাদের পশ্চিমে আসে? আস্‌তে পারে? বেশীর ভাগ লোক চায়ও না আস্‌তে। ব্যামোপীড়ে তখন যাই যেখানে দেখা দিক্—দেশ—দেশের পূজো—দেশের সব লোকজন—এদের টানে দেশের পানেই ছোটে।—অনেক যায়গা তখন জলে ডুবে যায়। তবু লোকে সেই দেশেই যায়। কেন যাবে না? সে যে দেশ—নিজের দেশ! তার বড় ঠাঁই কি আর কোথাও কারও হ'তে পারে, সত্যি যদি দেশের প্রাণ নিয়ে দেশে সে জন্মে থাকে?"

অবাক্ হইয়া ইলা কথাগুলি শুনিতেছিল। কলিকাতা-নিবাসী পদস্থ ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ সে। আধুনিক নাগরিক পরিমার্জ্জনায়ও আবার এই পরিবার দুইটি বহু অগ্রসর। গ্রাম, গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্যসমাজ, সামাজিক রীতি-নীতি কি ক্রিয়াকর্ম্মাদি—এ সবের কোনও খবরই সে রাখিত না। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ত কিছু ছিলই না, ইহাই মাত্র শুনিত, পাড়াগাঁ বলিয়া মানুষের বাসের অযোগ্য কতকগুলি স্থান এই বাঙালা দেশে আছে—দীন দরিদ্র নিরুপায় যাহারা সেখানে থাকে, কেবল জ্বরে ভোগে, আর মরে। ভাল যাহারা একটু থাকে, কেবল দলাদলি আর ঝগড়াঝাঁটিই করে। আর কুসংস্কার কদাচার কত যে আছে, তাহা বলিবার কি শুনিবার মতই নহে। সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের মত যাহারা জীবনযাপন করিতে চায়, 'পাড়াগাঁ' নামধেয় নরকতুল্য এই স্থানগুলি সর্ব্বথা তাহাদের বর্জ্জনীয়!

তাই অবাক্ হইয়া ইলা লতার কথাগুলি শুনিতেছিল। আর ইহাও মনে পড়িতেছিল, একবার যে সে পূজায় দেশে গিয়াছিল, সব তাহার কত ভাল লাগিয়াছিল। পূজা ভাল লাগিয়াছিল, লোকজনও সব ভাল লাগিয়াছিল। আর সেই গ্রাম—পথের দু-ধারে আরও কত গ্রাম—নদী খাল পুকুর বিল ভরা তর্‌তরে তাজা জল, তক্‌তকে তাজা সব গাছপালা, লক্ষ্মীর শ্রীতে ঢল ঢল ক্ষেতভরা ধান, চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়! আর সপ্‌সপে স্নিগ্ধ হাওয়া—গায়ে লাগিলে মরা শরীরও যেন জীবন্ত হইয়া ওঠে—তেমন হাওয়া চৈত্র-বৈশাখের সকাল সন্ধ্যায়ও কলিকাতায় কখনও বহে কি? কলিকাতার সে হাওয়াও বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর। কিন্তু গ্রামের সেই হাওয়া, তার সেই গা জুড়ান তাজা স্পর্শ, প্রাণ জুড়ান মিঠা গন্ধ—কই, তাহা কলিকাতায় কখনও ত সে পায় নাই। সবই তার বড় মিঠা লাগিয়াছিল। আর তার চেয়েও

বুঝি মিঠা লাগিয়াছিল পূজার আঙিনায় সমবেত পাড়াপড়সী গ্রামবাসীদের সরল তাজা প্রাণের অবাধ অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস—যার সাড়া তার নিজের প্রাণ ভরিয়াও উঠিত, উদ্দাম জীবন্ত এমন একটা ভাবের আবেশে সে বিভোর হইয়া পড়িত, যেমন নাকি সে পিতার কি শ্বশুরের নাগরিক বৈভব-সজ্জায় পরিপূর্ণ গৃহের ছাঁদা-বাঁধা জীবনের মধ্যে কখনও পায় নাই। সেই স্মৃতি তার প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছিল, নির্ব্বাক্ হইয়া সেই কথাগুলিই ভাবিতেছিল।

দুইটা উনানে ডাল আর ভাত চড়াইয়া দিয়া লতা কহিল, "চুঁচ্‌ড়োয় আমরা ছিলাম। গায়ে গায়ে সব বাড়ী—আর রাস্তায় কি ধূলো—একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম গঙ্গা নাইতে যখন যেতাম। কিন্তু গ্রামের সেই নদী, তার কাছে চুঁচ্‌ড়োর গঙ্গা কি? পাড়াগাঁয়ে আমিও আগে বড় কখনও যাইনি—শেষ ক'টা বছর যে ছিলাম, মনে সুখ ছিল না, তবুও কত ভাল লাগত।"

ইলা কহিল, "তোমার বিয়ে ত দিদি ক'ল্‌কেতায় হয়েছিল?"

"হাঁ।"

"উনি যদি নিরুদ্দেশ না হয়ে যেতেন, ক'ল্‌কেতায়ই ত তোমাকে থাক্‌তে হ'ত?"

"হাঁ।"

সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া লতা কুটনা কুটিতে বসিল।

ইলা কহিল, "তাহ'লে ত গ্রাম দেখা—গ্রামে গিয়ে থাকা, যেমন আমার তেমনি তোমার ভাগ্যেও জুটত না?"

"না। বোধহয়—তবে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ীতে মাঝে মাঝে গিয়েছি। শেষে আর যেতেন না, —ঘর-দুয়োর যা ছিল সব নষ্ট হ'য়ে গেল, আপনজনও কেউ আর ছিল না। তাই শেষে মা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ীতে যান। খুব গরীব হ'লেও আমার মামা মামী বড় ভাল, বড় ভালবাস্‌তেন আমাদের।"

"আবার সেখানে যাবে?"

"না। তবে মনে হয় সেখানে যদি থাক্‌তে পার্‌তাম, খোকা যদি গ্রামের ছেলেটির মত গ্রামেই মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ত, গ্রামকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌ত! তা অদৃষ্টের ফেরে গ্রাম থাক্, বাঙালা ছেড়ে একেবারে কাশীতেই আসতে হ'ল।"

"তা চল না, আমাদের সঙ্গে ক'ল্‌কেতায়। তবু বাঙালা ত। মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে যাব। আর ভাব্‌ছি, আমি আবদার নেব পূজোয় প্রত্যেক বছর বাড়ীতে যেতেই হবে—অন্য সময়ও মাঝে মাঝে গিয়ে থাক্‌তে হবে। আমার আবদার বাবা এড়াতে পার্‌বেন না। তখন তোমরাও যাবে। আমাদের সেই গাঁ, দেখনি বামুনদিদি, বড় চমৎকার! —তোমার মামাবাড়ীর গাঁ কেমন জানি না—তার চাইতে ভাল বই মন্দ কিছুই হবে না। কেমন, যাবে দিদি?"

"তোমাদের যাবার সময় আগে হ'ক্, তখন দেখি মা কি বলেন? তবে মণিঠাকৃরুণ যে মাকে ছাড়্‌তে চাইবেন এমন ত মনে হয় না।"

"তিনি না ছাড়্‌লে জিদ ক'রে ওঁরাও নিতে পার্‌বেন না। তা না হয় থাক্‌বেন তিনি এখানেই। কাশীতেও ত আমরা আসি, তখন আস্‌বে মায়ে ঝিয়ে দেখা হবে। মেয়ে ত কারও চিরকাল কাছে থাকে না, শ্বশুর বাড়ী পাঠাতেই হয়। ধর, এ যেন তোমাকে সেই শ্বশুরবাড়ীই পাঠাবেন। এই ত আমার মা, চোখের আড়াল ক'রতে পার্‌তেন না—এখন ক'দিন আমাকে দেখ্‌তে পান! এই ত কাশী চ'লে এসেছি—কি ক'র্‌ছেন?"

ম্লান একটু হাসি লতার মুখে ফুটিল। চাপিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "যাঁদের কাছে তুমি আছ, তাঁরা যে তোমার মা বাবার চাইতেও অনেক বড় আপন বৌঠাকৃরুণ—"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া ইলা কহিল, "ঠিক কথা। আর এ আপন থেকে পর করিয়ে মেয়েকে ফিরিয়েও কেউ নিতে চায় না, সাত জন্মেও যদি তার মুখখানি না দেখ্‌তে পায়। আর আমিই কি ফিরে যেতে চাই? না, তাও চাই না। তবে—তবে—সেই যে আপন তুমি হারিয়েছ, যদি—যদি—ফিরে আবার পাও।"

"পাব না বৌঠাকৃরুণ।"

"কেন পাবে না? চল ক'ল্‌কেতায়, ওঁরা সবাই আছেন, পাতি পাতি ক'রে খুঁজবেন। একটা ঠিকানা ত আছে, কোত্থেকে নাকি তোমার টাকা আস্‌ত। তা ওঁরা যদি গিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরেন, কিনেরা একটা পাবেনই।—"

"পেয়েই বা কি হবে? তবে—তবে—" মুখখানি লতা ফিরাইয়া নিল, চক্ষে জল আসিতেছিল—স্বরও একটু কাঁপিয়া উঠিল।—

"কাঁদছ দিদি!"

শক্ত হইয়া লতা উত্তর করিল, "না না, ও কিছু নয়।—খোঁজ যদি তোমরা পাও, বেশ নিও। আমাকে জানিও। আমি—আমি—জানাতে কিছু চাই না।"

"কেন চাও না? কেন চাইবে না? দাবী তোমার কিছু নেই?"

"থাক্‌তে পারে। কিন্তু—না বৌঠাক্‌রুণ, সে—সে হয়ত নতুন ক'রে সুখের ঘর কোথাও বেঁধেছে। জানালে সেই ঘরই ভাঙ্‌বে—আমার ভাঙা ঘর আর জুড়্‌বে না!"

"তবে জান্‌তেই বা কেন চাও?"

"চাই—দরকার একটু আছে। তুমি জান না বৌঠাক্‌রুণ, পরিচয়টাও যে কাউকে দিতে পারি নে—"

"কেন, তিনি কে, কোথায় বাড়ীঘর—"

"কিছুই জানিনে বৌঠাক্‌রুণ।"

"কেন, ক'ল্‌কেতায়—"

"ক'ল্‌কেতায় কত যায়গার কত লোক এসে বাসা ক'রে থাকে। উঠে গেলেই সব ফুরিয়ে গেল।"

"তা যেথায় তিনি ছিলেন—"

"সে কোন এক মেসে। শেষে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মেস নেই, কে কোথায় গেছে, কেউ জানে না।"

"কি সর্ব্বনাশ! তা'হলে—"

"থাক্ এখন ও-কথা বৌঠাক্‌রুণ।"

ডাল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লতা উঠিয়া গিয়া কাঁটা দিতে বসিল। শ্বশুর তখন ডাকিলেন। ইলাও ত্রস্ত বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

(১২)

ঐ মাগীই তবে উহাদের দেশ হইতে আসিয়াছে! মন্দা-ঠাক্‌রাণীর ঐ মেয়েটার চরিত্র বাস্তবিক কি, কেন দেশ ছাড়িয়া কাশীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে, সকল কথা উহার কাছেই জানা যাইতে পারে। সেইদিনই বৈকালে ক্ষান্তমণি গিয়া আতরমণির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল, সালঙ্কারে বিবৃত কথাও সব শুনিলেন।—রামঃ! কি ঘৃণার কথা! হাঁ, তা ভাল মন্দ এই কাশীতে অনেক আছে। কিন্তু কোলে ঐ ছেলে—নিঃসঙ্কোচে তাকে লইয়া লোকসমাজে বিচরণ করিতেছে! এই পুণ্যধামে আসিয়া বামুনের ঘরে ভাত র'াধিতেছে! এত বড় দুঃসাহস ঐ আতরমণিরও কখনও হইত না। কিন্তু ও-বাড়ীর গৃহিণী কমলিনীর কাছে এ সংবাদ লইয়া যাইতে ভরসা পাইলেন না। তখন ধরা পড়িবে ঐ বিন্দীর কাছে খোঁজ নিতে তিনি গিয়াছিলেন, যাহার একটু আভাসেও কমলিনী আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ও বাড়ীর দ্বার তাঁহার সম্মুখে চিরদিনের তরে রুদ্ধ হইবে। তবে এত বড় একটা কথা একেবারে হজম করিয়া যাওয়াও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। এখানে ওখানে কয়দিন একটু ফিস-ফাস করিলেন, মুখে মুখে যদি কথাটা কমলিনীর কানে যায়। কিন্তু গা করিয়া কেহই কমলিনীর কানে কথাটা লইয়া পৌঁছাইল না। কাহারও সম্বন্ধে এ জাতীয় কোনও কুৎসার কথায় বিরাগ বই আগ্রহ কখনও কমলিনীর দেখাই যাইত না। মণিঠাকুরাণীর কাছেও নিজে গিয়া ক্ষান্তমণি কথাটা পাড়িতে ভরসা পাইলেন না, কারণ মণিঠাকুরাণী তখনই গিয়া কমলিনীকে বলিবেন—ক্ষান্তমণির কাছে তিনি সব শুনিয়াছেন! এক আতরমণি গিয়া যদি বলে। তবে মাগীর বড় ঠ্যাকার! নিজের খেয়ালে কিছু কখনও হয় ত বলিতে পারে; কিন্তু ক্ষান্তমণি যদি গিয়া বলেন, নাকছাটা দিয়া উঠিবে, বলিবে—হাঁ, আর কাজ নেই, এখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোকের কুচ্ছো গেয়ে বেড়াব। আছে ও নষ্ট দুষ্ট আছে, আমার কি? কোন্ মাগীই বা এমন ধোয়া তুলসী, সবাইকেই জানা আছে। বলিয়া হয় ত তাঁহার পানেই একটু বক্র কটাক্ষ করিবে। ও মা, কি বেন্না! না, কাজ নাই। ঐ আতরমণি—সেও নাকি ভাবে-সাবে এমন একটা খোঁটা তাহাকে দিবে, সুদীর্ঘ বৈধব্যেও যাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতিতে এতটুকু একটু রেখাপাত কোনও হারামজাদী এই কাশীধামে কখনও করিতে পারে নাই! তা—এত লোকের মুখে মুখে কথাটা ফিরিতেছে, মণিঠাকুরাণীর কানে যাইবে না? আজ না হ'ক কাল যাইবেই।—গেল কিনা, একটু বুঝিয়া লইবার আশায় ঘন ঘন তিনি মণিঠাকুরাণীর ওখানে গিয়া বসিতেন, এ-কথা ও-কথার মধ্যে মন্দাকিনী ও তাঁহার লক্ষ্মীপ্রতিমা কন্যাটির দুর্ভাগ্যের কথা তুলিয়াও অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতেন, সশব্দ বহু দীর্ঘনিশ্বাসও মোচন করিতেন। কিন্তু গতরখাকী কি চাপা! আভাসেও যদি একটু কিছু ফাঁস করে। সত্যই

কি কথা তাহার কানে আইসে নাই ?—আসিয়াছিল। কিন্তু মণিঠাকুরাণী কথাটাকে আমল দিতে চাহেন নাই। কারণ মন্দাকিনীকে তিনি ছাড়িতে পারেন না। অমন মিঠা হাতে র'াধিয়া জীবনে কেহ কখনও তাঁহাকে খাওয়ায় নাই। অসুখ বিসুখ কখনও হইলে যত্নআত্তিও করে, যেন মার পেটের আপন ভগ্নীটি! ব্যবহারও বড় মিষ্ট। হাজার হইলেও একটা উড়ো কথা—কোন্ একটা ছোটলোক মাগী দেশ হইতে আসিয়া রটাইয়াছে। আর মেয়েটা যদি নষ্ট দুষ্ট এমন হয়ও, তাঁহার কি? তাহার হাতে ত তিনি খান না? খান তাহার মার হাতে, মা ত নষ্ট দুষ্ট নহে। তবে মেয়েটার সঙ্গে এক ঘরে থাকে। তা একে ত এই তীর্থশ্রেষ্ঠ মহাপুণ্যধাম বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার বারাণসী—তাহাতে আবার প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া তবে র'াধিতে আসে। পাপ কিছু থাকিলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তারপর মেয়েটাকেও সত্য এমন নষ্ট দুষ্ট বলিয়াও ত মনে হয় না। ঠাটঠমক কখনও কিছু দেখা যায় না। বাড়ীর বাহিরও কখনও হয় না। দু-বেলা র'াধিতে যায়, সারাটি দুপুর ঘরে বসিয়া পড়াশুনা কি শেলাই-ফোঁড়াই করে। অন্য কাহারও ঘরে গিয়া হাসিগল্প করিয়াও এতটুকু সময় কখনও নষ্ট করে না। নষ্ট দুষ্ট যারা, তাদের ধরণই হয় আলাদা।

আরও কিছুদিন গেল। বেলা পড়িয়াছে, মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাভঙ্গের পর মণি-ঠাকুরাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাতমুখ ধুইয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া গিয়া ডাকিলেন, "বলি শুনছ, ও লতার মা!"

বাহির হইয়া মুখ তুলিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "ডাকছেন আমাকে মা?"

"হাঁ, বাছা।—ওপরে একটিবার আস্‌বে? একটা কথা ব'লতাম—"

"যাচ্ছি মা।"

মন্দাকিনী উঠিয়া আসিলেন।

"ব'স বাছা, একটা কথা ব'লব। গঙ্গা নেয়ে বাবা বিশ্বনাথের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, আমার বউমার সঙ্গে দেখা হ'ল। তা—ওরা ত বাছা, ক'ল্‌কেতায় শীগ্‌গিরই ফিরে যাচ্ছে—"

"ফিরে যাচ্ছেন—এখুনি! কেন, শুনেছিলাম ত আরও দু তিন মাস থাক্‌বেন, যাবেন সেই জগদ্ধাত্রীপুজোর পর—"

"হাঁ, তাই ত বরাবর যায়—কথাও তাই ছিল। তা কি একটা জরুরী মোকদ্দমা ক'র্‌তে হবে আমার ভাসুর-পোকে, তাই এক্ষুণি যেতে হচ্ছে—"

"হুঁ, খুব ভাল লোক ছিলেন ওঁরা।—তা—"

"ওকেও খুব ভালবাসে ওরা। এই ত সবে মাস দেড়েক কাজে লেগেছে, এরি ভেতর ওর রান্না খেয়ে আর মিষ্টি ব্যাভারে ভারী খুসী হ'য়েছে সবাই। বৌমা ওকে দেখে যেন পেটের মেয়েটির মত, আর আমার ঐ নাতবৌটি—সে ত চোখে হারায়, পেয়ে আর ছাড়্‌তে ওকে কেউ চায় না।"

"তা—চ'লে যাচ্ছেন—"

"হাঁ। তাই ব'ল্‌ছিল, যদি দিতে বাছা ওকে একেবারে সঙ্গেই নিয়ে যেত।"

"সঙ্গে নিয়ে যেতেন! ক'ল্‌কেতায়—"

"তা ক্ষতি কি? চাকরী করেই ত খেতে হবে। বড় ভাগ্যিই ব'ল্‌তে হবে যে ওদের এমন সুনজরে প'ড়েছে। একেবারে ঘরের লোকের মতই ওদের কাছে বরাবর থাক্‌তে পাবে। ষাট্, ঐ ছেলেটি র'য়েছে, বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, ওরও একটা হিল্লে তখন হবে। সব দিকে এমন সুবিধে কি আর কোথাও ও পাবে বাছা?"

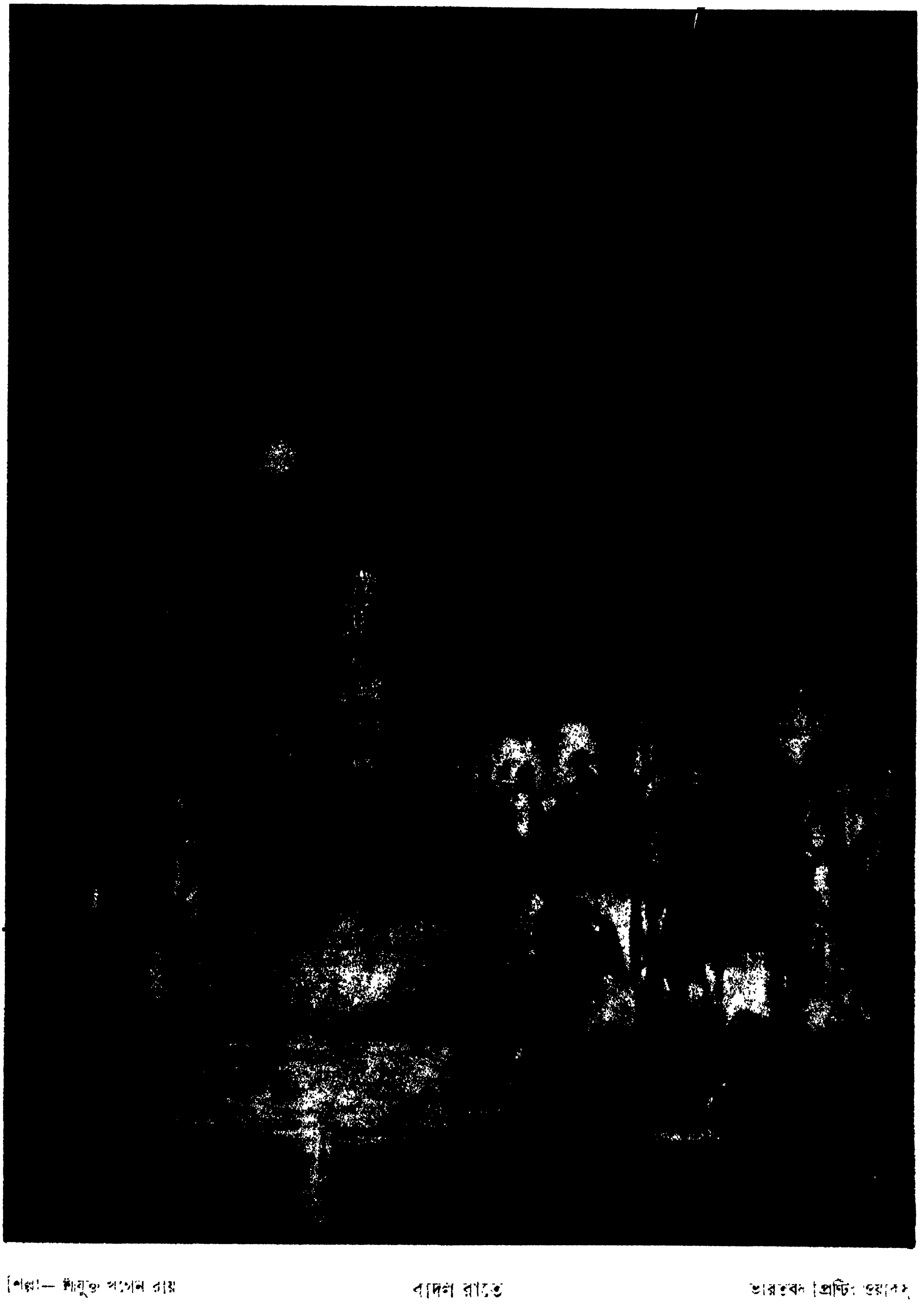
"হাঁ, লোক ওঁরা খুবই ভাল। ছিলও ওখানে বেশ সুখে। তা মা, বড় দুঃখী আমরা—আপন ব'ল্‌তে কেউ আর পৃথিবীতে নেই, তবু মায়ে ঝিয়ে ঐ ছেলেটি নিয়ে এক যায়গায় র'য়েছি—" কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অঞ্চলে মন্দাকিনী চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

"বুঝি ত বাছা, সবই বুঝি। সংসারের লক্ষ্যি সবে ঐ মেয়েটি—ওকে বিদেয় ক'রে দিয়ে একা থাকতে খুবই ক্লেশ হবে তোমার—"

"পারব না মা! কি ক'রে থাক্‌ব? শুধু পেটে দুটি খেয়ে একলা ঐ ঘরটিতে কি ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব? আর যে কোনও সুখের লক্ষ্যি আমার নেই। কোল ছাড়া কখনও ওকে করি নি। বিয়ে দিয়েছিলাম—সোয়ামীর ঘরেও একটি দিন যায় নি—

"সেটা ত কপালের দোষ মা। নইলে মেয়ে সন্তান—চিরকাল কাছে কি কেউ রাখ্‌তে পারে, না রাখ্‌তেই চায়?"

চক্ষু মুছিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "যার হাতে দিয়েছিলাম,



শিল্পী— শ্রীযুক্ত [illegible] রায় বাদল রাতে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সে যদি আজ নিয়ে যেত, তবে কি আর কিছু ভাব্‌তাম না? আহ্লাদ ক'রেই পাঠাতাম। কিন্তু এ তাকে কার সঙ্গে কোথায় পাঠাব মা?"

মণিঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "হাঁ, একথা ব'লতে পার বই কি বাছা?—আর দুঃখও একটা হ'তে পারে বই কি? তবে কি জান মা, ভাত রেঁধেই মেয়েকে ত খেতে হবে, তা এমন সুখের যায়গা আর কোথাও পাবে না। দেখ্‌ছ ত বাছা, ওরা একেবারে ঘরের লোকটির মতই ওকে দেখে। আর ঐ বউটি—তোমার মেয়ে যেন তার আপন মার পেটের বোন্‌। সুখে থাক্‌বে মা, মেয়ে তোমার পরম সুখে থাক্‌বে। ঐ ত ছেলেটি বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে; লেগে যদি থাকে, লেখাপড়া শিখিয়ে তাকেও ওরা মানুষ ক'রে দেবে।—একটা হিল্লে ওর হবে।—আমার বৌমাকে দেখেছি, সময় নেই অসময় নেই, ওকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কত আব্দার সইছে, যেন নিজের ঘরের নাতিটি!—কিচ্ছু ভেবো না, মেয়ে তোমার সুখে থাকবে মা। আর ভয়ও কিছু নেই—নিজের মেয়েটির মতই বৌমা ওকে আগ্‌লে রাখ্‌বে। ব্যাটা ছেলে কেউ চোখ দিতেও পার্‌বে না। আর চাকর বাকর ছাড়া ব্যাটা ছেলেই বা বাড়ীতে কটা আছে? যারা আছে বাইরের লোক, বাইরের কাজ করে—ভেতরে কখনও যায় না। আর জন্মের মতও ত মেয়েকে বিদেয় ক'রে দিচ্ছ না, বছরে দুতিন মাসেরও ওপরে ওরা এসে কাশীতে থাকে। তখন ত আবার মেয়েকে কাছেই পাবে।—ছেলেও ত বিদেশে চাকরী ক'র্‌তে যায়, আবার ছুটিছাটায় ঘরে আসে।—এও ধরগে, তেমনি ধারাই হবে। চাকরীই যদি ক'র্‌তে হয়, তবে ছেলেতে আর মেয়েতে তফাৎই বা কি?"

"তা—এ চাকরী ত মা কাশীতেও ক'র্‌তে পারে—"

"তা পারত। তবে কি জান বাছা—হাঁ, খুলেই তবে তোমাকে সব বলি। কি তোমাদের কথা, গাঁয়ে কি হ'য়েছিল, তোমরাই জান। তবে তোমার ঐ মেয়েকে নিয়ে একটা কথা উঠেছে—কথাটা র'টেও যাচ্ছে। আমি নিজে অবিশ্যি কিছু গ্রাহ্যি করি নি—আর সত্যি তোমার মেয়েকে নষ্ট দুষ্ট ব'লেও মনে হয় না। তবে কথা একটা উঠেছে—তোমার হাতে খাই, তা নিয়েও আবাগীরা কেউ কেউ এসে খোটা দিচ্ছে। চোখের সাম্‌নে থাকলে কথাটা বেড়েই চ'ল্‌বে।—ভাল কোনও গেরস্তর ঘরে রাঁধুনীর কাজে কেউ ঐ মেয়েকে তখন নেবে? তেমন বাড়াবাড়ি একটা হ'লে, ধর তখন আমিই কি তোমায় রাখ্‌তে পার্‌ব? এমন সুবিধে একটা পাচ্ছ—অল্পে অল্পে মেয়েকে দূরে পাঠিয়ে দেও। কথা তখন আপনিই বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

আড়ষ্ট হইয়া মন্দাকিনী বসিয়া রহিলেন। হায়, ঐ বিন্দী আবাগীই তবে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে! কোন্‌ জন্মের কোন্‌ পাপে বিধাতার এ কি অভিশাপ, যে দেশ ছাড়িয়া এই কাশীতে আসিয়াও তাঁহাদের একটু স্থান হইবে না! হাঁ, লতার—উঁহাদের সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তিনি? তিনিই বা কেন, কোন্‌ সুখে তবে কাশীতে পড়িয়া থাকিবেন? উঁহারা ধনী, ঘরে হয়ত বিধবা আছে, আরও কত রকম কাজ কর্ম্ম আছে। সামান্য দাসীর কাজ করিয়াও যদি লতার কাছে এই গৃহে একটু স্থান তিনি পান, কৃতার্থ হইয়া থাকিবেন। তবে মনিব মণিঠাকুরাণীর কাছে কথাটা তুলিতে মন্দাকিনী ভরসা পাইলেন না। এই অল্প দিনেই একান্তভাবে তাঁহার সযত্ন সেবার উপরে মণিঠাকুরাণী নির্ভরশীলা হইয়া পড়িয়াছেন। ছাড়িয়া যাইবার কথা কিছু বলিলে একেবারে চটিয়া যাইবেন। এ আশ্রয়েও হয়ত লতা বঞ্চিতা হইবে। তিনিও বহিষ্কৃতা হইবেন। কাশীতে তখন একেবারে অসহায় হইয়া তাঁহাদের পড়িতে হইবে।

মণিঠাকুরাণী কহিলেন, "কি ভাবছ বাছা? এই সব কথা কানে এসেছে ব'লেই না মেয়েকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে ব'ল্লাম। নইলে সত্যি কিছু আর বামনীর অভাব ওদের হ'ত না।—আর মেয়ে তোমার চাকরী ক'রে খাবে, ক'ল্‌কেতায়ই ক'রুক কি এখানেই করুক, আমার কি বল? তা যা হয় একটা ঠিক ক'রে ফেল। আমাকে আবার ওদের জানাতে হবে ত।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "তা—যেতে যদি হয় ত যাবে। কি আর ক'র্‌ব? তা লতির সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখি—সে কি বলে—"

"ওমা, তা দেখ্‌বে না? সত্যি ত আর কচি মেয়েটি নয়—বড় সড় হ'য়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে—সে যদি না যেতে চায়, জোর ক'রে তুমি পাঠিয়ে দিতে পার? তা কথা কও, মায়ে ঝিয়ে বুঝে পরামর্শ যা হয় একটা ঠিক কর, কাল সকালে আমাকে জানিও।—তবে—এখানে এই যে সব

কথা উঠেছে—আর তাতে ক'রে শেষে কি হ'তে পারে না পারে, তাও মেয়েকে সব বুঝিয়ে ব'লো। জান্‌লে ?"

"ব'লব মা।"

বলিয়া মন্দাকিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেলেন। লতা তখন কাজে চলিয়া গিয়াছিল।—রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিল। স্তব্ধ হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল।—মর্ম্মভেদী অতি গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া শেষে কহিল, "ক'ল্‌কেতায়ই ওদের সঙ্গে যাই মা।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "আমিই বা তবে কেন এখানে থাক্‌ব? কি ক'রে থাক্‌ব? কাজ ক'রেই ত খাচ্ছি। পেটের দুটি ভাত—তা কি ক'ল্‌কেতায় জুটবে না? কত দুঃখী বামুনের মেয়ে—যেমন কাশীতে—তেমন ক'ল্‌কেতায়ও ত রেঁধে খায়।"

"কিন্তু—এখুনি ত ওঁদের সঙ্গে যেতে পারছ না!—আমি একবার ব'লেছিলাম, ঘরে অবিশ্যি ওদের কাজ অনেক আছে। তবে মণিঠাকরুণ চ'টবেন, তাই আপত্তি করলেন।"

"কেনা বাঁদী ত কারু নই। আমি যদি না থাকি—"

"না, বেঁধে কেউ তোমাকে রাখ্‌তে পারে না; কিন্তু এখন সঙ্গে সঙ্গে যেতে চাইলে ওঁরা হয় ত শেষে আমাকেই নিতে চাইবেন না। আমার যে এখন আর উপায় নেই মা।"

"সে ত বুঝি। কিন্তু আমি যে থাক্‌তে পারব না লতি—" ফুঁকরাইয়া মন্দাকিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

অতি আয়াসে আত্মসম্বরণ করিয়া লতা কহিল, "খোকাকে বরং তোমার কাছে রাখ—"

"খোকাকে! ঐ অতটুকু ছেলে—মার কোল ছাড়া ক'রে—"

"তোমার কাছেই ত ও থাকে। তোমারই ন্যাওটা হ'য়েছে বেশী—"

"তা হ'য়েছে। কিন্তু তুই কি ক'রে থাক্‌বি?"

"সে পারব, ওই বরং তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না। পরের বাড়ী কাজ ক'রব, কেঁদে সবাইকে জ্বালাতন ক'রে তুলবে। তোমার কাছেই ও থাক্। যাক্ ত এইভাবে কিছুদিন, শেষে ওখানে কোনও বাড়ীতে একটা কাজের বন্দোবস্ত ক'রে তোমাকে জানাব—তখন কারও সঙ্গে চ'লে যেও। ওঁরাও কোনও আপত্তি তখন ক'রতে পারবেন না। কাজ যদি ওঁদের বাড়ীতে না কর, মণিঠাকরুণই বা কি ব'ল্‌তে পারেন?

"হাঁ, তা যদি পারিস্ লতি—"

"কেন পারব না? পার্‌তেই যে হবেনা মা। দুঃখু যতই পাই, তুমি আমি ছাড়াছাড়ি হ'য়ে ত সত্যি থাক্‌তে পারিনা।"

"কিন্তু তোকে যদি ওঁদের বাড়ীতেই রাতদিন ওঁরা রাখ্‌তে চান?"

"তা কেন চাইবেন? চাইলেই বা আমি থাক্‌ব কেন? রাঁধুনি—মাইনে খাচ্ছি—দু'বেলা রেঁধে বেড়ে দিয়ে আস্‌ব। যতটা সময় তার জন্যে দরকার—থাক্‌ব। রাতদিন কেন থাক্‌তে যাব? আপাততঃ উপায় নেই, গিয়ে থাক্‌তেই হবে। নইলে পরের ঘরে একেবারে ওভাবে আশ্রিত হ'য়ে থাকা—না মা, সে আমি কখনও পারব না। যত শীগ্‌গির হ'ক্, তোমাকে ওখানে নেবই। তখন একটা ঘর ভাড়া ক'রে মায়ে ঝিয়ে থাক্‌ব। ওঁরা শুনেছি কালীঘাটের কাছেই কোথায় থাকেন! পিসে মশায়ের শ্রাদ্ধে সেবার গিয়েছিলাম, দেখেছি ত গরীব অনেক বামুনপরিবার অনাথা অনেক বামুনের মেয়ে, এক একটা টিনের কি খোলার বাড়ীতে ছোট ছোট ঘর ভাড়া ক'রে থাকে, বেশ মিলে মিশেও থাকে ব'লে মনে হল—যেন পাড়াগাঁয়ের ছোট এক একটি পাড়ার সব গেরস্ত। আপদ বিপদেও মনে হ'ল, সবাই সবাইকে দরদ করে। এক ঘরের একটি বউ ছিল ব্যামোতে পড়ে, আর একঘরের এক গিন্নী দেখ্‌লাম তাদের রেঁধে দিচ্ছেন।"

"হাঁ, সে ত দেখেছি। গিয়ে একটিবার ব'স্‌তে পারলে অসুবিধে বড় কিছু হয়ত হবেনা। গরীব সব যায়গায়ই আছে, আর গরীবকে গরীব দরদও বড় করে। করে ব'লেই না এইভাবে অনেকগুলি গরীব একত্তর হ'য়ে এক বাড়ীতে থাক্‌তে পারে। ভিনদেশী সব হ'লেও থাকে যেন ঠিক পাড়াগাঁয়ের পড়সীদের মত। তবে ঝগড়াঝাঁটিও হয়।"

"সে কোথায় না হয় মা? পাড়াগাঁয়ের পাড়াপড়সীদের মধ্যে কি হয় না? মানুষের রাগ আছে, হিংসে আছে, আবার নিজের গরজটাও কেউ কেউ বড় বেশী দেখে। কাজেই ঝগড়া হয়। তা ঝগড়া যখন হয়, হয়। আবার আপদ বিপদেও সাহায্য করে, ক্রিয়াকর্ম্মেও হেসে খেলে

মেশে। তা মা, ঝগড়া ত আমরা কখনও কারও সঙ্গে ক'র্‌ব না। দরদ ক'রেই বরং চ'লব—আর ক্রিয়াকর্ম্মেও লোকের কাজ ক'রে দেব, যতটা যখন পারি। না মা, কিচ্ছু ভেবোনা, দুঃখুও কিছু ক'রো না মা। হদ্দ দুচারটে মাস—সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে যাবে। তারপর ওপানে যখন যাবে, সেই সব পড়সীদের সঙ্গে বেশ থাক্‌ব, এই যেমন এখানে আছি, এর চাইতে মন্দ কিছু থাক্‌বনা।"

বড় একটি স্বস্তির নিশ্বাস মন্দাকিনী ছাড়িলেন। অকুল-পাথারে যেন কুল পাইলেন। মনে হইল, সত্যই মায়ে ঝিয়ে দুজনে ছেলেটি লইয়া কালীঘাটে এইরূপ একবাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছেন, অন্যান্য গৃহস্থ যাহারা আছে, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সুখে স্বস্তিতেই দিন যাইতেছে। বৈকালে নাকি প্রত্যহই মায়ের বাড়ীতে পুরাণ পাঠ কথকতা কি কীর্ত্তন হয়, অন্যান্য প্রবীণাদের সঙ্গে যখন ইচ্ছা গিয়া শুনিতেছেন। দিন বেশ যাইতেছে! আর কোনও আপত্তি কি দুঃখপ্রকাশ মন্দাকিনী করিলেন না; চক্ষের জলও শুকাইয়া গেল; মুখে হাসি ফুটিল। বেশ একটা শান্তি ও স্বস্তিতেই কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সুনিদ্রায় সে রাত্রি মন্দাকিনী যাপন করিলেন; সুখস্বপ্ন আর কি দেখিলেন, তিনিই জানেন। (ক্রমশঃ)

কুমারসম্ভবে সৌন্দর্য্য ও দার্শনিকতত্ত্ব

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

প্রবন্ধ

দেবতারা সকলে কামকে শিবের সমাধি ভঙ্গ করিতে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারাও এই গুরুতর ব্যাপার দেখিতে আসিয়া শূন্যে অলক্ষ্যে লুকাইয়াছিলেন; কিন্তু যেই তাঁহারা দেখিলেন যে মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার তৃতীয় নেত্রে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, অমনি তাঁহারা মদনের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় আকুল হইয়া মহাদেবের কৃপাপ্রার্থী হইয়া সকাতরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি" "হে প্রভু সম্বর ক্রোধ" দয়াময় প্রভু, আপনার রোষ সম্বরণ করুন—সম্বরণ করুন। [এ তো শুধু কামের নিজকৃত স্পর্দ্ধা নয়, এ যে সমস্ত দেবকুলের কাজ, তাঁহারা নিতান্ত প্রাণের দায়ে আপনার প্রতি এই অযথা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রভু! দয়া করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মদনের প্রতি প্রসন্ন হউন।]

কিন্তু—

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৩।৭২

হে প্রভু সম্বর ক্রোধ দেবগণ উপরোধ
পৌঁছিতে বাতাস-পথে যে সময় লাগিল।
হায় সেই অবসরে ভস্মীভূত পঞ্চশরে
ভবনেত্র-জন্মা বহ্নি করিয়া যে ফেলিল ॥

আর মহাদেবও তখনি

তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী, বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রীসন্নিকর্ষং পরিহর্তুমিচ্ছন্ নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ ৩।৭৪

বজ্র যথা বনস্পতি ভেঙ্গে ফেলে আশুগতি,
তেমতি সে যোগীরাজ কামে ভস্ম করিয়া,
স্ত্রীজনের সন্নিকর্ষ ত্যাগ করা পরামর্শ
ভূতসহ ভূতপতি তিরোধিলা চিন্তিয়া ॥

তখন—

শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং
ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ। ৩।৭৫

পূর্ণ নাহি হল হায় জনকের উচ্চ আশ,
অসীম সৌন্দর্য্য নিজ ব্যর্থতার উপহাস ॥

এই অবস্থা হওয়ায় নগবালা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—

"ভগ্নমনোরথা সতী" (৫।১) তিনি একান্ত ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন, আর—

"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী" (৫।১) "আপনার রূপ নিন্দিলা মনে"—নিজের রূপের নিন্দাই বা না করিবেন কেন?

"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা" (৫।১) "সেই ত রূপ যা দয়িত গণে"—সেই সৌন্দর্য্যই ত প্রকৃত সৌন্দর্য্য, যে সৌন্দর্য্য প্রিয়জনের প্রেম আকর্ষণ করে।

তারপর—

ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ। ৫।২
সমাধির বশে রাখিয়া মন
করিয়া কঠোর তপঃ সাধন,
সফল করিবে রূপ আপন
ইচ্ছিলা পার্ব্বতী হৃদে তখন॥

পার্ব্বতীর এমন ইচ্ছা না হইবে কেন?

অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ। ৫।২
এমন যদি গো প্রেম না হবে
অমন সোয়ামি হয় কি তবে?

পার্ব্বতী সৌন্দর্য্য প্রভাবে তো শিবকে বশীভূত করিতে পারিলেন না দেখিয়া তপস্যার প্রভাবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। মা মেনকা তখন গৌরীকে তপস্যা করিতে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু নিষেধ করিলে কি হইবে---

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"। ৫।৫

[এত যে নিষেধ জনন করে, উমার সঙ্কল্প তবু না সরে]
নিম্নগামী জল নিশ্চিত মন, পথ হতে নাহি ঘোরে কখন।

উমা মা মেনকার কথা শুনিলেন না; একদিন তিনি পিতাকে জানাইলেন—

কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা, মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ, ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে॥ ৫।৬

একদিন আপ্ত সখীর মুখে
মনকথা-জ্ঞাত পিতারে সুখে,
মনস্বিনী কহে মনের গতি,
শিব-তপস্যায় হয়েছে মতি,
তপসিদ্ধি যতদিনে না হবে
সে অবধি সে যে বনেতে রবে।

তখন পিতার অনুমতি পাইয়া—

প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া
জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ॥ ৫।৭
শিখী কুলাকীর্ণ শিখর পরে
চলিলা গৌরী তপস্যা তরে,
পরে লোকে খ্যাত হইল যাহা
তাঁরি নামে "গৌরী শিখর" আহা।

উমা তপস্যা আরম্ভ করিয়াদিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে "বিরোধিসত্ত্বোজ্ঝিতপূর্ব্বমৎসরম্ (৫।১৭)

পরস্পর হিংসা করিত যারা
সেথায় সে ভাব ত্যজিল তারা।

এবং

পাবনং তচ্চ বভূব পাবনম্" (৫।১৭)
এতই প্রভাব সে তপোবনে
দিত পবিত্রতা শরীরে মনে।

প্রাণীরা পরস্পরের বৈরভাব ত্যাগ করিয়াছিল এবং যে সেই তপোবনে যাইত সে-ই দেহ ও মনে পবিত্রতা অনুভব করিত। এত প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও পার্ব্বতী দেখিলেন যে

'ন তত্র [illegible] তম্" (৫।১৮)
মনের বাসনা এ তপস্যায়,
পূর্ণ নাহি হলো দেখিয়া তায়।

তখন—

'তপোমহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে" (৫।১৮)
'কঠোর সাধনে করিলা মতি।'

রৌদ্র বৃষ্টি অগ্নি শীত গ্রীষ্ম কিছুই তিনি আর গ্রাহ্য করিলেন না, এমন কি—

"স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা, পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং, বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥ ৫।২৮

শুষ্ক পাতা ঝরে আপনি পড়ে
তাহার ভোজনে তপস্যা করে,
সুকঠোর তপঃ বলিয়া তায়
তপস্বি-সমাজে প্রচার যায়,
এ আহারো সেই প্রিয়ভাষিণী
ত্যজেছিলা আহা নগনন্দিনী।
তা হেরি তাঁহার প্রাচীনগণ
'অপর্ণা' নামটি দিলা তখন।

এই সুকঠোর তপস্যার জন্যই তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছিল। তাঁর তপস্যা—

মৃণালিকা-পেলবমেবমাদিভি র্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জিতং, তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥ ৫।২৯

মৃণাল-পেলব কমল কায়
দিনরাত তপ করিয়া তায়,
ক্লেশ সহশীল তপস্বীজন
কঠোর তপেতে নিযুক্ত মন,
পার্ব্বতী তপের কঠোরতায়
তাঁদেরো ছাড়ায়ে চলিলা হায়॥

যখন গৌরী এমন তপস্যায় নিমগ্ন তখন একদিন—

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্, জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং, শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥ ৫।৩০

দণ্ড করে ধরি অজিন-বাস
প্রগল্‌ভতা তার মুখে প্রকাশ,
জটাধারী এক জটিলযতি
তপোবনে তার হইল গতি,
ব্রহ্মজ্যোতি বুঝি জ্বলিছে গায়
মূর্ত্ত ব্রহ্মচর্য্য উদে তথায় ॥

উমা এই বিশিষ্ট অতিথিকে উপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা করিলেন।

তমাতিথেয়ী বহুমানপূর্ব্বয়া, সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্ব্বতী।
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং, বপুর্বিশেষেষ্বতি গৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫।৩১

অতিথি-সংকারে আদরবতী
অগ্রসরি তাঁরে আনিলা সতী,
সমতুল্য সনে বিশিষ্টজন
করেন সাদরে অতিথযতন।

অতিথিও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক শিষ্টাচার-সহকারে তপস্যা-সংক্রান্ত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন—

বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স নপশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্‌ঝিতক্রমঃ ॥ ৫।৩২

আতিথ্য সংকার করি গ্রহণ
ক্ষণেকে করিলা শ্রম মোচন,
উমাপানে চাহি ঋজু নয়নে
বলিতে উদ্যত হন তখনে।

অতিথি বলিতে লাগিলেন—

অপিক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণিতে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্ ॥৫।৩৩

হোমক্রিয়া সমাধানে কুশকাষ্ঠ উপাদানে
স্নানবিধি জল হেথা সুলভে কি পাও তো?
নিজশক্তি অনুসার তপস্যা কর তো আর
শরীর বজায় আগে পিছে ধর্ম্ম জান তো?

অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য মে, ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি।
ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থকাময়া, যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে ॥৫।৩৮

ত্রিবর্গের সার ধর্ম্ম হে ভাবিনি! আজি মর্ম্ম
তোমার তপস্যা হেরে মোর মনে ধরেছে,
যেহেতু ত্যজেছ তুমি অর্থকাম ভোগভূমি
মন তব একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয় লয়েছে ॥৫।৩৮

প্রযুক্তসৎকারবিশেষমাত্মনা ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি! সঙ্গতং মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥৫।৩৯

বিশেষ সৎকার ক'রে ভূষিয়াছ তুমি মোরে
পরভাবা আর তব যুক্তিযুক্ত হয় না,
দেখ না গো বরাঙ্গনে জান তো গো সাধুজনে
সখ্যতা যে সাপ্তপদী এ কথা কি কয় না ॥৫।৩৯

অতোঽত্র কিঞ্চিদ্ ভবতীং বহুক্ষমাং দ্বিজাতিভাবাদুপপন্নচাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টু মনাস্তপোধনে! ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হসি ॥৫।৪০

অতএব—

দ্বিজাতি স্বভাবজাত চপলতা পরবশে
জিজ্ঞাসিব কটি কথা তপস্বিনি তোমারে,
গোপণীয় নয় যদি দানিবে উত্তর তার
সখ্যতার উপরোধে ক্ষমিবে গো আমারে ॥৫।৪০

এন্ত ভণিতার পরে জটিল তপস্বী উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে, ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা, বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥৫।৪৪
দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ, পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা, ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥৫।৪৫

কেন ত্যজি অলঙ্কার যৌবনের শোভাহার
বৃদ্ধকাল যোগ্য যেই বাকলেরে পরেছ,
ত্যজি কেবা চন্দ্রতারা প্রদোষের ভোগ্য যারা
নিশায় রবিরে চায় বল কোথা শুনেছ।৫।৪৪
স্বর্গ যদি অভিলাষ বৃথা শ্রমে কি প্রয়াস
পিতৃরাজ্য মাঝে হেরি সেই দেব প্রদেশে,
বর তরে এ সাধনা দেখি না ত প্রয়োজনা,
রত্নেরে অন্বেষে সবে, রত্ন নাহি অন্বেষে ॥৫।৪৫

বরের কথা হওয়াতেই পার্ব্বতীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, অমনি কপট ব্রহ্মচারী তাঁর বাক্যের মাত্রা বাড়াইলেন—

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা, মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে, ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্লভঃ কথম্ ॥৫।৪৬

তব দীর্ঘশ্বাসে হায় মন কথা জানা যায়,
তবুও আমার মনে সন্দেহ না ঘুচিল,
(যেহেতু) তোমান প্রার্থিত বর ত্রিভুবনে অগোচর,
চাও তুমি পাও না তো, দুর্লভ কে হইল ॥৫।৪৬

আরও বহু ভণিতার পর বিশেষ সহানুভূতিসহ ব্রহ্মচারী বলিলেন—

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি বিদ্যতে, মমাপি পূর্ব্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং, বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥৫।৫০

আর কতকাল ধরি তপস্যা করিবে বলি
পূর্ব্বাশ্রম-জাত মম আছে কিছু তপস্যা,
লও তার অর্দ্ধভাগ পূর্ণকর মনরাগ,
বল কেবা সেই বর ঘুচুক গো সমস্যা ॥

এখানে মহাকবি কালিদাস "তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব" এই অর্দ্ধ ভাগ নাও ভাষা ব্যবহার করিয়া লক্ষণায় জানাইলেন যে, গৌরীর তপস্যার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, তিনি শিবের অর্দ্ধাঙ্গের উপযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু মহাকবি কেমন বলিয়া গেলেন, হঠাৎ এই ধ্বনির মারপেঁচ চক্ষে পড়ে না। কালিদাসের কাব্যে এই মহাগুণ।

অতিথি এত আত্মীয়তা এত সহানুভূতি দেখাইলেন, তাহাতে পার্ব্বতী লজ্জিত হইলেন, তাঁহাকে নিজমুখে কিছু বলিতে পারিলেন না, অথচ উত্তর না দিলে মাননীয় অতিথির অবমান না হইতে পারে আশঙ্কায় নিকটস্থ সখীকেই ইঙ্গিত করিলেন ঐ সকল কথার উত্তর দিতে—

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং, নিবোধ সাধো তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং, কৃতং তপঃসাধনমেতয়া বপুঃ ॥৫।৫২
ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ, পিনাকপাণিং পতিমাপ্তু মিচ্ছতি ॥৫।৫৩
ন বেত্তি স প্রার্থিতদুর্লভঃ কদা, সখীভিরস্রোত্তরমীক্ষিতামিমাম্।
তপঃ কৃশামভ্যুপপৎস্যতে সখীং, বৃষেব সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্ ॥৫।৬১

তখন—

পেয়ে গৌরী অনুমতি কহে সখি সাধুপ্রতি
শুন তবে এত যদি কৌতূহল জাগিছে,
আতপ বারণ তরে পদ্মে যথা ছত্র করে,
হেন দেহে সেই মত হায় তপ করিছে ॥৫।৫২
মহেন্দ্রাদি দিক্‌পালে অতুল ঐশ্বর্য্য জালে,
উপেক্ষা গো করিয়াছে যেন এই মানিনী;
রূপে যিনি বশ নয় মদনে করেছে জয়
সেই যে পিনাকপাণি তাঁর অনুরাগিণী ॥৫।৫৩
দারুণ তপস্যা ঘোর তাহে কৃশ সখী মোর
দেখি মোরা আঁখিজল বারিতে যে পারি-না,
কবে হবে সখী প্রতি সে দুর্লভজন রতি
অনাবৃষ্টি শুষ্ক ভূমে ইন্দ্র সম জানি না ॥৫।৬১

পার্ব্বতীর সখী খোলাখুলিভাবেই গৌরী যে বাসনা লইয়া তপস্যা করিতেছে তাহা বলিল—

অগূঢ়সদ্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া নিবেদিতো নৈষ্ঠিকসুন্দরস্তয়া ॥৫।৬২

না লুকায়ে কোন কথা
ইঙ্গিতজ্ঞ সখী তথা
নৈষ্ঠিকসুন্দর প্রতি খোলাখুলি বলিল।

কিন্তু তাহা শুনিয়া ব্রহ্মচারীর সন্তোষভাব দেখা গেল না, বরং উপরন্তু তিনি গৌরীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সখী তাঁকে পরিহাস করে নাই তো?

অযীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ ॥৫।৬২

হর্ষিত না দেখা যায়,
সাধু জিজ্ঞাসিলা তায়,
বল গৌরী সত্য কিবা পরিহাস করিল।

তখন গৌরী সখীর কথা অনুমোদন করিয়া সংযত কথায় উত্তর করিলেন—

যথা শ্রুতং বেদবিদাংবর ত্বয়া, জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে ॥৫।৬৪

ওহে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ শুনিয়াছ যেই মত
সেই উচ্চপদে আশা এ দীনের হয়েছে,
পদপ্রাপ্ত যে নহে জানি যদিও সাধনা মোর,
মনোরথ সদাই যে নিরঙ্কুশে চলিছে।

এইবার পার্ব্বতীর চরম পরীক্ষা আরম্ভ হইল। স্বয়ং শিব তেজপুঞ্জ যুবা তপস্বীর ছদ্মবেশে উমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, প্রভাবান্বিত তপস্বীজনের প্রতি যে সমাদর কর্ত্তব্য তাহা তিনি পাইয়াছেন, তাহারপর তিনি নানা ছলে নানা কথা তাহাকে বলিলেন, কিন্তু কি দেখিলেন? দেখিলেন, ঐ কথার মধ্যেও পার্ব্বতী এই অসামান্য তপস্বীর কথায় বা রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট নন, উমার মালা জপের বিরাম নাই। শেষে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে উমা নিজের মুখেই ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার এই তপস্যার উদ্দেশ্য। অল্প কথায় পার্ব্বতী জানাইলেন তাঁহার অভিপ্রায়, কিন্তু পাছে আবার ব্রহ্মচারী পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, তাহার গোড়া মারিয়া বলিলেন—"মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে"—অভিলাষের কি আর সম্ভব অসম্ভব আছে? পার্ব্বতী রূপ নিয়ে শিবকে আপন করিতে গিয়াছিলেন, পারেন নাই। শিবও তেজ এবং রূপের বলে পার্ব্বতীকে ভুলাইতে পারিলেন না। শেষে কঠোরতর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তিনি শিবের দোষ দেখাইয়া শিবের নিন্দা করিয়া পার্ব্বতীকে তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করানর অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন—

অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরস্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে।
অমঙ্গলাভ্যাসরতিং বিচিন্ত্য তং, তবানুবৃত্তিং ন চ কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ৫।৬৫
অবস্তুনির্ব্বন্ধপরে কথং নু তে, করোঽয়মামুক্তবিবাহকৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা, সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্ ॥ ৫।৬৬
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং, কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং, গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ ॥ ৫।৬৭
চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ, পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু ॥ ৫।৬৮
অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ, ত্রিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরিচন্দনাস্পদে, কথং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি ॥ ৫।৬৯
ইয়ং চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা, যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া, মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥ ৫।৭০
দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং, সমাগমপ্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৫।৭১
বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা, দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু ॥
বরেষু যদ্ বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে, তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ॥ ৫।৭২
নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ ক তদ্ বিধশ্বং ক চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥ ৫।৭৩

ব্রহ্মচারী শুনি কন, চিনি সেই ত্রিনয়ন,
তবু তারে চাও যেবা অবহেলা করিছে,
সে যে অমঙ্গলবাসা জানি আমি ত্যজ আশা,
তাই তব মতে সায় প্রাণ নাহি দিতেছে ॥ ৫।৬৫
তুচ্ছ বস্তু লাভে মতি তব লো পার্ব্বতী সতী
বিবাহ-কৌতুক যবে ওই করে শোভিবে,
সাপের বলয় যার হেন হাতে হায় হায়
প্রথমে ধরিবে শম্ভু কেমনে তা সহিবে ॥ ৫।৬৬
তুমিই দেখ না মনে বিচারিয়া বিচক্ষণে!
কলহংস পাড় যার হেন বধূ-দুকূলে,
রক্তবিন্দু ঝরে যায় হেন গজ-চর্ম্মে হায়
গ্রন্থিবাঁধা চলে কিনা এই দুই আঁচলে ॥ ৫।৬৭
যে চতুষ্ক পুষ্পময় তব পদ যোগ্য হয়,
আল্‌তা পরা পায় হায় বল দেখি কেমনে,
চলিবে শ্মশানে তুমি শবকেশে পূর্ণ ভূমি
শত্রু মত দিতে নারে বিসদৃশ ঘটনে ॥ ৫।৬৮
কি বলিব এর পর অসঙ্গত অতঃপর
সুলভ ত্রিনেত্র-বক্ষ তোমার গো হইলে,
হরি চন্দনেতে যাহা অনুলিপ্ত হয় তাহা
সেই কুচে চিতাভস্ম আলিঙ্গন পাইলে ॥ ৫।৬৯
এ যে আর' বিড়ম্বনা দেখদেখি সুলোচনা
নববধূ যান যেথা গজরাজ-বাহনে,
সে স্থলে বলদ বৃদ্ধ ... হবে যান কি সমৃদ্ধ!
হাসিবে যে জনজন তা দেখিয়া স্বপনে ॥ ৫।৭০
কপালীরে কাম্য করি ... দুটি বস্তু আহা মরি
শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইল রে এখনে,
হর-ভালে শোভাবতী শশিকলা কান্তিমতী,
আর যে কৌমুদী তুমি জগতের নয়নে ॥ ৫।৭১
একে বিরূপাক্ষ তায় জন্মজানা নাহি যায়
দিগম্বর বলি তার ধন বুঝা গিয়েছে,
বর কাছে যাহা চায় একটি কি আছে তায়,
হে বালমৃগাক্ষি! বল' ত্রিনেত্রে কি রয়েছে ॥ ৫।৭২
অসৎ এ অভিপ্রায় কর ত্যাগ তুমি তায়,
অমঙ্গল প্রতীকাশ কোথা তিন নয়ন,
আর কোথা তুমি সতী সুপুণ্য লক্ষণবতী
উভয়ের সমাগম সম্ভবে না কখন।
দেখ যত সাধুজন করে পূজা হৃষ্ট মন
বৈদিক পূজায় যেই যূপকাষ্ঠ বিহিত,
বল দেখি কোথা কেবা সেই মত করে সেবা
বধ্য-শূলে লো সুভগে! শ্মশানে যা প্রোথিত ॥ ৫।৭৩

শিবনিন্দা শুনিয়া উমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একবার তো সতী-কলেবরে পিতার মুখে পতি শিবের নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার কি সেই অভিনয় হইবে। এবার তাহা হইল না বটে কিন্তু উমার ক্রোধ পরিস্ফুট হইল—

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি, সবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া, বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে ॥ ৫।৭৪

দ্বিজবর প্রতিকূল বাক্য যদি বলিল.
তা' শুনি পার্ব্বতী সতী কোপে অভিভূত অতি
অধর পল্লব তাঁর কাঁপিতে যে লাগিল।
ভ্রূলতা কুঞ্চিত হায় মনোহর শোভা যায়
বক্রদৃষ্টি আঁখি-প্রান্ত রক্ত আভা ধরিল।

তখন পার্ব্বতী উত্তর করিলেন—

উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং, ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।
অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং, দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ ৫।৭৫
বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং, নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ, কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৫।৭৬
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং, ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে, ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥ ৫।৭৭
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা, গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং, ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ ॥ ৫।৭৮

তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে, ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং, বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥৫।৭৯
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ, প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা, বিনিদ্রমন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী ॥৫।৮০
বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা, ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং, কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৫।৮১
অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া, তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং, ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৫।৮২

ব্রহ্মচারী প্রতি কহিলা পার্ব্বতী
বলিলে যা মোরে বুঝিনু তায়,
হরের যে তত্ত্ব তার কিছু সত্ত্ব
পারনি বুঝিতে মোটেই হায়;
অলোক-সামান্য সর্ব্বজন মান্য
অচিন্ত্য-হেতুক মহৎজনা,
তাদের চরিতে নিন্দা ঢেলে দিতে
দুষ্টগণ হয় প্রফুল্লমনা। (৫।৭৫)
বিপদে উদ্ধার বাসনা যাহার,
ঐশ্বর্য্য কামনা যাহারি হয়,
মঙ্গলাচরণ করে সেই জন
এ কথা বিদিত ভুবনময়;
ত্রিলোক-শরণ হয় যেইজন,
কামনা যেথায় পেয়েছে লয়,
মঙ্গলাচরণ না করে সেজন
চিত্তদুষ্টি যেথা আশায় রয়। (৫।৭৬)
অকিঞ্চন বটে রাষ্ট্র সব বটে
সম্পদ আকর তাঁরেই কয়,
শ্মশান-নিবাস সর্ব্বত্র প্রকাশ
ত্রিলোকের নাথ কেন সে হয়!
ভীমরূপ বিনি কেন বল তিনি
সৌম্যমূর্ত্তি শিব সবাই বলে,
যথার্থ মহিমা পিনাকীর সীমা
বোঝে লোক কোথা জগতীতলে। (৫।৭৭)
বিশ্বমূর্ত্তি-কায় ভোগী শোভা পায়,
কিবা অলঙ্কারে শোভিত হয়,
গজের অজিন অথবা নবীন
দুকূল সুন্দর পরণে রয়,
কিংবা ভীতিকর করেতে খর্পর,
অথবা ভাতিছে ললাটে ইন্দু,
দাও যেইরূপ, তাঁহার স্বরূপ
বুঝে সাধ্য নাই একটু বিন্দু। (৫।৭৮)

অপবিত্র যেই চিতাভস্ম সেই
সে অঙ্গ পরশে পবিত্র হয়,
নতুবা কেমনে যত দেবগণে
নৃত্যচ্যুত ভস্মে মাথায় লয়। (৫।৭৯)
সম্পদ বিহীন দীন অতি দীন
বৃষভ-বাহন যদিও তাঁর,
তবু কি আশ্চর্য্য অতুল ঐশ্বর্য্য
মত্ত দিগ্‌গজ বাহন যাঁর,
সেই সুরপতি করে পায়ে নতি
লুটায়ে মস্তক নখরে যায়
মুকুট যাহার প্রফুল্ল মন্দার
পরাগে তাহার অরুণতায়। (৫।৮০)
স্বভাবের দোষে নিন্দ আশুতোষে,
তবু তো করিলে প্রশংসা তাঁর,
ব্রহ্মযোনি যাঁরে বলে লোকে তাঁরে
করে কে আর? । (৫।৮১)
শিবের স্বরূপ শুনেছ যেরূপ
বলিলে যেমন হউক তাই,
নাহি প্রয়োজন তা লয়ে এখন
তব সনে করি কোঁদল ছাই,
আমার এ মন সেভাবে মগন
জানিবে নিতান্ত আসক্ত হরে;
স্বেচ্ছাচারী জন জান ত কখন
অপবাদে কভু ভয় না করে। (৫।৮২)

ব্রহ্মচারী শিবনিন্দা করিয়া শিবের যতগুলি দোষ দেখাইয়াছিলেন, গৌরী প্রত্যুত্তরে সেই দোষগুলিই যে দোষ নয় সেগুলি যে শিবের মহদ্ গুণ এবং পরম মাহাত্ম্য, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, ঐ তাপস ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার যেন কিছু বলিতে যাইতেছেন, তখন তিনি সখীকে বলিলেন—

নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ, পুনর্ব্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ
স পাপভাক্ ॥৫।৮৩

হের লো সজনি, প্রমাদ যে গণি
কাঁপিছে আবার অধর কের
ধৃষ্ট বুঝি চায় বলে পুনরায়,
নিবার উহার শুনেছি ঢের,
মহত্তের গ্লানি করে যেই প্রাণী
শুধু সেই পাপী তাহা তো নয়,

শুনে যেই জন পাপের ভাজন
হতেও তাহায় হয় গো হয়। (৫।৮৩)

এই বলিয়াই আর এখানে থাকা বিধেয় নহে, কি জানি ব্রহ্মচারী যদি আবার শিবনিন্দা করেন, তাহা হইলে আবার না জানি কি ঘটিবে, এই মনে করিয়া—

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা।
এথা হতে চলে যাই বলিয়া যেমন হায়,
চলিলা বল্কলখানি বুক হতে খুলে যায়।

আর এদিকেও অমনি—

"স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ ।৫।৮৪
অমনি স্বরূপ ধরি বৃষভবাহন মরি
সাদরে ধরিলা তাঁরে হাসি হাসি মুখ করি !

তখন প্রার্থিত বস্তুর সহসা দর্শন স্পর্শনে—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ (৫।৮৫)

তাঁহারে হেরিয়া বালা কম্পবান কলেবরে
ঘামেতে ভিজিয়া উঠে আকুল ভাবের ভরে,
যাবে বলে তুলেছিল যে চরণ মরি হায়
ভূমে না পড়িল আর তেমনি রহিয়া যায়,
পাহাড়েতে পেলে বাধা গতিপথে মাঝখানে
সিন্ধুর যেমতি দশা আকুল বিকুল মানে,
নগরাজ-তনয়ার তেমতি ব্যাকুল মতি,
থাকিবে কি, যাইবে কি, বুঝিতে না পারে সতী।

যখন উমার এই অবস্থা তখন প্রণয়সহকারে দেবাদিদেব মহাদেব কহিলেন—

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥৫।৮৬

আজি হতে আমি তব চিরদাস হয়ে রব
ক্রীত তব তপস্যায় হে তম্বঙ্গি আমি হায়
সতত তোমার আসি, চন্দ্রমৌলি কহিলে,
তপস্যার ক্লেশ যত অমনি হইল গত
কার্য্যসিদ্ধি মাত্র ক্লেশ নাহি থাকে শ্রমলেশ
নবশক্তি ধরে দেহ সফলতা পাইলে।

কবি এই মিলনগান অপূর্ব্বভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কবি পার্থিব মিলন দেখাইয়াছেন 'শকুন্তলায়'। সেখানে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পরস্পরকে চাহিতেছে। যেই দুজনের মিলন হইল, পরস্পর পরস্পরে আদান প্রদানও হইয়া গেল; কিন্তু এ তো পার্থিব মিলন নয়, এ যে জগতের পিতামাতার অপার্থিব মিলন; এখানে কবি কত সংযত, তাঁহাদের রীতি দেখিয়াই তো জগৎ শিক্ষা লাভ করিবে, তাই গৌরী সখিমুখে সেই অসাধ্য সাধনের ফল যে শিবলাভ, সেই শিবকে জানাইলেন—"দাতা মে ভূভৃতাং-নাথঃ" ৬।১ পিতা হিমালয়ই তাঁহার দাতা, তিনি স্বতন্ত্রা নহেন। কি সংযমের সহিত কবি এখানে লেখনী পরিচালন করিয়াছেন। অর্বাচীন কবি হইলে এখানেই শিব-গৌরীর মিলনগীত গাহিতে বসিতেন। যাঁহাকে চাহিতেছেন, যাঁহার জন্য শরীর পাত করিয়া এই অতি কৃচ্ছ্র তপস্যা, সেই প্রার্থিত বস্তু আসিয়া তাঁহাকে চাহিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি তো আমার বশ নয়, আমার বাবার অনুমতি ব্যতীত আমি আমাকে তো দিবার অধিকারিণী নহি, সুতরাং বাবাকে বলুন। তারপর কবি শিবকেও অসংযত করেন নাই। শিব "স তথেতি" ৬।৩ তাহাই হইবে অর্থাৎ হিমালয়ের নিকটই তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর মহেশ্বর সপ্তর্ষিগণকে ঘটক করিয়া গৌরীর পিতা হিমালয়ের নিকট পাঠাইয়া বিবাহ কথা স্থির করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তৎপরে কুমার কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কুমার তারকাসুরকে বধ করিয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই ত গেল কাব্যকথা। এই কাব্যরসের মধ্য দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস যে দার্শনিক-তত্ত্ব যে ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

মহাকবি কালিদাস প্রকৃতি-পুরুষের লীলাখেলা কিরূপ, তাহাদের সংমিশ্রণেই যে সৃষ্টি, তাহাই হরগৌরী-মিলন-ছলে দেখাইতেছেন। প্রকৃতি পুরুষের মিলন অপ্রাকৃত ঘটনা। কবি তাহাই শিবপার্ব্বতীর পরিণয়রূপ পার্থিব সাজসজ্জায় সাজাইয়া অপূর্ব্ব কবি-শক্তিতে প্রাকৃত জনগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে প্রকৃতিই উমা এবং পুরুষই মহাদেব।

ত্রিধাবিভক্তমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥২।৬
একমাত্র ব্রহ্মরূপে তুমি ওহে হরি
প্রকাশিছ নিজ শক্তি তিনরূপ ধরি;

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান কারণ
হয়েছ তুমিই ওহে দেব সনাতন ॥

তাহারপর দেখাইলেন—

স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌতে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥২।৭
সৃষ্টি করিবার আগে ওহে নিরঞ্জন!
বিভক্ত করিলে স্বীয় মূর্ত্তিকে তখন,
অর্দ্ধভাগ হয় নারী আর ভাগ নর
আদি পিতা মাতা এঁরা সৃষ্টির ভিতর।

এই পিতামাতা যে কে তাহা মহাকবি তাঁর "রঘুবংশের" প্রথম শ্লোকে সুস্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ রঘু ১।১
শব্দ ও অর্থের মত নিত্য সম্মিলিত যাঁরা
জগতের পিতামাতা হরগৌরী হন তাঁরা ;
শব্দ ও অর্থের জ্ঞান লভিবারে মূঢ়মতি
তাঁদের চরণপদ্মে করি আমি সদা নতি।

এই যে জগতের পিতামাতা ইঁহারাই সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির নামান্তর। কালিদাস তাই বলিলেন—

ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনীম্।
তদ্দর্শিন মুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥২।১৩
ভোগ অপবর্গ দায়ী ত্রিগুণ কারণ
তুমিই ইহাই বলে সাখ্যবিদগণ ;
প্রকৃতির কার্য্যদর্শী কূটস্থ ঈশ্বর
বলিয়া বর্ণনা তোমা করে নিরন্তর।

পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও নিষ্ক্রিয় উদাসীন, আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। এই প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ। প্রকৃতিবিযুক্ত অবস্থাতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া মহাকবি দেখাইতেছেন যে, পুরুষরূপী যে মহাদেব তিনি সতীরূপিণী প্রকৃতি-বিয়োগে নিষ্ক্রিয় উদাসীন, তাই তিনি বিমুক্ত সঙ্গ ও তপস্যায় রত। প্রকৃতিশূন্য পুরুষের তো নিজ চেষ্টায় কোন কর্ম্ম নাই, সুতরাং তিনি চৈতন্যময় বটে কিন্তু উদাসীন। ব্রহ্ম স্বতঃই চৈতন্যময় হইয়াও যখন সমস্ত জগৎ সঙ্কোচ করিয়া নিষ্ক্রিয় থাকেন, এই কর্ম্মহীন অবস্থাই তাঁহার তপস্যা। আর কখনও তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইলেই সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে থাকে। এই যে "বহুস্যাম্" ইচ্ছা, ইহা কেন হয়, কখন হয়, কি ভাবে হয়, তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, তাহা অপরিজ্ঞেয়।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" .

'প্রয়োজন না থাকিলে মন্দব্যক্তিও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না' এই ন্যায় অনুসারে যে-কোনও ব্যক্তির যে-কোন কাজই হউক না কেন, তার প্রয়োজন থাকিবেই। সুতরাং মহেশ্বর বিনা কারণে তপস্যায় নিরত হইয়াছেন, ইহাতো হইতে পারে না। তাই অনুমান হয়, পুরুষের সেই বিরুদ্ধ ইচ্ছাকেই অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ পরিশূন্য অবস্থাকেই, মহাকবি পুরুষরূপী শিবের "কে নাপি কামেন তপশ্চচার" বলিয়াছেন। এই পার্ব্বতীরূপা প্রকৃতি এই শিবরূপী পুরুষের সহিত মিলিত হইবেন। প্রকৃতির মিলনের পূর্ব্বে যে চাঞ্চল্য ওঠে, তাহাই কলিদাস দেখাইলেন দেবতা প্রভৃতির চেষ্টা, সেই চেষ্টার প্রথম উন্মেষ, শিবের নিকট উমার সেবার জন্য গমন। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের ইঙ্গিত। ইহার প্রথম ফল তেজোৎপত্তি, তাহাই হরনেত্রজন্মা বহ্নি। তেজ অর্থাৎ আলোর প্রকাশে অন্ধকারের অন্তর্দ্ধান। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ তখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাই শিবের অন্তর্দ্ধান বা প্রকৃতি হইতে পুরুষের বহির্গমন। পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলনের যে অন্তরায় আছে, তাহার নিরসনের জন্যই প্রকৃতির বিষম চেষ্টা—তাহাই উমার তপস্যা। যেই অন্তরায় দূর হইয়া গেল অমনি পুরুষের সহিত প্রকৃতির যোগ হইল, তখন কুমারের উৎপত্তি বা সৃষ্টির বিকাশ আরম্ভ হইল। পরে কুমার তারকাসুরকে বধ করিলেন, অর্থাৎ—সৃষ্টিক্রিয়ার বিকাশের যে অন্তরায় দেখা দিয়াছিল, তাহার ধ্বংস হইল, এবং সৃষ্টিক্রিয়া অব্যাহত হইল।

আবার লৌকিকভাবে মহাকবি দেখাইতেছেন যে, উমা শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য অভিযান করিয়াছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহার পিতা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, আর প্রকৃতি ও তাঁহার অসীমরূপরাশি। কিন্তু কি হইল? সারা জগৎ তাঁহাকে সাহায্য করিলেও তাঁহার সেই অলোকসামান্য-রূপ ত্রিলোচনকে মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে পারিল না। পার্ব্বতী যে অনন্যসাধারণ রূপের অহঙ্কার লইয়া শিবকে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে যোগীশ্বর শিব ধরা পড়িলেন না, অধিকন্তু মদন ভস্ম হইল বা কামদগ্ধ হইল। মদন বলিতে মদ বা অহঙ্কার। কাম অর্থেও কামনা বা ইচ্ছা, তাহাও অহঙ্কারসূচক। সুতরাং মদন-ভস্ম অর্থে গৌরীর রূপের অহঙ্কার বা দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। পার্ব্বতী বুঝিতে পারিলেন

যে, দর্পের দ্বারা আরাধ্যবস্তু লাভ হয় না। আরাধ্যকে লাভ করিতে হইলে, চাই ত্যাগরূপ সাধনা। অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে, বিলাস ত্যাগ করিতে হইবে, মনকে সংযত করিতে হইবে, মনকে একাগ্র করিতে হইবে, আত্মাকে আরাধ্যের পায়ে বলি দিতে হইবে, অনন্য মনে আরাধ্যতেই চিত্তকে ন্যস্ত করিতে হইবে, তবেই তাঁহাকে পাইবার যোগ্য হইবার সম্ভাবনা। যেই গৌরী অহঙ্কার পরিশূন্য হইলেন, সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেন তখনই ভক্তাধীন দেবতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভক্তের অভীষ্ট পূরণের পূর্ব্বে দেবতা তাঁহার ভক্তকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা না করিয়া নিজকে ভক্তাধীন করেন না। তাই উমার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মহাদেব মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া অতি তেজস্বী নবীন যুবা তপস্বীর মোহনরূপ লইয়া পার্ব্বতীর নিকট এলেন। কত মিষ্ট কথা বলিলেন। উমা অবিচল। এত রূপ, এত তেজ, এত প্রিয় কথা, কিছুতেই উমার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নিজের কাজেই ব্যস্ত, মালা জপেই মন, অতিথির কথার উত্তর দিতে হইবে, তাহাতে অনেক কথা বলিতে হইবে, অত কথা বলিবার তাঁহার সময় কই, তাই সখীকে বলিতে আদেশ দিলেন। ছদ্মবেশী হর গৌরীকে এ চেষ্টায় পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তিনিও যেমন গৌরীর রূপে ভোলেন নাই, গৌরীও তেমনই তাঁহার রূপে ভুলিলেন না। এ পরীক্ষায় গৌরীর জয় হইল। তখন ঐ কপট যোগিবেশী মহেশ্বর, শিবের যে কত দোষ আছে তাহা এক এক করিয়া বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখাইতে লাগিলেন, শিব-নিন্দার একশেষ করিলেন। তাহাতেও পার্ব্বতী টলিলেন না। বরং তিনি সেই প্রদর্শিত দোষগুলিই যে শিবের অশেষ গুণ তাহা দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পের তিলার্দ্ধ চ্যুতি ঘটিল না, পরন্তু সঙ্কল্পে বাধা পড়ায় তাঁহার আরাধ্যের প্রতি অসীম বিশ্বাস, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ভক্তিই আরও বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার আত্মসমর্পণ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল, তিনি সুকঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অমনই পূর্ণমঙ্গলময় শিব স্বরূপে উমার হাতে ধরা পড়িলেন। এমন ধরা পড়িলেন যে হরগৌরীতে মিলিয়া অর্দ্ধ-নারীশ্বরে পরিণত হইলেন। উমার সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি ঘটিল। পুরুষ আর প্রকৃতি আর পৃথক্ থাকিল না, এক হইয়া গেল, মহাকবির "প্রাক্‌সৃষ্টেকেবলাত্মনে" (২।৩) হইল। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এক ব্রহ্মের স্বরূপ ছিল তাহারই প্রকাশ হইল। আমরা ইহাকেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বলিতে পারি।

মহাকবি কালিদাস হরগৌরীর মিলনগাথায় অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশ্লেষণ করিয়া গল্পচ্ছলে নানা রস সহযোগে অনুপম কবিতায় গাঁথিয়া আমাদের মত পাষণ্ডজনের ধর্ম্মে মতি হইবার জন্য জগজ্জনকে সাদরে উপহার দিয়াছেন।

অপমৃত্যু

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এ

ঝাঁক বাঁধিয়া সকলেই যাইবে।

মা বলিল, আরে বাপরে বাপ., যেন পঙ্গপাল ছুটল! সে কি ঘাট থেকেই বিদায় নেবে যে সবুর সইছে না!

বড়বউ হাসিয়া বলিল, তোদের চাপে সে বেচারী বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়!

কেহই ছাড়িবে না। বড়বউএর আড়াই 'বছরের' ছেলে মানকে, সেও আবার হাত পা' ছুঁড়িয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, তাহারও যাওয়া চাই।

ইলসামারির দত্তদের ছোটবউ আসিতেছে, দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আবার সে গাঁয়ে ফিরিতেছে। বিবাহের পর যেদিন সে গ্রাম হইতে বিদায় লইয়াছিল সেদিন সে কিশোরী নববধূ। ঘোমটার ফাঁক হইতে গ্রামের যেটুকু রূপ সে দেখিয়াছিল, আজিও তাহার অস্পষ্ট ছবি মনে

গাঁথা রহিয়াছে। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের অপরূপ মাধুর্য্য কতদিন কত দুঃখে তাহাকে সেই কর্ম্মমুখর সুদূর সহরে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।…সেই মনশাতলির তেতুল গাছ, কুয়ার পাড়ের সেই বাঁকা পেয়ারাগাছ, ইলসামারির সাঁকো,…চুড়িওয়ালী বেদেনী, কুন্তলা, বেণু, বীণা, ননী, টুকু…

আজ আবার তাহাদের সহিত চাক্ষুস মিলন ঘটিবে, উত্তেজনায় তপতীর আর সবুর সহিতেছিল না।

বাঁকের মোড়ে নৌকা আসিতেই পাড়ের ক্ষুদ্র জনতাটী পরমোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

—উই—ই যে—ছোটদা—

—বউদি—কাকী—

কাকী—ই—

আড়াই বছরের মানকেও মাথা দোলাইয়া বলিল, তা—কী—

তপতী হুড়মুড় করিয়া নৌকা হইতে নামিয়া তাহাদের মাঝে গিয়া দাঁড়াইল। সবাইকে আদর করিয়া বলিল, সবাই আমাকে মনে করে রেখেছ—বাঃ! আর এই বাচ্চাটা, দস্যি আমায় চিনলি কি করে?

মানকেকে বুকের মাঝে সে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

ননী বলিল, বড্ড দুষ্টু হয়েছে ওটা বৌদি।

তপতী তাহাকে টানিয়া কাছে আনিয়া হাসিয়া বলিল, আর তুই, দুষ্টু, যেদিন প্রথম এলাম, আমার নাক কামড়ে দিলি!

ননী লজ্জায় ভীড়ের মাঝে লুকাইল।

তপতী বলিল, বেণু, বীণা—চল ভাই, আমরা হাঁটতে আরম্ভ করি, ওদিকে মা, দিদিরা সব বসে আছে।

তপতী তাহার ক্ষুদ্রবাহিনীটী লইয়া চলিল।

পিছন হইতে বিনয় বলিল, বা-রে, এ পর্বত সামলাবে কে?

তপতী দুষ্টুমি করিয়া হাসিয়া বলিল, কেন, অগস্ত্য মুনি।

বীণা হাসিয়া বলিল, বেচারী সাগরকে সামনে না পেয়ে ঐ সন্দেশের হাঁড়ি কিন্তু অগস্ত্যের উদরস্থ হবে বৌদি!

বিনয় নিষ্ফল আক্রোশে ভেংচি কাটিয়া বলিল, রাক্কুসী—

তাহার ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কেহই দেরী করিল না। বিনয়কে বিপদ সাগরে ফেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া তপতী বলিল, আমি আর কোথায়ও কিন্তু যেতে পারব না মা, ইলসামারি ছেড়ে আর আমি একপা'ও নড়ব না।

মা হাসিয়া বলিল, পাগলী মেয়ে!

বড়বউ বলিল, তুই এখনও তেমনি ছেলেমানুষ আছিস তপতী?

তপতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ!

বড়ছেলে বিরাজমোহন ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমাদের আক্কেলখানা কি বল দেখি, বিনু ছেলেমানুষ, তারপরে অতগুলি মালপত্তরের ভার দিয়ে এখানে এসে দিব্যি সব হাসি তামাসা হচ্ছে?

বেণু বলিল, বড়দা'র বিনু কিন্তু সেই একরত্তি বিনুই রয়ে গেল, অথচ আমাদের দেখলে চোখ টাটায়; বলে, সব যেন বেড়ে চলেছে!

বড়বউ হাসিয়া বলিল, বিনু বাড়লেও ক্ষতি নাই, কমলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু তোদের বাড়ার পেছনে যে ভাবনা রয়েছে দিদি!

কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

মা বাধা দিয়া বলিল, কেন মহেশকে ত বাড়ী গিয়ে বলা হয়েছে, কুঁড়েটা এখনও যাইনি বুঝি?

বিরাজমোহন ব্যস্ত হইয়া বলিল, যাই দেখি, সব যেন হয়েছে নবাব—

কিন্তু কাহাকেও আর যাইতে হইল না। মালপত্তর লইয়া গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল।

সকলের পিছনে প্রকাণ্ড এক মোট মাথায় বিনয়কে আসিতে দেখিয়া মা, দাদা দৌড়াইয়া গেল—বেণু, বীণা হাসিয়া উঠিল।

বিনয় সজোরে মাথা হইতে মোটটী ফেলিয়া বসিয়া পড়িল, হাঁপাইয়া বলিল, উঃ, দাও দেখি এক গ্লাস জল!

হাতা খুন্তি এমন কি কুন্তলা বক্সর চুলের ফিতেটী পর্য্যন্ত ফেলে আসতে পারবেন না, অন্যের তাতে কি, এখন ঠেলা সামলাও এই কুলি, উঃ।

বিরাজমোহন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল, এই মহেশ, হতচ্ছাড়া, এতবড় মোটটা তুই ছোটবাবুর মাথায় উঠিয়ে দিলি, এ্যাঁ?

মহেশ কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, বাঃ, আমি ত গাড়ীতে সব তুলেইছিনু, ছোটবাবু ত হেনা-তেনা তখি দেখিয়ে নিয়ে নিলে, বললে, বাড়ীতে গিয়ে দেখবি কি মজা করি।

বিনয় বাধা দিয়া বলিল, এই ময়না, মিথ্যের জাহাজ, থাম্, গাড়ীতে তুলেইছিনু—গাড়ীতে জায়গা ছিল তোর? যা,—তোর বখশিস পাবি না,—যা, ভাগ্—

বিনয় তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া গেল—এমনভাবে যে তাহার পৌরুষ ব্যক্ত হইয়া পড়িবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

মা হাসিয়া বলিল, পাগলা!

দাদা মাথা নাড়িয়া সায় দিল, ছেলেমানুষ!

বেণু, বীণা তপতী হাসিয়া লুটোপুটি।

বেড়াইতে আসিয়া ঘোষগিন্নী বলিল, হ্যাঁ, যতই বল, বিনু বউ পেয়েছে ভাল, কিন্তু দুঃখ ছেলেপুলে হ'ল না!

মা বুড়া হইয়াছে সুতরাং বরাত, মা ষষ্ঠীর বিমুখতা লইয়া অনেক কান্নাকাটি করিল।

কিন্তু ঘোষগিন্নী যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই; এদিক ওদিক চাহিয়া এইবার বলিল, ধর বয়স ত কম হয় নাই, অত ছেলেমানুষী পাড়াগাঁয়ের লোক ভাল দেখবে কেন। এই ত আমিই সেদিন দেখলেম, পদ্মপুকুর ঝাঁপাঝাঁপি করে সব শালুক তুলছে, হাসি-ঠাট্টার আওয়াজে রাস্তার লোক জমে যায়। তুমি বারণ করে দিও বিনুর মা, আহা সরল মানুষ—

বাড়ীর ছাদে সেদিন এলাহি কাণ্ড। চার বছরের ক্ষেন্তর পনেরো বছরের ছলের সাথে ছোট্ট টুকুর বড় মেয়ের বিয়ে। শুভক্ষণ পদ্মপুকুরের

শাপলার ফুল, গোয়ালের বেড়ার পাতাবাহারের পাতা, উঠানের ভিটের মাটি লইয়াই সমাধা হইত। কিন্তু তপতী আসিয়া তাহা একদম উল্টাইয়া দিয়াছে। বেণু বীণাকে লইয়া কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে বিবাহের যজ্ঞ রাঁধিতে বসিয়াছে। বাজার হইতে সত্য ময়দা, ঘি, মিষ্টি আসিয়াছে। ছেলেমেয়েদের আনন্দের আর পরিধি নাই। কত পুতুলের অন্নপ্রাশন, বিবাহ, বৌভাত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মাঝে যে এত আনন্দ লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা তাহারা জানিত না। এই আনন্দের, এই প্রাণময় উৎসবের উৎস কাহার সহিত যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। তপতীকে তাহারা অল্পদিন হইল পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উৎসব আনন্দে এই করুণাময়ী নারীর অনুপস্থিতি তাহারা ভাবিতেও পারে না। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া পরমোল্লাসে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছিল।

বড়বউ দম্‌দম্‌ করিয়া উপরে আসিয়া বলিল, এ তোর কি ছেলে-মানুষী তপতী, এতগুলি টাকা এমন ভাবে বাজে খরচ করতে আছে?

তপতী কাজে ব্যস্ত ছিল। মুখ না তুলিয়াই বলিল, তোমায় নিমন্ত্রণ করবো, ঠিক সময় এসে খেয়ে যাবে, তার আগে কাজের বাড়ীতে এসে তোমায় আর লম্বা লেকচার দিতে হবে না।

বড়বউ রুষ্ট হইয়াছিল কিন্তু এই মেয়েটীর সামনে আসিলে সব রাগ যেন পড়িয়া যায়। তথাপি সে বলিল, বাজে কাজে তোর উৎসাহ কোনদিনই কম নয়, দেখ দিকি—

এইবার তপতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বাজে বাজে বলে তোমরা কাজের কাজকেও বাজে বলে উড়িয়ে দাও বড়দি। আমার এতগুলি ছেলেমেয়ে, ভাইবোনকে আনন্দ দেওয়া তোমরা বাজে বলে উড়িয়ে দিতে পার, আমি পারিনে। অন্তত আজকের দিনটা বাজে কাজের হিসেবটা বন্ধ রেখে নির্বিবাদে আমাদের একটু আনন্দ করতে দাও।

বড়বউ কথা বলিল না, কিন্তু তাহার যে যথেষ্ট রাগ হইয়াছে, তাহা বোঝা গেল তাহার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার ভঙ্গীতে।

নীচে হইতে শাশুড়ী বলিল, হোল ত? কারও কথা ও শুনবে!

তপতী ইচ্ছা করিলে এসব কথা না শুনিয়া পারিত, কিন্তু কেন জানি শাশুড়ীর কথার উত্তরে সেও চেঁচাইয়া বলিল, শুনবো, মা, শুনবো।

হঠাৎ যেন ভোজবাজী হইয়া গেল। সদ্য ভাজা এক ঝাঁকা লুচি উঠানের মাঝে ফেলিয়া, ছেলেমেয়েগুলির পিঠে দুম্‌দাম্‌ করিয়া কয়েকটা কিল চড় বসাইয়া তপতী ত্বরিতে নীচে নামিয়া গেল।

উপরে ছেলেমেয়েগুলির চীৎকার, নীচের উঠানে যত রাজ্যের কুকুর বেড়ালের ভীড়—বড়বউ অবাক হইয়া দেখিতেছিল।

পিছন হইতে তপতী বলিল, বাজে কাজটা এবার কেজো হয়ে গেল বড়দি! ছেলেমেয়েদের কাঁদাতে কাঁদাতে ওদের হাসা আর তোমরা শুনে দেখতে পার না।

তপতী গিয়া ঘরে দুয়ার দিল।

মা, বড়বউ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব বলিয়া চলিল। কিন্তু তপতী তাহা শুনিতে চাহে না, দুইহাত দিয়া কান চাপিয়া সে জোর করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাত্রে আসিয়া বিনয় বলিল, এখানেও এসে ছেলেমানুষী! এ কি শুধু আমি আর তুমি—মা, দাদা, বৌদি, এঁরা সব কি ভাবছে বল দিকি?

তপতী হাসিয়া বলিল, ছেলেমানুষী না দিদির সাথে করবো আ ত করবো তোমার সাথে?

বিনয় বাধা দিয়া বলিল, না—না হাসি নয়, অতগুলি লুচি উঠানের মাঝে অমন করে ফেলে দেওয়ায় তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে তপতী।

তপতী বলিল, বড্ড রাগ হোল। তা যাকগে, আমায় ক্ষমা কর বড়দি।

বিনয় অবাক হইয়া তপতীর মুখের দিকে তাকাইতেই, সে ইসারায় দেখাইল—বড়বউ লজ্জায় একরকম দৌড়াইয়া পলাইতেছে।

হাসিয়া তপতী বলিল, বড়দির কিন্তু সাহস বড্ড কম। কোন কিছু সামনে এসে শুনতে চায় না।

বিনয় বলিল, ধ্যেৎ, অমন করে বেয়াকুপ করতে আছে।

তপতী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কেউ মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে, কেউ লজ্জায় পালাবে, রাগারাগি, ফিস ফাস—এসব আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না বাপু। দেখ না দু' মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

তপতী একরকম ছুটিয়া গেল।

বিরাজমোহন বলিল, তোর তা হলে কালই যেতে হবে বিনু?

বিনয় বলিল, হুঁ, কিন্তু মুস্কিল বেধেছে—

বিরাজমোহন ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি হোল আবার? দেখি কাছে আয় ত, গা গরম হয়েছে?

নিকটে বড়বউ দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, তপতী এখন যেতে চায় না।

বিরাজমোহন বলিল, না-না, একেই ত যে চেহারা, তার পর ম্যালেরিয়ায় ভোগ, ও থেকে কাজ নাই।

বড়বউ বলিল, তাই নিয়ে যা, যা ছেলেমানুষের মত হুড়োহুড়ি করে, কবে আবার কি করে বসবে। এই ত সেদিন ঘোষ-গিন্নী বলছিলেন—

বাধা দিয়া বিরাজমোহন বলিল, হয়েছে কথায় কথায় আর কবি উবাচ'র দোহাই দের না।

এমন সময় বেণু হাসিতে হাসিতে এক পত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল। কাগজটা সে বিরাজমোহনের হাতে তুলিয়া দিল।

বিরাজমোহন দেখিল তাহাতে গোটাগোটা করিয়া লেখা—

—আমি যাইব না। জোর করিয়া সেই কাঠখোট্টা দেশে পাঠাইয়া দিলে বড় দুঃখ হইবে।

তপতী

কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, এমন কি বিনয়ও।

বিরাজমোহন মাথা চুলকাইয়া বলিল, কিন্তু বিনুটা ছেলেমানুষ, একা, একা—

বীণা হাসিয়া বলিল, তুমি এক কাজ কর বড়দা, মামকের ঐ ডলি পুতুলটার পাশে আমাদের বিনুবাবুকে বসিয়ে দাও, কোলী—

বেণু কথাটা শেষ করিয়া বলিল, নাবালক।

এইবার বিনয়ের বিক্রম দেখাইবার পালা। হাত পা ছুঁড়িয়া খানিকটা লাফাইয়া বলিল, এই তোমায় আমি বলে রাখলেম বড়দা, আর যদি আমি বাড়ী আসি। থাক্‌গে সব কুন্তলা বন্ধুকে নিয়ে। সামনের মাসে ছুটি ছিল, হ্যাঁ ছিলই ত,—আবার আসব নাকি ভেবেছিস?

বেণু অতিকষ্টে গম্ভীর হইয়া বলিল, হ্যাঁ।

ভেংচি কাটিয়া বিনয় বলিল, হ্যাঁ—মুখপুড়ী! বুঝলে বৌদি, ঐ ছুটোকে বিদায় না দিলে আমি আর বাড়ীতে ঢুক্‌ছি না।

বৌদি হাসিয়া বলিল, বিদেয় করা আর না করা ত তোদেরই হাত ভাই।

বিনয় বলিল, হ্যাঁ দেবই ত, ঐ খোঁড়া যতীন ডাক্তারকেই দেব।

বেণু, বীণা তারস্বরে তপতীকে ডাকিয়া বলিল, এই ভাই বৌদি, শো-নো, আমাদের এই নাবালক ভাইটা ত একদিন ওপাড়ার ঘোষেদের মে—

বিনয় চেঁচাইয়া উঠিল, এই খবরদার বলছি,—ভাল হবে না বলছি—

উর্দ্ধশ্বাসে সে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

বিনয় চলিয়া গিয়াছে।

দিনগুলি মহানন্দে কাটিলেও এক এক সময় তপতীর মনটা যেন খা-খা করিয়া ওঠে।

বেণু আসিয়া হাঁপাইয়া বলিল, কুন্তলাদি বড্ড কাঁদচে বৌদি।

তপতী তরকারী কুটিতেছিল, হঠাৎ হাত কাঁপিয়া গেল, ত্রস্তে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, কাঁদ্‌ছে?

বীণা বলিল, হ্যাঁ, পুকুর পাড় থেকে শুনলাম, ওদের বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়ে গেছে।

তপতী বিনাবাক্য ব্যয়ে তাহাদের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে শাশুড়ী বলিল, ভরসন্ধ্যের বাড়ী থেকে বেরুতে হবে না।

তপতী ফিরিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটা মা।

বড়বউ বলিল, তোর ভাসুর এখন বাড়ীতে নেই।

তপতী যাইতে যাইতে বলিল, তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লে তিনি রাগ করবেন না বড়দি।

শাশুড়ী, বড়বউ বিড় বিড় করিতে লাগিল।

তপতী বেণু বীণাকে লইয়া চলিয়া গেল।

কুন্তলা সুন্দরী। তাহার স্বামীর টাকাও আছে, ভালবাসাও আছে। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া কুন্তলা কিসের যেন একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছে। তাহার স্বামী হাত খরচ ত দূরের কথা নিয়মিত চিঠিপত্রও দেয় না।

তপতী আসিলে কুন্তলা কতদিন তাহাকে কাঁদিয়া বলিয়াছে, কি হোল ভাই?

তপতী তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, বলিয়াছে, তোকে যে অনাদর করবে সে মহাপাষণ্ড। ও দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

কুন্তলা হয়ত কাঁদিয়া মরিত, কিন্তু তপতী আসা অবধি সে শুধু হাসিয়াছে। তপতীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় সেও ভাবিয়াছে, ও দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় কুন্তলার কাকা খবর আনিয়াছে, ব্যাপার সুবিধার নহে। জামাই কোথাকার একটা বিধবাকে আনিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় নাচ-গানের ফোয়ারা ছোটে।

বাড়ীতে সোরগোল উঠিল। কুন্তলা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া মরিল।

তপতী গিয়া দাঁড়াইতেই কুন্তলা কাঁদিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; বলিল, কি করি বল দেখি, এমন করে তুই আমাকে বেঁচে থাকতে বলিস?

তপতী কাঁদিয়া ফেলিল, কিছু বলিতে পারিল না।

কুন্তলা তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইতে চায়, প্রতিশোধ লইতে চায়। আত্ম-প্রয়োজনে জ্ঞানশূন্য হইয়া সে চরমে উঠিল। তপতীকে একান্তে ডাকিয়া পরম আগ্রহে তাহার হাত ধরিয়া সে বলিল, আমাকে বাঁচা তপতী।

তপতী ভাবিয়া পাইল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কুন্তলা কোন বাধা মানিল না, বলিল, ও পাড়ার ভৈরবী দিদি বলত, শেষরাতে এক ডুবে পদ্মপুকুরের মাটি এনে শিবগড়ে পুজো দিলে স্বামী বশ হয়। কিন্তু মাটি নিজে আনলে ফল হয় না—আমাকে তুই বাঁচা।

সে হাঁপাইতে লাগিল।

তপতী যেন অগাধ সমুদ্রে কূল পাইল। কোন চিন্তা সে করিল না, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ করিয়া দিল—বলিল, আমি জেগে থাকব, শেষ রাতে আমায় চুপি চুপি ডাক্‌বি।

কুন্তলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগে কাঁদিয়া উঠিল।

শীতের শেষ রাত্রি। সমস্ত গ্রামটী নিস্তব্ধ। কনকনে শীত, দূর হইতে অস্পষ্ট কুকুরের ডাক শোনা যাইতেছে। সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কেবলমাত্র একটী নারী পরের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য তখনও জাগিয়া আছে।

অদূরে মানুষের ছায়া দেখিয়া তপতী তাহাকে ইসারায় চুপ থাকিতে বলিয়া নীরবে ঘর ছাড়িয়া আসিল।

পদ্মপুকুরের পাড়ে আসিয়া কুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার ভয় করছে তপতী।

তপতী হাসিয়া বলিল, ভয় কি রে, স্বামী পেতে হলে এমন কত করতে হয়। চুপ করে দাঁড়া, দেখ, এক ডুবেই কেমন মাটি নিয়ে আসি।

দূরে দাঁড়াইয়া কুন্তলা দেখিল, তপতী নিঃশঙ্কচিত্তে পদ্মপুকুরে নামিতেছে। অজস্র আগাছা, কলমির ডগা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

সেইখান হইতে তপতী হাসিয়া বলিল, এই দেখ, এক-দুই-তিন—

তপতী ডুব মারিল।

কুন্তলা ভয়ে চোখ বুজিল।

কুন্তলা চোখ বুজিয়াই আছে, তপতীর সাড়া পাইলে তবে সে চোখ মেলিবে।

কিন্তু এ কি—প্রহরের পর প্রহর যে কাটিয়া যায়—ওঃ এক যুগ, বিলের বুকে শব্দ হয় কই? তবে কি—সে চোখ বুজিয়া আস্তে ডাকিল, তপতী! ওপার হইতে একটা বিশ্রী প্রতিধ্বনি আসিল। মানুষের আওয়াজ পাইয়া একটা শেয়াল পলাইয়া গেল। কিন্তু তপতীর সাড়া নাই।

এইবার সে চোখ খুলিল। অন্ধকারে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। ভয়ে তাহার গলা শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল, প্রাণপণ সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—তপতী!

কোন সাড়া নাই। সর্ব্বশরীরে একটা ভীষণ ধাক্কা লাগিল, ভাল করিয়া কোন কিছু সে চিন্তা করিতে পারিল না। যত রাজ্যের ভয় আসিয়া তাহাকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিল, ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সে গ্রামপথে ছুটিয়া গেল, একবারও পিছন ফিরিয়া দেখিল না।

তপতীর দেহ কুৎসিত হইয়া পদ্মপুকুরের বুকে ভাসিয়া উঠিল। গ্রামময় সোরগোল পড়িয়া গেল। বিরাজমোহন বৃথা ছুটাছুটি করিল। শাশুড়ী কাঁদিল, বড়বউ কাঁদিল, গ্রামের সকলে কাঁদিয়া মরিল; কিন্তু কেহ জানিল না কেন কিসের জন্য তাহার এই রহস্যময় আত্মহত্যা। যে জানিল, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিল না।

ইলসামারির আবালবৃদ্ধবনিতা আজিও পদ্মপুকুরের পাড়ে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উপরের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করে, কেন আত্মহত্যা করিল?

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধ

গীতাক্রিয়াত্মক বর্ণ ও অলঙ্কার নিরূপণ করিবার পরে সঙ্গীত-রত্নাকরে জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; কারণ স্বর-সপ্তক যে গীত বা গানসমূহের শোভা সম্পাদনের জন্য বিচিত্র সন্নিবেশে বর্ণ ও অলঙ্কাররূপে পরিণত হয়, সেই গানসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত বা সংবদ্ধ রহিয়াছে—এই জাতি, সুতরাং জাতি-পরিচয় না হইলে গান-সম্বন্ধে বিদ্যার্থীর সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। জাতির লক্ষণ পরে বলা যাইবে, আপাততঃ শুদ্ধ জাতির নাম এবং এই শুদ্ধ জাতি কতপ্রকার তাহাই বলা যাইতেছে।

শুদ্ধ জাতি সাত প্রকার, ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সাতটি স্বরের নাম হইতে ইহাদের নাম রচিত হইয়াছে; যথা—ষাড়্জী জাতি, আর্ষভী জাতি, গান্ধারী জাতি, মধ্যমা জাতি, পঞ্চমী জাতি, ধৈবতী জাতি ও নৈষাদী জাতি।

শুদ্ধ জাতির লক্ষণ—যে সকল জাতিতে নাম স্বর (যেমন ষাড়্জী জাতির ষড়জ স্বর, আর্ষভী জাতির ঋষভ স্বর ইত্যাদি) ন্যাস, অপন্যাস, গ্রহ ও অংশস্বর হইয়া থাকে, তাহার স্থানে যে সকল জাতির ন্যাস বা সমাপ্তি হয় না, সম্পূর্ণ (অর্থাৎ সপ্তস্বরের) মূর্চ্ছনাযুক্ত সেই সকল জাতিকে শুদ্ধ জাতি বলে। ন্যাস অপন্যাস প্রভৃতি শব্দের অর্থ পরে বলা যাইবে।

বিকৃত জাতির লক্ষণ—যে জাতিসমূহের ন্যাস বা সমাপ্তি হয় নামস্বর বা নামকারী স্বরে, কিন্তু কখনই ঐ নামকারী স্বরটি অংশ, গ্রহ ও অপন্যাস স্বর হয় না—তাহাকেই বিকৃত জাতি বলে। এই বিকৃত জাতি বহুপ্রকার; নিম্নলিখিত বিবৃতিতে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে শুদ্ধ জাতির যে লক্ষণটি বলা হইয়াছে উহা একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ঐ লক্ষণে চারিপ্রকার বিশেষ গুণ দ্বারা শুদ্ধ জাতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (১) নামস্বরের অংশত্ব, নামস্বরের গ্রহত্ব, নামস্বরের অপন্যাসত্ব ও মূর্চ্ছনার সম্পূর্ণত্ব। যুগপৎ এই চারিটি বিশেষ গুণ কেবল শুদ্ধ জাতিতেই বর্ত্তমান, বিকৃত জাতিতে থাকে না। ইহার যে কোন একটি গুণের অভাবে অপর তিনটি গুণ থাকিলেও সেই জাতিকে শুদ্ধ জাতি বলা চলে না। সুতরাং শুদ্ধ জাতির চারিটি লক্ষণের মধ্যে এক দুই তিন বা চারিটি ক্রামক বা যুগপৎ বর্জনে যে জাতি গঠিত হয়, তাহাকেই বলে বিকৃত জাতি।

এক একটি লক্ষণ ক্রমে পরিত্যাগ করিলে চারিপ্রকার বিকৃত জাতি গঠিত হইতে পারে ; যথা—অন্য তিনটি লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যদি নাম-স্বরটিকে গ্রহস্বর না করা হয়, তবে তাহা একপ্রকার বিকৃত জাতি। এইরূপ অন্য তিনটি লক্ষণ থাকাসত্ত্বেও নাম স্বরটি যদি অংশস্বর না করা হয়, তবে তাহাও একপ্রকার বিকৃত জাতি। এইরূপ নামস্বর অপন্যাস না হইলে একপ্রকার বিকৃত জাতি এবং সম্পূর্ণ মূর্ছনার অভাবে ষাড়ব ও ঔড়ুব মূর্ছনায় এক এক প্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে ক্রমে এক একটি লক্ষণ বর্জন করিয়া চারিপ্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হয় ; এইরূপে একসঙ্গে দুইটি করিয়া লক্ষণ বর্জিত হইলে আরও ছয়প্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—(১) সম্পূর্ণ মূর্ছনা ও নাম-স্বরের গ্রহত্ব এই দুইটি লক্ষণ বর্জিত হইলে একপ্রকার (২) সম্পূর্ণ মূর্ছনা ও নামস্বরের অংশত্ব এই দুই লক্ষণ বর্জনে একপ্রকার (৩) সম্পূর্ণ মূর্ছনা ও নাম-স্বরের অপন্যাসত্ব বর্জনে একপ্রকার (৪) নামস্বরের গ্রহত্ব ও অংশত্ব বর্জনে একপ্রকার (৫) যুগপৎ নামস্বরের গ্রহত্ব ও অপন্যাসত্ব বর্জনে একপ্রকার (৬) যুগপৎ নামস্বরের অংশত্ব ও অপন্যাসত্ব বর্জনে একপ্রকার—এইরূপে যুগপৎ দুইটি লক্ষণের বর্জনে ছয়প্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আবার তিনটি লক্ষণের যুগপৎ বর্জনে চারিপ্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যথা—(১) সম্পূর্ণ মূর্ছনা, নাম-স্বরের গ্রহত্ব ও অংশত্ব পরিত্যাগে একপ্রকার। (২) সম্পূর্ণ মূর্ছনা, নামস্বরের গ্রহত্ব ও অপন্যাসত্ব বর্জনে এক-প্রকার। (৩) সম্পূর্ণ মূর্ছনা, নামস্বরের অংশত্ব ও অপন্যাসত্ব বর্জনে একপ্রকার। (৪) নামস্বরের গ্রহত্ব, অংশত্ব ও অপন্যাসত্ব বর্জনে একপ্রকার। এইরূপে তিনটি লক্ষণের যুগপৎ বর্জনে চারিপ্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আবার সকলগুলি লক্ষণ একসঙ্গে বর্জিত হইলে এক-প্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ বিকৃত জাতি (নিম্ন রেখাঙ্কিত সংখ্যার সংকলনে ৪+৬+৪+১=১৫) পঞ্চদশ প্রকার।

ষাড়জী বিকৃত জাতি এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার।

পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার ষাড়জী-সমুদ্ভূত বিকৃত জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ মূর্ছনার বর্জনে বিকৃত জাতি ৮ প্রকার ও অন্যান্য লক্ষণের বর্জনে ৭ প্রকার। আর আর্ষভী প্রভৃতি ছয়টি শুদ্ধ জাতি হইতে যে বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হয় তাহাকে সম্পূর্ণ মূর্ছনার বর্জন দুই প্রকারে হইতে পারে—মূর্ছনাটি ষাড়বিত হইলে এক প্রকার এবং ঔড়ুবিত হইলে আর এক প্রকার ; সম্পূর্ণ মূর্ছনার বর্জনে আর্ষভী প্রভৃতি ছয়টি বিকৃতি জাতি প্রত্যেকে ষোড়শ প্রকার। আর্ষভী হইতে নৈষাদী পর্যন্ত ছয়টি বিকৃত জাতির প্রত্যেকটি পূর্বোক্তরূপে (১৬+৭= ২৩) তেইশ প্রকারে বিকৃত হইলে এই ছয়টি বিকৃত জাতির মোট সংখ্যা (২৩×৬=১৩৮) ষাড়জী বিকৃত জাতির পঞ্চদশ সংখ্যার সহিত যোগে (১৩৮+১৫=১৫৩)। সুতরাং স্বরসপ্তকের বিকৃত জাতি মোট একশত তিপ্পান্ন প্রকার।

এই বিকৃত জাতিগুলির পরস্পর গ্রন্থ নির্দিষ্ট সংযোগে আরও এগার প্রকার বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; তাহাদের নাম—(১) ষড়জ কৈশিকী (২) ষড়জোদীচ্যবা (৩) ষড়্জ-মধ্যমা (৪) গান্ধারোদীচ্যবা (৫) রক্ত গান্ধারী (৬) কৈশিকী (৭) মধ্যমোদীচ্যবা (৮) কামারবী (৯) গান্ধার-পঞ্চমী (১০) আন্ধ্রী (১১) নন্দয়ন্তী।

যে সকল বিকৃত জাতির সংযোগে এই এগারটি বিকৃত জাতি নিষ্পন্ন হয়, নিম্নে তাহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল—

ষাড়জী ও গান্ধারী জাতির যোগে ষড়্জ কৈশিকী জাতি।

ষাড়জী ও মধ্যমা জাতির যোগে ষড়জ মধ্যমা জাতি।

গান্ধারী ও পঞ্চমী জাতির যোগে গান্ধার পঞ্চমী জাতি।

গান্ধারী ও আর্ষভী জাতির যোগে আন্ধ্রী জাতি।

ষাড়জী, গান্ধারী ও ধৈবতী জাতির যোগে ষড়জোদীচ্য-বতী বা ষড়জোদীচ্যবা জাতি।

নৈষাদী পঞ্চমী ও আর্ষভীর যোগে নিষ্পন্ন হয় কার্মারবী জাতি।

গান্ধারী পঞ্চমী ও আর্ষভীর যোগে নিষ্পন্ন হয় নন্দয়ন্তী।

গান্ধারী, ধৈবতী, ষাড়জী ও মধ্যমার যোগে নিষ্পন্ন হয় গান্ধারোদীচ্যবা।

গান্ধারী, ধৈবতী, পঞ্চমী ও মধ্যমার যোগে নিষ্পন্ন হয় মধ্যমোদীচ্যবা।

গান্ধারী, নৈষাদী, পঞ্চমী ও মধ্যমার যোগে নিষ্পন্ন হয় রক্ত গান্ধারী।

ষাড়জী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী ও নৈষাদীর যোগে নিষ্পন্ন হয় কৈশিকী।

জাতিসমূহের গ্রাম বিভাগ

ষাড়জী, ষড়জ কৈশিকী, ষড়জোদীচ্যবা, ষড়জমধ্যমা, নৈষাদী, ধৈবতী ও আর্ষভী এই সাতটি ষড়জ গ্রামের জাতি। অবশিষ্ট জাতিসমূহ মধ্যম গ্রামের অন্তর্গত।

পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মূর্ছনার জাতি

কার্মারবী, গান্ধার পঞ্চমী, ষড়জ কৈশিকী ও মধ্যমোদীচ্যবা এই চারিটি জাতি নিত্যই সম্পূর্ণ মূর্ছনাযুক্ত। যাড়জী, নন্দয়ন্তী, আন্ধ্রী, গান্ধারোদীচ্যবা এই চারিটি জাতি সম্পূর্ণ ও যাড়ব দুই প্রকারই হইতে পারে। গায়ক যদি এই চারিটি জাতিকে যাড়ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ষাড়জী জাতিকে নিষাদলোপে, নন্দয়ন্তী ও আন্ধ্রীজাতিকে ষড়জলোপে, গান্ধারোদীচ্যবা জাতিকে ঋষভলোপে ষাড়ব করিতে পারেন। শুদ্ধ জাতি সাতটি ও বিকৃত জাতি এগারটি এই আঠারটি জাতির মধ্যে অবশিষ্ট দশটি (আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী, ষড়জোদীচ্যবা, ষড়জমধ্যমা, রক্তগান্ধারী ও কৈশিকী) অর্থাৎ এই জাতিগুলি সম্পূর্ণ তো বটেই, গায়ক ইচ্ছা করিলে যাড়ব এবং ঔড়ুবেও ইহাদিগকে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মে একটি বা দুইটি স্বর লোপ করিয়া ঐ জাতিগুলিকে যাড়ব বা ঔড়ুবে পরিণত করিতে হইবে।

আর্ষভী-জাতি ষড়জলোপে ষাড়ব, স-প লোপে ঔড়ুব। গান্ধারী, রক্তগান্ধারী ও কৈশিকী জাতি 'রি' লোপে ষাড়ব এবং 'রি ধ' লোপে ঔড়ুব। মধ্যমা ও পঞ্চমীজাতি 'গ' লোপে ষাড়ব, নি-গ লোপে ঔড়ুব। ধৈবতী ও নৈষাদী-জাতি 'প' লোপে ষাড়ব এবং স-প লোপে ঔড়ুব। ষড়জোদীচ্যবা 'রি' লোপে ষাড়ব এবং প-রি লোপে ঔড়ুব। ষড়জ-মধ্যমাজাতিকে নি লোপে ষাড়ব এবং নিপ লোপে ঔড়ুব করিতে হইবে।

ভরতপ্রমুখ সঙ্গীতাচার্যগণ বলেন—পঞ্চমী, মধ্যমা ও ষড়জমধ্যমা এই তিনটি জাতিতে স্বর সাধারণ প্রয়োগ করিতে হয়। স্বর সাধারণ শব্দের অর্থ কাকলি-নিষাদ ও অন্তর-গান্ধার। ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম অংশস্বর হইলে যথা নিয়মে এইরূপ স্বর-সাধারণ প্রয়োগ করিতে হইবে। কশ্যপ, অন্যতর প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীতাচার্যগণ বলেন—নিষাদ ও গান্ধার স্বর যেখানে অল্প বা লোপ্য এইরূপ জাতিসমূহে (পঞ্চমী, মধ্যমা ও ষড়জ মধ্যমা জাতিতে স্বর-সাধারণ প্রযোজ্য। নিষাদ ও গান্ধারের মধ্যে একটি অংশ স্বর হইলে অপরটি তাহার বাদীস্বররূপে পরিণত হয়, সেখানে নিষাদ ও গান্ধার লোপ্য স্বর হইতে পারে না। অতএব এরূপ স্থলে স্বর-সাধারণ (কাকলি-নিষাদ ও অন্তর-গান্ধার) প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে। দ্বিশ্রুতিক স্বর নিষাদ ও গান্ধার যেখানে লোপ্য, এমন রাগ, গ্রামরাগ, উপরাগ ও রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ উপাঙ্গ প্রভৃতি রাগসমূহে স্বর সাধারণ প্রয়োগ করিতে হয়। স্বর-সাধারণ বিকৃতস্বর, সুতরাং বিকৃত জাতিতেই তাহা প্রযোজ্য, শুদ্ধ জাতিতে বিকৃত স্বরাত্মক স্বর-সাধারণ প্রযোজ্য নহে।

জাতিসমূহে অংশস্বরের নিয়ম

পূর্বোক্ত সাতটি শুদ্ধজাতি ও বিকৃত সংসর্গজনিত এগারটি বিকৃত জাতিতে নিম্নলিখিতরূপে অংশস্বর নিয়মিত হইয়াছে।

(১) নন্দয়ন্তী (বিকৃত) জাতিতে অংশ স্বর পঞ্চম
(২) মধ্যমোদীচ্যবা " " " " "
(৩) গান্ধার পঞ্চমী " " " " "
(৪) গান্ধারোদীচ্যবা " " " ষড়জ ও মধ্যম
(৫) ধৈবতী (শুদ্ধ) " " " ঋষভ ও ধৈবত
(৬) পঞ্চমী " " " " ঋষভ ও পঞ্চম
(৭) নৈষাদী " " " " নিষাদ, ষড়জ ও গান্ধার
(৮) আর্ষভী " " " " ঋষভ, নিষাদ ও ধৈবত।
(৯) ষড়জ কৈশিকী (বিকৃত) জাতিতে অংশ স্বর ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম
(১০) আন্ধ্রী " " " " ঋষভ, গান্ধার, পঞ্চম ও নিষাদ
(১১) কার্মারবী " " " রি প ধ নি
(১২) ষড়জোদীচ্যবা " " " স ম ধ ও নি
(১৩) রক্ত গান্ধারী " " " স গ ম প নি
(১৪) গান্ধারী (শুদ্ধ) " " " স গ ম প নি

(১৫) মধ্যমা	„	„	„	স বি গ ম ধ
(১৬) ষাড়জী	„	„	„	স গ ম প ধ
(১৭) কৈশিকী (বিকৃত)		„	„	স গ ম প ধ নি
(১৮) ষড়জ মধ্যমা	„	„	„	স বি গ ম প ধ নি

পূর্ববর্ণিত জাতিসমূহের সাধারণ লক্ষণ

গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, বহুত্ব, অল্পতা, অন্তরমার্গ প্রভৃতি একাদশটি লক্ষণ সকল জাতিতেই বিদ্যমান থাকে ; অধিকন্তু ষাড়ব জাতির ষাড়বত্ব ও ঔড়ুব জাতিতে ঔড়ুবত্ব এই দুইটি জাতির বিশেষ লক্ষণ। সম্পূর্ণ জাতিতে এই লক্ষণ দুইটি থাকে না।

গ্রহ—সঙ্গীতের আদিতে নিহিত স্বরকে গ্রহস্বর বলে। গীতে গ্রহ ও অংশ এই দুই নামে স্বরের পৃথক উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। যেখানে গ্রহ ও অংশের মধ্যে একটির উল্লেখ আছে, সেখানে একটির উল্লেখেই দুইটি বুঝিতে হইবে। অংশ স্বর—যে স্বরটি গানের রক্তিব্যঞ্জক, বিদারী বা গীতখণ্ডে যাহার সংবাদী অনুবাদীস্বর বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়, যাহাকে অবধি করিয়া তার ও মন্দ্রস্বরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা হইতে উত্তর স্বরে আরোহণ করিলে তারস্বর হয়, যাহা অপেক্ষা নিম্নস্বরে আরোহণ করিলে মন্দ্রস্বর হয়, যে স্বর বাদীস্বরের সংবাদীরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, কখনই অনুবাদী স্বররূপে পরিণত হয় না, যে স্বরটি কখনও ন্যাসরূপে কখনও অপন্যাসরূপে কখনও বা বিন্যাস সন্ন্যাস ও গ্রহস্বরে পরিণত হইয়া গীতিতে বহুলরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে অংশ স্বর বলে। মোটের উপর সঙ্গীতে বহুলত্ব ও ব্যাপকত্ব ইহাই অংশস্বরের সংক্ষিত লক্ষণ।

টীকাকার সিংহভূপাল বলেন, জাতি ও রাগ প্রভৃতিকে এই অংশস্বরই ভাগ করিয়া দেয়, এই জন্য ভাগের কারণস্বরূপ এই অংশস্বরটি ভাগবাচক অংশ শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিংহভূপাল মতঙ্গাদি মুনির অনুসরণপূর্বক অংশ ও গ্রহস্বরের পরস্পর প্রভেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যদিও অংশস্বরের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই গ্রহস্বরেরও আছে, তথাপি প্রভেদ এই—অংশস্বর কেবল বাদীই হয়, গ্রহস্বর বাদী সংবাদী অনুবাদী বিবাদী চারিপ্রকারই হইতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রভেদ, অংশস্বরটি রাগজনক বলিয়া প্রধান গ্রহস্বরটি অংশ স্বরের তুলনায় অপ্রধান।

তার—তার শব্দের অর্থ তারস্থান ; ইহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে তারস্থানে আরোহণের সীমা নির্দেশ করা যাইতেছে। মধ্যম সপ্তক বা মধ্যস্থানস্থিত সাতটি স্বরের মধ্যে চারিশ্রুতি বিশিষ্ট যে স্বরটি যখন অংশ-স্বর হইয়া থাকে (যেমন ষড়জগ্রামে ষড়জ স্বর, মধ্যমগ্রামে মধ্যমস্বরটি প্রধান বলিয়া অংশস্বর) তারস্থানের সেই স্বরটি হইতে চারিস্বর পর্যন্ত আরোহণ করিবে ইহাই তারস্থানে আরোহণের শেষ সীমা। গ্রামভেদে আরোহের এই শেষ সীমা একটু ভিন্ন—মধ্যম গ্রামে 'ম' স্বরটি লইয়া চারিস্বর (ম প ধ নি) পর্যন্ত আরোহণ করিবে, আর ষড়জগ্রামে ষড়জস্বরের পরে আরও চারিস্বর (স রি গ ম প) পর্যন্ত আরোহণ করিবে।

চেকোস্লোভেকিয়ার সঙ্কট

অতুল দত্ত

(রাজনীতি)

গত মার্চ্চ মাসে মধ্য-ইউরোপে রাজনীতিক বিপর্য্যয় ঘটিবার পর হইতে ঐ অঞ্চলে প্রবল রাজনীতিক আলোড়ন চলিতে থাকে। মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হার্ হিট্‌লার যখন সর্পিল গতিতে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ অষ্ট্রিয়া রাজ্যটী কুক্ষীগত করেন, তখন হইতে অন্যান্য দেশের নাৎসীগণ নানারূপ সঙ্গত ও অসঙ্গত দাবী উপস্থাপিত করিয়া দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। বিশেষতঃ হিট্‌লারের পৃষ্ঠপোষকতায় চেকোস্লোভেকিয়ার সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ (নাৎসী) দলের ক্রমবর্দ্ধমান ঔদ্ধত্যে অবস্থা এইরূপ হইয়া ওঠে যে, মে মাসের শেষভাগে মধ্য-ইউরোপের সঞ্চিত বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি উদ্ভূত অবস্থার প্রতি

বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য অথবা কোনপ্রকার দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে মধ্য-ইউরোপের সুরম্য উপত্যকাগুলিতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইত। কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত তৎপরতা ও অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়া এই আসন্ন নরমেধযজ্ঞে বাধা প্রদান করিয়াছেন। হিট্লার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ শুধু বাগাড়ম্বর করিয়াই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন—যুযুৎসু চেকোস্লোভেকিয়াবাসীকে আঘাত করিতে সাহসী হন নাই।

বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগের উপক্রম

গত ১৯শে মে তারিখে চেকোস্লোভেকিয়ায় জনরব শ্রুত হয় যে, সীমান্ত অঞ্চলে জার্ম্মাণী সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। এই সংবাদ চেকোস্লোভেকিয়ায় প্রচারিত হইবামাত্র নানা স্থানে তদ্দেশীয় জার্ম্মান্-দিগের সহিত চেক্‌দিগের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। কোন কোন স্থানে দুই-একটী গুলীও চলে এবং দুই-চারি জন হতাহতও হয়। চেক্ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত তৎপরতার সহিত রিজার্ভ সৈন্য আহ্বান করিয়া সীমান্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সর্ব্বত্র সিউদেতেন জার্ম্মান্‌দিগের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। চেকোস্লোভেকিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজা এই সময় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, তাঁহারা জার্ম্মান্‌দিগের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তবে তাঁহারা জাতীয় অধিকার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এদিকে সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ দল এই বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে যে, তাহাদিগের প্রতি অশ্রুতপূর্ব্ব আক্রমণ চলিতেছে। জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলি চেকোস্লোভেকিয়ার ঘটনা সম্বন্ধে নানারূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য সমাবেশের কথা অস্বীকার করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলেন যে চেকোস্লোভেকিয়ার ঘটনায় তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা হইয়াছে। জার্ম্মানী চেক্ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, চেক্ বিমান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জার্ম্মান্ অঞ্চলে ঘুরাফিরা করিতেছে। মুসোলিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অধিবাসীর এক বিন্দু রক্তপাত হইলে তিনি তাহা সহ্য করিবেন না। অন্য পক্ষে ফ্রান্সের সহিত চেকোস্লোভেকিয়ার যে চুক্তি আছে, তাহার সর্ত্ত পালন করিবার জন্য ফ্রান্স সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; রুশিয়া জানাইয়াছিল সে-ও প্রস্তুত। বৃটেন্ প্রাণপণ শক্তিতে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; তবুও অসীম ধৈর্য্যশালী মিঃ চেম্বারলেন্ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট "হস্তক্ষেপ" করিতে পারেন। এই সময় হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের সৈন্য সমাবেশের কথাও শুনা গিয়াছিল। অবশ্য উভয় দেশের গভর্ণমেণ্টই এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। চেক্ গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না; তাঁহারা সামরিক ব্যবস্থার জন্য হাঙ্গেরীর সীমান্ত পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই সময় চেকোস্লোভেকিয়ায় মিউনিসিপ্যাল্ নির্ব্বাচন চলিতেছিল। এই নির্ব্বাচনের সময় চেক্‌দিগকে সন্ত্রস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে হিট্লারের পক্ষে চেকোস্লোভেকিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা অসম্ভব নহে। মিউনিসিপ্যাল্ নির্ব্বাচনের পরই সাধারণ নির্ব্বাচন; কাজেই এই সময় চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে হিট্লারের কিঞ্চিৎ অধিক তৎপর হওয়া স্বাভাবিক। জার্ম্মানী সৈন্য সমাবেশের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, বিভাগীয় প্রয়োজনে সৈন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল; এই কার্য্যের মধ্যে কোন গুপ্ত দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আধুনিক রাজনীতিতে সত্যের স্থান নাই—পাশ্চাত্য মনীষীর ভাষায় রাজনীতিতে নীতির ক্ষেত্র চরম কুজ্ঝটিকাময় (exceedingly nebulous)। কাজেই জার্ম্মানীর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, জার্ম্মানী পোল্যাণ্ডের সহিত চক্রান্ত করিয়া উভয় সীমান্তে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চেকোস্লোভেকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বেনেস্ ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজার অপরিসীম দৃঢ়তা ও অতুলনীয় তৎপরতা দেখিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

চেকোস্লোভেকিয়ার জন্মকথা

গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের মানচিত্রখানি নূতনভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাই নব-অঙ্কিত মানচিত্রের মধ্যস্থলে ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের কতকাংশ লইয়া গঠিত একটী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের নামানুসারে রাষ্ট্রটীর নামকরণ হয় চেকোস্লোভেকিয়া। এই রাষ্ট্রের সৃষ্টির সহিত অধ্যাপক টমাস্ গ্যারিগ ম্যাসারিকের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চেক্ জাতিকে বিশ্বের সমক্ষে স্বাধীন ও উন্নতশির দেখিবার স্বপ্ন বাল্যকাল হইতেই ম্যাসারিককে পাগল করিয়াছিল। কাজেই—কি অধ্যয়নকালে, কি অধ্যাপনার সময় কখনও ম্যাসারিক্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী সঞ্চালন করিয়া চেক্ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপক্ষে বিশ্বের জনমত সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হন। গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হয়, তখন ডাঃ ম্যাসারিক ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে গমন করিয়া বিশিষ্ট রাজনীতিকদিগের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, চেক্ ও স্লোভ্যাক্‌দিগকে লইয়া নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইউরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত, চেকোস্লোভ্যাক্‌দিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্র-গঠন যুক্তিযুক্তও বটে। মহাযুদ্ধের অবসান হইবার পর ডাঃ ম্যাসারিকের চেষ্টা ফলবতী হইল; চেকোস্লোভেকিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। এই সময় ডাঃ ম্যাসারিকের চেষ্টাতেই অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের শতকরা ৮০টী শিল্পকেন্দ্র নব-গঠিত চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর তারিখে প্যারী নগরীতে এই নব-গঠিত সাধারণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ইহার দশদিন পরে চেকোস্লোভেকিয়ার নব-নির্ব্বাচিত শাসন-পরিষদ (Narodui Vybor) হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলির শাসনভার গ্রহণ করেন। ডাঃ ম্যাসারিক্

তখন দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকেই নূতন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন, ডাঃ বেনেস্ পররাষ্ট্রসচিব হন। ইহার পর ডাঃ ম্যাসারিক আরও দুইবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ ম্যাসারিকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সচিব ডাঃ বেনেস্ এক্ষণে চেকোস্লোভেকিয়ার প্রেসিডেণ্ট।

উত্তরে ও পশ্চিমে অষ্ট্রীয়ার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে হাঙ্গেরীর স্লোভেকিয়া ও রুথেনিয়া প্রদেশ চেকোস্লোভে-কিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন ৫৫ হাজার বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা দেড় কোটী; পাঁচ ভাগের চার ভাগ অধিবাসী রোম্যান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, শাসন ব্যবস্থা সাধারণতন্ত্র। চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশের সমাবেশে ঐ দেশের অধিবাসীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন ও শ্রমশিল্পে উন্নত পঁচাত্তর লক্ষ চেক্, বিশ লক্ষ অনুন্নত স্লোভ্যাক্ কৃষক, শ্রমশিল্পে অত্যুন্নত পঁয়ত্রিশ লক্ষ জার্ম্মান, সাত লক্ষ হাঙ্গেরিয়ান্ কৃষক, আশী হাজার পোল্ এবং অল্পসংখ্যক রাশিয়ান এই নব-গঠিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব্ব-ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে চেকোস্লোভেকিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী। এই রাজ্যের অধিবাসিগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী, বর্ত্তমান সময়ে তাহার শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতেছে, জাতির আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক। চেকোস্লোভেকিয়ার অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য অপেক্ষা-কৃত অল্প। মধ্য ইউরোপের জার্ম্মানী, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া রাজ্যের ন্যায় চেকোস্লোভেকিয়ায় ধনী জমিদার নাই—যাহারা জমি চাষ করে তাহারাই জমির মালিক। শ্রমশিল্পেও চেকোস্লোভেকিয়া উন্নত, ভূতপূর্ব্ব হ্যাপ্সবার্গ সাম্রাজ্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ বোহেমিয়া প্রদেশটী আধুনিক শিল্পসম্ভারে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এক সময়ে বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, "বোহেমিয়া যাহার কর্ত্তৃত্বাধীন, সমগ্র ইউরোপ তাহার অধীন।" কূটনীতিজ্ঞ ডাঃ ম্যাসারিক এই প্রদেশটীকে নব-গঠিত চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের শ্রমশিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কয়লা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চেকোস্লোভেকিয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, রেশম ও পশমজাত বস্ত্র, জুতা, ইস্পাত, লৌহ, চিনি প্রভৃতি। এখানকার কাচ ও পোর্সিলেন্ শিল্পও বিখ্যাত।

চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রটী কিরূপ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত তাহা আলোচনা করিয়াছি। অর্থনীতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ চেকোস্লোভেকিয়াকে দুর্ব্বল করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পররাষ্ট্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া চেকোস্লোভেকিয়াকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গঠন করেন নাই। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরি উভয়কেই পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে এই দুইটী দেশের জার্ম্মান্ ও হাঙ্গেরিয়ান্ অধ্যুষিত অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত, মধ্য-ইউরোপে একটী মিত্রভাবাপন্ন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণী সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করাও মিত্র শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য ছিল। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতিগুলিকে একটী গভর্ণমেণ্টের অধীনে সন্নিবিষ্ট করিয়া চেকোস্লোভেকিয়াকে চিরদিন দুর্ব্বল করিয়া রাখাও মিত্রশক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য কি না, কে বলিতে পারে?

ছোট আঁতাত ও চেকোস্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ

হ্যাপ্সবার্গ বংশের নৃপতি যদি পুনরায় অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান্ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী যদি তাহাদিগের হৃতভূখণ্ড পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চেকোস্লোভেকিয়া তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র যুগোস্লেভিয়া ও রুমানিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের নাম ছোট আঁতাত (Little Entente)। এই ছোট আঁতাত এত দিন ফ্রান্সের প্রতি অনুরক্ত ছিল। গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত তিনটী শক্তির মধ্যে চুক্তি হইবার পর গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের মধ্যে আরও একটী চুক্তি হয়; এই চুক্তির ফলে তিনটী শক্তির রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। এই চুক্তি অনুসারে তিনটী দেশের পররাষ্ট্র-সচিবকে লইয়া একটী স্থায়ী পরিষদ গঠিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, সমগ্র আঁতাত একযোগে নির্দ্দিষ্ট পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিবে। ইহা ব্যতীত, ছোট আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত শক্তিত্রয়ের প্রতিনিধি লইয়া একটী অর্থনীতিক পরিষদও গঠিত হয়। তিনটী দেশের নদী, রেলপথ, বিমান ও ডাক-বিভাগ সম্পর্কে একযোগে কাজ হইবে, ইহাও স্থির হয়।

গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিট্লার আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গর্জ্জিয়া ওঠেন—সিউদেতেন্ দিউৎসল্যাণ্ড (চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চল) জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার এক বৎসর পরে জার্ম্মানী পোলাণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। এই সময় চেকো-স্লোভেকিয়া ও রুশিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘের একটী উৎসাহী সভ্য। কাজেই, সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্য-শক্তির সহিত চেকোস্লোভেকিয়ার পৃথক্ চুক্তি না থাকিলেও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে এই সকল শক্তি চেকোস্লোভেকিয়া "রাজ্যের অখণ্ডতা" ও "রাজনীতিক স্বাধীনতা" রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ফ্রান্স রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি ব্যতীতও চেকোস্লোভেকিয়ার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ।

নাৎসী দলের আন্দোলন

অধুনা চেকোস্লোভেকিয়ার অধিকারভুক্ত জার্ম্মান্গণ পূর্ব্বে কখনও জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবুও মহাযুদ্ধের পর তাহারা আবেদন জানাইয়াছিল যে, তাহাদিগকে জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হউক, অথবা চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের অধীনেই জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা হউক। ঐ সময় হাঙ্গেরিয়ানগণও হাঙ্গেরির

সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের কাহারও আবেদন মিত্রশক্তি গ্রাহ্য করেন নাই। ডাঃ ম্যাসারিক ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জার্ম্মান্ ও হাঙ্গেরিয়ান্‌দিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যে সকল অধিকার উপভোগ করিয়া থাকে, তাহারাও সেই সকল অধিকার সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবে। ডাঃ ম্যাসারিক ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তাঁহাদিগের এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন। বস্তুত জার্ম্মান্ ও হাঙ্গেরিয়ান্‌দিগের আবেদন মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় প্রথমে তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও পরে চেক্-গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারে এই কথা কতক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিল। জার্ম্মানীতে নাৎসী-দলের অভ্যুত্থানের পর হইতে চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্‌দিগের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার পর, জার্ম্মানীতে নাৎসী দল যখন শক্তি লাভ করে, তখন হইতে চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মানগণ চঞ্চল হইয়া উঠে।

অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানীর কুক্ষীগত হইবার পর হইতে জার্ম্মান্‌দিগের এই চাঞ্চল্য শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তখন হইতে তাহারা কতকগুলি সঙ্গত ও অসঙ্গত দাবীর তালিকা লইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইতিমধ্যে চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্‌দিগের ঐক্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদিন তাহাদিগের মধ্যে একতার অভাব ছিল; প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জার্ম্মান্ নাৎসী-নেতা কনর‍্যাড হেন্‌লীনের বিরোধী ছিল। হিট্‌লার যখন অষ্ট্রীয়া অধিকার করেন, তখন চেকোস্লোভেকিয়ার পার্লামেণ্টে সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ (নাৎসী) দলের মুখপত্রে ডাঃ ফ্রাঙ্ক এই মর্ম্মে ভীতি প্রদর্শন করেন যে, চেকোস্লোভেকিয়ার সমস্ত জার্ম্মান্ যদি অবিলম্বে তাহাদিগের দলকে সমর্থন না করে, তাহা হইলে উহার ফল বিষময় হইবে। চেক্ পার্লামেণ্টে জার্ম্মান্‌দিগের চারিটী দলের মধ্যে তিনটী দলের প্রতিনিধি চেকোস্লোভেকিয়ার মন্ত্রিসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ডাঃ ফ্রাঙ্কের বক্তৃতার পর 'এগ্রিরিয়ান্' দল গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করে এবং সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ দলে যোগ দান করে। জার্ম্মান্ 'ক্যাথলিক' দলও গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্ম্মান্ সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়ে হেন্‌লীনের দলকে সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হয়। জার্ম্মান্ 'সোশ্যাল-ডিমোক্রাট্' দল নাৎসীদিগের ঘোর বিরোধী; তবুও অন্য দুইটী জার্ম্মান্ দল গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার পর এই দলের প্রতিনিধিও মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। তবে 'সোশ্যাল্-ডিমোক্রাট্' দল ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজাকেই সমর্থন করিবে।

এক্ষণে চেকোস্লোভেকিয়ার নাৎসীদিগের দাবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই দলের নেতা হেন্‌লীন্ গত এপ্রিল মাসে কার্লসবাদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, চেক রাজনীতিজ্ঞগণ যদি তাহাদিগের সহিত এবং জার্ম্মান্ রেচের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; কারণ এতদিন চেক্-গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মান্‌দিগের শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, হেন্‌লীন্ নিম্নলিখিত দাবীগুলি উত্থাপন করেন —চেক্ এবং জার্ম্মান্‌দিগের সমানাধিকার; সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ (নাৎসী) দলের অস্তিত্বের আইনগত স্বীকৃতি; চেকোস্লোভেকিয়ায় জার্ম্মান্-অঞ্চল নির্দ্ধারণ এবং ঐ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্তি; জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলের বহির্ভূত জার্ম্মান্‌দিগের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা; ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সিউদেতেন্ জার্ম্মান্ (নাৎসী) দলের উপর যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান; জার্ম্মান্ অঞ্চলের জন্য জার্ম্মান্ কর্ম্মচারী-নিয়োগের ব্যবস্থা; জার্ম্মান্‌দিগের জাতীয়তা ও রাজনীতিক আদর্শ রক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা।

চেকোস্লোভেকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বেনেস্ ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজা সম্পূর্ণ ধীরতা অবলম্বন করিয়া একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জার্ম্মান্‌দিগের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে কোন বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ তাঁহারা কখনও সহ্য করিবেন না। শুধু মুখের কথা নহে, তাঁহারা কার্য্যতও দেখাইয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে চেক্-গভর্ণমেণ্ট চরম অবস্থার সম্মুখীন হইবেন। গত মে মাসে অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত ও তৎপরতার সহিত আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার নাৎসী ষড়যন্ত্রকারীদিগের সাফল্যে এবং 'এগ্রেরিয়ান্' দলের পরিপূর্ণ সমর্থন ও 'জার্ম্মান্ ক্যাথলিক্‌দিগের অর্দ্ধ সমর্থন লাভ করিয়া চেকোস্লোভেকিয়ার নাৎসীগণ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। গত মে মাসের ঘটনার পর হইতে তাহাদিগের ঔদ্ধত্য কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। চেকোস্লোভেকিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এক্ষণে নাৎসী দলের প্রতিনিধিবর্গের সহিত তাহাদিগের দাবী সম্বন্ধে চেক্ গভর্ণমেণ্টের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যতদূর মনে হয়, এক্ষণে এই আলোচনায় হয়ত সাময়িকভাবে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চেকোস্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত দাবী এবং জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানের দাবী চেক্-গভর্ণমেণ্ট কখনও মানিয়া লইতে পারেন না। চেকোস্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। জার্ম্মানীর শ্যেন্ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় রুশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপন। রুশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের উর্ব্বর গমের ক্ষেতের উপর জার্ম্মানী বহুকাল হইতে লোলুপ দৃষ্টি পাত করিতেছে। এই ইউক্রেন যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ইউরোপে জার্ম্মানীর অধিকার বিস্তৃতিতে রুশিয়া কখনই উদাসীন থাকিতে পারে না। ফ্রান্সের পক্ষে—সন্ধির সর্ত্ত প্রতিপালনের জন্য যদি না-ও হয়—নিজের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে চেকোস্লোভেকিয়ার সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই, চেকোস্লোভেকিয়া যদি তাহার স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তাহা হইলে এই দুইটী বন্ধুকে যে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করাও চেকোস্লোভেকিয়ার পক্ষে সম্ভব নহে,

কারণ জার্ম্মানগণই চেকোস্লোভেকিয়ার একমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নহে। জার্ম্মানগণ যদি স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে হাঙ্গেরিয়ানরা কেন তাহা পাইবে না? পোলরা এই অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত হইবে? স্লোভ্যাক্‌রাই বা কি অপরাধ করিয়াছে?

হিট্‌লারের কপটতা

হিট্‌লার সর্ব্বদা তাঁহার স্বজাতির জন্য কুম্ভীরাশ্রু পাত করিয়া থাকেন; তিনি প্রত্যেকটী জার্ম্মানকে রেচের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অধিবাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি একাধিকবার চেক গভর্ণমেণ্টকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সেইদিনও হিট্‌লারের প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েব্‌ল্‌স্ বলিয়াছেন, অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান্ অধিবাসীদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার যেরূপ জার্ম্মানী সহ্য করে নাই, সেইরূপ চেকোস্লোভেকিয়ার ৩৫ লক্ষ জার্ম্মান্ অধিবাসীর উপর অত্যাচার সে কখনও সহ্য করিবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অধিবাসীর উপর কোনপ্রকার অত্যাচার হওয়া দূরে থাকুক, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী অধিকার উপভোগ করিয়া থাকে। চেকোস্লোভেকিয়ায় জার্ম্মান্ অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ২২ জন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য চেক্-গভর্ণমেণ্ট যত অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার শতকরা ২৪ ভাগ প্রেগের জার্ম্মান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রেগ ও ব্রানের জার্ম্মান্ টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলগুলিকে শতকরা ২৯ ভাগ সরকারী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। চেকোস্লোভেকিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ১২৭ জন শিশুর জন্য এক একটি করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান্‌দিগের প্রত্যেক ১১৫ জন শিশুর জন্য একটী করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা যদি দক্ষিণ টাইরলের জার্ম্মান্ অধিবাসীদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি, তাহা হইলে হিট্‌লারের স্বজাতি-প্রেমের 'বুলি' কতদূর কপটতাপূর্ণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব। দক্ষিণ টাইরলে জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিত প্রাচীরপত্রগুলি মুসোলিনি নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন এবং এই অঞ্চলের জার্ম্মান্ ভাষার বিলোপ সাধনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মুসোলিনি অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে এই অঞ্চলের জার্ম্মান্‌দিগকে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল জার্ম্মানের দেহে এক বিন্দু ইটালীয় রক্ত নাই; তবুও তাহাদিগের সন্তানদিগের ইটালীয় নামকরণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। কোন শিশুর জার্ম্মান্-ক্রিশ্চিয়ান্ নাম থাকিলে পুরোহিত-গণ সেই শিশুকে 'ব্যাপ্‌টাইজ' করিতে চাহে না। সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতি-ফলকগুলির উপর জার্ম্মান্ নাম অঙ্কিত থাকা নিষিদ্ধ। দক্ষিণ টাইরলের বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র ইটালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে জার্ম্মান্‌দিগের প্রভাব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ইটালীয়দিগকে এখানে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। হিট্‌লার যখন জার্ম্মানীর সর্ব্বময় প্রভু হন নাই তখন—গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে—তিনি টাইরলের জার্ম্মান্ অধিবাসীর উপর অন্যায় অত্যাচার হইতেছে বলিয়া মুসোলিনির নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মুসোলিনিকে তাঁহার 'হাতে রাখা' প্রয়োজন, এই জন্য তিনি টাইরলের জার্ম্মান্ অধিবাসীদিগকে মুসোলিনির হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্রেণার পর্য্যন্ত জার্ম্মান্ রাজ্যের সর্ব্বশেষ সীমারেখা টানিয়াছেন।

জার্ম্মানীর অভিসন্ধি

চেকোস্লোভেকিয়ার নাৎসীদলের আন্দোলন যে প্রধানত জার্ম্মানীর প্ররোচনাতেই পরিচালিত হইতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অধিবাসীদিগের জন্য হিট্‌লার বিগলিত-হৃদয় নহেন—তাঁহার প্রকৃত "দরদ" জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য। মধ্য ইউরোপের বোহেমিয়া প্রদেশটীর গুরুত্ব কত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই বোহেমিয়া প্রদেশে জার্ম্মান্ অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বোহেমিয়া-ব্যতীতও চেকোস্লোভেকিয়ার অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানই জার্ম্মাণ অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই, "চেকোস্লোভেকিয়ার প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি করায়ত্ত করিতে চাহি" এই কথা না বলিয়া "জার্ম্মানদিগকে রেচের অন্তর্ভুক্ত করিব" এই কথা বলিলেই হিট্‌লারের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, হিট্‌লার চেকোস্লোভেকিয়ার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন। সম্প্রতি "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ড্জেন" পত্রের প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, হিট্‌লার বোধ হয় চেকোস্লোভেকিয়ার ধ্বংস চাহেন না; জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলটীকে চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন। চেক্-রাষ্ট্রের যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ পোল্ এবং ইউক্রেনিয়ান্‌গণ পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং হাঙ্গেরিয়ান্‌গণ হাঙ্গেরির সহিত সংযুক্ত হইবে। এইরূপ অবস্থায় পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরির মিলন ঘটিবে। ফলে, জার্ম্মানী আর রুমানিয়ায় প্রবেশপথ পাইবে না। রুমানিয়ার তৈল এবং শস্যের উপর জার্ম্মানীর লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন যে, চেকোস্লোভেকিয়া যদি অখণ্ড থাকে এবং জার্ম্মানী যদি উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জার্ম্মানীর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। সে তখন অনায়াসে রুমানিয়ার তৈল ও শস্য করায়ত্ত করিতে পারিবে। চেকোস্লোভেকিয়ার উপর প্রভাব বিস্তৃত হইলে পোলাণ্ড সম্পর্কে জার্ম্মানীর যে দুরভিসন্ধি তাহাও কার্য্যে পরিণত করা সহজসাধ্য হইবে। সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, সিউদেতেন্ জার্ম্মান্‌দিগকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদানের দাবী চেকোস্লোভেকিয়ার উপর জার্ম্মানীর প্রভাব বিস্তৃতির প্রথম সূচনা। সিউদেতেন্ জার্ম্মান্‌গণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্তির পর চেকোস্লোভেকিয়ার সীমান্তের অভ্যন্তরে বাস করিয়াও জার্ম্মানীর প্রভুত্বাধীনে থাকিবে। জার্ম্মান্ অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনের পর সমগ্র চেকোস্লোভেকিয়ার উপর জার্ম্মানী প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে।

চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ড্জেন" পত্রের প্রতিনিধি

জার্ম্মানীর মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সুযুক্তিপূর্ণ। নাৎসী-নেতা হেন্‌লীন্ জার্ম্মান্ অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবী করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেকোস্লোভেকিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তনও দাবী করিয়াছেন। পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তনের অর্থ ফ্রান্স ও রুশিয়ার সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ইটালী ও জার্ম্মানীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। চেকোস্লোভেকিয়াকে জার্ম্মানীর আয়ত্তাধীন করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন দাবী করা হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে।

চেকোস্লোভেকিয়ার সমরায়োজন

গত মে মাসে চেকোস্লোভেকিয়ায় যখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তখন জার্ম্মানী একাধিকবার বলিয়াছে যে, তাহার ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত জার্ম্মানীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই—নাৎসী ধুরন্ধরগণ গলাবাজী করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যাহারা হিট্‌লারের প্রকৃতি এবং জার্ম্মানীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক অবগত আছেন, তাঁহারা হিট্‌লারের এই ধৈর্য্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিবেন। হিট্‌লার এতদিন সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন—প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন হন নাই। ভীতি প্রদর্শনের প্রকৃত কৌশল এবং কোন্ সময় ভীতি প্রদর্শন করিলে কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা, তাহা হিট্‌লার যেরূপ বুঝেন, বোধ হয় আর কেহ সেইরূপ বুঝে না। চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে হিট্‌লার নিশ্চিত বুঝিয়াছেন, এই স্থলে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিলে কোন ফল হইবে না। প্রেসিডেণ্ট বেনেস্ ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজা একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বিনা যুদ্ধে "সূচ্যগ্র ভূমি"ও প্রদান করিবেন না। তাঁহাদিগের এই উক্তি যে কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র নহে, তাহা হিট্‌লার উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন। অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন হইলে চেক্‌গভর্ণমেণ্ট কতদূর তৎপরতার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারেন, তাহার পরিচয়ও হিট্‌লার পাইয়াছেন। চেকোস্লোভেকিয়ার দেশ ক্ষুদ্র, তাহার সৈন্যসংখ্যাও অল্প। কিন্তু এই সৈন্য এমনভাবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে যে, ইটালী ও জার্ম্মানীর সমরসজ্জাও সেইরূপ নহে। চেকোস্লোভেকিয়ার স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার; রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা ১০ লক্ষ। ইংরেজিতে যাহাকে বলে "দন্ত পর্য্যন্ত অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত" এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে চেক্-গভর্ণমেণ্ট তাহাই করিয়াছেন। এই বাহিনীর প্রত্যেক ২০টী সৈন্যের জন্য একটী করিয়া মেসিন্‌গান আছে। ইউরোপের আর কোন দেশের সৈন্যের এই হারে মেসিন্‌গান নাই। চেকোস্লোভেকিয়ার ট্যাঙ্কগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী; ইহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫০ মাইল। চেকোস্লোভেকিয়ায় ৫৫০খানি প্রথম শ্রেণীর বিমান আছে। বিমানের সংখ্যা ২০০০এ পরিণত করিবার জন্য চেক্ গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে চেষ্টা করিতেছেন। এই সমর সজ্জার দ্বারা চেক্-গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু জার্ম্মানীর প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত ক্ষমতা তাহার আছে। প্রথম আক্রমণ যদি প্রতিহত হয়, তাহা হইলে ক্রমে ফ্রান্স ও রুশিয়া এই সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইবে এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধ ইউরোপব্যাপী হইয়া পড়িবে। কি অর্থনীতিক, কি সামরিক কোন দিক হইতেই জার্ম্মানী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে এখনও প্রস্তুত নহে।

আলো-ছায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ হাওয়া ঘূর্ণী-হাওয়ায় ঘুলিয়ে ওঠে জল
লজ্জা-রাঙা-রক্তকমল কাঁপছে টলমল,
স্রোতের আগায় ভাস্‌তে সে চায়—মৃণাল নীচে টানে
ভ্রমর কহে—'চললে কোথা? তাকাও আমার পানে।
ফুট্‌লে সকাল বেলা
সাঁঝ না হ'তে পথিক জনায় করবে তুমি হেলা?'

সূর্য্য ডোবে পচিম পানে পিছন ফিরে চায়—
কমল ভাবে আমায় বুঝি এড়িয়ে চলে যায়,—
মৃণাল দোলে জলের তলে নিতল কালো ছায়া
মলিন করে কমল-মণি, নিদ্ মহলের মায়া—
নয়ন ছেয়ে আসে
কূলের প্রদীপ চাঁদের আলোয় ওই কি দূরে ভাসে?

আজ মাধবীর লতায় পাতায় ফুলের মহোৎসব
চাঁপার কলি জাগবে তারই উঠছে কলরব,
বন-মালতীর গন্ধ বেড়ায় সংগোপনে বনে,
এমন সময় হঠাৎ দেখা তোমার আমার সনে
তোমার পরিচয়—
দুটি ভীরু আঁখির কোলে জাগাল বিস্ময়।

বনের পথে মনের পথে তোমার সনে দেখা
শ্যামল বনের শ্যামলী রূপ মনের চন্দ্রলেখা,
হরিণ চোখের সজল স্নেহ, কুন্দফুলের হাসি,—
নিরুপমা তোমার মাঝে উঠল পরকাশি
তোমার বরণমালা—
নিত্য জোগায় কুসুম তারি আমার হৃদয় ডালা।

ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বন্ধু

মিনিট দুই সজোরে হাত পা ছুঁড়িবার পর ঠাণ্ডা জল গা-সওয়া হইয়া গেলে গৌরী দেখিল, সাঁতার কাটিবার প্রয়োজন নাই, নদীর স্রোত তাহাদের সেই দীপান্বিত গবাক্ষের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দু'জনে তখন কেবলমাত্র গা ভাসাইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিল।

জল হইতে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না; চারিদিকে কেবল নক্ষত্রালোকে খচিত মসীকৃষ্ণ জলরাশি। গৌরী ও রুদ্ররূপ যতই দুর্গের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, জলের কল্লোলধ্বনি ততই বাড়িয়া চলিল; মগ্ন পাথরের সংঘাতে একটানা স্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গৌরী দেখিল, তাহারা আর সিধা সেই গবাক্ষের দিকে যাইতেছে না, বাধাপ্রাপ্ত জলধারা তাহাদের ভিন্নমুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গৌরী প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া নিজের গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর দেখিল বৃথা চেষ্টা, দুর্বার জলস্রোতে ইচ্ছামত চলা অসম্ভব। নিরুপায়ভাবেই দু'জনে ভাসিয়া চলিল।

ক্রমশ দুর্গের বিশাল ছায়ার তলে তাহারা আসিয়া পৌঁছিল। এখানে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তিও অন্ধ হইয়া গিয়াছে—চোখের দৃষ্টি জমাট অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। গবাক্ষের আলোটিও বামদিকের আলোড়িত তমিস্রায় কখন ডুবিয়া গিয়াছে।

দুর্গের প্রাচীর আর কতদূরে তাহাও অনুমান করা অসম্ভব। গৌরীর ভয় হইতে লাগিল, এইবার বুঝি তাহারা সবেগে দুর্গের পাষাণগাত্রে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবে। সে মৃদুস্বরে একবার রুদ্ররূপকে ডাকিল; রুদ্ররূপ তাহার দুইহাত অন্তরে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল—ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

গৌরী বলিল—'হুঁসিয়ার! সামনেই দুর্গ, জখম হয়ো না।'

রুদ্ররূপ বলিল—'না। আপনি সাবধান।'

অন্ধকারে গৌরী হাসিল। দুজনেই দুজনকে সাবধান করিয়া দিল বটে কিন্তু সত্যই দুর্গের গায়ে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইলে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে কেহই ভাবিয়া পাইল না। ক্ষিপ্র বিক্ষুব্ধ জলরাশির বুকে তৃণখণ্ড! তাহাদের ইচ্ছার শক্তি কতটুকু?

গৌরীর মনে হইল, আজিকার এই নিঃসহায়ভাবে ভাসিয়া-চলা তাহার জীবনের একটা বৃহত্তর সত্যের প্রতীক। দৈবী খেয়ালের দুর্নিবার টানে সে ত অনেকদিন হইতেই ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে! পাষাণ প্রাকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া এতদিন চূর্ণ হইয়া যায় নাই কেন ইহাই আশ্চর্য্য। কে জানে, হয়ত আজিকার জন্যই নিয়তি অপেক্ষা করিয়াছিল—তাহার লক্ষ্যহীন ভাসিয়া চলাকে পরিসমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু কোথায় সে উপকূল?—বৈতরণীর এপারে, না ওপারে?

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এই সময় গৌরীকে বিপর্য্যস্ত নিমজ্জিত করিয়া তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য একটা মগ্ন পাথরের পিচ্ছিল অঙ্গ তাহাকে স্পর্শ করিল; তারপর জলের উপর মাথা জাগাইয়া সে দেখিল—স্রোতের এলোমেলো গতি আর নাই, অপেক্ষাকৃত শান্তজলে মন্থর একটা ঘূর্ণির মধ্যে সে ধীরে ধীরে পাক খাইতেছে। সম্ভবত জলমগ্ন পাথরগুলা এইখানে এমন একটা সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করিয়াছে যাহাতে স্রোতের প্রবল গতি ব্যাহত হইয়া যায়; ঐ বড় ঢেউটা গৌরীকে সেই মজ্জিত প্রাচীরের পরপারে আনিয়া দিল। ঘূর্ণীর চক্রে আবর্ত্তমান তাহার দেহটা দুর্গের দেয়ালে গিয়া ঠেকিল।

এখানেও ডুব জল, মসৃণ দুর্গ-গাত্রে কোথাও অবলম্বন নাই; তবু এই শৈবাল পিচ্ছিল দেয়ালে হাত রাখিয়া গৌরীর মনে হইল সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে।

ক্ষণকাল জিরাইয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—'রুদ্ররূপ, কোথায় তুমি ?'

রুদ্ররূপ জবাব দিল—'এই যে, দেয়ালে এসে ঠেকেছি। আপনি ?'

'আমিও। এস, বাঁ দিকে জানালাটা আছে, সেইদিকে যাওয়া যাক। দেয়াল ধ'রে ধ'রে এস।'

'আচ্ছা।'

তখন পৃথিবীর আদিম পঙ্ক-শয্যার উপর অন্ধ মহীলতার মত দুজনে কেবল স্পর্শানুভূতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দশ মিনিট, পনের মিনিট, এমনি ভাবে কাটিয়া গেল ; কিন্তু জানালার দেখা নাই। গৌরীর আশঙ্কা হইল, হয়ত তাহারা কখন্ অজ্ঞাতে জানালার নীচে দিয়া চলিয়া আসিয়াছে জানিতে পারে নাই।

সে পিছু ফিরিয়া রুদ্ররূপকে সম্বোধন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঠিক মাথার উপর একটা অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ; তাহার অনুচ্চারিত স্বর কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। জানালার আলো দূর হইতে দেখা যায় কিন্তু নীচে হইতে তাহা অদৃশ্য। গৌরী উর্দ্ধে হাত বাড়াইয়া অনুভব করিয়া দেখিতে লাগিল ; জানালার কিনারা হাতে ঠেকিল—জল হইতে দুই-আড়াই হাত মাত্র উর্দ্ধে।

আবার জানালার ভিতর হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর আসিল—'বেইমান, তুই তবে আমাকে মেরে ফ্যাল্, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

গৌরী নিজের গলার স্বর চিনিতে পারিল ; কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আনচান করিয়া উঠিল ; মনে হইল সে নিজেই ঐ কারাকূপে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু কামনা করিতেছে।

এবার দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শুনা গেল ; কশাইয়ের ছুরির মত তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর, কোমলতার বাষ্প পর্য্যন্ত কোথাও নাই—'ব্যস্ত হোয়ো না ; দরকার হয়নি বলেই এতদিন মারিনি, তোমার প্রতি মমতাবশত নয়।—কিন্তু আর দেরি নেই, আজই যাহোক-একটা হবে।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর আবার শঙ্কর সিং কথা কহিল। এবার তাহার স্বর অত্যন্ত কাতর, মিনতি-বিগলিত—'উদিত, আমার প্রতি কি তোমার এতটুকু দয়া হয় না ? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। আমি রাজ্য চাই না, আমায় শুধু ছেড়ে দাও—'

'আর তা হয় না। তোমার বন্ধু ধনঞ্জয় সর্দ্দার সব মাটি করে দিয়েছে।'

'কিন্তু আমি ত তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। আমি ত তোমাকে সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এখন তোমার সিংহাসন ছাড়া না-ছাড়া সমান। ঝিন্দের গদীতে একটা বাঙালী কুত্তা বসে সর্দ্দারি করছে। শয়তানের বাচ্ছা মরেও মরে না। সে যদি মরত তাহলে তোমার ফুরসৎ হয়ে যেত।—যাক, আজকের কাজে যদি সিদ্ধ হই তখন তোমার কথা ভেবে দেখব।—এখন ঘুমোও।'

গৌরী গবাক্ষের কানায় আঙুল রাখিয়া বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে নিজেকে তুলিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল। পাথর কুঁদিয়া বাহির করা অপরিসর একটি প্রকোষ্ঠ—মোমবাতির আলোয় অল্পমাত্র আলোকিত। গবাক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে লোহার ভারি দরজা বন্ধ রহিয়াছে। দেয়ালে সংলগ্ন একটা লম্বা বেদীর মতন আসন, বোধহয় ইহাই বন্দীর শয্যা। এই বেদীর উপর গালে হাত দিয়া উদিত বসিয়া আছে, তাহার কোলের উপর একটা খোলা তলোয়ার। আর উদিতের অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার পানে করুণনেত্রে চাহিয়া আছে—শঙ্কর সিং। পরিধানে কেবল একটি হাফ্-প্যাণ্ট্, উর্দ্ধাঙ্গ উন্মুক্ত, কয়েদীর সাজ। তাহার মুখে দুর্দ্দশা ও দৈহিক গ্লানির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। চোখের কোণ হইতে গভীর কালির আঁচড় ক্ষতরেখার মত গণ্ডের মাঝখান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; অধরোষ্ঠের দুই প্রান্ত নত হইয়া ক্লিষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে ; বাহু ও কণ্ঠের পেশী ঈষৎ শীর্ণ। তবু অবস্থার নিদারুণ প্রভেদ সত্ত্বেও গৌরীর সহিত তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য অদ্ভুত। গৌরী সম্মোহিতের মত শঙ্কর সিংয়ের পানে তাকাইয়া রহিল।

উদিত ভ্রূকুটি করিয়া চিন্তা করিতেছিল, শঙ্কর সিংয়ের দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত হাস্য শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। শঙ্কর সিং স্খলিতস্বরে বলিল—'ঘুম, ঘুম আমার আসে না।'

'ঘুম না আসে—মদ খাও।' বিরক্ত তাচ্ছিল্যভরে ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উদিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বদ্ধ কক্ষে বাতাসের অভাব বোধ হয়

তাহাকে পীড়া দিতেছিল, সে জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

গৌরী নিঃশব্দে নিজেকে জলের মধ্যে নামাইয়া দিয়া জানালা ছাড়িয়া দিল। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে ফিরিয়া চলিল।

রুদ্ররূপের গায়ে তাহার হাত ঠেকিল। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিল—'ফিরে চল।'

জানালা হইতে পাঁচশ গজ গিয়া তাহারা থামিল।

রুদ্ররূপ জিজ্ঞাসা করিল—'কি দেখলেন?'

গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিং আর উদিত। উদিত পাহারা দিচ্ছে।'—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আজ রাত্রেই ওরা একটা কিছু করবে।'

'কি করবে?'

'জানি না। হয় ত—'

গতরাত্রে ময়ূরবাহনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা তাহার স্মরণ হইল। কি করিতে চায় উহারা? কোন্ দিক দিয়া আক্রমণ করিবে? কস্তুরীর বিরুদ্ধে কি কোনও মৎলব আঁটিতেছে। কিন্তু তাহাতে উহাদের লাভ কি? তাহাতে ঝিন্দের সিংহাসন ত সুলভ হইবে না!

কিস্তার দক্ষিণ কূলে কৃষ্ণার বিবাহোৎসবের দীপগুলি এক ঝাঁক খদ্যোতের মত মিটমিট করিতেছে; দক্ষিণ কূলে অন্ধকার। গৌরী ভাবিল—আর এখানে থাকিয়া লাভ নাই, শঙ্কর সিংয়ের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে না; স্বয়ং উদিত তাহাকে পাহারা দিতেছে। সম্ভবত উদিত আর ময়ূরবাহন পালা করিয়া পাহারা দিয়া থাকে। দুর্গে অন্য যাহারা আছে তাহারা হয় ত বন্দীর পরিচয় জানে না; কিম্বা জানিলেও উদিত তাহাদের বিশ্বাস করিয়া রাজার পাহারায় রাখে না। দুর্গে আর কাহারা? দু-চার জন অনুগত ভৃত্য, আর দু-চার জন রাজদ্রোহী বন্ধু। আশ্চর্য্য! এই মুষ্টিমেয় লোক লইয়া উদিত একটা রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে তাচ্ছিল্যভরে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে!

এই সব অফলপ্রসূ চিন্তা ত্যাগ করিয়া গৌরী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, হঠাৎ নিকটেই জাঁতা ঘোরানোর মত গড় গড় শব্দে সে থামিয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ভৌতিক হাসির শব্দ যেন দুর্গের পাথর ভেদ করিয়া তাহার কানে ভাসিয়া আসিল; গৌরীর সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ু-পেশী সহসা শক্ত হইয়া উঠিল।

ময়ূরবাহনের হাসি! তবে সে মরে নাই!

কিন্তু হাসির শব্দটা আসিল কোথা হইতে?

সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিতেই গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্ররূপকে টানিয়া দুর্গের দেয়ালের গায়ে একেবারে সাঁটিয়া গেল। মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দক্ষিণে দুর্গের গাত্রে পীতবর্ণ আলোকের একটি চতুষ্কোণ দেখা দিয়াছে।

জাঁতার মত গড়গড় শব্দ করিয়া এই চতুষ্কোণ প্রস্থে বাড়িতে লাগিল। প্রায় আট ফুট উচ্চ ও ছয় ফুট চওড়া একটি দ্বার ধীরে ধীরে কর্কশ অসমতল দেয়ালে আত্মপ্রকাশ করিল।

গুপ্তদ্বার! এই পথেই গতরাত্রে ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরিয়াছিল! গৌরী ও রুদ্ররূপ নিশ্বাস রোধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট কথার শব্দ গুপ্তদ্বারের অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিল। যেন তাহারা একটা ভারী জিনিস বহন করিয়া আনিতেছে। ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ডিঙির অগ্রভাগ দ্বারমুখে বাহির হইয়া আসিল।

'আস্তে! হুঁসিয়ার!' ময়ূরবাহনের গলা।

নৌকা ছপাৎ করিয়া জলে পড়িল। ময়ূরবাহন দড়ি ধরিয়া ছিল, টানিয়া নৌকা দ্বারের মুখে লইয়া আসিল।

'স্বরূপদাস, তুমি মোটা মানুষ, আগে নৌকায় নামো।'—একজন স্থূলকায় লোক সন্তর্পণে নৌকায় নামিল—'দাঁড় ধর।'

'এবার তুমি।' আর একজন নৌকায় নামিল।

তখন দড়ি নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ময়ূরবাহন লঘুপদে নৌকায় লাফাইয়া পড়িল। নৌকা টলমল করিয়া উঠিল; ময়ূরবাহন হাসিল—সেই বিজয়ী বেপরোয়া হাসি। গুপ্তদ্বারের দিকে ফিরিয়া বলিল—'দরজা খোলা থাক, আর তুমি লণ্ঠন নিয়ে এইখানে বসে থাকো—নইলে ফেরবার সময় দরজা খুঁজে পাব না।—কখন ফিরব ঠিক নেই, হয় ত রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। হুঁসিয়ার থেকো।'

দ্বারের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'যো হুকুম।'

ময়ূরবাহন বলিল—'দাঁড় চালাও।'

ক্ষুদ্র তরী তিনজন আরোহী লইয়া পলকের মধ্যে অন্তর্হিত

হইয়া গেল। গৌরী চক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—নৌকাটা কোন্ দিকে যাইতেছে, কিন্তু কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। আকাশ ও জলের ঘন তমিস্রার মধ্যে নৌকা যেন মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কাটিল।

তারপর গৌরী রুদ্ররূপের মাথাটা নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুপি চুপি বলিল,—'রুদ্ররূপ, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।'

রুদ্ররূপ সচকিতে বলিল—'আর আপনি?'

'আমি এই পথে দুর্গে ঢুকব।'

'কিন্তু—'

গৌরী সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া রুদ্ররূপের কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আমার হুকুম, দ্বিরুক্তি কোরো না।—এমন সুযোগ আর আসবে না। তুমি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে ধনঞ্জয় আর বিশ জন সিপাহী নিয়ে দুর্গের পুলের মুখে লুকিয়ে থাকবে। আমি দুর্গের ভিতর ঢুকছি, যেমন করে পারি দুর্গের সিংদরজা খুলে দেব। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' রুদ্ররূপের স্বর আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মত ভাবহীন।

'গুপ্তদ্বারে একটা মাত্র লোক আছে, সে আমাকে আটকাতে পারবে না। তারপর দুর্গের ভিতরকার অবস্থা বুঝে যেমন হয় করব। উদিত রাজাকে পাহারা দিচ্ছে, ময়ূরবাহন নেই—দুর্গে হয় ত কয়েকজন চাকর-বাকর মাত্র আছে। এই সুযোগ। ময়ূরবাহন ফেরবার আগেই কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। তুমি যাও, আর দেরী কোরো না।'

'যো হুকুম'—রুদ্ররূপ সাঁতার দেবার উপক্রম করিল।

গৌরী আস্তে আস্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—'স্রোতে ঠেলে যেতে পারবে না, তুমি বরং স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও—দুর্গ পেরিয়ে কিনারায় উঠতে পারবে।'

রুদ্ররূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল। এতক্ষণ দিক্‌ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে তবু একজন অদৃশ্য সহচর ছিল, এখন সেও গেল। গৌরী একা।

ছোরাটা সে কোমর হইতে হাতে লইল। তারপর অতি সাবধানে গুপ্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

জল হইতে একহাত উচ্চে গুপ্তদ্বার। গৌরী কোণ হইতে সরীসৃপের মত মাথা তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। সম্মুখেই একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার ওপারে কি আছে দেখা যায় না। ক্রমে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিল—সুড়ঙ্গের মত গুপ্তদ্বার ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—অস্পষ্ট অন্ধকার; হয় ত অপর প্রান্তে দুর্গের উপরে উঠিবার সোপান আছে।

চক্ষু আলোকে আরও অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিতে পাইল, লণ্ঠনের দুই-তিন হাত পিছনে একটা লোক দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না, একটা হাত কপালের উপর ন্যস্ত; বোধ হয় একাকী বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছে, কিম্বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে আর কেহ নাই।

গৌরী একবার চক্ষু মুদিয়া নিজেকে স্বস্থ সংযত করিয়া লইল। তারপর দ্বারের কাণায় ভর দিয়া জল হইতে উঠিয়া সিক্তদেহে দ্বারমুখে দাঁড়াইল।

উপবিষ্ট লোকটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌরী ছোরা তুলিয়া এক লাফে তাহার সম্মুখীন হইল।

'মহারাজ!'

গৌরীর উদ্যত ছোরা অর্দ্ধপথে রুখিয়া গেল। কণ্ঠস্বর পরিচিত।

গৌরী লণ্ঠনের আলোকে লোকটার ত্রাসবিস্ময়-বিকৃত মুখের পানে চাহিল। মুখখানা চেনা চেনা। কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে?

তারপর সহসা স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। গৌরীর হাতের ছোরা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে বিপুল আবেগে তাহাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'প্রহ্লাদ!'

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাল রাত্রি

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল।

কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কস্তুরী শ্রান্তদেহে দ্বিতলে নিজের শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ঘরে তৈলের বাতি জ্বলিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ আলোকে কস্তুরী একবার চারিদিকে চাহিল। বহুমূল্য

আভরণে সজ্জিত কক্ষ, মধ্যস্থলে একটি মখমলে মোড়া পালঙ্ক। নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ভাবিল, আর কৃষ্ণা তাহার শয়ন-সঙ্গিনী হইবে না।

ক্লান্তিতে শরীর ভরিয়া গিয়াছে, তবু শয্যা আশ্রয় করিতে মন চাহিল না। কস্তুরী ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণার বিবাহের প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে; সে আন্দোলন এখনো থামে নাই।

জানালার বাহিরে হৈমন্তী রাত্রির দেহও যেন ধীরে ধীরে হিম হইয়া আসিতেছে। উদ্যানে দুই-চারিটা আলো দূরে দূরে জ্বলিতেছে; গাছের শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া একটা অপরিস্ফুট প্রভা অন্ধকারকে তরল করিয়া দিয়াছে। উদ্যানের পরেই দ্রুতবহমানা কিস্তা; ক্লান্তি নাই, সুপ্তি নাই, অধীর আগ্রহে প্রপাতের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কস্তুরী কিস্তার পরপারে অগাধ অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। ঐখানে কোথাও এক তাঁবুর মধ্যে তিনি ঘুমাইতেছেন! কেন তিনি একবার আসিলেন না? আসিলে কাজের খুব বেশী ক্ষতি হইত কি?

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ঘরের দিকে ফিরিতেছিল, জানালার নীচে একটা শব্দ শুনিয়া চকিতে নীচের দিকে তাকাইল। যেন চাপা গলায় কে কথা কহিল।

নীচে অন্ধকার; মনে হইল একটা লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাগড়ীর জরীর উপর ক্ষণেকের জন্য আলো প্রতিফলিত হইল।

"রাণীজী!

কণ্ঠস্বর অতি নিম্ন, কিন্তু সম্বোধনটা স্পষ্ট—কস্তুরীর কানে আসিল। সে গলা বাড়াইয়া বিস্মিতস্বরে বলিল—'কে?'

নীচে হইতে উত্তর আসিল—'আমি রুদ্ররূপ।'

রুদ্ররূপ! কস্তুরীর মনে পড়িল, রুদ্ররূপ মহারাজের পার্শ্বচর, কৃষ্ণার মুখে শুনিয়াছে।

'কি চাও?' তাহার গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—'রাণীজী, মহারাজ এসেছেন, ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আপনি আসবেন কি?'

কস্তুরী জানালা হইতে একটু সরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আসিয়াছেন! কিন্তু এই শেষ রাত্রে কেন? নির্জ্জনে দেখা করিতে চান বলিয়াই কি আজ বিবাহ-বাসরে আসেন নাই!

সে আবার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল।

পুনশ্চ স্বর শুনিতে পাইল—'রাণীজী, দোষ নেবেন না। মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন। বড় জরুরী ব্যাপারে তাঁকে কালই চলে যেতে হবে, তাই একবার—'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুমি দাঁড়াও।' কস্তুরীর কথাগুলি শিউলি ফুলের মত অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে একবার ভাবিল, কাহাকেও সঙ্গে লইবে? কিন্তু কৃষ্ণা ছাড়া আর ত কাহাকেও সঙ্গে লওয়া যায় না। অথচ কৃষ্ণাকে এখন ডাকা সম্ভব নয়··· কিন্তু প্রয়োজন কি? সে একাই যাইবে।

ওড়না গায়ে জড়াইয়া লইয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিল। কেহ কোথাও নাই; বৃহৎ প্রাসাদের অপরাংশে সকলে তখনো আমোদে মগ্ন। যে-কয়জন দাসী রাণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, রাণী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার পর তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। লঘু পদে কস্তুরী নীচে নামিয়া গেল।

সেই লোকটি জানালার নীচে অপেক্ষা করিতেছিল, একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। কস্তুরীও তাহার মুখ অস্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই রুদ্ররূপ! সে রুদ্ররূপকে পূর্ব্বে দেখে নাই।

পুরুষ সসম্মানে কহিল—'এইদিকে রাণীজী, এইদিকে—'

তাহার অনুসরণ করিয়া কম্প্রবক্ষে কস্তুরী ঘাটের দিকে চলিল।

* * * *

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

গৌরী আর প্রহ্লাদ মুখোমুখি বসিয়া, তাহাদের মধ্যস্থলে লণ্ঠন। গৌরী স্থিরভাবে বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার নিষ্কম্প দেহটা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটা অনলস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে—যে-কোনো মুহূর্ত্তে বারুদের স্তূপের মত প্রচণ্ড উন্মত্ততায় বিস্ফুরিত হইয়া চারিদিকে দাবানল ছড়াইয়া দিবে।

কস্তুরী! এই নরকের ক্লেদাক্ত সরীসৃপগুলা কস্তুরীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিবার অভিসন্ধি করিয়াছে।

প্রথম প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনিবার পর ইহাদের গগনস্পর্শী ধৃষ্টতা গৌরীর মনটাকে ক্ষণকালের জন্য অসাড় করিয়া দিয়াছিল; প্রথমটা সে বিশ্বাস করিতেই পারে নাই। কিন্তু সত্যই ইহা ত অসম্ভব নয়। উদিত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ভাইকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া যে সিংহাসন গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, তাহার অসাধ্য কি আছে? ঝিন্দের সিংহাসন পাইবার আশা হারাইয়া সে অবশেষে ঝড়োয়ার সিংহাসন দখল করিবার এই ক্রূর মৎলব বাহির করিয়াছে। কস্তুরীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবে; হিন্দুর বিবাহ, একবার সম্পাদিত হইলে আর নড়চড় হয় না—তখন ঝড়োয়া রাজ্যের উপর উদিতের দাবী কে অস্বীকার করিবে? Factum Valet…কি নৃশংস স্বার্থপরতা! কি পৈশাচিক ক্রূর-বুদ্ধি! এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত গতরাত্রে ময়ূরবাহন তাহাকে দিয়াছিল।

প্রহ্লাদ কুণ্ঠিতস্বরে মৌনভঙ্গ করিল—'ময়ূরবাহনের ফিরতে এখনো বোধ হয় দেরি আছে। ইতিমধ্যে রাজাকে—'

গৌরী অগ্নিগর্ভ চোখ তুলিল; কথা কহিল না। প্রহ্লাদ দেখিল, চোখের মধ্যে সর্ব্বগ্রাসী একটি চিন্তাই প্রতিফলিত হইতেছে। রাজার স্থান সেখানে নাই, বোধ করি জগতের আর-কিছুরই স্থান নাই।

প্রহ্লাদ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল—'ওদিকে দুর্গের সামনে আপনার সিপাহীরা এতক্ষণ নিশ্চয় পৌঁছে গেছে—দুর্গের সিংদরজা খুলে দেবার চেষ্টা করলে হত না? দু'জন শাস্ত্রী পাহারায় আছে, আমি তাদের ভুলিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি। আপনার লোকেরা একবার ঢুকে পড়লে—'

'না, ওসব পরে হবে।'

আবার দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। লণ্ঠনের আলোক-শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; রাত্রিশেষের শীতল বাতাস জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সহসা প্রহ্লাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; চাপা উত্তেজনায় বলিল—'ওরা আসছে—দাঁড়ের শব্দ পেয়েছি। আপনি এখন আলোর কাছ থেকে সরে যান। যেমন-যেমন ঠিক হয়েছে তেমনি করবেন, যথাসময় আমি সঙ্কেত করব—'

গৌরীও চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপতিত ছোরাটা তাহার পায়ে ঠেকিল, সেটা ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া লইয়া সে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরের দিকে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রহ্লাদ লণ্ঠন লইয়া গুপ্তদ্বারের মুখের কাছে দাঁড়াইল।

দাঁড়ের মৃদু ছপ্ ছপ্ শব্দ, তারপর ময়ূরবাহনের হাসি শোনা গেল। নৌকার মুখ আসিয়া দ্বারের নীচে ঠেকিল।

'প্রহ্লাদ, দড়িটা ধর।'

ময়ূরবাহন লাফাইয়া প্রহ্লাদের পাশে দাঁড়াইল; নৌকার দিকে ফিরিয়া বলিল—'এইবার রাণীজীকে তুলে দাও। হুঁসিয়ার স্বরূপদাস, সব সুদ্ধ জলে পড়ে যেও না। আস্তে রাণীজী—চঞ্চল হবেন না; কোনো ভয় নেই, আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য—হা হা হা—'

ওড়না দিয়া মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ দড়ির মত করিয়া বাঁধা একটি বিদ্রোহী-নারীমূর্ত্তি ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে নামানো হইল। প্রহ্লাদ ও ময়ূরবাহন দেহটিকে সুড়ঙ্গের মধ্যে আনিয়া একপাশে শোয়াইয়া দিল। তারপর ময়ূরবাহন জলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'স্বরূপদাস, এবার তোমরা নেমে এস। ডিঙি ভিতরে তুলতে হবে।'

স্বরূপদাস নৌকা হইতে কাতর স্বরে বলিল—'দাঁড় দুটো জলে পড়ে গিয়ে কোথায় ভেসে গেছে—খুঁজে পাচ্ছি না।'

ময়ূরবাহন হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'তা যাক; আপাতত আর দাঁড়ের দরকার নেই।—প্রহ্লাদ, তুমি আর আমি এবার রাণীজিকে—'

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ পূর্ব্ব-নিরূপিত সমস্ত সঙ্কল্প উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদের সঙ্কেতের অপেক্ষা না করিয়াই দুরন্ত ঝড়ের মত গৌরী অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। কস্তুরীর ঠিক পাশে প্রহ্লাদ দাঁড়াইয়া ছিল, গৌরীর প্রথম ধাক্কাটা তাহাকেই গিয়া লাগিল। প্রহ্লাদ টাউরি খাইয়া ময়ূর-বাহনের গায়ে পড়িল। ময়ূরবাহন আচমকা ঠেলা খাইয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে লণ্ঠনটা ডিঙাইয়া জলের কিনারা পর্য্যন্ত গিয়া কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ফিরিয়াই নিমেষমধ্যে যেন পাথরে পরিণত হইয়া গেল।

দৃশ্যটা নাটকীয় বটে। মেঝের উপর পীতাভ লণ্ঠন জ্বলিতেছে; তাহার অনতিদূরে প্রহ্লাদ ভূমি হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিয়া নতজানু অবস্থাতেই ময়ূরবাহনের দিকে

নিষ্পলক তাকাইয়া আছে ; আর তাহার পশ্চাতে ভূ-লুণ্ঠিত নারী-দেহের দুইদিকে পা রাখিয়া একটা নগ্নকায় দৈত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষে জলন্ত অঙ্গার, হাতে একটা ঝকঝকে বাঁকা ছোরা।

ময়ূরবাহনের চক্ষু ক্রমশ কুঞ্চিত হইয়া আলোকের দুইটি বিন্দুতে পরিণত হইল। তারপর সে হাসিল ; কোমর হইতে বিদ্যুদ্বেগে অসি বাহির হইয়া আসিল—

'আরে! বাংগালি নটুয়া! তুই এখানে?'

ময়ূরবাহনের হাসিতে পৈশাচিক উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। সে তরবারি হস্তে একপদ অগ্রসর হইল।

'বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিস! হা হা হা—বাংগালী নটুয়া! আজ তোকে কে রক্ষা করবে?'

প্রহ্লাদ ভয়ার্ত্ত চোখে তাহার দীর্ঘ তরবারির দিকে চাহিয়া রহিল। গৌরীর হাতে কেবল ছোরা, অন্য অস্ত্র নাই।

পিছন হইতে স্বরূপদাসের করুণ স্বর আসিল—'দড়ি ছেড়ে দিলেন কেন? নৌকা যে ভেসে যাচ্ছে—'

কেহ কর্ণপাত করিল না ; ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইল।

প্রহ্লাদ সহসা নতজানু অবস্থা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'মহারাজ, পালান—'

ময়ূরবাহনের সাপের মত চোখ প্রহ্লাদের দিকে ফিরিল—'তুই বেইমানি করেছিস। তোকেই আগে শেষ করি।'

প্রহ্লাদ তখনও ময়ূরবাহনের তরবারির নাগালের মধ্যে ছিল না, ময়ূরবাহন আর এক পা আগে আসিয়া তরবারি তুলিল—

প্রহ্লাদের কানের পাশ দিয়া শাঁই করিয়া একটা শব্দ হইল ; একটা আলোর রেখা যেন তাহার পিছন হইতে ছুটিয়া গিয়া ময়ূরবাহনের পঞ্জরের নীচে গাঁথিয়া গেল।

ডান হাতে উত্থিত তরবারি, ময়ূরবাহন নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার অধরের রক্তিম হাসি ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তার পর উত্থিত তরবারিটা ঝন্ ঝন্ শব্দে পাথরের মেঝের পড়িল।

ময়ূরবাহন কিন্তু পড়িল না। একটা অর্দ্ধচক্রাকৃতি পাক খাইয়া সে নিজেকে খাড়া করিয়া রাখিল। আমূলবিদ্ধ ছোরার মুঠ ধরিয়া সেটাকে নিজের দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল। তাহার মুখ বুকের উপর নত হইয়া পড়িল, চোখে কাচের মত একটা দৃষ্টিহীন স্বচ্ছতার আবরণ পড়িয়া গেল। স্খলিত পদে গুপ্তদ্বারের কিনারা পর্য্যন্ত গিয়া যেন অসীম বলে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; মাতালের মত দুইবার টলিয়া হঠাৎ কাৎ হইয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

প্রহ্লাদ এতক্ষণ জড়ের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন সচেতন হইয়া ব্যগ্র বিস্ফারিত নেত্রে গৌরীর পানে তাকাইল। গৌরী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, শুধু তাহার হাতে ছোরা নাই।

প্রহ্লাদ ছুটিয়া জলের কিনারায় গিয়া উঁকি মারিল। ময়ূরবাহনের দেহ সেখানে নাই···হয়ত ডুবিয়া গিয়াছে। দাঁড়হীন নৌকাও দুইজন আরোহী লইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। স্থূলকায় ষ্টেশন মাষ্টার স্বরূপদাস সাঁতার জানে না—অন্য লোকটাও···

'প্রহ্লাদ, আলো নাও—পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চল।'

প্রহ্লাদ ফিরিয়া দেখিল, গৌরী কস্তুরীকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়াছে।

* * * *

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

দুর্গের উপরিভাগে একটি কক্ষ। বোধ হয় অস্ত্রাগার ; চারিদিকের দেয়ালে সেকেলে প্রাচীন অস্ত্র ঢাল তলোয়ার বল্লম ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘরটি নিরাভরণ।

এই ঘরের দ্বারের কাছে সেই লণ্ঠন জ্বলিয়া আলো বিকীর্ণ করিতেছে ; আর ঘরের মধ্যস্থলে গৌরী ও কস্তুরী দাঁড়াইয়া আছে।

আলোর পীতাভ অস্পষ্টতায় দুইজনকে পৃথকভাবে দেখা যাইতেছে না। কস্তুরীর দুই বাহু গৌরীর কণ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ, মুখখানি ক্লান্ত মুদিত কুমুদের মত তাহার নগ্ন বক্ষে নামিয়া পড়িয়াছে। গৌরীর বাহুও এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে যেন সে-বন্ধন ইহজীবনে আর খুলিবে না।

দু'জনেই নীরব ; কেবল গৌরী মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ক্ষুধিত স্বরে বলিতেছে—কস্তুরী-কস্তুরী-কস্তুরী—

কস্তুরী সাড়া দিতেছে না। সে কি মূর্চ্ছিতা? অথবা নিজের দুরবগাহ অনুভূতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

'রাণী !' গৌরী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল।

এবার কস্তুরী চোখ খুলিল। ধীরে ধীরে গৌরীর মুখের কাছে মুখ তুলিয়া ধরা-ধরা অস্ফুট স্বরে বলিল—'রাজা !'

গৌরী মর্ম্মছেঁড়া হাসি হাসিল—'রাজা নয়। সব ত বলেছি কস্তুরী, আমি নগণ্য বিদেশী। এবার ছেড়ে দাও, কর্ত্তব্য শেষ করে চলে যাই।'

কস্তুরীর হাত দুটি ক্রমশ শিথিল হইয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িল। সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তেমনি ধীর অচঞ্চল স্বরে বলিল—'চলে যাবে ?'

'তা ছাড়া আর ত পথ নেই কস্তুরী। তুমি ঝিন্দের বাগ্‌দত্তা রাণী—'

'বেশ—যাও। আমারও কিন্তু আছে।'

'না না না, ও-কথা নয় কস্তুরী। আমি মরি ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি—'

'আমি ঝিন্দের রাণী হবার জন্যে বেঁচে থাকব ?' অতি ক্ষীণ হাসি কস্তুরীর অধরপ্রান্তে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল, —'তুমি যাও, তোমার কর্ত্তব্য কর গিয়ে, আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।'

'কস্তুরী, ভালবাসার কাছে আমাদের প্রাণ তুচ্ছ, সে আমি জানি। কিন্তু ইচ্ছে করে মরবে কেন ? যদি বেঁচে থাকি—দূর থেকে দু'জনে দুজনকে ভালবাসব, হলেই বা তুমি ঝিন্দের রাণী, তোমার ভালবাসা ত চিরদিন আমার থাকবে—'

"রাজা, তোমাকে যদি না পাই, আমার কিন্তু আছে।'

এই অচঞ্চল উত্তাপহীন দৃঢ়তার সম্মুখে গৌরীর সমস্ত যুক্তি ভাসিয়া গেল; সে যে মিথ্যা যুক্তি দিয়া নিজেকেই ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাও বুঝিতে পারিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'বেশ, তাই ভাল। আমি চললাম, রাত শেষ হয়ে গেছে, তুমি এখানেই থাক। যদি রাজাকে উদ্ধার করেও বেঁচে থাকি, তোমার কাছে ফিরে আসব। আর—যদি না ফিরি, তখন যা-ইচ্ছা কোরো।'

কস্তুরী দুই বাহু বাড়াইয়া গৌরীর মুখের পানে চাহিল। আয়ত চোখ দুটিতে ভালবাসা টলটল করিতেছে; লজ্জা নাই, নিজের মনের নিবিড়তম বাসনা গোপন করিয়া তিলমাত্র খর্ব্ব করিবার চেষ্টা নাই। যে মৃত্যুর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে লজ্জা করিবে কাহাকে ?

দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত্তস্বর গৌরীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। দুরন্ত আবেগে কস্তুরীর দেহ নিজ বাহুমধ্যে একবার নিষ্পেষিত করিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

'প্রহ্লাদ, একটা অস্ত্র আমাকে দাও।'

প্রহ্লাদ তলোয়ার দিল। সেটা হাতে লইয়া গৌরী হঠাৎ হাসিল, বলিল—'চল একবার উদিতের সঙ্গে দেখা করি; বাংগালী কুত্তার ওপর তার বড় রাগ।—প্রহ্লাদ, এই তলোয়ার দিয়ে ঝিন্দের সমস্ত মানুষকে হত্যা করা যায় না ? তুমি—আমি—উদিত—ধনঞ্জয় রুদ্ররূপ—শত্রু মিত্র কেউ বেঁচে থাকবে না !'

প্রহ্লাদ ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চুপ করিয়া রহিল। গৌরী বলিল—'রাজার কোত-ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।'

লণ্ঠন হস্তে প্রহ্লাদ আগে আগে চলিল। কয়েক প্রস্থ অপরিসর সিঁড়ি নামিয়া তাহারা অবশেষে এক গোলক ধাঁধার মত স্থানে উপস্থিত হইল; সুড়ঙ্গের মত একটা বদ্ধ সঙ্কীর্ণ গলি বাঁকা হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার একপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার দরজা। গৌরী বুঝিল, এগুলি দুর্গের প্রাচীন কারা-কক্ষ, ইহাদেরই গবাক্ষ বাহির হইতে দেখা যায়।

এই গলির একটা বাঁকের মুখে এক বদ্ধ দরজার সম্মুখে প্রহ্লাদ দাঁড়াইল; গৌরীকে একটা চোখের ইঙ্গিত জানাইয়া আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল,—'কে ?'

'আমি প্রহ্লাদ। দরজা খুলুন, ময়ূরবাহন ফিরেছেন।'

দরজার জিঞ্জির খোলার শব্দ হইতে লাগিল। গৌরী প্রহ্লাদের কানে কানে বলিল—'তুমি যাও—দুর্গের সিংদরজা খোলার ব্যবস্থা কর।'

প্রহ্লাদ আলো লইয়া দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল।

উদিত দরজা খুলিয়া দেখিল, গলিতে অন্ধকার। কক্ষের ভিতরে ক্ষীণ আলোকে তাহার চেহারার রেখা দেখা গেল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া উদিত বলিল—'প্রহ্লাদ

ঝাঁকি! আলো আনো নি কেন? ময়ূরবাহন ফিরেছে! রাণীকে এনেছে?'

সে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—'প্রহ্লাদ, তুমি কোথায়! রাণীকে এনেছে ময়ূরবাহন—?' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা জঘন্য লুব্ধতা প্রকাশ পাইল।

গৌরী তাহার দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তলোয়ারখানা উদিতের বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। উদিতের কণ্ঠ হইতে একটা বিস্ময়-সূচক শব্দ বাহির হইল। আর সে কথা কহিল না, নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

গৌরী তাহার মৃতদেহ লঙ্ঘন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর সিং মলিন শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে দাঁড়াইল; মোমবাতির আলোয় দু'জনে পরস্পর মুখের পানে চাহিল। শঙ্কর সিংয়ের চোখে বিস্ফারিত বিস্ময়; গৌরী ভাবিতেছে—শঙ্কর সিংয়ের দেহটাও উদিতের মতই নশ্বর; শুধু তলোয়ারের একটা আঘাতের ওয়াস্তা!

তারপর অদ্ভুত হাসিয়া গৌরী বলিল,—'শঙ্কর সিং, তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

* * * *

রাত্রি আর নাই; পূর্ব্বাকাশে উষা ঝলমল করিতেছে।

দুর্গপ্রাকারের পাশে দাঁড়াইয়া দুই শঙ্কর সিং অরুণায়মান কিস্তার পানে তাকাইয়া আছে। প্রাকারের কোলে কোলে তখনও রাত্রির নষ্টাবশেষ অন্ধকার জমা হইয়া আছে।

পাশাপাশি দুই শঙ্কর সিং—চেহারা ও বেশভূষায় কোনো প্রভেদ নাই। দু'জনেই বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছে।

একজন ভাবিতেছে—ফুরাইয়া আসিল, আমার ঝিন্দের খেলা ফুরাইয়া আসিল। ঐ দুর্গের দ্বার খুলিল। ধনঞ্জয় আসিতেছে—আর দেরী নাই।

আর একজন ভাবিতেছে—কি ভাবিতেছে সে নিজেই জানে না। বোধ করি সুসংলগ্ন চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার নাই।

প্রাকার-ক্রোড়ের অন্ধকারে কি একটা নড়িল। কেহ লক্ষ্য করিল না। উভয়ের দৃষ্টি দূর-বিন্যস্ত।

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। পাথরের অঙ্গনে তাহাদের জুতার কঠিন শব্দ শুনা যাইতেছে। প্রহ্লাদের গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিল; সে পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া আসিতেছে।

আবার অন্ধকার প্রাকারের ছায়ায় কি নড়িল। দুই শঙ্কর সিং নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া দুজনেই ফিরিল।

একটি নারীমূর্ত্তি তাহাদের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কস্তুরী! দুই শঙ্কর সিং তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পাংশু নারীমূর্ত্তি অস্ফুট চীৎকার করিয়া তাহাদের কি বলিতে চাহিল। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই প্রাকারের ছায়াশ্রয় হইতে একটা মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। মূর্ত্তিটা টলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, হাতে ছোরা।

ছোরা একজন শঙ্কর সিংয়ের বুকে বিঁধিল—আমূল বিঁধিয়া গেল। শুধু সোনার কাজকরা মুঠ উষালোকে ঝিকমিক করিতে লাগিল।

নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ছোরা। এতদিনে বুঝি তাহার কাজ শেষ হইল।

আততায়ী ও আহত একসঙ্গে পড়িয়া গেল। শঙ্কর সিং নিশ্চল; মরণাহত ময়ূরবাহনের শেষ নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে একটা অস্ফুট হাসির শব্দ বাহির হইয়া আসিল।

বিজয়ী বেপরোয়া বিদ্রোহী ময়ূরবাহন।

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল।

একজন শঙ্কর সিং তখনো স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আছে; আর তাহার অদূরে একটি পাংশু নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ধনঞ্জয় ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইলেন। তারপর কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিলেন—'রুদ্ররূপ, এখানে আর কাউকে আসতে দিও না।'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

ঝিন্দ রাজপ্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী বিশাল কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে আবলুশের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ঝিন্দের রাজা শঙ্করসিং পত্র লিখিতেছেন।

চারিদিকের খোলা জানালার বাহিরে রৌদ্র-প্রফুল্ল প্রভাত; কয়েক দিন আগে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়া

আকাশ পালিশ-করা ইস্পাতের মত ঝকঝক করিতেছে; কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

শঙ্কর সিং পত্র লিখিতেছেন বটে, কিন্তু নির্বিঘ্নমনে পত্র শেষ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। ঘরের দ্বারে রুদ্ররূপ পাহারায় আছে এবং প্রাসাদের সদরে স্বয়ং ধনঞ্জয় বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছেন; তবুও রাজদর্শন-প্রার্থী সম্ভ্রান্ত জনগণের স্রোত ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না। ডাক্তার গঙ্গানাথের দোহাই পর্য্যন্ত কেহ মানিতেছে না। শক্তিগড় দুর্গে রাজার প্রতি হিংসুক উদিতের আক্রমণ ও রাজার অসাধারণ বাহুবলে উদিত ময়ূরবাহন প্রভৃতির মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। উদিত যে রাজাকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল একথা কাহারো অবিদিত নাই। মন্ত্রী বজ্রপাণি ভার্গব ও সর্দ্দার ধনঞ্জয় এই শোচনীয় ভ্রাতৃ-বিরোধের কাহিনী গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সত্য কথা চাপিয়া রাখা যায় না, প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তাই গত কয়েক দিন ধরিয়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ক্রমাগত রাজাকে অভিনন্দন জানাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহাদের শুভাগমনের ফাঁকে ফাঁকে পত্র-লিখন চলিতেছে—

—'যার হাতে চিঠি পাঠালাম তার নাম প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত। সে বাঙালী, যদিও তার ভাষা শুনলে সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মাতে পারে। কিন্তু ভাষা যাই হোক, প্রহ্লাদ খাঁটি বাঙালী। গত কয়েক দিন ধরে' আমি কেবলি ভাবছি, প্রহ্লাদ যদি বাঙালী না হত—অনেককে বলতে শুনেছি, বাঙালীর ভায়ে ভায়ে মিল নেই, যেখানে দুটি বাঙালী সেখানেই ঝগড়া। মিথ্যে কথা। বিদেশে বাঙালীর মত বাঙালীর বন্ধু আর নেই। যদি সন্দেহ হয়, প্রহ্লাদকে স্মরণ কোরো।'

রুদ্ররূপ দ্বারের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া জানাইল, ঝড়োয়ার বিজয়লালকে সঙ্গে লইয়া ধনঞ্জয় আসিতেছেন। শঙ্কর সিং অসমাপ্ত পত্র সরাইয়া রাখিলেন।

বিজয়লাল মিলিটারি স্যালুট করিয়া একখানি পত্র রাজার হাতে দিল। ঝড়োয়ার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে রাজকীয় লেফাপা-দুরস্ত পত্র—দেওয়ান লিখিয়াছেন। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পত্রে চোখ বুলাইয়া শঙ্কর সিং বিজয়লালের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন; গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাণী কস্তুরী-বাঈ ভাল আছেন?'

'আছেন মহারাজ।'

মহারাজের গম্ভীর মুখের এক কোণে একটু হাসি দেখা দিল—'আর—কৃষ্ণা বাঈ? তিনি ভাল আছেন?'

বিজয়লাল অবিচলিত মুখে কেবল একবার মাথা ঝুঁকাইল।

রাজা ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'সর্দ্দার, সুবাদার বিজয়লালকে আমি আমার খাস পার্শ্বচর নিযুক্ত করতে চাই। এ বিষয়ে ঝড়োয়ার দরবারের সঙ্গে যে লেখাপড়া করা দরকার তা আজই যেন করা হয়।'

'যো হুকুম মহারাজ।'

রাজা মস্তকের একটি সঙ্কেতে উভয়কে বিদায় দিলেন।

—'তোমার পায়ে পড়ি, অচল-বৌদি, দেরী কোরো না। যত শিগ্‌গির পারো দাদাকে নিয়ে চলে এস। তোমাদের জন্যে যে কি ভয়ঙ্কর মন কেমন করছে তা বলতে পারি না। যদি সম্ভব হত, আমি ছুটে গিয়ে তোমাদের কাছে পড়তুম। কিন্তু—এ রাজ্য ছেড়ে বার হবার উপায় নেই, হয়ত ইহজীবনে ছাড়া পাব না। আমি ত ঝিন্দের রাজা নই, ঝিন্দের বন্দী—'

রুদ্ররূপের ফ্যাকাসে মুখ ক্ষণকালের জন্য পর্দ্দার ফাঁকে দেখা গেল—'ত্রিবিক্রম সিং আসছেন।'

কিছুক্ষণ ত্রিবিক্রমের সঙ্গে অভিনন্দনের অভিনয় চলিল। তারপর শঙ্কর সিং সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'ত্রিবিক্রম সিং, আমি আপনার মেয়ে চম্পা দেঈর জন্যে পাত্র স্থির করেছি।'

ত্রিবিক্রম ঈষৎ চমকিত হইয়া মামুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তারপর দুইবার কাশিয়া পাত্রের নাম-ধাম জানিতে চাহিলেন।

শঙ্কর সিং কহিলেন—'ভারি সৎ পাত্র—আমার দেহ-রক্ষী রুদ্ররূপ। চম্পাও তাকে পছন্দ করে।'

ত্রিবিক্রম মনে মনে অতিশয় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। তিনি গলার মধ্যে নানা প্রকার শব্দ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিং যেন লক্ষ্য করেন নাই এমনিভাবে বলিলেন, 'ময়ূরবাহন মরেছে—তার কেউ ওয়ারিস নেই। আমি স্থির করেছি ময়ূরবাহনের জায়গীর রুদ্ররূপকে বক্‌শিস্ দেব।'

ত্রিবিক্রমের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি সবিনয়ে রাজার স্তুতিবাচন করিয়া জানাইলেন যে, রাজার অভিরুচির বিরুদ্ধে তাঁহার কোনো কথাই বলিবার ছিল না এবং কোনো কালেই থাকিতে পারে না।

আরো কিছুক্ষণ সদালাপের পর তিনি বিদায় হইলেন।

* * * *

—'রাজকার্য্যে ভয়ানক ব্যস্ত আছি। ঘটকালি করছি। এইমাত্র একটি বিয়ে ঠিক করে ফেললুম। পাত্র আর পাত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু মেয়ের বাপ বেঁকে বসেছিল। যাহোক, অনেক কষ্টে তাকে রাজি করেছি। প্রণয়ী-যুগলের মিলনে আর বাধা নেই।

বৌদি, বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় তোমাকে বলেছিলুম মনে আছে?—যে, তুমি যা চাও—অর্থাৎ বৌ—তাই এবার একটা ধরে নিয়ে আসব? একটি বৌ জোগাড় হয়েছে। আমাদের বংশে বেমানান হবে না; তোমারও বোধ হয় পছন্দ হবে। কিন্তু তুমি তাকে বরণ করে ঘরে না তুললে যে কিছুই হবে না বৌদি! তুমি এস এস এস। তোমরা না এলে কিছু ভাল লাগছে না। তার নাম কস্তুরী। নামটি ভাল নয়? মানুষটিকে বোধ হয় আরো ভাল লাগবে। সে একটা দেশের রাজকন্যা; কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। যদি চিঠিতেই কৌতূহল মিটে যায়, তাহলে হয় ত তুমি আসবে না।—'

এত্তালা না দিয়াই চম্পা প্রবেশ করিল।

রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—'কি, চম্পা দেঈ?'

চম্পা রাজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—'আজকাল কিছু না খেয়েই দরবার করতে চলে আসছেন? আপনাকে নিয়ে আমি কি করি বলুন ত?'

'খাওয়া হয়নি! তাই ত, ভুলে গিয়েছিলুম।'

'আপনি ভুলে যান, কিন্তু আমাকে যে ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে হয়! রুদ্ররূপেরও কি একটু আক্কেল নেই, মনে করিয়ে দিতে পারে না?'

'হ্যাঁ, ভাল কথা। চম্পা, তোমার বাবা এসেছিলেন; রুদ্ররূপকে তুমি বিয়ে করতে চাও শুনে তিনি খুব খুশী হয়ে মত দিয়ে গেছেন।'

চম্পার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গিয়া হাত নাড়িয়া যেন কথাটাকে দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। আপনার জন্যে কি নিয়ে আসব বলুন। দুটো আনারসের মোরব্বা, আর একপাত্র গরম সরবৎ—'

রাজা চিঠিতে মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন—'দরকার নেই।'

চম্পা বলিল—'তাহলে এক বাটি গরম দুধ—'

'বিরক্ত কোরো না চম্পা, আমি এখন ভারি জরুরী চিঠি লিখ্‌ছি।'

'কিন্তু কিছু ত খাওয়া দরকার। একেবারে—'

রাজা হাঁকিলেন—'রুদ্ররূপ!'

রুদ্ররূপ শঙ্কিত মুখে প্রবেশ করিল।

চম্পার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা হুকুম করিলেন—'তুমি চম্পা দেঈর হাত ধর।'

রুদ্ররূপ কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর ফাঁসির আসামীর মত মুখের ভাব করিয়া চম্পার একটি হাত ধরিল।

রাজা বলিলেন—'বেশ শক্ত করে ধরেছ? আচ্ছা, এবার ওকে নিয়ে যাও।'

ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ররূপ বলিল—'কোথায় নিয়ে যাব?

'তোমার বাড়ীতে। না না, এখন থাক, সেটা বিয়ের পরে হবে। আপাতত তুমি ওকে ওর মহালে নিয়ে যাও। সেখানে ওকে আটক রাখবে, যতক্ষণ তোমার কথা না শোনে ওর হাত ছাড়বে না—যাও।'

কড়া হুকুম দিয়া রাজা পুনরায় চিঠিতে মন দিলেন। চম্পা ও রুদ্ররূপ আরক্তমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আড়চোখে পরস্পরের পানে চাহিল। দু'জনেরই ঠোঁটের কূলে কূলে হাসি ভরিয়া উঠিল। রাজা তখন চিঠিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন; পা টিপিয়া টিপিয়া উভয়ে দ্বারের দিকে চলিল।

পর্দার ওপারে গিয়াই চম্পা সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর রুদ্ররূপের বুকে একটা আচম্‌কা কীল মারিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

—'ঝিন্দের মহারাজ শঙ্কর সিং বিদেশীদের খুব খাতির করেন। তোমরা এলে রাজপ্রাসাদেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হবে। তা ছাড়া রাজকীয় প্রকাণ্ড যাদুঘরের ভার নেবার জন্যে একজন পণ্ডিত লোক দরকার; দাদা ছাড়া আর ত যোগ্য লোক দেখি না।

এত কথা লেখবার আছে যে কিছুই লেখা হচ্চে না। তোমরা কবে আসবে? কবে আসবে?

দাদাকে বোলো, তাঁর দেওয়া ছোরাটা কিস্তার জলে ভেসে গেছে; ছোরার ন্যায্য অধিকারী সেটা বুকে করে নিয়ে গেছে। দুঃখ করবার কিছু নেই।

ভাল কথা, গৌরীশঙ্কর রায় নামক একজন বাঙালী যুবক ঝিন্দে বেড়াতে এসেছিল, সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে।

কবে আসবে? প্রণাম নিও। ইতি

দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ

শঙ্কর সিং

সমাপ্ত *

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

নমস্কার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অত্যাচারীর চরণেতে শির যে কভু করেনি নত,
প্রবলের রোষে দাঁড়ায়ে পুড়েছে নারিকেল তরু মত,
সত্যের লাগি যুঝেছে নিত্য, স্বার্থ দিয়াছে বলি—
কৃতঘ্নতার রূঢ় পদ যারে সদর্পে গেছে দলি,
দারিদ্র্য যার নিত্য সঙ্গী তবু সম্পদ বড়—
বৃটিশরাজ্য চেয়ে যে জনার হৃদয় বৃহত্তর।
যুগে যুগে আসি ভগবান ল'ন আগ্রহে পূজা তার,
সবাকার আগে তাহারেই আমি জানাই নমস্কার।

২

হীনতা যে জন জীবনে জানেনি, জানে নাই কুটিলতা,
প্রতারিত হয়ে নীরবে কেঁদেছে, মুখেতে কহেনি কথা,
করেছে গুণীর গুণ কীর্ত্তন, অখ্যাত জনে খ্যাত,
জগতেরে ভালবেসেছে আপনি রহিয়া অবজ্ঞাত,
এভারেষ্টের মতন যাহার অতি দুর্জ্জয় মন—
সহিতে চাহেনি, সহিতে পারেনি অযথা আক্রমণ,
পরশে তাহার সোনা হয়ে ওঠে এই ধরণীর ধূলি
তুলসীদাসের পাদুকা সে বয় নরোত্তমের ঝুলি।

৩

দেহও তাহার জীর্ণ শীর্ণ শক্তি তাহার ক্ষীণ।
অভাবে তাহার রাজার কিরীট হয়ে যায় আভাহীন।
বিপদ সাগর পাড়ি দিয়ে যায় তার ডিঙ্গা মধুকর,
কালীদহে সব কমলেরা বাঁধে তাহার লাগিয়া ঘর।
কমলে কামিনী কোল পেতে আছে কিসের তাহার ভয়
সিংহল তার চরণে লুটায় জয় জয় তার জয়।
যে মহাকালের স্নেহের উপর স্থাপিয়াছে অধিকার
সবাকার আগে তাহার চরণে জানাই নমস্কার।



পথমঞ্জরী *—ঢিমা তেতালা

আমি পথ-মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে।
গোপন অশ্রু সম রাতের নয়ন-পাতে॥

দেবতা চাহে না মোরে
গাঁথে না মালার ডোরে
অভিমানে তাই ভোরে শুকাই শিশির সাথে॥

মধুর সুরভি ছিল আমার পরাণ ভরা,
আমারও কামনা ছিল মালা হ'য়ে ঝ'রে পড়া।

ভালবাসা পেয়ে যদি
কাঁদিতাম নিরবধি,
সে বেদনা ছিল ভাল, সুখ ছিল সে কাঁদাতে॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম্‌ | **স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক্‌**

+ | ৩ | ১ | ২
II পা পা মা পা | মরা মা পা পা | রা পমা মরা রজ্ঞা | সা রা ন্‌া সা I
আ মি প থ | ম ন্‌ জ রী | ফু টে ছি আঁ | ধা র রা তে

+ | ৩ | ১ | ২
I পন্‌া সা মরা মরা | -া মপা পা পা | না না র্সা র্সজ্ঞা | র্সা র্রর্সা নর্সা র্সণ্‌ধপা II
গো প ন অ | ০ শ্রু ০ স ম | রা তে র ন ০ | য় ন পা তে ০ ০

+ | ৩ | ১ | ২
I মরা মা মপা পনা | না নর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সনা র্সজ্ঞর্রর্সা র্সা | নর্সা -া নর্সণা ধণপা I
দে ব তা চা | হে না০ মো রে | গাঁ থে০ না০০০ মা | লা০ র্‌ ডো০ রে০

+ | ৩ | ১ | ২
I পা পনর্সনা র্সধা পা | পরা -মা মপা পা | রা জ্ঞা -া জ্ঞরা | সা মরা ন্‌া সা II
অ ভি০০ মা নে | তা ই ভো০ রে | শু কা ই শি০ | শি র সা থে

+ ৩ ১ ২
II সা সরা সন্া প্া | ন্সা সজ্ঞা রা সা | জ্ঞা জ্ঞরা সা সা | রা মপা পা পা I
ম ধু র সু রং ভিং ছি ল আ মা র প রা ণং ভ রা

+ ৩ ১ ২
I রা মা মপা পনা | নর্সনা র্সধপা পা পা | পা পধা মা পা | রা জ্ঞা সন্া সা I
আ মা র কাং মং ং নাং ছি ল মা লাং হ’ য়ে ঝ রে পং ড়া

+ ৩ ১ ২
I রা মা পা পনা | নর্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সজ্ঞর্রা র্সা -া | নর্সা নর্সণা ধা পা I
ভা ল বা সা পে য়ে য দি কাঁ দিং তা ম্ নিং রং ং ব ধি

+ ৩ ১ ২
I পা পনর্সনা র্সধা পা | পরা রমা -পা পা | রা -মা সরা জ্ঞা | সা সরা সন্া ন্সা II II
সে বেং ং দ না ছি ল ভা ল সু খ্ ছি ল সে কাঁ দাং তে

* ‘পঠমঞ্জরী’ লুপ্তপ্রায় রাগ। কেহ কেহ ইহাকে ‘পটমঞ্জরী’ও বলে। এই রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এই রাগে দুই গান্ধার ব্যবহার করেন; আবার কেহ কেহ বেলাওল্ ঠাটে——সমস্ত শুদ্ধস্বরে গাহিয়া থাকেন। আবার কাফি ঠাটেও ইহা গাওয়া হয় এবং তখন এই রাগ অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়। এই রাগ গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। ‘দেশীর’ সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। ‘দেশী’তে কেহ কেহ দুই ধৈবত লাগাইয়া থাকেন, কিন্তু ‘পঠমঞ্জরী’তে তীব্র ধৈবতই লাগে। দুই নিখাদও লাগান চলে। আরোহীতে ধৈবত ও গান্ধার (কোমল) কম লাগে, সেইজন্য এই রাগ শুনিতে খানিক ‘সারঙের’ মত লাগে। ‘সারঙের’ পর এই রাগ গাওয়া উচিত।

আরোহী—স র ম প, ন র্স।

অবরোহী—র্স ণ ধ্ প, র ম, র জ্ঞ, স র, ন্ স।

গানখানি ঢিমা তেতালায়—বিলম্বিত লয়ে গাহিতে হইবে। উপরে লিখিত স্বরলিপির চার মাত্রাকে দ্রুত লয়ের আট মাত্রা হিসাবে ভাগ করিলে এইরূপ হয়, যথা :—

+ ৩
আ ০ মি ০ | প ০ থ ০ | ম ০ ০ ন্ | জ ০ রী ০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

ইত্যাদি। এইবার প্রতি দুই দুই মাত্রায় (অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রার উপর) এক মাত্রার ঝোঁক রাখিয়া গাহিয়া গেলেই বিলম্বিত লয় আসিয়া যাইবে। এখন প্রদত্ত স্বরলিপি ধরিয়া এইরূপ লয়ে গাহিয়া গেলেই ঢিমা তেতালায় গাওয়া হইবে।

—ইতি স্বরলিপিকার



ভারতের কৃষিসম্পদ—এরণ্ড বা রেড়ী

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

রেড়ী ভারতে চাষ হইলেও একটী উপেক্ষিত বস্তু। নিয়মিত চাষ ও তাহার প্রকৃত ব্যবহার আমাদের এখনও আয়ত্ত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল দ্রব্যের কিছু-মাত্রও রপ্তানী আছে, তাহারই দিকে নজর দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে তাহার কোনও বিশেষ কাজ আছে ; তাহা বিদেশীরা বুঝিয়াছে এবং আমাদের দেশ হইতে কাঁচা অবস্থায় লইয়া যাইতে সুরু করিয়াছে।

এরণ্ড বা রেড়ী গাছ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচুর জন্মায় এবং পর্ব্বত গাত্রে ছয় হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রদেশে জন্মিতে দেখা যায়। আফ্রিকা দেশে ইহার আদিম নিবাস মনে করিলেও ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং নানা স্থানে বহুদিন আবাদও হইতেছে।

প্রধানতঃ এরণ্ড গাছ দুই জাতীয়। মধ্যমাকার বৃক্ষ জন্মিয়া কয়েক বৎসর জীবিত থাকে, আবার ক্ষুদ্রাকারের গাছ জন্মিয়া বৎসরান্তে চাষের পর মরিয়া যাইতে দেখা যায়। অত্যধিক বর্ষায় ইহা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু চারা বাহির হইবার জন্য প্রচুর বর্ষা একবার বিশেষ প্রয়োজন। চাষ করিলে ইহারা জমির উর্ব্বরাশক্তি বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া ইহার চাষের অন্য বিপদ এই যে ইহার পাতা নানারূপ কীটের, বিশেষতঃ গুটীপোকার, প্রিয় খাদ্য এবং তাহারা এত দ্রুত ইহার সমস্ত পাতা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে যে, শীঘ্রই চাষের ঘোরতর হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রেড়ীর চাষেরও দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে। রেশমের গুটী পালন করিবার জন্য রেড়ীপাতা বিশেষ উপযোগী ; অপরটী রেড়ীর তৈলের জন্য প্রয়োজন। জগতে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়াছে অন্যান্য সকল প্রকার তৈল অপেক্ষা একটী বিশেষ ব্যবহারের জন্য ইহার তুলনা নাই।

ভারতে বাণিজ্য

ভারতে খুব পুরাতন চাষ হইলেও ঔষধার্থে যে তৈল ব্যবহৃত হইত তাহা পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমদানী করা হইত। ইংরেজি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ঔষধের জন্য রেড়ীর তৈলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে জ্যামেইকা হইতে বিশ হাজার পাউণ্ডের উপর তৈল আমদানী করা হইয়াছে ; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা কমিয়া সাড়ে তিন হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যেই স্থির হয়, যে, ভারতে প্রাপ্ত তৈল ঔষধার্থেও বিশেষ উপযোগী এবং তখন হইতেই এক প্রকার আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ৯ হাজার টাকা মূল্যের তৈল ভারত হইতে রপ্তানী হয়। ছয় বৎসরের মধ্যেই তাহা বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ টাকার উপর চলিয়া যায়। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহা কিঞ্চিন্ন্যূন এক কোটী টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে এক কোটী টাকার বীজ, খৈল ও তৈল বিদেশে গিয়াছে।

রপ্তানীর পরিমাণ :—

	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
বীজ—টন—	৫৯,৯৬৮	৪৩,০৮৯	৪২,০৭৯
খৈল—টন—	১,৭০৪	১,৬৯৮	২,৫২৭
তৈল—গ্যালন—	১৪,০৮,০২৩	১৫,১৪,৭২৮	১৫,৮৩,৫১৬

রপ্তানীর মূল্য :—হাজার টাকা

বীজ—	৮৩,১৫	৬২,৯৮	৬৪,০৯
খৈল—	৭২	৮৩	১,০২
তৈল—	২১,৪৭	২২,৯০	২৪,৬৬
মোট—	১,০৫,৩৪	৮৫,৯১	৮৯,৭৭

ভারতের চাষ

ভারতের বহুস্থানেই রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তুলনায় বাঙ্গালা দেশে এই চাষের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বাঙ্গালার মধ্যে রাজসাহীতে একশত একর ও মেদিনীপুরে তিনশত একর জমিতে চাষ হয় মাত্র। ভারতের মোট চাষের জমির পরিমাণ চৌদ্দ লক্ষ একরের উপর। সুতরাং সে হিসাবে বাঙ্গালা দেশে কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফসলের হিসাবে কমবেশ সওয়া এক লক্ষ টন ফসল পাওয়া যায়।

বৃটিশ ভারতে চার লক্ষ সাত হাজার একর জমিতে চাষ হয়, তাহা মোট অংশের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ (২৯%) আর করদ রাজ্যসমূহে দশ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা ৭০। ফসলের বেলায় অবস্থা কিন্তু ঠিক সেরূপ নয়। ইহাতে বৃটিশ ভারতে শতকরা ৩৭·৫ ভাগ পড়ে। ৪৮ হাজার টন বৃটিশ ভারতে, আর করদরাজ্যসমূহে কমবেশ ৮০ হাজার টন ফসল পাওয়া যায়।

বৃটিশ ভারতের মধ্যে মদ্রের চাষই উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রায় ২ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া পঁচিশ হাজার টন ফসল পাওয়া যায়। মোট ভারতের জমির অনুপাতে ইহা ১৮·৯%, আর ফসলের হিসাবে ১৯·৫%। তৎপরে বোম্বায়ের স্থান। আন্দাজ ৪৬ হাজার টন জমিতে কমবেশ ছয় হাজার টন ফসল হয়। এখানে দেখা যায়, জমির অনুপাতে ফসল অনেক বেশী। সারা ভারতের হিসাবে জমি পড়ে ৩·২%, কিন্তু ফসল ৪·৭%। বিহারে ও উড়িষ্যায় জমি ঐরূপ হইলেও ফসল অনেক কম। যুক্তপ্রদেশে জমি আন্দাজ সাড়ে ছয় হাজার একর অর্থাৎ ভারতের হিসাবে ·৭%—ফসল তিন হাজার টন বা ২·৩%। মধ্যপ্রদেশ এবং বিরারেও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী চাষ হয়, সেখানে জমির পরিমাণ ৩০ হাজার একর এবং ফসল ৬ হাজার টন। বিহার ও উড়িষ্যায় যথাক্রমে ৫ হাজার টন ও ৩ হাজার টন ফসল প্রতি বৎসর পাওয়া যায়।

করদরাজ্যসমূহে রেড়ী চাষ খুব বেশী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভারতের প্রায় ৭০%। ভারতের মধ্যে হায়দ্রাবাদের স্থান প্রথম। সমস্ত জমির ৫৫·৫% ফসলের ৫১·৬% এক হায়দ্রাবাদের ভাগে পড়ে। করদরাজ্যসমূহের অনুপাত এইরূপ

	একর হাজার	ভারতের শতকরা	টন হাজার	ভারতের শতকরা
	—	অংশ	—	অংশ
হায়দ্রাবাদ	৭,৮৮১	৫৫,৫	৬৬	৫১·৬
মহীশূর	১,০৩	৭,৩	৬	৪ ৮
বরোদা	৬৮	৪ ৭	৭	১·৫
বোম্বাই করদরাজ্য	৪৬	৩·৬	১০	৪ ৮

বৃটিশ ভারতের হিসাবেও দেখা গিয়াছে যে, জমির অনুপাতে বোম্বাইয়ের ফসল খুব বেশী; করদরাজ্যসমূহের হিসাবেও বোম্বাইয়ের উৎপাদিকা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রেড়ীর বিষয়ে ভারতের বিশেষ সুবিধা এই যে—এত বড় প্রয়োজনীয় ফল পৃথিবীতে খুব বেশী দেশে জন্মায় না। জগতের প্রয়োজনের অধিকাংশ ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়া থাকে। উগাণ্ডা, কেনিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোনও কোনও অংশে রেড়ী পাওয়া যায়; আর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হইয়া থাকে।

বীজ ও তৈল

সাধারণতঃ বীজ হইতে সকল প্রকার তৈল নিষ্কাসনের জন্য দুইটী পন্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম—শীতল অবস্থায় যন্ত্রাদির দ্বারা চাপ দিয়া। দ্বিতীয়—ঐ বীজকে উত্তপ্ত করিয়া পরে চাপ দ্বারা। এরণ্ড বীজ শীতল অবস্থাতেই শতকরা ৩৬ ভাগ তৈল প্রদান করে। প্রায় সিকি ভাগ বীজের খোসা বাদ গেলে বাকী অংশ তৈল পাওয়া যায়।

রেড়ীর তৈল বাহির করিবার জন্য বীজ উত্তপ্ত করা পন্থাটী আবার নানা ভাগে ভাগ করা হয়। কখনও বা সামান্য উত্তাপ দ্বারা, কখনও বা খোলা হইতে শাঁস বাহির করিয়া সিদ্ধ করিয়া, কখনও বীজকে সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। বীজ ভাঙ্গিয়া সিদ্ধ করিবার সময় তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই প্রক্রিয়া দুইবারও পালন করা হয়।

বীজ গরম করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া গেলে তৈলের গুণ হ্রাস পায়। কখনও কখনও বীজের শীতল অবস্থায় প্রাপ্ত তৈল জলের সহিত ফুটাইয়া লওয়া হয়। ইহা দ্বারা তৈলের আঠাল বা

চট্‌চটে অবস্থা এবং য়্যালবুমেন দূরীভূত করা হয়। সাধারণতঃ বীজগুলি ভাঙ্গিয়া বস্তায় ভরিয়া চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়। আজকাল উন্নত প্রণালীর কলে বীজ পেষণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বীজের খোসা বর্ত্তমান থাকিলেও তৈলের পরিমাণ বা রঙের কোন তারতম্য হয় না। তৈল শোষণ করে না বলিয়া আবরণ-সমেত বীজ পেষণ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে; ইহাতে বীজের শতকরা ৪৫ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়।

ব্যবহার

জ্বালানী হিসাবে রেড়ীর তৈল বহুকাল প্রচলিত আছে। কেরোসিন, সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈল অপেক্ষা কম পরিমাণ তৈল জ্বলে বলিয়া জ্বালানী হিসাবে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই রেড়ীর তৈলের প্রচলন। ইহাতে অপরাপর তৈল অপেক্ষা—একই জাতীয় আলোতে—কম ধোঁয়া উৎপন্ন করে, দামে সস্তা এবং বিপদের আশঙ্কা কম বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত রেল-কোম্পানী দ্বারা তাহাদের আলোতে বহুল ব্যবহৃত হয়। ইহার আলো স্নিগ্ধ বা "ঠাণ্ডা" অর্থাৎ চক্ষের পীড়া উৎপাদক নয় বলিয়া অনেকে এই আলো বিশেষ পছন্দ করে।

যন্ত্রাদি তৈল নিষিক্ত রাখিতে রেড়ীর তৈলের বহুল প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহারের সহিত ইহার আদর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। Lubricating oil-এর যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ বিশিষ্ট তাহা রেড়ীর তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। যে সকল স্থলে অত্যধিক শৈত্যের জন্য অন্য তৈল জমিয়া যায় এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সে সকল স্থলে "ক্যাষ্টর অয়েল" বহু সমাদর লাভ করিয়াছে। এ কারণে এরোপ্লেন বা বিমানপোতে কেবলমাত্র ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেলগাড়ীর চাকায় দিবার জন্য নাইট্রিক এসিডের সহিত ইহা মিলাইয়া লওয়া হয়।

চামড়া নরম রাখিবার জন্য এবং উহা বহুকাল স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়।

কাপড়ে রঙ ধরাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার তৈলজাত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক নাম "Turkey red oil". তুলাজাত বস্ত্রে রঙ করিতে ও প্রস্তুত বস্ত্রের চাকচিক্য বৃদ্ধি করিতে অন্যান্য তৈল অপেক্ষা রেড়ীর তৈল বিশেষ উপযোগী।

সাবানের ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল প্রকার সাবান প্রস্তুত করিতেই ইহা লাগে, বিশেষতঃ স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে রেড়ীর তৈল অপরিহার্য্য বলা চলে। ঔষধালয়ের Green sapo verdigris করিতেও ইহার প্রয়োজন।

মৃদু জোলাপ বলিয়া এই তৈলের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং এই কারণে ইহা বহুদিন ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া লোমকূপ পরিষ্কার রাখিতে, কেশ নরম, উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখিতে এবং কেশের গোড়া দৃঢ় করিবার শক্তি আছে বলিয়া রেড়ীর তৈলের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। নানারূপ সুগন্ধি তৈল, পোমেড প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্যও লাগিতেছে।

যাহারা অনেকক্ষণ জলে থাকিতে বাধ্য তাহারা ভেসেলিন (Vaseline) মাখে; কিন্তু উহা সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পল্লীর দিকে পাওয়া যায় না। অভাবে লোক রেড়ীর তৈল মাখিয়া লয়। বর্ষার দিনে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে লোকে বাহিরে যাইবার সময় পায়ে বেশ করিয়া রেড়ীর তৈল মাখে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রেড়ীর তৈল দেহের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক। সে কারণে স্বর্ণকারের প্রদীপে রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকারেরা ফুকা দিয়া বর্ণহীন শিখা দ্বারা সোনা রূপার পান ও জোড়াই করিবার জন্য কাঠ কয়লার উপর যে তাপ সৃষ্টি করে, তাহাতে রেড়ীর তৈলের প্রদীপ ব্যবহৃত হয়। শ্বাস দ্বারা তাহারা এই কার্য্য করে এবং রেড়ীর তৈলের বাষ্প বা ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক নহে বলিয়া এতদ্দেশে এই তৈলই প্রশস্ত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আলো ও তাপ পাইবার বিশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণকারের কারখানায় এখনও রেড়ীর প্রদীপ সমানই সমাদর লাভ করিতেছে।

* * * * *

চাষ

শীতের ফসল হিসাবে যে চাষ হয় তাহা ভাদ্র আশ্বিনে রোপণ করা হয় এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ঐ বীজ পরিপুষ্টি লাভ করে। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রাকার দুই জাতীয় বৃক্ষই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে রোপিত হয় এবং পৌষ মাঘে ঐ সকল গাছের বীজ সংগ্রহ করা হয়। মোট কথা চেষ্টা করিলে সকল সময়েই কম বেশী পরিমাণে বীজ পাওয়া কঠিন নয়।

রেড়ীর খৈলের প্রচুর ব্যবহার আছে। দাহ্য বলিয়া অনেকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিশেষ ক্ষমতা থাকায় সার হিসাবে ইহার সমাদর আছে। ধান ও আলু চাষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। ইক্ষু চাষে কেবল অস্থি চূর্ণের সার অপেক্ষা অস্থিচূর্ণ ও রেড়ীর খৈল অনেকাংশে উপযোগী। জ্বালানী বাষ্প (গ্যাস) অন্তরিত করিবার জন্য খৈলের ব্যবহার আছে। এই বাষ্প কয়লার বাষ্প (coal gas)-এর ন্যায় সুন্দররূপে জ্বলে। কোনও কোনও স্থানে চর্ম্মকারেরা জুতার "সুখ-তলায়" (sole) রেড়ীর খৈল দিয়া ভরিয়া লোককে প্রতারণা করিয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

অষ্টম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ীর বৈঠকখানা। বৈঠকখানা-গৃহের প্রকাণ্ড মেজেতে বিস্তৃত ফরাস বিছানো। বাঈনাচ হইতেছে। দত্ত মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরাপানের সমস্ত সরঞ্জাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। আতর-দান, গোলাপ-পাস, পানের বাটা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিসই বর্ত্তমান। একজন মুসলমান বাঈজি গান গাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে একজন সারেঙ্গি ও দুইজন তবলচি বাজাইতেছে। বাঈজি নৃত্যসহযোগে একটি উর্দ্দু গান গাহিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। 'কেয়াবাৎ', 'বাহবা' প্রভৃতি উৎসাহবাণী দ্বারা সকলেই গায়িকাকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নাচ গান হইবার পর গায়িকা উপবেশন করিল। দুই-একজন তাহাকে রুমালে টাকা বাঁধিয়া 'প্যালা' দিলেন

১ম ভদ্রলোক। (এক পাত্র পান করিয়া) যাই বল দাদা, এর কাছে থিয়েটার ফিয়েটার কিছু লাগে না—যদিও আজকাল থিয়েটার একটা ফ্যাসান বটে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ—কিসে আর কিসে!

রাজনারায়ণ। আমার ত এই বেশী ভাল লাগে!

১ম ভদ্রলোক। এতে একটা সত্যিকারের খাঁটি প্রাণ রয়েছে—নকল কিছু নেই। আর থিয়েটারের হ'ল সবটাই নকল। থিয়েটারের চেয়ে কবির লড়াই ঢের ভাল। দাশু রায় মাৎ ক'রে দেয়!

তৃতীয় ভদ্রলোক। তা ছাড়া আমাদের ভাল নাটক কোথা! সুঁড়োর বাগানে সেবার প্রসন্ন ঠাকুর থিয়েটার করালেন—নাটক উত্তররামচরিত—অনুবাদ করেছেন শুনলাম কে এক উইলসন সায়েব!

২য় ভদ্রলোক। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলে সায়েবে—তার অভিনয় হল সুঁড়োতে—হা—হা—হা—

রাজনারায়ণ। কিন্তু সায়েবদের নিজেদের যে থিয়েটারটা আছে সেটা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। হতে পারে ভাল, কিন্তু ওসব ইংরিজি মিংরিজি শুনে তেমন জুৎ হয় না ভায়া। অর্থাৎ ঠিক কি রকম জান? অপরকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার মত, অর্থাৎ সে যদি ঠিক জায়গাটাতে চুলকোতে না পারে সে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, এ অনেকটা তাই—সেজেগুজে সব আসছে যাচ্ছে হাত-পা নাড়ছে—বোঝা যাচ্ছে না অথচ কিছুই! ও আমাদের পোষায় না।

তৃতীয় ভদ্রলোক। যাক—আর বাজে কথায় কাজ কি! বিবিজান, তুমি আর একটা সুরু কর। কি বলেন দত্তমশায়?

রাজনারায়ণ। বেশ ত—হোক না আর একখানা—

দত্ত মহাশয় আর এক পাত্র পান করিলেন। সারেঙ্গীবাদক ও তবলচি সুর মিলাইতে লাগিল। বাঈজি অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান ধরিয়াছে, ঠিক এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে সবেগে রঘু নামক ভৃত্যটি আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। বাবু, শিগ্‌গির ভেতরে চলুন—মা মূর্চ্ছা গেছেন!

রাজনারায়ণ। কে, বড় বউ?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। কি হ'ল আবার! যা—আমি আসছি! (অতিথিগণের প্রতি) আপনারা তাহ'লে বসুন একটু—আমি আসছি এখনি।

আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে শশব্যস্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়

এ কি, তুমি কখন এলে!

আত্মীয়। খানিকক্ষণ হ'ল এসেছি—আপনি একবার চলুন ভেতরে। মধুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন!

রাজনারায়ণ। এ ত একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

রাজনারায়ণ ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

১ম ভদ্রলোক। এঃ—এ ত ভারি রসভঙ্গ হ'ল হে!

২য় ভদ্রলোক। অসুখের ওপর ত আর হাত নেই।

তৃতীয় ভদ্রলোক। রাজনারায়ণবাবু কেমন মন-মরা হয়ে আছেন দেখেছ? অমন একটা মাইফেলি লোক, কেমন যেন হয়ে গেছেন!

২য় ভদ্রলোক। মদের মাত্রাটাও বাড়িয়েছেন—.

১ম ভদ্রলোক। বাড়াবে না—বল কি! একমাত্র ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল! ছেলে ব'লে ছেলে—ছেলের মত ছেলে! ছেলে হবার আশায় আরও দু-দুবার বিয়ে করলেন, কিন্তু সেদিকেও ত বিশেষ আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মদের মাত্রা বাড়বে বই কি!

তৃতীয় ভদ্রলোক। শুনেছি নাকি ওঁর প্রথম স্ত্রী অভিশাপ দিয়েছেন যে, যতই না কেন উনি বিয়ে করুন, ছেলে আর হবে না ওঁর!

২য় ভদ্রলোক। ওসব বাজে কথা! (মদ্যপান) তুমি থামলে কেন বিবিজান—চলুক না ততক্ষণ—বাবুজি আসছেন এখুনি।

বাঈজি আবার গান সুরু করিতে যাইতেছে এমন সময় রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। বাবু এখন গান বাজনা বন্ধ রাখতে বললেন—অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

১ম ভদ্রলোক। তাই না কি!

২য় ভদ্রলোক। তাহলে ত উঠতে হয়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। এঃ—এমন আসরটা মাটি হ'ল!

১ম ভদ্রলোক। (বাঈজির প্রতি) আর একদিন হবে, আজ চললাম তাহলে। আদাব!

বাঈজি। আদাব—

প্রথমে ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে সকলেই বাঈজির নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে বাঈজিও সদলবলে প্রস্থান করিলেন। রঘু জিনিসপত্র সরাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একটু পরেই রাজনারায়ণবাবু ও সেই আত্মীয়টি আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মূর্চ্ছা ত ভেঙে গেল—এদের না যেতে বললেই হ'ত! হ্যাঁ, মধুর কথা কি বলছিলে তুমি? ওরে তামাক দে—

রঘু আলবোলাটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতেই আত্মীয়টিও অদূরে উপবেশন করিলেন

আত্মীয়। মধুর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনি—তাতে লজ্জায় মাথাকাটা যায়! ওকে আপনার একটু সাবধান করা দরকার।

রাজনারায়ণ। কি শোন তার সম্বন্ধে?

আত্মীয়। সে সব এমন কথা যে উচ্চারণ করাই শক্ত!

রাজনারায়ণ। যে কথা উচ্চারণই করতে পারবে না সে কথা বলতে এসেছ কেন?

আত্মীয়। মানে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর কি!

রাজনারায়ণ। সে ত আর নতুন কথা নয়—ও ত চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল—এটা উচ্ছৃঙ্খলতারই যুগ।

আত্মীয়। তবু সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা দরকার ত—

রাজনারায়ণ। উচ্ছৃঙ্খলতা জিনিসটা আপনিই কিছুদিন পরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে! ও নিয়ে বেশী হৈ চৈ করাটা বোকামি!

আত্মীয়। তবু—

রাজনারায়ণ। (একটু বিরক্তভাবে) এ নিয়ে তোমার এত শিরঃপীড়া কেন?

আত্মীয়। আমাদের ত শুনতে হয়—লোকের মুখ ত বন্ধ করা যায় না।

রাজনারায়ণ। নিজের কান বন্ধ করলেই পার—কানে তুলো দিয়ে থাকলেই হয়! আমাকে এসে বলছ কেন? আমি কি করতে পারি!

আত্মীয়। বাঃ—আপনি না পারলে আর পারবে কে?

রাজনারায়ণ। না, আমি পারব না। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর তোমরা যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তাহ'লে ত পাগল হয়ে যাব আমি।

আত্মীয়। কি মুস্কিল! আপনাকে বিরক্ত করাই কি আমার উদ্দেশ্য না কি! মধুর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত জিনিস শুনছি, সেটা আপনাকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করি। মধু যে এসব ক'রে বেড়াচ্ছে—সে ত আপনার অর্থেই!

রাজনারায়ণ। (স-ক্রোধে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অর্থেই!

আমার টাকা আছে—আমি আমার ছেলেকে তা যত খুশী দেব এবং সে যেমন খুশী তা খরচ করবে! তোমার তাতে কি?

আত্মীয়। (সঙ্কোচে) আমার কিছুই নয়—আপনাদেরই ভালর জন্যে বলা!

রাজনারায়ণ। না, আমার ভাল করতে হবে না তোমাকে—এ রকম হিতৈষণা বরদাস্ত হবে না আমার। ও নিয়ে আর কোন কথা ব'লো না আমাকে!

আত্মীয়। (এইবার একটু চটিয়াছিলেন) সমাজে থাকতে গেলে—এসব শুনতে হবে বই কি। তাছাড়া, আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার। মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু না কি সে বাড়ীতে যাতায়াত করে—আপনাদের সঙ্গে একই বাসনপত্রে খাওয়া দাওয়া সবই চলে—এ নিয়ে অনেকে—

এইবার রাজনারায়ণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

রাজনারায়ণ। তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয় হে! বাড়ীচড়াও হয়ে উপদেশ দিতে এসেছ! আমার ছেলে আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করবে না ত কার বাড়ীতে করবে? এ নিয়ে কে কি বলছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবসর আমার নেই! তাছাড়া দুশ্চিন্তাই বা কিসের? এই লক্ষীছাড়া সমাজের মেরুদণ্ড ব'লে কিছু আছে নাকি! যার টাকা তারই সমাজ। টাকা সম্প্রতি আমার যথেষ্ট আছে, সুতরাং কোন ব্যাটারই তোয়াক্কা করি না আমি। যাও— তুমি আমায় বিরক্ত ক'রো না!

আত্মীয়। না, বিরক্ত করব কেন? পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আপনার ভাল যদি না লাগে আমি আর কি করব বলুন। সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়—

রাজনারায়ণ। এ ছাড়া তোমার আর যদি কোন বক্তব্য না থাকে—তুমি যেতে পার।

আত্মীয়। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হাঁা, যাব বই কি—আপনার বাড়ীতে থাকতে আমি আসি নি—থাকবার প্রবৃত্তিও নেই।

স-ক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ চিন্তিতমুখে আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন। একটু পরেই মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাহেবী পোষাক। ফ্রক কোট্—বিভার হ্যাট্...মুখে চুরুট

মধু। Good evening, father. How do you do?

রাজনারায়ণ দুই-তিনবার তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন—তাহার পর বলিলেন

রাজনারায়ণ। মধু, শুন্‌ছি তুমি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছ?

মধু। (সবিস্ময়ে) বাড়াবাড়ি! What do you mean?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) I mean বাড়াবাড়ি—বাঙ্গলা ভুলে গেছ না কি!

মধু। Excuse me—বুঝতে পারছি না ঠিক।

রাজনারায়ণ। তা পারবে কেন! অথচ তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল!

মধু। উচ্ছৃঙ্খলতা! Well, I have done nothing unusual recently—আমি মদ খাই—সে আপনি জানেন। পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়েও হয় ত আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penny too much perhaps on dress! এর বেশী ত আর কিছু করি না!

রাজনারায়ণ। তবে তোমার নামে আত্মীয়স্বজনেরা নানা কথা বলে কেন?

মধু। Because they are heathen rascals

এই কথায় রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Heathen rascals!—খৃষ্টান হয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ত দেখছি! Don't you know, you swine, that all your Christian glare has been bought by money earned by your heathen father?

মধু। (অপ্রতিভ হইয়া) I am sorry father—I withdraw it,

রাজনারায়ণ। Withdraw it! এসো না আর এ বাড়ীতে। তোমার টাকা—the only tie between you and me now—I shall send- আস কেন এখানে?

মধু। আসি মাকে দেখতে।

রাজনারায়ণ। যখন খৃষ্টানই হয়ে যেতে পেরেছ, তখন মায়ের প্রতি অত টান কেন? She is heathen too!

। আমি ছাড়া এখন যে আর মায়ের কেউ নেই—

রাজনারায়ণ তার মানে?

মধু। তার মানে ত আপনার জানা উচিত। শুনলাম আপনি আবার নাকি বিয়ে করবার আয়োজন করছেন!

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়! বিয়ে আমি ক্রমাগত করে যাব, যতক্ষণ না আমার আবার ছেলে হয়!

মধু। কেন, আমি কি আপনার ছেলে নই!

রাজনারায়ণ। ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন তুমি আমার কেউ নও। A Christian son is no good to a Hindu father—a heathen father!

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন!

মধু। কি হয়েছে মায়ের?

রাজনারায়ণ। তুই যা—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

মধু। কি হয়েছে মায়ের?

ভিতরের দিকে যাইতে উদ্যত

রাজনারায়ণ। You need not be anxious for a heathen woman.

তাহার পথ-রোধ করিলেন

মধু। আমাকে যেতে দেবেন না ভেতরে?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। যেতে দিন আমাকে—

রাজনারায়ণ। (চীৎকার করিয়া) না—না—না—যেতে দেব না! Out you go—there's the door.

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। মধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নবম দৃশ্য

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ড্রয়িং-রুম! সন্ধ্যাকাল। ঘরের এক কোণে দেবকী অর্গানে একটি ইংরেজী গৎ বাজাইতেছেন। মধুসূদন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা শুনিতেছেন। মধু কিন্তু কেমন যেন অস্থির হইয়া রহিয়াছেন—মাঝে মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত-মস্তকে খানিকক্ষণ পায়চারি করিতেছেন। আবার বসিতেছেন—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বাজনা শুনিতেছেন—আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি। মধুর পরিধানে সায়েবি পোষাক—রীতিমত স্যুট। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঢিলা পায়জামা পরিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাজাইবার পর দেবকী থামিলেন ও অর্গান হইতে উঠিয়া আসিলেন। দেবকীও বেশ সুসজ্জিতা।

মধু। Splendid!

দেবকী। এটা এখনও perfect হয় নি—নতুন শিখেছি এটা। আপনারা বসুন—আমি দিদিকে ডেকে আনি!

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) You are rather impatient to-day, Modhu! ব্যাপারটা কি?

মধু। There is a limit to my patience, I am tired of waiting.

জ্ঞানেন্দ্র। সত্যিই কি এই বালিকাটিকে এত ভালবেসেছ যে, আর তর সইছে না!

মধু। ভালবাসার কথা ছেড়ে দিন—leave that alone. As a matter of principle, I should marry her. But I am very much afraid I shall be disappointed here too. (সহসা) You know, the gentleman who gave me hopes about England has backed out now. I have been cheated outright! এখানেও আমার সেই দশা হবে—I am afraid. শুনছি নাকি দেবকীর মা এখন বলছেন যে আমি কায়স্থ—আমার হাতে মেয়ে দেবেন কি ক'রে! What nonsense is this?

জ্ঞানেন্দ্র। ও কিছু নয়—রেভারেণ্ড ব্যানার্জি যদি মত করেন সব ঠিক হয়ে যাবে! You just tell him.

মধু। তাঁকে বলেছি অনেকবার। কিন্তু তিনি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলেন না! তাঁকে বললেই বলেন—I shall think about it to-morrow.

To-morrow and to-morrow and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death···

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেবকী আসিতেই মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। বন্ধ করলে কেন, চলুক!

মধু। না, তার চেয়ে let us have another tune

জ্ঞানেন্দ্র। বেশ! If it so pleases you—দেবকী, সুরু কর। দিদি কোথা?

দেবকী। দিদি কাট্‌লেট্‌ ভাজছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। অর্থাৎ তিনি আর একপ্রকার রস-সৃষ্টি করছেন—fine! মা ফেরেন নি এখনও?

দেবকী। না।

মধু উঠিয়া আবার পদচারণা করিতে লাগিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। রেভারেণ্ড ব্যানার্জিও লাইব্রেরিতে, সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়! Let us have organ first—then Modhu's recitation—and Cutlets last of all. মধু তোমাকে কিন্তু recitation করতে হবে। হিন্দু কলেজে তোমার recitation-এর নাম ছিল খুব। নাও দেবকী, সুরু কর।

দেবকী একটু মুচকি হাসিয়া অর্গানে গিয়া বসিলেন ও আর একটি গৎ সুরু করিলেন

আরে, শুধু নিরামিষ বাজনা কি ভাল লাগে—গানও হোক না একখানা।

দেবকী ঘাড় ফিরাইয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন ও তৎপরে একটি ইংরেজী গান ধরিলেন। মধু পদ-চারণা করিতে লাগিলেন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মনোনিবেশ করিলেন। গান শেষ হইলে মধু কথা কহিলেন

মধু। Fine!

জ্ঞানেন্দ্র। এইবার তুমি একটা কিছু শোনাও ভাই—

মধু। কি শোনাব?

জ্ঞানেন্দ্র। যা তোমার খুশী! তোমরা পরস্পরকে যা শোনাবার শুনিয়ে যাও—আমি ত উপলক্ষ মাত্র!

হাসিলেন

মধু। আমার যা খুশী! আচ্ছা, শুনুন তবে—

Quisquis es, haud, credo invisus caelestibus auras

জ্ঞানেন্দ্র। আরে থাম, থাম—এ কি

মধু। This is Latin—AENEID of Virgil.

জ্ঞানেন্দ্র। সর্ব্বনাশ! দরকার নেই ওতে—বাঙলায় কিছু বলো—

মধু। বাঙলায়? Is there anything worth reciting in Bengali? Do you want me to recite from পাঁচালি?

হাস্য

দেবকী। (জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে) মিল্টন থেকে কিছু বলতে বলুন না ওঁকে—

জ্ঞানেন্দ্র। আপনিই বলুন না মশায়

মধু। Milton?

জ্ঞানেন্দ্র। এমন একটা কিছু বল ভাই, যা বুঝতে পারি!

মধু পিছনে দুই হস্ত নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ পদ-চারণা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—

মধু। শোন তাহলে—This is from Paradise Lost. Exile from Eden—

High in front advanced
The brandished sword of God before them blazed
Fierce as a comet; which with torrid heat,
And vapour as the Libyan air adust,
Began to parch that temperate clime: whereat
In either hand the hast'ning angel caught
Our lingering parents, and to the eastern gate
Led them direct, and down the Cliff as fast
To the subjected plain: then disappeared.
They looking back all th' eastern side beheld
Of Paradise, so late their happy seat,
Waved over by that flaming brand the gate
With dreadful faces thronged and fiery arms:
Some natural tears they dropped, but wiped them soon
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide.
They, hand in hand, with wand'ring steps and slow
Through Eden took their solitary way.

বাহিরে পদশব্দ হওয়াতে মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিধানে পাদরির পরিচ্ছদ—বগলে দুইখানি বই ও একটি ফাইল। তিনি মধুকে দেখিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন ও তাহার পর পাদরির শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিয়া মস্তকের টাকে একবার হাত বুলাইলেন। তৎপরে দেবকীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন

কৃষ্ণমোহন। এগুলো নাও ত মা। ফাইলটা ভাল

ক'রে ধ'রো—Loose কাগজপত্র আছে ওতে—বিবিধার্থ সংগ্রহের ফাইল ওটা।

দেবকী কাগজপত্র লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেবকী চলিয়া গেলে কৃষ্ণমোহন মধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন

মধু। I want to speak to you—privately.

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দিকে চাহিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আপনারা এইখানেই কথা-বার্ত্তা বলুন—আমি ভেতরে যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

মধু। (সবিস্ময়ে) কি বলবেন আমাকে ?

কৃষ্ণমোহন। তুমি কাল কলেজে কি করেছ ?

মধু। কলেজে ? কখন ?

কৃষ্ণমোহন। কলেজে ঠিক নয়—খাবার সময়—

মধু। Oh, I see.

কৃষ্ণমোহন। You should be ashamed.

মধু। Ashamed ? Why ? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়া নিয়ম—that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share ?

কৃষ্ণমোহন। He did not refuse—মদ আর ছিল না—that is a fact—ফুরিয়ে গিয়েছিল।

মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল ? সায়েবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায় ? I won't tolerate this injustice. I am simply fed up with the distinction they make between black skin and white skin.

কৃষ্ণমোহন। তাই বলে তুমি খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার ক'রে উঠে আসবে ?

মধু। I am repentant that I did not smash the head of that rascal.

কৃষ্ণমোহন। No, I cannot approve of this unmannerly attitude—আর একটা কথা শুনলাম, তুমি নাকি বই বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কর ?

মধু। Yes, I do—but I need a lot of money to live like a gentleman here. This Bishop's College is very much expensive.

কৃষ্ণমোহন। (মাথা নাড়িয়া) You will be in deep waters if you do not check yourself, boy.

মধু। (হঠাৎ) আমি একটা কথা আপনাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই—

কৃষ্ণমোহন। কি কথা ?

মধু। আমি যখন ক্রিশ্চান হইনি তখন যাঁরা আমায় আশা দিয়েছিলেন যে, ক্রিশ্চান হ'লে আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবেন এখন তাঁরা সবাই সরে দাঁড়িয়েছেন। আমার ক্রিশ্চান হওয়ার আর একটা কারণ ছিল—I wanted to marry your daughter দেবকী ; you knew it and gave me hopes. May I know when are we going to be married ?

কৃষ্ণমোহন। সমস্ত দেখে শুনে তোমার সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়েছি !

মধু। হতাশ হয়েছেন ? কেন ?

কৃষ্ণমোহন। To be very candid—তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে আমি দিতে পারব না। তাছাড়া খিদিরপুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল এখনি—তিনি বললেন তোমার বাবা নাকি তোমার খরচ দেওয়া বন্ধ করবেন ! Naturally I cannot marry my daughter with a thoughtless and penniless young man. You drink too much.

মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল

মধু। May I ask you one question, Sir ? Are you not a disciple of famous Derozio ? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us ? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and was turned out of your own home ? আপনি আমাকে বলছেন উচ্ছৃঙ্খল মাতাল !

কৃষ্ণমোহন। I don't like to discuss these things with a youngster like you. But know it, my boy, that all the disciples of Derozio are the leading men of Bengal to-day. They are the flowers of the country.

মধু। ও সব কথা যাক্! আমি জানতে চাই দেবকীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন কি না!

কৃষ্ণমোহন। দিতে পারি, যদি তুমি solemnly promise কর যে জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না।

মধু। I am too green a Christian yet to make such a false promise. Then, this is final?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়।

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দেবকী। বাবা, আপনি কাপড় বদলাবেন না?

কৃষ্ণমোহন। হ্যাঁ, চল যাই।

মধুসূদন নিমেষের জন্য দেবকীর দিকে একবার তাকাইলেন। কি যেন তাহাকে বলিতে গেলেন—তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া টেবিল হইতে বিভার হ্যাটটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন

মধু। চললাম তাহলে—Good Night.

চলিয়া গেলেন—পিতা-পুত্রী পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

দ্বিতীয় বিরতি

দশম দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস, ভূদেব ও ভোলানাথ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সকলেরই বয়স বাড়িয়াছে। গোঁফ গজাইয়াছে।

ভোলানাথ। সত্যি, মধু মাদ্রাজে চলে গেছে—এ কথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

ভূদেব। তিন-চার বছর হয়ে গেল, না?

গৌর। তা হ'ল বই কি—! তোমার হাতে কি কাগজ হে ওখানা?

ভোলানাথ। 'হরকরা'—আমাদের রামগোপাল ঘোষ এতদিন পরে অপমানের শোধটা তুলেছে। I am glad that British Indian Association is going to be established.

ভূদেব। টমসন সায়েবের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' আর দ্বারিক ঠাকুরের Bengal Landholders' Association—এই দুটো বুঝি amalgamated হ'য়ে গেল? কোন্ অপমানের কথাটা তুমি বলছ?

ভোলানাথ। বাঃ—মনে নেই? সায়েবরা রামগোপাল ঘোষকে Agri-horticultural Society-র সহকারী সভাপতির পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল!

ভূদেব। হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে।

গৌর। সায়েবরা ওর ওপর চটেছিল সেই Black act-এর ব্যাপারে! ভালই হ'ল, এসোসিয়েশনটা হয়ে। এতদিনে আমাদের নিজেদের একটা জোর হ'ল—আমাদের নিজেদের কথা গুছিয়ে বলবার উপায় ছিল না! Association is a necessity.

ভোলানাথ। Certainly—আর ভাল ভাল লোক রয়েছেন এতে—দেবেন ঠাকুর—রাধাকান্ত দেব—জয়কেষ্ট মুখুজ্যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। The best men of the country are going to be assembled to uphold the cause of the native people.

গৌরদাস। তোমার native people কথাটায় মনে পড়ল—our মধু fought for this very word in Madras.

ভূদেব। কি রকম?

গৌরদাস। মাদ্রাজে দেশীদের বলত native man আর সায়েবদের বলত European gentleman. মধু খবরের কাগজে লেখালেখি করে native man কথাটা তাড়িয়েছে সে দেশ থেকে!

ভোলানাথ। ও ত সেখানে মাস্টারি করে, না?

গৌর। হ্যাঁ, খৃষ্টানদের একটা male orphan asylum আছে, সেইখানে চাকরি করে। কয়েকটা কাগজেও লেখে—Madras Circulator, Hindu Chronicle, Spectator, Athenœum—এই সব কাগজে ওর লেখা থাকে। Timothy Penpoem ত ওরই ছদ্মনাম। Circulator কাগজে ওর Visions of the Past পড় নি?

ভূদেব। যেটা ওর Captive Lady-র শেষে আছে?

গৌর। হ্যাঁ।

ভূদেব। না, Circulator-এ পড়িনি। তবে বইটাতে পড়েছি।

ভোলানাথ। সে ত সেখানে বিয়ে করেছে শুনেছি।

গৌর। Oh, yes.—not a কালা মেমসাহেব—but a real Scotch girl.—Miss ম্যাক্টাভিস্ রেবেকা! He

procured his wife from the female section of the orphan school. (হাস্য)

ভোলানাথ। And this is quite befitting Madhu. Really I respect the revolutionary in him—always after adventures.

ভূদেব। কিছুদিন আগে সে মাদ্রাজ থেকে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল—প্রকাণ্ড চিঠি। তাতে আমাকে অনুরোধ করেছিল তার Captive Lady-র ওপর সংস্কৃত বই থেকে যজ্ঞ টজ্ঞ বিষয়ে note লিখে দিতে। He wanted to republish the book.—আমার আর সময় হয়ে উঠল না!

ভোলানাথ। I wonder if he is happy there

গৌর। কি জানি—আজকাল চিঠিপত্রও লেখে না আর। বহুদিন তার চিঠি পাই নি।

ভূদেব। সে বেঁচে আছে কি না—তাই ত অনেকে সন্দেহ করছে। শুনেছি তার আত্মীয় স্বজনেরা নাকি—

গৌর। His relatives are rogues! মধু যে বেঁচে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! You can feel his fist in Hindu Chronicle of which, I think, he is the Editor. I read the paper regularly.

ভোলানাথ। কতদিন তার খবর পাও নি?

গৌর। তা প্রায় বছর দুই হবে! অথচ—he sends the paper Hindu Chronicle to me regularly.

ভোলানাথ। সে আমাদের একদম ভুলে গেছে।

ভূদেব। I am sorry for his mother—জীবন্মৃত হয়ে আছেন শুনলাম।

ভোলানাথ। ওর বাপও কেমন যেন হয়ে গেছেন আজকাল।

গৌর। ভদ্রলোক আরও তিন-তিনবার বিয়ে করলেন কিন্তু একটিও ছেলে হ'ল না! What a pity!

ভূদেব। সত্যি মধু যদি ক্রিশ্চান না হ'ত! আমরা একটা জিনিয়াস্ হারালাম। তা না হ'লে বাঙালীর ছেলে হয়ে ইংরিজিতে Captive Lady-র মত একখানা বই লিখতে পারে? বাঙলা ভাষায় যদি ও লিখত! মাদ্রাজে অত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েও Captive Lady-র মত একখানা বই লিখেছে—Just think of it.

ভোলানাথ। It rose as an Aurora Borealis from amidst the stern cold of want and poverty! আরে বাবা, আমাদের কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও-সি-দত্ত—আরও সব কে কে যেন ইংরেজিতে কবিতা লিখেছে—but Madhu distances them all. ও বাঙলা লিখলে বাঙলা ভাষার চেহারা বদলে যাবে। বিশেষত কবিতার। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তবু গদ্যটার অনেকটা পঙ্কোদ্ধার করেছে! উঃ, কি গদ্যই ছিল আমাদের! পাষণ্ডপীড়ন, প্রতাপাদিত্য-চরিত, বেদান্ত-চন্দ্রিকা—কি সঙীন ভাষা হে!

গৌরদাস। মধু বাঙলা লিখলে অদ্ভুত কাণ্ড হয়। তুমি যা বলেছ বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'বোধোদয়' বাঙলা গদ্যের ভোলটা ফিরিয়েছে। কিন্তু বাঙলা কবিতা এখনও সেই—দাশু রায়ের পাঁচালি, আর ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস!—We are sick of it. Sakespeare, Milton পড়বার পর এসব অত্যন্ত tame মনে হয়। মধু বাঙলা লিখলে নতুন কিছু পেতাম আমরা! His imagination has a Miltonic grandeur. মধুর কিন্তু বাঙলা ভাষার দিকে একটু যেন খেয়াল হয়েছিল কিছুদিন আগে—

ভূদেব। কি ক'রে বুঝলে?

গৌরদাস। প্রথম প্রথম ও যখন চিঠি লিখত আমায় মাদ্রাজ থেকে তখন হঠাৎ একটা চিঠিতে ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ চেয়ে পাঠিয়েছিল। This shows that he at least developed an interest for Bengali literature.

ভূদেব। তাছাড়া এই 'হরকরা'তেই ওর Captive Lady-র যা সমালোচনা বেরিয়েছিল তাতেও ওর মনে আঘাত লাগবার কথা।

ভোলানাথ। 'হরকরা'র কথা আর ব'ল না! 'হরকরা' is after all 'হরকরা'—সে কাব্যের কি বোঝে হে! 'হরকরা' গেছেন মধুর কাব্যসমালোচনা করতে! Look at its cheek!

গৌরদাস। মধু তাতে মোটেই দমে নি—সে পাত্র সে নয়। তবে বেথুন সায়েব যে চিঠিখানা লিখেছিলেন ওকে—তাতে হয় ত ওর মত বদলালেও বদলাতে পারে। It was a very decent letter.

ভূদেব। কি লিখেছিলেন বেথুন সায়েব?



শিল্পী— শ্রীযুক্ত কিরণ চৌধুরী

অনাথ্য

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

গৌরদাস। লিখেছিলেন যে Captive Lady বইখানা ভালই হয়েছে, কিন্তু মধুর মত শিক্ষিত প্রতিভাবান কবি যদি বাঙলা ভাষায় বই লেখে তাহ'লে বাঙলা সাহিত্যে তার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি থেকে যাবে। বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে ইংরিজিতে কিছু লিখতে যাওয়া পণ্ডশ্রম!

ভোলানাথ। আশ্চর্য্য লোক এই বেথুন সায়েব! মেয়েদের অমন একটা ভাল স্কুল ত স্থাপন করেইছে—শুনি নাকি ছোট ছোট মেয়েদের পিঠে ক'রে নিয়ে ঘোড়ার মত হয়ে খেলা করে তাদের সঙ্গে!

ভূদেব। আঃ—কথার মাঝখানে ফ্যাকড়া বার কর কেন? হ্যাঁ—বেথুন সায়েবের চিঠি পেয়ে মধু কিছু লিখেছিল?

গৌর। হ্যাঁ—অনেক কিছু লিখেছিল—That is the last letter I got from him—দাঁড়াও চিঠিখানা দেখাই তোমাদের।

নিকটস্থ একটা দেরাজ খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন

ভোলানাথ। We should be ashamed that we could not procure him many customers for his Captive Lady.

ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল

ভূদেব। রাত হয়েছে ত! এবার যেতে হবে—কাল আবার চাকরি আছে—

ভোলানাথ। মাদ্রাসার চাকরি তোমার লাগছে কেমন হে!

ভূদেব। মন্দ নয়—তবে চাকরি—চাকরিই!

গৌরদাস। আশ্চর্য্য ত—চিঠিখানা কোথায় রাখলাম!

ভূদেব। তুমি খুঁজে রেখো—আর একদিন এসে দেখা যাবে।

ভোলানাথ। হ্যাঁ সেই ভাল—যেতেও ত হবে অনেক-দূর—তাও আবার চরণবাবুর জুড়িতে!

গৌরদাস। কোথা গেল চিঠিখানা! আচ্ছা, তোমরা এসো তবে—Good Night.

ভূদেব ও ভোলানাথ। Good Night.

চলিয়া গেলেন। গৌরদাস তথাপি পত্রখানি খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রটি তিনি খুঁজিয়া পাইলেন

গৌরদাস। এই যে—

একটি কোচের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাঁহার তন্দ্রার মত আসিল—তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন—চারিদিকে অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—যেন মাদ্রাজে গিয়াছেন—মধুর সহিত দেখা হইয়াছে। মধু যেন অধ্যয়নরত—চারিদিকে বই স্তূপীকৃত

মধু। (সবিস্ময়ে) Hallo Gour! When did you arrive? কোন খবর না দিয়ে—হঠাৎ!

গৌরদাস। অনেকদিন তোমায় দেখি নি ভাই, থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

মধুসূদন উঠিয়া গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন

মধু। You are charming, my dear Gour-das—You are simply charming. I am so glad you have come—ব'স ব'স—please take your seat immediately!

গৌরদাস উপবেশন করিলেন

গৌর। করছ কি?

মধু। পড়ছি। I am preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine—6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit, 5 to 7 Latin, 7 to 10 English.

গৌর। রামায়ণ মহাভারত পেয়েছ ত?

মধু। নিশ্চয়! পড়ে ফেলেছি—and they have fired my imagination. There are numerous plots in these two epics of ours. I shall surely draw upon them when I begin writing in Bengali and I fully concur with Bethune—বাঙলাতেই লিখতে হবে!

গৌর। লিখেছ না কি কিছু?

মধু। না, বাঙলায় কিছু লিখি নি। (হাসিয়া) I have not mastered the language yet. But language does not count, my dear friend. I shall master it in no time. It is the inspiration that matters and I tell you I have been inspired to write in our own language.

গৌর। কিছুই লিখছ না আজকাল? Only reading?

মধু। A few English sonnets here and there by Timothy Penpoem. Yes, I have written another poem in English—Rizia. I think I wrote to you about it—eh?

গৌর। হ্যাঁ, সে শুনেছি! আচ্ছা, তুই চিঠিপত্র লেখা হঠাৎ বন্ধ করে দিলি, মানে?

মধু। অবসর কই! I hardly get time to eat. Even I dont find time to talk to my wife. (হাসিয়া) I am afraid, she is half repentant of marrying a scholar (হাসিলেন).

গৌর। Where is your wife?

মধু। Rebeca? বাইরে গেছে—She has gone out to buy a hat for herself.

গৌর। মেমসায়েব বিয়ে ক'রে লাগছে কেমন?

মধু। লাগছে কেমন! How shall I explain? যে কখনও বিয়ার খায়নি তাকে বোঝান মুস্কিল যে বিয়ার খেতে কেমন! (হাসিলেন) By the bye, will you have a drop? ব্র্যাণ্ডি আছে! Boy—

'বয়' আসিয়া প্রবেশ করিল। খানসামা জাতীয় ভৃত্য

ব্র্যাণ্ডি—সোডা—

বয় চলিয়া গেল

গৌর। এখনও কি আগেকার মত মদ খাও নাকি?

মধু। Not so much—লেখবার সময় ত আমি এক-ফোঁটা খাই না। মদ খেলে আমি লিখতে পারি না!

বয় দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি-সোডা লইয়া আসিল ও দুইজনের হস্তে দিল

গৌর। (একচুমুক পান করিয়া) মাদ্রাজ কেমন লাগছে!

মধু। Not bad. (সহসা) আচ্ছা, বাণী, হরি, শ্যাম, ভূদেব, স্বরূপ—এরা সব কেমন আছে? Has স্বরূপ started his own shop or is he still under his brother? ভূদেব is at Madrassa? How is he? How is his mother? I cannot forget his mother. She is one of the handsomest Bengali ladies I ever saw. When I think of an Indian Princess I think of Bhoodeb's mother. I have not forgotten her queen-like appearance. ভাই গৌর—আমার মা কেমন আছেন ভাই? অনেকদিন কোন খবর পাইনি—জানিস তুই কোন খবর?

গৌর। ভুগছিলেন শুনেছিলাম। এখন ভালই আছেন শুনেছি। (একটু পরে) মধু, বাঙলা দেশে আর ফিরবি না?

মধু। বাঙলা দেশে? ফিরতে ইচ্ছে হয় না ভাই। I was hunted out of Bengal! অত আশা ক'রে Captive Lady-খানা তোমাদের পাঠালাম—তোমরা গ্রাহ্যই করলে না কেউ! You could not get me more than eighteen customers. That damned 'হরকরা' was even incivil,—went so far as to cut silly jokes about my poverty! তার চেয়ে এদেশ ঢের ভাল! Here that very Captive Lady has secured me friends like Hon'ble George Norton, Mr. Nellor and many other distinguished men! বাঙ্‌লা দেশ ত আমাকে চায় না—why shall I go there?

গৌর। কে বল্লে, তোমায় চায় না? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমার মত একজন কবিকে পেলে লুফে নেবে! We are sick of ঈশ্বর গুপ্ত and his followers.

মধু। রঙ্গলাল কি করছে?

গৌর। ভদ্রসমাজের পাতে দেওয়ার মত ওই কিছু লিখছে আজকাল। Not bad.

রেবেকা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। খাঁটি মেম সাহেব। সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। মধু ও গৌরদাস দাঁড়াইয়া উঠিলেন

মধু। Let me introduce you—Mrs. Rebeca Dutt, my wife and Mr. G. D. Bysack, my friend.

উভয়ে উভয়কে বিলাতী প্রথায় অভিবাদন করিলেন

গৌরদাস বাঙলা দেশ থেকে এসেছে—দেখছ না ওর পোষাক? ওকে বাঙালী কায়দায় নমস্কার কর। সেই যে তোমায় শিখিয়েছিলাম!

রেবেকা। (সহাস্যে) Is it so? ন-মস্-কার!

দুইহাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন

গৌরদাস। নমস্কার—নমস্কার। বাঃ—আপনি বেশ সুন্দর বাঙলা শিখেছেন ত!

মধু। শিখিয়েছি ওকে। এখানে বাঙলায় কারো সঙ্গে কথা কইবার উপায় নেই—শেষে ওকেই শিখিয়ে

নিলাম! বাঙলায় কথা না ব'লে ব'লে বাঙলা ভুলে যাবার জোগাড় হয়েছিল। ভাগ্যে তুই রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছিলি!

গৌরদাস। সুন্দর শিখেছেন উনি দেখছি---

রেবেকা। (সাহেবী সুরে) আমাকে ভিতরে যাইবার (হাসিয়া) What is the Bengali word for 'permission'—I forget—

মধু। অনুমতি—am I correct Gour?

গৌর মাথা নাড়িলেন

রেবেকা। অনুমতি দিন।

গৌরদাস। নিশ্চয়।

রেবেকা ভিতরে চলিয়া গেলেন

মধু। কি রকম দেখছিস?

গৌরদাস। Wonderful.

রেবেকা হ্যাট প্রভৃতি রাখিয়া আবার বাহিরে আসিলেন

আসুন। আপনার মেয়ে কই!

রেবেকা। ঘুমাচ্ছে।

মধু। Splendid. গৌর কি রকম correct উচ্চারণ দেখ্‌ছিস!

গৌরদাস। Really good.

রেবেকা। (মদের গ্লাস লক্ষ্য করিয়া) Again you were drinking untimely!

মধু। বন্ধুর খাতিরে!

রেবেকা। (অনুযোগের সুরে) But you promised your won't—

মধু। (অপ্রতিভ হইয়া) বলছি ত বন্ধুর খাতিরে! Please send for tea.

রেবেকা। Boy!

বয় প্রবেশ করিল

Tea.

বয় চলিয়া গেল

মধু। গৌর, চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি নাকি?

গৌর। নাঃ—কিছু দরকার নেই! আমি খালি তোমার রেবেকাকে দেখছি and I find that you did not at all exaggerate.

রেবেকা। (সলজ্জভাবে) Did he write about me?

গৌর। I mean in 'Captive Lady'! আপনার উদ্দেশ্যে মধু Captive Lady-তে যে কবিতাটা লিখেছিল তা মোটেই exaggeration নয়। মধু, ভাই, পড়্‌ত কবিতাটা—আছে বইটা এখানে?

মধু। আছে। কিন্তু বইয়ের দরকার কি?

বয় চায়ের সরঞ্জাম নিকটস্থ একটি টেবিলে রাখিয়া গেল। রেবেকা উঠিয়া চা কাপে কাপে ঢালিতে লাগিলেন। মধুসূদন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

Come, list thee, gentle one! and whilst the lyre
Breathes softer melody for thee mine own
I'll weave thee sunny dreams those eyes inspire
In wreathes to consecrate to thee alone
Love's offering, gentle one! to Beauty's queenly throne!
'Tis sweet to gaze upon those eyes, where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam
'Tis sweet to see the smile as from above—

বাহিরে দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ। মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিলেন। 'বয়' আসিয়া প্রবেশ করিল

বয়। The bill from the press, sir.

একটি খাম মধুসূদনের হস্তে দিল

মধু। Damn it. Rebeca please go and manage to send him away. I haven't got a penny now.

বিরক্তমুখে রেবেকা উঠিয়া গেলেন

উঃ—ভাই গৌর, পাগল হয়ে উঠেছি দেনার দায়ে! ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি ছাপানোর 'বিল' এখনও শোধ হয় নি! Rebeca is losing all respect for me! তোর কাছে কিছু আছে? Can you lend me something?

বাহিরে রেবেকা ও পাওনাদারের বচসা শোনা যাইতে লাগিল

গৌরদাস। কত?

মধু। Anything.

রেবেকা ও পাওনাদারের বচসা প্রবলতর হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে একটি শিশু কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণের জন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। গৌরদাসের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গৌরদাস উঠিয়া বসিল

গৌরদাস। (চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) আশ্চর্য্য স্বপ্নটা দেখলাম ত! ঠিক মনে হচ্ছিল যেন মধুর কাছে মাদ্রাজে গেছি!

স্বরূপ—গৌরদাসের বন্ধু—আসিয়া প্রবেশ করিল

স্বরূপ। এই যে গৌর, বাইরেই আছ দেখছি। শুনেছ—মধুর মা মারা গেছেন?

গৌর। তাই না কি!

স্বরূপ। আমি এই কিছুক্ষণ আগে শুনলাম। এদিকে দোকানের একটা তাগাদায় এসেছিলাম, ভাবলাম তোমাকে খবরটা দিয়ে যাই! আহা, তিনি মরবার সময় নাকি বলেছিলেন—আমি ত জীবনেই মরে আছি—জলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করে ফেলেছে—আমি মরেই বাঁচব! কিন্তু আমার বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রয়েছে—তার মুখখানি না দেখে আমার মরতেও ইচ্ছে করে না! ভাবলেও কষ্ট হয়। মধুর কোন খবর টবর পাও আজকাল?

গৌরদাস বজ্রাহতের মত স্বরূপের মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—কোন জবাব দিতে পারিলেন না

ক্রমশঃ

ভেকদূত

শ্রীজ্যোতি সেন

শিলিগুড়ির বাঙ্গালীপাড়া বারগাওয়ায় প্রতি বছরই পূজার সময় বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে, 'টু-লেট্' লেখা বাড়ীগুলিতে কোথা হইতে দলে দলে সব ভাড়াটিয়া আসিয়া জোটে—দেখিতে দেখিতে প্রায় সমস্ত বাড়ী-ই নানাশ্রেণীর নরনারীতে ভরিয়া যায়, এই সব নরনারীর আকস্মিক ভিড়ে শিলিগুড়ির বাঙ্গালীপাড়া বারগাওয়া সহসা একেবারে সরগরম হইয়া উঠে।

জায়গাটিও বেশ। কোথাও খানিকটা উঁচু হইয়া আবার নীচের দিকে গড়াইয়া গিয়াছে—কোথাও বা একেবারেই সমতল। পার্ব্বত্য ভূমি যেমন হয় ঠিক তাই, পাহাড় হইতে একটি জলধারা নামিয়া আসিয়াছে ইহারই প্রান্তভাগে; শাল-মহুয়া ও ইউক্যালিপটাস্ গাছের ফাঁক দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অল্প পরিসরে অনেক ঘুরপাক খাইয়া জলধারাটি দূরে দিগন্তরালে গিয়া মিলাইয়াছে—এই ক্ষীণতোয়া পর্ব্বত-নন্দিনী উগ্রীর তীরেই বারগাওয়া।

বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই বারগাওয়ার বি-বি কটেজ নম্বর 'ওয়ান' এবং নম্বর 'টু' ভাড়া হইয়া গিয়াছে। বাড়ী দু'খানি কিছুদিন যাবত খালি পড়িয়া থাকায় বড় বড় ঘাস ও জঙ্গল জমিয়াছিল, জঙ্গল ও ঘাস কাটিয়া ভাড়াটিয়ারা যে যার বাড়ী পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই, জঙ্গলে যে সব ব্যাঙ ছিল তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ীর এখানে ব্যাঙ, ওখানে ব্যাঙ, সর্ব্বত্রই ব্যাঙের ছড়াছড়ি, চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাঙের তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়াই আছে। ঘরের ভিতরেও সোয়াস্তি নাই। লাফাইতে লাফাইতে ব্যাঙ আসিয়া ঘরে ঢোকে। তারপর সারা ঘরে কেবল লাফালাফিই চলে। ব্যাঙের দৌরাত্ম্যে ভাড়াটিয়ারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

হায়! ব্যাঙ, নাকি নিরীহ প্রাণী! হয়তো তাই। কিন্তু কি বিরক্তই করিতে পারে! তাড়াইলেও যায় না—তাড়া খাইয়া আবার ঘুরিয়া আসে।

এক নম্বরের ভাড়াটিয়া অতুলানন্দ নিতান্ত অহিংস হইলেও যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঙের বংশ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে, ব্যাঙ দেখিলেই সে মারে। একখানি লাঠি সর্ব্বদাই তাহার হাতের কাছে থাকে। ব্যাঙের পিছনে পিছনে ছুটিয়া—ঘর হইতে উঠান এবং উঠান হইতে রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়া—যে কোন রকমে ব্যাঙ মারিয়া তবে সে নিরস্ত হয়।

সেদিন কিরণবাবু সকালবেলা বেড়াইতে আসিয়া দেখেন—অতুলানন্দ প্রায় পঁচিশটি ব্যাঙ মারিয়া এক জায়গায় জড় করিয়াছে। ব্যাঙের শবগুলি সৎকার করিবার জন্য সে চাকরকে ডাকিয়া বাড়ীর এক কোনে একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে বলিয়াছে এবং হিন্দুস্থানী চাকরটি প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের পর ভারতবর্ষে তেমন কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কখনো হইয়াছে কি-না তাহা কিরণবাবুর জানা নাই। বর্ত্তমান ব্যাপারটি দেখিয়া কিরণবাবুর মনে হইল অতুলানন্দ নিশ্চয়ই ভেক-যজ্ঞ করিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও কি অতুলবাবু! এতগুলো ব্যাঙ মেরেছেন? ভেক-যজ্ঞ হবে নাকি?'

অতুলানন্দ একটু হাসিয়া তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল—'আর পারিনে

—আর পারিনে মশাই ! ব্যাঙের জ্বালায় বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে দেখচি। বাইরে তো আছেই—ঘরেও নিস্তার নেই। গায়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। ব্যাটাদের সব আমি সাবাড় করব।'

কিরণবাবু তাঁহার বিরাট বপু ঝাঁকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—'তা করুন। নিরীহ প্রাণী বধ করা কলি যুগেরই ধর্ম্ম, কিন্তু ওগুলোকে মাটি চাপা দেবার আগে আর একটা কাজ করুন না কেন, ওদের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বিলেতে চালান দিন, দু'পয়সা লাভ হবে।'

কিরণবাবুর কথা শুনিয়া অতুলানন্দ মনে মনে চটিয়াছিল, কিন্তু কিরণবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই সহসা একটি ব্যাঙের আবির্ভাব হওয়ায় অতুলানন্দ লাঠি হাতে সেইদিকে ছুটিল। তাড়া খাইয়া ব্যাঙটি প্রাণভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিল এবং এদিক ওদিক পথ না পাইয়া কিরণবাবুর গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিরণবাবু 'ওরে বাবা রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে দৈত্যের মত তিনি দাপাদাপি করিতে লাগিলেন। ফলে কিরণবাবুর পায়ের নীচে চাপা পড়িয়াই ব্যাঙটা চ্যাপ্টা হইয়া গেল।

এমনি করিয়াই বি-বি কটেজ নম্বর ওয়ানে ভেক-যজ্ঞ চলিতে লাগিল, দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল ব্যাঙ প্রায় সবই সাবাড় হইয়াছে।

গিরিডিতে আসিয়া গণ্ডায় গণ্ডায় ব্যাঙ মারিতে হইবে অতুলানন্দ তাহা মোটেই ভাবে নাই। ভাবিবার কথাও নয়, কলিকাতায় কোন বিখ্যাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে সে বড় একটি চাকুরী করে, গিরিডিতে আসিয়াছে দিনকতক শান্তিতে থাকিবার জন্য। কিন্তু ব্যাঙের মত নিরীহ প্রাণীও যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারে তাহা সে জানিত না, ব্যাঙের উপদ্রব অসহ্য না হইলে ব্যাঙ সে মারিত না নিশ্চয়।

ব্যাঙের উপদ্রব কমিলে অতুলানন্দ বাড়ীতে ফুলের বাগান করিবার জন্য একটি মালি রাখিল। মালি আসিয়া বাগানের পুরাতন ছক পরিষ্কার করিয়া সেখানে নূতন চারা লাগাইল। পাতাবাহারের ডাল আনিয়া প্রাচীরের ঠিক নীচে সারি সারি পুতিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে বাড়ীটির শ্রীও খুলিল।

অতুলানন্দ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে নিয়মিতভাবে বাগানের তত্ত্বাবধান করে, পাতাবাহারের গাছগুলির কাছে কাছে গিয়া দেখে গাছগুলি বাঁচিবে কিনা, মালির সঙ্গে সে নিজেও খাটে।

একদিন ভোরে সে পাতাবাহারের গাছগুলি দেখিতে দেখিতে বাড়ীর পিছন দিকে যাইতেই লক্ষ্য করিল—একটা ব্যাঙের বাচ্চা একটু একটু করিয়া লাফাইতে লাফাইতে তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বাচ্চাটা দেখিয়া রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল —আপদ সে এখনই বিদায় করিবে। ব্যাঙের বাচ্চাটাকে না মারিয়া অতুলানন্দ একখানি বাখারির সাহায্যে সেটাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, সেটা প্রাচীরের উপর দিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে ছিটকাইয়া পড়িল দুই নম্বর বাড়ীতে। সেই দিক হইতে তৎক্ষণাৎ নারীকণ্ঠের একটা চীৎকার শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের উপর একটি নারীমুণ্ড বিদ্যুৎশিখার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অতুলানন্দ অনুমানে বুঝিল—নারীটি কোনও একটা উঁচু জিনিষের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নারীটি মুখ বাড়াইয়া বলিল—'কি রকম ভদ্রলোক আপনি ! মেয়েদের গায়ে ব্যাঙ ছুঁড়ে মারেন ! আপনার লজ্জা করে না !'

অতুলানন্দ স্তম্ভিত হইয়া নারীটির মুখের পানে তাকাইল। এ বলে কি ! কলিকাতার একটা বিখ্যাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বড় চাকুরিয়া সে, তাহাকে বলে কি না—কি রকম ভদ্রলোক আপনি ! কেন ? ভদ্রলোক বলিয়া তাহাকে কে না জানে ! সে ব্যাঙ ছুঁড়িয়া মারিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়ে নাই। এত বড় মিথ্যা অপবাদ সে সহ্য করিবে না। অতুলানন্দ প্রতিবাদ করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল।

যে বাখারিটির সাহায্যে অতুলানন্দ ব্যাঙের বাচ্চাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটা তখনও তাহার হাতেই ছিল। বাখারি হাতে তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নারীটি অদৃশ্য হইয়া গেল। অতুলানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ঘরের ভিতর হইতে একটা জানালার ফাঁক দিয়া অতুলানন্দের ভ্রাতৃবধূ—অর্থাৎ তাহার বড় ভাইয়ের স্ত্রী—ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অতুলানন্দ ঘরে ফিরিয়া আসিলে তিনি কহিলেন—'ব্যাপারটা ভাল হ'ল না ঠাকুরপো, মেয়েটি উঁচু থেকে নামতে গিয়ে পা বোধ করি ভেঙ্গে ফেলেছে। দেখলাম লাফ দিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে গেল।'

অতুলানন্দ বিরক্তির সহিত বলিল—'বেশ হয়েছে। যেমন ঝগড়া করতে এসেছিলেন তেমনি উপযুক্ত শাস্তি।'

—'কিন্তু তুমি তো সত্যি ওর গায়ে ব্যাঙ ছুঁড়ে মেরেছ।'

—'উনি যে ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন তা তো আমি দেখিনি—না দেখে আমি ছুঁড়ে মেরেছি।'

একটু বাদে অতুলানন্দ পুনরায় বলিল—'সত্যি বৌদি, আমার কোন দোষ নেই। মোটেই না।'

তাহার বৌদি দোষগুণের বিচার না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'আইবুড়ো মেয়ে—খোঁড়া হ'য়ে যদি প'ড়ে থাকে তাহ'লে বিয়েও আর হবে না, বেচারা !'

তাহার কথা শুনিয়া অতুলানন্দ বুঝিল তিনি দুই নম্বরের বাড়ীর অনেক খবরই জানেন। এই উপলক্ষে অতুলানন্দকেও তিনি কিছু কিছু জানাইলেন। মেয়েটির বাপ নাই, বড় এক ভাই আছে। ভাইটি বড় চমৎকার লোক। বোনের বিবাহ দিতে পারে নাই বলিয়া—নিজেও অবিবাহিত রহিয়াছে। ভাইটি পণ দিতে স্বীকৃত হইয়া বোনের বিবাহ ঠিক করিয়াছিল কিন্তু বোন তার বিবাহে পণ দিতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বোনটি নাকি যার-পর-নাই স্বাধীনচেতা।

'হ্যাঁ, স্বাধীনচেতাই বটে'—বলিয়া অতুলানন্দ দাড়ি কামাইবার জন্য নিরাপদ ক্ষুর, সাবান ও দাড়ি ভিজাইবার তুলি লইয়া স্নানের ঘরে

ঢুকিল। দাড়ি কামাইতে কামাইতে সে শুনিতে পাইল যেন স্বাধীনচেতা মেয়েটি বলিতেছে—'কি রকম ভদ্রলোক আপনি! মেয়েদের গায়ে ব্যাঙ ছুঁড়ে মারেন! আপনার লজ্জা করে না?'

লজ্জার কথা সত্যই।

অতুলানন্দ তখন প্রায় অর্দ্ধেকটা দাড়ি কামাইয়াছিল। সেই সময় বাস্তবিকই সে শুনিতে পাইল বাহির হইতে কে ডাকাডাকি করিতেছে। শুধু ডাকাডাকি নয়—দরজা ঠেলাঠেলি, যেমন চীৎকার তেমনই দুম্‌দাম্ শব্দ। অতুলানন্দ স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিল—'ওরে এই, কে ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস না, শীগগীর দেখে আয়।'

চাকর গিয়া দরজা খুলিতেই আগন্তুককে বসিবার অনুরোধ জানাইলে সে কণ্ঠস্বর আরও একপর্দ্দা চড়াইয়া বলিল—'না, আমি বসব না। ছোটলোকের বাড়ীতে আমি বসি না। যে মেয়েদের সম্মান করতে জানে না, সে ছোটলোক।'

আগন্তুকের কথাগুলি কানে যাওয়ায় অতুলানন্দের মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়িল। ক্ষৌরকার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া রাগে গজগজ করিতে করিতে সে ছুটিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—'কে মশাই আপনি? কি জন্যে এখানে এসেছেন?'

আগন্তুক বলিল—'আপনি আমার বোনের গায়ে ব্যাং ছুঁড়ে মেরেছেন, আপনার উদ্দেশ্যটা কি, তাই জানতে এসেছি।'

অতুলানন্দ আগন্তুকের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল—'আপনি ঝগড়া করতে এসেছেন—তাই বলুন।'

'হুঁ'—বলিয়া আগন্তুক সুমুখের দিকে মাথা ঝাঁকাইল। তারপর পুনরায় সে কহিল—'আপনার আস্পর্দ্ধা বড় বেশী হ'য়েছে—আমার বোনকে আপনি তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন!'

—'মিথ্যে কথা।'

—'বটে! আমার বোন মিছে কথা বলেছে। কক্‌খনো না। নিশ্চয়ই আপনি মারতে গিয়েছিলেন—আপনার হাতে বাঁশের একখানি বাখারি ছিল।'

আগন্তুকের এই অকাট্য যুক্তি শুনিয়া অতুলানন্দ বুদ্ধুর মত তাহার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া আগন্তুক দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিল—'আমার বোন আপনার কোনই ক্ষতি করেনি, অথচ আপনি তার নিদারুণ ক্ষতি করেছেন।—আপনাকে মারতে উদ্যত দেখে সে ওপর থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছে। তার পা যদি না সারে তা হ'লে কি উপায় হবে! কি ক'রে আমি তার বিয়ে দেব? আর বিয়ে দিতে না পারলে চিরজীবন তার বোঝা আমাকেই ঘ'য়ে বেড়াতে হবে।'

'তা হয় যদি হবে'—অতুলানন্দ আগন্তুককে এই বলিয়া থামাইয়া দিল তারপর সে পুনরায় সুরু করিল—'আপনার সুখ দুঃখের কাহিনী শুনবার আগ্রহ আমার নেই। অদৃষ্টে আপনার যা আছে, আপনি ভোগ করবেন। আমার তাতে কি! আপনি এখন যান, আমি দাড়ি কামাব।'

—'না। এর একটা প্রতিকার না ক'রে আমি যাব না।'

'কিসের প্রতিকার? আপনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে।'

অতুলানন্দ আগন্তুককে ধাক্কা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। আগন্তুকও নিতান্ত দুর্ব্বল নয়। সে হাতের আস্তিন গুটাইয়া সবেগে ছুটিয়া আসিয়া অতুলানন্দকে আক্রমণ করিল। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে উভয়ে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময় কিরণবাবু সেখানে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিলেন।—'করেন কি—করেন কি মশাই আপনারা! সজ্জন ব্যক্তি হ'য়ে—ছিঃ ছিঃ ছি!' এই বলিতে বলিতে তিনি একবার তাহাদের কাছে—আবার তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে—এমনি করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তথাপি কেহই কাহাকেও ছাড়ে না দেখিয়া কিরণবাবু তাঁহার বপুখানি সবেগে তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সাড়ে তিন মণ ওজনের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া উভয়ে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

মল্লযুদ্ধের অবসান হইলে কিরণবাবুর মধ্যস্থতায় বিবাদের মীমাংসা চলিতে লাগিল, দুই পক্ষের কথা শুনিয়া কিরণবাবু একটা আপোষের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল অতুলানন্দ মেয়েটির কাছে গিয়া নিজের অপরাধের জন্য অনুতাপ করিবে এবং হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিবে।

বিকালে সমস্ত বারগাণ্ডায় এই দ্বৈত যুদ্ধের সংবাদ কি করিয়া না জানি রাষ্ট্র হইয়া গেল। বাড়ী বাড়ী ইহার তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। দু'টি ভদ্রলোক বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া সামান্য কথা কাটাকাটি হইতে একেবারে হাতাহাতি ও মারামারি পর্য্যন্ত করিতে পারে ইহা বারগাণ্ডার ভদ্রসমাজ কোন দিনও নাকি কল্পনা করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিল—না, ব্যাপারটা সামান্য নয়—ইহার অন্তরালে অনেক কেলেঙ্কারী আছে, তা না হইলে দুটি ভদ্রলোক কখনো মারামারি করিতে পারে না, এই আলোচনার ভিতর দিয়া অতুলানন্দ ও সেই স্বাধীনচেতা মেয়ে অলকা সম্বন্ধে একটা গুজব রটিল।

যাহাদের সম্বন্ধে গুজব রটে তাহাদের কানে সচরাচর তাহা কখ পৌছে না, এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। অতুলানন্দ বা অলকা গুজবটা শুনিতে পায় নাই। শুনিতে পাইলে অতুলানন্দ নিশ্চয়ই অলকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পর দিন যাইত না।

নম্বর 'টু' বি-বি কটেজে গিয়া সকালবেলা ডাকাডাকি করিতেই অতুলানন্দ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল—অলকা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে সুস্থ ও সবল দেখিবে অতুলানন্দ তাহা ভাবিতে পারে নাই। একটু হাসিয়া অতুলানন্দ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—'নমস্কার! কেমন আছেন? আপনার জন্য দুর্ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।'

অতুলানন্দের কথা শুনিয়া অলকা ট্রুক হইয়া তাহার মুখের পানে

তাকাইল। বলিল—'সে জন্তে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার শরীর বেশ ভাল আছে? আশা করি আজ রাতে আপনার ভাল ঘুম হবে।' এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

অতুলানন্দ তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল—'দাঁড়ান। কালকের অপরাধের জন্ত আমি আপনার কাছে অনুতাপ করতে এসেছি। শুধু তাই নয়—আপনার কাছে করজোড়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব। ততক্ষণ পর্যান্ত একটু কষ্ট ক'রে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।'

অলকা তাহার দাদার কাছে গতকল্যকার ব্যাপার আগাগোড়া সব শুনিয়াছিল। অতুলানন্দকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ করায় সে অপমানিত বোধ করিয়াছে, অলকা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহার কথার ভঙ্গিটা অলকার মোটেই ভাল লাগিল না। বলিল—'আপনার কিছুমাত্র অনুতাপ হ'য়েছে ব'লে তো মনে হচ্চে না; ক্ষমা চাইবার ছুতো ক'রে আবার আমাকে অপমান করতে চান। তাই নয় কি?'

অতুলানন্দ হাসিয়া বলিল—'না না না, তা নয়—তা নয়। কালও আমি আপনাকে অপমান করিনি এবং আজও আমার সে উদ্দেশ্য নেই।'

অলকাকে অতুলানন্দ সমস্ত ঘটনাটা খুলিয়া বলিল। অলকা তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইল। কহিল—'কি অন্যায়! কি অন্যায়! আপনার ওপর অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। আমি ভয়ানক ভুল বুঝেছিলাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

অতুলানন্দ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—'না না না, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন! বিচারে ওটা আমার ভাগে পড়েছে। আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

অলকা যেন মরমে মরিয়া গেল। বলিল—'ক্ষমা চেয়ে আমাকে আর অপরাধী করবেন না।'

অতুলানন্দ দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—'কি করব! তা না হ'লে কিরণবাবুও যে কিছুতেই ছাড়বেন না—রোজ দু'বেলা এসে আমার ওপর নৈতিক চাপ প্রয়োগ করবেন।'

অতুলানন্দের কথা শুনিয়া অলকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অলকার হাসি থামিলে অতুলানন্দ বলিল—'আপনার দাদাকে বলবেন—আমি ক্ষমা চেয়ে গেছি। উঃ, কাল আমাকে কি ভয়ানক দুশ্চিন্তায় তিনি ফেলেছিলেন। ওপর থেকে পড়ে' গিয়ে আপনার পা নাকি ভেঙ্গে গিয়েছিল—'

অলকা বাধা দিয়া বলিল—'ভাঙ্গেনি। মচকে' গিয়েছিল। রাতে কিরণবাবুর দেওয়া একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে একেবারে সেরে গেছে।'

অতুলানন্দ কহিল—'আপনার দাদার কথা শুনে' তো আমার মনে হয়েছিল পা ভেঙ্গে আপনি খোঁড়া হ'য়ে আছেন। দুশ্চিন্তায় রাতে আমার সত্যি ভাল ঘুম হয়নি। ভেবেছিলাম সেই অবস্থাই যদি আপনার হ'য়ে থাকে তা' হ'লে আপনার দুঃখের ভাগ আমিই নেব। মনে মনে সেজন্য প্রায় প্রস্তুতও হয়েছিলাম।'

কথাটা বলিয়া অতুলানন্দ হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর কহিল—'কিছু মনে করবেন না। অভ্যাসের দোষে বড্ড বেশী কথা ব'লে ফেলেছি। কিন্তু আর না। আসি।—'

অলকাকে নমস্কার জানাইয়া অতুলানন্দ বিদায় হইল।

যথাসময়ে কিরণবাবু খবর পাইলেন—অতুলানন্দ অলকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে। খবরটা পাইয়া মনে মনে তিনি খুশী হইলেন। অতুলানন্দ যে সত্য সত্যই তাঁহার রায় অনুযায়ী কার্য্য করিবে সে ভরসা রায় দেওয়ার সময়ও তিনি করিতে পারেন নাই।

এই উপলক্ষে কিরণবাবু এক ভোজের আয়োজন করিলেন।

নিমন্ত্রিত হইয়াছিল অতুলানন্দ, অলকা ও অলকার দাদা অসমঞ্জ। পাশাপাশি বাড়ী বলিয়া তাহারা একত্র হইয়া সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে কিরণবাবুর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। কিরণবাবু তখন সুমুখের খোলা বারান্দায় একখানি ডেক চেয়ারে সমস্ত শরীর ছাড়িয়া দিয়া আর একখানি লোহার চেয়ারে দুই পা তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আরাম করিতেছিলেন। তাহাদিগকে একসঙ্গে আসিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!'

কিরণবাবুর কথার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা এমন কিছুই নয়—কিন্তু বলার ভঙ্গিতে রহস্যময় ও রসাত্মক হইয়া উঠিল। অতুলানন্দের মনে হইল সে অলকাকে অধিকন্তু যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহা বোধ করি বা কোন রকমে কিরণবাবুর কানে উঠিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহাদিগকে একত্র আসিতে দেখিয়া তিনি পরিহাস করিতেছেন। অতুলানন্দ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অলকার পানে তাকাইল। এমনি একটা সন্দেহ অলকার মনেও দেখা দিয়াছিল। আড়চোখে চাহিয়া অলকা অতুলানন্দের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিতেছিল। উভয়ের দৃষ্টি উভয়কে লজ্জিত করিল। কিরণবাবু তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—'বসুন আপনারা—বসুন।'

সকলে বসিলে কিরণবাবু তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিলেন—'ওগো! শুনচ! একবারটি এদিকে এস।'

কিরণবাবুর স্ত্রী শুনিতে পাইলেন না, সাড়াও দিলেন না। একটু বাদে কিরণবাবু আবার ডাকিলেন—'ওগো! শীগগীর এস!'

অসমঞ্জ বলিল—'আপনি ব্যস্ত হবেন না কিরণবাবু, তিনি হয় তো রান্নাঘরে কাজে আটকা রয়েছেন। অলকা বরং সেখানে যাক্।'

'রান্নাঘরে যাবে! অলকা? ওরে বাপ্!'—বলিয়া কিরণবাবু যেন সহসা বিভীষিকা দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার পায়ের ধাক্কা লাগিয়া লোহার চেয়ারটা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল—আর তিনি নিজে ডেক চেয়ারটা লইয়া একেবারে ধরাশায়ী হইলেন।

অতুলানন্দ ও অসমঞ্জ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দুইজনে দুই হাত ধরিয়া

তাহাকে টানিয়া তুলিল, অলকা কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'লাগেনি তো কোথাও ?'

কিরণবাবু তাঁহার মাথায় ও কোমরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—'না না—লাগেনি। লাগেনি।'

অলকা বলিল—'সত্যি লেগেছে কিরণবাবু। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন।' বলিয়া তাহার নিজের আসনটি দেখাইয়া দিল।

—'আর তুমি ?'

—'আমি রান্নাঘরে গিয়ে বসব।'

তাহাকে বাধা দিয়া কিরণবাবু বলিলেন—'না না না, আগুনের তাপে একেবারে সেদ্ধ হ'য়ে যাবে যে! তুমি এখানেই ব'স। ঝি! ও ঝি! একখানা চেয়ার নিয়ে আয়।—আর তোর মাকে ডেকে দে তো। এঁরা সব কখন এসেছেন, এতক্ষণেও উনি একবারটি দেখা দিতে পারলেন না।'

অসমঞ্জ বলিল—'সে জন্মে আপনি এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন কেন ?'

কিরণবাবু হাসিয়া কহিলেন—'না হ'লে কি আর উনি এমনি আসবেন! কিছুতেই না। পুরুষ মানুষের সুমুখে বেরুতে ওঁর ভয়ানক আপত্তি। কিন্তু এ নারী-প্রগতির যুগে এটা কত বড় লজ্জার কথা বলুন তো! ওঁর জন্মে বন্ধুবান্ধবের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না।'

কিরণবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার স্ত্রী মাথায় ঘোমটা টানিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া অসমঞ্জ কিরণবাবুকে বলিল—'এই তো উনি এসেছেন—আর আপনি ওঁর নিন্দে করছিলেন—আপনার এ ভয়ানক অন্যায় কিরণবাবু।'

কিরণবাবু হাসিলেন। হাসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন—'ওগো, তুমি একটু এখানে ব'স। আমি দু মিনিটের জন্য ওদিকে যাচ্ছি।'

কিরণবাবুর স্ত্রী অলকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অলকা, তুমি ওঁকে বল—উনি রান্নাঘরে গিয়ে ওদিকের ব্যবস্থাটা তা হ'লে করুন—আমি বসচি!'

কথাটা কিরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল—সুতরাং তিনিই কহিলেন—'বেশ তো—আমি তাতেও রাজী। কিন্তু রান্না আমি জানি না—এই হয়েচে মুস্কিল। তা না হ'লে—'

'হ্যাঁ—তা না হ'লে উনি সবই করতেন। একটু ন'ড়ে বসতে হ'লে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে—আর মুখে কেবল হাতী মারেন আর ঘোড়া মারেন।'—এই বলিয়া কিরণবাবুর স্ত্রী অলকার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—'আমার তো এখন বসবার উপায় নেই অলকা, আমি বসে' থাকলে তোমাদের খাওয়া খেয়েই আজ বিদায় নিতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে রান্নাঘরে চল।'

কিরণবাবুর স্ত্রী আর কাল বিলম্ব না করিয়া অলকাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে অসমঞ্জ উঠিয়া পাশের ঘরে কিরণবাবুর ছোট ছেলেটাকে লইয়া আদর করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া অতুলানন্দ চুপি চুপি কিরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা কিরণবাবু, গিরিডিতে আপনার এত বন্ধুবান্ধব থাকতে বেছে বেছে আমাদের তিনটি প্রাণীকে আজ নেমন্তন্ন করবার মানেটা কি বলুন তো!'

—'কেন কেন—এ কথা জিজ্ঞাসা করচেন যে!'

—'কোন উদ্দেশ্য নেই তো ?'

কিরণবাবু সত্য কথাই বলিলেন। তাহাদের বিবাদ মিটাইতে পারিয়া তিনি খুব খুশী হইয়াছেন—এই কারণেই খাওয়া দাওয়ার এই আয়োজন করিয়াছেন। ইহার ভিতর আর কোন উদ্দেশ্যই তাঁহার নাই।

কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য বোধ করি বা অন্য রকম। অলকার কথাবার্তা ও চালচলনে অতুলানন্দ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

পরদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য রীতিমত সাজগোজ করিয়া অতুলানন্দ বেশী দূরে গেল না, বি বি কটেজ নম্বর 'ওয়ান' হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে নম্বর 'টু' পর্যন্ত গিয়াই থামিল। অসমঞ্জকে ডাকিয়া সে তাহাদের কুশল সংবাদ লইল, তারপর আমন্ত্রণ পাইয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

অসমঞ্জ বলিল—'আপনি এসেছেন—ভালই হয়েছে। আপনার কাছে আমিই যাব মনে করেছিলাম।'

অনাহূত হইয়া আসায় অতুলানন্দ মনে মনে যে সঙ্কোচবোধ করিতেছিল তাহা কাটিয়া গেল। কহিল—'আমি তো মনে করেছিলাম আপনি যাবেন। কিন্তু গেলেন তো না, সুতরাং আমিই এলাম। পাশাপাশি বাড়ীতে থেকে এতদিন যে আমাদের আলাপ হয়নি এটা বড়ই লজ্জার কথা। যা হোক্ আলাপ পরিচয় তো হ'য়েই গেছে। এখন যাওয়া-আসা না-করাটা আর ভাল দেখায় না।'

অসমঞ্জ কহিল—'অলকাও সেই কথাই বলছিল। ওর সঙ্গে আপনার মতামতের ঐক্য রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

শুনিয়া অতুলানন্দ খুব খুশী হইল। ভাবিল—অলকার সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে সে এই কথাটাই বলিবে। এই ভাবিয়া অতুলানন্দ অলকার উদ্দেশ্যে বার-কয়েক এদিক-ওদিক তাকাইল।

একটু বাদে অসমঞ্জ পুনরায় কহিল—'আশে পাশে যে ক'খানা বাড়ী আছে প্রায় সব বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেই অলকা আলাপ করে' নিয়েছে। আপনার বৌদির সঙ্গেও।'

অতুলানন্দ তাহা জানিত, বলিল—'হ্যাঁ, বৌদির মুখে শুনেছি।'

এমনি অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলিল, কিন্তু মোটেই জমিয়া উঠিল না। অতুলানন্দ আসিয়াছিল অলকার কাছে—অলকার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য। তাহার পরিবর্তে অসমঞ্জ—সুতরাং আলাপ জমিবার কথাও নয়। অলকার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া অতুলানন্দ অধীর হইয়া পড়িল।

অসমঞ্জ তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের আলোচনা করিতেছিল, গিরিডিতে কি কি ব্যবসা চলে—ইহাই ছিল তাহার বক্তব্য বিষয়। তারপর সে গিরিডির বাণিজ্যসম্পদ বিষয়েও গবেষণামূলক বক্তৃতা করিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া অতুলানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

অসমঞ্জ তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'চললেন ?'

অতুলানন্দ কহিল—'হ্যাঁ,—যাওয়া যাক্।'

অসমঞ্জ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত আসিল। গেটের কাছে অতুলানন্দকে দাঁড় করাইয়া অসমঞ্জ পুনরায় সুরু করিল—'কোল্', 'মাইকা' আর 'মাইরাবোলাম্' ছাড়া আরও একটা জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। সেটা কি জানেন ?'

অতুলানন্দ কহিল—'আজ্ঞে না।'

অসমঞ্জ বলিল—'সেটা হ'চ্চে ব্যাঙ,—অর্থাৎ ব্যাঙের চামড়া।'

'ও ! হ্যাঁ, জানি। আর বলতে হবে না।'—এই বলিয়া অতুলানন্দ অসমঞ্জের মুখের উপর দরজাটা টানিয়া দিয়া দ্রুত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

অলকার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় অতুলানন্দ মনে মনে চটিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সে আর তাহাদের বাড়ী যাইবে না, কিন্তু দিন দুই বাদে এক নিমন্ত্রণ পাইয়া তাহাকে যাইতেই হইল।

খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অলকা নিজের হাতে রান্না করিয়া অতুলানন্দ ও কিরণবাবুকে খাওয়াইবে।

অতুলানন্দ অলকাকে জিজ্ঞাসা করিল—'নিজের হাতে রান্না ক'রে খাওয়াবার এ সখ আপনার কেন হ'ল ?'

অলকা হাসিয়া কহিল—'রান্নার পরীক্ষা দেব।'

কি হেতু সে পরীক্ষা দিবে এবং কে-ই বা তাহার পরীক্ষা লইবে তাহা জানিবার জন্য অতুলানন্দের কৌতূহল থাকিলেও সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু অলকা রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার পক্ষে সময় অতিবাহিত করা যে কি কষ্টকর হইবে তাহাই ভাবিয়া অতুলানন্দ কহিল—'আপনি গিয়ে রান্নাঘরে বসে থাকলে আমার কি উপায় হবে ?'

—'কেন ? রান্নাঘরে গেলে আমি সেদ্ধ হ'য়ে যাব—আপনারও কি সেই ধারণা ?'

—'না না, তা নয়। আপনার দাদা আমাকে একলা পেলেই 'মাইকা' আর 'মাইরাবোলাম্' সুরু করবেন।'

অলকা কোন জবাব না দিয়া হাসিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অতুলানন্দ যে ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল। আজ অসমঞ্জ একলা নয়—তাহার সঙ্গে কিরণবাবুও আছেন। দুইটি অব্যবসায়ী লোক ব্যবসায় সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা ও কোলাহল করিতে লাগিলেন। অতুলানন্দ আর সহ্য করিতে না পারিয়া রান্নাঘরে গিয়া অলকার কাছে বসিল।

অলকা একটু হাসিয়া বলিল—'আপনি যে সদর ছেড়ে অন্দরে এসে বসলেন ?'

অতুলানন্দ কহিল—'সদর বড় সরগরম হ'য়ে উঠেছে। অন্দরে ব'সে একটু শান্তি লাভ করতে চাই।'

—'না না, আপনি এখান থেকে যান্।'

—'আমি ব'সে পড়েছি—আর উঠতে পারব না।'

অলকা হাসিয়া বলিল—'এত ঘনিষ্ঠতা কি সইবে ?'

অতুলানন্দও হাসিল, কহিল—'দেখাই যাক্ না।'

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল—অতুলানন্দ ও অলকার হৃদয়ে যে ভাল লাগার বীজ ছিল তাহা ভালবাসার অঙ্কুরে পরিণত হইয়াছে।

'আপনি' ছাড়িয়া তাহারা 'তুমি' বলিতে সুরু করিয়াছে। অল্প সময়ে এই অঘটন যে কি করিয়া ঘটিয়াছে তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

আহারের পর অতুলানন্দ প্রস্তাব করিল, পরদিন উগ্রী প্রপাতে চড়ুই-ভাতি করা হইবে। যে কয়জন এখানে উপস্থিত আছে তাহারা তো যাইবেই, আর যাইবেন কিরণবাবুর স্ত্রী ও অতুলানন্দের বৌদি। যাতায়াত ও খাওয়া দাওয়ার ব্যয় সমস্তই অতুলানন্দ বহন করিবে।

তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া অতুলানন্দ পর দিনের চড়ুইভাতির জন্য সমস্ত আয়োজন করিল। চাল, ডাল, ঘি, নুন, তরি-তরকারী, মাংস, মশলা এবং রান্না ও খাওয়ার বাসন-কোসন বাঁধিয়া ছাঁদিয়া এক জায়গায় ঠিক করিয়া রাখিল। তার পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া দুইখানি ট্যাক্সি করিয়া সকলে মিলিয়া উগ্রীপ্রপাতে চলিল।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া অনেকখানি হাঁটিতে হয়। দুইদিকে নানা রকমের গাছ—শাল, মহুয়া, বন-শিউলি, বাব্‌লা—এম্‌নি আরও অনেক। তারই ভিতরে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথ। পথটা কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা কেবলই কাঁকর ও পাথর। চলিতে চলিতে প্রপাতের গভীর গর্জ্জন শোনা যায়—আর গাছের ফাঁক দিয়া দেখা যায় গলিত রূপার মত বিপুল জলধারা।

প্রপাতের কাছাকাছি গিয়া উঁচু হইতে খাড়া নীচে নামিবার সময় অতুলানন্দ অলকাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার হাত ধরিল। অলকার মনে হইল অতুলানন্দ তাহাকে জীবনের যাত্রাপথে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভাবিতেই তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবে আবিষ্ট হইয়া সে তাহার অজ্ঞাতে অতুলানন্দের উপর নিজের দেহভার ছাড়িয়া দিল।

অতুলানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁটতে কি কষ্ট হচ্চে অলকা ?'

অলকা আব্দারের সুরে বলিল—'হুঁ।'

অতুলানন্দ চারিদিকে একবার তাকাইল। তাকাইয়া দেখিল, কেহই তাহাদের ধারে কাছে নাই। একটু ইতস্তত করিয়া সে অলকাকে দুই হাতে পাঁজা কোলে করিয়া লইল। অলকা প্রতিবাদ করিল না, পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সে অতুলানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল। অতুলানন্দ অলকাকে লইয়া নিরাপদে নীচে আসিয়া নামাইয়া দিল।

অলকাকে নামাইয়া দিয়া অতুলানন্দ হাসিয়া বলিল—'তোমার দাদা যদি দেখতে পেতেন তা হ'লে কিন্তু এর একটা প্রতিকার না ক'রে তিনি ছাড়তেন না।'

অলকাও হাসিল। হাসিতে হাসিতে কহিল—'হ্যাঁ, দাদা দেখতে পেলে জোর ক'রে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিতেন।'

—'তুমি আপত্তি করতে না ?'

—'না।'

একটু বাদেই তাহারা প্রপাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রপাতের জল বহু দূর হইতে গর্জ্জন তুলিয়া তীব্রবেগে শিলাতলে গড়াইতে গড়াইতে হুড়মুড় করিয়া নীচে লুটাইয়া পড়িতেছে। প্রতিহত জলরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে লক্ষ লক্ষ জলকণা বিস্তার করিতেছে। সেই জলকণায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সপ্তবর্ণের ইন্দ্রধনু ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপরিচিত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আসিয়া অলকা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। সহসা বোধ করি বা তাহার কৈশোর ফিরিয়া আসিল। কিশোরীর মত সে জলের ধারে শিলার উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অতুলানন্দের অবস্থাও হইল ঠিক তাই। অলকার সঙ্গে সে-ও যোগ দিল। ছুটাছুটি করিতে করিতে তাহারা প্রপাতের মুখে একটা প্রকাণ্ড শিলার উপর গিয়া দাঁড়াইল।

অতুলানন্দ বলিল—'উঃ। কি ভয়ানক তোড়ে জল গড়িয়ে পড়চে!'

অলকা হাসিয়া কহিল—'হঠাৎ যদি এখন পা পিছলে প'ড়ে যাই?'

অতুলানন্দ শিহরিয়া উঠিল। বলিল—'সর্ব্বনাশ!'

—'সর্ব্বনাশ না ছাই। আমি মরে' গেলে কার কি!'

—'অমন কথা বোলো না লক্ষ্মীটি—আমি তোমাকে ভালবাসি।'

অলকা মাথা নাড়িয়া বলিল—'না না, তুমি আমাকে ভালবাস না।'

অতুলানন্দ প্রতিবাদ করিয়া কহিল—'নিশ্চয়ই ভালবাসি। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

ইতিমধ্যে অসমঞ্জ ও কিরণবাবু তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কথাটা শুনিয়া কিরণবাবুর হাসি পাইয়াছিল,—কিন্তু হাসি চাপিতে গিয়া তিনি কাশিয়া ফেলিলেন। কাশির শব্দ শুনিয়া অতুলানন্দ ও অলকা চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল। কিরণবাবু বলিলেন—'আপনারা ওখানে কেন অতুলবাবু—এখানে আসুন। ও জায়গাটা কিন্তু বিপজ্জনক।'

'যা বলেছেন কিরণবাবু!'—বলিয়া অতুলানন্দ অলকাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া আসিল।

কিরণবাবু অতুলানন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

শ্রীনিরুপমা দেবী

(শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব দিনে,
স্থান—সমাজ-বাড়ী)

শুনি গৌড় অধিপের পুত্রেরো অধিক
ছিলে হে 'দবীর খাস্' 'সাকর মল্লিক!'
'বাদ্‌শাজাদার সম অসীম সম্মান
হেলায় ঠেলিলে শুনি যাঁহার আহ্বান,
অসীম সম্পদ আর কারার শৃঙ্খল
যাঁর আকর্ষণ রোধে ধরেনিক বল!
সে রাজরাজের আজি পাদপীঠতলে
কি আসনে বসি আছ! হের দলে দলে
ছুটিছে বৈষ্ণবযূথ গুরু-পূর্ণিমায়
হে বৈষ্ণব-কুলগুরু, পূজিতে তোমায়
তোমার 'শূচক' গাহি! করিছে মুণ্ডন
তব তিরোভাব স্মরি! করিল ধারণ
'মুড়িয়া-পূর্ণিমা' নাম এই শোক তিথি!
কোথা তুচ্ছ গৌড়ভূমে ধন জন খ্যাতি
কোথা সে হুসেনশাহ বাদ্‌শার নাম
ইতিহাসে মিলে কি না মিলে সে সন্ধান।
মহা ত্যাগ, মহা বৈরাগ্যের পরীক্ষায়
জয়ী তুমি মহাবীর মহা মহিমায়!
হে বৈষ্ণব-স্মৃতিকার! তব নাম রাজে
যাঁর পারিষদরূপে 'ছয়-প্রভু' মাঝে!
তাঁরি নাম সহ আজি বৈষ্ণব হৃদয়ে
"জয় সনাতন প্রভু" ফেরে তারা গেয়ে।
তোমার কাহিনী শত, স্মৃতিগাথা তব
হেরি এই ভগ্নস্তূপে আজি অভিনব!
ভগ্ন উচ্চ শ্রীমদনমোহন মন্দিরে,
'আদিত্য-টিলার' প্রতি ইষ্টক অক্ষরে,
প্রতি বৃক্ষ লতা তৃণে, প্রতি স্তূপে বনে
আজি ব্রজবাসী তব মদনমোহনে
পিতৃকৃত্য শ্রাদ্ধকামী সন্তানের ভাবে
বসাইয়া সম্পাদিছে শ্রাদ্ধ মহোৎসবে।
জানায়ে নিজের শ্রদ্ধা ভরেনি হৃদয়ে,
তোমার দেবতা দিয়ে তোমারে পূজিয়ে
তবে লভে তৃপ্তি, হেরি আঁখি জলে ভাসি,
জয় সনাতন প্রভু! জয় ব্রজবাসী।

কুম্ভমেলার স্মৃতি

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

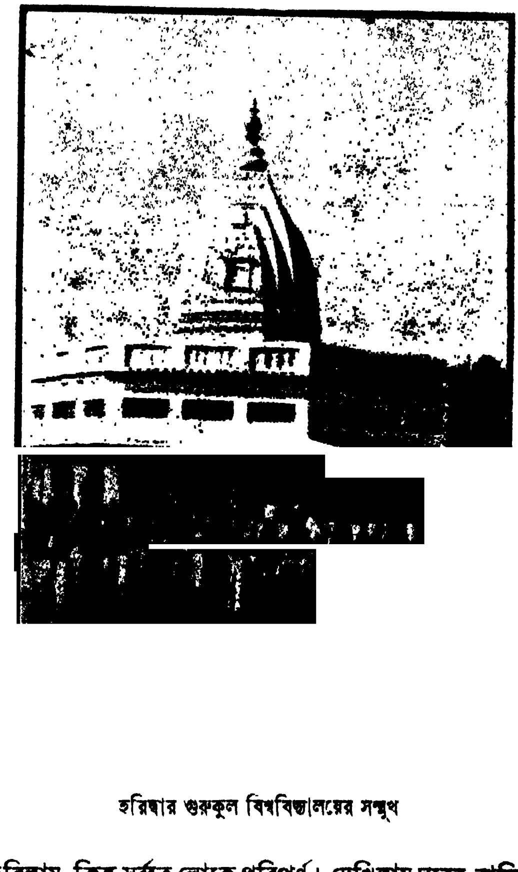
ভ্রমণ

সহধর্ম্মিণীর ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে এবার হরিদ্বার কুম্ভমেলা দেখিয়া আসিলাম। মেয়েদের পক্ষে যাহা তীর্থভ্রমণ, পুরুষের পক্ষে তাহা অধিকাংশ স্থলেই দেশভ্রমণ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়—আমিও প্রায় তদ্রূপ মন লইয়াই গৃহিণীর তীর্থযাত্রার সহগামী হইয়াছিলাম, কিন্তু পাইয়া আসিয়াছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

হরিদ্বারে কুম্ভের বিশালতা মনের মধ্যে এমনই একটা ছাপ মারিয়া দিয়াছে যে, কলিকাতায় ফিরিয়া আজ কয়েক সপ্তাহ কাল স্বপ্নের মধ্যেও কুম্ভের জনসমুদ্র উপভোগ করিতেছি। কুম্ভমেলায় ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধারা কিছু কিছু দেখিবার সুযোগ পাইয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি তাহাতে লাভবানই হইয়াছি।

কুম্ভমেলা ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব। এবার হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা গেল, এত অধিক জনসমাগম নাকি ইতিপূর্ব্বে হরিদ্বারে কিম্বা কোন স্থানের কুম্ভেই হয় নাই। জনসংখ্যা হিসাব করিবার কোন উপায় নাই—পূর্ণকুম্ভ অর্থাৎ মুখ্য-স্নান দিবস ৩০শে চৈত্র যাত্রীসংখ্যা হইয়াছিল—বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতে বিশ লক্ষ হইতে পঞ্চাশ লক্ষ। ইহা ভিন্ন মাঘ হইতে চৈত্র তিনমাস প্রতিদিন সহস্র সহস্র যাত্রী আসিয়াছে গিয়াছে—এই কুম্ভমেলা দর্শনে। ই-আই-রেল কোম্পানী তাহাদের টিকিট বিক্রয়ের হিসাব দৃষ্টে যে যাত্রী-সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা নগণ্য মাত্র—তাহার দশগুণ কি শত গুণ যাত্রী পদব্রজে এই হরিদ্বার কুম্ভে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নির্ণয় কে করিবে?

২৬শে চৈত্র কলিকাতা হইতে সস্ত্রীক হরিদ্বার কুম্ভমেলা দর্শনে যাত্রা করি। দীর্ঘ পথের কষ্ট লাঘবার্থ পথে অযোধ্যা এবং লক্ষ্ণৌতে নামিয়া বিশ্রাম করিয়া পূর্ণকুম্ভের পূর্ব্ব দিবস ২৯শে চৈত্র মধ্যরাত্রিতে আমরা হরিদ্বার পৌঁছিলাম। দেখিলাম কুম্ভ উপলক্ষে ষ্টেশনটি বিশালায়তনে নবনির্ম্মিত হইয়াছে। জনকোলাহলের মধ্যে ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিতেই রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী আমরা দুজনে কোথায় গিয়া উঠিব—বাকী রাত্রিটুকুই বা কোথায় কাটাইব কিছুই স্থির ছিল না—তার জন্য কোন ভাবনাও ছিল না। আমরা প্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া নগরের দিকে চলিলাম—দেখিলাম অত রাত্রি, তবু রাস্তায় বহু লোক চলিতেছে। রাত্রি কাটাইবার জন্য কত বাসভবন কত ধর্ম্মশালায় স্থানের চেষ্টা



হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখ

করিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্র লোকে পরিপূর্ণ। দেখিলাম ঘরের বাহিরে এবং রাস্তার পার্শ্বে পর্য্যন্ত যাত্রীগণ শয়ন করিয়া বা বসিয়া কাটাইতেছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালীগণ স্থান পাইয়া থাকে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নীচের বারান্দা হইতে তিন

তলার ছাদ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া যাত্রী শয়ন করিয়া রহিয়াছে—দোতলা তেতলার সিঁড়িগুলিতেও লোকে কোনমতে মাথা পাতিয়া ঘুমাইতেছে। দোতলার একটি প্রশস্ত হলঘরে অপেক্ষাকৃত শীত কম দেখিয়া সেইখানেই কোনমতে আমার স্ত্রী মেয়েদের মধ্যে এবং আমি পুরুষদের মধ্যে নিদ্রা গেলাম। সকালে উঠিয়া দেখিলাম এই ধর্ম্মশালায় যাঁহারা স্থান পাইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। অতি সহজেই এখানে আমাদের থাকিবার স্থান মিলিল—পরিচিত লোকও কয়েকজন পাইলাম।

৩০শে চৈত্র—আজ পূর্ণকুম্ভ স্নান দিবস। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আমরা দুজনে কুম্ভযোগ দর্শন মানসে মহা-



হরিদ্বার-মনসাপাহাড়ের গাত্রে ভীমগদা মন্দির

উৎসাহের সহিত যাত্রা করিয়া গঙ্গাভিমুখী জনশ্রেণীর মধ্যে মিলিয়া গেলাম। রাস্তা পথ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত। যোগ উপলক্ষে প্রত্যেক রাস্তায়ই গমন ও আগমনের পথ দুইদিকে বিভিন্ন করা হইয়াছে। উভয়পার্শ্বের যাত্রীশ্রেণী পরস্পর বামে রাখিয়া চলিতেছে। সরকারী পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ রাস্তার মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া যাত্রীগণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেছে।

প্রথমেই আমরা গঙ্গাদর্শন মানসে নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুঘাটে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার নির্ম্মল জল খরস্রোতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া কুলুকুলু প্রবাহিত হইতেছে। দূরে গভীর জল। কুম্ভ উপলক্ষে যাত্রীগণের এপার ওপার হইবার জন্য কয়েকটি অস্থায়ী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ যাত্রীগণ গমনাগমন করিতেছে—এপার ওপার—নিকটে দূরে সর্ব্বত্র জনাকীর্ণ। দেখিলাম কত যাত্রী গঙ্গাতীরে রাত্রি বাস করিয়াছে—মৃত্তিকা শয্যায় কেহ বসিয়া আছে, কেহ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ এইখানে বসিয়া হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও যাত্রীগণের গতিবিধি দেখিতে লাগিলাম।

হরিদ্বার গঙ্গাতীরে প্রায় দুই মাইল স্থান লইয়া অনেকগুলি স্নানঘাট আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড নামক ঘাটের মাহাত্ম্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মকুণ্ডের কথা ইহার পরে উল্লেখ প্রয়োজন হইবে, এখানে ইহার পৌরাণিক বৃত্তান্ত একটুকু বলিয়া লই। গঙ্গা বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রবল বেগে পতিত হইতেছিলেন তাহা ধরিত্রী দেবীর পক্ষে অসহনীয় বুঝিয়া মহাদেব নিজ মস্তক পাতিয়া সেই বেগ ধারণ করেন, মহাদেবের জটাজাল হইতে মুক্ত হইতেই ব্রহ্মা গঙ্গাকে কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে মুক্তি পাইয়া গঙ্গাদেবী এই হরিদ্বার ক্ষেত্রে পতিত হন। যে স্থানটিতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতিত হইয়াছিলেন সেই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। এই ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটেই কুম্ভস্নান করিতে হয়।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমরা বিষ্ণুঘাটে অবস্থান করিয়া বেলা এক প্রহরের সময় ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট দর্শন মানসে চলিলাম। সে কি আর পথ চলা—পথে জনস্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে হইল। ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম গঙ্গাতীরে প্রায় দুইশত ফিট প্রস্থ করিয়া ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম্ম এমনই জনতায় পূর্ণ হইয়াছে যে, আর সম্মুখে অগ্রসর হইবার উপায় নাই—

তখনও কুণ্ড প্রায় সহস্র ফিট দূরে। এই সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম্মের সমস্ত অংশ হইতেই স্নানের জন্য প্রস্তুত সোপান শ্রেণী গঙ্গায় গিয়া নামিয়াছে। এখানেও স্নানার্থীগণের জনতা এত অধিক যে, প্রত্যেককেই অতি কষ্ট করিয়া স্নান করিতে হইতেছে।

স্ত্রী সঙ্গে রহিয়াছেন—প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার উল্লেখ অনেকবারই করিতে হইবে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটু পরিচয়ও ছিল—'মাতৃমন্দির' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সুশীলা নন্দী। অতঃপর তাহার 'শীলা' ডাক নামটি ব্যবহার করিতে থাকিব। শ্রীমতী শীলা বলিলেন—তবে এখন এখানেই স্নান করলে হয় না? আমি বলিলাম, এই যে জনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি, এর পরেও আবার গঙ্গাস্নান! অবশ্য এই জনসমুদ্র উপভোগ আমাদের বিশেষভাবের আনন্দদায়কই হইতেছিল। এত ভীড়ের মধ্যে স্নান করা আমার ইচ্ছা ছিল না। শীলা যথারীতি গঙ্গাস্নান করিলেন, স্নানের পর তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দর্শনে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আরম্ভেই বলিয়াছি গৃহিণীর তীর্থ ভ্রমণ—আমার দেশভ্রমণ মাত্র। এই যে প্রকৃতির রমণীয় ক্ষেত্র হরিদ্বার দর্শন করিতেছি, এই যে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার ধারা দেখিতে পাইতেছি ইহাই আমার তীর্থের লাভ। কুম্ভযোগ বাস্তবিক যোগ বটে, এরূপ যোগ দর্শন ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। জনতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের আশ্রমে ফিরিবার পথে অপেক্ষাকৃত জনবিরল একটি ছায়াময় ঘাটে সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া আমরা একটু বিশ্রাম করিলাম এবং এইখানে আমি স্নান সমাপন করিলাম। এখানে স্রোত এতই প্রবল যে, স্নানের জন্য তীরে স্থানে স্থানে লোহার শিকল বাঁধা রহিয়াছে, স্রোতে ভাসিয়া যাইবার ভয়ে এই লোহার শিকল ধরিয়া স্নান করিতে হয়। বেলা বারোটায় আমরা আমাদের থাকিবার স্থান ভোলাগিরির ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম।

বিকাল তিনটার পর হইতে সন্ন্যাসীগণের স্নান আরম্ভ হইবে। বহু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড স্নানে যাইবেন। এই সময় সন্ন্যাসীগণ ব্যতীত আর কোন যাত্রী ব্রহ্মকুণ্ডাভিমুখী হইতে পারিবে না—বিপদের আশঙ্কায় সরকার হইতে এরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। রেল ষ্টেসন হইতে ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত হরিদ্বারের সদর রাস্তাটি—কুণ্ডের খানিকটা দূর হইতেই বিরাট লৌহময় একটি দরজা (গেট্) একেবারে আবদ্ধ করিয়া যাত্রীগণের গমন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গার উভয় তীর বহিয়াই সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা চলিবে। সমস্ত হরিদ্বারে যে যেখান হইতে পারে এই শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাই কুম্ভমেলার প্রধান দর্শনীয় বিষয়।



হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাটের সোপানাবলী

দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আমাদেরই একটু বেশী। শীলার আগ্রহাতিশয্যে গঙ্গার অপর পারে গিয়া যেখান হইতে সন্ন্যাসীগণ যাত্রা আরম্ভ করিয়া গঙ্গাপার হইবেন তথায় গিয়া দেখিতে হইবে, ইহাই স্থির হইল। বেলা দুইটা, তখনও আমাদের পূর্ব্বাহ্নের শ্রম ক্লান্তি দূর হয় নাই, আমরা যাত্রা করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের বিপরীত দিকে অতি দূরের একটি পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পারে পৌঁছিলাম। হরিদ্বারের

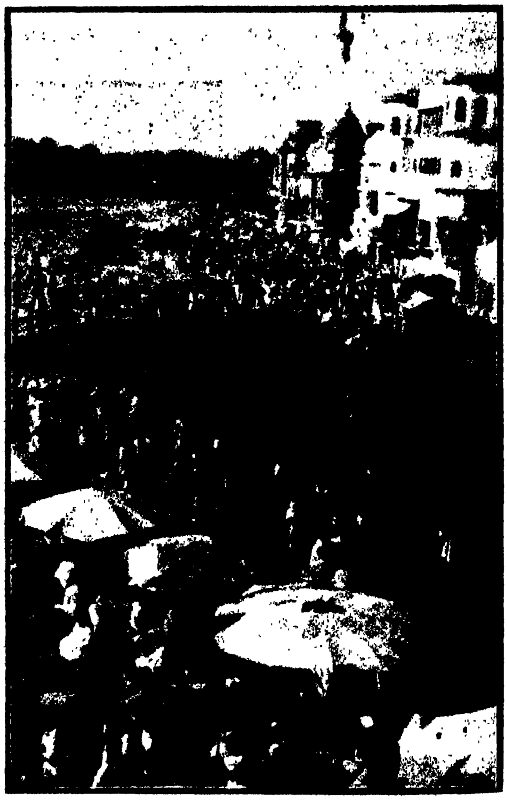
পার অপেক্ষা এ পারের স্থান বিস্তীর্ণ—রাস্তাগুলি খুবই প্রশস্ত। হরিদ্বারের পারে স্থানাভাববশত মেলার অধিকাংশ দোকানপাটই এই উত্তর পারে বসিয়াছে।

জনকোলাহলের মধ্য দিয়া আমরা মনোনীত স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। অনতিদূরে ব্রহ্মকুণ্ড এবং সন্ন্যাসীগণের আগমনের সেতু বেশ স্বচ্ছন্দে দেখা যাইতেছিল। এইখানে গঙ্গা প্রস্থে অনুমান তিন শত ফিট হইবে—কলিকাতার গঙ্গার চতুর্থাংশ মাত্র। দেখিতে দেখিতে নানা দিক হইতে সন্ন্যাসীগণ আসায় ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী প্রসারিত গঙ্গাতট ভরিয়া গেল। জয়ঢাক ঢোল ও সন্ন্যাসীগণের শিঙ্গাধ্বনিতে



হৃষীকেশ শিবমন্দির

গঙ্গাতট অপূর্ব্ব শব্দায়মান হইয়া উঠিল। এপারে আমাদের অতি নিকটে কমবেশী চল্লিশটি বৃহদাকার হস্তী সজ্জিত হইতেছে, কতকগুলি উষ্ট্র ও অশ্ব ঐ সঙ্গে ছিল। মহাবাদ্য কোলাহল সহকারে ব্রহ্মকুণ্ড তট হইতে সন্ন্যাসীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুলের উপর দিয়া এ পারে আসিতে লাগিল। প্রথমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বরগণ আসিয়া নিজ নিজ হস্তীপৃষ্ঠে, কেহ উষ্ট্র, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল, প্রশস্ত গঙ্গাতট ধরিয়া হস্তী আরোহণে মণ্ডলেশ্বরগণ একের পর আর চলিতে আরম্ভ করিলেন। তার পর এক এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসীশ্রেণী পর পর চলিতে আরম্ভ করিলেন। কোন দল ধ্বজাধারী, কোন দল কুঠার বা বল্লমধারী, কোন সম্প্রদায়ের হস্তে দীর্ঘ লাঠি, কোন দল গৈরিক বেশধারী, কোন দল কম্বলধারী, কোন দল উলঙ্গ। এই মত এক সম্প্রদায়ের পর অপর সম্প্রদায় দম্ভের মূর্ত্তিতে চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই মত এই শোভাযাত্রা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া নির্দ্ধারিত পথ অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া স্নান করিল।



হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখস্থ দ্বীপের একাংশ (নিম্নে)

নাগা সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রাই বেশী আড়ম্বরপূর্ণ; তারপর বোধ হয় পঞ্জাবী আকালীদিগের গ্রন্থসাহেবের শোভাযাত্রাই অধিক চিত্তাকর্ষক দেখা গেল। নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, শৈব, বৈষ্ণব, নাথ, দণ্ডী ইত্যাদি কত যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দেখা গেল; ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞান না থাকায় বিস্তারিত বর্ণন করিতে পারিলাম না। আর্য্যসমাজী, শিখ, সনাতনী প্রভৃতি সম্প্রদায় সন্ন্যাসী

দলভুক্ত কি-না জানি না। ইঁহারাও এই সন্ন্যাসী মিছিলে যোগদান করিয়াছিলেন।

গঙ্গা পার হইয়া আশ্রমে আসিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা স্বচ্ছন্দভাবে দেখিবার জন্য বহু লোক হরিদ্বারের গঙ্গার অপর পারে গিয়াছিল। যদিও এই কুম্ভ উপলক্ষে গঙ্গার উপর ক্রমাগত দশটি সাময়িক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল তথাপি ইহাও যাত্রী পারাপারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ফিরিবার সময় পুলের উপর আমরা যেরূপ জনতার চাপে পড়িয়াছিলাম তাহা জীবনের এক বিপদের অবস্থাবিশেষ!

কুম্ভের পৌরাণিক ব্যাখ্যা এই,—দেবাসুরে সমুদ্র-মন্থনকালে যে সকল অমূল্য বস্তু লাভ হইয়াছিল তাহার মধ্যে অমৃতকুম্ভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কুম্ভ লইয়া দেবদানবে বহু

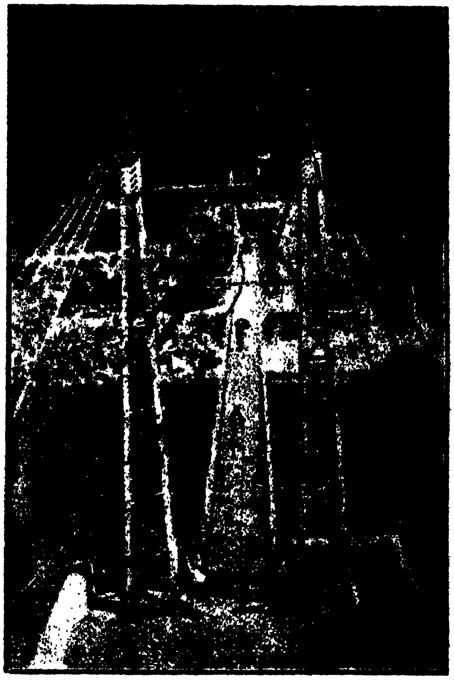


হরিদ্বার—গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ চণ্ডীপাহাড়ে চণ্ডীদেবীর মন্দির

সংগ্রামের পর রাহু ঐ অমৃতকুম্ভ লইয়া পলায়ন করে। পলায়নকালে অতর্কিতে ঐ পূর্ণ কুম্ভ হইতে প্রথমে হরিদ্বারে পরে প্রয়াগে, গোদাবরী তটে এবং আরও কয়েক স্থানে মোট দ্বাদশটি স্থানে কুম্ভ হইতে অমৃত পতিত হয়। এই স্থান-গুলির প্রত্যেক স্থানে বারো বৎসরে এক একবার কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। হরিদ্বারের কুম্ভযোগ সর্ব্বপ্রধান, তৎপরে প্রয়াগের কুম্ভ, অন্যান্য স্থানগুলি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রতি বারো বৎসরের মাঝখানে ছয় বৎসরে অর্দ্ধকুম্ভ হইয়া থাকে। হরিদ্বারের কুম্ভযোগ চৈত্র মাসে আর প্রয়াগের কুম্ভ মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হরিদ্বারে আমরা এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া অনেক দেখা শোনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কুম্ভের পর দিবস ১লা বৈশাখ (বর্ত্তমান ১৩৪৫) আমরা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের ঠাকুর দেবতাগুলি এবং ভীমগদা মন্দির দর্শন করি। ঘাটে এবং ঘাটের উপরে বহুসংখ্যক দেবালয় ও বিগ্রহ আছে। ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট অতি প্রশস্ত এবং গঙ্গাগর্ভে কয়েকটি ছোট দ্বীপের উপর মন্দির ও প্লাটফর্ম্ম প্রস্তুত হওয়ায় ইহা চারিদিকে বেষ্টনী দ্বারা ঠিক একটি বৃহদায়তন কুণ্ডের মতই করা হইয়াছে। ঘাটে প্রস্তরখণ্ডে বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে—ইহা "হরি কী পারি" নামে বিশেষ খ্যাত। তীর্থ-যাত্রীর অবশ্য দর্শনীয়।

ভীমগদা হরিদ্বারের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটি দর্শনীয়



লছমনঝোলা (সম্মুখের দৃশ্য)

স্থান—শাস্ত্রমতে পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণপথে অবস্থিত, ভীম নাকি তাঁহার গদা এইখানে রাখিয়া যান। এখানে পর্ব্বতগাত্রে একটি মন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবাদি অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন এখানে কালভৈরব, নারায়ণের অনন্তশয্যা, গুপ্ত-গঙ্গা অবস্থিত। ভীমগদা মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহদায়তন কুণ্ড আছে, পাণ্ডাগণ ইহার মধ্যে যাত্রীগণকে ভীমের গদা দেখাইয়া থাকেন। ভীমগদাকে স্থানীয় লোকের ভাষায় ভীম গোডা বা ভীম গোড়া বলা হয়।

মনসা-পাহাড় নামে একটি পাহাড় ব্রহ্মকুণ্ড ও ভীমগদার নিকট দক্ষিণাংশে অবস্থিত। উপরে মন্দিরে মনসা দেবী এবং

নিকটে অপর মন্দিরে বিশ্বকেশ্বর দেব অবস্থিত। এই পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ পথে দেরাডুন এবং হৃষীকেশ রেলপথ গিয়াছে।

১লা বৈশাখ (১৩৪৫) সকালে উঠিয়াই আমরা দুজনে গঙ্গাতটাভিমুখে গমন করিলাম। শীলার গতকল্য ভাল করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড দেখা হয় নাই—আজ তিনি প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন ও স্নান করিবেন। আমার মন কিন্তু পাহাড়ের উপর টানিতেছিল, পাহাড়ের উপর গিয়া চারিদিকের দৃশ্য



হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ দিবসে সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা (প্রথমাংশ)

দেখিব ইহাই একান্ত ইচ্ছা। স্থির হইল, প্রথমে মনসা পাহাড়ের উপর গিয়া সমগ্র হরিদ্বারের শোভা দেখিতে হইবে, তারপর গঙ্গা স্নান করিব। মনসা পাহাড়ের প্রান্ত বহিয়া রেলপথ গিয়াছে। আমরা সেই রেলপথ ধরিয়া খানিকটা পাহাড়ে উঠিবার পথ পাইলাম। সম্মুখে রেল লাইন সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়াছে। দেখা গেল—সকাল সাড়ে সাতটায় একখানি যাত্রীপূর্ণ ট্রেণ হৃষীকেশাভিমুখে আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া সুড়ঙ্গ-পথে মনসা পাহাড়-গর্ভে প্রবেশ করিল। গঙ্গা দর্শনে যাত্রীগণ "হর-হর-হর", "গঙ্গা মাঈকী জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। ধীরে ধীরে আমরা পাহাড়ের উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম, কোন সিঁড়ি বা ভাল পথ নাই। বহু যাত্রী মনসা দেবী দর্শন আশায় পাহাড়ে উঠিতেছে, আঁকা বাঁকা পথ—কোন স্থান বালুকাময়, কোন স্থানে অত্যন্ত খাড়াই—বিপদসঙ্কুল, কোন স্থান এমনই সঙ্কীর্ণ যে নাসা-ওঠা লইয়া যাত্রীগণের মধ্যে কষ্টকর চাপাচাপি হইতেছে। পাহাড়টি সম্ভবত দুই হাজার ফিটের অধিক উঁচু নয়, সর্বোপরি মনসা মন্দির অবস্থিত। আমরা অর্দ্ধ পথ উঠিতেই দুইবার পথে বিশ্রাম করিলাম। পরে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া হরিদ্বার নগর ও গঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। দূরে উত্তর ও পূর্ব্বাভিমুখে হিমালয় শ্রেণীর চূড়া পর পর দেখা যাইতেছিল। অতীব রমণীয় দৃশ্য। উপর হইতে ফেরত যাত্রীদের মুখে শুনিলাম, উপরে মন্দিরে মনসা দেবী ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। রৌদ্র ক্রমেই প্রখর হইতেছিল।

শীলার মন মনসা দেবী অপেক্ষা গঙ্গা দেবীই অধিক আকর্ষণ করিতেছিলেন। পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আমরা গঙ্গাতীরের প্রশস্ত রাস্তায় জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখান হইতে গঙ্গাতট বহিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট দিয়া একেবারে পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পথে রাস্তাটি চলিয়াছে। গতকল্যের পূর্ণকুম্ভ স্নান করিয়া আজ অসংখ্য যাত্রী হৃষীকেশ, লছমন্‌-ঝোলা, স্বর্গদ্বার ও কেদার বদরীর পথে ধাবমান হইয়াছে। রাস্তাটি এমনই পূর্ণ হইয়া লোক চলিয়াছে যে, কোন্ সময় যে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট হইয়া দূরে গিয়া একেবারে ভীমগদা ঘাটে উপনীত হইয়াছি তাহা বুঝিতেই পারি নাই। রাস্তার পশ্চিমে ভীমগদা মন্দির, বিস্তৃত গঙ্গার চড়া, কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গার ধারা। সর্ব্বত্রই যাত্রীর ভীড়। এখানে অনেক দোকানপাট বসিয়াছে। শীলা দেশে গিয়া বন্ধুবান্ধবকে হরিদ্বারের স্মৃতি উপহার দিবার জন্য অনেকগুলি রুদ্রাক্ষ মালা ও চিত্রপট ক্রয় করিলেন; আমি একটি শালগ্রামশিলা ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে শীলা নিষেধ করিলেন—অব্রাহ্মণের নাকি উহাতে অধিকার নাই। আমি বলিলাম, পূজা করিব না—হরিদ্বারের স্মৃতিস্বরূপ ইহা আলমারী সাজাইবার বেশ একটা উপকরণ হইবে।

...লা হাসিয়া ফেলিলেন—অর্থাৎ হিন্দুর সন্তান হইয়া আমার এতটুকু বুদ্ধি নাই যে, শালগ্রাম শিলা খেলার পুতুল নয়।

শালগ্রাম লওয়া ক্ষান্ত দিতে হইল।

অনন্তর আমরা গঙ্গার তীরে আসিয়া দেখিলাম গঙ্গার এক নূতন মূর্ত্তি। উত্তরে হিমালয় হইতে গঙ্গা অবতীর্ণ হইয়া এইখানেই প্রথম হরিদ্বারে পতিত হইয়াছেন—প্রশস্ত কয়েকটি জলধারা অগভীর খরস্রোত বহিয়া ছোট-বড় প্রস্তররাশির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নির্ম্মল জল গঙ্গার তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেখা যাইতেছে। অনতিদূরেই ব্রহ্মকুণ্ড।

এখানকার হরিদ্বারের এই প্রথম গঙ্গাধারার অভিনবত্ব দেখিয়া আমরা এখানেই স্নান করিলাম। মাঝ গঙ্গায় মাত্র কোমর পর্য্যন্ত জল। কিন্তু এমনই খরস্রোত যে আমরা মাঝ গঙ্গায় উপনীত হইতে পারিলাম না। অপেক্ষাকৃত কম জলে দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলাম। এই স্নানে আমাদের পরম আনন্দ অনুভূত হইল। মনে হইল, হিন্দুর ধর্ম্ম যদি সত্য হয় তবে ইহাই পরম পবিত্র ক্ষেত্র—এই স্নানই পরম পবিত্র স্নান, মানুষের শুদ্ধি লাভের স্থান। বৎসরের প্রথম দিবসের এই পুণ্য-স্নান আমাদের দুজনের মনে এক নূতন ধারা আনিয়া দিয়াছিল।

পরবর্ত্তী দুইটি দিন আমরা বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বসিয়া আমরা যে সকল সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিতাম তাহাদের যে সকল আলোচনা শুনিতাম তাহা আমাদের এই অবকাশ সার্থক করিত। ৪ঠা বৈশাখ মধ্যাহ্নের পর হরিদ্বারের পূর্ব্ব পারে মেলার মধ্যে এমন অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল যে, সমগ্র হরিদ্বার তাহাতে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ছাদের উপর হইতে আমরা সেই অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী অগ্নি দেখিতে পাইতেছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ৩।৪ বার ঐ স্থানে সামান্য আগুন লাগিয়া ৮।১০ খানা করিয়া ছাউনী পুড়িয়া যায় কিন্তু এদিনকার আগুন অতি ভীষণ। সমস্ত ঘরই ছিল মেলা উপলক্ষে খড় কাঠ ও টিনের চালার তৈরী। ক্ষতি কত হইয়াছিল কে তাহার হিসাব করিবে।

কুম্ভমেলায় রোগ, ব্যাধি, আকস্মিক দুর্ঘটনা সংবাদপত্রে আমরা যত দেখিতে পাইয়াছি তাহা সঠিক কি-না বলিতে পারি না, কারণ—আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, যাত্রীগণের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, শেষের দিকে দু-দশটা কলেরা দেখা দিয়াছিল মাত্র। এত জনতা হইলেও নগরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা যথেষ্ট হইয়াছিল। পথে ঘাটে কোথায়ও মলমূত্র দেখা যায় নাই।

একদিন ভ্রমণে বাহির হইয়া কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং কিঞ্চিৎ দূরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের হাসপাতালটি ওখানে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কীর্ত্তি। হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় হরিদ্বারের একটি গৌরবময় নিদর্শন। ছাত্র-বিভাগ এবং ছাত্রী-বিভাগ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এখানে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত পরিচয় করিয়া বুঝিলাম—সকলেই এক নূতন আনন্দের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছে।

হরিদ্বার হইতে আরও উত্তরে গিয়া তিনটি দিন হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। হৃষীকেশে হরিদ্বারের মত বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার কালী-কমলীওয়ালা ধর্ম্মশালাটি অতি বৃহৎ—আমরা যেদিন এখানে অবস্থান করিতেছিলাম সেদিন অন্তত তিন সহস্র যাত্রী এখানে স্থান পাইয়াছিল। এখানকার শিবমন্দির ও ভরতজী মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া আরও বহু মন্দির আছে। হরিদ্বার অপেক্ষা হৃষীকেশ ক্রম-ঊর্দ্ধ পাহাড়িয়া পথ। লছমন ঝোলা হৃষীকেশের আরও চারি মাইল উত্তরে। লছমন ঝোলা বর্ত্তমানে গঙ্গার উপর বৃহদায়তন নবনির্ম্মিত ঝোলান পুল, সম্পূর্ণ লৌহের প্রস্তুত। লছমন ঝোলা পার হইয়া দেখিলাম—আর সমভূমি নাই—হিমালয় ক্রম-ঊর্দ্ধ উঠিয়াছে।

এতদঞ্চলের কয়েকটি বাঙ্গালীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছি। হরিদ্বারে—ভোলানন্দগিরি আশ্রম ও ধর্ম্মশালা, কনখলে—রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং মহানন্দ মিশন, গঙ্গাভাগীরথী ধর্ম্মশালা। হৃষীকেশে—তারা দাতব্য চিকিৎসালয়। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কুম্ভ উপলক্ষ্যে যে সকল বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান হরিদ্বারে গিয়া জনসেবার সহায়তা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী, ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ইলেক্‌ট্রিক আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়। হরিদ্বার ঋষীকুল আশ্রমের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের অধ্যক্ষ কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে বহু লোককে আশ্রয়াদি দানে সহায়তা করিয়াছিলেন। দুই সপ্তাহকাল অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া যে সকল জিনিষ উপভোগ করিয়া আসিলাম তাহার স্মৃতি জীবনে প্রচুর আনন্দ দিবে।

অভিশপ্ত নীলা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

বাহিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

এই অল্পক্ষণ হয় হাসপাতাল হইতে ফিরিয়াছি। ধড়াচূড়াগুলি এখনও গা হইতে নামান হয় নাই। কেবলমাত্র গা হইতে ভারী কোটটা খুলিয়া চেয়ারের হাতলে ঝুলাইয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি।

সহসা এমন সময় দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ।

নাঃ—জ্বালালে দেখছি। মুহূর্ত্তে মনটা বিগড়াইয়া গেল। এ লোক-গুলির বিবেচনা বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই।

একবার ভাবিলাম দূর হোক্ গে ছাই। সাড়া দিব না, ফিরিয়া যাক্। আবার পরক্ষণেই মনে হইল, সরকারের গোলাম—কে জানে কেন ডাক পড়িয়াছে।

ততক্ষণ বাহিরের দরজার কড়া দুটা আবার যেন কে আরো জোরে নাড়া দিল। একান্ত অনিচ্ছার সহিতই বিরক্তচিত্তে বন্ধ দরজাটার দিকে আগাইয়া গেলাম। দরজাটা খুলিতেই প্রবল একটা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টার সাথে সাথে কে একজন যেন আমাকে একপাশে ঠেলিয়াই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি দরজাটা চাপিয়া খিল লাগাইয়া দিলাম।

দরজাটা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আগন্তুক আমার দিকে তাকাইয়া হাত দুটি জোড়ো করিয়া মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, নমস্কার!

প্রত্যুত্তরে আমিও কোনমতে প্রতি-নমস্কার জানাইলাম।

বসুন। হাত দিয়া সম্মুখের একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলাম।

ভদ্রলোক আমার নির্দ্দেশমত সম্মুখের চেয়ারখানিতে গিয়া উপবেশন করিলেন। সিলিং ল্যাম্পের খানিকটা আলো আগন্তুক ভদ্রলোকটীর মুখের এক অংশে তির্য্যক্‌ভাবে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকটীর দিকে বেশ একটু ভাল করিয়াই তাকাইলাম।

তাহার বয়সটা সঠিক যে কত, তাহা অনুমান করা খুবই কঠিন। তবে চল্লিশের কোঠাতেই সামান্য একটু এদিকওদিক বলিয়াই বোধ হয়!

কি মর্ম্মস্পর্শী তাহার শীর্ণ চোখের দৃষ্টিটুকু!

চোখের পাশের হাড়টা বিশ্রীভাবে ঠেলিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কালো চোখের মণি দুটা সেই কোথায় ঢুকিয়া গিয়াছে।

চক্ষু দুটী ছোট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন আরো প্রখর ও আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে চোখের দৃষ্টির কাছে কিছুতেই যেন নিজেকে ঠিক রাখা যায় না।

এক মাথা ভর্ত্তি কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এলোমেলো ও বিস্রস্ত! চুলের ফাঁকে ফাঁকে এই অল্পক্ষণ আগেই ভিজিবার দরুণ বৃষ্টির জলকণাগুলি ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করিতেছে।

গালের দুই পাশের মাংস পেশী অত্যন্ত বিশ্রীভাবে চুপসাইয়া যাওয়ায় সেখানকার হাড় দুটী সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া ব-এর আকার ধারণ করিয়াছে।

গায়ের শার্টটার উপরের দুইটী বোতামই ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ভিজা জামার কলার দুটো নেতাইয়া বুকের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

বুকের অনেকটা অংশই বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

ঘাড়ের দুই পাশের কণ্ঠা দুটী সুস্পষ্টভাবে দুই পাশে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

কণ্ঠের শিরা-উপশিরাগুলি সজাগ ও সুস্পষ্ট।

ঘরের অস্পষ্ট আলোয় তাহার সমগ্র মুখখানি ব্যাপিয়াই যেন একটা অতি উগ্র ও রুক্ষ ঋজু ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহাকে দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়—না-জানি কি এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি নিশিদিন অনুক্ষণ তাহার ভিতরে ভিতরে তাহাকে নিঃশেষে একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

ভদ্রলোকটী নিজেই প্রথমে ঘরের মৃত্যুর মতই ভারী নিস্তব্ধটাকে ভাঙ্গিয়া প্রশ্ন করিলেন, সিগারেট আছে?

নিঃশব্দে পকেট হইতে সিগারেটের কেস্‌টা ও দিয়াশলাইটা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে আগাইয়া দিলাম।

কেস্ হইতে একটা সিগারেট লইয়া ভদ্রলোক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটী ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইলেন।

দেখিলাম, তাহার বাঁ হাতের শীর্ণ অনামিকায় একটা নীলার আংটী! আংটীটা যেন একটা সাপের মত শীর্ণ অঙ্গুলীটী জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাঠির আগুনের উজ্জ্বল আভায় নীলাটা সাপের চোখের মতই ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। এত বড় আকারের নীলা আমি ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই।

জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়া নিভাইতে নিভাইতে ভদ্রলোকটী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—আমার আংটীর নীলাটা দেখছেন?

আমি মাথা দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

ভদ্রলোক আংটীশুদ্ধ অনামিকাটী আপন চোখের উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া কতকটা যেন আপন মনেই কহিতে লাগিলেন—হাঁ, এটা রক্ত নীলা, একবার এক সঙ্গে পাঁচশ টাকা দিয়ে এই আংটীটা আমি কিনি। এটী আমার বড় প্রিয়!

সহসা যেন একটা চাপা নিঃশ্বাস ভদ্রলোকটীর বুক কাঁপাইয়া ঠেলিয়া বাহিরে আসিল!

আমিও একদৃষ্টে আংটীর নীলাটীর দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

কি একটা অদ্ভুত সম্মোহন শক্তি যেন সেই পাথরটীর!

একদৃষ্টে পাথরটার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সহসা মাথাটার মধ্যে যেন কেমন একপ্রকার ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।

সহসা এমন সময় ভদ্রলোকটী বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান দিক্‌কার বুকটা সজোরে চাপিয়া ধরিলেন।

আমি চম্‌কাইয়া বলিলাম—কি হ'ল?

ভদ্রলোক যন্ত্রণাকাতর একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া কহিলেন—ওঃ ডাক্তার! সেই! আবার সেই বেদনাটা বুঝি উঠল!—উঃ!

আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

ভদ্রলোক অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা চাপিয়া ধরিয়া টেবিলটার উপর ততক্ষণে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে তাহার সর্ব্বশরীর কি এক দারুণ ব্যথায় বুঝি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আমি শুধু নিরুপায় অবস্থায় চুপটী করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোক যেন কতকটা সুস্থ হইলেন।

তাহার সমগ্র মুখখানি জুড়িয়া তখনও বেদনার যেন একটা অতি সুস্পষ্ট ছাপ!

আরো কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী বলিলেন, এই ডান বুকে কি যে একটা ভীষণ বেদনা!

উঃ অসহ্য! একেবারে 'আনবেয়ারেবল্'! মুখের ভাষায় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

উঃ ব্যথায় বুকের পাঁজরাগুলি যেন একেবারে গুঁড়িয়ে যায়! কত ডাক্তার, কত বদ্যি, কত কবিরাজ, কত ঔষধ! কত মালিশই যে লাগালাম! কিছু না! সবই বৃথা!

একটা অস্বাভাবিক গভীর উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভদ্রলোকটী হাঁপাইতে লাগিলেন!

উঃ এক দিন নয়, দু দিন নয়, এক মাস বা দু মাস নয়, দীর্ঘ পাঁচ-পাঁচটা বছর এই অসহ্য যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি। আমায় বাঁচান ডাক্তারবাবু! এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

সহসা এক সময় ভদ্রলোকটী চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া চঞ্চল পদবিক্ষেপে ঘরের মেঝেয় পায়চারী সুরু করিয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে এক সময় আবার তাহার সেই উত্তেজনার ভাবটা যেন একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল। টেবিলটার কাছে আগাইয়া আসিয়া কেস্ হইতে আর একটা সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

আপন মনেই সিগারেটটায় গোটাকয়েক টান দিয়া সহসা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি মনে করেন?

আজ্ঞে কি বলছেন?

কিন্তু এটা তো ঠিকই যে অসুখ আমার একটা আছেই; তা সে যে অসুখই হোক! নইলে এই অসহ্য ব্যথাটা আসে কোথা হতে! এ ত আর আপনাআপনি গজিয়ে উঠতে পারে না! কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখুন! আমি একেবারে কিন্তু ভুলেই গেছলাম, বলিতে বলিতে হঠাৎ পরক্ষণেই যেন ভদ্রলোক অত্যন্ত সজাগ হইয়া জামার নীচেকার পকেটটায় হাত চালাইয়া কি একটা বস্তু বাহির করিতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাতের মুঠোয় গোটা দুই-তিন দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে কহিলেন, হিয়ার ইজ ইওর ফিজ (Here is your fees); সত্যি! আমি আপনার ফিজের কথাটা একেবারে ভুলেই গেছলাম। Excuse me!

আমি লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, না না, তার জন্য আর কি?

হাঁ! কি বলছিলাম? হাঁ। আপনার কি মনে হয়?

ডাক্তারেরা কি বলেন? I mean আপনি আমার আগে যাদের দেখিয়েছিলেন?

কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন?

কি?

মনে হয় আমার বুকের ভিতর নিশ্চয়ই কোন ফাঁকটাক দিয়ে খানিকটা হাওয়া ঢুকে গেছে। এখন কোন না কোন উপায়ে যদি সেটা puncture করে বার করে দেওয়া যেত, তবে বোধ হয় আমার এ রোগ সারত। ···মাঝে মাঝে যখন সেই হাওয়ার চাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই বেদনাটা feel করি!···ডাক্তাররা আমার কথা শুনে হাসে। কিন্তু ডাক্তার, তুমি একটা সিরিঞ্জ দিয়ে আমার বুকের সেই জমা বিষাক্ত হাওয়াটা any how বের ক'রে দিতে পার? তুমি যা চাও তাই দেব! বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটী সহসা যেন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তোমরা যাই বল! আমি স্পষ্টই টের পাই সেই বদ্ধ হাওয়াটা বেরুবার কোন পথ না পেয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায়। মুক্তির জন্য তার কি দুর্জ্জয় গর্জ্জন। তোমরা শুনতে পাও না কিন্তু আমি পাই!··· দেখ! এই ঠিক—হাঁ এইখানটায়—বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটী সহসা দুই হাত দিয়া বুকের জামাটা সরাইয়া হাড়পাঁজরা বাহির করা বুকখানি চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরেন—'দেখ দেখি একটীবার কান পেতে, শুনতে পাবে তা'হলে কি সে দুর্জ্জয় গর্জ্জন! কি সে ক্রুদ্ধ আক্রোশ! উঃ! যেন একটা আগ্নেয়গিরি!···একটানা কথাগুলি বলিয়া ভদ্রলোক হাঁপাইতে লাগিলেন!

কথার ফাঁকে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখি সম্মুখের চেয়ারটী খালি, ভদ্রলোক নাই! ঘরের বদ্ধ দুয়ারটা খোলা! শুধু তখনও সেই নোট তিনখানি ঠিক তেমনিই টেবিলটার উপর পূর্ব্বের মত পড়িয়া! সহসা খোলা দরজা দিয়া একটা জোলো বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া টেবিলের উপর হইতে নোট তিনখানি উড়াইয়া ঘরের কোণে লইয়া গিয়া ফেলিল!

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, একদা সেই বর্ষারাতের আগন্তুকের স্মৃতিটা মনের কোণে ক্রমে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অবশেষে প্রায় মুছিয়াই গিয়াছিল।

সেদিনটাও ছিল একটা ধারামুখর দ্বিপ্রহর! বাহিরের ঘরে

চুপচাপ একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতেছি। চারিদিক আঁধার করিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। রান্নাঘরের টালীর চালে ছাতের পাইপ হইতে একটা মোটা জলের ধারা অবিশ্রাম ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে জলকণাবাহী এক একটা হাওয়ার ঝাপটা হা হা শব্দে ছুটিয়া আসিয়া হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে।

এই অবিশ্রাম বর্ষণমুখর প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া কেন না-জানি মনটা অকারণেই উদাস ও ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। গত জীবনের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ব্যথা ও বেদনাগুলি যেন মনের আনাচে কানাচে ব্যর্থতার একটা আলোড়ন জাগায়। জীবনের দীর্ঘযাত্রাপথে হাঁটিতে হাঁটিতে আজ কোথায়ই বা আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আর কোথায়ই বা চলিয়াছি! আবোল তাবোল এলো মেলো কত কি ভাবিতে ভাবিতে কোথায় কত দূরে যে চলিয়া গিয়াছিলাম, সহসা কে যেন পশ্চাত হইতে ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

চমকাইয়া মুখ ফিরাইলাম, কে!

নমস্কার! আমায় চিনতে পারছেন না?

চাহিয়া দেখি একটী ভদ্রলোক আমার আরাম-কেদারার একপাশে দাঁড়াইয়া। গায়ে একটা ভিজা বর্ষাতি! বর্ষাতির গা বাহিয়া জলের ধারা নামিয়াছে। মাথায় একরাশ বড় বড় চুল ভিজিয়া এলোমেলো ভাবে কপালের ও মুখের চারিপাশে নামিয়া আসিয়াছে।…কুৎসিত হাড়-জাগানো রুক্ষ মুখখানির দিকে তাকাইয়া মনে হইল, কবে যেন এমনিই একখানি মুখ কোথায় দেখিয়াছি! ভদ্রলোকটী ততক্ষণে গায়ের ভিজা বর্ষাতিটা গা হইতে নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ষাতিটা গা হইতে খুলিয়া রেলিংয়ের উপর রাখিয়া তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, চিনতে পারছেন না?

তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত হইলাম।

কি অন্তস্পর্শী তীব্র চাউনি! ধারালো ছুরীর ফলায় আলো পড়িলে যেমন ঝক্ ঝক্ করে, তাহার চোখের তারা দুটাও তেমনি ঝক্ ঝক্ করিতেছে; যেন নিমেষে মনের সবখানিই পড়িয়া নিতে পারে। এ দৃষ্টি যেন মুহূর্ত্তে অন্তরের অন্তঃস্তলে একেবারে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়। এই তীব্র চোখের দৃষ্টি যেন কোথায় দেখিয়াছি।…কবে? কার!

সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতই বহুদিন আগেকার একটী বর্ষণমুখর রাত্রের স্মৃতি আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল!

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম, হাঁ! হাঁ! মনে পড়েছে বটে! বসুন! বসুন!

ভদ্রলোক একটুখানি মৃদু হাসিয়া আমার সম্মুখের একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্মুখের টিপয় হইতে সিগারেট কেসটা তুলিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিলাম, সিগারেট, ধন্যবাদ!…ভদ্রলোক সিগারেট কেস্ হইতে একটা সিগারেট লইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। মনে হইল তিনি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

'আপনার অসুখটা আজকাল কেমন?'

আমার ডাকে ভদ্রলোক চমকাইয়া মুখ ফিরাইলেন—'অ্যাঁ', কি বললেন?

আপনার অসুখ?

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কহিলেন—কই আর! তেমনই আছে। বরং আজকাল আরো একটা নূতন উপসর্গ জুটেছে। এই উপসর্গটাই শেষ পর্য্যন্ত আমায় সত্যি সত্যিই বুঝি পাগল ক'রে তুলল।

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভদ্রলোক যেন এ কয় বৎসরে আরো শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। মুখটা আগের চাইতে আরো বেশী কৃশ ও লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী চাপান ছিল। সেই সিল্কের পাঞ্জাবীর তল হইতে তাহার নিরতিশয় রুগ্ন অস্থিময় দেহাবয়ব বিশ্রীভাবে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছিল।

সহসা একসময় ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকাইয়া অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনি বাইরে থেকে আমার এই শীর্ণ দেহটা দেখে ভাবছেন, আমার ভিতরটা বুঝি একেবারে সব নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে! কিন্তু মোটেই তা নয়; এখনও আমি অনায়াসেই আমার সাড়ে তিন মণ বারবেলটা মাথার উপরে তুলতে পারি! কিন্তু শক্তির দিক দিয়ে ক্ষয় না হলেও আমি যে তিল তিল ক'রে একেবারে চির-নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছি, সে যে আমি কিছুতেই মন থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুছে ফেলতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবার জন্যে অক্টোপাশের মতই অসংখ্য শুঁড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। সে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী গতি আমি কেমন ক'রে আটকাব! বলিতে বলিতে ভদ্রলোক যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন।

আর আমি শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। লোকে বলে কিন্তু আমি নিজে আজিও বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি ও ভবিষ্যতে কোন দিন পারবও না! এই যে দেখছেন নীলার আংটী।…বলিতে বলিতে ভদ্রলোক আংটী সমেত ডান হাতখানি আমার চোখের সম্মুখে টেবিলের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

একটু আগে সুইচ টিপিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিয়াছিলাম।

অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় আংটীর নীলাটা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। সেদিন দেখি নাই, কিন্তু আজ ভাল করিয়া দেখিলাম। একটা সাপ আংটী। সাপটা দুই প্যাঁচ দিয়া আপনার শরীর আপনি জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই সাপেরই বিস্তৃত ফণার উপর নীলাটী বসান। আকারে নীলাটী অনেকটা একটা বাদামের মত। ভদ্রলোকের অতি শীর্ণ হাড়সার অঙ্গুলীটাকে যেন সাপটা একান্ত কুৎসিত ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই আংটী একবার আমি বম্বের এক সেল থেকে কিনি। সে আজ দশ-বারো বছরের কথা হবে, আমার ব্যবসাসংক্রান্ত একটা কাজে হঠাৎ একবার আমায় বম্বে যেতে হয়েছিল। এই আংটীটা ছিল একটা ইহুদির। সেই ইহুদিও নাকি এক সেল থেকেই এই আংটীটা কেনে। ইহুদি ছিল প্রভূত অর্থের মালিক। এই আংটীটা কিনবার পর থেকেই তার ঘরে

অর্থ যেন হুহু ক'রে চারিদিক থেকে বন্যার জলের মতই আসতে লাগল। কিন্তু এই নীলার আংটীটা নাকি অভিশপ্ত! এই নীলার প্রভাবে প্রভূত অর্থ আসবে বটে, কিন্তু নিজে সে এক কপর্দকও ভোগ করতে পারবে না; আর শুধু তাই নয়, ক্রমে তারই জন্যে একে একে এ সংসারে তার সকল প্রিয়জন হয় আত্মহত্যা বা অন্য কোনভাবে জীবন দেবে এবং সর্ব্বশেষে সে নিজে হবে আত্মঘাতী! ইহুদির ব্যাপারেও হয়েছিল ঠিক তাই এবং তার আগে এর মালিক এক সাহেবেরও ঘটেছিল তাই। তার সংসারে একমাত্র স্ত্রী তারই দুর্ব্যবহারে গলায় ফাঁস দিয়ে প্রাণ দিল এবং শেষটায় সে নিজে নিজের প্রাণ নিল রিভলভারের গুলি চালিয়ে! ইহুদির বাড়ীর যাবতীয় জিনিষপত্র বেচে যা টাকা হ'ল এবং ব্যাঙ্কে নগদ যা ছিল তা তার আত্মীয়স্বজনেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিল। কিন্তু আংটীটা কেউ নিতে চাইল না, সেই জন্যে এটা অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে সেলে উঠল। আমিও সেই সেলে উপস্থিত ছিলাম; পাঁচশ টাকায় আমি আংটীটা কিনে নিলাম!

আংটীটা কেনবার সময় আমায় অনেকেই এর অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে এটা কিনতে বারণ করেছিল। ছেলে বেলা থেকেই কোন রকমের কুসংস্কারই আমি মানি না। আমি সকলের কথায় একবার মাত্র হেসে আংটীটা কিনে নিয়ে এলাম।

বাড়ীতে এসে স্ত্রী সুজাতাকে যখন সেই আংটীটা দেখালাম, সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে আমায় শুধাল—বাঃ! ভারী সুন্দর ত আংটীটা, কত দাম পড়ল?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে বললাম, দাম যতই হোক না কেন? তোমার আংটীটা পছন্দ হয়েছে যখন, এস তোমার আঙ্গুলেই আংটীটা পরিয়ে দিই! বলতে বলতে সাদরে তার ডান হাতখানি তুলে ধরে তার ডান হাতের অনামিকায় আংটীটা পরিয়ে দিলাম।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে এই আংটীর গল্পটা তাকে হাসতে হাসতে বললাম। সুজাতা শিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-দুটো ডিগ্রি সে বিয়ের আগেই জুটিয়েছিল। আংটীর গল্প শুনে সে ত আমার সঙ্গে হাসতে লাগল।

বললে, লেখাপড়া শিখে জ্ঞানের আলো পেয়েও মানুষ এমন 'সুপারষ্টিসাস্' হয়! কিন্তু আশ্চর্য্য!

দিন কয়েক বাদে ব্যবসা সংক্রান্ত কি একটা জরুরী কাজে বেরুব ব'লে কাপড়-জামা পরে প্রস্তুত হচ্ছি, সুজাতা ম্লান চিন্তিত মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুধালাম, কি খবর সু?

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম, সে যেন আমার কাছে কি বলতে চায় অথচ কোন কারণে মুখ ফুটে সেটুকু বলতে পারছে না।

বিস্মিত হলাম। বললাম, তুমি কি আমায় কিছু বলবে সু?

সে একটু আমতা আমতা ক'রে বললে, হাঁ—না; আচ্ছা, তুমি ঘুরে এস। এমন বিশেষ কিছুই নয়।

সে যেন বেশ একটু চিন্তান্বিতভাবেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমিও সেদিকে আর বিশেষ মন না দিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আমি আর সুজাতা একই ঘরে দু'জনা শুলেও পাশাপাশি দুটো আলাদা খাটে শুতাম। সুজাতা খোকাকে নিয়ে শুত। খোকার অসুখের জন্যেই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

গভীর রাত্রে সেদিন হঠাৎ একটা দীর্ঘ আকুল চীৎকারে সহসা আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আমি ধড়ফড় ক'রে শয্যার উপর উঠে বসলাম। দেখি, ঘুমের মধ্যে সুজাতা অমন ক'রে চেঁচাচ্ছে। ছুটে সুজাতার খাটের কাছে গেলাম। ধীর আবেগে তাকে ঠেলা দিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলাম, সুজাতা! সুজাতা!

সুজাতা তখনও চীৎকার করছিল, আমায় বাঁচাও! ওগো আমায় বাঁচাও!

আমার ঠেলা ও ডাকাডাকিতে সুজাতার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ ও মুখের চেহারা দেখে মনে হ'ল, সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে! ঘামে তখন তার সর্ব্ব শরীর ভিজে জল হয়ে উঠেছে। সমগ্র দেহখানি তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

সহসা এক সময় সুজাতা দুই হাত দিয়ে আমার গলাটা আঁকড়ে ধ'রে আমার বুকে মুখ গুঁজে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

আমি সস্নেহে তার মাথায় পিঠে গায়ে হাত বুলাতে লাগলাম, কি হয়েছে সু? হঠাৎ এমন ভয় পেলে কেন? এই ত আমি! ছিঃ! কাঁদে না! চুপ কর! একটু স্থির হও!

অনেকক্ষণ ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদবার পর সে যেন কতকটা সুস্থির হল।

পরের দিন সকালে আমি চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে সুজাতাকে শুধালাম, কাল রাত্রে হঠাৎ অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন সু?

প্রথমে সে ত আমার কথার জবাবই দিতে চায় না, অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বললে, আজ কয়দিন থেকেই রাত্রে ঘুমুলেই আমার মনে হয় যেন আংটীর সাপটা আমার গলাটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে। আর সেই প্যাঁচে প্যাঁচে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! আমি দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে যত গলা থেকে সেই সাপটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করি, সাপটা যেন ততই জোরে ও কঠিনভাবে আমার গলায় চারপাশে পাকিয়ে যায়।

সুজাতার কথায় আমি হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লাম।

শেষটায় তুমিও! যত উচ্চশিক্ষাই পাও, তুমি যে নারী ছাড়া আর কিছুই নও, শেষ পর্য্যন্ত এটাই কিন্তু তুমি একেবারে বিশদভাবেই প্রমাণ করলে। যা হোক, তোমায় আর ও আংটী পরে কাজ নেই। দাও, আমিই আংটীটা পরি!

সুজাতা যেন একান্ত করুণভাবেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, না থাক ! সে আংটী পরতে হবে না ! আমি সেটা বাক্সে তুলে রেখেছি।

উঃ, তুমি এত ভীতু ! আংটী একেবারে বাক্সের মধ্যে পুরেছ ! যাও ! আংটীটা নিয়ে এসো ! আংটীর পূর্ব্ব ইতিহাস শুনে আমার যত কুতুহল না হোক, তোমার কথা শুনে সত্যি আমি আর ও আংটীটা আঙ্গুলে না পরে সোয়াস্তি পাচ্ছি না। যাও আংটীটা আমায় এনে দাও।

নাই বা পরলে ও আংটী !

সুজাতার যে কোথায় গলদ তা আমার চোখে জলের মতই পরিষ্কার থাকলেও আমার যেন কেমন একরকম আংটীটার উপর জেদ চড়ে গেল !

শেষ পর্য্যন্ত একান্ত বিমর্ষচিত্তেই অনিচ্ছাভরে সুজাতা বাক্স খুলে আংটীটা আমায় এনে দিল। আমি কতকটা হৃষ্টচিত্তে আংটীটা পরে কাজে বেরিয়ে গেলাম।

সেদিন কাজে বেরিয়েই একটা অভাবিত মোটা রকমের লাভের অর্ডার পেলাম। মনটা ভারী প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। আংটীটার দিকে তাকিয়ে খানিকটা বেশ আপন মনেই হেসে নিলাম।

পরের দিন গভীর রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। যেন অসংখ্য সাপে আমার সারাটা দেহ একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। যে সাপটা আমার গলাটা পেঁচিয়ে ধরেছিল সেটার চোখের দিকে চাইতেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তার চোখটা যেন অবিকল আমার আঙ্গুলের আংটীর নীলাটার মত !

এর দিন দুই বাদে হঠাৎ এক দিন মাঝ রাত্রে আমার স্ত্রীর ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি আমার বুকের উপর একেবারে ঝুঁকে আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে !

আমি চোখ চাইতেই সুজাতা আকুলস্বরে শুধাল—কি হয়েছে, অমন কোঁকাচ্ছিলে কেন ?

আমি বিস্মিত হলাম, বললাম, কোঁকাচ্ছিলাম ?

স্ত্রী চুপ ক'রে গেল !

কিছু দিন থেকেই আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম, আমার স্বভাবটা যেন কেমন একপ্রকার খিটখিটে হয়ে পড়ছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। হাসি গল্প গান এসব যেন আমার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

একদিনের ঘটনা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন কি একটা কারণে বেশ একটু সকাল সকালই আপিস থেকে ফিরেছি।

উপরে উঠ্‌তেই কানে এল, আমার স্ত্রীর ঘরে গ্রামোফন রেকর্ড বাজছে।

ইদানিং আমার বাড়ীতে রেকর্ড বাজান একপ্রকার বন্ধই ছিল। আর বিশেষ ক'রে সে সময়টাও আমার ফিরবার সময় নয়।

গানশোনা মাত্রই কিন্তু আমার মনটা যেন হঠাৎ কেমন অকারণেই উত্যক্ত হয়ে উঠল। আমি দ্রুত পদবিক্ষেপে দুম্ দুম্ ক'রে জুতার আওয়াজ করতে করতে যে ঘরে গ্রামোফন বাজছিল, সেই ঘরে ঢুকে এক ধাক্কা দিয়ে সাউণ্ডবক্সটা ঘূর্ণমান রেকর্ডের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম।

একটা অতি বিশ্রী ক্যাঁচ্ শব্দ করে গানটা থেমে গেল।

পাশেই আমার চার বছরের ছেলে সুধাংশু একটা সোফায় বসেছিল, তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে দুই হাত দিয়ে তার মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

সুজাতাও যেন কেমন একরকম বিব্রত হয়ে ত্রস্তভয়চকিত পদবিক্ষেপে ভয়ার্ত্ত সন্তানকে বুকে চেপে নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আমিও শ্রান্ত হয়ে সামনেই একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

ক্রমে ক্রমে শেষটায় এমন হয়ে উঠ্‌ল যে, একটু জোরে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত আমার কানে অসহ্য ঠেকত।

আমি বাড়ীশুদ্ধ সকলকে বকে বকে চীৎকার ক'রে একেবারে তটস্থ ক'রে তুলতাম ! চাকরদাসী ত দূরের কথা, এমন কি আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্তও আমার ছায়া দেখলে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পালাবার পথ খুঁজত।

গভীর রাত্রে একদিন আপিস্ থেকে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার স্ত্রী একখানি কালীর পটের সুমুখে গলবস্ত্র হয়ে কি যেন আপনমনে প্রার্থনা করছে।

ভারী কৌতূহল হল। আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম। শুনলাম, আমার স্ত্রী বলছে, আমার স্বামীকে ভাল ক'রে দাও মা ! আমার দেবতার মত স্বামী ! তাঁর দিকে যে আর চাওয়া যায় না···সহসা কেন জানি আমার দুই চোখের কোল জ্বালা করে উঠল। আমি সেখান থেকে চুপি চুপি নিজের শোয়ার ঘরে পালিয়ে এলাম।

ঘরে ঢুকে চেয়ারটায় বসতে যাব, সহসা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় আমার চোখের সামনে আংটীর নীলাটা ঝলমল করে উঠল !

সত্যই কি তবে এই আংটীটাই একটা নিষ্ঠুর অভিশাপ ! আমার এই পরিবর্ত্তনের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত কি-না সামান্য এই একটা পাথরই হ'ল দায়ী !···কিন্তু আমার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মন যেন কিছুতেই এ কথা মানতে চাইল না !···না না, এ অসম্ভব ! সামান্য একটা নীল পাথর !··· আর সত্যিই যদি তার এতই ক্ষমতা হয়, তবে আমিও দেখতে চাই শেষ পর্য্যন্ত এ আমায় কত দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে। শেষটায় যদি এতে আত্মঘাতীও হতে হয় তবু এ আংটী আমি আঙ্গুল থেকে কোন মতেই খুলব না !···মাথার মধ্যে তখন যেন আমার একটা খুন চেপে গেছে !

আমি পাগলের মতই সোফা ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারী ক'রে বেড়াতে লাগলাম। আমার শরীরের সমগ্র শিরা-উপশিরা বেয়ে একটা দুর্দ্দান্ত জিদের নেশা যেন আগুনের তরল স্রোতের মতই বয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি সব, টের পাই তবু যে কেন এমনই ক'রে নিজেকে একান্ত অসহায়ের মত নিজের খেয়ালে চলতে দিতে বাধ্য হই—তা আজও আমি বুঝতে পারি না !

যতই দিন যেতে লাগল আমার বাড়ীটা যেন ক্রমে ক্রমে একটা অশান্তির আগার হয়ে উঠ্‌তে লাগল। একটী মুহূর্ত্তও বাড়ী যেন আর ভাল লাগে না। একদিকে পারিবারিক জীবনটা যেমন দিনের পর দিন অশান্তিতে

ভরে উঠ্‌তে লাগল, ব্যাঙ্কের হিসাবটাও ঠিক সেই পরিমাণে ফুলে ফেঁপে উঠ্‌তে লাগল। টাকা যেন আজকাল আমার কাছে একটা নেশার মতই দাঁড়িয়ে গেছল।

সদাসর্ব্বদাই মনের মাঝে ঘুরত, টাকা! টাকা! আর টাকা!

টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে নূতন একটা উপসর্গ এসে জুটল। সন্দেহ বাতিক। বাড়ীর প্রত্যেককেই আমি সন্দেহ করতে লাগলাম। মনে হ'ত, আমার চাকর-দাস-দাসী, মায় আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই যেন দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই আমার চারিপাশে ওৎপেতে আছে—কেমন ক'রে আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রে আমায় পথে বসাবে!

কাউকে আমার বিশ্বাস হ'ত না।

সব চোর! জুয়াচোর! সব ভণ্ড!

এ সংসারে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কেউই আপনার নয়। সকলেই সে যার আড়ালে বসে ছুরি শানাচ্ছে, কেমন ক'রে আমার বুকে ছুরি বসাবে!

এই সন্দেহ-বাতিকেই শেষটায় আমায় যেন একেবারে পাগল ক'রে তুললে।

আমার সিন্দুকের চাবী দেওয়ালের আয়রণচেষ্টে রেখে তার চাবী সদাসর্ব্বদা নিজের কোমরে বেঁধে রাখতাম।

শেষে এমন দাঁড়াল যে, রাত্রে ঘুমুতে পর্য্যন্ত পারতাম না। খুট্ ক'রে ঐ বুঝি কোথায় কিসের শব্দ হ'ল!…কোথায় গাছ থেকে পাতা পড়ার শব্দ!…ঐ কার পায়ের শব্দ! সারাটি রাত আমার বিনিদ্রই কেটে যেত। দুই চোখ ফেটে ঘুম আসছে, অথচ ঘুমুবার উপায় নেই!

রাতের পর রাত এমনই ক'রে নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটিয়ে কাটিয়ে ক্রমে শরীর হয়ে উঠ্‌তে লাগল শীর্ণ, কঙ্কালসার!…তার পর এক দিন—

সে দিন সবেমাত্র একটু চোখের পাতা দুটো বুজিয়েছি, হঠাৎ একটা মৃদু স্পর্শে আমার ঘুমটা গেল ভেঙ্গে! চেয়ে দেখি আমার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে সুজাতা যেন কি করছে!

মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ জেগে উঠল; নিশ্চয়ই সুজাতা আমার কোমর থেকে চাবী চুরি ক'রে আমার সিন্দুক থেকে টাকা চুরির মতলবে এখানে এসেছে! রাগে আমার সর্ব্বশরীর রি রি ক'রে জ্বলে উঠল। বিপুল এক ধাক্কা দিয়ে সুজাতাকে খাট থেকে নীচে ফেলে দিলাম। একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ ক'রে সুজাতা অদূরে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটার গায়ে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল। আমিও তাড়াতাড়ি খাট থেকে লাফিয়ে নেমে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলাম। কন্তু আলো জ্বালতেই আমার কণ্ঠ চিরে একটা ভয়মিশ্রিত অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এল। লাল তাজা রক্তে সমস্ত মেঝেটা একেবারে ভেসে গেছে। আর সেই রক্তস্রোতের উপর এলিয়ে পড়ে অভাগিনী সুজাতা! অত রক্ত দেখে সহসা আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জামাইয়ের সুজাতার লুণ্ঠিত মস্তকটা নিজের কোলে তুলে নিলাম! আমার চীৎকারে লোকজন সব ছুটে এল! সেই রাত্রেই ডাক্তার এল! কিন্তু সুজাতার জ্ঞান আর ফিরে এল না! ডাক্তার বললে, ব্রেণের একটা শিরা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে!

…শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সুজাতাকে চিতায় তুলে দিতে যাচ্ছি সহসা আমার নজর আমার আঙুলের আংটীটার উপর গিয়ে পড়ল। দেখি খানিকটা রক্ত নীলাটার গায়ে কালো হয়ে তখনও চাপ বেঁধে আছে। হঠাৎ কেন যেন আমার মনে হ'ল, তবে কি নীলাটা সত্যিই অভিশপ্ত! এমন সময় হঠাৎ ডান বুকে অসহ্য একটা বেদনা অনুভব করলাম। কি তীব্র সে বেদনা! দুই হাতে বুক চেপে সেইখানে চিতার পাশেই আমি মুহ্যমানের মত বসে পড়লাম।

তারপর আর আমার মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল, চেয়ে দেখি, নিজের ঘরে খাটের উপর শুয়ে আছি।

পরে ভেবেছি, হয় ত আমার হাত থেকে নীলার আংটী খুলবার জন্যই সুজাতা রাত্রে চুপি চুপি চোরের মত আমার ঘরে এসেছিল।

… … … …

সুজাতার মৃত্যুতে আমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন এল! আগেকার সেই খিটখিটে ভাব ও সন্দেহ-বাতিকটা যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু বাড়ীর কেউই যেন আমায় আর বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারত না! তাদের মনের মাঝে যেন একটা সন্দেহের বীজ সর্ব্বদাই খচ খচ করত।

আগে যেমন মানুষের সঙ্গ তাদের কথাবার্ত্তা আমার কাছে একেবারে বিষের মতই ঠেকত, এখন সুজাতার মৃত্যুর পর আমার মন যেন সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গ-লিপ্সায় আকুলি বিকুলি করত।

মনে হ'ত, এই এত বড় দুনিয়ায় আমি যেন একা—বড় একা, একেবারে নিঃস্ব! কেউ যেন আমার নেই! আমি যেন কারুরই নই!

ইচ্ছা হ'ত, ছেলে সুধাংশুকে ডেকে কাছে বসিয়ে আদর করি, কোলে নিই।

কিন্তু সুধাংশু আমায় দেখতে পেলেই এমনভাবে চীৎকার ক'রে উঠত যে, কার সাধ্য তার কাছে যায়। বুঝতাম, পূর্ব্বের বিভীষিকা আজিও তার সমগ্র কচি মনটীকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

নীরব অশ্রুতে চোখের কোল দুটো আমার ভিজে উঠত।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল; সহসা এমন সময় এক দিন বিকালের দিকে কি মনে ক'রে ছাতে গেছি—গিয়ে দেখি একটা ফুটবল নিয়ে সুধাংশু আপন মনে একা একা সেখানে খেলা করছে। আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের খেলা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় খেলতে খেলতে আমার প্রতি খোকার নজর পড়তেই সে ভীষণ-ভাবে ভয় পেয়ে একটা চীৎকার ক'রে উঠল এবং পরক্ষণেই আমার সকল নিষেধ ও বাধা উপেক্ষা ক'রে সিঁড়ির দিকে ছুটল! তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে গিয়ে আচমকা পায়ে পা বেধে ছিট্‌কে দশ-বারটা সিঁড়ি টপকে নীচে গিয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নীচে গেলাম!

সেই রাত্রেই সুধাংশুর জ্বর এল।

এবং পাঁচ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে মাঝে মাঝে ভুল বকতে বকতে সেও আমার কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ আবার সেই বুকের বেদনাটা দেখা দিল এবং এর পর থেকে প্রায়ই সেই বেদনাটা দু-চার সপ্তাহ বাদ দেখা দিতে লাগল। উঃ! কি অসহ্য সে যাতনা!

... ...

তারপর সেই বেদনাটা আরো ঘন ঘন দেখা দিতে লাগল। কত চিকিৎসা কত ঔষধ কত অর্থ ব্যয়—কিছুই হ'ল না। একটা মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মতই এই তীব্র বেদনা আমায় তাড়া ক'রে ফিরতে লাগল।

উঃ! এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন!...

... ...

কিন্তু এই মাসখানেক থেকে আর একটা নূতন উপসর্গ এর সঙ্গে এসে জুটেছে। নিজেকে খুন করবার একটা তীব্র বাসনা যেন অহোরাত্র আমায় ভূতের মতই পিছু পিছু তাড়া ক'রে নিয়ে ফিরছে।

উঃ কি সে দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তি!

আমার সমস্ত সংযম সমস্ত মনোবল যেন নিমেষে সে ইচ্ছাশক্তির কাছে বন্যার মুখে কুটোর মতই ভেসে যায়।

আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি, আত্মঘাতী আমায় হতেই হবে। আর কোন উপায়ই নেই। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গেলেও আমার রক্ষা নেই। আমার নিজের হাতেই আমার প্রাণ নিতে হবে। এই আমার জীবনের নির্ম্মম বিধিলিপি! কঠিন অনুশাসন এই নীলার। কেউ এর থেকে নিস্তার পায়নি। প্রথমে সেই সাহেব, তারপর সেই হতভাগ্য ইহুদি। এবং এবারে আমার পালা। এ যেখানে যাবে ঠিক এমনি ক'রেই নির্ম্মম অভিশাপের আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে যাবে। কিন্তু তবু, তবু এ আংটী আমি কোন মতেই আঙুল থেকে খুলতে পারছি না ডাক্তার।

গভীর উত্তেজনায় তাহার গলার স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে ভাঙিয়া পড়িল।

প্রতিমুহূর্ত্তে কি যে দুর্জ্জয় ইচ্ছা জাগে মনে, হয় রিভলভারের গুলি চালিয়ে, নয় গলায় ফাঁস দিয়ে, নয় ত নিজের হাতেই নিজের গলা টিপে ধরে এ অভিশপ্ত প্রাণটা শেষ ক'রে দিই; কিন্তু পারি না। শেষ পর্য্যন্ত কি-না একটা তুচ্ছ পাথরই হবে মানুষের উপর জয়ী!

তারপর যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিতে লাগিলেন, তবু, আমায় মরতেই হবে! এমনি ক'রে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের সাথে যুদ্ধ ক'রে বাঁচা চলবে না। মরতে আমায় হবেই।

বলিতে সহসা ভদ্রলোক চেয়ার হইতে উঠিয়া একপ্রকার ঝড়ের মতই যেন ছুটিয়া বাহিরে আঁধার প্রকৃতিতে মিলাইয়া গেলেন!

আমি মূহ্যমানের মত চেয়ারটায় একাকী বসিয়া রহিলাম।

বাহিরে তখন আবার মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে।

বর্ষা

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

আজ বরষায় হৃদয় আমার
উঠ্‌বে মেতে, উঠ্‌বে কি?
বিষাদ-ব্যথার শতেক বাঁধন
টুট্‌বে আজি, টুট্‌বে কি?
আজ কি আমার আকাশ-পারে
খুল্‌বে আগল রুদ্ধ দ্বারে?
ঝরিয়ে বাদল আকুল ধারে
নীপের হাসি ফুট্‌বে কি?
আজ বরষায় হৃদয় আমার
উঠ্‌বে মেতে, উঠ্‌বে কি?

ঝড়ের সাথে দোল দেবে কি
চিত্ত আমার, চিত্ত রে?
চির-চাওয়া আসবে আমার—
যা চেয়েছি নিত্য রে?
হারিয়ে-যাওয়া বিস্মরণে,
ফুরিয়ে-যাওয়া শঙ্কা মনে—
ফির্‌বে কি আজ হরষ সনে
অসীম বিরাট বিত্ত রে?
ঝড়ের সাথে দোল দেবে কি
চিত্ত আমার, চিত্ত রে?

স্বপন-পারের দুয়ারখানি
খুল্‌বে না আজ, খুল্‌বে না ?
নিত্য চাওয়া ক্ষুদ্র পিয়াস
ভুল্‌বে না আজ, ভুল্‌বে না ?
আপন মনে ঝড়ের খেলা
দেখ্‌তে নয়ন বাদল বেলা
কাজের ছলায় করবে হেলা ?
বিদ্রোহ-সুর তুল্‌বে না ?
স্বপন-পারের দুয়ারখানি
খুল্‌বে না আজ, খুল্‌বে না ?

ধরণী আজ সিক্ত সজল,
সুরভি দেয় চম্পা কি ?
আকাশ মাঝে ছড়িয়ে অলক
ঝিলিক হানে শম্পা কি ?
কোন্ রূপসী লুকায় চেয়ে ?
আঁচল লুটায় গগন বেয়ে ?
মেঘ-সাগরের এ কোন্ নেয়ে
উর্ব্বশী বা রম্ভা কি ?
ধরণী আজ সিক্ত সজল,
সুরভি দেয় চম্পা কি ?

প্রিয় আমার আস্‌বে আজি,
বক্ষ ভরি আস্‌বে গো !
মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
অধর চাপি হাস্‌বে গো !
দৃষ্টিতে মোর দৃষ্টি রাখি,
গোপন বাণীর পরশ মাখি,
কোন্ আবেশে পরাণ ঢাকি
তেমনি ভালোবাস্‌বে গো !
প্রিয় আমার আস্‌বে আজি,
বক্ষ ভরি আস্‌বে গো !

সে কি গো আজ আমার সনে
সুরের মালা গাঁথ্‌বে না ?
করুণ গীতির সিক্ত সুরে
নিঠুর সম কাঁদ্‌বে না ?
অজানা কোন্ শুভক্ষণে,
আপন হারা শিহর সনে,
পাগল করা হৃদয় মনে
আমায় কি সে বাঁধ্‌বে না ?
সে কি গো আজ আমার সনে
সুরের মালা গাঁথ্‌বে না ?

আজকে আমি পার্‌ব কি গো
বাস্‌তে ভালো সুন্দরে ?
বরণ করি পার্‌ব নিতে
আজ কি মম অন্তরে ?
হৃদয়-বাউল কি গান গাবে ?
পুরস্কারের কি দান পাবে ?
ভিক্ষু সম শুধুই চাবে
কোন্ ছলনার মন্তরে ?
আজকে আমি পার্‌ব কি গো
বাস্‌তে ভালো সুন্দরে ?



লোকশিক্ষা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রবন্ধ

আজকাল আমাদের দেশে লোকশিক্ষার (adult education-এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে লোকশিক্ষা—অবশ্য এইটি ইংরেজি কথাটির ঠিক প্রতিশব্দ নয়) জন্য নানা রকমের চেষ্টা চলেছে; অথচ কিছু দিন আগেও এদিকে দেশের জনসাধারণের, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত লোকদের বা রাষ্ট্রের কোন দৃষ্টিই ছিল না; শিক্ষার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ হ'ত তার অতি সামান্য অংশই এইজন্য খরচ করা হ'ত; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকশিক্ষার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ লোকশিক্ষার অভাবে আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে কোন সংস্কারই সম্ভবপর হচ্ছিল না। প্রত্যেক সমাজসংস্কারক, প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতা একথা বুঝতে পারছিলেন; কিন্তু শুধু তাঁরা আর তাঁদের সঙ্গে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই একথা বুঝছিলেন তা নয়, আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টও একথা ভাল ক'রেই জানতে পেরেছিলেন, অন্তত বারবার তাঁদের এ ব্যাপার জানবার সুযোগ হয়েছিল। কিছুদিন আগে রাজকীয় কৃষি-কমিশন বসেছিল ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার কি উন্নতি করা যায় তারই সন্ধান করতে; কমিশনের সভ্যেরা সারা দেশময় ঘুরে বেড়ালেন, কোথায় কি ভাবে চাষ করা হয় দেখলেন; চাষের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিয়ে অনেক বিচার আলোচনা করলেন, হাজার হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেল। মোটা মোটা রিপোর্ট লেখা হ'ল; সেই রিপোর্টের পাতাগুলি খুঁজে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে কমিশনের সভ্যেরা এ বিষয়ে একমত যে নিরক্ষরতা দূর না করতে পারলে ও দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে না পারলে চাষের উন্নতি সম্ভব নয়। তার কিছুদিন আগে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির পথ সন্ধান করতে আর এক রয়াল কমিশন বসেছিল, তার নাম ছিল রাজকীয় শিল্প কমিশন। সেই কমিশনও দেশময় ঘুরে বেড়াল, সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করেছিল, মোটা মোটা রিপোর্ট লিখেছিল; কিন্তু তার সিদ্ধান্তও ছিল—শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কারিগরদের শিক্ষিত ক'রে তোলা যাবে। কিছুদিন পরে আবার বসল রয়াল শ্রম-কমিশন। শ্রমিকদের সম্বন্ধে কি করা যায়, কি ভাবে তাদের উন্নত করা যেতে পারে, তাই ঠিক করতে; কমিশনের রিপোর্ট তৈয়ারি হল, কিন্তু সে রিপোর্টেরও শেষ কথা হ'ল—যতক্ষণ না শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূর করা যাবে ততক্ষণ শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হবে না। অথচ দীর্ঘকাল ধরে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকদেরই বলুন, গবর্ণমেণ্টেরই বলুন—কারো কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। আমরা সকলেই এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম।

তবে এতদিন পরে মনে হচ্ছে যেন দেশের লোক ও রাষ্ট্র লোকশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছেন; তাই সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে নিরক্ষরতা দূর ক'রে লোকশিক্ষা প্রবর্ত্তন করবার নানা রকম চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। লোকশিক্ষার সমস্যা বিরাট, এর সমাধান সহজ নয়। শুধু বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। এ দেশে প্রায় পাঁচ কোটি লোকের বাস; এই পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা মাত্র দশ এগার জনেরই অক্ষর পরিচয় আছে; এটা হ'ল সেন্সাসের হিসাব; কিন্তু সকলেই জানেন, সেন্সাসের হিসেবে অক্ষর পরিচয়ের মাপকাঠি কত নীচু। এই হিসেবে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে তারাই যে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, একথা জোর করে বলা যায় না। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে, শুধু আমাদের এই বাংলা প্রদেশেই লোকশিক্ষার সমস্যা কত ব্যাপক। অথচ এই সমস্যার সমাধান না হলে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন স্থায়ী উন্নতি হতে পারবে না, আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে না; কারণ সে পরিবর্ত্তনের আগে চাই দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি সহযোগিতা। লোকশি-

না হলে সে সহানুভূতি, সে সহযোগিতা আসবে কোথা থেকে? তাই অন্য সকল রকম শিক্ষার চেয়ে এদেশে দরকার লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা এর অভাব মেটান যেতে পারে না; কারণ একে তো আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখনও আবশ্যিক (compulsory) হয় নি; আর যদি বা হয়ই—তাহলে অন্তত পঁচিশ বৎসর—এক পুরুষকাল অপেক্ষা করতে হবে যখন দেশের সবাই শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

লোকশিক্ষার জন্য শিক্ষক চাই, বই চাই, উপাদান চাই, বিদ্যালয়-গৃহ চাই; বইপত্র সবই না হয় হ'ল, টাকা থাকলে এ সব হতে পারে। কিন্তু শিক্ষক পাওয়াই হ'ল সকলের চেয়ে কঠিন; সমস্যা এত বিরাট যে অল্প কয়েকটি শিক্ষক হ'লে চলবে না; চাই হাজার হাজার শিক্ষক, তাঁদের কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তাই লোকশিক্ষা-সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সকল দেশেই প্রথমে শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এর জন্য অনেক জায়গায় বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন তাঁদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, কোন কোন দেশে নূতন ক'রে শিক্ষক তৈয়ারি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোন কোন দেশে আবার স্কুল-কলেজের ছাত্রদের এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী সেদিন এই নিরক্ষরতা দূর করবার মহৎকার্য্যে ছাত্রদের আহ্বান করেছেন। রুশিয়ার স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি ভাবে এই কাজে লাগান হয়েছে তাই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করব।

লেনিন সোভিয়েট-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, নিরক্ষরতা দূর না হ'লে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না; তিনি বলেছিলেন—illiterate people cannot build the communist state, তাই রুশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনেতারা এই নিরক্ষতার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করেন। রুশিয়ার মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন ছিল নিরক্ষর; ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সে সংখ্যা কম হয়ে ৪৪ জনে দাঁড়ায়। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে এখন এদেশের লোকের শত করা ৮ জন মাত্র নিরক্ষর বলে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ১৫ বৎসরের চেষ্টায় রুশিয়ার জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৭০ জন শিক্ষিত হয়ে উঠেছে।

এদের শিক্ষার অনেকখানি ভার নিয়েছিল রুশিয়ার ছেলেমেয়েরা; তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন লেনিনের বিধবা পত্নী ক্রুপস্কায়া। তাঁর অনুপ্রেরণায় "নিরক্ষরতা সংহারিণী সমিতি" গড়ে ওঠে। এই সমিতির প্রথম কাজ হ'ল, বয়স্কদের অক্ষর শেখান। কিন্তু তার আগে দেশের লোককে শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা দরকার। সুতরাং সমিতিকে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হ'ল; আর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। প্রতি বিদ্যালয়ে সমিতির শাখা স্থাপিত হ'ল; ছেলেমেয়েরা দলে দলে কাজে লেগে গেল। প্রথমেই কারা নিরক্ষর সেটা ঠিক করা, সে হিসাব নেওয়ার দরকার। ছেলেমেয়েরা খাতা পেন্সিল নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগল—কে কোথায় নিরক্ষর আছে তার খোঁজ করতে। প্রথম প্রথম এতে অনেকেই বিরক্ত হ'ল; কেউ তাদের গালি দিল, কেউ ভর্ৎসনা করল, কেউ বা তাড়িয়ে দিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের তাড়ান কঠিন; তারা পরদিন ফিরে এল; এমনি ক'রে অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা নিয়ে তারা কাজ ক'রে অল্প দিনের মধ্যে দেশের নিরক্ষর লোকদের হিসাব তৈয়ারি করল। এর পর কাজ—এই নিরক্ষরদের ধরে অক্ষর পরিচয় করান; এর জন্য না আছে বই, না আছে খাতা পেন্সিল, না আছে আলাদা স্কুলঘর। যেখানে পাওয়া গেল সেখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের একটা ঘর এই কাজের জন্য নেওয়া হল; যেখানে স্কুলঘর পাওয়া গেল না, সেখানে স্থানীয় সোভিয়েটের (ইউনিয়নবোর্ডেরই মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান) ঘর ব্যবহার করা হ'ল। এই ভাবে ত ঘর সমস্যার সমাধান করা হ'ল। কিন্তু এদিকে বই নেই, খাতা পেন্সিল নেই। ছেলেমেয়েরা পরম উৎসাহে কাঠ কেটে অক্ষর তৈয়ার করল; অভিনয়, গানের মজলিস ক'রে খাতা পেন্সিল কেনার জন্য পয়সা সংগ্রহ করল; কিন্তু একটা সমস্যা যেই শেষ হয়, আর একটা সমস্যা আসে; লেখা-পড়া শেখাতে হবে ত বেশীর ভাগ মায়েদেরই; তাঁদের কোলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তাদের দেখে কে? তাদের দেখতে হ'লে মায়েদের লেখাপড়া শেখবার সময় থাকে না। এদিকে দেশে তখনও শিশু-বিদ্যালয়, নার্সারি স্কুল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা হয়নি। তখন স্কুলের একটা ঘর নিয়ে তাকে সাজিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের থাকবার ঘর করা হ'ল। দুটি ছেলেমেয়ের উপর এই শিশুদের

তত্ত্বাবধানের, দেখাশুনা করবার ভার দেওয়া হ'ল। এইবার কাজ আরম্ভ হ'ল। অবসর পেয়ে এখন মায়েরা লেখা আর পড়া শিখতে অক্ষর পরিচয় করতে লাগলেন। অনেক ছেলেমেয়ে বাড়ীতেই বাপমায়ের শিক্ষার ভার নিল; অল্প দিনের মধ্যে কারখানায় কারখানায় লেখাপড়া চলতে লাগল; একটা মজার ব্যাপার হ'ল; কারখানায় যে খাবারঘর আছে তারই এক কোণে দেখা গেল অবসর পেলেই শ্রমিকেরা বসে বানান মুখস্থ করছে, বানান ক'রে ক'রে পড়া তৈয়ার করছে; সন্ধ্যায় ছেলেমেয়ের কাছে পড়া দিতে হবে। ধীরে ধীরে লেখাপড়া শেখার এই উৎসাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল; গ্রামে গ্রামে লেখাপড়ার জন্য কুটীর গড়ে উঠল; সেখানে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় এসে বুড়োদের লেখাপড়া শেখাতে লাগল, খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে লাগল। আগে সন্ধ্যাগুলি প্রায়ই কাটিত গালগল্প পরনিন্দা আর পরচর্চা ক'রে বা তাড়িখানায়, মদের দোকানে; এখন তার বদলে লেখাপড়া হ'তে লাগল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলল কার দল কত বেশী কাজ করতে পারে। তাদের উৎসাহ সংক্রামক ব্যাধির মত বুড়দের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল; যারা এককালে লেখাপড়া শেখাকে ঘৃণা করত, ভয় করত, তারাই পরম আদরে, পরম উৎসাহে তাদেরই ছেলেমেয়েদের কাছে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলে।

এইভাবেই রুশিয়ার ছেলেমেয়েরা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে দেশের কোটি কোটি লোককে লেখাপড়া শেখাল। আজ সেখানে নিরক্ষরতা সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়েছে; তাছাড়া বয়স্কদের মধ্যে কাজ করবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকও অনেক হয়েছে; সুতরাং ছেলেমেয়েদের আর এ কাজ করতে হচ্ছে না। কিন্তু যে কাজ তারা করেছে, তার কথা সে দেশের ইতিহাসে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু লোকশিক্ষার সমস্যার এইখানেই শেষ হয় না, অক্ষরপরিচয় হ'লে কোনমতে একখানা বই পড়তে বা দরখাস্ত করতে পারলে বা একখানা চিঠি লিখতে পারলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না; অক্ষরপরিচয়কে জীবনে কার্য্যকরী করতে হ'লে আরও অনেক বেশী শিখতে হয়, তার জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে দু-চার বৎসরে যা শেখান হয় অন্তত সেটুকু শেখা দরকার হয়। তাই এখন রুশিয়ার সেই দিকে দৃষ্টি পড়েছে; অবশ্য সে আদর্শ দেশের সকলকে পূর্ণভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলা। তবে আপাতত রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্কল্প হচ্ছে, বয়স্ক জনসাধারণ অক্ষরপরিচয় শেষ করে যাতে চার বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার মত শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও কর্মীর অভাব, পড়াবার জায়গার অভাব। তবে অভাব কোন দিনই সে দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগেছেন। শিল্প-কেন্দ্রগুলিতে ও কারখানা অঞ্চলে যারা সাত বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে কাজ করছে, তাদেরই এ কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে। তাদের কাছে একাজ সামাজিক কর্ত্তব্যের অঙ্গ; যে সমাজ তাদের শিক্ষালাভ করবার সুযোগ দিয়েছে সেই সমাজের ঋণ কিছু পরিমাণে শোধ দেবার অন্যতম উপায়। সে দেশে যার আত্মসম্মান আছে সেই সামাজিক দায়িত্ব কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বড় বড় জায়গায় এ ব্যবস্থা চলে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবক সহজেই পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কৃষিপ্রধান স্থানে এরকম স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া কঠিন; সেখানে বেতনভুক্ শিক্ষক রাখা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকেরাও অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি, কেউ হয়ত দু'বছর বিদ্যালয়ে পড়েছে, কেউ-বা চার বছর; তাদেরও শিক্ষা দরকার। "নিরক্ষরতা সংহারিণী সমিতি"র চেষ্টায় এই শিক্ষকদের জন্যও ক্লাসের ব্যবস্থা হ'ল; শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার জন্য অধ্যাপকের দল নিযুক্ত হ'ল; তাঁরা বইপত্র নিয়ে শিক্ষকদের শেখাতে লাগলেন, কি ভাবে বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাতে হয়—তাই বোঝাতে লাগলেন। সমাজ ও রাষ্ট্র সব বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছে ও করছে। এই ভাবে রুশিয়ার আপামর সাধারণের সমবেত চেষ্টায় সে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে, দেশের সকল নরনারী শিক্ষালাভ ক'রে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

হাজারীবাগ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ছোটনাগপুর ইংরেজ অধিকারে আসার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামগড় জেলা স্থাপিত হয়। তাহার হেড-কোয়ার্টার ছিল রামগড় সহরঘাটী (সারঘাটি) ও চাতরা নামক স্থানে। সেই জেলার সর্ব্বপ্রথম কালেক্টার হন মিঃ চ্যাপ্‌মান্‌। তাঁহার পরে কালেক্টার হইয়া আসেন মিঃ মেয়ো লিস্‌লি। এই মেয়ো লিস্‌লি সাহেবের সময়ে (২৫শে মার্চ্চ, ১৭৯০ খৃঃ) রাজা মণিনাথ সিংহকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দশ-সালা পাট্টা কবুলতি দ্বারা রামগড় এলাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তথনকার রামগড় জেলার পরিধি ছিল ইদানীন্তনের হাজারীবাগ ও



পরেশনাথের মন্দির — ছবি—সুধীর সেন

পালামৌ জেলাদ্বয়ের সম্পূর্ণ ভূভাগ, গয়া, মানভূম ও মুঙ্গের জেলার শতকাংশ এবং আসল ছোটনাগপুরের সম্পূর্ণ অংশ।

সে সময়ে ইংরেজ রাজ্যে প্রচলিত আইনকানুন মত এই রামগড় জেলার শাসনকার্য্য চলিত। এইরূপে ১৭৮০ হইতে ১৮৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত না অশান্তিতে এই জেলার শাসনকার্য্য চলে, কিন্তু কোলবিদ্রোহের পর তাহার বিপর্য্যয় ঘটে।

কোল বিদ্রোহ ১৮৩১-৩৩ খৃঃ।

যদিও ১৮৩৩ পর্য্যন্ত প্রচলিত আইন মতই শাসনকার্য্য চলিয়াছিল, কিন্তু কোল বিদ্রোহের পর আইনকানুনের পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৮৩১ খৃঃ এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং ১৮৩৩ খৃঃ তাহা দমন হয়।

তৎপরে যে কঠোরতর এবং বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রচলিত হয় তাহার নাম ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৩শ রেগুলেসন। ইহার দ্বারা স্থানীয় হাকিমদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ছোটনাগপুর, পালামৌ, খড়গদিহা, রামগড়, কুণ্ডা, জঙ্গল মহাল সকল, ঢালভূম পরগণা এবং অধীনস্থ করদ রাজ্যগুলি এই আইনের আমলে আসিল। রাঁচিতে হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করিয়া উক্ত স্থানগুলি সমন্বিত ভূভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার



পাঁচমালী তেলী মন্দির — ছবি—কে, ঘোষ

এজেন্সি নামকরণ হইল। এই এজেন্সির শাসনকার্য্যের এক্তি বিভাগ, গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট নামক একটা দপ্তরখানার অধীনে ন্যস্ত হইল। তাহা অন্য দেশে প্রচলিত বিধি বিধানের আমলে থাকিল না।

এই সময়ে যে সমস্ত সৈন্যদলকে এই প্রদেশে আনিতে হইয়াছিল তাহাদের থাকিবার একটা উচ্চ বিস্তৃত সমতল ভূমির প্রয়োজন হয়। অনুসন্ধানের ফলে হাজারীবাগ সহর পত্তন হয়। এইরূপে বর্ত্তমান হাজারীবাগ সহরের মধ্যে সেণ্ট ষ্টিফেন্স গির্জ্জার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ মাঠে ইংরেজ (গোরা) সৈন্যের প্রথম ব্যারাক স্থাপিত হয়। এই স্থানটা পছন্দ

করিবার কারণ, সম্ভবত ইহা রামগড়ের নিকটবর্ত্তী সুউচ্চ সমতল ক্ষেত্র বলিয়া। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২০০০ ফুট, চাতরা ও গয়া হইতে প্রায় ১০০০ ফুট এবং রামগড় ও বড়হি হইতে প্রায় ৭।৮০০ শত ফুট উচ্চ। তাহা ছাড়া এখানকার স্বাস্থ্য নিকটবর্ত্তী সকল স্থান অপেক্ষা সাহেবদের পক্ষে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

রামগড়ের রাজা লক্ষীনারায়ণ সিং সর্ব্বপ্রথমে ১৪০০ বিঘা জমি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। সেই মালভূমিতে পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদের ছাউনি স্থাপিত হয়। রাজা লক্ষীনারায়ণের প্রদত্ত জমির এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট এলাকা ও দুই-তৃতীয়াংশ টাউন কমিটির পরিচালনাধীন বলিয়া গণ্য হয়। এই টাউন-কমিটিই পরে মিউনিসিপ্যাল এলাকা হইয়াছে।

১৮৩৪ খৃঃ হাজারীবাগ সহরে সদর কাছারী (হেড-কোয়ার্টার)



বোখারো জলপ্রপাত ছবি—মায়া গুপ্ত

স্থাপিত হয়। উক্ত ক্যান্‌টনমেণ্ট এলাকার উত্তর দিকে আরও ৪৪৬২ বিঘা জমি রাজা রামনাথ সিং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। ঐ দলিলের তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ। চৌদ্দটী সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি ও সাতটী বসতির অংশবিশেষ দ্বারা উপরোক্ত ৪৪৬২ বিঘা পূরণ হয়। উক্ত বসতিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটার নাম ছিল 'হাজারী' ও সেই স্থানে একটা ছোট আমবাগান ছিল। বাগানযুক্ত এই হাজারী নামক গ্রাম হইতে হাজারীবাগ নামের সৃষ্টি হয়। (ই, লিষ্টার, আই-সি-এস্, ১৯১৭—হাজারীবাগ জেলা গেজেটিয়ার)।

উপরোক্ত চৌদ্দটা বস্তির নাম—(১) হাজারী, (২) নওয়াদা, (৩) নুরা, (৪) সির্কা, (৫) সালি, (৬) চেপার, (৭) চামরু, (৮) মাতোয়ারী, (৯) কোরা, (১০) লাখে, (১১) হরহরা, (১২) ক্ষীরগাঁও, (১৩) জাবরা ও (১৪) ওরায়াঁ এবং সাতটী খণ্ড বস্তির নাম—(১) ওখনি (২৩ বিঘা ১৩ বিস্বয়া ৮ ধূল), (২) কদমা (১৫৬ বিঘা ১ ছটাক ১৮ ধূল), (৩) শীরষী (১৩৯ বিঘা ১৩ ছটাক ১৪ ধূল), (৪) কোলঘাট্টি (৪৩ বিঘা ১১ ছটাক ২ ধূল, (৫) বাহেরী (১৩২ বিঘা ১৭ কাঠা ৫ ধূল), (৬) কুদ (১৫৯ বিঘা ১৭ কাঠা ৫ ধূল ও (৭) চানো (১৭৮ বিঘা ৬ কাঠা ১০ ধূল জমি)।

হাজারীবাগে সেণ্ট্রাল জেল ও রিফর্মেটারী জেল (বা রিফর্মেটারী স্কুল) স্থাপন জন্য আরও জমি দরকার হয়। এজন্য রাজা রামনাথ সিং পুনর্ব্বার ১৮৩ বিঘা, ৪ কাঠা, ১১ ধূল জমি (২৩শে আগষ্ট ১৮৬৫ খৃঃ) রেজেষ্টারী পাট্টা দ্বারা দান করেন। এইবার যে জমি দেওয়া হইল তাহা নিম্নোক্ত তিনটি বস্তির অংশ। যথা,—(১) ক্ষুদ্র মণ্ডাই (৮৫ বিঘা ১৬ ছটাক ১৩ধূল), (২) নাওদিহা (৪ বিঘা ১৮ ছটাক) ও (৩) কোলঘাট্টী (৯২ বিঘা ৯ ছটাক ১৮ ধূল)।



লেখক—শ্রীজনরঞ্জন রায়

সর্ব্বমোট ৪৬৪৫ বিঘা খাসমহল জমি এক্ষণে হাজারীবাগের সরকারী এলাকায় পরিণত হইয়াছে। তাহার চারি বারের সার্ভে সেটলমেণ্টের বিবরণ হইতে অনেক সংবাদ জানা যায়। ১৮৭৪ খৃঃ বাবু কস্তুরীলাল নামক বেহারী আমিনের দ্বারা, ১৮৮৭ খৃঃ সেটলমেণ্ট অফিসার মিঃ ক্লাক আই-সি-এস দ্বারা, তৃতীয়বারে ১৯০৩ খৃঃ জনৈক বাঙ্গালী বৈদ্য বাবু মতিলাল রায় খাসমহল ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা এ[illegible] তৎপরে, ১৯১৩ খৃঃ প্রসিদ্ধ সেটলমেণ্ট অফিসার মাননীয় জে, [illegible] সিফ্‌টন আই-সি-এস দ্বারা সার্ভে হয়। পরে এই সিফ্‌টন্ সাহেবই বিহার উড়িষ্যার লাট হইয়াছিলেন।

রেজিমেণ্টগুলি থাকিবার জন্য ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা প্রশস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার বাসিন্দাদের দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতে হইল। এই সময়ে (দ্বিতীয় বারে) রামগড়ের রাজার নিকট যে জমি পাওয়া গেল তাহাতে সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সহর পত্তন হইল। এখন হাজারীবাগ সহরের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা জল নিকাশের যে নালা আছে তাহাই প্রথমে ক্যান্টনমেণ্ট এলাকার দক্ষিণ সীমা ছিল। সেটি ছিল একটা পাহাড়ীয়া নদী বা সোঁতা এবং দক্ষিণ দিকে ক্ষীরগাঁও নামক বস্তির নদীতে গিয়া মিলিত হইত। এক্ষণে এই নালাটী সহরের মধ্যস্থলে পড়িয়াছে।



সীতালড় পাহাড়　　ছবি—কুঞ্জ ঘোষ



সেণ্ট কলম্বস কলেজ　　ছবি—কুঞ্জ ঘোষ



রাজগোপাল রায়

...রের পূর্ব্ব-পশ্চিমের জমি ঢালু থাকায় উত্তর পার্শ্বের জল আসিয়া সেই ...লায় পড়িয়া থাকে ও সেই জল ঐ নালার স্বাভাবিক দক্ষিণের ঢালু দিয়া ...গাঁওয়ের দিকে চলিয়া যায়। নালার উপরে পাকা সাঁকো প্রস্তুত ...য়ায় চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ঐ ক্ষীরগাঁওয়ের নদীর ধারে ...ে হিন্দুদের মৃত দেহ সৎকার হয়।

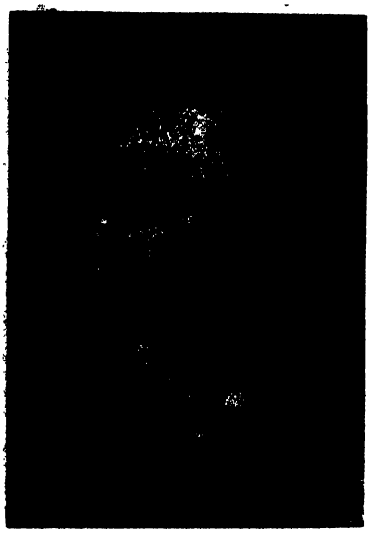
ক্যান্টনমেণ্ট এলাকাটী বর্ত্তমান সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ছিল। ফৌজ উঠিয়া গেলেও ঐ এলাকার উত্তর দিকে ফৌজের অবসরপ্রাপ্ত অনেক সাহেবকে বসতি করিতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং দানাপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে রেজিমেণ্টের সঙ্গে যত দর্জ্জি, খানসামা, ধোবা, মুচি, ছুতার, শেঠ প্রভৃতি আসিয়াছিল তাহাদের সহরের মধ্যে থাকিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপে উঠিয়া গিয়া ঘরবাড়ী পত্তনের সময়ে, পূর্ব্বে যাহার যতটুকু জমি ছিল, সহরের পশ্চিমাংশে তাহাকে ততটুকু জমি দেওয়া হয়। ইহা কর্ণেল বোডাম সাহেবের ডেপুটী কমিশনার থাকার সময় হইয়াছিল। এই সমস্ত ছুতার, ধোবা, মুচি প্রভৃতির বংশ বিস্তার হওয়ায় ঐ সমস্ত জাতির লোক এক্ষণে হাজারীবাগে বহুলাংশ দেখা যায়। মুসলমান দর্জ্জির হাজারীবাগের দক্ষিণে লাখে নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে।

১৮৫৭ খৃঃ সিপাই বিদ্রোহের সময়ে হাজারীবাগের ক্যান্টনমেণ্টে প্রথমে ৬০নং রেজিমেণ্ট আসে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ১০৭নং, ৭৪নং এবং একদল "হাইল্যাণ্ডার" সৈন্য আসে। ১৮৮২ সালে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে সমস্ত গোরা পণ্টনকে সরাইয়া লওয়া হয় এবং তৎস্থলে মাদ্রাজী সৈন্য আমদানী হয়। মাদ্রাজী সৈন্যদের দুই-তিন বৎসর পরেই স্থানান্তরিত করা হয়। তৎপরে আর কোনও সৈন্য আসে নাই। তখন নম্বর হিসাবে রেজিমেণ্ট ছিল, সৈন্যদের জাতি হিসাবে রেজিমেণ্টের নাম ছিল না। সেই সময়ে প্রস্তুত কেণ্টনমেণ্ট এলাকার বড় বড় পাকা ইন্দারা ও ব্যারাকগুলি এখনও অতীতের সাক্ষী দিতেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল শেষ হয় এবং ১৮৫৮ খৃঃ সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল আরম্ভ হয়।

কর্ণেল বোডামের সময়েই অধুনাদৃষ্ট হাজারীবাগ সহরটী পত্তন হয় এবং তাহার মধ্যে যে হাটুটা (পেঠিয়া) বসে তাহার নাম দেওয়া হয় বোডাম বাজার।

হাজারীবাগ সহর পত্তন হওয়ার প্রারম্ভে সেখানে কোনও পুষ্করিণী ছিল না। জনশ্রুতি এই যে, বোডাম বাজারের সন্নিকটে মিট্‌কা (মিষ্ট জল) তালাও নামক পুষ্করিণী রামগড় ব্যাটালিয়ন দ্বারা স্থাপিত হয়। ঐ সিপাহীদের টাকা-আনা-পাইতে বেতন দেওয়া হইত, তাহারা টাকা-আনা লইয়া পাইগুলি সরকারী তহবিলেই জমা রাখিত। শেষে ঐ সঞ্চিত তহবিল হইতে ঐ পুষ্করিণীটী খনন করা হয় এবং তাহার উপর একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাজারীবাগের অন্যতম পুষ্করিণী—পেঠিয়া তালাওটী মিউনিসিপালিটির দ্বারা ও নবাবগঞ্জ নামক বস্তির পুষ্করিণীটি বেণী ভকত নামক জনৈক স্থানীয় বণিকের ব্যয়ে খনন করা হইয়াছে। সেণ্ট াল জেলের নিকটে যে ঝিলটি আছে তাহার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।



ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এস-সি-মল্লিক

স্বাস্থ্যকর এবং অগম্য স্থান মনে করিয়া সরকার হইতে হাজারীবাগে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বন্দী নবাবগণ হাজারীবাগের ওখ্‌নি নামক বস্তির নিকটে থাকিতেন বলিয়া তাহা এক্ষণে নবাবগঞ্জ মহাল্লা নামে খ্যাত। ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় এখনও সিন্ধু ও হায়দ্রাবাদের বহু নবাবের কবর দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, কোনও কবরের উপরই মৃতের নামধামযুক্ত স্মৃতিফলক নাই এবং অবহেলায় তৎসমস্তই কালের রথচক্রপেষণে সমভূমে পরিণত হইতেছে। সেই সময়ে প্রস্তুত কয়েকটি ছোট মসজিদ্ এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ ক্যান্টনমেণ্ট এলাকার নিকটেই সাহেবদের যে কবরখানা আছে তাহা বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইতেছে। নবাবগঞ্জের মীর্জ্জা বংশ দানসূত্রে প্রাপ্ত বহু জমিজমা এখনও ভোগ দখল করেন। রাজ্যচ্যুত মণিপুর-রাজ ও সেনাপতির বংশধরেরা এখানে বন্দীভাবে থাকিতেন। এখন যে বাড়ীটি জেলা-বোর্ডের ডাকবাংলা হইয়াছে তাহাতেই পূর্ব্বে রাজবন্দীদের পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট থাকিতেন এবং তাহার চারিদিক পরিখা বেষ্টিত ছিল। মাড়োয়ারী ও জৈনগণ ধর্ম্মশালা এবং যে সব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। জনৈক তেলী জাতীয় ব্যবসায়ীর মন্দিরটি তেলী মন্দির নামে খ্যাত এবং সুউচ্চ। বাঙ্গালী হিন্দুগণ এখানে দুর্গা পূজায় বিশেষ উৎসব করেন। সম্প্রতি বিহারীরা পৃথকভাবে দুর্গোৎসব করিতেছেন।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ বড়িসা গ্রাম হইতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দু বাঙ্গালী, বৈদ্য জাতীয় গুরুদাস সেন হাজারীবাগে গমন করেন। তিনি ১৮৩৫ খৃঃ রামগড় ব্যাটালিয়নের সঙ্গে পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসেন। তিনি যখন হাজারীবাগে আসেন সে সময়ে ডাকঘরে পোষ্ট-কার্ড পাওয়া যাইত না, নগদ পয়সা লইয়া ডাক বিলি হইত। হাজারীবাগে তাঁহার কোন বংশধর নাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয় ভ্রাতা ভগবতীচরণ সেন, সৈন্যদের রসদ বিভাগের



ডক্‌টর এস-কে-গুপ্ত

গোমস্তার কার্য্য লইয়া হাজারীবাগে আসেন। তাঁহারা পুরাতন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া কলিকাতা হইতে আঠার দিনে হাঁটিয়া হাজারীবাগে আসিয়াছিলেন। ভগবতীবাবুর বংশধরেরা হাজারীবাগে বসবাস করিতেছেন। ভূপালচন্দ্র সেন—ডেপুটী কমিশনারের ভূতপূর্ব্ব পেস্কার; গয়ার ডাঃ রায় সাহেব শৈলেন্দ্রচন্দ্র সেন, এম-বি; উকিল শৌরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এল্; আরার ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ সেন, এম-বি; ধীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, হাজারীবাগের পার্ল মোটর সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী, আজমীরের ডাঃ ললিতকুমার সেন, এম-বি; হাজারীবাগের কবিরাজ প্রমথনাথ সেন প্রমুখ ভগবতীবাবুর বংশধর।

বড়িসার সেনেদের সঙ্গে কালীঘাটের বেণীমাধব গোস্বামী আসেন। তাঁহার ভাগিনেয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় হাজারীবাগে বাস করিতেছেন।

তৎপরে রাজমোহন গুপ্ত হাজারীবাগে আসেন, তিনি সিপাই বিদ্রোহের সময়ে সৈন্যদের রসদের ভাণ্ডার রক্ষক ছিলেন। তাঁহার বংশের কেহ হাজারীবাগে নাই।

১৮৬৫ খৃঃ হাজারীবাগ হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হয়। ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে কেদারনাথ সেন সাব-ইঞ্জিনিয়ার, পাকিন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ও গঙ্গাবিষ্ণু রায় ঠিকাদার ছিলেন। বগোদর হইতে হাজারীবাগ এবং রাঁচী হইতে বড়হি পর্য্যন্ত রাস্তা তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কুনার নামক নদীর উপরে হাজারীবাগের নিকটস্থ পাকা সাঁকোতে একখানি পাথরে উপরোক্ত নামগুলি খোদিত আছে। ঐ দুই রাস্তার দ্বারা হাজারীবাগ সহরটী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রাঁচীর সহিত যুক্ত করা হয়। উক্ত বাঙ্গালী দুই জনের কোনও বংশধর হাজারীবাগে নাই বলিয়া মনে হয়।

হাজারীবাগের আদালতের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার নাদনঘাটের সন্নিকটস্থ দাঁইপাড়া গ্রামবাসী বৈদ্য জাতীয় রাজগোপাল রায়। তিনি ১৮৬২ খৃঃ হাজারীবাগে গিয়াছিলেন, প্রথমে তিনি ডেপুটী কমিশনারের হেডক্লার্ক হইয়া আসেন, পরে ডেপুটী কালেক্টর হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺আনন্দময় রায়ের বংশের উকিল কালীপদ রায় বি. এল; উকিল সুধীরঞ্জন রায় বি. এল; উকিল সুরেন্দ্রনাথ রায় বি. এল, রামগড় রাজ্যের ল' সুপারিনটেনডেণ্ট; উকিল নির্ম্মলচন্দ্র রায় বি. এল; উকিল দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় বি. এল; উকিল নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল; উকিল অমিয়মাধব রায় বি. এল, বনেলি রাজ্যের ল' সুপারিনটেনডেণ্ট; উকিল সত্যেন্দ্রকুমার রায় বি. এল প্রভৃতি হাজারীবাগের বাসিন্দা। হাজারীবাগের অধিকাংশ বৈদ্য বাসিন্দাকে রাজগোপালবাবু রাঢ় প্রদেশ হইতে আনয়ন করেন। বর্ত্তমানে হাজারীবাগের বেশীর ভাগ বাঙ্গালী অধিবাসীই বৈদ্য সন্তান এবং বিশিষ্ট মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। রাজগোপালবাবু শালবন কাটাইয়া হাজারীবাগের মধ্যস্থলে যে হাটটি স্থাপন করেন তাহাই বোডাম বাজার নামে পরিচিত।

হাজারীবাগের সর্ব্বপ্রথম সরকারী উকিল ছিলেন বিঠলাল নামক জনেক বিহারী। ১৮৬৪ খৃঃ পাটনা হইতে যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী উকিল হইয়া আসেন। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলায়। তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দিগেন্দ্রনাথবাবু খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। হাজারীবাগ রেল ষ্টেশন হইতে ডাকবাহী লাল মোটর কোম্পানীর তিনিই প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। মুখোপাধ্যায় পরিবার হাজারীবাগেই বসবাস করিতেছেন। হাজারীবাগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবার রায় বাহাদুর যদুনাথের দ্বারা আনীত।

তৎপরে কায়স্থ জাতীয় রাজনারায়ণ সেন, নবগোপাল রায়, উমেশচন্দ্র সেন ও গোপালচন্দ্র সেন যথাক্রমে আগমন করেন। তাঁহাদের অনেকেরই বংশধর এখানকার অধিবাসী।

হাজারীবাগের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাণ্ডুয়ায় রেলের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সেখানে ষ্টেশন ও রেল-লাইন বড় ঝড়ের সময়ে নষ্টপ্রায় হইলে যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শমত তিনি ১৮৬৬ খৃঃ হাজারীবাগে আসেন। তাঁহার বংশধরেরা হাজারীবাগবাসী। তন্মধ্যে কালেক্টরীর টেজারার নলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; উকিল অনুপমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল; মুন্সেফ কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল; সাব ডেপুটী ধরণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল; সম্প্রতি বর্ম্মা প্রবাসী এডভোকেট রজনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল ও বর্ম্মার পক্কু আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার তরণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তারিণীবাবুর সমসাময়িক হইতেছেন অধরকালী মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এক সময়ে সরকারী উকিল ছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অধরকালীবাবুর উদ্যোগে ছোটনাগপুর ক্যারিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পুশপুশ নামক সাঁওতাল কুলীদের দ্বারা দুইচাকার ঠেলা কাঠের গাড়ী দ্বারা এই কোম্পানী গিরিডি হইতে হাজারীবাগ, রাঁচী, চাইবাসা প্রভৃতি স্থানে যাত্রী ও মাল যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেয়।

তৎপরে রাঢ় প্রদেশ হইতে রাজগোপাল রায় মহাশয়ের চেষ্টায় রাধিকাপ্রসাদ মল্লিক ও দীননাথ গুপ্ত নামক দুইজন বৈদ্য সন্তান আগমন করেন। রাধিকাবাবুর বংশধরেরা হাজারীবাগবাসী। তন্মধ্যে গোপীনাথ মল্লিক বি. এল, গোলকবিহারী মল্লিক বি. এল, ক্যাপ্টেন ডাঃ বিধুভূষণ মল্লিক, রায় সাহেব (মজঃফরপুরের সিভিল সার্জ্জন), নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক এম. এ, বি-এল হাজারীবাগের উকিল।

দীননাথবাবুর বংশধরেরাও হাজারীবাগে বসবাস করেন। তিনিই নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়কুমার গুপ্ত, গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এবং ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্তকে হাজারীবাগে আনয়ন করেন। প্রসিদ্ধ ঠিকাদার অক্ষয়বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্যে জীবনে বহু অর্থোপার্জ্জন করেন। গিরীন্দ্রবাবু সরকারী উকিল ছিলেন এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অক্ষয়বাবুর পুত্র প্রসিদ্ধ ঠিকাদার সুরথকুমার গুপ্ত, জামাতা জষ্টিস সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক এম-এ, আই-সি-এস, ভূপেন্দ্রবাবুর পুত্র অধ্যাপক ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম-এ (অক্সন), পি-এইচ্‌, ডি, বার-এট্-ল, প্রভৃতি হাজারীবাগবাসী।

১৮৮৩ খৃঃ রায় বাহাদুর যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, অধরকালী মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়গণের চেষ্টায় হাজারীবাগে বাঙ্গালী হিন্দুদের সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান "ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসন" স্থাপিত হয়। তখন হাজারীবাগ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্যামাপ্রসন্ন রায়। তিনিই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করেন।

অক্ষয়কুমার ঘোষ এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ অন্য দুইজন প্রাচীন অধিবাসী।

হাজারীবাগের প্রাচীন বাঙ্গালী অধিবাসীগণ একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সিপাহীদের রেজিমেন্টের সঙ্গে যে সব লোক আসিয়া ক্রমে হাজারীবাগে বসবাস করিতেছেন, তন্মধ্যে ছুতারদের পূর্ব্বপুরুষেরা গয়ার নিকটস্থ আগমুর গ্রাম হইতে আসে। তাহাদের এখন তৃতীয় পুরুষ হইল। সুবর্ণ মিস্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে আসে, তৎপুত্র মঙ্গল এবং নথুন। সুবর্ণর পর আসে বৈজনাথ মিস্ত্রী। তাহাদের বংশধরেরা হাজারীবাগে বসবাস করিতেছে।

সিপাহীরা আসিলে তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি পশ্চিমা মুসলমান আসে। তখন সপ্তাহে যে হাট বসিত সেখানে সেখ নব্বু তরকারী বিক্রেতা, সেখ ঢোলা ও সেখ ছেদি চাউল দাইল বিক্রেতা, সেখ হায়দার ছিল হাঁড়ি বিক্রেতা। বেয়াগন খানসামা, সেখ উলি মহাম্মদ ও সেখ বুদ্ধু, খানসামার কাজ করিত। ইহাদের সকলেরই বংশধর হাজারীবাগে বাস করিতেছে। বিদ্ধিচাঁদ শেঠ ছিল চাউল দাইল প্রভৃতির মহাজন এবং হকিমী ঔষধ দিত। তাহার দ্বারা হাজারীবাগে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় আনীত হন।

জীবনদেবতা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ওগো মৃত্যুহীন !
তোমার শৃঙ্খল পড়ে খসি'
বিশ্বপ্রান্তে লক্ষ শতবার
ইন্দ্রধনু নতজানু হ'য়ে
তোমারে জানায় নমস্কার !

অনির্ব্বাণ তুমি অগ্নিশিখা
ডুবে যাও সন্ধ্যা-অস্তাচলে,
প্রভাতের বেদগান সাথে
ফুটে ওঠ রক্ত শতদলে।

মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পরশে
শুদ্ধ তুমি লক্ষ শতবার।
ইন্দ্রধনু নতজানু হ'য়ে
তোমারে জানায় নমস্কার !

*

মুমূর্ষু ধরিত্রী কাঁদে বসি'
তোমার দুরন্ত পদতলে ;
লাঞ্ছনার গ্লানি ওঠে জমি'
সাগরের লবণাক্ত জলে।

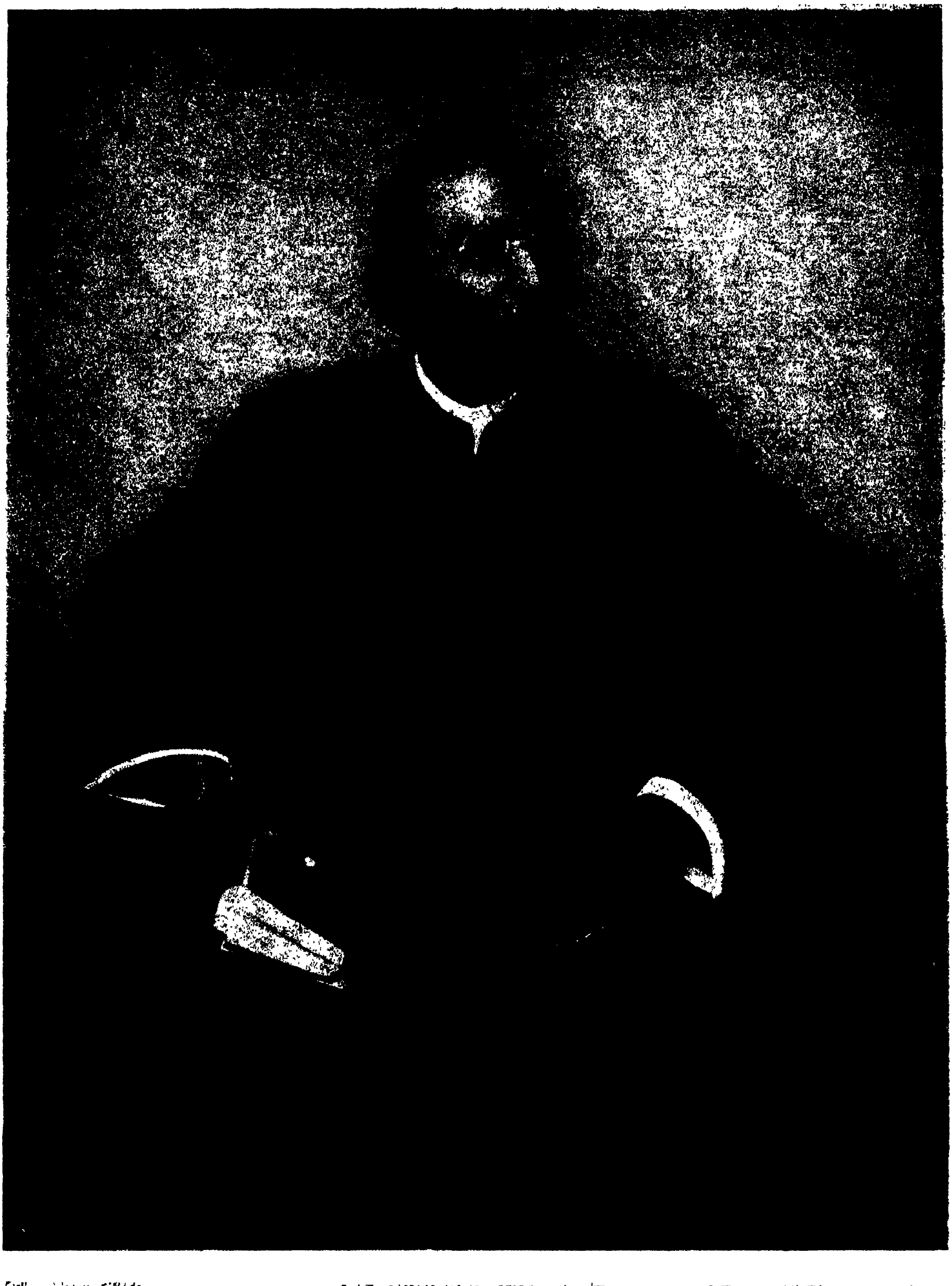
পৃথিবীর পুঞ্জীভূত ধূলি
দিগন্তের গৈরিক অঞ্চল,
তোমার চরণ প্রতিঘাতে—
নিরন্তর বেদনা-চঞ্চল।

জীবনের অগ্রদূত তুমি,
অভ্রভেদী তব উচ্চশির ;
প্রলয়ের মহাঝঞ্ঝা মাঝে
অচঞ্চল তুমি চিরস্থির।

তোমারে ঘিরিয়া নিশিদিন
মানুষের অশান্ত ক্রন্দন,
আকাশের গ্রহ-উপগ্রহে—
জাগে তার অধীর স্পন্দন ;

কালের আবর্ত্ত মাঝে তুমি
অগ্নিময় শুভ্র ধূমকেতু,
মহাকাল শূন্যতার বুকে
রচিতেছ কল্পান্তের সেতু।

মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পরশে
শুদ্ধ তুমি লক্ষ শতবার ;
ইন্দ্রধনু নতজানু হ'য়ে
তোমারে জানায় নমস্কার।



স্যার প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যর প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

জীবনী

বাংলাদেশের বাইরে যে কয়জন কৃতী বাঙালী নিজেদের আন্তরিক প্রযত্নে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন স্যর প্রমোদাচরণ তাঁদের অন্যতম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, যুক্তপ্রদেশে স্যর প্রমোদাচরণ এবং পাঞ্জাবে স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে রকম খ্যাতি লাভ করেছিলেন সে রকম আর কেউ করেছেন কি-না সন্দেহ। এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তি বৈবাহিকতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

স্যর প্রমোদাচরণের আদি বাড়ী উত্তরপাড়ায়। সেখানে এখনও তাঁদের বাড়ী বর্ত্তমান আছে। তবে এলাহাবাদেই তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

প্রমোদাচরণ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। উত্তরপাড়া হাই স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি, এ এবং বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে বিহারের অন্তর্গত আরা জেলায় কিছুকাল ওকালতি করেন। তার পর তিনি এলাহাবাদে আসেন এবং এলাহাবাদেই তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হয়।

স্যর প্রমোদাচরণের এলাহাবাদে আসা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" পুস্তকে লিখেছেন, "প্যারীমোহনবাবু যাঁহাদের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আনয়ন করেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম।"

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন যুক্তপ্রদেশে খুব সম্মান ছিল। তিনি "যোদ্ধা মুন্সেফ" (Fighting Munsiff) নামে পরিচিত ছিলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রমোদাচরণ মুন্সেফী গ্রহণ করেন এবং গাজীপুর এবং বেনারসে মুন্সেফ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবজজ নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল ডিষ্ট্রীক্ট্ এবং সেসন জজের কার্য্য করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর অতিরিক্ত (য়্যাডিসন্যাল) জজের পদে নিয়োজিত হন। আগ্রার স্মল কজ কোর্টে এবং এলাহাবাদ স্মল কজ কোর্টে কিছুদিন জজিয়তি করার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির সম্মানিত পদে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর প্রমোদাচরণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজিয়তি ক'রে গেছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ৭৫ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, তখন আবশ্যিক অবসর গ্রহণের (Superanuation) প্রথা ছিল না। প্রমোদাচরণের জীবনে এই ত্রিশ বৎসর অখণ্ড গৌরবে উদ্ভাসিত। আইনে তাঁর অসামান্য অধিকারের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রদত্ত রায়ের দিকে আইনব্যবসায়ীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাক্‌তেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রমোদাচরণ নাইটহুড (স্যর) প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হন। তিনি দুই বার অর্থাৎ ১৮৯৯ এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে President and Dean of the Faculty of Law হ'য়েছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্যর প্রমোদাচরণকে Doctor of Law উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

প্রমোদাচরণ যখন হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির (Chief Justice) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার পর তিনি আরো সাত বছর বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়। সেই সময় তাঁকে খবরের কাগজ এবং ক্লাসিক বই প'ড়ে শোনাবার জন্য তিনি একজন শিক্ষিত

যুবককে নিযুক্ত করেছিলেন। পড়াশোনার বাতিক তাঁর কোন দিন যায় নি। সামান্য অসুখের পর প্রায় বিরাশী বৎসর বয়সে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ সন্ধ্যা ছটার সময় প্রমোদাচরণ এলাহাবাদের বাড়ীতে মারা যান।

মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বেই প্রমোদাচরণ বিপত্নীক হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামনবমীর দিন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে। ছেলেদের নাম ললিতমোহন, যামিনীমোহন এবং রজনীমোহন। ললিতমোহন এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। যামিনীমোহন ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়ে লণ্ডনে ১৯২৫ সালের ২২এ অক্টোবর তারিখে মারা যান। এই শোকে প্রমোদাচরণ খুব কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন। পুত্রদের মধ্যে রজনীমোহন বেঁচে আছেন।

প্রমোদাচরণ মনে মনে গোড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী তিনি বরাবর পালন করতেন এবং সেই তারিখে নিয়মিত স-দক্ষিণা ব্রাহ্মণভোজন করাতেন। যখন মহামতি গোখ্‌লে মারা যান তখন এলাহাবাদে শোকসূচক শোভাযাত্রার সঙ্গে খালি পায়ে প্রমোদাচরণ ক্লক টাওয়ার থেকে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন। নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুর মত সম্বন্ধ ছিল। তাঁর অনেক গোপন দান ছিল।

সমাজ-জীবনে প্রমোদাচরণের স্থান কত উচ্চে ছিল সে সম্বন্ধে আমরা দুজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করব—একজন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার গ্রিমউড্ মিয়ার্স, আর একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীব স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু। স্যর গ্রিমউড্ মিয়ার্স এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রমোদাচরণের শোকসভায় বলেন,—

'১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমার এ দেশে আসার সময় থেকে ১৯২৩ সালে প্রমোদাচরণের অবসর গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় বরাবর আমি এই আদালতে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসেছি। * * * জীবনযাত্রার পথে মানুষ কখনো কখনো এমন এক-আধজন ব্যক্তির দেখা পায় যাঁর গুণাবলী তাঁকে সমসাময়িক ব্যক্তিদের এত উর্দ্ধে তুলে ধরে যে, মনে হয় একসঙ্গে একজন মানুষে এত গুণের সমাবেশ ক'রে বিধাতা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। স্যর প্রমোদাচরণ এই দুর্লভ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রাসাদের যেমন বনেদ তেমনি তাঁর মধ্যে জীবনীশক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য্য ছিল—তা না হ'লে দু'টি জীবিতকাল ধ'রে তাঁর কার্য্যাবলী বিস্তৃত হ'তে পারত না। তাঁর মস্তিষ্ক পরিষ্কার এবং শক্তিশালী ছিল এবং নিয়মিত পরিশ্রম করার অভ্যাসের ফলে বহু বৎসরের সাধনায় তিনি একজন অভিজ্ঞ আইনবিদ্ ব'লে খ্যাত হ'য়েছিলেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের জন্য এবং কোমল অন্তঃকরণের জন্য আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলুম।'

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ঐ সভায় বলেন,—

'যে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধ'রে প্রমোদাচরণ এই আদালতে বিচারপতি ছিলেন সেই সময়ে আইনের উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল করার সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট দান আছে। যদি আমরা নিজেদের স্মৃতিশক্তি গত শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রেরণ করতে পারি তবে আমাদের মনে হবে যে সেই সময়টাই ছিল আমাদের আইনের একটা ক্রমবিকাশের যুগ। এবং আমি কোন বিচারকের প্রতি অসম্মান বা অবজ্ঞা প্রকাশ না ক'রে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর প্রমোদাচরণ সম্পত্তি বন্ধক রাখা সম্পর্কীয় আইন যে রকম স্পষ্টীকৃত ক'রেছিলেন সে রকম আর কেউ করেন নি।'

হিন্দু আইন সম্পর্কে তিনি সর্ব্বজনস্বীকৃত অথরিটি বা প্রামাণ্য ছিলেন। এই আদালতে যখন তাঁর চাকরি তিন বৎসরের বেশি হয় নি সেই সময় দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি এক রায় দেন। ঐ রায়টি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হ'য়ে গেছে। ঐ রায় বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতিদের কাছ থেকেও সানন্দ সমর্থন পেয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই প্রমোদাচরণ সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু ল সম্বন্ধে সর্ব্বজনগ্রাহ্য প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হন। * * সম্রাটের অধীনে প্রমোদাচরণের চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত এবং অধিকতর প্রতিভাবান অপর কোন বিচারপতি এখনো নিযুক্ত হন নি।

ময়ূর-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

চার

ভোলাকে সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। জয়ন্তও সেদিনের পর থেকে ভোলার দেখা পায় নি। বাড়ীতে গিয়েও কেউ ভোলার সন্ধান পায় নি। ভোলার একটা এমনি খেয়াল, মাঝে মাঝে সে একেবারে ডুব মারে। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কেউ বলতে পারে না। ভোলার গুণমুগ্ধ কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। তারা একদিকে ভোলার শক্তির যেমন প্রশংসা করত, তেমনি তার কথার-ঠিক না থাকার জন্য বিরক্তও হ'ত। কিন্তু ভোলার সঙ্গ ত্যাগ করা তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। ভোলাদা না হলে তাদের আসর জমতই না। ভোলাদার বুদ্ধি পরামর্শ না হ'লে তাদের কোন কাজই চলত না; অথচ ভোলাকে তারা দস্তুর মত অকেজো ব'লেই জেনে রেখেছে।

একটা মাসিকপত্রের আপিসে ছিল তাদের আড্ডা। কাছেই একটা রেস্তরাঁ ছিল—সেখান থেকে আসত চা টোষ্ট ডিমের অমলেট্ কাটলেট্ চপ্—প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট পুড়ত। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দশ-এগারটা পর্য্যন্ত চলত আড্ডা। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান—সব বিষয়েই তাদের আলোচনা হ'ত। এটা ঠিক যে, তর্ক যত হ'ত, তর্কের মীমাংসা তত হয়ে উঠত না। মাসিক কাগজখানার নাম 'জয়ভেরী'। তার প্রচ্ছদপটখানা এঁকে দিয়েছিল ভোলা রায়। কাগজখানা যে কি বিশিষ্ট মত প্রচার করছে, তা ধরা যায় না। ভোলা রায়ের আঁকা ছবিখানা দেখলে মনে হয় যে, য়ুরোপের নতুন ধরণের ছবির অনুকরণেই আঁকা। চারিদিকে কলকারখানা মেসিনারির যুগের ভেতর থেকে একটি বাঙালী-মেয়ের মুখ। অনুমান করা যায় যে, সে মুখ যেন এই আষ্টে-পৃষ্ঠে মেসিনের শৃঙ্খল থেকে তার আত্মার মুক্তির পথ খুঁজছে, পারছে না; ম্রিয়মান চোখ—চোখের পল্লব তাই ভারী হয়ে এসেছে। 'ভেরী' সেই কথা বলছে কি-না—তা কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। ছবিখানাও মূলত যে কি তার অনুসন্ধান ক'রে ও ছাড়া আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না—তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে, ইংরেজীতে যাকে higgeldy-piggeldy বলে—সব একটা জায়গায় এলো-ধাবাড়ি জড়ো করা নানা বস্তু, তার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ওই নত-আঁখি মুখখানা। তাতে cubismও আছে, পিকাসোর যেগুলো তিন-কোণা-ধরণের সাজান তাতে রামধনুর সাত রঙ যেমন খেলে তেমনি রঙও সাজান তাও আছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার Braque-এর still-life, জড়-বস্তুর সমবায়ের ছাঁচও আছে। তা থেকে বাঙলার আত্মা মুক্তি পাচ্ছে কি-না তা বলা যায় না। আর্টিষ্টের, শিল্পীর মনের মধ্যে যন্ত্রযুগের যে ছাপ পড়েছে সেই ছাপের ভিতর পিকাসোর 'Lady' ছবির ঢঙ মিশিয়ে সেটা গড়ে তুলেছে ভোলা রায়। তার মনের ভেতরের ভাব ভাষা পিকাসো ও ব্রেকের সংমিশ্রণে তৈরী। তুলিকার লিখনভঙ্গী সেই ছাঁচই যেন নিয়েছে। কাগজের লেখা, কখন সনাতনী, কখন চিরন্তনী, কখন বিদ্রোহী—বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদের এখানে একটা ছোটখাট লাইব্রেরীর মত আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য নভেল-নাটক দর্শন-বিজ্ঞানের বইয়ের সংগ্রহও আছে। 'জয়ভেরী'র এই আপিসে প্রতি শনিবার একটা সাহিত্যের আসর জমে, নাম তার সাহিত্য-বাসর।

এই সাহিত্য-বাসরে ভোলাদা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সাহিত্যের-বাসর-জাগানদের মধ্যে সেও একজন।

সেদিনকার আড্ডা পুরা জমায়েৎ। কথা উঠল "প্রচার" নিয়ে। "প্রচার" কাগজ কটাক্ষে নাকি একটু বেশ বক্র ইক্ষন করেছে। তাই নিয়ে এদের ভিতর একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেই চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করবার জন্যে যার যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে বলছে, অথচ তাদের ভাব দেখে মনে হয় সম্পাদকের কথা তাদের অন্তরে এসে আঘাত করছে—অবিশ্যি তাদের অন্তর যদিও তাতে সব জায়গায় ঠিক সায় দেয় নি।

কালী মিত্তির বললে:

"গাল দিয়েছে তার হয়েছে কি বাবা! গালাগালির

কাজ করলে লোকে গালাগালিই দিয়ে থাকে। কেন বাবা, গোলযোগ করছ—"প্রচার" ভুল করে নি, ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে। গাল ত দেবেই। তোমরা এমন লেখ কেন?"

বলেই কালী মিত্তির গলা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে রবি ঠাকুরের গান ঢঙ ক'রে সুর ভাঁজতে লাগল।

বিমল বোস আলীপুরের উকিল, বেশ ভাল লেখাপড়া জানা ছেলে। বি-এস্‌সি পাশ করার পর বি-এল পাশ ক'রে ওকালতি করছে। রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের ছেলে। ওকালতির চেয়ে ঝোঁকটা বেশী সাহিত্যের দিকে। 'জয়-ভেরী'র সম্পাদক আসলে না হলেও কাজে সে-ই সম্পাদক। কাগজখানায় নানা নাম দিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে সব জিনিষই সে লেখে৭ বিমল বললে: "গালাগালির জন্যে আমি কিছু বলছি না। আমার কথা হচ্ছে ওরা না বুঝে ওই রকম লিখেছে—জিনিষটা একেবারেই বুঝতে পারে নি।"

ভোলা রায় বললে: "এমন ক'রে সব লেখ কেন বাবা, যে, লোকে বুঝতে পারে না! তোমাদের ওই মিষ্টিক না মরমী ব'লে কি যেন এক ঢঙ হয়েছে। যা বোঝা যায় না, সে গূঢ় রহস্য নিয়ে লোকের এত মাথা-ব্যথা কিসের জন্যে হবে—কেন হবে?"

প্রোফেসার গোস্বামী, কলকাতার একটা বড় কলেজে দর্শনের অধ্যাপক, সেও এদের দলের মধ্যে বাসর জাগানদের একজন, সে বললে:

"ঠিক বলেছ ভোলাদা, মিষ্টিসিজম্ জিনিষটা আমিও একেবারে পছন্দ করিনে। সব জিনিষেরই একটা ইকনমিক বেসিস্ আছে—মাটীকে ছেড়ে দিয়ে কেবল ধর্ম্ম আর পরলোক নিয়ে দেশটা উচ্ছন্নয় গেল।"

ভোলা রায় বাধা দিয়ে বললে:

"কবে যে বাবা তোমরা স্ব-ছন্নে ছিলে তা ত বুঝতে পারলাম না। বলি ক'শ বছর ইংরেজ এসেছে, এই ক'শ বছরের ভেতর কে বাবা তোমরা কি গড়ে তুলেছ বলতে পার—মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, মায় তোমাদের হালের নাট্যকাররা পর্য্যন্ত কি কাব্য, কি নাটক, কি উপন্যাস—সবই ত বাবা পশ্চিমমুখো; পূবে ত সূর্য্যি ওঠা দেখ না, দেখ পশ্চিমে—চালাকি কর কেন?"

বিমল বোস বললে: "ভোলাদা, আমি তোমার মতে সায় দিতে পারলাম না। তোমার data নেই, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ নিয়েই যা-কিছু করেছেন।"

কালী মিত্তির লাফিয়ে টেবিল চাপড়ে বললে: "থাম, থাম, এইবার বিমল-দি-গ্রেটের ডেটা আরম্ভ হয়েছে!"

ভোলা বললে: "ও তোমার ডেটা রেখে দাও। রবি ঠাকুরের উপনিষদ কেরেস্তানী ভাঁটিতে চোলাই করা fifty percent alcohol—যে মাদকতা তোমাদের মাতাল করে, সেটি ইংরেজের ভাঁটি থেকে সরবরাহ হয়। তার সঙ্গে তার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান জোগান দিয়েছে। এইবার তোমার ডেটা পেলে ত! যত সব schizophrenic patient···ক' শ বছর ধ'রে কেবল পরকীয়া আর বৈকুণ্ঠ গড়েছ···মানুষ কটা হয়েছ বলতে পার?"

বিমল বললে: "তুমি তাঁর "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" পড়েছ?"

"তা একটু-আধটু দেখেছি বই-কি বাবা, তবে কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের মত পণ্ডিত নই—আর তোমার য়ুনিভার্সিটির সোনার পদ্মও পাই নি। কুলগৌরবে ফুলের মুখুটী নই· ইতিহাস তোমাদের ছিল না, ইংরেজ এসে গড়ে দিয়েছে। তোমাদের মত schizophrenic রোগীদের দাওয়াই ওরা যখন দিলে তখন তোমাদের নিদ্রিত চৈতন্য মাত্র পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করলে—উত্থান একাদশী এখনও হয় নি। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' সেই একই খাদ· Caird সাহেবের Evolution of Theology থেকে এটি জন্ম লাভ করেছে।"

কালী মিত্তির এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে: "ভোলাদা, কথাটা কি বললে, কি রোগ?"

"Schizophrenia."

"মানে?"

"Dementia præcox··"

"দাও ঠেলা—আরে, সোজা ক'রেই বল না ভোলাদা, তোমার ও লাতিন-ফ্রাঙ্কো রাখ না ছাই।"

"কেন, তোমরা সব বড়-বড় পণ্ডিত পড়ুয়া—এটা না জান কেন?"

"দোহাই ভোলাদা, আমরা পণ্ডিত নই। তোমার রোগটা কি, তাই বল।"

"রোগটা আমার নয় কালী, রোগটা আমার দেশের।"

"ভোলাদা, তোমায় বলি নি, রোগটা কি বল।"

"রোগটা হচ্ছে দিবাস্বপ্ন। সারা দেশ বসে বসে জেগে স্বপন দেখছে।"

কালী হাসতে হাসতে বললে: "কেবল আমাদের ভোলাদা বাদ।"

"ভোলাদা বাদও বটে, নয়ও বটে—দেশের যে হাওয়া তাতে আমাকেও ত নিঃশ্বাস ফেলতে হয়।"

"তা ভাল কথা, কিন্তু কি ভাবে আমরা এ দিবাস্বপ্নটা দেখছি ভোলাদা—তার প্রমাণ?"

"প্রমাণ, তোমার সাহিত্য, প্রমাণ তোমার চিত্রকলা।"

"তা হ'লে ভোলাদা, তুমিও ত বাদ যাচ্ছ না বোধ হয়।"

বিমল এতক্ষণ চুপ করেছিল—সে জিজ্ঞাসা করলে, "ভোলাদা, য়্যাল্‌কোহল ত অনেক খাও জানি, আজ কি হয়েছে?"

"বাগবাজার, বাগবাজারে পক্ষীর ইট নিতে গিয়েছিলে বোধ হয়।"

"দেখ কালী, আমাকে পরিহাস করলে কি হবে, রোগ আমি ঠিক ধরেছি। দাও, সিগরেট দাও।"

"এই নাও। এখন নিদেন কও দেখি কবরেজ মশাই।"

ভোলা রায় সিগারেট টানতে টানতে বললে: "শোন তবে—dementia praecox কাকে বলে? সংসারে জীবন-যুদ্ধে যে অপারগ, অক্ষমতার জন্যে সে নিজেকে সরিয়ে নেয়। নিয়ে মনে মনে দেখে স্বপ্ন—সেই স্বপ্নে সে তখন তৃপ্তি পায়। যে কল্পনায় মানুষ নিজের কর্ম্মশক্তি বাড়াতে পারে—সে শক্তি হ'ল সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর—তা হয় না, হয় একটা মন-মরা ভাবের কল্পনা। তাতে মস্তিষ্ক ক্রমে বিকৃত হয়, তখন কল্পনায় যেটা সত্য সেটা হয়ে যায় মিথ্যা—যেটা মিথ্যা, সেটাকে সত্য ব'লে গড়ে তোলে। কর্ম্মের সাফল্য প্রত্যক্ষ জগতে না হ'লে মানুষ তাকে মানে না, মানতে চায় না। তাতে হয় এই যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদানের মধ্যে যে ভাব-সম্বেগ—সেটা বাধা পায়—বাধা পেলেই কূর্ম্মবৎ মুখ ঘুরোয়—স্বপ্নের জাল-বুনানি চলে বেশী। সমস্ত দেশের কর্ম্মশক্তি গেছে চলে—সবাই এখন উপনিষদের অব্যাকৃত মন্ত্রই আঁকড়ে ধরে আছে। এই যে মানুষগুলো, এরা সবাই ওই schizophrenia রোগে ভুগছে। তাই তোমাদের এই রকম সাহিত্য—আর এই রকম ছবি-লেখা।"

কালী মিত্তির বললে: "তাহলে ভোলাদা, তুমি যে এই 'জয়ভেরী'র ছবি এঁকেছ এটাও তবে তোমার ওই রোগাক্রান্ত?"

ভোলা রায় হাসতে হাসতে বললে: "নিশ্চয়ই—তবে একটু তফাৎ আছে। তফাৎ এই যে, মিথ্যেকে সত্যি দেখাবার জন্যে তোমাদের হলধর বর্দ্ধনের বাঙলার পট আমি আঁকি নি—এঁকে দেখিয়েছি যে সমস্ত দেশটা ওই থেকে যাতে মুক্তি পায়—সত্যিকে সত্যি ক'রে দেখাবার চেষ্টাই করেছি—মিথ্যাকে সত্যি করতে যাই নি।"

"ভোলাদা, দেখছি আজ একেবারে পঞ্চরঙে—"

"তোমাদের পাল্লায় পড়লেই রঙ ধরে যায়—কেন বাবা, গোলযোগ কর…বলতে পার, এই যে সাহিত্য করছ, এই যে 'জয়ভেরী'র ভেরী বাজাচ্ছ—এটা কি?"

বিমল বোস বলে উঠল, "অর্থাৎ, বলতে চাও, আমরা প্রপাগাণ্ডা করছি?"

"প্রপাগাণ্ডাই বল, আর প্রচারই বল, তোমাদের অক্ষম কর্ম্মশক্তি, মন-মরা কল্পনা মানুষের মত পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে খোলা আকাশে দাঁড়াতে পারে না, তাই যত morbid sentiment, তাই যত মন-মরা ভাবের আবেগ তোমাদের কল্পিত চরিত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা খুশী হ'লে। Schizophrenic patient-দের লক্ষণই তাই, কেউ কপালে হাড়কাট আঁকছ, কেউ তুলসী বনের বাঘ হচ্ছ, কেউ রুদ্রাক্ষ তন্ত্র-মন্ত্র মাদুলি নিয়ে আছ। তোমাদের মনের ভেতরটা গেছে কুঁচকে দুমড়ে—তাই মিথ্যাচারকে সত্যি মনে ক'রে এই সাহিত্যের ভোগ ও তার প্রচার করছ।"

কালী মিত্তির বললে: "ভোলাদা, This is rather serious—সঙিন কথা—"

"কি করি বল ভাই, সঙিন ত তুলতে পারি নে—তাই কথায় সঙিন ওঁচাই…দেখ ভাই, সাহিত্য আলাদা বস্তু আর তোমাদের প্রচার আলাদা বস্তু। সাহিত্যটা হ'ল সত্যি, প্রচারটা হ'ল, মিথ্যেকে সত্যি করার দুর্ম্মতি…"

শশী চাকর এমন সময় আবার চা এনে দিলে। শশী জানে, বাবুরা যখন চেঁচা-মিচি করে তখন গরমটা তাতিয়ে তাপ রক্ষা করতে হ'লে গলায় ঢালতে হবে চা, মুখে দিতে হবে কাগজ-পোড়ার ধোঁয়া…গরম-গরম চা পেটে পড়লেই বাবুদের তর্ক নরম হয়ে আসে, অন্য দিকে মোড় নেয়।

ভোলা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েই বললে: "ক'টা বাজল? ওঃ, সাড়ে আটটা! আর নয়, আমি উঠলাম— জয়ার ওখানে যেতে হবে—আজ কদিন যাই নি।"

প্রোফেসার গোস্বামী বললে: "দেখ ভোলাদা, এটা যে ঠিক দেশের সাহিত্য হয় নি—তা সবটা মেনে নিতে পারলাম না—আর তার কারণ শুধু পশ্চিমমুখো নয়—এরা দেশের যারা সত্যি মানুষ—যে গরীব-দুঃখী——তাদের কথা কয়নি কোনদিন—মরছে—আর মরেছে যত আধ্যাত্মিকতা ক'রে। আধ্যাত্মিকতা মানুষের জীবন নয় পেটের ভাত থাকলে আধ্যাত্মিকতা করা পোষায় বটে।"

ভোলা রায় চটে গিয়ে বললে: "মাফ করবেন প্রোফেসর গোস্বামী, আমার কাছে কথাটা বেশ যুক্তির মত মনে হ'ল না। এটুকু বুঝলাম যে, লেনিনে চোলাই করা কার্ল মার্কস্ আওড়ালেন। কিন্তু সে দেশ, সে জাত কি এই? গঙ্গার মোহানায় পলিপড়া জমি সোঁদর বনের আবাদী, এখানে বাঘে খায় মানুষ, আর মানুষে খায় মালপো—এদের খোল বলে চাকুম-চুকুম ভুস্ ভুস্। হা-কিঞ্চিৎ বলে তমাল জড়িয়ে ধরা এদের হ'ল বাগান্ন পুরুষের পেশা—নির্ঝঞ্ঝাটে বসে কেলিকদম্বতলে চূড়া বাঁধা ময়ূর পাখার স্বপন দেখা আর পরকীয়ার রসাস্বাদে মশগুল হওয়া এদের জাতের হয়েছে ধর্ম্ম।"

কালী বললে: "ভোলাদা, কি হয়েছে বল ত আজ? মনে হচ্ছে আজ কদিন তোমার পেটে য়্যালকোহল পড়ে নি। কেমন? গোঁসাই ত আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধেই বলছে।"

"থাম্ না কালী, গোঁসাই-গোবিন্দরা বৈষ্ণব দর্শনের রক্তে তৈরী··ঘুরে ফিরে ময়না পাখীর শেখা বুলি আওড়াবেই— তখন বলত অচিন্ত্যভেদাভেদ, এখন commune ছেড়ে কমিউনিজম্ বলে। ও তোমার রাশ্যার বুদ্ধি এখানে চলছে না গোঁসাই। মাটী আলাদা—মাটী আলাদা।"

গোঁসাই বললে: "মেনে নিলাম ভোলাদা সব কথা তোমার, .কিন্তু কি চলবে সেইটে বাত্‌লে দাও। আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে তাই করি। রাশ্যার কমিউনিজম্ না হয় নাই করলাম, একটা কিছু করতে হবে ত?"

"কি যে হবে না, কি যে হচ্ছে না, সেইটে আগে বোঝ— আগে বোঝ—আগে যদি negative বুঝে নিতে পার— positive ধরা শক্ত হবে না। আগে নেতির বিচার কর, তারপর আপনিই ইতি আসবে, বুঝলে?"

বিমল বললে: "যদি কোন ইতি থাকে ভোলাদা, তবে ত···"

"ইতি না থাকলে কি আর বেঁচে আছ···না, বাঁচবার চেষ্টা করছ···"

গোঁসাই বললে: "বেশ, তা হ'লে ভোলাদা, নেতির কথাই বল শুনি।"

"ইংরেজ আসার পর প্রথম নেতি হচ্ছে তোমাদের বন্দে-মাতরম্···তার পরের নেতি হচ্ছে বন্দে ভারতম্।"

"কারণ?"

ভোলা রায় খুব গম্ভীর হয়ে মুখভারী ক'রে বললে: "কারণ, তার মধ্যে অর্থাৎ বন্দেমাতরমের ভেতর ইংরেজ-ভীতি পরিস্ফুট অতএব তার জন্ম অর্থাৎ শব্দটা বেদ থেকে নিলেও ইংরেজ রাজত্বের কাছে inferiority complex থেকে জন্ম লাভ করেছে।"

"দ্বিতীয়টি কি?"

"দ্বিতীয়টি বন্দে ভারতম্। এর জন্ম হল নেশনের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে তোমাদের কংগ্রেসের ধুয়োয় মঞ্চ তৈরি করা প্রথমটায় তবু প্রাণের টান ছিল, ভয় যতই থাকুক দ্বিতীয়টায় ভারতবর্ষের সবারই কাছে যে ভয়, তারই চাতুর্য্য-বুদ্ধি থেকে করেছে জন্ম লাভ। এ দুটোই নেতি··· করতে হবে···"

"আর?"

"আর সব চেয়ে বড় নেতি হচ্ছে অদ্বৈত বেদান্তের দল·· তাদের গুরুবাদ··শিখের কাছে ধার করা 'ওয়াহি গুরু কি ফতে,···"

বিমল বললে: "ভোলাদা, তুমি দল বিশেষকে আক্রমণ করছ!"

"আক্রমণ আমি কাউকেও করিনি রে ভাই, তবে এইটুকু বুঝেছি, সবচেয়ে গভীর inferiority complex যদি থাকে তবে ওই তোমার অবতারবাদ··তোমার যত অবতারই আসুক—এ বাঙলার পলিপড়া মাটী—গঙ্গা থেকে পদ্মা পর্য্যন্ত হাজার বছরের অন্ধকার একটা দেশালাইয়ের কাটিতে ঘুচবে না, ঘোচে না, ঘোচে নি—সারবন্দী অবতার মায় তোমার বরিষ্টটি পর্য্যন্ত neurotic-এর দল। অবতারে

বাঙলা দেশ তরবে না, তরেও নি···ও তোমার শ্রীশ্রীশ্রীতেও হবে না···আনন্দ মহাত্মাতেও হবে না, আজও হয় নি।"

বিমল বলে উঠল: "এটা ভোলাদা তোমার অত্যন্ত অন্যায়, তুমি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছ, তোমার ভাল লাগে না বলে এগুলো সব নেতি হয়ে যাবে? এঁরা সব মহাজন, এঁদের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা থাকা উচিত।"

ভোলা হাসতে-হাসতে বললে, "শ্রদ্ধা আছে বলেই ত বলছি। এদের প্রতি না থাকলেও আমার সংসার চলবে, কিন্তু নিজের প্রতি শ্রদ্ধা যেদিন হারাব—সেদিন অবতারকে দণ্ডবৎ হয়ত করব। তার আগে নয়। যাও যাও, সারবন্দী সবাই আসেন মহামুক্তি দিতে—ইহলোকে পেটভরে খেতে পাইনে—সত্যি মনের ভাব, সত্য কথা বলবার অধিকার নেই···নিজের কল্যাণ—পরের কল্যাণ করবার ক্ষমতা নেই··· অনশনে, রোগে, উপবাসে, অভাবে মানুষগুলো পশুর অপেক্ষা হীনতা বহন করে চলেছে, ইহলোকে তাদের মুক্তি হয় না—সুস্থ সবল হয় না, গুরুকে প্লাম কেকের ভোগ দিয়ে পেসাদ খেলে আমার পরলোকে মুক্তি হয়ে চতুর্ভুজ হয়ে যাব। যাও যাও, রেখে দাও তোমার ও ধর্ম্ম—ধম্ম পালটাও···ধম্ম পালটাও ও ন্যাড়া-নেড়ীর কম্ম নয়, বুঝলে মহাজন!

ভোলা একটু হেসে আবার বললে: "হ্যাঁ, মহাজন ত বটেই, ধর্ম্মের ভণ্ডামিকে ক্যাপিটালিজম ক'রে মজার investment, বসে বসে সুদ খাচ্ছ। ধর্ম্মের মুখোসের মত ক্যাপিটাল আর আছে?"

কালী মিত্তির চুপ ক'রে বসে কেবল সিগরেট টানছিল। গোসাই আর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভোলা রায় বলতে লাগল: "শোন গোসাই, তুমি দর্শনের অধ্যাপক, তুমি এসব কথা নিশ্চয়ই জান। হীনত্বের যে একটা জটিলতা সারাটা দেশের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তা তুমি অস্বীকার করতে পার না। যতই পৃথিবীর অন্যান্য জাতের শক্তি-সম্পত্তি-বুদ্ধি-স্বাধীনতার কথা শুনছ, ততই তোমাদের এই হীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই হীনত্বই তোমাদের সকল রোগের মূল। যত দিন না এ বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছে যে তোমাদের মাথা হীনভাবে কার কাছে নত হবে না—না-গুরু, না-দেবতা, না-অবতার, না-মানুষ—ততদিন যা করবে সবই নেতি করতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞান ছুঁড়ে কালাপানীতে ফেলে দাও গে—জাত-কচ্ছপে খেয়ে ফেলুক। মাটীর দিকে তাকাও, বুঝলে?"

গোঁসাই বললে: "ভোলাদাও ঘুরে ফিরে সেই রাস্তার কথাই আওড়াচ্ছ।"

"একেবারেই নয়, বরম্—"

কথা বলতে না বলতেই একখানা ট্যাক্সী এসে দরজার কাছে দাঁড়াল, নামল জয়ন্ত। জয়ন্ত এসেই বললে: "আচ্ছা ভোলা, তুই ত বেশ লোক, সেই যে ডুব মারলি, তারপর থেকে আর দেখা নেই। তুই থাকিস্ থাকিস্, এমন ডুব মারিস্···ওদিকে সব কাজ পড়ে, আর তুই—"

"এখানে বসে আড্ডা মারছি···এই ত? আড্ডা দিই নি। ওদের বোঝাচ্ছিলুম যে inferiority complex থেকে কেমন ক'রে অবতার জন্মায়।"

"তুই নিজেই ত এক অবতার!"

"ও! তুই নিত্যসিদ্ধ থাকের সেই সপার্ষদ ছিলি, না? তাই ঠিক চিনতে পেরেছিস্···বোস্ বোস্ জয়া, একটু হাঁফ ছাড়—তোর মুখখানা অমনতর হয়ে গেছে কেন রে? কি যেন হয়েছে। বাড়ী গিয়েছিলি না?"

"এখন ওঠ দিকিনি, অনেক কাজ আছে···আমার দেরী করবার সময় নেই।"

"আহা এক পেয়ালা চা না হয় খেলি—বোস্ না—উঠব এখনই।"

কালী মিত্তির বললে: "ব্যাপারটা কি জয়ন্ত? এলে ঝড়ের মতন, ঝাপটা মেরে ভোলাদাকে নিয়ে যেতে চাও—বোসই না একটু···না হয় তোমরা বড়লোক···"

জয়ন্ত একটু দুঃখিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বললে: "বড়লোক ব'লে কোন দিনই ত কোন গর্ব্ব করি নি ভাই··· বড়লোক আমার কোন্‌খানটা দেখলে?"

ভোলা হেসে বললে: "আপাদ মুকুট পর্য্যন্ত···বড়লোক নয়? বড়লোক না হ'লে ভোলা রায় সাতবার তোমার দরজায় পাক খায় দু পাত্তর মদের জন্যে···"

বিমল বললে: "কিন্তু কথাটার কোন মীমাংসা হ'ল না ভোলাদা···"

"কোন কালেই হবে না বিমল, ওই যে জয়ন্ত আমাকেই বললে অবতার। অবতাররা ঘাড়ে চাপে পথটা বাইয়ে নেয়, মীমাংসা করে না। দেখ, খুব ভেবে-চিন্তে যারা কাজ করতে

চায়, তাদের মীমাংসা হয় হয় ত, কিন্তু কাজ কখন হয় না ; কাজ করে যারা, তারা কাজ করতে করতে ভাবে, কাজ করে···আচ্ছা জয়ন্ত, তুই অত ছট্‌-ফট্‌ কচ্ছিস কেন ? বোস্‌ না ভাই, আর এক পেয়ালা চা না হয় খেলি।···"

জয়ন্ত সেখানে বসে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। গত রাত্রে মিলনীর সঙ্গে সেই ঝগড়া-ঝাঁটির পর থেকে জয়ন্ত কোন কাজে আর উৎসাহিত ছিল না। এক একবার মিলনীর কথা মনে করে, আর বুকের ভেতর থেকে কান্না যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে—চোখে জল আসে না, একটা তপ্ত তাপের ভাব আগুনের ভাবরার মত উঠে মাথা পর্য্যন্ত যেন রি-রি করে উঠছে। এখানে এই আড্ডায় বসে খানিকটা নিঃশ্বাস ফেলতে পারলে সেও যেন বেঁচে যায়। অথচ কালী মিস্তিরের কথায় তাকে বড়লোক বলে ঠারে বলায় তার ভাবপ্রবণ মন আঘাত পেলে। মিলনীর সঙ্গে কেন যে এমন ক'রে এল—তা সে নিজে জানা না-জানা দুয়ের মাঝখানে পড়ে টানা-পড়েনে যেন ছিটকে ছলকে গেছে। হয়ত এই সময় যদি জয়ন্তর সঙ্গে মিলনীর দেখা হ'ত, যদি মিলনী সেই চিঠির কথা সবটা পরিষ্কার করে বলে বোঝাতে পারত—এ আগুনে জল পড়ত। তা হ'ল না। কেবল মনে করতে লাগল···যে ভাবে চলে এসেছি, তাতে আর ফিরে যাওয়া হয় না। অথচ বাইরে এসে মীনার রিহার্স্যালও ভাল লাগছে না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে জয়ন্ত এখানে ভোলার সঙ্গ খুঁজতে এসে পড়েছে।

চা খেয়ে জয়ন্ত বললে : "তাহ'লে ভাই, আমরা আসি।"

ভোলা বললে : "আরে বোস না জয়া···হ্যাঁ রে, সেদিন বোনটি অমন ক'রে ডাকলে, তুই আমাকে দেখা করতে দিলি নি কেন··তোর মতলবখানা কি বল্‌ ত ?"

"আবার ও-সব কথা এখানে কেন ? তোদের কি তর্ক হচ্ছিল তাই বল্‌ বসতে যদি হয় তাই শুনি, নয় উঠবি ত ওঠ্‌···বাজে কথা ক'স নি।"

ভোলা লক্ষ্য করছিল যে জয়ন্ত কি একটা ভয়ানক অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে আবার বললে : "ট্যাক্সী ত রয়েছে···চল্‌ না একবার বাড়ীর দিকে যাই।"

জয়ন্ত বিরক্তভাবে বললে : "তুই যদি না আমার সঙ্গে যাস্‌ তবে আমি উঠি···আমি এখন বাড়ী যাব না কিন্তু···

জয়ন্তর বলার ভঙ্গী ও গলার স্বর রূঢ় ও দৃঢ়।

ভোলা তবু উঠল না, বললে : "বোস্‌ না, একদিন তোমার রিহার্স্যাল না হয় বন্ধই রইল।"

এর মধ্যে থেকে বিমল বোস বলে ফেললে : "হ্যাঁ জয়ন্ত, তোমার নাটকখানা থিয়েটারে জমল না কেন ? বইখানা ত আমার কাছে সকল রকমেই খুব ভাল বই ব'লে মনে হ'ল।"

কালী চতুর, সেও এতক্ষণ জয়ন্তর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল বিমলের এ প্রশ্নটায় জয়ন্তর মুখ যে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল, সে তা লক্ষ্য করল ভাল ক'রে··সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে : "বই ভাল ব'লেই জমল না।"

ভোলাও এইবার একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল ; সে জানে যে জয়ন্তর বই না-জমার কথা তাকে কতখানি পর্য্যন্ত আঘাত করতে পারে। তাই কথাটা ঘুরিয়ে বললে : "তোমাদের যেমন প্রশ্ন—সব বই কি আর জমে, বিশেষত নাটক জমাটা কেউ বলতে পারে না ও হ'ল দর্শকের খেয়াল। সত্যি কথা বলতে গেলে কমলের পাট প্রডিউসারের দোষেই নষ্ট হয়েছে।"

বিমল প্রশ্ন করলে : "বই নষ্ট করে প্রডিউসারের কি লাভ ?··"

"লাভ ? সে অনেক কথা সে এক অপ্রিয় ইতিহাস সে কথা এখন থাক।"

জয়ন্তের বই নিয়ে যত এই সব কথা হতে লাগল, ততই জয়ন্তের ভিতরের ক্ষত যেন আগুনের মত জ্বলে উঠতে লাগল। সে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। একবার ভাবলে উঠে যাই···আবার ভাবলে কথাটা বলেই ফেলি। কথাগুলো তার বুকে যেন অগ্নি-শলাকা বিঁধতে লাগল।

ভোলা সকল রকমেই জয়ন্তকে চিনত··জয়ন্ত হাই তুললে সে তুলে ধরত, সে বুঝতে পারত, জানত—জয়ন্তের বেদনাটা কোন্‌ খানে। সে বেশ ধরতে পারলে, জয়ন্তের ভেতরে কি হচ্ছে। তাই বিমলকে বললে : "শোন বিমল, একটা কথা তোমাদের বলি ; এ কথাটা আমার উড়িয়ে দিও না, হেস না, বরং একটু চিন্তা করে দেখো।"

"কি কথা ভোলাদা ? বল, নিবিষ্ট হয়েই না হয় চিন্তা করব।"

"খানিক আগে যে inferiority complex-এর কথা বলছিলাম—তাই, সব ভাবদৈন্যের গ্রন্থি। দীনতার

গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছ। আমাদের সব চেয়ে দুর্দ্দশা হচ্ছে সেইখানে। কুক্ষণে গর্ডন ক্রেগ-এর বই বাঙলা দেশে এসেছিল—তাই এই অনাছিষ্টির কারবার আরম্ভ হয়েছে। দেশের বেশীর ভাগ অভিনেতাই অশিক্ষিত—আর অভিনেত্রীদের কথা ছাড়ানই দাও। যেমন তোমাদের প্রডিউসার, তেমনি তোমাদের অভিনয়। যে বইখানা চলে, সেই বইখানাই ভাল। জয়ন্তের বই যখন চলে নি, তখন বইখানাই খারাপ। যাক্ গে, তর্কের দরকার নেই—চল্ জয়া, আমরা যাই।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, সে যেন এই তর্কের গ্লানির হীনতা থেকে রেহাই পেয়ে গেল। ভোলা তাদের আর কোন কথা বলতে দিলে না, নিজেও দাঁড়াল না। দু'জনে তখনই চলে গেল।

ট্যাক্সীতে উঠে জয়ন্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শুধু বললে: "তোকে বললাম ভোলা, যে চল্—তা নয়··· এখানে ওই সব কথার কি দরকার ছিল? ওরা কি বলবে জানিস্?"

"কি?"

"বলবে, বইখানা জমে নি বলে ঈর্ষায় প্রডিউসারকে দোষী করছে। ও সব কথার কি দরকার ছিল? অভিনয় আলাদা করে যদি বই জমাতে পারি, লোককে সাধারণ দর্শককে যদি বোঝাতে পারি তখন তার কথা, নইলে প্রডিউসারের দোষে বই মাটি হয়েছে এ বললে লোকে শুনবে কেন?"

"তাই ত জয়া, ঠিক বলেছিস্ ত—আমার দেখছি superiority complex হয়েছে, শ্রেষ্ঠতার গাঁট পড়েছে —ঠিক আমিই তাহ'লে অবতার হয়ে যা··· কি বলিস্? যাক্ তুই বাড়ী যাস না কেন বল্ ত?"

"কিছু না—এখন ত থিয়েটারে চল্, সে কথা পরে হবে।"

ট্যাক্সী থিয়েটারের দিকে চলে গেল।

ভোলা ও জয়ন্ত চলে যাবার পর গোসাই বললে: "ভোলাদার আমাদের সব পশ্চিম-মুখো ভেবে-ভেবে একটা ম্যানিয়া দাঁড়িয়ে গেছে। ভাবরাজ্যের যে পূব-পশ্চিম নেই, সেটা ভোলাদা একেবারেই ভুলে যায়।"

কালী মিত্তির বললে: "না গোসাই, ভুল বললে। ভাবরাজ্যে পূব-পশ্চিম ত আছেই, উত্তর-দক্ষিণও আছে।"

"কি রকম, একটু বলুন শুনি?"

"দেশভেদে কালভেদে মানুষের মনের ভাবের যথেষ্ট অদল-বদল হয়—এ কিছু নতুন কথা নয়।"

"তা হলে সত্য ব'লে—truth reality ব'লে কোন জিনিষ নেই বলতে চান?"

"অর্থাৎ absolute truth আছে কি-না? ভোলাদাও ভুল বলে নি গোসাই, দার্শনিকতা তোমার রক্তে আছে; পণ্ডিতের বংশ মানতেই হবে···স্বভাবেই খানিকটা আধ্যাত্মিকতা থেকেই যাবে···ভোলাদার মতে তাহলে বলতে হয় যে প্রভুপাদের বংশ—বুদ্ধির দ্বারা অবতার গড়ে দেওয়ার জাত—গোসাই গোবিন্দ হ'লে তোমরা—তোমাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান হ'ল পরম সত্য।"

"ব্রহ্মজ্ঞান আমি মানি।"

"মানবে বই-কি, মানতেই হবে। ব্রহ্মজ্ঞান মানবে, অবাঙমনসগোচর মানবে, বেদ মানুষে তৈরি করে নি, শ্রীভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে মাটীর মানুষের শক্তিতে ও জন্মাতে পারে না—এ ত মানতেই হবে।"

গোসাই কালী মিত্তিরের ভাবভঙ্গী দেখে বললে: "আপনি রহস্য করছেন···"

"একেবারেই না। সবটাই মেনে নিচ্ছি কারণ আছে।"

"কি কারণ?"

"কারণ, তোমার দেশে তিন রকমের লোক আছে।"

"আমার দেশ মানে?"

"ওই হ'ল গো, আমাদের দেশে বড়লোক, পাতি-ভদ্দর-লোক, আর ছোটলোক।"

"পাতি-ভদ্দরলোক আবার কি?"

বিমল হেসে উঠল: "কি বললে কালী, পাতি-ভদ্দরলোক!"

"হ্যা, অর্থাৎ যারা খেতে পায় না সাজে বড়লোকদের অনুকরণ ক'রে ছোটলোকদের ঘেন্না করে বড়লোকদের খোসামোদ করে···বড়লোকের অস্ত্র হল ব্রহ্মজ্ঞান তার মানে টাকা, পাতি-ভদ্দরলোকরা ছোটলোক ঠেঙিয়ে সেই টাকাটা দেয় বড়লোকদের কাছে, তা থেকে যা-কিছু দালালী পায়। বড়লোকদের হাতেই ব্রহ্মজ্ঞান থাকে···তারাই সমাজ গড়ে, পুরুত গড়ে, চৌকীদার গড়ে, পণ্ডিত গড়ে। পণ্ডিতদের চাপরাশ—ফারমন তারাই দেয়। তোমাদের অব্যাকৃত ব্রহ্ম এমনি ক'রেই ব্যাকৃত সংসারে লীলা-অভিনয় ক'রে আসছেন। অভিনয়! সমস্তটাই অভিনয়!"

বিমল হাসতে লাগল। কালী মিত্তির বললে: "হেসো না বিমল, পৃথিবীর সব জায়গায়ই ওই তিন থাক লোক আছে; তবে কি জান, আমাদের এটা পরাধীন দেশ—তাই আমাদের ভাবরাজ্যের ধারাটা আর একটু বেশ মোলায়েম, কেন-না, আইনের ঘিস্‌কাপ দিয়ে র‍্যাঁদা মেরে একেবারে সমান পেলেন করে দিয়েছে। মুড়ি-মিছরির এক দর। তবে যেখানেই টাকা, সেইখানেই পুরুত, সেইখানেই দালাল, সেইখানেই ছোটলোক।"

বিমল জিজ্ঞাসা করলে: "তা'হ'লে তোমার বক্তব্যটা আসলে কি?"

"কিছুই না, কেবল সময়কে ফাঁকি দেওয়া আর বাজে বকা; এর চেয়ে বড় কাজ আমাদের কেউই করি না বোধ হয়। তবে মাঝে মাঝে ভাবি যে পাদরী ম্যানুয়েলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' হবে কবে?"

"তার মানে?"

"তার মানে? পাদরী ম্যানুয়েলের কৃপার ফারমন থেকে কেরী সায়েবের বাঙলা গদ্যে তৈরী এ বাংলা। রঘুনন্দনের সবটাই তলিয়ে গেছে, কেবল টিকিটা এখনও নড়ছে।"

"কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না।"

"পারবে ব'লে মনেও হয় না।"

কালী হাসতে হাসতে বললে: "আমার ডেটা আছে বিমল, ডেটা আছে।"

"ডেটাটা কি? আমরা না হয় পাতা ফুল ফল সব ধরিয়ে নেব।"

"ডেটা এই যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এই বাঙালী পদ্মা-গঙ্গার পলি-পড়া মাটীতে গজিয়ে উঠেছে—এ একেবারে নতুন—কেরীর কেয়ারী-করা মানুষ। যতই এর ঘাড়ে সনাতন চাপাও—তেলে জলে মিশ খাবে না। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' না হ'লে বাঁচবার উপায় আর নেই। ভোলাদার কথার ভেতর সে অর্থ আছে। ভোলাদা যে গর্ডন ক্রেগের কথা বললে, তা বস্তুতপক্ষে অনেকটা ঠিক। গর্ডন ক্রেগ্‌ যদি নিজে নাটককার হ'ত,তাহলে ওথিওরি বাত্‌লাত না। অক্ষম জাত অক্ষমেরই অনুসরণ করে—ক্ষমতাকে সহ্য করতে পারে না—আর শক্তি থাকলে কেউ অনুকরণ করে না, সৃষ্টি করার ঝোঁকই হয় তার বেশী। আমরা নাটক যাকে বলে তার গড়বার শক্তিও যেমন রাখি, তেমনি ক্রেগের বুদ্ধি ও বিত্তের দোহাই দিয়ে মনে করি প্রডিউসারই সব। তিনি যখন রূপদক্ষ, রূপের রসায়ন তাঁরই হাতে।"

বিমল বললে: "রাত হয়ে যাচ্ছে। কথাটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারলাম না কালী। কাল যদি ভোলাদা আসে তবে এ কথাটার আলোচনা হবে। এখন ত দেখছি সভ্যজগতে প্রডিউসাররাই দর্শকদের কাছে নাটকের রূপ দেয়। গর্ডন ক্রেগকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয় কালী।"

"তা ত নয়ই- বড়লোকের পুরুত তৈরী এখনও ত বন্ধ হয় নি। টাকা যাদের আছে তারা হয় নিজেরা গর্ডন ক্রেগ্‌ হবে—আর না হয় গর্ডন ক্রেগ তৈরী করে নেবে।"

বিমল বললে: "আচ্ছা, কাল আবার এ কথার আলোচনা হবে। আজ তবে সভা ভঙ্গ হোক্‌। চল প্রোফেসার, আমরা যাই। শশী আলোটা নিভিয়ে দরজা বন্ধ কর। আমরা যাচ্ছি।"

সভা ভঙ্গ করে সবাই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

কালী বললে: "এত সকাল-সকাল বাড়ী ফিরলে বাড়ীতে মনে করবে ফাইলেরিয়ার জ্বর দেখা দিয়েছে। বাড়ী যাওয়া এখন হবে না। চল গোসাই, রেস্তরাঁয় বসে আর এক পেয়ালা চা-ই খাওয়া যাক।"

"কালী, বেনেভান্তের বইখানা কবে দেবে?"

"তা একেবারে দিনস্থির করে বলতে পারছি নে। আমার এখনও কাজ আছে একটু।"

"কোন দিনই কিছু লিখবে না—কেবল বাজে বকবে। জান প্রোফেসার, কালী ইচ্ছা করলে সত্যি ভাল নাটক লিখতে পারে। কোন কাজ যদি করবে।"

কালী হাসতে হাসতে বললে: "কাজ যে করে সে তোমার 'জয়ভেরী'র সাহিত্য-বাসরে আড্ডা দেয় না—চল—চল, এক পেয়ালা চা খেয়ে বাড়ী যাবে।"

"বেশ, বইখানা কবে দেবে ঠিক ক'রে বল না ভাই।"

"তা ঠিক ক'রে বলতে পারছি নি।"

"তবু কত দিনের মধ্যে?"

"দিন ঠিক ক'রে যে-দিন বলতে পারব, সে-দিন কালী মিত্তির আর টেরা-প্লেনে চড়বে না, একেবারে এরোপ্লেনের ডাকে উঠবে।"

বউবাজারের মোড় পেরিয়ে তারা একটা রেস্তরাঁর

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেল।

বিমল বললে: "আর নয়—আমি যাই কালী। আমার ভাই রাত হয়ে যাচ্ছে। জান ত আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

"উকীলদের আবার বাপের কাছেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়!"

"রোজগার ত করিনে ভাই, এখন যে বাপের ভাতে আছি।"

"আচ্ছা বেশ—এক পেয়ালা চা-খেয়ে যাও।"

রেস্তরাঁর ভেতরে গিয়ে কালী বললে: "ওহে দিনু, ও দিনদা, শোন, তিনখানা টোষ্ট আর তিন পেয়ালা চা... গোসাই আর কিছু খাবে?"

"না।"

"যে কথা হচ্ছিল, কথাটা ব'লে শেষ করে নিই—এখন mood এসেছে—বুঝলে? শোন। ভোলাদা ঠিকই বলেছে।"

"কি ঠিক বলেছে?"

"কথাটা মন দিয়ে শোন। তুমি বাঙলা নাটক অনেক পড়েছ, কিন্তু তার অভিনয় খুব বেশী দেখনি।"

"সে কথা ঠিক—থিয়েটার খুব কমই দেখেছি।"

"আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্ম কোথা থেকে জান?"

"জানি। ইংরেজের অনুকরণে।"

"বেশ। এই অনুকরণ থেকে যে নাটক হয়েছে—তার অভিনয়ও অনুকরণ থেকে হবে। কেমন?"

"তা হবে বটে, তবে যতটা নিতে পারবে।"

"এর ভেতর আর একটা কথা বলতে চাই।"

"কি?"

"ওই যে রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ বলেছি না—ওই হ'ল ধ'রে নাও প্রথম গল্প। অর্থাৎ ওইখানে থেকে বাঙালী জাতকে প্র্যাক্টিকাল হবার রাস্তা বাতলেছে। তার আগে পরকীয়া রসচর্চ্চা আর কাব্যই করেছি। নাটক যখন রচনা আরম্ভ হ'ল তখন খানিকটা কাব্য আর বাকিটা নকল, দুইয়ে মিলিয়ে অভিনয় করেছি। আর আজকের অভিনয় দেখলে বুঝতে পারতে—অনুকরণের মোহ কাটে নি—অভিনয়ের নেশা বেশী ধরেছে।"

"কি রকম?"

"প্র্যাক্টিকাল্ বিশেষ এখনও হতে পারি নি, কিন্তু অভিনয়ের নেশাটা প্রায় পেশার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। স্কুল-কালেজে—ছেলে-মেয়ে বুড়ো-যুবো বড়লোক থেকে পাতি-ভদ্দরের মেয়েরা পর্য্যন্ত সবাই অভিনয় করে। সত্যি কিন্তু কেউ পারে না।"

"কি পারে না—অভিনয়?"

"হ্যাঁ, সত্যি যে না পারে, সে অভিনয়ও পারে না। সত্যি না জানলে অভিনয়ও করা যায় না। সেই জন্যে নাটকও সত্যি হয় না, অভিনয়ও ঠিক হয় না।"

"তার সঙ্গে তোমার গর্ডন ক্রেগের কি সম্পর্ক?"

"বলছি চা-টা খাও—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সত্যি নাটক কেন হয় না—শুধু যে নাটককারদের সত্যির সঙ্গে পরিচয় নেই তা নয়। নাটক না হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে—ঘরে-ঘরে গর্ডন ক্রেগের দল। সব পর্ব্বতের মূষিক প্রসব। হাঁক-ডাক publicity propaganda—অর্থ তার, কোন উপায়ে চোখে ধূলো দিয়ে নিজেদের গণ্ডা ভরতি করা।"

"বুঝলাম, তাতে অভিনয় না হবার কারণ কি, নাটকই বা হয় না কেন?"

"তার কারণ, কোন অভিনয় হতে পারে না—যদি না তুমি প্রডিউসারের মতে চল। অর্থাৎ যদি না নাটককার অভিনেতাদের যে সব দোষ আছে, সেই সব দোষের ছাঁচে বই কেটে-ছেঁটে না লেখে। মাইকেলের নাটকের পর থেকে আজও পর্য্যন্ত তার বদল হয় নি।"

"কেন হয় নি?"

"এই বড়লোক—টাকা—আর তার গর্ডন ক্রেগের দলের জন্যে। এখন অভিনেতারাই হ'ল নাটকের অভিনয়ের আদর্শরূপ, সত্যিটা নয়। জীবনের সত্য রূপ নয়। যেই কোন অভিনেতার নাম কোন বইতে বেশ হল অমনি সে একটা দল করলে। সে তখন হয়ে গেল গর্ডন ক্রেগ্। নাটককারেরা সেই অভিনেতার খোসামোদ করে—তার অনুকরণে তার ঢঙে কথা সাজাতে লাগল। কেন না, তাদের বেশীর ভাগ হ'ল পাতি-ভদ্দরলোক। নাটকের ভাষা হ'ল না-গদ্য না-পদ্য—খানিকটা রইল সেকেলে যাত্রাওয়ালা আর গিরিশ ঘোষের ছাঁচ, খানিকটা হল আধুনিক ইংরেজী বা ফরাসী নাটকের বাঙলা তর্জ্জমা—এমন কি, ইংরেজের কাছে ধার-করা যে আধুনিক ভাব ও ভাষা—তার ভাবও প্রকাশ করতে পারে না—দেশের মানুষের প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। একদিকে খানিকটা ইংরেজী ধরণ, অন্য দিকে

খানিক রবি ঠাকুরের ঢঙে পুরুষের মেয়ে-ন্যাকরা নাকী সুরের মধুর-প্রলেপ দিয়ে টেনে টেনে কথা। চরিত্রের স্বাভাবিক ছাঁচ তাতে নেই—আছে শুধু ন্যাকামী। নাটককার-গুলোও এমন বেকুব যে অভিনেতার বলার ঢঙ অনুকরণ করে ভাষা বসায়। অনেক সময় প্রডিউসারই কথা বসিয়ে দেন। নাটককারও তাই মেনে নেন। এতে ফল হয় এই যে, নাটককারগুলো ইয়ুফ খলিফার জামার ছাঁট-কাটার মত অভিনেতারূপী পোষাকের অনুকরণে তৈরী করতে সুরু করেছে—সেই নাটকের যে অভিনয়, সে অভিনেতার মতই হ'ল। এত ক'রেও নাটক জন্মাল না, জন্মাল নাটুকে দরজি। Drama made to order…নাটক যদি খানিকটা জমল—অর্থাৎ নাটকে যদি যৌন-রসের কারবার একটু বেশী থাকে—হালফ্যাসানের রসিক দল সেই টক্-ঝাল খেতে আসে। এই—বুঝলে, ভোলাদা কেন গর্ডন ক্রেগের আসাটাকে কুক্ষণ বলেছিল। হ্যাঁ আর একটা কথা; এর ভেতরেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান-ওলাদের অর্থাৎ—টাকাওয়ালাদের খেল্ ঠিক আছে।"

গোঁসাই বললে: "মিস্তির মশায় দেখছি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে Neo-socialism প্রচার করছেন।"

"ওই ত তোমাদের দোস; আমি প্রচারক নই, কোন ইজম্‌ই আমি প্রচার করি নি। আইন পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে, পুরোন রোম য়ুরোপের মাথার উপর চেপে বসে আছে, আর সেই য়ুরোপ আমাদের বুকে বসে গলা টিপে ধরেছে। ছাড়ন-ছোড়ন নেই… সে দিব্যিগেলে বসেছে যে তোমার জাত-ধম্ম-বুদ্ধি-প্রকৃতি সব বদলে দেবেই।"

বিমল বললে: "কালী মিস্তির ঘুরিয়ে বলতে চাও যে, সাহিত্য বাঙলা দেশে হয় নি?"

"বাপ্‌রে, এত বড় কথা বলতে পারি, তা হ'লে তোমাদের বড় ঠাকুরটি থেকে আশ-পাশের রসিক ইঁদুর-ছুঁচোগুলো পর্য্যন্ত কিচ-মিচ্ খিচ্ খিচ্ করবে আর কামড় দেবে। অবশ্য কামড়ের ভয় আমার নেই—সেপ্‌টিকের ভয় আছে… কেন না—ইঁদুরগুলো বড় infectious, ব্যাসিলিতে ভরা।… অ দিন-দা, এক প্যাকেট নেভিকাট্, ক্যাভেণ্ডার—না হয় গোল্ড ফ্লেক—"

গোঁসাই বললে: "আপনার যে-রকম য়ুরোপের প্রতি শ্রদ্ধা—তাতে আপনার ত সিগরেট খাওয়া উচিত ব'লে মনে হয় না।"

"আবার ভুল বললে গোঁসাই, আমরা হলাম পাতি-ভদ্দর-লোক…আমরা বড়লোকের দালালী করবই।"

বিমল জিজ্ঞাসা করলে: "তা হলে কালী, তোমার মতে সাহিত্যের স্বরূপ কি?"

"সে তোমার বড়ঠাকুর সব বলে গেছে· স্বরূপ সেইখানে পাবে ভাই…আমার যা তাতে তোমরা বিরূপ হবে। কেন না বড়লোকের রাজত্ব যত দিন চলবে, তত দিন রূপায়ন ওই থাকবে।"

"তবু শুনি?"

"তোমাদের এই সাহিত্যে আর চিত্রে আমাদের জন্যে কি আছে? যদি সে সব কিছু না থাকে তবে সরে পড়।"

বিমল হাসতে হাসতে বললে: "দূর হও·· এই ত! তা একে কি দূর করতে পারবে কালী মিস্তির?"

"পাতি-ভদ্দরলোকের মুখেও অতবড় ধাক্কার কথা শোভা পায় না বিমল—তবে ইচ্ছেটা প্রায় তাই। দেখ সব দেশেরই একটা নিজস্ব প্রতিভা আছে, সেইটাই হচ্ছে তার প্রাণ, তার জীবন সেইটিকে যদি না প্রকাশ করতে পার· তার দুঃখ তার বেদনার রূপ যদি না দিতে পার সাহিত্য হয় না। তোমার ওই দীনতার ভেতর থেকে ওই যে রঙিন স্বপন দেখা—তাতে হবে না। দেশের সমস্ত মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ কাঁদে, যারা সমস্ত মানুষকে কিছু বলতে পারে, তারাই সাহিত্য গড়তে পারে। মানুষকে যে মুক্তির বাণী শোনাবে—তার আগে তার দুঃখটা ভাগ করে নিয়ে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কর, তবে পারবে।"

"শুধু দুঃখবোধ জাগলেই সাহিত্য হবে?"

"হ্যাঁ, ভোলাদা ঠিকই বলেছে, ও schizophrenia থেকে আগে নিজেদের বাঁচাও—স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর, স্বপ্ন বন্ধ কর। আদর্শবাদটা একেবারে দুর্জ্জনের মত পরিহার কর পৃথিবীতে যত রকমের কাপুরুষতা আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কাপুরুষতা হ'ল ওই আদর্শবাদ। সত্যকে মুখোমুখি পরিচয় করে নাও।" ক্রমশঃ

সাময়িকী

দক্ষিণ আফ্রিকায় হিন্দু-মন্দির—

বহুদিন হইতে বহু ভারতীয় হিন্দু দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন; অনেকে যে সে দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তথায় কোন হিন্দু-মন্দির ছিল না। সম্প্রতি ভারতীয় এজেন্ট-জেনারেল শ্রীযুত রামরাও ও তাঁহার পত্নীর উদ্যোগে জোহন্সবার্গে একটি হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত রামরাও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ; কালীচরণ নামক এক ব্যক্তি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগমন করায় তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতার ইচ্ছাপূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীযুত রামরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদের বহুপ্রকার সুবিধাবিধান করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠাও তাঁহার সৎকার্য্যসমূহের অন্যতম।

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

বাঙ্গালাদেশে একটি মাধ্যমিক (হাইস্কুল) শিক্ষাবোর্ড গঠনের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ চেষ্টা করিতেছিলেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গভর্ণমেণ্ট একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহা নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ বিল সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গালার নেতৃস্থানীয় ২১ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক নিবেদন প্রচারিত হইয়াছে —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি ঐ নিবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। নিবেদনে বলা হইয়াছে— "বিলের বিধানসমূহে আগাগোড়াই প্রগতিবিরোধী মতবাদ এবং শিক্ষার সহিত সম্পর্কবিহীন নীতি পরিস্ফুট। এই সকল বিধান বাঙ্গালায় শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের পথ রুদ্ধ করিবে। প্রথম বিলের খসড়াটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল— কিন্তু তাহার পরও যে নূতন বিল গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সম্মতি দিতে পারেন নাই। তাহাতেই বুঝা যায় যে, বিল পরিবর্ত্তিত হইলেও গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির পথে বিঘ্নকর বলিয়া শিক্ষাবিলের যে সকল বিধানের ব্যাপক প্রতিবাদ হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট সেগুলি বাদ দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করাইয়া লইতে চাহেন। সেজন্য বাঙ্গালার শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল সমুদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে সজাগ থাকিতে আমরা অনুরোধ করি। গভর্ণমেণ্ট যদি সহসা বিলটি পাশ করাইতে চাহেন, তবে দেশবাসীকেও সকল প্রকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহার বিরোধিতা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রায় কিছুই দান করেন নাই। কাজেই যদি গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্কোচে প্রবৃত্ত হন, তবে আমাদিগকে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।" আমরা নেতৃছন্দের এই নিবেদনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। আশা করি, দেশের সর্ব্বত্র এ বিষয়ে আলোচনা হইবে ও সকলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অবহিত হইবেন।

ফিজিতে ভারতীয়দের অসুবিধা—

ফিজিতে বহু ভারতীয় বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তথায় যে সকল জমি ইজারা লইয়া চাষবাস করিতেছেন, সম্প্রতি সেই সকল জমি তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফিজির জমিদারগণ অতি উচ্চহারে ঐ সকল জমির খাজনা স্থির করিয়া সেগুলি পুনরায় পত্তন দিবেন। ফিজির অধিকাংশ জমি ফিজিবাসীদের হস্তগত— গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বত্ব সর্ব্বদা বজায় রাখেন। অথচ তথায়

লোক সংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ ভারতীয়—ভারতীয়গণকে জমি ক্রয় করিবার সুবিধা দেওয়া হয় না। ফিজিতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়—ভারতীয়গণের উদ্যোগেই ইক্ষুচাষ করা হইয়া থাকে। ভারতীয়গণকে জমি দেওয়া না হইলে সকল দিক দিয়াই তাহাদের অসুবিধা হইবে। কাজেই ফিজিতে একজন ভারতীয় কমিশনার প্রেরণ করিয়া ফিজি-প্রবাসী ভারতীয়গণের অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

চীন নেতার জীবনপণ—

চীন-জাপান যুদ্ধের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ৭ই জুলাই চীন-নেতা মার্শাল চিয়াং কাইসেক চীনজাতিকে লক্ষ্য করিয়া যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির সকলের প্রণিধানযোগ্য। চিয়াং কাইসেক বলিয়াছেন—"যদি সূচ্যগ্র ভূমি অবশিষ্ট থাকে অথবা একজন চীনাও জীবিত থাকে, তাহা হইলেও আমরা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিব। পরিণাম যাহাই হউক না কেন, ইহাই আমাদিগের চরম সঙ্কল্প।" সাম্রাজ্যলোলুপ জাপান আজ চীনদেশ জয়ের জন্য চীন জাতিকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর, এ অবস্থায় চীন-নেতার এই বাণী যে সেদেশের লোকের চিত্ত জয় করিবে, তাহাই স্বাভাবিক। সমগ্র সভ্য জগত এই সংগ্রামে চীনকে জয়ী হইতে দেখিলেই আনন্দ লাভ করিবে।

মিঃ নৌসের আলি ও কংগ্রেস—

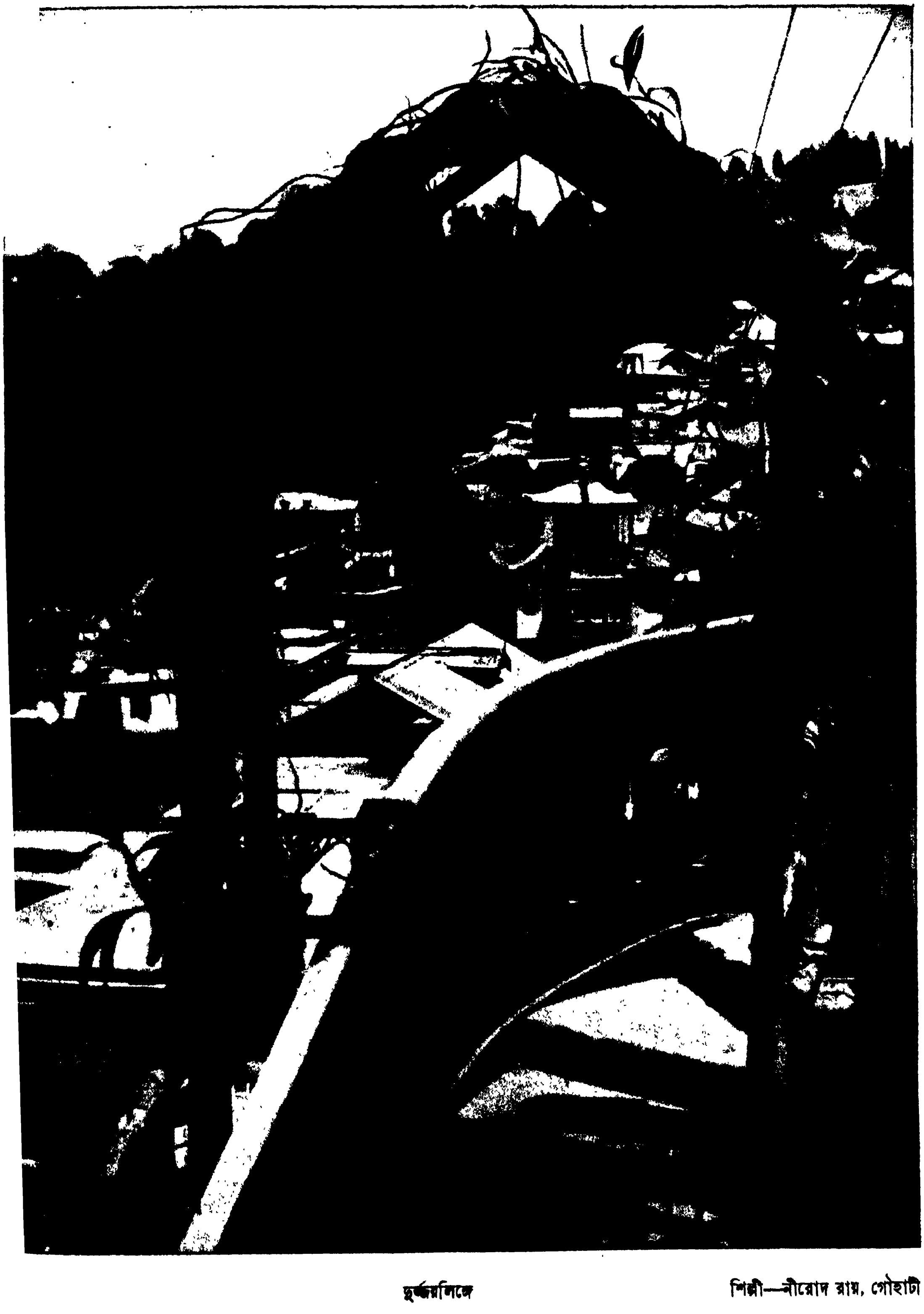
বাঙ্গালার একাদশ মন্ত্রীর মধ্যে অন্যতম মিঃ নৌসের আলি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগের পর তাঁহার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় সম্পর্কে ফরিদপুরে গমন করিলে তথায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সেই সম্বর্দ্ধনার পর তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেসের সহিত আমার মতভেদ হইতে পারে এবং আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের সংগ্রাম ও ত্যাগের জন্যই ঘটিতে পারিয়াছে।" মিঃ নৌসের আলির মত লোকের মুখেও এরূপ সত্যকথা বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অবশ্য ইহার পর তিনি যদি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্যগণের সহিত একযোগে কাজ করেন, তাহাতে কেহই বিস্মিত হইবেন না।

বাঙ্গালায় অতি বৃষ্টি—

বর্ত্তমান বৎসরকে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে দুর্বৎসরই বলিতে হইবে। বর্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অথচ বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখনও প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি হয় নাই। আবার উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার বহু স্থানে অতি বৃষ্টির ফলে পাট ও আউস ধান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য যে বাঙ্গালার সেচের ব্যবস্থাই দায়ী, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি। ইংরেজ শাসনের প্রবর্ত্তনের পর হইতে সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশ হইতে শস্যই সংগ্রহ করা হইয়াছে, কিন্তু সেচের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে থাকিলেও তাহার প্রতীকারের কোন উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। আমরা জানি, সামান্য বৃষ্টি হইলেই বাঙ্গালার কোন কোন স্থান এমন জলমগ্ন হয় যে তথায় ক্ষেতের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সে সব স্থানে সেচের ব্যবস্থা ও খালনালার ব্যবস্থা করা হইলে তাহা অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। শুনা গিয়াছিল, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সেচের একটি ব্যাপক ব্যবস্থায় হাত দিবেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন সাড়া দেখা যায় নাই।

পণ্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ—

বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয় গত ১লা শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করায় বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ত্রিপুরা জেলার দেবগ্রাম নামক স্থানে গুরুচরণের জন্ম হয়; তিনি ভট্টপল্লীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি গুরুচরণের সহপাঠী ছিলেন। স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের চেষ্টায় প্রথমে তিনি পুরীতে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন ও পরে রাজসাহীতে হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতে আসেন। ঐ সময়ে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরেই তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও

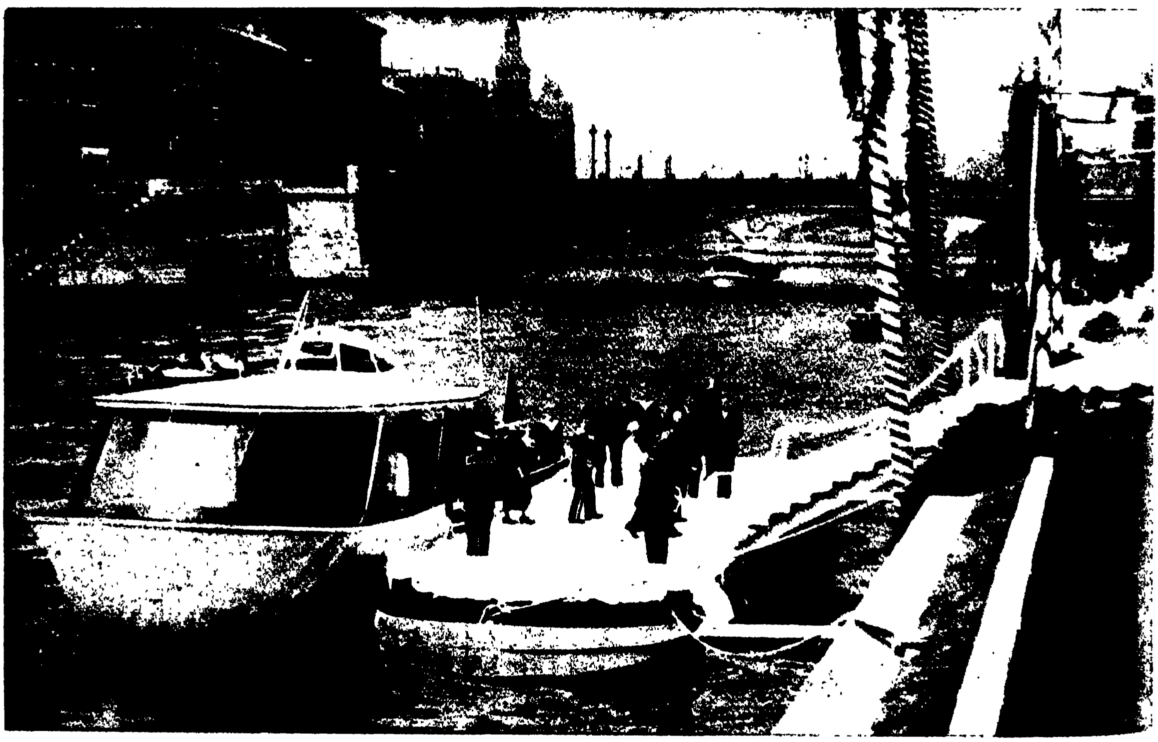


দুর্জ্জয়লিঙ্গে

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী



প্যারীর আর্ক-ডি-টি য়োম্ফে অনামা-সৈনিকের কবরে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ফুলের মালা রাখিবার পরে বিশিষ্ট পরিদর্শকদের খাতায় সহি করিতেছেন



নৌ-বিহারের পর প্যারীতে হোটেল-ডি-ভিলে অভিমুখে রাজা ও রাণী ; রাজা য়্যাড্‌মিরালের পোষাক পরিয়া আছেন ;
সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও ম্যাডাম লিব্রী

বহুদিন ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কিছুকাল পণ্ডিত গুরুচরণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি ত্রিপুরারাজ্যের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু পক্ষাঘাত রোগ হওয়ায় অধিকদিন সে কাজ করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আনন্দবাজার পত্রিকার বিপদ—

'মেদিনীপুর জেলে রাজনীতিক বন্দীদের অবস্থা' সম্বন্ধে গত ২রা মার্চ্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি রাজদ্রোহসূচক বিবেচিত হওয়ায় সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং মুদ্রাকর-প্রকাশক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কলিকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার হইয়া গিয়াছে। গত ২রা শ্রাবণ সোমবার বিচারফল প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারক আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদকের ৬ মাস এবং মুদ্রাকর-প্রকাশকের ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। নিম্ন আদালতের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে; কাজেই মামলার গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না। তবে এদেশে সংবাদপত্র-পরিচালনের অবশ্যম্ভাবী ফলই যে এই প্রকার, সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাস—

রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাসে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের বসবাস লইয়া গত বৎসরের গোলমালের ফলে এবার কোন হিন্দু ছাত্রই কলেজসংলগ্ন ছাত্রাবাসে ভর্ত্তি হয় নাই। সকল হিন্দু ছাত্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হিন্দু বিদ্যার্থীভবনে ভর্ত্তি হইয়াছে। বিদ্যার্থীভবনে পূর্ব্বে শুধু দরিদ্র হিন্দু ছাত্রেরাই বাস করিত—এখন ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে কোন হিন্দু ছাত্রই আর কলেজ-হোষ্টেলে বাস করিতে চাহে না। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া এবং তাহার প্রতীকারের উপায় না করিয়া যদি কলেজ হোষ্টেলে হিন্দু ছাত্রদিগকে বাস করিতে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে তাহা কখনই সুফলপ্রসূ হইবে না।

আপীলে মুক্তিলাভ—

গত বৎসর ২৭শে নভেম্বর "বাঙ্গালা আজ কোথায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি রাজদ্রোহসূচক বিবেচনায় কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে সম্পাদক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং মুদ্রাকর-প্রকাশক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য উভয়ের প্রত্যেকের ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছিল—এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয় হাইকোর্টে আপীল করায় বিচারপতি খোন্দকার ও বিচারপতি বার্টলের বিচারে গত ৩রা শ্রাবণ মঙ্গলবার উভয়েরই দণ্ডাদেশ বাতিল করা হইয়াছে। বিচারপতিরা বলিয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক গঠিত একটি স্কুল-শিক্ষা বিলের সমালোচনা করা হইয়াছিল। ইহাতে মন্ত্রিমণ্ডলকে আক্রমণ করা হয় নাই, প্রস্তাবিত বিধানকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪(ক) ধারা অনুসারে রাজদ্রোহ অর্থে যাহা বুঝায়, এই লেখা তাহার আমলে আসে না। সংবাদপত্রের পক্ষে ঐরূপ সমালোচনা যে অবৈধ নহে, সেরূপ মতও বিচারপতিরা প্রকাশ করিয়াছেন। এই রায়ের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আবহাওয়া কথঞ্চিত বর্দ্ধিত হইবে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুত মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন। গত ১৯শে জুলাই হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন—এই সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দলাভ করিবেন। আচার্য্য দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত হওয়ায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান (পালিত) অধ্যাপক হইলেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ডাক্তার সাহা দিন দিন অধিক গবেষণা দ্বারা জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি করুন।

পি-আর-এস—

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে চারি জন ছাত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন মহিলা আছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে বৃত্তি পাইয়াছেন—শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার ও শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউসন নামক মহিলা কলেজের গণিতাধ্যাপক এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ডাক্তার আর, সি, মজুমদারের পত্নী। সাহিত্য বিষয়ে শ্রীযুত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শশিভূষণ দাশগুপ্ত পি-আর-এস বৃত্তি পাইয়াছেন। শ্রীযুত দাশগুপ্তের লিখিত প্রবন্ধাদি প্রায়ই ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় পর্দ্দা কলেজ—

কলিকাতা সহরে ছাত্রীদের জন্য একটি পর্দ্দা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মন্ত্রীরা সম্প্রতি ইটালী অঞ্চলে ৫লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭ বিঘা জমি ক্রয় করিতেছেন। বাঙ্গালার বাজেটে ঐ কলেজের জন্য মাত্র ২লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রীরা অপর কতকগুলি ব্যয় কমাইয়া এই ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন। নোয়াখালী জেলার সদরের স্থান-পরিবর্ত্তন, ক্যাম্বেল হাসপাতালে নার্সিং ব্যবস্থা, যক্ষ্মা হাসপাতালের গৃহনির্ম্মাণ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসবাটী নির্ম্মাণের ব্যয় সেজন্য কমাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা এই নূতন পর্দ্দা কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধী নহি—কলিকাতায় এখন এরূপ একটি কলেজের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য এই ভাবে অপর বহু বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যয় হ্রাস করার যৌক্তিকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ফ্রান্স ভ্রমণ—

বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ও তাঁহার পত্নী সম্প্রতি ফরাসী দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। গত ১৯শে জুলাই তাঁহারা প্রথম প্যারী সহরে গমন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে তাঁহাদের যে বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও পরম সমাদর করা হইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সহসা এ সময়ে সম্রাট-দম্পতির ফ্রান্স ভ্রমণের প্রয়োজন সম্বন্ধে চারিদিকে নানা কথা শুনা যাইতেছে। ইউরোপের রাজনীতিক আকাশ এখন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের শেষ ফল কি হইবে তাহা বলা যায় না। ওদিকে ইটালীর সহিত জার্ম্মাণীর মিতালী দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যদি কোন দিন ইউরোপে আবার যুদ্ধ বাধে, তবে তাহার ফল যে বিশ্বধ্বংসী হইবে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। এই সকল কারণেই লোক সম্রাট-দম্পতির ফরাসীভ্রমণে রাজনীতিক কারণ আরোপ করিতেছে।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ—

বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী নূতন করিয়া সরকারী প্রচার বিভাগ গঠন করিতেছেন। সেজন্য ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ইংরেজী ভাষার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ আলতাফ হোসেনকে বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তাঁহার তিনজন সহকারী নিযুক্ত হইবেন এবং বাঙ্গালার সাংবাদিক মহল হইতেই সেই তিনজনকে বাছাই করা হইবে। গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু তাহা যাহাতে সুপরিচালিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

শোক সংবাদ—

গত ১২ই আষাঢ় রায় বাহাদুর ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্নী ধরাসুন্দরী দেবী পরিণত বয়সে চুঁচুড়া গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনীষী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং বাগবাজার নিবাসী ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। সে কালে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি নানা কলাবিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন এবং গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি দানশীলা ছিলেন এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুলেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা।

বিহারে ব্যয় সঙ্কোচ ব্যবস্থা—

সম্প্রতি বিহারের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলি ভারতের সর্ব্বত্র

বিবেচিত হইবার যোগ্য। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে গভর্ণর ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতনহ্রাসের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোক দিয়া যাহাতে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য চালান বন্ধ করা হয়, সে জন্যও প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সার্ভিসের বেতন হ্রাসেরও প্রস্তাব হইয়াছে। বিহারের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট নানাভাবে তাঁহাদের শাসনকার্য্য জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা যদি এইভাবে বড় বড় মোটা-বেতনের চাকরিয়াদের বেতন হ্রাস করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্বগ্রহণ সত্যই সার্থক হইবে।

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ—

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ জগতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৮২ বৎসর। এই বয়সেও তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া থাকেন। এখন তিনি একখানি নূতন নাটক রচনাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি হ্রাসের সম্ভাবনা হওয়ায় ৫০ বৎসর পরে তিনি আবার আমিষাহার আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের লোক হইয়াও তিনি গত ৫০ বৎসর কাল নিরামিষাশী ছিলেন। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনা মানুষের কিরূপ বলবতী হইতে পারে, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন। ৮২ বৎসর বয়সেও শ' মহাশয় পূর্ণকার্য্যক্ষমতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইহা কি বিচিত্র নহে ?

বৃটিশ গায়নায় ভারতবাসী—

একশত বৎসর পূর্ব্বে একদল ভারতীয় বৃটীশ গায়নায় গিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সম্প্রতি তথায় উপনিবেশ স্থাপনের একটি শত বার্ষিক উৎসবও হইয়া গিয়াছে। উৎসব ক্ষেত্রে ঐ স্থানের সকল ভারতীয় অধিবাসীই একত্র হইয়াছিল। উৎসব স্থলে ভারতীয়গণ নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—(১) বৃটীশ গায়নার জন্য একজন ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত করা হউক ; (২) সরকারী চাকরীতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় গ্রহণ করা হউক ; (৩) বিদ্যালয়গুলিকে সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত করিয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষা-আইন কঠোরভাবে প্রবর্ত্তন করা হউক ; এবং (৪) আইন সভায় অধিকতর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা হউক। বৃটীশ গায়নায় বহু ভারতবাসী বাস করেন ; তাঁহাদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এদেশেও আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

রুশিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার—

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ একজন ভারতীয় সোভিয়েট-বিরোধী কার্য্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আর কিছুই জানা যায় নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী সভাপতি শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত প্রমুখ পরিষদের কয়েকজন সদস্য ভারত গভর্ণমেণ্টের মারফত ধৃত ভারতীয়গণের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাগমনের অনুমতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপক আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ ধৃত ভারতীয়গণকে বিদেশে বহুকাল কারাবাস করিতে হইবে।

স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন—

স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিবার পর হইতে বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান মন্দিরে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। মধ্যে গুজব রটিয়াছিল, তিনি এ দেশ ত্যাগ করিয়া বিলাতে গিয়া বাস করিবেন। কিন্তু গত ১লা জুলাই হইতে তিনি পুনরায় বাঙ্গালোরে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে যে বৃদ্ধ বয়সে দেশত্যাগ করিতে হইল না, ইহাই সুখের বিষয়।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস—

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে বর্ত্তমানে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর যে সকল কর্ম্মী প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া পূর্ণোদ্যমে দেশসেবার কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যা প্রদেশটি আকারে ছোট হইলেও তথায় নানাপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল এবং বিশ্বনাথবাবু তাঁহার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দ্বারা সকল সমস্যার

সুসমাধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে ধনী নহেন বলিয়াই দরিদ্র উড়িষ্যাবাসীদিগের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, সম্প্রতি অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে ছুটী লইয়া নার্সিংহোমে বাস করিতে হইতেছে। তাঁহার কার্য্যভার অস্থায়ীভাবে অপর দুই জন মন্ত্রীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন বিশ্বনাথবাবু সত্বর রোগমুক্ত হইয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী মহিলা শ্রীমতী কনক রায় এ বৎসর ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুল হইতে সকল বিষয়ে রেকর্ড নম্বর পাইয়া শেষ এল-এম-পি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে ৪টি সুবর্ণ-



শ্রীমতী কনক রায়

পদক প্রদান করা হইয়াছে। ইনি ব্রহ্মদেশে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ডাক্তার; বর্ত্তমানে ইনি রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালে 'হাউস-সার্জ্জেন' রূপে কাজ করিতেছেন। আমরা ইঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্মানিত—

শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী রাজা জানকীনাথ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। সম্প্রতি ভারতের বড়লাট রমেন্দ্রবাবুকে ডোমিনিকা রিপাব্লিকের কলিকাতাস্থ অবৈতনিক কন্সাল পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ লইয়া ডোমিনিকা রিপাব্লিক গঠিত। রমেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে গিয়া ব্যবসা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং গত ৩০ বৎসরকাল নানা ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

ডাক্তার চৈৎরাম গিড্বাণী—

ডাক্তার চৈৎরাম গিড্বাণী খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। সম্প্রতি সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য দেওয়ান বাহাদুর হীরানন্দ ক্ষেম-সিংহের মৃত্যুতে পরিষদের যে স্থানটি শূন্য হইয়াছিল, ডাক্তার চৈৎরাম সেইস্থানে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। গিড্বাণীকে লইয়া উক্ত পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ১০ জন হইল। গিড্বাণীর মত কংগ্রেসকর্ম্মীকে পাইয়া সিন্ধু পরিষদের দল যে শক্তিশালী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শোক-সংবাদ—

মসুরীতে বাঙ্গালীদের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান আছে; তাহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ পাঠাগারটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন হরিচরণ মিত্র নামক একটি কর্ম্মী যুবক উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। গত ২৩শে মে যুবক হরিচরণ মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। হরিচরণ মসুরী প্রবাসী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

পরলোকে যাদুমতী দেবী—

স্বর্গত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী যাদুমতী দেবী গত ২২শে জুলাই সকালে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্রের

মধ্যে এক পুত্র বিলাতে ছিলেন। যাদুমতী ২৪ পরগণা বাদুড়িয়ার জমীদার চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ছিলেন; তাঁহাকে বিবাহ করিবার পর হইতেই রাজেন্দ্রনাথের ভাগ্যোন্নতি হইয়াছিল। যাদুমতী স্বামীর সহিত বিলাত গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যপ্রথা ত্যাগ করেন নাই। তিনি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বামীর বাসগ্রাম ভ্যাব্‌লাতে একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বহু পরিজনবর্গ লইয়া একত্র বাস করিতে ভাল বাসিতেন।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুত সন্তোষকুমার মজুমদার ব্রহ্মদেশের টঙ্গু জেলার এডভোকেট শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। সন্তোষকুমার গত বৎসর গণিতে বি-এস-সি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছিলেন। এবার তিনি ব্রহ্মদেশের প্রথম শ্রেণীর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ব্রহ্ম সরকার তাঁহাকে অডিট ও একাউণ্ট সার্ভিসে সহকারী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল



শ্রীযুত সন্তোষকুমার মজুমদার

নিযুক্ত করিয়াছেন। সন্তোষকুমার শুধু লেখাপড়া করেন না, ফুটবল টেনিস প্রভৃতি খেলাতেও তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালী—

বিহার প্রদেশের ছাপরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুত ভবদেব সরকার সম্প্রতি সরকারী কার্য্য



শ্রীযুত ভবদেব সরকার

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈস্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সির অন্তর্গত কিওনঝড় রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর সরকার ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে গত ৩৫ বৎসর কাল কৃতিত্বের সহিত সরকারী চাকরী করিয়াছেন এবং কার্য্যগুণে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালার বাহিরে একটি দেশীয় রাজ্যে তাঁহার মত একজন বাঙ্গালীর উচ্চপদলাভে আনন্দিত হইয়াছি।

আসামবাসী অধ্যাপকের কৃতিত্ব—

আসামের খ্যাতনামা অধ্যাপক, রায় বাহাদুর শ্রীযুত সূর্য্যকুমার ভুইঞা সম্প্রতি আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আসাম গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই আসামে একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং রায় বাহাদুরকে সম্ভবত উক্ত যাদুঘরের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হইবে। রায় বাহাদুর গৌহাটী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগের ডাইরেক্টর পদে এবং হিষ্টরিকাল রেকর্ড

কমিশনে কার্য্য করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আসাম হইতে মাত্র একজন পণ্ডিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি পাইয়াছিলেন। আমরা রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার ভুইঞার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রী-সমস্যা—

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার খারের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ছয় জন মন্ত্রী ছিলেন—(১) ডাক্তার এন, বি, খারে (২) শ্রীযুত গোলে (৩) শ্রীযুত দেশমুখ (৪) শ্রীযুত আর-এস শুক্লা (৫) শ্রীযুত



ডাঃ খারে

ডি, পি, মিশ্র ও (৬) শ্রীযুত ডি-কে-মেটা। কিছুদিন হইতে মন্ত্রি-সভার সদস্যগণ দুই দলে বিভক্ত হন এবং উভয় দলের মধ্যে রেশারেশি চলিতে থাকে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটী ঐ বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গত জুলাই মাসের শেষ ভাগে ডাক্তার খারে, শ্রীযুত দেশমুখ ও শ্রীযুত গোলে মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিয়া গভর্ণরের নিকট পত্র লেখেন। অপর ৩ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন নাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশের জন্য তাঁহারা অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর পদত্যাগকারী মন্ত্রীত্রয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া অপর তিন জন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন। তখনই গভর্ণর আবার পূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খারেকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং ডাক্তার খারে তাঁহার বিরুদ্ধ দলের তিন জন মন্ত্রী—শ্রীযুত শুক্লা, শ্রীযুত মিশ্র ও শ্রীযুত মেটাকে বাদ দিয়া তাঁহার স্বদলভুক্ত শ্রীযুত গোলে ও শ্রীযুত দেশমুখ এবং ঠাকুর পিয়ারীলাল ও শ্রীযুত অগ্নিভোজ নামক ২ জন নূতন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই সময়ে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন চলিতেছিল। ওয়ার্কিং কমিটী উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া ডাক্তার খারেকেই দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ডাক্তার খারে কর্ত্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তাহার পর ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ মত মধ্যপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার খারের দলের কেহই মন্ত্রী হইতে পারেন নাই। বিপক্ষ দলের নেতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লা প্রধান মন্ত্রী এবং পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, শ্রীযুত ডি-কে-মেটা, শ্রীযুত এস-বি-গোখ্‌লে, শ্রীযুত এম-পি-কোহলে ও শ্রীযুত সি-জে-ভোরুকাকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ডাক্তার খারের দলের সমর্থক সংখ্যাও অল্প নহে—তাঁহারা এখনও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন এবং ডাক্তার খারের পক্ষে আন্দোলন চালাইতেছেন। মধ্যপ্রদেশের এই মন্ত্রি-বিভ্রাট সম্পর্কে কে যে দোষী, তাহা সঠিক বলা খুবই কঠিন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ মত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটী যে ভাবে ডাক্তার খারেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা অনেকেই সমর্থন করেন না। কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী-দিগকে যদি সকল সময়েই এইভাবে কংগ্রেসের কর্ত্তাদের মুখ চাহিয়া কাজ করিতে হয়, তবে তাঁহাদের স্বাধীনতা কোথায়? কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ সময়বিশেষে অত্যধিক নিয়মতান্ত্রিক হন—আবার কখনও বা নিয়ম মানিয়া চলেন না। এ অবস্থায় ডাক্তার খারেকে অপসারিত করায় প্রায় সকলেই কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার নিন্দা করিতেছেন। মধ্যপ্রদেশে যে অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল, কংগ্রেস-শাসিত অন্য কোন প্রদেশে যাহাতে সেরূপ অবস্থা সৃষ্ট না হয়, সেজন্য বিধিনিয়ম প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। পণ্ডিত শুক্লার নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, তাহাও স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ। যদি বার বার মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও দেশের শাসনকার্য্য ভাল করিয়া চলিবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব—

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ ভারতের

খ্যাতনামা মুসলমান রাজনীতিক স্যর আকবর হায়দারীকে প্রধান বক্তারূপে আনয়ন করা হইয়াছিল। হায়দারী সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। ঢাকার প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাসের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে তিনি ঢাকায় সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা দোষ-মুক্ত হইয়া সকলের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেজন্য তিনি সকলকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে উপদেশ দেন। স্যর আকবর হায়দারীর মত লোকের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি সেই রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, হায়দারী সাহেব কি তাহার কোন খোঁজ রাখেন না? সমগ্র ভারতেও যেমন পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সদ্ভাবে বসবাস করিত, হায়দ্রাবাদ মুসলমান-শাসিত হইলেও সেখানেও সেইরূপই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে হায়দ্রাবাদের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। কাজেই ঢাকায় হায়দারী সাহেব যে শুভ-ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহা দ্বারা ঢাকাবাসী হিন্দুদের কোন লাভ হইবে না। ঢাকার মুসলমানগণের চেষ্টায় যদি ঢাকা সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত হয়, তাহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা—

বিহার প্রদেশে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগের উপর নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করায় বহুদিন ধরিয়া যে সকল বাঙ্গালী বিহারে বাস করিতেছিল, তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমানে বিহার প্রদেশে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী-সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর উপায় নির্দ্ধারণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন রাজেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে এখনও কিছু করিতে পারেন নাই। গত ২৪শে জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী পুনরায় শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর ঐ কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে সময় পিছাইয়া দেওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের ক্ষতিসাধন করা হইতেছে কি না কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। বিহারে বাঙ্গালী-দিগকে ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইয়াছে; সেজন্য সর্ব্বত্র বাঙ্গালী সমিতি গঠিত হইতেছে। যে স্থানে স্বার্থের সংঘর্ষ হয়, সেখানে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। যে সকল বাঙ্গালী তিন-চার পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাস করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে প্রবাসী বলিয়া নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত করা কিরূপ শোভন হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিহারের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট তাহাই করিতে চাহেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রদান করিলে বাঙ্গালীরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে।

কংগ্রেস ও রাষ্ট্রসংঘ—

বিলাতের গভর্ণমেণ্ট ভারতে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, যদি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের চেষ্টা হয় কংগ্রেস সর্ব্বতোভাবে তাহার বিরোধিতা করিবেন। তাহার পর কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস কর্ম্মীরা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া দেশশাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ করায় এক দল লোক মনে করিতেছে যে, কংগ্রেস এখন বোধ হয় আর রাষ্ট্রসংঘ গঠনের বিরোধিতা করিবেন না। লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রসংঘ গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যখনই রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব হইবে, তখনই কংগ্রেস তাহার বিরোধিতা করিবেন। সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর কোন কোন কংগ্রেস কর্ম্মী এ বিষয়ে কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকদিগের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গত অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুত রাজেন্দ্র-প্রসাদ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্রবসুও তথায় সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রসংঘগঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। আশা করি, অতঃপর আর এবিষয়ে আলোচনা হইবে না।

নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

আমরা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, খ্যাতনামা নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে শ্রাবণ রাত্রি ১০টা ২৬ মিনিটের সময় মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে (তখনকার মেট্রেপলিটান ইনিস্‌টিটিউসন) চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি যে সময়ে ছাত্র, সে



নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ে তাঁহারই উৎসাহ, শিক্ষা, যত্ন ও তত্ত্বাবধানে ঐ কলেজে প্রথম বাঙ্গালা ও ইংরেজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং কলিকাতাস্থ ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বাঙ্গালার বহু জীবিত ও মৃত, সৌখীন ও ব্যবসায়ী অভিনেতা তাঁহার শিষ্য স্থানীয়। ভূপেন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই চমৎকার অভিনয় করিতে পারিতেন। তিনি সুগায়ক ও মজলিসী লোক ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি নাট্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত বহু নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিনীত হইয়াছিল—তাহাতেই তাঁহার নাটকের জনপ্রিয়তা সপ্রকাশ। তাঁহার বহু নাটকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন জাতীয়তার যে ভাব পরিলক্ষিত হইত, তাহাতেই তাঁহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক নাটক ছাড়াও তিনি দেশের লোকশিক্ষার জন্য যে সমস্ত কৌতুক নাট্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার রচিত নাটক সমূহের মধ্যে ‘শাঁখের করাত’, ‘ভূতের বিয়ে’, ‘পেলারামের স্বদেশিতা’, ‘কেলোর কীর্ত্তি’, ‘বেজায় রগড়’, ‘কলের পুতুল’, ‘কৃতান্তের বঙ্গ দর্শন’, ‘জোর বরাত’, ‘নারী রাজ্যে’, ‘উপেক্ষিতা’, ‘যুগ-মাহাত্ম্য’, ‘ক্ষত্রবীর’, ‘বাঙ্গালী’, ‘সেকেন্দার শাহ’, ‘শঙ্খ-ধ্বনি’, ‘শিবশক্তি’, ‘ব্রহ্মতেজ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ‘অভিনয় শিক্ষা’ নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং তাহা সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছিল। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভাদ্র

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

শরৎ রাণী এসেছে আজি এসেছে
শ্যামল মাঠে আঁচলখানি লুটায়ে,
মাথার ’পরে বলাকা শ্রেণী ভেসেছে
চরণতলে কমল কলি ফুটায়ে।

রজনী আসে দিনেরই মত রূপালী শাড়ী পরিয়া,
অতসী জবা হাজারে ফোটে শেফালি পড়ে ঝরিয়া।
কাশের বনে উঠেছে ঢেউ নদীর বুকে লহরী—
দোয়েল শ্যামা পাপিয়া গাহে কোকিল উঠে কুহরি।



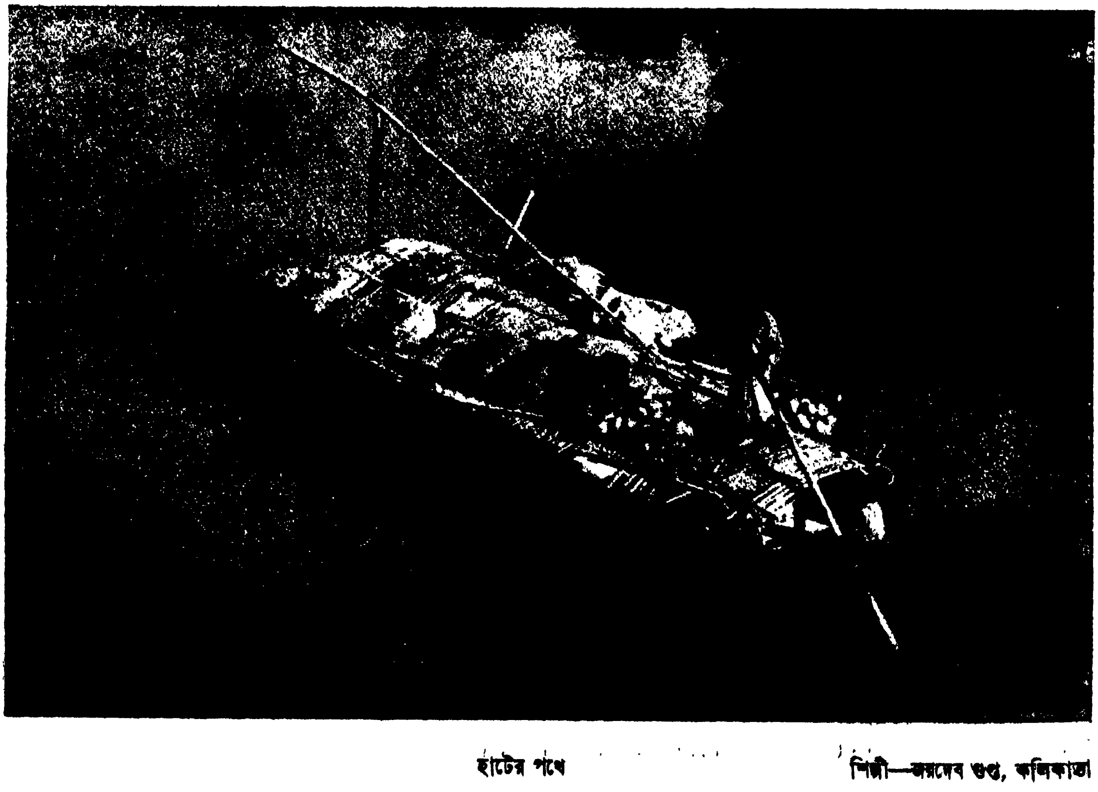
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু স্পেনীয় গভর্ণমেণ্টের বন্দী জনৈক ইতালীয় বৈমানিকের সহিত মণ্টজুইস্ ক্যাসেলে আলাপ করিতেছেন



মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী সঙ্কটের নায়কগণ ; (দক্ষিণ হইতে বামে) পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল (বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী), মিঃ মিশ্র, মিঃ মেহ্‌টা (অপর মন্ত্রীদ্বয়)



যাবার বেলায় — শিল্পী—সুনীল ধর, কুচবেহার



হাটের পথে — শিল্পী—জয়দেব গুপ্ত, কলিকাতা

খেলা ধুলা

শীল্ড খেলা ঃ

১২ই জুলাই শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে ৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে।

ফাইনালে ডালহৌসী আগত ইষ্ট ইয়র্কস্ মহমেডানদের সঙ্গে দু'দিন এক গোলে ড্র করে তৃতীয় দিনে ২-০ গোলে তাদের পরাজিত করেছে। প্রথম দিনের খেলায় আব্বাস



১৯৩৮ সালের শীল্ড বিজয়ী ১ম ইষ্ট ইয়র্কস্ রেজিমেণ্ট দল ছবি—জে কে সান্যাল

পূরা অফ্সাইড থেকে গোল করে। দু'পক্ষই একটি ক'রে পেনালটি পায়, কিন্তু কোন পক্ষই গোল দিতে পারে না। ইষ্ট ইয়র্কসের পক্ষে গোলটি করে ক্রমওয়েল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা নিকৃষ্ট হয়। দু'পক্ষই একটি ক'রে গোল দেয়। দু'টি গোলই অন্যায় রূপে ঘটে। মহমেডানদের প্রথম গোল রহমৎ করে অসম্ভব রকম অফ্সাইড থেকে। পটার প্রথমে অফ্সাইড দেখে গোল রক্ষা করতে চেষ্টা করে না, কিন্তু রেফারি বাঁশী না বাজাতে বিলম্বে ছুটে যায়। সৈনিকদের গোলটিও ন্যায়-সম্মত হয় নি বলে অনেকের মত। ওসমান বল ধরে' মারতে বিলম্ব করায় ক্রমওয়েল ধাক্কায় তাকে বল সমেত গোলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। খেলা শেষ হবার দু'মিনিট পূর্ব্বে এটি ঘটে। অতিরিক্ত সময়ে কোন ফল হয় না। ধাক্কাটি ন্যায্য হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। গোলরক্ষককে ধাক্কা দেওয়া সম্বন্ধে আইনে আছে,—

"The goal-keeper shall not be charged excepting when he is holding the ball or obstructing an opponent or when he has passed outside the goal areas."

তৃতীয় দিনে পিছল মাঠে ইষ্ট ইয়র্কস্ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মহমেডানদের হারাতে সক্ষম হয়। এ দিনের খেলায় তারাই শ্রেষ্ঠ দল ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। মাত্র শেষের দশ মিনিট মহমেডানরা দারুণ চেপে ধরে সৈনিকদের, কিন্তু পটারকে পরাস্ত করতে পারে না। ইষ্ট ইয়র্কস্ ঐ দশ মিনিট ব্যতীত সকল সময় মহমেডানদের গোলে হানা দিয়েছে। তারা অধিক গোলে জয়ী হলেও বিস্মিত হবার কারণ ছিল না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সাত মিনিটের সময় রসিদ খাঁর ইচ্ছাকৃত অবৈধ ফাউলে সৈনিকদলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড ক্রমওয়েল আহত হ'য়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, আর খেলায় যোগ দিতে পারে নি। ইষ্ট ইয়র্কস্‌কে দশ জনে খেলতে হয়, তথাপি তারা দুর্দ্দান্তভাবে বিপক্ষকে আক্রমণ করে।



বাঙ্গলার গভর্ণর ইষ্ট ইয়র্কসের সুদক্ষ গোলরক্ষক পটারের সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন ছবি— জে কে সান্তাল

প্রথম গোল হয় খেলারম্ভের বার মিনিটের সময় পেনালটিতে, সেণ্টার হাফ হল করে। ক্রমওয়েল সাবু ও জুম্মাকে কাটিয়ে গোল দিতে উদ্যত হ'লে জুম্মা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেওয়ায় পেনালটি হয়। দ্বিতীয় গোল হয় ওসমানের দোষে। হল বলটি মেরে গোলের সুমুখে ফেললে ওসমানের হাত থেকে বল পড়ে' যায় এবং সেও পড়ে' যায়, আর ক্রমওয়েল ফাঁকা গোলে বল প্রবেশ করিয়ে দেয়। একমাত্র জুম্মা খাঁ এদিন ভাল খেলে, কিন্তু তার দোষেই পেনালটি হয়। আর সকলেই তাদের যশের অনুযায়ী খেলতে পারে নি। রসিদকে হকিন্স একবার পেনালটি সীমানার মধ্যে ফাউল করে। হকিন্স ও রহিম রেফারী কর্ত্তৃক সতর্কিত হয়।

মহামেডানরা হেরে যাওয়ায় মহমেডানদের সমর্থকরা রেফারি ও লাইন্সম্যানের প্রতি জুতা ছুঁড়েছে।

টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১৫৯৮১৲ টাকা।

ইষ্ট ইয়র্কস: পটার; ব্রিথেল ও হকিন্স; ম্যাক্‌ডোনাল্ড, হল ও আর্কল; ক্রাম্পটন, জেন্‌কিন্স, ক্রমওয়েল, উইলিয়াম্‌সন্ ও হোয়াইট।

মহমেডান: ওসমান; মহিউদ্দীন ও জুম্মা খাঁ; নায়িম, সাবু ও রসিদ খাঁ; নূরমহম্মদ (ছোট), রহিম, রসিদ, রহমৎ ও আব্বাস।

রেফারি: এইচ্ সি ডব্‌লিউ গিলসন।

লাইন্সম্যান: এস ঘোষ ও এন সেনগুপ্ত।

ক্যামারোনিয়ন ১১-১ গোলে বিকানীরকে হারিয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই তারা আরো গোল ক'রতে পারতো। শীল্ডে অধিক সংখ্যক গোল দানের রেকর্ড হচ্ছে ব্রেক্‌নকের ১৯১৯ সালে, তারা ক্যালকাটা রিক্রিয়েশনকে ১৬ গোল দেয়। ক্যামারোনিয়ন মহমেডান-দের সঙ্গে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে পরাজিত হয়। উপর্য্যুপরি দু'দিন খেলে, অতিরিক্ত সময়ে তাদের বিশেষ ক্লান্ত দেখা গিয়েছিল।

গত বৎসরের বিজয়ী ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড দ্বিতীয় রাউণ্ডে রেঞ্জার্সকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আর্গাইলের কাছে হেরে গেলো। আর্গাইল সেদিন উচ্চাঙ্গের খেলা প্রদর্শন করে, কিন্তু ই বি আরের কাছে নিকৃষ্ট খেলে ১ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে।

মোহনবাগান প্রথম রাউণ্ডেই হাওড়া ইউনিয়নের কাছে

পরাজিত হ'য়ে বিদায় লয়। সেণ্টার ফরওয়ার্ড নন্দ রায়চৌধুরী তিনটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করে। ইষ্টবেঙ্গলও হাওড়া ইউনিয়নের কাছেই হারে তৃতীয় রাউণ্ডে।

যত বাজে দল আনিয়ে আই এফ এ এবারও অর্থ নষ্ট ক'রে সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেডও কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। শীল্ডের আকর্ষণীয় ও প্রকৃত প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক একটিও খেলা হয়নি বললেও চলে। কেবল অক্স ও বাক্স দল মহমেডান-দের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রত্যক্ষ অফ্‌সাইড গোলে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পুলিস ও কোয়েটা মুসলিমের খেলা কিছু আকর্ষ-ণীয় হয়েছিল। হ্যাম্পসায়ার ৫-১ গোলে মহমেডান-বিজয়ী ও কোয়েটা মুস্‌লিম-বিজয়ী পুলিসকে হারিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দেয়, কিন্তু কাষ্টমসের সঙ্গে একদিন ড্র করে পরদিন হেরে যায়। উভয় দিনই কাষ্টমসই শ্রেষ্ঠ দল ছিল, যদিও খেলা নিকৃষ্ট ধরণের হয়েছিল।

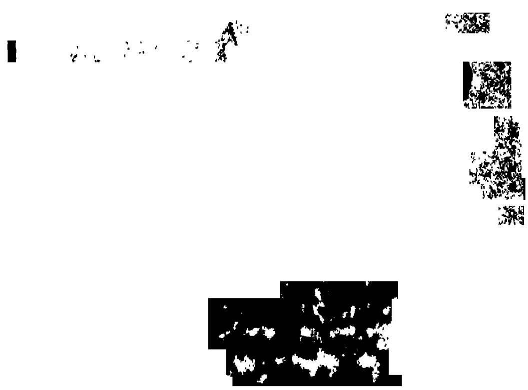


বিজিত মহমেডান স্পোর্টিং দল। (বাম থেকে) মহিউদ্দীন, ওসমান, জুম্মা খাঁ, রসিদ খাঁ, নাসিম, রসিদ, সাবু, রহমৎ, নুরমহম্মদ, রহিম ও আব্বাস (ক্যাপ্‌টেন) ছবি– জে কে সান্যাল

প্রথম সেমিফাইনাল হয় ইষ্ট ইয়র্কস্‌ ও ই বি আরের সঙ্গে। মোহনবাগানের ভাগ্য যে এতকাল পরে তাদের মাঠে প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলা হ'লো। প্রথম দিন চমৎকার শুকনো মাঠ পেয়ে এবং বেশীক্ষণ আক্রমণ ক'রেও ই বি আর গোল দিতে সক্ষম হয় না। পরদিন ভিজা মাঠে সামরিক দল প্রাধান্য করে এবং একগোলে জয়ী হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ বিশেষ শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলা না পড়ায় মহমেডানেরা সহজেই ফাইনালে পৌছাতে পারে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল চ্যারিটি খেলা হয় মহমেডানদের মাঠে, পুলিস কমিশনারের আজ্ঞা উলটে দেয় বাঙ্গলা সরকার। মহমেডানরা উৎকৃষ্ট খেলে এবং কাষ্টমসকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। রেবেলো নিজ দলের ব্যাক নীলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে হাঁসপাতালে যায়, কাষ্টমসকে দশজনে খেলতে হয়। নীল অখেলোয়াড়ী ভাবে খেলতে থাকে এবং বল অপেক্ষা মানুষের প্রতি তার লক্ষ্য বেশী দেখা যায়। শেষ সময়ে তাকে এবং মহিউদ্দীনকে রেফারি মাঠ থেকে নির্গমনের আদেশ দেন। মহমেডানরা দু'টি পেনাল্টি পায়, একটিতে গোল করে, অপরটিতে পারে না।



ইষ্ট ইয়র্কসের ক্রমওয়েল ওসমান বল ধরলে ধাক্কা দিয়ে তাকে শুদ্ধ গোলে প্রবেশ করাচ্ছে ছবি– জে কে সান্যাল

১৯৩৮ সালের আই, এফ, এ শীল্ডের ফলাফল ঃ

প্রথম রাউণ্ড

দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব	৫
ডালহৌসী এ সি	০
ইউনিয়ন স্পোর্টিং (খুলনা)	০
১ম ক্যামারোনিয়ান্স	৫
স্বতন্ত্র ক্লাব	০
বরিশাল এফ এ	৩
ভবানীপুর ক্লাব	০
টাউন ক্লাব (খুলনা)	১
পুলিস এ সি	৭
চিটাগঞ্জ এস এ	০
মাড়ওয়ারী ক্লাব	(১—০)
ফরিদপুর ক্লাব	(১—২)
কালীঘাট এ সি	১
জর্জ্জ টেলিগ্রাফ্	৩
কাষ্টমস্ এ সি	১
এরিয়ান্স ক্লাব	০
ক্যালকাটা এফ সি	১
কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট	০
২য় কে ও এস বি	৩
সুবারবন্ এ সি	০
মোহনবাগান ক্লাব	০
হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব	১
সিটি এথ্লেটিক্ ক্লাব	১
ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব	৩
ই বি আর স্পোর্টস্ ক্লাব	৩
হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন	০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং	৭
মুঙ্গের এস এ	০
ক্যামেরোনিয়ান্স	১১
বিকানীর ক্যাজুয়েলস্	০
বরিশাল এফ এ	০
জামালপুর এস এ	১
টাউন ক্লাব (খুলনা)	০
২য় অক্সফোর্ড ও বাক্স এল আই	২
পুলিস এ সি	৩
মুসলিম এফ সি (কোয়েটা)	২
ফরিদপুর ক্লাব	১
১ম হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট	২
জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	১
১ম রয়েল ফুসিলিয়ার্স	০
কাষ্টমস এ সি	১
দিল্লী এফ এ	০
ক্যালকাটা এফ সি	০
১ম ইষ্ট ইয়র্কস রেজিমেণ্ট	২
কে ও এস বি	(০-১)
১ম বেডস্ ও হার্টস্ রেজিমেণ্ট	(০-০)
হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব	৩
হবিগঞ্জ টি সি (সিলেট)	০
ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব	১
জামসেদপুর এস এ	০
ই বি আর	১
ক্যাণ্টনমেণ্ট জিমখানা ক্লাব (পেশোয়ার)	০
উলপুর স্পোর্টিং ক্লাব	০
২য় ওয়েল্চ্ রেজিমেণ্ট	২
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব	০
২য় আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড	১
ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড আর এ	৩
ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব	১

তৃতীয় রাউণ্ড

দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং	৩
ক্যামেরোনিয়ান্স	২
জামালপুর এস এ	০
অক্সফোর্ড ও বাক্স এল আই	৩
পুলিস এ সি	১
হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট	৫
জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	০
কাষ্টমস্ এ সি	১
ইষ্ট ইয়র্কস্	(০-২)
কে ও এস বি	(০-০)
হাওড়া ইউনিয়ন	১
ইষ্টবেঙ্গল	০
ই বি আর	২
ওয়েল্চ্ রেজিমেণ্ট	০
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড	২
ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড	০

চতুর্থ রাউণ্ড

দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং	১
অক্সফোর্ড ও বাক্স	০
হ্যাম্পসায়ার	(০-১)
কাষ্টমস্	(০-২)
ইষ্ট ইয়র্কস্	৩
হাওড়া ইউনিয়ন	০
ই বি আর	১
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড	০

সেমি-ফাইনাল

দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং	৪
কাষ্টমস্ এ সি	০
ইষ্ট ইয়র্কস্	(১-১)
ই বি আর	(১-০)

ফাইনাল

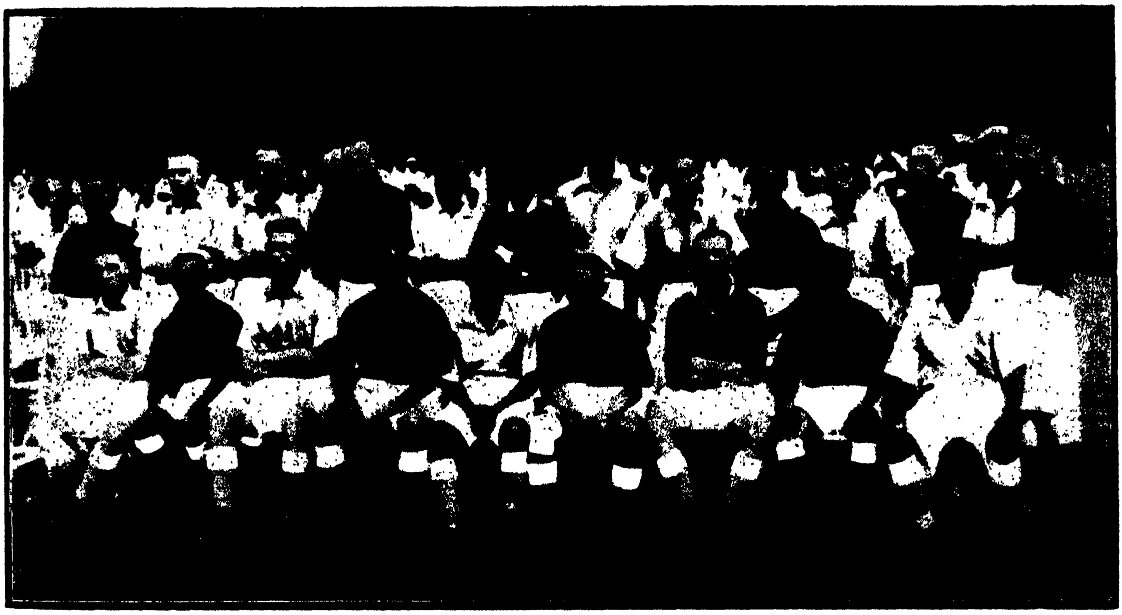
দল	ফল
মহমেডান স্পোর্টিং	(১—১—০)
ইষ্ট ইয়র্কস্	(১—১—২)

১ম ইষ্ট ইয়র্কস্

লোকাল বনাম ভিজিটার্স ঃ

লোকাল বনাম ভিজিটার্সের খেলায় লোকাল ২—১ গোলে জয়ী হয়েছে। দর্শক সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হয়েছিল। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ১৮৭৭৲ টাকা। আবার আনুমানিক! খেলা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে প্রবল নি। প্রথম গোলটি নূরমহম্মদ হেড করে দেয়। ই কার্ভে ও জুম্মা ব্যাকে ভালই খেলেছে। কে দত্তের গোলটি খাওয়া উচিত হয় নি।

স্থানীয় দল ঃ—কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল); ই কার্ভে (পুলিস) এবং জুম্মা খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং); বি মুখার্জ্জি (মোহনবাগান),



লোকাল ও ভিজিটার্সের খেলোয়াড়গণ　ছবি—জে কে সান্যাল

বারিপাতে মাঠ অত্যন্ত খারাপ হয়। তা' সত্ত্বেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, খেলার ষ্টাণ্ডার্ড যদিও উচ্চাঙ্গের হয় নি এবং ঐ রকম মাঠে তা হওয়াও সম্ভব নয়।

ভিজিটার্সরা প্রথম গোল করে লেফট-আউট ইষ্ট ইয়র্কসের হোয়াইটকে দিয়ে, জুম্মার দোষে গোল হয়। আগন্তুক দলে সৈনিকদলের খেলোয়াড়দের ছাড়া এই প্রথম তিন জন বেসামরিক খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছিল কোয়েটা মুসলিম দল থেকে, তারা কিন্তু ভাল খেলতে পারে নি। ইভান্স রাইট ব্যাকে, স্পেসার হাফে, মরিসন ও রাইট ফরওয়ার্ডে উৎকৃষ্ট খেলে, কিন্তু পটারের অত্যাশ্চর্য্য গোল রক্ষার জন্যই তারা বেশী গোল খায় নি।

স্থানীয় দলই খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। তাদের ফরওয়ার্ডরা ঐরূপ মাঠেও ক্ষিপ্রতর ছিল। নূরমহম্মদ (ছোট) ফরওয়ার্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, জে লামসডেনের খেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল, তার দূর থেকে সটটি এত সুন্দর হয় যে পটারের মতন গোলরক্ষকেরও তা রোধ করা সম্ভব হয়

জে লামসডেন (রেঞ্জার্স) এবং রসিদ খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং); নূরমহম্মদ, রহিম (মহমেডান স্পোর্টিং), মুর্গেশ (ইষ্টবেঙ্গল), জে মিলস (পুলিস) এবং কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)।

আগন্তুক দল ঃ—পটার (ইষ্ট ইয়র্কস্); ইভান্স (ষষ্ঠ ফিল্ড বিগ্রেড) এবং জুম্মা খাঁ (কোয়েটা মুসলিম); লেগান (হ্যাম্পসায়ার), স্পেসার (আরগাইল্) এবং ফকরু (কোয়েটা মুসলিম); ষ্টোন (হ্যাম্পসায়ার), বোয়ার্স (অক্স এণ্ড বাক্স), মরিসন (আরগাইল্), এ রসিদ (কোয়েটা মুসলিম) এবং রাইট (ইষ্ট ইয়র্কস্)।

রেফারী—এন সেনগুপ্ত।

লাইন্সম্যান ঃ—এম সাধু খাঁ ও পি বসু।

শীল্ডে বে-বন্দোবস্ত ঃ

মহমেডানদের ১৪ই তারিখের খেলা বন্ধ হ'লো না, কিন্তু কালীঘাট লীগ খেলবার পরদিনই ১৩ই তারিখে খেলতে বাধ্য হলো। ক্যামারোনিয়নসকে ১৯শে ও ২০শে উপরি উপরি

শীল্ড খেলতে হলো, অথচ এটা তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা। তৃতীয় রাউণ্ড তখনও আরম্ভ হয় নি, একদিন পেছিয়ে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। কাষ্টমস বা পুলিসের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা ঐ দিন দেওয়া যেতে পারতো, তারা ১৫ই তারিখে খেলে বসেছিল। রিপ্লের জন্ত উপরি-উপরি খেলতে হয় নি; তালিকা প্রস্তুতই হয়েছে, ঐ রকম বে-হিসাবী ভাবে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ক্যামারোনিয়নসদের খেলার তারিখ ১৯শে এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ২০শে—অর্থাৎ যে দলই জয়ী হোক তাকে পরদিনই খেলতে হবে। সেই রকম হ্যাম্পসায়ার ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফের তৃতীয় রাউণ্ডের তারিখ ২৪শে, আর চতুর্থ রাউণ্ডের ২৫শে করা হয়েছে। অথচ, ইষ্ট ইয়র্কস্ বা ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় রাউণ্ডে ২০শে ও ২১শে খেল্লেও তাদের তারিখ পড়লো ২৬শে।



মহিলাদের হকি কিল্লাডার কাপের বিজয়িনী বোম্বাই সিটি ৫-০ গোলে ভিনসেন্ট ক্লাবকে পরাজিত করেছে

কাষ্টমসরা ১৩ই তারিখে প্রথম খেলে বসে থাকলো ২১শে পর্য্যন্ত। ২১শে খেলে পুনরায় খেলতে আজ্ঞা পেলে ২২শে, অথচ তালিকায় তাদের খেলবার দিন ছিল ২৩শে।

হ্যাম্পসায়ারকে পুলিসের সঙ্গে খেলে পর রাউণ্ড কাষ্টমসের সঙ্গে তার পরদিনই খেলতে হয়। আই এফ এ দয়া করে রিপ্লে খেলাটি একদিন বাদ দিয়ে দেন; তবু ভালো!

এ হামিদকে মহমেডানদের উপর্য্যুপরি দু'টি শীল্ড খেলায় পরিচালক করার উদ্দেশ্য কি! রেফারি এসোসিয়েশনের এ ধারণা কিরূপে হ'লো যে, হামিদ হঠাৎ উৎকৃষ্ট রেফারি ব'নে গেছেন্? কে ও এস বি ও মোহনবাগানের খেলা পরিচালনের পুরস্কার নাকি?

মোহনবাগান ও হাওড়া ইউনিয়নের শীল্ড ম্যাচও মোহনবাগানের মাঠে হ'তে পেল না কেন? ক্যালকাটা-কুমারটুলি ম্যাচটি কি মহমেডানদের বা মোহনবাগানের মাঠে দিতে পারেন আই এফ এ? মহমেডানদের এবারই নূতন মাঠ হয়েছে, অথচ তাদের প্রথম দু'টি শীল্ড খেলা তাদের মাঠেই খেলান হয়েছে। শক্তের ভক্ত একটা কথা আছে, তাই বোধ হয়। তথাপি তারা সন্তুষ্ট নয়।

চিটাগঞ্জ, খুলনা ইউনিয়ন, মুঙ্গের, বিকানীর, হবিগঞ্জের নাম মনোনয়ন কোন কারণেই অনুমোদন করা যায় না। চতুর্থ ডিভিসনের দল সিটি এ সিও কি শীল্ডে ভালো ফল দেখাবে বলে আই এফ এর ধারণা হয়েছিল? তারা আবার রোভার্সে খেলতে বোম্বাই গেছে। অবশ্য সেখানে ধার করা খেলোয়াড় নিয়ে যাওয়া চলবে।

মুসলমানদের অনুযোগঃ

চ্যারিটির অর্থ বিতরণ সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে সিদ্দিকী ছাহেব বক্তৃতায় বলেন যে, ১৯৩৬-৩৭ সালে চ্যারিটি খেলায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় সত্তর হাজার টাকা, তার থেকে মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৪৩০০৲ টাকা বিতরিত হয়েছে। অথচ শতকরা ৬০৲ টাকা মুসলিমরা দিয়েছে।

১৯৩৪ সাল থেকে অধিক সংখ্যক মুসলিম জনসাধারণ ফুটবল খেলা দেখতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ১৯১১ সাল থেকে ফুটবল খেলা কলিকাতায় অধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং খেলার মাঠে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। চ্যারিটিতেও প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয়ে আসছে। আজ

যদি কোন সম্প্রদায়ের কিছু পরিমাণ লোক বেশী অর্থ দেয়, তবে তখনি তাদের সম্প্রদায়ের ভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, এই যুক্তি যদি মেনে নিতে হয়, তাহ'লে গত ২২ বৎসরের সংগৃহীত অর্থ বিতরণের খতিয়ান আগে করতে হবে। দাতব্য ভাণ্ডারে দেয় অর্থে সাম্প্রদায়িকতা আনা সকল সম্প্রদায়েরই পক্ষে অনিষ্টকর। হাঁসপাতালে হিন্দুদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ মুসলমানদের দেওয়া অর্থের সংখ্যার চেয়ে বহু বহু পরিমাণে বেশী। আজ যদি হিন্দুরা বলে যে তাদের প্রদত্ত অর্থে শুধু হিন্দুরা চিকিৎসিত হবে, তবে কি তা মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর হবে? কলিকাতায় হিন্দুদের দেয় ট্যাক্স পরিমাণে মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তথাপি মুসলমানরা করপোরেশনে অর্দ্ধেকের উপর চাকরির দাবী করে? কলিকাতার লোকসংখ্যানুযায়ী কি মুসলমানরা হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ? তাও নয়। যদি চ্যারিটিতে প্রাপ্য অর্থ মুসলমানরা এই কয় বৎসরে বেশী দিয়েছে বলে সেই বেশী অর্থের ভাগ চায়, তবে অন্যান্য দাতব্য ভাণ্ডারে হিন্দু প্রদত্ত অর্থে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ই উপকৃত হবে এই বিধান দিতে হিন্দুরাও বাধ্য হবে। নিম্নশ্রেণীর টিকিট মুসলমানরাই বেশী ক্রয় করে থাকে, অন্যান্য সম্প্রদায় ক্রীত উচ্চশ্রেণীর টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ মুসলমানদের ক্রীত টিকিটের মূল্যাপেক্ষা কম কিনা, তাও জোর করে বলা যায় না। মহমেডানদের সভ্যশ্রেণীতেও অনেক অমুসলমান সম্প্রদায় আছে।

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া মারফৎ মহমেডান স্পোর্টিং বা মুসলমানদের আই এফ এর সম্বন্ধে নানা কল্পিত অনুযোগ শোনা যায়:—যথা, তাদের ৫২ লাইট ইনফেন্ট্রির সঙ্গে খেলা হয় ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে। এ সম্বন্ধে ষ্টার ছাপেন যে তারা জানতে পেরেছেন যে মহমেডানরা প্রতিবাদ করে এই ম্যাচ খেলেছে। কারণ,—"It is a long standing practice that a club having a ground of its own gets the preference of playing on the home ground." ইহা সত্য নহে, ইহা প্রাক্‌টিসও নহে। মহমেডানদের বহু পূর্ব্ব থেকেই মোহনবাগানদের গ্রাউণ্ড আছে, তথাপি তাদের ক্যালকাটা মাঠেই এ যাবৎ সকল শীল্ড ম্যাচ (দু' একটি খেলা ছাড়া) খেলতে হয়েছে। অতএব নিজস্ব মাঠ থাকলেই সেখানে তাদের শীল্ড খেলা হবে, ইহা যে standing practice নয় তা' প্রমাণিত হ'লো। মহমেডানদের এই বৎসরই মাঠ হয়েছে, তথাপি শীল্ডের প্রথম দু'টি খেলা তারা তাদের নিজের মাঠে খেলতে পেয়েছে। এ সম্বন্ধে আই এফ একে অন্যদলই একদর্শিতার দোষারোপ করতে পারে, মহমেডানরা নয়। শীল্ডের মাঠ নিরূপণ বিষয়ে আই এফ এর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, তবে দলের সভ্যদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে বিবেচনা করতে তাঁদের অনুরোধ করা



বার্লিন অলিম্পিক ষ্টেডিয়মে ইংলণ্ড-জর্ম্মাণীর ফুটবল খেলায়, ইংলণ্ডের বিখ্যাত অষ্টম ভিলাদল এবং জর্ম্মাণীর সম্মিলিত দলের মাঠে অবতরণ। অষ্টম ভিলা ৩-২ গোলে জয়ী হয়েছিল। বল হাতে (বামে) এলেন (ইংলণ্ড) ও (দক্ষিণে) মক্ (জর্ম্মাণী)

যেতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও বলেছি এবং বলি যে আই এফ এর এ বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়ায় ঘোষিত হয়েছিল যে ৩১শে জুলাই ময়দানে মুসলিমদের একটি বিরাট সভা হবে। কিন্তু ঐ সভার কোন বিবরণ এতাবৎ প্রকাশিত হয়নি। ঐ সভাতে নিম্নলিখিত রেজলিউসনগুলি করা হবে বলে মুদ্রিত হয়েছিল ;—নির্দোষ বাচ্চি খাঁকে অব্যাহতি দিতে হবে, কারণ তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। গভর্ণিং বডিতে ১১ জন ইউরোপীয় এবং ১০ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান আছে। উহাতে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। অষ্ট্রেলিয়া টুরের নন্‌প্লেয়িং ক্যাপ্টেনকে বাদ দিয়ে এক-জন মুসলমানকে এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার নিতে হবে, যে কেবল মুসলিম খেলোয়াড়দের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আই এফ একে গ্যারাণ্টি দিতে হবে যে, কোন কারণে মুসলমান খেলোয়াড়দের কাকেও শাস্তি দেওয়া হবে না—ইত্যাদি। এই সব যদি না করা হয়, তা' হ'লে মুসলমানরা ভবিষ্যৎ খেলা, আই এফ এ ফাইনাল বয়কট করবে। বাচ্চি খাঁকে অব্যাহতি না দিলে অন্য মনোনীত মুসলমান খেলোয়াড়দের অষ্ট্রেলিয়া যেতে অসম্মত হতেও বলা হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যদি মুসলিম জনসাধারণের এই সব আপত্তিতে যোগদান না করে এবং এই সকল অভিযোগের প্রতিকারে সাহায্য না করে, তবে তাদেরও বয়কট করা হবে। অর্থাৎ, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এই সভার জনমতের সঙ্গে যে কোন যোগ নেই, তার প্রমাণ রাখা হয়েছে।

এটুকু বোধ হয়, আই এফ এর পূর্ব্ব মিটিংয়ে মহমেডান স্পোর্টিং প্রেরিত রেজলিউসনের বিতর্কে সুশীল সেনের প্রশ্নে তাদের সভ্য ইস্পাহানীর—তার ক্লাবের এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য করা হয়েছে।

কলিকাতায় কয়টি মুসলমান ক্লাব আছে, যার বলে সমান সংখ্যক সভ্যের দাবী করো ? মুসলিম খেলোয়াড়দের শাস্তির সম্বন্ধে পূর্ব্ব থেকেই গ্যারাণ্টি চাও—বোধ হয় স্থির জানো যে তারা কোন না কোন দোষ করবেই ? প্রত্যেক সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের সুখ সুবিধা দেখবার জন্য সেই সম্প্রদায়ের একজন ম্যানেজার রাখতে হবে বোধ হয় আগামী ভবিষ্যতে! কেন, ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্তের উপরও কি তোমাদের বিশ্বাস নেই!

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব ও বিলাতের দলে চুক্তি ঃ

কোলন ক্লাবের হয়ে খেলে অমর সিং ৫২ মিনিটে ৭৯ রান করেছেন, তার মধ্যে ৩টা ছয় ও ১১টা চার ছিল। বোলিংয়ে তিনি ৭৯ রানে বার্ণে দলের ৫টা উইকেট নিয়েছেন। হিস্-টনের বিরুদ্ধে ৬৮ মিনিটে ১২০ রান করেছেন এবং ২২ রানে ৮টা উইকেট পেয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দলের সমর্থকরা তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায়।

অমরনাথ নেলসন ক্লাবের হয়ে খেলে লোয়ার হাউসের ৬টা


অমর সিং


সি এস নাইডু

উইকেট ২৮ রানে এবং রিষ্টন ক্লাবের ৯ উইকেট মাত্র ২৯ রানে নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

সি এস নাইডু ইউনিভার্সিটি এথ্‌লেটিক্ ইউনিয়নের হয়ে খেলে ক্লাব ক্রিকেট কন্‌ফারেন্সের দু'ইনিংসে এক-দিনে ১৪ উইকেট মাত্র ৯১ রানে নিয়ে অত্যাশ্চর্য্য বোলিং চাতুর্য্য প্রদর্শন করেছেন। প্রথম ইনিংসে ৫৮ রানে ৭, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ রানে ৭ উইকেট।


অমরনাথ

অমরনাথ পাঁচ শত পাউণ্ড এবং যাতায়াত খরচা নিয়ে নেলসন ক্লাবের হয়ে খেলবার চুক্তি করেছেন দু' বৎসরের জন্য, তৃতীয় বৎসর খেলা তার ইচ্ছাধীন। অমরসিং সাত শত পাউণ্ড ও যাতায়াত খরচার চুক্তিতে বার্ণে ক্লাবের পক্ষে খেলবেন।

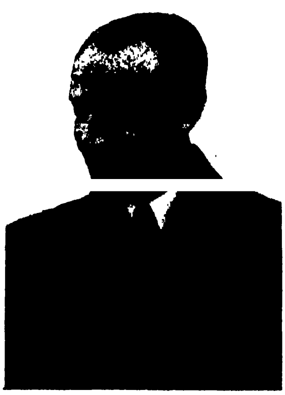
অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া—২৪২ ও ১০৭ (৫ উইকেট)

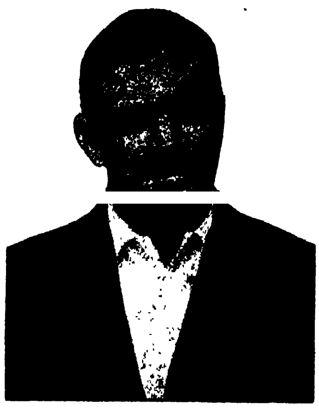
ইংলণ্ড—২২৩ ও ১২৩

২২শে জুলাই লীডস্ মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়ে ২৫শে জুলাই তৃতীয় দিনে ৪-১৬ মিনিটে সমাপ্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

লীডসের মাঠ ইংলণ্ডের পক্ষে শুভ হয়নি কখন। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্য পরীক্ষা এখানে আটবার হয়েছে, এবার নিয়ে ইংলণ্ড তৃতীয়বার হারলে, বাকীগুলি ড্র হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিজয় যখন নিশ্চিত, বরুণদেব ইংলণ্ডকে পরাজয় থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু ব্রাডম্যানের পক্ষে লীডস্ মাঠ শুভ। এখানে পন্স্‌ফোর্ডের সহযোগিতায় তিনি বিপুল রান তুলে, সমালোচকদের স্তম্ভিত করেন, ১৯৩০ সালে ৩৩৪ ও ১৯৩৪ সালে ৩০৪ রান করেন। ১৮৯৯ সালে এখানে টেষ্ট খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। কেবল ১৯০২ সালে টেষ্ট এখানে বন্ধ থাকে, শেফিল্ডে সেবার হয়। লীডসে অতীতে বরাবরই অধিক সংখ্যক রান উঠেছে, এবার কিন্তু মোট রান সংখ্যা মধ্যম।



ব্রাডম্যান
(ক্যাপ্টেন অষ্ট্রেলিয়া)



হ্যামণ্ড
(ক্যাপ্টেন ইংলণ্ড)

ও'রিলী, ফ্লিটউড্-স্মিথের নিদারুণ বোলিং অষ্ট্রেলিয়ার জয়ে প্রধান সহায় ছিল। ইংলণ্ডের পতনের জন্য উইকেট দায়ী নয়। ব্যাটস্‌ম্যানরা 'মিস-টাইম' করায়, ফিল্ডাররা সুযোগ পায়। স্পিন-বোলিং ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানদের ভয়ের কারণ হয়, কিন্তু কম্পটারকে ও'রিলী বা ফ্লিটউড্-স্মিথ ভীত করতে পারে নি।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটস্‌ম্যানরাও বেশী রান তুলতে পারে নি। বৃষ্টি পড়লে খেলা বন্ধ হবার ভয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেও খেলা চালিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে মাত্র একবার সামান্য বারিপাত হয়। মোট তিরানব্বই হাজার দর্শক কয়দিনে খেলা দেখেছে এবং তাদের কাছ থেকে দর্শনী মূল্য পাওয়া গেছে ১৩,৭৯১ পাউণ্ড।

প্রথম দিন পঁচিশ হাজার দর্শকের সম্মুখে সুন্দর মাঠে ও অনুকূল আবহাওয়ায় ইংলণ্ড টস জিতে খেলারম্ভ করে। মাত্র হ্যামণ্ড সর্ব্বোচ্চ ৭৬ রান করতে সক্ষম হন। চা পানের পরই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মোট ২২৩ রানে। ও'রিলী একা ৫ ও ফ্লিটউড্-স্মিথ ৩ উইকেট নেয়। অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস আরম্ভ হয়ে ১ উইকেটে ৩২ রান হলে বেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ারও প্রথম ইনিংস মাত্র ২৪২ রানে শেষ হয়। বাউস ও ফারনেসের নিখুঁত মাপের বোলিং ও চমৎকার ফিল্ডিংয়ের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটস্‌ম্যানরাও বেশী রান তুলতে সক্ষম হয় না। বার্ণেট ৫৭ করে ১৩০ মিনিটে। ব্রাডম্যান দলের সঙ্কট মুহূর্ত্তেও ভীত না হয়ে বিভিন্ন সুন্দর ষ্ট্রোকে নিজস্ব ৫০ রান তোলেন ৯০ মিনিটে। হাসেট-ব্রাডম্যানের সহযোগিতায় ৫০ রান উঠলে হাসেট স্লিপে হ্যামণ্ডের হাতে যান ১৩ রান করে এক ঘণ্টায়। ব্রাডম্যান মোট ২০০ রান তোলেন ২৫৫ মিনিট খেলার পরে। ক্ষীণালোকের জন্য খেলা ১৫ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়। তার পরে ফারনেস নূতন বল নিয়ে আরম্ভ করলে ব্রাডম্যান দারুণ পিটেছেন। তিনি প্রথম তিন বলে নয় রান করেন। ওয়েট ৪৫ মিনিটে মাত্র ৩ রান করে প্রাইসের হাতে গেলেন। একটু পরেই ব্রাডম্যান এ বৎসরের তাঁর দ্বাদশ শতরান এবং ইংলণ্ডের বিপক্ষে পঞ্চদশ শতরান করলেন, অর্থাৎ এ যাত্রায় প্রত্যেক টেষ্টেই একটা শত রান। পরে ৩ রান করে বাউসের বলে বোল্‌ড হলেন, তিনি একটিও সুযোগ দেন নি। এ অভিযানে এই তাঁর প্রথম বোল্‌ড আউট। ইয়র্কসায়ারের ডবলিউ ই বাউস-ই পৃথিবীর একমাত্র বোলার যে ব্রাডম্যানকে টেষ্ট ম্যাচে চারবার বোল্‌ড আউট করেছে। এমন কি এইচ্ লারউডও মাত্র

ছ'বার পেরেছেন এবং পাঁচ জন বিভিন্ন বোলার প্রত্যেকে একবার করে ব্র্যাডম্যানকে বোল্‌ড করতে পেরেছেন।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে বেলা শেষে কোন উইকেট না খুইয়ে ৪৯ করেন।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র একঘণ্টা ও পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হয় ১২৩ রানে। এ দিন অষ্ট্রেলিয়ার বোলাররা তাদের



বাউস ও'রিলী

মারাত্মক বোলিংয়ের কিছু নমুনা দেখায়। ফ্লিটউড্-স্মিথ 'হ্যাট-ট্রিক' করেন। মোট ৭৩ রানে ইংলণ্ডের তিনটি উইকেট (হার্ডষ্টাফ, হ্যামণ্ড ও এডরিচের) এবং ১১৬ রানে তিন উইকেট (প্রাইস, ভেরিটি, রাইট) যায়। ও'রিলীই ইংলণ্ডের সর্ব্বব্যাপী নাশের কারণ হয়ে ওঠে, পাঁচটি উইকেট মাত্র ৫৬ রানে নিয়ে। প্রকৃত পক্ষে ও'রিলীই খেলা জয় করে। হ্যামণ্ড শূন্য করে যায়, পেণ্টার নট আউট থাকে ২১ করে।

১০৫ রান করলে জয় হবে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ব্যাটস্‌ম্যানরা খুব ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে খেলছে। ১৭ রানে ব্রাউন গেলে ব্রাডম্যান এলেন। তিনিও সতর্ক হয়ে খেলছেন, দর্শকদের বিদ্রূপ সত্ত্বেও। মোট ৫০ রান উঠলো ৪৩ মিনিটে। রাইটের বলে ভেরেটি ব্রাডম্যানকে লুফলে তার ১৬ রানে। ম্যাক্‌ক্যাব গেলো পনেরোয়। হাসেট ও ব্যাডককের পঞ্চম উইকেট সহযোগিতায় রান উঠলো ৩০; হাসেট ৩৩ রান ৩৩ মিনিটে করেছে। ব্যাডকক ও বার্ণেট খেলছে, বৃষ্টি এসে আট মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ হলো। পুনরায় খেলারম্ভ হলে, উভয়ে মিলে মোট রান ১০৭ তুললে অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেট জয়ী হলো।

হেডিংলিংয়ের মাঠে সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক রান ওঠে। এবার যে রান সংখ্যা বেশী হয় নি, তার জন্য মাঠের অবস্থা দায়ী নয়। ব্যাটিংয়ের অকৃতকার্য্যতা ও বোলিংয়ের সফলতাই তার কারণ। নটিংহাম ও লর্ডসের টেষ্টের উভয় দলের গড়পড়তা রান সংখ্যা ৪৯এর কিছু উপরে প্রতি উইকেটে হয়, কিন্তু লীডসের এভারেজ রান কুড়িরও কম। ঐরূপ, বোলিংয়ের পক্ষে উপযুক্ত মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলাররা ইংলণ্ডের স্পিন বোলারদের অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হয়েছে। ইংলণ্ডের কুড়ি উইকেটের মধ্যে ১৭টি উইকেট স্পিন বোলারদের হাতে গেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের স্পিন বোলাররা অষ্ট্রেলিয়ার ১৫টি উইকেটের মাত্র সাতটি উইকেট নিতে সক্ষম হয়।

ইংলণ্ড তিন টেষ্টেই টস জেতে, ছ'বার রান সংখ্যা অত্যধিক তুললেও অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে পারে না। উপরন্তু এবার they beat England fairly and squarely. ইংলণ্ড খুব উৎকৃষ্ট দল সংগ্রহ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ টেষ্টে তাদের জয়ের আশা কম।

অষ্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ডবলিউ এ ব্রাউন···ব রাইট	২২
জে এইচ্ ফিঙ্গলটন···ব ভেরিটি	৩০
বি এ বার্ণেট···কট প্রাইস, ব ফারনেস	৫৭
ডি জি ব্রাডম্যান···ব বাউস্	১০৩
এস জে ম্যাক্‌ক্যাব্···ব ফারনেস	১
সি এল ব্যাডকক্···ব বাউস্	৪
এ এল হাসেট···কট হ্যামণ্ড, ব রাইট	১৩
এম জি ওয়েট···কট প্রাইস, ব ফারনেস	৩
ডবলিউ জি ও'রিলী···কট হ্যামণ্ড, ব ফারনেস	২
ই এল ম্যাক্‌করমিক্···ব বাউস	০
এল ও' বি ফ্লিটউড্-স্মিথ··· নট আউট	২
অতিরিক্ত···	৫
মোট ··	২৪২

উইকেট পতন :

২৮ (ব্রাউন), ৮৭ (ফিঙ্গলটন), ১২৮ (বার্ণেট), ১৩৬ (ম্যাক্‌ক্যাব্), ১৪৫ (ব্যাডকক্), ১৯৫ (হাসেট), ২৩২ (ওয়েট), ২৪০ (ব্রাডম্যান), ২৪২ (ও'রিলী) ও ২৪২ (ম্যাক্‌করমিক)।



ফারনেস



রাইট

বোলিং :—　　ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ফারনেস	২৬	৩	৭৭	৪
বাউস্	৩৫·৪	৬	৭৯	৩
রাইট	১৫	৪	৩৮	২
ভেরিটি	১৯	৬	৩০	১
এড্‌রিচ্	৩	১	১৩	০

অষ্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ডব্‌লিউ এ ব্রাউন···এল-বি, ব ফারনেস		৯
ফিঙ্গলটন···এল-বি, ব ভেরিটি		৯
ব্রাডম্যান···কট্ ভেরিটি, ব রাইট		১৬
ম্যাক্‌ক্যাব্···কট বার্ণেট, ব রাইট		১৫
হাসেট···কট এড্‌রিচ্, ব রাইট		৩৩
ব্যাড কক্···	নট আউট	৫
বি এ বার্ণেট···	নট আউট	১৫
	অতিরিক্ত···	৫
(৫ উইকেট)	মোট···	১০৭

উইকেট পতন :

১৭ (ব্রাউন), ৩২ (ফিঙ্গলটন), ৫০ (ব্রাডম্যান), ৬১ (ম্যাক্‌ক্যাব্) ও ৯১ (হাসেট)।

বোলিং :—　　ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
রাইট	৫	০	২৬	৩
ফারনেস	১১·৩	৪	১৭	১
ভেরিটি	৫	২	২৪	১
বাউস	১১	০	৩৫	০

ইংলণ্ড

চতুর্থ টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

বার্ণেট···কট বার্ণেট, ব ম্যাক্‌করমিক্		৩০
এডরিচ্···ব ও'রিলী		১২
হার্ডষ্টাফ···	রান আউট	৪
হ্যামণ্ড···ব ও'রিলী		৭৬
পেণ্টার···ষ্টাম্পড বার্ণেট, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		২৮
কম্পটন···ব ও'রিলী		১৪
প্রাইস্···কট ম্যাক্‌ক্যাব্, ব ও'রিলী		০
ভেরিটি···	নট আউট	২৫
রাইট···কট ফিঙ্গলটন, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		২২
ফারনেস···কট ফিঙ্গলটন, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		২
বাউস···ব ও'রিলী		৩
	অতিরিক্ত···	৭
	মোট···	২২৩

উইকেট পতন :

২৯ (এড্‌রিচ্), ৩৪ (হার্ডষ্টাফ), ৮৮ (বার্ণেট), ১৪২ (হ্যামণ্ড), ১৭১ (পেণ্টার), ১৭১ (কম্পটন), ১৭২ (প্রাইস্), ২১৩ (রাইট), ২১৫ (ফারনেস) ও ২২৩ (বাউস)

বোলিং :—　　অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	
ম্যাক্‌করমিক্	২০	৬	৪৬	১
ওয়েট	১৮	৭	৩১	০
ও'রিলী	৩৪·৪	১৭	৬৬	৫
ফ্লিটউড্-স্মিথ	২৫	৭	৭৩	৩
ম্যাক্‌ক্যাব্	১	১	০	০



ফ্লিটউড্-স্মিথ



হাসেট

ইংলণ্ড

চতুর্থ টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

এড্রিচ্…ষ্টাম্পড বার্নেট, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		২৮
বার্নেট…কট বার্নেট, ব ম্যাক্‌করমিক্		২৯
হার্ডষ্টাফ্…ব ও'রিলী		১১
হ্যামণ্ড…কট ব্রাউন, ব ও'রিলী		০
পেন্টার…	নট আউট	২১
কম্পটন…কট বার্নেট, ব ও'রিলী		১৫
প্রাইস…এল-বি, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৬
ভেরিটি…ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		০
রাইট…কট ওয়েট, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		০
ফারনেস…ব ও'রিলী		৭
বাউস…এল-বি, ব ও'রিলী		০
	অতিরিক্ত…	৬
	মোট…	১২৩

উইকেট পতন :

৬০ (বার্নেট), ৭৩ (হার্ডষ্টাফ), ৭৩ (হ্যামণ্ড), ৭৩ (এড্রিচ্), ৯৬ (কম্পটন), ১১৬ (প্রাইস), ১১৬ (ভেরিটি), ১১৬ (রাইট), ১২৩ (ফারনেস) ও ১২৩ (বাউস্)

বোলিং :— অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

ও'রিলী	২১'৫	৮	৫৬	৫
ফ্লিটউড্-স্মিথ	১৬	৪	৩৪	৪
ম্যাক্‌করমিক্	১১	৪	১৮	১
ওয়েট	২	০	৯	০



মেয়েদের ক্রিকেট। কম্প ক্রিকেট ক্লাবের মিস ক্লার্ক বাউণ্ডারী করেছেন। ডাচ্ উইকেট রক্ষক এল্ রাটগার্স বল লাগবার ভয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছেন

ফ্র্যাঙ্ক উলির কৃতিত্ব :

বিখ্যাত প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় উলি ১৯০৬ সালে টনব্রিজে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী প্রথম কাউন্টি ম্যাচে করেছিলেন। তিনি কেণ্টের হয়ে খেলে ১৯৩৮ সালে ১৫ই জুন ঐ মাঠেই তাঁর শেষ সেঞ্চুরী করেছেন, কারণ এই সীজন শেষে তিনি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নেবেন। তাঁর মোট ১৩৬ রান তুলতে ১২৫ মিনিট লেগেছিল, তাতে ২টা ছয় ও ১৮টা চার ছিল, প্রথম ৫৩ রান ওঠে ৪০ মিনিটে।



ফ্রাঙ্ক উলি

কিন্তু কেণ্ট কাউন্টি কমিটি তাঁকে অবসর নেওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে বিশেষ চেষ্টা করছেন।

এই বৎসরে তিনি ন'শো ক্যাচ নিয়েছেন। ২৮ সীজন হাজারের বেশী করেছেন, গ্রেসের রেকর্ডের সমান এবং ১৩ সীজন দু'হাজারের উর্দ্ধ রান করেছেন।

প্রথম দু' হাজার রান

ব্রাডম্যান ১৯শে জুলাই তারিখে এ বৎসর প্রথম নিজস্ব দু' হাজার রান পূরণ করেন নটিংহামসায়ারের বিপক্ষে খেলে। ঐ তারিখেই হ্যামণ্ড ল্যাঙ্কাসায়ারের বিপক্ষে খেলে তাঁর নিজস্ব দু' হাজার রান তোলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সেঞ্চুরী :

বেলমেন ক্রীকেট ক্লাবের জে মিণ্টার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সেঞ্চুরী করবার জন্য সিডনে ডেলি টেলিগ্রাফ প্রদত্ত পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ৩৪ মিনিটে শত রান করেন, শেষ পঞ্চাশ রান হয় মাত্র ১৬ মিনিটে।

আই এফ এর

ফুটবল দল ঃ

২রা আগষ্ট ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্ত ও এম দত্তরায় নন্-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন সমভিব্যাহারে আই এফ এ ফুটবল দলের নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা মাদ্রাজ মেলে অষ্ট্রেলিয়াভিমুখে যাত্রা করেছে :—

কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপ্টেন—কাষ্টমস্), ম্যাক্‌গুয়ার (কাষ্টমস্), রেবেলো (কাষ্টমস্), এস চৌধুরী (মোহনবাগান), প্রেমলাল (মোহনবাগান), পি দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল), নন্দী (ইষ্টবেঙ্গল), বি সেন (ইষ্টবেঙ্গল), কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল), রোজারিও (ই বি আর) ও জোসেফ (কালীঘাট)।

আই এফ এ দল ১৬ই আগষ্ট ফ্রীম্যাণ্টেলে পৌছোবে এবং ১০ই অক্টোবর কমোরিন জাহাজ যোগে কলম্বো অভিমুখে পুনর্যাত্রা করবে। প্রথম খেলা হবে এডেলেডে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ২০শে আগষ্ট তারিখে।

অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব্বসমেত ১৬টি খেলা হবে, পাঁচটি টেষ্ট খেলা নিয়ে। টেষ্ট খেলার তারিখ—সিডনেতে প্রথম টেষ্ট —৩রা সেপ্টেম্বর, ব্রিসবেনে দ্বিতীয়—১০ই সেপ্টেম্বর, সিডনেতে তৃতীয়—১৭ই সেপ্টেম্বর, নিউক্যাসেলে চতুর্থ—২৪শে সেপ্টেম্বর এবং মেলবোর্ণে পঞ্চম—১লা অক্টোবর।

শীল্ড ফাইনাল শেষ না হওয়ায় মহমেডান দলের মনোনীত ছয়জন খেলোয়াড় যেতে পারে নি। তজ্জন্য ৩রা আগষ্ট বিমল মুখোপাধ্যায় (মোহনবাগান), আর লামস্‌ডেন (রেঞ্জার্স) ও প্রসাদ (এরিয়ান) মাদ্রাজ মেলে কলম্বো যাত্রা করেছে। তারা একই জাহাজে অষ্ট্রেলিয়া পৌছোবে। বাকী তিন জন মুসলিম খেলোয়াড় রহিম, জুম্মা খাঁ ও নুর মহম্মদ (ছোট্ট) পরবর্ত্তী ক্যাথে জাহাজে ১৪ই আগষ্ট কলম্বো থেকে যাত্রা করবে। আব্বাস ও সাবুর যাওয়া ঘটলো না, মহমেডান ক্লাব তাদের জন্য অতিরিক্ত খরচা সম্পর্কে সাহায্য করতে অপারক হওয়ায়।





দুর্ঘটনায় খেলোয়াড় মৃত ঃ

আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাইলাণ্ডার্স দলের ফরোয়ার্ড থম্‌সন্ স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলায় নিজ দলের হাফব্যাক ফ্রিয়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে তলপেটে ভীষণভাবে আঘাত পায় এবং সেই রাত্রি ৮টার সময় হাঁসপাতালে মারা যায়। মৃতের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য পরদিনের সকল শীল্ড খেলার প্রথমে দু'মিনিট মৌন-বিরতি পালন করা হয়।



এস চৌধুরী



বিমল মুখোপাধ্যায়



নুর মহম্মদ ছোট (মহমেডান)



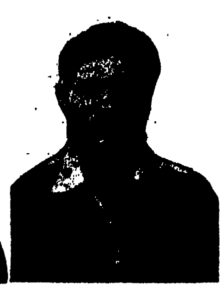
জুম্মা খাঁ (মহমেডান)



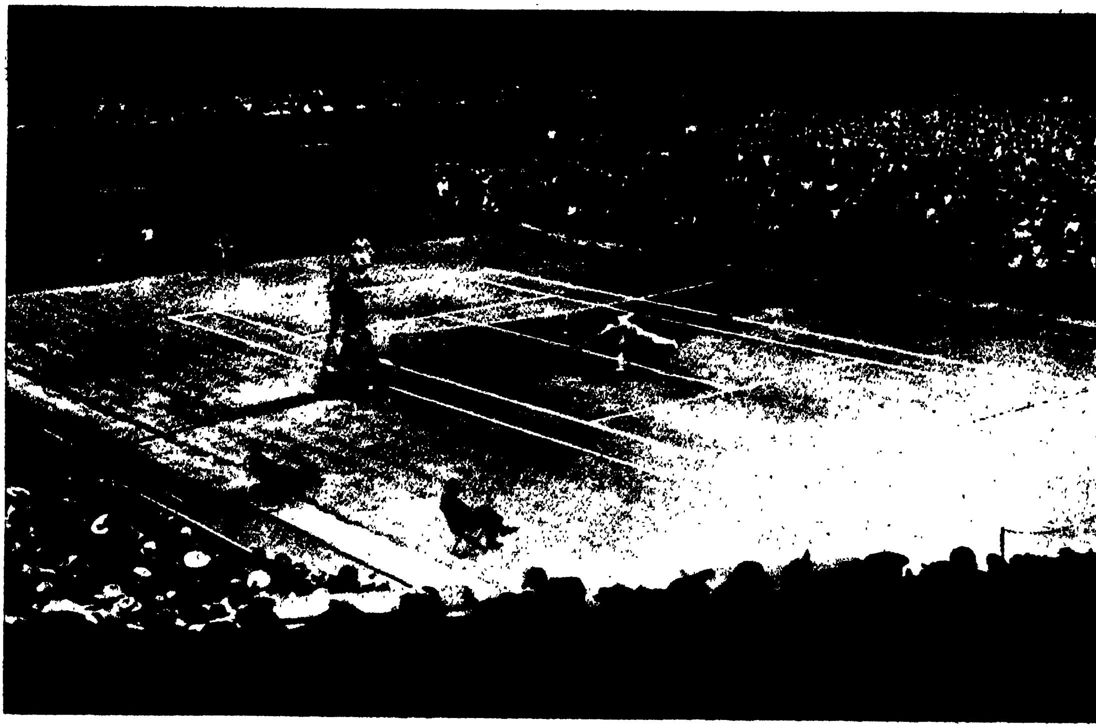
পি দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল)



কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল)



প্রেমলাল (মোহনবাগান)



উইম্বলডনে টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের ফাইনালে বিজয়ী জে ডি বাজ (আমেরিকা) এবং বিজিত এইচ্ ডব্লিউ অষ্টিন (বৃটেন) খেলছেন

বাঙ্গালোর মুসলিম ঃ

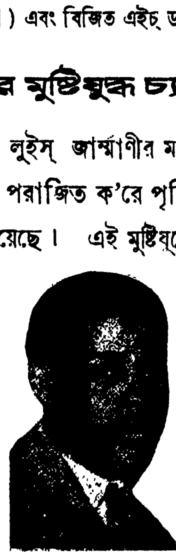
রোভার্স-বিজয়ী বাঙ্গালোর মুসলিম হাওড়ায় পুলিসের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচে ২-১ গোলে জয়ী হয়। ঢাকায় ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথম খেলায় তারা ৩-২ গোলে পরাজিত হয়েছে। পাখী সেন (ই বি আর), এম ব্যানার্জ্জি (ভবানীপুর) এবং পি মুখার্জ্জি গোল দেয়। বাঙ্গালোরের পক্ষে রহমৎ ও কাদের আলি গোল করে। শেষের দিকে মুসলিমরা চেপে ধরে এবং ড্র করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনই ভারতে একমাত্র ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স-বিজয়ী দল।

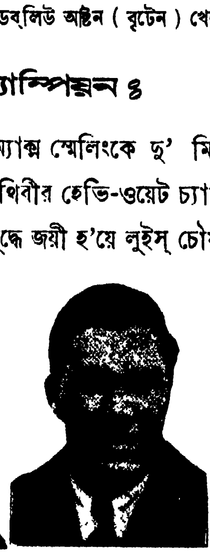
দ্বিতীয় খেলায়ও ঢাকা একাদশ ১-০ গোলে বাঙ্গালোর মুস্‌লিমকে পরাজিত করেছে। রসিদ (ছোট) ঢাকার পক্ষে গোলটি করে। দারুণ বারিপাতের মধ্যে খেলা হয়। ঢাকারা বেশী ভাগ আক্রমণ করে, তাদের পক্ষে মোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলেছে। তারপরই পাখী, রসিদ ও সুশীল সেনের নাম করা যায়। মুস্‌লিম পক্ষে এট্‌কিনসন্, মহীউদ্দিন ও ওসমান ভাল খেলেছে।

বিশ্বের মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন ঃ

জো লুইস্ জার্ম্মাণীর ম্যাক্স শ্মেলিংকে দু' মিনিট চার সেকেণ্ডে পরাজিত ক'রে পৃথিবীর হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী হয়েছে। এই মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে লুইস্ চৌষট্টি হাজার



জো লুইস্



মাক্স শ্মেলিং

পাউণ্ড লাভ করেছে ১২৪ সেকেণ্ডে, অর্থাৎ—প্রায় ৫১৭ পাউণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে তার রোজগার হয়েছে।

ডেভিস কাপ ঃ

জার্ম্মাণী ও জুগোশ্লাভিয়া ডেভিস কাপের ইউরোপীয় জোন ফাইনালে উঠেছে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে হারিয়ে।

যে পক্ষ জয়ী হবে তাকে আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকা জোনের বিজয়ীর সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে।

পত্নীদের স্বামী সঙ্গে যোগদানের অনুমতি ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড খেলোয়াড়দের পত্নীদের স্বামীদের সঙ্গে যোগদানের অনুমতি দিতে অবশেষে বাধ্য হয়েছেন, জনমতের প্রবল প্রতিবাদে। পত্নীরা ইংলণ্ডে স্বামীদের সঙ্গে যোগদান করতে পারবেন, এই সীজনের শেষে। ষ্ট্রেথমোর জাহাজ যোগে মিসেস ব্রাডম্যান ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেছেন, সঙ্গে মিসেস ম্যাক্‌ক্যাবও আছেন।



মিসেস ব্রাডম্যান

ক্যালকাটার আতিথেয়তা ঃ

মহমেডানরা তাদের মাঠে বিশেষ খেলা ও চ্যারিটি খেলার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করায় এবং কতকাংশে কৃতকার্য্য হওয়ায়, ক্যালকাটা ক্লাব শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডের ও রিপ্লে ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য প্রথম ডিভিসন ক্লাবগুলির সভ্যদের জন্য কয়েক শত অতিথি-টিকিট বিতরণ করেন।

ঐ টিকিট বিতরণ সম্পর্কে মোহনবাগান ক্লাবের অ-ব্যবস্থা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শোনা যায়। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার সম্বন্ধে কোনরূপ অভিযোগের কারণ না ঘটতে পারে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

টিলডেনের রসিকতা ঃ

টিলডেন তাঁর টেনিস সম্বন্ধে নূতন পুস্তক 'Aces, Places and Faults'এ বিখ্যাত তারকা খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে রসিকতা করে লিখেছেন,—

Helen Wills Moody, "Venus with a headache."
Helen Jacobs, "Brunhilda with a shovel."
Sara Palfrey Fabyan, "Shirley Temple grows up"
Ellsworth Vines, "The country boy in a big city."
Fred Perry, A race-horse with a sense of humour."

ব্রাডম্যান ষ্ট্রীট ঃ

ব্রাডম্যানের নামে একটি রাস্তার নামকরণ করবার স্থির হয়েছে, এডলেডের মহকুমা উডভাইলে। ইতঃপূর্ব্বে ঐ স্থানেই বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় গ্রিমেট, কলিন্স ও গিলিগ্যানের নামে রাস্তা করা হয়েছে।

অবিরাম সন্তরণে রেকর্ড ঃ

সন্তোষ দাশগুপ্ত হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় হেদুয়া পুষ্করিণীতে ৬১ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবিরাম সন্তরণ ক'রে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ২২শে জুলাই সকাল ৭-২৫ মিনিটে জলে নামেন এবং ২৪শে রাত্র ৮-৩৫ মিনিটে ওঠেন।

দাশগুপ্তের পূর্ব্ব রেকর্ড ঃ ১৯৩৭ সালে রেঙ্গুনে হস্তাবদ্ধাবস্থায় ৭০ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট অবিরাম সন্তরণ।

বোম্বাইয়ে ১০৩ ফুট উচ্চ থেকে ডাইভিং প্রদর্শন।

বালীগঞ্জে ৪৩ ঘণ্টা হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় অবিরাম সন্তরণ।



সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় অবিরাম সন্তরণে অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে, পার্শ্বে মেয়র মিষ্টার জ্যাকেরিয়া ও তদীয় কন্যা   ছবি—জে কে সান্যাল

১৯৪০এর অলিম্পিক ঃ

জাপান ১৯৪০ সালের অলিম্পিক খেলা যুদ্ধের জন্য করতে অক্ষম হওয়ায় ফিন্‌ল্যাণ্ডকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। ফিন্‌ল্যাণ্ড নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং ১০ই জুলাই প্রতিযোগিতা আরম্ভের দিন স্থির করেছে।

ভারতে আগামী এম সি সি দল ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এম সি সি দলকে ১৯৩৯-৪০ সালের শীত ঋতুতে ভারতে ক্রিকেট দল পাঠাতে নিমন্ত্রণ করেছেন, জার্ডিনের ক্রিকেট দলের সঙ্গে চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী। তাঁদের অন্ততঃ পক্ষে পাঁচজন অবৈতনিক খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলা হবে, দু'টি বোম্বাইয়ে এবং একটি ক'রে লাহোরে, কলিকাতায় ও মাদ্রাজে।

খেলোয়াড় দণ্ডিত ঃ

বাচ্চি খাঁ রেন্টনকে স্বেচ্ছাকৃত ফাউল করার জন্য রেফারি গিলসন কর্তৃক মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়। বিচারে এক বৎসরের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছে, ১৮ই জুলাই, ১৯৩৮ থেকে দণ্ডকাল গণ্য হবে। এ বৎসরই ফাউল করার জন্য সে দু'সপ্তাহের জন্য দণ্ডিত হয়েছিল।

বাচ্চি খাঁ তার দণ্ড মকুবের জন্য করুণ আবেদন করে, পঙ্কজ গুপ্ত ও এম দত্ত রায় তার পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু উহা ১১-৭ ভোটে বাতিল হ'য়ে যায়। রুল নং ৫০ অনুযায়ী বিশেষ অনুমতির জন্য প্রেসিডেন্ট অনুরোধ এবং পঙ্কজ গুপ্ত ও এ কে সেন অনুমোদন করেন, তথাপি বেশী ভোটে তাও বাতিল হয়ে যায়।

কাষ্টমসের নীল মহিউদ্দীনের সঙ্গে মারামারি করায় নীলকে আগামী বৎসরের ১৫ই মে পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড করা হয়েছে, কিন্তু মহিউদ্দীনকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য—অর্থাৎ, ফাইনালে খেলবার সুযোগ দেওয়া হ'লো—তার চেয়ে একেবারে কিছু না করলেই শোভন হ'তো।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সিরাজদ্দৌলা"—১।০
সুফিয়া এন হোসেন প্রণীত গল্পগ্রন্থ "কেয়ার কাঁটা"—১।০
ও কবিতা গ্রন্থ "সাঁঝের মায়া"—১৲
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "অন্ধের দৃষ্টি"—১।০
ডাক্তার নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থ "চলার পথ"—১৲
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত বাণিজ্য গ্রন্থ "ব্যবসায়ে বাঙালী"—১৲
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত সাহিত্য গ্রন্থ "বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগ"—২৲
শ্রীকালিদাস রায় সম্পাদিত গল্প সঙ্কলন "অষ্টরম্ভা"—২৲
শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত প্রণীত ছেলেমেয়েদের "পরীর গল্প"—।৵০
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল প্রণীত উপন্যাস "ঘুমভাঙার রাত"—১।০
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল প্রণীত "পর্দ্দার অন্তরালে"—১৲
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "বিশ্বের বিস্ময়"—৷৷৵০
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য উপন্যাস "ফেরারীর ছুরী"—১৷৷০
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "বেঁটে বক্কেশ্বর"—৸০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক "রাসলীলা"—১৲
শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "প্রেমের কবিতা"—১৲
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অনমিতা"—২৲
স্বামী বিদ্যানন্দ প্রণীত "অমৃতের সন্ধান"—৷৷০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ১৩ই আশ্বিন হইতে ৺দুর্গা পূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যা ২০এ ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ৩রা আশ্বিন, ২০এ সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কাপি আশ্বিনের জন্য ৬ই ভাদ্র, ২৩এ আগষ্ট, এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২৩এ ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পর আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs. G. D. Chatterjee & Sons
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.







আশ্বিন—১৩৪৫

প্রথম খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

আচার্য ফ্রয়েড্ ও আমরা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস

প্রবন্ধ

আধুনিক কাল 'মন্তবাদ'-এর যুগ। এই মতবাদের হিরণ্ময়-পাত্র দ্বারা সত্যস্বর্গ হয়ত ক্রমেই আবৃত হইয়া পড়িতেছে, স্বচ্ছ জলকে সমস্যার নিরন্তর পাকে হয়ত ক্রমেই বেশী করিয়া ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছি; কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি বিজ্ঞোচিত অবহেলায় কোণঠাসা হইয়া থাকিবার নহে; ইহার পশ্চাতে আছে জাগ্রত বিশ্ব-চিত্তের যে উদ্বোধন, তাহাই আমাদের শ্রদ্ধার্হ। এই জাতীয় মতবাদের মধ্যে আচার্য ফ্রয়েড এবং কার্ল মার্কস্-এর মতবাদই বোধ হয় বর্তমান যুগে আমাদের চিন্তা অধিকার করিয়া আছে সব চেয়ে বেশী।

বর্তমান মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য ফ্রয়েড্ যে একটি বিশেষ আলোড়ন আনিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য তাঁহার প্রচারিত মতবাদের মূল কথাগুলি সবই খুব নূতন এমন নহে; আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রসমূহেও এ জাতীয় অনেক কথা এখানে ওখানে ছড়ান রহিয়াছে। যৌনবৃত্তি এবং ক্ষুধাবৃত্তিই যে আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের ভিতরে প্রধান এবং মূলস্বরূপ, একথাও একটা কিছু প্রকাণ্ড আবিষ্কার নহে; আর আমাদের মনের জানা অংশ তাহার অজানা অংশ দ্বারা যে কি ভাবে চালিত হইতেছে, হিন্দুদর্শনের 'বাসনা'বাদের ভিতরেই সে কথা আরও অনেকখানি গভীরভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আচার্য ফ্রয়েড্ এই সকল কথাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই গবেষণার ফলে তিনি মানুষের মনের গহন অন্ধকারে যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু মনোবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানই উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা নহে; আমাদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, নীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ইহা একটা বিরাট পরিবর্তন সাধন করিতে বসিয়াছে; আর

আমাদের চিন্তারাজ্যের এই পরিবর্তন ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে।

আমাদের বর্তমান কালের সাহিত্যের ভাবধারাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—সকল সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া জীবন এবং জীবনের নৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আমাদের একটা নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার স্বরূপ খুব গভীর না হইলেও ইহার ব্যাপ্তি কম নহে। আর, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই নূতন নীতিবাদটি গড়িয়া উঠিতেছে অনেকখানিই আচার্য ফ্রয়েডের প্রমাণ যুক্তির ও তথ্যের উপরে। কোথাও আমরা ফ্রয়েডের মতবাদকে ঠিক ঠিকই গ্রহণ করিয়াছি, কোথাও তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলকে সাহিত্যের আসরে অনধিকার প্রবেশ করাইয়াছি, আর স্থানে স্থানে ফ্রয়েড্‌কে করিয়াছি আমরা বদ্-হজম।

এখানে প্রথমেই একটা বৈধতার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই জাতীয় মনস্তত্ত্ব ঘটিত নৈতিক বিচার সাহিত্যের আসরে গ্রাহ্য কি-না। আমার মতে ইহা নিতান্তই গ্রাহ্য; কারণ 'art for art's sake'—অর্থাৎ শিল্পকলার জন্যই শিল্পকলা বলিয়া আমরা সাধারণত আর্টের যে একটি নিরালম্ব তুরীয় অবস্থার কল্পনা করি উহা অনেকখানিই একটা অবাস্তব আদর্শ মাত্র। বিশেষত আধুনিক যুগে জীবন এবং তাহার সর্ববিধ সমস্যা সাহিত্যের ভিতরে এত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সাহিত্য শুধু সৌন্দর্যের পূজা নহে—ইহার ভিতরে রহিয়াছে জীবনের অতীত আগত এবং অনাগত অসংখ্য সমস্যার সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের মতামত। তাই বর্তমান যুগে মনস্তত্ত্বঘটিত নৈতিক প্রশ্নকে সাহিত্যের আসর হইতে একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া যায় না।

আধুনিক জগতের চিন্তাধারা এবং আধুনিক সাহিত্য কিরূপে কতখানি ফ্রয়েড্ প্রচারিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহা বিচার করিবার পূর্বে আচার্য ফ্রয়েডের মতবাদটিকেই সংক্ষেপে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। ফ্রয়েড্ বলেন, আমাদের মন পদার্থটির অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রই আমাদের জ্ঞানগোচর, মনের যে বৃহৎ রূপটি এই সামান্য ভগ্নাংশকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিয়া দেখাইতেছে তাহা রহিয়াছে একটি যবনিকার অন্তরালে। মনের যাহা কিছু কাজ তাহার অনেকখানিই রহিয়াছে নেপথ্যে এই যবনিকার অন্তরালে এবং সেই নেপথ্যগৃহ হইতেই নানারূপে সাজিয়া আসিয়া আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি বাহিরের রঙ্গমঞ্চে নানাপ্রকার অভিনয় করিয়া যাইতেছে। এই চিত্তবৃত্তিরূপ নাট্যকারগণের যাহা-কিছু বক্তব্য তাহার শিক্ষা হয় যবনিকান্তরালে—যাহা-কিছু প্রসাধন এবং সাজ-সজ্জাদি তাহাও হয় অন্তরালে—এমন কি, স্মারকটিও দাঁড়াইয়া আছেন যবনিকার অন্তরালে; নিপুণ নাট্যকারের ন্যায় মনোবৃত্তিগুলিও যেন অনেকখানি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যায়। ফ্রয়েড্ বলেন, আমরা আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলি অবচেতন সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করি। আর এই জীবনের বৃত্তি এবং অনুভূতিগুলিও বাহিরে শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে শেষ হইয়া যায় না—তাহারাও চেতনের রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া গিয়া অবচেতন এবং অবচেতনের ভূমিতে বাসনা ও সংস্কাররূপে বিরাজ করিতে থাকে। এই বাসনা-সংস্কাররূপে আমাদের সহজাত-প্রবৃত্তিগুলি এবং ইহজীবনের সঞ্চিত সর্বপ্রকারের অনুভব ও অভিজ্ঞতাগুলি দ্বারাই আমাদের মনের অধিকাংশ ভাগ অধিকৃত হইয়া আছে, আর মনের এই গহনের ভিতরেই অনেকখানি লুকাইয়া আছে আমাদের চেতন-বৃত্তির বীজগুলি—বাহির হইতে কোন আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সেই সুপ্ত বাসনাগুলিই আবার মনের পটভূমিতে ভাসিয়া উঠিতে চায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় দর্শনের প্রায় সব মতগুলিই সমস্বরে এই কথা বলে যে, আমাদের সাধারণ যাহা-কিছু চিন্তাপ্রণালী তাহা মানসিক বিকল্পমাত্র এবং এই বিকল্পের একমাত্র কারণ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা। আচার্য ফ্রয়েড্ অবশ্য এই বাসনা-সংস্কারগুলিকে ভারতীয় দর্শনগুলির ন্যায় একটি গভীর দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তিনি এগুলি দেখিয়াছেন শুধু মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে। এই বাসনা-সংস্কারগুলি আমাদের মনের মধ্যে অসংখ্য গ্রন্থি পাকাইয়া আত্মগোপন করিয়া আছে, বৌদ্ধ-দর্শনে এই গ্রন্থিগুলিকে সাধারণত মনের 'জট' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সামাজিক জীব হিসাবে আমাদিগকে আমাদের মনের ইচ্ছাগুলিকে অনেক সময়ই নিপীড়িত করিয়া রাখিতে হয়।

এই যে নিপীড়িত ইচ্ছাগুলি—তাহারা বাহিরে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই যে একেবারে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল এ কথা ভুল। তাহাদের বহিঃপ্রকাশে নিরন্তর বাধা-প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গিয়া অন্তঃপ্রদেশে এই শাসকটির বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাইতেছে এবং সেই নিভৃত প্রদেশের অন্ধকারের মধ্যে তাহারা তাঁহাদের নিপীড়নের বিক্ষোভে একটি ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং স্বমূর্তিতেই বাহিরে আসিবার অধিকার না পাইয়া নানাপ্রকার ছদ্মবেশে মনের প্রহরীটিকে ফাঁকি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া পূর্ব নিপীড়নের প্রতিশোধ লইতেছে। আমাদের চিত্তের বাসনার ভিতরে যৌন বাসনাটিই সর্বপ্রধান। আর আমাদের সমাজ ও আবেষ্টনীর ভয়ে এবং খানিকটা প্রয়োজনের খাতিরে এই যৌনবাসনাগুলিকে প্রায় সর্বদাই আমাদিগকে চাপিয়া রাখিতে হইতেছে। এই যৌনবৃত্তির নিরন্তর পীড়নের ফলে সে আমাদের চিত্তের মধ্যেই গিয়া পুনরায় আশ্রয় লইতেছে এবং সেখান হইতেই অনেক সময়ে সে নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদের চিন্তাধারা ও ভাবধারাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ফ্রয়েডের এই সকল মতবাদের ভিতর দিয়া দুইটি কথা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমত তিনি বলিতেছেন, এই যে যৌনবাসনার নিরন্তর নিপীড়ন ইহা আমাদের দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের পক্ষেই অনেক সময় অতি অমঙ্গলকর। এই নিপীড়নের দ্বারা মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে এবং সমস্ত বাসনাকে বুকে চাপিয়া চাপিয়া সমগ্র জীবনই নীরস, নির্জীব এবং বিষাদময় হইয়া যাইতেছে। তিনি চিকিৎসক হিসাবে শত শত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, আমাদের মানসিক রোগের প্রধান কারণই বাসনার নিপীড়ন। তিনি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সাধারণ আচরণ এবং তাহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত প্রভৃতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এই অন্তরের অবরুদ্ধ বাসনার কথাটি একবার জানিতে পারিলে এবং হৃদয়ের অন্তস্তলের সেই রুদ্ধ বাসনাটিকে আভাস এবং ইঙ্গিত দ্বারা মনের চেতনলোকে ভাসাইয়া তুলিতে পারিলেই অচেতন এবং অবচেতন লোকে তাহার বিষক্রিয়া অনেকখানি বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত ফ্রয়েড্ বলিতে চাহেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি সকলের উপরেও রহিয়াছে আমাদের অবচেতন এবং অচেতন লোকের রুদ্ধ-যৌনবাসনার অনিবার্য প্রভাব। আমাদের সকল ভাল-লাগা-না-লাগার পশ্চাতে, আমাদের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব এবং অনুভূতিগুলির ভিতরেও সন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের যৌনবাসনাগুলিরই সূক্ষ্মরূপ। আমাদের শিল্পসৃষ্টিকে অতি সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের নিপীড়িত যৌনবাসনাগুলিই নানারূপ মন-ভুলান রূপ লইয়া আসিয়া আমাদের আর্টের বাসর জমাইয়া বসিয়াছে। আমাদের অনেক ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মভাবের পশ্চাতেও রহিয়াছে অতি সূক্ষ্ম একটি যৌনবাসনা, কিন্তু বাহিরের জগতে আমাদের যুক্তির কারসাজি দ্বারা তাহাকে আমরা এমনভাবে সুমার্জিত এবং অন্যরূপে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছি যে, তাহাকে আর সকল সময় চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না। ফ্রয়েডের মতে আমাদের শিল্পবোধ, সাহিত্যবোধ, ধর্মবোধ প্রভৃতি বোধগুলি অনেক ক্ষেত্রে যৌনবৃত্তিরই আদর্শীকৃত রূপ (idealisation); নানা প্রকারের মহৎ এবং বৃহৎ কল্পনা দ্বারা নানা প্রকার উচ্চ আদর্শ দ্বারা আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত যৌনবৃত্তিকেই জীবনের ক্ষেত্রে বিপুল মহিমান্বিত এবং স্বর্গীয় প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া লই। মূলত তাহারা যৌনবৃত্তিরই রূপভেদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আচার্য ফ্রয়েডের এই মতবাদকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে যে কি ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সত্যকেই সাহিত্যিক-সত্য বলিয়া চালাইয়া লইয়াছি, সে বিষয়ে বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রথমে ফ্রয়েড্ যাহা বলিয়াছেন এবং তাহা হইতে আমরা জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ গড়িয়া লইতে পারি সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, আমাদের চিত্তবৃত্তির নিগ্রহই আমাদের প্রায় সকল মানসিক ব্যাধির কারণ। তাহা হইলে চিত্তবৃত্তির দমনই কি অন্যায়? কিন্তু চিত্তের কোন বৃত্তিকেই যদি আমরা দমন না করি—যে বৃত্তি যখন যেভাবে জাগিয়া উঠিতেছে তাহাকে যদি তখনই সেই ভাবেই মানুষ চরিতার্থ করিত তবে মানুষের মানুষ-প্রকৃতি বলিয়া কোন

একটা জিনিষই কোন দিন গড়িয়া উঠিতে পারিত না। চিরদিনই যদি মানুষকে চিত্তের অন্ধ আবেগেই নির্বিবাদে ইন্ধন জোগাইয়া আসিতে হইত এবং তাহা না করিলেই যদি তাহাকে নানারূপ দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতে হইত, তবে মনুষ্যত্বরূপ কোনও একটি পদার্থই আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম না। আর বাস্তব জীবনে আমাদিগকে কত বাসনাই ত কতরূপে চাপিয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মের কথা বা নীতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। একজন বড় কবি বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রেমিক ত তাঁহার সকল যৌনবাসনাকে চাপিয়া রাখিয়া জীবনের সমস্ত ভোগের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া জীবনের সাধনা করিয়া চলিয়াছেন ; এ জাতীয় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রেমিক কোন দিন মন-মরা হইয়া নীরস নির্জীব হইয়া পড়িয়াছেন বা বিবিধ মানসিক রোগে কষ্ট পাইয়াছেন তাহা ত সচরাচর দেখিতে পাই না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, মনের বৃত্তিকে নিরোধ করাই যে মানসিক রোগের অবশ্যম্ভাবী কারণ এ কথা বলা যায় না, আর ফ্রয়েড্‌ও নিশ্চয়ই সে কথা বলেন নাই। কিন্তু ফ্রয়েড্ বরাবরই এই নিরোধের কুফলটাকেই বড় করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; ফলে আমাদের মনে আজকাল এই জাতীয় একটা ভ্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে যে, মানসিক বৃত্তিগুলির সকল প্রকারের সংযমই দেহ ও মনের দিক হইতে অতীব গর্হিত। আমরা আজকাল ফ্রয়েডের মতবাদকে অনেকখানি এই আলোকেই গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহারই ফলে সংযমটা যে আমাদের মন ও দেহ কাহারই পক্ষে উপকারী নয়, এইরূপ একটি অদ্ভুত মনোভাব আমাদের ভিতরে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

অবশ্য ফ্রয়েড্ নিজে মূলত কোন দার্শনিক নহেন, কোনও মনস্তাত্ত্বিকও নহেন, তিনি একজন চিকিৎসক মাত্র। সুতরাং তাঁহার কাছ হইতে আমাদের হয়ত এ জিনিষটি আশা করা সব সময় উচিত হইবে না যে তিনি তাঁহার গবেষণা-লব্ধ সত্যগুলিকে কোনও দার্শনিক মতবাদরূপে প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মূলত চিকিৎসক হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ফ্রয়েড্ নিজেই যে তাঁহার চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়িয়া মানুষের জীবনের অন্য কোন সমস্যা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা কোনও কটাক্ষপাত করেন নাই এমন নহে। তিনি তাঁহার চিকিৎসার গবেষণা-লব্ধ ফলের উপরেই নির্ভর করিয়া মানুষের প্রেম, ভালবাসা, পরহিতৈষণা, স্বাদেশিকতা, —এমন কি সাহিত্য, শিল্পকলা এবং ধর্মকেও অনেক স্থলে যৌনবৃত্তিরই নানা প্রকারের ছদ্মবেশ বলিয়াছেন। সুতরাং আমরাও ফ্রয়েডের মতবাদ বিচার করিতে গিয়া ইহাকে শুধু একজন চিকিৎসকের মত বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি না।

ফ্রয়েডের মতবাদের ভিতরে প্রথমেই মনে হয়, চিত্তবৃত্তির 'সংযম' এবং তাহার 'নিগ্রহ' বা 'নিপীড়ন'-এর মধ্যে খানিকটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমাদের অনেক মানসিক ব্যাধিই যে চিত্তবৃত্তির নিগ্রহের ফলে, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না—আর ফ্রয়েড্ নিজেও শত শত রোগীর অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিগ্রহের দ্বারাই যে ব্যাধির সৃষ্টি হয় ফ্রয়েড এই কথাটিকেই নানাভাবে জোর দিয়া বুঝাইতে এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর আমরাও সেই জিনিষটিকেই বেশী করিয়া বুঝিয়াছি ; কিন্তু চিত্তবৃত্তির সংযম করিলেই যে ব্যাধি হয় না এবং এই সংযম যে আমাদের জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপেই কত প্রয়োজনীয় এ জিনিষটিও আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ফ্রয়েডের গ্রন্থ পড়িয়া চিত্তবৃত্তির নিরোধের যে কি কুফল তাহাই শুধু মনের কাছে বড় হইয়া ওঠে, কিন্তু এই নিরোধের যে অন্য একটি কত বড় দিক্ রহিয়াছে, তাহার প্রয়োজনও যে মানুষের জীবনে কতখানি অপরিহার্য—এ বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। ফলে চিত্তসংযমের কুফলের দিকেই আমাদের সব নজর পড়িয়াছে, তাহার সুফল এবং প্রয়োজনীয়তার কথাটা আমরা অনেকখানি ভুলিতেই বসিয়াছি ; আমাদের যে নূতন নীতিবাদটি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ভিতরে সেই জন্যই চরিত্রের দৃঢ় সংযম তেমন কোনই একটা মাহাত্ম্য লাভ করিতেছে না। স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে গা ঢালিয়া দেওয়াটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় কথা হইতে বসিয়াছে।

সংযম এবং নিগ্রহকে সাধারণত আমরা আজকাল সম-অর্থক বলিয়াই গ্রহণ করি ; কিন্তু সংযম এবং নিগ্রহের প্রকৃতি অনেকখানিই স্বতন্ত্র ; এই জন্যই সংযম এবং নিগ্রহ উভয়ের দ্বারাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেও তাহার ফল প্রায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফ্রয়েড্ যেখানে চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিগ্রহ বা মনের উপর অত্যাচার।

আমাদের মস্তকে সর্ব্বদাই একটি শাসক উদ্যত বেত্রহস্তে বসিয়া আছেন, আমাদের চিরাচরিত সামাজিক বা নৈতিক-বোধ বা মঙ্গলের বোধের বিরুদ্ধে কোন ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইবা-মাত্র এই শাসকটি তাহার পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাত বসাইয়া দেয়, —পীড়নে এবং ভয়ে সন্ত্রস্ত আমাদের ইচ্ছাগুলিকে অমনই চেতনার আলোক হইতে অচেতনের অন্ধকারে আত্মগোপন করিতে হয়। কিন্তু প্রবল শক্তি দুর্বলের যতই কণ্ঠরোধ করিয়া তাহার বুকের কথা রুদ্ধ করিয়া দিতে চায়, তাহার অন্তরের বেদনার জ্বালা ততই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে এবং সে তখন অত্যাচারিত সকলের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া যখনই যেখানে যেটুকু সুযোগ পায় আপনার অস্তিত্বকে প্রকাশ করিতে তৎপর থাকে। আর আমাদের মন যখন এই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সহিত কোন আপোষ-মীমাংসাই ঘটাইতে পারে না তখনই তাহার ভিতরে সৃষ্টি হয় একটি বিষাক্ত আবহাওয়ার—যে মানুষকে ক্রমে ক্রমে নীরস, নির্জীব এবং মন-মরা করিয়া রাখে। সামাজিক জীব হিসাবে অনেক সময় আমাদিগকে মনের অনেক প্রবল বাসনাকে, বিশেষত আমাদের যৌনবাসনাগুলিকে নিজেদের বিবেক দ্বারা সংহত এবং সংযত রাখিতে পারি না; কিন্তু সমাজের ভয়ে, লোকলজ্জার খাতিরে, শাসনের ভয়ে এই বাসনা-গুলিকে আমাদিগকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। আমরা নিজেরাও যে ইহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছুক তাহা নহে, কিন্তু শত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী কখনই আমাদিগকে ঐ জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে দেয় না। এই জাতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধে কোন মঙ্গলের মহিমা নাই, চিত্তের আনন্দ বা তৃপ্তি নাই—আছে শুধু অতৃপ্তির তীব্র জ্বালা, আছে শুধু বিরক্তি এবং বেদনা, আছে শুধু মঙ্গলবোধের বিরুদ্ধে ভীরু বিদ্রোহ। এই জাতীয় চিত্তবৃত্তির নিগ্রহই সাধারণত আমাদের অনেক দুরারোগ্য মানসিক এবং তাহার সহিত অনেক শারীরিক ব্যাধিরও সৃষ্টি করে। কিন্তু সংযমের ভিতরে যে চিত্ত-নিরোধ তাহা এ জাতীয় নহে। সেখানে কাহাকেও জোর করিয়া ঘাড় ধরিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয় না বা পলাইয়া যাইতে বাধ্য করা হয় না। যেখানে আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা অনেক মিষ্টি কথায় অনেক যুক্তি-প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিই এবং সম্পূর্ণ অনুভব করাইয়া দিই যে, জীবনের রঙ্গভূমিতে তাহার অস্তিত্ব এবং আবির্ভাব মঙ্গলের বিরোধী এবং তাহারাও তখন আপনা হইতেই সে কথা মানিয়া লইয়া আত্ম-বিসর্জন দেয়, মনরাজ্যে তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের মনের বৃত্তিগুলি কতগুলি ইষ্টক এবং মাল-মসলা স্বরূপ। এই সকল উপাদানের নিপুণ সমাবেশের দ্বারা আমাদিগকে মনের ক্ষেত্রে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা, শিল্প, সাহিত্য এবং ধর্ম প্রভৃতির বিরাট বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়, আর এই সকল সৌধের সমাবেশেই গড়িয়া ওঠে মনুষ্যত্বের বিরাট্ পিরামিড। এই গঠনকার্য্যে উপাদানগুলি যে-যাহার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করিতে পারে না; সকলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেরূপ করিয়া মানিতে গেলে মনুষ্যত্বের বনিয়াদ কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার রূপ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটি মূল পরিকল্পনার ভিতরে এই উপাদানগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে গড়িয়া লয়। এই গঠনকার্য্যের ভিতরে অনুগ্রহ-নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। এই জাতীয় অনুগ্রহ-নিগ্রহকে বরদাস্ত না করিলে মনুষ্যত্বের বনিয়াদটিই ধ্বসিয়া পড়িবে।

এই যে মনের বৃত্তিগুলিকে যদৃচ্ছ কাজ করিতে না দিয়া একটি বা একাধিক আদর্শ বা পরিকল্পনার ভিতরে তাহা-দিগকে সংহত করিয়া লওয়া, ইহা যে সর্বদাই আমাদিগকে নীরস, নির্জীব এবং মনমরা করিয়া রাখে তাহা নহে। অধিকন্তু একটা বৃহত্তর আনন্দের ভিতরে তাহারা আপনাদের সত্তা নির্বিবাদে মিলাইয়া দেয়। আমাদের জীবনের আদর্শ যেখানে শুষ্ক, নীরস, প্রাণহীন—সেই চিরাচরিত বাঁধা-বুলির সঙ্গে যেখানে আমাদের অন্তরের শুভ্র হাসিটি মিশিয়া যায় নাই, চিত্ত-সংযমে সেইখানেই নিপীড়নের বেদনা। কিন্তু একটি বৈজ্ঞানিক যেখানে তাহার গবেষণার রহস্যঘন আনন্দের মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে মগ্ন করিয়া দিয়াছেন, একজন দার্শনিক যখন তাঁহার সমস্ত সত্তাকে তাঁহার মনন ও নিদিধ্যাসনের আনন্দে ডুবাইয়া দিয়াছেন, একজন শিল্পী যেখানে তাঁহার রসসৃষ্টির ভিতরে আপনার অন্তরকে সৃষ্টির আনন্দে নির্বাত দীপের ন্যায় উপলব্ধি করেন, সেখানে তাঁহাদের যৌনবাসনা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যে সংযত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে ত শারীরিক বা মানসিক কোন অমঙ্গলেরই আশঙ্কা থাকে না। আসল কথা হইল, আমাদের

মন কিসে আনন্দ পায়, তাহার ঝোঁক কোথায়, তাহা দেখিতে হইবে। শুধু যৌন-আকাঙ্ক্ষার ভিতরেই যদি জীবনের সকল আনন্দের সন্ধান মিলিয়া যায়, সেক্ষেত্রে যৌন-আকাঙ্ক্ষার সংযম দেহমনের পক্ষে একটা কঠোর শাসন ব্যতীত কিছুই নহে—উহা নিপীড়ন, উহা সমাজকে রক্ষা করিলেও ব্যক্তিকে পিষিয়া মারে। সুতরাং এই যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করিতে হয় জীবনে অন্যান্য মহান্ আদর্শগুলির প্রতি চিত্তের গভীর প্রীতি উৎপাদন করিয়া। আমাদের মন স্বভাবতঃই যৌনবৃত্তিতে আসক্ত; কিন্তু চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা মহত্তর বৃত্তিগুলিতে চিত্তের আসক্তি স্থাপন করিতে হয়। যোগশাস্ত্রে তাই দেখিতে পাই, অভ্যাসকেই চিত্তবৃত্তিনিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলা হইয়াছে। এই অভ্যাসের দ্বারাই আসে মঙ্গলের প্রতি, বৃহত্তর আনন্দের প্রতি আসক্তি এবং নিতান্ত জৈবিকবৃত্তিগুলির প্রতি অনাসক্তি বা বৈরাগ্য।

আমাদের যোগশাস্ত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিগ্রহ বা পীড়ন করিয়া দমাইয়া না রাখিয়া একটা নিয়মিত অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা তাহাদিগকে কি করিয়া অতি সাবধানে মনের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা যায় তাহারই কথা বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে এই চিত্তসংযমের ভিতর দিয়া এই যোগাভ্যাসের ভিতর দিয়া আমরা যে শুধু এ জীবনের চিত্তবৃত্তিগুলিকেই নিরোধ করিতে পারি তাহা নহে, নিরন্তর অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা আমাদের মনের গহন প্রদেশে দৃঢ় শিকড় গজাইয়া আছে যে সকল বাসনা ও সংস্কার—তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণ সমাহিত বা আত্মস্থ করিতে পারি। কিন্তু আমাদের সাধারণ জীবনে এই যোগের সমাধির আদর্শ ছাড়িয়াই দিলাম, অন্তত এইটুকু সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে শিক্ষা, চেষ্টা এবং অভ্যাসের দ্বারা আমরা চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকেও সংযত করিয়া রাখিতে পারি এবং সেরূপ সংযম দেহ বা মন কাহারই কোন অনিষ্টের কারণ নহে। ফ্রয়েড্ শুধু দেখাইয়াছেন, আমাদের চেতন আমাদের জীবনে সর্বদাই কিরূপে অচেতন ও অবচেতনের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু আমাদের যোগদর্শন দেখাইয়াছে, তাহার বিপরীত পদ্ধতির সম্ভাবনা; অর্থাৎ আমাদের চেতনার সমাহিত একাগ্র শক্তির দ্বারা আমরা সমগ্র অবচেতন এবং অচেতন লোককেও কিরূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারি।

তারপরে ফ্রয়েড্-বাদীরা বলিয়াছেন এবং নানাপুস্তকে ও প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমরা যাহাকে জীবনের অতি উচ্চবৃত্তি বা ভাব বলিয়া মনে করি তাহাও অনেকস্থলে আমাদের রুদ্ধ যৌনবৃত্তিরই একটি আদর্শীভূত রূপান্তর মাত্র (idealisation)। ফ্রয়েডের এই মতটি খানিকটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে; এই জাতীয় মতবাদগুলির একটি সাধারণ দোষ এই যে ইহারা জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কোথাও কোনও সত্যের সন্ধান পাইলে অমনই তাহার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে সর্বগ্রাসী করিয়া তুলিতে চায়। আমাদের যৌনবৃত্তিই যে সর্বাপেক্ষা বড় বৃত্তি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যে সে আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে—স্ববেশে বা পরবেশে খানিকটা লুকাইয়া আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এই যৌনবৃত্তির রূপান্তর ব্যতীত আমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি যে আর কিছুই নহে, এ কথাও অশ্রদ্ধেয়। আমরা সাহিত্যের কথা দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার কথাই বিশেষ করিয়া ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথ যেখানে গাহিয়াছেন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।

তখন একটু সূক্ষ্মভাবে হয়ত দেখিতে পাইব যে, যে বেদনা আমাদের জীবনেরই বাস্তব বেদনা, ইহার ভিতরে তাহাকেই যেন অনেকখানি সূক্ষ্ম গভীর অ-স্পৃশ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে দূরে সরাইয়া শুধু মনোময় করিয়া শুধু সঙ্গীতময় করিয়া পাইয়াছি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই, এই যে আমাদের ভিতরে যৌন-বাসনাকেই বাস্তবের অতীত করিয়া

ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে দূরে—অতিদূরে সরাইয়া লইয়া একটি অসীমতার ভিতরে তাহাকে অনুভব করার গভীর আকাঙ্ক্ষা ইহা আমাদের মনকে কে দিয়াছে? সেও কি আমাদের যৌন-আকাঙ্ক্ষারই কোন ছায়ামূর্তি? না, আমাদের যৌন-বাসনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোন গভীর সত্তা? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের মনের গভীর উচ্চ ভাবগুলিকে যখন আমরা কাব্যে রূপায়িত করিয়া তুলি তখন তাহাকে সূক্ষ্ম যৌনরসের ঈষৎ বর্ণ-আভায় আমাদের পার্থিবরসে মধুর করিয়া তুলি। এইভাবেই হয়ত ভগবান্ এবং তাঁহার আত্মোপলব্ধির হ্লাদিনী শক্তিকে রাধাকৃষ্ণের ভিতরে মূর্তি দিয়াছি এবং হয়ত রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিগণের প্রতি এই প্রশ্নও একেবারে নিরর্থক নয়—

সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
… … … …
………এত প্রেম-কথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লয়েছিলে কার মুখ, কার
আঁখি হতে?—

কিন্তু এ প্রশ্ন যে শুধু বৈষ্ণব কবিগণের প্রতিই রবীন্দ্রনাথ করিতে পারেন তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমরা প্রশ্ন করিতে পারি—তিনি যখন 'মানস-সুন্দরী'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানস-সুন্দরী,
দু'টি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি' উঠে মর্মান্ত হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া ওঠে,—
এখনি ইন্দ্রিয়দ্বার বুঝি টুটে টুটে।

তখন কবির মনের সুন্দরীটি কাব্যে কাহার রূপ পাইয়াছে? রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা', 'কৌতুকময়ী', 'লীলা-সঙ্গিনী' সকলেই নারী। এমন কি জীবনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়ও দেখিতে পাই—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি।
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।

কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও বিশ্বসৃষ্টির যে অনন্ত অজানা রহস্য তাহার সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে কবির অন্তস্তল নিরন্তর বিমথিত করিয়া দিয়াছে তাহা শুধু কামেরই বিকার মাত্র নহে। সৃষ্টির মূলে যে রহস্য—তাহার প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রহস্য—তাহার যে রসময় অসীমতা তাহার ভিতরেও কি রহিয়াছে শুধু মদনের শর-সন্ধান? বলা যাইতে পারে, মদন এখানে অতনু। কিন্তু তাহা হইলেও অন্তত এইটুকু মানিয়া লইতে হয় যে, আমাদের ভিতরে আমাদের নিছক জৈবিক সত্তার অতিরিক্ত এমন একটি সত্তা রহিয়াছে, যে মদনের মূর্তিকে চাহে না, যাহার জন্য মদনকে অতনু হইয়া আমাদের পশ্চাতে ঘুরিতে হয়। তাহা হইলে আমাদের ভিতরকার এই যে সত্তাটি অন্তত সে আমাদের যৌনবৃত্তিরই রূপান্তর মাত্র নহে।

এখানে আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা দেখিতে পাইয়াছি, আমরা যাহাকে আমাদের স্বর্গীয় প্রেম বলি, আমাদের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যবোধ বলি, যাহাকে আমাদের সুকুমার চারুকলার বোধ বলি তাহা আমাদের যৌনবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের এই সত্যকে আজ আর একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্যবোধ, চারুকলাবোধ—এমন কি আমাদের ধর্মবোধও যদি মূলত যৌনবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াই থাকে তবে ত যৌনবৃত্তি এবং জীবনের এই সকল সূক্ষ্ম উচ্চ বৃত্তিগুলি কখনই সমধর্মা নহে। পদ্মও পঙ্কে জন্মে; তাহার মূলদ্বারা সে সর্বদাই পঙ্কের রসই গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল এবং পঙ্ক কি প্রকৃতিতে এবং মূল্যে একই? আধুনিক উপন্যাসগুলির নায়কনায়িকাদের কথোপকথন একটু

লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, আমাদের তথাকথিত স্বর্গীয় প্রেমও যে কামেরই রূপান্তর মাত্র, ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা বাহির করিয়া সকলেই যেন 'কত বিদ্যে করেছি জাহির'! কিন্তু পদ্ম এবং পাঁক যেমন এক নহে, কাম এবং প্রেমও তেমনই সর্বত্র এক নহে। পুষ্প যেমন মাটি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও পঞ্চভূতের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে যে অপূর্ব সৌরভ, যে রমণীয় বর্ণবৈচিত্র্য, যে রেখার সুষমা—তাহারই সমবায়ে সে মাটি হইতে বর্ণে, গন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক্; মানুষের সুকুমার এবং উচ্চ হৃদয় বৃত্তিগুলিও তেমনি মূলত যৌনবোধ হইতে উদ্ভূত হইলেও প্রকৃতিতে তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের অন্তরেও রহিয়াছে সেই ক্রিয়াশক্তি যাহা দ্বারা সে পঙ্ককে পদ্ম করিয়া লইতে পারে। আজকাল ঐকদল বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, বিবর্তনের প্রবাহের ভিতরে বস্তু সর্বদাই আপনার স্বরূপ বদলাইয়া প্রতিমুহূর্তেই নূতন স্বরূপ গ্রহণ করিতেছে; প্রতিমুহূর্তেই তাহার ভিতরে একটি নূতন সত্তার আবির্ভাব হইতেছে। এই বিবর্তনের নিয়মটি যে শুধু বাহিরের জগৎ সম্বন্ধেই সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা নহে- অন্তর্জগতেও সে তেমনই সত্য। আমাদের স্থূল বৃত্তিগুলিও যখন সূক্ষ্মের দিকে ক্রমবিবর্তিত হইয়া থাকে, তখন প্রতি স্তরেই তাহার স্বরূপ বদলাইয়া যায়। এই জন্যই যৌনবৃত্তি এবং প্রেম, সৌন্দর্য, নীতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কখনই সমধর্মা হইতে পারে না; তাহারা একই বস্তুরই পরিবর্তিত রূপ নহে—বিবর্তনের প্রবাহে তাহারা 'স্বরূপ-বিলক্ষণ'।

কিন্তু আচার্য ফ্রয়েডের নামে এবং চিত্তবৃত্তি-বিশ্লেষণবাদীদের নামে আমাদের ভিতরে আজকাল যে সকল মতামত ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহার অধিকাংশই আমাদের নিজেদের মত। চিত্ত-বিশ্লেষণবাদীদের গবেষণার কিছু কিছু তথ্য জ্ঞাত হইয়া আমরা তাহা হইতে অনেক মতই নিজেদের মতের পরিপোষকরূপে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য ফ্রয়েড্ চিকিৎসক মাত্র, চিত্তবৃত্তি-বিশ্লেষণবাদীরাও মনস্তাত্ত্বিক মাত্র। ইঁহাদের কাজ বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সত্য নির্ধারণ—সেই সকল সত্যকে সাধারণীকরণের দ্বারা জগৎ বা জীবন সম্বন্ধে কোনও নূতন মতবাদ রচনা করা তাঁহাদের কাজ নহে। কিন্তু আমরা সেই বিশেষের বিশ্লেষণ ফলকে সাধারণীকরণের দ্বারা নিত্য নূতন মতবাদ গড়িয়া তুলিতে লাগিয়া গিয়াছি। ফ্রয়েড্ বা চিত্তবৃত্তি-বিশ্লেষণবাদীদিগকে অবলম্বন করিয়া আমরা আজকাল যত মতামত গড়িয়া লইতেছি, তাহার অধিকাংশই ভুল সাধারণীকরণের ফল। আমাদের দ্বিতীয় ভুল এই, আমরা মনস্তত্ত্বকেই নীতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। আমাদের মনের গহনের যত সত্য তাহা মনস্তত্ত্বের সত্য মাত্র—তাহাই নীতির সত্য নহে। যাহা হয় তাহাই সর্বত্র হওয়া উচিত নহে; মনের বৃত্তিগুলি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহাকেই যদি আমরা তাহাদের কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করা উচিত তাই বলিয়া গ্রহণ করি তবে এ ভ্রান্তির আর উপমা নাই। কিন্তু কার্যত আমরা বর্তমানে তাহাই করিতেছি। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে যত কলুষ-কালিমার রূঢ় সত্য—তাহা দ্বারাই আমরা গঠিত করিতে চাহিতেছি বিরাট্ মনুষ্যত্বের বনিয়াদ।

প্রেম

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

শত যোজনের পথে সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত তপন,
দীপ্ত তার সুধারূপে ঝরে মর্ত্ত্যে পদ্মিনীর বুকে।
চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুজলে উচ্ছ্বলিত পুলক স্পন্দন,
যে বা যার প্রিয় ভবে, দেশান্তরে সে-ও থাকে সুখে

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

একাদশ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। ১৮৫১ খৃঃ অঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনারায়ণ দত্ত একটি ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছবিটি একটি বড় অয়েল পেন্টিং—স্বর্গীয়া জাহ্নবীর প্রতিকৃতি। রাজনারায়ণের বেশ বিস্রস্ত—দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—কেশ অবিন্যস্ত। তিনি অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। কিচ্ছু হয় নি—একদম কিচ্ছু হয় নি। টাকাগুলো জলে গেছে কেবল! জাহ্নবীর চেহারা ঢের ভাল ছিল এর চেয়ে। একেবারে অন্য রকম ছিল। সায়েবে কখনও বাঙালী মেয়ের ছবি আঁকতে পারে—বিশেষত জাহ্নবীর! তাহলে আর ভাবনা ছিল না।

আবার কিছুক্ষণ ছবিখানার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

নাঃ—কিচ্ছু হয় নি! চোখের সে দৃষ্টি কই—যে দৃষ্টি থেকে—No, I must not be sentimental!

আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন

সবাই বলছে—she died of a broken heart! হ'তে পারে। A tender heart is bound to break some day or other। আমি কি তার জন্যে দায়ী? মোটেই না! আরও তিনবার বিয়ে করেছি বটে কিন্তু each time with her permission! সে অনুমতি না দিলে কিছুতেই বিয়ে করতাম না আমি! No!

আবার খানিকক্ষণ নীরবে মদ্যপান করিলেন

It is that precious son of mine—সমস্তই সেই সুপুত্রটির কীর্ত্তি! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছবিটির দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন) বুঝলে, সমস্তই তোমার পুত্রটির কীর্ত্তি! আমি এর জন্যে বিন্দুমাত্রও দায়ী নই—হতে পারি না। বিয়ে? তিন-চারটে বিয়ে আজকাল করছে না কে! তাছাড়া, তুমিই ত অনুমতি দিয়েছিলে!

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণ করিলেন

(উচ্চৈঃস্বরে) প্যারী, প্যারী—

(নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—যাই!

শশব্যস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মধুর Captive Lady-খানা বাঁধিয়ে আনতে বলেছিলাম, এনেছ?

প্যারী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। নিয়ে এস—দুর্গাচরণকে খবর দিয়েছিলে?

প্যারী। দিয়েছিলাম। তিনি আসবেন বলেছেন।

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন ও বাঁধানো Captive Lady-খানা আনিয়া রাজনারায়ণের হস্তে দিলেন

রাজনারায়ণ। (বইটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া) এ কি হয়েছে!

প্যারী। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে?

রাজনারায়ণ। এ কি হয়েছে! তোমাকে বলি নি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে আনতে?

প্যারী। ভাল ক'রেই ত এনেছি। ভাল চামড়া দিয়ে—

রাজনারায়ণ। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) এর নাম ভাল বাঁধান নাকি? একে ভাল বাঁধান বল তুমি! দত্ত বংশের ছেলে তুমি!

হতভম্ব প্যারী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন

কি বই জান তুমি এখানা! এ ব'য়ের দাম কত ধারণা আছে তোমার?

প্যারী। এটা ত মধুর ক্যাপটিভ লেডি—

রাজনারায়ণ। (উচ্চতর কণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুর ক্যাপটিভ লেডি! এমন ক'রে বাঁধিয়ে এনেছ কেন তাহ'লে! ইডিয়ট্ কোথাকার!

প্যারী। এর চেয়ে আর কি রকম ভাল বাঁধান হবে। চামড়া দিয়ে ত—

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) চামড়া—চামড়া—চামড়া। ভেলভেট বাজারে ছিল না? সোনা

ছিল না ? সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে আনলে না কেন ? কে তোমাকে বারণ করেছিল !

প্যারী। (সভয়ে) আমি ভেবেছিলাম—

রাজনারায়ণ। (উত্তেজিত হইয়া) বেরিয়ে যাও— বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে ! তোমাদের মত অপদার্থের মুখ দেখতে চাই না আমি ! বেরিয়ে যাও—

প্যারী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

বাড়ীর সেরা ছেলেটা খৃষ্টান হয়ে গেল ! রয়ে গেল হাঁদাগুলো !

নিকটস্থ টেবিলের উপর 'ক্যাপটিভ্ লেডি'-খানা রাখিয়া দিলেন ও আবার মদ খাইতে সুরু করিলেন। ভৃত্য রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। হুজুর, একজন মক্কেল এসেছে।

রাজনারায়ণ। এখন দেখা হবে না।

রঘু। বলছে জরুরি কাজ।

রাজনারায়ণ। তাড়িয়ে দে। প্যারী কোথা ?

রঘু। বাইরের ঘরে বসে আছেন ?

রাজনারায়ণ। পাঠিয়ে দে এখানে।

ভৃত্য চলিয়া গেল ও একটু পরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিতেই রাজনারায়ণ স-স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাগ করলি বাবা ! রাগ করিস না—আয়—ব'স ! তোরা ছাড়া যে এখন আমার কেউ নেই ! (মদ্যপান করিলেন) কেউ নেই—কেউ নেই ! মধুর বইটা পড়্ ত একটু শুনি ! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গল্পটা কি চমৎকার ক'রে লিখেছে ! অদ্ভুত ! পড় একটু শুনি।

প্যারী টেবিল হইতে বইটি লইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন

প্যারী। কোন্খান থেকে পড়ব ?

রাজনারায়ণ। গোড়া থেকেই পড়্।

প্যারীচরণ পড়িতে লাগিলেন

The star of eve is on the sky
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around
So vast, so wild, without a bound
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear, unrest !
But soon, soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,
And soon the lady-moon will rise
To bathe in silver earth and skies
The soft, pale silver of her pensive eves.

রাজনারায়ণ। আচ্ছা প্যারী, মধু কোন চিঠিপত্র লেখে না কেন বল্ ত ! তোকে লেখে ?

প্যারী। আজ্ঞে না।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাউকে লেখে ? খবর রাখিস্ কিছু !

প্যারী। কাউকেই লেখে না ! কাল গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বললেন যে, দু'বচ্ছর কোন চিঠি পাননি তিনি।

রাজনারায়ণ। দু'বচ্ছর !

উঠিয়া পড়িলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া এক নিঃশ্বাসে সেটা পান করিয়া ফেলিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখেনি কাউকে ! আমাকে চিঠি না লেখার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দু'বচ্ছর চিঠি না লেখার মানে কি ! ওর ত সে রকম স্বভাব নয় !

প্যারীচরণ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ তাহাকে থামাইয়া দিলেন

ব'লো না—ব'লো না—তোমার যা মনে হচ্ছে ব'লো না সে কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু উচ্চারণ ক'রো না not a word ! (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু নাঃ—বিশ্বাস হয় না ! জাহ্নবী মরবার সময় বলে গেছে—মধু আবার ফিরে আসবে। সতী সাধ্বীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

দু' বচ্ছর চিঠি লেখে নি ! কাউকেই লেখে নি ! আশ্চর্য্য ত ! এক কাজ কর তুমি। পাল্‌কিটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও ! গৌর ভোলানাথ ভূদেব বঙ্কু—সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও—এখনি যাও—

প্যারী। এখন ?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ—immediately.

প্যারী। এত রাত্রে কি আসবে কেউ?

রাজনারায়ণ। Don't argue—যা বলছি কর! কেউ না কেউ আসবেই! I must have details—যাও!

নিরুপায় প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ আবার সেই ছবিটার নিকট গিয়া একদৃষ্টে সেটার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন

কি! ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ না কি! কিছুই বিচিত্র নয় তোমার পক্ষে—you jealous woman! তোমরা সব করতে পার!

রাজনারায়ণ যখন এইভাবে ছবির সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হরকামিনী—রাজনারায়ণের কনিষ্ঠতমা পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী। বয়স ষোল-সতেরো হইবে। রাজনারায়ণ তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

তোমরা সব করতে পার! দিব্যি ফেলে চলে গেলে ত আমাকে! অথচ যতদিন বেঁচে ছিলে আঁকড়ে ধরেছিলে—একদণ্ড ছাড়তে চাইতে না। কি তোমরা!

হরকামিনী। রান্না হয়ে গেছে—

রাজনারায়ণ। (হঠাৎ পিছন ফিরিয়া) তুমি কখন এলে—এ ঘরে এলে কেন তুমি—মানা করে দিয়েছি না যে এ ঘরে কেউ আসবে না!

হরকামিনী। (শঙ্কিতভাবে) রান্না হয়ে গেছে—তুমি কখন খাবে তাই জানতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। আমি খাব না এখন।

হরকামিনী। কিছুই খাবে না?

রাজনারায়ণ। না।

মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। (সানুনয়ে) ওগুলো আর খেয়ো না—শুনেছি ওতে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়!

রাজনারায়ণ। আমিও শুনেছি—

হরকামিনী। তবু খাবে?

রাজনারায়ণ। সেই জন্যেই খাব

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন

হরকামিনী। এমন ভাবে আত্মঘাতী হচ্ছ তুমি কোন্ দুঃখে?

রাজনারায়ণ। সে তোমরা কেউ বুঝবে না—এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ!

পুনরায় মদ্যপান

হরকামিনী। তোমায় পায়ে পড়ি, ও বিষগুলো আর তুমি খেয়ো না।

রাজনারায়ণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মদ্যপান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মদ্যপান করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। দেখ, এবার মনে করেছি কালীপুজো করব খুব ঘটা করে। দাদা একবার যেমন সাগরদাঁড়িতে করেছিলেন। এক আধটা কালী নয়—১০৮টা কালীর মূর্ত্তি পুজো করেছিলেন দাদা। ১০৮টা মোষ, ১০৮টা ভেড়া, ১০৮টা ছাগল একসঙ্গে বলিদান দেওয়া হয়েছিল। ১০৮টা সোনার জবাফুল অঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল মায়ের পায়ে। এই রকম পুজো এবার আমিও করব!

হরকামিনী। বড়ঠাকুর পুজো করেছিলেন কেন?

রাজনারায়ণ। ছেলের কল্যাণের জন্যে!

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

রাজনারায়ণ। কে, দুর্গাচরণ? ডেকে নিয়ে এস এখানে। (হরকামিনীকে) তুমি ভেতরে যাও—

হরকামিনী চলিয়া গেলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস, দুর্গাচরণ—ব'স।

দুর্গাচরণ। কারো অসুখ নাকি?

রাজনারায়ণ। অসুখ ঠিক নয়—একটা পরামর্শের জন্যে তোমাকে ডেকেছি।

দুর্গাচরণ। (উপবেশনান্তে) কি বলুন দেখি?

রাজনারায়ণ। মধু খৃষ্টান হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চলে গেছে—বেঁচে আছে কি-না জানি না। থাকলেও—as a son he is no good to me. I want another issue এবং সে উদ্দেশ্যে আমি আরও তিন-তিনবার বিয়ে করেছি—you know it. কিন্তু হচ্ছে না ত কিছুই। তাগা, মাদুলি, পাদোদক, মানত, সিন্নি—সব রকম হ'য়ে

গেছে। কিছু হয় নি। এখন তোমার medical advice চাই—কি করা উচিত। Shall I marry again ?

দুর্গাচরণ। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) না, বিয়ে করা আর উচিত হবে না।

রাজনারায়ণ। হবে না ? কেন ?

দুর্গাচরণ। (একটু ইতস্তত করিয়া) খুব সম্ভবত সন্তান না হওয়ার কারণ আপনার মধ্যেই রয়েছে। তা যদি না থাকত তাহলে কোন না কোন স্ত্রীর issue নিশ্চয়ই হত !

রাজনারায়ণ। This is logic—তোমার ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে ?

দুর্গাচরণ। (হাসিয়া) Medical science is not illogical !

রাজনারায়ণ। I don't mean that—ডাক্তারি চিকিৎসা করালে কিছু হবে বলতে পার ?

দুর্গাচরণ। খুব সম্ভবত কিছু হবে না। (একটু ইতস্তত করিয়া) দেখুন, রাগ যদি না করেন একটা কথা বলি !

রাজনারায়ণ। কি কথা !

দুর্গাচরণ। মদটা ছাড়ুন !

রাজনারায়ণ। তার মানে you want me to give up the only pleasure of my life ! ওটি পারব না ! You may have a peg if you like.

দুর্গাচরণ। No thanks—(একটু পরে) বলেন ত আপনার চিকিৎসা সুরু করে দেখি—though I cannot hold out any hope ! বিয়ে কিন্তু আর আপনি করবেন না—কারণ—

রাজনারায়ণ। No moral lectures please.—বিয়ে আর করব না তা ঠিক—তার কারণ, বয়স হয়েছে—রুচিও নেই ! সেদিন কে যেন বলছিল—ওহে আর বিয়ে ক'রো না, মরে গেলে অনেকগুলো একসঙ্গে বিধবা হবে ! কিন্তু কিছুকাল আগে Bengal Spectator-এ রামগোপাল ঘোষ and চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্সন যে রকম উঠে পড়ে লেগেছিলেন তাতে বিধবারা আর বেশী দিন বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে বলে মনে হয় না ! তোমাদের মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর ঈশ্বরচন্দ্র—I mean বিদ্যাসাগর—এঁরাও ত উঠে পড়ে লেগেছেন !

দুর্গাচরণ। শুনছি ত তাই।

রাজনারায়ণ। ভাল ভাল—I wonder who would be my successors.

দুর্গাচরণ। আমি এবার উঠি তাহলে। ক'জায়গায় যেতে বাকী আছে এখনও -এলোপ্যাথি চিকিৎসা যদি করান খবর পাঠালেই আমি আসব আর একদিন !

রাজনারায়ণ। তোমরা যখন কোন ভরসাই দিচ্ছ না—তখন তোমাদের দিয়ে চিকিৎসা করান বৃথা। তার চেয়ে হকিমের দাবাই করানই ভাল ! You people are no good.

দুর্গাচরণ হাসিলেন

দুর্গাচরণ। আমি আসি তাহলে—Good night !

রাজনারায়ণ। Good night.

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলে রাজনারায়ণ তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন

আর আশা নেই—দুর্গাচরণ বাজে কথা বলবার লোক নয়। ছেলে আর হবে না—মধুও আর ফিরবে না—সে হয় ত বেঁচে নেই !

উঠিয়া গিয়া জাহ্নবীর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। মধুসূদন পিছনের দ্বার দিয়া সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের পরিধানে সায়েবি পরিচ্ছদ—মুখে চাপদাড়ি। মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন

মধু। বাবা !

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত রাজনারায়ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

রাজনারায়ণ। কে—কে—who's there !

মধুসূদন আর একটু আগাইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন—এই চাপদাড়ি যুবক যে তাঁহার পুত্র মধুসূদন তাহা প্রথমে তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষণপরেই চিনিতে পারিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া আসিলেন।

মধু—তুই—তুই—তুই এসেছিস ! কখন এলি !

মধু। আমি এইমাত্র এসেছি। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছি !

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাহার পর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন

রাজনারায়ণ। Yes, your heathen mother is dead.

মধু। আমাকে খবর দেন নি কেন?

রাজনারায়ণ। প্রয়োজন মনে করি নি! But that heathen lady talked of you till death stopped her—মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার নাম করেছেন—প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করেছেন যে তুমি আবার ফিরে আসবে—laugh at her heathen tenacity if you like.

মধু। আমি খৃষ্টান হয়েছি, কিন্তু অমানুষ হইনি। আপনি—

রাজনারায়ণ। না, আমি কিছু বলছি না—I am glad to see you, my boy—ব'স—please take your seat and have a glass of wine if you like.

এক গ্লাস মদ ঢালিয়া মধুর দিকে আগাইয়া দিলেন—কিন্তু মধু তাহা স্পর্শ করিলেন না

হঠাৎ এলে কেন এ সময়! অকস্মাৎ এ অনুগ্রহ!

মধু। (উপবেশন করিয়া) মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে থাকতে পারলাম না—I thought it my duty to come to you—আপনার আর ছেলে হয় নি আমি শুনেছি (সহসা) ওটা কি মায়ের ছবি না কি!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন ও ছবিখানার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে দাড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজনারায়ণ বিস্ফারিত নয়নে ইহা দেখিতে লাগিলেন।

রাজনারায়ণ। উঠে এসো।

মধু ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন

কতক্ষণ এসেছ তুমি।

মধু। এখনি—আর কোথাও যাই নি—সোজা এখানেই এসেছি।

রাজনারায়ণ। What do you want? Money?

মধু। I am always in need of money—কিন্তু সেজন্য আসি নি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

রাজনারায়ণ। আমার কাছে? কেন?

মধু। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। কোথায়? মাদ্রাজে? (সবিস্ময়ে) Are you in your senses?

মধুসূদন নীরব রহিলেন

Have you married?

মধু। Yes, I have married a Scotch girl.

রাজনারায়ণ। I see. (একটু পরে) Is she not Scorching?

মধু। আপনি আমার কাছে চলুন—You will see for yourself.

রাজনারায়ণ। হঠাৎ এতদিন পরে এ আগ্রহ কেন! May I ask you?

মধু। এখানে থাকলে আপনার কষ্ট হবে। পৃথিবীতে মা আর আমি ছাড়া আপনাকে আর কেউ চেনে না। মা মারা গেছেন শুনে আমার মনে হ'ল যে আমার কাছে না থাকলে আপনি শান্তি পাবেন না—কেউ আপনাকে বুঝবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে—সেইজন্যেই এসেছি আমি।

রাজনারায়ণ। But that is impossible my boy—আমার আরও দুটি স্ত্রী আছে and I have duty towards them. (সহসা) Do you know you are responsible for the whole thing? এখন এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! It is too late.

মধু। মা মারা গেছেন, তাই বলছি—

রাজনারায়ণ। তুমিও যে মরে গেছ—you are a different person—a Michael (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে) I can never reconcile myself to this fact.

মধুসূদন স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

মধু। The Christians are the best people on earth to-day father.

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Go to the best people then—there's the door—who asked you to come here!

মধুসূদন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মধু। যাবেন না তাহলে আমার সঙ্গে?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। চল্লাম তাহলে—Good night.

বাহির হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন

যদি কখনও কোন বিষয়ে আমাকে আপনার প্রয়োজন হয় খবর দিলেই আমি আসব। এখন তাহলে চললাম—Good night.

মায়ের ছবিটার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন ও মধুসূদন চলিয়া গেলে দ্বারের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র।

তৃতীয় বিরতি

দ্বাদশ দৃশ্য

মাদ্রাজে মধুসূদনের বাড়ী। মধুসূদন ও রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টেবিলের দুই পাশে চেয়ারে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন। মধুসূদনের হস্তে একখানি পত্র রহিয়াছে। ১৮৫৬ খৃঃ অঃ।

মধু। বাবা মারা গেছেন?

কৃষ্ণমোহন। হাঁ—may his soul rest in peace—বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। শেষটা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

মধুসূদন নীরব রহিলেন

যাক যা হবার সে ত হয়ে গেছে—এখন you must go back. সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমার বিষয় সম্পত্তি তোমার মায়ের গহনা পত্তর, এমন কি তোমাদের খিদিরপুরের বাড়ীটা পর্য্যন্ত দখল করে বসেছে। তাই ত শুনেছি। I think Gour has written everything in the letter I have brought.

মধু। আপনি মাদ্রাজে হঠাৎ এলেন যে!

কৃষ্ণমোহন। আমি এসেছি মিশনের কাজে। আমার আসবার খবর পেয়ে গৌর আমাকে এই চিঠিখানা দিলে, আর বললে যে আমি যেন তোমাকে নিশ্চয়ই দেশে পাঠিয়ে দি।

মধু। গৌরের চিঠি ত পড়লাম!—ভাবছি আমার কি এখন ফিরে যাওয়া সঙ্গত হবে?

কৃষ্ণমোহন। হবে না কেন? Why not?

মধু। I am making two ends meet here—even that may not be possible in Bengal!

কৃষ্ণমোহন। তা হবে না কেন? তাছাড়া তোমার বাবার যা সম্পত্তি আছে শুনেছি—I don't know if it is encumbered—যদি encumbered না হয় তাতেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত। Have you married?

মধু। Yes, I have married second time.

কৃষ্ণমোহন। Second time? তোমার প্রথম স্ত্রী কি তাহলে—

মধু। No, she is not dead. She divorced me.

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

কৃষ্ণমোহন। (ঈষৎ হাসিয়া) Are you still going fast?

মধু। (সহাস্যে) I would like to—but I have not got the means.

কৃষ্ণমোহন। মধু, তুমি আমার ছাত্রস্থানীয়—I hope you will not take it amiss if I give you a piece of advice.

মধু। (হাসিয়া) আমি জানি আপনি কি উপদেশ আমাকে দেবেন। আমি নিজেই নিজেকে সে উপদেশ বহুবার দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই পালন করতে পারি না। There is somebody within me who defies everything.

কৃষ্ণমোহন। No, no—you must be temperate—you must control yourself. তুমি কবি, তোমার জানা উচিত, সংযমই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

মধু। I know.

কৃষ্ণমোহন। তুমি যদি সংযত হয়ে চল, তাহলে ভাবনা কি! But it is never too late to mend.

মধু। (এ কথার কোন জবাব না দিয়া) আপনি তা হলে আমাকে বাঙলা দেশে ফিরে যেতেই বলেন?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়—by all means! তুমি ইতস্তত করছ কেন বুঝতে পারছি না।

মধু। বাঙলা দেশ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। Bengal did not receive my Captive Lady nicely.

কৃষ্ণমোহন। কেন, অনেকেই ত প্রশংসা করেছে! Undoubtedly it is a good piece of work—কিন্তু বাঙালীর ছেলে ইংরেজীতে বই লিখে এর চেয়ে বেশী আর কি প্রশংসা পেতে পারে বল। বেথুন সায়েব তোমার বই পড়ে কি বলেছিলেন গৌর বসাকের কাছে শুনেছি আমি। I think he was quite right. By the bye, I hope you know Mr Bethune is dead. He died heart-broken,

মধু। হ্যাঁ তিনি ত অনেকদিন মারা গেছেন—I think he died in—

কৃষ্ণমোহন। In 1851. These Anglo-Indians killed him. কালা আইনের উত্তেজনা তাঁর শরীরে সহ্য হ'ল না। I hope Bengal will always remember the great soul.

মধু। Ought to.

কৃষ্ণমোহন। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার এবং বেথুন—এঁদের নাম প্রত্যেক বাঙালী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে—অন্তত করা উচিত। এই তিনজন মহাত্মা বাঙলা দেশের নব যুগের প্রতিষ্ঠাতা। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, রিচার্ডসন—এঁরাও! তুমি আজকাল বাঙলা দেশের খবর রাখ কি-না জানি না—যদি রাখতে তাহলে দেখতে এই সায়েবরা বাঙলা দেশের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে! Tremendous. It is almost like the recent French Revolution, but without a drop of bloodshed! বাঙলা দেশের খবর রাখ কিছু আজকাল?

মধু। কিছু—কিছু—not much.

কৃষ্ণমোহন। বাঙলা দেশে নব যুগের সূচনা হয়েছে। রাজনীতিক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেছেন—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কাগজ—'The Quill' critcised the Government fearlessly—কাগজটা বোধ হয় উঠে গেছে আজকাল—তারাচাঁদ আজকাল বর্দ্ধমানের রাজার ম্যানেজার। দেশ কিন্তু জেগে উঠেছে। দেবেন ঠাকুর পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগ চলেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করবার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাণপাত করছেন। সাহিত্যেও নব-জীবন-সঞ্চার হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর অপরূপ গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন; প্যারিচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার সকলেই বাঙলাভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। এ সময় তোমার এখানে পড়ে থাকা চলে না—Bengal cannot afford to lose a genius like you at this moment. বাঙলা কাব্যসাহিত্যে এখনও কোন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয় নি—I think Bengali Muse awaits your arrival.

ইহা শুনিয়া মধুসূদন বিচলিত হইলেন

মধু। I am very much tempted to go and I am confident of my capability—কিন্তু আমার ভয় বাঙলা দেশে গেলে খেতে পাব কি না—

কৃষ্ণমোহন। Why? All your friends are well placed in life. তোমারও সেখানে গেলে একটা না একটা কিছু জুটে যাবেই! নতুন educational scheme যা হচ্ছে তাতে you may get a service in educational line.

মধু। কি জানি! I love Bengal, but I haven't much faith on the Bengalees! দেখুন না, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজন আমার বিষয়সম্পত্তি দখল ক'রে বসেছে—রটিয়ে দিয়েছে আমি মরে গেছি—জাল উইল বার করেছে। Vultures!

কৃষ্ণমোহন। শকুনির অভাব পৃথিবীতে কোথাও নেই!

হেনরিয়েটা—মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি ফরাসী জাতীয়া। কম বয়স। সুন্দরী, তন্বী। পোষাক পরিচ্ছদে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হেনরিয়েটা। আপনাদের চা কি এখানেই আনতে বলব?

মধু। হ্যাঁ—এখানেই আসুক না!

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন

কৃষ্ণমোহন। তোমার স্ত্রী ত বেশ বাঙলা শিখেছেন!

মধু। (হাসিয়া) শিখিয়েছি। বাঙালীর স্ত্রীর বাঙলা না শিখলে চলবে কেন?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়ই! পড়তেও শিখেছেন নিশ্চয়

মধু। শিখছে—এখনও খুব ভাল পারে না!

কৃষ্ণমোহন। You will teach her in no time, you are a master of languages.

মধু। বাঙলা দেশে না ফিরে গেলে বাঙলা শেখা মুস্কিল। I am not very sure of the language myself!

একটি 'বয়' একটি 'টে'-তে করিয়া চায়ের কাপ প্লেট ইত্যাদি সরঞ্জাম রাখিয়া গেল। হেনরিয়েটা আসিয়া চা পরিবেশন করিতে অগ্রসর হইলেন

কৃষ্ণমোহন। এত খাবার আমি খাব না!

হেনরিয়েটা। আপনি ডিনারও এখানে খাবেন না—কিছুই খাবেন না—তা কি হয়?

কৃষ্ণমোহন। বুড়ো হয়েছি—আর হজম হয় না। অনেক কিছুই খেয়েছি এককালে! (হাস্য)

হেনরিয়েটা। এই কেকটা আমি তৈরি করেছি—ওটা অন্তত খেতেই হবে।

কৃষ্ণমোহন। খেতেই হবে?

হেনরিয়েটা। হ্যাঁ।

কৃষ্ণমোহন। তবে খাই—(খাইলেন) বাঃ—বেশ সুন্দর হয়েছে!

মধু। She is a marvellous hand on piano—তোমার একটা বাজনা শুনিয়ে দাও না রেভাঃ ব্যানার্জিকে!

হেনরিয়েটা। (সলজ্জভাবে) I am just a novice.

কৃষ্ণমোহন। তবু শোনা যাক—তোমার বাবার বয়সী হব বোধ হয়—আমার কাছে লজ্জা কি! Let us have something.

হেনরিয়েটা উঠিয়া পিয়ানোর কাছে গেলেন ও একটি গৎ বাজাইলেন। মধু ও কৃষ্ণমোহন চা পান করিতে লাগিলেন। গৎ বাজানো ও চা পান শেষ হইলে রেভাঃ ব্যানার্জি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

এবার আমি চললাম তা হলে। ঘুরতে হবে অনেক। I thank you very much for all this—যা বললাম সেটা ভেবে দেখো। Bengali literature needs you now, if not your father's home. Think over it. Good bye.

করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন

মধু। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি বলছেন—বাঙলা দেশে ফিরে যেতে—my father is dead!

হেনরিয়াটা। Oh, is it!

স্তম্ভিত হইয়া গেলেন

মধু। খিদিরপুরে আমাদের বাড়ী আছে—যশোরে জমিদারী আছে—সব নাকি অপরে দখল করেছে।

হেনরিয়েটা। You should go.

মধু। Should I? I must weigh anchor then—তোমার কি মত?

হেনরিয়েটা। আমার মত? তুমি যেখানে যাবে—আমিও সেখানে যাব—তুমি আমাকে যেখানে রাখবে সেখানেই আমি থাকব। আমার আলাদা কোন মত নেই।

মধু। (স-স্নেহে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া) I know my dear.

ঠিক এই সময়ে একটি ছয় বৎসরের বালিকা খোলা দ্বারপথ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল ও মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিল। রেবেকার কন্যা।

বালিকা। Daddy!

মধু। এ কি, তুমি কি ক'রে এলে?

বালিকা। আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে তোমাকে দেখতে পেলাম। তুমি আমাদের কাছে যাও না কেন, বাবা!

মধু। তুমি যাও—আমি যাচ্ছি এখনি।

বালিকা। না, তুমি চল।

মধু। যাচ্ছি তুমি যাও আগে—এখনি যাচ্ছি আমি।

বালিকা। না, তুমি যাবে না!

মধু। নিশ্চয় যাব—there's a good girl—কথা শোন—তুমি যাও আমি যাচ্ছি একটু পরে!

বালিকা অনিচ্ছাভরে চলিয়া গেল। হেনরিয়েটা নির্ব্বাক।

No, I must leave Madras! এখানে আর থাকা অসম্ভব!

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?

মধু। পারব, মানে? পারতে হবে! I must.

হেনরিয়েটা। এক কাজ কর না।

মধু। কি?

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল তুমি। আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে। I want to see you happy.

মধু। সে হয় না—I cannot deprive Rebecca of her children! সে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে—সে হয় না—সে হয় না—Henrietta—my dear—this is terrible!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন

ক্রমশঃ

সাহিত্যিক প্রশ্নোত্তর

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

আমি সাহিত্যে 'নেতি নেতি' বলিতে বসিয়াছি। কিন্তু শুধু নেতি বচনে মানুষের সন্তুষ্টি নাই, তাই কিছু 'ইতি'বচন করিয়া প্রবন্ধের মুখবন্ধ করি।

সাহিত্য, শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যকৃতশ্লোকময়গ্রন্থবিশেষ। শ্লোক, আধুনিক ভাষ্যে কবিতা, কাব্যধর্মাশ্রিত; কাব্য ভাবরসের ভাণ্ডার। ইহাই বোধ করি সাহিত্যের মূল অর্থ, ইংরেজীতে যাহাকে বলে belles-lettres। কিন্তু কালক্রমে সংজ্ঞার্থ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এত ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সংজ্ঞাটির বর্তমান অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা না করাই আজ নিরাপদ মনে করিতেছি। তা, যাহাকেই সাহিত্য বলি না কেন তাহাতে সাহিত্যের লক্ষণ থাকা চাই, প্রমাণ থাকা চাই; নতুবা তাহাকে সাহিত্য বলিব না। সাহিত্যের লক্ষণ রসে, প্রমাণ স্থায়িত্বে। যাহাতে রস নাই বা যাহা স্থায়ী নয় তাহা সাহিত্য নয়। জমিদারী সেরেস্তায় খতিয়ান-বহির প্রযত্নবিহিত স্থায়িত্ব আছে; কিন্তু তাহাতে রস নাই, তাই সেটা সাহিত্য নয়। আমি মুখে চমৎকার গল্প বলিতে পারি, আমার কণ্ঠস্বরে এবং শব্দ ও বাক্যের চারুবিন্যাসে শ্রোতার শ্রবণে, মর্মে রসপ্রবাহের কলধ্বনি জাগে; কিন্তু তাহা স্থায়ী নয়, তাই সাহিত্যও নয়। কাগজ, কালি ও কলমের সাহায্যে যেই রসের স্থায়িত্ব লাভের সম্ভাবনা ঘটে, অমনি সাহিত্যের সূত্রপাত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র সাহিত্যকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) জ্ঞানসাহিত্য, (২) ক্রিয়াসাহিত্য, (৩) ইচ্ছাসাহিত্য। প্রথমটি সত্ত্বরসপ্রধান, দ্বিতীয়টি রজোরসপ্রধান, শেষেরটি তমোরসপ্রধান। তিনি শেষেরটির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যাহাতে মিথ্যা সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের চিত্তবিনোদন হয়, সেটা ইচ্ছাসাহিত্য"। "মিথ্যা"! অর্থাৎ তিনিও 'নেতি' বলিয়াছেন। সাহিত্যের এই নেতিমূলক বিভাগ লইয়াই আমার প্রসঙ্গ। আমি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

কিন্তু তাহারও আগে বলিয়া লই, সাহিত্যের যতই ব্যাপক অর্থ থাকুক, 'সাহিত্য' বলিলেই যে সাহিত্যের কথা সর্বাগ্রে মানুষের মনে আসে তাহা অর্থশাস্ত্র নহে, জ্যোতিষ নহে, দর্শন নহে, ইতিহাসও নহে—তাহা এই নেতিমূলক সাহিত্য। কোনও বিশেষ শ্রেণীর সীমাবদ্ধ পাঠকসমাজ ইহার লক্ষ্য নহে, কোনও বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানবিতরণও ইহার উদ্দেশ্য নহে; জ্ঞানদান হউক, না হউক, শ্রেণীনির্বিশেষে জগতের নর ও নারী এবং নারী ও নরের রস ও সৌন্দর্যবোধ (æsthetic sense) পরিপ্রীত করাই ইহার পরম লক্ষ্য। ইহাই ইহার বিশেষ এবং আমার বিনীত বোধে ইহাই সাহিত্যের প্রকৃত নির্বচন (definition)।

আর একটি কথা। এই প্রবন্ধে কয়েকটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শব্দগুলির যথাসাধ্য বাংলা প্রতিশব্দ বা অর্থ দিয়াছি। যে প্রতিশব্দগুলি সর্বত্র ব্যবহার করিতে পারিয়াছি, করিয়াছি; অপরগুলি করি নাই। যে যে শব্দ বাংলায় স্বীকৃত বা যথাবৎ বাংলায় চলিতেছে তাহাদের বাংলা প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছি।

*

প্রশ্ন।—ক্ল্যাসিক সাহিত্য কাহাকে বলে?

উত্তর।—যে সাহিত্যের সত্তার প্রচারের চেয়ে তাহার সমালোচনার প্রচার বিপুল তাহাই ক্ল্যাসিক সাহিত্য।

প্রশ্ন।—ক্ল্যাসিক সাহিত্যের লক্ষণ কি?

উত্তর।—প্রধান তিনটি লক্ষণ এই,—(১) লোকে চিত্তবিনোদনের জন্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য পড়িতে চায় না। (২) শুধু সে সম্বন্ধে পরীক্ষা দিবার জন্য বা গবেষণা করিবার জন্য পড়ে। (৩) লোকে ক্ল্যাসিক সাহিত্য পড়িতে বিমুখ, কিন্তু তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

*

প্রশ্ন।—বাস্তব (realistic) সাহিত্যের স্বরূপ কি?

উত্তর।—এই সাহিত্য মুকুরোপম। ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা আমাদের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। ললাটে আমাদের পুণ্যতিলক থাকিলে তাহার ছবি এই মুকুরে ফোটে, গণ্ডে আমাদের চুণ-কালী থাকিলে তাহারও প্রতিকৃতি ইহাতে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন।—রোম্যাণ্টিক (সংজ্ঞান্তরে idealistic) সাহিত্যের স্বরূপ কি ?

উত্তর।—এই সাহিত্য চিত্রোপম। ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। হৃদয়ে আমাদের সংকোচ থাকিলে চিত্রের পটভূমি সংকীর্ণ হয়, হৃদয়ে আমাদের প্রসারণ থাকিলে চিত্রের পটভূমিও প্রসারণ লাভ করে।

প্রশ্ন।—যাহা বাস্তব তাহা তো সত্য। বাস্তব সাহিত্যকে তবে 'মিথ্যা' বলিব কিরূপে ?

উত্তর।—সাধারণ বাস্তব ও সাহিত্যিক বাস্তব অনন্য নহে। ঘটনা ও বর্তনের প্রতিকথন (যেমন, সংবাদ ইতিহাস ইত্যাদি) সাধারণ বাস্তব, ইহা প্রকৃত সত্য (যদিও একজন রসিক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "In history nothing is true except names and dates.")। সাধারণ বাস্তবের সাহিত্যিক অনুকথন সাহিত্যিক বাস্তব, ইহা কল্পিত সত্য (অর্থাৎ সোনার পাথরবাটি)। আরিষ্টটল ইহাকেই বোধ করি "poetic truth" বলিয়া কুইনীনের উপর চিনি প্রলিপ্ত করিয়াছেন।

সাহিত্যিক বাস্তব যে মিথ্যাশ্রয়ী, এ কথার সমর্থন দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি পর পর উদ্ধার করিলে পাওয়া যাইবে। গ্যয়টে বলিয়াছেন, "The artist's work is ideal, in that it is never actual." হাড্‌সন্ বলিয়াছেন, "Realism must be kept within the sphere of art by the presence of the ideal element." গ্যয়টে যাহাকে চির-অবাস্তব বলিলেন, হাড্‌সন্ বলিলেন, সাহিত্যিক বাস্তবকে সাহিত্য-পদবাচ্য মানিতে হইলে সেই উপাদানটিরই অবশ্য প্রয়োজন।

*

প্রশ্ন।—অশ্লীল সাহিত্য কাহাকে বলে ?

উত্তর।—যে সাহিত্যের প্রচার বিপুল এবং নিন্দাও বিপুল তাহাই অশ্লীল সাহিত্য।

প্রশ্ন।—অশ্লীল সাহিত্যের লক্ষণ কি ?

উত্তর।—ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ে নিষিদ্ধ পুলকের সঞ্চার হয়। এই সঞ্চার যত বেশী তীব্র হয়, রুচিবোধ তত বেশী মর্মাহত হয়; তত বেশী এ সাহিত্যের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে।

*

প্রশ্ন।—সাহিত্যে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' কথাটির অর্থ কি ?

উত্তর।—সত্যকে কণ্ঠে চাপিয়া নীলকণ্ঠ (অর্থাৎ শিব) বনিয়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি।

প্রশ্ন।—সাহিত্যিক সত্যের অর্থ কি ?

উত্তর।—বাস্তবিক অসত্য।

প্রশ্ন।—সাহিত্যিক শিব কাহাকে বলে ?

উত্তর।—যিনি সাহিত্যে যত বেশী সুন্দর করিয়া এবং মনোরম করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারেন তিনিই শিব।

প্রশ্ন।—সাহিত্যিক সৌন্দর্যের অর্থ কি ?

উত্তর।—সাহিত্যে সৌন্দর্য শব্দটির অর্থ আপেক্ষিক। তবলায় চাঁটি মারা সুন্দর, কিন্তু গানে চাঁটি মারা খুবই খারাপ। কাজেই, চাঁটি মারা কাজটি মূলে সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। আমাদের বাস্তব জীবনের সত্যগুলি সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া যখন আমাদের গালে চাঁটি মারিতে থাকে তখন আমরা তাহাকে অসুন্দর বলি এবং যখন আমাদের তোষামোদবোধরূপ তবলায় চাঁটি মারিতে থাকে তখন তাহাকে সুন্দর বলিয়া অভিহিত করি।

*

প্রশ্ন।—সার্থক স্রষ্টা এবং সার্থক সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর।—সার্থক স্রষ্টা সমালোচনার কাজে ব্যর্থ এবং সার্থক সমালোচক সৃষ্টির কাজে ব্যর্থ। অপিচ সৃষ্টির কাজে যে বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে সেইজনই বড় সমালোচক হইতে পারে। *

প্রশ্ন।—সমালোচক সৃষ্টির কাজে ব্যর্থ কেন ?

উত্তর।—প্রকৃত স্রষ্টার যে self (আত্মা) তাহা অজ্ঞান (unconscious); কিন্তু সমালোচকের যে সেল্‌ফ্ তাহা সজ্ঞান (conscious)। এই জন্যই সমালোচক সৃষ্টির কাজে ব্যর্থ। *

বার্নার্ড শ বলিয়াছেন, "Your breathing goes wrong the moment your conscious self

* এই উক্তির সহিত এই প্যারাগ্রাফের শেষে মনীষী হেজলিটের উদ্ধৃত উক্তি তুলনীয় কি-না, পাঠক তাহা বিচার করিবেন। বর্তমান প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' পাঠাইবার অনেক দিন পরে ইহা আমার গোচরে আসিয়াছে। "The severest critics are always those who have either never attempted or who have failed in original composition,—'William Hazlitt.

meddles with it." এই 'breathing' অজ্ঞান সেল্‌ফ্‌-এর কাজ। বলা বাহুল্য, ইহাই সৃষ্টির ধর্ম।

প্রশ্ন।—প্রতিভার প্রকৃত আধার কি?

উত্তর।—নিত্যমুক্ত (absolute) অজ্ঞান সেল্‌ফ্‌ই প্রতিভার প্রকৃত আধার। দৃষ্টান্ত—বিশ্বপ্রকৃতি।

প্রশ্ন।—প্রতিভাজনিত সৃষ্টির প্রেরণা কোথায়?

উত্তর।—গভীরতম বেদনায়।

সাহিত্য সম্বন্ধীয় উক্ত সত্যের সমর্থন একজন প্রতিভাশালী স্বর্গত সাহিত্যিকের বেদনা সম্বন্ধীয় এই উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—"...out of sorrow have the worlds been built and at the birth of a child or a star there is pain."—Oscar Wilde.

প্রশ্ন।-প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের লক্ষণ কি?

উত্তর।—"All great literary men are shy."—Jerome K. Jerome.

প্রশ্ন।—এ নিয়মের কি ব্যতিক্রম নাই?

উত্তর।—থাকিতে পারে। কিন্তু exception proves the rule.

লাজুক ব্যক্তির স্বভাব গভীর, অতিশয় সংচেত্য (sensitive)। তাহার জীবনে বেদনার সম্ভাবনার পরিধি তাই সুদূরবিস্তীর্ণ। সৃষ্টির পক্ষে এই অবস্থাই সর্বাঙ্গীণভাবে অনুকূল। স্রষ্টার সেল্‌ফ্‌ যে অজ্ঞান, এ কথা আগেই বলিয়াছি। লাজুক ব্যক্তির সম্বন্ধেও স্বর্গত জেরোম কে জেরোমের এই উক্তিটি উদ্ধার করিয়া বলি—"Shyness has nothing whatever to do with self-consciousness...."

প্রশ্ন।—গদ্য কি?

উত্তর।—সুস্থ (balanced) মননের সহজ প্রকাশ।

প্রশ্ন।—কবিতা কি?

উত্তরা।—অসুস্থ (unbalanced) মননের সহজ প্রকাশ। *

প্রশ্ন।—আর্ট কাহাকে বলে?

উত্তর।—যাহা সরল (simple) নহে তাহাই আর্ট। সরল বাংলায় বলিতে গেলে ঘুরাইয়া নাক দেখাইবার কৌশলই আর্ট। অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের ক্ষুধা পাইতে থাকে ততক্ষণ তাহা আর্ট নহে, কিন্তু যেই আমাদের জঠরানল প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে তখনই তাহা আর্ট।

প্রশ্ন।—আর্টের স্বরূপ কি?

উত্তর।—অরূপই আর্টের স্বরূপ। রূপে, গন্ধে, সৌন্দর্যে, সন্দেহাতীত বাস্তবিকতায় আমার প্রেয়সীর কবরীতে স্বরূপে ওই যে গোলাপ ফুলটির স্থিতি, উহা আর্ট নহে; ওই স্বরূপের অরূপ অনুকরণে একখণ্ড কাগজে খানিকটা লাল রঙের কৌশলপ্রলেপের নামই আর্ট।

প্রশ্ন।—আর্টের ধর্ম কি?

উত্তর।—ইন্দ্রজাল। যেখানে গ-এর বিন্দুবিসর্গ নাই, সেখানে আস্ত গোলাপেরই প্রতীতি জন্মানো, ভাজা বেগুনকে মুক্তার উচ্ছে বলিয়া পরিবেশন করা—এক কথায়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে এভারেস্ট্‌-শৃঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করাই আর্টের ধর্ম। একদা কবি এই এভারেস্ট্‌-শৃঙ্গকেই দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছো স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?

এই ব্যর্থতার কারণস্বরূপ স্বর্গত একিনের এই উক্তিটিও বিচার্য "He, whose first emotion on the view of an excellent production is to under-value it, will never have one of his own to show."—John Aiken।

ইহাতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকেও যথামর্যাদা না দেওয়ার বৃত্তিকে সমালোচকের first emotion বলা হইয়াছে। একিনের মতে ইহাই উক্ত ব্যর্থতার কারণ। এমন হইলে এই বৃত্তিকে সমালোচকের লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করা হয়।

* এই কথার এক তুলনা মেকলের ভাষায় পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন, যে সত্য "essential to poetry" তাহা "truth of madness". তিনি আরও বলিয়াছেন, কবিতায় যদিও "the seasonings are just", কিন্তু "the premises are false" এবং তাহাদের মানিয়া লইতে গেলে যে পরিমাণ "credulity"র প্রয়োজন তাহা "almost amounts to a partial derangement of the intellect."

তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ।"

প্রশ্ন ।—সাহিত্যে কল্পনার স্থান কোথায় ?

উত্তর ।—বিশ্ববিধানে আলোকের স্থান যেখানে, সাহিত্যে কল্পনারও স্থান সেইখানে। ইহার অভাবে দর্শনময় চৈতন্যের সম্পূর্ণ মৃত্যু সূচিত হয় ।

প্রশ্ন ।—সাহিত্যে নীতির (morality) স্থান কোথায় ?

উত্তর ।—সাহিত্যে নীতি বলিয়া কোনও বস্তুই নাই। সামাজিক নীতি-দুর্নীতিবোধের (ethical sense) সমর্থন যে সাহিত্যে যে পরিমাণে থাকে বা না থাকে, সেই পরিমাণে তাহাকে লোকে নৈতিক (moral) বা দুর্নৈতিক (immoral) বলিয়া থাকে। [অবশ্য অস্কার ওআইল্ড সাহিত্যিক নীতিকে এক পৃথক্ সংজ্ঞা মানিয়া তাহার এক অনন্যগামী অর্থই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা— "...the morality of art consists in the perfect use of an imperfect medium."]

প্রশ্ন ।—নীতির ব্যুৎপত্তি কি ?

উত্তর ।—কুসংস্কার ।

বারট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন—"Current morality is a curious blend of utilitarianism and superstition, but the superstitions part has the stronger hold, as is natural, since superstition is the origin of moral rules."

অবশ্য নৈতিক অনুকম্পাই (ethical sympathy) নৈতিক বিধির অব্যবহিত কারণ ।

প্রশ্ন ।—তবে স্রষ্টার রীতিতে কি নৈতিক অনুকম্পা নাই ?

উত্তর ।—না, এ রীতি দ্রষ্টার—সমালোচকের। যে মন ভদ্র অর্থাৎ যে মন বিশেষ রীতি, নীতি, সংস্কার ও ধর্মের শৃঙ্খলকে পায়ে পরিয়া সভ্য (civilized) হইয়াছে, এ রীতি তাহার। নৈতিক অনুকম্পা মাত্র তাহাতেই সম্ভব। স্রষ্টার যে সেল্ফ্ তাহা সজ্ঞান নহে বলিয়াই তাহার মন সংস্কার-মুক্ত। সংস্কারমুক্ত চিত্তে ব্যাধিতি (morbidity), তথা কুসংস্কার, অসম্ভব। কাজেই সেখানে নৈতিক অনুকম্পারও কোনও প্রশ্ন নাই ।

এবং যদি সুন্দর সাহিত্যের স্রষ্টাকে আর্টিষ্ট বলিবার বাধা কোথাও না থাকে তো এখানে অস্কার ওআইল্ডের এই মন্তব্যটির উদ্ধারও খুব কালোপযোগী হইবে,—"No artist is ever morbid. The artist can express everything."

সম্ভবত এইজন্যই বার্নার্ড শ বলিয়া থাকিবেন, "No artist is a gentleman."

প্রশ্ন ।—সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গেও কি নীতির কোনও সম্বন্ধ নাই ?

উত্তর ।—না। যেহেতু সুন্দর সাহিত্যমাত্রই আর্ট, যেহেতু আর্টের সহিত নৈতিক অনুকম্পার কোনও সম্বন্ধ নাই, অতএব সাহিত্যিক সৌন্দর্যেরও প্রসঙ্গে নীতির প্রশ্ন নিরর্থক। সম্পূর্ণ দুর্নৈতিক সৃষ্টিও অতিশয় সুন্দর হইতে পারে, পক্ষান্তরে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক সৃষ্টির পক্ষেও কদর্য না হইবার কোনও কারণ নাই ।

প্রশ্ন ।—স্রষ্টা ও আর্টিষ্টের ধর্ম কি পৃথক্ ?

উত্তর ।—না, উভয়েরই ধর্ম সৃষ্টি ; উভয়েই স্রষ্টা। সৃষ্টি যেখানে সুন্দর সেইখানেই স্রষ্টা আর্টিষ্ট। সৃষ্টির অর্থ ব্যাপক, আর্টের অর্থ সংকীর্ণ—এইমাত্র ।

*

প্রশ্ন ।—আর্টের লক্ষণ কি ?

উত্তর ।—প্রয়োগহীনতাই (uselessness) আর্টের লক্ষণ। কোনও জিনিস আর্ট কি-না তাহা, সে জিনিস প্রয়োগহীন কি-না, এই বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। প্রয়োগ (use) যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই আর্টের আরম্ভ। তরকারি নাড়ার কারণে খন্তির প্রয়োগ আছে ; কিন্তু সেইহেতু খন্তির হাতলকে সর্পাকৃতি করিয়া বা খন্তির মুখকে পুষ্পদলাকৃতি করিয়া গঠন করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কণ্ঠস্বর আর্ট নহে, কিন্তু গান গাওয়া আর্ট। কথা বলিবার জন্য কণ্ঠস্বরকে উঠা নামা করানো প্রয়োজন ; কিন্তু সেই উঠা-নামা যদি রতিমাত্রাতেও সংগীতের পর্যায়ে পদক্ষেপ করে তো সেই মুহূর্তেই তাহা নিষ্প্রয়োজন। দেওয়াল থেকে ওই সুন্দর ছবিখানি খুলিয়া আনিয়া তাহা পোড়াইয়া আমার দুধ গরম করিলাম বলিয়া এ কথা আমি বলিতেই পারি না যে, আর্টকে আমি প্রয়োগ করিলাম। প্রয়োগ যাহার ঘটিল তাহা কাগজ,আর্ট নহে। সেইজন্যই, স্বর্গত অস্কার ওআইল্ডের ভাষায় বলিতে গেলে—"All art is quite useless."

ঘাতে প্রতিঘাতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

১৩

দেশে ভাল পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তা ছাড়া কর্ত্তা হরমোহন রায় কলিকাতায়ও বড় একজন এটর্ণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতায় পৈতৃক বাড়ী একখানি ছিল। কয়েক বৎসর হইল দক্ষিণ কলিকাতায় লেক অঞ্চলেও নূতন ধরণের ভাল একখানি বাড়ী করিয়াছেন—সেখানেই এখন বাস করেন। পৈতৃক সেই বাড়ী ভাড়ায় খাটে।

মাতাকে লতা বলিয়া আসিয়াছিল ভাল কোনও বাড়ীতে তাহার জন্য একটি কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া সংবাদ দিবে। কিন্তু কোথায় সে দেখিবে? কে তাহাকে সাহায্য করিবে? জানাশুনা লোক ত কেহই এখানে নাই।

কাশী বাঙ্গালীটোলার ঘন বসতির মধ্যে সহজেই যেমন সকলের সঙ্গে সকলের বেশ জানাশুনা হইয়া যায়, এখানে তাহার সম্ভাবনা নাই। বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা সব বাড়ী, অধিবাসীরাও প্রায়ই সব বড়লোক, আদবকায়দাও আলাদা। মেয়েরাও অবাধে এখানে পথে বেড়ায় বটে, কিন্তু বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া পাঁচজনে বসিয়া গল্প-সল্প সে রকম করে না। আসা-যাওয়া যাহা আছে, তাহারও ধরণধারণ আলাদা—সবই প্রায় উঁচু কায়দার—বড়লোক কি-না! আর সে হইল একটা বাড়ীর রাঁধুনী মাত্র, ইঁহাদের কাহার সঙ্গে কোথায় গিয়া কি আলাপ করিবে? বয়স অল্প, অবসর সময় একা বাহির হইয়া অন্য কোনও বাড়ীর ঝি-বামনীদের সঙ্গেও গিয়া আলাপ করিতে পারে না। আর ছাই সে বামনীই বা কোথায়? লক্ষ্য করিতে, কিম্বা এ বাড়ীতে ঝি যাহারা কাজ করে কি অন্য কোনও বাড়ীর ঝি যাহারা মধ্যে মধ্যে আসে তাহাদের নিকটে সংবাদ যতদুর লইতে পারিয়াছে, সব বাড়ীতেই প্রায় উড়ে বামুনরা রাঁধে, বামনী কোথাও বড় নাই। কিন্তু কালীঘাটে সেবার যে আসিয়াছিল, অনেক বামনী সে দেখিয়াছে। কোথায় তারা কাজ করে? কি করিয়া কোথায় কার কাছে সে সংবাদ লইবে? এ বাড়ীর ইঁহাদের কাহাকেও কিছু বলিতে ভরসা পায় না। কে জানে হয়ত বিরক্ত হইবেন। মণিঠাকুরাণী ইঁহাদের অতি আপন জন, তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া তার মাকে ছাড়াইয়া আনিতে কেনই বা তাহার খাতিরে চাহিবেন? চেষ্টা কিছু করিতে হইলে নিজেকেই করিতে হইবে। কিন্তু করিবে সে সুযোগ কোথায়?

প্রবীণা বিধবা যাঁহারা গৃহে আছেন, যখন তখন তাঁহারা কালীবাড়ী যাইতেন। দুপুরে কি বৈকালে কখনও গেলে, কিছুদিন পরে সেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে যাইত, যদি অবসর ঘটিত। সেখানে অনেক প্রবীণা বিধবার সঙ্গে দেখা হইত—কেহ কেহ পাচিকার কাজও করে। তবে আছে; এরূপ পাচিকাও আছে। আব-খোরাকী পনের যোল টাকা বেতনও কেহ কেহ পায়। ঘরভাড়া করিয়া থাকে, ছেলেপুলেও কাহারও কাহারও আছে, কাজ সারিয়া আসিয়া তাহাদেরও আবার রাঁধিয়া খাওয়ায়। ইহাদের কাছে খোঁজ খবর লইয়া তাহার মাতার জন্যও এইরূপ একটি চাকরী হয়ত সে জোগাড় করিতে পারিবে। কিন্তু এখনই সুবিধা হইতেছে না। আরও কিছুদিন এইরূপ যাওয়া-আসায় আর একটু জানাশুনা ইহাদের সঙ্গে হওয়া চাই। তখন গৃহের এই প্রবীণারা যখন দেবতা দর্শনে, জপতপে কি পাঠ-পাঁচালী-কীর্ত্তনাদি শ্রবণে নিবিষ্ট থাকিবেন, তখন ইহাদের কাহাকেও একটু দুরে ডাকিয়া লইয়া খোঁজ-খবর লইতে পারিবে, ভাল চাকরীও একটা বন্দেজ করিয়া ফেলিতে পারিবে। কে জানে হয়ত জানাশুনা লোক কাহারও সঙ্গেও কোনও সময়ে দেখা হইতে পারে। তখন তাহাকে বলিয়া কহিয়াও সুবিধা একটা কিছু করিয়া লইতে পারিবে। যাহা হউক, যাহা করিতে হয়, যতদিনে হউক, নিজেকেই এইভাবে করিয়া লইতে হইবে। কাজের একটা জোগাড় হইলে তখন মাকে আসিতে লিখিবে।

বৈকালে একদিন বিন্দীর সঙ্গে লতার সাক্ষাৎ হইল।

"ওমা! আমাদের লতা যে! তা শরীরগতিক ভাল আছ ত মাসীমণি?"

"কে, বিন্দুমাসী! তা তুমি কবে এলে এখানে কাশী থেকে?"

"এই ত দিন দশ-বার হ'ল এসেছি। কি ক'রব মা, ভেবেছিলাম, যদি একটু কাজকর্ম্ম কোথাও জোটে, বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌ব—কদিনই বা আর আছে। আর দেশেও ত তিনকুলে আপন বল্‌তে কেউ নেই। আমাদের মত অনাথা অবীরা যারা—শেষকালে তাদের আশ্রয়ই ত ঐ কাশীর বিশ্বনাথ কি নদের গৌরচন্দর। তা মা, পাপের কপালে কি আর সেই ভাগ্যি কখনও ঘটে?"

"কেন, কাজকর্ম্ম ওখানে কিছু পেলে না?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিন্দী কহিল, "নাঃ! জুট্‌ল ত না সুবিধে মত কিছু। আর কেই বা দেখেশুনে দেয়, জানাশুনো লোকও কেউ ওখানে নেই। ব'সে দু'মাস খাব, আর খুঁজেপেতে দেখ্‌ব, এমন পুঁজি-পাটাও ত কিছু নেই। যা ছিল, তা ফুরিয়ে গেলে শেষে কি করব? সেই দূরদেশে তখন কোথায় গে' দাঁড়াব, দুটি ভাতই বা কে দেবে?"

"তা এখানে কি ক'রে এলে? কাদের সঙ্গে?"

বিন্দী উত্তর করিল, "ঐ ত পাতালেশ্বরে ছিলাম কি-না আতর ঠাক্‌রুণের বাড়ীতে। সামনেই কালীঘাটের একটি ভদ্রলোক গিয়ে বাসা ক'রে ছিলেন। তাদের ঝিটির সঙ্গে জানাশুনো হ'ল—কখনও গিয়ে বসতাম, দুটো সুখ দুঃখুর কথা কইতাম। তা তাঁরা সে বাসা ছেড়ে চ'লে এলেন কি-না, তখন সেই ঝিটিকে গিয়ে ব'ল্লাম, আমায়ও অম্‌নি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও দিদি, যদি কাজকর্ম্ম কিছু পাই, ক'রব, না হয় দেশে চ'লে যাব। সে-ই শেষে গিন্নীকে ব'লে তাদের সঙ্গে এখানে নিয়ে এসেছে।"

"তা কোথায় আছ এখানে? কাজকর্ম্ম পেয়েছ কিছু?"

"নাঃ! এখনও পাই নি। তবে ওদের সেই ঝিটিই দেখ্‌ছে। গিন্নীও ব'ল্লেন, তা বাছা, তুমি নতুন লোক, কোথায় আর যাবে? কাজকর্ম্ম যে কদিন না পাও, এখানেই বরং থাক। যা পার ওর সঙ্গে ক'রো, ছেলেপিলেগুলোকে একটু দেখো—একা ও পেরে ওঠে না। দেখি, কাজকর্ম্ম যদি জুটে কিছু যায় ক'রব, না হয় খুঁজেপেতে শেষে সেজবাবুর ওখানেই গিয়ে প'ড়ব। অনেক লোকজন ত তাঁর বাড়ীতে কাজকর্ম্ম ক'রে খায়, যদি রাখেন, থাকব। না হয় কারও সঙ্গে শেষে দেশেই পাঠিয়ে দেবেন। তবে বড় লজ্জা করে মাসীমণি! ব'লে এসেছিলাম, বাবার দয়া যদি হয়, মা অন্নপুন্নো যদি মুখ তুলে চান, ফিরে আর আসব না, তাঁদের পায়েই প'ড়ে থাক্‌ব!—তা পারলাম না, এই মুখ নিয়ে আবার দেশে গে' উঠ্‌ব—"

সশব্দে সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আঁচলখানি তুলিয়া বিন্দী চক্ষু দুটির উপরে বুলাইল।

দীর্ঘ এই দুঃখের কাহিনী ধৈর্য্য ধরিয়া লতা কানে তুলিল। কিন্তু সহানুভূতিসূচক কোনও কথাও বলিল না, সহানুভূতি কিছু মনেও জাগিল না। কারণ লতা জানিত, একটু ক্লেশ করিয়া বাঁধা নিয়মে কোনও বাড়ীতে কাজ করিবে, সে ধাতুরই মানুষ বিন্দী নয়। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়—চালটা ডালটা তরকারীটা কি দুই-চারি গণ্ডা পয়সা কাহারও কাছে কখনও চাহিয়া লয়। আর কারও বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম কিছু উপস্থিত হইলে লাগিয়াই পড়িয়া থাকে। ফর ফর করিয়া বেড়ায়, এ-কাজে ও-কাজে খুসীমত কখনও একটু হাত দেয়, তিন সন্ধ্যা খায়!—ঐ চৌধুরীদের বাড়ীতেও আনাগোনা সর্ব্বদা করে, তাদের ছেলেপিলেদের কোলে লইয়া ঘোরে ফেরে। সেখানেও খায়-দায় অনেক সময়ে, পায়-থোয়ও কিছু। এইভাবে জীবনটা কাটাইল, কাজ ভাল লাগিবে কেন? নহিলে সত্যই কি আর কাশীতে একটু ঝির কাজও কোথাও তার জুটিত না? না, এই কালীঘাটেই জোটে না?

যাহা হউক, চক্ষে আঁচলখানি বুলাইয়া বিন্দী যখন চাহিল, লতা জিজ্ঞাসিল, "তা আসবার সময় মা'র সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল? কেমন দেখ্‌লে তাঁদের?"

"ওমা, তা হ'য়েছিল বই কি!—দেখ্‌লাম—তা কি আর দেখ্‌ব মাসীমণি বল? মায়ে ঝিয়ে ছাড়াছাড়ি ত কখনও আর হও নি!—ঐ কোলের ছেলেটি আবার ফেলে চ'লে এলে—কোথায় সেই কাশী আর কোথায় কালীঘাট! দেহে কি আর আত্মা ব'লে কিছু তাঁর থাক্‌তে পারে? তবে মানুষের নাকি সব সয়—তাই কোনও মতে সয়ে আছেন। হাত দুটি ধ'রে কত ক'রে ব'ল্লেন, বিন্দী, যাচ্ছিস্ ত, তা একটু খুঁজে পেতে আমার লতিকে গিয়ে একদিন দেখে আসিস্।—তা মা, নতুন লোক আমি, নতুন জায়গা আর রাস্ত দিন

যেন হাটের লোক পথে ছুটছে! কে কাকে চেনে? কাকে কি শুধোব বল? আর কি সব কলের গাড়ী—হুড় হুড় ক'রে পথে চ'লছে, পা বাড়াতে ভয়ে মরি—এই বুঝি দ'লে পিষেই চলে গেল! মাগো! কি ক'রে যে লোক সব একটু সোস্তিতে এখানে থাকে! এ তবু কালীঘাট, খাস ক'লকেতার বড় বড় সব রাস্তায় দেখ্লাম শ'য়ে শ'য়ে এম্নি সব গাড়ী চ'লছেই চ'লছেই একটার পর একটা—মাঝে একটু ফাঁক থাকে না—যেন লম্বা এক একটা রেলগাড়ীই যাচ্ছে! ছ'দণ্ড লোকের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এক একটা রাস্তা পেরোতে। আবার নতুন ঐ যে কলের গাড়ীগুলো হ'য়েছে—বাস না কি বলে—যেন এক একখানা জাহাজ! আমরা কি পারি খুঁজে পেতে এখানে কাউকে বের ক'রতে? তবু ভাগ্যি মার বাড়ীতে এয়েছিলে, দৈবী দেখা হ'ল। তা কাছেই বুঝি বাবুদের বাড়ী?"

"হাঁ।—খুব বেশী দূরে নয়। মাঝে মাঝে বাড়ীর লোক কেউ যখন আসেন, সময় পেলে আসি তাঁদের সঙ্গে।"

"তা গিন্নীমাকে ব'লে ক'য়ে আমাকে একটু কাজে কেন ওখানে লাগিয়ে দেও না মাসীমণি? কাশীতেও গঙ্গার ঘাটে গিন্নীমাকে একদিন ব'লেছিলাম, তা ব'ল্লেন দরকার যদি হয়, তখন দেখবেন। তা—তুমি যদি এখন একটু ব'লে ক'য়ে দেও—শুনিছি খুব ভাল তোমাকে ওঁরা বাসেন—"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "ভালবাসেন—তা হাজার হ'ক্, বাড়ীর রাঁধুনী আমি—চাকরী ক'রে খাই। আমি কি আর এসব কথা ব'ল্তে পারি কিছু? লোকজন ত দেখ্তে পাই, যা দরকার সবই আছে। নতুন লোক আর কাউকে রাখবেন কি-না, সে ওঁরাই জানেন।"

প্রবীণা দুইজন বিধবার সঙ্গে লতা আসিয়াছিল, একজন একটু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ লোকটি বাছা? তোমাদের এক গাঁয়েই বুঝি বাড়ী?"

"হাঁ, ছোট্ট ঠাকুমা।"

বিন্দীর দিকে চাহিয়া এই ছোট্ট ঠাকুমা তখন কহিলেন, "তা বাছা, আমাদের বাড়ীতে নতুন কোনও লোকের দরকার কিছু নেই। সে কালে ভদ্রে দরকার যদি কখনও হয়, তখন যদি খালি থাক আর খোঁজ পাওয়া যায়, বরং দেখা যেতে পারে।"

গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বিন্দী কহিল, "তা মা ঠাকরুণ, দয়া যদি তোমাদের থাকে, আর মনে রাখ, খোঁজখবর—সে আমিই বরং মাঝে মাঝে গিয়ে নেব। শুনেছি বড় ভাল মনিব তোমরা, লোকজনও সব বড় সুখে থাকে, নিজেদের বাড়ী ঘরের মত।—তাই ভাব্ছিলাম, যদি আশ্রয় একটু পেতাম, কৃতার্থ হ'য়ে তোমাদের সেবা ক'রতাম। তা যাব, যাব—মাঝে মাঝে গিয়ে খোঁজ নেব। যেখানেই কাজ করি, এমন সুখের কাজ কি আর কোথাও পাব? তা মা, আমি ত চিনি না—তোমাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়ীটা বরং দেখেই একটিবার আসি আজ।"

"তা চল। আমরাও এখুনি ফিরছি। তা বাছা, শেষে চিনে আস্তে পারবে ত? শুনলাম নতুন এখানে এয়েছ—"

বিন্দী উত্তর করিল, "তা মা, এই মায়ের বাড়ী ত, নিজে না ঠিক পাই, যাকে ব'লব, সে-ই পথ দেখিয়ে দেবে। এখানে এসে একবার পৌছুতে পার্লে আর ভাবনা কি? অনায়াসে চিনে যেতে পারব, যেথায় থাকি।"

"বেশ, তা হ'লে চল, যদি ইচ্ছে হয়।"

তখনই ইঁহারা গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। বিন্দীও সঙ্গে গিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিল।

(১৪)

হরমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরিঞ্চিমোহন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিল। হাইকোর্ট ছুটি হইবার কিছু দিন পূর্ব্বেই জন দুই বন্ধুর সঙ্গে সে কোথায় বেড়াইতে যায়, আজ বেলা দশটা এগারটায় ফিরিয়া আসিবার কথা। সকালেই প্রফুল্ল-হাসিমুখে গৃহিণী কমলিনী রন্ধন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আজ আমার বিরু আসবে মা। খুব ভাল ক'রে পাঁচ ভাগে রেঁধো। তোমায় আর ব'ল্তে হবে কেন মা? তরকারীই সে ভালবাসে বেশী। ডালনা, ঘণ্ট, চচ্চড়ী—এই সব ভাল ক'রে রেঁধো। জান্লে? বউমা, তুমি ব'লে দিও।"

বলিয়াই কমলিনী অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

বাজার হইতে তখন মাছ-তরকারী সব কেবল আসিল। লতা কহিল, "কি রাঁধব ব'লে দাও বৌঠাকরুণ।"

একটু সলজ্জ হাসিমুখে ইলা উত্তর করিল, "আমি আর

কি ব'ল্‌তে যাব দিদি? তুমি নিজেই কেন সব ঠিকঠাক ক'রে নেও না!"

"আমি ত জানি না ভাই।"

"ওর আবার জানাজানি কি লাগ্‌বে? রোজই ত কত রাঁধ। উরি ভেতর যা ভাল হয়, কিছু কিছু বেছে নেও না? তরকারীও ঐ সব র'য়েছে—"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "সে কি ঠিক হবে বৌঠাকরুণ? আমি ত আর মন্তর তন্তর জানি নে—"

ইলাও তেমনই একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "জান বৈ কি? নইলে হাতের রান্না এমন মিঠে হয়?—কই, আমার ত হ'লই না। ভয় হ'চ্ছে, খুব লোভী মানুষ কি-না, পাছে তোমার রান্না খেয়ে—"

"ছি! ও সব কথা ব'ল্‌তে নেই বৌঠাকরুণ!"

লতার মুখখানি কিছু গম্ভীর হইয়া উঠিল। ইলা একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, "নেই ত আর ব'ল্‌ব না, রাগ ক'রো না দিদি। তা উনুন ধ'রে উঠেছে, তুমি ডাল ভাত চড়িয়ে দিয়ে এস। তার পর বল, আমি কুটনো কুটে দিচ্ছি।"

লতার নির্দ্দেশ মত কুটনা কুটিয়া ইলা ভাগে ভাগে রাখিল। লতা নিজেও আর একখানা বঁটী পাতিয়া বসিয়া কতক কতক কুটিয়া লইল। ইলা মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, শেষে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সাধে কি বলি দিদি, তুমি মন্তর তন্তর জান! ঠিক এই সব তরকারীই উনি সব চেয়ে ভালবাসেন।"

"তাই নাকি?"

চাপিয়া একটি নিশ্বাস লতা ছাড়িল। তাহার স্বামীও এই সব তরকারী বড় ভালবাসিতেন। যে কয়মাস তাঁহাকে পাইয়াছিল, কত সে রাঁধিয়া দিয়াছে। আজ কেমন তার মনে হইতেছিল, ইঁহারও এই সব ভাল লাগিবে। ভাল তরকারী রাঁধিবার কথা কেহ কখনও বলিলে আপনা হইতে এই সব তরকারীর কথাই তাহার মনে হইত।

যথাসময়ে বিরিঞ্চি আসিয়া পৌঁছিল। স্নানাদি সারিয়া আহারে বসিল। অন্নব্যঞ্জনাদি বাড়িয়া লতা কহিল, "তুমি নিয়ে যাবে কি বৌঠাকরুণ?"

"দূর! আমি কেন! ছি! মা কি ব'ল্‌বেন? তুমিই নিয়ে যাও না? ভয় নেই গো! আস্ত ধ'রে কেউ তোমায় গিলে খাবে না!"

অগত্যা লতা ঘোমটা টানিয়া ভাতের থালা লইয়া গেল। বিরিঞ্চি মাতার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ঘোমটার মধ্য হইতেই মুখ তুলিয়া লতা একবার চাহিয়া দেখিল। হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল; কম্পিত অবসন্ন দেহ গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল!

"এ কি! কে! অ্যাঁ!" বলিয়াই বিরিঞ্চি লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাথরের মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দিকে কেহ চাহিল না; কথাও কাহারও কানে গেল কি-না সন্দেহ।

কমলিনী ও অন্যান্য যাঁহারা কাছে ছিলেন, অতি উৎকণ্ঠিত হইয়া সকলে লতার শুশ্রূষায় মন দিলেন। এই গোলমালের মধ্যে বিরিঞ্চি বাহির হইয়া গেল। একটা দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া আড়ালে ইলা দাঁড়াইয়াছিল। সেও তখন ছুটিয়া আসিয়া কাছে বসিল। কিছুক্ষণ পরে লতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; একবার একটু মেলিয়া চাহিল, চাহিয়াই আবার চক্ষু দুটি বুজিল, অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল।

ইলা ডাকিল, "দিদি! দিদি! বামুনদিদি! লতাদি!"

কমলিনী কহিলেন, "কি হ'য়েছে মা তোমার? একটু ভাল বোধ ক'রছ ত এখন?"

"হাঁ—না!—" সমস্ত শরীর কেমন একটা ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ইলা মাথায় জলের ঝাপটা দিল। কমলিনী বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "ভয় কি—ভয় কি মা? হঠাৎ ভিরমী দিয়ে প'ড়েছ—এক্ষুনি ভাল হ'য়ে যাবে।"

একটু জড়িতকণ্ঠে লতা কহিল, "আমি—আমি—এখন কোথায়—যাব মা!"

"কোথায় আর যাবে?—এই ত তোমার বাড়ী মা!"

"বাড়ী!—আমার—আমার—বা—ড়ী—"

চক্ষু মেলিয়া এদিক ওদিক একবার চাহিল।

"তোমারই বাড়ী বই কি মা? আমাদের কাছে র'য়েছ; ঘরের লোকের মতই যে সবাই আমরা তোমাকে দেখি।"

চক্ষু দুটি লতার বুঝিয়া আসিল—দুটি অশ্রুধারা নামিল, অঝোরধারে বহিতে লাগিল। কোলে মাথাটি লইয়া শিয়রে ইলা বসিয়াছিল।—সাশ্রুনয়ন বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া দিতে দিতে কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

চক্ষু মুছিয়া কমলিনী কহিলেন, "কাঁদছ কেন মা? ভয় কি? এখুনি সেরে যাবে। স্থির হও, স্থির হও মা! কেঁদো না? মাথায়-টাথায় কোথায় লেগেছে খুব?"

মাথা নাড়িয়া লতা জানাইল, না, লাগে নাই কোথাও কিছু।

"তবে কেন কাঁদছ? ছি! লক্ষ্মী মা আমার! কেঁদো না।"

হাত তুলিয়া লতা নিজেই অশ্রুধারা একবার মুছিল। ধীরে ধীরে শেষে উচ্চারণ করিল, "আমার মা —"

"আঃ কপাল! মা যে তোমার কাশীতে মা।—এ বাড়ীতে, ধর আমিই তোমার মা।"

বড় জোরে আবার দুটি অশ্রুধারা নামিল; একটু সামলাইয়া পরে কহিল, "মার কাছে যেতে পারি না মা? আজই? এখুনি?"

"তাও কি হয় মা? কটা দিন যাক্, একটু সুস্থ সাব্যস্ত হয়ে ওঠ—যেতেই যদি চাও, দেব তখন পাঠিয়ে। না হয় তোমার মাকে এখানে আনাব, খোকাটিকে নিয়ে আস্‌বেন—"

সমস্ত শরীরটা লতার কাঁপিয়া উঠিল—"না, না, না! আমি যাব, আমিই যাব! তিনি আস্‌তে পারেন না —"

তখন ডাক্তার আসিলেন। মাথা টিপিয়া, হাত দেখিয়া, বুক পরীক্ষা করিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। কহিলেন, "ভয় কিছু নেই। হঠাৎ একটা হিষ্টিরিক ফিটের মত হয়েছিল—অমন হয়ে থাকে। এই ওষুধটা এনে খাওয়ান।—নিরেলা একটা ঘরে নিয়ে শুইয়ে রাখুন ওঁকে। একটু দুধ এখন খেতে দিন। খানিক বাদেই বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন। তখন ভাতটাতও খেতে পারেন। ওবেলা আবার আমি খবর নেব।"

লোকজন সর্ব্বদা চলাফেরা করে না, গোলমালও গিয়া কিছু বড় পৌছয় না, নিরালা এমন একটি ঘরে লতাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া রাখা হইল। ইলা একবাটি গরম দুধ লইয়া আসিয়া মুখের কাছে ধরিল, কয়েক চুমুক খাইয়া লতা কহিল, "দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে তুমি বরং যাও বৌঠাকরুণ। আমি—আমি—দেখি যদি একটু ঘুমুতে পারি।"

"একেবারে একলাটি থাক্‌বে?"

"হাঁ, নইলে সোয়াস্তি পাব না—ঘুম হবে না। ভয় নেই আর।—এখন—এখন বেশ সুস্থ হয়েই উঠেছি।"

"ওষুধ!"

"তা আসুক।—তখন কাউকে পাঠিয়ে দিও, খাব।"

দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া ইলা বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

আমেরিকায় প্রাচীনতম হিন্দু সংস্কৃতি

শ্রীকমলকুমার চক্রবর্ত্তী

হিন্দুশাস্ত্রে এমন বহু বিষয় আছে যাহা এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে কেহ কেহ বিশ্বাস না করিতে পারেন, তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছে হিন্দুকৃষ্টি। হিন্দুদিগের কৃষ্টি আজ হইতে লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে সারা জগতে জ্ঞানের আলোক বিকীরণ করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ বলা যাইতে পারে না, কারণ আরম্ভ যে কবে হইয়াছিল তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন; এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন, "অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরম্." প্রারম্ভ যাহা তাহা গহন ও গভীর—অর্থাৎ অন্ধকারে আবৃত। প্রারম্ভ যবেই হউক না কেন, লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দুকৃষ্টি প্রসার লাভ করিতে থাকে বর্ত্তমানে তাহা হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রাচ্যবিত্তার্ণব প্রতীচ্য সুধীমণ্ডলী হিন্দুকৃষ্টির অস্তিত্ব পাঁচ হইতে দশ হাজার বৎসরের অধিক নহে বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। অন্ত আর একটি বিষয় এই যে, পাতালে লোক বাস করিত এবং পাতালপুরীর অধিবাসীদের ধর্ম্ম ছিল, অধিনায়ক ছিল। হিন্দু দেবদেবীর উপাসকদের ভিতর শৈব উপাসকরাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম, এই জন্তই পাতালপুরীর অধিবাসীদের উপাস্য দেব-দেবীদের ভিতর দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বস্তুতান্ত্রিক জগতে পাতালপুরীর অধিবাসীদের শিবোপাসনা অত্যন্ত অবিশ্বাসজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে উপরোক্ত দুইটি অবিশ্বাস্য বিষয়ই সত্য বলিয়া বিজ্ঞানের দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দেশে আরিজোনা বলিয়া একটি প্রদেশ আছে। এই প্রদেশের আয়তনের পরিমাণ ১,১৩,৯৫৫ বর্গ মাইল এবং আকৃতিতে ইহা প্রায় চতুষ্কোণ। এই প্রদেশের মধ্যে সুবিখ্যাত নদী কলোরাদো প্রবাহিত

এবং তাহার স্রোতদ্বারা খনিত উচ্চদুরারোহ তীরের মধ্যে গভীর খাদ এবং এই প্রদেশে বিখ্যাত মরুভূমি বর্ত্তমান আছে। এই প্রদেশের অধিকাংশ জমি সমুদ্রের সমস্থল হইতে ৫,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত অধিত্যকা; আরিজোনার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রের সমস্থল হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার জমিগুলি উর্ব্বরা নহে, কিন্তু মার্কিণজাতি বৈজ্ঞানিক প্রণালিকা সিঞ্চনের দ্বারা জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। গবাদি পালনের সকল প্রকার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এইখানকার প্রধান পণ্য হইতেছে খনিজপদার্থসমূহ, প্রধানত তাম্র ও রৌপ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফিনিক্স শহর আরিজোনার রাজধানী; আরিজোনা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন দুইটি আইন সভাদ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, আরিজোনা হইতে একজন প্রতিনিধি (Representative) ও দুইজন পরিচালক সভার সভ্য (Senator) প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী হইতে জানা যায় যে আরিজোনার লোকসংখ্যা ৪, ৩৫, ৫৭০ জন। কলিকাতা হইতে আরিজোনা যাইতে হইলে এলারম্যান্ এণ্ড ব্যাক্নীল্ কোম্পানীর প্রতিনিধি গ্লাডষ্টোন ওয়াইলি দ্বারা অথবা কুক্লি ব্যাঙ্ক কুনার্ড এণ্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি গ্রেহামস্ টেডিং দ্বারা তাহাদের আমেরিকাগামী জাহাজে নিউইয়র্কে যাইতে হয়। নিউইয়র্ক হইতে বাষ্পীয়যানে নিউ মেক্সিকোর রাজধানী আলবুকার্কে যাওয়া যায়। আলবুকার্ক হইতে বাষ্পীয়যানে অথবা মোটর গাড়ী করিয়া আরিজোনা যাওয়া যায়। স্যালটন সমুদ্র এক বৃহৎ জলরাশি, তাহার অববাহিকা প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা এবং এক সময় ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগরের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া স্যালটন্ সমুদ্র কেবলমাত্র লবণরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলোরাদো নদীতে বাঁধ দিয়া তাহার ভীম আকৃতিকে বন্ধন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, ফলে জলরাশি বন্ধনের সীমা অতিক্রম করিয়া অববাহিকাটির উপর জলপ্রপাতে পরিণত হয়, ইহা দুই বৎসরকাল এই ভাবেই ছিল এবং ইহার ফলে ঐ অববাহিকাটি একটি সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে; ক্যালিফোর্ণিয়া ও আরিজোনার মধ্যে যে বড় রাস্তাটি আছে তাহা এই সমুদ্রের উত্তরদিকে অবস্থিত। ইংরেজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আরিজোনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরিজোনা সমুদ্রের সমস্থল হইতে অধিক উচ্চে অবস্থিত বলিয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান, শীতকালে ইউরোপের বহু ভদ্রব্যক্তি বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে আরিজোনায় গিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শীতকালে পৃথিবীতে আরিজোনার ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। আরিজোনার বিশুদ্ধ বায়ুর ন্যায় দেহের হিতকারী স্থান অধিক নাই। এইস্থানে দেখিবার জিনিষ বিশেষ কিছু নাই, পর্ব্বতগুলি ফণিমনসা গাছে পরিপূর্ণ এবং বহুদূর হইতে সেইগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেইগুলি একই প্রকারে ছাঁচে ফেলিয়া রং দিয়া রাখা হইয়াছে। পর্ব্বতগুলি সাধারণত তিনটি করিয়া শিখরদেশ বিশিষ্ট, দিবসে সূর্য্যালোকদ্বারা তাহারা নীল বর্ণবিশিষ্ট কিন্তু রাত্রে সূর্য্যাস্তের সময় সেই নীলবর্ণ লোহিতাকার ধারণ করে; বৃক্ষাদির স্থানগুলি ঝলিমলিম সবুজবর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং আকাশের উপর ক্রমশ রঙের স্থূল খণ্ড সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাত্রিকালে এত প্রকার তারকার সমাবেশ আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। আরিজোনার বিশেষ বিবরণ "দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড অফ্ দি গ্রেট্ সাউথ-ওয়েষ্ট" নামক পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। আরিজোনা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য লীলাস্থল। এখানে বহুপ্রকার অদ্ভুত ঘটনাদি ঘটিতে দেখা যায়, এখানে নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল ঘটিতেও দেখা যায়। পূর্ব্বে যে খাদের কথা বলা হইয়াছে তাহা আরিজোনার একদিকে অবস্থিত ও অপরদিকে বর্ণবৈচিত্র্যে অবস্থিত মরুভূমি এবং গভীর অরণ্য। এই অসাধারণ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভিতর অবস্থান করিয়া আরিজোনা আমাদের সম্মুখে মানবসভ্যতার আদিম অবস্থা কল্পনানেত্রে দেখাইয়া দেয়; সমগ্র জগত যখন নিষ্প্রভ নিদ্রাহীন নেত্রে তাহার শৈশবাবস্থার অসহায়তা উপলব্ধি করিতেছিল, তখনকার মানবহৃদয়রহস্য আরিজোনা দ্বারা আমাদের চক্ষু সমক্ষে ফুটিয়া ওঠে। এই সকল গভীর অরণ্যে পূর্ব্বে অতিকায় সর্পসমূহ বাস করিত এবং তাহাদের বাসস্থলসমূহ তাহাদের বাসচিহ্ন লইয়া অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে। এই জঙ্গলের চতুর্দ্দিকে মহাপ্রলয়ের ন্যায় ধ্বংস-চিহ্নাদি স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা যেরূপ অপূর্ব্ব রূপে বিদ্যমান সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব। বহু স্থলে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ পর্ব্বতরাজি মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহাদের দেখিয়া মনে হয় তাহারা কত যুগ-যুগান্তরের আদিম মানবতার একমাত্র দর্শক; এই সকল পর্ব্বতরাজি সম্বন্ধে বহুপ্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। বহু ব্যক্তি অনুমান করেন যে, আরিজোনার এই পর্ব্বতরাজি অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ এবং এই সকল পর্ব্বতাভ্যন্তরে বহু স্বর্ণখনি অবস্থিত, বহু ব্যক্তি স্বর্ণের লোভে এই সকল পর্ব্বতে গিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। এই অঞ্চলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, আরব্যোপন্যাসের নানা প্রকার ভূত-প্রেতাদি এই সকল পর্ব্বতে বাস করে। পর্ব্বতাভ্যন্তরে কেবল স্বর্ণ নহে,—উপলমণি, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি বহুপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরাদিও আছে বলিয়া অধিবাসীগণ বিশ্বাস করে। বহু শিলালিপি আছে বলিয়াও শুনা যায়; এই সকল শিলালিপি পাঠ করিতে পারিলে হয়ত এই কুবের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়া আলিবাবার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির এক নূতন সংস্করণ বাহির হইতে পারে। এই সকল পর্ব্বতরাজির পাকদণ্ডী-সমূহ ভুল করিলে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়, বহুলোক এই পাকদণ্ডী ভুল করিয়া পথচালনা করিবার ফলে জগতের ভিতর আর ফিরিতে পারে নাই; তাহাদের পরিণতি যে কি হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাঁহারা নানাপ্রকার পুস্তকাদিতে আরিজোনার অপূর্ব্ব মনোরম বৃত্তান্ত পড়িয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য আরিজোনা গমন করেন তাঁহারা নিজেদের এরূপ বিপন্ন করিয়া তুলেন যে জীবন-মরণ সমস্যা হইয়া পড়ে। আরিজোনার বিপদ আপদ সম্বন্ধে ঐ সকল পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা উচিত, নচেৎ আরিজোনায় গিয়া বহু ব্যক্তির জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। আরিজোনায় বহু পরিমাণে রাখাল বালক দেখা যায়, তাহারা চতুর্দ্দিকে তাহাদের গবাদি পশুচারণা করিয়া বেড়ায়; আরিজোনার দুর্গম পথগুলি এই সকল রাখাল বালকদের অত্যন্ত

সুপরিচিত। বায়ুপরিবর্ত্তনার্থী নরনারীগণ এই সকল রাখাল বালকের সাহায্যে অশ্ব আরোহণ করিয়া বহুস্থানে গমন করেন। এই সকল রাখাল-বালক সাধারণত অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত নহে, ইহাদের স্বাস্থ্যও খুব সবল ও সুন্দর। পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত প্রাচীন নদী কলোরাদোর তীরবর্ত্তী খাদের সমতট হইতে প্রায় ৭,০০০ ফিট উচ্চে একটি অবসর্পী অধিত্যকায় কয়েকজন বিখ্যাত মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এক প্রাচীন শিবমন্দির আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক জগতে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, এই প্রাচীন মন্দিরটি প্রায় লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের এই ধারণা কিছুমাত্র অনুমানমূলক নহে, পরন্তু ভূবিজ্ঞান পশু-বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা পরিষ্কাররূপে ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই মন্দিরের অবস্থান প্রদেশে বহুপ্রকার প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীনতম চেতন ও অচেতন পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন এবং বহু দ্রব্য ও জীবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিকগণ অগ্নি-প্রস্তর নির্ম্মিত বাণ প্রভৃতির খণ্ড বিখণ্ড অংশ পাইয়াছেন। বহু আয়াসে নানাপ্রকার কৌশলাদি দ্বারা ফাঁদ পাতিয়া প্রাচীনতম পত্রকর্ণ মূষিক এবং পত্রকর্ণ শশক ও পণ্যমৃগ প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক জীব সংগ্রহ করিয়া সারা জগতকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া দিয়াছেন। জলহীন স্থানে এই সকল জীবজন্তুর অবস্থিতি সত্য সত্যই অতীব বিস্ময়জনক। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবজন্তু ব্যতীত তাঁহারা তথায় অতীব প্রকাণ্ডকায় জীবজন্তুও দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সকল বৈজ্ঞানিকের ভিতর মিঃ ম্যাক্‌কি এবং ডাক্তার হ্যারল্ড য়্যান্‌টনি তাহাদের পরিমাণদণ্ড বহিয়া অতীব ক্লেশসহকারে এই প্রাচীনতম পরিত্যক্ত শিবমন্দিরে সর্ব্বপ্রথমে সভ্য মানবজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সকল বৈজ্ঞানিকের বার্ত্তায় ও তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যাদির অনুশীলন দ্বারা ইহা অতি সুন্দরভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, হিন্দুকৃষ্টি আজ হইতে প্রায় লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছিল। বহুপূর্ব্বেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বৃত্তাকার পৃথিবীর একদিকে ভারতবর্ষ ও তাহার নিম্নদিকে মার্কিণ দেশ অবস্থিত, সুতরাং মার্কিণ দেশকে আমাদের পাতালপুরী বলিয়া স্বচ্ছন্দে অভিহিত করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমে হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা যাইবার জন্য আর অর্ণবপোত বা বিমানপোতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না ; সেইদিন মাটির ভিতর দিয়া অতীব সহজ পথ আবিষ্কৃত হইবে ও তদুপযুক্ত যানবাহনাদি আমেরিকা ও ভারতবর্ষের ভিতর যাতায়াত করিবে। এই পাতালপুরীর অধিবাসীগণ যে শিবোপাসনা করিত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং এই নবাবিষ্কৃত শিবমন্দির যে এই পাতালপুরীর অধিবাসীদেরই ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় যে, পাতালে পূর্ব্বে নাগরাজা সপরিবারে বাস করিতেন। আরিজোনার সর্পবাস-চিহ্নিত অরণ্যসমূহ যে তাঁহাদেরই পূর্ব্ব বাসস্থান নহে ইহার প্রমাণ কি ? যাহা হউক, এই প্রাচীনতম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগে নির্ম্মিত এই শিব-মন্দির আবিষ্কারের ফলে আরিজোনা প্রদেশটি যে পূর্ব্বে হিন্দু অধিকৃত ছিল এবং বর্ত্তমানে মহা হিন্দুতীর্থস্থান তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যে, সামর্থ্যশালী হিন্দু তীর্থযাত্রীগণ তাঁহাদের প্রাচীনতম হিন্দুমন্দিরের প্রাচীনতম দেবতাকে দর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

হরেন্দ্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার সর্দি শুনে মিস সরকার আমাকে দেখতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপটা তখন বেশ জমে' উঠেছে—সর্দির ওষুধের আলোচনায় আমরা তখন য়্যাকোনাইট ছেড়ে র ব্র্যাণ্ডিতে চলে' এসেছি, হঠাৎ নজর পড়লো ঠিক আমাদেরই সামনেকার জানলার ওপারে কার দুটো বড়ো-বড়ো হিংস্র চোখ।

বললুম, 'কে ?'

কোনো জবাব পেলুম না। চোখ দুটো বুজে গেলো। কিন্তু জ্বলন্ত একটা নিশ্বাস শুনলুম।

আবার বললুম, 'কে ওখানে ?'

লোকটা সন্তর্পণে সরে' যাচ্ছিলো, উঠে পড়লুম আচমকা। বাইরে এসে দাঁড়ালুম, সর্দিতে গলায় যতোটুকু হেঁড়েমি ছিলো একত্র করে' ফের গর্জন করে' উঠলুম : 'কে ও ?'

'আমি।'

'আমি কে ?'

'আমি হরেন্দ্র।'

হরেন্দ্রকে আপনারা চেনেন না। হরেন্দ্র আমার আপিসে পাখা টানে।

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি এ কেন হয় ? ঠিক

যে-সময়টিতে পালে অনুকূল হাওয়া লেগেছে সে-সময়টাতেই স্টিমারের ধাক্কা লেগে নৌকোডুবি হয় কেন? হয়, হবে, আগেও আরো হয়েছে। প্রেস্টিজ-হানির ভয়ে মিস্টার সরকার নিম্নস্থ কর্মচারীর বাড়ী আসতে পারেন না বলে'ই ঈশ্বর হরেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিনাবাক্যে আমি ওকে বরখাস্ত করে' দিতে পারতুম, কেননা এই একটিমাত্র লোক যাকে আমরা চাকরিতে বসাতে ও চাকরি থেকে খসাতে পারি। কিন্তু এখুনি ওকে বিদেয় করলে আজকের সংসার তো গেছেই, কালকের সংসারও চলবে না। সংসার মানে উনুন-ধরানো, বাজার-করা, বাসন-ধোয়া, ঘর-ঝাঁট-দেয়া—স্ত্রীদেরকে জিগগেস করে' দেখবেন। হরেন্দ্র আমার আধখানা পাখা, বাকি আধখানা চাকা।

মিস সরকার কখন চলে' গেছেন, রাত দশটার সময় একাদশতম পেয়ালায় চা খাচ্ছি, হরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালুম।

ওকে অন্তত কঠিন তিরস্কার করাও উচিত ছিলো, কেন ও আমার ঘরের জানলায় এসে উঁকি দেয়, শুধু উঁকি দেয় না, প্রজ্বলন্ত প্রতীক্ষায় নিষ্পলক চেয়ে থাকে। কিন্তু ভাবলুম, মোটে সাত দিন ও এসেছে, তিরস্কার করবার আগে ওর সঙ্গে প্রথমে আলাপ করা দরকার। স্বপক্ষ-বিপক্ষ সমস্ত এভিডেন্সের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বিচার করবার অভ্যেস আর নেই।

ডাকলুম হরেন্দ্রকে।

ছ' ফুটের উপরে লম্বা, কিন্তু শরীর একেবারে দড়ি পাকিয়ে গেছে। গাল দুটো বসা, গভীর গর্তের মধ্যে থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে উদ্ধত বিকৃতিতে। গলাটা ঢিলে, নড়বড়ে, দেখলেই কেমন মায়া করে। বুকের জিরজিরে পাঁজর ক'খানা দেখলে হঠাৎ মুখ দিয়ে কঠিন কথা বেরুতে চায় না। তার দৈন্য-দুর্দশার সঙ্গে চেহারার সমস্ত-কিছু অনায়াসে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়, কিন্তু তার চোখ দুটোই মেলানো যায় না। তাতে না আছে একটু বিনয়, না বা কাতরতা। সে দুটো যেমন উগ্র, তেমনি উদভ্রান্ত। আমি পুরুষ বলে'ই শুধু ভয় পেলুম না।

জিগগেস করলুম: 'তোর কি কোনো অসুখ?'

ম্লান গলায় হরেন্দ্র বললে, 'হ্যাঁ, হুজুর।'

'কি?'

'আজ এগারো বচ্ছর সমানে মাথা-ধরা। রাতের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে, সারা রাত ঘুমুতে পারি না। এই এগারো বচ্ছর।'

'তোর এখন বয়েস কত?'

'আটত্রিশ।'

'এত দিন ধরে' ভুগছিস? কেন, ওষুধ খেতে পারিস না?'

'ওষুধ! ওষুধ পাবো কোথায়?' বিচ্ছিন্নীকৃত বড়ো-বড়ো পাঁশুটে দাঁতে হরেন্দ্র হাসলো।

বললুম, 'এই মাথা-ধরা নিয়ে কাজ করিস কি করে?'

'নইলে যে পেট চলে না হুজুর। আগে শিরদাঁড়া, তবে তো পায়ের উপর দাঁড়াবো।'

'কত পাস পাখা টেনে?'

'ছ' টাকা, আর আপনার এখানে দুই। চলে' যায়।'

'চলে যায়? বাড়ীতে ছেলেপুলে নেই?'

হরেন্দ্র আবার হাসলো, তেমনি সঙ্কেপে। বললে, 'বলে, ফুলই নেই তো ফল ধরবে!'

'কেন, পরিবার মারা গেছে বুঝি?'

'পরিবার করিনি, হুজুর।'

হরেন্দ্রের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম।

'স্ত্রীজাতির প্রতি অমানুষিক এই বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণার কারণ কী?'

কথাটা হরেন্দ্র বুঝলো না।

তাই সরাসরি জিগগেস করলুম: 'করিস নি কেন বিয়ে?'

'পাবো কোথায়?' কথার শেষে হরেন্দ্রর নিশ্বাস আমার কানে এলো।

'পাবি কোথায় মানে? কেন, তোদের জাতের মধ্যে গাঁয়ে কি মেয়ে নেই?'

'আছে বৈ কি, কম আছে।'

'তবে একটা কাউকে জুটিয়ে নে না। মাথা-ধরাটা ছাড়ুক।'

হরেন্দ্র হাসলো, যে-হাসি প্রায় হতাশার কাছাকাছি। বললে, 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি যে।'

'যে কখনো বিয়ে করে নি, সে কখনো বুড়ো হয়? কেন তোদের গাঁয়ে বড়ো মেয়ে নেই? সব সর্দা-আইনে পার হ'য়ে গেছে?'

'আছে বৈ কি, এই তো সন্নেসি বাওয়ালির মেয়ে বেগুনি আছে।' হরেন্দ্রর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে' উঠলো।

'বয়েস কত ?'

'বাইশের কম হবে না।'

'তবেই তো দিব্যি মানিয়ে যাবে। ওকেই বিয়ে কর্ না।'

'ওর বাপ ছ' কুড়ি টাকা চায়।'

'টাকা, টাকা কিসের ?'

'পণ, হুজুর।'

'তোদের দেশে মেয়েরা বুঝি পণ নেয়। উল্টো দেখছি।' আসলে, খতিয়ে দেখলুম সেইটেই ন্যায্য নিয়ম। বললুম, 'পণ জুটছে না বলে চামার বাপ মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে না ? মেয়েটাকে শুকিয়ে মারছে ? বেটাকে পুলিশে চালান দেয়া উচিত।'

আমার এই নিষ্ফল আক্রোশে হরেন্দ্র হাসলো। বললে, 'এর জন্যে সন্নেসি-খুড়োকে দোষ দেয়া চলে না, হুজুর। ঐ আমাদের নিয়ম, নড়চড় হবার জো নেই। মেয়েরাই লক্ষ্মী, তাই মেয়েদেরই দাম।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'সন্নেসি তোর খুড়ো নাকি ?'

'গ্রাম-পরচায় খুড়ো, কোনো কুটুম্বিতে নেই। একালি জমি, বাড়ীও নজদিগ্। মাঝখানে ছোট একটা জোলা। আমার বয়েস যখন বাইশ আর বেগুনির বয়েস যখন ছয়, তখনই বাবা কথা পাড়েন, সন্নেসি-খুড়ো এক ডাকে পঁয়ত্রিশ টাকায় উঠে বসলো। মহাজনের দেনা, মালেকের খাজনা, ছ'-ছ' বছর অজন্মা, জমিতে বাঁধবন্দি নেই, অত টাকা বাবা পাবে কোথায় ? এ-বছর যায়, ও-বছরে জমি লাটে ওঠে, রেহেনদার এসে ডিক্রির টাকা আমানত করে' দিয়ে দখল নেয়। অভাবের পর অভাবের তাড়না, টাকা কোথায় ? হালের একটা গরু কিনতে পারি না, তায় বিয়ে ! এদিকে দিন যত গড়িয়ে যায়, সন্নেসি-খুড়োর ডাকও তত এক পরদা করে' উঁচু হতে থাকে। উঠতে-উঠতে এখন তা ছ'-কুড়িতে এসে ঠেকেছে। আমাদের দেশে মেয়ের যত বয়েস তত দাম।'

'ভূতের দেশ। বুড়ি মেয়েকে টাকা দিয়ে বিয়ে করবে কে ?'

'আমার মতো বুড়োরাই। বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োও তো গজাচ্ছে।'

'তবে এক কাজ কর্। আট টাকা করে' পাচ্ছিস, কিছু-কিছু জমাতে সুরু কর্। বেগুনবালার বয়েস যখন পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাকে ধরে' ফেলতে পারবি।'

'আট টাকা ! সব গিয়ে জমি এখন তিন বিঘেতে এসে ঠেকেছে। ফসল যা ওঠে তাতে সংসারই কুলোনো যায় না। আগে খাবো, না খাজনা দেবো ! বাবার বুড়ো ঘাড়ে লাঙল ফেলে দিয়ে আমি এখানে পাখা টানছি, যদি খাজনাটা, সেস্‌টা, গোমস্তার তহুরিটার কিছু অংশও মেটাতে পারি। আমার আবার বিয়ে, আমার আবার ঘর ! সেদিন সোজাসুজি বলেছিলুম না বেগুনিকে—' হরেন্দ্র ঢোক গিলে কথাটা গিলে ফেললে।

'কী বলেছিলি ?' কথাটা ধরিয়ে দিলুম : 'বিয়ে করতে বলেছিলি ?'

ঘেমে, দম নিয়ে হরেন্দ্র বললে, 'বলেছিলুম, কী হবে এমনি বসে' থেকে, দিনে-দিনে দু'জনেই বুড়িয়ে গিয়ে ? টাকা তো আর তুই পাবি না, পাবে ঐ সন্নেসি-খুড়ো। মিছিমিছি সোয়ামির টাকা অপব্যয় করিয়ে লাভ কী ? চল্, আমরা দু'জনে চলে' যাই।'

মুহূর্ত্তে অনেকটা ফাঁকা আকাশ ও অনেকটা ঢালু মাঠ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। বললুম, 'বেগুনি কী বলল ?'

'ও ঠাট্টা করে' উঠলো, চোখ টেরিয়ে মাজা বেঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটলো : কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে !'

আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে-সঙ্গে হরেন্দ্রও হাসলো। কিন্তু মানুষে এমন ভাবে কেঁদে উঠতে পারে এ কখনো শুনিনি।

'যা, যা, ঢের হয়েছে। বিয়ে করিস নি, বেঁচে গেছিস। বিয়ে করলেই পাঁচ শো ঝঞ্ঝাট। ছেলে রে, পুলে রে, আজ এটা, কাল সেটা—একেবারে নাজেহাল করে' ছাড়তো। দিব্যি আছিস বিয়ে না করে', ভারও বোস্ না, ধারও ধারিস না। এই যে আমি এখনো বিয়ে করিনি, কী হয়েছে ? আমার তাতে মাথা ধরে, না চোরের মতো পরের জানলা দিয়ে উঁকি মারি ?'

সেদিন রাত ভরে' বারে-বারে আমারই কথাটা কানের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলো : এই তো আমি এখনো বিয়ে করিনি, কী হয়েছে ? সে কি কোনো অভাব, না শূন্যতা, না

শ্রান্তি, কী হয়েছে ? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না জানি, কিন্তু দুধ টকে' গেলে ঘোল হ'তে আর কতক্ষণ ! তৃষ্ণার যখন শেষ নেই, তখন ডিকেণ্টার সাজিয়ে কী দরকার !

একদিন হরেন্দ্রকে জিগগেস করলুম : 'তোর বাড়ী কোথায় ?'

'কোতলগঞ্জ। হিরণপুর ইস্টিশনে নেমে মাইল দুয়েক।'

'যাবো তোদের গাঁ দেখতে।'

হরেন্দ্র বিশ্বাস করতে চায় না।

'সামনে এই রথের ছুটি আছে, সেই ছুটিতেই যাবো। তুই আমাকে নিয়ে যাবি পথ দেখিয়ে।'

রথের ছুটির দিন সত্যিই তাকে স্টেশনে যাবার জন্যে গাড়ী আনতে বললুম দেখে হরেন্দ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। বললে, 'সত্যিই যাচ্ছেন নাকি, হুজুর ?'

'হ্যাঁ, দেখছিস না, সকাল-সকাল খেয়ে নিলুম।'

হরেন্দ্র আমতা-আমতা করে' বললে, 'আমাদের ওখানে দেখবার কী আছে ?'

'তোর বেগুনি আছে। দেখি সন্নেসিকে বলে'-কয়ে' তোর সম্বন্ধটা ঠিক করতে পারি কিনা।'

লজ্জায় ও আনন্দে হরেন্দ্রের সমস্ত মুখ ভরে' গেলো।

বললুম, 'কি, মাথা-ধরাটা একটু কম বোধ হচ্ছে ?'

হরেন্দ্র সস্নেহ চোখে বললে, 'আপনার ভারি কষ্ট হবে, হুজুর।'

'কিন্তু তোর কষ্ট যে দেখতে পারি না।'

'কষ্ট কেন, বেগুনিকে বিয়ে করতে পাবো না বলে' ?' হরেন্দ্রর অভিমানে ঘা পড়লো।

'না। একদম বিয়ে করতে পাচ্ছিস না বলে'। নে, গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়। বিকেলের ট্রেণেই ফিরে আসতে পারবো।'

দুপুর প্রায় দুটো, কোতলগঞ্জে সন্নেসি বাওয়ালির বাড়ী এসে পৌছুলুম। সন্নেসি মাঠে ছিলো, হরেন্দ্র ডেকে নিয়ে এলো। আমি যে কে, সবিস্তারে হরেন্দ্র তার বিজ্ঞাপন দিতে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি করে নি, কিন্তু মনে হলো সন্নেসি বিশেষ অভিভূত হলো না। মনে হলো প্যাণ্ট-কোট পরে' না আসাটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

তবু আমি যে জমিদারের নায়েব-গোমস্তার উপরে, এইটুকু সে অবিসম্বাদে বুঝতে পেরেছে। দাওয়ার উইয়ে-খাওয়া একটা চৌকি ছিলো; তাতে তেল-চিটচিটে ছেঁড়া একটা পাটি পেতে আমাকে সে বসতে দিলো।

বললুম, 'তোমার একটি মেয়ে আছে ?'

সন্নেসি ঘাড় নাড়লো, ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না।

'বিয়ের যুগ্যি ?'

'বউ ছেড়ে শাশুড়ি হবার যুগ্যি।' সন্নেসি একটা নিশ্বাস ছাড়লো।

'আমাকে একবারটি দেখাতে পারো ?'

এ-প্রশ্ন আরো দুরূহ। সন্নেসি হরেন্দ্রের মুখের দিকে অবোধের মতো তাকিয়ে রইলো।

'নতুন কিছু নয়, হরেন্দ্রর সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করতে চাই। কি, আপত্তি আছে ?'

'একটুও না।' সন্নেসি উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'টাকা পেলেই আমি ছেড়ে দিতে পারি। হরেন্দ্র ছাড়া ও-মেয়ের যুগ্যি পাত্রও সমাজে আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'খুব ভালো কথা। আমিই যখন হরেন্দ্রর মুনিব, তখন আমিই ওর বরকর্তা। কি বলো, ঠিক কিনা ?'

'ঠিক।' সন্নেসি মাথা নাড়লো।

'তবে বরকর্ত্তাকে একবার মেয়ে দেখাতে হয়। মেয়ে না দেখলে সে বুঝবে কি করে' কত তার দাম হতে পারে।'

'দাম হুজুর, হাজার টাকা, এক আধলাও কম নয়। এ আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে' বলে' আসতে পারি। তবে হরেন্দর গরিব-গুর্বো লোক, রয়ে'-সয়ে' মোটে ছ' কুড়ি টাকায় রফা করেছি।'

সে কথা পরে দেখবো। বললুম, 'মেয়ে তোমার বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখতে হবে নাকি ?'

'কেন, ডাকলেই চলে' আসবে এখানে।' বলে'ই সন্নেসি ডাকলো : 'বেগনি !' তার পর হাসিমুখে বললে, 'বাজার-হাট, গরু-চরানো, মাঠে আমাকে পান্তা দিয়ে আসা, আমার তামাক খাবার ফাঁকে লাঙল-ধরা, সবই তো আমার বেগুনি করে। সংসারে ওর মা নেই, ভাই-বোন নেই, কেউ নেই; আমার ওই সব।' বলে' আবার ডাকলো : 'বেগনি !'

গৌরবে তাকে দরজা বলছি, একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'কী করছিলি এতক্ষণ ?' সন্নেসি বললে।

হাসতে-হাসতে বেগুনি বললে, 'ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিলুম।'

এতদিন মেয়েদেরকে শুধু পোষাকের সংজ্ঞায় দেখে এসেছি, কিন্তু সেই আমার প্রথম দেখা, পোষাকের অতিরিক্ত করে' দেখা। কেননা মেয়েটির গায়ে সামান্য একটা সেমিজ পর্যন্ত নেই, মোটা লাল-পাড় কোরা একটা সাড়ি (সন্দেহ হচ্ছিলো ইতিমধ্যে সে বেশ-পরিবর্তন করে' এসেছে কি না) দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে সমান কুণ্ঠিত, মুখের কাছে আঁচলটা রাশীভূত করে' হাসি লুকোতে গিয়ে এখানে-ওখানে কিছু-কিছু সে বঞ্চিত করে' এসেছে—কিন্তু মনে হলো, দুপুরের রোদে গাছের ছায়াতে এসে যেন বসলুম। ভাবলুম রূপ কী, রূপ কোথায়? দেখতে ও নির্মল কালো, মুখশ্রী নিখুঁত সরল, বেশভূষার ঐ তো চেহারা, কিন্তু মনে হলো, এত সজীবতা এমন স্বাস্থ্য কোথাও আগে দেখিনি। যেন ও মাটি থেকে উঠে-আসা সতেজ লতা, তাতে রোদ পড়েছে, জ্যোৎস্না পড়েছে, শিশির পড়েছে, শক্ত তাজা সবুজ—তবু সে একটা লতা, সেতারের তার বা পেটিকোটের দড়ি নয়। ভাবলুম এতদিন স্লেপ-করা দাঁত, ক্রুসেন-সল্ট্ আর ট্যাঙ্গিকেই সৌন্দর্য বলে' এসেছি কারণ এতদিন বেগুনিকে দেখি নি।

বললুম, 'কি, হরেন্দ্রকে পছন্দ হয়?'

বেগুনি হাসছে, কেবল হাসছে, ঝলকে-ঝলকে হাসছে।

বললুম, 'টাকা চাই নাকি?'

বেগুনির ততোধিক হাসি, থরে-থরে পরতে-পরতে হাসি। আর সে-হাসির জলে উঠেছে লজ্জার তরঙ্গ। সেখানে সে আর দাঁড়াতে পারলো না।

সন্নেসিকে বললুম, 'কত নেবে ঠিক বলে' দাও।'

'আগেই তো বলেছি, ছ' কুড়ির এক আধলাও কম হবে না।'

'কী বলো যা-তা! টাকা দিয়ে তোমার কী হবে?'

'ওকে ছেড়ে দিয়েই বা আমার কী হবে? এমন মেয়ে আমি বিনি-পয়সায় বিদেয় করবো নাকি? কেউ করে কখনো?' সন্নেসি চোখ পাকিয়ে উঠলো।

'তা করে না। কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়া আর পাত্র কোথায়?'

'আর ও ছাড়াই বা আমার মেয়ে কোথায়?'

কোন দিক দিয়ে যে অগ্রসর হবো বুঝতে পাচ্ছিলুম না। বললুম, 'কিন্তু বিয়ে না দিয়ে মেয়ে কি তুমি চিরকাল আইবুড়ো রাখবে নাকি? ওরো তো সাধ-আহ্লাদ আছে।'

'ওর চেয়ে যার সাধ-আহ্লাদ বেশি দেখা যাচ্ছে, ছ' কুড়ি টাকা সে ফেলে দিক না। তা হলেই তো চুকে যায়।'

'হরেন্দ্র তা পাবে কোথায়? কর্জে-খাজনায় তলিয়ে আছে।'

'আর আমি সুখের সাগরে সাঁতার কাটছি, না? টাকা ক'টা পেলে মহাজনের নাকের উপর তা ছুঁড়ে দিয়ে জমিটা আমার ছাড়িয়ে আনতে পারি।'

'কিন্তু টাকা ক'দিনের?'

'বলে, এক দিনের জন্যেও পেলুম না, ক'দিনের!' সন্নেসি ভেঙচিয়ে উঠলো।

'এ-ও ভেবে দেখ, হরেন্দ্রর মতো পাত্র আর দুটি নেই। আজ ও পাখা টানছে, কাল ও আর্দালি হবে, ক'দিন পরেই আদালতের পেয়াদা। ভেবে দেখ, আদালতের পেয়াদা তোমার জামাই হবে।'

'তাই বলে' বিনা-পণে মেয়ে দেবো?' সন্নেসি রুখে উঠলো: 'সমাজে আমার একটা সম্মান নেই? লোকে বলবে কী আমাকে? নেমন্তন্ন খেতে ডাকবে না যে। ছি ছি ছি, সমস্ত সংসারে যা কেউ করলো না, দাম না নিয়ে মেয়ে ছাড়বো? হরেন্দর না হয়, মহেন্দর আছে, ও-পাড়ার রাইচরণ আছে, দুর্লভ আছে, দ্বারিক আছে—'

'সব, সব ওরা বয়েসে ছোট, হুজুর।' হরেন্দ্র একটা গুহার মধ্যে থেকে আচমকা শব্দ করে' উঠলো।

'তাতে বাধা কী! পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়ো যদি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, তার উল্টোটাই বা চলবে না কেন? কী করা যাবে, যদি বয়েস মেপে পাত্র না পাওয়া যায়! ছোট ছেলে বড়ো মেয়ে বিয়ে করেছে, আমাদের অঞ্চলে তা একেবারে অচল নয়। টাকা যার শাঁখা তার।'

'কিন্তু ছোটরা তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?'

'রাজি না হয়, বিয়ে হবে না। তাই বলে' জাত-জন্ম খুইয়ে বিনা-পণে মেয়ে বিয়ে দিয়ে সমাজের বা'র হয়ে যেতে পারি না তো।'

'সবই বুঝলুম, সন্নেসি—কিন্তু বাপ হয়ে মেয়ের কষ্টটা তুমি বুঝলে না সেইটেই বড়ো দুঃখ থেকে গেলো।'

সন্নেসি পালটা জবাব দিলো। বললে, 'আপনিও বা আপনার চাপরাশির কষ্ট বুঝে ট্যাঁক থেকে টাকা ক'টা ফেলে দিন না।'

এমনি একটা কথায় এসে শেষ হবে আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলুম। ট্যাঁকে হঠাৎ টান পড়তেই মনে হলো এ আমি কী ছেলেমানুসি করছি! কোথাকার কে হরেন্দ্র, তার মাথা ধরেছে বলে' আমার মাথা-ব্যথা! এক দিনের জন্যে নয়, সমস্ত জীবনের জন্যে একটা মেয়ের দাম একশো কুড়ি টাকা! হরেন্দ্রর মাঝে যে প্রসুপ্ত পুরুষত্ব আছে সেই একদিন আমাকে নির্লজ্জ কণ্ঠে অভিশাপ দেবে, তাকে জয়ী না করে' ভিক্ষুক করেছি।

উঠে পড়ে' বললুম, 'বাড়ী চল্, হরেন্দ্র। গাড়ীর সময় হলো।'

মাঠটা দু'জনে নিঃশব্দে পার হয়ে এলুম। হঠাৎ হরেন্দ্র লজ্জিত সৌজন্যে বললে, 'কোনো বাপই রাজি হয় না, হুজুর। যে-দেশে যেমন প্রথা। নড়চড় হবার জো নেই।'

উত্তর দিলুম না।

'বলা যায় না', হরেন্দ্র আবার বললে, 'হয়তো ঐ মহেন্দ্র কি দ্বারিকই শেষকালে বিয়ে করবে। কিন্তু, তাও ঠিক, ওদেরই বা অত পয়সা কোথায়? বলা যায় না, কর্জই করে' বসবে হয়তো।'

'করুক গে।' ধমকে উঠলুম: 'ঐ তো রূপের ডালি মেয়ে, তার জন্যে দশ-বিশ নয়, একশো কুড়ি টাকা! একশো কুড়ি টাকায় গ্রিনল্যাণ্ডের রাণী পাওয়া যায়।'

সেটা কী জিনিস—হরেন্দ্র ভেবড়ে গেলো।

তারপর অনেক দিন হরেন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখি নি। কিন্তু একদিন রাতে চাকরের ঘর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ শুনলুম, ঠিক কুকুরের কান্না। মনে হলো যে-কুকুরটা রোজ রাতে খেতে আসে তাকে ঘরের মধ্যে এঁটে বন্ধ করে' রেখে ঠাকুর হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথাও একটা বন্ধনের চেতনা মনের মধ্যে জেগে বসে' থাকলে সারা রাত আমার চোখে ঘুম আসবে না।

উঠোনটুকু পেরিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেলা দিলুম। দেখি কপালের উপর দিয়ে শক্ত করে' একটা দড়ি বেঁধে হরেন্দ্র দুই হাতে দেয়াল ধরে' বসে' তাতে মাথা ঠুকছে আর পশুর ভাষায় নির্বোধ আর্তনাদ করছে। মুহূর্তে সমস্তটা শরীর জমে' পাথর হয়ে গেলো।

বললুম, 'কী হয়েছে?'

হরেন্দ্র মুখ তুলে তাকালো না, বললে, 'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, ঘুমুতে পাচ্ছি না।'

মনে হলো ও একটা পরিপূর্ণ অবসাদ চায়, একটা অতলান্ত শান্তি, নিঃস্বপ্ন ঘুম—যে-ঘুমে মৃত্যুর আস্বাদ।

বললুম, 'আমার ঘরে আয়।'

হরেন্দ্র ঘরে এলো।

'এই ক'টা টাকা দিচ্ছি, কোথাও একটু ঘুরে আয় ক'দিন।

হরেন্দ্র ভাবলো আমি বুঝি ওকে বিদায় ক'রে দিলুম।

বললুম, 'মদ খাস? খেয়েছিস কখনো?'

হরেন্দ্র জিভ কেটে কান ম'লে মুখ-চোখের একটা বিবর্ণ চেহারা করলো।

'কী হলো, না খেয়েই ওক্ করছিস যে? খেলে ঠাণ্ডা হয়ে বিভোর ঘুমিয়ে পড়তে পারতিস।'

'কী সর্বনাশ!' মাথা ছেড়ে হরেন্দ্র যেন এবার তার বুকের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করলে। বললে, 'মরে' গেলেও ও-জিনিস মুখে তুলতে পারবো না, হুজুর। নইলে তো কলেই চাকরি নিতে পারতুম, অনেক মাইনে, অনেক উপ্‌রি। কিন্তু সেখানে শুনেছি সবাই ও-জিনিস খায়, সেখানে নাকি কারুরই চরিত্তির ভালো থাকে না।'

'সাধে আর তোদের চাষা বলে! যা, দেয়ালে মাথা ঠোক্ গে যা।

হেসে ফেললুম। এবং সে-হাসিতে হরেন্দ্র যেন অনেকখানি অভয় পেলো। বললে, 'আর যাই হোক, হুজুর, চরিত্তির খোয়াতে পারবো না।'

বললুম, 'তবে এক কাজ কর্, একটা চাঁদার খাতা খুলে ফ্যাল্। যেচে-মেগে ছ' কুড়ি টাকা তুলতে চেষ্টা কর্ ঘুরে-ঘুরে। যদ্দিনে পারিস। নে, এই পাঁচ টাকাই আগে তোকে দিতে যাচ্ছিলুম। আমারই এই প্রথম চাঁদা—নে, তুলে রাখ বাক্সোয়।'

হরেন্দ্র হাত পেতে টাকা নিলো, নোটটা কপালে ঠেকালো ও মুহূর্তে ঝরঝর করে' কেঁদে ফেললে।

তারপর দেখতে-দেখতে এসে গেলো পূজোর ছুটি—পাথার সিজ্‌ন্ চলে' গেলো বলে' হরেন্দ্র বিদায় নিলো।

জিগগেস করলুম : 'কত জুটলো এত দিনে ?'

'বারো টাকা সাড়ে তিন আনা।'

'ছ্যাথ্, বারো বছরে যদি সাধনায় সিদ্ধি মেলে।'

এর পর প্রায় ছ' মাস হরেন্দ্রর কোনো খবর রাখিনি। কিন্তু ফিরতি মার্চ মাস এসে পড়তেই দেখলুম পাথার উমেদার হয়ে সে উপস্থিত।

যা ছিলো তারো আধখানা হয়ে গেছে। চোখ মেলে যেমন তাকানো যায় না, চোখ বুজলেও তেমনি ভয় করে।

পাশে ছাতাটা নামিয়ে রেখে হরেন্দ্র গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলো।

বললুম, 'কেমন আছিস ?'

'ভালো নয়, হুজুর।'

'চাঁদার খাতায় কত হলো এতদিনে ?'

'একুশ টাকাটাক হয়েছিলো—যেমন জোরালো করে' আপনি লিখে দিয়েছিলেন।'

'হয়েছিলো মানে ? টাকাটা কোথায় ?'

'আর টাকা !' মেঝের উপর দুই হাত চেপে রেখে হরেন্দ্র হাঁপ নিলো। বললে, 'বসন্ত হয়ে গরু একটা মরে' গেলো, দেখলুম লাঙল চলে না, সেই টাকা দিয়ে বাবাকে গরু কিনে দিয়েছি।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলুম। বললুম, 'তবে আর পাখা কেন ? বাপে-পোয়ে মিলে লাঙল ঠেলো গে যাও। এবার আমি অন্য লোক নেবো—তোমার এখানে পোষাবে না।'

কিন্তু সেই দিনই এমন একটা কাণ্ড ঘটে' গেলো যাতে হরেন্দ্রকে রাখতে হলো।

পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কে একজন এখানে স্বামীজী এসেছেন চাঁদা সংগ্রহ করতে। কি-একটা অবলা-আশ্রম না মাতৃমন্দিরজাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে।

স্বামীজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' অনেক রকম কথা হলো। তাঁদের প্রধান কাজ ও সমস্যা হচ্ছে অভাগিনীদের সমাজে ফের স্থান দেয়া, গৃহ দেয়া, গৃহস্থজীবনের নির্মল পরিবেশ তৈরি করে' দেয়া। যার স্বামী ছিলো তাকে ফের স্বামীর ঘরে আসন দেয়া, যার ছিলো না তাকে দেশের সেবার উপযুক্ত করে' তোলা, আর যে কুমারী তাকে সুরক্ষিত পত্নীত্বে নিয়ে যাওয়া।

বললুম, 'আমাকে একটি পাত্রী দিতে পারেন ?'

'কার জন্যে ?'

'আমার পাঙ্খাপুলারটার জন্যে।' বলে' হরেন্দ্রর অশ্রু-রক্তহীন প্রস্তরীভূত জীবনের কাহিনী বললুম, শেষ পর্যন্ত তার একুশ টাকার চাঁদায় হালের গরু কেনা অবধি।

'এই হিন্দু সমাজ' স্বামীজী বক্তৃতায় বিস্ফারিত হয়ে উঠলেন।

বললুম, 'নিচু জাতের মেয়ে-টেয়ে আছে ?'

'তারাই তো বেশি।'

'তবে দিন একটি জোগাড় করে'। আমার হরেন্দ্র খুব ভালো ছেলে। আর যাই হোক, তার চরিত্র সম্বন্ধে ফার্সট-ক্লাশ সার্টিফিকেট দিতে পারি।'

স্বামীজী হাসলেন। বললেন, 'খাওয়াতে পারবে তো ?'

'সেটা আপনার সহরের শিক্ষিত ছেলেদের সমস্যা। হরেন্দ্রর মতো যারা গরিব, তারা স্ত্রীদের খাওয়াবার চিন্তায় ভয় পায় না। সম্পদে-দারিদ্র্যে তাদের সমান সাহস। দিন একটি জোগাড় করে'। রাণীর মতো সুখে থাকবে।'

'তবে আমার সঙ্গে চলুন। পছন্দ করে' আসবেন।'

হাসলুম : 'এর আবার পছন্দ !'

'তবু চলুন, কাল রোববার, দেখে আসবেন আমাদের আশ্রম।'

হরেন্দ্রকে কিছু বললুম না। শুধু বললুম, 'পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিস, দুটো দিন এখানে জিরিয়ে নে।'

পরদিন স্বামীজীর সঙ্গে রওনা হলুম।

আশ্রম বলতে ভাঙা একটা দোতলা বাড়ি, নিচে আপিস বলতে একটা আলমারি আর গোটা দুই টেবিল-চেয়ার। প্রতিষ্ঠান সবে সুরু হয়েছে, কিন্তু এরি মধ্যে বাসিন্দা হয়েছে বিস্তর। উপরে গোলমাল, চেঁচামেচি, খানিকটা বা ঝগড়া-ঝাটির মতো শুনতে পেলুম।

স্বামীজী উপরে একটা ফাঁকা ঘরে আমাকে নিয়ে এলেন। পর পর তিনটি মেয়ে এনে হাজির করলেন। বললেন, 'এরা কেউই বিবাহিত নয়।'

জাত-গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার আর দরকার ছিলো না, কেন না বেগুনিকে আমি চিনতে পেরেছি। আমাকে মনে

করে' রাখবার ওর কথা নয়, কিন্তু দেখলুম, কোথায় তার সেই রূপালি হাসি, কোথায় তার সেই সবুজ স্বাস্থ্য! যেন এক কটাহ কালিতে তাকে আধ-সেদ্ধ করে' কে তুলে এনেছে।

ওর ইতিহাস জানতে চাইলুম। স্বামীজী খাতা-পত্র বের করে' এনে ওর কাহিনী বললেন। সেই মোটা মামুলি কাহিনী, খবরের কাগজ খুললেই যা চোখে পড়ে।

'কন্‌ভিক্‌শান হয়েছে ?'

'কয়েক জনের। ছাড়াও পেয়েছে কয়েকজন।'

'আর কোথাও আশ্রয় মিললো না মেয়েটার ?'

'না। বাপ ছিলো, কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি হলো না।'

'ভালো কথা। একেই তবে নির্বাচন করলুম। কিন্তু ওর মত আছে তো বিয়েতে ?'

'এক্ষুণি।' স্বামীজী হাসলেন: 'বিয়েতে আবার কোন মেয়ের মত নেই ?' পরে স্নিগ্ধস্বরে অদূরবর্তিনী বেগুনিকে সম্বোধন করলেন: 'কি মা, বিয়েতে মত আছে তো? স্বামী গরিব হোক, কুৎসিত হোক, তার সঙ্গে ঘর করে' তাকে সেবা করে' তার সঙ্গে সুখ-দুঃখ সয়ে নিজে তুমি সুখী হতে পারবে না ?'

অশ্রু-ভরভর চোখে বেগুনি ম্লানমধুর গলায় বললে, 'পারবো।'

রাত্রেই ফিরে এলুম। ডাকলুম হরেন্দ্রকে।

হাসিমুখে বললুম, 'কি, বেগুনিকে বিয়ে করবি ?'

হরেন্দ্র নিরবয়ব শূন্যের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললে, 'কাকে ?'

'বেগুনিকে।'

'বেগুনিকে ?' হরেন্দ্র ভীত একটা আর্তনাদ করে' উঠলো: 'সে কোথায় ? তাকে পাওয়া গেছে ?'

যেন কিছুই জানি না এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম, 'কেন, কোথায় যাবে সে ?'

'তাকে হুজুর, ধরে' নিয়ে গেছলো। কত থানা-পুলিশ, কত দাদ-ফরিয়াদ। তারপর বাপ যখন তাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিলো না, শুনলুম বিবাগী হয়ে সে চলে' গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।'

'ভালোই তো হয়েছে বাপ তাকে নেয়নি। তাই আজ তুই ইচ্ছে করলেই তাকে বিনা-পণে বিয়ে করতে পারিস।'

'কোথায় সে ?' হরেন্দ্রর দুই চক্ষু যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

'যেখানেই থাক, নিরাপদে আছে। কিন্তু আমার কথার জবাব দে। তাকে তুই বিয়ে করতে রাজি আছিস ?'

'এক্ষুণি।'

'তার এই অবস্থায়ও ?'

'তার এই অবস্থা কে করেছে, হুজুর ?'

'কে ?'

'তার বাপ, যে ছ' কুড়ি টাকার এক আধলা কমেও মেয়ে ছাড়বে না বলে' প্রতিজ্ঞা করেছিলো; আমি যে পুরুষ হয়ে জন্মে'ও এ ক' বছরে সামান্য ও-ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারিনি।'

'বিয়ে যে করবি খাওয়াবি কী ?'

'শাক-ভাত, নুন-আলুনি, ভগবান যা দেবেন।'

'থাকবি কোথায় ?'

'কেন, গাঁয়ে আমার ঘর নেই, জমি-জমা নেই, হাল-গরু নেই ?'

হরেন্দ্রকে মুহূর্তে আজ প্রকাণ্ড বড়োলোক মনে হলো।

বললুম, 'যা, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে এখন।'

'ঘুম! ঘুম কি আমার কোনোদিন আসে ?' হরেন্দ্র চলে' যাচ্ছিলো, আবার ফিরলো: 'কিন্তু হুজুর, সে বেশ ভালো আছে তো ?'

বই একটা টেনে নিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক দেখাবার চেষ্টায় নির্লিপ্তের মতো বললুম, 'আছে।'

হরেন্দ্র আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে সরে' গেলো। আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করবে কিনা এই যেন সে ভাবছে।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, হরেন্দ্র বাড়ী নেই। ঠাকুর বললে, শিগগিরই নাকি তার বিয়ে, তাই বাড়ী চলে' গেছে তোড়জোড় করতে। ট্রেণ-ভাড়ার পয়সা নেই, এদিকে নাকি সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তাই রাত থাকতে উঠে পায়ে হেঁটেই সে চলে' গেছে। আশ্চর্য, ছাতাটা কিন্তু নেয় নি, ও যে শিগগিরই ফের ফিরে আসবে রেখে গেছে তার নিদর্শন।

কিন্তু সেই যে গেলো, হরেন্দ্রের আর দেখা নেই।

মাসখানেক পরে এক সন্ধেবেলা বাবার টেলি এসেছে — আসছে একুশে এপ্রিল আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে, যেন এখুনি আমি ছুটির জন্যে দরখাস্ত করি—ঘুরে-ফিরে বারে-বারে সেই টেলিটাই পড়ছি, এমন সময় হরেন্দ্র এসে হাজির।

একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে আমার পায়ের কাছে বসে' পড়ে' দুই হাতে মুখ ঢেকে আকুল কেঁদে উঠলো।

'কি, কী হলো আবার ?'

'কাউকে রাজি করাতে পারলুম না, হুজুর।'

'কিসের রাজি ?'

'আমার বিয়ের। বাবা, ভাইরা, সবাই এর বিরুদ্ধে, পাড়া-প্রতিবাসী, জ্ঞাতি-কুটুম, স্বজাতি-বিজাতি সবাই। জমিদারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা—বলে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে' দেবো। সন্নেসি-খুড়ো শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—বেগনি যদি ফের গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচি-কুচি করে' শেয়ালের মুখে ধরে' দিয়ে আসবো। পারলুম না, কিছুতেই রাজি করাতে পারলুম না।' সঙ্গে-সঙ্গে তার উদ্বেলিত কান্না।

চুপ করে' শুনলুম। আর ভাবলুম।

তার এই অবস্থাতে তার হাতে পাখাটা আবার ছেড়ে দিই—সবাই পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি ওকে কিছুতেই কাজ দিলুম না এবং বাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চলে' যেতে বললুম। তার আর কোনোই কারণ নেই, সম্প্রতি আমি বিয়ে করে' স্ত্রী ঘুরে আনছি, এ-সময়টায় আমারই চারপাশে একটা বুভুক্ষু উপবাসী মানুষের নিরুপায় যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

স্মৃতি

শ্রীমতী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

রোজ সন্ধ্যার পরে
মলিন মেয়ে জ্বেলে যায় দীপ কি জানি কাহার তরে ;
রোজ আসে একা কবরের পাশে প্রদীপটি লয়ে করে ;
বন্ধনহারা আঁখি দুটি হতে জলধারা পড়ে ঝ'রে।
তারপর সেই ছোট হাত দুটী তুলে সমাধির গায়
ছোট্ট সে মেয়ে কি যে ব'লে যায় বুঝিতে পারি না হায়।
সুন্দর ফুলে সুন্দর ক'রে সাজায় কতই ছলে
শেষ হ'লে কাজ ছলছল চোখে ফিরে যায় বাড়ী চ'লে।

একদিন তারে ডাকি
বলিলাম রোজ হেথা এসে খুকি কাঁদ কেন থাকি থাকি ?
কবরের তলে আছে কেবা তব আমারে বলিবে চল ;
কাঁদ কেন ভাই এইটুকু প্রাণে কি যে ব্যথা আছে বল।
গভীর এ বন রবির আলো যে পড়িতে পারে না ঝরে ;
সাঁঝের বেলায় আসিতে তোমার ভয় নাহি কভু করে !
তোমার মনের গোপন ব্যথাটি বল বল আজ খুলে,
কাহার এ গোর কেনই বা তুমি সাজাও যতনে ফুলে ?

ধীরে ধীরে তুলে আঁখি
কি বলিতে চায় বিষাদের ছায়া দেয় মুখ তার ঢাকি ;
মুছে ফেলে নীর নীচু ক'রে মাথা থেকে থেকে মোরে কয়—
জান না বন্ধু সমাধির মাঝে মা যে গো আমার রয়।
একদিন রাতে অসুখ শরীরে শিয়রে আমারে ডাকি-
বলেছিল দিস্ মোর গোরখানি মাধবীলতায় ঢাকি।
খর রবিকর সমাধির পরে কভু যেন নাহি পড়ে
গাছের পাতার সিক্ত শিশির পড়িবে নিশীথে ঝরে !

আমারে কাছেতে ডেকে
বলেছিল—মাগো, ভুলিস্‌নে মোরে—আসিবি আমারে দেখে
প্রতিদিন এই সন্ধ্যা বেলায় কবরের পাশে গিয়ে
সাদা ফুল আর মাটীর প্রদীপ আস্‌বি সেথায় দিয়ে।
তাই আসি রোজ এমন সময় এই নির্জ্জনে একা—
গভীর এ বন কোন লোকজন যায় না ক' কভু দেখা।
চোখ দুটি তার জলে ভরে আসে বলিতে পারে না আর
সমাধির বুকে ঝরে ঝরে পড়ে বালিকার আঁখিধার।

শিল্পী-পরিচয়

শ্রীপ্রকাশ বসু

(প্রবন্ধ)

কিছুদিন থেকে ভারতীয় চিত্রকলায় অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর জীবনীশক্তি গেছে হারিয়ে, হয়ে দাঁড়িয়েছে



উর্বশীর জন্ম

শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। প্রতি বৎসরের চিত্রপ্রদর্শনী-গুলিতে ও মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় এর নিদর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্ছে। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে, এর পত্তন হয়েছিল ক্লাসিক্স এবং আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানের উপরে। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরেও এদিকে ভারতীয় চিত্রকলা কি নিজেকে বিশেষ প্রগতিশীল বল্তে পারে? টেক্‌নিকের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলেও ভারতীয় চিত্রীরা নিজেদের প্রগতিশীল অথবা জীবিত বল্তে পারেন না। ভারতীয়



অর্দ্ধনারীশ্বর

চিত্রশিল্পে টেক্‌নিকে যা-কিছু experiment করা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই প্রথম যুগে। আজ ভারতীয় শিল্প-জগতে চিত্রী অনেক, কিন্তু যথার্থ শিল্পীর দেখা মেলে না।

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের শিল্প-ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন তার জীবনীশক্তি আসে কমে—

গতিবেগ যার ফুরিয়ে—আর স্বষ্টি পর্য্যবসিত হয় সাধারণ অনুকরণে। শিল্পী যখন আপনার বিকাশের নূতন নূতন পথ খুঁজে নিতে পারে না—পরিপার্শ্বের জীবনের তথা ইতিহাসের, সাথে তার সম্বন্ধ যখন ক্ষীণ হয়ে আসে—নানা দেশের জীবিত শিল্পকলা থেকে সে যখন রস সংগ্রহ করতে পারে না তখনই তা হ'য়ে ওঠে গতানুগতিক, তথা anæmic.

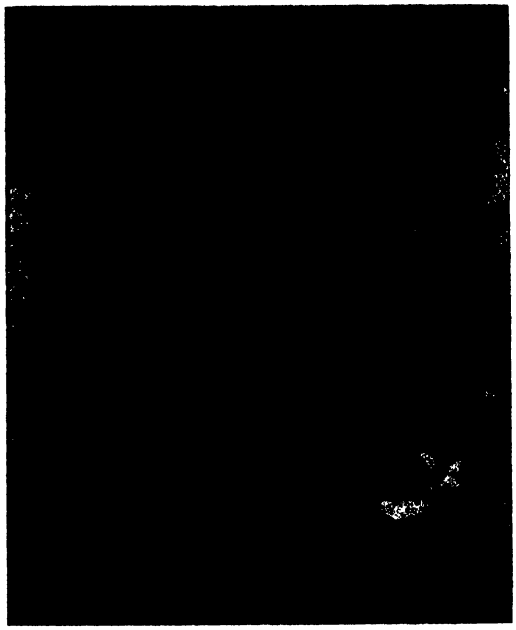
ভারতীয় চিত্রশিল্পের জন্মস্থান খুঁজতে আমাদের যেতে হয় অজন্তায়। সেই প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন চিত্রকলার অনুকরণ ও অনুসরণে ভারতীয় চিত্রকলা খুঁজতে চেয়েছিল নিজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু আজ তা পর্য্যবসিত হয়েছে বদ্ধ



সেণ্ট জর্জ্জ ও ড্রাগন

গলিতে। ভারতীয় চিত্রকলার গভীর দর্শনপ্রসূত ধ্রুপদি ভঙ্গি আজ শুধু ফাঁকা ঐতিহ্যে ঠেক খেয়েছে; ঠিক ঐতিহ্যও নয়, কেন না, ঐতিহ্যেরও একটা বিশেষ ঐতিহাসিক, তথা সামাজিক মূল্য আছে; অনেক সময় নেহাৎ ঐতিহ্যেরই আওতায় অনেক art-movement দাঁড়িয়ে গেছে এবং আমাদের চিত্রশিল্পে শুধু পাই ঐতিহ্যের খোলস। এ স্থানে আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় উত্থাপন করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক বাংলা কবিতায় একটা নূতন প্রাণশক্তি দেখা দিয়েছে—সে প্রাণশক্তি এসেছে পুরাতন ক্লাসিক্স থেকে। আমাদের চিত্রশিল্পেও আশা করি, এই ধ্রুপদি ঐতিহ্যের পুনরাগমন নূতন প্রাণসঞ্চার করবে।

তরুণ বাঙালী চিত্রশিল্পী তারাদাস সিংহ এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রণী। তারাদাসের চিত্রে এই ধ্রুপদির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু সব পুরাতন ক্লাসিক্স থেকেই নেওয়া। তারাদাসের অনুশীলন শুধু ভারতবর্ষীয় ক্লাসিক্স-এই আবদ্ধ নয়, বরঞ্চ তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ চিত্রের বিষয়বস্তু তিনি আহরণ করেছেন পুরাতন গ্রীক্ ক্লাসিক্স থেকে। সমস্ত দেশেই ধ্রুপদি ঐতিহ্যের ধারা এক, তা সে ভারতবর্ষই হোক্ আর গ্রীস্-ই হোক্। তারাদাস



মিডিয়া কর্ত্তৃক ড্রাগন বশীকরণ

সিংহ-ই প্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী—যিনি শুধু ভারতীয় ক্লাসিক্স-এর মাঝেও তার গতানুগতিক অনুকরণে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি; বরং তাঁর স্রষ্টা মন বিদেশের ক্লাসিক্স-এর মধ্যে দিয়ে তার বিকাশের নবতম পথ খুঁজে পেয়েছে।

তারাদাসের এই জাতীয় দুখানি চিত্র—St. George and the Dragon" ও "Medea charming the Dragon"-এ গ্রীক্ ক্লাসিক্যাল বিষয়বস্তুর সাথে ভারতীয় চিত্রকলার ধ্রুপদি ঐতিহ্যের এক অপূর্ব্ব সংমিলন পাই। এই দুটি অনবদ্য চিত্রের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,

তারাদাস সাধারণ শিল্পীদের মত নিজেকে ক্লাসিক্স-এর বাহ্যিক সঙ্কীর্ণতার মাঝে হারিয়ে ফেলেন নি। তিনি এই সঙ্কীর্ণতা উত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসিক্স-এর গভীরতর ইঙ্গিতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ডাক্তার কুমারস্বামীর মতে—"Works of art are an integration of the self and by them the sacrificer likewise integrates himself (আত্মানম্ সংস্কুরুতে) in the mode of the rhythm !" তারাদাসের চিত্রে আমরা এই আত্ম-সংস্কৃতির আভাষ পাই।

এই অতি-সাধারণ চিত্রের যুগে তারাদাসের আর একটি অসাধারণত্ব এবং বিশেষত্ব হচ্ছে, তাঁর চিত্রের আলঙ্কারিক



মা—কালী

সৌন্দর্য্য ও বর্ণলেপনার অপূর্ব্ব সুষমা। তাঁর বর্ণলেপনের তথা অলঙ্কারের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তাঁর "উর্ব্বশী", "কালী", "অর্দ্ধনারীশ্বর" এবং "St. George and the Dragon" প্রভৃতি এই জাতীয় ছবির পর্য্যায়ে পড়ে। তাঁর এই ছবিগুলি, বিশেষ ক'রে 'উর্ব্বশী' ও 'কালী' ছবি দুখানিতে বোঝা যায়, তাঁর শিল্প-সাধনার উৎকর্ষ। এই অতি-সাধারণ পুরাতন বিষয়বস্তু তাঁর হাতে পড়ে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারাদাস বয়সে নিতান্ত তরুণ হ'লেও এর মধ্যেই উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ইনি লক্ষ্ণৌ কলা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এঁর ছবি বহু চিত্রামোদী ব্যক্তির কাছে এবং শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রশংসা লাভ করেছে। ইনি Academy of Fine Arts, লাহোর শিল্পসমিতির প্রদর্শনী, মহীশূর প্রদর্শনী এবং আরও অন্যান্য শিল্প-প্রদর্শনী থেকে বহু পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের 'বার্লিংটন্ গ্যালারীজ্'-এ ভারতীয় চিত্রকলার যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে এঁর চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল এবং সম্রাজ্ঞী মেরী এঁর চিত্রগুলির মধ্যে "সূর্য্য" নামক চিত্রখানি ক্রয় করেছিলেন। এই সংবাদটা হয় ত সকলে ভারতের, এমন কি, লণ্ডনেরও সকল সংবাদপত্রে পাঠ ক'রে থাক্‌বেন।

গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তারাদাস সিংহ "শুভাকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম পরিকল্পনা প্রতিযোগিতায়" (All-India Greeting Telegrams Design Competition) ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার তিনশত টাকা পেয়েছেন। এ সংবাদও আপনাদের অজানিত নয়। এরূপ কত যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র ইনি পেয়েছেন তা লিখে জানানো আমার পক্ষে অসম্ভব।



শিল্পী—শ্রীতারাদাস সিংহ

আমি এই তরুণ শিল্পী শ্রীমান্ তারাদাস সিংহের শুভ-কামনা করি এবং ভবিষ্যতে তিনি যেন তাঁর চিত্র অঙ্কনের অদ্ভুত নৈপুণ্যের দ্বারা চিত্রজগতকে বাঁচিয়ে রাখেন।

প্রদত্ত কয়েকখানি চিত্র থেকে পাঠক-পাঠিকাগণ শ্রীমান্ তারাদাসের চিত্র-শিল্পের নমুনা পাবেন। যদিও সাদা-কালোয় তাঁর সেই অদ্ভুত বর্ণসুষমার সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব, তবুও আপনারা এই তরুণ শিল্পীর নবীন দৃষ্টিভঙ্গী ও শুদ্ধ অঙ্কন-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারবেন না।

একদিক

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বি-এস-সি

শশিকান্ত ওরফে শশা ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমার বিছানাটার ওপর ব'সে পড়ে। ছাতাটাকে একপাশে রেখে হাতের ছোট পুঁটুলীটাকে সন্তর্পণে কোলের কাছে টেনে বলে, আরে বাস্ রে, মেসটা বদলে ফেলেচ কেন হে, খুঁজে পেতে কি কম কষ্ট হ'য়েছে মনে কর?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবেই বলি, তা কষ্টটা করতে কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল? এত কষ্ট না করলেই পারতে!

শশা হেসে বলে, আরে কষ্ট না ক'রে কি পারি? আজকালকার ছেলেরা, অবশ্য আমি বাদে, কষ্ট না ক'রেই ত মরতে বসেছে। কাজ চাই, কষ্ট চাই, তবেই না ভগবান স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। এসব কি সোজা মনে করেছ নাকি!

বলি, খানিকটা মাটী কোপালেও ত পারতে। গা দিয়ে ঘাম বেরুত, আর ভগবান হাতে এসে পৌঁছতেন।

ও বলে, এসব হচ্ছে উপলক্ষ মাত্র। নিমিত্তের ভাগী কাউকে না করলে কি চলে? যাকগে, বড্ড শীত পড়েছে—কলকাতা কি দার্জ্জিলিংয়ের পাশে উঠে গেছে নাকি? চাকরটাকে ডাক না একবার। ওহে, ও চাকর, কি নাম রে—বাপু, পরিতোষ? তা যাই হক, এসই না এদিকে। ও নিজেই ডাকতে সুরু করে।

বলি, শীত আবার পেলে কোথায়? এই ত সবে শীতের হাওয়া দিচ্ছে।—

ও রেগে ওঠে, বলে, থাম, শীতের কি বোঝ বল ত? আছ কলকাতায় ভারী মজা, বিয়ে করনি—শীত ত করবেই না। আমার মত হ'ত একটা মেয়ে—হাড়ে হাড়ে শীত পাইয়ে দিত। ছ'বছরের মেয়ে হ'লে কি হয়, ভাবনা ত আর কম নয়। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, হাতে আর মাত্র দশ-বারটা বছর আছে। ওরে বাবা, কেটে এল ব'লে।

হেসে ফেলি ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে; বলি, আচ্ছা শীত না হয় পড়েছে'খুব; কিন্তু শীতের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক এখন?

ও জবাব দেয়, বটে! শীতের সঙ্গে কি সম্পর্ক? বেশ, শীত পড়েনি, ভীষণ গরমই আছে, তা হোকগে তবু—চা আমি খাবই। ভীষণ গরমে দুপুর বেলা বসেও আমি চা খেতে পারি।

না হেসে থাকা যায় না। চাকরটাকে ডেকে এক কাপ চা আনতে বলি।

ও ব্যস্ত হ'য়ে বলে, কিন্তু শুধু চা এন না বাপু—একটা মামলেটও সে সঙ্গে এনো।

চাকরটা ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যায়।

এবার ওর মুখের দিকে চেয়ে বলি, তারপর আবার কলকাতায় কি মনে ক'রে? টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে বুঝি?

ও বলে, টাকা ছিলই বা কবে! আরে ধ্যাৎ, তোমার কাছে এসব গোপন কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। যা বলেছি একেবারে ভুল। হ্যাঁ ভুলই ত, টাকা ছিল না আবার! তবে এখন নেই সেটা ঠিক। আর হতেই বা কতক্ষণ। ও সবের মজা কি জান, যখন আসে বন্যার মত আসে, বন্যা দেখেছ ত? না দেখলে ধারণাই করতে পারবে না।

সহানুভূতির সুরে বলি, তা ঠিক, কিন্তু কবে যে বন্যা আসবে তা কে জানে?

ও চটে যায়; বলে, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বল কেন? এত বড় গভর্ণমেন্ট, সে-ই টের পায় না কখন কোথায় বন্যা আসবে, আর তুমি কি-না মেসের ঘরে বসে—! হাসিও না আর এসব কথা ব'লে।

আমার একটু রাগ হয়; বলি, সে আশায় তুমি ব'সে থাকতে পার বটে কিন্তু সবাই ত আর তার দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না।—পরের থেকে এমনি ভাবে পয়সা ভিক্ষে ক'রে আর কতদিন চলবে? কেই বা আর তোমাকে ব'সে ব'সে খাওয়াবে বল!

চা আর মামলেট্ এসে যায়।

মুহূর্ত্তেই মামলেট্‌টাকে শেষ ক'রে চায়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ও বলে, ভিক্ষে মানে? তুমি ব'লতে চাও কি? অপমানিত হবার জন্যে ত আর তোমার এখানে আসিনি। আমার কাজ আছে তাই এখানে কয়েক দিন থাকব আমি—এখন তুমি চাকরি কর, আমি করি নে, তোমার বিয়ে হয়নি, আমার হয়েছে—কিন্তু স্কুলের কথা মনে ক'রে দেখতে পার—এমন কিছু ভাল ছেলে তুমি ছিলে না।—ভিক্ষে আমি কোন দিনই করিনি, করবও না।

স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ ক'রেই বলি, তবে কি কর তুমি? ভিক্ষে নয় ত কি ও?

ও রাগ ক'রে বলে, ধার ব'লে একটা কথা আছে তা কি ভুলে গেছ নাকি? ধার কি তোমরাই কর না? তবে শোধ দেওয়ার কথা আলাদা। অবশ্য শোধ একদিন হবেই নিশ্চয়।

ওর কথা শুনে হাসি পায়, কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে বলি, আজ পর্য্যন্ত কত ধার হ'ল?

ও বলে, তা বলতে পারি না, যাদের গরজ তাদের মনে আছে নিশ্চয়।—

আস্তে আস্তে বলি, তাদেরও মনে আছে কি না সন্দেহ। তবে কি জান, একটা কিছু জোগাড় ক'রে নাও, কতদিন আর মানুষে ধার দেবে?

শশার মুখ শুকিয়ে ওঠে, একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলে, এই খোঁড়া পা নিয়ে কিই বা করি? অমন যে নিকৃষ্ট কাজ চুরী করা, তাও খোঁড়া পা নিয়ে হবার উপায় নেই—ভাল কাজ করব কি ক'রে? আর কটা বছর কেটে গেলেই হয়, মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে ত।

ওকে গালাগালি দিয়ে কোন লাভই নেই, আর দেওয়াটা উচিতও

হয় না ; বলি, মেয়ের বিয়ে ? সবে ত হ'ল একটা। মাথার কি গোলমাল হয়েছে নাকি কিছু ? এখনও অন্তত বারটা বছর ত আছে।

ও হাসে ; বলে, তা বটে, কিন্তু যাদের সম্বল নেই তাদের কাছেও সময়টা খুব বেশী নয়। ফুরিয়ে যেদিন যাবে সেদিন যে একেবারেই শেষ ক'রে দেবে।

কথাটার মোড় ফেরাবার জন্যে বলি, ভাল কথা, আমাদের মামার বিয়ে হয়েছে তা জান ত ? সেই যে আমাদের সঙ্গে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল।

ও মাথা নেড়ে বলে, মনে আছে হে, তাকে ভোলা সহজ নয়। তার মত বোকা লোক পৃথিবীতে আর আছে কি না জানি নে, কিন্তু তার বিয়ে হ'ল কি ক'রে ?

'বিয়ে হ'ল কি ক'রে মানে ?' প্রশ্ন না ক'রে পারি নে।

ওর মাথা ন'ড়তেই থাকে, বলে, কোন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ত ! ,

বলে কি ? ওর মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থাকি।

ও হঠাৎ সোজা মুখের দিকে চেয়ে বলে, বিয়ের সময় ঝপাং ক'রে আওয়াজ হয়েছিল ত ?

না, ও আমায় পাগল ক'রে দেবে। প্রশ্নগুলো যেন রহস্যময়। মরীয়া হ'য়ে বলি, তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ? ঝপাং ক'রে আওয়াজ হ'তে যাবে কেন ?

এবার ও জোরে জোরে হেসে ওঠে, বলে, তুমি একেবারেই 'গ্রীন' দেখছি। এসব বোঝবার মত মাথা তোমার কোন কালেই হবে না। আরে, একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে জলে ফেলে দিলে আর ঝপাং ক'রে আওয়াজ হবে না ! এ যে হ'তেই হবে—নির্ঘাৎ। নাঃ, মজাটা উপভোগ করতে দিলে না, বড্ড ফাঁকি দিয়েছে কিন্তু। এবার দেখা হ'লে 'ফেস্' একেবারে 'লাইম' করিয়ে দেব।

হাসতেই হয়। কিন্তু আর ব'সে থাকতেও পারি নে, অফিস ব'লে একটা মস্ত চাকা আছে যার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা আছে আমার। স্ত্রীজাতির চেয়েও তার আকর্ষণ অনেক বেশী।

শশাও উঠে প'ড়ে বলে, আমিও চলি, একটু কাজ আছে, জগদীশদের সঙ্গে দেখা করতে হবে—বিকেলে আসব, তার পর এখানেই কদিন। হ্যাঁ, ভাল কথা, আজ একটু 'লেদারের' ব্যবস্থা ক'র, অনেক দিনই ত নিরামিষ গেছে কি না।

পরের দিন চা-পান করতে করতে ও বলে, জগদীশটা নেহাৎ বোকা—আমাদের সেই মামারই মত আর কি। বলে কি-না ব্যবসা করব।

ব্যবসা করার সঙ্গে বোকা হওয়ার কি যোগাযোগ থাকতে পারে তা ভেবে পাই নে, ওর মুখের দিকে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে থাকি।

ও মুচ্‌কি হেসে বলে, না, জগদীশের আর দোষ কি, সবাই ওর মত। ওকে বললুম, ব্যবসা করতে চাও ত এস আমার সঙ্গে। বাপু, আর কিছু না থাক—মগজটা ত আছে খুবই সাফ। ও একটি নিরেট, বলে, তোর 'প্রেস্‌টিজ' কোথায় ?

ছেঁড়া কাপড়টা দেখিয়ে বলি, এইখানে। ও কিন্তু ঘাবড়ে যায়।

ওর মুখের দিকে তেমনি করেই চেয়ে থেকে বলি, তা ঘাবড়াবেই ত। ব্যবসার একটা বাইরের চাল চাই ত।

ও বলে, ছাই, আজকাল স্বদেশীর যুগ—দামী সিল্ক আর হাত-ঘড়ি চলবে না—বড় বড় সর্দ্দাররা এখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে আসা যাওয়া করে, মোটরের বদলে ছ্যাক্‌রা গাড়ীরই দাম এখন বেশী। নেহাৎ গোঁড়া, তাই বাঁচোয়া, নইলে হোমরা-চোমরা সর্দ্দার মনে ক'রে আমাকেই হয় ত কোন্ দিন টেনে নিয়ে যেত—পুঁটুলীটা দেখেই বুঝতে পারছ ত ?

ওর কথা শুনে না হেসে থাকা যায় না, কিন্তু হাসলেও চলবে না—কোন রকমে গাম্ভীর্য্য টেনে এনে বলি, কিন্তু কি ভাবে ব্যবসা সুরু করতে চাও ?

ও বলে, নাহে বাপু, সে-সব আমার কাছ থেকে জেনে নেওয়া অত সোজা নয়। আমার মতলবটা কাজে লাগাও আর কি !—বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার নক্সা এঁকে দিয়ে পয়সা আদায় করে—আমার এ পরিকল্পনারও একটা দাম আছে ত।

আর কোন কথা বলবার ইচ্ছে হয় না—ও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু চুপ ক'রে থাকা ওর স্বভাব নয় ; তাই ও আস্তে আস্তে আরম্ভ করে, কিন্তু যাই বল, আর ব'সে থাকা যায় না। এবার একটা কিছু আমায় ক'রতেই হবে, বৌয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না—বেচারা সত্যি ভালমানুষ।

বলি, এই নিয়ে কতবার বলা হ'ল ও কথা ?

ও উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ; বলে, বলবই ত, আরও একশ বার বলব। কাজ ত কোন দিন করতে পারবই না—দুটো কথা বলতেও কি পাব না নাকি ? তোমাকেও শুনতে হবে—না শুনলে আমিই বা ছাড়ব কেন ?

চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

ও ব'লে চলে, বিয়ে ত করনি, বুঝবে কি ক'রে ? বৌ-ই যাদের নেই তারা বৌয়ের দুঃখ বুঝবে কি ক'রে ? সে মুখের দিকে তাকান যায় না—গায়ের রং যেন কালী হ'য়ে গেছে। তবু কোন কথা ত বলে না, এতটুকু নালিশও নেই। এ খোঁড়ারও মঙ্গল কামনা করে এমন একজন লোকও আছে এ কথা মনে হ'লে তৃপ্তিতে বুক ভ'রে যায়—এ স্বাদ ত পাওনি তোমরা। বাংলা দেশের কথা নিয়ে হৈ চৈ ক'রে বেড়াও, কিন্তু এর মাটীর এতবড় গুণের কথা আজও হয় ত তোমাদের অজ্ঞাত।

বিস্মিত হ'য়ে যাই। দারিদ্র্যের জন্যে ওকে অভিশাপ দিতে পারি কিন্তু অশ্রদ্ধা ত করতে পারি নে। এত নিষ্পেষণের মধ্যে থেকেও যে ও সম্পূর্ণ শেষ হ'য়ে যায়নি তা ত কই ওকে দেখে বোঝা যায় না।

ও কিন্তু আর ব'সে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়　　চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কয়েকদিন পর।

পুঁটুলীটাকে ভাল ক'রে বেঁধে নিয়ে ও একটু ইতস্তত ক'রে বলে, আজ সকালে তুমি যখন বেরিয়ে যাও, তখন বালিশের তলা থেকে চাবীটা নিয়ে তোমার বাক্স খুলে কুড়িটা টাকা পাই। চুরি ব'লে মনে করতে পার, কিন্তু তোমার সেই মনে করার চেয়েও ঢের বড় আমার বৌ, আমার মেয়ে। চাইলে যদি না পাই—এ ভয় ছিল ব'লেই ও কাজ করেছি। আগেকার কত পাওনা আছে তোমার?

অত্যন্ত ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্ব'লে ওঠে, এত বড় নির্লজ্জ মানুষ হ'তে পারে কি ক'রে ভেবে পাই নে, কিন্তু কোন কথাই বলতে পারি নে।

ও ব'লে চলে, তা যাক্‌গে, ও আর মনে ক'রে কাজ নেই—যতই হোক, কাটাকাটি ক'রে দশ টাকাই ধর। জগদীশের কাছে বিশেষ কিছুই পাইনি এবার—ও ভয়ানক কৃপণ হ'য়ে গেছে আজকাল, আমাকে ও আর সহ্য করতেও পারে না। এই নাও দশটা টাকা—তোমার আগের সমস্তই শোধ হ'য়ে গেল। আর বাকী দশটা নিয়ে চলি আমি —মাত্র দশটা রইল ধার, তোমার পক্ষে এমন কিছু নয়।

দশ টাকার একটা নোট বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা নিয়ে ও আবার বলে, আবার দু মাস পরে দেখা দেব। মেসটা যেন বদ্‌লিয়ে ফেল' না—ভারী অসুবিধে হবে তাতে। তার পর একটু হেসে বলে, আর শীতই থাক আর গরমই থাক—চা আর মামলেটের কথাও কিন্তু আমি ভুলব না। আর কোন কথাই না ব'লে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পশ্চিমপারস্থিত তেল-কলঘাট হইতে মার্টিন কোম্পানীর যে রেলপথ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্ব শেষ ষ্টেশন আমতা। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল! আমতার পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম বর্ত্তমান। ইহা সংক্ষেপে "পেঁড়ো" বা "পেঁড়োর গড়" নামেও পরিচিত। ইহাই ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি।

পেঁড়ো-বসন্তপুর হাওড়া জেলার একটী সুপ্রাচীন গ্রাম। ইহার অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক সময়ে ইহা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজধানী ছিল। তৎকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া সংগঠিত ছিল এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর বাসস্থান ছিল। ধনবান শ্রেষ্ঠীগণের বাসনিবন্ধন ইহা ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার আদি রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হারাইয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যে আগমন করিয়া পেঁড়ো বসন্তপুরের সন্নিকটে বর্ত্তমান কানসোনা নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন-পূর্ব্বক উহার "কর্ণসুবর্ণ" আখ্যা প্রদান করেন (১)। তিনি বর্দ্ধমান হইতে পুরী ও গঞ্জাম পর্য্যন্ত শাসন করিতেন (২)। সে সময়ে পেঁড়ো-বসন্তপুর কোন্ নামে পরিচিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে উহা কর্ণসুবর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস নামে একজন কায়স্থবংশীয় নরপতি এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে স্থানটী পাণ্ডুয়া নামে অভিহিত হয়। দশম শতাব্দীর হিন্দু রাজত্বকালের বিখ্যাত পাণ্ডুয়া বর্ত্তমান পেঁড়ো বা পেঁড়ো-বসন্তপুর নামে পরিচিত। অধুনা পেঁড়োর আয়তন যেরূপ, পাণ্ডুয়া রাজ্য তদপেক্ষা বহু বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া সংগঠিত ছিল। মহারাজ পাণ্ডুদাস দক্ষিণ রাঢ়ান্তর্গত অপরমন্দার রাজ্যের (৩) অধীশ্বর যামিনী-

(১) কর্ণসুবর্ণ হইতেই কানসোনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) Epigraphica Indica, vo IV, p. 144

(৩) অপরমন্দার-রাজ্য বর্ত্তমানে গড়মান্দারণ নামে পরিচিত। "রামপালচরিতে" উক্ত হইয়াছে যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগের ছয় মাইল পশ্চিমে 'ভিতরগড়' নামে যে ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, তাহারই কোন স্থানে অপরমন্দারের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র গড়মান্দারণের ঘটনা অবলম্বন করিয়াই তাঁহার অমর উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিয়াছিলেন।

শূরের সামন্ত-নরপতিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন (৪)। যামিনীশূর আইন-ই আক্‌বরীতে যামিনী ভাল নামে পরিচিত (৫)।

পাণ্ডুদাস অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। রাঢ়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া রাজ্য দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যে সময়ে মিথিলাতেও দর্শনচর্চ্চার কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় নাই, তখন এই পাণ্ডুয়া রাজ্য শাস্ত্রালোচনা ও দার্শনিক গবেষণার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীধরাচার্য্য মহারাজ পাণ্ডুদাসের সভা-পণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেন। তিনি ৯১৩ শক বা ৯৯১ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুয়াতে বসিয়া তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ "ন্যায়কন্দলী" রচনা করিয়াছিলেন (৬)। "ন্যায়কন্দলীর" অখণ্ডনীয় যুক্তিবলেই বৌদ্ধধর্ম্মের ভাবপ্রবাহ রাঢ়দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মুসলমান শাসনকালে এই সুবিখ্যাত পাণ্ডুয়া রাজ্য "পেঁড়ো" নামে অভিহিত হয় এবং উহার আয়তনও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে গড়-ভবানীপুর রাজবংশের এক শাখা পেঁড়ো-বসন্তপুরে রাজত্ব করিতেন (৭)। তাঁহাদের শাসনকালে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং বাঙ্গালার মুসলমান শক্তি প্রভূত পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। এই রাজবংশ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই রাজবংশেই ইতিহাস বিখ্যাত কালাপাহাড়ের জন্ম হয়।

(৪) যামিনী শূরের আনুমানিক রাজত্বকাল ৯৬৫ হইতে ৯৯৫ খৃষ্টাব্দ।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড।

(৫) Ain-i Akbari by Jarette.

(৬) ত্র্যাধিকদশোত্তর নব শকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রী পাণ্ডুদাস কায়স্থ যাচিত ভট্ট শ্রীধরেণ সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশ ন্যায়-কন্দলী টীকা।—ন্যায়কন্দলী সমাপ্তি পুষ্পিকা. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

(৭) পেঁড়ো-বসন্তপুরের চারি মাইল উত্তরে গড় ভবানীপুর অবস্থিত। এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ সেই স্থানে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। চতুরানন নিয়োগী নামক এক ব্রাহ্মণ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ রাজপদে অভিষিক্ত হন। সদানন্দের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র ও কনিষ্ঠ শ্রীমন্ত। কৃষ্ণচন্দ্র যখন গড় ভবানীপুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই সময় শ্রীমন্ত পৃথকভাবে পেঁড়ো-বসন্তপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাল্যকালীন নাম রাজীবলোচন। পেঁড়ো-বসন্তপুরের অনতিদূরে রাজীবলোচনের প্রতিষ্ঠিত পাহাড়পুর গ্রাম তাঁহার কালাপাহাড়ত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে (৮)।

পেঁড়ো-বসন্তপুরের শেষ রাজা নরেন্দ্রনাথ। তাঁহার রাজত্বকালে পেঁড়ো-বসন্তপুর বর্দ্ধমান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। বাঙ্গালার অন্যতম মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় রাজা নরেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পেঁড়ো-বসন্তপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ "অন্নদা-মঙ্গল" কাব্য তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। "অন্নদা-মঙ্গল" ব্যতীত তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় রচনায় আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য (৯) ও রাজা নরেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করিয়াছেন (১০)। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পেঁড়োর অনতিদূরে কাণা

(৮) বাস্তবিক কালাপাহাড় যে কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-গণের মধ্যে প্রবল মতভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু রাজীবলোচনের উপর কালাপাহাড়ত্ব আরোপ করিবার একটী প্রধান হেতু এই যে, তিনি যখন গৌড়ের নবাব-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি উড়িষ্যার বহু দেবমন্দির বিচূর্ণ ও কলুষিত করিয়াছিলেন। গৌড় হইতে উড়িষ্যা যাত্রাকালে তিনি অবশ্যই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের একটীও মন্দির তিনি স্পর্শ করেন নাই।

(৯) মুসলমান শাসনকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ভুরস্থট পরগণা নাম ধারণ করে।

(১০) ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস, ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি!
—সত্যপীরের কথা।

অন্যত্র:
ভুরস্থট মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
মুখটী বিখ্যাত দেশে দেশে,
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদা মঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।
—অন্নদামঙ্গল।

নদীর তটে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয় ; উহা ভারতচন্দ্রের গড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১১)। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে পাণ্ডুয়া এক সুসমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল এবং শাস্ত্রালোচনার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। সপ্তম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বাদশ শত বৎসর ধরিয়া শৌর্য্য, বীর্য্য, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানগরিমায় সমুদ্ভাসিত হইয়া পাণ্ডুয়া রাঢ়বঙ্গের ভাগ্যাকাশে এক প্রোজ্জল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করিয়াছিল। শ্রীধরাচার্য্যের "ন্যায়কন্দলী"তে তাহার জ্ঞানগৌরবের যে উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের মহাকাব্যে তাহার নবমী পূজা সমাপ্ত হয়। পাণ্ডুয়ার গৌরব শশাঙ্ক ও পাণ্ডুদাসে, পাণ্ডুয়ার গৌরব শ্রীধরাচার্য্য ও ভারতচন্দ্রে, পাণ্ডুয়ার গৌরব "ন্যায়কন্দলী" ও "অন্নদামঙ্গলে"। পাণ্ডুয়ার চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানসমূহে তাহার অতীত গৌরবের কত কীর্ত্তিকাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে তাহার উদ্ঘাটন করিবে? দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে পাণ্ডুয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার ন্যায্য সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই, পাণ্ডুয়ার প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারকল্পে কোন সহৃদয় ঐতিহাসিক বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, পাণ্ডুয়ার অতীত কীর্ত্তিগাথা প্রচার করিবার জন্য কোনও চারণ-চারণীরও আবির্ভাব ঘটে নাই। বাঙ্গালার ক্ষুদ্রতম জেলার যে ভূখণ্ডটুকু দ্বাদশ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরবের উপাদান জোগাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহা "পেঁড়ো" নামে পর্য্যবসিত হইয়া কোনক্রমে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করিতেছে মাত্র। কিন্তু নিয়ন্তার বিচিত্র বিধানে যদি কোন দিন পাণ্ডুয়ার পূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি আবিষ্কৃত হয়, যদি অদূর ভবিষ্যতে রাঢ়বঙ্গের ভাগ্যাকাশে রাজস্থান-রচয়িতা টডের মত কোন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় যে অধুনা-অপরিজ্ঞাত এই পেঁড়ো-বসন্তপুর রাঢ়বঙ্গের নালন্দা-রূপে সমাদৃত হইতে পারিবে।

(১১) Howrah District Gazeteer.

অভিনয়

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

ছেলেবেলা থেকেই আমি অভিনয় করতে পারতাম। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা দেখে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বাড়ী এসে অনুতাপের অভিনয় ক'রে মেজদার গাট্টা থেকে বেমালুম রেহাই পেয়ে গেছি। পেছনের বেঞ্চিতে ব'সে পণ্ডিত মশায়ের ঘণ্টায় সংস্কৃতে মনোনিবেশ করাটাকে একটু সংস্কৃত বা সংস্কার মুক্ত ক'রে নিয়ে নাতিউচ্চকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্তের মহলা চলছে, হঠাৎ পাশেই পণ্ডিত মশায়ের নিঃশব্দ আবির্ভাব। চন্দ্রগুপ্ত ক্ষিপ্রহাতে শুধু গুপ্ত হয়ে' গেলেন ইংরেজী বইয়ের তলায়। পণ্ডিত মশায় জিজ্ঞেস করলেন—কি পড়া হচ্ছিল? আমি ব'লে দিলাম—যদা শ্রৌষং,—তারপরেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ব'লে চললাম—আচ্ছা দাঁড়াও, আজ সন্ধ্যেবেলা যাবে না আমাদের গলি দিয়ে? তখন দেখিয়ে দেবো কি পড়ছিলাম ; পরে উচ্চরবে শুনিয়ে দিলাম—তদা নাশংসে বিজয়ার সঞ্জয়। পণ্ডিত মশায় বল্লেন—ঐ তো বাবা, একটু পড়লেই পারিস তো সব—একটু পড়, ওরে পরকালে কাজে দেবে। দেখি একটিপ নস্যি। আমি তাড়াতাড়ি নস্যির ডিবে বাড়িয়ে ধরতেই তিনি একটি টিপে আধ ডিবে নস্যি নিয়ে আমায় শাসন করে দিলেন—আবার! অর্থাৎ এটি দৈনন্দিন সংশোধন তাঁর, তিনি রোজই নস্যি নেন এবং বলে দেন কাল থেকে আমি যেন নস্যি না নিয়ে যাই।

যাক্ যা বলছিলাম—আমার অভিনয়। প্রাত্যহিক জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের অভিনয়, বাইরে ভদ্রতা সৌজন্যের অভিনয় ইত্যাদি ছেড়ে দিলেও আমি সখের দলের মধ্যে উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ব'লে পরিগণিত ছিলাম। বিশেষত শৈশিরী ঢং-এ। এই অভিনয়ের জন্যেই আমার চাকরী। চাকরী হ'ল—আমার বর্ত্তমান বড়সাহেব একবার আমার অভিনয় দেখেন ; বঙ্গভাষায় বিশেষজ্ঞ তিনি, অভিনয়কালীন আমার কথার একটি বর্ণও না বুঝে, শুধু আঙ্গিক অনুষ্ঠান দেখেই তিনি আমাকে কেরাণীগিরি দিলেন। কিন্তু এটি তিনি বুঝেও বুঝলেন না যে, ছোকরা অফিসের কাজেও কাগজে কলমে শুধু অভিনয়ই ক'রে যাবে। সেই

বড়সাহেব তাঁর সাহেব-ডাক্তার বন্ধুর উপরোধে আমাকে ডাক্তারের দলের থিয়েটারে সারথ্য করতে অনুরোধ করলেন। বড়সাহেবের অনুরোধ মানেই আদেশ। সাহেব-ডাক্তার একটি ডাক্তারী বিদ্যালয়ের কর্ণধার।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আমি তাঁদের ক্লাবে হাজির হ'লাম। ক্লাবটি হাসপাতালের সমবেষ্টনে। যেখানে অত্যন্ত বাস্তব—অত্যন্ত সত্য জীবন্মৃত্যুর লীলা, তারই পাশে বাস্তবতার অবাস্তব অভিনয় শুধু অবান্তরই মনে হয় না, নিতান্ত খারাপ লাগে। আমি যখন উপস্থিত হ'লাম, ক্লাবের সদস্যেরা তখন আমারই প্রতীক্ষায় কার কোন্ নির্দ্দিষ্ট ভূমিকায় কতখানি সাফল্য লভ্য—তাই নির্ণয়ে ব্যস্ত। আমি হাজির হ'লে বড় উদ্যোক্তা বড়বাবু এবং বড়সাহেবের কাছে আমার আগমন বার্ত্তা জানাতেই তাঁরা ছুটে এলেন। আসতেই সবাই শশব্যস্ত হয়ে' উঠে দাঁড়ালেন; আমি উঠতেই বড়সাহেব একরকম জোর ক'রেই শ্রেষ্ঠ আসন খানাতে আমাকে বসিয়ে বল্লেন—আরে, হামি এখানে বড়া-সাব নেই আছে, টুমি মাস্টার আছে; হামি, হোয়াট্‌স্ ছাট, হোয়াট্‌স্ ছাট, হামি টোমার ছাট্টার আছে। ব'লেই দামী হ্যাটটি নিয়েই মাটির ফরাসে লেপ্টে বসলেন। আমি শীতার্ত্তের মত সঙ্কুচিত হয়ে চেয়ারে বসতে বাধ্য হ'লাম।

এর পরেই সাহেবের হুকুম হ'ল—মাসটার, তুমি আগে তোমার অভিনয়ের নমুনা দেখাও, তার পর তিন রাত্রি তিনখানি বীররসের বইয়ের বন্দোবস্ত কর।

আমি এক আধখানা বইয়ের কথা ভাবছি, ছেলের দল নানা রকম নির্ব্বাচন করতে লাগল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে চন্দ্রগুপ্ত, কেদার রায় তো হ'ল, এখন তৃতীয় বীর কে? সেখানকার সকলেরই জীবানন্দ বেচারার 'পর খরদৃষ্টি—বস্তুত আমার জীবানন্দ রূপায়ন এরা অনেকেই দেখেছে। হয়তো অনেকেই বাড়ী এসে তাই কসরৎ ক'রে থাকবে। আমি তাদের বললাম—কিন্তু সাহেব যে বলছে বীররস, এই বইয়ে নায়ক থাকতে পারে কিন্তু বীর তো নেই। সাহেব নিজের নামটি উচ্চারিত হ'তে শুনে সতাল গর্জ্জনে বলে' উঠলেন—ক্যা সাহেব, হামি টোমাডের বাঙালী কোঠা কিসসু বুজটে পারে না। একটি ডাক্তার ছাত্র বলে' উঠল—ঐ যে কি একটা মারামারি আছে না, সেইটেই বীররস।

বড়বাবু ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলেন—নায়কটা মাতাল, ছেলেদের এই বই দেখলে মাতালের 'লীভার পেন' সম্বন্ধে চাই কি খানিক জ্ঞানও হ'তে পারে। সাহেব রাজী হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম—বা রে বড়বাবু!

সাহেব আমার মুখ থেকে মোটামুটি পার্টগুলো শুনে তাঁর নিজের জন্য নির্ব্বাচন করলেন চন্দ্রগুপ্তে সেকেন্দর, কেদার রায়ে কার্ভালো, ষোড়শীতে নির্ব্বাক সর্দ্দার।

এর পরে পার্ট বেছে নেবার পালা বড়বাবুর। তিনি বড় মলাটপ্রিয় লোক। তিনি বল্লেন—তা যাকগে, আমি বড়বাবু বলেই বরং চন্দ্রগুপ্তটা, কেদার রায়টা আর ষোড়শীতে কি দেবে? বইটা উল্টে দেখে দয়া ক'রে জীবানন্দটা না নিয়ে এককড়িটা কেন যে নিলেন সেইটেই আশ্চর্য্য! ছেলের দল বেশ খুশী হ'ল—তাদেরই কেউ জীবানন্দ, ষোড়শী হ'তে পারবে।

সেদিন তো গেল। বাড়ী এসে দেখি গিন্নীর মেজাজ খারাপ, তার আবার বারো গজী শাড়ীও লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়; আর সেই ক্ষুদ্রায়তন বপুর প্রতি বর্গ-ইঞ্চি কোন না কোন ব্যারামের আড়ৎ। বাড়ী এসে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলাম এই ভেবে যে, ভবিষ্যতে ডাক্তারের দর্শনীবাবদ আমার মাসিক আয়ের যে পঞ্চমাংশটা ব্যয় হয়ে থাকে, সেটা আর হ'বে না। অতগুলো ডাক্তার, মায় সাহেব-ডাক্তার পর্য্যন্ত যখন আমার চেলা।

মহলা রোজ চলছে; সেই অজুহাতে আজকাল চাদরখানা গায়ে দিয়েই দু-এক ঘণ্টা আগে সটকে পড়া চলে। এ আপনারা অর্থাৎ আমার সগোষ্ঠী কেরাণীরা সকলেই ক'রে থাকেন, যথা চাদরখানাকে শ্রীরামচন্দ্রের পড়মস্বরূপ চেয়ারে খাড়া ক'রে অফিস পলায়ন।

মহলার একটু নমুনা দিই। বড়বাবু, আফিসের খাতায় বিয়াল্লিশ বছরের বৃদ্ধ বড়বাবু একটু কোল কুঁজো হয়ে পড়েছেন, তাঁকে আমি একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম যে, চন্দ্রগুপ্ত—তিনি ছিলেন একটা প্রকাণ্ড বীর, তিনি দাঁড়াতেন এই রকম ক'রে—ব'লে বুক চিতিয়ে একটা পোজ মেরে দিলাম। বড়বাবু উত্তরে বল্লেন—ও তুমি 'প্লে'র দিন দেখে নিও মাসটের। আর বড়সাহেব—তিনি প্রত্যেকটি কথা ইংরিজিতে লিখে নিয়ে একটা নোটবুক করলেন, তার ডানদিকের মন্তব্যের জায়গায় ইংরিজিতে লিখে নিতেন—এইবার মাথা এত ডিগ্রী বাঁকবে, ডান হাতটা কুনুইতে ভাঁজ খেয়ে এত ইঞ্চি উঠবে ইত্যাদি। আর তাঁর উচ্চারণের অনুলিপি করলে এই রকম দাঁড়ায়—সট্ সেলুখাস্, খী বিচিট্টর এই ডেশ, ডিনে পরচানড্ সুরয···ইত্যাদি। আমি সেকেন্দারের পার্টের সময় তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—ভাখো সাহেব, প্রথমে এই যে এতটা লম্বা বর্ণনা—কোন দরকার নেই। একটু ছোট ক'রে দিই। সাহেব তাতে রাজী নয়; সবটা বলবেই।

আর একদিন মহলায় বড়বাবুর অংশের এক জায়গায় আমি হাসি চাপতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম—সেইটেই হ'ল কাল। বড়বাবু মনে করলেন সেইটে আমার প্রশংসামুখর অভিভূতি। ফলে দাঁড়াত যে, সেখানে হাসিটাকে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে তো আসতাম, পথে আসতে সেই হাসি অগ্নিগিরির মত কেটে তোড়ে বেরোত। পথচারি অনেকে হয়তো পাগলই মনে করত।

সাহেবের পার্টগুলো খানিক মানিয়ে যেত। সেকেন্দার ওরফে আলেকজাণ্ডার দী গ্রেট যে পুরুকে পরাস্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ-ভারতীকেও পরাস্ত ক'রে তাঁর সম্পদ ভাণ্ডা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন—এ কথা দ্বিজেন্দ্রলালও মানতেন না; অন্তত সাহেব ঐ রকমই মনে করেন। আর কার্ভালোকে যত বাংলা নাট্যকার বলিয়েছেন, তার চেয়ে সত্যিকার কার্ভালো যে কম বাংলা জানত না, তাই বা বলি কি ক'রে!

আর ছেলেদের কথা না-ই বললাম। তারা যেন পাল্লা দিয়েছে কে কত খারাপ অভিনয় করতে পারবে—তারই।

এমনি ক'রে থিয়েটারের দিন ঘনিয়ে এল। ইতিমধ্যে আমার সাহেব আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন—ডাক্তারদের অভিনয়ের কথা। আমি বলেছি—সায়েব, ছেলেরা নতুন—তারা যেমন তেমন, কিন্তু বড়সাহেবের কি আশ্চর্য নিষ্ঠা যা অভিনয়-ক্ষমতা, আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি! এই ব'লে টাকা-ফলপ্রসূ চাকরীর গাছের গোড়ায় যে কতটা জল দিলাম—তা আমি আর অন্তর্যামী জানেন। তা আমি তো অভিনেতা।

প্রথম দিন অভিনয়ের ঠিক প্রাক্কালে খবর পেলাম—চাণক্যের স্ত্রী অনাহারে মারা গেছেন, এটা দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল লিখেছেন; তার স্ত্রী জীবিত। মেয়ে চুরি যাওয়া দূরের কথা, তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি—উপস্থিত প্রসব বেদনায় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। বর্ত্তমানে সেই হাসপাতালের কোন্ ওয়ার্ডে ছটফট্ করছেন। আমি প্রমাদ গণলাম। এইবার কি তবে এই উচ্চাঙ্গের সৌখীন অভিনেতাদের সঙ্গে তৈরী না হয়ে আমার চাণক্য পাল্লা দিয়ে পারবে? আমি চাণক্যের সাজপোষাক খুঁজে বেড়াচ্ছি, চাণক্য দেখি আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইতে সে উত্তর করলে—আমি যদিও কাছে থাকতে পারি, তবুও আমি থাকলে পরে পেটে যদি মেয়ে থেকে থাকে, সেটা কি ছেলে হয়ে' জন্মাবে? তার চেয়ে বরং ষ্টেজে চাণক্যকে মেয়ে পাইয়ে দিয়ে আমি সত্যিকারের ছেলের মুখ দেখে আসব! আমি ভাবলাম—এর স্ত্রীর প্রতি প্রেমের অভিনয়ের অংশটা অনেক কম।

প্রথম রাত্রি—চন্দ্রগুপ্ত হ'চ্ছে। সাহেব সেকেন্দার যাই হোক কিছু হ'ল, কিন্তু বড়বাবু বোতল কৃপায় সব ভুলে গিয়ে শুধু একটি কথা মনে রেখেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত বীর—তার সম্পদে-বিপদে, সম্মানে-অপমানে, প্রকৃতায়-বিমনতায় কখনও মাথা হেঁট হ'তে পারে না। সেই যে তিনি বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন, সমস্ত ক্ষণ আর ঘাড় হেঁট করছেন না দেখে চাণক্যের 'মা' সম্বন্ধে লম্বা 'বক্তৃতার দৃশ্যের আগে অনেক করে' বুঝিয়ে বললাম যে ও-কথাগুলোর সময় মাথা নীচু করবেন যেন! বক্তৃতা শেষ হ'তে চল্ল—আমি উইংসের পাশ থেকে কেবল বলছি—মাথা হেঁট, মাথা হেঁট। একে চন্দ্রগুপ্ত তায় বড়বাবু, তিনি ষ্টেজ থেকেই চেঁচিয়ে বললেন—সতেরো দিনে এর চেয়ে আর বেশী হয় না মাস্টের—তুমি থামো।

কিন্তু গুরুর আজ্ঞা তিনি এমন পালনই করলেন যে, পরের দিন কেদার রায় একবারও মাথা তুলে না পারলে ঈশা খাঁর সঙ্গে কথা কইতে, না কিছু বীরত্ব দেখাতে। সেদিনও শ্রীমন্ত অনায়াসে অভিনয় ক'রে গেল। এরও স্ত্রী স্বর্গতা এবং চাণক্যের মতই মেয়ের প্রতি সমাজ অবিচার করেছে! বলা বাহুল্য, একটি দিনেই, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান হ'লেও চাণক্য শ্রীমন্তায়িত হয়ে' গিয়েছিল এবং শ্রীমন্তর স্ত্রী তখনও বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন।

তৃতীয় দিনে এক নূতন বিপদ। শ্রীমন্ত আবার এক পুত্রের আলো পেয়ে জীবানন্দ অর্থাৎ অতি আধুনিক মাতাল জমিদার তো হয়ে গেলেন। তখন আর জীবানন্দর স্ত্রী মা হ'বার দু-এক ঘণ্টার বেশী দেরী নেই। ডাক্তার ছোকরাটি অদ্ভুত, সেদিনও সাজ পোষাক পরে' 'প্লে' করছে! জীবানন্দ একবার আমার কানে কানে বলে' গেল—গুরুদেব, একটা দুঃখু রয়ে' গেল; যার জন্যে থিয়েটার করা, সে দু'হাত তফাতে থেকেও প্লে দেখ্‌তে পেলে না। আমি কাল-পরশু কোন রকমে কষ্ট ক'রে বসে' থেকে থিয়েটার দেখ্‌তে বলেছিলাম। সে বললে—খুব নাকি কষ্ট হ'চ্ছে; আজ তো বেদনায় একেবারে অজ্ঞান! আর দেখুন, আমি ডাক্তার হ'তে চলেছি—এইটুকু 'হার্টলেস' না হ'লে পয়সা রোজগার করব কি ক'রে? অবিশ্যি অস্বাভাবিক লক্ষণ আমার স্ত্রীর কিছুই দেখা যায়নি। একটু কষ্ট পেল।

এদিকে নির্ম্মলের, হৈমবতীর স্বামী নির্ম্মলের নিজের ওয়ার্ডে একটি মেনিঞ্জাইটিস রোগীর এখন-তখন। নির্ম্মলের ফোর্থ-ইয়ার, হস্পিটাল ডিউটি সেদিন আবার। নির্ম্মল এসে বললে—দেখুন তো গুরুদেব, কি গেরো? ব্যাটার বিকেলে মরলেই হ'ত, কিম্বা বেশ তো আজ রাত্তিরটা পৃথিবীটা না হয় দেখেই যা। হাউস্ সার্জ্জন তো এখানে, আমাকেই এক একটা সীন শেষ করে' গোঁফ খুলে' ছুটতে হবে সেই একেবারে এদিককার ওয়ার্ডে, দু'—ফার্লং হবে প্রায়! যাই দেখে আসি গে—যেমন দুর্ভোগ!

এক অঙ্কের পর জীবানন্দ হয়ে' গেল রোগা ফর্সার থেকে কালো এবং মোটা। জীবানন্দর ছেলে হয়েছে, সে আর করবে না, আমাকেই নাম্‌তে হ'বে। যাবার সময় বলে গেল—গুরুদেব, মেয়ে হ'লে দেখতে যেতুম না, ছেলে কি-না, নরক থেকে উদ্ধার করবে যে! আর আপনার জীবানন্দ —সে একটা জিনিষ!

প্রায় জীবানন্দ ব'নে গেছি; এমন সময় নির্ম্মল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উপস্থিত। আমি শুধোলাম—ব্যাপার কি?

সে বললে—কই দেখি আমার গোঁফ, আমার কোঁচানো চাদর আর ছড়ি। ব্যাটা টেঁশে গেছে, হাড় জুড়িয়েছে আমার।

রুগ্না স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য মাসে মাসে গড়ে যে পঞ্চাশটা বায় না ক'রে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, এই সমস্ত ভাবী ডাক্তারের সহৃদয়তায় আমার সে অভিলাষ কর্পূরের মত উবে গেছে।



সঙ্গীত

আগমনী

দুখ-নিশি হ'ল ভোর
ওঠ ওঠ গিরিরাণী।
আঁখি মেলি দেখ চাহিয়া
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঈশানী॥

গেল বিষাদ-আঁধার দূরে
মা এলো গিরিপুরে
হাসিছে অরুণ প্রভাতে
উমার আনন-খানি॥

আজ আকাশের চাঁদ হের ঐ
ধরায় হ'ল উদয়,
'ওঠ মা কেঁদো না আর'—
উমা সতী এসে কয়।

আজি আনন্দময়ীর আগমনে
ভরে আনন্দ ভুবনে,
ফিরে উমার বাতাস ডাকিয়া
দুয়ারে দুয়ারে কর হানি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

II { সা রা মা | পা পদমা মপা | পর্সা -া -া | (-া -া -া) } I -ণসণা দা -া I
দু খ নি শি হ'০ ল ভো ০ ০ ০ ০ র্ ০ ০ ০ র্

I মপা পণা ণদা | দপা পমা মপা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞা | রসা -া -া I
ও০ ঠ০ ও০ ঠ০ গি০ রি০ রা ০ ০০ ণী ০ ০

I পা পজ্ঞর্া র্া | র্সা সর্া র্সা | ণধা -ণা দা | পা -া -া I
আঁ খি০ মে লি দে০ খ চা০ ০ হি য়া ০ ০

I মপা পণা ণদা | দপা পমা মপা | মজ্ঞা রজ্ঞা সরমা | -া -া -া I
দু০ য়া০ রে০ দাঁ০ ড়া০ য়ে০ ঈ শা নী০ ০ ০ ০

পা দা II মা পা ণদা | দা দণা ণর্সা | দণা ণা র্সা | -া -া -া I
গে ল বি ষা দ০ আঁ ধা র দূ ০ রে ০ ০ ০

I দণা -র্সর্রা জ্জর্া | র্রা র্সা র্সা | ণা র্সর্রা -ণর্সা | ণদা -ণদা -পা I
মা ০ ০ ০ এ লো গি রি পু ০০ ০০ রে০ ০০ ০

I { পা পণা ণদা | দপা পমা মপা | মজ্ঞা রজ্ঞা সরা | মা (পদা দমা) } I
হা সি০ ছে০ অ ০ রু ০ ণ ০ প্র ভা তে ০ তে০ র

I -া -া I { সরা রমা -া | পা পদা পমা | পদা ণর্সা ণর্সা | (-া -া -া) } I
০ ০ উ ০ মা ০ র্ আ ন০ ন০ খা০ ০০ নি ০ ০ ০

I -া -ণদা -পমা I মপা পণা ণদা | দপা পমা মপা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞা | রসা -া -া II
০ ০০ ০০ ও০ ঠ০ ও০ ঠ০ গি০ রি০ রা ০ ০০ নী ০ ০

সা -া II সা সজ্ঞা জ্ঞা | -ঋা সা -ন্া | সা রা সরা | -জ্ঞা -ঋজ্ঞঋা -সা I
আ জ্ আ কা শে র চাঁ দ্ কে র ও ০ ০ ০ ই

I সা রা মা | পা পণা দণদা | পক্ষা -পা -া | -া -া -া I
ধ রা য় হ' ল০ উ০ দ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I পা পধা পমা | পা ধপা ধা | ধর্সা ণা -া | -ধণধা -পধপা -মা I
ও ঠ মা কেঁ দো০ না আ ০ ০ ০০ ০০ র্

I পা দা ণা | র্সা র্সজ্ঞা ঋর্জ্ঞঋা | র্সনা -র্সা -া -া র্সা র্সা I
উ মা স তী এ০ সে০০ ক০ ০ ০ য়্ আ জি

I { পা দা জ্ঞা | মজ্ঞা জ্ঞঋা -র্সা | ণধা ণা দা | পা -া -া I
আ ন ন্ দ ম য়ীর্ আ০ গ ম নে ০ ০

I পা দা মা | পধা -ণর্সা র্সা | ণধা -ণা ণদা | পা (-া -া) } I
ভ রে আ ন্০ ০ন্ দ ভু০ ০ ব নে ০ ০

I পা পা I পক্ষা পণা -ধণা | দা পদা -মপা | মজ্ঞা -রজ্ঞা সরা | রমা -া -া I
ফি রে উ০ ষা ০র্ বা তা০ ০স্ ড়া ০০ কি০ য়া০ ০ ০

I { সা রা মা | পা পদা দমা | পদা -ণর্সা ণা | (ণর্সা -া -া) } I
দু য়া রে দু য়া০ রে ক০ ০র্ হা নি ০ ০

I ণর্সা -ণদা -পমা I মপা পণা ণদা | দপা পমা মপা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞা | রসা -া -া II II
নি ০০ ০০ ও০ ঠ০ ও০ ঠ০ গি০ রি০ রা ০ ০০ নী ০ ০

মহাশ্রেষ্ঠী মিৎসুই

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

প্রবন্ধ

জাপানের মিৎসুই-ফার্ম্ম বর্ত্তমান বিশ্বের বাণিজ্য জগতে একটি বিস্ময়; কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম ও অতিকায় প্রাচীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার বিশ্বব্যাপী প্রসার তত বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, যতটা বিস্ময়কর তার নিয়ন্ত্রণের নীতি, পরিচালনের পদ্ধতি।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হাকিরোবী মিৎসুই নামক এক ব্যবসায়ী মিৎসুই-ফার্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন সেই থেকে এই ফার্ম্ম পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরদের অধিকারেই হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। সেকালে সারা বছর ক্রেতাদের বাকীতে মাল জোগান ছিল রীতি। জাপানী ব্যবসায়ীদের দস্তুর বৎসরান্তে একবার তাঁরা গোটা বছরের হিসেবনিকেশ ক'রে বিল্ করতেন এবং খরিদদাররা সারা বছরের বাকী টাকা একদিনে পরিশোধ করতেন অনেক দরকষাকষি ও ধস্তাধস্তির পর। হাকীরোবীই জাপানে সর্ব্বপ্রথম 'এক দর' এবং 'নগদ মূল্য' প্রথার প্রবর্ত্তন করেন; শুধু তাই নয়, অপরিচিত ও অভিনব এই প্রথাটিকে অল্পদিনের মধ্যে জাপানে জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। হাকিরোবী অতঃপর স্বীয় ফার্ম্মের বিজ্ঞাপন ও বহুল প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। পুস্তকে, পত্রিকায়, রঙ্গমঞ্চের যবনিকায় বিজ্ঞাপন দেবার যে সব আধুনিকতম উপায় আছে, হাকিরোবী বর্ত্তমান বাণিজ্য-যুগের সেই উদয় উষাতেই সে উপায়গুলি অবলম্বন করেছিলেন। সেই আদিমতম বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রথার নমুনা আজিও টোকিয়োর মিৎসুই-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যাপারেও হাকিরোবী জাপানে প্রথম পথ প্রদর্শক। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশের পূর্ব্বে জাপানে নগর থেকে নগরান্তরে নগদ টাকা প্রেরিত হ'ত বাহকের মারফৎ, তিনিই সেখানে সর্ব্বপ্রথম বিনিময়-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। wrapped money-অর্থাৎ 'মোড়া টাকার' প্রচলন তাঁর আর একটি উদ্ভাবন। বিভিন্ন রকমের মুদ্রা কাগজে মুড়ে তিনি কতকগুলি মোড়ক প্রস্তুত করতেন এবং মোড়কগুলির ওপর নিজের ফার্ম্মের মোহর অঙ্কিত ক'রে তাদের ওপর জড়িত অর্থের পরিমাণ লিখে দিতেন। মিৎসুই ফার্ম্মের সততার ওপর জনসাধারণের বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, মোড়কগুলি না খুলে এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ গণনা না ক'রেই কেবলমাত্র মিৎসুই ফার্ম্মের শীলমোহর দেখেই তারা নিশ্চিন্ত মনে সেগুলি গ্রহণ করত। এই 'মোড়ক প্রথা' থেকেই বর্ত্তমান নোট প্রথার জন্ম, তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছাড়া নোট অন্য কোন সারবান বস্তু গর্ভে বহন করে না, আর মোড়কের মধ্যে গ্রহীতারা ফার্ম্মের শীল-মোহর ছাড়াও মূল্যবান ধাতুর সত্তা স্বহস্তে অনুভব করতে পারতেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে হাকিরোবীর এই সব নব নব উদ্ভাবন, নূতন নূতন নীতির প্রবর্ত্তন মিৎসুই-বংশের পক্ষে গৌরবের বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অবদান—তাঁর স্বহস্ত রচিত 'বংশ-বিধান'। এই বিধানই মিৎসুই-বংশের জীবন-বেদ, সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ ধরে এই বৈদিক অনুশাসনেই মিৎসুই-পরিবার শাসিত হয়ে এসেছে, পৃথিবীর বৃহত্তম পারিবারিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে। হাকিরোবীর বংশ বিধানের অবিকল বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) এই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহৃদয় ব্যবহার করবেন। সাবধান, আত্মকলহ যেন অবশেষে বংশটিকে ধ্বংস না করে।

(২) বংশের শাখা-প্রশাখা যথেচ্ছ বিস্তার ক'রো না। সব-কিছুরই সীমা আছে। পারিবারিক সম্প্রসারণ লোভনীয় বটে, কিন্তু স্মরণ রেখো, অপরিমিত প্রসার বিশৃঙ্খলা ও বিড়ম্বনার হেতু।

(৩) মিতব্যয়িতা সমৃদ্ধির মূল এবং বিলাসিতা বিনাশের হেতু। প্রথমটি অভ্যাস কর এবং শেষেরটি পরিহার

কর। তাহলেই পারিবারিক উন্নতি ও অনুক্রমণের স্থায়ী ভিত্তি গঠিত হবে।

(৪) বিবাহ ব্যাপারে, ঋণ গ্রহণে ও ঋণপরিশোধে সর্ব্বদা পারিবারিক সমিতির (Family Council) পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে।

(৫) বার্ষিক আয়ের নির্দ্দিষ্ট কোন একটি অংশ পৃথক ক'রে রেখে দেবে এবং প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুযায়ী প্রতি বৎসর তা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবে।

(৬) মানুষের জীবন যত দিন, কাজও তত দিন। সুতরাং বিনা কারণে কর্ম্মহীন জীবনের আলস্য বা আরাম আকাঙ্খা ক'রো না।

(৭) প্রতিটি শাখা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাতে হবে ; তোমাদের সঙ্গতি সঙ্ঘবদ্ধ কর, স্বতন্ত্র ক'রো না।

(৮) যোগ্যতম ব্যক্তির নিয়োগ এবং তাঁর বিশিষ্ট ক্ষমতাকে কাজে লাগানই ব্যবসা-পরিচালনের মূল নীতি। বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্যদের কর্ম্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দাও এবং তাঁদের স্থান পূর্ণ কর উদীয়মান তরুণ কর্ম্মীদের দ্বারা।

(৯) কেন্দ্রীভূত না হ'লে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের পরিবারের নিজস্ব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাতে সকলেরই ভরণপোষণের সংস্থান হ'তে পারে, অন্য কোন ব্যবসায়ে কখনও লিপ্ত হয়ো না।

(১০) নিজে যে জানে না, সে নেতৃত্বও করতে পারে না। সামান্য শিক্ষানবীশের কাজ থেকে তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার কাজ সুরু কর। ক্রমশ ব্যবসার গোপন তথ্যগুলি যখন তাঁদের আয়ত্ত হবে, তাঁদের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার জন্য কোন শাখা-প্রতিষ্ঠানে তাঁদের নিযুক্ত কর।

(১১) বিচক্ষণতার আদর সর্ব্বক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ব্যবসাক্ষেত্রে তার সমাদর সমধিক। মনে রেখো, কালকার বৃহত্তর ক্ষতির চেয়ে আজকের ক্ষুদ্র ক্ষতি বাঞ্ছনীয়।

(১২) পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পারস্পরিক সতর্কতা এবং পরামর্শের নীতি অনুসরণ ক'রে চলবে, তাহ'লে বড় রকমের কোন ভুলভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা থাকবে না। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কারুর অনিষ্ট চেষ্টা করে, পারিবারিক সমিতিতে (Family Council) তার প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার বিহিত হবে।

(১৩) দেবতার লীলাভূমিতে তোমাদের জন্ম, দেবতার উপাসনা করবে, সম্রাটকে শ্রদ্ধা করবে, দেশকে ভালবাসবে এবং প্রজা হিসাবে তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করবে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পারিবারিক মূলধনের অসংখ্য বিভাগ এবং তার ফলে পারিবারিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শোচনীয় অপমৃত্যু হাকিরোবী স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বংশগত সনাতন সঞ্চয় অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী হাকিরোবী এই 'বংশ-বেদ' রচনা করেন। এই বৈদিক অনুশাসনে শাসিত মিৎসুই-ফার্ম্ম কেমন ক'রে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পারিবারিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে, এইবার সেই ইসিহাসের আমরা আলোচনা করব।

সার্দ্ধ শত বৎসর ধরে মিৎসুই-পরিবার এই বিধান অনুসরণ ক'রে তার ব্যাঙ্কিং এবং ব্যবসা সংগঠিত ক'রে চলেছে, সহসা এক বিচিত্র ঘটনা তার ব্যবসা-বৃত্তিতে নব অনুপ্রেরণা এনেছিল। ১৮৫৩ সালে কমোডোর পেরী আমেরিকা থেকে জাপান আগমন করেন। তখনও জাপান বৈদেশিক সংস্পর্শে আসে নি, তখনও সে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজের গৃহকোণে নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। পেরীর পদার্পণে তাই জাপানী সমাজে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল, জাপানের সহজ, অনাড়ম্বর জীবনে আমেরিকান সভ্যতার প্রথম ছোঁয়াচ লাগল। এই চাঞ্চল্যের ফলে মিৎসুই-ফার্ম্ম একজন শিল্পীকে প্রেরণ করলেন পেরীর প্রতিকৃতি আঁকবার জন্য। শিল্পীর অঙ্কিত পেরীর প্রতিকৃতি মিৎসুই-মিউজিয়ামে আজও বিলম্বিত আছে। পাশ্চাত্যের উন্নত নাসিকা, চেপ্টা নাক জাপানী শিল্পীর মনে যে কৌতুক এবং কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল, হয় ত তার জন্য, অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, শিল্পীর আঁকা পেরীর চিত্রখানি দেখতে অনেকটা ব্যঙ্গচিত্রের মত হয়ে দাঁড়াল। এই চিত্র দর্শনে কৌতূহলী মিৎসুই আবার সেই শিল্পীকে পাঠালেন আমেরিকার জাহাজ এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। এই পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রচারের ফলে জাপানের সহজাত সুপ্ত অনুকরণ প্রবৃত্তি সহসা জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে জাপানের যুগজীর্ণ সমাজ-দেহে দেখা দিল নবজাগরণের চাঞ্চল্য। অতঃপর প্রাচীনের বিরুদ্ধে

নবীনের যে অভিযান সুরু হ'ল, মিৎসুই-বংশ তার নায়কতা গ্রহণ করলেন। কিমোনো পরিহিত জাপানী যুবকেরা দলে দলে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করল সেখানকার শিল্প বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্কিং প্রথা শিক্ষা করবার জন্যে। অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে তারা যেই স্বদেশে ফিরে এল, অমনি সুরু হ'ল সর্ব্বক্ষেত্রে অভিনব জাপানের জীবনোৎসব। এই আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত জাপানের রাজসিংহাসন তথা রাজবংশকেও আলোড়িত ক'রে তুলল। এই সময় 'মেইজি' নামক অতি-আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি বংশের উদ্ভব হয়। জাপানের প্রাচীনপন্থী পুরাতন রাজবংশের সঙ্গে নবজাত এই শাখাটির যে সংঘর্ষ বাধল, তাতে মিৎসুইগণ নবীনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। যত বিরোধ ক্রমশঃ সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে পরিণত হ'ল এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশেষে নবীনেরই হ'ল জয়লাভ। ফলে 'মেইজি' বংশের নেতা মিকাডোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'লেন। এইরূপে বিজয়ী রাজবংশের সকৃতজ্ঞ সহৃদয়তায় ব্যবসায়ী মিৎসুই-ফার্ম্ম নবজাগ্রত জাপানের শিল্পক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করলেন। রাজার অনুমতি ক্রমে মিৎসুইগণ 'জাপান ষ্টীল ওয়ার্কস' নামে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মাণ করলেন। জাপানে এই জাতীয় ব্যক্তিগত এবং বে-সরকারী কারখানার প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। মহাযুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ সরবরাহের অত্যধিক চাহিদার ফলে মিৎসুই-ফার্ম্ম আশাতিরিক্তরূপে স্ফীত হয়ে উঠল।

এক দিকে রাজানুগ্রহ, অপর দিকে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পা, মিৎসুইকে আজ নবীন জাপানের সৌভাগ্যশ্রীর প্রতীক ক'রে তুলেছে, মিৎসুইয়ের পণ্যবাহী পোত সপ্ত সমুদ্র মথিত ক'রে ফিরছে; আপাতদৃষ্টিতে এ সব দেখলে মনে হয়, মিৎসুই-বংশ আপনার অসপত্ন মহিমায় গৌরবের উচ্চতম শিখরে সমাসীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিচক্ষণ হাকিরোবী যতই দূরদর্শী হোন, যে কালে তিনি তাঁর পারিবারিক বিধান রচনা করেন সেই সুদূর সপ্তদশ শতাব্দীর শিখরে বসে, তাঁর দূর প্রসারী দৃষ্টিও বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগের এই ঘোরতর জীবন-যুদ্ধের ভীষণ দৃশ্য দেখতে পায়নি; তাই অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ না করবার নির্দ্দেশ তিনি তাঁর বংশধরগণকে দিয়ে গিয়েছিলেন। গত মহাযুদ্ধের বধ্যভূমিতে জাতি এবং জনপদের জীবন-শোণিতে পরিপুষ্ট যে সব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মিৎসুই-ফার্ম্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল, 'মিৎসুবিশি কোম্পানী' তাদের অন্যতম। এই কোম্পানীটি প্রাচীনতায় ও প্রতিষ্ঠায় মিৎসুই-ফার্ম্মের সমকক্ষ না হ'লেও কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং বীমা প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই জাপান তার নব অভ্যুদয় অনুভব করছিল। এই তরুণ প্রতিযোগীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য মিৎসুই-ফার্ম্ম তাঁদের পারিবারিক বেদের অন্যতম সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ লঙ্ঘন ক'রে অন্যান্য ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হ'লেন, কৌলিক কারবারের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নবীন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। অচিরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেগ ব্যবসার বাজার প্লাবিত ক'রে রাজনীতির দরজায় হানা দিল। জাপানী 'Diet' মেনসেইটো ও সেইয়ুকাই—এই দুইটি প্রতিযোগী রাজনীতিক দলের মল্লক্ষেত্রে জাপানের বৃহত্তম দুইটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগী এই দুটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। মেনসেইটো দল ব্যাঙ্কিং এবং ফাইনান্স প্রথার সমর্থক, কাজেই, তার বৈদেশিক নীতি বন্ধুত্বপূর্ণ, আন্তর্জাতিক আদর্শ সখ্যের, ইয়েনের স্থায়িত্বই তার একমাত্র কাম্য; দলগত নীতির অনুরোধেই সে ব্যাঙ্কিং এবং ফাইনান্স প্রথার সমর্থক 'মিৎসুবিশি' কোম্পানীর পক্ষ গ্রহণ করল। পক্ষান্তরে, সেইয়ুকাই দল উগ্র জাতীয়তাবাদী, কাজেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিযোগিতার সে পক্ষপাতী; দলীয় নীতির খাতিরে সে নিল যন্ত্রশিল্পের সমর্থক 'মিৎসুই-ফার্ম্মের' পক্ষ। এই প্রতিযোগিতা চরমে উঠল ১৯৩১ সালে; এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যসঙ্কটের আঘাতে জাপানও আহত, মিৎসুই-ফার্ম্মের ব্যবসার বাজার অতিশয় মন্দা; কাজেই, দুর্দ্দিনের দুঃখ লাঘব করবার জন্য জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ মাঞ্চুরিয়া অভিযানের আয়োজন করতে লাগলেন। দেশের শাসনভার যদিও মেনসেইটো দলের হাতে, তথাপি সমর বিভাগের উপর তাঁদের কোন কর্তৃত্বই নেই, কাজেই আসন্ন অভিযান থেকে নিরস্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও তাঁরা কৃতকার্য্য হলেন না। অবসর বুঝে সেইয়ুকাই দল সমর বিভাগের সহায়তায় ছুটে এলেন; ফলে, মেনসেইটো গবর্ণমেণ্টের পতন হ'ল এবং মন্ত্রীসভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এল সেইয়ুকাই দলের হাতে। সেইয়ুকাই দলের

জয়লাভ অর্থে মিৎসুই-ফার্ম্মেরই বিজয় অর্জ্জন; মিৎসুই-ফার্ম্মের প্রভাবে প'ড়ে জাপান স্বর্ণমান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বাজারে ইয়েনের স্থানচ্যুতি ঘটল, ফলে মিৎসুই-ফার্ম্মের ব্যবসা-বাজারে এল প্লাবন; মিৎসুইদের তুলার ব্যবসা এতদিন সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাজারের অভাবে ম্রিয়মান হয়েছিল, এই কারেন্সি-কৌশলের কল্যাণে দেখতে দেখতে তা সজীব এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

মিৎসুই-ফার্ম্ম যথেষ্ট লাভবান হলেও জাপানের জনসাধারণের দুঃখের অনুমাত্র লাঘব হ'ল না, বরঞ্চ বৃদ্ধিই হ'ল। অসহনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার রুদ্ধ আক্রোশ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি করল, অত্যল্প সময়ের মধ্যে দেশের গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তি আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। ১৯৩২ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে 'মিৎসুই গোমেই কাইশা ফার্ম্মের' ম্যানেজিং ডিরেক্টার ব্যারণ তাকুমা দান ফার্ম্মের টোকিয়োস্থ হেড অফিসের বারান্দায় এক জাপ যুবকের রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। মিৎসুই-পরিবারের প্রতি জাপ-জনসাধারণের রুদ্ধ আক্রোশ এই প্রতিবিধিৎসায় কথঞ্চিত পরিতৃপ্ত হ'ল। ব্যারণ তাকুমা ছিলেন মিৎসুই-ফার্ম্মের প্রাণ, তাঁর অভাবে ফার্ম্মের প্রভূত ক্ষতি হ'ল বটে, কিন্তু সে ক্ষতি মাত্র সাময়িক, তার দরুণ ফার্ম্মের প্রসার ও পরিচালনের পথে স্থায়ী কোন অন্তরায় সৃষ্টি হ'ল না। বিধান যেখানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যক্তিত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু সেখানে ঘটতেই পারে না। তাই তাকুমার মৃত্যুর পরেও, কি বাণিজ্য, কি রাজনীতি—সর্ব্বক্ষেত্রে মিৎসুই-বংশের একাধিপত্য আজও অক্ষুণ্ণ, আজও পৃথিবীর প্রতি রাজধানীতে, এবং এসিয়ার প্রত্যেক নগরীতে মিৎসুই ফার্ম্মের শাখা-প্রতিষ্ঠান সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে; জাপান সাম্রাজ্যের পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশে যতগুলি 'কনসাল' নিযুক্ত আছেন, মিৎসুই ফার্ম্মের জগত-জোড়া শাখা-প্রশাখার সংখ্যা তাঁর চেয়ে ঢের বেশী; আজও তাই কোন জাপানী পৃথিবীর যে-কোন দূরতম প্রদেশে যাক, জাপানী কন্সালের সন্ধান না ক'রে সে মিৎসুই-ফার্ম্মেরই খোঁজ আগে নিয়ে থাকে, কারণ, কন্সাল হয় ত কোন নগরে নাও থাকতে পারে, কিন্তু ফার্ম্ম থাকবেই—এই তার দৃঢ়বিশ্বাস।

যে বিধানবলে সুবৃহৎ মিৎসুই বংশের পারিবারিক ঐক্য আজও অক্ষুণ্ণ, পারিবারিক ঐশ্বর্য্য আজও নিত্য বর্দ্ধনশীল, তার বিস্তৃত বিবরণ আগেই প্রদত্ত হয়েছে, এইবার তার পারিবারিক দীক্ষার প্রথা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব। মিৎসুই পরিবারের তরুণদের জাপানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপ্ত হ'লেই তাদের ম্যাসাচুসেট্স, টোকিয়ো, হারভার্ড প্রভৃতি বৈদেশিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—শিল্প এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে স্বদেশে ফিরে এলে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মিৎসুই তরুণকে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ ক'রে 'ফেমিলি কাউন্সিলে' প্রবেশ করতে হয়। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে দীক্ষার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত রূপে শপথ পাঠ করতে হয়:

"আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য ক'রে, আমাদের পারিবারিক ঐক্যের চিরস্থায়ী ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর এবং বিস্তৃততর করবার জন্য তাঁদের পরলোকগত আত্মাকে সাক্ষী ক'রে মিৎসুই পরিবারের পরিজনরূপে আমি শপথ করছি, আমাদের পারিরারিক বিধানের প্রতিটি ধারা আমি যথাযথভাবে প্রতিপালন করব এবং অনুসরণ করব, যথেচ্ছভাবে তাদের পরিবর্ত্তন করতে কখনও প্রয়াসী হব না। আমার এই পণের প্রমাণ স্বরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পরলোকগত আত্মার সমক্ষে আমি এই শপথ গ্রহণ করলাম এবং নাম স্বাক্ষর করলাম।"

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত এই পারিবারিক বিধান এই দীক্ষাদান-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর একটি প্রগতি-শীল পরিবারকে ও একটি ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে আজ ইঙ্গিতে পরিচালিত করছে; জানি না, এই অতি প্রাচীন কৌলিক প্রথার মধ্যে কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি, কি শাশ্বত সঞ্জীবন সুধা সঞ্চারিত আছে। দীক্ষা গ্রহণের সময় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যে, অপ্রাকৃত অলৌকিক সত্তার অনুভবগম্য আবির্ভাবে পারিবারিক সভা-গৃহ যেন দেবতার দেউল হ'য়ে দাঁড়ায়; এই আবেষ্টনীর আধ্যাত্মিকতা, এই অনুষ্ঠানের প্রভাবে তরুণ মিৎসুই-র মনে

যে মোহবিস্তার করে, সারা জীবনে সে তার মাদকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই মিৎসুই-পরিবারের কোন ব্যক্তি কি শিক্ষায়তন, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ভোজসভা, কি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, যেখানেই খুশী যাক না কেন, পারিবারিক সভার প্রাধান্য তার সহগামী. সে আগে পরিবারের, তারপর, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের। মিৎসুই-বংশের প্রধানকে এই জন্য ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে তুলনা করা হয়, 'ফেমিলি কাউন্সিলের' সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু পারিবারিক একতার একাধিপত্য প্রধান এবং পরিজনদের মধ্যে সেরূপ মতানৈক্য ঘটবার সুযোগ দেয় না। মিৎসুই-ব্যারনরা ফার্ম্মের পরিচালক সত্য, কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা পরিবারের হাতে, তার প্রাধান্যের কাছে ব্যক্তিত্বকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়।

অপূর্ণ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

অরুণ যে মেমসাহেব বিবাহ করিয়া ফিরিয়াছিল, তাহার পিছনে একটা অনতি দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

অরুণ বড়লোকের ছেলে নয়, তাহার দাদা ওকালতি করিয়া কোনমতে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিল। লেখাপড়ায় ভাল বলিয়া স্কলারসিপ পাইয়াছিল, তাহার সহিত তাহার দাদা মিতব্যয়িতার সঙ্গে সংসার চালাইয়া কিছু সাহায্যও করিয়াছিলেন এইমাত্র।

যাইবার পূর্ব্বে, তাহার বৌদিদি প্রতিভা তাহার দাদা অজয়কে বলিয়াছিলেন,—একটা বিয়ে দিলে না, শেষে মেমসায়েব নিয়ে ফিরবে—সে হবে না।

অজয় হাসিয়া বলিয়াছিল—বিয়ে ক'রলেই যে আর একটা মেমসায়েব নিয়ে ফিরবে না, তা কি ক'রে বুঝলে?

প্রতিভা বলিয়াছিল,—তবুও একটা পথের কাঁটা থাকবে ত!

—বিয়ে ক'রে রেখে যদি আর একটা মেমসায়েব আনে তবে সেটা কি আরও খারাপ হবে না? আর অরুণকে যদি অতটুকু বিশ্বাসই আমরা না করি তবে সংসার করব কি ক'রে?

দাদা তাহাকে এতখানি বিশ্বাস করিতে পারেন জানিয়া অরুণ মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিল,—এ বিশ্বাসের যোগ্য যেন সে হইতে পারে।

কিন্তু তিন বছর বিলেত থাকিবার পরে অরুণের ধারণা হইল, যুক্ত পরিবারই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উন্নতির অন্তরায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে সে নতুন আদর্শ খুঁজিয়া পাইল। তাহার পর অকস্মাৎ একদিন অজয়ের নামে পত্র আসিল তাহার মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে এই যে, ওই দেশীয় একটি মেয়ে তাহাকে বিপদ হইতে বহু ত্যাগে উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ না করিলে তাহাদের জীবন ধ্বংস হইবে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত প্রয়োজন—

সংসারে কতকগুলি লোক আসে কেবল সহিবার জন্য, দিবার জন্য; অজয় সেই দলের। বাল্যাবধি সে নিজের সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভাইকে মানুষ করিয়াছিল। যে দিন এ পত্র সে পাইল সে দিন সে নিরাশায় নির্ব্বাক হইয়া গেল। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা বা অনিবার্য ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়াইবার মত সাহস তাহার আর থাকিল না। প্রেমের দেবতা অন্ধ, সেখানে যুক্তির অবকাশ নাই তাহাও অজয় জানিত। সে লিখিল—

তুমি বড় হইয়াছ, শিক্ষায় আমা হইতে বড়, হয় ত বুদ্ধিতেও বড়; এ ক্ষেত্রে আমার মতামত কতখানি মূল্যবান হইবে জানি না। যাহা করিবে তাহা ভাবিয়া করিও। বাড়ীতে আসিলে কি অবস্থা হইবে, ভবিষ্যতে কি হইবে সমস্ত চিন্তা করিয়া দেখিও, নেহাৎ খেয়ালের বশে কিছু করিও না।

পত্রের মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ছিল সে কথা অরুণ বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। এক দিন সত্যই সে মেমসায়েব বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল।

প্রতিভার মত সাধারণ মেয়ের সঙ্গে চলা, একসঙ্গে সংসার করা যখন কোনমতেই সম্ভব নয়, তখন অকারণ সে চেষ্টা না করিয়া অরুণ আলাদা বন্দোবস্ত করাই সমীচীন মনে করিল।

ব্যারিষ্টারীতে যেরূপ পসার হইবে ভাবিয়াছিল সেরূপ হইল না। সাহেবী ষ্টাইলে বাস করিতে খরচাও বেশী, অরুণ কোনমতে সংসার চালাইয়া উদ্বৃত্ত দশ-বিশ টাকা দাদাকে না দিত এমন নয়, দুই-একবার স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতেও যাইত। কিন্তু মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা অস্বস্তিও সে অনুভব করিত। ওই দাদা, বৌদি তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে একদা একসঙ্গে, এক সংসারের অঙ্গীভূত হইয়া বাস করিত। আজ দাম্পত্য জীবনের সুখের অধিকারী হইলেও এই বাল্য-যৌবনের

অশেষ স্মৃতি-স্নেহ-বিজড়িত সংসার হইতে সে যেন পর, একান্তই পর হইয়া গিয়াছে।

পূজায় সেবার অরুণ দেওঘর বেড়াইতে যাইবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু যাইবার দুই দিন আগে বাড়ীওয়ালার সহিত গোলমাল হওয়ায় বাড়ী ছাড়িয়া দিল। অন্য বাড়ীও পাওয়া গেল না, এ ক্ষেত্রে কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে সে যখন অনেকটা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন য়্যাটর্নী-বন্ধু সুনীলবাবু বলিলেন—আমার দেওঘরের বাড়ীতে অনেক ঘর রয়েছে, আমরাও যাব অবশ্য। তবে দুটা ঘর আমি ছেড়ে দিতে পারি, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে—বাঙালীর সঙ্গে থাকা বুঝলেন না! খানিক হাসিয়া তিনি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—আমার মা ত গঙ্গাজল তিন কলসী নেবেন, তবে ঘর দুটা একপাশে হবে, বিশেষ সংযোগ নেই।

অরুণ বলিল,—আমার অসুবিধা কিছু হবে না, তবে আপনাদের যদি না হয় তবে অবশ্যই যাব। আমার বাবুর্চি নেই, ঠাকুর।

তারপরে তাহাই ঠিক হইল।

রোহিনী রাস্তার ধারে বিরাটকায় বাড়ী। সামনে ফুলবাগান, ব্যাটমিন্টনের কোর্ট। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। সদর দরজার বাঁ পাশের দুইখানি ঘরে আশ্রয় নিল অরুণ ও তাহার ইউরোপীয় স্ত্রী। ডাইনে সুনীলবাবুর বিপুল সংসার—মা, মাসিমা, স্ত্রী, তাহার অপোগণ্ড শিশুবাহিনী, ভ্রাতা সুশীল ইত্যাদি। সুশীল এম, এস-সি পাশ করিয়া রিসার্চ স্কলার হিসাবে ইউনিভারসিটিতে কাজ করিতেছে।

দুইটি অংশের বিশেষ সংযোগ না থাকিলেও জানালা দিয়া সুনীলবাবুর বাড়ীর ভিতরটা বেশ দেখা যায়। জানালায় নেটের পর্দা, তাহার অন্তরালে মিসেস ঘোষ তাহার ইউরোপীয় সংসার পর্যবেক্ষণ করেন।

দেওঘরে তখন বেশ একটু শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া বারান্দায় টেবিলে সুনীলবাবু, অরুণ ও মিসেস ঘোষ চা-পান করিতেছিলেন। সামনে অদূরে সুনীলবাবুর সন্তানবাহিনী বিচিত্র রং-এর ফ্রক টুপি প্রভৃতি পরিয়া সুশীলের তত্ত্বাবধানে রৌদ্র পোহাইতেছে। সকালের শীত কাটিয়া শরীর কিছু উষ্ণ হইলে সুশীল বালকবৃন্দসহ কানামাছি খেলিতে আরম্ভ করিল। সুনীলবাবুর বড় ছেলে ভন্টু হইল প্রথম স্বীকার—তাহার চোখ বাঁধিয়া, সাত পাক দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সকলের সমবেত চিমটিতে না টিকিতে পারিয়া ভন্টু যখন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছে তখন অগত্যা সুশীল নিজেকে ধরা দিল। সুশীলের চোখ বাঁধিয়া সকলে চিমটি দিতে আরম্ভ করিল, সুশীল কিছু বলে না, ছেলেরা সাহস পাইয়া সকলে নিকটবর্ত্তী হইয়া চিমটি দিতেই সুশীল সবকটিকে একসঙ্গে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নাম বলিয়া দিল। তাহার পর সকলের চোখ বাঁধিয়া দিল। শিশুর দল একান্ত নিষ্ঠার সহিত অপর প্রাঙ্গণ হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, সুশীল নিশ্চিন্তে প্রাঙ্গণের প্রান্তে এক পেয়ারা গাছে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

সুনীলবাবু চা খাইতে খাইতে হাসিয়া বলিলেন,—দেখেছেন অরুণবাবু, সুশীলটা কি ফাজিল, ছেলেগুলোকে কেমন ক'রে বেকুব করলে? দিবারাত্রি একটা না একটা উৎকট কিছু করা চাই,—এম, এস-সি পাশ করলে ভাবলুম মানুষ হ'ল,—একেবারে বদ্ধ পাগল।

অরুণ সংক্ষেপে বলিল,—বেশ ফুর্ত্তিবাজ ছেলে।

সুনীলবাবুর মা সহসা শিশুগণের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া একটু রাগান্বিত হইলেন—এগুলোর এ শাস্তি করেছে নিশ্চয়ই ওই সুশীল। পাথরে বেধে যদি মুখ-থুবড়ে পড়ে যায়!

সকলের চোখ খুলিয়া দিতেই সকলে একসঙ্গে নালিশ করিল,—কাকা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

সুনীলবাবুর মা বলিলেন,—দেখেছিস সুনীল, সুশীলের আক্কেল, দিবারাত্রি এগুলোকে মারবে, শাস্তি ক'রবে—

সুনীলবাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি ওকে ব'কে দেব'খন।

সুশীল গম্ভীরভাবে পেয়ারা গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল,—না জেনেই ত এক পশলা গালাগালি ক'রে নিলে, এমনও ত হ'তে পারে যে, ওরা নিজেরাই চোখ বেঁধে খেলা করছিল।

মা বলিলেন,—দূর হ সামনে থেকে, বুড়ো হ'য়ে গেলি কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হ'ল না!

সুশীল সহসা অভিমানের সহিত বলিল,—আমি বুড়ো, আমি বে-আক্কেল, দুত্তোর, আমি আত্মহত্যা করবো, আর কিছু পেয়ে না মরণ হয় গরম চা খেয়েই মরব! সুশীল বীরদর্পে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল—

সকলেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল!

মা বলিলেন,—এমন লক্ষ্মীছাড়া যে ওর সামনে গম্ভীর হ'য়েও থাকা যাবে না।

অরুণ বলিল,—আজ ক'দিন ধ'রেই দেখছি, আপনার ভাইটি বাড়ীখানাকে একেবারে সরগরম করে রাখে।

সুনীলবাবু বলিলেন,—সর্ব্বদাই ও অমনি আনন্দ করে। ছেলেমানুষ!

সুনীলবাবুর সমবয়সী অরুণ, কাজেই বিদেশে তাহরাই পরস্পরের সঙ্গী। সর্ব্বদাই প্রায় এক সঙ্গে বেড়ান গল্প করেন, সঙ্গে স্বাধীন ইউরোপীয় মহিলাটিও থাকেন। সেদিন অরুণের ঘরে বসিয়াই আইন ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, সহসা বাড়ীর ভিতর একটা কোলাহল শোনা গেল, মা যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—দাঁড়া ডাকছি তোর দাদাকে!

সুশীল একখানা চিঠি খুলিয়া পড়িতে যাইতেছে, মা তাহা কিছুতেই শুনিবেন না, সুশীল বুঝাইয়া বলিতেছে,—তোমারই ছেলে, তোমারই বৌ, চিঠি দেখ্‌লে তাতে দোষের কি আছে,—পেটের সন্তান, তোমার কাছে আমার গোপন করবার কি আছে! শোন, তোমার পত্র পাইলাম—

মা বলিলেন,—ওরে লক্ষ্মীছাড়া, তোর আক্কেল হচ্ছে দিনেদিনে—তোর দাদাকে ডাকব?

মাসিমা বুঝাইয়া বলিলেন,—তোমাকে চটাচ্ছে দিদি, ও কি সত্যিই পড়ে নাকি? আর তা কি কেউ পারে?

—কেউ যা পারে না, ও তা খুব পারে, বিয়ের পরদিন, বৌমা কি বললে তা গল্প ক'রতে বসলে আমার কাছে!

সুনীল নাটকীয় ভঙ্গিতে কহিল,—অকারণ কালক্ষেপ কিহেতু করিছ মাতা, শোনো,—তোমার চিঠি না পাইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলাম—

মাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডাকিলেন,—সুনীল! সুনীল!

সুনীল পর্দ্দার ফাঁক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমায় ডাকছ মা?

সুনীলবাবু জানালায় দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিলেন।

মা উত্তর করিবার পূর্ব্বেই দেখা গেল সুনীল বিদ্যুতের মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

মা বলিলেন,—ছ্যাখ ত, ওটা এখন আমার সঙ্গে লাগতে এল—

অরুণ এবং তাহার স্ত্রী এই ছেলেমানুষ ভাইটির কাণ্ড শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, মনে মনে তাহার সরলতা ও নির্ম্মল আনন্দ দানের প্রচেষ্টাকে প্রশংসাও করিল। মাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল,—তোমার সঙ্গে ও দিবারাত্রি লাগে, এক কাজ কর মা, বৌমাকে এখানে নিয়ে এস, তার সামনে অন্তত একটু গম্ভীর হবেই,—গম্ভীর হোক না হোক, অন্তত তার সঙ্গে লাগ্‌লেও ত তুমি বেঁচে যাবে।

মা বলিলেন,—তাই কর, ওর শালাকে লিখে তাদের নিয়ে আয়, আমি হাড় জুড়ুই,—বৌমার শরীরও তেমন ভাল দেখলাম না।

সুনীল বলিল,—আচ্ছা তাই লিখে দিচ্ছি।

সুনীল বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিল সুশীল তাহার বৌদিকে বলিতেছে—দাদা ত বেশ ভাল ডাক্তার!

সুনীল হাসিয়া ফেলিল। এবং হাসি প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই অরুণের ড্রইং রুমে ঢুকিয়া পড়িল। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, হাসছেন যে?

মিসেস ঘোষ ইংরেজীতে বলিলেন,—আপনার ভাই সম্বন্ধে কিছু বোধ হয়!

সুনীলবাবু ইংরেজী করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ব্যাপারটার আনন্দ যখন খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে তখন মিসেস ঘোষ কি কারণে অন্য ঘরে প্রস্থান করিলেন। অরুণ সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সুনীলবাবু, আপনার কি মনে হয়—ধরুণ, আপনি যদি কেবল আপনার স্ত্রী নিয়েই সংসার করতেন তবে এতটা সুখী হতে পারতেন?

সুনীল বলিল,—না, আমার মনে হয়, জীবনকে পূর্ণ ক'রে পেতে হ'লে যেমন স্ত্রীর ভালবাসা চাই, তেমনি মায়ের স্নেহ চাই, ভাই বোন—এদের সেবা সান্নিধ্য চাই, তাদের আব্দারের অত্যাচার চাই,—তা নইলে যেন একদিক ফাঁক বলে মনে হয়—না?

অরুণ সহসা চুপ করিয়া গেল, খানিক পরে বলিল,—আপনি যদি মনে কিছু না করেন তবে একটা কথা বলি—

—বলুন।

—আমার অমনি একটা ভাই নেই ব'লে আমার বড় হিংসে হয়।

সুনীল বলিল,—আমি এদিক দিয়ে ভাগ্যবান, ও ত এই আষাঢ়ে চাকরি পেয়েছে, প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে একেবারে ৭৫৲ টাকাই আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি ওর মনটা পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম, তোর মান্থলি টিকেটের টাকা রাখলি নি? ও জবাব দিলে, কাল কোর্ট থেকে ফিরবার মুখে তুমি নিয়ে এসো। আমি বললাম, বায়স্কোপ দেখার জন্যেও কিছু রাখলিনি? ও হাত পেতে বললে—দাও না, আজকে ভাল বই একটা আছে। আমি বললাম,—যদি না দি? ও আবার বললে,—না দাও, বৌদির কাছথেকে চেয়ে নেব।—সেই দিন মনে যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম, সে আনন্দ আমার চিরস্থায়ী হ'য়ে রয়েছে, ওর জন্যে পরিশ্রম আজ সার্থক ব'লে মনে হয়।

অরুণ শুনিয়া আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল।—আড্ডা আর তেমন জমিল না।

সপ্তাহ মধ্যেই সুশীলের স্ত্রী আসিয়া পড়িল।

সকলে ভাবিয়াছিল মা'র হাড় জুড়াইবে, কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ উল্টা। প্রত্যহ তিন বেলা তাহাকে মীমাংসা করিতে হইবে, সুশীল দেখিতে ভাল, না তাহার স্ত্রী ভাল। বৌমাকে ভাল বলিলে রক্ষা নাই, ইতিহাস জ্যামিতি প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ সহ সুশীল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেই এবং তাহা না শুনিলে, মায়ের পা জড়াইয়া ধরে। মা অগত্যা বলেন —ডাকব তোর দাদাকে?

সুশীল অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়।

সুশীল দেখিতে কালো, এবং তাহার স্ত্রীর বর্ণ রীতিমত ফর্সা কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই, বলিলেই সে বলিবে, সাদা হইলেই হয় না, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ ছিল নবঘন শ্যাম অর্থাৎ তাহার মত।—কারণ তাহার বর্ণ আষাঢ় মাসের মেঘের মত। শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণও ছিল ওইরূপ।

আজ দুই সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। মীমাংসা হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

সেদিন সুশীল বেলা এগারটার সময় একটু চা পাইবার জন্যে চুপি চুপি রান্নাঘরে উপস্থিত হইল। বলিল,—বৌদি, তোমার পায়ে ধরি, একটু চা,—চেঁচিও না।

সুশীলের একবার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছিল, তাহার দুইবারের বেশী চা খাওয়া নিষিদ্ধ। বৌদি বলিলেন,—মা বকবেন, সে আমি পারব না।

—ওর দোষ দিয়ে দেবে, ও ত আর জানে না।

—বা, ওর দোষ আমি শুধু শুধু দেব কেন?

—পতি পরমগুরু, তার জন্যে এটুকু ও করবেই।

বৌদি পরিহাস করিয়া বলিলেন—কি রে রেবা, দোষটা নিতে পারিস?

রেবা মাথা নাড়াইয়া জানাইল, পারিবে না।

সুশীল বলিল,—হায় কলির সতী, এই তোমার ত্যাগ? এই তোমার পতিভক্তি, এই তোমার নিষ্ঠা . . .

মা পিছন হইতে বলিলেন,—সুশীল, চা খাওয়ার মতলব বুঝি? এত বেলায় চা হবে না।

বৌদি বলিলেন,—একটু দিই মা, অনেক তোষামোদ করেছে।

মা বলিলেন,—দাও একটু, পায়ে ধরার হাত এড়ানো যায় না।

সুশীল হৃষ্টমনে আসন পাতিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। এবং আধুনিক নারীরা যে সব স্বার্থপর এবং পতি ভক্তি যে তাহাদের একেবারেই নাই—এই সমস্ত বিষয়ে গবেষণামূলক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল।

বৌদি জল গরম করিয়া বলিলেন, রেবা, চা টা করে দে ত ভাই।

রেবা চা করিতেছিল, চিনির কৌটায় কয়েকটা পিপড়ে ছিল, একটা অকস্মাৎ রেবার আঙুল কামড়াইয়া দিল।

সুশীল যখন চা পান প্রায় শেষ করিয়াছে, তখন অসাবধানে রেবার পায়ে আর একটা পিঁপড়ে কামড়াইয়া দিল। রেবা উঃ বলিয়া বসিয়া পড়িল।

সুশীল হাতের কাছে বাটি ঘটি যাহা কিছু ছিল সব মুহূর্ত্তে একত্রিত করিয়া বলিল,—বৌদি ফিট্ হ'তে পারে, জল দিন—টিন্‌চার আইডিন, ব্রমাইন, ম্যাংগানিজ ডাইঅকসাইড, নাইট্রিক এসিড,—ডাক্তার—ডাক্তার—

সুশীলের মা ও সুনীলের কানে শেষোক্ত দুটি কথা গিয়াছিল। তাহারা কোন বিপদ আশঙ্কায় ত্বরিৎপদে রান্নাঘরে উপস্থিত হইলেন। তাহারা পৌছিবার পূর্ব্বেই সুশীল নিরাপদে নিজের ঘরে পৌছিয়া নিবিষ্ট মনে ছোট ভাইপোটিকে আলতা ও কালির সাহায্যে সাজাইতে লাগিয়া গিয়াছে। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে? এত বালতি-ঘটি এখানে কেন?

রান্নাঘরে সকলেই হাসিতেছে, কে জবাব দিবে! মা ব্যাপারটা শুনিয়া আসিয়া জানাইলেন যে রেবাকে পিপীলিকা দংশন করায় হতভাগা সুশীল এই কাণ্ড করিয়াছে। সুনীল হাসিবে, না রাগ করিবে খুঁজিয়া পাইল না। বলিল,—হতভাগা! প্রাণ চম্‌কে উঠেছে, কি জানি কি একটা হ'য়েছে! সেটা গেল কোথায়?

মা বলিলেন,—এখন কি আর তার খোঁজ পাওয়া যাবে?

বৌদি বলিলেন,—তাকে আবার বকতে যাবে নাকি? ফুকুড়ি করেছে তা হ'য়েছে কি? তোমাদেরও যত সব কাণ্ড, ডাক্তার শুনেছ, কি ছুটে এসেছ!

ব্যাপারটায় গুরুত্ব কমিয়া গিয়া যখন সকলেই হাসিতে আরম্ভ করিলেন তখন বিচিত্র চেহারা দামুকে লইয়া সুশীল প্রবেশ করিল,—"দ্যাখ বৌদি, কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছে? নবকার্ত্তিকটি!"

অবোধ বালকের এই দুর্গতি দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সুনীল বাহিরে আসিয়া এই আশু বিপদের এই অতি হাস্যকর পরিণামের কথা যখন জানাইল তখন অরুণ এবং তাহার স্ত্রী উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

মিসেস ঘোষ বলিলেন,—আপনার ভাই সত্যিই খুব আমুদে, আমি সেদিন আলাপ করেছিলাম, কিন্তু তখন এমন গম্ভীর হ'য়ে রইলেন যে, আমার কেবলই হাসি পাচ্ছিল।

সুনীলবাবুর এই আনন্দ কোলাহলপূর্ণ সংসারের অনাবিল জীবনযাত্রা দেখিয়া অরুণের মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহারও দাদা ছিল, এমনি করিয়া তাহাদের সংসারও হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারিত, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক একত্রে হয় ত জীবনের পূর্ণতা পাইত।

সেদিন বৈকালে অরুণ একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া এই কথাটাই বার বার ভাবিতেছিল, এ ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের সহিত হয়ত পাশ্চাত্যের আদর্শের যোগাযোগ অত্যন্ত অল্প, তাহাকে একত্রিত করিতে যাওয়া হয়ত কেবল বোকামী নয়,—পণ্ডশ্রম।

পর্দ্দার ভিতর দিয়া সে সহসা চাহিয়া দেখিল,—সুশীল রান্নাঘরের দাওয়ায় স্ত্রীর সহিত কি কথা বলিতেছে। এমন কোন কথা যাহাতে রেবা বার বার লজ্জিত হইয়া পড়িতেছে।

সুশীল তাহার সহিত খুনসুড়ি করিতেছে। অরুণ একমনে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল।

রেবা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা ঘোমটা দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অরুণ চাহিয়া দেখিল, পিছনে সুনীলের মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই রেবা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল ফিরিয়া মাকে দেখিয়া বলিল,—উহু হু, গেছি গেছি,—দেখলে মা, ও আমাকে মারলে!

মা সক্রোধে বলিলেন,—দূর লক্ষ্মীছাড়া!

—সত্যিই মা, মারলে, ঠাস্ করে চড় মারলে, মুখখানা, ভ্যাগো মা লাল,—না না খুড়ি, বেগুনে হ'য়ে উঠেছে!

মা কোন উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই নববধূর সলজ্জ অবগুণ্ঠন, সুশীলের প্রহসন, আজ অরুণের মনটাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আজ যদি রেবারই মত কোন বাঙালী নারীর সহিত তাহার বিবাহ হইত, তবে ওই মার আগমনে সেও অমনি অবগুণ্ঠন দিত, সুশীলের মত পরিহাস হয়ত সেও করিতে পারিত।

তাহার স্ত্রী তাহাকে যে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, সেখানে ওইরূপ শিশুবাহিনী, অমনি স্নেহশীলা ভ্রাতৃবধূ, অমনি শ্রদ্ধেয় বড়ভাই হয়ত আজ তাহাকে নিবিড়ভাবে চারিপাশ হইতে বাঁধিয়া ফেলিত। তাহার জীবনও হয়ত পূর্ণ হইয়া উঠিত।

অরুণ ভাবিতে ভাবিতে বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কি অসুখ করেছে?

—না, ভাবছি।

—কি ভাব্‌ছ—বল্‌বে না?

অরুণ বলিল,—বল্‌লে তুমি সুখী হবে না তাও জানি, তবুও বলছি, তোমাকে পেয়েছিলাম সে আমার ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবে তোমার জন্যে হয়ত তোমার চেয়েও বড় জিনিষ হারিয়েছি।

মিসেস্ ঘোষ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ

জীবনে আকস্মিকতা উপেক্ষণীয় নয়, দৈবও নয় অস্বীকার্য্য। আমরা স্বীকার করি শুধু দৈবের পর নির্ভরশীল থাকলেই আকাশের চাঁদ হাতে ধরা যায় না—আর জানি, আকস্মিকতা জিনিষটি তুনিয়ার সব স্থান জুড়ে নেই। তবুও বলি ছন্দহীন জীবনেও দৈব আনে ছন্দের কলগীতি, আর স্বচ্ছন্দ জীবনেও আকস্মিকতা আনতে পারে বিরক্তির পরিবেশ। তাই যদি না হ'ত, তবে কি আমরা আলোর দেশের রাজকুমারকে পথপ্রান্তে হারিয়ে ফেলতাম—আর তা হ'লে কি দীনের চেয়েও দীনের মাথায় শোভা পেত রাজমুকুট!

ছয়ই পৌষ বেলা বারটা পর্য্যন্তও ঠিক ছিল না দিনটা কেমনভাবে কাটবে। হঠাৎ বন্ধু জ্যোৎস্নাভূষণ এসে অনুরোধ করলে, পৌষ-উৎসবে শান্তিনিকেতনটা দেখতে যেতে হবে। যে কথা মুহূর্তের জন্মে আমি চিন্তাও করি নি, বন্ধুর অনুরোধে সে কথাকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছেতেও মন সাড়া দিয়ে উঠল। এরই নাম আকস্মিকতা—যাবার কথা মুহূর্তে চিন্তায় অবধি আসে নি—অথচ এক কথায় অনুরোধে মন সাড়া দিল এই ভেবে যে, যাঁর আজীবন সাধনায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে তিনি কিছুদিন আগেই প্রকাণ্ড ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিজেকে ফিরে পেয়েছেন, তাঁকে তাই এই নবজীবনের সূচনায় তাঁরই আশ্রমে একবার দেখবার সুযোগ হারানো অনুচিত।

কত দূর দূরান্তের লোকের ভারতবর্ষ দেখবার বাসনা শুধু এই শান্তিনিকেতন দেখবার জন্মেই—অথচ আমাদের নিজেদের পাশের ঘর শান্তিনিকেতনকে এতদিন সুযোগ থেকেও দেখতে যাইনি; এর জন্মে আর কিছুকে দোষ দেওয়া যায় না, দোষ দিতে হয় নিজের ঔদাসীন্যকে। কিন্তু এবার যাবার আহ্বানে মনে ঔদাসীন্য এল না—এল আগ্রহ। ছয়ই পৌষ মঙ্গলবারেই তাই কলকাতার শীতের ধূম্রমলিন সন্ধ্যায় কোন এক উন্মুক্ত প্রান্তরের উদ্দেশে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এবার যাবার আহ্বানে মনে এসেছিল আগ্রহ, সে-কথা এর মধ্যে জানিয়ে ফেলেছি—এটা যে আন্তরিক আগ্রহই ছিল তার মধ্যে কোন মিথ্যে প্রচ্ছন্ন নেই। কারণ জানতাম আমাদের যাওয়াটা স্থির হয়েছে বড় দেরীতে—এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে যে অসম্ভব ভিড় হবে তা অতিথি-শালার অধিনায়ক আমাদের জানিয়েছিলেন; অতিথিশালায়, পান্থনিবাসে, এমন কি ছাত্রাবাসেও স্থানাভাব—তাই আমাদের থাকতে হ'বে তাঁবুতে। এই শীতের মধ্যেও উদার আকাশের নীচে শিশিরসিক্ত তাঁবুতে রাত্রিবাস করবার কষ্ট স্বীকার করতে যে আমরা রাজী হয়েছিলাম তাই বোধ হয় আমাদের আগ্রহের আন্তরিকতার পরিচয় দিতে যথেষ্ট।

ভূমিকা করতে গিয়ে আসল কথাতেই এখনও আসতে পারি নি। এমনই হয়—কথার পিঠে কথা ব'লে কথার মালা গেঁথে ফেলি শেষ পর্য্যন্ত আসল কথাকেই হয়ত আমরা হারিয়ে ফেলি। কথাটা আর কিছু নয়: আমরা চলে-ছিলাম একদল—দলে ছিলাম জন কুড়ি। তবে শেষ পর্য্যন্ত তু-দিন বেশী ছিলাম আমরা তিনবন্ধুতে—আমি, শ্যামাপ্রসন্ন ও জ্যোৎস্নাভূষণ।

রাত সাড়ে দশটায় বোলপুর ষ্টেশনে আমরা এসে পৌছলাম। দেখি ষ্টেশনে আমাদের সুবিধার্থে বিশ্বভারতী বিদ্যায়তনের তু'জন ছাত্র উপস্থিত আছেন।

সেখান থেকে ঠিকঠাক ক'রে শান্তিনিকেতনে আসতে ঘড়ির কাঁটা প্রায় মাঝরাতের ইঙ্গিত দিল। অতিথিশালার ভারপ্রাপ্ত শিশিরবাবুর নির্দ্দেশে পান্থনিবাস আর বিশ্বভারতী হস্‌পিট্যালের মাঝের মাঠে আমাদের তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা হ'ল।

আমাদের মনে ছিল প্রাণের সাড়া। না হ'লে সেই গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতায় হাতুড়ি নিয়ে ঠকাঠক তাঁবু খাটানোর উৎসাহ হ'ত তুর্লভ। তবে সকলকার মিলিত

প্রচেষ্টায় উৎসাহের অভাব প্রায়ই হয় না, বরং আনন্দেরই যে একটা সাড়া পাওয়া যায়, এ তাঁবু-খাটানোর বেলাতেও তা প্রত্যক্ষ করলাম।

যাক্, রাত দেড়টায় তৃতীয় তাঁবু খাটানো হ'লে আমরা বিছানা পেতে নিজেদের গুছিয়ে যখন বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়েছি, রাত তখন দুটো। এত রাত—তবু উৎসাহের অন্ত ছিল না আমাদের। গল্পের—আর তার সঙ্গে প্রাণের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুম এসে আমাদের চোখের পাতা পর্য্যন্ত যোগাতে পারলে না। সবাই বললে—সকাল চারটেয় যখন বৈতালিক সুরুই হচ্ছে, তখন আর এ দু-ঘণ্টার জন্যে ঘুমিয়ে কোন লাভ নেই!

গল্পের ভেতরে দু-ঘণ্টা কেটে গেল নিমেষে। চারটে বাজতেই বিছানা গুটিয়ে অন্য তাঁবুর বন্ধুদের সচেতন ক'রে বৈতালিকের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকার সেই রাত্রি শেষে আমরা আধ ঘণ্টা এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়ালাম। বৈতালিকের কোন সাড়া পেলাম না। চারদিকের সেই অখণ্ড নীরবতার ভিতর আমরা ক জন হট্টগোলের সৃষ্টি করিনি। সাড়ে চারটে বাজতে দু-একজন লোকের মুখ দেখতে পেয়ে অনুসন্ধানে জানলাম যে এখানে রেলওয়ে টাইম অনুসারে কাজ হয়।

অনুসন্ধান নিতে নিতেই ঘুম ভাঙ্গানোর ঘণ্টা বেজে উঠল। এ-ঘণ্টা নাকি রোজই বাজে ঠিক এই সময়ে— ঘণ্টা বাজতেই সব উঠে পড়ে ঘুম ছেড়ে। আর এখানে সব কাজেরই যখন সূচনা হয়—তার আগে ঘণ্টাধ্বনি ক'রে সবাইকে সচেতন ক'রে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখি ছেলেমেয়ের দল দূর থেকে গান করতে করতে আসছেন। এই মৌনতার মধ্যে প্রভাতী বৈতালিকে প্রাণে যেন একটা আনন্দের সাড়া পেলাম—অপরিচিত শান্তি-নিকেতনের আবহাওয়ার সঙ্গে যেন নিমেষে চির-পরিচয় হয়ে গেল।

প্রভাতী সঙ্গীতের দু একটা পদ যেন এখনও মনে পড়ছে—

হ'ল জয় হ'বে জয়,
এ বিশ্বে নির্ভয়—
আঁধারের হ'বে জয়।

প্রতিদিন ভোরে এমন নির্ভয়বাণী যদি আমাদের কেউ শোনাত, আর আমরা যদি তার মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারতাম, তবে কি আর এতদিনে আমরা নতুন সূর্য্যোদয় দেখতে পেতাম না?

বৈতালিক শেষ হতেই প্রভাতিক ক্রিয়াকলাপ শেষ করতে আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। তাঁবুতে ফিরে আসতেই দেখি চারদিকের আবছা ভাব কেটে গিয়েছে, আর পূবের আকাশ উঠেছে রাঙিয়ে। বুঝলাম, একটু বাদেই রঙ্গের খেলা খেলতে খেলতে ঐ রাঙানো মেঘের



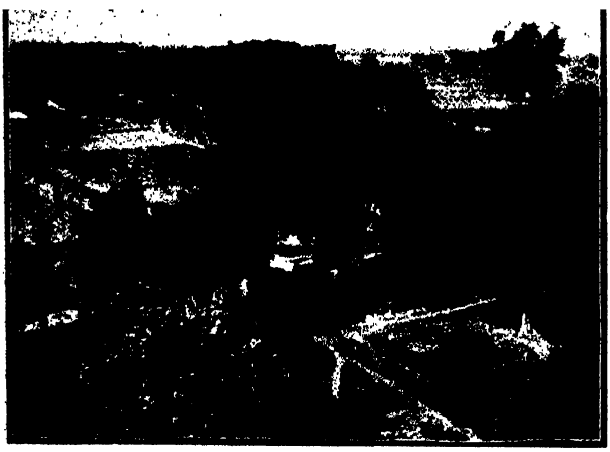
উত্তরায়ণের ভিতরে উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মর মূর্ত্তি

ভেতর দিয়ে আকাশের গায়ে ফুটে উঠবে ভোরের সূর্য্য—তার নীচেই আকাশের গায়ে-মেশা দূরের ঐ গাছপালাদের মাথায় প্রথম আলোর পরশ দিয়ে, আমাদের তাঁবুতে রোদের ছোঁওয়া দিয়ে—আর প্রান্তরের শিশির-ভেজা ঘাসে উষ্ণতার আভাষ দিয়ে।

বেলা আটটায় ছিল মন্দিরে উপাসনা—সেই অনুযায়ী আমরা তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। যথাসময়ে আমরা মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দির ভ'রে উঠেছিল সব অতিথি, প্রাক্তন এবং নবীন ছাত্রছাত্রী নিয়ে। শান্তিনিকেতনে যত উৎসব আছে তার মধ্যে এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-উৎসবেই নাকি সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়। তা ছাড়া তিনদিনব্যাপী আনন্দ

উৎসব মেলা এই সময়কার একটা বড় আকর্ষণ। শুনলাম এবার অন্য বারের তুলনায় ভিড় নাকি একটু বেশী—সম্প্রতি কবির রোগভোগই বোধ হয় এর মূলে।

আমাদের শত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও যখন আমরা একটিবার মঙ্গলময়কে স্মরণ করি, তখন দুঃখের যেন অনেকটা লাঘব হয়। প্রিয়-দেবতার উদ্দেশে একবার মন্দিরে এসে বসলেও মনে সত্যিই একটা নির্ম্মল আনন্দের পরশ পাওয়া যায়। মন্দিরের ধূপ ধেঁাওয়ার ছোঁওয়ায় একটা অযাচিত পবিত্রতা যেন নেমে আসে কোন্ অজানিত উৎস থেকে। রাত্রির ক্লান্তি মন্দিরে এসে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ দুর্ব্বল শরীরেও মন্দিরে না এসে পারেননি—বছরখানেক আগে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, সে



শ্রীনিকেতনের শ্রী

তুলনায় তিনি যেন আরো অনেক বুড়িয়ে গিয়েছেন। তবুও আশ্রমের এই ৩৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে কবীন্দ্র প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রার্থনা করেন। প্রথম প্রার্থনায় মানুষের স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন ও দুঃখবরণ ইত্যাদি মহাগুণের কথা বলে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথাপ্রসঙ্গে বলেন—আশ্রমের পেছনে যে এমন একজন মহাপুরুষের প্রেরণা আছে এটা সত্যিই আনন্দের। সত্যিই মহর্ষি এবং অন্যান্য মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত এ আশ্রমে যেন একটা সুন্দর আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রার্থনা শেষে 'কর তাঁর নাম গান'—এই প্রদক্ষিণ-সঙ্গীত করতে করতে যখন মহর্ষির প্রিয় সেই ছাতিম গাছতলায় এসে দাঁড়ালাম, তখন গাছের নীচের বেদীর শ্বেত-প্রস্তরফলকে মহর্ষির অন্তরতম মনের দুটি কথা—তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি—আমায় যেন ব'লে দিল মহর্ষির মত যিনি তাঁকে নির্ভর করতে পারেন তিনি সুখে-দুঃখে সকল সময়েই মনে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন।

কবি তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনায় বর্ত্তমান পৃথিবীর অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। পৃথিবীর বুকে বর্ত্তমানের বর্ব্বর শক্তির নৃশংস অভিযানের কথা, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচারের কথা যখন কবি তাঁর প্রার্থনায় বলছিলেন, তখন মূর্ত্তিমান দুঃখের একটা রূপ চোখে ফুটে উঠেছিল। আমাদের অত্যাচারিত চির-অবহেলিত আত্মা এ দুঃখের কাহিনী শুনে কেন বুক-ভরা ব্যথায় গুমরে না উঠবে? তবু কবি আমাদের নিরাশ হ'তে বারণ ক'রে যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন তাতে একটা অপূর্ব্ব প্রাণের সাড়া পেলাম। তিনি সম্ভবত বলেছিলেন, যে-শাশ্বত শক্তি অনাদি অনন্তকাল মানবের কল্যাণ করছে সে শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হ'বে। আজ যাঁরা সাম্রাজ্যলিপ্সার বেদীমূলে আত্মবিসর্জ্জন করছেন তাঁরাই প্রকৃত বীর। আপাতদৃষ্টিতে আজ তাঁদের পরাজয় হ'তে পারে, কিন্তু তাঁদের পরাজয়ের ভিতরেই আমাদের জয়ের সূচনা হচ্ছে—শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের দুর্জ্জয় সাহস ও বীরত্বের দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই। কবির আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করেছিলাম—কারণ, এ বাণী অবিশ্বাস করা মানে শাশ্বত শক্তিকে অস্বীকার করা। প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির ধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন—চিরন্তনী বাণী কি এর ভিতরে নিহিত নেই?

কবির উপাসনা এবং প্রদক্ষিণ-সঙ্গীতের শেষে তাঁবুতে ফিরে এলাম। সকাল থেকেই যেন সমস্ত আবহাওয়ায় একটা চঞ্চলতা উপলব্ধি করলাম। আর এই শীতের দিনেও বসন্তের আমেজ বোধ করলাম।

এদিকে মেলার হৈ চৈ। পান্থনিবাস থেকে আরম্ভ ক'রে অতিথিশালা এবং য়ুরোপীয় অতিথিশালার রাস্তা পর্য্যন্ত চারদিকে নানারকম দোকান-পাট ব'সে গিয়েছিল। পান্থনিবাসের ধারে ইঁদারাটায় মেলাদর্শনকারীদের অত্যাচারে আমাদের স্নানটা অতি অসোয়াস্তির মধ্যেই সারতে হয়েছিল।

যা আমাদের রীতি—স্নানশেষে গেলাম ভোজনালয়ে।

নানাজাতির ছাত্র-ছাত্রী অতিথি অভ্যাগতের সমাবেশ এখানে। পরিবেশক সব আশ্রমের ছাত্রছাত্রী। এখানে জাত বিচারের বালাই নেই—কবি তাঁর বিশ্বজনীনতার আদর্শ এক অর্থে ভোজনালয়েও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—ভোজনালয় যেন উদারনীতির শ্রীক্ষেত্র। আমরা বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী সব একসারে ব'সে গিয়েছিলাম—আমাদের পরিবেশকের মধ্যে অবাঙালীই ছিলেন বেশী। এখানে এসে ভোজনের সঙ্গে এই সুন্দর ব্যবস্থায় বেশ একটা পরিতৃপ্তি বোধ করলাম।

দুপুরে বিশ্রাম নেবার পর বিকেলে আমি, জ্যোৎস্নাভূষণ ও শ্যামাপ্রসন্ন চীন-ভবন দেখতে গেলাম। উৎসব উপলক্ষে সব ভবনই বন্ধ। তবুও আমরা তিনজন নবনির্ম্মিত চীন-ভবন দেখবার বাসনাকে চেপে রাখতে পারি নি। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সেই প্রাচীন যুগের যোগসূত্র দৃঢ় করবার জন্যে অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের অধ্যবসায়, আর রবীন্দ্রনাথের চিয়াংকাইসেকপ্রমুখ বন্ধুর সাহায্যে ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যথাসময়ে সুন্দর সুরম্য চীন-ভবনে এসে উপস্থিত হলাম। ভবনটির পরিকল্পনা শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের। এখানে একটি জিনিষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে কুঁড়ে ঘর থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সব কিছুতেই একটা সুন্দর শিল্পবোধের পরিচয় পেয়েছি। সেটা একদিকে যে বিশ্বকবির সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণা থেকে হয়েছে তা নিঃসন্দেহ—সঙ্গে সঙ্গে এখানে অনেক কিছুর পেছনেই নাকি আছে সুরেন্দ্রবাবুর পরিকল্পনা। যাই হোক্, সুরেন্দ্রবাবুর পরিকল্পনার মাধুর্য্যকে পুরো মনে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

এদিকে মেলা এবং লোকজনের চাপে শান্তিনিকেতনের যথার্থ রূপটি বোঝার ব্যাঘাত হয়েছিল। চীন-ভবন মেলা প্রাঙ্গণ থেকে দূরে—সেখানে আবহাওয়া শান্ত। এই লোকসংখ্যা আর হট্টগোল বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মেলার জায়গা ছাড়া সবখানেই শান্তিনিকেতনের যথার্থ রূপটি খুঁজে পেয়েছি। যদিও আমরা যে ক'দিন ছিলাম কোন ক্লাশ তার মধ্যে হয়নি—তবু বড় শালগাছের ছায়ায় এসে বসলে মনে হ'ত, আমরা যেন প্রাচীন যুগে ফিরে এসেছি, আর গুরুদেব যেন গাছের ছায়ায় বেদীমূলে বসে আমাদের পড়িয়ে চলেছেন। অবিশ্যি এখানে একটা কথা বললে ভুল হ'বে না—কবির শিক্ষা-পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—তবুও পরাধীন দেশ ব'লেই কবি তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে সম্পূর্ণ সার্থক রূপ দিয়ে উঠতে পারেন নি।

এসে দেখলাম চীন-ভবন বন্ধ। কেবল নীচে দু-জন চীনা ছাত্র এই উৎসবের দিনে বিকেলেও পড়ে চলেছিলেন। এঁদের দেখে মনে হ'ল, প্রকৃত যে শিক্ষার্থী তাঁকে কোন কিছুই তাঁর সাধনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। শিক্ষার অনন্ত-ভাণ্ডার থেকে সে তার সাজিতে কিছু ফুল তুলবেই।

যা বলছিলাম ; চীন-ভবন ছিল বন্ধ। কেবল দেখলাম বাইরে একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, অধ্যাপক তান-য়ুন-শানের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। অধ্যাপকের



পুনশ্চ

ঘরে সে আমাদের নিয়ে গেল—দেখলাম তিনিও ঘর বন্ধ ক'রে তার ভিতরে অধ্যয়নরত। আমাদের দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন—আমরা নমস্কার করায় তিনি প্রতি-নমস্কার করলেন। যতক্ষণ ছিলাম তাঁর ঘরে তিনি অতি বিনীতভাবে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন, আর তিনি আমাদের চীন-ভবনের পুস্তকাগার দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এখানে একেবারে বড়দের থেকে সুরু ক'রে সাত-আট বছরের ছাত্র পর্য্যন্ত সবাইয়ের মধ্যে এমন একটা বিনীত ভদ্রতা এবং আত্মীয়তা-ভাব লক্ষ্য করেছি, যা মনকে সত্যই আনন্দ দিয়েছে। এঁদের দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এঁরা বোধ হয় কঠোর হ'তে জানেন না। অধ্যাপক তান-য়ুন-শান প্রভৃতির চেষ্টায় সত্যিই চীন-ভবন একটা

অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কত প্রাচীন পুঁথি-পত্তর থেকে সুরু ক'রে আধুনিক চীনা ভাষার নতুন বই যে এ পুস্তকাগারে এসেছে এবং আসছে, তার শেষ নেই। ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রীভাব এবং সংস্কৃতিগত মিলনের সাক্ষ্য দেবে এই ভবন—সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দেবে চীনবাসীর উদারতার। এই ধরণের একটা হিন্দী-ভবনের প্রতিষ্ঠার জন্যে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে—এই মাসেই তার ভিত্তিস্থাপনের উৎসব হয়েছে। এ সমস্তই বিশ্বভারতী জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করবে এবং তার এদিনকার পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদাকে আরো অনেক গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।



আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক অনুষ্ঠানের পৌরহিত্যে রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ

সকালে কবিকে প্রার্থনা করতে দেখলাম—তাঁর সঙ্গে দেখা এখানেও একবার ক'রে যাব ঠিক করেছিলাম। শুনলাম, তিনি উত্তরায়ণের ভিতর তাঁর নব-নির্ম্মিত ভবনে আছেন—কারো সঙ্গে বড় দেখা করছেন না—উত্তরায়ণের বাইরে ফটকে এক হিন্দুস্থানী রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমরা তবুও নাছোড়বান্দা। কবির বর্ত্তমান সেক্রেটারী সুধাকান্ত-বাবুকে বলায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত কবির সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে ঠিক করেছিলেন যে, পরদিন বিকেলে একবার দেখা হ'তে পারে। আমরা আশ্বস্ত হলাম। রাত্রে নানারকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু খুব উপভোগ্য হয়েছিল fire works-টা—যা দেখবার লোভ উৎসবের তিন দিনের একদিনও সম্বরণ করতে পারি নি।

পূর্ব্ব রাত্রের নিদ্রাহীনতার ক্লান্তি সত্ত্বেও তাঁবুতে ফিরতে প্রায় মাঝ রাত হ'ল—কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তি হেতু এ দিন রাত্রে ক ঘণ্টা ঘুম হয়েছিল।

পরের দিন সকালে আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের পৌরহিত্য করেছিলেন ভারতবন্ধু এণ্ডরুজ। এঁকে দেখে এঁর কিছু পরিচয় পেলাম। শুভ্র ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী-পরা এণ্ডরুজ সাহেব—হেসে হেসে কথা বলছিলেন সকলকার সঙ্গে। এটা সত্যি যে, যিনি মানুষকে ভেদাভেদ না রেখে আপন ক'রে ভালবাসতে পারেন—তিনিও বিনিময়ে সকলকার ভালবাসা পান। এণ্ডরুজ এই শ্রেণীর মানুষ। তাঁর এ-দিনকার অল্প সময়ের বক্তৃতাতেও ভারতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভারতের মহাত্মাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি, শান্তিনিকেতনের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা, এমন কি গ্রাম্য সাঁওতালীদের উপর সহানুভূতি সবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে, একজন বিদেশী যদি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন; কিন্তু অন্যের দেশকে নিজের দেশের মত ভালবাসা এক এণ্ডরুজ সাহেবের মত মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

আগের দিন শ্রীনিকেতনের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে স্থির হয় যে তিনি আমাদের শ্রীনিকেতনের সব কিছু দেখিয়ে আনবেন। শান্তিনিকেতনে এই ছুটির ভেতরেও আমাদের সব কিছু যে দেখা হয়েছে তার মূলে রয়েছে এখানকার ছাত্র অধ্যাপক সকলের সমবেত কষ্টস্বীকার। তাঁদের কাছে আমরা যে দাবী করেছি, তার মধ্যে জুলুম থাকলেও তা তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। কালীমোহন-বাবু কষ্টস্বীকার না করলে এ যাত্রায় শ্রীনিকেতন দর্শনে যে বঞ্চিত হতাম তা বলাই বাহুল্য। তিনি আমাদের আর একবার শ্রীনিকেতন দেখবার নিমন্ত্রণও করেছেন।

বেলা নয়টায় কালীমোহনবাবুকে শান্তিনিকেতন থেকে বাসে তুলে নিয়ে আমরা শ্রীনিকেতনে রওনা হলাম—অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা শ্রীনিকেতনে এসে পড়লাম। দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলোকে সংস্কার ক'রে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে নিয়ে যাবার সার্থক পরীক্ষাগার এই শ্রীনিকেতন; কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ কম স্থান

অধিকার করেন নি তার পরিচয় এই শ্রীনিকেতন। গ্রামের উন্নতিতে যে দেশের উন্নতি সে-কথা কবি জানেন। গ্রামের উন্নতির পথে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা একটা প্রকাণ্ড বাধা—এই বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে আশপাশের গ্রামসমূহে সম্প্রতি নয়টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এই কেন্দ্রসমূহের প্রধান চিকিৎসক থাকেন শ্রীনিকেতনে। এঁদের চেষ্টায় প্রায় সব কেন্দ্রেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং অনেকের প্রশংসা এঁরা এরই মধ্যে অর্জ্জন করেছেন।

স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে হ'লে বেঁচে থাকার উপকরণের প্রয়োজন—গ্রামবাসী কৃষিকার্য্যের সঙ্গে নানারকম উপজীবিকা নিয়ে যাতে ভাল ক'রে বেঁচে থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। উন্নত উপায়ে কৃষি, বয়ন-শিল্প,



কলাভবনের ছাত্রদের কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি

রং-শিল্প, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ—এ-সবই এখানে শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামবাসীরা এ-সব শিখে যাতে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে তারও ব্যবস্থা এঁরা করেছেন। গ্রামবাসীদের এবং শ্রীনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ভার কর্তৃপক্ষই নিয়ে থাকেন। এ-সব কাজে নাকি গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সর্ব্ব-উন্নতির পথে রয়েছে শিক্ষার বড় প্রয়োজন—গ্রামবাসীরা যাতে একেবারে নিরক্ষর না থাকে তার জন্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এঁরা করেছেন। গ্রামের উন্নতির জন্যে নানা বিষয়ে পরীক্ষা চলছে শ্রীনিকেতন পরীক্ষাগারে—এঁদের পরীক্ষায় যে সার্থক ফল পাওয়া গিয়েছে ওখানে, তা যদি দেশবাসী গ্রহণ করতে পারে তবে তারা তাতে উপকৃত হবে।

শ্রীনিকেতনে প্রত্যেকটি বিভাগই আমার ভাল লেগেছে—কিন্তু মুগ্ধ করেছে আমাকে শ্রীনিকেতনের ত্রিতলে, রবীন্দ্রনাথের থাকবার ঘরে খাট-টেবিলে কাঠের কাজের শিল্পবোধের পরিচয়। কালীমোহনবাবুর কাছে শুনলাম, এ-গুলো লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মশায়ের করা। প্রত্যেক জিনিষের পিছনে উপযুক্ত সাধনা থাকলে তার শেষ ফল শুভ না হয়ে পারে না—সুইডেনে লক্ষ্মীশ্বরবাবুর সুদীর্ঘকালের শিক্ষা বিফল হয় নি।

এই সামান্য কটা কথাতে শ্রীনিকেতনের যে-পরিচয় দিলাম তা একেবারেই অসম্পূর্ণ। তবে শেষ কথা এইটুকু আজ বলি—এমনিতর প্রতিষ্ঠান দেশে আরও কয়েকটা হ'লে দেশ উন্নতির পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে।

ভোজনালয়ের পরিবেশকদের মধ্যে কলাভবনের তৃতীয় বার্ষিকের ছাত্র শ্রীযুক্ত পরেশ সিংহের সঙ্গে আলাপ গাঢ় হওয়ায় আমরা তিন জন দু-তিনবার কলাভবন দেখবার সুযোগ পাই। তিনি নানা দেশের সংগৃহীত নানা রকম শিল্পের পরিচয়, কবির আঁকা ছবি, নন্দলালবাবুর আঁকা ছবি, ছাত্রদের করা প্রাচীর-চিত্র—সবই আমাদের কষ্টস্বীকার ক'রে বুঝিয়ে দেখান। ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদ্বয় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর সাধনায় কলাভবন সত্যিই এ-দিক দিয়ে ভারতে শ্রেষ্ঠ ত বটেই—তা ছাড়া অতুলনীয়। কলাভবনে নন্দলালবাবুর হরিপুরা কংগ্রেসের জন্যে আঁকা ছবিগুলো দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে—এই ব্যাপারের জন্যেই যে নন্দলালবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল না—সেটা অবিশ্যি দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

কলাভবনের পরেশবাবুই আমাদের বিশ্বভারতী লাইব্রেরী, শিশুদের শিক্ষাভবন ইত্যাদি দেখাবার কষ্ট স্বীকার করেন। শিশুদের শিক্ষাভবনে দেওয়ালের গায়ে আঁকা নানারকম জীবজন্তুর ছবি ছোটদের মনে যে অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান দেয় তা বুঝতে পারলাম।

সারা দুপুর কবি যেন কি লিখছিলেন তাই শুনেছিলাম। বিকেলে সুধাকান্তবাবুর মারফৎ কবি আমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়েছে এই সংবাদ জানিয়ে পাঠালেন। আমরা

সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে সবাই গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে। উত্তরায়ণের ভেতরেই একটা নবনির্ম্মিত ছোট ভবনে কবি তখন ছিলেন— ভবনটি যেন ঠিক একখানা সম্পূর্ণ সুন্দর ছবি।

কবিকে নমস্কার করায় তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায়—এখনও দুর্ব্বলতা যে কাটেনি তাই তিনি জানালেন। তার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় আছি। তাঁবুতে আছি শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—শীতের মধ্যে তাঁবুতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত? যদিও তাঁবুতে অসুবিধে আমাদের কম হয় নি তবুও কবিকে খুসী করার খাতিরে বললাম যে, আমাদের কোন অসুবিধেই হয় নি। অন্য দু-একটা কথাবার্ত্তার পর কবিকে নমস্কার ক'রে আমরা বিদায় নিলাম।



উদয়ন

কবির কাছ থেকে বেরিয়ে উদয়ন, কোনারক, পুনশ্চ, শ্যামলী প্রভৃতি উত্তরায়ণের দেখবার জিনিষ দেখা শেষ ক'রে —ভিতরে ঘুরে ঘুরে কতকগুলো ছবি তুললাম। উত্তরায়ণের উদ্যান, রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মরমূর্ত্তিশোভিত ছোট উদ্যানটি, তার পর পারাবত থাকবার সুন্দর ঘর– সৌন্দর্য্যবোধ যার আছে এ-সব তার খুব ভালই লাগবে।

সন্ধ্যায় ছিল নৃত্যগীত শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যগীত শিক্ষাতেও যে একটা নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন তা দেখলেই বোঝা যায়। নতুন ধারা শুধু নয়—নৃত্য সত্যই উপভোগের। তা ছাড়া নায়ারের কিরাত-নৃত্য খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

রাত্রে ঘুরে ঘুরে মেলার ভিতরে সাঁওতালীদের নৃত্য, যাত্রা প্রভৃতি দেখতে অনেক রাত হ'ল। আজ বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল, কিন্তু ঘুরে ঘুরে সবই দেখছিলাম। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সাঁওতালীদের দোকানে তাদের হাতের কাজ-করা রূপোর ঝুমকো, মাথার ফুল প্রভৃতি যা দেখলাম —তাতে এই অল্পশিক্ষিত জাতির সৌন্দর্য্যবোধকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।

তাঁবুতে ফিরতে প্রায় রাত একটা হ'ল। আজ এত ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল যা বলার নয়! শিশিরে তাঁবু ভিজে বিছানা শুদ্ধ ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিল। সমস্ত গরম কাপড় যা ছিল—গায়ে দিয়ে তার উপরে কম্বল চাপিয়েও শীতে কাঁপতে হয়েছিল আমাদের। ভারি কষ্ট হয়েছিল আমাদের এই শীতাধিক্যে।

পরের দিন সকালের গাড়ীতে দলের সবাই চলে গেল— আমরা তিনজন ছাড়া। সেদিন সকালে এণ্ডরুজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আর তাঁর সঙ্গে ফটো তোলা হয়েছিল। দলের সবাই তাঁবু তিনটে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ছাত্রদের হষ্টেলে একটা ঘরে তিনজন থাকবার ব্যবস্থা করলাম।

উৎসবের এই তৃতীয় দিনে ভিড় অনেক কমে গেল। সকালে এণ্ডরুজ সাহেবের পৌরহিত্যে আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতি-বাসর ও শান্তিনিকেতনপরিষদের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এখানে উপস্থিত থেকে দুপুরে সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম পরিচয় করলাম সবাইয়ের সঙ্গে। কলাভবনের শিক্ষক রাম-কিঙ্করবাবুর সঙ্গে পরেশবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁকে কিছু আঁকতে বলায় তিনি আমার একটা স্কেচ্ এঁকে দিয়েছিলেন পাঁচমিনিটের ভেতরে। এ-দিন ঘরের ভেতরে থাকায় অন্য দিনের তুলনায় ঘুমটা ভাল হয়েছিল।

পরদিন এণ্ডরুজ সাহেবের পৌরহিত্যে খ্রীষ্টজন্মোৎসব হ'ল উপাসনা মন্দিরে। রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ তাঁর উপযুক্ত বাণী অল্পকথায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। শান্তিনিকেতন উৎসব আগের দিন শেষ হয়ে' গেছে—আজ তাই মেলা উঠে গিয়ে ভিড় অনেক কমে এল—শান্তিনিকেতনের স্বাভাবিক রূপ অনেকটা ফিরে এল।

উৎসব শেষে আমরা কয়জনে মিলে সাঁওতাল পল্লী দেখতে বেরোলাম। এদের জীবনধারার সুশ্রী সারল্য সবাইকে

মুগ্ধ করবে এবং সবাই এদের সারল্যের প্রশংসা না ক'রে পারবে না। এরা অল্পের মধ্যে তাদের নিজেদের কুঁড়ে ঘরকে সাজিয়ে, ছোট-খাটো বাগান ক'রে প্রত্যেকটি গ্রাম এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে যা বাঙলা দেশের অন্যান্য কৃষকপল্লীতে একেবারেই দুর্লভ। আমাদের তাঁবুর কাছে দু-দিন অনবরত বাস-মোটর যাতায়াত করায় শান্তি-নিকেতনের লাল ধূলোয় গাছের পাতাগুলো পর্য্যন্ত ধূলি-মলিন হয়ে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে জনতার আধিক্যে একটা নোংরা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখানে এসে এদের পরিচ্ছন্নতা মনকে প্রসন্ন করলে—এদের বাগানের গাছপালাগুলোর সজীবতা দেখতে ভাল লাগল।

আজ শান্তিনিকেতন আমলকী আর শালবনে ভরা—তার আম্রকুঞ্জে বসলে মন শান্তিতে ভরে ওঠে—কিন্তু একদিন নাকি ছিল পঞ্চাশ বছর আগেও—যখন এখানে ধূ ধূ করত শুধু অনুর্ব্বর প্রান্তর। পঞ্চাশ বছর আগে কি ছিল জানি না, কিন্তু আজও এখানে ধূ ধূ করছে সব বড় বড় মাঠ, লাল কাঁকর বিছানো পথ তবে আজ আর এখানে লতাগুল্মের অভাব নেই, গাছপালার শ্যামল শোভা এখন চোখে মেলা দুর্লভ নয়। তা ছাড়া এখানকার প্রকৃতির এমন একটা উদারতা ও শান্ত গাম্ভীর্য্য আছে যা কবি-মনের অফুরন্ত খোরাক জোগায়। শুধু তাই নয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণায় শান্তিনিকেতনকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যাতে সমস্ত শান্তিনিকেতনই হয়ে উঠেছে সুন্দর একটি কবিতা। আর সত্যিই এখানে এমন একটা আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় প্রকৃতির উন্মুক্ত আত্ম-প্রসারে যা অকবিকেও কবি ক'রে তুলতে পারে। কবির নিজের কাব্যপ্রেরণার বড় উৎস একদিকে যেমন পদ্মা, অন্যদিকে তেমন এই শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনে চার দিন হয়ে' গেল—বিকেলেই তাই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাব ঠিক হ'ল। এই চারদিন এখানে থেকেই এখানকার উপর একটা টান এসে গিয়েছিল। মানুষের গৃহ-প্রীতি এবং ভালবাসার বৃত্তিই অচেনা মানুষকে আপনার করে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে। আর এই স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার বিনিময়ে মানুষের পরিচয়ের যে-ক্ষেত্র প্রসারিত হয় তাতে মানুষ অনেক আনন্দ ও শিক্ষা পায়।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার সময় বিশ্বভারতীর বাসে আমরা উঠে বসলে যখন এখানকার পরিচিতেরা আমাদের বিদায় দিতে এলেন, তখন সত্যিই একটা বিদায়ের ব্যথায় মন ভরে' উঠল; তবু নিয়ে গেলাম এখান থেকে তাঁদের সঙ্গে আনন্দে কাটানো দিনগুলোর সুখময় স্মৃতি।

আর একটা কথা নিয়ে গেলাম এখান থেকে সেটা



শান্তিনিকেতন লাইব্রেরী

হচ্ছে এই—মানুষের শুভবুদ্ধি ও শুভইচ্ছার প্রেরণায় যেমন শান্তিনিকেতনের মত আশ্রম সম্ভব হয়েছে, তেমন মানুষ ইচ্ছে করলেই তার অশান্তিময় জীবনকে শান্তিময় ক'রে তুলতে পারে। আজ বিশ্বভারতী যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে মিলনের যোগসূত্র স্থাপন করায় সমস্ত বিশ্বের একটা শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে—তার পেছনে কবির শুভ-ইচ্ছার প্রেরণাই ত অনেকখানি। তাই বলি—মানুষের শুভবুদ্ধি আর তার কাজ করবার শুভ ইচ্ছা এই তার জীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবার প্রধান সহায়ক।

লিখন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাতাস দুলায়ে ফিরিছে গাছের শাখা,
নিশীথের পাখী গহনে দুলায় পাখা,
স্তব্ধ নিশীথে শব্দহীনের তান,
মর্ম্ম দোলাতে জাগ্রত করে প্রাণ।

এ কি ক্রন্দন বুকের গ্রন্থি টুটে,
শল্য দারুণ বিকল পরাণে ফুটে,
হৃদয় জুড়িয়া ওঠে শুধু হাহাকার,
অবশ নিমেষে নামিছে অশ্রুভার।

আছ কি না আছ, সেথায় নীরব চেতনা;
বক্ষ ভেদিয়া ছুটিছে তীক্ষ্ণ বেদনা,
মগ্ন পরাণে বিরাট দাঁড়ায়ে হাসে,
ডুবি অসহায়ে দেখি না কাহারে পাশে।

শক্তি নাহি যে ভক্তি করিব তোমারে,
দাঁড়াতে দেওনি কভুও তোমার দুয়ারে,
বাহিরে রেখেছ নগ্ন আকাশ তলে,
অন্তরগৃহ করেছ গোপন, ছলে।

আঁধারে রয়েছ আঁধারের রাজা তুমি,
গুরু বলে তব কেমনে চরণ চুমি,
প্রীতিভরে কভু দেও নাই হাত হাতে,
বন্ধু বলিয়া কেমনে চলিব সাথে;

তবু শুনি বাণী কেহ নাই তব সম,
অনাদি বন্ধু অনন্ত প্রিয়তম;
লতায় পাতায় কীট পতঙ্গে তব
আমার আমিরে পাই যেন অভিনব।

তোমার সাধন করিব সাধ্য নাহি
তাই ব'সে ব'সে অকারণে গান গাহি;
তাই অকারণে নয়নে অশ্রু ঝরে
ক্ষণিক ভাবের আবেশে পুলক ভরে;

গভীর নিশীথে আকাশে রয়েছি চাহি
তারালোক হোতে অসীম আকাশ বাহি'
সন্তরি ছুটি আসিছে জ্যোতির শিখা
পড়িবারে নারি কি আছে তাহাতে লিখা।

যত দেখি তত দেখা নাহি শেষ হয়
আকাশ পেয়েছে আকাশের মাঝে লয়;
নীল নীরাধারে বুদ্বুদ শত শত
নিরখি' হৃদয় স্তব্ধ নিমেষ হত;

লুকায়ে তব রেখেছে কোথায় মহিমা,
কোথা আরম্ভ, কোথা শেষ, কোথা সীমা;
কি নিয়মে কেন রবি শশী গ্রহ তারা
নিয়ত কালের দুয়ারে নৃত্যহারা।

একটি ফুলের কোমল পাপড়ি লয়ে'
কি খেলা খেলিছ রঙের ঝর্ণা হয়ে',
কীট পতঙ্গ পাখায় আঁকিছ ছবি
পশু বিহঙ্গে কৌতুক রঙ্গ লভি;

তাই যবে সুখে নয়ন মেলেছি আমি
রক্ত গিয়েছে ধমনীর মাঝে থামি;
চিত্ত বলেছে, ভাঙ্গ এ রুদ্ধ কারা,
বিশ্বধারাতে মিলুক তোমার ধারা,

বক্ষ নিঙাড়ি সেই কথা বারেবার
বক্ষ ছিঁড়িয়া তুলেছে সুরের তার;
যতনে তোমারে জানিতে চেয়েছি যত
নির্ব্বাক্ আমি হয়েছি নিমেষ হত।

স্পর্দ্ধা না রাখি করিতে সাধন তব
জাগুক বেদনা নিত্য সে নব নব;
তাই লয়ে' শুধু চাহি বিশ্বের পানে
শ্যামল প্রভাতে ডুবি বিহঙ্গগানে।

দলিত হৃদয় চন্দন তেল সম
গোপনে জ্বালায়ে তুলিবে প্রদীপ মম;
তাহাতে উঠিবে একটি শুদ্ধ শিখা
তোমার নামটি হইবে তাহাতে লিখা।

মাধ্যাকর্ষণ

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

গত সাত দিন ধরে যে কথা শেষ হয়েও শেষ হচ্ছিল না, আজ সকালে চলল তার পুনরুক্তি। মলিনা ঘরের চারিদিকে ছড়ানো এলোমেলো জিনিসপত্র নিয়ে টুকিটাকি কাজ করতে করতে স্বামীকে বললেন, শেষে বনের মধ্যে কোথায় আমাদের নিয়ে চললে বল ত ?

জ্ঞানবাবু হেসে জবাব দিলেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব, তার আবার বনজঙ্গল কি ? এতদিন ত পরের দেশে পরবাসী হয়ে কাটালুম।

—তাই ত ভাবি, কোলকাতায় সারাজীবন কাটাবার পর বুড়োবয়সে এ ভীমরতি তোমার ধরল কেমন ক'রে !

একটু ভারি গলায় জবাব এল, আজ কদিন ধরে ত এই কথাই তোমায় বোঝাবার চেষ্টা করছি, মনু। কোলকাতায় চিরকাল বড়মানুষী সমাজে কাটালে। পাড়াগাঁয়ে থাকতে প্রথম প্রথম কষ্ট হবে জানি। কিন্তু একবার এই পুরোনো জীবনের মায়া কেটে গেলে যে আনন্দ পাবে তার তুলনা নেই। জীবন ভোর মক্কেলদের কৃপায় পয়সা ত উপায় করলুম ঢের। কিন্তু এই কদিন ধরে যে শান্তি যে তৃপ্তি পেয়েছি তার তুলনা কই ! অদ্ভুত ঐ নেংটি-পরা মানুষটা। ফকিরী করার মধ্যে যে এত আনন্দ তা কে জানত !

—ফকিরী করতে হয় কর না, কিন্তু কোলকাতা ছাড়বার দরকার কি ?

মলিনার অসন্তোষের প্রধান কারণ এইখানেই।

জ্ঞানবাবু আলীপুর কোর্টের বিখ্যাত উকিল। পশার এবং সম্মানে কেবল একজন ছাড়া তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উকিল অমল রায়কে কেবল জীবনে পরাজিত করতে পারেন নি। লোকটি সত্যই প্রতিভাবান্‌। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের দুজনের যেমন ছিল বিদ্বেষ—কর্মজীবনেও তাঁরা পরস্পরের বিপক্ষ পক্ষে কাজ পেতেন। তবু অমলবাবুর শক্তির উপর মানুষের যে আস্থা ছিল, জ্ঞানবাবু শতচেষ্টা করেও তা লাভ করতে পারেননি। সকলেই ভাবতেন, জ্ঞানবাবুর আইন-জ্ঞান অদ্ভুত। কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত অমল রায়ের ধীর শান্ত বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। আইনজ্ঞ হিসেবে জ্ঞানবাবুর জুড়ি নেই কিন্তু তিনি অত্যন্ত হঠকারী। সহজে যেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তেমনি কাজ করেন শুধু উত্তেজনার বশে।

এমনি সময়ে ভারতবর্ষে হঠাৎ সুরু হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। দিকে দিকে পৌঁছল মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগের আহ্বান। আইনজীবী সমাজে ডাক এল পেশা ছাড়, শত্রুর আদালতে গিয়ে বিচারের অভিনয় করো না। গ্রামে ফিরে গ্রামের কাজে লেগে যাও।

জ্ঞানবাবু জন্মেছিলেন পাড়াগাঁয়ে। কোলকাতায় থেকে যখন আইন পড়তেন তখন বাপমা মারা যান। তারপর আর দেশে ফেরেন নি। শ্বশুরের সাহায্যে সহরেই ঘর-সংসার পেতেছিলেন। সে আজ বাইশ বছর আগেকার কথা। তবু এতদিন পরেও গ্রামের আকর্ষণ তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। 'গাঁয়ে ফিরে যাও'—এই বাণী তাঁর চিত্তের গোপন কোণে গিয়ে সাড়া জাগালো। একদিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কৌতূহলবশে মির্জাপুর পার্কে গান্ধীজির বক্তৃতা শুনতে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে জানালেন, কাল থেকে আর কোর্টে নয়।

মলিনা প্রথমে মনে করেছিলেন, এ শুধু স্বামীর মনের এক টুকরো খেয়াল। তাই হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কতদিন এই বৈরাগ্য থাকে দেখব। কিন্তু সপ্তাহ খানেক পরে যখন কোলকাতা থেকে বাস তুলে মেদিনীপুরে জ্ঞানবাবুর পৈত্রিক গ্রামে গিয়ে খদ্দরের কাজ সুরু করার উদ্যোগ চলতে লাগল, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনুনয় বিনয়, মান অভিমানের অভিনয় শেষে পরিণত হ'ল উষ্ণ তর্কাতর্কিতে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হল না। জ্ঞানবাবুর সেই এক কথা, সারাজীবন তো লোক ঠকিয়ে পয়সা উপায় করলুম। এবার মুক্তি চাই।

মুক্তি চাই বললেই মুক্তি মেলে কই ! আজ তিন সপ্তাহ হ'ল জ্ঞানবাবু আদালত যাওয়া বন্ধ করেছেন। তাঁর হাতে যে সব কেস ছিল তা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিলি ক'রে দিয়েছেন। জটিল দু-একটা কেস প্রতিদ্বন্দ্বী অমলবাবুকেই দিয়েছেন। তাঁর জুনিয়ারেরা আপত্তি করেছিল ; কিন্তু জ্ঞানবাবু হেসে বলেছিলেন, উনি চিরদিন আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে এসেছেন বটে কিন্তু ওঁর শক্তি আছে তা বরাবর আমি স্বীকার করি। সেই স্বীকার করার চিহ্ন হিসেবে দিলুম এই কেসগুলো। আমার এইটুকু মহত্ত্ব অন্তত উনি উপলব্ধি করতে পারবেন—বিশ্বাস করি।

প্রাতরাশ শেষ করে নীচে এসে উপস্থিত হতেই জুনিয়ার মুখুজ্জে হন্তদন্ত হয়ে বললেন, আপনার জন্যে দেওড়াপুলির কুমার বাহাদুর বসে রয়েছেন।

জ্ঞানবাবু মুখুজ্জের ব্যস্ততায় কোন আগ্রহ প্রকাশ না ক'রে শান্তভাবে বললেন, তাই নাকি ! তুমি কেন বললে না যে আমাকে আর অনুরোধ করা মিথ্যে। তা ছাড়া ও কেসটা তো অমলবাবুকে দিয়েছি, ভয়ের কারণ কি ?

—ওঁরা চাইছেন, আপনি কোর্টে গিয়ে না দাঁড়ান, অন্তত অমলবাবুকে যদি একটু পরামর্শ দেন তো—

—না না। এ সবের মধ্যে আমাকে আর টেন না। বিরক্তিভরে জ্ঞানবাবু অসম্মতি জানালেন।

বৈঠকখানায় যেতেই কুমার বাহাদুর মাথার পাগড়ীটা খুলে বললেন, বাবা বুড়ো হয়েছি। বেশি কথা বলার আর শক্তি নেই। এই মাথার পাগড়ী খুলে তোমার পায়ের কাছে—

—আহা, হা! করেন কি? আমাকে এমন ক'রে অপরাধী করছেন কেন? জ্ঞানবাবু ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বুড়ো বাপের রুদ্ধ আবেগ কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে। নির্দোষকে রক্ষা করাও দেশের কাজ।

—আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? কেসটা অমলবাবুকে দিয়েছি—তাঁর মত আর যোগ্য লোক কে আছেন?

—সে আস্থা আর রাখতে পারছি নে বাবা। কাল গভর্ণমেন্ট থেকে যে সাক্ষী দিইয়েছে তাতে কেসটা আরো বেঁকে গেছে। গোড়া থেকে তুমিই এর তদারক করেছ, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই এর তদারক করতে হবে। কোর্টে না হয় নাই গেলে। অমলবাবু বলছিলেন, এত তাড়াতাড়ি তিনি এখনো সবটা আয়ত্ত করে নিতে পারেন নি। এই চার হাজার টাকা তোমার হাত খরচের জন্যে রেখে যাচ্ছি, আমার ছেলেকে খালাস করতে পারলে আরো দশ হাজার টাকা তোমায় দেব।

ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানবাবু মৌন হয়ে রইলেন। হাঁ্যা ওনা'র দোটানা বিদ্যুৎ মুহূর্তের মধ্যে মনের আকাশে ঝলসে গেল। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।—তিনি ভাবলেন।

থাক্। ক্ষণিকের মধ্যে জ্ঞানবাবুর মনের অন্ধকার ভেদ ক'রে আবার ভেসে উঠল এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি—দেশের জন্য যিনি স্বেচ্ছায় ফকিরী নিয়েছেন। তাঁর আহ্বান—এ যে সমুদ্রের আহ্বান!

জ্ঞানবাবু কুমার বাহাদুরের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, আপনারা সকলে মিলে আমাকে পাগল ক'রে দেবেন দেখছি। টাকা আপনি নিয়ে যান। আপনাদের অনেক পেয়েছি। আজ সন্ধ্যেবেলা অমলবাবুর সঙ্গে আমি নিজেই দেখা করতে যাব। মুখুজ্জের সঙ্গে আপনি আসবেন।

বড় কিছু ত্যাগ করার একটা আনন্দ আছে—একটা দুঃখও আছে। ত্যাগ করতে পারায় মনের মধ্যে যে অহমিকা-বোধ তৃপ্তি পায়, তা থেকে জাগে আনন্দ। কিন্তু ছেড়ে-দেওয়া লাভের হিসেবটা যেন কিছুতেই মনের গোপনতল থেকে যেতে চায় না। জ্ঞানবাবু দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মনে পড়ার ঘরে বসে নতুন-কেনা চরকায় সুতো কাটতে লাগলেন। সময়ের অপব্যয় করার উপায় নেই। যত ঘণ্টা তিনি আগে আদালতে কাজ করতেন সেই হিসাবে এখন সুতো কাটেন।

ঘরের চারিদিকে আলমারি থেকে নামানো বড় বড় পুরোতন আইন-বইগুলো মেঝের ছড়ানো রয়েছে।

একদিন এই আইনের বইগুলোর কতই যত্ন ছিল। এত দুষ্প্রাপ্য আইনের বই কোলকাতা সহরে খুব কম লোকই সংগ্রহ করেছেন। বইগুলো জ্ঞানবাবুর একান্ত প্রিয়জিনিস। আইন ব্যবসা ছেড়ে দেব স্থির করার পর তিনি তা-ই বেচে দিয়েছেন, যাঁরা কিনেছেন তাঁরা এখনো নিয়ে যাননি। বইগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে জ্ঞানবাবুর মনে পড়ে যায় অতীত জীবনের কথা। এই এক-একখানা বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ব্যবসাজীবনের কত ওঠা-পড়া—কত সুখদুঃখের কাহিনী। কখনো কখনো এই বই সংগ্রহ করার জন্যে অমল রায়ের সঙ্গে কি ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। শুধু বই নিয়ে কেন—সারাজীবন তো এই অকারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর দিনগুলি বিষিয়ে উঠেছে। ছেলেবয়সে কে একজন জ্যোতিষী তাঁর কোষ্ঠিবিচার করে বলেছিলেন, জীবনে তাঁর চরম উন্নতি হবে বটে, কিন্তু একজন অতি-কাছের মানুষের বিদ্বেষে চিরদিন তাঁকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হবে। জীবনে সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। রক্তের সম্পর্কে অমল রায় তাঁরই অতি দূরের আত্মীয়, কিন্তু ছেলেবয়সে মেদিনীপুরের জিলা স্কুল থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কাটিয়ে আজ তাঁদের আত্মীয়তার শেষ বাষ্পটুকুও আর বাকি নেই। জ্ঞানবাবুর মনে পড়ে, য়ুনিভার্সিটি-পরীক্ষায় অমল কখনো তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি, তিনি বরাবর প্রথম হয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, অমলও বরাবর দ্বিতীয় হতেন। পাছে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে কখনো পরাজয় ঘটে, এই ভয়ে ক… অকারণ দুঃখে এবং মনপীড়ায় না তাঁর দিন কেটেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ছাত্রজীবনে যাঁর কাছে কোন দিন হার হয়নি, কর্মজীবনের বিস্তৃতক্ষেত্রে তিনিই পেলেন উচ্চতর আসন। জ্ঞানবাবুর স্পষ্ট মনে পড়ে, মেদিনীপুরের জেলা-আদালত থেকে আলীপুরে যোগ দিয়ে কেমন ভাবে ধাপে ধাপে অমলের উন্নতি হয়েছে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদ জ্ঞানবাবুর জানা। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তিনি মাঝে মাঝে এই অপ্রীতিকর স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চান; কিন্তু তবু তা যেন নিরাশ্রয়ের শেষ সম্বলের মত তাঁকে আঁকড়ে থাকে।

হঠাৎ অন্যমনস্কতার জন্যে জ্ঞানবাবুর হাতের সুতো ছিঁড়ে গেল। তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন—এ সব কি বাজে জিনিস তিনি এতক্ষণ একমনে ভাবছিলেন! এ যে শেষ হয়েও শেষ হয় না। জ্ঞানবাবু মনে মনে বললেন দূর হোক ও সব স্মৃতি। যে জীবন ছেড়ে এসেছি অতীতের অন্ধকারে তার ইতি হয়ে যাক। আমি আজ নতুন মানুষ— আমার জীবনে হয়েছে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। অমল বড় হোক, তার অগাধ ঐশ্বর্য্য হোক। এতেই আমার আজ আনন্দ। যা… হোক, রক্তের সম্পর্কে সে তো আমার আত্মীয়!

জ্ঞানবাবুর অতি-সূক্ষ্ম মনের গোপন তল থেকে একটা অবিশ্বাসের হাসি ভেসে উঠল; তিনি নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ ক'রে বললেন, এ… মহত্ব! কি জানি, এ 'আঙুর বড় টক' নয় ত!

আধুনিক মানুষের চোখে নিজের মনের সূক্ষ্ম আবরণ যতই খুলে যাচ্ছে, মানুষ নিজেকে নিয়ে ততই বিব্রত হয়ে উঠছে। আত্ম-অবিশ্বাস

আজ তার মজ্জাগত। নিজের সম্বন্ধে অতি-সচেতন হওয়ার যে বিপদ—তা সৃষ্টি ক'রে তুলেছে তার জীবনে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বাধা।

—ওহে জ্ঞান, আপন মনে খুব চরকা কাটছ যে! দরজায় টোকা পড়ল।

কণ্ঠস্বর শুনেই জ্ঞানবাবু চিনতে পেরেছিলেন, মলিনার দাদা ডাঃ চকরওয়ার্তী এসেছেন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বললেন, এস এস। হঠাৎ তুমি কি মনে ক'রে?

—এলুম তোমাকে রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। ডাঃ চকরওয়ার্তী বিলেত-ফেরত ডাক্তার। জ্ঞানবাবু কথাটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, তুমি এসে পৌঁছলে তাহলে! আমি ভাবছিলুম, শনি লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসার আগেই পাততাড়ি গুটোব। একমাস তো দেশছেড়ে দিব্যি কাটিয়ে এলে।

—কি করি বল, ওদের অনেক পয়সা পেয়েছি। বুড়ো কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না।

—তা, নবাববাহাদুরকে জ্যান্ত রেখে ফিরলে, না শেষ ক'রে এসেছ? জ্ঞানবাবু কথাবার্তাকে খুব লঘু ক'রে আনলেন।

—না হে, এ যাত্রায় বুড়ো রক্ষে পেয়েছেন। আচ্ছা, বাজে কথা থাক। তোমার এসব কি হচ্ছে শুনি! কালকের 'ইভনিং নিউজ' কাগজে তোমার বিয়ে কি লিখেছে দেখেছ? এত বড় ব্রিলিয়েন্ট কেরিয়ার নষ্ট করা মানে জীবন নিয়ে জাগলারি খেলা।

—আমার তো বিশ্বাস, এতদিন ছেলেমানুষের মতন জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। মনে আছে তপেন, বিলেত যাবার আগে একদিন তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে? তখনো আমার পসার জমে নি, শুধু চলেছে কর্মক্ষেত্রের প্রাথমিক জীবন সংগ্রাম।

—কাঁচাবয়সে অমন অনেক কথা অনেকেই বলে, কিন্তু বুড়োবয়সে যারা সেই কথাকে নজির হিসেবে ধরে তাদের বিশেষণ কি যে দেব বুঝতে পারি নে। জানো, সেদিন যে কথাটা বলেছিলুম তারপর জীবনের বিশবছরের অভিজ্ঞতায় আমরা কত এগিয়ে গেছি। ডাঃ চকরওয়ার্তী গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন—যেন একটা মস্তবড় সত্য আবিষ্কার করেছেন।

জ্ঞানবাবু একটা বিষাদের হাসি হেসে বললেন, এগিয়ে আমরা একটুও যাই নে। শুধু একটা গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে মরি। আজ প্রায় আটচল্লিশ বছর আমাদের বয়স হল। বল ত জীবনে আমরা করলুম কি? টাকা কিছু উপায় করেছি। সমাজের চাকায় পড়ে পাগলের মত ঘুরে মরেছি—বিত্ত আর সামাজিক সম্মানের পেছনে। যত পেয়েছি, সমাজের আরো দশজনের হিংসের ততই আমাদের লোভ বেড়ে গেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে কতটুকু আমরা বাড়তে পেরেছি—জীবনের দিক থেকে কতটুকু মিলেছে শান্তি!

ডাঃ চকরওয়ার্তি অধীর হয়ে বলে উঠলেন, থামো থামো, তুমি যে একেবারে থিয়োসফিষ্টদের বক্তৃতা সুরু করে দিলে!

জ্ঞানবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, তামাসা করতে হয় কর, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হয় কখন জান, যখন ভাবি যে সমাজের চাকার সঙ্গে বাঁধা-পড়ে আমরা ভুলে গেছি আমাদের নিজেদের। আমরা আর আমাদের নই। শুধু দশজনের ইচ্ছেমত নিজেদের গড়ে তুলছি। সমাজ আমাদের বলছে, প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তোমায় ওপরে উঠতে হবে। ফলে মৈত্রীর প্রেরণায় সমাজ বাঁধতে গিয়ে আমরা বিদ্বেষের কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে তুলেছি। এ কথাটা এমন স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলুম কেমন ক'রে জান? আশ্চর্য ঐ রোগা মানুষটি! জীবনের মূল সূত্রটিকে যেন জলের মত বুঝতে পেরেছেন।

—কে? মহাত্মাজী?

—হাঁ, আবার কে?—অন্যমনস্কের মত জ্ঞানবাবু বলে যান—সেদিন দুপুরে রায় বেরোল নায়েবগঞ্জ কনস্পিরেসি কেসটার। অমলের সুখ্যাতিতে সারা কোলকাতা ভরে উঠল। আর আমি সরকার পক্ষে ছিলুম বলে কি টিটকিরি!

—হেরে গেলে লোকে টিটকিরি দেবে না?

—কি, হেরে গেলুম আমি!—প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জ্ঞানবাবুর পুরাতন উত্তেজনা ফিরে আসে—তিনি বলে চলেন, অমলের শক্তি আছে স্বীকার করি, কিন্তু এ কেসটাতে তার কোন পরিচয় দিতে পারে নি। বরং আমার বক্তৃতাগুলো পড়ে দেখো, অভিভূত হয়ে যাবে। পুলিশ যদি ঠিক সময়ে সাক্ষী জোগাড় করতে পারত, তাহলে—যাক্‌গে, ওকথা আর ভাবব না। সেদিন অবশ্য সত্যিই বড় কষ্ট হয়েছিল। এত বড় হার জীবনে আর কখনো হয় নি। টমসন সাহেবকে বলেছিলুম, এ কেসটায় তোমাদের জয় নিশ্চয়ই। রায় বেরোবার পর সাহেব এসে আমার চেম্বারে দেখা ক'রে গেল। দেখলুম, মুখখানা চুণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ওদের গুণগ্রাহিতা। বলে গেল, হার আমাদের হয়েছে বটে কিন্তু তোমার আইনের বক্তৃতা অনেক দিন মনে থাকবে। ভারতবর্ষে অনেক দিন আছি, এমনটি আর কখনো দেখিনি। আর আমাদের দেশের লোক! জীবন গুপ্তকে চেন? খেতে পেত না, টাকা দিয়ে যাকে পড়িয়েছি, সে কি না আমার পেছনে জুতো ঘসতে সুরু করলে আর অমলের জয় দিতে লাগল!

—ও, তাই বুঝি তোমার হঠাৎ এই বৈরাগ্য?

—মানে?

—অর্থাৎ রেষারেষিতে অমলকে হারাতে না পেরে শেষে বনং ব্রজেৎ-এর চেষ্টা!

—না হে। মানুষের মধ্যে যে মহামানুষের শক্তি আছে, অমানুষদের মধ্যে থেকে থেকে তা তোমরা ভুলে গেছ। জ্ঞানবাবু বলে যান—সারাদিন টিটকিরি সয়ে সয়ে মনটা অবশ্য সেদিন খারাপ ছিল। ধীরেন মুখুজ্জের কি খেয়াল হ'ল জানি নে, কোর্ট থেকে বেরিয়েই সোফারকে বললে, চল মির্জাপুর পার্কে। সেদিন প্রথম গান্ধীজীকে দেখলুম—প্রথম তাঁর কথা শুনলুম আর মজলুম। কি যে যাদু জানে এই মানুষটা! আবেগে জ্ঞানবাবুর স্বর কাঁপতে থাকে।

—কি দাদা, তুমিও কি বিবাগী হবার মন্ত্র নিচ্ছ নাকি?—মলিনা ঘরে ঢুকে বললেন, তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর।

—না না, তোমার ভয় নেই। যার বোনকে একমাস ধরে বুঝিয়েও কিছু করতে পারলুম না, তাকে এই দু'মিনিটের বক্তৃতায়—

—দেখো, তোমাদের বোঝা ভার। তোমরা যখন ভোল, দু'মিনিটেই ভোল।

—হ্যাঁ, আমরা দু'মিনিটে ভুলতে পারি বলেই তো মেয়েরা যাদু ক'রে আমাদের নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে। বলিহারি তোমাদের শক্তি!

—যাদু শুধু আমরাই জানি নে। তোমরাও। আমরা যাদু দিয়ে ভোলাই অন্যকে। আর তোমরা যে ভোলাও নিজেকে! পুরুষদের মতন আত্মপ্রবঞ্চনা করতে আর কে পারে?

—বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু আমার মতন আত্মপ্রবঞ্চনা কি যে সে করতে পারে মলিনা? রক্তে থাকা চাই।

—ওঃ, কি সাধুবংশ তোমাদের! তবু যদি তোমার ঠাকুর্দার বাবার কথা না জানতুম!

ডাঃ চকরওয়ার্তি অধীর হয়ে বললেন, থাক্‌, থাক্‌, তোমাদের দাম্পত্য কলহ। আমি বলছি, ব্যবসা ছাড়তে হয়, না-হয় ছাড়। জীবনভোর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছ, হুজুকে পড়ে কিছুদিন বিশ্রাম নাও। কিন্তু গোবিন্দপুরে যাবার বাঁদরামিটা তোমার মাথায় কে ঢোকালে?—গুরুজনের মত উপদেশ দেবার কপট গাম্ভীর্যে ডাঃ চকরওয়ার্তি কথাটা বলে ফেললেন।

—যাঁরা বিলেত গিয়ে বাঁদর তৈরি হয়ে আসেন, অবশ্য তাঁদের কেউ নয়।

—তার মানে?

—মানে খুব স্পষ্ট। জ্ঞানবাবু ঝাঁজের সঙ্গে বললেন। দাঁতে দাঁত চেপে ডাঃ চকরওয়ার্তি বললেন, তাহলে এই বিলেতী বাঁদরেরও একটা কর্তব্য আছে। আমি মলিনা আর খোকাখুকুকে নিয়ে চললুম। গোবিন্দপুরে যেতে হয় তুমি একলা যেও।

—তা আমি জানি। কাল তোমার ওখান থেকে আসার পর মলিনা অনেকবার সে কথা আভাসে আমাকে বলেছেন। বেশ, মলিনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে নিয়ে যাব না।

সন্ধ্যেবেলা কুমার বাহাদুর এবং মিঃ মুখার্জি আসতেই খুব খুশী মনে জ্ঞানবাবু অমল রায়ের বাড়ী গেলেন। সারাদিন ভেবে ভেবে তিনি মনকে স্থির ক'রে নিয়েছেন। তপেনের কথায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলেই ভাবে, অমলের সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা দুর্বলতা আছে।—তিনি কিছুতেই তাঁকে সহ্য করিতে পারেন না। আজ তিনি দেখাবেন, অমলের সম্বন্ধে তাঁর মন কত মুক্ত। তাঁর দিক থেকে কখনোই বিশেষ শত্রুতা ছিল না। অমলই বরং বারবার তাঁকে আঘাত করেছেন। আজ তিনি সকল বিদ্বেষ, সকল মান অপমানের ঊর্দ্ধে।

গাড়ীতে বসে বসে জ্ঞানবাবু ভাবেন, কুমারবাহাদুরের ছেলের কেসটা জলের মতন সহজ—ওপর থেকে মনে হয় অবশ্য খুবই জটিল হয়ে গেছে। কিন্তু একটি মূল পয়েণ্ট আছে সেটিকে ধরতে পারলে বিরুদ্ধ পক্ষের সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। জ্ঞানবাবুর একবার ইচ্ছা হয়, বলে দেব না, দেখি অমলের কত শক্তি, এই পয়েণ্টটা ধরতে পারে কি-না। আবার ভাবেন, না, অমলের শক্তি থাকুক বা না-থাকুক, সে বিচার ক'রে আমার কি হবে? আজই ব্যাপারটা খুলে বলে দেব, তাহলে কুমারবাহাদুরের ছেলে মুক্তি পাবে—আমিও মুক্তি পাব। জীবনের যে পংকিল পরিমণ্ডল ছেড়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে পরোপকারের অজুহাতেও আর তিনি আসতে চান না। সংসারের দুর্নিবার মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আবার ফিরে এলে আর কি রক্ষা আছে!

অমল রায় তাঁর অফিস-কামরায় বসে গল্প করছিলেন। সঙ্গে বন্ধু ব্যারিষ্টার সেন। সেন উত্তেজিত হয়ে বললেন, যাই বল, এ যেন হেঁয়ালির মতন ঠেকছে। জ্ঞানবাবু এসে তোমায় পরামর্শ দেবেন, এ প্রস্তাবে তুমি রাজি হলে কেমন ক'রে?

—না হয়ে করি কি? কুমারবাহাদুরের অতগুলো টাকাও তো হাতছাড়া করতে পারি নে।

—টাকাটাই এত বড় হ'ল! এতদিনের এত বড় শত্রুতা ভুলে গেলে?

অমলের মুখে একটা বড় কিছু পাওয়ার মৃদু তৃপ্তি গভীর হাস দেখা দিল। বললে, তাহলে খুলেই বলি সেন। আজ এগার বছর আগেকার ইচ্ছে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই এগার বছর বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি মর্মান্তিক অপমান।

সেন কথাটা বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অমল একটু থেমে বলে যান, তখন দাদার বড়ছেলের অন্নপ্রাশন। মেদিনীপুরের জমানো ব্যবসা ছেড়ে বছর পাঁচেক কোলকাতায় এসেছি—চলেছে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ঘোর জীবন-সংগ্রাম। হাতের পুঁজি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দাদার হাসি বিদ্রূপ, অকারণে আমার নিন্দে—সবই মুখ বুজে সহ্য করছি। অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন তিনি আর সকলের বাড়ী নিজে গিয়ে ক'রে এলেন, কেবল আমার নেমতন্ন হ'ল চিঠিতে। তবু গেলুম নেমন্তন্নে। দাদার এখনকার বাড়ীখানা তখন সবেমাত্র তৈরি হয়েছে। তার হালধরণের প্রশংসায় সারা কোলকাতায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

—হ্যাঁ, ভদ্রলোক বাড়ীটা করেছিলেন বটে, রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

—দাদার সঙ্গে দেখা হতেই কথা খুঁজে না পেয়ে বললুম, জ্ঞানদা একখানা বাড়ী করেছেন বটে, চমৎকার। জবাব এল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে, তা তোমার কালীঘাটের বাড়ীখানার তুলনায় চমৎকার বটে! এ যেন মেদিনীপুরের কোর্ট আর আলিপুরের কোর্ট। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম কি জান,—না থাক্। যদি জীবনে তা সফল হয় তো বলব।

—বাবুরা এসেছেন, হুজুর।—বেয়ারা এসে খবর দিলে।

অমল বললে, সেন, একমিনিটের জন্যে মাপ কর। আমি ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি।

সেন বললেন, আবদুল নিয়ে আসছে, তুমি বস না।

—না হে, সেটা খারাপ দেখায়। হাজার হোক, সম্পর্কে ভাই তো।

কাজের কথা শেষ হবার পর অমল জ্ঞানবাবুকে একলা পেয়ে একটু ইতস্তত ক'রে কথাটা তুললে, দেখুন জ্ঞানদা, আপনি যখন এই জুয়োচুরীর ব্যবসা ছাড়লেন, তখন একটা কথা বলি। বইগুলো তো আপনার আর বিশেষ দরকার হবে না—যদি রাখতে চান, অবশ্য আমার কোন কথা বলবার নেই। রাখা তো উচিত—কেন না কে জানে, হয়ত আবার একদিন এদিকে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু যদি না রাখেন, তাহলে আমাকে দেবেন কি ?

—তুমি আগে জানাওনি কেন ? আমি যে সেগুলো বোসকে বিক্রি ক'রে দিয়েছি।—জ্ঞানবাবু অন্যমনস্কের মত জবাব দিলেন।

—ওঃ, তাহলে যা শুনেছি তা ঠিক।

—কি ?

—কে যেন বলছিল, আপনি বাড়ীখানাও বিক্রি ক'রে দেবার জন্যে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছেন।

—হঁ্যা, তবে তেমন কিছু—অল্প লজ্জার সঙ্গে জ্ঞানবাবু সুরু ক'রে শেষ করতে পারলেন না।

—আমি বলছিলুম কি ? কথাটা অবশ্য খুবই ডেলিকেট, কিন্তু—যদি আপনি কিছু মনে না করেন। আমি তো আপনার আত্মীয়।

—নিশ্চয়ই সে কথা আবার মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি ? আজ না হয় আমরা একটু দূরে পড়ে গেছি। তোমার ঠাকুর্দা আর আমার ঠাকুর্দা তো একই বাড়ীতে মানুষ হয়েছেন।

অমলের প্রসন্ন মনে কথাটা শেষ করতেই আর একটা চিন্তা জ্ঞানবাবুর মনের আকাশে বিদ্যুৎবেগে খেলে গেল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মাঝে মাঝে ভাবি, আজকের মানুষ জীবনে বড় হবার নেশায় কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অমল !

অমল কালক্ষেপ না ক'রে নিজের কথাটা শেষ করবার জন্যে সুরু করলে, তাই বলছিলুম কি, আত্মীয়ের জিনিস আত্মীয়ের কাছেই থাকবে। যদি বাড়ীখানাও আমাকে দেন, মিঃ বোস যা দাম দিচ্ছেন তার চেয়ে হাজার পাঁচেক আমি বেশি দিতে প্রস্তুত। অবশ্য বাড়ীখানা আপনি মনের মতন করে করেছিলেন জানি—আমারও খুব পছন্দসই। কিন্তু তার জন্যে নয়। ভাবছি, আমার কাছে থাকলে ভাইপোরা কখনো নিরাশ্রয় হবে না। উপরন্তু কিছু বেশি দাম পেলে ওদের পুঁজিতেও কিছু থাকবে। জানি তো, আপনি যেমন রাজার মতন উপায় করেছেন, তেম্নি রাজার মতন খরচও করেছেন। টাকার ওপর আসক্তি আপনার বরাবরই নেই, তা না হলে এককথায় এমন সন্ন্যাসী হতে পারেন !

জ্ঞানবাবু আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর শিরায় উপশিরায় উষ্ণ রক্ত চঞ্চলবেগে ছুটোছুটি করছে। রাগে ও বিদ্বেষে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমার ছেলেদের আমি পথের ভিখিরী করে যাচ্ছি, আর তুমি আমার বাড়ীঘর কিনে নিয়ে তাদের সাহায্য করবে। এত বড় স্পর্দ্ধা !—কিন্তু মনের উত্তেজনাকে গোপন রাখা তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। নিজেকে চেপে সহজস্বরে জবাব দিলেন, আচ্ছা, বাড়ী যদি বিক্রি করি তো পরে তোমায় জানাব।

গাড়ীতে এসে যখন তিনি বসলেন, তখন তাঁর মুখের ঘনশ্যাম রঙের উপর দ্রুত রক্ত প্রবাহের ছাপ সুস্পষ্ট।

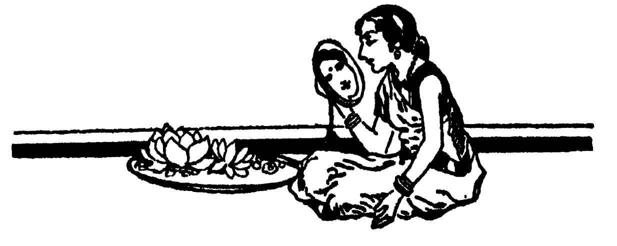
অকস্মাৎ এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে মুখুজ্জে বললেন, আপনার শরীরটা যেন খারাপ খারাপ ঠেকছে।

জ্ঞানবাবু কোন কথার জবাব দিলেন না। তাঁর চারিদিকে পৃথিবীর রং যেন বদলে গেছে। মলিন এই পৃথিবী—তার চেয়েও মলিন মানুষের জীবন।

গাড়ী জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে এসে যখন পৌছল, তখন একখানা মোটর লরীতে আইনের বইগুলো বোঝাই করা হচ্ছিল। বোধ হয়, মিঃ বোস পাঠিয়েছিলেন। তা দেখে জ্ঞানবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, ব্রিজিন্দর, যাইাসে কিতাব লায়া, ওহী ওয়াপিস্ লেনা।

তারপর মুখুজ্জের দিকে ফিরে বললেন, মুখুজ্জে, কাল থেকে তৈরি হয়ে থেক। আমি ঠিক সময়ে আদালতে যাব।

কথাটা বলে ফেলে যেন তাঁর মনের উত্তেজনা অনেকটা কম্‌ল। খুশীর লঘু পদক্ষেপে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর চারিদিক যেন হঠাৎ খুব হাল্কা হয়ে গেছে।



পথের ধারে

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

ভ্রমণ

তখন কার্ত্তিক মাসের প্রথম। হু হু ক'রে ট্রেন হাজারিবাগ জেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা। জঙ্গল প্রদেশের শীতালি হাওয়া গাড়ীর ভিতরে ঢুকে আমাদের হাড়ের ভিতরে কনকনানি ধরিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই সার্সি তুলে দিয়েছেন—শীতের হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। এমন সময় বন্ধুগণ এক মতলব করলেন। তাঁরা বল্‌লেন, এক কাজ কর! 'ইস্‌রি'তে break journey করা থাক—ভারী সুন্দর জায়গা—ক'দিন শান্তিতে বাস ক'রে তারপর অন্য জায়গায় যাওয়া যাবে।...

টাইম টেবিল দেখে জানা গেল, পরের ষ্টেশনের নাম



জৈনমন্দির—মধুবন

'পরেশনাথ' এবং ব্রাকেটে লেখা আছে 'ইস্‌রি'। বন্ধুরা হোল্ড-অল বেঁধে ফেল্‌লেন। সব ঠিক-ঠাক।...যাই পরেশনাথ ষ্টেশন এল, অমনি আমরা একে একে নেমে পড়লাম। ট্রেন আমাদের ফেলে চলে গেল।...দিগন্তবিসারী অন্ধকার—আর তারই মাঝে আমরা ক'টি প্রাণী। আশে পাশে দু-তিনটে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।...টর্চটা জ্বেলে ধরলাম। এই অকূল অন্ধকারের মধ্যে এই ছোট টর্চটা একটুখানি আলোর আঁচড় টেনে কতটুকুই বা আমাদের সাহায্য করতে পারে! এ ষ্টেশনটিতে আর কেউ নামল না, বা, উঠল না।

একটি জীবের দেখা পাওয়া গেল। বল্‌লে সে কুলী। তার মাথায় ব্যাগেজ চাপিয়ে দিয়ে বলা হ'ল ওয়েটিঙ্‌ রুমে নিয়ে চল।

একজন বললেন—যে রকম ষ্টেশন তাতে মনে হয় ওয়েটিঙ্‌ রুম মানে মুক্ত আকাশের পদতল!

কিন্তু লোকটি আমাদের আস্তে আস্তে যেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে সেটি হ'ল একটি রীতিমত furnished room! মাঝখানে একটি মস্তবড় টেবিল, তার চার পাশে চেয়ার সাজান। একদিকে একটি dressing table এবং অপর তিনদিকে গুটিকতক আরাম কেদারা। লেখা আছে—first and second class waiting room.



ফল্গুনদী

যাক্ একটা আস্তানা মিলল—কিন্তু থাকা যাবে কোথায়?

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল, তিনি বললেন—এখানে দুটি ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু সে দুটি জৈন-ধর্ম্মশালা। জৈনরা মাছ খাওয়ার জন্য বাঙালীদের বড্ড ঘৃণা করেন, সুতরাং সেখানে আপনারা থাকতে পারেন বলে মনে হয় না। তবে ষ্টেশনের কাছে কুঠি ভাড়া পাওয়া যায়, আপনারা সেই কুঠি ভাড়া ক'রে থাকতে পারেন। সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা ওয়েটিঙ্-রুমে কাটান। তারপর সকালে যা হয় করবেন।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়কে বহু ধন্যবাদ দিয়ে আমরা ওয়েটিঙ রুমে আরাম ক'রে বসলাম। বন্ধুগণ ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন। সবাই মুখ ধোবার জন্য টুথ পেষ্ট আর টুথ ব্রাস নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।··· রাত্রির অন্ধকার সবে তরল হয়ে গেছে। পূর্ব্বদিকটা বেশ ফর্সা হয়ে আসছে। সেদিকে গগনচুম্বী পরেশনাথ পাহাড় দেখা যাচ্ছে।···সে একটি অলৌকিক মুহূর্ত্ত! জীবনে এমন সুন্দর প্রভাত আর একটীও আসে নি। অভিভূতের মত সবাই সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। পৃথিবীর বুকে অন্ধকারের ওড়নাটি একটু একটু ক'রে স্বচ্ছ হয়ে আস্‌ছে। আশে-পাশের গিরিশ্রেণী বনজঙ্গল ক্রমশ দৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়ল। প্লাটফরমে একটু দৌড়ান গেল।··· বাতাসে যেন একটা কিসের আস্বাদ আছে! ··টেলিফোন-পোষ্টের মাথার উপরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার ঝরে গেল তার



বৌদ্ধস্তূপ (গয়া)

পরিবর্ত্তে ফুটে উঠ্‌ল স্পষ্ট দিবালোক। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্যদেব আমাদের দাক্ষিণ্যের দৃষ্টি দান করলেন। পরেশনাথদেবের সুবৃহৎ মন্দিরটি ছোট্ট একটি বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছিল। তারই নীচে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল।

চা পান শেষ ক'রে আবার পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে ষ্টেশন থেকে বিদায় নিলাম। নিকটেই গ্রাম। সেখানে কুঠি খোঁজ করলাম। কুঠি পাওয়া গেল। ইটের পাকা দেওয়াল কিন্তু খোলার চাল আর মাটির মেজে। আমরা এতে কোন অসুবিধার কিছু দেখলাম না—থাকবার জোগাড় করে ফেললাম।

গ্রাম থেকে একটু দূরেই গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড। এ রাস্তা দিয়ে সোজা মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে ইসরি আসা যায়। এ রাস্তায় কলকাতা থেকে ইস্‌রির দূরত্ব ২০১ মাইল। রেলপথ দিয়ে (গ্রাণ্ডকর্ড লাইন) এলে দূরত্ব হয় ১৯৮ মাইল। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক মোড়েই একটি নদী পাওয়া যায়। এই নদীটিতে প্রত্যহ আমরা স্নান করতাম। ছোট্ট পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। জল বেশী ছিল না—উঁচু-নীচু পাথরের উপর দিয়ে জলের ধারা বিক্ষুব্ধগতিতে নেমে আসছিল। উপলাহত স্রোতের ঝর ঝর শব্দটি একটু দূর থেকেই পাওয়া যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেশটার সঙ্গে যেন আমাদের অন্তরের



বুদ্ধগয়ার মন্দির

আত্মীয়তা জমে উঠল। এই ছোট গ্রামখানির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য আমাদের বড় ভাল লেগেছিল। এখানকার লোকগুলি সরল, কিন্তু অত্যন্ত গরীব এরা। সামান্য একটা পয়সা দিলে আনন্দের সঙ্গে যে-কোন কাজ ক'রে দিয়ে যেতে পারে। শীঘ্রই চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল যে, কলকাতা থেকে কয়টি বাবু এসেছে। কলকাতার বাবুরা এদের মস্ত শীকার! অমনি সবাই যার যার ক্ষেতে যা ফলেছিল আমাদের কাছে বিক্রী করবার জন্যে এনে হাজির করলে! কেউ বা আনলে একটা লাউ, কেউ বা বরবটি, কেউ বা

ভুট্টা। আমাদের দরকার মত কিনলাম, কিন্তু অত্যন্ত সস্তায়। একটি জিনিষ এখানে পাওয়া যায় না, সেটি হচ্ছে আলু। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কেউ এখানে আসতে চান তো অনুগ্রহ ক'রে ও জিনিষটি আন্‌তে ভুলবেন না।

দেশটি ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে নিলাম। সাঁওতালদের সঙ্গে ভাব ক'রে' নিয়ে মুরগীর ব্যবস্থা করা গেল। ধর্ম্মশালায় উঠিনি অতএব রামপক্ষী বধের কোন বাধা থাকতে পারে না। এই নদীটি একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। সেখানে একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বাঁধ দেখলাম। এই পরিত্যক্ত স্থানটিতে এইরূপ একটি বাঁধ তৈরী করার কারণ কি বুঝতে পারলাম না। আশ-পাশের পাহাড়গুলিতে ঘন জঙ্গল। এখানকার



মায়াদেবীর মূর্ত্তি (গয়া মিউজিয়াম)

লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, এই সমস্ত জঙ্গলে খরগোশ বা ময়াল সাপ খুব পাওয়া যায়। একদিন দেখলাম আসানসোল থেকে দুইটি শেতাঙ্গ এসে পাহাড়ীদের পয়সা কবলিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেলেন। পাহাড়ীরা দড়ির ফাঁস দিয়ে একটা ময়াল সাপ ধ'রে এনে দিলে। ফাঁসে ফাঁসে সাপটাকে এমনভাবে ধরা হয়েছিল যে, সে জীবন্ত থাকলেও তার আর নড়বার উপায় ছিল না। পাহাড়ীরা আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, আমরা বন্দুক আনি নি কেন? আমাদের মধ্যে এক বন্ধু বললেন—'পরে যখন আসব নিয়ে আসব।' আর এক বন্ধু হাতে একটা চিমটি কাটলেন।

এখানকার লোকেদের জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়? তাদের কথামত বুঝলাম, এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ পরেশনাথ পাহাড়, তারপর তোপচাঁচি হ্রদ সূর্য্যকুণ্ড, উশ্রী জলপ্রপাত ('ইস্‌রি' নামের সঙ্গে কেউ গোলমাল না করেন এই জলপ্রপাতটি গিরিডির নিকটে) এবং বুদ্ধগয়া। আমরা প্রথমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা ঠিক করলাম।

পরেশনাথ পাহাড় যাবার দুটি রাস্তা আছে; একটি হাজারীবাগ রোডের উপর মধুবন নামক স্থানটি দিয়ে আর একটি গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট ষ্টেশনের দিক দিয়ে।



সীতানালা—পরেশনাথ

নিমিয়াঘাট পরেশনাথ ষ্টেশনের পূর্ব্বের ষ্টেশন এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর পড়ে। আমরা নিমিয়াঘাট থেকেই পরেশনাথে ওঠবার মনস্থ করলাম। পরদিন ভোর পাঁচটার সময় আমরা সোজা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে নিমিয়াঘাট যাত্রা করলাম। নিমিয়াঘাট ইস্‌রি থেকে পাঁচ মাইল দূরে। ইস্‌রি থেকে পরেশনাথ যাবার রাস্তা নেই, নিমিয়াঘাট দিয়ে আছে; তথচ ইসরি ষ্টেশনের নাম বদলে কেন 'পরেশনাথ' নাম দেওয়া হ'ল তা,রেল কোম্পানিই জানেন!...আমাদের মনে হয়, নিমিয়াঘাট ষ্টেশনটির নাম বদলে পরেশনাথ নাম দেওয়া

উচিত ছিল। যাই হোক, যথা সময়ে আমরা নিমিয়াঘাট ডাক-বাঙ্লোতে উপস্থিত হ'লাম। ডাক-বাঙ্লোর নিকটের মাঠটিতে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলাম। তারপর যাত্রা সুরু।

পরেশনাথ যাবার রাস্তার মোড়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাথায় এক জায়গায় লাল নীল কাগজ দিয়ে ফটক তৈরী করা হয়েছে—পাতা দিয়ে সাজান হয়েছে! ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, সেদিন ও বিভাগের কমিশনার পরেশনাথে উঠবেন তাই তাঁর জন্যে এ সমস্ত করা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে রুটি, মাখন, ষ্টোভ, বিস্কুটের টিন প্রভৃতিতে একটি বোঝা হয়েছিল, তাই সেটিকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটি কুলি করতে হ'ল। কুলিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল।

নিমিয়াঘাট গ্রাম দিয়ে যেতে যেতে এক ঘর বাঙালী আছেন ব'লে মনে হ'ল, কিন্তু তখন তাড়াতাড়িতে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয় নি। নিমিয়াঘাট গ্রাম থেকে পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত প্রায় মাইলটাক। তারপর পাহাড় আরম্ভ। পাহাড়টির উচ্চতা সাড়ে চার হাজার ফিট। তলা থেকে উপরের মন্দির পর্য্যন্ত পথ সাত মাইল। কিন্তু এই সাত মাইল পথ চলা যে কি শ্রমসাধ্য তা ভুক্ত-ভোগী না হ'লে বোঝা যায় না।

পথটি এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমরা সব সময় এ সমস্ত রাস্তা দিয়ে না উঠে 'পাকদন্তী' বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলাম। পাকদন্তী দিয়ে পাহাড়ীরা ওঠে। নীচের রাস্তা থেকে উপরের রাস্তায় পাহাড়ের খাড়াই গা দিয়ে উঠে যাওয়ায় অনেকখানি পথ বাঁচান যায়। একবার একটা পাকদন্তী প্রায় এক মাইলটাক পাড়ি দেওয়া হ'ল। কিন্তু উঁচু নীচু গড়ান পাথরের উপর দিয়ে চলায় যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছিল। খাড়াইয়ের উপর দিয়ে ওঠবার জন্যে আমাদের একজনের রীতিমত বুক-ধড়ফড়ানি ধ'রে গেল।

পাহাড়ে দু ধারে ঘন সন্নিবেশিত জঙ্গল। মাঝে মাঝে ঝরণার ঝর ঝর শব্দ বনান্তরাল ভেদ ক'রে কানে আস্ছে। একটু উঠতেই উপরে মেঘ ঢেকে গেল। অথচ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে প্রত্যক্ষ দিবালোক। আমাদের মধ্যে সুনীল ছিল মহাপ্রস্থানের পথ-ফেরৎ, সে বললে—'আরে এ যে একটা ছোটখাট হিমালয়!' হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখি নি, কিন্তু পরেশনাথের জঙ্গলময় পথে ক্রমাগত আঁকাবাঁকা উঠে যাওয়ার ভিতরে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা আর ভুলে যাবার নয়। সারা ছয় মাইল পথে একটি লোকের সঙ্গেও দেখা হ'ল না। শুধু দু'দিকে ঘন বন-শ্রেণী স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে—তাদের দিকে মাত্র আমাদের মূক দৃষ্টি হেনে চ'লে যেতে হ'ল। যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই এক একটা ঝরণা দেখতে পাই। দু হাত পেতে আকণ্ঠ জলপান ক'রে দারুণ তৃষ্ণার সমাধান করি। উপরে সাড়ে ছয় মাইলের মাথায় একটি ডাক-বাঙ্লো আছে। উপরের দিকের পথে এক স্থানে একটি গ্রাম আছে দেখলাম। গ্রামের ভিতর আবার একস্থানে একটি স্কুল আছে। কিন্তু সেটি যে আর চলে না, তা তার জীর্ণ অবস্থা দেখেই মনে হয়। ডাক-বাঙ্লোর একটু পূর্ব্বে আর একটি পথ এসে আমাদের পথের সঙ্গে মিলেছে। সে পথটি মধুবন থেকে এসেছে। মধুবন পাহাড়ের অপর দিকে, হাজারিবাগ রোডের কাছে। সাধারণত গিরিডি দিয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা এই পথেই আসেন।

উপরে ডাক-বাঙ্লো পর্য্যন্ত পৌছাতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল। ডাক-বাঙ্লো পার হয়ে আরও খানিকটা যাবার পর মন্দির। ডাক-বাঙ্লো থেকে মন্দির যেতে প্রায় মিনিট কুড়ি লাগে।

উপরে মন্দিরে পৌছে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পরেশনাথ দেবের মন্দিরটি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। মন্দিরের বারান্দা থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূরের অনেক জিনিষ দেখা যায়। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ট্রেণ যাচ্ছে দেখলাম। বরাকর নদীটি একটি রূপালী রেখার মত চলে গেছে। দুদিকে আমগাছ বসান আমাদের পরিচিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটি সোজা গিয়ে ধূম্র অদৃশ্যের ভিতর আত্ম-গোপন করেছে! মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। একখানি মেঘ এসে চারিদিক ঢেকে ফেল্লে। তারই মধ্যে আমরা মন্দিরের একটি ফোটো নিলাম, কিন্তু সেটি মোটেই ভাল হয় নি।

মন্দির থেকে নেমে এসে আমরা একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে ষ্টোভ জেলে চা তৈরী ক'রে ফেললাম। রুটি মাখন বিস্কুট প্রভৃতি প্রচুর ছিল। তাই দিয়ে কোন রকমে

উদরটা ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার ঠিক করলাম, নিমিয়াঘাটে না গিয়ে উল্টো রাস্তা দিয়ে সোজা মধুবন চলে যাব। সেখান থেকে হাজারিবাগ-রোডের বাস ধরে সোজা আবার ইস্‌রি ফিরে যাব। পাহাড়ের আর এক দিকে একটি মন্দির আছে, সেটিকে জল-মন্দির বলে। তাছাড়া এদিকে ওদিকে আরও বহু মন্দির আছে, সেগুলোকে 'টোকা' বলে।

যাই হোক, আমরা সোজা মধুবনের রাস্তা দিয়ে নামতে লাগলাম। মধুবনের রাস্তা নিমিয়াঘাটের রাস্তার চেয়ে আরও বিশ্রী। এ রাস্তায় ক্রমাগত মেঘ জমে জমে পাথরের উপর এত শেওলা পড়েছে যে, পা দিলেই ছিট্‌কে পড়ে যেতে হয়। আমরা জুতা পায়ে দিয়ে কেউ সে রাস্তার ওপর হাঁটতে পারি নি। শেষে জুতা খুলে বড় রাস্তা ছেড়ে পাক-দন্ডী বেয়ে বেয়ে কোন রকমে মধুবনে এসে পৌছলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ-ছ বার ক'রে ধরণীতলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। মধুবন পৌছাতে আমাদের প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল। এ রাস্তাটি ভাল বলে জানতাম, কিন্তু এত বিশ্রী রাস্তা জানলে আমরা কখনই এদিক দিয়ে নামতাম না।

মধুবনের দৃশ্য পাহাড়ের নীচের দিক থেকেই বেশ দেখা যায়। এখানে একটি গ্রাম আছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা নিতান্ত দরিদ্র। গ্রামের মধ্যে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এগুলি জৈন ধর্ম্মশালা হ'লেও এদের বাঙালী বিদ্বেষ নেই। এরা অতিথির আদর না জানুক, অতিথিকে তাড়িয়ে দেয় না, এটা ঠিক।

আমরা এখানকার মন্দিরগুলি দেখলাম। সেগুলি মন্দ লাগল না। এখানকার লোকেরা আমাদের বলে দিলে যে, সন্ধ্যের মধ্যে হাজারীবাগ রোডে না পৌছলে বাস পাওয়া যাবে না। আমরা তাড়াতাড়ি হাজারীবাগ রোড ধরবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। মধুবন থেকে হাজারীবাগ রোড দু মাইল। আমাদের সেদিন হাঁটা হয়েছিল ইসরি থেকে নিমিয়াঘাট পাঁচ মাইল, নিমিয়াঘাট থেকে পাহাড়ের উপর সাত মাইল, পাহাড়ের উপর হতে মধুবন ছ মাইল—মোট আঠার মাইল। শেষের দু মাইল অতি কষ্টে হেঁটে মোট কুড়ি মাইল শেষ করলাম। হাজারীবাগ রোডে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কারুকে দেখতে পেলাম না। জানবার উপায় নেই কখন বাস আসবে। অনেকক্ষণ বসে আছি। ক্রমশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। পকেট থেকে টর্চ্চটা বার ক'রে জ্বালতে গিয়ে দেখি সেটি আর জ্বলে না। কি বিপদ! পকেটে একটি দিয়াশলাই এবং তার মধ্যে আছে মাত্র চার-পাঁচটি কাঠি। বাস আর আসে না। আমরা ভাবলাম, বাস হয় ত আমাদের আসবার আগেই চলে গেছে। অতএব? বন্ধুবর চট্টোপাধ্যায় বললেন, এখান থেকে সোজা রাস্তায় ডুমরী চলে যেতে হবে; সেখানে গিয়ে বাড়ী ফেরা যাবে অথবা থাকবার স্থান পাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম ডুমরী কতদূর হবে? বন্ধুবর নির্বিকারভাবে উত্তর করলেন, মাইল সাতেক হবে। আমরা হাল্‌ ছেড়ে দিয়ে সেখানে ব'সে পড়লাম। ঘড়ীতে প্রায় আটটা বাজে; এ রকম স্থানে শীতের রাত্রে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? কি করা যাবে আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় দূরে একটা পাহাড়ের আড়ালে মোটর হর্নের শব্দ পাওয়া গেল। আমরা সবাই লাফিয়ে উঠ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে সত্যসত্যই আমরা হেডলাইটের আলো দেখতে পেলাম। বাস এসে দাঁড়াতেই আমরা উঠে পড়লাম। তারপর এখান থেকে চড়াই উৎরাই পার হ'তে হ'তে ডুমরী পর্য্যন্ত বেশ যাওয়া গেল। ডুমরীতে বাস এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। সেখানে অনেকগুলি দোকানপাট দেখলাম। একটি খানসামার হোটেল আছে। সেখানে পেট ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে ডুমরী থেকে আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে ইস্‌রি ফিরে এলাম। ইস্‌রি থেকে চলে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে আমাদের কতকগুলি জিনিষ বাইরে ফেলে গিয়েছিলাম। দেখি গ্রামের লোক সেগুলি চাবিতালা দিয়ে তুলে রেখেছে। একটিও হারায় নি। তারা দরিদ্র হলেও হীন নয়!

ইস্‌রিতে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা তোপচাঁচি হ্রদ দেখে এলাম। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ধানবাদের দিকে একটু আসতে হয়। তোপচাঁচি হ্রদ একটি দেখবার মত জিনিষ। পরেশনাথ পাহাড়ের পাশেই এমন সুন্দর একটি স্থান আছে অনেকেই জানেন না। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাঁরা মোটরে ক'রে যান, তাঁরা ইচ্ছে করলেই এটি দেখে যেতে পারেন। ধানবাদ শহরের জল সরবরাহ হয় এই হ্রদ থেকে। হ্রদের কাছ থেকে পরেশনাথের দৃশ্য চমৎকার।

তোপচাঁচির পর আমরা সূর্য্যকুণ্ড দেখবার জন্যে তারকাট্টী

যাত্রা করলাম। ভারকাট্টা যেতে হ'লে ডুমরী বগোদর পার হয়ে যেতে হয়। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সূর্য্যকুণ্ড পর্য্যন্ত গেছে। কুণ্ডের জল সব সময় টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে। আর তার ভিতর থেকে সর্ব্বময় Sulphurated Hydrogen-এর গন্ধ আসছে। কুণ্ডের কাছে একটা গাছ আছে, তার ডালপালা কিছু নেই—ছালও উঠে গেছে। সম্ভবত গন্ধকের ধোঁয়া লেগে ঐরূপ হয়ে থাকবে। আমরা একখানি তোয়ালে ক'রে আলু বেঁধে কুণ্ডের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যে তা সিদ্ধ হয়ে গেল। বেশ মজা ক'রে মরিচ দিয়ে খাওয়া গেল। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা বুদ্ধগয়া যাত্রা করলাম।

গয়ায় আমাদের দেখবার প্রধান আকর্ষণ ছিল বুদ্ধগয়া। ইস্‌রি থেকে গয়া পর্য্যন্ত রাস্তার নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যই দেখবার মত। বিশেষভাবে গুঝণ্ডী নামক স্থানের পরে যে জঙ্গল প্রদেশ আছে তার শ্যামল নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করবার উপযুক্ত। কেবল সারি সারি শাল, শিশু, অর্জ্জুনগাছ সসজ্জ সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে বন-প্রদেশের বেপরোয়া বাতাস এসে তাদের শীর্ষে শীর্ষে কম্পন তুল্‌ছে। মধ্যে এক একবার এক একটা পাখী ডানা ঝট্‌পট্ ক'রে বনের অপরিমেয় শান্তির ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।...এমনি কত দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা যেতে লাগলাম। এইখানে গ্রাণ্ড কর্ড রেল লাইন একটা ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে পার হয়েছে। সেই কারণে প্রত্যেক ট্রেনের সাম্‌নে এবং পিছনে দুইটি ইঞ্জিন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তিনটি টানেল আছে। মধ্যের টানেলটিই বৃহৎ। বেলা এগারটার সময় আমরা গয়ার হোটেলে পৌছলাম। হোটেলে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে আমরা একটি মোটর ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। গয়া থেকে বুদ্ধগয়া সাত মাইল। গয়ার উপকণ্ঠে ফল্গুনদীর তীর ধরে যে রাস্তাটি সোজা চলে গেছে সেইটি দিয়ে বুদ্ধগয়া যেতে হয়। বুদ্ধগয়ার রাস্তা পূর্ব্বের রাস্তার চেয়ে আরও ভাল। বিশেষ ক'রে যে সমস্ত স্থানে রাস্তা প্রায় ফল্গুনদীর বালিচরের সঙ্গে মিশে গিয়ে চলে গেছে সে সমস্ত স্থানের সৌন্দর্য্য অনুমেয়। পথ ফুরিয়ে গেলে দূর থেকে প্রধান মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরটির অনেকখানি যে এককালে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল তা দেখলেই বোঝা যায়। মন্দিরটি দেড়শ ফিট উঁচু। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, রাজা অশোক এটি তৈরী করেন এবং পরে ভেঙে যাওয়ায় নানা যুগে এর উপর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। মন্দিরটির গঠন-ভঙ্গিমা দেখে ঐতিহাসিক ফাগু'শন মনে করেন, এর নির্ম্মাণকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে। যদিও মূল-মন্দিরটি কিরূপ ছিল তা না জানায় এ সমস্ত কথা অনুমান করা হয়। শুনা যায়, বৌদ্ধদের সারা পৃথিবীতে এমন পবিত্র স্থান আর নেই। পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন বলেছেন—"For the Buddhist of Asia this is their Bethlehem—this is their Mecca and their Medina." মন্দিরটির পাশেই সুপ্রাচীন বোধিদ্রুম বৃক্ষটি রয়েছে। যথাসময়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম! বাস্তবিক এমন অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ আমাদের জীবনে কোনদিন ঘটে নি। মন্দিরের ভিতরে কয়েকটি ব্রহ্মদেশীয় মেয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে পঞ্চপ্রদীপ দোলাতে দোলাতে গান গাইছিল। তাদের সেই নিবেদনের গান এবং তদুপরি ক্ষীণ দীপালোকে বুদ্ধদেবের সেই রহস্যময় মূর্ত্তি আমাদের মত নাস্তিকের মনকেও অনির্ব্বচনীয়তায় দ্রবীভূত করে ফেলেছিল। মন্দিরের প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ বেড়াবার পর আমরা ফল্গুর তীরে এসে বসে রইলাম। ফল্গুর সম্বন্ধে কাহিনী এইরূপ: বনবাসে গমন করবার সময় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ফল্গুর তীরে দশরথের প্রেতাত্মা সীতাকে দর্শন দিয়ে বল্লেন যে, ফল্গুর তীরে তাঁর পিণ্ড দিতে হবে। তখন সীতা দেবী একাকী ছিলেন—উপায়ান্তর না দেখে তিনি বালির পিণ্ড প্রদান করেন। রাম লক্ষ্মণ যখন ফিরে এলেন, তিনি তাঁদের এ কথা বলায় তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। তখন সীতা দেবী বলেন, ফল্গুনদী এবং এই বটগাছ সাক্ষী আছে। কিন্তু বটগাছ সাক্ষ্য দিল, ফল্গুনদী সে কথা স্বীকার করল না। সীতা দেবী ক্রোধে ফল্গুকে অভিশাপ দিলেন—তুমি অন্তঃসলিলা হও। সেই থেকে ফল্গু অন্তঃসলিলা।...তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। এই সময়টিই ফল্গুর রূপ দর্শন করবার সময়। আমরা বালির চড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বালুর বুকে অন্তঃসলিলা স্রোতধারার একটি ঝির্ ঝির্ শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ল। ফল্গুর অন্তর্প্রবাহের পশ্চাতে যে একটা বেদনার আলোড়ন চলছে তা আজকের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার মধ্যে বুঝতে পারলাম। কতক্ষণ নদীর সেই কাতর কান্না শুনেছিলাম মনে নেই—হঠাৎ মোটরের হর্নে আমাদের ধ্যানভঙ্গ হ'ল—আবার অন্যত্র যাবার জন্য। এত স্থান ঘুরেও পথের ধারের ইস্‌রিকে ভুলতে পারি নি। অমন স্বাস্থ্যকর স্থান আর দু'টি নেই।

সেপাহীর স্ত্রী

(কাইজারলিঙের 'কাৰ্ট্টা' হইতে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

"আলোকের মত সহজিয়া ভালবাসা।"—শেলি।

বরফ গলতে সুরু হয়েছে। গির্জ্জের পথে নভেম্বর মাসের আধো-গলা তুষারের উপর দিয়ে চাকাহীন ভারী গাড়ীটা হোঁচট্ খেতে খেতে চলেছে। চারটি স্ত্রীলোক এই গাড়ীতে। সবেমাত্র খাতায় নাম লিখিয়েছে এমনি চার জন সৈনিকপুরুষের এরা নবপরিণীতা বধূ—মেরি, কেটি, ইলসি আর কার্ট্টা (যে হচ্ছে বিধবা য়্যান্লিস্ বুড়ীর মেয়ে)। একটু আগেই গির্জ্জেয় ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। কাল সকালেই স্বামীরা চলে যাবে ফৌজের আখড়ায়। নববধূর মুকুটের উপর ওরা প্রত্যেকেই বেঁধেছে একটা করে নীল রঙের রুমাল। ছুঁচলো টোপোরের নীল ডগাগুলি গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে নেচে নেচে উঠছে। রুবেন জেজ্ গাড়ী হাঁকাচ্ছে, নেশায় চুর, শীর্ণ রুক্ষ বেতো ঘোড়াগুলোর পিঠে মারছে চাবুকের পর চাবুক। পিছনের গাড়ীতে আসছে স্বামীর দল। ওরাও নেশায় বুঁদ, তারস্বরে কর্কশকণ্ঠে দিয়েছে গান জুড়ে। নববধূরা স্থির হয়ে চুপটি ক'রে বসে আছে, থেকে থেকে নীল রুমালে ঢাকা মাথাগুলি গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে। কার্ট্টা সব চেয়ে ছোট। গোলাপের কুঁড়ির মত তার রাঙা টুলটুলে মুখখানি, গোল গোল নীল চোখ দুটি, আর ট্যাবাটোবা নাকটি দেখে মনে হয়—সে যেন নিতান্ত শিশু। কিন্তু তার রুদ্ধ ওষ্ঠাধরের কোণ দুটি লিথুনিয়া কৃষাণীর মত যেন দুশ্চিন্তায় অবনত। তার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি কুয়াশায় ঢাকা মাঠের উপর আবদ্ধ। সেই আব্ছায়ার ঝোপে ঝোপে কেমন একটা অপূর্ব্ব অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। ওই কাকগুলোর রঙ কি রকম অদ্ভুত মনে হয়। ধূসর প্রচ্ছদপটের উপর পাতা-ঝরা রক্তাভ গাছের কঙ্কালগুলি ওর চোখে তেপান্তর মাঠে প্রেতমূর্ত্তির মত লাগে। এই বিবর্ণ প্রান্তরের ছবিখানি কার্ট্টার চোখের সামনে একটু একটু দুলছে, যেন সে দোলনায় বসে আস্তে আস্তে আগুপিছু দোল খাচ্ছে ঈস্টারের মেলায়।

পথের প্রত্যেক ভাঁটিখানায় ওদের গাড়ীটা এসে থামে। কার্ট্টার দীর্ঘকায় স্বামী থোম্ গাড়ীর উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, "কি গো খুদে মানুষটি, শীতে বুঝি জ'মে কাঠ হয়ে গেলে?" তার পর দেয় ব্রাণ্ডির বোতলটা বাড়িয়ে। বেচারী শীতে আড়ষ্ট ঠোঁটে একটু হাসে, বোতল থেকে এক ঢোক গেলে। তা মন্দে শরীরটা একটু তাতে বই কি, দুশ্চিন্তাও দূর হয়। মন্দ কি? ঝাপ্সা পৃথিবীটা ওর চোখের সামনে যেন শূন্যে গলে যায়; এমন কি, সম্মুখে ওই গাড়োয়ান জেজের চ্যাটালো পিঠখানা দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সমস্ত দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি স্বপ্নের মত ফুটে ওঠে, ঘুরে ঘুরে একই ঘটনাগুলি চোখের সামনে জাগে, যেন সে নাগর-দোলায় খাচ্ছে ঘুরপাক, একই জটলা চোখে পড়ে। বিবাহ! সেই সকালবেলা মিহি সুতার সেমিজের হিমস্পর্শ, নববধূর অঙ্গবাস স্মরণ ক'রে সর্ব্বাঙ্গে শিউরে উঠল। আর ক'নের টোপরটি এমনি চেপে বসেছে মাথায় যে, কপালে ব্যথা ধরে গেছে। নিশ্চয়ই ওর শুভ্র ললাটে একটা লাল রেখা দেগে দিয়েছে। নতুন জুতো জোড়াটা গির্জ্জের শান-বাঁধানো বারাণ্ডায় কেমন খট্খট্ ক'রে একটা মিষ্টি আওয়াজ তুলেছিল! কত সাবধানেই না তাকে চলতে হয়েছিল, যেন মসৃণ বরফের উপর দিয়ে একটু অন্যমনস্ক হলেই অমনি পদস্খলন।

পাদ্রি সাহেবের দিব্যি পরিপুষ্ট লাল মুখখানি, কথা বলবার সময় এক একবার অধরোষ্ঠ লেহন করেন, যেন সুমিষ্ট কিছু ঠোঁটে লেগে আছে। কিন্তু চমৎকার তাঁর বক্তৃতা! বিয়ের পরেই যাদের বিদেশে ছুটতে হবে সেই সভাস্থ বরদের সম্বোধন ক'রে চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার কথা, ঈশ্বরের বিধি ও বাণীর কথা কি সুন্দর ক'রেই বল্লেন! কার্ট্টা কেঁদেছিল অবিশ্যি। সেপাইদের স্ত্রীরা বিবাহ-সভায় কেঁদেই থাকে। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে একটু-আধটু কাঁদা ভাল। খুব জোরে বুক ফেটে যখন কান্না বার হয়, মুখে যেন আগুন জ্বলে, রুদ্ধশ্বাসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বডিসের হুক্গুলো বেঁধে বুকে। সকলের চেয়ে কার্ট্টাই কেঁদেছিল বেশী। পরে যখন এই কান্নাকাটির আলোচনা ওদের মধ্যে হচ্ছিল, তখন কার্ট্টা গর্ব্ব ক'রেই বলতে পারত, কেউ তার মত কাঁদতে পারেনি। গির্জ্জে থেকে গেল তারা পাশের শরাবখানায়। সকলেই কিছু কিছু পান করল। স্বামীদের মধ্যে বাধল বিবাদ। সব বিবাহেই এমনি হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না।

গাড়ী আবার চলল। পরিণয়! পরিণয়! টুন্ টুন্ ক'রে বাজে জেজের টাট্টুঘোড়াদের গলঘণ্টা। কার্ট্টা দেখে স্বপ্ন, সেই ঠাণ্ডা সেমিজের থেকে আরম্ভ ক'রে। আর তিনটি মেয়েও চুপ ক'রে বসে ছিল, তাদের চোখেও সেই অপলক দৃষ্টি যা কিছুই দেখে না। কেবল হঠাৎ যখন একটা খরগোশ রাস্তার এপার থেকে ওপারে লাফিয়ে পালায়, তখন ওরা চারজনেই সমস্বরে ব'লে ওঠে, "ওই রে, একটা খরগোশ!" আর সেই সঙ্গে শীতে জমাট ঠোঁটে একটু মুচকি হাসি। গ্রামের সরাই-এর কাছে এসে গাড়ী থামল। নিমন্ত্রিতেরা তাদের সব চেয়ে ভাল পোষাক পরে দাঁড়িয়েছিল, সবাই মিলে তুলল একটা জয়ধ্বনি। ঘরে ঘরে ঝাপসা কাচের সার্শিতে মুখ দিয়ে উঁকি মারছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর গ্রামের কুটীর-লক্ষ্মীরা। কার্ট্টার মনে উৎসব পার্ব্বণের আনন্দ জাগে।

সদ্য-বিবাহিতা তরুণী আজ সকলের চোখেই বরণীয়, এমন সুখের দিন জীবনে আর আছে কি?

সরাই-এর দেউড়িতে কার্স্টা তার থোমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল; কারণ ওদের এখন এক সঙ্গে পা ফেলে পাশাপাশি যেতে হবে। গম্ভীর-ভাবে সে দাঁড়িয়ে পথের ও ফুটপাতের বৃদ্ধাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছে। এমন কি গ্রামবৃদ্ধেরাও আজ ওর সঙ্গে যেন সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলে, আর মেয়েরা অবাক হয়ে দেখে ক'নের মাথার টোপর। য়্যান্‌লিস্ বুড়ীর মেয়ে কার্স্টার কপালে এত সমাদর ও হৃদ্যতা এতকাল জোটেনি। বেচারী গরাব, ছোট্ট নামুনটি, সম্বলের মধ্যে ত কেবল একটি ছাগল। এতদিন কেউ ত ওর পানে ফিরেও চাইত না। কিন্তু আজ সে যে নববধূ, সুতরাং সম্মানযোগ্য বটেই ত। আনন্দে গর্ব্বে কার্স্টার শিশুর মতন নিটোল গাল দুটি আপেলের মত রাঙা হয়ে উঠল। এতক্ষণে বরদের গাড়ী এসে পৌঁছল। থোম এক লম্ফে এল কার্স্টার কাছে, কোমর ধরে তুলল তাকে শূন্যে। "খুদে হলে হবে কি, ভারী যেন ময়দার বস্তা" এই ব'লে তাকে ছেড়ে দিল, সবাই উঠল হেসে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কার্স্টার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। থোমের উপর ভারী খুশী।

প্রশস্ত ঘরে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো টেবিলগুলি পাতা। সবাই ব'সে গেল ঔদ্বাহিক ভোজে। মুখে কথা নেই, গুরুগম্ভীর ভাব। ভূমিকায় দুধ ও সুরুয়া। কিছুক্ষণ কেবল সুপসাপ শব্দ চলল। অতঃপর এল আমিষপরম্পরা, শূকর, মেষ, পুনশ্চ বরাহ। আতপ্ত সুরভি বাষ্পে ঘর আমোদিত, কুয়াশাচ্ছন্ন। কার্স্টা মহোল্লাসে খেয়েই চলেছে। গুরু-ভোজনের পরে চেয়ারে এলিয়ে কোনমতে বডিসের নীচের দিকের দু-একটা হুক উন্মুক্ত ক'রে হাঁফ ছাড়ল। মনে মনে স্বগতোক্তি—"একেই বলে বিয়ের খ্যাঁট, তোফা! আস্তে আস্তে থোমের পিঠে হাত বুলোয়। এই ত আমার আপনার জন, চিরদিনের সম্পত্তি। স্বামীরত্ন লাভ করা সৌভাগ্য বটে।" থোম বলে, "খুদে বৌটি আমার, আর একটু পান কর।"

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলল। মদের শূন্য বোতলের মুখে আঁটা মোমবাতি। ধোঁয়াটে ঘরের বদ্ধ বাতাসে সোনালী শিখাগুলি ঘিরে ইন্দ্রধনুর বর্ণমণ্ডল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল পলকা নাচের তালে। তিনটিমাত্র যন্ত্র, বেহালা, বাঁশি আর য়্যাকর্ডিয়ন্। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কার্স্টা বলে, "এইবার নাচের পালা।" মুহূর্ত্তের জন্যে সে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার সন্ধ্যা, সুদূরবিস্তৃত বরফের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া ব'য়ে চলেছে, কোরা কাপড়ের মত ধূসর মেঘমালা ঝুলছে আকাশে। কার্স্টা ভাবে, কাল সকালে তুষার বৃষ্টি হবে।

শুষ্ক পল্লীপথের পাশে ছোট ছোট কুঁড়েঘরের জটলা। জানালা দিয়ে আলো আসে কুটীর থেকে, ছোটছেলের কান্না শোনা যায়, ঘুমপাড়ানি গানের একঘেয়ে সুর কানে জাগে। পথের শেষে ওই অন্ধকারের ঢিপিটা য়্যান্‌লিস্ বুড়ীর কুঁড়ে। কাল থেকে আবার সবই আগেকার মত গুমসাম্ হবে, যেন কিছুই ঘটেনি। কার্স্টাকে আবার ওই শূন্য ঘরে তার মার সঙ্গে দিনপাত করতে হবে। কেন কান্না আসে? সে চোখ ঢাকল, আজ থাক, চোখের জল ফেলবার যথেষ্ট অবকাশ মিলবে কাল। ঘরের ভিতরে এসে সে নাচে যোগ দিল।

বলিষ্ঠ পুরুষের বাহুর উপর ভর রেখে ঘূর্ণীনৃত্য। তার নিবিড় স্পর্শটি ত্বক ভেদ ক'রে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়, হৃৎপিণ্ডে জাগায় হর্ষ-বেপথু, চিন্তা বিলুপ্ত হয় মধুময় অনুভূতিতে, দেহমন তখন হয় আনন্দোচ্ছল আতপ্ত তরঙ্গভঙ্গমাত্র। চারিদিকের ঘূর্ণ্যমান দৃশ্যপট একটা অস্ফুট স্বপ্নাবেশে লীন হ'ল কার্স্টার বিস্ফারিত চোখে। চুরোটের ঘন ধোঁয়ার কুয়াশায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে জড়পিণ্ডগুলি, আর ঘরের মেঝের উপর খটখট শব্দে রুদ্রতালে বাজছে পুরুষদের পাদুকা-চপটের মৃদঙ্গবোল। নিড়ানীর যষ্টির ছন্দে খামারবাড়ীর উঠানে এমনি তালেই ত সোনার যবের ঝরণা ঝরে। কার্স্টা ভাবে, এমন সুখের দিন আর হবে না। সে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে এই নাচের চক্রে যোগদান করল। পতিগর্ব্বের জয়োল্লাস আকাশ বিদীর্ণ ক'রে একটা অট্টরোল তুলতে চায় যখন সে দেখে—থোম্ আর সব পুরুষের চুলের মুঠি ধ'রে দিচ্ছে এক একটা নাড়া। অবশেষে সকলে মিলে থোম-দম্পতিকে গ্রামের পথ দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাইতে গাইতে নিয়ে গেল য়্যান্‌লিস্ বুড়ীর কুটীরে। সেখানে ওদের শয্যা প্রস্তুত হয়ে আছে।

ছোট্ট ঘরটিতে নববধূ মোমবাতিগুলি জ্বালছে। পরিশ্রান্ত থোম বিছানার উপর হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। নেশায় বিভোর, তৎক্ষণাৎ হ'ল নিদ্রায় অচৈতন্য। কার্স্টা স্বামীর বুটজোড়া টেনেটেনে খুলে নিল, বালিসটা ভাল ক'রে মাথার নীচে দিল গুঁজে। তারপর শ্রান্তিশিথিল দেহটা এলিয়ে পড়ল স্বামীর পাশে। চোখ বুজে থাকে, মনে হয় যেন খাটটা দুলছে নৌকার মত। তবু ঘুম আসে না। স্বপ্নে দেখে গির্জ্জের ছবি, শরাবখানার নাচের ঘুরপাক, তার টোপরের লম্বা ফিতেগুলো যেন চাবুকের মত চারিদিকে বিতরণ করছে হর্ষদৃপ্ত কশাঘাত, অমনি আবার সে চমকে জেগে ওঠে। অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে, ভাবে কি যেন একটা বিভীষিকা তার জন্যে ওৎপেতে আছে। আতঙ্কে দৃষ্টি ফোটে। কাল সকালেই যে তার স্বামী চলে যাবে, আবার সেই আগেকার একঘেয়ে জীবন, মিলন না হতেই হবে ছাড়াছাড়ি, সুখের দীপটি নিভবে কত দিনের জন্যে কে তা বলতে পারে?

ভোরের আলো জাগে, কালো সার্শিগুলো হয় নীলাভ। কার্স্টা উঠে বসে, চেয়ে থাকে থোমের দিকে। সে ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। উস্কোখুস্কো চুলগুলো তার কপালে লুটিয়ে পড়েছে, ভিজে ভিজে ঠেকে ঘামে। মুখখানা রাঙা, আধোখোলা ঠোঁটের ফাঁকে তালে তালে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস। তার বুকে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, মুখে ফোটে একটা অস্ফুট স্নেহগুঞ্জন, যেন শিশুকে ঘুমপাড়াচ্ছে। স্বামীটি যেন তার সেমিজের মত, বুনানি পশমের মত, ওই সবেধন নীলমণি ছাগলটার মত। না ছাগলের মত ত নয়, কারণ সেটা মা-ঝির এজমালি সম্পত্তি। তা হোক গে। সে এখন তার যথাসর্ব্বস্ব পেয়েছে, যা প্রত্যেক নারীই চায়—একটি মাত্র পুরুষ—যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি জোয়ান। কিন্তু কি লাভ হ'ল সে ধন পেয়ে যা পর মুহূর্ত্তেই হারাতে হবে? হা ভগবান, কি

দুঃখের কথা ভাবতে পারা যায় না! কার্ষ্টা শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠল, হাতে নিল কেঁড়ে, চলল ছাগলের দুধ দুইতে।

বাইরে কি দুর্যোগ! ঝাপটা হাওয়ার সঙ্গে তুষার বৃষ্টি, মেঘলা ভোরের আব্ছায়ায় পথঘাট ধূসর। দূরে ঘন বনান্ত রেখার উপরে ম্লান ঊষালোক। কার্ষ্টা কিছুক্ষণ চুপটি ক'রে কপালের নীচে হাত রেখে নাসা-ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বিষণ্ণ মনে প্রাতঃসন্ধ্যার পানে চেয়ে থাকে। গ্রামের অলিগলিতে মেয়েরা দুধের কেঁড়ে হাতে বার হচ্ছে কুঁড়ের আগল খুলে। তারাও কার্ষ্টার মত কপালে হাত রেখে ভোরের এই ম্লান ছায়ালোকে চেয়ে রয়, তাদের পাংশুমুখে ফোটে একটা আসন্ন উদ্বেগের কালিমা।

কার্ষ্টা শিউরে উঠল। ছুটল খামারবাড়ীর দিকে, যেখানে ছাগল শূয়র আর মুরগীদের আস্তানা। এখানে বাতাসটা ভারী, একটু গরম। শূয়রটার নাসাগ্রে পরিতৃপ্তির গদগদ ধ্বনি। মুরগীগুলো ডানা ঝাপ্টে উঠল। কার্ষ্টা ছাগলের পাশে উবু হয়ে বসে দুধ দুইতে সুরু করল। আঙুল বেয়ে পড়ে গরম দুধের ধারা। চোখে লাগে ঘুমের নিচুটি। ছাগলের পিঠে মাথা রেখে সে কাঁদে। এ কান্না বিবাহরাত্রির লোক-দেখানো চিরপ্রচলিত আর্ত্তরব নয়। স্বামীর কাছে বিদায়লগ্নে যে কান্না আজ সে কাঁদবে সে কান্নাও নয়, এ কেবল শিশুর সরল অনাড়ম্বর কান্না। চোখের জলে তার মুখ ভেসে গেল, যেন উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করছে। বড় দুঃখের কান্না, যা কেবল উথলে পড়ে আপনার একাকীত্বের অন্তরালে। কাঁদতে কাঁদতে এল শান্তি আর নিঃস্বপ্ন নিদ্রা। ছাগলটা চুপ ক'রে রইল দাঁড়িয়ে। কেবল মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় মায়ের মত এ ঘুমন্ত মেয়েটির পানে, হলদে চোখে পলক পড়ে না।

"হা ভগবান, মেয়ে আমার দুধ দুইতে দুইতে ঘুমিয়ে পড়েছে!" মার কণ্ঠস্বরে কার্ষ্টা ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল। ভাঙা গলায় বলল, "কাউকে ত দুইতেই হবে।" "হাঁ, দুধ দুইবে আর ঘুমোবে বই কি!" বুড়ী রুক্ষ-স্বরেই কথা বলে, তবু মনে হ'ল আজ তার গলায় আওয়াজে একটু চাপা হাসি আর সম্ভ্রম লুকিয়ে আছে। আর ত আইবুড়ো মেয়ে নয়, এয়োস্ত্রী সে, একটু সমিহ ক'রে কথা বলতেই হয়।

"যা বেটি, ভাল ক'রে আগুনটা জ্বাল; এখনি ত তোর সোয়ামী চ'লে যাবে।" কার্ষ্টা চট ক'রে উঠে দাঁড়াল। তাই ত, আজ কি গড়িমসি করবার সময় আছে? এখনই সেজেগুজে গাড়ী চেপে শহরে ছুটতে হবে। আজ সে পাবে সবারই স্নেহদৃষ্টি ও সহানুভূতি, এইটুকু সান্ত্বনা আছে।

গাঁয়ের মোড়ল নতুন সেপাইদের নিয়ে বড় গাড়ীতে রওনা হবে। ওদের বাপ-মা-স্ত্রীরা পিছন পিছন ছুটবে ষ্টেশনে বিদায় নিতে।

প্রাতরাশে বসে থোমের মুখে কেবল মকদ্দমার কথা, স্ত্রীকে দিচ্ছে মামলাসংক্রান্ত পরামর্শ। পিটার রুজ গাঁয়ের বাঁ দিকে জঙ্গলের পাশে দান্দুর পল্লনিটা বেদখল ক'রে বসে আছে। ও জমিটা কার্ষ্টারই প্রাপ্য, কারণ সে-ই হল স্বত্বাধিকারীর নিকট-সম্পর্কের ওয়ারিশান। পিটার কেবল তার সৎ-মেয়ের জামাই। কার্ষ্টাকে বিয়ে ক'রে এই জমির উপর থোমের আইনসঙ্গত অধিকার বর্ত্তালো। অতএব স্বামীর অনুপস্থিতিতে কার্ষ্টাকেই আপনার ন্যায্য অধিকার প্রতিপন্ন করতে হবে জাকব্সন উকীলের কাছে গিয়ে। ইহুদীরা মগজে আক্কেল ধরে, আর ওকে কম পয়সা দিতে হবে। সাবধান, যেন ঠকাতে না পারে। কার্ষ্টার মুখের ভাবখানা বিজ্ঞের মত গম্ভীর হ'ল। তার যথেষ্ট দায়িত্ব-বোধ আছে। "ঠিক তদ্বির করব, নিশ্চিন্ত থেকো। আমি আহাম্মক নই।"

"তুমি যদি বোকা হতে তা হ'লে আমি কি আর তোমায় বিয়ে করতুম?" এই হ'ল থোমের শেষ কথা। তারপর ঠাট্টা তামাসা হৈ চৈর মধ্যে পল্লীবীরবৃন্দ চক্রহীন রথে সমারূঢ় হলেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা গাড়ী ঘিরে দাঁড়াল, কান্নাকাটিও হ'ল। নববধূচতুষ্টয় উঠল তাদের বাহনে। মুষলধারে বরফ পড়ছে। ওদের টোপরের নীল চূড়াগুলি দোলে গাড়ীর দুম্কি চালে, সাদা হয়ে যায় তুষারের আবরণে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাড়ী চলেছে। মেরি বলে, "এ বিয়েয় আমাদের কি লাভটা হ'ল? কাল থেকেই ত আবার পুনর্ম্মূষিকের অবস্থা।" সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা বটেই ত।' ইল্সি বলে, 'জমাট বরফে সর্ষে ক্ষেত চাপা না পড়লে কচি চারাগুলো প'চে উঠবে।' আর সকলে বলাবলি করে, 'এমনই ত দিন চলা দায়, তার উপর আবার ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা কেন?' বাকি পথটা কারুর মুখে রা নেই।

শহরে পৌঁছে বিমর্ষ হবার আর অবকাশ নেই। চারিদিকে দেখবার কত জিনিষ। তারপরে টাউন হলের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীদের জন্য অপেক্ষা, পান্থশালায় মধ্যাহ্ন ভোজন, মদ্যপান, উপসংহারে ষ্টেশনে আর্ত্তরবে বিদায়-বিলাপ। কার্ষ্টার পিঠে চাপড় মেরে থোম বলে, 'ফুর্ত্তি কর, ভয় নেই, আমরা যমের মুখে যাচ্ছি না, শিগ্গিরই ফিরব আবার। মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠিও, ওখানে রশদের বড় খাঁকতি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

'মকদ্দমার কথা ভুলো না। উকীলের বাড়ী যেয়ো।'

'হাঁ, হাঁ।'

'বুদ্ধিটা সজাগ রেখো, ফিরে এসে যেন বোকা ব'নে না যাই।'

'রাখব, রাখব।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। যুবতীরা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আকুলকণ্ঠে কেবল বলে, 'হা ভগবান! হা ভগবান!'

কার্ষ্টা সবার আগে চুপ করল। তাকে উকীলের বাড়ী যেতে হবে।

দিব্যি গরম একটি ঘরে তাকে অপেক্ষা করতে হল। উকীল মশাই ছোটখাট মানুষটি, সহৃদয়, মন দিয়ে ওর কথা শুনলেন এবং জয়লাভের ভরসা দিলেন। একটু রহস্য করতেও ছাড়লেন না। ওর থুৎনিটা ধরে বললেন, "তোফা বউটি সেপাই-এর! হায়, হায়, কতকাল যে প্রোষিত-ভর্তৃকার তুষানলে দগ্ধ হ'তে হবে!" এ সুনজরটা মামলার পক্ষে আশাপ্রদ বটে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গ্রামের মুখে গাড়ীগুলি সারি বেঁধে চলেছে। আকাশের এ-পার ও-পার রক্তমেঘের ছটায় লাল হয়ে উঠল। মাকাল ফলের মত টকটকে রাঙা নিটোল গোলকটি সমুদ্রের জলে ডিমের মত

আস্তে আস্তে ডুবে গেল। ঢেউ খেলানো ঘোলা জল ক্রমে হয় রক্তাভ, রেশমী সাড়ীর খস খস শব্দে ঢেউগুলি মুখর হয়ে ওঠে।

সেপাইদের স্ত্রীরা সারাদিনের পরিশ্রমে, প্রতীক্ষায়, মদের নেশায়, কান্নাকাটির অবসাদে একেবারে আধ-মরা হয়ে পড়েছে। চুপ ক'রে বসে আছে ওরা, সহিষ্ণু, অবসন্ন, হতাশ্বাস। অপসৃয়মান অস্তরাগের নিষ্প্রভ অভিভূত দৃষ্টি। বনের ভিতর শুদ্ধ অন্ধকার, ঝাউগাছগুলির রুক্ষ মাথায় চাঁদ দেখা দিল, বিরহক্লিষ্ট ওদের হৃদয় হ'ল গুরুভার। এবার গানের পালা। প্রথমেই যে গানটা মনে হ'ল, করুণ সুরে সমস্বরে সেই গানটা ধরল।

এস বঁধু এস ফিরে ঘরে
বিরহে পরাণ কেঁদে মরে!
বিলম্বে হবে যে হানি,
ছিঁড়ে যাবে মালাখানি
কাঁটাগাছে যদি বাঁধা পড়ে।

বেচারী কাষ্টার বিয়ে ত হ'ল শুধু নামে। ম্যান্‌লিন্‌ বুড়ীর ঘরে আগের মতই দিন যায়। সেই ছাগল দোয়া, কাঠ কুড়ানো আর তাঁত বোনা। ডিসেম্বর মাস পড়ল। বেলা তিনটে বাজতে না বাজতেই অন্ধকার। সন্ধ্যা ছটার সময় যেন নিশুতি রাত। আশৈশবের ছোট্ট বিছানাটিতে কোনমতে হাত-পা গুটিয়ে ঘুমোয়। রাত দুটার সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে তাঁতে বসে। দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন, ওর হাতের মাকুটার মতই নিরবচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যের মাঝখানে কেবল আগু-পিছু করে, শুধু ধূসর জীবনের তন্তুজাল বোনা। কাষ্টা যে আর কুমারী নয়—তার একমাত্র প্রমাণ তার সেই লম্বা বেণীটি এখন হয়েছে খোঁপা। ছুটির দিনে সে আর শরাবখানায় নাচতে যায় না। শনিবার রাত্রে কোন তরুণ যুবা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে আসে না। একজন কথা বলবার সঙ্গীও নেই। অন্য মেয়েরা তাদের প্রণয়ীদের গল্প করে পরস্পরে। গিন্নীরা ছেলে স্বামী আর গৃহস্থালীর কথা পাড়ে। কাষ্টার সে সৌভাগ্য নেই। সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন, মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না, বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ কেবল ছটফট করে। চারিদিক নিস্তব্ধ, ছোট জানালার সার্শির ভিতর দিয়ে কেবল ঝলমল করে শীতরাত্রের তারা। আশপাশের কুঁড়ে ঘরের প্রত্যেক শব্দটি ওর কানে আসে। বিলির বেবী কাঁদছে। জেজ্‌ বাড়ী ফিরল গভীর রাতে, মাতাল হয়ে টলতে টলতে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেউড়ির উপর। বিলিকে ধরে ঠেঙায়, সেই সঙ্গে কানে আসে বিলির কান্না আর পচালবৃষ্টি। কাষ্টার বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ওর কপালে সব শূন্য কেন? স্বামীর জন্তে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। কোথায় থোম? দু-চোখ দিয়ে জল ব'য়ে যায়, যন্ত্রণায় সে বিছানা বালিশ কামড়ায়।

তবু ভাল যে মকদ্দমাটা চলছে। মনের শূন্যতা কতকটা ভরে, কর্ত্তব্যের গৌরবে আত্মশ্রদ্ধা জাগে। প্রতি সপ্তাহে চার ঘণ্টা হেঁটে উকীল বাড়ী যেতে হ'ত। পথের প্রত্যেকটি গাছ আর পাথরের টুকরোর সঙ্গে ওর নিবিড় পরিচয় নানা আলোছায়ার বৈচিত্র্যে। যখন ঠাণ্ডায় আঙুলের ডগা অসাড় হয়ে না যেত, তখন সে মোজা বুনতে বুনতে পথে চলত। সবাই এই খর্ব্বকায়া যুবতীকে চিনত—মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, হাতে সেলাই আর মামলার নথিপত্র। কাঠুরেরা হাঁকত, "বলি ও হাবিলদারের বৌ, মরদ বিনে দিন কাটে কেমনে?" কাষ্টা দাঁড়ায়, রাঙা মুখখানি আংরাখার আস্তীনে মুছে বলে, 'ভালই কাটে, কেন কাটবে না?'

'থোম আর ছ বছরের মধ্যে ফিরছে না!'

'নাই বা ফিরল, তাতে কি?'

চাষারা হেসে বলে, 'হাঃ হাঃ, ও একলা থাকতেই ভালবাসে! মামলা গড়ালো কতদূর?'

'জিতবার মুখে। ধর্ম্ম যার, কি ভয় তার?'

'সে কথা বলো না।'

জঙ্গলের চৌকিদারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দিব্যি চেহারা, চুমরানো কালো গোঁফ, চকচকে কপিশ চোখ, সবুজ গলাবন্ধ, ফতুয়ার জেবে রূপোর চেন ঘড়ি। দেখা হলেই সে কাষ্টাকে আটকাত একটু রহস্য করবার জন্তে।

'কমন আছ গো ফৌজদারের বৌ?'

কাষ্টার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হত। গ্রীবাটি হেলিয়ে রাখত ওর চোখে চোখ।

'খুব ভাল আছি।'

'থোমও খুব ভাল আছে তোমাকে ছেড়ে?'

'ওঃ, ওর ভাবনা কি? সেখানে অনেক রূপসী আছে।'

'তোমারও ইয়ারের ঘাঁকতি নেই?'

'ঢের, ঢের!'

'মাইরি, আমি যদি তোমার মত হতুম—যেন পাকা আপেলটি—তাহ'লে কিন্তু একটা বুড়ো মিন্সের জন্তে হাপিত্যেস্‌ হয়ে বসে থাকতুম না।'

কাষ্টা খিল খিল ক'রে হেসে জবাব দিত, 'বসে আছে আবার কে?' ও রসিকা, পাল্টা জবাব দিতে জানে, ভড়্‌কায় না।

'তাই নাকি? দেখ, তোমায় আমায় মিলবে বেশ। তুমি ছোট-খাটো, যেন চড়ুই পাখী, আর আমি যেন উট পাখী, কি বল?'

কাষ্টা চলে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'দিব্যি মানাবে। আসছে মেলার দিন আবার দেখা হবে, আজ চললুম।'

কাষ্টা ঠাট্টা বোঝে, উত্তর দিতে জানে।

এক দিন বনরক্ষক ধরল ভক্তকের মূর্ত্তি। কাষ্টাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে চায়। ধস্তাধস্তিতে কাষ্টা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, তারপর উঠেই দে ছুট। সারাদিন হাসে যতবার সেই মল্লযুদ্ধের কথা মনে হয়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কেবল মনে হয় তার চোখ দুটো। পাশের কুঁড়ে ঘরের জানলায় পাড়ার ছেলেরা আস্তে আস্তে টোকা মারে। ছটফট করে, ঘুম হয় না।

বসন্তকাল এল। শহরে যাবার পথটি এখন মনোরম! কাষ্টা আস্তে আস্তে চলে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেও আকাশভরা আলো, ফিরবার পথে আঁধারের ভয় নেই। মাঝে মাঝে গতি হয় মন্থর, পা টিপে টিপে চলে। ভাবে, 'আশ্চর্য্য, বসন্তের সন্ধ্যায় কেন গা ভারী হয়, নড়তে ইচ্ছে করে না। এমন কি মামলার কথা ভুলিয়ে দেয়, বড় অদ্ভুত লাগে।'

বড় বড় দেবদারু গাছে কচি কিশলয় গজিয়েছে। মনে হয় কে যেন একটা সবুজ ওড়না গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। ওই যেন একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে! না না, ওটা চেরী গাছ, ফুলে ফুলে ভ'রে গেছে। অতদূর থেকে কি মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে। বনের মাঝে একটা ফাঁকা জমি। একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, আলোর জাজিমের উপর যেন কালো ছায়ামূর্ত্তি, নিস্পন্দ নিথর। দূরে পাহাড়ের কোলে ধেনুচরা মাঠ থেকে মেয়েদের গান কানে আসে, তার কথাগুলি কাষ্টার কণ্ঠস্থ। সেও একদিন তাদের মত পায়ের উপর পা রেখে, গ্রন্থিবদ্ধ আঙ্‌লের বেড় হাঁটুর উপর রেখে পিছনে হেলান দিয়ে গানের পর গান গেয়ে গেছে সারারাত। উত্তরের প্রতীক্ষা করেছে—কেউ কি আসবে না তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট দু'খানা রাখতে? কাষ্টা বনপথে পায়চারি করে, আর ওদের গান শোনে।

সেদিন উকীলবাড়ী থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেছে। বনের ভিতর শুক্‌না পাতার মর্ম্মর কানে এল। একটা বনের হরিণ ঝোপের আড়াল থেকে ডেকে উঠল। আবার সেই শব্দ। বনদেবতা সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই চৌকিদারের মূর্ত্তিতে।

'বৌরাণী, আবার এই পথে চলেছ?' চাঁদের আলোয় ওর চোখ আর দাঁতগুলি ঝকঝক করছে।

কাষ্টা দাঁড়াল। নির্ভয়ে ওর মুখে চোখ রেখে বলল, 'হাঁ, শহরে গিয়েছিলুম, তুমি কি মনে ক'রে?'

'বড় সুন্দর রাত্রি, বেড়াবার মত, না?'

'হাঁ, চমৎকার!'

লোকটা হেসে একবার কাষ্টার মুখের পানে চাইল, তারপরে চুপ। কাষ্টাও নীরবে করে অপেক্ষা। তারপর চৌকিদার আস্তে আস্তে কাছে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'তুমি আর আমি, তুমি আর আমি, চল।'

'কেন, তোমার হয়েছে কি?' বিদ্রূপের সঙ্গে কাষ্টা কথাটা বলল বটে, সে রুক্ষতা কোথায় গেল? কণ্ঠস্বর কোমল, দ্বিধান্বিত। বিনা আপত্তিতে আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে চলল, রাস্তা ছেড়ে বনের ভিতর। গাছের ছায়ার তলে দাঁড়িয়ে ওর গালে হাত বুলায়। হাতখানা তপ্ত, কম্পান্বিত। কাষ্টা বোঝে, বাধা দিবার শক্তি নেই আর।

রাত্রি ভোর হয়ে গেছে। জলার মোরগ ডেকে ওঠে তীব্র কণ্ঠে। কাষ্টা ক্ষিপ্রপদে ছুটল পল্লীমুখে।

কাষ্টা মনে মনে ভাবে, "সারারাত বনের ভিতর পুরুষমানুষের সঙ্গে কাটালে যা ঘটবার ঘটবেই ত। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

এখন থেকে শহর থেকে ফিরবার পথে প্রায়ই দুজনে দেখা হয়। গ্রান্‌লিস্ বুড়ী ধমকায়, 'বাড়ী ফিরতে এত রাত হয় কেন?'

'মামলা মকদ্দমার হাঙ্গামা শিগ্‌গির মেটে? তোমার যেমন বুদ্ধি! এ ত তার ডিম সিদ্ধ করা নয়, যে, দু মিনিটেই হবে!'

মেয়েদের গান বা পাশের বাড়ীর জানালায় মৃদু করাঘাত ওকে আর উতলা করে না।

খড় শুকাবার সময় এল। কাষ্টার বুঝতে বাকি রইল না যে, সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। ব্যাপার ত ভীষণ, এখন উপায় কি? গোলাঘরে গিয়ে ছাগলের পাশে বসে পড়ল। সেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ঘণ্টাখানেক খুব কাঁদল, তারপর গেল কাজে। লোকটার সঙ্গে দেখা হ'ল। খুব খানিকটা বকাবকি করল। কিন্তু কি লাভ হ'ল তাতে?

নীরবে বিবর্ণ মুখে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কাজকর্ম্ম করে। গ্রীষ্মের সময় যা-কিছু পরিশ্রমের কাজ একাই করে, মার সঙ্গে কেবল বাধে খিটিমিটি, দুধ দুইবার সময় ছাগলটাকে মারে, আর মামলার তদ্বির করতে ঘন ঘন শহরে যায়। মকর্দ্দমায় যদি হারে তবেই ত সর্ব্বনাশ! থোম তা হলে ওকে আর ওর বাচ্চাকে ঠেঙিয়ে মারবে। শিশুটারই বা কি গতি হবে? জন্মাবে কেবল মরতে। থোমের ফিরবার ত এখনো অনেক দেরী। যাই হোক, ভাবী সন্তানের দুর্ভাবনা মন থেকে যায় না। কেবল তার দোলনা কাঁথা, বিছানা বালিশ, খুঁটিনাটি আরও কত কিছুর কথা ভাবে। ছোট্ট একটুকরো মাংসের দলা, বুকে লেগে থাকবে, দুধ খাবার জন্যে ঠোঁট ফুলোবে! নাঃ, আর ভাবতে পারি না, ম'লেই বাঁচি!

আলুর ফসল গোলাজাত করবার সময় যখন এল, তখন কাষ্টার অবস্থা আর লুকিয়ে রাখা যায় না। খাঁজকাটা সরল পথে উবু হয়ে আস্তে আস্তে কোঁচড়ে আলু সংগ্রহ ক'রে এগিয়ে যায়। শুনতে পায়, পিছন থেকে বিলি বলে, 'কাষ্টা থোমের জন্যে একটি উপহার সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। সে যখন দেশে ফিরবে, কি খুশীই হবে!"

অন্যান্য মেয়েরা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল, হাসিটা ক্ষেত ভ'রে ছড়িয়ে গেল। বেচারী মনে মনে বলে, 'জানতুমই ত এই দুর্গতি হবে, হ'ল শেষকালটা।'

থর থর ক'রে পাদুটো কাঁপে, ঝর ঝর করে আলুগুলো পড়ে যায়। সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, নিরুপায় ক্রোধে কোণঠাসা জন্তুর মত ওদের দিকে কটমট ক'রে চায়। আবার নীচু হয়ে চুপ ক'রে ঘাড় গুঁজে আলুগুলো কুড়োতে আরম্ভ করে। ঠাট্টা মস্করার অবধি নেই। ক্ষেত পার হয়ে গাড়ীতে যখন আলুগুলো তুলতে যায়, অজস্র বিদ্রূপের বাণ ভেদ ক'রে চলতে হয় ওকে। 'বলি কোত্থেকে পুতুলটা গড়ালি? শহরে বুঝি? গাঁয়ে অত সস্তায় মিলবে না। বল্ না খুলে, মামলায় নথিপত্র ঝেড়ে, না, থোম ডাকে পাঠিয়েছে?' কাষ্টা নীরব। ভাবে, বলুক না, যত পারে বলে যাক, তারপর নিজেরাই ঠাণ্ডা হবে। মার কাছেও ছিল না শান্তি, উদয়াস্ত কেবল গালাগালি আর অভিসম্পাৎ। অশান্তি ক'রে কি লাভ? মাকে বলে, 'অদৃষ্টে যা ছিল ঘটেছে, হাউ মাউ করে কেন আর গোদের উপর বিষ ফোড়ার সৃষ্টি কর? যন্ত্রণা কমবে তাতে? কেন দুঃখের বোঝা বাড়াও মা, ভার ত কিছু কম নয়।' কাষ্টা বড় কিছু একটা গায়ে মাখে না, তাই মনে বল পায়।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীরনাথ মুন্সী

বৈরাগী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শীত পড়েছে। কার্ষ্টা গিয়েছিল জঙ্গলে শুক্‌নো ফেক্‌রি ডাল কুড়োতে। এমন সময় ব্যথা উঠল। মেয়েরা তাকে ধরে ঠেলা গাড়ীতে চাপিয়ে দিল। তারপর হাসতে হাসতে ঠেলতে ঠেলতে ওকে পৌঁছে দিল ঘরে। খুকী হল। মরল না ত, দিব্যি ট্যাবা টোবা, জলজলে চোখে কেমন করুণ দৃষ্টি! গাঁয়ের লোকে মেনে নিয়েছে কার্ষ্টা সন্তানবতী, কেউ আর উপহাস করে না। মকদ্দমা ছাড়া কার্ষ্টার জীবনের নতুন একটা অবলম্বন হ'ল। অবশ্য মকদ্দমাটাই সব চেয়ে জরুরি, তবু আতুড়ের শিশুর দাবী মেটাতে হয় দিনরাত্রি ধরে। বুকে নিয়ে দোলাও, দুধ খাওয়াও, হিম লাগবার ভয় নেই যখন দেউড়িতে কোলে নিয়ে বোসো, আর ঘুমপাড়ানি গান গাও।

খোমের চিঠি এল।—

প্রাণের কার্ষ্টা,

তোমাকে লিখতেই হ'ল যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমাকে ছুটি দিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে। আসছে হপ্তায় ফিরবো। কুশলে থাকো।

তোমার খোম।

ঘরে আগুন জ্বলছে! ক্ষীণ আলোয় চিঠিখানা কার্ষ্টা কোনমতে পড়ল।

বুড়ী জিজ্ঞেস করে, 'কি লিখেছে?'

'কি আর লিখবে!' এই বলে কার্ষ্টা আগুন ঘেঁষে চুপ ক'রে বসে থাকে।

'বলি, ভাল আছে ত?'

কার্ষ্টা নিরুত্তর, আগুনের দিকে চেয়ে থাকে।

'উত্তর দিচ্চিস না কেন, শিগ্‌গির বল্‌ কি লিখেছে?'

'উনি ফিরে আসছেন।' শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল। 'হে ভগবান, খুকীর গায়ে যেন হাত না তোলে।' নীরব প্রার্থনা গুমরে ওঠে মাতৃবক্ষে।

বুড়ীরও সে ভাবনা। বলে, 'খুকীর দোলনাটা এমনি জায়গায় রাখ, যাতে উঠতে বসতে ওর চোখে না পড়ে।'

'হাঁ, তাই রাখব।'

মা ও মেয়ে চুপ ক'রে পাশাপাশি বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যে যার বিছানায় গিয়ে ঢুকল। বিছানা থেকে বুড়ি জিজ্ঞেস করে, 'মকদ্দমার খবরটা ভাল ত?'

'নিশ্চয়ই। মন্দ হবে কেন?'

'ভাল, তাহলে—'

শনিবার বিকালে কার্ষ্টা শরাবখানার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অবকাশপ্রাপ্ত সেপাইদের গাড়ী শহর থেকে এসে এইখানে থামবে। দারুণ ঠাণ্ডা। স্বচ্ছ আকাশের পশ্চিমকোণে অপসৃয়মান রবি। গাঁয়ের সব স্ত্রীলোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। ঘাঘ্‌রার সামনে আঁটা শটাঞ্চলে হাত জড়িয়ে নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কখন গাড়ী এসে পৌঁছবে। ঐ যে, ফৌজের দল চীৎকার করতে করতে টুপি ঘুরোতে ঘুরোতে এক্কা হাঁকিয়ে আসছে।

'কি গো আমার খুদে বৌ, বেঁচে আছ দেখছি!'—কার্ষ্টার চিবুক ধরে হেঁট হয়ে বলে, ওর গালদুটি রাঙা হয়ে ওঠে। ও প্রায় ভুলেই গিয়েছিল খোম কত লম্বা। বেচারী লজ্জায় আরো যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়।

'মরব কেন?' হেসে বলে, তবু চোখদুটি জলে ভ'রে ওঠে। আস্তে আস্তে খোমের হাতের পিঠে হাত বুলোয়।

'ঘরে চল, খাবার প্রস্তুত।'

'বহুৎ আচ্ছা, খানা তৈরী!' সহর্ষে খোম বলে। 'ওর পক্ষে বড় কাহিল হয়ে পড়েছি, দানাপানি দিয়ে আবার চাঙ্গা ক'রে তুলতে চায়—' খোম ভাবে মনে মনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে খোম এগিয়ে যায়, কার্ষ্টা খুর খুর করে পিছু পিছু চলে।

কুঁড়ে ঘরখানি লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। দুটি মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলের উপর ধবধবে চাদর পাতা। মেঝের উপর পাইনের মঞ্জরী ছড়ানো। ম্যান্‌লিস্‌ বুড়ী আগুনের উপর ডেক্‌চি চড়িয়ে হাতা দিয়ে নাড়ছে!

'মা গো, বেঁচে আছ ত? বুড়ো হাড় কখানা ঠিক জোড়া আছে?'

'এখনো খসতে দেরী আছে। এসো বাপ আমার, তোমাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল।'

খোম তৎক্ষণাৎ বসে গেল ভোজে। এক প্লেট গরম শূয়রের মাংস কার্ষ্টা সামনে রাখল। প্রত্যেক গ্রাসটি খোম আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়ে খায়, আর কার্ষ্টার দিকে চেয়ে বলে—গোগ্রাসে তখনো গাল ফোলা—'জমিদারণী, দুন্দুভের জমিদারণী!'

কার্ষ্টা মনে মনে বলে, 'আশ্চর্য্য! পুরুষের এত রূপও হয়!' রোদে পুড়ে খোমের মুখে যেন ঝকঝকে তামার জলুষ ফুটেছে, গোঁফের রঙটা ফিকে দেখায়। ঘাড়ে কাঁধে বলিষ্ঠ হাত দুখানায় পেশীর তরঙ্গ। এমন জোয়ান স্বামী না পেলে সুখ কিসের?

যেমন খিদের আগুন জ্বলেছিল তেমনি পরিতৃপ্তির পূর্ণতা। খোম হাতের পিছনটা দিয়ে মুখ মুছে চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসল।

'এইবার মামলার কথা শুনি।' কার্ষ্টা বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে সব কথা দিব্যি গুছিয়ে বলতে লাগল। উকীল আদালতে কি বক্তৃতা করলেন, সে-ই বা জবানবন্দীতে ও বিপক্ষের সওয়াল-জবাবে কি উত্তর দিয়েছিল সব কথা বলে গেল। হাঁ, যেমন চতুর উকীল তেমনি বুদ্ধিমতী তার স্ত্রী। জোত-জমি এখন শ্রীমতী কার্ষ্টার। খোম মন দিয়ে শোনে, নববধূর প্রতি শ্রদ্ধায় বুক ভ'রে ওঠে। ওইটুকু মাথায় এত বুদ্ধি ধরে!

উৎসাহে উদ্দীপনায় কার্ষ্টার মুখে খই ফোটে। ঘরের কোণ থেকে হঠাৎ শিশুর কান্না জেগে উঠল। কার্ষ্টা কথা না থামিয়ে নিঃশব্দে দোলনার কাছে গিয়ে বুকের বোতাম খুলে খুকীকে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করল। সেখান থেকেই কণ্ঠস্বর আর একটু উচ্চে তুলে কথা বলে যেতে লাগল, যাতে দূর থেকেই খোম সব শুনতে পায়। তারপর হঠাৎ থেমে গেল আধখানা কথার মাঝখানে। ম্যান্‌লিস্‌ বুড়ী ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

'এইবার আসছে ঝড় !' কাষ্টা হৃৎকম্পের সঙ্গে মৌনে বলে।

থোম মাথা বাড়িয়ে পায়ে পায়ে দোল্‌নার দিকে আসছে শিকারী বেরালের মত, যেন কিছু ধরতে চায়। কাষ্টা তাড়াতাড়ি খুকীকে দোলায় শুইয়ে দিয়ে আগবাড়িয়ে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে, নীচের ঠোঁটটা পড়েছে ঝুলে, বিস্ফারিত চোখ দুটো ঝকঝক করছে সন্ত্রস্ত জন্তুর মত। হাত দুখানা থর থর ক'রে কাঁপছিল, গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে পেটের উপর রাখল। ধৈর্য্য ধরে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটে বুঝি।

'ওটা কি ?' থোমের কণ্ঠস্বর এত মৃদু, যেন কেউ তার গলা চেপে ধরেছে।

'তোমার কি মনে হয় ?'

'কোত্থেকে—কোত্থেকে ওই বাচ্চাটা এল ?'

'কি, খুকী ? কোত্থেকে আর আসবে ?'

এই কথাটা জোর করে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। শিশু যেমন কাঁদে, হঠাৎ কোনো অপকর্ম্মের মাঝে ধরা পড়লে।

'বটে ? তুমি তা হলে—এই রকম !" তীব্র ঘৃণার সঙ্গে থোম হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ওর হাতখানা ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে ঘরের মাঝখানে আনল।

'তুমি স্বামীকে প্রবঞ্চনা করেছ ? তোমাকে খুন করব, আর ওই বাচ্চাটাকে।'

তারপর নির্দ্দয়ভাবে প্রহার। কাষ্টা চীৎকার ক'রে কাঁদে আর আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে।

"বাপ রে, ঘুঁষিগুলো যেন লোহার গোলা ! 'গেলাম, ম'লাম', উঃ, কি জোর গায়ে, নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে !'—মনে মনে বলে।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবু—তবু যেন তৃপ্তি পায়—হাঁ, আছে বটে তার স্বামী।

থোম হাঁপিয়ে উঠল। এক ধাক্কায় তার স্ত্রীকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে থুথু ফেলে অভিসম্পাৎ ক'রে টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। কাষ্টা নিস্পন্দ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, অসহ্য ব্যথায় পঙ্গু, আড়চোখে থোমের দিকে তাকায়। শেষ হল কি ? না, আবার আরম্ভ হবে ? আরো যদি মারে তাও ভাল ঔদাসীন্যের চেয়ে। কপালে হাত রেখে থোম কি ভাবে।

কাষ্টা কোন মতে উঠে আগুনের পাশে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। আহত স্থানগুলি ঘসে, আর নিঃশব্দে কাঁদে। স্বামীর জন্যে দুঃখ হয়।

বাতি দুটো পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে এল। কালো কালো শিষ মাথা তুলে উঠেছে। বাহিরে তুষার বৃষ্টির ঝাপ্টা সার্শির গায়ে টোকা দিচ্ছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশ থেকে ঝিঁঝিঁ পোকা সশব্দে জেগে উঠল। কি করবেন উনি ? আবার কি মারবেন রাতে ?

থোম খানিকটা মদ ঢেলে খেলো। হাই তুলে জুতো খুলতে আরম্ভ করল।

কাষ্টা তাড়াতাড়ি উঠে ওর জুতো খুলে নেয়। থোম কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তক্তপোষটা উঠল মড়মড় ক'রে, বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে। কাষ্টার হাসি পেল। হাঁ, মানুষটা ভারী বটে !

কাষ্টা বাতি নিভিয়ে আগুনের পাশে বসল। আঙরার আভা পড়েছে ওর ছোট পা দুপানির উপর। চুপটি করে নিথর হয়ে বসে আছে, রুদ্ধশ্বাসে দারুণ উদ্বেগের সঙ্গে স্বামীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসটি কান পেতে শুনছে।

'এই !' বিছানার থেকে শব্দ এল।

ভয়ে কাষ্টা উঠল চমকে।

'ওখানে বসে কি হচ্ছে ? শুতে আসবে না ?'

'কি আর করব ?' কাষ্টা রুক্ষ স্বরে জবাব দিল। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বিছানার কাছে গেল। যা হোক, মনটা তাহলে নরম হয়ে এসেছে। এতক্ষণে অন্যান্য পল্লীবধূদের পদে সে বাহাল হল।

কিছুদিন ধরে ওদের কুটীরে দুর্যোগ চলতে লাগল। স্ত্রীর ব্যাভিচারের জন্যে থোমের ক্রোধানল মাঝে মাঝে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, প্রহার এবং রোদনের পালা চলে। শরাবখানায় মদ খায় ও দিব্যি করে, স্ত্রীকে আর তার বাচ্চাটাকে খুন ক'রে ছাড়বে। শিশুটিকে সব সময়ে ওর চোখের আড়ালে রাখে কাষ্টা। 'ওর স'য়ে যাবে আস্তে আস্তে, সব পুরুষেরই ওই রকম হয়, ব্যতিক্রম নেই'—কাষ্টা মনে মনে ভাবে।

বাস্তবিক দাঁড়ালোও তাই। যত দিন যায়, খুকীর কথা আর উচ্চারণ করে না। উত্তরোত্তর মকদ্দমার আলোচনায় প্রগল্‌ভ হ'য়ে ওঠে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ চলে কতকগুলো গরুশূয়র ওদের খামারবাড়ীতে রাখবে। কথাবার্ত্তার আর শেষ নেই। মেয়েটার কথা ভুলেই গেছে। একবারও ওর দিকে তাকায় না। দোলার পাশ দিয়ে যাবার সময় আগেকার মত থুথু ফেলে না। কাষ্টা অসঙ্কোচে ওর সামনেই খুকীকে মাই দেয়। থোম স্থির করল, এবার মাম্‌লার তদ্বির ও নিজেই করবে। হাঁ, স্ত্রীলোকের হিসাবে কাষ্টাকে বুদ্ধিমতী বলতেই হবে। তবে পাকা মাথার চাল যেখানে দরকার সেখানে মেয়েমানুষ অচল।

কাষ্টা বলে, 'সত্যিই ত, তুমি ছাড়া এ সব কে বুঝবে ?'

একা চড়ে থোম ছুটল শহরে। ফিরতে রাত হল। গোলাপী নেশায় মেজাজটা ভারী উৎফুল্ল। মকদ্দমায় জয়লাভ হয়েছে।

'আরে এস এস জোতদারের বৌ, তোমার বকশিসটা নিয়ে যাও। একটা লাল রুমাল কাষ্টার মাথায় জড়িয়ে দিল থোম। এখন ত আর সেদিন নেই। একটু সাজতে গুজতে হয় বই কি।

'বাঃ, কি সুন্দর রুমাল ! আমাকে আবার কি জন্যে দেওয়া হল ?' —কাষ্টা বলে হেসে।

'এই জন্যে যে—' আর মুখে কথা জোগাল না। কতকটা অপ্রতিভ হয়ে একটু স'রে গেল। তারপর টেবিলের উপর একটা সাদা পশমী কাপড়ের মোড়ক ফেলে দিয়ে বলল,

—'আর ওটা কি মেদি—ওই ওটার জন্যে।

'কেন, কিসের জন্যে ?'

'ওই খুকীর জন্যে।'

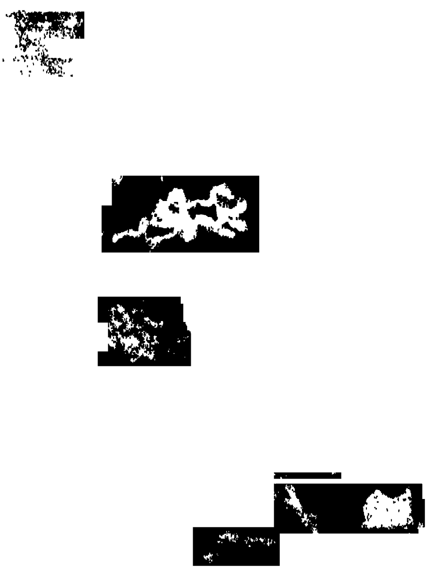
কাষ্টা মোড়কটা তুলে বুকে রাখল। এতদিন পরে বুঝি দেবতা প্রসন্ন হলেন।

চৈনিক চিত্রকলার ছায়াপথ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

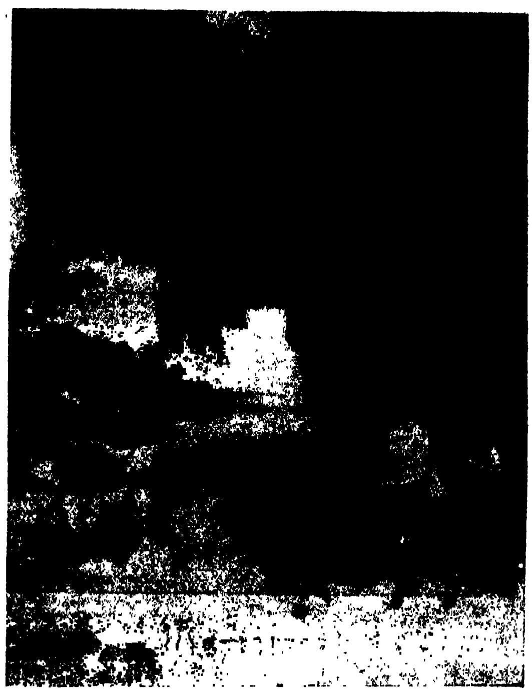
প্রবন্ধ

চৈনিক চিত্ত দুর্জ্ঞেয় বলে' ইউরোপীয়দের একটা বিভীষিকা আছে। জটিল চৈনিক সাধনার অন্তরালে লেওট্‌সু ও কনফুসিয়াস অসীমের সহিত যে সামাজিকতা স্থাপন করেছে খ্রীষ্টীয়-শীলতা সে বার্ত্তার উপর অভিজ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ করতে পারেনি। একদিকে কনফুসিয়সের বহিরঙ্গ সংযম ও শৃঙ্খলা, অপরদিকে তায়োধর্ম্মের অন্তর্মুখীন আবেশ ও আবেষ্টনে চৈনিক হৃদয়তত্ত্ব জর্জ্জরিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সহজে চৈনিকের অন্তররাজ্যে প্রবেশ দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই।



মার্জ্জার (সুঙ্গ যুগ)

অথচ চৈনিক হৃদয়ের স্বচ্ছ মানবিকতা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য নয়। চীন দেশ শুধু ড্রাগন আঁকে নি—চমৎকার রাজহাঁস ও রঙীন পাখী প্রভৃতির সুরম্য দেহশ্রীকে উপস্থাপিত ক'রে চীন জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। বস্তুত চীনের চিত্রকলার সূক্ষ্ম কালোয়াতীতে সকলেই মুগ্ধ হয়। চৈনিক তুলিকার মায়াজালে দূরদিগন্তের কুজ্ঝটিকা, শৈলপুঞ্জের হিল্লোলিত প্রবাহ যেন একটি মরীচিকার মত ভেসে ওঠে। তাতে কোথাও বা বাঁশের রচিত কুটীর, কোথাও বা দুর্গম শৈলশীর্ষে ভজনপূজনের বায়বীয় নীড় প্রাকৃতিক আবেষ্টনকে আলিঙ্গন করে' এক রম্যলোক সৃষ্টি করে। মনে হয়, কোথাও বা স্তরে স্তরে শালগাছের সারি যেন এক অসীম ও নিঃশব্দ দর্শকশ্রেণীর নীড় রচনা করে' রেখেছে আদি যুগ থেকে। স্বচ্ছ হ্রদের পুলক কম্প, ভাসমান নৌকার মৃদু



দৃশ্য (শিল্পী লি-য়ি)

শিহরণ, পাহাড়ের পাদমূল ঘিরে এক নূতন সামাজিকতা সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায়। বস্তুত চৈনিক চিত্রকলা জগতের বিচিত্র উপাদানের ভিতর একটা রসসম্পর্ক রচনা ক'রে নবতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। সে প্রাণ-তরঙ্গে মানুষের অর্ঘ্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে অফুরন্তভাবে—তাতে রুক্ষ নিঃসঙ্গতার ভাব নেই—আদিম আরণ্য জীবনের ভ্রূকুটি

তাতে পাওয়া যাবে না। একটা নূতন রসলোকে সমগ্র জগৎ যেন মজ্জিত হয়েছে। সৃষ্টির বিচিত্র জীব ও জড়সম্পদ যেন একাগ্র হয়ে' পরস্পরের ভিতর একটা নিবিড় বোঝা-পড়ায় মগ্ন ও নিবিষ্ট—এমন একটা অবস্থা বিকশিত করা হয়েছে। জগতের কোন শিল্পসম্পদ এ রকমের অসামান্য ঐশ্বর্য্যের গৌরবমুকুট পরিধান করতে পারে নি।

এর কারণ খুঁজতে হয় চৈনিক চিন্তা ও তত্ত্বে। কনফুসিয়সের বহিরঙ্গ চর্চ্চায় একটা সুসঙ্গত সাধনার চেষ্টা আছে। নাস্তিক্যবাদের উপর নিহিত এই বস্তুবাদ অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে জগতের শেষতত্ত্বকে উদ্ঘাটনের



মাছধরা (সুঙ্গ যুগ)

স্পর্দ্ধা করেছে—অপরদিকে লেওট্‌ঝু আড়ালে ও আলোকে রহস্যের ওতপ্রোত সম্পর্ক রচনা ক'রে অতীন্দ্রিয়বাদের পতাকা উত্তোলিত করেছে। তাতে ক'রে জগতের অনুদ্ঘাটিত ও অসীম অবগুণ্ঠনের ছায়ায় নিহিত বার্ত্তার উপর আলোক নিক্ষেপের চেষ্টা আছে। বস্তুবাদ ও রহস্যবাদ এমনি করে' চৈনিক সভ্যতা ও শীলতায় একটা বিরোধবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চীনের প্রাথমিক ইতিহাসে এল ভারতের বাণী। বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সমসাময়িক যুগে নিয়ে এল ভগবান তথাগতের সম্পর্ক—তাতে চৈনিক চিত্ত একটা বিশিষ্ট শ্রীতে অভিষিক্ত হয়ে গেল। বৌদ্ধধর্ম্মে বহিরঙ্গ সাধনের সহিত অন্তর্লোকের গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। জগতের মনস্তাত্ত্বিক চর্চ্চার প্রথম উন্মেষ ভারতবর্ষেই হয়। এই অন্তর্লোকের জিজ্ঞাসা যুগযুগান্তের জন্মজন্মান্তরের ধারার সহিত এক দিকে যুক্ত, অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের অনাত্মবাদ বসুধাকে একটা সার্থক মর্য্যাদা দান করে। বুদ্ধ ভূমিস্পর্শমুদ্রার সাহায্যে পৃথিবীর সার্থক



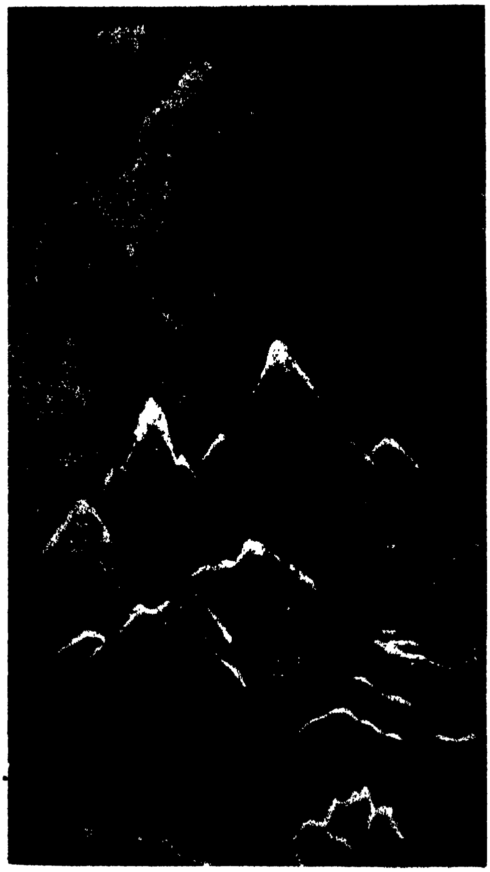
বাঁশ ও পরগাছা (মাঙ্গু যুগ)

সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। এ দুটি দৃষ্টির সুসঙ্গতিতে বৌদ্ধ শীলতা জগতে একটা দুর্লভ শান্তির আলোক উপস্থিত করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের স্পর্শলাভ করে' চৈনিক অন্তর জগতের সঙ্গে একটা নূতন রসসম্পর্ক স্থাপন করে। চৈনিক সভ্যতার আদিম প্রতীতি ছিল yin ও yang-এর, অর্থাৎ গতি ও স্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতের সত্যতা সম্পর্কে। কিন্তু পরবর্তী

চিন্তা এ দুটিকে অঙ্গাঙ্গী বলে' কল্পনা করতে উৎসাহিত হল। yang হচ্ছে আত্মা এবং yin দেহ, এই নূতন ব্যাখ্যার প্রতিকূলে চৈনিক ভাবুক Wang Jing hsiang প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তিনি স্বীকার করেন, এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংস্পর্শের ফলে হয়েছে।

এমনি করে' চৈনিক রসস্থষ্টির মূলে এল নূতন প্রেরণা। ক্রমশ ড্রাগন প্রভৃতির বিরোধী ব্যঞ্জনায় চীন তৃপ্তিলাভ করতে পারে নি। 'ড্রাগন' স্বর্গীয় ঘোড়া ও স্বর্গীয় মাছ;



বরফের দৃশ্য (ট্যাঙ্গ যুগ)

এ দুটি বিরোধী কল্পনার একটা যুগ্মমূর্ত্তি ছিল। কিন্তু বৌদ্ধবাদ নিয়ে এল এক নূতন সম্পদ। ভারতের নাগ কল্পনা এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সমগ্র দৃষ্টিটি তাতে করে' একটা অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস হয়ে পড়ল। "ড্রাগন"ও একটা নূতন সমন্বয়ী রূপ পেয়ে গেল। এমনি করে' ধীরে ধীরে ভারতীয় কল্পনার অজস্র রসপ্রবাহ চৈনিক স্থষ্টির ভিতর নূতন মাদকতা সঞ্চার করতে লাগল।

সহস্র বুদ্ধ-গুহায় যে চৈনিক চিত্রকলা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুখ্য দেবতাদের রূপ ভারতীয় প্রথামতেই অঙ্কিত—চারি দিকে চীনের আলঙ্কারিক প্রতিভা একটা রূপ-স্থষ্টির বেষ্টনী রচনা ক'রে ধন্য হয়েছে।[১] য়ুয়ান ক্যাঙ্গ গুহার রচনাও ভারতীয় ছায়ায় মণ্ডিত। Siren-এর মতে মথুরার শিল্পের প্রভাবে এ সমস্ত রচনা পরিপুষ্ট। ট্যাঙ্গ যুগের রচনায়ও গুপ্তপ্রভাব প্রস্ফুট।



হেমন্তে নদী পার হওয়া (সিঙ্গ যুগ)

ব্রিটিশ মুজিয়ামে একটা ট্যাঙ্গ যুগের কাঠের ফলক আছে যার আকার প্রকার একেবারে ভারতীয়। বস্তুত ভারতবর্ষ থেকে কাশ্মীরের গুণবর্ম্মা ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে উপস্থিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বোধিধর্ম্ম উপস্থিত হয় ৫২৯-৫৩৬

১ The brain, cult figures (Buddhas & Bodhisattwas) which depended for their efficacy on an exact conformity to Indian prototypes retain their exotic luxuriance of outline. But the anecdotal schemes which crowded upon them on every side are typically Chinese".—Aurel Stein.

খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্ত্তী যুগে বুদ্ধপ্রিয় এসে যোগমার্গে হাত-পা ও মুদ্রাদির রক্ষা ও রচনার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন। এমনি করে ধীরে ধীরে চৈনিক ছন্দ ভারতীয় রীতির তরঙ্গভঙ্গের অনুসরণ করেছে। অপর দিকে ৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্য থেকে প্রায় দশ বার ভারতে রাজদূত পাঠান হয়। তাতে করে' ভারতের তত্ত্ব ও শিল্পকলাদির সঙ্গে চীনের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই সম্পর্ক চিত্রকলায় নানাভাবে ছায়াপাত করে।



দৃশ্য—শিল্পী সু-হান-চেন

ছায়ার সাহায্যে গভীরতা প্রতিপাদন চৈনিক চিত্রকলার প্রিয় নয়, অথচ কোন কোন চৈনিক চিত্রে এই ব্যবস্থা আছে। Waley বিখ্যাত চিত্রকর Chang-seng-yu-এর প্রথা (ষষ্ঠ শতাব্দী) সম্বন্ধে বলেছেন :—"In painting he used a method of handling vermilion and verdigris which is said to be derived from India". এই রকমের প্রথা বা উপকরণ গ্রহণ করলেও চৈনিক চিত্রকলার বিশিষ্ট মাদকতা অনির্ব্বচনীয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপগৌরবে চৈনিক রচনা মণ্ডিত।

চৈনিক চিত্রকলার যুগগুলি ক্রমশ জগতে পরিচিত হয়েছে। হ্যান যুগের (Han) স্বভাববাদিতা শিল্পী লিয়েহ্-ই-র জন্যে বিখ্যাত হয়েছে। এমনি জীবন্ত phœnix এই শিল্পী আঁক্ত যে, মনে হত তা উড়ে যাবে (২২০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব)। পরবর্ত্তী যুগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ট্যাঙ্গ, সুঙ্গ, য়ুয়ান, মিঙ্গ ও ম্যাঞ্চু।

ট্যাঙ্গ যুগে বৃহত্তর চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।



শৈলবক্ষে তাপস (সুঙ্গ যুগ)

কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত চীনরাজ্য বিস্তৃত হয়। ট্যাঙ্গ যুগে চৈনিক কবিতার চরম সমুত্থান হয়। কবি লি-পো (Le-Po ৭০৫-৭৬২ খ্রীঃ) জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব আলিঙ্গন করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে। ট্যাঙ্গ যুগের কল্পনাপ্রিয় উৎসাহ তুন্-হুয়াঙ্গের চিত্রকলায় ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী উ-তাও-য়ুয়ান (Wu-Tao-yuan) বিখ্যাত হয়েছে। 'পশ্চিমের স্বর্গ' নামক স্বরচিত চিত্রের ভিতর তিনি অদৃশ্য

হয়ে যান এরূপ প্রবাদ আছে। ট্যাঙ্গযুগের 'বরফের দৃশ্য' ছবিখানিতে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটা অপূর্ব্ব উদ্ঘাটন। শুধু বরফ মাত্র নয়, সমগ্র রচনাটির মুগ্ধকর বিন্যাস ও আলুলায়িত ছন্দে একটা অব্যক্ত উন্মাদনা লক্ষিত হয়। মনে হয়, এটা যেন কোন কিন্নরপুরী—বরফগুলি যেন তার ভিতর একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-সম্বাদ রচনা করে' কারুর শুভদৃষ্টির প্রতীক্ষা করছে। ক্ষুদ্র একটি গৃহকোণের বার্ত্তা যেন সমগ্র দৃশ্যটির মাঝখানে হৃদপিণ্ডের মত জাগ্রত আছে। চীন অতি দুর্গম ও দুরূহ দৃশ্যের সঙ্গেও



জলকেলি (সম্রাট হুই-সাঙ্গ, ১০৮২—১১৩৫ খৃঃ)

এমন একটা লাবণ্যপূর্ণ আন্তরিকতা সৃষ্টি করে—যার তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। এই বরফের সমগ্র দৃশ্যটি যেন মনে হয় একটা আকুল হৃদ্‌স্পন্দনের মত—অথচ কোথাও বহিরঙ্গ কৌলীন্যকে খর্ব্ব করা হয় নি।

সুঙ্গ যুগে এল বিচারবিবেচনার উৎসাহ। তাতে করে' সৌন্দর্য্যসাধনা আরও গভীরতর লোকে উপনীত হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনার একটা বিপুল প্রেরণা এই যুগেই সূত্রপাত হয়। চৈনিক চিত্রকলার অজানা ছায়াপথে উদ্‌ভ্রান্ত পথিক এ সব রচনা দেখে' উল্লসিত হয়। বিশ্ব-মানবের উপভোগ্য এ সমস্ত চিত্রসম্পদে যে লঘু ভাবাবেশ ও সূক্ষ্মরস সম্পাত আছে ইউরোপীয় চিত্র (landscape) তা কল্পনাও করতে পারে না। চৈনিক চিত্রে রেখাপ্রয়োগে একটা মর্য্যাদা ও গভীরতা আছে। পুরুষানুক্রমে পিতা থেকে পুত্রে এই রেখাপ্রয়োগের প্রণালী শেখান হয়। এজন্য Calligraphy ও চিত্রকলা চীনদেশে একই শিল্পরূপে



ভূচিত্র (মিঙ্গ যুগ)

বিবেচিত হয়। মস্‌লিন-সূক্ষ্ম রচনার যে একটা লঘু ঐশ্বর্য্য আছে, তার তুলনা মোটা তুলির কাজে পাওয়া যায় না—এ জন্যই চৈনিক শিল্পীর এই রূপের ভাষা অপরাজেয় হয়েছে।

সুঙ্গ যুগের সম্রাট হুই-সাঙ্গের একখানি চিত্রে দেখা যাবে স্বভাববাদের নমুনায়ও চীন অপরাজেয়। চিত্রের মাঝখানটায় যে রাজহাঁসটি আছে তার চেয়ে অধিক জীবন্ত হাঁস রচনা সম্ভব নয়। চীন শুধু অদ্ভুত কিছু রচনা করে, এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। এ ছবিখানি তার

সুরম্য প্রতিবাদ। ছোট গাছটির ফুলগুলি ছবির মাঝে যেন দীপজ্বালার মত একটা শ্রী সঞ্চার করছে। সুঙ্গ যুগের শিল্পী মা-ইউয়ানের ছবিতে এসেছে গভীরতর রসসম্পর্ক যা চিত্তকে সহজেই অভিভূত করে। সুঙ্গ চিত্রকরেরা কুয়াসার হেরফেরে, অস্পষ্টতার ঝরোকায় অধ্যাত্ম উপলব্ধির রেখা খুঁজতে উৎসাহিত হয়। অস্পষ্টতা রহস্যে ওতঃপ্রোত বলে তা তুরীয় অনুভূতিকে অনির্ব্বচনীয়ভাবে প্রকাশ করে, এ কথা চৈনিক শিল্পী চমৎকার বোঝে। তাই চিত্রকলায় অজানার



দৃশ্য—শ যুয়ান অঙ্কিত

সংস্পর্শ দান করতে গিয়ে দিতে হয় মেঘের উদ্‌ভ্রান্ত আবরণ বা কুজ্ঝটিকার উড়ন্ত আবর্ত্ত। মা-ইউয়ান পাহাড়, জল, গাছপালা, কুয়াসা, আকাশ প্রভৃতি দিয়ে এমন এক রাজ্য সৃষ্টি করেছে যাতে আরব্য রজনীর স্বপ্ন হতপ্রভ হয়। বট-গাছের বঙ্কিম বেষ্টনীর ভিতর আছে যুগযুগান্তের সুপ্ত কাহিনী। দেহকুণ্ডলীর ভিতর যেন তা লুকোন। অপর দিকে অভ্রভেদী শৈলশির যেন সুদূর ভবিষ্যতের কিরণে শীর্ষদেশকে উজ্জ্বল করেছে। কালের কল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে হ্রদের মতই অজানা আবহাওয়া ও ধূসর কুহেলিতে মগ্ন হয়ে। সব নিয়ে হয়েছে একটা সৌন্দর্য্যের পুঞ্জীভূত সম্পদ।

হ্যান্‌-চেনের চিত্রে আছে দুটি শিশুর জল্পনা। সমগ্র ছবিখানিই যেন এ দুটি শিশুর সারল্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। ফুলগুলির সহজ বিকাশ যেন সৃষ্টির বালসুলভ সারল্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি অজানা চিত্রকরের রচিত মার্জ্জারের ছবিখানির উল্লেখ প্রয়োজন। এরূপ স্বাভাবিক



শৈলপথে পাইন বৃক্ষের মর্ম্মরধ্বনি (মিঙ্গ যুগ)

ও চমৎকার চিত্র কোন শিল্পের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। ছোট গাছের ফুলগুলির নিপুণ তুলিকা-ভঙ্গ উপভোগ্য সন্দেহ নেই। অপর দিকে লি-য়ি রচিত চিত্রের সূক্ষ্ম তুলিকাপাত ও জন্তু রচনার কৃতিত্ব চৈনিক শিল্পের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। ছবিখানিতে দুটি মোষের দ্রুত ধাবনের দৃশ্য আঁকা হয়েছে—মোষ দুটি অতি নিখুঁত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টি

পার্শ্ববর্ত্তী গাছটিকেও গতিশক্তিশীল করে' সমতান রক্ষা করেছে—মনে হয়, উপরেও একটা গতির বেগ নীচের সঙ্গে যোগ রক্ষা করছে। বস্তুত সুঙ্গ যুগের এ সমস্ত জীবজন্তুর পেলব রচনা সকলেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে। চৈনিক চিত্রগুলি এ যুগে উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করে। চিত্রকরেরা ত্যায়ো ধর্ম্মের রহস্যবাদ ও Zen ধর্ম্মের ধ্যানবাদকে শিরোধার্য্য করে' নব্যতার স্বপ্ন রচনায় মশগুল হয়ে যায়। তাতে করে' চিত্রশিল্পের অতি গূঢ় সম্পদও রচিত



প্রাকৃতিক দৃশ্য (মাঙ্গু যুগ)

হ'তে পারে। মানব ও প্রকৃতির ঐক্য উপলব্ধি এ যুগের প্রধান অধ্যাত্ম সম্পদ। কোন আলোচক * এ যুগের রচনা সম্বন্ধে বলেন, "Man is not conceived of as detached from or opposed to external nature rather is the thought of one life or one soul manifested in both." এই যুগে তাতারদের আক্রমণে চৈনিক রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়। সম্রাট হুই-সুঙ্গকে (Hui tsung) তাতারেরা বন্দী করে' নিয়ে যায়। তখন হাংচোতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। এখানেই শিল্পী মা-ইউয়ানের প্রতিভার বিকাশ হয়। জাপানের Kauo-শিল্পচক্র এই শিল্পীর কাছে গভীরভাবে ঋণী। শালবৃক্ষের সারি, বাঁশবনের ঘনসন্নিবেশ, বিক্ষিপ্ত সাইপ্রাস গাছের প্রাচুর্য্য, উঁচু পাহাড়ের, তরঙ্গায়িত রূপভঙ্গ, কুজ্ঝটিকার আধ-ঢাকা আবরণ, ছায়াশিহরিত হ্রদ এবং দু-একটি মানুষের রহস্যপূর্ণ সংযোগ—এরকমের মুগ্ধকর বিষয় নিয়ে



শিল্পী মুন-চুন-মে (যুয়ান যুগ)

মা-ইউয়ান ছবি আঁক্‌ত। এ রকমের চিত্র মাঝে মাঝে রেশমের উপর আঁকা হ'ত বলে একটা গুপ্ত প্রভা চিত্রকে প্রাণবান করে' তুল্‌ত। সুঙ্গ চিত্রকরদের ভিতর মু-চির নাম বিখ্যাত। এ শিল্পী মদের ঝোঁকে বা চায়ের উত্তেজনায় চমৎকার ছবি আঁক্‌ত। ড্রাগনের ভীষণ ছবি এঁকেও এই শিল্পী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র জাতির ভিতরই

* Soothill : The Three Religions of China.

এরকমের একটা সুগুপ্ত ভীতির ছায়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্কও এই বিভীষিকা দূর করতে পারেনি। অনেক চৈনিক শিল্পীর প্রণালী অদ্ভুত। চেন্-জাঙ্গ কালী ছড়িয়ে, জল ঢেলে', চেঁচিয়ে হৈ চৈ করে' ছবি আঁকত মদের ঝোঁকে। * সুঙ্গ যুগ এমনি করে' চিত্রকলার সুমেরু ও কুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেছে। বস্তুত চৈনিক চিত্ত সমগ্র সৃষ্টিতে মানবের মুখশ্রীর অনুপম ব্যঞ্জনা অনুভব করেছে। মানবীর মুখশ্রীর রহস্যময় সীমান্তে, নিমীলিত চোখের রেখা-লালিত্যের বাণীতে, চৈনিক শীলতা অনুভব করেছে জগতের চরম কারুর হিল্লোল ও প্রেরণা। তাই তা মানব ও প্রকৃতি



সুঙ্গ—যুগ শিল্পী "মা-ইউয়ান"

চীনের একান্তভাবে হৃদ্য হয়েছে। "নদীর উপরে মাছ ধরার" চিত্রের কৌতুক বা "শৈলশীর্ষে বিহার" ছবির অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা—
—সবদিকেই সুঙ্গ চিত্রকর নিজের প্রতিভা দেখিয়েছে?

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এল নূতন বিপ্লব। জেঙ্গিস খাঁ চীন বিজয় করে এ যুগে। কাব্‌লা খাঁ এরূপে চীনে য়ুয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করে। এ যুগের চিত্রকর চ্যায়ো-মেঙ্গ-ফু প্রাচীন পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এ চিত্রকর বলেছিল, "এ যুগে ছবির রেখা যদি সূক্ষ্ম হয় এবং রঙ যদি উজ্জ্বল হয় তবেই লোকে সুখী হয়; কিন্তু তারা ভুলে যায়, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ না করলে শত শত ভ্রান্তি ও ভুল ঘট্‌তে বাধ্য।" এ যুগেই নেপালের শিল্পী আনিকো (Aniko) সম্রাট কাব্‌লা খাঁ কর্তৃক শিল্পকলা দপ্তরের প্রধান পদে নিযুক্ত হয়।

মিঙ্গ বংশের উত্থানের সময় (১৩৪৪-১৬৪৩ খ্রীঃ) হচ্ছে চতুর্দ্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এ যুগ সুঙ্গ যুগের আদর্শ গ্রহণ করে। অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতির জন্য এ যুগ বিখ্যাত। এ বংশ প্রাদেশিকতার অনুরক্ত ছিল। এ যুগে "বিদ্বানের চিত্র"ই সমাদৃত হ'ত বেশী এবং চিত্রকলার রচনাপদ্ধতি অনেকটা আচারমূলক হয়ে পড়ে। এই রীতিতে কি করে' গাছপালা, পাহাড় প্রভৃতি আঁকতে হবে তাই নির্দ্দেশ করা হয়েছিল এইভাবে—"the trees should be like twisted iron—the mountains like painted sand. They should exclude anything pretty or common place. For such is scholarly painting · · · Painting was a complicated ritual like a court function." *

মিঙ্গ যুগের "হেমন্তে নদীর পার" একটি চমৎকার রচনা। সমগ্র চিত্রটির ভিতর একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মহান্ অনুভূতি কাজ করছে। মিঙ্গ যুগের "পার্ব্বত্য পথে পাইন গাছের মর্ম্মরধ্বনি" আর একটি উচ্চ শ্রেণীর রচনা। এ দুটির ভিতরই একটা মহাকাব্যের ন্যায্য বিরাটের স্পর্শ আছে।

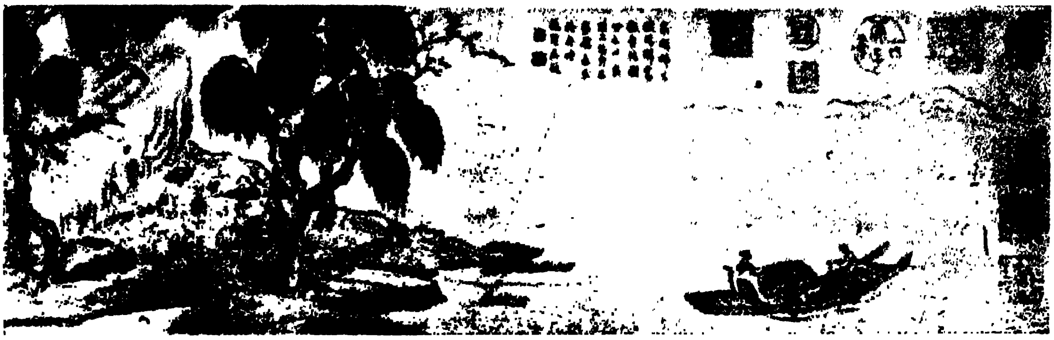
ম্যাঞ্চু যুগের রচনায়ও (১৬৪৪-১৯১২) চীন নিজের অনুভব ও স্বপ্ন হারায় নি। এ যুগের বাঁশের ও পরগাছার ছবিখানি ভারি চমৎকার হয়েছে। এ যুগের প্রাকৃতিক আর একটি দৃশ্যের পাখীগুলিও জীবন্ত মনে হয়। বস্তুত নানা ভাব ও বংশবিপ্লবে চীন নিজের অন্তরানুভূতিকে কখনও বর্জ্জন করেনি। অতি সূক্ষ্ম রসপ্রসঙ্গ ও ভাবপর্য্যায় পার্থিব অপার্থিব রূপপ্রসঙ্গে চৈনিক শিল্পে এক নূতন মর্য্যাদা লাভ করেছে। ভারতবর্ষ অরূপের ধ্যান থেকে রূপাবলির সন্ধান

* "He would make clouds by splashing ink and mists by spelling water. When excited by wine he would give a great shout and seizing his cap use it as a painting brush roughly design."—Waley.

* Tung Chi-chang.

পেয়েছিল। চীন রূপের অনুসরণ করে' অরূপকে স্পর্শ করতে সাহসী হয়েছে। রূপের সীমান্তে অরূপের ছায়াকে আঁক্‌ড়ে ধরে' চীন এক অপার্থিব সম্পদ দান করেছে বিশ্বের শিল্প-প্রদর্শনীতে। এ জন্য বিপরীতমুখী হ'লেও ভারতের ক্ষুণ্ণ হয়নি—ভারতেও তা আরও গভীরতর সত্যানুভূতি ও নিপুণতর বস্তুবাদে পরিণত হয়েছে।

এ জন্য চীনের চিত্র ইউরোপের কাছে দুর্বোধ্য হ'লেও ভারতের কাছে তেমন সুদূর বা অপরিচিত নয়। ভারতীয়



শিল্পী চিয়েন স্যুয়ান

প্রস্ফুট ও রূপকাচ্ছন্ন চিত্রপর্য্যায়ে যে সৌন্দর্য্যের অজস্র দান আছে—চীনও সে দানের সম্মুখীন হয়ে উপচিত হয়েছে—ব্যাহত হয়নি। চীনের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় বস্তুতন্ত্র সত্যবোধ তত্ত্বের একটা দিকের প্রতিফলন হয়েছে—চৈনিক সাধনায়। সে দিক থেকে প্রাচ্য আদর্শ সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে দীপশিখার মত যুগযুগান্তর থেকে জ্বল্‌ছে।

নবীন-'তারা'

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

'তারা বিড়ি'—(যার রেজিষ্টার্ড ট্রেড্‌মার্ক ছিল অতি-সজ্জিত এবং অতি-রঞ্জিত একটি নারীমূর্ত্তি) আজকালকার ধূমপায়ীদের নিকট পরিচিত নয়।

কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে শহরে 'তারা বিড়ি'র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তখন এই বিড়ির কারখানায় দৈনিক প্রায় এক শ লোক খাটিত এবং শহরের পথে-পথে বিচিত্র বেশধারী নর-নারী গলায় হারমোনিয়াম বাঁধিয়া নানারকম কাগজ বিলাইয়া ও গান গাহিয়া ফিরিত। বহু গণ্ডগ্রামে মুদী-দোকানের সৌখীন মালিকের গৃহদ্বারে এখনও উক্ত বিড়ির সুদৃশ্য ট্রেড্‌মার্কের ছবি আঠা দিয়া লাগানো আছে। সিন্দুর ও ধূলাবালির নীচে চাপা পড়িয়া এবং বয়সের দরুণ পটগুলি একটু জীর্ণ হইয়াছে বটে, তথাপি এককালে প্রসিদ্ধ বিড়ির ছাপ হিসাবে ঐ মূর্ত্তিটি সর্ব্বজনপরিচিত ছিল। এখনও হয়ত দুই-একজনের 'তারা বিড়ি'র নানারকম গান বা পদাবলীর দু-একটা চরণ মুখস্থ আছে। সত্য কথা বলিতে কি, গলির মোড়ে কোন-কোন দিন বাদ্য ও নৃত্যসম্বলিত 'তারা বিড়ি'র গান, যথা :

ওগো দেশের মানুষ, দেশের পয়সা বিদেশে দিও না,
একটি প্যাকেট্ 'তা-রা বিড়ি' কিন্‌তে ভুলো না ;

অথবা—

ওগো, 'তারা বিড়ি'র গুণের কথা
বলব কত আর,
সখি—বলব কত আর !

অথবা—

'তারা' নামের পরম সুবাস
গোপন মনে রয়,
'তারা বিড়ি' কিন্‌লে পরে
স্বদেশীও হয় ;

ইত্যাদি খুবই ভাল লাগিয়া যাইত এবং নানা ছলে বারান্দায় আসিয়া, এমন কি, সুযোগমত পথে নামিয়া যতক্ষণ শুনা যায় ততক্ষণ এই সমস্ত গান শুনিতাম।

এহেন সুপ্রসিদ্ধ 'তারা বিড়ি'র মালিক ছিল আমাদেরই পাশের গ্রামের নবীনকৃষ্ণ। অনেক সময় ইস্কুলের পথে যখন 'তারা বিড়ি'র গুণকীর্ত্তন শুনিতাম এবং রাস্তায় উৎসুক জনতা দেখিতাম, তখন সঙ্গীদের প্রতি নিরতিশয় কৃপা অনুভব করিতাম। নবীনকৃষ্ণ আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক, এমন কি পরিচিত। অথচ সঙ্গীরা তাহা জানে না এবং নবীনকৃষ্ণ তাহাদের কেহ নয়। একদিন আমাকে দেখিতে পাইয়া নবীনকৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিল, কি খোকাবাবু, আমাকে চিন্‌তে পারেন? ভাল আছেন?

নিরুদ্ধনিশ্বাসে আমি বলিলাম, তুমি, তুমি আমায় চিন্‌তে পার?

নবীনকৃষ্ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দলের একজনকে হাঁক দিয়া কহিল, ওরে ও রাধা, খোকাবাবু কি বলছে শোন্! আমি নাকি ওকে চিন্‌ব না!

ইহার চেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না বলিয়া সে বেদম হাসিতে লাগিল।

নবীনের ডাকে যে বাহির হইয়া আসিল, সে আমার আরও বেশী চেনা। রাধাশ্যাম আমাদেরই গ্রামের লোক। রাধাশ্যাম বলিল যে তাহারা অনেকেই আজকাল শহরে আছে; নবীনের কারখানায় কাজকর্ম্ম করে, একদিন আমাদের বাসায় আসিয়া বাবাকে 'পেন্নাম' করিয়া যাইবে, ইত্যাদি।

অন্য পথে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে নবীনকৃষ্ণ আমাকে একটা দোকানে লইয়া গেল। দোকানী নবীনকে দেখিতে পাইয়া সসম্মানে বলিয়া উঠিল, নবীনবাবু যে! বসুন, বসুন! আপনি নিজেই বেরিয়েছেন বুঝি আজ?

নবীনকৃষ্ণ বলিল, আর সে-কথা বলবেন না মশাই। কে আবার একটা নূতন লোক এক বিড়ি বার করেছে; বাজারে জোর প্রচার চালাচ্ছে;—বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেপালী সুপা প্রস্তুত। বলি শালা, নেপালী সুখা কোন দিন চোকে দেখেছিস? শালা জোচ্চোর বলে যে জেল খেটে এসেছে। যত সব সিঁদেল চোরের দল বুঝি তোর জন্যে নেপাল থেকে সুখা এনে দিয়েছিল! যত সব···গালি দিয়াই নবীনকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া গেল। আমার উপস্থিতির জন্যই হোক্ বা বাজারে তাহার সম্ভ্রম ছিল বলিয়াই হোক্—সে রীতিমত লজ্জা পাইয়াছিল। তার মুখের সেই অপরাধী চেহারা আজও মনে পড়ে।

তারপর দুই পকেট ভর্ত্তি লেবেনচুস উপহার দিয়া সেই দিন নবীনকৃষ্ণ আমাকে ইস্কুলের গেট্ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়াছিল। সেই দিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, শহরের ব্যবসায়ী মহলে নবীনকৃষ্ণ নিতান্ত নগণ্য নয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, দোকানী তাহার নিকট হইতে কিছুতেই লেবেনচুষের দাম রাখে নাই; নবীনকৃষ্ণ অবশ্য অনেক সাধাসাধি করিয়াছিল।

মাস দু-এক পরে নাকি নূতন বিড়ি-কোম্পানী ফেল্ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই দিন নবীনকৃষ্ণ একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। প্রায় পাঁচ শত লোক যাত্রার দলের পোষাক পরিয়া অসংখ্য বাদ্যভাণ্ড, নিশান ও বিজ্ঞাপন লইয়া শহরের অনেক ছোট-বড় পথ দিয়া 'তারা বিড়িকি জয়!' বলিতে বলিতে বীরবিক্রমে চলিয়া গিয়াছিল আর কত বিড়ি যে বিনা-মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

এইবার নবীনকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। নবীনের পিতৃপুরুষেরা ঠিক কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহা আমি জানি না। তবে তার বাবার টাকাতে অত্যন্ত লোভ বলিয়া একটা অদ্ভুত দুর্নাম ছিল। নবীনকৃষ্ণের বাবা না-কি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কেন যে রীতিমত ভাল ছাত্র হইয়াও নবীনকৃষ্ণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা না দিয়া যাত্রার দলে গিয়া ভিড়িল—তাহা সে-ই মাত্র জানে। ভাল গান গাহিতে পারে এবং চমৎকার ছোট রাজপুত্রের পার্ট করিতে পারে বলিয়া তাহার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, দুই-তিনটি যাত্রার দলের মধ্যে তাহাকে লইয়া মনোমালিন্য এবং ঝগড়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ছেলেবেলায় আমরা শুনিতাম যে, নবীনকৃষ্ণ নাকি মাসে নগদ পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানা পায়—তদুপরি থাকা এবং খাওয়া তো আছেই।

যদিও আমার মনে হয় যে, ইহাতে নবীনকৃষ্ণের সুযশই হওয়া উচিত ছিল, তবু তাহার নিন্দা-কুৎসায় চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। নবীনকৃষ্ণের পক্ষে ভদ্রলোক হইবার অনেকগুলি উপায় থাকিতেও যে সে যাত্রার দলের 'ছোকরা' হইল, ইহাতে তাহার ছোট জাতের ছোট প্রবৃত্তিই নাকি প্রমাণিত হইল। আমরা শহরে চলিয়া আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে নবীন বাড়ী ফিরিল। যাত্রার দলের কথায় ওসব আর ভাল লাগে না বলিয়া সে নির্ব্বোধের মত হাসিত। তাহার বয়স তখন বিশ বছরের কম হইবে না। চমৎকার উঁচু গড়ন, ফর্সা রং, মাথায় বাবরি চুল, ভোজপুরী জুল্‌পি—তবু যে কেন তাহাকে সবাই এড়াইয়া চলিত বুঝিতাম না। নবীনকৃষ্ণের নিকট যাইতে, তাহার গান শুনিতে, তাহার সঙ্গে গল্প করিতে আমি সবিশেষ আগ্রহ অনুভব করিতাম। কিন্তু সুযোগ বড় একটা হইত না।

নবীনকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিবার পরে তাহার বাবা মারা গেল। নবীন যে-দিন শাদা থান কাপড় পরিয়া বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—সেদিন তাহার দুঃস্থ চেহারা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল।

তারপর তিন-চার বছর আর নবীনের কথা বড়-একটা শুনিতে না পাইয়া তাহাকে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হঠাৎ 'তারা বিড়ি'র বিজ্ঞাপনে তাহার নাম ও চেহারা দেখিতে পাইলাম।—পরের ঘটনা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কিন্তু সে যাহাই হোক্, 'তারা বিড়ি'র আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। তৎসত্ত্বেও টিঁকিয়া থাকিবার যা একটু সম্ভাবনা ছিল, তাহাও নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণে আর রহিল না। সদ্য জেল-ফেরৎ পূর্ব্ব প্রতিযোগীকে হটাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নূতন প্রতিযোগী ঈশ্বরপ্রসাদের 'ভাগ্যলক্ষ্মী'

বিড়ির আক্রমণে 'তারা বিড়ি'র সৌভাগ্যশশী পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িল। কথিত আছে যে, শ্রীমান ঈশ্বরপ্রসাদ পরীক্ষা ব্যাপারে বিফল-মনোরথ হইয়া বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল এবং অতি শীঘ্রই তাহার লক্ষ্মীলাভের আশা ফলবতী হইয়াছিল।

বিড়ির ব্যবসা ফেল্ পড়িবার পরে নবীনকৃষ্ণকে কয়েক বছরের জন্য আর শহরে দেখা গেল না। আমিও এই সময়ে তার প্রতি খানিকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। অকস্মাৎ একদিন শুনিলাম যে, 'নবীন-তারা অপেরা পার্টি' গীতাভিনয়ে দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে এবং পূজার সময় আমাদের পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে উক্ত দলের দুই পালা গান হইবে। নামটা দেখিয়া সন্দেহ হইল। মনে হইল যে শীঘ্রই নবীনকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। কারণ, নবীনকৃষ্ণের নবীন এবং 'তারা বিড়ি'র 'তারা' উভয়ে আসিয়া এই অপেরা পার্টিতে যুক্ত হইয়াছে।

সত্য সত্যই নবীনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বাবার নিকট হইতে যাত্রা দেখিতে যাইবার অনুমতি পাইলাম। বাস্তবিক পক্ষে নবীন-তারা দলের যশ না-হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। নূতন তরোয়াল, নূতন পোষাক, নূতন পালা, নবীনকৃষ্ণের একান্ত শ্রম ব্যর্থ হইবার নহে। সে-রকম চমৎকার অভিনয় জীবনে আর কখনও দেখি নাই। মনে হইল নবীনের জন্যই যেন বইখানা লেখা হইয়াছে। তার ভূমিকা ছিল একটি অদ্ভুত প্রেমিকের—যার চরিত্রের সহিত অভিনেতার চরিত্রের সাদৃশ্য ও সমবেদনা নিহিত ছিল। নবীনের প্রাণ-ঢালা অভিনয়ে চরিত্রটি একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গীতাভিনয়ের নাম ছিল—'নক্ষত্রবিলাস।' প্রথমত নামটাই একটু অসাধারণ। কিন্তু তার ঘটনাসংস্থান ও গল্প আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। আমার যতদূর মনে পড়ে তাহা এই রকম: এক দেশে একজন উদাসী প্রকৃতির ছেলে ছিল। তার নাম নবকান্ত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল, চেহারা সুন্দর। নবকান্তদের বাড়ীর পাশ দিয়া একটি ছোট নদী চলিয়া গিয়াছে। উদাসী ছেলেটি প্রায়ই তাহার তীরে বসিয়া থাকে—নৌকা চলাচল দেখে, মাঝিদের গান শোনে, নিজেও গান করে, দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শোনে আর স্বপ্ন দেখে। এইখানেই প্রথম অঙ্কের শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্কের সুরুতে—একদিন নবকান্ত প্রত্যহের মতই নদীর পাড়ে বসিয়া আছে: এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পান্‌সী নৌকা উজান বাহিয়া তাহার নিকট আসিল। তখন সন্ধ্যা হইতে আর বিশেষ বাকী নাই। নৌকার ছাদের উপর একটি মেয়ে বসিয়াছিল। নবকান্ত তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, ভালবাসিল। মেয়েটিও যখন নবকান্তের দিকে চাহিল, তখনই পানসীর ভিতর হইতে কে ডাকিল, নক্ষত্রা, ভিতরে আইস! নক্ষত্রা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। এক নাম ভিন্ন নবকান্ত মেয়েটির আর কোন পরিচয়ই জানিতে পারিল না। কিন্তু না জানিলেও তাহার কোনই সন্দেহ রহিল না যে, নক্ষত্রা একটি রাজকন্যা। তার রূপ-গুণের তুলনা নাই। তাহাকে ভিন্ন নবকান্ত পৃথিবীর আর কোন মেয়েকেই ভালবাসিতে পারিবে না। উদাসী নবকান্ত আরও উদাসী হইয়া গেল।

কিন্তু নবকান্ত যে-নক্ষত্রার জন্য এমন উদাসী হইল, সে নক্ষত্রাকেই যে সংবাদটা জানানো যায় না। কি তার ঠিকানা? কোথাকার নক্ষত্রা, কোথায় চলিয়া গেল, আর কোথাকার কে এক নবকান্ত একটা গণ্ডগ্রামে বসিয়া তাহাকে ভীষণ ভালবাসিল। এই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তী গল্পাংশ জমিয়া উঠিয়াছে।

নক্ষত্রাকে রাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া নায়ক ও নাট্যকার বইটিতে চিরাচরিত যাত্রার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। তবে বাস্তব ও কল্পনা, আধুনিক ও গতানুগতিক, নিয়ম ও ব্যতিক্রম এমনভাবে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত পদ্মা-মেঘনার মিলনের বাড়া আর কিছুই দাঁড়ায় নাই। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত একটা আপোস করিয়াছে মাত্র—মিলিত হইয়াও পৃথক ব্যক্তিসত্তা বজায় রাখিয়াছে।

ইহার পরের অংশগুলিতে দেখা যায় যে, নায়ক তাহার অগাধ প্রেমের কথা নায়িকাকে জানাইবার জন্য অথবা কোন ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তে পরস্পর মিলনের জন্য নানারূপ সম্ভব ও অসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। শেষের ঘটনাটা ঠিক মনে নাই। হয়ত নায়ক জীবনের শেষ অঙ্কে শ্রান্তক্লান্ত দেহে নায়িকার প্রাসাদদ্বারে আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল এবং বহু-বাঞ্ছিতাকে মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইবার নায়িকার কাঁদিবার পালা। মৃতব্যক্তির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু বোধ হয় সে খুব অশ্রুত্যাগ করিয়া চিকের আড়ালে অনেক অশ্রুত্যাগের কারণ হইয়াছিল।

আজিকার তুলনায় বা বিচারবুদ্ধিতে যাহাই মনে হোক্—সেই দিন নবীনকৃষ্ণের যাত্রাগান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং অপর্য্যাপ্ত কাঁদিয়াছিলাম। নবকান্তের মত আব্‌ছা রকমের প্রথম প্রেম আমাদের অনেকেরই হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মত আর কাহারও এমন ধরণের প্রথম প্রেম স্থায়ী হয় না—অথবা আর কাহারও প্রেমিকা এমন রাজকুমারী হয় না। হয় না বলিয়াই শুধু নবকান্তের কাহিনী লইয়াই যাত্রার পালাগান রচিত হয়, অন্যের প্রেম লইয়া তাহা হয় না।

'নবীন-তারা অপেরা পার্টি' কিছুকাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট সমাদৃত হইয়া বিলীন হইয়া গেল। তারপর—বহুদিন পরে, নবীনকৃষ্ণের সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তখন আমি একটা মফঃস্বল শহরে সবে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি।

সারাদিন খাটুনির পর বাসায় ফিরিতেছি, পিছন হইতে আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই একগাল হাসিয়া নবীনকৃষ্ণ কহিল, নমস্কার খোকাবাবু! তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। অর্থাভাব অথবা যাত্রার দলের চরম অনিয়ম তাহার সর্ব্বাঙ্গে অকাল বার্দ্ধক্য আনিয়াছে।

ইস্, চেহারা যে তোমার বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে নবীন।

আমার কথা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনভাবে নবীনকৃষ্ণ বলিল, যাত্রার দল ভেঙে দিইছি বাবু

কেন রে? টাকার অভাব হচ্ছিল বুঝি?

তা নয়। টাকা পাচ্ছিলাম খুবই। নক্ষত্রার পার্ট যে করত, সে-ই দল ছেড়ে চলে গেল। আর লোকই পেলাম না!

অনেকদিন পূর্ব্বে 'নক্ষত্রাবিলাস' দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িল। নবীন বলিল, আপনার মনে আছে! বড়ই খুশী হলাম বাবু।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার খুব ভাল লেগেছিল যে নবীন, তাই ভুলিনি।

নবীন কোন কথা না বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। শীতের পড়ন্ত বেলা—সূর্য্যের শেষ স্বর্ণালোক গিয়া একটা বাড়ীর সম্মুখস্থ লনের উপর পড়িয়াছে—কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে সুন্দর রঙীণ উলের জামা গায়ে খেলা করিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় আছ—এখানে?

নবীন বলিল, কিছু দিন হ'ল একটা হোটেল খুলেছি। বেশ চলছে—চকবাজারে একটা ব্রাঞ্চ খুলব ভাবছি।

নাম দিয়েছ কি হোটেলের?

তারা বোর্ডিং।

একটু চমকিয়া উঠিলাম। কতক্ষণ বাদে প্রশ্ন করিলাম, তোমার শরীর খারাপ হ'ল কেন?

নবীনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল, বলতে পারিনে। শরীর হচ্ছে নদীর জোয়ার-ভাটার মত। ইচ্ছে হ'লে আবার জোয়ার আসতে পারে।

তাহলে শরীরটা ভাল করছ না কেন?

দরকার নেই ব'লে। আজ আসি খোকাবাবু। আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্যে যেতে হ'বে একবার। খুব দরকারী।

যে-কোন সময় সে আসিতে পারে এবং তাহার জন্য উৎসুক রহিলাম জানাইয়া পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* * * *

কেন জানি-না 'তারা বোর্ডিং' নামটা মনে লাগিয়া রহিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া 'তারা' নামটি চৈতন্যস্রোতে আঘাত করিতে লাগিল।

যতদূর জানিতাম এবং কৌতূহল হইবার পরে যতদূর খোঁজ লইতে পারিলাম, তাহাতে নবীনকৃষ্ণের 'তারা'র প্রতি এই পক্ষপাতের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাইলাম না। তাহার মা-বোন্ প্রভৃতি কাহারও নাম 'তারা' ছিল না। তা ছাড়া, নবীনকৃষ্ণেরা পুরুষানুক্রমে পরম বৈষ্ণব, তারা বা কালীর প্রতি তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা বিশেষ আছে বলিয়া কেহ বলিল না। অথচ 'তারা বিড়ি', 'নবীন-তারা অপেরা পার্টি,' 'তারা বোর্ডিং' প্রভৃতি পর-পর সবগুলি নামেই 'তারা' আছে। নবীনকৃষ্ণের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য এবং প্রেরণাশক্তি এই 'তারা' নামটি। কে এই তারা? অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, বিড়ির ব্যবসার প্রারম্ভে সে নিতান্তই খেয়ালবশে 'তারা বিড়ি' নামটা পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু প্রথম দিকে ব্যবসা খুব জাঁকিয়া উঠিলেও শেষে বিড়ির কারবার ফেল্ পড়িয়াছিল। তবু তার ব্যবসায়ী-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় যে যাত্রার দল, তাহাতেও ঐ নামটিই রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাত্রার দলও কিছুদিন পরে ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিকার এই বাণিজ্যপ্রচেষ্টাতেও এই 'তারা' কথাটিই বিদ্যমান! কে এই তারা?—অথবা এই বিশেষ নামটির প্রতি নবীনকৃষ্ণের এত অনুরাগ কেন?

ভাবিয়া কিছুই ঠিক পাইতেছি না, এমন সময় ফাল্গুনের এক অপরাহ্নে নবীনকৃষ্ণ আসিল। তাহার চেহারা এইবারে আরও খারাপ দেখাইল।

আজ নবীন একটু বিশ্রাম করিয়া নিজেই বলিল, আমার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়ছে। এখানে আর থাকব না।

কোথায় থাকবে?

তীর্থে যাব খোকাবাবু।

সে তো খুব ভাল কথা নবীন। চকবাজারে হোটেল খুলেছ?

হাঁ। কিন্তু আজকাল দেখ্‌ছি মূলধনে টান্ পড়ছে।

সে কি! হোটেল না খুব চলছে…

চলেছিল। কিন্তু নিজে দেখতে না-পারায় কেবল লুট—আর রাহাজানি চলছে। এরই মধ্যে পুঁজিতে ধাক্কা লেগেছে।

তা ব্যবসা করতে গেলে প্রথম থেকেই লাভ না-হ'তে পারে। কয়েকদিন সবুর কর, ব্যবসা জেঁকে উঠবে।

না। ব্যবসা আমি জানি খোকাবাবু। এক দিন ব্যবসা আমি নিজে করেছি। আজকের এটা ব্যবসা নয়।

কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। ঘরের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিল, তা ছাড়া নবীনের কথাগুলির পিঠে নূতন কথা বলিবার স্থান ছিল না। কতক্ষণ পরে হঠাৎ খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করিলাম, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নামের উপর বিশ্বাস আছে তোমার?

অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া নবীনকৃষ্ণ বলিল, কি বল্‌লেন?

বলছি যে আমায় মনে হয়, তোমার ঐ 'তারা' নামটিতে লক্ষ্মী নেই।

নবীন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ক'রে জানলেন?

আমার মনে হয়…

তা হোক্!

তবে?

তবে নেই কিছু। ব্যবসা ঐ নামেরই। নইলে আমি আবার করব ব্যবসা? ঐ নামটাই সব! নইলে- ঐ যে কথায় বলে যে, আর রাঙ্গো বামুন নেই…

আমি আশান্বিত হইলাম। তারা নামের রহস্যোদ্‌ঘাটনের অভিপ্রায়ে একটা 'অতিরিক্ত-প্রশ্ন' করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় নবীনকৃষ্ণ বলিল, আমি কি জন্যে এসেছি জানেন খোকাবাবু? আমি একটা স্কুল করব—মেয়েদের স্কুল।

স্কুল! কোথায়?

আমাদের গাঁয়ে।

গাঁয়ে কি মেয়েদের স্কুল চল্‌বে নবীনদা'?—এই সর্ব্বপ্রথম তাহাকে 'দাদা' সম্বোধন করিলাম।

চালাবার দায়িত্ব আপনার। আমি শুধু টাকা দিয়েই খালাস। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন, গাঁয়ের মধ্যে মানসম্ভ্রমও আছে। আমি কিছুই শেষ করতে পারিনে—ক্ষমতা নেই।

কত টাকা দিতে পারবে তুমি?

কত টাকা লাগবে?

ধর, দশ হাজার!

দশ হাজারে হ'বে?

হ'বে। দিতে পারবে অত টাকা?—তা তুমি যদি অর্দ্ধেকটা দিতে পার, তবে···

অত হাঙ্গামে কাজ নেই। সবটা টাকাই আমি দিব। দশ হাজার টাকাই আমার আছে। চাঁদা করলেই গোল বাধবে, দলাদলি হ'বে। বহুকর্ত্তা হ'লে গোলযোগের অন্ত থাকে না।

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নবীন বলিতে লাগিল, আমার শুধু একটিমাত্র সর্ত্ত আছে। স্কুলের নাম হ'বে: তারা বিদ্যাপীঠ বা বিদ্যালয়। মোট কথা, 'তারা' নামটি থাকা চাই। তা ছাড়া, আর সব আপনার ইচ্ছেমত—আমার কিছু বলবার নেই। ···আমি শীগগিরই বেরিয়ে পড়তে চাই। যা লেখাপড়া করা দরকার, মুসাবিদা ক'রে ফেলুন। আপনি উকিল হ'য়ে ভালই হয়েছে খোকাবাবু। ···কাল আবার আমি আসব।

*   *   *   *

নবীনকৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরে তাহার কথা অনেকবার মনে হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ অবধি নবীনের জীবনে এই 'তারা'। নবীনকৃষ্ণ যে নবকান্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এই তারাটি কে?

নিতান্ত অনাবশ্যক প্রশ্ন। তবু কৌতূহল হয়।

—

অভিনব ডাক্তারী

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

নাটিকা

বীরেন্দ্রনাথ মুখাজ্জীর পড়িবার ঘর। টেবিলের উপর টেলিফোন। একখানি চিঠি লিখিয়া ব্লট করিল। খামে ঠিকানা লিখিল। চিঠি পুরিয়া খাম বন্ধ করিল ও টিকিট আঁটিল। পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া পায়চারী করিতে করিতে—

বী। এই ত রামপুরহাটের জমিদার নরোত্তমবাবুকে লিখে দিলাম যে শিকারে যাব। মাত্র হপ্তাখানেক বই ত নয়। আর শিকারের লোভ ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে আমাদের মত লোকেদের। কিন্তু অণিমা শুনলে একেবারে অনর্থ করবে। কে জানে কেন, শিকারের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। মেয়েরা যে এতটা স্বার্থপর তা আগে জানতুম না। আমরা একটু স্ফূর্ত্তি করবো তা তাদের সহ্য হবে না। যাবার কথা বললেও চটবে, না বললেও অন্যায় হবে। কি করা যায়?

(ভিতর হইতে বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী অণিমা—"ওগো,—)

বী। ঐ আসছে। To tell or not to tell—that is the question. না—বলব না, অমি নেমন্তন্ন ব'লে সরে পড়ব।

অ। (নেপথ্যে)—ওগো তুমি কোথায়?

বী। (চেঁচিয়ে) এই যে পড়বার ঘরে। (আস্তে) না বলাই ভাল। জানতে পারলেই মিছিমিছি একটা রাগারাগি—

অ। (হাতে একটা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকে) সাড়া দাও না কেন? তোমায় সমস্ত বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বী। আমি ত সমস্তক্ষণ এই ঘরেই ছিলুম।

অ। দেখ—আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু ইলার চিঠি এসেছে। তার জন্মোৎসবে ওরা একটা প্লে করবে। আমাকে তাই বিশেষ ক'রে যেতে লিখেছে। আসছে সপ্তাহে যেতে হবে।

বী। আসছে সপ্তাহে?

অ। হ্যাঁ। রোববারে যাওয়া যাবে। তোমাকেও যেতে অনেক ক'রে লিখেছে, হপ্তাখানেক ওখানে থাকব। কি বল বেশ মজা হবে না?

বী। কিন্তু—আসছে সপ্তাহে—

অ। কি?

বী। মানে—বুঝলে কি না—

অ। না—

বী। এত তাড়াতাড়ি ক'রে কি কোথাও যাওয়া যায়। আজ হ'ল বৃহস্পতিবার—

অ। তাতে কি?

বী। এর মধ্যে সব গোছগাছ করা—

অ। সে তো আমি করবো।

বী। দেখ, কি বলছিলুম—মানে আমার আর সপ্তাহে যাওয়া ঠিক সুবিধা হবে না।

অ। কেন হবে না শুনি?

বী। অর্থাৎ—আমি তোমার প্লে করাটা—কি বলে, ঠিক পছন্দ করি না।

অ। প্লে পছন্দ কর' না? যখনই আমরা কোলকাতায় যাই, থিয়েটার দেখে আসি না?

বী। নিশ্চয়। থিয়েটার দেখাটা তো অপছন্দ করি না—করি তোমার থিয়েটার করাটা। আর কোলকাতায় গিয়ে থিয়েটার দেখি, একটু আনন্দ করবার জন্য।

অ। নিশ্চয়। আমরাও তো প্লে করব, একটু আনন্দ করবার জন্যে।

বী। যাই হোক—মোটের উপর আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না।

অ। পারে না মানে?

বী। মানে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমি আর এক জায়গায় যাব কথা দিয়েছি।

অ। বটে? কোথায়, কবে কথা দিয়েছ?

বী। নরোত্তমবাবুর ওখানে আমার হপ্তাখানেকের জন্যে নেমন্তন্ন।

অ। ওঃ রামপুরহাটে—শিকার-টিকার হবে নিশ্চয়?

বী। মানে—তোমায় আর কি বলব বল'। একটু আধটু অবশ্য হ'তেওপারে--তবে বুঝলে কিনা,আমিবেশীদিনথাকব না।

অ। দেখি চিঠি।

বী। এই যে। (নিজের লেখা চিঠি দিল—যেটা এতক্ষণ হাতে ছিল।)

অ। (ঠিকানা দেখে) Narottam Sinha, Esq. হুঁ। তাঁর চিঠির জবাব বুঝি।

বী। (তাড়াতাড়ি হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে) না, না—ওটা আর একটা—

অ। দেখি—দাও চিঠিটা। কি লিখেছ দেখি।

বী। সে কি হয়। পাগল। টিকিট মারা, খাম আঁটা হয়ে গেছে। এখন খাম খুললে মিছিমিছি একটা টিকিট নষ্ট হবে। (চিঠি বন্ধ করে রাখলে)

অ। নরোত্তমবাবুর চিঠি কোথায়?

বী। এই যে টেবিলের ওপর—

অ। কই। টেবিলে তো কোন চিঠি দেখছি না—

বী। ওঃ! ঠিক হয়েছে। ছিঁড়ে waste paper basket-এ ফেলে দিয়েছি।

অ। (waste paper basket দেখে) কই, এতে তো কোন কাগজই নেই।

বী। হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার মনে পড়েছে। যে জামার পকেটে ছিল সেটা কাল ধোপার বাড়ী চলে গেছে।

অ। ও সব আমি বুঝি--চিঠি দেখাও।

বী। হ্যাঁগা, তোমার স্বামীর কথার উপর কি কোন বিশ্বাস নেই।

অ। এতগুলো নির্জ্জলা মিথ্যের পরও বিশ্বাস করতে বল! চিঠি বের কর।

বী। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিঠি দিয়ে) বেশ পড়।

অ। (চেয়ারে বসে চিঠি পড়ে) হুঁ হুঁ। "So come along old man"—old man বটে!

বী। মানে নরোত্তম আমার class-friend ছিল কি না

অ। "খুব স্ফূর্ত্তি হবে—হপ্তাখানেক একসঙ্গে হৈ-হৈ করা যাবে— হপ্তাখানেক।"

বী। না, এই সামনের সোমবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত।

অ। তুমি যাওয়াটা ঠিক ক'রে ফেলেছ বোধ হয়?

বী। না না, কি যে বল। তোমায় না জিজ্ঞেস ক'রে কি করতে পারি। এতদিন তোমায় ছেড়ে আমি থাকবই বা কি ক'রে। আমি চিঠিতে লিখে দিচ্ছি শুক্রবার নাগাদ আমার নিশ্চয়ই ফেরা চাই।

অ। কোন দরকার নেই। আমি রোববারের আগে ফিরছি না।

বী। মানে?

অ। শুক্রবারে আমাদের প্লে। শনিবারে পার্টি।

বী। কোথায়?

অ। ইলাদের ওখানে।

বী। য়্যাঁ। তুমি কি একলাই চলে যাবে নাকি?

অ। তুমিও তো একলাই যাচ্ছ।

বী। সে অন্য কথা। শিকারে তো আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

অ। ও!

বী। আর তুমি ঘর-সংসার ফেলে এখন কোথায় যাবে?

অ। I see.

বী। দেখ, তোমার বোঝা উচিত যে, যখন আমি প্রে করা ভালবাসি নে তখন তোমার এ সব না করাই ভাল। তার ওপর আমি থাকব না সেখানে—না না, তোমার যাওয়া হতে পারে না। বুঝেছ?

অ। বিলক্ষণ বুঝেছি।

বাহিরে calling bell-এর ধ্বনি

অ। তাই ত এখন কে এল?

বী। কিছু তো বুঝতে পারছি না।

অ। আবার আর একটা শিকারের নেমন্তন্ন হয় তো।

বী! কে জানে—

(নেপথ্যে ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ সেন—'দুটো suit case, একটা trunk, একটা bedding, দুটো লাঠি, একটা ছাতা —হ্যাঁ ঠিক আছে—')

অ। সুধীন ঠাকুরপোর গলা না?

বী। তাই ত মনে হচ্ছে। দেখি—(বাহিরে গেল)

অ। যাক্, সুধীন ঠাকুরপো এসে পৌঁচেছে। ওকে লেখা ছাড়া, আর কোন উপায়ই ছিল না। রোজ রোজ ওঁর শিকারে যাওয়া নিয়ে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

বী। (সুধীনকে টানতে টানতে) আরে এস ডাক্তার। তার পর, সব ভাল তো?

অ। এই যে ঠাকুরপো—হঠাৎ যে? এবার কিন্তু ভাই, তোমায় কিছুদিন এখানে থাকতে হবে—কোন রকম ওজর আপত্তি শুনব না। একেবারে তো বলতে গেলে ভুলেই গিছলে।

সু। আরে—তোমাদের কি ভুলতে পারি। তবে কাজ কর্ম্মের যা চাপ, মোটেই সময় ক'রে উঠতে পারি না।

বী। ওগো ডাক্তারের জিনিস-পত্তর ওর ঘরে তুলে দিতে বল, আর ঘরটা সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে এস।

অ। সব ঠিক আছে। তুমি গিয়ে চাকরদের বল না সব গুছিয়ে দিতে— (টেলিফোন আসার শব্দ)

(বীরেন্দ্র টেলিফোন ধরতে গেল, সেই সুযোগে অণিমা চুপিচুপি)

অ। ওঁকে কিছু বোলো না যেন—

সু। না না, ক্ষেপেছ নাকি?

(টেলিফোনে কথা চলছিল, এখন শেষ হল)

বী। ওগো, এবার ডাক্তারের ঘরটা ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে এসো।

অ। এই যে যাচ্ছি—

(সুধীনের দিকে চুপ ক'রে থাকবার ইসারা ক'রে প্রস্থান)

সু। Now, young man, এ সবের অর্থ কি?

বী। দেখ সুধীন, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজকের নয়। You are an old and valued friend.

সু। থাম বাবা। এ রকম সূচনার পরিণতি হচ্ছে হয় টাকা ধার করবার, না হয় কোন দোষ স্খালনের চেষ্টা, কোন্‌টা বল ত চাঁদ।

বী। For heavens sake don't joke. ব্যাপারটা খুবই serious.

সু। Serious যে নয়, তা তো একবারও বলিনি।

বী। আমার ধার চাই নে, তাও তুমি জান।

সু। বেশ।

বী। আর আমি কোনরূপ গর্হিত কাজ করতে পারি নে, এও বিশ্বাস কর'।

সু। বটে!

বী। আবার ঠাট্টা! আমাকে তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

সু। বিলক্ষণ হচ্ছে—

বী। কারণ?

সু। কারণ তোমার এই চিঠি। (পকেট হইতে একটি চিঠি বার করলে। পড়তে গিয়ে তাড়াতাড়ি আবার মুড়ে পকেটে রেখে আর একটা পকেট থেকে আর একটা চিঠি বার করলে)

"ভাই সুধীন, আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবেই। তুমি আমার নিরাশা করবে না জানি। You are such an old and valued friend. অণিমার মত ভাল মেয়ে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে আমাদের ঠিক মনের মিল নেই। তুমি ভাই দয়া করে এসে তোমার বৌদিকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বোলো যে, আমার ব্যবহারের মধ্যে সত্যি ক'রে খারাপ কিছু নেই। এর মানে কি? কি করেছ শুনি?

বী। সমস্তটা আগে পড়—

সু। (পড়িতে লাগিল) "এখানে এলে আমি সংক্ষেপে তোমায় সবটা বুঝিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই সাংসারিক অশান্তিটা তুমি নিশ্চয়ই মিটিয়ে দিতে পারবে। তোমার আশায় রইলুম। ইতি—তোমার বন্ধু বীরেন্দ্র।"

এখন আমার বন্ধু বীরেন্দ্র, ব্যাপারটা কি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল ত?

বী। দেখ ভাই, আমার শিকারের একটা ভয়ানক বাতিক আছে জানই—বলতে গেলে, ঐ আমার একমাত্র নেশা। জান তো শিকার করতে গেলে অনেক সময় একটানে দু-তিন দিন বাইরে থাকতে হয়?

সু। হুঁ।

বী। কিন্তু অণিমা সেটা মোটেই পছন্দ করে না। ওর ইচ্ছে নয়, আমি কোথাও যাই।

সু। ওঃ।

বী। শিকারে যাবার নাম করলেই এমন গোলমাল, মনোমালিন্য ক'রে তোলে যে, আমি একেবারে মুস্কিলে পড়ে যাই। সে বলে যে আমি নাকি তাকে ভালবাসি না, দূরে থাকতে চাই—ইত্যাদি। Ridiculous নয় কি।

সু। Ridiculous তো বটেই। তার চেয়েও যদি কিছু stronger term থাকে তো তাই। স্ত্রী স্বামীকে কাছে রাখতে চাইছে—

বী। না না, আমি তা বলছি নে। আমার কথা হচ্ছে এই যে, দু-চার দিন এমন বাইরে শিকারে গেলে fuss করাটা অন্যায়।

সু। নিশ্চয় অন্যায়—একশো বার অন্যায়।

বী। বলে যে, লেগে-টেগে যাবে তখন মুস্কিলে পড়তে হবে—

সু। Foolish. এতে আবার মুস্কিলের কি আছে?

বী। মানে?

সু। লাগবে তো কি! হয় হাসপাতালে যাবে, না হয় স্বর্গে যাবে।

বী। ঠাট্টা নয়। তুমি তো ডাক্তার। ওকে বোলো —হজমের জন্যে আমার শিকারের বিশেষ প্রয়োজন। নইলে শরীর খারাপ হবে।

সু। হজমের জন্যে তোমার সকাল বিকেল বেড়াতে advice দিতে পারি, কিন্তু শিকার ছাড়া উপায় নেই, একথা ডাক্তার হয়ে কি ক'রে বলি?

বী। বেশ—তা না বলতে পার, তবে এই বোলো যে, আমায় বড্ড লেখাপড়া করতে হয়, over-work হয়ে যায়। Brainটাকে সুস্থ রাখতে গেলে মধ্যে মধ্যে শিকার অপরিহার্য্য।

সু। তা হলে তো brain নামক একটি পদার্থ আছে ধরে নিতে হয়। বৌদি কি তা স্বীকার করতে রাজী হবে?

বী। স্বামীকে বুদ্ধিমান বললে স্ত্রীরা বরং খুশীই হয়।

সু। ওঃ। তা হবে।

বী। মোট কথা একটা কিছু বলে আমার শিকারে যাবার পথটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। বুঝলে?

সু। Perfectly. সে আমি যা হয় একটা বলব'খন।

বী। আমি এবার গিয়ে অণিমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(দরজার কাছে গেল)

সু। Just one question.

বী। কি?

সু। বৌদির কোন সখ-টখ নেই?

বী। সখ—কই না। কিছু মনে পড়ছে না তো।

সু। গান, বাজনা, নভেল—

বী। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে। রোমান্টিক নভেল পড়বার, আর প্লে করবার—

সু। প্লে—অভিনয়?

বী। হ্যাঁ। ভয়ানক সখ। কিন্তু আমি ওর প্লে করা দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

সু। I see, বেশ—send in the patient.

(বীরেনের প্রস্থান)

সু। এই রকম কেস মন্দ নয়। Interesting অথচ মোটেই dangerous নয়। কিন্তু এই ব্যাধি সারাবার ওষুধ তো জানা নেই—দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। (অণিমা ঢুকল)

অ। (সলজ্জ ভাবে) ঠাকুরপো, তুমি কিছু মনে কর'নি তো?

সু। করেছি বইকি। এই চিঠির অর্থ কি? (ভুলে বীরেনের চিঠি বার করে পড়তে গিয়ে পকেটে রেখে আর একটা চিঠি বার ক'রলে—পড়লে) "ভাই ঠাকুরপো, তুমি

ওঁর এবং আমার অতি আপনার লোক। সেবারে অসুখের সময় তুমি যে কি ক'রে আমায় বাঁচিয়েছিলে তা জীবনে ভোলবার নয়। তোমাকে ভাই, আর একবার আমায় বাঁচাতে হবে। একটা খুব গোপনীয় কথা বলছি—আশা করি কাউকে বলবে না। আমাদের বিবাহিত জীবন বাইরে থেকে যে রকম মনে হয়—সত্যি ক'রে তা নয়। আমাদের সুখের পথে একটা কাঁটা পড়েছে, তুমি ছাড়া এ কাঁটা আর কেউ দূর করতে পারবে না। দয়া ক'রে নিশ্চয়ই এসো। ইতি

তোমার বৌদি অণিমা।"

ভঁ। তারপর, আমার বৌদি অণিমা, কি করতে হবে—বল তো?

অ। তোমার বন্ধু প্রায়ই শিকার করতে যায়। একটানে দু-তিন দিন বাইরে থাকে। এসব আমি পছন্দ করি নে। তোমাকে কোন অছিলায় এটা বন্ধ করতে হবে।

সু। ওঃ।

অ। যখন তখন শিকারে যাওয়াটা আমাকে তাচ্ছিল্য, অপমান করারই সামিল।

সু। বটেই তো।

অ। তুমি হ'লে তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে এরকম ভাবে শিকারে যেতে পারতে?

সু। স্ত্রী তো কখনও হয়নি—কি ক'রে বলব বল?

অ। ভাব' হয়েছে—তখন কি পারতে?

সু। না, তা কিছুতেই পারতুম না। আমি হ'লে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসে 'কালিদাস পড়তুম।

অ। দূর—আমি কি তাই বলছি—সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ফিরে এলেই আমি সন্তুষ্ট। তা উনি মোটে গ্রাহ্যই করেন না।

সু। ছিঃ ছিঃ। এ তো বীরুর ভারী অন্যায়।

অ। তার ওপর আমি একটু বন্ধুদের সঙ্গে মিলে প্লে করি, তা উনি সহ্য করতে পারেন না।

সু। Idiot. ওর লজ্জা হওয়া উচিত। তবে আমার মনে হয় ও তোমায় চোখের আড়াল করতে পারে না।

অ। (সলজ্জভাবে) যাও—কি যে বল।

সু। তোমার সঙ্গে আর কেউ কথা বলছে দেখলে ওর হিংসে হয়। To have a charming wife is dangerous.

অ। অথচ ওঁর শিকারের বেলা আমায় ফেলে দিব্যি চলে যান।

সু। Utter selfishness.

অ। তুমিই বল ঠাকুরপো, এখন কি করা যায়?

সু। তাই তো—এখন কি করা যায়?

অ। তুমি একটা উপায় ঠিক করো না।

সু। অনেক রকম উপায়ই তো মাথার মধ্যে কিলবিল করছে। কিন্তু কোন্‌টা কাজে লাগবে ভেবে পাচ্ছি নে।

অ। তুমি নভেল পড় না—না?

সু। বহুদিন পড়িনি। সময় পাই নে।

অ। ধর—যদি ওকে একটু—মানে—কি বলে—jealous ক'রে দেওয়া যায়।

সু। Jealous? কি জন্যে।

অ। তোমার তো শুনেছি ঠাকুরপো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, এটা আর বুঝতে পারলে না?

সু। দুষ্ট লোকেরা নানান্ কথা বলে। ওসব কথা বিশ্বাস কোরো না। জিনিষটা আমায় বুঝিয়ে বল—কি করতে হবে।

অ। ওঁর মনে এই ধারণাটা যদি করিয়ে দেওয়া যায় যে—

সু। কি?

অ। নাঃ—তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

সু। না না হবে। একটু পরিষ্কার ক'রে বল।

অ। মানে—অবশ্য সবই মিথ্যে—বুঝলে কি না?

সু। সে তো বটেই।

অ। (সলজ্জভাবে) ধর—ওর যদি এই বিশ্বাস মনে হয় যে, আমাকে কোন একজন লোক একটু ইয়ে করে—

সু। তা'হলে ও শিকারে না গিয়ে, বন্দুক হাতে তার বাড়ী যাবে।

অ। না না—তা কেন। তাহলে উনি যখন তখন আমাকে একলা ফেলে যেতে পারবেন না।

সু। হুঁ। এ প্ল্যানটা মন্দ নয়। তবে—

অ। তবে আবার কি?

সু। আমার কথা শুনলে হয়। ওর এত শিকারে যাবার পিছনে একটা ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে।

অ। ইতিহাস—কি শুনি?

সু। দু'টো হৃদয়কে মিলিত করাতে একটা আনন্দ আছে তৃপ্তি আছে। কিন্তু এমনও অনেক সময় হয় যে, মিলন অসম্ভব।

অ। (বিস্মিত ভাবে) কি বলছ ?

সু। (উঠিয়া পায়চারী করিতে করিতে) না না—সে তোমায় বলা অসম্ভব।

অ। না ঠাকুরপো, আমায় বলতেই হবে।

সু। ভয়ানক কষ্ট পাবে।

অ। তবুও আমি শুনব।

সু। তুমি কি বৌদি এখনও বুঝতে পারনি এরকম dangerous sports-এ মাতবার গূঢ় কারণ কি ?

অ। গূঢ় কারণ ?

সু। গূঢ় এবং সত্যিকারের কারণ। আমার মনে হচ্ছে তোমায় সবটা জানালেই হয়ত সুফল হবে।

অ। (ভীতস্বরে) ব্যাপারটা কি ঠাকুরপো ? শীঘ্র বল।

সু। বেচারা বীরুর কোনো দোষ নেই।

অ। বল, থেম' না।

সু। তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে সে একজনকে ভালবাসত।

অ। সত্যি ঠাকুরপো ?

সু। হ্যাঁ। ওর ওপর অবিচার কোরো না।

অ। উঃ নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—

সু। আহা—বিয়ের আগে। পরে নয়। এমনও অনেক স্থলে হয় যে বিয়ের পর অন্য কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়। নভেলে পড়ো নি ?

অ। কিন্তু—এর সঙ্গে শিকারের কি সম্বন্ধ ?

সু। সেই মেয়েটী শিকার দু'চক্ষে দেখতে পারত না। বীরু শিকারে যেত বলে রাগারাগী করত। ওর সঙ্গে ঐ শিকার নিয়েই মনোমালিন্য হয়ে যায়—একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই থেকে এ বাতিকটা আরও বেড়ে যায়। Spiteful revenge—বুঝলে কি না ?

অ। তারপর ?

সু। সে মেয়েটা এখনও ওকে ভালবাসে, কিন্তু বীরু তাকে রাখতে চায় দূরে। He is honourable and faithful, তাই ও যা ভালবাসে না সেইটা ও বেশী কোরে করে to avoid her.

অ। সত্যি ?

সু। হুঁ। শিকার ওর বন্ধ করলে তার ফল যে শুভ হবে এমন তো মনে হয় না।

অ। না না।

সু। আমার মনে হয়, ওকে মধ্যে মধ্যে শিকারে যেতে দেওয়া ভাল। তাতে ওর মনটা ভাল থাকবে।

অ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি এবার থেকে ওঁকে জোর ক'রে শিকারে পাঠাব।

চাকর। (নেপথ্যে) মা !

অ। কি রে ?

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। মাছটার কি হবে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে ?

অ। তুই যা—আমি যাচ্ছি— (চাকরের প্রস্থান

অ। একটু বস ঠাকুরপো, আমি এখুনি আসছি।

প্রস্থান

সু। এই অবধি তো বেশ চলছে। শেষ অবধি কি রকম দাঁড়াবে বলা শক্ত। নভেল পড়ে পড়ে বৌদির মাথা বিগড়ে গেছে। বলে কি না বীরুকে বলতে—ওর একজন প্রেমিক আছে—যাক্, আমিও বলে দি—পরে যাহোক্ একটা করা যাবে।

(বীরেন্দ্রর প্রবেশ)

সু। এই যে, তোমায় এখুনি ডেকে পাঠাব মনে করছিলুম—এসে পড়েছ ভালই হয়েছে।

বী। সেটা পেড়েছ।

সু। একটা খুব বড় problem rise করেছে।

বী। কি ?

সু। তোমায় বলা উচিত কি না ভাবছি। বৌদি কাউকে বলতে বারণ করেছে।

বী। আমাকে বলতে দোষ কি ? She can hav[e] no secret from me.

সু। বিয়ের পর থেকে। কিন্তু এটা বিয়ের আগেকা[র] কথা।

বী। কি শুনি ?

সু। You must not misjudge her.

বী। না, না, তুমি বল।

সু। বিয়ের আগে ওর সঙ্গে আর একজনের বিয়ের স[...]

ঠিকঠাক হয়। সেবার ও আই-এ দেবে। কলেজের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে মেয়েরা সব একটা প্লে করে। বৌদিও নেমেছিল এবং খুব ভাল অভিনয় করেছিল। সেই নিয়ে সেই ছেলেটির সঙ্গে মন-কষাকষি হয়। সে বলে, ভবিষ্যতে কোনও প্লে করতে পাবে না। বৌদি জান তো ভারী independent type-এর—বললে "বিয়ে করার আগে কোন কন্‌ট্রাক্ট করতে রাজী নই।" বিয়ে ভেঙ্গে গেল—

বী। তার পর ?

সু। তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ে। সে লোকটা এখনও ওর জন্যে পাগল but she hates him. সেইটে দেখাবার জন্যে ও যখন তখন প্লে করতে চায়।

বী। বটে !

সু। আমার মনে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ওকে প্লে করতে দেওয়া ভাল। আর এ তো একেবারে selected party-র মধ্যে। সুতরাং, I don't think you should object.

বী। না না—পাগল !

সু। এতে ওর মনটা তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে। আপত্তি করলে তোমাকেও তার মত ঘৃণা করবে।

বী। আপত্তি তো করবই না— বরং encourage করব।

সু। Sure. You ought to do it.

বী। ভাগ্যিস তুমি বললে। ওর এই শনিবারে এক বন্ধুর ওখানে যাবার কথা। হপ্তাখানেক থাকবে। তার জন্মদিনে একটা প্লে-ও করবে। আমি প্রায় বারণ করেছিলুম আর কি।

সু। Don't do it. ঐ বৌদি আসছে। তোমরা একটু একলা কথা কও, আমি নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়জামা ছেড়ে আসি। (প্রস্থান

বী। আমি ওকে নিজে থেকেই ইলাদের ওখানে যেতে বলব।

(অণিমার প্রবেশ)

অ। হাঁ গা ঠাকুরপো কোথায় ?

বী। ও ঘরে কাপড় ছাড়তে গেছে। তা তুমি তবে এই শনিবারে ইলাদের ওখানে যাচ্ছ তো ? রামসিংকে একটা বাথ রিসার্ভ করতে পাঠিয়ে দি ?

অ। তোমারও তো নরোত্তমবাবুদের ওখানে যাবার কথা—স্যুটকেসে কি কি গুছিয়ে দেব ?

(দু'জনেই অবাক হলেন)

বী। না, ভেবে দেখলুম, এবার আর যাব না।

অ। দেখ, সত্যি কথা বলতে কি, আমারও ইলাদের পার্টিতে যেতে বিশেষ ইচ্ছে নেই।

বী। ছিঃ, তোমার না-যাওয়াটা ভাল দেখায় না—এত ক'রে যেতে লিখেছে।

অ। তা নরোত্তমবাবুও তো তোমার আশায় থাকবেন। যাব বলে না-গেলে বড্ড খারাপ দেখাবে।

(দু'জনেই অবাক হলেন)

বী। তুমি যদি একান্তই বল, তবে না হয় যাব ; কিন্তু বেশী দিন থাকব না।

অ। তুমি অনুরোধ করছ তাই আমি যাব—তবে ভবিষ্যতে আর কোথাও তোমায় ছেড়ে আমায় যেতে বোলো না

(দু'জনেই উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছেন)

বী। হ্যাঁ গা, সত্যি বলবে ? তুমি আমায় রাগ ক'রে শিকারে যেতে বলছ না তো ?

অ। তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ—তাই যেতে বলছ ?

বী। না না। আমার ইচ্ছে তুমি যাও, একটু মনে আনন্দ পাবে।

অ। আমারও ইচ্ছে তুমি শিকারে যাও—মনটা অন্যমনস্ক থাকবে।

সুধীনের প্রবেশ

বী। এই যে, এস। He is wonderful নয়, কি ?

অ। নিশ্চয়ই। ঠাকুরপোর মত লোক আজকাল দেখা যায় না।

বী। বটেই তো। Such a friend.

অ। And so good to us.

সু। Thank you both for the compliments. গরীবের দেখছি তোমরা বড্ড বেশী খাতির আরম্ভ করলে। ধাতে সইলে বাঁচি।

বী। তুমি যে দয়া ক'রে এসেছ তার জন্য যে আমরা কত thankful.

অ। আর কত আনন্দিত তা বলা যায় না।

সু। Thank you again.

বী। কিন্তু একটা যে বড় মুস্কিল হয়েছে!

অ। কি বল তো?

বী। আমি যদি নরোত্তমবাবুদের ওখানে যাই, আর তুমি যদি ইলাদের ওখানে যাও তবে ডাক্তার যে একলা পড়ে যাবে?

অ। আর ঠাকুরপোকে ফেলে তো আমাদের যাওয়া উচিত নয়।

বী। তবে আমি থেকে যাই, তুমিই যাও।

অ। তোমাদের রেখে আমিই বা কি ক'রে যাই—

সু। আরে তাতে আর কি হয়েছে। আমার একলা থাকা খুব অভ্যাস আছে।

বী। না না, তা কি হয়!

অ। তোমাকে আমরা একলা রেখে কি কখনও যেতে পারি?

বী। ঠিক হয়েছে। সুধীন যদি আমার সঙ্গে যায়।

অ। আমিও কিন্তু—ঐ কথাই ভাবছিলুম। ঠাকুরপোকে যদি আমার সঙ্গে নিয়ে যাই—ইলার মাবাবা খুব খুশী হবেন।

সু। রক্ষে কর। আমি কারুর সঙ্গেই যাব না।

বী। না না, তোমাকে একবার শিকারের interest-টা দেখতেই হবে।

অ। কিন্তু আমাদের প্লে-টা—

সু। আমি ভাই মানুষ। একসঙ্গে দু জায়গায় তো আর অধিষ্ঠিত হতে পারি নে।

অ। তোমার যখন ইচ্ছে, তখন তোমার সঙ্গেই ঠাকুরপো যাক্।

বী। না, না, সে কি হয়। ও তোমার সঙ্গেই যাক্। শিকারের চেয়ে প্লে-ই ওর ভাল লাগবে।

সু। ওহে, ওটা না হয় কাল ঠিক করা যাবে। আজ তো আর তোমরা যাচ্ছ না।

বী। ও তো ঠিক হয়েই আছে। তুমি ওর সঙ্গে ইলাদের ওখানেই যাবে।

অ। সে কাল দেখা যাবে'খন। এত তাড়াতাড়ি কিসের? ঠাকুরপোর এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি।

বী। তুমি একবার আমার ঘরে চল, তোমায় আমার নতুন উইনচেস্টার-টা দেখাই—

অ। আমি ততক্ষণ তোমাদের জন্যে কতকগুলো মাছের চপ ভেজে দি গে—

বী। ডাক্তার এস। আমি বন্দুকটা বের করছি—

প্রস্থান

অ। ঠাকুরপো চল, আমি এখুনি চপ ভেজে আনছি—

প্রস্থান

সু। (হাঁফ ছেড়ে) উঃ আদরের ঠেলায় প্রাণ যায় আর কি! এখন ভালয় ভালয় বিদায় হতে পারলে বাঁচি। কখন মুখ দিয়ে কি বেফাঁস কথা বেরিয়ে যাবে, আর সব পণ্ড হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে ম্যানেজ করা গেছে। দু'জনের মধ্যে পড়ে হয়েছে মহা মুস্কিল। কাউকে প্রেফারেন্স দেবার উপায় নেই। এখন আমার বিশেষ একটা কাজের দোহাই দিয়ে পালানই হচ্ছে একমাত্র সমস্যার সমাধান।

নেপথ্যে বী। সুধীন, এস হে।

সু। যাচ্ছি—(ডানদিকের দরজার দিকে গেল)

নেপথ্যে অ। ঠাকুরপো, এসো তাড়াতাড়ি।

সু। যাচ্ছি—(বাঁ দিকের দরজার দিকে গেল)

যবনিকা



দুর্গোৎসব

রাধারাণী দেবী

কাজের জোয়াল্ কাঁধে নিয়ে আট্‌কা পড়ে গেছি
সুদূর পঞ্চনদের এক ছোটো শহরে।
অনেকদিন কাট্‌ল, আর ভাল লাগে না ; তাই
নিয়ে এসেছি দেশ থেকে পত্নীপুত্রকন্যাদের।
বহুকাল বাদে আস্বাদ পেলাম শুক্তুনি আর লাউঘণ্টের।
দিনান্ত হ'লে কানে শুনলাম
সান্ধ্যশঙ্খের মঙ্গল মন্দ্র,
আঘ্রাণ পেলাম ধূপ ধূনার সৌরভ।

তেতো শুক্তুনি যে এতো মিষ্টি—আর
লাউঘণ্টের মতো বাজে ব্যঞ্জন যে এতো সুস্বাদু
এর আগে টের্ পাইনি।
দিনের প্রখর-দাহন অন্তে
সন্ধ্যা যে এমনই স্নিগ্ধশীতল
স্বপ্নচ্ছায়ায় মোহন মেদুর—
কোনও দিনই হয়তো জানতেও পেতাম না
যদি শঙ্খধ্বনির পরেই
চন্দনকাঠের গুঁড়ো আর গুগ্‌গুল্ মেশানো ধূনোর
আশ্চর্য গন্ধবিহ্বল ধোঁয়া
এমন ক'রে এই গৃহ আচ্ছন্ন না করতো।

এলো শরৎ ঋতু, দুর্গোৎসবের আনন্দমাস।
গৃহিণী পঞ্জিকার পাতা উল্টে তারিখ দেখেন
আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।
ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—
আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা হয় না
এ কেমন দেশ বাবা ?—
উত্তরে মৃদুমন্দ হেসে বিজ্ঞভাবে মাথা দোলাই।
আবার প্রশ্ন করে—এদের ইস্কুলে
আশ্বিনমাসে পূজোর ছুটিও নেই ?
কচিকণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে অপরিসীম বিস্ময়।
যেন এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার
দুনিয়ায় আর কিছুই হতে পারে না।
শান্তকণ্ঠে জবাব দিই—না, এদের পূজা ভেকেশন্ নেই।
সহানুভূতিভরা ব্যথিতস্বরে
কচিকণ্ঠ পুনরায় শুধায়—
এখানকার ইস্কুলের ছেলেরা
পূজোর ছুটির জন্যে কাঁদে নিশ্চয়ই ! না বাবা ?
সংক্ষেপে হেসে বলি—না।
প্রশ্নকারীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না যেন।

গৃহিণী বলেন—বৎসরান্তে মা আসছেন.
মাতৃমুখ দর্শন মিললো না এবার।
ললাটে দক্ষিণ কর ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে দায়ী করেন
ভাগ্যবিধাতাকে।
ছেলেমেয়েরা সকলেই ম্রিয়মাণ
নিরুৎসাহে ঘুরে বেড়াচ্চে শুখনো মুখে।
যদি চ পূজোর পাওনা জামা-কাপড়-জুতো পেয়েচে সবই,
তবুও ওরা মনমরা ;
সঙ্গে সঙ্গে ওদের মা-ও।

গৃহিণীকে ডেকে বললাম—
এক কাজ করলে হয় না ?
এই চার দিন ঘটস্থাপনা ক'রে
পূজো করি এসো।
এদেশে তো প্রতিমা মিলবে না
ঘটপেতে চণ্ডীপাঠ করবো চারদিন।
ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি
পূজো-পার্বণের আর ভাবনা কি ?
মনে করলেই হোলো।
গৃহিণী সম্মতি দিলেন সানন্দেই।

ছেলেমেয়েরা আনন্দে নৃত্য করচে।
শুনেচে ওরা বাড়ীতেই হবে পূজা।
যখন গঙ্গোদকের বদলে সিন্ধুউদক পূর্ণ ঘটে
আঁকলাম সিন্দূরের পুত্তলি,—
পরালাম ফুলের মালা,
ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে এসে ঘিরে দাঁড়ালো।

সবার ছোটো মেয়ে—রিণ্টু—
অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে
কোঁকড়া চুলে ঝাঁকড়া মাথাটি নেড়ে
তুললে প্রবল প্রতিবাদ।
বললে—হুঁ বুঝেচি—ফাঁকি দিচ্চ আমাদের।
ও কেন দুগ্গা-পূজো হবে?
ও তো একটা কলসী!—
গৃহিণী বলে উঠলেন সত্রাসে
—চুপ্ চুপ্ বোকা মেয়ে, বলতে নেই ওকথা।

ততক্ষণে ছেলেটিও বলে উঠ্ল—সত্যি মা—
লক্ষ্মী সরস্বতী—কার্ত্তিক-গণেশ দূরে থাক্
মা-দুগ্গাই নেই মোটে।
এ' কী রকম পূজো?
মুখরা রিণ্টু পুনরায় ঠোঁট ফুলিয়ে
চুল দুলিয়ে বলে উঠ্লো—
ডিডিম্ ডিডিম্ ডিম্ডিম্ডিম্ বাজ্না নেই
ছাই পূজো—ফাঁকি।

পরণে চওড়া লালপাড় নতুন শাড়ী
দল বেঁধে আলতা পরে
বিকালের দিকে গৃহিণী এসে পাশে বসলেন।
ছেলেমেয়েরা গেছে বেড়াতে।
হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—
আজ মহাষ্টমী—
কিন্তু পূজো-পূজো ঠেকচে কৈ?
অল্পক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন,
কানে আসচে না ঢাক-ঢোলের আওয়াজ।
রাস্তায় নেই রঙীন জামা কাপড় পরা
ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড়।
—পোড়া দেশের রোদ্দুরেও কি একটু
পূজো পূজো ছোঁয়াচ লাগেনি গা? আশ্চয্যি

* * *
* * * * * *

সত্যিই!—রুক্ষ পাঞ্জাবে তো
ঘনবর্ষার শ্যাম সমারোহ ঘটে না,
আসে না আষাঢ় অফুরন্ত ধারা-দাক্ষিণ্য নিয়ে।
সজল শ্রাবণের স্নেহস্নিগ্ধ অশ্রু স্পর্শে
গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে না এখানে
তৃণলতা তরু বনস্পতি।
তাই, প্রাবৃটের ধূসর মেঘাবগুণ্ঠন সরিয়ে
হেসে ওঠে না আশ্বিনের নীল নয়ন
বৃষ্টি ধোওয়া আকাশে আকাশে।
ঝল্মলিয়ে ওঠে না কাঁচা হলুদবরণ রৌদ্রে
বারিধৌতা নির্মলা পৃথিবী।
লঘু মেঘের শ্বেতহস্তীদল
সোনালী আলো মাখা আকাশের নীলে
ছড়িয়ে দেয় না পেঁজা তূলোর রাশি।

প্রতিমা এনে ধুমধামে পূজো করলেও
শারদা কি হবেন আবির্ভূতা
এই পঞ্চনদের কাবেরী তীরে?
যে-দেশে নেই স্থলপদ্ম, শিউলি ফুল,
জলে ভাসে না রক্তকমল, কুমুদ, কহ্লার,
বেড়ার গায়ে দোলে না স্নিগ্ধনীল অপরাজিতা,
হেথা-সেথা ফুটে ওঠে না
স্তবকে স্তবকে রক্তকরবী
আর শ্বেতকরবীর গুচ্ছ।
কানে শোনা যায় না শালিখপাখীর ঝগড়া
আর ছোট্ট দোয়েলের মিষ্টি শিশ্।
মাঠে বাটে ঘাটে যায় না শোনা
আগমনী গানের আকুল সুর।

নেই নারকেলছাপা—রস্করা—পূজোর মেঠাই,
নেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে
প্রায় সবার অঙ্গে নববস্ত্র।
নেই বিপুল উল্লাস উৎসাহ
পথচারী জনতাপুঞ্জের।

ঠিকই বলেচে ছোট মেয়ে রিণ্টু
'ডিডিম্—ডিডিম্—বাজনা না বাজলে
দুগ্গা পূজো হয় কখনো?'

মুসলমান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলবী একরামুদ্দীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু মুসলমানে যে বাকযুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন "পদ্ম"-এর উপর "শ্রী"। মুসলমান বলিতেছেন, ইহা পৌত্তলিকতার নিদর্শন ; হিন্দু বলিতেছেন, "পদ্ম" একটি শ্রেষ্ঠ ফুল মাত্র এবং "শ্রী" অর্থে "সিদ্ধি ও শুভ"।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির যে মুসলমান ভীতি হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; নচেৎ তিনি "পদ্ম"-এ আসীনা "শ্রী"র, মুসলমান কৃত মৌলিক অর্থ গোপন করিয়া "পদ্ম"-এর সাধারণ অর্থ এবং "শ্রী"-র ভাবার্থ পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশ করিতেছেন কেন? মৌলিক অর্থ হইতেই ভাবার্থ বাহির হইয়াছে, সুতরাং মৌলিক অর্থ গোপন করা বাতুলতা মাত্র। মুসলমানকে এরূপ বোকা বুঝাইবার চেষ্টা নিন্দনীয় নহে কি?

"পদ্ম" বামা "শ্রী" অর্থে লক্ষ্মী বা সরস্বতী হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া ইহার অর্থে সরস্বতীকেই বুঝাইবে, লক্ষ্মীকে নহে। যেমন "ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র" বলিলে, দেবরাজকেই বুঝাইবে এবং "ঐরাবত" হইতে "ইন্দ্রকে" পৃথক করিয়া ভাবার্থে "শ্রেষ্ঠ" বুঝাইবে না, সেইরূপ "পদ্ম" হইতে "শ্রী"কে পৃথক করিয়া তাহার পৃথক অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। আমি দেখাইব যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন "পদ্ম" বামা সরস্বতী হইলেও ইহা পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্বরূপ বিবেচ্য নহে।

"পদ্ম" বামা "শ্রী"-র মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা এস্থলে সঙ্গত হইবে না, যেহেতু মৌলিক অর্থে এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। পদ্মবামা সরস্বতী বিদ্যার প্রতীক, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বিদ্যা ভিন্ন আর কিছু বুঝাইবে না এবং ভাবার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির কৃত অর্থ, "সিদ্ধি ও শুভ" বুঝাইবে।

"পদ্ম" বামা "শ্রী" অর্থে সরস্বতীকে বুঝাইলেও এবং অধুনা সরস্বতীর প্রতিমা পূজিত হইলেও সরস্বতী যে পৌত্তলিকতার নিদর্শন, ইহা মনে করা ভুল। বেদোক্ত আর্য্য ধর্ম্মে নাকি প্রতিমা পূজা নাই এবং বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত থাকার সময়েই সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং "শ্রী" সেই সময়কার সংস্কৃত শব্দ। সম্ভবত অনেক পরেই, সর্ব্বসাধারণে নিরাকার দেবতার ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই, দেবতার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া প্রতিমা পূজার উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সময় যে ভাষায় "শ্রী" শব্দের উদ্ভব, সেই সময় সেই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে যখন পৌত্তলিকতা ছিল না, তখন "শ্রী" শব্দকে পৌত্তলিকতার চিহ্ন কিছুতেই বলা যায় না।

"পদ্ম" বামা "শ্রী" শব্দ যদি হিন্দুর দেবতা সরস্বতীকে মনে করাইয়া দেয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দই হিন্দুর দেবতাকে মনে করাইয়া দেয় এবং মুসলমানের বাঙ্গালা ভাষা না শেখাই উচিত। "বজ্র" শব্দ, দধীচি মুনির অস্থি মনে পড়াইয়া দেয় এবং সূর্য্য সূর্য্যদেবকে ও চন্দ্র চন্দ্রদেবকে মনে পড়ায়। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী আদি নক্ষত্র, চন্দ্রদেবের সপ্তবিংশ পত্নী স্মরণ করায়! কৃষ্ণ, হরি, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদিও হিন্দুর দেবতা, সুতরাং এই সকল নাম পড়া বা লেখা মুসলমানের উচিত নয়, পাছে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়! শুধু হিন্দুই দেবতার উপাসক নহেন, আরও জাতি যাঁহারা হিন্দুর ন্যায় এক সময় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষাও মুসলমানের পাঠ করা উচিত নয়, পাছে তাহাদের দেবদেবী চুম্বকের ন্যায় মুসলমানকে আকর্ষণ করে!

তাহা হইলে মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া মুসলমানের আর কিছু পড়া উচিত নহে। জগতের নানা জাতির ভাষা না পড়িলে জ্ঞানের বিস্তার হয় না। অন্যান্য জাতির ভাষা না পড়িলে, সেই সকল জাতির সুধীবর্গের লব্ধ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সম্যক জ্ঞান লাভ কি বাঞ্ছনীয় নহে?

কূপমণ্ডুক কূপমধ্য হইতে কখনও বাহির হয় না। সে জানে কূপটাই জগৎ—কূপে যাহা নাই, জগতে তাহা নাই। কূপের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই সে মনে করে তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইয়াছে ; তাহার জ্ঞান যে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা সে বুঝিতে পারে না। যেমন বৃক্ষহীন দেশে ভেরেণ্ডা গাছও মনে করে "আমি বৃক্ষ", সেইরূপ কূপের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই কূপমণ্ডুক মনে করে "আমি মহা জ্ঞানী"। কিন্তু নিজে নিজেকে বড় মনে করিলে কেহ বড় না হইতেও পারেন, অনেক সময় হস্তীমূর্খও নিজেকে বড় মনে করিতে পারেন। যিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, পাঁচ জনে তাঁহাকে বড় বলিতে বাধ্য হইবে। যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও কেহ নিজেকে বড় মনে করেন, তিনি বেশী দিন জগতের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন না—ময়ূর পক্ষ সহিত বায়সের ন্যায় অচিরে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন মুসলমান সভ্যের মতে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথেরও কোন কোন রচনা বর্জ্জনীয়। সেদিন কলিকাতার মুসলমান ছাত্রবৃন্দও একটি অধিবেশনে বঙ্গের গৌরব স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" ও একটি অভিশপ্ত পুস্তক বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং বাঙলার সরকার বাহাদুরকে তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যদি এই সকল উপাদেয় রচনা মুসলমান না পড়িতে চান, না পড়ুন, কিন্তু এই সকল রত্নমালা জগত হইতে লুপ্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পূর্ব্বকালে যেমন কোন জাতি, প্রাচীনকালের মনীষিগণের পুস্তক নিহিত জ্ঞানরাশি, লাইব্রেরিসহ সমূলে ধ্বংস করিয়া চিরকালের জন্য মানব-সমাজের দ্বারা ধিকৃত হইয়াছেন, এই বিংশ শতাব্দীতেও কি বাঙলার সরকার বাহাদুর সেই পৈশাচিক লীলার পুনরভিনয় করিতে পারেন?

এক্ষণে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য বিখ্যাত হিন্দু লেখকের রচনা পরিত্যাজ্য কি-না তাহাই বিবেচ্য। মুসলমান যদি কোর্ম্মা-পোলাও না খাইয়া দালভাত খাইয়া সুখী হইতে পারেন, তাহাতে অন্য কাহারও কিছু ক্ষতি নাই, কেহ কিছু আপত্তি করিবেন না। মুসলমান যদি জগতে গৌরবময় আসন গ্রহণ করিতে না চান্, তাহাতে অপরের কথা বলিবার কি আছে? মুসলমান যদি চিরকাল কুলায় শুইয়া দুধ খাইতে থাকেন, অপরে তাহাতে কেন বাধা দিবে। তিনি যাহা চান্ না, তাহা পাইবার চেষ্টা না করিলেই চুকিয়া গেল।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্বতন্ত্র। যখন একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থাকে তখন প্রথম ব্যক্তি উঠিতে চাহে না বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও উঠিতে দিবে না বলিলে, সে কথা শেষোক্ত ব্যক্তি শুনিবে না। তুমি নিজের ঘোড়ায় লেজের দিকে চড়িলে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু এজ্‌মালি ঘোড়ার তোমার অংশীদারকেও লেজের দিকে চালাইবার চেষ্টা করিলেই গণ্ডগোল বাধিবে। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা শিক্ষার্থীদের জন্য যে পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা হইতে বড় বড় লেখকের রচনা বাদ দিতে চাহিলেই তুমুল প্রতিবাদ হইবে। "তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নীচে পড়িয়া থাকিতে পার, কিন্তু আমি কেন তোমার সহিত নীচে থাকিব?" এইরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা তোমাকে জর্জ্জরিত করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন এক জাতির জন্য সৃজিত হয় নাই, বঙ্গবাসী মাত্রের জন্যই হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন এক জাতির খেয়াল মত পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিবেন না এবং হিন্দুয়ানি-ভাব আছে বলিয়া বড় বড় লেখকের রচনার রস হইতে শিক্ষার্থিগণকে বঞ্চিত করিবেন না। তাহা হইলে অবশ্য মুসলমান ছাত্রগণের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয় না—মুসলমানের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করা দরকার, কিন্তু ইহা এত ব্যয়সাধ্য যে, সরকার বাহাদুর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন কি-না সন্দেহের বিষয়।

কিন্তু এত ভয় কিসের? মুসলমান ধর্ম্ম এত ঠুন্‌কা নহে যে, অপর ধর্ম্মের সহিত ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া চুরমার হইবে! সেদিন আরা টাউন স্কুলে দারুল ইস্‌লাম কমিটি "প্রভু কৃষ্ণের দিবস" বলিয়া যে সমারোহ সম্পন্ন করিলেন এবং যাহাতে দুই-তিনজন মুসলমান কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিলেন এবং মৌলুবী বদরুদ্দীন হাইদার সাহেব কোরাণ ও গীতা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের ভাবের সামঞ্জস্য দেখাইলেন তাহাতে কি তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন?

তাঁহারা সংস্কৃত, অন্তত বাঙলা ভাষা শিখিয়া হিন্দু দেবদেবীর বিষয় না পড়িলে কখনই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতেন না। পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইলে পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা আসিবে না এবং পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা না আসিলে পরধর্ম্মের প্রতি চিরকাল বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতে থাকিবে। যদি পরধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সখ্যতা স্থাপনে অভিলাষী হও, তাহা হইলে পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে শিখ।

প্রতিবেশীর সহিত সখ্যতা স্থাপিত হইলে শান্তিতে বাস করা যায়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পাশাপাশি বাস করেন। ভারতবর্ষে প্রতিবেশীর সহিত সখ্যতা স্থাপন অতীব বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবেশীর সহিত সখ্যতা না হইলে রাত্রি-দিন পরস্পর ঝগড়া, ঝটাপটি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি, জখম খুন, বহু ঘরে কাঁদাকাটি, হাহাকার। এই বিসদৃশ ফল দেখিয়াও কি তুমি শিখিবে না—পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিতে আজীবন ইন্ধন জোগাইতেই থাকিবে? জ্ঞানীজন একবার ঠেকিলেই শিখে, তুমি বার বার ঠেকিয়াও কি শিখিবে না?

রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাদের উপর গ্রীক দেবতাদের প্রতিমা দেখিয়া তুমি অসহিষ্ণু হও না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্নে পদ্মাসনা সরস্বতীর প্রতিমার নির্দেশক বুঝিয়া তোমার রক্ত গরম হয় কেন? তুমি প্রভুর দেবতার প্রতিমার প্রতি সদয় এবং প্রতিবেশীর দেবতার প্রতিমা নহে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্নের উপর বিরূপ কেন? প্রভুর বেলায় যেমন ধর্ম্মের আগ্রহকে ভোঁতা করিতে পারিয়াছ, আশা করি, প্রতিবেশীর বেলায়ও তাহা করিতে পারিবে।*

* ১৯৩৮এর ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিত।

আশ্বিন

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

শরৎকালে শারদা মাসে কনকচাঁপা বরণী
চরণ তলে প্রণতি-লতা লুটায়ে আছে ধরণী।
মাথায় জ্বলে তারার দীপ
কপালে পরা চাঁদের টিপ
আগমনীর ছন্দে গানে ভরিয়া গেছে সরণী
শরতে আজি শারদা মাসে জ্যোৎস্না হেমবরণী"।

ময়ূর-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

এমন সময় রেস্তঁরার সামনে একখানা রোলস্ রইস্ এসে দাঁড়াল। সোফেয়ারের পাশ থেকে নামল জয়ন্তেরীর শশী চাকর। শশী তাড়াতাড়ি বিমলকে বললে: "বাবু, ভোলা-বাবু কোথা গেলেন?"

"কেন-রে?"

"একটা মেয়ে-লোক তাঁকে খুঁজতে নেগেছে যে—"

বিমল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে, পরে জিজ্ঞাসা করলে: "কে? মেয়েলোক?"

"তা ত জানিনে হুজুর—আফিসে গিয়ে গাড়ী দাঁড়াল, আমায় বললে ভোলাবাবুকে খোঁজ ক'রে দিতে হবে।"

"কালী, ব্যাপারটা কি দেখ ত।"

কালী উঠে এগিয়ে গিয়ে দেখে বললে: "ওরে বিমল, এ যে জয়ন্তর গাড়ী বোধ হচ্ছে, জয়ন্তর বউ বোধ হয় গাড়ীর ভেতর। ব্যাপারটা কি রে—রাস্তার মধ্যে···"

"জয়ন্তর বউ!·· বল যে ভোলাদা ঘণ্টা দেড়েক আগে জয়ন্তর সঙ্গে চ'লে গেছেন।"

কালী গাড়ীর ভেতরের স্ত্রীলোকটীকে দেখবার জন্যে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে বললে: "ভোলাদা এই কিছুক্ষণ হ'ল জয়ন্তর সঙ্গে চলে গেছেন।"

"কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

"তা ত ঠিক বলতে পারি নে—বোধ হয় থিয়েটারে···"

"থিয়েটারে ত ভোলাদা নেই। সেখানে খবর নিয়েছিলাম।"

কালী বলতে যাচ্ছিল—তা হলে বোধ হয় মীনার···সামলে নিয়ে বললে, "তাহ'লে ত বলতে পারলাম না।"

"একবার না হয় পটলডাঙায় তাঁর বাড়ীতে খবর নিলে পারতেন···"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ; বিরক্ত করলাম কিছু মনে করবেন না···"

"না—না, সে কি কথা, বিলক্ষণ···"

"দেখুন যদি ভোলাদার সঙ্গে দেখা হয়, তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি—আমি মিসেস সেন।"

"ও জয়ন্তর?···"

"আজ্ঞে হ্যাঁ···নমস্কার!"

"নমস্কার!"

মোটরে হর্ন দিয়ে গাড়ী চ'লে গেল। কালী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসে বললে: Something is rotten in the state of Denmark,···বিমল? I smell a rat. ব্যাপার একটা বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। আচ্ছা শশী, তুমি যাও। বিমল, চল যাওয়া যাক্, কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান, এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি একটা ঘটেছে!"

"তার জন্যে ভোলাদাকে খুঁজছে কেন?"

"ভোলাদা আমাদের একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি—এক্ষেত্রে ভোলাদা হচ্ছেন—মারিলে মারিতে পার, রাখিলে কে করে মানা।"

গোস্বামী এতক্ষণ চুপ ক'রে কেবল সিগারেট্ টানছিল। হঠাৎ বলে উঠল: "নাঃ, ভোলাবাবুর তর্কে grip নেই··· উনি দর্শনশাস্ত্র পড়েন নি। নিখুঁত চুল-চেরা বিচারবুদ্ধি না থাকলে, মানুষ কিছুই করতে পারে না।"

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি। হঠাৎ মেঘের গর্জ্জন শোনা গেল। বিমল বললে: "ব্যাপার কি, বৃষ্টি আসছে না কি?"

কালী জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে: "তাই ত ঘোর ঘন গহন ঘটা—বৃষ্টি পড়ছে হে!"

বলতে বলতেই খুব জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল।

বিমল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

"তাই ত রাত এখানে অনেক হয়ে গেল। নাঃ, তোমার পাল্লায় পড়লে কালী···"

"বেশ ভাই, আমি কি বৃষ্টি ডেকে আনলাম।"

"আমাকে যে অনেকখানি পথ যেতে হবে, শেষ বাসও পাব না।"

"তা এখন এ বিষ্টিতে ত আর যাওয়া হবে না। শরীরটাও ত খুব জাঁদরেলী নয়, ভিজলে অসুখ করবে; একটু বোস—না হয় ট্যাক্সী ক'রে যাবে।"

এমন সময় আবার একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। তা থেকে নামল ডাক্তার ভার্গব আর মানবেন্দ্র।

মানব নেমেই বললে: "বরাবর বাড়ী গেলেই হ'ত ডাক্তার সায়েব।"

"এ রকম চায়ের দোকানে বোধ হয় আপনার আসা নিশ্চয়ই এই প্রথম?

"নিশ্চয়ই নয়। যখন কলেজে পড়তাম, তখন চায়ের দোকানই ছিল আমাদের রেস্তেভো···চায়ের দোকান না হ'লে কখন স্কুল-কলেজের ছেলেদের আড্ডা জমে? তার জন্যে নয়—বিষ্টিটা ভারি জোরে এসেছে বাড়ী পৌছতে পারলে ভাল হ'ত।"

"বিষ্টিটা থামুক—নেবে যখন পড়া গেছে, বুঝলেন কি না। আচ্ছা মানবেন্দ্রবাবু, আপনি ত সর্ব্বেশ্বর রায় ব্যারিষ্টারের ওখানে যাতায়াত করেন···আচ্ছা, ওঁর স্ত্রীর, I mean, মিসেস রায়কে দেখবার জন্যে একটা call দিয়েছিল। আমি ত কোন রোগ খুঁজে পেলাম না। বড়লোকের বাড়ী সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করাও সব সময় সঙ্গত হয় না। আমার কি মনে হয় জানেন, she is rather neurotic—মাঝে মাঝে নাকি অজ্ঞান হয়েও যান।"

"মিসেস রায়ের কথা ছেড়ে দিন—ও চিকিৎসার বাইরে—ইচ্ছা ক'রে কেউ যদি মাথা খারাপ করে·· ব্যাপারটা কিন্তু জয়ন্তর সঙ্গে ওঁর বড় মেয়ের বিয়ের পর থেকেই বেড়ে উঠেছে।"

আচ্ছা উনি drink করেন?"

"শুনেছি—তবে দেখিনি···এ-সব কথা এখানে থাক ডাক্তার সায়েব।"

"আমার মনে হ'ল তাই—নাকের ফুঁপিগুলো···যাক্ তা জয়ন্তর বিয়ের সঙ্গে ওঁর এ অসুখের সম্পর্ক কি?"

"শুনেছি—ওঁর ইচ্ছা ছিল না যে জয়ন্তর সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে হয়।"

"কার সঙ্গে বিয়ে দেবার ওঁর ইচ্ছা ছিল?"

মানব একটু ঢোক গিলে বললে: "সেটা আমি সঠিক বলতে পারলাম না। তবে জয়ন্ত ও ওঁর মেয়ে দু'জনে নাকি দেখা-শোনা ও পছন্দ ক'রেই বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, they love each other very dearly···"

মানবেন্দ্র ও ডাক্তার ভার্গব রেস্তঁরার সামনের টেবিলের কাছে বসেছিল। কালী, বিমল ও গোঁসাইকে তারা প্রথমে দেখতেই পায় নি। হঠাৎ ডাক্তার ভার্গব ভেতর দিকে মুখ ফেরাতেই সবার চোখো-চোখি হয়ে গেল। ডাক্তার বললে: "বেশ মিত্তির মশায়, আপনারা যে আমাদের ফিরেই দেখলেন না—চিনতে পারলেন না বুঝি?"

কালী ও বিমল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসবার মতলব ক'রে উঠছিল—এমন সময় ডাক্তারের চোখে পড়ে গেল। কালী মিত্তির বলছিল বিমলকে—"নাও, এখন আবার ডাক্তার এসে জুটল। এ বিষ্টির জল কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে!"

"ডাক্তার কখন বুঝি সোজা কথা বলতে জান না? চিনতে পারব না মানে? একজনের নাম শুনে আমরা একটু চুপ করেছিলাম।"

"কার নাম মশায়?"

"জয়ন্ত।"

"জয়ন্তর নাম শুনে আপনাদের অমন চমকিত হবার কারণ কি বলুন তো?"

"বিমল, বৃষ্টি একটু কমেছে, এই বেলা যদি···"

ডাক্তার বললে: "বসুন না বিমলবাবু—বৃষ্টিটা ধরুক—গাড়ী আপনাকে পৌছে দেবে এখন। ডর কেয়া···"

কালী রহস্য করে বললে: যে গুরু-গুরু দেয়ার ডাক গুরুজনের ডর আছে বই কি।···

"কথাটা কি কালীবাবু, জয়ন্তর নাম শুনে আপনারা···"

"খানিক আগে এখানে একটা নাটকের একটা দৃশ্য হ'য়ে গেল, তার সঙ্গে জয়ন্তর সম্পর্ক আছে।"

মানব অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না, কারণ সে মনে মনে ভাবলে—"এরা কি তবে আমাকে উপলক্ষ্য ক'রেই বলছে না কি!"

"এই কিছুক্ষণ আগে জয়ন্তর বউ গাড়ী ক'রে এসেছিল ভোলাদাকে খুঁজতে।"

মানব চমকে উঠে বললে: "জয়ন্তর বউ, মানে?"

"মানে জয়ন্তর বউ—as plain as day-light…"

"এখানে এই চায়ের দোকানে ?"

কালীর আভিজাত্য-বোধে একটু আঘাত লাগল, বললে : …"আশ্চর্য্য কি—দরকার পড়লে স্ত্রীলোকে যমের বাড়ী যেতে পারে…এ ত একটা চায়ের দোকান। যদিও এর দরজার মাথায় লেখা যেতে পারে—leave ye all hopes, ye who enter here…হ্যাঁ এইখানে—এই চায়ের দোকানে।"

কালীর ইঙ্গিতটা মানব ঠিক ধরতে পারলে ব'লে মনে হ'ল না—সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"সঙ্গে কেউ ছিল ?—না, গাড়ী তিনি নিজেই…

"সঙ্গে অবিশ্যি কেউ ছিল—গাড়ী নিজে ড্রাইভ ক'রে আসেন নি—সোফেয়ার ছিল।"

"ওঃ বটে।"

"ব্যাপারটা কি বলতে পারেন মানববাবু ?…"

"আমি এ বিষয়ে কি বলি বলুন। মাস কতক আমি কলকাতায় ছিলাম না, ওদের ওখানেও যাইনি—আমি ত ঠিক বলতে পারি নে।"

"আচ্ছা জয়ন্ত বুঝি থিয়েটার নিয়ে খুব মেতেছে, বাড়ীতে থাকে না ? আপনি interested, জয়ন্তর বন্ধু বলেই জিজ্ঞাসা করছি।"

ডাক্তার কথাটা ঘুরিয়ে বললে : "কথাটা কি জানেন কালীবাবু, আপনার এ বিষয়ে, অর্থাৎ জয়ন্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও মীমাংসাজনক প্রশ্নটা আমাদের কেমন যেন লাগল।"

কালী হেসে বললে—"হ্যাঁ, প্রশ্নটা একটু সন্দেহজনক ত বটেই। কিন্তু কি করি ডাক্তার, আমরা interested party না হ'লেও কৌতূহলের interest-টা ছাড়ি কি ক'রে বল ? তাই খানিক আগে বিমলকে বলছিলাম, I smell a rat. তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, জয়ন্ত কি রাত্রে বাড়ী থাকে না ?"

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললে : "আমাদের উভয়কে ঐরূপ প্রশ্ন করাটা কি অপরীক্ষিত কারণ হয় না ?"

"দেখ ডাক্তার, আমি তোমার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক করতে আসি নি…fact is fact. ব্যাপারটা এই যে, জয়ন্তর বউ ভোলাদাকে খুঁজতে জয়ভেরীর আপিসে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে এখানে। অথচ তারই কিছুক্ষণ আগে জয়ন্ত ভোলাদাকে জয়ভেরী আপিস থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। সন্দেহ হয়।"

জয়ন্ত ও জয়ন্তর বউ সম্বন্ধে একটা চায়ের দোকানে এই রকম আলাপ মানব একেবারেই পছন্দ করছিল না। তার মুখখানা রাতের আকাশের মত অন্ধকার হয়ে উঠল। কালী মিত্তির সেটা বরাবর লক্ষ্য ক'রে আসছিল। কিন্তু মানবের মনের ভেতর যাই হোক্ না কেন, কালী তার মনের ভেতরে ত প্রবেশ করতে পারে না—আর মানবও কালীকে এ বিষয়ে আলোচনা করাটা বন্ধ করতে বলতেও পারে না। কালী বলেছে, fact is fact,—আসলে যখন ঘটনা এই। সে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যে ডাক্তারকে বললে : "ডাক্তার, বিষ্টি কমেছে, চল আমরা উঠি…রাত হয়ে গেল।"

"আপনি এখন বাড়ী যাবেন ত ?"

"হ্যাঁ, বেশী রাত হলে মা আবার ভাববেন। তিনি আবার খানিকটা সেকেলে মানুষ—দেরী হ'লে বড় ভাবেন।"

"আপনার মা'র বয়স কত হ'ল ?"

"মার প্রায় পঞ্চান্ন শেষ হয়ে এল। জানেন ত, এক ছেলে, সুবিধেও যত, অসুবিধেও তত। তাহ'লে ডাক্তার সাহেব, চল ওঠা যাক…"

"আমি একটু পরে যাব, গাড়ী আপনাকে আর বিমল-বাবুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

"কেন তুমি এখন যাবে না ডাক্তার ?"

"না, আমি ততক্ষণ কালীবাবুর সঙ্গে গল্প করি। বসুন কালীবাবু।"

"এগারটা বেজে গেছে।"

"তা বাজুক। আপনি আসুন। কালীবাবুর সঙ্গে একটা অন্য কথা আছে।"

গোস্বামীও ওদের সঙ্গে ডাক্তার ভার্গবের গাড়ীতে চলে গেল।

"আচ্ছা কালীবাবু, জয়ন্ত সম্বন্ধে আপনার ও-রকম একটা ধারণা মনে হচ্ছে কেন ?"

"কি ধারণা ?"

"যে, তিনি রাত্রে বাড়ী থাকেন না ?"

"অন্যায় কিছু মনে করি নি। রাত্তির দশটার সময় স্ত্রী স্বামীর বন্ধুর খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে। এতে এইটে বুঝতে হবে যে, হয় স্বামী বাড়ী থাকে না, নয় স্বামীর এই বন্ধুটার

জন্যে এঁর কিছু বিশেষ দরদ আছে। অথবা এটাও মনে করা যায় যে, স্বামীর জন্যেই তার বন্ধুর খোঁজ হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা খুব সহজ ও স্বাভাবিক নয়। স্বামীর বন্ধুর খোঁজে স্ত্রী ঘুরে বেড়ায় না—তার কোন interest—স্বার্থ না থাকলে।"

ডাক্তার খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে: "দেখুন, আপনার অনুমান অপরীক্ষিত—একে প্রমাণ বলে গ্রহণ··"

"রাখ ডাক্তার, তোমার প্রমাণ-অপ্রমাণ। এই মানবেন্দ্র দাশ—জয়ন্তর অত্যন্ত বন্ধু—ঘনিষ্ঠতা বেশী ওর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে অনেক দিনের। এই মানব তিন-চার মাস সেখানে যায় নি—এখানে ছিল না—সে আসবার পর থেকে একবারও দেখা করে নি, অথচ তার আভিজাত্য। এখানে জয়ন্তর বউ নিয়ে কথায় মুখ গুম্ হয়ে উঠল,···কেন বল তো? আমি ঠিকই বলেছি—আই স্মেল এ র‍্যাট্"

"আপনারা উকীল মানুষ, একটা কিছু পেলেই—বাতাসে ফাঁদ পাততে পারেন।"

"এ বাতাসে ফাঁদ পাতা নয় ডাক্তার, ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর। শোন একটা ভেতরের কথা বলি। জয়ন্ত অনেক টাকা ধার করেছিল হাটখোলায় শোভাবাজারে।"

"জয়ন্ত ধার করেছিল?"

"হ্যাঁ, দুলাখ টাকার কাছাকাছি। আজকে নগদ টাকা দিয়ে সেই দেনা—আর যেখানে যা দেনা ছিল, সব পরিশোধ করেছে। আমি জানি তার কারণ—আমাদের আপিস থেকে ওদের ষ্টেটের সব কাজ হয়। হঠাৎ জয়ন্ত এত টাকা শোধ করলে কি ক'রে—বিশেষত নগদ এত টাকা কোথা থেকে এল। বিষয়ও বেনামা হয় নি—সমস্তই জয়ন্তর নামে transfer অর্থাৎ re-conveyance হ'ল। বেলা দু'টোর মধ্যে transaction close হয়ে গেছে অথচ জয়ন্তকে সেখানে দেখিনি···তার বাড়ীর দারওয়ান শুধু ছিল।"

"এতে কি প্রমাণ হল যে···"

"শোন, আজ সন্ধ্যার সময় যখন জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হ'ল জয়ভেরী আপিসে, সে এক ভীষণ মূর্ত্তি—সুস্থচিত্ত নয়, এল ট্যাক্সীতে—আর রাত দশটায় তার বউ এল ভোলাদাকে খুঁজতে। আর এই আজ সন্ধ্যার সময় ভোলাদা আমার কাছে বলেছে, কলকাতার বাড়ী রেখে জয়ন্ত বিশ হাজার টাকা চায়—জয়ন্তর দেনা যে শোধ হয়েছে, এ ভোলাদাও জানে না—আমিও তাকে বলিনি। সে বললে, টাকা চাই, থিয়েটার তা না হ'লে খোলা যাবে না···টাকা চাই···আমার মনে হয়, জয়ন্তর অজ্ঞাতেই এ দেনা শোধ দেওয়া হয়েছে।"

ডাক্তার বললে: "কথাটা ভাববার মত বটে, তবে আমাদের এতে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও যেন অপ্রয়োজনে প্রয়োজন হচ্ছে।"

"আরে জয়ন্ত যে আমাদের মক্কেল···তার সম্বন্ধে আমাকে ভাবতেই হবে—কারণ সেখানে—আমার প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু টাকাটা এল কোথা থেকে? এটা ধরতে পারলাম না।"

ডাক্তারের গাড়ী ফিরে এল। কালী মিত্তির বললে: "চল ডাক্তার, তোমার গাড়ী ফিরে এসেছে। এরা আমাদের জন্যে বন্ধ করতে পারছে না।"

"চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাব।"

দু'জনে গাড়ীতে উঠতে যাবে, এমন সময় আর একখানা মোটর তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

কালী বললে: "ওই দেখ ডাক্তার সেই গাড়ী। জয়ন্তর বউ গাড়ীতে—এখন পর্য্যন্ত গাড়ী ঘুরছে। কি একটা নিশ্চয় ঘটেছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না। রাত হয়ে গেছে, ভোলাদা আর জয়ন্তর খবর নেব না কি?"

কালীকে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার তার বাড়ী চলে যাবে ব'লে গাড়ীতে উঠল।

"ডাক্তার, মানবের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?"

"বিলাত যাবার পূর্ব্বে। বিকানীর যাবার সময় দিল্লীতে আমরা এক হোটেলে পনেরো দিন ছিলাম। খুব বুদ্ধিমান ও পড়াশোনা ঢের করেছে।"

"সে-সব আমি জানি, কিন্তু···না ডাক্তার, দেখছি মানুষ চেনা বড় শক্ত।"

কথা কইতে কইতে কালীর বাড়ীর কাছে গাড়ী দাঁড়াল। কালীকে নামিয়ে দিয়ে ডাক্তার গেল বাড়ী। তখন রাত প্রায় বারটা। বৃষ্টি তখন নেই—থেমে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের গর্জ্জন ক্ষণে-ক্ষণে ধীর-গম্ভীর।

পাঁচ

সে রাত্রে মানব বাড়ী ফিরে মাকে বললে: "আমার আজ শরীরটা ভাল নেই, খেয়ে এসেছি এক জায়গায়—এ আর কিছু খাব না।"

মা কিছুতেই তাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। বললেন, "এই ক'রে ক'রে তুই নিজের শরীরটা নষ্ট করছিস।"

বয়কে ডেকে বললেন: "দুধ আর ফল নিয়ে আয়। না খেলে চলবে কেন। এই ত ক-মাস বাইরে বাইরে ঘুরে এলি। কিছুই ত করবি নি। বাড়ীতে চুপ ক'রে থাকবি—তা নয়। আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দে। লেখা-পড়া শিখে মানুষ হয়েও মানুষ হলি নি!"

"সবাই কি আর সংসারে মানুষ হয় মা! আর তোমার মানুষ হওয়া মানে—বিয়ে ক'রে মানুষ হওয়া এই ত?"

"সবাই যা করে, আমিও তাই করতে বলি। নতুন কিছু ত জানিনে। তোরা যে কি হলি, তা আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ইলাটা কলেজে প্রফেসারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, শুনেছিস্?"

"শুনেছি।"

"তা তার একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে।"

"কাল তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা-হয় করব। মা রাত হয়েছে শোওগে। আর কখনও রাত করব না মা। দেখি কাল একটাবুদ্ধি-বিবেচনাক'রে ইলার একটা বন্দোবস্ত করব।"

"কচি খোকার মত বললেই বলিস আর হবে না মা।"

মা ঘরে চ'লে গেলেন। মানব সামনের জানালাটা খুলে দিয়ে দেখলে, নিস্তব্ধ রাস্তা···পিচ্ দেওয়া, বৃষ্টির জলে-ধোয়া ইলেকট্রিকের আলো পড়ে চক চক্ করছে। আকাশে মেঘ এখনও ঘোর ক'রে আছে। জোর হওয়ায় সেগুলো দৌড়ুচ্ছে কখন কখন তার ভেতর থেকে এক ফালি চাঁদ উঁকি মারছে, আবার তখনই লুকিয়ে পড়ছে।

মানবের মনটা আজ তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। পুকুর-পাড়ের সেই ঘটনার পরদিন থেকে সে মিলনীদের বাড়ী যায় নি। তার পর দিনই বেড়াতে যাব ব'লে কলকাতা ছেড়ে চ'লে গেল। এ অসংযম যে তার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় হয়েছে—এ অন্যায়বোধ আজও পর্য্যন্ত তাকে পীড়া ও গ্লানিতে ভরিয়ে রেখেছে। সে বেশ ক'রে ভেবে দেখতে লাগল, তার মনের কোথায় এখন এ তৃষ্ণাটা লুকিয়ে আছে। চা'র-দোকানে যখন মিলনীর কথা নিয়ে কালী মিত্তির আলোচনা করতে লাগল, ঠারে-ঠোরে জয়ন্ত সম্বন্ধে যে-সব কথা বলতে লাগল, সেগুলো তার একেবারেই ভাল লাগে নি। শুধু ভাল লাগে নি নয়, সে এতদূর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, কালীকে ও-কথার আলোচনা থেকে নিবৃত্ত করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ কেলেঙ্কারীর ভয়ে থেমে গেল। ভাবলে কি জানি, এই কথা থেকে সে না আবার জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যতই হোক, এ সব কথা তার ভাল লাগছিল না। সে উঠে আসবার জন্যে ছট-ফট করছিল।

জয়ন্তকে সে সহোদরের অধিক ছেলেবেলা থেকে ভালবাসে। মিলনীর সঙ্গে তার একটা বালক-কালের প্রাণের টান। সেই টান—বড় হয়ে খানিকটা ভালবাসা আর খানিকটা মিলনীর রূপের নেশায় পরিণত হয়েছিল। তথাপি জয়ন্ত যখন মিলনীকে বিয়ে করলে, মিলনীর আগ্রহ দেখে সে চুপ ক'রে গেল—বুঝলে মিলনী তাকে চায় না, চায় জয়ন্তকে। তখন বন্ধুর প্রীতি-সংস্পর্শে মানব মিলনীর শুভ কামনাই করেছিল। কিন্তু সে-দিনকার সে সংযমহীন লোলুপ আসক্তি যখন তার নিজের ভেতর ফুটে উঠল—তখন সে নিজেই চমকে গেল। সে ছুটে কলকাতা থেকে পলায়ন করলে। আজকের এই ব্যাপার দেখে সে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। তবে কি আমিই এদের সুখের জীবনে আগুন ধরিয়েছি। তাই সে ভাবতে লাগল কি ক'রে এর প্রতিকার করি।

কলিকাতায় ফিরে এসেই সে জয়ন্ত-মিলনী সম্বন্ধে সকল সংবাদ আহরণ ক'রে রেখেছে। জয়ন্ত যে বাড়ীতে থাকে না, থিয়েটার করব বলে মত্ত হয়েছে, দস্তুর মত মাতাল হয়েছে, ভোলা রায় সেই থিয়েটারের সবার চেয়ে বড় কর্ম্মকর্ত্তা হয়েছে,—এ সব সংবাদ সে রাখে। কিন্তু মিলনী যে এই রকম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর তার এই কথা নিয়ে শহরের চায়ের দোকানে আলোচনা হচ্ছে এটা সে কোন মতেই সহ্য করতে পারে না।

কি কর্ত্তব্য? মিলনীর সঙ্গে দেখা—না, সে আমার আর মুখ নেই। জয়ন্তর সঙ্গে—আরো উল্টো হবে। ভোলাকে ডেকে, নাঃ, সেটা eccentric মাতাল, তাকে দিয়ে কিছু হবে না—তবে? মাধুরীদের বাড়ী গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করব, ব্যাপার কি? মাধুরীর মত মেয়ে হয় না। মিলনী বিদ্যুৎ, মাধুরী স্থির দীপশিখা, স্নিগ্ধ। ভুল করেছি। না—কালই মাধুরীদের ওখানে যাব। জয়ন্ত যদি সত্যিই বিগড়ে থাকে তাকে ফেরাতে হবে। কিন্তু সে কি আমার কথা শুনবে? না শুনলেও সে আমার বন্ধু, তাকে রক্ষা করাও আমার

কর্ত্তব্য। আমি নিজে গিয়ে তার কাছে সব কথা খুলে আবার বলব—যে, মিলনীর এর মধ্যে কোন অপরাধ নেই, আমার ভেতরের যে পশু-প্রকৃতি, সে-ই আমার এ অসংযমের অসতর্কতা এনেছে—আমাকে মার্জ্জনা কর—আমার অন্যায়ের জন্যে মিলনী কেন ফলভোগ করে? যে নিরীহ নির্দ্দোষী তাকে তুমি শাস্তি দাও কেন?

মানব বিছানায় গিয়ে শুতে পারলে না—হাত দুটো পিছন দিকে ক'রে সমস্ত ঘরটা সে এদিক-ওদিক পায়চারী করতে লাগল। মিলনী ও জয়ন্তর অবস্থাটা সে ভাবতে লাগল। এখন যে নতুন ক'রে সংসারে এ ভাবটা দাঁড়িয়েছে সেটার সম্বন্ধে কি করা সঙ্গত। Jealousy—ঈর্ষা! কিসের ঈর্ষা! মিলনী যদি আমার দিকে কোন নজর দিত, ঢলে পড়ত, তাহ'লে ঈর্ষার কারণ হয় ত হ'তে পারত—তার দিক থেকে সামাজিক, দৈহিক, কোন অন্যায় হয় নি, তবে সে কেন এ ঈর্ষার আগুনে প'ড়ে পতঙ্গের মত পুড়ে মরে। নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করা, তাকে অপমান করা, অত্যন্ত অন্যায়। বিনা দোষে কাউকেও কারুর অপমান করার কোন সঙ্গত অধিকার থাকতেই পারে না। মুখো-মুখি তার সামনে এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। আমার দোষ, আমার দোষ আমি ত স্বীকার করেছি, তার দোষ নেই যখন, তখন তাকে কেন দোষী করতে দেব। হয় এস্পার—নয় ওস্পার··· I will fight with tooth and nail and must fight it to a finish···প্রাণ দিয়েও এর প্রতিকার করব।

আবার খুব জোরে বৃষ্টি এল। মানব জানালা বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

* * * *

সকাল বেলা উঠে চা-টা খেয়ে মানব তার পড়ার ঘরে বসে আছে—সকালের খবরের কাগজ দিয়ে গেল। প্রথমে টেলিগ্রামগুলো চোখ বুলিয়ে গেল—খবরের কাগজে যেমন সব খবর থাকে খানিক সত্যি—খানিক মিথ্যে। তার পর দেশের খবর—কোথাও বন্যায় ভেসে গেছে, কোথাও দুর্ভিক্ষে লোকে উপবাস ক'রে মরছে—কোথাও সেবাশ্রম কত চাল, কত কাপড় দিচ্ছে—তারপর দেখলে আদালত—জাল-জুচ্চুরি নারীহরণ—একই রকম—বিশেষ বদল কিছু নেই।

এমন সময় ইলা এসে ডাকলে—'দাদা!'

"কি রে?"

"আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছ। তা ত শুনেছি। ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কলেজে পড়বি?"

"না, আমি বাড়ীতে পড়ে private-এ examine দেব।"

"বাড়ীতে পড়া কি সুবিধে হবে? আমি ত সেটা···"

"খুব হবে। বাড়ীতে মাষ্টার রাখব। তুমি খোঁজ ক'রে philosophy-র প্রফেসার ভাল মাষ্টার রেখে দাও—দেখো তুমি, আমি ঠিক পাস করব—অনার ত নেবই—first class-ও পাব। আমি ওই রকম অভদ্র ছোটলোক প্রফেসারের কাছে ও কলেজে পড়ব না। He doesn't know how to behave with a girl of aristocracy··· একটা ছোটলোক ইতর।"

"একজন প্রফেসার সম্বন্ধে ও রকম মন্তব্য প্রকাশ করাটায় কি খুব aristocracy বজায় রইল বোন্?"

"দেখ না, ছোটলোক ছাড়া কি সে?"

"বেশ, তোমাকে ভাল মাষ্টার রাখারই বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

"তুমি দেখো দাদা, আমি ভাল পাশ করব। I have so much confidence in me···"

এমন সময় মানবের মা সেখানে এসে বললেন: "পড়ে-শুনে আর দরকার নেই মনু—আমি বলছিলাম দেখে শুনে বিয়ে-থা দে—আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"মা, তুমি দেখছি সেই anti-diluvian-age-এ চলে গেছ। পাস আমি করবই।"

মানব বললে: "মা, ইলা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে examine পাশ করবে বলছে। ওর যখন ইচ্ছে তখন তাই পড়ুক··· এম-এ অবধি পাশ করায় আপত্তি কি···বিয়ে বরং আরো ভাল হওয়ার সম্ভাবনা।"

"তাহলে লেখা-পড়া শেখাটা তোদের বুঝি ভাল বিয়ে হবে বলে, আর কিছু নয় ও···লেখাপড়ার দরকার বুঝি হবে বিয়েরই জন্যে?"

"না মা, তা নয়, তবে ভাল লেখা-পড়া পাসকরা মেয়ে হওয়া একটা বড় গুণ ত—"

"সে গুণ থাকলে খুব গুণবান বর জুটবে? না হ'লে নয়?"

"তা নয়—তবে···"

"যাক, ও নিয়ে আমার তর্ক করবার দরকার নেই—

তোরা কেউই আমার কথা শুনবি নি, তুই-ই যখন শুনিস না—তখন ও ত তোর ওপর আর এককাটী সরেশ···যা ভাল বুঝিস কর্।"

মা বকতে বকতে চ'লে গেলেন।

ইলা বললে: "দাদা! শোন কেন মায়ের কথা—মা ওই রকম—আমি বি-এটা পাশ ক'রে বিলেতে অক্সফোর্ডে পড়তে যাব। হ্যাঁ দাদা, তুমি কালই মাষ্টারের ব্যবস্থা কর—বুঝলে?"

"আচ্ছা।"

ইলা বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল। মানব আবার খবরের কাগজে মন দিল। য়্যাসেম্বলীর আলোচনার বিবরণটা পড়তে পড়তে—এক পাশে জহরলালের বক্তৃতার খানিক অংশ নিয়ে কাগজওয়ালারা নানান কথা কয়েছে। তাদের টিপ্পনীগুলো পড়তে লাগল। কেউ বলছে চমৎকার, কেউ বলছে আশ্চর্য্য, কেউ বলছে জহরলালের কথা শুনলে কালই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। যাক্, খবরের কাগজ থেকে এইটে বোঝা গেল যে, তারা বলছে দেশ চায় স্বাধীনতা—তাদের যারা পাণ্ডা জহরলাল তার মধ্যে একজন। আর বোঝা গেল—দেশের মানুষ খবরের কাগজে সব চেয়ে বেশী পড়ে নারী-হরণ, তারপর দেখে সিনেমার ছবি, তারপর পড়ে ইংরেজের শাসনকে কে কে কতখানি গাল পেড়েছে—তার মধ্যে তুড়ুং ঠুকে দেবার ভয়, কার বেশী আর কার কতটা কম।

বাইরে থেকে একজন চাপরাশী এসে বললে: "সাব, এক বাবু আয়া।"

"আনে বোল।"

মহিম চক্রবর্ত্তী মানবের ঘরে এসেই বললে: "চা শেষ না কি?"

"না, তুই কি বোলপুর থেকে আসছিস্ না কি?"

"হ্যাঁ, এই সকালের গাড়ীতে।"

"এখানেই বরাবর এলি—জিনিসপত্তর? বেশ, তা বলতে হয়।"

তারপর জোরে দরওয়ান বলে ডাকলে।

দরওয়ান ছুটে এল: "হুজুর!"

"গাড়ীমে সাব্‌কো লাগেজ হ্যায়—উঠায়কে—হামারা কাম্‌রেমে···রাখ্ দেও।···"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর!" বলেই সে অগ্রসর হতেই মানব তাকে ডেকে বললে: "আরে বিন্দেশ্বরী, শোন্···বয়কে এখানে পাঠিয়ে দে।"

মহিম জিজ্ঞাসা করলে: "কি পড়ছিস্?"

"একটী মেয়ে—তার স্বামী তার সতীত্বের ওপর সন্দেহ করাতে মেয়েটী কেরোসিন জেলে আত্মহত্যা করেছে।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোলা রায় এসে ঢুকল বলতে বলতে, "ওরে মানব, তাকে ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ পড়তে দিলে আর সে আত্মহত্যা করত না।"

মহিম ভোলা রায়কে দেখেই, আরে ভোলাদা, ভোলাদা, ভোলাদা রবে চীৎকার ও লাফা-লাফি ক'রে দিলে। মানব বললে: "ভূদেববাবুর?"

"তা বুঝি জানিস নি—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে হ'লে ভূদেববাবুর প্রবন্ধই একমাত্র ওষুধ।"

"আচ্ছা ভোলা, তুই কি সব তাতেই টিপ্পনী কাটবি! কোত্থেকে আসছিস্ এখন? জয়ন্তর ওখান থেকে, না বাড়ী থেকে?"

ভোলা মুখভঙ্গী ক'রে বললে: "এমনি আসছি।"

"থাক্ গে ও-সব কথা, জয়ন্তর খবর কি?"

"জয়ন্ত থিয়েটার করছে।"

মহিম চা পান করতে করতে বললে, "থিয়েটার! জয়ন্ত থিয়েটার করছে?"

"কেন, তোমরা সবাই থিয়েটার করতে পার, জয়ন্ত পারবে না কেন?"

ক্রমশঃ

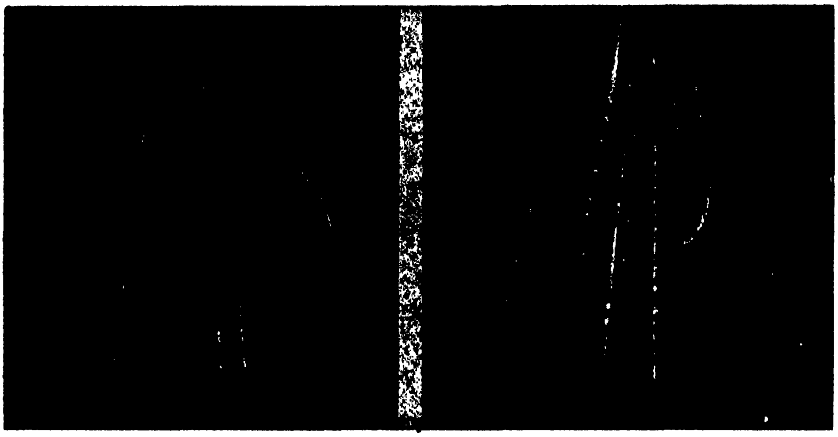


পরমাণু চূর্ণীকরণ

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল এম, এস্-সি

প্রবন্ধ

পরমাণু যে আদিবস্তুকণা নয়, এ কথা বর্ত্তমানে অনেকেই জানিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, পরমাণু বিভাগের এবং পরিবর্ত্তনের অতীত মূল বস্তুকণা। ১৮৯৬ সালে ইউরেনিয়াম্ ও থোরিয়াম্ নামক দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা ভারী মূল পদার্থের তেজসক্রিয়ার (radioactivity) আবিষ্কার হয়। সেই সময় হইতে উক্ত ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ পায় যে, পরমাণু প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্য নয় এবং তেজস্ ক্রিয়াশীল মূল বস্তুর পরমাণু আপনা আপনি ভাঙিয়া যায় বলিয়াই উহা হইতে রশ্মি বাহির হইতে থাকে। এক মূল পদার্থ যে ঐরূপ স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ অন্য এক মূল পদার্থে পরিণত হয়, সে তত্ত্বও আবিষ্কৃত হয়। ইউরেনিয়াম্ ও থোরিয়ামের ন্যায় আরও কয়েকটী মূল পদার্থের মধ্যে একইরূপ ক্রিয়া ঘটিতে থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেশীর ভাগ মূল বস্তুরই রূপান্তর হয় না। কোন কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় কি-না তাহা সেই সময় হইতে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার বিষয় হইয়া ওঠে। এই কার্য্যে পরমাণুর গঠনসংক্রান্ত যে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড সেই ধারণা পরমাণুর ক্ষেত্রে আনিয়া দেন। ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এই অনুমান করেন যে, প্রত্যেক প্রকার পরমাণুর আসল বস্তু উহার অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস্। এই নিউক্লিয়াস যোগ-তড়িতবিশিষ্ট এবং ভারে প্রায় গোটা পরমাণুর সমান। যে পরিমাণ যোগ-তড়িত শেষ পর্য্যন্ত নিউক্লিয়াসে বর্ত্তমান থাকে তাহারই উপর পরমাণুর গুণ নির্ভর করে। সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হাইড্রোজেনে উহার মাত্রা ১, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যোগ-তড়িতের পরিমাণ ১ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়ামে ৯২। অপর মূল পদার্থগুলি মধ্যবর্ত্তী সংখ্যার সহিত জড়িত।

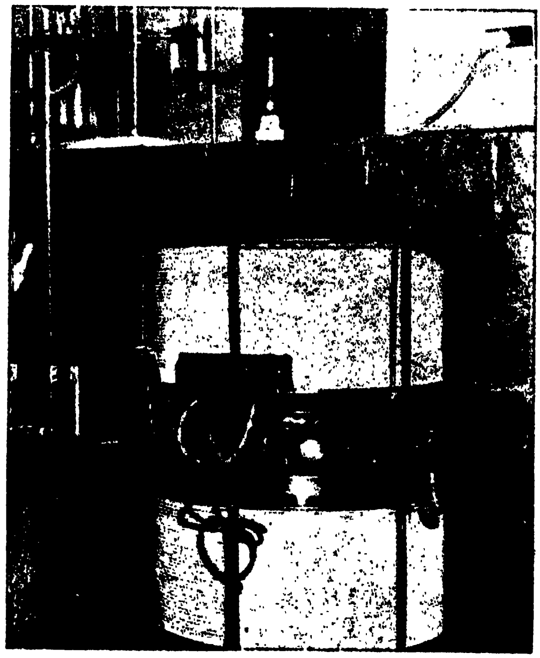


নাইট্রোজেনের মধ্যে আলফা কণিকার গমন-পথের চিত্র

পরমাণুর উক্তরূপ গঠন হইতে সহজেই অনুমান করা গেল যে, পরমাণুকে রূপান্তরিত করিতে হইলে উহার কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসকেই আঘাত করিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। হয় নিউক্লিয়াসের তড়িতের পরিমাণ কিম্বা উহার ভার অথবা দুইটী একসঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিবার উপায় বাহির করিতে পারিলে তবেই পরমাণু ভাঙার চেষ্টা সফল হইবে। এ কথাও অনুমান করা কঠিন হইল না যে, বিশেষ রূপ শক্তি-সম্পন্ন গুলি ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের আঘাত দ্বারা নিউক্লিয়াস দেহ ছিন্ন করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ কয়েক প্রকার গুলি সম্প্রতি পরমাণু ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। উহাদের দ্বারা পরমাণু জগতে এখন যে ধ্বংস-সাধন করা যাইতেছে পৃথিবীর কোন দানবীয় শক্তি বর্ত্তমানে কোন শত্রুরাজ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী কৃতিত্বপূর্ণ ধ্বংসলীলা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

বস্তুর রূপান্তর সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে যে সকল আদি কণার দ্বারা পরমাণু গঠিত সেগুলির সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এইগুলি হইতেছে,—(১) ইলেক্‌ট্রন—ইহা বিয়োগ-তড়িতবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা, হাইড্রোজেন পরমাণু ইহা অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ বেশী ভারী। সূর্য্যের চারিদিকে যেমন গ্রহগণ ঘুরিয়া থাকে, একমতে ইলেক্‌ট্রনগুলি সেইরূপ কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চারিপাশে চক্রপথে ঘুরিয়া থাকে। একটী হাইড্রোজেন পরমাণু একটী মাত্র ইলেক্‌ট্রনের অধিকারী। পরমাণু যত ভারী হইতে থাকে উহা চারিপাশের ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও তত বাড়িয়া যায়। (২) পজিট্রন-ইহা ইলেক্‌ট্রনের ন্যায় একই রূপ বস্তুকণা,প্রভেদের মধ্যে পজিট্রনের মধ্যে যোগ-তড়িত বর্ত্তমান। আমাদের জগতে ইলেক্‌ট্রন সংখ্যায় খুব বেশী, পজিট্রনের সংখ্যা অল্প। দূর জগতে সম্ভবত পজিট্রন বেশী আছে। (৩) প্রোটন—ইহাও যোগ-তড়িতবিশিষ্ট কণিকা এবং ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ বেশী ভারী, অর্থাৎ ইহার ওজন হাইড্রোজেনের ওজনের প্রায় সমান। সকল প্রকার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন বর্ত্তমান। একটী হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটীমাত্র প্রোটন থাকে। উহার মধ্যে তড়িতের পরিমাণ ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রনের তড়িতের সমান। (৪) নিউট্রন-ইহা প্রোটনের সমান ওজনের তড়িতবিহীন কণিকা। প্রোটনের ন্যায় নিউট্রন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপাদান। ১৯৩২ সালের পূর্ব্বে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াস আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইলেকট্রন ও প্রোট্রন দ্বারা পরমাণুসকলের নিউক্লিয়াস গঠিত বলিয়া মনে করা হইত। নিউক্লিয়াসে আদৌ যদি কোন ইলেক্‌ট্রন থাকে তবে তাহা নিউট্রনের সহিত জড়িত হইয়া আছে। ইহাই এখনকার সাধারণ মত। নিউট্রন ও প্রোটন দুইটীই সম্ভবত আদিবস্তুকণা নয়। নিউট্রন—ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংযোগে উৎপন্ন—কিম্বা প্রোটন—নিউট্রন ও পজিট্রনের মিলনে সৃষ্ট।

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড প্রথম কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু ভাঙ্গিতে সমর্থ হন। তিনি আলফা কণিকার দ্বারা আঘাত করিয়া উহাকে অক্সিজেনে পরিবর্ত্তিত করেন। রেডিয়াম হইতে স্বতনির্গত আলফা কণিকার পরিচয় গ্রহণযোগ্য। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুই আলফা কণিকা। উহার ভার (mass)-৪ (হাইড্রোজেনের ভার ১ ধরা হয়), দুই মাত্রার যোগ-তড়িত উহাতে বর্ত্তমান থাকে। আদিকণা না হইলেও আলফা কণিকার অংশগুলি এমনই জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে যে, সেগুলি সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। অনেক পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কণিকাসমূহ আলফা কণারূপে বর্ত্তমান এবং পরমাণু চূর্ণ হইবার কালে ঐগুলি বাহির হয়। আলফা কণিকার আঘাত দ্বারা পরমাণু কি ভাবে ভাঙিয়া পড়ে একটী তুলনা দিলে তাহা সহজে বোঝা যাইবে: প্রতি পরমাণু যে একটী ক্ষুদ্র সৌরজগত সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৬০০ কোটী মাইল ব্যাসবিশিষ্ট সৌরজগতের



পরমাণু চূর্ণকারী সাইক্লোট্রন—ইহাতে ২৯ লক্ষ ভোল্ট উৎপন্ন হয়

কেন্দ্রে আছে সূর্য্য এবং গ্রহগুলি উহার চারিদিকে দূরে দূরে ঘুরিতেছে। বিরাট শূন্যতায় পূর্ণ, পাশাপাশি অবস্থিত অনেকগুলি সৌরজগতকে যদি সূর্য্যের আকারের কতকগুলি গোলা প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল বেগে যাইয়া আঘাত করে তবে সহজেই ধারণা করা যায় যে, বেশীর ভাগ গোলা সূর্য্য সকলকে অনাহত রাখিয়া সোজা চলিয়া যাইবে। উহাদের মধ্যে দুই-একটী মাঝে মাঝে গ্রহবিশেষকে চুরমার করিয়া দিয়া আপন পথে চলিবে। কদাচিৎ কোন গোলা একটী সূর্য্যের উপর গিয়া পড়িবে। এই গোলা যদি

আঘাতে ভাঙিয়া না যায় তবে উহা পূর্ব্বপথে না গিয়া বাঁকিয়া চলিবে। দুইটীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে বিশেষ প্রকার ধ্বংসের ব্যাপারও ঘটিতে পারে। রেডিয়াম হইতে স্বতনির্গত আল্‌ফা কণিকার গুলি বর্ষণে পরমাণু জগতে একইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। বেশীর ভাগ আল্‌ফা কণিকা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত না করিয়া সোজা চলিয়া যায়। দুই-একটী মাত্র কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসে ধাক্কা খাইয়া বাঁকিয়া পড়ে। কদাচিৎ একটী আল্‌ফা কণিকা ধ্বংস সাধনের পর নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হইবার পর নূতন রকমের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ৪—ভারের একটী আল্‌ফা কণিকা ও ১৪ ভারের একটী নাইট্রোজেন-নিউক্লিয়াসের মিলনে ১ ভারের একটী প্রোটন ও ১৭ ভারের একটী অক্সিজেনের সমধর্ম্মী পরমাণুর (isotope) জন্ম হয়। উইলসন ক্লাউড চেম্বারের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ আল্‌ফা কণিকা পরমাণুর মধ্যস্থিত মূল বস্তুকে আঘাত না করিয়া উহার



ডিউটিরন কণিকার দ্বারা লিথিয়াম পরমাণু চূর্ণ হইবার সময় যে আলফা কণিকা বাহির হইয়াছে তাহার গমন-পথ

চারি পাশের বিরাট ফাঁক দিয়া সোজাসুজি চলিয়া গিয়াছে এবং কেবলমাত্র দুই-একটী কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসে ঘা খাইয়া ফিরিয়া পড়িয়াছে। কণিকাসমূহের ফটোগ্রাফে কোন কোন গতিপথের দ্বিধা বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। নাইট্রোজেন পরমাণুর সহিত আল্‌ফা কণিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে যে প্রোটন নির্গত হয় তাহা ঐ ভাগ দুইটীর সরুটী দিয়া চলিয়া থাকে এবং নাইট্রোজেন পরমাণু ও আল্‌ফা কণিকা যুক্ত হইয়া মোটা রাস্তাটী ধরিয়া চলে (প্রদর্শিত ফটোগ্রাফে উহা দেখা যাইবে)।

রাদারফোর্ড সহকর্ম্মীর সাহায্যে এইভাবে আটটী মূল পদার্থকে রূপান্তরিত করেন। ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত পরমাণু ভাঙার কাজে কেবলমাত্র আল্‌ফা কণিকা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে আল্‌ফা কণিকার দ্বারা বেরিলিয়াম নামক মূল পদার্থ ভাঙিবার সময় দেখা গেল যে, ভগ্ন পরমাণু হইতে সাধারণত যেরূপ প্রোটন বাহির হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ হইতেছে না, অন্য একটী নূতন কণা নির্গত হইতেছে। উহারই নাম দেওয়া হয় নিউট্রন। এই নিউট্রনকেও এখন পরমাণু চূর্ণকারী গুলিরূপে ব্যবহার করা হইতেছে। দ্রুতগামী (fast) নিউট্রন দ্বারা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির পরমাণু ভাঙিয়া ফেলা সম্ভবপর হইয়াছে। রাদারফোর্ড পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াও আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে অক্সিজেনের রূপান্তর সাধন করিতে পারেন নাই। প্রথম সময়কার পরীক্ষায় মনে হইয়াছিল যে, পরমাণু হইতে প্রোটন বাহির হইবার পর উহার যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল তাহা স্থায়ী! কিন্তু কুরী-জলিয়েটের গবেষণায় প্রমাণিত হইল, অনেক ক্ষেত্রেই রেডিয়ামের ন্যায় স্বতরশ্মিবিকীরক অস্থায়ী (unstable) মূলবস্তু গঠিত হইতেছে। ঐগুলি হইতে ইলেক্‌ট্রন এবং কখন কখন পজিট্রন আপনা আপনি বাহির হয়, ধীরগামী (slow) নিউট্রন পরমাণুর মধ্যে উক্তরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার কাজে বিশেষ উপযোগী। নিউট্রন তড়িতবিহীন হওয়ায় নিউক্লিয়াসের উপর উহার ক্রিয়া করার বিশেষ সুবিধা আছে। ধীরগামী নিউট্রন, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম এই দুইটী ভারী পদার্থকে আরও বেশী ভারী (atomic number higher than 92) দ্রব্যে পরিণত করে। রেডিয়াম্‌-ধর্ম্মী কৃত্রিম-দ্রব্যগুলির জীবন অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী নয়। নিউট্রন ও আল্‌ফা কণিকার ন্যায় প্রোটনের সাহায্যেও পরমাণুবিশেষ ভাঙা যাইতেছে। বোরন নামক মূল পদার্থ প্রোটনের আঘাতে কার্ব্বনে পরিণত হয়। পরমাণু ভাঙার কাজে ব্যবহৃত চতুর্থ প্রকারগুলির নাম ডিউটিরন। উহা অধুনা বিখ্যাত ভারী হাইড্রোজেনের (heavy hydrogen) কেন্দ্রীয় বস্তু। দ্রুতগামী ডিউটিরনগুলির সাহায্যে বিসমাথ নামক মূল পদার্থের পরমাণু হইতে রেডিয়াম-'ই'র পরমাণু উৎপাদন করা যায়। হাইড্রোজেন ও ভারী হাইড্রোজেনের মধ্য দিয়া তড়িত চালাইয়া প্রচুর পরিমাণ প্রোটন ও ডিউটিরন পাওয়া যাইতে পারে।

উপরোক্ত কণিকাগুলিকে খুব বেশী ফলদায়ক করিতে হইলে উহাদের শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজন। বেশী শক্তি

উৎপাদন করিবার মত যন্ত্রের উদ্ভাবন হইতেছে। তড়িত-যন্ত্রের ভোল্টেজ বাড়াইবার জন্য কেম্ব্রিজে কন্‌ডেন্সার ও রেকিটিফায়ারের ব্যবহার চলিতেছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ই, ও, লরেন্স সাইক্লোট্রন নামক নূতন যন্ত্রে স্তরে স্তরে শক্তি বাড়াইয়া ভারী হাইড্রোজেন কণাকে এ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ কেলী ভোল্ট দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ একটী যন্ত্র ছবিতে দেখান গেল। ভ্যান্‌ডিগ্রাফ্‌ তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন যন্ত্রে শীঘ্রই কোটী ভোল্ট উৎপাদন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবাবিষ্কৃত ব্যোমরশ্মির কতকাংশ একশত কোটী ভোল্টেরও বেশী শক্তি ধারণ করে। বস্তু-কণার সাহায্য না লইয়াও কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে হাল্‌কা পরমাণু ভাঙিতে পারা যায়। এক কোটী সত্তর ভোল্ট শক্তির গামা রশ্মির দ্বারা এ পর্য্যন্ত কতকগুলি পরমাণু ভাঙা সম্ভবপর হইয়াছে।

পরমাণু চূর্ণ করার প্রসঙ্গে নিউক্লিয়াসের আকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে অনুমান করা যাইবে—কিরূপ ক্ষুদ্রাদি-ক্ষুদ্র বস্তুকণা লইয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। এক ফোঁটা জলকে বাড়াইয়া যদি পৃথিবীর আকারে করা হয় তখনও পর্য্যন্ত উহার মধ্যেকার কোন নিউক্লিয়াস খালি দেখা যাইবে না। পরমাণু ভাঙা পরীক্ষায় মাত্র পরমাণু জগতেরই জ্ঞানলাভ হইতেছে তাহা নহে—উহার মধ্য দিয়া জড়জগতের প্রকৃত রূপ ক্রমে ধরা পড়িতেছে।

ভৃত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রভু হইবার নাহিক আমার শক্তি সামর্থ্য,
যুগ যুগ ধরি পরিচারক আর আমিই যে ভৃত্য।
মনু রে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আবদার,
কোলে ক'রে আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার।
রামভদ্রের হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন,
'দাদা' বলে মোর গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জ্জুন।
আমি যাই আসি, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন,
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

২

উমার বিয়ের টোপর এনেছি, আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর,
অক্ষয় শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শত ভার।
দ্বিরাগমনেতে সঙ্গে গিয়েছি শ্রীবৎস-চিন্তার।
পাতিয়া দিয়েছি বেদব্যাসের আমিই অজিনাসন,
জন্মান্তর ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।
মনিব ছিলেন কালিদাস মোর ছিনু তাঁর অনুরাগী
তুলট কাগজ কিনিয়া এনেছি শকুন্তলার লাগি।

৩

কৃষ্ণদাসের পাদুকা বহেছি ধোয়ায়েছি পদ আমি,
মোর হাত হতে হরিতকী ল'ন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি,
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের বেড়ার বাখারী আমিই এনেছি বহি
মহামায়া এলো কন্যা সাজিয়া দেখিয়াছি দূরে রহি।
ধনী মহাজন, রাজা মহারাজ হিংসা করিনে কারু
গর্ব্ব আমার বিদ্যাপতির বহেছি গামছা-গাড়ু।

৪

আনন্দে সহি' শত লাঞ্ছনা, হয়েও হইনে দেক্‌
জীবনে হয়েছে শত মহতের পদরজ অভিষেক।
অকিঞ্চনের কি মহাভাগ্য, মন্দির তরে গেহ,
পরশমণির পরশে তাহার কাঞ্চন হ'ল দেহ।
গরুড়ের আমি জ্ঞাতি ও দায়াদ, এ যে আনন্দ ভারী,
ভৃত্য হয়েই হয়েছি নিত্য অমৃতের কারবারী।
আমি আসি যাই শুধু সেবা করি সদা প্রফুল্ল মন
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

বিক্রমপুরের ও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রবন্ধ

বাল্যকালে ভারতচন্দ্রের "হরগৌরীর" রূপ বর্ণনার অতি সুন্দর কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছিলাম্। অমন মধুর কবিতাটি এখনও মনে পড়ে :—

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে,
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে।
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণি ফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হাড় উজালা
আধ গলে শোভে গরল কালা
আধই সুধা মাধুরী রে॥

এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ,
এক হাতে শোভে মণি কঙ্কণ
আধই তাম্বুল পূরি রে॥
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন,
কজ্জলে উজ্জল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন,
আধই সিন্দূর পরি রে॥
কপাল লোচন আধই আধে,
মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক আরাধে
হইল প্রণয় করি রে॥
দোঁহার আধ আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে॥
এক কানে শোভে ফণি মণ্ডল,
এক কানে শোভে মণি কুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধ কস্তূরী রে॥···ইত্যাদি।

এই সুন্দর বর্ণনার সহিত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির অপূর্ব্ব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, কবি যেন একটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশে আমার পূর্ব্বে কেহ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং প্রবন্ধও লিখেন নাই।

সে ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্ষার সময় যখন বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন বেলাশেষে পুরাপাড়া নামক গ্রামের মধ্যবর্ত্তী খালটি দিয়া যাইবার সময় এক বাড়ীর পাশের একটি ডোবার নিকট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় সুন্দর একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। অমনি নৌকা ভিড়াইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী সেই অযত্ন-বিক্ষিপ্ত শ্রীমূর্ত্তিখানি আমাকে উপহার দিতে এতটুকুও ইতস্তত করিলেন না।

দেখিবামাত্র মূর্ত্তিখানি যে অর্দ্ধনারীশ্বরের তাহা চিনিতে পারিলাম। কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, কি সুন্দর সুগোল অবয়ব, কি কোমলতা, কি শিল্পনৈপুণ্য, দেখিবামাত্রই মনে হইল, এই বুঝি শিল্পী মূর্ত্তিটি গড়িতে গড়িতে কোথাও চলিয়া গিয়াছে!

বিক্রমপুরে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব শিল্পধারা ছিল। বারেন্দ্রভূমের ধীমান্ ও বীতপালের ন্যায় বিক্রমপুরেও একটি শিল্পীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিক্রমপুরেই এই সকল মূর্ত্তি গড়িত। তাহারা রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের আশেপাশেই বাস করিত। তাহাদের কথা একদিন বলিব।

বাঙ্গলাদেশে সেন-রাজগণের শাসনকালে, শৈব সেন-রাজগণ অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের অর্চনা করিতেন। বল্লাল সেনদেবের তাম্রশাসনে প্রথমেই "ওঁ নমঃ শিবায়" সন্ধ্যা-তাণ্ডব - সম্বিধান - বিলসন্নান্দী - নিনাদোর্ম্মিভি-নির্ম্মর্য্যাদর-সার্দ্ধকে দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধ নারীশ্বরঃ। পাঠের পরেই অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের বর্ণনা বা স্তুতি আছে।—"যাঁহার

একার্দ্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে এবং অপরার্দ্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভবেগে বিবিধ অভিনয় সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে ; সন্ধ্যা তাণ্ডবনৃত্যে বিকশিত আনন্দ-নিনাদ-লহরী-লীলার অকূল রসসাগর [সেই] অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

হেমাদ্রিকৃত "চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি" নামক গ্রন্থের ব্রতখণ্ডেও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। তাহা এই :—

"অর্দ্ধং দেবস্য নারী তু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণা।
অর্দ্ধস্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্বলক্ষণভূষিত॥

এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে যে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের পূজাবিধি প্রচলন ছিল, তাহা অনুমিত হয়, তবে আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গলার অন্য কোনও স্থান হইতেই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।*

বিক্রমপুরে যে সকল দেউলবাড়ী আছে, তাহার মধ্যে পুরাপাড়ার দেউলবাড়ীটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দেউল-বাড়ীর নিকটেই "তাম্রকুণ্ড" নামক গভীর কুণ্ডের বা ডোবার পাশে এই মূর্ত্তিটি ছিল। আমি তাম্রকুণ্ডের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম একথা প্রথমেই বলিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইল পুরাপাড়ার দেউলবাড়ী হইতে একটি উমামহেশ্বর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। —"মৎস্যপুরাণ"-এ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির স্তব আছে। তাহা এইরূপ—

অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারী রূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ॥
উমার্দ্ধে তু প্রদাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা বিশেষতঃ॥
স্তনভারসতার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েত।

ইত্যাদি।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন। একবার ভাল করিয়া দেখুন—ঊর্দ্ধে বামদিকে ফণিময়-জটাজুট-বিলম্বিত জটাজাল কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র। বামদিকে সিন্দূরবিন্দু, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, কর্ণে কর্ণভূষা। অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছে, তবু কি তার বিচিত্র গঠননৈপুণ্য। আর দক্ষিণে ফণি-কুণ্ডল। কণ্ঠে নরকপাল-মালা—বামে মণিময় মালিকা।


বিক্রমপুরের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি

দক্ষিণে স্থূল যজ্ঞোপবীত, বাম কণ্ঠে পার্ব্বতীর লম্বিত দোদুল্যমান মণিমালার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন। যদি অভঙ্গ থাকিত, তাহা হইলে সে হাতে থাকিত ত্রিশূল। বাম হস্তটিও সম্পূর্ণ ভগ্ন। যদি

* Up to now, however, so far as known, only one image of Ardhanariswara has been discovered in East Bengal. Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum. p.—130. N. K. Bhattasali, M. A.

ইহা অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম বাজু ও বলয় এবং অন্যান্য অলঙ্কার। বামে পীন স্তন। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে আবৃত। দক্ষিণে মুক্ত ও বিশাল বক্ষস্থল, পুরুষোচিত দৃঢ়তার সহিত খোদিত। আর পরিধানে বাঘছাল। কটিতে নরহস্ত। উর্দ্ধ লিঙ্গ। বামে স্তরে স্তরে মাল্যাকারে ভূষণসমূহ দোলায়মান।

মূর্ত্তিটির পদদ্বয় ভগ্ন। যদি মূর্ত্তিটির পদযুগল অভগ্ন থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে দক্ষিণ পদখানি বিকশিত শতদলোপরি সুরক্ষিত আর বাম পদখানি থাকিত লোহিত রাগরঞ্জিত পদালঙ্কার শোভিত শতদলের উপর।

আমার সংগৃহীত "অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তির বদনমণ্ডলও নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এ জন্য মুখমণ্ডলের অনেকখানি শোভার হ্রাস পাইয়াছে। তবু কি মসৃণ, কি কোমল! এই মূর্ত্তিখানি যদি অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে এই মূর্ত্তিখানির সৌন্দর্য্য শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হইত। এখনও এই মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বের সৌন্দর্য্য ভাস্করশিল্পানুরাগী ব্যক্তিরই চিত্ত মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে।

কতদিন হইতে "অর্দ্ধনারীশ্বর"-এর কল্পনা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন। "কালিকা-পুরাণ"-এ—হরগৌরীর এইরূপ পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গ প্রাপ্ততা সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। 'কালিকাপুরাণ'—মার্কণ্ডেয় কথিত উপপুরাণ। এই উপপুরাণে না আছে এমন বিষয় নাই—ইহাতে আছে ধর্ম্মোপদেশ, ঐতিহাসিক উপাখ্যান, রাজ-কর্ত্তব্য ইত্যাদি অনেক কিছু। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ পুরাণ আদরে গৌরবে সমাজেও সকল মহাপুরাণেরই সমকক্ষভাবে প্রচলিত। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব কলিকালের অশ্বমেধ শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা অধিকাংশস্থলেই এই মতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।" কাজেই 'কালিকাপুরাণ'-এর এই কাহিনীটি উপেক্ষণীয় নহে।

কালিকাপুরাণের একচত্বারিংশোঽধ্যায়ে আমরা শুনিতে পাই নারদ হিমালয়কে বলিতেছেন :—

> অনয়ৈব গিরিশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ॥
> ভবিষ্যতি চ সৌহার্দ্দাজ্জ্যোৎস্নয়ৈবামৃতাংশুনঃ।
> শরীরার্দ্ধং হরস্যৈষা করিষ্যতি নিজাস্পদে॥

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কার্য্য করিবেন এবং ইঁহার দ্বারাই শিব অর্দ্ধনারীর ঈশ্বর হইবেন। শিবের দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য হইবে এবং দেবী ভগবানের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার আস্পদ প্রাপ্ত হইবেন।"

আবার কালিকাপুরাণের পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ে এক স্থানে দেখিতে পাই, মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব সগর রাজাকে উপদেশ প্রসঙ্গে—কি কারণে কালী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন, কি কারণেই বা কালী গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

> শ্রূয়তে হিমবৎপুত্রী শম্ভুসঙ্গতমানসা।
> ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভিঃ শম্ভুনা সা প্রযোজিতা॥
> ততোঽতিমহতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
> শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী॥
> অর্দ্ধনারীশ্বরস্তেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ॥

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শম্ভুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে বহু যত্নবশতঃ শম্ভু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাহার পর শম্ভুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী তাঁহার অনুমতিক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্য সেই অবধি শঙ্কর অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন।

আর একটি উপাখ্যান এইরূপ :—

> অথৈকদা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা।
> আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্॥
> স্ফটিকাভ্রসমে স্বচ্ছে হৃদি শম্ভোর্মনোহরে।
> যোগিজ্ঞানাদর্শতলে চার্ব্বঙ্গীং প্রতিবিম্বিতাম্॥
> আত্মচ্ছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে।
> দদর্শ বণিতারূপাং স্মিতবক্ত্রাং মনোহরাম্॥
> ভ্রান্ত্যা দৃষ্ট্বার্থ পার্ব্বত্যাস্তদা জ্ঞানমজায়ত।
> কৃতসঙ্গোঽপি গিরিশঃ কিমন্যাং বণিতাং দধৌ॥
> মায়য়া স্থাপিতাং গাত্রে বীক্ষন্তীং কুটিলক্ষ মাম্
> ইতি তস্যাস্তদা বক্ত্রং মলিনং ভ্রূকুটিযুতম্।
> বভূব বৃষকেতুশ্চ শ্যাম উৎপাতকো যথা॥
> সা দৃষ্ট্বাথ তদা ছায়াং বিষ্ণুমায়া বিমোহিতা।
> অপহ্নুতং গিরেঃ শৃঙ্গং মানা দ্রোযাদ্বিবেশহ॥

ইত্যাদি।

একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে।

গিরিজা—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শতল শম্ভুর বক্ষঃস্থলে বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যযুক্ত মনোহর-বদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞানে এই বুদ্ধি হইল,—গিরিশ সত্য করিয়াও পুনর্ব্বার মায়া দ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটিলা এবং চঞ্চলা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলেন!! এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হইল; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গ-পাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন। পার্ব্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়াকে দর্শন করতঃ প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ জানিয়া লইলেন, তখন শঙ্কর—পার্ব্বতী যে বিস্তীর্ণ এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত নিজের ছায়াকেই দর্শন করিয়াছেন সে বিষয়টি নানাভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

তখন পার্ব্বতী বলিলেন—"যেরূপে আমি ছায়ার ন্যায় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন, আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি।"

শিব তখন গৌরীর প্রীতি সাধনার্থ অর্দ্ধনারীশ্বর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ভাবিনি! যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর। মনোহরে! তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে। * * * দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়; আমি আপনার অর্দ্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়।" এইরূপ বলিয়া হরের অভিপ্রায় জানিয়া জগন্ময়ী দেবী

পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ রুচা।
কালী ভূত্বা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধঞ্চ শাঙ্করম্॥

এবং শিবও গৌরীর প্রীতি সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্দ্ধদ্বয় গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। এইভাবে হর-গৌরী পরস্পর দেহার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বররূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শোভা কিরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত হইয়াছিল, সেই বর্ণনা "কালিকাপুরাণ" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অর্দ্ধং ধম্মিল্লসংযুক্তং জটাজুটার্দ্ধযোজিতম্।
একস্মিন্ শ্রবণে ভোগী ভাগে জাম্বুনদার্চ্চিতম্॥
কুণ্ডলং শ্রবণেঽন্যস্মিন শীর্ষে তস্যা ব্যরাজত।
অর্দ্ধং মৃগাক্ষি চান্যার্দ্ধং বৃষভাক্ষি ব্যজায়ত॥
অর্দ্ধ স্থূলনসং চারু তিলপুষ্পনসং পরম্।
দীর্ঘশ্মশ্রু তথৈবার্দ্ধমর্দ্ধং শ্মশ্রুবিবর্জ্জিতম্॥
আরক্তচারুদর্শনং রক্তৌষ্ঠমেকতস্তথা।
অপরং শুক্লবিপুলং দীর্ঘাকৃতিরদং পরম্॥
অর্দ্ধনীলগলং চার্দ্ধমপরং হার সংযুতম্।
অর্দ্ধং কঙ্কণকেয়ূরযুক্তবাহু তথাপরম্॥
নাগকেয়ুর সংযুক্তংস্থূলে বাহু নিরূর্ম্মিকম্।
অর্দ্ধং বিলোলসুভুজং করিহস্তভুজং পরম্॥
একত্র সোর্ম্মিকাশাখা করস্যান্যত্র তাং বিনা।
একস্তনন্ত হৃদয়ং রোমাবল্যর্দ্ধ সংযুতম্॥
রম্ভাস্তম্ভ সমানোরু সুপার্ষ্ণি মৃদু পাদকম্।
একং তথাপরং স্থূলং সংহতোরুপদাম্বুজম্॥
একং চারুমৃদু স্থূলজঘনং সুমনোহরম্।
তথাপরং দৃঢ়কটি সংহতোর্দ্ধাপদাদ্বয়ম্॥
একং বৈয়াঘ্রচর্ম্মোমিযুক্তং ভূতিবিলেপনম্।
অপরং মৃদু কৌশেয়বসনং চন্দনোক্ষিতম্॥
এবমর্দ্ধং তথা জাতং যোষিল্লক্ষণসংযুতম্।
অপরং বলবদ্ভূরি সুগূঢ়ং পুরুষাকৃতি॥
এব বমর্দ্ধং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী।
হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কাসিকোপমা॥
তস্যাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতদর্দ্ধসংযুতম্।
যেনোপমেয়ং তন্নাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে॥
সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্ত বিশদস্তরুঃ।
অমোঘরা যথাবল্যা তৌ চাপি যযতুর্নহি॥

বহুধা চ পৃথক্ তেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন॥

তাঁহার অর্দ্ধভাগ সংযত কেশপাশযুক্ত, অর্দ্ধভাগ জটাজুট-বিভূষিত। এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপর ভাগে শ্রবণ কুণ্ডলযুক্ত। অর্দ্ধ মৃগলোচন, অর্দ্ধ বৃষভাক্ষ, নাসিকা এক দিকে স্থূল, অপর দিকে তিলকুসুম সদৃশ্য। এক ভাগ দীর্ঘ-শ্মশ্রুযুক্ত অপর ভাগ শ্মশ্রু রহিত; এক দিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুল নেত্র ও দীর্ঘ দন্ত; অর্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে ভূষিত। তাঁহার এক বাহু কনকময় কেয়ুর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ূরযুক্ত, স্থূল ও দীপ্তিহীন; এবং এক বাহু মৃণাল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকরসদৃশ স্থূল; একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে; বক্ষের অর্দ্ধভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ লোমাবলীবিরাজিত। এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু-সদৃশ, পাঞ্চি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপরপার্শ্বের উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। একটি জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ। দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দনসিক্ত মৃদু-বস্ত্র শোভিত;—এইরূপ অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শম্ভুর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! কালীর শরীরার্দ্ধ হরদেহার্দ্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার উপমার উপযুক্ত বস্তু বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল। হে নরেশ্বর! সন্তান, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একান্ত বিশদ তরুগণ পৃথক্রূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইল না। শিব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত হইলেন।

এই বর্ণনার সহিত আমাদের এই অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির অপূর্ব্ব মিলন দেখা যাইবে। শিল্পী ধ্যানবিভোর হইয়া যেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী—বর্ত্তমানে পরিচিত রামপালের বিস্তৃত সীমা মধ্যে পুরাপাড়া দেউল অবস্থিত। দেউল বলিতে দেবালয় বুঝায়। "দেবকুল" শব্দ হইতে "দেউল" শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। "দেবকুলিকা' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির।" অধ্যাপক কিলহর্ণ "দেবকুলিকাকে" ক্ষুদ্র দেবমন্দির [small temple] বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। *

বিক্রমপুর রামপালের চারিদিকেই দেউল আছে। পুরাপাড়ার 'দেউল'—এক সময়ে বেশ বড় একটি স্তূপ ছিল। এখন অনেকটা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেউলের বা দেবালয়ের কাছেই ছিল বৃহৎ তাম্রকুণ্ড। তাম্রকুণ্ড শব্দের অর্থ সকলেরই জানা আছে। দেবপূজার জন্য যে তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই তাম্রকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। পূজার পর বিল্বপত্র ও পুষ্প ইত্যাদি ঐ কুণ্ডটির মধ্যে সম্ভবতঃ ফেলা হইত, ঐ জন্য আজও ঐ স্থানটি তামাকুণ্ড নামে পরিচিত।

একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে যখন সেন রাজাদের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ নৃপতি বল্লাল অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের সুন্দর এই শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিয়া উহা পুরাপাড়া বা "পুরোহিত পাড়া"য় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর কোন এক দুর্দ্দিনে হয় মানুষের হাতে কিংবা কোন দৈব-দুর্বিপাকে ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইলে মূর্ত্তি বেদীপীঠ হইতে ভূলুণ্ঠিত হইল, তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশ কে জানে কে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শৈব সেন-রাজগণের ধ্যানধারণার আশ্রয় এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই একটি মূর্ত্তি ব্যতীত বাঙ্গলা দেশের আর কোথাও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসনে নৃত্যোৎফুল্ল অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের স্তুতি দেখিতে পাই।

সেনরাজ বংশীয়গণের বিশেষতঃ বল্লালসেনের বিক্রমপুর যে সর্ব্বপ্রধান রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ এখন আর সন্দিহান হইবেন না।

বাঙ্গলা দেশে এই একটি মাত্র 'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে। আমি ঢিচিং যাদুঘরে একটি অর্দ্ধ-ভগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়াছি। তাহার পরিচয়ও 'ভারতবর্ষ-এ কিছুদিন পূর্ব্বেই দিয়াছি।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধ্যানধারণার সামগ্রী। একজন

* গৌড়লেখমালা—২৫ পৃষ্ঠা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নৃতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত ইহার আদর্শকে যৌনমিলনের বা দাম্পত্যমিলনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা বলিয়া বলেন। এ বিষয়টি পণ্ডিতগণের আলোচনার বিষয়। আমরা সাধারণভাবে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের সহিত পাঠকগণের পরিচয় করাইয়া দিলাম।

এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

অনেকে হয়ত জানেন না যে, সর্ব্বপ্রথম যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে চিত্রশালার সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহারও অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমি শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এবং আমার উপহৃত "দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বর" মূর্ত্তিটি আজিও সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালার গৌরবস্বরূপ হইয়া আছে।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তদ্‌রচিত Indian Images নামক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: A type of Siva and Parvati in amorous posture is known as Ardhanariswar. Its description is—one-half of Siva has the form of a goddess. The part representing Siva has plaited hair, a crescent, and a trident. The other part representing Uma should have parted hair, a cobra in the right ear, a mirror or a lotus, and thick breast.

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার পূর্ব্বেই আমার অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছিল। তখন ঢাকা চিত্রশালা, কিংবা অন্য কোথাও মূর্ত্তি সংগ্রহ করিবার কল্পনাও হয় নাই—শুধু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিই আমরা অনুরাগী হইয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে কে তাহা স্মরণ করে ?

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাঁহাদের কোন অনুষ্ঠানেও আজ আমাকে স্মরণ করেন না! বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহোদয় অর্দ্ধনারীশ্বরের বিষয়ে তদ্‌রচিত—"Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum নামক গ্রন্থের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ভুলেও আমার নাম স্মরণ করেন নাই।

অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব মূর্ত্তি বাঙ্গলার ইতিহাসের শিল্পের দিক্ দিয়া অমূল্যনিধি, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

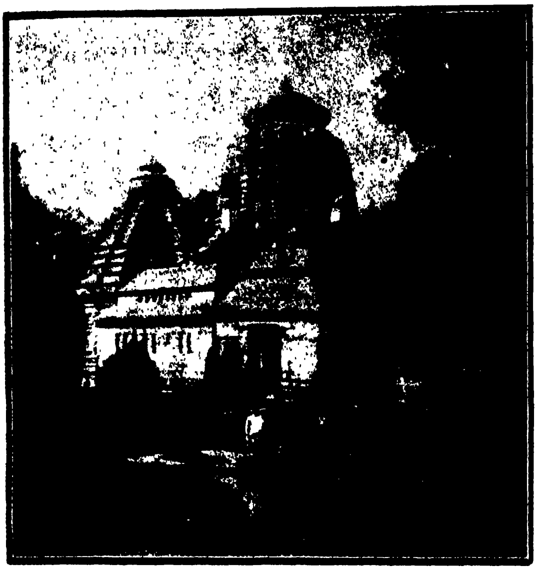
নিদ্রার মতন তুমি লোচনগ্রাহিণী—
মূর্চ্ছাসম মনোহরা! আনন্দদায়িনী
অমৃত-আস্বাদসম; চিরলোভনীয়া—
নন্দন-মন্দারপ্রায়! তুমি যেন প্রিয়া—
কান্তপদাবলীসম হৃদয়-হারিণী;
পল্লবিনী বল্লরীর মত সঞ্চারিণী—
চঞ্চলা চপলাসম। তুমি সুমধুর
নিশীথের দূরাগত বাঁশরীর সুর!
উচ্ছল যৌবন ভরে ওগো গরবিনী
কূলে কূলে ভরা তুমি বরষা তটিনী।
মূর্ত্তিমতী শান্তি তুমি—কি নিবিড় মায়া
তোমার অলকগুচ্ছে ধরিয়াছে কায়া।
শরীরিণী তুমি সখি, বিরহ-বেদনা—
কল্পনার চির-উৎস—মরম-চেতনা!

চক্রাবর্ত্ত

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পিএইচ্‌-ডি

(পুরীচক্র, পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যমের পিসীমাসীগণের সহিত পরিচয় সমাপ্ত হইলে পর গাড়ী পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধমাইল দূরে নরেন্দ্র সরোবর তীরে চলিল।



মার্কণ্ডেয় সরোবরের কোণে মন্দির

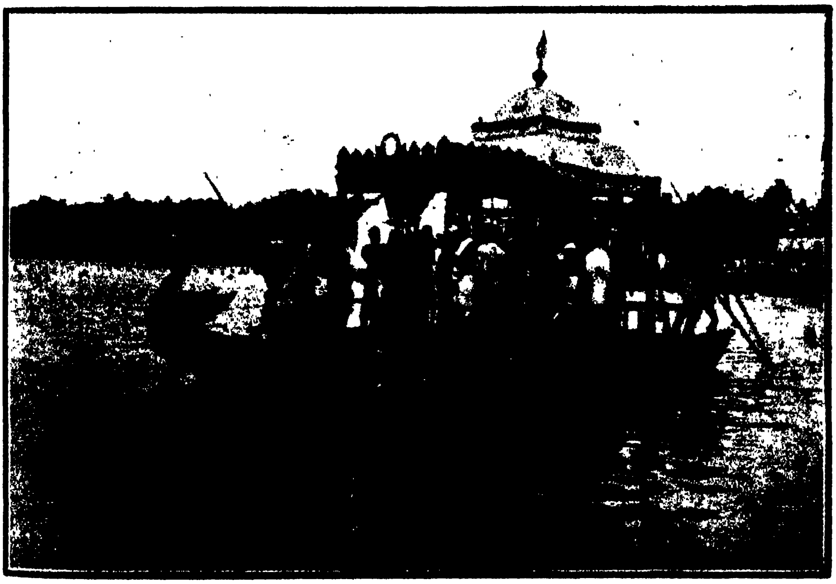
প্রকাণ্ড সরোবর—মার্কণ্ডেয় সরোব। অপেক্ষা অনেক বড়; মনোমোহনবাবু লিখিয়াছেন, ইহা দৈর্ঘ্যে ২৯১।গজ এবং প্রস্থে ২৪৮ গজ। মার্কণ্ডেয় সরোবরের মত নরেন্দ্র সরোবরও চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান এবং চারিপারেই পাথরের সিঁড়ি কাটা। নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপ, তাহার উপরে জগন্নাথ দেবের চন্দনযাত্রার মন্দির এবং গঙ্গা দেবীর মন্দির। বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া দিন হইতে জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয়। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার ভোগমূর্ত্তি বা প্রতিনিধি মূর্ত্তি তখন চন্দনযাত্রার মন্দিরে আনা হয় এবং একুশ দিন পর্য্যন্ত এই ভোগমূর্ত্তিগুলি এই চন্দনযাত্রার মন্দিরে বিরাজ করেন। চন্দনযাত্রার প্রধান অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া নরেন্দ্র সরোবরে জগন্নাথদেবের নৌকা-বিহার। এই তিন সপ্তাহ ধরিয়া নরেন্দ্র সরোবরে আনন্দ বাজার বসিয়া যায়, সহস্র সহস্র লোক সন্তরণ সহকারে নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় তাঁহার "মন্দিরের কথা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, (পুরীর কথা, ১২৪ পৃঃ) চন্দনযাত্রার বিংশতি দিবসে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নাকি নরেন্দ্র সরোবরে স্নানাদি করে।

চৈতন্যদেবের স্মৃতি পুরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, কিন্তু নরেন্দ্র সরোবরের সহিত উহা বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। নীলাচলে অর্থাৎ পুরীধামে চৈতন্যদেবের স্থায়ীরূপে অবস্থান আরম্ভ হইলে পর একদা অদ্বৈতের নবদ্বীপের ভক্তগণ রথযাত্রা দেখিবার জন্য নীলাচলে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে আগুবাড়িয়া লইবার জন্য যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপের দলকে অভ্যর্থনা করিতে চৈতন্যের সহিত যে দলটি চলি।,



নরেন্দ্র সরোবর—চন্দনযাত্রার মন্দির

তাঁহাও নিতান্ত ছোট ছিল না। নিত্যানন্দ গদাধর তো ছিলেনই—"চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ" হইতে আরম্ভ করিয়া পুরী গোসাঞী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্র, দামোদর স্বরূপ, পাত্র পরমানন্দ, রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন—প্রভৃতি অনেক ভক্ত এই দলে চৈতন্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সরোবর ও আঠার নালার মধ্যে দুই দলের দেখা হইল। যে অপূর্ব্ব আনন্দ-তরঙ্গ ও ভাবোচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল, তাহা সত্যই ভাষায় অবর্ণনীয় :—



নরেন্দ্র সরোবরে চন্দন যাত্রা

দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যান্যোর্তে সব।
দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রু মুখে লাগিলা করিতে দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবৎ কেবা কারে করে।
সবাই চৈতন্য-রসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবৎ করি সবে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বর করেন ভক্ত সঙ্গে দণ্ডবৎ।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেই মত॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভাল মতে॥

* * *

আনন্দে অদ্বৈত সিংহ করেন হুঙ্কার।
আনিলুঁ আনিলুঁ বলি ডাকে বারেবার॥

—চৈতন্য ভাগবত, আন্ত্যখণ্ড

অদ্বৈতের ক্রন্দনে ও হুঙ্কারে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হ'ন, শেষ ছত্রে বৈষ্ণবগণের সেই বিশ্বাসেরই উল্লেখ আছে।

এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে দশ দণ্ডে চৈতন্যদেব সানুচর আঠার নালা হইতে নরেন্দ্র সরোবরকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় চন্দনযাত্রার জন্য জগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি নরেন্দ্র সরোবরে আগমন করিলেন। চৈতন্যের দল ও জগন্নাথের দল, দুই দল মিলিয়া মহা আনন্দ কোলাহল উত্থিত করিল। জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি নৌকায় চড়ান হইল :—

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকার বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে॥
শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্র জলে করিল বিহার॥

ইহার পরে যে তুমুল জলকেলি আরম্ভ হইল তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টবৎ বর্ণনা চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস রাখিয়া

গিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠক পাঠ করিয়া ধন্য হইবেন। বিপুলকায় অদ্বৈত ও দীর্ঘ প্রমাণকায় চৈতন্যদেবে প্রথম জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল, একে অন্যের চোখে প্রাণপণ জোরে জল দিতে লাগিলেন ; বন্দুকের গুলির ঝাঁকের মত গিয়া জল-বিন্দুর ঝাঁক দুই জনের চোখে পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকলেই জলযুদ্ধে মাতিয়া গেলেন—

পূর্ব্বে যেন জল-ক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্য রায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরেন্দ্র জলেরও হৈল সেই ভাগ্য-সীমা॥

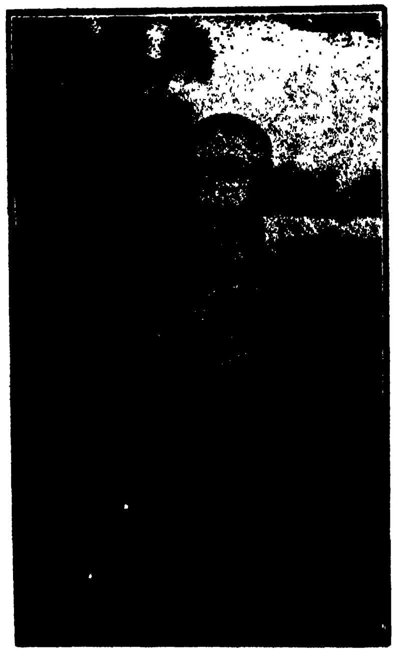
নরেন্দ্র সরোবরকূলে দাঁড়াইয়া পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের বৈশাখ-শেষের একদিনের জলকেলি-আনন্দের ও চন্দনযাত্রার তুমুল কোলাহল কল্পনার শ্রবণে শুনিতে শুনিতে সহসা স্মরণ-পথে সমুদিত হইল যে, চৈতন্য শেষ জলকেলিও না এই নরেন্দ্র সরোবরেই করিয়াছিলেন ?—কবি জয়ানন্দ স্বীয় চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন যে, একদা আষাঢ় মাসে রথ দ্বিতীয়ায় রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চৈতন্য বাঁ পায়ে ইটের টুকরায় বড় আহত হন। সেই আঘাত গ্রাহ্য না করিয়া

নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জল-ক্রীড়া নানা রঙ্গে॥

ইহার ফলে ষষ্ঠীর দিন বেদনা ভয়ঙ্কর বাড়িয়া গেল এবং সপ্তমীর দিন রাত্রি দশ দণ্ডের সময় চৈতন্য তিরোহিত হইলেন।

নরেন্দ্রসরোবরতীরে দাঁড়াইলে তাই স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হয়, নয়ন অশ্রুসজল হয়। এই সরোবর শুধু চৈতন্যদেবের জলকেলিরই স্মৃতিপূত নহে, কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর বিখ্যাত ছবিতে দেখা যায়, এই সরোবরতীরে বাঁধাঘাটে সমবেত হইয়া বৈষ্ণবগণ ভাগবত পাঠ করিতেন, চৈতন্যদেব শুনিতেন আর অবিরলধারে অশ্রুতে তাহার বক্ষস্থল সিক্ত হইত। কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীর ছবিখানিতে চৈতন্যদেবের প্রকৃত মুখাবয়ব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই হৃদয় সায় দেয়। বৈষ্ণব কবিগণ যে গাহিয়া গিয়াছেন—"চাঁদের সুধা ছানিয়া, অমিয় ছানিয়া বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া গোরার মুখখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—কুঞ্জঘাটার ছবিতে চৈতন্য-দেবের মুখখানি দেখিয়া এ বর্ণনা সার্থক মনে হয়। কোন চিত্রকরের সাধ্য নাই, তুলিকার মুখে এত কমনীয়তা, এত ভাবঘন ভক্তিঘন কোমলত্ব ফুটাইয়া তোলে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বীরভূম বিবরণে মূল ছবিটি হইতে চৈতন্যের ছবিটি বাছিয়া বৃহদাকারে ত্রিবর্ণে এই ছবিটি ছাপিয়াছেন। ঢাকার একজন সব-জজ একদিন আমার লাইব্রেরীতে বসিয়া এই ছবি দেখিয়া অশ্রুসজল নেত্রে যে ভাবে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—"আজ আমার জন্ম সফল হইল"—তাহা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।

যে অদ্বৈতাচার্য্যের জলকেলিতে একদা নরেন্দ্র সরোবর আলোড়িত হইয়াছিল তাঁহারই বংশধর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নরেন্দ্র সরোবরের পূর্ব্ব তীরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ বা জটিয়া বাবার আশ্রমের দরজায় গিয়া গাড়ী থামিল। আমরা বিনম্রচিত্তে এই মহাপুরুষের



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব
(শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বীরভূম বিবরণ' হইতে)

আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ-পথের বাঁ দিকে প্রকাণ্ড একটি ছায়াশীতল বকুলবৃক্ষ, ডালগুলি মাটি পর্য্যন্ত নুইয়া পড়িয়াছে। অভ্যাগতগণকে গাছের পাতা ছিঁড়িতে নিষেধ করিয়া একখানা বিজ্ঞাপন লাগান রহিয়াছে। জটিয়া বাবার সমাধি মন্দিরটি অতি পরিচ্ছন্ন—সম্মুখে শ্বেত পাথরের প্রশস্ত সিঁড়িগুলি থাকাতে বেশ একটা পবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময় ভাব মন্দিরের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। যেন সদ্যস্নাতা শুভ্রবসনা পূজারিণী পুষ্পপাত্র হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন।

বারান্দায় বিজ্ঞাপন লাগান রহিয়াছে, কেহ যেন চেঁচামেচি করিয়া বা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া এই শান্তিময় স্থানের শান্তিভঙ্গ না করেন। আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত এক ভদ্রলোকের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া আমরা আঠার নালা দেখিতে চলিলাম।

এই আঠার নালা বা অষ্টাদশ খিলানযুক্ত পাথরের পুল পুরীর প্রবেশদ্বারস্বরূপ। চৈতন্যভাগবতে কয়েক স্থানেই এই আঠার নালার উল্লেখ আছে। বাঙ্গালা দেশ হইতে পথ এই আঠারনালার উপর দিয়াই আসিয়া পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। চৈতন্য যখন প্রথম বার পুরী আগমন করেন, তখন এই আঠার নালায়ই সঙ্গীগণকে ছাড়িয়া একাকী জগন্নাথ দেখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে নবদ্বীপ হইতে আগত বৈষ্ণবগণকে চৈতন্য সদলবলে এই আঠার নালা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিতেন। মুটিয়া নদী নামক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর এই আঠার খিলানের পুলটি নির্ম্মিত। লম্বায় পুলটি ২৯০ ফুট। Orissa and her Remains প্রণেতা ৺মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় বলেন, পুলটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে নির্ম্মিত।

গাড়ী হইতে নামিয়া পুলের উপর দিয়া হাঁটিয়া ওপারের মাটি স্পর্শ করিয়া যেন বাঙ্গালা দেশের স্পর্শ একটু পাইয়া আসিলাম। নদীতে জল সামান্যই ছিল, পুলের নীচেই একটি ঘাট, ইট ফেলান। এই ঘাটে ভাল করিয়া হাত পা ধুইয়া লইলাম। গাড়ী গুণ্ডিচাবাড়ী বা জগন্নাথের মাসীবাড়ী চলিল।

পুরীর ঘোড়ার গাড়ী ধীর মন্থরগামী। কিছু দূর যাইতেই গাড়ীর সঙ্গে একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দৌড়িল। গায়ের রং নিকষকৃষ্ণ—বয়স পাঁচ-ছয় হইতে দশ-এগার পর্য্যন্ত, অধিকাংশেরই আকাশবাস পরিহিত, বড় মেয়েগুলির মধ্যপ্রদেশ কথঞ্চিৎ আবৃত। কি আশ্চর্য্য তাহাদের অধ্যবসায় অথবা শিক্ষা, প্রায় মাইলখানেক রাস্তা গাড়ীর দুইধারে তাহারা গাড়ীর সহিত দৌড়িতে লাগিল। মুখে বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিতে করিতে চলিয়াছে—

হে রাণী মা গো
তোর ভাল হবে গো
বড় মানুষের বিটি গো
বড়মানুষের নানী গো
একটা পসা দে গো।
তোর ছেলে হবে গো
তোর কোল ভরবে গো
তুই সুখে থাক্‌বি গো!

বান্ধবী বলিলেন—"মর্ পোড়ামুখীরা, আবার ছেলে হবার আশীর্ব্বাদ করে দেখ না! তোদের ছেলে হোক্—তোদের কোল ভরুক্।"

কে কাহার কথা শোনে? মানবকবৃন্দ সমান অদম্য উৎসাহে ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে গাড়ীর সহিত দৌড়িল। বেশ কতকদূর চলিবার পর একটা পান সিগারেট ও ডাবের দোকান দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলাম। বালক-বালিকার দলের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে তখনও গাড়ীর সঙ্গে দৌড়িতেছিল, তাহারাও থামিল। উহাদের মধ্যে একটি বালিকা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বয়স এগার বার হইবে—যৌবনের ঊষার রক্তিমরাগে দেহ রাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, নয়নে কটাক্ষ জাগিয়াছে। আর নিকষ-কৃষ্ণ আননে রূপ যেন উচ্ছল হইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। আমি লক্ষ্য করিতেছি দেখিয়াই তাহার উজ্জ্বল বিশাল লোচনদ্বয় আনত হইয়া গেল, সমস্ত শরীরে লজ্জার সঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল!

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোর নাম কি রে?"

মেয়ে আমার মুখে একবার চাহিয়াই চোখ নত করিল। সঙ্গে অনুরূপ নিকষকৃষ্ণ একটি সাত-আট বছরের ছেলে ছিল, সে বলিল—"ওর নাম চন্দ্রা—আমার বহিন্।" খুদে ভাইটি ঘাড় বাঁকাইয়া এমনি গর্ব্বের সহিত "আমার বহিন্।" বলিল যে, চন্দ্রা-ভগিনীর ভ্রাতৃত্ব গর্ব্বে বিশ্বসংসার যেন উহার নিকট নগণ্য হইয়া গিয়াছে। এমন ভগিনীকে এক মাইল দৌড় করাইয়াও যাহারা একটা পয়সাও সেইক্ষণ পর্য্যন্ত দেয় নাই তাহারা যে নিতান্ত পাষণ্ড, ভাইটির ভাবভঙ্গীতে তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া হাতে রাখিয়া ডাকিলাম—"আয় চন্দ্রা, নিবি আয়।" চন্দ্রা আমার দিকে অর্দ্ধপিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আহ্বান শুনিয়া অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে পয়সাটির দিকে চাহিল। কি অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গি! যেন একটা অমৃতরসের পিচকারী ফুলবৃষ্টি করিতে করিতে

পয়সাটির গায়ে আসিয়া ঠেকিল! ঐখান হইতে হাত পাতিয়া বলিল—"ছুঁড়ে দাও।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তা হবে না, কাছে এসে নিয়ে যাও।"

"না, ছুঁড়ে দাও"—বলিয়া নৃত্যভঙ্গিতে মেয়ে একেবারে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল! উহার খুদে ভাইটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দাও বাবু, আমাকে দাও।" পয়সা পরহস্তগত হয় দেখিয়া লাজুক মেয়ে এবার কতকটা আগাইয়া আসিল, বলিল—"এবার দাও।"

আমি বলিলাম—"এই যে নাও না!" খুদে ভাইটি এবার ছোঁ মারিয়া আমার হাত হইতে পয়সাটি ছিনাইয়া লইয়া দৌড়িল—চন্দ্রাও তাহার পিছনে দৌড়িল দেখিতে দেখিতে দুজনে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বান্ধবী বলিলেন—"তুমি ছেলেমানুষের সঙ্গে এত ছেলে-মানুষীও করতে পার!"

গম্ভীরভাবে বলিলাম—"বুড়োমানুষীর অতি উত্তম প্রতিষেধক।"

ডাবের দোকান হইতে ছড়িদার দুইটি ডাব লইয়া আসিল। ও হরি! এই নাকি উড়িষ্যাদেশজ নারিকেল ফল? নোয়াখালি বরিশাল অঞ্চলের যে সমস্ত ডাব আমরা ঢাকায় পাই, সেগুলি প্রত্যেকটি আকারে এই উড়িষ্যা-দেশজ ডাবের চতুর্গুণ হইবে। নোয়াখালীর ডাবে অনেক সময়ই বড় গেলাসের দেড় গেলাস জল হয়। মনে পড়িল, কলিকাতার ডাবও নোয়াখালীর ডাব অপেক্ষা সাধারণ ক্ষুদ্রাকৃতি। পরে দেখিয়াছি, কোচিন রাজ্যের নারিকেল-গুলিও এমনি ক্ষুদ্রাকৃতি। নোয়াখালী-বরিশালের নারি-কেলের নাম Royal Bengal Cocoanut হওয়া উচিত।

গাড়ী আবার চলিল এবং কতকক্ষণ পরেই জগন্নাথের মাসীবাড়ী বা গুণ্ডিচাবাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। গুণ্ডিচা মন্দির দুর্গপ্রাকার অনুকারী সু-উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। সিংহ দরজার মাথায় মন্দিরের মত চূড়া, সম্মুখে নবগ্রহের মূর্তিযুক্ত বৃহৎ প্রস্তর বসান। মন্দির প্রাকারে বহু কৃষ্ণবদন বৃহল্লাঙ্গুল হনুমান বসিয়া আছে, সিংহদরজার বাহিরে অনেকগুলি কঙ্কালসার কুকুর ঘুরিতেছে। ছড়িদার বলিল, "বাবু, এখানে সবাই হনুমানদেরে নাড়ু-মোয়া খাওয়ায়।" কৌতূহলী হইয়া গাড়ীতে বসিয়াই দুই পয়সার নাড়ু মোয়া আনিতে বলিলাম। উহার কিছুটা বাহিরে ছড়াইয়া দিবামাত্র কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়া গেল! প্রাকার হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া নিমেষের মধ্যে পনের কুড়িটি হনুমান আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তখন হনুমানে কুকুরে বিষম লঙ্কাকাণ্ড আর কি! কপিসৈন্য আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেখিতে দেখিতে কঙ্কালসার কুকুরদলকে পরাভূত করিয়া নাড়ু মোয়া দখল করিয়া লইল। বান্ধবী মোয়ার ঠোঙ্গা হস্তে এই মজা দেখিতেছিলেন, সহসা এক হনুমান এক লাফ দিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল এবং মোয়ার ঠোঙ্গা ধরিয়া টান দিল। একটু বাধা দিতেই হাতে এক মৃদু মধুর আঁচড় বসাইয়া ঠোঙ্গা লইয়া চম্পট দিল। তখন বানরের বেয়াদপীতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিঘূর্ণিত ছত্রহস্তে



গুণ্ডিচা মন্দিরের সিংহদ্বার
(শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার কৃত 'পুরীর কথা' হইতে)

বীরদর্পে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং ছড়িদার ও গাড়োয়ানের সাহায্যে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া অগ্রসর হইলাম। কঙ্কালসার কুকুরের দল এবার জোর করিল, ভীষণ কোলাহল করিতে করিতে তাহারা বানরগণকে তাড়াইয়া গেল—বানরগণ রণক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার গিয়া প্রাকারের উপর বসিল। বান্ধবী পোড়া-মুখকে পোড়ামুখ বলিয়া গালি দিয়া বিশেষ লাভ নাই দেখিয়া ভাষান্তর অবলম্বন করিয়া-ছিলেন এবং আহত হস্তে হাত বুলাইতেছিলেন। উভা রামায়ণ এইরূপ উদ্যমেই উপসংহার করিয়া বান্ধবীসহ গিয়া গুণ্ডিচাবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

নীচের খবরটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল :

গুরুনারায়ণ মঠে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি

নারীসহ সন্ন্যাসী উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র।

ডেরাডুন, ১৬ই মে

স্বামী অমৃতানন্দ গুরুনারায়ণ মঠের জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মী। এক দিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কঠোর তপশ্চর্য্যা, অন্য দিকে তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার ও চারুদর্শন চেহারা অল্প-দিনেই তাঁহাকে আশ্রমবাসীদের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। গত বুধবার অকস্মাৎ একটি সুন্দরী তরুণী আশ্রমে আসিয়া আপনাকে অমৃতানন্দের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। অমৃতানন্দও তাহা অস্বীকার করেন না। অথচ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন প্রথম আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন নিজেকে অবিবাহিত বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আশ্রমে এবং এই অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ স্বামী অমৃতানন্দকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সে যাহাই হউক, পরের দিনই সকলের অগোচরে কখন যে তিনি স্ত্রীলোকটিকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান কেহ জানে না। ইহাতেও কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। ব্যাপারটা সকলেরই কেমন রহস্যজনক মনে হইতেছে।

মনে হওয়ার দোষ নেই। কারণ রহস্য জিনিসটা স্ত্রীলোকের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নিতান্ত সাধারণ ঘটনাও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসে রহস্যজনক হয়ে ওঠে। এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে এমনি রহস্যজনক ঘটনার বিবরণ আমরা প্রত্যহই কিছু না কিছু পাই।

আমি নিজে খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক। অন্যান্য বিবরণের মতো এটিকেও যথাসময়ে যথারীতি প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে গলাধঃকরণ করেছিলাম। কিন্তু তখন ভাবিনি সংবাদপত্রের রক্তমাংসহীন হাড়ের টুকরো বিবরণ একদা সাহিত্যে ঠাঁই পাবে। না, তখন আমি একথা ভাবিনি।

অথচ ভাববার কারণ ছিল। শুনেছিলাম, আমাদের সুরেন অমৃতানন্দ অথবা ওই রকম কি একটা নাম নিয়ে কি যেন একটা আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে গেরুয়াও পরেছে

কিন্তু সেই সুরেন যে গুরুনারায়ণ আশ্রমের অমৃতানন্দ নয় সে বিষয়ে সুরেনকে যারা চেনে তাদের সংশয় হবে না। বাইরে এবং মনে সুরেন চিরকাল ঝরঝরে এবং পরিষ্কার। সুরেন কলেজে যে পড়াশুনায় খুব নামকরা ছেলে ছিল তা নয়। কিন্তু মেধায় অসাধারণ না হলেও বাক্যে ব্যবহারে, চিন্তায় কর্ম্মে একটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট শুচিতা সব সময় সে যেন ব'য়ে নিয়ে বেড়াত। সুতরাং সংবাদপত্রের ইঙ্গিতপূর্ণ বিবরণের রহস্যময় নায়ক যে আমাদের সুরেন নয় এ তো অতি সহজেই বলা চলে।

তথাপি এই ঘটনায় অনেক দিন পরে সুরেনকে মনে পড়ে গেল। অনেক দিন তাকে দেখিনি। কেন যে হতভাগা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেল তাই বা কে জানে! সংসারে দুঃখ বলতে কিছুই তো তার ছিল না। এই বয়সে জ্বালাই কি এমন পেলে?

কিন্তু মানুষ যে শুধু দুঃখ-জ্বালায় সন্ন্যাস নেয় তাও তো নয়।

ইত্যবসরে একদিন সুরেনের সঙ্গে দেখা। সন্ন্যাসী সুরেনের সঙ্গে নয়, আমাদের সেই পুরোণোকালের সুরেনের সঙ্গে। অর্থাৎ বাবু সুরেনের সঙ্গে।

বললাম, আরে সুরেন যে!

এক গাল হেসে সুরেন বললে, তুই! কি খবর?

—ভালোই। তবে যে কে বললে, তুই সন্ন্যাসী হয়েছিস?

—আমি ? কে বললে রে ?

—কে যেন বলেছে। অনেক দিনের কথা। ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় একটু রসিকতা ক'রেছিল। তারপর ? এখানেই থাকিস, অথচ একদিন দেখা করিস নি ? আচ্ছা যা হোক !

—এখানে তো ছিলাম না। কিছুদিন হ'ল এসেছি।

—তাই নাকি ? কোথায় ছিলি ? কোথায় আছিস ? কি করছিস ?

—বিশেষ কিছু না। মানে ইন্সিওর‍্যান্সের দালালী। আছি বৌবাজারে। আসবি একদিন ?

—যাব বই কি ? ঠিকানাটা ?

সুরেন ঠিকানা দিলে। আশ্চর্য্য সুরেন ! এত দিনেও এতটুকুও বদলায় নি। একদিন যেতেই হবে ওর ওখানে। তার মানে সামনের রবিবারেই যেতে হবে। খুব দেখা হয়ে গেছে যা হোক ! এই সময় ওর কথাই ভাবছিলাম।

রবিবারে হাতে কোনো কাজ ছিল না। ঠুক ঠুক ক'রে সুরেনের কাছেই গেলাম। আমার বাসা থেকে বৌবাজারের সেই এঁদো গলিটা অনেকখানি দূরে। রবিবার বিকেলে হাতে কোনো কাজ না থাকলে হাঁটতে মন্দ লাগে না।

কেবল একটুখানি সন্দেহ ছিল, এই সময়টায় ওর সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে কি না। যা আড্ডাবাজ লোক ! এমন চমৎকার বিকেলে ওর মতো ছেলের পক্ষে বাসায় না থাকাটাই বেশী সম্ভব।

চমৎকার বিকেলই বটে !

কিছু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার পরে উঠেছে পড়ন্ত বেলায় একটুখানি মিঠে রোদ। রাস্তার দুটি ফুটপাথে চলেছে অগণিত জনতার অনতিব্যস্ত মন্থর স্রোত। মোটরে, ফিটনে, ট্রামে বাসে উৎসুক মানুষের খুশী মুখ। শেষ অপরাহ্ণের আলোয় সব যেন রঙীন, যেন হাসছে। পথে পথে খুশী যেন উপচে উঠছে। যেন অকারণ যোগাযোগে এই অপরাহ্ণটিই খুশী মানুষের সমারোহহীন শোভাযাত্রার জন্যে বিধাতা পুরুষের কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

বাস্তবিক এর পরে বড় রাস্তা ছেড়ে সেই স্বল্পান্ধকার সরু গলিটির ভিতরে ঢুকতে আমার মন সরছিল না।

কিন্তু তবু গেলাম। মনে শুধু এইটুকু ভরসা ছিল যে, দেরী বেশী হবে না। সুরেনের সেই বাসস্থানটি,—মেসই হোক আর বাসাই হোক,—নিশ্চয় দেখব বন্ধ। নিশ্চয়ই তার দেখা পাওয়া যাবে না। একটু পরেই আবার ফিরে এসে এই সুন্দর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারব। এইটুকু ভরসা হাতে নিয়েই সেই অন্ধকার গলির গর্ভে পা দিলাম।

তেরো নম্বর কাছেই। খুঁজতে বেগ পেতে হ'ল না মোটেই। দেখেই মনে হ'ল এটা মেস নয়, বাসা। সুরেনের নিজেরই হোক, বা তার কোনো নিকট আত্মীয়েরই হোক। কাজেই একটু সমীহ ক'রেই দরজার কড়া নাড়লাম।

কোনো সাড়া নেই।

বোধ হয় সুরেন বাড়ী নেই। বোধ হয় বাড়ীতে কোনো পুরুষ মানুষই নেই। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে আর একবার কড়া নাড়লাম।

সাড়া এবারও পেলাম না বটে, কিন্তু অনতি উচ্চ দোতালার ঘর থেকে যেন একটা চঞ্চলতার আভাস পেলাম। কারা যেন উৎসুক হয়ে উঠল মনে হ'ল।

ডাকলাম, সুরেন আছ ?

—কে ?

কণ্ঠস্বর শুনে উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি একখানি অনিন্দ্য সুন্দর মুখ জানালার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সুরেন আছে ?

—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—বলুন মৃত্যুঞ্জয়।

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে নীচে এসে দরজা খুলে দিলে।

হাসি মুখে বললে, ওপরে চলুন। ওঁর জ্বর।

বললে, আপনার কথাই হচ্ছিল। বলছিলেন, আজ আপনি আসতে পারেন।

—জ্বর কি খুব বেশী ?

মেয়েটি এবারে সকৌতুকে হেসে উঠল। বললে, মোটেই না। একশোর নীচে। কিন্তু দেখবেন চলুন কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন !

মেয়েটি আর একবার সুন্দর ভঙ্গিতে হাসলে। অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। কিন্তু কে ? সুরেন কি বিয়ে ক'রেছে ?

নিশ্চয় ক'রেছে। নইলে বাড়ীতে নিশ্চয় দ্বিতীয় একজন স্ত্রীলোক থাকত।

—দেখবেন। সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।

মেয়েটি আমার পিছু পিছু উপরে এল।

সুরেন উপরের ঘরের মেঝেয় একটি পাতলা বিছানার উপর অসাড় হয়ে শুয়ে। দ্বিতীয় আসন না থাকায় আমি তার বিছানারই একপ্রান্তে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ ?

বিকৃত মুখে সুরেন কি যে বললে বোঝা গেল না। কেবল মনে হ'ল জীবন সম্বন্ধে আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। এমনি ভাবটা।

মেয়েটি হাসি চাপবার জন্যে অন্য দিকে মুখ ফেরালে। হাসি আমারও এসেছিল। কিন্তু চাপবার জন্যে ক্লেশ পেতে হ'ল না।

কপালের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে বললাম, কিন্তু জ্বর তো তেমন বেশী মনে হচ্ছে না।

এ কথায় সুরেন যেন বিরক্ত হ'ল। কিন্তু প্রকাশ করলে অন্য ভাবে।

ঝাঁঝের সঙ্গে মেয়েটিকে বললে, ওখানে সাজগোজ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে ? একটা আলো আনতে হবে না ?

মেয়েটি শান্তভাবে আদেশ প্রতিপালনের জন্যে চলে যাচ্ছিল। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, না, না। এখন আলো কি হবে ? তোমার উপরের এ ঘরখানায় তো মন্দ আলো আসে না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াল।

সুরেন বিরক্তভাবে বললে, তুমি কথা শোন না কেন খুশী ? আলো নাই আনলে, অনেকদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় এল একটু চা তো খাওয়াতে হবে।

খুশী ! মেয়েটির নাম খুশী ! খুশীই বটে ! অকারণে চমকে-ওঠা, অকারণেই থমকে-যাওয়া খুশী ও।

খুশী নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল। সুরেন আবার একটা ধমক দিয়ে বললে, যাচ্ছ তো ? কিন্তু চা আছে তো, না নেই। যাই বল মৃত্যুন, সন্নিসির আশ্রম দেখলাম, কত কি দেখলাম, কিন্তু আমার এই আশ্রমের কাছে কিছুই কিছু নয়। যে জিনিসটি চাইবে, ঠিক সেইটিই নেই।

ব'লে এমন নিষ্ঠুরভাবে হাসলে যে, খুশীর লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে আমি পর্য্যন্ত লজ্জায় মাথা নীচু করলাম।

কিন্তু খুশী যেন তখনই নিজেকে সামলে নিলে। আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে একটুখানি হাসি গোপন ক'রেই নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বারান্দায় এবং সেখান থেকে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ির শেষ ধাপে যখন ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, তখন যেন সুরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

বললে, এই একটা আচ্ছা উপসর্গ জুটিয়েছি। ওকে নিয়ে কি করি বল তো ?

—কার কথা বলছ ? তোমার স্ত্রীর ?

এবারে সুরেন উত্তেজনায় বিছানার উপর ওঠে বসল। ফিস ফিস ক'রে বললে, স্ত্রী আবার কে ? খবরের কাগজে পড়নি ডেরাডুনের গুরুনারায়ণ আশ্রমের—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বামী অমৃতানন্দ না কে একজন—

—আমিই তো অমৃতানন্দ। শোননি বছর পাঁচেক আগে আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম ?

—সে তো শুনেছি। কিন্তু তুমিই তো একদিন···তা আশ্রমে তুমি তো ওঁকে স্ত্রী ব'লেই—

—তা স্বীকার করব না ? যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা রয়েছে সেখানে···বেশ লোক যাহোক !

সুরেন রাগে মুখখানা বিকৃত করলে।

বললাম, তবে আর উপসর্গটা কি ?

—উপসর্গ নয় ? বেশ ! কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বল তো ? কেউ কি আমাদের আশ্রয় দেবে ?

—তার দরকারই বা কি ? তুমি লেখাপড়া শিখেছ, দুটো পেট চালাতে পারবে না ?

—তুমি তো বললে সে কথা ? কিন্তু চালাই কি ক'রে ? দাও না একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে ?

সে একটা সমস্যা বটে ! এ সংসারে সুন্দরী নারী সংগ্রহ করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু একটা সামান্য টাকার চাকরী জোগাড় করা অসম্ভব।

একটু বিরক্তভাবেই বললাম, কিন্তু এ উপসর্গও তো তুমি নিজেই জুটিয়েছ। ওঁকে নিয়ে তুমি নিজেই তো আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছ।

বিস্মিতভাবে সুরেন বললে, আমি ! তুমি জান না

মৃত্যুন, আমার সাধ্য কি গুরুজির আদেশ ছাড়া আশ্রম ছাড়ি।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, আচ্ছা তুমি বলতে পার মৃত্যুন, গুরুজি এ কথা আমাকে কেন বললেন যে, সন্ন্যাস জীবনের পুণ্য আমার পাওয়া হয়ে গেছে, এর পরে আমাকে খুশীকে নিয়েই গৃহী হতে হবে?

ওর কথা শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বললাম, গুরুজি নিজে এই আদেশ দিয়েছেন?

—নিজে। আমায় পাথেয় দিয়েছেন, এবং সকলের অগোচরে নিজে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দিয়েছেন। আশ্চর্য্য হচ্ছ?

—হচ্ছি বই কি।

—হুঁ। সমস্তটুকু না শুনলে বুঝতে পারবেও না। আশ্চর্য্য আমারও কম লাগেনি। ভয়ও পেয়েছিলাম। কেঁদে ব'লেছিলাম, আমায় মার্জ্জনা কর ঠাকুর। সংসারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। তার বাঁধা ছকের মাঝখানে আমি মূর্ত্তিমান অনিয়মের মত ওকে নিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

গুরুজি হেসে বলেছিলেন, তবে এতদিনের সন্ন্যাসে পেলে কি, কি হ'ল তপশ্চর্য্যায়! আমি জানি তোমায় যে কাজের ভার দিলাম তা সন্ন্যাসের চেয়েও দুরূহ। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পারবে।

বড় বড় চোখ মেলে সুরেন বললে, এই কথা গুরুজি বললেন। ভাবতে পার?

জিজ্ঞাসা করলাম, খুশীকে তুমি পেলে কি ক'রে?

—যেমন ক'রে সবাই পায় তেমনি ক'রে। তার মানে, খুশী আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম জান তো? সে ওরই জন্যে। সামাজিক কারণে যখন আমার সঙ্গে বিয়ে কিছুতেই হ'ল না, হ'ল অন্য লোকের সঙ্গে, মনের দুঃখে সেদিন সংসার ত্যাগ ক'রেছিলাম। দেখলে প্রকৃতির পরিহাস, আবার মাথা নীচু ক'রে সেইখানেই ফিরে আসতে হ'ল। কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ হয় না,—দুঃখ হয় যখন দেখি আমারই জন্যে খুশীর গায়ের গহনা একখানি একখানি ক'রে অন্তর্হিত হচ্ছে। দুঃখ গহনার জন্যে নয়, কিন্তু কেমন যেন পৌরুষে ঘা লাগে।

সুরেন মুখখানা কি রকম করলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর স্বামী আছেন, মানে, যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল?

—আছেন।

ব'লেই হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, তাঁর তো কোনো দোষ নেই। দিব্যি ভদ্রলোক। কিন্তু খুশী সেখানে থাকতে পারে না। বলে, কেমন গ্লানি বোধ হয়।

সুরেন ফিক ক'রে হাসলে।

এমন সময় খুশী ফিরে এল। তার এক হাতে চায়ের বাটি, অন্য হাতে একখানা রেকাবিতে খানকয়েক লুচি।

তাড়াতাড়ি বললাম, এসব আবার কেন করলেন? শুধু একটু চা হ'লেই তো হ'ত।

খুশী যেন লজ্জিত হ'ল তার দারিদ্র্যের কথা স্মরণ ক'রে। কথাটা ব'লে আমিও লজ্জা কম পেলাম না। লুচি যখন হয়েই গেছে, তখন অনাবশ্যক ও কথা ব'লে তার দারিদ্র্যকে খোঁচা দেওয়ার কোনোই দরকার ছিল না।

অপরাহ্ণ থেকে সন্ধ্যা, তারপরে রাত্রিও হ'ল। হারিকেনের স্বল্পালোকে ব'সে তিনজনে কত গল্পই হ'ল।

হঠাৎ সুরেন বললে, দেখ তো খুশী, আমার জ্বর বোধ হয় ছেড়েছে।

খুশী ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করার আগেই বললে, জ্বর অনেকক্ষণ থেকেই নেই।

—তবে কি ছিল?

—অস্থিরতা।

সুরেন হো হো ক'রে উঠল।

বললে, সত্যি। একটু জ্বর হলেই আমি অস্থির হয়ে উঠি। তোমার ভয় করে না তো?

খুশী হেসে বললে, ভয় করবে কেন? তোমাকে কি আমি চিনি না?

এই একটি কথায় কি যে তৃপ্তি ছিল জানি না, গভীর আনন্দে সুরেন চোখ বন্ধ করলে।

জীর্ণ হোক, অন্ধকার হোক, খুশী গৃহ পেয়েছে। আরও বেশী ক'রে পেয়েছে,—যার চেয়ে বড় জিনিস মেয়েদের আর নেই,—গ্লানি ও অশুচিতা থেকে মুক্তি। কিন্তু এ ঘটনার এইখানেই কি শেষ!

ওদের কিছু বলিনি বটে, কিন্তু আমি পুলিশ কোর্টের

উকিল, মনে মনে এইখানেই আমি দাঁড়ি টানতে পারলাম না। খুনীর স্বামী বেঁচে আছে। তার পক্ষে আইনের আশ্রয় নেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

তখন ?

সুরেনের কথা আমি ভাবছি না। সে সন্ন্যাসী,—মনে প্রাণে সন্ন্যাসী। খুনীর জন্যে হাসতে হাসতেই হয়তো সে আইনের চরম দণ্ড মাথা পেতে নেবে। কিন্তু খুনী ? কোথায় যাবে খুনী ? এ সংসারের কোন আইন তাকে দেবে সত্যকারের গৃহ, দেবে নারী জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি ? সে কোন্ আইন ?

অন্তর্নিহিত রসধারা

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল এম-বি

প্রবন্ধ

জীবনে ক্রমবিকাশে মনোবৃত্তির স্থান কতখানি তাহার আলোচনায় দেখিয়াছি, মনঃ-বিশ্লেষকের কাজ জীবনের রসানুসন্ধান। এই ক্রমবিকাশ বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ দুইই। আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশের ফলেই শিশু-সুলভ অনুমান (infantile cover-ideas) বাহ্যত সামাজিক রীতি-নীতির পরিণতিতে, প্রভাব প্রক্রিয়ার ধারায় ও আনুষঙ্গিক সরল, জটিল ও বৈচিত্রময় অনুষ্ঠানের চলনে ও সংস্কারে রূপ লয়। পৌর-জীবনের চরিত্রগত ভাবধারায় যাহা জটিল-প্রবণতা (complex-bias), পরম্পরাগত লোকাচারের মধ্যে যাহা কুসংস্কার। এই শিশুসুলভ অনুমান তাহারই পূর্ব্ব অধ্যায় নয় কি ? মনঃবিশ্লেষণে উক্ত যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় বলিয়া রসবেত্তা সাইকো-এনালিষ্ট উহাকে অন্তর্জগতের রসধারা বলিয়া থাকেন। লোকাচারগত এই মানবতত্ত্ব (sociological anthropology) ও জাতিতত্ত্ব শাস্ত্রের (ethnology) এবং শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের (educational psychology) সূক্ষ্মালোচনা যে-কোন শিল্পকলা বা রসশাস্ত্র হইতে কোন অংশে রমণীয়তায় ম্লান নয়। বস্তুত কোন সত্যই ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণ নয়। সত্যের স্বরূপ তাহা হইলে শুষ্ক তো নয়ই বরং সত্যের মূল উপাদান এই আদিরস লইয়া। তাই ইহা সত্যম্ সুন্দরম্ শিবম্ ছাড়া আর কিছু নয়।

মানসিক ব্যাধির মূল কথা মনের ঘাত-প্রতিঘাতের আকস্মিকতা বা মানসিক সংঘাত ব্যতীত আর কিছু নয়। জ্ঞানার্জ্জন বা শিক্ষালাভের অন্যতম ও অন্যতম লক্ষ্য বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য, ঐক্য বা সংযোগ কোথায় তাহা দেখান। এই শিক্ষাই মানসিক-সংঘাত-সম্ভাবনা হ্রাসের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে, কেন না, দুই বিভিন্নমুখী প্রেরণার আকস্মিক বিরোধ দূর করিতে শিক্ষার স্বোপার্জ্জিত ও সহজাত ঐক্যের ধারণা থাকিয়া যায়। শিক্ষার অন্তর্নিহিত বীজগুলি সংঘাতাপন্নতার শক্তিকে হরণ করে (buffer mechanism)। এখন আমাদের শিক্ষায় এমন কি গলদ রহিয়া গেল যাহাতে শিক্ষিত সমাজের নিদর্শন এই যে অস্বাভাবিক বৃত্তি, চিত্তবিক্ষেপ ও চিত্তোন্মাদনা বাড়িয়া চলিবে ! মেকীবৃত্তি হইবে পৌরজীবনের পেশা ! স্বার্থ-পোষণে বিনয়ের মুখোস পরা এবং ব্যর্থ কামনার বিষ উদ্গীরণ করাই জাতীয় চরিত্র ! (এখানে চরিত্র বলিতে আমরা অনুকরণীয় ইচ্ছা বা fashioned will বুঝি) পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতার অভাবই হইবে জাতীয় সম্পদ ! ব্যক্তি জীবনের উন্নতির পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সরকারী-দৃষ্টির কৃপা-ভিক্ষা ! দাম্পত্য-জীবনে মিলিবে মাত্র স্ব-নিপীড়ন ও বিষয়-পীড়ন-রতি ! আর ধর্ম্ম-জীবনে টিঁকিয়া থাকিবে বিফল-জীবনের অদৃষ্ট-নির্ভরতা !

মানসিক সংঘাত ও সংশয় বিভিন্ন বস্তু। আমার উপর মানসিক সংঘাতের ফল হইল আকস্মিক ও বিহ্বলকারী আর আমি হইলাম সংঘাতাপন্ন জীব—ব্যাধি ও বিপত্তির, হীনতা ও দীনতার, পীড়নের ও পীড়িত হইবার মূল কেন্দ্র। কিন্তু সংশয়াপন্নতার অর্থ, পাছে আপনার বা অন্যের কোন অনিষ্ট হয় এই রকম ভাব। শিক্ষা মানুষকে সংশয়াপন্ন করিতে পারে কিন্তু যে শিক্ষায় মানুষের সংঘাতাপন্নতা হ্রাস না পায় তাহা কু-শিক্ষা। সংঘাত স্বার্থপুষ্ট ব্যাঘাতের অজ্ঞাত বিস্ময় ও আকস্মিতা ; সংশয় একই ব্যাঘাতের সজ্ঞাত চাঞ্চল্য বা অধীরতা। সংশয়কে সরল রেখাকারে তুলনা করা যাইতে পারে। স্বার্থের দৃষ্টি ঋজু জটিল বা কুটিল কিন্তু সংশয় এমনভাবে প্রকাশ পায় যাহাতে জীবনের দাবীগুলি নিজের কাছে না অপুষ্ট থাকিয়া যায়। সংঘাত মনের অগোচরে থাকে বিন্দুর আকারে। উহা ব্যক্তির আদিম ও সভ্যতার চারিপাশের সহিত অসামঞ্জস্যে, আকস্মিকতায় ও আড়ষ্টতার টানে বিহ্বলকারী ও বিড়ম্বনাময়।

আদিম সমাজে মানসিক আঘাতের কারণ ছিল বাহ্যিক। তখন মানসিক আঘাতের অর্থ হইত মানসিক চাঞ্চল্য। বিবেকের কশাঘাতে যে আদিম মনের বিদ্রোহীতা আরম্ভ হইল তাহার ফল হইল মানসিক সংঘাত। আদিম মন নগ্ন-আকারে প্রকাশ পাইত। সভ্য

মানুষ নিজেকে নগ্ন আকারে প্রকাশ না করিয়া মগ্ন থাকিতে চায় অজ্ঞাত মনীষার প্রেরণায় সত্যে ও সৌন্দর্য্যে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায়। সুস্থ ও সুন্দর চিত্তে ঘন বর্ষার যে নিবিড়তা, সংশয়রূপ ভীতিজালে সংজ্ঞাত কামনাকে আবদ্ধ করিয়া ও অজ্ঞাত মনকে সরল বিশ্বাসে (১) অভ্যস্ত করিয়া তাহা শুধুই ভালবাসিব বলিয়া ভালবাসার (স্বতঃ রতির) উপর নয় কি? ইহার মূলসূত্র এই যে, অন্তর্জাত বা সহজাত প্রত্যয় (inner and spontaneous conviction) ও সংজ্ঞাত সংশয় এই দুইয়ে অনুক্ষণ বাঁধ মিলাইয়া আমাকে বা আমার 'পাকা-আমিকে' আত্মম্ভরিতার (super-ego) স্তরে লইয়া যায়। এই আত্মম্ভরিতা বা 'পাকা-আমির' সংশয় ও বিশ্বাস বা সত্য ভাবাপন্নতা, সংজ্ঞান ও সুদূরদর্শিতা (anticipation) লইয়া যে জটিলতা (super-ego complex) সৃষ্টি করে তাহার কথা আমরা পরে বলিব। সংযত কামপরায়ণতাই সত্যকার আত্মশক্তি। আত্মম্ভরিতার কর্ম্মকুশলতা এই আত্মশক্তিজাত। অর্থলোভে বা প্রতিপত্তি লাভে কর্ম্মকুশলতা পুষ্ট হইতে পারে কিন্তু সে কর্ম্মকুশলতার পরিসর ও গতি সঙ্কীর্ণ। সত্যকার কর্ম্মকুশলতা আত্মম্ভরিতায় বা আত্মশক্তিতে নিহিত। যে-কোন অনুষ্ঠানের কর্ম্মকুশলতার মূলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মম্ভরী লোকের সংখ্যা যত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ভাড়াটিয়া কর্ম্মীর দল বা বেতনভোগীরা সংখ্যায় তত বেশী কিছুতেই নহে।

মেকী-মানুষ যে সভ্যতায় বাড়িয়া চলিয়াছে এ দোষ কাহার? মেকী-মানুষ লইয়া সমষ্টির সুখ কোথায়? কোন্ শিক্ষায় ইহাদের অবসান হইবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, যে-শিক্ষায় সংযম লাভ হয় না তাহা অশিক্ষা অপেক্ষা কুৎসিত। শিক্ষার মোট কথা হইবে যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুষ্ঠু উপায় নির্দ্ধারণ। শৈশবকালে যৌন-বিজ্ঞান-শিক্ষাই উত্তরকালে চরিত্রহীনতার পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে শাখা উপ-শাখার মধ্যে হলাহল সৃষ্টি হইল, মূলত তাহা কাহাকে লইয়া এবং কিসের কারণ? সৃষ্টি-সংবেগের অজ্ঞাত tension বা টানই সকল উন্নতির ও অবনতির মূল, তা আত্মিক, মানসিক, দৈহিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক যে-কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন। তাহা হইলে শিক্ষার নির্দ্দেশ বা সংজ্ঞা দাঁড়াইল এই যে, যাহাতে আমরা শিক্ষিত বা সংযত হইতে পারি।

জীবতত্ত্বের দিক দিয়া বিশ্লেষণকে দ্বন্দ্ব মিটাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা বলা যায়। এই দ্বন্দ্ব কি? যৌন-সংবেগের ও সভ্যতার বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে যে বিরোধ তাহাকে দ্বন্দ্ব বলে। এই দ্বন্দ্ব হইতেই অজ্ঞাত এবং আকস্মিক আঘাত মনোরাজ্যে উদ্ভূত হয়। এই সংঘাতের কথা আমরা জানি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই দ্বন্দ্বে মানসিক দৌর্ব্বল্য বা অসম্পূর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায়, এই দ্বন্দ্বই জন্তু-জীবন হইতে মানুষকে পৃথক করে। জন্তুজীবনের স্বাধর্ম্ম্য হইতেছে গড্ডালিকা-প্রবাহের অখণ্ডতা রক্ষা করা। কিন্তু মনুষ্য জীবনে আত্মম্ভরিতা লাভের প্রথম সোপান বৈশিষ্ট্য লাভ। যৌনআকর্ষণের মধ্যে যে উপযোগীকরণশক্তি নিহিত তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের সহিত বিরোধ ঘটায় কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-সংঘটন ও তাহার সমন্বয়েই ব্যক্তিত্ব সম্যক-ভাবে প্রকাশ পায়। তাই উন্নত মানব-জীবনের উপযোগী সাজসজ্জা এই দ্বন্দ্ব লইয়া—স্বতন্ত্রীকরণে ও সমীকরণে, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে ও গোষ্ঠী সমৃদ্ধিতে, আত্মস্থের সংযম ও তিতিক্ষায়, ও আত্মবিস্মৃতের ত্যাগে ও প্রেমে, মৌনাবলম্বনে ও আত্মপ্রকাশে, মনের অন্তর্নিহিত রস-সিক্ততায় এবং মনঃপূততায়।

পুস্তক অধ্যয়ন হইতে যে জ্ঞান লাভ, বিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা লাভ তাহা উপদেশ-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই শিক্ষা বা জ্ঞান শক্তি নয়। ইহা শক্তির আড়ম্বরপূর্ণ ভানমাত্র। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে, ইহা জ্ঞানলাভের বহু সহজপন্থা দেখাইয়া দেয়। যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ছাত্রদিগকে চিন্তা করিতে এবং পরিশ্রম করিতে শিখাইত, এখন এই সমস্ত বাধা অতি যত্নের সহিত দূরীকৃত করা হইয়াছে। ছাত্রগণ এখন এমন সহজে জ্ঞানের রাজপথের উপর দিয়া চলিয়া যায় যে, তাহার দুই ধারের প্রস্ফুটিত পুষ্প-রাজির প্রতি দৃষ্টিলাভ করিবার তাহাদের অবসর নাই। যাহারা সর্ব্বদা অপরের কথা শুনিয়া চলে তাহারা আপনাদের দোষগুণ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকিয়া যায়। ব্যক্তিগত ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত জ্ঞান-গভীরতা আসে না। ক্লেশলাভ একটা মূল্যবান বস্তু। বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নির্ম্মল বিচারবুদ্ধি, উৎপাদনক্ষম অভিজ্ঞতা—এ সমস্তই দুঃখ জয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই অর্জ্জিত হইতে পারে না। অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে দুঃখজয়ী হওয়া যায় না; ক্লেশ স্বীকারে এই অন্তর্দৃষ্টিই লাভ হয়। সজ্ঞানে ক্লেশ স্বীকার বা দুঃখে বিলাসিতাই নিরুদ্ধরাজ্যের স্ব-নিপীড়ন-রতির (sadism) দ্যোতক সত্য কিন্তু তাহা ছাড়াও অন্য কিছু। ক্লেশ-স্বীকারের উৎস অজ্ঞাত মনের গর্ভজাত। ইহাকে প্রেরণা বলে। কে জানে ইহাই জন্মান্তর অর্জ্জিত বা অজ্ঞাত আত্মার সঞ্চয়। অপরের ভিতর সাইকো-এনালিষ্টদের এই অন্তর্দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি কি? এই অন্তর্দৃষ্টির প্রচ্ছন্নতা আন্তরিক সত্যভাবাপন্নতার নামান্তর। কেবলমাত্র দুঃখী ব্যক্তিই জানে, কি ভাবে আমরা ক্ষমাশীল হইতে পারি অপরের দোষত্রুটির উৎস নিজেরই মধ্যে খুঁজিয়া পাই বলিয়া। আন্তরিক সত্যভাবাপন্নতার জন্যই এই সহানুভূতি সংযোগ সম্ভব। সত্যই অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যভাবে আচ্ছন্ন না হইতে পারিলে দোষত্রুটিজাত নিজের অন্তরের আক্ষেপ প্রকম্প অপরের অজ্ঞাত মনের মানসিক বৃত্তিকে কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিকম্পিত না করিতে পারে? আপনার মলিনতার সহিত অপরের দোষত্রুটি মিলাইতে পারি বলিয়াই তো নির্ম্মল হইতে পারি। সাইকো-এনালিষ্টদের অন্তর্দৃষ্টি এইভাবেই অপরের অজ্ঞাত মনে প্রতিফলিত হয় (২)। আত্মম্ভরিতার যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, চলতি কথায় যাহাকে ভয় পাওয়া বলে তাহা মনঃ-বিশ্লেষকদিগের অন্তর্দৃষ্টিরই

(২) Theodor Reik: Surprise and the Psycho-analyst.

নুরূপ। সাইকো-এনালিষ্টরা অন্তর্নিহিত রসধারা হইতে বঞ্চিত কে না—তাই তাহাদের সত্যভাবাপন্ন হওয়া সোজা। শিক্ষায় ই যৌন-বিজ্ঞান বা তাহার বিশ্লেষণ বিষয় অন্তত প্রথম জীবনের পক্ষে কান্ত দরকার। তাহা হইলে ঐ শিশুকে উত্তরকালে আর বর্ণচোরা সন্তানের রূপান্তর গ্রহণে এবং ভাঁওতা দিতে, তথা দেশের দুঃখদৈন্য াড়াইয়া তুলিতে অনুক্ষণ চেষ্টা পাইতে হইবে না।

আমরা শিশুদিগকে তাহাদের যৌন সম্বন্ধ প্রশ্নের যথাযথ আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

এমন অনেক লোক আছে যাহারা চিরাচরিত আচারের সামান্য মাত্র বর্জনে মনের মধ্যে জখম হয়। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যাহাদের মধ্যে ইতরকথা ও যৌন-ক্রিয়ার কোন ভাব উদিত হইলে তাহারা দুশ্চিন্তাপন্ন হয়। অনেক স্থলে ইহার বহু পরিবর্ত্তিত আকার লক্ষীভূত হয়। পক্ষান্তরে এমন অনেকে আছে যাহারা সমাজের আচার-বিধি ভঙ্গ করিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় সমাজের রীতিনীতির পরিবর্ত্তনের জন্য বিরোধিতা করিতেছে। ইহারাও নানা উপায় অবলম্বন করে। ইহাদের উভয়েরই পক্ষে যৌন-বিজ্ঞান অত্যাবশ্যক।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগে ধর্ম্মসম্পর্কহীন যে শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছিল তার আবশ্যক ছিল, কারণ ধর্ম্মের মোহ ছিল সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া। শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বের ফলে যে আত্ম-বিশ্লেষণে আমরা উপযোগী হইয়া উঠিব—তাহাতে আমাদের নৈতিকশক্তি অর্জ্জিত হইবে। আমরা যাহা চিন্তা করি তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারি তাহা হইলে কিরূপে আমরা মানসিক সংঘাত জয় করিতে পারি? ইহাই আত্মপ্রকাশ। যে মানুষের চিন্তা করিবার সৎসাহস ও উদারতা যত বেশী সে মানুষ তত বেশী সার্ব্বজনিক ভালবাসার পাত্র। উচ্চাঙ্গের কাব্যে ও শিল্পে কবির ও শিল্পীর এই জাতীয় আত্মপ্রকাশ লক্ষীভূত হয়। আর তাহাতে রসিকজনের হৃদয়শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ-পরিণতি লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। নিজের বিচার আমরা নিজে করি নাই। আত্ম-বিশ্লেষণ অভাবে আত্মপ্রকাশের নামে আমরা হইয়া উঠিতেছি ভাব-প্রবণ ও পুরাতনী সমৃদ্ধিতেই গর্ব্বস্ফীত। দ্বন্দ্ব উইতে উদ্ধার পাইবার ক্ষণিক উপায়ে—মৌনতায় ও তমিস্রে আত্মপ্রকাশ হইতে বঞ্চিতও হইতেছি। আর স্বামী বিবেকানন্দ যাহাকে শিক্ষা বলিয়া বুঝিতেন বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাহার একপ্রকার অবসান ঘটিয়াছে বলিতে হইবে, কারণ বর্ত্তমান শিক্ষায় সংযমের স্থান সঙ্কীর্ণ। মোট কথা দাঁড়াইল, বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে ও সংযত জীবনযাপন করিতে যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন তাহা লাভ হয় নাই কেন? ইহার প্রধান কারণ, শিক্ষার প্রধান স্থান শিক্ষালয় নয়। যে শিশুর অন্তর্জগতে স্নেহময়ী মাতা বা স্নেহবান পিতা কর্ত্তৃক সুষ্ঠু উপায়ে আলোকপাত না হইয়া ছায়াপাত হয়,—যে শিশুর মাতা বা পিতা সংঘাতাপন্ন তাহার ভ্রাম্যমরতার পথে চলা স্বাভাবিক। শিক্ষার বেলা তাহাকে প্রথমে উদ্ভিদতত্ত্ব ও পরে প্রাণীতত্ত্ব দুইই যথাযথ ভাবে জানাইতে হইবে। ইহাতেই শিশুর যৌন-বিজ্ঞান তথা অনুমান-শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি সমৃদ্ধ হইবে এবং উত্তরকালে সেই শিশু গৃহপঞ্জিকা বা অকালপক্ব বয়স্তদের দ্বারা ভ্রাম্যমরতার পথে চালিত হইবে না। এই শিশুর উপর বিদ্যাসাগরের নির্দ্দেশ-জাত ব্যবস্থা বা বিবেকানন্দের উপদেশ সুফল প্রদর্শন করিবে, অর্থাৎ বালক স্বয়ং-সিদ্ধ হইবে এবং শিক্ষিত বা সংযত হইবে। শিশুর অর্থবোধের অনুমানশক্তি যেন অনিয়মে ও বিশৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত না হয়। জীবনের প্রথম অনুভূতির গুরুত্ব বড় বেশী। তা ছাড়া যে অনুভূতি-সমস্যার সমাধান শিশু কিছুতেই করিতে পারে না তাহা প্রাপ্ত-বয়সেও থাকিয়া যায়। লোকাচার ও দেশাচারের মধ্যে এই শিশু-সুলভ ধারণা যে থাকিয়া যায় তাহা পরে আমরা বিশেষভাবে দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

পূর্ব্বস্মৃতিতে চলা, শিশু-সুলভ ধারণায় যে লোকাচার গড়িয়া ওঠে সেই লোকাচারগত কুসংস্কার মানিয়া লওয়া, শিক্ষাকেন্দ্রে বিদ্যাসাগরীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া পুনঃ ধর্ম্মভাবাপন্ন হওয়া জন্য জীবনের জাবর-কাটার অনুরূপ। ইহাতে নূতন অভিযান ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের উপর বীতশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে। যুবক মনে বৃদ্ধ হইয়া পড়ি গোটা জাতি মিলিয়া আমরা বাঁচিতে ভুলিয়া যাই। নিরুদ্ধ ভাব কৈফিয়ৎ কাটিতে ক্রমশই জমিয়া উঠিতেছে, তাই আপিসের জমা-কাজের জন্য কৈফিয়ৎ কাটিতে অতীতের সূত্র টানিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থাকে জটিল করিয়া তুলিতেছি। আমাদের এই সৃষ্টির প্রেরণাহীন, গতিমন্থর জীবনে কৃষ্টির ক্রমবিকাশ লাভের জন্য একমাত্র উপায় আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপ্রকাশ। ভাবপ্রবণ জাতির পক্ষে শিক্ষায় ইহার যেন প্রধান লক্ষ্য থাকিয়া যায়। এখানে উইলহেলম্ বুশ্-এর কথায় বলা যায়, সকলেরই চিন্তা-গত বোকামি আছে। ব্যঙ্গ করিয়া বলা যায়, সেই লোকই বিজ্ঞ যাহার চিন্তাধারায় বোকামি প্রকাশ পায় নাই। আর এখানে আমরা যেন প্রত্যুত্তর হিসাবে বলিতে পারি যে, সেই লোকই সমধিক বিজ্ঞ, যে তাহার অর্থশূন্য চিন্তারাজির মধ্যেও গূঢ় রহস্য অন্বেষণ করিয়া থাকে। সত্যই যাহা আমরা চিন্তা করি তাহা প্রকাশ করা আদৌ শক্ত কাজ নয়, কিন্তু কি আমরা চিন্তা করি তাহা খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন, কেন না চিন্তার অধিকাংশ প্রেরণাই আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। একমাত্র মনঃপূততায়, অন্তঃকরণের অন্তর্দৃষ্টির আচ্ছন্নভাবে মনের তলদেশ হইতে আমাদের অজ্ঞাত ভাবনাকে টানিয়া বাহির করিতে পারি। আমরা শিক্ষার সেই উপাদান চাই যাহাতে আমাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আত্মজয়ী হইয়া উঠি এবং স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারি। পরিপ্রশ্ন করিতে পারি, সেই সত্য, সুন্দর ও শিব কি? প্রণিপাত করিতে পারি সেই কাম, প্রজাপতি বা ব্রহ্মার নিকট কামস্তুতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। "কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা।" কাম কামকেই দান করিলেন; কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা।

এখন যে প্রেম বা আত্মশক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই প্রজাপতির কাম, কামপরায়ণতা বা কামনায় পার্থক্য কোথায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে শিক্ষার যাহা কিছু মোটা আয়োজনের কথা আমাদের বলা সম্পূর্ণ হইবে। আমরা জানি, কামই হইতেছে আদি ব্রহ্মা। ইহার বা কামনার উপর গোটা সৃষ্টিটা নির্ভর করিতেছে। ইংরেজীতে

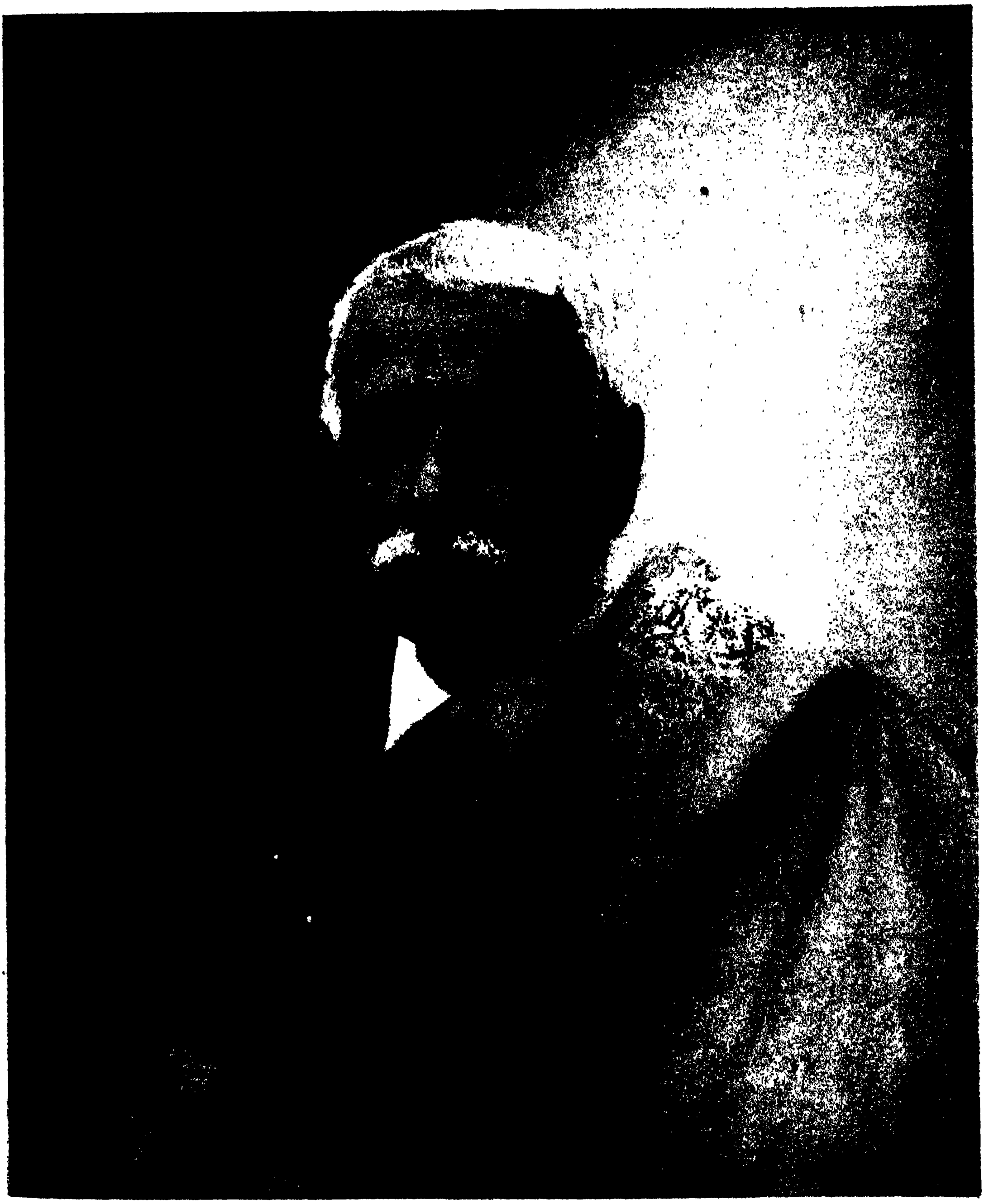
বলে, 'Idea rules the world and its events.' সত্যই কামনা তুচ্ছ নয়, কামও নয়। কাম খুব বড় জিনিষ বলিয়াই উহার মধ্যে সদিচ্ছা ও সংযমের বড় বেশী প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কাম তার মধ্যেও যে অসংযম, প্রকৃতি তাহাকেও ক্ষমা করে না। আমরা যেখানে বিবাহের চতুর্থী-কর্ম্ম-পদ্ধতির কথা বলিব সেখানে ইহা সবিস্তারে জানাইব। সেখানে দেখিব, প্রকৃতি বিন্দুমাত্র অসংযমকেও ক্ষমা করে না। এই অসংযত তথা অশ্লীল কামনাই কামের পরিবর্ত্তে স্থান পাইয়াছে। তাই তো কামকে আমরা এত ছোট্ট করিয়া ভাবি; আর ছোট করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি বলিয়াই গোটা জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। প্রেমের পরিসর কাম অপেক্ষা আরও বিস্তৃত, তাহার স্থান আরও উর্দ্ধে। 'শেষপ্রশ্নে' কমল বলিতেছে, "সমস্ত সংযমের মধ্যে যৌন-সংযমেও সত্য আছে, কিন্তু সে গৌণ সত্য ঘটা ক'রে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য ক'রে তুললে সে হয় আর এক ধরণের অসংযম। তার দণ্ড আছে।" কথাটা সত্যও বটে, মিথ্যাও বটে। মিথ্যা এই জন্য যে যৌন-সংযমই জীবনের মুখ্য সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে ঘটা করিয়া আড়ম্বরের সহিতও চেষ্টায় অধিগত করা যায় না। সজ্ঞাত-চেষ্টা, কৃতকার্য্যতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পুনঃপৌনিক চেষ্টায় সে গণ্ডীরেখা অতিক্রান্ত করা হয়। এখন দাঁড়াইল এই যে, শিক্ষার্থী এই পুনঃপৌনিক চেষ্টার প্রেরণা পাইবে কোথা হইতে? শেষ-প্রশ্নের কমল তাহা বুঝিতে পারিবে না, কেন না, কমলের মন বা তাহার বংশপরম্পরাগত মননশক্তিই তাহাকে এখানে বুঝিতে বাধা দিবে। আমরা জানি, প্রেরণা সকল সময়েই অজ্ঞাত-আত্মাধীন। এই প্রেরণাকেই আমরা আত্মশক্তি বলিয়া জানি—আর প্রেম ও আত্মশক্তি একই।

আমরা এখানে নীট্শের দরের হেরফের কিম্বা উপলব্ধ মূল্য-মর্য্যাদার পুনর্মূল্য নিরূপণের কথা উত্থাপন করিতে চাই। কেন না, এই কমল তথা আলোকপ্রাপ্তার কথা "সংযম বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্য্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে, তার আর স্থান, কাল, কারণ, অকারণ নেই।" আমরা বারম্বার দেখাইয়াছি, ইন্দ্রিয়শক্তির সাফল্য—(তা ইন্দ্রিয়প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ইন্দ্রিয়েতর কামশক্তির সাফল্য পর্য্যন্ত) নির্ভর করে ইন্দ্রিয়-দেশ বা ইন্দ্রিয়-অপদেশের রক্তাধিক্য ও টান এবং রক্ত-ক্ষীণতা ও শথিল্যের উপর। সংযম বা কামাকর্ষণ হইতেছে সৃষ্টির সংযোগ আর বা সংযম হইতেছে প্রকৃতির অজ্ঞাত প্রেরণা যাহা যৌনভোগের ক্লান্তি অপনোদন করে, রসভোগের ভাবী শক্তি বর্দ্ধিত করে এবং তাহা আত্মশক্তি বা বিশুদ্ধ-বিষয়-রতিতে রূপান্তরিত করে। শিক্ষায় সংযমের স্থান তাই এত বড়। বড় জিনিষের লক্ষণ এই যে, ইহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে। যাহা বহুকাল ধরিয়া বহুস্থানে মর্য্যাদা পাইয়াছে তাহাকেই আমরা নিজের করিয়া বুঝিয়া পুনরায় মর্য্যাদা দিতে চাই, আর এই মর্য্যাদা দিতে যে আত্মশক্তির প্রেরণা বা প্রেম আমাদের থাকা দরকার তাহা অভ্যাস ও বংশ-পারম্পর্য্যের উপর নির্ভর করে—আড়ম্বরের উপর নয়। যে সৃষ্টি-প্রেরণায় সৃষ্টি চলিতেছে তাহা পূর্ব্বগামীদের সাধনালব্ধ শেষ সমাধান, প্রেমের উপর হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধঃগামীদের ইতর-বৃত্তি-পরিপোষক, এবং নিরুদ্ধ-বৃত্তি-উদ্ভূত-র উপর কিছুতেই নয়। Heridity হইতেছে বংশগত ভাব-স্রোতের সম্বন্ধগত ভাষান্তর। ব্যক্তিবিশেষের অভ্যাসেও অভ্যস্ত হইবার যে প্রেরণা তাহার মূল সমবায়ে এই বংশপারম্পর্য্যের ভাবপ্রবণতা বাইবেলের যে উক্তি "When the fathers have eaten sour grapes are the children's teeth set on edge?" ইহা সত্যও বটে মিথ্যাও বটে। মিথ্যা এই জন্য যে, সত্যই পিতামহেরা টক খাইয়া থাকিলে বংশজাত ও সন্তজাতদের দাঁত তাহার জন্য টকিয়া যায় না, কিন্তু আত্মশক্তির প্রেরণা যেমন অজ্ঞাতের ইঙ্গিত, আর তাহারাই লাভ করে যাহারা পূর্ণতার ভাব থেকে চলিবার তাল পায়। ("a go in the whole"—Goethe) তেমনই মানুষের অভ্যাসের যে প্রেরণা তাহাও তাহার অগোচরে থাকিয়া যায়, কেন না, এই প্রেরণা heridity হইতে আসে। ব্যক্তিবিশেষ তখন a go in the racial stream. এই mental heridity বা শিশুর অজ্ঞাত মন পূর্ব্বগামীদের পিতামহ এবং পিতামহীদের নিরুদ্ধ-রাজ্যের জের ছাড়া আর কি? শিশুর তাহা হইলে দাঁত না টকিলেও টক খাইবার প্রবণতা—তথা দাঁত টকিবার পূর্ব্বগামীদের মতই টকে তাহারই সম্ভাবনার প্রেরণা থাকিয়া যায়। তাই আমরা রসবোধের মূলসূত্র বা রসোৎপত্তির কথা অবতারণা করিতে শিশুর শিশুসুলভধারণারাজি টানিয়া চলিতে বাধ্য। আর মনে পড়ে—

এ জগতে আমি নহিত একেলা
আমার একেলা বক্ষে নয়নে নয়নে আছে
আলোর সোহাগ, নক্ষত্রের কথা
সাগরবালার প্রেম-কলরব আর নিঃসীমতা। (১১)

(ক্রমশঃ)





জন্ম – [illegible] অগ্রহায়ণ, [illegible] সাল মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই মৃত্যু – [illegible]

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

এ মাসে আমরা যাঁহার ত্রিবর্ণচিত্র প্রকাশ করিলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বজনপরিচিত ও সর্ব্বজনমান্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, ডি-লিট, এফ-এ এস-বি, এফ-এ-এস, সি-আই-ই।

বন্দ্যঘটী বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ হর্ন্দলী গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার যশোহর জেলার নলডাঙ্গার রাজার সভাপণ্ডিত হন; তাঁহার চতুর্থ পুরুষ মাণিক্য তর্কভূষণ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার নৈহাটীতে পদব্রজে গঙ্গাস্নানে আসিয়া তথায় বসবাস করেন। যশোহর কালীগঞ্জে এখনও তাঁহার জ্ঞাতিরা বাস করেন; মাণিক্যের পৌত্র রামকমল ন্যায়রত্নও পণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহার টোল ছিল। রামকমলের ৬ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম হরপ্রসাদই অশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন; সন ১২৬০ সালে ২২শে অগ্রহায়ণ নৈহাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। একই বৎসরে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগমন করায় তাঁহাদের সংসারে আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হয়। হরপ্রসাদ প্রথমে নৈহাটীর পাঠশালায়, পরে জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট কান্দি স্কুলে, পরে আবার নৈহাটী স্কুলে, ও মধ্যে কিছুদিন টোলে শিক্ষালাভের পর চারিটি বৃত্তি লইয়া ও পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৃত্তিলাভের ফলে বিনাবেতনে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন ও সহরে কোন আত্মীয় না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে ৪।৫ মাস বাস করেন। পরে তিনি বহুবাজার নেবুতলায় এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহার পুত্রকে পড়াইতেন ও নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকায় ও পরে এফ-এ পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করেন ও পর বৎসর ১০০ টাকা বেতনে হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রথম হইয়া সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ায় তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। সেই বৎসরই অধ্যাপক রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর স্থানে তিনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক হন ও ১৩ মাস তথায় কাজ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন; ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান পদ লাভ করেন ও ৮ বৎসর ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ গ্রন্থাগার তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ বৈষ্ণব-সাহিত্যের সন্ধান দেয়। তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের এম-এ ক্লাস খোলা হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ও পরে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করেন ও আজীবন তাঁহাকে সেই কার্য্য করিতে হইয়াছিল;—বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, রীতি ও প্রচলিত কাহিনী সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে প্রয়োজনমত সংবাদ প্রদান করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। সে জন্য তিনি মাসিক ২০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তিনি ১৯২১ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া তাঁহাকে বহু অবৈতনিক কার্য্যও করিতে হইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উৎসাহে তাঁহাকে বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীতে কাজ করিতে হয়। ১৯০৬ হইতে তিনি উক্ত সোসাইটীর সহ-সভাপতি ছিলেন এবং ১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কমিশনার হন এবং তাহার পর ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নৈহাটীতে অবৈতনিক

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৮৮ হইতে আজীবন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

১৩০৩ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রবেশ করেন এবং পর বৎসর হইতে ১৪ বৎসর উহার সহকারী সভাপতি এবং ১৩ বৎসর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিষদের জন্য তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা পরিষদের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৮তে মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে এবং ১৯২০তে হেতমপুরে বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মথুরায় নিখিল-ভারত সংস্কৃত মহাসভায় সভাপতি হইয়া শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতেই অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সেও তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের অন্যতম ট্রাষ্টী ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আজীবন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৩৮ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র উদ্বোধন সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃঃ তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ১৩১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহার বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত করে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় তাঁহাকে 'সি-আই-ই' উপাধি দান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার গভর্ণর সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈল চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। 'এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল' এবং 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহাদের 'ফেলো' এবং 'বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটী' তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র, তখন মহারাজা হোলকার "প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদিগের মতে স্ত্রী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ" সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার ঘোষণা করিলে শাস্ত্রী মহাশয় পুরস্কার লাভ করেন ও ঐ প্রবন্ধ 'ভারত-মহিলা' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষে তিন সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষের বঙ্গদর্শনে শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মিকীর জয়' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই 'বাল্মিকীর জয়' বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত উপন্যাস 'কাঞ্চন-মালা' ও পরিণত বয়সে লিখিত 'বেনের মেয়ে' তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বাঙ্গালায় 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' লিখিয়াছিলেন। এই ইতিহাস বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য হইয়াছিল এবং তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা ইতিহাস বিক্রয় হইতে ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় মূল পুস্তক বহু না লিখিলেও বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সম্পাদন করিয়াছিলেন, বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বহু অভিভাষণ লিখিয়াছেন, পুঁথির তালিকা সম্বলিত বহু বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও বহু প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ ম্যাকডোনাল ভারত ভ্রমণে আসিলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত পুরী, বাঁকীপুর, নালন্দা, রাজগৃহ, কাশী, লক্ষ্ণৌ, বলরামপুর, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, ঝাঁসি, বোম্বাই প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভাট-চারণদিগের গান-পুঁথি সংগ্রহের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুরোধে তিনি ৪ বার রাজপুতানায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং ৪ বার নেপালে গমন করিয়াছিলেন। নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার দান কম ছিল না। সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশের জন্য তিনি ১৮ হাজার টাকা এবং স্বগ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল; তাঁহার ৫ পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন এবং সর্ব্বদাই সংসার হইতে দূরে বাস করিতেন।

১৩৩৮ সনের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতা পটলডাঙ্গার বাটীতে সহসা তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। তাঁহার শব কলিকাতা হইতে নৈহাটিতে লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে সৎকার করা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল; এরূপ কর্ম্মময় জীবন সাধারণতঃ অল্পই দেখা যায়।

সাময়িকী

বাঙ্গালায় বন্যা—

বাঙ্গালা প্রতি বৎসরই বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু এবার যে ভাবে বন্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেরূপ সর্ব্বগ্রাসী বন্যার কথা বহুদিন শুনা যায় নাই। কোন এক বা দুইটি জেলায় বন্যা হইলে অন্যান্য জেলার সহৃদয় লোকদিগের সাহায্যে কোনপ্রকারে বন্যাপীড়িত লোকদিগের দুঃখ দূর করা যায়। এবার বাঙ্গালার ১৭টি জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়াছে! যশোহর জেলার বহু স্থান আষাঢ় মাসেই জলমগ্ন হওয়ায় সে অঞ্চলের সকল ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র স্থানই এবার জলমগ্ন হইয়াছে—পদ্মার জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুর্শিদাবাদ প্লাবিত করিয়াছে। নদীয়ার একাংশও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশা পদ্মার ভাঙ্গনে বিক্রমপুর ভাসিয়া গিয়াছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক গৃহ পদ্মার গর্ভগত। ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহি প্রভৃতিতেও পাট ও ধান উভয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কে কাহাকে দেখে তাহার ঠিক নাই। একমাত্র গভর্ণমেণ্টই চেষ্টা করিলে প্রজাসাধারণকে তাহাদের এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বন্যার প্রকোপ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন এবং সে জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল সাময়িক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু বন্যা বন্ধ করার স্থায়ী ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এইভাবে প্রতি বৎসর অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া কোন লাভ নাই। উড়িষ্যার কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই স্থায়ীভাবে বন্যা বন্ধ করিবার উপায় অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের মত বিশেষজ্ঞগণ যে ভাবে বন্যা নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হন নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভায় বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহারা মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে যে সকল উপায় সদুপায় বলিয়া মনে করিতেন, মন্ত্রি-সভায় প্রবেশের পর কি সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন?

কুটীর শিল্প, না যন্ত্রশিল্প—

গত ২১শে আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে একটি সভায় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহার সহিত রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা সকলের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ডাক্তার সাহা রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভবিষ্যত ভারত তাহার দাসত্ব বজায় রাখিতে সেই পুরাতন কুটীর শিল্পের মতবাদই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, না আধুনিক ধরণের শিল্প-সমুন্নত জাতিতে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধন করিয়া জাতির দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং দেশরক্ষা সমস্যার সমাধান করিয়া বিশ্বের জাতিসংঘে সম্মানজনক আসন লাভ করিবে?"—উত্তরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন, "স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে কংগ্রেসকর্ম্মীরা সকলেই একমত নহেন। তবে আমি এ কথা বলিতে পারি যে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে যুব সম্প্রদায় দেশকে আধুনিক শিল্পোন্নত করিয়া তুলিবারই পক্ষপাতী এবং এ-কথা বলায় কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে না।" ইহাতেই দেখা যায় যে, বাঙ্গালার রাজনীতিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় নেতাই আজ একভাবে দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। উভয়েই যদি এখন একত্র হইয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করেন ও দেশে যাহাতে সেই কার্য্যপদ্ধতি অনুসৃত হয় সে বিষয়ে অবহিত হন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতও বাঙ্গালায় যে শিল্পোন্নতি সাধন সম্ভব, এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি। বাঙ্গালার অধিকাংশ অর্থ কোম্পানীর কাগজে আবদ্ধ—ডাক্তার মেঘনাদ ও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের মত মনীষীরা শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা স্থির করিলে সেই অর্থ যে কার্য্যে নিয়োজিত হইবে তাহাতে

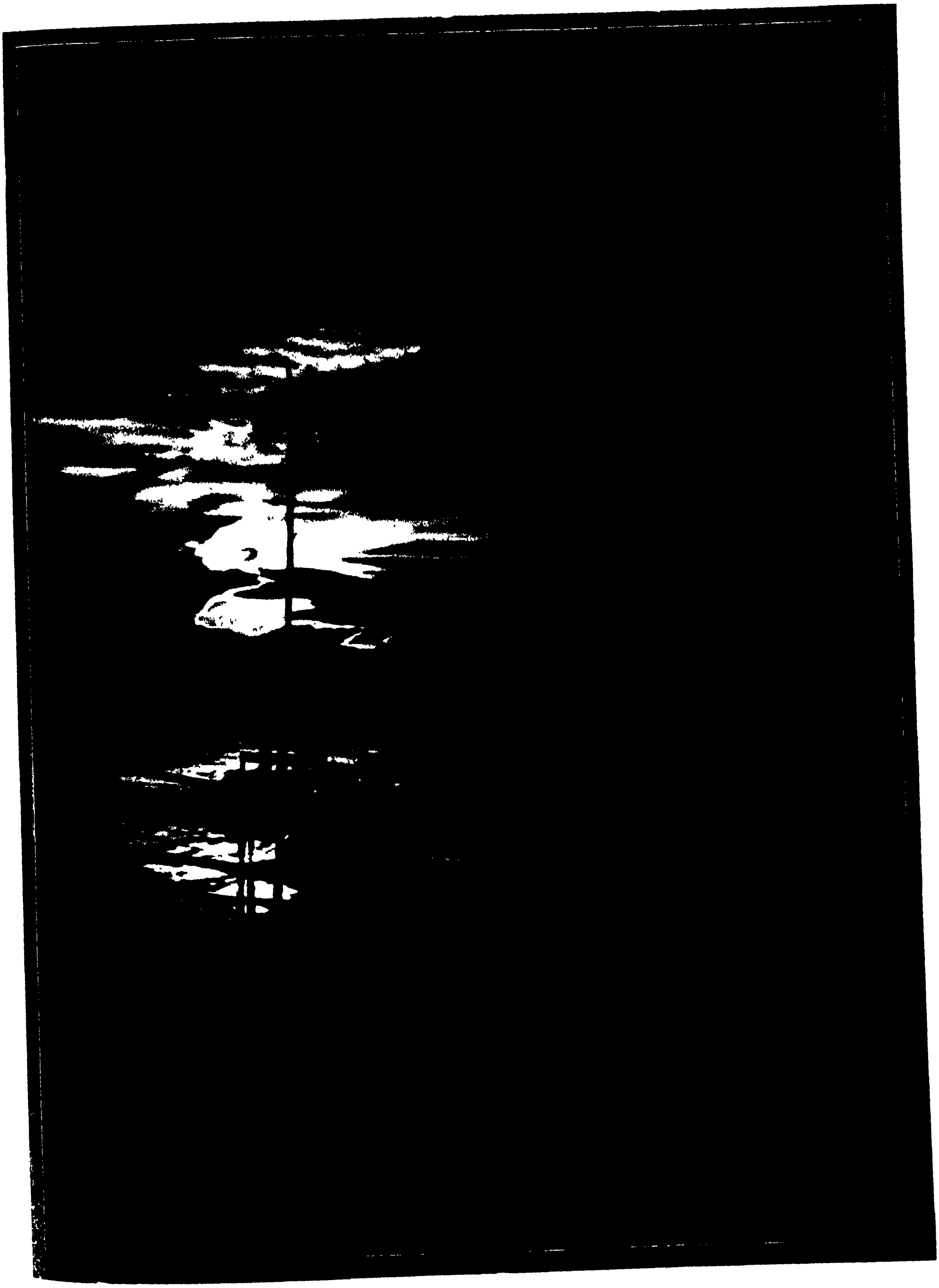
সন্দেহ নাই। জাতীয় জাগরণের দিনে আজ দেশবাসী তাঁহাদের মত দেশ-নেতার দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

হায়দ্রাবাদে সংবাদপত্র নিষিদ্ধ—

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শাসক মুসলমান হইলেও তথায় হিন্দু প্রজার সংখ্যাই অধিক। সে জন্য পরলোকগত সার সালার জঙ্গের মত রাজনীতিক তথায় যে শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে হায়দ্রাবাদে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনা নিবারিত হইয়াছিল। ফলে দেওয়ান চণ্ডুলাল ও রাজা কিষণপ্রসাদপ্রমুখ হিন্দুরা হায়দ্রাবাদ দরবারে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এমন কি রীতি দাঁড়াইয়াছিল যে, দেওয়ান হিন্দু হইলে তাঁহাকে কোন মুসলমান মহিলা এবং মুসলমান হইলে তাঁহাকে হিন্দু মহিলা বিবাহ করিতে হইবে। সার আকবর হায়দারী বর্ত্তমানে হায়দ্রাবাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা। তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি এবং হিন্দুদিগের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। এই সেদিন তাঁহারই চেষ্টায় দরবার হইতে এক লক্ষ টাকা 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে' প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও নাকি বর্ত্তমানে হায়দ্রাবাদে এমন তীব্র সাম্প্রদায়িকতা সংক্রামিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে দরবার হইতে রাজ্যের মধ্যে বহু সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল সংবাদপত্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে, সে সকল সংবাদপত্র যদি হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য দায়ী হয়, তবে এই কার্য্যে কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এইভাবে সংবাদপত্র দমন করিয়া দরবার যদি এক পক্ষের বিরাগভাজন হন, তবে তাহার ফল কি ভাল হইবে? হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্য—তথায় অল্পদিনের মধ্যে সকল দিক দিয়া যেরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মনে করিলেও আনন্দ হয়। যদি এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে সেই উন্নতি ব্যাহত হয়, তবে তাহা দরবারের পক্ষে যেমন কলঙ্কের কথা—উভয় সম্প্রদায়কেও সেইরূপ তাহার কুফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আমরা হায়দ্রাবাদের এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সংবাদে ক্ষুব্ধ এবং আশা করি, দরবার সত্বর ইহার সুমীমাংসায় সমর্থ হইবেন।

মন্ত্রী-বিতাড়ন প্রস্তাব—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর বাঙ্গালা দেশে মৌলবী এ-কে-ফজলুল হকের নেতৃত্বে একাদশ জন মন্ত্রী লইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। এ দেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার ফলে যে-ভাবে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস অধিকসংখ্যক সদস্যপদ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। সেজন্য কংগ্রেস দল এখন মন্ত্রীদিগের বিরোধী হইয়াই পরিষদে কাজ করিতেছে। দুই মাস পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের সহিত একমত হইতে না পারিয়া অন্যতম মন্ত্রী মৌলবী নৌসের আলি মন্ত্রীপদ ত্যাগ করায় তাঁহার সহিত বহু মুসলমান সদস্য মন্ত্রীদল ত্যাগ করেন ও ফলে বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া যায়। সেজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে পরিষদের ১০জন সদস্য পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। গত ২০শে শ্রাবণ সোমবার তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্রীযুত ধনঞ্জয় রায় অন্যতম মন্ত্রী মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থিত করিলে মন্ত্রীপক্ষে ১৩০ জন সদস্য এবং প্রস্তাব পক্ষে ১১১ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। ইউরোপীয় দলের ২২জন সদস্য একযোগে মন্ত্রীপক্ষে ভোট দেওয়ায় অপর পক্ষ জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া বহু নির্ব্বাচিত হিন্দু সদস্যও মন্ত্রীদিগের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রীযুত আফতাব আলিও মন্ত্রী মিঃ এচ্-এস-সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে আনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুইটি প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় অপর ৯জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই। এই ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় কয়দিন উভয় পক্ষে সভা, মিছিল প্রভৃতির অন্ত ছিল না এবং কয়েকজন পরিষদ-সদস্যের উপর আক্রমণেরও চেষ্টা হইয়াছিল। সেজন্য ২২শে শ্রাবণ রাত্রিতে পরিষদের বহু সদস্যকে পরিষদ-গৃহে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। ইউরোপীয়দলের সমর্থনে সেদিন মন্ত্রীদল জয়লাভ করিলেও তাঁহারা যে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছেন, সে কথা প্রকাশ



বিদায় হাসি

শিল্পী—অজয় সেন, কলিকাতা



আমেরিকার রাজদূত মিষ্টার জোসেফ কেনেডি (বামে) আয়ারের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডঃ ডগ্‌লাস্ হাইডের সঙ্গে তার ড্রইংরুমে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। মিষ্টার কেনেডিকে ডাবলিন ইউনিভার্সিটি হইতে ডক্টর-অব্-ল' উপাধি দেওয়া হইয়াছে



কেম্‌ব্রিজে দুই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের সম্মিলন; বিজ্ঞানের উৎকর্ষে নিয়োজিত মার্কিন সমিতির স্থায়ী সম্পাদক ডঃ এফ্ আর মৌলটন (বামে) এবং এইচ্-জি ওয়েল্‌স্; ওয়েল্‌স্ প্রণীত 'অ্যান আউটলাইন অব্ হিষ্ট্রি'র পয়গম্বর প্রসঙ্গ লইয়া মুসলমান সম্প্রদায় আন্দোলন করিতেছে

হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই দেশের লোকের অভিমত।

পরিষদে ভোটের হিসাব—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রীদের উপর অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া যে ভোট হইয়াছিল, তাহাতে কোন্ দলে কে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার হিসাব করিলে দেখা যায়—কংগ্রেস দলের ৫৩ জন, কৃষকপ্রজাদলের ১৮ জন, স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত জাতিদলের ১৫ জন, স্বতন্ত্র প্রজা দলের (মৌঃ তমিজুদ্দীন খাঁ ও সৈয়দ নৌসের আলির নেতৃত্বে)—১৪ জন, ন্যাশানালিষ্ট দলের ৫ জন, ভারতীয় খৃষ্টান ২ জন, স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের ২ জন, এংলোইণ্ডিয়ান ১ জন ও চা বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধি ১ জন—মোট ১১১ জন সদস্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। মন্ত্রীদের পক্ষে ছিলেন সম্মিলিত দল—৮২ জন, ইউরোপীয় দল—২২ জন, তপশীলভুক্ত জাতি—৯ জন, মন্ত্রী—১০ জন, ন্যাশানালিষ্ট ২ জন ও এংলোইণ্ডিয়ান ৩ জন—মোট ১৩০ জন। মৌলবী আবদুল হাকিম, কাজেম আলি মির্জা ও মহম্মদ ইব্রাহিম পরিষদে উপস্থিত থাকিয়াও কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং রায় বাহাদুর মাংটুলাল টাপুরিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ২ জন ইউরোপীয়ের স্থান শূন্য ছিল এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারুল আজিমের নির্ব্বাচন নাকচ হওয়ায় সে পদটি পূর্ণ হয় নাই। মোট সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন, তন্মধ্যে স্পিকার (সভাপতি) কোন পক্ষে ভোট দেন না। ইউরোপীয় দলের সাহায্যে সরকার পক্ষের জয় হইয়াছে। ইউরোপীয় সদস্যরা অধিকাংশই ব্যবসায়ী, জনমতের অনুকূলে ভোট না দিলে তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হইবে এ ধারণা না হইলে জনমতের পক্ষে তাহাদের ভোট পাওয়া দুর্ঘট।

রাজসাহী কলেজে নূতন গণ্ডগোল—

গত প্রায় এক বৎসরকাল ধরিয়া রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাসে হিন্দু ছাত্রগণের বাস-সমস্যা লইয়া যে গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহার বিবরণ আমরা যথাকালে প্রকাশ করিয়াছি। গত জুলাই মাসে কলেজ খুলিলে এবার আর কোন হিন্দু ছাত্র কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বাস করিতে যায় নাই। তাহারা একটি নূতন ছাত্রাবাসে বাস করিতে থাকে। নূতন ছাত্রাবাসটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত। তথাপি কলেজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি এক আদেশ জারি করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র নব-নির্ম্মিত ছাত্রাবাসে বাস করে তাহাদিগকে কলেজে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়টি জানান হইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাই বিবেচ্য।

আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক কংগ্রেস—

এবার ইউরোপের 'জুরিক' সহরে আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল উক্ত কংগ্রেস কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ১০ই আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে উক্ত কংগ্রেসে আলোচনা হইবে; কাজেই ডাক্তার ঘোষাল সেখান হইতে বহু নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া আসিবেন। তাহার পর ডাক্তার ঘোষাল ব্রুসেল্স সহরে আর একটি সম্মিলনে যোগদান করিয়া আসিবেন। তথায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গমন করিবেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

বাঙ্গালায় মাছের চাষ—

৩০ বৎসর পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিসের প্রবীণ কর্ম্মচারী সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তকে যখন ছোটলাট করার কথা ওঠে, তখন তাঁহাকে সে পদ হইতে দূরে রাখিবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাছের চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিশেষ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাকে ইউরোপে ও আমেরিকায় পাঠাইয়া মাছের চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বলা হইয়াছিল। সার কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহার গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তদনুসারে কাজ করিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী খাজা নবাব হবিবুল্লা সাহেব মাছের চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করাইবার জন্য মাদ্রাজ হইতে এক বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়াছেন। লোকটি মাদ্রাজে ২৫০৲ টাকা

বেতনে মৎস্য বিভাগে কাজ করিতেন, তাঁহাকে ৭০০৲ বেতন দিয়া বাঙ্গালায় আনা হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একজন কৃতী অধ্যাপক গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে মাছের চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি-গবেষণা বিভাগ হইতেও তাঁহাকে সাহায্য করা হয়—কিন্তু বাঙ্গালার মন্ত্রীরা বোধ হয় সে সংবাদ রাখেন না। সেজন্য তাঁহারা মৎস্য চাষ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে বাঙ্গালার লোক না লইয়া মাদ্রাজ হইতে লোক আনাইয়াছেন। বাঙ্গালায় মাছের চাস প্রয়োজন; বাঙ্গালী মাছ খায় এবং যে পরিমাণ মাছ তাহার প্রয়োজন, তাহা সে পায় না। কাজেই সেজন্য গভর্ণমেণ্ট অর্থ ব্যয় করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এই ভাবে যদি অর্থের অপব্যয় করা হয়, তাহা কি কেহ সমর্থন করিতে পারেন? মন্ত্রী মহাশয় কি এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সহিত একযোগে এই কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা

বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটাইবার জন্য যে বাঁটোয়ারা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বিরোধী এবং বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে উহা দেশের রাজনীতিক জীবনের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা গত কয় বৎসর ধরিয়া দেশের সর্ব্বত্র বলা হইতেছে। বাঁটোয়ারার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিবার জন্য গত ১লা ভাদ্র ভারতের সর্ব্বত্র সভা হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থার ফলে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিষ বিস্তৃত হইতেছে। যতদিন না ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, ততদিন উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন পরিচালন করা প্রয়োজন।

সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি—

কলিকাতার তিন নম্বর ওয়ার্ডের করদাতৃসঙ্ঘ সাধক কবি রামপ্রসাদের স্মৃতি রক্ষার্থ একটি পার্কের নামকরণে যত্নবান হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। তমলুকের লবণ-দেওয়ান দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহের একাংশে সাধক রামপ্রসাদ তাঁর পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায়ই বাস করিতেন। ঐ অংশ এক্ষণে পার্কে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ঐ পার্কের নামকরণ হইবে। আমরা আশা করি, বর্ত্তমান কাউন্সিলাররা ঐ পার্কটির 'সাধক রামপ্রসাদ পার্ক' নামকরণ করিয়া সাধকের স্মৃতিরক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। এ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা—

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে কয়েক কোটি টাকার দুগ্ধজ দ্রব্য আমদানী হইলেও এ পর্য্যন্ত এদেশে ঐ প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। সম্প্রতি ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নামক এক যুবক ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ায় বহু দুগ্ধজাত দ্রব্যের কারখানায় কার্য্যশিক্ষা করিয়া আসিয়া দমদমে একটি কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ২০শে আগষ্ট শনিবার রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু উক্ত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন।



ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

ডাক্তার ইউ-এন রায়চৌধুরী, ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু, ডাক্তার আর-আমেদ প্রভৃতি খ্যাতনামা ডাক্তারগণ উক্ত কারখানার পরিচালক হইয়াছেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশ সেদিন উদ্বোধন সভায় সভাপতিরূপে বলিয়াছেন—১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে তাঁহারা এরূপ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

সিকিমে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক দল—

একদল জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হিমালয় অভিযানে আগমন করিয়া সম্প্রতি সিকিমে শিবির স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন। তাহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তদন্তের জন্য দলে দলে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন; পশুপক্ষী, গাছপালা, মাটী প্রভৃতি সংগ্রহ করাই তাঁহাদের কার্য্য। হিমালয়ের ঐ অংশে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও বৈজ্ঞানিক-গবেষণা হয় নাই; এই গবেষণার ফলে হয়ত জার্ম্মান জাতি সমৃদ্ধ হইবে। বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের কত নূতন জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সন্ধানের ফলে মানবজাতি কিরূপ উপকৃত হয়, তাহা জার্ম্মানী জগতকে দেখাইতে জানে। তাই তাহারা এত দূরে একদল লোক প্রেরণ করিয়াছে। স্বাধীন জাতির বিশিষ্টতাই এই। আমরা হিমালয়ের এত নিকটে থাকিয়াও তাহার কোন খবর রাখি না - ইহাই আমাদের পরাধীনতার পরিচয়।

পরিষদে সরকার পক্ষের পরাজয়—

গত ৭ই ভাদ্র বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপর্য্যুপরি দুইবার সরকার পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে পরিষদে আর সরকার পক্ষের পরাজয় হয় নাই। মন্ত্রী বিতাড়ন সম্পর্কে মন্ত্রীরা নানা উপায়ে নিজেদের দল রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। যদি এই ভাঙ্গন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অচিরে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পতন হইতে পারে। স্বতন্ত্রদলভুক্ত তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রস্তাব করেন যে,প্রভিন্সিয়াল ও সার্বাডনেট সার্ভিসের সকল সরকারী কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের চাকরীর ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। প্রস্তাবটি প্রবল ভোটাধিক্যে সভায় গৃহীত হয়। স্বতন্ত্রপ্রজাদলের ডেপুটী-নেতা সৈয়দ আবদুল মজিদ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন; তাহাতে বলা হইয়াছে—কৃষকদিগের উপর করভার না চাপাইয়া অবিলম্বে বাঙ্গালায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি পরিষদে ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল সদস্য সরকারপক্ষে ভোট দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন স্থগিত—

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গালার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এচ এস-সুরাওয়ার্দ্দী শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় বঙ্গীয় পরিষদে একটি নূতন বিল উপস্থিত করিবেন এবং আগামী বারেই যাহাতে নূতন বিল অনুসারে নির্ব্বাচন হয়, সেজন্য আগামী মার্চ্চ মাসে কর্পোরেশনের যে নির্ব্বাচনের কথা আছে, তাহা পিছাইয়া দিবেন। ফলে বর্ত্তমান কাউন্সিলারদিগের কার্য্যকাল বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু নূতন আইনের ফলে কর্পোরেশনে কংগ্রেস প্রাধান্য কমাইবার চেষ্টা হইলে তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টেরই সৃষ্টি করিবে।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত কয় বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, ৭ই আগষ্ট তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ৮ই আগষ্ট হইতে খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সি-আই-ই মহাশয় নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। হক সাহেব পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অধিবাসী, বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মত আজিজুল হক মহাশয়ও ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিবেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হইয়াছে, সেরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না। তিনি ৪ বৎসর কাল প্রায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। বেতনভুক ভাইসচ্যান্সেলারের পক্ষেও এত অধিক কাজ করা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উন্নতি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় নাই। শ্যামাপ্রসাদবাবু বাল্যকাল হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট—সেইজন্যই ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ লাভ করিয়া তাঁহার পক্ষে এত অধিক কাজ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত ৩২শে শ্রাবণ কলিকাতায়

বেরিবেরি রোগে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। নাটোরের নিকট চৌকীপাড় গ্রামে তাঁহার বাস। তিনি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং নাটোর হইতে প্রকাশিত 'কেয়া' ও 'পঞ্চপ্রদীপ' নামক মাসিক পত্রদ্বয়ের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়খানি উপন্যাস ও বহু গল্প বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতায় তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'জলছবি' ও 'অত্রি' নামক মাসিক পত্রগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রদিগকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

আফ্রিকায় বেদমন্দির প্রতিষ্ঠা—

পর্ত্তুগীজ পূর্ব্বআফ্রিকার 'লরেন্স মার্কস্' সহরে স্থানীয় প্রবাসী ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক ৩১শে জুলাই একটি 'বেদমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা নির্ম্মাণে সাড়ে তিন হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। স্বামী ভবানীদয়াল সন্ন্যাসীর নাম ভারতে সুপরিচিত; প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই এই বেদ-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। সুখের বিষয়, পর্ত্তুগীজগণ উপনিবেশের ভারতীয়গণকে কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও উন্নতি-শীল বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের প্রতি অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতীয়-গণ সকল সময়েই তথায় পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ভারতীয়গণের আচার ব্যবহার বা ধর্ম্মে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। বিদেশে ভারতীয়গণের এই সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের সংবাদে ভারতীয়-মাত্রই গৌরবানুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

দেবোত্তর—

আমাদের দেশে অনেক হিন্দু দেব-সেবার জন্য সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সে সম্পত্তি কখনও উৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাকে এমন ভাবে অর্পণ করা হয় যে, তাহার সহিত দাতার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; আবার কোন কোন স্থলে দাতা ও তাহার বংশধরেরাই ঐ সম্পত্তি সেবাইতরূপে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে দাতার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সম্পত্তির আয় দেবসেবাতিরিক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইতে থাকে এবং শেষে হয় ত সেবাইতরা দেবতার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া আপনা-দিগের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টাও করেন। মাদ্রাজ প্রদেশে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় যাহাতে অপব্যয় না হয়, সে জন্য কয় বৎসর পূর্ব্বে তথায় দেবোত্তর আইন পাশ হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন। মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রীরাও এক্ষণে সেগুলি সুপরিচালনার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বহু দেবস্থানে যে দেবোত্তরের অর্থ লইয়া অনাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। বাঙ্গালায় দেবমন্দিরের এবং দেবোত্তর সম্পত্তির সংখ্যা অল্প নহে এবং বহু স্থানে এখনও অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে ও দেবসেবার অর্থ অপব্যয় হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইয়া দেশের বহু উপকার হইতে পারে।

দেশসেবকের দান—

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস-নেতা সর্দার নর্ম্মদাপ্রসাদ সিং ১৪ বৎসরকাল প্রবাসে থাকিয়া সম্প্রতি নিজ জমিদারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রেওয়া রাজ্য সর্দ্দারজীর জমিদারী, তাহার বার্ষিক আয় ৩৫ হাজার টাকা। এই বিরাট সম্পত্তি তিনি জনসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। জমিদারীস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া এক কমিটীর হস্তে সম্পত্তির পরিচালনভার অর্পিত হইয়াছে। কমিটী তাঁহার পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ দিবেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন, অতিরিক্ত কিছুতেই তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না। সর্দারজী প্রজাদিগের বকেয়া খাজনা মাপ করিয়া দিয়াছেন, ঋণের দায়ে যাহার যে সম্পত্তি বন্ধক ছিল তাহা প্রত্যর্পণের আদেশ দিয়াছেন ও সকল ঋণের দাবী তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ প্রকার দান বর্ত্তমান যুগে বিরল হইলেও প্রাচীন ভারতে বিরল ছিল না। কাজেই ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তথাপি আমরা এই দাতার সর্ব্বস্ব ত্যাগের প্রশংসা না করিয়া পারি না।



ঝড় বয়েছে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে

আসছে তরী বেয়ে—রবীন্দ্রনাথ শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা



সীডনিতে বৃটিশ কমনওয়েলথ রিলেশন অধিবেশনে যোগদানের জন্য ডঃ কালিদাস নাগ (মধ্য), মিঃ গীয়াসুদ্দিন এবং সৈয়দ আমজাদ আলি বোম্বাই হইতে অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে জাহাজযোগে রওনা হইয়াছেন



রক্তাল্পতার জন্য ম্যালভার্ণ-উৎসবে যোগ দিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া হার্টফোর্ডসায়ারে বিশ্রামার্থ অবস্থানের পর বার্ণার্ড শ লণ্ডন ছাড়িয়া মফঃস্বলে যাইতেছেন



মিলিটারি সেন্সের বিরাট সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ ব্যাপারে সিনর মুসোলিনী একটি মটার-গান পরীক্ষা করিতেছেন

সম্মানিতা মহিলা—

আমরা নিম্নে তিনজন কৃতী বাঙ্গালী মহিলার পরিচয় প্রদান করিব—মহিলারাও যে সুযোগ পাইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা এই কয়টি উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়। (১) নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষা মিসেস কোমলতা দত্ত বিলাতের ট্রিনিটী সঙ্গীত কলেজের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন; তিনি স্যার আলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জ্জীর কন্যা ও নাগপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ ডবলিউ-সি-দত্তের পত্নী। তিনি বর্ত্তমানে নাগপুরে একটি সঙ্গীত কলেজ খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। (২) কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বলদেওদাস মেটারনিটি হোমের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সরলা ঘোষ বিলাতের ট্রিনিটি কলেজ হইতে ডিগ্রি-ও এবং রোটাণ্ডা হাসপাতাল হইতে এল-এম ডিগ্রি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি প্রসূতি-বিজ্ঞান ও শিশু-মঙ্গল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। (৩) শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী নাম্নী এক বাঙ্গালী মহিলা মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলার গাড়ারওয়াড়া নামক স্থানে তিন বৎসর ধরিয়া মিউনিসিপালিটীর মনোনীত সদস্য হইয়া আছেন। তিনি ঐ সহরে জনসাধারণের অর্থে শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিতা নহেন, কিন্তু নিজ সহৃদয় ব্যবহারের ফলে ঐ অঞ্চলে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি দেখা যায়।

দিব্য স্মৃতি উৎসব

বাঙ্গালার এককালীন নির্ব্বাচিত রাজা দিব্যের স্মৃতি উৎসব গত কয় বৎসর ধরিয়া উত্তর বাঙ্গালার স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ দেশে যে এককালে গণতন্ত্র ছিল তাহা রাজা দিব্যের জীবনী হইতে জানা যায়। এবার বগুড়া জেলার মঙ্গলবাড়ীতে দিব্যস্মৃতি উৎসবের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান হইবে। ঐ স্থানে হরগৌরীর মন্দির আছে—মন্দিরটি রাজা ভীম কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মন্দিরের নিকট প্রসিদ্ধ গরুড়স্তম্ভ বিদ্যমান—লোকে তাহাকে ভীমের বণ্ডী বলে। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের চর্চ্চা দেশবাসীকে তাহার পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভিয়েনায় বাঙ্গালী ডাক্তারের মৃত্যু—

কর্ণেল পি-এন-বসু পাটনার অধিবাসী; তিনি রায়-বেরিলির সিভিলসার্জ্জেন ছিলেন। দীর্ঘকালের ছুটী লইয়া তিনি ইউরোপে গিয়াছিলেন। ভিয়েনা সহরে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভিয়েনায় ভারতবাসীদিগের একটি সমিতি আছে; ঐ সমিতির সদস্যগণ ডাক্তার বসুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানীয় হোটেলে সকলে সমবেত হইয়া এক শোকসভা করিয়াছেন। স্বদেশ ও স্বজন হইতে দূরে ডাক্তার বসুর এই মৃত্যু বিশেষ শোচনীয়।

বিজয়কৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

গত ২৬শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমায় কাশীধামে স্বর্গত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার পত্নী যোগমায়া দেবীর শ্বেতমর্ম্মরমূর্ত্তি স্থানীয় বিজয়কৃষ্ণ মঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার ভাস্কর শ্রীযুত জি-পাল মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইটালী হইতে গোস্বামীজির ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি তৈয়ার হইয়া আসিয়াছিল, তাহা যথাযথ না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়; এবার শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তি যথাযথ হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশের চেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশবাসী একজন মহাপুরুষের শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তি কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের স্মৃতি ফলক—

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র হুগলীর নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত দেবানন্দপুরে তাঁহার কোন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি উত্তরপাড়ার জমীদার শ্রীযুত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় হুগলী জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক দেবানন্দপুরে ভারতচন্দ্রের বাসগৃহে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনা বাঙ্গালী চিরদিন আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। কাজেই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া হুগলী জেলাবোর্ড উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র—

জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌গণের আগামী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন হইবে তাহাতে যোগ-দিবার জন্য ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউটসাহী নিবাসী ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র আহূত হইয়াছেন। ডাক্তার মিত্র এক্ষণে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির রসায়নবিভাগের অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন। জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে



ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

তিনি যথাক্রমে রেঙ্গুন কাষ্টম্ হাউস, দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও কলেজ, কলিকাতার স্কুল অব্ ট্রপিকেল মেডিসিন এবং অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ হাইজিন ও পাবলিক হেল্‌থে রাসায়নিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমেরিকার সিগ্‌মা সাই নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সভার তিনি একজন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। খেলা-ধূলায়ও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

হাবসী সম্রাটের বাণী—

আবিসিনিয়ার রাজ্যচ্যুত সম্রাট হাইলে সেলাসী সম্প্রতি নিউইয়র্কের বিশ্ব যুব-সম্মিলনে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা গ্রামোফন রেকর্ডে গৃহীত হইয়াছে এবং জগতের সর্ব্বত্র সেই রেকর্ড বিক্রীত হইতেছে। তিনি তাঁহার বাণীতে জানাইয়াছেন—"বর্ত্তমান যুগের তরুণদের ভুলিলে চলিবে না, তাহাদের দায়িত্ব কত অধিক। এ যুগে শুধু 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা নহে, পরন্তু সন্ধির সর্ত্ত, আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায় বিচার হইতে উদ্ভূত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুদৃঢ় দাবী জানাইতে হইবে। একমাত্র রাষ্ট্রসংঘেরই এইরূপ শান্তি রক্ষা করার ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রসংঘ ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত জাতিসমূহ সংঘের নিয়ম না মানিয়া চলায় আজিও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।" হাবসী সম্রাট রাষ্ট্রসংঘের শরণাপন্ন হইয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে পারেন নাই; তথাপি আজও তিনি যে রাষ্ট্রসংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহাতেই তাঁহার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মত শক্তিমানের পক্ষেই শান্তির কথা বলা শোভা পায়।

লাক্ষাচাষের উন্নতি বিধান—

ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুর প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাক্ষা বা গালার চাষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিমণ লাক্ষার দাম ছিল ১০০৲ টাকা, এক্ষণে তাহা কমিয়া লাক্ষার মণ ২০৲ টাকা হইয়াছে; এ কারণে যে সকল দরিদ্র কৃষক লাক্ষার চাষ করিয়া জীবিকার্জন করিত, আজ তাহাদের দুঃখের অন্ত নাই। বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি লাক্ষা চাষীদের দুর্দ্দশা দূরীকরণে যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লাক্ষা এদেশে নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং বিদেশেও তাহা রপ্তানী করিয়া তদ্দারা লাভবান হওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুপ্রমুখ নেতারা লাক্ষার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শীঘ্রই একটি নিখিল ভারত সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবেন। তাহার ফলে সমগ্র ভারতে যাহাতে ছোটনাগপুরের লাক্ষা ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়, তাহার চেষ্টা হইবে। ইক্ষুচাষ সম্বন্ধে যেরূপ নিখিল ভারত বোর্ড আছে, লাক্ষাচাষ সম্বন্ধেও সেইরূপ বোর্ড গঠিত হইবে। ভারতের ধ্বংসোন্মুখ শিল্প-গুলির রক্ষাবিধান ছাড়া ভারতের উন্নতির অন্য উপায় নাই—এ বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে শুধু দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে না—কৃষকগণেরও আর্থিক উন্নতি হইয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হইবে।

কালীকৃষ্ণ সেন—

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক কালীকৃষ্ণ সেন গত ১৪ই শ্রাবণ শনিবার লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কালীবাবু হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুরের বিখ্যাত সেনপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সেই তিনি সাংবাদিকের কার্য্যে ব্রতী হন। পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে "বেঙ্গলী" পত্রে সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন। "ট্রিবিউন"এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় এবং পরলোকগত পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সমসাময়িক ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণবাবু "ইণ্ডিয়ান্ ডেলী নিউজ" পত্রে যোগদান করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে "ডেলী নিউজ"-এর সম্পাদনার ভার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। তিনি "ডেলীনিউজ" হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে "ক্যাপিটাল" পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। দীর্ঘ ১০ বৎসর "ক্যাপিটালের" সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়া ১৯৩৪ খৃঃ অঃ অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খৃঃ অঃ যখন শ্রীযুক্ত মুলচাঁদ আগরওয়ালা "ইলাসট্রেটেড্ ইণ্ডিয়া" পত্র প্রকাশ করেন, তখন তিনি কালীবাবুকে সম্পাদক করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি "ওরিয়েন্ট্" পত্রিকার সম্পাদক হন। কিছুদিন পরেই কালীবাবু "এডভান্সের" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংবাদিকরূপে তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতেন এবং তাঁহার নিরপেক্ষতা সুবিদিত। যখন ইংরেজী "বসুমতী" প্রকাশিত হয় তখন কিছুদিন কালীবাবু তাহার অন্যতম প্রবন্ধলেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশে একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের অভাব হইল।

সৈন্য সংগ্রহ বিল—

মিঃ ওগিলভির সৈন্যসংগ্রহ বিল মুসলীম লীগ ও ইংরেজ সভ্যগণের ভোটের জোরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাশ হইয়াছে। ভারতে সৈন্যসংগ্রহের বিরুদ্ধে যাহাতে কোন আন্দোলন না হয় তাহার জন্যই এই বিল রচনা। সরকার পক্ষ বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে সৈন্য সংগ্রহ কম হইবার সম্ভাবনা এবং এই প্রকার সম্ভাবনা অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও হইতে পারে। তাঁহাদের মতে, এইরূপ বিল পাশ না করিলে সৈন্যসংগ্রহের বিরুদ্ধে জনমত এত প্রবল হইবে যে সৈন্যদলে লোক পাওয়া দুর্ঘট হইবে। বিলটি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকল প্রদেশের অভিমত গ্রহণ করা উচিত ছিল। সৈন্যদলে যোগদান করা বা না করা বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই বিল মানুষকে সেই স্বাধীনতায়ও বঞ্চিত করিবে।



কালীকৃষ্ণ সেন

ভারতীয় নিয়োগ—

সমানযোগ্য এমন কি যোগ্যতর ভারতীয় পাওয়া গেলেও অনেক সময় তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বড় বড় সরকারী পদে ভারতীয়ের স্থলে শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের কি সন্তোষজনক উত্তর থাকিতে পারে তাহা আমরা জানি না। এইবার ইনসিওরেন্স-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যখন একজন শ্বেতাঙ্গ নিয়োগের সুপারিশ করা হয় তখন কংগ্রেসী সদস্যগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার উত্তরে সরকার পক্ষ কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলেও মাত্র এক ভোটের জোরে তাঁহাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, যে মহম্মদ আলি জিন্না এতদিন যোগ্য ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে পরিষদ গৃহে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন তিনি স্বীয় দলবলসহ সরকার পক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন। কতকালে জিন্নাদলের মতি ফিরিবে?



অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের পঞ্চম টেষ্ট ঃ

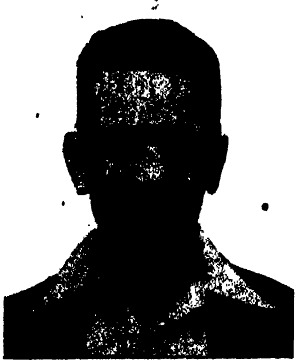
ইংলণ্ড—৯০৩ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়া—২০১ ও ১২৩

২০শে আগষ্ট শনিবার ওভাল মাঠে বাইশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে পঞ্চম টেষ্ট খেলা (যদিও শেষ পর্য্যন্ত খেলবার সর্ত্তে আরম্ভ হয়) চতুর্থ দিনেই শেষ হয়। ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে বিজয়ী হয়েছে। 'এসেস্' অষ্ট্রেলিয়ারই কাছে রইল, কারণ পাঁচটি টেষ্টের মোট ফলাফল সমান। নিয়মানুযায়ী পূর্ব্ববারের বিজয়ী দলের কাছেই 'এসেস্' থাকবে।



এল হাটন ব্যাট করছেন

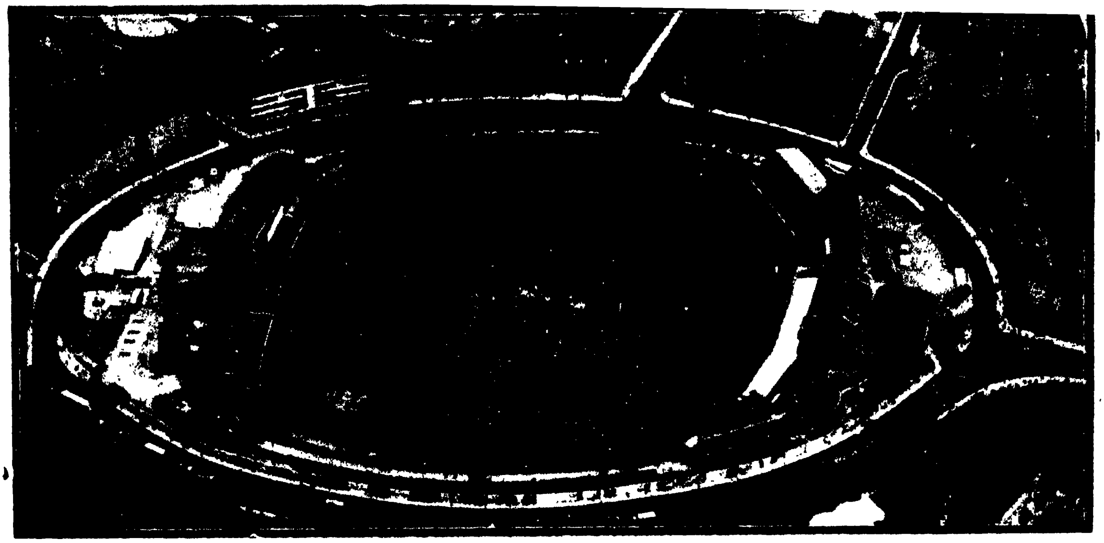


অষ্ট্রেলিয়ার এরকম শোচনীয়ভাবে হার ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটেনি। পূর্ব্বে এরূপ বিশেষ জয় হয়—১৯২৮ সালে ব্রিসবেনে ইংলণ্ডের ৬৭৫ রানে এবং অষ্ট্রেলিয়ার ১৯৩৭ [illegible] ইনিংস ও ২০০ রানে। ব্রাডম্যান পড়ে' গিয়ে পায়ে আঘাত পাওয়ায় এবং ফিঙ্গলটন আঘাতের জন্য খেলতে না পারায় অষ্ট্রেলিয়াকে ন'জনে দু' ইনিংসই খেলতে হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের বিপুল রান সংখ্যার বিরুদ্ধে জয়ের ক্ষীণাশাও মনে উদয় হ'তে পারে না যখন শেষ পর্য্যন্ত খেলতে হবে, ড্র করবারও কোন উপায় নেই; তার উপর দলের সর্ব্ব আশা-ভরসা ব্রাডম্যানকে হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়ারা একেবারে মুসড়ে পড়লো। সত্যই, ব্রাডম্যানকে বাদ দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের টেষ্ট যেন শিবহীন যজ্ঞ। ম্যাককরমিক্ও অনুপস্থিত; অষ্ট্রেলিয়ার দল ভাঙা-দল।

এবারও হামণ্ড টসে জয়ী হন এবং এড্রিচ্ ও হাটনকে ব্যাট করতে পাঠান। এড্রিচ্ ১২ ক'রে গেলে লেল্যাণ্ড যোগ দেন এবং এই দু'জন ইয়র্কসায়ার খেলোয়াড় সারাদিন পিটে রান



হার্ডষ্টাফ.



ইংলণ্ডের ওভাল মাঠের বায়ুরথ থেকে গৃহীত দৃশ্য। এখানে এবার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয় এবং ইংলণ্ড বিপুল রানাধিক্যে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজয় করে

তোলেন ৩৪৭ এবং উভয়েই নট আউট থাকেন বেলা শেষ পর্য্যন্ত, হাটন করেন ১৬০, লেল্যাণ্ড ১৫৬। লেল্যাণ্ড ৩ বার রান আউট থেকে বেঁচেছেন এবং হাটন ষ্টাম্পড হন নি একবার বার্ণেটের দোষে, যখন তিনি ক্রিজ থেকে প্রায় গজ খানেক দূরে ছিলেন। মোট শত রান ওঠে ১২৭ মিনিটে। লেল্যাণ্ড নিজস্ব ৫০ রান তোলেন ৯৩ মিনিটে, কিন্তু হাটনের ৫০ ওঠে ১৪৫ মিনিটে। তার পরে হাটন বেশী আক্রমণ প্রবণ হন। দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ত্রিশ হাজার হয়।



পঞ্চম টেষ্ট খেলায় হাটন ও'রিলীর বল লেগে পিটেছেন

বোল্যাররা চমৎকার লেংথ রেখে বল করছে, উৎকৃষ্ট ফিল্ডিংয়ের জন্য রান উঠছে কম, তবু ব্যাটসম্যানরা যেন অগ্রাহ্য ভাবে পিটছে। ১৫০ রান উঠলো ১৭৫ মিনিটে। হাটন চমৎকার খেলছে উইকেটের চতুর্দ্দিকে পিটিয়ে, নিজস্ব শত রান করেছে ১২৫ মিনিটে। মোট দু'শত রান ২২৫ মিনিটে উঠেছে। নূতন বলেও ম্যাক্‌ক্যাব ও ওয়েটের চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতার ১৯৩২-৩৩ সালের সীডনেতে সাটক্লিফ্ ও হ্যামণ্ডের ১৮৮ রানের রেকর্ড ভঙ্গ হ'য়ে গেলো।



ফার্নেস

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো চা পানের সময়। ও'রিলীর নো-বল লেল্যাণ্ডের উইকেটে পড়্লো। দুই ব্যাটসম্যানে রান সংগ্রহের পাল্লা চল্‌ছে, হাটন ১১৮, লেল্যাণ্ড ১২০, মোট ২৬৬ এক উইকেটে। হাটন ৩৩০ মিনিটে নিজস্ব ১৫০ তুললে। তার খেলার বিশেষত্ব ছিল, অফ্-ড্রাইভ, লেগগ্লাইড্ ও কাটিংয়ে। লেল্যাণ্ড সময়মত জোর সোজা পিটিয়ে নিজস্ব ১৫০ তুলেছে ২২৫ মিনিটে।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ৬৩৪ রান তোলে। ইংলণ্ড পক্ষে হাটন ও লেল্যাণ্ড দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৮২ রান তুলে নূতন রেকর্ড স্থাপন করলে। লেল্যাণ্ড অবশেষে রান আউটই হলো, ১৮৭ রান করে ৩৭৫ মিনিটে, ১৭টা চার ছিল। তার খেলার মধ্যে চমৎকার অফ্-ড্রাইভিং, লেগ্-গ্লান্সিং ও কাটিং ছিল। হ্যাসেটের ছোঁড়া থেকে ব্রাডম্যান উইকেটে মারে যখন লেল্যাণ্ড পুনরায় রান নিতে গিয়েছে। হাটন পুরা দু'দিন ৬৬৫ মিনিট ব্যাট করে ৩০০ রান তুলে টেষ্টে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যক্তিগত নূতন রেকর্ড করলে। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ফষ্টারের ২৮৭, ১৯০৩ সালে সীডনেতে। ক্ষীণালোক ও বৃষ্টির জন্য খেলা ৬-১৯ মিনিটে বন্ধ করতে হয়। হাটন ধীরে কিন্তু দৃঢ়তাসহকারে ও সুপ্রণালী-সঙ্গত-ভাবে রান তুলে গেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার বোলাররা কখনও হতাশ হয় নি, তাদের অবিরত চেষ্টা ও ঐকান্তিকতা অবশেষে সুফল দিয়েছিল, তৃতীয় উইকেটে ১৩৫ রান যোগ হ'লে, হ্যামণ্ড ৫৯ রানে এল-বিতে গেলেন। পেণ্টার ০ ও কম্পটন ১ রান করে গেলে হার্ডষ্টাফ যোগদান করে খেলা শেষে ৪০ রান করে নট আউট থাকে। মোট ৪০২ রান ৪২০ মিনিটে ওঠে, ৫০০ রান ওঠে ৫৫০ মিনিটে। চা পানের পর ফিঙ্গলটন ফিল্ড করতে নামে নি, পায়ের পেশীতে আঘাতের জন্য।



বাউস

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরেই হাটন ৩৬৪ রান করে ও'রিলীর বলে হ্যাসেটের হাতে কট হন, ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলে, ৩৫টা চার ছিল। তার ইনিংস প্রায় ত্রুটিশূন্য ছিল, কেবল ৪০ রানের মাথায় একবার ষ্টাম্পড হবার সুযোগ দেওয়া ছাড়া। হাটন ব্রাডম্যানের টেষ্টের রেকর্ড ৩৩৪ ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড করেছে। হার্ডষ্টাফ নির্দ্দোষ ইনিংস খেলে ১৬৯ (নট আউট) করেছেন ৩৩০ মিনিটে, ২০টা চার ছিল। এটিই তার প্রথম সেঞ্চুরী অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। মোট ৭০০ রান ওঠে ৭৩০ মিনিটে।



হ্যাসেট

টেষ্টের মোট রান সংখ্যার রেকর্ড ভঙ্গ হলো, পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল অষ্ট্রেলিয়ার ৭২৯ (৬ উইকেটে)। ষষ্ঠ উইকেট সহযোগিতার পূর্ব্ব রেকর্ড ১৮৬ রান হ্যামণ্ড ও এইমসের ভঙ্গ করলে হাটন।

মোট ৮০০ রান সংখ্যা উঠ্‌লো ৮৩০ মিনিটে। ৮৮৭ রানের পর দ্বিতীয় বার বল দেবার সময় হার্ডষ্টাফের মার ফেরাতে ব্রাডম্যান পড়ে গিয়ে ডান পায়ের গাঁটে বিশেষ আঘাত পান, তাঁকে মাঠ থেকে নিয়ে যেতে হয়। তিনি আর খেলতে পারেন

নি এবং ইংলণ্ডে আগামী খেলাগুলিতেও আর নামতে পারবেন না। ইংলণ্ড চা পানের সময় ৯০৩ রান ৭ উইকেটে তুলে ডিক্লেয়ার্ড করে। লাঞ্চের পর জনসমাগম হয়েছিল ত্রিশ হাজার।



পঞ্চম টেষ্টে উইকেট রক্ষক বার্ণেট লেল্যাণ্ডকে ষ্টাম্প করতে অকৃতকার্য্য হয়েছেন

বেলা ৫টার সময় অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস আরম্ভ হয় এবং বেলা শেষে তিন উইকেট খুইয়ে মাত্র ১১৭ রান ওঠে। ব্রাউন ও বার্ণস খেলছে, হাসেট, ম্যাক্‌ক্যাব ও ব্যাডকক্ গেছে।

ব্রাড্‌ম্যান ও ফিঙ্গলটন খেলতে পারবে না প্রচারিত হওয়ায় চতুর্থ দিন খেলা দেখতে এসেছে মাত্র পাঁচ হাজার লোক। ব্রাডম্যান তাঁর হোটেলের বিছানায় ব'সে টেলিভিসনে খেলা দেখছেন। ব্রাডম্যানহীন অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম বল থেকেই ভগ্নোৎসাহ হয়ে খেলছে। ক্ষীণাশাও নেই তাদের মনে যে জয়ী হবে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানায় খেলায় উৎকর্ষতা আসা সম্ভব হয় নি। ইংলণ্ডের মারাত্মক বোলিংয়ের বিপক্ষে তারা দাঁড়াতেই পারলে না। প্রথম ইনিংসে বাউস ৪৯ রানে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫ রানে ২ এবং ফারনেস ৬৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে।

প্রথম ইনিংস ২০১ রানে শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করতে হলো। প্রথম ইনিংসে ব্রাউনের ৬৯ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বার্ণেটের ৪৬ রানই সর্ব্বোচ্চ। দ্বিতীয় ইনিংস বেলা ১টায় আরম্ভ হয় এবং বেলা শেষ হবার পূর্ব্বেই ১২৩ রানে শেষ হ'য়ে যায়। ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে বিজয়ী হয়েছে।



অষ্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের সঙ্গে ক্রিকেট টেষ্ট খেলবার খেলোয়াড় মনোনয়ন খেলায় রেষ্টের মিস বি আর্কডেল স্লিপ দিয়ে বল চালিয়েছেন

এবারের টেষ্টের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :—হাটনের ৩৬৪ রান, ইংলণ্ডের এক ইনিংসে ৭ উইকেটে ৯০৩ রান এবং লেল্যাণ্ড ও হাটনের সহযোগিতায় ৩৮২ রান।

এ্যাংলো-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্টের মোট ফলাফল :

	ইংলণ্ডের জয়	অষ্ট্রেলিয়ার জয়	ড্র	মোট
অষ্ট্রেলিয়ায়	৩৪	৪১	২	৭৭
ইংলণ্ডে	২১	১৬	৩০	৬৭
	৫৫	৫৭	৩২	১৪৪

দেখা যায় যে, এখনও অষ্ট্রেলিয়া দু'টি খেলায় বেশী জয়ী আছে। অষ্ট্রেলিয়ার অষ্ট্রেলিয়ার জয়ের সংখ্যা বেশী এবং ইংলণ্ডে ইংলণ্ডের জয় বেশী।



উস্‌চেষ্টার কলেজের ক্যাপটেন আর বি প্রাউড রেষ্টের পক্ষে পেলে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সেঞ্চুরী করেছেন লর্ডস মাঠে লর্ডসের বিপক্ষে। তাঁর শত রান হয়েছে মাত্র ৪৮ মিনিটে

ইংলণ্ড

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

হাটন···কট্ হাসেট, ব ও'রিলী		৩৬৪
এড্‌রিচ্···এল-বি, ব ও'রিলী		১২
লেল্যাণ্ড···	রান আউট	১৮৭
ডবলিউ আর হ্যামণ্ড···এল-বি, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৫৯
পেণ্টার···এল-বি, ব ও'রিলী		০
কম্পটন···ব ও'রিলী		১
হার্ডষ্টাফ	নট আউট	১৬৯
উড্···কট্ ও ব বার্ণেস		৫৩
ভেরিটি	নট আউট	৮
	অতিরিক্ত···	৫০

বাই ২২, লেগ্‌বাই ১৯, ওয়াইড্ ১ এবং নো-বল ৮

(৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) মোট··· ৯০৩

কে ফারনেস এবং বাউস ব্যাট্ করেন নি।

উইকেট পতন :

২৯ (এড্‌রিচ্), ৪১১ (লেল্যাণ্ড), ৫৪৬ (হ্যামণ্ড), ৫৪৭ (পেণ্টার), ৫৫৫ (কম্পটন), ৭৭০ (হাটন) ও ৮৭৬ (উড্)

বোলিং :— অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ওয়েট	৭২	১৬	১৫০	১
ম্যাক্‌ক্যাব্	৩৮	৮	৮৫	০
ও'রিলী	৮৫	২৬	১৭৮	৩
ফ্লিটউড্-স্মিথ	৮৭	১১	২৯৮	১
বার্ণেস	৩৮	৩	৮৪	১
হাসেট	১৩	২	৫২	০
ব্রাডম্যান	৩	২	৬	০

অষ্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ডবলিউ এ ব্রাউন···কট্ হ্যামণ্ড, ব লেল্যাণ্ড		৬৯
সি এল ব্যাডকক্···কট্ হার্ডষ্টাফ, ব বাউস		০
এস্ জে ম্যাক্‌ক্যাব্···কট্ এড্‌রিচ্, ব ফারনেস		১৪
এ এল হাসেট···কট্ কম্পটন, ব এড্‌রিচ্		৪২
এস্ বার্ণেস···ব বাউস		৪১
বি এ বার্ণেট···কট্ উড্, ব বাউস		২
ই সি এস্ ওয়েট···ব বাউস		৮
ডবলিউ জে ও'রিলী···কট্ উড্, ব বাউস		০
এল ও'বি ফ্লিটউড-স্মিথ	নট আউট	১৬
	অতিরিক্ত···	৯
	মোট···	২০১

অনুপস্থিত : ব্রাডম্যান ও ফিঙ্গলটন।

উইকেট পতন :

৯ (ব্যাডকক্), ১৯ (ম্যাক্‌ক্যাব্) ৭০ (হাসেট্), ১৪৫ (বার্ণেস), ১৪৭ (বার্ণেট), ১৬০ (ওয়েট), ১৬০ (ও'রিলী) ও ২০১ (ব্রাউন)।

বোলিং :— ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ফারনেস	১৩	২	৫৪	১
বাউস	১৯	৩	৪৯	৫
এড্‌রিচ্	১০	২	৫৫	১
ভেরিটি	৫	১	১৫	০
লেল্যাণ্ড	৩·১	০	১১	১
হ্যামণ্ড	২	০	৮	০

অষ্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ডবলিউ এ ব্রাউন···কট্ এড্‌রিচ্, ব ফারনেস	১৫
সি এল ব্যাডকক্···ব বাউস	৯
এস্ জে ম্যাক্‌ক্যাব্···কট্ উড্, ব ফারনেস	২
এ এল হাসেট···এল-বি, ব বাউস	১০
এস্ বার্ণেস···এল-বি, ব ভেরিটি	৩৩
বি এ বার্ণেট···ব ফারনেস	৪৬
ই সি এস ওয়েট···কট্ এড্‌রিচ্, ব ভেরিটি	০
ডবলিউ জে ও'রিলী　নট আউট	৭
এল ও'বি ফ্লিটউড্-স্মিথ···কট্ লেল্যাণ্ড, ব ফারনেস	০
অতিরিক্ত···	১
মোট···	১২৩

উইকেট পতন :

১৫ (ব্যাডকক্), ১৮ (ম্যাক্‌ক্যাব্), ৩৫ (হাসেট), ৪১ (ব্রাউন), ১১৫ (ওয়েট), ১১৭ (বার্ণেট) ও ১২১ (ফ্লিটউড্-স্মিথ)।

বোলিং :— ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
বাউস	১০	৩	২৫	২
ফারনেস	১২·১	১	৬৩	৪
লেল্যাণ্ড	৫	০	১৯	০
ভেরিটি	৭	৩	১৫	২

অষ্ট্রেলিয়ার প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মৃত্যু :

অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন পুরাকালের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে; হিউ ট্রাম্বল হৃদ্‌রোগে মেলবোর্ণে এবং উইকেট রক্ষক জে কেলী সীডনেতে মারা গেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাগামী এম সি সি :

এম সি সি দলে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানে যাবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা নিমন্ত্রিত হয়েছেন :—হ্যামণ্ড (ক্যাপ্‌টেন), কে ফারনেস, ইয়ার্ডলে, গীব্, এইমস্, কম্পটন, এড্‌রিচ্, হাটন, পেণ্টার, ভ্যালেন্‌টাইন, ফ্যাগ, রাইট, গোডার্ড, পার্কস্, উইল্‌কিন্‌সন্ ও ভেরিটি।

কম্পটন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর্সেনালের সঙ্গে চুক্তি থাকায় তিনি ফুটবলই খেলতে চান।

মানভাদার হকি-দলের প্রথম পরাজয় :

নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড প্রভিন্স ৫-৪ গোলে মানভাদার হকি দলকে পরাজিত করেছে। এটি তাদের প্রথম পরাজয়।



ওয়াটার পলো প্রতিযোগিতায় ১৯৩৮ সালের চ্যাম্পিয়ন অপরাজিত বৌবাজার দল　　ছবি—জে কে সান্যাল

পর পর পাঁচটি ছ'য়ের বাড়ি ঃ

সামারসেটের ওয়েলার্ড কেন্টের বিপক্ষে খেলে পর পর



ওয়েলার্ড

পাঁচটি ছয়ের বাড়ি দিয়েছেন, এবার বোলার ছিলেন ফ্রাঙ্ক উলি। দু'বৎসর পূর্ব্বেও ওয়েলার্ড একবার পাঁচটি ছয় উপর্য্যুপরি করেন, সেবার বোলার ছিল লিষ্টার্সের আর্মষ্ট্রং। বল তিনবার হারিয়ে যায়। তিনি মোট রান করেন ৫৭, ৩৭ মিনিটে, ৭টি ছয় ও ২টি চার। ওয়েলার্ড যে কি রকম হাঁকড়ে খেলেন, তা' কলিকাতাবাসীর জানা আছে।

বৃটিশ হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ পদবী ঃ

ফারের ইস্তফা কণ্ট্রোল বোর্ড অনুমোদন করায় হার্ভে ও এ ডি ফিলিপ্সের মধ্যে হেভিওয়েট পদবীর জন্য প্রতিযোগিতা হবে স্থির হয়েছে।

ট্রেডস কাপ ঃ

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর এবার মোহনবাগান ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়েছে টাউন ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। এস গাঙ্গুলি দু'টি গোলই করে। একদিন খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। গতবারের বিজয়ী ছিল নেপিয়ার স্পোর্টিং।

মোহনবাগান ১৯০৬-০৭-০৮ সালে উপর্য্যুপরি ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয় তখন তাদের দলে খেলতেন নামজাদা খেলোয়াড় শিব ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী, এ দাস, ডি এন বসু, জে দত্ত, এস (হাবুল) সরকার প্রভৃতি।

ইয়ঙ্গার কাপ ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং খেলতে না যাওয়ায় রেঞ্জার্স ওয়াক-ওভার পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। গত দু'বৎসর মোহনবাগান বিজয়ী ছিল।

রাজা শীল্ড ঃ

রেঞ্জার্স ৫-১ গোলে রবার্ট হাডসনকে পরাজিত করে রাজা শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। গতবারের বিজয়ী ছিল মোহনবাগান।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

রিপন কলেজ ২-১ গোলে প্রেসিডেন্সী কলেজকে পরাজিত করে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। তাদের



বেলজিয়াম ও ভারতবর্ষের ডেভিস কাপ সিঙ্গলস্ প্রতিযোগিতার শেষে লে ক্রয়ন্স ও সোহানী করমর্দন করছেন

এই প্রথম শীল্ড বিজয়। এস দে ও এস হুসেন গোল দেয়। প্রেসিডেন্সী পক্ষে এন চট্টোপাধ্যায় গোল দেয়। পূর্ব্ব বৎসর বিজয়ী ছিল বিদ্যাসাগর কলেজ।

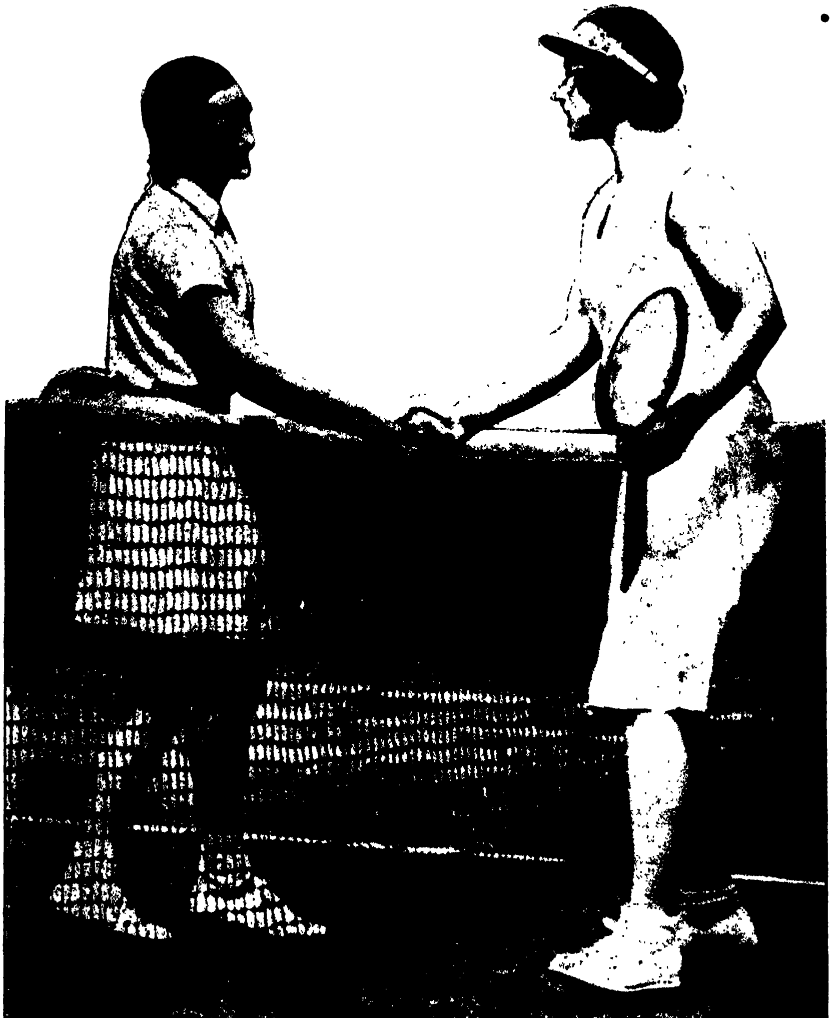
লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড ঃ

রেঞ্জার্স ১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে, ব্রিজ গোলটি দেয়। পূর্ব্ববার বিজয়ী ছিল কাষ্টমস্।

ম্যালায়ান-চাইনিজ দল ঃ

মালয়-চৈনিক-কোরিন্থিয়ান দল বর্ম্মায় ফুটবল খেলতে গিয়ে প্রথম খেলা সম্মিলিত অ-বর্ম্মা একাদশের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে। তাদের দলগত ঐক্যতা সুন্দর, কিন্তু গোলের সুমুখে অকৃত কার্য্যতার দোষ দৃষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের পাঁচ মিনিট পর সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও চং সেং চমৎকার হেড দিয়ে গোল দেয়। স্থানীয় দলের ইন্‌সাইড লেফট পাগ্‌সলে খেলা শেষের সাত মিনিট পূর্ব্বে গোল শোধ দিতে সক্ষম হয়। খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে খেলা হয়েছিল।

সমগ্র বর্ম্মা একাদশের সঙ্গে খেলাটিও ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আগন্তুক দলের ইন্‌সাইড রাইট আর লিয়োন গোল দেবার দু'মিনিট মধ্যে বর্ম্মাদলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড টুন্ সেন্ গোল শোধ দেয়।



মেয়েদের চ্যাম্পিয়নসিপের বিজয়িনী মিসেস এইচ্ উইলিসমুডিকে বিজিতা মিস এইচ্ এইচ্ জ্যাকব সম্বর্দ্ধিত করছেন

খেলোয়াড় হস্তান্তরের রেকর্ড মূল্য ঃ

বিলাত দেশে সকলই সম্ভব। সেখানে এবার ফুটবল খেলোয়াড়ের হস্তান্তরের মূল্যের পরিমাণ উঠেছে, তের হাজার পাউণ্ড! ভাগ্যবান খেলোয়াড়টি হ'লেন, উলভারহামটন্ ওয়াণ্ডারার্সের এবং ওয়েল্‌সের ইণ্টার-ন্যাসনাল ফরওয়ার্ড ব্রান্ জোন্স। আর্সেনাল দল তের হাজার পাউণ্ড মূল্য দিয়ে তাঁকে দলভুক্ত করলে। ব্রান্ জোন্স গত পাঁচ বৎসর উল্‌ভারহাম্‌টনে খেলেছেন এবং দশ বার আয়ারলণ্ডের বিপক্ষে ওয়েল্‌সের হ'য়ে খেলে চারটি ক্যাপ্ (caps) এবং তিনটি করে ক্যাপ্ ইংলণ্ড ও

গ্রাফিক্স শীল্ড ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে কে ও এস বিকে হারিয়ে হয়েছে। গতবারেও মহমেডান বিজয়ী ছিল।

স্কটলণ্ডের বিপক্ষে লাভ করেছেন। তাঁর নামের আকর্ষণে বহু টিকিট বিক্রীত হয় প্রতি খেলায়।

দশ বৎসর পূর্ব্বে আর্সেনাল বোল্টন ওয়াণ্ডারার্সকে ডেভিড জ্যাকের জন্য ১০,৮৯০ পাউণ্ড দিয়েছিল।

সাত মাইল সন্তরণ ঃ

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে অষ্টম বার্ষিক সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ৩৪ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। তন্মধ্যে তিনজন বালিকা সন্তরণকারিণীও ছিল, তারা শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা করে সমস্ত পথ অতিক্রম করেছিল। গত বৎসরের বিজয়ী আনন্দ স্পোর্টিংয়ের মদনমোহন সিংহ ৪৯ মিনিট ৫৯½ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। গত বৎসর সময় লেগেছিল মাত্র ৪৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। মদনমোহন আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছিল।



সাতমাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী মদনমোহন সিংহ (বামে), দ্বিতীয়—শচীন্দ্র নাগ, তৃতীয়—শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবি—জে কে সান্যাল

প্রথম—মদনমোহন সিংহ (আনন্দস্পোর্টিং), সময় ৪৯ মিনিট ৫৯½ সেকেণ্ড।

দ্বিতীয়—শচীন্দ্রনাথ নাগ (হাটখোলা), সময় ৫১ মিনিট।

তৃতীয়—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আনন্দ স্পোর্টিং), সময় ৫৩ মিনিট।

চতুর্থ—কাশীনাথ কেশরবাণী (আনন্দ স্পোর্টিং)।

হাটন ও ব্রাডম্যান ঃ

এখন হাটনের নাম পৃথিবীর ক্রিকেট জগতের মুখে মুখে ঘুরছে। যতদিন টেষ্ট ক্রিকেট খেলা চলবে, তার নাম স্মরণীয় থাকবে। পঞ্চম টেষ্টে রেকর্ড রান করে হাটন পূর্ব্ব ধুরন্ধরদের উচ্চশির অবনত ক'রে যশের শিখরে নিজেকে স্থাপন করেছে; তথাপি রান তোলার দ্রুততায় সে ব্রাডম্যানের অনেক পশ্চাতে এখনও পড়ে আছে। ব্রাডম্যানের রান তোলবার সহজসাধ্য ও সাবলীল গতি অতুলনীয়, তাঁর জুড়ি এখনও হয় নি। হাটনের ৩৬৪ করতে সময় লাগে ৮০০ মিনিট; কিন্তু ব্রাডম্যানের সর্ব্বোচ্চ রান ৪৫২ মাত্র ৪০৬ মিনিটে হয়; তিনি ১৯৩২ সালে, ১৯৫ মিনিটে ২৩৮ রান করেন ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে। ব্রাডম্যানের টেষ্টের রেকর্ড ৩৩৪ লীডস মাঠে ১৯৩০ সালে হয় ৩৮১ মিনিটে। ১৯৩৪ সালে ফোক্‌ষ্টোনে ফ্রিম্যানকে এক ওভারে পিটে ৩০ রান করেন, স্কারবোরোতে ৯০ মিনিটে ১৩২ করেন। এই সব রেকর্ড ভঙ্গ হ'তে এখনও বিলম্ব আছে মনে হয়।

সার পি এফ্ ওয়ার্ণার ব্রাডম্যানের সঙ্গে বিখ্যাত খেলোয়াড় ডব্লিউ জি গ্রেসের তুলনা ক'রে লিখেছেন,—

It is difficult indeed to compare the cricketers of different generations—conditions very so—but "W G," created modern batting and Mr. Bradman is the Grace of Australia.

But if a comparison must be made surely Mr. Bradman ranks above any batsman of any time? No one has reduced run-getting to such a certaint

and I believe if you put a wicket down in Piccadilly he would make a hundred as he did at Leeds almost in the dark—at any rate in the worst light I have ever seen cricket played in a first-class match.

তোমারি তুলনা তুমি শ্যাম—তুমি অতুলনীয় এখনও। ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতই জানে।



কুমারী তারকবালা ৮ম বর্ষীয়া, কুমারী চামেলী ৭ম বর্ষীয়া ও কুমারী মনোরমা ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকাত্রয়। ইহারা সাত মাইল সন্তরণে সমস্ত পথ অতিক্রম করেছে

ছবি—জে কে সান্যাল

ইণ্টার-কলেজ বাচ্ লীগ ঃ

ইণ্টার কলেজিয়েট বাচ্ লীগ প্রতিযোগিতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ সর্ব্বোচ্চ ১৪ পয়েণ্ট লাভ করে এবং অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেণ্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সীর পয়েণ্ট সমান সমান হওয়ায় এই দু'দলের শেষ প্রতিযোগিতার উপর চ্যাম্পিয়নসিপ্ নির্ভর করে। এই বাচ্ খেলাটি বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক ও দর্শনীয় হয়েছিল। এরূপ দর্শক সমাগম কখনও ইতিপূর্ব্বে হয় নি। উভয়পক্ষই প্রায় সমান সমান বাচ্ করে, শেষকালে কে সি সেনের প্রাণান্ত চেষ্টায় সেণ্ট জেভিয়ার্স মাত্র তিন ফিটের ব্যবধানে জয়ী হয়, রেকর্ড সময় ৩ মিনিট ২·৯৬ সেকেণ্ডে।

এবার স্কটিস ও কারমাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। বিদ্যাসাগর কলেজ একটিও পয়েণ্ট না পেয়ে এবারও শেষ স্থান পেয়েছে।

গত বৎসর পোষ্ট গ্রাজুয়েট ১০ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন ছিল এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স ৮ পয়েণ্টে রানার্স আপ পায়।

ফলাফল :—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েণ্ট
সেণ্ট জেভিয়ার্স	৭	৬	০	০	১৪
প্রেসিডেন্সী	৭	৬	০	১	১২
পোষ্ট গ্রাজুয়েট	৭	৫	০	২	১০
আশুতোষ	৭	৪	০	৩	৮
কারমাইকেল	৭	৩	০	৪	৬
স্কটিস	৭	২	০	৫	৪
ল' কলেজ	৭	১	০	৬	২
বিদ্যাসাগর	৭	০	০	৭	০

মানভাদারের তৃতীয় টেষ্ট বিজয় ঃ

বৃষ্টির মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা চলে। মানভাদার ৩-১ গোলে জয়ী হয়েছে। লতিফ, গুরনারায়ণ সিং ও ফারনাণ্ডেজ গোল করে। এ পর্য্যন্ত ৩১টি ম্যাচ তারা খেলেছে, ৩০টি জিতেছে, ১টি হেরেছে, গোল হয়েছে পক্ষে ২৩২ এবং বিপক্ষে ১৯। এই অভিযানের সকল প্রতিযোগিতাই বাদলা ও শীতল আবহাওয়ায় হয়েছে।

মণ্টগোমারী এসোসিয়েশন হকিদল ঃ

মণ্টগোমারী এসোসিয়েশন হকিদল কলিকাতায় এসে অসময়ে কয়টি হকি খেলেছে।

প্রথম খেলায় মোহনবাগানের সঙ্গে তারা ৩-২ গোলে হেরেছে। দ্বিতীয় খেলা রেঞ্জার্সের সঙ্গে বৃষ্টির জন্য হয় নি। তৃতীয় লেখা মহমেডানদের সঙ্গে ড্র হয়েছে শূন্য গোলে। চতুর্থ ও শেষ খেলায় মিষ্টার সিংহের একাদশের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

মাঠের গ্যালারী কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ঃ

ফুটবল খেলার মাঠে কণ্ট্রাক্টের সম্বন্ধে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ এসেম্বলীতে খাঁন বাহাদুর মহম্মদ আলির প্রশ্নোত্তরে জানা গেছে যে, পুলিস কমিশনার হেডওয়ার্ড কোম্পানীকে যে লীজ দিয়েছেন তা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে শেষ হবে। গভর্ণমেণ্ট টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের কোন লভ্যাংশ পান না, আমোদ-করের প্রাপ্য ব্যতীত। হেডওয়ার্ড কোম্পানী কলিকাতা পুলিসের 'গরীব খাতায়' (Poor Box) সাত হাজার টাকা সাহায্য দান করেন এবং কতকগুলি ক্লাব ও এসোসিয়েশন প্রভৃতিকেও দাতব্য

হিসাবে চাঁদা দিয়ে থাকেন; তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন, বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন, কিং জর্জ্জ ৫ম মেমোরিয়াল ফণ্ড, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, স্যার জন এণ্ডারসন কজাল্‌টি ব্লক, যাদবপুর টিউবার্‌কিউলসিস্‌ হস্‌পিটাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ মেটারনিটি হোম, কিং-এ স্পা রা র্স এণ্টি-টিউবার্‌-কিউলসিস্‌ ফণ্ড ইত্যাদি। গত দু' বৎসরের চাঁ দা র পরিমাণ ২৩৫০৪৲ টাকা।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কি কারণে হেডওয়ার্ডের হাত তোলা নিয়েছে, আর হেডওয়ার্ড কো ম্পা নী ই বা হঠাৎ তাঁদেরই একমাত্র দানের উপযুক্ত পাত্র স্থির করলেন কেন? অবশ্য অন্য কোন মর্য্যাদা সম্পন্ন ক্লাব দাতব্যের দান নিতে রাজী হবে না। এসোসিয়েশন এবং দাতব্য ভা ণ্ডা রে সাধারণের নিকট থেকে উপার্জ্জিত অর্থের কিছু, সে যত সামান্য পরিমাণই হোক না কে ন, দা ন প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু কোন সমাজের বা কোন দলের ক্লা ব কে তাদের ব্যয়ের বা সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য অহেতুকী দান করা কর্ত্তব্য নয়, এবং প্রশংসনীয়ও নয়। যারা উপকৃত এখন তারাই আবার বিরুদ্ধাচরণ করছে। অনুচিত কার্য্যের পুরস্কার এমনি হয়।



উইম্বলডন বিজয়ী বাজ ও বিজিত অষ্টিন (বামে) খেলতে নামছেন

অষ্ট্রেলিয়ায় আই এফ এ দল ঃ

আই এফ এর ফুটবল দল অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছে প্রথম খেলা এডেলেডের হিণ্ডমার্স ওভালে খেলেছে সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এবং ৬-১ গোলে জয়ী হয়েছে। আর লামস্‌ডেন ৪টি, কে ভট্টাচার্য্য ১টি এবং প্রসাদ ১টি গোল দেয়। খেলাতে দুর্ঘটনা ঘটে—লামস্‌ডেন ও রেবেলোকে মাঠ ত্যাগ করতে হয়। পরিবর্ত্তে সেন ও চৌধুরীকে খেলতে দেওয়া হয়। ভারতীয়দের

বিপক্ষের গোলটি পি দাশগুপ্ত ও কে দত্তের ভুলের জন্য হয়।

দলে খেলেছে :—কে দত্ত ; পি দাশগুপ্ত ও ম্যাকগুয়ার ; বি মুখোপাধ্যায়, রেবেলো ও প্রেমলাল ; নন্দী, কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপ্টেন), আর লামস্ডেন, জোসেফ, কে প্রসাদ।

দ্বিতীয় খেলায় আই এফ এ ৪-২ গোলে ভিক্টোরিয়া ষ্টেট একাদশের কাছে হেরে গেছে। খেলা হয় বিখ্যাত মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠে, যেখানে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার বহুবার ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভারতীয়দের পক্ষে মাঠ বড় শক্ত ছিল, তারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছিল। গোলের সুমুখে খারাপ সমাপ্তিই তাদের হারের কারণ, নতুবা খেলা সমান সমান চলেছিল। ভিক্টোরিয়া দল সুযোগের অপব্যবহার করে নি। লামস্ডেন ও প্রসাদ গোল দেয়। পূর্ব্ব খেলার সকল খেলোয়াড়রাই খেলেছিল।

৪-৩ গোলে হারাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে কোন দলই গোল করতে পারে নি। শেষার্দ্ধে স্থানীয় দল তাদের শক্তিমত্তায় ভারতীয়দের ক্রমশঃ কাবু ক'রে দু'টি গোল দেয়। লামস্ডেন একটি শোধ করতে সক্ষম হয়।

চারটি খেলার ফলাফল দেখে বেশ প্রতীয়মান হচ্ছে যে অষ্ট্রেলিয়ায় ফুটবল খেলায় প্রতিযোগিতা করতে দৈহিক শক্তির বিশেষ আবশ্যক, কেবলমাত্র চাতুর্য্য ও নিপুণতায় জয়ী হওয়া সেখানে চলে না। তিনটি খেলাতে শেষার্দ্ধেই ভারতীয়রা দুর্দ্ধর্ষ বিপক্ষদের অপরিসীম শক্তির কাছে কাবু হ'য়ে পড়েছে এবং গোল খেয়েছে। ক্ষীণকায় দুর্ব্বল ভারতীয়দের পক্ষে বলিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় নি। সেখানে ৮০ মিনিট খেলার সময়, অর্থাৎ এখানের অপেক্ষা অর্দ্ধ ঘণ্টা বেশী, দশ মিনিট বিরাম। ভারতীয়দের অত দম না থাকায় শেষার্দ্ধে তারা কাবু হয়ে পড়ছে ও গোল খাচ্ছে।

তৃতীয় খেলাতেও আই এফ এ দলের পরাজয় ঘটেছে। সীডনেতে নিউ সাউথ ওয়েলস্ ষ্টেট দল ৬-৪ গোলে তাদের হারিয়ে দিয়েছে। এবার দলে মুসলিম খেলোয়াড় তিন জন যোগ দিয়েও পরাজয় রক্ষা করতে পারে নি। খেলার মাঠে বিশ সহস্র দর্শক জড়ো হয়, ভারতীয়দের ফুটবল খেলায় নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা দর্শকদের দ্বারা বহুবার প্রশংসিত হয়েছে। ওয়েলস দল প্রথম গোল করে। ভারতীয় পক্ষে রহিম আধ মিনিটের মধ্যে দু'টি গোল দেয়। অর্দ্ধ সময়ে উভয়দলের তিনটি গোল হয়। শেষার্দ্ধে ভারতীয়দের দম হ'য়ে যাওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া দল তিনটি গোল করে। শেষ সময়ে আদান প্রদানের ফলে রহিম একটি গোল দিতে সক্ষম হয়।



বার্ষিক অফিস ইণ্টার-ন্যাসনাল খেলার ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ   ছবি—জে কে সান্যাল

দলে খেলেছিল :—রোজারিও ; ম্যাকগুয়ার ও জুম্মা খাঁ ; রেবেলো, বি সেন ও প্রেমলাল ; নুরমহম্মদ, রহিম, লামস্ডেন, ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

ম্যাকগুয়ারের ডান কব্জি অল্প ভেঙে গেছে বিপক্ষের ধাক্কায়। আগামী খেলাতে আর নামতে পারবে না।

চতুর্থ খেলায়ও ২-১ গোলে আই এফ এর হার হয়েছে নরদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টের কাছে। ইহারা অষ্ট্রেলিয়ার খুব শক্তি-শালী একটি দল। কিন্তু ইংলিস ফুটবল দল গত বৎসর এদের

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেষ্টে পরাজয় ঃ

৩রা সেপ্টেম্বর সীডনেতে আই এফ এ দল প্রথম টেষ্ট খেলায় ৫-৩ গোলে পরাজিত হয়েছে। প্রায় বিশ হাজার দর্শক সমাগম হয়। ভারতীয়রা অত্যধিক ড্রিবলিং ও অব্যর্থ লক্ষ্য সন্ধানের অভাবের জন্য পরাজয় বরণ করেছে। এই অমার্জ্জিত ত্রুটি ব্যতীত সব বিভাগেই অষ্ট্রেলিয়াপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছে, তাদের খেলায় চাতুর্য্য ও আক্রমণপ্রবণতা বেশী ছিল। অষ্ট্রেলিয়ারা দর্শনীয় না খেললেও, অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে খেলেছে। উইলকিন্সন ১, হিউজেস ২ ও কুইল ২টি গোল দিয়েছে, এরা দারুণ খেলেছিল ; কিন্তু ম্যাক-ন্যাবের

অত্যুৎকৃষ্ট গোল রক্ষার জন্তই অষ্ট্রেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী থাকতে পেরেছে। ভারতীয়দের লামস্‌ডেন ছ'টি অত্যন্ত সহজ সুযোগ হারায়, রহিম বড় স্বার্থপর হয়ে খেলে ছ'টি অবধারিত গোল নষ্ট করেছে। রহিম, ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদের আদান-প্রদান দর্শনীয় ও সুন্দর হয়েছিল। আমাদের 'বেবী অষ্টিন' প্রসাদের সেখানে নাম হয়েছে 'মিকি মাউস', তার ছোট্ট আকার ও মনোরম কৌশলের জন্য।

৩৮ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৪ মিনিটে রহিম শোধ করে। ভারতীয়রা বেশী আক্রমণ করলেও, তাদের লক্ষ্যহীন ও দুর্ব্বল মারের জন্ত গোল হয় না। রক্ষণ ভাগের দোষের সুবিধা পেয়ে হিউজেস্ দুই মিনিটে দু'টি গোল দেয়। এইবার ভারতীয়রা খাতে আসে, তারা ভীষণরূপে আক্রমণ করতে থাকে, কয়েকটি সুযোগ নষ্ট হবার পরে ৮ মিনিটের সময়ে কে ভট্টাচার্য্য চমৎকার ড্রিবলিং ক'রে দ্বিতীয় গোল করে। দু' মিনিট পরেই কিন্তু কুইল চমৎকার হেড ক'রে স্কোর বাড়ায়। ভারতীয়রা পুনরায় চেপে ধরে এবং চার মিনিট পরে লামস্‌ডেন প্রসাদের চমৎকার পাশ থেকে তৃতীয় গোল করতে সক্ষম হয়। শেষ মুহূর্ত্তে কুইল একাকী ব্যাকদের কাটিয়ে অতি নিকট থেকে রোজারিওকে পরাজিত করে।

আই এফ এ:—রোজারিও; রেবেলো ও জুম্মা খাঁ; নন্দী, বি সেন ও প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "সাগরিকার নির্য্যাতন"—২৲
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "নারীধর্ম্ম"—১৲
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত ছেলেদের গল্প পুস্তক "গল্পঠাকুরদা"—।৵৹
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "কাঁটা তার"—১।৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "রূপ ও ধূপ"—॥৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ঢেউয়ের দোলা"—২৲
শ্রীসুনির্ম্মল বসু ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্পপুস্তক "অপরূপ কথা"—॥৵৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রোমান্স"—১৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অবশেষে"—২৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু প্রণীত ছেলেদের গল্প পুস্তক "জীবনের সাফল্য"—।৵৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আত্মনিবেদন"—১।৹
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রণীত গল্পপুস্তক 'বনফুলের আরও গল্প"—১॥
শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব"—১।
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্পপুস্তক "বিভীষিকার মূল্য"—॥
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "বাংলার টার্জ্জান"—১৲
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত নারীজাগরণ কথা "বিশ্বনারী প্রগতি"—১॥৹
শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "স্বরূপসিদ্ধি বা আত্মজ্যোতিঃ দর্শন"—১।
শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "ভবিতব্য"—১৲
শ্রীগোপীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের নাটক "উৎসব"—।৵৹
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত নাটক "উত্তরা"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আগামী ১৩ই আশ্বিন হইতে ৺দুর্গা পূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা ৩রা আশ্বিন, ২০এ সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কাপি কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২৩এ ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পর আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর ‖ সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মজুমদার

ষ্টীমারের যাত্রী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



প্রথম খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভগবান মহাবীর

শ্রীপূরণচাঁদ শামসুখা

(প্রবন্ধ)

পুণ্যভূমি ভারতে যে সমস্ত মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য-সমাজকে আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন ভগবান মহাবীর তাঁহাদের অন্যতম। ইনি জৈনসম্প্রদায়ের চতুর্ব্বিংশতিতম বা শেষ তীর্থঙ্কর। ইঁহার পূর্ব্বে প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতিজন তীর্থঙ্কর এই পবিত্র ভারতভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে মহাবীর আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়ে ভারতে এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। বৈদিক যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসার বিরুদ্ধে শ্রমণ-সম্প্রদায়ের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা প্রবলভাবে আন্দোলন করিতেছিলেন এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি বা নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তৎপ্রতি জনসমুদয়কে আকৃষ্ট করিতেছিলেন। এইরূপ শ্রমণ-সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে নির্গ্রন্থ বা জৈন সম্প্রদায়ের নেতা মহাবীর, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতা গৌতম-বুদ্ধ, আজীবক সম্প্রদায়ের নেতা মঙ্খলিপুত্র, গোশালা বিশেষভাবে ভারতীয় চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২৫৩৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে বৈশালীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রামে—প্রাচীনকালের ভাষায় বলিতে গেলে গ্রীষ্ম-ঋতুর প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ—চৈত্র মাসের (চৈত্র মাসকে তখন গ্রীষ্মের প্রথম মাস ধরা হইত) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে নিশীথ সময়ে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন (১)।

(১) যদিও সেকালে ষড় ঋতুর গণনা ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ বৎসরে তিন ঋতুই ধরা হইত। চৈত্র হইতে আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক বর্ষা ও অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুনকে হেমন্ত ঋতু বলা হইত এবং তদনুযায়ী আষাঢ় চাতুর্ম্মাস্য, কার্ত্তিক চাতুর্ম্মাস্য ও ফাল্গুন চাতুর্ম্মাস্য গণনা করা হইত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহাবীরের জন্মস্থানের নাম ক্ষত্রিয় কুণ্ড-গ্রাম। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা সম্মিলিত লিচ্ছবী-রাজ-সংঘের রাজধানী পুরাতন ভারতের সুবিখ্যাত নগর বৈশালীর একটী অংশ বা পল্লী অর্থাৎ পাড়া। এই নগরের যে অংশে ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন তাহাকে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম এবং যে অংশে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন তাহাকে ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম বলা হইত। ইঁহাদের মতে বর্ত্তমান পাটনার সাতাইশ মাইল উত্তরে গঙ্গার উত্তর পারে বসাঢ়, বসুকুণ্ড ও বানিয়া নামক তিনটী ক্ষুদ্র গ্রামই যথাক্রমে পুরাতন কালের কেন্দ্র বৈশালী কুণ্ডগ্রাম ও বাণিজ্য গ্রাম।—অধুনা জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর-গণ লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশন হইতে আঠার মাইল দক্ষিণে গয়া-জেলার অন্তর্গত লছবাড় নামক একটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ের অধিত্যকাতে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম ছিল বলিয়া মানেন, আর দিগম্বরগণ বর্ত্তমান নালন্দার নিকটবর্ত্তী কুণ্ডলপুর নামক গ্রামকে মহাবীরের জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই মত সম্বন্ধেই সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

যে দিবস ভগবান মহাবীর তাঁহার মাতার গর্ভে প্রথম আবির্ভূত হন, সেই রজনীতেই তাঁহার মাতা অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় চতুর্দ্দশটী মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্মের ইহা একটী বিশ্বাস যে, কোন ভাবী তীর্থঙ্কর মাতৃগর্ভে আগত হওয়া মাত্র তাঁহার মাতা সেই রাত্রিতে অনুক্রমে এই চতুর্দ্দশটী স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, যথা :—

১। চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট শ্বেত হস্তী, ২। বৃষভ, ৩। সিংহ ৪। লক্ষ্মীদেবী, ৫। পুষ্পমালাযুগল, ৬। চন্দ্র, ৭। সূর্য্য, ৮। ধ্বজা, ৯। কলস, ১০। পদ্ম-সরোবর, ১১। ক্ষীরসমুদ্র, ১২। দেব-বিমান, ১৩। রত্ন-রাশি এবং ১৪। নির্ধূম-অগ্নি।

ভগবান মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ। ইনি জ্ঞাতৃ নামক ক্ষত্রিয় কুলের অধিনায়ক ছিলেন।—মাতার নাম ত্রিশলা। ইনি বৈশালী রাজ-সংঘের অধিনায়ক মহারাজা চেটকের ভগিনী। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম ছিল বর্দ্ধমান; তিনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবীর, জ্ঞাতৃ-কুলের সন্তান বলিয়া নায়পুত্ত নাতপুত্ত বৈশালী বা বিদেহ দেশের অধিবাসী বলিয়া বৈশালিক, বিদেহ-দত্ত প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতৃব্যের নাম ছিল সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্দ্ধন, ভগিনীর নাম সুদর্শনা, স্ত্রীর নাম যশোদা, কন্যার নাম অনবদ্যা বা প্রিয়দর্শনা এবং নাতনীর নাম শেষবতী বা যশোবতী। শ্বেতাম্বর মতে মহাবীর বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু দিগম্বরগণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার বিবাহ হয় নাই—আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন।

মহাবীরের বাল্যকালের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহাকে শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য যথারীতি পাঠান হইয়াছিল কিন্তু এরূপ বর্ণিত আছে যে, শিক্ষারম্ভের প্রথম মুহূর্ত্তেই তাঁহার জ্ঞান শিক্ষকের জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, কুমার বর্দ্ধমান অতি অচিরেই সমস্ত কলায় প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে তাঁহার মনোনিবেশ হইত না। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। যথা সময়েই বর্দ্ধমান কুমারের বিবাহ হয়, বধূ যশোদা কৌডিন্য গোত্রীয়া ছিলেন। এই বিবাহের ফলে অনবদ্যার জন্ম হয়।

মাতাপিতা বর্দ্ধমান কুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া ইনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের জীবদ্দশায় সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেন না। যখন ইঁহার বয়স আটাশ বৎসর তখন সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা উভয়েরই মৃত্যু হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানকুমার দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনের আদেশ ভিক্ষা করেন; কিন্তু ভ্রাতা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলায় আরও দুই বৎসর গৃহে অবস্থান করেন। শেষ বৎসরে তিনি প্রত্যহ দান করিতেন—কোন প্রত্যাশী তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণ-মনোরথ না হইয়া ফিরিত না।

ত্রিশ বৎসর বয়সে মহাবীরস্বামী সংসার ত্যাগ করা স্থির করিলেন। হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে তৃতীয় প্রহরে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ক্ষত্রিয়-কুণ্ড-গ্রামের বহিস্থিত জ্ঞাতৃ-কুলের উদ্যানে, দীক্ষাগ্রহণের জন্য মহাড়ম্বরে আত্মীয়-স্বজনাদি সহ উপনীত হন। তথায় অশোক বৃক্ষতলে দেহের সমস্ত আভরণ ও বস্ত্রাদি উন্মোচন করেন এবং স্বহস্তে আপনার মস্তকের কেশ পাঁচবার মুষ্টির আকর্ষণে উৎপাটিত

করেন। অতঃপর একটী মাত্র বস্ত্র বাম স্কন্ধে ধারণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর তের মাস যাবৎ মহাবীর বস্ত্রধারী ছিলেন তৎপরে সম্পূর্ণ বস্ত্ররহিত হন। যে বস্ত্রখানি তাঁহার স্কন্ধে ছিল তাহার অর্দ্ধেক এক ব্রাহ্মণকে দান করেন; অপরার্দ্ধ সুবর্ণবালুকা নদীর তীরে কণ্টক বৃক্ষের সংস্পর্শে স্কন্ধ হইতে অপসৃত হয়। দীক্ষাগ্রহণের পর ইনি ঘোর তপস্যাতে নিমগ্ন হন। প্রায় সমস্ত সময় মৌনব্রত ধারণ করিয়া কায়োৎসর্গপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। বর্ষা ঋতুর চারিমাস একস্থানে অবস্থান করিতেন, অন্য সময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন।

এই সময়ে মঙ্খলি-পুত্র গোশালা আসিয়া মিলিত হন। গোশালা নিজকে শিষ্য করিয়া লইতে মহাবীরকে অনুরোধ করেন; কিন্তু মৌনব্রতী মহাবীর সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করায় গোশালা ইঁহার নিকট থাকিয়া যান এবং নিজকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া গোশালা চলিয়া যান কিন্তু আবার ছয়মাস পরে আসিয়া মিলিত হন। প্রায় ছয় বৎসর একত্রে থাকিবার পর গোশালা মহাবীর স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং নিজকে সর্ব্বজ্ঞ ও তীর্থঙ্কর বলিয়া ঘোষণা করিয়া আজীবক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু ও নেতা হন। পরবর্ত্তী-কালে গোশালা নিগ্রন্থ বা জৈন সম্প্রদায়ের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হন।

ভগবান মহাবীর কিঞ্চিদধিক বার বৎসর কাল ঘোর তপস্যারত থাকেন এবং বহুস্থান পর্য্যটন করেন। রাজগৃহ, চম্পা, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, শ্বেতাম্বী, আলম্ভিকা প্রভৃতি অনেক নগরে, গ্রামে, উদ্যানে, বনে, অনার্য্যদের দৃঢ়ভূমি প্রদেশে (বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা?) বাঙ্গলার রাঢ়দেশে ও অন্যান্য বহুস্থানে বিচরণ করেন এবং বহুবিধ কষ্ট সহ্য করেন। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি নৈসর্গিক কষ্ট, মশকাদির দংশন, কুকুরাদির আক্রমণ এবং দৈব ও মনুষ্যাদি কৃত যে সমস্ত প্রচণ্ড কষ্ট ইঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। এই সমস্ত দুঃখকষ্ট তিনি অম্লানবদনে নির্ব্বিকার-চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন—বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এস্থলে মাত্র একটী উপসর্গের বিবরণ উল্লিখিত হইল। একস্থানে ধ্যানমগ্ন থাকার সময় এক গোয়ালা তাঁহার দুই কানের ভিতর কীলক প্রোথিত করে। ইহার ফলে তাঁহার উভয় কর্ণমূল প্রদাহিত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে কিন্তু মহাবীর অবিচলিত-চিত্তে বেদনা সহ্য করিতে থাকেন। মধ্যপাবাপুরের (বর্ত্তমান রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী পাবাপুর) সিদ্ধার্থ-নামক এক বণিক এবং খরক নামক এক বৈদ্যের চেষ্টায় কীলক দুইটী অবশেষে নিষ্কাশিত হয় এবং উক্ত বৈদ্যের দ্বারা ঔষধ লেপনে স্ফীত স্থান ক্রমে আরোগ্য লাভ করে।

এইরূপে মন-বচন-কায়াকে সংযত করিয়া, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া শান্ত, প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় নিরালম্ব, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিবদ্ধ, শরৎকালীন জলের ন্যায় শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপত্রের ন্যায় নিরুপলেপ, সাগরের ন্যায় গম্ভীর হইয়া অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চরিত্র, অনুপম বীর্য্য, অনুপম সরলতা, অনুপম কোমলতা, অনুপম বিনয়, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম তুষ্টি, অনুপম সত্য-সংযম-তপস্যাচরণ দ্বারা আত্মধ্যানে লীন হইয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে, গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে দশমী তিথিতে দিবা তৃতীয় প্রহরের শেষ ভাগে জৃম্ভিক গ্রামের বহির্ভাগে ঋজুবালিকা নদীর তীরে ব্যাবৃত নামক যক্ষায়তনের নিকটে শ্যামাক নামক গৃহস্থের ক্ষেত্রভূমিতে শাল বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে তাঁহার কেবল-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কেবল-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতে তিনি অর্হন্, জিন, কেবলী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী হইলেন। সম্পূর্ণ চরাচরের সমস্ত দৃশ্য এবং অদৃশ্য চেতন ও অচেতন পদার্থ এবং বিশ্বভুবনের সমুদয় ভাবরাশি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার গোচরীভূত হইল।

ভগবান মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করার পর পাবা-পুরীতে আসিলেন। এস্থলে বেদ-বেদাঙ্গাদি সমস্ত শাস্ত্রে বিশারদ একাদশ জন ব্রাহ্মণাচার্য্য বহু শিষ্যসহ ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই একাদশ জনকে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের গণধর পদে স্থাপিত করা হয়—ইঁহারা সাধু-সংঘের নেতা হইলেন। ইঁহাদের নাম:—মগধের অন্তর্গত গুব্বর-গ্রাম নিবাসী গৌতম-গোত্রীয় তিন ভ্রাতা ১। ইন্দ্র-ভূতি, ২। অগ্নিভূতি, ৩। বায়ুভূতি; কোল্লাগ-সন্নিবেশের অধিবাসী ৪। ব্যক্ত, ৫। সুধর্ম্ম; মৌর্য্য-

সন্নিবেশের অধিবাসী ৬। মণ্ডিত, ৭। মৌর্য্যপুত্র; কোশলদেশের অধিবাসী ৮। অচল; মিথিলার অধিবাসী ৯। অকম্পিত; বৎস দেশের তুঙ্গীয়-সন্নিবেশের অধিবাসী ১০। মেতার্য্য এবং রাজগৃহের অধিবাসী ১১। প্রভাস।

গণধরগণ দ্বাদশ 'অঙ্গশাস্ত্র' নামক জৈনশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমানে যে একাদশ 'অঙ্গ' পাওয়া যায় তাহা পঞ্চম গণধর সুধর্ম্মের প্রণীত। দ্বাদশতম অঙ্গ—যাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ "পূর্ব্ব"-শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান একাদশ অঙ্গের নাম:—১। আয়ারাঙ্গ, ২। সুয়গড়াঙ্গ, ৩। ঠানাঙ্গ, ৪। সমবায়াঙ্গ, ৫। বিবাহ-পন্নত্তি বা ভগবতী, ৭। ণায়াধম্মকহা, ৭। উবাসগদসাও, ৮। অন্তগড়দসাও, ৯। অনুত্তরোববায়িয়দসাও, ১০। পণ্হাবাগরণম্, ১১। বিবাগসুয়ম্।

মহাবীর এসময়ে তীর্থ স্থাপনা করেন বলিয়া তীর্থঙ্কর নামে বিখ্যাত হন। জৈন শাস্ত্রে তীর্থ শব্দের বিশেষ অর্থ প্রচলিত আছে। 'তীর্থ' বলিতে সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা এই চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘকে বুঝায় এবং যিনি এই প্রকার তীর্থের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘের স্থাপনা করেন তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলে।

মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পরম্পরাগত নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সাধুগণ যাঁহারা এ সময়ে ছিলেন তাঁহারা মহাবীরের সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার মানিয়া লইলেন।

ভগবান মহাবীর তীর্থঙ্কর হইয়া বহু নগরে, গ্রামে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মগধ কাশী, কোশল, বৈশালী প্রভৃতির রাজগণ তাঁহার অসীম জ্ঞান ও মহান্ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেন। যখন যে কোন স্থানে উপনীত হইতেন তখন তৎস্থানের রাজাপ্রমুখ ব্যক্তিগণ মহা সমারোহে তাঁহাকে বন্দনা করিতে যাইতেন। মগধের শিশুনাগ বংশীয় মহারাজ বিম্বসার—যিনি জৈনগ্রন্থে শ্রেণিক নামে বিখ্যাত—তাঁহার অনন্যোপাসক ভক্ত ছিলেন।

ভগবান মহাবীর ত্রিশ বৎসর কাল ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া বর্ষাকালের চতুর্থ মাসে, সপ্তমপক্ষে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যা তিথিতে, রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে স্বাতী নক্ষত্রে, রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী মধ্যপাবা নামক নগরে হস্তী-পাল নামক রাজার পুরাতন লেখনশালাতে ৭২ বৎসর বয়সে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে রত অবস্থায় নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া জন্ম-জরা-মরণকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করতঃ নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি ত্রিশ বৎসরকাল গৃহস্থাবাসে ছিলেন, কিঞ্চিদধিক বার বৎসর যাবৎ ঘোর তপস্যা করেন ও কিছু কম ত্রিশ বৎসর তীর্থঙ্কররূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন—সর্ব্বসমেত ৭২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহাবীরের নির্ব্বাণকালে নির্গ্রন্থ বা জৈন সঙ্ঘে ইন্দ্র-ভূতি প্রমুখ ১৪,০০০ সাধু, চন্দনা প্রমুখ ৩৬,০০০ সাধ্বী, শঙ্খ, শতক প্রমুখ ১,৫৯,০০০ ব্রতধারী শ্রাবক এবং ৩,১৮,০০০ শ্রাবিকা ছিলেন।

ভগবান মহাবীর বিশ্ব-সংসারের মহামানবগণের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁহার জীবন, আদর্শ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের প্রাণীমাত্রের কল্যাণ নিহিত আছে। যে অতুলনীয় অহিংসা ও কঠোর তপশ্চর্য্যার মহান্ আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কালের প্রত্যেক মুমুক্ষুর পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকিবে। যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা নিবারণকল্পে বেদবাক্যের যে আত্মমুখী অর্থ তিনি করিয়াছিলেন তাহার ফলস্বরূপ ইন্দ্রভূতি আদি বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী মহাবিদ্বান বহু ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া মহাবীর প্রদর্শিত পথে আত্ম-সাধনায় নিবিষ্ট হন। ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতিবিভাগের অসারতা ঘোষণা করার ফলে চণ্ডাল বংশোদ্ভব হরিকেশ-বল প্রভৃতি সাধুগণ আত্মসাধনার উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়া মুক্তিসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন এবং বহু উচ্চজাতির শির তাঁহাদের চরণপ্রান্তে অবনত হয়। ভোগবিলাসের অকিঞ্চিৎকারিতা প্রদর্শন করাতে চিরবিলাসী, মহাধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ধন্না, শালীভদ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠিগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষো-পজীবী সাধুগণের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রাণী জন্ম-জরা-মরণের যে মহাকষ্ট অনাদি কাল হইতে সহ্য করিয়া আসিতেছে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চমহাব্রতের সম্যক অনুষ্ঠান দ্বারা কি প্রকারে আত্মার নিজ-স্বভাব পরিপূর্ণরূপে বিকশিত-করতঃ মুক্তির নির্ম্মল, অবিনাশী, শাশ্বত, অব্যাবাধ, অনন্ত আনন্দে বিলীন হওয়া যায় তাহার উপায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতের নানাস্থানে সরল, সহজ অথচ নিশ্চিত বচনে ভগবান মহাবীর প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা ঐ মহান্ আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়া এই আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি যে একদিন এমন সময় জগতে আসিবে যেদিন এই জ্যোতি-র্বিমণ্ডিত মহাতীর্থঙ্করের অমৃতোপম বাণী এবং মহান্ চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সমগ্র জগদ্বাসী তাঁহার পুণ্য নাম ভক্তি-বিমিশ্র অন্তরে স্মরণ করিবে।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(১৫)

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বাড়ী নিস্তব্ধ, সকলেই যার যার গৃহে নিদ্রা-বিভোর। রাস্তায়ও লোকজনের সাড়া-শব্দ কিছু আর বড় নাই, কেবল দুই-একখানা মোটর কখনও যাতায়াত করিতেছে, আর ক্বচিৎ দুই-একখানা রিক্‌সার ঘণ্টা শোনা যাইতেছে। ধীরে ধীরে লতা তখন উঠিয়া বসিল। একাই এই ঘরটিতে সে শুইয়া ছিল; বলিয়াছিল, একাই ভাল থাকিবে—অনেকটা সুস্থ সে হইয়াছে; ভয়, কি, চিন্তার কোনও কারণ আর নাই। রাত্রিটা এইভাবে কাটিয়া গেলেই সকালতক্ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

উঠিয়া কিছুক্ষণ লতা বসিয়া রহিল। তার পর খোলা জানালার কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বাহিরের একটা আলোকচ্ছটা আর সম্মুখের বাড়ীগুলির দ্বিতল ত্রিতল ব্যতীত কিছুই আর দেখা যায় না। জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া লতা আলোটা জ্বালিল। যদি কিছু দরকার হয় এই বলিয়া বাক্সটি এই ঘরেই আনাইয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দুই তিনখানি কাপড় বাহির করিয়া একটি পুঁটলি বাঁধিল। থলেটি বাহির করিয়া দেখিল, দুইটি টাকা আর দশটি পয়সা মাত্র তাহাতে আছে। এখানে আসিয়া মাসকাবারী কোনও বেতন সে এখনও পায় নাই।—আড়াইটি টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, চিঠিপত্রে আর দেবালয়ে সামান্য কিছু খরচ হইয়া ইহাই সম্বল তাহার হাতে এখন রহিয়াছে। গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থলেটি লতা সেই পুঁটলির মধ্যে রাখিল। তারপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে শেষে পুঁটলিটি বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বালিশটির উপরে কাত হইয়া পড়িল।

"লতা!"

চমকিয়া লতা উঠিয়া বসিল—দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরিঞ্চি। ত্রস্তে মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। বিরিঞ্চি কহিল "না, বস তুমি। উঠ্‌ছ কেন?—আমি এই চেয়ারটায় বরং বস্‌ছি।"

একখানি চেয়ার ঘরে ছিল, আস্তে বিরিঞ্চি সেখানি একটু কাছে সরাইয়া আনিল। মাথার কাপড়টা টানিয়া একটু ঘুরিয়া লতা তখন বসিল।

"লতা!"

মুখে কোনও সাড়া উঠিল না। ফিরিয়া একটিবার চাহিবার চেষ্টা মাত্র লতা করিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "শেষে এই বাড়ীতে এসে রাঁধুনী হ'য়েছ?"

"হাঁ।"

"কি করে কোত্থেকে এখানে—"

ঈষৎ কম্পিত মৃদু কণ্ঠে লতা উত্তর করিল, "কাশীতে ছিলাম, সেখানে—"

"ও!—তা কাশীতে—শেষে কি কাশীতে গিয়ে তোমরা ছিলে?"

"এইটুকু খবর পেয়েছিলাম, তোমার বাবা মারা গেছেন, চুঁচড়োয় তোমরা নেই—"

লতা নীরব।

"চুঁচড়ো ছেড়ে কি কাশীতেই যাও?"

"না। তখন মামার বাড়ী যাই।"

"তার পর?"

"থাকবার সুবিধে হ'ল না। পরিচয় কিছু দিতে পারি নি, লোকে নানা কথা ব'ল্‌ত, তাই শেষে কাশীতে আসি।"

মাথায় হাতখানি রাখিয়া একটু নত হইয়া বিরিঞ্চি বসিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু রাঁধুনীর কাজ নিয়েছ—কেন, খরচপত্রের যে একটা ব্যবস্থা তোমাদের হ'য়েছিল?"

"খরচ মাসে মাসে যেত। কিন্তু আমি শেষে ফেরত পাঠিয়ে দিই—আর নিই নি।"

আনত মুখে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া বিরিঞ্চি আবার কহিল "তোমার মা?"

"কাশীতেই আছেন—খোকাকে নিয়ে।"

"খো—কা—ও!"

গভীর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল। মাথায় হাতখানি রাখিয়া আবার বিরিঞ্চি নতভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

"তা—তোমার কি তাঁর সঙ্গে কাশীতে থাকবার সুবিধে হ'ল না?"

"না। সেখানেও নানা কথা উঠল। এঁদের বাড়ীতে কাজে লেগেছিলাম; সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে চাইলেন—তাই চলে এলাম।"

আরও একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে বিরিঞ্চি তখন কহিল, "দিনের বেলায় পারিনি, এখন—সবাই ঘুমিয়ে—তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এলাম।"

লতা কহিল, "এসেছ, ভালই হ'য়েছে। আমিও ভাব্‌ছিলাম, যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা হ'লে ভাল হ'ত।"

"যাবার আগে!—কোথায় যাবে?"

"ঠিক এখনও কিছু ভাবতে পারিনি। তবে—যেখানে হয় যেতেই হবে। এখানে ত আর থাক্‌তে পারি না।"

থাকিতে পারে কি?—সেও রাখিতে পারে কি? প্রতিবাদে উত্তর কিছু বিরিঞ্চির মুখে যোগাইল না। অতি অপ্রতিভভাবে নতশিরে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। একটু আমতা আমতা করিয়া শেষে কহিল, "যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি তার কি কৈফিয়ৎ দিতে পারি জানি না।"

"কৈফিয়ৎ ত কিছু চাইনি আমি।"

"না, তা চাও নি, হয়ত চাইবেও না। তবে—তবে—আমি—যাই হোক—গোটাকত কথা তোমায় বল্‌তে চাই, শুন্‌বে?"

"বল।"

বিরিঞ্চি কহিল, "তোমায় যখন দেখেছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে যখন জানাশুনো হয়, তোমাদের ওখানে যেতাম আস্‌তাম—"

লতা বলিয়া ফেলিল, "এ নাম, এ পরিচয় তখন কেউ জান্‌ত না।"

মুখখানি বিরিঞ্চির লাল হইয়া উঠিল। একটুকাল থামিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "নাম—হাঁ, তা বন্ধু-বান্ধবরা—বাড়ীরও কেউ কেউ প্রায় মোহন ব'লেই আমায় ডাক্‌ত। কারও সঙ্গে আলাপ যখন হয়, পিতার নাম ধাম, কি কুলবংশের পরিচয় কেউ আজকাল চায়ও না, যেচেও কেউ বড় দেয় না। বন্ধুদের সঙ্গে এই সব কাজে যে যেরোতাম, বাবা সেটা পছন্দই করতেন না—জান্‌তে পারলে ভয়ঙ্কর রেগে যেতেন। তাই ওদের সঙ্গে ভলান্টিয়রীতে কোথাও গেলে আর কোনও ছুতো দেখিয়ে যেতাম—পরিচয়ও কোথাও দিতাম না। সে যাই হোক, শেষে যখন বুঝ্‌তে পারলাম, বাবার মত কোনও মতে পাওয়া যাবে না, তখন—তখন—আমি উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিলাম—হিতাহিত জ্ঞান ছিল না—সামলাতে পারলাম না—পরিচয় সব গোপন ক'রে তোমাকে বিবাহ করি। দু-তিন জন খুব অন্তরঙ্গ বিশ্বাসী বন্ধু ছাড়া কেউ আর কিছু জান্‌ত না। উৎসাহও খুব তারা দেখায়, জোগাড়-যন্তরও নিজেরা সব ক'রে নেয়।"

লতা কোনও উত্তর করিল না। চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়াই বসিয়া রহিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "এমন যে শেষে হবে, স্বপ্নেও তা তখন ভাবিনি। ইলার বাবা ওঁর বড় একজন বন্ধু ছিলেন। এই সম্বন্ধ যখন ক'রলেন, গোপনে একদিন সব কথা তাঁকে জানালাম। কিন্তু কোনও কথা কানেও তিনি তুল্লেন না। আমি দুর্ব্বল এমন ধারা অবস্থা তখন ঘটল যে বুঝ্‌তে আর পারলাম না, তাঁর মতেই বাধ্য হ'তে হ'ল। বিবাহ দিয়ে অতি তাড়াতাড়ি ক'রেই আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। তোমার খরচপত্র সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা ক'রে কেবল তাই আমাকে জানালেন। আর কড়াভাবে নিষেধ ক'রে দিলেন, তোমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখি, কোনও খবরাখবরও কিছু না করি। আর যদি তা কিছু করি, বললেন, জান্‌তে তিনি পারবেন, আর তাহ'লে—তাহ'লে—"

"তাহ'লে—কি?"

"বললেন, খরচপত্র একদম বন্ধ ক'রে দেবেন।"

"কিসের খরচপত্র!—আমাদের খোরপোষের জন্য এই যা ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই?"

লতা ঘুরিয়া একবার চাহিল। অশ্রুধারা তখন শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে বিরিঞ্চি মুখ তুলিয়া চক্ষু খুলিয়া চাহিতে পারিল না। অন্যদিকে একটু ফিরিয়া আনতমুখে কহিল, "তাই বটে।—তবে—তবে—"

"কি? কি তবে?"

"আমি—আমি—একেবারে নিরুপায় হ'য়ে প'ড়েছিলাম।

আর যে সব কথা তখন তিনি বলেছিলেন—তাতে—তাতে—বুঝ্‌তেই আমি পারছিলাম না, কি কর্‌তে পারি—সর্ব্বনাশ যা ক'রে ফেলেছি, প্রতিকার তার কি হ'তে পারে—মনে হ'ল অগত্যা এই এখন মন্দের ভাল। বিয়ে আর একটা ক'রে ফেলেছি—আইন-কানুনও ভাল জান্‌তাম না—"

"আইন-কানুন! আইন-কানুনের কি? কেন, কি তিনি বলেছিলেন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "সে কথা মুখ ফুটে তোমায় বল্‌তে পারছিনি লতা। তবে—তবে—চেপে রাখাটাও বোধ হয় উচিত হবে না। বলেছিলেন, তোমাকে যে বিবাহ করেছিলাম, ধর্ম্মত কি আইনত তা সিদ্ধ হয় না।"

"সিদ্ধ হয় না!" মুখখানি লতার লাল হইয়া উঠিল। একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সিদ্ধ হয় না!—তবে যা হয়েছিল, সেটা কি হয়েছিল? পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে অগ্নি, শালগ্রাম, বামুন সাক্ষী ক'রে মন্ত্র প'ড়ে বাবা তোমার হাতে আমাকে সঁপে দিলেন, আর তুমি—" বলিতে বলিতে লতা থামিয়া গেল—দারুণ একটা উত্তেজনার আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিরিঞ্চি কহিল, "আমিও তখন সরল মনে ধর্ম্মত আমার বিবাহিতা স্ত্রী ব'লেই তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু শেষে শুন্‌লাম—উনি বললেন—পিতা বর্ত্তমান, তাঁর অনুমতি নিইনি—নান্দীমুখ হয়নি, আত্মীয় বান্ধব সকলের অজ্ঞাতে নাম পরিচয় সব গোপন ক'রে, অন্য একটা নামে একা গিয়ে বিবাহ করেছিলাম—"

"কেন করেছিলে?"

"জান্‌তাম না। বিয়ের আইন-কানুনে এত প্যাঁচ যে আছে—"

"সত্যিই আছে? হাঁ, উনি বলেছেন, হয়ত ভয় দেখিয়েছিলেন।—তুমি—আর কারও কাছে গিয়ে সন্ধান নেও নি কিছু?"

"না।—একেবারে হতবুদ্ধি তখন হ'য়ে পড়ি। হিন্দু-বিবাহের সব অনুষ্ঠান আর তার আইন কানুনের অনেক কথাই তখন তিনি বললেন। মনে হ'ল, সব সত্যি। বললেন—সন্তানসম্ভাবনা আছে—তাও জানিয়েছিলাম। তা বললেন, তোমাদের খরচপত্র চ'লে যেতে পারে, পাকা একটা ব্যবস্থা তার করবেন। খবর যা রাখতে হয়, গোপনে তিনিই রেখে এর পর যখন যেমন দরকার হয়, সব তিনি করবেন। কিন্তু আমি যদি এ নিয়ে কোনও গোলমাল কিছু করি, প্রকাশ্যভাবে আদালতের সাহায্যে প্রমাণ করবেন, এই বিবাহ অসিদ্ধ। আদালতের ব্যবস্থায় যেটুকু দায়িত্ব নিতে হয় তার বেশী কিছু কখনও নেবেন না। আর তার ফলে তোমাদেরও লোকসমাজে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হবে।"

"মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে আমাদের হয়েছে। যাক্! তখন ত আইনকানুন কিছু জান্‌তে না, কিন্তু এখন—আইন প'ড়ে শুনেছি ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছ, এর আইন-কানুন সত্যি কি ব'লে জান্‌তেও অবিশ্যি পেরেছ—"

বিরিঞ্চি কহিল, "হাঁ, আইনের বই অনেক ঘেঁটেছি। আলোচনাও অনেকের সঙ্গে করেছি। তাতে—তাতে এই বুঝেছি—প্রতিপক্ষ কেউ তেমন জিদ ক'রে যদি লড়ে, বৈধতা প্রমাণ করা শক্ত হবে। বিশেষ তিন-চার বছর হ'য়ে গেছে—তোমার বাবা বেঁচে নেই, চুঁচড়োর স্থায়ী অধিবাসীও ছিলেন না, চাকরী ক'রতেন মাত্র। আমিও ওখানকার কাউকে চিনি না। এখন এই তিন-চার বছর পরে বিয়ের সাক্ষী-টাক্ষী সব জোগাড় করা—সেই পুরুত—সেই নাপিত—কোথায় কে গেছে—নামও আমি জান্‌তাম না—সম্ভব হ'তে পারে ব'লেই মনে হয় না। আবার ওঁরা টাকা খরচও ক'রবেন দু হাতে। একা আমি কি করতে পারি?"

আড়ষ্ট হইয়া লতা বসিয়া রহিল। বিরিঞ্চি কহিল, "ফিরে আসবার পরেও বাবার সঙ্গে কথা হয়। আবার তিনি এই সব কথা ব'লে বিশেষ সাবধান আমাকে ক'রে দেন। বলেন, কোথায় কি ভাবে তোমরা আছ, খবর তিনি রাখ্‌ছেন, খরচপত্রও চালিয়ে যাচ্ছেন, পাকা ব্যবস্থাও তার ক'রে রেখেছেন। মনে হ'ল, যা হবার হ'য়েছে। এখন—এখন—এ ছাড়া আর উপায়ও কিছু হ'তে পারে না। কিছু ক'রতে গেলেও—উনি বললেন—ইলার বাবাও সহজে ছাড়্‌বেন না, আর আদালতে একটা ঘাঁটাঘাঁটি হ'লে—"

অশ্রুধারা আর বাঁধ মানিতেছিল না—স্খলিত কণ্ঠে লতা কহিল, "আদালতে একটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়—সেটা আমিও চাই না। তবে—তবে—সাক্ষী আর কেউ না থাক, না

কাউকে পাওয়া যাক্—তুমি বিবাহ ক'রেছিলে—তোমার কথাটা—"

"হয়ত গ্রাহ্যই হবে না—ওঁরা দেখাবেন, বড় একটা স্বার্থের টান আমার এদিকে রয়েছে।"

মাথায় একটুকাল হাতখানি রাখিয়া কি ভাবিয়া লতা শেষে কহিল "নিজের জন্য কিছু ভাবতাম না। ভাগ্যে যা ছিল হ'য়েছে—যে ক'রে হোক স'য়ে ব'য়ে যেতাম। কিন্তু ঐ যে ছেলেটা এসেছে—আজ অসহায় অজ্ঞান শিশু—বেঁচে যদি থাকে—বড় হ'য়ে যখন উঠ্‌বে—কি নাম-পরিচয়ে লোকসমাজে সে দাঁড়াবে? আমি মা, যদি বেঁচে থাকি, কি চোখে আমায় তখন দেখ্‌বে?"

বিরিঞ্চি কহিল, "তখন—তখন—আজ আমি নিরুপায় লতা। তবে এর পর—যাই হোক, একটু ভেবে দেখ্‌তে দাও আমাকে—দেখি কি ক'র্‌তে পারি।"

"কি ক'রবে তুমি? ভেবে কি দেখ্‌বে? হাঁ, ঘরে পয়সা আছে; কিন্তু তোমার—তোমার—না, সে দান, সে অনুগ্রহ কখনও তাকে ক'রতে যেও না—যদি না তোমাদের এই ঘরে আর ন্যায্য দাবী কখনও স্বীকার ক'রে না নিতে পার। পিতা তার নিরুদ্দেশ, অজ্ঞাত কুলশীল, অন্তত এটুকু মান তার থাক। যদি জান্‌তেই কখনও কিছু চায়—খুলে সব ব'লব। জানি না, কি সে তখন ভাব্‌বে। যদি তোমার কাছে আসে, এইটুকু মাত্র প্রার্থনা আজ আমার, তার মর্য্যাদা তাকে না দিতে পার, অস্বীকার কিছু ক'রো না।—আচ্ছা, তা হ'লে এখন বিদায় দাও, আমি আসি। কি চোখে আমায় এখন দেখ্‌ছ জানি না; কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার স্বামী, আর দেখা হবে না—শেষ এই প্রণাম তোমাকে ক'রে যাচ্ছি।"

ভূনতা হইরা একটি প্রণাম করিয়া লতা সেই পুঁটলিটি হাতে লইল। ত্রস্ত উঠিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "যাবে! কোথায় যাবে লতা?—একা অসহায়—এই রাত্তিরে—ক'ল্‌কাতার এই শহর—"

"পথ ছেড়ে দাও। দোহাই তোমার! যেথায় হোক্, যেতেই আমাকে হবে। আজই—এখুনি!—কাল—একটা জানাজানি যখন হবে—তখন যে মুখ নিয়ে আমাকে বেরোতে হবে—না, না, সে আমি ভাবতেই পারছি নি।—অসহায়!—কি ক'রব? মাথার উপরে যিনি আছেন—সর্ব্বহারা সকল অসহায়ের সহায় তিনি। তাঁর ভরসা ক'রেই বেরোচ্ছি—এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। সর—পথ ছাড়।"

"শোন, শোন লতা! দোহাই তোমার!—কোনও ভয় নেই তোমার। কেউ কিছু জানে না, জান্‌বেও না। —মাকে কাল গোপনে সব কথা ব'ল্‌ব।—তারপর তোমাদের একটা ভাল ব্যবস্থা যাতে হয়, নিরাপদে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার—কালই তা ক'র্‌ব। এ সংসারে না রাখ্‌তে পারি, অন্তত এটুকু ক'র্‌তে যে আমি বাধ্য!"

"হ'তে পার। কিন্তু রাখ্‌বে আমি থাকব—কি পরিচয়ে? কিসের দাবীতে? না না, প্রাণ থাক্‌তে তা পারব না! ভগবানও যদি মুখ তুলে একটু না চান, পৃথিবীতে ঠাঁই যদি একটু না হয়, খোকাকে নিয়ে গঙ্গায় বরং ডুবে মরব। তবু তোমাদের এ আশ্রয় স্বীকার ক'রে নেব না।"

অতি ব্যথিত দৃষ্টিতে বিরিঞ্চি চাহিয়া রহিল। কিন্তু নড়িল না, এদিক ওদিক লতা একবার চাহিল, অন্য কোনও পথে বাহির হইতে পারে কি না।

—"এ কি! তুমি—তুমি—এখানে!—লতাদি!"

চমকিয়া বিরিঞ্চি পাশের দিকে পা কয়েক সরিয়া গেল। লতাও একেবারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল, শিথিল হাত হইতে পুঁটলিটি পড়িয়া গেল।

শিরঃপীড়ার ওজুহাত দেখাইয়া সামান্য কিছু আহার করিয়াই বিরিঞ্চি গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইলা যখন শয়ন-গৃহে গেল, দেখিয়া মনে হইল, স্বামী নিদ্রিত। আলোটা নিভাইয়া দিয়া নিঃশব্দে সে গিয়া শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া রহিল। নিশুতি রাত্রিতে যখন ঘুম একবার ভাঙ্গিল, দেখিল স্বামী শয্যায় নাই—বাথরুমও দেখিল খালি।

কোথায় গেলেন—অসুস্থ শরীর?—উদ্বিগ্ন হইয়া সে বাহির হইল; এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া সে নীচে নামিল, বাহিরের দিকে কতটুকু যাইতেই মনে হইল—লতা যে গৃহে ছিল, সেই দিকে—একটা কথাবার্ত্তার সাড়া যেন পাইতেছে। তাই ত! লতাদি কি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে! ত্রস্তে সে অগ্রসর হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে হইলেও মনে হইল, লতা যেন বেশ উত্তেজিতভাবেই কি বলিতেছে, ঘরেও আলো জ্বলিতেছে।—নিকটে আসিয়াই দরজাটা সে খুলিয়া ফেলিল। কি এ ব্যাপার! তার স্বামী এই—নিশুতি

রাত্রিতে একা এখানে—লতাদির গৃহে! কেন?—আহারে বসিয়াছিলেন, ভাতের থালা লইয়া আসিয়াই লতাদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! কেন?

"লতাদি!"

"কি, বৌ-ঠাক্‌রুণ!"

"উনি—উনি—এখানে—কেন?"

"ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

স্বামীর দিকে ইলা চাহিল—অতি অপ্রতিভভাবে—যেন কাঠ হইয়া—নতশিরে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কেন, কেন তুমি এখানে?—কেন এসেছ? লতাদি তোমার কে?"

মৃদুস্বরে বিরিঞ্চি কহিল, "ঘরে যাও এখন ইলা। আমি—আমি—আস্‌ছি—"

"না—বল—বল! আমি আর বরদাস্ত কয়তে পারছি নি! বল—কেন তুমি এখানে! লতাদি তোমার কে?"

বিরিঞ্চি নীরব!—ঘরের ভিতরে লতার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ইলা কহিল, "তুমি—তুমিই তবে বল লতাদি,—বল, কেন উনি এখানে? কে উনি তোমার।"

"কেউ নন বোন্!—এসেছেন কি করব?—আমি বিদায় হচ্ছি!" বলিয়াই পাশ কাটাইয়া লতা বাহির হইয়া পড়িল।

"না না! যেও না—যেও না! শোন—দাঁড়াও একটু—বল—বল—"

ছুটিয়া ইলা দ্বারের দিকে চলিল। চৌকাঠে হুঁচোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িল।

"ইলা! ইলা!"

ত্রস্ত বিরিঞ্চি আসিয়া ইলাকে একটু তুলিয়া ধরিতেই দেখিল, সে মূর্চ্ছিতা।—লতাও একবার ঘুরিয়া চাহিল, কিন্তু ফিরিল না।

ক্রমশঃ

বৃন্দাবনী হিন্দোল

শ্রীনিরুপমা দেবী

"জয় রাধে, শ্রীরাধে!"
স্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রহরী ফুকারে গভীর নাদে!
অস্ফুট কলগুঞ্জনে কোথা কে যেন কাহারে সাধে!
"রাধে,—ওগো রাধে!"

ভেঙে যায় ঘুমঘোর　　অন্তরে পড়ে মোর
অস্ফুট কলগুঞ্জনে কোথা কে যেন কাহারে সাধে,
"রাধে,—ওগো রাধে!"

দুয়ারে কে ডাকে আসি　বাজে কি কোথাও বাঁশী?
তুমি সেই স্বন-সাওন পবন চলেছে মেঘের বাজে!
"রাধে,—জয় রাধে!"

ঝলিছে দামিনী-রেখা,　　দূর বনে ডাকে কেকা
ঝিমি ঝিমি ঝিম্ যামিনীর বীণ
বাজিছে নূপুর ছাঁদে,
"রাধে,—জয় রাধে!"

নিরজন ব্রজবীথি　　গাহে কেগো কোথা গীতি
যেন নিবিড় মিলনে বিরহ বেদনে
সে ধ্বনি কেবলি কাঁদে
"রাধে,—ওগো রাধে।"

*　*　*　*

পথিক চলিয়া যায়　　স্বজনে দেখিয়া ধায়
আনন্দ রোলে তুলি কল্লোলে হৃদয়ে হৃদয় বাঁধে,
গাহি　"রাধে,—জয় রাধে!"
আগত ঝুলন রাত্রি　　ছুটিছে অযুত যাত্রী
শতেক কণ্ঠে সেই এক নাম
ছুঁয়ে চলে যেন চাঁদে!
"রাধে,—জয় রাধে!"
দুলিছে হৃদয় দোলা　　অপরূপ হিন্দোলা
উতলা মন-পবন তাঁহারে দোলায় শতেক ছাঁদে
"রাধে,—জয় রাধে!"

উমেদারকাব্যসঙ্কলন

শ্রীরণজিৎচন্দ্র সান্যাল

প্রবন্ধ

গদ্য কাব্য এবং সমালোচনাকে চক্রে ফেলে এ পর্যন্ত মানুষের সাহিত্যের ভাবের ঘরে বাণীর আরাধনা চলেছে; কিন্তু এই গতানুগতিকতার মধ্যেও যেন মাঝে মাঝে নতুনত্বের নূপুর-ধ্বনি কানে এসে বাজে। কোনও কোনও সাহিত্যিক-পেট্রিয়ট্ যে বিষয়টিকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বা পংক্তিভুক্ত করবার কথা কল্পনা করেছেন সেটি হচ্ছে 'উমেদারকাব্য'—যাকে বর্তমান যুগের বেকার-দর্পণ বা ভবঘুরের স্বর্গ নাম দিলেও একই অর্থ হয়। কাব্যে নানারকম ছন্দের সৃষ্টি—অমৃতাক্ষর, পয়ার, পঞ্চচামর, লঘুগুরু, মাত্রাবৃত্ত, সনেট্ ইত্যাদি নিয়ে কাব্যের ভাঙাগড়ার ইতিহাস প্রস্তুত হ'ল; উপন্যাস, ছোট-গল্প, সমালোচনা, রসরচনা, চাটুনিরচনা ইত্যাদিকে উৎসর্গ ক'রে এ পর্যন্ত সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কালির 'দৈনিক' শ্রাদ্ধ হ'ল। কিন্তু যে অবস্থায় মানুষ বাউণ্ডুলে-বৃত্তি বা বেদুঈন-পন্থা বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হয়, সেই অবস্থার বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিককেই চিন্তা করতে দেখা যায়। বস্তুবাদী জগতের কোনও মানুষকেই এর আবশ্যকতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে স্মরণ করিয়ে দেবার কিছু নেই।

সামান্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমান সময় প্রত্যেক ইংরেজী-বাংলা দৈনিক পত্রে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; বলা বাহুল্য, দশ বৎসর পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা যে অনুপাতে না বেড়েছে সেই অনুপাতে বেড়েছে বিজ্ঞাপন-পাঠক —কর্মপ্রার্থী এবং উমেদারের সংখ্যা। থিয়োরীর দিক্ দিয়ে আলোচনা করলে একথা মনে হয়, অনুপাতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির মূলে রয়েছে—আমাদের দেশের শিক্ষিতের হারে শতকরা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবনতি। বর্তমান সময়ে এই মতবাদের মূলে সত্যতা থাকলেও যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন, কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বেকার-সমস্যার মূলে রয়েছে দুটি কারণ:

(১) নিয়োগকর্তাদের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা।

(২) কর্মপ্রার্থীদের অযোগ্যতা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পর নিয়োগকর্তা-দের কার্যালয়ের টেবিলে কর্মপ্রার্থীদের দরখাস্তনামার যে স্তূপ এসে সঞ্চিত হ'তে থাকে সেগুলি পরীক্ষা ক'রে অনেক নিয়োগকর্তাকে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, কি চাকরি আবশ্যক এবং কি রকম ভাবে দরখাস্তের খসড়া করতে হয় সে সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না ক'রে প্রার্থীরা ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি ক'রে থাকেন। কথাটা সত্য এবং এই অজ্ঞতার দুটি প্রতিষেধক হচ্ছে—(ক) কার্যকরী দরখাস্ত এবং (খ) সুচিন্তিত ইন্টারভিউ-এর মহলা। দরখাস্ত-প্রস্তুতে এবং নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের কয়েকটি যুক্তিসম্মত কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এই গুলির যথাযথ ব্যবহারে কর্তার দৃষ্টি কর্মীর প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ হয়েছে। বর্তমান সময়ের কেনাবেচার জগতে একসঙ্গে 'রথ দেখা, কলা বেচা'র নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ বর্তমান ব্যবসায়িক জগতের অধিকাংশ কর্ণধার অল্প মূল্যে শ্রেষ্ঠতর কর্মের বিনিময় করবার প্রয়াসী। এই লাভবান হবার মনোবৃত্তির মূলে আমরা দেখ্‌তে পাই তাঁদের বৈষয়িক ধূর্ততা এবং কর্মীদের অযোগ্যতা। এই মনো-ভাবের প্রতি লক্ষ্য ক'রে অতঃপর প্রত্যেক কর্মীকেই স্বত-গতিশীল মানুষ-যন্ত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করবার সাধনা করতে হবে; কারণ জনৈক বিশেষজ্ঞের কয়েকটি শব্দসমষ্টিতে তা প্রমাণ হবে—'Employment has advanced far beyond the days, when an employee was simply a living being regarded as acting—spontaneously without consciousness."

বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে প্রতিযোগিতা তার শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে—এই অজুহাতে প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীকে উন্নতির সহায়ক বলে দুটি মন্ত্র স্বীকার করতে হবে—

(১) প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ।

(২) কৌশল সহযোগে কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করা যে, যে রকম আবশ্যক প্রার্থী তার উপযুক্ত! এই অপরিহার্য প্রতিযোগিতার যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের কার্যালয়ে যে সকল ব্যক্তির উপর নিয়োগ-কর্ত্তৃত্ব থাকে, বুদ্ধিতে তাঁরা গড়পড়তা মানুষের তুলনায় ধূর্ত্ত এবং বুদ্ধিমান। এই বুদ্ধিমত্তার সুযোগ নিয়ে নিয়োগ কর্ত্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে উৎকৃষ্টতর যোগ্যতর ব্যক্তির কাজ কিনতে উৎসুক। কর্মপ্রার্থীদের দরখাস্তের নির্বাচন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে এবং সেই পদ্ধতি অনুধাবন ক'রে দেখা গিয়েছে প্রতি দশখানি দরখাস্তের মধ্যে নয়খানি হয় বাতিল —যার উত্তর হয়—'Your application with reference to our advertisement has been rejected.' অবশিষ্ট একটির উপর নিয়োগ-কর্ত্তৃপক্ষের এই ধারণা হয় যে, ঐ দরখাস্তনামার লেখক সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতা এবং কার্যক্ষমতাসম্পন্ন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বক্তব্য বিচার করা হয়। উপরোক্ত বাতিল-করা নয়খানি চিঠিতেই এমন কোনও বিবরণী থাকে না, যার দ্বারা প্রার্থীর নিজস্ব উন্নতির প্রতি আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

দরখাস্ত লেখা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে বিচারের বিষয়—বিজ্ঞাপনে নিয়োগকর্ত্তা কি চায়, এই বিচার সহজসাধ্য মনে হয় না, যেহেতু বিজ্ঞাপনে অতি সামান্যই জ্ঞাতব্য হিসাবে আমরা পাই। বলাবাহুল্য, প্রার্থীর এই অনুশীলন-বুদ্ধিতে সাফল্য যেন এক এক ধাপ এগিয়ে আসে। দরখাস্তে technical এবং academic শিক্ষা ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করলে দরখাস্ত কার্যকরী হয়—

(১) কাজকর্মের প্রতি নিজের স্বার্থ।

(২) কার্যালয়ের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি

(৩) বিশ্বাস এবং লয়াল্‌টি।

কর্মে উন্নতি লাভের একটা প্রকাণ্ড সহায়ক হচ্ছে—উচ্চাশা। এই উচ্চাশা অদৃশ্যভাবে ভাগ্যের সঙ্গে দৈনিক-জীবনে মিশে রয়েছে। কর্মীদের মনে উচ্চাশা দৃঢ়ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেই ক্ষেত্রে—যে ক্ষেত্রে সে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিজের বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, কাজ করবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয় সেগুলিকে উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ ক'রে। নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ ক'রে কর্ত্তৃপক্ষের মনে ভাল ধারণার সৃষ্টি করা অনেক সময় সহজ হয়ে পড়ে। নিয়োগকারী প্রার্থী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই হেতু কিছু কৌশলে যতদূর সম্ভব জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়ে কর্মীর প্রতি কর্মনিয়োগকর্ত্তার good will সৃষ্টি করাবার প্রচেষ্টা যুক্তিসম্মত। দুই-একটি এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে যে, কোনও কোনও দরখাস্তকারী বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত এবং ইন্‌টারভিউ-এর যে বাণগুলি লক্ষ্যহীন ভাবে ছুঁড়েছেন তার সংখ্যা পঞ্চাশকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এই ব্যর্থতার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়—(১) সতর্কতার সঙ্গে দরখাস্ত লেখার প্রণালী জ্ঞান এবং (২) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎলাভের পূর্বে প্রশ্নের তালিকা তৈরী করা। আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা-সম্পন্ন চিঠির প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয়-সংক্ষিপ্ততা। এসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ গ্রন্থকার Jos W. Rowbottom তাঁর লিখিত এক গ্রন্থে লিখেছেন—'Brevity gives charity and force to your statements, renders them easily understood and helps them to make an impression upon the reader.' বড় চিঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগ্‌বাহুল্য সৃষ্টি ক'রে নিয়োগকর্ত্তার চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করে এবং এরই ফলে চিঠিখানি তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বোধ হয়। ফলকথা, চিঠিতে জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক, কিন্তু সংক্ষিপ্ত না হ'লে তার কোনও কৃতিত্ব এবং কার্যকরী শক্তি নেই। সমগ্র চিঠির সারাংশ হবে—'আমি উপযুক্ত অর্থের সঙ্গে আমার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কর্মের বিনিময় করতে সমর্থ।' যে দরখাস্তে এই সারাংশের অস্তিত্ব থাকে সেই লিপি কর্মস্থলে প্রার্থীর একজন উপযুক্ত দূতের কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়াস পায়।

দরখাস্তে জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি পর পর এইভাবে সাজাতে হবে—

(ক) প্রার্থীর বয়স, জাতি, ধর্ম্ম

(খ) শিক্ষা

(গ) সেই কার্যে অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ঘ) অন্যান্য টেক্‌নিকাল শিক্ষা ইত্যাদির বিবরণ

(ঙ) সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(চ) পূর্বে কোনও কাজে নিযুক্ত থাকলে তার পরিত্যাগের স্বপক্ষে যুক্তি

(ছ) প্রেরিত সার্টিফিকেটগুলির একটি তালিকা

(জ) পূর্ব কাজের বেতন

(ঝ) বর্তমান কাজে বেতনের দাবী।

ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় বিশেষ ক'রে ইংরেজী ভাষায় দরখাস্তে প্রথমে একটি ভূমিকা থাকে, একটি আদর্শ উদাহরণ দেওয়া গেল, 'Having been given to understand that a post of clerk has fallen vacant in your office, I beg leave to apply for the position, confident that it is one I can ably fill.' বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায়—'কোনও সূত্রে আপনার কার্যালয়ে জনৈক কর্মচারীর স্থান খালি আছে জ্ঞাত হইয়া আমি ঐ কার্যটির প্রার্থীরূপে দরখাস্ত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার বিশ্বাস আমি ঐ পদটি যোগ্যতার সহিত পূরণ করিব।' শেষ সম্বোধনে—'I have the honour to be Sir, Your most obedient servant' লেখবার প্রথা আছে; সাধারণ দরখাস্তে পরিশেষে লেখা উচিত—

I have the honour to remain,
Gentleman,
Your's very faithfully

কোনও কোনও অবস্থায় পরস্পর সন্দর্শনের সুযোগ আসে। কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হবার এই যোগাযোগ বিশ্বাস জন্মাবার একটা শ্রেষ্ঠ সুযোগ, এই হেতু কর্মক্ষেত্রে ইন্টারভিউ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন অর্থে বোঝায় সাক্ষাৎলাভের জন্য কর্মীকে প্রস্তুত হওয়া। সাক্ষাৎলাভের পূর্বরাত্রে দেখা হওয়ার পর যে প্রশ্নগুলি কর্মকর্তার দিক থেকে হবার সম্ভাবনা আছে সেগুলির সন্তোষজনক উত্তরের একটি খসড়া মনে মনে স্থির করে রাখা ভাল, উত্তরগুলির পুনরাবৃত্তি করে রাখাও যুক্তিসম্মত। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়।—(১) বয়স, (২) শিক্ষা, (৩) পূর্বেকার অভিজ্ঞতা, (৪) পূর্বেকার এবং বর্তমান বেতনের দাবী। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে উপস্থিতবুদ্ধি প্রখর করবার সাধনা করতে হবে। একবার একজন ভদ্রলোক salesman চাকরির প্রার্থী হয়ে একজন ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কয়েকটি প্রশ্নের পর প্রশ্নকর্তা ঐ ভদ্রলোকের হাতে কয়েকটি বিক্রয়ের বস্তু দিয়ে বলেছিলেন—'Here are your articles, suppose I am a rich customer, sell those to me.'

এক্ষেত্রে ঐ ভদ্রলোকটি যে কর্তৃপক্ষের একজন এ কথা ভুলে গিয়ে একজন ভাল salesman-এর অভিনয় করা আবশ্যক। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সময় আসল সার্টিফিকেট এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চরিত্র-যোগ্যতা সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সঙ্গে নেওয়া দরকার হয়। এ ছাড়াও ঐ সময় নিজের পোষাক পরিচ্ছদ এবং চেহারাও যাতে গ্লানিশূন্য ও পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে কিছু দৃষ্টির আবশ্যক, কারণ এগুলির একটা মনস্তত্ত্বমূলক কৃতিত্ব আছে। নিয়োগ-কর্তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অনেক সময় তাঁকে নীরব গম্ভীরভাব অবলম্বন করতে দেখা যায়, এই ভাব অবলম্বনের মধ্যেও একটা পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার প্রার্থীর কার্যতৎপরতা, কথাবার্তায় চটপটে ভাব ইত্যাদি গুণ লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্য থাকে জানতে হবে। এই সময় প্রশ্নকর্তার পক্ষ থেকে কোনও প্রশ্ন না এলে নমস্কার সম্ভাষণ ক'রে গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে কিছু বলা ভাল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিয়োগকারী প্রার্থীকে আসন গ্রহণ করতে ব'লে তার সার্টিফিকেট এবং লিখিত দরখাস্তখানির দিকে মনযোগ দেন। অনেক সময় কর্মীর খেলাধূলা সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি-না, অর্থাৎ out-door জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, কর্মী কর্মের গণ্ডীর বাইরে কি ভাবে জীবন কাটায় জানবার উদ্দেশ্যে। Personal interview-এর আসল উদ্দেশ্য কর্মপ্রার্থীর ব্যবহার, ভদ্রতা, বুদ্ধি, তৎপরতা এবং কাজের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা। ইন্টারভিউ-ভীত-ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে যে, ওটা হচ্ছে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে দুইজন ব্যক্তির পরস্পরে দেখাশোনা। একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎ করাকে, 'go in to win' ব'লে পরিচিত করেছেন।

যে-ক্ষেত্রে এ সুযোগ হয় না সে-ক্ষেত্রে দরখাস্তের সাথে প্রার্থীর একটি ফটোগ্রাফ পাঠান যুক্তি-সম্মত অথচ অভিনব রীতি—এই রীতির প্রচলন ইংলণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। উপযুক্ততার অস্তিত্ব থাকলে ফটোগ্রাফের কার্যকারিতা আছে, কারণ স্বভাবতই মানুষের দৃষ্টি ঐ ফটোগ্রাফের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

ত্রয়োদশ দৃশ্য

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় মধুসূদনের বাসায় ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি সুবিস্তৃত ঘর। ঘরের তিনকোণে তিনটি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সম্মুখে একটি করিয়া চেয়ার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের আর একদিকে দুইটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সোফা প্রভৃতিও আছে। একটি বড় বুক শেল্ফে অনেকগুলি পুস্তক দেখা যাইতেছে। একটি টেবিলের নিকট মধুসূদন আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা এবং গায়েও আদ্ধির ঢিলাহাতা একটা ঘুন্টি-দেওয়া পাঞ্জাবি। হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রহিয়াছে। কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করিয়া তাহার পর তিনি জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

The infernal serpent, he it was whose guile,
Stirred up with envy and revenge, deceived
The mother of mankind, what time his pride
Had cast him out from Heaven, with all
his host
Of rebel Angels, by whose aid, aspiring
To set himself in Glory above his peers,
He trusted to have equalled the most High
If he opposed and with ambitious aim
Against the throne and monarchy of God
Raised impious war in Heaven and battle proud
With vain attempt—

(নেপথ্যে) মধু, বাড়ী আছে ?

মধু। (বই বন্ধ করিয়া) আছি—এসো—গৌর নাকি ?

গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস—এলে কবে ! তোমার যে পাত্তাই নেই আজকাল, হে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটকুলতিলক ! তার পর খবর কি ? তিলোত্তমাসম্ভব পেয়েছ ?

গৌর। (উপবেশনান্তে) পেয়েছি—তার সমালোচনাও পড়েছি। I congratalate you. রাজনারায়ণ, রাজেন, even old fashioned দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ of 'সোমপ্রকাশ' has praised you ! You have worked wonders my friend.—তারপর, খবর কি তোমার ?

মধু। খবর ? খবর ভালই। (হাসিয়া) অর্থাভাব ছাড়া আর কোন অভাব নেই।

গৌরদাস। অর্থাভাব ? কেন ? আদালতে চাকরি করছ—বই লিখেও কিছু পাচ্ছ—you should not be in want.

মধু। বই লিখে আর কত পেয়েছি !

গৌরদাস। পাওনি কি রকম ! রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা—you have flooded our literature—আর প্রত্যেক বইখানাতেই তুমি বেশ টাকা পেয়েছ। বড় রাজা, ছোট রাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সবাই ত যথেষ্ট দিয়েছেন তোমাকে !

মধু। And I am grateful to them !—কিন্তু ওই কটা টাকাতে আমার কি হবে বল দেখি ! বৈশ্বানর কখনও এক আধ চামচে ঘি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন ! আমি দাউ দাউ করে জ্বলতে চাই ! রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে চাই ! I thrive in luxury, you know—it is a necessity for me and my imagination. I hate—I simply hate to live in close atmosphere. It suffocates me ! এই কটা টাকাতে কোনক্রমে খাওয়া পরা চলতে পারে বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমে চলাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। I want to soar—I mean, materially too ! I am thinking of going to England and becoming a Barrister. I must have more money.

গৌর। তোমার জ্ঞাতিদের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ত উদ্ধার হয়েছে—নয় ?

মধু। প্রায়—P and B seem to be yielding—the rascals !

গৌর। তবু তোমার কুলুচ্ছে না ?

মধু। My dear G. D. Bysack, you illustrious deputy magistrate, you ought to know that a few hundred rupees per month are too inadequate for the poet of তিলোত্তমা সম্ভব। তৃতীয় সর্গ মনে আছে ?

আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

এড়াইয়া কাঞ্চন তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে ;
পদ্মাসনে, পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিকপাল দল পরম হরষে !
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল—রত্নমালা,
ফল হায় কেমনে বর্ণিব ফলচ্ছটা ?

তিলোত্তমাসম্ভব খানা শেলফ্ হইতে পাড়িয়া লইয়া

my imagination revels in descriptions like these.

পড়িতে লাগিলেন

ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ-ফুল ; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃত-ফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
সঙ্গীত তরঙ্গে কেহ, কেহ রঙ্গে ঢালি
মন—হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির সমীপে
স্বর্ণময়, হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেব-চক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম !—

(বই রাখিয়া দিয়া) No, my dear, I cannot remain within a few hundreds.

গৌর। (হাসিয়া) ওটা পড়ছিলে কি বই ? (টেবিল হইতে দুইটি বই তুলিয়া) এটা ত দেখছি 'হোমার', এখানা ত 'টাসো'—ওটা কি !

মধু। Paradise Lost.

গৌর। নতুন কিছু সুরু করেছ না কি ?

মধু। সুরু করেছি, মানে ? তিনখানা একসঙ্গে সুরু করেছি ! ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক—মেঘনাদবধও সুরু করেছি কাল থেকে।

গৌর। (সাশ্চর্য্যে) একসঙ্গে তিনখানা ! বল কি হে !

মধুসূদন গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। মুখে স্মিতহাস্য

মধু। চলবে না কি !

গৌর। না, থাক।

মধু। (হাসিয়া) নতুন গৃহিনীটি কিছু কড়া নাকি !

গৌর। না, সেজন্যে নয়।

মধু। একটা গুজব শুনছি প্যারিচরণ সরকার নাকি 'সুরাপান নিবারিণী' সভা করবে ! সেই দলে ভিড়েছ নাকি ! আচ্ছা, দেবেন ঠাকুর যে কেশব সেন আর কাকে নিয়ে সিংহলে গেছলেন—ফিরেছেন কি ? I have a desire to see Ceylone. And I shall one day.

গৌর। টেবিলের ওপর চিঠিখানা কার হে !

মধু। রাজনারাণের, পদ্মাবতী পড়ে কি লিখেছে দেখ না—

গৌর হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইলেন ও পড়িলেন

গৌর। He is a good critic—খুব ত প্রশংসা করেছে দেখছি !

মধু। Oh, yes.

গৌর। আমি মাঝে মাঝে সেই দিনটার কথা ভাবি

মধু। কোন্ দিনটা ?

গৌর। যেদিন তুমি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে Blank verse নিয়ে তর্ক করেছিলে—it is a memorable day in our literature.

মধু। Have I not convinced not only J. M. T. but every educated man of Bengal that our language is capable of Blank verse ? সংস্কৃত যে ভাষার জননী সে ভাষায় কি না হতে পারে ? মেঘনাদবধে আমি আরও প্রমাণ করব সেটা—it is going to be a grand epic.

গৌর। মাদ্রাজে পড়ে থাকলে কি এসব হত ! ভাগ্যে তোমাকে জোর জবরদস্তি ক'রে এখানে আনিয়েছিলাম।

মধু। নিশ্চয়ই,—গৌরদাস you are another ভগীরথ। আমার কাব্য-সুরধুনীকে তুমিই মর্ত্যে এনেছ।

মাদ্রাজে পড়ে থাকলে ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি মিষ্টার দত্ত would have ended in a miserable grave. You have made me famous, my dear G. D. Bysack—please have a drop

মদ আগাইয়া দিলেন

গৌর। (গ্লাসে এক চুমুক দিয়া) আচ্ছা মধু, 'একেই কি বলে সভ্যতা' লেখবার পরও ত তুমি বেশ সমান তালে মদ চালিয়ে যাচ্ছ!

মধু। Why not? My genius and my habit are two different things and I am slave to both.—তবে বেশী মদ এখন খাব না—লিখতে হবে। I cannot write if I drink too much.

গৌর। By the bye—'একেই কি বলে সভ্যতা' বইটাতে একটু যেন personal attack হয়ে গেছে। তোমার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' সভা যে 'জ্ঞানার্জ্জন' সভারই নামান্তর তা বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না। Even there is a Ghose in it!—তোমার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও কি সত্যি ঘটনা না কি! It is too realistic a book!

মধু। হ্যাঁ—ও চরিত্রগুলি সাগরদাঁড়ির। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামটা ছোট রাজার দেওয়া—জান ত?

গৌর। কার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের? তাই না কি!

মধু। হ্যাঁ—by the bye—আমাদের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যের বহরটা দেখেছ? তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পড়ে কি বলেছেন শুনেছ? Hopeless! সুন্দর জবাব দিয়েছে রাজেন!

গৌর। কে, রাজেন মিত্তির? বিবিধার্থসংগ্রহে তার সমালোচনা পড়েছি ত!

মধু। না, সে সমালোচনা নয়। রাজেন লিখেছিল—রাজনারায়ণকে। রাজনারায়ণের কাছ থেকে আমি জেনেছি this is private. রাজেন লিখছে রাজনারায়ণকে—I hear that even the renowned Vidyasagar, to whom I have the greatest respect, thinks our poet an abortion—the worthless issue of drunkenness and stupidity! তারপর রাজেন লিখছে—would such abortions were plentiful in the country and men to know their value! (হাসিয়া) বোঝ একবার—টুলো পণ্ডিত বিদ্যাসাগর গেছেন তিলোত্তমা-সম্ভব পড়তে! I wonder how many times he stumbled over each line! Poor Vid!

গৌর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের কাছ থেকে—this was not expected.

মধু। This was very much expected! চেনো না তাকে? He is always sincere and always truthful—that's the trouble with him! ও ত ওরকম বলবেই—আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নি। ওর ত কোন দোষ নেই! He could not manage the blank verse! মিল্টনও পড়ে নি, হোমারও পড়ে নি—সুতরাং blank verse is quite blank to him. They want every one to write পজ্ঝটিকা or অনুষ্টুভ! ও আবার যখন বুঝতে পারবে—প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে! He will be all praises—দেখো! (একটু থামিয়া) ওদের ব্যাপার কিছু বুঝি না—'শর্ম্মিষ্ঠা'-খানা সংস্কৃত ছাঁদেই ত লিখেছি—তাও নাকি ওদের ভাল লাগে নি। These barren pundits understand nothing but Grammer!

গৌর। বিদ্যাসাগর কিন্তু বাঙলা গদ্য যা লিখেছে তা অপরূপ!

মধু। Oh, yes! His prose is dignified and sweet—তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের উপক্রমণিকা পড়ছ?

গৌর। বই হয়ে বেরিয়েছে ত সেখানা?

মধু। ঠিক জানি না। It will be a good book no doubt. কালীপ্রসন্ন সিংহ কি কাণ্ড করেছে শুনেছ ত! সমস্ত মহাভারতটা অনুবাদ করবার বিরাট আয়োজন ক'রে বসেছে! A heroic attempt, indeed!

গৌর। বিদ্যাসাগর ওর পেছনে আছে যে! ছেলেটিও ভাল—ওর স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী' সত্যিই 'বিদ্যোৎসাহিনী'।

মধু। Undoubtedly. He is a mere boy, but he has the soul of a sage.

গৌর। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছ? 'অভেদী' বলে আর একখানা বই সুরু করেছে না কি শুনলাম! 'মাসিক পত্র' কাগজটা দেখেছ?

মধু। অত চলতি আটপৌরে ভাষা আমার পছন্দ হয়

না—it leaves no impression—it has no grandeur!

গৌর। ওই কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক উপন্যাস—I mean আলাল

মধু। (হাসিয়া) তা হোক্! আমিও প্রথমে পৃথিবী শব্দের মৌলিক বানান প এ র ফলা হ্রস্বই লিখেছিলাম। প্রথম হলেই যে ভাল হতে হবে এমন কোন কথা নেই! ভূদেব কোথা হে আজকাল?

গৌর। ঠিক জানি না! স্কুল দেখে দেখে বেড়াচ্ছে আর কি! ভূদেবও মাঝে মাঝে লেখে—দেখেছ?

মধু। দেখেছি! এডুকেশন গেজেট—

গৌর। চারদিকেই যেন নতুনত্বের বান ডেকেছে। ওদিকে ব্রাহ্ম-সমাজে দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন, পলিটিক্সে হরিশ—রামগোপাল ঘোষ—সাহিত্যে তোমরা! গত বছর ঈশ্বর গুপ্ত মারা গেছেন—তিনিই বোধ হয় প্রাচীন যুগের শেষ কবি—কি বল?

মধু। আমাদের রঙ্গলালও খুব আধুনিক ন'ন!

গৌর। রঙ্গলাল ত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য—but he is more chaste! ঈশ্বর গুপ্তের অনেকগুলি শিষ্যই আছেন। ওই দীনবন্ধু!—'নীলদর্পণ' পড়েছ ত? কস্যচিৎ পথিক হচ্ছেন দীনবন্ধু!

মধু। You are carrying coal to New Castle! আমি নীলদর্পণ পড়েছি—and even I am thinking of translating the book. এ ধরণের political propaganda বাঙলাতে না হয়ে ইংরেজিতে হলেই ভাল হয়।

গৌর। দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তোমার?

মধু। হয় মাঝে মাঝে—he is a grand fellow—মূর্তিমান হাস্যরস। সেদিন ওর এক বন্ধু—বঙ্কিম চাটুজ্যে—তার সঙ্গেও আলাপ হল! He is a deputy magistrate. I was greatly impressed by his look. My God, he has terrible nose and eyes!—মুখে যদিও বড় একটা কিছু বলে না। প্রভাকরে পদ্য-টদ্য লিখত শুনেছি। He is a brilliant boy.

গৌর। কোথায় তোমাদের আড্ডাটা জমে—বল ত?

মধু। বাঃ—ঝামাপুকুরের তারক ঘোষের বাড়ীতে! ঠিক দিগম্বর মিত্তিরের বাড়ীর সামনে। সেখানে মাঝে মাঝে বেশ সাহিত্যিক আড্ডা জমে। Let us have another dose.

মদ ঢালিতে লাগিলেন

গৌর। বেশী মদ খেয়ো না হে—মদ খেয়ে হরিশ মারা যাবার জোগাড় হয়েছে।

মধু। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ? বেচারাকে খুব খাটতে হয়—কি করবে! He is fighting tooth and nail against these indigo-planters. He is a thorough-bred editor and wields a powerful pen. It is a misfortune that he and Ramgopal Ghose did not write in Bengali.

গৌর। লোকটার হিম্মৎ আছে ভাই। এই ক'বছর আগে, মিউটিনির সময় কি লেখাটাই লিখেছিল!

মধু। Please don't remind me of the Mutiny—নানা সাহেবের পাশবিক কাণ্ডের কথা ভাবলেও আমার লজ্জা হয়। He killed women and children—My God!

গৌর। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তার শোধ তুলে নিয়েছে। যাক্—যেতে দাও ওসব কথা! তোমার নতুন লেখাটা একটু শোনাও না! সত্যি আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে! শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়টা আমি দেখতে পাই নি। কিছুতেই ছুটি পেলাম না। শুনেছি খুব গ্র্যাণ্ড হয়েছিল। আচ্ছা, 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এ দুটো বই staged হল না কেন বুঝলাম না!

মধু। (এক চুমুক মদ্যপান করিয়া) জানি না! These Rajales are strange fellows! তাদেরই ফরমাসে বই দুখানা লিখলাম—they paid me for them! শুনছি নাকি some of the young Bengals have intervened—রাজারা তাদের চটাতে রাজী নয়। যাক গে—satire আর লিখব না। কেশব—I mean কেশব গাঙ্গুলী—has given me a very good idea and I have got a very good plot for কৃষ্ণকুমারী from Todd.

গৌর। রঙ্গলালও শুনেছি রাজস্থানের গল্প নিয়ে আবার কি যেন একটা লিখছে।

মধু। I wish he would leave the beaten track.

বুক শেল্ফ্ হইতে একখানি বই পাড়িলেন

এই শোন না রঙ্গলালের লেখা—

মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে,
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে।
বহে রক্ত-ধারা বুঁদেলা শরীরে
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদ নীরে;
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে
পড়ে সৈন্য ঠাট তরবার কোপে—

This may be a good imitation of 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' —কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনা হিসাবে he ought to have been loftier in imagination. তিলোত্তমার প্রথম দিকে আমি দৈত্যদের নিকট পরাজিত দেবতাদের বর্ণনায় খানিকটা যুদ্ধের আভাস দিয়েছি—here you are.

তিলোত্তমাসম্ভব হইতে পড়িতে লাগিলেন

যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুল
প্রবল তরঙ্গ-দল তীর অতিক্রমি'
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম-অঙ্গ ঋতু-কুল-পতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন—তার আভরণ!

And here again—

ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইল সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যার সখা
সর্ব্বভুক প্রবেশিলে নিবিড় কাননে
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় কেশরী,
মদকল, নাগদল চঞ্চল সভয়ে
করভ করিণী ছাড়ি পলায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদল, শার্দ্দূল বরাহ
মহিষ, ভীষণ-খড়্গী—অক্ষয় শরীরী
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পলায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজি
পলায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ বেগে ধায় চারিদিকে
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে।

গৌর। তোমার লেখা ত অন্য জাতেরই! It has Homeric outlook and Miltonic grandeur!

মধু। মিলটন আমার দেবতা! রঙ্গলালের আদর্শ কারা জান? Byron, Moore and Scott. I wish he would travel farther. He would then find what hills peep over hills—what Alps on Alps arise! বাল্মিকী, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো, মিলটন—এঁরাই হচ্ছেন কবিকুলগুরু! আদর্শ করতে হ'লে এঁদেরই আদর্শ করব। Byron, Moore, Scott, Pope are at a much lower level.

গৌর। হিন্দু কলেজে কিন্তু তোমাকে আমরা Pope বলতাম!

মধু। (হাসিয়া) And I became vain like a Cock at this. I was a fool then.

গৌর। রঙ্গলালের কবিতা মাঝে মাঝে কিন্তু বেশ লাগে—

মধু। Oh, yes.—পদ্মিনীর এই লাইনগুলো খুব ভাল লাগে আমার!

পদ্মিনী খুলিয়া পড়িলেন

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়!
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়!

This is superb. I have also started rhyming in ব্রজাঙ্গনা!

(নেপথ্যে) আসতে পারি আমরা ?

মধু। আসুন! পণ্ডিতরা এসেছে—Gour now I must bid you Good-Night.

গৌর। এখন পড়াশোনা হবে বুঝি—

মধু। হ্যাঁ—I shall dictate now.

গৌর। উঠি তবে। তোমার নতুন লেখাগুলো দেখাই হ'ল না—বাজে কথায় সময় কেটে গেল!

মধু। সে আর একদিন হবে।

তিনজন পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

আসুন আপনারা, বসুন। গৌর, তোমার কাছে আইনের বইও দু-এক খানা নেব। আইনও পড়ছি জান ত ? (হাসিয়া) Carrying on everything.

গৌর। আচ্ছা, কাল আসব! Good Night (প্রস্থান)

মধু। Good Night. (পণ্ডিতদের প্রতি) বসুন আপনারা—

পণ্ডিতগণ তিনকোণে তিনটি টেবিলে গিয়া বসিয়া ছিলেন। মধুসূদন একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রথম পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

আপনি কৃষ্ণকুমারী লিখছেন, না? কতদূর হয়েছে দেখি! (দেখিলেন) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হয়েছে—না? that's all right!

দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকটে গেলেন

ব্রজাঙ্গনার 'ময়ূরী' কবিতাটা কাল শেষ হয় নি! মাত্র গোড়াটা সুরু করেছিলাম। পড়ুন ত—

২য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা, কে না ভালবাসে রাধিকা-রমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী বিহঙ্গিনি!

মধুসূদন সিগারেটটাতে দু-একটা টান দিলেন। তাহার পর তৃতীয় পণ্ডিতের নিকট গেলেন

মধু। মেঘনাদ কতটা হয়েছে ?

তৃতীয় পণ্ডিত। ভগ্নদূত এসে রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

মধু। শেষের কয়েক লাইন পড়ুন ত!

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িলেন)

এতেক কহিয়া রাজা দূতপানে চাহি
আদেশিলা—কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?

মধু। দেখি—

দেখিলেন ও পাতা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে হস্তনিবদ্ধ করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রথম পণ্ডিতের কাছে গেলেন।

লিখুন!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ

সম্মুখে দেবালয়

দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা

হয়েছে লেখা ?

১ম পণ্ডিত। দাঁড়ান—হয়েছে—মদনিকা

মধু। লিখুন তাহলে এবার—মদনিকা বলছে—আর কেন সখি! চল এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেব-দর্শনের ছলে এখানে এসেছি—আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি! নেপথ্যে—রণবাদ্য! লিখেছেন ?

১ম পণ্ডিত। হ্যাঁ—নেপথ্যে রণবাদ্য।

মধু। লিখুন—বিলাসবতী এবার বলছেন—ঐ শোন লো শোন! মহারাজ বুঝি ফিরে আসছেন। মদনিকা উত্তরে বলছেন—

পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া থামিতে বলিলেন

Oh, you are slow, pundit! হয়েছে? লিখুন মদনিকা বলছেন—তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি কে আসছে ?

আবার কিছুক্ষণ পদচারণ

লিখুন। বিলাসবতী। সখি আমি চক্ষের জলে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ—আমি ত কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না!

মদনিকা। এখন ভাই কাঁদলে আর কি হবে। ওই দেখ মন্ত্রীমশায় আসছেন। (মন্ত্রীর প্রবেশ)

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মধুসূদন আবার বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকট গিয়া থামিলেন

আপনি আর একবার ময়ূরীটা পড়ুন ত!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (পাঠ)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে　তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী?
আহা কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি, শশী, বিহঙ্গিনি!

মধু কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

—আয় পাখি আমরা দু'জনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে
নবীন নীরদে প্রাণ　তুই করেছিস্ দান
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকা-রঞ্জনে
তুই ভাবঘনে ধনি আমি শ্রীমাধবে।

দ্বিতীয় পণ্ডিত লিখিতে লাগিলেন ও মধুসূদন আবার পদচারণা সুরু করিলেন। সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন

ইন্দ্রের আর একটী নাম—শক্র, না?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। লিখুন—

কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু　রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পরে তরুবর?

মধু। মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) এইবার আপনার পালা! পড়ুন ত খানিকটা! একটু আগের থেকে পড়ুন! Just create the atmosphere.

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি—
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী—
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে!

মধু। চুপ করুন। ঠিক পড়া হচ্ছে না আপনার—

আর একটা সিগারেট ধরাইলেন ও টেবিল হইতে মিল্টনখানা তুলিয়া লইয়া খানিকক্ষণ নীরবে পড়িলেন। তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া পদচারণ করিতে সুরু করিলেন। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হাতীর কি কি প্রতিশব্দ জানেন বলুন ত! তিলোত্তমাতে ব্যবহার করেছি অনেক কথা—মনে থাকে না সব!

তৃতীয় পণ্ডিত। হাতীর? হস্তী, করী, গজ, মাতঙ্গ, বারণ।

মধু। I think there is another good word.

তৃতীয় পণ্ডিত। কুঞ্জর।

মধু। That's the word—কুঞ্জর। আচ্ছা বজ্র শব্দের কয়েকটা বলুন ত—

তৃতীয় পণ্ডিত। বজ্র, কুলিশ, দাঁড়ান অভিধানটা দেখি —(অভিধান দেখিলেন) ইরম্মদ—

মধু। (উদ্দীপিত হইয়া) yes, I want ইরম্মদ—সুন্দর কথাটা।

আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া

এইবার লিখুন—

প্রণমি রাজেন্দ্র পদে করযুগ যুড়ি
আরম্ভিলা ভগ্নদূত—হায়, লঙ্কাপতি
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
মদকল করী যথা পশে নলবনে

তৃতীয় পণ্ডিত। মদকল শব্দের অর্থই মত্ত হস্তী—আবার করী কেন?

মধু। যা বলছি লিখে যান—

মদকল করী যথা পশে নলবনে

পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে!
শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে: জলধির কল্লোলে: দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব ছুটিতে পবন
—পথে;

ধনুকের ভাল বাঙলা কি! বেশ গালভরা একটা শব্দ বলুন ত! There is a word.

তৃতীয় পণ্ডিত। দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(দেখিলেন) কোদণ্ড?

মধু। কোদণ্ড, কোদণ্ড! লিখুন।

কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।

মধু। শরের কতকগুলো প্রতিশব্দ দেখুন ত।

তৃতীয় পণ্ডিত। শর, তীর, বান, কলম্ব—

মধু। good—লিখুন—

পদচারণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘনঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে
মেঘদল আসি যেন আবরিল রুষি
গগনে: বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

আবার পিছনদিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া তিনি পদচারণা সুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথম পণ্ডিত হাই তুলিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

প্রথম পণ্ডিত। দত্ত মশায়!

মধু। (হঠাৎ চমকাইয়া) Shut up.—কথা বলেন কেন? কি বলছেন?

প্রথম পণ্ডিত। (ইতস্তত করিয়া) আমাদের বেতন প্রায় তিনমাসের বাকী পড়েছে—যদি কিছু দিতেন আজ ভাল হ'ত!

মধু। তিনমাসের বাকী পড়েছে! বেশ ত পাবেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পাবেন পাবেন ত রোজই শুনছি! আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—

মধু। আপনারা কি মনে করেছেন আমার হাতে টাকা আছে—অথচ দিচ্ছি না?

তৃতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে তা নয়—তিনমাসের হয়ে গেল কি না!

মধু। হাতে টাকা এলেই সব মিটিয়ে দেব—এখন যা করছেন করুন।

(নেপথ্যে) দত্ত মশায় বাড়ী আছেন?

মধু। Damn it—আবার কে এলো!

বাড়ীওলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওলা। ভাড়াটা কবে দেবেন?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওলা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওলা। ঠিক ত?

মধু। ঠিক!

বাড়ীওলা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন সুরু করা যাক। লিখুন। কতদূর হয়েছে?

তৃতীয় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

পিছন হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণ সুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামাজাতীয় লোক একটি প্যাকেটহস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর মেম সাহেব গাউন লায়া—

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। ও, যেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম?

খানসামা। জি হুজুর!

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন্! It will make Henrietta look like a princess! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন্! সুন্দর নয় পণ্ডিত?

প্রথম পণ্ডিত। তাতে আর সন্দেহ কি!

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বকশিস্ লে যাও!

(টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন)

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দে না!

খানসামা। জি হুজুর—

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা! Fine! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি! আজ আর কিছু হবে না! আপনারা আজ যান!

'হেনরিয়েটা' 'হেনরিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন

ক্রমশঃ

জাপানের পথে

যাদুকর পি-সি-সরকার

ওশাকা ও টোকিও

এক মাসকাল জাপানের দক্ষিণাংশের মোজী, সিমোনেশেকী, কোবে, ওশাকা, টাকারাজুকা প্রভৃতি শহরে অতিবাহিত করিয়া আমরা ক্রমেই উত্তর দিকে চলিয়াছি। নাগোয়া, কিওতো, ইয়োকোহামা, নারা, ফুজী প্রভৃতি অঞ্চল শেষ করিয়া অবশেষে জাপানের বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও শহরে যাই।

সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিলাম, জাপান পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। পরমেশ্বর যেন সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন এই প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপটীতে। আয়তনে জাপান দেশ আমাদের বাংলা প্রদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইতে চাহিবে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিতে উহা সমগ্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সৃষ্ট এই জাপান দেশ। ইহার সব বিষয়েই যেন একটু বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

এদেশের গাছ ফলফুলে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফুলে গন্ধ নাই। কুকুর আছে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকে না। শিশুরা কাঁদে না। বাপ মায়ের হাতে মার খাইয়া তাহারা অধোবদন হইয়া থাকে এবং তখন চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়ে কিন্তু কখনও চীৎকার করিয়া ওঠে না। সেখানে একদিনও একটী শৃগাল দেখি নাই (অবশ্য চিড়িয়াখানায় অনেকই দেখিয়াছিলাম।) সুন্দর সুন্দর পাখী যথেষ্টই আছে কিন্তু কোনটাই গান করে না। কি আশ্চর্য্য!

কোবে শহরে যখন আমার যাদুবিদ্যাভিনয় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ জাপানী ঐন্দ্রজালিক টেন কাট্সু ওশাকা শহরের 'নাকা-জা' থিয়েটার হলে সদলবলে অভিনয় করিয়াছিলেন। 'নিচি-নিচি' সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া Japan Tourist Bureau হইতে সমুদয় বিবরণ সঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া আমি টেন কাট্সুর যাদুবিদ্যা দর্শনাভিলাষে ওশাকা রওনা হইলাম। কোবে হইতে ওশাকা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলের মত হইবে এবং আমরা (over-head elongated railway) মাথার উপর দিয়া গামী বিশেষ গতিশীল বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে মাত্র কয়েক মিনিট মধ্যেই ওশাকা শহরে পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে বাসযোগে শহরের অপরপ্রান্তে 'ভোতমবরি' অঞ্চলে 'নাকা-জা' রঙ্গমঞ্চে পৌছান গেল। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে জাপানের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক টেন কাট্‌সুর বিরাট তৈলচিত্রসমূহ শোভা পাইতেছে। বলাবাহুল্য, টেন কাট্‌সুই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর এবং তিনি একজন মহিলা। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম সোকিওকুশাই টেন কাট্‌সু। মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই টেন কাট্‌সু—সমগ্র পৃথিবীময় যাঁহার এত সুনাম। ইঁহার পিতা টেন ইচি যাদুবিদ্যা-জগতের একজন বিশেষ খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত বহুবিধ খেলা বর্ত্তমানের বিংশশতাব্দীর যাদুকর, এমন কি, যাদু-সম্রাটগণও নিজেদের রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করিয়া আমার নাম ও বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। জাপান ও চীনের বড় বড় সংবাদপত্রে আমার বিস্তৃত জীবনকাহিনী সম্বলিত সচিত্র প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছে—কাজেই আমার নিজের তরফ হইতে কিছুই করিতে হইল না। সসম্প্রদায় টেন কাট্‌সু আমাকে তাঁহাদের বহুপ্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাইলেন। টেন কাট্‌সুর যাদুবিদ্যা বাস্তবিকই অতিশয় উচ্চাঙ্গের। বহুবিধ দামী যন্ত্রপাতি সাহায্যে—বিশেষ প্রস্তুত ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চে তাঁহার যাদুবিদ্যাভিনয় হইতেছিল। এস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন



জাপানের যাদুকর সম্মিলনী—মধ্যে উপবিষ্ট 'টেন কাট্‌সু'

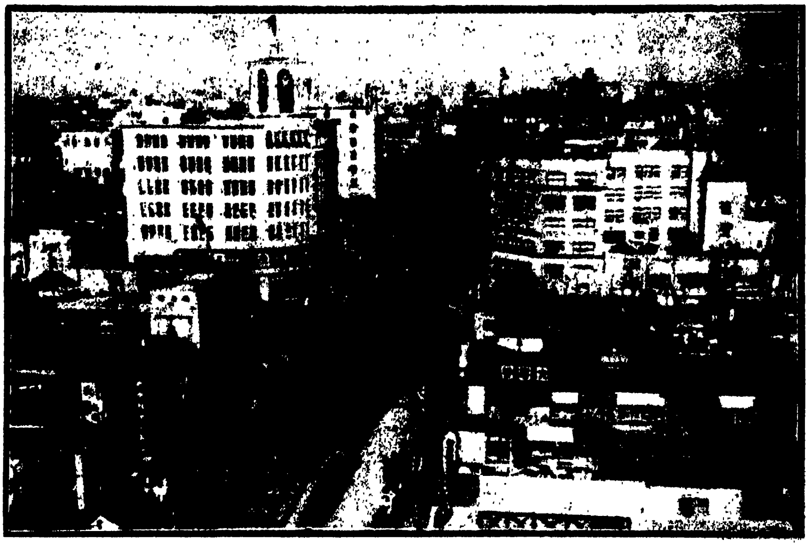
আসিতেছেন। টেন ইচি বহুবিধ নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়া সভ্য শিক্ষিত আমেরিকা ও ইউরোপের জনসমাজে সেগুলির প্রচার করিয়া শুধু জাপানেরই নহে, সমগ্র প্রাচ্য-দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তদীয় কন্যা টেন কাট্‌সুও ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়মাল্য লইয়া আসিয়াছেন।

টেন কাট্‌সু আমার পরিচয় পাইতেই বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে লণ্ডন যাদুকর-সম্মিলনীর পত্রিকাতে ও অপরাপর বহু বিলাতী সংবাদপত্রে

যে, টেন কাট্‌সুর বর্ত্তমান বয়স বাহান্ন বৎসরেরও অধিক। বার্দ্ধক্যবশত তিনি যাদুরঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয়া চব্বিশ বৎসর বয়স্কা কন্যা সোকিওকুশাই টেন কাট্‌সু (জুনিয়ার) নাম লইয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। সাধারণত টেন কাট্‌সু (জুনিয়ার)ই সমস্ত খেলা দেখাইয়া থাকেন—বৃদ্ধা টেন কাট্‌সু প্রত্যহ পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য রঙ্গমঞ্চে আসেন মাত্র। দর্শকগণ ঐ পাঁচ-দশ মিনিটের অভিনয় দর্শনার্থেই পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে। আমার আলাপ পরিচয় ঐ আসল টেন কাট্‌সুর সঙ্গেই হইয়াছিল এবং

আমাকে দেখাইবার জন্য তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টারও অধিক কাল তাঁহার নির্ব্বাচিত যাদুক্রীড়াসমূহ দেখাইলেন। পরে তিনি আমার খেলাগুলিও দেখিলেন। টেন কাট্সু আমার যাদুবিদ্যাভিনয়ে অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছিলেন বলিয়া সেদিন হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। টেন কাট্সু প্রেস-প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি দিলেন, 'যাদু-সম্রাট পি-সি-সরকার (যিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়াছেন)—জাপানে এ পর্য্যন্ত বৈদেশিক যে সব যাদুকর আসিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি টোকিও যাদুকর সম্মিলনীতেও একটী পত্র দিয়া দিলেন—যাহাতে আমাকে সেখানে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। আমি এর পর টোকিওতে গিয়া দেখি যে, রাজধানীময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে—হাজার হাজার বিশেষ গণ্যমান্য জাপানীর উপস্থিতিতে জাপানের যাদুকর-সম্মিলনীর সভাপতি আমাকে তাঁহাদের 'মেডেল' পরাইয়া দিয়া ও একতোড়া টাকা দিয়া তাঁহাদের 'সম্মানিত সদস্য' (hony. member) নির্ব্বাচিত করিলেন। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ভারতীয় সমস্ত সংবাদপত্রেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক টেন কাট্সু যখন আমার যাদুবিদ্যাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন—সেদিন হইতে জাপানে আমার আদর সর্ব্বাধিক।

জাপানের সংবাদপত্রপরিচালনা বড়ই আশ্চর্য্যরকম। সে দেশে শহর সংখ্যা—মফঃস্বল সংখ্যা নাই। যেদিনকার কাগজ সেইদিনই শহরময় ছড়াইয়া পড়ে। সংবাদপত্র-ওয়ালাদের নিজস্ব উড়োজাহাজ আছে—ঐগুলি অতি প্রত্যূষে সংবাদপত্র লইয়া শহরে শহরে বিলি করিয়া দিয়া আসে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ গতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে সংবাদপত্র শহর হইতে শহরান্তরে প্রেরিত হয়। জাপানের 'নিচি-নিচি' নামক দৈনিক সংবাদপত্রখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার দৈনিক প্রচার-সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও অধিক।

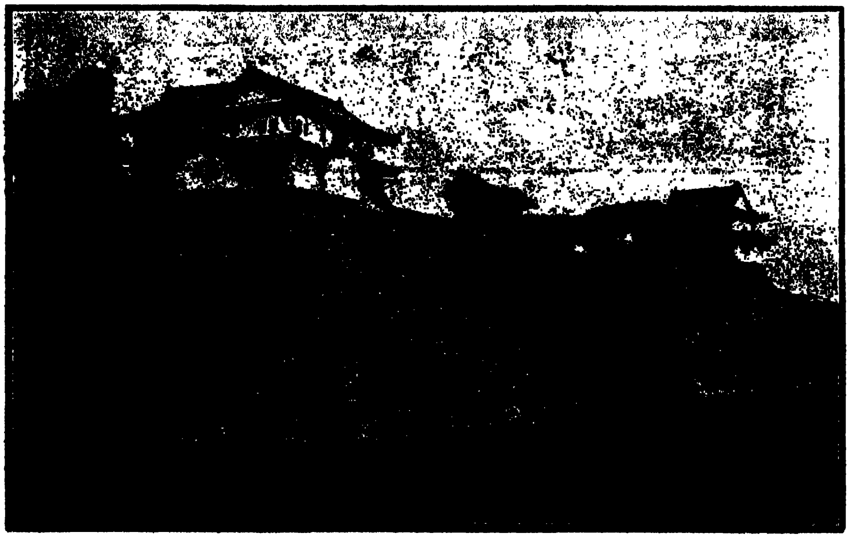


টোকিও শহরের জলযানবহুল জিঞ্জা ষ্ট্রীট



কলিকাতার মনুমেণ্টের ন্যায় জাপানের ওশাকা শহরের সুপ্রসিদ্ধ সুতেনকাচু মনুমেণ্ট

ঐরূপ 'ওশাকা আশাহী' সংবাদপত্রখানিরও প্রচার-সংখ্যা ভারতবর্ষের যে-কোন পত্রিকার প্রচার-সংখ্যার চেয়ে বহু (বহু শত) গুণ বেশী। সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও উহাদের বিশেষ আধুনিক প্রণালীসম্বলিত। লিনো টাইপ, মনো টাইপ, রোটারী মেসিন বাদেও উহাদের রেডিওগ্রাফ, টেলিফটো সার্ভিস প্রভৃতি আছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদবাহী কবুতর সাহায্যেও তাহারা বহু সংবাদ জুটাইয়া থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ নানাবিধ ফটোচিত্র গ্রহণ করিয়া উহার ফিল্মনেগেটিভ কবুতরের পাখায় বাঁধিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেয়—সাংবাদিক কবুতরগুলি খবরের কাগজ অফিসে (বহু শত মাইল দূরে) ঐ বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসে। সাধারণ



ওশাকাস্থিত জাপানের রাজবাড়ী

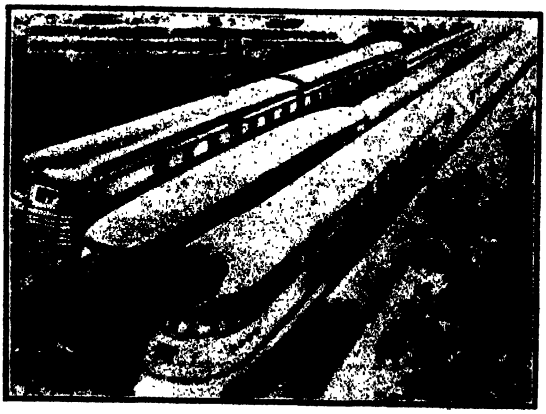
মানুষের পক্ষে হয়ত ঐ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা হইত না। সমুদ্রবক্ষে কোন জাহাজ বিপন্ন হইলে তাহাদের বিবরণ ও আলোকচিত্র ঐ সংবাদবাহী পারাবত বহন করিয়া আনিয়া দেয়।

জাপানে স্কুলের ছেলেরা ইউনিফর্ম্ম পোষাক পরে এবং মিলিটারী প্রথায় চলাফেরা করে। তাহাদের চলার এবং কথা কহিবার কায়দা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনে তেজ কতদূর। রাস্তায় উহারা কখনও মারামারি ও হুড়াহুড়ি করে না। এ দেশে স্কুল ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেরূপ গণ্ডগোল করিয়া বাহির হইয়া হৈ হৈ শব্দে পথ চলিতে থাকে, উহাদের মধ্যে ঐরূপ প্রথা নাই। তাহাদের মধ্যে ধৈর্য্য ও সংযমের বাঁধটা

খুবই বেশী। উহারা আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের পরমভক্ত। একবার অষ্টম এডোয়ার্ড (যখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ছিলেন) জাপান ভ্রমণে গিয়া সখ করিয়া রিক্সা টানিয়াছিলেন। জাপানে সেই রিক্সাবাহক প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-এর বিরাট তৈলচিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহারা বলে, খুব ভাল রাজা, আসল রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড। (Very good king, real king—King Edward the Eighth) তাঁহারা ঘরে ঘরে সম্রাট এডোয়ার্ড ও মিসেস সিমসনের ফটো রাখিয়াছে। সখে পড়িয়া নহে—তাঁহার রাজোচিত গুণে মুগ্ধ হইয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করে বলিয়া। যেদিন আইনের কঠোর শাসনে পড়িয়া এই রাজা প্রেমের বেদীমূলে তাঁহার সিংহাসন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেদিন সমস্ত জাপানী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, সরল প্রাণা গেইসাদল হয়ত বা অন্তরালে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা ম্যাজিক প্রসঙ্গ উঠিলেই বলে, 'Ex-King Edward is a very good magician'. ইতিপূর্ব্বে আমি জানিতামই না যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড একজন চতুর যাদুকর। জাপানের যাদুকরগণই সর্ব্বপ্রথম ঐ রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করে। তাহারা প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্‌কে কতকগুলি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ক্রীড়া দেখাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। প্রিন্স নাকি তৎকালে টাকা, পয়সা, সিগারেট, ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা প্রভৃতি দ্বারা অতি চমৎকার হাত সাফাই করিতে পারিতেন। কিছুদিন পরে এদেশে ফিরিয়া আসিবার পথে সিঙ্গাপুরের মালয়ার ম্যাজিক মার্কেলে জানিতে পারি যে, ডিউক-অব-উইণ্ডসর একজন অতিশয় প্রতিভাবান যাদুকর। তৎপর ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর অন্যতম সভাপতি জে সি ক্যানেল লিখিত ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের যাদুবিদ্যা

জীবনের একটা বিস্তৃত কাহিনী পাই। তিনি বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরদের শিষ্যত্ব করিয়া বর্ত্তমানে বহু অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী। তিনি নাকি অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী যাদুকরকেও পরাস্ত করিয়াছেন। ইয়োকোহামা ও টোকিওতে লক্ষ্য করিলাম প্রত্যেকেই, আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ঐ বৎসরই জাপানীদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৬০০তম উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যেও তাহারা একটী বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিবার বাসনা করিয়াছে। তখন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে, কিন্তু এই তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাহাদের সাজ সাজ ভাব আরম্ভ হইয়াছে। কিমোনো ডিজাইন, স্কুলের ছেলেদের ইউনিফর্ম্মের ডিজাইন সকলের উপরই অলিম্পিকের পাঁচরঙ্গাচক্রের প্রতীক শোভা পাইতেছে। নূতন দালানকোঠার পরিকল্পনা, প্রচারার্থ পত্রিকার পরিকল্পনা—সকলই চলিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক উৎসবের সদস্যগণ একটী জরুরী সভা আহ্বান করিয়া আমার যাদুবিদ্যার প্রশংসা করিয়া আগামী অলিম্পিক উৎসবে যোগদানের জন্য যথারীতি নিমন্ত্রণও করিয়া ফেলিলেন। ফেরার পথে দেখিলাম, বহু পুরাতন বাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নূতন পরিকল্পনার নূতন মূর্ত্তিতে সব অট্টালিকা গড়িয়া উঠিতেছে।

জাপান নবীনতার পূজারী। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া তিল তিল করিয়া নূতন সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া তাহারা তাহাদের দেশকে নূতন তিলোত্তমা করিয়া গড়িতে ব্যস্ত। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সমগ্র টোকিও শহর ধূলায় পরিণত হয়। কিন্তু উহাতে জাপানের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হইয়াছে বেশী। শহরের পুনরায় নির্ম্মাণের সময় আধুনিকতম রূপ ও ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহরসমূহের অনুকরণ করিয়া আজ নূতন রাজধানী টোকিও বর্ত্তমান। সেই ভূমিকম্পের ফলেই টোকিও আজ এত বিরাট—এত সমৃদ্ধ ও এত নয়নাভিরাম। আজ টোকিও আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় মহানগরী। এই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরিই জাপানকে আজ এত বড় এবং এত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ভূমিকম্পের



ফুজিয়ামাগামী বিশেষ গতিশীল বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী

জন্য তাহারা সব কিছুই নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে—মৃত্যুকে তাহারা ভয় করে না। মৃত্যুকে খেলার সাথী করিয়া লইয়া গৌরবকে তাহারা উচ্চে স্থান দিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয় প্রতি বৎসর তাহারা দলে দলে এত পেট কাটিয়া



উৎসবে নৃত্যরতা জাপানী তরুণী

আত্মহত্যা 'হারিকিরি' করিতে সক্ষম হয়। আগ্নেয়গিরির জন্য সেদেশে খনিজ পদার্থ খুব বেশী, কয়লার খনির খোঁজ করিতে করিতে তাহারা বাহির করিয়া ফেলিল গন্ধক, তামা প্রভৃতি, যেগুলি যুদ্ধযাত্রায় প্রধানতম উপকরণ। আগ্নেয়-

গিরি ও ভূমিকম্পনের আধিক্য হেতু সে-দেশ নদী-নালা-প্রস্রবণ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। সেখানে জলের ঝরণা ও জল-প্রপাতের সাহায্যে (Hydro-electric scheme) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় বলিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য জাপানের সামান্য পাড়াগ্রামেও ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, হিটার, টেলিফোন প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। সে-দেশে একবার ফোন করিবার খরচ মাত্র এক পয়সা আর কলিকাতায় শহরের এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর খরচ প্রতিবারে দুই আনা; দুই-তিন পয়সা ইউনিট খরচে সেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জলে। যে দেশে ইলেকট্রিক খরচ এত সস্তা, সে দেশের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য অপর দেশ অপেক্ষা সস্তা হইবে

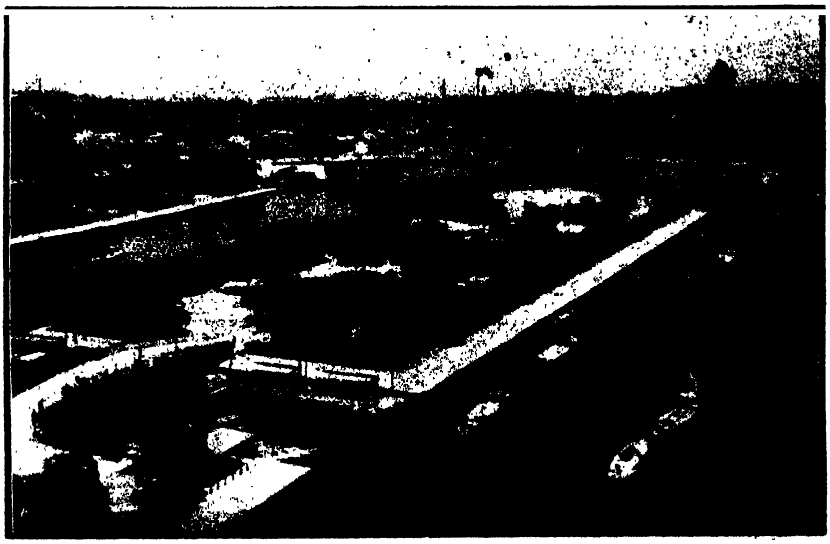


জাপানে ভারতীয় কৃষ্টি (বুদ্ধমূর্ত্তি)

তাহাতে বিচিত্র কি? তাহারা ঐ সস্তা বিদ্যুৎ পাইয়াই সন্তুষ্ট নয়, তাহাদের মনে আন্তরিক আগ্রহ ও ইচ্ছা, যে-কোন উপায়ে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করিব, উন্নত করিব—'জাপানী আমরা মানুষের মত মানুষ হইব।' ইহা লইয়াই তাহারা প্রাণপাত করিতেছে। এই জন্যই সে-দেশে আজ চোর নাই। প্রতিবেশী চীনাদের মধ্যে কতরূপ অসভ্য গালি দেওয়ার ভাষা বিদ্যমান—এমন কি, সভ্য শিক্ষিত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজও উহার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কিন্তু জাপান এই প্রত্যেকটী জাতির অতিশয় ঘন সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের সর্ব্বব্যাপার অনুকরণ করিয়াও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। জাপানী ভাষায় অসভ্য গালি দিবার কোন কথা নাই। ইহা উহাদের নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কতটা নির্দ্দেশ করে।

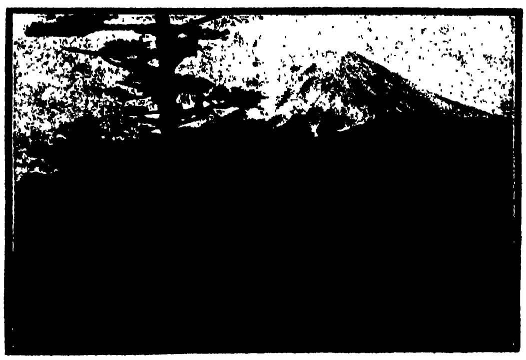
বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেডিও (radio broadcasting) আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করে। জাপানও উহাকে নিজেদের দেশে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তৎকালে রেডিও শ্রোতাদিগকে মাসিক দুই ইয়েন ভাড়া দিতে হইত। কিন্তু তৎপরেই সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা বিশেষ আদৃত হয় বলিয়া ভাড়া ক্রমে ক্রমে অল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাদের হিসাবে দেখিলাম প্রথম ১০,০০,০০০ সংখ্যক শ্রোতার জন্য তাহাদের সাত বৎসর সময় লাগে, তৎপর আরও ১০,০০,০০০ বৃদ্ধি পাইতে লাগিয়াছিল মাত্র তিন বৎসর। বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, মোট রেডিওর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭,৭৬,১৮৯ অর্থাৎ প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে ৩৯৯টী রেডিও বিদ্যমান। বর্ত্তমানে জাপানে প্রত্যেক পাঁচটা পরিবারের মধ্যে একটীতে রেডিও আছে এবং একটী রেডিও রাখার মাসিক খরচ মাত্র পঞ্চাশ সেন অর্থাৎ ছয় আনা। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে বোধ হয় এত সস্তায় রেডিও পাওয়া যায় না। উহাদের প্রোগ্রামেও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের চিত্তবিনোদন, দেশের জনসমাজের উপকার করাই উহাদের প্রকৃত লক্ষ্য। উহারা নিজেদের সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে এইভাবে বিভক্ত করে,—(১) সংবাদ (Information) অর্থাৎ যাহাতে সংবাদ, আবহাওয়া, বাজার দর, গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি জানান হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টাকাল Employment Agency News বিজ্ঞাপিত করা হয়, ৬-৫৫ মিনিট হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষায় দিনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি টোকিও সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে জানান হয়। (২) Talks, এই বিভাগে বিশেষ চলতি ব্যাপার, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতা হয়। ইহাতে আবার

মেয়েদের জন্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় দুই ভাগ করিয়া রাখা হয়। (৩) Children's Hour, প্রত্যহ ২৫ মিনিটকাল ছোট ছোট শিশুদের জন্য নানারূপ চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। (৪) School broadcasting, ইহা বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পুঁথিগত বিদ্যার বাহিরেও যে সব বিষয় জানিবার প্রয়োজন তাহাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়। (৫) Outside broadcasting, এই সময়ে রেডিওর শ্রোতারা বিদেশের রেডিও ষ্টেশন প্রেরিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে। (৬) সর্ব্বশেষে Music, Entertainment. এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বেলা দুইটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত জাপান হইতে (short wave) রেডিও সংবাদ বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহা overseas broadcast নামে খ্যাত। ঐ সময়ে ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় জাপানের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি, সেদিনকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি, জাপানের নিজস্ব বাণী পৃথিবীময় জানান হয়। বলাবাহুল্য, জাপানের এই overseas broadcast বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। উহাদের বেতার টেলিফোন (wireless telephone) বিভাগটী গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আছে। বেতার টেলিগ্রাম (wireless telegraphy) বিভাগও গভর্ণমেণ্টের আংশিক কর্তৃত্বাধীনে আছে, তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে communication minister-এর সহায়তায় সাধারণের ব্যবহারে আনা যায়।



জাপানের দুইটি নদীর মধ্যস্থলে মনোরম উদ্যান

জাপানে বাইসাইকেলের প্রচলন খুবই বেশী। উহাদের ন্যায় ওস্তাদ সাইকেল চালক আমি ইতিপূর্ব্বে আর কোথায়ও দেখি নাই। সার্কাস অভিনেতার ন্যায় উহাদিগকে প্রায়ই ভারকেন্দ্রের কঠিনতম পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। ইয়োকোহামাতে দেখিয়াছি, সাইকেলে আরোহী নিজে বাদেও সম্মুখে পিছনে আরও দুই তিন জন লইয়া অক্লেশে গ্লাস ভর্ত্তি সরবৎ লইয়া যাইতেছে। সাইকেলের পিছনে বিরাট মোট বাঁধিয়া—একহাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিল ও অপর হাতে তরকারির বোঝা—এ দৃশ্যও প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ট্রাম, বাস প্রভৃতি জনযানবহুল রাস্তায় ঐরূপ যাতায়াত করা কম কথা নহে। ওদেশে মোটর (taxi) খুবই সস্তা। গাড়ীগুলির রং কলিকাতার ট্যাক্সির ন্যায় অদ্ভুত লাল রংয়ের নহে—সবগুলিই private car-এর ন্যায় এবং নূতন। দেখিলে মনে



জাপানের পৃথিবী বিখ্যাত পর্ব্বত ফুজিয়ামা

হয় যে, সবেমাত্র যেন কারখানা হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে অতিশয় জীর্ণ ও কদাকার মোটর দৃষ্ট হয়—জাপানে অনুরূপ মোটরগাড়ী বা রিক্সা আমি কুত্রাপি দেখি নাই। ভাড়াও অতিশয় কম। মাত্র ছয়

আনা ভাড়া দিয়া আমরা পাঁচ-ছয় মাইল কখনও আট-নয় মাইল বেড়াইতাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলি অতিশয় ভদ্র ও বিনয়ী এবং অনেক স্থলে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। কোবে অবস্থান কালে মাঝে মাঝে আনন্দমোহন সহায় মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়া লজে' বেড়াইতে যাইতাম। 'ইণ্ডিয়া লজে'র ঠিকানা ছিল কমিৎ-স্যুৎ-স্যুঃ-ডোরি। এই নামটা আমাদের মনে থাকিত না—আমরা গাড়ীতে উঠিয়াই বলিতাম commit-suicide—'দড়ি', ট্যাক্সী চালক হাসিয়া বুঝিয়া ফেলিত এবং আমাদিগকে 'ইণ্ডিয়া লজে' লইয়া যাইত।

জাপানী হোটেলের আদব কায়দা সবই পৃথক। সখে পড়িয়া একবার একটা জাপানী হোটেলে উঠিয়াছিলাম। প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিবামাত্র কুলী আসিয়া মালপত্র নামাইয়া



জাপানের প্রসিদ্ধ পুতুল নাচ

লইয়া গেল এবং হোটেল ম্যানেজার বা মালিক আসিয়া নমস্কার জানাইল। সেখানে নিজের পরিহিত জুতা পরিবর্ত্তন করিয়া স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। উপরে গিয়া দেখি, কোনরূপ খাটপালঙ্ক নাই—সমস্ত মেঝে পুরু মাদুর দ্বারা আবৃত। এই মাদুরকে উহারা টাটামী বলে। ঐ টাটামীর উপর যাহাতে অক্লেশে যাতায়াত করা যায় সেইজন্য তুলার সোলযুক্ত আর একজোড়া চটিজুতা দেওয়া হইল। সেই মেঝের উপর পাঁচ-ছয় প্রস্থ পুরু তোষক পাতিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া হইল' উহাই বিছানা। খাইবার জন্য আট ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু একটা টেবিল ও তাহাতে কিছু কাঠি ও বাটী আসিল। ভাত (গোহান), জল (মিজু)—সবই আসিল কিন্তু আমাদের তৃপ্তিমত খাওয়া হইল না। দেওয়ালের একদিকে বুদ্ধমূর্ত্তি আঁকা আছে। সেই-স্থান উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধগণ ইচ্ছা হইলে ঐখানে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' করে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পৃথিবীর এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা ওদেশে প্রচারিত হয় নাই। উহারা ধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখে নাই। কাহাকেও ধর্ম্মের গোড়ামি করিতে দেখা যায় নাই—তাহারা জানে, তাহাদের ধর্ম্ম দেশসেবা, রাজভক্তি। দেশকেই তাহারা বড় বলিয়া জানিয়াছে এবং দেশের উন্নতি লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। সে দেশে একই পিতার এক পুত্র খৃষ্টান, এক পুত্র বৌদ্ধ এবং অপর পুত্র মুসলমান—এই লইয়া সুখে ঘর করিতেছে। সেখানে মসজিদের নিকট কামানের শব্দ হইলেও নামাজের ব্যাঘাত হইতেছে না। পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও হীন স্বার্থান্বেষণ তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা বাঁচিতে চায় জাতির জন্য, জন-সমাজের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য, তাহাদের আদরের দেশ—নিপ্পনের জন্য। সে দেশের একজন মন্ত্রীর বেতন আমাদের দেশের একজন সাধারণ রাজকর্ম্মচারীর সমান। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রেরণা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়—তাই আজ তাহারা এত বড়। সেইজন্য জাপান আজ প্রাচ্যজগতে একটী প্রহেলিকা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামান্য বাঙলা দেশের আয়তনের একটী দেশ আজ সেইজন্য সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্য সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী জাতিসমূহ আজ বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে জাপানের কীর্ত্তি দেখিতেছে। বাংলাদেশের সহিত জাপানের তুলনা করিলে স্বতই মনে হয়—

"পাঁচ কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী;
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ ক'রোনি।"

সমাপ্ত

প্রাচী ও প্রতীচী

অতুল দত্ত

(রাষ্ট্রনীতি)

আমরা যদি এই মুহূর্ত্তে দূরনিরীক্ষণশক্তি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বহির্জ্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইব—এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে একটী মদগর্ব্বিত তরুণ জাতি সাম্রাজ্য লোভে তাহার শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে চরম হিংস্রতার সহিত আক্রমণ করিবার পর এক্ষণে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত, অন্য একটী নব-উদ্দীপিত প্রবল প্রতিবেশীর রক্ত চক্ষু তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে। এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে একটী মরুচারী জাতি সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে বিনষ্টসর্ব্বস্ব হইবার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নির্ভীক দুর্দ্দমনীয় এই জাতি যে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নিকট সর্ব্বপ্রকার সামরিক দক্ষতা পরাভব স্বীকার করিতেছে। পশ্চিম ইউরোপে দুই বৎসর পূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে যে ভয়াবহ মারণযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে এখনও সমভাবে মনুষ্য জীবন আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। কবে এই বিরাট যজ্ঞের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। মধ্য ইউরোপে পুঞ্জীভূত বারুদ-স্তূপের পার্শ্বে জ্বলন্তশলাকা হস্তে মদগর্ব্বিত রাজনীতিকদিগের ইতস্তত পদচারণ সমগ্র ইউরোপকে শঙ্কিত করিয়াছে; যে-কোন মুহূর্ত্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণ সমগ্র ইউরোপে প্রবল রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে পারে।

সুদূর-প্রাচী

সুদূর প্রাচীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর জুলাই মাসের প্রথমভাগে উত্তর চীনের লুকোচিয়াও নামক স্থানে একটী তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই বিরাট সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘর্ষ যাহাতে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে চীনা কর্ত্তৃপক্ষ কৌশলে জাপানকে সাংহাইতে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। তিন মাসকাল ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিবার পর জাপ-সৈন্য সাংহাই ও তৎসন্নিকটস্থ অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর চীনের তৎকালীন রাজধানী নান্‌কিং অতি অল্পায়াসে জাপানের করতলগত হয়। উত্তর চীনে জাপ-সৈন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া পীত নদী অতিক্রম করে এবং লুংঘাই রেলপথে সুচাও জংসনের নিকটে পৌছায়। এই স্থানে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে বিরাট সমরায়োজন করিয়াছিলেন; জাপ-সৈন্যের অগ্রগতি এখানে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জাপ-সৈন্য তিলমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না; এমন কি, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় উত্তর চীনে দারুণ প্লাবনে জাপ-সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর, তাহারা চীনের বর্ত্তমান রাজধানী হাঙ্কাও লক্ষ্য করিয়া ইয়াংসী নদীর উপত্যকা-পথে অগ্রসর হইতেছে। যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, জাপ-সৈন্য কিউ-কিয়াং অধিকার করিয়াছে; প্রায় প্রত্যহ জাপানী বিমানপোত হইতে হাঙ্কাওয়ে বোমা বর্ষণ চলিতেছে।

চীন-যুদ্ধের গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই মনে হইবে, জাপান যে আশায় বুক বাঁধিয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। জাপান মনে করিয়াছিল যে, চীনের উপকূলভাগ অবরোধ করিয়া দুর্ব্বল চীনকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে বহির্জ্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ হইয়া সে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু কাৰ্য্যত যাহা ঘটিল, তাহা জাপানের স্বপ্নের অতীত। জাপানের সহিত সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবামাত্র চীনের বিবদমান দলগুলি আপনাদিগের বিরোধ ভুলিয়া মাতৃভূমির গৌরব রক্ষার্থ একতাবদ্ধ হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান যে নৃশংসতা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন দেশে জাপ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। বিশেষত চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের চির-বিরোধী কম্যুনিষ্ট দল, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইয়া সুদূর প্রাচীর এই যুদ্ধে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। কম্যুনিষ্টগণ সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে গণ-সংযোগের আবশ্যকতা বুঝাইল। তাহারা উত্তর চীনের প্রতি গ্রামে, প্রতি জনপদে কৃষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারকাৰ্য্য আরম্ভ করিল। তাহাদিগের চেষ্টায় চীনের কৃষকগণ সর্ব্বতোভাবে চীনাবাহিনীকে সাহায্য করিতে লাগিল; সত্বর তাহাদিগের মধ্যে একটী অৰ্দ্ধ-সামরিক বাহিনী গঠিত হইল। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর গরিলা যুদ্ধে উত্তর চীনে জাপ-সৈন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, উত্তর চীনের বহু জাপ-অধিকৃত স্থান কম্যুনিষ্ট বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। উত্তর স্যান্‌টাঙ্গ প্রদেশে প্রধানত গরিলা যোদ্ধা এবং চীনা কৃষকবাহিনীর সহযোগিতায় চীনা সৈন্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নান্‌কিং হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে চীনের পক্ষে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। কম্যুনিষ্টগণ পূর্ব্ব হইতে গণ-সংযোগের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন; এই সময় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হন। এই সময় জেনারেল চু-তের নেতৃত্বে অষ্টম রুট্ আর্ম্মি উত্তর চীনের কৃষকদিগের মধ্যে শুধু প্রচারকাৰ্য্যই আরম্ভ করিল না, তাহাদিগকে অস্ত্র প্রদান করিয়া একটী অৰ্দ্ধ-সামরিক বাহিনী গঠন করিল। তখন হইতে কৃষকগণ খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করিয়া, পথ ঘাট বন্ধ করিয়া, কূপের জলে বিষ মিশ্রিত করিয়া আক্রমণকারীকে বিপন্ন করিতে সচেষ্ট হয়।

অর্দ্ধ-সামরিক কৃষকবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে অবস্থান করিয়া যুদ্ধে রত সৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতে থাকে। নান্‌কিং হস্তচ্যুত হইবার পর হইতেই চীনে কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম্যুনিষ্টদিগের চেষ্টায় চীনের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে প্রবল জাগরণ আসিয়াছে, ইহাই জাপানের পক্ষে কাল হইয়াছে। আজ চীনের কৃষকগণ কেবল তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নহে, তাহাদের নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সামরিক শক্তিও তাহারা লাভ করিয়াছে। আজ চীন যদি সম্মুখ-যুদ্ধে জাপানের নিকট পরাজিতও হয়, তাহা হইলেও পর্ব্বতে, জঙ্গলে, গিরিকন্দরে চীনের গরিলা যোদ্ধা, চীনের কৃষক, চীনের ছাত্রছাত্রী যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

নান্‌কিং অধিকার করিবার পর জাপানী সৈন্য বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিলেও তাহাদিগের অগ্রগতি প্রতি পদে প্রবলভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে চীনা সৈন্য কেবল শত্রুকে বাধা দান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল; এই সময় হইতে তাহারা প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হয় এবং কতকগুলি হৃত স্থান পুনরায় হস্তগত করে। বিশেষত এই সময় হইতে চীন বিপুল ভাবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে; হংকং-এর পথে বহু সমরোপকরণ চীনে প্রবেশ করিতেছে; বিভিন্ন দেশের বহু স্বেচ্ছা-সৈন্য, চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারিণী চীনের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। সর্ব্বোপরি রুশিয়ার সহায়তা। রুশিয়া পূর্ব্ব হইতেই চীনকে সাহায্য করিতেছিল; এই সময় ডাঃ সান্‌-ইয়াৎ সেনের পুত্র ডাঃ সুন্‌-ফো মস্কৌতে গমন করিয়া রুশিয়া হইতে নিয়মিত সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে শত শত রুশ বিমানপোত এবং বৈমানিক সৈন্য চীনের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে।

সুদূর-প্রাচীর এই যুদ্ধ সম্পর্কে রুশিয়ার মনোভাব একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। রুশিয়া সুদূর-প্রাচীর এই যুদ্ধের গতি প্রথম হইতে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। জাপানের সহিত রুশিয়ার অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ ব্যতীতও জাপান সম্পর্কে রুশিয়া চিরদিন সচেতন। রুশিয়া জানে, জাপান কম্যুনিষ্ট তথা সোভিয়েট রুশিয়ার চরম শত্রু; অল্প দিন পূর্ব্বে সে জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া কমিণ্টার্ন অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সমিতির প্রধান পরিপোষক। এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র মস্কৌতে। সোভিয়েট রুশিয়া জানে, চীনে যদি জাপানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এই জন্য সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর চীনের পক্ষ হইতে সাহায্যের আবেদন রুশিয়া আন্তরিকতার সহিত পূরণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সুদূর-প্রাচীতে বিরাট সমরায়োজন করিয়া সে জাপানকে মাঞ্চুকোতে তিন লক্ষ সৈন্য মজুত রাখিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, মাঞ্চুকো-সীমান্তে সোভিয়েট বাহিনীর সহিত জাপ-সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে এই সঙ্ঘর্ষকে সীমান্তের নগণ্য ঘটনা (minor incident) বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এক্ষণে উহা ক্রমেই ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। জাপানের পক্ষ হইতে মস্কৌতে মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব লিট্‌ভিনফ্‌ এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে সকল অপরাধ জাপানের স্কন্ধে চাপাইয়া বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে একজন জাপ-সৈন্যও থাকিবে, ততদিন কোনপ্রকার মীমাংসা হইবে না। এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে দোষ কাহার, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না—উভয়েই পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছে। তবে এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে একটা কথা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সুর এবার বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং জাপানের সুর একেবারে নামিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্ঘর্ষ সীমান্ত অঞ্চলেই আবদ্ধ থাকিবে, না, ক্রমেই উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সোভিয়েট রুশিয়া সুদূর প্রাচীতে সমরায়োজন করিয়া জাপানের তিন লক্ষ সৈন্যকে মাঞ্চুকোতে প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। এক্ষণে জাপানী সৈন্য হাঙ্কাও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; হাঙ্কাওর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান অধিকারও করিয়াছে। কাজেই, এক্ষণে সীমান্ত অঞ্চলে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত করিয়া হাঙ্কাওর উপর জাপানী সৈন্যের আক্রমণের বেগ হ্রাস করিতে সচেষ্ট হওয়া রুশিয়ার পক্ষে অসম্ভব নহে। অবশ্য, এই সঙ্ঘর্ষের সূত্র অবলম্বন করিয়া রুশিয়া জাপানকে চরম আঘাত করিতে চাহিতেছে কি না, তাহাও বলা যায় না। জাপানকে আঘাত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সুযোগ; রুশিয়া এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া আজ এই সুবর্ণ সুযোগ অবলম্বন করিতেছে কি না, কে বলিবে? জাপান আজ চীন যুদ্ধে বিব্রত, এমন কি, বিপন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কমিণ্টার্ণ-বিরোধী মিত্রদ্বয়ের মধ্যে ইটালী স্পেনের গৃহ-দ্বন্দ্বের তন্তুতে আপনাকে বিজড়িত করিয়াছে। ইহা হইতে সে শীঘ্র মুক্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। জার্ম্মানী মধ্য ইউরোপের সমস্যায় বিব্রত; সদ্যকুক্ষিগত অষ্ট্রীয়াকে সে এখনও পরিপাক করিতে পারে নাই। কাজেই, এক্ষণে এই দুইটী শক্তির পক্ষে তাহাদের সুদূর প্রাচীর কমিণ্টার্ন-বিরোধী মৈত্রের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। জার্ম্মানী যদিও জাপানের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছে যে, সে তাহাকে নৈতিক এবং 'অন্যান্য উপায়ে' সমর্থন করিবে, তবুও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মানীর পক্ষে জাপানকে নৈতিক সমর্থন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সমর্থন করা সম্ভব নহে।

অদূর-প্রাচী

প্যালেষ্টাইনের মরুচারী আরব জাতির বিদ্রোহ আজ তিন বৎসর ধরিয়া সমান গতিতে চলিতেছে। পাকা সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন্—বাঙলা ও আয়র্লণ্ডের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ বৃটেন্—তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশল উজাড় করিয়াও এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি পীল-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত কতকগুলি "টেক্‌নিক্যাল্‌"

বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্ত উড্‌হেডের নেতৃত্বে আর একটী কমিশন প্যালেষ্টাইনে গমন করিয়াছিল। এই সময় আরবদিগের সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রত্যহ বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, গুপ্তহত্যা, অতর্কিত আক্রমণ প্রভৃতি চলিতে থাকে। বিশেষত উত্তর প্যালেষ্টাইনের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে; হাইফা এবং জেরুজালেমের অবস্থা অত্যন্ত সঙীন হইয়া ওঠে।

প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম বলিতে হইবে যে, আরবদিগের এই সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য ভারতবাসী কখনও সমর্থন করিবে না। আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে হিংসানীতি বর্জ্জন করিয়া অহিংস মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি, হিংসা-নীতির সাহায্যে যদি বিজয়লাভ সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা কখনও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই, আমরা বলিব, প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সর্ব্বতোভাবে মহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও আমরা তাহাদিগের অবলম্বিত নীতিকে কোন ক্রমেই সমর্থন করি না।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কিরূপ তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। গত মহাযুদ্ধের সময় আরবদিগকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরে সেই প্রতিশ্রুতি কিরূপে ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। পীল-কমিশন আরবদিগের দাবী সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্যালেষ্টাইনকে ত্রিধা বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পীল-কমিশনের সুপারিশগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সুপারিশে অদূর-প্রাচীতে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই হইয়াছে—আরবদিগের দাবী পূর্ণ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। পীল্-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা আরবদিগের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য বৃটেন্ একরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে। অধুনা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বৃটীশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈঠকখানায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বৃটেনের ইচ্ছা পূরণের পথে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। কিছুদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের "ম্যাণ্ডেটস্ কমিশন" পীল্-কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথাটি সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। বৃটেন্ যদিও প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তাহার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবুও সে এই বিষয়ে অত্যন্ত ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। যেখানে আপনার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় বিঘ্ন উপস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে ধীরতা অবলম্বন করা বৃটেনের চিরন্তন নীতি। আজ ভারতবর্ষে যুক্ত-রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বৃটেন্ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে, যুক্ত-রাষ্ট্র সম্পর্কে কিরূপ প্রবল মনোভাব ভারতবর্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সে জানে। প্যালেষ্টাইনে আরবদিগের আন্দোলন দমন করিবার জন্য বৃটেন্ সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, পীল্-কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে সমগ্র জগতে যে মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যও সে সচেষ্ট হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কমিশন, কমিটী, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির অজুহাতে সে কালহরণ করিতেছে। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামায় ইটালীর গোপন হস্ত কার্য্য করিতেছিল, ইহা মনে করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। বৃটেন্ ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ইটালীকে নিরপেক্ষ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ইহুদীদিগের দুর্ভাগ্যের কথা স্বতই মনে হয়। এই স্বদেশ তাড়িত গৃহহারা জাতিটী আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তাহাদিগের জন্য প্যালেষ্টাইন্‌কে "ন্যাশন্যাল হোম্" নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই "ন্যাশন্যাল হোমে" হতভাগ্য ইহুদীগণ শৃগাল কুকুরের ন্যায় প্রাণ হারাইতেছে। বৃটেন্ আজ প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদিগের জন্য বিগলিত-অশ্রু। কিন্তু যাঁহারা বৃটীশ কূটনীতির সহিত পরিচিত, তাঁহারা বুঝেন যে, বৃটেন্ ইহুদীদিগকে শিখণ্ডীস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া আপনার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই দুই বৎসরের গৃহ-যুদ্ধে দশ লক্ষের অধিক স্পেনবাসীর মৃত্যু হইয়াছে এবং স্পেনবাসীর শ্রমার্জ্জিত দুই কোটী পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে স্পেনের ত্রিশটী প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের অধিকারভুক্ত, মাত্র নয়টী প্রদেশ সরকার পক্ষের অধিকারে আছে। কতকগুলি প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে স্বতই মনে হয়, সরকার পক্ষের আর কোন আশা নাই; সত্বর স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষত, স্পেনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ত স্পেনের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নাই —ইহা বস্তুত ফ্যাসিষ্ট ইটালীর প্রকাশ্য আক্রমণে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তবুও আমরা মধ্যে মধ্যে সরকার পক্ষের নেতৃবর্গের নিকট আশার কথা শ্রবণ করি—তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলেন, বিজয় লাভ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ আশান্বিত। এই সেই দিন পণ্ডিত জহরলাল স্পেন পরিভ্রমণের পর যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সরকার পক্ষ এখনও তাঁহাদিগের বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী। যাঁহারা স্পেন যুদ্ধের গতি পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, সরকার পক্ষের নেতৃবর্গের এই সকল উক্তি অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। বিদ্রোহিগণ আজ ত্রিশটী প্রদেশের অধিকারী হইলেও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রিদের উপকণ্ঠে পৌঁছিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদিগের সাফল্য, সময়ের অনুপাতে অত্যন্ত অল্প। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরে এষ্টুরিয়ান্ প্রদেশ বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়াছে। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসের শেষভাগে গিজো বন্দরটী বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইবার পর হইতে উত্তরাঞ্চলে সরকার পক্ষের প্রতিরোধের অবসান হয়। তাহার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো যখন আরাগন উপত্যকায় বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন দারুণ শীত ও তুষার পাতের মধ্যে সরকার পক্ষের অতর্কিত আক্রমণে বিদ্রোহী সৈন্য বিপর্য্যস্ত হয়।

মুসোলিনি তখন দ্বিগুণ উৎসাহে স্পেনে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন ; বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ইটালীয় বিমানপোতগুলিও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সরকার পক্ষের বন্দরগুলির উপর পাশবিক হত্যাকাণ্ড চালাইতে থাকে। ইটালীর এই সহযোগিতা এবং পাশবিকতায় শক্তিলাভ করিয়া ক্যাটালোনিয়া ও ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের সীমান্তের নিকটে কতকগুলি স্থান বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি এব্রো নদীর তীরে সরকার পক্ষের সৈন্য অতর্কিত আক্রমণে বিদ্রোহীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের প্রচারবিভাগের দামামা তাহারাই শুধু একলা বাজায় না—বৃটেন, জার্ম্মানী, ইটালী—সকলেই এই দামামায় দণ্ডাঘাত করে। কাজেই আমরা সকলেই শুনিতেছি, সরকার পক্ষের আর কোন আশা নাই—বিদ্রোহিগণ অতি সত্বর সমগ্র স্পেনের একচ্ছত্র প্রভু হইবে। কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত স্পেন-যুদ্ধে উভয়পক্ষের লাভালাভ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার পাঁচ মাস পরে সরকার পক্ষের যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস যদি সরকার পক্ষের জয়ের আশা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও তাহাদিগের জয়ের আশা আছে। অবশ্য, স্পেন-যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে এবং উহার প্রভাবে স্পেনে কোন অঘটনও ঘটিতে পারে।

স্পেনের ব্যাপারে মহা অসুবিধায় পড়িয়াছে বৃটেন্। মিঃ ইডেন ও তাঁহার সমর্থকদিগের উপর টেক্কা দিবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিতে এই মর্ম্মে একটী সর্ত্ত সংযোজিত হইয়াছে যে, স্পেনের স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ-প্রসঙ্গ মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বে ঐ চুক্তি বলবৎ হইবে না। চুক্তিতে এই সর্ত্তটী যখন সন্নিবদ্ধ হয়, তখন ইটালীর সাহায্যে বিদ্রোহিগণ সরকার পক্ষের সৈন্যকে সাময়িকভাবে বিপন্ন করিয়াছিল। কাজেই, তখন বৃটেন্ ও ইটালী উভয়েরই মনে হইয়াছে, সত্বরই বিদ্রোহীদিগের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এক্ষণে উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিতেছে, "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী"—সরকার পক্ষের সৈন্য কিছুকাল মৃতবৎ অবস্থান করিবার পর অকস্মাৎ যখন বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই "বৈরী" মরে নাই, তাহার হৃদপিণ্ড তখনও ধক্‌ধক্ করিতেছে। ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয়পক্ষই আগ্রহান্বিত। স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবে সরকার পক্ষ বহু পূর্ব্বেই সম্মত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহী পক্ষ আজ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দেয় নাই। শুধু তাহাই নহে, তখনও ইটালীর সৈন্য বিদ্রোহী পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায়ই যোগদান করিতেছে। কাজেই, স্বেচ্ছাসৈন্য 'অপসারণ' সংক্রান্ত প্রস্তাব কবে কার্য্যে পরিণত হইবে, কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে কি-না, তাহা বলা যায় না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হইলে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিও লণ্ডন ও রোমের পররাষ্ট্রীয় দপ্তরখানায় ধূলি ধূসরিত হইবে।

চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যা

চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য লর্ড রান্‌সিম্যান্ মধ্যস্থতা করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সদল বলে প্রাগে গমন করিয়াছেন। কিছুকাল ধরিয়া সিউডেটেন্ জার্ম্মানদিগের দাবী সম্পর্কে চেকোস্লোভেকিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হোজার সহিত ঐ দলের প্রতিনিধিদিগের আলোচনা চলিতেছিল, লর্ড রান্‌সিম্যান্ প্রাগে যাওয়া সত্ত্বেও এই আলোচনা চলিতেছে; উহা বন্ধ হয় নাই। চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের দাবী পূরণের জন্য তিনটী বিল চেক্ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। প্রথম বিলটী বিভিন্ন জাতি সংক্রান্ত (Nationalities Statute), দ্বিতীয়টী ভাষা সংক্রান্ত (the Languages Bill), তৃতীয় বিলটী রাষ্ট্রের পরিচালনা সংক্রান্ত (Bill for the Administrative Reorganisation of the State)। প্রথমোক্ত বিলটীর সর্ত্তগুলি গত জুলাই মাসের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বোহেমিয়া, মোরাভিয়া-সাইলেসিয়া, স্লোভেকিয়া এবং রুথেনিয়া প্রদেশকে স্বায়ত্ত-সাধনাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা। এই সকল প্রদেশের আইনসভায় বিভিন্ন জাতির অনুপাতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হয় এবং স্থির হয় যে, প্রত্যেকে প্রদেশের আইনসভা সাধারণভাবে স্থানীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং অর্থবিভাগের ভার জাতীয় পরিষদের উপর থাকিবে। এই ব্যবস্থায় সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবী পূরণের জন্য যদি পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতে নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তনই যে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট হইবে কেমন করিয়া ?—ইহাতে যে তাহারা সর্ব্বত্র ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে না !

লর্ড রান্‌সিম্যান্ চেকোস্লোভেকিয়ায় গমনের পূর্ব্বে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই কার্য্যের সহিত বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড রান্‌সিম্যানের চেকোস্লোভেকিয়ায় গমনের অল্পকাল পূর্ব্বেই হিট্‌লারের প্রতিনিধি ক্যাপ্‌টেন্ ওয়েডম্যান্ বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময়, চেক্ গভর্ণমেণ্ট সীমান্ত অঞ্চলে সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছে, এই অভিযোগ করিয়া জার্ম্মানী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। জ... সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হওয়ায় সিউডেটেন্ জার্ম্মানগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। এই সময় অকস্মাৎ একদিন চেম্বারলেন্ ঘোষণা করেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্ চেকোস্লোভেকিয়া যাইতেছেন। লর্ড রান্‌সিম্যানের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে জার্ম্মানী ও সিউডেটেন্ জার্ম্মান্ দল সম্মত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, জার্ম্মানী এই সময় রাইনল্যাণ্ডে ও চেক্ সীমান্তে বিপুল সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে 'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান্" পত্রিকার প্রতিনিধি জানাইয়াছিলেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্ সিউডেটেন্ সমস্যার

মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও অবস্থা ক্রমেই নৈরাশ্যজনক হইতেছে। চেক্ সীমান্তে এবং রাইনল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সৈন্য সমাবেশ পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। ইহার পর, রাইনল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর সমরায়োজনের আরও বহুত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, লর্ড রান্‌সিম্যান্‌কে জার্ম্মানীর ইঙ্গিতেই প্রাগে প্রেরণ করা হইয়াছে। লর্ড রান্‌সিম্যান্ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সমস্যা সম্পর্কে যাহা প্রস্তাব করিবেন, তাহা জার্ম্মানীর গ্রহণযোগ্য হইবে জানিয়াই সে তাহার মধ্যস্থতার প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। লর্ড রান্‌সিম্যানের প্রস্তাবে চেক্ গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইতে চাহিবেন না, ইহা বুঝিয়া জার্ম্মানী তাহাকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতেছে। চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে বৃটীশ রক্ষণশীল দলের মনোভাব কিরূপ তাহা যদি আমরা স্মরণ করি, তাহা হইলে এই অনুমান অযৌক্তিক মনে হইবে না। রক্ষণশীল দলের বড় বড় পাণ্ডারা একাধিকবার বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতি-সন্নিবিষ্ট চেকোস্লোভেকিয়াকে ভাঙ্গিয়া যদি সুইজার-ল্যাণ্ডের ন্যায় যুক্ত-রাষ্ট্র পরিণত করা হয়, তাহা হইলে বৃটেনের উহাতে কোন আপত্তি নাই। আপাততঃ জার্ম্মানীও চেকোস্লোভেকিয়া সম্পর্কে এই দাবীই করিতেছে। চেকোস্লোভেকিয়া যদি যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মান্-প্রধান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমে সমগ্র চেকোস্লোভেকিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। আমরা জানি, "চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানী" জার্ম্মানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক্ষণে আগ্রহান্বিত। কাজেই, লর্ড রান্‌সিম্যানের দ্বারা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করিয়া জার্ম্মানীর সন্তুষ্টি বিধান তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। লর্ড রান্‌সিম্যানের প্রস্তাবের জন্য যাহাতে কেহ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে মিঃ চেম্বারলেন্ পূর্ব্ব হইতেই সাফাই গাহিয়াছেন যে, লর্ড রান্‌সিম্যানের কার্য্যের সহিত বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই!

হাফিজ্

নরেন্দ্র দেব

স্তব্ধ করি দিল মৃত্যু জীবনের কলকণ্ঠ আনন্দ সঙ্গীত,
কটাক্ষ হারাল লক্ষ্য, স্পন্দহীন প্রাণছন্দ বক্ষের সম্বিৎ।
অধরের রক্ত আভা লুপ্ত হল মরণের বিবর্ণতা মাখি,
কবর পাষাণী প্রিয়া হিমদেহ আবরিয়া দিল তৃণে ঢাকি।

এই তো চলেছে বন্ধু জনমের ইতিহাস ধরণীর কোলে,
কে কাহারে মনে রাখে স্মরণের সীমাপ্রান্তে কালক্রমে ভোলে।
একমাত্র তুমি কবি করিয়াছ বিস্মৃতির ব্যর্থতারে জয়,
তোমার দিওয়ান্-গান ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে আজো বিশ্বময়।

যে হাসি নিভিয়া গেছে তারে তুমি করিয়াছ পুনরুদ্দীপিত,
যে প্রেম মরিয়া গেছে সঞ্জীবি তুলেছে তারে তব প্রেমামৃত।
জীবনের শূন্যপাত্রে পূর্ণ করিয়াছ কবি প্রাণতপ্ত-সুরা
বিশীর্ণ নার্গিস্‌পুষ্প তোমারি শিশিরে পুনঃ সৌরভবিধুরা।

বুলবুলের মৃতকণ্ঠে উজ্জীবিত করিয়াছ অভিনব সুর,
গজল্ গুঞ্জরি' ফিরে অন্তরের তীরে তীরে আবেশ মধুর
সরস হয়েছে মরু তব গীত সুষমার সুছন্দ সঙ্গতে,
মৃত্যুর অমৃতবাণী, মুসাফির! দিলে আনি সূফী-শরিয়তে।

ইরাণের নীলাকাশ ভরেছিল তব কণ্ঠ প্রেমের প্রলাপে,
বোগ্‌দাদের বাগিচায় ব্যাকুলতা জেগেছিল গোলাপে গোলাপে।
তরঙ্গিয়া তুলেছিল রুক্নাবাদ স্রোতস্বিনী দেওয়ানা বাতাস,
কুঞ্চিত কুন্তল গন্ধে মিশেছিল তরুণের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

এসেছিল নেমে জানি খোরাসান ইস্পাহানি বেহেস্ত্ ভূলোকে
বোখারা সামারখন্দ্ বিলায়ে দিয়েছ কবি প্রেমের পুলকে।
প্রিয়ার গোলাপী গণ্ডে একবিন্দু কৃষ্ণতিল—মূল্য তার দিতে
সাম্রাজ্য করেছ দান আনন্দবিহ্বল প্রাণ অকাতর চিতে।

তৃষার্ত্ত যাদের কণ্ঠ সুধা-উৎস সন্ধানিয়া দিকে দিকে ঘোরে,
অমৃত আনন্দনীরসে পরাণ পিয়ালা যারা নিতে চায় ভরে,
বিরহ-ব্যথিত হিয়া, তোমারে খুঁজিয়া ফিরে—হে বন্ধু হাফিজ!
তুমি যে গো মরমীরে শুনায়েছ অশ্রুনীরে প্রেম-মন্ত্র-বীজ।

পথের ধুলা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রভাত-জীবনের ক্রীড়াভূমি—সারাজীবনের নিভৃত মনের অলস দিনের লীলাভূমি। তাই অমূল্য চৌধুরী ভালবাসত ছেলেখেলা দেখতে। আজ কিন্তু ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ তাকে বিমর্ষ করলে। সে যেন আজ মন-ভোলা আত্মহারা।

পুকুরের দূরের পাড়ে কনক-চাঁপার শাখায় মাছরাঙা চীৎকার করছিল। কুলায়-প্রত্যাশী আরো কত পাখীর এলোমেলো কলরবে মুখর ছিল সন্ধ্যা-গগন। অমূল্য চৌধুরীর কানে পৌঁছিল মাত্র তার সুকুমারের নাটকী তর্জ্জন।

—মেরে নাক চ্যাপ্টা ক'রে তোমায় ইয়াংসিকিয়াঙের স্রোতে ভাসিয়ে দেব।

—হোয়াঙ্-হোর জলের ধাক্কায় চুবন খেয়ে জ্ঞান থাকলে তো?—প্রত্যুত্তর দিলে তার প্রত্যুৎপন্নমতি ভ্রাতুষ্পুত্র।

তারপর কে কাকে চীন মুলুকের কোন্ প্রদেশের কোন শহরে আবদ্ধ ক'রে জ্ঞান ক'রে দেবে অবলুপ্ত সে বিষয়ে বাদানুবাদ হ'ল।

এসব কথায় চৌধুরী মশায়ের বাল্য স্মৃতি জেগে উঠে তাকে জেলা স্কুলের অমসৃণ বেঞ্চি থেকে চীন-সাম্রাজ্যে নিয়ে গেল না, একথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু এ কি উৎকট সৃষ্টিছাড়া খেলা—বিশেষ যখন কিম্বদন্তী বলে—চীনেরা আরসোলা খায়।

ইত্যবসরে বালকদের বিতণ্ডা ভূগোল ছেড়ে জীবতত্ত্বে এসে উপস্থিত হ'ল। কারণ কালু বললে—লালু, তোমার গর্দ্দানটা টেনে এমন লম্বা করে দেব যে তুমি জিরাফ হ'য়ে বগাচক বগাচক করে লাফিয়ে বেড়াবে।

—বল কি ভাই কালু?—বললে লালু—তোমার হাত ছুটো করব বেটে—হেঁটে বেড়াবে তুমি কেঙ্গারুর মত তুড়িলাফ দিয়ে।

পরবর্ত্তী সম্ভাষণের মধ্যে ওরাঙ গরিলা লেমার সম্বর হিপো প্রভৃতি বিশিষ্ট জানোয়ারদের নামোল্লেখ হ'ল।

বাক্-সংগ্রামের এ প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় অমূল্য হ'ল উত্তেজিত ও উত্যক্ত। তার প্রধান ভয় জ্ঞাতি-বিরোধকে। বালকের ঝগড়া যৌবনের মনোমালিন্যে পরিশেষে বাটোয়ারার মামলায় পরিণত হয়। ব্যবহার-জীবীদের করাল গ্রাস লোভ-হীন অসুন্দর মুখ বিভীষিকার সৃষ্টি করত তার মনে।

রোগের বীজ অঙ্কুরে বিনষ্ট না হ'লে বলবান হয়। তাই লালু-কালুর ডাক পড়লো তার দরবারে।

—এসব ঝগড়া কে শেখালে তোমাদের?

—মাষ্টার মশায়। বেশ নূতন রকম নয় বাবা?

—দেখুন কাকামণি, চাষাদের ছেলেরা যখন ঝগড়া করে একজন অন্যকে বলে গরু, গাধা, বাঁদর।

—তারা ভালো ভালো জানোয়ারের নাম কি ক'রে জানবে বাবা?

—তাদের তো আর মাষ্টারমশায় নাই—এম্-এ, বি-এল—যে, খেলার জন্যে নূতন নূতন দেশের নাম শেখাবে।

শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা বাতুলতা। বোঝাপড়া করতে হবে এম্-এ, বি-এল যোগেশ রায়ের সঙ্গে। এম্-এ, বি-এল! মাথামুণ্ডু। অগত্যা চৌধুরী বললে—যাও।

আনন্দে কালু চরকার মত ঘুরতে লাগ্‌লো। লালু নিজের অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণায়মান কালুকে প্রদক্ষিণ করলে।

এবার একাধারে শৈশব-স্মৃতি ও অপত্য-স্নেহ স্বভাব-কোমল অমূল্যের চিত্তকে সরস করলে।

সে বললে—তোদের খেলা ভুল হচ্ছে। একজনের চোখ বাঁধতে হবে—আর সে বলবে—আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।"

কালু বললে—চোখ বুজব কেন বাবা? সূর্য্য যে চোখ খোলা। ঝলসানো তার চোখ—তার কিরণে লোকে দেখতে পায়, গাছপালা বাড়ে।

—ধোবার কাপড় শুকোয়। কিন্তু সূর্য্য!

—হ্যাঁ বাবা, আমি যেন সূর্য্য! তাই ঘুরছি।

—আর বড় কাকামণি, আমি পৃথিবী। আমি ঘোরবার সময় যেদিকটা সূর্য্যের দিকে থাকে সেদিকটা দিন। আর যেদিকটা থাকে না সেদিকে নিবিড় অন্ধকার রাত্রি। তাই ঘোরবার সময় এক একটা চোখ বন্ধ করছি দেখছেন না কাকামণি।

—অসম্ভব ! আমায় কি তোরা পাগল করবি ?

বালকদের উচ্চ হাস্যে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হ'ল অবনী। কালু-লালু সমস্বরে বললে—ছোট কাকামণি !

যখন সভা-স্থলে শান্তির স্থির-মূর্ত্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে ; উভয় ভ্রাতা সরল বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালো। উভয়ে উপলব্ধি করলে আগন্তুক গবেষণার গুরুত্ব। ছেলেরা স্বস্থানে প্রস্থান করলে। যাবার সময় একজন বললে—ভাঙা অতিথশালা—ফাটা ভিতে অশথ-বটে মিলেছে ডাল-পালা।

অন্য জন বললে—তবে আমি যাইগো তবে যাই।

ভোরের বেলা শূন্য কোলে—
ডাক্‌বে যখন খোকা বলে—
বলব আমি নাই সে খোকা নাই।

—এসব কি ভাই ?

—কেন দাদা, রবিবাবুর কবিতা।

—হুঁ ! বললে দাদা।

তারপর সে সকল কথা বললে। এ কি খেলা না জ্যাঠামি ! ঘোরতর পাকামি। খেলার ভেতর গোয়াঙ-তা ! সর্ব্বনাশ !

যোগেশ মাষ্টার অবনীর সহপাঠী। সে তাকে এনেছে। তার উদ্ধত সরলতা অমূল্যকে উৎপীড়িত করত। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতার সরল প্রাণে ব্যথা লাগবার ভয়ে সে কোনো কথা বলতে পারতো না। মোট কথা, মাষ্টারটি ফাজিল।

ব্যাপার আরো সঙ্গীন হ'ল যখন তাদের আদরের ভগ্নী রেবা এসে বললে—দাদামণি, বত্রিশের ঘর পূর্ণ করতে পার ?

অবনী বললে—পাঁজিতে লেখা আছে ?

—পুঁথিতে তো সবই লেখা থাকে। পুস্তকের বিদ্যা আর পরের হাতের ধন।

যে কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিল অমূল্য, অবনীর প্রশ্নের উত্তরে রেবা সে কথা বললে—মাষ্টার মশায় শিখিয়েছে।

অমূল্য বললে—হুঁ ! মনে মনে বললে—নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা—ঝরণার গায়ে শিলা-বৃষ্টি ক'রে তার বেগ থামাবার চেষ্টা করা—একই কথা।

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মনে মনে অবনী বললে—যোগেশের তালে পা ফেলে দাদা চলতে পারছে না। একটা না অশান্তির উদ্ভব হয়।

যোগেশ তার বাল্য-বন্ধু, সহপাঠী। যোগেশ পণ্ডিত, কিন্তু তার চাল-চলন চিরদিন বে-খাপ্পা। যোগেশ দরিদ্র। মাদারীপুরে দিনকতক ওকালতী করবার চেষ্টা করেছিল বেচারা, কিন্তু গুণগ্রাহিতার অভাবে তাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে হ'য়েছিল। কর্ম্মের ব্যর্থ সন্ধান এবং অর্থাভাবে বাসা হ'তে বিতাড়িত হবার অব্যর্থ ইঙ্গিতে বেচারা যখন কর্ণধারহীন তরণীর মত ঘুরছিল—পার্ক সার্কাসে একখণ্ড জমির উপর মন্নু মিঞার "আমোদ বাগিচা" তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পথের মেলার পরিচালকদের মুক্তপ্রাণ আর অবাধ স্ফূর্ত্তি অনুপ্রাণিত করলে নিরুৎসাহকে। জীবিকার উপায় শহরে অগণিত। প্রবেশ মূল্য এক আনা। এখানে দেখানো হয়—ভোজবাজি, হুলাহুলা নৃত্য, জীবন্ত বাঘের সঙ্গে বীরাঙ্গনার কৌতুক-ক্রীড়া।

পরিচালক মন্নু মিঞার সাথে তার আলোচনা হ'ল অনুষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে। যে বালক চীনা-মেম সেজে হুলা নাচে আর বোম্বাই বীরাঙ্গনা সেজে বাঘের খেলা দেখায়—তাকে ফিজি দ্বীপের জুলিয়া নারী সাজালে খেলার সৌষ্ঠব বাড়ে। বীরাঙ্গনার পোষাক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তার সঙ্গে যদি ডি-এল-রায়ের—"ভারত আমার"—কাজী নজরুলের —"কে বিদেশী"—গাওয়া হয়, আর প্রত্যেক ক্রীড়ার সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজানো হয় তাহ'লে এ খেলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মাঠেও দেখানো যেতে পারে।

যোগেশের কথাগুলা মন্নুর প্রাণে তীরের মত লাগলো। খোদার মেহেরবাণী না লাভ করলে যোগেশবাবুর মত সহযোগী পাওয়া দুর্লভ। যোগেশ যখন তার দলে যোগ দিতে সম্মত হ'ল, মন্নু দৈনিক একটাকা পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতিতে যোগেশকে নিযুক্ত করলে আমোদ-বাগিচার সহকারীরূপে।

অবনী সাতদিনের জন্য কলিকাতায় এসে শহরের আমোদে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। দেশের জয় হোটেলে তার অনেক পুরাতন বন্ধু এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। বিলাসপুরের নির্জ্জনতার প্রতিশোধ নিলে অবনী শহরের সকল প্রমোদাগারে ঘুরে।

অকস্মাৎ দেখলে তারা আমোদ-বাগিচা—প্রবেশ মূল্য এক আনা। অনেক শ্রমিক ও শিল্পী তাঁবুর দ্বারে দাঁড়িয়ে শুনছিল—মন্নু মিঞার বক্তৃতা।

এক বন্ধু বললে—এটা না দেখলে জীবনের কাজ অসম্পূর্ণ থাক্‌বে।

সত্য কথা। তারা প্রবেশ করলে শিবিরে।

প্রথমে যখন গৈরিক আলখাল্লা—শিরে তারবুস টুপি এক হাতে ত্রিশূল অপর হস্তে চাঁদ—যোগেশ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ল তারা তাকে চিন্‌লে না। কিন্তু সঙ্গীতের সময় ছদ্মবেশ গোপন রাখতে পারলে না—তাদের বন্ধুকে। তারা সমস্বরে বললে—যোগেশ! লে লুল্লু! যোগেশ!

এ অবস্থায় আবিষ্কৃত হ'লে অন্যে অপ্রস্তুত হ'ত কিন্তু যোগেশ রায় ভিন্ন ধাতে গড়া। সে উৎসাহ পেলে শিক্ষিত দর্শকদের শুভাগমনে। সুতরাং সে নির্দ্দিষ্ট গানের পর গাহিল—আমরি বাঙলা-ভাষা।

ক্রীড়া-অন্তে যবনিকা পড়লো যাতে ইংরেজীতে লেখা Good-bye.

বন্ধুরা ধরলে যোগেশকে।

—কি করব ভাই-সকল, এক পেট বিদ্যে। তার মধ্যে ডাল ভাত প্রবেশ করলে ভারতীর একাধিপত্য ধাক্কা খায়। তাই তার চেষ্টা জঠরে অন্ন না প্রবেশ করে। যখন লেখা-বিদ্যার জেলাসিতে পেটের জ্বালায় ঢাকুরের লেকে আত্ম-সমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম—বিধি মন্নু মিঞার রূপধারণ ক'রে একমুঠা অন্নের ব্যবস্থা করলেন।

সেটা কি কথা হ'ল—ঐ সঙ্গ—ঐ ভাঁড়ামি—ঐ কদর্য্য স্ত্রীলোকের নাচের সঙ্গে বাজনা বাজানো।

—ওর বাবাও স্ত্রীলোক না। লতিফ পুরুষ-মানুষ।

কিন্তু এ রত্নকে উদ্ধার করতেই হবে। অবনী হাতে পায়ে ধরে তাকে ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষক—অভিভাবক হ'তে সম্মত করলে।

মন্নু তার বকেয়া পারিশ্রমিকের চার টাকার স্থলে তিন টাকা দিলে।

মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার পর দীঘির চাতালে বসে অমূল্য বললে—বেচু, মাষ্টার বাবুকে ডেকে দে তো।

অমূল্য যদি শুন্‌তো যোগেশ মন্নু মিঞার দলের অবসর-প্রাপ্ত আর্টিষ্ট—তাহ'লে ভ্রাতার মনে কষ্ট দিয়েও সে তাকে বিদায় দিত। মোট কথা, যোগেশের কথা-বার্ত্তা, চালচলন অমূল্যর মনের জড়তাকে সচল করবার চেষ্টা করত। সে চাইত অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে—সম্ভ্রান্ততার ধীর স্থির অচল আয়তন।

আজ কিন্তু অমূল্যর মন সচল হ'য়েছিল। তার জমিদারী শাসনের সুপ্ত সিংহ-বিক্রম জেগে উঠেছিল। যোগেশ পুকুর-ধারে এসে বললে—দাদা, ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ। দেখ যোগেশ, ছেলেদের কু-শিক্ষা দেওয়া বন্ধ কর।

—কু-শিক্ষা!

—হ্যাঁ কু-শিক্ষা। জ্ঞাতি-বিরোধের শিক্ষা।

প্রহেলিকাময় মনে হ'ল তার উক্তি। যোগেশ বোঝালে, খেলার ছলে ছেলেদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসম্মত। বিবাদ ছেলেরা করবেই। সেটা তাদের প্রকৃতিগত। সেই প্রকৃতির লীলার মাঝে ভূগোল জীবতত্ত্ব বা ইতিহাসের শিক্ষা অবাধে অনায়াসে গুড়ি মেরে প্রবেশ করতে পারে।

অমূল্যর রক্তের চাপ অসাধারণ। চিকিৎসক তাকে উত্তেজিত হ'তে নিষেধ করেছিল। আজ কিন্তু তার উত্তর-কালের বংশের দুলালদের শিক্ষা সমস্যা যাচিঞা করছিল সমাধান।—আজ

সে বললে—জন্তু জানোয়ারের নামে পরস্পরকে ডাকলে—'সবার উপরে মানুষ সত্য' ইত্যাদি নীতি চোট খায়।

—সহজ পথে যে নদী চলে তার গতি কেহ রোধ করতে পারে না। যেমন গিরি নদী। শিশু শিশুকে পশু সম্বোধন করে—এটা কলহের বিধি। এতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে—মানব শিশুর মানবতার ঔৎকর্ষ্যবোধের।

অমূল্য বললে—শিশু-কলহ জ্ঞাতি-বিরোধের ভিত্তি।

যোগেশ বললে—জ্ঞাতি-বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে মহাভারত লেখা। তার শেষ পরিণতি ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়।

তর্কের শেষ নাই। বিশেষ শিক্ষিত দুর্ব্বৃত্ত যদি হয় এক পক্ষের তার্কিক। অমূল্য বললে—আমার হুকুম, কাল থেকে ছেলেদের কেবল বই পড়াবে—

—ও হুকুম মোটেই আমি মানব না।

কি? তার অমিত-বিক্রম পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটায় দাঁড়িয়ে তার বংশের কেহ অদ্যাবধি শোনেনি এমন অশিষ্ট কথা বেতনভোগীর মুখে। হুকুম মানব না!

উত্তেজনায় অমূল্যর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়েছিল। ক্রোধে ও

ঘৃণায় যোগেশের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়েছিল। ধনীর উৎপীড়ন দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা। সে তো পথের ধূলা। পথে ফিরে যাবে, কিন্তু এ অশিষ্টতা সহ্য করবে না।

যোগেশ বললে—আমি শিক্ষক, শিক্ষাবিষয়ে কারও কথা মানব না।

—মনিবেরও না!

কাঁপছিল অমূল্য। তার চক্ষু মুদে আসছিল। যোগেশ বুঝলে সে পীড়িত। চকিতে তাকে ধরে পুকুর পাড়ে শুইয়ে দিলে। না হ'লে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ত।

আত্মগ্লানিতে যোগেশ দগ্ধ হচ্ছিল—তার উদ্ধত অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য।

ডাক্তারবাবু বললেন—ভয় নাই। সারারাত বরফ দিতে হবে মাথায়—আর কোনো শব্দ করবে না কেউ।

বাবুর অসুখ—সর্দ্দিগরমী। সংসারে হুলস্থূল পড়ে গেল। কেউ জানল না তার আকস্মিক রোগের সাক্ষাৎ কারণ।

যোগেশের প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কর্ম্মক্ষমতা। সে বিশাল অট্টালিকায় সকল শব্দ বন্ধ করলে। ডাক বসিয়ে শহর থেকে সর্ব্বদা বরফ আনাবার ব্যবস্থা করলে। নিজে সারারাত তার সেবা করলে।

এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল যোগেশের মনের মাঝে। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায় সত্য। দুই মাস এদের আশ্রয়ে থেকে সে পৃথিবীর মুখে আবার হাসি দেখেছিল—কিন্তু এ কি ব্যাপার। সত্যই তো যে অর্থ দেয় তার স্বত্ব আছে কি সুর-বাজবে তা বলবার।

রাত্রি বারোটার সময় অমূল্য চোখ মেলে তাকালে। তার স্ত্রী ও জননী আগ্রহে কথা কইবার চেষ্টা করলে। যোগেশ হাতজোড় ক'রে তাদের নিষেধ করলে।

অমূল্য তার দিকে তাকালে। সে বললে—দাদা, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ুন।

সুবোধ বালকের মত অমূল্য চোখ বুজলে—তার আজ্ঞায়, ব্রোমাইডের নেশায়।

যোগেশের কাছে উত্তরকাল চিরদিন সোনার কিরণ মাখা। এবার সে বুঝলে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে ভাবী-কালেও। বিলাসপুরে বসে সে একখানা পুস্তক লিখেছিল অর্থ-নীতি সম্বন্ধে। কলিকাতার এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়েছিল সে তার পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এক্ষেত্রে—

—জল!

সে এক টুকরো বরফ দিলে রোগীর মুখে। তখন ভোর চারটে। বাকী সব নিদ্রামগ্ন। অমূল্য চোখ চাইল।

যোগেশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—দাদা, ভাল?

সে ঘাড় নাড়লে।

এবার যোগেশের চোখের বাঁধ ভাঙল, শিশুর মত কেঁদে সে রোগীর পা ধরলে। বললে—দাদা, ক্ষমা কর অকৃতজ্ঞ পশুকে—ক্ষমা কর।

—ছিঃ! বললে রোগী। সে কম্পিত করে যোগেশের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললে—না ভাই, না।

প্রভাতে চিকিৎসক বললে—ভয় কেটে গেছে, কিন্তু এমনি শুশ্রূষা চলা চাই তিন দিন তিন রাত।

লালুর মা বিধবা। বাড়ীর বড়বৌ। জোড় হাত ক'রে তাকে ভাগালে যোগেশ—দেবরের সেবা সে প্রত্যক্ষ-ভাবে করতে পেলে না। কালুর মা মেজোবৌ কাছে কাছে রইল, কিন্তু তার পরিশ্রম করতে হ'ল না। জননী নীরবে এই কান্ত যুবকের দিকে তাকাতো—ছেলের দিকে তাকাতো। অন্তরালে অবনীকে বল্‌ত—ধন্যি বন্ধু পেয়েছিলি বাবা!

রেবাকে যোগেশ শেখালে কেমন ক'রে বরফ পুরতে হয় বরফ-থলিতে—ঔষধ খাওয়াতে, হরলিক করতে।

সপ্তম দিনে গৃহস্বামী বৈঠকখানায় বসলেন; হরির লুট, চণ্ডীপাঠ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা ইত্যাদি সমাপ্ত হল।

অষ্টম দিনে জননী তিন বউ দুই ছেলেকে নিয়ে সভা করলে। আলোচ্য বিষয় গুরুতর।

গৃহিণী বললে—শান্তার বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে জ্বলে পুড়ে মলাম বাবা। এক দিনের জন্যে পাঠালে না।

এ অভিযোগ জননীর চিরন্তন। অবনী বললে—সে তো ভাল মা। তাঁরা এত ভালবাসেন শান্তাকে যে একদিনের জন্য তাকে চোখের আড়াল করতে চান না।

গৃহিণী কুপিত হ'লেন। বললেন—তোরা নিষ্ঠুর। তোরা গোঁয়ার। বোনের উপর কিছু মায়া নেই তোদের।

মুখ ফুটে বললেন না—তোদের নিজেদের বউ কাছে থাক্‌লেই হ'ল।—তিনি বধূমাতাদের দিকে তাকালেন। বড় মেজো সমস্বরে বললে—সত্যি। ভাসুরের সান্নিধ্যহেতু ছোট জন কেবল ঘাড় নাড়লে।

অমূল্য চৌধুরী বললে—আন্‌তে চাই তো আমরা—ভালবাসা—

ছোটবাবু বললে—দাদা উত্তেজিত হ'য়ো না—রক্তের চাপ।—তাদের বিরক্ত ক'রে লাভ কি মা?

গৃহিণী বললেন—তোর লেকচার থামা। বি-এ পাশ সবাই করে।

এবার সভাস্থল হাস্য-মুখর হ'ল।

গৃহিণী মনোভাব ব্যক্ত করলেন। রেবার বিবাহ দেবেন গরীবের সঙ্গে। জামাতাকে গৃহে রাখবেন।

—ঘর-জামাই! বললে অবনী।

গৃহিণী বললে—তোরা ঠাঁই না দিস, শহরে আমার যে বাড়ী আছে সেখানে তাদের রাখবো। রোজ তারা আসবে আমায় দেখ্‌তে। আর জামাই ওকালতি করবে।

বড়বৌ বিচক্ষণ। সর্ব্বদা শাশুড়ীর সঙ্গে একমত। সে বললে—আমাদের নিজেদের যা মামলা হয় তাতে তার চলে যাবে।

—কিন্তু এমন শান্তশিষ্ট গরিষ্ঠ ঘর-জামাই পাবে কোথা মা? আবার শ্বশুরবাড়ীর মামলা করা চাই।

—পেয়েছি। পাব। এম্‌-এ, বি-এল।

—কে?

—যোগেশ মাষ্টার।

বিস্ময়ে অবনী শিস দিলে। বহুকষ্টে উর্দ্ধগামী রক্ত-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করলে অমূল্য। বধূত্রয় মুগ্ধবিস্ময়ে গৃহকর্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

রাত্রে আবার যখন মজলিস বসলো অবনী যোগেশের দারিদ্র্য আমোদ-বাগিচা প্রভৃতির গল্প বললে। ওকালতী সে করবে না। শেষে বললে—মা দারিদ্র্যের জন্য বলছি না। শেষে তোমরাই ওকে অবজ্ঞা করবে—শাস্ত্যার স্বামী ওর সঙ্গে কথা বলবে না—নায়েব গোমস্তারা আড়ালে হাসবে।

গৃহিণী ও বড়বৌ দমে ছিল। আমোদ-বাগিচা! হুলাহুলা!

অমূল্যবাবু বললেন—মা যোগেশের চিত্ত খুব উঁচু। জীবিকার জন্য সার্কাস করায় দোষ নাই। কিন্তু—

সে তার ঔদ্ধত্যের কথা বল্‌লে না।

ইত্যবসরে যোগেশের অমায়িক মাতৃ-সম্বোধন, তার মার্জ্জিত রুচি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, তার গুণরাশিনাশি দারিদ্র্য-দোষকে পরাভূত করলে বর্ষীয়সীর বিচারের কাঠগড়ায়।

তিনি বললেন—সেইটাই তো ভাল। তাহ'লে তার বাড়ীর দিকে টান হ'বে না।

ভ্রাতৃদ্বয় মাথা চুলকে বললে—দেখি।

পরদিন প্রত্যুষে ভ্রাতৃদ্বয় যখন বসে চা-পান করছে—হাতে চামড়ার স্যুটকেশ, মুখে হাসি—যোগেশ এসে হাজির।

কি ব্যাপার!

সে হেসে বললে—"কোমাস"এর শেষটা মনে আছে? কর্ম্ম অবসানে হরিত ধরণীর প্রান্তে চললাম—যেথায় ধনুকের মত গোল আকাশ মিশেছে ধরণীর সাথে।

ব্যাপারটা কি?

—সত্য কথা বলি ভাই। বনের পাখী সোনার খাঁচায় মোটেই সুখে থাকে না। পথের ধূলা স্বর্ণ-রেণুর সঙ্গে মিশলে—সোনা হয় মলিন।

অমূল্য বললে—যোগেশ, কবিতায় সমস্যা আরও জটিল হয়।

সে বললে—দাদা, ফুটপাথ ডাকচে—পথে পথে ঘুরে আর একবার দেখব কাজকর্ম্ম জোটে কি-না। পকেটে নগদ ষাট টাকা আছে—তিনমাস অনশন-দমন।

মেজোবাবু জানতো মানুষটির জিদ্‌। অবনী তর্ক করলে। ধরা দেয় না যোগেশ—মাগুর মাছের মত পিছ্‌লে যায়।

অবনী রেগে বললে—গরীব সবাই। তোর মত সবাই জেঁকো নয়। তোর পয়সা থাকলে ঔদ্ধত্য—দম্ভ—

দম্ভ! এবার প্রাণ খুলে হাসলে যোগেশ। বললে—খালিপেটে দম্ভটা সত্যিই আসে। কিন্তু আমি নিজের পথের সন্ধানে পথে যাচ্ছি ভাই।

এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। ডাকে তার একশত টাকা এলো 'অর্থ-নীতি প্রবেশ' মনোনীত হ'য়েছে।

প্রকাশক কপি-রাইট কিনেছে। আর একশ টাকা দেবে যখন পুস্তক প্রকাশিত হবে।

সে বললে—অমূল্যদাদা, আরও চার মাস জুঝতে পারবো। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—যদি ছ'মাসে না অন্ন জোটে—আপনাদের সদাব্রতের অতিথি হ'ব। ঢাকুরের লেকে ডুব্‌বো না।

অমূল্য ডিপ্লোম্যাট। অমূল্য সংযমী। সে বললে—জান তো ভাই, আমরা কেউ নই। মার অনুমতি নাও।

—আলবাৎ।

মা চুপি চুপি তাকে সে কথা বললে।

উন্মাদের মত হাসলে যোগেশ। তারপর নাচলে। মার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বললে—ওকথা বোলো না মা। দেবতা-পূজার ফুল পগারে ফেলবে? তবে মা আসি।

মা ব্যাপারটা বোঝবার পূর্ব্বে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো।—সর্ব্বনাশ! দেব-পূজার ফুল! পালাও লোভী! পালাও পালাও!—

সে পিছনে তাকালে না। ছুট্! ছুট্! পথের ধূলার সোঁধা গন্ধ তাকে শক্তিশালী করলে।

উড়িষ্যার জঙ্গলে তেষট্টি দিন

শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ

অঙ্গুল হইতে পূজনীয় বড়দার স্নেহের আহ্বান আসিল। কারণ কয়েক মাস থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার একান্ত বাসনা ছিল। উড়িষ্যায় ভ্রমণ এই আমার প্রথম নয়; প্রথম বারে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর, ১৯১৭-তে কটক হইতে ত্রিশ মাইল দূরে জগৎসিংপুর এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পুরী যাত্রার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এবারের ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, জ্ঞানবর্দ্ধক ও আনন্দদায়ক। বড়দা বহুদিন থেকেই উড়িষ্যায় কার্য্যব্যাপদেশে আছেন, সম্প্রতি অঙ্গুলে বদলি হইয়াই আমাকে ওই স্থানের অপরূপ দৃশ্য দেখিতে যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। আমার বড়দার পুরা নাম—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ মাতুলের একমাত্র পুত্র। অঙ্গুলের পূর্ত্তবিভাগের সব ডিভিশনাল অফিসার।

সাথী হইলেন শ্রীযুক্ত নলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পর্কে কাকা আর আমার ভাতুষ্পুত্র শ্রীমান সত্যচরণ। বিদেশে, বিশেষত যেখানে বাঙালীর সংখ্যা খুব অল্প, এরকম জায়গায় সঙ্গী না হইলে ভ্রমণই বৃথা।

২৭শে অক্টোবর (১৯৩৭) বৈকালে যাত্রা করিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিলাম। গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা থাকায় কম্বল বিছাইয়া তৃতীয় শ্রেণীকে মধ্যমে পরিণত করিলাম ও সটান শুইয়া পড়িলাম। ৮-৪৪ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের পুল পার হইয়া প্রায় দু'-ঘণ্টা পরে বাহাত্তর মাইল দূরস্থ খড়্গপুর ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। দামোদর নদ খুব বিস্তৃত নহে, কিন্তু রূপনারায়ণের রূপ দেখিবার মত। এক পার হইতে অন্য পারের নৌকার মৃদু আলোকগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। ক্রমে রূপসা জংসনে গাড়ী থামিয়া একেবারে বালেশ্বর-এ গিয়া গাড়ী থামিল (১৪৪ মাইল)। বালেশ্বর ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে নীলাচল নামক সুবিশাল পর্ব্বত মেঘের মত দেখা যাইতে লাগিল। এখানে গাড়ী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল এবং কলিকাতাগামী পুরী এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিলে আমাদের গাড়ী ছাড়িল এবং ভদ্রক ও জগৎপুরে থামিয়া এবং বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও মহানদীর পুল অতিক্রম করিয়া কটকে আসিল, তখন ভোর পাঁচটা। শ্রীমান্ সত্যর এইদিকে ভ্রমণ এই প্রথম—কাজেই সে বালেশ্বর হইতে বসিয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়গুলি দেখিতে লাগিল। রেল লাইনের পাশে জেনাপুরেই একটি পাহাড় দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল ও আমাকে ডাকিয়া তুলিল। কটকে অবতরণ করিয়া পুরী-তালচর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অঙ্গুল যাইতে হইলে এখানে তালচরের গাড়ীতে চড়িতে হয় এবং কটক হইতে ছেষট্টি মাইল দূরস্থ মেরামণ্ডলি ষ্টেশনে নামিয়া পরে মোটরবাস যোগে চৌদ্দ মাইল যাইতে হয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একখানি গাড়ী সকাল সাতটার সময় পুরী হইতে আসিয়া কটকে উপস্থিত হয়। যথাসময়ে তালচর প্যাসেঞ্জারে আরোহণ করিয়া পুনরায় মহানদী পার হইলাম, কিন্তু এবারে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা অতি মনোরম। সম্মুখে মহানদীর সুদীর্ঘ এনিকাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং দূরে মহানদীর পরপারে দিগন্তপ্রসারী ক্রমবর্দ্ধমান পাহাড়-শ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল—একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব নিসর্গ শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম এবং পরম আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অতঃপর গাড়ী জগৎপুর জংশন অতিক্রম করিয়া

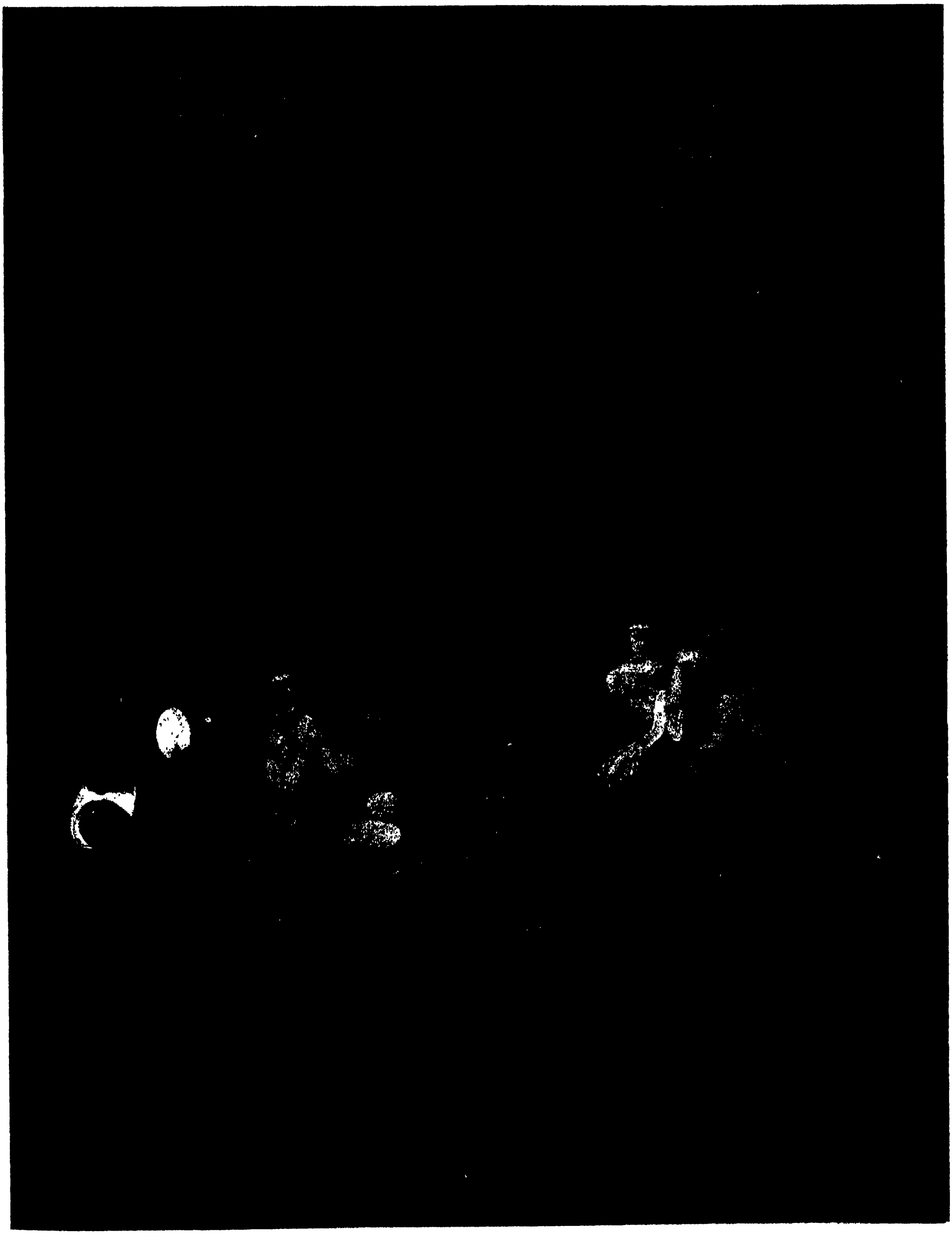
ব্রাঞ্চ লাইনে তালচর অভিমুখে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই আমাদের গাড়ী পাহাড়সমূহের মধ্য দিয়া কখন সরলভাবে, কখন তির্য্যক্‌ভাবে বেগে চলিতে চলিতে বহু জঙ্গল অতিক্রম করিল। কোনও স্থানে পাহাড় কাটিয়া রেল লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। মাটি প্রস্তরময় ও লালবর্ণ। গাড়ী ক্রমশ একটু একটু করিয়া পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে উঠিল। কারণ রেল লাইনের পার্শ্বে বিজ্ঞাপনীতে দেখিলাম (সমুদ্র-লেবেলের পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে)। দুই পার্শ্বে পাহাড়—কোনটার উপরে মন্দির, কোনটার উপর রাজার বাড়ী। এইভাবে গাড়ী বহু পাহাড় ও জঙ্গল অতিক্রম্‌ করিয়া রাজ আটগড় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। মধ্যে একস্থানে গাড়ী থামিয়াছিল—সেখানে না আছে প্লাটফরম, না আছে কোন ষ্টেশনের চিহ্ন, অথচ গাড়ী হইতে লোক নামিল ও দুই-একজন উঠিল। গার্ড ইহাদের টিকিট লয় ও দেয় —এ এক মজার ষ্টেশন, নাম 'চারবাটিয়া", আছে শুধু একখানি মাত্র সাইন্‌ বোর্ড। তাহার পর গড় ঢেঙ্কানল ষ্টেশন—এখান হইতে পাহাড়ের উপর রাজার প্রাসাদ ও শহরের গৃহগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। মোটের উপর এ'টিকে বেশ সুদৃশ্য শহর বলিয়া বোধ হইল। তাহার পর সদাশিবপুর ও হিন্দোল রোড ষ্টেশন ; নিকটবর্ত্তী হিন্দোল পাহাড়ের নামানুসারে এই ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। রাজ আটগড়, ঢেঙ্কানল ও হিন্দোল সমস্তই করদরাজ্য। অবশেষে বেলা দশটার সময় বহু পাহাড় অতিক্রম করিয়া ট্রেণ মেরামণ্ডলিতে আসিয়া পৌঁছিল (তিন শত ছয় মাইল)। ইহার পরবর্ত্তী ও শেষ ষ্টেশন তালচর (তিন শত আঠার মাইল)।

মেরামণ্ডলি ষ্টেশনে অঙ্গুল যাইবার বাস পাওয়া যায়—এই বাসখানি প্রত্যহ দশটার সময় মেরামণ্ডলি হইতে অঙ্গুলের মধ্য দিয়া সম্বলপুরে যায় এবং আর একখানি বাস প্রত্যহ প্রাতে সম্বলপুর ত্যাগ করিয়া বেলা চারিটার সময় অঙ্গুলের মধ্য দিয়া মেরামণ্ডলি পৌঁছে। সেই রাত্রে বাস ষ্টেশনেই থাকে। কারণ প্রত্যহ একখানি ট্রেণ বৈকালে তালচর হইতে মেরামণ্ডলি দিয়া পুরী যায় ও প্রাতে দশটার সময় একখানি ট্রেণ পুরী হইতে এখানে আসে। আর বাকী সময় কেবল মালগাড়ী তালচর হইতে কয়লা লইয়া যাতায়াত করে। আমরা বাসে উঠিলাম এবং বহু বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় এক ঘণ্টা পরে অঙ্গুল শহরে আসিয়া পৌঁছাইলাম। শহরের প্রথমেই পুলিস লাইন। তারপর অন্যান্য স্থান। আমাদের বাস ডাক বহন করিয়া আনিয়াছিল। কাজেই প্রথমে সে ডাকঘরে উপস্থিত হইল এবং একে একে যাত্রীদিগকে নামাইয়া দিতে লাগিল।

আমরা দাদার বাসায় যাইব বলায় আমাদিগকে একেবারে বাসার হাতার মধ্যে লইয়া আসিল। বেলা তিনটার সময় বড়দা অফিস্‌ হইতে মোটর পাঠাইয়া দিলেন। সেই মোটরে চড়িয়া আমরা নিকটবর্ত্তী চারি মাইল দূরস্থ একটা পাহাড় দর্শন করিতে গেলাম। তবে সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েরা থাকায় অধিকদূর পর্ব্বত আরোহণ করা হয় নাই। তারপর পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমগ্র শহর পরিভ্রমণ করিলাম। এইখানে আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অঙ্গুলের রাজা বাস করিতেন। কোনও কারণে সেই সময়ে অঙ্গুল বৃটিশ সরকারের অধীনে আসে এবং ইহা একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। সেই সময় হইতে এখানে একটি জেল (১৮৯৭), ডাক্তারখানা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, হাইস্কুল (১৯২৬) ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। সার্কিট হাউস—গভর্ণর, মন্ত্রী অথবা রাজকর্ম্মচারী, যাঁহারা পরিদর্শনে আসেন—তাঁহাদের অস্থায়ী বাসস্থানরূপে নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া বনবিভাগের একটি দফতর আছে, থানা ও ডাকঘর, একটী বাজার আছে। সেখানে শাকশব্জী একটু পাওয়া যায় তবে মাছ আদৌ পাওয়া যায় না। মাংস অবশ্য দুর্লভ নহে। বাজারে সাইকেলের দুই-চারিটি দোকান, মাড়োয়ারীদের কাপড়, ষ্টেশনারি ও আটা ঘি ইত্যাদির দোকান আছে। উহারা সকলেই অবস্থাপন্ন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মাড়োয়ারী, বাঙালী ও উড়িয়া ঠিকাদারও আছেন। বাঙালীদের মধ্যে দুই-চারিজন চাকরি করেন ও বাকী চারি-পাঁচ ঘর ঠিকাদার এই সবডিভিসনের অধীনে দুইশত চারি মাইল রাস্তা আছে এবং প্রায় আড়াইশত খানি সরকারি গৃহ আছে। প্রতি বৎসর এই গুলির সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এখানকার পাথরের লাল কাঁকর বিছান রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর। বেশ সরল, দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী। এই শহরের মাঝে দুইটী সরোবর আছে। তাহাতে লোকেরা প্রাতঃকালে স্নান করে। দারুণ শীতেও প্রাতঃস্নান—এখানকার প্রথা। এখানে মোটর মেরামতের কারখানা আছে ; তাহা বর্ত্তমানে একজন বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই সাবডিভিসন হইতে একজন বাঙালী উড়িষ্যা ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজা-ভূষণ ঘোষ বি এ—কংগ্রেস সদস্য। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি বাড়ীতেই কূয়া আছে। শহরটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে সরকারি চাকুরেদের বাসস্থান, দক্ষিণে বাজার, স্কুল ইত্যাদি। পশ্চিমে হেমহরপাড়া এবং উত্তরে আমলাপাড়া। এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে প্রতি রবিবারে হাট বসে। হাটে সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। তার মধ্যে বাঁশের কাজ ও বাসন, গহনা (উড়িয়াদের), আকের গুড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানে পেঁপে, কমলালেবু, কপি, আখ, আম ইত্যাদির গাছ যথেষ্ট আছে।

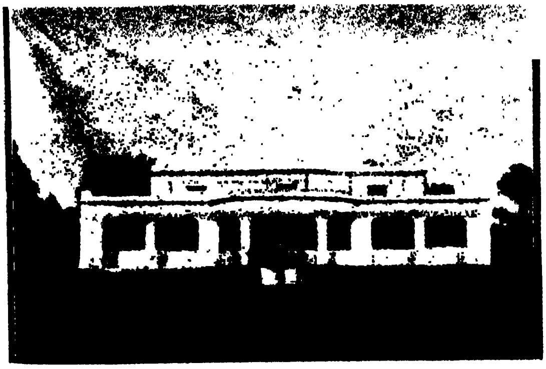
এখানে পুরী, দেওঘর ইত্যাদি শহরের মত রোগীর ভিড় নাই। এখানকার চারিদিকে বহু মাইল ব্যাপিয়া উন্মুক্ত প্রান্তর—কেবল দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের কোলে কয়েকটি পল্লী আছে। পল্লীর অবস্থা আদৌ ভাল নহে। এখান হইতে সম্বলপুর (একশত দুই মাইল), বামড়িয়া (ঊনাশী মাইল), ত্রিকড়পাড়া (ছত্রিশ মাইল), তালচর (ষোল মাইল), নোয়া পাটনা (ষাট মাইল), ইত্যাদি যাইবার রাস্তা আছে। তার মধ্যে নোয়া পাটনা হইতে কটক তিন মাইল মাত্র, মহানদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিকড়পাড়া দিয়া মহানদী পার হইয়া যথাক্রমে দাশপাল্লার ও ফুলবাণীর রাস্তা দিয়া কটক ও খুর্দ্দা যাওয়া যায়। আবার সম্বলপুর হইতে কটক যাইবারও রাস্তা আছে। নোয়াপাটনা যাইবার পথে মেরামণ্ডলি, ঢেঙ্কানল, হিন্দোল ইত্যাদি পড়ে।



[illegible] মজুমদার গোষ্ঠবিহার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শহরের দক্ষিণভাগে নাতি-উচ্চ একটি পাহাড় আছে, ইহার নাম মুনাসগড়। ইহার উপর আবহাওয়া নির্ণায়ক যন্ত্রাদির একটি গৃহ আছে। ইহার ছাদে উঠিলে সমস্ত শহর ও ইহার চারি দিককার পাহাড়-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত উত্তর ও পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি দূরে অবস্থিত বলিয়া শহরের অন্য কোনও স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শহরের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ মাইলব্যাপী একটি মাঠ আছে। সেখানে স্কুলের ছেলেরা বল খেলে। তাহা ছাড়া, যেখানে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ আছে। মাঝে মাঝে দুই-চারিটী বৃক্ষ—সমস্তই মহুয়া, শাল, নিম, অর্জ্জুন ইত্যাদি। এই গাছগুলির তলা দিয়া শহরের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ভূমি সর্ব্বত্রই অসমতল। এই অসমতলভূমির উপর বেড়াইতে বড়ই ভাল লাগে—মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর ক্ষুদ্র পাহাড় রচনায় ব্যস্ত। বস্তুত শহরের বায়ু যে এত নির্ম্মল হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিগ্রা নামক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী উপলখণ্ড অতিক্রম করিয়া ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর অধিকাংশ



ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো, অঙ্গুল

ভাগ বালুকা পূর্ণ, কিন্তু বর্ষাকালের দৃশ্য এরূপ নহে ; সেই জন্য ইহার উপর একটী পাথরের তৈরি নাতিবৃহৎ পুল আছে। এই পথে সম্বলপুর যাইতে হয়। এখান হইতে চারি মাইল দূরে একটি পাহাড় অবস্থিত। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পাহাড়—ইহাকে শহরের যে-কোন স্থান হইতে নানা ভাবে দেখা যায়।

চিন্দিপদা এখান হইতে চব্বিশ মাইল উত্তরে বাঘড়িয়ার রাস্তায় যাইতে হয়। মোটরযোগে চিন্দিপদায় যাওয়া যায়।

শহরের পশ্চিম-উত্তর দিকে যে পথটি কৃষি ক্ষেত্রের দিকে গিয়াছে সেই পথে আমাদের মোটর চলিতে লাগিল। বামদিকে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী ও দক্ষিণে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পড়িল। ক্রমে আমাদের মোটর লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই জঙ্গলটি একটি নাতি-উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, কিন্তু এই অনুচ্চ পাহাড়টি বহু মাইল বিস্তৃত। দূর হইতে পাহাড় বলিয়া বোধ হয় না। ইহাকে পাহাড় না বলিয়া উচ্চভূমি বলাই ভাল। ইহার নাম নিশা জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা বেশ সরলভাবে গিয়াছে। আমলকী গাছ এই জঙ্গলে যথেষ্ট আছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা ঝরণার আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটায় জল আছে, আবার কোনটায় নাই। ঝরণার কাছে রাস্তা খুব নীচে আসিয়া আবার উপরে উঠিয়াছে এবং লাল প্লাকার্ড ড্রাইভারকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ধীরে ধীরে চালাইও। কচিৎ দুই-একটি স্থানে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহাতেও এইরূপ একটি করিয়া প্লাকার্ড আছে। এইরূপভাবে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর এই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা এক পল্লীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে নিশা বাংলো (দশ মাইল) অবস্থিত। গৃহখানি একতালা—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; প্রত্যেক বাংলোর মত তিন খানি ঘর আছে ও বাথরুম ইত্যাদিও আছে। আমরা অতঃপর কয়েকটি পল্লীগ্রাম পার হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় একটি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানকার জঙ্গল বেশ ঘন ও গাছগুলিও বৃহত্তর। ইহা বামদিকে বহু মাইল বিস্তৃত কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে ইহার বিস্তার দুই-এক মাইলের অধিক নহে। এই জঙ্গলে নীল গাই, হরিণ, ভাল্লুক, বাঘ ও

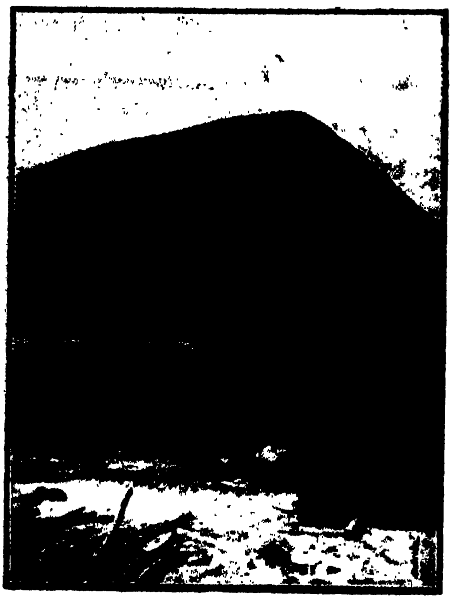


অঙ্গুলের হাটের চিত্র

বাইসন দেখিতে পাওয়া যায়। বামপার্শ্বে নূতন নূতন পাহাড়শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড় খুব দূরে—অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আবার সোজা রাস্তায় চলিতে চলিতে আবার কয়েকখানি গ্রাম দেখা গেল—আবার জঙ্গল আরম্ভ হইল—মধ্যে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে—দুই-একটি নালার উপর পুলও আছে, উহা কাঠের তৈরী। কারণ কাঠই এখানে সুলভ। আমাদের মোটর বেশ দ্রুতবেগে চলিতেছে—আর মাঝে মাঝে সরিষা বোঝাই গরুর গাড়ীসমূহের জন্য মোটরের বেগ কমাইতে হইতেছে। এখানকার গরুগুলি মোটর দেখিতে অভ্যস্ত নহে, কারণ এপথে সাধারণত মোটর চলে না—সাইকেলই চলে। তাই কখন কখন গরুগুলি গাড়োয়ানদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও মোটরগাড়ী দেখিয়া মাঠ বা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা চিন্দিপদার নিকটবর্ত্তী হইলাম। ক্রমে জঙ্গল পাতলা হইয়া আসিল। ধানক্ষেত ও কুটীরসমূহ

সুবৃহৎ পাহাড়ের ঠিক নিম্নে কয়েকটি গৃহ দেখা গেল। ডাকবাংলো একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলাম এবং এইরূপ সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় মহানদী তীরস্থ ত্রিকড়পাড়া নামক স্থানে উপনীত হইলাম। সম্মুখে মহানদীর অপর পার্শ্বে সুউচ্চ পর্ব্বতরাজি, বামে নদীকূলে প্রায় দুহাজার ফিট উচ্চ একটা প্রকাণ্ড পাহাড় সগর্ব্বে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতেছে—দক্ষিণে পশ্চিমে নদীর উত্তর পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড়—আর কিছুই দেখা যায় না—প্রত্যেক পাহাড়টিই নদীতীর হইতে উত্থিত—স্থানে স্থানে মনে হয়, যেন নদীগর্ভ হইতে উঠিয়াছে। আর নিম্নে তলদেশে কুল কুল নাদিনী স্বচ্ছতোয়া মহানদী স্বীয় মনের আনন্দে পর্ব্বতের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

এইবার আমরা মোটর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহানদীর বক্ষে



মহানদীর দৃশ্য (ত্রিকড়পাড়া ঘাট)

নৌকাতে আরোহণ করিলাম এবং পূর্ব্বদিকে নৌকা চালাইতে বলিলাম। প্রথমে দেখিয়া মনে হইল—মহানদী এত অপ্রশস্ত, কিন্তু পরে দেখিলাম ইহা প্রস্থে প্রায় এক মাইল। একস্থানে দুই পার্শ্ব হইতে পাহাড় আসিয়া নদীকে যেন বাঁধিয়া ফেলিয়াছে এবং দূর হইতে সেই স্থান অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইল। কাজেই আমরা সেই স্থানটি দেখিবার জন্য জোরে নৌকা চালাইতে লাগিলাম। যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই উহা দূরে সরিয়া যায়—এইভাবে ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘণ্টা চালাইয়াও যখন তাহার নিকটে উপনীত হওয়া গেল না তখন অগত্যা আমাদিগকে ফিরিতে হইল। মহানদীর অপর পার্শ্বে অবতরণ পূর্ব্বক গঞ্জাম জেলায় উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে নদীতীরে পদাঙ্ক রাখিয়া আবার নৌকারোহণ করিলাম।

তারপর যখন তীরে ফিরিলাম তখন দেখি ৫-৪০ মিঃ—সন্ধ্যা হইয়াছে। অতঃপর আমরা মোটরযোগে সেই পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিশ মাইলস্থ পুরাণকোট নামক বাংলোয় উঠিলাম,—উহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শুনিলাম এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড়ই বেশী। পরে অঙ্গুলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে রাত্রি হইল—আমরা বন্য জন্তু দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। তবে কেবল মাত্র একটি সম্বর হরিণ তাহার সুদৃশ্য শৃঙ্গ লইয়া আমাদের পথমধ্যে আবির্ভূত হইল। হরিণটি বেশ বড়—একটি বড় বাছুরের মত। এবং মোটরের আলোকে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। রাত্রিকালে আর বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। ক্রমে আমরা জগন্নাথপুর, বরহমপুর, পুণ্যাগড় ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া অঙ্গুলে উপস্থিত হইলাম রাত্রি তখন ৭-৪৫ মিঃ।

আবার একদিন এক মাইল ব্যাপী বালুচর অতিক্রম করিয়া মহানদীর পারস্থ একটী বৃহৎ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। প্রথমে মনে হইল ঝড়ের শব্দ কিন্তু পরে আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। এবং আমাদের মধ্যে অমরকৃষ্ণ একটা ঝরণা দেখিতে পাইল। এই ঝর্ণা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলাম কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতা আমাদের পথরোধ করিল; তা'ছাড়া নিরস্ত্র হইয়া সেই অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তারপর আমরা দাশপাল্লা ও ফুলরাণীর পথে কিয়ৎদূর বেড়াইলাম। দাশপাল্লার পথ গভীর জঙ্গল ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—দ্বিপ্রহরে অন্ধকার। আর ফুলরাণীর পথে জঙ্গল থাকিলেও দেখা গেল তাহাকে ততটা ভীষণ বলিয়া বোধ হয় না। বাসায় ফিরিতে প্রায় দুইটা বাজিল। পথে কয়েকটা বানর, ময়ূর ও বন্য কুক্কুটের দল দেখা গিয়াছিল।

সম্বলপুরের পথে—২৯শে ডিসেম্বার বেলা দশটায় সম্বলপুরের পথে রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে বড়দার পুত্র ও জামাতা। প্রথমত ছয় মাইল পর্য্যন্ত পথ ত্রিকড়পাড়ার পথে যাইতে হইল, অতঃপর আমরা ত্রিকড়পাড়া রাস্তা ছাড়িয়া কটক-সম্বলপুর রোড ধরিলাম। বাম পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড় শ্রেণী, বিরাম নাই। তবে রাস্তা খুব উঁচুনীচু নহে। সম্মুখে দূরে ও দক্ষিণে দুই-চারিটি পাহাড় দেখা গেল। পথে একটি পাহাড় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এইটি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ পাহাড়—অঙ্গুল হইতে দক্ষিণে যে পর্ব্বতমালা দেখিতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে উহা শ্রেষ্ঠ। আর একটি পাহাড় গাত্রে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখিতে বড় সুন্দর লাগিল—এইভাবে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা জরপাড়া বাংলো অতিক্রম করিলাম এবং ক্রমে বেলা এগারটার সময় অঙ্গুল হইতে ২৬ মাইল দূরস্থ একটি সুদৃশ্য বাংলোতে উপনীত হইলাম। বেলা অধিক হওয়ায় আর অধিকদূর যাওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। আমরা সেই বাংলোর সম্মুখস্থ বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করিলাম।

ক্রমে ছুটি ফুরাইয়া আসিল—৩১শে ডিসেম্বর বাড়ী ফিরিবার পথে

তালচর দেখিয়া ফিরিব স্থির করিলাম। দুইখানি মোটর যোগে সকলে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বেলা এগারটায় যাত্রা করিলাম। প্রথম আট মাইল খেরাখণ্ডলির পথে আসিয়া বামদিকে তালচরের রাস্তা পাওয়া গেল। গাড়ী ক্রমশ ঢালু রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল, দুই পার্শ্বে অসমতল ধান্য ক্ষেত্র। মাঝে একটি ক্ষুদ্র নদী পড়িল, জল খুব অল্প—গাড়ীতে চড়িয়াই পার হওয়া গেল। কিয়ৎদূর এইভাবে যাইবার পর আমাদের গাড়ী তালচর রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হইল, একজন কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ী থামাইতে বলিলেন। আমাদের অগ্রে একখানি মোটর আসিতেছিল, তাহা হইতে একজন ভদ্রলোক নামিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তালচর যাইতেছি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি রাজার বাড়ী ও রাণী পার্ক দেখিবেন?"— আমরা বলিলাম যে উহা দেখিবার জন্যই যাইতেছি, তখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। ড্রাইভারের কাছে শুনিলাম, ইনি তালচরের রাজা। সাধারণ পোষাক—মাথায় টুপি, গায়ে সিল্কের শার্ট, ও পায়ে জুতো ও পরিধানে কাপড়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলিলেন। ক্রমে আমরা রাজবাড়ীর গেট অতিক্রম করিয়া রাণী পার্কে উপস্থিত হইলাম। রাজা একজন প্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। সে প্রথমে আমাদের একটি সদ্য আগত ভল্লুক বাচ্চা দেখাইলেন এবং খাঁচার ভিতর দুইটা ব্যাঘ্র ও দুইটি সিংহ দেখাইল।

তাহার পর আমাদের মোটর রাণী পার্কস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিল—দেখিলাম কতকগুলি ঘোড়া, জেব্রা ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। আমরা সমস্ত পার্কটি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম—ক্রমে আমাদের গাড়ী পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া কিছু উচ্চে উঠিল—সেখানে রাজার ও রাজার আত্মীয় স্বজনের ও অন্যান্য কয়েকটি মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সে গুলি দেখিবার মত—হঠাৎ দেখিয়া সত্যিকারের মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়। মৃৎ শিল্পের এই সকল নিদর্শন দেখিবার পর আমরা সেই জঙ্গলের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া মোটরযোগে চলিতে লাগিলাম। আর দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরখণ্ড মধ্যে হরিণ, জেব্রা ও অন্যান্য বহু জানোয়ার (অবশ্য বাঘ, সিংহ ও ভল্লুক ব্যতীত) ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহা চিড়িয়াখানা নহে। এই পার্কের পরিধি আট-দশ মাইল হইবে এবং মধ্যে পাহাড় আছে তাহা কৃত্রিম নহে—খানিকটা বন ও পাহাড় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া এই উদ্যান প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক্রমশ আমরা একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলাম ও নানা প্রকার জন্তু জানোয়ার দেখিয়া অবশেষে রাজবাড়ীর জলের পাম্প, ইলেকট্রিক কারখানা ও রাজবাড়ীর বহু মন্দির, সভাঘর ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে পুনরায় গেটের কাছে আসিলাম—এখানে দশ-বারটা হাতী রহিয়াছে দেখা গেল। রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিত ও তাহার অপর তীরে পাহাড়গুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণী নদী তীরস্থ রাজপ্রাসাদটি বড়ই মনোরম। এই পার্কটি অতিক্রম করিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। তারপর এখান হইতে দুই মাইল দূরস্থ তালচর খনি দেখিতে গেলাম। এখানে তিনটি কয়লার খনি আছে, একটি বি-এন-রেলের, দ্বিতীয়টী ভিলিয়ার্স কোম্পানীর এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ মাদ্রাজ রেলের। এখানকার খনিতে বিষাক্ত গ্যাস ওঠে না, আমরা কয়েকজন কয়লার খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে চারি শত ফিট নিম্নে কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দুই-চারি মাইল বিস্তৃত। ইহার কুলি মজুরেরা স্বচ্ছন্দে কেরোসিন কুপী লইয়া কাজ করিতেছে। আমরা অবশ্য গ্যাস ল্যাম্প লইয়া গিয়াছিলাম। ইহার ভিতরে ক্ষুদ্র রেলপথ আছে, তাহাতে কয়লা বোঝাই ট্রাক ইলেকট্রিকে চলিতেছে। মেসিনে কয়লা ভাঙ্গা হইতেছে। অনেক স্থানে ইহার গহ্বরগুলির উচ্চতা ছয় ফিটেরও কম। কাজেই সাবধানে চলিতে হয় নতুবা মস্তকে আঘাত লাগিতে পারে—আর প্রদর্শক না থাকিলে পথ হারাইবারও সম্ভাবনা আছে। ক্রেনে করিয়া একটি লিফ্‌ট উঠিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে একটি নামিতেছে—কলিকাতা শহরে যাহারা লিফ্‌ট-এ উঠিয়াছেন, তাহারা ইহার কতকটা অনুভব করতে পারেন—দুইটি সুবৃহৎ ক্রেন ক্রমাগত দিনের পর



মন্দার-গিরি (স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে এই নাম জানিয়াছি)

দিন চব্বিশ ঘণ্টা এই কাজ করিতেছে। একটিতে কয়লা ওঠে আর অপরটিতে মানুষ ওঠা-নামা করে। সেই চারি শত ফিট নিম্ন হইতে যন্ত্রচালিত পাম্প সাহায্যে উপরে জল উঠিতেছে ও তালচরের খনির কর্ম্মচারী ও কুলিদের জল সরবরাহ হইতেছে, এবং রাস্তায় রাস্তায় ও গৃহে গৃহে ইলেকট্রিক বা বিজলিবাতি জ্বলিতেছে—এই তালচর রেল লাইন অধিক দিন পূর্ব্বে স্থাপিত হয় নাই। খনিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইহার পত্তন হইয়াছে। বৈকাল ৫-১৫ মিঃ ট্রেনে তালচর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং রাত্রি দশটার সময় কটক হইতে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিয়া পরদিন প্রাতে হাওড়া পৌঁছাইলাম। এই দুই মাসে ছয় শত মাইল রেল পথে, পদব্রজে পাঁচ শত মাইল এবং মোটরে পাঁচ শত মাইল,—মোট ষোল শত মাইল বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া বহু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন শরীরের ও মনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বাঙ্গলায় শারদীয়া পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমাদের এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে হিন্দুর ঘরে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রতিপত্তি ও বিস্তারের কথা চিন্তা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। পূজা বলিতে আমরা এই দুর্গাপূজার কথাই বুঝি, অন্য পূজার কথা মনে আসে না। কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক প্রভৃতি নানা পূজার প্রচলন এদেশে থাকিলেও, এই শারদীয়া দুর্গাই সমস্ত বাঙ্গলা দেশের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। 'বাসন্তী'ও তিন দিনের পূজা ; বাসন্তীর রূপকল্পনাও শারদীয়া দুর্গারই অনুরূপ, তথাপি বাসন্তী বাঙ্গলায় প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, সে কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। হয় তো, বর্ষারম্ভের বৈশাখ, বাসন্তী-চৈত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া। এই চৈত্রে ও বৈশাখে বঙ্গদেশে যথাক্রমে চৈতালি ফসল কাটিবার ও ধান্য বপন করিবার সময় বলিয়া গৃহস্থ-বাঙ্গালী সে সময়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে পূজাপালন করিবার সুযোগ পায় না। নয় তো, শরৎ ঋতুর উদারতা গ্রীষ্মসুলভ চৈত্র অপেক্ষা পূজাপার্ব্বণের অধিকতর উপযোগী মনে করিয়া বাঙ্গালী শারদীয়া পূজারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। এমনও হইতে পারে, শক্তির উদ্বোধনই প্রধানতঃ এই শারদীয়া দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য বলিয়া এবং এই আদ্যাশক্তির সহিত তাঁহার পুত্রকন্যা-পরিবৃত পারিবারিক পূর্ণ মূর্ত্তিটির প্রকাশ বলিয়া, গৃহপরিবারপ্রিয় শক্তি-পূজক বাঙ্গালী মনে-মনে ইহারই অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এই শরৎকালেই অকাল-বোধন করিয়া শক্তিলাভের জন্যই এই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া শরতের শক্তি-আরাধনাই বাঙ্গলায় বেশী আদর পাইয়াছে। শ্যামাপূজাও শক্তিপূজা। তাহাও এই দুর্গাপূজারই কাছাকাছি। এবং এই শ্যামাপূজাও প্রচলন হিসাবে দুর্গাপূজারই পরবর্ত্তী। শক্তিপূজক বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিক অভ্যুদয়। বৈষ্ণবধর্ম্মানুগত কীর্ত্তনাদি সেজন্য দেশে প্রসার লাভ করিলেও শক্তিপূজা কিন্তু কমে নাই। অবশ্য দেশের দারিদ্র্যবশতঃ অনেক স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এই মাত্র।

বস্তুতঃ এই দুর্গাপূজার প্রভাব বাঙ্গলায় এমনই প্রবল যে, অনেকেই এক পূজা হইতে অন্য পূজাপর্য্যন্ত মনে-মনে যেন বর্ষগণনা করিয়া থাকেন। 'ভয় নাই, পূজার আগেই দিব,' কিম্বা 'এখন নয়, পূজার পরে'—এই সকল কথা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মাত্র তিন দিনের ব্যাপার হইলেও, এই পূজা যেন সমস্ত বৎসরের মধ্যে একটি প্রাচীর বা পরিখা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মাত্র তিনটি দিনের ব্যবধান হইলেও, 'পূজার আগে' ও 'পূজার পরে' বলিতে যেন সময়ের একটা বিশেষরূপ পার্থক্য বুঝায়।

কবে এই পূজা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের সময়ে কি সুরথ রাজার সময়ে, সে আলোচনা বিশেষজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের বিচার্য্য। আমরা শুধু এইটুকু বুঝি ও জানি—এই দুর্গাই সমগ্র বঙ্গদেশের আরাধ্য দেবতা। যে প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে পারিল, সে ধন্য। যে তাহা পারিল না, ঘটা করিয়া না হউক, সেও ঘট ভরিয়া পূজা সারিল। তাহাও যাহার সাধ্যে নাই, সে দুর্ভাগ্যও কুটীরাঙ্গনে কেবলমাত্র আলিপনা আঁকিয়া ও জলপূর্ণ মৃৎকলসে আম্রপল্লব মাত্র সাজাইয়া মনে-মনে মা-দুর্গার মানসিক সেবা সারিয়া লইল।

দুর্গার কল্পনা ও দিব্যমূর্ত্তি অতিশয় চিত্তগ্রাহিণী। একাধারে সব দিক দিয়া চিত্তবৃত্তি ও ভাবের সেবা করিবার যোগ্য এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূজা আর নাই। রুচি, কল্পনা ও কারুকলার দিক্ হইতেও ইহার জোড়া মেলে না। একই সঙ্গে শিব, শক্তি, সিদ্ধি, শান্তি, বিজয়, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের আরাধনাও অন্যত্র দুর্ল্লভ। কমলাকান্তের অপূর্ব্ব দুর্গোৎসবে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। মানুষের সকল উচ্চবৃত্তি, কামনা ও আদর্শ এখানে চরিতার্থ।

বাঙ্গলাদেশের সমস্ত নরনারীর অন্তরে কোনো-না-কোনো দিক্ দিয়া এই পূজা সার্থকতা লাভ করে। যাহার ঘরে পূজা, সেখানে তো আনন্দের উৎসব পড়িয়া যায়। এই পূজায় প্রবাসপ্রত্যাগত আত্মীয়-মিলনের যে শুভ সুযোগ উপস্থিত হয়, সমস্ত বঙ্গবাসীরই ইহা পরম কাম্য। সকলেই এই বৎসরান্তের আনন্দ-মিলনের আশায় অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। যাহার ধন আছে, মন নাই, সেও এই পূজার সুদীর্ঘ অবকাশে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। যে দীনদরিদ্র, তাহার ঘরের বালকবালিকারাও বৎসরের মধ্যে এই সময়ে একবার মাত্র একখানি নূতন বস্ত্র লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠে। ভিক্ষা বা ধারকর্জ্জ করিয়াও তাহার গৃহে সেদিন নূতন আহার্য্যের যথাসাধ্য ব্যবস্থা হয়। যে অভাগার ভাগ্যে তাহাও দুর্ল্লভ, সেও সেদিন সপরিবারে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দর্শন করিয়া ও প্রসাদ পাইয়া আনন্দ-ময়ীর আগমনের কথঞ্চিৎ আভাষ লাভ করে। দরিদ্র চাষীর ঘরেও সেদিন আনন্দের ইঙ্গিত। ধান্যাদি শারদীয় শস্যের পুষ্টির সঙ্গে সেদিন তাহারও আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন বাড়িয়া উঠে। বাঙ্গলার বাতাসে সেদিন আনন্দের হিল্লোল, বাঙ্গলার মাটীতে সেদিন আগমনীর উল্লাস, বাঙ্গলার নদ-নদীতে সেদিন বিজয়ার কল্লোল ধ্বনিত হইয়া উঠে।

স্বভাবতই এই শরৎকাল সুন্দর। সুশুভ্র সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে—চারিদিকে সৌন্দর্য্যের বিকাশ। বর্ষার বারিধারায় কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথ আজ বিশুষ্ক। দুঃসহ গ্রীষ্মাবসানের নাতিশীতোষ্ণ বাতাসে দেহমনে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস। নদী-তড়াগের বক্ষে আজ সুপরিষ্কৃত স্বচ্ছতা। গৃহে গৃহে গৃহাঙ্গনে অযত্ন-পালিত শেফালিকা-বৃক্ষে অজস্র পুষ্পসম্ভার। সরোবরে কুমুদকহ্লারকোকনদের অফুরন্ত শোভা। বর্ষাবাসের কুলায়-কোটর ত্যাগ করিয়া সৌরকরোজ্জ্বল আকাশে পক্ষিগণ পক্ষবিস্তার করিয়া আজ সঙ্গীতমুখর।

পূর্ব্বে এই শরৎকালে দিগ্বিজয়ের দিন ছিল। শক্তি-মায়ের পূজা শেষ করিয়া শরতের পরিশুষ্ক পন্থায় রাজা-রাজড়ারা দিগ্দেশ জয় করিতে বাহির হইতেন। ইহ-জগতের অধিকাংশ সুখের আকরই শক্তি। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। এমন যে আত্মা, তাহাও বলহীনের জন্য নহে। আজ বাঙ্গালী বলহীন, দুর্ব্বল। সে সত্যকার শক্তিসেবা ভুলিয়াছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যেদিন এই আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনায় সমুদয় বঙ্গপল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। বিজয়ার রাত্রে বা পরবর্ত্তী প্রভাতে গুরুলঘু নির্ব্বিচারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আলিঙ্গন ও যথাযোগ্য সম্ভাষণের আদান-প্রদানও এক অভিনব আনন্দময় ব্যাপার ছিল। বিসর্জ্জনের সদ্য ব্যথা ইহাতে যেন অনেকটা ভুলাইয়া দিত। এই বিজয়ার পরে গৃহস্থের গৃহাঙ্গনেও আমরা পল্লীতে পল্লীতে লাঠিখেলা দেখিয়াছি। সেদিন আর নাই। গ্রামে গ্রামে দেশশাসনের কল্যাণে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়া দেশকে শ্রীহীন স্বাস্থ্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালীও আর সে বাঙ্গালী নাই। তাহার বুকে সে প্রাণ নাই, মুখে সে গান নাই। তবু পূর্ব্বের সেই স্মৃতি ও রীতি আজিও তাহার মজ্জাগত হইয়া আছে। তাই, এই শরতের শারদীয়া অদ্যাপি বঙ্গগৃহে দরিদ্রের প্রাণের পূজা পাইতেছে। তাই, ইহার এত প্রভাব। সত্যকার শক্তি-সাধনায়, 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে' বলিয়া ডাকিয়া আবার এই প্রভাব বাড়াইতে হইবে।

আরো একটি কথা এবং তাহাই বোধ করি, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। যাহা এই উৎসবের প্রাণ, যাহা এই কোমলচিত্ত বঙ্গবাসীর বিশিষ্ট আকর্ষণ, তাহা হইতেছে এই অনুষ্ঠানের সত্যকার আভ্যন্তরিক মানবতা, ইহার অন্তরের দিক্। বঙ্গগৃহে গৃহিণীই গৃহকর্ত্রী—গৃহিণীই গৃহ। দুর্গাপূজার এই অন্তরের দিক্‌টাই একান্তভাবে তাহার চিত্ত স্পর্শ করে। মেয়ের প্রতি মায়ের যে স্নেহ অপরিসীম, সেই স্নেহধর্ম্মই এই উৎসবের মধ্যে যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। মা-মেনকার আনন্দদুলালী উমা শ্বশুরঘর হইতে তিনটি দিনের জন্য পিতৃ-গৃহে আসিতেছেন। ইহা যেমন আনন্দময়, তেমনি করুণ। পিতৃগৃহের স্বল্পকালস্থায়ী আনন্দ-কারুণ্যই আগমনীগানে মুখরিত। শাশ্বত-জননীর সহিত শাশ্বত-কন্যার এই সাম্বৎসরিক মিলনমাধুর্য্যই এই দুর্গাপূজাকে বাঙ্গালীর অন্তরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গগৃহের এই মধুময়ী স্নেহরসধারাই এই দুর্গাপূজাকে নিত্যপ্রাণে সঞ্জীবিত ও নিত্যগানে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই তিন দিনের পরে বিদায় দিতে হইবে জানিয়াও মা-মেনকার মুখের—

এবার আমার উমা এলে আর আমি পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ (আমি) কাউরি কথা শুনব না॥

বাঙ্গলার সমস্ত মাতৃহৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তাই, এই শারদীয়া দুর্গাপূজা বাহিরের পূজাড়ম্বর মাত্র নহে, অন্তরের আনন্দ-বেদনার নিত্যকার ও সত্যকার পূজা। তাই, ইহার প্রসারও তেমনি অধিক।

এবং

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সার্জ্জারির প্র্যাক্‌টিকালের সঙ্গে ফাইনালে এম-বি পরীক্ষার পালা শেষ করিয়া সত্যেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল মেডিকেল কলেজের বাহিরে—কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে।

পরীক্ষা মন্দ হয় নাই! মন এতদিন চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন ছিল, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সে ভার ঠেলিয়া মনে সেঁধ দিতে পারে নাই। এখন পথে আসিয়া সত্যেন্দ্র দেখিল, বাতাস তেমনি বহিতেছে; গোলদীঘির কোণে গোল্ড-মোহরের গাছ অজস্র লাল ফুলে আলো হইয়া আছে; ট্রামে-বাসে জীবনের তেমনি কলরব!

খাঁচার পাখীকে সহসা খাঁচার বাহিরে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন প্রথমে স্তম্ভিত থাকে, পরে মুক্তির উল্লাসে মাতিয়া ওঠে, সত্যেন্দ্রর মন তেমনি ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিবার পর চারিদিককার জীবন-প্রবাহে আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিতে চাহিল।

সামনে যে-বাস পাইল, কোনো-কিছু না ভাবিয়া একেবারে তাহাতে সে চড়িয়া বসিল এবং আসিয়া নামিল এস্‌প্ল্যানেডে। বাস হইতে নামিবামাত্র একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পাইল। হ্যাণ্ডবিল পড়িল। ছাপা আছে—

> আতুর-আশ্রম-নির্ম্মাণের
> সাহায্য-কল্পে
> এম্পায়ার থিয়েটারে
> শনিবার ৮ই মে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়
> ভদ্র-মহিলাদের নৃত্য-গীত—মণিপুরী ম্যাজিক—
> রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয়—
>
> চৌরঙ্গীর টেম্পল্ হাউসে
> অগ্রিম সীট্ রিজার্ভ করুন

সামনেই টেম্পল হাউস। সত্যেন্দ্র গিয়া সেখানে ঢুকিল এবং অগ্রিম পাঁচ টাকা ফেলিয়া সীট কিনিল—একেবারে সামনের চেয়ার।

ভাবিল, এতদিন যেন কোন্ নিরালা অন্ধকূপে পড়িয়াছিল, আজ আলোর দেখা পাইয়াছে!

কিন্তু ৮ই মে'র এখনো দুদিন বাকী! এ দুটো দিন কি করিয়া কাটাইবে?

সত্যেন্দ্র গেল এলফিনষ্টোন্ পিকচার প্যালেসে।…

৮ই মে।

সাড়ে পাঁচটা বাজিতেছে, সত্যেন্দ্র আসিল এম্পায়ারে।

প্রমোদ-বিলাসী সৌখীন লোকে লোকারণ্য। গাড়ীর ঘটা, পোষাকের ঘটা, সাজসজ্জার ঘটা, রূপ-মাধুরীর ঘটা! সে-ঘটায় চোখ ঝলসিয়া যায়, মন ঠিকরিয়া পড়ে!

আট আনা দাম দিয়া প্রোগ্রাম কিনিয়া সত্যেন্দ্র ঢুকিল অডি-টোরিয়ামে।

গাঢ় লাল রঙের মোটা মখমলের পর্দায় ওদিকটা ঢাকা। সত্যেন্দ্রর মনে হইল, ঐ পর্দার আড়ালে আলো-হাসি-সুরের লহর বহিবে…কত আশা…কত আনন্দ…

মানুষের রক্ত-পূঁয ঘাঁটিয়া দিন কাটাইলেও সত্যেন্দ্রর মন আর্টিষ্টের ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে। সে গান গায় চমৎকার—বাজায় ভালো এবং মেডিকেল কলেজের নাটক অভিনয়ে বহুবার নায়িকা সাজিয়া গম্ভীর ডাক্তার-দর্শকদের সে বিমোহিত করিয়াছে! অর্কেষ্ট্রার সুরে-সুরে মঞ্চের পর্দা উঠিল এবং প্রমোদ-লীলা সুরু হইল।

তিন-চারিটা নাচ-গানের পর্ব চুকিলে পঞ্চম পর্ব্বে গান গাহিতে বসিলেন এক কিশোরী…চমৎকার গান! যেমন কণ্ঠ, সুরের উপর তেমনি অনায়াস-অধিকার! সুরগুলাকে লইয়া খেলাইতেছেন—আশ্চর্য্য কৌশলে!

কিশোরী গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান—

> আমার মল্লিকা-বনে
> যখন প্রথম ধরেছে কলি—
> তোমার লাগিয়া তখনি বন্ধু,
> বেঁধেছিনু অঞ্জলি…

গানের সুরে-ভাষায় সত্যেন্দ্র ভুলিয়া গেল, পাঁচ টাকার টিকিট কিনিয়া দর্শকের আসনে বসিয়া সে রিহার্শাল-দেওয়া গান শুনিতেছে! আবেশে তার দু'চোখ মুদিয়া আসিল। মনে হইল, কোন্ মল্লিকা-বনে প্রথম-জাগা ফুলগুলি লইয়া কে যেন তাহারি জন্য অঞ্জলি রচিয়াছিল…যেন সে অঞ্জলির দাম ভুলিয়া চলিয়া আসিয়াছে বনের গান অবসান হইবার আগেই…

সহসা চট্‌পট্ করতালি-ধ্বনিতে তার আবেশ গেল ভাঙিয়া। চোখ মেলিয়া সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে, ষ্টেজের উপরে পর্দা পড়িয়া গেছে। সুরের যে রেশ জাগিয়াছিল, অশান্ত কিছু দর্শকের দল করতালির বিকট শব্দে সে আবেশটুকু ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে!

সত্যেন্দ্র প্রোগ্রাম খুঁজিল—কে এ সুরের পরী?…

প্রোগ্রামে নাম নাই। শুধু লেখা আছে—

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—শ্রীমতী···

বুক ভরিয়া নিশ্বাসের উচ্ছ্বাস!

ষ্টেজে তখন মণিপুরী-ম্যাজিক সুরু হইয়াছে। পাঁচটা পায়রা কাটিয়া চোখের-সামনে সেই কাটা-পায়রার ধড়ে বেঁটে-খাটো ম্যাজিশিয়ান কাকের মুণ্ড আঁটিয়া দিয়াছে···পায়রা সে 'বকুবম্'-বুলি ঘুচিয়া 'কাকের'-সুরে 'কা'-'কা' কর্কশ রব তুলিয়াছে···দর্শকের দলে তেমনি বিকট করতালির শব্দে ম্যাজিকের তারিফ করিতেছে!

এ-করতালি সত্যেন্দ্রর বুকে বাজিতেছিল, ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষের মতো। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, হারে মূঢ়ের দল,—সেই গান আর এই ভেল্‌কিকে সমানভাবে তারিফ করিয়া এ বর্ব্বরতা-প্রকাশে তোমাদের লজ্জা হয় না?···

একটার পর আর একটা পালা বহিয়া চলিল চলন্ত মটরের মতো! ফাঁক নাই যে ভালোর রেশ দু'দণ্ড মনকে আচ্ছন্ন রাখিবে! ভালো-মন্দ মিশিয়া এ যেন তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছে!

ইন্‌টারভালের সময় সত্যেন্দ্র ভাবিল, আর নয়। এবারে সরিয়া পড়া যাক! উঠিয়া সে আসিল থিয়েটার-বাড়ীর লবিতে। সেখানে বেশ ভিড়···ষ্টেজের ভিতরকার সঙ্গে বাহিরের মিলন ঘটিয়াছে। দু-চারজন রঙমাখা মেয়ে-আর্টিষ্ট আসিয়া বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপ করিতেছে!···

সিঁড়ির উপরে সত্যেন্দ্রর চোখ পড়িল···

হাসি-কলরবের ঝলক বহিতেছে।

···সেই সুর-পরী না? তাই···

মুগ্ধ নয়নে সত্যেন্দ্র চাহিয়া রহিল তার পানে···

এক বান্ধবীর সঙ্গে পরী কথা কহিতেছিল। সত্যেন্দ্র সে-কথা শুনিল। পরী বলিতেছিল—শেষে আমাকে আর একখানা গান গাইতে হবে, ভাই···প্রোগ্রামে নেই···সকলের অনুরোধ।

বান্ধবী বলিল—প্রোগ্রামে নাম দিস্‌নি কেন?

হাসিয়া পরী বলিল—আমি নাম বাজাতে চাই না ভাই। I hate the idea···

বান্ধবী বলিল—তোর গান কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল···কারো মন নয়···

হাসিয়া পরী বলিল—থাম্, থাম্—তুই চিরদিন আমাকে flatter করিস্!···ভালো কথা, ম্যাজিক কেমন দেখলি?

বান্ধবী বলিল—চমৎকার! কি করে' করে ভাই?

পরী বলিল—আগাগোড়া ফাঁকি! ধেৎ···

পরী চাহিল সত্যেন্দ্রর পানে···সে দৃষ্টিতে যেন অগ্নিশিখা! অপ্রতিভ হইয়া সত্যেন্দ্র সরিয়া গেল···পথের দিকে।

পরক্ষণে ভাবিল, না, পরী আর একখানি গান গাহিবেন—সবশেষে। ···সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে আবার আসিয়া অডিটোরিয়ামে ঢুকিল।···

পর্দা উঠিল। অতি-সাধারণ কতকগুলা নাচ-গান-বাজনা···

তারপর আবার সেই পরীর গান···

পরী গাহিল—

তবু মনে রেখো—
যদি দূরে যাই চলে, তবু মনে রেখো!
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়
নব প্রেম-জালে।

সত্যেন্দ্র মুগ্ধ, তন্ময়···এমন ভালো গান সে কোনোদিন শোনে নাই···

পরী গাহিতেছিল—

যদি পড়িয়া মনে,
ছল-ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে
তবু মনে রেখো।

চক্ষু মুদিয়া সত্যেন্দ্র মনে মনে বলিল,—রাখিব! মনে রাখিব! চিরদিন মনে রাখিব!···

যবনিকা পড়িলে সত্যেন্দ্র আসিয়া লবিতে দাঁড়াইল। দলে-দলে লোক চলিয়াছে···গা ঘেঁষিয়া, ধাক্কা দিয়া, গায়ের উপর দিয়া···যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলিয়াছে! এবং শেষ ঢেউ চলিয়া গেলে···

ঐ পরী···সঙ্গে আরো চারজন লোক···দুজন তরুণ পুরুষ···দুজন তরুণী···কথা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে···পরীর হাতে রাশীকৃত ফুল··· সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া দেখিল···

থিয়েটার ছাড়িয়া ক'জনে পথে চলিয়াছে···চৌরঙ্গীর দিকে।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক'জনে চেতনা-হারা···

পরীর হাত হইতে পথে কি ও পড়িল?···পরীর হুঁশ নাই! কাহারো হুঁশ নাই···সত্যেন্দ্র ছুটিয়া পথে আসিল।

ভ্যানিটি ব্যাগ!···তুলিয়া হাতে লইল, ভারী। ব্যাগ লইয়া সত্যেন্দ্র চলিল পরীর পিছনে···

কি বলিয়া ডাকিবে? কি বলিয়া দিবে? পিছন-পানে চাহিয়া দেখে না···ঘুরিয়া সে আসিল সামনে···ব্যাগটা দেখাইয়া কহিল— আপনার ব্যাগ!

বলিতে গিয়া কথাটা গেল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া···

পরী দাঁড়াইল···চমকিয়া উঠিল। বলিল—আমার ব্যাগ··· কোথায় পেলেন?

পরীর মুখে মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কম্পিত স্বরে সত্যেন্দ্র বলিল,—পথে পড়ে গিয়েছিল···

—ও···থ্যাঙ্কস···

ব্যাগ লইয়া পরী আর সত্যেন্দ্রর পানে চাহিল না, সঙ্গীদের উদ্দেশে বলিল—কোথায় গাড়ী রেখেছো'চারুদা?

সঙ্গী বলিল—গ্রাণ্ড-হোটেলের সামনে!···

—বাবাঃ!···

ছোট কথাটুকু বলিয়া পরী মোড় বাঁকিয়া চৌরঙ্গীর ফুটপাথে উঠিল।

মোড়ে দাঁড়াইয়া সত্যেন্দ্র রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল…সে একগা ঘামিয়াছে !…

সত্যেন্দ্র গিয়া মাঠে বসিল। জ্যোৎস্নায় দিক ভরিয়া আছে। আকাশে মেঘ নাই…নক্ষত্র-সভায় হাসির ঝিকিমিকি…

সত্যেন্দ্র যেন স্বপ্ন দেখিতেছে ! সুরের স্বপ্ন ! জ্যোৎস্নায় সেই সুর… জ্যোৎস্না গাহিতেছে—

তবু মনে রেখো…
যদি দূরে যাই চলে…মনে রেখো…

শুধু মনে রাখিবার জন্য করুণ-কাতর নিবেদন ! সত্যেন্দ্র গাহিল আপন-মনে—মনে রেখো…মনে রেখো…

মনে রাখিয়া লাভ ? একবার এই দেখা…জীবনে আর কখনো দেখা হইবে, সে আশা নাই ! কি করিয়া দেখিবে ? চেনে না, নাম জানে না…অসম্ভব।

সহরের পথে কলরব ক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল…শ্রান্ত সহর !…

সত্যেন্দ্র ভাবিল, পাগলের মতো এ সে কি ভাবিতেছে ! কোথাকার কে কিশোরী…! না…না…না ! মনকে বলিল—পাগল !

মন বলিল, কিন্তু চমৎকার। দেখিতে যেমন সুন্দর…তেমনি সুন্দর গান গায় !

রাত্রে ঘুমের ঘোরে এম্পায়ারের সেই ষ্টেজ…স্বপ্ন-মায়ায় ভরিয়া কতবার আসিয়া মনের উপরে চাপিয়া বসিল…ষ্টেজের উপরে আলোর পাহাড় ! আর সে পাহাড়ের গা বহিয়া ঝরিতেছে সুরের লহর !

সকালে চিঠি পাইল। বাবা লিখিয়াছেন—

আমার ছুটী হইয়াছে। আমি কাল ষ্টার্ট করিয়া পরশু কলিকাতায় পৌঁছিব। পরের দিন বাহির হইব শিলঙ। তুমি প্রস্তুত থাকিবে।

ভালো…ভালো…সহরের এ সুরের হাওয়ায় এখন আর বাস করা সম্ভব নয় ! পাগল হইয়া যাইবে।

বাবা নিত্যগোপাল বাবু লক্ষ্ণৌয়ের প্রোফেসর। রসায়নে এত বড় বাঙালী পণ্ডিত স্যর প্রফুল্ল রায়ের পরে আর দেখা যায় নাই। দেশী গাছ-গাছড়া হইতে যে সব ঔষধ তৈয়ার করিয়াছেন, জার্ম্মানী-আমেরিকা পর্য্যন্ত তাদের গুণে জয়-জয় করিতেছে !

নিত্যগোপাল বাবু আসিলেন। বলিলেন,—তুমি আগে বেরিয়ে পড়ো। ছোটখাট একটা বাঙলো ঠিক করো গিয়ে…বেশ ভালো জায়গা দেখে। দশ-বারো দিন পরে আমি যাবো…স্যর পি-সি রায়ের সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ আছে। মানে, একটা খট্‌কা লাগছে, তাই তাঁকে ধরে সে খট্‌কার মীমাংসা করবো !

সত্যেন্দ্র একা চলিল শিলঙ। মশমা-ফলশের পিছনে বাঙলো মিলিল। ঘরে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া পাহাড় দেখা যায়—বন-গিরি-নির্ঝর দেখা যায়।

আহার আর নিদ্রা—এ দুই কাজের জন্য বাঙলো। বাকী সারা সময়টা সত্যেন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়। দৃশ্য-বৈচিত্র্যে কলিকাতার সেই সুর-পরীর ছায়া মাঝে মাঝে মিলাইয়া যায়…

সেদিন গিয়াছিল নংক্রেমের দিকে। দু-চারিটা ছোট পাহাড় ঘুরিয়া বাড়ীর পথে ফিরিতেছে, সহসা কানে বাজিল গানের কলি…

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধলো অকারণে !

এ গলা যেন বড় চেনা ! কে গায়…এ বন-গিরিতে ?

গানের স্বর লক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্র আসিল একটা ঝোপের কাছে…

একখানা বড় পাথর। তার উপরে বসিয়া…

সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিল,…এ যে সেই পরী !…কোনো ভুল নাই। এ রূপ, এ-কণ্ঠ দুনিয়ায় আছে শুধু একজনের।…এবং সে-জন…

আবেগের উচ্ছ্বাসভরে সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি এখানে !

পরীর গান থামিয়া গেল। ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রর পানে চাহিয়া পরী কহিল—আপনি ভুল করচেন !…আপনাকে আমি চিনি না।

যে-কণ্ঠে অমন ভুবন-ভুলানো সুর…এমন কঠিন বাণী সে কণ্ঠে !

সত্যেন্দ্র ভড়কাইয়া গেল।

পরী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল…

সত্যেন্দ্র কহিল—ক্ষমা করবেন।…কিন্তু আমার ভুল হয়নি। কিছুদিন আগে এম্পায়ারে আপনার গান শুনেছি…রবীন্দ্রনাথের সেই 'মনে রেখো' গান…

এ কথায় পরীর দৃষ্টি আবার এদিকে ফিরিল…সে দৃষ্টিতে সংশয়… বিরক্তি…

সত্যেন্দ্র বলিল—হঠাৎ দূর থেকে গান শুনলুম…মনে হলো, সেই গলা…তাই এসেছিলুম…

পরী কহিল—তামাসা দেখতে !…কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, এম্পায়ারে আমার গান শুনেছিলেন টাকা দিয়ে টিকিট কিনে…

সত্যেন্দ্র অবাক !

পরী কহিল—এখানে আমি কাকেও শোনাবার জন্য গান গাইচি না —এবং সে-গান শোনাতে টিকিট বেচ্‌তে বসিনি !…আমি গান গাইচি বনে বসে একা…কোনো ভদ্দর লোক যে আমার এ 'প্রাইভেসি'র মর্য্যাদা রক্ষা করবে না, এ কথা আমার মনে হয়নি…

কথায় রোষের ছিটা ! কথা বলিয়া পরী জুতা টানিয়া পায়ে দিল—দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যেন্দ্রকে যেন সে চাবুক মারিল ! তেমনি যাতনা বহিয়া সে কহিল—আমাকে ক্ষমা করবেন। অভদ্র কৌতূহল নিয়ে আমি এখানে আসিনি আপনার নির্জ্জন-বিশ্রামসুখে ব্যাঘাত দিতে !…আপনাকে যেতে হবে না…আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসুন…আমিই চলে যাচ্ছি !…

পরী একবার কঠিন ভঙ্গীতে সত্যেন্দ্রকে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিল, পরে বলিল—এ আমার কেনা জায়গা নয়। আমার সুবিধের জন্য

আপনিই বা কেন এখান থেকে চলে গিয়ে মহত্ত্ব দেখাবেন, বুঝি না !··· আর আপনাকে চলে যেতে বলবো আমার স্বার্থে···এমন অভদ্র আমি নই সত্যি···

এ কথার উত্তরের জন্য সত্যেন্দ্রকে কোনো সুযোগ না দিয়া পরী দ্রুত পায়ে সেখান হইতে চলিয়া গেল !

সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল···নিস্পন্দ···যেন কাঠের পুতুল !···

তারপর মনকে নাড়া দিয়ে বলিল, পরীর কথা ভুলিয়া যাও ! যাকে ভাবিতেছ, মণি—সে মণি নয়—অগ্নিশিখা !

সেদিন সত্যেন্দ্র গিয়াছিল দিংগাই হিলে। পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিতে দেখা আবার সেই পরীর সঙ্গে !

পরী চুপ করিয়া বসিয়া আছে—ওদিকে বহুদূরে হিমগিরির তুষারশির দেখা যাইতেছে···তাহারি পানে চাহিয়া।

পরীকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র ফিরিল—বেটক্করে একটা পাথরে হুঁচোট লাগিল। ছিটকাইয়া সে পড়িয়া গেল অগভীর এক গহ্বরে।

পতন-শব্দে পরী চাহিয়া দেখিল ; দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সত্যেন্দ্র তখন গহ্বর ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছে।

অপাঙ্গদৃষ্টিতে হাসির মৃদু বিদ্যুৎ ছিটাইয়া পরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সত্যেন্দ্র বলিল—আমি আজ আপনার পথে আসিনি···আপনি এসেছেন !

—তার মানে ?

পরী ফিরিয়া চোখের অবিচল দৃষ্টি সত্যেন্দ্রর মুখে নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল,—মানে, আমি এখানে এসেছি বেলা দুটোয়। পাহাড়ের উপরে ছিলুম···এখন নেমে আসছিলুম।

পরী কহিল—আমায় দেখে ?

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনাকে দেখলুম এখানে এসে।···কিন্তু একটা কথা না বলে' থাকতে পারছি না···

—বলুন···

—এ পথে একলা এসে ভালো করেন নি ! একটা খাশিয়া মদ খেয়ে দুদিন আগে একজনকে মারধোর করে তার পয়সা-কড়ি আর তার স্ত্রীর গহনা কেড়ে নিয়েছে।

পরী কহিল—আমি একলা আসিনি !

ও !

সত্যেন্দ্রর বুকের উপরে কে যেন মুগুর মারিল !···তাহা হইলে···

সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

পরী কহিল—আপনি পড়ে গেছলেন···হাঁটুর নীচে কেটে গেছে, দেখছি।

হাঁটুর নীচে জ্বালা করিতেছিল—এতক্ষণে সত্যেন্দ্রর হুঁশ হইল। চাহিয়া দেখিল, খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

সত্যেন্দ্র কহিল—ও কিছু নয়···

পাহাড়ের গা বহিয়া ছোট্ট নির্ঝর-রেখা···

সত্যেন্দ্র এ-কথায় 'না' বলিতে পারিল না। জল লইয়া ক্ষত ধুইল।

পরী কহিল—আপনি শিলঙে থাকেন ?

—না। বেড়াতে এসেছি।···আপনিও বোধ হয় বেড়াতে এসেছেন ?

পরী কহিল—হ্যাঁ।···

তারপর সে চাহিল পাশে পাহাড়ের পানে, কহিল—আপনি পাহাড়ে চড়েছিলেন ?

মাথা নাড়িয়া সত্যেন্দ্র জানাইল, হাঁ।

পরী কহিল—আমিও চড়বো ভেবেছিলুম···কিন্তু একা···সাহস হলো না।

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি যে বললেন, একা এসেছেন···

সত্যেন্দ্রর মুখে-চোখে কৌতুকের মৃদু হাসি।

পরী জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—জেরা করচেন !···না, আমি একলা আসিনি। এসেছি বিশুদার সঙ্গে···বিশুদা গেছে একজোড়া জুতোর সন্ধানে। নাগরা-পায়ে দিয়ে পাহাড়ে ওঠা উচিত নয়। ওদিকে খাশিয়া-বস্তীতে জুতো পাওয়া যায়। বিশুদা বললে তাই একজোড়া কিনতে গেছে···একপাটি নাগরা নিয়ে গেছে বিশুদা···দেখচেন না একপাটি নাগরা এখানে পড়ে আছে ?

পরীর পায়ের পানে সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে নাই—এখন চাহিল। পদ্মের মতো পা···পায়ের তলা অলক্ত রাগ রাঙানো !

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি পায়ে আলতা দেন !

পরী কহিল—কেন দেবো না বলতে পারেন ? আমি বাঙালীর মেয়ে···ফিরিঙ্গি নই।

সত্যেন্দ্র কহিল—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—করতে পারেন। তার জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা

সত্যেন্দ্র কহিল—মানে, আপনি সব সময়ে আমার উপর এত রাগ করেন কেন ? আমি আপনার সঙ্গে কোনো অশিষ্ট বা অভদ্র আচরণ করেছি বলে' তো মনে পড়ে না। বরং···

পরীর চাহনিতে বক্র ভাবের আভাস···দেখিয়া সত্যেন্দ্র চুপ করিল।

পরী কহিল—বলুন কথাটা শেষ করুন···থামলেন কেন ?

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনি যে রাগ করচেন···

পরী কহিল—ও আমার স্বভাব। খুশী হলেও আমি সময়ে-সময়ে রাগ করি···

সত্যেন্দ্র কহিল—ভারী আশ্চর্য্য স্বভাব তো আপনার !

পরী কহিল—আমার সমালোচনা করবেন না···কি বলবার আছে, বলুন···আমি আর বেশীক্ষণ এখানে থাকবো না···বেলা পড়ে আসছে··· বাড়ী ফিরতে হবে···

সত্যেন্দ্র কহিল—আপনার বিশুদা এলে তবে তো ফিরবেন···

পরী কহিল—আপনাকে সব কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি ?···

না, আমি যদি বিশুদা ফিরে আসার আগেই ফির—আপান বাধা দিতে পারেন ?

সত্যেন্দ্র কহিল—কিন্তু ঐ একপাটি জুতো পায়ে দিয়ে…?

পরীর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল…ঝঙ্কার তুলিয়া পরী কহিল, যদি শুধু পায়েই ফিরি, কি করতে পারেন আপনি ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে নাগরার পাটি হাতে তুলিয়া পরী সেটা সবলে নিক্ষেপ করিল পাহাড়ের দিকে…

সত্যেন্দ্র অপ্রতিভ হইল, কহিল—দেখচি, আমার সঙ্গে আপনার কুক্ষণে দেখা…আমার জন্য এ লোকসান করবেন, আমি তা সহ্য করবো না…এতে আপনি যত রাগই করুন…

এই কথা বলিয়া সত্যেন্দ্র চলিল নাগরা কুড়াইবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে।

নাগরা লইয়া ফিরিবার সময় দেখে, আর একপাটি নাগরা পথে পড়িয়া আছে—তলার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে। সে পাটি কুড়াইয়া দু'পাটি মিলাইয়া দেখিল…ইহারি জুড়ি !

সত্যেন্দ্র চাহিল পরীর পানে…পরী এই দিকেই চাহিয়াছিল…

সত্যেন্দ্র এদিকে আসিতেছে দেখিয়া পরী ছুটিল…শুধু-পায়ে নুড়ি-কাঁকরের উপর দিয়া…

সত্যেন্দ্র কহিল—ছুটবেন না…পথ ভালো নয়।

সে কথা কে শোনে ? কাজেই সত্যেন্দ্রকেও ছুটিতে হইল।…

উঁচু-নীচু পথ—নুড়ি-কাঁকর-কাঁটায়-জঙ্গলে ভরা…

পরী পারিল না…পায়ে কাঁটা ফুটিল। 'উঃ' বলিয়া সে বসিয়া পড়িল মাটীর উপরে ডান-পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া…

সত্যেন্দ্র কাছে আসিল, কহিল—পায়ে লাগলো তো! শুধু-পায়ে আপনাদের চলা অভ্যাস নেই…

পরী কথা কহিল না…পায়ের পানে চাহিয়া মাথা নামাইল।

সত্যেন্দ্র কহিল,—দেখি,…আমাকে দেখতে দিন…

পরী কহিল, আপনার জন্যেই তো হলো…

—আমার জন্য ! সত্যেন্দ্রের স্বরে বিস্ময়…এবং সঙ্কোচ।

পরী কহিল,—নিশ্চয়।…আপনি আমায় মিথ্যাবাদী ভেবেচেন তো…

সত্যেন্দ্র কোনো কথা কহিল না…চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি…সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…

তার পর কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কোনো কথা নাই। পরী শেষে এ নীরবতা ভঙ্গ করিল, বলিল,—পায়ে কাঁটা ফুটেছে…মস্ত বড় কাঁটা…

সত্যেন্দ্র কহিল,—তাইতো বলছি, আমায় দেখতে দিন…তুলে দিতে পারবো…

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরী চাহিল সত্যেন্দ্রর পানে…

সত্যেন্দ্র কহিল,—ও বিদ্যা আমি জানি…ছ'বছর মেডিকেল কলেজে পড়েছি…

পরী কহিল,—আপনি ডাক্তার ?

তার স্বরে বিস্ময়ের রাশি!

সত্যেন্দ্র কহিল,—হ্যা…

দু'চোখে শ্রদ্ধা…পরী কহিল,—আমি ভেবেছিলুম…

—কি ভেবেছিলেন ?

লজ্জায় পরী মুখ নামাইল…মুখে ফুটিল রক্ত গোলাপ। সত্যেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল।

পরী বলিল—না, আমি তা বলবো না…

সত্যেন্দ্র বলিল—বেশ, ইচ্ছা না হয়, বলবেন না…কিন্তু পা দেখতে দিন আমায়…বেলা পড়ে আসছে। হেঁটে ফেরা ভিন্ন উপায় নেই…অন্ততঃ ঐ খাসিয়া বস্তী পর্য্যন্ত…

পা মেলিয়া দিতে হইল…সত্যেন্দ্র পা ধরিয়া কাঁটা তুলিয়া দিল…

তার সারা অঙ্গে বিদ্যুতের প্রবাহ…পরী লজ্জায় এতটুকু !

কাঁটা বাহির হইল…এত বড় কাঁটা ! কাঁটাটা সত্যেন্দ্র ভালো করিয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল—বেশ বড় কাঁটা…

বলিয়া কাঁটাটা রাখিল জামার পকেটে…

পরী কহিল,—ও কি ! গায়ে ফুটে যাবে যে…ডাক্তার বলে' কাঁটা তার ফোটানোর ধর্ম্ম ছাড়বে না তো…

সত্যেন্দ্র কহিল,—এটা রেখে দেবো…স্মৃতি ! এখন চলুন…পারবেন চলতে ? না, আমি হাত ধরবো ?

ক্ষিপ্র স্বরে পরী কহিল—না, না, হাঁটতে খুব পারবো…

সত্যেন্দ্র কহিল—বিশুদার জন্য দাঁড়াবেন না ?

পরী কোনো কথা কহিল না, মৃদু হাস্যে অন্য দিকে চাহিল।…

দুজনে চলিল…অস্তসূর্য্যের আভায় চারিদিক লালে লাল…কাহারো মুখে কথা নাই !

পরী কহিল,—কথা কইচেন না যে ?

—না। একটা গল্প মনে পড়চে…

—কি গল্প ?

—Androcles and the Lionএর গল্প…নিশ্চয় সে গল্প পড়েচেন ! এ্যাণ্ড্রোক্লিস ছিল কাফ্রী দাস, আর এক সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল…

পরী কহিল,—রেখে দিন আপনার পচা গল্প…ভালো কথা, আপনার নাম ?

সত্যেন্দ্র কহিল,—সত্যেন ব্যানার্জী !

—এখানে কোথায় আছেন ?

—'শান্তি-আবাসে'।

—ও…ঐ মসমা ফল্‌শের কাছে ?

—হ্যাঁ।

—ও-বাড়ী না ভাড়া নিয়েছেন প্রোফেসার এন্ ব্যানার্জী ? শুনেছি…

সত্যেন্দ্র কহিল,—হ্যাঁ। প্রোফেসার নগেন্দ্র ব্যানার্জী। তিনি আমার বাবা…

—আপনি নগেন বাবুর ছেলে !

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন ?

—কে না তাঁর নাম জানে ! অত বড় পণ্ডিত-লোক…

পাশিয়া বস্তীতে একটা ডুলি মিলিল। পরী ডুলিতে চড়িল… বলিল, ধন্যবাদ…আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি যেতে পারবো'খন…

আশ্চর্য্য মেয়ে ! যেই কাজ চুকিল, অমনি প্রস্থান !

সত্যেন্দ্র ভাবিল, যাও তুমি ! ভাবিয়ো না, দীন-আতুরের মতো তোমার পিছনে ফিরিব তোমার কৃপা চাহিয়া ! জানি…তোমার মতো মেয়েরা…স্বার্থে-অহঙ্কারে সারাক্ষণ মন ভরিয়া আছে ! তুমি…তুমি…

মনের উচ্ছ্বাস মনে বহিয়া মনেই মিলাইয়া গেল…সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল…

টেলিগ্রাম আসিয়াছে। বাবা তার করিয়াছেন, দু-একদিনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবেন…

বাবা প্রোফেসার এন্ ব্যানার্জ্জী আসিলেন।…

এবং…

দুদিন পরে সন্ধ্যার সময় বাবা ডাকিলেন—সতু…

সতু ওরফে সত্যেন্দ্র আসিল। বাবা বলিলেন,—এই ছুটীতে ঠিক করেছি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবো। জানো তো, আমার বন্ধু ডক্টর চ্যাটার্জী…শিলঙ হাসপাতালে আছেন…তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, এ আমাদের অনেকদিনের বাসনা। সেইজন্যই শিলঙে ছুটী কাটানোর ব্যবস্থা করেছি…

সত্যেন্দ্র কহিল—কিন্তু আমার একটু নিবেদন ছিল…

বাবা বলিলেন,—জানি, একালের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কি নিবেদন হতে পারে ! তুমি বলবে, আমি বিয়ে করবো আমাদের কলেজে পড়ে মিস্ শান্তি সেন…না হয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার রায়ের মেয়ে ডলি,…কি বেলা…দীপ্তি…সাহারা ? কি গ্রেটা গার্বো, নর্ম্মা শীয়ারার ! ও-সব নিবেদন আমি শুনবো না, জেনে রেখো। আমার এক কথা…যেদিন তিনি গেছেন…সেদিন থেকে তোমাকে নিয়ে পড়ে আছি…চ্যাটার্জীরও ঠিক আমার দশা। সে'ও উইডোয়ার আর তার ঐ এক মেয়ে পুঁটু… লেখাপড়া শিখেচো…বাপের কথা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না।…

সত্যেন্দ্র নিঃশব্দে সব কথা শুনিল…জবাব দিল না।

বাবা বলিলেন,—চ্যাটার্জী আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন…সন্ধ্যার সময় যাবে তাঁর ওখানে। আমি আজ যেতে পারবো না…ক্লান্ত ! এ-কথা তাঁকে তুমি বলো…চ্যাটার্জী থাকেন পাইন মাউণ্টের কাছে 'গিরি-নিবাসে'। 'পাইন-মাউণ্ট' জানো ?

—জানি।

—বেশ। আজ সন্ধ্যাবেলায় যাবে…বুঝলে !

মাথা নাড়িয়া সত্যেন্দ্র জানাইল, বুঝিয়াছে !

যাইতে হইল…যেন কারাবাসে চলিয়াছে, এমনি ভারী মন লইয়া।

এবং…

কিন্তু কেন ? ঐ তো দর্পিতা কিশোরী ! কিসের লোভে মন এমন বিহ্বল হয় ! এ দুর্ব্বলতা অনুচিত !

মনের উদাস ভাব তবু কাটে না…

এবং এমনি উদাস মন লইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল গিরি-নিবাসের ফটকের সামনে। বাগান-ঘেরা ছবির-মতো বাঙলা। দীর্ঘ পাইনের ফাঁকে ফাঁকে নানা জাতের ফুলের ঝোপ-ঝাড়…চমৎকার সাজানো।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তার বর্ণাভা তখনো পৃথিবীর অঙ্গ হইতে মিলাইয়া অদৃশ্য হয় নাই !

ফটকের সামনে সত্যেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল নিথর নিস্পন্দ…অনেক ক্ষণ। চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধতায় ঘেরা।

সে স্তব্ধতা চিরিয়া সহসা জাগিল গানের লহর ! সেই কণ্ঠ… গাহিতেছিল,—

আলো-ঝলমল পূর্ণিমারি জোছনা রাতে
সারা নিশি জাগি ছিনু ফুলবনে—
সে ছিল সাথে—
জোছনা রাতে !…

সুরের মায়ায় একপা একপা করিয়া ফটক পার হইয়া সত্যেন্দ্র কখন বাগানে আসিয়াছে, খেয়াল ছিল না।

সে শুধু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে…সুরের আকর্ষণে…

এবারে গান শুনিল খুব কাছে…

নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন—মায়ার তুলি !
প্রথম প্রেমের মধুমঞ্জরী গো—উঠিছে দুলি !

স্বপ্নমোহে সত্যেন্দ্র চেতনাহারা…

চেতনা জাগিল ছোট একটি প্রশ্নে,—কে ?

চমকিয়া সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখে, পরী ! সামনে !…তার গান থামিয়া গিয়াছে।

পরী কহিল—ডাক্তারবাবু যে ! আমার পায়ের খপর নিতে, নিশ্চয় ?

সত্যেন্দ্রর বিস্ময়ের সীমা নাই…

বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে একটি সুমধুর সম্ভাবনার আশায় মন ভরিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র কহিল—এইটে না গিরি-নিবাস ?

পরী কহিল—হ্যাঁ।

সত্যেন্দ্র কহিল—ডক্টর চ্যাটার্জী এখানে থাকেন ?

—থাকেন।

সত্যেন্দ্র কহিল—তাঁর মেয়ে পুঁটু এ-বাড়ীতে থাকেন ?

পরী কহিল—পুঁটু বলে কেউ থাকে না এখানে।

আবার বিস্ময় ! সত্যেন্দ্র কহিল—তাঁর মেয়ে ? ঐ একটিই মেয়ে তাঁর এবং সে মেয়ের নাম পুঁটু…

পরী কহিল—এবং সে-নাম বহুদিন লোপ পেয়েছে এবং পুঁটু এখন পুঁটু নয় এবং সে এখন শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী !…

একটু পরে ডক্টর চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা হইতেছিল ডক্টর সত্যেন্দ্র ব্যানার্জীর।

আজ খপর আসিয়াছে, সত্যেন্দ্র ফাইনাল এম-বি পাশ করিয়াছে… সসম্মানে।

ডক্টর চ্যাটার্জী। তোমার বাবার সঙ্গে এ কথা হয়ে আছে বহু বৎসর যাবৎ…

সত্যেন্দ্র। এবং বাবা তাই বলছিলেন ?

ডক্টর চ্যাটার্জী। জ্যোৎস্নার সঙ্গে তোমার জানাশোনা হয়েছে, শুনেছি…accidentally.

সত্যেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

ডক্টর চ্যাটার্জী। এবং তোমার বাবা আর আমি ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি এক-স্কুলে সেই সাবেকী নাইন্থ, ক্লাশ থেকে—

সত্যেন্দ্র। আজ্ঞে, আমি শুনেছি…

ডক্টর চ্যাটার্জী। এবং তোমার বাবা ব্যস্ত হয়েছেন…আমিও কম ব্যস্ত নই। কি জানো, বয়স হয়েছে তো…

সত্যেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ…

দেড় মাস পরের কথা।

সত্যেন্দ্র আর জ্যোৎস্না বসিয়া কথা কহিতেছিল।

সত্যেন্দ্র। এবং তুমি আমাকে চিনতে ?

জ্যোৎস্না। নিশ্চয়। যেদিন এম্পায়ারের সামনে ভ্যানিটি-ব্যাগ কুড়িয়ে এনে হাতে দিলে—তোমার পানে চেয়েই চিনেছিলুম, তুমি কে ! তোমার ছবি দেখেছি তো…আমাদের ঘরে ছবি ছিল…বাবার বন্ধুর ছেলে…এবং সে ছেলের হাতে বাবা তাঁর মেয়েকে সম্প্রদান করবেন, এ কথা আমাদের বাড়ী কারো অজানা ছিল না।

সত্যেন্দ্র। তবু আমাকে কোনোদিন পরিচয় দাওনি ?

জ্যোৎস্না। না। মজা দেখতুম।

সত্যেন্দ্র। কিন্তু শিলঙে…

জ্যোৎস্না। বাবা শিলঙে থাকেন। আমি গিয়েছিলুম কলকাতায় মাসিমার ওখানে। ওরা ধরলে, চ্যারিটি-শোতে একটা গান গাইবার জন্য। আমার মাসতুতো-ভাই বিশুদা ছিল চ্যারিটি-কমিটির একজন মেম্বার।

সত্যেন্দ্র। এবং শিলঙে আমার আসবার কথা…

জ্যোৎস্না। আমি জানতুম। বাবা বলেছিলেন, তোমার এগজামিন চুকেছে। প্রোফেসার ব্যানার্জী ছুটী নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে শিলঙে আসবেন ; এবং কিছুদিন থাকবেন—থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।…বাবাই তো ঐ 'আরাম নিবাস' বাঙলো ঠিক করে রেখেছিলেন তোমাদের জন্য !

সত্যেন্দ্র। তুমি তো কম মেয়ে নও ! এত কথা জেনে…

জ্যোৎস্না। (সহাস্যে) না হলে পায়ের কাঁটা তুলতে পথের লোককে পা বাড়িয়ে দেবো—এ বিশ্বাস তোমার হলো কি করে ?…তোমার সঙ্গে অত যে কৌতুক করেছিলুম, তোমার পরিচয় না জানা থাকলে তোমার পানে ফিরেও তাকাতুম না মশাই…প্রগতি-যুগ হলে কি হবে, বাঙালীর ঘরের মেয়ে তো…গল্প-উপন্যাসের নায়িকা নই !

কথা এইখানে বন্ধ হইল…সত্যেন্দ্র লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না ; অধর দিয়া জ্যোৎস্নার অধর ঢাকিয়া দিল।

কুয়াশা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল-চৌধুরী

রাত্রি শেষ, তবু হায় দিনের প্রকাশ নাহি হয়।
পৃথিবীর চারিদিকে কুয়াশার ঘন আবরণ,
প্রকৃতি স্তম্ভিত ম্লান দাঁড়াইয়া প্রেতের মতন,
মানুষ লভিতে নারে মানুষের কোনো পরিচয়।
আলোর ধরণী আজ ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারময়,
মানুষের দেহমন তন্দ্রালস তমিস্রা-মগন ;
অনন্ত সৃষ্টিরে ঘিরি' ওঠে শুধু নীরব ক্রন্দন
আলোর পরশ লাগি। দাও দীপ্তি ওগো জ্যোতির্ময় !
কোথা সূর্য্য, জাগো জাগো ; হানো এই মায়া কুজ্ঝটিকা
কুয়াশা তো সত্য নয়, সত্য সেই সুন্দর আকাশ ;
দূর কর কুয়াশার মিথ্যাময় জীর্ণ যবনিকা,
মানুষ দেখিতে পাক্ দেহ মন আত্মার প্রকাশ।

মানুষের পরিচয় মানুষের সাথে, সত্য আজি হোক্,
অন্তরে বাহিরে তার উৎসারিত হোক্ সূর্য্যালোক।

বাঙ্গালী সৈন্যদল

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ বি-এ

ভ্রমণ

বঙ্গবাসীদিগকে অবসর সময়ে সামরিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ১১/১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট্ নামক ভারতীয় সার্ব্বভৌম সৈন্যদলের (Indian Territorial Force) একটী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।



অফিসারগণ—বামদিক হইতে—ক্যাঃ এস, সি, চৌধুরী, লেঃ বি, বি, সরকার, ক্যাঃ ডি, মিত্র ও লেঃ বি কে বসু

কিন্তু প্রয়োজনমত স্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত ব্যক্তির অভাবে উক্ত রেজিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যায়; কারণ রুগ্ন এবং নিরক্ষর সৈন্য লইয়া স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর কার্য্য যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। ঐ সৈন্যদলটী উঠিয়া যাইবার পরে ক্যাপ্টেন্ এস সি চৌধুরীর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের নিমিত্ত পঞ্চম বঙ্গীয় পৌর পদাতিক সৈন্যদল (5th Bengal Presidency Urbun Infantry) নামক একটী সৈন্যদল গত বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিত সমাজকে সামরিক শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ ও সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিয়া ক্যাঃ চৌধুরী বাঙ্গালী জাতির যে মহোপকার করিলেন তজ্জন্য জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে।

এখন প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য কালবিলম্ব না করিয়া এই সৈন্যদলভুক্ত হওয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করা। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে অন্য জাতির কবল হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে হইলে চাই যথোপযুক্ত সামরিক শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন হইবে এই নবগঠিত ও নবভাবে উদ্দীপ্ত বাঙ্গালী সৈন্যদলে।

প্রথমবারে যে সকল ব্যক্তি এই দলভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের দর্শন করিয়া ক্যাঃ চৌধুরী ও তাঁহার সহকারী অফিসারগণ বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়; কারণ বহু ইঞ্জিনিয়র, উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন কেরাণী, শিক্ষক এবং বেকার আসিয়া উত্তমরূপে দলপুষ্ট করিয়াছেন। নূতন ব্যক্তিগণকে দলভুক্ত করিবার সময় লেপ্টন্যাণ্ট্ বি বি সরকার যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরিশ্রম কতক পরিমাণে সফলতা আনয়ন করিয়াছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অধিকসংখ্যক নূতন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আসিয়া দলভুক্ত হইয়া সখের সৈন্যদলটীকে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে রাখিবার সহায়তা করিবে।



লেঃ বি কে বসু ব্যাটালিয়ন হাবিলদার মেজর ও কোয়াটার মাষ্টার এবং 'বি' কোম্পানীর সনন্দবিহীন অফিসারগণ

দলভুক্ত নূতন ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় এলেন্‌বরা ময়দানে গত বড়দিনের অবকাশের প্রথম দিন হইতে ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৮) পর্য্যন্ত প্রথম শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সর্ব্বশুদ্ধ চারিজন অফিসার এই শিবিরের কার্য্যাবলী পরিচালনা করেন। ক্যাঃ এস সি চৌধুরী ছিলেন অফিসার কমাণ্ডিং। লেঃ বি বি সরকার ছিলেন 'এ' কোম্পানী কমাণ্ডার এবং লেঃ বি কে বসু ছিলেন 'বি' কোম্পানী কমাণ্ডার। চিকিৎসা বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন ক্যাঃ ডি মিত্র।

২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) সকালে বাঙ্গালী বাবুর দল একটি করিয়া ছোট সুট্‌কেশ এবং সামান্য বিছানা লইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সকলের বক্ষে ছিল নবীন আশা এবং মুখে ছিল আনন্দের ভাষা। পরস্পর পরস্পরের সহিত যখন আলাপ করিতে ব্যস্ত তখন হঠাৎ বংশীধ্বনি করিয়া আদেশ হইল—ফল্ ইন্ (fall in)। তৎক্ষণাৎ যিনি যেমনভাবে পারিলেন সুবিধামত আঁকাবাঁকা লাইনের



জি—ও—সি মেজর জেনারল লিণ্ডসে সৈন্যদলকে পরিদর্শন করিতেছেন

মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইলেন। কে একজন মিহি সুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

ওরে তোরা পালা রে ভাই পালা,
একটু পরে বুঝবি ওরে মিলিটারীর ঠেলা···

সুরটী শেষ না হইতে কর্ণে প্রবেশ করিল তীব্র আদেশ —এখনই গান বন্ধ কর। তৎক্ষণাৎ তিনি নিস্তব্ধ হইলেন।

অতঃপর গুদাম হইতে প্রত্যেকে একখানি সতরঞ্চি, ২খানি কম্বল, একটী এনামেলের থালা ও মগ্ লইয়া কর্ম্ম-



কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে প্রহরীগণ

কর্ত্তাদের নির্দ্দেশমত তাঁবুর মধ্যে আপন আপন স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদও (Uniform) যথা সময়ে পাওয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রত্যেক তাঁবুর জন্য একটী করিয়া হ্যারিকেন্ আলো মিলিল।

যদিও প্রথম দিন বিশেষ পরিশ্রম হয় নাই তথাপি অসংখ্যবার আদেশের উপর আদেশ আসিয়া সখের সৈনিক-গণের মনের কোণে যে একটু ভীতির সঞ্চার করে নাই তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। নৈশভোজনের পরে বংশীধ্বনির সঙ্কেতে আলোক নির্ব্বাপিত হইবামাত্র কোলাহলমুখরিত এত বড় শিবির একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। কেবল মাঝে মাঝে দূর হইতে ট্রাম এবং মোটরের শব্দ আসিয়া নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গেল। পরদিনের কঠিন কার্য্যতালিকা মনকে আলোড়ন করিতে আরম্ভ করিলে নিদ্রাদেবী আসিয়া সকল চিন্তার অবসান করিলেন।

প্রয়োজন মত সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও সাধারণতঃ দৈনিক কার্য্যতালিকা ছিল :—

শয্যাত্যাগ	···	৫টা ৩০ মিঃ
প্রাতঃকালীন চা	···	৬টা
ফিজিক্যাল্ ট্রেণিং	···	৬টা ৩০ মিঃ হইতে ৭টা
পোষাক পরিধান	···	৭টা হইতে ৭টা ৩০ মিঃ

প্যারেড্	···	৭টা ৩০ মিঃ হইতে ৮টা ৩০ মিঃ
প্রাতঃরাশ	···	৮টা ৩০ মিঃ হইতে ৯টা ১৫ মিঃ
প্যারেড্	···	৯টা ১৫ মিঃ হইতে ১২টা ১৫ মিঃ
মধ্যাহ্ন ভোজন	···	১টা ১৫ মিঃ



শিবিরের চিকিৎসা বিভাগ

প্যারেড্	···	৩টা হইতে ৪টা ১৫ মিঃ
আমোদ-প্রমোদ	···	৬টা হইতে ৭টা ৪৫ মিঃ
নৈশভোজন	···	৮টা
হাজিরা গ্রহণ	···	৯টা ১৫ মিঃ
লাষ্ট্ পোষ্ট্	···	৯টা ৪৫ মিঃ
আলোক নির্ব্বাণ	···	১০টা

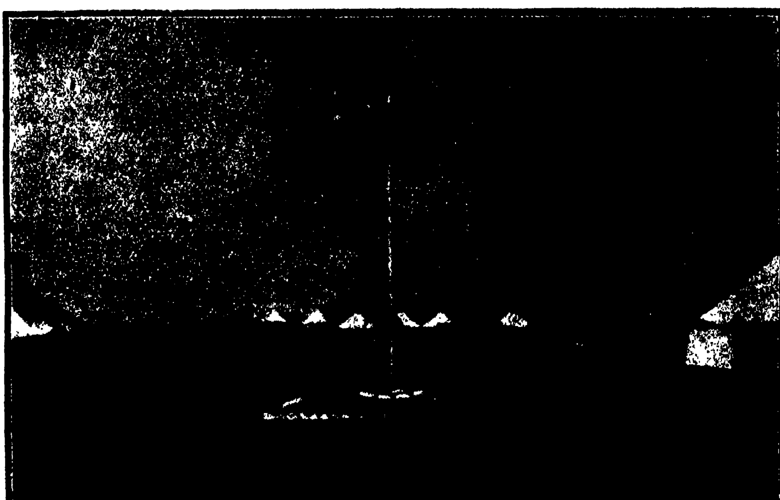
২৫শে ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের আদেশ শুনিয়া বাবুর দল সত্যই একটু 'কাবু' হইয়া পড়িলেন। গতকল্য পর্য্যন্ত দারুণ শীতের জন্য যাঁহারা বাটীতে আটটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা কি-না এই উন্মুক্ত ময়দানে কম্বলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবেন! ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবল বেগ যেন অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়! কিন্তু উপায় নাই। বাধ্য হইয়া আদেশ পালন করিতে হইল।

হাপ্‌প্যাণ্ট্ এবং গেঞ্জি সম্বল করিয়া ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর নিমিত্ত সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। কুয়াশায় ময়দান সমাচ্ছন্ন। অদূরস্থিত বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন সকলে ছুটিয়া চলিলেন তখন কয়েকজন গাহিতে লাগিলেন—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত,
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল···ইত্যাদি।

দ্বিপ্রহরে প্যারেড্ শেষ হইবামাত্র কেহ কেহ ভূমিশয্যার উপর লম্বা হইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কেহ বলিলেন, 'এত খাটুনি, আগে জানলে কি আর আসতুম!' আবার কেহ বলিলেন, 'হায় রে, একদিনেই চেহারাখানা অর্দ্ধেক হ'য়ে গেল!' অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু বলিলেন, 'দাদা, ভয় পাবেন না—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'। সহানুভূতি পাইয়া প্রাণে যেন নূতন শক্তির সঞ্চার হইল।

সন্ধ্যার আলোক জ্বালিবার পরে দেখা গেল, হ্যারিকেনে তৈল গরম করিয়া কেহ পায়ে মালিশ করিতেছেন, কেহ বা বালির পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক লাগাইতেছেন, আবার কেহ বা বুটের ঘর্ষণের ফলে ফোস্কা লইয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। প্রথম প্রথম কষ্ট অনেককেই ভোগ করিতে হইয়াছে।



শিবিরের সম্মুখে উড্ডীয়মান পতাকা

ক্রমে কঠিন পরিশ্রম সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। তবে যেদিন প্রথম রাইফেল্ (Rifle) লইয়া প্যারেড্ হইল, সে দিন পুনরায় অনেকে কষ্ট বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে শরীরের জড়তা পুনরায় কাটিয়া গেল এবং কার্য্যতালিকা অনুসারে নির্ব্বিবাদে কার্য্য করা অভ্যাসগত হইয়া পড়িল।

উভয় কোম্পানীর হাবিলদার-মেজর নিজ নিজ কোম্পানীর শিক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সত্যই উল্লেখযোগ্য। 'বি' কোম্পানীর হাবিলদার-মেজর



পতাকামূলে পদ্মশোভিত ক্রেষ্ট

বি ব্রহ্ম প্যারেডের সময় যেরূপ কঠিনরূপে পরিশ্রম করাইয়াছেন, অবসর সময়ে তেমনি বিভিন্ন তাঁবুতে গমন করিয়া স্বাস্থ্য, সুবিধা-অসুবিধার সংবাদ লইয়া বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। প্যারেডের সময় তিনি যেমন কঠিন এবং কঠোর, অবকাশ সময়ে তিনি তেমনি অমায়িক এবং মধুর।

প্রত্যহ রাত্রিশেষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুগায়ক পরমেশ গাঙ্গুলীর সুললিত কণ্ঠে মধুর সুর বাজিয়া উঠিত। তিনি যেন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেন—

কে বলে তোমায় কাঙালিনী ওমা আমার ভারত রাণী।
তোমার মহিমা বিভব গরিমা কি কব মা নাহি জানি॥
নাই বা পরিলে হেমহার গলে মণি মুকুতার মালা,
নাই বা শোভিল চরণে তোমার সোনার বরণ ডালা ;
জীর্ণ কুটীরে ছিন্ন বসনে তবু তুমি রাজরাণী…ইত্যাদি।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পরে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হইত। এ বিষয়ে আয়োজন এবং পরিবেশন করিতে ব্যাটালিয়ন্ হাবিলদার মেজর এস ব্যানার্জ্জি ছিলেন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ। তাঁহার সুমিষ্ট ভাষা এবং অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় গীত, বাদ্য, নৃত্য, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির আয়োজনের কোনদিনই ত্রুটি হয় নাই। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরে যদি এইরূপ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত।

২৯শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সি ও আসাম ডিষ্ট্রিক্টের জি-ও-সি মেজর-জেনারল্ লিণ্ডসে তাঁহার দুইজন ষ্টাফ-অফিসারের সহিত এই নবগঠিত পদাতিক সৈন্যদলকে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেককে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যাহাতে এই শিক্ষিত এবং ভদ্র সৈন্যদল অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

১লা জানুয়ারী ও-সির অধিনায়কত্বে আমরা ব্রীগেড্ প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে প্রোক্ল্যামেশন প্যারেড্ দেখিতে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ভবিষ্যতে আমরাও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারি। যথাসময়ে বড়লাট এবং বাংলার লাট উভয়ে উপস্থিত হইবার পরে তোপধ্বনির পর যথারীতি কার্য্য আরম্ভ হইল। বৃটিশ এবং ভারতীয় বহু সৈন্য মার্চ্চ পাষ্ট (March Past) করিল ; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইল সর্ব্বশেষের মিলিটারী মোটর লরীগুলির চলন-ভঙ্গিমা। দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে ইহারা যত আনন্দসূচক ও উৎসাহবর্দ্ধক করতালি পাইয়াছিল কোন সৈন্যদল তাহা পায় নাই। এইরূপ মার্চ্চ পাষ্ট যে কত কঠিন তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই বুঝিতে পারে।

২রা জানুয়ারী লেঃ বসু সৈনিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। লেঃ বসু গত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় সমরক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাইয়া উচ্চপদ এবং প্রশংসা লাভ করেন। এতাবৎকাল ধরিয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার বিষয় শুনিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, একতাবদ্ধ হইয়া আজ্ঞা পালন এবং কর্ত্তব্যকার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা সৈনিকগণের প্রকান্ত প্রয়োজন।

ঐ দিন অপরাহ্নে লেঃ বসুর অধিনায়কত্বে সকলে 'এমারেল্ড' এবং 'নরফোক্' নামক দুইটী যুদ্ধজাহাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রিনসেপ্‌স্ ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া সকলে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ দুইটী দেখাইবার জন্য ক্যাঃ চৌধুরী পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিয়া রাখায় কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রদর্শকের (Guide) নিকট নানা প্রকার যন্ত্রের, বিশেষত সুবৃহৎ কামানগুলির ব্যবহার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে যুগপৎ চমৎকৃত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জলযুদ্ধের কি অপরূপ বৈজ্ঞানিক সাজ-সজ্জা।

৮ই জানুয়ারী রেজিমেণ্ট্যাল্ স্পোর্টস্ হয়। এই উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট অফিস, সওদাগরী অফিস এবং অন্যান্য বহু অফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে মিঃ ভূপতিভূষণ রায় এইস্থানে প্রদত্ত এবং আরও অনেকগুলি ছবি আগ্রহপূর্ব্বক তুলিয়া যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

৯ই জানুয়ারী ও-সির অধিনায়কত্বে রুট মার্চ্চ (route march) করিয়া আমরা দক্ষিণ কলিকাতা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অত অল্প সময়ের মধ্যে সখের সৈন্যদল যে এত সুন্দরভাবে মার্চ্চ করিবে তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। নিম্নলিখিত রেজিমেণ্ট্যাল্ সঙ্গীতটী সেদিন আমাদের সর্ব্বসময়ে সজীব ও সতেজ করিয়া রাখিয়াছিল।

চলরে চল চলরে চল, চলরে চলরে চলরে চল।
বীরদর্পে বিজয়গর্ব্বে আজিকে মোদের প্রাণ উতল॥
নাহিক গ্লানিমা আর মনের,
পতাকা পঞ্চ 'আরব্যানের',
বক্ষে মোদের বান্ধবীরূপে রাজিছে পদ্মদল॥
জ্বলিছে প্রখর সূর্য্য,
বাজিছে সঘনে তূর্য্য,
আমরা বিজয়ী পঞ্চ-রঙ্গ-আরবান্ সেনাদল॥

রুট মার্চ্চ শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে শিবিরে ফিরিবামাত্র ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল। ধূলা-বালি উড়িয়া চতুর্দ্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। বৃষ্টি নামিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিজ নিজ তাঁবুতে আশ্রয় লইলেন। বৃষ্টি থামিলে নব-লব্ধ স্বাস্থ্য, শক্তি এবং উদ্যম লইয়া সকলে আনন্দিত মনে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বাতাস কাঁপাইয়া মিলিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল—

বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহ বিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি।
শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী—
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী··

অলঙ্কারের শোভা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন্ ভট্টাচার্য্য

নীহার বলিছে, "দূর্ব্বে! আমি অলঙ্কার
কভু না অঙ্গের শোভা বাড়াই তোমার।"
দূর্ব্বা বলে, "ক্ষণপরে তোমার মরণ,
আমার শাশ্বত শোভা শ্যামল বরণ।"

কারিকর

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

সুরথ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে আঙিনার ক্ষুদ্র বাগিচায় কাজ করিতেছে। হাসি আর গুন্ গুন্ স্বরে গান করা এই দুইটি যেন সর্ব্বক্ষণ তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। কেউ কখনও সুরথকে বিমর্ষ হইতে দেখে নাই। সুখ দুঃখ, বিরহ ব্যথা, অভাব অভিযোগ—সকল সময়ই তাহার শান্তমুখে স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

সুরথ খুব সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া চারা গাছগুলির গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতেছে আর মনের খুশীতে গাহিয়া চলিয়াছে—"সখি কে বলে পীরিতি ভাল। কাঁদিয়া জনম গেল…"

কিশোরী স্ত্রী কুসুমকামিনী পুকুর হইতে স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে জলের কলসী কাঁখে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। আত্মভোলা স্বামীর গান শুনিয়া কুসুম আঙিনায় ঢুকিবার বাঁশের ফটকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সুরথ স্ত্রীর আগমন বুঝিতে পারিল না, আপন মনে গাহিতে গাহিতে কাজ করিয়া চলিল।

কুসুম আর পারিল না, স্বামীর ভুল সুরে ও ভুল গানে হাসিয়া উঠিল। সুরথ হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল। সিক্তবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। কুসুম হাসি চাপিবার জন্য নীচের ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া ধরিল। সুরথ দৃষ্টি সংযত করিতে পারিল না।

কুসুম কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে প্রশ্ন করিল, হাঁ করে দেখচ কি ?

: দে-খ-চি—দেখচি তোকে !

: কেন—আমি কি বহুরূপী ?

না, তোরা অপ্সরার জাত।

দূর পোড়ারমুখো !

: তবে রাজকন্যা !

: উহু !

: তুই আমার চাঁদের কণা !

: সোহাগে আর বাঁচিনে। সকালবেলায় উঠে কাজকর্ম্ম ত নেই ; কেবল গান আর—

: আর কি রে ?

: জানিনে ! তোমার সঙ্গে বসে ফষ্টিনষ্টি করলে ত আমার চলবে না, ঢের কাজ পড়ে আছে।

: আরে যাচ্চিস যে। জল দিয়ে যা। মাইরি, চারা গাছে জল না দিলে মরে যাবে সব। আজ তুই দিয়ে দে, কাল আমি নিশ্চয়ই জল আনব।

: অত সখের কাজ নেই। রান্নার জল এনেচি ; উনি তার ফুল বাগিচায় দেবেন ! ভারি ত আমার ফুল বাগিচা ! আজ সবগুলি চারা উপড়িয়ে ফেলে আমি বেগুন আর মরিচের গাছ লাগাব !

: সত্যি বলচিস ?

: সত্যি নয় ত কি ! বেগুন আর মরিচ লাগালে তবু দু'পয়সা আয় হবে।

কুসুম জলের কলসীটা রাখিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

সুরথ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, উপড়ালেই হ'ল !

: দে'খ তখন !

কুসুমকামিনী চলার গতিতে একটা রূপের ঢেউ তুলিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল।

স্বামীর গানের সুর তাহার অন্তরেও রূপের ও আনন্দের ঢেউ তোলে। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কুসুম গাহিতে লাগিল,—

সখি কে বলে পীরিতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল।
কুলবতী হয়ে কূলে দাঁড়ায়ে
যে ধনী পীরিতি করে
তুষের অনল যেন সাজায়ে
এমতি পুড়িয়া মরে।

সুরথ স্ত্রীর গান শুনিয়া উঠিয়া আসিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ এক সময় ভাবের উচ্ছ্বাসে স্ত্রীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান ধরিল। কুসুম তাড়াতাড়ি বুকের কাপড় সংযত করিয়া লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বলিল, দুষ্টু কোথাকার !

সুরথ সুর ধরিয়া বলিল, সখি কে বলে পীরিতি ভাল !

: কি আমার পীরিতির ঠাকুর রে !

কুসুম লীলাচঞ্চল গতিতে সুমধুর হাস্যে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরথ গানের প্রথম চরণখানি গাহিতে গাহিতে বাগিচায় চলিয়া আসিল।

সুরথ অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া ফুলের বাগিচায় কাজ করে, যৎসামান্য কাজ শেষ করিতে তাহার বেশী দেরী হয় না। বাগিচার কাজ শেষ করিয়াই উঠানের এক ধারে কাদামাটি লইয়া বসে পুতুল গড়িতে। যদিও পুতুল গড়িয়া জীবিকার্জ্জন হয় না ; তবু ইহাকেই সে

পেশা করিয়া লইয়াছে। পুতুল বেচিয়া এবং যে সামান্য জমি আছে তাহাতে দুই জনের খরচ চলে না কিন্তু চলে না চলে না করিয়াও দুই বছর চলিয়া গিয়াছে। এই না-চলার বিরুদ্ধে তাহাদের বড় রকম কোন বিদ্রোহ নাই। সকল অভাব অভিযোগকে ছাপাইয়া ওঠে দাম্পত্য প্রেম।

মগরা নদীর পাড়ে বিষ্ণুপুর গ্রাম। গ্রামের একপ্রান্তে, নদীর তীর ঘেঁযিয়া সুরথের ছোট বাড়ী! বাড়ীতে তিনটি মাত্র খড়-বিচালীর ছোট ছোট ঘর। পরিষ্কার ফুটফুটে বাড়ী—পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা যেন সারা বাড়ী জুড়িয়া আছে।

সুরথ পুতুল গড়িবার মাটি ছানিতে ছানিতে গায়—

"বিধবার কপালের দুঃখু কান্দলে তো যায় না
সাত না বছরের কালে দানে দিছল বিয়া
তের না বছরের কালে পতি গেল মইর‍্যা গো মাইয়া
ধর্ম্মে তো সইল না।

স্ত্রী কুসুমকামিনী রান্নাঘর হইতে টিপ্পনী কাটিয়া বলে, সকালবেলায় কোন্ বিধবার দুঃখে কাঁদচ গা?

সুরথ হাসিয়া গায়—

থাকবে না পণ্ডিতের বংশ
বিধবার শাপে গো মাইয়া
ধর্ম্মে তো সইল না।

কুসুম রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলে, বিধবার জন্যে যে পরিমাণ উতলা হয়েচ—

সুরথ হাসিয়া বলে, তোর জন্যে কম উতলা হইনি কিন্তু।

: সে আমার জানা আছে গো!

: রাধাকে নিয়েই যে কৃষ্ণপ্রেম, তুই না জানলে চলবে কেন!

: ঢঙ্ দেখ—কৃষ্ণপ্রেম! কুসুম ভ্রূকুটি করিয়া সরিয়া গেল।

কুসুম উনুনের উপর হইতে ডালের কড়াইটা নামাইয়া ভাত রাঁধিবার ডেগ্‌টা চড়াইয়া দিল। ভাতের জল ফুটাইতে দিয়া চাউল আনিবার জন্য হাঁড়িতে হাত দিয়া খানিক বোকা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরথ স্ত্রীর প্রতীক্ষায় একটু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

"শোন রে ভাই লোকজন দেশে আইল বিজ্ঞাপন
শন সুতা গলায় দিয়া ঝালরা বেরাম্মন।
বাইট হাত পানির নীচে কাউট্টারে চিত কইর‍্যা
লণ্ডণের বের লাইগ্যা গেলরে জীবন!

কুসুম তর্ তর্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।
সুরথ গান থামাইয়া বলিল, কি হ'ল গো?

: কি হল গো! কেবল গান আর গান আর মাটি নিয়ে ছেঁড়ামি!

সুরথ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

: হেঁস না বলচি—ফের দাঁত বার ক'রে বোকার মত হাসচ!

: বলি আমার আঁধার রাতের চাঁদের কপাল হল কি?

: এক মুঠি চাল নেই। আজ গিলবে কি!

সুরথ কুসুমের পাতলা তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠযুগলের প্রতি তৃষিতের মত তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

: পাগল নিয়ে আর পারি নে! চাল আর নেই, ধার মিলবে না, দুটি পয়সাও নেই যে দু-তিনি মুঠি চাল কিনে আনব! হাসলে ত চলবে না, খাবে কি?

: কেন, ওই মধুমাখা হাসি!

কুসুম ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া বলিল, ন্যাকামি দেখে শরীর আমার রি রি করে! সত্যি বলচি, রোজগারের যে উপায় দেখচ না, দেশে যা দুরবস্থা পড়েচে, কি গতি হবে?

সুরথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে বলিল, সত্যি কি গতি হবে!

কুসুম চীৎকার ক'রে বলিল, আমায় চটিও না বলচি!

: তুই যদি চটিস্ তবেই ত এত বড় সমস্যাটা মিটে যায়। রাগ ক'রে শুয়ে থাকবি, মান ভাঙ্গাতে সূর্য্য যাবে গড়িয়ে ওপ্রান্তে, তারপর রইল আমাদের এক ফালি চাঁদের হাসি, ছোট্ট আমাদের বাগান আর মাঠের ধারে মগরা নদীর কলকলানি!

মাঠের কথা বলিতে বলিতে যেন সুরথের চোখের উপর সবুজ ধান ক্ষেতের দৃশ্য ভাসিয়া ওঠে। নদীর পাড় ঘেঁষিয়া মাঠের পর মাঠ—হেঁটে শেষ করা যায় না। ধান গাছে শীষ গজাইয়াছে, বাতাসে কেমন হেলিয়া দুলিয়া হাসে। এক একটা বাতাসের ঝাপটায় যখন গাছগুলি পর পর হেলিয়া পড়ে তখন মনে হয় নাচের ছন্দে যেন ষোড়শীরা যৌবনভারে শিথিল অবয়বে হেলিয়া পড়িয়াছে। নীলাকাশে সাদা সাদা সুতার মত গাছের কস উড়িয়া বেড়ায়। সূক্ষ্মতম সুতাগুলি ধানগাছের শীষ জুড়িয়া বসে।...

কুসুম বলিল, চল আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। আর ভাল লাগে না আমার।

: আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। দলাদলি, সামাজিক গোলমালে আমরা নেই তবু এরা আমাদের টেনে আনবার জন্যে কম চেষ্টা করেনি। ঝামেলা আর পোষায় না।

: আমার মিথ্যে কলঙ্ক, অপবাদ। কুসুমের কলঙ্কের কথায় চোখ ছল ছল করিয়া ওঠে! সে স্বামী-সোহাগিনী বলিয়া স্বামীর সঙ্গে গভীর রাত্রে নদীর ধারে হাত ধরিয়া বেড়ায় বলিয়া দুইজনে সুর মিলাইয়া গান গায় বলিয়া লোকে অনেক কিছু বিশেষণ জুড়িয়া নানা আখ্যায় ভূষিত করে। সে জন্য তাহার অভিযোগ নয়; অভিযোগ তাহার নাই, দুঃখ তাহার মিথ্যা কলঙ্কের।

: দুঃখ করিস্ না কুসুম। এদের ইতর মনের এই সান্ত্বনা। চল আমরা নির্জ্জন পাহাড়ে চলে যাই। ফলমূলে আমাদের দুটির বেশ দিন

চলে যাবে। কেউ কোন কথা বলবার থাকবে না, মনের আনন্দে প্রকৃতির বনশোভায় বন্য হরিণ-হরিণীর মত সদা চঞ্চল হাস্য-লাস্যে খেলা ক'রে বেড়াব আর কলকণ্ঠে ঝর্ণাধারা, গুহা-উপত্যকা, বনবনানীকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলব।

কুসুমকামিনী কোন জবাব দেয় না, কল্পনার রঙিন শোভায় তাহার চোখ বুজিয়া আসে, তন্ময় হইয়া স্বামীর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

সুরথ খেয়ালবশেই একটা বড় করিয়া প্রতিমা গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাল প্রতিমা গড়িতে পারিলে সৌখীন জমিদার মোটা টাকা দিয়া ক্রয় করিবেন। সুরথের আশা সফল হইয়াছে, জমিদারের জামাই প্রতিমাটি পছন্দ করিয়াছেন এবং অগ্রিম দুইটি টাকা দিয়েছেন।

সুরথ তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া অসুস্থ স্ত্রীকে বলিল, কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতিমাটি শেষ হয়ে যাবে। জমিদারবাবুর জামাই ভারী পছন্দ করেছেন! আমায় শহরে নিয়ে যেতে চান। বলেচি যাব! সত্যি তো এখানে পড়ে থেকে কি হবে! আমার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কারিকর, ইংরেজী শিক্ষার লোভে পাঠশালায় যাই, নতুবা আমিও বাপ ঠাকুর্দ্দার মত বড় ওস্তাদ হতে পারতাম।

: কত টাকা দেবে?

সুরথ কাছা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, বায়না হয়ে গেছে, এখন তোমার বরাত! বদ্যিকে বলে এসেচি, এবার এমন এক অষুদ দেবে যে দু-দিনে জ্বর সেরে যাবে?

কুসুমকামিনী টাকা দুইটি লইয়া ছেলেমানুষের মত খেলা করিতে লাগিল। স্ত্রীর মুখে হাসি দেখিয়া সুরথের অন্তর আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

কুসুম প্রশ্ন করিল, প্রতিমাটি কবে ওরা নেবে?

: কাল নেবে, বাকী কাজ ও রং-পরানোর কাজ সেখানে গিয়ে করতে হবে। জামাইবাবুর কয়েকজন বন্ধু আসবে; সে জন্যেই ত অত তাগিদ।

কুসুম ক্লান্তিবশত চুপ করিয়া গেল। স্বামীর হাতখানি বুকে চাপিয়া খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিল, একটা গান গাও না। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

সুরথ খুশী হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে মহুয়ার গান ধরে! বিরহী মহুয়ার গানে কুসুমের মনটা যেন কেমন কেমন করিয়া ওঠে! চোখের উপর যেন ভাসিয়া ওঠে নদেরচাঁদ ও মহুয়ার কল্পিত ছবি!

কাল পূজা। সুরথের আর অবসর নাই। শেষ রাত্রে অসুস্থ স্ত্রীকে শয্যায় রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়াছে, রাত্রি গভীর হইতে চলিল; বাড়ী যাইতে অবকাশ পায় নাই। শিল্পী সে, সৃষ্টির প্রেরণায় রোগিণীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া-পরা, সুখ-দুঃখ সকল কথা ভুলিয়া একমনে ধ্যানমগ্ন মুনীর মত প্রতিমার রঙ লাগাইয়াছে।

প্রতিমার রঙ পরাণর কাজ যখন প্রায়-শেষ হইয়া আসে তখন জামাইবাবু ও তাঁহার কলিকাতার বন্ধুরা প্রতিমা দেখিতে আসেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রশংসায় যেন সুরথের প্রাণ আনন্দে গর্ব্বে ভরিয়া ওঠে। হ্যাঁ, এতদিনে তাহার প্রতিমা গড়িবার কাজ সার্থক হইয়াছে। আজ সে বাড়ীতে গিয়া কুসুমকে বলিতে পারিবে, কুসুম, তখন বলিনি আমি যে পুতুল গড়ি তার কদর এই গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না। সকলে কি আর এসব বুঝতে পারে! জান জামাইবাবুর বন্ধুরা আমায় কত প্রশংসা করলেন, আমার তৈরী পুতুল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লোক ডেকে দেখাবেন! এরা যে-সে লোক নয় কালাপানি পাড়ি দিয়ে হাকিম হয়ে এসেচেন (আই-সি-এস)!···

প্রতিমার কাজ যখন শেষ হইল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে তখন নিশুতি রাত। সুরথ রঙের বাটি, তুলিটুলি গুছাইয়া হাত ধুইয়া জামাটা গায়ে পরিল। বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল জামাইবাবুর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বলিয়াছিলেন, প্রতিমাটি দেবীমূর্ত্তি হয় নাই, রক্তমাংসের এক যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে। জীবন্ত যুবতীর মূর্ত্তি! কথা কয়টি তাহার কানে খটখট করিয়া বাজিল। মানুষের মূর্ত্তি কি করিয়া হইবে? সুরথ লণ্ঠনের আলোটা একটু চড়াইয়া দিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। প্রতিমার দিকে চাহিয়া সুরথ স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি করিয়া সম্ভব হইল?

সুরথ ধপ্ করিয়া বাতিটা নীচে রাখিয়া ছুটিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিল। নিঝুম রাত্রি। গাঢ় আঁধার সারা বাড়ীময় ভচনচ করিয়া খেলিয়া চলিয়াছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে স্ত্রীকে ডাকিল! কোন সাড়া দিল না। বেচারী হয় ত তাহার অধীর প্রতীক্ষায় অভিমানে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরথ আস্তে আস্তে মাথাটা নত করিয়া স্ত্রীর পাণ্ডুর ওষ্ঠে একটা চুম্বন দিল!

সুরথ আঁতকিয়া উঠিল! হিম শীতল দেহ, নিশ্বাস পড়িতেছে না। সুরথ স্ত্রীকে দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—কেহ সাড়া দিল না, নিঃস্তব্ধ রাত্রির যবনিকায় ব্যর্থ ক্রন্দন গিয়া প্রতিধ্বনি করিল!

শোঁ শোঁ করিয়া যেন বাতাস বহিতেছে। উন্মত্ত তুফানে সুরথ চমকিয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। গভীর রাত্রি, শ্রান্ত আকাশ, হিমকণাগুলি অব্যক্ত ব্যথায় ঝরিয়া পড়ে।

সুরথ আবার ছুটিয়া চলে, আবার থমকিয়া দাঁড়ায়।

উদভ্রান্তের মত মণ্ডপের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাল প্রত্যূষে পূজা! দেবীর পূজা হইবে, তিনি জগদ্ধাত্রী কল্যাণময়ী! সুরথ একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ হাতের লাঠিখানা তুলিয়া প্রতিমার উপর ঘা মারিতে মারিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি দেবী দেবীর প্রতিমা আমি গড়েচি!

মাটির প্রতিমা ভাঙিয়া চুরিয়া মেঝের পড়িয়া গেল, সুরথ ক্ষিপ্তের মত লাঠি চালনা করিতে করিতে একসময় ধ্বংস স্তূপের উপর অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

মায়া-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

মানবের এ-সব একেবারেই ভাল লাগছিল না। তার মন জয়ন্ত-মিলনীর ব্যাপারেই ডুবে ছিল। সে তখন কথাটাকে বদলে অন্যদিকে নেবার জন্যে বললে: "মহিম, তুই তাহ'লে স্নান-টান সেরে নে—রাত্রে এসেছিস ট্রেনে।"

"ঠিক বলেছিস্, আগে শরীর-চর্চ্চা ক'রে নিই, তারপর পর-চর্চ্চা করব।"

মহিম স্নান-ঘরে চলে গেল।

"হ্যাঁ রে ভোলা, জয়ন্তর ব্যাপারটা কি বলতে পারিস?"

"ওই ত বললাম, থিয়েটার করছে।"

"হুঁ!...আচ্ছা জয়ন্ত আজকাল নাকি বাড়ীতে বড় একটা আসে না। সেই থিয়েটারেই—"

"থিয়েটারেই নয়—বেশীর ভাগ সেই মীনার বাড়ীতেই থাকে।"

"তা তুই এ-সব করতে দিস কেন? তাকে..."

"তুই চার-মাস বাড়ী মাড়ালিনি— একেবারে কলকাতা ছেড়ে কোথায় ডুব মারলি—কেন? জবাব দিতে পারিস্?"

মানবের সমস্ত দেহটা যেন কে ইলেকট্রিক ব্যাটারিতে ঝাঁকি দিয়ে দিলে।

"আমার শরীরটা ভাল ছিল না, কিছুদিন চেঞ্জে ঘুরে এলাম।"

"জয়ন্তরও মনটা ভাল নেই—মীনার বাড়ীতে চেঞ্জের হাওয়া খাচ্ছে।"

"মিলনী কিছু বলে না?"

"বলতে পারলাম না। আমার সঙ্গে আজ ক-মাস দেখা হয় নি।"

"কাল থেকে সে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন?"

"হ্যাঁ, শুনলাম বাড়ীতে গিয়েছিল।"

"তুই একবার দেখা করলি নি কেন?"

"প্রয়োজনবোধ আমার হয় নি।"

"তা হবে কেন?"

"বন্ধুত্বটা তুই যা দেখিয়েছিস্ এমন আর কেউ দেখায় না। তুই যা না কেন, তোর ত ছেলেবেলার খেলুড়ী, ছোট বোনের মত, তুই যা না? আমি না হয় বন্ধুত্বর মর্য্যাদা রাখতে পারি নি—তাকে মীনার আস্তানায় তুলেছি...তুই ছাড়িয়ে নিয়ে আয়—আমি কর্ম্মকর্ত্তাগিরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

"ফট্ ক'রে আমিই বা সেখানে যাই কি ক'রে—ব্যাপারটা কি জানতে হবে ত?"

"তুই সেখানে গিয়ে বোনটাকে জিজ্ঞাসা করে দেখলি না কেন?"

"কেবল ত সারবন্দী কেনই বলছিস্, তাতে মীমাংসাটা কি হবে—বুদ্ধি পরামর্শ ক'রে এইটে কর, যাতে জয়ন্ত বাড়ীতে থাকে। এ কি অন্যায়!"

"অন্যায়টা যে কোন্ পক্ষে সেটা এখনও জানা যায় নি।

"তুই বলতে চাস্ যত অন্যায় সব আমার পক্ষে?"

"তোরও দেখছি মাথা বিগড়েছে! হচ্ছে তাদের কথা, তুই গায়ে মাখিস্ কেন?"

"জানিস্ ভোলা, ওদের কথা নিয়ে চায়ের দোকানে কাল রাত্তিরে কালী মিত্তির নানা কথা কইছিল। জয়ন্ত-মিলনীর কথা যে চায়ের দোকানে আলোচনা হবে, এ আমরা সহ্য করি কি ক'রে বল্?"

"তা হ'লে তারা prominent men-এর দলে উঠে গেছে। একটা কাজ করলি নি কেন?"

"কি কাজ?"

"মারামারি করলি নি কেন, অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপের chivalry দেখাতে পারতিস্। Eighteenth century য়ুরোপ আর twentieth century Bengalও প্রায় সমানই।"

এমন সময় মহিম স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে: "ভোলাদা! আবার কবে থেকে Politics-এ dabble করতে আরম্ভ করলে?"

"যেদিন থেকে তোমরা নেশনের ব্যারিয়ার ভেঙে নতুন ধরণে ডিমোক্রাসির নমুনা এম্পায়ার থিয়েটারে

দেখাতে সুরু করেছ, সেই দিন থেকে আমি সুরু করিছি পলিটিক্স।"

"তাতে অন্যায় কি হয়েছে, এটা ত democratic age, democracy-ই ত এখন সব চেয়ে বড় practical philosophy. Demos এখন দেবতার জায়গা কেড়ে নিয়ে বসেছে।"

মানবের এ-সব কথা একটুও ভাল লাগছিল না। সে বললে: "নে তোদের তর্ক রাখ্—কি খাবি কি? তাই বল্!" ভোলা বললে, "এক গেলাস গরম জল—আর দুটো পাতিনেবুর রস—with a pinch of salt···পাকস্থলীটা জেবড়ে আছে—তার একটু পাক খুলে দিতে হবে।"

মহিম বললে: "আমি একবার বিমল বোসের ওখানে যাব। সকাল-সকালই ফিরব।"

এমন সময় টেলিফোন রিং করলে। মানব উঠে গেল:

"Hallow! who speaking—হ্যাঁ, আমি।"

"আমি আজ তিন দিন হ'ল কলকাতায় এসেছি। ভাল আছ সব?"

"আজকে? আজকে দেখা করতে পারব বলে ত মনে হচ্ছে না। কেন বল ত?"

"জয়ন্ত? কেন, কি হয়েছে? ও···নিতান্তই দরকার? আজ যদি না পারি, কাল যাবার চেষ্টা করব।"

"সকালে? সকালে পারব না—বিকালে যাব।"

টেলিফোন ছেড়ে ফিরে আসতেই দেখলে রংরাজবাবু এসে বসে রয়েছেন।

মানব নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কখন এলেন? শরীর ভাল?"

"Mon amie, শরীর আমার বেশ ভালই আছে। তুমি চেঞ্জে গিয়েছিলে? কই, সারতে বিশেষ পেরেছ ব'লে ত মনে হয় না।"

ভোলা নেবু-গরমজল চুমুক দিতে দিতে বললে, "এর ওপর যদি মানব সারে—তাহ'লেই সেরেছে।"

"নে-নে থাম্, তোর সব কথাতেই দেখছি ইয়ারকি।"

"তোমার কাছে এলাম একটা বিশেষ খবর নিয়ে।"

ভোলা হাসতে হাসতে ঢঙ ক'রে বললে: "ও রংরাজ-বাবু, তাহ'লে মানবের কাছে দেবতাদের হংসদূত হয়ে এসেছেন! দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হবে না কি?"

"তার মানে কি ভোলা?"

"আজ্ঞে নল রাজাকে কলিতে পেয়েছে কি না?"

"কলিটা কে—তুমি?"

"আজ্ঞে ঠিক চিনেছেন, আমি একেবারে সাক্ষাৎ কলি—তবে যে ভোলা রায় সেজে মদ খেয়ে বেড়াই, সেটা আমার ছলনা। ওটা আমার স্বরূপ নয়, æsthetic রূপ—"

"Mon amie!"

মানব ভোলাকে বললে: "দেখ্ ভোলা, তুই এমন হচ্ছিস্ দিন্-কে-দিন্—কার সঙ্গে কি যে কথা ক'স্!"

"কলির চার-পো হয়ে আসছে কি-না, সেই জন্যে। তোমাদের রংরাজবাবুরা সত্য যুগ ফিরিয়ে আনবেন শীগ্‌গির, আমি চললাম মানব। তোকে না বললুম, একটু ভেবে-চিন্তে দেখ্, বুঝলি?"

ভোলা রংরাজবাবুর পিছন দিকে গিয়ে—মুখ ভেঙচে চ'লে গেল। বললে—"মন আমি! আহা মন আমি!"

রংরাজবাবু তখন মানবকে বললেন:

"আঃ পাজীর-পাঝাড়া, মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানে না। ওই ত এই বুদ্ধি-শুদ্ধি দিয়ে জয়ন্তটার সর্ব্বনাশ করলে। অমন লেখা-পড়া জানা টাকা-ওয়ালা বড়মানুষের ছেলে—সেটাকে মদ খাওয়াতে শেখালে, যত অনাছিষ্টি কাণ্ড। Me voila, আমার দিকে তাকাও, শোন।"

"বলুন।"

"জয়ন্ত মিলনীকে ডিভোর্স করবে।"

মানব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললে: "ডিভোর্স! আপনি পাগল নাকি!"

তারপর হেসে উঠল, বললে: "তা, ডিভোর্স করবে কেন?"

"জয়ন্ত করবে না—মিলনী করবে।"

"দুটোই অসম্ভব। ডিভোর্স হবে না, হতে পারে না।"

"নিশ্চয়ই হতে পারে এবং হবেও।"

"আপনি কি বলছেন? মিলনী সর্ব্বেশ্বর রায়ের মেয়ে—"

"হ্যাঁ এবং প্রভাতী দেবী তার মা···এ ডিভোর্স না হয়ে পারে না। আর তোমার এতে interest আছে।"

মানবের সমস্ত দেহ ও মনে আবার কে যেন ইলেকট্রিক

ব্যাটারির চার্জ্জ ক'রে দিলে। সে একটু শক্ত হয়ে বললে: "আমার interest—তার মানে?"

"এদের ডিভোর্সটা তুমি চাও কি-না—"

"আমি, আমি এদের ডিভোর্স চাইব, আপনি আমায় এ-সব কি বলছেন ঠিক ধরতে পারছি নি। আমি চাইব কেন?"

"শোন, মিলনীর মা প্রভাতীর বিশেষ ইচ্ছে ছিল যে, তোমার সঙ্গে মিলনীর বিয়ে হয়—এখন জয়ার অবস্থা জান?"

মানব বিরক্ত ভাবে বললে: "না।"

"জয়ন্তর ব্যাঙ্কে যা ছিল সব গেছে। জমিদারী বাঁধা—বাড়ী বাঁধা—এক পয়সার সঙ্গতি নেই, তার ওপর একটা থিয়েটারের মেয়ে নিয়ে এই রকম ক'রে বেড়াচ্ছে। ডিভোর্স হবার কোন বাধা নেই—মামলা উঠলেই adultery proof হয়ে যাবে—ডিভোর্স—একেবারে ডিক্রি নিসি—তখন মিলনীও স্বাধীন—জয়ন্তর যা অবস্থা এতে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে তার সঙ্গে ঘর করতে পারে না।"

মানব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে:

"কিন্তু আপনার এতে কি এমন স্বার্থ তা বুঝতে পারলাম না। মিলনীর মা হয় ত মেয়ের সুখ-দুঃখ বা ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেন—মিলনীর পিতাও হয় ত এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারেন—আমরা এ সব নিয়ে আলোচনা ক'রে কি তাঁদের সম্বন্ধে অবিচার করছি না?"

"শোন মানব, তুমি মিলনীকে ভালবাসতে, বিয়ে করার কথাও উঠেছিল—এখন…"

"সে-সব গত কথার আলোচনা কেন রংরাজবাবু? জয়ন্ত আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, সহোদরের সমান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার সুখ-দুঃখের মধ্যে আমরা খানিকটা জড়িত। তার অন্তঃপুরের সঙ্গে আমার একটা অন্তরের আন্তরিক সম্পর্ক আছে। ডিভোর্সও যদি হয়—যদিও আমি যতদূর জানি, হবে না—যদিও তা হবার সত্যি কোন কারণ ঘটে থাকে তবে, তার মধ্যে, আপনি আমাকে টেনে আনতে চান কেন—এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নি। আজ যদি জয়ন্ত-মিলনীর বিয়ে ভেঙে এই রকম একটা অবস্থা হয়, তাতে আপনি জানবেন আমার চেয়ে কষ্টবোধ তার অন্য কোন বন্ধুদের হবে না। আর আপনিও তাঁর পিতৃস্থানীয় বন্ধু—এ অবস্থায় আপনারও সেজন্যে বিশেষভাবেই দুঃখিত হওয়া উচিত।"

"আরে বাবা! দুঃখ ত হয়, দুঃখই ত করি, তাই ত করছি—কিন্তু যে সৎ তার জন্যই সহানুভূতি মানুষে করে, না হ'লে যে লক্ষ্মীছাড়া—উড়নচণ্ডে—তার জন্যে দুঃখ করা—বুঝলে-কি-না, Mon amie, মহাপাপ—মহাপাপ…ওই যে ভোলা—ওর মুখ দেখলে পাপ হয়…ওসব লোকের সংস্পর্শে এলে শ্রীভগবান স্বয়ং বিরূপ হন। মানুষ ত কোন্ ছার। অনাচারের সংসারের চেয়ে সংসার ব্যর্থ ক'রে দেওয়ায় ধর্ম্ম হয়। এ সংসারে স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করার মত পাপ আর নেই।"

"আপনি কি ঠিক জানেন যে জয়ন্ত তার স্ত্রী মিলনীকে অশ্রদ্ধা করে? আর একটা কথা মিলনীর পিতা সর্ব্বেশ্বর রায়—তিনি কি বলেন? তাঁর এ বিষয়ে কি মত?"

"সর্ব্ব—সর্ব্ব কি বলবে—প্রভাতী যা বলেন, তাই হয়। সর্ব্ব ত প্রভাতীর প্রতিধ্বনি—তার আলোয় প্রতিভাত হয়। আর মিলনীরও তাই ইচ্ছে…"

মানব বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করলে: "কি ইচ্ছে?"

"ডিভোর্স যাতে হয়।"

"ভাল, যাই হোক, আপনি আমাকে এর ভেতর জড়াবেন না। আমি এ সব হাঙ্গামার মধ্যে থাকতে চাই নে। থাকতে চাই নে শুধু নয়, আমি জয়ন্তর বন্ধু—তার যদি এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে—"

"ঘটে কি রে বাবা, বুদ্ধির দোষে সে এটা ঘটিয়েছে Mon amie তোমাকে একটা গোপন কথা মিলনী যৌতুকের টাকা আর গয়নায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সব দিয়েছে, বুঝলে কি-না?"

মানব হঠাৎ এমনি জোরে হাহা-হাহা ক'রে হেসে উঠল যে রংরাজবাবু চমকে উঠলেন—একটু ভীত হলেন।

"কথাটা হাসবার নয় বাবা, কথাটা সত্যি—আমি বেশ ভাল রকম জানি।"

"হুঁ! কিন্তু রংরাজবাবু! তাতে আপনার বা আমার ত কোন লোভ নেই।"

"আহা, তুমি বুঝতে পারছ না বাবাজী…"

"দু লাকই হোক, আর পাঁচ লাকই হোক…যাক্ আপনি ওদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। আমার একটু কাজ আছে—আমাকে বেরুতে হবে।"

"আচ্ছা বাবা, কিন্তু আমি যা বললাম দেখো, এ অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।"

রংরাজ বাবু চলে গেলেন।

মানব একটা সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে বললে:

"ভোলা যে বলে তা ঠিক: পৃথিবীর বেশীর ভাগই scoundrel—পেজমীতে ভরা..."

রংরাজবাবু আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললেন:

"দেখ, আমি যে তোমার কাছে এসব বললাম, অথবা আমি যে এইজন্যেই এসেছিলাম তোমায় বলতে, এটা যেন সর্ব্ব জানতে না পারে। Mon amie!"

"আজ্ঞে না, এ কথা প্রকাশ করার আমার কি দরকার বলুন। না আমি বলব না, আর আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ত নাও হতে পারে।"

"সেইটে তোমাকে caution—সাবধান ক'রে গেলাম। সংসারে সৎ লোকের প্রায়ই অভাব—ওই ভোলা—ভোলার মত পাজী আমি আর সংসারে দেখি নি। এরা পারে না কেন কর্ম্ম নেই। জয়ন্তর কি সর্ব্বনাশই না করলে!"

রংরাজ এইবার চলে গেলেন।

মানব মনে মনে বললে:

"ভোলার মত পাজী ত সংসারে দেখবেই না। কেন-না, ভোলা অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য বলতে পারে। যেহেতু সে সর্ব্বেশ্বর রায়ের মাসহারা খায় না—বন্ধু বলে, আর প্রভাতী দেবীর জুতোর সুখতলাও সে চাটে না। ভোলা ওইখানেই ~~বড়~~ পাজী। সে কথার ভুল কি?"

ভোলা তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল।

"কি রে, ফিরে এলি যে?"

"ওই পাজীটা গেছে দেখে। আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। ওটা আবার ফিরবে না ত?"

"না।"

"দেখ মানব, ওই লোকটার মত পাজী—scoundrel আমি আর ভু-ভারতে দেখি নি—আমি যদি সর্ব্বেশ্বর রায় হতাম—আমি ও-বেটাকে গুলি করে মারতাম।"

"কেন?"

"যাক্, ওর কথা নিয়ে আলোচনা করতেও ঘেন্না হয়।"

"তোর রংরাজবাবুর ওপর এত জাতক্রোধ কেন?"

"কেন? ওই যে বললুম—মনে হয় পাঁশ পেড়ে কাটি—এক ফোঁটা রক্তও যেন মাটীতে না পড়ে। রক্তবীজের ঝাড়। এই লোকগুলোই বাংলার সংসারে পাপ ঢুকিয়েছে। যখন-তখন শ্রীভগবানের নাম করে আর...থাক্..."

"কেন, কি হ'ল?"

"কিছু হয় নি মানব—ছেড়ে দে ওর কথা। জয়ন্তর সম্বন্ধে কি করা যায়? টাকাগুলো সব ত বরবাদ হয়ে গেল। এদিকে থিয়েটার যদি খুলতে হয় আরও টাকা চাই। তার ওপর ওই মীনা, যেটা নায়িকা সাজছে—সেটা ত পাঁচ হাজার টাকা বোনাস আগাম চায়, তবে সে প্লেতে নামবে। এখন একটা বুদ্ধি বিবেচনা ক'রে দেখ, যদি কোন উপায় থাকে...আমি ত একটা পোটো—আমি ত মানুষের মধ্যেই নয়। পোটোরা যে মানুষ নয় তা ত জানিস্।"

"এতখানি বিনয় শিখ্‌লি কবে থেকে রে ভোলা...এত বড় সত্যি কথাটা বলে ফেললি?"

"তুই কি আজ আমায় নতুন দেখলি?"

"না।"

"তবে? দেখ্, আমি গড়তে পারি শুধু আর্ট—সংসার গড়বার ক্ষমতা আমার নেই—আমি জানি কোন্‌খানে আমার limitation—কোথায় থামতে হবে, তা আমি জানি।"

"তা আমায় কি করতে বলিস্—পাঁচ হাজার টাকা চাস? জয়ন্ত যদি টের পায় এ টাকা আমার কাছ থেকে নিয়েছিস্ তা হলে সে কি করবে জানিস্?"

"কি করবে?"

"তার বড় অভিমান, অভিমানে ঘা পড়বে, সে সহ্য করতে পারবে না। সব আরো খারাপ হবে।"

"কিন্তু আমার মনে যচ্ছে আদৌ এ থিয়েটারটা করতে দেওয়াই উচিত কি-না। টাকা সে এখন আর কোথাও পাবে না। কেন-না সব বন্ধক দিয়েছে। আমি কালী মিত্তিরকে বলেছিলাম, সে বলে second mortgage করায় একটু সময় লাগবে—ধনীকে বোঝাতে হবে।"

"শোন, পাঁচ হাজার টাকা কেন, আমি তোকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি—তোর নামে চেক্ দিই, তুই ভাঙিয়ে নিয়ে যা করতে হয় কর্। তবে থিয়েটার থেকে এ-টাকা তুলতে পারবি কি-না তা বলতে পারিনে। তবে তুলতে না পারলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। জয়ন্ত না জানতে পারে এ টাকা আমি দিয়েছি। একটা কথা কি জানিস

ভোলা, সংসারে কতক মানুষ আছে যে কাজে সফল হ'লে মাথা বিগড়য়, আর কতক মানুষ আছে সফল না হ'লে মাথা বিগড়য়। যে একখানা নাটক ষ্টেজে সফল হয়নি ব'লে এই রকম অব্যবসায়ীর মত টাকা নষ্ট করতে পারে সে খেয়ালী মানুষ—হয় ত সফল হ'লে ভাল হতে পারে। কিন্তু এইটেই আমার কাছে ঠেকছে—সে বাড়ীতে থাকে না··· খায় না···তার বউয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে। নাটক অভিনয় কি এত বড় জিনিষ যে, সংসার ছেড়ে অভিনয়ের জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ করতে হবে! না ভোলা, এর ভেতর আরও কিছু আছে!"

"কি আছে?"

"পুরুষের পক্ষে মেয়েমানুষের মোহ, তার নেশার চেয়ে বড় নেশা আর নেই।"

"তোরও ও নেশা আছে না কি?"

"আছে না?"

"তবে বিয়ে করিস্ না কেন?"

মানব একটা নিঃশ্বাস নিজের অজ্ঞাতে ফেললে। ভোলা সেটা লক্ষ্য ক'রে বললে:

"কি রে, তোকেও রোগে ধরেছে বল্!"

"যাক, ও-কথা ছেড়ে দে—তোর টাকার কি আজই দরকার। তাহলে তোর নামে চেক্ দেবারই বা কি দরকার— আমি নিজের নামে টাকা বার করে নিয়ে তোকে দিয়ে দি। কিন্তু শোন্ ভোলা, জয়ন্ত কি মিলনী, কি আর কেউ যেন এ টাকার কথা জানতে না পারে। তুই ত জানিস্, আমার নিজের খরচ অত্যন্ত কম। এই টাকাটা সব খরচ করলেও আমার এমন বিশেষ কিছু কমে যাবে না। আমি এটা দিতে চাই—যদি জয়ন্তর এই নাটক অভিনয় সফল হয়—তার মনটা স্থির হয়। কিন্তু তুই যা বললি, তাতে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে। শুধু নাটক অভিনয় অসফল হওয়া নয়; এর ভেতর আরও কোন কারণ আছে—সেই কারণের সঙ্গে ওর তোর মীনাও একটা কারণ জুটেছে।"

"সে কারণটা কি?"

"সে কারণটা কি—মনে ভাবছি।"

"কি ভেবেছিস্?"

"ভাবছি, কিন্তু তোকে এখন সে কথা বলতে পারছি না।"

"কোন আপত্তি আছে?"

"আপত্তি নেই, কিন্তু বললে বিপত্তি হতে পারে। তাই এখন বলব না। শোন এখন নটা বেজেছে। তুই এখানে স্নান-টান সেরে নে। খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর একসঙ্গে ব্যাঙ্কে যাব, সেখান থেকে তোকে টাকাটা দিয়ে দি। তুই নিয়ে যা। দেখ্ যদি অভিনয়টা সফল হয়।"

"ধর যদি অভিনয় সুফল না হয়, তাহলে? জয়ন্ত কি ফিরবে মনে করিস?"

"সবটাই মানুষের বুদ্ধি আর কাজের হাতে—তা বলতে ভরসা পাই নে। তবু সে যখন এত বড় ভার নিতে ভয় পায় নি—তখন আমরা বন্ধু, তার সফলতার জন্যে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।"

এমন সময় ইলা বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বললে:

"দাদা, তোমার আজকে গাড়ীর দরকার আছে? আমি মাধুরীদের বাড়ী যাব তিনটার সময়।"

ভোলা রায়কে নমস্কার করে বললে: "এই যে ভোলাদা! কেমন আছেন?"

"তুমি ভাল আছ বোন্?"

"আমাকে আপনি paintings শেখালেন না? মাধুরীকে ত শেখান।"

"হয়েছে, ভোলা তোমায় painting শেখাবে? তা তোর গাড়ীর যদি দরকার হয় নিয়ে যাস্।"

"তুমি কি বেরুবে?"

"বেরুব। তাহ'লেও আমার গাড়ী না হ'লেও চলবে— আমি ট্রামে যাব এখন।"

"আচ্ছা। হাঁ ভোলাদা, আমাকে শেখাবেন কি-না বলুন?"

"সবাই কি সব শিখতে পারে দিদি! বড় পরিশ্রম করতে হয়। আঁকা শেখান যায়, কিন্তু রঙের খেলা শেখান যায় না। সেটা মানুষের মাথার ভিতর থাকে।···আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা হয় আমি শেখাতে চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা ইলা, তুই ক'রকম করবি। ফিলজফির মাষ্টারও রাখবি, আবার ছবি-আঁকাও শিখবি—কোনটাই তোর হবে না।"

"ঠিক হবে। তুমি ভোলাদাকে বলে দাও।"

"আচ্ছা বলব। ওরে ভোলা, তোর আদুরে বোনের

আবদার যদি রাখতে পারিস ত দেখ্। ভোলাকে কিন্তু মাসে এক-শ ক'রে টাকা দিতে হবে।"

"সে তুমি জান, তুমি দেবে। আমি ছবি আঁকা শিখব।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! শোন্ ইয়েকে বলে দিবি, আমরা ক'জন খাব। তাড়া ক'রে করতে বলিস্। আমি ভোলার সঙ্গে এক জায়গায় যাব।"

"আচ্ছা।"—ব'লে ইলা বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

"ভোলা, তুই তবে স্নান করে নে। মহিম এলে একসঙ্গে খেয়ে নেব। কিন্তু কাপড়-চোপড়?"

"তোর গায়ের জামা আমায় একেবারে মশারির খোলের মত দেখাবে। এতেই হবে।"

"এক কাজ কর্—তোর জামাটা cream colour, ওটাকে খুলে দে—ধনিয়া ওটা কেচে ইস্তিরি ক'রে রাখুক—আমার কাপড় একখানা পর—তুই আবার কোঁচান কাপড় পরিস নি। তাহোক্ সে যা-হয় হবে। আমি বাড়ীর ভেতরের স্নান-ঘরে যাই।"

ভোলা স্নান করতে গেল। মানবও বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল। ক্রমশঃ

মহিষাসুর

শ্রীরামেন্দু দত্ত

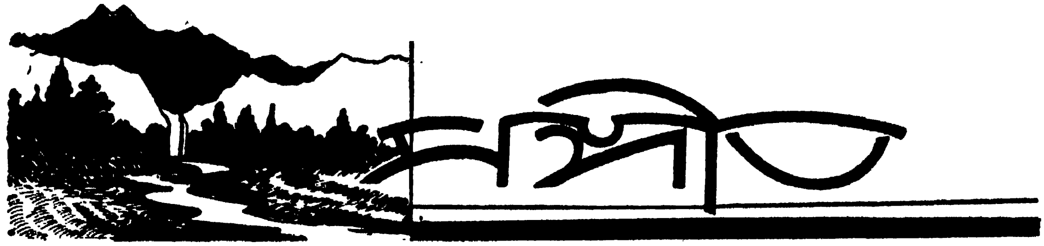
দুর্গারে আর পূজবো নাকো দুর্গতির এই আটচালায়
পেটের দায়ে পোটো যেথায় তুলি ফেলে কাঠ চেলায়!
সকাল থেকে সাঁঝ অবধি
কবির বহে ঘর্ম্ম-নদী
লম্বা আঁকে কোমর বাঁকে পরের হিসাব;—তার ঠেলায়!

সরস্বতী সঙ্গে আসেন; না আসিলেই পারেন তো—
কলম-পেষাই যাদের পেশা, খোদা তারেই মারেন তো!
এবার ভারী রেগেছি মা
হয় তো যাবো ছাড়িয়ে সীমা
"আব দুলিয়ে"ও যেতে পারি, আল্লা কিছু ছাড়েন তো!

লক্ষ্মীমাতাও লক্ষ্মী মেয়ের মতন থাকেন ডান পাশে
তাঁর চেলাদের লক্ষ্মীছাড়া আদল্ দেখে লোক হাসে!
গণেশ ঠাকুর! লোকের ভিড়ে
চিন্‌বে কি এই শিষ্যটিরে?
ঋণং কৃত্বা থাইলে ঘৃত শুকায় ভুঁড়ি এক মাসে!

কার্ত্তিকটি আসেন বটে, ময়ূর চ'ড়ে চমৎকার—
কুঁচিয়ে-পরা কাঁচি ধুতি, গুম্ফে অটো-দিল্‌বাহার!
দেবতাদের সেনাপতি
তাঁরই যখন এ দুর্গতি,
ভক্তরা তাঁর করবে কি আর, কিন্‌ছে নূতন মোটরকার!

দেখে শুনে ভাব্‌ছি মা ঐ মহিষাসুর দাও ক'রে!
হুমহুমিয়ে বেড়াই তবু বুক ফুলিয়ে প্রাণ ভ'রে—
ধাৰ্ম্মিক আর ঠাণ্ডা ছেলে
মাঝ গঙ্গায় দাও মা ফেলে,
তুমি সুধু আর এসো না বধ করিতে বর্ষা ধ'রে!



দেশী তোড়ি * — ঢিমা তেতালা

না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা।
জীবন-প্রভাতে এলো বিদায় বেলা ॥

আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখপানে,
বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা ॥

আঁধারের এলোকেশ দুহাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশিথিনী কাঁদে বন-ছায়ে,
বুঝি দুখনিশি মোর হবে না হবে না ভোর
ভিড়িবে না কুলে মোর বিরহের ভেলা ॥

কথা ও সুর :—কাজী নজরুল ইস্লাম্ স্বরলিপি :—জগৎ ঘটক

II ৷ স সরা রমা মপা ৷ পধা -ধমা মপা - ণদা | -মপা মজ্ঞাঃ সরঃ সণ্া | সা -া সা -া I
০ না মি০ টি ০ তে০ আ০ ০০ শা০ ০ ০ ভা ঙি ল খে ০ লা ০

I ৷ সরা রমা মপা | পা পদাঃ জ্ঞমঃ মপা | ৷ পণপাঃ র্সঃ ণর্সা ! ণধা -ণা -ধণাঃ -দপঃ II
০ জীব ন০ প্র০ ভা তে০ এ ০ লো০ ০ বিদা য় বে০ লা ০ ০ ০০

* ত্রয়োদশ তোড়ির মধ্যে কতকগুলি চর্চ্চার অভাবে অপ্রচলিত হইয়া "মার্গ সঙ্গীত" শ্রেণীভুক্ত হইতে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় ভারতবর্ষে 'খট্তোড়ি'র একখানা স্বরলিপি ও গান দিয়াছি। 'খট্ তোড়ি', 'মুদ্রা তোড়ি', 'সুহা তোড়ি' প্রভৃতি পাঁচটিকে মিশ্র তোড়ি, এবং 'দেশী তোড়ি', 'দরবারী তোড়ি', 'আশাবরী', 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি আটটিকে শুদ্ধ তোড়ি বলে। এবার 'দেশী তোড়ি'র একখানা স্বরলিপি দেওয়া হইল। ইহা আশাবরী ঠাটের।

'দেশী তোড়ি'র তিন প্রকার মত দেখা যায়। যথা :—

১। আরোহী—স র ম প, ণ প র্স।
অবরোহী—র্স ণ দ প, র ম, র জ্ঞ, স র ণ্, স, জ্ঞ র স।

২। দ্বিতীয় মতে আরোহীতে ধৈবত (তীব্র) ব্যবহার হয়।

৩। তৃতীয় মতে, দুই ধৈবতই ব্যবহার হয়।—স্বরলিপিকার

II । মপা পণা ণপা | পর্সা -া র্সা র্সা | । ণর্সা ণদা দণা | ণর্সা -া র্সা -া I

০ আঁচ লে০ র ফু ল্ গু লি ০ করু ণ ন য়া ০ নে ০

I । র্সর্রা র্রা -া | র্সর্রা র্সর্জ্ঞা র্সর্রা·র্সর্ সর্ণা | । ণর্সা র্সা র্সা | ণর্সর্রা -ণর্সা ণদ ণদা -পা I

০ নিরা শা য়্ চে০ য়ে০০ আ০ ছে০০ ০ মোর্ মু্ খ পা০০ ০০ নে ০ ০

I । পধা পমা মা | রা রমপাঃ পঃ পা | । র জ্ঞা সরা সন্‌া | সা -া সা -া II

০ বাজি য়া ছে বু কে০০ যে ন ০ কার্ অ০ ব হে ০ লা ০

II । সরা ণ্সা ণ্সা | রা গমা রমা -া | । রমমা মপাঃ মঃ | পদা -ণা ণদ ণদা -পা I

০ আঁধা রে০ র ০ এ লো কে০ শ্ ০ ভুগা০ তে জ ড়া০ ০ য়ে ০ ০

I । পপধাঃ মঃ পা | পা পঃ -ণদা মঃ পা | । রঃ জ্ঞা সরঃ ণ্‌া | সা -রঃ -জ্ঞঃ রসা -া I

০ যেতে০ যে তে নি শি ০ থি নী ০ কাঁ দে ব০ ন ছা ০ ০ য়ে০ ০

I । মপা পণদা ণপা | পসা র্সা দণা র্সা | । র্সর্রা র্সর্রা -র্জ্ঞঃ র্রর্সঃ |

০ বুঝি দু০ খ নি শি মো র্ ০ হবে না০ ০ হ

র্সর্রা র্সর্ণা ণর্সণর্সা ণদপা I

বে ০ না০০ ভো০০০ ০র্

I । মপা পণা ণর্সা | ণর্সা ণর্সদা মপমপা -া | । রজ্ঞা সরা ণ্‌া | সা -া সা -া II II

০ ভিড়ি বে না কু০ লে০০ মো০০০ র্ ০ বির হে০ র ভে ০ লা ০



বঙ্গের পাল-শিল্প

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

প্রবন্ধ

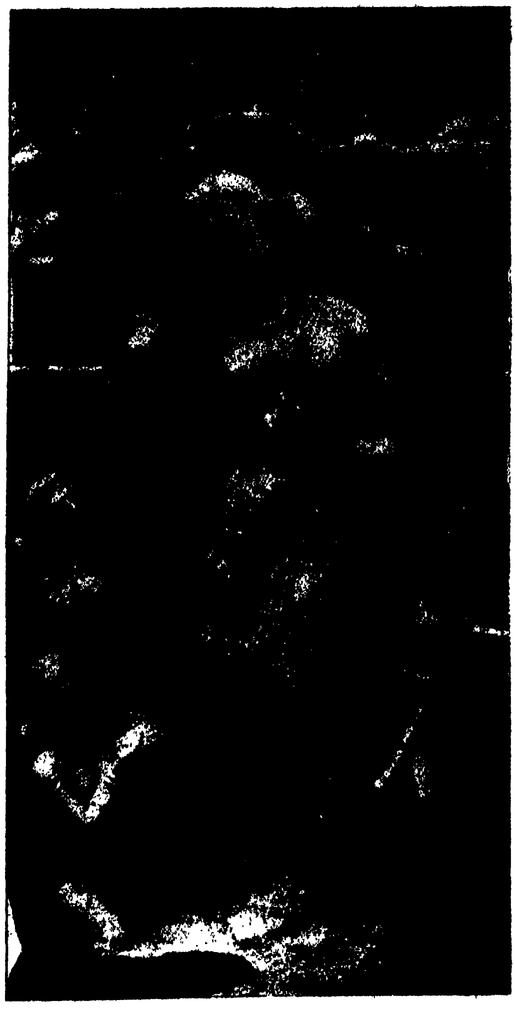
প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত গুপ্তযুগকে যেমন সচরাচর গ্রীস দেশীয় পেরিক্লিয়ান্ যুগের সহিত তুলনা করা হয় তেমনি



অর্দ্ধনারীশ্বর

যুগে বঙ্গের পাল-অভ্যুত্থান পূর্ব্ব ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক অনবদ্য রূপ প্রদান করিয়াছে।

ভারতেতিহাসে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা; কেন না, জানিতে পারা যায় যে, বহু বৎসরের অমানুষিক অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জনসাধারণ সাগরবংশীয় গোপালকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে দেশের শাসনকর্ত্তা



যমুনা

হিসাবে নির্ব্বাচিত করেন। ইহাদের অধীনে বঙ্গের কৃষি-শিল্পের উৎকর্ষসাধনই কেবলমাত্র হয় নাই, পাল সম্রাটের

রাজত্বকালীন বঙ্গ ও মগধে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া শিল্প-জগতে এক নূতন রস-সৃষ্টির অবতারণা হয়। এই



গঙ্গা

মহাযান মতবাদ পালযুগের শিল্পকে সহজ মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহা তৎকালীন ভারতীয় জীবনের উপরেই কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নাই, ইহা ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে যবদ্বীপে এবং সুমাত্রায় নীত হইয়াছিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পাল সম্রাটদের উৎসাহে বঙ্গের পাল-শিল্প সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। পাল-সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে আমরা দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপালের পরিচয় পাই। ভিক্ষু তারানাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্র ভূমিতে নিপুণ দক্ষশিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, কৃষিকলায় বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিষ্য মগধেই বেশী ছিল এবং ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে 'পূর্ব্ব-বিভাগ' এবং বীতপালের পদ্ধতিকে 'মধ্যদেশ শিল্প বিভাগ' বলা হইত।

পালযুগের অধিকাংশ শিল্প নিদর্শনগুলি নিম্নলিখিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (১) নালন্দা, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, ভাগলপুর (বিহার), (২) দিনাজপুর, রাজসাহী, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম (বঙ্গদেশ), ও (৩) খিচিং (ময়ুরভঞ্জ)। নিম্নলিখিত মিউজিয়মগুলিতে উহা বেশীরভাগ সুরক্ষিত আছে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম (রাজসাহী), ভারতীয় যাদুঘর (কলিকাতা), ঢাকা মিউজিয়ম (ঢাকা), আড়িয়ল মিউজিয়ম (বিক্রমপুর), আশুতোষ মিউজিয়ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ

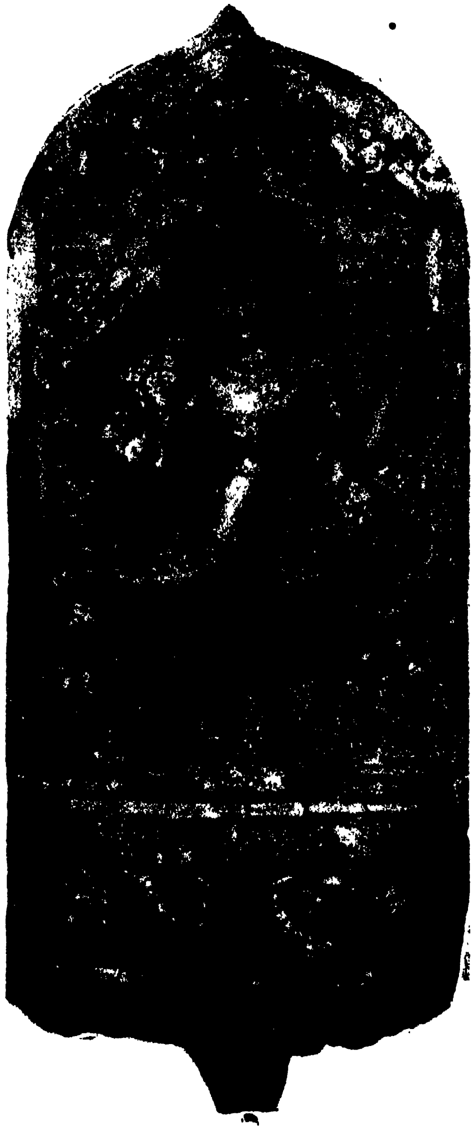


সূর্য্য

(কলিকাতা), মাহার মিউজিয়ম (কলিকাতা), লক্ষ্ণৌ পাটনা মিউজিয়ম, ব্রিটিশ মিউজিয়ম (লণ্ডন), কেম্ব্রি-

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথি, মিউজি গিমে (প্যারিস), বার্লিন মিউজিয়ম, বোষ্টন মিউজিয়ম, মেট্রোপলিটান্ মিউজিয়ম (নিউ ইয়র্ক)।

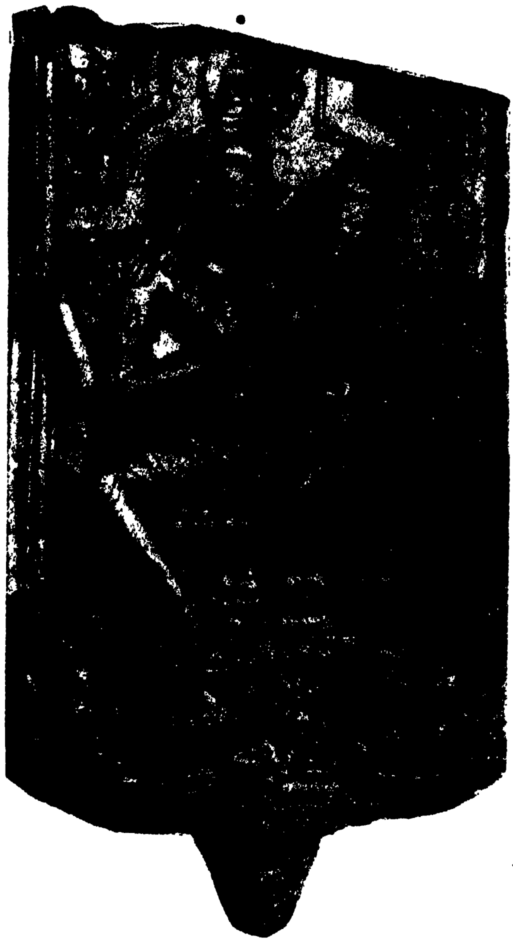
পালশিল্পের মসৃণ কালো পাথরের মূর্ত্তিগুলিই প্রধান। মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্যবহুলতা ও কমনীয়তাই এই শিল্পের



কার্ত্তিকেয়

বিশেষত্ব। সাধারণতঃ মূর্ত্তিগুলির বক্ষ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ আবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। মূর্ত্তিগুলিতে মুকুল, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, মেখলা, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কার খোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মুখাকৃতি সাধারণতঃ দীর্ঘ হয় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের নিম্নগতি হওয়ায় মূর্ত্তিগুলির মুখে সাধারণতঃ একটি বিনম্র হাসি দেখিতে পাওয়া যায়। বেশীর ভাগই নাসিকা উন্নত হয় না, উহার দুই পার্শ্বে প্রজাপতির শুঁড়ের মত ভ্রূ-যুগল উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধ-নিমিলীত চক্ষু দুইটিতে ঢুলু ঢুলু ভাব ফুটিয়ে ওঠে।

প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির এই একই শিল্পপদ্ধতি পালযুগের



হর-পার্ব্বতী

ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলিতেও অনুসরণ করা হইয়াছিল। ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি সাধারণতঃ নালন্দা এবং চট্টগ্রামে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলির সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গীর প্রকাশ ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলিকে সহজেই ছাপাইয়া যায়। সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে পালযুগের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গশিল্পের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই তিব্বতীয়েরা বাংলায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং মহীপালদেবের রাজত্বের সময় বিক্রমশিলার প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নেপাল ও তিব্বত গমন করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় বঙ্গশিল্প নেপাল ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এলিস সেলি লিখিয়াছেন, "বাংলায় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তৈজসপত্রে মগধরীতি অনুযায়ী যে চিত্রাঙ্কন



মকরবাহিনী

হইত সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি তিব্বত ও নেপালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ ষ্টেপলটন্ লিখিয়াছেন যে, একাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় 'Pog-Sam-Jom-Zam' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রে বঙ্গশিল্পীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরে নেপাল ও তিব্বতীয় শিল্পীগণ এবং সর্ব্বশেষে চীনাশিল্পী। আমরা নেপাল ও তিব্বতের মন্দির-গাত্রে লম্বমান চিত্র ও সমসাময়িক বঙ্গচিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পর পালেরা মাত্র কয়েক পুরুষ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পালরাজা মদনপালের সময় হইতেই বঙ্গদেশ বার বার বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের



হে বজ্র

বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে এবং ইহার ফলে বঙ্গশিল্পীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে অনেকেই অনুমান করেন, কাংড়া উপত্যকার শিল্পীরা ইহাদেরই বংশধর। শ্রীযুক্ত জে. সি.

ফ্রেঞ্চ মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই। তিনি লিখিয়াছেন, "লেখক যখন পাঞ্জাব 'হিল-ষ্টেটে' ছিলেন তিনি পালবংশ সম্পর্কীয় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও অপ্রত্যাশিত প্রবাদ শুনিতে পান যে, সুকেত, কাওন-থল, কাঙ্গওয়ার, মুণ্ডি প্রভৃতি ষ্টেটের নৃপতিগণ বাংলার গৌড়রাজ-বংশোদ্ভূত। এই সব প্রাচীন রাজপুত রাজবংশের প্রবাদগুলি শক্তিশালী ও নির্ভুল বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে, কাঙ্গওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'কাহন পাল' একদল ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রাজ্যস্থাপনার্থ ঐ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজবংশের কুমার ছিলেন।" ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে, তদ্দেশীয় অনেক নৃপতি পালবংশোদ্ভূত এবং তাঁহারা এখনও উহা বলিয়াই পরিচয় দেন। কাংড়া-শিল্পও বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার বিষয়বস্তু, বর্ণবিন্যাস ও মূর্ত্তি-রচনা বঙ্গশিল্পের একই ধাঁচে গঠিত। যদিও ইহাতে রাজপুত শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সম্ভবপর। কেন না তদ্দেশে বসবাস করিয়া রাজপুত-শিল্পীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি তাহাদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্গশিল্পের ধারা অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।



মাতৃ-মূর্ত্তি

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন রাজাগণের প্রভুত্ব ও অন্যান্য অনেক রাজনীতিক বিপ্লবে পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের এই পালশিল্প সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। *

হেমন্ত—কার্ত্তিক

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উঠেছ কি ভোরবেলা ব্রত উদ্‌যাপন তরে
প্রাতঃস্নান সারিয়াছ ধূসর সাড়িটি পরে।
সযতনে গাঁথিয়াছ করবীর মালাখানি
ইষ্টদেবতার লাগি পূজারিণী হিমরাণি!

* ভারতীয় মিউজিয়ম, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং হে বজ্র চিত্রখানি শ্রী নাহারের সৌজন্যে প্রকাশিত।

উপযাচিকা

শ্রীমতিলাল দাশ

১

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলাম—ভারতীয় হিন্দুদর্শনের মহিমা নিয়ে। ছুটি এল, মন শান্তি চাইল; চাইল অবসর, অখণ্ড বিশ্রামের দিন, তাই মঁসিয়ে রিভেল বললেন—জেনেভা যেতে; সেখানে ওর কবিবন্ধু মঁসিয়ে বুঁলো থাকেন। কাটবে দিনগুলি কাব্যশাস্ত্র-বিনোদনে, আর নিসর্গের চারুতা ভোগ করে।

প্যারি-মেল রাত দশটায় থামল জেনেভায়। বুঁলো বলেছিলেন তাঁর এক বান্ধবী ভাল ইংরেজী জানেন—তিনি আমায় অভ্যর্থনা করতে আসবেন। কা কস্য পরিবেদনা? কি করি, নিজের ভারি সুটকেসটি একটি পোর্টারের মাথায় দিয়ে সিঁড়ি নামছি, একটি তরুণী ভারতীয়-প্রথায় যুক্তকরে প্রণাম করে বলল—"আপনিই মিঃ রায়?" সম্মতি জানালাম মাথা নেড়ে। তরুণী বলল—"ক্ষমা করবেন, আমার একটু দেরী হয়েছে। তবে চলুন আপনার হোটেল নিকটেই আছে, এটা বেশ ভদ্র অথচ সস্তা।"

তরুণী কিশোরী—যৌবনের বিলাস তার বরাঙ্গকে সজ্জিত করবার বাসনায় লোলুপ হয়ে উঠেছে। তার মুখে চোখে এসেছে যৌবনের জলুস, মুগ্ধ করল ওর রূপ আর আলাপ।

বললাম—"অসংখ্য ধন্যবাদ! আমায় ঠিকানাটা বলে দিন, আমি কুলিকে নিয়ে যাচ্ছি।"

তরুণী হাসল—"না, তা হয় না, বুঁলো আপনাকে আমায় সঁপে দিয়েছেন, আপনাকে না খাইয়ে ছাড়ব না।"

দুজনে আলাপ করতে করতে চললাম, হোটেল ছিল কাছেই—দুজনে গিয়ে একটা ঘর পছন্দ করা হল। তার পর লীনা—ওর জার্মান নামকে বাংলা করলে লীনার মতই শোনাবে—ড্রয়িং রুমে গেল। আমায় বলল—"তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন—"

রাস্তায় তখন লোকসমাগম নেই—বিদেশে নীলাকাশতলে দুটি তরুণ ও তরুণী, মন আনন্দে ভরে উঠল। হোটেলের পরিচারিকা বলল "দুজনের খাবার দেব?"

লীনা বলল সুন্দর ফরাসীতে—"না না, আমি খেয়েছি।"

আমি বল্লাম—"তাহলে যে আমার খাওয়াই হবে না।" আমার কৃপণ-চিত্ত তরুণীর জন্যে বদান্য হয়ে উঠছিল।

লীনা বলল—"আপনি খান—আমি বরং একটা গ্রেপফ্রুট খাচ্ছি।" শেষে এই রকমই হল।

খেতে খেতে ও ভারতবর্ষের গল্প তুলল—ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা আছে—বইতে ও টেগোর-গানডি প্রভৃতির কথা পড়েছে—তা ছাড়া মিস মেয়োর বইও পড়েছে—তাই কৌতূহল ভরে ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে বলল—"আপনারা মেয়েদের প্রতি অত্যাচার করেন?"

আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম, সেখানে ব্যঙ্গ ছিল না। ও ভাবে আমাদের মেয়েরা খাঁচার পাখী, তাদের স্বাধীনতা নেই, তাদের জীবন দুঃখের একটানা স্রোত।

আমার বক্তৃতা ছুটল, বুক-ভরা মধু বাংলার বধূর—এনার কথা মনে জাগছিল; বাংলার সেই শ্যামল মেয়ের কালো চোখ মনে জাগছিল। এনা কষ্ট পাচ্ছে, তবু সে স্বামীর কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করছে; তাই হয়ত অজ্ঞাতে আমার কথায় এসেছিল আন্তরিকতার উচ্ছ্বাস। লীনা মুগ্ধ হয়ে উঠল, ওর চোখে ফুটল কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ মাধুরী, বলল—"আপনার কথায় আমার ভুল ভাঙ্গল।"

খাওয়া শেষ হলে হাস্যময়ী পরিচারিকাকে কিছু বেশী বখশিস দিলাম; ও খুসি হয়ে উঠে শুভরাত্রি জানাল আর বলল—"যে কদিন আছি, ওদের রেঁস্তরায় গেলে ওরা ভারতীয় খাবার দাবার দিয়ে আমায় যত্ন করবে।"

রাজপথ নির্জন; নীল আকাশে উঠেছে তারার মেলা; তার নীচে জেনেভার সরোবরে পড়ছে তড়িতালোক—দূরে শৈলশিখরে জ্বলছে আলোর মালা; লীনা বলল—"ঘুমোতে যাবেন, না কাফি খাবেন কোনও কাবারেতে।"

ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু তরুণীর আহ্বান উপেক্ষা করা বীরোচিত হবে না; আর তাছাড়া আমরা ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা দিই না একথা কিছু আগেই ওর কাছেই শুনেছি। তাই আধ-ইচ্ছায় আধ-অনিচ্ছায় চললাম। হ্রদের পাশেই কাফির ঘর, নানা দেশের নর ও নারীর বিচিত্র সমাবেশে জীবনের কি স্ফূর্ত্ত লীলা-বিলাস—বেশীর ভাগই যুগলে যুগলে। লীনার সঙ্গী হিসাবে আমার মনেও জাগল যৌবনের আনন্দ, বিজয়ের উল্লাস।

পরিচারিকা আনল কাফি; তার পর কি পান করব জানতে চাইল। লীনার মুখের দিকে চাইলাম; ও বলল—"আপনি বোধ হয় সুরাপান করেন না?"

আমি সঙ্কোচে বললাম—"না।"

হাসতে হাসতে বলল—"তা জানি, আপনারা অতি ভীতু জাত—" তার পর পরিচারিকাকে বিদায় করল।

কাফি পানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ দেখা চলল। জিপসী নাচ হচ্ছিল, বেদিয়ারাও দেখছি তাদের অবদান ভদ্রসমাজে দিতে পারছে। য়ুরোপীয়েরা যেখানে মাণিক পায় সেখান থেকে সেটা আহরণ করে; আমাদের মত আর্য্যামির ভড়ং নেই বলে ওরা বেড়েই চলেছে।

"কেমন লাগছে?"

"ভালই।"

আনন্দের আতিশয্য বাড়ল; লীনার জন্য একপাত্র দ্রাক্ষাসব আনতে বললাম; আমায় বলল—"খান না এটা. ঠিক মদ নয়, এটা আপেলের নির্য্যাস।" আমার শিরায় জাগল কৌতুকোল্লাস—আমিও পান করলাম।

তখন অনেক রাত হয়েছে, ফিরলাম। ওকে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হল; পাশাপাশি চললাম—হয়ত দ্রাক্ষা সব আড়াল দূর করেছিল। ও তার পেলব হাত দিল আমার গায়ে।

ওর মুখের সুরভি বাস, ওর বক্ষের স্পন্দন, কিন্তু না—এনা রয়েছে তার কালো চোখ নিয়ে চেয়ে।

চোখে ভাসল—বাংলা দেশের কাজলা মেয়ের কাজল কালো চোখ।

২

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা নটায়; পরিচারিকা বলল—"বুঁলো আমায় ডেকেছিলেন—ফোন তুলে নিলাম।"

"কেমন কাটল কাল রাত, লীনা তোমায় সাহায্য করেছিল ত?"

"ধন্যবাদ, আপনার সৌজন্যে খুব কৃতজ্ঞ। লীনা সত্যই খুব ভাল—"

"হ্যাঁ, ভারতীয়কে ও খুব ভালবাসে; বেশ, দুপুরে কোথাও যাচ্ছেন কি?"

"না।"

"তাহলে আসুন গরীবখানায় মাধ্যাহ্নিক—"

"না না, আপনার অসুবিধা হবে।"

"মোটেই নয়; তা হলে ঠিক রইল। বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন। ততক্ষণ ঘুরে নিন, লীগ অব্ নেসন্স দেখে নিন।"

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চললাম রাষ্ট্রসংঘের কর্ম্মকেন্দ্র দেখতে; রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ ও কল্পনা আমার খুব ভাল লাগে; জগতে এতদিন ধরে কেবলই শোষণ চলছে। বুদ্ধিজীবী, শাস্ত্রজীবী, ধর্ম্মজীবী—আপনার স্বার্থের জন্য দিয়েছে জগৎ জুড়ে মিথ্যা শিক্ষা—সেই শিক্ষা ভুলাতে হবে। এইচ-জি-ওয়েলসের কথা মনে পড়ল—লোককে শিখাতে হবে নূতন বাণী।

রাষ্ট্রসংঘের বাড়ী ঘর তখনও সব তৈরি হয়নি; দেখলাম নানা দেশ থেকে এসেছে নানা অবদান।

খুব ভাল লাগল আমার; ওখান থেকে বাসে করে গেলাম বুঁলোর ওখানে—মাদাম বুঁলো দরজাতেই ছিলেন। বোতাম টিপতেই দরজা খুলে ড্রয়িং রুমে নিয়ে চললেন মাদাম—প্রৌঢ়া, তবুও ওর মুখে অপূর্ব্ব কান্তি।

মঁসিয়ে বুঁলো নামলেন; তার পর আহারে বসা গেল। মাদাম বললেন—"আপনার কি ভাল লাগবে জানিনে। এখানে একজন ভারতীয় আছেন, তাঁর জার্ম্মান স্ত্রীর কাছ থেকে দু-চারটি ভারতীয় খাবার শিখেছি।"

মাদাম পোলাও্যা করেছিলেন, বেশ লাগল খেতে। ভারতীয়েরা করে মসলা দিয়ে খুব গুরুপাক—এটা বেশ সুগন্ধ ও সুপাচ্য লাগল।

বুঁলো বললেন—"আমি নূতন বই লিখছি—নূতন যুগের কাব্য—যারা বলে কবিতা মরছে তারা ভুল বলে—আমি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লিখি, তবু এগুলি লোকের ভাল লাগছে।"

আমি বললাম—"কবিতা ছিল অতীতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, গদ্য এসে পদ্যকে রাজ্যচ্যুত করেছে।"

বুঁলো বললেন—"তা অনেকটা ঠিক। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন দরকার ছিল সুরের ও মিলের। মিল মনে রাখবার সুবিধে করে দিত। আজকাল গদ্যের অবাধ রাজত্ব।"

আমি ওঁকে খুসি করতে বললাম—"তবে গদ্যেও পদ্য লেখা যায়।"

মাদাম হাসলেন, বললেন—"তবে পদ্যও চলছে। ওঁর কবিতার প্রত্যেক চরণের জন্য উনি আমেরিকার কাগজ থেকে এক গিনি করে পান। লোকের ভাল না লাগলে এত দাম পাওয়া যেত না নিশ্চয়ই।"

আমি বললাম—"তা ঠিক, তবে সাহিত্যের এই ব্যবসাদারি—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভবের পথে বাধা দিচ্ছে।"

বুঁলো উত্তর দিলেন—"হয়ত খানিকটা ঠিক; শক্তিমানের লেখা জন-চিত্তের দাবীতে আপনার স্বাধীনতাকে ব্যক্ত করতে পারছে না।"

"য়ুরোপে প্রত্যেক জিনিসের মাপকাঠি অর্থ। একে আমি অন্যায় মনে করিনে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা হয়ত বেশী, তাই অর্থকে অনর্থ ভাবে। তার ফলে হয়েছে আমাদের অর্থ নৈতিক প্রতিরোধ। আমাদের কাজ চলছে না।"

মাদাম বললেন—"লীনাকে কেমন লাগল?"

আমি বললাম—"চমৎকার মেয়ে!"

খাওয়া শেষ হল, উঠে ড্রয়িংরুমে বসা গেল। বুঁলো পাইপ ধরিয়ে বললেন—"ওর ইতিহাসটি চমৎকার; জেকোস্লোভাকিয়ায় তিনটি জাত জুড়ে খিচুড়ি পাকিয়েছে। লীনারা সত্যিকার জার্ম্মান, এ মেয়েটিও প্রথম বয়সে হিটলারি দলে যোগ দিয়েছিল। এখন মুস্কিলে পড়েছে। ওর এক বোন জার্ম্মানিতে পড়ে, এক জার্ম্মান যুবককে বিয়ে করেছে, সেই বোন ওকে যেতে লেখে, ও জার্ম্মানীতে কিছুতেই যাবে না।"

আমি বললাম—"ওঁর ভারতবর্ষের প্রতি খুব ভালবাসা।"

মাদাম হাসলেন, চোখে তার কৌতুকের মাধুর্য্য, বললেন—"কিন্তু একটু সাবধান, ও ভারতীয় রাজা মহারাজা বিয়ে করবে এইটা ওর মনের ধারণা, আপনাকে শেষে কোনও যুবরাজ ঠাউরে না বসে।"

বুঁলো একটু চটলেন, বললেন—"না, না, ও লঘু নয়, ভারতকে ও শ্রদ্ধা করে। তাই যদি কোনও সত্যিকার দরদী ভারতীয়ের সাথে ওর মিল হয় তা মন্দ হয় না।"

মাদাম চকোলেটের বাক্স আগিয়ে দিলেন। নিলাম দু-একটি। বুঁলো তাঁর সদ্য প্রকাশিত একখানি বই দিলেন। নিজের হাতে একটি ফরাসী কবিতা লিখে দিলেন। কবিতাটি আমার এক বন্ধু অনুবাদ করেছিলেন—

পূবের রবির প্রিয় তুমি, কণ্ঠে জাগে নদীর কলছন্দ,
একটি দিনের ক্ষণিক স্মৃতি রাখুক তবু পারিজাতের গন্ধ,

পূবের সাথে পশ্চিমেরি রয়েছে ভাই নাড়ীর আত্মীয়তা
বিশ্ব জোড়া মানুষ একই মিথ্যে ভেদ জাগায় জাতীয়তা।

বিদায় নিলাম ; স্বপ্নবিলাসী কবি বললেন—"যখনই অবসর পাবেন, আসবেন ; কিছু কাব্য আলোচনা করা যাবে, সন্ধ্যে আটটা থেকে রাত নটা আমি গল্প করি।"

মাদাম দরজা পর্য্যন্ত এলেন ; নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম।

(৩)

লীনা এল পরদিন সন্ধ্যায়, বলল—"ছুটি আছে সামনের সোমবার, চলুন পাহাড়ে বেড়িয়ে আসবেন। শুধু সহর দেখলে, যাদুঘর আর কলাভবন দেখলে একটা জাতকে চেনা যায় না।"

ওর কথায় যাদু আছে ; ওর আবেদন নিরুত্তর জানে না। তাই সম্মতি দিতে হ'ল। সোমবার বেলা দুটায় রওনা হওয়া গেল। লেকে নিলাম একটা ছোট বোট, চলল সরোবরের কালো জল পাড়ি দিয়ে, মনে জাগল কবিত্ব। এ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা, অসীম অন্তহীন পাথার যেন সামনে, আর তার মাঝে আমরা দুটি তরুণ ও তরুণী। ও যেন কলচন্দ-মুখর ঝরণা ; ওর মুখে কথার খই ফুটছে—পাড়ে দেখাচ্ছে এক একটা গির্জ্জা, এক একটা বাড়ী, বলছে তার ইতিহাস ; মাঝে মাঝে বলছে কৌতুক কথা। পাহাড়ে যখন পৌছালাম তখন বেলা চারিটা।

লোকে যে পথে চলে সে পথ ছেড়ে আমরা একটা পায়ে চলার পথ ধরলাম।

আল্পস পাহাড়ের একটি নগণ্যতম শাখা, আল্পস হয়ত জ্ঞাতি বা পৌত্র বলতে একে লজ্জা বোধ করে, তবু ভাল লাগল এই ছোট পাহাড়ের স্নেহ-ভরা কোল। সরল দ্রুমের বন বেশী নেই, মত্তমাতঙ্গের মদস্রাবে এর বন কম্পিত হয় না, এর গুহায় গুহায় যক্ষরক্ষ নেই, তবু কালিদাসের হিমালয় দুস্তর মহিমায় থাকে অনেক দূরে—এ রইল যেন সঙ্গী, খেলার সাথী।

আমরা একটা ছোট ঝরণার পাশে গেলাম ; ও খুলল ওর হাত-থলের মাঝ থেকে খাবার। সাজিয়ে দিল কাগজের ঠোঙায়, য়ুরোপে হোক আর ভারতে হোক—মেয়েরা গৃহিণী। এ রূপ ওদের মোছে না, শুধু দৃশ্যপট ও রঙ্গভূমির কিছু পরিবর্ত্তন—সেটা বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয়।

লীনা খেতে খেতে বলল—'আমার বাবা ছিলেন বৈদিক পণ্ডিত, তাঁর কাছে আমি ভারতবর্ষের অনেক গল্প শুনেছি—"

আমি বললাম—"জার্ম্মান জাত সংস্কৃত সাহিত্যের বড় অনুরাগী, জার্ম্মান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের যত সেবা করেন, ভারতবর্ষ তত করে না।"

"আমি ত শুনেছি ভারত এখনও বেদের শাসনে শাসিত ; বাবা বলতেন—আর তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠত ; বলতেন এত বড় জাত দুনিয়ায় হয় নি ; কবে কোন্ দূর অতীতে শতদ্রুর তীরে যে ভাবধারা জন্মেছিল আজও সেই ভাবধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত হয়ে আছে ;"

"তা ঠিক, আমরা এখনও প্রত্যহ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি ; আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে এখনও বেদের মন্ত্র লাগে, কিন্তু—"

"এইটেই আমার দুঃখ, আপনারা কেন আসেন য়ুরোপের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে। আপনাদের দেশে রয়েছে হীরার খনি, আর আপনারা কাঙাল—"

লীনার ভাষায় ব্যঙ্গ ছিল না—ছিল ব্যথা, আন্তরিক ক্ষোভ। তাই সে আমার অন্তরকে স্পর্শ করল।

আমি বললাম—"এটা আমাদের Inferiority Complex—আমরা পিতৃধন হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই আসি ভিক্ষা করতে। আর আমাদের দেশেও বিলেতি ডিগ্রি চলে, গেঁয়ো-যোগীরা ভিখ পায় না !"

"আপনি ত বোঝেন, আপনিই বা কেন প্যারিতে থিসিস দেবেন ?"

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠলাম। এদের কাছ থেকে একটা জিনিষ শেখবার আছে—সেটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।"

"না না, ওকথা বলবেন না, যারা বেদ রাখবার জন্য পদ পাঠ করেছিল, নিরুক্ত করেছিল, ব্যাকরণ করেছিল, তার উপর ভাষ্য ও টীকা করেছিল, সূত্র করেছিল, তারা জানে না বিশ্লেষণ ! হাসালেন আপনি।"

ওর হাসিতে মুক্তা ঝরল, পাইন-শাখায় এল পাখীর জোড়া, বেশ রঙীন দুটি পাখী, মিষ্টি তাদের সুর, তাদের কূজন মনে আনে মদন-মহোৎসবের গান। ও কাছে সরে এল, আমার হাঁটুর উপর শুয়ে পড়ল, বলল আমার মুখের দিকের চেয়ে—"আমার মনে হয়, আমি আর জন্মে ভারতীয় ছিলাম ; আমার চোখে ভাসছে ভারতের সুষমাময় গরিমাময় ছবি, সামগান জেগেছিল যে হিমালয়ের বনভবনে, তুষার কিরীটি সেই হিমালয় যেন চোখের উপর চলছে চলচ্চিত্রের মত। দেখছি গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী, কত বড় সে জাত, যারা বেদ লিখেছে, যারা উপনিষদের মন্ত্র গেয়েছে। ভারতবর্ষের ডাক আমার মর্ম্মে মর্ম্মে সাড়া দেয়।" ওর পেলব ওষ্ঠে আবেগ ও রসভের দ্যুতি—আমি বিহ্বল হয়ে উঠি, আপন অজ্ঞাতেই সেই রক্ত-কোকনদে প্রীতির চিহ্ন মুদ্রিত করি।

লীনা উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে চাইল, অভিমানে বলল—"কিন্তু মিঃ রায়, এটা ভারতীয় ভব্যতা নয়—"

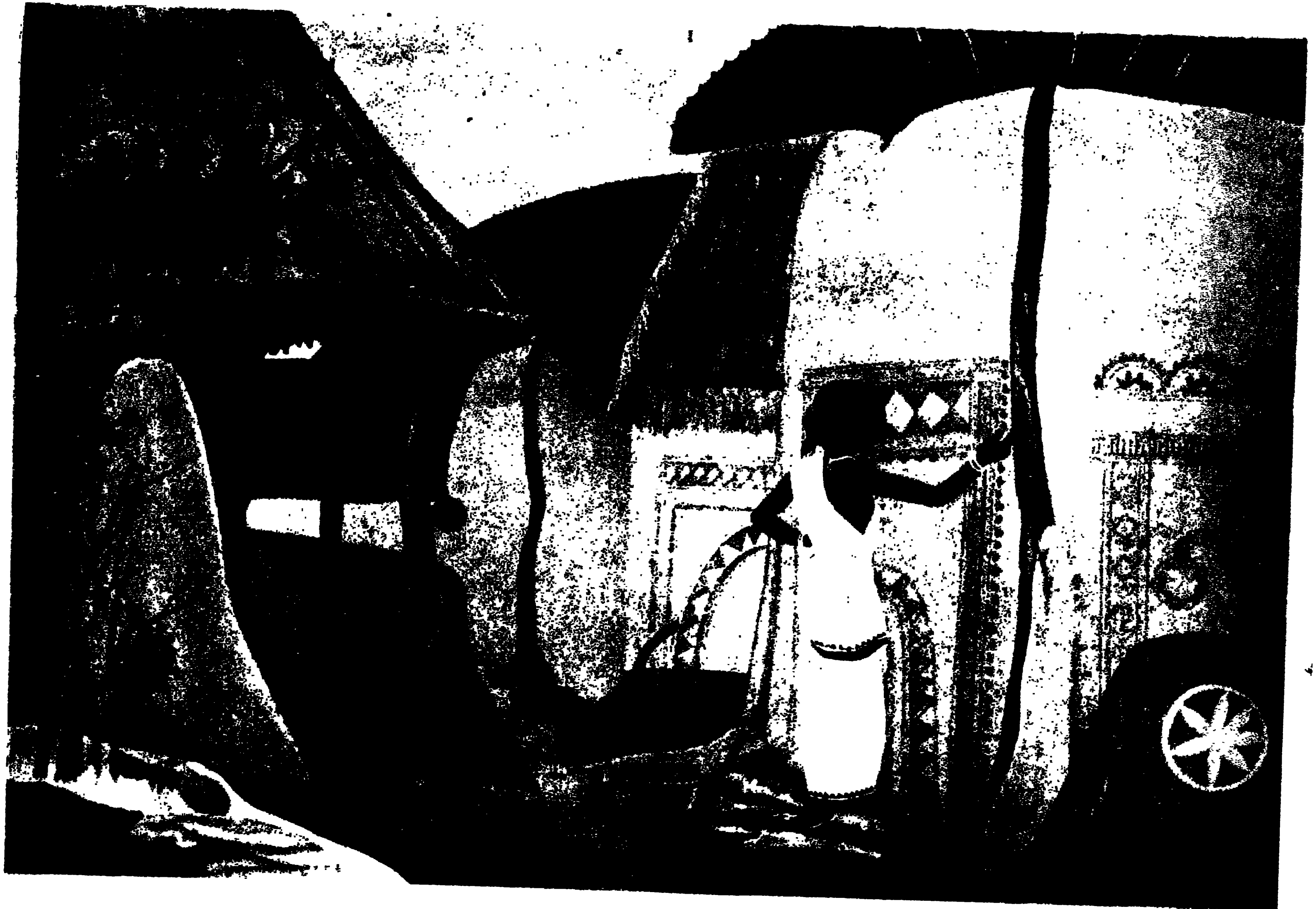
আমি বললাম 'জানি না, কিন্তু কাল থেকে নেই—আজ বেদের যুগ ফিরবে না লীনা !"

কথা কইল না, গোধূলির রক্তরাগ নামছে আকাশে—মনে পড়ল গোধূলি লগ্নের কথা—মনে পড়ল গোধূলি লগ্নের প্রিয়া এনার কথা। বার বার করে বলেছিল—"তুমি আমার, সে কথা ভুলো না।"

এ কি বিশ্বাসঘাতকতা ? কে জানে, মন অস্থির হয়ে উঠল ; শান্ত হয়ে বললাম—"আমায় ক্ষমা করো লীনা।"

ও হাসল ; ওর সেই অনুপম হৃদয়-হরণ হাসি। বলল—"এর ত ক্ষমা হয় না মিঃ রায় ?"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম ; লীনা কৌতুক করছে, না ব্যঙ্গ করছে ! কে জানে—রহস্যময়ী নারী চরিত্রের ভাব-বিকাশের কথা ?



শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিম্মল মুখার্জ্জী

আলপনা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

"আমি আন্তরিকই দুঃখিত।"

"দুঃখই কি সব শেষ করে দেয় ? আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি, আমার রক্তে ভারতের রক্ত এসেছে হয়ত কোনও অজানা পথে। ওর নদনদী, ওর গিরিপাহাড়, ওর বাসভূমি, ওর মরুপ্রান্তর আমায় ডাকছে ; আমি ভারতবর্ষে যেতে চাই।"

ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম—"তাই চল লীনা, ভারতবর্ষ তোমায় আদর করে নেবে। তোমার সেবা দিয়ে, তোমার ভাব দিয়ে, তোমার আদর্শ দিয়ে তুমি জাগাবে ভারতবর্ষে নূতন জীবনের উৎস।"

লীনা উল্লসিত হয়ে উঠল ; ওর কথায় এল স্পন্দন, ওর চোখে জাগল নর্ত্তন ; বলল—"ঠিক মিঃ রায়, আমায় নিয়ে চলুন। আমি সত্যই ভারত-মায়ের হারাণো দুহিতা।"

আবেশে এল ওর চোখে জল ; আমি ওকে আদর করে হাত ধরে পাহাড় থেকে নামতে সুরু করলাম। ও কথা কইল না, উত্তেজনায় শুধু ওর হাত কাঁপছিল।

"কিন্তু আমায় কি তোমার দেশ গ্রহণ করবে ? ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করবে না ?"

ওর কাঁপনের বেদনা আমায় বুকে বেদনা জাগায়। আমি বললাম—"না লীনা, তুমি যেমন করে আমার দেশমাতাকে ভালবাস, অমন করে কেউ হয়ত দেশেও বাসে না। তুমি চল, তুমি হবে আমাদের ভাবের ধাত্রী, আমাদের উৎসাহদাত্রী, তুমি হবে কল্যাণী তুমি হবে আনন্দময়ী বান্ধবী।"

লেকের পাশে এসে পড়েছি ; জলে পড়েছে আলোর মালা, সেখানে কেউ নেই। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিচুম্বন করল, বলল—"কিন্তু বান্ধবী কেন বন্ধু ? আমায় নেও করে তোমায় সুখের সাথী, তোমার দুখের ব্যথী, তোমার কল্পনার লক্ষ্মী, তোমার স্নেহময়ী সেবিকা—তোমার আদরিণী প্রেয়সী।"

পাহাড়ের নীচে ডাকল বন-মোরগ, দূরে বাজল ছোট ষ্টীমলঞ্চের বাঁশী, আকাশে তারার মেলা, জলে আলোর খেলা, সত্যই মিলনবাসর।

মাঝি ডাকল—"চলুন মঁসিয়ে।"

বললাম—"চলি।"

নৌকায় উঠলাম ; যাওয়ার সময় ব্যবধান ছিল, এখন সে ব্যবধান আর রইল না। ও বিশ্বস্ত প্রেমিকার মত পাশে এসে বসল ; বসে আমার কালো চুলের গোছা নাড়তে লাগল।

মাঝিকে বলল—"মাঝি, গান গাও।"

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করলাম ; মাঝির সামনে ওর ভুল ভাঙাতে চাইলাম। কিন্তু লজ্জা এসে কণ্ঠে বাধা দিল।

মাঝি চালাক, ও হয়ত বুঝল—ও গাইল একটা ফরাসী গান, গেঁয়ো চাষীর গান।

যে গান বলছে—ওগো আমার দরদী দূর-দেশিয়া, হঠাৎ দেখা হল স্বপ্নের মত, তবু জাগল বুক-ভরা ভালবাসা, এ যেন চাঁদ আছে নীল আকাশে, নলিনী আছে কালো সলিলতলে।

মাঝির কণ্ঠে ছিল মাদকতা, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে সুর মনকে উৎফুল্ল করে তুলল।

মাঝিকে বখশিস দিয়ে তীরে উঠলাম। লীনা বলল,—"তোমায় আমার আংটি দিই ?"

আমি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "লীনা, তুমি ভুল বুঝেছ, তুমি হবে আমার প্রিয়তমা বান্ধবী।"

"কেন, আমায় তুমি পছন্দ কর না ?"

"তোমায় ভালবাসি লীনা, কিন্তু আমি বিবাহিত।"

আকাশে চাঁদ উঠেছিল ; মেঘে ঢেকে গেল। আমরা দুজনেই নীরবে লেকের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম ; জল চলল চলচল কলকল।

কে ?

শ্রীহেমমালা বসু

কে এসে দাঁড়াত সব আগে,
তার কথা শুধু মনে জাগে…
কার নয়নের দৃষ্টি, করিত অমিয় বৃষ্টি,
সে চাহনি কি মধুর লাগে !

হাসিতে ভরিয়া যায় মুখ,
আনন্দে নাচিয়া ওঠে প্রাণ ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, কে বিরাজ করিত রে ?
জীবন কে করিল শ্মশান !



নিমন্ত্রণ

প্রবোধকুমার সান্যাল

শাড়ীটা ঘুরিয়ে পরতে গিয়ে ভাঙা তক্তার খোঁচা লাগলো হাঁটুতে। নিতান্তই রক্ত বেরিয়ে গেল, আর তারই দাগ লাগলো শাড়ীখানায়। রক্তের চেয়ে শাড়ীর দাম বেশি। শাড়ীখানা তোলা ছিল এমনি কোনো অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের জন্য। অপ্রত্যাশিত বৈকি, কে ভেবেছিল সাতাশ বছর বয়সে নন্দিনী বিয়ে করবে, আর সেই বিয়েতে পুরণো কলেজের বন্ধুদের করবে নিমন্ত্রণ। শাড়ীখানার দাম অনেক, এর পাটে পাটে ছিল কুমারীকালের নানা নিষ্ফল স্বপ্ন। বোটানিকাল্ গার্ডেনের চোরকাঁটা, মধুপুরের পথের রাঙা ধুলোর দাগ, পুরীর সমুদ্রের ওজোন্। হাঁটুটা জ্বালা করছে। রক্তটা সামান্য, জ্বালাটা বেশি। আজকের দিনের রক্তের দাগ থাকুক শাড়ীতে, আজকের জীবন-বিতৃষ্ণা তার পক্ষে অমর হোক। শীলাবতী ভাবতে লাগলো, এই শাড়ীটা গায়ে জড়ালে সে যেন নতুন ক'রে নিজেকে সৃষ্টি করে, নতুন ক'রে ফিরে পায় তার কুমারীত্ব, তার নিষ্কলঙ্ক অতীতকাল।

সেমিজটা ছেঁড়া, ব্লাউসটাই যা ভদ্রসমাজের যোগ্য। তবু ত সব পুরণো। যেমন পুরণো তার এই অসন্তুষ্ট জীবন, যেমন পুরণো মৌখিক ভদ্রতা, যেমন পুরণো তার যন্ত্রণাদায়ক দিবাস্বপ্ন। এই সব প্রাচীনের হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়া দরকার। এই যে ঘর, এই যে দেয়ালের কোণে জটাজটিল উইপোকার অভিযান, এই যে পুরাতন ইটকাঠের একটা বন্য গন্ধ, আর এই অতি পরিচিত, অতি বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা, যার অন্ত নেই, যার প্রতিবিধান নেই—ঈশ্বর, এই প্রাচীনের হাত থেকে শীলাবতীকে মুক্তি দাও। ছেঁড়া সেমিজ হোক, পায়ে একটু আল্‌তা না জুটুক, হাঁটু দিয়ে পড়ুক দু' ফোঁটা রক্ত, কিন্তু অন্তত নতুন ক'রে সৃষ্টি করো দুর্ভাগ্যকে, হানো বজ্র, এনে দাও চরম দুঃখের বন্যা। অন্তত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে শীলাবতী ঝাঁপিয়ে পড়ুক নতুন দুর্যোগে।

আল্‌তা একটু পাওয়া গেল না। রক্তহীন নিষ্প্রভ দুর্ভাগ্য-মাড়ানো দুখানা পা,—তার পা দুখানা দেখলেই মনে হ'তে পারে দারিদ্র্যের চিত্র, শিরা উঠে দাঁড়িয়েছে, মাংস পাতলা হয়েছে—জল ঘাঁটা, বাসনমাজা, ঝিগিরি করা দুখানা কুৎসিত পা। এই পায়ে আল্‌তার দাগ না দিলে উৎসবের আসরে চল্‌তে লজ্জা করবে। কিন্তু লজ্জাই ত নারীর ভূষণ! যত কিছু লজ্জা,—স্বামীর অকর্ম্মণ্যতার, শাশুড়ীর নীচতার, ননদের গোয়েন্দাগিরির, রুগ্নসন্তান প্রসবের, অনড় অনটন ও দারিদ্র্যের, সমাজের অচল জড়তার, পুরুষের কাপুরুষতার—যত কিছু লজ্জা সবই নারীর ভূষণ। নারীর লজ্জা জীবনে, নারীর লজ্জা মরণে। শীলাবতী ভাবলে, দরকারের সময়ে পায়ে একটু আল্‌তা নেই, ইস্তিরি করা একখানা ভালো শাড়ী নেই, কানের এক জোড়া ঝুমকো নেই,—এমনি ক'রে বাঁচা ভয়ঙ্কর, এমনি ক'রে মরা বিভীষিকাময়।

বাইরে থেকে উৎসবের আমন্ত্রণ তার ভিতরে জাগালো অসন্তোষ। তার অভাব-বোধটা খুঁচিয়ে বা'র ক'রে আনলো। বেশ ছিল সে। চারটি সন্তানের জননী, রুক্ষ-স্বভাব স্বামী, মুখভারকরা ষড়যন্ত্রপ্রিয় শাশুড়ী, ডাক্তারে ওষুধে গাঁদালপাতার ঝোলে, ময়লা বিছানায়, একান্নবর্ত্তী অপোগণ্ডের দলে বেশ ছিল সে। নন্দিনীর বিয়ের সংবাদ এলো বিপ্লবের বার্ত্তা নিয়ে, কুমারী জীবনের অনন্ত সুখস্বপ্ন নিয়ে, বঞ্চিত জীবনের অভিসম্পাত নিয়ে। কেন জুটলো না একটু আল্‌তা, কেন নেই পায়ে একজোড়া চটি, কেন গলায় নেই অন্তত দুভরি ওজনের একছড়া চেন্। মেয়েদের সম্মান আবরণে আর আভরণে। পুরুষের পৌরুষটাই তার বড় পরিচয়, কিন্তু নারীত্বটা ত নারীর বাহ্য পরিচয় নয়। বয়স বাড়লে পুরুষের আদর বাড়ে, মেয়ের বেলায় উল্টো, দাম যায় কমে। যৌবনই ত মেয়েমানুষের ঐশ্বর্য্য, বয়সটার জন্যই ত তাদের যত কিছু সমাদর।

কেন গেল সেই বয়স। ঈশ্বর, তুমি বল্‌তে পারো? কেন জোটে না একটু আল্‌তা, কেন এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শাড়ী বা'র করতে হয়, কেন ক্ষয়শীল অধিকারকে ধ'রে রাখার এমন চেষ্টা? এমন ঘর সে কামনা করেনি। ভাঙা কাঠের আয়নার কাছে শীলাবতী দাঁড়ালো—দাড়াভাঙা চিরুণী, তেল চট্‌চটে মাথার ফিতে, দুটো লোহার কাঁটা, 'পতি পরম গুরু' মার্কা সিঁদূর কৌটা—অর্থাৎ এই তার প্রসাধন সামগ্রী। পারা-ওঠা আয়নায় দেখা গেল তার মুখ। কোথায় সেই গৌরব? কেন ঠোঁট কালো হোলো, কেন হোলো দাঁতের গোড়ায় বয়সের দাগ, কেন জাগলো কপালে রেখা, কেন পাতলা হোলো মাথার চুল?

জীবন মথিত ক'রে প্রশ্ন উঠলো, হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে প্রশ্নটা ধক্ ধক্ করতে লাগলো। বি-এ পাস করার মুখে তার বিয়ে হোলো। উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ আশার চরম পরিণাম হোলো বিয়ে। মিশর দেশের মরুভূমি, প্রাচীন ইংলণ্ডের ডাইনীদের কাহিনী, মেরুপ্রদেশের অসভ্য জাতির জীবন-যাত্রা,—এদের ইতিহাসের পর ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালী, দুরবস্থার ক্লেদে যে গৃহস্থালী হতমান করে প্রতিদিন। প্রতিদিনই সে এক ধাপ ক'রে নামছে। উঠতে চেয়েছিল সে নিজেকে ছাড়িয়ে, সাধারণকে ডিঙিয়ে—সকলের মাথার উপর দিয়ে তার মাথাটা হবে দৃশ্যমান। প্রতিদিন সে যুদ্ধ করেছে, প্রতিদিনই তলিয়ে গেছে। ভালো খাওয়া নেই, ভালো হাওয়া নেই, মনের মতো পাওয়া নেই, তবু সে বেঁচে রইলো।

সাজগোজ একটুও হোলো না। শীলাবতী ব'সে রইলো। ঘরে রং-ওঠা চাবি-ভাঙা দুটো তোরঙ্গ, দুখানা ক্যালেণ্ডার, ছেলেমেয়েদের কয়েকটা দুরন্তপনার চিহ্ন, পায়া-ভাঙা একটা আল্‌মারী। কেরাণির স্ত্রী সে, তার পক্ষে নিমন্ত্রণে যাওয়া চলে না। লেখাপড়া শিখেছিল সে সামান্য কেরাণির স্ত্রী হবার জন্য, নোংরা ও রুগ্ন এক পাল ছেলেমেয়ের মা হবার জন্য। এই জীবন কি তার অভিপ্রেত ছিল? ষাট টাকার কেরাণির বউ—এক হাতে রান্না, অন্য হাতে বাট্‌না, অন্নবস্ত্রের আশায় অকর্ম্মণ্য স্বামীর মন জুগিয়ে চলা, দুর্ম্মুখ শাশুড়ীর বেতো পায়ে টারপিন্ মালিশ করা—এই জন্য কি সে ছিস্ট্রিতে অত বেশি নম্বর পেয়েছিল?

আবার সে উঠলো। তার না গেলেই চলবে না। বহুদিন পরে এই একটা দিন মাত্র, আজ বাইরের আলো এসে পড়েছে তার জীবনে। দূরের থেকে তাকে কে যেন ডাক দিয়েছে, যেমন শরৎকালের আকাশ থেকে ডাক দিয়ে যায় শঙ্খচিল। আজ ফাটল দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে দিগন্তের আলো, যে আলো তার অস্ত্র-তন্ত্রের কেন্দ্রকে মাদকরসের মতো উত্তেজিত করেছে। শীলাবতী গিয়ে পুরণো একজোড়া চটি উদ্ধার করলো, মাথার চুলটা ফিরিয়ে নিলে সোজাসুজি, মুখখানা মুছলো ভিজে গামছায়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল শিকল ছিঁড়ে।

বাঁচলো। এমন একটা অখণ্ড মুক্তি তার অনেক কাল হাতে আসেনি। ভুলে যাও অভিশপ্ত আটটা বছর, ফিরে চলো কলেজে। পাঠ্য বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে যৌবনের রঙ, বেঞ্চের কাঠের উপর ছুরি দিয়ে কাটা অজানা কোন্ ছাত্রীর হাতের দাগ, বন্ধুদের খোঁপায় কেমন একটা অদ্ভুত সোঁদাল গন্ধ। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরা, দুটো রাস্তা বেশি ঘুরে যাওয়া, অবাধ অবারিত জীবন। মনে মনে রাজপুত্রকে ভাবা, মনে মনে সুভদ্রার রথচালনা, মনে মনে কদম্বের মূলে আত্ম-সমর্পণ। জনম জনম হাম ও-রূপ নেহারনু—সেই রূপ! শীলাবতী চলতে চলতে ভাবলো সেই রূপ! চৈত্র পূর্ণিমায় ছাদে শুয়ে আকাশের তারায় জ্বল্‌তো যে-রূপ, যে-রূপ দেখা যেতো গিরিডির মাঠে দাঁড়িয়ে দূরে পরেশনাথের নীল অরণ্যে, যে-রূপ ঝলমল ক'রে উঠতো কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর দিয়ে শরৎকালের শূন্যে।

অনেক দূর পথ। তা হোক, হাঁটতেই তার ভালো লাগছে। রুগ্ন শিশু যেমন প্রথম হাঁটতে গিয়ে টলমল করে, তেমনি ক'রে হাঁটা। পথকে অনুভব করা, পৃথিবীকে নূতন ক'রে উপভোগ, জীবনকে প্রতি পদে মাড়িয়ে চলা। হাঁটতে ভালো লাগছে, কারণ এমন ক'রে অনেক দিন হাঁটা হয়নি। আজ স্বামীকে অস্বীকার করতে ভালো লাগছে, সন্তানদের মন থেকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কারো মৃত্যু সে কামনা করে না, অমঙ্গল সে চায় না—কিন্তু হে ঈশ্বর, তোমার এমন কোনো নিয়ম আছে, যে-নিয়মে তুমি স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য ভোলাতে পারো?

এক পথ থেকে অন্য পথে চললো শীলাবতী। সন্ধ্যার বিলম্ব নেই। ট্রামগাড়ীর ভিতরে, কাপড়ের দোকানে,

ডাক্তারখানায়, সিনেমার বারান্দায় আলো জ্বলছে। উৎসব দীপমালায় নগরীর নৈশরূপ রঙে ও রসে যেন টলটল করছে। কিন্তু সে নিজে এর মধ্যে কোথায়? আলতাটুকু যার পায়ে জোটেনি, সামান্য একখানা শাড়ী যার কালের গতির সঙ্গে রুচি মিলিয়ে চলতে পারেনি, তার এখানে কোথায় স্থান? মানুষটা ত আবহমানকালের পুনরাবৃত্তি, রুচি ও জীবনযাত্রার আদর্শটাই ত শুধু গতিশীল! শীলাবতী এর মধ্যে কোথায়? পরিচয়চিহ্নহীন একটা নগণ্য জীবের মতো সে কেন তলিয়ে গেল ধ্বংসের অনর্গল বিপুল প্রবাহের নীচে।

হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল শহর চোখের সুমুখ থেকে। বাতাসের আগে চললো কল্পনা। নূতন দেশে শীলাবতী উত্তীর্ণ। চারিদিকে মরুভূমি। সেই শস্যহীন ভূভাগের ভিতরে রাজপুতানার দুর্গ। দুর্গ থেকে কামান গর্জ্জে উঠলো। অদম্য রক্তপিপাসায় শত শত সেনা ছুটলো শত্রু নিপাতে; প্রাণের মূল্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেখানে বিকিয়ে চলেছে—সেই সংহারলীলার ক্ষেত্রে ভীমা ভয়ঙ্করী লক্ষ্মীবাঈ এলেন অশ্বারোহণে। অতি দ্রুত, হত্যার নেশায় অধীর উন্মত্ত। সমস্ত পাপ, সমস্ত অন্যায়কে বিনাশ কর। এক হাতে বল্গা, অন্য হাতে তরবারী। এমনি ক'রে কি উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়েছিল লক্ষ্মীবাঈয়ের মুখ, যেমন এই নৈশ নগরীর পথে যেতে যেতে শীলাবতীর চক্ষু ভয়ঙ্কর দীপ্তিতে জ্ব'লে উঠেছে? এমনি মুখ হয়েছিল কি দেবী সুভদ্রার? এক হাতে বল্গা অন্য হাতে তরবারী। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিন্তু ভাবনাহীন।

এমন একটা মুক্তির মধ্যে দিয়ে শীলাবতী ছুটলো—যেখানে বাঙালী স্বামীর নগণ্য পৌরুষ পৌছতে পারে না। এমন একটা শিকলছেঁড়া তীব্র স্বাধীনতা, যেখানে আঁচলধরা অপোগণ্ড বাঙালী সন্তান পথরোধ করতে সমর্থ নয়। চললো শীলাবতী হাবসীদের দেশে। অজানা অনামা হিংস্র শ্বাপদময় অরণ্য, অরণ্যময় পর্ব্বত, পর্ব্বতের দূর দুর্গম গহ্বরের ভিতর থেকে কৃষ্ণকায়া প্রবাহিনী বন্য জন্তুর মতো তাড়না ক'রে আসছে। একা সেখানে শীলাবতী শিলাতলে আসীন। বনবিহারিণী, বিজনবাসিনী। তখনও মানব-সভ্যতার জন্ম হয়নি, তখনও পুরুষ নারীকে স্পর্শ করেনি। সমস্ত প্রকৃতির মর্ম্মকোষে প্রাণপিপাসার যে-চেতনা লুক্কায়িত, শীলাবতী তারই সন্ধানে। তারই সন্ধানে উত্তীর্ণ হোলো পর্ব্বতের পর পর্ব্বত। যেখানে আকাশ কথা বলে পর্ব্বতের কানে কানে, প্রথম সূর্য্যরশ্মিলেখা চুম্বন করে পৃথিবীর প্রথম প্রস্ফুটিত কুসুম-পল্লবে, যার শব্দে ভ্রমরের তন্দ্রা ভেঙে যায়—সেই পথ দিয়ে অলক্ষিত চরণে শীলাবতী চ'লে গেল।

বেদুঈনের দেশে উত্তীর্ণ। তপ্তরৌদ্রে বালুময় মরুপথে চলে দলে দলে উটের দল। দূর-দিগন্তে নীলাভ পাংশু আবছায়ায় মরীচিকার সঙ্গে মিলে যায় দস্যুকবলিত বন্দিনীর লোহার শৃঙ্খলের আওয়াজ। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে লুণ্ঠিতা শীলাবতী। উটের পিঠে ঘেরাটোপের ভিতরে বোরখা-পরা অজানা দেশের যাত্রী শীলাবতী। বেদুঈন দস্যু প্রহরী, বিশাল, ভয়াল—হিংসায় যার জন্ম, হিংস্রতায় যার দীক্ষা, নিষ্ঠুরতা যার পেশা। এমন সময় বোরখার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, বালুরাশি উড়িয়ে আসছে অস্ত্রধারী নাইটের দল। রক্তপাগল বেদুঈনের সঙ্গে বাধলো সংগ্রাম। অনন্ত বালুরাশির মধ্যে মানুষের রক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপরে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! অশ্বপৃষ্ঠে শীলাবতীকে নিয়ে মধ্যযুগের নাইট্ ছুটলো অজানা দেশ থেকে কোন্ অজানায়। বিজন ভীষণ মানুষের দেশে—দিকে দিকে অতিকায় জানোয়ারের আনাগোনা, নূতন মানব সভ্যতার পত্তন সেখানে আজো হয়নি, জন্তুর চর্ব্বি জ্বালিয়ে পাষাণ-পুরীকে আলোকিত করা হয়, মানুষের কঙ্কাল সাজানো গুহার গর্ভে গর্ভে, অদৃশ্য বিশালকায় প্রহরীর ভয়াল করাল দৃষ্টি নারীর বুকের মধ্যে কেবল বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

প্রেতিনীর মতো গুহার রন্ধ্রপথে শীলাবতী সেখান থেকে পলায়ন করিল। আবার নূতনতর জীবন। যে-জীবন পরম পিপাসায় থরোথরো। যার আদি নেই, যার অন্ত নেই। পৃথিবীর পথে আবার অবারিত ছুটে চলা। যে দেশ আজো অনাবিষ্কৃত, যেখানে সমাজ সৃষ্টি হয়নি, সন্তানের দায়িত্ব যে দেশে জননী আজো বহন করে না। বল্কলধারী স্ত্রীপুরুষ, জানোয়ারের মাংসাস্থি কেবল খাদ্য, বৃক্ষের ফাটলে যাদের আবাসস্থল—সেই সব বন্য নরনারীর মধ্যে কিম্বা অন্য কোথাও। মেরুর দেশে, বরফের গর্ভে, মৎস্যব্যবসায়ীদের পরিবারে, এস্কিমোদের সঙ্গে সঙ্গে।

শীলাবতী বড়ই ক্লান্ত। নিজের ভাগ্যকে পরীক্ষা করতে না পারার হতাশায় ক্লান্ত। একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব সে দেখতে পারলো না, সে দেখতে পারলো না দেশ-জোড়া একটা

ওলোট-পালট। একটা অন্ধ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে তার এই যে জীবনটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল, এর জন্য দায়ী কে? পায়ে তার একটু আলতা জুটলো না বটে, কিন্তু যারা তার বুকের উপর ব'সে সমস্ত রক্তটা নিংড়ে নিল, তাদের কণ্ঠের রক্তে সে তার চরণ রাঙাতে পারলো না কেন? সে দরিদ্র ব'লে তার রাগ নয়, কিন্তু তার জীবন পরিপূর্ণ বিকশিত হ'তে পারলো না, তাই তার আত্মগ্লানি।

*

* *

নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে এসে শীলাবতীর ঘুম ভাঙলো। ঘুমই বটে, একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। পথ অনেকটা দূর বটে, কিন্তু দুঃস্বপ্নটা স্থান ও কালকে বিশ্ববিস্তৃত ক'রে দিয়েছিল। সময়টা কিছু না, মনের একটা কল্পনা মাত্র। এই ত সে নন্দিনীর বাড়ীর বাগানে বিবাহ উৎসবের মধ্যে এসে পড়লো।

পুরণো বন্ধুরা তাকে চিনতে পারলো। যৌবনই মেয়েদের পরিচয়, তার শারীরিক দৈন্যটা দেখে বন্ধুরা একবার মুখ চাওয়াচায়ি করলে। দৈন্যটা তার সর্ব্বাঙ্গে। ভালো শাড়ী নেই, আধুনিক অলঙ্কার নেই, পায়ে আল্‌তা নেই। তবু চিন্‌তে পারলো, আদর ক'রে নিয়ে গেল অন্দরে।

কার সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে? কি করে সে ভদ্রলোক? দেখতে কেমন? পরম্পরায় খবরটা শীলাবতীর কানে এলো। কলেজে ছেলেটি ছিল নন্দিনীর সহপাঠী। দু'জনেই এম-এর ছাত্র। প্রণয়টা পরস্পরের মধ্যে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধ'রে সেই প্রণয় নির্ঝরিণী থেকে নদীতে পরিণত হয়েছে, এখন দুই কূল প্লাবিত। এবার শাঁখ বাজলো।

পাত্রের নাম সুশীল সেন। অমনি শীলাবতী ঘুরে দাঁড়ালো। মাথায় পড়লো বজ্রাঘাত। সুশীল সেন? মানে, সেই সুশীল? শীলাবতীর বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্‌লো।

*

* *

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় প্রথম হেমন্তকাল। বাতাসটি মধুর, কিন্তু অল্প অল্প গায়ে কাঁটা দেয়। দেরাদুন থেকে নেমে আসার সময় হরিদ্বারের এক ধর্ম্মশালায়।

মা বাবা সঙ্গে ছিলেন।

কেউ বলে আগে থেকে ষড়যন্ত্র, কেউ বলে, না, অমনি হঠাৎ দেখা। যে-পথটা গেছে নতুন কন্‌খলের দিকে, সেই পথে গঙ্গার পাকা বাঁধের কাছে দু'জ'নে এসে দাঁড়ালো।

শীলাবতী বললে, কেন এলে তুমি?

সুশীল বললে, এলুম তীর্থে। তুমি যেখানে সেখানেই তীর্থ।

তুমি জানো না যে, এ কিছুতেই সম্ভব নয়? মা-বাবা রাজি নন্?

তোমার মত আছে?

আমি তাঁদের অবাধ্য নই।

ফিরে গেল সে। ফিরে আর চাইল না। অদ্ভুত উল্লাস হোতো তাকে কাছে পেয়ে। রক্তের ভিতরে একটা দুরন্ত কোলাহল মুখর হয়ে উঠ্‌তো। পুরুষ জানে কতটুকু? প্রিয়-জনের পদচিহ্ন ধ'রে নারীর বুকের তৃষ্ণা ব্যাকুল হয়ে পিছু পিছু ছুটে যায়,—পুরুষ কতটুকু জানে—নারীর সে কত আপন?

আবার দেখা বিল্বকেশ্বর মন্দিরে। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনহীন, পাশেই পর্ব্বতের সানুদেশে অরণ্য। এখানে ওখানে তপস্বীর আস্তানা। মধ্যাহ্নে নিশুতি, যাত্রীর সমাগম নেই।

সে বললে, যাবার আগে জানতে পারলুম যা কোনোদিন জানা সম্ভব হোতো না। যা পাবার নয় তার জন্যেই কেবল মাথা কুট্‌তে আসিনি। সাধ ছিল তোমার প্রসন্ন শুভকামনা নিয়ে যেতে পারবো। কেবল কি হাতই পাতবো, দিতে পারবো না কিছু? এই নাও, এই রইল তোমার পায়ের কাছে আমার বাঁশি, এই পীতবাস, এই আমার মোহনচূড়া। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে এই সাধ রইলো, তুমি যেন সহজে আমার কাছে আসতে পারো, যেন বাধা না থাকে দুই দিক থেকে। কাঁদো কেন?

শীলাবতী বললে, ভাবছি জন্মান্তর।

আমার আশা আরো বড়, আমি ভাবছি এই জীবনেই নয় কেন? বেশ, আমি চললুম। যত দূরেই যাই যেন তোমারই কাছে পৌছতে পারি।

শীলাবতী হাত ধ'রে বললে, কোথায় যাচ্ছ?

কোথায়? যাচ্ছি দেশে, কল্‌কাতায়। সেখান থেকে যাবো বম্বে, বম্বে থেকে যাবো বিলেত, বিলেত থেকে পৃথিবী!

*

* *

পায়ের শব্দে শীলাবতীর চমক ভাঙলো। এ কি, সে নিশ্চল হয়ে ব'সে রয়েছে তার পায়াভাঙা তক্তাখানার উপর! স্বামী ফিরেছেন অফিস থেকে।

স্বামী বললেন, কই, নিমন্ত্রণে যাওনি?

মুখের দিকে চেয়ে শীলাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, থাকগে, ভালো কাপড়-চোপড় নেই, ছেলেটারও অসুখ,—যাবার মন নেই।

শ্রান্ত হয়ে সে তক্তার উপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো।

বোধন

"বনফুল"

১

যৌবন কোথা? যৌবন কই? জীবন্ত যৌবন?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর
আদর্শবাদী, প্রবল, তীক্ষ্ণ, কই সে পূর্ণ মন?
শিব সুন্দর সত্য শুভঙ্কর!
অপরের দ্বারে মর্য্যাদা-হীন ভিক্ষা যাহারা যাচে,
প্রাণ-শক্তির ঝুটা উৎসবে উদ্বাহু যারা নাচে,
তুচ্ছ হুজুগে মাতিয়া যাহারা চীৎকার তুলিয়াছে
জয় জয় নাদে কাঁপাইয়া অম্বর
বাংলা দেশের যৌবন কি গো আজিকে তাদের কাছে?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

২

অগ্নি ঝঞ্ঝা বন্যার মত দুর্দ্দাম যৌবন!
বাংলা দেশের আছে যৌবন হেন?
যদি থাকে ত'বে প্রতিপদে কেন শিকলের ঝন্ ঝন্?
সবারই পিঠেতে চাবুকের দাগ কেন?
সারা দেশ জুড়ে শঙ্কার ছায়া ঘনাইছে দিবা রাতি,
ঝরিয়া পড়িছে আশার কুসুম, নিভিয়া যেতেছে বাতি
অথচ আমরা গৌরব করি—'আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি
ছোট নহি মোরা—নহি মোরা বর্ব্বর!'
যৌবন, হায়, সে কি করে শুধু রসনায় মাতামাতি?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৩

বাংলা দেশের যৌবন আছে প্রমাণ কে দিবে তার?
প্রাণ-প্রদীপ্ত কই সে যুবন্ বীর!
সূর্য্যের মত উদিত হইয়া নাশিবে অন্ধকার
বজ্র-কণ্ঠে কহিবে সুগম্ভীর—
হও আগুয়ান জীবন-যুদ্ধে এস এস চল ত্বরা
বীর্য্যবন্ত যোগ্য বীরের ভোগ্য বসুন্ধরা
অপেক্ষা করে তাহারই লাগিয়া কমলা স্বয়ম্বরা
হস্তে বহিয়া বিজয়-মাল্য, বর।
বাংলা দেশের কোথা সেই বীর প্রদীপ্ত-প্রাণ-ভরা?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৪

বাক্যেই নহে কার্য্যে প্রমাণ করিবে শক্তি তার.
কই সে সতেজ সুস্থ সে যৌবন?
মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধ হইবে যাহার পুরুষকার
তাহারই লাগিয়া করিবে জীবনপণ,
বাধার পাহাড় যার পদ-তলে গুঁড়াইয়া হবে ধূলি
আগাইয়া যাবে বজ্র-মুঠিতে বিজয়-পতাকা তুলি
স্কন্ধে বহিবে দায়িত্বভার—নহে ভিক্ষার ঝুলি—
কই সে যুবক—কই সে জাতিস্মর!
তারই আশা-পথ চাহিয়া রয়েছি সকল দুঃখ ভুলি,
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৫

ভারতবর্ষে বঙ্গদেশই ত যৌবন-প্রসবিনী
শুনিয়া এসেছি আকুল কর্ণ ভরি
সারা ভারতের জাত্যভিমান বাংলার কাছে ঋণী
ইতিহাসে লেখে, বিশ্বাসও তাহা করি।
কিন্তু আজিকে সেই বাংলার কোথা সেই যৌবন
জাগো যৌবন, থাকো যদি তুমি, খোলো তিমিরাবরণ
মিথ্যা ভস্মে আবরি রাখিবে বল আর কতখন
সত্য বহ্নি তব অবিনশ্বর!
যৌবন কোথা? যৌবন কই? জীবন্ত যৌবন?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্তস্বর।

৬

তুচ্ছ করিয়া জীবন মৃত্যু উচ্চে তুলিয়া শির
উর্দ্ধে রাখিয়া দেশের জাতির মান
ধন্য করিয়া বঙ্গদেশেরে জাগো আজি তুমি বীর
প্রণাম করিয়া গাহিব তোমারি গান।
স্বদেশের নামে স্বার্থের বোঝা করিয়া বেড়ায় ফেরি
প্রাণ চাহে না ত গান গাহিবারে সে ফেরিওলারে ঘেরি
থামাইয়া দাও এ আড়ম্বর চীৎকার তূরী-ভেরী
ধ্বংস কর এ মিথ্যা ভয়ঙ্কর।
বাংলা দেশের যৌবন তব জাগিবার কত দেরী?
হৃদয় মথিয়া উঠিছে আর্ত্ত স্বর।

জীবনের যুদ্ধ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

গুপ্তর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছি আমি এবং অনেকে।

গুপ্ত ফরেষ্ট-অফিসার। মস্ত বড় শিকারী। তাঁর রাইফেল কত হিংস্র জন্তুর যে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে তার সংখ্যা নাই। এ শুধু তাঁর মুখের গল্প মাত্র নয়, এ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। এ গর্ব্ব যে তিনি সত্যই করতে পারেন, তা তাঁর বাড়ীর বস্‌বার ঘরখানি দেখ্‌লেই বেশ প্রমাণ হয়ে যায়।

বস্‌বার ঘরের সাজসজ্জার প্রধান উপকরণই হ'ল তাঁর নানা জন্তুর নানা অঙ্গের অংশ। দেয়ালে ডানা বিস্তারিত বিচিত্র পাখীর শব, মেজেতে গণ্ডারের চামড়ার কার্পেট, দরজার দুপাশে সাদা হাতীর দাঁত দাঁড় করান; আর ঘরের প্রতি কোণটিতে মোটা হাতীর পা, না হয় গণ্ডারের পা। কেবল মাত্র বস্‌বার জন্যই যা আছে সোফা এবং গদি আঁটা চেয়ার। তাও মোড়া—হরিণের বা চিতাবাঘের বা রয়াল বেঙ্গলের চামড়ায়। পা রাখবার স্থানটিতে পাওয়া যাবে বড় বড় ভালুক বা রয়াল বেঙ্গলের চামড়া আস্তীর্ণ। এক কথায়, তাঁর বাইরের ঘরখানিকে যাদুঘরের একটি অংশ-বিশেষ বলে ভুল করে নেওয়া কারও পক্ষে অসম্ভব নয়।

সেই ঘরে বসে চা-ই খাও বা অন্য যে-কোন আকর্ষণই থাকুক, মনটা আপনিই এই সব শিকারের বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের গল্প শোনার ইচ্ছাটা সাধারণতই প্রবল। সুতরাং প্রত্যেকটি শিকার বস্তুর সঙ্গে জড়িত যে শিকার-কাহিনী তা জানবারও একটা স্বাভাবিক কৌতূহল মানুষের মনে আসে।

এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী বোধ হয় সব থেকে বেশী হয়েছিলাম আমি, কারণ আমারই মুখ থেকে গুপ্তর কাছে এই অনুরোধ ব্যক্ত হয়ে পড়ল যে, এত শিকার করেছেন, বাঘ, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি, তার একটা গল্প বলুন না শুনি।

আমার এ অনুরোধ সকলেরই মনঃপূত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ সকলেই একবাক্যে আমার সেই অনুরোধের সমর্থন করলেন।

গুপ্ত বললেন—গল্প বলতে আমি রাজী আছি; কিন্তু কোন্ গল্পটা বলে দিন।

এই খানেই হ'ল সমস্যা। দশজনে দশ রকম মত প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন, এই যে বাঘের চামড়াটা পড়ে রয়েছে, এই বাঘ শিকারের কাহিনীটি বলুন। কেউ বলেন, ঐ যে হাতীর বড় বড় দাঁত খাড়া করা রয়েছে তার গল্পটি বলুন। এইরূপ নানা বিরোধী অনুরোধ সমস্যার সমাধান না ঘটিয়ে তাকে আরও জটিল করে তুলল।

হঠাৎ খেয়াল বশে আমি বলে উঠ্‌লাম, নির্দ্ধারণ করবার ভার সম্পূর্ণ আপনার উপর। যে কাহিনীটি আপনার মতে সব থেকে লোমহর্ষণ হবে, সেই কাহিনীটিই আমাদের আজ উপহার দিন।

গল্পের বিষয়গুলি কি, তা যখন আমাদের জানা নেই এবং তাঁর নিজের সবগুলিই জানা আছে, বাছাই করবার ভার সম্পূর্ণ তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়াই সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ ব্যবস্থায় আমরা বাস্তবিকই ঠকিনি। তার সত্যতা গল্পটা বলা হয়ে গেলে সকলেই বুঝ্‌তে পারবেন।

আমার এই প্রস্তাব সে সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। কাজেই গুপ্ত তাঁর কাহিনী বলতে সুরু করলেন। গল্পটা এখন তাঁর নিজের কথাতেই চল্‌বে।

"চাকুরীর প্রথম জীবন। তখনও বিবাহপাশে আবদ্ধ হইনি। তাই মনে যেমন দুর্জ্জয় সাহসও ছিল, জীবনটাকে তেমন কোন মূল্য দেবারও প্রয়োজন হত না।

যাক সে কথা। খুলনা আমার হেড-কোয়াটার্স। দক্ষিণে সুন্দর-বনের জঙ্গলে বন পরিদর্শনে বেরিয়েছি। লঞ্চে করে গিয়েছি, বলেশ্বর নদ ধরে সোজা দক্ষিণে। এই বলেশ্বর যে জায়গাটায় সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে মিশেছে সেটার নাম হল হরিণঘাটা। দুপাশে বিস্তীর্ণ চর, বালুর নয়, কাদা মাটির। জোয়ারের জল পেয়ে পেয়ে সে মাটিতে প্রচুর সবুজ ঘাস হয়েছে। আর সেই ঘাস খেতে সেখানে হরিণের ভিড় হয় ভয়ানক। সেই জন্যই স্থানটির নাম হরিণঘাটা। সেইখানে লঞ্চ নঙ্গর করেছি।

সেদিন বিকাল বেলা মনটা বড় ছটফট করছিল। সারাদিন একঘেয়ে একই স্থানে লঞ্চে বসে কেটেছে। কোথাও বেড়িয়ে আস্‌বার ইচ্ছাটা তাই প্রবল হয়ে উঠল। তখনও ঘণ্টা দুই বেলা আছে। জলি বোটে করে বেড়িয়ে আসা যাক না নদীর ধারে ধারে—মন্দ কি?

লঞ্চের দুটো মাঝিকে জলি বোট নামাবার আদেশ দিয়ে নেমে পড়লাম ক্যাবিন হতে। শিকার করবার বিশেষ উদ্দেশ্য না থাক্‌লেও রাইফেলটা সঙ্গে নিলাম। ওটা একটা অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ দেশে এটুকু সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্ট।

ফুর ফুরে হাওয়া। নদীতে ঢেউ নাই, যেন ঘুমাচ্ছে। আমরা বেশ আরামেই নদীর তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

খানিক দূরে গিয়ে এক অতি মনোরম দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। যেখানে নদীর মোহনায় সবুজ ঘাসে ভূমির অনেকখানি বিস্তার করে—সেখানে অনেক গণ্ডা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। এইখানেই ভূমির একটু বর্ণনা করা দরকার। সুন্দরবনের সব নদীতেই জোয়ার-ভাঁটা খেলে। নদীর ধারে জোয়ার ও ভাঁটার ফলে রোজ যে অংশটি দিনে দুবার করে জলে নিমজ্জিত হয় এবং জাগে, সে অংশে কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। সে জায়গা এমন কর্দ্দমাক্ত যে, সেখানে হাঁটতে গেলে পা প্রায় হাঁটু অবধি

কাদায় পুতে যায়। তারপর এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড থাকে যেখানে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার জোয়ার ভিন্ন জল পৌঁছায় না। এই ভূমিই সবুজ ঘাসে ভরে গিয়েছে, তবে এখানেও কাদা। এর পরে বনের গাছ আরম্ভ হয়েছে, বেশীর ভাগই তার সুন্দরী গাছ। তারা এত সন্নিবদ্ধ যে তার ভিতরে দৃষ্টি প্রবেশ করতে পারে না।

সেই হরিণের দল দেখে মাঝি দুজনের হঠাৎ হরিণের মাংস খাবার লোভটা অতি প্রবল হয়ে উঠল। তারা বললে, একটা হরিণ মারুন না হুজুর, কয়েকদিন আমাদের ভাগ্যে মাছ পর্য্যন্ত জোটে নি। বন্দুক ত হাতেই আছে।

বন্দুক যে হাতে ছিল সে কথা ঠিক এবং যদিও হরিণ শিকার করতে আসব ভেবে আসিনি, তা হলেও সে ইচ্ছাটা এপনই মনে পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যবাধা ছিল। তখন ক্লোজ সীজন, হরিণ মারা বারণ।

সে কথা তাদের বললাম। তবু কি তারা শোনে? তাদের অনুরোধ এবং উপরোধ শেষটা সত্যই আমার মতির পরিবর্ত্তন ঘটাল। আমি বললাম যে মেয়ে হরিণ ত কিছুতেই মারতে পারি না, তবে যদি শিংওলা হরিণ দেখাতে পার, ত চেষ্টা করে দেখি!

সে কথা শুনে তাদের আর উৎসাহ দেখে কে? নিঃশব্দে ক্ষিপ্রগতিতে নদীর ধারে ধারে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম, সেই হরিণের দলের অভিমুখে। প্রায় সিকি মাইল এই ভাবে চলার পরে সত্যই তাদের ভাগ্যের জোরে একটা শিংযুক্ত হরিণ দেখা গেল।

আমরা ছিলাম নীচে জলের উপর। নদীর কোলের লম্বা ঘাস আমাদের সেই হরিণযূথ হতে প্রায় অদৃশ্য করে দিয়েছিল। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হল, তারা আমাদের উপস্থিতির কোন আভাস পায় নি।

এ ক্ষেত্রে তাদের কথা আমার রাখতেই হয়। নৌকা থামাতে বললাম। শিং-ওয়ালা হরিণটা আমার কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে ছিল। তাতে ক্ষতি নাই, রাইফেলের গুলি এতদূর হতে লাগলেও কাজ দেবে। আমি বেশ ধীরভাবে সেই হরিণের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম।

বন্দুকের ধোঁয়া চোখের সামনে মিলিয়ে যাবার আগেই দেখা গেল যে হরিণের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে আর সেই শিংযুক্ত হরিণটা মাটিতে পড়ে গেছে। অব্যর্থ প্রমাণ যে গুলি লেগেছে। মাঝিরা উল্লাস করে উঠল।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আর একটা কাণ্ড ঘ'টে মাঝিদের সে উল্লাসকে তখনই থামিয়ে দিলে। হরিণটা মাটি হতে উঠল, উঠে খুঁড়িয়ে তিন পায়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

সঙ্গে সঙ্গে নৌকাতেও একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটল। মাঝি দুজনেই দুখানা দা নিয়ে নৌকা হতে ঝাঁপিয়ে তীরে পড়ল এবং সেই হরিণের পেছনে ছুটতে লাগল। তাদের মানা করলাম যেতে, কিন্তু ফল হল না। সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে কে কার কথা শোনে?

তারা ছুটতে ছুটতে আমায় সংক্ষেপে বলল: হরিণ মরবেই জানা কথা এবং একেবারে যে মরে যায় নি সেটা তাদের সৌভাগ্য। এখন যদি তারা তার মরবার আগেই নাগাল পায়, তা হলে তার জবাই-করা মাংস খাবারও সম্ভাবনা আছে। এই ডবল সুযোগ কে ছাড়ে?

অগত্যা আমার নৌকা সামলানই প্রথম কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াল; একটা দাঁড় অগভীর জলে মাটিতে পুতে তার সঙ্গে নৌকাটাকে বাঁধলাম। একবার মনে আশঙ্কা হল যে এই হরিণের মাংস আর এক জাতীয় জীবেরও বিশেষ উপাদেয় খাদ্য এবং তারা বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে একটা বিপদ না ঘটায়। হয়ত নামা প্রয়োজন। কিন্তু নামলে হাঁটুসমান কাদা ভেদ করে হাঁটতে হবে, আবার স্নান করতে হবে। কত অস্বস্তি, কত অসুবিধা। সে ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে না নেমেই নৌকায় অপেক্ষা করব ঠিক করে নৌকায় বসে রইলাম। মাঝিরা গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আন্দাজ দশ বার মিনিট হয় ত কেটে থাকবে। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, ঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ দুজন মাঝির যুগপৎ আকুল আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন আমাকে জাগিয়ে দিলে। বুঝলাম, ভাগ্য মন্দ, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটেছে। অগত্যা সাহায্যের জন্য যাওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করে আমি রাইফলের ম্যাগেজিনে যতগুলি গুলি ধরে পুরে নিয়ে তীরে লাফ দিয়ে নামলাম এবং সেই কর্দমাক্ত ভূমির উপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সেই চীৎকারের স্থানের দিকে ছুটলাম।

তৃণভূমি অতিক্রম করে যখন বনের নিকটবর্ত্তী হলাম, তখনও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তাদের ডাক দিলাম। সুখের বিষয় ভাঙা গলায় তাদের সাড়া পেলাম মাথার উপর থেকে। উপরে চেয়ে দেখি দুজনে দুই গাছের আগার ডালে উঠে বসে আছে, মুখে ভয়জনিত বিকারের চিহ্ন।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তারা বুঝিয়ে দিলে যে তারা বাঘ দেখেছে এবং তাদের তাড়া করেছে কিনা দেখবার আগেই তারা প্রাণভয়ে চীৎকার করেছে এবং ছুটে গাছে উঠেছে।

বাঘের উপস্থিতির সংবাদ শুনে আমার লোভ হল। কোন শিকারীর না হয়? তাদের বললাম—নেমে আয়। কোথায় বাঘ, দেখাবি চল্।

তারা বললে—না।

তাদের বললাম—ভয় কিসের? সঙ্গে ত বন্দুক আছে।

তাতেও তারা ভরসা পেল না। মোটেই নামতে চাইল না।

বেলা শেষ হতে আর বেশী দেরী ছিল না। দেরী করলে শিকার ফসকে যায়। কাজেই নিজে জুতো খুলে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে গহন বনে প্রবেশ করলাম। উত্তেজনায় বুক দ্রুত চলতে সুরু করেছে, সব কটা ইন্দ্রিয় আমার অতি মাত্রায় সজাগ। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রকৃতি দেহের মধ্যে এমনি করেই সাড়া দিয়ে উঠে।

খানিকক্ষণ এইরূপে ঘনসন্নিবিষ্ট বন অতিক্রম করে সামনে একটা জায়গা চোখে পড়ল, যেখানে বড় গাছ নাই, কেবল তৃণপূর্ণ ভূমি। এইরূপ তৃণপূর্ণ ভূমি জঙ্গলে স্থানে স্থানে থাকে। সেখানে দেখলাম অসংখ্য হরিণ দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টি, আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে তার অপরদিকে

নিবদ্ধ। তাদের দেহের মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে রয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে চঞ্চলতার আভাস। অনুমান করে নেওয়া শক্ত হল না যে এইদিকে তারা ভয়ের আশঙ্কা করে এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছে—যখনই ভয়ের কারণ আস্‌বে তখনই পালাতে হবে। আমি ধীরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমার সে অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হল এবং দৌড় দিয়ে সেই গভীর অরণ্যে বিলীন হয়ে গেল। এই কথাগুলি বল্‌তে যত সময় লাগে তার থেকে ও অল্পসময়ের মধ্যে এই কাণ্ডটি ঘটে গেল। তখন বুঝতে পারলাম না কেন এমন ঘটল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সেই পরিষ্কার ভূমির অপরপার্শ্বে যেদিকে হরিণদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, সেখানে শুক্‌নো পাতার ওপর একটা ভারি জিনিস টান্‌লে যেমন একটা শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শোনা গেল। সেদিকে চেয়ে দেখি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ডোরা-কাটা দেহ আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, আর মনে হল যেন সেটা একটা কিসের শব টান্‌ছে।

মনে মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক চিন্তা খেলে গেল। বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে এই পশুটিও আমার মাঝিদের মতই হরিণমাংসলোলুপ হয়ে এই হরিণ দলের পিছু নিয়েছিল। তবে হরিণ বড় ক্ষিপ্রগতি, তাই সুবিধা করতে পারে নি। কিন্তু আমার গুলী হরিণটাকে আহত করে তার সহায়তা করেছিল। হরিণটা আহত হয়ে যখন ছুটেছিল, তখন মাঝিরাও তাকে যেমন ধরতে ছুটেছিল ইনিও সেই উদ্দেশ্যে ছুটেছিলেন। ফলে উভয়ের পথে সাক্ষাৎলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং ঘটেও ছিল তাই। সেই কারণেই মাঝিদের চিৎকার এবং বৃক্ষারোহণ এবং আমারও তাদের সাহায্য করতে এসে এখানে আগমন। ব্যাপার ত মন্দ নয়। দেহও একটু দেখা যাচ্ছে। এখনই কি ট্রিগারটা টিপ্‌ব? বড় লোভ হচ্ছিল।

কিন্তু বুদ্ধিশক্তি তখনও আমার খুবই সজাগ ছিল। সে উপদেশ দিল সেটা করা ঠিক হবে না। কারণ অনেক। প্রথমত কোন জায়গায় গুলী লাগাতে পারব তার ঠিক নাই। ফলে বাঘকে যদি মারাত্মক রকম জখম না করতে পারি, বাঘ প্রতিশোধ নিতে চাইবেই। আমি খোলা মাটিতে দাঁড়িয়ে। কাজেই প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে বিশেষ শক্ত কাজ হবে না। সুতরাং ঠিক করলাম যে সেখানেই গাছের আড়ালে বস্‌ব, বন্দুক ঠিক রাখব এবং অপেক্ষা করব। যে মুহূর্ত্তে বাঘের সমগ্র দেহ দৃষ্টি পথে আস্‌বে এবং মারাত্মক স্থান লক্ষ্য করে গুলী-ছোঁড়া সম্ভব হবে, সেই মুহূর্ত্তেই ট্রিগার টিপ্‌ব।

অগত্যা বস্‌লাম—বসে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। এক মিনিট, দু মিনিট, অনেক মিনিট যেন কাট্‌ল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঘের আর কোন সাড়া শব্দ নাই। সমস্ত বন আশ্চর্য্য রকমের এক নীরবতায় নিমজ্জিত হল। ভারি অদ্ভুত লাগ্‌ল।

মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়বলে যদি কিছু থাকে তা তাই হঠাৎ আমার মধ্যে কাজ করে উঠ্‌ল। দৃষ্টি আমার সামনের দিকে নিবদ্ধ। পেছনে ত দূরের কথা, আশে পাশে কি ঘট্‌ছে, আমার তা দেখবার বা জানবার কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ আমার ডাইনের দিকে ফিরবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্‌ল। কি কারণে জাগল, কেন জাগল, সেটা তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু ইচ্ছা এত প্রবল যে তাকে না সম্মান করে থাকা গেল না। আর সম্মান করে লাভও হয়েছিল ষোল আনা।

ডানদিকে চেয়ে দেখি একটা খুব নীচু ঝোপের অপরপার্শ্বে স্বয়ং বাঘ মহারাজ বসে। শিকারের ওপর লক্ষ্য দেবার আগে যে ভঙ্গিতে তারা বসে থাকে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে বসে। আমার থেকে বেশী দূর হবে না, বড় জোর আট দশ হাত দূরে। সুমুখের পা দুটো সামনে এগিয়ে দেওয়া, মুণ্ডটা প্রায় মাটির সঙ্গে লাগান, দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ, লোহ পড়ছে।

আমি যখন দেখেছি, তখন ভাববার বা চিন্তা করবার সময় ছিল না। ঠিক শিকারের উপর লাফ দেবার পূর্ব্বক্ষণ, আর এক কি দুই মুহূর্ত্ত পরেই বোধহয় দেবে। এমন ক্ষেত্রে মানুষ নিজে ভাবতে পারে না, তার বুদ্ধি-শক্তি আপনিই সে কাজ সেরে নেয়; সে নিজে দেহকে চালায় না, দেহ নিজেকেই চালিয়ে নেয়। আমারও হল তাই। কি হতে চলেছে এবং এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, সেকথা ভেবে শেষ করবার আগেই আমার মন ও দেহ একযোগে তাদের কাজ করে ফেলে দিল। বন্দুক ডান পাশে ফিরিয়ে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলী টিপলাম।

লক্ষ্যটা আশ্চর্য্য রকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল—ঠিক দু চোখের মাঝখানে কপালে গুলী ঢুকেছে। বাঘ লাফায় নি, শব্দ পর্য্যন্ত করতে পারে নি; কারণ সেটা করবার সময় হয় নি, তার আগেই রাইফেলের গুলী তার মস্তিষ্ক ভেদ করে তার প্রাণকে শেষ করে দিয়েছে। তা যদি না হত, তা হলে যে কি হত সেইটা ভেবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবে আমার মনটাকে ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছি এমন সময় শুনি মাঝিদের পদধ্বনি এবং গলার আওয়াজ। বুঝলাম, বন্দুকের শব্দ শুনে হ'ক, যে কারণেই হ'ক, তারা আশ্বাস পেয়েছে এবং আমার দিকে আস্‌ছে। আমার পক্ষে সেটা খুবই প্রয়োজনীয়।

অনতিবিলম্বেই তারা আমার কাছে এসে পড়ল এবং কি যে ঘটেছে সে ভাল করে বুঝে নেবার আগেই তারা একটা ভারি উপহাসাস্পদ ব্যাপার ঘটিয়ে বস্‌লে। হাতে তাদের সেই দা। তারা তীরবেগে আমার কাছে ছুটে এসে আমার পাশেই একটা কটা রঙের জীবের দেহ পড়ে দেখে, তার দিকেই সবেগে ছুটল।

আসলে তারা ভুল করেছে। বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের সেই হরিণের মাংসের লোভ এখনও বিদায় নেয় নি। বেশ পেটুক লোক বলতে হবে। তাই বন্দুকের শব্দ শুনেই তারা এই অভ্রান্ত অনুমান করে নিয়েছে যে অবশেষে হরিণকেই আমি ধরাশায়ী করতে সমর্থ হয়েছি। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে যা ভাবে তাই দেখে। তাই বাঘের গায়ের কটা রঙের সাদৃশ্যটুকু অবলম্বন করেই তারা মৃত বাঘের দেহকে হরিণের দেহরূপে দূর হতে দেখেছে। শুধু তাই নয়, বিশুদ্ধ মাংস পাবার লোভও তাদের ষোল আনা বর্ত্তমান; তাই তার প্রাণ বের হবার আগেই তারা যাতে তাকে জবাই করতে পারে তার জন্য তার দিকে দা নিয়ে ছুটেছে।

কিন্তু মৃত জন্তুটার গলায় দা বসাবার আগেই নৈকট্য হেতু তাদের এ ভ্রম তখনই দূর হয়ে গেল যে সেটা সেই হরিণ নয়, একেবারে আসল ডোরা-কাটা বাঘ। যেমনি সে উপলব্ধি হওয়া সেই সঙ্গে ঠিক স্প্রিং এর মত দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে তারা চিৎকার করে উঠ্‌ল।

আমি হেসে বলে উঠ্‌লাম—ওটা মরে গেছে রে, ভয় নেই।

সূর্য্য প্রায় ডোব্‌বার জোগাড়। এক্ষেত্রে সে হরিণের দেহটার খোঁজে বের হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মোটেই হবে না, বিশেষ ক'রে বিপদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন হাতে হাতে এমন করে মিলেছে। কাজেই মাঝিদের রাজি করিয়ে তিনজনে মিলে বাঘের মৃত দেহটাকে টেনে নৌকায় এনে তুল্‌লাম। মাঝিদের রাজী করান আর শক্ত হল না। প্রত্যক্ষ বাঘের মৃতদেহ তাদের হরিণ খাবার লোভকে এবার সত্যই এবং সহজেই নির্ম্মূল করল।

লঞ্চে ফিরে এসে মাঝিদের মোটা রকম বক্‌শিস্ দিয়েছিলাম ভাল করে মাংস কিনে খাবার জন্যে।

এ গল্প শুনে আমরা সকলে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলাম। আমার প্রস্তাব যে এমন সুফল দেবে আগে কেউ ভাবতে পারেন নি। কাজেই আমায় ধন্যবাদ দিয়ে এবং বিশেষ করে গুপ্তর নির্ভীক শিকারের তারিফ করে সেদিন আমাদের চায়ের পার্টি ভঙ্গ হয়েছিল।

হৃদয়তীর্থ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস

শুধা'য়ো না নাম—জীবনের পথে একাকী আপন মনে
অনাদি পথিক চ'লেছি নিরন্তর—
জলহীন মরু পার হ'য়ে ফিরি দুর্গম বনে বনে—
প্রান্তরে মোর ভ'রে ওঠে অন্তর।
আকাশের মুখে অনিমেষ চোখে চাহি,
বাতাসের কানে আনমনা গান গাহি,
ভাবনা ভাসাই শরৎ-মেঘের সাথে,
ঝরণার সনে মাঝে মাঝে করি খেলা
পথ চ'লে মোর কেটে যায় সারা বেলা,—
হাতখানি রাখি সুদূরের রাঙা হাতে।

চলিতে চলিতে মুগ্ধ নয়নে হেরি যে চলার পাশে
জীবনের পথে জমিয়া উঠিছে ভিড় ;
নীড়-হারা যত মানুষের মন কি গভীর আশ্বাসে
বেঁধেছে যতনে স্নেহ ও প্রেমের নীড়।
নির্বাক্ রহি দাঁড়ায়ে হৃদয়-তীরে,
অবগাহি' উঠি প্রীতির তীর্থ-নীরে—
ধুয়ে যায় যত দেহ ও মনের ধূলি—
হৃদয়তীর্থে যতবার অবগাহি
শুধু মনে হয়—বন্ধন মোর নাহি—
হৃদয়-কোরকে শতদল যায় খুলি'।

অজানার লাগি অভিসার পথে শত তীর্থের স্নান,
হৃদয়ে নিবিড় হৃদয়ের স্পন্দন—
মিথ্যা নহে সে, মর্ত্যে যে দেয় সত্যের সন্ধান—
সুদূরের পথে সে ত নহে বন্ধন !
চলিতে চলিতে পথে তাই বারে বার
হৃদয়তীর্থে জানাই নমস্কার—
প্রেমের পরশে ভরিল চিত্তখানি ;
যাত্রা-পথের শতেক তীর্থ-বারি—
স্মৃতির পাত্রে সঞ্চয় শুধু তারি—
জীবনের চলা ধন্য করিয়া মানি।

ফিলিপাইনে বাঙ্গালী পর্য্যটক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রাণী চেরী ফুলের দেশে কয়েক মাস ভ্রমণ করে ইয়োকোহামা থেকে ডলার লাইনের 'প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন' যোগে এবার রওনা হলাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলার দিকে, জাহাজখানি বেশ বড়, ১৬,০০০ টনের। এতে চারটি বিভিন্ন শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, টুরিষ্ট ও তৃতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্যও পৃথক পৃথক বিছানাযুক্ত কেবিন এবং তাহাদের জন্যও একটি ছোট পাঠাগার ও তাসপাশা প্রভৃতি খেলবার ঘর আছে দেখলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ইয়োকোহামা থেকে ম্যানিলা পর্য্যন্ত ভাড়া বাবদ আমাকে দিতে হল ৬২ ইয়েন (৫০৲ টাকার মত)। আমার কেবিনে একজন ভারতীয় শিখকে সঙ্গী পেলাম। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঐ জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ফিলিপিনো ব্যতীত আর সকলেই চীনা ও জাপানী। জাহাজে আমার দিনগুলো বেশ কাটতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিলিপিনোদের সঙ্গে আলাপ হল ও পরিশেষে বিশেষ আলাপ ঘনিষ্ঠতাতেই পরিণতি লাভ করিল। এঁদের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কোন কলেজের ছাত্রী। কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাচ্ছিলেন। এই ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ পেলাম না। তার জীবনযাত্রা, আচারব্যবহার ও হাব-ভাব—কিছুর সঙ্গে যেন প্রাচ্য-সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ খুঁজে পেলাম না। তিনি যেন সম্পূর্ণরূপেই আমেরিকা-নাইস্‌ড্ হয়ে গিয়েছিলেন। যখনই তাঁকে আমার চোখে পড়ত—তখনই তাঁকে হয় লিপ্‌ষ্টিক্ ব্যবহার করতে নতুবা তাঁর কেশরাশি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম।

ম্যানিলায় পৌছবার দিন দুই পূর্ব্বে আমাদের জাহাজখানি এক ভীষণ ঝড়ের সম্মুখীন হল। সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত মূর্ত্তি দেখে আমি আতঙ্কিতই হয়েছিলাম। সারা দিন মেঘাচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। জাহাজ তখন হংকং ও ম্যানিলার মধ্য পথে। চতুর্দ্দিকে কোথাও একটি পাহাড়ের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্টিপথে এল না। সূর্য্য তখন অস্তমিত। চতুর্দ্দিক তখন

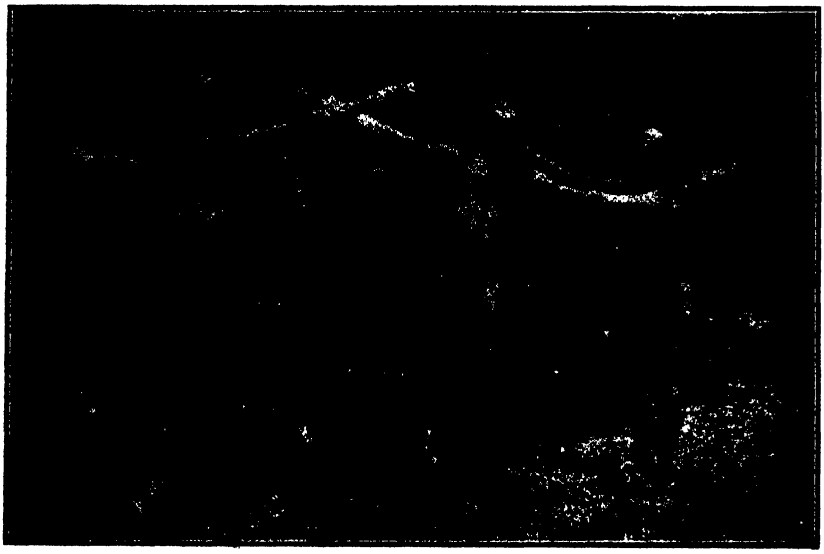


ম্যানিলা উপসাগরের কূলে ম্যানিলা সহর

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। এমনি সময় হঠাৎ একটা ঝাপটা বাতাস এল, মহাসাগরের মূর্ত্তিও যেন তখন পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। আমরা আসন্ন একটা ঝড়ের আশঙ্কা ক'রে যার যার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। উত্তরোত্তর হাওয়াও বাড়তে সুরু করল—সে সঙ্গে আমাদের জাহাজখানিও বেশ দুলছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজের বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। আর কেউ বাইরে রইল না। সকলেই নিজের নিজের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেবিনে শুয়ে শুয়েই

পুরু কাচের জানালা দিয়ে পাহাড়ের মত বৃহদাকার ঢেউগুলি লক্ষ্য ক'রে অসহায় বালকের মত ভয়াতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ঢেউগুলি যেন ডেকের উপর দিয়েই চ'লে যেতে লাগল। আমাদের জাহাজখানিকে যেন একটি তৃণখণ্ডের মত মনে হ'ল, পার্শ্ববর্ত্তী ঘর থেকে করুণ কান্নার সুর আমার ঘরে ভেসে আস্‌ছিল, যারা জীবনে কখনও ভগবান বলে বিশ্বাস করে নি—তাদেরও অনেককেই এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে এবার উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করতে দেখা গেল। আমার অবস্থা তখন কাহিল, কিন্তু আমার চেয়েও কাহিল ছিল আমার সঙ্গী ভারতীয় বন্ধুটির। তিনি ত ভয়ে চক্ষুই মুদ্রিত ক'রে মড়ার মত পড়েছিলেন। এই অবস্থায়ও জাহাজ চল্‌তে সুরু করলে। প্রায় ছ ঘণ্টার পর ঝড় থাম্‌ল—আস্তে আস্তে প্রশান্তের দানবীয় মূর্ত্তি শান্ত হ'ল—আর যাত্রীরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর। ক্রমাগত দশ দিন চলিবার পর আমাদের জাহাজ মধ্যাহ্নে এসে ম্যানিলা বন্দরে পৌছল। এই বন্দরে এখানে সেখানে আমেরিকানদের অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ দেখলাম। শীঘ্রই আমাদের জাহাজ ৭নং পিয়ারে এসে লাগল। এই পিয়ারটিই নাকি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর। পিয়ারটি দ্বিতল বিল্ডিং—যাত্রীরা পিয়রের দ্বিতলে অবতরণ করে। যাহোক, একজন কর্ম্মচারী এসে আমাদের ছাড়পত্র দেখে একে একে সকলকেই নামতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রইলাম বাকী আমি ও কয়েকজন চীনা—যাদের ম্যানিলায় নামবার অনুমতি মিল্‌ল না—যদিও আমার সাথে ভিসা প্রভৃতি সবই ছিল। কেন অনুমতি পেলাম না—তা এক রহস্যই রয়ে গেল; কিছুক্ষণ পর পুলিশ পাহারায় আমরা লঞ্চে ক'রে অদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে গেলাম—সেখানেই অন্যান্যের ন্যায় আমারও থাকবার বন্দোবস্ত হ'ল জেলে। জেলটি দ্বিতল বাড়ী, উভয় তলাতেই কয়েকটি ক'রে অপরিসর ঘর আছে লক্ষ্য করলাম, বিছানাপত্রের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল খানকয়েক বেঞ্চ। দ্বিতলে এমনি একখানি বেঞ্চ দখল ক'রে নীচে গেলাম খেতে। খাবার আয়োজন দেখেই আমার ক্ষুধা কপালে উঠল। খাবার মধ্যে ছিল—একটি চীনা বাটীতে কিছু ঠাণ্ডা ভাত—তাও পর্য্যাপ্ত নয়—দুই টুকরা শুকনো মাছ ও একটি কলা। এমনি চমৎকার খাবার দেখে আমি নিঃশব্দেই উপরে চলে এলাম। অবশ্য যদিও আমি খেলাম না তথাপি এই জেল কর্ত্তৃপক্ষ আমার কাছ থেকে ঐ খাবারের মূল্য বাবদ একটি টাকা আদায় না ক'রে ছাড়লে না।



ফিলিপাইনে বানটক পর্ব্বতে অধিবাসীদের নৃত্য

পরদিন প্রত্যুষে আমাকে অন্যান্যের সঙ্গে এমিগ্রেশন আপিসে হাজির করা হইল। পাসপোর্ট-অফিসার আমার ছাড়পত্রটি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে আমাকে নামবার অনুমতি দিলেন এবং তদনুসারে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে আপিস পরিত্যাগের জন্য দাঁড়ালে ইউরোপীয় পোষাক-পরিহিত একজন উকিল ভদ্রলোক আমার কাছে উপস্থিত হয়ে পঁচিশ পেসো (১০০ সেণ্টস্=১৷৹) দাবী করল। দাবীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললে যে উকিল হিসেবে আমার পক্ষ হয়ে আমার নামবার অনুমতির জন্য অনেক কষ্ট করেছেন; তদুত্তরে আমি তাকে একটি পয়সাও দিতে অস্বীকার করলাম ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম যে আমি

আমার পক্ষ হয়ে কোন কথা বলবার জন্য কোন উকিলকে নিযুক্ত করিনি। এই কথা বলে যেতে উদ্যত হলে পাসপোর্ট-অফিসার আমায় পুনরায় ডেকে নামবার অনুমতি বাতিল ক'রে দিয়ে একটি অন্ধকার পূতিগন্ধময় ছোট্ট সেলে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানেই আমার বহুক্ষণ কেটে গেল ও ভাবলাম বোধ হয় আমার ঐ দেশভ্রমণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হল। সন্ধ্যায় ঐ উকিল আবার আমার সঙ্গে ঐ জেলে দেখা করে বলল যে, তার দাবীর টাকা মেটালেই আমি নামবার অনুমতি পেতাম। ইতিপূর্ব্বে আমি জেল থেকে ফিলিপাইনে একমাত্র বাঙালী ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে ফোন ক'রে জানতে চাইলাম, তিনি আমার জন্য একটি জামিন দিতে পারেন কি-না। কিন্তু তার উত্তরে আমি নিরাশ হলাম, তাই অবশেষে আমায় ঐ উকিলের সাহায্যই নিতে হল। তাকে পঁচিশ পেন্স ঘুষ দিয়ে আমি এবার ফিলিপাইনে অবতরণ করলাম। ম্যানিলায় যে কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন ভারতীয় শিখদের স্থানীয় গুরুদ্বারাতেই অবস্থান করেছি।

এই গুরুদ্বারাটি দ্বিতল বাড়ী, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটি তৈরী হয়েছে। উপরের তলায় গ্রন্থজী রক্ষিত হয় ও সেখানেই প্রতি রবিবার মহাসমারোহে শিখদের প্রার্থনা হয় ও প্রসাদ বিতরিত হয়। এজন্য বহুদূর থেকেও শিখেরা এখানে আসে ও সমবেত হয়ে তাদের নিজেদের ও দেশের বিষয় আলোচনা করে। এই শিখদের সংখ্যা ফিলিপাইনে প্রায় তিন শ। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পাহারাদারের কাজ করে, অথচ এই স্বল্পবেতনভুক পাহারাদাররাই একত্র হ'য়ে এত টাকা ব্যয়ে ঐ মন্দিরটি তৈরী করেছে, আবার এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতিমাসে বহু টাকা খরচও করে। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে-কোন অসহায় ভারতবাসী এই মন্দিরে বিনা খরচে যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারে। শুধু থাকাই নয়—তার খাবার বন্দোবস্তও এরাই করে। ম্যানিলাতে আরও অনেক ভারতীয় আছেন, তাঁরা সকলেই ব্যবসায়ী—সিন্ধুপ্রদেশের লোক।

পরদিন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এই মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের অভিনন্দন জানালে। তাদের মধ্যে একজনের নামই আজও আমার স্মরণ আছে। তার নাম সোবন সিং। সে জীবনে কখনও ভারতবর্ষ দেখে নি। সে ওখানেই জন্মগ্রহণ করেছে, ওখানেই লালিতপালিত হচ্ছে, সে তখন এম্-এ পড়ত। সেই ম্যানিলাতে "আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। সে খুব অমায়িক ভদ্রলোক, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি কতই না সুখী হয়েছি!

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দুজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে বেড়াতে



জাতীয় পোষাকে ফিলিপাইনবাসিনী

বার হব—এমনি সময় কয়েকজন ফিলিপিনো ও আমেরিকান খবরেরকাগজের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এঁরা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ছাড়া ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করলেন; সেই সঙ্গে তাঁরা মহাত্মাজী ও কবিবরের সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্নই করলেন—মহাত্মাজীর তখন কি অসুখ ছিল। তাই একদিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় হরফে

মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, এ সংবাদে তারাও বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিল। মহাত্মাজীর নাম এখানকার সুদূর পল্লীতেও সুপরিচিত—অবশ্য লোকে তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানে না, শুধু জানে যে তিনি ভারতের

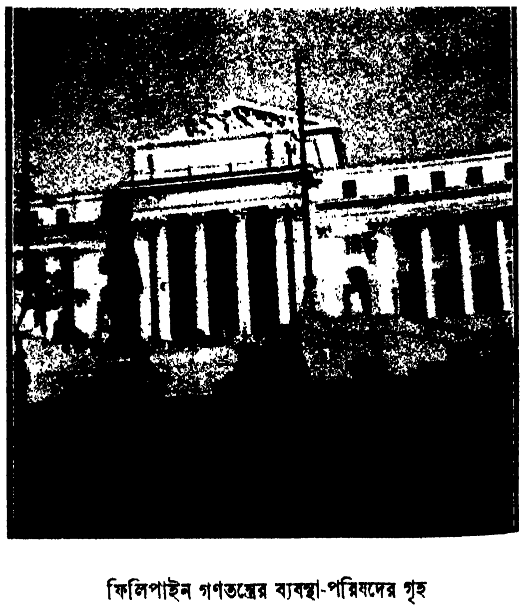


ম্যানিলার ফিলিপাইন গণতন্ত্রের সভাপতির প্রাসাদ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। আবার কেউ কেউ জানেন, তিনি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ জানেন—তাঁদের মধ্যেও অনেকেই তাঁর অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্ম্মকথা বিস্তারিত ভাবে জানেন না। কবীন্দ্রের নাম শুধু শিক্ষিত সমাজেই সুপরিচিত—তাদের উপর তাঁর প্রভাবও অসীম—এমন কি মহাত্মাজীর প্রভাব থেকেও বেশী। শুধু এই দুজন ভারতীয় সন্তানের জন্যেই আমরা ভারতীয়রা এই বিদেশে শ্রদ্ধা পেতাম।

ম্যানিলা কয়েকশ' বৎসর ধরেই ফিলিপাইনের রাজধানী, শহরটি বেশ বড়—লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের মত। শহরটি ঠিক ম্যানিলা উপসাগরের উপরেই। ফিলিপাইনে প্রায় চার হাজার দ্বীপ আছে—তার মধ্যে ঐ লুথান দ্বীপটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও এখানেই দেশের বড় বড় শহরগুলি গড়ে উঠেছে। ম্যানিলাও এই দ্বীপেই অবস্থিত। শহরের ভিতর দিয়ে একটি সরু নদী প্রবাহিত—নাম তার পেলিগ। একে একটি বড় ফলের মত দেখায়। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আদর্শ ঋতু প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিদেশী ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে। শহরটী ইতিহাসবিখ্যাত। এখানেই ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে স্পেনিয়ার্ড ও আমেরিকানদের মধ্যে যুদ্ধ হয় ও প্রায় চারশ বৎসর শাসনের পর স্পেনিয়ার্ডরা এখানে আমেরিকানদের হাতে পরাজিত হয়ে এদেশ পরিত্যাগ করে। স্পেনীয় শাসনকালে শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল—অবশ্য তা আজও আছে। এর পুরাতন অট্টালিকা ও দুর্গ শুধু স্পেনীয় রাজত্বের অত্যাচার ও বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে আছে,—যখন ফিলিপিনোরা স্পেনীয় শাসনের অত্যাচারের কথা আমার কাছে বল্‌তেন—তখন তাঁরা ঘৃণায় ও রাগে শিউরে উঠতেন।

বর্ত্তমান শহরটি প্রাচীর-বেষ্টিত পুরাতন শহরের চতুর্দ্দিকে গড়ে উঠেছে। যাতায়াতের বেশ সুব্যবস্থা আছে। ট্রাম, বাস, তিন চাকার ছোট ট্যাক্সি ও কোলেসা আছে। ট্যাক্সির ভাড়া বেশ সস্তা, মাত্র ৫ সেণ্টাভোতে (১০০ সেণ্টাভো—১ পেসো=দেড় টাকা) ট্যাক্সিতে প্রায় আধ মাইল যেতে পারা যায়। কোলেসা—দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ী—একটি ঘোড়ায় টানে। শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই, আছে



ফিলিপাইন গণতন্ত্রের ব্যবস্থা-পরিষদের গৃহ

মাত্র একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা ও একটি ক্ষুদ্র যাদুঘর। তবে য়্যাকোয়ারিয়ামটি যদিও ছোট, অনেক নূতন সামুদ্রিক জন্তু দেখা যায়, এই শহরের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু—লুনেটা পার্ক। ইহা সমুদ্রের সম্মুখে একটি বিস্তৃত বাগান—

অনেক ফুল এর শোভা বর্দ্ধন করে আছে। সন্ধ্যাকালে যখন অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি অদূরের পাহাড়শ্রেণীর উপর খেলা করে ও সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ-জাহাজগুলোয় বাতি জ্বলে ওঠে—আর এ-পারে ফুলের সুগন্ধি ভেসে বেড়ায় —তখন দর্শকমাত্রই এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, নিজেকে ভুলে যায়। এই সুবিস্তৃত বাগানের মধ্যস্থলে ফিলিপাইনের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক ডাঃ যোস্ রিজালের প্রস্তরমূর্ত্তি পার্কটির শোভা আরও বর্দ্ধন করেছে। এই মূর্ত্তিটি একে যেন একটি তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় এখানে অসংখ্য ফিলিপিনো এই দেশ-প্রেমিকের পদতলে এসে সমবেত হয় ও তাদের ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান ক'রে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। এই স্বদেশ-প্রেমিক ফিলিপাইনের স্বাধীনতার জন্য তাঁর শেষ রক্তটুকু দান করেছিলেন। তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত হন ও সামরিক বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ বৎসরেরই ৩০শে ডিসেম্বরের অতি প্রত্যূষে তাঁকে এই বাগানে গুলী করে হত্যা করা হয়। তখন ফিলিপাইনে স্পেনীয় শাসনের শেষ অধ্যায়। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বহু ভাষা জানতেন, তাঁর লেখনী তাঁকে ফিলিপাইনে অমর ক'রে রেখেছে। তাঁকে যেদিন উন্মুক্ত লুনেটা মাঠে হত্যা করা হয়—সেদিন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজীতে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন। সেই কবিতার একাংশ এই—

'I die while dawn's rich iris hues are
staining yet the sky,
Heralds of the freer day still hidden
from view
Behind the night's dark mantle.
And should
The morning nigh
Need crimson, shed my heart's blood
quickly,
Freely let it dye
The newborn light with the glory of its
Ensanguined hue'.

সন্ধ্যার কুলায়ে

শ্রীকালিদাস রায়

রবি গেল অস্তাচলে। চিতাভস্ম-ধূমের তিমিরে
সন্ধ্যা এলো ঘনাইয়া আজি মোর অন্তরে বাহিরে।
রসবতী তটিনীর লাবণ্য মুহূর্ত্তে গেল ঘুচে,
দিগ্‌বধূর ওষ্ঠে ভালে রক্তরাগ কেবা দিল মুছে?
লুপ্ত গ্রামান্তের চিহ্ন, শশিহারা দিগন্তের পার,
মসীর পাথারে গৃহ লতা তরু সব একাকার।
আলোর বিদায়-গীতি বাজে শীর্ণ কুলায়ে কুলায়ে
ফুলেরা মুরছি পড়ে—তীরে নীরে নয়ন ঢুলায়ে।
দীপ্তি অভিনয় করে খদ্যোতেরা, ঝিল্লী ধরে গীতি
তমোঘন নিরাশারই হয় তায় শুধু পরিমিতি।
এই সন্ধ্যা-সাথে সেই যৌবনের সন্ধ্যাগুলি মোর;
তুলনা করিতে হায় খরস্রোতে বহে আঁখি লোর

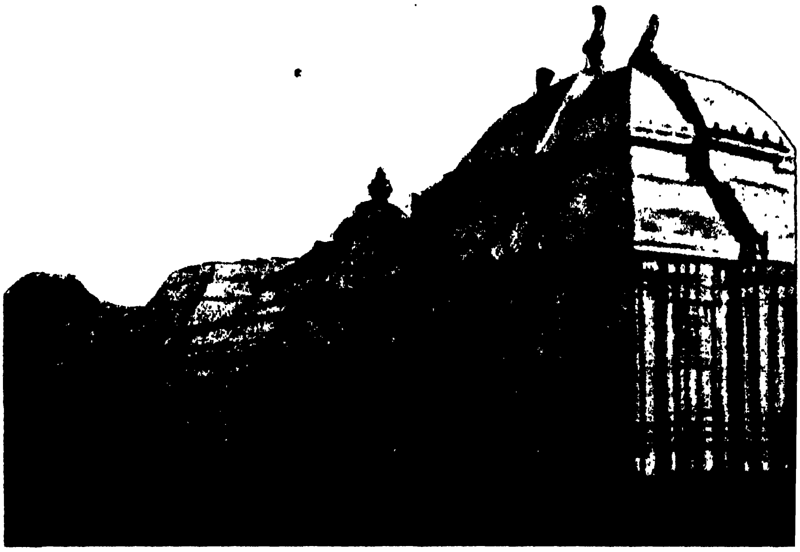
সে সন্ধ্যা আসিত নিয়া কত আশা কত ভালবাসা,
জাগাত আমার প্রাণে উদ্দীপনা রসের পিপাসা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দ্যা মোর প্রেমোল্লাসে করিত নন্দিত,
অন্তরের অন্তরীক্ষ হ'তো কোটি নক্ষত্র-খচিত।
সন্ধ্যা হলো বন্ধ্যা আজি, গন্ধ নাই রজনীগন্ধায়
কমলে ঢুলায় ঘুমে কুমুদেরে আর না জাগায়।
ভিড় করে মূঢ় মনে ভবিষ্যের কত ছায়া ভীতি
তার সাথে যোগ দেয় অতীতের যত মায়া স্মৃতি।
যে কথা ভাবিতে গেলে প্রাণমন শিহরিয়া উঠে,
সে কথাই বার বার জনতার বাধা ঠেলে ফুটে!
আজ এ সন্ধ্যায় শুনি শ্রীমন্দিরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ,
মনে হয় যেন ওরা মুহুর্মুহুঃ ওপারের ডাক।

চক্রাবর্ত্ত

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি এইচ্-ডি

(পুরীচক্র, পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জগন্নাথ মন্দির হইতে গুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত প্রশস্ত এক রাস্তা বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল হইবে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রা সহ রথে চড়িয়া এই বড়দাণ্ডের উপর দিয়াই গুণ্ডিচা মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। গুণ্ডিচা শব্দটি একটু অদ্ভুত শুনায়; শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এই যে গুণ্ডিচা মানে কাঠের গুঁড়ি। আদৌ এই মন্দির কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং গেজেটীয়র-কার শ্রীযুক্ত ওমালি সাহেবও অনুরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সরকার কৃত "পুরীর কথা" ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা)। আদৌ যাহাই থাকুক, বর্ত্তমানে গুণ্ডিচা মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত—চূড়াবিহীন সাদাসিধা মন্দির। জগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রাসহ রথযাত্রাকালে এই স্থানে নয় দিন অবস্থান করেন। আমরা প্রায়-অন্ধকার সেই মন্দিরগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের সাহায্যে জগন্নাথের শূন্য রত্নবেদী দর্শন ও স্পর্শ করিলাম এবং গুণ্ডিচা মন্দির তহবিলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া বাহির হইলাম। দেখিলাম মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত লোকের নাম লেখা রহিয়াছে! যিনিই গুণ্ডিচা মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তিনিই মন্দিরের দেয়ালকে Visitor's Book করিয়া কাঠকয়লা সহযোগে নিজের নাম, ধাম এবং পরিদর্শনের তারিখ তাহার উপর লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। হাতে যতদূর নাগাল পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তো নাম লেখা হইয়াছেই, উহা ঊর্দ্ধেও নাম লেখা দেখিয়া বুঝিলাম সঙ্গীর স্কন্ধারূঢ় হইয়া ঐ নামগুলি লিখিত হইয়া থাকিবে! গুণ্ডিচা মন্দিরের গায়ে নাম থাকার জন্য ইহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন বা যাইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।



গুণ্ডিচা মন্দির (শ্রীযুত গুরুদাস সরকার কৃত 'পুরীর কথা' হইতে)



অরুণস্তম্ভ (সাক্ষীগোপাল)

গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি চার-পাঁচ ফিট উচ্চ অনতিবৃহৎ মঞ্চের উপর দুইখানি পদচিহ্ন স্থাপিত। ছড়িদার বলিল—মহাপ্রভু চৈতন্যের পদচিহ্ন। শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছড়িদার বলিল—বহু অজ্ঞাতনামা সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া স্বহস্তে ঝাড়ু ধরিয়া এই প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করেন, এই পদচিহ্নতলে গড়াগড়ি দেন। মনে পড়িয়া গেল চৈতন্যদেবের স্বহস্তে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের কথা—মনে পড়িয়া গেল ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ—যাহাতে তিনি এই পদচিহ্নদ্বয়কে চৈতন্যের বিস্মৃত সমাধির নিদর্শন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া কিছুদিন পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থানের পর একদিন চৈতন্যদেব কাশীমিশ্র, পড়িছা পাত্র এবং রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া আনিলেন :—

এই মতে নানা রঙ্গে দিন কথো গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনায় পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥

প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র পাত্র মহাশয় একশত ঘট ও একশত ঝাড়ু আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু দলবল সহ গুণ্ডিচা মার্জ্জনে গেলেন। চৈতন্যদেব যে কেবল স্বপ্নবিলাসী ভাববিভোর প্রেমের-পাগল ছিলেন না—বহুলোককে সংহত দলবদ্ধ করিয়া হাতেকলমে খাটাইবার এবং নিজেও খাটিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ রকমের ছিল, এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। বৃন্দাবনদাসবিবৃত নগর-কীর্ত্তন ও কাজিদলন বিবরণেও দেখা যায়, জনতাকে এক লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় [illegible] চৈতন্য [illegible]। এই প্রকাণ্ড মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণ দুইবার ঝাঁট দিয়া, ছাদ পর্য্যন্ত জল দিয়া ধুইয়া—

এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥*

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ নাকি চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত রথের পূর্ব্বে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনোৎসব অদ্যাপি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সকলেই জানেন চৈতন্যের স্মৃতিতে অদ্যাপি পুরীতীর্থ পূর্ণ; কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ সকলে নীরব। এ যেন এক মহানীরবতার ষড়যন্ত্র! চৈতন্যদেব অংশই হউন আর পূর্ণই হউন, আর শুধু মাত্র ভগবদ্ভক্তই হউন, তিনি মানব দেহধারী ছিলেন—ভগবদ্বুদ্ধিতে কেহ তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলে তিনি বিষম বিরক্ত হইতেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকালে একজন সরলস্বভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুণ্ডিচায় জল ঢালিবার ছলে চৈতন্যের পায়ে জল ঢালিয়া তাহা পান করিয়াছিলেন। দেখিয়া চৈতন্যদেব অস্থির হইয়া পড়িলেন :—

হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল অর্ঘ্য জল॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥

এইখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটি ছত্রে নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া চৈতন্যচরিত্রকে অনেকখানি খাট করিয়াছেন, যথা :—

যদ্যপি গোসাঞি তারে হৈয়াছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥

অর্থাৎ পাদোদক পান করাতে চৈতন্য মনে মনে খুসীই হইয়াছিলেন, শুধু লোকশিক্ষার জন্য বাহিরে রাগ দেখাইলেন! বর্ত্তমান দীনহীন লেখক শাক্ত। চৈতন্যের ভিতর বাহিরে এতখানি প্রভেদ ছিল এবং ঈশ্বরবুদ্ধিতে

* এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইবার প্রণালিকা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—অর্থ ড্রেন।

ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥

এমন সুন্দর শব্দটি থাকিতে বিদেশী ড্রেন শব্দটির অথবা পণ্ডিতী পয়ঃপ্রণালীর কোন প্রয়োজন আছে কি

স্তবাদি করিলে চৈতন্য মনে মনে খুসী হইয়া বাহিরে রাগ দেখাইতেন, এই অধম শাক্তও এইরূপ কল্পনা করিতে কিন্তু মনে ব্যথা অনুভব করিতেছে। অন্তরাত্মা বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—"না না, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি ভক্তের হৃদয়দৌর্ব্বল্যজনিত নিজ মনগড়া বিকৃত চৈতন্য-প্রতিমা মাত্র, ইহা স্ফটিক স্বচ্ছ চৈতন্যের স্বরূপ হইতে পারে না।"

মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়া স্বরূপদামোদরকে জানাইলেন :—

স্বরূপ গোসাঞি আনি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক ফৈজতি ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে ঘাড়ে হাত দিঞা।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা ॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল টিপয়।
অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা।

কাজেই এই মানববুদ্ধি মানবদেহধারী চৈতন্যদেবের দেহের কি হইল, ইহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হয়। অদ্যাপি পঞ্জিকাতে চৈতন্যপর বহু বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথি লিখিত হয় এবং উহা বৈষ্ণবগণের পর্ব্বদিন বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ চৈতন্য কোন্ তিথিতে তিরোহিত হইলেন, তাঁহার সমাধি কোথায় অবস্থিত, কিছুই নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। আসন্ন্যাস আত্মগোপনকারী চৈতন্যদেব এমনভাবেই আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। সমগ্র পুরীতীর্থে চৈতন্যের নিজস্ব আর কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই—একমাত্র তাঁহার প্রিয় গুণ্ডিচা-মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার এই দুইখানি চরণ-চিহ্ন ছাড়া।

কৃষ্ণদাসকবিরাজ বা বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপুর বা মুরারি গুপ্ত, কেহই চৈতন্যের তিরোভাব-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। শুধু জয়ানন্দ ও লোচনদাস তাঁহাদের "চৈতন্য-মঙ্গল" কাব্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই উভয় গ্রন্থকারই বৃন্দাবনদাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যে সংস্করণ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদনে অনেক বৎসর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা অপ্রাপ্য। ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক পুঁথি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগ্রহে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। ঢাকা মিউজিয়মের সংগ্রহেও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের একখানি চমৎকার খণ্ডিত পুঁথি আছে। এই সমস্ত উপাদান অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্রায়তন মূল্যবান প্রাচীন কাব্যখানির নূতন সংস্করণ হওয়া উচিত। চৈতন্যের তিরোভাবসূচক পয়ারগুলি জয়ানন্দের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

যম গিয়া ব্রহ্মার নিকট নিবেদন জানাইল, তাহার যমালয় শূন্য হইয়াছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতাপে তাবৎ পাপী উদ্ধার পাইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মা তখন চৈতন্যকে লীলা সম্বরণ করিতে অনুরোধ জানাইতে চৈতন্যের আশ্রমে চলিলেন :—

ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনি।
সকল দেবতা মেলি করিয়া (করিলা ?) ধরণী ॥
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে।*
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী ॥

* * * *

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে ॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে ॥

---

* মুদ্রিত পুথিতে আছে "টোটাগ্রামে", ভূমিকার ॥৵ পৃষ্ঠায় আছে "টোটাশ্রমে"। কিরূপ অসতর্কতায় ও অপরিশ্রমে নকলনবীশের উপর নির্ভর করিয়া আদিযুগে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত হইত, ইহা তাহারই নিদর্শন।

নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পরিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্ব কথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা বর্ণে দিব্য মাল্য আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজে রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বু দ্বীপ ছাড়ি॥

মুদ্রিত পুস্তকের এই শেষাংশের পাঠে গোলযোগ আছে বোধ হয়। "আষাঢ় বঞ্চিত রথ" কথা কয়টির মধ্যে 'বঞ্চিত' শব্দটি অর্থশূন্য বোধ হয়। তাহার পরে, রথযাত্রা শেষ না হইতেই অদ্বৈত গৌড়দেশে চলিলেন, ইহা যেন সঙ্গত ও সম্ভবপর মনে হয় না। মোট কথা এই অংশের পাঠে নানা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত সমস্তখানি পুস্তক মিলাইয়া এই অংশের আদর্শ পাঠ উদ্ধৃত হওয়া উচিত। যাহা হউক, "আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে" ছত্রের প্রকৃত পাঠ যদি এই হয় যে—"আষাঢ়ে বাঞ্ছিত রথবিজয়া নাচিতে" তবে ধরা যায় যে রথদ্বিতীয়া দিন চৈতন্যের প্রথামত রথাগ্রে নৃত্য করিতে চৈতন্য বাঁ পায়ে আঘাত পান। নৃত্যান্তে তাঁহার অভ্যাসমত দলবলসহ নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করেন। ষষ্ঠীর দিন, অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্তি হইতে পঞ্চম দিনে পায়ের আঘাত গুরুতর বেদনাপ্রাপ্ত হয় এবং চৈতন্য নিজের আশ্রমে শয্যাগত থাকিতে বাধ্য হন। সপ্তমী দিন দশদণ্ড রাত্রিকালে অর্থাৎ রাত্রি দশটার সময় তাঁহার তিরোভাব ঘটে। কোথায় তাঁহার দেহ সমাহিত হয়, এই বিষয়ে জয়ানন্দ কোন কথাই বলেন নাই, রোগশয্যাও টোটায় অর্থাৎ নিজের আশ্রমেই ছিল, এমনি বুঝা যায়।

এখন দেখা যাক্, এই সম্বন্ধে লোচন দাস কি বলেন।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ—১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা।

অইমতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক যে হয়েত অনেক।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুঞ্জা বাড়ী মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥
এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥ *

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের চারিখানি সম্পূর্ণ পুথি আছে। এই স্থানটির পাঠ পরীক্ষা করিতে

লোচনদাসের এই বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, জয়ানন্দ অসুস্থতার বিবরণ ভাল করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তিরোভাবের পূর্ণ বিবরণ দেন নাই। আবার লোচনদাস তিরোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু অসুস্থতার উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই দুই সমসাময়িক লেখকের বিবরণ মিলাইয়া চৈতন্যদেবের শেষ কয়দিনের নিম্নরূপ বিবরণ সঙ্কলন করা সম্ভবপর।

রথ দ্বিতীয়ায় রথাগ্রে নৃত্য করিতে চৈতন্যদেব বামপদে আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি দলবলসহ নরেন্দ্র সরোবরে জল-ক্রীড়া করেন। পরের কয়েক দিন সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যাদি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন বেদনা এত বাড়িল যে নিজের আশ্রমে কাশীমিশ্রের ঘরে শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রোগ শয্যায় শুইয়া থাকা এবং জগন্নাথের অদর্শন তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সপ্তমীর দিন পায়ের বেদনা এবং জ্বরগ্রস্ত শরীর লইয়াই দুই মাইল হাঁটিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। কাশীমিশ্রের ঘর জগন্নাথ-মন্দিরের নিকট, সম্ভবতঃ পশ্চিমে বা দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই সময় গুণ্ডিচা মন্দিরে। তথায় পৌছিতে তাঁহাকে সেই আষাঢ় মাসের বিষম গরমের মধ্যে অসুস্থ শরীরে প্রায় দুই মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। তৃতীয় প্রহরে গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌছিয়া তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিলেই জগন্নাথকে আলিঙ্গনের ইচ্ছা চৈতন্যদেবের অসম্বরণীয় হইয়া উঠিত। এই জন্য স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় তিনি দূর হইতে জগন্নাথ দর্শন করিতেন। আজ অসুস্থ শরীরে মন্দিরের অন্ধকারে শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তিনি জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। অসম্বরণীয় ভাবাবেগে অমনি তিনি বেদীর উপর উঠিয়া জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। "তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।" শরীরের দশ দুয়ারে কপাট পড়িয়া গেল,—চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইল, মহাভাবে চৈতন্যদেব অচেতন হইয়া গেলেন। লোকের ভিড় নিবারণ করিতে মন্দির প্রাঙ্গণের কপাট লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দশটায়—

মায়ার শরীর তথায় রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥ *

গুণ্ডিচা মন্দির প্রাঙ্গণে চৈতন্যের দেহ সমাহিত হইল। পরে কপাট খুলিয়া সমবেত ভক্তগণকে জানান হইল, চৈতন্য জগন্নাথ আলিঙ্গন করিতে গিয়া জগন্নাথে লীন হইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ অতিলৌকিকে অতি সহজে বিশ্বাস করেন—তাই জগন্নাথে লীন হইবার প্রবাদই চৈতন্য সম্বন্ধে প্রবল হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্যের নবনীতকোমল ভাবঘন যে দেহখানি বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব কবিগণ উপমা খুঁজিয়া পাইতেন না সেই অনুপম দেহ যে সমাধিতে সমাহিত আছে, চৈতন্যের পদচিহ্নদ্বয় দ্বারা যে সমাধি নির্দ্দিষ্ট—সেই সমাধি তাই অদ্যাবধি বৈষ্ণব সমাজে অজ্ঞাত অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'প্রবাসী'র এক প্রবন্ধে প্রথম এই মত প্রকাশ করেন যে, চৈতন্যের পদচিহ্নদ্বয় চৈতন্যের অজ্ঞাত সমাধির নিদর্শন। সমস্ত বিচার করিয়া আমি সানন্দে সেন মহাশয়ের মতই সমর্থন করিলাম। চৈতন্যের জগন্নাথে লীনত্ব প্রবাদে যে সকল শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব বিশ্বাস করেন, আমার এই সমর্থন যদি তাঁহাদের মনোবেদনার কারণ হয়, তবে তাঁহারা আমাকে

পুঁথিগুলি খুলিয়া দেখি, এই পুঁথিগুলির কোনখানিতেও এই স্থানটি নাই। একখানি মাত্র পুঁথিতে চৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোভাব প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহার পাঠ একেবারে ভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে লেখা আছে যোগাবলম্বনে চৈতন্য জগন্নাথে এবং নিত্যানন্দ বলরামে লীন হইয়া গেলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে লোচনদাসের যে সকল পূর্ণাঙ্গ পুঁথি আছে সেইগুলির সাহায্যে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সংস্করণের এই অংশের পাঠ পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ভক্তিভূষণ মহাশয় কোন্ পুঁথি অবলম্বনে নিজ সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার কোন পরিচয় ভূমিকায় দেন নাই। প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনে অবলম্বিত পুঁথির পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথির তালিকায় দেখিলাম, পরিষদের ২৩২ নং পুঁথিতে (৩ পাতা মাত্র) চৈতন্যের তিরোধান বর্ণিত আছে, পাঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রদত্ত পাঠের অনুরূপ।

* চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন ২৯শে জুলাই তিরোহিত হ'ন। কাজেই তিরোভাবের সময় তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর ৫ মাস ১৬ অথবা ১৭ দিন হইয়াছিল।

যেন ক্ষমা করেন। আমাদের বড় আদরের নিমাই এইখানে সমাহিত আছেন মনে করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যের বেদনাময় আনন্দ যেটুকু পাই, তিনি জগন্নাথে সশরীর লীন হইয়াছেন মনে করিয়া সেই আনন্দ পাই না—বরং অপ্রাপ্যরূপে একেবারে হারাইবার দারুণ নৈরাশ্যে হৃদয় অন্ধকার হইয়া যায়। আমার এই পৌত্তলিকতার জন্য সাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণের নিকট পুনঃ পুনঃ করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ইহার পরে আর কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। গুণ্ডিচা মন্দির দেখা সমাপ্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিয়া জগন্নাথ মন্দিরে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথ দর্শনের সময়ের তখনও বিলম্ব আছে জানিয়া গাড়ী ফিরাইয়া পুরীর পশ্চিম-প্রান্তে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং গোবর্দ্ধন মঠ দেখিলাম। গোবর্দ্ধন মঠে কিছু হাতের লেখা পুঁথি আছে দেখিলাম। ফিরিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে পুরাপুরি জগন্নাথ দেখিয়া ও পরিক্রম করিয়া বোর্ডিংএ ফিরিলাম। পরদিন প্রভাতে পাণ্ডাকে ১৲ দক্ষিণা এবং ছড়িদারকে ॥০ বক্শিস্ দিয়া ৮টা ৩৫ মিনিটের ট্রেণে ভুবনেশ্বর রওনা হইলাম। কণারকের রাস্তা তখনও খোলে নাই বলিয়া কণারক যাওয়া হইল না।

বিধাতা ললাটে এই ত লিখন দিয়েছে আঁকি

শ্রীক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য

দুখের পেয়ালা হবে রে পূর্ণ,
রবে না বাকি;
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন,
দিয়েছে আঁকি।
বেদনার-রাঙা তীব্র গরল,
কর কর পান ব্যথা-বিহ্বল!
হউক সজল, অশ্রু-বাষ্পে,
মলিন আঁখি।
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন
দিয়েছে আঁকি!!

শুষ্ক-জীবনে ফুটিবে না ফুল,
মিলিবে কাঁটা;
মিলিবে না জল, তৃষার-দাহনে,
এ বুক-ফাটা!
পদে পদে তোর হবে পথ ভুল,
অকূল-সাগরে মিলিবে না কূল
আশা মরীচিকা ছলিবে কেবল,
জানিস নাকি?
বিধাতা ললাটে এই ত লিখন
দিয়েছে আঁকি!!





নারদ ঋষির মর্ত্যের সঙ্গে সংযোগটা কিছু বেশী, দেশে দেশে, ঘরে ঘরে তাহার সম্বন্ধ। তাই যাওয়া-আসাটাও কিছু ঘন ঘনই ঘটিয়া থাকে। এবার ঋষি সম্প্রতি মর্ত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গধামে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারদ কুবেরকে ধরিয়াছেন, স্বর্গে একটি ফিল্ম কোম্প্যানী খুলিতে হইবে। কুবের প্রথমে রাজি হন নাই, তারপর অনেক হিসাব নিকাশ দেখাইয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহাকে রাজি করান গিয়াছে।



তাড়কা বধ

বিশ্বকর্মাকে আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পাঠান হইয়াছে এবং কৈলাসে একটি নিভৃত শৈলশিখরে ষ্টুডিও নির্মাণ সুরু হইয়াছে।

এই সংবাদে স্বর্গের দিকে দিকে হর্ষধ্বনি উঠিতে লাগিল। নারদ যাহাতে লাগেন তাহার একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ছাড়েন না। দেখিতে দেখিতে সকল ব্যবস্থা হইল। যন্ত্র আসিল, যন্ত্রী আসিল। পৃথিবীর বাছা বাছা বিশেষজ্ঞের স্বর্গগমনে মর্ত্যে হাহাকার উঠিল। ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী সকল দেশ হইতে বাছিয়া আনা হইল। বিশ্বকর্মার কর্মকুশলতায় সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হইল, নারদ মর্ত্যে দেখিয়া গিয়াছেন ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ চিত্রাবতরণ করিতেছেন। তাঁহার পরামর্শে একদল দেব-দেবীও সাজিলেন—তাঁহারা চিত্রাবতরণ করিবেন।

সমস্ত স্থির হইল—এখন প্রয়োজন উপযুক্ত কাহিনী। এক ঘরোয়া বৈঠকে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। খ্যাত, অখ্যাত, বিখ্যাত, সুখ্যাত, পরিখ্যাত অপখ্যাত যত লেখকলেখিকা স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ছিলেন সকলের নাম উচ্চারিত হইল, কিন্তু দারুণ ভোটাভুটিতে কোনটিই টিকিল না। এত নামের মধ্যে আদি কবির নামটাই কাহারও মনে পড়ে নাই। অবশেষে মিস্ সরস্বতী দেবী প্রস্তাব করিলেন—বাল্মীকির রামায়ণ।

নারদ শুনিয়া হাসিয়া আর বাঁচেন না। লেখক ত্রিকালের বৃদ্ধ, ততোধিক পচা পুরাতন রামায়ণের কাহিনী। তবু বাল্মীকির নামের কিছু দাম আছে বিচার করিয়া রামায়ণের প্রতি কৃপা করা হইল। স্থির হইল চিত্রনাট্যকে কিছু রদবদল করিয়া উহা কালোপযোগী করিয়া লইলেই চলিবে।

চিত্রগুপ্ত তাহার পাহাড়প্রমাণ খতিয়ান খুঁজিয়া এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের নাম বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার উপর চিত্রনাট্য রচনার ভার পড়িল। রামায়ণের গল্পটি চিত্রোপযোগী করিতে কিছু বর্ত্তমানের ছাঁদ না দিলে মনোরম হইবে না। চিত্রনাট্যকারকে সে স্বাধীনতা দেওয়া হইল।

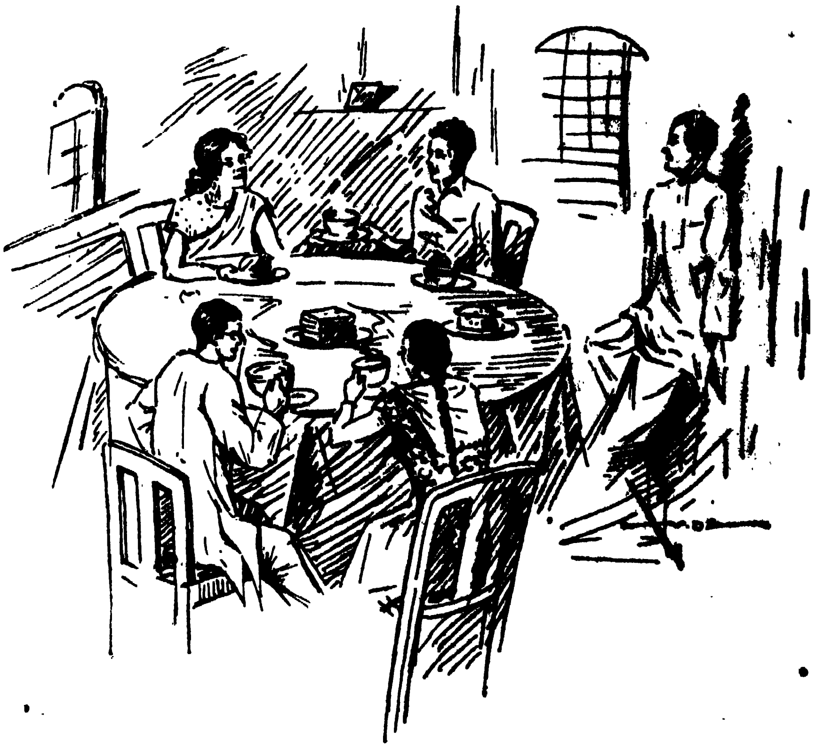
যথাসময়ে স্বর্গধামের দেওয়ালে দেওয়ালে শৈলে শৈলে পোষ্টার পড়িল, প্রচারপত্র প্রকাশিত হইল। বহুল প্রচারের জন্য মর্ত্ত্যেও কিছু আসিল। আমরাও জানিলাম—কুবের ফিল্ম কর্পোরেশনের নবতম অবদান "নবরামায়ণ" বিচিত্র ভূমিকা সমাবেশে শীঘ্রই আত্ম-প্রকাশ করিবে।

ষ্টুডিও হইতে মাঝে মাঝে যে সব সংবাদ আসিতে লাগিল তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম যে, "নব-রামায়ণ" একালের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র হইবে।

যথাকালে ট্রেডশোর নিমন্ত্রণ আসিল। আমাদের কাগজের অফিসে সিনেমা-সম্পাদক—সদ্য বিবাহ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গারোহণে রাজি হইলেন না। আর কেহই ভরসা করিল না। অগত্যা আমিই রাজি হইলাম। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখি—গিয়া দেখিলাম, স্বর্গ যায়গাটা বিশেষ খারাপ নয়, কলিকাতার অপেক্ষা তো নয়ই। আর রাজি হইয়াছিলাম বলিয়াই তো আজ সেই বিচিত্র চিত্রের কথা আপনাদের কাছে বলিতে পারিতেছি।

প্রেক্ষা-গৃহে সেদিন অধিক জন বা দেবসমাগম হয় নাই। মন বা জীবিত ভূলোকবাসী বলিতে আমি একা ছিলাম। আর অন্য অন্য লোকবাসী সাংবাদিক ও অন্যান্য গণ্যমান্য দেবদেবী ছিলেন। দাড়িওয়ালা কয়েকজন ঋষিও পিছনের সিটে বসিয়াছিলেন দেখিয়াছিলাম।

প্রেক্ষা-গৃহে চন্দ্র কিরণ দিতেছিলেন। চন্দ্র অস্তমিত হইলেন, ঘোর অমাবস্যার মাঝে বিদ্যুৎ জ্বলিল, ছবি ফুটিল। দেখিলাম হাণ্টিং শ্যুটে রাম বন্দুক লইয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে অনেক লোকজন, কিন্তু উহার মধ্যে লক্ষ্মণকে চিনিলাম না। রাম তাড়কাবধে আসিয়াছেন। বহু গোলযোগের মধ্যে তাড়কাবধ সমাধা হইল। লোকজন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। যে ব্রাহ্মণ রামকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মুখেও হাসি ফুটিল। একটা লোক জঙ্গল হইতে হিড় হিড় করিয়া তাড়কাকে টানিয়া বাহির করিল।



প্রেম-চক্র

দেখিলাম একটা কেঁদো বাঘ। সে নাকি উক্ত ব্রাহ্মণের একটি ছাগল মারিয়াছিল।

নিকটে জমিদারবাড়ী। জমিদার রাজা জনক রাম রামকে মহাসমাদরে নিজগৃহে স্থান দিলেন। সেখানে একটি লিক্‌লিকে রোগাপানা যুবক—গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী, চোখে চশমা—আধ আধ উদাস ভাব, দিনকয়েক পূর্ব্বে আশ্রয় নিয়াছে। সঙ্গে ছিল চিত্রাঙ্কিত জনক রাজার ভাগিনেয়। পরে শুনিলাম ঐ রোগাপানা ছোঁড়াই লক্ষ্মণকুমার; বন্ধু চিত্রাঙ্কিতের সঙ্গে তাহার মামাবাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে।

রামের সঙ্গে দেখা হইতেই রাম বলিয়া উঠিলেন—আরে, তুই এখানে ?

লক্ষ্মণ রীতিমত বিরক্ত হইল, বলিল—ভদ্রলোকের বাড়ী একটু ভদ্রভাবে কথাবার্তা কইতে শেখ। জানো এখানে সব শিক্ষিতা মহিলারা রয়েছেন। কি ভাববেন তাঁরা শুনলে! কেবল গোঁয়ার ভাব—বনে বনেই ঘুরে বেড়াও বন্দুক নিয়ে, বাণই তোমার মানায় ভালো। এটা ভদ্রসমাজ।

রাম এতটুকু হইয়া গেলেন। শিক্ষিত ভাই লক্ষ্মণ তাহার দাদাকে শিক্ষা দিয়া গেল।



ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল এবং পর মুহূর্ত্তে

জনক রাজার এক পালিতা কন্যা—নাম সীতা, যেমন নরম প্রকৃতি তেমনি লাজুক। সে এই কবি লক্ষ্মণকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণের ভালো লাগে ঊর্মিলাকে। যেন বিদ্যুল্লতা, চোখে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। এক মুখে দশটা কথা বলে। জমিদার-কন্যার এলিগ্যান্স আছে, লক্ষ্মণ তাহার মূল্য জানে, তাহার সাহিত্যিক বর্ণনা ওর কণ্ঠস্থ।

লক্ষ্মণকে ঊর্মিলা নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উহাকে করুণা করে, ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। পুরুষ হইবে সংযমে অটুট, দৃঢ়তায় হিমাচল—নতুবা তাহার চরণে আত্ম বিলাইয়া প্রণাম করিয়া, তাহাকে সারা মনপ্রাণে শ্রদ্ধা করিয়া ভালোবাসিয়া মন ভরিবে কেন? সেই দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্মণ রক্ষা করিয়া চলিতে জানে না।

বৃদ্ধ জনক রায় রামচন্দ্রকে তাহার উভয় কন্যা, চিত্রাঙ্কিত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যে রামচন্দ্রের ভাই তাহাও জানা গেল না। সিনারিও লেখকের কৃতিত্ব আছে দেখিলাম। এরূপ না হইলে কি আর আধুনিক ভাই।

রামচন্দ্র গম্ভীরপ্রকৃতি, বেশী কথা বলিতে ভালোবাসেন না। শিকারী মানুষ, স্মার্ট এবং ম্যানলি—যাহাকে বলে পুরুষোচিত—দেহে, কণ্ঠে, ব্যবহারে, সীতাকে তাহার ভালো লাগিল। তাহার লাজুক প্রকৃতিটা বেশ স্নিগ্ধকর এবং স্বল্প আলাপও ব্যবহার মনোরম মনে হইল। রামচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় গভীর হইলে জনক জানিতে পারিলেন দশরথ তাহার বাল্যবন্ধু। সুতরাং দাশরথীকে তিনি সহজে ছাড়িলেন না। রামচন্দ্র দিনকয়েক বিদেহ নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিদেহ নগরের জলহাওয়ার গুণেই হউক বা স্বভাববশেই হউক রামচন্দ্র একদিন দৃঢ়তা হারাইয়া সীতাকে মনোভাব জানাইতে গিয়া তিরস্কৃত হইলেন এবং অপর ঘটনায় বুঝিতে পারিলেন ঊর্মিলা তাহার পরুষ প্রকৃতিটাকে ভালোবাসিয়া বসিয়াছে। ঊর্মিলা ছন্ ছন্ করিয়া বেড়ায়। সারা পরিবেশটি সে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে এমনই তাহার চলা বলার ভঙ্গিমা। দেখিয়া প্রথম অবধি মনে হইতেছিল ইনি এবার আর কাব্যের উপেক্ষিতা থাকিতে রাজি নহেন। মনে মনে চিত্রনাট্যকারকে সাধুবাদ দিলাম—তাহার মৌলিক মত প্রবর্ত্তনের জন্য। বাল্মীকির একটা মারাত্মক ভুল শুধরাইয়া দিয়াছেন বটে! রামচন্দ্র জানিতে পারিয়া জনক রায়ের নিকট ঊর্মিলার পাণিপ্রার্থী হইলেন। জনকও রামের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—রাম একবার মাত্র স্টার্টার চাপিয়া মোটরবাইককে স্টার্ট দিতে পারেন, একা একটা বাঘ মারিতে পারেন, শুনা গেল রামচন্দ্র নাকি নিজে ভালো উড়িতেও পারেন (pilot), অতএব এ হেন শৌর্য্যশালী পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কে দ্বিধা করে। বিশেষ দশরথ তাঁহার বাল্যবন্ধু—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম।

এদিকে চিত্রাঙ্কিত সমস্ত ঘটনা চক্ষুর উপর পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। যে গোলটেবিলে রাম লক্ষ্মণ সীতা উর্ম্মিলা ও তিনি চা পান করিতে বসেন তাহা হইতে নিজেকে সরাইয়া নিলে উহা একটি প্রেমচক্রে পরিণত হয়—সে চক্রটি বিষম বেগে ঘুরিতেছে—আর তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সীতার দিকে, সীতা লক্ষ্মণের দিকে, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার দিকে আর উর্ম্মিলা রামচন্দ্রের দিকে ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া চিত্রাঙ্কিত চিত্রাঙ্কিতের মত নিস্পন্দ ও স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ গতির তো বিরাম নাই, শেষ নাই। কি জটিল তত্ত্ব! এমনভাবে জোট ধরিয়া জট পাকাইতে বাল্মীকির মাথার জটাও পরাস্ত হইয়াছে—আর বর্ত্তমান চিত্রনাট্যকার কিরূপ কৌশলে এমন পরিস্থিতির সৃজন করিয়াছেন। মৌলিকতা আছে বটে, না হলে আর এ যুগ!

মাসিমার কাছে রামচন্দ্রের পেটের খবর শুনিতে পাইয়া ভাগিনেয় চিত্রাঙ্কিত কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইল এবং কবি লক্ষ্মণকুমারকে একদিন শ্রান্ত রোষকণ্ঠে ডাকিয়া লইয়া সমগ্র অবস্থা সংবিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিল—উর্ম্মিলা একটা মানুষই নহে, সে বর্ব্বর, ইতর—প্রেমের মর্য্যাদা সে কি বুঝিবে! তবে হ্যাঁ, সীতা একটা মেয়ে বটে, যাকে বলে হ্যাঁ, একেবারে ইয়ে—তাই। স্ত্রীসুলভ লাজুকতায়, অন্তরের সৌন্দর্যে, প্রেমের গভীরতায় সে একেবারে খাঁটি স্বর্গের পারিজাত! (উপমাটায় মর্ত্ত্যলোকের গন্ধ থাকিয়া গিয়াছে—কারণ বোধ হয় চিত্রনাট্যকার সদ্য সদ্য মর্ত্তালোক হইতে আসিয়াছেন)। সীতা মনে প্রাণে লক্ষ্মণকেই ভালোবাসে—অথচ রাম চাহেন সীতাকে। সীতাকে যদি লক্ষ্মণ লুফিয়া নেয় তবে রামকে উচিত-সাজা দেওয়া হইবে। লক্ষ্মণ শেষের কথায় রাজি হইলেন। এমন না হইলে আর এ যুগের লক্ষ্মণ ভাই! চিত্রনাট্যকারকে দশবার সাধুবাদ দিলাম—অবশ্য মনে মনে—কারণ তখন লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার পর যাহা হইল তাহাতে মোটমাট বুঝা গেল, রামচন্দ্র ও উর্ম্মিলার এবং লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্বাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

অথ বিমানকাণ্ড। নব-রামায়ণে বোধ হয় এই একটি নূতন কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথবা অন্য কাণ্ড লণ্ডভণ্ড করিয়া এই কাণ্ড সংযোজনা করা হইয়াছে, সঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, দেখিলাম বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রামচন্দ্র উর্ম্মিলাকে লইয়া বিমান যানে সিংহলযাত্রার আয়োজন করিতেছেন। কিষ্কিন্ধ্যায় বানরের ব্যবসায় না কি করিবেন—সিংহলে হইবে তাহার হেড-অফিস। বিবাহ করিয়াছেন, এখন একটা কাজ-কারবার কিছু না করিলে চলে না—না এইরূপ একটা কি কথা লইয়া পিতার সঙ্গে বচসা হইয়া রামচন্দ্র শেষে বানরের ব্যবসায় করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কেবল বিমানঘাটির ছবি পর্দায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহার মধ্যে অন্ধকার অডিটরিয়ামে "হা সীতা—হা রাম—হায় রে আমার সাধের রামায়ণ" বলিয়া ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল এবং পরমুহূর্তে কি গুরুপতনের শব্দ হইল। চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিলেন। ছবি বন্ধ হইয়া গেল, দেখা গেল, শ্মশ্রুমহল অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া টপ্‌টপ্ ধারায় জল গড়াইতেছে। আর এক জন মূর্চ্ছা গিয়াছেন। বাল্মীকিকে রত্নাকর বা ঋষি কোনরূপেই দেখা ছিল না—শুনিলাম যিনি মূর্চ্ছা গিয়াছেন—তিনিই বাল্মীকি। পবন বাতাস করিলেন, বরুণ শৈত্য সম্পাদন করিলেন—তবুও পূর্ণ জ্ঞান হইল না—কেবল মাঝে মাঝে বিলাপ স্বর উঠিল—হায় রে আমার রামায়ণ!

রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, উত্তররামচরিত প্রভৃতির গ্রন্থকারেরাও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

শো বন্ধ হইয়া গেল। জানান হইল, মহর্ষি বাল্মীকির অসুস্থতানিবন্ধন আজ শো আর হইবে না। অপর দিবসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আর যাই নাই। সেই দিনই কর্ত্তৃপক্ষের কানে কানে বলিয়া আসিয়াছিলাম—যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই বুঝা গেল, সকল দিক দিয়াই ছবিটি প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হইবে। চিত্রনাট্যকারকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতে বলিয়া আসিলাম।

ফিরিবার পথে শরৎচন্দ্রের ওখানে একবার গিয়াছিলাম। দেখিয়া চিনিলেন, এটা ওটা নানাপ্রকার গল্প করিলেন। পরে কথায় কথায় "নব-রামায়ণ"-এর কথা উঠিল। সকল শুনিয়া শরৎচন্দ্র বাল্মীকির জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিলেন এবং শেষে আমাকে বলিলেন—আমার কমল, সাবিত্রী, কমললতাদের তো তোমাদের হাতেই রেখে এসেচি। দেখো যেন তাদের নিয়ে এমন কেলেঙ্কারী না ঘটে।

ভরসা দিতে পারিলাম না—যে পরিমাণে পথে ঘাটে ফিল্ম কোম্পানী গজাইতেছে! একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ঝুলন

রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

প্রবন্ধ

হিন্দুদের পূজাপার্বণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষিকার্যের সঙ্গে তাহাদের কিছু-না-কিছু যোগ আছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই আমাদের আমোদ-প্রমোদ পূজাপার্বণ কৃষিকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়। রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অকালবোধন করিতে হউক বা না হউক, আমাদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা শরতেই সম্পন্ন হয়। রাবণবধের প্রয়োজনীয়তা থাক বা না থাক, ঐ সময়ে কৃষিজীবিগণের প্রচুর অবসর। সেইজন্য উৎসবের দেশব্যাপী আয়োজন। দুর্গাপূজার নাম সেইজন্য দুর্গোৎসব। অন্য কোনও পূজার এরূপ আনন্দবহ নামকরণ হয় নাই। দুর্গোৎসবের পরে পরপর লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, কার্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, নবান্ন প্রভৃতি।

বৈষ্ণবরা তাঁহাদের উৎসবের পরিকল্পনায় আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিকে তাঁহারা ধর্মকর্মের সঙ্গে গাঁথিয়া লইয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ বৈষ্ণবরা ধর্মের প্রয়োজনে কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রকে জুতিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের দেবতা অখিলরসামৃত মূর্তি, ভজন যাঁহাদের রম্যা কাচিৎ উপাসনা, সাধ্য যাঁহাদের প্রেম— তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধ কিছু প্রবল থাকিবে, ইহাই ত আশা করা যায়। বৈষ্ণবদের তিনটি প্রধান উৎসব তিন চন্দ্রমা-শালিনী পূর্ণিমা রজনীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাবৃট্ পূর্ণিমায় ঝুলন, শারদীয়া পূর্ণিমায় রাস, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি। ভগবানের এই তিনটি লীলাই মনোমুগ্ধকর। প্রত্যেকটিতেই আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। সৌন্দর্য আনন্দের একটি অপরিহার্য উপাদান। সৌন্দর্যকে বাধা দিলে আনন্দের অনেকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভক্ত ভগবানকে দেখেন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয়, নয়নমনের অগোচর, তাহাতে ব্রহ্মবিদ পরমহংসগণ তৃপ্ত হউন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা হৃৎকর্ণ-রসায়ন, আপামর সাধারণ সকলের পক্ষেই মধুর। স্বভাবশোভাও সকলের উপভোগ্য, সকলেরই অধিগম্য। কাজেই এই স্বভাবশোভার মধ্যে ভগবানকে পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি ভগবদ্-ভক্তির উদ্দীপনা জোগাইতে না পারে, তবে আর কিসে পারিবে? আকাশে যখন রামধনু আঁকে, তখন মনে পড়ে সেই মোহনচূড়া। উপাস্য তখন নবমেঘের অন্তরালে রূপায়িত হইয়া উঠেন সেই ইন্দ্রধনুর অপরূপ রঙের বাহারে!

আকাশ চাহিতে কিবা
ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা।

—জ্ঞানদাস

যমুনার কালো জলে চাঁদের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। অমনি ভক্তের মনে পড়িয়া গেল, কৃষ্ণের কালো অঙ্গে সোনার অলঙ্কারের কথা।

অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ তর তর
কালিন্দী জলে যৈছে চান্দকি চলনা।

—নয়নানন্দ

নীল আকাশে মেঘ করিয়াছে, তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গোধূলি বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে বকের সারি সেই আকাশের বুকে মালা দুলাইয়াছে। (অম্বুম্বতোরণস্রজাং—কালিদাস) এমন সময় পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন। এ চিত্র কেমন লাগে? এই সৌন্দর্য স্মরণ করাইয়া দেয় না কি সেই ভগবানকেই, যাঁর নীলকান্তোপম অঙ্গে পীতবসন ঝলমল করিতেছে, যাঁহার সুপ্রসর বক্ষে মালতীর মালা দুলিতেছে, যাঁহার ললাটে চন্দনবিন্দু শোভা পাইতেছে?

উজোর হার উর পীত বসন ধর
ভাল হি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু॥

—ঘনশ্যাম দাস

কেহ কেহ বলেন, বাংলা কবিতায় স্বভাব শোভার বর্ণনা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা পড়িলে সে ধারণা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। ঝুলন লীলায় বর্ষার শোভা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্যানুভূতির যে কোনও ত্রুটি আছে এমন বোধ হয় না। বর্ষার বর্ণনা বর্ষাভিসারেও আছে, স্বপ্নদর্শনেও আছে।

বর্ষাভিসারে শ্রীমতী অভিসারে যাইতেছেন প্রকৃতির দারুণ বিপ্লবের মধ্যে :

দশদিশ দামিনী দহন বিথার
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত॥

—গোবিন্দদাস

সখীরা অনেক নিষেধ করিল। কিন্তু অভিসার ব্যাহত হইল না। শ্রীমতী বলিলেন :

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গগনে গরজে ঘন ঘোর।

—কবিশেখর

শ্রীমতী প্রাণবন্ধুকে স্বপ্নে দেখিলেন সে এক বর্ষার রজনীতে। স্বর্গে মর্ত্যে স্বপনের গুপ্ত আনাগোনা' বর্ষার নিবিড় নিশীথেই সবচেয়ে বেশী হয় বোধ হয়। মনে পড়ে, ইংরেজ কবি স্বপ্নের নিভৃত নিকেতন নির্মাণ করিয়াছেন বর্ষার বারিধারার মাঝখানে, নিঝুম রাত, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, দূরে কুকুর ডাকিতেছে একঘেয়ে রবে, প্রতিধ্বনি মিলাইতেছে দূর আকাশের কোলে।* এই ত স্বপ্নের বিলাসভূমি। শ্রীরাধিকাও স্বপ্ন দেখিতেছেন এক শ্রাবণ রজনীতে। গুরু গুরু মেঘ ডাকিতেছে, মন্দ মন্দ বৃষ্টিপাত হইতেছে, রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দূরে পর্বতের উপর ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে, ভেকের দল বর্ষার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

রজনী শাঙন ঘন　　　ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

*　　　*　　　*

শিখরে শিখণ্ড রোল　　　মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনিকি বাজে　　　ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে॥

—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিরা শাঙন ঘন বিভাবরীর মোহে মুগ্ধ। কি মিলনে, কি বিরহে কবিমাত্রেরই মনে পড়ে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ। যমুনার কূল, বনভূমি তমালচ্ছায়ায় শ্যামায়মান, রাত্রি সমাগত, মেঘে মেঘে গগন ছাইয়া গিয়াছে—কি চমৎকার পরিবেশ! রাধামাধবের নিভৃত কেলি-বিলাসের এমন সুন্দর উদ্দীপনময়ী প্রাকৃতিক অবস্থা আর হইতে পারে না। জয়দেবেরও বহুপূর্ব্বে কালিদাস নির্বাসিত যক্ষকে এমনই এক বাদল ঘন সন্ধ্যায় বিরহের অশ্রুতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘাড়ম্বর দেখিয়া বিরহী যক্ষ ব্যাকুল, বিচলিত, বিভ্রান্ত হইয়াছিল। এমন প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের বাদল দিনে প্রণয়িনী যাহার কণ্ঠলগ্না, সে ভাগ্যবানের হৃদয়ও কাতর হইয়া উঠে, সুদূর প্রোষিত কান্তের ত কথাই নাই! এই আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ-বর্ষার বর্ণনা দেখিয়া আমার মনে হয় কবিকুলতিলক বাংলা দেশের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশ নহিলে পয়লা আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মাধুরী আর কোথায়ও এমনভাবে অনুভব করা যাইত কি? যাহা হউক, কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে মিলন ও বিরহের উদ্দীপনা রূপে বর্ষাকে প্রেমের দেউলে চির-প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতিও এই বর্ষার ছবি এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে জগতে তাহার তুলনা মেলা কঠিন।

গগনে অব ঘন　　　মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন　　　শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥

বিরহ-বর্ণনায় এই বর্ষার সমাবেশ আরও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমতী আজ একাকিনী নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতেছেন। 'দোসর জন নাহি সঙ্গ।' এমন সময়ে বর্ষা নামিল। 'বরিষা পরবেশ পিয়া গেও দূর দেশ রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ।' প্রিয়সঙ্গ লালসা প্রবল হইল।

---

* Spenser : Faery Queene, Canto I.

সজনি আজু শমন-দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জিউ নিকসয়ে মোয়॥

প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রিয় যে কাছে নাই এমন বর্ষার নিশিতে, এ দুঃখের কি আর অবধি আছে?

সখি হে হামার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

এই 'শূন্য মন্দির' কথাটির মধ্যে যেন জগতের হাহাকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

ঝম্পি ঘনগর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥

চারিদিকে মেঘ ঝাঁপিয়াছে ও মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছে। ভুবন ভরিয়া বর্ষণ নামিয়াছে। আমার প্রাণকান্ত প্রবাসে রহিয়াছে আর দারুণ অনঙ্গ আমার প্রতি খরতর শর বর্ষণ করিতেছে। (ঐ বারিধারা আমাকে কন্দর্প শরে জর্জরিত করিতেছে।)

কুলিশ কত শত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

এমন সুন্দরবোধ আর কোনও দেশের কবিতায় নাই। এরূপ শব্দচিত্র কোনও ভাষায় কখনও অঙ্কিত হয় নাই। 'হরি বিনে' এই দীর্ঘ দিন-রজনী কেমন করিয়া অতিবাহিত করিব? বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আর এক দিন এমনই কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন:

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদলোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

হে হরি, তোমার অদর্শনে এই অধন্য দিনগুলি কিরূপে কাটাইব! হায় হায়! কিন্তু বিরহের এই দীর্ঘ দিনগুলি কেমন করিয়া যাপন করিব?

যাক্ আজ বিরহের কথা আর বলিব না। ঝুলনলীলার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা যে মিলনের সুর গাহিয়াছেন, তাহারই এক আধটি তান যদি ধরিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যমুনার কূলে, বটতরুর ডালে নবীন লতা দিয়া সুন্দর একটি হিন্দোলা খাটানো হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ বর্ষার কুসুম দিয়া মনোহর সজ্জা করা হইয়াছে। ভ্রমরকুল ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কুসুমপুঞ্জে পড়িতেছে, উড়িতেছে, গুন গুন করিতেছে। শুকপিকপাপিয়া সেই হিন্দোলা ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ও কলধ্বনি করিতেছে:

হিন্দোলা রচিত কুসুমপুঞ্জ
অলিকুল তাহে বিহরে গুঞ্জ
সারি শুক পিক বেঢ়ল কুঞ্জ
ঘেরি ঘেরি ঘেরি বোল রি।

আজ পূর্ণিমা রজনী—'চাঁদ উজোর রাতিয়া'। মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া সে স্নিগ্ধ জোছনাকে মৃদুতর, স্নিগ্ধতর করিয়া দিতেছে—'গগন হি মগন স-ঘন রজনীকর আনন্দে করত নেহারি।' শুধু যে মেঘের দল আকাশের নীল সরোবরে সাঁতার দিতেছে আর তাহার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিতেছেন, তাহা নহে। অল্প অল্প বৃষ্টিও হইতেছে:

বুন্দ সুন্দর নেনি নেনি।

এই 'নেনি নেনি' বৃষ্টির বালাই যাই! প্রাচীন সাহিত্যে কোথায়ও এই পিশ্ পিশ্ করা ইলশে গুঁড়ির বর্ণনা দেখিতে পাই না! কিন্তু ঝুলনলীলার পক্ষে এমনই এক বর্ষার রাত্রি চাই—ঝড়ঝঞ্ঝা দুর্যোগ চাই না।

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল
বুন্দ বুন্দ করি করু পাত।
কহ শিবরাম মলয়াচল দুহুঁ পর
মৃদু মৃদু করতহি বাত॥

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে মলয় সমীরণ বহিতেছে। ময়ূর কেকাধ্বনি করিতেছে, চকোর-চাতক-শুক-পিক মধুর গান করিতেছে, অলি-ঝঙ্কারে কানন ভরিয়াছে। নদীর কূলে

কূলে ব্যাঙ ডাকিতেছে, আর সেই ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশাইয়া গগনে গুরু গুরু দেয়া ডাকিতেছে।

বদত মোর চকোর চাতক
কীর কোইল অলিগণি।
রটত দরদা— তোয়ে দাদুরী
অম্বুদাম্বরে গরজনি॥ —শিবরাম

'পরম মুঘড় শিরোমণি' অখিল কলাগুরু কৃষ্ণচন্দ্র এমনই দিনে ঝুলনায় বসিয়াছেন। সখীগণ ব্রীড়াসঙ্কুচিতা রাধাকেও তুলিয়া দিলেন। তখন সেই লতার ডুরি ধরিয়া সখীরা দোলা দিতে লাগিলেন। ইহাই নওল-নওলী কৃষ্ণরাধিকার ঝুলন।

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি,
শ্যাম হৃদয়ে হৃদয় মেলি
রাধা রহু লাগি। —উদ্ধবদাস

শ্রীমতী ঝুলনার ঝোঁকে যত চমকাইতে লাগিলেন, নায়কশ্রেষ্ঠ তত তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন।

ঝুলনা-ঝমকে চমকে রাই
বিহসি মাধব ধরল তাই
আনন্দে অবশ পরশ পাই
চাপি করত কোলে রি। —কৃষ্ণদাস

কিছুক্ষণ পরে তিনি দোল্‌নার দুলুনীতে অভ্যস্ত হইলেন। কিন্তু সখীরা যখনই কৌতুকে 'অতিহুঁ বেগে' দোলা চালাইতেছেন, তখনই শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত হইয়া সখীগণকে অনুনয় করিতেছেন, "তোমরা একটু ধীরে-ধীরে ঝুলাও, পাছে আমার প্রাণবঁধু পড়িয়া যান।

ঝুলায়ত সখীগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥ —জগন্নাথদাস

বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার ছন্দে ঝুলন-গীতি রচনা করিয়া পরম উপভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু লীলার মাধুর্য সকলের প্রাণে সমান আনন্দ দান করে না। শ্রীরাধামাধব কোন এক অতীত যুগে বর্ষার ঘনায়মান সন্ধ্যায় ঝুলনায় ঝুলিয়াছিলেন, শুধু এইটুকুমাত্র স্মরণ করিয়া যাঁহারা ভাবলীলারসে অবগাহন করিতে পারেন না, তাঁহাদের সন্ধানী চিত্ত তত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়। তাঁহারা লীলার ফুলপাতা সরাইয়া ফলের অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের তৃপ্তি-বিধানের জন্য লীলার মধ্যে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যলীলা তিনটি। একটি রাসলীলা। ইহাতে তত্ত্ব হিসাবে আছে বিশ্বের অফুরন্ত আনন্দের উৎসব। রাস অর্থই প্রকৃষ্ট রস। রস এব রাসঃ! রাস অর্থে অখণ্ড আনন্দ। সেই ভূমা আনন্দের প্রতীক হইল রাসের নৃত্য। রাসের আর এক অর্থ অবশ্য চক্রাকারে নৃত্য। চক্রধারীর রাসমণ্ডলী বা রাসচক্র আনন্দের সীমাহীন পৌনঃপুনিকতা, অনন্ত বিস্তৃত পুলকোচ্ছ্বাস। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাঁহা কিছু আনন্দের সবই তাঁহারই বিকাশ। আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

তাঁহার আর একটি লীলা হোলি। হোলিলীলার তত্ত্ব তাহার বাহিরের লাল রঙেই ঘোষিত হইয়াছে। হোলি বা দোল ফাগের উৎসব। যাহার হৃদয় অনুরাগে অরুণ হয় না, ফাল্গুনের অধীর পুলক যাহার প্রাণে অনুরাগের ফাগ মাখাইয়া দেয় না, তাহার পক্ষে হোলি উৎসব ব্যর্থ। বিজয়া দশমী যেমন শাক্তদিগের পক্ষে এক পরম মৈত্রীর মিলন মহোৎসব, হোলিও তেমনই বৈষ্ণবদের এক সার্বজনীন মহা মিলনক্ষেত্র। প্রীতির পিচকারী যখন লাখে লাখে ছুটে, তখন গালাগালিও কটু না হইয়া উপভোগের সামগ্রী হয়। 'স্তুতি নিন্দা সকলই মধুর।'

ঝুলন লীলা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও অনাদিকাল হইতে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভগবানের আন্দোলন লীলা সমস্ত ছন্দ, সমস্ত গতি, সমস্ত জীবপ্রবাহের উত্থান-পতনের প্রতীক। বিশ্বে যে ছন্দ অনন্ত মাধুর্যে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আভাস ঝুলনে পাওয়া যায়। ছন্দ নহিলে বিশ্ব যে এক মুহূর্ত্ত চলে না! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে চলিতেছে, যদি সে ছন্দের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে, তবে দিনরাত্রির ক্রমভঙ্গ হইবে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের পথ রোধ করিয়া চুরমার হইবে। সমস্ত বিশ্বে সঙ্গীতের, কাব্যের প্রধান সম্পদ্‌, সুষমা, গৌরব তাহার বিচিত্র ছন্দ। সঙ্গীত, কাব্য না হইলেও মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত সবই যে ছন্দ। সে ছন্দচ্যুতি যখন ঘটে, তখন প্রাণ নিষ্কৃতি লাভ করে মরণে, গতি মূর্ছিত হয় পাষাণের চিরস্তব্ধ স্থাবরতায়। নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের কীট-পতঙ্গ অণুপরমাণু পর্যন্ত সবই ছন্দে সুরে সৌন্দর্যে বাঁধা। তাহারই সূত্রডুরি ধরিয়া আনন্দময়কে আমরা দোলাই ঝুলনে।

মা-হারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোন্ গ্রামে মা বেড়াও ঘুরে—কোন্ গ্রামে বা থাক ?
মা-হারা এই হতভাগায় চিন্‌তে পার নাক ?
দেখ্ দেখি মা ভাল ক'রে তাকিয়ে আমার পানে,
স্থির নয়নের দৃষ্টি জাগে তোমারি সন্ধানে ;
মানুষ বদল হলে পরেও মুখের আদল দেখে
মা চিনে নেয় আপন ছেলে সে নেয় মারে ডেকে।
তুমি যে মা—তোমার কাছে শক্ত গোপন করা,
মা যদি চায়—ছেলে যে তার আপনি দেবে ধরা !
মুখের দিকে চাইলে মায়ের জাগ্‌বে ব্যথা প্রাণে,
এড়িয়ে তারে মা জননী লুকাবি কোন্ খানে ?

কত আমায় ভুলাবি বল্—ধেনুচরা মাঠে—
এক্‌লা বেড়াই সারা দুপুর, সূর্য্য বসেন পাটে ;
রোদ্ পড়ে যায় তোর আঙিনায়, সন্ধ্যা আসে নেমে ;
এক্‌লা পথের হাঁটনী আমার হঠাৎ আসে থেমে ;
ম্লান গোধূলির ছায়ায় ভাসে মায়ের মুখের ছায়া
দুঃখ এত কিসের হ্যাঁ গো ?—এমনি মায়ের মায়া—
ভুলিয়ে রেখে আপন ছেলে কিসের অন্বেষণে
মা তুই এমন ব্যাকুল হয়ে বেড়াস বনে বনে ?

সকাল হতে নাহি হতে দেখি দুয়ার খুলে,
ঘুম থেকে না জাগিয়ে আমায় খেল্‌নাপাতি তুলে,
শিয়রে মোর জ্বালিয়ে রেখে মাটির প্রদীপখানি
হ্যাঁ মা তুমি কোথায় গেলে—কিছুই নাহি জানি !!
নদীর জলে বন্যা আসে ঘূর্ণিঘোলা জল
সেই জলে মা নাইতে এসে হলি কি নিতল ?
কূল ছাপিয়ে জল ওঠে মা, সেই সে কূলের কাছে
আলতা-রাঙা পা দুখানির চিহ্ন আজও আছে,
ওপার থেকে এপারে কে ডাক্‌লে নিশি ভোরে
ছেলের মায়া ত্যাগ করে মা আসতে হল তোরে,
নদীর ধারে খুঁজে বেড়াই দেখি কাশের বনে
আকুল হাওয়ার বৈরাগী সুর উঠ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে,
শঙ্খচিলের ডানার ভরে মন উড়ে যায় দূরে,
তোর দেখা বল্ মিলবে কোথায় ? কোন্ সে গোপনপুরে ?
সেথায় বুঝি বন্দিনী তুই ? শান্ত্রি চারিধারে
পাহারা দেয় সজাগ হয়ে পাষাণ কারাগারে।

বল্ না মাগো কোথায় আছিস্, কোন্ ঠিকানা তার
বন-কাপাসীর দখিনপাড়ায় ? চিত্রা নদীর ধার ?
কাশ কুসুমের কোমল হাসি শুভ্র দুধের ফেনা
কূলে কূলে উঠছে ফুলে যায় না ক' ঠিক চেনা—
মায়ের শুভ্র আঁচল না কি কাশ কুসুমের হাসি
সেইখানে কি লুকিয়ে আছিস, হায় গো সর্ব্বনাশী।
ঘাটের কূলে বটের মূলে নৌকা বাঁধা আছে
নেঙটা ছেলে হেলেদুলে চল্‌ছে মায়ের পাছে,
জলভরা তার কল্‌সী—থেকে চল্‌কে পড়ে জল
কিসের ব্যথায় মা জননীর নয়ন ছল্‌ছল ?
আন্‌মনে মা চলছে পথে মন চলে কোন্‌খানে
সেইখানে কি লুকিয়ে আছিস ? কিসের ব্যথা প্রাণে ?
মাঠের পরে মাঠ চলেছে গ্রামের পরে গ্রাম
নৌকা চলে বৈঠা চলে হেলায় অবিশ্রাম।
গলায়-দড়ের নীলকুঠি তার আধভাঙা সব বাড়ী
রইল বামে চণ্ডীতলা রুদ্রনগর ছাড়ি—
পশ্চিমে ওই যায় দেখা যায় আকাশ নামে দূরে
অস্ত রবি সোনার রঙে ছোপায় সুবলপুরে।
ডাইনে আমার সোনার গাঁয়ে বাঁধব কি মোর তরী
খুঁজলে যদি না পাই তোরে সেই ভয়ে মা মরি।
ভয় করে মা সন্ধ জাগে যদিই না পাই দেখা,
কেমন ক'রে আস্‌ব ফিরে বল্ মা একা একা।
আয় ফিরে আয় আপন ঘরে অভিমানী মা
ঘরের আঁধার সরিয়ে ঘুচাও মনের কালিমা।
দিন যামিনী থাকব এবার তোমার আঁচল ধরে
নয়ন ছাড়া করব না মা, ছাড়বি কেমন ক'রে ?
কোলে তোমার রাখব মাথা, চাইব মুখের পানে
আদর করিস সোহাগ করিস, ঘুমপাড়ানি গানে ;
ঘুম পাড়িয়ে দিস না যেন এবার জাগার পালা
নয়ন জলে ব্যথার পূজা—প্রাণের প্রদীপ জ্বালা।

মাধবের সংসার

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

মাধব গরীব হলেও সংসারটী তার বেশ শান্তিতে পূর্ণ ছিল, অভাব অভিযোগ হয়ত তাহার কিছু কিছু ছিল, কিন্তু মাধব আদৌ তাহা গ্রাহ্য করত না।

পাড়ার সকলের বাড়ীঘর যেমন হয় মাধবেরও তাই, বাঁশের খুঁটি, হোগলার বেড়া ও গোলপাতার ছাউনির দুইখানা ঘর। কিন্তু উঠান, ঘর ও বাড়ীর চারিদিক সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাধবের স্ত্রীর প্রখর দৃষ্টির জন্য কোথায়ও এতটুকু ময়লা জমবার উপায় ছিল না।

বাড়ীর নীচে খরস্রোতা কপোতাক্ষ নদী, জোয়ারের সময় কপোতাক্ষ পূর্ণ যৌবন ভরে ছোট-বড় ঢেউগুলি বুকে নিয়ে হেলে দুলে তাহার দুই কূলে আছড়ে পড়ে, আর ভাঁটায় তাহার সেই পূর্ণ যৌবনের কোন চিহ্ন থাকে না, সেই দুই কূল প্লাবিত জলরাশি কোথায় যায়, কে জানে? মনে হয় যেন কপোতাক্ষ একেবারে শুকিয়ে গেছে।

এই জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে মাধবের সংসার-যাত্রা। পরিপূর্ণ জোয়ারের শেষ দিকটায় মাধব তাহার সেই বৃহৎ বেড়াজাল নৌকার উপর রেখে গাছে বাঁধা শেকলটী খোলে আর চেঁচিয়ে ডাকে, "রাঙাবৌ, ও রাঙাবৌ, দেরি করিস না, জল থম্ থম্ করছে, এখুনি ভাঁটায় টান পড়বে।"

রাঙাবৌ তার একহাতে গামছায় বাঁধা ভাত-তরকারি ও অপর হাতে আগুনের মালসাটা নৌকায় রেখে বলে, "খোকাকে আদর করে এলে না?"

মাধব রাঙাবৌয়ের হাতে বৈঠাখানা দিয়ে বলে, "নৌকাটা ধ'রে থাক, যেন সরে না যায়।"

নৌকায় ফিরে এসে মাধব ব'লে, "জানিস রাঙাবৌ, খোকার রং তোর চাইতে ফরসা হবে, বেটা ভারি দুষ্টু হয়েছে, কেমন ক'রে হাসে মুখের দিক চেয়ে, ইচ্ছে হয় না ফেলে কাজে যাই, কষ্টে-ছিষ্টে সাতটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে তখন খোকা আমার সঙ্গে জালে যাবে।"

রাঙাবৌ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "বাঃ রে, জালে যাবে কি? পাঠশালে পড়বে না?"

মাধব সহর্ষে রাঙাবৌয়ের হাত থেকে বৈঠাখানা কেড়ে নিয়ে বলে, "আচ্ছা, ও আগে বাঁচুক, তার পর তোর ছেলেকে তুই পণ্ডিত করিস। এখন ঘরে যা, খোকা একলা আছে।"

রাঙাবৌ নৌকা থেকে নেমে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "ভাত-তরকারি কম ক'রে দিইছি, সব খেয়ো কিন্তু, জলে ফেলো না।"

মাধব ছোট্ট একটু 'আচ্ছা' বলে নৌকার পাড়ি ধ'রে, মাঝ নদীতে গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখে রাঙাবৌ তারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

মাধব চেঁচিয়ে বলে, "হাঁ ক'রে দেখছিস কি? দেখে তোর আশ মেটে না, না!"

রাঙাবৌ সলাজে ছুটে যায় বাড়ীর দিকে।

সংসার ছোট হলেও রাঙাবৌয়ের একটুও অবসর ছিল না, সে পরম উৎসাহে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল সকল রকম কাজের মধ্যে, তার না ছিল শ্রান্তি, না ছিল অবসাদ।

দুপুর বেলায় রান্নাঘরের কাজ শেষ ক'রে রাঙাবৌ নদীর ঘাট থেকে বাসন মেজে ও কাপড় কেচে ফিরবার সময় একবার ভাল ক'রে জলের দিক চেয়ে দেখে জোয়ারের টান ফিরবার আর দেরি কত। আপন মনে বলে, "ওঃ বেলা শেষ না হলে আজ দেখছি জোয়ার ফিরবে না।" রাঙা-বৌয়ের সুন্দর মুখখানা যেন বিষাদের ছায়ায় মলিন হয়ে ওঠে, তার স্বামী যে ভাঁটার সময়টায় মাছ ধ'রে ও জোয়ারের প্রথম দিকটায় ঘাটে এসে নৌকা লাগায়। আজ সে অনেক দেরি।

মোটা জালের তৈরি দোলনার ভিতর ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে রাঙা-বৌ ক্ষিপ্র হস্তে জাল বোনে, আর ভাবে তার ছোট বেলার কথা—কত ছোট বয়সে সে এ বাড়ীতে এসেছিল, তার শ্বশুর-শাশুড়ী কত স্নেহ যত্ন তাকে করতেন, বেশী বড় হতে না হতে তাঁরা একে একে এই সংসারের ভার তার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে গেলেন। সময় সময় তার বড় ইচ্ছা হয় যে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়ে কাটিয়ে দেয় কিন্তু তার স্বামীর যে তাকে না হলে একদিনও চলে না, তার স্বামী ত সংসারের কোন খবরই রাখে না। শৈশবের স্মৃতিগুলি একে একে তার মনের মাঝে যখন জমাট হয়ে ওঠে তখন সে নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে, সে ভুলে যায় যে, সে এমন বড় হয়ে একটা সংসারের ভার মাথায় নিয়ে চলেছে, সেই ত তার বাপ মায়ের প্রথম সন্তান, বড় আদরের। তারা দুই বোন ও এক ভাই, ভাই-বোনেরা হয়ত এখন যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ীর নীচে ছোট নদীতে ভাই-বোন ও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে কত খেলা তারা করত। সাঁতার দিয়ে কে কত বার এপার ওপার করতে পারে, এক ডুবে কে কতখানি যেতে পারে, এই নিয়ে তারা কত ঝগড়া ও মারামারিই না করেছে। দোলনায় শায়িত শিশুটী কেঁদে উঠতে রাঙাবৌয়ের চিন্তাসূত্র যায় ছিন্ন হয়ে, সে ব্যস্ত হয়ে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে স্তন্য দেয় ও আপন মনে বলে, "এইবার একদিন স্বামীপুত্র সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই বাবা মাকে দেখে আসব, কতই বা দূর, চার বাঁক জল পুরা বাইতে হয় না।"

শ্রাবণের শতধারা নেমে এসেছে ধরণীর বুকে, কপোতাক্ষ আজ সানন্দে আত্মহারা হয়ে দুই কূল প্লাবিত করে ছুটে চলেছে যেন কোন্ অজানার সন্ধানে, তার না আছে শ্রান্তি, না আছে বিরাম। কপোতাক্ষর দুই পার্শ্বস্থ জনপদ আজ জলে জলময়।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে মাধব কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত হয় নাই। সন্ধ্যার পর

মাধব তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নদীর এ পার থেকে ওপার পর্য্যন্ত টাঙান দড়ার বৃহৎ বেড়াজালের একটা পাশ বেঁধে অপর সমস্ত অংশটা নদীগর্ভে স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বৈঠা হাতে নৌকার গলুইয়ের উপর ধীর স্থির-ভাবে বসে থাকে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মাধবের অনাবৃত মস্তক ও দেহ সিক্ত ক'রে দেয়, কিন্তু সে একটুও গ্রাহ্য না ক'রে জালের দড়ি গাছাটি ধরে দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকে কখন তার জাল গুটিয়ে মাছগুলা নৌকায় তুলতে হবে। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে মাধবের যখন শীত ধরে তখন সে নৌকাখানা চড়ার সঙ্গে বেঁধে জালের দড়িগাছটী হাতে নিয়ে ছইয়ের ভিতর যায় আগুনের মালসায় হাত-পা ভাল ক'রে সেঁকে এক ছিলিম তামাক খেয়ে পুনরায় নিজের স্থান অধিকার করে। এইত তার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা।

সমস্ত রাত মাছ ধরার পর আজও মাধব গ্রামের বাজারে কেনা-বেচা শেষ ক'রে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বৈঠার সাহায্যে উজানের টানে নৌকা-খানা তীর বেগে ছুটিয়ে দিল বাড়ীর দিকে। মনে হয় তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে স্ত্রী-পুত্রের অদর্শনে।

ঘাটে নৌকা লাগাতেই মাধব ব্যস্ত হয়ে উঠল একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনে, তার অনুমান করতে দেরী হল না যে, কোলাহল চলেছে তারই বাড়ীর উঠানে। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বিন্দুমাত্র দেরি না ক'রে শেকলটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ছুটে চলল বাড়ীর দিকে।

উঠানে পৌঁছে মাধব চীৎকার করে বললে, "রাঙাবৌ, আমার খোকা কোথায় রে?"

মুখরিত জনতা মাধবের আগমনে মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

রাঙাবৌয়ের পরিহিত বস্ত্রখানি ছিন্ন ভিন্ন, মাথার চুল এল মেল, সজল চক্ষু রক্তবর্ণ, খোকাকে কোলে নিয়ে সে বসেছিল উঠানের এক পাশে, মাধবের ডাকে রাঙাবৌ ছুটে গিয়ে খোকাকে মাধবের কোলে ফেলে দিয়ে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

মাধব রাঙাবৌয়ের ঐ রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বললে, "ঢং করিস না রাঙাবৌ, কি হয়েছে সব খুলে বল্, তুই ঘর ছেড়ে উঠানে কেন?"

রাঙাবৌ বললে, "এরা আমায় ঘরে যেতে দিচ্ছে না, সেই শেষ রাত্রি থেকে দাওয়ায় বসে, এখন সকলের হুকুম আমাকে উঠানে থাকতে হবে।'

মাধব বিকট চীৎকার করে বললে, "হুকুমদার কে? একবার এগিয়ে আয়, মাথাটা ভেঙে ছাতু করে দি।"

মাধবের চীৎকারে জনতার মধ্যে থেকে পাড়ার মোড়ল হারু গড়াই মাধবের দিকে এগিয়ে এসে বললে, "হুকুম দিয়েছি আমি, শোন্ মাধা, বুড় হলেও তোর মত দুই-দশটা ছোঁড়ার চীৎকারে হারু মোড়ল ভয় পায় না। তুই আর ঐ বৌ নিয়ে ঘর করতে পারবি না, শান্ত হয়ে সব কথা শোন্, কাল রাত্রিতে তোর ঘরে পাঁচ-সাত জন লোক তোর বৌকে টানতে টানতে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তোর বৌয়ের চীৎকারে আমরা সব লাঠি ঠ্যাঙা নিয়ে হাজির হলাম, জানিস মাধা, একটা হাঁক দিতেই বাছাধনরা নৌকায় উঠে পাড়ি মারলে। আঁধার রাত, মুষলধারে বৃষ্টি, কাউকে চিনতে পারলাম না। তার পর শুনলাম, তোর টাকার থলেটা না কি নিয়ে গেছে। এখন তুইই বল্ না মাধা, ঐ বৌ নিয়ে তুই ঘর করবি কি ক'রে?"

মাধবের সমস্ত শরীর রাগে থর থর ক'রে কাঁপছিল, সে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "বৌয়ের অপরাধ কি হ'ল, হারু খুড়?"

হারু গড়াই মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, "জানিস্ মাধা, যত দিন বেঁচে আছি, সমাজে অনাচার ঢুকতে দেব না। তোর বৌয়ের কোন দোষ নাই, একথা আমি কেন, সবাই বলবে, খুব শক্ত বৌ, সাহস ক'রে ধস্তাধস্তি ও চীৎকার না করলে পাড়ার কেউ জানতে পারত না। কিন্তু জানিস মাধা, সমাজ সে বিচার করবে না, পরপুরুষ তোর বৌকে জোর করে ধরে ঘরের বার করেছিল, কাজেই ও বৌকে আর এখন ঘরে নেওয়া চলে না। কথায় বলে, হেঁসেলের হাঁড়ি আর ঘরের বৌ বাইরের লোক ছুঁলে নষ্ট হয়ে যায়, আর ব্যবহার করা চলে না।"

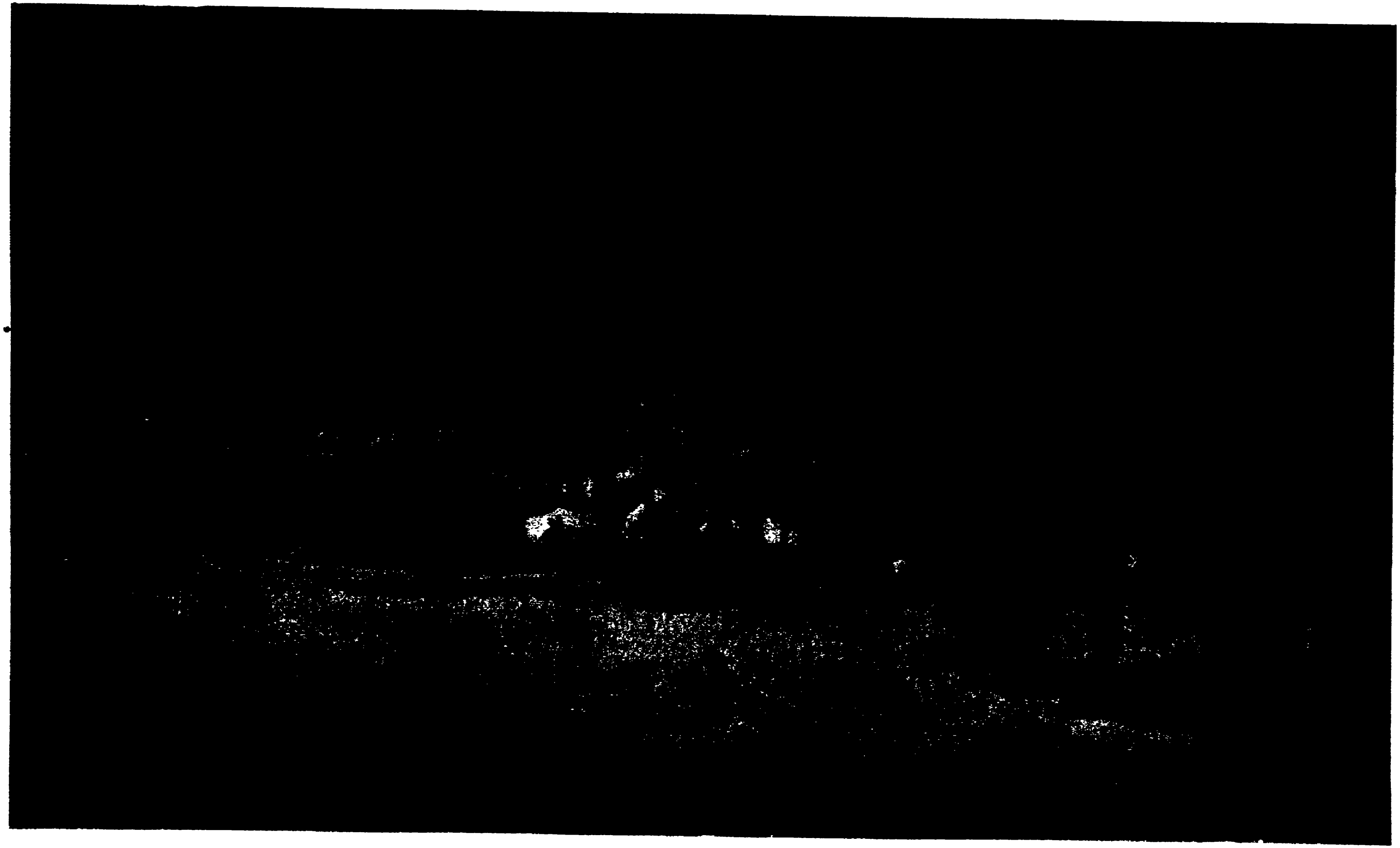
মাধব উত্তেজিত হয়ে বললে, "শোন হারু খুড়া, আমার বৌকে আমি খুব ভাল করেই জানি, নয় বছর বয়সে ও আমার ঘরে এসেছে, ও ইচ্ছা করে অপরের সঙ্গে ঘর থেকে বেরুবার মতলব করেনি, তুমি নিজে বলছ ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তোমার সমাজের বিচার মানি না, আমি আমার বৌকে ত্যাগ করতে পারব না।" একটু থেমে মাধব হুকুমের সুরে রাঙাবৌয়ের দিকে চেয়ে বললে, "ছেলেকে নিয়ে ঘরে চল্ রাঙাবৌ, বাজে লোকের কথায় ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, বোকা কোথাকার!"

হারু গড়াই কাঁধের গামছাখানা কোমরে বেঁধে নিয়ে আরও দুই পা এগিয়ে এসে দারুণ উত্তেজনার স্বরে বললে, "খবরদার মাধা, সমাজকে অমান্য করে বৌকে ঘরে নিলে তোর ভাল হবে না, তোর গুরু, পুরুত, ধোপা, নাপিত, এমন কি হুঁকা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেব। হ্যাঁ, আরও স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, এর জন্য তোকে গ্রাম ছাড়তে হবে। আমার যে কথা সেই কাজ।"

মাধব অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, "সে জানি খুড়, যারা জোর করে আমার বৌকে বেইজ্জতের চেষ্টায় ছিল, তাদের তুমি কিছু করতে পারবে না, তুমি যত কিছু অত্যাচার করবে আমার উপর, কিন্তু খুড়, যখন যা কিছু কর সাবধান হয়ে করো, মাধবের লাঠির জোর একটুকুও কমেনি, প্রাণের মায়া থাকে ত তোমার দলবল নিয়ে এখন সরে পড়।"

উত্তেজনার সঙ্গে মাধব বললে, "চল্ রাঙাবৌ, ছেলেকে নিয়ে ঘরে চল্।"

রাঙাবৌ ধীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সজল চোখে বললে, "না, আমি ঘরে যাব না, আমার জন্য ওরা তোমায় গ্রাম ছাড়া করবে, অত্যাচার করবে, তোমার অপমান আমি সইতে পারব না। খোকাকে দেখো। চোখের নিমিষে রাঙাবৌ মাধবের পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে ছুটল খরস্রোতা কপোতাক্ষীর দিকে, ক্ষিপ্র হস্তে মাধব তার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে তুলে ঘরে এনে শুইয়ে দিলে।

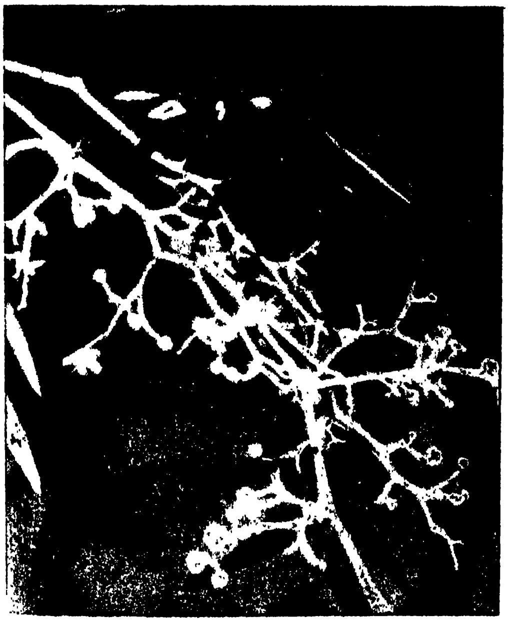


শি   শ্রীযুক্ত অ

বোলতা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

কৌতুক উপভোগ করবার লোভটুকু সংবরণ করতে না পেরে যারা কোনদিন বোলতার চাকে ঢিল ছুঁড়েছেন, তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানেন, বোলতা আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও আত্মরক্ষার্থ তাদের প্রকৃতিগত অস্ত্রের আক্রমণের প্রতিরোধ করা শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় ক্ষীণকায় দেহ, বোলতার হুলের বিষে স্থূলকায়ে পরিণত হ'য়ে



উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় শিকারী-বোলতা মধুপানে রত ;
এর এ অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হয়

ত্রাসবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। বোলতা সাধারণত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির—অকারণে কারও কোন অনিষ্ট করে না।

প্রত্যেক শ্রেণীর বোলতার মধ্যে কোন না কোন প্রভেদ আছে; বোলতার এরূপ শ্রেণীর সংখ্যা দশ সহস্র। সামাজিক জীবন অর্থাৎ একত্রে বহুসংখ্যক বোলতার বসবাস খুব কম শ্রেণীর বোলতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র আটশত শ্রেণীর বোলতা সামাজিকভাবে জীবন যাপন ক'রতে অভ্যস্ত। বেশীর ভাগ শ্রেণীর বোলতা নির্জ্জনবাস পছন্দ করে।

মস্তক, বক্ষ ও উদর নিয়ে বোলতার শরীর গঠিত। মস্তক ও বক্ষের সঙ্গমস্থলের নিকট বক্ষের উপর একজোড়া পা এবং বক্ষের নীচের দিকে খুব কাছাকাছি দু-জোড়া পা, মোট ছয়টি পা ; তার মধ্যে শেষের দুটি পা অন্যান্য পা অপেক্ষা বেশী লম্বা। প্রত্যেক পায়ের শেষের দিকে চিরুণীর দাঁতের মত ছোট ছোট কাঁটা বোলতার গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ সহায়তা ক'রে থাকে। মাথার দু-পাশে আছে তাদের একজোড়া উজ্জ্বল কাচের মত স্বচ্ছ চোখ—আর এই চোখের আকৃতি অদ্ভুতরকমে লম্বা। দুই চোখের ঠিক মাঝখান থেকে বার হ'য়েছে একজোড়া শুঁড়। বোলতার দু-জোড়া ডানা প্রজাপতির ডানা অপেক্ষা আকারে ছোট হ'লেও বেশ মজবুত। প্রজাপতি অপেক্ষা দ্রুত উড়ে যেতে পারে। ডানাগুলো সূক্ষ্ম শিরা দিয়ে তৈরী কাঠামোর ওপর আলোক-সঞ্চারী চামড়ার দ্বারা আবৃত। নীচের দিককার ডানাগুলো উপর দিকের ডানা অপেক্ষা ছোট এবং উপরের ডানার ঠিক নীচে ছোট ডানাগুলো দেহের সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন।

সামাজিকভাবে জীবনধারণ ক'রে এইরূপ বোলতার কথা বলতে গেলেই হলদে-রংয়ের একশ্রেণীর সামাজিক বোলতার কথা মনে পড়ে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও হলদে বোলতা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

শীতকালে রাণী-বোলতাকে নির্জ্জনে দেওয়ালের ফাটলে বা অন্য কোথাও ঘুমিয়ে কাটাতে দেখা যায়। বসন্তকালে রাণী-বোলতাগুলো শুক্নো গাছের ডালের উপর ব'সে তাদের দৃঢ় চোয়ালের সাহায্যে গাছের সূক্ষ্ম বাকল কুরে কুরে গুঁড়ো ক'রে সংগ্রহ করতে থাকে। তারপর মুখ থেকে এক রকম

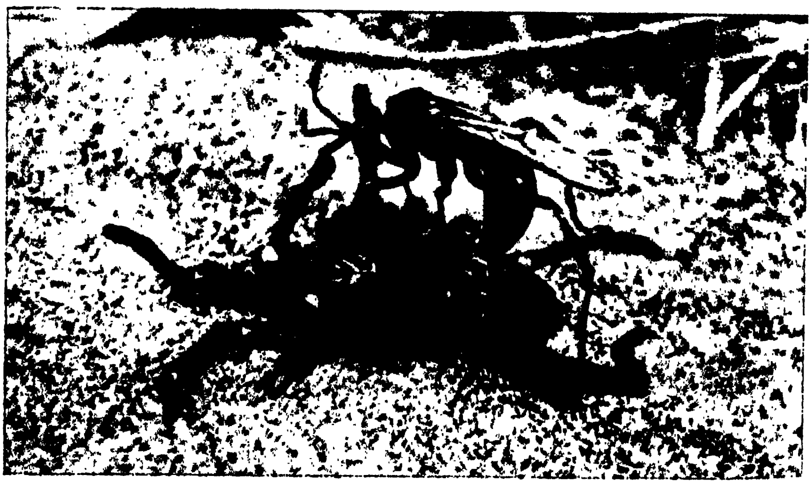
লালা বার ক'রে সেই কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা ছাই-রংয়ের কাগজের মত একরকম জিনিষ প্রস্তুত করে। এইটাই হয় বোলতাদের গৃহনির্ম্মাণের মূল উপাদান।

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণী-বোলতাগুলো গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে মন দেয়। গরমের সময় আমরা যখন অলস ভাবে দিবা-নিদ্রার সুযোগ খুঁজি সেই সময় দেখতে পাই কড়িকাঠের আশে পাশে হলদে বোলতা গৃহনির্ম্মাণের নিরাপদ স্থান খোঁজবার জন্য ব্যস্ত রয়েছে।

রাণী-বোলতাই গৃহনির্ম্মাণ ও সন্তান প্রতিপালন কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-বোলতারা নানা ভাবে রাণী-বোলতাকে সাহায্য করে থাকে। গৃহ-নির্ম্মাণের সময় আমরা দু' একটী বোলতাকেই এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। পুরুষ-বোলতাদের আমরা গ্রীষ্মকালে দেখতে পাই না। শীতের প্রকোপে তারা শীতকালে মারা যায়। সন্তানদের জন্মদান ছাড়া পুরুষ-বোলতাদের আর কোন কাজ থাকে না।



২ শিকারের পথে বোলতা ও মাকড়সার হঠাৎ সাক্ষাৎ। উভয়েই বেশ শক্তিশালী—একজনের বিষাক্ত হুল অপরের সুদৃঢ় চোয়াল, কিন্তু বোলতার কাছে মাকড়সা সহজেই পরাজয় স্বীকার করে



বোলতার এই অকস্মাৎ আবির্ভাবে মাকড়সা বিহ্বল হ'য়ে পড়ায় বোলতা চকিতের মধ্যে বিষাক্ত হুল সাহায্যে শিকারের সর্ব্বদেহে বিষ প্রবেশ করাচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে শিকার জড় অবস্থায় পরিণত হয়

প্রথমে রাণী-বোলতা কাঠের গুঁড়ো আর লালা মিশিয়ে একটা লম্বা সরু কাঠির মত ক'রে সেটা, নির্ব্বাচিত স্থানে লাগিয়ে দেয়। এইটাই তাদের হয় গৃহের ভিত। এই ভিত যাতে দৃঢ় হয় তার জন্য এরা বিশেষ যত্ন নেয়। এই জাতীয় বোলতার চাক দেখলে মনে হয় যেন একটা বাটীকে উপুড় ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাটীর উপুড়-করা অবস্থার মত সেই কাঠির নীচের দিক থেকে তারা ঘরের ছাদ তৈরী ক'রে নিয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে ষড়ভূজের মত দেখতে চারটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করে। প্রকোষ্ঠের প্রবেশ-পথ নীচের দিক থেকেই ক'রে থাকে।

মানুষের কাগজ তৈরীর কল্পনা করবার বহু যুগ পূর্ব্ব থেকেই বোলতা তাদের তৈরী কাগজ দিয়ে গৃহনির্ম্মাণ ক'রে আসছে। এমনি সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরী হ'লেও তাদের

গৃহ ঝড়-ঝাপটা থেকে কেমন ক'রে যে রক্ষা পায় তা ভাবলে আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকতে পারা যায় না।

মৌমাছি ও বোলতার চাকের মধ্যে বেশ প্রভেদ আছে। মৌমাছিরা চাক তৈরী করে মোমজাতীয় পদার্থের দ্বারা, আর বোলতারা চাক-নির্ম্মাণ করে পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজের মত জিনিষ দিয়ে। কয়েক প্রকারের বোলতা আবার মাটি দিয়েও গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে থাকে। মৌমাছিরা চাকের পাশ দিয়ে তাদের চাকে প্রবেশ করে, কিন্তু বোলতাদের প্রবেশ-পথ নীচের দিক থেকে।

গৃহনির্ম্মাণ শেষ হ'লে রাণী-বোলতা তাদের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফুলের পরাগ ও মধু রেখে ডিম প্রসব ক'রে গৃহের মুখগুলো পাতলা শাদা আবরণ দিয়ে বন্ধ ক'রে দেয়।

জড় অবস্থায় বোলতা-কীটগুলো দেখতে শাদা ফ্যাকাশে এবং প্রাণহীন ব'লেই মনে হয়। স্ত্রী জাতীয় বোলতা-কীটগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। কার্য্যক্ষম হ'লেই তারা মধু-সংগ্রহ সন্তান-প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের ভার লয়। সেই সময় রাণী-বোলতা কেবলমাত্র ডিম প্রসব করা ছাড়া অন্যান্য কাজ থেকে অবসর নেয়। গ্রীষ্মের শেষ দিকে স্ত্রী-বোলতাদের সাহায্যে ক্ষুদ্র চাক এক বৃহৎ পরিবার-ভুক্ত চাকে পরিণত হয়। পুরুষ-বোলতাগুলো স্বভাবত অলস প্রকৃতির ; তারা শীতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাক থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেয়। সাধারণত একটি চাকে একের বেশী ডিম প্রসবকারী রাণী-বোলতাকে দেখতে পাওয়া যায় না।



জড় অবস্থায় জীবিত মাকড়সাকে পরীক্ষা ক'রে পিছন হেঁটে বোলতা শিকারকে নিজ-গৃহে টেনে এনেছে



গৃহ-অভ্যন্তরে স্থিত মাকড়সার উপর বোলতা ডিম প্রসব ক'রে গৃহের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে।
এইভাবে মাকড়সার সমাধিলাভ হয়

বোলতাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী-বোলতাদেরই হুল

আছে। শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় তারা তাড়াতাড়ি অনেক ক্ষেত্রে হুল ফুটিয়ে দিয়ে আর হুল বার করবার সময় পায় না—শত্রুর দেহে হুল রেখে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কর্ম্মরত স্ত্রী-বোলতারা কার্য্যকালে একরকম শব্দ করে। গ্রীষ্মকালে জলাভাবের সময় এরা ডানার সাহায্যে যে-কোন জলাশয় হ'তে জল বহন ক'রে এনে চাকের ওপর জল ছিটিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক উষ্ণতা রক্ষা করে।

বোলতারা সাধারণত নিরামিষভোজী, কিন্তু এদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর বোলতাকে আমিষভোজী ব'লে শোনা যায়। নিরামিষভোজী বোলতা ফুলের মধু, ফলের রস পান



মাটি দিয়ে কলসীর আকারে তৈরী একশ্রেণী বোলতার গৃহ। চোয়াল দিয়ে বৃহৎ ছিদ্র ক'রে বোলতা-কীট বের হ'য়ে এসেছে। ছিদ্রের নীচে রাণী-বোলতা যে গৃহের প্রবেশপথ রুদ্ধ ক'রেছিল তা এখনও রুদ্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

ক'রে জীবনধারণ করে। অনেক সময় এদের রসগোল্লার গামলাতে ব'সে রস পান করতেও দেখা যায়।

ভীমরুল বা ভীম-বোলতা আর এক শ্রেণীর বোলতা। সব দেশেই এরা অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির ব'লে পরিচিত। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর বোলতা যথেষ্ট দেখা যায়। এরা সাধারণ বোলতা অপেক্ষা অনেক বড়। রং গাঢ় খয়ের রংয়ের মত—উদরের ওপর চওড়া হলদে ডোরা আছে। এদের গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী হলদে বোলতারই মত। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ভীম-বোলতার একযোগে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ কিরূপ ভয়াবহ তা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। তবে বিনা কারণে এরা কারো কোন অনিষ্ট করে না। এদের বিষের ক্রিয়া বড়ই ভীষণ। একসঙ্গে অনেকগুলি ভীম-বোলতা যদি কাউকেও হুল ফুটোয় তাহ'লে তার অবস্থা খুব সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত হয়েছে শোনা যায়।



মাটির লম্বা লম্বা নল দিয়ে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যস্ত আর একশ্রেণীর বোলতা

আমেরিকাতে দশ শ্রেণীর হিংস্র ভীমরুল বা ভীম-বোলতা দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বোলতাগুলো অধিকাংশই আমিষভোজী। কীটপতঙ্গের রস পান ক'রে তারা জীবন-ধারণ করে। এই বোলতাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর বোলতা আবার নিজেদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রতে পারে না। প্রতি-বাসী বোলতাদের চাকে গিয়ে বাস করাই তাদের স্বভাব।

কীট-শিকারী আর এক শ্রেণীর বোলতার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সব আর বোলতার মত চাক তৈরী করে না। মাটি দিয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাই



এই শ্রেণীর বোলতা কাগজ দিয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে বোলতা শাদা আকারে ডিম প্রসব করছে

এদের বিশেষ যত্ন। নির্ম্মাণ কার্য্যে অন্য বোলতাদের মতই এদের রাণী-বোলতারা শিল্পীর কাজ ক'রে থাকে। পলি মাটি দিয়ে এরা প্রথমে পাশাপাশি লম্বা দুই কুঠরী ঘর তৈরী করে। তারপর আড়াআড়িভাবে মাঝে দেওয়াল তুলে তাকে ছয় কুঠরী ঘরে পরিণত করে। ঘরের ছাদ মাটি দিয়ে তৈরী ক'রে নিয়ে তারা শিকার সন্ধানে বার হ'য়ে যায়।

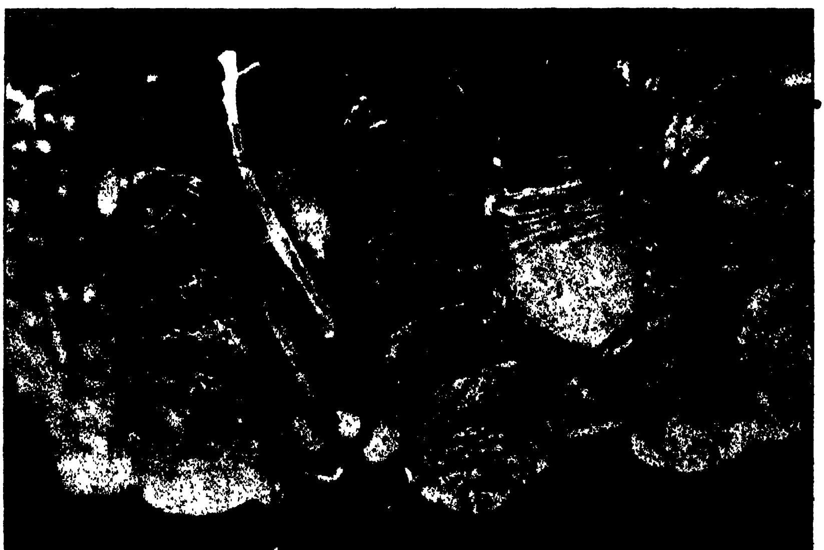
লম্বা লম্বা সবুজ পোকার শরীরে হুল ফুটিয়ে জ্ঞানশূন্য ক'রে তারা তাদের ঘরে নিয়ে আসে। শিকারকে গৃহে বহন ক'রে আনবার কৌশল এদের এতই চমৎকার যে, আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকা যায় না।

পোকাটিকে ঘরের ভেতর সাবধানে রাখা হ'লে তার ওপর রাণী-বোলতা শাদা ডিম পেড়ে ঘরের প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে অপর শিকারের খোঁজে চলে যায়। এইরূপে জীবিত পোকাগুলো অসহায় অবস্থায় চিরদিনের জন্য বোলতার গৃহে সমাধিলাভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত কুঠরীগুলো পোকা ও ডিম দ্বারা পূর্ণ না হচ্ছে, ততক্ষণ রাণী-বোলতার কাজের একটুও বিরাম থাকে না।

তিন দিন ডিমে তা দেবার পর,—ডিম থেকে নির্গত বোলতা-কীট সাত দিন সবুজ পোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। পরে এ কীট নিজের চারদিকে প্রচুর পরিমাণে রেশমের জাল বুনে শীতকাল অতিবাহিত করে। এই ভাবে তারা কীট-অবস্থা অতিক্রম ক'রে বসন্তকালে পূর্ণ বোলতার আকারে মাটীর ঘর থেকে বার হ'য়ে আসে।

এই শ্রেণীর বোলতা সন্তানদের জীবনধারণের জন্যই কেবল পতঙ্গ শিকার ক'রে থাকে। নতুবা এই জাতীয় পূর্ণবয়স্ক বোলতারা সকলেই নিরামিষভোজী।

আর এক শ্রেণীর কীট-শিকারী বোলতা দেখতে পাওয়া যায় তা'দের কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ ও দীর্ঘ। রাস্তা ভাল



জড় অবস্থায় বোলতা-কীট—চিত্রে সম্মুখের পা, চোখ, এবং অস্পষ্টভাবে ডানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে

থাকলে রাণী-বোলতারা মাটির ওপর পিছন-হেঁটে শিকার টেনে আনে। পরে শিকারের ওপর ডিম প্রসব



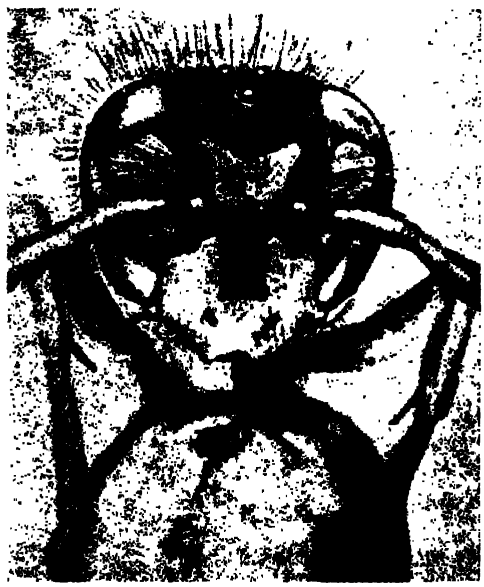
Sand Wasp নামে আর এক শ্রেণীর বোলতার দেহের আকৃতি

করা হ'লে ঘরের প্রবেশ-পথ বন্ধ ক'রে দেয়। রাস্তার ওপর শিকার টেনে আনবার চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে এরা এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকে। ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে তারা আগাগোড়া সমস্ত চিহ্ন সাবধানে মুছে দেয়। কারণ ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একরকম বোলতা নিতান্ত অলস প্রকৃতির ব'লে তারা গৃহনির্ম্মাণ করে না। নিজেদের ডানা জলে ভিজিয়ে এনে অপরের বাসা নরম ক'রে তার ভেতর প্রবেশ করে ও সংসার পেতে বসে। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কীট-শিকারী বোলতাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হয়। এমন কি, তারা শিকার অন্বেষণ করবার সময়ও বার বার নিজের বাসার খোঁজ নিয়ে যায়।

শিকারী-শ্রেণীর বোলতার মধ্যে মাকড়সা-হত্যাকারী বোলতার শিকার ধরবার কৌশল এবং সাহস বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বড় আকারের এক শ্রেণীর বিষাক্ত মাকড়সার সন্ধানে তারা ঘুরে' বেড়ায়। ঐ রকম মাকড়সার সাক্ষাৎ মিললে বোলতা আক্রমণের সুযোগের জন্ত অপেক্ষা করে।

উভয় পক্ষই শক্তিশালী—একজনের আক্রমণের অস্ত্র বিষাক্ত হুল,—অপরের সুদৃঢ় চোয়াল। উভয়ের সাক্ষাতে মনে হয় যেন উভয়েই নিজ নিজ শত্রুকে হত্যা করবার শক্তি রাখে—কিন্তু বৃহদাকার মাকড়সা বোলতার এই অকস্মাৎ দর্শনে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। বোলতা কিন্তু নিজেদের স্বভাবজাত কৌশল কখনও হারায় না। বিদ্যুৎ-গতিতে এরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' তার বিষাক্ত হুল বার বার ফুটিয়ে দেয়। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হতভাগ্য মাকড়সা এইভাবে বোলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। শিকারী-বোলতাদের সময় সময় মাথার ওপর ভর দিয়ে নরম কাদা মাটি থেকে, ছোট ছোট মাটীর তাল সংগ্রহ করতে দেখা যায়। গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হ'লে, এই ছোট মাটির তালগুলো ছাদের চারদিকে বেশ সুসজ্জিত-ভাবে বসিয়ে দেয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শিকারী-বোলতার মত আমাদের দেশেও "কুমরে" পোকা এক শ্রেণীর বোলতা দেখতে পাওয়া যায়।

দেহের গঠন, গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও শিকার ধরবার কৌশলও পূর্ব্ববর্ণিত শিকারী বোলতাদেরই অনুরূপ।



বোলতার মাথার সম্মুখভাগ—দু'জোড়া চোখ ও শুঁড় এবং কপালে ছোট ছোট তিনটি গোল গোল যা দেখা যায় তাকেও চোখ বলা হয়

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বাড়ীর কবাট, জানালার আশেপাশে' এদেরকে গৃহনির্ম্মাণ করতে দেখা যায়।

সেইজন্য এদের গৃহনির্ম্মাণ, কীট-শিকার এবং শিকার আনবার কৌশল আমাদের বেশ চোখে পড়ে।

আমেরিকার Pipe-organ-বোলতা মাটি দিয়ে গৃহ-নির্ম্মাণ করার জন্য বোলতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে পরিচিত। নিরাপদ স্থানে সাধারণত মাটির দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি স্থান মাটি মাখিয়ে তার ওপরে লম্বা লম্বা মাটির নল প্রস্তুত করে। তাদের নির্ম্মিত চাকগুলি বেশ বড় ও দর্শনযোগ্য হয়। মাটির নলগুলি কাগজের মত পাতলা হ'লেও ঝড় বৃষ্টি সহজে ক্ষতি করতে পারে না। এক একটি নলের ভেতর মাটির দেওয়াল তুলে খাদ্য সংযোগে ডিম প্রসব করে।

কলসআকারে গৃহনির্ম্মাণ করে—এরকম আর এক শ্রেণীর বোলতা পাওয়া যায়। Jug-maker নামে এরা পরিচিত। এদের বাসগৃহ সাধারণত গাছের ডালে দেখতে পাওয়া যায়।

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর বুদ্ধিবিকাশের কোন লক্ষণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাদের যা স্বভাব-জাত কৌশল তাই তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত ধন। নব নব জ্ঞান উন্মেষের প্রাচুর্য্য না থাকলেও আমরা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হই, আদিম যুগে মানব যখন লতাপাতার আচ্ছাদনে বাস করত সেই সময় এই নগণ্য পতঙ্গ কেমন নিপুণতার সঙ্গে তার বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমিই সুষমা, তুমি লাবণ্য, পরিপূর্ণতা তুমিই আনো।
তুমিই মোহিনী অমৃতদাত্রী 'রসঃ বৈ সঃ' এ মন্ত্র জানো।
খনির মাঝারে তুমি মণিরূপা, দুর্লভ কর ত্যক্ত ভূমি,
মৃগের নাভিতে তুমি কস্তুরী, শুক্তির বুকে মুক্তা তুমি।
মরুতে রেখেছ মরীচিকা তুমি, মেরুতে তুমিই অরোরা বুঝি
ছেনী ও তুলিতে ঝরণা রূপের, কালীর দাগেতে কালের পুঁজি।
পূর্ণচন্দ্রে তুমি কৌমুদী, সুরপুরে তুমি সুরেশ্বরী,—
তুমিই ঋদ্ধি, তুমিই সিদ্ধি, তোমারেই আমি প্রণাম করি।

২

কত কাচ তুমি কাঞ্চনে মোড়ো, বিশ্রীরে কর শ্রীমণ্ডিত,
তোমার কৃপায় নির্গুণ গুণী, পণ্ডিত হয় অপণ্ডিতও।
ইঙ্গিতে তব গর্ব্বে খর্ব্ব নূপুর পরিয়া পঙ্গু পায়ে
দানিশবন্দী মিনার উপরে তাণ্ডব নাচ নাচিতে চাহে।
লোভে বত্রিশ সিংহাসনের কত অভাজন উঠিছে ঘামি'
কত শিখণ্ডী গাণ্ডীব ধরি টঙ্কার দিতে অগ্রগামী।
হাউই চাহিছে ধূমকেতু হতে, কাণ্ড দেখিয়া বসিয়া ভাবি'
বিক্রমহীন বিক্রম করে নব-রত্নের বরণ দাবী।

৩

তুমিই অণিমা, তুমিই গরিমা, কল্পনা মহামনার সাথী,
ভুবনেশ্বরী গলায় পরেছ পদ্মবীজের মালিকা গাঁথি।
মরালে গমন, শিখীরে নৃত্য, বিদ্যুতে দিলে অবাধ গতি,
তুমি যেথা নাই সে দেশ সে ভূমি অভিশপ্ত ও অভাগা অতি।
শ্রীহর্ষের আর হর্ষ থাকে না, বিশালা যে হয় শূন্য পুরী
কমলে কামিনী হারা কালিদহে কাঁদে পথ চায় কমল কুঁড়ি।
স্বদেশে বিদেশে ঘরে'ও বাহিরে যেথা যাই তুমি সঙ্গে থেকো
ভক্তে তোমার করুণা করিয়া শ্রীহীন করো না, মিনতি রেখো।

নারিকেলের কথা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পূজার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, আবার পুরাতন কত কথা মনে পড়ে। বাল্যকাবস্থার আনন্দের কত উৎস ছিল, কত ধারায় তাহা বহিয়া চলিত, কত সাধারণ বস্তুকেও তাহার আনন্দস্পর্শ দিয়া পূত করিয়া লইত, তাহা আজ ভাবিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বয়স্কের বিচারে আজ যাহা সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা হইতেও নানা আনন্দলাভ করা যাইত। তখন সকল দিক দেখিবার, কার্য্যকারণতত্ত্ব সমস্ত বুঝিবার বয়স হয় নাই, সময়ও ছিল না, যাহাতে নিন্দাস্তুতি মিলিয়া আছে তাহার মধ্যে যাহাতে নিজের আনন্দলাভ হয় তাহা লইয়াই তখন ব্যস্ত ; সুতরাং এখন পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে বটে কিন্তু তাহার সহিত কোনওরূপ গ্লানি জড়িত নাই।

নারিকেল উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের নানা দিক দিয়া ক্রিয়াকলাপ ফুটিয়া উঠিত। দিনের গতির সহিত নারিকেলের সম্পর্ক ত ছিলই, তাহা ছাড়া ৺পূজা আসিয়া পড়িলে তাহাকে নানারূপে দেখিতে পাইতাম। বোধনের সময় বিল্ববৃক্ষমূলে সূতা দিয়া ঘিরিয়া ঘটস্থাপনা করা হইত, সেই সশীষ নধর ডাব সূতার বেড়ায় সুরক্ষিত থাকিত ; গুরুজনের নিষেধবাণী আর অমঙ্গলের ভয় মিলিয়া, সেই ডাবটী আমাদের উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইত, আবার জলকলস, সশীষ ডাব আর কদলীবৃক্ষ মঙ্গলসূচনা করিয়া পূজাবাড়ীর সম্মুখে স্থাপিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রতিমার নির্দ্দোষ ঘট, পঞ্চপল্লব, পুষ্পমাল্য, তরকারিমিলিত সশীষ ডাব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

দ্বারের ডাব লইয়া বিপদে পড়া যাইত। ভয় ছাড়িত না, ঐ ডাব খাইলে হয়ত অমঙ্গল হইবে। আরম্ভ করা যাইত কলাপাতা লইয়া। গাছ বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য পাড়ার আত্মনির্ব্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক জুটিয়া যাইত। তাহার ভিতর হইতে পাতা সংগ্রহ করিয়া বাঁশী তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা অতিশয় প্রবল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যাইত, কে কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি এড়াইয়া এই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে। জল্পনা কল্পনার মধ্যে প্রায়ই রজ্জু মুক্ত কোনও গাভী আসিয়া বিষম তাড়না ও প্রহারের মধ্যেও গাছের পাতা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত। আশঙ্কা প্রায়ই লোভের কাছে পরাজয় স্বীকার করিত এবং কোনও উৎসাহী বা সাহসী বালক পূজা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাবের সদ্ব্যবহার করিয়া ফেলিত।

পূজার বাড়ীতে নারিকেলের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। নারিকেলের নাড়ু, রস্করা, চিনিরপুলি, মনোহরা প্রভৃতি পূজার উপকরণ হইতে কাঙ্গালী বিদায়, এমন কি, লক্ষপতি ধনীর পাতে পড়িত ; পূজার মিষ্টান্নের মধ্যে প্রায়ই অন্য কোনও বস্তুর স্থান থাকিত না।

নারিকেল নাড়ু লইয়া সময় সময় মহাহাঙ্গামা ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ পূজা বাড়ীতে উহা সকল সময় সংগ্রহ করা কঠিন হইত। যাহা আমাদের মত লোকের জন্য, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকেও যাহারা সকল সময় পূজা বাড়ীর মাঠ সরগরম রাখে বা রবাহুত হইয়া আসিয়া কিছু ভোজের জন্য বিরক্ত করে, তাহাদের স্পেশাল নাড়ু জুটিত। সেই নাড়ু দুপুরে গালে পড়িলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে টিকিয়া যাইত। সত্য সত্যই এই নাড়ু লইয়া আমাদের দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। বিদ্রূপচ্ছলে একবার এক বন্ধুকে ছুঁড়িয়া মারা হইয়াছিল, তাহার কপালে লাগিয়া রক্তপাত হইবার উপক্রম হয়। স্বাদের কথা না বলিলেও চলে। তিক্ত কটু কষায় এবং সময় সময় অম্ল রসও পাওয়া যাইত, আজ বিচার করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তখন তাহা পাইয়াই কত আনন্দ হইয়াছে ; প্রত্যেকের ভাগে এক একটা পড়িলে তাহার আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না। রস্করা প্রায়ই ভাগ্যবানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, আমরা দেখিয়াছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল তেলের গন্ধ পাওয়া যাইত। কারণ পূজার হাঙ্গামা জুটিবার পূর্ব্বে কাজ সারিয়া রাখিবার আশায় কর্ত্রীরা রস্করাগুলি আগে তৈয়ারী করিয়া রাখেন। তৈয়ারি করিবার "পাক" যথারীতি না হইলে, নারিকেল তৈলের গন্ধ ভাসিয়া ওঠে।

এই গন্ধযুক্ত রস্করা পাওয়ায় অনেক আনন্দ ছিল, কারণ "শেষ পাতের" উহাই সন্দেশ। এক বার দেখিয়াছি জনৈক ব্রাহ্মণ ভোজনে বসিয়াছেন। সমস্ত ব্যঞ্জনাদি পূর্ণমাত্রা সেবনের পর যখন রস্করা পরিবেশন হইতেছিল তখন পরিবেষ্টা দুইটা করিয়া পাতে দিবার পর আর দিবে কি না বারে বারে প্রশ্ন করিতেছিল। ভোক্তা উত্তর দিবার কষ্ট গ্রহণ না করিয়া উচ্ছিষ্ট দুইটা রস্করা পরিবেষ্টার হাঁড়ির মধ্যে তুলিয়া দিলেন। সকলেই গোলমাল করিয়া উঠিলেন, গৃহকর্ত্তা তখন সেই পাত্র সমেত রস্করা তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া দিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে প্রায় তিন চার সের পরিমাণ গন্ধযুক্ত রস্করা সেবন করিয়া আসনত্যাগ করিলেন। এরূপ "খাইয়ে" তখন প্রায়ই দেখিতাম ; আর বয়োবৃদ্ধের নিকট শুনিতাম, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই সকল ভোজনবিলাসী শিশু মাত্র।

এই রস্করা আর নাড়ু পূজার নৈবেদ্যর প্রধান অঙ্গ। সকল নৈবেদ্য সন্দেশযুক্ত হইলে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। তাহা ছাড়া নারিকেলজাত মিষ্টান্ন শুচি বা "শুদ্ধ", সে কারণে এই নাড়ু রস্করার প্রচলন। পুরোহিত ঠাকুর এই নাড়ুর কি ব্যবস্থা করেন জানিবার আগ্রহ হইত। নিশ্চয়ই দান করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা না হইলে পূজার শেষে ঐ সকল বস্তু যে অখাদ্য হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি।

নারিকেল ছাপা পূজাবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় বস্তু হইলেও দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থের পরম বন্ধু। ৺বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন প্রভৃতি ব্যাপারে মিষ্টমুখ করিবার রীতি রামরাজার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জানি না

বিজয়ার আনন্দে বিজয়ী বানরচমূ কি খাইয়া সীতাদেবীর নিকট মিষ্টমুখ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহা যে ছাপা বা রস্করা নয়, তাহা আমার স্থির বিশ্বাস। সেই দিনই যদি ঐ দারুণ যুদ্ধের পর ছাপা রস্করা খাইতে হইত, তাহা হইলে তাহার পর বৎসর এই বাৎসরিক উৎসব আর পুনরভিনয় করিত না. একালের গৃহস্থ রক্ষা পাইত। পূজার ছাপা অপরিস্কৃত চিনির রূপান্তর, তাহাতে নারিকেলের ছিটাফোঁটা থাকে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন গৃহে বিজয়া উপলক্ষ্যে নানারকম মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু দরিদ্রের গৃহের এই ছাপা সম্বল। সকলের আবার ইহার এক একখানা পূর্ণ দিবার শক্তি থাকে না।

পূজাবাড়ীর চাকী আসিতে আসিতে নারিকেল পাতার প্রয়োজন হইয়া পড়িত। তাহারা কত শীঘ্র উহা হইতে চাটাই প্রস্তুত করিত, আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম। তাহার অনুকরণ করিয়া পাটী বুনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। অনভিজ্ঞ ও অপটু হাতে তাহা সমাধা করা সম্ভব হইত না ; অর্দ্ধসমাপ্ত ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজে যাইতে পাইলে আনন্দ পাইতাম।

নারিকেলের পাতা চাঁচিয়া কাঠি বাহির করা আমাদের এক কাজ ছিল। বগলের মধ্যে কতগুলি করিয়া পাতা লইয়া পাড়া হইতে পাড়ান্তরে যাইবার সময় যাত্রাদলের বীরের পৃষ্ঠে তূণে ভরা তীরের সহিত বগলের পাতার গুচ্ছকে তুলনা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। কাঠি সংগ্রহ হইলে যজ্ঞ ডুমুরের খোঁজ পড়িত ; ভীষ্মদেবের শরসজ্জার মত তাহাকে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া তাহা দ্বারা রথ এবং অন্যান্য নানাপ্রকারের যান তৈয়ারী করা হইত। ইহার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

আমরা তখন নারিকেল পাতার ডাঁটা বা বেগলো হইতে ধনু, ঢেঁকি, তলোয়ার, হাঁড়িকাঠ প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার অবস্থা পার হইয়াছি। বড়দের অনুকরণে যাত্রা করিয়া যুদ্ধ বাধিলে ঐ তলোয়ার যে আত্মরক্ষা, মানরক্ষা এবং মুখরক্ষা করিয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এ সকলে কত আনন্দ ছিল, আজ তাহা মনে করাও কঠিন।

ডাব, ডাবের শাঁস, ঝুনা, ঝুনার দুধ, শাঁস—সকল জিনিসের প্রতি লক্ষ্য ছিল। সঙ্গীদের নিকট বুঝিয়াছিলাম ডাব চুরি করিয়া খাইলে দোষ হয় না। ধরা পড়িলে খুব বেশী সাজা হইলে মালিকের ধমক খাওয়াই যথেষ্ট। ডাব চোরের মধ্যে নাকি এমন পাকা ব্যবস্থা আছে যে, ধরা পড়িয়া বকুনি খাইলে আবার চুরি করিতে হয় এবং গৃহস্থকে জব্দ করিতে হয়। মনে মনে ইহা মানি নাই, তথাপি ডাব চুরির সহায়তা করিয়াছি। সঙ্গীদের নিকট গল্প শুনিতাম, এক ডাব চোর গাছতলায় ধরা পড়িয়া বলিল, সে অপরাধ করে নাই। তখন এরূপ কথোপকথন হইল।

মালিক : তবে এখানে কেন এলি ?

চোর : ঘুরতে ঘুরতে।

মা : গাছে উঠলি কেন রে ?

চো : পথ ভুলে।

মা : ডাব পাড়লি কেন ?

চো : ঐটাই ত আহাম্মুকি। দিন, মশাই, দুটো ধমক দিয়ে ছেড়ে দিন।

এই নাকি খুব চরম বিচার। খুব "ভাল ছেলেকে" আমি ডাব চুরি করিতে দেখিয়াছি। অন্য উপায় না থাকাতে লোহার শিকের ছাতি ঠুকিয়া "মুখ করিয়া" ডাব খাইতেও দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহার অংশ কপালে মিলিয়াছে—তবে তিরস্কারের নয়।

ডাবের শাঁসের লোভ ত্যাগ করা বড় কঠিন। বড়রা জল খাইবে, শাঁসে ছোটদের দাবী ; ইহাই তাহাদের ধারণা। এক পিতা রোজই ডাব খাইয়া ভিতরে আঙুল প্রবিষ্ট করিয়া শাঁস উঠাইয়া পরে চুমুক দিয়া শাঁস খাইয়া লইতেন। তাঁহার একটী ছোট কন্যার ভাগ্যে মুখ ফোটানো ডাব কেবল বহন করিবার ভার ছিল। সে আর না পারিয়া বাড়ীর ভৃত্যকে একদিন বলিল, নারিকেলের "মুখ" যেন "শিশির মত" হয়। কারণটা জানিতে চাহিয়া ভৃত্য শুনিল যে, "তা হ'লে বাবা আঙুল দিয়ে শাঁস খেতে পারবেন না। তিনি চলে গেলে ডাবটা কেটে আমরা খাবো। এই শাঁসের লোভ শাশ্বত।

শহরের ছেলেরা জানেনা নারিকেলমালার কিরূপ খড়ম হইতে পারে। ফুটা মালার মধ্যে দড়ি দিয়া ঐ দড়ি হাতে করিয়া ধরা হয়। তাহার পর পায়ের বুড়া আঙুলের ফাঁকে ঐ দড়ি পরিয়া আমরা প্রতিযোগিতার দৌড় দিয়াছি। নূতন পরিবার পর পায়ের তলায় দারুণ বেদনা হইত, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় কোথায় ! হোঁচট লাগিয়া কত পড়িয়াছি, কিন্তু কে তাহার হিসাব রাখে !

পূজার বাড়ীতে নারিকেলের কাঠি বা ঝাঁটার ব্যবহার যে কত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কি ? পূজার বাড়ী অর্থাৎ মায়ের আগমনে তাহা শুচি হইয়াছে, তাহাকে অপরিষ্কার রাখা যায় না ; লোকের হাতে ঝাঁটা চলিতেছে। এই ঝাঁটার যে কত পরিচয় তা তখনও জানা যায় নাই। লোক মুখে শুনিয়াছি, সাহিত্যে পড়িয়াছি, এই সম্মার্জ্জনী নাকি অনেক দুর্দ্দান্তকে শাসনে রাখিয়াছে। সমর্থ হস্তে পড়িলে ইহার প্রতাপ দুর্দ্ধার। পরিষ্কার চাঁচা কাঠি খেলার ছলে পরস্পরকে মারিয়া দেখিয়াছি, পিঠ সরু করিয়া কাটিয়া যায় ; সুতরাং অস্ত্র যে খুব তীক্ষ্ণ তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু আজ এই সম্মার্জ্জনীর দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। ভুশণ্ডীর মাঠে শিবু যাহাকে মাত্র একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে সেই ডাকিনী ওরফে নেত্য একটা খেজুরের ডাল দিয়া রক ঝাঁট দিত। আজ-কাল "নেত্য"র রাজ্য শহর ও শহরতলীতে আর নারিকেল কাঠির কদর নাই, সেখানে খেজুরপাতার সখের ঝাঁটা হইয়াছে, বুরুশ আসিয়াছে, আর অকর্ম্মণ্য কতগুলা জঙ্গলী গাছের শীষ দিয়া ঝাঁটার কাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ভুশণ্ডীর মাঠে নারিকেল গাছ ছিল কি-না পরশুরাম জানান নাই। কিন্তু থাক্ আর নাই থাক্, নেত্য দূরদর্শিনী, তাই পূর্ব্ব হইতেই খেজুরের ডাল সম্বল করিয়া ঝাঁট দেওয়ার ফাঁকে নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াছিল। তখনকার মত হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেখিতেছি এখন সেই নেত্যর পদ্ধতি ঘরে ঘরে বিরাজমান।

নারিকেল খোলের হুঁকা লইয়া আমার এক মহা সমস্যা ছিল। কতগুলা দেখিতাম একটু যত্ন করিয়া বসাইয়া দিলে, তাহারা বেশ সোজা হইয়া থাকিত, আর কতগুলাকে ঘরের কোণে লইয়া গিয়া অনেক যত্নে ঠেসান দিয়া রাখিতে হইত। বরাবরের ধারণা, যাহারা ইচ্ছামত বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল ; কিন্তু অপরে তাহা স্বীকার করিত না। শ্মশানকালীর জিব বড়, না, রক্ষাকালীর জিব বড়—এই প্রশ্ন একদিন যেমন বালক ইন্দ্রনাথ আর শ্রীকান্তকে বিব্রত করিয়াছিল, ঐ দুই জাতীয় হুঁকার মধ্যে কোন্‌টী ভাল, তাহা আমাকে সর্ব্বদাই সন্দেহের মধ্যে রাখিত। নারিকেলের হুঁকায় নানারূপ আভরণ পরাইয়া খোলের মান বাড়িয়াছে ; মালিকের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছে। যাহারা নিজের দেহে বা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তৈল মাখাইবার সময় পান না, তাঁহারা হুঁকায় তেল মাখাইতে যে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম।

বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁহারা চুরি করিয়া তামাকু সেবন করিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নারিকেল ছোবড়ার সদ্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এক ঘরের মধ্যে খেলা হইতেছিল, তামাকু সেবনের জন্য যে সকল মালমশলার প্রয়োজন অর্থাৎ ভাঙ্গা কলিকা, তামাকু এবং দিয়াশলাই—সবই সঞ্চিত ছিল, কিন্তু তামাক ধরাইবার কয়লা ইত্যাদি ছিল না।

এক ছিলিম ধরাইবার যখন সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে, তখনও সকলে তাস খেলায় মত্ত, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, উহাদের মধ্যে একজন পাপোষের উপর গিয়া বসিয়া বসিয়া বিড়ালের মত মাটী অথবা বিকল্পে পাপোষ আঁচড়াইতেছে। বিড়ালে করিলে তাহার সদুদ্দেশ্য তখনই বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু মানুষে কি বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইল? কতক আচরণে ত পার্থক্য দেখিতেছি না, শেষ পর্য্যন্ত যে কি দাঁড়াইবে তাহা আমার সমস্যা ঠেকিল। আরও ভাবিলাম, শাস্ত্রীয় বচন "নরম মাটী না হইলে বিড়ালে আঁচড়ায় না" ; মানুষে বিড়ালে ঐখানে প্রভেদ বুঝিলাম। মানুষ বলিয়াই পাপোষের মত শক্ত বস্তু আঁচড়াইতেছে! কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যে কি, তখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। চক্ষে না দেখিলে আমি এই কঠোর পরিশ্রমের অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। অবশেষে দেখিলাম, কতগুলি নারিকেলের শোঁয়া উঠাইয়া "নুটী" পাকাইতেছে ; তখন বুঝিলাম শীঘ্রই কলিকা ধরানো হইবে। তাঁহাদের কথোপকথনে বুঝিলাম, পাপোষখানা পুরাতন হইলেও ছেঁড়া ছিল না, কিন্তু কয়দিন তামাকু সেবনের উৎসাহে পাপোষখানা প্রায়-নিঃশেষ হইয়াছে ; এখন খালি তলার দড়ির বোনা অংশটা বাকী। আশঙ্কা হইল, পূজার বাকী দিনটাতেই তাহার নিকটও চৌথ লইতে হইবে, বা তাহার এক-চতুর্থাংশ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। নারিকেল দড়ি যে ধূমপায়ীদের পরম বন্ধু, তাহা এখনও শহরে প্রতি বিড়ি-সিগারেটের দোকানে দেখা যায়।

সন্দেহমোচন হইল কেন ঐ ঘরেই খেলা বসে। Necessity is the mother of invention—এ কথার এমন জাজ্বল্য প্রমাণ আর দেখা যায় না। এখন ঐ পাপোষ বদলাইয়া না দিলে যে কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা লইয়া গম্ভীর তর্ক বিতর্ক আলোচনা চলিতে লাগিল, মীমাংসা যে কি হইল তাহা জানা নাই।

শুনিতে পাই নারিকেল গাছ না কি ভারতের কোন্‌ সমুদ্র উপকূলে প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল এবং উহা হইতে ঝরা নারিকেল সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশে গিয়া নূতন আবাস দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া ভারতবর্ষেই প্রথম জন্মলাভ করিল, তাহার উত্তর কেহ দিলেন না। শাস্ত্রীয় লোকেরা ইহার সদুত্তর দেন, বৈজ্ঞানিক লোকেরা আপত্তি করেন। শোনা যায়, বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতাদের সহিত টেক্কাটিক্কি করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চান এবং মানুষ তৈয়ারী করিবার প্রচেষ্টা তাঁহার প্রায় ফলবতী হইয়াছিল। মানুষের মাথা তৈয়ারী হইয়াছে, দেবতাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, তাঁহাদের চরেরা প্রতিমুহূর্ত্তে আসিয়া জানাইতেছে কতদূর অগ্রসর হইল, এবং দেবতাদের যোদ্ধৃসভায় সে বিষয়ে ঘন ঘন আলোচনা হইতেছে। যখন দেখা গেল, বিশ্বামিত্রকে রোধ করিবার আর শক্তি নাই এবং দেবতাদের এ বিশ্রামের পরিচয় বহুতর আছে, তখন তাঁহার দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনা হইল—"Their bugle sang truce" বিশ্বামিত্র খুশী হইলেন, কিন্তু তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অসম্মান হইতে পারে না, তাহাতে তিনি সেই বিবর্ত্তনমূলক নরমুণ্ডকে জগতের এক অতি প্রয়োজনীয় ফলে পরিণত করিয়া দেন। সে সময়ে বিশ্বামিত্র আর দেবতাদের লড়াইয়ের গল্প খুব মুখরোচক বা শ্রুতিসুখকর ছিল ; কারণ দেবতাদের মধ্যে অধিকাংশই যে শক্তিহীন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট গণনায় তাঁহারা তেত্রিশ কোটী ; অবশ্য এ আদমসুমারি যখন লওয়া হইয়াছিল, তাহার পর কত দশ-বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে এবং এখন কত শত কোটীতে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাহার হিসাব আর নাই :—কিন্তু এত দেবতা যে একা বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট হারিতেছেন, ইহাতে খুব আনন্দ পাইতাম। কয়েকটী দেবদেবী ছাড়া যে সকলেই শক্তিহীন বা হীনা তাহা বুঝিতে পারিতাম ; তাহা না হইলে আমাদের বিদ্যালয়ের এত কম ছুটি হইবে কেন? যে কয়জন বলশালী, এবং আমাদের সেক্রেটারী মহাশয় বা হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘাড় ভাঙিবার শক্তি রাখেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য বিদ্যালয়ের ছুটি দেওয়া হয়। যে সকল দেবতাকে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট পরাজিত হইবেন তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে। দেবতাদের এই অপমান আমাদের নিকট খুব উপভোগের বস্তু ছিল।

দেবতাদের কথায় আমার association of ideas ফুটিয়া উঠিল ; মনে পড়া উচিত ছিল ঝাঁটার কথার সঙ্গে, "নেত্য"র সঙ্গে। ভালই হইয়াছে ডাকিনী নেত্যর সঙ্গে কোনও দেবীর কথা মনে পড়ে নাই ; তাহাতে দেবী কুপিতা হইতে পারিতেন ; এখন আর সে ভয় নাই। যে দেবীর কথা মনে পড়িল তিনি সম্মার্জ্জনীসমন্বিতা, তাঁহাকে সকলেই নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় করে না, এমন জীব আমার জানা নাই। তিনি "সুরানাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদমুজনরানাং"

সকলেরই চক্ষে মহাত্রাসের বস্তু। তাঁহার দর্পে ধরা শঙ্কান্বিতা। দেবী অশ্ব বাহন ছাড়িয়া গর্দ্দভারূঢ়া, হস্তে কলস আর সম্মার্জ্জনী। পূজাবাড়ীতে কলস দেখিয়াছি, সম্মার্জ্জনী দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের অধিকারে। এখানে একাধারে সব। অশরীরীরূপে কোথাও আসিয়া আবির্ভূতা হইলে অঙ্গ শীতল হইয়া যায়। "মাতা"র রূপ যিনি ধ্যান করিয়া পাইয়াছিলেন, তিনি কত বড় ঋষি তাহা জানি না, কিন্তু তিনি খুব বড় (স্যানিটারী অফিসার); গরুড়, উচ্চৈঃশ্রবা, মূষিক, ষণ্ড, এমন কি, ঐরাবত প্রভৃতি বাহন দ্রুত চলে, যদি "মাতার অনুগ্রহ" হইতে রক্ষা পাইতে হয়, গর্দ্দভগতি ধরিতে হইবে। ধীরে ধীরে মায়ের এক অস্ত্র সম্মার্জ্জনী চালনা করিয়া ঝাঁট দিতে হইবে এবং অপর হস্তের কলসের জল দ্বারা সব ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। মায়ের এই শিক্ষা যাহাদের উপর কাজ করে তাহাদের মায়ের তূণের অস্ত্রগুলি হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে। মানবপৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনী পড়িলে আরও নানারূপ রোগ ছুটিয়া যাইবার গল্প প্রায়ই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেবীর শিক্ষা বিফল না হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কা দূর হয়।

যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, তাহার মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে নারিকেল আমাদের এক আতঙ্কের বস্তু ছিল। সকল পড়াই আপত্তিকর, কারণ অনেক কবিতার মধ্যে একটী মাত্র কবিতার সার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আর কিছুই নয়—"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে"—এত কষ্ট করিয়া, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া "দুঃখে মরিবার" উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রবৃত্তি কখনও ছিল না, সুতরাং যখন কবি মনোমোহন বসুর পদ্য আমাকে পড়িতে বাধ্য করা হইল তখন সুখী হইতে পারি নাই; এখন দেখি, সেই কয়টী সহজ পংক্তিতে এত মূল্যবান্ কথা আছে যাহা দিস্তা কয়েক কাগজ খরচ করিলেও সমস্ত প্রকাশ করা সম্ভব নহে:—

চমৎকার! বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল
দীর্ঘতরু-শিরে ফল, তার মাঝে জল!
সে জল সম্পূর্ণ ঢাকা দেখা নাহি যায়
রুদ্ধ রয় স্বভাবের বিচিত্র কৌটায়।
পাছে সুধা নীর নষ্ট হয় অকারণ;
তাই দিয়াছেন বিধি পুরু আবরণ।
আহা মরি স্বভাবের সেই গুপ্ত বারি;
বিধিমতে মানবের কত হিতকারী।
রবি-করে যবে করে উত্তপ্ত শরীর;
তপ্ত বায়ু বহে, তপ্ত জলাশয়ে নীর।
পথশ্রমে যবে ক্লান্ত, শ্রান্ত পান্থজন;
পিপাসায় শুষ্ক তালু, আকুল জীবন;
সে সময় পায় যদি নেয়াপাতি ডাব;
দাবানলে মুক্তিলাভ হয় যেন ভাব!
পানে যেন প্রাণে হয় সুধার সঞ্চার!
হেন সুখদাতা ফল কোথা পাব আর!

ইহা কেবল নেয়াপাতি ডাবের জলের জন্যই লিখিত। মানুষের বুদ্ধিতে ডাব, দুরমো, ঝুনো, ঝোবড়া, খোলা, শাঁস, তেল প্রভৃতি সকল বস্তুই কাজে লাগিয়াছে—অবশেষে বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছে "নারিকেল ছোবড়ার কয়লা বিষাক্ত গ্যাস হইতে রক্ষা পাইবার মুখোস তৈয়ারী করিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন।

—শিল্প ও সৃষ্টি—

শ্রীমতী কমলারাণী মিত্র

দুঃখ তোমার ললাটে আঁকিব
মহিমার নব জয়-টিকা,
হৃদয়-সুষমা নিঙাড়ি লিখিব
তব গৌরব-নাম-লিখা।
আনন্দঘন প্রীতি রসধারে
সিঞ্চিব তোমা নিতি বারে বারে,
চিত্ত-প্রদীপে শুভ সমারোহে
জ্বালিব তোমার দীপশিখা।

তোমার ভ্রূকুটি ভুরু-কটাক্ষে
যে রোষ-বহ্নি ওঠে জ্বলি',
যে-নিঠুর-পায়ে আশা ভরসার
শেষ-আশ্বাস যাও দলি'
শক্তি মাধুরী-বৈভবে,
মহিমার গুরু গৌরবে
উজ্জ্বলতম সার্থকরূপে
তব রূপ-জ্যোতি র'বে ফলি'॥

ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পিএচ-ডি

প্রবন্ধ

আমি প্যারিসে পৌঁচেছি। জেনেভায় আমার দিনগুলি কাটছিল ভাল। রেলফ্‌স্ পরিবারে বাস ক'রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আনন্দ বেশ উপভোগ করেছিলাম। দু-তিনটী বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই জেনেভায় বহু বন্ধু হয়েছিল। দেশাক পরিবারে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই মিলিত হয়েছিলাম। সমস্ত পরিবারটীর ভারতবর্ষের ওপর কি শ্রদ্ধা! কেন না, তাঁদের প্রিয় গুরুদেব (এনায়েত খাঁ) ভারতীয়। এ পরিবারে একটী শ্রদ্ধার ভাব আছে ভারতীয় আদর্শের ওপর। এ শ্রদ্ধা এতদূর যে এনায়েত খাঁর মৃত্যুর পর এরা তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করছেন, যেমন গুরু বা উপদেশকের স্মৃতিকে আমরা রক্ষা করি। দেশাক পরিবার শান্তির ও প্রীতির আবহাওয়ায় পূর্ণ। সমস্ত পরিবারেরই একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে। এরূপ প্রীতিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও এঁদের অন্তর-জীবনের গভীরতা—দেখলেই মনে হয় এটা এনায়েতেরই দান।

প্যারিসে আসা মাত্রই সুফী সম্প্রদায়ের সম্পাদিকা আমাকে একদিন তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করলেন—দেশাক তাঁকে পত্র দিয়েছিলেন। এঁর নাম মিস্ Good Enough. প্যারিস আসবার দুদিন পরে তিনি তাঁর পরিচারিকাকে পাঠিয়ে আমার সব সংবাদ নিলেন ও আহ্বান করলেন একদিন দশটা-এগারটার ভেতর যেতে। আমি স্বীকৃতি ও ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখলাম।

মিস্ Good Enough থাকেন প্যারিস থেকে অন্তত সাত মাইল দূরে। আমি ঠিক সময়েই ট্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। পরিচারিকাটী এসে আমাকে নিয়ে গেল; কিন্তু মিস্ Good Enough-এর সম্বন্ধে কিছুই বললে না। বাড়ীতে যখন প্রবেশ করলাম, তখন কাউকেই দেখতে পেলাম না। বাড়ীটী উদ্যান-সংলগ্ন। আমার খুব ভাল লাগল, একটা গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। তার ভেতর কেমন একটী শান্তি।

পরিচারিকাটী আমাকে একটী ঘরে নিয়ে গেল এবং দূর থেকে আমায় একটী ঘর দেখিয়ে বলল—মিস্ Good Enough ওই প্রকোষ্ঠেই আছেন। কড়া নাড়তেই দরজাটী খুলে গেল। মিস্ Good Enough তাঁর আসন থেকে উঠে করমর্দ্দন করে আমায় বসালেন। কোন কথা বললেন না। তিনি ছিলেন ধ্যানস্থ, আবার ধ্যান করতে বসলেন। আমিও নীরব হয়ে বসে রইলাম। আমিও ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন হলাম। পরস্পর কোন আলাপই হলো না। আলাপের ইচ্ছাও হলো না। এমনি আবহাওয়া—মিস্ Good Enough সৃষ্টি করেছিলেন যে, নীরবতার ভেতর দিয়ে একটী গভীর প্রশান্তি ও সুখ হৃদয় স্পর্শ করছিল। যেখানে বাক্ ও চিন্তা শান্ত, সেখানেই ভাব-বিনিময় হয় গভীরভাবে। মৌনতাই পরম তপস্যা। অপরূপ চিত্তস্বাচ্ছন্দ্য আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম।

এরূপ ভাবে আমরা বসেছিলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা। ধ্যান অবস্থাটী ভেঙ্গে যেতেই আমি উঠে পড়লাম। মিস্ Good Enough করমর্দ্দন করলেন কিন্তু কোন কথাই বললেন না। তখন কথা বলবার কোন ইচ্ছা কারও ছিল না। অথচ পরস্পর হৃদয়ের শ্রদ্ধা বিনিময় এতটুকুও কম হয়নি—বরং আরও আন্তরিকতার সঙ্গেই হয়েছিল। আমি বের হয়ে পড়লাম, মিস্ Good Enough তখনও বসেছিলেন তাঁর ঘরে। পরিচারিকা এসে আমাকে ট্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমি যখন ফিরছিলেম, তখন আমার মনে হয়েছিল, ইউরোপে একটা বড় সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। এরূপ অভিজ্ঞতা এদেশে আমার আর হয় নি। মিস্ Good Enough-কে আর একদিন Sorbonneএ দেখেছিলেন। তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর ভেতর কোন অসাধারণত্ব দেখতে পাই নি।

মরমীরা (mystics) যাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলেন, মিস্ Good Enough-এর ভেতর তার স্পষ্ট বিকাশ দেখতে পেয়েছিলাম। এ মার্গে ইউরোপের বহু লোক

বিচরণ করেন। অন্তত এ বিষয়টীকেও তাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমানে ইউরোপে চেতনার এরূপ অবস্থিতিতে অনেকেই আকৃষ্ট। যাঁরা মনে করেন ইউরোপে অধ্যাত্ম দৃষ্টির অভাব, তাঁরা ভুল করেন। বিশেষত যুদ্ধের পর ইউরোপে অধ্যাত্ম শক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে বহু লোক যত্ন করছে। এটা শুধু সাধারণ লোকের ভেতর আবদ্ধ নয়—বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিও এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়েই মানুষ ধাবিত হয় একটা অজানার দিকে, যেখানে সে আকাঙ্ক্ষা করে বিমল শান্তি ও জীবনের শুভ্র বিকাশ। জীবনের ঘোরতর দ্বন্দ্বে অদৃশ্য আলোর ছায়াপাত হয় অন্তরে, তাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্যারিসে এসে অধ্যাপক লেভীর সঙ্গে দেখা করলাম্ তাঁর বাড়ী গিয়ে। সানন্দে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। আমাকে Sorbornne নিয়ে এসে রেক্টর ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লেভী তাঁর ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউটে নিয়ে গেলেন এবং পুস্তকাগারটী দেখালেন। আমাকে Sorbornne-এ বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান করলেন। রেক্টর অধ্যাপক বার্গশঁ-র কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এক পত্র দিলেন।

Sorbornne খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। এখানে ভারতীয় ও এসিয়ার সব দেশের সংস্কৃতির চর্চ্চা হয়। অধ্যাপক লেভী ভারতীয় ও এসিয়ার সংস্কৃতির অধ্যাপক। অধ্যাপক লেভী প্রধানত ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাপনা করেন। মানুষটী বিনয়ে ভরা, সদা হাস্যময়, এত বড় পণ্ডিত, অথচ এত সরল।*

রেক্টর-এর পত্র নিয়ে আমি অধ্যাপক বার্গশঁ'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বার্গশঁ' বড় কারও সঙ্গে দেখা করেন না, শরীর অসুস্থ। বাতব্যাধিতে কাতর। রেক্টরের পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে উত্তর এল, বেলা তিনটের সময় তিনি আমার সঙ্গে সানন্দে দেখা করবেন। আমি তিনটেয় পুনরায় গেলাম। মিসেস্ বার্গশঁ' এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বার্গশঁ' তখনও অসুস্থ ছিলেন—উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করতে পারলেন না। আমি তাঁর পার্শ্বে বসলাম্। তাঁকে দেখে মনে হ'ল—লোকটী অত্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন। শান্তির চেয়ে তাঁর মুখে শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট।

অধ্যাপকের প্রকোষ্ঠে রাশি রাশি পুস্তক। সামনে দেওয়ালে একটা ছবি,—মেরীর কোলে যীশু। অধ্যাপক সেই ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে বললেন, "আমার দর্শনের মূল আমি ওখানে পেয়েছি। মাতা রূপ নিয়েছে পুত্রে (the mother is repeated in the son)"। গতি ও শক্তিবাদী। সৃষ্টি গতিপ্রবাহ, এর আদি-অন্ত নেই। জীবনধারার কোথাও শেষ নেই। সন্তান মাতারই পুনরাবৃত্তি। বার্গশঁ' মনে করেন, ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রধান কথা জীবনবাদ। যদিও ইউরোপে ক্রিশ্চিয়ানিটিকে প্ল্যাটোর ছায়ারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্ল্যাটোর অতীন্দ্রিয়ের রাজত্বের কথা উঠ্‌লে বললেন, "এরূপ অতীন্দ্রিয়-বোধ ও অতীন্দ্রিয় রাজ্য থাকলেও, তাও জীবনের গতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—জীবনের এক রমণীয় পরিচ্ছেদের প্রকাশ। জীবনের গতি কিন্তু তাকেও অতিক্রম ক'রে যায়।" বার্গশঁ' স্থিতিবাদকে একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। স্থিতিবাদ আমাদের বুদ্ধিরই সৃষ্টি, তত্ত্বে এর স্থান নেই—তত্ত্ব গতি। গতির আংশিক রূপ দেখে তাতেই লিপ্ত থাকার অভ্যাস থেকেই হয় স্থিতিবাদের উৎপত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক বললেন, "আমার দর্শনের ভিত্তি মিস্‌টিসিজ্‌ম্"। St. John on the Cross-নামক পুস্তক থেকে তিনি ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বুঝতে পেরেছেন। তাকেই অবলম্বন ক'রে তাঁর দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

St. John ছিলেন মরমী প্রেমিক। প্রেমই তাঁর মতে তত্ত্ববোধের ও তত্ত্বাস্বাদনের প্রধান উপায়। এই প্রেমেই দেয় অনন্ত জীবনধারার ও আনন্দের আস্বাদ। প্রেম জীবন, জীবনই প্রেম। জীবনের সুষমা প্রেমে। প্রেম ও জীবন অভিন্ন।

বার্গশঁ' এই জীবন ও প্রেমের অনুভূতির ওপর তাঁর দর্শন রচনা করেছেন। প্রাণতত্ত্বের সংবেদ থেকে তার রচনা আরম্ভ হয়েছে। আমি অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম "মরমী (mystics)-দের ভিতর একটী বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা কালের জ্ঞানকে অতিক্রম করতে চান।

* লেভীর মৃত্যুর পর অধ্যাপক ফুসে তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। লেভীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারিয়েছে।

মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌-এর এই আকর্ষণ। তাঁরা কালের সংবেগ ও সংকোচ অতিক্রম ক'রে পরমতত্ত্বকে অনুভব করেন। কাল নিত্য হ'লে তা কিরূপে সম্ভব? আপনার দৃষ্টিতে এরূপ অনুভূতি অসম্ভব—কারণ জীবন-প্রবাহের শেষ নেই। শেষটা জানাই তো আপনার পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অনাবশ্যকও বটে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি ইউরোপীয় মরমীদের ভিতর থেকে দু-একজনের নাম করুন যাঁরা এরূপ কালের অতীত সত্তায় অনুভূতিতে তৃপ্ত।"

আমি Meister Eckhart ও Ruysbroeck-এর নাম করলাম। অধ্যাপক বললেন, "হ্যাঁ, ওঁদের চিন্তার ধারা অন্যরূপ; কিন্তু যাকে ওঁরা কালের অতীত অবস্থা বলেন, সেটা একটা গতির ভিতর একটা স্থিতি (equilibrium), সেটা গতির অবস্থাবিশেষ, কিন্তু গতিহীন নয়। গতি অত্যন্ত বেশী হ'লে স্থিতি ভাবাপন্ন হয়—যেমন, ধ্যানে,—তখন ওরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও গতি আছে। প্রেমের ভিতর দিয়েও এরূপ অবস্থাবিশেষ লাভ হয় কিন্তু এরূপ অবস্থা স্থায়ী হয় না। এ জন্যেই মিস্‌টিক্‌স্‌দের ভিতর কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্র-অপসারিণী গতি দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানের গতিও গতি; কর্ম্মের গতিও শক্তি। ধ্যানের পর গতির বেগ হয় অত্যন্ত বেশী। মিস্‌টিক্‌স্‌রা যেমন ধ্যানী, তেমনি কর্ম্মীও বটে। এত শক্তি আর কারুর মধ্যে দেখতে পাইনে। এতেই মনে হয় চেতনার উচ্চস্তরে গতির অভাব হয় না। এ বিশ্বাস আমার এসেছে, বিশেষ ক'রে, ক্যাথলিকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাঁদের ভিতর কাজ করবার কি শক্তি! তাঁরা ধ্যানী বলেই এত বড় কর্ম্মী। ধ্যানে শক্তি সঞ্চয় করে।"

অধ্যাপক বার্গসঁ-এ কথাগুলি খুব উৎসাহের ও উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন। আমি ও মিসেস বার্গসঁ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। দেখলাম, তিনি মিস্‌টিক্‌স্‌দের অনুভূতিতে খুব বিশ্বাস করেন এবং তাঁদের ওপর খুব শ্রদ্ধান্বিত। বার্গসঁ'র মধ্যে একটা গভীর অনুভবশক্তি আছে। এই অনুভব-শক্তিই দিয়েছে তাঁর দর্শনের রূপ। তার দৃষ্টির বিশেষত্ব বিশ্বকেন্দ্রহীনতা (cosmic pointlessness)। মানুষের দৃষ্টি চিরকালই খুঁজেছে তার সত্তার কেন্দ্র। মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বকেন্দ্রে, বিশ্বাস্তিত্বের সঙ্গে এক হওয়া। কিন্তু বার্গসঁ'র মতে জীবন কেন্দ্রহীন—চলাই তার স্বভাব, কোন কেন্দ্র থেকেই তার উৎপত্তি নয়, কোন কেন্দ্রেই সে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এই কেন্দ্রহীনতার বোধ যখন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়, তখনই আমরা জীবনের স্বৈরগতিকে বুঝতে পারি। আমাদের বুদ্ধি ধর্ম্ম এই সচঞ্চল জীবন-প্রবাহকে বুঝতে না পেরেই বৈচিত্র্যকে বরণ করতে পারে না, সৃষ্টির নব নব রচনার মাধুর্য্য অনুভব করতে পারে না এবং তার অবিরাম উৎসের সঙ্গে পরিচিত হয় না। সৃজন-শক্তিতেই তিনি এত আকৃষ্ট যে, সৃষ্টির অপরূপ বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ নন্। শক্তির উচ্ছ্বাস বার্গসঁ'কে এত পূর্ণ করেছে যে, তাঁর দৃষ্টিতে শান্তি ও সমতা স্থান পায় নি। সৃষ্টির পিছনে আছে যে প্রাণের সমতা সে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। শক্তির ব্যক্তাবস্থার ওপর তাঁর দৃষ্টি, শক্তির অব্যক্ত অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। এরূপ অবস্থাকে তিনি স্বীকার করেন না। বিশ্ব-প্রাণের গতিছন্দে আপ্লুত যিনি, স্বভাবতই তিনি এ ছন্দ যেখানে লয় হচ্ছে, সেখানকার অনুসন্ধানে তৎপর নন।

বার্গসঁ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি শূন্যের উপাসনা করেন?" আমি বললাম, "হিন্দুরা আনন্দের উপাসনা করেন।' এই ব'লে তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দ শ্রুতিটার ইংরেজী তর্জ্জমা ক'রে শুনিয়ে দিলাম। তিনি আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন, "আমি পূর্ব্বে হিন্দুর উপাসনা সম্বন্ধে এরূপ শুনিনি। 'আমার বড় ভাল লাগল।" আমি বললাম, "সাধারণভাবে বলা হয়, বৌদ্ধেরা শূন্যের উপাসনা করেন; কিন্তু সে শূন্য সত্যি ক'রে void নয়—অতিমানস-তত্ত্ব—যা বুদ্ধিতে ধৃত হয় না। শূন্য বা পূর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতে পরতত্ত্বের জ্ঞাপক হতে পারে না, কারণ এ ধারণাও মানসিক ধারণা; অব্যক্ত অতিমানসতত্ত্বকে বোঝানর ভাষা নেই বলেই তাকে বলা হয় শূন্য বা পূর্ণ।" তিনি বললেন,"আমার হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আমার বন্ধুদের কাছে শুনে একটা ধারণা হয়েছে। তা বোধ হয় খুব ঠিক নয়।" আমি বললাম, "হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকে বলেছেন, তত্ত্ব-সংবেদ বুদ্ধির দ্বারা হয় না; বোধি (intuition) দিতে পারে পরিচয়।" অধ্যাপক সন্তুষ্ট হলেন, বললেন, "জানেন তো, আমারও সেই ধারণা।" আমি উত্তর

করলাম, "দার্শনিকেরা এত সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করেন যে, এখানেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। সকলেই অনুভূতির কথা একরকমই বললেন না। মনে হয়, মানুষের সত্তার নানা স্তর থেকে হয় অনুভূতির বিকাশ।" বার্গশঁ বললেন, "মানুষ বিশেষ ক'রে বুদ্ধিধর্ম্মী। বুদ্ধির স্বভাবই বিশ্লেষণ ক'রে দেখা। অনুভূতির স্তর থেকে নেমেই যখন মানুষ তাকে বুঝতে চায়, তখনই তার নানারূপ দেখতে পায়। ভাষাও বুদ্ধির অনুগমন করে—তাই অনুভূতিকে বোঝা এত কঠিন। অনুভূতির স্তরে দাঁড়িয়ে তাকে বুদ্ধির ভাষায় ত বোঝা যায় না বা প্রকাশ করা যায় না।" আমি বললাম, "মানুষের ভিতর বুদ্ধির স্থান এত বড় হয়ে আছে যে, আপনার জীবনবাদের কথা কইতে গিয়েও তাকেই করতে হয়েছে আশ্রয়। যত দিন না অভিব্যক্তি-ধারায় মানুষের অনুভব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট হবে, তত দিন মতভেদের অবকাশ থাকবে। মরমীদের ভিতরও যে ভেদের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তার কারণও সত্তার সকল পরিচ্ছেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা হয় নি।" অধ্যাপক সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আর বললেন, "মানুষের অনুভব-শক্তি বাড়িয়ে চলতে হবে। যত তার বৃদ্ধি হবে ততই মানুষ জীবনের রূপকে বুঝতে পারবে। মানুষ বুদ্ধির জগতে এত লিপ্ত যে কদাচিৎ কোন শুভমুহূর্ত্তে যদি এই বুদ্ধির অধিকার থেকে সে মুক্ত হয়, তখনই অনুভূতির স্পর্শ পেয়ে সেইদিকেই ধাবিত হবে। অধ্যাপক মনে করেন, এরূপ অনুভব-শক্তিকে বৃদ্ধি করবার জন্য আবশ্যক,—জীবনের স্বত স্ফূর্ত্তিকে অলিপ্ত হয়ে আস্বাদন করা। এই অভ্যাসের ফলে জীবনের স্বৈরগতির সঙ্গে একবার পরিচয় হ'লে তা আর কখনও নষ্ট হয় না। আমাদের বুদ্ধির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তা পুনরায় আপনা থেকেই কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। জীবনের সংবাদ, জীবনই দিয়ে দেয়। এরূপে জীবনের ভিতর অবিরাম চেষ্টা আছে বুদ্ধির বোধকে অতিক্রম ক'রে, তার স্বরূপকে জানিয়ে দেবার জন্যে।"

কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বললেন, "ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় শক্তিবাদের কথা পাওয়া যায় না। ক্রিশ্চিয়ানিটির স্পর্শে এসে ইদানীং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভিতর শক্তিবাদের কথা পরিস্ফুট হয়েছে।" আমি বললাম, "ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার বৈচিত্র্য আছে; একই মতবাদ সকলেই মেনে নেয় নি। এ-কথা বললে ঠিক হবে না যে, শক্তিবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন পরিচয় হয় নি। তন্ত্রাচার্য্যেরা শক্তিবাদ প্রচার করেছেন—যদিও অনুভূতির স্তরবিশেষে তাঁরাও আকৃষ্ট হয়েছেন স্থিতির দিকে কিন্তু স্থিতি সাধারণত ইন্টেলেক্টের জগৎ নয় বা সম্বন্ধাত্মক বিশ্ব নয়; ইহা পরমস্থিতি—যাকে স্থিতি বলাও ঠিক হবে না, কারণ এও মানসানুভূতি বা বুদ্ধির বাহিরের তত্ত্ব। ইহা তত্ত্ব। তন্ত্রাচার্য্যেরা এ দৃষ্টিকে ত্যাগ করেন নি, কিন্তু তাঁদের সাধন-প্রণালীর ভিতর শক্তিবাদ পরিস্ফুট। শক্তি ও গতির সত্তার সম্বন্ধে এত কথা বোধ হয় কোন দেশের চিন্তার মধ্যে স্থান পায় নি। কিন্তু সেগুলি অতীন্দ্রিয় বলেই, তা সাধারণ দার্শনিক চিন্তার ভেতর ধরা পড়ে নি। কিন্তু তার একটা বিজ্ঞান আছে, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়।"

"আপনি যে রামকৃষ্ণের কথা বললেন, তাঁর সাধনায় শক্তির স্থান ছিল অতি উচ্চে; ক্রিশ্চিয়ানিটি থেকে তিনি শক্তির সন্ধান পেয়েছেন একথা বললে তাঁকে ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর শক্তিদীক্ষা তন্ত্রমতেই হয়েছিল; তন্ত্রমার্গের সাধনায় তিনি পেয়েছিলেন পরম দীপ্তি। তন্ত্রের সাধনা এমনি যে তা জাগিয়ে তোলে আমাদের সত্তার পূর্ণ স্বরূপকে। তার ভিতর দিয়ে শক্তির গভীর জ্ঞান আমরা পাই। ইতিহাস বলে, রামকৃষ্ণ খৃষ্টধর্ম্মের মার্গেও সাধনা করেছিলেন। কিন্তু যদি আমরা বুঝি তিনি জীবনের বিকাশের পথ পেয়েছিলেন এখানে, তবে ভুল হবে। বস্তুত ভারতীয় শক্তি সাধনার পরিধি এত বড় যে, কোন লোক এতে অভ্যস্ত হলে তার আর কোন সাধনার বাকী থাকে না। সত্তার সকল স্তরে শক্তি সাধক ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারে।"

"রামকৃষ্ণকে অবলম্বন ক'রে যে মিশন প্রস্তুত হয়েছে, তা ক্রিশ্চিয়ানিটির আদর্শে রচিত হয়নি। ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সমষ্টিগত আদর্শ ভারতবর্ষের আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের ইতিহাস এর প্রধান স্মারক।"

অধ্যাপক বার্গশঁ ক্রিশ্চিয়ানিটিকে জীবনবাদের এত বড় আদর্শ করেন যে, তিনি ভাবেন যে, যেখানেই আছে ধর্ম্মের মধ্যে শক্তির ভাব, সেখানেই হয়তো আছে খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শের প্রেরণা।*

---

* "Two Essays on Religion and Morality" গ্রন্থে বার্গশঁ তাঁর এ মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক বার্গশঁর ন্যায় পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই মনে করেন, ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার ভিতর শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা নেই ব'লে ভারতবর্ষের জীবন-ধারা নবীন নবীন বিকাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। এ কথাটী প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় আজকাল আমাদেরও দেশে নবীনদের মুখে। বিস্ময়ের বিষয় এই, ভারতবর্ষে যখন মুক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষ শক্তিবিকাশের পরাকাষ্ঠা দেখেছে। যেমন বৌদ্ধযুগ, এবং শঙ্করের যুগ। যে শ্রদ্ধা, শান্তি, সংযম প্রতিষ্ঠা হ'লে মুক্তির পথে মানুষ ধাবিত হতে পারে তাতে মানুষের শক্তি যে পরিমাণ প্রতিষ্ঠা হয়, অন্য কিছুতেই তা হয় না। শক্তিকে তত্ত্ব বলে ধারণা করা হোক, আর নাই হোক—একথা অত্যন্ত সত্য যে, পূর্ণ শক্তিমান না হ'লে চেতনার বিশ্বাতীত রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। একথা প্রায়ই ভুলে যাই যে, শক্তির অতীত হতে না পারলে শক্তিকে অধিকৃত করা যায় না। শক্তির অতীত তত্ত্বে মানুষ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সে হয় শক্তিমান। এরূপ তত্ত্বে যখনই প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতে আচার্য্যদের, তখনই তাঁরা সমাজ, জাতির অভ্যুদয়ের পথ দেখিয়ে গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ-কাল যারা ভারতের শক্তিহীনতার কথা বলেন, তাঁদের ইউরোপের শক্তিবাদের পরিণতির দিকে তাকানো উচিত। শক্তির মূলে দাঁড়াতে পারলে শক্তিকে অধিকার ক'রে তবে শোভন পরিণাম সম্ভব। ভারতে শক্তিবাদের মূলে এই সত্যটী রয়েছে। শক্তি ত চাইই, কিন্তু তাকে শুদ্ধ ক'রে দিব্য ক'রে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কথা প্রায় শেষ হতে না হতে একজন মহিলা এলেন। আমি অধ্যাপকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। অধ্যাপক বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা কয়ে' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ভুল ভেঙ্গে গেল। আমি নমস্কার ক'রে ও ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস্ বার্গশঁ আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

মিসেস বার্গশঁ অত্যন্ত ভদ্র, ধীর ও শান্ত। আমাদের প্রায় দু-ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথনে তিনি কোন কথাই বলেন নি। আসবার সময় বললেন, "যদি আরও কিছু দিন থাকেন, আবার একদিন আসবেন। আমাকে পত্র লিখলে আমি অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো। আমি ধন্যবাদ জানালাম। নমস্কার ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। সামনে ছিল একটী উদ্যান—বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। আমি উদ্যানে প্রবেশ ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলাম। অধ্যাপক বার্গশঁর কথা স্বতই মনে হতে লাগল। তিনি একজন বড় আর্টিষ্ট, কথা বলার শক্তি তাঁর অদ্ভুত। শব্দবিন্যাস চমৎকার। তাঁর শক্তি ও সজীবতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি প্রাণশক্তির আধার। যদিও রুগ্ন, তবুও তাঁর জীবনীশক্তির বেগ বেশ অনুভব করা যায়। প্রত্যেক মানুষের দর্শন তাঁর স্বরূপ ও স্বভাবের আলেখ্য। বার্গশঁর মধ্যে এ সত্যটী মূর্ত্ত।

বর্ষণ-মুখর-রাতে

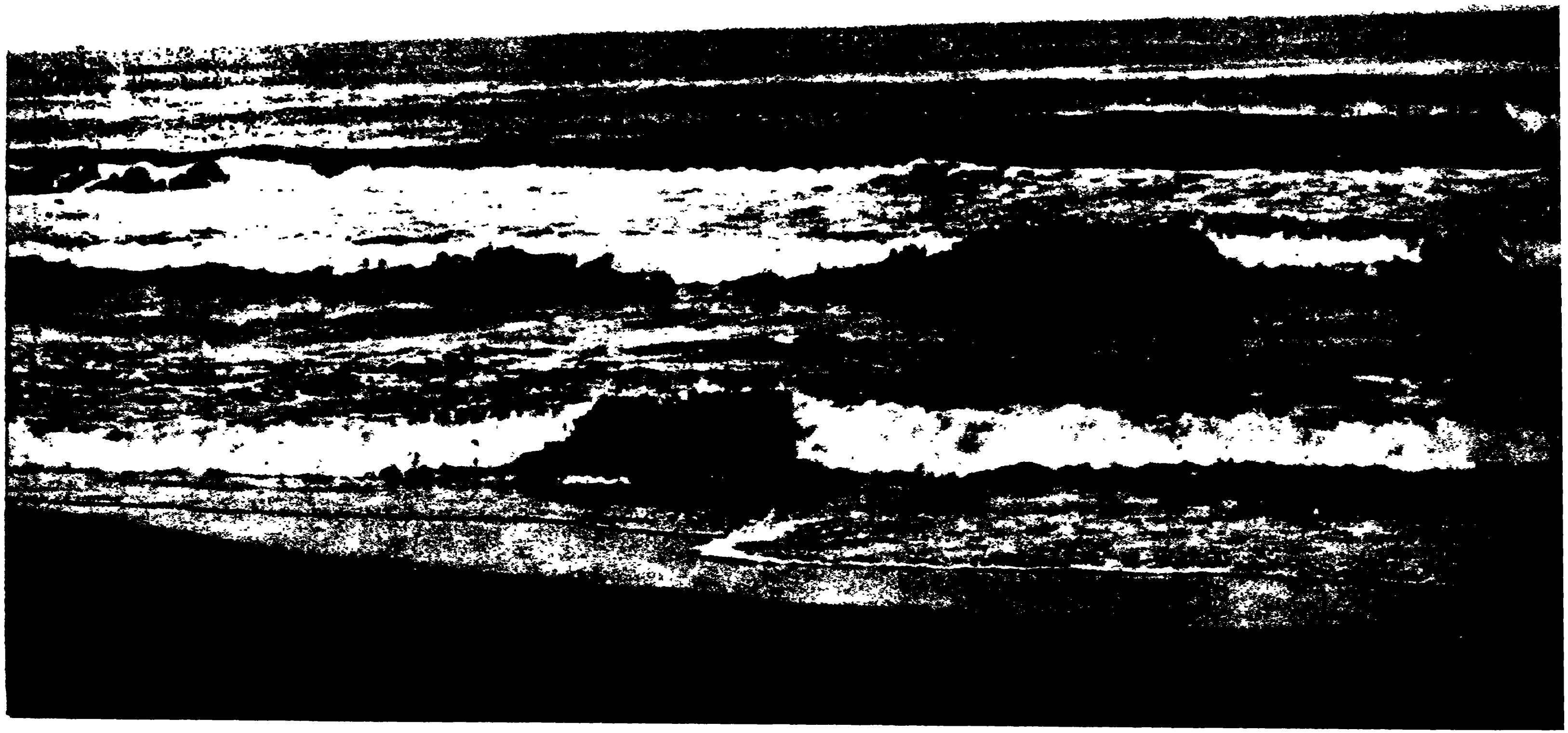
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাদলের বরিষণে তোমারে পড়েছে মনে গভীর নিশায়,
বিজলী চমকে ঘন কাজল মেঘের মাঝে নভো নীলিমায়।

ঝরোখার ধারে বসি চেয়ে আছি দূরপানে ব্যাকুল নয়নে,
হে মোর পথিক বধু! আঁধার কুটীর কাঁদে বিরহ লগনে।
দেহের দেউলে মোর নিবে গেছে স্মর-দীপ, ভেঙে গেছে হিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছে গেহে পরাণের পারাবত তোমারে স্মরিয়া।
রেখে গেছে উপায়ন—প্রেম-মাখা একাবলী মোর মনোপুরে
পথের ধূলারে প্রিয়া পাথেয় করিয়া একা চলে গেছ দূরে।

স্মরণ সুদূর পারে তোমার আঁচলখানি এ বাদল রাতে
হয় তো বেপথু এবে স্বপননদীর তটে সমীরণ সাথে!
হয় তো সে পথ দিয়া মেঘেরা উড়িয়া যায় তব পানে চাহি,
প্রাণের বিহগদল পরাগত হোলো প্রেম-স্রোতে অবগাহি।
বরষা ফুরায়ে যাবে, আমার নয়নধারা বহিবে নীরবে,
যতদিন স্মৃতি তব জীবনের পাদপীঠে কুসুমিত র'বে।





—"সাগর বেলায় ঢেউ করে কানাকানি"

শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা

সাময়িকী

ব্যবস্থাপরিষদের ইউরোপীয়ান দল—

বিখ্যাত ইংরেজলেখক Aldous Huxly তাঁহার 'Jesting Platc' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন 'But if I were a member of I. C. S. or if I held shares in a Calcutta jute mill (I wish I did) I should believe in all sincerity that British rule had been an unmixed blessing to India and that the Indians were quite incapable of governing themselves'. অর্থাৎ 'আমি যদি একজন আই-সি-এস অফিসার হইতাম অথবা কলিকাতার কোন চটকলে আমার অংশ থাকিত তবে আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতাম, ইংরেজ শাসনে ভারতের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় নাই এবং ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।' হাকৃসলীর এই মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইংরেজ বণিকগণ কেন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষপাতী। তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যকালে ইঁহাদের আনুগত্য ও ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধার বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহারা জানেন, কংগ্রেসীদল বা প্রজাদল কোন কারণেই কোটি কোটি দরিদ্রের দুর্ভাগ্য কায়েম করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, প্রগতিশীল মন্ত্রিমণ্ডলী ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী—তাঁহাদের স্বার্থ যতই অযৌক্তিক হউক এবং কৃষক ও দরিদ্রের পক্ষে যতই দুর্ভোগজনক হউক—তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিবার তাঁহাদের কারণ এই। আজ তাঁহারা গণতন্ত্রের নামে গাঢ় মসীলেপন করিয়া নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীকে কল্যাণকামী বলিয়া সমর্থন করিলেন ; কিন্তু যেদিন জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় স্বার্থে পুষ্ট সত্যকার দেশহিতৈষী মন্ত্রিমণ্ডলী দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবে সেদিন তাঁহারা কি করিবেন ?

হিন্দীবিরোধী আন্দোলন—

পণ্ডিত জহরলাল যখন সংশোধিত ফৌজদারী ও ইহার সমতুল্য আইনগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—যে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পূর্ব্ববর্ণিত আইনের সাহায্যে দেশ শাসন করিতে হয় তাহাদের টিকিয়া থাকার কোন অর্থ নাই, তখন কেহ কল্পনা করিতেও পারেন নাই যে, কংগ্রেস-পরিচালিত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শেষে অনুরূপ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত রাজাগোপাল যে শেষে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাহা আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। রাজাজীর আরও দু-একটি কার্য্যের জন্য কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট হইয়াছে। এই সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যাহার করা দূরে থাক, অযথা এই আইন প্রয়োগের ঘটা দেখিয়া দেশবাসী আশ্চর্য্যান্বিত।

দরিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান—

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা শুধু তাঁহার গবেষণা কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকেন না, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপকারের কথাও চিন্তা করিয়া থাকেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বহু জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি সম্প্রতি দেশে শিল্প-বিস্তার সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—"গত আদম সুমারী অনুসারে ভারতের শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ১১ জন শিল্পকার্য্য করে ও বাকী সকলে ব্যবসা উপলক্ষে সহরে থাকে। অবশিষ্ট ২৩ জনের কতক পল্লীশিল্প দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, বাকী অপরের গলগ্রহ। উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য আরম্ভ

হইলে শতকরা ৩০ জন সমস্ত জাতির জন্য প্রচুর খাদ্যশস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারিবে, সকলে সুলভে খাদ্যদ্রব্যাদি পাইবে; কিন্তু তাহাতেও দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর হইবে না। শতকরা ৬৬ জন কৃষকের মধ্যে ৩৬ জন বেকার হইবে; সুতরাং সেই সকল বেকার লোকের জন্য শিল্প চাই। উন্নত প্রণালীর জীবন-যাত্রা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সকলেই চাহে খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ, মনোরম ঘর বাড়ী, নিজের ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা, বেশী পরিশ্রম না করা, দুঃখের চিন্তা দূর, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। এই সমস্ত পাইতে হইলে কৃষিজাতের প্রাচুর্য্যবৃদ্ধি ও শিল্প-দ্রব্যাদির উৎপন্নের পরিমাণ ১০ হইতে ২০ গুণ বাড়াইতে হইবে। তাহার যথোচিত ব্যবস্থা চাই—তজ্জন্য যাহারা পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্য করে তাহাদের অধিকাংশকে সহরে আসিয়া শিল্প-কার্য্যাদিতে লাগাইয়া দিতে হইবে। বহু শিল্প-সহর খুলিয়া পল্লীগ্রামের বেকার লোকদিগকে ঐ সমস্ত সহরে আনিতে হইবে। তখনই পল্লীর উন্নতি হইবে। * * * বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা মানব বহু প্রকার উন্নত জীবন-যাত্রার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারে এবং জাগতিক অবস্থাকে অত্যধিক উজ্জ্বলও করিতে পারে—এই ধারণা লইয়াই বর্ত্তমান যুগে মানুষের কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত হয়। প্রগতির যে প্রেরণা বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক—বেশী দিনের কথা কি—একশত বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ছিল না। তখন ছিল গোঁড়ামি—তাহা ভবিষ্যতকে ভীষণ দুঃখময় করিয়া চিত্রিত করিত এবং পৃথিবী ধ্বংসমুখাগত বা মানব-সমাজ বিপ্লবে নিমজ্জমান হইবে বলিয়া ভীতি জন্মাইত। বর্ত্তমান যুগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের, ইংলণ্ডের বা জার্মানীর লোকেরা যে-ভাবে চলিতেছে তাহা দেখা এবং সেই সব দেশে কি ভাবে শিল্পাদি উৎপন্ন হয়, তাহা জানা আবশ্যক।"

বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা—

বিহারে বাঙ্গালীদের বাসের অসুবিধা দূর হওয়ার যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্পর্কে হাজারীবাগের বাঙ্গালী সমিতিতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—(১) ভারতীয় জাতীয়তার উন্নতি সাধন জন্য 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' প্রথা রহিত করা উচিত (২) সরকারী চাকরিতে সকল ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রার্থী-নির্ব্বাচন করা উচিত—কেবল শতকরা কয়েকটি পদ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্টভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে (৩) গুণানুসারে সকলকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা উচিত। স্কুল ও কলেজে যে সকল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, বাঙ্গালা ভাষা তন্মধ্যে একটি ভাষা হওয়া উচিত ও বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করা উচিত ও (৪) ব্যবসায় ও বাণিজ্যে জাতিধর্ম্ম হিসাবে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। যে প্রস্তাব চারিটি উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ করিলেই বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী-অধিবাসীদিগের অসুবিধা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হইবে।

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা—

কংগ্রেস যদি মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্যতালিকানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতেন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যাহাতে এই তালিকা-নুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন, সে জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। তালিকাটি এইরূপ—(১) প্রাচীন ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন, (২) জমিদারের সর্ব্ববিধ আবওয়াব, খরচা ও বেগার বন্ধ। খাজনা ব্যতীত অন্য দাবী অবৈধ বলিয়া ঘোষণা, (৩) খাজনা ও কর বিশেষ-ভাবে হ্রাস, (৪) কৃষির আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য—অবশ্য নিম্নতম কর স্থির করা হইবে, (৫) ভূমিকর বাঁধিয়া দেওয়া, (৬) গ্রামবাসীদিগের ঋণভার এবং বাকী খাজনা ও বাকী রাজস্বের ভার লাঘব, (৭) সর্ব্ববিধ পীড়নমূলক আইনলোপ, (৮) রাজনৈতিক বন্দী ও আটকবন্দীদিগকে মুক্তিদান, (৯) আইনঅমান্য আন্দোলনের সময় সরকারে বাজেয়াপ্ত এবং সরকার কর্ত্তৃক বিক্রীত জমি ও সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, (১০) শ্রমজীবীদিগের জন্য বেতন হ্রাস না করিয়া দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা; তাহাদিগের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত বেতনদানের ব্যবস্থা, (১১) মাদক দ্রব্য-বর্জ্জন, (১২) বেকারদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা, (১৩)

সরকারের শাসন ব্যয় এবং কর্ম্মচারীদিগের উচ্চ বেতন ও ভাতা হ্রাস, (১৪) শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা প্রদানের দ্বারা শিক্ষা বিষয়ে আর্থিক অবস্থায় এবং অন্যান্য বিষয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত সম্প্রদায়ের পর্য্যায়ভুক্ত করা, (১৫) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সরকারী চাকরীতে লোক নিয়োগ; তপশীলভুক্ত ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, (১৬) উচ্ছেদ করিবার পরিবর্ত্তে অন্য পন্থায় বাকী খাজনা আদায়—(সিভিল ঋণ আদায়ের ন্যায়), (১৭) কৃষকদিগের উপর কর ধার্য্য না করিয়া অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, (১৮) কৃষিজাত পদার্থের মূল্যবৃদ্ধি, (১৯) পাট সম্পর্কিত রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষক ও শ্রমিকদিগের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতি সাধনের জন্য পৃথককরণ, (২০) সমগ্র প্রদেশে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি, (২১) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কার এবং ব্যবহারিক শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং (২২) সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যসাধন।

উড়িষ্যায় কৃতী বাঙ্গালী—

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগ্‌চী উড়িষ্যার সেরাইকেলা রাজ্যে পঁচিশ বৎসর চীফ মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। পঁচিশ বৎসর পরে তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর



ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগচী

গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রাজচিকিৎসক ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ৩১ বৎসর ধরিয়া তিনি সেরাইকেলা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সহরের অধিবাসীগণের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁহাদের আহ্বানে উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। সেরাইকেলা রাজদরবার হইতে তাঁহাকে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর বহরোজা পদক অর্পণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার যোগেশচন্দ্র বাগ্‌চীর নিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। তিনি গত ২২শে জুলাই ৫৮ বৎসর বয়সে রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ডক্টর নবগোপাল দাস—

সিভিলিয়ান ডক্টর নবগোপাল দাস পি-এচ-ডি মহাশয় সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেকার-সমস্যা-অফিসার নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে বেকারদিগকে কি ভাবে



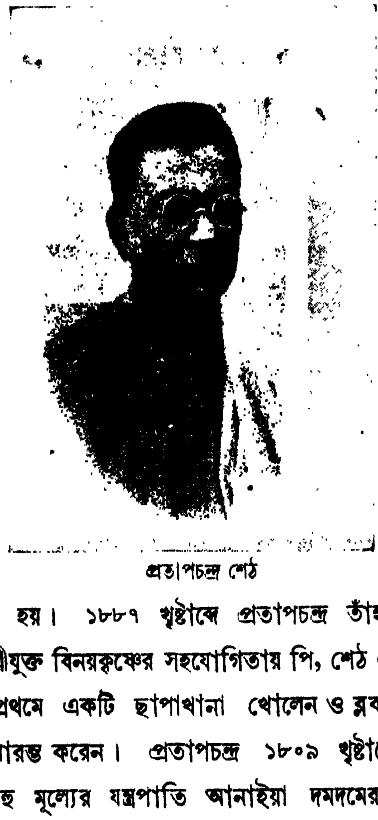
ডক্টর নবগোপাল দাস

কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, ডক্টর দাস তাহা স্থির করিয়া দিবেন। বাঙ্গালায় বেকারের সংখ্যা কিরূপ এবং বেকার-দিগের প্রয়োজন কিরূপ তাহার একটা হিসাব তাঁহাকে

প্রস্তুত করিতে হইবে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস পাশ করিয়া আসিয়াই তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার কথা সার অটো নিমায়ারকে জানাইবার ভার পাইয়াছিলেন। আমরা ডক্টর দাসের কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে প্রতাপচন্দ্র শেঠ—

বিগত ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ী প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। মাত্র দশ বৎসর বয়সে পিতার অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনে বালক প্রতাপচন্দ্রের মনে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সংকল্প



প্রতাপচন্দ্র শেঠ

জাগরূক হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণের সহযোগিতায় পি, শেঠ এণ্ড কোং নামে প্রথমে একটি ছাপাখানা খোলেন ও ব্লক নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রতাপচন্দ্র ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে বহু মূল্যের যন্ত্রপাতি আনাইয়া দমদমের সন্নিকটে সিঁথি গ্রামে একটি বিস্কুটের কারখানা খোলেন। বিলাতি বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় 'লিলি বিস্কুট' শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানবতার দিক দিয়াও প্রতাপচন্দ্রের চরিত্রে বহু সদ্‌গুণ ছিল। পরদুঃখকাতর, স্বভাব-বিনয়ী, জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী—প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে তুলার চাষ—

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় লম্বা আঁশ যুক্ত তুলার চাষ ইতিপূর্ব্বে ছিল না। কয়েকটি জেলায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার আঁশ লম্বা নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালার কাপড়-কলওয়ালা সমিতি বাঙ্গালায় তুলা চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতেছে। মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাদুরের বাগানে ৫০ বিঘা জমিতে তুলার চাষ হইতেছে। তাহা ছাড়া কয়েকজন জমিদারও তাঁহাদের জমিদারীতে তুলার বীজ বিতরণ করিয়াছেন। বীজ ছাড়ান তুলা এদেশে ২৫ টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের বহু জিলায় বহু পতিত জমি পড়িয়া আছে; কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেই সকল পতিত জমিতে ভাল তুলার চাষ হইতে পারে। বাঙ্গালায় তুলার চাহিদা যথেষ্ট; কাপড়ের কলগুলিতে শুধু ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে তুলা আমদানী করা হয় না, বিদেশ হইতেও তুলা আমদানি করা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় তুলার চাষ বাড়িলে একদিকে যেমন নিরন্ন কৃষকের সুবিধা হইবে, অন্যদিকে তেমনই তুলার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে দেশী কাপড়ের দামও কমিয়া যাইবে। বাঙ্গালার সকল জেলার জমিদারেরা যদি এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কৃষকগণকে উপযুক্ত স্থানে তুলার চাষ করিতে প্ররোচিত করেন, তবেই তাহা বাঙ্গালার পক্ষে শোভন হইবে।

ভারতবন্ধুর দান—

স্যর উইলিয়ম হ্বীকল্যাণ্ড বৃটিশ প্রজা; তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া প্রাচীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একমাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাহায্যেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি দুইটি ভারতীয় বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি মেক্সিকোর দুইটি বালককে দত্তকরূপে

গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির কতক অংশ দান করিয়া গিয়াছেন। চীনে মাঞ্চু আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ডাক্তার সানইয়াৎ সেনকে তিনি ১০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকালে তিনি ৯০ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি বিলাতে 'ব্যারনেট' হইয়াছিলেন ; কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উপাধি ত্যাগ করিয়া তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রজা হইয়াছিলেন। তাঁহার উইল লইয়া হয়ত সেজন্য গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে। আমরা এই বিদেশী ভারতবন্ধুর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি এবং আশা করি তাঁহার উইলের নির্দ্দিষ্ট অর্থে ভারতে একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

ভারতের বাহিরে বাঙ্গালী—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুত এ-কে-পাল মহাশয় সম্প্রতি এডেন উপসাগরের শীর ও মাকলার সুলতানের অধীনে তামাকু-বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি পাশ করিয়া তিনি পুনায় কৃষি-গবেষণাগারে দুই বৎসর কৃষি-শিক্ষা করিয়া আই-এ-আর-এ উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকায় সরকারী কৃষি-গবেষণাক্ষেত্রে কাজ পাইয়াছিলেন ও তথায় বাঙ্গালার গাছ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। ভারতের বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই সম্মানজনক পদলাভ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বীরেন্দ্রনাথ রায়—

প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ১৫ই ভাদ্র রাত্রিকালে ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গত ৩০ বৎসরকাল তিনি 'বেঙ্গলী', 'সার্ভেণ্ট', 'ফরোয়ার্ড', 'এম্পায়ার' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন ; তাঁহার কার্য্যে কেহ কখনও অসন্তুষ্ট হইতেন না—এমনই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল। ফরিদপুর জেলার উলপুর নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ রায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র—

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নত ধরণের কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও ভারতবাসীর মনে এখনও এক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, বিলাতে না গেলে বিদ্যাশিক্ষার যেন সমাপ্তি হয় না। এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন না? তাহা করেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় না। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ১৬৮০ জন ছাত্রছাত্রী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে বিদ্যাশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ছাত্রী ছিলেন ১২৬ জন। তাহা ছাড়া বহু ছাত্র বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। এই যে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র বিলাতে শিক্ষা লাভ করিতে যায়—ইহার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? এ দেশে বিলাতে না গিয়াও স্যর গুরুদাস বা স্যর আশুতোষ হওয়া যায়। বিলাতে গিয়া যুবকগণ অধিকাংশ স্থলে কু-শিক্ষাই লাভ করিয়া আসেন ; অনেকে আবার এমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন, যাহা পরবর্ত্তী জীবনে কখনও কোন কাজে লাগে না। ভারতবাসী কবে এই মোহ হইতে মুক্ত হইবেন জানি না। দেশভ্রমণের উপকারিতা ও উপযোগিতা আছে ; শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যদি ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতে বেড়াইতে যান, তবে যে তাঁহারা লাভবান হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে এতগুলি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থাকিতে বিদেশে পড়িতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ—

সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদে এক নূতন আইন প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। নানাকারণে সংবাদপত্র-সমূহকে মধ্যে মধ্যে সরকারের অনেক গোপনীয় কাগজপত্র-প্রকাশ করিয়া দিতে হয়। ভবিষ্যতে সংবাদপত্রসমূহ যাহাতে তাহা করিতে না পারে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট 'সরকারী দলিল বিল' নামক একটি আইন প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা

গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ আইন অমান্য করা হইলে ছাপাখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে। এতকাল পর্য্যন্ত এই আইনের কোন প্রয়োজন ছিল না—এখনই বা তাহা হইল কেন? গুপ্ত সরকারী-দলিল প্রকাশ করিলে সংবাদপত্রসমূহের অন্য আইনেও দণ্ড হইতে পারে, হঠাৎ সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনেরই বা প্রয়োজন কি?

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন—

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সম্মিলনে আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু নেতা উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনেক স্থানে মাসিক মাত্র চারি টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া থাকেন; তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা যে অবিলম্বে প্রয়োজন, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সম্মিলন কি সত্যই তাঁহাদের কোন উপকার করে? বহুসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষেই এই সম্মিলনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় না। এই সম্মিলনে ত বহু সরকারপক্ষীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা কি এদেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী? বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র কৃষকের উপর করভার চাপাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ফলবতী হয় নাই। এখন কি ভাবে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে তাহাই বিবেচ্য।

জাপান ও রবীন্দ্রনাথ—

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সমরনায়কগণ প্রসিদ্ধ জাপানী কবি নোগুচি দ্বারা কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্র লিখাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রমণের যৌক্তিকতা রবীন্দ্রনাথকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; নোগুচির উদ্দেশ্য ছিল যে এই আক্রমণ দ্বারা সমগ্র প্রাচ্যে এক বৃহত্তর শক্তির প্রতিষ্ঠার কথা রবীন্দ্রনাথকে বুঝান হইলে রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই বর্ব্বরতাপূর্ণ আক্রমণ সমর্থন করিবেন। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ নোগুচির পত্রের উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই শান্তির কথা। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি জানি একদিন আপনার (জাপান) দেশবাসীদের মোহ ঘুচিবে এবং রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত আপনাদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ তাহাদের শত শত বৎসর ধরিয়া দূর করিতে হইবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে, আজ জাপানের সৌম্যগুণ যে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, সেই ক্ষতির তুলনায় চীনের প্রতি অভিযান নিতান্ত তুচ্ছ। চীন অজেয়। চিয়াং কাইসেকের নির্ভীক নেতৃত্বে তাহার সভ্যতা অতুল সম্পদের নিদর্শন দেখাইতেছে। অভূতপূর্ব্ব ঐক্যবদ্ধ চীনবাসীদের নেতার প্রতি অটুট অনুরক্তি আজ চীনের নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে। অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও চীন প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছে; তাহার পূর্ণ জাগ্রত চেতনা সাময়িক পরাজয়ে কিছুতেই দমিত হইবে না। নিছক পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত জাপানের ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান চীন আজ জাপান অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের পরিচয় দিতেছে। চীন মহান—উদারচেতা জাপানী মনীষী ওকাকুরা কেন যে আমাকে পরম উৎসাহভরে এই কথা বলিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ যেরূপ সুস্পষ্ট বুঝিতেছি পূর্ব্বে আর কখনও তেমন বুঝি নাই। * * * * অদূর ভবিষ্যতেই যেন চীন ও জাপান পরস্পর মিলিত হইয়া মর্ম্মপীড়াকর অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলে। খাঁটি এসিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবে, কবিরা পুনরায় শান্তির গীতি গাহিবেন এবং যে মানবসমাজে বৈজ্ঞানিক-মারণাস্ত্রে ব্যাপক ভ্রাতৃ-হত্যার স্থান নাই, সেই মানবসমাজে পুনরায় তাঁহাদের আস্থা ঘোষণা করিতে লজ্জিত হইবেন না।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের কথা,—ভারতের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া এইরূপই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—ভারতের সংস্কৃতি চিরদিনই জগতকে এই অহিংসার বাণী শিক্ষা

দিয়াছে—ভারতের বুদ্ধ চীন ও জাপানে এই শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। আজ সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত রণোন্মত্ত জাপান যদি এ কথায় কর্ণপাত না করে, তবে তাহার ফলে তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক নন্দলাল গাঙ্গুলী—

নাগপুরের অধ্যাপক শ্রীযুত নন্দলাল গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি জব্বলপুর রবার্টসন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইলাম। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে নন্দলালবাবু নাগপুরে অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন এবং ছাত্রদের শারীরচর্চ্চা বোর্ডের সভাপতিরূপে ছাত্রদের শারীরিক উন্নতিবিধানে অবহিত ছিলেন। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় জব্বলপুরে অধ্যক্ষপদ লাভ করেন নাই। আমরা বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই সম্মানলাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পরলোকে সুনৃতরঞ্জন গুপ্ত—

ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'শিক্ষা-সমাচার' সম্পাদক সুনৃতরঞ্জনগুপ্ত গত ১২ই. ভাদ্র মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার পিতা খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী অবিনাশচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর গত ৮ বৎসরকাল তিনি শিক্ষা-সমাচারের সম্পাদকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। আমরা এই উৎসাহী কর্ম্মীর অকালমৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—

আজীবন শিক্ষাব্রতী, খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই সেপ্টেম্বর সকালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ৪২ বৎসর কাল বিদ্যাসাগর কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তন্মধ্যে শেষ ৯ বৎসর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ইংরেজী ও দর্শন উভয় শাস্ত্রেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। জ্ঞানরঞ্জনবাবু ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহার পিতা রেভারেণ্ড প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন হুগলী জেলার সোনারটেবরীতে বাস করিতেন, সেই সময় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে



জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলিজিয়েট স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স, ১৮৮৪তে এফ-এ, ১৮৮৬তে বি-এ ও ১৮৮৯তে এম-এ পাশ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তিনি দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা তাঁহাকে বিদেশ যাইবার জন্য বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। দুই বৎসর কাল ডাফ কলেজে' অধ্যাপনার পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর কাল তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বহুদিন তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সিনেট সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের নেতা ছিলেন এবং সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সংযোগ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি উদারনীতিক হইলেও সকল প্রকার অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। তিনি ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন এবং সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সে-কালের একজন আদর্শ অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীর যে অভাব হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনমতের চেষ্টায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রজাগণের সকল অসুবিধা দূর না হইলেও কতক পরিমাণে যে দূর হইবে তাহা বলা যায়। যাহাতে এই আইনে বড়লাট তাঁহার সম্মতি না দেন, সে জন্য জমিদারগণ নানাপ্রকার আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। নিম্নলিখিত বিষয়ে নূতন আইনে প্রজাদিগের সুবিধা হইয়াছে—(১) প্রজাগণকে খারিজ ফী বা সেলামী আর দিতে হইবে না (২) জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা আইন ছিল যে জমিদার ক্রয় করিতে চাহিলে প্রজা আর কাহাকেও জমি বেচিতে পারিত না, তাহা উঠিয়া গেল। জমির অন্যান্য অংশীদারগণের অগ্রক্রয়ের অধিকার হইল। (৩) আদালতে দরখাস্ত করিয়া সরিকগণ নিজ নিজ অংশ খারিজ করাইয়া লইতে পারিবে। এইজন্য মাত্র এক টাকা ফি লাগিবে। (৪) টাকায় দুই আনা স্থলে এক আনা সুদ দিতে হইবে—ক্ষতিপূরণের জন্য চারি আনা স্থলে দুই আনা দিতে হইবে (৫) জমিদারগণ সার্টিফিকেটে খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। (৬) মোকররী জমায় ইস্তফা দিবার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। (৭) হিসাবানা, মাথট, আবওয়াব প্রভৃতি কোনরূপ বাজে আদায় লইলে জমিদার বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা দণ্ডনীয় হইবে। (৮) জমি নদী শিকস্তি হইয়া ২০ বৎসরের মধ্যে পুনরুত্থিত হইলে প্রজা ৪ বৎসরের খাজনা দিয়া তাহা দখল পাইবে। (৯) সুদবন্ধকী ও খাইখালাসী বন্ধকী ১৫ বৎসরের অধিক থাকিবে না। ১৫ বৎসর গত হইলে তাহা পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ও আদায়ের দরখাস্তের ফলে খাতক তাহা দখল পাইবে। নূতন আইন কিছুদিন চলিলে পর ইহা দ্বারা প্রজা সত্যই লাভবান হইবে কি-না তাহা জানা যাইবে। তবে কতকগুলি বিষয়ে যে প্রজার সুবিধাবৃদ্ধি করিয়া জমিদারের অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা উপরের ধারাগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। কৃষক ও শ্রমিকদিগের উন্নতিবিধান করা না হইলে এ যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে আত্মরক্ষা করিয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সম্প্রতি মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে



কবিরাজ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার হাতিশালা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি দর্শন, ইংরেজী ও কমার্স তিনটি

বিভাগে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন গভর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইনিষ্টিটিউটে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং 'রসজলনিধি' গ্রন্থ রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা প্রচারিত হওয়ায় আমেরিকা-চিকাগোর কেমিক্যাল সোসাইটী তাঁহাকে তথায় গিয়া রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তথায় গমন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশে একজন বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের অভাব হইল।

বিদ্যালয়ে রন্ধনোৎসব—

আজকাল বাঙ্গালা দেশে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টিতে হইলে, লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত গৃহকার্য্যে, বিশেষত রন্ধন কার্য্যে নিপুণা হইতে হয়। আজকাল সকল গৃহস্থ গৃহেও উড়িষ্যাবাসী পাচকের আধিক্য দৃষ্ট হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার রামজয় শীল শিশু পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি রবিবারে রন্ধন কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সম্প্রতি উক্ত পাঠশালায় একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল; তাহাতে দুই শতাধিক লোককে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা হইয়াছে। ছাত্রীরা কুটনা কুটা, বাটনা বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজই নিজেরা করিয়াছিল। তাহাদের কাজ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ কর্ম্ম অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়। শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রীদের গৃহস্থালীর সকল কাজই শিক্ষা দিয়া থাকেন। সকল বালিকাবিদ্যালয়েই রামজয় শীল পাঠশালার এই আদর্শ অনুসৃত হওয়া উচিত।



রামজয় শীল শিশু পাঠশালা

লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জানি না। বোধ হয় সেরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। বালিকাদিগকে সুগৃহিণী হইতে

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নাটোরের

সম্প্রতি চীনদেশে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া বত্রিশ হাজার কলেরা-বীজের টিউব এবং বহু টাইফয়েড ও প্লেগের বীজের টিউব লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল চীনদেশে বাস করিয়া রেডক্রস সোসাইটীর অধীনে কাজ করিবেন। ঐ দলে আছেন, ডাক্তার শ্রম, অটল, ডাক্তার চোলকার, ডাক্তার কটনিস, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার বি, কে, বসু। এই মহান সেবাকার্য্যের জন্য যাঁহারা বিদেশে গমন করিলেন, তাঁহারা জাতির ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের যাত্রা জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসনীয় কার্য্য—

মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী শতকরা বার্ষিক তিন টাকা সুদে দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন। ঐ টাকা দ্বারা ইলেকট্রিক পরিকল্পনা, সেচ কার্য্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও কৃষকগণকে ঋণ দান প্রভৃতি করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। যে সকল প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা টাকার অভাবের কথা বলিয়া কার্য্যপ্রসার করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা মাদ্রাজের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন সন্দেহ নাই। একদিকে যেমন ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া কংগ্রেস-মন্ত্রীরা নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন, জনহিতকর কার্য্যের জন্য এইরূপ ঋণগ্রহণ করিয়া তাঁহারা অপর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙ্গালা দেশ আজ বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত; এখানকার মন্ত্রীরা কি ঐ ভাবে ঋণ গ্রহণ করিয়া বন্যাপীড়িতদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না?

লোকশিক্ষা সংসদ—

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিশ্বভারতী হইতে লোকশিক্ষা সংসদ গঠিত হইয়া গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। আমাদের দেশে লেখা-পড়া-জানা লোকের সংখ্যা কত কম—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি সহজে বৃদ্ধি করা যায়। পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না, পরে যাহাতে তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয়, লোকশিক্ষা-সংসদ ব্যাপকভাবে তাহার ব্যবস্থা করিলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে। আমরা বিশ্বভারতীর এই প্রচেষ্টা সমর্থন করি এবং দেশবাসী সকল শিক্ষিত যুবককে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই সংসদের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হন।

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে ভাদ্র রবিবার ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া



উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ব্যথিত হইলাম। ইংরেজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ভবানীপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় তারাপ্রসন্নবাবু সেকালের সাব-জজ ছিলেন এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প বয়সেই উপেন্দ্রবাবু সাংবাদিকের কার্য্যে ব্রতী হন এবং 'বঙ্গনিবাসী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। নিজ ব্যয়েই তিনি তাহা পরিচালনা

করিতেন। পরে 'ভারত-সংবাদ' ও 'শিল্পসখা' নামক দুইখানি সাময়িক পত্রও তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 'ন্যাশনাল গার্জ্জেন' ও 'পাওয়ার' নামক দুইখানি ইংরেজী সাময়িকপত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে উক্ত পত্র দ্বয়ের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী' তাঁহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে। কিছুদিন তিনি 'ভারতবর্ষ'-এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু 'ভারতবর্ষ'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রকৃষ্ণের দুই পুত্র, এক কন্যা ও দুই জামাতা বর্ত্তমান। শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার বড় জামাতা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জ্যোতি বাচস্পতি, কনিষ্ঠ জামাতা হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় আলিপুরের উকিল এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র পান্নালাল ছোট আদালতের উকিল। আমরা তাঁহার দুই পুত্র পান্নালাল ও মনিলালকে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার নূতন নিয়ম—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার দুইটি নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নূতন নিয়ম দুইটি নিম্নে প্রদান করিলাম—"(১) ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে পরীক্ষার্থীকে নিম্নহারে নম্বর রাখিতে হইবে—(ক) মাতৃভাষা ও ইংরেজীতে মোট নম্বরের শতকরা ৩৬ ভাগ, (খ) অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে শতকরা ৩০ ভাগ, (গ) সমস্ত অবশ্যপাঠ্য বিষয়ে মোট নম্বরের গড়ে শতকরা ৩৬ ভাগ। (২) যে সমস্ত পরীক্ষার্থী গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর পাইবে তাহারা প্রথম বিভাগে, যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর পাইবে তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে ও অপরাপর পাশ ছাত্রগণ তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন পরীক্ষার্থী অবশ্য পাঠ্য বিষয়ে পাশ করে ও গড়ে তাহার পাশের নম্বর থাকে, তবে অতিরিক্ত বিষয়ে সে শতকরা ৩০এর অধিক যত নম্বর পাইবে, তাহা তাহার মোট নম্বরের সহিত যোগ হইবে এবং ঐ মোট নম্বর অনুসারে তাহার বিভাগ ও স্থান ঠিক হইবে।"

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর সংখ্যা—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল যখন ভারতবর্ষে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন হয়, তখন বাঙ্গালা দেশে মোট ২৬ শত ৯১ জন রাজবন্দী আটক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১০ শত ৪৮ জন কারাগারে বা বন্দীশিবিরে, ৮ শত ৫৩ জন পল্লীগ্রামে, ১ শত ৮২ জন স্বগৃহে, ৪ শত ৫৮ জন অপেক্ষাকৃত কম নিষেধাজ্ঞার অধীনে, ১ শত ৩৪ জন বন্দী-শিক্ষাশিবিরে এবং ১৬ জন তিন আইনে বন্দী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সকলকেই মুক্তি দান করিয়াছেন। ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে "একেবারে না হওয়ার অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া ভাল"—আমরাও তাহাই বলি। তবে এই মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই।

বঙ্গীয় জ্যোতিষী সম্মিলন—

আমাদের পঞ্জিকাসংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছি। পঞ্জিকাসংস্কারের চেষ্টাও ক্রমে বলবতী হইতেছে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বাঙ্গালার জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীদিগের এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুত রাধাবল্লভ স্মৃতিপুরাণজ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধ মনীষী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তারকেশ্বরের নূতন মোহান্ত দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম তীর্থগুরুরূপে সম্মিলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মোহান্তমহারাজ বাঙ্গালী, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিত। তিনি একটু চেষ্টা করিলে হয় ত পঞ্জিকাসংস্কার অতি সহজেই হইতে পারে। সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ ও তাঁহার মত একজন লোককে সম্মিলনে আনিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সম্মিলনের চেষ্টায় যদি পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে তদ্দ্বারা হিন্দুমাত্রই উপকৃত হইবেন। খ্যাতনামা জ্যোতিষী শ্রীযুত দিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ নন্দীর চেষ্টার ফলেই এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ—

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কি করিয়া মিলন ঘটিতে পারে আজিকার দিনে ভারতের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মনেই সেই চিন্তা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত মোসলেম লীগের দলপতি মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার এ বিষয়ে চিঠিতে ও সাক্ষাতে বহু আলোচনা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের পত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে সাধারণ লোকেও জিন্না সাহেবের মিলনেচ্ছার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই মিলন-চেষ্টা আদৌ সঙ্গত হইয়াছে কি-না সন্দেহ। কেন না, মোসলেম ভারতে মোসলেম লীগই একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, মুসলমানদের মধ্যেও তেমনই অসংখ্য সম্প্রদায় ও দল আছে। সুতরাং মোসলেম লীগকে কখনই মোসলেম ভারতের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে-কোন মুসলমান ইচ্ছা মাত্রেই লীগের সদস্য হইতে পারে না। অপর পক্ষে যে-কোন ভারতবাসী কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া লইলেই ইহার সভ্য হইতে পারেন। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার তুলনায় মোসলেম লীগের সদস্যের সংখ্যা নগণ্য। তাহা ছাড়া, লীগের উদ্দেশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন, আর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করা। কংগ্রেস অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে; অপর পক্ষে লীগ অদ্যাপি স্বসম্প্রদায়ের জন্যও এমন কিছু করেন নাই বা করিতে পারেন নাই যাহার জোরে মোসলেম ভারত তাহাকে তাহার মুখপাত্র বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইবে এবং সম্মত হয়ও নাই, তাহা বহু স্বরাজকামী উদারপ্রকৃতি মুসলমানের বিভিন্ন বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে জানা গিয়াছে। কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছুই করিয়াছে। খিলাফত আন্দোলন হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও জাঞ্জিবারের মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন দেশবাসীর অজানা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লীগের পক্ষে কংগ্রেসের সমকক্ষতা দাবী অসঙ্গত। লীগ কেবল নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী চাকরির সংখ্যা বাড়াইবার আন্দোলনই চালাইতেছে। অথচ এই সত্যটা তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে যে, সরকারী চাকরিতে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া কেবল অযোগ্যদের দিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে রাষ্ট্রের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত রূপে পরিচালনে বাধার সৃষ্টি হইবে। এমন কি, যোগ্যতার প্রতিযোগিতা না থাকিলে মোসলেম সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপযুক্ত যোগ্য লোকের ক্রমশ অভাব ঘটিবে। সম্প্রতি কংগ্রেস মুসলমানদের তুষ্ট করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী চাকরি বণ্টনে যে পক্ষপাত-উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিন্দনীয়। সরকারী চাকরির শতকরা ষাটটি মুসলমানদের আর বিশটি অনুন্নত সম্প্রদায়কে এবং বাকী বিশটি হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের মধ্যে বণ্টিত হইতে সম্মতি দিয়া কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতি অবিচারই করিয়াছে বলিয়া বহু মনীষী মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ভাই পরমানন্দ এই ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক তৃতীয় রোয়েদাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, দেশের শোণিত পাত করিয়া যে হিন্দু সমাজ বাঙ্গলা দেশের সেবা করিয়াছে, যাহারা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, হাসপাতালে ও বহু প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে, তাহারা অবশিষ্ট দলে পড়িল!

টাইমস পত্রও বাঙ্গলার হিন্দুদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে; ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের সদস্য ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ চাকরি বণ্টনে মত দিয়া কংগ্রেস হিন্দুসমাজের প্রতি যে নির্ম্মম অবহেলা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতেও কি তাঁহারা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন? বোধ হয় না, কারণ আব্দারে ছেলেকে যতই 'নাই' দেওয়া যায় ততই তাহার আব্দারের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়।

করবৃদ্ধির প্রস্তাবে খাতেদারবর্গের আতঙ্ক—

সিন্ধু প্রদেশের সরকার আবার করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সিঙ্গোর তালুকের অন্তর্গত মীর আল্লাবক্স এবং আরও কয়েকজন খাতেদার মহাত্মা গান্ধীর নিকট একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। খাতেদারগণ নানা করভারে নাজেহাল হইতে বসিলেও প্রত্যেকবার জমি জরিপ করিবার পরেই কর বৃদ্ধি করা হইয়া আসিতেছে। জমি জরিপের অর্থ ই কর বৃদ্ধি বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে এবং তাহারা এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে যে, অন্যান্য প্রদেশে যখন জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার চেষ্টা করা হইতেছে তখন সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসী দল আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগে প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে নূতন কর ধার্য্য করিয়া জনমতকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা

মৌলবী একরামুদ্দীন

প্রবন্ধ

মায়ের মুখে যে ভাষা শিখা যায়, অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোকে বর্ত্তমানে মুখের কথায় যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই মাতৃভাষা। এক প্রদেশের একজন লোক হয়ত এক ভাষায়, অন্য লোক অন্য ভাষায় এবং তৃতীয় লোক তৃতীয় ভাষায় কথা কয়, তাহা হইলে কোনটা মাতৃভাষা হইবে? এরূপ স্থলে সেই প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক যে ভাষায় মনের ভাব জানায়, তাহাই সে প্রদেশের মাতৃভাষা।

পূর্ব্বের জাতীয় ভাষা হয়ত অন্যভাষা—বর্ত্তমান মাতৃভাষা নয়। তাহা হইলে তুমি সেই ভাষায় জাতীয় জ্ঞানার্জ্জন করিতে পার, কিন্তু সাংসারিক চলিত কাজকর্ম্মের জন্য তাহাকে মাতৃভাষা বলিয়া চালাইতে চাহিও না। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন, এখন যদি সেইপথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পথে চলিবার প্রয়াস পাইও না, তোমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হইবে, তুমি গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে না।

জোর করিয়া প্রণয় হয় না—সৈকতে ফুলের বাগান জন্মে না—এক গাছে অন্য ফল ধরে না। যেমন সরু ছুঁচে মোটা সুতা অমূলক, সোনার পাথর বাটী অসম্ভব, ভূতের মুখে রাম নাম অবাস্তব, তেমনি একটা অচলিত ভাষাকে মাতৃভাষার স্থান দেওয়া অপার্থিব। যেমন কিলাইয়া পাকাইলে কাঁঠাল ইচড়ে-পাকা হয়, অসময় প্রসব করাইলে ভ্রূণ হত্যা হয়, ব্যবহারশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারাসনে বসাইলে বিচারবিভ্রাট হয়, সেইরূপ অপ্রচলিত ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে মাতৃভাষা পঙ্গু হইয়া পড়ে।

ঐরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টার ফল কি হইতে পারে, তাহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিব। বঙ্গদেশীয় কোন যুবক পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিখিয়া বাড়ী হইতে কিছু দূরে স্কুলের মৌলবী অর্থাৎ পার্সীশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা হইলেও তিনি উর্দ্দু ছাড়া কথা কহিতেন না, হউক না কেন তাঁহার শ্রোতা উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ। তাঁহার অগ্রজ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, পরদিন তাঁহার বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি বাড়ী না ফিরিয়া মৌলবী সাহেবকে বাংলায় চিঠি দিলেন, "আবশ্যক হওয়ায় আমি এখান হইতে আজমীর যাইতেছি—তোমার বড় ভাইজ্‌কে বলিয়া দিবে।" সেই দিন বাড়ী হইতে কোন বাংলাভাষী আত্মীয় তাঁহার নিকট আসায় মৌলবীসাহেব উর্দ্দুতে তাঁহাকে বলিলেন, "বড় ভাই আজমের গেয়ে বড়া ভাবীমে কহ্‌ দেনা।" মৌলবীসাহেব শুদ্ধ উর্দ্দু বলিলেও শ্রোতা উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় বুঝিলেন, "বড় ভাই আজ মরে গিয়েছেন—বড় ভাবির (অর্থাৎ ভাইজের) নেকা দিতে হবে।" শ্রোতা মৌলবীসাহেবের কথার যে অর্থ বুঝিয়াছিলেন, বাটীতে আসিয়া তাহাই বলিলেন। গৃহকর্ত্তার মৃত্যুসংবাদে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

মুখের কথায় মনের ভাব বিনিময়ের জন্যই মাতৃভাষা। মনোভাব প্রকাশ করিবার সময় বক্তা যদি এক ভাষার একটি শব্দ ব্যবহার করে এবং শ্রোতা যদি অন্য ভাষায় তাহার অন্য অর্থ বুঝে—তাহা হইলে মনোভাব-বিনিময় কিরূপে হইতে পারে? মাতৃভাষার কোন শব্দ এক জিনিষকে বুঝায় এবং অন্য ভাষায় সেই শব্দ অন্য জিনিষকে বুঝায়। আদেশকারী প্রভু মাতৃভাষাভাষী পালনকারী ভৃত্যকে অন্য ভাষার একজিনিষ আনিতে আদেশ দিয়াছেন; সে অন্য জিনিষ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তুমি কোন জিনিষ খরিদ করিবার জন্য অন্য ভাষায় তাহার নাম বলিয়া দূরস্থিত দোকানদারকে মূল্যসহ অর্ডার পাঠাইলে মাতৃভাষাভাষী দোকানদার মূল্য লইয়া মাতৃভাষায় সেই নাম যে জিনিষকে বুঝায়, তাহাই তোমাকে পাঠাইল। এরূপ ঘটনাও হইতে দেখিয়াছি। এইরূপ অসুবিধার জন্য যে প্রদেশের যা মাতৃভাষা তাহা ছাড়া অন্য ভাষা সেই দেশে চালাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বাংলা দেশের মাতৃভাষা কি? অতি প্রাচীনকালে তাহা কি ছিল ঠিক জানা যায় না, তবে আর্য্যদের ভারতবর্ষে আসিবার পর প্রথম প্রথম তাহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত ছিল। মূল সংস্কৃত হইতে সাধারণের মধ্যে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইল এবং কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাংলা হইল। বাংলা দেশে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে বাংলা ভাষাই হিন্দুদের মাতৃভাষা ছিল। মুসলমান বাংলায় আসিয়া হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে লাগিল এবং প্রতিবাসীদের সহিত আদান প্রদান করিতে লাগিল। মুসলমান বাহুবলে হিন্দুর রাজ্য অধিকার করিয়াছিল মাত্র, তাহার ভাষা জয় করিতে পারে নাই; তাহার ভাষা বাংলাই থাকিয়া গেল।

একটা পুরাতন জাতির মধ্যে নূতন জাতির বাসস্থান স্থাপিত হইলে পুরাতন জাতির সহিত মনোভাব প্রকাশের জন্য একটা ভাষা দরকার। কিন্তু মনোভাব প্রকাশের জন্য একটা নূতন ভাষা সৃষ্ট হইতে পারে না—হয় পুরাতন জাতি নূতন জাতির ভাষায় কিম্বা নূতন জাতি পুরাতন জাতির ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ সৈকতভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে গোষ্পদের ন্যায় খুব কম সংখ্যক মুসলমান আসিয়া বাংলাদেশে অগণ্য হিন্দুর মধ্যে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে মুষ্টিমেয় মুসলমান—এরূপ অবস্থায় হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের মাতৃভাষা গ্রহণ করা কি সম্ভব? কখনই না।

প্রবাসের জন্য যুদ্ধব্যবসায়ী কয়জন মুসলমানের স্বদেশ হইতে সঙ্গে চাকর আনা সম্ভবপর? হয়ত প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য অশ্বের জন্য বাংলাদেশে সঙ্গে সহিস আনিয়া থাকিবে কিন্তু এদেশে বাসস্থাপন করিবার পর সাধারণ হুকুম পালনের জন্য এবং সংসারের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অনেককে নিশ্চয়ই হিন্দু চাকর রাখিতে হইয়াছিল এবং হিন্দু দোকানদারদের নিকট জিনিষপত্র খরিদ করিতে হইয়াছিল।

বাংলাভাষী হিন্দু চাকর, হিন্দু দোকানদার, হিন্দু প্রতিবাসীর নিকট তাহাদের মনোভাব প্রকাশের আবশ্যক হইয়াছিল এবং উহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া উহাদের মাতৃভাষা বাংলা শিখিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া অনেক হিন্দু মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং আজকাল যেমন খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণ খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের মাতৃভাষা ছাড়িতে পারেন না, তখনকার মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দুগণও নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহাদের বংশধরগণও পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মাতৃভাষা সহজেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; তাঁহাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অন্য ভাষা গ্রহণ করিবার কোন সঙ্গত কারণ হয় নাই। নবাগত মুসলমানদের সহিত আদান প্রদানের ফলে মনের উপযুক্ত ভাব প্রকাশক দুই চারিটি বিদেশী শব্দ মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মাতৃভাষা কণ্টকিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিভূষিত হইয়াছে।

আমরা দেখাইলাম যে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাংলা-ভাষাই প্রচলিত ছিল, মুসলমান আসিবার পরেও তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ হয় নাই। এবার সত্যই এ দেশের চলিত মাতৃভাষা কি তাহাই দেখাইব। আমি সরকারী কাজের উপলক্ষে বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু এ দেশের মুসলমানকে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতে খুব কমই দেখিয়াছি—এত কম যে হাজার করা পাঁচজন বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু অল্পোক্তি নহে। অন্য ভাষা ব্যবহার করে এরূপ মুসলমান, রাজধানী এবং প্রধান প্রধান শহরে কিছু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আরও কম। প্রধান প্রধান শহরেও যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাহারা দুই-এক পুরুষের মধ্যে অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া বাংলায় বাস করিতেছে।

আরও বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, বাংলার মুসলমানের লেখা পুস্তক ও মুসলমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র। মুসলমান লেখকের মধ্যে খ্যাতনামা লিপিকরের সংখ্যা খুব কম—অধিকাংশই প্রায় সাধারণ লেখক। মুসলমান সাধারণ লেখকের রচনার পাঠকও সাধারণত মুসলমান। যে সকল মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, তাহারাই সাধারণতঃ ইহার পাঠক। মুসলমান-সাধারণের মাতৃভাষা বাংলা না হইলে মুসলমানের লেখা সংবাদপত্র এতদিন ধরিয়া জীবিত থাকিত না এবং মুসলমানের লেখা পুস্তকও ক্রমাগত প্রকাশ হইত না। মুসলমান হষ্টেলে ও মেসে বাংলার নানা জেলার মুসলমান ছাত্র থাকে, তাহাদের সকলেরই মাতৃভাষা প্রায় বাংলা। কেহ যদি বলেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি বিশ্বাস করিব না। কেমন করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিব?

সুতরাং বাংলাই যে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী। সুতরাং মুসলমানের সংস্কৃত শেখা দোষ হওয়া দূরের কথা, বাংলা ভাষায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জাতীয় আরবী ভিন্ন অন্য ভাষা শিখিতেও দোষ নাই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে-কোন ভাষায় জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষিতের ধর্ম্মের কোন হানি হয় না।

বিশেষত হিন্দু আমাদের প্রতিবাসী; তাহাদের মাতৃভাষা আমাদেরও মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় আমাদের জ্ঞানলাভ জন্য হিন্দুদের দেবদেবীর পরিচয় আমাদের সবিশেষ দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য পুস্তকে হিন্দুদের দেবীর কথা আছে বলিয়া তাহা অপাঠ্য হইতে পারে না বরং সুপাঠ্য বটে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা, শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ পড়িলে আমাদের প্রতিবাসীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক পড়িলে প্রাচীন দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নয়, পৌরাণিক ধর্ম্ম এবং দর্শন ভাল রকম না জানিলে মাতৃভাষাতেও সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে।

বিশেষতঃ পুরাকালে সাহিত্য ও দর্শনে হিন্দু জাতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের রসাস্বাদন করিবার জন্য সমগ্র জগতের জ্ঞানপিপাসুগণ লালায়িত। যাহা মাতৃভূমির গৌরবের বিষয় তাহা হইতে মুসলমান বঞ্চিত থাকিতে চাহেন কি?

ভারতবর্ষকে মুসলমানের মাতৃভূমি বলিলাম বলিয়া কোন মুসলমান দোষ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের অনেকের পূর্ব্ব পুরুষের মাতৃভূমি হয়ত ভারতবর্ষ ছিল না কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের বাসস্থান—হয়ত জন্মস্থানও ভারতবর্ষ বটে, সুতরাং ভারতবর্ষকে তাঁহাদের মাতৃভূমি বলাই সঙ্গত। হিন্দু ছাড়া অন্যান্য কোন কোন জাতিও জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে। সুতরাং ভারতবর্ষ কিম্বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ মুসলমানের জন্মভূমি হইলে তাহাকে তাহার জন্মভূমি বলিলে দোষ হইতে পারে না।

কোন কোন লোকের এমন শুচিবাই আছে যে, তিনি হাজার দুষ্কর্ম করিয়াও অপবিত্র হয়েন না, কিন্তু সামান্য কারণে বা বিনা কারণে তাঁহার বাহ্য দেহ অশুচি হইয়াছে মনে করিয়া দিনের মধ্যে বিশ বার স্নান করিয়া শুচি হইয়াছেন মনে করেন। মুসলমান ধর্ম্ম এমন বাতিকগ্রস্ত হইতে পারে না যে, মাতৃভূমিকে বন্দনা করিলেই "প্রাণ গেল—প্রাণ গেল" বলিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে। মুসলমানধর্ম্ম কাচের ঘর নয় যে ঢেল মারিলেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

"বন্দেমাতরম্‌" গানের উপরের চারি ছত্রে কোন হিন্দু দেবদেবী উল্লেখ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ মুসলমান ধর্ম্মের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে শুধু উপরের চারি ছত্র গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ কার্য্যে







(উপরে) যুক্তপ্রদেশের মাননীয়া মন্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রেগে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ও চার্লস্ ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য অনুশীলনের প্রফেসর লেস্নি (বামে) কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন

(নীচে) মাদাম হর্থি হের্ হিটলার সহ সার্লেটনবুর্গে হের্ রিবেনট্রপ প্রভৃতি কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন

সমুচিত প্রস্তাবই করিয়াছিলেন ; কিন্তু মুসলমান ছাত্রবৃন্দ তাহাতেও স্বীকার না হইয়া গর্হিত কাজ করিয়াছেন।

কোন কোন মুসলমানের মতে একমাত্র আল্লা ছাড়া অন্য কেহ বন্দনীয় নহেন। সত্য বটে একমাত্র আল্লাই সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাতের যোগ্য কিন্তু সাধারণ বন্দনা সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। মুসলমানের গুরুজন এবং ইংরাজ প্রভুকে মাথা নত করিয়া নমস্কার করিতে কোন দোষ নাই, আর মাতৃভূমিকে বন্দনা করিলেই ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ করা হইল—এ কেমন কথা? যাঁহাদের বাস্তবিক ধর্ম্ম আছে তাঁহারা ধর্ম্মহানির এরূপ অছিলা খুঁজিয়া বেড়ান না—যাহারা অনর্থক 'ধর্ম্ম গেল—ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল নহে। আলিগড়ের মুসলমান ছাত্রদের কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই? আমরা তাঁহাদের সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে দেশহিতৈষী হইতে পারিব না এবং দেশহিতৈষী হইতে না পারিলে স্বদেশের উদ্ধার হইবে না।

তোমার ছোঁয়ায় তনু শতদল উঠলো সোহাগে দুলে

শ্রীঅনুরাধা দেবী

উনিশ বছরে এত কথা আমি শিখেছি কেমন ক'রে ?
মেয়েরা ওসব আপনি শেখে গো, নয় তো কেতাব প'ড়ে।
এগারো ছাড়িয়ে বারোর কোঠায় বাড়ানু যেমনি পা,
না জানি কিসের ছোঁয়ায় শিউরে উঠ্‌লো অমনি গা।
ধীরে ধীরে সারা দেহটা ছাপিয়ে মালতী লতার মত,
সবুজ শাড়ির আঁচল আড়ালে ফুট্‌লো কমল কত।
বালিকা তখন নই আর আমি, বুঝতে শিখেছি নিজে :
পলে পলে মন ভাঙে গড়ে কত অজানা স্বপন কি যে !
তার আগে যেটা কখনো ভাবিনি, কখনো জাগে নি মনে,
নানারূপে তাই ভেসে ওঠে বুকে সতত সংগোপনে।

পনেরো যখন হয় নি পূর্ণ, চোদ্দ হ'য়েছে শেষ,
হঠাৎ মনের কল্প দোলায় লাগলো সুরের বেশ।
ছাপিয়ে উঠ্‌লো গায়ে পায়ে সে কি অভিনব অবয়ব,
বুকের তলায় ঝঙ্কার তোলে নানা গীতি কলরব।
কত কথা জাগে, কত ভাবভাষা, কত না শ্যামল ছায়া,
ভরে যায় মন। হাতছানি দেয় অচেনা শিশুর মায়া !

অতি অকারণ কোলাহল ক'রে ফিরেছি আপন মনে,
সোনালি আশার প্রদীপ জ্বলেছে নিরালা নিথর ক্ষণে।
পুতুল খেলায় সখীদের নিয়ে ছিলেম আপনা ভুলে,
অবাধ উতল হাসি কলরবে খেলেছি মৌরী ফুলে।

তার পর যেন হঠাৎ কখন আমার আঁখির পাতে,
চুম্বনে দিলে প্রেমের কাজল ফুলশয্যার রাতে।
লঘু হাতে দিলে মনের দেউলে শত শত দ্বার খুলে',
তোমার ছোঁয়ায় তনু শতদল উঠ্‌লো সোহাগে দুলে।

ইস্ ইস্, থামো, অনেক হ'য়েছে, চাইনে পুরস্কার।
নোবেল প্রাইজ ? সামলানো দায়, তোমায় নমস্কার !
পাঁজ্‌রা ক'খানা ভেঙে যাবে ওগো, দিওনা অমন জোর,
এবার একটু ঘুমোও লক্ষ্মী, রাত হ'য়ে এলো ভোর।



ষষ্ঠ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের ধারা

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ

প্রবন্ধ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বপ্নময় দিনগুলি অতীত হইয়া গেল। মগধের রাজ-সিংহাসন হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির মোহিনী মায়া আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভুক্তি এবং বিষয়গুলির একতা রক্ষা করিতে পারিল না, গৌরব রবি অস্তমিত হইল।

ইতিহাসের প্রত্যেক ফলকে বাংলা দেশ লৌহকীলকযোগে যে লিপি লিখিয়াছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারই এক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতীত কাল হইতেই বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহে বাংলার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, বিভিন্ন দেশের গতানুগতিক ইতিহাসের মত সে যেন রাজা আর সম্রাটের ইতিহাস নহে। দুর্ব্বার গতিতে রঘু তাহার দিগ্বিজয়ী বাহিনী লইয়া আসিয়াছে, বাধা দিয়াছে বঙ্গের জনসাধারণ।[১] কবির রচিত আলেখ্যে ইতিহাসের ছায়াপাত কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইলেও আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ী রাজা চন্দ্রকে চূড়ান্ত শক্তিতে প্রতিহত করিবার প্রয়াসে বঙ্গের[২] জনসাধারণ ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্র-গুপ্তের সর্ব্বরাজোচ্ছেদক তরবারিকে উপেক্ষা করিয়া সমতট আজও বিশিষ্ট। হিমাচলের তুহিনবিগলিত ধারায় গঠিত দেহ বঙ্গমাতা সন্তান-কুলকে এক বৈশিষ্ট্যময় ধারায় মানুষ করিয়া যুগে যুগে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাময়িক পরাধীনতা, তমসাচ্ছন্ন রাত্রি ও প্রাবৃটের কুহেলিকারাশি ভেদ করিয়া সুসন্তানগণের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন।

সার্ধ শতবর্ষের পরাধীনতার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী এমনই একটি যুগ। পশ্চিম রাজ্য-সীমান্তের বহিরাগত বৈরীগণের বারম্বার আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত পতিত কুললক্ষ্মীকে সাময়িকভাবে উদ্ধার করিলেও আর অধিক দিন সে সাম্রাজ্য টিকিতে পারিল না। বাংলা তাহার সমগ্র নিজস্ব সত্তা লইয়া এত কাল গুমরিয়া মরিতেছিল, এইবার তাহার সুযোগ আসিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম তপন উদিত হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসবার্ত্তা বিঘোষিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের নবজীবনের বার্ত্তাও ঘোষণা করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তমান দিনগুলিতে বাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে এযুগের ইতিহাসের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বিদেশাগত রাজপুরুষগণই বাংলার সমভূমিকে নিজস্ব করিয়া লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এই দেশকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বঙ্গের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন।[৩] ৫০৭-৮ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত এই তাম্রশাসন হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐন্দ্রজালিক মোহপাশ মুক্ত হইয়া বাংলাদেশের স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়া উঠিতেছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উপরিকগণের মহারাজ উপাধি গ্রহণ হইতে যেমন সুদূর বঙ্গের গুপ্তাধিকারের শিথিলতা অনুমিত হইতে পারে[৪] তেমনি মহারাজ বৈন্য-গুপ্তের তাম্রশাসনে তাঁহার কার্য্যত অধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হওয়াও গুপ্ত মাগধ সিংহাসনের বঙ্গে অধিকার লোপ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। মূল গুপ্তবংশের অবস্থা এসময়ে নিতান্তই শোচনীয়। ৫১০ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত ইরাণের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তদানীন্তন গুপ্তসম্রাট ভানুগুপ্ত রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধে বিব্রত ছিলেন। প্রায় সমকালে পূর্ব্বদেশে গুপ্ত নামা জনৈক মহারাজের অধিরাজরূপে গণ্য হওয়ায় মূল বংশের সহিত বৈন্যগুপ্তের সম্বন্ধ নির্ণয় অধিকতর প্রমাণ সাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গুপ্তান্তক নাম হইতে তাঁহার গুপ্ত রাজবংশের সহিত সম্পর্ক অনুমান বিশেষ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্ সম্পর্কে অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রমাণাবলী ব্যতীত একখানি বৌদ্ধ অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিশেষ আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। পুথিখানির নাম আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প। ইংরেজী ১৯২৫ খৃঃ অব্দে ত্রিবান্দ্রাম গ্রন্থমালায় আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রথম প্রকাশিত হয়।[৫] অধুনা পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন তিব্বত হইতে উহার একখানি তিব্বতীয় অনুলিপি সংগ্রহ করিবার পর স্বর্গত পণ্ডিত জয়শ্‌ওয়াল কর্ত্তৃক An Imperial History of India নামীয় একখণ্ড গ্রন্থে উহার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিগুলির সমন্বয়ে একখানি ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আচার্য্য জয়শ্‌ওয়ালের প্রচেষ্টা হইতে গ্রন্থখানির বিশাল ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার কথা অনুভূত হইলেও তাঁহার দেওয়া সকল ইঙ্গিতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

১। বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ ॥

২। Fleet: Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. iii., p. 141.

৩। প্রবাসী. ১৩৪৩, Indian Historical Quarterly. 1930 pp. 45-60.

৪। Mazumdar; Early History of Bengal.

৫। Trivendrum Sanskrit Series, No. lxxxiv, pp. 579-656.

আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যবহারের পক্ষে গ্রন্থখানি বহুল দোষযুক্ত সন্দেহ নাই। বস্তুত সর্ব্বাংশে উল্লিখিত বিবরণে যদিও বা কিছু ঐতিহাসিকতা থাকিয়া থাকে তাহাও ধর্ম্মনৈতিক ইন্দ্রজাল ও গ্রন্থকারের নানাবিধ দুর্জ্ঞেয় বিবৃতিভঙ্গিতে এমন আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, কোনও রূপ উপকরণকে প্রকৃত ইতিহাস সৃষ্টির পর্য্যায়ে ব্যবহার করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মন্তব্যাদি করিতে হইবে, নচেৎ বিষম ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু তৎকালীন ইতিহাস রচনার উপাদান যেহেতু নিতান্তই সামান্য. কয়েকখানি তাম্র ও শিলালেখ, অসংখ্য অর্থহীন মুদ্রা, বৈদেশিক ধর্ম্মান্বেষী ভ্রমণবীরগণের রচিত খানকয়েক ইতিবৃত্ত আদি যেহেতু কোন সুসম্বদ্ধ ইতিহাসের পর্য্যাপ্ত উপকরণ হইতে পারে না, সেই জন্যই খেয়ালী গ্রন্থকারের দুর্জ্ঞেয় ইঙ্গিতের ও বর্ণিত আখ্যায়িকাসমূহের আপাতদৃষ্ট অসম্বদ্ধতার জন্য একেবারে উপেক্ষা করিয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

বিশেষত গুপ্তরাজ-পণ্ডিতের শেষে মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে যেখানে মগধ হইতে বিল্লিষ্ট গৌরগণের পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, উহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়াই প্রতীত হয়। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মঞ্জুশ্রীমূলকল্প হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহাতে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে।

রাজন্যসমূহকে উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহাদের নামের আদ্যক্ষর কিম্বা প্রতিশব্দ মাত্র ব্যবহারের দরুণ তথ্যান্বেষীদিগকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। এই হেঁয়ালিজনক ব্যবহার মূলকল্পের অন্যতম ত্রুটি। গুপ্ত-রাজবংশ-পঙ্গী জনৈক শ্রীমান "উ"-তে আনিয়া গ্রন্থকার বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে এক অভিনব বিবরণ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

ততঃ পরেণ বিল্লেবতেবামন্যোন্যতেন্যতে।
মহাবিল্লেব নাহেতো গৌড়া রৌদ্র চেতবঃ॥[১]

গৌড় কোন্ দেশ? গৌড়গণ কাহারা? তৎপর ঈশানবর্ম্মার[২] হাড়াহাগ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়গণ সাগরতীরের অধিবাসী ছিলেন।

তৎপর সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উচ্চাভিলাষী পরাক্রান্ত গৌড়সম্রাট শশাঙ্কের অধীনে গৌড়গণ পশ্চিমে সুদূর কান্যকুব্জ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ-দেশান্তর্গত আধুনিক গঞ্জাম পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। প্রায় এই সময় হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী জাতীয় জীবনের এক নবচেতনার অভ্যুত্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। যেন একটা নিদ্রাচ্ছন্ন জাতির মহাজাগরণ, জীবনের সর্ব্বতোমুখী প্রকাশগুলির বিস্ময়কর স্ফুরণ। বঙ্গেতর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিল্লিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব-প্রতিভার স্ফুরণে বাংলা যে জাতীয় ধারায় আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারই শক্তিতে রচিত হইয়াছিল বৃহত্তর বঙ্গদেশ, বিপুল সাম্রাজ্য, অপূর্ব্ব শিল্প, বৈচিত্র্যময় সাহিত্য ও অচিন্তনীয় নৌবাণিজ্য। সাহিত্যের গৌড়ী রীতি, লিপির গৌড়ীয় ধারা, বাস্তু, ভাস্কর্য্য ও বিশেষ করিয়া দক্ষমৃত্তিকাময় শিল্পে বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশের মত রাজনীতিতেও বাংলার প্রতিভার এক বিচিত্র প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। নেতাকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে জাতি যে অধিকতর প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল সংশ্লিষ্ট রাজন্যগণের রাজনৈতিক দলিলগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং সমসাময়িক যুগে গৌড় বলিতে শুধু গৌড় বিষয়কে নিশ্চয়ই বুঝাইত না। এতাবৎকাল প্রমাণসহরূপে ইতিহাসে সর্ব্ব প্রথম শশাঙ্ককেই গৌড়দেশের রাজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।[৩] কিন্তু ইউয়ান-চোয়াঙ্গের মতে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা।[৪] আবার তাঁহারই মতে কর্ণ-সুবর্ণ বর্ত্তমান বাংলার ভৌগলিক পরিবেশের মধ্যে ৪৪৫০ লি পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র—সমুদ্রের সহিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের সুদীর্ঘ ব্যবধান সমতট ও তাম্রলিপ্তি রাজ্যান্তর্গত। শশাঙ্ক নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তিরও অধীশ্বর ছিলেন। হাড়াহা শিলালেখ হইতেও জানা যায়, গৌড়গণের অধিকার সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। গৌড় নামীয় কোন রাজ্যের অস্তিত্বের কথা চৈনিক পরিব্রাজক জ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগের কথাই জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট ব্যতিত চতুর্থটি পুণ্ড্রবর্দ্ধন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের অন্যতম রাজধানী বলিয়া মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] মাত্র সমতট সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ সন্দেহ ব্যতিত বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গের তদানিন্তন সমগ্র ভূভাগই শশাঙ্কের অধীন ছিল ও সম্ভবত গৌড়নামে খ্যাত ছিল। সম্ভবত এই চারিটি (স্বয়ং শাসিত?) সমষ্টি সমন্বিত বিশাল বঙ্গদেশই ছিল বৃহত্তর গৌড়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ইউয়ান-চোয়াঙ্গের নিকট গৌড়দেশের অস্তিত্ব অজ্ঞাত। এই হেতু মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'গৌড়তন্ত্র' এই নামে গৌড়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[৬] কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তার মৃত্যুর পরও বাংলার চৈনিক পরিব্রাজক কোন অরাজকতা দেখেন নাই, কিন্তু দেশ হর্ষবর্দ্ধনেরও অধীনস্থ হয় নাই। এই সকল বিবরণ হইতে ইহা মনে করিলে হয়ত বিশেষ ত্রুটি হইবে না যে, গৌড় বলিতে সমগ্র বঙ্গীয় রাজ্যসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত দেশ, রাজনৈতিক কারণে যাহারা কোনও এক নেতার অধীনে একত্রিত হইয়াছিল। ইহাই মূলকল্পের গৌড়তন্ত্র, এবং সেই নেতার তীরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই হেতুই সমগ্র দেশে অরাজকতা দেখা দেয় নাই। এই অনুমান সত্য হইলে রাজনৈতিক চেতনার দিক হইতেও বাংলার এই যুক্তরাষ্ট্র (federation) এক অচিন্তনীয় ব্যাপার বলিয়া স্বীকার না করিবার উপায় থাকিবে না।

১। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, Trivendrum, পৃঃ ৬৩১।

২। Epigraphica Indica, vol. xiv, p. 117.

৩। Dr. R. C. Majumdar: Early History of Bengal; স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুরের গৌড়রাজমালা।

৪। Wyatters on Uan-chewang.

৫। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে (ত্রিবান্দ্রাম) পৃঃ ৬৩৪। ৬। ঐ, পৃঃ ৬৩৬।

দুর্ভাগ্যবশত গৌড়মণ্ডলের মধ্যে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি-আদি হইতে জ্ঞাত ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের কালনির্দ্ধারণের জন্য, অক্ষরতত্ত্ব বিচার ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। বৈন্যগুপ্তের তাম্রলিপির আবিষ্কার স্থলের (ত্রিপুরা জিলার নিকটস্থ গুনাইগর গ্রাম) অবস্থিতি হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজা বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন।[১] নালন্দায় বৈন্যগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা বহুদিন হইল আবিষ্কৃত হইলেও ইহার পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় ইহাকে নালন্দা পর্য্যন্ত বৈন্যগুপ্তের রাজ্যের বিস্তৃতির প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে নাই। কিন্তু অধুনা এই প্রবন্ধের খসড়া রচিত হইবার পর মল্লসারুলে আবিষ্কৃত মহারাজ গোপচন্দ্রের যে তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে,[২] উহাতে এ যুগের ইতিহাসে এক নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে। এই শাসনে উল্লিখিত বর্দ্ধমান বিষয়াধিপতি সামন্তরাজ বিজয় সেন ও বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে দূতকরূপে বর্ণিত মহারাজ বিজয় সেন একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। নালন্দায় আবিষ্কৃত শিলমোহর, মল্লসারুল তাম্রশাসন ও বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন হইতে বৈন্যগুপ্তকে সমগ্র বঙ্গদেশ (গৌড়) ব্যাপী অধিরাজ বলিয়া মনে করা আর কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত পার্জিটারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে ফরিদপুর তাম্রশাসনোক্ত মহারাজাধিরাজগণের কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থাংশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।[৩] ইঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনও রাজার নাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমান সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। পণ্ডিত ডক্টর বসাকের মতে ইঁহারা নিতান্তই পূর্ব্ববঙ্গীয় নৃপতি ছিলেন।[৪] কিন্তু ডক্টর বসাক ইঁহাদের মধ্যস্থ গোপচন্দ্র ও মঞ্জুশ্রীকল্পোক্ত গোপখ্যকে এক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[৫] মূলকল্পোক্ত গোপখ্য (৬৩৭ পৃঃ) ও গৌড়রাজ গোপালক (৬৩১ পৃঃ) একই ব্যক্তি। গৌড়-রাজ গোপালক যে 'অ'কারাখ্যকে শৈশবে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন,[৬] তাঁহার মৃত্যুর পর অরাজকতার কালে সেই শিশু জনৈক ভাগবত কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'হ'কারাখ্য কর্ত্তৃক মগধের সিংহাসনাভিষেক বর্ণনা কালে মূলকল্পে তাঁহাকেই গোপাখ্য বলিয়াছিলেন। ডক্টর বসাকের মত ও মঞ্জুশ্রীকল্পের প্রমাণানুসারে গোপচন্দ্রকে গৌড়েশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অধুনা মল্লসারুল শাসন আবিষ্কারের পর তাঁহাকে আর কেবল মাত্র পূর্ব্ববঙ্গীয় রাজা বলিয়া বর্ণনা করা চলিবে না।

গোপচন্দ্র[৭] যে ধর্ম্মাদিত্যের পর তাঁহারই রাজ্যাংশের অধিকারী হইয়াছিলেন ইহাতে মতদ্বৈধ নাই এবং অনেকের মতে ইঁহারা একই বংশজাত।[৮]

ধর্ম্মাদিত্য ও বৈন্যগুপ্তের মত প্রারম্ভে মাত্র মহারাজরূপেই অভিহিত ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের মতে তিনিই প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌম রাজারূপে পরিচিত হইবার প্রয়াস পান। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বৈন্যগুপ্ত ফরিদপুর শাসনাবলী হইতে জ্ঞাত মহারাজাধিরাজগণ ও শশাঙ্ক একই বংশজাত।[৯] মল্লসারুলে আবিষ্কৃত গোপচন্দ্রের শাসন হইতে মহারাজ বিজয় সেনের নামের সামঞ্জস্যে অন্তত গোপচন্দ্রের সহিত বৈন্যগুপ্তের নিকট-সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। ভবিষ্যতের আবিষ্কৃত প্রমাণাবলীতে ডক্টর ভট্টশালীর অনুমান যে দৃঢ়ীভূত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে ধর্ম্মাদিত্যের নাম 'গোপালকের' পূর্ব্বগামী গৌড়-রাজগণের নামের প্রদত্ত আদ্যক্ষরসমূহ হইতে অনুমান করা না গেলেও লিপিকরপ্রমাদে 'ধ'='দ' এ (গোপালকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি) পরিণত হইবার সহজ সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম্মাদিত্য তিন বৎসর মহারাজরূপে রাজত্ব করিবার পর কোনও সময় মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াসের কারণ অনুমান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, উহা বস্তুত আকস্মিক নহে। মহারাজাধিরাজ ভানুগুপ্তের পর আর কোনও গুপ্তনামা মহারাজাধিরাজের উল্লেখ একমাত্র দ্বিতীয় গুপ্তরাজ বংশের ভিন্ন অন্য কোনও দলিলে পাওয়া যায়না। মূল রাজবংশের তিনিই বোধহয় শেষ সর্ব্বগ্রাহ্য একচ্ছত্র নরপতি। ৫১০ খৃঃ অব্দের পরে কোনও সময়ে তাঁহার মৃত্যুর পর হয় ত বা গুনাইগর তাম্রশাসন হইতে জ্ঞাত বৈন্যগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। মূলকল্পের মতে জনৈক জনপ্রিয় রাজার নামের আদ্যক্ষর ছিল 'ভ'।[১০] তিনি চিররুগ্ন ছিলেন। ভানুগুপ্ত কি স্বাস্থ্যহীনতাবশত বৈন্যগুপ্তকে প্রতিভূরূপে পূর্ব্ব দেশ শাসন করিতে দিয়াছিলেন? গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর দুর্ব্বার বেগে যশোধর্ম্মদেব যখন বিজয়াভিযানে লৌহিত্য[১১] পর্য্যন্ত ভূভাগ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন সেই ৫৩৩ খৃঃ অব্দে সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যই বৈন্যগুপ্তের মত গৌড়দেশের সামন্তরাজ ও উপরিকগণের অধিরাজ ছিলেন। এই তীব্র অভিযানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় বন্ধন নিশ্চিতই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, গৌড়দেশীয় নৃপতিগণ বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া পড়িলেও এতকাল পূর্ণ সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন নাই, এইবার চ্যুতশক্তি মাগধবংশ সম্ভবত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে ইঁহারা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতে আর কোন অন্তরায়

১। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক—The History of North-Eastern India. 182-3.

২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৪, প্রথম সংখ্যা।

(শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার)

৩। Ind. Ant., 1910. ৪। বসাক-Hist. of N.-E. India ১৮৭, ৫। ঐ, ১২. ৬। মূলকল্প ১৬৩৭ ৭। Ind., Ant 1910 বসাক—Hist. of N.-E. India, ১৯১.

৮। Epigraphica. Indica . vol.No. 11, 84.

৯। . Epigraphica. Indica. Vol. xviii, II, p. 84.

১০। মূলকল্প, ৬৩১।

১১। Fleet : C. I. I., vol. iii.

দেখিলেন না। যশোধর্ম্মদেব লৌহিত্য তীর পর্য্যন্ত অভিযান করিলেও এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দত্তগণকে১ উৎপাত করিলেও সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যের মূলশক্তি-কেন্দ্রে আঘাত করেন নাই এবং দিগ্বিজয়ান্তে দেশে প্রত্যাগত হইয়া যখন তিনি ইরাণের প্রস্তরগাত্রে দিগ্বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করাইতেছিলেন তখনই হয়ত সমগ্র বঙ্গদেশকে তাঁহার প্রভাব মুক্ত করিয়া ধর্ম্মাদিত্য আপনাকে সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছিলেন।

এই সূত্রে দুইটি কথা বলিতে হইবে। বিষ্ণুগুপ্ত নামীয় যে মুদ্রায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এলেন গুপ্তবংশীয় রাজগণের মুদ্রার তালিকায় তাঁহার বিক্রমচন্দ্রাদিত্য২ পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মাদিত্যও হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অধুনা ধর্ম্মাদিত্য নামীয় গৌড়-রাজের কথা জানিতে পারায় নূতন করিয়া মুদ্রার লেখাই পাঠ করিলে উহাকে স্বতই ধর্ম্মাদিত্য পড়িতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, ধর্ম্মাদিত্য সার্ব্ব-ভৌম উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করাইবার কালে তাঁহার গুপ্ত নাম বিষ্ণুগুপ্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন ও যশোধর্ম্মের প্রভাব হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে মুক্ত করিয়া আপনার কোনও সন্তানকে তথায় উপরিক মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম দামোদরপুর তাম্রশাসনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সম্ভবত নূতন সম্রাটকে তাহার গুপ্ত নামেই অভিহিত করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, কারণ এতাবৎ সাক্ষাৎভাবে গুপ্ত সম্রাটগণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় দামোদরপুরে উহাই প্রচলনে (tradition) দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সম্মিলিত গৌড়দেশের ধর্ম্মাদিত্যই সম্ভবত প্রথম সম্রাট। ৫৩৩ খৃঃ অব্দের দুর্য্যোগের পর প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গে অধিকার রক্ষা করিবার মত কোনও কেন্দ্রীয় গুপ্ত সম্রাটের অস্তিত্ব মগধে কিম্বা আরও পশ্চিমে কোথাও ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং ধর্ম্মাদিত্যের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণের সময় হইতেই বাংলার এই নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই নবীন বাংলাই উত্তরোত্তর শ্রী ও সম্পদমণ্ডিত হইয়া উত্তরকালে শশাঙ্কে কান্যকুব্জ ও ধর্ম্মপালে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত সুবিশাল গৌড় সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে সামান্য ছেদসম্বলিত বাংলার এই দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাস এক ও অখণ্ড বাংলার সর্ব্বতোমুখী স্ফুরণের একৈক ইতিহাস মাত্র।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন ও ৫৪৩ খৃঃ অব্দের দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অনুসরণে প্রাপ্ত সুসম্বদ্ধ রাজ্যশাসনপ্রণালী ভিন্ন ধর্ম্মাদিত্য সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। সম্ভবত মহা-রাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের এক স্বপ্ন উত্তরাধিকার-সূত্রে (?) গোপচন্দ্রে সংক্রামিত করিয়া দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে শাসনভার বহন করিয়া ৫৫০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গোপচন্দ্র সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্যের পুত্র বা পুত্রস্থানীয় উত্তরাধিকারী। গুপ্তনাম ও বিরুদের মোহ গৌড়-সম্রাট-পরিবার হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া-গেলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ পরবর্ত্তী মাগধ গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য স্রষ্টা আদিত্যসেনেরও ঐ মোহ ছিল না। গুপ্তবংশাবতংশ হইলেও গৌড় সম্রাটগণ জন্মভূমি গৌড়দেশকেই আপন মাতৃভূমি জ্ঞানে সেবা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবগণের মতই তাহারা বাঙালী, তথা গৌড়ীয় হইয়া গিয়াছিলেন।

গোপচন্দ্রের শাসনকালে বাংলায় কোন অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যায় না, অন্যদিকে সম্ভবত তাঁহার রাজ্যকালেই সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্নে বিভোর হইয়া গৌড়গণ প্রতিবেশী মৌখরী রাজ্যসীমা আক্রমণ করিয়াছিল।৩ আক্রমণ ফলপ্রসূ হইল না। স্রোত মৌখরী প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু নবোন্মেষিত যৌবনের দুর্ব্বার শক্তি অবনমিত হইল না, গৌড়ী সেনা সুদূর চালুক্য সাম্রাজ্যের৪ দ্বার-সীমায় করাঘাত করিয়া দক্ষিণী রাজ-পুঙ্গবকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল। এ সংগ্রাম হয়ত বা মাত্র দিগ্বিজয়ের লোভ, হয়ত বা উন্মুখ যৌবনের স্রোত রোধ করিতে না পারিয়া একটা কিছু করিবার মোহ—কে যানে হয়ত বা কোন ফল লাভও হইয়াছিল, গ্রহণযোগ্য প্রমাণাভাবে যাহা আমরা বলিতেও পারি না।

ইহাই ইতিহাস। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে গোপচন্দ্র একজন ক্ষণজন্মা নরপতি।৫ দীর্ঘ একবিংশ বৎসরের রাজত্বের পর আনুমানিক ৫৫৭ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাচারদেব নামাঙ্কিত চতুর্থ ফরিদপুর তাম্রশাসন ও কতিপয় মুদ্রাব্যতীত তাঁহার ইতিহাস রচনার আর কোনও উপকরণ না মিলিলেও অক্ষর বিচারে মনে হয় তিনি গোপচন্দ্রের পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন—হয়ত বা গোপচন্দ্রের পুত্র বা পুত্রস্থানীয় কোন আত্মীয়। তিনিও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন—তাম্রশাসন হইতে তাহার রাজ্যকালেও কোন অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ পাওয়া যায় না।

আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গোপচন্দ্রের পরবর্ত্তী ইতিহাসে এক নূতন আলোকসম্পাত করিতেছে। সেই আলোকে গোপচন্দ্রের পর গৌড়মণ্ডলে এক বিপ্লবের সন্ধান পাওয়া যায়—যে বিপ্লব বৈদেশিক আক্রমণজাত।

গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে কোন গোলযোগের সন্ধান না পাইলেও—তৎকর্ত্তৃক এক রাজপুত্রের শৈশবে বন্ধন ঘটিয়াছিল আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

আক্রমণকারী রাজার নাম মূলকল্প হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ঐ পুস্তকে প্রভাবিষ্ণু নামী বঙ্গ বীরের উল্লেখ হইতে মনে হয়, উহা একটি উপাধি কি গ্রন্থকারের প্রিয় কোন বিধায়ক। প্রভাবিষ্ণু গৌড় আক্রমণ করিয়া ভাগবতকে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে নবাভিষিক্ত রাজা ভাগবত গোপচন্দ্র কর্ত্তৃক আবদ্ধ শিশুকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু ভাগবতের অদৃষ্টে অধিক দিন

১। ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী : Political History of Ancient India.

২। Allen Catalogue of the Gupta Coins.

৩। Ep. Ind., vol. xiv,—p 110. ff.

৪। V. A Smith : Early History of India.

৫। মূলকল্প—৬৩১।

গৌড়রাজ্য ভোগ ছিল না। তিন বৎসর পরেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে গৌড়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন তাঁহার নামের আদ্যক্ষর 'স'। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বিবরণ সত্য হইলে মনে হয়, সমাচারদেবের সিংহাসন লাভ তিন বৎসর বিলম্বিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের গৌড়রাজ্যে প্রাধান্যলাভে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পরে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের পীড়ন এই ব্রাহ্মণপ্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে।

অধিকন্তু এতৎ বিপ্লব সম্পর্কে বঙ্গে নাগগণের অভ্যুদয়ের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয়, পার্শ্ববর্ত্তী কোনও রাজ্যখণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিস্তৃত নাগ-বংশধরগণের কোনও এক অংশ গৌড়ের শ্যামল তৃণশস্য-সম্বলিত ভূখণ্ডের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল; এইবার পরাজিত হইয়াও তাহারা নিবৃত্ত হয় নাই। উত্তর কালে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাহাদের নায়ক জয়নাগ গৌড়ের এক অংশ জয় করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। মূলকল্পের এই উক্তি বপ্যঘোষবাট তাম্রশাসন হইতে সমর্থিত হইতেছে।

প্রভাবিষ্ণু ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজার অধীনতা পাশ মুক্ত হইয়া গৌড় আবার স্বাধীন হইল। সমাচারদেবের দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের কথা তাঁহার নামাঙ্কিত তাম্রলিপি হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে কোনও সময় তাঁহার রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। আর বিপ্লব নহে, শশাঙ্কের 'গৌড়তন্ত্রের' মহারাজাধিরাজ আখ্যালাভে কোনও বহিঃশত্রু প্রশ্ন করিল না। ৭০৩ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও সময় মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের "সোমাখ্য", হর্ষচরিতের গৌড়-রাজ নরেন্দ্রগুপ্ত বা শশাঙ্ক, ইউয়ানচোয়াঙের কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক, কান্যকুব্জ-বিজয়ী শশাঙ্ক আকলিঙ্গবিস্তৃত গৌড়তন্ত্রের অধীশ্বর শশাঙ্ক সিংহাসন আরোহণ করিলেন। বঙ্গেতিহাসের আর এক নবপর্য্যায় আরম্ভ হইল।

পুস্তকে

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

তুমি এই বইখানি দিয়াছিলে পড়িবারে
বড় না কি লেগেছিল ভাল!
তোমার চিঠির স্পর্শ আখরে আখরে মাখা
কয় কথা ওই আঁখি কালো।
পড়িতে পড়িতে ভাবি বুলায়ে নয়ন মোর
অক্ষর রচিত উর্ণ জালে,
—যে ফাঁদে পড়েছে ধরা তোমার মুগ্ধ হিয়া
সে বাঁধনে আমারে জড়ালে।
যত পড়ি লাগে ভাল, তোমারে নিকটে পাই,
কেতাবের কথা যাই ভুলে,
অক্ষরের ফুলে ফুলে মক্ষিকার মত আসি
মধুকণা লই যেন তুলে।
সে মধু পরাণে তব ছিল যেন সঙ্গোপনে
পুষ্পপুটে রেখেছিলে ঢেলে,
পুঁথিটির পত্র হ'তে লক্ষ প্রজাপতি সম
উড়ে এস কম্প্রপক্ষ মেলে।
প্রতি ছত্র পরিণত হয় যেন পরিচ্ছেদে
প্রতি পৃষ্ঠা পুঁথি হ'য়ে যায়,
কেতাব ফেলিয়া দিয়া রচি নব উপন্যাস
আঁখি মুদি—তোমায় আমায়।
নায়ক নায়িকা দোঁহে অলিখিত গীতিকাব্যে
স্বপ্নলোকে অভিনয় তার,
রঙ্গমঞ্চে নটনটী তুমি আর আমি শুধু
রঙ্গালয়ে জটলা তারার।
ইহকাল পরকাল কত জন্মজন্মান্তর
সেথায় করেছে যেন ভিড়,
অভিনেতা অভিনেত্রী আদি অন্তহীন কালে
বিরহ-মিলনে সুনিবিড়।
লোকে লোকে জন্মে জন্মে আলো আর অন্ধকারে
গেঁথে চলে জীবনের মালা,
অফুরন্ত দৃশ্যপট অনন্ত বৈচিত্র্যময়
চিরন্তন যুগলের পালা।
ক্ষুদ্র এই পুস্তিকায় তুমি কি করেছ পাঠ
অপূর্ণ কাহিনী আমাদের?
আমারে পড়িতে দিয়া বুঝাইলে লীলাচ্ছলে
এ-পুঁথির বাকী আছে ঢের?
এস তবে এস কাছে রাখি মোর হাতে হাত
শুধু ব'সে থাক চুপ করি,
নীরবে নিঃশব্দে মোরা কায়মনে অনুভবে
এই শূন্য পুঁথিটিরে ভরি।
যদি প্রাণ চায় তব একটি চুম্বন পরে
যবনিকা পড়ুক হেথায়,
ত্রিদিব-সঙ্গীত সনে খুলুক সে যবনিকা
নব জন্মে নূতন অধ্যায়।



যশোহরে উচ্ছ্বসিত কপোতাক্ষ নদের বন্যায় ঝিকারগাছা বাজার জলমগ্ন



অমৃতবাজারের প্লাবন দৃশ্য ; সমগ্র গ্রাম জলমগ্ন

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ধর্ম্মঘট



সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ধৃত ছাত্রবৃন্দ ; জামীনে মুক্তির পর



কলিকাতা কলেজ ধর্ম্মঘট। রাষ্ট্রপতির ভ্রাতুষ্পুত্র পুলিশের লাঠি-চালনার প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন

খেলা ধুলা

অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ব্রিসবেনে ১০ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ৪-৪ গোলে অমীমাংসিত হ'য়ে শেষ হয়েছে। প্রথমার্দ্ধে আই এফ এ দলের দ্রুততা, নৈপুণ্য ও আদান-প্রদান বিপক্ষদল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয়রা ছ'টি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হয় না।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের চতুর্থ মিনিটে সুন্দর আদান-প্রদানের পর নুরমহম্মদের পাশ থেকে রহিম প্রথম গোল দেয়। এক মিনিট পরেই করুণা ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় গোল করে। একটু পরে অষ্ট্রেলিয়া হেড ক'রে একটি গোল শোধ দিতে পারে। উনিশ মিনিটে নুরমহম্মদ অতি দর্শনীয় একটি গোল দেয়।

অষ্ট্রেলিয়া ভীষণ চেপে ধরে এবং পঁচিশ, ছাব্বিশ ও আটাশ মিনিটে পর পর তিনটি গোল দেয়। পুনরায় ভারতীয় দল খেলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তেইশ মিনিটে লামস্‌ডেন চতুর্থ গোলটি দিলে ফল সমান সমান হয়।



নুরমহম্মদ কে ভট্টাচার্য্য রহিম

অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় গোলটি অবিসম্বাদী অফসাইড থেকে হয় এবং বল গোল লাইন অতিক্রম না করতেই চতুর্থ গোলটির নির্দেশ দেওয়া হয়। কে দত্ত ঐ বিষয়ে রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন, 'the matter was now beyond all decision'.

ভারতীয়দের খেলার দ্রুতগতি বিশেষ দর্শনীয় হয়েছে, তারা সট্‌ পাশিং করে খেলেছে।

আই এফ এ ঃ—কে দত্ত; রেবেলো ও জুম্মা খাঁ; নন্দি, বি সেন ও প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, আর লামসডেন, কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন) ও প্রসাদ।

তৃতীয় টেষ্ট পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় খেলার মোট ফলাফল ঃ

খেলা	জয়	পরাজয়	ড্র	পক্ষে	বিপক্ষে
১০	৫	৪	১	৪১	৩৩

গোলদাতা ঃ—লামস্‌ডেন ১৮, রহিম ১৩, কে ভট্টাচার্য্য ৬, প্রসাদ ২, নুরমহম্মদ ২।

আই এফ এ দলের বিজয় ঃ

আই এফ এ ৭-৬ গোলে কুইন্সল্যাণ্ডকে হারিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াতে এটি তাদের দ্বিতীয় বিজয়। প্রথমার্দ্ধে তারা ৫-১ গোলে অগ্রগামী থাকে। ভট্টাচার্য্যের অপূর্ব্ব কৌশলপূর্ণ আদান-প্রদানের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পায়ে আঘাত পেয়ে অবসর নিলে, জোসেফ তার স্থলে খেলে তখন খেলার গতি বদলে যায়, কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে ৫টির মধ্যে ৩টি গোল দেয় বুটেন সাত মিনিটে একটি পেনালটি থেকে। ভারতীয়রা সকল বিভাগেই উৎকর্ষতা দেখিয়েছে। রহিম ৪টি ও লামসডেন ৩টি গোল করে। খেলা হয়েছিল রাত্রি আটটায় ফ্লাড লাইটে।

• আই এফ এ দল ৫-২ গোলে ইপিস্‌উইচ্‌ দলকে হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় তৃতীয়বার বিজয়ী হয়েছে। ইপিস্‌উইচ্‌ দলে

ছ'জন ইণ্টার-ষ্টেট ও পাঁচজন ইণ্টার-ন্যাসনাল খেলোয়াড় ছিল। এই বিশেষ শক্তিশালী দলটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দলই উৎকৃষ্ট খেলেছিল। নুরমহম্মদ প্রথম, লামস্‌ডেন দ্বিতীয় ও রহিম তৃতীয় গোল করলে প্রথমার্দ্ধে ভারতীয়রা ৩-১ গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অষ্ট্রেলিয়াদের আক্রমণ বেগ প্রবল হলেও তারা কিন্তু গোল করতে পারে না। লামস্‌ডেন পুনঃ পুনঃ বিপক্ষ গোলে হানা দেয় এবং শেষ দু'টি গোল সে-ই দেয়।

আই এফ এ : কে দত্ত; রেবেলো ও দাশগুপ্ত, নন্দি, বি সেন ও বিমল মুখোপাধ্যায়; নুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, প্রেমলাল ও সতু চৌধুরী।

আই এফ এর চতুর্থ বিজয় হয়েছে কুইন্সল্যাণ্ডকে ফিরতি খেলায় ৫-২ গোলে হারিয়ে। গোল দেয় লামস্‌ডেন প্রথম দু'টি, ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় দু'টি, ও রহিম শেষ একটি। সকল বিভাগেই ভারতীয়রা উৎকৃষ্ট খেলে এবং তাদের লক্ষ্য সন্ধানের উন্নতি দৃষ্ট হয়। বিরুদ্ধ আবহাওয়া, শক্ত মাঠ ও খেলার সময়ের বৃদ্ধির অসুবিধা অনেকাংশে তারা অতিক্রম করতে পেরেছে ব'লে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রথম গোলটি পেনালটি থেকে হয়। দু'টি গোলই ইয়ং শোধ দেয়।

আই এফ এ : কে দত্ত; রেবেলো ও দাশগুপ্ত; বি মুখার্জ্জি, বি সেন ও প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, কে ভট্টাচার্য্য ও এস চৌধুরী।

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ফুটবল টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড থেকে যে অবৈতনিক খেলোয়াড় দল অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্ব্বে খেলতে যায়, তাদের টেষ্ট খেলার ফলাফল হয়েছিল :—

প্রথম টেষ্ট :—অষ্ট্রেলিয়া ৫ : ইংলণ্ড ৪

দ্বিতীয় টেষ্ট :—ইংলণ্ড ৪ : অষ্ট্রেলিয়া ০

তৃতীয় টেষ্ট :—অষ্ট্রেলিয়া ৪ : ইংলণ্ড ৩

অষ্ট্রেলিয়া ২-১ ম্যাচে জয়ী হয়েছিল।

কুচবিহার কাপ ঃ

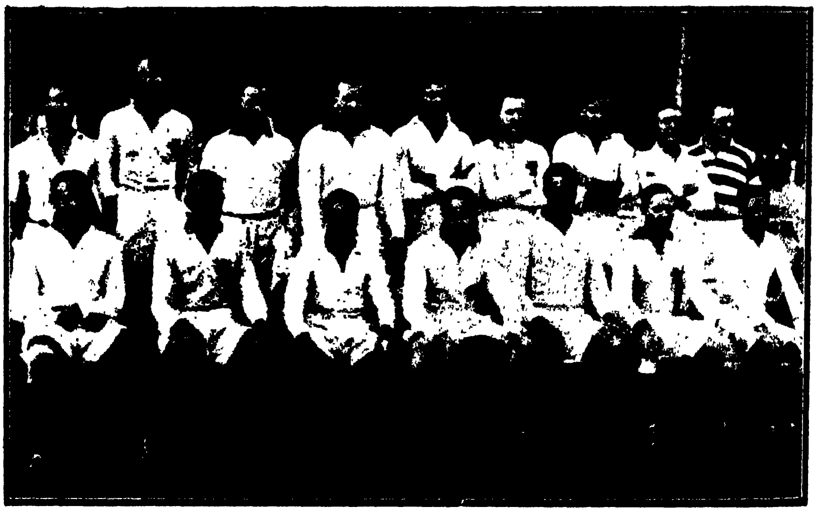
ই বি আর দল ৩-০ গোলে ভবানীপুরকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছে। ই বি আর ১৯৩০ সালে প্রথম বার এই কাপ বিজয়ী হয়েছিল। গত বৎসর টাউন ক্লাব বিজয়ী ছিল। সামাদ ১টি ও এন মজুমদার ২টি গোল দেয়। মজুমদারের একটি গোল অফসাইড থেকে হয়। প্রথম দিনের খেলা শূন্য গোলে ড্র হয়েছিল।

রোনাল্ডসে শীল্ড ঃ

ঢাকা ফার্ম্ম ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ওয়ারীকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছে।

বেল কাপ ঃ

ই বি আর পাওয়ার হাউস ২-১ গোলে রেঞ্জার্সকে পরাজিত ক'রে বেল কাপ বিজয়ী হয়েছে।



রাগবী ইণ্টার-ন্যাসনাল বিজয়ী ইংলণ্ড দল—স্কটল্যাণ্ডকে ১৭-৮ পয়েণ্টে পরাজিত করেছে ছবি—জে কে সান্যাল

রোভার্স কাপ ঃ

বাঙ্গালোর মুসলিম ১৯৩৮ সালেও রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছে আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে।

খেলার গতি অনুযায়ী আর্গাইল দলেরই জয়ী হওয়া উচিত ছিল। অধিকাংশ সময় তারা দশজনে খেলতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ, ইন্‌-সাইড লেফট ক্যাম্পবেল সতর্কিত হ'লে রেফারির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে এবং তজ্জন্য মাঠ থেকে বিতাড়িত হয়। শেষ দশ মিনিট এরূপ ভীষণ প্রতিযোগিতা

হয়, যা' বোম্বাইয়ে বহুদিন দৃষ্ট হয় নি। আর্গাইল মুস্লিম রক্ষণভাগকে বিপর্য্যস্ত উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তোলে ঝড়ের গতিতে, তাদের দু'টি অত্যাশ্চর্য্য সট্ মধ্যবারে লেগে ফিরে আসে এবং একটি সামান্যর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বাঁশী বাজবার ঠিক পূর্ব্বে দেখা যায় যে, পাঁচ ছয় জন আর্গাইল বিপক্ষ গোল লাইনের সুমুখে গোল দিতে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়েছে।



কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়—শত মিটার সন্তরণে নিজ রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে। সময় —১ মিঃ ২৮⅘ সেঃ

মুসলিম দলের খেলা তুলনায় নিকৃষ্ট হ'লেও, তারা গোলের মুখে বেশী কার্য্যকরী হওয়ায় জয়ী হয়েছে। গোল দিয়েছে করিম, কাদের আলি ও স্বামীনাথম্।

গতবার বাঙ্গালোর মুসলিম ১-০ গোলে কলিকাতার মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিল।

বাঙ্গালোর মুসলিম ফাইনালে উঠেছে—বি বি এণ্ড সি আইকে ৩-২, দিল্লী কম্পানিয়নকে ৩-০, হাওড়া ইউনিয়নকে ১-১, ১-০, লিন্‌কন্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে। আর্গাইল্‌স্ ফাইনালে পৌঁছিয়েছে—আফ্‌গান ফুটবল ক্লাবকে ৪-০, ইয়ং গোয়ান্সকে ১-০, দিল্লী ইয়ংমেনকে ২-১, চেশায়র্সকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে

মেডিকেল কলেজ ২-০ গোলে বঙ্গবাসী কলেজকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

সন্তরণ ঃ

২রা সেপ্টেম্বর, ৯টা ২২ মিনিটে রবীন চট্টোপাধ্যায় অবিরাম দীর্ঘ সন্তরণে রেকর্ড স্থাপন উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের যোগীঘাট থেকে কাশীর অসিঘাট পর্য্যন্ত সন্তরণ করেছেন। এই ১৮৩ মাইল জলপথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে ৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। তাঁকে বিষম দুর্য্যোগের মধ্যে সন্তরণ করতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘ অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড, লস্ এঞ্জেলসে পেড্রো ক্যাণ্ডিয়েডির কিঞ্চিদধিক ৮৭ ঘণ্টায় ২১০ মাইল সন্তরণ।



রবীন চট্টোপাধ্যায়

ব্রাডম্যানের ক্রিকেট জীবন ঃ

ব্রাডম্যান তাঁর 'My Cricketing Life' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, "কেউ আমাকে ক্রিকেট খেলতে শিক্ষা দেয় নি। আমি কখনও কারো কাছে শিক্ষা নিই নি, আমি নিজেই শিখেছি।" ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাসেক্স বোলার মরিস্ টেট্ তাঁকে অষ্ট্রেলিয়াতে বলেছিলেন,—'Don, learn to play a straighter bat before you come to England. If you don't, you will never get many runs.' এই বইতে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে; হ্যামণ্ড সম্বন্ধে লিখেছেন, হ্যামণ্ড সর্ব্বোৎকৃষ্ট অল্ রাউণ্ডার।



হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড বিজয়ী মেডিকেল কলেজ দল
মধ্যে প্রিন্সিপাল লেঃ কঃ বয়েড

ছবি—জে কে সান্যাল

কন্‌ষ্টাইন্‌ সম্বন্ধে বলেছেন, উইকেটের নিকটে সে চমৎকার ফিল্ডার। বডি লাইন বোলিং সম্বন্ধে,—"Those who



সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব স্পোর্টসের ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং প্রতিযোগিতার বিজয়ী অজিত রায় (ন্যাসনাল) ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং বিজয়ী আশু দত্ত (বামে) ছবি—জে কে সান্যাল

are in charge of the welfare of cricket must preserve its traditional beauty by confining the rivalry to bat and ball."

ব্রাডম্যানের পিতা ছুতার ব্যবসায়ী। তাঁর তিনটি বোন ও একটি ভাই আছে, তারা বেশ লম্বা—তাঁর মতন ছোট নয়।



ন্যাসন্যল সুইমিং স্পোর্টসের ১৫০০, ৪০০, ২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল বিজয়ী দুর্গাদাস

জবাকুসুম কাপ ঃ

পুলিস ১-০ গোলে রবার্ট হাডসন দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ঃ

বেঙ্গল কেমিক্যাল ৪-০ গোলে কাষ্টমস্‌ রিক্রিয়েশনকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। গতবার বি জি প্রেস বিজয়ী ছিল।

মহিলা বাস্কেট বল লীগ ঃ

মেয়েদের প্রথম বিভাগের বাস্কেট বল লীগ চ্যাম্পিয়ন এবারও ওয়াণ্ডারার্স হয়েছে ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে। ব্লু বার্ড ১২ ও গ্রেল ক্লাব ১০ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগ 'এ' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্রেল ক্লাব এবং 'বি' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চক্রধরপুর অর্ডিন্যান্স ব্লুকে মীমাংসা খেলায় পরাজিত করে।

সীড্‌নে বার্ণস্‌ ঃ

পুরাকালের ইংলণ্ডের টেষ্ট বীর সীড্‌নে বার্ণস্‌ ছেষট্টি বৎসর বয়সে এখনও শক্ত আছেন। এ বৎসর ব্রিজনর্থ স্রপ্‌সায়ার ক্লাবের হ'য়ে ১৮টি খেলায় তিনি ১০২ উইকেট এভারেজ ৬·৮ রানে নিয়েছেন। এখনও সপ্তাহের প্রত্যেক দিন খেলেন এবং দু'দিন বৈকালে একাদিক্রমে বল করেন।

প্রথম টেষ্ট সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মতামত ঃ

অষ্ট্রেলিয়ায় ফুটবল প্রথম টেষ্ট সম্বন্ধে সেখানের কয়েকটি সংবাদপত্রের মতামত থেকে দেখা যায়, ভারতীয়রা পরাজিত হ'লেও তাদের নূতন ধরণের ক্রীড়াকৌশল দেখে সে দেশবাসী বিস্মিত হয়েছে।

Courier-Mail—* * * The result was a triumph for the more robust type of Australian fooball pitted against speedy, tricky, but more conventional positional play.



প্রফুল্লকুমার ঘোষ (চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু) মধ্যে, নরেন ঘোষ (জীবন রক্ষক) বামে, বি কে দাস (ডাইরেক্টর) দক্ষিণে, মোটর যোগে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করেছে, সেখানে প্রফুল্লকুমার ইংলিস চ্যানেল পার হ'তে চেষ্টা করবে



বিভিন্ন স্পোর্টসের শত মিটার ফ্রি ষ্টাইল ও ব্যাক ষ্ট্রোক বিজয়ী রাজারাম সাহু ছবি—জে কে সান্যাল

Sydney 'Sun' লিখেছে—

The forwards, especially Prosad, were thorns in the sides of Australian backs, Henwoon and Evans, with their ball control and tricky footwork. The forward play of Prosad, the Indian outside left, must rank with the best seen in Australia. His play often bewildered Henwood and his geometrical pattern weaving with the ball on the ground made the astute Indian winger a great favourite with the crowd."

The "Truth" লিখেছে—

"India's barefooted toeball tricksters—the flashing black streaks from the land of rice, rupees and Rajahs—were again tops with yesterday's big Soccer crowd. * * * Once again Mickey Mouse Prosad, the boy with the personality pants, was the pulse of the paying public's plaudits. Ghandi in his loincloth, tiptoeing down the touchline could not have captivated the crowd as did this capricious youngster. Every time the ball went his way the crowd rose en masse. They cheered every move of his twinkling feet—they sighed when he lost the leather. * * * With Premlal and Bhattacharjee he pulled some of the finest triangular play ever seen in Australia. The trio had Australia's defence falling into one another's arms.

আগামী এম সি সি দল ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এ এস ডিমেলোর বিবৃতিতে জানা যায়, ১৯৩৯-৪০ সালে এম সি সি ভারতে খেলতে আসবে এবং সে দলের অধিনায়ক হবেন হ্যামণ্ড। হ্যামণ্ড ভারতে খেলতে আসবার জন্য বিশেষ উৎসুক। তিনি ভারত সম্বন্ধে বলেছেন, 'I would love to see India which I have learned to recognise as the land of Maharajas and elephants. মহারাজা ও হাতী দুই-ই নামে ও আকৃতিতে বৃহৎ বোধ হয়, দেখবার লোভ সম্বরণ করা যায় না!

চার্লস্-ব্রে এম সি সির আগামী ভারত অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ক'রে ডেলি হেরাল্ডে লেখেন, ফাষ্ট বোলারদের ভারতে খেলতে পাঠিয়ে, তাদের খেলার জীবনের সমাপ্তি করা হচ্ছে। ভারত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোভার ও নিকলসের বোলিং নাকি অনেকাংশে নিকৃষ্ট হয়। গোভার গত গ্রীষ্মে দু'শোর অধিক উইকেট নেন, তিনি ফারনেসের ভীষণ প্রতিযোগী ছিলেন, এবারের টেষ্টে তাঁর মনোনীত হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ বৎসরে মাত্র ৬৬ উইকেট নিতে পেরেছেন। নিকলসও



গোভার



নিকলস্

নাকি ভারত থেকে এসে আর ভালো বল করতে পারেন নি, মাত্র ৭৭টি উইকেট পান। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর ব্যাটিং পড়ে' যায় নি। চার্লস ব্রের মতে,—"Cricket tours of India 'kill' more cricketers than they make, and I understand it is the intention of the country clubs to get together and prevent their players undertaking these trips."

গোভার নাকি তাঁকে বলেছে, * * * 'it was the food, the heat and the living in India that was responsible for his disappointing display this summer." নেমকহারামই বটে,—রাজার হালে থেকে ফাষ্ট' ক্লাস বোর্ডিং ও travelling পেয়েও, সহ্য হলো না এ দেশ! কথায় আছে,—কার পেটে কি সয় না, তাই।

ওয়েলার্ডও নাকি বলেছে যে তার বল দেবার গতিও কমে গেছে ভারতে আসার জন্য।

এম সি সি কিন্তু ভারতে আসার জন্য কোন বোলারের খেলা পড়ে' যায় এই অবিশ্বাস্য কাহিনী মোটেই বিশ্বাস করেন না। তা' ছাড়া তাঁদের মত, অষ্ট্রেলিয়ায় আগামী টেষ্টের তোড় জোড়ের জন্যও ভারতে খেলতে আসা একান্ত প্রয়োজন।



ইউনিভার্সিটি স্কালিংয়ে পরাজিত মিষ্টার সেন (প্রেসিডেন্সী)

ছবি—জে কে সান্যাল

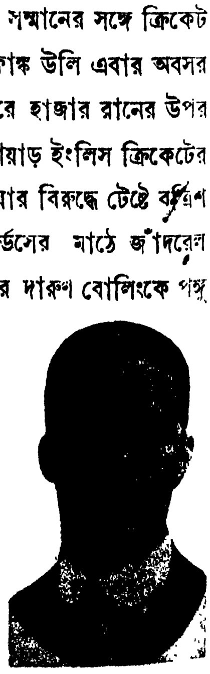


ইউনিভার্সিটি স্কালিং বিজয়ী মিষ্টার প্রকাশ (পোষ্ট গ্রাজুয়েট)

ছবি—জে কে সান্যাল

ফ্রাঙ্ক উলি ঃ

বাহান্ন বৎসর বয়সে বত্রিশ বৎসর সম্মানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক উলি এবার অবসর নিলেন। ত্রিশ বৎসর প্রত্যেক বৎসরে হাজার রানের উপর করেছেন। কেন্টের এই নেতা খেলোয়াড় ইংলিস ক্রিকেটের একটি রত্ন। ইংলণ্ডের হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্টে বত্রিশ বার খেলেছেন। ১৯২১ সালে লর্ডসের মাঠে জাঁদরেল বোলার গ্রেগারী ও ম্যাকডোনাল্ডের দারুণ বোলিংকে পঙ্গু করে দিয়ে তাঁর দু' ইনিংসের ৯৫ ও ৯৩ সকলের মনে এখনও জাগরূক আছে এবং চিরকাল তা' থাকবে। যখন তিনি ইনিংস শেষ করলেন, দেখা গেল যে তাঁর হাঁটু থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত বলের আঘাতে দাগ ধরে' গেছে, তথাপি ঐরূপ বডি লাইন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে গৌরবের সঙ্গে জয়ী হয়ে এসেছেন।



ফ্রাঙ্ক উলি

উলি সর্ব্বসমেত ৫৯,৯৮৪ রান করেছেন, ২০৬০ উইকেট নিয়েছেন এবং ৯০০ শত ক্যাচ্ করেছেন। স্যর পেল্‌হাম্ ওয়ার্ণার উলি সম্বন্ধে বলেছেন, one of the immortals of cricket.

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় পরাজয় ঃ

সাধারণ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের বিলাতে দ্বিতীয় পরাজয় ঘটেছে স্যর ল্যাভেসন-গোয়ার একাদশের কাছে ১০ উইকেটে। অষ্ট্রেলিয়া—৩০৬ (বার্ণস ৯০, ওয়েট ৭৭, ম্যাকক্যাব ৫৮) ও ১০২ ; ল্যাভেসন গোয়ার—৩৬৩ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড ;—হার্ডষ্টাফ ১০৮, হাটন ৭৩, লেল্যাণ্ড ৫১) ও ৪৬ (০ উইকেটে)

সতের বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ খেলায় ১৯২১ সালে সি আই থর্ণটনের একাদশ ৩৩ রানে ডব্‌লিউ আর্ম্মষ্ট্রংয়ের দলকে হারায় স্কারবোরোয়।

ইংলণ্ডে টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার হারের সংখ্যা মাত্র চারটি—লর্ডসে ১৯৩৪, ওভালে ১৯৩৮ ও ১৯২৬ ও ট্রেণ্টব্রীজে ১৯৩০ সালে।

ডেভিস কাপ ঃ

আমেরিকা এবারও ডেভিস কাপ বিজয়ী হলো অষ্ট্রেলিয়াকে ৩-২ ম্যাচে পরাজিত করে।

ফলাফল :—

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ৬-২, ৬-৩, ৪-৬, ৭-৫ গেমে জন্ ব্রম্ উইচ্‌কে হারিয়েছেন।

আর এল রিগস্ (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-০, ৮-৬, ৬-১ গেমে এ কে কুইষ্টকে পরাজিত করেছেন।

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ৮-৬, ৬-১, ৬-২ গেমে এ কে কুইষ্টকে হারিয়েছেন।

জন্ ব্রম্ উইচ্ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৪-৬, ৬-০, ৬-২ গেমে আর এল রিগ্‌স্‌কে পরাজিত করেছেন।

ডবলসে এ কে কুইষ্ট ও জন্ ব্রম্ উইচ্ (অষ্ট্রেলিয়া) ০-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে ডোনাল্ড বাজ ও আর মেকোকে (আমেরিকা) হারিয়েছেন।



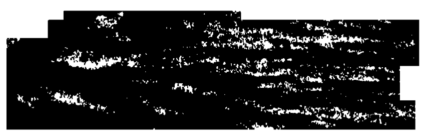
সাউথ ক্লাব হার্ডকোর্ট টেনিস বিজয়ী সাবুর। এস সি বিটিকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাজিত করে তৃতীয় বার উপর্য্যুপরি বিজয়ী হয়েছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

ইণ্টার-কলেজ মহিলা বাস্কেট বল ঃ

ইণ্টার-কলেজ মহিলা





ইউনিভার্সিটি নক্-আউট চার জনের প্রতিযোগিতার বিজয়ী সেন্ট জেভিয়ার্স (দক্ষিণে) ও বিজিত প্রেসিডেন্সী (বামে)।

ইণ্টার-কলেজ বাচ লীগ প্রতিযোগিতা বিজয়ী ও [illegible]

স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন এ বৎসর মেয়েদের বাস্কেট বল লীগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাঁচটি দল যোগদান করেছিল।



কৃষ্ণা সেন
(ক্যাপটেন—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন্)

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছে। তাদের পক্ষে ৮৫ এবং বিপক্ষে ১৬ গোল হয়েছে। স্কটিশ ও আশুতোষ ৫ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, বিদ্যাসাগর ২ পেয়ে চতুর্থ এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ০ পয়েণ্ট পেয়ে শেষ স্থান অধিকার করেছে।

আই এফ এর তৃতীয় টেষ্ট বিজয় ঃ

নিউ ক্যাসেলে ১৭ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় টেষ্টে আই এফ এ ৪-১ গোলে জয়ী হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এগার মিনিটের সময় প্রথম গোল করে বৃটেন। লামসডেন উনিশ মিনিটে শোধ দেয়। অর্দ্ধ সময়ে ১-১ গোল থাকে। বিরামের পর লামসডেন তৃতীয় মিনিটে পেনালটি থেকে গোল করে। নবম মিনিটে ভট্টাচার্য্য দর্শনীয় একটি গোল দেয়। পঁচিশ মিনিটে রহিমের সুন্দর সট বারে লেগে ভিতরে চলে যায়। এবার অষ্ট্রেলিয়ারা চেপে ধরে, কে দত্ত উইলকিন্সনের সুন্দর সট্ ফেরায় কর্ণার ক'রে।

এবার দ্বিতীয়ার্দ্ধেই আই এফ এ দল কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছে। সেখানে অধিক সময় খেলার নিয়মের জন্য শেষার্দ্ধেই আই এফ এ দল দম না থাকায় হারছিল। তাদের অসাধারণ ক্ষিপ্রগতি, অনায়াসে বল কাটাবার অপূর্ব্ব কৌশল, নিখুঁত আদান-প্রদানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলার তুলনাই হয় নি।

কে দত্ত চমৎকার গোল রক্ষা করেছে, রেবেলো ও দাশ-গুপ্ত এবং বি সেন রক্ষণ কার্য্য বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। ফরওয়ার্ড লাইনে শক্তি ও বুদ্ধি জুগিয়েছে করুণা। 'মিকি মাউস' প্রসাদ অষ্ট্রেলিয়ার দর্শকদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে দিনের পর দিন, তার দ্রুতগতি, কৌশল ও পায়ের কায়দার জন্য। লামসডেন গোলের সুমুখে এ দিন বেশ খেলেছে। রহিম বল পেলেই বিপদের সৃষ্টি করেছে।

সুবিজ্ঞ সমালোচকদের মতে ভারতবর্ষ এ টেষ্টে ইংলণ্ডের অবৈতনিক ফুটবল দল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক্রীড়া কৌশল দেখিয়েছে।

টেষ্টের ফল সমান সমান হ'লো। আগামী শনিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর সিডনেতে এবং পরের শনিবার মেলবোর্ণের টেষ্টের ফলাফলের উপর উভয় পক্ষেরই 'রবার' নির্ভর করছে।

আই এফ এ : কে দত্ত; রেবেলো ও দাশগুপ্ত; নন্দি, বি সেন, প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, আর লামসডেন, কে ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক "মিহি ও মোটা কাহিনী"—১৷৷০
সুলোচনা দেবী প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থ "গীতি স্মৃতি"—৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত উপন্যাস "মণিমালিনীর খনি"—১৷৷০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "অজানা দেশের পথে"—১৲
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ছেলেদের বই "হরেক রকম"—৷০
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "স্নেহের ঋণ"—১৷০
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রোমাঞ্চ সিরিজের "মরণের মায়াজাল"—৷৹০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনুদিত "মেঘদূত" মূল ও পদ্যানুবাদ—৷৹০
শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত ছেলেদের সংগ্রহগ্রন্থ "আরতি"—১৷০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত রাষ্ট্রনেতাদের জীবনী "সাহসীর জয়যাত্রা"—১৲
শ্রীমতী শিখরবাসিনী দেবী প্রণীত কবিতাপুস্তক "ফুলহার"—১৷০
শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী প্রণীত রাধাস্বামী কথামৃতমালার "বেদের কথা"—৷৹০
স্বামী অমলানন্দ গিরি প্রণীত "গুরুতত্ত্ব কৌমুদী"—৷০
শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী অনুদিত "[illegible] ন্যায়মালা" প্রথম খণ্ড—১৷০
শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র [illegible] "সত্যপ্রিয়া"—৷৹০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "শেষ উত্তর"—২৷০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "[illegible] প্রতিষ্ঠা"—১৷০
শ্রীভীমাপদ ঘোষ সম্পাদিত বার্ষিক "শিশুসাথী"—১৷০

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharya for Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



শিল্পী—শ্রীযুক্ত নক্ষেশ্বর সাহা

পল্লী জীবন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

প্রথম খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা

অধ্যাপক—শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

একদা এই ভারতবর্ষ প্রাচ্য বিবিধ দর্শনতত্ত্বের অনুশীলনে অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মনীষিসমাজকে উপকৃত আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেই প্রাচীনকালে যে দার্শনিক যে দর্শনতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন, সেই দার্শনিক সেই দর্শনতত্ত্বকেই পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। নিজ দর্শনতত্ত্বে একনিষ্ঠতা হেতু পরকীয় দর্শনতত্ত্ব সাতিশয় যুক্তিপূর্ণ হইলেও তাহাতে সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতেন না। পরন্তু যে কোনও উপায়ে উহার প্রতিবাদ করিয়াই আত্মপ্রসাদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। এই জন্যই প্রাচীন দর্শনগ্রন্থসমূহের মধ্যে এক দর্শনে অপর দর্শনের মতবাদ অতি তীব্রভাবে খণ্ডিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দর্শনই কোনও না কোনও অংশে ভিন্ন [illegible] বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। এক দর্শনের সকল সিদ্ধান্তগুলিই নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিরোধিসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক অপর দর্শনের মতবাদ কোনও মতেই জনসমাজে স্থিতিলাভ করিতে পারে না, এই কারণেও নিজ নিজ দর্শনসিদ্ধান্ত জনসমাজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে দার্শনিকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অন্যান্য দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রবল বিজিগীষাবৃত্তিই উহার কারণ নহে, নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ তত্ত্বের দৃঢ় প্রচার মানসেই প্রাচীন দার্শনিকগণ ঐ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে কেবল দর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্ব লইয়াই যে পরস্পর অত্যাধিক পার্থক্য ছিল এমন নহে, পরন্তু ইষ্টদেবতা ও আচার প্রভৃতি লইয়াও উঁহাদের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য ছিল। আমরা এস্থলে দার্শনিকগণের বিভিন্ন আচার প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া কেবল তাহাদিগের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধেই দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

দার্শনিকপ্রবর হরিভদ্রসূরির ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের

গুরুকে প্রণাম করিবার সময় শিষ্য কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' এইরূপ বলেন, গুরুও সেইরূপ 'শিবায় নমঃ' এইরূপ প্রতিবচন প্রয়োগ করেন'।

কিছু পরে যাইয়া টীকাকার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, 'নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সর্বদা শিবভক্ত বলিয়া তাহারা শৈব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং বৈশেষিকগণ পাশুপতনামে আখ্যাত হয়েন। সেই কারণেই নৈয়ায়িক দর্শন শৈবদর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন পাশুপতদর্শন বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে'।

ষড়্দর্শনসমুচ্চয় মূলগ্রন্থেও দেখা যায়—'যিনি সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা বিভু নিত্য এক সর্বজ্ঞ এবং নিত্য জ্ঞানের আধার, সেই শিবই অক্ষপাদমতে (গৌতম ন্যায়মতে) দেবতা'। ঐরূপ অন্যান্য দার্শনিকদিগের ইষ্টদেবতার নির্দেশও ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দেবতা সুগত বা বুদ্ধদেব। ঐ সুগত বা বুদ্ধদেব যে একজনই ছিলেন বা রহিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে, গুণরত্নসূরির টীকায় 'বিপশ্যী' প্রভৃতি 'শাক্যসিংহ' পর্য্যন্ত প্রধানতঃ সাতজন বুদ্ধের নির্দেশ পাওয়া যায়। অন্যত্র অধিকসংখ্যক বুদ্ধেরও নির্দেশ আছে।

সাংখ্যদর্শনের দেবতা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়, তাহা এই সাংখ্য দুই প্রকার, সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি কপিল যে সাংখ্যতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, উহা বর্তমানে যে সূত্রাকারে নিবদ্ধ পাওয়া যায় তাহাতে অথবা সাংখ্যের ষষ্টিতন্ত্রানুযায়ী ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রামাণিক সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করা হয় নাই। সাংখ্যসূত্রে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' প্রভৃতি সূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ উহা খণ্ডিতই হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাগ্রন্থেও 'পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।' এই বলিয়া সৃষ্টির অনুরোধেও ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। কাজেই কাপিল সাংখ্য নিরীশ্বর সাংখ্য।

এক সম্প্রদায় বলেন যে ঐ নিরীশ্বর কাপিল সাংখ্যের কোনও ইষ্টদেবতা নাই। সেশ্বর পাতঞ্জল সাংখ্যে ঈশ্বরই দেবতা। ঐ টীকায় হরিভদ্রসূরি স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। গুণরত্নসূরিও বলেন - কতিপয় সাংখ্য-দার্শনিকের ঈশ্বরই দেবতা। অপর কতিপয় সাংখ্য দার্শনিক নিরীশ্বরবাদী। যাহারা নিরীশ্বরবাদী, তাহাদের নারায়ণই দেবতা। শিষ্যগণ তাহাদিগকে প্রণাম করিবার সময় 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এইরূপ বলেন, গুরুও 'নারায়ণায় নমঃ' এই বলিয়া প্রতিবচন প্রয়োগ করেন। ঐ গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক সম্প্রদায় নিরীশ্বর সাংখ্যে দেবতা স্বীকার করেন না এবং অপর সম্প্রদায় নিরীশ্বর সাংখ্যবাদেও নারায়ণকে দেবতা স্বীকার করেন।

জৈন দার্শনিকদিগের দেবতা বিবিধ বিশেষণযুক্ত ভগবান জিনেন্দ্র। বৈশেষিক মতে নৈয়ায়িকের শিবদেবতাই পশুপতি নামে দেবতা। ন্যায়দর্শনের দেবতানির্দ্দেশের সময় উহাকে শিব নামে গ্রহণ করা হইয়াছে, আর বৈশেষিক মতের দেবতা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উহাকেই পশুপতি নামে গ্রহণ করা হইয়াছে এইমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঐ উভয় দর্শনের দেবতার কোনও পার্থক্য নাই। এইজন্য হরিভদ্রসূরি বলেন

'নৈয়ায়িকগণের সহিত বৈশেষিকদিগের দেবতা বিষয়ে কোনও প্রভেদ নাই; তত্ত্ববিষয়ে ভেদ আছে, অতএব ঐ তত্ত্ববিষয়ে ভেদ দেখাইতেছি।'

প্রশস্তপাদভাষ্যের শেষ ভাগে দেখা যায়,—

'ভগবান্ কণাদ যোগাচার বিভূতিদ্বারা মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া বৈশেষিকদর্শন নির্মাণ করেন'।

এইরূপে ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে যে বিভিন্ন দার্শনিকসম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতার কং জানিতে পারা যায় উহা সবিশেষ প্রমাণসিদ্ধ ইহ দৃঢ়রূপে বলা যায় না। কারণ, যে গুণরত্নসূরির টীকায় ঐ বিষয়গুলি সুবিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনি নিজেই ঐ টীকার এক অংশে বলিয়াছেন যে, 'আমি যেমন শুনিয়াছি ও যেমন দেখিয়াছি এস্থানে সেইরূপই ইহা বর্ণনা করিলাম। উহার বিশেষ তথ্য তত্তদ্‌গ্রন্থ হইতে জানিবে।

ঐ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার নিজের প্রদর্শিত ঐ বিষয়গুলির উপর জিজ্ঞাসু জনসমাজের বিশ্বাস কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিয়াছেন। অতএব তিনি যে শিবকে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের দেবতা বলিয়া ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন নামে আখ্যাত করিয়াছেন উহা যুক্তিযুক্ত বা প্রমাণসিদ্ধ কিনা, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যায়—গৌতমের ন্যায়সূত্রের প্রারম্ভে বিশেষ করিয়া কোনও দেবতার নমস্কারাদি করা হয় নাই। গৌতমের ন্যায়সূত্র ন্যায়দর্শনের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রুতিতেও ন্যায়শাস্ত্রের নামোল্লেখ থাকায় ন্যায়সূত্রই ন্যায়শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রথম গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হইলেও উহার পূর্ববর্তী কোনও ন্যায়গ্রন্থ যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন ঐ ন্যায়সূত্রকেই ন্যায়শাস্ত্রের সর্বপ্রথম গ্রন্থ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শ্রুতি যে সময়ের ন্যায়শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন সে সময়ে ন্যায়শাস্ত্র এইরূপ গ্রন্থাকারে বর্ত্তমান ছিল ইহা কোনও প্রবল প্রমাণ দ্বারা স্থির করা যায় না। ঐ ন্যায়সূত্রের আরম্ভে গ্রন্থকার স্পষ্টরূপে কোনও দেবতার উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন নাই। পরবর্ত্তী টীকাকারগণ ভগবদ্‌বাচক প্রমাণ শব্দের উপন্যাস দ্বারাই ঐ গ্রন্থারম্ভের প্রাথমিক মঙ্গলাচরণ উপপাদন করিয়াছেন। যদি নৈয়ায়িক সম্প্রদায় শৈব হইবেন, তবে ন্যায়সূত্রকার গোতম এবং তাহার সূত্রের ব্যাখ্যাতা বাৎস্যায়ন প্রভৃতি যে স্বীয় সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা শিবকে স্মরণ না করিয়াই সূত্র ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিলেন এবং নৈয়ায়িক-পরমাচার্য্য উদয়নাচার্য্য স্পষ্টরূপে শিবদেবতার প্রণতি না করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের প্রারম্ভে কেবল 'সৎ' শব্দ ও অস্পষ্টার্থ ঈশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াই মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ করিলেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

ইহার উত্তরে যদি এই কথা বলা যায় যে ন্যায়সূত্রকার ও ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার গ্রন্থের প্রারম্ভে বাচনিক শিবদেবতার নমস্কার না করিলেও কায়িক মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে শিবের কায়িক ও মানসিক নমস্কার যে করেন নাই ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়। অতএব সূত্রকার ও ভাষ্যকার যে গ্রন্থারম্ভে স্পষ্টাক্ষরে শিবদেবতার বাচনিক নমস্কার করেন নাই, তাহাতেই নৈয়ায়িক শৈব নহেন ইহা স্থির করা যায় না।

ইহাতে বিরুদ্ধবাদী বলেন যে সূত্রকার ও ভাষ্যকার সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু নৈয়ায়িকচূড়ামণি বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন যখন ঐ ন্যায়সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিতে উদ্যত হইয়া দেবতার স্মরণ করিলেন, তখন প্রথমতই তিনি অতি ভক্তি সহকারে 'সজলজলদ-শ্যামলতনু ব্রজবধূজনের অপূর্ব আনন্দধনি শ্রীকৃষ্ণেরই' স্মরণ করিলেন। পরেও কিন্তু মুখ্যরূপে ত্রিপুরারি শিবের প্রণাম না করিয়া তাহাকে তিনি অতি গৌণভাবে গ্রহণ করিয়া 'ভবানীর পদনখদীপ্তিকেই চিন্তা করিয়াছেন'। যথাক্রমে ঐ শ্লোক দুইটী এই—

> বপুর্লীলালক্ষ্মীজিতমদনকোটির্জবধূ-
> জনানামানন্দং কমপি কমনীয়ং বিরচয়ন্।
> স কোঽপি প্রেমাণং প্রথয়তু মনোমন্দিরচর-
> স্ত্রিলোকীলোকানাং সজলজলদশ্যামলতনুঃ ॥ ১ ॥
> সংযুক্তাং নূপুরপ্রান্তভিনবনিহিতালক্তকারক্তভাসা
> সন্ধ্যাপীযূষভানোরতিরুচিরতরাং চূর্ণয়ন্তীমভিখ্যাম্।
> মানব্যামোকনম্রত্রিপুরহরশিরোরত্নভূষাবিশেষং
> ভূয়ো ভব্যং বিধাতুং চরণনখরুচং ভাবয়ামো ভবান্যাঃ ॥ ২ ॥

ঐ দুইটী শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয় চরণটী ভবানীর চরণনখদীপ্তির বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে; উহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—'মহাদেব ভবানীর মানভঞ্জনের জন্য ভবানীর চরণে নত হইয়াছেন, কাজেই ভবানীর চরণনখের দীপ্তি মহাদেবের শিরের ভূষণরূপে পরিণত হইয়াছে।' দেবতার স্বরূপবর্ণনা স্তুতি হইলেও কোনও শৈবের পক্ষে ইষ্টদেব শিবকে ঐভাবে ভবানীর চরণপ্রান্তে নত করিয়া তাহার চরণনখের দীপ্তিকে শিবের শিরোভূষণরূপে বর্ণনা করা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বনাথ যদি শৈব হইয়াও প্রথমতঃ শিব দেবতাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি ও উক্তরূপে নিজ ইষ্টদেবতা শিবের বর্ণনাকে সমীচীন মনে করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে নিজ ইষ্টদেবতার শক্তি বিষয়ে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। আরও দেখা যায় যে ঐ বিশ্বনাথই যখন 'রাজীব-দয়া বশংবদ' হইয়া ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি শিবকে একেবারেই বাদ দিয়া পরমেশ্বররূপে একমাত্র 'নূতনজলধররুচি শ্রীকৃষ্ণকেই' প্রণাম করিলেন।

তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সেই বিশ্বনাথই যখন ঐ কারিকাবলীর টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রথমতঃ 'ভবো ভবতু ভব্যায়' বলিয়া শিবেরই স্মরণ করিলেন। অতএব তিনি যে শৈব, এ কথা বলিবার পক্ষে কি বাধা থাকিতে পারে। উক্ত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মূলে তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন এবং টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রারম্ভেও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ একমাত্র শিবেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কারণ 'ভবো ভবতু ভব্যায়' বলিয়া শিবের স্মরণের পরেই নানাবিধ বিচিত্রার্থ শব্দসম্ভার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর কথা উল্লেখ করিয়া তাহারই বক্ষে মুক্তামালার ন্যায় সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর ন্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তিন স্থানে তিন রীতিতে দেবতার স্মরণ করিয়াছেন। একস্থলে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন, অপর দুই স্থলের একস্থলে প্রথম মহাদেবকে স্মরণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন এবং অন্যস্থলে প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া পরে মহাদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহাকে শৈব বলা অপেক্ষা বৈষ্ণব বলাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ ভাষাপরিচ্ছেদের মূল গ্রন্থে যখন তিনি একই মাত্র দেবতার প্রণাম করিয়াছেন, তখন শিবকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। এই ত গেল বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের কথা।

নৈয়ায়িকপ্রবর হরিদাস ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বোধ-সৌকর্য্যার্থে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের কারিকাংশের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি বালরূপী 'গোপতনয়' শ্রীকৃষ্ণেরই স্পষ্টরূপে প্রণাম করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকপ্রবর রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার রঘুনাথশিরোমণি-কৃত পদার্থতত্ত্বনিরূপণের টীকার প্রারম্ভে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ন্যায় প্রথমতঃ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও পরে কামহন্তা মহাদেবকে স্মরণ করিয়াছেন।

রামতর্কালঙ্কার আত্মতত্ত্ববিবেকের দীধিতি গ্রন্থের টীকা করিতে গিয়া 'শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্ব'ই আশ্রয় করিয়াছেন।

রাধামোহনগোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি বহু ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থের উপাদেয় টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ বিদ্যাবাচস্পতি স্বকৃত ন্যায়সূত্রবিবরণের প্রারম্ভে 'নত্বা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রণতিই করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষখণ্ডের তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্যও 'নত্বা নন্দ-তনুজন্মনঃপদং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই প্রণাম করিয়াছেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার স্বতন্ত্রভাবে ন্যায়শাস্ত্রীয় পদার্থবোধের জন্য যে তর্কামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রথমে 'শ্রীবিষ্ণুচরণাম্বুজ'ই স্মরণ করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়কে একনিষ্ঠ শৈব বলা কতদূর সমীচীন তাহা শৈববাদী সম্প্রদায়ই বিবেচনা করিতে পারেন।

এ বিষয়ে শৈববাদী সম্প্রদায় বলেন—যে সকল ন্যায়-শাস্ত্রীয় গ্রন্থকারের ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিরোরত্নস্বরূপ, যে সকল গ্রন্থকেই প্রধানতঃ ঐ সম্প্রদায় প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং যে সকল উপাদেয় গ্রন্থরাজির আবির্ভাব ও প্রভাববশতই ন্যায়শাস্ত্র সুসমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও ভারতবর্ষের অসীম গৌরব ঘোষণ করিতেছে, ঐ জাতীয় কতিপয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবরূপে প্রসিদ্ধ শিব দেবতাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেরই আলোচনা করা যাউক।

নব্যন্যায়শাস্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্ব চিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণশ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা ভগবান্ শিবেরই নমস্কারসূচক। ঐ শ্লোকের অন্তিম অংশ উল্লেখ করিলেই উহা সম্যক্‌রূপে প্রতীত হইবে। যথা,—

'নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে'

এস্থানে 'পুরভিদ্' শব্দের অর্থ ত্রিপুরারি মহাদেব, অন্য কোনও দেবতা নহে। অতএব নব্যন্যায়শাস্ত্রের মূল পুরুষ গঙ্গেশোপাধ্যায় যখন ভগবান্ ত্রিপুরারি মহাদেবকে নমস্কার করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারাই নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শৈবত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইহাতেও কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ঐ কথা স্বীকার করিতে রাজী নহেন; তাহারা বলেন যে ইহাও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শৈবত্ব সাধনে যথেষ্ট প্রমাণ নহে, কারণ 'পুরভিদ্' শব্দের অর্থ আপাততঃ ত্রিপুরারি মহাদেব প্রতীত হইলেও 'পুরং শরীরং ভিনত্তি' এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়া যিনি মুক্তিদান করিয়া শরীরের একান্ত বিচ্ছেদ সাধন করেন, তাহাকেও পুরভিদ্ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। যিনি বৈষ্ণব তিনি বিষ্ণুকে, যিনি শৈব তিনি শিবকে, যিনি শাক্ত

তিনি শক্তিকে এবং যিনি অন্য যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতাকেই মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব ইহা দ্বারাও নৈয়ায়িকের শৈবত্ব ব্যবস্থাপন করা সুসম্ভব নহে।

তার্কিকশিরোমণি দীধিতিকার রঘুনাথ যে অনুমান-তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির প্রারম্ভে—

'ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥'

এইরূপ নমস্কারশ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, উহাতে রঘুনাথের দেবতা বিষয়ে কোনও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিপন্ন হয় না। ঐ শ্লোক সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ পক্ষে সঙ্গতার্থ করিয়া লইতে পারেন। অতএব উহা দ্বারাও একতর পক্ষ স্থির করা অসম্ভব।

মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রত্যক্ষ-খণ্ডের দীধিতিব্যাখ্যার প্রারম্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছেন, সেইরূপ অনুমানদীধিতিব্যাখ্যার প্রারম্ভে 'অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজযুগং পুরদ্বিষঃ' এই বলিয়া 'পুরদ্বিষ্' শব্দ দ্বারা দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতেও মহাসমস্যারই সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যক্ষখণ্ডের গদাধরকৃত নমস্কারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে হয় 'পুরদ্বিষ্' শব্দের অর্থ মুক্তিদাতা স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা না হইলে 'পুরদ্বিষ্' শব্দের স্থানে 'মুরদ্বিষ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব উহাও নৈয়ায়িকগণের শৈবত্বসাধনপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নহে।

এখন দেখিতে হইবে যে উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ও জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িক-শিরোমণিগণের গ্রন্থে একতর পক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নৈয়ায়িকচূড়ামণি ন্যায়নিবন্ধ ও তাৎপর্য্য টীকার নির্মাতা বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়নিবন্ধের প্রারম্ভে কোনও দেবতারই বাচনিক নমস্কার করেন নাই। তাৎপর্য্য টীকার প্রারম্ভেও দেবী সরস্বতীর প্রণাম করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়নিবন্ধের অন্তিম ভাগে—

'সংসারজলধিসেতৌ বৃষকেতৌ সকলদুঃখশমহেতৌ।
এতত্তু [illegible] শ্রীরস্তামীশঃ।'

এই বলিয়া 'বৃষকেতু' শব্দ দ্বারা শিবেরই আশ্রয় লইয়াছেন। নৈয়ায়িকচূড়ামণি বর্দ্ধমানোপাধ্যায় যখন উদয়নকৃত তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে শিবের নাম করিয়াই তদীয় বিলক্ষণ স্বরূপ বর্ণনাপূর্ব্বক বন্দনা করিয়াছেন। যথা—

'ঘণ্টাশাঃ পরিধানমিন্দুকলিকা ধত্তে শিখণ্ডশ্রিয়ং
জ্বালাপল্লবিতঃ শিখী দৃশি শিরোরঙ্গে সরিন্নৃত্যতি।
যং পশ্যন্তি নিরন্তরায়মনসঃ সংসারমোহচ্ছিদং
তং বন্দে সুরবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং শিবম্॥'

শিব শব্দের অর্থান্তরসম্ভাবনা থাকিলেও প্রথমাংশে যে স্বরূপের বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে এই শিব শব্দের অর্থ মহাদেব ত্রিপুরারি ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারে না। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিকের প্রারম্ভে বাচনিক কোনও দেবতার নমস্কার করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের শেষভাগে পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তিপুষ্পিকায় 'পাশুপতাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। যথা—'ইতি শ্রীপরমর্ষিভারদ্বাজ-পাশুপতাচার্য্য—শ্রীমদুদ্দ্যোতকরাচার্য্য-কৃতৌ ন্যায়বার্ত্তিকে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ'; অতএব উদ্দ্যোত-করাচার্য্য যে শৈব ছিলেন, ইহাও কথঞ্চিৎ প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ন্যায়পরমাচার্য্য উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের প্রারম্ভে ঈশ শব্দ দ্বারা যে দেবতার প্রচ্ছন্নভাবে স্মরণ করিয়াছেন, তিনি যে শিব ব্যতীত আর কেহই নহেন, তাহা তদীয় পরবর্ত্তী গ্রন্থাংশ আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ঐ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—'শক্তোন্মেষ-কলঙ্কিভিঃ কিমপরৈস্তন্মে প্রমাণং শিবঃ'। এস্থানে অপর সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র শিবকেই প্রমাণ পুরুষ বলিয়া ব্যবস্থাপন করায় উদয়ন যে শৈব ছিলেন ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সর্বদর্শনসংগ্রহে দার্শনিকপ্রবর মাধবাচার্য্য অক্ষপাদ-দর্শনে ঈশ্বর প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে 'এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে' এইরূপ শ্রুতির উল্লেখ করিয়া ন্যায়মতে শিবই যে ঈশ্বরপদবাচ্য ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন। ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থকার জয়ন্তভট্ট ন্যায়সূত্রের বিবরণরূপ ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে স্পষ্টরূপে শম্ভু ও শম্ভুশক্তি ভবানীকেই প্রণাম করিয়াছেন।

এইরূপ আলোচনাদ্বারা সুপ্রসিদ্ধ কতিপয় প্রাচীন নৈয়ায়িক শৈব বলিয়া সিদ্ধ হইলেও পরবর্ত্তী বিশ্বনাথ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার জগদীশ ও গদাধর প্রভৃতির গ্রন্থাদিতে কিছু

পরায়ণতা দেখিয়া নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, নৈয়ায়িকগণ শৈব কি বৈষ্ণব ?

আমরা কিন্তু নৈয়ায়িক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের নির্দিষ্টরূপে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়গত এক এক দেবতা স্বীকার করিতে রাজী নহি। যিনি নৈয়ায়িক তিনি শৈব বা শাক্ত যে কোনওরূপ হইতে পারেন। নৈয়ায়িককে যে শৈবই হইতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। অতএব নৈয়ায়িক কোনও স্থলে শৈব এবং কোনও স্থলে বৈষ্ণব বা কোনও স্থলে অন্যান্য দেবতার উপাসকও হইতে পারেন।

কেহ কেহ আবার বলেন যে গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার যাহার নমস্কার করিবেন, তাহাকেই যদি সেই গ্রন্থকারের ইষ্টদেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তবে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতির ইষ্টদেবতা শিব ও বিষ্ণু উভয়কেই স্বীকার করিতে হয়। কারণ উঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে শিব ও বিষ্ণু এই দুই জনকেই নমস্কার করিয়াছেন। অধিকন্তু আবার বিশ্বনাথ ভবশক্তি ভবানীকেও বাদ দেন নাই।

অতএব গ্রন্থারম্ভে প্রণাম দ্বারাই গ্রন্থকারের বা তৎসম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা নির্দ্ধারণ করা একান্ত অসম্ভব। তবে একই গ্রন্থকার একই গ্রন্থে বা বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভিন্ন দেবতার নমস্কার করিয়াছেন, উহা বিভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধিমূলক বলিয়া উপপাদন করা যাইতে পারে।

প্রাচীন প্রসিদ্ধ প্রমাণ দেখা যায়, 'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ জ্ঞানঞ্চ। শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ' অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য, অগ্নির নিকট ধন, শিবের নিকট জ্ঞান ও জনার্দ্দন বিষ্ণুর নিকট মুক্তি কামনা করিবে।

যিনি শৈব তিনিও মুক্তিকামী হইলে বিষ্ণুর আশ্রয় লইবেন, আর যিনি বৈষ্ণব তিনিও জ্ঞানকামী হইলে শঙ্করের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, কুসুমাঞ্জলিকারিকার টীকাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও প্রত্যক্ষদীধিতির টীকাকার গদাধরভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যখন ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রন্থনির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন হয়ত তাহাদিগের চিত্তে মুক্তিকামনা প্রবল হইয়াছিল, এই জন্যই মুক্তির দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবার যখন ঐ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননই কারিকাবলীর টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে বসিলেন তখন টীকাগ্রন্থ নির্মাণে বিশিষ্ট জ্ঞানের উপযোগিতা মনে করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞানকামনায় 'ভবোর জন্ত' ভব বা শিবকেই আশ্রয় করিলেন। সে স্থানেও তিনি মূল গ্রন্থনির্মাণকালীন মুক্তি-কামনাকে একান্তরূপে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকামনা করেন নাই, কাজেই পরবর্ত্তী শ্লোকেই আবার 'নিজোর্বক্ষসি বিশ্বনাথকৃতিনা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বিন্যস্তা মনসো মুদং বিতনুতাং সদ্যুক্তিরেষা চিরম্' বলিয়া বিষ্ণুকেও স্মরণ করিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্যও অনুমানদীধিতির ব্যাখ্যানির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া শিরোমণির অতি দুর্বোধ সন্দর্ভের ব্যাখ্যা কার্য্যে জ্ঞানেরই বিশেষ উপযোগিতা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানদাতা শঙ্করেরই নমস্কার করিয়াছেন। অতএব একই ব্যক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন ফলপ্রদ শাস্ত্রানুশিষ্ট শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতির নমস্কার দ্বারাই যে গ্রন্থকারের শৈবত্ব বা বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না ইহা বলা যাইতে পারে।

আমরা এমন বহু নৈয়ায়িকের কথা জানি, যাঁহারা কুলপরম্পরাক্রমে বিষ্ণুরই উপাসক। বিষ্ণুই তাঁহাদের ইষ্টদেবতা। আবার এমনও অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন ও আছেন যাঁহারা একান্ত শৈব। একমাত্র শিবকেই তাঁহারা সর্বার্থসাধক মনে করিতেন বা করিয়া থাকেন। ঐরূপ আবার শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন ও আছেন। অতএব নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সহিত দর্শন বিশেষের আলোচনা বা পাণ্ডিত্যের নিয়মিত সম্বন্ধ আছে, ইহা আমরা কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কারণ উহার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক যে দার্শনিকপ্রবর গুণরত্নসূরি প্রভৃতির গ্রন্থে যে ন্যায়দর্শনের শৈবদর্শন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; ইহার কারণ কি? আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে দর্শনে যে দেবতাকে ঈশ্বররূপে ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে, সেই দর্শনকে সেই দেবতার দর্শন বলা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের মতানুযায়ী কোনও কোনও গ্রন্থে শিবকেই ঈশ্বররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের 'শক্তোহয়েষকলাবিত্তিঃ কিমপরৈস্তন্মে প্রমাণং শিবঃ' এই অংশ এবং মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শনের 'এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে' এই অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আরও কারণ এই যে, বহু প্রাচীন কাল' যে সকল

নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র গঙ্গেশোপাধ্যায় বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থকর্ত্তা জয়ন্তভট্ট প্রভৃতির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁহারা সকলেই প্রায় সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে শিবকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং নিজ নিজ অভিমত সিদ্ধির জন্য তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছেন। এই দুই কারণেই বোধহয় ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন বলা হয়।

ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনেরই ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব অভিন্ন প্রকার, কেবলমাত্র ঐ দুই দর্শনের প্রমাণাদি কতিপয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঈশ্বররূপে অভিমত শিবের সংজ্ঞা লইয়া যেমন ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন বলা যায়, ঐরূপ শিবেরই পশুপতি সংজ্ঞা লইয়া বৈশেষিক দর্শনকে পাশুপত দর্শন বলা যাইতে পারে। ঐ যুক্তি অনুসারে উক্ত দুইটী সংজ্ঞার বিনিময় করিয়াও ব্যবহার করা সম্ভবপর।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, অক্ষপাদপ্রভৃতি মুনিগণ যে যে দেবতার শক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়া ন্যায়প্রভৃতি দর্শনসমূহের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সেই দেবতার সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়াই সেই সেই দর্শন নিজ নিজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। পুরাণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি অক্ষপাদ শিবশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মহর্ষি কণাদ ও শিবশক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়াই বৈশেষিক দর্শন নির্মাণ করেন, অতএব ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন শিবের সংজ্ঞা লইয়াই যথাক্রমে শৈবদর্শন ও পাশুপত দর্শন। ঐ যুক্তি আমরা সমীচীন মনে করি না, কারণ অক্ষপাদ ও কণাদ শিবশক্তির আবেশে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন নির্মাণ করিয়াছেন এই কথা আমরা যে পুরাণাংশের আলোচনায় জানিতে পারি, সেই পুরাণাংশেই কপিলাদি মহর্ষিগণও যে শিবশক্তির আবেশে আবিষ্ট হইয়াই সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ইহাই জানিতে পারা যায়। যথা—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পার্বতীর প্রতি শিব বলিতেছেন,—

'প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃ পরম্।
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ।'

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ন্যায়দর্শনকে শৈবদর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে পাশুপত দর্শন বলিতে হইলে কাপিলাদি দর্শনকেও শৈবদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু কাপিলাদি দর্শনকে কেহ কোথায়ও শৈবদর্শন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে যথাক্রমে শৈবদর্শন ও পাশুপত দর্শন বলিবার পক্ষে আমরা ইতঃপূর্বে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যে যুক্তির উপন্যাস করিয়াছি, তাহাই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পক্ষে নৈয়ায়িকগণ শৈব হইলেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্লাবনে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী কতিপয় গ্রন্থকারই শৈব হইয়াও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে নিজ নিজ গ্রন্থে শিবকে ছাড়িয়া বিষ্ণুর প্রণাম করিয়াছেন। পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কারণ পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের পরিচিত এমন বিলক্ষণ বহু সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা প্রকৃতই বৈষ্ণব বা শাক্ত কিম্বা শৈব নহেন। অতএব নৈয়ায়িকের দেবতা শিবই হইবেন একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক।

গুণরত্নসূরিকৃত টীকায় যে নৈয়ায়িকগণকে শৈবই বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য যদি এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায় যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে ন্যায়দর্শন শৈবদর্শন বলিয়া সিদ্ধ হইলে ঐ শৈব অর্থাৎ শৈবদর্শন যাঁহারা জানেন বা অধ্যয়ন করেন এই অর্থে শৈব শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া সকল নৈয়ায়িকের বিশেষণরূপেই ঐ শৈব শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিব যাহার দেবতা এই অর্থে শিব শব্দের পর অণ্ বা ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া যে শৈব শব্দ নিষ্পন্ন হয় ঐ শৈব শব্দটী সকল নৈয়ায়িকের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে আমরা রাজী নহি, যেহেতু সকল নৈয়ায়িকেরই ইষ্টদেবতা শিব নহেন। সমগ্র নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের বিশেষণরূপে উক্ত ব্যুৎপত্তিযুক্ত শৈবশব্দ প্রয়োগ করিলে উহাকে আমরা ভ্রান্তির অন্যতম বিলাস বলিয়া উপেক্ষাই করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—হে নৈয়ায়িকের দেবতা! তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিবরূপী হও, বিষ্ণুরূপী হও, শক্তিরূপী হও বা নীরূপ হও, তোমারই করুণায় আবার ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের মত ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রতিভা প্রকাশিত হইয়া ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর নিকট বরণীয় করুক। হে সর্বশক্তিময় দেবতা! তোমাকে আবার নমস্কার!!

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(১৬)

সদর দরজায় দারোয়ান থাকিত। অন্য দিকের একটি দরজা খুলিয়া লতা বাহির হইয়া পড়িল; বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা একদিকে ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, পথে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে, কিছুই সে জানিত না। এইটুকু কেবল তার মনে হইয়াছিল, এই রাত্রির মধ্যে এই বাড়ী হইতে যতদূর সে পাবে চলিযা যাইবে। তারপর—মাথার উপরে দেবতা আছেন—সত্যই যদি থাকেন—যা করেন হইবে। কত দূর গিয়া তার মনে পড়িল, পুঁটলীটিও সে ফেলিয়া আসিয়াছে! ভাবিযাছিল, সামান্য সম্বল যাহা আছে তাহা লইয়া চুঁচড়ায় পূর্ব্বপরিচিত কাহারও অথবা অগত্যা তাহার মামীর আশ্রয়ই আপাতত গ্রহণ করিবে। তারপর একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া, কি হিতৈষী কাহারও পরামর্শমত ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। কিন্তু হায়, এখন যে সে একেবারেই নিঃসম্বল! পরিধানে ঐ একখানি বস্ত্র মাত্র, একটি কপর্দ্দকও হাতে নাই। একখানি পত্র কাহাকেও লিখিবে, পথ চলিতে না পারিলে চার-পাঁচটি পয়সাও গাড়ীভাড়ায় খরচ করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। কি করিবে? কি উপায় হইবে? সমস্ত শরীর তার ঝিম ঝিম করিয়া অবশ হইয়া আসিল—পাও আর চলে না। একটি গাছতলায় তখন সে বসিয়া পড়িল। গাছের গুঁড়িতে মাথাটা রাখিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটি পাহারাওয়ালা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ বয়স্কা এক নারী সে, এই নিশুতি রাত্রিতে একা কোথায় যাইতেছে, কোথা হইতে আসিল, নাম পরিচয় কি, সদুত্তর কিছু না পাওয়ায় পাহারাওয়ালা তাহাকে থানায় লইয়া গেল—সে রাত্রির মত গারদ-ঘরে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তবু একটু আশ্রয় ত তখনকার মত!। লতা যেন একটু স্বস্তিই ইহাতে বোধ করিল। শরীরও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহতলেই শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে দারোগাবাবু যখন আফিস ঘরে আসিয়া বসিলেন, লতাকে আনিয়া হাজির করা হইল। দারোগাবাবু চাহিয়া দেখিলেন—বিস্ময়ে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পাহারাওয়ালা কোথায় কি অবস্থায় তাহাকে পাইয়াছে, পাইয়া থানায় লইয়া আসিয়াছে, সব বলিল। দারোগাবাবু ডায়েরী বহিতে সব লিখিয়া লইলেন। তারপর লতার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনি কে? দেখে ত ভদ্রঘরের মেয়ে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

মৃদু স্বরে লতা উত্তর করিল, "হাঁ, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"নাম কি আপনার?"

"কনকলতা দেবী।"

"স্বামী?"

হাতে লোহা এবং সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন দেখিয়া দারোগা অনুমান করিযাছিলেন, নারী বিবাহিতা এবং সধবা।

একটু ইতস্তত করিয়া লতা উত্তর করিল, "স্বামী নিরুদ্দেশ।"

"নাম কি তাঁর?"

"নাম—নাম—শ্রীমোহনলাল চক্রবর্ত্তী।"

"আপনার আর কে আছেন?"

"কেউ নাই।"

"কোথায় থাকেন আপনি?"

লতা কহিল, "এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ ক'রতাম।"

"থাকাও সেইখেনে হ'ত?"

"হাঁ।"

"তা সেই বাড়ী ছেড়ে রাত দুপুরের পর একা কোথায় যাচ্ছিলেন?"

চক্ষে জল আসিল; কোনও মতে আত্মসম্বরণ করিয়া লতা কহিল, "সেখানে—থাকবার সুবিধা হ'ল না, তাই চ'লে এসেছি।"

"চলে এলেন—একা এই রাত্তিরে—একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায়—তার মানে? শুনলাম, একখানি কাপড় কি একটি পয়সাও আপনার সঙ্গে ছিল না!"

"না।"

"তার মানে?"

"আমি—আমি—পালিয়ে এসেছি। রাত পোয়ান অবধি থাক্‌বারও স্থবিধে হ'ল না।"

"কেন? বাড়ীর কোনও লোক—আপনার ওপর—এই—এই—অত্যাচার কিছু ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল?"

"না।"

"তবে—রাত্তিরে একা পালিয়ে এলেন—হাঁ, ব'ল্‌ছেন, যে কারণেই হ'ক্ রাত পোয়ান অবধি থাকবার স্থবিধে হ'ল না—আস্‌তে পারেন, কিন্তু একেবারে এইরকম নিঃসম্বল অবস্থায়—তাও কি হয় কখনও?"

লতা উত্তর করিল, "সম্বল কিছু ছিল। কিন্তু পুঁটলীটি আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি।"

দারোগাবাবু একটু হাসিলেন—কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় হইল না! কহিলেন, "পালিয়ে যখন এলেন, অন্য কোথাও যাবেন বলে ত বেরিয়েছিলেন?"

"হাঁ। ভেবেছিলাম—এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠব।"

"সে আত্মীয় কোথায় থাকেন? এই ক'ল্‌কেতায় কোথাও?"

"না, বাইরে।"

"বাইরে! কতদূর হবে? হেঁটে যাওয়া যায়?"

"না, রেলে ক'রে যেতে হয়!"

"কি ক'রে তবে যেতেন? পালিয়ে এলেন রেলভাড়া ক'রে কোথাও যাবেন ব'লে! এ অবস্থায় সম্বল কেউ ফেলে আসে? এমন কিছুও ঘটেনি ব'ল্‌ছেন, যাতে ক'রে কোনও মতে ছুটে আপনাকে এম্‌নি ভাবে বেরিয়ে প'ড়তে হ'ল যে গুছিয়ে পুঁটলীপাটলী ক'রে কিছু নিয়ে আস্‌বেন সে অবসর হ'ব না।"

ধীরে ধীরে লতা কহিল, "মনটা তখন বড় অস্থির ছিল।"

"হাঁ, নিশ্চয় ছিল—সেটা বুঝি। নইলে রাত্তির ক'রে কেন পালিয়ে আসবেন?—কিন্তু ভেবে চিন্তে, রাতপোয়ান অবধি থাকবার স্থবিধে হবে না—এইটে বেশ বুঝে, রেলে ক'রে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে যাবেন এটাও মনে মনে ঠিক ক'রে চ'লে এলেন, আর পথের সম্বলটা সঙ্গে নিয়ে আস্‌তেই কেবল ভুলে গেলেন?"

লতা নিরুত্তর। নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, একদিকে একটু ঘুরিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। দারোগাবাবুর একটু দুঃখও হইল। সবই সম্ভব। তবে এরূপ অশ্রুপাতও সময়-মত নারী অনেকে করিতে পারে, করিয়াও থাকে।

কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এখানে কোন্ বাড়ীতে আপনি ছিলেন রঁাধুনীর কাজে?"

"সে ব'লতে পারব না।"

"পারব না—মানে?"

"ব'ল্‌তে চাই না আমি।"

"কেন?"

"পালিয়ে এসেছি—আমি চাইনে যে আপনারা গিয়ে খোঁজখবর কিছু করেন, একটা জানাজানি সেখানে হয়।"

"পালিয়ে কেন এলেন? কি হয়েছিল?"

"তাও ব'ল্‌তে চাইনে।"

"ব'ল্‌তেই আপনাকে হবে। না ব'ল্লে চ'ল্‌বে না।"

"আমি ব'ল্‌ব না।"

"বটে!" দারোগাবাবু ভ্রূকুটি করিলেন।

একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ, আপনার স্বামীর নাম কি ব'ল্লেন না—মোহনলাল চক্রবর্ত্তী?"

"হাঁ।"

"এই ক' বছর যাবৎ তিনি নিরুদ্দেশ?"

"বছর চারেক হবে?"

"তাঁর বাড়ী কোথায় ছিল?"

"এই ক'ল্‌কেতায় তিনি থাক্‌তেন।"

"কোথায় থাক্‌তেন? কোন্ ঠিকানায়?"

"সে একটা মেসে না হোটেলে থাক্‌তেন, এখন উঠে গেছে।"

"দেশ গাঁ?—তাঁর পিতার নাম?"

"পিতার নাম ছিল—হরলাল চক্রবর্ত্তী।"

"দেশ গাঁ?"

"জানি না।"

"জানেন না! সে কি? বিয়ের পর তবে কোথায় আপনাকে নিয়ে তিনি যান?"

"নিয়ে কোথাও যান না। বাবার কাছেই থাক্‌তাম।"

"আপনার বাবা কে ছিলেন? কোথায় থাক্‌তেন? কি ক'র্‌তেন? দেশ গাঁ কোথায় ছিল?"

লতা আর কূলকিনারা কিছু পাইতেছিল না। অতি ক্লিষ্টদৃষ্টিতে একটিবার চাহিয়া কহিল, "দেখুন, দয়া ক'রে আমাকে মাফ ক'র্‌বেন। ও সব কিছুই আমি ব'ল্‌তে পারব না। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চ'লে যাই।"

কঠোরস্বরে দারোগা কহিলেন, "না, সে আর পারি না। হাঁ, আর একটি কথা। আপনার স্বামী যে মেসে ছিলেন, তার ঠিকানাটা বোধ হয় আপনার জানা আছে?"

"আছে।"

"তাও ব'লবেন না?"

"না।"

নীরবে ভ্রুকুটি করিয়া দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "দেখুন, আপনার সব কথাগুলো বড় অদ্ভুত রকম লাগছে। বড় একটা রহস্য কিছু আছে—যার কোনও সূত্রই ধরতে পারছি নি। যা সব আপনি ব'ল্লেন, একটা কথাও তার সত্যি ব'লে এখন আর মনে হচ্ছে না।"

"তবে—কি সত্যি ব'লে মনে করেন?"

"মনে অনেক কথাই হ'তে পারে। তবে ঠিক কি তাই আমাদের জান্‌তে হবে। না জেনে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না, দেওয়া অতি বিপদ্‌জনক হ'তে পারে।"

"বিপদ্‌জনক—? কেন, কি আপনারা ভাবছেন?"

"ভাব্‌তে—কিছুই এখনও ঠিক পারছি নি। তবে ভাব্‌তে হবে। আপনি কে, পূর্ব্ব ইতিহাস আপনার কি, কোথায় ছিলেন, কোত্থেকে কোথায় একা এমনভাবে যাচ্ছিলেন, সব আমাদের জান্‌তে হবে। আর যদ্দিন না জান্‌তে পারি—"

"তদ্দিন—"

"হাজতে আপনাকে আট্‌কে রাখ্‌তে হবে। আজ দুপুরে কোর্টে আপনাকে নিয়ে যাব। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম নিয়ে কোনও জেলে আপনাকে রাখব। তারপর অনুসন্ধান ক'রে সব বের ক'র্‌তে হবে।"

"কি ক'রে ক'র্‌বেন? প্রাণ গেলেও আমি কিছু ব'ল্‌ব না। কোথায় কার কাছে কি অনুসন্ধান ক'র্‌বেন?"

হাসিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "সে অনেক উপায় আমাদের আছে। আপনার ফটো তুলে, কোথায় কি অবস্থায় কাল রাত্তিরে আপনাকে পাওয়া গেল, সব জানিয়ে খবরের কাগজে বের ক'র্‌ব। চেনা লোক কেউ না কেউ এসে সনাক্ত আপনাকে ক'র্‌বেই।"

কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়! বিশুষ্ক বিবর্ণ মুখে অতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে লতা একবার চাহিল—তারপর কাঁদিয়া গিয়া দারোগাবাবুর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

"দয়া করুন! দোহাই আপনার! আপনি আমার বাবার মত—অনাথা মেয়ে ব'লে একটু দয়া করুন। একেবারে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না! ছবি তুলে দিন আর নাই দিন, কালকার ঘটনা কাগজে বেরোলেই আমার সর্ব্বনাশ হবে। বড় অভাগী আমি, কিন্তু আমার দুঃখের কথা কাউকে ব'লবার নয়। জানাজানি যদি একটা হয়—আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আর গতি আমার কিছু থাক্‌বে না। তাতেও দুঃখ কিছু ছিল না। কিন্তু—কিন্তু—একটা ছেলে র'য়েছে—তাকে দেখ্‌বে, মানুষ ক'রে তুল্‌বে, কেউ আর এমন নেই।"

"ছেলে! ছেলে কোথায় আছে? কার কাছে?"

"আমার মার কাছে—কাশীতে। তিনিও এক বাড়ীতে রেঁধে দুটি খান। মাইনে কিছু পান না, খোরাকী আর থাকবার একটু যায়গা কেবল পেয়েছেন—ছেলেটিকে কি খাওয়াবেন?"

"কাশীতে—কোথায়—কার বাড়ীতে তিনি আছেন?"

পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া লতা কহিলেন, "দোহাই আপনার! দয়া করুন—আর কিছু সুধোবেন না—ব'ল্‌তে পার্‌ব না। ব'ল্লেই সব জানাজানি হবে। লুকোন কিছু থাক্‌বে না। দেখুন, বড় অভাগী আমি—একেবারে অসহায় নিরাশ্রয়। ভাগ্যের ফেরে আবার এমন একটা সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছি—সে আর কাউকে ব'লবার নয়। বিশ্বাস করুন, মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন—ছেলের মা আমি, সেই ধর্ম্মের নামে দেবতার নামে দিব্যি ক'রে ব'ল্‌ছি, অসৎ দুষ্ট আমি নই—যা সন্দেহ হয় ত ক'র্‌ছেন—কোনও বিপ্লব দলের মেয়েও আমি নই—তার কোনও সম্পর্কেও রাত্তিরে একা এভাবে পথে বেরোইনি। কি ক'রে আর বোঝাব জানি না, বোঝাতে

হ'লে ম'রে আমাকে বোঝাতে হবে, আমি যা ব'লছি সব সত্যি। কিন্তু—কিন্তু—মরতে আমি চাই নে—ঐ ছেলেটাকে ফেলে ম'রতে আমি যে পারিনে। ফটো তুলে বিজ্ঞাপন দেবেন ব'লছেন—এটা জানবেন, তা দেখে সনাক্ত ক'রতে যে আসবে, জীবিত আমাকে দেখ্‌তে পাবে না।"

উবুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে দারোগাবাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি লতা তাহার উপরে রাখিল।

দারোগাবাবুরও চক্ষে তখন জল আসিল—রুমালে মুছিয়া কহিলেন—"উঠুন—আর কাঁদবেন না। বামুনের মেয়ে ব'ল্‌ছেন, আমার পায়ের উপরে ওভাবে জড়িয়ে প'ড়ে থাকবেন না।"

পা ছাড়িয়া দিয়া লতা একটু সরিয়া বসিল। হাঁটুর উপরে দুই হাতে ঢাকা মুখখানি রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দারোগাবাবু কহিলেন, "শুনুন, একটু স্থির হ'ন। হাঁ—হ'তে পারে—কিছুই অসম্ভব এ পৃথিবীতে নয়—হ'তে পারে, অপরাধ এমন কিছু করেন নি—অথচ ঘটনাচক্রে এমন সঙ্কটে প'ড়েছেন, যাতে ক'রে আত্মগোপন ক'রেই আপনাকে থাক্‌তে হবে, নইলে সত্যিই বড় একটা কিছু অনিষ্ট আপনার হতে পারে। তবে—আমিই বা কি করি বলুন? থানায় আপনাকে আনা হ'য়েছে, ডায়রী লেখা হ'য়েছে—সবাই এরা সব দেখ্‌ছে, জান্‌ছে। সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ কিছু না দেখিয়ে কি ক'রে আপনাকে ছেড়ে দিই? সে দায়িত্ব আমি নিতে আর পারি না, কোর্টে নিয়ে আপনাকে হাজির আমাকে ক'রতেই হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটই বা তখন এই রকম কিছু একটা কৈফিয়ৎ ছাড়া কি ব'লে বেকসুর আপনাকে ছেড়ে দেবেন?"

"তাহ'লে কি হবে? উপায় কি আর কিছুই নেই?"

একটু ভাবিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "হাঁ, যে অবস্থায় যে কারণেই একা আজ এভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ক্, বেশ বুঝ্‌তে পারছি, আপনি সম্ভ্রান্ত, অন্তত শিক্ষিত কোনও ভদ্রঘরের কন্যা, নিজেও শিক্ষিতা, অতি বুদ্ধিমতী—বেশ একটু বুদ্ধিমতীও বটেন। আপনাকে বেশ জানেন, সম্ভ্রান্ত এমন লোকও এই ক'লকেতায় কেউ কেউ হয়ত থাকতে পারেন। এমন কারও নাম ক'রতে পারেন, যাঁকে আপনি বিশ্বাস ক'রতে পারেন, আর আপনার খুঁটিনাটি পরিচয় কিছু না নিয়েও কেবল যাঁর কথার উপরে নির্ভর ক'রে যাঁর জামিনে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?"

একটু ভাবিয়া লতা কহিল, "আছেন একজন—আমাকে বেশ জানেন।—এখানকার একজন বড়লোকই তিনি, হয় ত নাম শুনেও থাকবেন। আমার জামিন হ'তে রাজি তিনি হ'তে পারেন। আর আমার অনিচ্ছায় আমার পরিচয় প্রকাশ ক'রে অনর্থক বিপন্ন আমাকে ক'রতে চাইবেন, এমনও মনে হয় না।"

"কে তিনি বলুন?"

"ব্যারিষ্টার সুকেশ চৌধুরী।"

"ব্যারিষ্টার সুকেশ চৌধুরী? বলেন কি? তিনি আপনাকে জানেন! এখানকার অতি বড় একজন নামজাদা লোক যে তিনি!—সব রকম বড় বড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন—দেশের বড় একজন নায়কই যে তিনি এখন হ'য়ে উঠেছেন। বটে! তিনি আপনাকে জানেন! কোথায় কি ভাবে পরিচয় হয়?"

একটু কি ভাবিয়া লতা উত্তর করিল, "এইটুকু অন্তত ব'লতে পারি—তাঁকেও বোধ হয় এটা আপনাদের ব'লতে হবে। আমার মামার বাড়ীতে আমি থাকতাম, আমার সেই মামার বাড়ী তাঁদেরই গায়ে, তাঁদেরই বাড়ীর কাছে।"

"বটে! আচ্ছা, এখুনি তাঁকে ফোন ক'রছি তবে।" বলিয়াই দারোগাবাবু উঠিলেন। লতা কহিল, "কেবল লতা ব'লেই সবাই আমাকে ডাকে, সেই নামটাই ব'লবেন।"

পাশের ঘরেই ফোন ছিল। একটু পরেই দারোগাবাবু ফিরিয়া আসিলেন—কহিলেন, "হাঁ, সুকেশ চৌধুরী আপনাকে চেনেন বটে—এখুনি আসছেন, ভবানীপুরেই তিনি থাকেন। আপনি উঠে স্থির হ'য়ে ঐ চৌকিতে বসুন। যান, চোক মুখটা বরং একটু ধুয়ে মুছে আসুন গে।"

লতা বাহিরে গেল। চক্ষু মুখ ধুইয়া আঁচলে মুছিয়া এক-পাশে একখানি বেঞ্চির উপরে আসিয়া বসিল। দারোগাবাবু একবার চাহিয়া দেখিলেন—কিছু আর বলিলেন না।

পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সুকেশ চৌধুরী আসিয়া পৌঁছিলেন। লতা উঠিয়া নমস্কার করিল। স্মিতমুখে ঈষৎ শিরঃসঞ্চালনে সেই নমস্কার স্বীকার করিয়া লইয়া দারোগাবাবুর সম্মুখে তিনি বসিলেন। সব কথা শুনিয়া

একটু হাসিয়া লতার দিকে একবার চাহিলেন, কহিলেন, "হাঁ, ওকে বেশ জানি। গত তিন-চার বছর দেশে আমাদের বাড়ীর কাছেই ওর মামার বাড়ীতে থাকত—ও, ওর মা, আর ছোট একটি ছেলে থাকবার সুবিধে শেষে আর হ'ল না, তাই এই মাস তিনেক বোধ হয় হ'ল, কাশী যায়। সেখানে মায়ে মেয়ে দুজনেই শুনেছি রাঁধুনীর কাজ আরম্ভ করে। ও যে বাড়ীতে কাজ ক'রত, তাদের সঙ্গেই বোধ হয় এখানে এসেছে। কেমন, তাই নয় লতা?"

"হাঁ।"

"যে বাড়ীতে কাজ ক'রত, তাঁদের আমি বেশ জানি।"

লতা চমকিয়া উঠিল। সুকেশবাবুও একবার তার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"হাঁ, বিন্দী আমাদের ওখানেই গিয়েছে—তোমার সঙ্গেও নাকি দেখা হয়েছিল। তাব কাছেই সব শুনলাম। ওঁরা আমার খুব জানাশুনো লোকই বটে। তবে—" বলিতে বলিতে দারোগাবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তবে হঠাৎ কাল রাত্তিরবেলায় কেন পালিয়ে এসেছে—সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনি। যাই হ'ক, এখানে কিছু ব'লতে চায় না, ও যখন তাঁদের নাম পরিচয়ও কিছু জানাতে চায় না, এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির কোনও দরকার আমি দেখি না। মেয়েটি খুব ভাল, নিঃশঙ্কচিত্তে আমি ওর জামিন হ'তে পারি। হাঁ, একেবারে এখান থেকেই ওকে discharge ক'রে (একদম ছেড়ে) বোধ হয় আপনারা দিতে পারবেন না? পারেন কি?"

"না, মাফ ক'রবেন মিষ্টার চৌধুরী, সেটা আর এখন সম্ভব হয় না।—কোর্টে ওঁকে আজ একবার উপস্থিত হতেই হবে। সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ ত আজই কিছু দেওয়া যাচ্ছে না। আপাতত আপনার জামিনেই ওঁকে থাকতে হবে, আর সে জামিন কোর্টই মঞ্জুর ক'রতে পারেন, তার পর একটা formal enquiry আর report—কিছু আটকাবে না ওঁতে, যা হয় ক'রে দেওয়া যাবে।' তখন একেবারে খালাস পাবেন।"

লতার দিকে ফিরিয়া সুকেশবাবু তখন কহিলেন, "তা হ'লে যদ্দিন না পুরো খালাসের হুকুম হয়, আমার হেফাজতেই কিন্তু তোমাকে থাক্‌তে হবে লতা। কারণ একটা দায়িত্ব আমাকে নিতে হ'চ্ছে, কে জানে যদি আবার কোর্টে তোমাকে হাজির করাতে হয়—কি বল?"

একটু ভাবিয়া লতা উত্তর করিল, "হাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু কোথায় থাকব? আপনার বাড়ীতে—"

"না, সেটা তোমার পক্ষে সুবিধে বোধ হয় মনে ক'রবে না। অন্য কোথাও—হাঁ, একজন ভদ্রমহিলা, এই লেডী ডাক্তার তিনি—আমার বিশেষ পরিচিতা আর শ্রদ্ধার পাত্রীও বটে। তাঁর কাছে আপাতত তোমাকে রেখে দিতে পারি। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেশ নিরাপদেই তাঁর ওখানে থাক্‌তে পারবে।"

"তাই থাকব।"

দারোগাবাবু কহিলেন, "তাহ'লে এখানে আর ওঁকে আটকে রাখ্‌তে চাইনে। আপনিই সঙ্গে নিয়ে যান। এই—বেলা বারটা তক আলিপুরে ওঁকে নিয়ে যাবেন। যত শীঘ্র সম্ভব জামিনের অর্ডার করিয়ে দেব।"

"Thanks! তাহ'লে উঠি এখন।"

"আসুন।—নমস্কার।"

"নমস্কার।—এস লতা।"

লতা উঠিল। দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া সুকেশবাবুর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

যথাসময়ে লতাকে লইয়া আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে তিনি উপস্থিত হইলেন। জামিন মঞ্জুর হইল। ফিরিয়া আবার লতাকে লইয়া তিনি সেই লেডী ডাক্তারের গৃহে গেলেন। যথাপ্রয়োজন বন্দোবস্ত সব করিয়া দিয়া সেখানে রাখিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ



ছাপাকল ও সংকেত-লিপি

(প্রবন্ধ)

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রকম ছাপা জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৭৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ছাপার আবির্ভাব হলো চীন দেশে কাঠের ফলকে খোদাই করা হরফে। সুয়ে বংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে চীনের অনেকগুলি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এইভাবে প্রথম ছাপা হলো। তার পরেই এর প্রচলন ঢুকলো জাপানে—৭৬৪ থেকে ৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তখনকার জাপ-সাম্রাজ্ঞী শিয়াটোকুর ইচ্ছাক্রমে জাপানের সমস্ত কায়া ও চংএ বিতরণের উদ্দেশে একলক্ষ কাগজে "বৌদ্ধ-ধারণী" এভাবে কাঠের ফলকে ছাপা হলো। এই সমস্ত ছাপার নিদর্শন নাকি আজও কিছু কিছু তাদের দেশে পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীন ও জাপান ক্রমে কাঠের ফলককে বিদায় দিয়ে ধাতু-অক্ষরের সৃষ্টি করলেন। এর বহু বৎসর পরে কোরিয়ায় ধাতু-অক্ষরে ছাপার কাজ সুরু হলো ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে—তার প্রথম ছাপা বইখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

এইভাবে প্রাচ্যে মুদ্রাক্ষর-প্রচলনের বহুশতাব্দী পরে সর্বপ্রথম ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে কাঠের মুদ্রা-ব্যবহার দেখা গেল। সেই প্রথম যুগে মুদ্রিত জার্মানির ২০খানি এবং নেদারল্যাণ্ডের ১০খানি পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন সহরের গ্রন্থাগারে আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে। ইউরোপে ধাতু-অক্ষরের প্রথম আবির্ভাব হলো ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে। জার্মেনির মেন্‌জ্‌ সহরের গাটেনবুর্গ হলেন তার উদ্ভাবন-কর্তা। ল্যাটিন-অক্ষরে তাঁর ছাপা বাইবেলখানিই হচ্ছে ইউরোপের সর্বপ্রথম ছাপা বই। ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন সহর থেকে বিভিন্ন ভাষার হরফ প্রস্তুত হতে লাগলো। এইভাবে (১) মেন্‌জ্‌ সহর থেকে ফাষ্ট এবং সোফার গ্রীক হরফে সিসিরোর গ্রন্থ সর্বপ্রথম ছাপালেন ১৪৬৫ সালে; (২) ক্যাক্সটন্ করলেন ইংরেজি হরফ ১৪৭৪ সালে; ইংরেজির প্রথম ছাপা বই হলো—"The Recnyell of the Histories of Troye"; (৩) প্রথম হিব্রু এলো ১৪৭৫ সালে, জার্মেনির একটি ইহুদি পরিবারের চেষ্টায় সমগ্র হিব্রু বাইবেলখানা ছাপা হলো ১৪৮৮ সালে; (৪) স্লাভনিক হরফে ক্র্যাকো সহর থেকে প্রথম ছাপা হলো 'শুবমালা'র একখানি পুস্তক ১৪৯১ সালে; (৫) ইটালীয় হরফে ভেনিস সহরের এলডাস্ ম্যান্যুটাস্ ১৫০১ সালে কবি ভার্জিলের একখানি গ্রন্থ ছাপালেন; (৬) আরবী হরফ সর্বপ্রথম দেখা গেল ১৫১৪ সালে ইটালিতে। ভেনিস সহর থেকে তার প্রথম কোরাণ ছাপা হলো ১৭১৮ সালে; (৭) রুশীয় ভাষায় সর্বপ্রথম ছাপা হয় বাইবেলের কতকাংশ ১৫১৭-১৯ সালের মধ্যে প্রাগ সহরে; (৮) ইথিওপীয় ভাষায় তার প্রথম বই ছাপা হলো রোম সহরে ১৫১৩ সালে; (৯) সিরীয় হরফে প্রথম ছাপা হলো প্যারিস সহরে ১৫৬৯ সালে; (১০) আর্মেনিয়ার কতকগুলি স্তব ছাপা হলো প্রথম ১৫৩৫ সালে রোম সহরে; (১১) এংলো-স্তাক্সন হরফ প্রস্তুত করলেন জোন ডে ১৫৬৭ সালে; (১২) আইরিশ হরফ কুইন এলিজাবেথ দান করলেন ডাবলিনের ওকারনি সাহেবকে ১৫৭১ সালে এবং সেই বৎসরেই তার প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হলো; (১৩) রুনিক হরফ প্রথম ব্যবহৃত হলো ইক্-হলম্ সহরে ১৬১১ সালে; (১৪) কপ্‌টিক ও সামারিটন হরফ প্রথম পাওয়া যায় ১৬৩৬ সালে; (১৫) গথিক ও স্কাণ্ডিনেভীয় হরফ প্রথমে প্রস্তুত করলেন ফ্রানসিস্ জুনিয়াস্ ১৬৭৭ সালে; (১৬) এটরুস্কান হরফ প্রস্তুত করলেন উইলিয়াম ক্যাশ্‌টন ১৭৩৩ সালে।

এইভাবে নানা মনীষীর উদ্ভাবনায় যদিও মুদ্রাক্ষর-শিল্প ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চললো—তথাপি ১৮১১ সাল পর্যন্ত সে কর্ম-জগতের দ্রুতগতির সঙ্গে কিছুতেই সমান তালে পা ফেলতে পারছিল না, কেননা এতদিন পর্যন্ত নিছক হাতের সাহায্যেই ছাপার যা কিছু কাজ চলে আসছিল—যন্ত্রপাতি তাকে সাহায্য করতে পারেনি। এই বৎসর জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক কোনিগ সর্বপ্রথম তাঁর বাষ্প-চালিত মুদ্রা-যন্ত্র পৃথিবীকে দান করলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র 'টাইম্‌স্' কাগজখানি এই যন্ত্রে সর্বপ্রথম ছাপা হয়। প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ সংখ্যা ছাপার মত শক্তি তার হলো। কিন্তু যান্ত্রিক-জগৎ যে উদ্দাম গতিতে ছুটেছে—তাতে প্রাচীন যা-কিছু প্রতি নিয়তই তার কাছে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আজ ১৫০০ ছাপার স্থানে প্রতি ঘণ্টায় ছাপা সম্ভব হয়েছে ১২০,০০০ সংখ্যা! এর সঙ্গে মুদ্রা-জগতের আরও ক'টি দান—টাইপ-রাইটার—মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ—বাণিজ্য-জগতের তিনটি অমূল্য নিধি! এই নির্বাক হিতৈষীগুলির জন্মকথার অল্পবিস্তর আলোচনা এইবার আমরা করবো।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কুইন আনির রাজত্বকালে হেন্‌রি মিল টাইপরাইটার নির্মাণের সর্বপ্রথম চেষ্টা করে যান। দ্বিতীয় চেষ্টা হয় ফ্রান্সে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় চেষ্টা হয় আমেরিকায় ১৮২৯ সালে। তার পর চেষ্টা করেন ফ্রান্সের আর একজন যন্ত্রবিৎ জেভিয়ার প্রোগিন ১৮৩৩ সালে। এইভাবে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু যন্ত্রই আবিষ্কৃত ও নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্য থেকে দুর্বল শৈশবের ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। এই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই জোন প্র্যাটের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর মার্কিন বৈজ্ঞানিক ক্রিষ্টোফার শোল্‌সের পরিকল্পনায় যে যন্ত্রটি নির্মিত হয় তাই ক্রমে রেমিংটন কোম্পানির বর্তমান যন্ত্ররূপে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৩ সালে মিঃ ওয়েগনারের এক নূতন পরিকল্পনা নিয়ে আণ্ডারউড কোম্পানি আর একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। লিপি-কৌশলের

অতি-আধুনিক উৎকর্ষই এ দুটি যন্ত্রে বর্তমান। অবশ্য ন্যূনাধিক গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি যন্ত্রই আজ পর্যন্ত বাজারে প্রচলিত হয়েছে।

তার পর মনো ও লাইনো টাইপের কথা। ১৮৮৭ সালে ট্যাবলট ল্যান্সটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এর দু বৎসর পরে অটমার মারগেনথেলার লাইনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। ইনি একজন জার্মান যন্ত্র-শিল্পী—থাকতেন আমেরিকায়। এই যন্ত্র দুটির উদ্ভাবন করে তাঁরা মুদ্রা জগতকে মহামূল্য সম্পত্তিই দিয়ে গেছেন। কেন না এ পর্যন্ত ছাপার হরফগুলি হাতের সাহায্যেই একটির পর একটি করে সাজাতে হতো—যার ফলে কাজের গতিবেগ হতো মন্থর—আর ছাপাইকারের শ্রম ও ভ্রমের অন্ত থাকতো না। কিন্তু আজ যন্ত্রই যেন মানুষ হয়ে উঠেছে; যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে টাইপ যন্ত্রের চাবি টেপা মাত্র অক্ষরের পর অক্ষর পাশাপাশি সারি গেঁথে রচনায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে—দেখতে না দেখতে যন্ত্র ঘর থেকে মুক্তি পেয়ে তার গতিবেগের জয় লেখা পৃথিবীর আলোয় সুপ্রকাশ হয়।

তারপর সংকেত লিপির জন্মকথা। পৃথিবীর কোন্ বয়সে এবং কোন্ দেশে যে সংকেত লিপির প্রথম জন্ম হয়—তার কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। কতকগুলি ঘটনার উপর নির্ভর করে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে সংকেত লিপির অস্তিত্ব ছিল। রাণী এলিজাবেথের সময় ডাঃ টিমোথি ব্রাইট ও পেটার বেল তাঁদের নিজ নিজ পদ্ধতি বহু বৎসর সাধারণ্যে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৬২০ সালে শেলটন যে নূতন পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন পেপিস তারই সাহায্যে তাঁর রোজ্‌নামচাখানি লিখে গেছেন। টেলরের সংকেত লিপিই প্রথম সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন এবং স্পেনে এই পদ্ধতিই ভাষান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হতে থাকে। ম্যাসন যে নীতির প্রবর্তন করেন—গারনির হাতে তা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর পরে বারনেশের যে নীতি প্রবর্তিত হয়, সেটিও পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। ১৮৩৭ সালে পিটম্যানের পদ্ধতি প্রকাশিত হয়। দ্রুতলিপির কাজে এই পদ্ধতিই আজ সর্বাধিক ব্যবহৃত। পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন ভাষায় এই পদ্ধতিটি রূপান্তরিত হয়েছে। এর পর গ্রেগ অয়েফোড, রোন, স্লোশটন প্রভৃতি অধুনাতন কতকগুলি পদ্ধতিও প্রচলিত হয়েছে।

তারপর বাংলা সংকেত-লিপির জন্মকথা। ১৩১৯ সালে ৺দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর "রেখাক্ষর-বর্ণমালা" লিথোর সাহায্যে সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন। কলকাতার শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী এই দ্বিজেন্দ্র নীতিকে প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত করে নিয়ে একটি নূতন প্রথার রূপ দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তারপর ১৩৩২ সালে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ইংরেজি পিট্‌ম্যান্‌-এর অনুকরণে বাংলা শর্টহ্যাণ্ডের আর একটি প্রথার সৃষ্টি করেন। কলিকাতার শ্রীশশিভূষণ দাস এ বিষয়ে গবেষণার ফলে আর একটি নীতি উদ্ভাবন করেছেন। গ্রেগ-এর অনুসরণে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও সম্প্রতি একটি নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি বাংলা সংকেত-লিপির যথেষ্ট লেখনিকের সৃষ্টি সম্ভব হয় নি—কারণ ছাপানো বই এবং সাধারণ শিক্ষালয়ের অভাব। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা অর্থবান দানশীলমণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে কোন ব্যাপক ফললাভের সম্ভাবনা নেই।

বাংলা অক্ষর ও ছাপাখানার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ছাপানো বই। ১৭৭৮ সালে চুঁচুড়ার ছাপাখানায় এই বই ছাপা হয়। তারপর উইলিয়ম কেরী সাহেব ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুরে একটি বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রথম এইখানেই ছাপা হয়। বাংলা অক্ষর গঠনের বহু প্রকার জটিলতা নিয়ে অদ্যাধিক দেড়শো বছর প্রায় একভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় কঠোর সংগ্রাম ক্ষেত্রে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ভাষার সংস্কার যে এক অপরিহার্য প্রয়োজন—একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। পরিবর্তন বিরোধী মন নিয়ে যদি আমরা নিশ্চিন্ত স্থবিরতায় বসে থাকি তাহলে কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে এমন ভাষা কোন কালেই গড়ে উঠবে না। আজ শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লাইনো-টাইপ ও অক্ষর সংস্কারের জন্য যে চিন্তা, শ্রম ও সময় দান করেছেন—তার যথাযথ উপযোগিতাকে এখনি গ্রহণ করে যোগ্য প্রতিদান হয়ত দেশ এখনই দিতে পারবে না, কিন্তু ভাষার বহু যুগের অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে তিনি যে ভবিষ্যৎ সংস্কারের পথ মুক্ত করে দিয়েছেন—শুধু সেই কথাই স্মরণ করে দেশ আজ তাকে ধন্যবাদ দেবে।

তারপর বাংলা লিখন যন্ত্র বা টাইপরাইটারের কথা। ১৩২৫ সালে ময়মনসিং ধানকুড়ার শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার আবিষ্কার করেন। তারপর বছর কয়েক পরে রেমিংটন কোম্পানির কল বাজারে বেরোয়। যন্ত্র দুটিতে উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট অবকাশই রয়েছে। অবশ্য তার জন্য বাংলা অক্ষরগঠনের জটিলতা বড় কম দায়ী নয়। মনীষিগণের চিন্তার ফলে যতদিন না বাংলা অক্ষরের এই জটিলতা-সমস্যা দূর হয়—ততদিন পর্যন্ত বাংলা ছাপাকলের দ্রুতগতি কোনমতেই সম্ভব হবে না।

এ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিবর্তনের যে রূপ কল্পনা আমাদের আছে তারই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

ি ৃ, ে ৈ ে া ে ৌ স্বরচিহ্ন গুলিকে পরিবর্তন করে া া এর মত ব্যঞ্জনের দক্ষিণভাগে ব্যবহারের উপযোগী চিহ্নের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা।

যুক্তাক্ষর নীতির পরিবর্তন করে ইউরোপীয় ভাষার মত পাশাপাশি লেখার সুবিধা সৃষ্টি করা।

'শব্দ-বন্ধের' ফাঁকামিকে কতটা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া চলে, তার হিসাব নির্দেশ করা।

দ্বিত্বনীতির অবসান করা।

বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব'এর মধ্যে আকৃতিগত কোন পার্থক্য নির্ধারণ করা।

মিশ্র সংযোগে মূল অক্ষরের আমূল পরিবর্তন-নীতি ত্যাগ করা, যেমন—ক্‌ষ = ক্ষ, জ্‌ঞ = জ্ঞ, হ্‌ম = হ্ম ইত্যাদি।

এই সমস্ত সমস্যা মনীষিগণের চিন্তাফলে যদি না দূর হয়—তাহলে কর্ম-চঞ্চল জগতের দরবারে প্রবেশের শক্তি বা অধিকার বাংলা ভাষা কি করে পাবে? আমাদের মূঢ় বিশ্বাস, প্রাচীনের প্রতি নিরর্থক শ্রদ্ধার আবরণে যুগ-সংস্কারের দাবীকে আমরা চিরকালই বঞ্চিত করে রাখতে পারি না।

শ্রীমধুসূদন

বনফুল

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

কলিকাতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবন সীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দ্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন—কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening—Pundit!

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—বস! কোথায় বসতে দিই তোমাকে! তুমি সাহেব মানুষ। ওবে ছিরু—

মধু। Please don't trouble yourself. এই ত বেশ বসেছি।

চৌকিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি?

মধু। বীরাঙ্গনা কাব্য। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি— ক্ষমা করবে ত?

বিদ্যাসাগর। কি বল ত!

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক আর নেই। There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। তুমি কবি মানুষ, অনেক কিছু অলীক বস্তু কল্পনা ক'রে থাক। তোমার সঙ্গে তর্কে ত পারব না।

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত! এ সব লিখছ কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। খিদিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি করে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনলে? হরিমোহন?

মধু। হ্যাঁ। আর বাকী সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে —তাছাড়া মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চলে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইলো, একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তাহলে! তোমার মেঘনাদবধ ত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে—নয়?

মধু। হ্যাঁ। Bhudeb has introduced 'মেঘনাদ' in his school! Hemchandra, a real B. A., is editing the second edition.

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক—কেমন যেন আটকে আটকে যায়। তোমার 'ব্রজাঙ্গনা' খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়—কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই! বাঙলা সাহিত্যে তুমি যে একজন অসাধারণ কবি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই আর! প্রথমে তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম আমি। মানে—

মধু। My dear Vid., you are great! I prize your opinion above all others because your admiration is honest and you are above flattering any man.

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—কবিদের মুখ বন্ধ করার ত সাধ্য নেই! কিন্তু একটা কথা ভাবছি, এত টাকা-কড়ি খরচ ক'রে, বিলেত যাচ্ছ—শেষ পর্য্যন্ত সুবিধে হবে ত?

মধু। বাঃ—সুবিধে হবে না? ব্যারিষ্টার হ'য়—

that will open a bigger scope for the—টাকা রোজগার করতে হবে—I can't rot in poverty !"

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মুস্কিল এই যে, টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই তোমার ঝোঁকটা বেশী! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক করে দিয়েছিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়তো তাতে, কিন্তু তুমি ফট্ করে ছেড়ে দিলে!

মধু। আমি পারলাম না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ—সবাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি পারলাম না। It was impossible for me to carry on—রেখে ঢেকে ওজন ক'রে লেখা আমার কর্ম্ম নয়—I am not a journalist by nature. Citizen কাগজে লিখে কি বিপদে পড়েছিলাম জান ত!

বিদ্যাসাগর। জানি ত সব! কিন্তু পেট্রিয়ট চালাবার মত একটা ভাল লোকও যে দরকার। কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে—একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে! কেষ্টদাস পালকেই শেষ পর্য্যন্ত দিতে হবে দেখছি। হরিশ মারা যাওয়ার পর থেকে কাগজটাতে অভদ্রা লেগেছে। গিরীশ আর হরিশের স্মৃতিচিহ্ন ওই কাগজখানি! ওটা নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।' ভাল কথা, শুনছি নাকি নীলকর সায়েব ব্যাটারা হরিশের বিধবার নামেও মোকদ্দমা করে ডিক্রী করছে!

মধু। শুনেছি! These planters are demons, (হাসিয়া) যদিও আমার প্রথম শ্বশুর একজন planter ছিলেন—I mean Rebecas' father—তবু ওদের সম্বন্ধে আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না। The Rogues!

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি যে নীলদর্পণের অনুবাদক একথাটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।

মধু। তা খুব জানি! ওপরওলার কাছ থেকে ধঁতোও খেয়েছি এর জন্যে! But I don't care. I am sick of this horrid service! আমার বিলেত যাওয়ার আর একটা কারণও এই! I want an independent profession.

। কিন্তু লং সায়েবের মনের জোরটা দেখলে অর্থদণ্ড! [illegible] গেল, তবু কিছুতেই তোমার নাম প্রকাশ করলে না! সায়েব জাতের গুণই এই। একেবারে ইস্পাত!

মধু। আমাদের কালীপ্রসন্ন সিংহও কম ইস্পাত নয়! লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ করে ফেলে দিলে আদালতে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) সে কথা একশ' বার! সঙ্গদোষে যদি বিগড়ে না যায় ও ছোকরার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে! ওর একটা মহৎ কীর্ত্তি হ'ল মহাভারতের অনুবাদ। অনেক টাকা খরচ করেছে। ভাল ভাল পণ্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে—এ কি সোজা কথা! ওর 'হুতোম' কিন্তু সুবিধে হয় নি।

মধু। মহাভারতের পেছনে তুমি রয়েছ যে! হুঁতোম্ is too realistic.

বিদ্যাসাগর। মহাভারতের আমি আর কি করেছি—জোগাড়-যন্ত্র করে দিয়েছি মাত্র।

মধু। আচ্ছা, তোমার চেহারাটা কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই নাকি?

বিদ্যাসাগর। মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যাবার সময় সেই যে গাড়ী থেকে পড়ে গেছলাম—তার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া (হাসিয়া) চালকলা খেকো এ বামুনের চেহারা কোন কালেই কন্দর্পকান্তি ছিল না!

মধু। কে বললে? In your youth, তুমি সত্যিই কন্দর্পকান্তি ছিলে। Look at your portrait by Hudson.

বিদ্যাসাগর। আবার কবিত্ব সুরু করলে তুমি! থাম! তার চেয়ে তোমার 'বীরাঙ্গনা' থেকে কিছু পড় দেখি, শোনা যাক। বীরাঙ্গনা কি নিয়ে লিখেছ?

মধু। এ কাব্যখানা পত্রাকারে লেখা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে কতকগুলি নারী-চরিত্র নিয়েছি—তারা যেন তাদের স্বামী অথবা প্রেমাস্পদকে পত্র লিখে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। Ovid-এর Heroic Epistle-এর ধরণে লিখেছি আর কি!

বিদ্যাসাগর। পড় ত—শুনি।

মধুসূদন পড়িতে লাগিলেন ও বিদ্যাসাগর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন

মধু। প্রথমটাই শোন—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা।

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলা-রাশি, হা নাথ, আকাশে
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে
অমনি চমকি ভাবি মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে পশিছে আশ্রমে
পদাতিক, বাজীরাজি সুরথ সারথি
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা অনসূয়া ডাকি সখিদ্বয়ে
কহি, হেদে দেখ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে।
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!

বিদ্যাসাগর। অতি উত্তম হয়েছে! আমার ভয় হচ্ছে, তোমার এ শকুন্তলা পড়বার পর আমার শকুন্তলা আর কি কেউ পড়বে! (হাস্য)

মধু। বল কি! Your prose is unparalleled! যতদিন বাঙলা সাহিত্য থাকবে ততদিন বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা স-গৌরবে বিরাজ করবে। You are another কথ!

বিদ্যাসাগর। তোমার একটা দোষ কি জান? অতিশয়োক্তি। সব জিনিষই অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে তোলা কেমন তোমার একটা বদ রোগ! তোমার তিলোত্তমা আর মেঘনাদবধে উপমা আর অলঙ্কারের ভীড় ঠেলে এগোনই মুস্কিল।

মধু। তবু লোকে এগিয়েছে ত! My misson is fulfilled—আমার যা করবার আমি করেছি!

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) করেছ মানে!: যা-তা কাণ্ড করেছ তুমি। একটা দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিকশাস্ত্র হয়ে এলে, তুমি আমাদের হৃদয়-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছ জোর ক'রে। 'বিদ্যোৎসাহিনী' তোমাকে সাথে অভিনন্দিত করেছে? করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের রুচির কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না। দিলে কি-না রূপোর একটা পান-পাত্র। ছ্যাঃ! রূপোর দোয়াত কলম দিলে ঢের বেশী সুরুচিসঙ্গত হত।

মধু। আমি কিন্তু ঢের বেশী অভিনন্দিত হয়েছি সেদিন চীনেবাজারে?

বিদ্যাসাগর। (সবিস্ময়ে) চীনেবাজারে!

মধু। হ্যাঁ! সেখানে সেদিন এক দোকানদার দেখি নিবিষ্টচিত্তে ব'সে মেঘনাদবধ পড়ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ছেন মশায়? 'একখানি নূতন কাব্য!' বললাম—কাব্য! বাঙলা ভাষায় ভাল কবিতাই নেই—কাব্য হবে কোথা থেকে! দোকানী কি উত্তর দিলে শুনবে? বললে—সে কি মশায়, মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে-কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) বটে! তারপর?

মধু। তারপর তাকে বললাম—আচ্ছা একটু শোনান ত দেখি! সে আমার সায়েবি পোষাক দেখে বললে—এর ভাষা বোধ হয় আপনি বুঝতে পারবেন না। বললাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি। তখন সে খানিকটা পড়ে শোনালে। তারপর তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে আমিও খানিকটা পড়ে শোনালাম তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এই অমিত্রাক্ষর বাঙলায় চলবে কি? সে মহা উৎসাহে বললে—খুব চলবে মশাই—এ বাঙালায় নূতন সৃষ্টি—মনে হয় এ-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি তাকে আত্মপরিচয় না দিয়ে সরে পড়লাম—but I was puffed up like a baloon!

বিদ্যাসাগর। ছুছুন্দরিবধ কাব্য দেখেছ? (হাসিলেন)

মধু। দেখেছি? ঢাকার জগবন্ধু ভদ্র লিখেছে—বেশ লিখেছে। He has imitated me nicely! বেহার থেকেও কে একজন—নামটা ঠিক মনে আসছে না—হিন্দিতে অমিত্রাক্ষর লিখেছে। কিন্তু তেমন নাকি জমিয়ে হয় নি।

বিদ্যাসাগর। দেখ, আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে—মেঘনাদবধ লিখতে লিখতে কি করে তুমি ব্রজাঙ্গনা লিখলে! একেবারে অন্য সুর!

মধু। ওটা লিখেছি ভূদেবের প্ররোচনে। ভূদেব একদিন আমাকে বললে—"ভাই, তুমি ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি করতে পার?" তারই ফল 'ব্রজাঙ্গনা'। ভাল লেগেছে তোমার?

বিদ্যাসাগর। চমৎকার! (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও ঠিক বাগিয়ে উঠতে পারি নি! (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাক্—বিলেত চললে তাহলে!

মধু। হ্যাঁ—ছেলেবেলা থেকে সাধ বিলেত যাব। And go I must. কল্পনানেত্রে আমি যেন বিলেতটাকে দেখতে পাচ্ছি। টাসোর Jerusalem Delivered-এ Crusader-রা Jerusalem-এর কাছাকাছি এসে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনের অবস্থাও অনেকটা তাই—

Wing'd is each heart and winged every heel
They fly, yet notice not how fast they fly—

জাহাজে উঠলে যেন আমি বাঁচি—I am impatient.

বিদ্যাসাগর। তা'ত দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধু বেশ বিশ্বাসী লোক ত!

মধু। দিগম্বর মিত্তির, বৈদ্যনাথ মিত্তিরের মত লোক জামিন হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।

বিদ্যাসাগর। দেখো,—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে।

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি।—সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? কিসের টাকা?

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর টাকা নেই—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তার উপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার উপর—আমার আর টাকা নেই। এদেশের লোক মিলেমিশে ত কিছু করবে না। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে এক ট্রেনিং একাডেমি খুলে বসেছে। মনে পড়ে কিছুকাল আগে হীরাবুলবুল বলে এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা নিয়ে রাজেন দত্ত-টত্ত মিলে কোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ খুলে বসে? মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই দেশটা গেল! আমি আর ক'দিক সামলাই বল। সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? কিসের জন্যে টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জমে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে ত before I sail.

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে—চুরি করব?

মধু। You can work wonders if you like! টাকা না পেলে আমি অপমানিত হব। You are a noble man and therefore I appeal to you! বন্ধু বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে আরও কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলে আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। মুস্কিলে ফেললে দেখছি—টাকা কই—

মধু। দাও ভাই! হাতযোড় করে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাতযোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা, হা—ওকি কর তুমি! কিছুদিন আগে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় তোমার 'আত্ম-বিলাপ' পড়ে মনে হয়েছিল যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে—এবার থেকে ভালভাবে চলবে! কিন্তু দেখছি—

মধু। Believe me—ভাল-খারাপ আমি কিছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। You know necessity knows no law!

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার necessity যে রাজকীয় necessity, এই হয়েছে মুস্কিল [illegible] কত টাকা চাই তোমার?

মধু। I need a lot! তুমি কত [illegible] পারবে তাই বল।

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই।

মধু। কিছু নেই?

বিদ্যাসাগর। না—

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) But I counted upon your greatness—কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক বলে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্গত আবদার করি। রাগ করো না আমার ওপর। I am a helpless creature. কেন জানি না, কিছুতেই কুলোতে পারি না। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে যদি ফিরতে পারি—I shall role in wealth and I shall help you in all your noble projects. (উঠিয়া) আচ্ছা, যাই তা হলে—good night.

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ও ক্ষণপরেই একটি চেক্ বহি বাহির করিয়া একটা চেক্ কাটিলেন

বিদ্যাসাগর। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সায়েব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় ত—দৌড়ে যা—

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন

মধু। You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর। দোয়াত-টোয়াত সব উল্টে দেবে না কি!

মধু। সত্যিই তুমি সাগর—করুণাসাগর!

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্ক একদম খালি! এর মধ্যে টাকাটা জমা করে দেব!

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চকিতে চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ বিরতি

পঞ্চদশ

কলিকাতায় ভোলানাথ দত্তের বাড়ীতে ভোলানাথ দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথোপকথন নিরত। ইঁহারা উভয়েই যে যৌবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

সময় ১৮৬৯ খৃঃ অঃ—মে মাস

ভূদেব। মধু তাহলে ব্যারিস্টার হয়ে এল শেষ পর্য্যন্ত!

ভোলানাথ। নিশ্চয়—ও যা ধরবে তা করবে—এই ওর স্বভাব।

ভূদেব। বিলেতে নাকি টাকার জন্যে মহা বিপদে পড়েছিল?

ভোলানাথ। ভয়ানক! টাকার অভাবে বিলেত থেকে ফ্রান্সে চলে আসে। সেখানেও দিন চলা মুস্কিল হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর টাকা ধার ক'রে পাঠায়, তবে উদ্ধার হয়! আশ্চর্য্য লোক আমাদের দেশের! যাদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেউ দিলে না। মধুর স্ত্রী-পরিবারের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠল! শেষে তারা সুদ্ধ কোনক্রমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে বিলেত গিয়ে হাজির হ'ল মধুর কাছে! বোঝ একবার ব্যাপারখানা! Then the fat was in the fire! একে তারই সেখানে অনটন—তার উপর এরাও গিয়ে জুটল! হিতৈষীরা মধুর চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিতেন না শুনেছি। বিদ্যাসাগর টাকা না পাঠালে মধুকে জেলে যেতে হত!

ভূদেব। জেলে? সে কি!

ভোলানাথ। ঋণের দায়ে! সেখানে না খেয়ে যে ওরা কতদিন কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সে পাড়া-প্রতিবেশীরা নাকি লুকিয়ে ওদের ঘরে খাবার রেখে যেত, শুনেছি। Look at their greatness! আর আমাদের দেশের লোক তার বিষয়টি মেরে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল! সত্যি ভাবলেও দুঃখ হয়।

ভূদেব। এ সব ত আমি জানতাম না।

ভোলানাথ। আরে, আমিই কি জানতাম! ও এক বিদ্যাসাগরকে ছাড়া ও কাউকেই লেখেনি এ সব কথা। এদিকে ওর self respect জ্ঞান ভয়ানক প্রবল কি-না!

ভূদেব। যাক্—ব্যারিস্টারি ওর হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। হচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু মধুকে ত জানই— ওর টাকার অভাব কোনদিন ঘুচবে না।

ভূদেব। কেন, কি করছে ও ?

ভোলানাথ। যা চিরকাল করে আসছে—বাবুয়ানি। স্পেনসেস্ হোটেলে লর্ডের মত বাস করছে—আর যা রোজগার করছে দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ছেলে-মেয়ে পরিবার সব ফ্রান্সে রয়েছে—তাদেরও মাসে মাসে তিন-চার শ' টাকা পাঠাতে হয়। আর হোটেলেও ওর নিজের খরচ মাসে পাঁচ-ছ শ' টাকার কম হবে না। বেশী হতে পারে।

ভূদেব। হোটেলে থাকবার দরকার কি ?

ভোলানাথ। দরকার কি ! Don't judge Madhu with our standard—he is a far more superior being ! বিদ্যাসাগরও বলেছিল—দরকার কি ! বিলেত থেকে আসবার ঠিক আগে বিদ্যাসাগর সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে খানকয়েক ঘর সায়েবি কায়দায় সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছিল—ভেবেছিল ওপাড়ায় বাসা করলে শস্তায় হবে। মধু কিন্তু জাহাজ থেকে নেবে সোজা গিয়ে হোটেলে উঠল—কিছুতেই সেখান থেকে নড়ল না। এখন সেখানে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড চলছে ! মধুর ত এখন দেশ-জোড়া খ্যাতি—দলে দলে বন্ধুবান্ধব যাচ্ছে—খানা খাচ্ছে—মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ওর সেলার সর্ব্বদাই নাকি উন্মুক্ত ! এমন কি, শুনেছি নাকি ওর মুন্সিকে পর্য্যন্ত ডেকে ও মদ খাওয়ায়।

ভূদেব। তাই না কি ? খুব মদ খাচ্ছে ও ?

ভোলানাথ। সেদিন ললিত ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাথ্রুমে বসে' জিবে লঙ্কা ঘসছে। ললিত জিগ্যেস করলে, এ কি করছ হে ? মধু বললে—মদ খেয়ে খেয়ে জিব অসাড় হয়ে গেছে—স্পষ্ট উচ্চারণ হচ্ছে না ! আন্দাজ কর তাহলে ! ওর গলার স্বরও কেমন যেন বদলে গেছে—কেমন যেন একটা চেরা আওয়াজ—সে রকম মিষ্টি স্বর আর নেই ওর !

ভূদেব। বিলেত যাওয়ার এই পরিণাম তাহলে ?

ভোলানাথ। বিলেত গিয়ে লাভ কিছু কম হয় নি। ব্যারিষ্টার ত হয়েছে !—তাছাড়া ফরাসী, ইটালী, জার্মাণ এ তিনটে ভাষা রীতিমত শিখে এসেছে। কবিতা লিখতে পারে প্রত্যেকটাতে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু—এগুলো ত আগেই জানত। এতগুলো ভাষা এদেশে কেউ জানে না। সেদিন এক মজার ব্যাপার হয়েছে।

ভূদেব। কি ?

ভোলানাথ। ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের ছেলে সুরেন্দ্র—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত যাচ্ছে। সেদিন তাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু, মনোমোহন ঘোষ আর বিদ্যাসাগব গেছে মধুব সঙ্গে দেখা করতে। In B. A. Surendra stood first in Latin—এই শুনে মধু তাকে পরীক্ষা করতে বসল। Horace খুলে দিয়ে বললে—এই passage-টা পড়ে বুঝিয়ে দাও দেখি ! সুরেন্দ্র বুঝি ভাল করে পারে নি। তাই দেখে মধু মনোমোহনকে বললে —যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে ! সুরেন্দ্রের মত ছেলেকে যে ও কথা বলতে পারে তার self-confidence কতখানি বোঝ !

ভূদেব। ও ত চিরকালই ওই রকম ! নতুন বই-টই কিছু লিখেছে আর ?

ভোলানাথ। বাঃ —'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'—দেখ নি ? It is a masterpiece ! মধুই বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেটও লিখলে ! এই যে এইখানেই আছে বইখানা— বিলেতে বসে লিখেছে।

শেল্ফ্ হইতে বইখানা পাড়িলেন

এই দেখ। There are fine pieces of different varieties.

ভূদেব। (বইখানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সব বিলেতে বসে লিখেছে ও ? অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কীর্ত্তিবাস, বউ কথা কও, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপাখী, পুষ্করিণী— বিলেতে গিয়েও মনটা তাহলে ওর সম্পূর্ণ দিশিই ছিল দেখছি !

ভোলানাথ। ওই ত ওর বিশেষত্ব—বাইরে ও সায়েব— মনটা কিন্তু ওর বরাবরই পুরো বাঙালী। এখনও হোটেলে শুনেছি হরিমোহনের বাড়ী থেকে ভুনিখিচুড়ি আর মুগের ডাল আনিয়ে খায়। গৌর যখন এখানে আসত তখন তার বাড়ীতে রুটি আর ঘণ্ট ত ওঁর বাঁধা বরাদ্দ জানতুম।

ভূদেব। (চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন) বাঃ—এই কবিতাটি ত সুন্দর।

ভোলানাথ। কোন্টা ? পড় ত—

ভূদেব। (পড়িতে লাগিলেন)

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি'।
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে,'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে: পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে!

ভোলানাথ। (সগর্বে) He has a regular field-day in the arena of Bengali literature.—

ভূদেব। এ কবিতা যে লিখেছে সে কি ক'রে সায়েবি হোটেলে বসে মদ আর খানা খায়—এ আমি ভাবতেই পারি না!

ভোলানাথ। ও একটা অদ্ভুত লোক। অদ্ভুত! এদিকে ঋণে জর্জরিত অথচ হাতে যখন টাকা থাকে তখন মুঠো মুঠো খরচ করবে। খানসামাকে বকশিস দেবে দশ টাকা—গাড়ী ভাড়া দেবে এক মোহর—এর কোন মানে হয়! Really he makes no distinction between his own money and others' money! টাকা is টাকা—সে যারই হোক—খরচ কর—এই হচ্ছে ওর idea!

ভূদেব। ওর প্র্যাকটিস্ হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। চলছে মন্দ নয়—কিন্তু ব্যারিষ্টারি ওর বেশী দিন চলবে না।

ভূদেব। কেন?

ভোলানাথ। ও রকম করলে কি কখনও প্র্যাকটিস্ হয়? ও জজেদের সঙ্গে অনবরত তর্ক করবে—কবিতা আওড়াবে। জ্যাকসন সায়েবকে সবাই ভয় করে। জ্যাকসন সায়েব একচোখে monocle লাগিয়ে যখন কারো দিকে তাকায় বুকের রক্ত জল হয়ে যায় তার। কিন্তু মধু does not care him.

ভূদেব। কি করে মধু?

ভোলানাথ। জ্যাকসন সায়েব এক চোখে গোল চশমা পরে যেই মধুর দিকে চাইবে অমনি মধুও তার spring-এর চশমা নাকের ওপর লাগিয়ে সমানে চেয়ে থাকবে তার দিকে। তর্ক ত প্রায়ই করে শুনেছি। তাছাড়া ভয়ানক চীৎকার করে কোর্টে—গলার স্বরও ওর কর্কশ হয়ে গেছে আজকাল। একদিন জ্যাকসন সায়েব নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "The court orders you to plead slowly—the court has ears." মধু তৎক্ষণাৎ বলে বসল—'But pretty too long my Lord!' এ-রকম করলে কতদিন চলবে? আমি ওকে মানা করেছি অনেকবার—শোনে না কিছুতে—ও বলে—Michæl can never brook anybody's bullying! জ্যাকসনের সঙ্গে ওর আদায় কাঁচকলায়! ওর হাইকোর্টে ঢোকার সময় ওই জ্যাকসনই ত বাগড়া দিয়েছিল! অনেক সুপারিশ অনেক testimonial জোগাড় করে তবে ও Bar-এ join করতে পায়। একটু মানিয়ে চলা ত উচিত—মধু কিন্তু তা কিছুতে করবে না।

ভূদেব। অনেক দিন দেখি নি তাকে—চল একদিন দেখা করে আসি।

ভোলানাথ। বেশ ত চল না—সে ত ওই চায়। বন্ধুবান্ধব—বিশেষত, সাহিত্যরসিক কেউ গেলে ও মক্কেল-টক্কেল ফেলে তাদেরই সঙ্গে আড্ডা দিতে সুরু করে দেবে।

ভূদেব। চেহারা কেমন হয়েছে আজকাল?

ভোলানাথ। সে চেহারা আর নেই! বেশ মোটা হয়েছে—ভুঁড়ি হয়েছে—খুব গোঁফ, দু'দিকে দাড়ী। সে মধু আর নেই। ওর মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল।

ভূদেব। মেয়ের নাম শর্ম্মিষ্ঠা রেখেছে না কি?

ভোলানাথ। ছেলের নাম—Michæl Milton Dutt—ডাকনাম মেঘনাদ! আর ছোট ছেলের নাম Albert Napoleon Dutt! বল কেন, সবই অদ্ভুত ওর।

নেপথ্যে। ভোলানাথ বাড়ী আছো হে!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত!
পুরা সাহেবি পোষাক—হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট

মধু। Hallo—is it ভূদেব? You have changed a lot and so have I. Very glad to see you!

তাহার সহিত শেক হ্যাণ্ড করিলেন

তারপর ভোলানাথ, ক'দিন ছুটি তোমার? ছুটিতে এসেছ শুনে এলাম। I did not expect our illustrious Bhudeb here.

ভূদেব। আমারও ছুটি এখন। তবে আজই আমি চুঁচড়ায় ফিরব।

ভোলানাথ। হঠাৎ তুমি আর্য্যপল্লী ছেড়ে অনার্য্য পল্লীতে এসে হাজির হলে যে!

ভূদেব। আর্য্যপল্লী মানে?

ভোলানাথ। মানে, মধুকেই জিগ্যেস কর! একদিন ওকে ওর কোন এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল—কোন্ পাড়ায় বাসা হে? মধু উত্তর দিয়েছিল—বামুনপাড়ায়! গ্রামের মধ্যে সেরা পাড়াটা যেমন বামুনপাড়া, তেমনি কলকাতার বামুনপাড়া হচ্ছে সায়েব পাড়া—অর্থাৎ সেরা পাড়া! তারপর ব্রাহ্মণপ্রবর, হঠাৎ পদধূলি দানের অর্থ কি!

মধু। (হাসিয়া) অর্থের সন্ধানেই বেরিয়েছি—I must have some money. শুনলাম তুমি এসেছ, তাই তোমার কাছে এলাম।

ভূদেব বিস্মিত হইয়া মধুর পানে চাহিয়া রহিলেন

ভোলানাথ। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল এখন?

মধু। আমার স্ত্রী সপুত্রকন্যা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে ভাই, কোন খবর না দিয়ে। মহা মুস্কিল!

ভোলানাথ। তাই না কি? এ রকম করার মানে?

মধু। It is my fault—সময় মত টাকা পাঠাতে পারি নি! She has practically begged her way back—একথা কাউকে বলো না যেন। It will damage my prestige. এ দেশে টাকা না থাকলে একদিনও টেকা মুস্কিল!

ভোলানাথ। টাকা পাঠাও নি কেন তুমি?

মধু। For a very simple reason—ছিল না। I tried my utmost to borrow, but I failed. Even Vid failed me.

ভূদেব। সপরিবারে কি হোটেলেই থাকবে না কি?

মধু। সে ত অসম্ভব—it will go against my prestige. লাউডন ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী দেখেছি—it is a palace-like building—I would like to settle there—৪০০্ টাকা ভাড়া চায়—but still I must have it and fix it up immediately. টাকা দিতে পার কিছু?

ভোলানাথ। মধু, তুমি যদি এই rate-এ চল, কোথায় এর পরিণতি ভেবে দেখেছ?

মধু। (হাসিয়া) যে রেটেই চলি ভাই—I know I shall end in a grave. That is certain.

ভোলানাথ। এত টাকা কিসে তোমার লাগে—তাই আমি ভাবি। রোজগার, করছ সব করছ অথচ—still you are in want!

মধু। My dear Bholanath, please be convinced once for all. ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন—পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। Can you tell me why should one cringe and live shabbily? এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম সামান্য কেঁচোর মত কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে বলতে পারো আমায়? What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life?

ভূদেব। মতে মিলছে না ভাই—my angle of vision is quite different.

মধু। I know—live according to your angle of vision by all means, but let me live according to mine.

ভোলানাথ। কিন্তু এমন ভাবে টাকা ধার ক'রে—

মধু। ধার করি—কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি বলেই হাতে টাকা থাকে না। In any civilised country a man of my abilities would have lived more decently.

ভূদেব। যাক্—ও সব অপ্রিয় আলোচনা থাক্। We will never agree on this point.—আমাদের বাড়ীতে একদিন এসো।

মধু। নিশ্চয়ই যাব!

ভোলানাথ। এখন আমাকে কি করতে হবে বল!

মধু। ভাই, ওই বাড়ীটায় একটা ব্যবস্থা করে দেবে চল।

ভোলানাথ। ওর চেয়ে শস্তা গোছের একটা কিছু দেখলে হত না!

মধু। (অধীর ভাবে) No, no, no—my dear. I must have that house. It will fit in with my prestige and suit me admirably.

ভোলানাথ। (নিরুপায় ভাবে) চল।

সকলে বাহির হইয়া গেলেন

ষোড়শ দৃশ্য

বেণিয়াপুকুর রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। অর্থাভাবে লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যান বাটিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন—তাহা সাহেবি ফ্যাসানে মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেল্‌ফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দ্দিকে হোমার, দান্তে, ভার্জিল, তাসো, শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন্ প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তর নির্ম্মিত, কোনটা ধাতু নির্ম্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্র্যাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখশ্রী অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন

হেনরিয়েটা। এমন ভাবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সায়েবি পোষাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় করে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এঁরা দুঃখিত হলেন আমার পোষাক দেখে, আর বিলেতে গোল্ড ষ্টুকারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন, আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে! Strange!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন

এলোমেলো কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পুরুকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে! (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িকে—সেই বিশাল বাদামগাছটা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! সেই বটগাছটাও—যার তলায় বসে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে—শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম! সব ঠিক আছে—আমিই ফুরিয়ে গেলাম! Men end so quickly!

হেনরিয়েটা। ফুরিয়ে গেলে? Don't say that dear

মধু। ফুরিয়ে গেলাম হেনরিয়েটা! Finished—every thing is finished! Why are you worrying, my dear? Nothing is permanent—everything will end sooner or later.

হেনরিয়েটা। Don't talk of the end.

মধু। (হাসিয়া) Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

But I cannot kill my thoughts! যতক্ষণ বেঁচে আছি ভাবতে হবে—this brain is a terrible machine!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন

Did I not fight my utmost, Henrietta? কত কি করলাম! বিলেত গেলাম—ব্যারিষ্টার হলাম—হাইকোর্টে চাকরি নিলাম—আবার ব্যারিস্টারি করলাম—পঞ্চকোটে চাকরি নিয়ে গেলাম—ফের ব্যারিস্টারি করছি!

হেনরিয়েটা। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার!

মধু। ঠিক হয়ে যাবে? (হাসিয়া) I envy your optimism!

হেনরিয়েটা। কেন, এমন করছ তুমি আজ? শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে?

মধু। I am not sorry for myself—তোমাদের কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না—এইটেই আমার দুঃখ! শর্ম্মিষ্ঠার বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি—I have done a

great duty—I hope Lord will make her happy. (সহসা) মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠাকে—মনে আছে তোমার? It was lovely!

আবার চুপ করিয়া গেলেন

হেনরিয়েটা। (স-স্নেহে তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন) শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে আজ?

মধু। যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে! গলায় ঘা হয়েছে, পেটে জল হয়েছে, পিলে হয়েছে, লিভার হয়েছে—রক্ত বমি করছি। এখনও অন্ধ হয়ে যাই নি!—this much is wanting! Milton became blind—হোমারকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে হয়েছিল—Virgil, Ovid, Dante were exiled—টাসো, বানিয়ন্ were imprisoned! I don't expect a better lot. I shall die the gloriously miserable death of a poet. এইটুকুই শুধু দুঃখ যে তুমিও আমার সঙ্গে কষ্ট পেলে! You have shared my miseries but cannot share my glories Future generation will remember poet Madhusudan but not Henrietta who inspired him. This idea is terrible. (সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া) Why did you stick on to me—you foolish woman! রেবেকা আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে গেল—দেবকী slipped away from my fatal grasp—why did you stick on?

হেনরিয়েটা। (অসহায়ভাবে) এমন করছ কেন তুমি? একটু স্থির হও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুসূদন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন

মধু। সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠিক! (সহসা) সত্যি ক'রে বল ত Henrietta—were you happy with me? পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এদিকে এস না—

হেনরিয়েটা সামনের দিকে আসিলেন

হেনরিয়েটা। Need I say that in so many words! লাউডন স্ট্রীটের বাড়ীতে যে সুখে ছিলাম আমরা তেমন সুখ কজনের ভাগ্যে ঘটে? প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ী—আমাদের বড় গাড়ীখানাকে লোকে grand carriage বলত! We employed the cook of Prince Dwarkanath Tagore! আমাদের সুখে রাখবার জন্তে তুমি কি না করেছ!

মধু। Wait, wait, you will get time enough to live on memories. Don't exhaust them now! (সহসা হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া) এ কি, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে! কখন থেকে জ্বর হয়েছে আবার?

হেনরিয়েটা। না, জ্বর হয় নি আমার—ও কিছু নয়।

মধু। কিছু নয় কি! ডাক্তার পামারকে খবর পাঠাই কাকে দিয়ে?

হেনরিয়েটা। Don't worry for me! আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা বলছেন, Kaviraji treatment may do you good. Why not try it—my dear?

মধু। I cannot degrade myself.

বাহিরে একটা কোলাহল ও বচসা শোনা যাইতে লাগিল

হেনরিয়েটা। What's this? I think—

বয়-ভৃত্যের প্রবেশ

বয়। বিল নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক—ভেতরে আসতে চাইছে—গালাগালি দিচ্ছে!

হেনরিয়েটা। এখন যেতে বল! বল, সায়েবের শরীর খারাপ!

বয় চলিয়া গেল

মধু। Henrietta, this is hell. (সহসা উঠিয়া) Please let me go—I shall plead guilty—I shall tell them that I am a pauper now. এক কপর্দ্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর ক'রো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।

হেনরিয়েটা। Please don't go—please—.

তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি মুখ তুলিলেন—

মুখে বিচিত্র হাসি।

মধু। Am I not playing my part well! Splendid—isn't it? (সহসা) যাও, তুমি শোও গে যাও—জ্বর গায়ে বসে থাকবার দরকার নেই। Give me the bottle of Brandy and Dante's Inferno.

হেনরিয়েটা। Please don't excite yourself!

মধু। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) Don't contradict! যা বলছি শোন!

হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে মধুর আদেশ পালন করিলেন—
ব্র্যাণ্ডি ও ইন্‌কার্নো আগাইয়া দিলেন

হেনরিয়েটা। আমার যা দু-একখানা সৌখীন কাপড় গয়না এখনও বাকী আছে—সব বিক্রি করে দাও। আমাদের এই আসবাবপত্র যা-কিছু আছে সব বিক্রি করে দাও—ঋণ শোধ করে ফেল—তুমি সুস্থ হও—আবার সব হবে!

মধু। (মিনতি করিয়া) Please leave me alone—যাও ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়—you are ill, my dear. Go—

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—মধুসূদন নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ইন্‌কার্নো-খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল ও একখানি কার্ড দিল

(কার্ডখানি দেখিয়া) সাহেবকে আসতে বল।

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও যথারীতি অভিবাদন করিলেন

Good afternoon মনু—এস! I hope you have not come to remind me of my debts!

মনোমোহন। (সহাস্যে) Oh, no.

মধু। (সহসা) উঃ—বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণটাও যদি শোধ ক'রে যেতে পারতাম! ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার—অথচ they are the people I respect most.

আবার মদ্যপান করিলেন

Will you have a drop, মনু?

মনোমোহন। No, thanks. কিন্তু আপনি এ করছেন কি? চারদিকে কপাট জানলা বন্ধ করে দিয়ে নির্জ্জলা মদ খাচ্ছেন!

মধু। (সহাস্যে) There is no doubt about it.

মনোমোহন। এর পরিণাম কি জানেন?

মধু। জানি না? গলায় ছুরি বসালেও পারতাম—but this is a process equally sure but less painful.

মনোমোহন। (হাসিয়া) আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! মিনিকতক একটু নিয়মে থাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু। (আর একপাত্র পান করিয়া) হেনরিয়েটাও এতক্ষণ ঠিক ওই কথাই বলছিল আমাকে। সে মেয়েমানুষ, তার মুখে ওসব কথা মানায়। But you are not only a man but a clever barrister—you should not talk nonsense.

মনোমোহন। কি আশ্চর্য্য! এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন আপনি?

মধু। Do you think I want to die? Do you think I want to leave this beautiful world? No. But the fact is there is no way out of it তা ছাড়া আমার এখন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। Why should I drag on this miserable existence any more? Why should I?

মনোমোহন। বাঃ—বাঁচতে হবে বই কি আপনাকে—we cannot afford to lose a genius like you.

মধু। But the genius is dead long ago. আমি এখন তার প্রেতাত্মা—genius in another sense of the word! A dead volcano.

মনোমোহন। কি যে বলেন আপনি!

মধু। ঠিকই বলছি—আমার বেঁচে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই। (একটু পরে) অনেক আগেই আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল।

মনোমোহন। কেন?

মধু। 'সধবার একাদশী' পড়েছ? দীনবন্ধু has become popular at my cost! By the bye, where is বঙ্কিম? He is the coming light—I would like to see him.

মনোমোহন। দীনবন্ধুর কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। সধবার একাদশীর নিমচাঁদ যে আপনি তা কে বললে?

মধু। কে আবার বলবে! Am I a fool?

মনোমোহন। না, না, ওটা আপনার ভুল। দীনবন্ধু নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন মধু কি কখনও নিম হয়?

মধু। দেখ ভাই, আমিও কিছুদিন আগে 'একেই

কি বলে 'অত্যন্ত' লিখেছি এবং আমিও ব্যক্তিবিশেষকেই লক্ষ্য ক'রে লিখেছি। But do you think I would admit it publicly? Certainly not! আমি দীনবন্ধুর ওপরে রাগ করি নি—I appreciate the satire—I admit he has got a powerful pen—but still it hurts! কেমন আছে সে আজকাল? শুনেছিলাম সে-ও অসুস্থ—

মনোমোহন। তাঁর ডায়াবিটিস হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন

মধু। (সহসা) আমি কি সত্যিই নিমে দত্তের মত?

মনোমোহন। Far from it! ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা আপনার লেখাগুলোই পড়বে—আপনাকে ত আর দেখতে পাবে না এইটেই দুঃখ। I wonder how your biographers will paint you.

মধু। আমার চরিত্রের মধ্যে প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—I am reckless, tactless, thoughtless and everything-less!

মনোমোহন। বলেন কি! এক বিদ্যাসাগর ছাড়া আপনার মত মহানুভব লোক ত আমি আর দেখি নি!

মধু। You are a darling মনু। But don't try to delude me. I understand you and thank you.

মনোমোহন। This is no delusion. I have seen it with my own eyes যে, আপনার দারুণ অভাবের সময় আপনি মুঠো মুঠো টাকা দান করেছেন—গরীব মক্কেলের কাছ থেকে এক পয়সা ফি নেন নি—চক্ষু লজ্জার খাতিরে বড়লোক মক্কেলের কাছ থেকেও নেন নি! এই সেদিনও নিতান্ত অভাবের মধ্যেও আপনি আপনার পাঠশালার পণ্ডিতকে কুড়িটা টাকা স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিলেন। যখন দ্বারকাবাবু হাইকোর্টের Justice হলেন—everybody became jealous—but you became overjoyed and gave a grand dinner. কাল হুগলী জেজুরগাঁয়ের রাধাকিশোর ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি আপনার কথা বলছিলেন—

মধু। কি বলছিলেন?

মনোমোহন। বলছিলেন—সেবার অত খেটেখুটে আমার মোকদ্দমাটা করলেন উনি—কিন্তু ফি দিতে গেলাম কিছুতেই নিলেন না। অনেক ধরাধরি করাতে শেষটা বললেন—নিতান্তই কিছু যদি দিতে চাও—একটা Burgundy, half a dozen beer আর একশ মালদহের আম পাঠিয়ে দিও। সেদিন এক বামুন সখী-সংবাদ গান শুনিয়ে আপনার কাছে কাজ আদায় করে নিয়ে গেল! Are these not facts?

মধু। ব্রাহ্মণ গেয়েছিল কিন্তু সুন্দর। সখী-সংবাদের অমন গান বড়-একটা শোনা যায় না।

মনোমোহন। আপনার মত লোকের কখনও টাকা হতে পারে!

মধু। আমি ত টাকা চাই না—আমি সুখে থাকতে চাই। কিন্তু এ জীবনে তা আর হ'ল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল!

মনোমোহন। সব হবে আবার—আপনি একটু সামলে উঠুন। বৌদি কোথা? ছেলেরা কোথা?

মধু। ছেলেরা বাইরে গেছে—they have gone to Floyd. তোমার বৌদির জ্বর। ডাক্তার পামারকে খবর দিতে পার?

মনোমোহন। নিশ্চয় পারি! খুব বেশী জ্বর নাকি? কোথা আছেন তিনি?

মধু। পাশের ঘরেই আছে—যাও না দেখে এস—তোমার সঙ্গে ত কোন formality নেই। বয়টাকে ডেকে একটা খবর দিয়ে—যাও।

মনোমোহন ভিতরের দিকে গেলেন। নেপথ্যে 'বয়' 'বয়' ডাক শোনা গেল। মধুসূদন আবার খানিকটা মদ্যপান করিলেন ও ইন্‌ফানো খানার খাতা উলটাইতে লাগিলেন। সহসা গোবর্দ্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। ইনি একজন পাওনাদার

গোবর্দ্ধন। নমস্কার দত্ত সায়েব!

মধু। একি, গোবর্দ্ধন যে! এস।

গোবর্দ্ধন। আপনার চাকরটা ঢুকতেই দেয় না—এ ত এক মুস্কিল! সে ভেতরে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি। আপনার অসুখ নাকি?

মধু। হাঁ—ভাল নেই শরীরটা? তার পর খবর কি?

গোবর্দ্ধন। খবর ভালই।

মধু। দিগম্বর ভাল আছে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, হাঁ, (একটু ইতস্তত করিয়া) টাকাটার কোন ব্যবস্থা হ'ল?

মধু। কিছু হয় নি।

গোবর্দ্ধন। অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে টাকাটা—

মধু। (সহাস্যে) এই সমস্ত ফার্নিচারই ত তুমি দিয়েছিলে—না ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। এইগুলোই তুলে নিয়ে যাও and release me ! ওই bust-গুলোও নিয়ে যাও—অনেক দাম দিয়ে বিলেত থেকে কিনে এনেছিলাম এগুলো—ওই বইগুলোও—সব নিয়ে যাও—সব নিয়ে যাও—কিছু টাকা তবু তোমার উশুল হবে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ? Take them all !

গোবর্দ্ধন। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে সে কি হয় ! টাকা হলে দেবেন এখন পরে। আমি শুধু এমনি খবর নিতে এসেছিলাম। যাই তা হলে—নমস্কার !

গমনোদ্যত

মধু। ওহে শোন শোন—আমার কতকগুলো অপ্রকাশিত কবিতা আছে। নেবে ? নাও ত দিতে পারি। বিক্রি করলে কিছু পেতে পার !

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে না। টাকা পরে যখন হয় দেবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না ওর জন্যে—

চলিয়া গেলেন

মধু। অনুগ্রহ ! গোবর্দ্ধনের মত লোকও অনুগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে আমাকে ! O God, how long am I to suffer this ? O Almighty God in Heaven—please end my miseries !

মনোমোহন ঘোষ পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ—

মনোমোহন। আচ্ছা, আপনি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন বলুন দেখি !

মধু। কি ?

মনোমোহন। আপনি এ কবিতা লিখেছেন কেন ? বৌদিদি এই কবিতাটা পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন ! ছি, ছি, ভারি অন্যায় আপনার !

মধু। কি কবিতা ?

মনোমোহন। এই যে—এটা নাকি আপনার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে পড়েছিল—পরিচারিকা কুড়িয়ে পেয়েছে।

মধু। কই দেখি ! আজকাল কোথায় যে কি ফেলি মনে থাকে না আমার ! অথচ I had a powerful memory once ! রভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা এনে কোথায় হারালাম ! কি কবিতা দেখি !

মনোমোহন। এই দেখুন—

কবিতাটি মধুসূদনকে দিলেন

মধু। ও—এটা waste paper basket-এ ছিল ! অথচ আমি এটা চতুর্দ্দিকে খুঁজছি। পড় ত কবিতাটা—read it aloud.

মনোমোহন। Excuse me—ও আমি পড়তে পারব না।

মধু। আমি পড়ি তা হলে—দাও।

চেয়ারে বিকৃত স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি,—জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মনোমোহন। এ কবিতাটা লেখা কি আপনার উচিত হয়েছে !

মধু। Why not ? I am digging my own grave. Why shall I not write my own epitaph too ?—যাক্ যেতে দাও ওসব। হেনরিয়েটাকে কেমন দেখলে ?

মনোমোহন। খুব জ্বর—

মধু। ডাক্তার পামারকে ভাই একবার—

মনোমোহন। ব্যস্ত হবেন না আপনি—আমি ব্যবস্থা করছি তার।

'বয়' আসিয়া প্রবেশ করিল ও একটি ডাকের চিঠি দিয়া গেল

মধু। (পত্রখানি পড়িতে পড়িতে) তাহলে ত ভালই হ'ল !

মনোমোহন। কি?

মধু। উত্তরপাড়া থেকে জয়কৃষ্ণ মুকুজ্যে চিঠি লিখেছে। তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম যদি সে তাদের লাইব্রেরি ঘরটায় কিছুদিনের জন্যে থাকতে দেয় আমাকে। He has welcomed me.—একটু change-ও হবে—তাছাড়া পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই! I want a little respite!

মনোমোহন। এ ত খুব ভাল কথা।

মধু। তুমি তাহলে সব ব্যবস্থা করে দাও ভাই! কালই একটা বজরা জোগাড় কর—আর দেরী ক'রো না। আর ডাক্তার পামারকে একবার পাঠিয়ে দাও আজ—হেনরিয়েটাকে দেখে যাক্! You just go—আর দেরী ক'রো না! বুঝলে?

মনোমোহন। আচ্ছা—চললাম তাহলে! Good bye.

মধু। Good bye.

মনোমোহন চলিয়া গেলে মধুসূদন কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

I wonder, if they will put it up on my grave! (একটু পরে) The curtain will soon be rung down and the show will be over! Funny!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

সুন্দর কথা লিখে গেছে শেক্‌স্‌পীয়র—All the world's a stage! (সহসা) Bye the bye—stage-এর কথায় মনে পড়ল শরৎ ঘোষকে 'মায়াকানন'টা লিখে দেব বলেছিলাম—শেষই করতে পারছি না বইখানা! অথচ টাকা দিয়ে গেছে বেচারা।

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গৌরদাসের অনেকদিন খবর পাই নি। ভোলানাথও আসে না আজকাল। ভূদেবের চিঠিটাই বা কোথা ফেললাম——'হেক্‌টার বধ' পেয়ে সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছিল ও আমাকে!

টেবিলের দেরাজটা খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন

কোথায় যে কি ফেলি—কিছু মনে থাকে না! everything is topsy-turvy—সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার!

পাশের ঘরে কান্নার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

ও কি! হেনরিয়েটা কাঁদছে নাকি! হেনরিয়েটা—হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা!—

প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন

শেষ দৃশ্য

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে বঙ্গদর্শনের ফাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের এক হস্তে গড়গড়ার নল অন্য হস্তে লেখনী। রাত্রিকাল। সহসা দুয়ার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পোষাক—বগলে একগাদা বই। মধুসূদনকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভ্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

বঙ্কিম। আসুন, আসুন—আপনি এ সময়ে হঠাৎ! বসুন!

মধু। (উপবেশনান্তে) তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল! লিখছিলে না কি! কি লিখছ?

বঙ্কিম। বঙ্গদর্শনের জন্যে লিখছি—

মধু। Good—তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' পড়েছি—চমৎকার হয়েছে—চমৎকার! তোমার বঙ্গদর্শনও সুন্দর হচ্ছে! You have created real romances in our literature. I congratulate you. আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম—I hope you will take care of them.—দেখ, জীবনে অনেক কিছু করব মনে করেছিলাম। আরও ঢের ভাল কাব্য লেখবার ইচ্ছে ছিল আমার—ভাল গদ্যও রচনা করব ভেবেছিলাম—শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার। কিছুই আর হয়ে উঠল না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। I hope you will do what I could not.

বঙ্কিম। আপনার অসুখ শুনেছিলাম?

মধু। (সহাস্যে) I have been cured now. I am going out for a long change.

বঙ্কিম। কোথায়?

মধু। ঠিক জানি না।

বঙ্কিম। ফিরবেন কবে?

মধু। তাও ঠিক জানি না। এবার উঠি—সময় নেই বেশী আমার—God bless you my boy—keep the flag flying—Good bye.

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে) বঙ্কিমবাবু বাড়ী আছেন না কি ?

বঙ্কিম। আছি—আসুন।

জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন

ভদ্রলোক। খবর শুনেছেন ? আপনাদের কবি মাইকেল মধুসূদন মারা গেছেন আজ।

বঙ্কিম। (সবিস্ময়ে) মারা গেছেন ? মাথা খারাপ হ'ল নাকি আপনার।

ভদ্রলোক। এইমাত্র কোলকাতা থেকে একজন লোক এল তারই মুখে শুনলাম। আজই মারা গেছেন—আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্যেদের লাইব্রেরীতে ছিলেন—সেখানে বাড়াবাড়ি হওয়াতে আলিপুর হাসপাতালে আনা হয় তাঁকে। সেখানেই মারা গেছেন।

বঙ্কিম। (হাসিয়া) একেবারে বাজে গুজব।

ভদ্রলোক। কি যে আপনি বলেন মশায়। শুধু তিনি নয় তাঁর মেমসাহেবও মারা গেছেন—তিনিও ভুগছিলেন। তবে তিনি হাসপাতালে মরেন নি—বেনেটোলায় বাড়ীতে মরেছেন—স্বামীর আগেই মারা গেছেন শুনলাম।

বঙ্কিম। মশাই, আপনি আসবার ঠিক আগে এই বইগুলো (সবিস্ময়ে)—কই বইগুলো কোথা গেল—তাই ত—বইগুলো এইখানে ছিল যে—এ কি।

খুঁজিতে লাগিলেন

ভদ্রলোক। কি বই ?

বঙ্কিম। এইখানে ছিল যে বইগুলো—কি আশ্চর্য্য।

ভদ্রলোক। বই পরে খুঁজবেন—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন শুনলে চোখের জল রাখা যায় না।

বইগুলি দেখিতে না পাইয়া বঙ্কিম নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন—যে দ্বারপথে মধুসূদন এইমাত্র ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গিয়াছেন। ভদ্রলোকও নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে বঙ্কিমের দিকে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন

বঙ্কিম। মধুসূদন মরে নি—মরতে পারে না—অসম্ভব।

যবনিকা

স্ত্রীধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুর্জ্জয় কন্‌রাড,
উইন্‌সবর্গ দুর্গ ঘেরিয়া
রোধিয়াছে ঘাট বাট।
ফুরালো রসদ রণসম্ভার,
দুর্গেতে থাকা চলে না ক' আর,
সন্ধি সর্ত্ত এসেছে রাজার,
—পড়িতেছে সম্রাট।

২

দূতে নরপতি ক'ন
দুর্গের কারও জীবন ভিক্ষা—
দিতে তিনি রাজি ন'ন।
প্রতিহিংসায় কে করিবে রোধ
রক্তই লবে রক্তের শোধ,
মৃত্যু-বেদীতে বলির সংখ্যা
হইবেই অগণন।

ফুরাইল আশা সব—
রাজা কন ডাকি মৃত্যুর লাগি
প্রস্তুত হও সবে।
অনশনে মরা কাপুরুষ প্রায়
সৈন্যকে নয়, অস্ত্রে সাজায়,
মরিবেই যবে বীরের মতন
লড়িয়া মরিতে হবে।

রাজ্ঞী চতুরা অতি,
শুধু নারীদের দুর্গ ত্যাগের
চাহিলেন অনুমতি।
সম্রাট ত্বরা দিলেন আদেশ—
তাঁহাদের নাই শঙ্কার লেশ
আপনার ধন রত্ন সহিত—
তাঁদের অবাধ গতি।

চর চুপে চুপে কয়,
ও দুর্গ মণি রত্নেতে ভরা
বুঝি সব ব'হে লয়।
অলঙ্কারেই রমণীর লোভ,
অন্য কিছুতে নাই তত ক্ষোভ
কত ভার ওরা বহিতে যে পারে
পাইবেন পরিচয়।

৬

মুক্ত দুর্গ দ্বার।
রমণীর দল সারি দিয়া আসে
স্কন্ধেতে গুরুভার।
দেখে সম্রাট বিস্ময়ে চাহি
স্কন্ধেতে স্বামী আর কিছু নাহি,
নিদারুণ ক্লেশে পুরাঙ্গনারা
পরিখা হতেছে পার।

বলিলেন মহারাণী
হে রাজাধিরাজ স্বামীই মোদের
শ্রেষ্ঠ রত্ন জানি
স্কন্ধে করিয়া যেই যার ধন—
তোমার আদেশে করছি বহন,
হে দাতা দয়ালু হও চিরজীবী
মোদের আশীর্ব্বাণী

সম্রাট আসি' আগে,
বলেন জননী দস্তী তনয়
তোমাদের ক্ষমা মাগে।
যেথায় নিবসে হেন সতী নারী
সে দেশ জয়ের আমি অধিকারী!
ভাবিয়া হৃদয় উথলিয়া ওঠে—
গর্ব্বে ও অনুরাগে।

উঠিতেছে কোলাহল,
বিশ্ববিজয়ী বীরের চক্ষু
অশ্রুতে ঢলঢল।
উড়াও পতাকা, কামান সাজাও,
সজোরে সমর বাদ্য বাজাও
প্রচারিত হোক দিকে দিকে এই
কাহিনী সুমঙ্গল।

১০

কোনও ভয় নাহি আর,
সম্মানসহ মুক্তি মিলিল
দুর্গের সবাকার।
বীর রমণীরা জয় দিয়া যায়
সম্ভ্রমে সেনা অস্ত্র নোয়ায়,
সজ্জিত চতুরঙ্গ বাহিনী
জানায় নমস্কার।

দেখা হল ফাল্গুনে

শ্রীনিশানাথ মুখোপাধ্যায় বি-এসসি, ডিপ-এড্

এক

ফাল্গুন মাস। শীতের সময় শেষ হইয়াছে, এখন বসন্তের পালা কিন্তু বসন্ত এখনও আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই, কাজেই শীতও চার্জ্জ বুঝাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছে না—তাহার প্রকোপ এখনও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। এদিকে জীবজন্তুসকল তাহার দাপটে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে আর বসন্তকে দেরি করিয়া আসিবার জন্ত গালি পাড়িতেছে। অতি-বৃদ্ধদের এখনও পায়ে পটু বাঁধিয়া ও ফ্লানেলের শার্টের উপর বালাপোশ জড়াইয়া তবে বাড়ীর বাহির হইতে হয়, সপ্তাহে দুই দিন স্নান করিবার সময়েও এক বালতি গরম জলের দরকার পড়ে—তাহারাই শাপান্ত করিতেছে সব চেয়ে বেশি।

বেলা তখন বারটা। প্রকাশ স্নানের ঘর হইতে বাহির হইতেই তাহার মামীমা নির্ম্মলা দেবী বলিলেন, 'ওরে! খুকীদের স্কুল থেকে দরোয়ান তোর নামে একটা চিঠি এনেছে, বাইরে গিয়ে নিয়ে আয়।'

খুকী ওরফে মলিনা প্রকাশের মামাত বোন—সে আনন্দময়ী গার্লস্ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ বাড়ীর বাহিরে আসিতেই গার্লস্ স্কুলের দরোয়ান সেলাম করিয়া তাহার হাতে খামে আঁটা একখানি পত্র দিল।

প্রকাশ খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

Anandamoyee Girls' High School
Bhagalpur
Dated ২৮।২।৩৫

প্রিয় প্রকাশ,

কাল আমাদের স্কুলে প্রাইজ। এই উপলক্ষে মেয়েরা কয়েকটি গান গাহিবে ও বিসর্জ্জন নাটক প্লে করিবে। Opening song হইবে সেই গানটা—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। তুমি এ ক'দিন এখানে না থাকায় আমার বড় অসুবিধা হইয়াছে। মলিনার নিকট শুনিলাম যে, তুমি আজ সকালে ফিরিয়া আসিয়াছ। আজ দুপুরে একবার আসিয়া মেয়েদের একটু coach করিয়া দিয়া যাও। দরোয়ান মারফৎ বলিয়া পাঠাইবে যে কখন আসিতেছ। ভাল আছ আশা করি। স্নেহাশিস নিবে। ইতি

তোমাদের মীরাদি

পত্র পড়িয়া প্রকাশ দরোয়ানকে বলিল, 'মীরাদিকো বোলো—হম তুরন্ত আতে হেঁ।'

'বহুত খুঁ হুজুর'—বলিয়া দরোয়ান সেলাম করিয়া প্রস্থান করিতেই প্রকাশ ভিতরে দিয়া রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া মামীমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মামীমা, শিগ্‌গীর আমার ভাত দিন, এখুনি আবার বেরুতে হবে।"

প্রকাশের গলা শুনিয়া নির্ম্মলা দেবী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, কেন রে, এখুনি আবার কোথায় যাবি? খুকীদের স্কুলের দরোয়ান কিসের চিঠি এনেছিল রে?"

—'চিঠি মীরাদি দিয়েচেন। কাল তাঁদের স্কুলে প্রাইজ, আমার গিয়ে একটা গান শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে?"

দুই

প্রকাশ ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর বাপ-মার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ভাগলপুর কলেজে আই-এস্‌সি পড়িতে থাকে। তাহার মামা ধীরেনবাবু ভাগলপুর কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর। আই-এস্‌সি-তে ফার্ষ্ট হইয়া সে এবার এই কলেজ হইতেই বি এসসি পরীক্ষা দিয়াছে।

প্রকাশ ভাত খাইবার পর ফ্লানেলের পাঞ্জাবীটি গায়ে দিয়া সাইকেলে চড়িয়া গার্লস্ স্কুলের দিকে রওনা হইল।

শ্রীমতী মীরা বসু গার্লস্ স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। এই শহরেরই মেয়ে। তিনি প্রকাশকে ছোট ভাইয়ের মতই দেখেন, কাজেই স্কুলে প্রাইজ হইবার সময় এবং অন্যান্য সময় যে কয়েকজন লোকের সাহায্য লওয়ার দরকার হয়, প্রকাশ তাহাদের মধ্যে একজন।

স্কুলের গেট হইতেই মেয়েদের মিলিত স্বরের রেশ তাহার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কোরাস গান হইতেছে। সে ধীরে ধীরে সাইকেল হইতে নামিয়া হেড মিষ্ট্রেসের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মীরা বসু দূর হইতে প্রকাশকে দেখিতে পাইয়া গান থামাইয়া নিজের ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'যাক্, তুমি এসে পড়েছ ভালই হল, এখন গানটা আর পার্টগুলো একটু ঠিক করে দাও। যদিও আর সময় নেই, তবু তোমার মত ওস্তাদের কাছে অল্প-কিছু শিক্ষা পেলেও মেয়েরা অনেকটা ভাল করতে পারবে।

তার পর মীরা বসু ও প্রকাশ দুজনে গান ও পার্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হেড মিষ্ট্রেস নিজের ঘরে চলিয়া আসিতেই মেয়েরা নিজেদের ভিতর গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট-কন্যা শুভা বলিল, 'ওরে ঐ লোকটিই সেদিন দোকানে আমার পায়ে হাত দিয়েছিল, লোকটি কে ভাই?'

অরুণা বলিল, 'জানিস নে, ও যে ম—'

মলিনা দেখিল যে অরুণা যদি তাহার পরিচয় দিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার দাদার পায়ে হাত দিবার সরস গল্পটি আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না, তাই সে ইঙ্গিতে অরুণাকে চুপ করিতে বলিয়া শুভাকে বলিল, 'কি হয়েছিল ভাই শুভা ? তোর পায়ে হাত দিতে গিয়েছিল কেন রে ?'

শুভা বলিতে লাগিল, 'সে ভাই এক মজার ব্যাপার। এখানে ঐ যে হাতিবাগানে 'শু ষ্টোর্স' আছে না, সেই দোকানে সেদিন বাবার সঙ্গে এক জোড়া জুতো কিনতে গিয়েছিলাম। তা ভাই সে দোকানে জুতো দেখাবার জন্ম কোন চাকরবাকর নেই, তাঁরা নিজেরাই জুতো বের করে দেখান। ঐ লোকটিই এক জোড়া জুতো বের করে দিলেন। কিছুতেই আমার পা ঢোকে না, আমি বাবাকে বললাম যে ছোট হয়েছে। উনি বললেন, না ছোট হয়নি, এইটেই ঠিক ফিট্ করবে—বলে একটা শু-হর্ন্ নিয়ে আমার পায়ের গোড়ালির কাছটা ধরে শু-হর্ন্ দিয়ে পা'টা ঢুকিয়ে দিলেন। এত তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারটা হয়ে গেল যে, আমি বারণ করবার বা পা সরিয়ে নেবার সময়ই পেলাম না, যখন সরালাম তখন পা জুতোর ভেতর ঢুকে গেছে। ওঁরা দোকান করেচেন কিন্তু লোক রাখেন না কেন ? আমার ভাই তখন এমন লজ্জা করছিল !'

মেয়েরা এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুভার কথা গিলিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইতেই মিনতি মলিনার দিকে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ রে মলিনা ! তোর দাদা শুভার পা ধরে ফেললে ! আচ্ছা শুভা, প্রকাশদা যখন তোর পায়ে হাত দিল তখন বোধ হয় মনে মনে বলছিল, 'দেহি পদপল্লব মুদারম্।'

শুভা বলিল, 'উনি মলিনার দাদা বুঝি ?'

অরুণা বলিল "হ্যাঁ, মলিনার পিসতুতো ভাই, খুব ভাল ছেলে। তবে, ও জুতোর দোকানটা প্রকাশদার নয়, ওটি ওর এক বন্ধু কিরণবাবুর দোকান। তিনি গ্র্যাজুয়েট, তিনি বলেন যে বাঙালীরা পরিশ্রম করতে জানে না বলেই ব্যবসায় ফেল মারে, তাই তিনি কোন চাকরবাকর রাখেননি নিজে ও নিজের ভাই, ভাগ্নে সব মিলেই দোকান চালান। তোর দেখচি কপাল ভাল; জুতো কিনতে গিয়ে য়ুনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন প্রকাশচন্দ্রের পদ-সেবা লাভ হয়ে গেছে !"

এইরূপে ঠাট্টা তামাসা চলিতেছে এমন সময় মীরা দেবী প্রকাশকে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রকাশ শুভাকে সেখানে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, সেদিন কিরণের দোকানে 'আঃ ছাড়ুন ! ছাড়ুন !' বলিয়া কিরূপ জুতো সমেত পা সরাইয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

—"প্রকাশ, বসে পড় অরগানের সামনে।" বলিয়া মীরা বসু যে মেয়েরা গান গাহিবে তাহাদের সার বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন।

প্রকাশ মেয়েদের বলিল, "তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে থাক।" বলিয়া সুর করিল—

"জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা—"

মীরা দেবী, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী এবং আর আর মেয়েরা বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল। মীরা দেবী আগামী কল্য গানটির সাফল্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ওস্তাদের সুশিক্ষার গুণে তখন মেয়েদের মিলিত কণ্ঠের সুললিত সুরে ধ্বনিত হইতেছিল—

"তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা—"

গান শেষ হইবার পর প্রকাশ মীরা দেবীর ঘরে আসিয়া বিশ্রাম লইতেছে এবং শুভার রূপ ও গুণের বিষয় ভাবিতেছে এমন সময় পিছন হইতে ধাক্কা খাইয়া চমকাইয়া পিছনে তাকাইতেই দেখিল সুরেশ ও অবনী। সুরেশ বলিল, 'কি রে তুই কখন এলি ? একা চুপচাপ বসে কি ভাবচিস্ ?' প্রকাশ বলিল, 'এসেচি অনেকক্ষণ। এইমাত্র মেয়েদের একটা গান শিখিয়ে এলাম।'

অবনী বলিল, 'মীরাদি কই ? ষ্টেজ টাঙাবার কি ব্যবস্থা করেচেন দেখি !' বলিয়া সে মীরাদির খোঁজে এধার ওধার করিতে লাগিল।

প্রকাশ বুঝিল যে তাহারা আসিয়াছে ষ্টেজ বাঁধিবার জন্ম।

অবনী মীরাদিকে খুঁজিয়া আনিতেই সকলে মাঠে গিয়া ষ্টেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেল। সুরেশ ও অবনীকে ষ্টেজ বাঁধিবার কাজে নিযুক্ত করিয়া মীরা দেবী প্রকাশকে লইয়া 'বিসর্জন' নাটক রিহার্সাল দিবার জন্ম মেয়েদের নিকট চলিয়া গেলেন।

তিন

পরদিন সন্ধ্যার সময় পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেলে 'বিসর্জন' নাটক আরম্ভ হইল। নাট্যাভিনয় হইবে বলিয়া প্রাইজের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সন্ধ্যায়। সুরেশ ষ্টেজ ম্যানেজ করিবার ভার লইয়াছিল, আর প্রকাশের উপর পড়ে প্রম্‌ট্ করিবার ভার।

তখনও প্লে আরম্ভ হয় নাই। সাজঘরে মেয়েরা জটলা করিয়া কেহ সাবান দিয়া মুখ ধুইতেছে, কেহ বা মুখে জিঙ্ক অক্সাইড্ মাখিতেছে এমন সময় মলিনা হাসি হাসি মুখে বলিল, 'বুঝেছিস শুভা, কাল প্রকাশ-দা বাড়ী গিয়ে তোর খুব সুখ্যাতি করছিল।'

ডালিম বলিল, 'হ্যাঁ রে মলিনা ! তোর দাদা কিসের সুখ্যাতি করছিল রে ! রূপের, না গুণের ?'

মলিনা একবার দেখিয়া লইল যে টিচারদের মধ্যে কেহ সেখানে নাই তখন সে বলিল, 'সে ত ভাই জানি না ! দাদা শুভাকে দেখে একেবারে মশ্‌গুল !

শুভা তখন মুখে সাবান মাখিয়া ঘসিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, সে সেই অবস্থাতেই বলিল, "যাঃ যাঃ ফাজ্‌লামো করিস না বলছি, এখুনি তোর কান মলে দেব।"

মলিনা হাসিয়া জবাব দিল, 'না ভাই, দাদার মনের কথা, কিন্তু আমি যা শুনেছি তাই বলছি।' বলিয়া অন্য মেয়েদের দিকে তাকাইয়া বলিতে

লাগিল, 'কালকের সেই গানটা বাড়ী গিয়ে দাদা আবার গাইছিল, তবে কথাগুলো একটু অদল-বদল করে নিয়ে, ঐ যেখানটায় আছে না,

'তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা—'

কি বলব ভাই, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম যে দাদা গাইচে—

শুভা নাম হৃদে জাগে
তব করুণা চিত মাগে
খেয়েচ তুমি মোর মাথা—'

শুভার তখন মুখ ধোওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল সে রাগে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া মলিনার গায়ে একটি চিমটি কাটিল।

মলিনা 'উঃ' না করিয়া স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিল 'দেখ্ ভাই শুভার আনন্দ হচ্ছে কি না, অথচ তোদের কাছে দেখাতে হবে যে তার রাগ হয়েছে তাই চিমটি আমায় কাটলো বটে, কিন্তু এত আস্তে যে আমার লাগা ত দূরের কথা বরং—'

অন্যান্য মেয়েরা সব খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং শুভার মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল।

মেয়েদের হাসির শব্দে মীরা দেবী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই, তোরা অত হাসচিস কেন? মুখ ধোওয়া হল? আয় এবার পেন্ট করে ড্রেস পরিয়ে দিই।' এই বলিয়া আর একজন শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে তিনি মেয়েদের একে একে সাজাইতে লাগিলেন।

চার

ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল। বসন্তের মৃদু মধুর বাতাস শীতের জড়তা নাশ করিয়া নিজের কল্যাণময় হস্ত চারিদিকে বুলাইয়া দিতেছে। বুড়াদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের আর পায়ে পট্টি বাঁধিয়া বা গায়ে বালাপোষ জড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইতে হয় না। ছেলে-ছোকরাদের পুলোভার ও র‍্যাপার ট্রাঙ্কে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সেই কাবুলীদের মত কাপড় পরিয়া, ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী গায়ে, গাল জুড়িয়া লম্বা জুলফি নামাইয়া সদর্পে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তরুণীরা গরম ব্লাউস ও র‍্যাপার ছাড়িয়া বিকালে বা দুপুরে কাহারও বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য আবার সিল্কের শাড়ী ও ব্লাউস বাহির করিয়াছে। বুড়ারা আবার পুরাদমে নিজেদের আড্ডায় আজ-কালকার ছেলে-ছোকরাদের নিন্দায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

এমন বসন্তের দিনে একদিন রবিবার সকালে ভাগলপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় আলবোলা টানিতে টানিতে একটি মকদ্দমার রায় লিখিতেছেন, এমন সময় পত্নী আভা দেবী এক বাটি দুধ আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া সম্মুখের সোফায় বসিয়া পড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র রায় লিখিবার কাগজ ও ফাউন্টেন পেনটি সরাইয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'প্রিয়ে! কহ কিবা সমাচার?'

আভা দেবী বলিয়া উঠিলেন, 'ঢং দেখে আর বাঁচিনে। বলি, যত বয়স বাড়চে রসিকতাও তত বাড়চে, না?'

—"বয়স আর এমন কি বেশী, এই তো সবে বিয়াল্লিশ, আর গুড় ছাড়, বয়স বাড়বার সঙ্গেই ত রস ঘনীভূত হবে? তুমি কিছু বলতে চাও—না, বসে পড়লে আমায় শুধু তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করাবার জন্য?'

আভা দেবী দেখিলেন যে তাঁর স্বামীকে রসিকতা-করা হইতে কিছুতেই থামাইতে পারিবেন না কোনকালে পারেনও নাই; তাই আর কিছু না বলিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমায় বলবো-বলবো করে বলাই হয় নি, তুমি ঠাকুরপোকে লেখো এইবার শুভার বিয়ের জন্য, বড়-সড় হয়েছে, এইবার বিয়েটা দিয়ে দেওয়া উচিত।'

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন, 'আরে এই কথা বলবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? শুভার বিয়ের ত সব ঠিকই হয়ে আছে, একদিন দিলেই হবে, তার জন্য তাড়াতাড়ি কি, আরও কিছু দিন যাক না।'

'— না না তুমি বোঝ না মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে, শেষে যদি আবার অমত করে বসে।'

—'শুভা ত সে রকম মেয়ে নয়, সে ত জানেই যে তার বর ঠিক হয়ে আছে, সে কি আবার অন্য কারো লভে পড়বে না কি।'

—'শুভার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু নবু যদি শেষে শুভাকে বিয়ে করতে না চায় তখন? সে ত আজকালকার ছেলে যদি তার বাপের কথা না শোনে? তাকে ত দেখেচি সেই ছোট্টটি, তখন ত সবে তার পাঁচ বছর বয়স কে জানে কেমন হয়েচে দেখতে, তখন ত বেশ চেহারা ছিল। তুমি চিঠি একটা লিখে দাও, আমিও একটা লিখে দিচ্ছি।'

কৈলাসচন্দ্র এ ক্ষেত্রে পত্নীর পরামর্শ মতই চলিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এ একটা কথা বটে, আচ্ছা আমি আজ চিঠি লিখে দিচ্চি। আমরা ভাগলপুরে ত প্রায় দু মাস হল এসেচি, এর মধ্যে তো তাকে কিছুই লেখা হয় নি। নবু ত এবার বি-এ এগজামিন দিয়েচে।'

আভা দেবী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আজকাল শুভারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখতে পাই সে রকম ফূর্ত্তি নেই। বড় হয়েছে ত, এখন কি আর ঐ অঙ্ক আর সংস্কৃতর বই ওর ভাল লাগে? কোথায় বিয়ে-থা হবে স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না আমোদ আহ্লাদ করবে, তা নয়, 'এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনস বি ইকয়লটু এ স্কয়ার মাইনস্ বি স্কয়ার' আর এলিজাবেথ কখন রাণী হল, জাহাঙ্গীর কাকে ভালো বাসলো—এই সব কি ওর ভাল লাগে? ওকে তার রাজার রাণী করে দাও তবে ত তার ভাল লাগবে। এ বয়সে মেয়েদের প্রেম ভালবাসা ছাড়া আর কি পছন্দ হয়, শুনি?'

কৈলাসচন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন, 'তুমি সবাইকে তোমার মতই ভাব কি-না। তোমাকে যখন আমার রাণী করেছিলাম তখন নূরজাহানের মতই তোমার দাপট ছিল। কি পদসেবাই তুমি করিয়ে নিয়েছিলে আমায় দিয়ে।'

—'কি মিথ্যে কথাই তুমি বলতে শিখেছ!'" বলিয়া একটি কোপ কটাক্ষ হানিয়া দুধের খালি বাটিটি লইয়া আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

পত্নী চলিয়া যাইতেই কৈলাসচন্দ্রের পুরাতন দিনের ঘটনা স্মৃতিপথে

আসায় মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, 'আজার চলিবার ভঙ্গীটুকু এখনও ঠিক সেই রকমই আছে।' তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া কলিকাটি বদলাইয়া দিতে বলিয়া পুনরায় রায় লিখিতে সুরু করিলেন।

পাঁচ

এইখানে গোড়ার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় উনিশ কুড়ি বছর পূর্ব্বে কৈলাসচন্দ্র এবং তাঁহার সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিমলকুমার, দুইজনে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ ও ল' পড়িতে লাগিলেন। কৈলাসের সহিত বিমলের যখন প্রথম বন্ধুত্ব আরম্ভ হয় তখন দুইজনেই বিদেশে কলেজে পড়িতে আসিয়া হোষ্টেলের একই ঘরে বাস করিতে থাকেন। দুইজনেই যুনিভার্সিটির নাম-করা ছাত্র, কাজেই বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। কৈলাস এম-এ পড়িতে পড়িতেই ডেপুটির পদ পাইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন এবং বিমল এম-এ ও ল পাশ করিয়া পরে ছাপরায় ওকালতি করিতে লাগিলেন। বিমলের প্রাকটিস আরম্ভ করিবার একবৎসর পরে কৈলাস ছাপরায় সেকেণ্ড অফিসার হইয়া বদলি হইয়া আসিলেন।

এই সময় দুই বন্ধুপত্নীর মধ্যেও সখিত্ব স্থাপিত হইল। বিমলের তখন একটি পুত্র, বয়স পাঁচ-ছয় বৎসর ও কৈলাসের একটি মেয়ে, বয়স এক বৎসর। বিমলের ছেলে নবু যেমন দেখিতে সুশ্রী, কৈলাসের মেয়েটিও খুব সুন্দর, ফুলের মত দেখিতে। সেই সময়েই তাঁহাদের মধ্যে ঠিক হইয়া যায় যে এই দুইটিতে বিবাহ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধ চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিবেন।

তারপর একবৎসর পরেই কৈলাস অন্য স্থানে বদলি হইয়া যান। ইহার পর পনর বৎসর ধরিয়া নানা জায়গা ঘুরিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন।

ওদিকে বিমলকুমার নিজের প্রতিভা বলে এখন ছাপরার মধ্যে একজন নামজাদা উকিল। এই কয়েক বৎসরে কৈলাসের সহিত বিমলের বিশেষ দেখা শোনা হয় নাই, তবে দুই বন্ধু ও দুই সখীর মধ্যে প্রায়ই চিঠি পত্র লেখালেখি হয়। প্রায় তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে বিমল সস্ত্রীক যখন একবার পুরী গিয়াছিলেন তখন কৈলাস ছিলেন কটকের এস. ডি ও.। সে সময় পুরী ফেরত কটকে তাঁহারা কয়েক দিন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। বিমলের স্ত্রী শুভাকে দেখিয়া তাহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা লক্ষ্মীর আমার নবুর সঙ্গে রাজ-যোটক মিল হবে।'

কৈলাস ও আভাদেবী নবুকে আর কখনও দেখেন নাই। কয়েকবার বিমলকে লিখিয়াছিলেন তাহাকে একবার তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য, কিন্তু নবুর সেখানে যাইবার কোন সুযোগ ঘটিয়া ওঠে নাই।

বিমল বলিয়াছিলেন যে, নবু বি-এ পরীক্ষা দিলেই তাহার বিবাহ দিবেন এবং এই বৎসর সে বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে, কাজেই আভা দেবী স্বামীকে বলিলেন সেখানে চিঠি দিবার জন্য এবং নিজেও তাহার সখীকে চিঠি লিখিবেন ঠিক করিলেন।

ছয়

আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে প্রাইজ হইবার দুই দিন পরেই ভাগলপুরে প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী এ অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। নানা জায়গা হইতে শিল্প ও অন্যান্য জিনিসে ষ্টল ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। গার্লস স্কুলের একটি ষ্টলে মেয়েদের আঁকা ছবি এবং সূতা ও রেশমের মূর্ত্তি বা কারুকার্য্য খচিত শিল্পাদি সাজানো রহিয়াছে। কলেজের ষ্টলে দিনে বেতার সংক্রান্ত সব কিছু ও রাত্রে এক্স-রে দেখানো হয়। বেতারে এ ঠিক টেলীগ্রাম না দেখাইয়া তাহার বদলে তাতে বেল বাজানো হইয়া থাকে।

কলেজের ষ্টলে, ফিজিক্সের জুনিয়র প্রফেসর নরেনবাবুর শরীর অসুস্থ থাকায় ঐ দুটি জিনিষ দর্শকদের দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রকাশের উপর ভার পড়িয়াছে।

দিনের বেলা ষ্টলে যখন ভীড় করিয়া লোক জমা হয় তখন প্রকাশ বেলটিকে বাজাইয়া বুঝাইয়া দেয় যে, বেলটির ব্যাটারির সহিত সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া তাহা বাজিতেছে, আবার কোন লোক যখন থাকে না তখন সামনের একখানি চেয়ারে বসিয়া সে বিশ্রাম লইতে থাকে।

সেদিন ষ্টলের সামনে তখন ভীড় না থাকায় সে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের প্রাইজের পর দিনকয়েক তাহাদের বন্ধুমহলে মেয়েদের গান এবং থিয়েটার লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে শুভার অভিনয় অঙ্গভঙ্গী এবং গানের সুখ্যাতি করিয়াছিল। যখনই কেহ শুভার প্রশংসা করে তখনই প্রকাশ বলে, 'কে শিখিয়েছে দেখতে হবে ত?' এই সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল 'বিসর্জ্জন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইবার পর সে একবার শুভাকে বলিয়াছিল, 'তোমার অপর্ণার পার্ট চমৎকার হচ্ছে, ওয়াণ্ডারফুল।' শুভা একটু হাসিয়া উত্তর দেয়, 'আপনি নিজে একজন সু-অভিনেতা কি-না, তাই সকলকেই ভাল মনে করেন।

প্রকাশ বলে, 'আমি ভাল অভিনেতা তোমায় কে বললে, মলিনা বুঝি?'

—"তা কেন, আমি বুঝি জানি না, ঐ ত কয়েক দিন হল আপনি কলেজে 'মেবারপতন' প্লেতে মহাবত খাঁর ভূমিকা নিয়েছিলেন, আমরা যে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর 'আপনার অংশগুলি আমার বেশ লেগেছিল' বলিতে গিয়া 'আপনাকে আমার বেশ লেগেছিল' বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া ওঠে। একে তাহার সুন্দর মুখ, তায় জিঙ্ক অক্সাইড্ ও সিঁদূরের পেণ্ট-এ সুন্দরতর হইয়াছিল এবং লজ্জায় রাঙা হওয়ায় তাহা সুন্দরতমে পরিণত হইয়া ওঠে।

আজ প্রকাশের মনে হইতে লাগিল, 'এই শুভা মেয়েটি বেশ—এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত তাহলে কি সুখীই হতে পারতাম; কিন্তু তা কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়—বাবা, মা ত কিছুতেই রাজী হবেন না--" এমন সময় সামনে তাকাইতেই দেখিতে পাইল শুভা সেই দিকেই আসিতেছে।

শুভা কলেজের ষ্টলের নিকট আসিতেই প্রকাশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, এগজিবিশন দেখতে এসেছ নাকি?'

শুভা হঠাৎ প্রকাশকে সেখানে দেখিতে পাইয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, পরে বলিল, 'না। আমাদের স্কুলের যে ষ্টল আছে তাতে আমাদের কয়েকটি মেয়েকে মীরাদি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ষ্টলে থাকবার জন্য, আর তাছাড়া আমি একজন লেডি ভলাণ্টিয়ার, আপনি এখানে ?'

—"আমাদের ফিজিক্সের প্রফেসর নরেনবাবু অসুস্থ, কাজেই আমার ওপর এই বেতার ও এক্স-রে দেখাবার ভার পড়েছে ?

—"আমি এখন কাজে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যার পর আসবো কয়েকজন, আমাদের এক্স-রে দেখাবেন ত ?'

—"নিশ্চয় দেখাব, ঐ জন্যই ত আছি।'

—"আচ্ছা এখন যাই।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

প্রকাশ মনে মনে বলিল যে আজ তাহার এক্স রে দেখানো সার্থক হইবে।

রাত্রি আটটার সময় শুভা তাহাদের ষ্টলের কয়েকটি মেয়ের সহিত কলেজের ষ্টলে আসিয়া প্রকাশকে বলিল, কই, দেখান্ আমাদের এক্স-রে।'

প্রকাশ তাহাদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সে প্রথমে বেতার যন্ত্র দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, রেডিওতে গান প্রভৃতি যাহা আমরা শুনিতে পাই তাহা এইরূপেই ধরা পড়ে। তারপর সে এক্স রে যন্ত্রের সামনে গিয়া প্রথমে থলের ভিতর টাকা রাখিয়া, বাক্সের ভিতর চশমা পুরিয়া যখন সেই যন্ত্রটির সামনে ধরিল তখন গ্রাউণ্ড গ্লাসের পর্দায় থলে ও বাক্স ভেদ করিয়া কেবল মাত্র টাকা, থলের ধাতুর বোতাম ও চশমার ফ্রেমটি দেখা যাইতে লাগিল। বাক্স বা থলে দেখা গেল না। শুভা ও অন্যান্য মেয়েরা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর প্রকাশ যখন নিজের হাতটি কলের সামনে ধরিল তখন মাংস, চামড়া ভেদ করিয়া কেবলমাত্র তাহার হাতের হাড়গুলি দেখা যাইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা আরও আশ্চর্য্য হইল এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের হাতের হাড় দেখিতে চাহিল।

প্রকাশ ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তোমাদের সকলেরও ঠিক আমার মতই হাতের হাড় দেখা যাবে, কেবল তফাৎ এই যে, তোমাদের চুড়ীগুলিও দেখা যাবে। মনে হবে যেন ঐ হাড়গুলি কয়েকটি মালা পরে রয়েছে।

মেয়েরা ছাড়িল না, তাহারা নিজেদের হাতের হাড় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কাজেই প্রকাশ একে একে সব মেয়েরই হাতের হাড় দেখাইয়া দিল।

শুভা ও তাহার বন্ধুর দল চলিয়া যাইতেই প্রকাশ মনে মনে বলিল, শুভার হাতখানি কি সুন্দর ও নরম। এই এক্স-রে প্লেটের ওপর তাহার ও শুভার হাতের হাড় দুইটির ছায়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যাবে না কিন্তু ঐ হাড়ের ছায়া না দেখে যদি আসল হাত দুটি নিয়ে তুলনা করা যায় তাহলে দুটি হাতের কতই না প্রভেদ!

সাত

ভাগলপুরে মহিলাদের একটি সমিতি আছে। আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বিকালে সমিতির অধিবেশন হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নী ইহার সভাপতি। এই সমিতিতে মহিলাদের সহিত তাঁহাদের মেয়েরাও আসিয়া থাকে, কাজেই যে দিন সমিতির অধিবেশন হয় সেদিন সমবেত স্ত্রীলোকেরা তিনটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং প্রত্যেক দল এক একটি স্থান অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে থাকেন।

এই তিনটি দলের মধ্যে প্রধান দলে থাকেন মেয়েদের মায়েরা অর্থাৎ যাঁদের জন্য এই সমিতির উৎপত্তি। এই দলের মধ্যে পূর্ব্বে কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছুই হইত না। মেয়েদের মধ্যে মামুলি কথাবার্ত্তা যাহা হইতে তাহাই হইত, অর্থাৎ আজ কি কি রান্না হইল, তোমার জামাই কবে আসিবে, অমুকের মেয়েকে তার বর নেয় না কেন? এই সবই বেশির ভাগ আলোচনা হইত। আর হইবেই বা না কেন, কারণ ইঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই অশিক্ষিতা। যাঁহারা শিক্ষিতা আছেন তাঁহারা আবার নিজের নিজের স্বামীর পদমর্য্যাদার কারণ সকলের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন না, তাঁহারা নিজেদের ভিতর কয়েক জনের সহিত মিশিতেন আর তাঁহাদের আলোচনা বিশেষত হাল ফ্যাশনের শাড়ী ব্লাউস ও গহনা লইয়াই হইত।

কিন্তু যেদিন হইতে আভা দেবী এই সমিতির প্রেসিডেন্ট নিযুক্তা হইলেন সেদিন হইতেই ইহার কার্য্যপ্রণালী বদলাইয়া গেল। তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন এবং কথাবার্ত্তা কহিতেন; সকলকেই তিনি নিজের লোক বলিয়াই মনে করিতেন। উপরন্তু তাঁহার পোষাকের জাঁকজমক ছিল না। ডালিমের মতই রং তাঁহার ফাটিয়া পড়িতেছে অথচ অহঙ্কার বলিয়া তাহার কোন জিনিষ নাই। কোথায় কোন মঞ্জরী মিনাভা গাড়ী চড়িয়া বেহায়াপনা করিতেছে, কোথায় অমিয়ার পিসিমা কাহার সহিত প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, এই সব আলোচনা তিনি হইতে দিতেন না। আভা দেবী বলিতেন যে পৃথিবীতে অনেক লোকের বাস এবং সকলেই একরকম হইতে পারে না, কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ। সমিতির সভ্যাদের উচিত ঐ সব মন্দ লোকদের ঘৃণা না করিয়া তাহারা যাহাতে ভাল হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা। আভা দেবী আসিবার পর সমিতির মধ্যে একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্রত্যেক অধিবেশনের দিন পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। বিষয়গুলি এমনভাবে নির্ব্বাচন করিতেন যাহাতে সেই বিষয়ের আলোচনা হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা উপকৃত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় দলটি ছিল উপরোক্ত মহিলাদিগের কিশোরী বা যুবতী কন্যাদের, যাহারা সম্প্রতি বিবাহিতা হইয়াছে। তাহাদের দলে নিজেদের সুখের কথা ছাড়া আর কিছু হইত না। তাহাদের নিকট পৃথিবী এখন রঙীন, অন্য কিছুই লক্ষ্য করিবার নাই। কেবল মাত্র সে নিজে ও তাহার স্বামী, এই দুজনার মধ্যে হাসি-কান্না, মান-অভিমান

ভালবাসা এই গুলিই তাহাদের এখন প্রধান [illegible]। যে সব মেয়ের স্বামী এইখানেই থাকে বা আছে তাহারা সখীদের শুনায় তাহাদের নবীন পৃথিবীর কাহিনী. প্রত্যেকেই ভাবে তাহার মত স্বামীভাগ্য আর কারও নাই, পৃথিবীতে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। আবার যাহাদের স্বামী বিদেশে, তাহারা লেখায় চিঠি। এই সব চিঠিতে ছত্রে ছত্রে স্ত্রীকে সম্বোধন করিবার এতগুলি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় যাহা কোন অভিধান, এমন কি রাজশেখর বসু সম্পাদিত চলন্তিকাতেও পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র সদ্যবিবাহিত যুবকেরাই এই কথাগুলি জানে এবং ব্যবহার করে।

তৃতীয় দলটি মহিলাদের প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাদের। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয় কোন্ মেয়ে কি রকম অহঙ্কারী, ভাল অঙ্ক জানে অথচ জিজ্ঞাসা করিতে গেলে কখনও বুঝাইয়া দেয় না; কে কি রকম স্বামী পাইলে তবেই বিবাহ করিবে; আজকালকার ছেলেরা কি অসভ্য, বাসের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গেলে দূর হইতে অনেকের গায়ে পাইয়া বসে।

মহিলা-সমিতির আজিকার নির্ব্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর গল্প চলিতে চলিতে আভা দেবী বলিলেন, 'আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, আজকাল যে সব মেয়ে স্কুলে বা কলেজে পড়ে তারা রান্নাবান্না বিশেষ কিছুই জানে না এবং তাদের বিয়ের পর সংসারের সকল ভার ঠাকুর-চাকরের উপরই ছেড়ে দিতে হয়।'

নির্ম্মলা দেবী বলিলেন, 'সেটা হয় অনেক কারণে। কোন কোন মেয়ে আছে যাদের কোন কাজ করতে বললেই স্কুলের পড়ার চাপের অজুহাতে কিছু করতে চায় না, আবার কোন কোন মা আছেন যাঁরা মনে করেন মেয়ে তাঁর স্কুলে পড়ছে, সব শিক্ষাই তাহলে হয়ে গেল।

একজন বলিলেন, 'কিন্তু আমাদের মেয়েরা স্কুলেও পড়ে, বাড়ীর কাজও সব করে। তাদের শেখাতে গেলে ত আমাদেরই শেখাতে হবে। আমরা যদি জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে না নিই তাহলে তারা শিখবে কোথা থেকে?'

নির্ম্মলা বলিলেন, 'সে ত নিশ্চয়ই। স্কুলে আর কতটুকু শিক্ষাই বা তারা পায়। স্কুলে মেয়েদের যা শেখানো হয় তার ভেতর অল্পই তার জীবনে কাজে আসে। মেয়েরা আই-এ পাশই করুক আর বি-এ পাশই করুক, তাকে বিয়ে করে সংসার করতেই হবে, ছেলেপুলে মানুষ করতে হবে, রান্নাবান্না যাবতীয় সংসারের কাজ করতে হবে। কিন্তু সন্তান-পালন, রান্নাবান্না, কম আয়ে কি করে সংসার চালানো যেতে পারে—এ সব কি স্কুলে কখনও শেখানো হয়? যেগুলি বিশেষ দরকার সেই-গুলিই তাদের শেখানো হয় না। আমাদের উচিত মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ঐগুলি শেখানো।

একজন উকিলের স্ত্রী বলিলেন, 'তাহলে মেয়েদের স্কুলে না পড়িয়ে বাড়ীতে কেবল ঐ সব শেখালেই হয়।'

নির্ম্মলা ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা হয় না। মেয়েকে স্কুলে দিতেই হবে। এর দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, বিয়ের আগে ছেলেরা আজকাল এইটেই জিজ্ঞাসা করে যে, পাত্রী কতদূর লেখাপড় শিখেছে, গান জানে কি-না—তারা ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, অমুক তরকারি রাঁধতে জানে কি-না, ছেঁড়া কাপড় রিপু করতে পারে কি-না দরকার হলে বাসন মাজতে পারে কি-না—সব ছেলেই ত আর বড়-লোক নয়, আর স্কুলে-পড়া সব মেয়েরই বড়লোকের ঘরে বিয়ে হবে না; আর তাছাড়া, আমার মনে হয়, স্বামী-পুত্রকে যে নিজের হাতে রেঁধে না খাইয়ে ঠাকুর রাখে, তার মেয়ে-জন্মই বৃথা। দ্বিতীয় কারণ এই যে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। ছেলে-পুলেরা যতদিন মাষ্টারের কাছে পড়বার মত বড় হয়ে না ওঠে ততদিন তারা মায়ের কাছেই শিক্ষালাভ করে থাকে, যে মায়েরা নিজেরা শিক্ষিতা নহেন তাঁরা সন্তানকে শেখাবেন কি করে?'

আভা দেবী এতক্ষণ ধরিয়া ইঁহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। তিনি যতই নির্ম্মলার যুক্তিগুলি শুনিতেছিলেন ততই তাঁহার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, নির্ম্মল দেবীকে সহকর্ম্মীরূপে পাইয়া তিনি সমিতির অনেক উন্নতি সাধ করিতে পারিবেন।

রাত্রি হইয়া যাওয়ায় সভা ভঙ্গ হইতেই আভা দেবী সকন্যা চলিয় যাইবার সময় নির্ম্মলা দেবীকে বলিলেন, 'আপনি একবার সময় পেলে আমাদের বাড়ী গেলে আমি বড় খুশী হব। আপনার যুক্তিগুলি ভাববা মত, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা করবার ইচ্ছে আছে।'

নির্ম্মলা দেবী হাসিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন।

আট

মেয়েদের এক্স-রে দেখাইবার পরদিন, হলের নিকট শুভার সহিত দেখা হইতেই প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল কেমন দেখলে?'

শুভা উত্তর করিল, 'বেশ! কি আশ্চর্য্য! মাংস চামড়া ভেদ কর হাড়গুলো কি করে দেখা যায়?'

—'ঐ আলোর ওই ত গুণ, সব ভেদ করে হাড় দেখা যায় বলেই মানুষের কত রোগ আজ ধরা পড়চে ঐ কলের সাহায্যে, আর তা চিকিৎসাও হচ্ছে।'

তারপর প্রকাশ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'দেখ, আমার একট কাজ করে দেবে?'

শুভা বলিল, 'কি কাজ বলুন।'

—'এমন কিছু বিশেষ শক্ত নয়, অন্তত তোমার পক্ষে? তোমাদে হলে মেয়েদের বোনা যে সব শিল্প কাজ রয়েছে তাতে তোমার বোন একটি প্রজাপতি রয়েচে দেখলাম। ঐ প্রজাপতিটি অতি সুন্দর হয়েচে আমাকে যদি একটা প্রজাপতি বুনে দাও ত বড় ভাল হয়।'

—'ওঃ এই কাজ। বেশ ত, বুনে দেব।'

প্রকাশ সত্যই মনে মনে শুভার সহিতই বিবাহের কামনা করিত কিন্তু সে জানে যে তার বাবা-মা এ বিবাহে [illegible] মা তাই সে শুভার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ তাহার [illegible] একটা বোনা জিনি

কাছে রাখিতে চায় এবং যদি শুভা ফুলিয়া দিতে রাজী হয় এই ভাবিয়া আগে হইতেই সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সে পকেট হইতে একটি সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া শুভার হাতে দিয়া বলিল, 'এই রুমালে সব আঁকা আছে, তুমি খালি সুতোর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলবে।'

শুভা রুমালের পাট খুলিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার একটি কোণে পেন্সিল দিয়া একটি প্রজাপতি আঁকা। প্রজাপতির ডানা দুটি শরীরের সহিত জোড়া নহে, একটু বিচ্ছিন্ন এবং একটি ডানায় লেখা আছে পি ও অপরটিতে এস্. ইহা দেখিয়া শুভা একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রজাপতির ডানা দুটি কাটা কেন, আর পি. ও এস্. এর মানে ?'

প্রকাশ বলিল, 'তা আমি বলতে পারব না।'

শুভা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

শুভাকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া প্রকাশ ভাবিল, কাজটা হয়ত অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেইজন্য সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, থাকুক, ওটা ফিরিয়ে দাও, আমি মলিনাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেব।'

—'না, আমিই করে দেব, আমার কাছেই থাক।' এই বলিয়া রুমালখানি কোমরে গুঁজিয়া শুভা প্রস্থান করিবার জন্য পিছন ফিরিতেই প্রকাশ বলিল, 'কবে দেবে ?'

—'কাল।'

—'কালকের মধ্যেই হয়ে যাবে ?'

—'এটুকু সেলাই করতে আর কতক্ষণ লাগবে। দু ঘণ্টার বেশী নয় কাল ঠিক পাবেন।'

শুভা চলিতে চলিতে ভাবিল যে মলিনার কথা তাহার ঠাট্টা বলিয়াই মনে হইত কিন্তু এখন দেখিতেছে যে প্রকাশ সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় প্রকাশ জানে, যে শুভার অন্যত্র বিয়ের ঠিক হইয়া আছে তাই প্রজাপতির ডানা কাটা এবং ডানায় প্রকাশ ও শুভার নামের আত্তক্ষর। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শুভা মনে মনে একটু হাসিল মাত্র।

সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে বসিয়া শুভা প্রজাপতিটিকে ফুটাইয়া তুলিল। অক্ষর দুইটি লাল রঙের সুতায় সেলাই করিয়া যখন শেষ করিল তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে।

শুভা রুমাল লইয়া চলিয়া যাইবার পরদিন বিকালে প্রকাশ অধীর আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিছু পরে শুভা আসিয়া পাটকরা রুমালখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'এই নিন্ আপনার রুমাল। জানেন, কাল প্রায় সমস্ত রাত ঘুমতে পারিনি ?'

—'কেন, সমস্ত রাতই লেগেছিল এটা সেলাই করতে ? তবে যে বলেছিলে দুঘণ্টায় হয়ে যাবে !'

—'তা ত হয়ে যাবই, তবে এ কাজটা কি আর দু ঘণ্টায় হয়, কত পরিশ্রম এতে, সুতো মেলাতেই ত কত সময় কেটে গেল !'

প্রকাশ রুমালখানি খুলিয়া দেখিল যেন জীবন্ত একটি প্রজাপতি এখুনি উড়িয়া আসিয়া রুমালের উপর বসিয়াছে, ডানা দুটি তার কাটা নয়, নিপুণভাবে জুড়িয়া সেলাই করা, দেখিলে মনে হয়, এখুনি হয়ত উড়িয়া আবার অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। ডানা দুইটির উপর ঘোর লাল রঙের সুতায় সুন্দররূপে সেলাই করা পি এবং এস্।

প্রকাশ মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'চমৎকার হয়েছে, ধন্যবাদ এর জন্য। কিন্তু ডানা দুটি এর কাটা ছিল, সে দুটি জুড়ে দিলে কেন ?'

শুভা বলিল, 'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, এটা রেখে দেবেন। ডানা দুটো জোড়াই থাক, কেটে দিয়ে কেন ওকে কষ্ট দেবেন ? ওর কাটা ডানার যন্ত্রণা দেখে আপনার কষ্ট হবে না ? ভয় নেই, উড়ে পালাবে না, ও পোষা প্রজাপতি।'

এই বলিয়া শুভা একটু হাসিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় ততক্ষণ তাহার পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রকাশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রুমালখানি বক্ষে চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নয়

সেদিন শনিবার। মলিনাদের সকালে স্কুল থাকায় দুপুরে ছুটি। অন্য দিন দুপুরে মলিনার ছুটি থাকে না এবং রবিবারে স্বামী বাড়ীতে থাকেন, কাজেই সেদিন দুপুরে নির্ম্মলা দেবী মলিনাকে লইয়া আভা দেবীর বাড়ীতে গেলেন।

আভা দেবীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া তাঁহারা দেখিলেন, আভা দেবী কাজে ব্যস্ত এবং শুভা তাঁহার সাহায্য করিতেছে।

নির্ম্মলা দেবীদের আসিতে দেখিয়া আভা দেবী হাসিমুখে তাঁহাদের আগাইয়া লইয়া বলিলেন, 'আসুন, আসুন, এইখানেই বসুন, আমার কাজ শিগগীরই হয়ে যাবে।' এই বলিয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'একটা আসন বিছিয়ে দিয়ে তুমি মলিনাকে নিয়ে তোমার ঘরে গিয়ে গল্প করোগে, যেটুকু বাকি আছে আমি একাই করে নিতে পারবো।'

শুভা নির্ম্মলা দেবীকে বসিবার আসন দিয়া মলিনার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল।

নির্ম্মলা আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি তৈরি করছেন ?'

আভা দেবী হাসি মুখে বলিলেন, 'পেয়ারার জেলি। উনি বড় ভাল বাসেন। বাজারে শিশি করে যে সব চাটনি বিক্রি হয় তা উনি খেতে চান না ; এই জেলি খেতে বড় ভালবাসেন, তাই মাঝে মাঝে আমায় তৈরি করতে হয়।

নির্ম্মলা বলিলেন, 'এ ত খুব ভাল কথা। ওঁদের যা খেতে ভাল লাগবে তা আমাদের তৈরি করে দিতে হবে বই কি।'

এই বলিয়া কি করিয়া জেলি তৈয়ারি করিতে হয় তাহা আভা দেবীর নিকট জানিয়া লইলেন। জেলি তৈয়ারি হইয়া গেলে আভা দেবী নির্ম্মলাকে লইয়া অন্য ঘরে গিয়া বসিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কিরূপে এখানকার মেয়েদের সব দিক দিয়া উন্নত করা যাইতে পারে সে বিষয়েও কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

কথায় কথায় আভা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মলিনা ত শুভার সঙ্গেই পড়ে, আসচে বার ত ম্যাট্রিক দেবে, ওকে কি কলেজে দেবেন, না বিয়ের কিছু ঠিক ঠাক হয়েচে?'

নির্ম্মলা বলিলেন, 'এখনও কিছুই ঠিক হয় নি, আমি ত বিয়ে দেবার জন্ম ওঁকে প্রায়ই বলি; কিন্তু উনি বলেন পাশটা করুক না, তার পর দেখা যাবে। শুভাকে আপনি নিশ্চয়ই কলেজে দেবেন? বেশ মেয়েটি আপনার। আমার বড় ইচ্ছে ছিল আমার ভাগ্নে প্রকাশের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করি কিন্তু তা আবার হবার জো নেই; প্রকাশের আবার অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক করে রেখেচেন আমার নন্দাই।'

আভা দেবী বলিলেন, 'শুভারও বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে, বোধ হয় এই বোশেখেই হবে।'

—'কোথায় ঠিক করলেন?'

—'ওঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন, তাঁর ছেলের যখন ছ বছর বয়স তখন শুভার বয়স এক বছর; সেই সময়েই ওঁরা দুই বন্ধু এবং আমরা দুই সখী এদের বিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুত হই। ছেলেটি খুব ভাল, অবশ্য তাকে এই চৌদ্দ-পনর বছর দেখিনি; কিন্তু তার বাপ-মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কয়েকদিন হল চিঠি দিয়েছি, আমার ইচ্ছে এই বোশেখেই বিয়ে দেওয়া, মেয়ে বড় হয়েছে এখন বিয়ে দেওয়াই ভাল।'

—'কোথায় সম্বন্ধ হয়েছে, কোন্ ছেলে বলুন ত?'

—'ছেলের বাবা ছাপরার উকিল, নাম বিমলকুমার বসু, ছেলের ভাল নাম জানিনে, তাকে তার বাপ-মা নবু বলে ডাকে।'

এই কথা শুনিয়া নির্ম্মলা আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন, 'ওমাঃ ঐ তো আমার ভাগ্নে প্রকাশ, ওর বাবাই ত ছাপরার উকিল, আমার নন্দাই! প্রকাশ তো এখানেই আছে।'

আভা দেবী বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'নবু আপনার ভাগ্নে? সে এখানে আছে নাকি, কই তা তো আমরা জানিনে!'

নির্ম্মলা দেবী তখন বলিলেন, 'প্রকাশকে তার বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নবু বলিয়া ডাকে না এবং তার মামা প্রফেসর বলিয়াই সে এইখানেই পড়ে।' তার পর তিনি বলিলেন, 'দেখুন কি আশ্চর্য্য, প্রকাশ ও শুভা দুজনাই দুজনাকে দেখেছে, প্রকাশ তাদের স্কুলে প্রাইজের সময় গান শিখিয়ে এসেছে অথচ দুজনার কেউই জানে না যে, এই দুইজনার মধ্যেই বিয়ের কথা অনেক দিন থেকেই পাকাপাকি হয়ে রয়েছে!'

আভা দেবী বলিলেন, 'প্রকাশ শুভাকে চেনে নাকি?' বলিয়াই তিনি শুভাকে ডাকিলেন।

ওদিকে শুভা আর মলিনাতে তখন মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শুভা বলিতেছিল, 'ভাই মলিনা, আমার যদি কোন দাদা থাকতো, তাহলে তোকে বৌদি করে ঘরে এনে চিরকালের জন্ম ধরে রাখতাম।' আর মলিনা বলিতেছিল, 'তোর যখন দাদা নেই তখন তা ত আর হবার জো নেই; কিন্তু ভাই, আমার দাদা থাকতেও যে তোকে বৌদি করে আনতে পারছিনে, দাদার-আবার কোথায় কোন্ এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে আছে অনেক দিন থেকে।' শুভা বলিল, 'তাই নাকি? আমারও ঠিক ঐ রকমই।' বলিয়া আরও বলিতে যাইবে এমন সময়ে মায়ের ডাক শুনিতে পাইয়া সখীকে লইয়া নীচে আসিতেই আভা দেবী হাসিহাসি মুখে বলিলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই মলিনার দাদা প্রকাশকে চিনিস্?'

শুভা বলিল, 'প্রকাশবাবুকে খুব চিনি। তিনিই ত প্রাইজের সময় গান শিখিয়েছিলেন, coach করেছিলেন, তিনি না শেখালে কি আমার গান আর পার্ট অত ভাল হত?'

—'প্রকাশ কে, তা জানিস্?'

—'কেন, মলিনার পিসতুত ভাই।'

—'মলিনার পিসতুত ভাই ত বটেই, কিন্তু ঐ প্রকাশই নবু, বিমল ঠাকুরপোর ছেলে, তোর—'

ইহা শুনিয়াই শুভা ছুটিয়া তর তর করিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং মলিনা তাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইয়া উপরে ফিরিয়া গিয়া আনন্দের আতিশয্যে সখীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'বৌদি?'

শুভা কেবলমাত্র বলিল, 'ঠাকুরঝি!'

এমন সময়ে কৈলাসচন্দ্র কাছারি হইতে হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসায় আভা দেবী নির্ম্মলাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বামীকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্ম তাঁহার ঘরে যাইতেই কৈলাস বলিয়া উঠিলেন—'কি আশ্চর্য্য! নবু এখানে আছে এবং তাকে দেখেছিও কতবার, অথচ চিনতে পারি নি!'

আভা দেবী বলিলেন, 'তুমি কি ক'রে জানলে? আমি ত এখুনই তার মামীর কাছে সব শুনলাম, তার মামী বেড়াতে এসেছেন আমাদের বাড়ী।'

কৈলাসচন্দ্র তখন একখানি চিঠি দেখাইয়া বলিলেন, 'আজ দুপুরের ডাকে বিমলের চিঠি পেলাম; সে লিখেছে যে নবু অর্থাৎ প্রকাশ এখানে আছে এবং সে ধীরেনবাবুর ভাগ্নে। বিমল ও তোমার সখী দুজনাই সাত-আট দিনের মধ্যে এখানে আসচেন। তাঁদেরও ইচ্ছে যে বোশেখেই যেন বিয়ে হয়। যাক তুমি একবার ধীরেনবাবুর বাড়ী যাও, নবুকে ধরে নিয়ে এসো।'

আভা দেবী ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্মলা ও মলিনাকে মিষ্টি মুখ করাইয়া নিজেদের মোটরেই নবুকে আনিবার জন্ম তাঁহাদের সহিত রওনা হইলেন।

শুভা বাড়ীতেই রহিয়া গেল।

দশ

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া প্রকাশ চুল আঁচড়াইতেছে এবং গুন্ গুন্ করিয়া ইমন রাগিণীর একটি সুর ভাঁজিতেছে, এমন সময় ঝড়ের মত মলিনা ঘরে প্রবেশ করিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, 'দাদা, তোমায় যদি একটা সুখবর দিই ত আমায় কি দেবে বল!'

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আগে শুনি তোর সুখবরটা কি। যদি সুখবরই হয়, তা হলে তোকে একজোড়া ব্রেসলেট্, না হয় তোর যা পছন্দ তাই দেব।'

—'তোমার বিয়ের সব ঠিক করে এলাম।'

—'কার সঙ্গে রে!'

—'ঐ যার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি সুখী হও তার সঙ্গে অর্থাৎ শুভার সঙ্গে।'

—'তা কি করে হবে রে? আমার ত পাত্রী ঠিক হয়ে আছে।'

—'তোমার যেখানে ঠিক হয়ে আছে সেখানে অন্য একটা পাত্র ঠিক করে দিলেই হবে, সে আমি পিসেমশাইকে বলে ঠিক করে নেব।'

—'তোর এ সুখবর আমি আগেই জানতে পেরেচি, এই দেখ, বাবার চিঠি।' এই বলিয়া দুপুরের ডাকে পাওয়া বাবার চিঠিখানি আগাইয়া দিতেই মলিনা বলিল 'ও, তুমি আগেই জানতে পেরেছ; তাহলে তোমাকে আশ্চর্য্য করে দেওয়া গেল না। নাও এখন চল, শুভার মা এসেচেন তোমায় নিয়ে যাবার জন্য, চল শিগগীর।'

—'কই, কাকীমা এসেচেন নাকি?'

—'আর কাকীমা নয়, দুদিন পরেই তোমার শাশুড়ী অর্থাৎ—কাকী বাদ দিয়ে সুধু 'মা' হবেন!'

—'ফাজলামি করিস নে, আয়।' বলিয়া প্রকাশ কাকীমার সহিত দেখা করিতে চলিল।

প্রকাশ আভা দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া একে একে পুরাণো কথা সব বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, 'চল বাবা আমার সঙ্গে, তোমার কাকাবাবু তোমায় দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। তাঁকে আবার এখুনি কমিশনারের বাড়ী যেতে হবে, তাই নিজে আসতে পারলেন না।'

প্রকাশকে লইয়া আভা দেবী বাড়ী ফিরিতেই কৈলাস আসিয়া হাসিমুখে তাহাদের আগাইয়া লইলেন।

কৈলাস বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য, তোমাকে ত আগেও দেখেচি, কিন্তু চিনতে পারি নি—তুমি যখন আমাদের দেখেছিলে তখন তোমার পাঁচ-ছ বছর বয়স, তুমি ত আমাদের চিনতে পারবেই না, কিন্তু আমাদের চিনতে পারা উচিত ছিল।" তারপর পুনরায় বলিলেন, 'শুনেছিলাম তুমি পাটনায় পড়ছ।'

প্রকাশ বলিল, 'পাটনায় পড়তে গিয়েছিলাম, কিন্তু মামা ছাড়লেন না, তিনি আবার আমায় এখানে নিয়ে এলেন বি-এস-সি পড়বার জন্য।'

—"তুমি কি জানতে না যে আমিই এখানে বদলি হয়ে এসেচি?'

—"আপনিই যে এসেচেন তা জানতাম না। আপনি কটকে এস-ডি-ও এই জানতাম।'

—'কটক থেকে আমি পুরুলিয়া যাই, সেখান থেকে এখানে এসেছি। যাক, তুমি এঁদের সঙ্গে গল্প করো, আমাকে একবার বেরুতে হবে। তুমি রোজ আসবে, লজ্জা করো না।' এই বলিয়া কৈলাস বাহির হইয়া গেলেন।

আভা দেবী প্রকাশকে ভিতরে লইয়া গিয়া শুভাকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু শুভা আসিল না দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া প্রকাশকে বলিলেন, 'যাও বাবা, ঐ ঘরে শুভা আছে, গল্প করগে যাও; আমি ততক্ষণ জলখাবারের বন্দোবস্ত করিগে যাই।'

আভা দেবী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেই প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শুভা একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি বই দিয়া মুখ আড়াল করিয়া বসিয়া আছে। শুভাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া প্রকাশ বলিল, 'এ কি! তুমি ও রকম করে বসে আছ? তোমাদের বাড়ী অতিথি হলাম, খুব অতিথি সৎকার করছ ত!'

শুভা বইটি সরাইয়া বলিল, 'অতিথি সৎকার মা-ই ত করছেন।'

—'তা তো করছিলেন, কিন্তু তোমার ওপর ভার দেবার জন্যই ত তোমায় ডাকছিলেন; তুমি এলে না দেখে আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন জোর করে আতিথ্য সৎকার আদায় করে নেবার জন্য!'

তারপর, ও দিকে চা জলখাবার তৈয়ারি হইতে যেমন অনেক দেরি হইতে লাগিল তেমনই এদিকে দু'জনার লজ্জার বাঁধন কাটিয়া গিয়া নানারূপ গল্পে দুজনে মাতিয়া উঠিল।

শুভা একসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি ত জানতেন আপনার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে, তবুও যে বড় আপনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে গিয়েছিলেন!'

প্রকাশ একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'ও কথাটা আমিও ত তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি।'

—'না, পারেন না।'

—'কেন?'

—'তার কারণ, আমি আগেই আপনার পরিচয় পেয়ে সব বুঝতে পেরেছিলাম; তা না হলে আপনি কি মনে করেন আমি একা একা কখনও আপনার ট্রলে যেতাম? আর আপনি বলবামাত্রই রুমালে প্রজাপতি ফুটিয়ে তুলবার জন্য রাজি হতাম?'

—'তুমি কি করে জানলে যে আমিই সেই—'

—'সে আমি অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি। যে দিন আপনি প্রথম আমাদের স্কুলে গিয়ে গান শিখিয়ে এসেছিলেন সেইদিনই আমি আপনার সকল পরিচয় জানতে পেরেছিলাম।'

প্রকাশ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল এবং পরে বলিল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি প্রজাপতির ডানা দুটি জুড়ে দিয়েছিলে।' তাহার পর একটু থামিয়া সে আবার বলিল, 'কেন, আমি তোমার সঙ্গে অমন ঘনিষ্ট-ভাবে মিশেছিলাম শুনবে?'

—'কেন?'

—'বেতারে শুধু বেলই বাজে না বা গান ও বক্তৃতাই শোনা যায় না, ঐ বেতারের গুণেই বোধ হয় আমার মনেও সাড়া পড়ে গিয়েছিল যাতে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তুমিই আমার আপনার জন এবং ঐ জন্যই আমি তোমার সঙ্গে ওরূপভাবে মিশতে পেরেছিলাম।'

প্রকাশের সাফাই শুনিয়া শুভা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সময়েই আভা দেবী বাহির হইতে প্রকাশকে ডাকিলেন।

প্রকাশ চা জলখাবার খাইয়া কাকীমাকে আর একবার প্রণাম করিয়া এবং প্রত্যহ আসিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বাড়ী ফিরিল।

সেদিন রাত্রি তখন দশটা। শুভা নিজের ঘরে খিল লাগাইয়া তাহার কোন প্রিয় সখীকে পত্র লিখিতেছে। প্রকাশ নিজের ঘরে বসিয়া যাহা কখনও করে নাই তাহাই করিতেছে, অর্থাৎ—কবিতা লিখিতেছে, আর কৈলাসচন্দ্র তখন আভা দেবীকে কিছুদিন পূর্ব্বে জুতার দোকানের ঘটনার বিবরণ দিয়া বলিতেছিলেন, তোমার মেয়ে আবার তোমাদের ছাড়িয়ে গেল, সে আগেই—

—'তোমার লজ্জা করে না, তুমি বাপ হয়ে ঐ কথা বলছো?' এই বলিয়াই আভা দেবী হাসিয়া ফেলিলেন।

কৈলাসচন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'বাপ হয়ে ও কথা বলতে নেই বুঝি? তবে থাক। তাহলে তোমার কথাই বলি—'

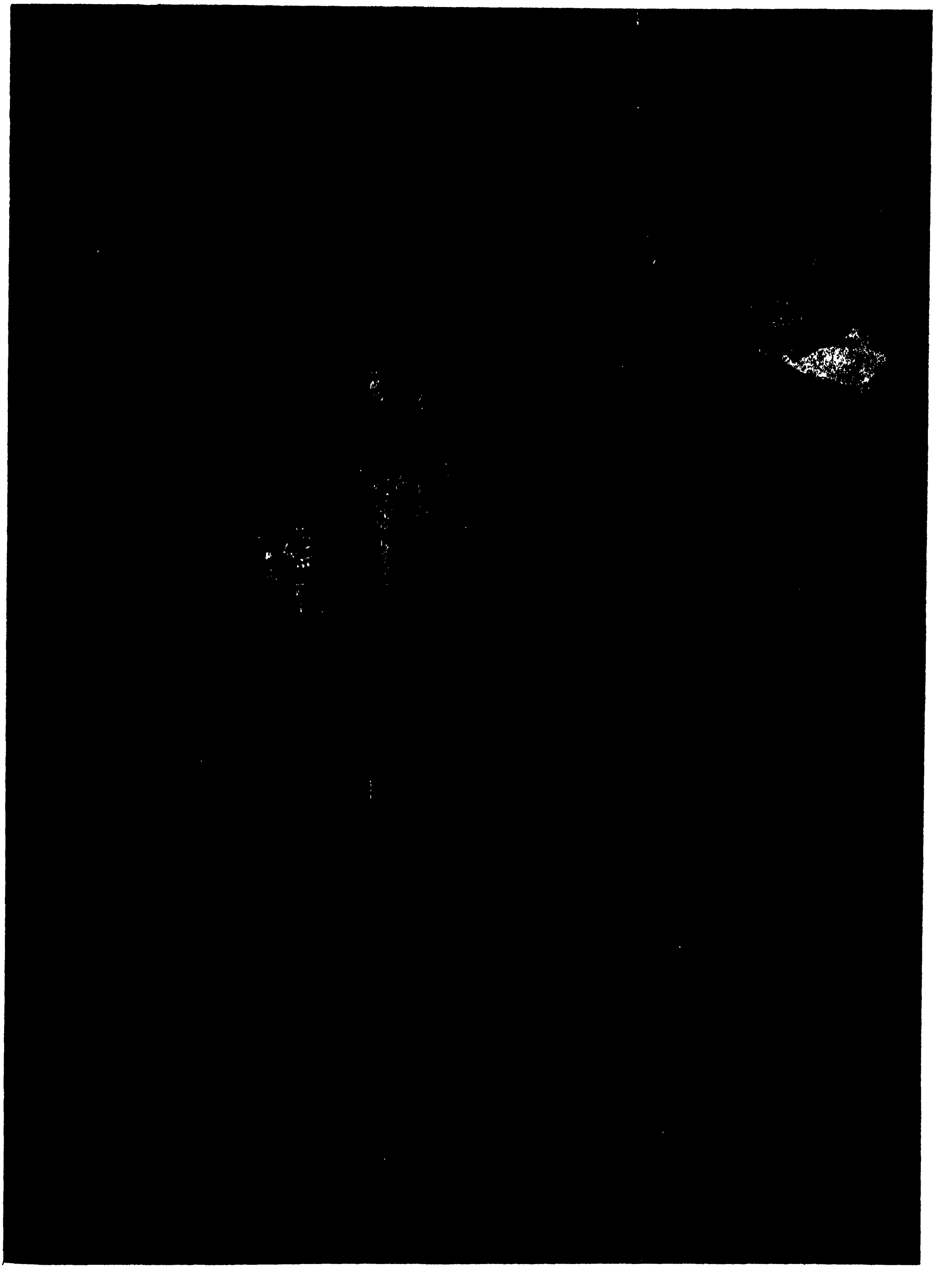
কার্য্য-কারণ তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব, ডি-এস্‌সি

প্রবন্ধ

অনেক দিন আগে (১২৮৩ সালে) অধুনা বিলুপ্ত বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সেই সময়ের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" বিষয়ে একটি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করেন এই ব'লে, "সমুদয় বিশ্বব্যাপারই কার্য্য-কারণসূত্রে গ্রথিত। অগ্নি দহিতেছে, মারুত হিল্লোলে লতাপল্লব সঞ্চালিত হইতেছে ইত্যাদি যাহা কিছু জগন্মণ্ডলে ঘটিতেছে, সে সকলই কার্য্য-কারণের দৃষ্টান্তস্থল।" প্রবন্ধটি শেষ করবার সময় এই সিদ্ধান্তটির ওপর আরও জোর দিয়ে আবার বলেন, "সমুদয় বিশ্বব্যাপারই কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ জগন্মণ্ডলস্থিত প্রত্যেক ঘটনারই একটি একটি কারণ আছে।" কেন যে এই অদ্ভুত "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকবে সে সম্বন্ধে তিনি দুটি প্রমাণ উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরই লেখা আবার উদ্ধৃত ক'রে বলি—"ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, অনুসন্ধান দ্বারা অদ্যাপি কোথায়ও কার্য্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই।... কোনও পরিজ্ঞাত স্থলেই বিনা কারণে কোন একটি ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই। এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, কারণ বিনা কোন ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না।"

মানুষ জগৎসত্তার পরিচয় পায় মন দিয়ে—তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যে রাজা তার মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের সমস্তই ছেড়ে দেয় সে যেমন রাজ্যের সত্যকার সংবাদ পায় না, মন্ত্রীরা যা দেখায় তাই সে দেখে, আমাদের মনও ঠিক তেমনি জগতের পরিচয়ের জন্যে যখন সম্পূর্ণভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে তখন তার সত্যকার পরিচয় সে পায় না। যা পায় তা তার ইন্দ্রিয় দ্বারা রঞ্জিত এমন একটা কিছু—যার মূল আর যেখানেই থাক, বাইরের জগতে নেই। আমাদের সমস্ত অনুসন্ধান সমস্ত অভিজ্ঞতার অন্তরালে এই ব্যাপারটি আত্মগোপন ক'রে থেকে জগতের যে রূপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষীভূত করে তার মধ্যে থেকে objectivity-কে প্রায় পরিপূর্ণ ভাবেই দূরে রেখে দেয়। এইদিক দিয়ে বিচার করলে এই বলতে হয় যে, আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদের দিয়েই অসম্ভব রকম সীমাবদ্ধ। এই রকম নিজেরই গণ্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রে বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে সর্ব্বগ্রাহী সিদ্ধান্ত গঠন খুব যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয় না। তাছাড়া, আমরা যা ভাবতেও পারি না এমন জিনিষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় এই কথাটি স্বীকার ক'রে নেওয়া অন্ততঃ বিজ্ঞানের আজকালকার দিনে আর সম্ভব নয়। আপেক্ষিক তত্ত্বের চতুর্থ মান (fourth dimension) আমাদের ভাবনার মধ্যে আসে না কিন্তু একে অস্বীকার করার দুঃসাহস এখনকার দিনে কোনো বিজ্ঞানবিদের আছে কি-না সন্দেহ। অতএব যে দুটি প্রধান যুক্তির ওপর "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" স্থাপিত—শেষ পর্য্যন্ত বিচারের ভার কাঁধে নেবার সময় সে দুটি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলে।



শিল্পী—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উপাসনা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কিন্তু একথা মানতেই হয় যে, যুক্তি দিয়ে কোনও সুবিধা না করতে পারলেও "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ" আমাদের সমস্ত বুদ্ধিসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দার্শনিকতা বাদ দিলেও আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রভাব কত ব্যাপক তা তখনই আমরা ধরতে পারি যখন দেখি যে আমাদের পাগলামীর মধ্যেও একে এড়িয়ে চলতে পারি না। মাঝ পথে বিপদে পড়লে ভাবতে বসি, যাত্রা করবার সময় হাঁচি পড়েছিল কি-না ; শূন্য কলসী দরজায় রাখা ছিল কি-না ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আবার এ জন্মের প্রত্যেক কাজ নানা জন্মের নানা কারণ দিয়ে গঠিত - এতদূর পর্য্যন্ত বলে থাকেন। ফলিত জ্যোতিষের যাঁরা চর্চ্চা করেন তাঁরা আরও চমৎকারভাবে এই "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"টিকে স্বীকার করেন। গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি আর চলাফেরা-রূপ কারণ মানুষের প্রত্যেক কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এই তাঁদের বিশ্বাস। অতএব এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জীবনের মধ্যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে, আমাদের সমস্ত দার্শনিকতার মধ্যে যত নিবিড়ভাবে এক হয়ে আছে এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নেই। তাই যখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখলেন যে, এছাড়া আর কিছু যে হ'তে পারে তা আমরা ভাবতেও পারি না, তখন তিনি একটি খুবই সত্য কথা বলেছিলেন। যে সত্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যা আপনা আপনিই চিরকাল সত্য, তাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বলা হয়। জার্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এই কারণে "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"কে "স্বতঃসিদ্ধ সত্যে"র পর্য্যায়ে ফেলে বলেছিলেন, ইয়ুক্লিডের জ্যামিতির axiomগুলি যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"ও তেমনি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নূতন নূতন গবেষণার নূতন আলোতে অতিকায় প্রাচীন স্বতঃসিদ্ধরা নিজের স্বরূপ মূর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত করতে বাধ্য হয়েছে। ইয়ুক্লিডের জ্যামিতির অটুট axiomগুলিও আজকাল আর সে রকম অটুট স্বতঃসিদ্ধ বলে পরিগণিত হয় না। অতএব নব-বিজ্ঞানের নির্ভীক দৃষ্টির সামনে "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে"র মূল কতদূর তা হয়ত নতুনভাবে ধরা পড়তে পারে। এইখানে একথা জানান যেতে পারে যে, বর্ত্তমানে খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকেদের বেশীর ভাগই এই "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ"কে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। আণবিক জগতে তাঁরা খুব স্পষ্টভাবে এর ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা এর স্বপক্ষে এখনও ওকালতি করেন তাঁরা বলেন যে, মানুষের সমস্ত যৌক্তিকতার মূলে রয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে এই "কার্য্য-কারণ তত্ত্ব"। একে বাদ দিলে পরে মানুষের দার্শনিকতার ক্ষেত্রে প্রলয় দেখা দিবে। অপর পক্ষীয়েরা তাতে একটুও বিচলিত হন না। তাঁরা বলেন যে, সম্পূর্ণ অনিয়ম বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থেকেই সমস্ত কার্য্যকরী নিয়ম গড়ে উঠতে পারে। কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এমনিতরই একটা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দেশকাল অনুসারে সীমাবদ্ধ নিয়ম। ইচ্ছা হ'লে একে স্বীকার করতে পারা যায়, অস্বীকার করলেও কিছু যায় আসে না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা এইরকম একটা অতিশয় দুঃসাহসের কথা প্রচার করেন কি সাহসের ওপর নির্ভর করে—তা বুঝতে হ'লে প্রথমে কার্য্য-কারণ তত্ত্বটিকে আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝা দরকার। দুটি ঘটনা সংঘটিত হ'তে দেখতে পাওয়া গেল। এই ঘটনা দুটি যুগপৎ নয়—একটি অপরটির পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত। এই ঘটনা দুটি কার্য্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ হ'তে হ'লে এই দুটি পরস্পরে কোনও রকম নিয়মে শৃঙ্খলিত থাকতে হবে। এইরকম নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত একটি অপরটির ঠিক পরবর্ত্তীকালে সংঘটিত এমন দুটি ঘটনার প্রথমটিকে বলা হয় কারণ, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় তার কার্য্য।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন দুটি খুব স্পষ্টভাবে মনে জাগে। তার প্রথমটি এই হ'ল যে, যে নিয়ম এই দুটি ঘটনাকে এক ক'রে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখছে তার বাস্তবিক স্বরূপ কি? নিয়মটি যে কি তা ঠিকভাবে জানা না থাকলে ঘটনা দুটি বাস্তবিক "কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে" আবদ্ধ কি-না তা বলা চলে না। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হ'তে পারে। রাতের পর দিন, আর দিনের পরে রাত—পৃথিবী যে ক্ষণ থেকে নিজের অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, সে ক্ষণ থেকেই হ'য়ে আসছে। অতএব আপাতদৃষ্টিতে এই রাত আর দিন হওয়ার মধ্যে একটা নিয়ম বর্ত্তমান। শুধু এইটুকু তথ্য নিয়েই যদি, ধরা যাক্, রাতকেই দিন হবার কারণ বলে ঠিক করি তবে তা যুক্তি হিসাবে ঠিক হ'লেও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক হবে না। কিন্তু রাতের পরে দিন যে নিয়মে হয় সেটিকে জানতে পারলে আর রাতকে দিনের

কারণ বলবার অবকাশ থাকে না। তাই কারণ আর তার কার্য্য যে নিয়মে শৃঙ্খলিত তার সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই নিয়মটি যে কি তা না জানতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পূর্ব্বাপর ঘটনা দুটির প্রথমটি পরেরটির কারণ এই কথা জোর ক'রে বলা চলে না। তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, পরবর্ত্তী কালের ঘটনা যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঘটনা থেকেই উদ্ভূত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ রকম প্রমাণ আছে কি? এইখানে সেই চিরকালের উদাহরণ—গাছ আর তার বীজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীর দার্শনিকের মত এই যে, সম্পূর্ণ গাছটাই সুপ্ত আকারে ওই বীজটার মধ্যে বর্ত্তমান না থাকলে পরবর্ত্তী কালে ওই গাছটা ওই আকার পেতে পারত না। এই কথা বলা তখনই সম্ভব—যখন ওই গাছটা নিজের পরিপূর্ণ আকার পেয়েছে। কিন্তু বীজ অবস্থায় এই বীজটা দেখে পরবর্ত্তী কালে এর কি আকার হ'বে তা ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার সাহস কোনও উদ্ভিদ্‌বিদের আছে কি-না জানি না। অতএব গাছ আর বীজের উদাহরণটা স্বীকার করলে আমরা কার্য্য থেকে কারণ উদ্ধার করি, কারণ থেকে কার্য্যকে পাই না।

সে যাহোক, কার্য্য-কারণ তত্ত্বের শেষ পর্য্যন্ত যে চেহারা আমরা পেলাম তা থেকে একটা জিনিষ আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ যদি সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারের মূলে থাকে তবে কোনও একটা ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানা থাকলে তার পরবর্ত্তীকালের ঘটনা আমরা তা থেকে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারি। মাল্লারা নদীতে নৌকো নিয়ে যাচ্ছে। 'নদীর স্রোতের বেগ আমরা জানি, মাঝিমাল্লার দাঁড় টানবার জোর কতকখানি তা হিসাব করতে পারি, আর ধরা যাক বাতাস কেমনভাবে ওই নৌকোটার ওপর ক্রিয়া করছে তাও আমাদের অজানা নয়। এইগুলো স্পষ্ট ক'রে জানা থাকলে আর পাঁচ ঘণ্টা পরে নৌকা আমাদের ঘাটে লাগবে তা আমরা সকলেই অনুমান করে নিই। আর বস্তুতঃ সে অনুমান ঠিকও হয়। অতএব ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যে সম্ভব একথা আমাদের একটা খুবই সাধারণ ধারণা। পঞ্জিকাতে এক বছরেরও আগে থেকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান অঙ্ক কষে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হ'য়ে থাকে, আর তার ব্যতিক্রমও হ'তে দেখা যায় না। যেদিন চন্দ্রগ্রহণ হ'বে বলে লেখা থাকে ঠিক সেই দিনেই তা হয়, এমন কি, ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডও মিলে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা যে ধরণের বিচার করেন তা সাধারণ মানুষের বিচার থেকে একটু স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ ব্যবহারিক মানুষ। তার কাজ চলবার মত মিল পেলেই সে সন্তুষ্ট হয়—খুব নির্ভুলভাবে, একেবারে খুঁটিয়ে মিল্‌ল কি-না—সে সংবাদে তার কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ঠিক তার উল্টো। সে দেখতে চায় একেবারে পুরোপুরি ঠিক হ'ল কি-না। অঙ্ক কষে সে যা বার করল, তার সঙ্গে সত্য যা ঘটবে তা একেবারে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে কি-না এই কথা সে স্পষ্ট ক'রে জানতে চায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে দেখতে পায় যে, তার অঙ্ক তাকে প্রায় ঠিক উত্তর—সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দেয় না। যত দিন সে বিশ্বাস করত যে এই দুটো ব্যাপার অর্থাৎ তার অঙ্ক-ক'ষে-বার-করা ভবিষ্যদ্‌বাণী—আর সত্য যা ঘটেছে তা একেবারে পুরোপুরি মিলে যাবেই—তত দিন সে খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোথায় সে ভুল ক'রেছে আর কি পরিমাণ ভুল সে করতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত সে সম্ভব আর অসম্ভব সব রকম ভুল ভেবে চিন্তে জেনে নিল, কিন্তু তখনও তার ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় না। বৈজ্ঞানিক তখন বিপদে পড়লেন। তাঁর সামনে এখন দুটি সমস্যা—স্বীকার করা যে, নির্ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভবই নয়, কিম্বা তার সব রকম ভুল জেনে নেওয়া এখনও হয় নি। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা দ্বিতীয়টাকে সত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা প্রথমটার ওপরেই বেশী বিশ্বাস রাখেন।

বিভিন্ন মতের বৈজ্ঞানিকেরা যাই নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস করুন না কেন আজকাল তাঁরা সকলেই এই তথ্যটি (fact), সে যত সামান্য ব্যাপারই হোক না কেন আর যত সূক্ষ্ম যন্ত্রই তার জন্যে ব্যবহার করা হোক না কেন—আগে থাকতে তাঁদের পরীক্ষার ফল তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে বার করতে পারেন না। যে ফল তাঁরা পূর্ব্ব থেকে অঙ্ক কষে পান তার মধ্যে সর্ব্বদাই কোথাও না কোথাও একটু অনিশ্চয়তা থাকেই। উদাহরণস্বরূপ এখানে ইলেক্ট্রনকে নেওয়া যেতে পারে। ইলেক্ট্রন হ'ল আমাদের জানা জিনিষের মধ্যে বোধ হয় লঘুতম কণা, অতএব ধরা যাক সামান্যতম পদার্থ। মনে

করা যাক্ এই ইলেক্ট্রনটা অবাধভাবে, কারুর সঙ্গে ধাক্কা না খেয়ে বিচরণ করতে পারে। আর ধরা যাক্, এই মুহূর্ত্তে এই ইলেক্ট্রনটা সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার আছে সবই আমরা জেনে নিলাম। এইবার দেখা যাক্, এক সেকেণ্ড পরে এটা কি অবস্থাতে পৌছুবে তা আমরা কতখানিটা গুণে বলতে পারি। সব দিক দিয়ে আমরা যদি সম্পূর্ণ সুবিধা পাই তবে এক সেকেণ্ড পরে ইলেক্ট্রনটা যেখানে বাস্তবিক পৌছুবে তার দেড় ইঞ্চিখানেকের মধ্যে আমরা তার অবস্থিতি গুণে বার করতে পারি—এ থেকে বেশী নির্ভুলভাবে বলা আমাদের সাধ্যের অতীত। ভুলটা অবশ্য খুবই সামান্য, কারণ ওই এক সেকেণ্ডে ও ইলেক্ট্রনটা প্রায় ১০,০০০ হাজার মাইল চলে গিয়েছে। কিন্তু যত সামান্যই হোক, ভুল ভুলই। কারণ এক অবস্থায় যে ভুল অতি সামান্য হয় অন্য অবস্থায় তাই মারাত্মক হয়ে ওঠে। ধরা যাক ওই ইলেক্ট্রনটা দিয়ে আমরা একটা কোন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কণাকে ধাক্কা লাগাতে চাই। এই ক্ষেত্রে ওই দেড় ইঞ্চির অনিশ্চয়তা অতিশয় বিরাট ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ইহুদী বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স বহ্‌র এই জিনিষটাকে বোঝাতে গিয়ে একটা অতি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। উইলিয়াম টেলকে তাঁর ছেলের মাথায় একটা আপেল রেখে দূর থেকে তীর মেরে সে আপেলটাকে বিদ্ধ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। টেল্-এর তীরন্দাজ হিসাবে দক্ষতা তাঁকে নিজের পুত্রহন্তা হ'তে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপেলের পরিবর্ত্তে সেখানে যদি একটা পরমাণু থাকত আর তীরের পরিবর্ত্তে একটা আল্‌ফা কণা ছুঁড়ে দিয়ে সেই পমমাণুকে বিদ্ধ করতে দেওয়া হত, আর তাঁর ধনুকের পরিবর্ত্তে আজকালকার দিনের সব থেকে ভাল পরীক্ষকদের সর্ব্বোত্তম যন্ত্র তাঁকে ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত, আর সে যন্ত্র ব্যবহার করতে তিনি তীর ধনুক চালাবার মতই দক্ষ হতেন তবুও তাঁর দক্ষতা কোন কাজেই লাগত না। পরমাণুটাকে বিদ্ধ করা বা না-করা তখন একেবারে তার দক্ষতার বাইরে চলে যেত, কারণ তখন তা নির্ভর করত সম্পূর্ণভাবে আকস্মিকতার ওপর।

নৌকো থেকে আরম্ভ ক'রে যে উদাহরণগুলি দিয়ে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করবার অক্ষমতা সিদ্ধ করছিলাম তাতে কেবলমাত্র জগতের এক শ্রেণীর ব্যাপারই অর্থাৎ mechanical world-এর বিষয়েই বলা হ'ল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই অক্ষমতা বিদ্যমান। বায়ুর চাপ গণনায়, রেডিও র‍্যাকটিভিটিতে, আলোক বিজ্ঞানে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আমরা শেষ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে কোন কথা পূর্ব্ব থেকে জানতে পারি না। আমাদের জানার মধ্যে সর্ব্বদাই কিছু না-কিছু অনিশ্চয়তা জড়িয়ে থাকবেই। অতএব যে ভিত্তির ওপর স্থাপন ক'রে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে আমরা স্বীকার করতে চাইছিলাম সে ভিত্তি শেষ পর্য্যন্ত কঠিন হ'য়ে রইল না। নতুন নতুন তথ্যের প্রবল চাপে তা অবশেষে তলিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

তবে কি জগৎ সংসারে কোন কাজ কোন কারণের অপেক্ষা রাখে না? কথাটাকে মন সহসা স্বীকার করতে চায় না, বহু শতাব্দীর সংস্কার তাকে বাধা দেয়। একথা স্বীকার করবার স্পষ্ট কোন যুক্তি তার নেই—তবু সে একে মেনে নিতে সাহস পায় না। মনের দিক দিয়ে এমন কঠিন বাধা সত্ত্বেও অগ্রগামী বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে ভূতকালের ওপর নির্ভর করে না। খানিকটা অবশ্য সে করে, তাই ভূতকালের সঙ্গে কতকটা সম্পর্ক তার আছে। খানিকটা সম্পর্ক আছে বলেই আমরা কতকটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, কিন্তু বাকিটা একেবারে অনিশ্চিত থাকে। এই বৈজ্ঞানিকদের কাছে বাহ্য জগৎ প্রকাশ পায় এক অভিনব রূপ নিয়ে। বর্ত্তমান রচনার তা প্রধান বিষয় নয় বলে এর শুধু উল্লেখ মাত্রই আমরা আপাততঃ করে রাখলাম। আমাদের প্রধান বক্তব্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তাই যাঁরা এখনও তাকে জগতের মূলে বর্ত্তমান বলে স্বীকার করে থাকেন তাঁদের যুক্তিপ্রণালী কি তাই আমরা অনুসরণ করব।

আমরা এই নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম যে, কার্য্য-কারণ তত্ত্ব দিয়ে প্রত্যেক ঘটনা বা কাজ নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'লে তা থেকে এই একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হয় যে, কাজ বা ঘটনাগুলিকে পূর্ব্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে বিচার ক'রে এই পাওয়া গেল যে, কাজ বা ঘটনাকে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কার্য্য-কারণ তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বললেন যে, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে যাচ্ছি ঘটনা বা eventকে—যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপ-জোক ক'রে যাকে পাওয়া যায় তাকে নয়। মাপ-

জোক করা ব্যাপার আমাদের ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার, তাই তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু এই event-এর মধ্যে সে অসম্পূর্ণতা এসে লাগে না। এই জন্তেই ঘটনা বা event পূর্ব্ব থেকেই জানবার সীমার মধ্যে এসে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ হাওড়া আর কলকাতার মধ্যে গঙ্গার ওপরের যে সেতু আছে তাকে নেওয়া যেতে পারে। এই সেতুটা কতটা লম্বা তার একটা স্পষ্ট পরিষ্কার ধারণা আমাদের সকলেরই মনে বর্ত্তমান। মনের এই ধারণা আমরা ঠিক কত গজ কত ফুট ইত্যাদি দিয়ে না বলতে পারলেও ধারণার মধ্যে এর যা দৈর্ঘ্য বর্ত্তমান তাতে এতটুকুও কোনও অনিশ্চয়তা নেই। এই অনিশ্চয়তা এসে পড়ে যখন তাকে হাতে কলমে (actually) মাপ-জোক করে দেখতে যাই। জগতের সবকিছুকেই এই ভাবে দু দিক দিয়ে দেখলে তার দুটো রূপ পাওয়া যায়। একটা রূপ যা আমাদের মনোগত বা ধারণাগত জগতের জিনিষ, যা আমরা একেবারে সমগ্রভাবে আমাদের মধ্যে পাই ; আর অন্য একটা যা আমরা মাপজোক করে টুকরো টুকরো একত্র করে তৈরী করে নিই। প্রথমটার মধ্যে কোনও রকম সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা নেই, অনিশ্চয়তা থাকে সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয়টার মধ্যে। তাই মাপজোক করে দেখতে গেলে কোনও জিনিষ পূর্ব্ব থেকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভাবনার বাইরে চলে যায়। অতএব তাঁরা বলেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা শুধু মাপজোকের জগৎ নিয়েই কারবার করেন, তাই তাঁদের ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্ভুল হয় না।

আমরা এই জগতে মাপজোক করি কেবলমাত্র চারিটা জিনিষের—দৈর্ঘ্য, সময়, ভার (mass) আর বৈদ্যুতিক শক্তি বা চার্জ্জ (charge)। এই চারটি জিনিষ ছাড়া আর কিছু আমাদের মাপজোক করতে হয় না। আগে যা বলা হয়েছে সে অনুসারে এই চার রকম মাপজোকের মধ্যে সর্ব্বদাই দুটো অর্থ বর্ত্তমান থাকে। একটা, মাপজোক করার অতিরিক্ত আমাদের মনে সর্ব্ব সময়ের জন্তে এদের সম্বন্ধে যে অর্থ থাকে তা, আর অন্যটা মাপজোক করে যে অর্থ আমাদের হস্তগত হয় তা। প্রথমটা একেবারে নিশ্চিত, তাতে কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই ; অপর পক্ষে দ্বিতীয়টা কখনও একেবারে নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি না, তার মধ্যে মূলগতভাবে একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। কার্য্য-কারণ তত্ত্বের উদ্যোক্তারা বলেন যে, জগতের বাস্তবিক রূপ নিহিত থাকে প্রথমটারই মধ্যে, মাপজোক করে যা পাওয়া যায় সেটা সত্যকারের রূপ নয়। জগতের সত্যকারের রূপে মাপজোক করে পাওয়া রূপের এই অনিশ্চয়তা নেই, তাই সেখানে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা চলে, আর তাই তার মূলে কার্য্য-কারণ রয়েছে এই কথাও স্বীকার করতে হয়।

তাঁরা বলেন যে, আমাদের সর্ব্বদাই যুগপৎ দুটো জগতের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে হয়। একটা আমাদের বোধগত বা দৃশ্যমান জগৎ। আর একটা কার্য্যকরী জগৎ বা world of measurement. এই দুটো সব সময়ই পাশাপাশি চলেছে, আর মানুষের চেষ্টা এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। মানুষ এই দুটোর মধ্যে কতকটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তাই তার মাপজোকগত জগৎ বা world of measurement-এর মধ্যেও সে কতকটা কার্য্য-কারণ দেখতে পায়। এই সম্পর্ক সৃষ্টি তার যত সর্ব্বাঙ্গীন হয় তার মাপজোকগত জগতেও কার্য্য-কারণের প্রভাব সে ততটা সর্ব্বাঙ্গনী দেখতে পায়, আর এই সম্পর্কের পূর্ণতম বা চরম অবস্থায় তার বোধের জগৎ আর মাপজোকগত জগৎ এক হ'য়ে মিশে যায়। এই অবস্থায় তার কোথাও কিছু সামান্যতমও ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা নেই—পৃথিবীর প্রথম উষার আলো দেখে সে শেষ সন্ধ্যার বর্ণনা করতে পারে।

তাই কার্য্য-কারণতত্ত্ববাদীদের মতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নয় ; তার কারণ, জগতের মূলে কার্য্য-কারণ তত্ত্ব নেই তা নয়, তার কারণ এই যে, তার বোধগত জগৎ আর পরিমাণগত জগতের পরস্পরের সম্পর্কের চাবিকাঠিটি এখনও সে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করতে পারেনি। গতযুগের বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ক্রমে ক্রমে এই চাবিকাঠিটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করবার পথে চলেছেন ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নবীনেরা বলেন, গত যুগের বৈজ্ঞানিকদের তা ছিল দুরাশা মাত্র, মানুষের কখনও সে চাবির সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেমন ক'রে নেই সে সম্বন্ধে তাঁদের যুক্তি এই,—

জার্ম্মান পদার্থবিদ্ ম্যাক্স প্লাঙ্ক আবিষ্কার করলেন আলোর কোয়াণ্টাম্ (Light quantum) অর্থাৎ কণাকে, আর তা থেকে গড়ে উঠল কোয়াণ্টাম থিয়োরী বলে বর্ত্তমান

পদার্থবিজ্ঞানের আধখানারও ওপর এত বড় একটা মীমাংসা। নানারকম সূক্ষ্ম ও স্থূল পরীক্ষা আর প্রয়োগের ভিতর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, আলোর শক্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হবার সময় অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত হ'যে যায় না, বরং কণার ঝাঁক হয়ে এগিয়ে চলে। •আলো যেখানে অতিশয় তীব্র সেখানে এই কণার ঝাঁক খুব ঘন হয়—আর এই অবস্থায় তাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের আকারে চলে যেতে দেখতে পাই। আলো যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকে অনেক দূরে এসে পড়লে স্বভাবতই এই স্রোতের অবিচ্ছিন্ন ভাব কমে আসে আর আলোর কণাগুলো তখন অত কাছাকাছি থাকে না। কাজে-কাজেই আলোর তীব্রতা কম হবার সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি (energy) আপনা আপনিই কম হ'য়ে যায়। কিন্তু দেখা গিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত আলোর তীব্রতার সঙ্গে তার শক্তির কম হওয়ার এই সম্পর্কটি আর থাকে না। আলো যতই ক্ষীণ হোক না কেন তার শক্তি একটা নিম্নতম মানের নীচে আর যায় না। তখন আলো ক্ষীণতর হতে হলে তার শক্তি কম হ'যে হয় না, যেখানে সেকেণ্ডে চারিটা আলো আসত সেখানে দুটা বা একটা হ'য়ে গিয়ে এই ভাবে ক্ষীণ হয়। আলোর এই রকম ব্যবহার কার্য্য-কারণ তত্ত্বকে যে ধাক্কা দিয়েছে তা থেকে সে এখনও উদ্ধার পায় নি। কোথায় যে তার বিপদ্ তা নীচে বলছি।—

চক্‌চকে পালিশ করা জায়গায় আলো পড়লে তা থেকে, খানিকটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, আর খানিকটা ভেতরে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ধরা যাক্, তিন ভাগ প্রতিফলিত হচ্ছে আর এক ভাগ অন্যদিক ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। আলো যতই তীব্র বা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, এই ব্যাপারের কোনও ব্যতিক্রম হয় না—যেখানে তিন ভাগ প্রতিফলিত হবার কথা, ক্ষীণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কমে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে যায় না—ঠিক তিনই থাকে। যখন অনেকগুলো, ধরা যাক্, ১০০টা আলোর কণা এসে পালিশ করা জায়গায় লাগল তখন হিসেব মত ৭৫টা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল আর ২৫টা অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই অবস্থায় অবশ্য কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই ১০০টা কমতে কমতে যখন একটায় দাঁড়ায় তখনই বাস্তবিক বিপদ উপস্থিত হয়। সোজা হ'ত যদি বলা যেত যে একটা কণা চার টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে তিন টুকরো প্রতিফলিত হবে আর এক টুকরো বেরিয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, আলোর কণা এইভাবে টুক্‌রা হতে পারে না। তাই, কাজে কাজেই, তা সম্ভব নয়। অতএব এই একটা আলোর কণাকে হয় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হ'তে হবে, নয় সম্পূর্ণই ভেদ করে যেতে হবে। এই কণাটা এখন কি করবে তা গণনা ক'রে আগের থেকে জানতে পারা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মানুষ কোনও দিনই পূর্ব্ব থেকে বলতে পারবে না যে, অমুক কণাটা প্রতিফলিত হবেই বা অমুক কণাটা জিনিসটাকে ভেদ ক'রে যাবে। যখন একশটা আলোর কণা ছিল তখনও তাদের মধ্যে যে-কোনও একটা কণা নিয়ে বিচার করতে গেলে ঠিক ওই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়. তখন ৭৫টা প্রতিফলিত হবেই একথা অতি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারলেও কোন্ ৭৫টা তা হবে একথা একেবারে নির্ভুল ক'রে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানুষের সমস্ত জানার মূলে এই অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা সর্ব্বদাই রয়েছে। এ অনিশ্চয়তা তার মাপজোকের, অনিশ্চয়তা বড় নয় তাই কোনও দিনই তার ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে নির্ভুল হবে না।

আলো ছাড়া যেখানে প্রকৃতি জড়রূপে প্রতিভাসিত, সেখানেও ঠিক এই রকম অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। পূর্ব্বে ইলেক্ট্রনের কথা একবার বলেছি। এই ইলেক্ট্রনই হ'ল এখনও পর্য্যন্ত জড়প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম প্রকাশ, কারণ এখনও এর থেকে ক্ষুদ্রতর কোনও জিনিষের অস্তিত্ব মানুষ জানতে পারে নি। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, ইলেক্ট্রনও অবিকল ঐ photon বা আলোর কণার মতই আচরণ করে। এই ইলেক্ট্রন তার চলবার অবস্থায় যদি কোনও জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তা হয় ফিরে আসে, নয় সে তাকে ভেদ করে চলে যায়। কিন্তু এটা ভেদ করে যাবে—না ফিরে আসবে তা পূর্ব্ব থেকে গণনা ক'রে জানতে কেউ সমর্থ হয় নি। সমর্থ হয়নি তাদের নিজেদের দোষে নয়। কারণ তা সম্ভব নয় বলেই। এখানেও তার ভবিষ্যদ্বাণী করার সাধ্য নেই। অতএব তত্ত্বের দিক দিয়েও মানুষ তার বোধের জগৎ আর তার অনুভবগত জগৎ (world of measurement and world of experience)-কে কোনও দিন মিশিয়ে দিতে

পারবে না; এই দুটি জগতই তার কাছে চিরকাল পৃথক হয়েই থাকবে।

মানুষের জ্ঞানের পথ যে কি পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ এই ইলেক্ট্রনই আবার একটা নতুন দিক দিয়ে তা মানুষকে দেখিয়েছে। প্রত্যেক জিনিষের দুটা দিক আছে, অর্থাৎ দু-দিক দিয়ে আমরা প্রত্যেক জিনিষকে দেখে থাকি বা বিচার ক'রে থাকি। একটা হ'ল সে কোথায় আছে, আর দ্বিতীয়টা হ'ল সে কিভাবে আছে। প্রথমটাকে বলা যেতে পারে তার অবস্থান (position), আর দ্বিতীয়টাকে বলা যেতে পারে তার গতি (velocity)। কোথায় আর কিভাবে আছে এটা জানতে পারলে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন কোনও ক্ষেত্রে যুগপৎ কোনও জিনিষের অবস্থান আর গতি জানতে পারা মানুষের সাধ্যাতীত। একটা ইলেক্ট্রনকে নিয়ে এই কথাটাকে স্পষ্ট করা যাক্। ইলেক্ট্রনটা কোথায় আছে তা জানতে হ'লে তাকে আমাদের দেখা দরকার। দেখতে হ'লে আলোর প্রয়োজন, আলো ফেলে তাকে আলোকিত না করলে তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। আলোর রশ্মি ইলেক্ট্রনের ওপর পড়লে তার গতিকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করে দেয় যে, তা আর ধরতে পারা যায় না। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনটার অবস্থিতি (position) জানতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার গতি অজানিত থেকে যায়।

ইলেক্ট্রনের এই রকম ব্যবহার থেকে একটা অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকেরা টেনে বার করেছেন। কোনও জিনিষকে ভাল ক'রে জানতে গেলে জানবার প্রক্রিয়া সেই জানার মধ্যে বিক্ষোভ এনে দেয়। যা আমরা মাপজোক ক'রে জানতে পাই তার মধ্যে মাপজোক করার প্রক্রিয়া নিজে আত্মগোপন হ'য়ে থাকে, আর যাকে জানতে যাচ্ছি সে গোপন রয়ে যায়। স্যর জেমস্ জীন্স একটা চমৎকার কথা এ সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেন যে, Nature is something which is destroyed by observation. অর্থাৎ স্পষ্টভাবে নির্ভুলভাবে প্রকৃতিকে জানতে গেলেই সে নষ্ট হ'য়ে যায়। এ ঠিক যেন মরুভূমিকে উড়োজাহাজে চড়ে দেখবার মত। দূর ওপর থেকে বেশ দেখা যায়, কিন্তু কাছে এসে আরো ভালো ক'রে দেখতে গেলে নিজেরই যন্ত্রের তাড়নায় এত ধূলো ওড়ে যে, প্রকৃতি একেবারে গোপন হয়ে পড়ে, তাকে আর দেখা চলে না। অতএব কোনও জিনিষকে ভাল করে দেখতে গেলেই তার সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে তাকে জানতে গেলেই তার মধ্যে আমরা নানা রকম উৎপাত এনে ফেলি, এর পর যাকে পাই আর যাকে জানতে গিয়েছি এ দুটোর একটুও মিল থাকে না। অর্থাৎ আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা (experience) নির্ভর করে যে যন্ত্র দিয়ে সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা হয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ আমরা আমাদের কাজকেই ফিরে পাই—প্রকৃতি চিরকাল অজানিতই থেকে যায়।

অতএব মাপজোক করে measurement-এর মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষৎকে জানা ত দূরের কথা বর্ত্তমানকেও সম্পূর্ণভাবে আমরা জানতে পারি না। এই সব নূতন আর অচিন্তিত-পূর্ব্ব তথ্যের সামনে a priori বা a posteriori কোনও রকম যুক্তি দিয়েই কার্য্য-কারণ তত্ত্বকে মেনে নেওয়া চলে না। কার্য্য-কারণ তত্ত্ব, পূর্ব্বে বলেছি, কঠিন আর নিশ্চিত নিয়ম দিয়ে শৃঙ্খলিত। এই জন্যেই এর আর এক নাম determiniom যা নিশ্চয়তাবাদ। আজকালকার নতুন বৈজ্ঞানিকেরা একে স্বীকার করেন। তাঁরা এর পরিবর্তে ঠিক এর বিপরীত এক তত্ত্বকে স্বীকার করেন আর তার নাম দেন অনিশ্চয়তাবাদ (indeterminism)। স্যর আর্থার এডিংটন-এর কথায় এই অনিশ্চয়তাবাদের ওপর নির্ভর ক'রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যা হয়েছে তা অসাধারণ, অপর পক্ষে নিশ্চয়তাবাদ বা কার্য্যকারণ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে তার অগ্রগতির পরিমাণ—"just nil", এই কিচ্ছু না।

কার্য্যকারণ বা causality-কে পরিত্যাগ করলেই একটা সমস্যা স্বভাবতঃ এসে পড়ে। তবে কি জগতের সবই স্বাধীন, এ জগতে সবই কি সম্পূর্ণরূপে স্ব-ইচ্ছা-পরায়ণ? এ সমস্যা ঠিক বিজ্ঞানের না হলেও যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উত্তর ফল স্বরূপ হ'য়ে এ প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছে তখন বৈজ্ঞানিককে এর সম্মুখীন হ'তেই হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে এর উত্তর দিতে চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সে আলোচনা আপাততঃ অন্য সময়ের জন্যে তোলা রইল।

প্রোপাগাণ্ডা

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

আমার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইতেছিল। নিরুপায় হইয়া তাঁহার সামনে বসিয়াছিলাম। তাঁহার মুখনিস্মৃত উচ্ছ্বসিত বাক্যপ্রবাহ নদীর স্রোতের মত যেন লহরী তুলিয়া ছুটিতেছিল। সেই তরঙ্গবেগে আমি ভাসমান তৃণখণ্ডের মত নিঃসহায় হইয়া কোন্ অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছি।

ভদ্রলোকটি যেন একটি জীবন্ত সংবাদপত্র! তিনি বলিতেছিলেন—বিচার, বিচার কোথা! চেয়ে দেখুন য়ুরোপের দিকে—সাম্রাজ্যলোভী ইটালীর কি পররাজ্যলোলুপতা; আমাদের চোখের সামনে নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তারা আবিসিনিয়া অধিকার করলে। সমস্ত দেশটার ওপর থেকে মরণোন্মুখ মনুষ্যত্বের যে আর্ত্তনাদ জাতির মর্ম্মস্থলে ধ্বনিত হয়ে উঠল—তাহ'ল নিষ্ফল। সবাই শক্তির দম্ভকে নির্ব্বিচারে মেনে নিলে। মুসোলিনির বিরুদ্ধে কেউ কথাটা পর্য্যন্ত কইলে না। তারপর দেখুন জার্ম্মানী। দুর্ব্বল ইহুদীদের ওপর নাৎসী গবর্ণমেন্টের সে কি নিদারুণ নিপীড়ন! আইনষ্টাইনের সম্মান পর্য্যন্ত তারা রাখলে না। দ্বিধাদুর্ব্বল অপরাপর শক্তির আকস্মিক বিহ্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগটুকু নিয়ে সে আজ তার হারানো উপনিবেশগুলি পুনর্ব্বার দাবী করছে। তারপর চেয়ে দেখুন—আমাদের এসিয়া মহাদেশে প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পর সে কি হানাহানি! প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল সদ্যজাগ্রত চীনের প্রতি য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য জাপানের অভিযান! উদয়শঙ্করের রুদ্রতাণ্ডব নানকিং-এ মূর্ত্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোন বকধার্ম্মিকের কিন্তু সে দিকে চোখ নেই। মাঝখান থেকে বুভুক্ষু জাপান তার অসীম সাম্রাজ্যলিপ্সা—অবাধে চরিতার্থ করবার অবসর পেয়ে মনে মনে হাসছে। বিচার কি সত্যি আছে?

আমি নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলাম।

তিনি বলিয়া চলিলেন—আধুনিক মানব পশুশক্তির উপাসক। মনুষ্যত্ব বলে যে একটা কথা আছে—আধুনিক অভিধান থেকে তারা সেটাকে বাদ দেবে। এ যুগে অর্থনীতিই একমাত্র নীতি আর সেই নৈতিক সাফল্যের মূলেই এ যুগের সার্থকতার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। জাতি বা ব্যক্তি—সকলেরই টাকা হ'চ্ছে একমাত্র উপাস্য, সমস্ত দুনিয়া টাকা টাকা করে ক্ষেপে উঠেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, জার্ম্মানী, রুশিয়া যেখানেই যান—একমাত্র টাকা ছাড়া দেখবেন কারো কিছু কাম্য নেই যে জাত চাইছে—বাণিজ্যের প্রসার, উপনিবেশ স্থাপন, সৈন্যসজ্জার বৃদ্ধি, একটু ভেবে দেখবেন, একমাত্র অর্থসম্পদ বৃদ্ধি ছাড়া তাদের পরম প্রয়োজন আর বিশেষ কিছু নেই, যা আছে সব—সেকেণ্ডারী ইন্স্ট্যান্স!

তাঁহার উপর শ্রদ্ধা ক্রমশ বাড়িতেছিল। ভদ্রলোক যেন দুরবীণ কষিয়া সমস্ত দুনিয়াটা এবং দুনিয়াবাসীদের অন্তর্নিহিত ভাব সমস্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষার ইন্দ্রজালে তিনি এইবার আমাদের দেশের দুর্দ্দশার জ্বলন্ত কাহিনী বিবৃত করিতে সুরু করিলেন:

খালি এই হতভাগা দেশের হতভাগা লোকগুলোর পরিবর্ত্তন আর দেখলুম না। এঁরা লক্ষ্মীপূজা করে বটে কিন্তু সে পূজা প্রাণহীন, শুধু একটা আনুষ্ঠানিক সমারোহ মাত্র। প্রকৃত লক্ষ্মীর আরাধনা কাকে বলে সে এরা জানে না। কি আশ্চর্য্য, দেশ আর ধর্ম্ম নিয়ে যারা আজ হৈ হৈ করছে—তারা দেশ আর ধর্ম্মের কোন মানেই জানে না।

সবিনয়ে বলিলাম—বিংশ শতাব্দীতে দেশ আর ধর্ম্ম এই দুটো কুসংস্কারই আজ পর্য্যন্ত ভারতে টিকে আছে, এ দুটো গেলেই আর কোন বালাই থাকবে না। তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরাও আমাদের দেশে য়ুরোপ-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করব। তখন এই আনুষ্ঠানিক লক্ষ্মী পূজাই হয়ে উঠবে অলক্ষ্মীর আরাধনা। ভবিষ্যতের সেই অলক্ষ্মী বিদায়ের ঝাঁটা আর কুলো এখন থেকেই জোগাড় করে রাখা হচ্ছে সে ভার অবিশ্যি নিয়েছে বাংলা সাহিত্য। যে দিকে যা ময়লা জমেছিল—নির্ম্মম হাতে ঝাঁটা ধরে সাহিত্যিকরা সড়ক একেবারে সাফ করে রাখছে। এই নয়া সড়ক ধরেই পশ্চিমের চঞ্চলা কমলা বোধ করি পূর্ব্বে একেবারে অচলা হয়ে বসবেন।

তিনি বলিলেন—আশার কথা সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সে খবর আমি সদাসর্ব্বদা রাখতে পারি না—দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতেই অধিকাংশ সময় কেটে যায়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও একটি বস্তুর প্রয়োজন।

দেশবিদেশে সদাসর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ান শুনিয়া আমার শ্রদ্ধা বোধ করি বাড়িয়া গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—আর একটি বস্তু কি? তিনি কিন্তু আমার কথায় কান দিলেন বলিয়া মনে হইল না। আমি মন দিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া চলিলাম—দেখতে পাচ্ছেন না—কি যুগ আমাদের চোখের সামনে এসেছে, এ যুগে ন্যায় আর নীতি বলে কোন কথাই নেই। এ হিটলার-মুসোলিনির যুগ। এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব শীগ্‌গীর সমগ্র মানব সমাজকে বাঁদর নাচ নাচাবে—সমস্ত পৃথিবীব্যেপে তারই একটা আয়োজন চলছে। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র—যা নিয়ে বিরাট মানব-সমাজ, এঁরাই এদের অনাগতবিধাতা। এঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে আর আমাদের কোন উপায় নেই।

এইবার যেন তাঁহাকে অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। তিনি নিশ্চয়ই

একজন অনন্তকর্ম্মা স্বদেশপ্রেমিক এবং এমনও হইতে পারে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি হইতে আসিয়াছেন। বলিলাম—আপনার পরিচয় দয়া করে—

তিনি স্মিতমুখে মৃদু হাস্য করিলেন। তাঁহার শান্ত ও সৌম্য মুখশ্রী স্বর্গীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন—আমার পরিচয়? আমার দেশের হতভাগ্যদের লক্ষ্মীহীন ভাণ্ডারে আমি অচলা কমলার বার্ত্তা প্রচার করে বেড়াই এই আমার পরিচয়। লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব নিয়ে যারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে বেঁচে আছে, মৃতপ্রায় হয়ে যারা দুটি অন্ন খুঁটে খাওয়ার নিষ্ফল চেষ্টায় সমস্ত জীবনটাকে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করছে, আমি তাদের একজন দীন সেবক। তাদের দেওয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা, নির্য্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত আমি মুখ বুজে সহ্য করছি এবং করব, যদি তারা আমায় কোনদিন বুঝতে পারে এই আশায়।

আমার শ্রদ্ধা ক্রমশঃ ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাবল্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আর কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিলে দরবিগলিতধারে চক্ষু হইতে অশ্রু বহিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম; গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলাম—এই যে বলছিলেন একটু আগে—দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও একটি বস্তুর প্রয়োজন, সে বস্তুটি কি?

তিনি তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া অচঞ্চল স্বরে আমায় বলিলেন—সে বস্তুটা লাইফ ইন্সিওরেন্স! বলিয়া একখানি ছোট বই আমার হাতে দিলেন।

বইখানি এক জীবন-বীমা কোম্পানীর প্রস্পেক্টাস।

অচিন ফল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কভু ত আমি দেখিনি হেন ফল,
জানি না বুকে ধরে কি সুধা অথবা হলাহল।
নম্রনত দোদুল শাখা 'পরে
আবেগভরে শুধু নিমেষতরে
অধর কোণে আগুসারিয়া সরিয়া গেল হায়
গন্ধে মোর ভরি নিশাস বায়।

পাড়িব বলি ধরিতে যবে গেনু,
গৃধ্রবাহু বাড়ানু বৃথা নাগাল নাহি পেনু।
চকিতে শাখা ঊর্দ্ধে গেল সরি'
পত্রাবলি উঠিল মর্ম্মরি'
কি যেন তারা কহিল মৃদুভাষে,
চপল সখীদলের মাঝে অচল ফল হাসে।

লভিব তারে করিনু আমি পণ
বিফল হ'ল উদ্বাহু সে বামন-লম্ফন।
সে তরুমূলে রহিনু তদবধি
পাকিয়া ফল আসিয়া পড়ে যদি
অমনি তারে কুড়ায়ে 'লব তুলি,
ব্যর্থতার বহুবেদনা নিমেষে যাব ভুলি।

ঊর্দ্ধমুখে কত না দিবাযামী,
রহিনু চাহি তৃষিত আঁখি, এল না সে ত নামি
আসিল পাখী বসিল আবডালে
চঞ্চুপুট ফুটাল সে রুমালে
অচিরে তারে করিল সর্ব্বগ্রাস,
হেরিনু হায় আপন চোখে এমন সর্ব্বনাশ।

তৃপ্ত-সুখে উড়িয়া গেল পাখী
কপালে মোর ছিল না লিখা কেবলমাত্র ফাঁকি।
ক্ষুদ্র আঁঠি পড়িল ভূমি 'পরে
কুড়ায়ে তারে লভিনু নিজকরে
ভাবিনু মনে, শুষ্ক বুক চিরি
রোপিব তারে বৃক্ষাকারে পাব তাহারে ফিরি।

সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি

শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী

সোভিয়েট রুশিয়ার গোড়ার কথা হচ্ছে—উৎপন্ন দ্রব্য থেকে প্রয়োজন মিটাতে হবে, তা থেকে লাভ করা চল্‌বে না। প্রত্যেককেই খাটতে হবে শক্তির অনুপাতে, আর মূল্য পেতে হবে চাহিদার মাপ মত। এ মূলমন্ত্রটিকেই অনুসরণ ক'রে কম্যুনিষ্টরা গড়ে তুলেছে একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—সমগ্র জাতির কাজ আর পাওনা দু'টারই জোগান দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে যার হাতে। কৃষক আর শ্রমিকদের কাছ থেকে যে ওরা নিংড়ে যদ্দূর সম্ভব লাভ বের করে নিতে একটুও কার্পণ্য করে না তাতে কোন ভুল নেই; এ বিষয়ে নিকারবোকার হিসাব করেছেন—উৎপন্ন শস্য থেকে গভর্ণমেণ্টের লাভ দাঁড়ায় শতকরা এক হাজার, তবে সে লাভের সবটাকেই আবার তাদের কাজেই লাগানো হয়। ব্যক্তিগত লাভ ব'লে কিছুই থাকে না, কম্যুনিষ্টদের মতে যা দেশের স্বার্থ তাকেই শুধু মেনে নেওয়া হয় লাভের মাপকাঠি ব'লে। ওরা পারিশ্রমিক পায় নামমাত্র হারে, সে খুবই সামান্য। কম্যুনিষ্টদলের বাইরে থেকে যে-সব বিশেষজ্ঞের কাজে লাগানো হয়, তাদের ভাতার তুলনায় কম্যুনিষ্টদের ভাতা সাধারণত খুবই কম! থিওরিটা এই: উৎপাদনের সবটুকু ফল একত্র করে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। রাজনীতির দিক দিয়ে গণতন্ত্রের কোঠা একেবারেই শূন্য, তবে ধনবিজ্ঞানের দিক থেকে—অন্তত থিওরি হিসাবে—গণতন্ত্রকে পূর্ণতাই দেওয়া হয়েছে।

এ প্রণালীকে কাজে লাগাতে গিয়ে, আর বাস্তবতার ক্ষেত্রে যে-সব অদল-বদল সাময়িকভাবে মেনে নিতে হয়েছে সেগুলোর জন্যেও এমন অনেক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাদের কতকগুলো সত্যিসত্যিই পরস্পর-বিরোধী, বাকীগুলো শুধু উপরি উপরি দেখতে গেলে তাই বলেই মনে হয়। এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ সকল বিরোধ খুঁজে বের করার কাজে বাজোর লোকদের উৎসাহের অভাব নেই।

নজির ধরে বলা যেতে পারে—সোভিয়েট নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে, যদিও এ ব্যাপারে আইনের কিছুটা কড়াকড়ি আছে—মানে, মৃতের সঙ্গে সোজাসুজি বংশগত সম্পর্ক, বা পোষ্যগ্রহণের সম্পর্ক থাকলেই শুধু উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা থাকবে। যাদের বয়স আঠারোর নীচে তাদের উত্তরাধিকারে আইনের কোন বাধা সেখানে নেই। কেউ উইল ক'রে ষ্টেটকে তার সম্পত্তি দান ক'রে যেতে পারে—যদি সে রকম ইচ্ছা তার থাকে, তবে তা বড় একটা হয় না।

একটা কথা হয়ত অনেকেই জানেন না; আইনের মারপ্যাঁচ থাকলেও ঘরবাড়ীর সম্পত্তি সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত হতে পারে। শহরের ছোট ছোট বাড়ী কিম্বা গ্রামের বড় বড় বাড়ীও (ড্যাচা) বিক্রি করা চলে, আর তা কিনে নেওয়ার পর ক্রেতাই তার সম্পূর্ণ ও একমাত্র মালিক। তবে এতে একটা সর্ত্ত এই, কারুরই একখানার বেশী বাড়ী রাখা চলবে না। জমির ব্যক্তিগত অধিকার নেই। সোভিয়েট গণতন্ত্রের এলাকায় যা-কিছু জমি সবই জাতিগত বা রাষ্ট্রের দখলে।

যৌথ বাড়ীর অংশবিশেষ সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে কিনে নেওয়া চলতে পারে; কিন্তু সে সম্পত্তি থেকে আইনের জোরে তাকে বিচ্যুত করা হয়, যদি সে—ব্যার্নেসের ভাষায় বলতে গেলে—'আইনগত কোন অপরাধ ক'রে ফেলে, এমন কোন ব্যক্তিগত ব্যবসাতে লিপ্ত হয় যা বে-আইনী, কিম্বা হারজিতের কাজ অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে যোগ দেয়।' কখনও কখনও শুধু ঘর-বাড়ী তৈরী করার উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জমি ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা কালে ভদ্রেই হয়।

লাইব্রেরী বা শিল্প-সংগ্রহ কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে রেজেষ্ট্রী করিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে-কেউ, সাধ্য হ'লে, মোটর গাড়ী কিনে নিতে পারে; বোট, লঞ্চ বা ষ্টীমারেরও মালিক হওয়া চলে। এরোপ্লেন কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহারেও বাধা-নিষেধ কিছুই নেই, তবে কোন সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে—

অবিশ্যি সরকারী লোক না হলে—বাস্তবে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত পৌছানো কখনও হয়েই ওঠে না।

যে-কোন সোভিয়েটের নিজের অধীনে লোক খাটাবার অধিকার রয়েছে। ঘর-সংসারের কাজের জন্য কিম্বা কারু একার জন্ত চাকর-বাকর রাখা চলে। এমন কি নিজের ইচ্ছামত কোন পেশাদারের পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ করাও অচল নয়—যেমন কোন-এক অঞ্চলের চর্ম্মকার তার কাজের জন্তে একজন সহকারী রাখতে পারে—কিন্তু তা'তে লোক-লাভের সম্ভাবনা অনেক। এ রকম ব্যবস্থাতে কাজ করে দু'পয়সা ঘরে আনা কখনও ঘটে না। ডাক্তার, আইনজীবী কিম্বা তেমনতর পেশা যাদের, তারা যদি সরকারী চাকুরে না হ'ন, তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করতে পারেন।

ভাতা সম্পর্কে—অন্তত আইনের দিক থেকে—কোন সীমারেখাই টেনে দেওয়া হয়নি, টাকা কড়ি জমিযে রাখার দিকেও কোন অঙ্কের নির্দ্দেশ নেই। তবে রাষ্ট্রের দলিল ছাড়া অন্য কোন উপায়ে টাকা খাটাবার পথ বন্ধ। এ-সব দলিলে রাষ্ট্রকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাতে সুদ পাওয়া যায়—যেমন ধনিকদের দেশে পাওয়া যেতে পারে; আর সে সুদের হারও বেশ ভালই—শতকরা আট টাকা। সেভিং ব্যাঙ্কের কারবারে রাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম পক্ষে চার কোটি ত্রিশ লক্ষ লোক সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিল, তারা শতকরা আট থেকে দশ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পেয়েছিল।

সব চাইতে বড় কথা—আয়ের দিক দিয়ে পার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগ থেকে গেছে। 'সোভ্কিনোর এক সিনেমা কোম্পানীতে দরোয়ান মাসে প্রায় দেড়শত রুবল পায়, প্রধান অভিনেতা পনরশ রুবল পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে। কারখানাগুলোতে বেশী কাজ করাবার জন্তে কাজের অনুপাতে মাইনে দেবার নিয়ম আছে। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যথেষ্ট টাকা রোজগার করতে পারেন, কিন্তু সে টাকা শুধু রুশিয়ার ভাণ্ডারেই থেকে যায়। কারণ ব্যাঙ্ক-নোটগুলোকে তাঁরা নিজেদের কাজে লাগাবার কোন সুবিধাই পেয়ে ওঠেন না। ভ্যাসিলি ভি, স্ভার্কিন বলে একজন নাট্যকার মধ্যবিত্ত লোকদের উপযোগী করে য়্যোনাদার ম্যানস্ চাইল্ড' নামে এক মিলনান্ত নাটক লিখেছিলেন। এ নাটকখানিতে সবগুলো দেশ এমনি মেতে উঠেছিল যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এ থেকে নাট্যকার রয়্যাল্টি পেয়েছিলেন—দুইলক্ষ রুবল। হাস্য-রসের পত্রিকা ওগানকের সম্পাদক মাইকেল কোলজফ মাসে ত্রিশ হাজার রুবল রোজগার করে নামজাদা হযেছেন। রুশিয়ার সেরা সংবাদ-পত্র 'ইজভেস্তিয়া'তে ক্রমিক লেখার জন্য লেখককে দেওয়া হয় পাঁচশত রুবল।

অবিশ্যি মনে রাখতে হবে, এ-সব আয় এ পর্য্যন্ত খুব কম লোকেরই হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে আয়ের পরিমাণ ব্যক্তি-বিশেষে তফাৎ হতে পারে বটে, তবু—ফিশার (Fisher) দেখিয়েছেন—তাতে এমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয় না—যেমন বৃটেন বা আমেরিকাতে কারখানার মালিক আর কেরাণীর মধ্যে দেখা যায়। রুশিয়ার ১৬৫০ লক্ষ লোকের ভিতর হয়ত বা দশজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের আয় বছরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড হতে পারে।

আরও মনে রাখতে হবে—এ সামাজিক অসাম্যের মূলে দুটি বড় কার্য্য রয়েছে: প্রথম—সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপাদনের উপাযগুলোর উপর ব্যক্তির কোন হাত নেই। টাকা জমিয়ে রাখা বা হস্তান্তর করা চলতে পারে, কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলো সম্পর্কে তা চল্‌বে না।

দ্বিতীয়—সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমকে ব্যক্তির লাভে ব্যবহার করা চল্‌বে না। দলিলের উপর সুদ পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সুদকে শ্রমের ব্যক্তিগত মূল্য বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে।

এ-সব রক্ষা-কবচের মূল্য অনেক। আর এগুলো আছে বলেই বিরোধগুলোর জন্তে ষ্টালিনের মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই। জনগণের খুবই অল্পসংখ্যার উপর ও-গুলোর প্রভাব। তা ছাড়া, এ বিরোধগুলো ইচ্ছা ক'রেই সৃষ্টি করা হয়েছে উৎপাদন বাড়িয়ে দেবার জন্তে।



সেকালের উৎসব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

প্রবন্ধ

বাংলার উৎসবগুলির মূল্য অপরিসীম। উৎসবগুলির ভিতর দিয়া বাঙ্গালী নরনারী অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে ও অশেষ শিক্ষালাভ করে। এই উৎসবগুলি মিলনক্ষেত্র। এখানে হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, পণ্ডিত-মূর্খ প্রভৃতি ভেদাভেদ নাই। প্রত্যেকেই উৎসবগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশে যোগদান করিতে পারে। উৎসবসমূহ সাহিত্য, শিল্প ও নৃত্যের আলোচনা কেন্দ্র। বাংলার সংস্কৃতিধারাগুলির মধ্যে উৎসবগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। প্রাচীন উৎসবগুলির মধ্যে দোল, মহরম, দুর্গোৎসব ও বিবাহোৎসব অন্যতম।

বিবাহোৎসব সম্পূর্ণ সার্ব্বজনীন। যে পরিবারে বিবাহ, উৎসবটী শুধু সেই পরিবারে সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র প্রদেশটী লইয়া ইহার ঘটা পড়িয়া যায়। এই উৎসবে আত্মীয়-স্বজন, এমন কি ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা, কুমার, কামার, কলু, মালি, মালাকর, বাস্তকর নিমন্ত্রিত হয় এবং প্রত্যেকেই ইহাতে যোগদান করিয়া উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করে ও ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বর-কন্যার সজ্জা, বরযাত্রীর অভ্যর্থনা, নিমন্ত্রিতের আহার বাস, নৃত্য-গীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য চারিদিকে একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া যায়। উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নারীই বেশী অংশ গ্রহণ করে। নারী সমস্ত গৃহটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সিন্দুর ও গিরিমাটির সাহায্যে দেওয়ালে নানা প্রকার ফুল-লতা, লক্ষ্মীর পা, শিবের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে বিচিত্র করে। বর ও কন্যার বসিবার পিঁড়িতে পদ্ম-আলিপনা অঙ্কিত হয়। ছায়ামণ্ডপের চারি কোণের কলার গাছগুলি বিভিন্ন ফুল ও লতার সজ্জায় অপূর্ব্ব রূপ গ্রহণ করে। আলিপনায় সিদ্ধহস্ত নারী ছায়ামণ্ডপে পদ্মচাকী আলিপনার চিত্র আঁকে। খুকুমণির বরের জন্য জননী দশ-বার বৎসরে বহু আদর ও স্নেহ দিয়া যে কাঁথাখানি সেলাই করেন তাহা তিনি বরকে দান করেন। এত আদরের, এত স্নেহের জিনিষ রাজা বা মহারাজাও পান না। অনেক নারী বর-কন্যার আনন্দোৎসাহের জন্য নৃত-গীতের চর্চ্চা করে। মালাকর বরকন্যার জন্য কত বিচিত্র রংএর সমাবেশে ফুলের মুকুট রচনা করে। শুভ মুহূর্ত্তে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে, নারীর হুলুধ্বনিতে, আত্মীয়-স্বজনের আশীর্ব্বাদে নৃত্য-বাদ্য-গীতের ভিতর বর-কন্যার পূতমিলন সম্পন্ন হয়। বরকন্যার মিলনোৎসব রাজারাণীর রাজ্যাভিষেকের মতই।

বাংলার দুর্গাপূজা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় উৎসব। বর্ষার মেঘ-গর্জ্জনে ও বর্ষণে জনগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কৃষক-কুটীরে শ্রমের ভিড় পড়িয়া যায়। কৃষক ভূমি কর্ষণ, ধান্য রোপণ, ধান্য ছেদন, পাট কর্ত্তন প্রভৃতি পরিশ্রমের ভিতর ডুবিয়া যায়। কৃষক মাঠে শ্রমের মধ্যে গান ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের আনন্দোপভোগ ছাড়া অবকাশ পায় না। খোলা হাওয়া ও মুক্ত রবি-কিরণ লইয়া শরৎ যখন পৃথিবীতে আসে, তখন বন্যার প্রকোপ হ্রাস পায়। তখন কৃষককুটীরেও ক্রমশ আনন্দের আলোকপাত হয়।

এই শারদীয় দুর্গোৎসব। শারদীয়ার আগমনে বাংলার আকাশ-বাতাস, নদী-স্থল আনন্দে আত্মহারা। যখনই ধরায় শারদীয়ার আবাহন আসে, তখনই চারিদিকে কার্য্যের সাড়া পড়িয়া যায়। মৃৎ-শিল্পীর ভবনে আনন্দময়ী শারদীয়ার মূর্ত্তি গড়িবার প্রচেষ্টা চলে। শারদীয়ার আগমনী প্রচারের জন্য ঢাকী বাদ্যচর্চ্চা আরম্ভ করে। জননীর মঙ্গলার্চ্চনার জন্য পুরোহিতগৃহে চণ্ডীপাঠের ওঙ্কারধ্বনি বাজিয়া উঠে। দেবীর অভ্যর্থনা জন্য কৃষক বাঁশফুল, আলোভোগের চাউল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জারি, মনসামঙ্গল, লক্ষ্মী, কবির গানের আখড়ায় প্রতিদিন সঙ্গীত পালা আলোচিত হয়। আখড়ায় আখড়ায় লাঠি, ছোরা, কুস্তিতে শরীরচর্চ্চা চলে। নদীতে নদীতে নৌকার বাইচ খেলা চলে। ব্যবসায়ী নিত্য নূতন জিনিষের আমদানী করে। মালী ফুলের বাগানে সুন্দর ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করে। নারী তাহার গৃহখানি সাজাইবার উদ্দেশ্যে আলিপনা ও চিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত। চতুর্দ্দিকে শুধু নূতন বস্ত্র, নূতন আহার্য্য, পরিবারের আত্মীয়বন্ধুর শুভাগমন—পূর্ণ মিলন। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। উৎসবের নির্দ্দিষ্ট তিন দিনের জন্য সবাই প্রতীক্ষায়। ঐ তিন দিনের জন্যই চারিদিকে এত প্রতিযোগিতা। কে কত ভাল বাজাইতে পারে, কে গান গাইতে পারে, কে ভাল কুস্তি বা লাঠি খেলা দেখাইতে পারে। কে ভাল বাইচ করিতে পারে, কোন্ শিল্পীর প্রতিমা শ্রেষ্ঠ—এইগুলি লইয়া একটি তুমুল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

জননীর আগমনে কোনও বিচার নাই—সবাই সমান। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলেই প্রতিমা দর্শন করে ও দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে। সকলেই গীত, নৃত্য, বাদ্য, বাইচ, খেলাধূলায় যোগদান করে। এত সার্ব্বজনীন এই দুর্গোৎসব।

এই দুর্গোৎসব অসীম আনন্দময়। আজ আর কি সেদিন আছে? আজ শিক্ষিতসম্প্রদায় পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছে। শিক্ষিত পল্লীকে আর শ্রদ্ধা বা সম্মান করে না। পল্লীতে তাই অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনগণ নিরুৎসাহ হইয়া বাস করে। পল্লী আজ ধ্বংসের মুখে। সাথে সাথে উৎসব, শিল্প, সাহিত্য বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিষে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী জর্জ্জরিত। হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে বিরোধ—উন্নত-অনুন্নত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য। বাংলায় পল্লীর নিরক্ষর লোক এইগুলির খোঁজও রাখে না। আজও মুসলমান হিন্দুর উৎসবে যোগদান করে, হিন্দুও মুসলমানের উৎসবে যোগদান করে। পল্লীতে এইগুলির দৃষ্টান্ত আজও প্রতি উৎসবেই মিলিবে।

বাংলার উৎসবগুলি ছিল বড় বড় প্রদর্শনী। এইগুলিকে উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য ও বাদ্যের রীতিমত আলোচনা হইত। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এইগুলিতে যোগদান করিয়া বাঙ্গালী অনাবিল আনন্দলাভ করিয়াছে এবং সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালীকে যদি বাংলার নিজস্ব সম্পদ্ লইয়া বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে বাংলার উৎসবগুলিকে প্রাচীনভাবেই রক্ষা করিতে হইবে।

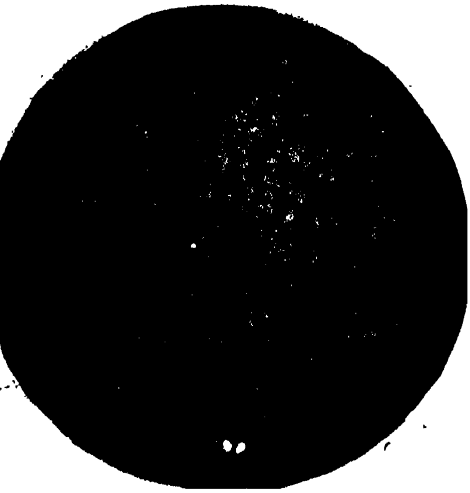
ডাকঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

(১)

মিশর

মানব সভ্যতার আদি জন্মভূমি এই মিশর। এতৎ কারণে অনুমান হয় যে ডাকবিভাগের আদি উৎসও এই দেশে এবং বিভিন্ন হরকরা দ্বারা দূর প্রদেশে সংবাদ প্রেরণের যে ধারা তাহা এই উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়া ফিনিসিয়া, অ্যাসেরিয়া প্রভৃতি দেশকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, "১৬২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বে ফ্যারাও রাজাদের সময় মিশর দেশে যথেষ্ট পত্রের আদান-



খৃঃ পূঃ ২১০৯ অব্দে এই মৃৎফলকের পত্রখানি লিখিত। আজও কেহ ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মধ্যস্থান হইতে ইহার পাঠ আরম্ভ হইবে

প্রদান ছিল।" 'হিষ্ট্রী অফ্ দি ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রেস'-এ আছে, যে, মিশরের মন্দির-গাত্রে যে সকল পত্রবাহী পারাবতের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২৯৭ অব্দ বা তাহারও কিছু পূর্ব্বে খচিত। পত্র-প্রেরণের এই যে ধারণা, এই যে কৌশল ইহা নিশ্চয় মানবের মনে একদিনে জাগিয়া ওঠে নাই। ইহার পশ্চাতে অনেকখানি চিন্তা ও চেষ্টা এবং একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বর্ত্তমান আছে। এতদ্‌ব্যতীত ডক্টর আর, পি, গ্রীনফল্ এবং ডক্টর হাণ্ট অক্সিরেঞ্চাসের পাপিরী সকলের মধ্য হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়াছেন, সেখানি ২৭০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে নাইল উপত্যকার মধ্যস্থিত কোন একটি ডাকঘরে পত্রাদি রেজিষ্ট্রি করার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে হরকরা পৌছানর সময় ও তারিখ, মোড়কের সংখ্যা, যে যে ব্যক্তির নিকট পত্র পৌছাইতে হইবে তাহাদিগের নাম ও ঠিকানা এবং পত্র-বাহীর নাম লিখিত আছে। ইহা আরও স্পষ্টই প্রমাণিত করিতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগে ডাকঘরের কার্য্য-বিষয়ে মিশরবাসীরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে মিশরবাসীদের সহিত ভারতবাসী হিন্দুদিগের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান চলিত।" মিশরের ইতিহাসে আছে, সুলতান নাসিরউদ্দীন যিনি ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন, তিনি তাঁহার রাজ্যকালে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ করিতেন। অতঃপর ১২৬০ খৃষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তা মামিলুকা ডাকের বহুল প্রচার ও উন্নতিসাধন করেন।

ব্যাবিলন

ব্যাবিলনে ২০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে হামুরাবীর রাজ্যকালে যে ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। টেল্-এল-আমর্নার মৃতফলক ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। এই দেশের অধিবাসীরা মিশরবাসীদিগের ন্যায় কাগজ ব্যবহার জানিত না। এই কারণে তাহারা ছোট ছোট সমচতুষ্কোণ ইষ্টকখণ্ডের উপর কাঁচা মাটির অক্ষর সাজাইয়া তাহা পোড়াইয়া লইত; অতঃপর মাটির খামে ঐ ভাবে ঠিকানা লিখিয়া তন্মধ্যে উক্ত পত্র বন্ধ করিয়া পাঠাইত। ১৩৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বে লিখিত ঐরূপ কতক-গুলি পত্র টেল্-এল্-আমর্নায় আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে

অধিকাংশই বৃটিশ মিউজিয়ম ও বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। য়্যাসেরিয়া, মিটানি, সাইপ্রাস, হিটাইট, ফিনিসিয়া এবং কেনান ইত্যাদি দেশের সহিত ইহাদের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান ছিল, এই পত্রগুলি হইতে তাহা জানা যায়। ডাকবাহীরা ভারবাহী পশুর সাহায্যে ঐ সকল পত্র লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এই দেশের স্ত্রী-পুরুষ উভয়পক্ষই পত্র লিখিতে জানিত। প্রবাসী পুত্র পিতামাতার সহিত, স্বামী স্ত্রীর সহিত, বণিক মহাজনদিগের সহিত, শাসনকর্ত্তারা সম্রাটের সহিত—এইভাবে নিত্য শত শত পত্র আদান-প্রদান করিতেন। আবার ইহার মধ্যে কোন বিশেষ পর্ব্বদিন উপস্থিত হইলে, সেদিন শুভ-সম্ভাষণ জানাইয়া লোকে এত পত্র আদান-প্রদান করিত যে, বস্তা মাথায় ডাক-হরকরাদিগের ভিড়ে রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইন হইতে যোশেফ যখন মিশরে যান, সে সময় (১৬৮১ খৃষ্ট-পূর্ব্ব) প্যালেষ্টাইনে পত্র আদান-প্রদান ছিল। অতঃপর ১০১৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বে সোলেমান যখন এই দেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই সময় এই দেশে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণের রীতি প্রচলিত হয়।

ফিনিসিয়া

ফিনিসিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৯৭৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বে হারণ যখন ঐ দেশের সিংহাসন লাভ করেন সেই সময় তদানিন্তন অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত ইহাদের যথেষ্ট পত্রের আদান-প্রদান ছিল।

কার্থেজ

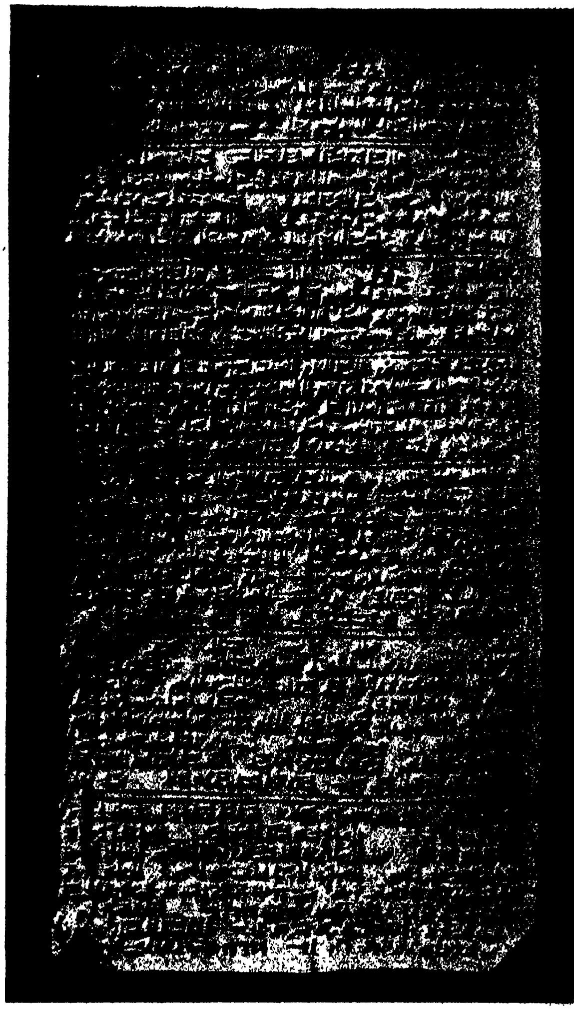
কার্থেজেও বহু প্রাচীনকাল হইতে পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ২২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সময় হিন্দুদিগের সহিতও ইহাদের পত্র আদান-প্রদান ছিল।

আরব

খলিফা মোজা নামক জনৈক ব্যক্তি মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় ৪০ বৎসর পর আরবে সর্ব্বপ্রথম ঘোড়ার ডাকস্থাপন করেন।

বোগদাদ

কোদামা নামে বোগদাদের একজন অধিবাসী যিনি ৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান, তিনি তাঁহার 'বুক অফ দি টেক্সাস'-এ লিখিয়াছেন যে, সে সময় বোগদাদে সর্ব্বসমেত ৯৩০টা ডাকঘর ছিল। বোগদাদ হইতে যে ছয়টি রাজপথ বাহিরে



খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে মিশর রাজ তৃতীয় এমেন হোটেলের নিকট মিটাণী রাজ এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন

গিয়াছে, তাহার উপরে ঐ সকল ডাকঘর স্থাপিত। এই রাজপথগুলির মধ্যে যেটি পারস্য অভিমুখে গিয়াছে এই পথে হরকরারা পত্র বহন করে; সিরিয়া এবং আরবের পথে উটের ডাকে পত্রাদি প্রেরিত হয়; অপরাপর পথগুলিতে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাক অধ্যক্ষ মহাশয়ের

"নওয়াকুইয়াম" এবং যাঁহারা শহরস্থ ডাকঘরগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন তাঁহারা "করওয়ান কুইয়াম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তদানিন্তন ডাকঘরগুলির মধ্য দিয়া যে সকল পত্রের আদান-প্রদান হইত তাহা অতি-আধুনিক কালের ন্যায় রেজিষ্ট্রী করার রীতি ছিল।



খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে লিখিত দুইখানি পার্চমেন্ট পত্র

পারস্য

জোনারস লিখিয়াছেন, ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে পারস্য দেশে পরস্পর পত্র আদান ছিল। হেরডেটাস ও জনফন্ পাঠে জানা যায় যে, ৫৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বে সম্রাট কুরুষ পারস্য দেশের রাজধানী এবং দূরস্থ শহরগুলির মধ্যে রাজকীয় পত্রাদি আদান-প্রদানের জন্য প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপর স্থানে স্থানে হরকরা এবং ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন এবং দরায়ুস ও জারেক্স-এর রাজ্যকালে ইহার বহুল প্রচার ও উন্নতিসাধন করেন। মেকিদন্ অধিপতি পারস্যরাজ সময়ও ডাক স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র ডক্টর আর-পি-গ্রীণফল ও ডক্টর হাণ্ট, অক্সিরেঙ্কাসের প্যাপীরিসকলের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পত্রের একখানি অদ্যাপি বার্লিন ডাকবিভাগের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

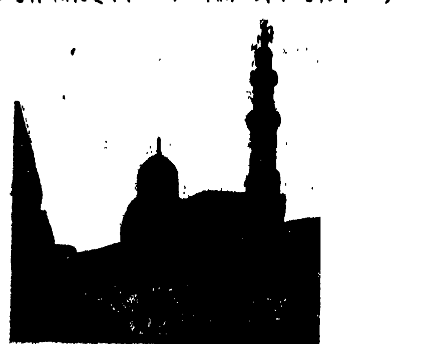
৬৫

বৃহত্তর ভারত

ইন্দোনেসিয়া, ইন্দোচীন, সেরিন্দিয়া এবং ইণ্ডিয়া-মাইনর এই কয়টি দেশ লইয়া বৃহত্তর ভারত। ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তাধারা ইহাদিগের মধ্যেও সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে মনে হয়, এই সকল রাজ্যের অধিবাসীরাও প্রাচীনকাল হইতেই পত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং প্রথম হইতেই এ বিষয়, ঘোড়া, উট, খচ্চর অথবা গাধা এবং নৌকার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, সেই যানবিহীন দিনে সুদূর ভারতবাসীদিগের সহিত সভ্যতা স্থাপনও বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষা করা তাহাদিগের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হইত না।

মহা চীন

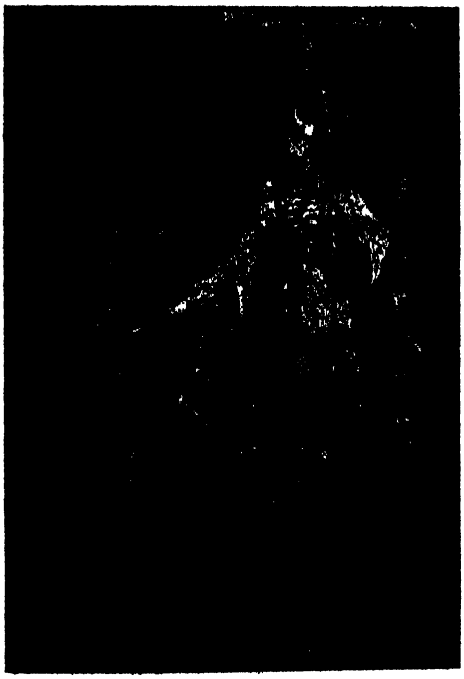
বিভিন্ন হরকরাদ্বারা পত্র প্রেরণের যে ধারণা, অনেকের অনুমান যে চীন দেশেই তাহার সূচনা। কিন্তু চীন দেশের ইতিহাসে আমরা ইহার কোন সন্ধান পাই নাই। তবে বহুপ্রাচীনকালে লিখিত কয়েকখানি চীনআগত পত্র যাহা আজিও ভারতের ২১১ প্রাচীন মন্দিরাদিতে রক্ষিত আছে, তাহা হইতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে সে যুগে চীন দেশেও পত্র ব্যবহার চলিত এবং মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলির ন্যায় ইহারাও ভারতের সহিত আদান-প্রদান রাখিয়াছিল। সে যাহা হউক, নবম শতাব্দীতে এ দেশে যে ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। সোলেমন এবং আবু জায়াদ হোসেন নামক দুইজন আরব তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, চীন সম্রাট্ প্রদেশস্থ শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যথেষ্ট পত্রের আদন-প্রদান রাখিয়া থাকেন। পত্রবাহীরা ছোট ছোট ল্যাজবিশিষ্ট খচ্চরের পৃষ্ঠে ঐ সকল পত্রভার চাপাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অতঃপর ভেনিস দেশীয় পর্য্যটক্ মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, ১২৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন চীন ভ্রমণে যান সে সময় উক্ত রাজ্য মধ্যে বেশ উন্নত প্রথায় এবং বিস্তৃত ভাবে ডাক বিভাগের কার্য্য চলিতে দেখিয়াছেন। ঐ সময় চীন দেশে ১০,০০০



মিশর দেশের একটি ডাকঘর, আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা বর্ত্তমান ছিল। সম্মুখে কায়রোর বিখ্যাত মসজিদ

ডাকঘর এবং প্রতি ডাকঘরে দুইটি হিসাবে সর্ব্বসমেত প্রায় ২০,০০০ যোড়া ডাক হরকরা নিযুক্ত ছিল। আরবকের

একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া অপরের পৃষ্ঠে পত্রাদির ভার চাপাইয়া পাশাপাশি দুইটি ঘোড়া লইয়া যাত্রা করিত। পথিমধ্যে যে সকল ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সকল স্থানে ঘোড়া বদল করিয়া হরকরারা এইভাবে দিন প্রায় দুই-তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চলিত। ইহাতে খুব শীঘ্রই গন্তব্য স্থানগুলিতে পত্র পৌছাইবার সুবিধা হইয়াছিল। এইভাবে ডাকবহনের রীতি এখনও চীন দেশে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে একজন বাহক ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লাসায় পৌছাইয়াছিল, পণ্ডিত নাইন সিং এই দূতটিকে দেখিয়াছিলেন।



খৃঃ পূঃ ১১০ অব্দে ইস্রাইল রাজ দায়ুদ যেকবের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিতেছেন

মেক্সিকো

মেক্সিকো দেশের অধিবাসী এজেক্টসরাও পত্র আদান-প্রদান করিত। তবে তাহারা আধুনিক বর্ণমালার সহিত পরিচিত না থাকায়, ছবি আঁকিয়া নিজদিগের মনোভাব পত্র মধ্যে প্রকাশ করিত। এই দেশের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপর সর্ব্বত্র প্রায় ৬ মাইল অন্তর ডাকঘর এবং তন্মধ্যে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাত বদল করিয়া পত্র বহনের যে রীতি তাহাও ইহাদিগের জানা ছিল। ইহারা দিন প্রায় ১০০ মাইল পথ চলিয়া রাজধানী হইতে দূর নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তেও পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইত।

পেরু

পেরু দেশের অধিবাসীরাও বহুপ্রাচীন কাল হইতে সংবাদ আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই দেশে ডাক-পথের আয়তন মেক্সিকো হইতে আরও অনেক বিস্তৃত। রাজধানী হইতে যে কয়টি রাজপথ উঠিয়াছে সেই সকলের উপর সর্ব্বত্র ৫ মাইল অন্তর ডাকঘর নির্ম্মিত ছিল এবং তাহার প্রত্যেকটাতেই হরকরা নিযুক্ত ছিল। এই হরকরাগণ



মধ্যযুগের প্রথমভাগে ডাক হরকরা মারফত এইভাবে পত্র প্রেরণ করা হইত

খুব শীঘ্রগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হাত বদল করিয়া পত্র বহন রীতি ইহাদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এইভাবে ডাক বহন করিয়া এই হরকরারা দিন প্রায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চলিত। পেরুভিয়ানারও লিখিতে পড়িতে জানিত না, তবে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল, যাহা কোন একটি লম্বা দড়ির স্থানে স্থানে নানারূপ গ্রন্থিদ্বারা জানান চলিত। ইহারা সেই কারণে দড়িতে ঐ ভাবে গ্রন্থী দিয়া তাহাই পত্র স্বরূপ পাঠাইয়া দিত।

গ্রীস

গ্রীসের ইতিহাসে আছে পূর্ব্বে স্পার্টানরা লিখিতে পড়িতে জানিত না, তবে তাহারা খুব মেধাবী ছিল। সে সময় তাহাদের কোন সংবাদাদি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতে হইলে তাহারা দূত নিযুক্ত করিত। দূতেরা খুব দ্রুতগতিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রচার করিয়া ফিরিয়া আসিত। অতঃপর মেসিদন উত্তরাধিকারী পারস্য-রাজদিগের সময় পত্রাদি প্রেরণের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার ডাক এবং হরকরা স্থাপিত হয়।

রোম

রোম সাম্রাজ্যের কালে সম্রাট অগাষ্টস (৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্ব) রাজকীয় পত্রাদি বহনের জন্য স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রধান প্রধান পথগুলির উপর ডাকঘর নির্ম্মাণ করাইয়া সর্ব্বত্র ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমে জনসাধারণে ইহার দ্বারা পত্র প্রেরণের কোন সুবিধা পায় নাই। সেই কারণে রাজ্যের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই আপন আপন পত্র বহন জন্য হরকরা নিযুক্ত রাখিতে হইত। রাজকীয় ডাক বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সাধারণের পত্র প্রেরণে এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া সদাশয় হাডরিন রাজকীয় ডাক বিভাগের দ্বার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ডাকবিভাগের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুল উন্নতি সাধিত করেন। পেনিজ, গল, কেণ্ট প্রভৃতি ইউরোপী প্রাচীন জাতিগণও এই ডাকবিভাগের সাহায্য পাইয়াছিলেন রোমকদিগের পত্র প্রেরণে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহা মিশরবাসীদিগের ন্যায় প্যাপিরী কাগজে পত্র লিখি প্রেরণের পূর্ব্বে তাহা সুগন্ধিত করিয়া অতঃপর তাহা রেশমে সুতায় বাঁধিয়া ঐ সুতার দুই মুখ শীলমোহর করিয়া দিত ভারতে সিন্ধুনদীর তীরে যে শীলমোহরগুলি পাওয়া গিয়া তাহাও বোধ হয় রোমকদিগের ন্যায় পত্রাদিতে ঐরূপ শীলমোহর করিতে কাজে লাগিত। ভূতত্ত্ববিদ ও প্রাগ্-ইতিহাসক পণ্ডিতগণ যে এরূপ অনুমান না করিয়াছেন তাহা নয়; ত সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অভাব।

কুসুম-কাব্য

(কাল্পনিক)

শ্রীরামেন্দু দত্ত

চিনিতে পারো নি ?—এ যে আজ সুধু শুকানো ফুলেরই দল
সজীব রাখিতে পারেনি ইহারে আমার আঁখির জল !
জীর্ণ এ ফুল নাহিক গন্ধ, বর্ণ-সুষমা নাহি
শুকানো ফুলেরও স্বরূপ হারালো আঁখিনীরে অবগাহি' !
চিনিতে যাহারে পারো নি তাহারে সারাটি জীবন ধরি'
আমি মনে মনে পূজিব যতনে বুকের রতন করি'—

* * * * * *

বহু দিন আগে, মনে কি পড়িবে, তোমার কবরী 'পরে
গোলাপের ফুল লাল টুল্ টুল্ গালটির শোভা ধরে—
ভুল করেছিনু ফুলটিকে তব গোলাপী অধর ব'লে
তুমি, "এই নাও রাণীরে তোমার"—ব'লে দিয়ে গেলে চ'লে।
আসল রাণীরে পেলাম না আর ; রাণীর খোঁপার ফুলে
আমার রাণীর মতনই যতনে বক্ষে রেখেছি তুলে !

কভু নিরজনে বসি' একমনে এরই মুখপানে চেয়ে
দেখি মৃদু মৃদু হাসিছে একটি পরীর মতন মেয়ে—
কভু দুরন্ত ঝড়ের নিশীথে পাতার কুটীর কাঁপে,
বসন্ত নিশা হারাইয়া দিশা মুরছায় অভিশাপে,
সে আঁধার মথি' তোমার মুরতি উপজে লক্ষ্মী সম !
অশ্রু-সরসী আরসিতে ভাসে শুকানো কুসুম মম !
কভু এই ধরা ধরিলে সাহারা মরুর মুরতি হায়
তব-দেওয়া-ফুলে দেখি, আর সব শ্যামল হইয়া যায় !
এই কুসুমের সুষমা-সুবাস কোথায় গিয়াছে চলি'
রূপ যৌবন পলায় যেমন রূপসী নারীরে ছলি'—
কুসুম বলিয়া চিনিবে ইহারে অন্যে কেমন ক'রে
তোমার খোঁপার গোলাপ, তুমিই চিনিতে নারিলে ওরে
তুমি নাহি চেনো, ক্ষতি নাই, জেনো একটি হৃদয় ভরি'
আছে এই ফুল সৌরভাকুল গৌরবে ফুলপরী !

দিবসে নিশীথে বসন্তে শীতে সুখে ও দুঃখে মম
ইহারে ঘেরিয়া কাব্য রচিব নিত্য নূতনতম !

দীপক সেন

শ্রীযামিনীমোহন কর

দীপক সেন—দীপক সেন—চারিদিকেই দীপক সেন। থিয়েটারে দীপক সেন—বায়স্কোপে দীপক সেন—রেডিওতে দীপক সেন। আপনারাও হয়ত তার বিশেষ ভক্ত। কিন্তু বছর দু-এক আগে দীপক সেন কি ছিল? তার সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানতেন? তার নাম কখনও শুনেছিলেন?

আমার কথাগুলো হিংসের মত শোনাচ্ছে। হয়ত এতে রাগেরও একটু আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সবটা আগে শুনুন, তার পর বিচার করবেন।

বছর দু'য়েক আগে দীপক একটা ভ্যাগাবণ্ড ছিল। তখন তার নাম ছিল মাখন। আমি, সে, বারীন, মুরারী, প্রমথ—আমরা সব রোজ হারু খুড়োর চায়ের দোকানে আড্ডা দিতুম। কেউ কেরাণী, কেউ জীবন বীমার দালাল, কেউ বেকার। মাখন ছিল একটা সিনেমা হাউসের গেট্ কীপার, ওর চেহারাটা চিরকালই ভাল। ফরসা রঙ, টানা টানা চোখ, কোকড়ানো চুল। গলাটা আশ্চর্য্য রকম মিষ্টি। গান ও গাইতো চমৎকার। কিন্তু ভুললে চলবে না, দু'বছর আগে ও ছিল দশ টাকা মাহিনার একজন গেট্ কীপার।

সেই মাখনটা আজ দীপক সেন হবে উঠল কি করে সেই কথাটাই আজ বলব।

দু'বছর আগেকার কথা। আমি, মাখন বারীন আর প্রমথ হারু খুড়োর দোকানে চা খেতে খেতে গল্প করছি। হারু খুড়োর এক পয়সা টা' এখনকার দু'আনা দামের কাপকেও হার মানাব। যাক্ সে কথা।

মাখন বলছিল—'আমার চেহারা আছে, গলা আছে। যদি কোনো রকমে একবার কর্ত্তাদের নজরে পড়তে পারি'তো দেখে নিস্। কোথায় যাবে পাহাড়ী সান্যাল, আর কোথায় যাবে সাইগল। জানিস্ তো ওদের নজরে পড়তে গেলে একটু সাজগোজ করে কিছুদিন ষ্টুডিওর চারিধারে ঘুরতে ফিরতে হয়। একবার যদি হাতে কিছু পয়সা আসে, তাহলে মাইরি বলছি—"

এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুরারী এসে ঢুকল। ও যে এতদিন এখানে আসে নি সেটাই আমাদের হঠাৎ তখন খেয়াল হ'ল। আমাদের এ-ভাবে ত্যাগ করবার কারণ জিজ্ঞেস করতেই বল্লে—'ভাই, দিন পনের বিছানায় শুয়ে ছিলুম।"

'বিছানায় শুয়েছিলে! ছিঃ ছিঃ! এই যৌবন, জীবনের অমূল্য সময় বিছানায় শুয়ে নষ্ট করছ?" প্রমথ বল্লে।

আমরা [illegible] মুরারী বল্লে—'একটা য়্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল। সাইকেল থেকে পড়ে [illegible] পা [illegible] ছিলুম।"

আমরা [illegible] [illegible] কথা—" ইত্যাদি [illegible]।

মুচকে হেসে মুরারী বল্লে—"দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলা কঠিন। [illegible] দিন পনের বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগল না। তার উপর আবার দশটা টাকা।"

'দশটা টাকা!"

"হ্যাঁ। 'স্পোর্টস্‌ম্যান্' কাগজরা দিলে।"

"তোমাকে—দিলে।" প্রমথ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে। "শুয়ে পড়ে থাকবার জন্য দশ টাকা? কেন? ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল। কস্মিকালে তো ঠিক এমনটা হয় না।"

"কিন্তু কথাটা সত্যি।" মুরারী বল্লে।

"আগে দশটা টাকা দেখা—"

'মাইরি আর কি। আমি দেখাই, আর অমি তুমি ধার চাও। তোমাকে আমার বেশ জানা আছে।"

লাঞ্ছিত হবার ছেলে প্রমথ নয়। জিজ্ঞেস করলে—"হ্যাঁ হে, যে কেউ পা মচকে দশ টাকা পেতে পারে?

'নিশ্চয়ই। তবে গ্রাহক হওয়া চাই।"

'গ্রাহক মানে?"

খেলা ধূলো সম্বন্ধে কাগজগুলোর একটা নূতন কায়দা। গ্রাহক হয়ে একবছরের অগ্রিম চাঁদা দিলে য়্যাক্সিডেণ্ট ইন্সুরেন্স-এর বেনিফিট পাওয়া যায়। ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে হাপা হাপি ব্যবস্থা।"

আমরা সকলেই থ'। এ বলে কি। প্রমথ তখন ভাবছে।

'আচ্ছা এরকম কটা কাগজ বেরিয়েছে? গোটা দশে'ক হবে?"

'তা হবে।"

'যদি কেউ প্রত্যেক কাগজের গ্রাহক হয় আর তার পা মচকায় তবে সকলের কাছ থেকেই দশটা করে টাকা পাবে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করলে।

"নিশ্চয়ই। বেশীও পেতে পারে। চোট হিসেবে দাম। পা মচকালে দশ, হাত ভাঙলে পঁচিশ, পা ভাঙলে একশ'—এই রকম দর কষা আছে।"

"What।" প্রমথ লাফিয়ে উঠল। "ঠাট্টা নয়?"

"না, না, সত্যি।"

"হ্যাঁ হে, তোমরা নিজেদের মধ্যে কত চাঁদা তুলতে পার?" আমাদের জিজ্ঞেস করলে প্রমথ।

বারীন ব্যাঙ্কের কেরাণী। অতি সতর্ক লোক। বল্লে—"[illegible] হচ্ছে?"

"কিছু [illegible] হে? টাকায় কি', হবে! যা [illegible]।

একমাত্র লোক হয় ইতিপূর্বে কেউ পারে নি। যত কাগজ আছে সব গুলোর আমরা একবছরের গ্রাহক হব।"

"তারপর ?" বারীন শুধালে। "যদি কিছু না হয়—"

"ননসেন্স! কিছু না হয় মানে? আমরা চাঁদা তুলে সব কাগজের গ্রাহক হব। তারপর লটারী করব। যার নাম উঠবে তাকে পা ভাঙতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা। সকলে ভাগ ক'রে নিয়ে কিছুদিন মনের সুখে থাকব।"

সকলে স্তব্ধ, বিস্মিত, স্তম্ভিত।

আবার বারীন বল্লে—'যদি সে পা না ভাঙতে পারে ?"

"সিলী বিংশ শতাব্দীতে একটা লোক পা ভাঙতে পারে না এ কথা ভাবলে কি ক'রে? চারিদিকেই তো পা ভাঙবার ফাঁদ রয়েছে। একটা গাধাও পারে। আমার কথা আর বলব কি ভাই, মুরারী যদি দুটো টাকা ধার না দেয় তবে তো না খেয়েই মরতে হবে। আমাদের সবারই বলতে গেলে শোচনীয় অবস্থা—এমন সময় এই রকম ইউনিক একটা প্ল্যান দিচ্ছি আর তোমরা কি-না তর্ক করছ। ভগবান এতে অসন্তুষ্ট হবেন।"

বারীন হিসেবী মানুষ। ফের জিজ্ঞেস করলে— তোমার যদি এমন হোপলেস অবস্থা, তবে তোমার ভাগের চাঁদা দেবে কি ক'রে ?"

বিস্ময়ে প্রমথ চোথ দুটো গোলাকার করলে।

"চাঁদা! আমার কাছ থেকে তোমরা চাঁদা নেবে? এত বড় একটা কাজের কি কোনো দাম নেই? আমি হলুম তোমাদের ব্রেণ, আর তোমরা কি-না আমাকে বলছ চাঁদা দিতে। ছি, ছিঃ! আর কেউ বল্লেও কথা ছিল—কিন্তু তোমরা আমার most intimate friends—তোমরা কি-না এই কথা বল্লে—'

"যাক্, যাক্, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।" বারীন তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"তবে তোমার নামটা যদি ওঠে, আমি সকলকে 'চাচার হোটেলে' একদিন খাইয়ে দেব।"

প্রমথ বল্লে—"ভেব না। আমার নাম উঠবে না।"

সত্যিই। লটারী হ'ল। নাম উঠল মাখনের।

কয়েকদিন পরে সকালে চা খাচ্ছি এমন সময় প্রমথ এসে হাজির। মুখে চিন্তিত ভাব। পাশে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"সত্যেন, মাখনটা দেখছি আমাদের ডুবোবে। এত কষ্ট ক'রে বুদ্ধি খরচ ক'রে একটা প্ল্যান করলুম—যাতে ক'রে এই দুঃসময় আমাদের সকলেরই একটা সংস্থান হয়—আর এই মাখনটা কি না বাদ সাধলে। আগে জানলে এরকম লোককে কখন দলে টানতুম না। বেটা ভীতু, কাপুরুষ। এখন তো আবার নতুন করে আর কারুর জন্তে চাঁদা তোলা সম্ভব নয়। যে রকম করে হোক ওকে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।"

আমি বল্লুম—"আমার মনে হয় ওকে আর কিছুদিন সময় দেওয়া দরকার।"

প্রমথ জবাব দিলে—"মাখনও তাই বলে। বাছাধন কাল বলছেন কি করে যে অ্যাক্সিডেন্ট করব, ভেবে পাচ্ছি না।" মূল, এর মধ্যে শক্তটা কোন্ খানটায়। একটা তিন বছরের ছেলে পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাধিয়ে ফেলতে পারে। যে গয়ারগোবিন্দ হি, তার পছন্দ হয় না। কাল রাত্রে আমি আর মাখন কর্জন পার্কে বেড়াতে গিছলুম। দু ব্যাটা গোরা মদ খেয়ে ঝগড়া করছে। বেশ তাগড়া তাগড়া চেহারা। ওদের একটা ঘুসি খেলে সোজা এক মাসের জন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কত ক'রে বোঝালুম যে তুই যা—গিয়ে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্। তারপর সব ব্যবস্থা আমি করব। বল্লে কি-না—পরের ঝগড়ার মধ্যে হাত দেওয়া উচিত নয়। লজ্জার কথা। হৃদয় নেই—বিবেক নেই। এমন টাইপের ছেলেদের দিয়ে কথন দেশের উন্নতি হবে না। যাক্, এখন এক কাপ্ চা আর দু'টো টোষ্ট খাওয়া।"

'পয়সা নেই।" ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লুম।

"ধার করে খাওয়া।" উত্তর দিলে।

অগত্যা খাওয়াতে হ'ল। সকাল বেলা কতকগুলো পয়সা গচ্চা গেল।

খেতে খেতে সে বল্লে—'আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেছে যা হোক। এতগুলো টাকা মিছিমিছি আটকে রইল। আমার ভাই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোনো দিনই আমি ওটাকে বিশ্বাস করি না—কোঁকড়ানো চুল, ফর্সা রঙ। মনে রেখ, যার কোঁকড়ানো চুল তাকে জীবনে কখনো বিশ্বাস কোরো না।"

বিকেলে আমাকে নিয়ে প্রমথ বেড়াতে গেল। বেড়াতে বেড়াতে দেখি ভগবতী হোটেল-এ নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। "ভগবতী হোটেল"কে হোটেলও বলা চলে মেসও বলা চলে। এক বেলা খাবার চার্জ্জ ছ'পয়সা।

প্রমথ বল্লে—"আমি আগে এখানে থাকতুম। আমার সীটে এ ন মাখন থাকে। সঙ্গে নরেশ বলে এক ছোকরা আছে।"

"কিন্তু আমাকে এখানে আনবার কারণ ?"

"তার সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিতে চাই।"

"কেন? কিছু হয়েছে নাকি ?"

"না হয়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে তাকে আজ কুকুরে কামড়াবে।"

"হঠাৎ এরকম মনে হবার মানে?"

"কে জানে। কিন্তু মন যেন বলছে।" প্রমথ বল্লে।

'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।" আমি বল্লুম।

মনে বেশ তৃপ্তি হ'তে লাগল। যাক্ কিছু আদায় হবে। সহসা যেন সামনে সাপ দেখেছে এমন ভাবে প্রমথ চমকে উঠল। ফিরে দেখি সামনে মাখন।

আমাদের দেখে মাখন বল্লে—"কি হে? হঠাৎ এখানে? কি খবর সব ?"

প্রমথ গম্ভীরভাবে শুধু বল্লে—"হু।"

মাখন বল্লে—"আচ্ছা ভাই, চলুন। দেরী করবার উপায় নেই। ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

"ডাক্তার—কেন ?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আর বল কেন। নরেশকে কুকুরে কামড়েছে।"

একজন আমার দিকে চাইলেন, আমি প্রমথের দিকে চাইলুম।

কুকুরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য আক্ষেপ হতে লাগল। এক ঘরে নরেশ আর মাখন। কামড়ালে কি-না নরেশকে। কুকুর কামড়ানো নরেশের ঘ জানে কি দাম!

"আমাদের হোটেলওয়ালার কুকুরটাকে দেখেছ তো?" মাখন বলে চলল। "আমি আর নরেশ ঘরে ঢুকছি—নরেশ আগে, আমি পিছনে পিছনে। দরজার শেকল খুলতে দেখি একটা কুকুর লাফিয়ে আমাদের ঘাড়ে পড়ল। আমি কোন মতে পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লুম, নরেশকে কামড়ে দিয়ে কুকুরটা সরে পড়ল। আমাদের ঘরে তাকে যে কে বন্ধ করেছিল কোন রকমে ভেবে উঠতে পারছিনা, ম্যানেজারকে একথা বলতে সে তো মহা খাপ্পা। আচ্ছা ভাই, চললুম।"

মাখন চলে গেল। আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।

প্রমথ বল্লে— শুনলে কথা? পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লুম। ছিঃ ছিঃ। কুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কামড় খাওয়ার সাহস হোলো না? বড়ই দুঃখের কথা।'

"বটেই তো"। আমি বল্লুম।

"এখন কি করা যায়? প্রমথ বল্লে। 'এ লোকটার তো কর্তব্যজ্ঞান বলে কিছুই নেই। কালই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।'

পরদিনই আমাদের দল মাখনের মেসে গিয়ে হাজির হোল। প্রমথ হ'ল আমাদের মুখপাত্র। মারপ্যাঁচ না করে সোজা মাখনকে জিজ্ঞেস করলে—"তারপর কি করছ?'

ভীত স্বরে মাখন প্রশ্ন করলে— কিসের?"

জলদগম্ভীর স্বরে প্রমথ বল্লে—"অ্যাকসিডেন্টের।'

'ওঃ। হ্যাঁ—ভাবছি।" মাখন উত্তর দিলে।

'ভাবছি মানে? পনের দিন শুধু ভাবছ? ওসব ফাজলামী চলবে না। কবে কাজে নামছ ঠিক করে উত্তর দাও।"

মাখন চুপ করে রইল। কাঠগড়ার আসামী।

"কতগুলো টাকা আমরা তোমার ওপর ইনভেস্ট করেছি, তুমি জান কি কষ্টের পয়সা তাও জান। তবু যে তুমি কি করে এমন ভাবে চুপ করে অলস হয়ে বসে রয়েছ, বুঝতে পারছি না। ছিঃ ছিঃ। তোমার সম্বন্ধে আমাদের এর চেয়ে উচ্চ ধারণা ছিল।"

"কিন্তু—"

"এতে কিন্তু নেই। তোমার মনের জোর নেই—তুমি কাপুরুষ। সেদিন যখন ঐ ব্যাটা গোরা মদ খেয়ে ঝগড়া করছিল, তোমায় আমি চাপ দিতে বল্লুম। তুমি কথা শুনলে না। কাল দেখি, একটা লরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখে তুমি তাড়াতাড়ি ফুটপাতে উঠে পড়লে। তোমার ঘরে এত' মেহনত করে একটা কুকুর পুরলুম, আর তুমি কি-না পাশ কাটিয়ে একটা টেবিলে উঠে পড়লে—মাঝ থেকে নরেশ ব্যাচারী কামড় খেলে। কুকুরের অর্থ কি? আমরা জানতে চাই—পরিষ্কার

"কিন্তু—"

"কিন্তু-কিন্তু চলবে না। আসল কথা তোমার কিছুরই জোর-আকাঙ্ক্ষা নেই। তবু একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারত' না, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে।"

"জেনে শুনে কি করা সম্ভব?"

"নিশ্চয়ই যায়। মনে কি একটু কবিত্ব কি বীরত্ব কিছুই নেই? ভাববে, একটি ষোল বছরের সুন্দরী তরুণী রাস্তা দিয়ে তাঁর ছোট ভাইটার হাত ধরে যাচ্ছেন। হঠাৎ ছেলেটি হাত ছাড়িয়ে ছুটল। এক বাসের তলায় পড়ে-পড়ে, সুন্দরী চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন—তখন তুমি কি করবে? চট করে বাসের সামনে ছুটে যাবে। ব্যস্—তারপর আমরা আছি।'

'বলা সহজ, করা সহজ নয়।

তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে প্রমথ বলে চল্ল'—"তারপর আমরা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে গেলুম। দেশ জোড়া তোমার খ্যাতি হ'ল—কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে গেল। সভা-সমিতিতে তোমার জন্য অভিনন্দন সভা হল, তোমার আরোগ্য কামনা করা হল। দিন দশেকের মধ্যে তুমি ভাল হয়ে ফিরে এলে—খ্যাতির মালা গলায়, হাজার টাকা পকেটে। তখন তোমায় নামজাদা পাইয়ে আর অভিনেতা হবার পথ রোধে কে?"

প্রমথের বক্তৃতা মাখনের মনে সুগভীর দাগ কাটছে বলে মনে হ'ল। দেখা গেল সে ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ বলে উঠল— "দেখ ভাই ভেবে দেখলুম আমার অ্যাকসিডেন্ট করা কর্তব্য। কিন্তু এমি করতে পারব না। যদি নেশা করা যায় তবেই সম্ভব, নচেৎ নয়। তোমরা যদি আমাকে একটু 'স্কচ কিংবা হোয়াইট হর্স' খাওয়াতে পার তবে হয়ত আমি কাজটা হাসিল করতে পারি।"

আমরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। বারীন বল্লে— 'কিন্তু আমাদের ফণ্ডে আর পয়সা কই?

মাখন উদাসভাবে উত্তর দিলে 'তবে হ'ল না।"

প্রমথ বল্লে— আহা হা চটো কেন? তুমি একটু বাইরে যাও। আমরা পরামর্শ করে তোমায় এর উত্তর এখুনি দিচ্ছি।"

"বেশ।" বলে মাখন বেরিয়ে গেল।

প্রমথ চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বল্লে— ভাই সব, এ উত্তেজনার সময় নয়। আমাদের সকলকে এখন ধীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মাখন যা বলছে নেহাৎ অযথা নয়। আর ওকে ছাড়া যখন আমাদের উপায় নেই তখন তাই করতে হবে। ও সুযোগ মুখে মোচড় দিচ্ছে কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। সুতরাং আমার মনে হয় কিছু চাঁদা তুলে ওকে ফ্যাক্টরে ওয়াতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেওয়া যাক্। তারপর ওকে ধরে এনে চৌরঙ্গীর মোড়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে। এ শুভ অনুষ্ঠানে আমি দুটাকা চাঁদা দেব।"

আমরা সকলে অবাক। লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি? দু টাকা! তুমি কোথায় পাবে?" আমরা জিজ্ঞেস করলুম। অবিশ্বাসের হাসি হাসলুম।

"এসরাজটা কিনে বসে রেখেছ ?" জিজ্ঞেস করলে।

বিস্ময়বিষ্ট মেয়ে মুরারী জিজ্ঞেস করলে—"এসরাজ ? জীবনে তুমি কখনও এসরাজ বাজিয়েছ ? তোমার এসরাজ কোত্থেকে এল ?"

"আমার না। পাশের ঘরের নবীনবাবুর।" অবিচলিত কণ্ঠে প্রমথ উত্তর দিলে।

যাই হোক—চাঁদা দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। মাখনকে ডেকে আমাদের সম্মতির কথা জানালুম। সেইদিন বিকেলেই চ্যাঙ-ওয়া খাওয়া ঠিক করে আমরা বিদায় নিলুম।

সেদিন সন্ধ্যায়। মাখন চপ, কাটলেট, ফাউলকারী ইত্যাদি খাচ্ছে, গ্লাসের পর গ্লাস চালাচ্ছে। আমাদের পয়সায়। আর আমরা জুল জুল করে চেয়ে আছি—মনের কষ্ট মনে চাপছি। চতুর্থ গ্লাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিরকেলে ভীতু মাখন একেবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে তাকে টেনে আমরা রাস্তায় নিয়ে এলুম। তার মুখে একটা ডোণ্ট ক্যেয়ার ভাব। আমাদের সঙ্গে আসতে দেখে চীৎকার করে পিছন পিছন যাবার কারণ জিজ্ঞেস করলে। অতি কষ্টে রাগ সামলে প্রমথ হেসে উত্তর দিলে—'আমরা ভাবছি তুমি যখন সেই কাজটা করবে তখন আমরা কাছে থাকলে তোমার উপকারে লাগতে পারব।"

"কোন্ কাজটা ?" বিস্মিত স্বরে মাখন প্রশ্ন করলে।

মানে ? জান না ? য্যাকসিডেণ্ট।" প্রমথ বল্লে।

'ওহ্, শাট্-আপ। আচ্ছা বোকা তো তোমরা। য্যাকসিডেণ্ট করবে না কচু করবে। অনেক দিন পেটভরে ভাল খাওয়া হয়নি ফাষ্ট ক্লাস মালও টানা হয়নি, তাই এই ফন্দী করেছিলুম। একটু গড়বড় হ'ল আশা করি কিছু মনে করবে না। "আচ্ছা—" বলে প্রাচ্য নৃত্যের ভঙ্গীতে একটা পাক দিয়ে যেই এগিয়েছে অমি কলার খোসায় পা। সঙ্গে সঙ্গে একটি ধাবমান লরীর তলায় পতন ও মূর্চ্ছা।

পুলিশ, ডাক্তার, লোক, য্যাম্বুলেন্স কার, হাসপাতাল।

"হাত ভেঙেছে, একটা পাঁজরা ভেঙেছে।"

আমরা সকলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লুম—স্বস্তির, না দুঃখের, জানি না।

দিন পনের পরে আমরা খবর পেলুম রোগীর জ্ঞান হয়েছে, সুস্থ আছে—আমরা ইচ্ছে করলে দেখা করতে পারি। কিছু ফল নিয়ে আমি আর প্রমথ হাসপাতালে গেলুম। "কি হে- এখন কেমন আছ ?" আমরা ভয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করলুম।

"এই যে—আপনারা বসুন।" রোগী উত্তর দিলে।

আমি একটু বিস্মিত হলুম। মাখন তো আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা কয় না। প্রমথ কিছু লক্ষ্য করেছে বলে মনে হ'ল না।

"ভালই, ভালই।" প্রমথ বল্লে। "তারপর আর সব খবর কি ?"

রোগী বল্লে—"আমি এখন বেশ ভালই আছি, বাড়ছি। এখানকার ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যবহার সত্যিই চমৎকার। রোগীর কষ্ট লাঘবের জন্য সর্বদাই প্রাণপণ চেষ্টা করেন।"

—এই যে আজকাল এদেশে স্পোর্টস্-এর কাগজের সঙ্গে য়্যাক্সিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স, অর্থাৎ বিপদবীমা দিচ্ছে এর উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। দৈনিক জীবনে, বিশেষত স্পোর্টস্-এ য়্যাক্সিডেন্টের সম্ভব ভয়। এ ধরণের জিনিসের আমাদের দেশে বহুল প্রচলন হওয়া উচিত। আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এ প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সহানুভূতি করা। বিশেষ ক'রে যিনি এর আবিষ্কারক তিনি আমার ও সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। লিখেছেন ?—

আমি ও প্রমথ দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলুম। আমরা খবর পেয়েছিলুম ও এখন সুস্থ, কিন্তু এ তো দেখছি সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত।

প্রমথ ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"লিখেছি মানে ?"

মাখন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে—"কেন ? আপনারা কি কাগজে লোক ন'ন ?"

"কাগজের লোক। কোন্ কাগজের ?"

"স্পোর্টসের কাগজ। যারা আমার ইন্সিওরেন্সের টাকা দিচ্ছে।"

আবার আমরা দু'জনে দু'জনের দিকে চাইলুম। এ বলে কি।

উদ্বিগ্নভাবে প্রমথ জিজ্ঞেস করলে—"আমাকে চিনতে পারছ না আমি যে প্রমথ।

'প্রমথ—সে কে ? মাখন জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দিকে তাকালে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্লে—'হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রমথ বলে একজনকে চিনতুম বটে। তুমিই প্রমথ, না ?"

প্রমথ বল্লে—'হ্যাঁ, আমিই তো। কি বল সত্যেন ?"

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। কথা বলতে চেষ্টা করলুম বেরোল না।

মাখন বল্লে—'ব্রেনে শক্ লেগেছে। ডাক্তাররা বলে পুরোনো কথা কিছু কিছু পরিষ্কার মনে থাকবে, আবার কতক কতক একেবারে থাকবে না।"

প্রমথ প্রায় কাঁদ কাঁদস্বরে জিজ্ঞেস করলে—"কিন্তু আমাদের চিনতে পারছ তো ?"

'হ্যাঁ। তুমি প্রমথ আর ও মন্মথ।"

'মন্মথ নয় সত্যেন।" ব্যথিতকণ্ঠে আমি বল্লুম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যেন। ঠিক ঠিক সত্যেনই তো।" মাখন বল্লে।

সন্দেহ-দোলায় তখন আমার মন দুলছে।

ভীতকণ্ঠে প্রমথ প্রশ্ন করলে—"আর সেই স্পোর্টস্ কাগজে ইন্সিওরেন্সের কথা মনে আছে তো ?"

"নিশ্চয়ই। থাকবে না ! তারা আমার টাকা দিচ্ছে।" মাখন উত্তর দিলে। অনেকটা স্বস্তির স্বরে প্রমথ জিজ্ঞেস করলে—"আমরা যে আর চাঁদা করে তোমার নামে টাকা দিয়েছিলাম। তুমি য়্যাক্সিডেণ্টের জন্য এই সর্তে ? পরে টাকা পাওয়া গেলে আমাদের।

'...উপর শেষ করা ...।' মাখন বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বল্লে—"এমন আবোল তাবোল কি বকছ ? আমার তো এমন কোন কথা মনে পড়ছে না। আর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে এমনভাবে ঠকাবার চেষ্টা যে দণ্ডবিধির আইনের কোঠায় পড়ে। আমি কখনই এ কথায় রাজী হতে পারি না।"

রাগে দুঃখে প্রমথর গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে এল। রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—মাখন, তুমি কি-না শেষে আমাদের এমনি করে ডুবোবে। আমাদের কি কষ্টের পয়সা তা তো তুমি জান—"

কথা কেড়ে নিয়ে মাখন বল্লে—"কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, কৈ এমন ... লেখাপড়া কিছুই আছে। কই দেখি ?"

প্রমথর ধৈর্য্য শেষ হয়ে গেছে। "বেটা জোচ্চোর বিশ্বাসঘাতক !" বলে যেই চেঁচিয়েছে অমি গোঁ গোঁ করতে করতে মাখন একেবারে শিবনেত্র। ডাক্তার, নার্স সব ছুটে এল। আমরা তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

প্রমথ আমার দিকে চাইলে, আমি প্রমথর দিকে চাইলুম।

... ...

সেই মাখন আজ দীপক সেন।

রামেশ্বরম্

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভ্রমণ

'ত্রিচি'র পরেই আমাদের গন্তব্যস্থান হ'ল সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর, মাদ্রাজে এ শুধু রামেশ্বরম্ বলেই পরিচিত। 'ত্রিচি' হতে রাত্রি প্রায় দশটায় আমাদের গাড়ী ছাড়লে। আমাদের একটি কামরায় নীচেকার দুখানি বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, আমরা তাই দখল ক'রে শুয়ে পড়লুম্। বন্ধু চাটার্জ্জি আমাদের শোবার মত ব্যবস্থা করে দিয়ে অন্য কামরায় অপর দুই বন্ধুর কাছে চলে গেলেন। আমাদের কামরার উপরকার দুটি বার্থও 'রিজার্ভ' বলে টিকিট-আঁটা ছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরেই একটা স্টেশনে ঐ বার্থগুলির মালিকেরা এসে হাজির হলেন। 'ত্রিচি' স্টেশনে প্রতীক্ষা-গৃহে আমাদের একটি ওদেশীয় ব্রাহ্মণ-দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ; অপরাহ্নে তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে পড়েছিলেন। রাত সাড়ে দশটায় দেখি তাঁরাই আবার আমাদের সহযাত্রী হতে ফিরে এসেছেন সঙ্গে তাঁদের নয়-দশ বছরের ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে। এই মেয়েটি 'ত্রিচি'তে তাদের সঙ্গে ছিল না, পাশেই কোথায় কোন এক বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে ; তাই বিকেল বেলা মা ও বাবা তার কাছে গিছলেন তাকে সঙ্গে করে নিতে ...। মেয়ের বাবা বল্লেন, মেয়েটির শাদি ... দু-তিন মাসের মধ্যেই বিয়ে হবে।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম, এইটুকু মেয়ের বিয়ে ! আইনেও ত আজকাল বাধে। ভদ্রলোকটি হেসে বল্লেন, "আইনকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক উপায় আছে, তাতে কিছু যায় আসে না, বিশেষত যখন মনের মতন একটি সুপাত্র পাওয়া গ্যাছে, ইত্যাদি !" মুখে কিছু বল্লুম না, কিন্তু দুঃখ



সমুদ্র স্নান—ধনুষ্‌কোডি

হ'ল, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যেই এরকম গতানুগতিক অতি সাধারণ মনোবৃত্তি দেখে। যাক্, ভদ্রমহিলাটি একটি বার্থে শুয়ে পড়লেন এবং অপর বার্থটিতে ছোট্ট মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে বাপও শুয়ে পড়লেন। ছোট্ট খুকুটি ... বাপের গলা জড়িয়ে বল্লে ... কি ... ...

পরে বাপের বুকের উপর মাথাটি রেখে, তাঁকে জড়িয়ে মেয়ের কি আনন্দ, আমাদের তা বুঝতে বাকী রইল না। সুইচ্ টিপে বাতি নিবিয়ে আমরা আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মন দিলুম।

অতি প্রত্যুষে তখনও রাতের অন্ধকার দূর হয় নি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রেলওয়ে কুলীর মুখে চীৎকার শুনে; বুঝতে পারলুম গাড়ী কোন একটা স্টেশনে এসে থামল। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি কামরার মধ্যে এসে পড়েছিল, হাত বাড়িয়ে তারই কাছে ঘড়িটা এনে দেখলুম সাড়ে চারটা বেজে গেছে। আর দশ পোনর মিনিটের মধ্যেই আমরা রামেশ্বর দ্বীপে যাবার যোজক রেলওয়ের উপর পৌছব। দশ বছর আগে কলম্বো যাওয়ার



রামেশ্বর হতে ধনুষ্‌কোডি, যাত্রীবাহী নৌকা

পথে এই স্থানটি আমার চোখে খুবই ভাল লেগেছিল। তাই ছোট স্টেশনটি হতে গাড়ী ছাড়বামাত্র নিদ্রিতা পত্নীকে জাগিয়ে দিলুম ঐ স্থানটা দেখতে। প্রায় দশ মিনিট পরেই গাড়ী এসে পৌছল, সংযোজক সেতুটির উপরে। তখনও অন্ধকার ছিল, তবু দুপাশের জানালাগুলি দিলুম খুলে! ঘড়ঘড়্ শব্দে ট্রেন চলেছিল সংযোজক সেতুর উপর দিয়ে! সপত্নী আমি এবং কন্যাসহ ব্রাহ্মণ-দম্পতি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলুম শেষ রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় নীলাম্বুরাশি! উপরে অসংখ্য তারকাখচিত অমাবস্যার সুনীল চন্দ্রাতপ, আর নীচেও সুনীলাম্বুরাশিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের প্রতিচ্ছবি; যে আরও অপূর্ব মহিমায় পূর্ণ! [illegible] দুটিতে আমরা

মনে হচ্ছিল কবি নবীন সেনের 'রৈবতকে'র দুটি লাইন—

"নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইবা পরস্পরে গাঢ় আলিঙ্গনে—"

বাস্তবিক দশ বছর পূর্ব্বে দিনের বেলায় একই দৃ দেখেছি, তখনও ভাল লেগেছিল, কিন্তু এবারে যা দেখলু তা সত্যই অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত! পুলটা যখন পার হয়ে গেল তখন আমি পত্নীকে জিজ্ঞেস্ করলুম, "কেমন, দেখলে?"

পত্নী একটি কথায় তার উত্তর দিলেন, "চমৎকার। আমারও মনে হ'ল, এই একটি কথা ছাড়া যেন আ কিছুতেই মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।"

মিনিট পাঁচ পরেই আমাদের গাড়ী এসে পৌছ পামবন্ জংশনে। এখানে রামেশ্বর-যাত্রীদের গাড়ী বদ করতে হয়, কেন-না আমাদের গাড়ীটা সোজা যাবে চ 'ধনুষ্‌কোডি'তে, পাঁচমাইল দূরে। তীর্থকামীরা প্রথমে যান ধনুষকোডিতে। সেখানে সমুদ্রস্নান করে, পিতৃপুরুষে তর্পণ প্রভৃতি করে, তবে তারা ফিরে যান রামেশ্বর দর্শনে ধনুষকোডি হতে সিলোনের টালাইমানার-এর জাহাজ ছাড়ে সুতরাং ধনুষ্‌কোডি, যেখান হতে শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে সাহায্যে সমুদ্র শাসন ক'রেছিলেন, তা দশ বছর পূ বিলাত-যাত্রার পথেই আমার দেখা হয়েছিল। বন্ধুরা যখ শুনলেন যে, রামেশ্বরম্-এও সমুদ্র আছে, তখন স্থির করলে যে ধনুষ্‌কোডিতে আর না গিয়েই রামেশ্বর-এই সমুদ্রস্না করে মন্দিরদর্শনে যাবেন। রামেশ্বর-এই প্রথম যাবার আ একটা কারণও ছিল। সেদিন সোমবার—অমাবস্য রামেশ্বর দর্শনের নাকি মহা পুণ্যসঞ্চয়ের দিন! তা আমাদের গাড়ীর অসংখ্য যাত্রী সকলেই ধনুষ্‌কোডিতে স্না করে মন্দিরে যাবে দেখে, ও বেলায় মন্দিরে অসংখ্য জনত হবে এ স্থির নিশ্চয় জেনে, বন্ধুরা আগেই রামেশ্বর যাও স্থির করলেন। ধনুষ্‌কোডি আমার পূর্ব্বেরই দেখা, সুতরা আমিও তাদের মতেই মত দিলুম। কথা রইল, সময় হ'লে আমরা রামেশ্বর থেকে নৌকা ক'রে ধনুষ্‌কোডিতে যাব [illegible] যাওয়া [illegible] হ'য়ে [illegible]

ধনুষ্কোডি যান্। সুতরাং আমরা পাম্বন্ জংশনে নেমে রামেশ্বরম্-এর ছোট গাড়ীতে চাপলুম। আমাদের কামরার সহযাত্রীরা সমুদ্র স্নানের জন্য ধনুষ্কোডি রওয়ানা হলেন, সেই গাড়ীতেই। রামেশ্বরম্-এ যদিও তাঁদের সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নি, তবু অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরবার পথে আবার তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দিরে।

পাম্বন্ থেকে রামেশ্বরম্ মোটে পাঁচ মাইল। গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চলে বলে এটুকু পথ যেতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। আমরা ভোরে প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে রামেশ্বরম্-এ পৌঁছলুম। অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনই পাণ্ডার ভীড়, তবে দু-চারজন হিন্দুস্থানী পাণ্ডাও দেখতে পেলুম। তা ছাড়া লক্ষ্য করে দেখলুম, গাড়ী হতে



রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরম্ (প্রবেশ-দ্বার)

যা সকল তীর্থকামী যাত্রী রামেশ্বরম্-এ নামলে, তার বেশীর ভাগই উত্তরভারতবাসী। রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি সুদূর স্থান হতে ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে আসার কৃচ্ছ্রসাধন সত্যিই খুব নিষ্ঠা ও ধর্মপ্রবণতার পরিচায়ক। গাড়ী হতে নামার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার দল আমাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল 'তীর্থ-কাকের দল'। ডাক্তার মিত্র তাদের মধ্য হতে নবরকান্তি গৌরবর্ণ একজন হিন্দুস্থানী পাণ্ডাকে বেছে নিলেন; অপর অন্যেরা আপনা আপনি সরে দাঁড়াল। আমরা কোথায় আস্তানা নিতে পারি, ডাক্তার মিত্র পাণ্ডার কাছে তাই জিজ্ঞাসা করে একটা জৈন ধরমশালার ঠিকানা জেনে নিলেন। স্টেশনে অন্য কোন যানের ব্যবস্থা ছিল না, শুধু 'জোট্কা' অর্থাৎ ঝটকা গাড়ী ছাড়া, তাও আবার ঘোড়ায় নয় গরুর। অগত্যা আমরা তারই দুখানি বন্দোবস্ত ক'রে মন্থরগতিতে চল্লুম 'রামেশ্বর'-এর বালুকাপূর্ণ রাজপথের উপর দিয়ে গোযানের ভারী চাকা দুটির গভীর দাগ কেটে কেটে। দেখে অবাক হয়ে গেলুম, পথে অসংখ্য মাড়োয়ারীর ভীড়, তার মাঝে মেয়েদের সংখ্যাই অনেক বেশী।

আমরা প্রায় দেড় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসে পৌঁছলুম ধরমশালার দ্বারে। এই সুদূর দক্ষিণ ভারতেও ধরমশালাটি একজন বিকানীর-রাণীর কীর্তি। কিন্তু ধরম-



রামেশ্বর মন্দিরে কারুকার্য্যময় স্তম্ভশ্রেণী

শালাটি দেখে আমরা খুসী হতে পারলুম না, কেন-না সেরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোটেই নয়. তার উপর অসংখ্য ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও পরিচালক কিছুতেই আমাদের একটি কামরা ছাড়া দুটি খুলে দিতে রাজী হ'ল না—তাও আবার এত ছোট যে, আমাদের লট-বহরেই প্রায় অর্দ্ধেক ভরে উঠ্ল! তার উপর চারিদিকে অসংখ্য মাছি ভন্‌ভন্ করছে। শ্রীমতী প্রতিমা অপ্রসন্ন মুখে শুধু ছোট দুটি কথা উচ্চারণ করলেন "ছিঃ, ছিঃ!" চাটার্জি তাড়াতাড়ি কোথা থেকে ক' পেয়ালা কফি জোগাড় করে এনে একেবারে সকলের মুখের কাছে তুলে ধরলেন, "খেয়ে ফেলুন" বলে।

আমরা সকলেই এক নিঃশ্বাসে তা গলাধঃকরণ করলুম, শুধু মিসেস্ পাল তা স্পর্শও করলেন না। ডাক্তার মিত্র ও নায়ক ইতিমধ্যে প্রাতঃকৃত্যের জন্ত বাইরে গিছ্‌লেন, ফিরে এসে দুজনেই বলতে লাগলেন, "যত শীগ্‌গির সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন।" কথা ছিল আমরা একদিন ওখানে থাকব, কিন্তু আমাদের সে প্ল্যান তখনই সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে বদলে গেল। তখন ভাবনা হ'ল, খাবার ব্যবস্থা কি করা যায়। যদিও রান্নার হাঁড়ি-কুড়ি পাওয়া যাবে ধরমশালায়, তবু রাঁধে কে? রান্নাবান্নায় মন দিলে মন্দির দর্শনে যেতে বেলা হয়ে যাবে, ততক্ষণে মন্দিরে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌বে! 'দেখি কি করা যায়'



রামেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণময় মন্দির চূড়া

বলে ডাক্তার মিত্র বাইরে চলে গেলেন এবং মিনিট কুড়ির মধ্যেই কোথা হতে একটি হিন্দুস্থানী বামুন সংগ্রহ করে নিয়ে এসে হাজির হলেন; বল্লেন, "রাঁধুনী পাওয়া গেছে, এবার রান্নার জোগাড় করতে হবে। তার পরে আমরা যাব সমুদ্র-স্নানে।"

আমরা বল্লুম, "তথাস্তু"; কিন্তু প্রতিমা. গররাজি. হয়ে বল্লেন, "তিনি সমুদ্রস্নান করতে যাবেন না; ধরমশালাতেই স্নান করে মন্দিরে পূজা দিতে যাবেন। তখন আমাদের চার বন্ধুর কার্য্যবিভাগ আপনা আপনি হয়ে গেল। ডাক্তার নায়ক গেলেন রান্নাঘর, বাসনবর্তন প্রভৃতি ধুইয়ে পরিষ্কার করাতে মিত্র গেলেন বন্ধুপত্নীর জন্ত বাথ্‌রুম ও স্নানের জলের ব্যবস্থ করতে, চাটার্জ্জি গেলেন ডাল, চাল, তেল, ঘি, নুন কিনতে বাজারে, আর আমি চল্লুম টিফিন্-কেরিয়ারের বড় বাটিট হাতে করে দুধের সন্ধানে। একে ওকে জিজ্ঞেস করে প্রা দুই ফার্লং দূরে একজন দুধ-ওয়ালীর বাড়ীতে পৌঁছে দুসে দুধ চাইলুম। মাদ্রাজের কোথাও সের দরে জিনিস পাওয় যায় না, কিন্তু শুধু রামেশ্বরেই দেখলুম, সের হিসেবে পাওয় যায়; তার কারণ বোধ হয়, হিন্দুস্থান থেকে প্রতি বৎস অসংখ্য তীর্থযাত্রীর যাতায়াতের প্রভাবে। দুধওয়ালী বল্লে, দু ঘরে নেই, তবে একটু অপেক্ষা করলে গরু দুইয়ে দিতে পারে আমি অগত্যা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপ দুধওয়ালী, এসে আমাকে একটা ছোট ঘরের ভিতর দিে ডেকে নিয়ে গেল একটা আম বাগানের মধ্যে। সেখানে দু-তিনটে ছোট গরু গাছের সঙ্গে বাঁধা; অদূরে, তাদের কা বাছুরগুলি লাফালাফি করছে, মুখে দড়ির জাল আঁটা, যাতে ইচ্ছামত মার দুধ পান করতে না পারে। অদূরে একটি পাতকুয়া, তার চারিদিকে বসে আছে সাত-আটটি মেয়ে কেউ বা জল তুলছে, কেউ বা বাসন ধুচ্ছে, আবার কেউ ব কাপড় কাচছে। এই আম বাগানের মাঝে, এই কালো ভারী ঠোঁট, টেনে সিঁটকে চুল বাঁধা আর লম্বা লম্ব ঝুলে পড়া কান দেখে মনে হচ্ছিল যেন এদের কোথা দেখেছি! কিন্তু কোথায়! আমি ত পূর্ব্বে কখন রামেশ্বরে আসি নি! তবে কোথায়! হঠাৎ আমা মনে পড়ল, কৃত্তিবাসী রামায়ণে অশোক বনে চেড়ীদ পরিবেষ্টিতা সীতার একখানা ছবি দেখেছিলুম, এই মেয়েদে হাবভাব, বেশভূষা, কেশ-বিন্যাস প্রভৃতি সবই হুবহু মি যাচ্ছে—রামায়ণের সেই ছবির সঙ্গে! তবে তফাৎ অশো বনের পরিবর্ত্তে আম্র-কানন, আর সীতার পরিবর্ত্তে দর্শ হিসাবে আমি স্বয়ং। অশোক বনের ত্রেতাযুগের দৃশ্যে একমাত্র দর্শক ছিল বীর হনুমান্। রামসেবকের সঙ্গে দেখা হ'লে জেনে নিতুম এরাই তারা—অর্থাৎ তাদের বংশধর কি না! দুধওয়ালী আপন মনে দুধ টেনে নিচ্ছিল গর বাঁট হতে, একটাকে দুইয়ে আর একটার কাছে যাচ্ছে এমন সময় আমার নজরে পড়ল, বাছুরের কাছেই উপবি একটি নয় বছর বয়সের শিশুর উপাস্য-রূপে ধ্যানে আপন মনে

মলত্যাগ করছে, আর তার চারিপাশে মাছি ভন্‌ভন্ কছে। দেখামাত্র আমার গা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করতে লাগল, আমার আর সেখানে একমুহূর্ত্তও দাঁড়াতে প্রবৃত্তি হ'ল না। হাত বাড়িয়ে বল্লুম, "যা হয়েছে দাও, আর চাই নে।" আমার তাড়ায় দুধওয়ালী ঘরের ভিতর দুধ এনে মেপে বল্লে, "দুসের হয়নি, কম হয়েছে।"

"যা হয়েছে তাই দাও।" বলে তাড়াতাড়ি ঘটীটা টেনে নিয়ে পয়সা ফেলে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম সেই অশোক-বনের দৃশ্য হতে! ধরমশালায় ফিরে দেখি রান্নার জন্য রান্নাঘর ও বাসনবর্ত্তন প্রস্তুত এবং বন্ধুর তদারকে প্রতিমার জন্য বাথরুম ও স্নানের জলও তৈরী। শুধু চাটার্জ্জি বাজার থেকে ফিরে এলেই হয়! প্রায় আধঘণ্টা পরেই চাটার্জ্জি মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এল; ডাল চাল, ঘী নুন, মশলা, তরীতরকারী, কাঠ, এমন কি দেশলাইটি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নি।

দুমিনিটের মধ্যেই 'মেনু' তৈরী হয়ে গেল; ডাল, ভাত, আলুভাজা আর পেঁয়াজ ও বেগুনের ঘণ্ট। প্রবাসে, বিশেষত তীর্থ-ভ্রমণে তাই যথেষ্ট। ডাক্তার মিত্র পাচক ঠাকুরকে কিভাবে কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন, আর বল্লেন ভাল হিন্দীতে, "ভাত আমরা শক্ত খেতে পারি না, আচ্ছা করে 'গিলা' অর্থাৎ নরম করা চাই, আর যত শীগ্‌গির সম্ভব তৈরী করা চাই।"

তারপরেই প্রতিমা ডাক্তার মিত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে গিয়ে স্নান করতে ঢুকলেন স্নানের ঘরে; আর আমরা চার বন্ধুতে চল্লুম সমুদ্র-স্নানে। সমুদ্র কোন্ দিকে জানি না, মন্দির কোনদিকে তাও জানি না, লোককে জিজ্ঞেস্ ক'রে ক'রে চল্লুম সমুদ্রের দিকে। খানিকক্ষণ পরেই এসে পৌছলুম মন্দিরের গোপুরম্-এ (প্রবেশ-দ্বারে); শুনলুম এবার মন্দিরের মধ্য দিয়েই সোজাসুজি গিয়ে পৌছতে হবে সাগরে। মন্দিরে প্রবেশ করেই দুধারে দোকান-পাটের সারি; ফুল, মালা, কলা, নারিকেল, শঙ্খ, শঙ্খের মালা, মন্দিরের ছবি ইত্যাদি কেনা-বেচা হচ্ছে। এগুলি পার হয়ে গিয়ে আমরা বাঁ দিকের চত্বরে পড়লুম। দু-পাশে নানা কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভের সারি, উপরে ছাদেও বড় বড় শিলানের উপর নানা রকম কাজ। দেখে স্পষ্টই মনে হ'ল, দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দির! দু-পাশের স্তম্ভসারি যদিও সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, তবুও মন্দিরের অপর প্রান্তে, মনে হয় যেন আর সমান্তরাল নেই, যেন দুইতে মিলিত হয়ে একটি কোণের সৃষ্টি করেছে, আর সেই কোণের মধ্য দিয়ে ও-পাশে যাবার পথ। এইভাবে আমরা প্রায় দুই ফার্লং পথ অতিক্রম ক'রে আসল মন্দিরটি ডান দিকে রেখে গিয়ে পৌছলুম অপর দিকে সমুদ্রের পথে। মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার পথে চল্‌লুম, ছাই রং-এর বালুকারাশির উপর দিয়ে অদূর সমুদ্রের পানে। ক'মিনিটের মধ্যেই আমরা এসে দাঁড়ালুম বেলা তটে! ওঃ হরি! এই কি সমুদ্র, না আছে উত্তাল তরঙ্গ, না আছে ঢেউয়ের মাথায় রূপালী ফেনার মুকুট, না আছে জলের শব্দ! মনে একটা হতাশের ভাব এল, তবু স্নান ত করা চাই, ভেবে নামলুম জলে, আর সঙ্গে সঙ্গে পা বসে গেল বালুকামিশ্রিত কাদায়! সেই ঘোলাটে জলেই খানিক দূর এগিয়ে গেলুম; আশা ছিল পরে বোধ হয় ভাল জল পাব; কিন্তু সে আশায়ও ছাই পড়ল, কেন না, পেলুম পায়ের নীচেয় আগাছার জঙ্গল! সাঁতার কাটবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু লাভ হ'ল শুধু মুখের ভিতর এসে ঢুকল খানিকটা বিস্বাদ নোনা জল! ভাবলুম যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়; কোন রকমে দুটো ডুব দিয়েই কাদা ভেঙ্গে উঠে এলুম। বন্ধুরাও হৈ-চৈ ক'রে কোন রকমে 'কাক-স্নান' সেরে উঠে এলেন উপরে! ডাক্তার চাটার্জ্জি বল্লেন, এবার বুঝতে পেরেছি, কেন লোকেরা ধনুষকোডিতে স্নান ক'রে তবে রামেশ্বরে পূজো দিতে আসে! ডাক্তার নায়ক পুরীর লোক, সুতরাং এরকম সমুদ্র-স্নান করে তাঁর মুখের ভাবখানাই হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী শোচনীয়, না দেখলে তা বলে অথবা লিখে বুঝানো শক্ত! ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "ভাগ্যিস্, মিসেস্ পাল আসেন নি!"

আমি বল্লুম, "আমাদেরও তার মতই সমুদ্র স্নানটা বাথ-রুমেই সেরে নিলে বোধ হয় ভাল হ'ত। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি।"

আবার আমরা ফিরলুম মন্দিরের পথে! যেতে যেতে ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "মন্দিরের মধ্যেই আসতে হবে জানলে, সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে আসতুম, একসঙ্গে পূজো শেষ ক'রে যাওয়া হ'ত!"

নায়ক বল্লেন "হাঁ, একসঙ্গে দু'কাজই হয়ে যেত।"

চাটার্জ্জি বল্লেন "কিন্তু বন্ধুপত্নীর যে আসা হ'ত না!"

নায়ক বল্লেন, "তাও ত বটে!"

আমি নির্ব্বাকভাবে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দেখা গেল আমাদের নধরকান্তি, গৌরবর্ণ পুরুত ঠাকুরটি সেদিকে আমাদেরই সন্ধানে আসছে। আমরা স্নান ক'রে ফিরে যাচ্ছি দেখে সে বল্লে, "আপনাদের স্নান হয়ে গেছে, তবে এখন পূজা দিতে মন্দিরে আসুন।" ডাক্তার মিত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "আমরা টাকা পয়সা ত কিছু সঙ্গে আনি নি; পাণ্ডা ঠাকুর, আপনি যদি কিছু ধার দেন এখনকার মত, তবে পূজোটা সেরে নেই!"

কথাটা শুনে পাণ্ডা ঠাকুরের মুখের ভাবটা একেবারে অন্য রকমের হয়ে গেল, বল্লে "তা আপনারা ধরমশালায় গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসুন, আমার একটু কাজ আছে, বড্ড তাড়াতাড়ি, আমি আসি তবে!" বলেই পাশ কাটিয়ে ত্বরিতপদে পাণ্ডাঠাকুর অন্তর্ধান হলেন। আমরা চারজনে একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠ্লুম। ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "বেটা কথাটা সত্যিই ভেবেছে, কোথায় দু-পয়সা লাভ করবে, তা না হয়ে 'উল্টা বুঝলি রাম' হয়ে গেল; যাত্রীরা আবার ধার চেয়ে বসল, বেচারা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল।" আমরা এবার মন্দির ডান দিকে রেখে ও পাশের চত্বর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। কথা হ'ল যদি ফিরে এসে শীগ্‌গির পূজা শেষ হয়ে যায়, তবে সেদিনের ইণ্ডো-সিলোন্ এক্‌স্‌প্রেসেই রামেশ্বর ছেড়ে যাবো, কারণ ওখানে থাকার কোন সুবিধাও নেই এবং সার্থকতাও নেই।

মিসেস্ পাল স্নান করে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তিনি আমাদের সমুদ্র স্নানের বিড়ম্বনার কথা শুনে হেসেই খুন, আর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছিলেন, "ভালই করেছি আমি যাই নি, ও-ভাবে আমি কখনও চান্ করতে পারতুম না।" ততক্ষণে ডাক্তার মিত্র আবার গেলেন ঠাকুরকে "ভাত আচ্ছা করে গিলা করা চাই" বলতে! আর আমরা কুয়োর জলে কোন রকমে হাত মুখটা ধুয়ে সমুদ্র স্নানের দোষটা কাটিয়ে নিলুম এবং অনতিবিলম্বে আবার রওয়ানা হলুম মন্দিরের দিকে, তিন বন্ধু ও পত্নীসহ আমি! সেদিন রামেশ্বরের আকাশে মেঘ করেছিল এবং ক'মিনিট আগে ছোটখাটো এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিছলো, তাই আমাদের খুব গরম ভোগ করতে হয় নি সেখানে। এবারও আমরা আগের পথেই মন্দিরে ঢুকলুম, চাটার্জ্জি সকলের হয়ে কি ফুল মালা ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। এবার আম চারজনই মিসেস্ পালের গাইড। এটা দেখ, ওটা দেখ কী চমৎকার ইত্যাদি বলে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা আসল মন্দিরের দিকে! বাঁ দিকের চত্বরটা প হয়ে ডানে মোড়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছ রামেশ্বরের দ্বারে! এই মন্দিরটির চূড়া সোনার পা মোড়া, কারুকার্য্যও অতি চমৎকার, আমরা খানিক দাঁড়িয়ে তার পানে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলু তার পরেই আমরা খানিক এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলুম মনি প্রাঙ্গণে—যেখানে সোনালী ধ্বজস্তম্ভ অবস্থিত! এটি দা ভারতের প্রত্যেক মন্দিরের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ! ত পরেই রামেশ্বর শিবের বাহন প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় প্রস্তর নি ষাঁড়। আমরা তার পরেই গিয়ে পৌঁছলুম আসল মন্দি দ্বারে। তখন মন্দিরে একেবারেই ভীড় ছিল না, সুত আমাদের রামেশ্বর-শিবকে মনের মত দর্শনের কোন বা ছিল না। পুরুত এগিয়ে এসে বল্লে, "পূজার টি কোথায়?"

সে আবার কি? গাড়ীর টিকেট ত রামেশ্বর স্টেশ দিয়ে এসেছি! মন্দিরেও আবার টিকেট, সে কি?

পুরুত হেসে বল্লে, "রামেশ্বরের পূজার ভার একটি নিয়েছেন, তারাই পূজার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। বা কর্ম্মচারীর কাছে টিকেট পাওয়া যাবে কিনতে। নিয়ে এলে পূজো হবে, আর আপনাদের যার যা ইচ্ছা দেবেন ঐ শীল করা বাক্সের মধ্যে।" বলে দুটা প্র তালাবন্ধ শীল-করা বাক্স দেখিয়ে দিলে। পাণ্ড অত্যাচার হতে যাত্রীদের রক্ষা করতে ব্যবস্থাটা ভাল মনে হ'ল। আমি তখন পত্নী ও বন্ধুদের সেখানে পূজার টিকিট কাটতে গেলুম বাইরে, আর একজন লো পয়সা দিলুম পূজার জন্য কিছু ফলমূল কিনে আন নগদ সওয়া পাঁচ আনা মূল্যের চারখানি টিকেট আমি ফিরে এলুম, তখন আমাদের পূজা আরম্ভ এক একজনের করে। পুরুত এক একবার অবোধ্য বিড়্ বিড়্ করে মন্ত্র পড়ে, তারপর পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে অ করে, আর এসে নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করে। ন গোত্র বার কয় উচ্চারণ করে ঠিক করে নিয়ে আবা

ও পূজা শেষ করতে। এমনই করে প্রথম আমাদের, তৎপর ডাক্তার নায়কের পূজা শেষ হ'ল! তারপর পূজার সময় চাটার্জ্জিকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বল্লুম পূজা হবে মিসেস্ চাটার্জ্জির নামে। পুরুত কথাটা ঠিক বুঝতে পেরে হেসে বল্লে "শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, তস্য ধর্ম্মপত্নী—" আমি শৈলেনকে খোঁচা দিয়ে বল্লুম নামটা বলে দাও। একগাল হেসে বন্ধু "শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী"র নাম উল্লেখ করলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ও তস্য পত্নীর সংযুক্ত নামেই পূজা শেষ হ'ল! ডাক্তার মিত্র নিজের পিতার নামেই পূজা দিলেন। পূজা শেষ করে আমরা যার যা ইচ্ছা দর্শনী বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলুম। তার পরেই আমরা গিয়ে প্রণাম করলুম রামেশ্বর শিবের স্থাপয়িতা যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে। কথিত আছে রাবণ-বধের পর রাবণের ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের বিগ্রহকে লঙ্কা হ'তে নিয়ে এসে তিনিই এখানে স্থাপন করেন, এজন্যই এখানকার ঠাকুরের নাম রামেশ্বর। এখান হতেই সেতুবন্ধের আরম্ভ হয়েছিল, সেজন্য দুটি নামযুক্ত করে বলা হয় সেতুবন্ধ রামেশ্বর। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণময় মূর্ত্তির কাছেই সীতা ও লক্ষ্মণের স্বর্ণমূর্ত্তি, সম্মুখেই উপবিষ্ট ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান। আমরা ভক্তিভরে তাদের কাছে মস্তক নত করে এবং তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, তথন পুরুত ঠাকুর ও সেথানে উপস্থিত আরও ক'জন নিজের মূর্ত্তি ধরলে, অর্থাৎ "আমাদের দাও।" বুঝতে পারলুম ট্রাষ্ট্ এত করেও পাণ্ডাদের সংযত করতে পারেন নি, আমরা যা হোক কিছু দিয়ে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে গেলুম।

আমাদের গাড়ীর সময় নিকটবর্ত্তী, তাই যত শীগ্‌গির সম্ভব মন্দির-পরিক্রমা শেষ করে গোপুরম্-এর কাছে পৌছাতেই প্রতিমা বল্লেন, "শঙ্খ কিন্‌বো!" বন্ধুরা একটু বিরক্তিসহকারেই মত দিলেন, তথন আমরাও কিছু কিছু কিনলুম, ওরাও বাদ গেলেন না, আমাদের প্রায় আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল সেখানে। ফলে আমাদের ছুটতে হ'ল! ঊর্দ্ধশ্বাসে ধরমশালায় পৌছে, কেউ বা লাগলেন কসে পোটলা-পুটুলি গুছোতে, কেউ বা ঝট্‌কা ডাকতে, আর কেউ বা থাবারের ব্যবস্থা কতদূর হয়েছে দেখতে। তথন আর থাবার সময় ছিল না, আমি বল্লুম, "থাবার টিফিন্ কেরিয়ারে উঠিয়ে নিয়ে যাব, গাড়ীতেই বসে থাব!" বন্ধুরাও তাতে মত করলেন, আমি তথন উনোনের কাছ থেকে ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দুটি টিফিন কেরিয়ারে পুরে নিলুম যা হয়েছে তাই। কি হয়েছে আর কি হয় নি, দেখবার সময় মোটেই ছিল না, কারণ গাড়ী ছাড়বার আর মোটে আধঘণ্টা দেরী! এ'রকম হৈ চৈ করেই আমাদের মোট বোঝা সব চাপানো হ'ল ঝটকার উপর; আর আমরাও দেবাদিদেব রামেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে ধরমশালা ছেড়ে রওয়ানা হলুম রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে।

হেমন্ত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কুয়াসা জালে পড়েছে বাঁধা সকলি
রাতের তারা আকাশে উঠে বিকলি,
অরুণ আলো ফোটে না আর উষাতে
প্রকৃতিরাণী সাজে না ফুল ভূষাতে।
ঘাসের পরে মতির মালা ছড়ানো
জগৎ আজি কুহেলি জালে জড়ানো।

চাটার্জ্জি বল্লেন "কিন্তু বন্ধুপত্নীর যে আসা হ'ত না!"

নায়ক বল্লেন, "তাও ত বটে!"

আমি নির্ব্বাকভাবে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দেখা গেল আমাদের নধরকান্তি, গৌরবর্ণ পুরুত ঠাকুরটি সেদিকে আমাদেরই সন্ধানে আসছে। আমরা স্নান ক'রে ফিরে যাচ্ছি দেখে সে বল্লে, "আপনাদের স্নান হয়ে গেছে, তবে এখন পূজা দিতে মন্দিরে আসুন।" ডাক্তার মিত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "আমরা টাকা পয়সা ত কিছু সঙ্গে আনি নি; পাণ্ডা ঠাকুর, আপনি যদি কিছু ধার দেন এখনকার মত, তবে পূজোটা সেরে নেই!"

কথাটা শুনে পাণ্ডা ঠাকুরের মুখের ভাবটা একেবারে অন্য রকমের হয়ে গেল, বল্লে "তা আপনারা ধরমশালায় গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসুন, আমার একটু কাজ আছে, বড্ড তাড়াতাড়ি, আমি আসি তবে!" বলেই পাশ কাটিয়ে ত্বরিতপদে পাণ্ডাঠাকুর অন্তর্ধান হলেন। আমরা চারজনে একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লুম। ডাক্তার মিত্র বল্লেন, "বেটা কথাটা সত্যিই ভেবেছে, কোথায় দু-পয়সা লাভ করবে, তা না হয়ে 'উল্টা বুঝলি রাম' হয়ে গেল; যাত্রীরা আবার ধার চেয়ে বসল, বেচারা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল।" আমরা এবার মন্দির ডান দিকে রেখে ও পাশের চত্বর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। কথা হ'ল যদি ফিরে এসে শীগ্‌গির পূজা শেষ হয়ে যায়, তবে সেদিনের ইণ্ডো-সিলোন্ এক্‌স্‌প্রেসেই রামেশ্বর ছেড়ে যাবো, কারণ ওখানে থাকার কোন সুবিধাও নেই এবং সার্থকতাও নেই।

মিসেস্ পাল স্নান করে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তিনি আমাদের সমুদ্র স্নানের বিড়ম্বনার কথা শুনে হেসেই খুন, আর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলছিলেন, "ভালই করেছি আমি যাই নি, ও-ভাবে আমি কখনও চান্ করতে পারতুম না।" ততক্ষণে ডাক্তার মিত্র আবার গেলেন ঠাকুরকে 'ভাত আচ্ছা করে গিলা করা চাই" বলতে! আর আমরা কুয়োর জলে কোন রকমে হাত মুখটা ধুয়ে সমুদ্র স্নানের দোষটা কাটিয়ে নিলুম এবং অনতিবিলম্বে আবার রওয়ানা হলুম মন্দিরের দিকে, তিন বন্ধু ও পত্নীসহ আমি! সেদিন রামেশ্বরের আকাশে মেঘ করেছিল এবং 'ক'মিনিট' আগে ছোটখাটো এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিছলো, তাই আমাদের খুব গরম ভোগ করতে হয় নি সেখানে। এবারও আমরা আগের পথেই মন্দিরে ঢুকলুম, চাটার্জ্জি সকলের হয়ে কিছু ফুল মালা ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। এবার আমরা চারজনই মিসেস্ পালের গাইড। এটা দেখ, ওটা দেখুন, কী চমৎকার ইত্যাদি বলে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম আমরা আসল মন্দিরের দিকে! বাঁ দিকের চত্বরটা পার হয়ে ডানে মোড়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে আমরা পৌছলুম রামেশ্বরের দ্বারে! এই মন্দিরটির চূড়া সোনার পাতে মোড়া, কারুকার্য্যও অতি চমৎকার, আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পানে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তার পরেই আমরা খানিক এগিয়ে গিয়ে পৌছলুম মন্দির-প্রাঙ্গণে—যেখানে সোনালী ধ্বজস্তম্ভ অবস্থিত! এটি দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ! তার পরেই রামেশ্বর শিবের বাহন প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড়। আমরা তার পরেই গিয়ে পৌছলুম আসল মন্দিরের দ্বারে। তখন মন্দিরে একেবারেই ভীড় ছিল না, সুতরাং আমাদের রামেশ্বর-শিবকে মনের মত দর্শনের কোন বাধাই ছিল না। পুরুত এগিয়ে এসে বল্লে, "পূজার টিকিট কোথায়?"

সে আবার কি? গাড়ীর টিকেট ত রামেশ্বর স্টেশনেই দিয়ে এসেছি! মন্দিরেও আবার টিকেট, সে কি?

পুরুত হেসে বল্লে, "রামেশ্বরের পূজার ভার একটি ট্রাস্ট নিয়েছেন, তারাই পূজার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। বাইরে কর্ম্মচারীর কাছে টিকেট পাওয়া যাবে কিনতে। সে নিয়ে এলে পূজো হবে, আর আপনাদের যার যা ইচ্ছা দর্শনী দেবেন ঐ শীল করা বাক্সের মধ্যে।" বলে দুটা প্রকাণ্ড তালাবন্ধ শীল-করা বাক্স দেখিয়ে দিলে। পাণ্ডাদের অত্যাচার হতে যাত্রীদের রক্ষা করতে ব্যবস্থাটা ভাল বলেই মনে হ'ল। আমি তখন পত্নী ও বন্ধুদের সেখানে রেখে পূজার টিকিট কাটতে গেলুম বাইরে, আর একজন লোককে পয়সা দিলুম পূজার জন্য কিছু ফলমূল কিনে আনতে। নগদ সওয়া পাঁচ আনা মূল্যের চারখানি টিকেট কেটে আমি ফিরে এলুম, তখন আমাদের পূজা আরম্ভ হ'ল এক একজনের করে। পুরুত এক একবার অবোধ্য ভাষায় বিড়্ বিড়্ করে মন্ত্র পড়ে, তারপর পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করে, আর এসে নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করে। নাম ও গোত্র বার বার উচ্চারণ করে ঠিক করে নিয়ে আবার যায়

ও পূজা শেষ করতে। এমনই করে প্রথম আমাদের, তৎপর ডাক্তার নায়কের পূজা শেষ হ'ল! তারপর পূজার সময় চাটার্জ্জিকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বল্লুম পূজা হবে মিসেস্ চাটার্জ্জির নামে। পুরুত কথাটা ঠিক বুঝতে পেরে হেসে বল্লে "শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, তস্য ধর্ম্মপত্নী—" আমি শৈলেনকে খোঁচা দিয়ে বল্লুম নামটা বলে দাও। একগাল হেসে বন্ধু "শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী"র নাম উল্লেখ করলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ও তস্য পত্নীর সংযুক্ত নামেই পূজা শেষ হ'ল! ডাক্তার মিত্র নিজের পিতার নামেই পূজা দিলেন। পূজা শেষ করে আমরা যার যা ইচ্ছা দর্শনী বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলুম। তার পরেই আমরা গিয়ে প্রণাম করলুম রামেশ্বর শিবের স্থাপয়িতা যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে। কথিত আছে রাবণ-বধের পর রাবণের ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের বিগ্রহকে লঙ্কা হ'তে নিয়ে এসে তিনিই এখানে স্থাপন করেন, এজন্যই এখানকার ঠাকুরের নাম রামেশ্বর। এখান হতেই সেতুবন্ধের আরম্ভ হয়েছিল, সেজন্য দুটি নামযুক্ত করে বলা হয় সেতুবন্ধ রামেশ্বর। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণময় মূর্ত্তির কাছেই সীতা ও লক্ষ্মণের স্বর্ণমূর্ত্তি, সম্মুখেই উপবিষ্ট ভক্তশ্রেষ্ঠ হনূমান। আমরা ভক্তিভরে তাদের কাছে মস্তক নত করে এবং তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, তখন পুরুত ঠাকুর ও সেখানে উপস্থিত আরও ক'জন নিজের মূর্ত্তি ধরলে, অর্থাৎ "আমাদের দাও।" বুঝতে পারলুম ট্রাষ্ট্ এত করেও পাণ্ডাদের সংযত করতে পারেন নি, আমরা যা হোক কিছু দিয়ে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে গেলুম।

আমাদের গাড়ীর সময় নিকটবর্ত্তী, তাই যত শীগ্‌গির সম্ভব মন্দির-পরিক্রমা শেষ করে গোপুরম্-এর কাছে পৌঁছাতেই প্রতিমা বল্লেন, "শঙ্খ কিন্‌বো!" বন্ধুরা একটু বিরক্তিসহকারেই মত দিলেন, তখন আমরাও কিছু কিছু কিনলুম, ওরাও বাদ গেলেন না, আমাদের প্রায় আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল সেখানে। ফলে আমাদের ছুটতে হ'ল! ঊর্দ্ধশ্বাসে ধরমশালায় পৌঁছে, কেউ বা লাগলেন কসে পোটলা-পুটুলি গুছোতে, কেউ বা ঝট্‌কা ডাকতে, আর কেউ বা খাবারের ব্যবস্থা কতদূর হয়েছে দেখতে। তখন আর খাবার সময় ছিল না, আমি বল্লুম, "খাবার টিফিন্ কেরিয়ারে উঠিয়ে নিয়ে যাব, গাড়ীতেই বসে খাব!" বন্ধুরাও তাতে মত করলেন, আমি তখন উনোনের কাছ্ থেকে ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দুটি টিফিন কেরিয়ারে পুরে নিলুম যা হয়েছে তাই। কি হয়েছে, আর কি হয় নি, দেখবার সময় মোটেই ছিল না, কারণ গাড়ী ছাড়বার আর মোটে আধঘণ্টা দেরী! এ'রকম হৈ চৈ করেই আমাদের মোট বোঝা সব চাপানো হ'ল ঝটকার উপর; আর আমরাও দেবাদিদেব রামেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে ধরমশালা ছেড়ে রওয়ানা হলুম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে।

হেমন্ত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কুয়াসা জালে পড়েছে বাঁধা সকলি
রাতের তারা আকাশে উঠে বিকলি,
অরুণ আলো ফোটে না আর উষাতে
প্রকৃতিরাণী সাজে না ফুল ভূষাতে।
ঘাসের পরে মতির মালা ছড়ানো
জগৎ আজি কুহেলি জালে জড়ানো।

কাক ডাকে কা কা

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

পুরো তিনটি মাসও হয়নি নিখিল এই নতুন ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে এসেছে, এরই মধ্যে তা'র স্ত্রী প্রভারাণী হ'য়ে উঠলো পুরোদস্তুর অতিষ্ঠ!

আগের বাড়ীটাতে অসুবিধা ছিল বিস্তর। উত্তরমুখো, স্যাঁৎসেঁতে, ঘুপ্‌সি! নতুন বাড়ীতে এসে অবধি নিখিল যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচছিল।

এ বাড়ীটাতে কুঠুরীর সংখ্যা কম, অথচ ভাড়া দু'টাকা বেশী। দক্ষিণটা অধিক হ'লেও দক্ষিণটা ছিল যা'-হোক্ কিছু খোলা, পূবের রোদের খবরটাও পাওয়া যেত কিছু-কিছু, আবার বাড়ীর মধ্যে ছোট্ট একখানি উঠোনের অস্তিত্বও ছিল। বেশী ভাড়া দিয়েও নিখিল খুশীই হ'য়েছিল বলতে হবে।

কিন্তু এত সব সুখসুবিধা সত্ত্বেও, সেদিন সকাল বেলা চা দিতে এসে প্রভারাণী সরোষে নিখিলকে জানিয়ে দিলে, এ বাড়ীতে তার তিষ্টানো দায় হ'য়ে উঠেছে, শীগ্‌গিরই আর একখানা বাড়ী না দেখলেই নয়!

নিখিল প্রথমত কথাটা গায়েই মাখল না। বিবাহিত জীবনের এই সুদীর্ঘ চার বছর ধ'রে, প্রভার কত কথাই তো সে ওরকম শুনে আস্‌ছে!

তাই, বেশ সহজ গলায়ই জিজ্ঞাসা করলে: আজ বুঝি চায়ের নতুন প্যাক্‌টা খোলা হয়েছে? রংটা কিন্তু…

উত্তেজিতা প্রভা বাধা দিয়ে বিরক্তভাবে জবাব দিলে: না, পুরণো চা-ই খানিকটা ছিলো। কিন্তু আমি যা বললুম, সেটা শোনা হ'ল কিছু?

নিখিল থতমত খেয়ে ব'লে ফেলল: নিশ্চয়ই! কি হয়েছে বল! ব'লে, চায়ের কাপ্ মুখে তুলল।

প্রভা পুনশ্চ তার বক্তব্যটা বেশ স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবেই নিখিলকে অবগত করিয়ে দিলে, নতুন বাড়ী দেখতে হ'বে।

হাতের রুটিখানা ঠোঁটের কাছাকাছি নিয়েও নিখিল সেটাকে নামিয়ে আনল। তারপর প্রভার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে: অর্থাৎ?

—অর্থাৎ মানে? অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রভার প্রশ্ন হ'ল।

—কিসে এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে?

প্রভা তার অভিযোগ এবং কারণাদি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে ফেলল। শুনে, নিখিল উঠল হা-হা ক'রে হেসে: এই কারণ! আমি ভাবলুম না জানি কি! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি!

নিশ্চিন্ত মনে নিখিল চায়ের স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল, রুটি সহযোগে।

প্রভা গেল আরও চ'টে। বললে: তুমি তো হাসবেই! টের তো আর পেতে হয় না নিজের কিছু! আমি অতশত বুঝি না, হয় এর একটা বিহিত কর, নয় তো এ বাড়ী বদ্‌লাও! আমার আর এ সহ্য হয় না!

নিখিল কিন্তু তেমনি হাসতেই লাগল।

বললে: আরে, এতে আর কি হয়েছে, তোমায় ত আর খেয়ে ফেলছে না! একটু স'য়ে থাকলেই হ'ল! এর জন্যে বাড়ী বদ্‌লানো—লোকে শুনলে হাসবে যে!

হাসুক্ গে, ঠোঁট ফুলিয়ে প্রভা ব'ললে: তারা হাসল তো আমার ভারী ব'য়েই গেল! দুঃখটি জানবার বেলায় সবাই বোঁধেন বড়!

নিখিল কথাটা উড়িয়ে দেবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি বললে: আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ক'রে তাড়া ক'ষে দিলেই দেখবে পালাবার আর পথ পাবে না! ব'লে চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

প্রভা তবু বললে: হ্যাঁ, তাড়ালে যাবে কি-না! ওসব ঢের ক'রে দেখেছি এতদিন ধ'রে, ওতে কিচ্ছু হবে না! যে বজ্জাত!

নিখিল কৃত্রিম বিস্ময়ে ব'লে উঠল: বল কি, তাড়ালেও যায় না, ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে! এতখানি ম'জে গেছে, এ তো বড় ভয়ানক কথা!

প্রভা মুখভার ক'রে বললে: যাও যাও, সব সময়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না। এই আবার ব'লে দিচ্ছি, এর একটা কিছু না করলে, দাদা আসছে ক'দিন বাদে, আমি তার সাথেই এখান থেকে চ'লে যাব!

ব'লে আঁচল সুদ্ধ, চাবির গোছাটি ঝনাৎ ক'রে পিঠের উপর ফেলে প্রভা গমনোদ্যতা হ'ল।

নিখিল অকস্মাৎ যেন সমগ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব এক নিমেষেই উপলব্ধি ক'রে ফেলল। ব্যস্ত হ'য়ে বললে: তবে যা'-হোক একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে!

প্রভা একটু দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে: কি করবে, শুনি?

শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের শূন্য কাপটা প্রভার দিকে এগিয়ে ধ'রে নিখিল বললে: আহা, তা কি অমন চট্ ক'রে বলা যায়! ভাবতে হবে, তবে না! যাক্, এখন দয়া ক'রে আর এক কাপ্ চা নিয়ে এস তো, লক্ষ্মীটি! চা খেতে খেতে ভাবি!

প্রভা খালি-কাপ্‌টা নিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল।

তা অতিষ্ঠ হবারই কথা।

সেই ভোর বেলা, যখন চারদিক ভাল ক'রে ফর্সাও হয় না, তখন

থেকে যতক্ষণ না অন্ধকার ঘোর হবে, প্রভার একটা চোখ, একটা কান সব সময়ে সতর্ক ক'রে রাখতে হয়, কখন কি ঘটে যায়! তবু কি পারা যায়!

সারা পৃথিবীতে যেন ওই একটাই কাক, আর সেটা মরেছে এসে এই বাড়ীতে, শুধু প্রভারাণীকে জ্বালিয়ে খেতে। সারা বিশ্বে বাড়ীও যেন আর কোথাও নেই!

ওর স্বজাতির আর দু-একটা যে কচিৎ কদাচিৎ না আসে এমন নয়, তবে তারা ওর দাপটেই হোক্, অন্য কোনও কারণেই হোক্, আসে আবার চ'লে যায়। কিন্তু 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য'-ভাব নিয়ে উনি যেন এ বাড়ীতে একচ্ছত্র সম্রাট! চঞ্চল, ক্ষিপ্র ওর গতি, সর্বদা সন্ত্রস্ত, সতর্ক ভাব। নন্দ চাকরটাও ওর সাথে এঁটে উঠতে পারে না, ধড়ীবাজ ও এমনি!

নিখিলের রান্নাঘরের পূর্বদিকটা ঘেঁষেই একটা নিমগাছে ওর রাতের আশ্রয় এবং বিপদকালীন নিরাপদ দুর্গ। আর, সারাটা দিন সে তো নিখিলের পরিবারেরই বিশিষ্ট একজন!

বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙবার বহুপূর্বেই ওর ঘুম ভাঙে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রভা তা টের পায়, ওর পরিচিত, তীক্ষ্ণ ডাক শুনে। তারপর প্রভা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ও নিশ্চয় ব'সে আছে রান্নাঘরের আল্‌সেতে, নয় তো খিড়কি দরজাটার উপর, নয় তো আর কোথাও।

প্রভাকে দেখেই কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে দু-চারটে ডাক দেয়, যেন বলে: এলুম!

প্রভাও চোখ পাকিয়ে বলে: এলে? বেশ!

সেই থেকে সুরু হয় ওর দৈনন্দিন উৎপাত আর অত্যাচার!

অত্যাচার বই কি!

এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে বাড়ীময় করা যেন ওর একটা মস্ত কাজ। শেষটায় গোবর ছড়িয়ে হয়রাণ হতে হয় প্রভারাণীকে। নন্দ ঢিল ছুঁড়ে মারে, ওর গায়ে লাগে না, টুপ্ ক'রে লাফিয়ে স'রে যায়।

বাইরে কোথাও একটি জিনিষ রাখবে, তা'র জো কি! খাবার বস্তু হ'লে তো কথাই নেই, অভক্ষ্য জিনিসগুলোতে অবধি ঠোক্ মেরে দেখবেই কয়েকবার! আর, নিয়ে পালিয়ে যাবার মত পদার্থ হ'লে কার্য্যতও তা করতে একতিল বিলম্ব হয় না। একটু অসতর্ক হয়েছে কি একটা কিছু ঘটে যাবেই!

প্রভা চ্যাচাতে থাকে: কি অলুক্ষুণে হাবাতে কাক রে বাবা! কোত্থেকে এ ভুষুণ্ডী এসে ভর করেছে, একদণ্ড যদি নিশ্চিন্ত হ'তে দেবে! হুস্, হুস্!

ভুষুণ্ডী উড়ে গিয়ে বসে ওদিককার বাঁশটার আগায়। ব'সে প্রভার কথাগুলো শোনে। অবশেষে, প্রভা যখন একখানা কাঠ উঁচিয়ে এগিয়ে যায়, তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় একেবারে নিমগাছের ডালে। সেখান থেকে মাথা হেলিয়ে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, অতঃপর প্রভারাণী কি করে।

খানিকবাদে আবার চারিদিক একটু ঠাণ্ডা হ'তেই নিঃশব্দে নেমে এসে এখানে ওখানে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে থাকে। প্রভাও আবার বেরিয়ে এসে তাড়াহুড়ো আরম্ভ ক'রে দেয়।

নিখিলের মাইনে বেশী নয়; অথচ তা'ই দিয়েই সংসার চালাতে হয়।

প্রভা নিজেই রান্না করে, গৃহস্থালী কাজকর্ম ছাড়াও। চার টাকা মাইনেতে ছোকরা চাকর নন্দকে রাখা হয়েছে, নইলে সত্যিই চলে না।

সকালবেলা নন্দ উনুন ধরিয়ে দিয়ে। প্রভা কেৎলি ক'রে চায়ের জল চাপিয়ে নন্দকে ডেকে বললে: যা তো নন্দ, চট্ ক'রে চার পয়সার মাখন নিয়ে আয় তো!

নন্দ পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল, প্রভাও এদিকে চায়ের সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় বসল।…

নন্দ যতক্ষণ না ফিরে আসে, তারই মধ্যে পাঁউরুটিখানা স্লাইস্ ক'রে সেঁকে ফেলবে, জলও ততক্ষণে ফুটে যাবে।

প্রভারাণী রুটির বুকে ছুরি চালাতে লাগল।

কয়েকখানা স্লাইস্ কাটা হয়েছে, এমনি সময়ে জল ফুটে উথ্‌লে উনুনে পড়বার শব্দে প্রভা তাড় তাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। যাবার আগে, চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশ ক'রে চারিদিকটা একবার দেখে নিলে, ভুষুণ্ডী কাছাকাছি কোথাও আছে কি-না।

নেই। যাক্।

আর, ঘর থেকে কেৎলিটা নিয়ে আসবে, এইটুকু তো সময়!

রান্নাঘরে ঢুকে গরম হাতলটা আঁচল দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে কেৎলিটা সবে উনুন থেকে তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে বাইরে একটা ছটোপুটি শব্দ এবং তারই সাথে নন্দর সশব্দ চীৎকার: নিলে মা, নিলে!…ঐ যাঃ, নিয়েছে! দূর্ দূর্!

আচম্কা গোলমালে প্রভা উঠল চমকে, খানিকটা সন্তফুটন্ত জল পড়ল এসে তা'র পায়ের উপর। যন্ত্রণায় মুখখানি কুঞ্চিত ক'রে বাইরে এসে দেখে, আর কিছুই নয়, ভুষুণ্ডী এক স্লাইস্ রুটি নিয়ে পালিয়েছে। নন্দ ঠিক সময়ে এসে না পড়লে, হয় তো আরও নিত!

একে পায়ের যন্ত্রণা, তার উপর এই কাণ্ড, প্রভা গেল ক্ষেপে। কেৎলিটা দুম্ ক'রে মেঝেয় রেখে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল: মরণ হয়েছে আমার! মুখপোড়ার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ম'লুম! কাক তো নয়, যেন ডাকাত্! একটু যদি নিঃশ্বাস ফেলতে পাবো! মরতে ওর কি আর জায়গাও নেই ইত্যাদি।

রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে গরম জলে চা ছেড়ে রুটি সেঁকতে প্রভা আবার ঘরে ঢুকল। এবার নন্দকে বসিয়ে রেখে গেল বারান্দায়।

কিন্তু এ রকম ক'রে পাহারা দিয়ে কতক্ষণই বা চালানো যায়, সংসার ঘরে !

সুতরাং নিখিলকে চা দিতে গিয়ে প্রভারাণী যে উষ্মাপ্রকাশ ক'রে এল, সেটা অসঙ্গত কিছুই নয় !

এমনি খুঁটিনাটি কত না উৎপাত !

বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসে নন্দ কুটতে বসেছে, একটু অন্যমনস্ক হ'লে আর রক্ষে নেই, নিয়েই যাবে তার থেকে অন্তত একটা। কোথায় যে সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে ব'সে থাকে, আগে তা' কিছুতেই টের পাওয়া যাবে না। তা'রপর, হৈ চৈ লেগে গেলে সোজা পুবদিকের সই নিমগাছে, নয়তো পশ্চিমদিকের আমড়া গাছটার উঁচুডালে। প্রভাই বা তার আর কি করবে, নন্দই বা কি করবে !

এটায় মুখ দিচ্ছে, ওটায় ঠোঁট লাগাচ্ছে, কায়দামত পেলেই হ'ল। আবার চোরের মত রান্নাঘরে গিয়েও ঢুকেছে কতদিন, শেষটায় তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছে !

ওর দৃষ্টি থেকে এড়ায়ও না কিছু। কোথায় প্রভা তা'র চুলের কাঁটা ফিতে রেখে দিয়েছে, ও তা' খোঁজ ক'রে বের করবে। নিখিল হয় তো ভুলে তার দাঁত-বুরুষটা বাইরে রেখে গেছে, সেটাকে একবার নাড়াচাড়া করতেই হবে। নন্দ তার বিড়িটা কোথায় গুঁজে রাখল, বেহায়া সে সন্ধান অবধি রাখবে। তা ছাড়া, এঁটো আবর্জনা নোংরা ঘেঁটে সেই মুখ ঘটির জলে, বালতির জলে দিব্বি ডোবাচ্ছে, কোনও বাছবিচার নেই ! তাড়া দাও, গালমন্দ কর লজ্জা ব'লে বস্তু ওর আছে কি-না !

মাঝে মাঝে প্রভা ওঠে রীতিমত হাঁপিয়ে !

ডালটা চাপিয়ে সে হাত ধুচ্ছে, এমনি সময়ে কিসের শব্দ হ'ল, বাইরে বারান্দায়। প্রভা এল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে।

এসে দেখে, ভুষুণ্ডী চায়ের একটা খালি কাপ, নিয়ে টানাটানি করছে, তারই শব্দ। প্রভাকে দেখতে পেয়েই সেটা ফেলে দিলে চোঁ চা চম্পট !

বারান্দার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা ছিল শান-বাঁধানো। কাপ্‌টা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল গিয়ে সেইখানে। সুতরাং সেটা যে সশব্দে চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেল, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই হ'ল না।

খানিক স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রভা ডাকল : নন্দ !

নন্দ তখন বাড়ীতে ছিল না, বাটি-বাসনগুলো ধুয়ে বারান্দায় সাজিয়ে রেখে এইমাত্র নিখিলের সিগারেট আনতে গেছে।

প্রভা দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল।

একটু বাদেই নন্দ এল ফিরে। তাকে দেখতে পেয়েই প্রভা উঠল খেঁকিয়ে : কোথায় গেছলি তুই, হতভাগা পাজি !

নন্দ ব্যাপার কি, কিছুই জানে না। প্রভার মেজাজ দেখে হতভম্ব হ'য়ে সে বেচারা জবাব দিলে : বাবু পাঠিয়েছিলেন সিগারেট আনতে।

প্রভা উগ্রকণ্ঠে বললে : যাবার আগে বাসনগুলো ঘরে রেখে যেতে কি হাত ক্ষ'য়ে গেছল ? ওটার দাম এখন কে দেয়, শুনি !

ব'লে আঙুল দিয়ে কাপ-এর ভাঙ টুকরোগুলো দেখিয়ে দিলে। একবার মনে করলে, নিখিলকেও ডেকে দেখায়।

নন্দ এতক্ষণে বুঝল, ব্যাপার কি। বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে : কি ক'রে ভাঙলো, মা ! এখনি তো রেখে গেলুম !

প্রভা উত্তেজনায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে তিক্ত গলায় বললে : আর পারিনে বাপু, তোরা সব হয়েছিস্ সমান, আমার হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেলো !

একটু চুপ ক'রেই আবার বললে : তোরই বা আক্কেলখানা কি, ওগুলো রেখে গেলি বাইরে ! জানিস্‌নে কি ডাকাত এ বাড়ীতে আছে !

নন্দ এবার সবই বুঝতে পারল। কারণ, প্রভারাণী ও বিশেষ বিশেষণটি শুধু একটি জীবের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করত এবং নন্দও তা জানত। তা'ই সে ব'ললে : ও, সেই কাকটা ? আচ্ছা, বাবুর সিগারেট দিয়ে আসি, আজ দেখাচ্ছি ওকে।

এবম্বিধ আস্ফালন এবং প্রতিজ্ঞা নন্দ হামেসাই ক'রে থাকে, কিন্তু ভুষুণ্ডীর কিছুই সে ক'রে উঠতে পারে না। আজও তার বেশী কিছুই যে হ'ল না, একথা বলাই বাহুল্য। তার অশেষ চেষ্টা বিফল ক'রে, ভুষুণ্ডী নানাপ্রকার নিরাপদ জায়গায় ব'সে সন্দিগ্ধ এবং সতর্কভাবে দিব্বি সমস্তই লক্ষ্য ক'রতে লাগল। কাপ্‌টা ভাঙবার পর ওর সম্বন্ধেই একটা যে আলোচনা হয়েছে, সেটা সম্ভবত ওর নজর এড়ায়নি এবং তার পর থেকে নন্দর গতিবিধির ভাবগতিকও হয়তো বা নেহাৎ বন্ধুজনোচিত নয় ব'লে বুঝতে পেরেছিল কতকটা। তাই তার নাগাল পাওয়া নন্দর সাধ্যই হ'ল না।...

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে প্রভা শুয়েছে। নিখিল অফিস। নন্দও কাজকর্ম সেরে নিয়ে বাইরের ঘরটাতে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে শব্দ এল, ঠন্‌ঠন্ ঠনাৎ !

নন্দ উঠল লাফিয়ে, প্রভাও শশব্যস্তে বাইরে এল ছুটে।

কি হ'ল রে, ভাখ, তো নন্দ ! নন্দকে ডেকে প্রভা বললে।

নন্দ দেখ্‌ল, ভাঙা বালতিটা বাইরে বারান্দায় ছিল, সেটা নীচের প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর কাকটা বারান্দা থেকে, তাদের দেখেই দিলে ছুট ! কাজটি যে কার কৃত, সে কথা জলের মতই পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

প্রভা চাপারাগে বললে : নন্দ, তুলে রাখ বালতিটা। দুপুরবেলা একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে শোব, তারও কি জো আছে হাড়হাবাতের জ্বালায় ! ও বালতিটায় কি এমন ম'শো পঞ্চাশ ছিল যে ওটা নিয়ে লাগতে এসেছিল !

বালতিটা তুলে রেখে নন্দ বললে : কিছু না। কাজ তো নেই, তাই ক'রে বসল একটা ! বেহদ্দ পাজী !

ব'লেই, অকস্মাৎ চোখ কপালে তুলে গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল : এ যে একখানা হাড় দেখছি কিসের ! রাম রাম ! এ নিশ্চয়ই ওই নচ্ছারের কাজ, মা ! কোত্থেকে এনে এই বারান্দায় ফেলেছে !

প্রভা এগিয়ে এল।

বললে : কিসের হাড় রে ! ফেলে দে, ফেলে দে, শীগ্‌গির ! নাঃ, আর পারলুম না ! যা, এইবার খানিকটা গোবর নিয়ে আয়।

মোটের উপর, গৃহিণী এবং ভৃত্য উভয়ের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামসুখে অন্তত আধটি ঘণ্টা ব্যাঘাত জন্মিয়ে ভুষুণ্ডী সেই নিমগাছে তার জায়গাটিতে গিয়ে নির্ব্বিকারকল্প হ'য়ে ব'সে থাকল, পরবর্ত্তী সুযোগের অপেক্ষায়।

অষ্টপ্রহর চলছে এইরকম। যখন আর কোনও কাজ থাকে না, তখনও প্রভারাণীকে বিব্রত ক'রে তুলবার মত কাজের অভাব ভুষুণ্ডীর হয় না। যথা—

কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে, সে হয়তো এসে অযথা সেখানা ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়তে লেগে গেল। একপাশে ছিল একটা লঙ্কাগাছ তারই পাকা পাকা লঙ্কাগুলো এসে রাক্ষসের মত হয়তো বা গিলতে লাগল, নয়তো গাছের ডালগুলোকে মট্ মট্ ক'রে লাগল ভাঙতে ! পেঁপে গাছটায় ওর অত্যাচারে পেঁপে থাকে না একটাও। আর যদি কিছু না পাবে তো এসে ঝাঁটার কাঠিগুলো খামকা পটাপট টুক্‌রো করতে লেগে যাবে ! এম্‌নি সব।

এর উপর, তার সেই তীব্র, কর্কশ ডাকে বাড়ী শুদ্ধ সকলের কান যেত ঝালাপালা হ'য়ে। আবার, তারই মাঝে যখন কণ্ঠস্বরে একটা গদ্‌গদভাব এনে দু'লে দু'লে সে ডাকতে সুরু ক'রে দিত, প্রভা তার রকম দেখে, রাগতে গিয়ে ফেলত হেসে। ব'লত : আহা, কি ঢং !

কিন্তু সে যা হোক্, এই নিয়ে প্রভার অভিযোগ ক্রমশই বেড়ে চলল, নিখিলের কাছে। সে বেচারা অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে সত্যিই বাড়ী খুঁজতে গেলে গেল।

এরই কদিন বাদে প্রভার দাদা সুকুমার এল বোনের বাড়ী বেড়াতে। দু-চার দিন থেকে আবার ফিরে যাবে। এই মর্ম্মে প্রভার কাছে সে চিঠিও দিয়েছিল আগে একখানা।

তার আগমনে বাড়ীতে কাজকর্ম্ম এবং খাওয়া-দাওয়ায় বহরটা স্বভাবতই গেল কিছু বেড়ে। ভুষুণ্ডীও যে সেই সাথে অধিকতর ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল, একথাটাও নিঃসংশয়ে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

গল্পগুজবের মাঝে, দাদার কাছে প্রভা বিষয়টির উল্লেখ না ক'রে পারল না। কাকটার জন্যে এ বাড়ীতে থাকা তার পক্ষে কি প্রকার দুঃসহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাও অবশ্য জানানো হ'ল। শেষটায় স্পষ্টই ব'লে দিলে : মনে ক'রেছি, এবার এ বাড়ীটাই ছেড়ে দেব !...

সুকুমার মহাবিস্মিত হ'য়ে বললে : বলিস্ কি রে ! একটা কাকের জন্যে বাড়ীই ছেড়ে দিবি ! খাগলি কোথাকার !

নিখিল ফোড়ন দিলে : সেটা তোমার বোন্‌কে নাকি বড্ড বেশী রকম পছন্দ ক'রে ফেলেছে, সাধ্বী সেটা মোটেই বরদাস্ত ক'রতে পারছেন না ! কেমন, তাই না ? নিখিল প্রভার দিকে তাকাল।

প্রভা রুখে উঠে বললে : থাম, ঢের হয়েছে। তোমার সব তাতেই ইয়ে ! ঘরকন্নার কাজ তো আর করতে হয় না, তা হ'লে বুঝতে ! সত্যি দাদা, বাড়ী না বদলালে আমি এখানে আর থাকতে পারব না, তোমার সাথেই চ'লে যাব !

সমস্ত জিনিষটা ঠাট্টা কি-না, সঠিক বুঝতে না পেরে সুকুমার থাকল প্রভার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে।

তার মনোভাব বুঝতে পেরে প্রভা বললে : আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, দেখবে চল। কোথাও না কোথাও ঠিক ওৎ পেতে ব'সে আছে ! কি নেবে, কি ভাঙবে, সব সময়ে ব'সে এই মৎলব আঁটছে !

সুকুমার হেসে বললে : বেশ কথা। চল্ তো দেখি কোথায় তোর কাক !

তিনজনেই ঘর থেকে বেরুল।

ওই ছাখো, ওই। প্রভা চেঁচিয়ে উঠে রান্নাঘরের ছাতের দিকে আঙুল দেখাল।

কথাটা মিথ্যে নয়, বাস্তবিকই কাকমহাপ্রভু তখন সেখানে ব'সে চারিদিক নিরীক্ষণ করছিল। ওদের দেখতে পেয়ে, বিশেষ ক'রে প্রভার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, সে তক্ষুনি উড়ে পালাল সটান সেই নিমগাছে।

প্রভা উত্তেজিতকণ্ঠে বললে : ওই পালাল !...

সুকুমার কৌতুক অনুভব ক'রে বললে : তাই তো।

দাদার কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে প্রভা ব'লে চলল : চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ক'রে জ্বালায় ! যে ক'টা দিন তুমি থাকবে, একটু কষ্ট ক'রে নজর রেখো, টের পাবে। আর, উনি তো আমার কথা গায়েই মাখেন না।

ব'লে, নিখিলকে দেখিয়ে দিল।

নিখিল ভালমানুষের মত বললে : মাখি না কি রকম ! দিনরাতই তো মাখছি !

প্রভা ঝঙ্কার দিয়ে ধমক দিলে : হয়েছে হয়েছে ! একটি কথা বলতে গেলেই কেবল ফাজলাম ! কিন্তু দাদা, তুমি এর যা হোক্ একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাও ! সুকুমারকে ধরলে প্রভা।

সুকুমার একটু ভেবে বললে : আচ্ছা, দেখি।

তারপর নিখিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে : তোমার জানাশোনা কারো কাছে বন্দুক আছে, নিখিল ?

নিখিল পাল্টা প্রশ্ন করলে : কেন, গুলি ক'রে মারবে নাকি ?

কথাটা প্রভার ভাল লাগল না। সে অমনি ব'লে উঠল : না না, মেরে কাজ কি ! আর, কাক মারতেও নেই ; তার চাইতে বরং এ বাড়ীই ছেড়ে দি।

বাধা দিলে সুকুমার হেসে বললে : ভয় নেই, বাড়ীও ছাড়তে হবে না, কাক-হত্যার পাতকও হবে না। শুধু বায়সপ্রবরের দিকে তাক ক'রে দুদিন ছুটো ফাঁকা আওয়াজ করলেই দেখবে আর আসবে না। বন্দুক, বিশেষ ক'রে ওর আওয়াজকে, ওরা বড্ড ভয় পায়। দেখাই যাক্ না, তাই ক'রে।

এ কথায় প্রভার অবশ্য আর কোন আপত্তি হ'ল না। নিখিলও বললে : বেশ। বন্দুক এনে দিতে পারব আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। তারপর, তাতেও যদি না যায়, তবে বাড়ীও আমার ঠিক করা আছে একটা।

সুকুমার বললে : বল কি, এর মধ্যে বাড়ী ঠিক করাও হ'য়ে গেছে ? তুমি অবধি ক্ষেপলে !

নিখিল হতাশভাবে বললে : কি আর করা ! তবে, একেবারে ঠিক হয়নি, বাড়ীওলা এখানে নেই। ক'দিন বাদে সে এলেই কথাবার্ত্তা পাকাপাকি ক'রে ফেলব।

প্রভা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন বাড়ী ক'খানা ঘর, ভাড়া কত ?

নিখিলের কাছ থেকে বাড়ীর বিষয় যা জানা গেল, ভাড়া কিঞ্চিৎ কম হ'লেও এ বাড়ীর তুলনায় তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তবু যা হোক্, প্রভা চিন্তিতভাবে বললে : এ যন্ত্রণা থেকে তো অব্যাহতি পাওয়া যাবে !

যথাসময়ে সুকুমারের ব্যবস্থামতই কাজ করা হ'ল।

অর্থাৎ, পরদিন নিখিল তার এক বন্ধুকে সব কথা জানিয়ে ডেকে আনল, তার বন্দুকটাসহ। সুকুমার নিজেই বন্দুক ছুঁড়তে জানত, সেই নিলে সেটা হাতে।

সবাই মিলে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হাজির হ'ল। প্রভা শোবার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল।

খিড়কির দিকে পাঁচিলটার উপর ব'সে ভুষুণ্ডী তখন কি একটা জিনিষ পায়ে চেপে, ঠোঁট দিয়ে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে খুঁটছিল, আসন্ন বিপদের কথা বিন্দুমাত্রও জানতে পারলে না।

হঠাৎ মুখ তুলতেই তার নজরে প'ড়ে গেল, তারই দিকে বাগিয়ে ধরা বন্দুকের নলটা। অবস্থা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই শব্দ হ'ল, গুড়ুম্ !

কাক কখনও পাগল হয় কি-না জানা নেই, তবে সেই আওয়াজ শুনে সম্পূর্ণ নিরুদ্দিষ্ট হ'বার আগে সন্ত্রস্ত ভুষুণ্ডীর পলায়নের যে ভঙ্গীটা প্রকাশ পেল, সেটা শুধু একান্ত আতঙ্কিত নয়, উন্মত্ত ব'লেও মনে হ'ল। কোথায় যে সে উধাও হ'য়ে গেল, তার আর কোনও নিশেই থাকল না !

নন্দটা এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানত না, ছিল রান্নাঘরে। শব্দটা হবার সাথে সাথে সেও একলাফে এসে প'ড়ল একদম বাইরে !

সবটা মিলে একটা হাস্যরসের সৃষ্টি হ'ল। সুকুমার হাসতে হাসতে বললে : দেখলে তো !

নন্দটা অবধি বোকার মত হাসতে লাগল আসল কথা শুনে।

যাই হোক্, খানিকপরে নিখিলের বন্ধু বিদায় নিলে। সুকুমার তাকে অনুরোধ করলে : দয়া ক'রে মশাই, কালও ওটা আর একটিবার আনতে হবে। কারণ, আরও একবার ওঁর আগমন হ'তে পারে। তারপর থেকে আর দরকার হবে ব'লে মনে করি না।

বন্ধু সানন্দে রাজী হ'য়ে হেসে বললে : বেশ তো !

সকাল বেলা সেই কাণ্ডের পর থেকে ভুষুণ্ডী সেদিন আর এ বাড়ী মুখোই হ'ল না। প্রভা যেন বাঁচল।

কিন্তু পরদিনই সে আবার এসে হাজির, সেই নিমগাছটার ডালে। প্রভাকে দেখতে পেয়েই স্বাভাবিক কণ্ঠে বিনীত সম্ভাষণ জানাল।

প্রভা কি জানি কেন, খুব যে বিরক্ত হ'ল, ঠিক এমনটি মনে হ'ল না। সুকুমারকে ডেকে লঘুগলায় বললে : দাদা, যা বলেছিলে ! ফের এসেছে সেই হতভাগা কাকটা, দেখবে এসো !

সুকুমার ছিল শুয়ে। বললে : আসুক, কিচ্ছু বলিস্‌নি এখন, বন্দুকটা আসুক আগে !

বলাবাহুল্য, অতঃপর সেদিনও পূর্ব্ব ঘটনার পুনরভিনয় হ'ল এবং ভুষুণ্ডীও পূর্ব্বের মতই ভীত, সচকিত হ'য়ে পালিয়ে গেল।

তারপর থেকে আর তার দেখা নেই। এমন কি পরদিনও গেল কেটে।

প্রভার কিন্তু মনে হ'তে লাগল, একবার সে নিশ্চয়ই আসবে··· যে শয়তান ! সব কাজের মধ্যেও সে নজর রাখল, কখন্ আসে।

ভুষুণ্ডী কিন্তু সত্যিই এল না।

রাত্তিরে নিখিলকে প্রভা বললে : কাকটা আজও আসেনি। আর বোধ হয় আসবে না।

নিখিল রাগে উঠ্‌ল চেঁচিয়ে : রেখে দাও তোমার কাক। কাক-কাক ক'রে আমায় পাগল ক'রে তুলবে দেখছি। আচ্ছা পাল্লায় পড়েছি যা হোক্।

প্রভারাণী একটু লজ্জিতা হ'য়েই বললে : না, এমনিই বলছিলুম ! গেছে, বেশ হয়েছে !

নিখিল কাজের কথা পাড়ল : তোমার দাদা কি কালই যাচ্ছে ?

প্রভা সংক্ষেপে জবাব দিলে : হ্যাঁ।

তারপর মশারিটা ফেলতে ফেলতে মৃদুকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলে : আচ্ছা, কাকগুলো বন্দুককে খুব ভয় করে, না ?

নিখিল মহাবিরক্ত হ'য়ে পাশ ফিরে শুয়ে জবাব দিলে : জানি নে !

পরদিন বেলা ন'টার গাড়ীতে সুকুমার যাবে। প্রভা খুব সকালে উঠে কাজকর্ম্মে লেগে গেল, দাদাকে শীগ্‌গির ক'রে যা-হোক্ চারটি খাইয়ে দিতে হবে, সারাটা দিনও কাজ তো আর তার হ'য়ে উঠবে না !

নিমগাছটার দিকে আমড়াগাছটার দিকে দু-চার বার তার দৃষ্টি প'ড়ল, কিন্তু কোথাও কিছু নেই! হঠাৎ এক সময়ে নন্দকে সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল: সেই কাকটা আর এলই না, না রে নন্দ!

নন্দ দন্তবিকাশ ক'রে সোৎসাহে বললে: না মা!—ভারী বিরক্ত করত দিনরাত, ভারী জব্দ হয়েছে এবার!

হুঁ—ব'লে প্রভা রান্নাঘরে ঢুকল।

খানিকবাদে কি একটা কাজে বেরিয়ে আসতেই তার চোখ গেল নিমগাছটার দিকে, ভুষুণ্ডী ঠিক সেই মুহূর্তে উড়ে এসে বসল তারই একটা ডালে। আর ওই সময়টিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুকুমার, প্রভাকে একটু তাড়াতাড়ি করবার জন্যে উপদেশ দিতে।

সুকুমারকে দেখতে পেয়েই, তৎক্ষণাৎ ভুষুণ্ডী গাছ ছেড়ে আবার উধাও হ'ল, সেই সন্ত্রস্ত গতিতে, ভীত ভঙ্গীতে। সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে প্রভা বললে: দাদা, কাকটা এক্ষুণি এসেছিল, ওই তোমাকে দেখেই পালিয়ে গেল!

সুকুমার গাছটার দিকে তাকিয়ে সকৌতুক তাচ্ছিল্যে হেসে বললে: তাই না কি!

ন'টার গাড়ীতে সুকুমার চ'লে গেল। এর পর দু' তিন দিন কাটল, ভুষুণ্ডী আর আসেই না, একদম ফেরার। প্রভা অলস অবসরে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবে, কাকটা সত্যিই চ'লে গেল নাকি! সমস্ত দিন কি অস্থিরই না ক'রে তুলত সবাইকে। যাক, আপদ বিদেয় হয়েছে, বেশ হয়েছে!

কিন্তু বাড়ীটা যে ফাঁকা লাগে, একথা মনে মনে প্রভাকে স্বীকার করতেই হ'ল। ও যেন ছিলো একটা দুষ্টু ছেলে, যার অনুপস্থিতিটা সব সময়েই টের পেতে হয়!

এখন কত জিনিষই তো বাইরে প'ড়ে থাকে, কই কিছুই তো হয় না! কি ভাঙল, কি খেয়ে ফেলল, কি ছড়াল, এসব নিয়ে সতর্ক হবার আর কোনও প্রয়োজনই নেই। যেখানকার যা, সব ঠিকঠাক, কোনও সোরগোল নেই, সর্ব্বত্র কেমন যেন একটা নিশ্চিন্ত নীরবতা! প্রভার অসোয়াস্তি লাগে।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে অলসভাবে বই পড়তে পড়তে প্রভা অকস্মাৎ মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে, রান্নাঘরের দিক থেকে কোনও শব্দ এল কি না!—কিছু না। প্রভা বইয়ে মন দেয়।

বিছানা থেকেই জানলা দিয়ে দত্তদের এঁদো পুকুরের ঘাটটা দেখা যায়; খেজুর গাছ কেটে তৈরী ঘাট। প্রভা একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, ঘুমটা ভাঙতেই তার নজর পড়ল সেইদিকে।

বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। আলস্যজড়িত চোখে সেইদিকে চেয়ে প্রভা ভাবতে লাগল, কত দিন এমনি পড়ন্ত বেলায় ওই ঘাটে গিয়ে কাকটা স্নান করত, মাথাটা জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ডানায় ঝাপটায় সারাগায়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে! স্নানপর্ব্ব সমাধা ক'রেই সোজা সে বসত গিয়ে তার নিজস্ব জায়গাটিতে, ওই নিমগাছের ডালে। সেখানে ব'সে কত না ভঙ্গীতে তার চিকনকৃষ্ণ অঙ্গখানি ঝাড়াঝোড়া সুরু ক'রে দিত, ঠোঁটের কত না আঘাতে তার গায়ের রোঁয়াগুলো উস্কোখুস্কো হ'য়ে ফুলে ফুলে উঠত!

তারপর, খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে রোদটুকু উপভোগ ক'রে, শরীরটাকে তাজা ক'রে নিয়ে আবার সুরু করত তার বৈকালিক উৎপাত!

এ ছিল তা'র প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্য। আজও যেন সে একটু বাদেই তেমনি এসে স্নান করবে, ঘাটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু এই কথাটাই প্রভার মনে হ'তে লাগল।

বিকেলে জলখাবারের সময় নন্দকে প্রভা বললে: ডাকাতটা আর আসে না, রক্ষে পাওয়া গেল, না রে!

নন্দ পূর্ণসমর্থন ক'রে ব'ললে: হ্যাঁ মা! মামাবাবু ঠিকই ধ'রেছিলেন, বন্দুকই হচ্ছে ওদের আসল ওষুধ!

প্রভা যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে আপনমনেই বললে: তা ব'লে কি আর মোটেই আসবে না!

নন্দ বিজ্ঞের মত মন্তব্য প্রকাশ করলে: তাই তো মনে হচ্ছে, মা! অন্তত এ বাড়ীতে আর নতুন লোক না আসা অবধি তো নয়!

প্রভা আর কোনও কথা না ব'লে চুপ ক'রে গেল।

তেমনিভাবে আরও দুদিন কাটল।

নিখিলকে পান দিতে এসে প্রভা জিজ্ঞাসা করলে: কই, তোমার সে বাড়ী ঠিক হ'ল? বাড়ীওলা এসেছে?

নিখিল পান চিবুতে চিবুতে বললে: সে তো এসেছে, আমিই আর ও বিষয়ে বলিনি কিছু। কেন, সে কাকটা তো আর আসে না, তবে আর বাড়ী বদলাবার এমন দরকারটাই বা কি?

প্রভা কি ভেবে বললে: না, তুমি সেই বাড়ীটাই দেখো! অন্তত ভাড়া তো কম হ'বে! এখানে আমার আর ভাল লাগছে না!

নিখিল খানিকক্ষণ প্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে: এর মানেটা কি, শুনতে পারি? কি হয়েছে এ বাড়ীতে সত্যি ক'রে বল তো!

প্রভা প্রথমত কোনও জবাব দিলে না। তারপর যেন জোর করেই খানিকটা হেসে বললে: হবে আবার কি?

—তবে? এ বাড়ীটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, আসল কারণটা কি তাই? নিখিল খোঁচা দিলে।

—না না, তা কেন, এমনিই! বাব্বাঃ, এমন ঝগড়াটেও তুমি: প্রভা অপদস্থ হয়ে শশব্যস্তে ব'লে উঠল: ভাড়া কম আছে, যদি হয়, তবে মন্দ কি! তাই বলছিলুম—

ব'লে ঘর থেকে প্রস্থানকরলে।

নিখিল অবাক। ভাবল, স্ত্রীচরিত্রের রহস্য যে অতীব দুর্ব্বোধ্য—দেবা ন জানন্তি, সে কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য!

সকালবেলা প্রাতর্ভোজন সেরে নিখিল গেছে বেরিয়ে। প্রভা চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে, সাথে একটা রেকাবীতে কিছু ঘি-মাখানো মুড়ি আর খানকতক ঘিয়ে-ভাজা গরম বেগ্‌নি?

চা-টা শেষ হয়ে গেছে, রেকাবীও প্রায় খালি, হঠাৎ তার চোখ পড়লো খিড়কির দরজাটার দিকে।

ও কি, দরজার উপরে ব'সে ভুষুণ্ডী না?

হ্যাঁ, ভুষুণ্ডীই!

প্রভা উঠল লাফিয়ে। ছেলেমানুষের মত নন্দকে ডেকে ব'লে উঠল: নন্দ, শীগ্‌গির দেখবি আয়, সেই কাকটা আবার ফিরে এসেছে!

নন্দ রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়াল: কই,, মা? কোথায়?

প্রভা সোৎসাহে বললে: ওই তো! খবদ্দার, কিছু বলিস্‌নি ওকে! কেমন, তোকে বললুম না সেদিন, বন্দুকের আওয়াজ কি চিরকালই ওদের মনে থাকে!

বলতে বলতে ভুক্তাবশিষ্ট মুড়িগুলো উঠোনময় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

ভুষুণ্ডীও এদিক-ওদিক সতর্কদৃষ্টিতে কি যেন দেখে নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এসে মহোল্লাসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার সুরু ক'রে দিলে।

—বজ্জাতটা দাদার ভয়ে এতদিন আসতে পারেনি!—ব'লে, স্মিতহাস্যে প্রভা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এরই খানিকবাদে, নিখিল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরে এসে বললে কথাবার্ত্তা একরকম ঠিক ক'রে এলুম, বাড়ীওলার সাথে। কিন্তু এ বাড়ীটাই ছিল সব দিকে ভাল! সে কাকটাও তো আর নেই, ত তোমার কি যে খেয়াল।

বাধা দিয়ে প্রভারাণী হেসে বললে: আচ্ছা আচ্ছা, অতই যা ভাল লেগে থাকে এ বাড়ী, তা হ'লে না-হয় না-ই ছাড়লে! আমি না-হয় আমার মতটা বদ্‌লে ফেললুম! কেমন, হ'ল তো এবার ব'লে—মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

তার হাসির আড়ালে রাগ বা অভিমানের বিন্দুমাত্র ছায়াচিহ্ন খুঁজে না পেয়ে নিখিল গেল বোকা ব'নে।

প্রভা কিন্তু তেমনি তরলকণ্ঠে ব'লে চলল: আর সে কাকটা কথা বলছ, সেটা তো আজ আবার ফিরে এসেছে!

নিখিলের মুখ থেকে অস্ফুটভাবে শুধু বেরিয়ে এল: এসেছে! তবে

প্রভা সহজভাবেই বললে: তবে আর কি! আসুক্ গে, ও আর এমনই বা কি হ'য়েছে! ভেবে দেখলুম, ওসব একটু স থাকতেই হয়। ও বাড়ীতেই যে হ'বে না, তারই বা কি মানে তুমি বরং বাড়ীওলার সাথে দেখা হ'লে ব'লে দিও, বাড়ীর আ আমাদের দরকার নেই!

নির্ব্বাক নিখিল হাঁ ক'রে প্রভারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তার চোখমুখের তখনকার অবস্থাটা হ'য়ে দাঁড়াল বাস্তবিকই দেখবার মত

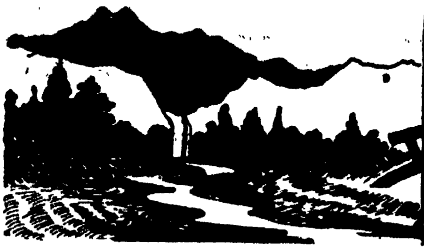
মনে নাই

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দূরে দূরে গাওয়া করুণ কাহিনী
কেঁদে মিশে যায় আকাশে;
মর্ম্মরি যায় মর্ম্মের বাণী,
অবশে উদাসী বাতাসে।
মনে ভেসে আসে, ক্ষণে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

কত না তরুণ চোখের কিরণ,
অরুণের প্রভা হরে' যায়;
কত না সুপ্ত ব্যথার পীড়ন,
শিশিরের জলে ঝরে' যায়;
তারা সজীব বেদন শোনে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

অতীতের গুপ্ত যত ইতিহাস,
চেতনা-পরশি কেঁপে যায়।
প্রাচীনের পরে নবীন বিকাশ
একাকী আমায় ব্যেপে যায়।
কণিকা কি কেউ গণে নাই?
কিছুই যে আর মনে নাই।



সঙ্গীত

পঞ্চম—ত্রিতাল

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী
জাগো মহাকালী॥
প্রাণহীন শবে শিব শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ নিদ্রা ভাঙ্গাও
অগ্নিশিখায় দশ দিক রাঙ্গাও
বরাভয়দায়িনী নৃমুণ্ডমালি॥
শ্রীচণ্ডিতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী
এসেছে সে কলি কালিকা এলি কই
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ঐ
অভয় বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মাগো খর করতালি॥

কথা ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম
সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

\+ ৩ ০ ১ ॥

II পা পা পা পা | -হ্মাগহ্মা -া -গা হ্মা | ধা হ্মাধনর্সা -া -ননর্সা | র্সা -া র্সা -া I
নি পী ড়ি তা ০০০ ০ ০পৃ থি বী০০০ ০ ০০০ ডা ০ কে ০

I নধনা ধনা -র্সনর্সনা -ধা | ধা -া না ধনধা | -হ্মাধহ্মা -গা ঋগহ্মপা গহ্মা | গা ঋা -সা -া I
জা০ গো০ ০ ০ ০ চন্ ০ ডী কা০০ ০০০ ০ ম০০০ হা০ কা ০ লী ০

I সসা ন্ধ্ ন্সা ধ্ন্সঋা | ন্সগা -া হ্মা হ্মা | গগা.হ্মধা ধর্সা র্সা | -া া র্সর্সর্গা র্গঋা I
মৃতে শ্ম শানে না০০০ চো০০ ০ মৃ ত্যুন্ জয়ী মহা শক্ তি ০ ০ দনু ০ জদ

সকালবেলা প্রাতর্ভোজন সেরে নিখিল গেছে বেরিয়ে। প্রভা চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে, সাথে একটা রেকাবীতে কিছু ঘি-মাখানো মুড়ি আর খানকতক ঘরে-ভাজা গরম বেগ্‌নি?

চা-টা শেষ হয়ে গেছে, রেকাবীও প্রায় খালি, হঠাৎ তার চোখ পড়লো খিড়কির দরজাটার দিকে।

ও কি, দরজার উপরে ব'সে ভুষুণ্ডী না?

হাঁ, ভুষুণ্ডীই।

প্রভা উঠল লাফিয়ে। ছেলেমানুষের মত নন্দকে ডেকে ব'লে উঠল: নন্দ, শীগ্‌গির দেখবি আয়, সেই কাকটা আবার ফিরে এসেছে!

নন্দ রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়াল: কই,. মা? কোথায়?

প্রভা সোৎসাহে বললে: ওই তো! খবরদার, কিছু বলিস্‌নি ওকে! কেমন, তোকে বললুম না সেদিন, বন্দুকের আওয়াজ কি চিরকালই ওদের মনে থাকে!

বলতে বলতে ভুক্তাবশিষ্ট মুড়িগুলো উঠোনময় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

ভুষুণ্ডীও এদিক-ওদিক সতর্কদৃষ্টিতে কি যেন দেখে নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এসে মহোল্লাসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার সুরু ক'রে দিলে।

—বজ্জাতটা দাদার ভয়ে এতদিন আসতে পারেনি!—ব'লে, স্মিতহাস্যে প্রভা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এরই খানিকবাদে, নিখিল ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে এসে বললে: কথাবার্ত্তা একরকম ঠিক ক'রে এলুম, বাড়ীওলার সাথে। কিন্তু এই বাড়ীটাই ছিল সব দিকে ভাল! সে কাকটাও তো আর নেই, তবু তোমার কি যে খেয়াল।

বাধা দিয়ে প্রভারাণী হেসে বললে: আচ্ছা আচ্ছা, অতই যদি ভাল লেগে থাকে এ বাড়ী, তা হ'লে না-হয় না-ই ছাড়লে। আমিই না-হয় আমার মতটা বদ্‌লে ফেললুম! কেমন, হ'ল তো এবার? ব'লে—মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

তার হাসির আড়ালে রাগ বা অভিমানের বিন্দুমাত্র ছায়াচিহ্ন খুঁজে না পেয়ে নিখিল গেল বোকা ব'নে।

প্রভা কিন্তু তেমনি তরলকণ্ঠে ব'লে চলল: আর সে কাকটার কথা বলছ, সেটা তো আজ আবার ফিরে এসেছে!

নিখিলের মুখ থেকে অস্ফুটভাবে শুধু বেরিয়ে এল: এসেছে! তবে!

প্রভা সহজভাবেই বললে: তবে আর কি! আসুক্‌ গে, ওতে আর এমনই বা কি হ'য়েছে! ভেবে দেখলুম, ওসব একটু স'য়ে থাকতেই হয়। ও বাড়ীতেই যে হ'বে না, তারই বা কি মানে? তুমি বরং বাড়ীওলার সাথে দেখা হ'লে ব'লে দিও, বাড়ীর আর আমাদের দরকার নেই!

নির্ব্বাক নিখিল হাঁ ক'রে প্রভারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখমুখের তখনকার অবস্থাটা হ'য়ে দাঁড়াল বাস্তবিকই দেখবার মত!

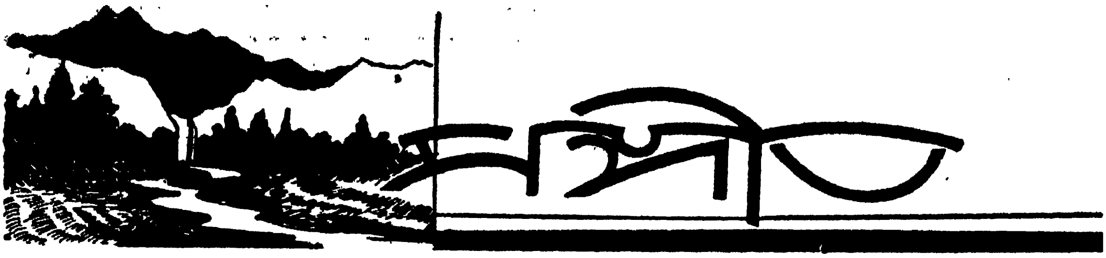
মনে নাই

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দূরে দূরে গাওয়া করুণ কাহিনী
কেঁদে মিশে যায় আকাশে;
মর্ম্মরি যায় মর্ম্মের বাণী,
অবশে উদাসী বাতাসে।
মনে ভেসে আসে, ক্ষণে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

কত না তরুণ চোখের কিরণ,
অরুণের প্রভা হরে' যায়;
কত না সুপ্ত ব্যথার পীড়ন,
শিশিরের জলে ঝরে' যায়;
তারা সজীব বেদন শোনে নাই;
কিছু যেন আর মনে নাই।

অতীতের গুপ্ত যত ইতিহাস,
চেতনা-পরশি কেঁপে যায়।
প্রাচীনের পরে নবীন বিকাশ
একাকী আমায় ব্যেপে যায়।
কণিকা কি কেউ গণে নাই?
কিছুই যে আর মনে নাই।



পঞ্চম—ত্রিতাল

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী
জাগো মহাকালী॥
প্রাণহীন শবে শিব শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ নিদ্রা ভাঙ্গাও
অগ্নিশিখায় দশ দিক রাঙ্গাও
বরাভয়দায়িনী নৃমুণ্ডমালি॥
শ্রীচণ্ডিতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী
এসেছে সে কলি কালিকা এলি কই
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে পুনঃ ঐ
অভয় বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মাগো খর করতালি।

কথা ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

+ ৩ ০ ১ ॥
II পা পা পা পা | -হ্মাগহ্মা -া -গা হ্মা | ধা হ্মাধনর্সা -া -ননর্সা | র্সা -া র্সা -া I
নি পী ড়ি তা ০০০ ০ ০ পৃ থি বী০০০ ০ ০০০ ডা ০ কে ০

I নধনা ধনা র্সনর্সনা -ধা | ধা -া না ধনধা | -হ্মাধহ্মা -গা ঋগহ্মপা গহ্মা | গা ঋা -সা -া I
জা০ গো০ ০ ০ ০ চন্ ০ ডী কা০০ ০০০ ০ ম০০০ হা০ কা ০ লী ০

I সসা ন্ধ্া ন্সা ধ্ন্সঋা | ন্সগা -া হ্মা হ্মা | গগা হ্মধা ধর্সা র্সা | -া া র্সর্সর্গা র্গঋা I
মৃতে রশ্ম শানে না০০০ চো০০ ০ মৃ ত্যুন্ জয়ী মহা শক্ তি ০ ০ দনু ০ জদ

I র্সর্সা নর্স র্সা না -ধা | হ্মধহ্মা হ্মগা -া হ্মগা | গঋা সা হ্মধা ধর্সা | র্সনা ধনা ধপহ্মধা পা II
লনী ক রা লী ০ জা০০ গো০ ০ মহা কা লী মহা কা লী০ মহা কা০০০ লী

\+ ৩ ০ ১
II পপা পপা হ্মপা গহ্মা | পনা র্সর্ঋর্সা নর্সা র্সা | র্সর্সর্গা র্গা র্ঋা র্সর্সা | ধনা নর্সা ধনা ধা I
প্রাণ্ হীন্ শবে শিব শক্ তি০০০ জা০ গাও নারা০ য় ণের যোগ্ নি০ দ্রা০ ভা০ ঙাও

I হ্মধনর্সা র্সনা ধধনা নধা | হ্মধা ধহ্মা গহ্মা পা | নসা গগা হ্মধা র্সা | নধা হ্মগা হ্মহ্মগা ঋঋর্সা II
অ০০গ্ নি০ শি০০ খায়্ দশ্ দিক্ রা০ ঙাও বরা ভয় দায়ি নী নৃমু ন্ড মা০০ লী০০

\+ ৩ ০ ১
II নধা না -সনা -সনা | -ধা -া হ্মা পা | -গহ্মা -পা -গহ্মা -গা | ঋা -া -সা সা I
মা ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ শ্রী

I সগা -া গা গা | হ্মহ্মা -ঋগা ঋগা -া | হ্মা র্সা না ধা | ধহ্মা নধা ধর্সা -র্সা I
চন্ ০ ডী তে তো০ ০০ রি০ ০ শ্রী মু খে র বা ০ ণী ০

I না না না নধা | ধনা -সনধা ধহ্মা গা | গা গা ঋগহ্মপা -গহ্মা | গহ্মগা ঋগঋা সা -া I
ক লি তে আ বি ০র্ ভা ব্ হ বে তো০০০ ০র্ ভ ০ বা ০ নী ০

I হ্মর্সা র্সর্সা ধনা ধা | হ্মধা নর্সা ধনা র্সা | না নঃ নধঃ হ্মা হ্মগা | গহ্মা গগা ঋঋা সা I
এসে ছে সে ক লি কা০ লীকা এলি কই শুম্ ভ নি শুম্ ভ জন্ মেছে পুন ঐ

I র্সর্গা র্গঃ র্ঋর্গহ্মা র্গঃ র্ঋর্সা | নর্সা র্ঋর্সা নর্সা র্সা | পর্সা ননা ঃা হ্মগা | হ্মহ্মা গগা ঋা সসা II I
অভ য় বা০০০ নী তব মা০ ভৈ০ মা০ ভৈ শুনি ব ক বে মাগো খর কর তা লী০



জন্ লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, ইডি-ডি

জন্ লক্ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৬৩২ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং বহু বৎসর যাবত তাঁহার সময়ে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌রূপে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতিক অবস্থার বিপর্য্যয় লকের প্রতিকূল হইলে পর তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শীঘ্রই রাজনীতিক জীবন পুনরায় আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নৃপতিদের ঐশ্বরিক শক্তির (divine right of kings) বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল। লক্ প্রকাশ্যভাবে প্রতিপক্ষ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও জনসাধারণের ঐশ্বরিক শক্তির (divine right of the people) অনুকূলে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। জনসাধারণের ঐশ্বরিক শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেও লক্ সর্ব্বদাই রাজকীয় সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি রাজার ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার মতে রাজার ক্ষমতা জনসাধারণের অনুমোদন সম্ভূত এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী রাজার শক্তি তাঁহার প্রজার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। ইহা চুক্তি তত্ত্ব (contract theory) নামে পরিচিত। তাঁহার এই তত্ত্বে লক্ ব্যক্তিত্বের স্থান আদৌ স্বীকার করেন নাই। ব্যক্তিবিশেষকে ষ্টেটের বশ্যতা মানিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং লকের শিক্ষাতত্ত্বানুযায়ী রাজ্যের মঙ্গলই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

যথেচ্ছাচারী রাজার অধীনে পরিচালিত রাজ্যশাসনের বিরোধিতা ব্যতিরেকে লক্ সপ্তদশ শতাব্দীতে সুকুমারবিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুনাগরিক গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি অভিজাত এবং দরিদ্র পরিবারনির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকজনের লেখাপড়ার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে শিক্ষা অযথা বিষয়ে না হইয়া সমাজে বসবাস করিবার উপযোগী জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়ে হইবে। এই কারণে জন্ লক্‌কে শিক্ষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসলেখকগণ "সোসিয়াল্ রিয়ালিষ্ট" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সমাজে ব্যক্তিবিশেষের বর্ত্তমান পদমর্য্যাদানুযায়ী শিক্ষা হওয়া উচিত এই দৃঢ় প্রত্যয় হেতু লকের শিক্ষাতত্ত্বানুসারে অভিজাত এবং শ্রমিক পরিবারের শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপায় ও পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইবে। রাজ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ততার জন্য উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবকগণ মাতৃভাষা, ফরাসী ও লাটিন ভাষা, পদার্থবিজ্ঞান হস্তশিল্প, এবং বিবিধপ্রকার পেশায় স্বল্প পরিমাণে শিক্ষালাভ করিবে। রাজ্যে স্বাবলম্বী নাগরিক ও সমাজে সম্মানী সভ্য হইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক পরিবারের যুবকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়ে লক্ কোন আলোচনা করেন নাই। সমাজের ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়েই তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষার অবস্থার বিষয়ে লকের অভিমতের সংক্ষিপ্ত বিবৃতির পর আমরা এক্ষণে তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে পেশা-শিক্ষার অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিব। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাম্ থট্‌স কন্‌সারনিং এডুকেশন্ (Some Thoughts Concerning Education) নামক প্রকাশিত রচনাবলী হইতে পেশা-শিক্ষা বিষয়ে লকের অভিমতের বিষয়ে বিশেষরূপে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। হলাণ্ডে নির্ব্বাসিতজীবন যাপনের সময় লক্ প্রথমত তাঁহার বন্ধু এড্‌ওয়ার্ড ক্লার্কের সন্তানসন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে ধারাবাহিকরূপে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন এই প্রবন্ধ ইহাদেরই সমষ্টি। অপর একজন বন্ধু ওইলিয়াম মোলিনিউক্সের (William Molyneux) অনুরোধে এইগুলি একত্রিত

করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কন্‌ডাক্ট অব্‌ দি স্মাণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং (Conduct of the Understanding) নামক প্রবন্ধ হইতে শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। জন্‌ উইলিয়াম্‌ এডাম্‌সনের "দি এডুকেশনাল রাইটিংশ অফ্‌ জন্‌ লক্‌" নামক সংস্করণে এই রচনাবলী দৃষ্ট হইবে। দরিদ্র ভরণপোষণার্থ আইনের সংশোধন ও শ্রমিক বিদ্যালয় বিষয়ক লকের ক্ষুদ্রলিপি হইতেও উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। এই মূল পুস্তিকা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য কিন্তু ইহা এইচ্‌ আর সক্স বোর্ণি কর্তৃক বিরচিত "দি লাইফ অফ্‌ জন্‌ লকের" দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লকের শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতি রেবালের শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতির অনুরূপ। মন ও দেহের পরিপুষ্টির জন্য রেবালে এবং লক্‌ উভয়েই শিক্ষার নব যুগের আদর্শের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার নব যুগের বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই শিক্ষার আদর্শের লোপ পাইয়াছিল। এই আদর্শের বিষয়ে লক্‌ লিখিয়াছিলেন, "সুস্থদেহে সুস্থ মনই এই পৃথিবীতে আনন্দদায়ক অবস্থার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বর্ণনা।"১ তবু এই মূলতত্ত্বে একমত হইলেও শিক্ষা-বিজ্ঞানবিদ্‌দ্বয় এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার পন্থা বিষয়ে দ্বৈধ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। রেবালে অভিজাত পরিবারের যুবাদের ব্যায়াম চর্চ্চায় হস্তশিল্পের অনুমোদন করেন নাই। তাহাদের বিশ্বকোষিক বিদ্যার পরিপূরণের জন্য তিনি হস্তশিল্পের প্রচার করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে লক্‌ শারীর চর্চ্চার নিমিত্ত যেরূপ হস্তশিল্পের প্রচার করিয়াছিলেন তদ্রূপ কৃষি অথবা বিশ্বকোষিক জ্ঞানের জন্য ইহার প্রচার করেন নাই। উভয়েই সম্মত হইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞানের পরিপূরকের উদ্দেশ্যে রেবালে প্রাচীন গ্রন্থকারদের পুস্তক পাঠের অনুমোদন করিয়াছিলেন। লক্‌ ইহার সমর্থন করেন নাই। রেবালে অভিজাত পরিবারের যুবাদিগকে সকলপ্রকার পেশার সহিত পরিচিত করাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিবিধ প্রকার পেশায় দক্ষতা জন্মাইতে চেষ্টা করেন নাই। লক্‌ সম্ভ্রান্ত-পরিবারের তরুণদের মধ্যে দুই বা তিনটি বৃত্তিতে সাধারণ জ্ঞান এবং একটি পেশায় বিশেষ বুৎপত্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। লক্‌ এবং রেবালের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত এবং অপরাপর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও মোটের উপর লক্‌ শিক্ষার নবযুগের পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরের সমালোচনায় ও রাজ্যে নেতৃত্বগ্রহণে উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবাদের জন্য হস্তশিল্প এবং উচ্চাঙ্গের পেশা প্রচারে রেবালের সহিত একমত।

লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব তাঁহার "সুস্থদেহে সুস্থ মন" এই মতের ভিত্তির উপর নির্ভর করে। কৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হস্তশিল্প এবং পেশা বিষয়ক আদর্শ পাঠ্যলিপির সাহায্যে তিনি মন ও দেহের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষার নবযুগের পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপীয় স্কুল-কলেজগুলি সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবাদিগের কৃষ্টি বিষয়ক অধ্যয়ন আবৃত্তির রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ছাত্রদিগকে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় বিশুদ্ধ বাক্য রচনা করিতে এবং প্রাচীন ভাষার ভঙ্গী অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। মানসিক অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সকল উৎসাহ পরিচালিত হইয়া-ছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিকাশের কিছুই করা হইত না। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অমানুষিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ লক্‌ ব্যায়াম চর্চ্চার উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, লক্‌ সর্ব্বদাই অভিজাত পরিবারের যুবাদের শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং উচ্চাঙ্গের পেশা-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। মানসিক আয়াস ও উৎসাহ, দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। "আমার বিবেচনায় অধ্যয়নই অভিজাত-পরিবারের যুবাদের গুরুকার্য্য এবং যখন ইহা আয়াস ও বিশ্রাম দাবী করে তখন ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা চিন্তাকে শিথিল করে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তিকে দৃঢ় করে।"২ আমরা অবশ্য মনে রাখিব যে, লক্‌ হস্তশিল্পের

১ জন্‌ উইলিয়াম্‌ এডাম্‌সন্‌, দি এডুকেশনাল্‌ রাইটিংশ অফ্‌ জন্‌ লক্‌, পৃঃ ২৫।

২ জন্‌ উইলিয়াম্‌ এডামসন্‌, দি এডুকেশনাল্‌ রাইটিংশ অফ্‌ জন্‌ লক্‌, পৃঃ ১৭০।

সাহায্যে নৈপুণ্য গঠনের উপকারিতা বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই উদ্দেশ্যে ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হস্তশিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপে শুধু ভাষা ও বিজ্ঞানে নৈপুণ্যলাভ করা হইবে না। কিন্তু চিত্রাঙ্কন, বাগান ও লোহার কাজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিবে।"৩

অতি প্রয়োজনীয় পঠিতব্য বিষয়গুলি অধ্যয়নের অব্যবহিত পরেই হস্তশিল্পশিক্ষার অতি উত্তম সময় বলিয়া লক্ সমর্থন করিয়াছেন। এই সময়ে অত্যধিক পঠনের ফলে মনের অবসাদ হয় এবং মনের আয়াসের জন্য কর্ম্মান্তরের আবশ্যক। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই সময়ে অভিজাত পরিবারের যুবাগণ খামার অথবা কারখানায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বিবিধপ্রকার পেশা শিক্ষা লাভ করিবে। এইরূপে তাহারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পেশা-সমূহ শিক্ষানবিশের সাহায্যে শিক্ষা করিবে। এই কার্য্য শিক্ষার্থীদিগকে নিশ্চয়ই আনন্দ ও সুখ আনয়ন করিবে এবং যে সময় আলস্যে অথবা যথেচ্ছাচারিতায় কর্ত্তিত হইত তাহা লাভজনকরূপে যাপিত হইবে। "পূর্ব্বোক্ত শিল্পকলার সহিত সুগন্ধি দ্রব্য নির্ম্মাণ, বার্ণিশ, খোদনকার্য্য এবং লৌহ, পিত্তল ও রূপা প্রভৃতির কার্য্য সংযোজিত হইবে। যদি অভিজাত পরিবারের অধিকাংশ যুবাদের ন্যায় একটি সুবৃহৎ নগরে তাহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় তাহা হইলে সে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তন, পালিশ ও স্থাপন কার্য্য শিক্ষা করিতে অথবা চশমা পালিশ করিতে আত্মনিয়োগ করিবে। বিবিধপ্রকারের মধ্যে এমন হস্তশিল্প আছে যাহাতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। ইহা একেবারে অসম্ভব হইবে যাহা তাহাকে আনন্দদান করিবে না......। যে হেতু সে সর্ব্বক্ষণই পঠন, অধ্যয়ন ও আলাপনে রত থাকিতে পারে না তদ্দরুণ যথেষ্ট সময় থাকিবে। তাহার পঠনের সময় ব্যতীত ইহা এইরূপে ব্যয়িত না হইলে আরও মন্দরূপে ক্ষেপিত হইবে।৪

হস্তশিল্পে শিক্ষা ব্যতীত সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবাদের পেশা শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় সিভিল ল, সদাগরী হিসাব ও শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক কোর্সের সন্নিবেশ হইবে। এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এমনই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যে এইগুলি উচ্চপদস্থ যুবাদের শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যলিপির অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচিত হইবে। আর্থিক, সামাজিক এবং কৃষ্টিবিষয়ক উদ্দেশ্যের জন্য এইগুলি পঠিত হইবে। নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে লক্ যে প্রয়োজনীয়তা আরোপ করিয়াছেন তাহা সূচনা করিবে।

সম্ভ্রান্তপরিবারের যুবকের পক্ষে সিভিল আইনের জ্ঞান বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বেকন্ ইহা তাহাকে রাজ্যের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে এবং পৃথিবীতে তাহার সহচরদের নিকট হইতে সম্মান অর্জ্জন করিতে সহায়ক হইবে। সুতরাং সে সমাজের উৎপত্তি ও ভিত্তি এবং সমাজে মানবের অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিবে। সুচারুরূপে আন্ত-র্জ্জাতিক সম্বন্ধ বুঝিবার উদ্দেশ্যে সে আন্তর্জ্জাতিক আইনে অনুরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে। এই বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভের জন্য আন্তর্জ্জাতিক আইন বিষয়ে গ্রোটিয়াস এবং পুফেন্ডরফ্ প্রভৃতি প্রাচীন রোমকদের পুস্তক অধ্যয়ন করিবে। "টুলিস্ অফিসেস্" (Tully's Offices) সুচারু-রূপে হজম করিবার পর এবং তৎসহ "পুফেন্ডরফের ডি অফিসিও হোমিনিশ এট্ সিভিশ" (Puffendorf, de officio hominis et civis,) যোগ কর, তাহাকে "গ্রোটিয়াস্ ডি জুরি বেলি এট্ পেসিশ্" (Grotius de jure belli et pacis) অথবা এই দুইটির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর "পুফেন্ডরফ ডি জুরি নেচ্যারেলি এট্ জেন্টিয়াম্" (puffendrof de jure naturali et gentium) পড়িতে দিবার সময়োচিত হইবে। তৎসমুদয় হইতে মানবের স্বাভাবিক ক্ষমতা, সমাজের আদি ভিত্তি এবং সেই সকল হইতে সমদ্ভূত কর্ত্তব্যের বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সিভিল ল এবং ইতিহাসের এই সাধারণ পঠিতব্য অংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবাগণ কেবল মাত্র সামান্যরূপে পাঠ করিবে না। কিন্তু সর্ব্বক্ষণই অধ্যয়ন করিবে ও কখনও বিরত হইবে না। যে ধার্ম্মিক ও বিনয়ী তরুণ যুবক সিভিল লয়ের সাধারণ অংশের সহিত সুপরিচিত (যাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতারণামূলক মোকদ্দমার সহিত বিজড়িত নহে,

---

৩ ঐ, পৃঃ ১৬৯।

৪ জন্ উইলিয়াম্ এডাম্সন, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংশ অফ্ জন্ লক্, পৃঃ ১৭৩।

কিন্তু অধিকাংশে সভ্য জাতিসমূহের কার্য্যাবলী ও সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং প্রমাণের মূলতত্ত্বের উপর সংস্থাপিত)। ল্যাটিন ভাষা সুচারুরূপে বুঝিতে পারে এবং সুশ্রী লিখিতে পারে, তাহাকে কোন লোক এই দৃঢ় বিশ্বাসে দুনিয়াতে ছাড়িয়া দিতে পারে যে সে সর্ব্বত্র চাকুরী ও সম্মান পাইতে পারে।"৫

লকের মতে ইংলণ্ডে প্রধান বিচারপতি হইতে অমাত্য পর্য্যন্ত যে কোন পদ পাইতে উচ্চকাঙ্ক্ষী তরুণ ভদ্র যুবাদের পক্ষে আইন অধ্যয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ন্যায় ও অন্যায়ের নিরূপণে আইন বিশেষ প্রয়োজন। আইন শাস্ত্র করায়ত্ত করিতে হইলে ইংলিশ কনষ্টিটিউশন এবং গভর্ণমেণ্ট বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের পুস্তক পাঠ করিবে।৬

বিজ্ঞতার সহিত তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ ও ধ্বংসের কবল হইতে তাহাদের বিত্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে লক্ উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবাদের সওদাগরী হিসাব-প্রণালীতে বুৎপত্তি লাভের আবশ্যকতার প্রচার করিয়াছিলেন।৭

অভিজাত পরিবারের যুবাদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত লিপিজ্ঞানও প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে জ্ঞান, বিশেষত গোপনীয় চিঠিপত্রাদি লিখনে ব্যক্তিগত অশেষ উপকারে আসিবে।৮

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনা প্রকাশ করিয়াছে যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবাদের সম্পর্কিত লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব দ্বিত্ববোধক। চিত্তবিনোদন ও দৈহিক শক্তির উদ্দেশ্যে তিনি হস্তশিল্প শিক্ষার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ এবং সুচারুরূপে নাগরিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিবিধ প্রকার উচ্চাঙ্গ পেশা-শিক্ষার অনুমোদন তিনি করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দরিদ্র-শ্রেণীর সভ্যদের বিষয়ে লিখিত লকের পেশাতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিব।

লক্ শ্রমিকদিগকে ব্যবসা ও ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবার সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষে ব্যবসা, ধর্ম্ম ও বিনয়শিক্ষা তাঁহার বিবেচনায় যথেষ্ট। এইরূপে তাহারা গণতন্ত্রের উত্তম নাগরিকরূপে প্রমাণিত হইবে। এইস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সামাজিক আভি-জাত্যই পেশা বাছাইয়ের প্রয়োজনীয় মাপকাঠি। বহু-সংখ্যক দরিদ্রদিগকে চিরতরে সমাজের নিম্নস্তরে চাপিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যথোপযুক্ত পেশা শিক্ষা দেওয়া হইবে ও তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইবে। "গণতন্ত্রস্থিত ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহার বিশেষ পেশা সম্পর্কিত কর্ত্তব্য কার্য্য ও ধর্ম্মবিষয়ে (এই জগতের অধিবাসী বলিয়া যাহা তাহার পেশা) জ্ঞান হইতে সাধারণতঃ সকল সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে।"৯

ষ্টেট্ গরীব ও ভিখারীদের রক্ষক। শ্রমিক বিদ্যালয়ে গরীব ও ভিখারীদিগকে ব্যবসা এবং শিল্প শিক্ষা দ্বারা ষ্টেট্ দারিদ্র্য বিমোচন করিবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিককে স্বাবলম্বী ও আত্মমর্য্যাদাশীল করিতে হইবে। উত্তম নাগরিক হইতে হইলে ব্যক্তিবিশেষকে ব্যবসা, শিল্প ও ধর্ম্ম-বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ষ্টেটের তত্ত্বা-বধানে এই শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং দরিদ্র বালকবালিকা-দিগকে শ্রমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে ষ্টেট্ বাধ্য করিবে। "আমরা ইহার জন্য যে অতি ফলোৎপাদক উপায় কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং যাহা আমরা অতি বিনীতভাবে প্রস্তাব করি তাহা এই যে, পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন প্রস্তাবিত আইনে এই ব্যবস্থা হইবে যে, প্রত্যেক পেরিশে শ্রমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, যেখানে পেরিশের সাহায্য পাইবার উপযোগী তিন বৎসরের ঊর্দ্ধ ও চৌদ্দ বর্ষের ন্যূন পিতৃগৃহে-বাসী বালক বালিকাগণ দরিদ্রের পরিদর্শকের নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই তাহারা তথায় যাইতে বাধ্য হইবে।"১০ এই শ্রমিক বিদ্যালয়গুলি বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয় হইবে। বয়ন, সেলাই

জন্ উইলিয়াম এডাম্‌সন, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংশ অফ্ জন্ লক্, পৃঃ ১৫১-১৫২।

৬ জন্ উইলিয়াম্ এডাম্‌সন, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংশ অফ্ জন্ লক্, পৃঃ ১৫২।

৭ জন্ উইলিয়াম্ এডাম্‌সন, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

জন্ উইলিয়াম্ এডাম্‌সন, পৃঃ ১২৪।

৯ জন্ উইলিয়াম্ এডামসন, দি এডুকেশনাল্ রাইটিংশ অব জন লক্, পৃঃ ২১৫।

১০ এইচ আর বক্স বোর্ণি, দি লাইফ অব জন্ লক্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ—৩৮৩।



অথবা পশম নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিবিধ পেশা শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্থানীয় জিলাগুলির বিশেষ প্রয়োজনানুসারে শ্রমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা গঠিত হইবে। পেশাশিক্ষা সমাপনান্তে দরিদ্র ছেলেমেয়েদিগকে হস্তশিল্পী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষিজীবী প্রজা, অথবা কুলাচার্য্য মণ্ডলীর অন্যতমের নিকট শিক্ষানবীশরূপে চাকুরীতে প্রবেশ করাইবে।[২] এইরূপে দরিদ্রজনসম্পর্কিত লকের পেশা-শিক্ষাতত্ত্ব দারিদ্র্যকে সমাজের অভিশাপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় শ্রমিক বিদ্যালয়ের সাহায্যে সকল দরিদ্রদিগকে পেশা শিক্ষা দ্বারা দারিদ্র্য অবশ্য মুছিয়া দিতে হইবে।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, লক্ তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে সমাজের সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে পেশা শিক্ষার প্রচার করিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদন, দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সংগঠন, হস্তনৈপুণ্য লাভ এবং পৌরকার্য্য ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে উপযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্টি শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ বিবিধ প্রকার পেশাশিক্ষা ধনাঢ্য শ্রেণীর যুবাদের জন্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রস্তাবে লক্ সর্ব্বক্ষণই মন ও দেহের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য সংরক্ষণের বিষয় মনে রাখিয়াছিলেন। লক্ দরিদ্রলোকের জন্য ব্যবসা ও ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমাজ হইতে দারিদ্র্য-বিমোচন দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মানী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা ষ্টেটের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহার মতে এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক দরিদ্রকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাইতে ষ্টেটের অধিকার আছে।

২ এইচ আর ফক্স বোর্ণি, দি লাইফ অব জন্ লক্, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ—৩৮৫-৩৮৬, ৩৯০

সঙ্গীতের জের

কুমারী অলকা গুহ

...র বড় গান শেখার সখ, কিন্তু মগের মুল্লুকে থাকিত বলিয়া এতদিন ...িখিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই। আরাকানের প্যাগোডা দিয়ে ঘেরা ...ং শহরে বাংলা গানের কোন চলন নেই, সুদূর ভবিষ্যতেও হইবে কি-না ...া কঠিন। তারপর যদিও মিনুর বাবার কুষ্টিতে লেখা আছে, তিনি ...ন্ত নৃত্যগীতপ্রিয় হইবেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সঙ্গীতের প্রতি নিতান্তই ...ন। একমাত্র কন্যার আবদার ঠেলিতে না পারিয়া একবার "একজন ...ঃ সঙ্গীতজ্ঞ চাই" বলিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দিয়া-...লেন। সঙ্গীত-প্লাবিত বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ হইতে বন্যার স্রোতের ...র আবেদনপত্র তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। আত্মগুণকীর্ত্তনে ...একটি চিঠিই ভরা ছিল। কেহ কেহ আবার শুনিয়া বিচার করিবার ...নিজেদের রেকর্ডের নম্বর পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ...দের মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করা যে বড় কঠিন ব্যাপার ...তে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে মিনুর কাকা এই বিষম সমস্যা ...সহজেই সমাধান করিয়া দিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের হাতের ...া দেখিয়া তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ভাল গায়কের হাতের ...া কখনই সুন্দর হয় না। তাঁহার পরামর্শমত সমস্ত চিঠিগুলি সব অযত্নের লেখাগুলি একস্থানে জড় করিলেন। তারপর অনেক চিন্তা বিবেচনার পর একজনকে আসিতে লেখা হইল।

যথাসময়ে মিনুর সঙ্গীতশিক্ষক আসিয়া পৌঁছিলেন; ফিটফাট কায়দাদুরস্ত অল্পবয়স্ক যুবকটিকে দেখিয়া সকলেই যেন একটু নিরাশ হইলেন। যাহা হউক, তিনি ওস্তাদীবর্জ্জিত রবি ঠাকুরের গান বেশ ভালই জানিতেন, গাহিবার সময় মুখব্যাদান মিনুর বাবা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, এই অতি-আধুনিক মাষ্টার সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। কিছু দিন খুব উৎসাহের সহিত ছাত্রীকে শিক্ষাদান করিলেন কিন্তু ক্রমেই যেন তাঁহার উৎসাহে ভাঁটা পড়িয়া আসিল। হঠাৎ একদিন তিনি এক মর্ম্মান্তিক খবর দিলেন। তাঁহার নিকট চিঠি আসিয়াছে যে তাঁহার স্ত্রীর অত্যন্ত অসুখ, সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বেই সেখানে চলিয়া যাইতে হইবে। তিনি প্রস্থান করিবার কিছুদিন পরে মিনুর বাবা খুব বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলেন যে, ভদ্রলোক অবিবাহিত, সে বছর মাত্র এম-এ পরীক্ষা দিয়াছেন, এমনি সব করিয়া নরখাস্ত দিয়াছিলেন। পরের পয়সায় বর্ম্মা দেখিবার লোভ সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল, তাই ...

বালাই বিদায় নেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। মিনুর বাবা মাষ্টারের আকস্মিক তিরোধানের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া হৃদয়ে প্রভূত ব্যথা পাইলেন যে, সকলের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আর কোন নূতন মাষ্টারকে আসিতে লিখিলেন না। তবে মিনুকে হাতের লেখা ভাল করিবার জন্য এক ডজন কপিবুক কিনিয়া দিলেন।

এই ব্যাপারের পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। মিনুর বাবা সম্প্রতি বদলি হইয়া সপরিবারে কলকাতায় আসিয়াছেন। কন্যার ঘ্যানঘ্যানানীতে অস্থির হইয়া তাহাকে গান শিখাইবার জন্য বেশ নামকরা একজন ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়াছেন।

একদিন ভোরে প্রায় সাড়ে চারটার সময় বিকট চীৎকারে মিনুর বাবার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে মশারির ফাঁক দিয়া দেখিলেন, আদরিণী কন্যা মাটিতে বসিয়া হারমনিয়মের সহিত প্রাণপণ জোরে গলা সাধিতেছে। সেই তীব্র রাগিণী ভেদ করিয়া কোন কথা মিনুর কানে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার! অনেকক্ষণ পরে হয়ত গলায় ব্যথা অনুভব করিয়া মিনু একটু থামিল। পিতা ধমক দিলেন, "এত জোরে পাগলের মত চেঁচাচ্চিস্ কেন? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?" মিনু গম্ভীরস্বরে কহিল, "ওস্তাদজী বলেছেন খুব ভোরে উঠে ভৈরবীর উপর গলা সাধতে—"

এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া মিনুর বাবা বলিলেন, "কানের কাছে কেন, অন্য কোথাও যা।"

মিনু একটু লাজনম্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় করে।"

পিতাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় তারায় পর্দায় গলা সাধিতে সুরু করিল। সেই দিনই তাঁহার পিতা আহারের পর একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিতে যাইবেন এমন সময় দেখিলেন মিনু আবার হারমনিয়ম লইয়া বসিয়াছে। মিনুকে কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিবেন—না বাজনাটা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবেন এই চিন্তায় তিনি বিশেষ মগ্ন, এমন সময় মিনুর মার বিরক্তি-মাখান স্বর কানে আসিল, "মেয়েটা এত চেষ্টা করে গান শিখ্‌ছে তাও তোমার সহ্য হয় না! আজকাল ঘরে ঘরে সব মেয়েই গানবাজনা করে, তোমার সব কিছুতেই গোলমাল বাঁধান চাই।" —এইরূপ অপ্রিয় সত্যকথার উপর তিনি আর কি বলিবেন? মনে পড়িল এই ত সেদিন এক পুরাতন বন্ধুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন; সেই ভদ্রলোক নিজের কন্যার অজস্র প্রশংসা করিলেন, খেয়ালে প্রথম হইয়া কি পুরস্কার পাইয়াছে, ঠুংরী ভজনে কি কি মেডেল পাইয়াছে—সব দেখাইলেন। তারপর নিজেই আগ্রহ করিয়া বন্ধুকে কন্যার একঘণ্টা ব্যাপী ভীষণ কাওলাতী শুনাইলেন। গান শেষ হইলে মিনুর বাবা একটু কাষ্ঠহাসির সহিত কহিলেন, "বাঃ বেশ ত কীর্ত্তনখানা।" পিতাপুত্রী উভয়েই একথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির। অর্ব্বাচীন মেয়েটা ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা! আপনি বুঝি গান কিছুই বোঝেন না? কীর্ত্তনে কি এত ওস্তাদী থাকে? এটা প্রোঃ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটু জয়জয়ন্তী সুরের খেয়াল।" কন্যার বয়সী একটি ছোট মেয়ের নিকট এরূপ অপ্রস্তুত তিনি আর ইতিপূর্ব্বে হন নাই। যাহা হউক সেদিন আর দিবানিদ্রা হইল না—বোধ হয় নিজের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্যাকেট তাস লইয়া মিনুর বাবা 'পেসেন্স' খেলিতে সুরু করিলেন।

সন্ধ্যার সময় মিনুর উৎকট রেয়াজের পালা পুনরায় আরম্ভ হইল। উচ্চৈস্বরে পিতা হাঁক দিলেন, "ফের চীৎকার সুরু করেছিস? থাম বলছি এখনি।"

মিনুর হইয়া মিনুর মা সেলাই করিতে করিতে উত্তর দিলেন, "সন্ধ্যার সময় পুরবী সুরে রেয়াজ করার নিয়ম, তাতে গলা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়।"

মিনুর মার প্রতি এক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিনুর বাবা ঘরের কোণ হইতে ছড়িগাছি লইয়া হনহন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েক দিন এরূপ রেয়াজ শুনিয়া মিনুর বাবার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি আজকাল কানে একটু কম শোনেন। এই মানসিক দুর্ব্বলতাবশত জোরে না ডাকিলে সহজে সাড়া দেন না।

রবিবার—ছুটির দিন। সকালে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় কন্যা পিছন হইতে আসিয়া দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের ভঙ্গীতে কহিল, "বাবা, আমাকে এবার বাঁয়াতবলা কিনে দাও না!"

চক্ষু কপালে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত মিনুর বাবা বলিলেন, "তুই তবলা বাজাবি, বলিস কি রে! ফের্ ওসব কথা মুখে আনবি ত গানশেখা বন্ধ করে দেব।" মিনু পিতার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি কিছু বোঝ না, তবলচী বাজাবে, আমি শুধু সঙ্গে গাইবো।"

এ কথার পরও তিনি সামান্য আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু মিনুর মার তর্জ্জন গর্জ্জনে সব আপত্তি অচিরাৎ দূর হইল।

হঠাৎ সেদিন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে পড়িতে মিনুর বাবার চোখে পড়িল "... ৭ নম্বর বি ফ্লাটের টুনুর মা কন্যার বেসুরে গলায় গান বাহির করিবার জন্য দুইজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন যে গান না জানিলে আজকালকার বিবাহের বাজারে তাহার কন্যা অচলমান বলিয়া বিবেচিত হইবে।" পত্রিকা হইতে এই স্থানটুকু কাটিয়া অবিলম্বে পত্নীর সেলাইয়ের বাক্সের উপর গদ দিয়া আঁটিয়া দিলেন।

এই খবরটি পড়িয়া মিনুর মার মনে কোন রেখাপাত করিয়াছিল কিনা দুঃখের বিষয় তিনি জানিতে পারেন নাই—হারমনিয়ম সম্বন্ধে দেশনেতা জহরলাল কি বলিয়াছেন তাহা মিনুকে তিনি দিনে অন্তত একবার করিয়া বলেন। মিনুর মার অন্তরালে "জোরে চীৎকার করিলে মাথার রগ ছিঁড়িয়া যায়, মস্তিষ্কে গণ্ডগোল হয়।" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মিনুকে অনেক দিয়াছেন কিন্তু কোন লাভ হয় নাই।

মিনু যে সঙ্গীত-জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে মিনু ও মিনুর মার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই ত সেদিন ওস্তাদজী বলিয়াছেন যে, আর মাত্র তিন বৎসর একভাবে সাধনা করিলে মিনু বড় বড় গানের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে। "আর মাত্র তি

বৎসর" শুনিয়া মিনুর বাবার অবস্থা কাহিল হইয়াছিল আর কি! তারপর মিনু তাহার প্রাণের বন্ধু রেখার নিকট হইতেও অনেক আশার বাণী শোনে। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র রেয়াজের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া বাড়ীওয়ালা নাকি তাঁহাকে নোটিস্ দিয়াছিল (অবশ্য তখন এই গায়ককে কেহই চিনিতেন না)। মিনুর বাড়ীওয়ালার নোটিস্ পাইবার ভয় নাই, কারণ তাহারা নিজেদের বাড়ীতেই থাকে। যা কিছু আপত্তি গোলমাল আসে সব পিতার দিক হইতে। রেয়াজ কানে আসিলেই মাথা-ধরা কান কটকট করা জ্বর-জ্বর ভাব প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে। অমৃতাঞ্জন, ওরিয়েন্টালবাম অনেক শিশি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কোন উপকার পান নাই। রেয়াজের সময়টা ছাড়া অন্য সময় বেশ ভালই থাকেন।

ভোরে সেদিন যখন রেয়াজের শব্দ কানে আসিল না, তখন মিনুর বাবা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। পরক্ষণেই মিনুর ঘর হইতে বিড় বিড় করিয়া পড়ার আওয়াজ কানে আসিল। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, "আহাঃ কাজে ব্যস্ত থাকায় কতদিনের মধ্যেও বেচারীকে একটু পড়া বলিয়া দেন নাই। অনুতপ্তচিত্তে কাছে গিয়া দেখেন টেবিলের উপরে একটুকরো কাগজে কি লেখা আছে সেটা মিনু খুব মনোযোগের সহিত মুখস্থ করিতেছে। অনেক ভাবিয়াও তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না, বাঁশের ছড়ি দিয়া কাঁচের বাসনের উপর আঘাত করিলে যেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ হয় এটা অনেকটা সে ধরণের। কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, মা্মণি, এটা কি শিখছিস রে, ল্যাটিন গ্রামার?" মিনু জবাব দিল "ল্যাটিনের বুঝি এমন উচ্চারণ হয়? এগুলি তবলার বোল, ওস্তাদজী বলেছেন মুখস্থ করতে। কি মিষ্টি রেকেটে, ধিন্, না, তুনা, কিছুতেই আর আসছে, পারছিনা না, বাবু বোলটি একটু মুখস্থ নাও না!" উহা কতটুকু হইয়াছে কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোর পরীক্ষা কবে?" কন্যা তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিল, "এখনও দেড় মাসের উপর বাকি আছে, আসছে সপ্তাহে টেষ্ট আরম্ভ হবে।"

এত রেয়াজ করিয়াও যখন মিনু একবারে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করিয়া গেল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলেন মিনুর বাবা। তিনিও ঠিক করিয়াছিলেন, ফেল মারিলেই গান শেখা বন্ধ করিয়া দিবেন। কন্যার সখ অনুসারে ফৈয়জ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কের দুই ডজন রেকর্ড উপহার স্বরূপ কিনিয়া দিলেন। মিনুর রেয়াজ শুনিতে শুনিতে কিছুটা সহ্য হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু এই রেকর্ডগুলি যখন বাজান হইত তখন তিনি অন্যের মত নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা অতিকষ্টে দমন করিতেন।

* * * * *

সেই বিভীষিকাময় তিন বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আসছে বছর এলাহাবাদে যে মিউজিক কম্পিটিসন হইবে তাহার জন্য এখন হইতেই মিনু তৈরী হইতেছে। এ দিকে মিনুর বাবা 'হারমোনিয়মের অপকারিতা' সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক পুস্তক লিখিতেছেন। আশা করা যায়, মিনু এলাহাবাদ হইতে অনেক পুরস্কার লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহার বইটা বাজারে বাহির হইয়া যাইবে।

মোটর বাইকে পাঁচ হাজার মাইল

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ভ্রমণ

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "পা-দুটো থাক্‌লেই চলা যায়, কিন্তু হাত দুটো থাক্‌লেই তো আর লেখা যায় না!"

এটা অবশ্য শরৎচন্দ্রের স্বভাব-সুলভ বিনয়। তা হোক্, কথাটা কিন্তু সত্যি; তা আমাদের পক্ষে যে কতদূর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সত্য, তা তখনই বুঝি, যখন দেখি দিনের পর দিন, দেশের পর দেশ অতিক্রম ক'রে চলেছি, স্মৃতির পাতায় তার কত বিচিত্র রসঘন কাহিনী মুদ্রিত হ'য়ে গেছে, অথচ লিখ্‌তে ব'সে আকাশ-পাতাল ভেবে কূলকিনারা পাই না যে কেমন ক'রে কাহিনীটা আরম্ভ করি।

কথার মালা গেঁথে যাঁরা আমাদের মুগ্ধ করেন তাঁরা আপনাদের নমস্য।

আমি কবিও নই, সাহিত্যিকও নই—এই কথাটাই আমাদের সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখি।

অনেকদিন আগে থেকেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখ্‌বার বাসনা মনের মধ্যে জেগেছিল। তাই যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

অমিয় ব্যানার্জি এঁর বন্ধু। তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন—এ কথা কল্‌কাতা থেকে বন্ধুবর আমাদের জানিয়েছেন। ঠিক হ'লো—আমি ও বন্ধু শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ মান্না হুগলী থেকে যাব।

বাংলার গভর্ণর বাহাদুর তখন দার্জিলিং-এ। সুতরাং ছাড়পত্রের ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। যত শীঘ্র তা পাবার আশা করেছিলাম, তত শীঘ্র না পাওয়ায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লাহিড়ী আগেই দার্জিলিং রওনা হলেন। (তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল) তিনি ও তাঁর বন্ধু ১৮ই অক্টোবর



হুমায়ুনের সমাধি মন্দির দিল্লী

দার্জিলিং থেকে নেমে এসে শিলিগুড়িতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন—এই ঠিক হ'ল। ঐ তারিখের মধ্যে আমাদের ছাড়-পত্র পাওয়া যায় ভালই, না-পাওয়া গেলেও আমরা শিলিগুড়ির পথে রওনা হব ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই, একথা বন্ধুবরকে জানিয়ে দিলাম।

যথাসময়ে ছাড়পত্র হস্তগত হ'ল।

উনিশে অক্টোবর সকাল সাতটায় শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এসে দার্জিলিং মেল থাম্‌ল।

ষ্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড সাইডকারযুক্ত মোটার বাইকে বন্ধুবর আমাদের প্রতীক্ষায় ব'সে ছিলেন। তাঁকে তাঁর সঙ্গীটির কথা জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন, তিনি ১৬ মাইল দূরে তিস্তানদীর (জলপাইগুড়ি) ডাক-বাংলোতে অপেক্ষা বেলা বারটায় সময় কিষণগঞ্জের দিকে গাড়ী চালালাম।

দার্জিলিং-নিবাসী সঙ্গীটিকে, আমিও চিনতুম না, আমার বন্ধু নিমাই মান্নাও চিন্‌ত না। কিন্তু এই অপরিচয়ের প্রাথমিক সঙ্কোচ কখন্ কেমন ক'রে যে কেটে গেল তা আমরা টেরই পেলুম না। কিষণগঞ্জে এসে যখন পৌছালাম তখন তিনি বল্লেন, "নতুন বিয়ে-করা ইয়ের মতন মুখ ইযে-ক'বে থাকা আমার ধাতে সয় না, সুতরাং বায়নাক্কা এই যে, যখন যা খুশী বলব, যখন যা খুশী করব, কিন্তু ঐ যে বল্লুম, ইয়ের মতন ইযে হ'য়ে থাক্‌বও না, থাক্‌তে পারবও না—কি বলেন মিষ্টার ঘোষ ?"

আমি এই সদাপ্রফুল্ল অমায়িক ভদ্রলোকটিকে অন্তরের প্রীতির অভিনন্দন জানিয়ে বল্লুম, আপনার কথা অকাট্য।

পথ দারুণ খারাপ। একে বিপথ বলাও চলতে পারে। কামানের গোলা এসে হঠাৎ কানের কাছে ফাট্‌লে যেমন আওয়াজ হয়, তেমনি একটা শব্দ হ'যে বাইকখানা হাত দুই লাফিয়ে উঠ্‌ল। উল্টে যে যায়নি, সেটাকে সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেবার প্রবৃত্তি তখন আর হ'ল না, আমরা এমনি বিপর্যস্ত হ'যে পড়েছিলুম। যাত্রার প্রারম্ভেই এই অবস্থা—না জানি অদৃষ্টে কি অশেষ দুর্গতিই আছে!

চাকার ফুটা মেরামত ক'রে কন্‌-কনে নদী পার হ'য়ে তার ছ মাইল দূরে আর একটা নদীর সাম্‌নে এসে হতাশ হ'য়ে পড়ি।

ভাদ্রের ভরা গাঙের মত এই অগ্রহায়ণের নদীটি তার কূলে-কূলে উপ্‌চে-পড়া যৌবন কেমন ক'রে যে অটুট রেখেছে—সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শুনলুম নদীটির নাম মহানন্দা। কোন্ এক অজ্ঞাত কালের কোন্ অজ্ঞাত মনীষীর মুখ থেকে এর নাম প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তা জান্‌বার আজ কোন উপায় নেই; কিন্তু যিনিই তাঁর নাম দিন না কেন, কোন্ এক অলৌকিক মহিমায় আজ সে সার্থকনামা হ'য়ে উঠেছে—মহানন্দা।

ফেরিঘাটে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনাদের পথ খুব ভাল।

তাল ঐ রকম ডাঙাতে ডুবেছিলুম।

[illegible] নেই। [illegible], রাতে এ বাড়ীর কোন [illegible] ছিল না। হঠাৎ খুব জোরে ব্রেক ক'সে গাড়ীর গতিরোধ না করলে একেবারে স-বাহন নদীগর্ভে নিমজ্জিত হতে হ'ত।

পূর্ণিয়ায় যখন পৌছালাম তখন খানিকটা রাত হয়েছে, শীতের নিশুতি রাত, শহর নিস্তব্ধ। জলযোগে গোলযোগ বাধ্‌ল। অথচ কারুর উপর অভিযোগ করা চল্‌ল না। অদৃষ্ট যে মন্দ। রাত দশটায় কারাগোলা রোড স্টেশনে পৌছালাম।

এখান থেকে ভাগলপুর যেতে একমাত্র ট্রেনই ভরসা। অথচ সে রাত্রে ট্রেন যে মিল্‌বে, এমন আশ্বাসবাণী টাইম টেবলে লেখা ছিল না। স্টেশন মাষ্টার দয়া ক'রে ওয়েটিং-রুমে থাক্‌তে দিলেন। গাড়ী পরদিন বেলা এগারটায়।

আহারান্বেষণে দুই বন্ধু বেরুলেন। ঘণ্টাখানেক পর খবর নিয়ে ফির্‌লেন বাজারের মধ্যে এক বিহারী ব্রাহ্মণের একটা সরাই আছে। বাজারে অন্যান্য আহার্য্যও মিল্‌তে পারে। জনৈক বন্ধু বিহারীর হোটেলই মনোনীত কর্‌লেন—কারণ তিনি শুনেছিলেন, হোটেলওয়ালা অন্যান্য উপাদেয় আহার্যের সঙ্গে "চোখা" নামক একটি অতি অভিনব বস্তু আমাদের খাওয়াবেন।

খেতে বসে বন্ধুবর অপরূপ "চোখা" বস্তুটির আবির্ভাব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে রইলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেল, প্রায় কেন, সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল,—তবুও সেই অ-পূর্বদর্শন বস্তুটি পাতে এসে পড়্‌ল না দেখে তিনি বিমর্ষ মুখে হোটেলওয়ালাকে অনুযোগ কর্‌লেন। সেই হোটেলওয়ালা ওরফে নিরীহ বিহারী ব্রাহ্মণটি সহাস্য মুখে জানালেন, "বাবু, আপনি তামাসা করছেন, 'চোখা' কেমন লাগল, বলুন!" বন্ধুটি তখন খুব বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, "সে কি, চোখা আমি খেয়েছি!"

বিহারী ব্রাহ্মণটি সবিনয়ে জানালেন যে, আমরা যাকে 'আলু ভাতে' বলি, সেইটা তাদের 'চোখা'। বন্ধুবর অপ্রতিভ হ'য়ে একরূপ ক্ষিপ্ত হ'য়েই উঠ্‌লেন। তাঁর কল্পিত অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিনব "চোখা" শেষে হ'ল কি-না অতি-সাধারণ আলু ভাতে!'

[illegible]—[illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible]।

যাই হোক, এমনি ক'রে আমাদের "চোখা"-পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আমি মনে মনে এই কথাই সেদিন ভেবেছি, বিহারী ব্রাহ্মণ চোখার নামে বন্ধুবরকে বোকা বানিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে মানুষের যে একটা স্বাভাবিক আদিম লোভ আছে সেটাকে উপলক্ষ ক'রে বন্ধুকে সেদিন এ মর্মান্তিক বেদনা দেওয়ার আমাদের কোন অধিকার ছিল না।



ফতেপুর সিক্রির একটা প্রাচীন স্তম্ভের কারুকার্য্য

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে ১১টার ট্রেন এসেছিল ও আমরা তাতে চেপে ভাগলপুর পৌঁছেছিলাম। ভাগলপুরে আহারাদি সেরে রাত ৮টায় দেওঘর অভিমুখে যাত্রা কর্‌লাম। ভাগলপুর থেকে ৭২ মাইল দূরে যেখান থেকে দেওঘর রোড বের হয়েছে, সেখানে আমাদের এক বন্ধুর থাকার কথা। তখন রাত প্রায় ১২টা। অনেকগুলি [illegible] গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। [illegible] [illegible] নিরিবিলি। বন্ধুবর একটা গাড়ীকে নিয়ে গিয়ে একটা [illegible] বাড়ীর মধ্যে

ছিলেন। তারপর তাঁর [illegible] মাড়োয়ারীর কানে বিকটভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

লোকটি এই অবস্থায় জেগে উঠে এত ভয় পেয়ে গেল যে, আমরা তিন জন তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারি না। আমাদের অদ্ভুত সাজ পোষাকে সে হয়ত আমাদের ভৌতিক জীব মনে করেছিল।

অবশেষে তাকে শান্ত করতে আমাদের কি যে বেগ পেতে হয়েছিল তা বর্ণনা ক'রে বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। বন্ধুটির উপর আমরা সকলে অপ্রসন্ন হয়েছিলুম। দেওঘরে যখন পৌঁছালাম তখন রাত বারটা। দেওঘরে যে বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের কথা ছিল সেটা খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে একটা মর্মান্তিক [illegible]



[illegible] মিউজিয়ামে রক্ষিত [illegible]

কলকাতার মত বাড়ীর নম্বরের কোনবালাই নেই, সুতরাং অপরিচিত বিদেশী লোকদের অন্য কারও সাহায্য ছাড়া বাড়ী খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু বারটা রাত্রে জনপ্রাণীহীন শহরে আমাদের তখন কে চিনিয়ে দেবে সেই বাড়ীটি! আমরা হতাশ হ'য়ে বিমর্ষভাবে রাস্তার ধারে বসে পড়লুম; মনে করলুম, দূর ছাই, কি হবে আর সারা শহরটা টহল দিয়ে অনিশ্চিতভাবে? তার চেয়ে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক।

[illegible] কে একজন বল্লেন, 'গাছেরা রাত্রিকালে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ত্যাগ করে,' সুতরাং 'গাছের তলায় রাত কাটাতে গিয়ে বেঘোরে একটা [illegible] হারাতে [illegible]

[illegible] এক পাহারাওয়ালা এসে [illegible] প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুললে; আমাদের অবস্থার কথা তাকে জানালুম, একটু কাতরভাবেই জানালুম। দেখ্‌লুম লোকটা আর যাই হোক, করুণ রসটা উপভোগ করবার তার ক্ষমতা আছে। লোকটি ব্যাপারটা বুঝে বল্লে; "আমি সে বাড়ী চিনি, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।" তারপর খানিক দূর আমাদের নিয়ে গিয়ে দূর থেকে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। আমরা শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

পরদিন (২১ অক্টোবর) নির্মলবাবু আমাদের গাইড হলেন। তাঁর সাহচর্যে আমাদের দিনটা পরমসুখে কেটে গেল।

২২শে অক্টোবর আমরা গিরিডি অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের রোড ম্যাপে দেওঘর থেকে গিরিডি যাবার ভাল রাস্তা দেখানো ছিল না। নির্মলবাবু বাসওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিয়ে আমাদের জানালেন যে একটি পথ আছে। শীতকালে মোটর বাইক চল্‌তে পারে। তাঁরই নির্দেশমত গন্তব্যপথে যাত্রা করলুম।

খানিকটা যাওয়ার পর একটা নদী পড়্‌ল। জল খুব কম, কিন্তু বালি ভাঙ্‌তে হয় অনেকটা। গাড়ী নিজের 'পাওয়ারে' পার হ'তে পারবে ভেবে আমরা নদীতে নেমে পড়লুম, বেশ কতকটা যাবার পর পিছনের চাকা ভস্‌ ক'রে বালির মধ্যে বসে গেল। যতই ইঞ্জিন 'রেস' করি, ততই চাকা যায় ব'সে। বড্ডই নিরুপায় বোধ হ'ল। জুতা মোজা খুলে জলে নাম্‌তে হ'ল গাড়ী ঠেল্‌বার জন্যে। কিন্তু আমাদের চারজনের সমবেত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে গাড়ী রইল অচল অনড়।

দূরে শস্যক্ষেতে অনেকগুলি চাষী কাজ করছিল। মোটরের বিকট আওয়াজে আর আমাদের হৈ চৈ-এ লোকগুলি এরই মধ্যে নদীর ধারে এসে জুটেছিল। তারা স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়েই আমাদের সাহায্য করতে এল। তাদের সাহায্যে অনেক কষ্টে গাড়ীকে ওপারে ঠেলে তুলতে পেরেছিলুম।

গাড়ী খানিকটা চল্‌তেই দেখি পথরেখা হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে আছে বড় বড় খানা, খোন্দল, নালা। [illegible] ছোট

একথা বলা বাহুল্য।

এইভাবে ৪৬ মাইল পথ অতিক্রম করার পর মির্জাগঞ্জ নামে একটা গ্রামের কাছে এসে আমাদের গাড়ীর পেট্রোল গেল ফুরিয়ে। যখন দেওঘর ছাড়ি তখনও দুই গ্যালন অর্থাৎ ১০০ মাইল চলবার মত পেট্রোল ছিল। সেই বাসওয়ালারা বলেছিল ৭২ মাইল পথ। কাজেই আমরা ঠিক করেছিলুম গিরিডিতে এসেই তেল কিনব। যাই হোক মির্জাগঞ্জে জানতে পারলুম, সেখান থেকে দু মাইল দূরে জামুইতে বাস চলাচল করে। সেখানে বাস-ওয়ালাদের কাছে পেট্রোল মিলতেও পারে।

কিন্তু এ পর্যন্ত দেওঘর থেকে মির্জাগঞ্জ এই ৪৬ মাইল পথ আমরা সকলেই এমন নাস্তানাবুদ হ'য়ে এসেছি যে এই দুই মাইল পথ যে হেঁটে যাব তেমন সামর্থ্য আমাদেরছিল না। পেট্রোল ট্যাঙ্কে ফুঁ দিয়ে কারবুরেটারে পেট্রোল জমিয়ে খানিকটা বাইক চালান গেল। খানিকটা পথ বাইক আর আমাদের চড়তে হ'ল না—বাইকই আমাদের উপর চড়ে চলল। ভাগ্যক্রমে বাকী পথটুকু ঢালু ছিল, তাই রক্ষে; জামুই পৌছুতে আর বেশী কিছু কষ্ট পেতে হয়নি।

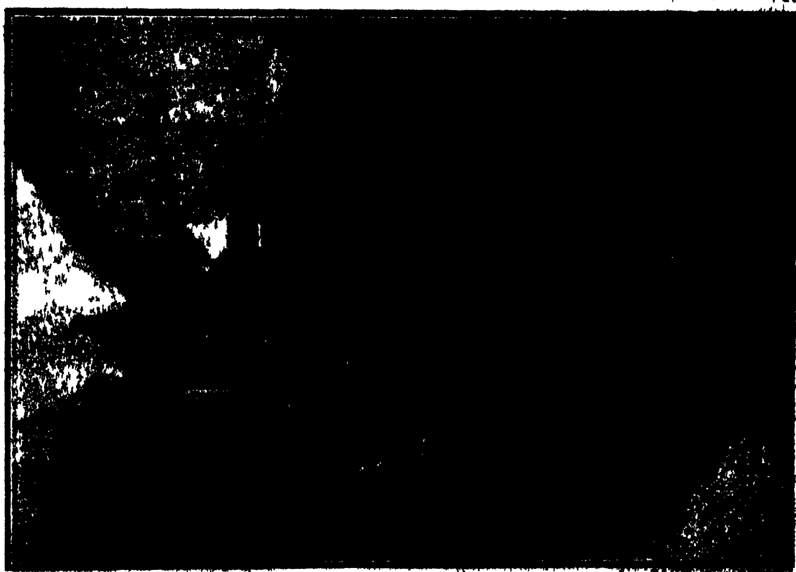
বিকাল তিনটায় গিরিডি পৌছালুম। উস্রী নদীর জল ও দোকানের 'পুরী'তে উদর পূর্তি ক'রে সন্ধ্যা ছটায় গিরিডি-ডুমুরি চটি রোড ধ'রে ডুমুরিতে এলুম। সেখানে চা খেয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে ফের চলতে লাগলুম। কিছু পরে রাস্তার দুপাশে হাজারিবাগের জঙ্গল পাওয়া গেল। বন্ধুবরের বন্দুক নিয়ে শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ... মাইল ... আগে

... পথ থেকে ... হ'য়ে গেল। ... দূরে একটা সার্চলাইট ফিট-করা শিকারী মোটর দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে সেটি ... ছুটে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মোটর থেকে একজন ভদ্রলোক চড়া গলায় আমরা কেন প্রাইভেট জঙ্গলে শিকার করছি তার কৈফিয়ৎ তলব করলেন। আমরা তাঁকে ... জানালাম যে, ওটা যে প্রাইভেট জঙ্গল তা আমাদের জানা ছিল না। পরিশেষে তিনি ও মোটরের ... ভদ্রলোক ... আমাদের অজ্ঞতা মেনে নিয়ে বললেন যে, গাড়ীর বিদেশী নম্বর দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা বিদেশী। নইলে তাঁরা আমাদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারতেন। আলাপ ক'রে জানতে পারলুম যে, প্রশ্নকর্তা স্বয়ং টিকারীর রাজপুত্র।

সে রাত্রে আমরা বাগোদর ডাকবাংলোয় রইলাম।

পরদিন (২৩শে অক্টোবর) সকালে ... রামঘাটী অভিমুখে যাত্রা করলাম। ... শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় আমাদের ... করেছিলেন। সেইখানেই উঠলুম। ...

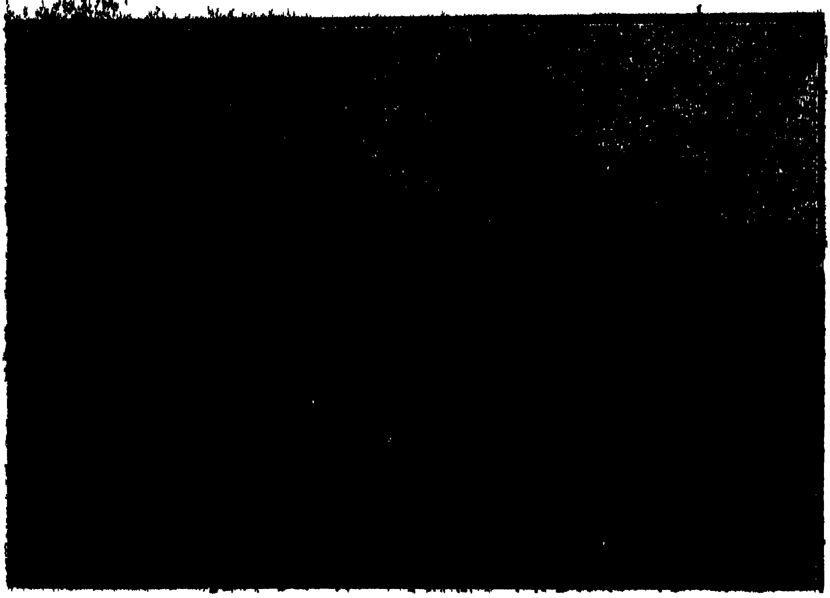
... আমাদের ... বিচিত্র



বাণিহাল পাশ—টানেলের মুখে—৮৯৯০ ফিট, কাশ্মীর

[illegible] একাগ্র চিন্তার বিষয়।' তাই পথের আর কোন [illegible] আমাদের আর তেমন ক'রে আকর্ষণ করতে পারে [illegible] যেখানেই কোন একটা আকর্ষণের কারণ ঘটেছে, সেইখানেই এই অজুহাত দিয়ে মনকে প্রবোধ দিয়েছি যে, শ্রীনগর দেখার পর ফেরবার পথে যথেষ্ট সময় পাব, তখন আমরা তন্ন তন্ন ক'রে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক জিনিষটি দেখে যাব, এখন নয়।

দূর পথের স্বপ্নধারা তখন তার অলৌকিক হাতছানি দিয়ে আমাদের সামনের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ [illegible] অনুরোধ সত্ত্বেও [illegible] থামতে পারলুম না। ফেরবার



পরীমহল পাহাড় হইতে ডালহ্রদ ও শ্রীনগর সহরের একাংশের দৃশ্য

পথে থেকে যাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বেলা বারটায় শোন নদীর তীরে পৌঁছালাম। সেখানেই স্নান সারা গেল। আহারের প্রয়োজন ছিল না। কারণ [illegible] মহাশয় জলযোগের নামে আমাদের জঠরের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন, তার উপরে আমাদের আর কিছু চাপাতে ভরসা হ'ল না।

এইবার আমাদের শোন নদী পার হবার পালা। এক্‌. আমাদের পরপারে পৌঁছে দিয়ে যে বারটি রৌপ্যমুদ্রা দক্ষিণা নিশ্চয়ই নেবে। সুতরাং পেছিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যেন না গাড়ীতে ওর চেয়ে বেশী ভাড়া লাগ্‌বে না, অধিকন্তু তা অধিকতর সুবিধাজনক ও নিরাপদ।

এর পর আমরা ইষ্ট-ব্যাঙ্ক ষ্টেশন-এ এলাম। দেখলুম এবারকার ব্যবস্থা খুব ভাল। আগে কোন গাড়ী পার করতে হলে ষ্টেশন মাষ্টারের কামরার দুয়ারে ধরণা দিয়ে অন্তত তিন ঘণ্টা পড়ে থাকতে হ'ত। এখন আর সে বালাই নেই। গাড়ী তোলা-নামানর কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্তে উপযুক্ত লোকজন সবসময়ই মোতায়েন থাকে, কাজেই আমাদের এতটুকুও অসুবিধা হ'ল না।

ও পারে ডিহিরি-অন-শোনে শুরু ভোজন করা গেল। ব্যস্‌, পথে আর কোথাও অপেক্ষা করা নয়, আর যেন আমাদের কোন কাজই নেই—কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে চলা—এই চলার পথে যা না করলে নয় তাই করা—ঘুম পেলে ঘুমানো, খিদে পেলে খাওয়া—আর দিনের পর দিন পথকে অতি সহজে অবলীলাক্রমে পিছনে ফেলেরেখে চ'লে যাওয়া।

আমরা এখন বেনারসের দিকে চলেছি। এখান থেকে বেনারস ১০০ মাইল। সাসারাম পর্য্যন্ত পথ মন্দ নয়। সাসারামে শের শাহের সমাধি দ্রষ্টব্য। দুর্গাবতী নদীর উপরে সেতু আছে। পার হয়েই যুক্তপ্রদেশের এলাকায় এলুম। সাসারামের পর থেকে পথ বরাবর খারাপ। বেনারস পৌঁছাতে যখন মাত্র ২০ মাইল বাকী, তখন হঠাৎ একটা চাকা পাংচার হ'ল। তাড়াতাড়ি চাকা বদলে

যথাবিধি আটক পড়্লুম। তখন রাত সাড়ে আটটা। এটা রেলওয়ে রোড ব্রীজ। সুতরাং রেলের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় মোটর-যাত্রীদের পার হ'তে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মর্জ্জির উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। ক্যাবিনে অনেকক্ষণ দরবারের পর রাত দশটায় তারা দয়া ক'রে পারের অনুমতি দিলেন।

বেনারসে যে বাড়ীতে ওঠ্বার কথা ছিল, বড্ড বেশী রাত হোয়ে গেছে দেখে, সেখানে গিয়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালায় গিয়ে অতিথি হওয়া গেল।

যাঁর বাড়ীতে ওঠ্বার কথা ছিল, পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে প্রথমেই খুব একচোট বকুনি খেলুম, এ বড় মন্দ নয়। ভদ্রলোককে অযথা বিব্রত করিনি, এই হ'ল আমাদের অপরাধ! বকুনি-পর্ব শেষ ক'রে তিনি সটান্ আমাদের টান্তে টান্তে ধর্মশালায় নিয়ে এলেন এবং আমাদের বোচকা-বুচ্কি কতক গাড়ীতে, কতক মুটের মাথায় বোঝাই ক'রে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তবে ক্ষান্ত হ'লেন। সত্যি, পথে ঘাটে এরকম সহৃদয় লোক পাওয়া যায় বলেই মানুষ দেশভ্রমণ করতে পারে। নতুবা দেশভ্রমণের নামে লোকের গায়ে জ্বর আসত হয়ত।

ইনি অবশ্য আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অমিয় ব্যানার্জীর আত্মীয়—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়।

সারনাথে মূলগন্ধকুটীবিহারের দেওয়ালে অঙ্কিত চারু কারুকার্য্যগুলি দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকা যায় না, এতই মনোহর।

নানা কারণে বেনারস ত্যাগ করতে একটা বেজে গেল। পথে যথাসম্ভব কম বিশ্রাম ক'রে রাত্রি এগারটায় মহারাজপুর পৌঁছালাম। এখান থেকে কানপুর আরও এগার মাইল। রাস্তার অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। মহারাজপুর ডাকবাংলোয় সেই রাত্রির মতন থাকা স্থির করলুম, নিজেদের তৈয়ারী চা ও সঙ্গে আনীত খাবার খেয়ে রাতটা কাটানো গেল।

আমাদের এই একঘেয়ে একটানা ভ্রমণকাহিনীর ভেতর নূতনত্ব কিছু ছিল না। ছিল শুধু এগিয়ে চলার একটা প্রত্যক্ষীভূত আনন্দ। তাই এ কাহিনী হয় তো পাঠককে নব নব রস পরিবেশন করতে সমর্থ হবে না। তবে সহৃদয় পাঠককে এই ভেবে এই কাহিনী-লেখককে ক্ষমা করবেন যে, যেখানে দেখা ও শোনার মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই সেখানে শুধু লেখনীর রঙে রঙীন করবার কৌশল এ অক্ষমের জানা ছিল না।

পরদিন সকালে চা-পান ক'রে আটটায় রওনা হই কানপুরের দিকে। দেখ্তে দেখ্তে ১১ মাইল পথ পার হওয়া গেল। কানপুর শহরের চারিদিক ঘুরে আস্তে আরও ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। আমরা যে সময়ে কানপুরে গিয়েছিলাম তখন সেখানে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের গণ্ডগোল সবেমাত্র থেমেছে। শহর শান্ত। আমরা [illegible]নের



ইতিমাদ উদ্দৌলা—মমতাজের পিতার সমাধি মন্দির, [illegible]।

কাছে এক পাঞ্জাবী হোটেলে আহারাদি সারলাম। বিদেশে বেরিয়ে অবধি আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মকানুনগুলোও মেনে কখনও চল্তে পারিনি। আহারের পূর্বে যে স্নান করার বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে, তা পালন করা সব সময় ঘটে ওঠেনি। স্থির করলাম, পথে অনেক খালটাল পাওয়া যাবে তাতেই স্নান সারব। বেলা দশটায় কানপুর ছাড়্লুম। কিছুক্ষণ চলার পর একটা খাল পাওয়া গেল। জলের রঙ্ কালো, বন্ধুরা বল্লেন—জল বড় অপরিষ্কার। এ জলে স্নান করা উচিত হবে না। আরও এগিয়ে চল্লুম। একটার পর একটা ক'রে অনেকগুলি খাল পার হয়ে এলুম। প্রত্যেকটির জল কালো। সুতরাং স্নান করা আর হ'ল না। বেলা ৩টায় বেবুর শহরে পৌঁছালুম। রৌদ্রের প্রখরতায় প্রত্যেকেরই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল।

স্নান না ক'রে আর এক পাও যাওয়া অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছিল। শহরে ঢুকে আবার একটা খাল পেলুম, তারও জল কালো। কিন্তু দেহমনের তখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে, এর কালো রঙ আর আমাদের স্নানের প্রবৃত্তিতে বাধা ঘটাতে পারলে না। পোষাক পরিচ্ছদ খুলে নেমে পড়লুম। জল খুব ঠাণ্ডা। স্নান ক'রে এত তৃপ্তি মনে হ'ল, যা জীবনে কখনও পাইনি। দেখলুম, জলের উপরকার ঐ কালো রং ওটা ওর ছদ্মবেশ। ওর অন্তরে কোন আবিলতা ছিল না। খালের জল যতটা নির্মল হওয়া সম্ভব, ততটাই তা নির্মল ছিল।

ছেলেবেলা থেকে বইয়ে পড়ে এসেছি, বর্ণহীনতা ও গন্ধহীনতা—এই হ'ল জলের বিশুদ্ধতার লক্ষণ। পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি এই নিয়ম। তবুও কানপুরে ওর ব্যতিক্রম ঘটল কেন? মনে সংশয় জাগল, তবে কি রোদে পুড়ে পুড়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটল? নিজেদের দেহের দিকে তাকালাম, না সেখানে তো কোন গোলযোগ নেই! নিজের নিজের শরীরের যা রঙ তাইই আছে—গাছপালা ঘরবাড়ী আকাশ—সর্বত্র একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম—না তাদেরও রঙ তো কিছু বদলায় নি।—প্রত্যেকটি বর্ণের বিভিন্নতা, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে দিব্যি প্রতিভাত হচ্ছে তো—কেবল জলের বেলায় এমন হ'ল কেন? তবে কি রোদের সঙ্গে কেবল জলেরই শুধু কোন অলৌকিক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে—যা এতদিন আমাদের কারও জানা ছিল না।

যাই হউক, এই রকম নানা প্রশ্নবহুল সমস্যা নিয়ে আমরা জল থেকে উঠে পড়লুম এক সময়। ভাবলুম 'ভারতবর্ষ'-এ আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী ছাপা তো হবেই, এই সমস্যার মীমাংসার ভার দেব পাঠকবর্গের উপর। তাঁরা হয়ত আমাদের মত দিশেহারা নাও হ'তে পারেন। উত্তর ঠিক মিলবে।

কিন্তু আজ আর আমাদের কোন প্রশ্নই নেই। ব্যাপারটা যে জলের মত সোজা, তা আজ জেনে ফেলেছি। যমুনার জল কালো। আর এখানকার সব খালই যমুনা থেকে কেটে আনা। সুতরাং তাদের জলও অনিবার্য কারণে কালো।



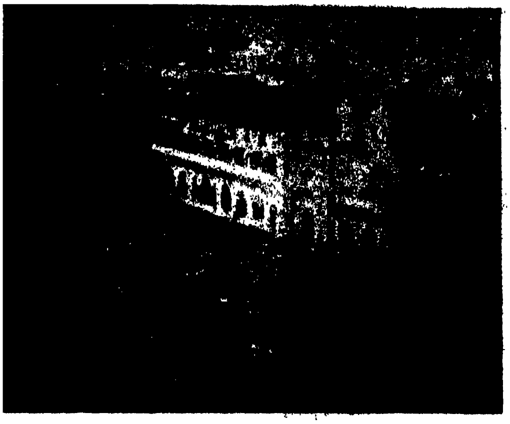
গুলমার্গ হইতে খেলনবার্গ তুষারাচ্ছন্ন পথে—কাশ্মীর

খাওয়া তো আগেই সারা হয়েছে। স্নান সেরে আবার যাত্রা সুরু। পথে একটা জলের ধারে মাণিকজোড় পাখী দেখ্তে পেয়ে এক বন্ধু গুলি চালালেন। এর আগে আরও কয়েকটি পাখী মারা হ'য়েছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে রান্না ক'রে তাদের সদ্ব্যবহার করতে না পেরে সেগুলি পথের ধারে ফেলে রেখে যেতে হয়েছিল। তাই আজ আর পাখী মারবার মত প্রবৃত্তি কারও ছিল না। কিন্তু বন্ধুর হঠকারিতা গুলি চালানো ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী। যাই হোক, মারা যখন হ'লই তখন তার পরের কাজটা করতে তিনি পেছুবেন কেন? বেশ যত্ন ক'রে ও ঐকান্তিক মনোযোগের সঙ্গে, পাখীটির নাড়ী ভুঁড়িগুলো বার ক'রে ফেলে দিয়ে তিনি সেটাকে বেঁধে নিলেন। কথা রইল, আজ আর কিছুতেই ফেলা হবে না।

রাত্রি আটটায় আলিগড়ে পৌঁছালুম। আগেই শহর

প্রায় জনবিরল হ'য়ে গেছে। বাজারের মধ্যে কচিৎ দু-একটা লোক চলা ফেরা করছে।

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করছিলুম। একবার পাখীটি ও তার



ফতেপুর সিক্রীর সাধারণ দৃশ্য

শিকারীর দিকে চাইলুম। আহা বেচারী! কাতর সস্নেহ দৃষ্টিতে পাখীটির দিকে চেয়ে বললেন, আজও এটাকে ফেলে দিতে হ'ল মিষ্টার ঘোষ।

বললুম, ফেলবেন কেন, রাঁধুন না।

—দেখ্ছেন না, শুকিয়ে উঠেছে কি রকম, এ কি আর খাওয়া যায়!

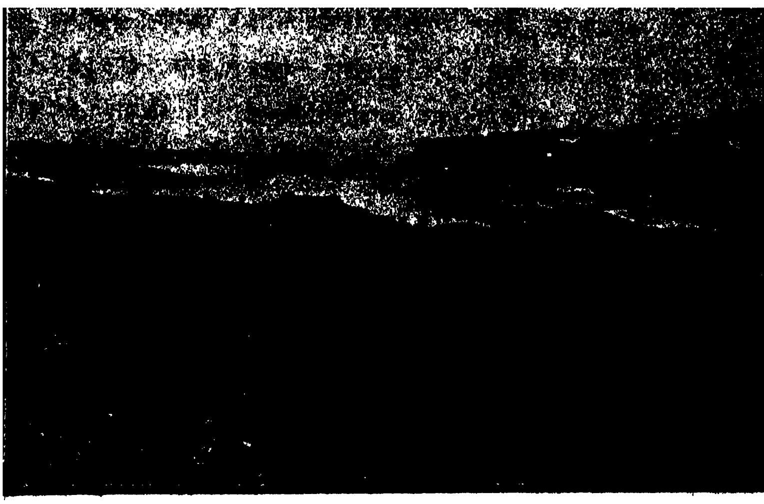
আলিগড় শহর আদৌ ভাল লাগ্‌ল না। বড্ড অপরিষ্কার। পথ-ঘাট খুব নোংরা। বাজারে কোন হোটেল নেই। আহারান্তে আলিগড় ত্যাগ ক'রে রাত ১১টায় খুরজা ডাক বাংলোয় পৌঁছালুম। এখান থেকে দিল্লী ৫৫ মাইল।

পরদিন ৮টায় খুরজা ডাকবাংলো ত্যাগ করলুম। সুন্দর রাস্তা। দিল্লী পৌঁছালুম বেলা সাড়ে দশটায়। শহরে ঢুকেই সরাসরি G. P. O-তে পত্রাদির তল্লাসে গেলুম। পথে এক শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁর অনুরোধে তাঁর হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলটির নাম প্রিন্স হোটেল ইনি আমাদের খুব খাতির-যত্ন করলেন। টুরিষ্টস্ ব'লে কনসেসন্ রেটও দিয়েছিলেন।

এক বন্ধুর কোন পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী তাঁর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

অসিমবাবুর পূর্বেকার ট্যুরে পরিচিত কাশ্মীর গেটের মোটর সাইকেল হাউস-এ আমাদের গাড়ী গ্যারেজ করলুম। ট্যুরিষ্টস্ বলে বরাবর এঁরা খাতির ক'রে থাকেন।

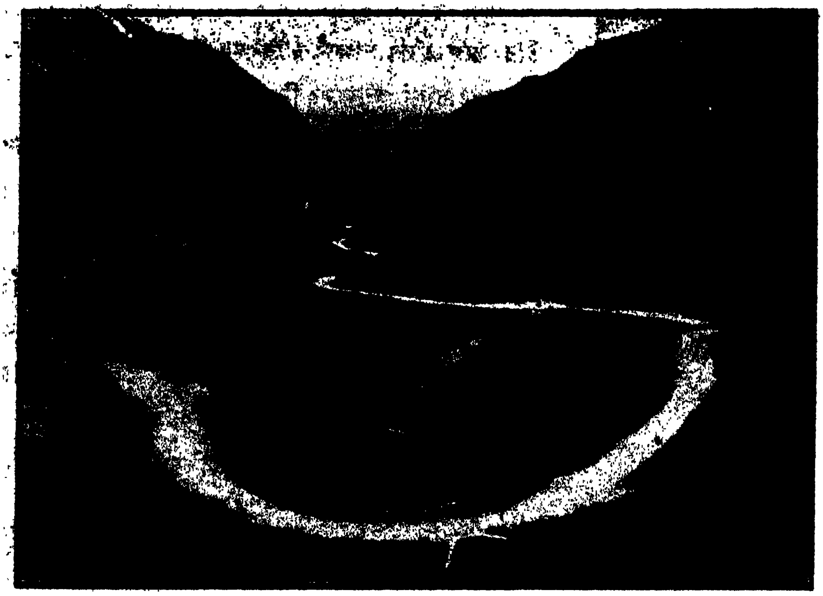
পরদিন ২৮শে অক্টোবর দিল্লীতেই কাটলুম। দিল্লীর দ্রষ্টব্যগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলুম। আমাদের কাছে বন্দুক দেখে আমাদের হোটেলের অধ্যক্ষ পরদিন ভোর পাঁচটার সময় আমাদের শিকারে নিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরা রাত চারটা থেকে জেগে বসে রইলুম পাছে তিনি ডাকাডাকি ক'রে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে যান এই ভয়ে। কিন্তু ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। কে জানত যে, চিন্‌চিনে রোদ্দুর জানালা দিয়ে ঢুকে ভদ্রলোকের গায়ে না লাগলে তাঁর ঘুম ভাঙে না!



সিন্ধুনদ—একদিকে পাঞ্জাব, অপর দিকে ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স

ভদ্রলোক যথেষ্ট লজ্জিতভাবেই আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে সবিনয়ে জানালেন যে, কাল আর এরকম অন্যায় হবে না, আর একটা দিন থেকে যান। নিশ্চয়ই শিকারে নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।

আমাদের সেই দুষ্ট বন্ধুটি আমার কানে কানে বললেন, এখানেও সেই 'পলিসি'—আরও একটা দিন অর্থাৎ চার দুগুণে আটটি মীল!



খাইবার পাশের দৃশ্য

আমি হোটেলাধ্যক্ষকে সবিনয়ে জানালুম যে, যাবার পথে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি; কারণ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শ্রীনগরে অত্যধিক শীত পড়বে ও তুষার পাতের পরিমাণ বাড়বে। তাড়াতাড়ি না গেলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে। বরঞ্চ ফেরার পথে আপনার এখানে ছদিন বেশী থাকা যাবে।

২৯ অক্টোবর বেলা ১১টার সময় দিল্লী ত্যাগ করলাম। আজ থেকে আমাদের বাইকের স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আগে ৪০ মাইল স্পীডে যাচ্ছিলাম। এখন থেকে ৫০, ৫৫ মাইল, পথ খুব ভাল থাকায় ঐ গতি সর্বত্র সমান রাখা সম্ভবপর হয়েছিল।

নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা ৭টায় লুধিয়ানায় পৌছালুম। এইখানে জলযোগের পালা। বেলা ১১টার আগে দিল্লীতে মধ্যাহ্ন আহারটা সেরেছিলুম। ট্যুরে বেরিয়ে একটা কথা কেবলই মনে হয়েছে যে, মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থাটা দুবার থাকলেই ভাল হ'ত।

এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি সম্মুখ পথের অনেক খবর বললেন।

এই রাস্তেই আমরা আরও অগ্রসর হব শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, এই পথে যে ডাকাতের উপদ্রব আছে তা কি আপনাদের জানা নেই?

আমরা আমাদের অজ্ঞতা স্বীকার ক'রে বললুম, ধন্যবাদ! কিন্তু আমাদের আজ আরও খানিকটা এগিয়ে থাকতেই হবে।

তিনি বললেন, আজ আপনারা এই দীনের কুটীরে অতিথি হোন্। বিপদের মুখে আপনাদের এ রাত্রে যেতে দিতে পারব না।

না-ছোড়-বান্দা। আমাদের কাছে বন্দুক আছে। আমরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র। তাছাড়া, ৫০।৫৫ মাইল স্পীডের মুখে কখনও কোন ডাকাত কারো কিছু করতে পারে না, এই কথা জানিয়ে তাঁর এই অযাচিত সহৃদয়তা প্রকাশের জন্য তাঁকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাত ৮টা ১৫ মিঃ সময় লুধিয়ানা ত্যাগ করলুম।

৩৪ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে রাত্রি প্রায় ৯টার সময়



ল্যাণ্ডিকোটাল—উত্তর পশ্চিম ভারতের শেষ সীমানা। লেখক ও তাহার সঙ্গী তিনজন—বামদিক হইতে অজিত ভাদুড়ী, অজিত ব্যানার্জি, নিমাই মান্না, দুলালচন্দ্র ঘোষ।

জলন্ধরে পৌছালুম। ষ্টেশনের নিকটস্থ, একটি হোটেলে নৈশ ভোজন ও নিশা যাপনের ব্যবস্থা হ'ল।

পায়খানার সন্ধান করায় হোটেলের একটি লোক বাড়ীর ছাদের ওপর ছোট একটি ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল। তার উপরে কোন আচ্ছাদনই ছিল না, দরজা ব'লে কোন বস্তুও সেখানে ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল, ভিতরে দুটা পা-দান।

পরদিন সকালে বেলা সাড়ে সাতটায় চা পান সেরে জলন্ধর ত্যাগ করলুম। দিনের আলোয় একটা নূতন দৃশ্য উপভোগ করা গেল—লোটা হস্তে লোকের ছাদে গমন। এ পর্য্যন্ত সকলকে মাঠেই ছুট্‌তে দেখেছি। সে-দেখা বড়ই একঘেয়ে। তাই এই পরিবর্ত্তিত দৃশ্য মন্দ উপভোগ্য হ'ল না।

এখান থেকে পথ অতিশয় চমৎকার। বেলা এগারটায় লাহোর পৌছালুম, অমিয়বাবুর আগেকার ট্যুরে পরিচিত হোটেলে ওঠা গেল। কিন্তু তাঁরা অতিরিক্ত চার্জ করায় তাঁদের সঙ্গে বনল না। সেখান থেকে চ'লে গিয়ে আনারকলি বাজারে সেণ্ট্রাল হোটেলে কম খরচায় ব্যবস্থা করা গেল।

স্নানাহার সেরে G. P. O-তে চিঠি পত্রের সন্ধানে গেলাম। পথে এক ট্রাফিক পুলিশ আমাদের এক বাইকে চারজনকে দেখে ধরলে, পরে আমাদের রেজিষ্ট্রেশন বুক (যাতে চারজনের বসবার অনুমতি লেখা ছিল) দেখে তবে আমাদের অব্যাহতি দিলে।

বেলা ২টায় লাহোর ছাড়লুম। ৩টায় গুজরানওয়ালা ছাড়বার আগে পথে খাবার জন্য কিছু মাখন ও রুটি কিনে নেওয়ার কথা হ'ল। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরেও অজস্র মাখন ও রুটি থাকা সত্ত্বেও তা সংগ্রহ করতে পারলুম না। আমরা কি চাই বহুকষ্টেও তা তাদের বোঝাতে পারলুম না। এরা যে হিন্দী বোঝে না তা এই প্রথম জানলুম।

বিরক্ত হ'য়ে ফিরছি এমন সময় ইংরেজী-জানা একটি স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরই সহায়তায় সে যাত্রা মাখন রুটির ক্রয় পর্ব শেষ করতে পেরেছিলুম।

বর্ত্তমান গন্তব্য শিয়ালকোট। শিয়ালকোট যেতে হলে ওয়াজিরাবাদ দিয়ে যেতে হয়, আমাদের অটোমোবাইল এসোশিয়েশনের (বেঙ্গল) গাইড পুস্তকে লেখা ছিল। সেইদিকে অগ্রসর হ'ব এমন সময় এক বাসওয়ালা হিন্দীতে আমাদের শিয়ালকোট যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা বাৎলে দিলে। শিয়ালকোট পৌছে আরও কিছু মাখন ও রুটি কেনা গেল। শহরটা মন্দ লাগল না। মিলিটারী ভাবটাই বেশী প্রকট।

ক্রমশঃ

অলঙ্কারের শোভা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

নীহার বলিছে "দূর্ব্বে! আমি অলঙ্কার
কত না অঙ্গের শোভা বাড়াই তোমার।"
দূর্ব্বা বলে "ক্ষণ পরে তোমার মরণ,
আমার শাশ্বত শোভা শ্যামল বরণ।"



মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"মানুষের স্নেহ ত মাটির বাসন নয—যে একবার এঁটো হ'য়ে গেলে আস্তাকুঁড়ে ফেল্‌তে হবে। যে ধর্ম্ম মানুষকে পিছনে ফেলে আপনি চলে এগিয়ে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।"

"না মেনে লাভ?"

"অন্ততঃ মান্‌যাব লাঞ্ছনা আব আত্মবঞ্চনার লোকসান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায। নাগালেব বাইবে যে লালপতাকা আসমানেব আদর্শ দেখিযে চোখ বাঙায, নীচে দাঁড়িযে তাব জযধ্বনি করে মূর্খবা।

নোটকেসেব মাইকা-টা ভেঙে ফেলে, সত্যেন সুরেখার ফটোগ্রাফখানা বের ক'রে ফেল্‌ল। তড়িৎ-এব মুখপানে এক সেকেণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেযে, ছবিখানা টুকবো টুক্‌রো ক'রে ছড়িযে দিল ফুটপাথে। ' সুন্দবী হ'লেও ওব চোখে আজ সুরেখা মজুমদার আবর্জ্জনার চেযে কদর্য্য।

তড়িৎ বিদ্রূপেব স্বরে বলে –"তবে যে ব'ল্‌ছিলে—"

"ব'ল্‌ছিলাম কেন। এখনও বলি, পবেও ব'ল্‌বো—বিচ্যুতিকে ক্ষমা কবা যায, কিন্তু নীচতাকে নয।'

প্রায দশমিনিটের নীরবতা উন্মত্ত হাসিতে কাটিযে, সত্যেন তড়িৎ-এব পিঠে একটু চাপ দিযে ব'লে উঠ্‌ল—"সে কথা যাক্, চল্‌তি পথের অপায ওবা। থ্রী বীলে গত শনিবাবের খানিকটা আজ মেক-আপ ক'রেছি। আস্‌ছে সপ্তাহে ক'রব ট্রিপ্‌ল্।"

"ট্রিপ্‌ল্? একবাবে—"

"ট্রিপ্‌ল্, ডবল্ টোট্ ত নিশ্চযই। সত্যেন সেনের টিপ্ সব্যসাচীর তীরের চেযে কম অব্যর্থ নয়।"

"জানি। তবে—"

"তবে মানে? মেজাজটা সব সময় ঠিক থাকে না তাই। গত শনিবাব সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেল এম্পাযারের 'পোয়ে' ডান্সে। চার্মিং ড্রিম্!"

"বাক্ আপ্ বন্ধু, বাক্ আপ্। আজ 'ডমিনিয়নে' হুট নৃত্য।"

"চুলোয় যাক্ তোব হুউ। যে সব হতভাগাদের বউ আছে, তারাই দেখুক-গে হুউ। আমি এবাব লাষ্ট্ ম্যান।"

"লাষ্ট্ ম্যান।—তুমি, সত্যেন সেন।"

"নিশ্চযই। এবার আমাব আকর্ষণ 'মর্ণিং বোজ', না হয 'ফ্লাশ লাইট'। আপ্-সেট্ হবে তড়িৎ, দেখে নিও।"

"তথাস্তু। জয হোক্ তোমাব। আজ তো চল, টেম্প্‌ল হোটেলেব কেবৎ হুউ দেখে শনিবারটাকে গুড্-বাই করি। তপন ও সেনবয যাবে মল্লিকাদেব নিযে।"

কপালটা কুঁচ্‌কিযে সত্যেন কি যেন ভেবে নিযে বলে—"আচ্ছা, আজকের মত—শুধু আজকেব মতই।"

তড়িৎ তর্জ্জনী-সঙ্কেতে একখানি চলমান ট্যাক্সিব গতি শ্লথ ক'বে পেভমেণ্টেব পাশে দাঁড করায। পথেব দুপাশে তখন অজস্র আলো জ্বলে' উঠেছে, বড বড় বাড়ীগুলোব ভিতব জীবন্ত বিকাবের মত নানা-দেশী সুবের কোলাহল মনটাকে ঘবছাড়া ক'বে দেয।

তড়িৎ ও সত্যেন অর্দ্ধমনস্কভাবে গাড়ীর কাছে এগিযে গেল। প্রাসাদেব বুকে ওই রেডিওগুলো যেন প্রেতাত্মাব বীভৎস উৎসব।

তড়িৎ-এব মনে আলোক-বেখাব ছাবাপথ এম্পায়াব থেকে গার্ষ্টিন প্লেস পর্য্যন্ত পুঞ্জীভূত বসচেতনার বৈচিত্র্য এঁকে দেয়। সত্যেন নিবিষ্ট মনে ভাবে—গ্রে-ক্রহাম আব ক্যামেরনোব তফাৎ ছিল মাত্র তিন পাউণ্ড, চমৎকাব পেডিগ্রি, রাইট ব্যাঁলান্স, তবুও সব গেল ভেস্তে। কেমন ক'রে প্লেস আর উইনে গোলমাল হ'য়ে গেল! যাক্—

"সেনরয় মল্লিকা বোসেব সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্; তপন আছে মল্লিকার ছোট বোন মঞ্জরীর রেশমি ফাঁসে মাথা গলাবাব চেষ্টায। জন্মদিনে এবার ওকে সে জাপানী স্লিপিং গাউন উপহার দিয়েছে।"

"পাকা সাইকোলজিষ্ট ব'ল্‌তে হবে; মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিণামটাকে প্রকারান্তরে ওর মনে জাগিয়ে দেওয়া মানেই, নিজের পাওনাটুকু সুদের আসল আদায় ক'রবার

পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের প্রাকারটা আলগোছে একবার ছুঁয়ে দেওয়া, আর কি!"

দুজনে ট্যাক্সিতে উঠে ব'স্‌ল। সত্যেনের মনটা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। জাপানী ক্লোক-পরা আব্‌ছা একটা নারীমূর্ত্তি হয় তো ভেসে ওঠে ওর চোখের সাম্‌নে; মুখখানা মঞ্জরীর, কিন্তু গলা থেকে পা পর্য্যন্ত সুরেখা মজুমদারের: তেমনি লম্বা অথচ নিটোল চেহারা, দুটি বাহুতে উদগ্র কামনার চঞ্চলতা।

* * * *

প্রকাণ্ড হল। দুপাশে সারি সারি টেবিল—নানা আসবাবে সাজানো। নিত্য প্রয়োজনের উপকরণ রূপ নিয়েছে ঐশ্বর্য্যের মণিমালায়। ধব্‌ধবে টেবিল-ক্লথের উপর স্যালাড্‌-সেট্‌টা ঝক্‌ঝক্‌ করে; রকমারি গন্ধ নানা রকম স্ত্রীপুরুষের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। ডিনার কনসার্টের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁটা-চামচের রুনটুন্‌ শব্দ; অ-:খ্য পাখার ঝাপ্‌টায় বাতাসটা ঘুরপাক খেয়ে রেশমি পর্দ্দার ঝালরগুলো চঞ্চল ক'রে তোলে; আশেপাশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম-সাহেবদের কৃত্রিম মিহি গলার প্রণয়গুঞ্জন স্যাম্পেনের হাল্‌কা গন্ধের মত মগজটায় ঝিম্‌ ধরিয়ে দেয়। ও পাশের হলে 'ডান্স' সুরু হ'য়েছে; মৃত্যুক্লিষ্ট জীবনের পান্থশালায় অমৃতের উৎসব যেন ফেনিল হ'য়ে উঠেছে।

তড়িৎ ও সত্যেন এ পাশের একটা ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকল। ষ্টুয়ার্ট যেন ঠিক এই দুজনেরই অপেক্ষায় এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিল। নিতান্ত প্রত্যাশিত আগমন তাদেরই দুজনের, অন্য কারুর নয়; হ'লেও হয় ত এতটা আনন্দের হ'ত না। সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়ে বয় আদেশের অপেক্ষায় মুখপানে চেয়ে থাকে।

হুকুম দিয়ে সত্যেন ও তড়িৎ চুপটি ক'রে ব'স্‌ল। সত্যেনের মনটা আজ কোন রকমেই স্বাভাবিক হ'তে চায় না। বৈশাখী সন্ধ্যার মত মাঝে মাঝে বাতাস ওঠে, আবার পরক্ষণেই থমথমে গরমে গুমট ধরে।

পাশের কেবিনে একটী বাঙালী মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গায়। নব পরিচিতকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুল্‌বার চেষ্টায় সে যেন গুন হাসির ফিন্‌কি ছড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কথার জাল বুনছে। স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছে—তার আজন্ম-সঞ্চিত ব্যাকুল প্রতীক্ষা ওই নবপরিচিতের পথ চেয়ে এতকাল কেমন ক'রে বদ্ধ জলের মত শেওলায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল। আজ ফুটেছে সেখানে সার্থকতার হিঙ্গুল শতদল।

ওরা দুজনে নির্ব্বাক হ'য়ে শোনে। সত্যেনের অন্যমনস্কতা কখনো একটু ক'মে আসে; আবার বেড়ে যায়; হঠাৎ টিপ্‌গুলোর কথা, না হয় সুরেখার আচরণটা মনে প'ড়ে।

স্পষ্ট অস্পষ্ট আরও, অনেকের কথা শোনা যাচ্ছে। মেয়েটা খুব হাস্‌তে পারে; কথায় কথায় ঠিকুরে প'ড়ছে ওর হাসি—চৈতালি বাতাস-লাগা শিমুলের পাথরি মত। সঙ্গীদের ভিতর একজন সিন্ধী ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় আলাপ করে; ষ্টুয়ার্টকে ফিরিস্তি দেয়।

হঠাৎ সত্যেন চমকে উঠ্‌ল সুরেখার কণ্ঠস্বরে। বিশ্বাস হ'ল না। মাথাটা ঝাঁকিয়ে কানপেতে শুন্‌বার চেষ্টা করে—'হাঁ সুরেখা, সুরেখাও আছে ওদের ভিতর।'

সত্যেনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'রে উঠ্‌ল। এক নিঃশ্বাসে বিয়ারের টামব্লারটা শেষ ক'রে, তড়িৎকে এক রকম টান্‌তে টান্‌তে বাইরে নিয়ে এলো। বিল আন্‌বার আগেই বয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে, চেঞ্জের অপেক্ষা না রেখে সে বেরিয়ে প'ড়ল রাস্তায়।

মেট্রোর নীল এন্‌সাইন্‌গুলো চাবুকের মত কিলবিল করে। সাম্‌নের ময়দানটায় ছড়িয়ে পড়ে ইলেক্‌ট্রীক্‌ নিউজের তীব্র আলো।

তড়িৎ হঠাৎ সত্যেনের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে একটু বিস্মিত হ'য়েছে, কিন্তু কারণটা অনুমান ক'রতেও পারে নি। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে সত্যেন কি ভাব্‌ছিল। একজন ফিটন্‌ওয়ালা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটু ইতস্ততঃ ক'রে চুপি চুপি জিজ্ঞেস্‌ ক'রল—"চায় বাবু, খাঁটি বিলিতি? একদম নয়া—উনিশ কি বিশ!"

তড়িৎ হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল। সত্যেন কোন কথা না ব'লে এগিয়ে চল্‌ল 'ডমিনিয়নের' পথে। ফিটন্‌ওয়ালা পিছু পিছু আসে; তড়িতের ইচ্ছা দাঁড়িয়ে একটু আলাপ ক'রতে, কিন্তু সত্যেন দৃক্‌পাত করে না।

সত্যেন্ সেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সংসারে আপন ব'ল্‌তে বিশেষ কেউ নেই তার। পিতার মৃত্যুর পর পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সত্যেনের একটা কেন্দ্র অন্ততঃ ছিল। সুতো-বাঁধা খেলনা-বেলুনের মত উড়বার চেষ্টা ক'রেও ফিরে আস্‌তে হ'ত তাকে পিসিমার হাতের কাছে। দুরন্ত মন চলন্ত এক্সপ্রেসের মত ছুটবার আয়োজন ক'রলেও লাইন ছাড়িয়ে চল্‌তে পারত না।

ললিতবাবু মৃত্যুকালে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও জীবনবীমার কয়েকখানি মেয়াদি দলিল রেখে গিয়েছিলেন। দেশে একখানি বাড়ী ও অল্পস্বল্প জমিদারিও ছিল; দেখেশুনে চল্‌লে একটী মাত্র পুত্রের পক্ষে বোধহয় তাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সত্যেন দেশের বাড়ীতে যেতে চাইল না। ব্যাঙ্কের খাতাখানি ঘিরে গ'ড়ে উঠ্‌ল তার এক ক্রমবিবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠা; বন্ধুমহলে নিরর্থক নেতৃত্বের সমারোহ।

লেখাপড়া সে অনেকদিন আগেই ছেড়েছে। এখন মাঝে মাঝে করে সঙ্গীতচর্চ্চা, গণজীবনে নিজেকে বিশিষ্ট ক'রে তুল্‌বার অসার্থক প্রয়াস, আর অভিজাত মহলে সুপরিচিত হবার নানা উদ্যোগ।

পিসিমা মারা গেছেন। সত্যেন বাসা উঠিয়ে দিয়ে একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে এখন চেরি-ক্লাবের সেক্রেটারী ও সবুজসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট।

পৈতৃক সঞ্চয়ের অনেকখানি ব্যয় ক'রে সত্যেন যখন বুঝ্‌ল যে অবশিষ্ট অঙ্ক শেষ হ'তে আর বেশী দিন নেই; তখন বাকী টাকা সিকিউরিটি জমা রেখে সে সিটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হ'ল। দেড়শ টাকা মাইনে; ভবিষ্যতের আশাপ্রদ সম্ভাবনাও আছে।

মানসিক পরিস্থিতির সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই এসে প'ড়েছে সুরেখা মজুমদার। অর্থকে সুরেখা অবহেলা করে, তাই ওর চলাপথে পায়ের দাগের মতই অর্থকে পিছনে ফেলে চল্‌তে হয়; নইলে সুরেখার আভিজাত্য নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের ভ্রূকুটি করে।

হোটেলের অন্যান্য মেম্বারের চোখে সত্যেন যেন একটা জীবন্ত বিস্ময়। রঙ-বেরঙের শাড়ি-পরা যে সব আধুনিকাদের ভিড় জমে তার ঘরে, তাই নিয়ে আশপাশের বৈঠকী ছোট আসরগুলি মশগুল হ'য়ে ওঠে নানা আলোচনায়। ওর সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই।

সত্যেনের জন্মদিন উপলক্ষে একটা উৎসবের আয়োজন ক'রবার জন্য সুরেখা পীড়াপীড়ি সুরু ক'রেছে। অনেক কিছু ভেবে সে প্রথমটা রাজী হয় নি, কিন্তু সুরেখার অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অগত্যা সত্যেন সম্মত হয়েছে সে প্রস্তাবে। সুরেখা উদ্যোগী হ'য়ে কার্ড ছাপিয়ে বিলি ক'রেছে; কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু, সাহিত্যিক ও টুরিষ্টকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছে সে নিজে গিয়ে। ওর জন্মদিনকে স্মরণীয় ক'রবার জন্য সুরেখার এই আগ্রহ যেন শিরায় শিরায় স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, সত্যেনের বুকের তলায় গ'ড়ে ওঠে ভবিষ্যতের তাজমহল।

কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়ে ওই সুরেখা মজুমদার! নিজে থেকে যতখানি সে ধরা দেয়, তার বেশী এক তিলও অধিকার থাকে না অন্যের। হাতের কাছে থেকেও সে ছায়ার মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি চলে।

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সত্যেন সেদিন হঠাৎ সুরেখার হাতখানা নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে মধ্যমার অগ্রভাগটায় দিয়েছিল আল্‌গোছে দাঁতের চাপ। নিমেষে সুরেখা ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কে উঠ্‌ল—

"মিঃ সেন!"—কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক তীব্রতা।

সত্যেন শুধু অপ্রস্তুত হ'ল তাই নয়, লজ্জায় তার মাথাটা যেন মাটিতে নুইয়ে পড়তে চায়। সুরেখার মুখপানে আর ও ভালভাবে চাইতে পর্য্যন্ত পারে না।

কিন্তু পরক্ষণেই সুরেখা নিজে থেকে তার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"তাড়াতাড়ি কেন? অত বেশী—"

এবার সত্যেন সাহস ক'রে চাইল ওর মুখপানে। সুরেখার মুখে আগেকার মতই স্বাভাবিক হাল্‌কা হাসির রঙ। সত্যেনের হাতখানা কোলের উপর টেনে নিয়ে বলে—"দ্রুত আত্মসাৎ করবার চেষ্টা আসন্ন ত্যাগের লক্ষণ।"

সত্যেন বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে। হয়ত তেমনি ক'রে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে আবার কখন সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এবার সুরেখা ওর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঝক্‌ঝকে শাদা দাঁত দিয়ে মধ্যমার মাথাটা আস্তে চেপে ধরে। মুহূর্ত্তে সত্যেনের দেহমন শিউরে ওঠে।

সুরেখার আচরণে মাঝে মাঝে মনে যে দাগ পড়ে, সে দাগ মুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়।

ডিনারের দিন ঘুম থেকে উঠেই সত্যেন ম্যানেজারের কাছে খবর পাঠালো—ওবেলা চব্বিশ জন গেষ্ট আছে তার নিমন্ত্রিত। এ-ধরণের খবর ম্যানেজারের কাছে এই নতুন নয়; আগেও অনেকবার হয়ে গেছে।

সকালে সুরেখার আস্‌বার কথা; কথা নয়, আস্‌বেই সে। সত্যেন তার অপেক্ষায় আজ এখনও চা খায় নি। খবরের কাগজখানা নিয়ে ডেকচেয়ারে অবসন্নভাবে ব'সে কি ভাব্‌ছিল সে, এমন সময় হোটেলের বুড়ো চাকরটা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

বুড়ো কৈলাসের হাতে সবুজ স্লিপ দেখে ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে সত্যেনের বিলম্ব হয় নি। তবুও কাগজখানা উল্টাতে উল্টাতে হেসে জিজ্ঞেস্ ক'রল—"কি খবর কৈলাস? ম্যানেজারবাবু—"

"হাঁ হুজুর!"—মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে কৈলাস স্লিপখানা বাবুর হাতে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যেনের হিসাবে হোটেলে বাকী প্রায় হাজার টাকা। সন্ধ্যার আগে টাকা না দিলে ডিনারের কোন ব্যবস্থাই হবে না। আগামী রবিবার থেকে তার মিল্ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।—এক নিঃশ্বাসে স্লিপখানা দু'তিনবার পড়ে সত্যেন অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়াল। নিমেষে তার মাথার ভিতরটা যেন কেমন পাক খেয়ে গেল। এই আসন্ন লাঞ্ছনাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোন পন্থা নেই আজ। হয় ত এখুনি আস্‌বে সুরেখা, আরও কেউ তার সঙ্গে। স্বপ্নলোকের তাজমহল পলকে ভেঙে পড়বে পথের ধূলোয়; সুরেখার বড় বড় দুটো চোখে ঘনিয়ে উঠ্‌বে অবহেলা—ঘৃণা!

কোন জবাব না দিয়ে সত্যেন জামাটা ঘাড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কৈলাস হতভম্বের মত চেয়ে রইল; সত্যেনের চেহারা দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস্ ক'রবার সাহস তার হ'ল না।

সত্যেনের দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। শুধু এ্যারিষ্টোক্রেসির একটা অদম্য নেশা ছাড়া তার জীবনে অন্য কোন বালাই ছিল না। আভিজাত মহলে মেলামেশা ক'রতে সে ভালবাসে। বিশেষ করে যে সব আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায় পাব্‌লিক ষ্টেজে মেয়েদের নিয়ে প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশন করেন, তাঁদের প্রতি সত্যেনের অপরিসীম শ্রদ্ধা। এক কথায়, সে নব্যতন্ত্রের সাধক। যে আধুনিকারা প্রাচ্য কলার রস-পরিবেশনে পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, সত্যেন তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত।

চল্‌তি পথে সত্যেনের সঙ্গে হ'ল সুরেখা মজুমদারের পরিচয়। সুরেখার দিক থেকে যে গভীর আগ্রহ ওৎ পেতে ছিল এতকাল, তাতে সত্যেনকে ঘনিষ্ঠতর করে নিতে তার বিলম্ব হ'ল না মোটেই। রূপের চেয়েও ব্যবহারে ছিল ওর বেশী মাদকতা, সেটা পুরাণ মদের মত যেন হাওয়ায় হাওয়ায় আমেজ বাড়িয়ে দেয়। সুরেখার সঙ্গে একটা দিনের পরিচয়ের নেশা কাটিয়ে উঠ্‌তে যে কোন পুরুষকে অন্ততঃ একপক্ষকাল কঠোর সাধনা করতে হয়। আধুনিকতার জন্যে সুরেখা আধুনিকদের চিত্ত-জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না; তার চালচলনে আছে এমন একটা ঋক্‌বেদী সুর, যাতে করে প্রত্যেকটি গতিভঙ্গি স্বতন্ত্র মৌলিকতায় আত্মপ্রকাশ করে। অসাধারণ না হ'লেও সে সাধারণের বাইরে।

কথাপ্রসঙ্গে সত্যেন একদিন ব'লেছিল—"জীবনটা পাহাড়ি ঝর্ণার মত টেনে নিয়ে যাব। বাঁধন আমার নেই, থাক্‌বেও না কোনদিন।"

সুরেখা হেসে উত্তর দিয়েছিল—"বাঁধন না থাক্‌লেই যে বাধা থাক্‌বে না, তার ত কোন কারণ নেই।"

"কেন?"

"পাহাড়ি ঝর্ণা ব'লে; সমতলের ফোয়ারা হ'লে শিলাতটে আঘাত লাগ্‌বার ভয় ছিল না।"

সত্যেন হেসে ব'লেছিল—"ওঃ, তাই! সে বাধার আঘাত শুধু নিজেকেই লাগ্‌বে, আর কেউ ত ব্যথিত হবে না!"

সুরেখা মুখ টিপে শুধু একটু হেসেছিল। পাৎলা ঠোঁট দুখানি আগুনের ফণার মত লক্‌লক্ করে; নিটোল দুটি গালের মাঝখানে হাসির মধুপর্কের মত ফুটে ওটে দুটি অগভীর রেখা। সেই টোল-খাওয়া গাল দুটো অনেকক্ষণ ধরে আঁকা থাকে অন্যের মনে।

সত্যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—"হাস্‌লেন যে?"

"হাসি পায় আপনার কথা শুনে। পুরুষ কি না! তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাব্‌বার দরকার হয় না। বেশী ভয় মেয়েদের, যারা পুষ্পিত লতার মত পাহাড়ের পাদদেশে

দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পাহাড়ি ঝর্ণাকেই তাদের ভয় সব চেয়ে বেশী।"—ব'লে সুরেখা অকারণ ব্লাউজের বোতামটা বারবার খুলছিল আর লাগাচ্ছিল।

তেমনি ক'রেই ওর দিকে চেয়ে সত্যেন জিজ্ঞেস ক'রেছিল—"তার মানে?"

এইবার সুরেখা হেসে উঠেছিল আরও জোরে—"মানে আর বুঝবেন কেমন ক'রে? পাহাড়ের মাথা থেকে দুরন্ত বেগে নেমে আসেন শিলা-উপশিলা ব'য়ে, আর তারই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ভেসে যায় আমাদের মত অসহায় লতাগুলো; আপনাদের সেই চলার বেগে কোন্ অচেনা তলে তলিয়ে যায় তারা।"

তারপর থেকে তিলে তিলে সত্যেন যেন কেমন জড়িয়ে গেল সুরেখার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই, এমনি ক'রেই সে আঁকড়ে ধরে চলমান সহযাত্রীকে।

ওদের মহলে সত্যেনের যাতায়াত গেল ক্রমেই বেড়ে; বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যা হ'ল বেশী। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে সত্যেনকে প্রায়ই বহন ক'রতে হয় ডিনারের খরচ। বন্ধুদের নিয়ে সাহেবি হোটেলে পার্টি দেয়; প্রীতি-ভোজ, ডান্স—আরও কত কি! প্রতি শনিবারে চলে ওদের উৎসব; তা ছাড়া জন্মদিন ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের অভাব নেই। বান্ধবীদের জন্মদিনে সে-ই দেয় সব চেয়ে দামী উপহার।

আগের চেয়ে খরচ বেড়ে গেছে দশগুণ, কিন্তু মাসিক আয় নিক্তির ওজনে পরিমিত। দেনা বাড়ে, সত্যেন নিশ্চিন্ত হবার আশায় দুটো পেগ দিয়ে মনের বর্ত্তমানটাকে চাপা দেয়। প্রগতির মাঝখানে গৌরবের আসনটুকু অটুট রাখবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে অগ্রগামী ক'রে রাখে। ঠিক এমনই সময় তার মাথায় হঠাৎ চেপে ব'সলো "রেস্"। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অর্থের প্রয়োজন যত বাড়ে, তত বেড়ে চলে তার অপ্রত্যাশিত প্রচুর অর্থের আকস্মিক আগমনের স্বপ্ন।

মাঝে মাঝে মনটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আসে, কিন্তু নিতান্ত ক্ষণিক সেই আত্মস্থতা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কর্পূরের মত বিলীন হ'য়ে যায়। সত্যেন দেনায় জড়িয়ে পড়ে, তবুও একটা শনিবারের অভাবনীয় কল্যাণস্পর্শের স্বপ্ন তাকে মাতাল ক'রে রাখে।

* * * *

সন্ধ্যার আগেই সত্যেন ফিরল তড়িৎকে সঙ্গে নিয়ে। সারাটা দিন ঘুরেও সে কারো কাছে টাকা যোগাড় ক'রতে পারে নি। যাদের কাছে একদিন অনায়াসে পেত ওই সামান্য টাকা, তাদের প্রত্যেককে সে জলৌকাবৃত্তিতে একে একে পিছনে ফেলে এসেছে অনেক আগে। অন্ততঃ আজ আর সেখানে হাত বাড়াবার মুখ নেই তার। নিরুপায় হ'য়ে সত্যেন ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে টাকা এনে হোটেলের দেনা শোধ ক'রে দিল। অত বড় লাঞ্ছনা সে কোনমতেই সইতে পারবে না।

ব্যাঙ্কের ক্যাশে হাত দেওয়া এই তার প্রথম নয়। অবশ্য প্রত্যেকবারই সে ভেবেছে—আগামী শনিবার বেশী টাকা ষ্টেক্ ক'রে নিশ্চয়ই পাবে প্রচুর অর্থ; তাই থেকে ক্যাশ মেক্আপ ক'রে পাওনাদারদের পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত মিটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটে সম্পূর্ণ উল্টো।

দুপুর থেকে সুরেখা না হবে তো পাঁচবার ফোন ক'রেছে ব্যাঙ্কে—সত্যেনের কাছে। সারা বিকেল মঞ্জরী আর সে মিঃ সেনের ঘরখানা সাজিয়েছে রকমারি ক'রে। মঞ্জরী আসতে চায় নি; সুরেখা জোর ক'রে তাকে এনেছে গান গাওয়াবে ব'লে। অজন্তা নৃত্যে অদ্বিতীয়া হ'লেও সে মঞ্জরীর মত গান গাইতে পারে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে মঞ্জরী ভাল গাইতে পারে ব'লে সুরেখা গর্ব্ব অনুভব করে।

সত্যেন আসতেই সুরেখা হৈচৈ ক'রে ব'লে উঠল—"চমৎকার হোষ্ট যা হোক্!"

সত্যেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে সামনে মঞ্জরীকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল। মঞ্জরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় ত হয় নি কোনদিন, তবুও সত্যেন তাকে জানে অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী।—হঠাৎ জাপানী ক্লোকটার কথা মনে জেগে ওঠে। মঞ্জরী সুরেখার চেয়েও স্মার্ট!

রেইন-বো ক্লাব ছেড়ে সত্যেন ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সে এসে উঠেছে। দেশের বাড়ী ও জমিদারিটুকু এক রকম মাটির দামেই বিক্রি ক'রেছে সে, মাত্র সাত হাজার টাকায়

র‍্যাঙ্কেনের দেনা মিটিয়ে, হোটেলে দিয়েছে কিছু টাকা জমা, আর কিনেছে একখানি টু-সিটার। নিজেই ড্রাইভ করে।

রেসকোর্সের মোহ একটুও কমে নি; তবে সুরেখার প্রতি মোহ বোধহয় একটু কেটেছে মঞ্জরীর সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে। কিন্তু সুরেখার প্রভাব সে কোনমতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।

এম্পায়ারে যে-দিন তমাল দত্ত ও সুরেখা মজুমদারদের 'ঘোষ নৃত্য' উপলক্ষে সহরময় হ'য়েছিল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি, সেদিন সিন্ধী এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সুরেখার সম্পর্কটা অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে গেছে সত্যেনের চোখে।

সত্যেনের ভাবান্তর হ'লেও সুরেখার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। সে আগের মতই সকালে উঠে এসে ওর ঘুম ভাঙায় মুখে-চোখে টাসেলের কেশর বুলিয়ে, কোনদিন এলোচুলের গোছা আল্‌গা হাতে ধ'রে সত্যেনের দুই চোখে আস্তে ছুঁইয়ে দেয়। ঘুমন্ত মুখ দেখেও হয়ত সুরেখা বুঝ্‌তে পারে ওর মনের গোপন কথা; ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—"মিঃ সেন, দূর পথে যা দিনের আলোয় টলমল করে, তাকে সব সময় জল মনে ক'রলে ঠক্‌তে হয়।"

সত্যেন আগের মত হেসে কথা ব'ল্‌তে পারে না, তবুও ব'ল্‌তে হয়—"আপনার কথাগুলো হেঁয়ালির মত।"

সুরেখা কিন্তু হেসেই তার উত্তর দেয়—"আর আপনার মনটা যে তার চেয়েও বেশী। রমণীর নয়, পুরুষের মন সহস্র যুগের সখা সাধনার ধন।"

পথ শেষ না হ'তেই সত্যেনের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হ'ল। ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সে'ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক টাকা বাকী প'ড়ল; এবার সত্যেন গাড়ীখানা বিক্রি ক'রে কিছু টাকা জমা দিয়ে, বাকী টাকার জন্যে মালিকের কাছে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে উঠে গেল। কিন্তু সেখানেও তাগিদ আরম্ভ হ'তে দেরী হ'ল না।

* * * *

ব্যাঙ্কের হাফ-ইয়ার্‌লি হিসাবে দেখা গেল, সত্যেন প্রায় পনের হাজার টাকা ক্যাশ ভেঙেছে। এ টাকা শোধ ক'রবার কোন সঙ্গতিই এখন আর নেই তার। ব্যাঙ্ক কেস্ ক'রল। সিকিউরিটীর টাকা হ'ল বাজেয়াপ্ত; বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডও হ'ল।

খবরের কাগজে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হ'ল সে সংবাদ। বন্ধু মহলে তাই নিয়ে চলে নানা আলোচনা। চেরি ক্লাবের সেক্রেটারী ও সবুজ সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট সত্যেন সেনের জীবনে এত বড় আকস্মিক সংঘটন হয় তো কেউ কোনদিন কল্পনাও করে নি।

আজ নিঃসঙ্গতায় সত্যেনের কান্না পায়। অবসরের বিশ্রামকুঞ্জে বান্ধবীর ভিড় নেই; পর্দ্দার আড়াল থেকে "বুকী" উঁকিঝুঁকি মারে না।

* * * *

জীবনের ত্রিশটি বৎসর অতীত দিনের বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসে মিলিয়ে গেছে। মনের সবটুকু সম্বল নিঃশেষে ব্যয় ক'রে সত্যেন জেল থেকে ফিরে এলো ভবিষ্যের আতঙ্কিত কঙ্কালের হাত ধ'রে। আজ সকল দ্বার রুদ্ধ। বন্ধুমহলে সে আর মুখ দেখাতে পারে না। মাথা গুঁজ্‌বার মত একটু ঠাঁইও নেই কোথাও। যে কোন মেস-বোর্ডিং-এ উঠ্‌তে যায়, সেখানেই অগ্রিম টাকার বিজ্ঞপ্তি। নিরুপায় হ'য়ে পার্কের একটা বেঞ্চে ব'সে ব'সে সত্যেন ভাবে; কিন্তু আজ এ ভাবনার কোন কূল-কিনারা নেই আর। দুপুর গড়িয়ে যায়, জ্বলন্ত সূর্য্য ধীরে ধীরে লাল হ'য়ে আসে পশ্চিমের আকাশে; ওর সর্ব্বাঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার মতই আস্তে আস্তে নামে উপবাসের অবসন্নতা।

মাত্র একটি দিন! একটি দিন আশ্রয় দেবার মত কোন আত্মীয়ও নেই তার! হঠাৎ সত্যেনের মনে হ'ল অবিনাশের কথা; ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ঠিক বন্ধু না হ'লেও, পরিচিত।

অবিনাশ প্রেসে চাকরি করে। কুড়ি টাকা মাইনের কম্পোজিটার। অনেক দিন আগে সত্যেন তার প্রেসটা একবার দেখেছিল, মাণিকতলার ছোট একটা গলির ভিতর। সেই প্রেসেরই এক পাশে অবিনাশ থাকে।

অনেক ঘুরে ঘুরে সত্যেন রাত্রি আটটার সময় এসে উপস্থিত হ'ল অবিনাশের ঘরে। সত্যেনকে এ অবস্থায়

দেখে অবিনাশ প্রথমটা চিনে উঠ্‌তে পারে নি। রুক্ষ চেহারা, চোখে সশঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টি!

একমুহূর্ত্তে ওর মুখপানে চেয়ে অবিনাশ সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ ক'রল—"সত্যেনবাবু?—আপনার এ চেহারা! অসুখ ক'রেছিল বুঝি?"

সত্যেনের মুখে শুষ্ক একটু হাসি। "হাঁ, আমি। অসুখ ঠিক নয়, অমনি; না না অসুখ বৈ কি! এখন সেরে গেছে।"

তবু ভাল, অবিনাশ জানে না ওর কথা। জান্‌লেও হয় ত. ক্ষতি ছিল না; আজ না হোক্‌, দুদিন পরে জান্‌বেই।

অবিনাশের মনে কেমন ধাঁধা লাগে। তাড়াতাড়ি টুলটা এগিয়ে দিয়ে সত্যেনের পায়ে মাথা রেখে সে প্রণাম করে'।

না ব'লে উপায় নেই, তবুও সত্যেন মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারে না। অবিনাশ নানা কুশলপ্রশ্ন করে। সত্যেন কোনটার উত্তর দেয়, কোনটা হয় ত অন্যমনস্কতায় এড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে সে হঠাৎ ব'লে ফেল্‌ল—"একটা টাকা ধার দিতে পার অবিনাশ?"

কথাটা শুনে অবিনাশ যেন প্রথমটা বিশ্বাস ক'রতে পারে না। সত্যেন সেন, ওদের গ্রামের জমিদার! একটা টাকা ধার! এ নিয়ে প্রশ্ন ক'রতেও তার সাহস হয় না।

সাত জায়গা খুঁজে অবিনাশ সিকি-দুআনিতে মিলিয়ে একটি টাকা সত্যেনের হাতে এনে দিল। সত্যেনের চোখ দুটো তখন জলে ছাপিয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে সে আর কোন কথা না ব'লে রাস্তায় এসে নাম্‌ল। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে অবিনাশ পিছু পিছু এসে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

যুগমাতা

শ্রীকালিদাস রায়

হে যুগজননি চরণে নমি
ধন্য জনম জীবন ধন্য তোমার পুণ্য ক্রোড়ে জনমি'।
গাহে তব জয় তুর্ক রুশিয়া মিশর ইরাক ভারত চীন,
মাথা তুলে উঠে জগৎ জুড়িয়া যত লাঞ্ছিত পতিত দীন।
জেগেছে শূদ্র, জেগেছে ক্ষুদ্র, জেগেছে পান্থ যাত্রাপথে,
সত্য দেবতা রথের বল্গা ধরেছেন নব-জীবন-রথে।
আজি বেঁচে উঠে অর্দ্ধ-মৃতেরা পথের প্রান্তে চরণ ঘায়,
জেগেছে শ্রমিক বিধির নির্দেশে হৃদি-শোণিতের মূল্য চায়।
চিরবঞ্চিত দীনলাঞ্ছিত মানবাধিকার করিছে দাবি,
অজ্ঞ মূর্খ জ্ঞানভাণ্ডার-দ্বারের আজিকে মাগিছে চাবি।
কূপমণ্ডুক আলোকে আসিছে অন্ধকূপের গণ্ডী ছাড়ি,'
সরীসৃপেরা বাহিরে আসিছে বিবরের মাঝে রহিতে নারি।
স্বার্থতন্ত্র তুলোটের পুঁথি ছিঁড়ে চলে সবে সগৌরবে,
সবার উপরে মানুষ সত্য—এই সত্যই বিজয় লভে।
মিথ্যাজ্ঞানের প্রথা বিধানের আশ-শৃঙ্খল সবলে ছিঁড়ে
মুক্ত জীবন করে উৎসব মহামানবের সাগরতীরে।
বংশকুলের অহমিকা দলি' ত্যাগের সাধনা লভেছে জয়,
ন্যায়ধর্ম্মের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত আজিকে ভুবন ময়।
জাগিয়াছে নারী চূর্ণ করিয়া সংস্কারের অন্ধকারা,
মানবাত্মার জয় জয়কার—নয়ন পেয়েছে অন্ধ যারা।
জড় প্রকৃতিরে বিজয় করিয়া মানুষ ছুটেছে ঊর্দ্ধলোকে,
তাহার বিমানে জয় অভিযানে শৈল সিন্ধু কে আজ রোখে?
কত কাল পরে নব বসন্ত জাগাইলে তুমি মানব-মনে,
শিল্পী তাহারে করিছে অমর—কবি গায় জয় গুঞ্জরণে।
মহাসমরের যজ্ঞভস্মে ভরেছিল বটে পৃথ্বীতল,
ঋষি কবি তায় আজিকে ছিটায় অমৃত মন্ত্রে শান্তিজল।
অশোক মন্ত্র অমৃত মন্ত্র অভয় মন্ত্রে দীক্ষা লভি'
বিশ্বমানব প্রাচী পানে চায়—যুগান্তরের উদিছে রবি।
ব্যর্থ হবে না ব্যর্থ হবে না হে যুগজননি তোমার দান,
পুন যদি হয় জন্ম জগতে জন্মিব হয়ে মহাপ্রাণ।
তোমার অঙ্কে জনমি' জননি জীবনে ধন্য গণ্য করি,
পরজন্মের যুগমাতা হবে ধন্য আমারে অঙ্কে ধরি'।
যে পাথেয় দিলে আত্মার পুটে যত্নে বহিয়া সে বৈভবে,
যুগযুগান্তে লোকলোকান্তে চলে যা'ব আমি সগৌরবে।

কাজু বা হিজলী বাদাম

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

এই বাদাম ভারতের একটী অতি প্রয়োজনীয় পণ্য বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। সাধারণত রপ্তানির মধ্যে ফলের (fruits) তালিকায় ইহা স্থান পাইয়াছে। কারণ এই বাদামের বীজের শাঁস লোকে ভোজন করে এবং বৎসরে এক কোটী টাকা পরিমাণের শাঁসের রপ্তানির ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও স্থানে কাজু বাদামের গাছ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও নানাস্থানে, বিশেষত সমুদ্রতীরের বনানীতে, মদ্র, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের কাঁথিতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। জগতে নানা কারণে বাদামের বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আজকাল অনেক স্থানেই বাদাম গাছ জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্থান হয়ত প্রথম। শাঁসের রপ্তানির পরিমাণ হইতে কতক বোঝা যাইতে পারে। আফ্রিকা মহাদেশে পর্ত্তুগাল অধিকৃত মোসম্বিক প্রদেশে প্রচুর বাদাম জন্মে। কিন্তু ভারতবর্ষে কেবল যে বাদাম জন্মে তাহা নয়, এখানে বীজের কঠিন আবরণী হইতে তৈল নিষ্কাসিত করিবার বিরাট শিল্প থাকায় কাজু সম্পর্কে ভারতবর্ষের স্থান অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক উপরে।

এই ফলের একটী বিশেষত্ব আছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ অর্থাৎ বীজটী ইহার সমস্ত ফলের বাহিরে থাকে। মূল ফলের আকার ও পরিমাণ যাহাই হউক, বীজটী তলদেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জানি না, ইহা হইতেই "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীজ" কথাটী জন্মলাভ করিয়াছে কি-না। তবে ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে ফলের অপেক্ষা বীজটী আকারে বা পরিমাণে বড়।

বাদামটী পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কেহ কেহ তাহা খাইয়া থাকে, কিন্তু এই কারণে তাহার সমাদর নহে; বীজের অভ্যন্তরস্থিত শাঁসই লোকের ভোজনে সমধিক লাগে। ইংরেজীতে বীজের আবরণী অংশকে "cashew apple" বলে, অর্থাৎ কাজুর আতা; ইহা নরম এবং অখাদ্য নহে।

আসল বাদামটী বৃক্কাকার (kidney shaped); ইহা হইতেও একপ্রকার তৈল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা শাঁস মূল্যবান্, মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া শাঁসেরই ব্যবহার বেশী। এই শাঁস চাটনী, মোরব্বা, মুখরোচক মিষ্টান্ন, চকোলেট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে লাগিয়া যায়।

আমরা হয়ত সকল ব্যবহার জানি না; কিন্তু ইহা যে নানা কাজে লাগে তাহা বুঝা যায় প্রতি বৎসর ইহার রপ্তানির পরিমাণ হইতে। বর্ত্তমানে এই শাঁসই প্রায় এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার যায়; তন্মধ্যে আমেরিকা (U. S. A.) প্রধান খরিদ্দার। তাহার সহিত অপরাপর জাতিও আছে। পরিশিষ্ট (ক) হইতে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের রপ্তানির পরিমাণ ক্রেতাগণের নাম ও প্রত্যেকের অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্বে কাজু বাদামের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইত না; অপরাপর ফলের সহিত একসঙ্গে ছিল, সুতরাং পরিমাণ বুঝিবার উপায় নাই; তাহা হইলেও এই যুক্ত হিসাবে যে পরিমাণ ফলের রপ্তানি ছিল, তাহার মধ্যে কাজুর স্থান প্রধান। যে ফল এদেশে আমদানি হয়, তাহা প্রধানত এখানকার কারখানায় সাঁকা, পোড়া বা roasting-এর জন্য আসে।

এই শাঁসের রপ্তানি ব্যতিরেকেও কাজুর অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার রহিয়াছে। বীজের কঠিন আবরণী (shell) জগতের পণ্যের বাজারে মহা মূল্যবান্ বস্তু। উপরের কোমল অংশ (আমের খাদ্যাংশের ন্যায়) দূরীভূত হইলে বাদামগুলি একস্থানে করিয়া তাহা সাঁকিয়া লওয়া

হয় (roasting)। ভারতবর্ষে এই কাজটী বেশ সুচারুরূপে হইয়া থাকে এবং এতৎসংক্রান্ত কয়েকটী কারখানারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোম্বায়ে রত্নগিরি জেলায় মালভান ও ভেনগুর্লায়, পর্ত্তুগীজ-ভারতে গোয়া ও পানজিমে, মদ্রে মাঙ্গালোরে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কোনও কোনও স্থানে এই সকল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বাদামের শাঁস বাহির করিবার জন্ম যখন ঐ বীজগুলি আগুনে ঝলসাইয়া লওয়া হয়, তখন উহা হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হইতে থাকে। লোহার পাত্রে—খোলা বা ঢাকা—খুব উত্তাপ দিবার সময় ইহা হইতে যে তৈল বাহির হয়, তাহা জলিয়া উঠে। প্রয়োজনমত সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ প্রজ্বলিত অবস্থায় উহার উপর জল দিয়া আগুন নির্ব্বাপিত করে এবং খুব ঢালু স্থানে নামাইয়া রাখে। তখন জল ও তৈল গড়াইয়া একস্থানে গিয়া জমে এবং সাধারণ উপায়ে জল হইতে তৈল স্বতন্ত্র করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সংস্কার সাধন আরম্ভ হইয়াছে এবং উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। আশা করা যায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য পুরাতন নানা প্রথার ন্যায় এই প্রথাও অনতিকালের মধ্যে লোপ পাইবে।

কাজু বাদামের তৈলের নানাপ্রকার ব্যবহার জানা ছিল। বহুকাল হইতে লোকে নৌকার কাঠে বা জালের সূতায় কষ লাগাইত; ইহার উপর জলের ক্রিয়া কম হওয়ায় পচন নিবারণ করিয়া থাকে। উইপোকার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম লোকে পুস্তকাদিতে মাখাইয়া রাখিত। এই তৈল নিতান্ত কটু, তিক্ত ও উগ্রগন্ধি। বর্ত্তমানেও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া এই তৈল ঐ সকল বিষয়ে আরও অধিক কার্য্যকরী করা হইয়াছে। Waterproof, Verminproof নানা প্রকার রঙ বার্ণিশ হইয়াছে এবং তাড়িৎশক্তি রোধক মশলা বা বার্ণিশ (insulating material or varnishes) তৈয়ারী হইতেছে। কোনও পদার্থের নমুনা ও ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্ম যে সকল বস্তু প্রয়োজন হইতে পারে তাহা যৌগিক উপায়ে (synthetic plastics) এই তৈল হইতে কারখানায় সৃষ্টি হইতেছে। আমেরিকা এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী, এমন কি, এই ব্যবসা তাহার একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মানীতেও কিছু কিছু এই সকল দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতে, কোনও স্থানে ফোস্কা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে এই তৈল লাগাইয়া দেওয়া হইত।

এই তৈলের স্বাদ তিক্ত হইলেও ইহার নাকি এক বিশেষ সুগন্ধের জন্ম মাদিরা (madeira) এবং অন্যান্য মদ্য সুবাসিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শাঁস হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয় কি-না বলা কঠিন।

বৃক্ষের ত্বক হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হয়; তাহা দ্বারা নির্লোপ চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া কাপড় প্রভৃতিতে দাগ দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে জগতের বাজারে ভারতবর্ষই খুব বেশী তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন এই রপ্তানি তৈলের পরিমাণ দুই হইতে আড়াই লক্ষ গ্যালন।

বাদামের সিকি পরিমাণ আস্ত বা পূর্ণ বীজ পাওয়া যায়; আরও পাঁচ বা ছয় ভাগ ভাঙ্গা বীজ হইয়া থাকে। ফলের মোটামুটি অর্দ্ধেক বীজের কঠিন আবরণী বা shell এবং এই আবরণীর ওজনের এক পঞ্চমাংশ তৈল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে সাধারণত হাতের দ্বারাই শাঁস বাহির করা হইয়া থাকে এবং তাহার অধিকাংশ বিদেশে চালান যায়। হয়ত সমস্ত বীজের পরিমাণের শতকরা দশ বা খুব বেশী কুড়ি ভাগ এদেশে ব্যবহৃত হয়।

পরিশিষ্ট (ক)

রপ্তানি— ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ
পরিমাণ—১২,৭৪৫ টন
মূল্য— ১,২৮,৯০,৯৭৯ টাকা

ক্রেতাগণের নাম ও অংশ
১৯৩৭-৩৮

	টন	টাকা	শতকরা অংশ
আমেরিকা—	১০,৭৩৫	১,১০,৫৩,৪১০	৮৫.৫
ব্রিটেন—	৬১২	৫,৭৮,২৯৭	৪.৪
নেদারল্যাণ্ড—	৩৩০	৩,২৮,৯৮০	২.৫
কানাডা—	২৭১	৩,২০,৯৪৫	২.৪
ফ্রান্স—	৩৩৪	১,৫০,৩২৯	১.১
বেলজিয়ম—	১৪০	১,২৫,২৯১	১.০
অন্যান্য—	৩২৩	৩,৩৩,৭২৭	—

(খ)

আমদানি—১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ
পরিমাণ— ১৭,৭৮২ টন
মূল্য— ২৩,২৯,৮৫৭ টাকা

বালিগঞ্জের বাড়ী

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

আজ যে আমার গৃহপ্রবেশের দিন। আমার নতুন বাড়ীতে—

একটা আর্ত চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভয়াতুর চোখে বাইরে তাকালাম। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শুধু মধ্যরাত্রির আবছা-অন্ধকার। কোনখানে কিছু নাই।

তবু কেমন ভয় করতে লাগল। আর্তনাদের রেশ এখনও কানে বাজছে। হাত বাড়িয়ে শিওরের জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। নিবিড় আঁধারে ঘর ভরে গেল।

মফঃস্বলের এক স্কুলের মাষ্টার। এক নতুন আত্মীয়ের কৃপায় সম্প্রতি কর্পোরেশন-স্কুলে একটা চাকরী জুটেছে। তাই বালিগঞ্জের এককোণে নব-নির্মিত একটি বাড়ীতে উঠেছি। ভাড়া অল্প। বাড়ীটিও বেশ। ছোট দুখানি শোবার ঘর দুপাশে। মাঝখানে ততোধিক ছোট বসবার ঘর। ভিতরে তার চেয়েও ছোট দুখানি ঘর—রান্নার ও ভাঁড়ারের। ডান দিকের শোবার ঘরটি আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। ডানের জানলাটি খুললেই ছোট একটু মাঠ। তারপর খানিকটা বেশ জঙলা। বাঁশগাছের ঝাড়। বেশ।

সবে কাল এসে এ বাড়ীতে উঠেছি। এখনও আর কেউ আসে নাই। আজই তার করে দিয়েছি। সঙ্গে চিঠিও পাঠিয়েছি মিলনীকে—বাড়ীটি বড় সুন্দর। দু-একদিনের মধ্যেই তারা এসে পড়বে। কিন্তু ইদানীং আমি একা। না—ভাঁড়ার ঘরে চাকরটা ঘুমুচ্ছে।

চোখ বুজে খানিকটা পড়ে রইলাম। ঘুম কিন্তু এল না। সে আর্তনাদের রেশ বার বার কানে বাজতে লাগল। চোখের উপর ভাসতে লাগল কয়েকটি মানুষের জীবনের কয়েকটি টুকরা ঘটনার রেখাচিত্র। কিন্তু সে কথা খুলে বলতে হ'লে একটি পারিবারিক জীবনের রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে বিস্মৃতির যবনিকাটি তুলে ধরতে হয়। আপনারা অনুমতি করুন, সে অকরুণ কাজটি আমিই করছি। এ পাপের বোঝা গল্প-লেখকদের মাথা পেতেই নিতে হয়।

যবনিকার অন্তরালে।

প্রথম দৃশ্য।

দশ বছর আগেকার কথা।

গোপাল বসু সেকেণ্ড লেনের একটি অন্ধকার বাড়ী। ঢুকতেই দুপাশে দুটি ঘরে মুদির দোকান। তারপর কলতলা। কলকাতার দুদিকের দুটি ঘরে থাকে দুটি পরিবার। একটি উৎকলবাসী। অপরটি বঙ্গদেশীয়। সামনের ছোট বারান্দায় তারা রান্না করে, দরকারী জিনিষপত্র রাখে। ভিতরে রাতকাটায়। তারপর ভাঙা লোহার সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠলেই দোতালার দুখানি ঘর। সেখানে থাকে একটি কেরাণি-পরিবার—আমাদের গল্পের নায়ক।

সুমথ পোষ্টাপিসে চাকরি করে। যা পায় তাতে সংসার চলে। বুড়ো বাপ প্রায় অকর্মণ্য। কাঠের শিক দেওয়া জানলার পাশে সারাদিন শুয়েই কাটায়। ইট-কাঠের ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে আকাশ চোখে পড়ে। তার মনে পড়ে গ্রামের বাড়ীর চারপাশের অফুরান মাঠ, আর অজস্র হাওয়ার কথা। খড়ের তিনখানি বড় বড় ঘরের কথা। দেনার দায়ে সব বিকিয়ে গেছে। তা যাক—বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে—তবু সুমথ তো মানুষ হয়েছে। বি-এটা পাশ করেছে। ভাগ্য ভাল, তাই পোষ্ট আপিসে একটা চাকরিও পেয়েছে।

তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে এগার বছরের মানু এসে জোটে। বলে : জান বাবা, সতুরা সব ভবানীপুরের নতুন বাড়ীতে চলে গেল।

বাবা কৌতুহলী হয়ে শুধাল : কেন রে?

মানু জানে বাড়ী বদলের ব্যাপারে বাবার ভারী উৎসাহ। পরম বিজ্ঞের মত সে বলল : ও হরি, তুমি জান না বুঝি? সতুর ঠাকুর্দার যে অসুখ। এ বাড়ীতে হাওয়া খেলে না, আলো নাই। তাই তো ভবানীপুর গেল। মস্ত বড় নাকি সে বাড়ী।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : হুঁ।

ঝোপ বুঝে মানু কোপ দিল : আমরাও কেন বাড়ী বদল ক'রে ভবানীপুর যাই না বাবা।

বাবা জবাব দিল না।

মানু আবার বলল : তুমিই তো বল বাবা, এই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাড়ীতে তোমার শরীর ভাল থাকছে না। বাড়ীটা ছেড়ে দিলে ভাল হ'ত। তবে ভবানীপুর কেন চল না বাবা?

বুড়ো বাবার সাথে মানুর ভারী সদ্ভাব। যেন খেলার সাথী।

মানু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে : আজই তুমি দাদাকে বল না বাবা, ভবানীপুরে বাড়ী দেখতে।

বাবা কি বলতে যাচ্ছিল, মানুর মা ঘরে ঢুকল। একহাতে ওষুধের গ্লাস, আর এক হাতে এক কাপ গরম দুধ।

মা বলল মানুকে : কোথায় গেছলিরে তুই সেই ভরা দুপুরে?

মানু বাবার বুকের কাছে আরও ঘেঁসে বসল : বা রে কোথায় আবার গেলাম! ওই সতুদের বাড়ীতেই তো ছিলাম। জানো মা, ওরা সব আজ ভবানীপুরে উঠে গেল!

মা বুঝল, বাপ-ছেলের এতক্ষণ এই আলোচনাই চলছিল। কৃত্রিম রাগের সাথে বলল : গেল তো গেল, তাতে তোর কি রে? তুই কেন সারাদুপুর ওদের বাড়ীতে হা-পিত্যেস্ বসে থাকতে গেলি?

মান্নু ভয়ে ভয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, বাবাই ওকে সে দায় থেকে উদ্ধার করল : তাতে আর কি হয়েছে। খেলার সাথী চলে যাচ্ছে, ওদের কচি মনে একটু লাগেই তো।

মান্নুর মা দুধের কাপটি নামিয়ে রেখে বলল : এই ক'রেই তো ছেলেটার মাথা খুমি খেলে ! দিনরাত ভাল কথায় ছেলে মানুষ করা যায় মাগো, বুঝলে ?

বাবা হেসে বলল : ছেলে মানুষ করতে জানি কি-না আমার সুমথই তার সাক্ষী। এ ছেলে না হয় তুমিই মানুষ ক'র।

মাও হেসে ফেলল : নাও হয়েছে। এখন এই ওষুধটা খেয়ে ফেল তো। তোমাদের সঙ্গে বকতে বকতে দুধটা বুঝি জুড়িয়েই গেল। ওমা, জল তো আনি নি। এত ঝঞ্ঝাটে কি কিছু মনে রাখবার জো আছে। বলি ও বৌমা, কাঁচের গ্লাসে একটু জল দিয়ে যাও তো বাপু।

বাবা হেসে বলল : তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না তো। চুপ করে বস, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা আর যাবে না ! তোমাদের সংসারে এসে জিরিয়ে জিরিয়ে তো গেলাম। নাও, এখন ওষুধটা খেয়ে নাও, আমার আরও কাজ আছে।

ওষুধের গ্লাসটা নিতে নিতে বাবা বলল : কেন, তোমরা এই সাতঝামেলা কর বল তো ? কত দিন বলেছি, এ ছাইভস্ম ওষুধপত্তর খেয়ে আমার কিছু হবে না।

এই বিতর্কিত তিক্ত সমস্যাটি উঠে পড়ায় মা জ্বলে উঠল : ছাইভস্ম খেলে তো কিছু হয় না, কিন্তু ডাক্তার যে আর কোন পিণ্ডি গিলতে বলে না।

আগুনের ছোঁয়াচ লেগে বুড়োও জ্বলে উঠল : ডাক্তার বললেই তাই করতে হবে নাকি ? ডাক্তার তো কত কিছুই বলে, সব করেছ নাকি তোমরা, না, সব করবার ক্ষমতা তোমাদের আছে শুনি ?

বুড়োর শীর্ণ শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাতের ওষুধের শিশিটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

বুড়ো চেঁচাতেই লাগল : ডাক্তার বলেছে ! ডাক্তার তো বলেছে গিরিডি-মধুপুর যেতে, পারলে তোমরা নিতে ? ডাক্তার তো বলেছে এই এঁদো বাড়ী ছেড়ে একটা ভাল বাড়ীতে যেতে, তা কুলিয়েছে তোমাদের সামর্থ্যে ? শুধু ডাক্তার বললেই—

মা দুহাত এক ক'রে ব'লে উঠল : ওগো, তোমার পায়ে পড়ছি, ক্ষমা দাও—থাম।

বুড়ো আবার গর্জে উঠল : কেন থামব ? যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোমাদের। চোখের উপর দেখছ বেচারা কত কষ্টে সংসারটা চালাচ্ছে। গায়ে একটা ভাল জামা নাই। এই তো বৌমা আমার, গায়ে একখানা গয়না দিতে পারলাম না আজও। আর আমি বুড়ো বেতো রুগী, আমার জন্ত আষ্টেপিষ্টে খরচ করছ। কেন ? আমার অসুখ করেছে, না হয় আমি মরব। তাই বলে যা সামর্থ্যে কুলোয় না—

রেণুকা এরই মধ্যে জলের গ্লাস এনে দাঁড়িয়েছিল। সে বাধা দিল : সে কথা এখন থাক বাবা, আপনি দুধটা খেয়ে ফেলুন।

বুড়ো তেমনই তিরিক্ষি মেজাজেই জবাব দিল : না মা, ও সব দুধ-টুধ আর আমি খাব না।

বাইরে জুতার শব্দ শোনা গেল।

বুড়ো তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দুধের কাপটি নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল : যাও না তোমরা সব কাজ করগে। এখানে অমন ক'রে বসে আছ কেন ? এই মান্নু, ভাঙা কাঁচগুলো জানলা গলিয়ে ওপাশে ফেলে দেতো বাবা।

সুমথ শুনল সব। বুঝলও। আজকের এই দাবানলের স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল অতীতের কয়েকটি ঘটনার সংঘাতে। বুড়ো বাবা বাতে আক্রান্ত হবার পরেই ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল বাড়ী বদল করতে—একটা বেশ আলোযুক্ত বাড়ীতে যেতে। কি কুক্ষণেই সে পরামর্শ যে তার কানে ঢুকেছিল, বুড়োর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল—বাড়ী না বদলালে সে আর ভাল হবে না।

বুড়োর তাগিদের বিরাম নাই। বাড়ীশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ। সুমথ চেষ্টার ত্রুটি করল না, কিন্তু এত অল্প টাকায় যে বাড়ী পাওয়া যায় তা এ বাড়ীর চেয়ে ভাল তো নয়ই, বরং খারাপ।

কিন্তু সে কথা কে শোনে ! বুড়োর জিদ—বাড়ী বদল করতেই হবে, নইলে সে মরে যাবে এখানে।

সুমথ বলল : বাড়ী তো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা বলল : হ্যাঁ, এ আবার একটা কথা। কলকাতা শহরে আবার বাড়ীর অভাব !

সুমথ বলল : আমি তো অনেক খুঁজলাম বাবা, এত কম টাকায় কোথাও ভাল বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা বলল : ভাল বাড়ী কি আর রাজবাড়ী চাই আমাদের। এই একটু আলোটা বেশ পাওয়া যায়।

বেচারা সুমথ বাড়ী খুঁজতে কসুর করে নাই। একটু বিরক্ত হয়ে তাই বলল : কিন্তু আলোটা দেখতে গেলেই টাকাটাও যে বেড়ে যায়।

কথাটা খচ্ ক'রে বুড়োর বুকের মাঝে বিঁধেছিল। মুখ তুলে শুধু বলল : ওঃ, আচ্ছা।

আর কখনও বুড়ো বাড়ী বদল করবার কথা বলে নাই। সুমথ পায়ে ধরে অনেক ক্ষমা চেয়েছে। বাবা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে তার একটা গভীর বেদনার ক্ষত ক্রমশ গভীরতর হয়ে চলেছে। অনেক অসতর্ক মুহূর্তেই সে বেদনা আত্মপ্রকাশ করে কথা ও কাজে।

আজকার দাবানলও সেই স্ফুলিঙ্গের বৃহৎ প্রকাশ।

শেষ দৃশ্য।

পাঁচ বছর পরে।

কালিগঞ্জের এক কোণে একখানি ছোট্ট একতলা বাড়ীতে আজ

গৃহপ্রবেশের উৎসব। মায়ের ছোট ঘরখানিতে পূজার নানা সরঞ্জাম জড় করা হয়েছে। একপাশে আলপনা আঁকা হয়েছে নিপুণ হাতে।

বাড়ীখানির একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে—সে ইতিহাস এর সৃষ্টির। এর প্রত্যেকখানি ইটের বুকে লেখা আছে একটি অনুতপ্ত পুত্র-হৃদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কাহিনী। সেই কাহিনীই সংক্ষেপে বলব। কারণ আমাদের গল্পের সার্থক পরিণতির জন্য এ কাহিনী বলা দরকার।

সুমথর জীবনে সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই সূর্যোদয় হ'ল। একদিনে সে চাকরী-জীবনের অনেকগুলি সিঁড়ি পার হয়ে গেল। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়ল পঁচিশ টাকা।

বাড়ী ফিরেই সুমথ বাবার পা জড়িয়ে ধরল : আমার কথা তোমাকে এবার রাখতেই হবে বাবা, বাড়ী বদল করতেই হবে।

পুত্রের উন্নতির আনন্দে বাবার মনেও সেদিন আনন্দের জোয়ার। দীর্ঘ দিনের চোখের জলে যে অভিমান ভাঙে নাই, আজ তা কোথায় ভেসে গেল।

বুড়ো সুমথকে তুলে ধরে বলল : বেশ তো, তার জন্যে এমন ক'রে পড়লি কেন?

সুমথ বলল ধরা গলায় : না বাবা, হঠাৎ একদিন যে অন্যায় করেছিলাম, তা তোমাকে ভুলতেই হবে। আমি কালই নতুন বাড়ী দেখব।

বুড়ো হেসে : না রে, নতুন বাড়ী দেখে কাজ নাই।

সুমথ জলভরা চোখ তুলে চাইল। বুড়ো ওর মাথাটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল : না রে না, আর আমার রাগ নাই। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, বেশী টাকায় নতুন বাড়ী ভাড়া করে আর কাজ নাই। এই বাড়ীতেই আরও কিছু দিন না হয় থাকি। তুই এদিকে চেষ্টা দেখ, একটু জায়গা-জমি কিনে কোথাও মাথা গুঁজবার একটু ছাউনি ফেলা যায় কি-না।

প্রস্তাবটি ভাল। সুমথও অনেক দিন ভেবেছে। তবু বলল : কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার বাবা, কত দিনে তা হবে।

বুড়ো হেসে উঠল : তত দিন আমি মরব না রে। আর বেশী দিনই বা কি লাগবে। এই তো বালিগঞ্জের ওদিকে শুনছি খুব সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছে।

সুমথ বাধা দিল : ওদিকটা মোটেই ভাল না বাবা। যা জঙলা আর পচা ডোবায় ভর্তি।

বুড়ো হাত নেড়ে বলল : না রে বাবা, গরীবের ওই ভাল। তবু খোলা রোদ্দুর আর গাছের বাতাস তো একটু গায়ে লাগবে। তোদের এ ইটকাঠ-সুরকি বাবা আমাদের আর সহ্য হয় না। ওই জঙ্গল আর পচা ডোবাই আমাদের ভাল।

তারপর এই বাড়ীর সৃষ্টি। সুমথর প্রায় পাঁচ বছরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা, প্রতিটি মুহূর্তের স্বপ্ন এই বাড়ীর প্রতিটি অণুতে মিশে আছে। সুখ-সম্ভোগের হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ও অর্থসঞ্চয় করেছে। সে অর্থ নিঃশেষে ফেলে দিয়ে গড়ে তুলেছে এই বাড়ী। পাঁচ বছরের স্বপ্ন আজ সফল। বাড়ী দেখে বাবা ভারি খুশী। অনুতপ্ত পুত্র-হৃদয় আজ প্রশান্তিময়।

গৃহপ্রবেশের উৎসব।

মা নানা আয়োজন-উপচার নিয়ে ব্যস্ত। রেণুকা গৃহকর্মে ডুবে আছে। কত কাজ আজ। পূজা-অর্চনা। দুজন লোক খাবে। বাড়ীটাকে সাজাতে হবে।

মানু জোগাড় করেছে অনেকগুলি ফুলের টব। সেগুলি সাজাতে সে ব্যস্ত। রাস্তার পাশ দিয়ে কেয়ারী করে লাগিয়ে দিয়েছে পাতা-বাহারের ডাল। ভিতরে গোল করে পুঁতেছে মরশুমী ফুলের চারা।

বুড়ো বাবা বাইরের রকে বিছানা নিয়ে পড়ে আছে। সকালের মিঠে রোদে শরীর ছড়িয়ে দিয়েছে পরম আরামে। কাঠের শিকের ফাঁকে দেখা আকাশ আজ তার চোখে সীমাহীন নীলিমায় ভরে উঠেছে। বুড়ো চেয়েই আছে।

সুমথ বেরিয়ে গেছে খুব সকালে। কোন্ বন্ধুর মোটর নিয়ে সে নিমন্ত্রণ করতে গেছে দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে। আজ তার বড় আনন্দের দিন। এ দিনটিকে সে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে চায় নানারূপে নানা রসে।

মোটরের হর্ন বেজে উঠল বড় রাস্তার মোড়ে। বুড়ো বাবা চোখ ফিরাল। মানু লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল, দাদা এসেছে। মা দরজার এ পাশে এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি চোখের চাওয়া।

মোটর থামল।

সুমথর অচেতন রক্তাক্ত দেহ ঘরে তোলা হ'ল ধরাধরি ক'রে। কয়েকটি মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদে নীল আকাশ কালো হয়ে গেল।

মোটর-য়্যাক্সিডেণ্টে ভীষণভাবে আহত হওয়ায় সুমথ মারা গেল। মরবার আগে অর্ধচেতন অবস্থায় আকুল দৃষ্টি মেলে ও শুধু কয়েকবার বলেছিল : আজ যে আমার গৃহপ্রবেশের দিন। আমার নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উৎসব।

গৃহপ্রবেশের আগেই বাড়ীর সামনে 'টু লেট' ঝুলান হ'ল।

* * * * *

বেজায় গরম। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

হাত বাড়িয়ে শিওরের জানলাটা খুলে দিলাম। একটা ঝিরঝিরে বাতাস এসে ঘরে ঢুকল।

আবার চোখ বুজলাম।

আজ রাতে কোন বাতগ্রস্ত বুড়ো বাবা কাঠের শিকের ফাঁক দিয়ে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে আছে কি-না কে জানে।

ফলের ব্যবসা ও তাহার উপায়

শ্রীমতী প্রতিভা দাস

(প্রবন্ধ)

সকলেই জানেন, বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা কিরূপ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। অল্প-শিক্ষিত, এমন কি উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা পর্য্যন্ত কর্ম্মের অভাবে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। উপস্থিত এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে এবং কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং উহার আলোচনা করিব না; শুধু ব্যবসায় করিবার একটি সহজ ও সরল পথ কিরূপ ভাবে উপেক্ষিত হইয়া আছে সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি।

ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমাদের দেশের লোকের যে বিশেষ নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। আগে হয়ত ছিল। বাঙালী বণিকেরা অকূল সমুদ্রে ডিঙা ভাসাইয়া সুদূর জাভা বলী প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সে ত আজিকার কথা নয়! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এখনকার ছেলেরা ইচ্ছা সত্বেও কোনরূপ ব্যবসায়ে যাইতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ তাঁহারা আরম্ভ করিতে জানেন না। মূলধনের অভাব ত বটেই, আরম্ভ করিতে না জানাও একটা কারণ। সকলেই জানেন, চাকা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে কতকটা আপন বেগেই চলে, কিন্তু এই আরম্ভ করাটা না-জানার দরুণ অনেকে অগ্রসর হইতে ভয় পান। কিছু দিন হইতে আমেরিকানরা খুব জাঁকাইয়া ফলের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। শুষ্ক ফলের নয়, ফল স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু-শূন্য পাত্রে রাখা। এই ফলের অত্যন্ত চাহিদা।

আমাদের ভারতবর্ষ ফলের দেশ, কিন্তু আমাদের দেশের কজন লোকের দৃষ্টি এদিকে আছে, শীতের দিনে কমলা, আপেল, গ্রীষ্মের আম, জাম, কাঁটাল, লিচু—কত নাম করিব। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকারের ফলে আমাদের দেশ পরিপূর্ণ থাকে। এত প্রকারের ফল কোন দেশে পাওয়া যায় বলিয়া শুনি নাই।

সুতরাং ফলের ব্যবসায়ে আমাদের দেশে কিরূপ লাভের সম্ভাবনা! কেবল যদি আমের কথাই ধরা যায়, তাহা হইলে বলিব আমের উপর দিয়াই যে কোন ব্যাক্তি বিস্তর লাভ করিতে পারেন। আমের ন্যায় সুস্বাদু ফল আর পৃথিবীতে নাই। ইউরোপে ইহার বিলক্ষণ চাহিদা আছে। শুনিয়াছি বিলাতে দুই শিলিং করিয়া একটা আম বিক্রয় হয়। অতএব কেবল আমের দ্বারাই এরূপ লাভ হয় তা ছাড়া অন্যান্য ফল ত আছেই।

ক্যালিফোর্নিয়া ও হাওয়াই দ্বীপ হইতে লক্ষাধিক টাকার ফল আমাদের দেশে আসিয়া থাকে। আমেরিকানরা পাকা ব্যবসায়ী, উহারা ব্যবসা করিতে জানে; সুতরাং পঁচিশ-ত্রিশ টাকা ডিউটি দিয়াও স্বচ্ছন্দে ব্যবসা বজায় রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে ফল এত প্রচুর ফলে যে, আমরা খাইয়া উঠিতে পারি না—এক ভাগ যদি খাই ত যথেষ্ট। বাকী পাখী পক্ষীতে খায়, কিম্বা পচিয়া গলিয়া নষ্ট হয়। আমরা যদি সেই প্রাচুর্য্যের দিনে ফল কোন রকমে ধরিয়া রাখিতে দিতে পারি, তাহা হইলে অসময়ে খাওয়া যাইতে পারে, বিদেশেও পাঠাইতে পারা যায়। প্রথমে দেখিব কিরূপে বিদেশে পাঠান যাইতে পারে। এমনই পাঠাইলে পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইবে, বরফ দিয়া পাঠাইতে পারা যায় কিন্তু তাহাতে অসুবিধা আছে, বরফ হইতে বাহির করিলে আর বেশীক্ষণ রাখা যাইবে না। কোল্ড রুমেও সেই অসুবিধা, যদি শীঘ্র বিক্রয় না হয় তবে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং বায়ুশূন্য করিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশে বায়ুশূন্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট বার শত ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করেন। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য সবচেয়ে ভাল-ভাবে রাখিবার উপায় বাহির করিবে উহা তাহাকে দেওয়া হইবে। নিকোলাস্ এপার্ট নামে এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা বুদ্ধি বলে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বায়ুতে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। খাদ্যদ্রব্য যদি বায়ুশূন্য করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে

দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। সেই ব্যক্তি এক পুস্তিকা বাহির করে এবং পুরস্কার তাহারই প্রাপ্য হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই যে, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিবার জন্য বায়ুতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুই দায়ী। এই কীটাণু যে নির্দ্দিষ্ট তাপে ধ্বংস হয় তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এপার্টের ছেলে বায়ুশূন্য ও বীজাণু রহিত (sterelize) করিবার এক প্রকার যন্ত্র বাহির করে, ইহার নাম 'অটোক্লেভ'।

তারপর পাস্তুর সাহেব এই আন্দোলন সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে nicro-organism হইতে খাদ্যবস্তু রক্ষা করিতে হইলে paturisation করিতে হইবে। ফ্রান্সে House of Apert এখনও প্রসিদ্ধ, তথায় এখনও অতি উত্তম জ্যাম জেলি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ফলের দেশ, মজুরীও অন্যান্য দেশ হইতে কম, দেশের লোকের দৃষ্টি এদিকে পড়িলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়, যথা—

১। দেশের ছেলেরা কাজ পায়।

২। ফলের অযথা অপচয় দূরীভূত হয়।

৩। কৃষকদের বিক্রয় সমস্যা দুর হয়।

৪। ভাল ফলের চাহিদা বাড়ে।

৫। বিদেশে ফলের জন্য যে টাকা যায় তাহা বাঁচে।

৬। ভারতের চিনির একটা উপায় হয় অর্থাৎ কাজে লাগে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে Fruit Grower's Association-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুত মুলচাঁদ মালবীয়ের বিশেষ চেষ্টায় ছাত্রদিগকে হাতে কলমে ফল-সংরক্ষণ, জ্যাম জেলি প্রস্তুত শিখাইবার জন্য একটি বিশেষ ক্লাস করা হয়। গ্রীষ্মের বন্ধে চৌদ্দ দিনের কোর্সে দুই দল করিয়া শিখান হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বৎসরে আমি কৌতূহল প্রযুক্ত উক্ত ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। শুধু ছাত্র নয়, মেয়েরা যাঁহারা জ্যাম জেলি প্রস্তুত করিতে ভালবাসেন, এমন কি, যাঁহারা ও বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী তাঁহারাও সামান্য একটু আধটু বৈজ্ঞানিক সাহায্য লাভ করিলে আরও সহজে ওই সব প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যেমন টেম্পারেচার ব্যবহার, একটু এসিড্ বা প্রিজারভেটিভ্ ব্যবহার, বায়ুশূন্য করিবার সহজ উপায় ইত্যাদি—এই সব দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী আরও সহজ হইবে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি ছাত্রগণের এবিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। গ্রাজুয়েট, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেরাও ছিল, আবার কাছাকাছি গ্রামের ছেলেও অনেক ছিল—যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে, এমন কি, সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে চারিজন মাদ্রাজী ছাত্র আসিয়াছে, তাহারা এদেশের ভাষাও জানে না, কেবল ইংরেজীর সাহায্যে চলে। আহার ও বাসস্থানের বিশেষ অসুবিধা, তথাপি Fruit Preservation শিখিবার উৎসাহে কোন অসুবিধা গ্রাহ্য করিতেছে না।

আমার মনে হয় ছেলেরা যখন এত উৎসাহী তখন প্রত্যেক প্রদেশে ঐরূপ ক্লাস করা উচিত। আমি বাঙালীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের বাঙলা সকল ব্যাপারেই অগ্রবর্ত্তী হইয়াই চলে, সুতরাং জনকত উৎসাহী ভদ্রলোক যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। খুব বেশী টাকারও প্রয়োজন নাই, দু-একটা auto clave ইত্যাদি আবশ্যক। এইবার এলাহাবাদের Fruit Preserving class-এর একটু বিবরণ দিব।

এলাহাবাদের Fruit Preserving Class চৌদ্দ দিনের কোর্স, ফলরক্ষা, ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী, জ্যাম জেলি মোরব্বা, আচার, প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাস হইতে পাশ করিবার পর Agriculture Institute-এ ছয়মাসের কোর্সে কোন একটি জিনিষের উপর স্পেশালাইজ করিতে হয়। যাহা হউক বাঙালী ছাত্রগণ যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তবে, কুটীরশিল্পরূপে আরম্ভ করিয়া দশ-পনর টাকা লাভ করিতে করিতে ক্রমে দশ-পনর হাজারও লাভ করিতে পারেন।



শুধু স্বপ্ন আর ছায়া

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বি-এ

বছর ঘুরে এল।

কি ভাবে যে কেটে গেল এতগুলো দিন টেরই পাওয়া গেল না। লীনার মৃত্যুর তারিখটা নিষ্ঠুর হ'য়ে দেখা দিল ক্যালেণ্ডারের পাতায়। হঠাৎ পুরান একখানি চিঠি হাতে পড়তেই শিশির শিউরে উঠল—হাতের বইখানা বালিশের উপর রেখে সে বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল আয়নার কাছে। মনে পড়ল, তার, এমনি একদিনে সে হারিয়েছে তার লীনাকে এক বছর আগে। পাশের টেবিলের ওপর থেকে শিশির তুলে নিল একগাছা মুক্তার মালা—তখনও উষ্ণ, একটু আগেই যেন লীনা মালাটি তার বুক থেকে নামিয়ে রেখে গেছে। শিশির আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, হার গাছাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে গিয়ে শুয়ে পড়ল—সব শূন্যতার মাঝেও সে একবার ঘরের চারদিকে চেয়ে নিল—পিয়ানোর ওপর স্বরলিপির শেষ পাতাটি সে ভাবেই খোলা, লীনার আপন হাতের রচা ফুলদানিতে ফুলের স্তবক তেমনই যেন সজীব।

শিয়রে মোমের বাতির ক্ষীণ শিখা কেঁপে উঠল পরিসমাপ্তির ভয়ে। শিশির নিজেই তাকে নিভিয়ে দিয়ে ভয় থেকে তাকে রেহাই দিল; তারপর ধীরে ধীরে চুপেচোপে তার জড়িয়ে এল নীল নিদ্রার কুহেলি মায়া।

শিশির দেখছে, লীনা আসছে - আসতেই হবে তাকে, মন্দিরে তার স্মৃতির সৌরভ, আর সে আসবে না? শিশির দেখল, লীনা প্রচুর আলো আর স্বর্গের অনেক পারিজাত-সৌরভ নিয়ে এসে পড়েছে তার ঘরে—ঘরের সমস্ত কিছুই তাকে আনন্দে বরণ করে নিল। আবার সব সজীব হয়ে উঠল। অশরীরী লীনাকে কাছে পেয়ে শিশির তাকে বাহুপাশে বেঁধে নেবার জন্য একবার হাত দুটাকে বাড়িয়ে দিয়েই পাশ ফিরে শুল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

অচেতন শিশির। অন্ধকার রাজ্যে স্বপ্নস্নাত কল্পনার আলোকে তার চোখে ভেসে উঠল আড়াই বছরের এক রহস্যময় ইতিহাস!

লেকের এক বাসন্তী সন্ধ্যা। আকাশে নীল তরলতা। লেকের জলে তীরের আলোগুলোর টুকরা টুকরা ছায়া মৃদু বাতাসের দোলায় চলছে খেলে খেলে ভাঙা ভাঙা ছোট্ট ঢেউয়ের সাথে। পুরাম একবন্ধুর সাথে দেখা অনেক দিন পর। সঙ্গে তার একটি ভগ্নী গ্রাম থেকে নূতন কলকাতা এসে লেক দেখতে এসেছে দাদাকে নিয়ে। দুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ হ'ল অনেকক্ষণ ধরে। পল্লীর এই সরলা মেয়েটিকে শিশিরের খুব ভাল লাগল। শহুরে মেয়েদের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এই পল্লীবালাকে সামনে দেখে যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যাবার বেলা মেয়েটি শিশিরকে প্রণাম জানিয়ে গেল তার দাদারই ইসারায় নেহাৎ গাঁয়ের কায়দায়।

কিছুদিন পর শিশিরের এই ভাল লাগাটাই ঐ মেয়েটির সাথে এনে দিল তার আজীবনের বন্ধন—প্রেমের পুণ্য-তীর্থে হ'ল তাঁদের মহামিলন।

শহরের এক নিস্তব্ধ অঞ্চলে গিয়ে তারা বাসা বাঁধল। অর্থের অভাব নেই। দিনগুলো তাদের কেটে চলল বেশ- কাব্যে, গানে ও স্বপ্নে!

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ শিশির আবার শিউরে উঠল। লীনার সেই নির্মম বিদায় দিনের ছবি! লীনা পলাতকা?

শিশির দেখতে পেল, সোফাটা তেমনি ভাবেই রয়েছে,—ওরই হাতলের ওপর লীনার নীল চাইনিজ সিল্কের ব্লাউজটা অলস হ'য়ে পড়ে আছে সাপের ছাড়া খোলসের মত। লীনার বালিশের ওপর তার একরাশ চুলের এলোমেলো ছাপ আর পরিচিত একটা গন্ধের রেশ। কিন্তু তাতে আজ আর কোন উন্মাদনা নেই, কোন উত্তেজনা নেই—শুধু কেবল বেদনার বিষে ভরা।

হঠাৎ শিশির কিসের একটা শব্দ শুনতে পেল। তার মনে হ'ল, পিয়ানোটার ওপর লীনার অঙ্গুলির মধুর স্পর্শ লেগেছে, তাই!

লীনার চুড়ির টুং টাং শব্দ! খুট খুট করে সে আসছে আমার দিকে, ঐ যে লীনার পরণে আমারই দেওয়া বেগুনী রংয়ের জর্জেট শাড়ী—তার খানিকটা দেখা যাচ্ছে! আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে, কপালে উড়ে পড়া চুলগুলোকে লীনা সরিয়ে দিচ্ছে দু'দিকে।

শিশির আর দেখল, হাসির লহর তুলে লীনা এসে ভেঙ্গে পড়ল তার বিছানার ওপর তার বুকে মাথা রেখে। তার কিছু বলবার অবসরও দিল না—তার কপোলে পরপর অনেকগুলো চুমুর রেখা এঁকে দিয়ে লীনাই বলল তাকে—"তুমি ভয় পেয়েছ? সত্যি, ভয় পেয়েছ? খুব কষ্ট হয়েছে তোমার, না? আমি ওই তারার দেশ থেকে কটা দিন একটু বেরিয়ে এলাম। আমি আবার যাব। তুমি যাবে আমার সাথে? যাবে?"

শিশির ডাকল—লীনা!

সে উত্তর শুনল- বন্ধু! প্রিয়তম!

শিশির বলল—আমিও তোমার সাথে যাব তারার দেশে বেড়াতে।

লীনা ডাকল—চল!

শিশির তার দু'হাত বাড়িয়ে দিল লীনাকে জড়িয়ে ধরতে।

স্বপ্ন ভেঙে গেল।

তখন ঘুচে এসেছে আঁধার রাতের মায়াজাল। শ্রাবণের বর্ষণ-মুখর আকাশ আর মেঘ-ম্লান উষার ছবি ভেসে এসেছে খোলা জানলার ভেতর দিয়ে। শিশির সারা ঘরটাকে আর একবার বড় বড় চোখে দেখে নিল।

মায়া-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

সেইদিন অপরাহ্ণে সর্ব্বেশ্বর রায়ের বাড়ীর ভেতরের ড্রয়িং-রুমের কোণে পিয়ানোর কাছে বসে মাধুরী গান গাইছিল। মাধুরীর গলাটী ভারি মিষ্টি, শুধু যে সুর মিষ্টি তা নয়, গান গাইতে হ'লে যে সাধনার প্রয়োজন হয়, তার সঙ্কেত মাধুরী অনেকখানি আয়ত্ত করেছিল।

পিয়ানোর কাছ থেকে একটু দূরে একখানা সোফায় ইলা বসে একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে ছবি দেখছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কি ক'রে মেক-আপ করে—রূপসজ্জা বিদ্যায় তারা মুখের ও চেহারার কত রকম বদল করতে পারে, কত ভাল চেহারাকে কুৎসিত করে, আর কুৎসিতকে সুন্দর করে। বইখানা এক পাশে রেখে মাধুরীর দিকে চেয়ে ইলা বললে: আচ্ছা রি, তুই এ সব গান কোথায় শিখলি, তুই ত আগে রবিঠাকুরের গান গাইতিস—আজকাল তোর মুখে আর সে-সব গান একটাও শুনতে পাওয়া যায় না।

মাধুরী একটু হেসে সুরটা বদলে বললে: ইলা, শোন্ একটা নতুন গান:

> তোমায় আমায় গোপন ঘরে
> কইব কথা কানে-কানে।
> যে কথাটি বলব তোমায়,
> আমি জানি আর মনই জানে।
> বলবে যখন ভালবাসি
> চুমু খাব মুচকে হাসি
> ইসারায় জানিয়ে দেব
> তার কি মানে…
> মুখের কথা মুখেই রবে
> বুঝে নেব প্রাণে-প্রাণে।

গানটা শুনে ইলা মুখ লাল ক'রে উঠল। কি যেন একটা গোপন ক্রোধ তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। সে মাধুরীকে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলে: What do you mean? এর মানে কি রি? Don't tell me in this way, I tell you.

মাধুরী চমকে গেল। বললে: কেন লো, এ গানে আবার তোর কি হ'ল? আর তোকেই বা আমি ক্ষেপাতে যাব কেন?

ইলা অত্যন্ত অভিমানের সুরে বললে: কলেজের সেই ব্যাপারটা নিয়ে সব মেয়েরা—শীলা, রেবা, যূথী সবাই আমায় টিটকিরী দিচ্ছে, ঠাট্টা করছে।

কেন? সত্যি আমি কিচ্ছু জানি নি ভাই, আমি বরং জানি যে তারা তোমার দলে।

না তুমি জান না, তুমি নিশ্চয় জান!

সত্যি ইলা, আমি কিছু জানি নে।

সেদিন অমিয় প্রতিবাদ ক'রে ক্লাস থেকে চ'লে গেল না…তারা সব বলতে আরম্ভ করেছে যে, আমি তার ফি অন্ সে…সেইজন্যে সে ওই শিভাল্‌রি দেখালে। ছেলেরা সব কত ঠাট্টা করেছে। আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। শুনলাম, অমিয়ও কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

ইলা কথাগুলো কান্নার সুরে অভিমান মিশিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, দেখ্ না ভাই, আমি কি করেছি…

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে: তাই নাকি! Eventful day…I congratulate you, Senora Ila. বলে ফরাসী দেশের ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন করলে।

যাঃ, কি ন্যাকাম করিস—বলে ইলা একটু মুখ টিপে হাসল।

মাধুরী আবার পিয়ানোর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে গান ধরলে

> দেখা হবে অশোকতলায়
> বলে গেছে ইসারায়।

সেই বাগানে ঝোপের কোণে
বেঞ্চি পাতা নিরালায়।

ইলা লাফিয়ে উঠে হাতের রেশমী রুমালখানা ছুঁড়ে মাধুরীর গায়ে মারলে: দাঁড়া ত, I will pricle you red…

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে, কেন ভাই, রাগ করছিস, মিষ্টি লাগছে না?

ইলা ফের ঘুরে গিয়ে মাধুরীর কাছে বসল; বললে, দেখ ভাই, সত্যি কথা বলি, I'did never feel such things before. আগে আমি এটা একেবারে বুঝতে পারি নি যে, অমিয় সত্যি আমায় ভালবাসে—সেদিনের ওই ঘটনা…

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, তারপর…My dear lover, এখন কি বলছে সেও প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে?

মাধুরী খুব গম্ভীর হয়ে বললে, তুই তাকে এই গানটা শুনিয়ে দিয়ে আয়। বলে আবার গান ধরলে:

ফুলের কলি বলে ভোমর
অমন ক'র না।
এ কি রীতি ওগো তোমার
বারণ মান না॥
ফাগুন দিনে দখিন বায়
আগুন হেন লাগবে গায়
আবেশ ভরে উঠবে দুলে
সফল কামনা।
সেই কালেতে এস ভোমর
বাধা দেব না॥
(এখন) অমন ক'র না
এ কি রীতি ওগো তোমার
বারণ মান না॥

ইলা হেসে বললে, After all, it is vulgar. তুই এতও জানিস্।

জানতে হবে না, না জানলে ভেড়া বানাব কি করে?

তার মানে?

হয় ভেড়া বানাতে হবে, নয় ভেড়ী হতে হবে। তা নইলেই ঢুঁ মারবে যে।

কেন? তা হবে equal status, সমান অধিকার… স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার…

স্বপ্ন রে ইলা, স্বপ্ন; কোন দিনই হবে না ভাই, হয় পুরুষের মুখে দাতানা দিয়ে লাগাম পরাতে হবে, নয় নিজের নাকে দড়ি পরতে হবে, either of the two, দু-এর একটা। হয় সে করবে না—না—না, তুই করবি মিয়ো—মিয়ো—মিয়ো—তা না হলেই পরমা গতি।

সে আবার কি? পরমা গতিটা কি?

সিনেমা আর্টিস্ট হওয়া।

তাতে সুবিধে কি?

মেলাই ছোঁড়ার মুখে লাগাম পরান যায়—আর বেদুইনদের মত মরুভূমে ঘোড়া ছোটান যায়।

মরুভূমি কেন?

ছায়াশীতল গ্রাম ত সেখানেও পাবে না—জলের তৃষ্ণায় ছুটে বেড়াতেই হবে।

তবে কি তুই বলতে চাস্ যে, বিয়ে করাটা একটা দাসত্ব?

সংসারে যদি কারুর কাছে কিছু চাও—তা হ'লেই—দাসত্ব করতে হবে তার। নিলেই ঋণ, ঋণ করলেই শোধ দিতে হবে।

এর আবার ঋণ কিসের? বাপ-মা ভাই যে ছেলে-মেয়ে—বোনকে দেয়, তাতে কি তাদের ঋণ হয় নাকি? তোর সবই কেমন উল্টো-উল্টো কথা—

শোন্, ছেলে-মেয়ে বাপ-মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে সে ঋণ শোধে, স্ত্রী স্বামীর কোলে ছেলে দিয়ে সে ঋণ শোধ করে, স্বামী সংসার প্রতিপালন ক'রে—সংসার গড়ে তুলে স্ত্রীর ঋণ শোধ করে। ঋণ শোধ করতেই হবে।

যাক গে, ও—ফিলসফিতে আমার দরকার নেই শোনবার। কিন্তু শোন ভাই রি, এই কদিনে আমি কেমন যেন হয়ে গেছি, আমার পড়া-শোনা কিচ্ছু হচ্ছে না। এটা অবশ্য সত্যি যে, অমিয়ও আমার দিকে একরকম চাইত—আমিও তাকাতাম, কিন্তু তাতে বুঝতে পারি নি তখন—এখন…

বুঝে ফেলেছিস্ যে অমিয় তোকে ভালবাসে, কেমন?

এই দেখ্ না তার চিঠি। ব'লে তার ব্লাউসের ভিতর হাত দিয়ে বুকের কাছ থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে দিলে।

মাধুরী আগ্রহভরে চিঠিখানা পড়তে লাগল, পড়ে

আর মুখ টিপে-টিপে হাসে ; বললে : দেখ্ ভাই ইলা, পুরুষ মানুষগুলো এমন নির্লজ্জ—এ সব কি ক’রে লেখে—

ইলা জিজ্ঞাসা করলে, তুই এই রকম চিঠি আরও কারুর দেখেছিস্ ?

হুঁ ! যখন লভ্ হয় তখন সবারই কোঁচার খুঁটে ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্য—আর উঠতে বসতে ‘প্রাণ যায়, মন যায়, বুক যায়’…কি যে তাদের হয় তা তারাই জানে। দিদির চিঠিতে জয়ন্ত এই রকম কত কথা—সে আবার কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা…

যাক্ তোর কপাল ভাল—আমাদের কেউ ভাই এমন চিঠি যদি একখানা লিখত—সত্যি না হ’লেও মনটাকে প্রবোধ দিতাম যে, যাক্ সংসারে আমার দর বেড়ে গেল—একজনও তব্ ভালবাসে—পোড়া অদেষ্টে বোধ হয় নেই। যাক্ তোরই বরাৎ ভাল

কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং কন্যা
বরকর্ত্তা বর।
মদন রাজার জয় হোক ভাই
(তোরা) ঘরকন্না কর॥

তুই কি বলিস্, রাজী হই ?

মন্দ কি—তোর মন কি বলে ? তবে একবার বাজিয়ে দেখে নিবি নি ?

বাজিয়ে আবার কি ক’রে দেখব ?

বলি, লোকে হাড়ী-কলসী কিনতে গেলেও টোকা মেরে ঠংঠং ক’রে বাজিয়ে দেখে, কাণ্টা ভাঙা, কি আস্ত,—সে ত দু-চার পয়সার ব্যাসাতি। এত বড় মূল্য, দেহ মন—সর্ব্বস্ব সমর্পণ, একবার বাজিয়ে দেখবি নি ভাই যে, কাণ্টা ভাঙা কি-না ? ছলো কি বোঁচা, জগন্নাথের মত ঠুঁটো কি-না ?

কি করে বাজিয়ে দেখব বল্ ?

আহা ! আমার রসকে রে, ভালবাসা বুঝতে পারেন, এটা আর জানেন না…ঘর করবেন উনি, আর বাজিয়ে দেখব আমি !

আচ্ছা, তোকে যদি কেউ এই রকম চিঠি লিখত, তুই কি করতিস্ ?

বাড়ীতে ডেকে এনে বেশ ক’রে পেট ভরিয়ে রসগোল্লা খাইয়ে—তার পর এক হাতে কান ধরে তিন বার ওঠবোস্ করিয়ে বলতাম—ভ্যাড়ার ডাক ডাকতে পার কি-না ?…

তুই অতি, অসভ্য। তা আর করতে হয় না। তা কি আবার মানুষে পারে—না কি হ্যাঁ…

কেন আগে বিয়ের সময় ছাদনাতলায় নাপিত দিয়ে যাচিয়ে নিত—তখন ভ্যা করত বাপু বল্‌ত, এখন আগেই না হয় ছাদনাতলাটা নিজেরা সেরে নিই। ‘বর বড়, না কনে বড়’ এই ত কথা, কখন বর বড় ; না হয় কখন কনে বড়, এইটে বুঝে নিতে পারলেই হ’ল। যাক্, সে তুই আপনিই দু’দিন গেলেই পারবি এখন। কিন্তু একটা কথার সমাধান হয়ে গেল।

কিসের ?

তোর কালেজ ছাড়া, আর প্রোফেসারের সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা।

কি সমাধান পেলি ?

পেলাম এই যে, আমাদের ওই অল্পবয়সী প্রোফেসরটার অমিয়কে ভাল লাগে নি।

সত্যি কথা, নইলে তুই ছাড়া সব মেয়েই ত হাসি ঠাট্টা করে ক্লাসে—চোট্‌টা এল কেন আমার ওপর, সেই জন্যই সর্ত্তহীন ক্ষমাপ্রার্থনা—

তার জবাব ত তোরা দু’জনেই দিয়েছিস।

যাক্ গে ও কথা—এখন আমি কি করি ?

অনুরাগের প্রথম লক্ষণ—ঠিক হয়েছে, সখি-সম্বাদ আমার কাছে হ’ল ; কিন্তু এখন সুবল সখা কোথা পাই বল্, তা হ’লে না হয় পাঠাতাম দৌত্যে। আগের কালে শুনেছি বৃন্দে দূতীগিরি করত, আমার ত ভাই সে বয়েস হয় নি যে, দূতীগিরি করব। এখনকার দিনে দূতীকে খারাপ নাম দেয় জানিস্ ত।

না, তুই যা বলেছিস, যাচাই ক’রে নিতে হবে। আমি দাদাকে বলেছি বি-এ আমি পাশ করবই, আগে পাশটা করি তারপর…

ততদিন ধৈর্য্য থাকবে ত !

নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু আজ তার সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে।

কোথায় ?

এক জায়গায়।

এক জায়গায় না ত কি দু জায়গায়—তবু কোথায় শুনি ?

বাগানে।

কোথাকার বাগানে, স্বর্গে—না মর্ত্তে? বাগানে? বাগানে মানে কি?

বাগানে মানে—বাগানে—স্বর্গে নয় এই মর্ত্তে। শোন্, আমাকে একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারিস্?

আমার চেয়ে প্রেমশাস্ত্রে তুই অনেকখানি এগিয়ে গেছিস্—আমি তোকে বুদ্ধি দেব?

না শোন্, আমার কিন্তু একলা দেখা করতে ভয় হয়। কেউ যদি টের পায়—যদিও ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়—ভয়শূন্য না হতে পারলে প্রেম করা যায় না। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

মাধুরী এতক্ষণ খেলছিল ইলার সঙ্গে—কথাটা শুনে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু হেসে বললে: আমারও ত প্রেমিক থাকতে পারে, সেও হয় ত এখনি আসতে পারে, আর আমি···

হ্যাঁ, তোর আবার প্রেমিক কে

কেন সেখানে যত প্রেমিক আছে সবই ইলার একচেটে নাকি?

তুই রি, আমায় ঘুরিয়ে গাল দিচ্ছিস!

রাম কহো, পাগল হলি না কি, আমি যাব কোথা? তোর সঙ্গে? শোন্ ইলা, একটা কথা তোকে বলে রাখি—এ ভাবে মাকে না জানিয়ে, লুকিয়ে তার সঙ্গে বাড়ীতেই হোক্ আর বাগানেই হোক্—পথেই হোক্ আর ঘাটেই হোক্—এভাবে দেখা করা ভাল নয় ভাই! সে দেখা করতে বললেই দেখা করতে হবে—এরই বা মানে কি···যদি সত্যিই if his bent of love be honourable, his purpose marriage, তাহলে তার উচিত মানবের সঙ্গে দেখা করা—এ বিষয়ে সহজভাবে গ্রহণ করা—না ইলা, স্বর্গেই হোক, আর মর্ত্তেই হোক—দু'দিনের চোখ-ঠার—একদিনের চিঠি, তারপরই নিজেকে এমন ভাবে ধরা দিতে যাওয়া, একে আমি কিছুতেই সঙ্গত বলে মনে করিনে!—তুই যখন সহজভাবে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলি, তখন আমার সহজ বুদ্ধিতে যা এল তাই তোকে বললাম।

তা আমি যে চিঠিতে তাকে বলেছি, যাব, দেখা করব। অমিয় আমার আসার আশায় সেখানে যে অপেক্ষা করবে!

বরং টেলিফোন ক'রে কিম্বা এমনি চিঠি লিখে কাউকে দিয়ে না হয় পাঠিয়ে দে যে, একলা সেখানে গিয়ে দেখা করতে পারব না—সে বরং তোদের বাড়ীতে এসে দেখা করুক না কেন! মনে ভাবাটাই সব নয়, যাচাই করার প্রয়োজন আছে।

কেন, কত মেয়ে ত তাদের কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। তাতে কি ক্ষতি হয় বা অন্যায় হয়?

সত্যি যদি বন্ধু হয় তবে তার মর্য্যাদা সে হয়ত রাখবার চেষ্টা করে—স্বামী এখনও আমার হয় নি—সব কথা সে সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকারও নেই—তবে এটা হয়ত বুঝতে পারি যে, স্বামীর বন্ধুত্বটা বন্ধুর বন্ধুত্ব অপেক্ষা দামী বলেই অনুমান করি। অনুমান করি, কেন না, সেইটেই সম্ভবত সত্য।

তোর দেখছি সব সেকেলে ধারণা। বিয়ে করাটা একটা প্রয়োজন বলেই লোকে বিয়ে করে—প্রেমটা ত পরের ব্যাপার—

বিয়ে করাটাই যদি প্রয়োজন হয়, তবে বিয়ে করে ফেল্। সমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আগুনই হোক্ আর মানুষই হোক্, সাক্ষী রাখা ভাল।

প্রেম যদি হয় গৌণ, তবে ভালবাসার এত ভাবনা কেন লো?

সেটা হ'ল খুসী—আমার ওপর তার মন পড়েছে, তার ওপর আমারও মন পড়েছে—তাই কি যথেষ্ট নয়?

তাই যদি যথেষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এ পরামর্শ চাস কেন? শোন্ ইলা, আমি দেখেছি, শুধু বইতে পড়েছি বলে বলছি তা নয়—আমি দেখেছি, ভালবাসা না হ'লেও বিয়ে হয়, আর ভালবাসা—যা তুই বলছিস সে রকম বিয়ে হয়েও শেষকালে হয় বিয়ে ভেঙে যায়—নয় বিয়ে না ভেঙেও দু'জনে লোকচক্ষে ঠিক থাকে, কিন্তু আসলে দু'জনের মাঝখানে পাঁচিল উঠে যায়। সেইজন্যেই বলছি, যাচাই ক'রে দেখা ভাল।

যাক গে, আমি আজ তাহলে দেখা করব না, চিঠি পাঠিয়ে দেবার কিন্তু সময় আর আজ নেই—আজ যাব না সকালে সে চিঠি পাবে। সেই ভাল।

কিন্তু শোন্ ভাই ইলা, আমার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে তোকে আমি চলতে বলতে পারি নে—তুই তোর মনকে বুঝে দেখ্—মন সত্যি কি চায়···this is an age

liberty, স্বাধীনতার যুগ—রাস্তা-ঘাটে, পথে—ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে সব মানুষ এখন স্বাধীনতা চায়। ইতিহাস পড়লে এই দেখতে পাওয়া যায় যে, কোন সভ্যতা কোন দিন বিংশ-শতকের সভ্যতার ছাঁচে স্বাধীনতা চায় নি। প্রত্যেক মানুষটি তার জীবনের ধারার মধ্যে তার কাজ তার শিক্ষা, তার ধারা তার সঙ্গী, তার দিনের কাজ, রাতের কাজ, তার ধর্ম্ম, তার নীতি, সব বিষয়ে স্বাধীনতা চাইছে। আগের দিনে মানুষের কাউকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ত না, আমি মাছ খাব কি মাংস খাব, বোষ্টম হব কি শাক্ত হব, সমাজতন্ত্রবাদী হব কি আত্মতন্ত্রবাদী—মাতাল হব, কি একেবারে শুচিবায়ুগ্রস্ত হব, বিয়ে করব কি বিয়ে করব না—এর কোন কথা তাদের ভাবতে হ'ত না—সমাজ যে আইন আর তার কানুন ঠিক ক'রে দিয়েছিল, পাঁজি পুঁথি সব বেঁধে দিয়েছিল—স্বামী-স্ত্রী আজ ঘরে এক সঙ্গে শোবে কি-না—সব নিয়ম বাঁধা ছিল—এখন সেটা একেবারে উল্টে গেছে। এ যুগে সে সব নেই, আসলে আমাদের দেশের কবিরা যত প্রেমের গানই বাঁধুক, যত মিলন-বিরহ-মাথুর বোষ্টমের ঢঙেই হোক, আর ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী কবির নকল করুক—সে প্রেমের ভাব সত্যি আজকের মানুষের মেয়ে-পুরুষের ভাবের মধ্যে নেই—তা যদি থাকত তাহলে দেশের সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ ও রূপ এমন বদল হয়ে যেত না। সে নেই? আজ আমার দেশের সাহিত্য মেয়েদের সতীত্বকে প্রশ্ন করছে, সংশয় এনে দিয়েছে। শুধু, আমার দেশেই বা কেন বলি—পৃথিবীর সব জায়গায়ই প্রায় অল্পবিস্তর স্বাধীনতার ঢেউ চলেছে। আমার সঙ্গে আমাদের ভোলাদার একদিন তর্ক হচ্ছিল—ভোলাদা কিন্তু বলে, এটা হচ্ছে age of liberty নয়, age of libertine স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা—দুটো শব্দের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ আছে।

শব্দে তফাৎ থাকলেও মানে প্রায় একই।

মাধুরী হেসে বললে, তুই দর্শনের ছাত্রী—শব্দ সম্বন্ধে এটা বিচার করা তোর পক্ষে শক্ত নয়। নিজের অধীন হতে হলে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতায় কোন দায়িত্ব না থাকাই সূচনা করে।

তুই বলতে চাস্, এই রকম ভালবাসা হলেই তার মানে উচ্ছৃঙ্খলতা? ...

তা কেন বলতে যাব—আগে বুঝি, অনুভব করে ভাবনা করে দেখি যে তোর এটা ভালবাসা, তখন মেনে নেব।

আর তা না হলে—মানবে না?

কেন মানব—আমি তোমায় চাই বললেই ভালবাসা হয়ে গেল না কি? তাহলে পথে ঘাটে—কলেজের বাসে কি বাড়ীতে কি গাড়ীতে—অন্য পুরুষ বা ছেলেরা যে মেয়েদের দিকে হাঁ করে চায় তার মানেও তবে ভালবাসা!

বা রে! তা কেন হতে যাবে! তুই এত কড়া কথা বলিস্—আবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল academic discussion করবি, তোর সঙ্গে আর পারা যায় না...

এটা অবশ্য একটা স্তরের প্রেমের লক্ষণ ত বটেই।

কোন্‌টা?

ওই 'পারা যায় না' বলাটা...আর সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় ভালবাসে ওইটে মনে করাটা...যাক্ গে, শোন্—বলেই মাধুরী আবার তখনি গান ধরলে—

সে আমায় বুঝি ভালবাসে।
আঁখিতে আঁখিতে কথা,
সে ব্যথা তার চোখে ভাসে॥
কারণে কি অকারণে
পড়ে সদা তারে মনে...
স্বপনে জীবনে ধ্যানে
সে ধ্যানে জল চোখে আসে॥
সে আমার কত ভালবাসে...

এমন সময় গানের শেষ কলি শেষ হবার পূর্ব্বেই পারলারের পর্দা সরিয়ে একজন বললে: May the intruder come in?

মাধুরী চমকে উঠল—তারপর সামনে গিয়ে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হেসে বললে: Who you please? O I see...

Yes! yes! the intruder may come in, if he likes...ও আপনি...কবে থেকে আপনি আবার এ বাড়ীতে intruder হলেন...ম্যাতারলিঙ্ক-এর 'ইনট্রুডার' নয় ত?

বলেই মাধুরী হেসে ফেললে, কিন্তু মনের ভিতর একটা তীক্ষ্ণ নাড়া পেয়ে। তবুও হাসলে।

হ্যাঁ! তুমি কি আমার সেই রকমের ইনট্রুডার বলেই মনে

কর নাকি ?…এ কি ইলা, তুই এখানে, এই যে মা বললে তোর কে কলেজের বন্ধু—তার সঙ্গে সিনেমায় যাবি !…

ইলা বললে : যাবও মনে করেছিলাম, কিন্তু ওই ত আটকে রাখলে, যেতে দিলে না। দাদা, তুমি আমাদের নিয়ে চলনা…তুমি কিসে এলে ?

হেঁটে। আমার আজ অনেক কাজ আছে, আমি ঠিক পেরে উঠব বলে মনে হচ্ছে না, তবু একবার এদের সঙ্গে দেখাটা করে যাই বলে এলাম, অনেক দিন আসিনি। মাধুরী, তোমরা সবাই বেশ ভাল আছ ? মা ভাল আছেন ?

না, মার সেই মাথার অসুখটা বেড়েছিল, বুকের ভেতরের সেই যন্ত্রণা—ডাক্তার অধিকারী দেখছেন—আজ কদিন একটু ভাল ছিলেন—আজ আবার তেমনই শুয়ে আছেন।

তোমাদের ওবাড়ীর খবর ভাল ?

কোন্ বাড়ীর ? কথাটা বলেই সে মানবের মুখের ওপুর তাকালে—যেমন অন্ধকার ঘরে ডাক্তারেরা চোখ পরীক্ষা করার সময় দেখে, তেমনই ক'রে চকিতের মধ্যে মানবের ভিতরটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলে। মানবও যেন একটু ইতস্তত করে বললে : জয়ন্তদের বাড়ীর। ভাল আছে সব ?

ভালই আছে বোধ হয়। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে…

মানব একটু দূরে টেবিলের কাছে বসল।

মাধুরী আবার একটু হেসে বললে : আপনি অমন আন্‌কম্‌ফর্টেব্‌ল্ ফীল করছেন কেন, একটু সুস্থ হয়ে বসুন।

না—না—আন্‌কম্‌ফর্টেব্‌ল্ বোধ করব কেন—আমি বেশ বলেছি।

দাদার আসা দেখে ইলাও অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বললে : দাদা, তুমি তাহ'লে সিনেমায় যাবে না ?

না রে, বলছি—আমার কাজ আছে।

রি-ও যাবে না, তুমিও যাবে না, তবে আর আমার যাওয়া হয় না—আমি বাড়ী যাই। আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলাম, তাও হ'ল না। রি-র পাল্লায় পড়লে আর কিছু হয় না।

Then you ought to reject me…আমাকে বাদ দিলেই পার !

অমনই মেয়ের রাগ হয়ে গেল !

রাগের কথা আবার কি বললাম। দেখুন ত মানববাবু ! ও তোমাদের ঝগড়ার ভেতর আমি নেই।

দাদা, আমার মাস্টারের কি হ'ল ?

সব ঠিক করেছি, কাল আসবে তিনটের সময়, সুজিৎ নিয়ে আসবে।

তাহ'লে দাদা, তোমরা যাবে না, দেখ, এখনও ছ'টা বাজে নি।

তাহ'লে আমি বাড়ী গিয়ে, তোমায় গাড়ীটা পাঠিয়ে দেব।

তাই দিস্।

রি, তোর কথাই রইল, আজ চললাম ভাই।

এমন সময় বয় চা নিয়ে এল। মাধুরী বললে : চা খেয়ে যা, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে আবার গল্প সুরু হ'ল। মানব বলতে লাগল : দিল্লী গিয়েছিলাম, ভাল লাগল না; গেলাম কাশী…ভাল লাগল না…মিছে মিছে ক-মাস ঘুরে-ঘুরে…

মাধুরী হাসতে হাসতে বললে : ভাল ত লাগতেই পারে না…

কেন ?

না ব'লে, কাকেও না জানিয়ে অমনি গেলেন বেড়াতে সেখানে বুঝি সঙ্গী পান নি বকবার !

আমি বুঝি খুব বকি ?

ইলা বললে : মাগো ! তোমার যখন গল্প-করা সুরু হয় তখন রাতই প্রায় কাবার…কেবল ডেমোক্রাসি আর সোশ্যালিজম্-এর তর্ক। রি ! আমার চা খাওয়া হয়েছে—আমি চলি।

মাধুরী অমনি গান ধরলে : গান গাইতে গাইতে ইলাকে এগিয়ে দিতে গেল :

চলি গো চলি, যাই গো চ'লে।
বুকের ব্যথা মনের কথা,
রইল নবি আঁখির কোলে॥
রইল তা যা বলবার ছিল
শুধু মুখ দেখে প্রাণ ভরিল…

মানবের অলক্ষে ইলা মাধুরীকে একটা ঝিল দেখিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

মানব বললে: গানটা থামল কেন রি?

আপনাকে শোনাবার জন্যে ত গান করি নি। অত্যন্ত গর্ব্ব ও অহং-ভাবে মাধুরী উত্তর দিলে: আপনাকে শোনাবার জন্যে ত' গান গাই নি।

না হয় শোনালে, তাতে কি এমন···

কিছু নয়···তারপর সকালে যখন ফোন করলাম, তখন ত বললেন আসতে পারবেন না—তবে যে বড় এলেন আবার!

একটা দরকারে এসেছি।

আমার কাছে? কি দরকার?

মাধুরী, তুমি অমন ক'রে কথা কইছ কেন?

কি ক'রে?

তুমি ত এভাবে কথা কখনও কও না—আজ যেন কি···

আপনাকে যখন ফোন করলাম, তখন ত এ দরকার আছে বলে জানতে পারি নি···

এখন তোমার দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি! মাধুরী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বললে: দিদি! কখন পাঠিয়েছে? সে ত এখানে।

তা আমি জানি, সেই জন্যেই এখানে এলাম।

দিদি! আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে—অ···তাহ'লে দিদিকে খবর দিই।

না, একটু পরে—শোন মাধুরী···

মাধুরীর ভিতরটা আগুনের মত জলছিল—সে তার রাগ প্রকাশ করতে পারছিল না। ভিতরে একটা ভীষণ গর্জ্জন উঠছে, সে সেটাকে দাবিয়ে রেখে সহজ সরলভাবে কথা কইতে চেষ্টা করলেও গলার স্বরে কেমন একটা তীব্র ঝাঁঝের মত প্রকাশ পাচ্ছে।

বলুন।

জয়ন্ত সম্বন্ধে কতকগুলো কথা আমি শুনলাম, সে সব কথা—

জয়ন্তর কথা দিদিই বলতে পারে, আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি। আপনি বসুন।

মাধুরী উঠে দাঁড়াল।

মানব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললে: শোন মাধুরী, তুমি ত কখনও আমায় আপনি-আপনি সম্বোধন করতে না—বরাবর তুমি বলে এসেছ—আজ এ-ভাবে কথা বলছ কেন?

ভেবে দেখলাম যে, তুমি শব্দটা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।

এতদিন ত বলতে।

এতদিন একটা ভুল ক'রে এসেছি ব'লে আজও যে তার সংশোধন করব না এমন কি মানে আছে?

ভুল করে এসেছ?

হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে। মানুষেই ভুল করে, গাছ-পালা পাহাড় ভুল করে না—তারা শোধরায় না, শোধরাবার তাদের প্রয়োজন হয় না—মানুষের প্রয়োজন হয়, তাই মানুষ ভুলটাকে ছিঁড়ে নিজে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

আর ভুল যদি আমি ক'রে থাকি?

সে কথা আপনি জানেন—সে কথা জানবার আমার কি দরকার?

কোন দরকারই তোমার নেই মাধুরী?

মানুষ যে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সে তার নিজের জন্যেই করে—অন্যের সুবিধে বা অসুবিধের কথা ভাববার তার অবসর থাকে না। যাক্, আপনি বসুন, আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি। দিদি ডেকেছে বলেই ত আপনি এসেছেন!

দেখ মাধুরী, মানুষ ভুল করে, ভুলের জন্য মানুষ তাকে ক্ষমাও করে—করে না কি?

না, ক্ষমা করে না, ক্ষমা করা অন্যায়; ভুল করা যেমন অন্যায়, তার জন্যে শাস্তি ভোগ না করাও তার চেয়ে বেশী অন্যায়। অন্যায়ের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়, ক্ষমা করলে মানুষের মনুষ্যত্বকে ছোট করা হয়। যদি আপনি অন্যায় করে থাকেন, তবে তার জন্যে ক্ষমা চাওয়া—আপনার পক্ষে অন্যায় ও গর্হিত—অন্যের পক্ষে সে ভাবে ক্ষমা করাও আপনাকে ছোট করা। থাক্, আমিই বা এ সব কথার আলোচনা আপনার সঙ্গে করি কেন···কোন প্রয়োজন ত নেই আমার।

কোন প্রয়োজন নেই তোমার?

না—কোন প্রয়োজন নেই—আপনি আমার কে?

মানব আর কিছু না বলে সিগারেট-কেশ বার করে একটা সিগারেট ধরালে, খুব জোরে টেনে ধোঁয়া বার ক'রে

বললে : ভাল, অন্যায়ের শাস্তি আমিই ভোগ করব। সেই ভাল।

মাধুরী তার আঁচলের কোণটা আঙুলে পাক দিয়ে দিয়ে জড়াচ্ছিল, সে আর কোন কথা না ব'লে খট্-খট্ ক'রে পারলার থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললে : দেখুন, সব জিনিষ সকলকে সাজে না, মানায় না। পুরুষ মানুষের অনেক য়্যাড্‌ভান্‌টেজ্—তাদের অনেক সুবিধা—তাদের মিথ্যাবাদী, শঠ প্রবঞ্চক হওয়া সহজ হয় এবং সাজেও—হয়ত তাদের সেভাবে চলে ; তবে আমরা মেয়েমানুষ, আমরা প্রবঞ্চনা শঠতা এ সবগুলো যে করতে পারি না তা নয়, করলে আমাদের সংসার করা চলে না—নিজেদের ছোট করলে আমাদের ক্ষতি হয়···না হলে ইতিহাসের ধারা থেকে দেখে আসা যাচ্ছে যে, ইচ্ছা করলে ছলনার মায়ার খেলায়—পুরুষের চেয়ে নারী ঢের বেশী অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে··· বুঝলেন···এবং তাতে সে কোন দিনই পিছয় নি···বুঝতে পারলেন ?

বুঝলাম। আরও বুঝলাম যে, শ্রীমতী মাধুরী দেবী আমার অন্যায়ের কথা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, তিনিও সকল রকমেই আমাকে ছলনা করছেন।

মাধুরী চলে গেল। মনে হল সে দাঁতে-দাঁত দিয়ে নিজের কথাকে অস্পষ্ট চিবিয়ে নিজেই গিলে ফেললে।

পাশের টেবিলের ওপর একখানা বই পড়েছিল। মানব বইখানা টেনে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। শুধু অন্য দিকে মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এটা মানব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না যে মিলনী তাকে ডেকে পাঠালে কেন। মাধুরী যে আমার সে কথা জেনেছে এ ত তার হাব-ভাব কথাবার্ত্তায় স্পষ্টই বোঝা গেল। সে কাজটা যে আমার গর্হিত হয়েছে, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মিলনীর এ ব্যাপারটা আমার কাছে অন্য রকম বলে মনে হচ্ছে। সে এ ক্ষেত্রে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন ?···আবার বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগল···বইয়ের পাতা ওল্টানটা উপলক্ষ মাত্র, মানব নিজের মনের স্মৃতির কেতাবের পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগল। সে খুঁজছিল সেই পৃষ্ঠা—সেই পুকুরঘাটের অসংযমের পৃষ্ঠা—সত্য বলতে গেলে সেটা সে খুঁজছিল না—সেই পৃষ্ঠা যদি আজ এমন সময় কৈফিয়ৎ চায়—সে অন্যায়ের বিচার যদি এখনই এখানে সুরু হয় তবে সে কি করবে।

ক্রমশঃ

অন্তর্দর্শী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমি যত কথা বলি
তুমি হও উদাসীন,
বৃথা আপনারে ছলি,
জানি তুমি শ্রুতিহীন।

আমি যে অন্ধ কত'
সে কথা ভুলিয়া যাই,
আঁখি তব জাগ্রত,
কিছু অগোচরে নাই।

আমার মুখের কথা
কত যে মিথ্যা নয়
—বোঝ, তাই নীরবতা
দিয়া তারে কর জয়।
যেটুকু সত্য আছে,
তোমারে তা বাঁধিয়াছে।



রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস, এফ্-আর্-ই-এস্

(জীবনী)

কমলার বরপুত্র হইয়াও যাঁহারা অবিচলিত অধ্যবসায়, একাগ্র সাধনা ও গভীর নিষ্ঠার সহিত আজীবন সারদার সেবা করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং দেশকে ধন্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে, সঙ্গীত বিদ্যার বিস্তারে এবং সঙ্গীত বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়নে তিনি যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহ সেরূপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনন্যসাধারণ ছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গীতসমাজ তাঁহার সঙ্গীত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছিল। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যার প্রচারের জন্য, সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং দেশের অন্যবিধ কল্যাণার্থে অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা বাঙ্গালার এই বরেণ্য সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় (পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে) সৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপণ্ডিত হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের নাম বাঙ্গালার রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। নয় বৎসরকাল তথায় অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শিরোরোগগ্রস্ত চিকিৎসকগণের পরামর্শে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গ্রন্থকার হইবার বলবতী বাসনা ছিল এবং এই বাসনা উত্তরকালে তাঁহাকে অন্যূন পঞ্চাশখানি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। উহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার পূর্ব্বেই বাটীতে পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত ও কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'মুক্তাবলী নাটক' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। প্রাণীবৃত্তান্তেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং নানাবিধ গৃহপালিত পশু পক্ষীর আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যার জন্যই তিনি ভূমণ্ডল-ব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহাদের কাছারীর কোনও আমলার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে প্রসিদ্ধ বীণ্কর ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র এবং বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট তিনি উচ্চতর সঙ্গীতজ্ঞান লাভ করেন। একজন জার্ম্মান সঙ্গীতবিদের নিকট তিনি পিয়ানোতে প্রতীচ্য সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পরে প্রতীচ্য বহু কলাবিদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রতীচ্য সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, বারাণসী, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি বহু স্থান হইতে তিনি প্রভূত ব্যয়ে এই সকল গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন। ফাদার লাফোঁর নিকট তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

সৌরীন্দ্রমোহন ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখনপ্রথা প্রচলিত করেন। 'সঙ্গীত সার' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতবিদ্যার্থীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। তাঁহার 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা'য় সেতারের অনেক গৎ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার প্রচারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি রাগ রাগিণীর শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপযুক্ত চিত্রকর দ্বারা চিত্র অঙ্কন করিয়া

প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাগাদির এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক চিত্র সন্দর্শন করিলে মনে হয় যেন তাহাদের কল্পনাকারীর মানস নয়নের সমক্ষে এই সকল রাগ রাগিণী সর্ব্বদা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া বিরাজ করিত। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থও তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে চিৎপুর রোডে বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। উহাতে নামমাত্র বেতনে ছাত্রগণকে উপযুক্ত সঙ্গীতাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার পরবৎসর কলুটোলায় একটি শাখা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা সৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং পরিচালনা করিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যার প্রচারের জন্য সঙ্গীতাচার্য্যগণকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রচারে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষকের বেতনাদি ও সঙ্গীত পুস্তকাদি তিনি বহু বৎসর স্বয়ং দিতেন। কনসার্ট বাদ্যের অনেক গৎ সৌরীন্দ্রমোহনের রচিত।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রকাশিত বহু গ্রন্থাদিতে তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "ডক্টর অব মিউজিক" বা সঙ্গীতবিশারদ উপাধি প্রদান করেন। তদানীন্তন শিক্ষাধ্যক্ষ উড্রো সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই উপাধি স্বীকার করিয়া লন। অতঃপর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোর্ত্তুগাল, স্পেন, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, ইটালী, সুইজার্ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, স্যাক্সনি, জার্ম্মানি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি বহু দেশের শাসনকর্ত্তা বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অতি উচ্চ সম্মানসূচক পদক, প্রশংসাপত্র বা উপাধি লাভ করেন। পারস্যের শাহ ইঁহাকে 'নবাব সাহজাদা' উপাধি দেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি লাভ করেন। এরূপ সম্মান সচরাচর প্রদত্ত হয় না। কবি হেমচন্দ্র "হুতোম প্যাঁচার গানে" দেশের যে সকল বরেণ্য সন্তানের যশোগান করিয়াছেন তন্মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহনের উদ্দেশে লিখিত পংক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে 'মিউজিক-ডাক্তার'।
'অর্ডার অফ সি আই ই, অ্যাণ্ড রাজা-কম';
'অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম বেলজিয়ম,'
'অর্ডার অফ ফ্রান্সে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া',
'অর্ডার অফ ডনার ব্রোগ' ডেনমার্ক নিয়া,
'অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্‌সনী',
'অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরী লুসিগনানী',
'অর্ডার অফ মলটা-রোড্‌স্ ফ্রাঙ্ক সিভেলার,'
অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেণ্ট সেপলকার',
'ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউসিং' চাইনার,
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন এণ্ড সন্,'
'সেকেন কেলাস ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি সুলতান,'
'অর্ডার অফ গুর্খা-তারা' দিয়েছে নেপাল,
'শ্যামদেশের বসবামালা পারস্য সা-জাদা।
এর ওপরে আরো কত এটসেটেরার গাদা!!
সত্যই এ সকলগুলি রাজশ্রীর হার,
সাক্ষী রেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার!!

সৌরীন্দ্রমোহন এত দেশ হইতে, এত বিদ্বৎসমাজ হইতে, এত সম্মানসূচক উপাধি পাইয়াছিলেন যে তাহার তালিকা প্রদান করাও অসম্ভব। কোনও সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী প্রিন্স বিসমার্ককে তিনি আরও কতকগুলি পদক লাভ না করিলে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, কারণ প্রিন্স বিসমার্কের ৪৮২টী পদক প্রভৃতি পরিতে হইলে তাঁহার বিশাল বক্ষ ২১ ফুট প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন।

সৌরীন্দ্রমোহন 'God save the Queen' শীর্ষক ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতটির যথোচিত সুরলয়ে রচিত একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেন। উহা লণ্ডনের জাতীয় সঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং উক্ত সমিতির অনুরোধে তিনি নানা রকমের দেশীয় রাগিণীতে উহার স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে চমৎকৃত করেন। তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সরূপে এদেশে আসেন তখন সৌরীন্দ্রমোহন একটি

অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহার সুর সংযোজনা করিয়া দেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সৌরীন্দ্রমোহন সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী মাসে রাজোপাধিতে ভূষিত হন। বাঙ্গালা প্রদেশের আটটি জিলায় বিস্তৃত তাঁহার বিস্তৃত জমিদারি (যাহার মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ প্রাঙ্গণও অবস্থিত) ছিল বলিয়াই তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হন নাই। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এশলি ইডেনের একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও গবেষণা যাহা য়ুরোপে সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে এবং দেশে তাঁহার নাম সুপরিচিত করিয়াছে—তাহাও এই উচ্চ উপাধিদানের অন্যতম কারণ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সৌরীন্দ্রমোহন "বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক' প্রতিষ্ঠিত করেন। উহা হইতে সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য ডিপ্লোমা দেওয়া হইত।

সৌরীন্দ্রমোহন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব দি পীস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো প্রভৃতি সম্মানসূচক পদপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকারে দেশের কল্যাণসাধন করেন। তিনি নানা প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব মিউজিক ফণ্ডে তিনি সুযোগ্য ছাত্র ছাত্রীকে সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিবার জন্য ভারতসচিবের নিকট অর্থ প্রেরণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পিতা হরকুমার ও খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ী দেবীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থদান করিয়াছেন। পিতার নামে গঙ্গাসাগর দ্বীপে একটি পুষ্করিণী খনন এবং বরাহনগরে ভাগীরথী তীরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান, কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রমে অর্থসাহায্য, বাঁকুড়া লেডী ডাফ্‌রিণ হাসপাতাল নির্ম্মাণের অর্থদান উল্লেখযোগ্য। ইনি বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিনয়ী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সালে) তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থাবলীর পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে, আমরা কেবল প্রসিদ্ধতর গ্রন্থগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করিয়া আংশিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত
মুক্তাবলী নাটিকা (মৌলিক নাটক
মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক (অনুবাদ)
জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব
যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা
মৃদঙ্গ মঞ্জরী
হার্মোনিয়ম সূত্র
যন্ত্রকোষ
ভিক্টোরিয়া গীতিমালা
ভারতীয় গীতিমালা
ভারতীয় নাট্য রহস্য

ইংরাজী

Hindu Music from various Authors
(A collection)
Six Principal Ragas of the Hindus
(with Lithographic Illustrations)
Eight Principal Ragas of the Hindus
(with Lithographic Illustrations)
Ten Principal Avataras of the Hindus
(with Lithographic Illustrations)
The Binding of the Braid (A translation of the Veni samhara Nataka)
Hindu Music
English verses set to Hindu Music
Short Notices of Hindu Musical Instruments
Fifty Tunes
Specimens of Indian songs.
Ækatana or the Indian concert
A few Lyrics of Owen Meredith set to Hindu Music
Eight Tunes.

সংস্কৃত

সঙ্গীত সার সংগ্রহ
মানস্ পূজনম্
কবিরহস্যম্
ভিক্টোরিয়া গীতিকা
প্রিন্স পঞ্চাশৎ
রোম কাব্য

হিন্দী

গীতাবলী
সংস্কৃত (হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী অনুবাদসহ)
মণিমালা

সমাজতত্ত্ব

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

প্রবন্ধ

সমাজ বলিতে কি বোঝায়

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, সমাজ কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা আবশ্যক। (পক্ষীদের ঝাঁক থাকে, গাভীর পাল থাকে, ছাগের দল থাকে, সেই রকম মানুষের জন্য সমাজ আছে)। বেকনের রচনায় মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যে মানুষ সমাজের অন্তর্গত নহে, সে হয় ভগবান, না হয় বনের পশু। মানুষের স্বভাবগত চাওয়া হইল মানুষের সহবাস। এই স্বাভাবিক সংস্পর্শের চাওয়াই হইল সমাজগঠনের মূল কারণ। মানুষ চায় বিপদে বন্ধু, আদান-প্রদানের জন্য আত্মীয়, চিন্তাধারার নেওয়া-দেওয়ার জন্য স্বজন। যতই বাক্‌বিতণ্ডা হোক্ না কেন তারই মধ্যে কোথা থেকে জেগে ওঠে মিলনের ইচ্ছা, তাহাই আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সঙ্ঘ, সমাজ বা অন্য যে-কোন অনুষ্ঠান হউক না কেন, তাহার মধ্যে পরস্পরের মিলনই হইল সৃষ্টির ভিত্তি। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিভিন্ন সঙ্ঘের উৎপত্তি হইবার কারণ কি এবং কেনই বা নানা জাতি, বহুপ্রকারের সভ্যতা, রকম-বেরকমের জীবন-ধারার গতির সৃষ্টি হইল? তাহার উত্তর এই যে বিভিন্নতাই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। এই বিভিন্নতার মধ্যে একস্থানে একত্বটুকু লুকাইয়া আছে। মানুষের চাওয়া একপ্রকারের হইতে পারে না। সেই কারণে সদৃশ-চাওয়া যাহাদের তাহারা একটা দল বা শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছে। এই জন্য নানা দল একই সঙ্গে একই দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সমষ্টিগত জীবনও আছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজগত জীবন দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক দল বা সঙ্ঘের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবন দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রাজনৈতিক লেখক লাস্কির মতে জাতি অর্থে মানবের সমষ্টি না ধরিয়া দল, অনুষ্ঠান বা সঙ্ঘের সমষ্টি ধরাই হইল বিজ্ঞানসম্মত। যেখানে যাহাই হউক না কেন, শেষ পরিণতিতে মানবই হইল একক বা ইউনিট এবং এই মানব ও মানবের আত্মীয়তাই হইল সঙ্ঘ গঠনের আকর্ষণ। এই সঙ্ঘগুলি আবার বাসনার রূপ অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাব ধারণ করে। সাধারণত সমাজকে আমরা দুইভাবে দেখিতে পাই—প্রথম রাষ্ট্রিক এবং দ্বিতীয় স্বাভাবিক। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকায় নানা প্রকারের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। আহার বিহারাদি ব্যাপারে যে সকল অনুষ্ঠান তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিতে পারা যায়, কিন্তু সম্পত্তিরক্ষা, দেশের উন্নতিসাধন করার জন্য অথবা জ্ঞান বা রাজনৈতিক বিষয়ীভূত অনুষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। মোট কথা সমাজ বলিতে বোঝা যায়—কতগুলি ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে মেলামেশা করিতেছে কিম্বা একপ্রকারের উদ্দেশ্য-সাধন করিবার জন্য একটা অনুষ্ঠান গঠিত করিয়াছে। উপরিউক্ত ভাবে যদি সমাজের সংজ্ঞা করা যায় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানশুদ্ধ বলা চলিবে না। বিজ্ঞানশুদ্ধভাবে দেখিতে হইলে বলা উচিত সমাজ হইল কতগুলি সচেতন ব্যক্তির সমষ্টি যাহা পরস্পরের একত্বানুভবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে।

সমাজতত্ত্বের সামান্য ইতিহাস

সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছে কোথায় বলা বড় কঠিন ব্যাপার। মানব যখন হইতে ক্ল্যান বা ট্রাইবে পরিণত হইয়াছে তখন হইতেই সমাজতত্ত্বের সুরু হইয়াছে বলা যাইতে পারে, আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন মানব মিলিত চেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিল তখনই ইহার প্রথম সৃষ্টি হইল। যাহাই হউক, পুঁথিগত সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া আমাদের দেশের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনু, শুক্র প্রভৃতি লেখকদের নামই আমরা বলিতে পারি; পাশ্চাত্যে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনার আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম কোঁতের যুগে। ইহা হইল সমাজশাস্ত্রী গিডিংসের মতে—কিন্তু বাঙালী সমাজশাস্ত্রী

বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলেন যে, কোঁতের যুগের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা-সম্ভূত তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার দ্বারা আর পুরাতন সমাজ-তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে কি-না সন্দেহ। কোঁত, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং মাক্‌সে এই তিনজন সমাজশাস্ত্রীকে তিনি "ক্ল্যাসিক্যাল সোশিওলজিস্ট" বলেন। যাহাই হউক সাধারণত দেখা যায় বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া ইহার গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। প্লেটোর "ল" এবং আরিষ্টটলের "পলিটিক্স" নামক গ্রন্থেও ইহার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাকালে কেহই সভ্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে পূর্ণভাবে ধরিয়া বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করেন নাই।

সমাজতত্ত্ব বলিতে বোঝায় সমগ্র সমাজকে একত্রে গ্রহণ করিয়া তাহার নিয়মিত ব্যাখ্যা করা এবং বর্ণনা করা। অগষ্ট কোঁতের "কোর ডি ফিলসফিএ পসিটিভ্" নামক গ্রন্থে "সোসিওলজি" বা সমাজতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে ধারণা করিয়াছিলেন যে, উক্ত বিষয়টি পৃথকভাবে বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হব্‌স্, মন্‌তেস্কিয়ো প্রভৃতি মনীষী কেহই সমগ্র সমাজকে চিন্তার বিষয়ীভূত বলিয়া ধরেন নাই। কোঁত প্রথমে ধরেন যে, সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানের মতে গবেষণা করিতে হইলে দেখিতে হইবে—সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহার পরিবর্ত্তনের কারণ কি, সমাজের প্রাকৃতিক বিধিসমূহ প্রভৃতি; অসাধারণ বা মনুষ্য বিচারের বহির্ভূত বিষয় হইতে সেগুলি বিভিন্নভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। হার্বর্ট স্পেনসার তাঁহার সমাজতত্ত্বের উপর লিখিত "সিন্‌থেটিক ফিলসফি" নামক গ্রন্থে বলেন যে, সমাজতত্ত্বের জন্ম হইল মনস্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব নামক বিজ্ঞান হইতে। তাঁহার মতে সমাজের গতি জৈব-ধর্ম্মের অনুযায়ী অথবা সমাজতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়ই সদৃশ। দেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া থাকে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কল-কারখানার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদ্বারা "সাস্‌টেনিং সিস্টেম্" গঠিত হইয়াছে, বাণিজ্যিক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক "ডিস্‌ট্রিবিউটিং সিস্টেম্" হইয়াছে, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক "রেগুলেটিং সিস্টেম্" হইয়াছে। সাস্‌টেনিং সিস্টেম্ বা যাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়। ডিস্‌ট্রিবিউটিং সিস্টেম্ অথবা যাহার দ্বারা বাটোয়ারা হইয়া থাকে। "রেগুলেটিং সিস্টেম্" বা যাহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। অনেক সুধী ব্যক্তি স্পেন্সারের এই মত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া সমালোচনা করেন। অনেক বিষয়ে দেহতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সদৃশ হইতে পারে কিন্তু উভয়েই একই প্রণালীতে চালিত বলিলে ভুল হইবে। (১)

সমাজতত্ত্বের বিষয়

আধুনিক সমাজতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে টোনিস্, তার্দ, দুর্খাহিম এবং সিমেলের লেখা হইতে। মার্কিণ এবং ইংরেজ সমাজশাস্ত্রীর নামও এখানে উল্লেখযোগ্য যথা:—স্মল, গিডিংস, ব্যস্, ওয়ালাস, ম্যাকডুগল, কুলী, এলউড্ প্রভৃতি। সমাজশাস্ত্রী ডুপার্টের মত—যে সকল ঘটনাকে সামাজিক বলিয়া ধরা যায় এবং সমাজ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার বলিয়া মনে হয় তাহাকেই সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত বিষয় বলিতে পারা যায়। ডক্টর সরকারের মতে প্রাচ্যধারার সমাজতত্ত্বকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা প্রয়োজন:—

১। থিওরেটিক্যাল সোসিয়লজি (পুঁথিতে সমাজতত্ত্ব) (ক) ইন্‌স্টিটিউসনাল সোসিঅলজি (গৃহ, সম্পদ, রাজস্ব, পুরাণ, বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি) (খ) সাইকলজিক্যাল সোসিঅলজি (ইহাই হইল আসল সমাজতত্ত্ব, অবশ্য সঙ্কীর্ণ-ভাবে ধরিলে); ইহাতে সমাজের মনস্তত্ত্ব, সমাজের গতি, এবং তাহার রূপ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

২। এপ্লায়েড্ সোসিঅলজি।

পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রী গিডিংসের মতে সমাজতত্ত্বের মধ্যে বহুরকমের আলোচনা পড়িয়া যায়, সেইজন্য বাস্তবিক ইহার নিজস্ব আলোচ্য বিষয় কি তাহা নিরূপণ করিতে হইলে কয়েকটি বিশিষ্ট চিহ্নের প্রয়োজন। যাহা নিছক সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু তাহাকে পৃথক্ করিতে হইলে সেই সেই চিহ্ন অনুসরণ করিলেই সহজসাধ্য হইবে। কোন কোন সমাজশাস্ত্রীর মতে অর্থনীতির সাহায্যে সমাজতত্ত্বের বিষয়ীভূত আলোচনার বস্তুকে বিভিন্ন করা যায়। অর্থনীতির উন্নতির সহিত শ্রমিক বিভাগও উদ্ভব হইতেছে এবং সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যতা,

---

(১) এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য—"দি সোসিওলজি অব পপুলেশন", পৃঃ ৩। অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার-কর্ত্তৃক প্রণীত।

সহানুভূতি এবং অন্যান্য সদ্‌গুণেরও বিকাশ হইতেছে। প্রথম যদি ধরা যায় যে, "ডিভিসন্ অফ্ লেবর" বা "শ্রমের বিভাগ"ই কার্য্য-বিভিন্নতার মূল কারণ, অতএব সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয়েও তাহা কার্য্যকরী হইবে তাহা হইলে ভুল করা হইবে। কারণ কার্য্য-বিভিন্নতা জীবনের সঙ্গে অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়াছে বা হয়, কিন্তু তাহা সঠিক সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যায় না। দেহের মধ্যে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তো রহিয়াছে এবং তাহারা পরস্পরের সহানুচর্য্যে না চলিলে সমস্ত দেহই বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িবে, ইহাও সত্য; কিন্তু তথাপি দেহতত্ত্বকে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া চালানো কঠিন। অষ্ট্রিয়ান সমাজশাস্ত্রী লুড্‌উইগ্ গুমপ্লোভিচ্ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বস্তুর যে সামাজিক ঘটনা-চিত্র, তাহাতে প্রকাশ পায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ, তাহার পর সংমিশ্রণ ও সমাজগঠন। বেলজিয়ান সমাজশাস্ত্রী গ্রীফ্ দেখাইয়াছেন যে, মানুষের জীবনে যে যে বস্তু ও ঘটনার মধ্যে "চুক্তির" প্রভাব দেখা যায় একমাত্র সেই সকল বস্তু ও ঘটনাই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার মতে সমাজের উন্নতির মাপ করিতে হইলে দেখা চাই, কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক অনুজ্ঞা হইতে মানুষ যখন মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় চুক্তির পরবশ হয় এবং আপনাকে সেই চুক্তির কথা অনুযায়ী বাধ্য করে তখনই তাহার প্রকৃত উন্নতি।

ফরাসী অধ্যাপক দুর্খাহিম্ এবং তার্দ্দ উভয়ের মতবাদ একেবারে বিরুদ্ধবাদী। তার্দ্দ বলেন যে, প্রাথমিক সমাজগত বিষয়ের লক্ষণ হইল "অনুকরণ"। এই অনুকরণ করার প্রবৃত্তিই পরস্পরকে সহানুভূতি করিতে লওয়ায় শ্রমবিভাগ করার বাসনা উদ্দীপ্ত করে এবং চুক্তির সৃষ্টি করে। এস্পিনাস দুর্খাহিম বলেন যে, মানব ভিন্ন অন্যান্য জীবের মধ্যেও অনুকরণ-প্রিয়তা খুবই প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। দুর্খাহিম বলেন যে, সমাজের বিশিষ্ট চিহ্ন হইল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে চালিত করে।

পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রত্যেক জিনিষের মূল্য হয়। তার্দ্দ বলেন এই পুনরাবৃত্তি হইল অনুকরণের ছায়া মাত্র। জড়-তত্ত্বে এবং জীবতত্ত্বে আমরা এই পুনরাবৃত্তিকেই পরিষ্কার দেখিতে পাই। জীবতত্ত্বে জন্ম—যেমন এক শ্রেণীর জীব বা একটি বংশে তাহার স্থিতি হয়—কিন্তু জনন দ্বারা পুত্র বা কন্যার মধ্যেই পিতা-মাতার নিজের বিকার অথবা দেহের ধারাবাহিক সূত্র স্থায়িত্বের একমাত্র উপায়। সমাজতত্ত্বের বিষয়েও ঠিক ঐ কথা প্রযোজ্য, কারণ "অনুকরণ" দ্বারাই আমরা ভাল-মন্দ কার্য্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া থাকি এবং তাহার দ্বারা নিজের ভাব, উচ্ছ্বাস, জ্ঞান সমস্তই প্রকাশ করি। দুর্খাহিম্ কিন্তু দেখাইতে চাহেন যে, বহু-মনের যে কার্য্য-করণের ছাপ কোন এক বিশিষ্ট মনের উপর পড়া এবং তদনুযায়ী সেই ব্যক্তির কার্য্যধারার বৈচিত্র্য আনয়ন করাই হইল সমাজবিষয়ের মূল বৈশিষ্ট্য। সে যাহাই হউক, একটি মনের প্রভাব বহুমনের উপরেই বিস্তৃত হউক আর বহুমনের ছাপ একটা মনের উপরেই ছায়াপাত করুক, তাহার দ্বারা সঙ্ঘ বা সমষ্টির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর কিনা? একটি সর্প কোন এক পক্ষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দেয় এবং পক্ষীর মনে পূর্ণ প্রভাবও বিস্তার করিয়া থাকে কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে নিঃশেষ করিয়াও ফেলে। জুয়াচোরে পরচুলো পরে বা মুখোস ধারণ করে কিন্তু সে অনুকরণের মধ্যে সামাজিক বৃত্তির অভাব দেখা যায়। কাজেই এমন একটা গুণ বা চিহ্ন আবিষ্কার করা বাঞ্ছনীয়, যাহার মধ্যে সামাজিক অনুকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। "সমভাবাপন্ন ব্যক্তির একত্রিত হইবার যে অনাবিল বাসনা" সেই বাসনা হইতেই সমষ্টির সৃষ্টি হওয়া এবং পরস্পরের সহানুভূতির জন্য একে অন্যের নিকটে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়। তাহাই হইল সমাজান্তর্গত বিষয়ের পৃথকীকরণের চিহ্ন।

সমাজতত্ত্বের প্রণালী

সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমগ্র সমাজকে একত্র করিয়া তাহার বিশ্লেষণ করা এবং প্রত্যেক ঘটনা এবং সামাজিক ব্যাপারকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যা করিবার জন্য কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত বিধি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "ল"—তাহার সন্ধান করা। ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইলে "লাব্ জেন্ট্রিক" বা মধ্যগতের তরফ হইতে "কন্‌সেন্সাস্" বা চেতনা এবং "ট্রেন্‌ডেন্সি" বা বৃত্তি এই দুইটির বিশ্লেষণ; কারণ একান্ত আবশ্যক। ঐতিহাসিক বাস্তব জগতের দিক হইতে উহার ব্যাখ্যা

কাজেই বাহির এবং দার্শনিক বস্তুসমূহের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই

এবং পরস্পরের নির্ভরতা প্রকাশ পায। উভয় ব্যাখ্যাব প্রণালী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইবে না ববং তাহাদের মধ্যে যেন যোগাযোগ থাকে। এবিস্টটলেব "পলিটিক্স" হইতে আবম্ভ কবিয়া বোঁদা, মঁতেস্কিয়ো এবং অন্যান্য ফিসিওক্রাত বা প্রকৃতিনিষ্ঠ দাশনিকগণ একটা বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে জাতি, জন্ম, জলবায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে বিচার কবিযাছেন। আবাব অন্যদিকে গ্রোসিযাস্, হব্‌স্, লক্, হিউম্, বেন্‌থাম, বার্কলে, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি মনীষীবা মানব-প্রকৃতি, ব্যবহাব, নৈতিক চবিত্র এবং আদর্শ সম্বন্ধীয ব্যাপারসমূহকে মনজগতেব দিক হইতে ব্যাখ্যা কবিযাছেন। উক্ত দুই প্রকারেব ব্যাখ্যাকে একত্রিত কবিযা পবস্পবেব মধ্যে মিলন কবার সম্ভাবনা দেখা যায না। বার্কেব বাজনৈতিক বিষযে লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে কিছু কিছু মনস্তত্ত্বেব ব্যাখ্যা এবং বস্তুনিষ্ঠের ব্যাখ্যা উভয়ই একসঙ্গে পরিলক্ষিত হয। সত্যেব অনুসন্ধানের জন্য সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান -এই উভয প্রণালীর সংমিশ্রণে উৎপাদন হওয়াই আবশ্যক। এখানে মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যার যতটা প্রয়োজন আছে, ঠিক ততদূরই বাস্তব জগতেব দিক্ হইতেও ব্যাখ্যার আবশ্যক। উভয় দিক হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটা দৃশ্যকে বিশ্লেষণ কবিলে তবে তাহার ব্যাখ্যাব সঠিক রূপ প্রকাশ পাইবে। বিশ্লেষণের সর্বত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কার্য্য-কাবণতথ্যেব ব্যাভিচার না ঘটে এবং পর পর নিয়মিত ভাবে সাজান হয়।

মনজগতের দিক হইতে যখন ব্যাখ্যা করিতে হইবে তখন এমন একটা "ডেটা" বা ধর্তা লইতে হইবে যাহা এখনও পর্য্যন্ত তথ্য পরিণত হয নাই। স্পেন্সাবের একটা মত এখানে দেখা যাক। তিনি বলেন যে, চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট এবং মজুর বা "এলারেন্স" এই দুটি দৃশ্য সঙ্ঘ, সমাজ, অনুষ্ঠান

বা অনুভূতি-প্রভৃতির সমস্ত প্রকাবের দৃশ্য হইতেও অধিক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই আমাদেব মনজগতের দিক

করিয়া সমাজতত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা কবিতে পারি না। সমাজশাস্ত্রী গিডিংসও বলেন, মনস্তত্ত্বেব দিক্ হইতে সমাজ-বিজ্ঞানেব ব্যাখ্যাই চবম ও পবম।

সমাজ-বন্ধন

সমাজেব বন্ধনপ্রকৃতি সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ কবিব। সমাজেব গোড়াব দিকে কেন্দ্রীকরণ আবম্ভ হয বাহিব হইতে। কাবণ, মানুষে খাদ্যের জন্য, জলবায়ুব জন্য, পবস্পবেব আত্মীযতার জন্য কিম্বা দুই সঙ্ঘের বিরুদ্ধতাব জন্য একত্রে মিলিত হইবাব জন্য আসে। এক প্রকারের আচাব-ব্যবহাবসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা এক-আদর্শেব লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি সঙ্ঘ গড়িয়া ওঠে এবং ভবিষ্যতে তাহাই এক বিরাট সমাজে পরিণত হয়। এই সকল সঙ্ঘ বা অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-দুঃখের জন্য বহুভাবে দাযী। সমষ্টির চেষ্টায় ব্যষ্টি উন্নতি করে, আবাব ব্যষ্টির চেষ্টায় সমষ্টির উন্নতি হইয়া থাকে। ইহাব মধ্যে কে আগে চেষ্টা করিবে বা কাহার উন্নত হওয়া প্রথম আবশ্যক এ আলোচনা অমূলক, কারণ তাহা হইলে নৈবায়িকেব "তৈলাধারে পাত্র" না, "পাত্রাধারে তৈলের" মত তর্ক হইবা যাইবে। উভবেরই একসঙ্গে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ একে অপরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তিগত চাওয়া না-চাওবার উপর সমাজের চাওয়া না-চাওয়ার কথাও সেই রকম সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এক সম্বন্ধ রাখা-না-রাখা অথবা যোগসূত্র উন্মোচন করার কারণ অনুসন্ধান কবিলে দেখা যাইবে যে, "শ্রেণীত্বের একতার চেতনা" হইল মূল। আব সমাজ-বন্ধন, গঠন এবং বিচ্ছিন্ন-করণের কারণ হইল এই চেতনা।



প্রজাপতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রবন্ধ

পতঙ্গশ্রেণীর জীবগণের মধ্যে প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা তাহাকে অপরূপ রূপসম্ভারে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রজাপতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ঔৎসুক্য পাশ্চাত্য দেশবাসীর তুলনায় আমাদের কম থাকিলেও আমরা প্রজাপতিকে শ্রদ্ধা করি। কেন করি তাহার উত্তর-নিষ্প্রয়োজন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সংগ্রহের পিছনে যে সমস্ত দেশ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে আমেরিকার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণ যেরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে প্রজাপতি সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এ প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির রহস্যজাল উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার বিস্তার করা।



স্ত্রী-জাতীয় 'পার্জ' প্রজাপতি

বর্ণভেদ, দেহের কোন কোন অঙ্গের তারতম্য এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈষম্য হেতু প্রজাপতিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ছয় শ্রেণীর মধ্যে কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে।

অন্যান্য পতঙ্গশ্রেণীর জীবগণের মতই প্রজাপতির দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহাদের বক্ষদেশ ও উদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয়-সংলগ্নে গঠিত। বক্ষের পার্শ্বে দুই জোড়া ডানা, মস্তকের উপর দুইটী শুণ্ড এবং পার্শ্বে দুইটী চক্ষু আছে। প্রত্যেক চক্ষু আবার কতক গুলি ছোট ছোট চক্ষুর সমষ্টি লইয়া গঠিত; চক্ষুপুঞ্জ নামে ইহারা পরিচিত। ফুলের ভিতর হইতে মধু সংগ্রহের জন্য প্রজাপতির আর একটী লম্বা শুণ্ড আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় শুণ্ডটী স্প্রীংয়ের মত গুটান থাকে। উদরের দুই পার্শ্বে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথ রহিয়াছে—এই সকল ছিদ্র-পথ দিয়া দেহে বাতাস প্রবেশ করে। প্রজাপতির ডানাগুলি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র শিরায় তৈয়ারী কাঠামোর উপর পুরাতন কাগজের মত একপ্রকার বস্তুর দ্বারা গঠিত। আমাদের অঙ্গুলি চাপে ইহারা নষ্ট হইয়া যায়। ডানাগুলি

সম্পৃক্ত বর বলিয়াই প্রজাপতিকে মধ্যে মধ্যে বেশ পরিবর্তন করিতে হয়। ডানার আকৃতিও বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ডানার উপরিভাগ সূক্ষ্ম আঁইস দ্বারা আবৃত। প্রজাপতির ডানা স্পর্শ করিলে ইহাদের নানা বর্ণের ছাপ আঙুলে দেখা যায়। আঁইসগুলি বিচিত্র বর্ণের এবং ডানার উপর ইহারা নানারূপে চিত্রিত বলিয়াই প্রজাপতির রূপসৌন্দর্য্য এতখানি।

কাশ্মীরী শালের বিচিত্র বর্ণের নক্সা নাকি এ দেশীয় প্রজাপতির ডানায় চিত্রিত নক্সা অনুকরণে প্রস্তুত—দেশ-বিদেশে ইহার জন্যই তাহার খ্যাতি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে আমরা প্রজাপতির ডানার উপর একশ্রেণীর আঁইস দেখিতে পাইব। শরীরের অন্যান্য আঁইস হইতে ইহারা পৃথক এবং সুবাসিত আঁইস নামে পরিচিত। ডানার উপরিভাগস্থ কয়েকটী অদ্ভুত গ্রন্থির উপর এই আঁইসগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত। এই গ্রন্থির মধ্য দিয়া একপ্রকার উদ্বায়ী গন্ধ প্রবাহিত হয়। উহার উপরিভাগস্থ আঁইসগুলির সাহায্যেই সেই উদ্বায়ী গন্ধ বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। লেবুর গন্ধের ন্যায় ইহার গন্ধ। কোন কোন শ্রেণীর প্রজাপতির পশ্চাদ্দেশীয় ডানায় বিশেষ বিশেষ স্থানে এই সুবাসিত আঁইস দেখিতে পাওয়া যায়।

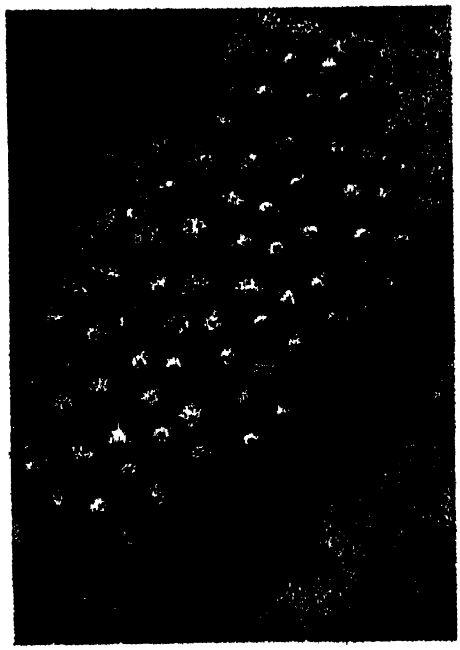
ইহা ছাড়া কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির ডানার উপর পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থিগুলি ঘনায়তনে বিস্তৃত এবং গ্রন্থিগুলি প্রধান শিরার সহিত সংযুক্ত। কোনরূপে উত্তেজিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে এইরূপ গন্ধ প্রজাপতির গাত্র হইতে বাহির হয় না।

প্রজাপতির শত্রু অনেক। আত্মরক্ষার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণ এবং এইরূপ উদ্বায়ী গন্ধের সৃজন করিয়াছেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গ ভক্ষণকারী প্রাণী প্রজাপতির এই বিচিত্র বর্ণ এবং গন্ধ মোটেই পছন্দ করে না। কারণ তাহারা কয়েকবার মাত্র পরীক্ষা করিবার পর প্রজাপতি ভক্ষণ হানিকর এবং অনুপাদেয় ইহা বুঝিতে পারে। ইহার পর তাহারা আর প্রজাপতি শীকারে উৎসাহিত হয় না।

আত্মরক্ষা ব্যতীত প্রজাপতির এই সুবাসিত গন্ধের অনেকখানি প্রয়োজন রহিয়াছে।

যৌনসম্বন্ধের পূর্ব্বে পুং প্রজাপতি স্ত্রী প্রজাপতিকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত এই গন্ধ নির্গত করিয়া থাকে। এই গন্ধের মাদকতা এতই বেশী যে, কোন কোন স্থলে পুং প্রজাপতি স্ত্রী প্রজাপতির অবর্ত্তমানে এই গন্ধ নির্গত করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যেই এই গন্ধ নির্গত করিবার ক্ষমতা বিদ্যমান। তবে পুং প্রজাপতি কর্ত্তৃক নির্গত গন্ধ স্ত্রী প্রজাপতির গন্ধ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উগ্র। পুং প্রজাপতির ডানার বিচিত্র বর্ণও স্ত্রী প্রজাপতি অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

ডিম্ব, শূক, পুত্তলি এবং পতঙ্গ—এই চার অবস্থার মধ্য দিয়াই প্রজাপতির জন্ম।



শ্বেত প্রজাপতির ডিম্ব

প্রজাপতির ডিম্বের আকার মোচাকৃতি, বর্ত্তুলাকার, এমন কি সমকোণী আকারেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রেণীর প্রজাপতির ডিম্বের উপরিভাগ মসৃণ এবং গন্ধযুক্ত, আবার কোন কোন প্রজাপতির ডিম্বের উপরিভাগ শৈলমালার ন্যায়—ইহারা জালবৎ উন্নত ভূষণ দ্বারা ভূষিত; দেখিতে অতিশয় মনোরম।

গাছের পাতার নিম্নভাগেই প্রজাপতি ডিম্ব প্রসব করে। প্রসবকালে ডিম্বের সহিত একপ্রকার আঠা নিঃসৃত হয়। ঐ আঠা ডিম্বকে পাতার সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রাখে যে, বৃষ্টির জলে বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় প্রজাপতির ডিম্ব

হাসজাই হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি নিজ নিজ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক এক জাতীয় গাছের পাতার নিম্নেই কেবলমাত্র ডিম্ব প্রসব করে। আমাদের দেশে রজনী, করবী ও কাসকাসিন্দে গাছের পাতায় প্রজাপতির ডিম্ব প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত প্রজাপতির প্রচুর পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করিবার ক্ষমতা অল্প। আমেরিকার শ্বেতকায় প্রজাপতি দুই বা ততোধিক শৃঙ্খল রচনায় ডিম্ব প্রসব করে। প্রত্যেক শৃঙ্খল শ্রেণীতে পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ সংখ্যক ডিম্ব থাকে।

প্রজাপতি একই স্থানে বহু সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে না, কারণ ডিম্ব হইতে বহির্গত শূক কীট যাহাতে খাদ্যাভাবে না পড়ে সেই জন্য তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে ডিম্ব প্রসব করিয়া বংশবিস্তারে মন দেয়। ডিম্ব প্রসব করিয়া স্ত্রী প্রজাপতির মৃত্যু ঘটে।

প্রজাপতিরা অল্পায়ু। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী প্রজাপতি এক সপ্তাহ হইতে দুই কি তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। উত্তর আমেরিকার 'টরটয়েজ সেল' জাতীয় প্রজাপতি এক বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিচিত।

ডিম্ব হইতে বহির্গত শূককীটের দেহ কতকগুলি অংশে বিভক্ত থাকে। শূককীট অবস্থায় দেহে শ্বেত এবং পীতবর্ণের জোড়া থাকে। কয়েক জোড়া পা এবং মস্তিষ্কের উপরিভাগে দুই জোড়া শুঁড় দেখা যায়। শূককীটের জীবনের একমাত্র কর্ম—প্রচুর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া শরীর পুষ্ট করা। পূর্ণাঙ্গ শূককীট অবস্থার পূর্ব্বে ইহারা কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ফুলের কুঁড়ি, গাছের পাতা ইহাদের প্রধান খাদ্য। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ম্যাসাচুসেট্‌স এবং শ্যামদেশের কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির শূককীট পিপীলিকা অথবা ঐ জাতীয় কীট ভক্ষণে অভ্যস্ত। এই শ্রেণীর পিপীলিকাভোজী প্রজাপতির প্রায় সকল শূককীটদেরই পশ্চাদ্ভাগে মাংস গ্রন্থি আছে। ঐ মাংস গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত একপ্রকার রস পিপীলিকার অতি প্রিয় খাদ্য। এই উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে পিপীলিকা শূককীটকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। শূককীট বেশ পুষ্ট হইলে পিপীলিকার গর্ত্তে প্রবেশ করে এবং পিপীলিকার ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া শূককীট অবস্থার শেষ দিনটুকু তাহাদের বাসায় অতিবাহিত করে। আফ্রিকা দেশের এক শ্রেণীর প্রজাপতির শূককীট কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। পিপীলিকাভোজী শূককীট শিকারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি পরিণত অবস্থায় এবং শূককীট অবস্থাতেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

শূককীট অবস্থা হইতেই প্রজাপতির জন্মান্তরিক বিবর্তন



পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় শূককীট • পুত্তলি অবস্থার ঠিক পূর্ব্বে দেহের চর্ম্মাবরণ পরিত্যাগরত শূককীট • পুত্তলি অবস্থা

বাচ্চিদেরও সেই সময়ে তাহারা কোনরূপ সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

কয়েকবার দেহের চর্ম্মাবরণ পরিবর্ত্তনের পর পূর্ণ শূককীট অবস্থায় পরিণত হইলে শূককীট মুখ হইতে একপ্রকার রেশম প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বাচিত স্থানে লাগাইয়া দেয় এবং পশ্চাতের পাগুলি তাহাতে লাগাইয়া নীচের দিকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকাল স্থির ভাবে ঝুলিয়া থাকে। ইহাতে ক্রমশ দেহের শ্বেত এবং পীত বর্ণের ডোরাগুলি ঈষৎ সবুজ বর্ণে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে হঠাৎ শূককীটের দেহের উপরিভাগস্থ চর্ম্মাবরণ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহার পর শূককীট দেহকে ছোট

দুই ঘণ্টা পর প্রজাপতি তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে সমর্থ হয়।

প্রজাপতি জন্মলাভের পর সে-স্থানে বেশী দিন থাকে না। একক কিংবা দলবদ্ধ অবস্থায় প্রজাপতি দেশদেশান্তরে অভিযান সুরু করে।

শূন্য-পথে এইভাবে সহস্র সহস্র বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতির দেশভ্রমণের অভিযান আমেরিকা অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্ট হয়। আমেরিকার 'মনার্ক' প্রজাপতির বংশ দলবদ্ধ-ভাবে প্রতি বৎসর কানাডা হইতে কালিফর্ণিয়া পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। আকারে ইহার দুই ডানা বিস্তারিত অবস্থায় পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ হইয়া থাকে।



পতঙ্গ অবস্থায় গুটী হইতে প্রজাপতির বহির্গমনের দৃশ্য

উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় পরিশ্রান্ত প্রজাপতি শিশু

জন্মাইবার পরের কিছুকাল পরের প্রজাপতি— অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে

করিয়া দেহের উপরিভাগে স্বচ্ছ উজ্জ্বল বর্ণের আবরণে আবৃত রাখিয়া পুত্তলিকা অবস্থায় পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় পুত্তলি নরম থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না।

প্রায় দশ দিন এই অবস্থায় থাকিবার পর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা অর্থাৎ প্রজাপতি অবস্থায় আসিয়া পড়ে।

খোলস হইতে প্রথমে প্রজাপতির মস্তক ও সম্মুখের পা দুইটা বাহির হয় এবং পরে ডানা ও শরীরের বাকী অংশটুকু বাহির হইয়া [illegible] খোলস হইতে বাহির হইবার

নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াই প্রজাপতির যাত্রা সুরু হয়। দেখা গিয়াছে, সহস্র সহস্র প্রজাপতি দলবদ্ধভাবে রেলওয়ে সুড়ঙ্গ, এমনি কি বাড়ীর দরজা বা জানালা পথমধ্যে পড়িলেও তাহারা দিক পরিবর্ত্তন না করিয়াই তাহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিয়া যায়। কয়েক শ্রেণীর প্রজাপতির এইরূপ অভিযান কোন কোন দেশের অনিষ্টকারক বলিয়া জানা গিয়াছে। আবার পশ্চিম আফ্রিকায় মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে একদল প্রজাপতি ভ্রমণে বাহির হইলে সেখানকার লোক এই অভিযানকে [illegible]

বলিয়া মনে করে। তাই সহস্র সহস্র প্রজাপতির দল যখন ইবাডান এবং দক্ষিণ নাইজেরিয়ার উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায় তখন সেখানকার নিগ্রো কৃষকগণ নির্ভয়ে তাহাদের কৃষি-কার্য আরম্ভ করে।

কারণ ইহাদের এই অভিযানের কয়েক দিন পরেই বর্ষা আরম্ভ হয়। বর্ষার ঠিক শেষ দিকে সেই প্রজাপতির দল উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নিগ্রো কৃষকদল এই প্রজাপতির অভিযানে বিশেষ উপকৃত। বর্তমানে এই প্রজাপতিদলের আর প্রত্যাবর্তনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যে সকল শ্রেণীর প্রজাপতি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প।



গুটি হইতে বহির্গমনের দুই ঘণ্টা পর প্রজাপতি উড়িতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার জন্য ইহাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনদিন পরে প্রজাপতি ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে

আমাদের ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে অক্টোবর মাসে পালনি পর্বতে প্রায় আট হাজার ফিট উপরিভাগে বহু রংয়ের বড়িয়া প্রজাপতির অভিযান দক্ষিণ দিকে চলিয়া আসিতেছে। সিংহল দেশীয় প্রজাপতির সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে প্রচুর দৃষ্ট হয়।

ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সেই দলের অল্প-সংখ্যক প্রজাপতি প্রত্যাবর্তন করে। ইহাদের মধ্যে কিন্তু সিংহলদেশীয় প্রজাপতি প্রত্যাবর্তন করে না। আমেরিকার 'মনার্ক' শ্রেণীর প্রজাপতি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়।

উত্তর ভারতে বসন্তের প্রারম্ভে হিমালয়ের উপরিভাগসহ সমতলভূমিতে প্রজাপতির অভিযানের ইতিহাস পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপে বৎসরে দুই বার এইরূপ প্রজাপতির অভিযান হইয়া থাকে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্বে ইহাদের প্রথম অভিযান আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অভিযান সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে, মৌসুমী বায়ু শেষ হইবার সময়।

এই অভিযানে ষাট প্রকারের বিভিন্ন প্রজাপতি পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ও মালয় দ্বীপেও প্রজাপতির অভিযানের খবর আমরা পাইয়া থাকি। একমাত্র চীন দেশ সম্বন্ধে আমরা এখনও কোন সংবাদ পাই না।



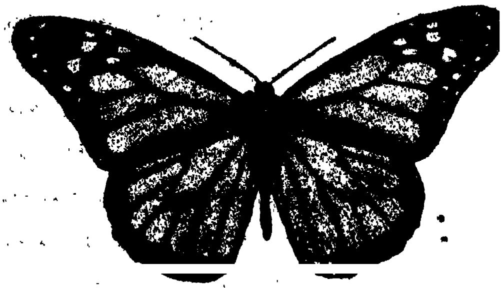
'পেচক' প্রজাপতির ডানার দৃশ্য

উত্তর আমেরিকার 'ডানায়াস প্লেক্সিপস্‌' শ্রেণীর প্রজাপতির অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর প্রজাপতি দলবদ্ধভাবে বহু দূর দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ বলেন, প্রায় এক হাজার প্রকারের প্রজাপতি দেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত। প্রাণীতত্ত্ববিদগণের অভিমতে খাদ্যাভাব, আবহাওয়া এবং সংখ্যাধিক্য হওয়ার জন্যই প্রজাপতির এইরূপ অভিযান প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আজ পর্যন্ত প্রজাপতি-বাহিনীর অভিযান সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে "স্কাউট প্রজাপতি"-বাহিনীর বিস্তৃতিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া প্রাণীতত্ত্ববিদগণের অভিমত। আর্জি এবং সেন্টেরস বলেন, এই জাতীয় প্রজাপতির প্রায়

দুইশত পঞ্চাশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ট্রেক্স্যালের উপর দিয়া অভিযান করিতে দেখা গিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, প্রতি মিনিটে প্রায় বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রজাপতি তুষার-ঝটিকার ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর প্রজাপতির জন্মস্থান কোথায় এবং কোন্ দেশেই বা এই অভিযানের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে তাহা প্রাণীতত্ত্ববিদগণের নিকট এখনও অবিদিত।

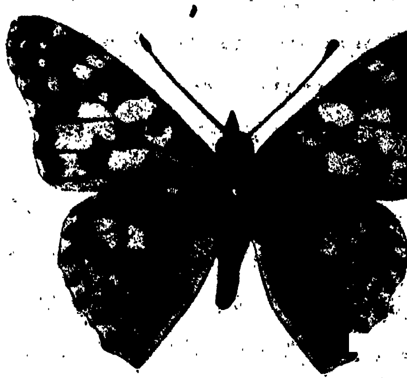
কালিফর্ণিয়ায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর



বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি দৃষ্ট হয়। সেখানকার 'টরটয়েজশেল' প্রজাপতি প্রায় আট হাজার দুই শত ফিট উপরিস্থিত স্থান-সমূহের উপর দিয়া যে অভিযান করিতে সক্ষম হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালিফর্ণিয়ার প্রজাপতি-সংগ্রহকারীগণ বিদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি রপ্তানি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

লণ্ডন শহরেও প্রজাপতি বিক্রয়ের জন্য বহু ধনশালী ব্যবসায়ী আছে। আমাদের দেশে কাশ্মীরের ও দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অধিবাসীদিগকে প্রজাপতি বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

বর্তমানে প্রজাপতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলিতেছে। পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে বহু গ্রন্থে বহু শ্রেণীর প্রজাপতির জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশার কথা, আমাদের দেশে ইদানীং প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে।



লণ্ডনের 'পেন্টেড লেডী' প্রজাপতি

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদগণ প্রাণীজগত সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে সাগরের অতলতলে দিনের পর দিন জীবনকে বিপন্ন করিয়া প্রকৃতির কত যে রহস্যময় ঘটনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিতেছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া আসে। আমাদের দেশেও এইরূপ অভিযানের প্রয়োজন আজ অনুভূত হইতেছে।



চেকোশ্লোভোকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

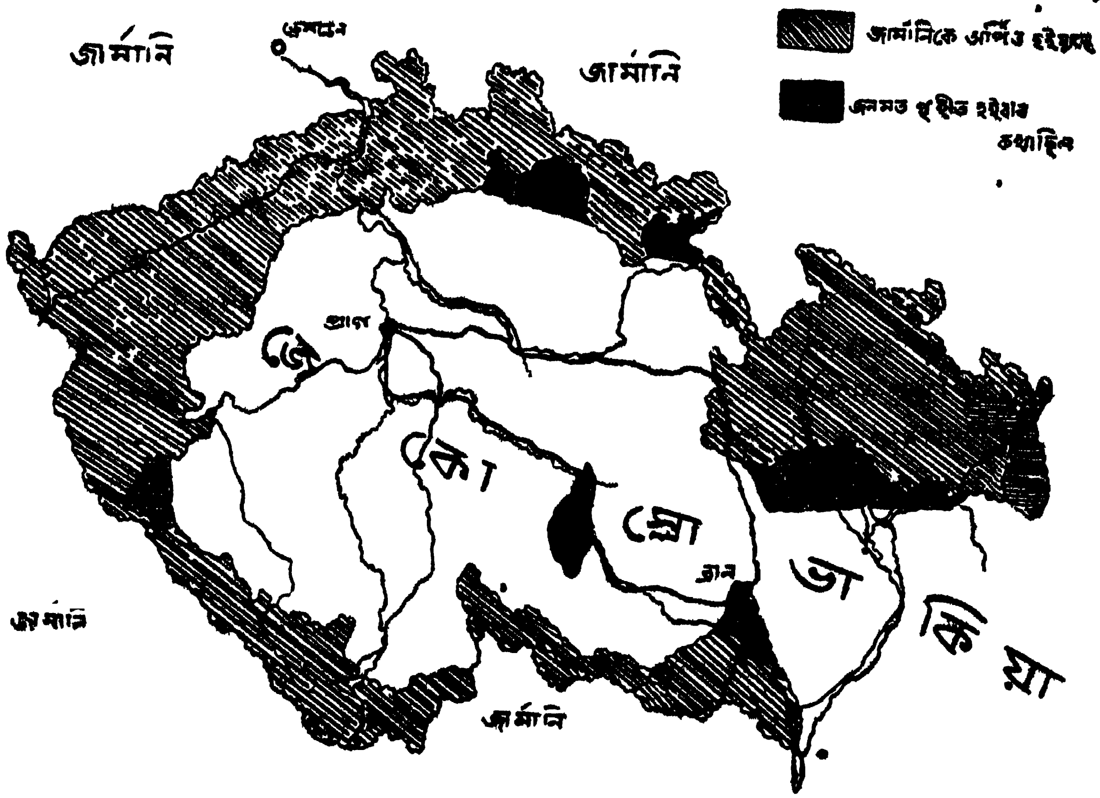
বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ মাসে মধ্য ইউরোপের একটী প্রাচীন রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটী আর নূতন রাজ্যের অঙ্গচ্ছিন্ন হইয়া বস্তুত উহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইল। প্রাচীন রাজ্যটীর সমস্ত দেহ এবং নূতন রাজ্যটীর বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রায় সমুদয় অংশ জার্মানীরই উদরস্থ হইল। ঘটনা দুইটীর অভিনবত্ব এই যে, এইরূপ বিরাট রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ে একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই, একখানি তরবারি কোষমুক্ত হয় নাই, সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সগর্ব্ব পদক্ষেপে ধরাবক্ষ তিলমাত্র বিকম্পিত হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের অবতারণা করিয়া যে নাৎসী-নীতি গত ছয় বৎসর কাল যাবৎ প্রত্যেক বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়া আসিতেছে, উহা মধ্য-ইউরোপে আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই —"দাবী পূরণ না হইলে যুদ্ধ করিব" এই ভীতি প্রদর্শনেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষুদ্র এই ইঙ্গিতটীতে সন্ত্রস্ত হইয়া ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের বীরপুঙ্গবগণ সন্ধি, প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন এবং নাৎসী নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া 'বিরাট রক্তপাতের' সম্ভাবনা দূর হইল মনে করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন। ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তা সাজিয়া তাঁহারা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সহস্র সহস্র মানব জীবন রক্ষার জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা আর ছিল না।

মধ্য-ইউরোপের নব-গঠিত চেকোশ্লোভেকিয়া রাজ্যে সুদেতেন্ জার্মান্ (নাৎসী) দলের আন্দোলন এবং এই সম্পর্কে জার্মানীর মনোভাব ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। গত আগষ্ট মাস হইতে সুদেতেন্ জার্মানীদের দাবী সম্বন্ধে তাহাদের প্রতিনিধিদিগের সহিত চেক্ গভর্ণমেণ্টের আলোচনা চলিতেছিল। এই আলোচনার গতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই মনে হইয়াছিল যে, সুদেতেন্গণ "নানা ছলে" কালক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আবদার করিয়াছিল যে, তাহাদের নেতা হের হেন্লাইন্ গত মে মাসে কার্লস্বার্গে বক্তৃতাকালে যে সকল দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণ না হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে চেক্ গভর্ণমেণ্ট সুদেতেন্ জার্মান্-দিগের প্রতি কতদূর উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার একটী মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে। এই পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—চেক্ গভর্ণমেণ্ট সুদেতেন্দিগকে যে সকল অধিকার প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর কোথাও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সেইরূপ অধিকার সম্ভোগ করে নাই।

এই সময় জার্মানীতে অকস্মাৎ সমরায়োজনের ধূম পড়িয়া যায়। পশ্চিম সীমান্তে ব্যূহ রচনার কার্য্য দ্রুত-গতিতে চলিতে থাকে, পশ্চিম সীমান্তও উপেক্ষিত হইল না। দেশের অভ্যন্তরেও নানাবিধ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। জার্মানীর এই সমরায়োজন দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, সম্ভব সে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার এই উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া ফ্রান্স নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। সেও রিজার্ভ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তের "মেগিনট লাইন" নামক রক্ষাব্যূহে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সম্ভাবিত বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এদিকে চেক্ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় সুদেতেন্ প্রতিনিধিগণ নানা উপায়ে কালক্ষয় করেন; জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টাও হয়। এই সময়ে নিউরেম্-বার্গের বাৎসরিক নাৎসী সম্মিলনীতে হের হিট্‌লার চেক্ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করেন এবং সুদেতেন্-জার্মানদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেন। হের হিট্‌লারের এই বক্তৃতায় চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে তাঁহার অভিসন্ধি ব্যক্ত না হইলেও ইহার পর সুদেতেন্ জার্মানগণ

অত্যন্ত সাহসী হইয়া ওঠে; তাহারা চেকদিগকে মারামারি আরম্ভ করে। এই সকল হাঙ্গামা যে আকস্মিক নহে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। হাঙ্গামা সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যে সকল লিপি আবিষ্কার হয় তাহাতে নেতৃবর্গ কর্তৃক দেশময় উত্তেজনা সৃষ্টির আদেশ ছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইলে চেক গভর্ণমেণ্ট যখন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, তখন হের হেন্‌লাইন প্রভৃতি সুদেতেন্ নেতৃবর্গ একটী সুদেতেন্ বাহিনী গঠন করেন। শুনা যায়, এই বাহিনী নাকি চল্লিশ হাজার সৈন্য

চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার গডেস্‌বার্গে হের হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সিদ্ধান্তের কথা তাঁহাকে জানাইলেন। হের হিট্‌লার এই সিদ্ধান্তে তত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার দাবীর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে একখানি স্মারকলিপি তিনি মিঃ চেম্বারলেনকে প্রদান করেন। মিঃ চেম্বারলেন ক্ষুণ্ণচিত্তে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎকারের ফলাফল তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর গোচর করেন। এই সময় প্রচারিত সংবাদ হইতে মনে হইয়াছিল, হয়ত চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যার



লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই সময় সীমান্ত অঞ্চলে সমবেত জার্ম্মান সৈন্য নাকি চেকোস্লোভেকিয়ায় প্রবেশে উদ্যত হয়।

সেপ্‌টেম্বর মাসের মধ্যভাগে ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন্ বার্খটেসগাডেনে হের হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ার ও ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ বনেটের সহিত বৃটিশ মন্ত্রিগণের আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, হিট্‌লারের দাবী অনুসারে চেকোস্লোভেকিয়ার জার্ম্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল জার্ম্মানীকে প্রদান করা হইবে। মিঃ

আর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হইবে না। ইহার পর গত ৩০এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে হের হিট্‌লারের আমন্ত্রণ অনুসারে মিউনিকে মিঃ চেম্বারলেন্, মঃ দালাদিয়ার, সিনর মুসোলিনি এবং হের হিট্‌লার চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

মিউনিক সম্মেলনীর আলোচনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা অন্তে সর্ব্বপ্রথম হের হিট্‌লার ও মিঃ চেম্বারলেন্ বৃটেন্ এবং জার্ম্মানীর অক্ষুণ্ণ মিত্রতা জ্ঞাপন করিয়া এক ঘোষণা বাণী প্রকাশ করেন।

চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে স্থির হয় যে, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া প্রদেশের জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার (একণে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত) সীমান্তের নিকটবর্ত্তী চারিটী নির্দ্দিষ্ট জার্মানী-অধ্যুষিত অঞ্চল ১০ই অক্টোবরের মধ্যে জার্মানী অধিকার করিবে; ঐ সকল প্রদেশের অন্য কয়েকটী অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে তথাকার জনমত গৃহীত হইবে; চেকোস্লোভেকিয়ার সর্ব্বশেষ সীমান্ত নির্দ্ধারণকার্য্যও আন্তর্জ্জাতিক কমিশন কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে। মিউনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানী চেকোস্লোভেকিয়ার চারিটী নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে জনমত গৃহীত হইবার কথা ছিল, ঐ সকল অঞ্চল সম্পর্কে জার্মানী ও চেকোস্লোভেকিয়া সরাসরিভাবে আলোচনা করিয়াই যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে—জনমতগ্রহণের আর প্রয়োজন হইবে না।

মিউনিক চুক্তিতে চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ হাঙ্গেরিয়ান্ ও পোল্দিগের সম্পর্কে স্থির হইয়াছিল যে, চেক্ কর্তৃপক্ষের সহিত হাঙ্গেরিয়ান্ ও পোল্ কর্তৃপক্ষের সরাসরি আলোচনার দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না হয়, তাহা হইলে তিন মাস পরে চতুঃশক্তির সম্মিলন আহূত হইবে। পোলাণ্ডের দাবী ছিল সাইলেসিয়া প্রদেশের টাস্‌কান্ নামক স্থানটীর উপর। জার্মানী যখন তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলগুলি অধিকার করিতেছিল, তখন পোলাণ্ড টাস্‌কান্ অধিকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কে যথারীতি দাবী উত্থাপন, চরমপত্রপ্রদান প্রভৃতি রাজনীতিক অভিনয়ে পোলাণ্ডের কোন ত্রুটি হয় নাই। হাঙ্গেরীর দাবী রুমেনিয়ার উপর। এই সম্পর্কে হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভেকিয়া কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমবারের আলোচনা নিষ্ফল হইয়াছে। একণে দ্বিতীয়বার আলোচনা চলিতেছে।

মধ্য ইউরোপের এই রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। চেকোস্লোভেকিয়ার হোজা মন্ত্রি-সভা পদত্যাগ করিয়াছেন। জেনারেল সিরভি নামক জনৈক সামরিক নেতা কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রি-সভায় কামিল্ ক্রোফ্‌তার পরিবর্ত্তে খভ্‌কোভেস্কি পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। চেক্ প্রেসিডেন্ট ডাঃ বেনেস্ পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকালে তিনি বলিয়াছেন, "চারিটী প্রধান শক্তি আমাদিগের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই আমাদিগের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ের কোনরূপ সমালোচনা করিব না। ইতিহাস ইহার বিচার করিবে।" বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির সহিত একমত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। মন্ত্রি-সভার অন্যান্য সদস্যদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া মিঃ চেম্বারলেন ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষর করায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; মিঃ চেম্বারলেনের ন্যায় তিনি হিট্‌লারের প্রতি বিশ্বাসবান নহেন। মিঃ ডাফ কুপার এই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নীতি কখনও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মিউনিক্ চুক্তি সম্পর্কে মিঃ ডাফ কুপার বলিতেছেন, "মিউনিক চুক্তির সর্ত্তগুলি আমি গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা আমার গলায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে।"

মাসাধিক কাল ধরিয়া চেকোস্লোভেকিয়া সমস্যা সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনীতিকদিগের গতিবিধি, গলাবাজি, শলাপরামর্শ এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলি যাহা উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিয়াছে, উল্লিখিত অনুচ্ছেদ কয়েকটী তাহারই সংক্ষিপ্তসার। চেকোস্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশসাধনের পূর্ব্বে উদ্ভূত রাজনীতিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণই প্রকৃত বিবরণ কি-না, রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য অভিনয় অপেক্ষা যবনিকার অন্তরালের অভিনয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কি-না, তাহা পরে আলোচনা করিব। অভিনয় যেরূপই হউক, চেকোস্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছিন্ন হইয়াছে ইহা সত্য এবং ইহার ফলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে চেকোস্লোভেকিয়া ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে ইহাও সত্য। অঙ্গচ্ছিন্ন হওয়ায় চেকোস্লোভেকিয়ার সর্ব্বপ্রধান ক্ষতি এই যে, যে সুরক্ষিত সীমান্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে তাহার এই ক্ষতি অপূরণীয়। চেকোস্লোভেকিয়ার সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত এবং দক্ষিণ ও উত্তর সীমান্তের একটা বিরাট অংশ পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে চেকোস্লোভেকিয়া তাহার সীমান্তকে দুর্ভেদ্য করিয়াছে। এই দুর্ভেদ্য সীমান্ত [illegible]

ভবিষ্যতে সর্ব্বদা তাহাকে জার্মানীর "চোখ-রাঙানী"র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে। তাহার পর চেকোশ্লোভেকিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি; রাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং টাস্কানের শিল্পকেন্দ্র, কয়লা ও লোহ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ক্ষতি উপেক্ষণীয় নহে; কারণ চেকোশ্লোভেকিয়ার অধিকাংশ বিখ্যাত শিল্প-কেন্দ্র এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত; তাহার প্রয়োজনীয় লোহ ও কয়লা প্রধানত এই সকল অঞ্চল হইতেই আসিত। জার্মান্ অধিকৃত অঞ্চলের আট লক্ষ চেক্ সম্পর্কে এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ অঞ্চলের ইহুদী ও সোশ্যাল্ ডিমোক্রাটগণ নাৎসীদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পলায়ন করিতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুদেতেন্ অঞ্চল্ জার্মানীর কুক্ষীগত হওয়ায় অন্যায়টা কোথায়? চেকোশ্লোভেকিয়ার ক্ষতির জন্য জার্মানী দায়ী নহে—সে তাহার স্বজাতিকে স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে; চেক্-জার্মানগণও স্বেচ্ছায় এই পরিবর্ত্তন মানিয়া লইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয় না—রাষ্ট্র গঠিত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঐক্যকে (community of economic interst and political ideal) ভিত্তি করিয়া। মানুষ যদি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অনুসারে অথবা জাতি অনুসারে বিভিন্ন হইতে থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অতি সত্বর বিলুপ্ত হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কতকগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থাকে। যত দিন মানুষের জাতিগত অথবা ধর্ম্মগত সম্প্রদায়ের বোধ থাকিবে, তত দিন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে যে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের সহিত ঐ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের ঐক্য আছে, সেই রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। চেক্ গভর্ণমেন্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মান্‌দিগের প্রতি কত দূর ন্যায় বিচার করিয়াছেন, তাহা গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে 'চেকোশ্লোভেকিয়ার সঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নিউরেমবুর্গের বক্তৃতায় হের হিট্‌লার চেকগণ কর্ত্তৃক জার্মান-দিগের প্রতি [illegible] "অত্যাচার" মিথ্যা অভিযোগ করিলে "টাইম্‌স্" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিলেন, "[illegible] উক্তি করিয়া হের হিট্‌লার তাঁহার একান্ত অনুগত লোকদের বর্গকেও প্রতারিত করিতে পারেন নাই।" অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মানগণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিয়াছে এইরূপ কথা কখনও শুনি নাই, বরং ইহার বিপরীত কথাই শ্রবণ করিয়াছি। জার্মানী যখন সুদেতেন্ অঞ্চল অধিকার করিতেছিল, তখন "টাইম্‌স্" পত্রিকার প্রাগ্-স্থিত প্রতিনিধি ঐ অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সকলে জার্মানী কর্ত্তৃক ঐ অঞ্চল অধিকারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা ইহা কখনও আশা করি নাই। আমরা কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাগের সহিত আমাদের ব্যবসা-সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহার কি হইবে? আমরা কি জার্মানীর রুটি খাইব? আমরা স্বায়ত্তশাসনাধিকার চাহিয়াছিলাম, ইহা কখনও চাহি নাই।" রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে চেকোশ্লোভেকিয়ার সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা জার্মানীর ডিক্টেটরী শাসন ব্যবস্থাই যে প্রত্যেক চেক্-জার্মানের প্রিয়, তাহাও নহে। চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রত্যেক জার্মান্ অধিবাসীই হের হেন্‌লাইনের নেতৃত্বাধীন নাৎসী দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে। বস্তুত তাহাদিগের এক-তৃতীয়াংশ হের হেন্‌লাইনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। চেক্-জার্মান্‌দিগের মধ্যে সোশ্যাল্ ডিমোক্রাট দলও আছে। ইহারা নাৎসী মতবাদের কতদূর বিরোধী, তাহা এই দলের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে। ক্যাথলিকদিগের পক্ষেও নাৎসী দল ত্রাসের বস্তু। তাহাদিগের সম্পর্কে হের হিট্‌লার ও তাঁহার নাৎসী দলের মনোভাব সংবাদপত্রের পাঠকগণের অবিদিত নাই। সম্প্রতি ভিয়েনায় কার্ডিন্যাল্ ইনিজারের প্রতি নাৎসীদিগের ব্যবহার সমগ্র সভ্য জগৎকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় একমাত্র সুদেতেন-জার্মান্ (নাৎসী) দলের আন্দোলন ও চক্রান্তে সুদেতেন্ অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি-না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা এক্ষণে চেকোশ্লোভেকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিব। ঘটনাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ—সুদেতেন জার্মান্ দল চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজ্যভাগের আন্দোলন করিল। হের

চেকো-জার্মানদিগের প্রতি অত্যাচার হই-তেছে, সুতরাং তাহাদিগকে জার্মান্ রাইকের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি যুদ্ধ করিবেন; মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ার রক্তপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে সুদেতেন্ অঞ্চল জার্মানীকে অর্পণ করিতে চেক্ গভর্ণমেন্টকে বাধ্য করিলেন। সুদেতেন্ জার্মান্ দল বিশেষ অভিসন্ধি লইয়া ইচ্ছা করিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল এবং হের হিট্লার বিশেষ উদ্দেশ্যে চেক্ জার্মানদিগের প্রতি অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ করিয়া-ছিলেন, তাহা ঘটনাস্রোত হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এক্ষণে কথা হইতেছে, হের হিট্লার তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সত্যই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কি-না। ইহার উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, হিট্লার যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিতেছিলেন মাত্র—যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। হিট্লার জানিতেন, মধ্য ইউরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে উহা কখনও সীমাবদ্ধ থাকিবে না। মিঃ এণ্টনি ইডেনের ভাষায় মধ্য-ইউরোপের সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ রাখিবার কল্পনা অলীক স্বপ্নবিশেষ। হিট্লার এইরূপ অলীক স্বপ্ন দেখিবার লোক নহেন। হিট্লার যদি সত্যই চেকোশ্লোভেকিয়াকে সশস্ত্র আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে ফ্রান্স চেকোশ্লোভেকিয়ার সহিত সামরিক চুক্তি অনুসারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইত। সোভিয়েট রুশিয়া কেবল প্রস্তুত ছিল না—ফ্রান্সের দৌর্ব্বল্যে সে পুনঃ পুনঃ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং মধ্য-ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে সে যুদ্ধ যে ব্যাপক আকারেই হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত অর্থ নৈতিক সামর্থ্য জার্মানীর নাই। এই সম্পর্কে অধিক কথা না বলিয়া খ্যাতনামা সাংবাদিক ভারনন্ বার্টলেটের একটা উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভারনন্ বার্টলেট তাঁহার সম্পাদিত "ওয়ার্লড্ রিভিউ" পত্রিকার গত জুলাই সংখ্যায় "কেন যুদ্ধ হইবে না" শীর্ষক প্রবন্ধে জার্মানীর অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জার্মান্ সৈন্য যখন ভিয়েনা অধিকার করে, তখন মিউনিকে এবং অন্যান্য শহরে পেট্রোলের এত টান পড়িয়াছিল যে, 'প্রাইভেট' গাড়ীগুলি পেট্রোল্ পায় নাই। জার্মানীর সংবাদপত্রগুলি তামা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের জন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখ করে। একজন প্রসিদ্ধ জার্মান্ সেনাপতি কিছুদিন পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, খোরাক-পত্র (food-cards) হাতে লইয়া যুদ্ধ বড় করা আরম্ভ করা যায় না।" ভারনন্ বার্টলেটের এই উক্তির পর অন্য কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; কারণ দুই মাসের মধ্যে জার্মানীর অর্থ নৈতিক অবস্থার কোন গুরুতর পরিবর্তন হয় নাই।

তাহার পর জার্মানীর মিত্র-শক্তি। জার্মানীর কমিণ্টার্ণ-বিরোধী বন্ধু জাপান সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধে শুধু ব্যাপৃত নহে—বিপন্ন। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কমিণ্টার্ণ-বিরোধী ইটালীর রাষ্ট্রপতি মুসোলিনি 'ভাঙেন তবু মচ্‌কান্ না।' যে আবিসিনিয়া সাম্রাজ্য লইয়া তিনি 'তাল ঠোকেন,' উহা এক্ষণে ইটালীর ভারস্বরূপ হইয়াছে। এখনও আবিসিনিয়ায় ঔপনিবেশিক যুদ্ধ (colonial war) চলিতেছে। এই যুদ্ধে আহত ইটালীয় সৈন্য পূর্ব্বে নেপ্‌লসে অবতরণ করিত। এই করুণ দৃশ্য যাহাতে দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ না করে, তদুদ্দেশ্যে এক্ষণে আহতদিগকে গোপনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্পেনের যুদ্ধ মুসোলিনির 'ছুঁচো গেলা' হইয়াছে; ইহা কবে শেষ হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সম্প্রতি ইটালীতে মুসোলিনির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্মান্ গুপ্তচরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হের হিম্‌লার গুপ্তচরের সাহায্যে ইটালীর অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ লইয়া হের হিট্লারের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জানাইয়াছিলেন, "রোম-বার্লিন্ মেরুদণ্ড কেহই আর পছন্দ করিতেছে না; যুদ্ধ বাধিলে ডিক্টেটরী প্রথা আরও দৃঢ় হইবে এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত; মুসোলিনির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে; জার্মানীর সহিত সামরিক চুক্তির যৌক্তি-কতা সম্বন্ধে যে সকল ইটালীয় সেনাপতির মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দশ জনের মধ্যে নয়জন উহার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে; বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, অভিজাত সম্প্রদায়, এমন কি রাজবংশের ব্যক্তিদিগের মধ্যেও ফ্যাসিজমের বর্তমান গতির বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বিরোধিতা আরম্ভ হইয়াছে; অর্থ নৈতিক অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"

জার্মানী এবং তাহার মিত্র-শক্তির অবস্থা [illegible] তখন হের হিট্লারের যুদ্ধে [illegible]

আঘাতের" ভয় ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, জার্ম্মানীর যদি ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন এইরূপ দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিলেন কেন? গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ-এ" 'জার্ম্মানীর অষ্ট্রীয়া গ্রাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং গত কার্ত্তিক মাসের 'প্রাচী ও প্রতীচী' শীর্ষক প্রবন্ধে চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে বৃটেনের মনোভাবের যে আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মিঃ চেম্বারলেনের এই দৌর্ব্বল্য আকস্মিক নহে—পূর্ব্ব হইতেই তিনি জার্ম্মানীকে মধ্য-ইউরোপে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। গত বৎসর লর্ড হ্যালিফক্স হিট্‌লারকে মধ্য ইউরোপে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের উৎকোচ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সাময়িকভাবে উপনিবেশের দাবী উত্থাপনে বিরত হইতে সম্মত করাইয়াছিলেন। আমরা জানি, তদবধি হের হিট্‌লার উপনিবেশের দাবী তত উচ্চ-কণ্ঠে জ্ঞাপন করেন নাই—তাঁহার মনোযোগ মধ্য ইউরোপের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছে। মধ্য ইউরোপে জার্ম্মানীর আয়তন বৃদ্ধিতে বৃটেন্ যাহাতে নিরপেক্ষ থাকে, তদুদ্দেশ্যে উপনিবেশের জন্য অধৈর্য্য হইয়া হের হিট্‌লার তাহাকে চাপ দিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে, কারণ হিট্‌লার তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "অধুনা রাজ্য বিস্তৃতির নীতি সফল করিতে হইলে তাহা ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে—ক্যামারুণ (জার্ম্মানীর হৃত উপনিবেশ) পর্য্যন্ত ঐ নীতি বিস্তার করিলে চলিবে না।" সে যাহা হউক, চেকোশ্লো-ভেকিয়া রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন হইলে বৃটেন্ যে উদাসীন থাকিবে, তাহা মিঃ চেম্বারলেনের গত ২৪শে মার্চ তারিখের বক্তৃতাতেই বুঝা গিয়াছিল। গত সেপ্‌টেম্বর মাসের শেষ-ভাগে চেকোশ্লোভেকিয়ার সমস্যা সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, ২৪শে মার্চ তারিখে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত কিছুই বলিবার নাই। মিঃ চেম্বারলেনের ২৪শে মার্চ তারিখের বক্তৃতা সম্বন্ধে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ"-এ যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা অন্যায় হইবে না। ঐ সময় "জার্ম্মানীর অষ্ট্রীয়া গ্রাস" শীর্ষক প্রবন্ধে "সঙ্কটাপন্ন চেকোশ্লোভেকিয়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলিয়াছিলাম, "হ্যালিফক্স কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব (মধ্য ইউরোপে জার্ম্মানীর যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা) সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা আজ মিঃ চেম্বারলেনের মনোভাব লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইতেছে। মিঃ চেম্বারলেন কিছুতেই চেকোশ্লোভেকিয়া সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না। প্রথম রাষ্ট্র বিরোধী দল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই জটিল বিষয়ে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে তিনি রাজী নহেন। তারপর গত ২৪শে মার্চ তারিখে তিনি যখন কমন্স সভায় পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে তাঁহার অতি-প্রত্যাশিত ঘোষণাবাণী পাঠ করেন, তখনও তিনি কৌশলে এই প্রশ্নটী এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সকল দিক বজায় রাখিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানী ও চেকোশ্লোভেকিয়ার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য সকল প্রকার সাহায্য দানে বৃটেন প্রস্তুত আছে। চেকোশ্লোভেকিয়া বিপন্ন হইলে তাহাকে সামরিক সাহায্য দানে বৃটেন্ অগ্রণী হইবে কি-না তৎসম্পর্কে কোন কথা বলা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, কারণ তৎসম্বন্ধে কোন কথা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিলে উহা কূটনীতির পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে এবং নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবে।"

জার্ম্মানীর অষ্ট্রীয়া অধিকার এবং চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্ম্মান্ অঞ্চল অধিকারের কৌশল উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে হের হিটলার অতি সন্তর্পণে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতেছেন। অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে হিট্‌লার জানিতেন যে তথায় কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই—সামরিক শক্তিরূপে অষ্ট্রীয়া দুর্ব্বল, সর্ব্বোপরি ডক্টর শুশ্‌নীগের "মুরুব্বি" মুসোলিনি তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিবেন না। এই জন্য তিনি অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে হের হিট্‌লার এক একটী পদ অগ্রসর হইয়াছেন এবং "হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে," তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃটেন্ কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবে, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটেন ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য করিবে। ফ্রান্স যদি নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে রুশিয়াও চেকোশ্লোভেকিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। ফ্রান্স ও রুশিয়ার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে

চেকোশ্লোভেকিয়া তাহার সামরিক শক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হইবে না। কিন্তু ফ্রান্স যখন অকস্মাৎ সমরায়োজন আরম্ভ করিল এবং মনে হইল যে, সে তাহার মিত্র বৃটেন্‌কে উপেক্ষা করিয়াই চেকোশ্লোভেকিয়ার সহিত তাহার সামরিক চুক্তি পালন করিতে চেষ্টা হইবে, তখন হিট্‌লার একটু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এই জন্য নিউরেমবুর্গে তাঁহার বক্তৃতা একটু নরম হইয়াছিল। ইহার পর, চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্-অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন (সম্ভবত তাঁহার নির্দ্দেশেই) হাঙ্গামা আরম্ভ হইল, তখন বৃটেনকে মধ্যস্থতা করিবার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে হিট্‌লার পুনরায় "মেজাজ" দেখাইতে লাগিলেন। এই সময় মিঃ চেম্বারলেন যখন সুডেটেন অঞ্চল জার্মানীকে প্রদান করিবার প্রস্তাবে ফ্রান্সকে সম্মত করাইলেন, তখন হিট্‌লার বুঝিলেন যে এইবার "বাজি মাৎ" হইয়াছে; তখন তিনি পুনরায় কিঞ্চিৎ "উগ্র" হইয়া উঠিলেন। চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্ অঞ্চল অধিকার সম্পর্কে তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম হইবার উপক্রম হইল! গডেনবুর্গে তিনি মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আরও কঠোর প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ওদিকে চেকোশ্লোভেকিয়ায় জেনারেল সিরভির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নূতন গভর্ণমেণ্ট জার্মান্ অঞ্চলে পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবেন, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। তখন হিট্‌লার ভাবিলেন যে, এত অধিক "উগ্রতা" প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই; বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়া রুশিয়া একক চেকোশ্লোভেকিয়ার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইতেছে কি না, কে বলিবে? কাজেই তিনি পুনরায় "চব্বিশ ঘণ্টার জন্য" ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মিউনিকে চতুঃশক্তির সম্মিলনী আহ্বান করিলেন। হিট্‌লারের কণ্ঠধ্বনির এই যে "সা" হইতে "নি" পর্য্যন্ত উত্থান-পতন, ইহার কারণ তিনি "লাঠি না ভাঙিয়া সাপ মারিতে" চেষ্টা করিতেছিলেন।

হিট্‌লার সাময়িকভাবে উপনিবেশের দাবী উত্থাপনে বিরত থাকিলেও ঐ দাবী ত্যাগ করেন নাই। মধ্য-ইউরোপে তাঁহার অভিসন্ধি সফল হইলে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা মিঃ চেম্বারলেন্ জানিতেন। তবুও তিনি হিট্‌লারকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, কারণ তিনি স্থির করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় রাজনীতিতে বৃটেন্ সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে না। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষণে এইরূপ একটা স্থানে উপনীত হইয়াছে, যখন প্রত্যেক দেশের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতিতে হয় জার্মানী-ইটালী, নতুবা সোভিয়েট রুশিয়া—এই দুয়ের মধ্যে একটা পক্ষ বাছিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। গণতান্ত্রিক ধুয়া ধরিয়া নিরপেক্ষ পন্থা অবলম্বন আর সম্ভব নহে। চেকোশ্লোভেকিয়া সংক্রান্ত সমস্যায় বৃটেন্ যদি হিট্‌লারের ঔদ্ধত্যে প্রশ্রয় না দিত, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে রুশিয়াও ফ্রান্সের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। রুশিয়ার পক্ষাবলম্বন 'চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানী'র মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। রুশিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়া কম্যুনিজমকে প্রশ্রয় দান ধনিকপ্রভাবান্বিত রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট কিরূপে সহ্য করিতে পারেন? কম্যুনিজম্ বৃটিশ রক্ষণশীলদিগের মনে কিরূপ ভীতি ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা স্পেনস্থিত বৃটিশ দূত লেকের একটী উক্তি হইতে বুঝিতে পারিব। এই ব্যক্তি এক সময় বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া অপেক্ষা রাজতন্ত্রী জার্মান্ কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া শ্রেয়।" এইরূপ মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ রুশিয়াকে উপেক্ষা করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়কে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে সরকার পক্ষ যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে তথায় সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে বিদ্রোহী পক্ষকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। ইটালীর জলদস্যুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইটালীকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষকে ইটালী ও জার্মানী সাহায্য করিতেছে, ইহা জানিয়াও বৃটেন্ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে। এই সম্পর্কে নিরপেক্ষতা সমিতিতে সোভিয়েট রুশিয়ার অভিযোগ বৃটেন্ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বৃটেনের এই মনোভাবের উল্লেখ করিয়া লণ্ডনের "ম্যানচেস্টার গার্ডেন্" পত্র দুঃখ করিয়াছেন, "বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের অনুসৃত নীতিতে আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বিরূপ হইয়াছি।"

মিঃ ইডেন্ প্রভৃতি রক্ষণশীল দলের কয়েক জন বিশিষ্ট

ব্যক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের নিকট দৌর্ব্বল্য প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন বলিয়া মিঃ চেম্বারলেন এত দিন অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইবার চেকোশ্লোভেকিয়া সমস্যার মীমাংসায় মিঃ চেম্বারলেনের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে কোন অবস্থাতেই রুশিয়ার পক্ষাবলম্বন করিবেন না—তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার সমস্যায় বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য রুশিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কারণ সে জানিত, এই সুযোগ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে বৃটেন্ নিশ্চিতভাবে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের পক্ষাবলম্বী হইবে। রুশিয়ার এই শেষ চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বৃটেনের অধিবাসীদের সমরাতঙ্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মিঃ চেম্বারলেন্ নিশ্চিতভাবে ফ্যাসিষ্ট পক্ষে যোগদান করিয়াছেন।

মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের যে সমালোচনা করিলাম, ইহার সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, এন্, আইক্সের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ আইক্স সম্প্রতি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মিউনিক্ চুক্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে গণতান্ত্রিক দেশগুলি ফ্যাসিজম্ অপেক্ষা কম্যুনিজম্‌কেই অধিক ভয় করে। তাঁহার মতে, ইউরোপীয় মহাসমরের কোন আশঙ্কাই ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটী মিঃ চেম্বারলেন, মঃ দালাদিয়ার, মুসোলিনি ও হিট্‌লারের ধাপ্পাবাজী; ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই চেকোশ্লোভেকিয়ার কতকাংশ জার্মানীকে প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই পরিকল্পনার সমর্থনে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ভান করিয়াছিলেন।

কবি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

উন্মুক্ত সৈকতে শুনি ঝঙ্কারিত সাগর-সঙ্গীত
তন্দ্রাতুর রক্তিম সন্ধ্যায়,
উদাস বিরাট বুকে মরণের নৃত্য পরিচিত
নৈশাকাশে কৃষ্ণ অলকায়।
অগ্নির দাহিকা রহে বৈশাখের মধ্যাহ্ন ভাস্করে,
সর্বহারা হাহাকার নিত্য শুনি প্রতি ঘরে ঘরে,
বৈধব্যের নগ্ন বুকে পুঞ্জীভূত রহে অন্ধকার—
তপ্ত অশ্রুভার।

শুনি বসি জনপদে পুত্রহারা বিধবা জননী
বিনাইয়া কাঁদে নিশিদিন,
আকাশের বুকে জমে তপ্তশ্বাস বুঞ্চনার ধ্বনি
বিহগ কাকলি দুখে ক্ষীণ;
শুনিবারে চাহি আরো, যত শুনি মিটে না বাসনা,
বিরাট এ পৃথ্বীবুকে অতৃপ্তের মৌন আরাধনা,
আমি চাহি ভাষা দিতে বিশ্বজনা মূক আকাঙ্ক্ষায়—
পাণ্ডুর সন্ধ্যায়।

সৃষ্টির আনন্দপাশে ধ্বংসের চরণধ্বনি শুনি,
আবর্ত্তিত মৃত্যু-বিভীষিকা,
ব্যথিত অন্তর মোর কল্যাণের গাহে আগমনী
ধ্বংস করি' মিথ্যা প্রহেলিকা।
মোর ভাষা মোর গান অসত্যের চাহে না বিলাস,
পূর্ণ হোক কণ্ঠে মোর নিখিলের ব্যর্থ অভিলাষ,
মূর্ত হোক স্বপ্ন মোর, বাস্তবের বিচিত্র যৌবন—
তৃপ্ত আঁখিমন।

মৃত্যুর অনল গ্রাসে দগ্ধীভূত শত জনপদ,
ভস্মীভূত মানবের আশা,
বন্যার সুতীব্র বেগে ভেসে যায় অন্তরের সাধ,
তৃপ্তিহীন স্নেহ-ভালবাসা।
শক্তিমান শৃঙ্খলিত অসত্যের লৌহ কারাগারে
আঘাত হানিছে নিত্য নির্যাতন ক্লেশ বারে বারে।
চাহিছে মুক্তির স্বাদ অগণিত নিস্ব বিশ্ববাসী—
আলোর প্রয়াসী

আমি গাহি অনাগত মানুষের ভবিষ্যের গান,
কণ্ঠে মোর বাজে বিশ্ব-বাণী,
সর্বহারা মানবের চাহি স্বাস্থ্য চাহি তৃপ্ত প্রাণ,
মুছে যা'ক সর্ব ক্লেশ গ্লানি।
বর্তমান শ্মশানের ভিত্তি 'পরে' চাহি গড়িবারে
স্বর্গরাজ্য পরিপূর্ণ সুন্দরের ঐশ্বর্য-সম্ভারে।
আমি চাহি বিশ্বজনে বিলাইতে মুক্তি অনুপম—
প্রাণ নবতম।

শিরসি মা লিখ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

একবার নয়, দু বার নয়, বারবার চার বার যখন উপর্য্যুপরি ফেল করলাম—তখন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই স্থির করলেন আমি একটা আস্ত চতুষ্পদ ভারবাহী জন্তুবিশেষ। আমারও ইচ্ছা হ'ত সবার থেকে একটু দূরে থাকতে। তাই বাধ্য হ'য়ে আমার চিরাভ্যস্ত সান্ধ্যভ্রমণটুকু গোলদীঘির পাড়ে না সেরে সারতে হ'ত এস্প্ল্যানেডের মাঠে।

এতটা রাস্তাই কি নিরাপদ, পথে সতীন সেন, অতুল মিত্তির, নিখিল ধর সবার বাড়ীই পড়ে। এতগুলি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ চলাটা যে কি কষ্টকর সেটা শুধু আমিই জানি।

আমি চাই না ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে, চিরকাল যাদের সঙ্গে একসাথে পড়ে এসেছি তারা যে আজ আমায় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে কথা কইবে এটুকু আমি সহ্য করতে পারি না। তর্ক এখন ওদের সঙ্গে ত চলতেই পারে না—কিছু বললে ওরা যে শুধু ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে তা নয়—হয়ত প্রকাশ্যে অপমানই ক'রে বসবে। এই জন্যই সব সময় ওদের এড়িয়ে চলি। তাই কি সব দিন পারা যায়।

চায়ের দোকানের সামনে সেদিন সবাই জুটে হল্লা করছিল—পড়ে গেলাম ওদেরই সামনে।

আর যাই কোথা! কেউ বলে—হ্যালো; কেউ—কেমন আছিস্? কেউ—আরে, কেউ—কি আর দেখা যায় না যে, কেউ—তারপর? পঞ্চবাণে আহত হয়ে সংক্ষেপে বললাম—এই ত।

চট্ ক'রে একজন বলে বসল—গোলদীঘি বর্জ্জন যে?

কি বলি? আস্তে বললাম—আজকাল মাঠের দিকে একটু যাই।

অখিল সান্ন্যাল ঠোঁট-কাটা, বলতে কিছুই বাধে না, ফস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—ঘাস খেতে না কি?

হো হো ক'রে উঠল এক হাসির হররা।

আমার তখন যে অবস্থা সে অবস্থায় কথার উত্তর দিতে হ'লে দস্তুরমত ফৌজদারী আইনের জ্ঞান থাকা চাই, তাই চুপ ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। গায়ে একটু বাতাস লাগলে নিজের মনেই গাহি—

—এই করেছ ভাল, নিঠুর, এই করেছ ভাল!

চাকরীর চেষ্টায় যাই নাই কলকাতায় এমন আফিসই নাই। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-এর কর্ম্মখালি ত রোজই দেখি, একটাও ত জুৎসই পাই না। এই যে একটা—ও, কালই যাচ্ছি দরখাস্ত নিয়ে দশটায়।

দশটায় হাজির হই। মহামারী ব্যাপার। "এখানে দরখাস্ত" দেবার আগে কুস্তি শেখা দরকার। এরকম ক'রে বায়স্কোপের ফোর্থ ক্লাস টিকেট কেনা চলে—দরখাস্ত দেওয়া অসম্ভব।

দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি। ঘৃণা ধরে যায় কলকাতার অফিসে—দেখা যাক্, বাইরে কোথাও সুবিধা হয় কি-না।

ট্যাং ট্যাং ট্যাং, ট্যাং ট্যাং ট্যাং—গৌরীপুর রং কলে সকাল আটটার ঘণ্টা পড়ে। কুলীর স্রোত চলেছে ঠিক্ গোমুখীর ধারার মত। অনিলদার নির্দ্দেশমত দরখাস্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি গেটের একপাশে। অনিলদা পনের বছর ধরে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্য্যন্ত এখানে তার দেহের রক্ত জল করছে—তার একটা কথা কি আর সাহেব রাখবে না?

—এই যে, এসে পড়েছিস্, বেশ। ঠিক্ এইখানে দাঁড়া, আমি দরখাস্তখানা দিয়ে যাচ্ছি বড় সাহেবকে, একটু পরেই ডাকবে।

—হাঁ, বেশ ভাল ক'রে একটা সেলাম আর মনে আছে ত সেই গ্রস্‌ওয়েট্ মাইনাস্ টেয়ার ওয়েট্ সমান নেট ওয়েট, ব্যস্—আর কি জিজ্ঞেস করবে ছাই, জানে ত কচু।

—ঠিক্ দাঁড়া, যাই, ঘণ্টা পড়ে গেছে, ব্যাটা আবার দাঁত খিঁচোবে!

অনিলদা সিনেমার ছবির মত মিলিয়ে যায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি। দু-চারজন কুলী বোধ করি চাকরীপ্রার্থী, রাস্তার উপর ব'সে খইনী ডলে, কেউ বা রামকেলী ভাঁজে।

—আপ্ দরখাস্ত ভেজা?

বিপুলকায় দারোয়ান বেরিয়ে আসে, তার হাতে আমারই দরখাস্ত। হাতে নিয়ে খুলে দেখি নীচে লাল পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা—Regret, no vacancy.

বরাত, তা ছাড়া আর কি? সোজা ষ্টেশনে চলে আসি। ট্রেণ ছাড়লে মধুকরবিনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরি—

এই করেছ ভাল, নিঠুর, এই করেছ ভাল।

ইন্‌সিওরেন্সের এজেণ্টরূপে তিনমাস হাঁটাহাঁটি ক'রে দুজোড়া জুতা ছিঁড়ে আজ পারিশ্রমিক পেলাম তিরিশটি টাকা। জীবনে প্রথম উপায়—টাকা কটি ব্যাগে নিয়ে বাড়ী আসছিলাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বেঞ্চে ব'সে যতীদা কি লিখছে দেখতে পেলাম। যতীদা সেদিন ছেলের অসুখের জন্য দশটা টাকা ধার করতে এসে আমার কাছে দুপুর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসেছিল। দিতে পারিনি বলে বোধ হয় আর কদিন দেখা করেনি। যতীদা লোক ভাল, অল্প বয়সে বিয়ে করে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বড়বাজারে কোন এক কাপড়ের দোকানের তাগাদাদার, তা এখানে বসে কি লিখছে দেখা যাক্।

চট্ ক'রে স্কোয়ারে ঢুকে পিছন থেকে যতীদার হাত চেপে ধরি। যতীদার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

এ কি অসভ্যতা !

আমি তখন কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে সুরু করেছি—

আমার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নয়।

রোগগ্রস্ত পুত্রকে মরণের হাত থেকে বাঁচাতে জীবনে প্রথম অবিশ্বাসী হয়ে মনিবের পঁচিশ টাকা আত্মসাৎ করেছি. ভেবেছিলাম জোগাড় ক'রে দেব। কিন্তু—

—যতীদা, এসব কি ?

—নিরুপায় ভাই, আজ হিসাব দাখিলের দিন, চাকরী ত যাবেই ; সঙ্গে সঙ্গে জেল—ওদিকে ওরাও মরবে অনাহারে শুকিয়ে, তাই পথ পরিষ্কার করছি।

—ছিঃ, পঁচিশটা টাকার জন্য !

—কদিন সবার দোরে ঘুরে পঁচিশ পয়সাও জোগাড় করতে পারিনি।

যতীদার হাতে পঁচিশটা টাকা দিতে যতীদা কেঁদে ফেলে। যতীদাকে শান্ত ক'রে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে ভাবলাম জীবনে একটা কাজের মত কাজ করেছি। বৈকাল ও সন্ধ্যা কখন কোন্ ফাঁকে কেটে গেল জানতেও পারলাম না। রাত্রে গৃহিণীকে আজকের ব্যাপারটা সালঙ্কারেই শুনালাম। প্রথমে গৃহিণী বলিল—যাও, শুধু শুধু মিথ্যে কথা কেন ?

যখন ভাল ভাবে বুঝিয়ে বললাম—এর মধ্যে একতিলও মিথ্যা নাই, এটা সবই সত্যি, তখন গৃহিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—পোড়া কপাল আমার, নইলে আর এমন দশা। তারপর একেবারে নিরুত্তর। ডাকিয়া সাড়া পাইলাম না। অভ্যাসমত এবারেও গাহিতে গেলাম—

এই করেছ ভাল,
হঠাৎ বিষম লেগে গেল।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গলদ

শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য বি-এ

ফ্রয়েড সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বর্ত্তমান জগতে যে আলোড়ন এনেছে তার ফলে তরুণ মনে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কেবল তা নয়। নীতি ও ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা তরুণ-তরুণীর মনকে আর যেন আয়ত্তাধীনে রাখ্তে পারে না। সর্ব্বত্র এক প্রকার বেসামাল বিদ্রোহের ভাব।

মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আবিষ্কৃত তথ্য যুক্তি-তর্ক দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করারও উপায় নাই। অবস্থা-বিচারে মনের গতি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র এক—নীতির বিধান একরূপ নয়—ধর্ম্মের বিধান একরূপ নয়। এতকাল পৃথিবীতে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি নীতির বিধান দিয়েছে—মনের গতিবিধি নির্দ্দেশ করে দিয়েছে। অন্য কথায়, এ তিনের মধ্যে ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল পরিচালক। এ যুগে ধর্ম্ম বা ভগবান স্থান পেয়েছে এত উপরে যে নীতির সঙ্গে বা মনের গতির সঙ্গে তার কোনরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধই পণ্ডিতগণ (?) স্বীকার করতে চান না। আমাদের দেশে মুনিঋষিগণ পরমব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আভাষ দিয়েছেন তা যদি সত্য হয় তবে তাঁদের সঙ্গে মনের ত কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না ; যিনি অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌, তাঁর সঙ্গে আবার মনের সম্বন্ধ ! সে কি কথা ? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্—তাঁর বিধান শাশ্বতের বিধান, দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তনশীল ও অশাশ্বত হতে পারে না। নীতির এমন সব বিধান কখনও ভগবানের বিধান নয়। যুক্তিতর্কের কথা ছেড়ে দিয়েও আজ মানুষ অনুভূতি দিয়ে বুঝ্ছে যে মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই—ভগবান থাকুন বা না থাকুন, ভগবান মঙ্গলময় হউন আর নাই হউন, ভগবান এক হউন আর একাধিক হউন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হউন আর নাই হউন, (১) সম-অবস্থায় মানব-মনের গতি সম-নিয়মে চলবে, (২) মানুষের সুখ সুবিধার জন্য মানুষ নীতির নিগড় গড়বে ভাঙবে, আবার গড়বে। প্রয়োজনমত তার পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তন সাধবে। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা এ যুগের মানবমণ্ডলী যে সত্য আবিষ্কার ও অনুভব করছে তারই আলোকে তাঁদের পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং একেই যুগধর্ম্ম বলে। এটাই এ যুগের দর্শন।

এখন বিচার্য্য বিষয় হল—এ নব-দর্শনের প্রভাবে মানবের

গতি কোন্ দিকে চল্ছে। যুগে যুগে মনীষিগণ নব নব সত্য প্রকাশ করে মানবকে উন্নততর করেছে। আমরাও এ যুগে নূতন সত্যের আভাষ পেয়েছি, কিন্তু আমাদের গতির আভাষ পেয়েছি কি ?

যে সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়, মানুষের সকলপ্রকার শক্তি অল্পবিস্তর হ্রাস পায়, মানুষ ভীরু কাপুরুষ হয়, মানুষে মানুষে রক্তারক্তি সুরু হয়, তেমন সত্য কি মানুষকে মঙ্গলের (শিব) পথে নিয়ে যেতে পারে ? তেমন সত্য কি মানুষকে সুন্দরের পথে নিয়ে যেতে পারে ? যা একাধারে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নয়, তা দিয়ে আমরা কি করব! স্বীকার করি নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, স্বীকার করি ধর্ম্মের রাশ মনের স্বাভাবিক গতিকে পরিচালন করতে পারে না এবং একথাও স্বীকার করি, এ সত্য যে কেবল যুক্তিসহ তা নয়—অনুভূতিমূলক ; তবু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাঙালী হিন্দুর নীতিবোধে আঘাত পায় অথচ ফ্রয়েড্ সাহেবের মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক গতি চায় এমন অনৈতিক—ধর্ম্মের কথা তুলব না—কাজ করে কেউ অনুতাপ না করে থাক্তে পারেন ? মনস্তাত্ত্বিক সত্য অস্বীকার করলে ত চলবে না। মুহূর্ত্তের জন্যই বা কেন এ অনুতাপ আসে ? দুর্ব্বলতা ? হাঁ, তাই মানলুম ; এ দুর্ব্বলতাই বা কেন থাকে ? যা সত্য বলে বুঝি, যা ধর্ম্মাধর্ম্মের বাইরে, তার অনুষ্ঠানে মনে এ অনুতাপ আসে কেন ? এ দুর্ব্বলতা আসে কেন ? দুর্ব্বলতা এবং অনুতাপ দুই-ই ত মনের কষ্টদায়ক অনুভূতি। অনুভূতিই ত সত্য। সুখের আকাঙ্খায় মনের স্বাভাবিক গতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে-কর্ম্ম সাধন ক'রে মন তৃপ্তি পেয়েছে তারই অব্যবহিত পরে একই মনে একই কারণে আবার অতৃপ্তির অনুভূতি! এও সত্য—যেহেতু এ অনুভূতি। এ কেমন ধারা ? নিশ্চয়ই এরকম সত্যের সন্ধানে কোথাও কোনরকম গলদ আছে। সে গলদ কি এবং কোথায় ?

ফ্রয়েড্ সাহেবের মনস্তত্ত্বালোচনা একদেশী। তা সত্য কিন্তু সমগ্রভাবে সত্য নয়। এজন্য তা সত্য হলেও শিবও নয়—সুন্দরও নয়। তরুণ তরুণীর মনোরাজ্যে আজ যে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ ও চঞ্চল বিভ্রাট উপস্থিত হয়েছে তার কারণ ফ্রয়েড্ সাহেব মানব-মনের আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষার সম্যক আলোচনা করেছেন ; কিন্তু ঐ মনের ঠিক অর্দ্ধেক অংশ জুড়ে যে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করে থাকলেও সে সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি সার-তথ্য লিপিবদ্ধ করা হল মাত্র।

মানব-মনে সর্ব্বপ্রথমে জন্মে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা, তারপর আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। রোরুদ্যমান মানবশিশু—পুরুষই হউক, নারীই হউক—ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উন্মীলিত নয়নে অন্য লোক দেখে—কিংবা নিমীলিত নয়নে অন্যের স্পর্শ অনুভব ক'রে ক্রন্দন বন্ধ করে। কিছুকাল পরে বিছানায় সুপ্তোত্থিত শিশু একাকী ক্রন্দন করে সঙ্গলাভের নিমিত্ত, যে-কোন দ্বিতীয় শক্তির আগমন-আভাষ পেয়ে ক্রন্দন বন্ধ করে। কিছুকাল পরে পাঠশালার পথে শিশু চায়—তার সঙ্গী আর কিছু নয়—আর যদিও বা কিছু সে নির্ব্বাচনের পালা আসে পরে পরে। যে কোনরূপ দীর্ঘ নির্জ্জন পথ যাদের ভাগ্যে ঘটেছে—তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন, সর্ব্বপ্রথম তাদের মনে জাগে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। ইহাই মানব মনে আদি-আকাঙ্ক্ষা। এজন্যই কবি বলেছেন সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা (society, friendship and love) ভগবানের দান। এজন্যই মানুষকে সামাজিক জীব (social being) বলা হয়। এজন্যই আমাদের আদি-পুরুষগণ অন্য কোনরূপ কাজ সুরু করার আগে মনের আদি-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে সঙ্গ-সুখের জন্য সমাজ গঠন করেছিলেন—সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সঙ্গবিধি (social contract) প্রণয়ন করেছিলেন। ইহাই মানবের আদি-কর্ম্ম—তারপর অন্য কিছু। আজ যে মানব-মন পরিপূর্ণ স্ফুরণ পেতে বসেছে এর আরম্ভ সেই আদি-সমাজের গঠন থেকে। সমাজের দাবী সকলের আগে, সকলের বড়। এর অর্থ কি ? মানব-মনে যেমন সর্ব্বপ্রথমে জাগে সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা, তাই চরিতার্থ করতে মানব প্রথম গঠন করলে সঙ্গ-তন্ত্র।

বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন ও সাবলীল চিন্তাপ্রবাহে যদি মানব-মনের সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা ও আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি স্থান পেত—যে ধৈর্য্য ও উৎসাহভরে আজ ফ্রয়েড্ সাহেবের কামতন্ত্র আলোচিত হয়—ঠিক সেভাবে যদি সঙ্গ-তন্ত্র ওরফে মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচিত হ'ত—তবে একই মনস্তাত্ত্বিক সত্যের পরিপূর্ণ আলোকে আমরা অভ্রান্তভাবে দেখতে পেতাম, মনের এক অংশে যদি জাগে বন্ধুপত্নীর জন্য আসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা সেই মনেরই অপর অংশে জাগে বন্ধুজন সঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা। দুই চক্ষুতে মনের দুটি দিক্ দেখে যে পথে চলা যায় সেই পথই পূর্ণ-সত্যোদ্ভাসিত পথ। সেই পথের শেষে গিয়ে যাঁর সাক্ষাৎ হয় তিনিই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বি, এস্-সি

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের এক তিনতলা বাড়ীর আধা-অন্ধকার ঘরে আমার অফিস। অফিস ব'লেই অভিহিত করতে হয়—ওটা ব্যবসাদারী চাল। কি যে ব্যবসা করি তা আমার চেয়ে আমার বন্ধুরাই জানে বেশী। ওরা বলে, হার্ডওয়ার মার্চ্চেণ্ট হ'য়ে পড়, লাভ আছে—চাই কি, বাড়ী গাড়ীও হ'তে পারে। মানুষের লোভ! রাজী হ'য়ে যাই। কার্ডও ছাপান হ'য়ে যায়—দস্তুরমত একটা মার্চ্চেণ্ট! একটা লোকও রাখতে হয় হুকুম তামিল করবার জন্যে—লোকজন এলে কায়দা ক'রে ডাকি—বেয়ারা! তবে লোকটা ভাল, সদ্য উড়িষ্যা থেকে এসেছে, এখনও পাকা হ'য়ে ওঠেনি। বাড়ীতেই থাকে, কাজ করে বাড়ীর আর অফিসের—খায় দায় আর তিন টাকা পায় মাইনে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন ওকে, নইলে নিজেকেই হ'তে হ'ত বেয়ারা থেকে ম্যানেজার। অফিসের কায়দা যেত চুলোয়—বন্ধুরা বলে, কায়দাটাই আসল, আর সব ফাঁকি।

তাইতেই রাজী। বন্ধুদের কথা বেদবাক্যের মত মেনে নিয়ে লেগে পড়ি কাজে। কিন্তু সমস্ত কিছুই ভুয়ো ব'লে মনে হয়। বাড়ী গাড়ী মাথায় থাকুক, অফিস রাখাই দায় হ'য়ে পড়ে। বন্ধুরা সাহস দেয়, বলে, আরে থামো না—প্রথম প্রথম ক্ষতি হ'লেই কি পেছিয়ে প'ড়লে চলে? এ হচ্ছে ব্যবসা—লাভ যখন হ'তে থাকবে, হুঁ হুঁ।

হুঁ হুঁ-ই বটে, আমার অবস্থা এদিকে শেষ। কিন্তু তবু সৎপরামর্শ নিতে হয় তাদের। গৃহিণীটি তার পিতার দেওয়া অলঙ্কার পতির জন্যে হারাতে থাকে। পুরুষের দেওয়া জিনিষ পুরুষের কাজেই ব্যয় হয়। হিন্দু মেয়েদের জয়গান করতে ইচ্ছে করে—ভাগ্যে সতী-সাবিত্রীর দেশে জন্ম!

সেদিন অফিসে ব'সে একটু ঝিমিয়ে নিতে থাকি, কতই বা আর ঘোরা যায়। শরীর যায়, তাতে দুঃখ নেই কিন্তু কোন কিছুই আসে না যে।

মহাপাত্রটির ডাকে ঝিমোন বন্ধ হ'য়ে যায়। ওর দিকে চেয়ে থাকি অবাক হ'য়ে। হুঁসিয়ার মহাপাত্র জানায় কে একটি বাবু আসছে এদিকে।

বুঝি আরও হতভাগ্য সে। কিন্তু তবু অফিসের কায়দা আছে ত। টেবিলের ওপর থেকে আধ-পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বার ক'রতে হয় ড্রয়ার থেকে একটা সিগরেটের বাক্স, গোল্ড ফ্লেক—অবশ্য বাক্সটার নাম থেকে ভেতরকার জিনিষগুলোর স্বরূপ জানা যায় না, কারণ ওগুলো সস্তা-দরের। ওটাও একরকম কায়দা।

ওরই একটা ধরিয়ে দাঁতে চেপে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একটা খাতা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মার্চ্চেণ্ট—সে ত আর সোজা কথা নয়।

লোকটি এসে একধারে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। তার জামা, কাপড় আর চেহারা দেখে মনে হয়, এই আমার সত্যিকার বন্ধু। ও চেহারা শুধু ওরই নয়, আমার সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে যেন অনেকটা। বন্ধু ব'লে গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে কিন্তু ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কায়দা ছাড়লে ত আর চলে না।

চেয়ারটায় ভাল ক'রে হেলান দিয়ে বলি, বসুন।

লোকটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে সামনের চেয়ারটায় ব'সে পড়ে—আর দাঁড়িয়ে থাকাও যেন তার পক্ষে অসম্ভব।

একটা হাই তুলে বলি, কি কাজ আপনার?

লোকটি আস্তে আস্তে বলে, দেখুন, একটা কাজ যদি দিতে পারেন—যে-কোন রকম, টাইপ ক'রতেও জানি আমি। পনেরটা টাকা পেলেই আমার চলে। ও যেন ভেঙে পড়ে।

কাজ? জবাব দিই, লোকের ত এখন দরকার নেই মোটেই। তবে হ্যাঁ, টাইপের জন্যে শীগ্‌গীরই লাগবে বটে, কিন্তু সে ত আপনাকে দিয়ে হবে না, সেজন্যে—

ও যেন একটু ভরসা পায়—বলে, বলেন ত আমি সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারি—টাইপ করতে জানি আমি খুব ভাল।

একটু হেসে বলি, না সেজন্যে নয়, ও কাজটা আজকাল মেয়েদেরই দেওয়া হয়েছে—ওরা ভাল জানুক আর নাই জানুক, বুঝলেন না?

লোকটি চুপ ক'রে থাকে, আস্তে আস্তে উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি বলি, একটু চা খেয়ে—

ও ঘাড় নেড়ে বলে, না, বরং একটু জল যদি—

গম্ভীর হ'য়ে ডাকি, বেয়ারা!

জল খেয়ে লোকটি বেরিয়ে যায়। ভদ্রতা জ্ঞান আছে—দু'টা পয়সা বাঁচিয়ে দিয়েছে। মনে মনে ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুদের কথা মনে হয়—তাদের জয়জয়কার, কিন্তু পেট ভরে কই?

মায়ার মুখের দিকে চাইতে লজ্জা হয়। হাত দুটো ত প্রায় মরুভূমি হ'য়ে এসেছে, দেহের হাড়গুলো বোধ হয় গোণা যায়। হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হয়। কেন ও এমনি নির্ব্বিবাদে সহ্য করে সমস্ত অত্যাচার? কি পায় এমনি অত্যাচারের মাঝে ও?

মায়া এসে বলে, কিছু সুবিধে হচ্ছে আজকাল?

বলি, ছাই, সুবিধে হবার জন্যেই ভগবানের অন্যায় বিচার মাথায় পেতে নিয়েছি কি-না। কিন্তু মায়া, তোমার মধ্যে কি আর এতটুকু শক্তিও নেই? আমি শুধু অবাক হ'য়ে ভাবি এত নিষ্ঠুর ভগবান হয় কি ক'রে? কি ক'রে সে তোমাদের এমন রিক্ত ক'রে ফেলে?

মায়া যেন ভয় পেয়ে যায় কাছে স'রে এসে বলে, কেন, হয়েছে কি ? ওর দুটো কাঁধের ওপর হাত দুটো রেখে ভাল ক'রে চেয়ে দেখি ওর মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বলি, আজও স্বামী ব'লে আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান কর কি ক'রে সেইটেই আমি ভেবে পাইনে মায়া। আমাদের রাজার জাতের মেয়েরা কিন্তু—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই মায়া ব'লে ওঠে, রাজার জাতের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তবে আমার কথা ? ও আমার মুখের দিকে চায়, একেবারে বুকের কাছে স'রে এসে মাথাটা কাঁধের ওপর রাখে।

এই মায়া—সতী সাবিত্রীর দেশের মেয়ে। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এই ভঙ্গি, কি ভাল নয়, তা ভাবতেও ইচ্ছে হয় না. শুধু মনে হয়, এটুকু না থাকলে বুঝি চলত না।

একটা দেশলাইএর বাক্স সুতো দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে হাজির হয় খোকন। বলে, বাবা, গাড়ী—মা যাবে. পোঁক্, পোঁক্। তুমি যাবে না ?

ওকে বুকে তুলে নি। ওর কচি মুখে খাই অসংখ্য চুমো। খোকন—মায়ার খোকা।

বলি, আমাকেও নিয়ে যেও বাবা, তুমি আমি আর তোমার মা।

খোকন রাজী হ'য়ে যায়, বলে, ভাল গাড়ী এনো কিন্তু।

চেয়ে দেখি মায়া চেয়ে আছে আমাদেরই দিকে একদৃষ্টে। ওর চোখ দিয়ে বিশ্বের মায়া মমতা উজাড় হ'য়ে প'ড়তে চায়। ওর স্বামী আর ওর ছেলে।

সেদিন রাখী-পূর্ণিমা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বাড়ীটার দরওয়ান এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়, ভাঙা বাঙলায় বলে, বাবু : রাখী বাঁধতে হবে আজ।

নির্জীবের মত হাতটা বাড়িয়ে দিই, দরওয়ান তার কাজ শেষ ক'রে সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝতে বাকী থাকে না, কিন্তু না বুঝতে পারলেই বোধ হয় ছিল ভাল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা আধুলী—দরওয়ানের হাতে তুলে দিই।

সেলাম ক'রে আর একটা রাখী আমার হাতে দিয়ে বলে, মাজিকো দিজিয়ে। মাজীর উদ্দেশ্যে বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে সে এগিয়ে যায়।

খোকার জামা কেনবার জন্যে এনেছিলুম আধুলীটা, ফেরা মাত্রই ও হয় ত এসে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু উপায় কি ? মনে মনে ভাবি, যার হাতে আজ তুলে দিলুম খোকার আনন্দটুকু, সে কিন্তু আমার চেয়ে ঢের সুখী। আজও আমি বাবু, কিন্তু সত্যি কি তাই ? বক্‌শিস দেবার হাত আমার কি আজও কেউ ভেঙে দেয়নি ?

হাওড়ার পোলের সামনে আসতেই কেন জানি না মনটা হঠাৎ খুশী হ'য়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে—কাদাও হয়েছে মন্দ নয়। ওদের সঙ্গে আমার যেন একটা যোগ আছে আর তাই বোধ হয় মনটা আমার হঠাৎ এত খুশী হ'য়ে ওঠে।

পুরণো দিনের ভুলে-যাওয়া একটা গান মনে হয়—সুর জানি না, জানতুমও না কোন দিন। কিন্তু তাই ব'লে মনের খুশীকে হত্যা ক'রে মারে কে ? গলা দিয়ে আমারই মত জীর্ণভাবে গানটা বেরিয়ে পড়ে।

পাশের লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে মুখের কাছে এসে হাত মুখ নেড়ে কি সব বলে—আর ঠিক সেই সময়েই পাশ দিয়ে যায় একটা মোটর—কাদায় ভ'রে যায় কাপড়টা। কিন্তু কিছুই বাধা দিতে পারে না আমায়।

বাড়ী ফিরতেই মায়া বলে, খোকার জামা !

বলি, ঘুমিয়ে আছ ত, থাক্। সে দরওয়ান নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কি হবে জামার কথা মনে ক'রে, ভাব গাড়ীর কথা আর বাড়ীর কথা। যুদ্ধ লাগল ব'লে, আর কি, একেবারে বড়লোক—বন্ধুদের কথায় অবিশ্বাস করতে নেই মায়া। পরে কাপড়টাকে দেখিয়ে আস্তে আস্তে বলি, কিন্তু আজ এটাকে একটু ভাল ক'রে ধুয়ে রেখো বড্ড বেশী রকম কাদা লেগে গেছে।

মায়া আমার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে—কি-ই বা ব'লবে সে।



বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী কোন্ পথে?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু

জগতের সকল জাতিই শিক্ষার ভিতর দিয়া উন্নতিলাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার সৃষ্টি হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের যে এত উন্নতি, ইহা একমাত্র শিক্ষার ফল। শিক্ষা ভিন্ন রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি কিছুতেই উন্নতি করা সম্ভব নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও শুধু ভারতের প্রদেশগুলির তুলনায় বাঙ্গালা আজ একেবারে নিঃস্ব। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় এদেশের লোকের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল না। যে দেশে অন্নবস্ত্রের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, সে দেশের লোক সাধারণত অলস হইয়া পড়ে। এমন কি, সুজলা সুফলা বাঙ্গালার চাষীরা পর্য্যন্ত বৎসরে তিন মাস পরিশ্রম করিয়া নয় মাস আলস্যে অতিবাহিত করিত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বাঙ্গালার মত এত সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা ছিল না। কাজেই ভারতের ঐ সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় আজ তাহারা ধনী ব্যবসায়ী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে আজ বাঙ্গালার দুর্গতির প্রথম কারণ, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাহাতেও বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইত না, যদি সাধারণ লোক কেরাণীগড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া চাকুরীর দিকে না ঝুঁকিত, আজ মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়, যাহারা বাঙ্গালায় ব্যবসা করিয়া প্রভূত ধনী, তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা দেশেরও যে সমস্ত অশিক্ষিত বৈশ্য সম্প্রদায় ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, আজ তাহারা নিঃস্ব নহে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীদের যেমন কেরাণীগিরি ফুরাইয়াছে, অমনই তাহারা পথে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু, যাহারা ব্যবসা করিত, তাহাদের বংশধরগণ এখনও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া উচ্চবর্ণের সম্পত্তিশালী লোক-দিগকে টাকা ধার দিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির মালিক হইয়া পড়িতেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি এবং যাহারা এতদিন বড় বড় চাকুরী করিয়া কিছু সম্পত্তি ও অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সকলেই ঋণগ্রস্ত। সভ্যতার চাল-চলন বজায় রাখিতে গিয়া সকলেই নিঃস্ব। কেরাণীগিরির তো কথাই নাই; যেমন আয়, তেমনই ব্যয়। বরং মুদী-দোকানে দেনদার। কাহারও কিছুই সঞ্চিত নাই। কন্যার বিবাহে কিংবা কঠিন পীড়ায়, ভিটামাটী অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বন্ধক ও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যে শিক্ষায় অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় না, অধিকন্তু বিলাসিতা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, আমাদের দেশে সেই শিক্ষাই প্রচলিত। একটি ছেলেকে বি-এ, এম-এ পড়াইতে যাহা খরচ হয়, হয়তো অনেক ছেলের জীবনে তাহা রোজগার হয় না। যাঁহারা কায়ক্লেশে, এমন কি ঋণ করিয়াও পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেন, তাঁহারা হয়তো পুত্রের বিবাহের সময় কন্যার পিতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ওয়াশিল করেন। নতুবা বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গোলাম তৈরির পরীক্ষায় পাশ করিয়া অন্ন-সমস্যার সমাধান নাই। অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছাড়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করা ভুল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বি-এ পর্য্যন্ত পড়াইতে চারি বৎসরে যে সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, যদি সেই সময়টি অন্য যে কোন অর্থকরী শিক্ষায় নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে যুবক সম্প্রদায় হয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু না কিছু উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে। যাহাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা নাই, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হউক। বিশেষত কলেজে পড়ার সময় সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের পোষাক-পরিচ্ছদের ঝোঁক ও বায়োস্কোপের নেশায় ব্যয় বাড়িয়া যায়। যে সমস্ত ছাত্র ধনী সন্তানের সহিত একত্রে হোষ্টেলে বাস করে, তাহারা ঐ সমস্ত ধনী সন্তানের চাল-চলনের সহিত সমান তালে চলিতে গিয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থার কথা মনে রাখিতে পারে না। যে সময় ছাত্রদের জীবন ও চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি

তাহাদের মনে ধনী সন্তানের জীবনযাত্রার আদর্শের সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিতব্যয়িতার শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। প্রথম জীবনে যদি বালকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা না পায় এবং বিলাসিতায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, সংসার-জীবনে তাহারা আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে।

আমি জনৈক নিরক্ষর ব্যবসায়ীর কথা জানি। তিনি প্রথম জীবনে কোন একটি ইংরেজ কোম্পানীর লোহার কারখানায় মাসিক পনর টাকা বেতনে মিস্ত্রির কাজ করিতেন। পরে নিজের অধ্যবসায়ে নিজেই খুব ক্ষুদ্রভাবে প্রথমে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া ক্রমশ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইয়া নিজের কারখানায় মিস্ত্রিদের সহিত কাজ শিক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। কিছুকাল ঐ ভাবে কাজ শিক্ষা দেওয়ার পর মিস্ত্রিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দিতেন। তিনি কোন দিন পুত্রদের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার পুত্রেরা পিতার নিকট ঐ ভাবে শিক্ষা পাইয়া বর্ত্তমানে ঐ কারখানার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তিনি একজন বিশিষ্ট ধনী। সে অবস্থায় যদি তিনি তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থার তুলনায় পুত্রদিগকে ঐ ভাবে সাধারণ মিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত করা অপছন্দ করিতেন এবং পুত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত এতদিন তাঁহার ব্যবসার অস্তিত্ব বজায় থাকিত না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন নিরক্ষর ব্যক্তি অতি হীনাবস্থা হইতে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াও নিজের নিরক্ষতার জন্য সভ্য সমাজে মেলামিশা করিতে প্রাণের মধ্যে দারুণ দুঃখ অনুভব করেন। তজ্জন্য তিনি পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সভ্য সমাজে মিশিবার জন্য কোন প্রকার অর্থব্যয়ে কৃপণতা করেন না। পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া পিতা যেমন মনে মনে একটা তৃপ্তি লাভ করেন, পুত্রগণ কিন্তু নিরক্ষর অসভ্য পিতাকে তদনুরূপ ঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। শরৎবাবু তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের উইলে' ইহার উজ্জল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষায় ছাত্রদের প্রাণে একটা বিলাসিতার ভাব আনিয়া দেয়। পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছাড়াও পারিবারিক জীবনে একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে পূর্ব্বেকার মত মিলনের ভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকেই নিজের স্ত্রী-পুত্রের স্বার্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিজেদের পরিবার লইয়া পৃথকভাবে কর্ম্মস্থলে বাস করেন। সংসারে প্রতিপাল্য, এমন কি বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপরও অনেক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন দেখা যায়। ইউরোপীয়েরা যে ভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেক স্থলে ঐ জাতীয় বিচ্ছিন্নভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রচুর পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তি থাকিলে বর্ত্তমান যুগে সম্মিলিতভাবে উহা পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরিচালকের উপর কাহারও বিশ্বাস থাকে না। সকলেই ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যৌথ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার ফল সকলের পক্ষে যে ক্ষতিজনক, তাহা কেহই চিন্তা করেন না। যৌথ সম্পত্তি যাহা একজন ম্যানেজার বা কর্ম্মচারীর দ্বারা পরিচালন করা যায়, ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে ঐ সম্পত্তি যতগুলি ভাগে বিভক্ত হইবে, অংশীদারগণের ততগুলি কর্ম্মচারীর বেতন বহন করিতে হইবে। চারিজন অংশীদারের পক্ষে একজন কর্ম্মচারীর যাহা বেতন দিতে হইত, যৌথ সম্পত্তি বিভাগ হইলে তাহার কর্ম্মচারীর বেতন চারিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি পরিচালক থাকিয়া যদি কিছু আত্মসাৎও করেন, তাহাতেও লোকসান নাই। কিন্তু একজনের স্থলে যদি চারিজন চোর নিযুক্ত করা হয়, সে তুলনায় কত বেশী ক্ষতি ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই লাভ-লোকসান যে কেহই বোঝেন না তাহা নহে। কিন্তু সরিকগণের মধ্যে পরস্পরের এমন একটা জিদ্ ও হিংসাভাব দেখা যায় যে, সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও নিজেদের জিদ্ বজায় রাখিতেই হইবে। বরং একান্নবর্ত্তী পরিবার পৃথক অন্ন হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু সম্পত্তি বিভক্ত হইলে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ ঘটে। কোন একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে পার্টিসনের মামলা রুজু হয়। দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পর এটর্নিগণের উদর ভর্ত্তি হইলে কয়েকজন এটর্নি সালিশ নিযুক্ত হইয়া সম্পত্তি পার্টিসন করিয়া দেন। পরে এটর্নি যাহা পরিশ্রমিকের বিল দিলেন, তাহাতে যে

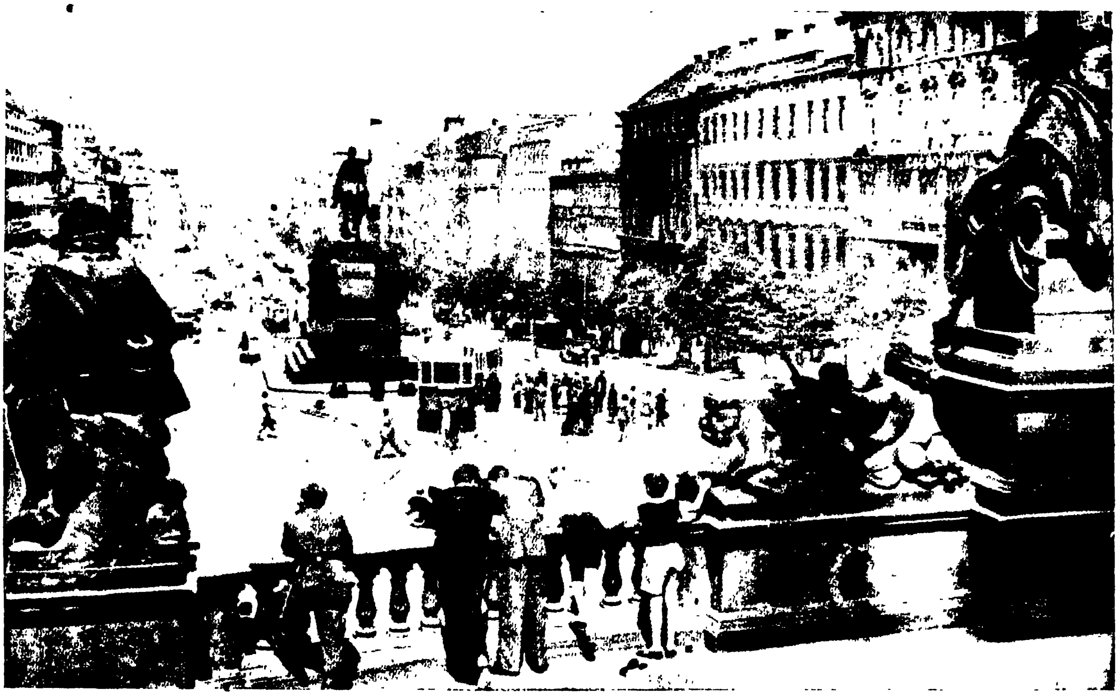


প্রকৃতির দর্পণ

শিল্পী—অমর গোস্বামী, কলিকাতা







উপরে : (বামে) শ্রীমতী চিয়াংকাইসেক স্বয়ং চৈনিক সৈনিকদিগের ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জামা তৈয়ারী করিতেছেন

(দক্ষিণে) তিব্বতের বড় লামা (পূর্ব্বে সাক্যর রাজা) ভারতবর্ষীয় শিল্পী কানওয়াল কৃষ্ণকে তিব্বতীয় মূর্ত্তি উপহার দিতেছেন

(নীচে) প্রেগের কর্ম্মবহুল ওয়েনসেসলস্ স্কোয়ার, বোহেমিয়ানের সদাশয় রাজা ওয়েনসেসলস্এর প্রস্তরমূর্ত্তি স্কোয়ারের সম্মুখে অবস্থিত। 'খৃষ্টদিবস' উপলক্ষে রাজার মূর্ত্তি বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়

সম্পত্তি বাটোয়ারা হইয়াছিল, সেই সম্পত্তিই বিক্রয় করিয়া এটর্নির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। শিক্ষিত পরিবার মধ্যে এই ভাবটা বেশী দেখা যায়। বর্ত্তমানে ঐ আদর্শের আবহাওয়া অশিক্ষিত পরিবার মধ্যেও দেখা দিয়াছে। আজ যাঁহারা এই আদর্শের সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রগণও যে উক্ত আদর্শ অনুসরণ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ভাবটা ইংরেজ জাতিরই আদর্শ। কিন্তু ইংরেজ জাতির মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত গুণ আছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অনুসরণ করেন না; কেবল তাহাদের দাম্পত্য জীবনযাত্রারই অনুকরণ করেন—যাহা আমাদের সংসারে আদৌ খাপ খায় না। ইংরেজ জাতির সংসারে স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্যা—আর বাঙ্গালী জাতির সংসারে মা, বাপ, ভাই, বোন, মাসি, পিসি প্রভৃতি অনেককে প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরেজ জাতির প্রত্যেকে উপার্জ্জনক্ষম; যদি কেহ উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তবে সামান্য উপার্জ্জনে কেহ বিবাহ করে না। আর বাঙ্গালীর সংসারে হয়ত একজন রোজগার করে, দশজনে তাহার মুখাপেক্ষী। ইংরেজ জাতির মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগার করে; আর বাঙ্গালীর ঘরের অনেক বিধবা হয় পিতার সংসারে, না হয় স্বামীর বংশের কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া জীবনযাপন করে।

বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। আমাদের আর্য্যনারীগণ সকলেই বিদুষী ছিলেন। যাঁহারা মাতৃজাতি সন্তান পালনে তাঁহাদের শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু যেভাবে নারী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন চলিয়াছে, যদি উহার আমূল পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এতদিন বাঙ্গালীর সংসারে যে সুখশান্তি ছিল তাহা অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই বিলাতী আদর্শের শিক্ষায় নারীজাতি সংসারের গৃহিণী পদে ইস্তফা দিয়া স্বামীর বিলাসসঙ্গিনী হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুজাতির মধ্যে এতদিন ডাইভোর্স ছিল না। বর্ত্তমানে আদালতে উহার মামলা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার ফল যদি এইরূপই দাঁড়ায়, তবে এ জাতির অধঃপতনে বাঙ্গালার আর বেশী দেরী নাই।

আজকাল শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় শিক্ষিতা পাত্রী ছাড়া বিবাহ করিতে চাহেন না। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যয়বহুল সভ্যতার যুগে অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক স্থিতি স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হইলে কলহ একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন বা সংযম শিক্ষা নাই, যাহাতে ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, সবর্ণ অসবর্ণ যুবকযুবতীর মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রণয় সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মিলন না ঘটিলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে, ইহাই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা? যত দিন যুবক-যুবতীর চরিত্র গঠন শিক্ষা না হইতেছে, তত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ডিগ্রী লাভ করিয়াও জাতীয় উন্নতির কোন সাহায্য হইবে না।

ইংরেজ জাতির ব্যবসায়ে কোনপ্রকার প্রতারণা নাই। ইংরেজ জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে কাহাকে ঠকাইয়া লাভ করিতে চাহে না। কোন মালের অভাব লইয়া খারাপ বা ভেজাল মাল সরবরাহ—ইহা ইংরেজ ব্যবসায়ী কখনই করে না। এইজন্য ভারতের বাহিরের অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজের সুনাম বেশী। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়—যাঁহারা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা লোককে ঠকাইয়া কি উপায়ে লাভ হইবে, এই উপায় উদ্ভাবনে সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই সমস্ত কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কোন ব্যবসায়ে জনসাধারণের বিশ্বাস নাই। এই কলিকাতা শহরে কতকগুলি বিবাহ, মৃত্যু বীমা কোম্পানী খুলিয়া পল্লীগ্রামের বহু দরিদ্র অনাথা বিধবার যে সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে লোককে চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া, মিথ্যা অফিস খুলিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা ডিপজিট লইয়া কত লোককে ঠকান হইতেছে, তাহা প্রত্যেক দিনের সংবাদপত্রে "আইন-আদালত" কলমে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

আইনকে ফাঁকি দিয়া সাধারণ লোককে ঠকাইবার অভিনব ফন্দি শিক্ষিত লোকের মাথায় যত সহজে আবিষ্কার হয়, সাধারণ অশিক্ষিত লোকের দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভ্যতার চালচলন যতই বাড়িতেছে অভাব-অভিযোগের মাত্রা যত বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে, দিন দিন অভিনব প্রতারণার কৌশল তত বেশী আবিষ্কার হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ জাতির

বহুবিধ গুণের মধ্যে কেবলমাত্র ইংরেজের দাম্পত্য জীবন-যাত্রার আদর্শ অনুকরণে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইতেছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ দেশের স্বার্থ রক্ষায় পরস্পর সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন, আর বাঙ্গলার শিক্ষিত নেতাগণ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে দেশের স্বার্থ বলি দিতেছেন। সকল দেশের লোকের মধ্যে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। আর বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ জাতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানেও নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যে দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই প্রকার আদর্শ, সে দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে দোষ দিয়া লাভ নাই। যে দেশে পূর্ব্বকালে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইত, সে দেশের লোক এখন শিক্ষার প্রভাবে হাজার হাজার রেজিষ্টরী খত, বন্দকী দলিল আদালতে উড়াইয়া দিতেছে। বাঙলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিলেও প্রতারণা বিদ্যায় তাহারা যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে যে নূতনত্ব কিছু নাই এমন কথা বলা যায় না।

যত দিন এই জাতীয় দুষ্ট মনোবৃত্তির সংশোধন না হইবে, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতি নাই। যত দিন না সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পরস্পর মতের সামঞ্জস্য করিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে পারিবে, তত দিন এ জাতির কলঙ্ক দূর হইবে না। যত দিন বাঙ্গালীর প্রাণে জাতীয় স্বার্থের প্রেরণা না জাগিবে, তত দিন এ জাতি শক্তিহীন হইয়া থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালী নিজ স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থের প্রতি অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন না হইবে, তত দিন এ জাতির কোন কূলে স্থান মিলিবে না। বাঙ্গালী বিলাসিতা বিসর্জ্জন দিয়া যত দিন সহজ ও সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত না হইবে, তত দিন এ জাতির দরিদ্রতা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেই বল, আর ব্যবসাক্ষেত্রেই বল, ঐক্যবদ্ধভাবে সমষ্টিগত সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া এ জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

পাড়াগাঁয়ে

দিলীপকুমার

গাছের তলায় গান বাঁধছি—কৃষাণ এসে বসে এত কাছে—
কী এক ব্যথা লুকিয়ে ছিল—বিরাগ জেগে ওঠে মনের মাঝে।
চেয়ে দেখি: সাদা দাড়ি, মাথারো চুল সবই পাকা তার,
বিরল বস্ত্র দেহখানি শীর্ণ—চোখে দৃষ্টির নেই ধার।
ছোট্ট বুকের হাড়গুলো যায় গোনা, ঠোঁটে কোমল হাসির রেশ,
মুখে দরদ—অনুতাপে শুধাই: মিঞা, কোথায় তোমার দেশ?
"হেথায়ই"।
"নাম?"
"কাশিম মিঞা বলে সবাই।"
"কি চাও?"
"কী চাই? মানে?"
হঠাৎ এসে কাছে বসার মানে যে কেউ চায় সে কি হায় জানে?
কয় না কথা—চায় চেয়ে, রয়।
"দেখছ কী ভাই?"
"দেখব কী আর?—তোমায়।"
আমি হাসি, হাসে সেও—আলাপ সুরু হ'ল কথায় কথায়।

হঠাৎ বলে : "মাটি হেথায় কাঁকরভরা—দিই না চাটাই পেতে ?"
"দরকার নেই মিঞা, বোসো, গল্প বলো।"

"একটু তামাক খেতে—"

"তামাক আমি খাই না তো ভাই—"

"খাবার কিছু ?"

"নেই যে ক্ষিধে—তবে

একটি গেলাস জল যদি দাও—" অবাক্ হ'য়ে চায় সে : সাধু কবে
মুসলমানের জল খেতে চায় ! খুশি হ'য়ে কুঁড়েয় গেল চ'লে।
মনটা ওঠে ভ'রে—ছায়ামেঘ না ব্যথা ধীরে গেছে গ'লে !

পিতলের এক পাত্রে মিঞা মিছরীমিঠে টলটলে দুধ মুখে
ধরল আমার—আধেক স্নেহ আধেক কৌতূহলেরি কৌতুকে।
"দুধ এ যে ভাই !"

"কোথায় ? একটু মিছরিগোলা সর্বৎ—নিন খেয়ে।
খাবার কিছু খেলেই হ'ত—বেলা হ'ল—" আবার হাসে চেয়ে।
"উঠি মিঞা ?"

"ধুপ যে বড়—"

"অভ্যেস আছে।"

"না না, বেজায় কড়া—

ছাতা একটা দিই ?"

"না মিঞা, দেখছ না এ-মাথায় টুপি-পরা ?
দুধটি তোমার কী যে ভালো লাগল—ঠাণ্ডা, মিষ্টি, চমৎকার।
শান্তি যেন পাও ভাই—না দেখা যদি হয় আমাদের আর,
তোমার কথা ভুলব না—"

"কী বলেন সাধু ! সেলাম।"

"নমস্কার।"

রয় চেয়ে ঠায়, মুখে করুণ হাসি, চোখে দৃষ্টির নেই ধার।

সোনার আলোর ঘোড়া ছোটে, গাছ গান গায়—এ কী ? কোথায় ব্যথা ?
অরুণ স্নেহে ছায়ার মতই মিলিয়ে গেছে। উছল কৃতজ্ঞতা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উপ্ছে পড়ে।

একলা ? কৈ নয় ? তবু পথের 'পরে
এমনি কত দরদ-ভরা দৃষ্টি-প্রদীপ রয় কে জেলে ধ'রে ?

সাময়িকী

সতীশচন্দ্র বাগচী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বিশ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর বাগচী জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের বাড়ী নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং কেম্ব্রিজে ১৯০৪ সালে গণিতশাস্ত্রে ও ১৯০৬ সালে আইনে ট্রাইপস লাভ করেন; পরে তিনি কেম্ব্রিজ ও ডাবলিন উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-বি উপাধি লাভ করিয়া ১৯০৯ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' হইয়াছিলেন এবং ১৯৩১ সালে তাঁহাকে 'আশুতোষ মুখার্জ্জি লেকচারার' নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধ্যে দুই বৎসরকাল (১৯৩১-৩২) ছুটি লইয়া তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পদার্থ-বিদ্যা, গণিত, সাহিত্য ও আইন বিষয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ডক্টর বাগচী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ—

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ গত ২৩শে অক্টোবর রবিবার সকালে ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ২৫শে এপ্রিল বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মৃত্যুর পর শুদ্ধানন্দজী সভাপতি হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের পর স্বামী শুদ্ধানন্দ পঞ্চম সভাপতি :— প্রথম ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৯৮—১৯২২); দ্বিতীয় স্বামী শিবানন্দ (১৯২২—১৯৩৪), তৃতীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৯৩৪—১৯৩৭); চতুর্থ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৯৩৭এর মার্চ্চ হইতে ১৯৩৮এর এপ্রিল, ও পঞ্চম স্বামী শুদ্ধানন্দ (১৯৩৮এর মে হইতে অক্টোবর)। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শুদ্ধানন্দের জন্ম হয়; সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বি-এ ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত ইংরেজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন; পাঁচ বৎসরকাল রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত উদ্বোধন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন; ১৯২৭ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত তিনি মিশনের সম্পাদক ছিলেন; পরে তিনি মিশনের সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতাস্থ বিবেকানন্দ সোসাইটী ও ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি মিশনের ভারতস্থ সকল শাখা কেন্দ্রে গমন করিয়া সকল স্থানের কার্য্যধারার সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মত কর্ম্মী জগতে অসাধারণ।

সম্রাট সহোদরের চাকরী গ্রহণ—

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এবং বর্ত্তমান সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ভ্রাতা 'ডিউক অফ কেণ্ট' সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নভেম্বর মাসেই তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ডিউকের বর্ত্তমান বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র! ১৯৩১ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ১৯৩৪ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে গ্রীসের প্রিন্স নিকোলাসের কন্যাকে তিনি বিবাহ

করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা আছে। রাজভ্রাতার এইরূপ উচ্চ রাজকার্য্য গ্রহণ এই প্রথম। তিনি দুই-তিন বৎসরকাল অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড ইংলণ্ডে বাস করেন



'ডিউ অফ কেণ্ট'

না। এখন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ব্যতীত মাত্র তৃতীয় ভ্রাতা 'ডিউক অফ গ্লষ্টার' ইংলণ্ডে থাকিবেন; তাঁহাকেই রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে বহু রাজকার্য্য করিতে হইবে।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

যুক্তপ্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কাশীবাসী ডাক্তার ভগবানদাস সম্প্রতি পদত্যাগ করায় কেন্দ্রীয় পরিষদের যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছিল, এলাহাবাদের প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালী শ্রীযুত আর-এন-বসু বিনা বাধায় সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাধাশ্যাম পাঠক ও লালবিহারী শাস্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীযুত আর-এন-বসু এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ অসাধারণ সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবানুভব করিবেন।

কুমার সত্যমোহন ঘোষাল—

ভূকৈলাস রাজবংশের অন্যতম সন্তান কুমার সত্য-মোহন ঘোষাল গত ২০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার নিকট ষাট হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কুমার সত্যমোহন সেই ঋণের টাকার দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গত বার বৎসরকাল দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের অন্যতম হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে পুরাতন মন্ত্রিসভার পতনের পর কংগ্রেস দল হইতে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত আট জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে; দুইজন উচ্চ জাতির হিন্দু, দুইজন তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি, একজন পার্ব্বত্য জাতির প্রতিনিধি ও তিনজন মুসলমান—এই ৮ জনকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিবেন। নিম্ন-লিখিত ভাবে মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কার্য্য বণ্টন করিয়া লইয়াছেন—(১) প্রধান মন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই—শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ, (২) ফকরুদ্দীন আলি আমেদ—রাজস্ব ও অর্থবিভাগ, (৩) কামিনীকুমার সেন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, বিচার ও আইন বিভাগ, (৪) অক্ষয়কুমার দাস—কৃষি ও আবগারী বিভাগ, (৫) রামনাথ দাস—চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও শ্রমবিভাগ, (৬) রূপনাথ ব্রহ্ম—বন ও রেজিষ্ট্রেসন বিভাগ, (৭) আলী হায়দার খাঁ—পূর্ত্তবিভাগ, (৮) মামুদ আলী—শিল্প ও সমবায় বিভাগ। ইতিমধ্যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রেভাঃ নিকোলাস রায়ের দলের তিনজন সদস্য, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রোহিনী চৌধুরীর দলের তিনজন সদস্য ও মুসলেম লীগ দলের তিনজন সদস্য কংগ্রেসী দলে যোগদান করায় নূতন মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রীরা কম বেতন লইতে সম্মত হইয়াছেন এবং মন্ত্রীদের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থের যাহা উদ্বৃত্ত হইবে,

তাহা তাঁহারা বন্যার্ত্তদের সাহায্য করে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় সকল প্রদেশেই ক্রমে কংগ্রেসদল কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেছে।

শিল্প পরিকল্পনা সমিতি—

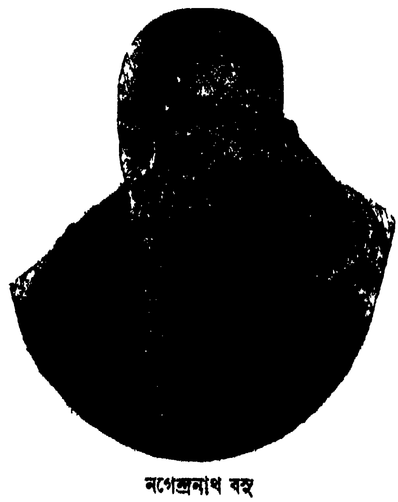
এবার কংগ্রেস হইতে ভারতের জাতীয় শিল্পগুলির উন্নতি বিধানের উপায় নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিছু দিন হইতে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি 'জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা সমিতি' গঠন করিয়াছেন—(১) স্যার এম বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, (২) ডক্টর মেঘনাদ সাহা, (৩) স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, (৪) শ্রীযুত অম্বালাল সারাভাই, (৫) অধ্যাপক কে-টি-সাহা, (৬) বোম্বায়ের তুলা-গবেষণাগারের ডক্টর নাজির আমেদ, (৭) শ্রীযুত এ-ডি-স্রফ, (৮) মিঃ এ-কে-সাহা ও (৯) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি এস দুবে। সুভাষচন্দ্র এই সমিতিতে আরও একজন রাসায়নিক পণ্ডিতকে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে এই সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস, পণ্ডিতজী এ পদ গ্রহণ করিবেন। ভারতের যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস শাসন প্রচলিত হইয়াছে, অন্তত সেই সকল প্রদেশ যে এই সমিতির নির্দ্ধারণ মত কার্য্যে অগ্রসর হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিশেষজ্ঞ কমিটীর নির্দ্দেশ মত কাজের জন্যও আশা করি এ দেশে অর্থের অভাব হইবে না।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—"ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র একটা ভীতি ও অসন্তোষের ভাব দেখা গিয়াছে। ইউরোপের কোথাও জনগণ সুখে আছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও ভবিষ্যতের জন্য ভীতি দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ দেশেই শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান রাজনৈতিকদলগুলির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন মনোভাব বিরাজ করিতেছে। ঐ সমস্ত রাজশক্তি নিজেদের পক্ষে ব্যাপকভাবে পরস্পর-বিরোধী যে সকল প্রচারকার্য্য চালাইতেছে, তৎপ্রতি জনগণের খুব কমই আস্থা আছে বলিয়া মনে হয়। স্ক্যান্দিনেভিয়ান দেশসমূহ (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড) ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশে জনসাধারণের মধ্যে ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিতের ও উদ্বেগের ভাব পরিলক্ষিত হয়।" সুনীতিবাবু যে অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ইউরোপে একটা ব্যাপক যুদ্ধের সূচনা করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা কি সত্যই তবে একদিন মহাযুদ্ধের ফলে বিলুপ্ত হইবে?

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু—

গত ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়



নগেন্দ্রনাথ বসু

তাঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' নামক দুইখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়াছেন। তাহার পর দর্জ্জিপাড়া থিয়েটার ক্লাবের জন্য তিনি 'শঙ্করাচার্য্য' ও

'পার্শ্বনাথ' নাটক রচনা করেন। উনিশ বৎসর বয়সে বিশ্বকোষ সম্পাদনের ভার নগেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বকোষ সম্পাদনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি সম্প্রতি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু সে কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ হিন্দী ভাষাতেও বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল; তিনি পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়, প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহের জন্য বহু অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। প্রাচ্যতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁহাকে 'প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু কিছুকাল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ময়ূরভঞ্জে চাকরী করিবার সময় তিনি যে সকল পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার করেন তিনি সেগুলি গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। বসু মহাশয় বহুদিন কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ১৯৩৫ সালে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার দেহ ও মন আদৌ ভাল ছিল না। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী বিশ্বকোষ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারী নিজে গিয়া বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাত করেন। নগেন্দ্রনাথ তখন রোগ শয্যায়—গান্ধীজি সেইখানেই নগেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু যে ধরণের পণ্ডিত, এ-দেশে ক্রমে সেই প্রকৃতির পণ্ডিতের অভাব দেখা যাইতেছে। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে উপযুক্তভাবে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালী জাতি তাহার ব্যবস্থা করিলেই নগেন্দ্রবাবুর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

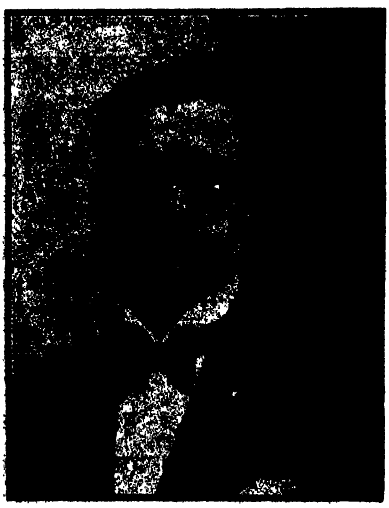
ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে' সে সম্বন্ধে সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হরিজন পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয় লইয়া যাহারা বিতর্ক করিতেছিলেন তাঁহাদের সেই বিতর্কের অবসান হইবে সন্দেহ নাই। গান্ধীজি বর্ত্তমান হিন্দী বা উর্দ্দু কোন ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। তিনি 'হিন্দুস্থানী' নামক এক অন্য ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে চাহেন; সেই 'হিন্দুস্থানী' ভাষা কি অক্ষরে লিখিত হইবে সে বিষয়েও এখন পর্য্যন্ত গান্ধীজি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। গান্ধীজি লিখিয়াছেন—'কংগ্রেস যে হিন্দুস্থানীর কল্পনা করিয়াছে সে ভাষা এখনও রূপ পরিগ্রহ করে নাই। কংগ্রেসের সভা-সমিতি ও কার্য্য বিবরণী যে পর্য্যন্ত আগাগোড়া কেবলমাত্র হিন্দুস্থানীতে পরিচালিত না হয়, হিন্দুস্থানীর প্রকৃত গঠন সে পর্য্যন্ত সম্ভব নহে।" যে ভাষার বর্ত্তমানে অস্তিত্ব নাই, হরফ নাই, সে ভাষা যে কি করিয়া ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যে ভাষায় কোন কোন প্রদেশের কোন কোন লোক কথা বলে, সেই ভাষা কি সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। গান্ধীজির প্রবন্ধ হইতে তাঁহার রাষ্ট্রভাষার রূপ স্পষ্ট বুঝা যায় না। সেইজন্য একদিকে যেমন হিন্দী বা উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ বাঙ্গালা যাহাতে রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয় সে-জন্য সমগ্র ভারতে ব্যাপক আন্দোলন হওয়া উচিত। হিন্দী প্রচার সমিতির মত বাঙ্গালা দেশে 'বাঙ্গালা প্রচার সমিতি' গঠন করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার পক্ষ হইতে আন্দোলন [illegible] প্রচার কার্য্য করিতে [illegible]। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার [illegible], শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কার্য্য করা উচিত। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

সংখ্যক লোক যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই বাঙ্গালার মত একটী জীবন্ত ও ক্রমবর্দ্ধমান ভাষা যদি ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে না বা রাষ্ট্রভাষার সাহিত্য রচনার জন্য নূতন করিয়া উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। আমরা বাঙ্গালী জাতিকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া সত্বর এই কার্য্যে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করি।

সুকুমার বসু—

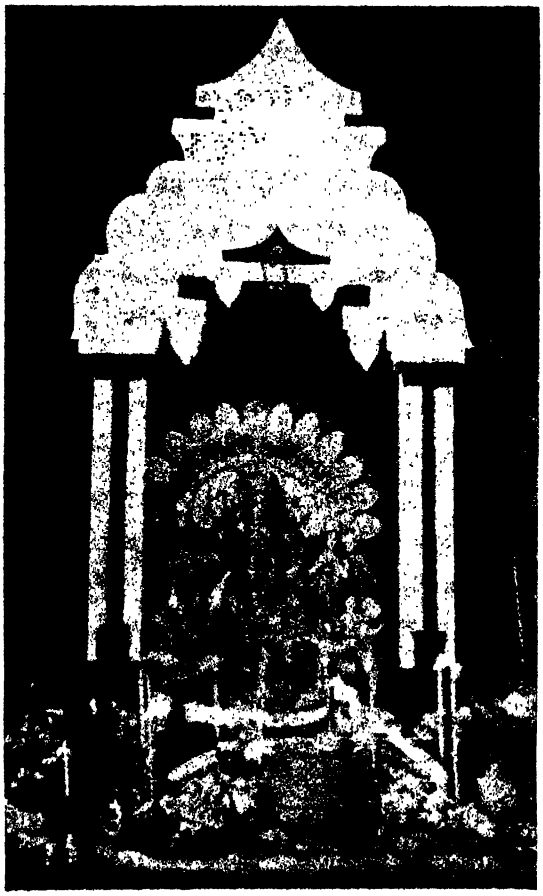
মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ সুকুমার বসু আই-সি-এস মোটর দুর্ঘটনায় কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাণ হারাইয়াছেন। বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামের বসু বংশে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের রাণী ৺দিনমণি চৌধুরাণীর গৃহে সুকুমারের জন্ম হয়। সুকুমারের পিতা ৺নলিনীকুমার বসু রাণী দিনমণির দৌহিত্র ছিলেন। ১৯২৯এ বি-এস্‌সি পাশ করিয়া সেই বৎসরই সুকুমার বিলাত গিয়াছিলেন এবং পর বৎসর আই-সি-এস পাশ করেন। সে বৎসর বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র সুকুমারই আই-সি-এস হন। ১৯৩৫ সালে ছুটি লইয়া সুকুমার ইউরোপের নানাস্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন।



৺সুকুমার বসু

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সুকুমার সাগর জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ হইয়াছিলেন। সুকুমার বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দের শিষ্য ছিলেন। সুকুমারের মাতা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয়ী।

অন্যান্য বারের ন্যায় এ বৎসরও করাচী প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায়



করাচীর প্রতিমা

যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই দেখিবার মত হইয়াছিল। প্রবাসী কয়েক ঘর বাঙ্গালীর এই চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমরা এই সঙ্গে তাঁহাদের মাতৃমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

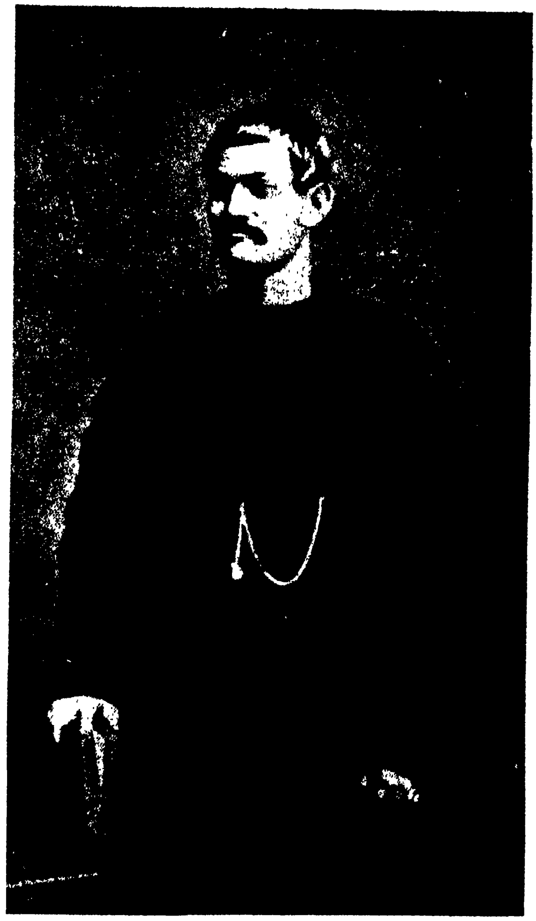
রাজবন্দীদের মুক্তিদান—

বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্র-সচিব গত দুর্গাপূজার ঠিক পূর্ব্বেই (২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে) দমদম জেল ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে এক সঙ্গে পঞ্চাশজন রাজনীতিক

বন্দীকে তাঁহাদের দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তিদান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল রাজনীতিক বন্দীর দণ্ডকাল শেষ হইতে আঠার মাসের অধিক বিলম্ব ছিল না, তাহাদের সকলকেই নাকি ঐদিন মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায় তাহার 'পরও শুধু দমদম জেলে সেদিন পঁয়তাল্লিশ জন রাজনীতিক বন্দী ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দী-দিগকে মুক্তিদান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। স্বরাষ্ট্রসচিব গান্ধীজির পরামর্শে সম্মত না হওয়ায় গান্ধীজি সে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখনও যে বাঙ্গালা দেশে বহু রাজনীতিক বন্দী আটক আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশে নূতন শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইলে সকল রাজবন্দীকেই মুক্তি দেওয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। যতদিন না সে ব্যবস্থা হয়, ততদিন দেশবাসী কখনই বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত নূতন সাপ্তাহিক 'বাঙলার কথা'তে মন্ত্রী খাজা সার নাজিমুদ্দীনের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও জনগণের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী—

বাঙ্গলা দেশ শতবর্ষ পূর্ব্বে যে তিনজন মহাপুরুষের জন্মে ধন্য হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শততম বার্ষিকী উৎসব দেশবাসী বিশেষ উৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বাকী শুধু রহিয়াছে—কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী উৎসব। এইবার তাহাও সম্পাদিত হইতে চলিল। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম আগামী ১৯শে নভেম্বর হইতে কেশবচন্দ্র শততম বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে একজন অসাধারণ মনস্বী পুরুষ এবং অদ্ভুত কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচেষ্টা, কি ধর্ম্ম সমন্বয়, মাদকতা নিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সংবাদপত্র প্রচার, স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা, সাহিত্য সেবা প্রত্যেক বিষয়েই তিনি ছিলেন অগ্রদূত এবং সংস্কারপন্থী। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ এক সময়ে কথিত বাংলার আদর্শ-রূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেকালে কেশবচন্দ্রের প্রভাব সমাজের সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত ছিল। বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নামে গৌরববোধ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের



কেশবচন্দ্র সেন

বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পরিচয় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে ও গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক দিয়া কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন দিক্‌পাল! তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী আজ তাহার সাক্ষী দিতেছে। কেশবচন্দ্র স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মপ্রচারক, দেশ-

প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধু মহাপুরুষ রূপে বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরদিন বরণীয় হইয়া থাকিবেন। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আদি, সাধারণ ও নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ দেশবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্রের শততম বার্ষিকী উৎসব করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আশা করি বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই এই মহাপুরুষের শততম বার্ষিকী উৎসবের ব্যবস্থা হইয়া দেশবাসী এই বরেণ্য মহাপুরুষের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন।

মাদ্রাজে দুর্গোৎসব—

এ বৎসরও মাদ্রাজপ্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। 'কেদার রায়' ও 'বন্ধু' নাটক অভিনীত হইয়াছে। এ দেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন না থাকিলেও শহরের বহু গণ্যমান্য নরনারী পূজায় যোগদান



মাদ্রাজের দুর্গা

করিয়াছিলেন। প্রত্যহ পূজার্চ্চনার পর নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার দ্বারা বাংলার পূজাবাড়ীর বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল। প্রতিমার রূপ দিয়াছেন নিপুণ চিত্র-শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রচন্দ্র নাগ।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিরোধানে ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রের যে ক্ষতি হইল তাহা বর্ণনাতীত। মৃদঙ্গ বাদ্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রচার এবং এই বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। প্রাতঃস্মরণীয় মৃদঙ্গবিশারদ ৺মুরারি গুপ্ত মহাশয়ের তিনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জীবনব্যাপী গুরুর আদর্শ রক্ষা করিয়া দেশবরেণ্য হইয়াছিলেন। দুর্লভ-বাবু হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছী গ্রামনিবাসী স্ব-ধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ দৃষ্ট হয়।



দুর্লভ ভট্টাচার্য্য

মৃদঙ্গবিদ্যায় যথারীতি শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়া তিনি গুরুর সহিত দেশ বিদেশে বহু সঙ্গীত সভায় গমন করেন এবং শিবনারায়ণ মিশ্র, কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্ত্তী, লছমীপ্রসাদ এবং সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গুণিগণের সহিত সঙ্গত করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেনারস নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন, চট্টগ্রাম আর্য্যসঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলন, বগুড়া সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্মেলনে গিয়া তাঁহার অসাধারণ বাদ্য-নৈপুণ্যে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করেন। তিনি নিরহঙ্কারী, উদারচেতা এবং অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার অর্জ্জিত অমূল্য বিদ্যা অসংখ্য ছাত্রগণকে অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। ১২৭৮ সালে ফাল্গুন মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং গত আশ্বিন মাসের ২৪শে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী সঙ্গীত আসরে মৃদঙ্গসঙ্গতকালে পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি।

কামাল আতাতুর্ক—

তুরস্কের গণতন্ত্রের সভাপতি গাজি মুস্তাফা কামাল গত ১০ই নভেম্বর সকাল ৭টার সময় ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম



কামাল আতাতুর্ক

তুরস্ক গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং পর পর ১৯২৭, ১৯৩১ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেও পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কামাল পাশা অতি সাধারণ অবস্থায় দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি জেনারেল পদ লাভ করেন এবং তাহার পর সন্ধির সর্ত্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। লোঁজা সন্ধিতে তুরস্ক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। মহাযুদ্ধের সময়েই তিনি 'জাতীয় পরিষদ' গঠন করেন। তাঁহার সময়ে তুরস্ক নবজীবন লাভ করিয়াছে। ফেজ পরিধান প্রথা চলিয়া গিয়াছে. মহিলাগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পাইয়াছেন, ধর্ম্মযাজকদের প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছে, জমীর মালিক কে তাহা স্থির হইয়াছে, শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, ল্যাটিন লিখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তুরস্কের যে প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছিল কামাল কয়েক বৎসরে তাহা ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনি জাঁকজমকের জীবন যাপন করিতেন না, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন, মোটরে না চড়িয়া যথাসম্ভব অধিক পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, সাধারণ লোকের সহিত একত্র বসিয়া সাধারণভাবে আহার করিতেন—সেজন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গৃহে ধনীরা অপেক্ষা দরিদ্রেরাই অধিক সত্বর প্রবেশাধিকার পাইত। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বহু বৎসর পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছিল; তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, সেজন্য তিনি কয়েকটি মেয়েকে 'পালিতা কন্যা'রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশকে পাশ্চাত্য প্রথায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার পাশ্চাত্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে এই প্রকৃতির মানুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুতে তুরস্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তুরস্কবাসীরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুভব করিবে।



শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বি-ই, এ-এম-আই-ই
কলিকাতা কর্পোরেশনের নব নিযুক্ত এসেসার

দুই বৎসরের শিশুর মুখে ভাবের খেলা। মনে মনে একটি বিশিষ্ট ভাব কল্পনা করে তাকে মুখ চোখের ও দেহের ভঙ্গীতে প্রকাশ কোরতে পারা। এটা হল সৃষ্টি—art. লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে, বালকটির ভঙ্গীতে কোন জায়গায় অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছন্দতা বা আড়ষ্টভাব নেই। ভবিষ্যৎ অভিনেতার আভাস সৃষ্টি করে।—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী



রাগ



চিন্তা

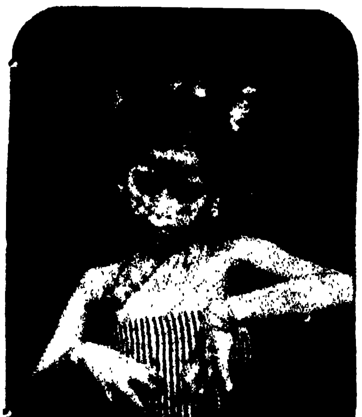


ক্রূর সঙ্কল্প

শিল্পী—মিন্টু

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

নৃত্যের ভঙ্গী ঃ—



আনন্দ



আরতি নৃত্য



প্রতিশোধ

শিল্পী—কুমারী অঞ্জলি গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



দিল্লীতে সপ্ত কংগ্রেস প্রদেশের শ্রমশিল্প মন্ত্রীদের সহিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, জি ডি বিরলা ও কৃপালনী



চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেনেস্ ও প্রথম প্রেসিডেন্ট থমাস্ গ্যারিক্ মাসারিক্, যিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৮৫০ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইনি প্রেগ ইউনিভার্সিটির দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার বাণী রচনা করিয়াছিলেন



ভাইফোঁটা   শিল্পী—রমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়



চেকোশ্লোভাকিয়ার হোয়াইট হাউস। এক সময় বোহেমিয়ান রাজবংশ ও বিশিষ্ট লোকের আবাসস্থান ছিল। মধ্যে সেণ্ট ভিটাস ক্যাথিড্রাল দৃষ্ট হইতেছে। ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট এডওয়াড বেনস্ এই প্রাসাদের বামপার্শ্বের শেষভাগে বাস করিতেন

খেলাধূলা

অষ্ট্রেলিয়ায় চতুর্থ টেষ্ট ঃ

সীডনেতে বার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ৫-৪ গোলে আই এফ এ দলকে হারিয়ে দিয়ে তাদের 'রাবার' পাবার পথ সুগম ক'রে নিল। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম বার মিনিটের ভেতরই পর পর দু'খানা গোল চাপিয়ে দেয়। মাত্র তিন মিনিট খেলার পরেই হজেসের পাশ থেকে কুইল বাঁ পায়ে চমৎকার সট ক'রে একটি গোল পরিশোধ করে। আট মিনিট পরে ক্রাউন হার্টের পাশ থেকে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে হজেস্ হেড দিয়ে আর একটি গোল দেয়। এর একটু পরেই মুরের পাশ থেকে লামস্‌ডেন first timed shot ক'রে একটি চমকপ্রদ গোল দেয়। বিশ্রামের সময় অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকে। খেলা পুনরায় আরম্ভ হবার দু'মিনিট পরেই ব্র্যায়াণ্ট কুড়ি গজ দূর থেকে সট্ মেরে দত্তকে পরাভূত



হাওড়া ষ্টেশনে অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত আই এফ এ ফুটবল দলের সম্বর্দ্ধনা — ছবি—জে কে সান্যাল

করে। এরপর উইলকিন্‌সন্ দলের পঞ্চম বা শেষ গোলটি দেয়। অনেক দর্শকের মতে তার হাণ্ডবল হয়েছিল। তিন গোল পিছিয়ে থেকেও আই এফ এ প্রবল বেগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং লামস্‌ডেন পর পর দুটি গোল পরিশোধ করে; একটি গোল হয় পেনালটি থেকে, আর একটি হয় ভট্টাচার্য্যের চমৎকার পাশ থেকে। আই এফ এ প্রথম গোল করলে। ব্যাকেদের বোঝাপড়ার ভুলের জন্যই এই গোলটি হয়। বার মিনিটের সময় ওসবর্ণ গোলের সামনে বলটা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে উইলকিন্‌সন্ দৌড়ে এসে চলন্ত বলের ওপর সট্ ক'রে দ্বিতীয় গোল দিলে। এবার আই এফ এ দল আক্রমণ সুরু করে, ১৮ মিনিটের সময় রহিম পাশ দেয় প্রসাদকে। প্রসাদ কঠিন angle থেকে

ল শেষ পর্য্যন্ত চেপে থেকেও শেষ গোলটি পরিশোধ ক'রতে ।ক্ষম হয়নি। রহিম দুটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে আই. এফ এ দল বিজয়ী হতে পারতো। অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের দৈহিক শক্তির প্রয়োগও আই এফ



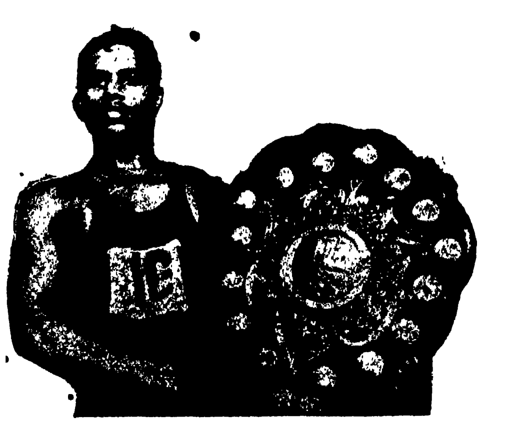
২২০ গজ 'ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক্' বিজয়ী পি মল্লিক

ছবি—জে কে সান্যাল

এ দলের সাফল্যের পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি ক'রেছিল। আই এফ এ :—দত্ত; দাসগুপ্ত, জুম্মা খাঁ; নন্দী, বীরেন সেন ও প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, লামস্‌ডেন, ভট্টাচার্য্য ও প্রসাদ।

অষ্ট্রেলিয়ায় পঞ্চম

অষ্ট্রেলিয়া আই এফ এ দলকে পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট ম্যাচে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে 'রবার' পেয়েছে। খেলা হ'য়েছিল পৃথিবী বিখ্যাত মেলবোর্ণ ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে। দর্শক পাঁচ হাজারের কিছু উপর। আবহাওয়া ও মাঠের অবস্থা খুব ভাল। আই এফ এ. দল নেমেই আক্রমণ সুরু করে। চৌধুরী, রহিম ও লামস্‌ডেনের সট্ মরগ্যান সুন্দরভাবে প্রতিরোধ করলে, ভট্টাচার্য্যের একটা কঠিন সটও চমৎকার বাঁচালে। ওদিক থেকে হোয়াইট হেড্ দিয়ে উইলকিন্‌সনকে বলটা দিলে তাঁর সট একটুর জন্যে পোষ্টের উপর দিয়ে চ'লে গেলো। আবার আই এফ এ দল প্রবলভাবে আক্রমণ করলে। চৌধুরী ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে বল পেয়ে কৌশলে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোলের কাছে পৌঁছেও শেষ রক্ষা ক'রতে পারলে না। চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য ও লামস্‌ডেনের সঙ্গে সুন্দর আদান-প্রদান ক'রে গোলের নিকটে গিয়ে লামস্‌ডেনকে পাশ ক'রলে লামস্‌ডেন চমৎকার ভাবে বল গোলে মারলে, কিন্তু মরগ্যান অত্যাশ্চর্য্যরূপে গোল বাঁচালে। দশ মিনিটকাল প্রবল আক্রমণেও কোন ফল হলো না। অষ্ট্রেলিয়া দল এবার আক্রমণ সুরু করলো। হজেস হোয়াইটকে চমৎকার পাশ দিলে, কিন্তু বিমল সুকৌশলে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলে। এরপর মরগ্যান রহিমের কাছ থেকে আর দত্ত উইলকিনসনের কাছ থেকে দুটো কঠিন সট্ আটকালে। লামসডেনের চমৎকার সট ও চৌধুরীর সট মরগ্যান অতি কষ্টে বাঁচালে। বিশ্রামের সময়ে কোন পক্ষেই গোল হয়নি। খেলারম্ভে ভারতীয় দল আক্রমণ সুরু করলে। প্রেমলালের কাছ থেকে বল পেয়ে চৌধুরী ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে কর্ণার থেকে লামস্‌ডেনকে ব্যাক পাশ করলে লামস্‌ডেন গোল দেয়। অল্পক্ষণ পরেই ম্যাকিভার ও হজেস আদান-প্রদান ক'রে বল নিয়ে গিয়ে গোল শোধ দেয়। ভট্টাচার্য্যের গোল দেবার চেষ্টা দু'বার অল্পের জন্য ব্যর্থ হলো। ম্যাকইভার হজেসের নিকট হইতে বল পেয়ে দ্বিতীয় গোল করে। আই এফ এ দল একটুও না দমে প্রবল বেগে আক্রমণ আরম্ভ করলে। রহিম বল নিয়ে সকলকে কাটিয়ে গোলে সট করেছে,



বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন স্পোর্টসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পয়েণ্ট লাভ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী এস নাগ

ছবি—জে কে সান্যাল

মরকগ্যান পরাজিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বল পোষ্টে লেগে ফিরে এল। আই এফ এ দল হতাশ না হয়ে প্রবলভাবে আক্রমণ চালাতে লাগলো। হাফ্ ব্যাকেরাও ফরওয়ার্ডদের সঙ্গে যোগ দিলে। প্রেমলালের খেলা বিশেষ দর্শনযোগ্য হয়েছিল। রহিম প্রেমলালের পাশ থেকে মাত্র চারগজ দূর হ'তে গোলে সট্ করলেও মরগ্যান আশ্চর্য্যভাবে বল ধরে ফেলে কুলহানের দিকে ছুঁড়ে দিলে। কুলহান সেই বল নিয়ে দৌড়ে বিপক্ষদের কাটিয়ে দলের তৃতীয় গোল দিলে। খেলা শেষ হলো। মরগ্যানের চমৎকার গোল রক্ষা, আই এফ এ রক্ষণ-ভাগের অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ও ফরওয়ার্ডদের খারাপ সুটিং তাদের পরাজয়ের কারণ। অতি সুন্দর আদান-প্রদান ও গ্যালারী প্লে দেখিয়ে বেশ বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে ফরওয়ার্ড-দের সময়মত সুন্দর ও অব্যর্থ লক্ষ্যের উপর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'তে হ'লে আমাদের খেলোয়াড়-দের দৈহিক শক্তির যে আরও বেশী প্রয়োজন তা' বলাই বাহুল্য।



অর্দ্ধ ও সিকি মাইল ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণ বিজয়ী দুর্গাদাস

ছবি—জে কে সান্যাল

আই এফ এ :—দত্ত, রেবেলো, জুম্মা খাঁ; বিমল, বি, সেন, প্রেমলাল; নুরমহম্মদ, রহিম, লামসডেন, কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপটেন) ও চৌধুরী।

কলম্বোর টেষ্ট ঃ

কলম্বোয় 'অল্ সিলোনে'র সঙ্গে টেষ্ট খেলায় আই এফ এ দল ৩-০ গোলে জয়ী হ'য়েছে। চৌধুরী অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে চলন্ত বলের উপর সট্ ক'রে দলের প্রথম গোল দেয়। পুনরায় চৌধুরীর চমৎকার পাশ থেকে রহিম দ্বিতীয় গোল করে। তারপর সিংহল দলের ডায়াসের সট্ দুর্ভাগ্যের জন্য গোলে ঢোকে না। নুরমহম্মদের পাশ থেকে রহিম দলের তৃতীয় গোল করে। এদিন চৌধুরীর খেলা খুব চমৎকার হ'য়েছিল।

আই এফ এ :—দত্ত, রেবেলো, দাশগুপ্ত; মুখার্জ্জি, সেন, নন্দী; নুরমহম্মদ, রহিম, জোসেফ, ভট্টাচার্য্য ও চৌধুরী।

সিংহলে অন্য খেলার ফলাফল ঃ

কান্ডি একাদশের সহিত ড্র	০-০	,,
সিলোন ,, ,, ,,	০-০	,,
বেয়ার ফুটেড্ একাদশের সহিত বিজয়ী	২-০	,,

অষ্ট্রেলিয়ায় জয়-পরাজয়ের তালিকা ঃ

অষ্ট্রেলিয়া অভিযানের জয়-পরাজয়ের সম্পূর্ণ তালিকা ঃ

সাউথ অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	বিজয়ী	৬-১	গোলে
ভিক্টোরিয়ার ,,	বিজিত	২-৪	,,
নিউ সাউথ ওয়েলসের	,,	৪-৬	,,
নরদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টের	,,	১-২	,,
সীডনেতে প্রথম টেষ্ট	,,	৩-৫	,,
কুইন্সল্যাণ্ডের নিকট	বিজয়ী	৭-৬	,,
ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেষ্ট	ড্র	৪-৪	,,
ইপস্উইচের নিকট	বিজয়ী	৫-২	,,
তুম্বার ,,	,,	৫-২	,,
নিউক্যাসেলে তৃতীয় টেষ্ট	বিজয়ী	৪-১	,,
সাউথ কোষ্টের নিকট	,,	৬-৪	,,
চতুর্থ টেষ্ট	বিজিত	৪-৫	,,
গ্রানভিলা ডিষ্ট্রিক্টের নিকট	,,	৪-৬	,,
সিডনি একাদশের সহিত	ড্র	৩-৩	,,
মেলবোর্ণে পঞ্চম টেষ্ট	বিজিত	১-৩	,,
ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	,,	১-৫	,,
ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার নিকট	বিজয়ী	৩-১	,,

মাদ্রাজে খেলার ফলাফল ঃ

আই এফ এ ভারতে ফিরে এসে মাদ্রাজে দু'টি প্রদর্শনী খেলা খেলে। তারা মাদ্রাজ এফ এ কে ৩-১ গোলে



মাদ্রাজ এসোসিয়েশনের এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত আই এফ এর খেলোয়াড়গণ। আই এফ এ মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করেছে

পরাজিত করেছে এবং মাদ্রাজ একাদশের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে।

ডুরাণ্ড ঃ

সাউথ ওয়েল্‌স্ বর্ডারার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লোকো স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরাণ্ড বিজয়ী হ'য়েছে। পঞ্চাশ বৎসরাবধি সৈনিকদলই এই কাপ্ বিজয়ী হ'য়ে আসছে। বিজয়ীদল খেলা আরম্ভের কিছু পরেই গোলটি দেয়। রেলওয়ে দল বহু চেষ্টা ক'রে এবং বহু সুযোগ পেয়েও গোলটি শোধ করতে পারে নি।

ছোট ডুরাণ্ড ঃ

কলেজিয়ানস্ 'এ' ১-০ গোলে বিশপ কটন্ স্কুলকে হারিয়ে ছোট ডুরাণ্ড বিজয়ী হ'য়েছে।

ইণ্টার ন্যাসনাল ফুটবল ঃ

নিউক্যাসেলে ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল খেলায় ইংলণ্ড ৪-০ গোলে নরওয়েকে পরাজিত করেছে। এডিনবরাতে ইণ্টার-ন্যাসনাল খেলায় স্কটল্যাণ্ড ৩-২ গোলে ওয়েলস্‌কে হারিয়েছে।

চ্যারিটির অর্থ ঃ

আই এফ এর চ্যারিটির টাকা ব্যয়ের কমিটি এ বৎসরের প্রাপ্ত মোট ৪১,৬৮৪॥০ টাকা সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে হাঁসপাতালে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত হবে বলে স্থিরীকৃত করেছেন।

কোন কোন খেলায় কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে :—

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়	২১২০।৵০
ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং	৮৮৩৬।৵০
লোকাল বনাম ভিজিটার্স	৭২৭।৵০
কাষ্টমস্ বনাম মহমেডান স্পোর্টিং (শীল্ড সেমিফাইনাল)	৯৯৮৬॥০
ইষ্টইয়র্কস্ বনাম মহমেডান স্পোর্টিং (শীল্ড ফাইনাল)	১১৪৮৫৸০
বর্ম্মা দলের খেলা থেকে	৩১৬৩৸৵০
ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্সের খেলা থেকে	৫৩৬৪৲
মোট	৪১,৬৮৪॥০

সিন্ধুর পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ঃ

হিন্দু—২১৫ ও ৭২ (৬ উইকেট)

(সাতারাম দাস নট আউট ৯৫ ; দ্বিতীয় ইনিংস—ভিকাজী ২২)

প্রথম ইনিংসে গোলাম মহম্মদ ৪৬ রানে ৫, হাইদার ৪৬ রানে ২, সাজান ২৭ রানে ১, লানেওয়ালা ১৯ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে—হাইদার ৩৬ রানে ৩, লানেওয়ালা ১৬ রানে ২, গোলাম মহম্মদ ২০ রানে ১ উইকেট।

মুসলিম—১৩৯ ও ১৪৫ (দাউদ খাঁ ৫৪, গোলাম মহম্মদ ৩৪ ; দ্বিতীয় ইনিংস—হায়দারি ৫৮, দাউদ খাঁ ৩২)

গোপালদাস ৩১ রানে ২, ওধোজী ৩৭ রানে ৪, জগন্নাথ ২৪ রানে ২, নওমল ২৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

২২শে অক্টোবর সিন্ধুতে হিন্দু ও মুসলমান দলের মধ্যে ফাইনাল পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় হিন্দুদল ৪ উইকেটে জয়ী হয়েছে। মুসলিমদল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে নামে। কোমরুদ্দিন ও খাদিম হাসান যোগ দিতে না পারায় দল কিছু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। আরম্ভ খুব ভাল হয়নি, লেনওয়ালা মাত্র এক রান ক'রে বিদায় নিয়েচে। দাউদ খাঁ ও গোলাম মহম্মদ দলের রান সংখ্যা খানিকটা তোলেন ৫৪ ও ৩৪ করে। তাঁদের খেলা বেশ চমৎকার হ'য়েচে। লাঞ্চের সময়কার স্কোর ছিল চার উইকেটে ১১০, এভারেজ খুব খারাপ নয়। এরপর দলের এমন ভাঙ্গন ধরলো যে, কেউই আর দাঁড়াতে পারলো না ; বাকী ছ'টা উইকেট মাত্র ২৯ রানেই চ'লে গেল। পর পর তিনজন ক'রলেন শূণ্য। ওধোজি চারটে উইকেট পেলে ৩৭ রানে।



নাওমল



গোপাল দাস

হিন্দুদলের আরম্ভও খুব ভাল হয়নি। আমবেপ, গোপাল দাস, ভিকাজী কেউই সুবিধে ক'রতে পারলেন না। একমাত্র নবাগত সাতারাম উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলতে লাগলেন। ওধোজি কুড়ি রান ক'রে সাজানের কাছে এল বি ডবলিউ হ'লেন। দিনের শেষে হিন্দুদলের ৪ উইকেটে হলো ৯৯ রান, সাতারাম তখনও ব্যাট ক'রচেন।

পরের দিন এক গিরিধারীলাল ছাড়া সাতারামকে কেউই বিশেষ সাহায্য ক'রতে পারলে না। মাত্র পাঁচ রানের জন্যে সাতারাম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হ'লেন। হিন্দুদলের ২১৫ রানে ইনিংস শেষ হ'ল, সাতারাম নট্ আউট ৯৫। মুসলিম দলের উইকেট রক্ষা অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে, অতিরিক্ত দিতে হয়েচে ৪০।

৭৬ রান পিছিয়ে মুসলিম দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ৩১ রানের মাথায় তিনটে উইকেট পড়ে গেল। তারপর দাউদ খাঁ ও হাইদার আলির সহযোগিতায় চায়ের সময় স্কোর দাঁড়াল ৯৫। হিন্দু দলের ফিল্ডিং খুব খারাপ হ'চ্ছিল, তারা তিনটে সহজ ক্যাচ ফেলেছে। ৩২ রানে দাউদ খাঁ ও ৫৮ রানে হাইদার বিদায় নিলে। আবার উইকেট পড়া সুরু হলো। ইনিংস শেষ হ'ল ১৪৫ রানে। ওধোজি ২২ রানে ৬টা, আর গোপালদাস ২৮ রানে ৩ উইকেট পেলে।

৬৮ রান ক'রলেই হিন্দুদল জিতে যাবে। খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে হিন্দুদল ব্যাট করতে নামলো, কিন্তু দিনের শেষে মাত্র ২৯ রানে চারটে উইকেট পড়ে গেল। সাতারাম মাত্র তিন রানে আউট হ'য়ে গিয়ে সকলকেই হতাশ ক'রে দিলে। হাইদারের বল ও ফিল্ডিং খুব ভাল হ'চ্ছে, নিজে দুটো উইকেট নিয়েচে আর লানেওয়ালার বলে দুটো 'ক্যাচ' নিয়েচে।

পরের দিন খেলা আরম্ভ হলে হিন্দুদল ৬ উইকেটে ৭২ রান করলে। ভিকাজীর ২২ রানই সর্ব্বোচ্চ। দু'বছর পরে হিন্দুরা পেণ্টাঙ্গুলার জয়ী হ'ল।

এম সি সির আফ্রিকায় প্রথম খেলা ঃ

ওয়ালি হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে পনের জন খেলোয়াড় গঠিত এম সি সি দল টেষ্ট খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌচেছে। দলে আছেন—হ্যামণ্ড, হাটন, এডরিচ, পেণ্টার, ভেরিটি, গ্রইম্‌স্, ফারনেস, বার্টলেট, গোডার্ড, ইয়ার্ডলে, গিব, উইলকিন্‌সন্, ভ্যালেণ্টাইন, রাইট ও পার্কস্।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম খেলায় এম সি সি কেপ্‌টাউনের ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স কাউন্টি ডিষ্ট্রিক্ট দলকে এক ইনিংস ও ৩৪২ রানে পরাজিত ক'রেছে। এম সি সি প্রথমে ব্যাট ক'রে ৮ উইকেটে ৫০৯ রান করে। পেণ্টার ক'রেচেন ১৯৩, তার ভেতর ৫টা ছয় আর ১৮টা চারের বাড়ি মেরেচেন। হ্যামণ্ড ১১৫ মিনিটে রান তুলেচেন ১০৬, চারটে ছয় আর সাতটা চার। ভ্যালেন্‌টাইনের ৬৯ রানে, চারটে ছয় আর তিনটা চার ছিল।

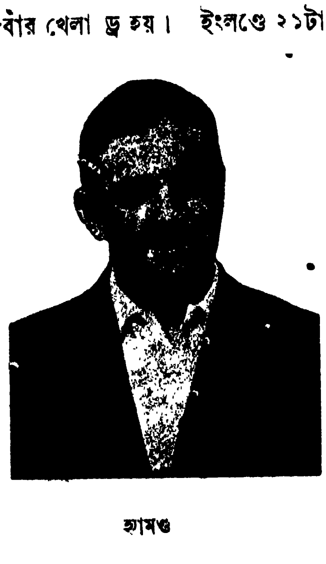
ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স ১ম ইনিংসে ১৭০ করে। গডার্ড ৩৯ রানে ৪৫ আর ভেরিটি ২৬ রানে ৪ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে রান আরও কম ওঠে, মাত্র ১০৭। এডরিচ ৪ উইকেট নেন মাত্র ১৩ রানে, আর ভেরিটি ২৯ রানে ৩ উইকেট।

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলা প্রথম সুরু হয় ১৮৮৮-৮৯ সালে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫৯টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। ৩৮টি হয়েছে সাউথ আফ্রিকায়,—ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে ১৯বার, হেরেছে ১১বার, আর ৮বার খেলা ড্র হয়। ইংলণ্ডে ২১টা ম্যাচ খেলা হ'য়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা মাত্র একবার জয়ী হয়েছিল, ১১বার খেলা ড্র হ'য়েছে, আর বাকী ৯বার ইংলণ্ড জিতেছে।

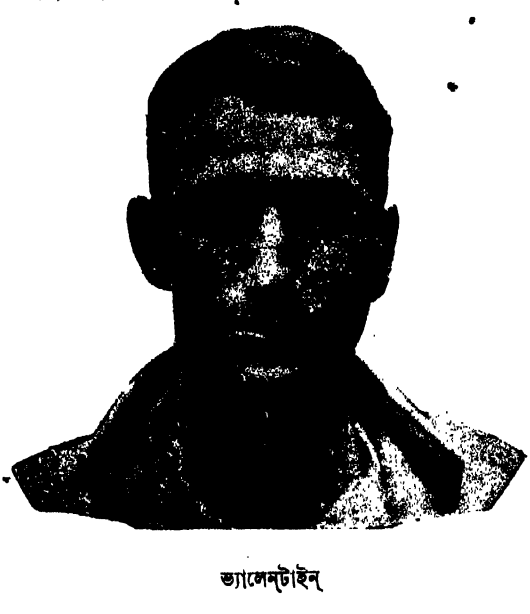
১৯৩৫ সালে 'ওভাল' মাঠে ইংলণ্ড সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান তোলে, ছয় উইকেটে ৫৩৪; তার আগে ১৯৩০-৩১ সালে কেপটাউনে ইংলণ্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ রান ৮ উইকেটে ৫১৩। লীডস্ মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডকে সব থেকে কম ৭৬ রানে নামিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে ইংলণ্ড মাত্র ৩০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ ক'রে দিয়েছিল। চারজন ইংলিস ব্যাটস্‌মান দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্টে প্রথমবার নেমেই সেঞ্চুরী ক'রেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ব্যাটস্‌ম্যান আজ পর্য্যন্ত প্রথম বারেই নেমে টেষ্টে সেঞ্চুরী ক'রতে পারেননি। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টের মতন দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্টেও নূতন রেকর্ড স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।

ভারতে এম সি সি ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মান্দ্রাজ অধিবেশনে প্রকাশ, আগামী ১৯৩৯ সালের ১২ই অক্টোবর এম সি সি দল ভারতে পদার্পণ করবে। সর্ব্বসমেত ২৬টি ম্যাচ, তার মধ্যে ৩টি টেষ্ট খেলবার পর ১৯৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ড যাত্রা ক'রবে। টেষ্ট খেলা হবে বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে। বিভিন্ন প্রদেশে মোট ২০টি ম্যাচ ছাড়া পাতিয়ালার মহারাজার দল, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়



হ্যামণ্ড



ভ্যালেন্‌টাইন্



এড্‌রিচ্

দল ও ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে একটি ক'রে খেলা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলাটি আমেদাবাদে গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে হবে। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রিকেট কেন্দ্র আলিগড়েও এটা হ'তে পারে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অর্থ সম্বন্ধে 'গ্যারাণ্টি' দেন। এম সি সির এই অভিযানে ব্যয় হবে ১২,৫০০০ টাকা। বোম্বাই কলিকাতা ও মাদ্রাজ যেখানে টেষ্ট খেলা হবে তাদের যথাক্রমে ২৬০০০৲ টাকা, ২০০০০৲ টাকা ও ১২০০০৲ টাকা দিতে হবে। শেষ খেলা হবে বোম্বাইতে ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে। এই খেলাটির জন্য বোম্বাইকে ৩০০০৲ টাকা আরও বেশী দিতে হবে। কলিকাতায় টেষ্ট খেলার তারিখ—২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৯।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাই : বরোদা :

বোম্বাই—৪৪১ (৬ উইকেট)

(মার্চ্চেণ্ট নট আউট ১৪৩, হাভেওয়ালা—৬৪, জয়—৫৯, নায়েক—৬৮)

বরোদা—৩২৬

(নিম্বলকার—১১৯, সেখ নট আউট ৩৯)

বোম্বাই ১১৫ রানে জয়ী হয়েছে।

বোম্বাই ঃ সিন্ধু ঃ

বোম্বাই—৩৬৬

(মার্চ্চেণ্ট—১২০, জয়—৬৭, হাভেওয়ালা—৫৪; গোলাম মহম্মদ ৬৪ রানে ৩, হায়দার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)

সিন্ধু—৩৭০ (৭ উইকেট)

(নাওমল—১৪৯, দাউদ খাঁ—৭৪, হায়দারআলি—৪০)

সিন্ধু প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় জয়ী বলে ঘোষিত হয়েছে।



অমর সিং মার্চ্চেণ্ট ভিনু মানকাদ

নওনগর ঃ গুজরাট ঃ

নওনগর—৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

গুজরাট—১০৫ ও ১৪৮

(অমর সিং ৫৬ রানে ৫, ভিনুমানকাদ ২১ রানে ৫ উইকেট ; দ্বিতীয় ইনিংসে—ভিনুমানকাদ ৭৬ রানে ৫ ও অমরসিং ৫৬ রানে ৫ উইকেট)

নওনগর—২৩৪ ও ১৬ (২ উইকেট)

(ভিনু মানকাদ ৮০, কোলা ৪৯, এস্ ব্যানার্জ্জি ৩৮)

পশ্চিমভারত ঃ মহারাষ্ট্র ঃ

পশ্চিম ভারত ২০৯ রানে বিজয়ী হয়েছে।

পশ্চিম ভারত—১৩৮ ও ১৮০

(পট্টবর্দ্ধন ৫১ রানে ৪, যাদব ২৭ রানে ৩ উইকেট)

(দ্বিতীয় ইনিংসে—সাহানী ৫৬ রানে ৫ উইকেট)

মহারাষ্ট্র—১৩১ ও ৭৭ (গান্ধী ৫৩ রানে ৫ ও আকবর খাঁ ৫২ রানে ৪ ; দ্বিতীয় ইনিংসে—সৈয়দ আমেদ ২৫ রানে ৫, গান্ধী ৫১ রানে ৫ উইকেট)

নওনগর ঃ পশ্চিম ভারত ঃ

নওনগর ৪ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

পশ্চিম ভারত—১৬৬ ও ১৮৫

নওনগর—১৬৮ ও ১৮৪ (৬ উইকেট)

পশ্চিম অঞ্চলের ফাইনালে নওনগর ও সিন্ধু খেলবে।

হাগ মাসাই ঃ

বিশ্ববিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড় হাগ মাসাই-এর মৃত্যু হয়েছে। মাসাইকে বাদ দিয়ে ক্রিকেট ইতিহাস ভাবা যায় না। মাসাই হ'চ্ছেন প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান যিনি প্রথম শ্রেণীর খেলার প্রথম দিন নেবেই 'ডবল-সেঞ্চুরী' করেন। তারপর অবশ্য উড্ফুল ১৯২৬ সালে আর ব্রাডম্যান ১৯৩০ সালে ঐ রকম রান ক'রেছেন।

'এসেসে'র জন্ম কথা ঃ

আজ যে 'এসেস্' নিয়ে ইংলণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এত 'ক্রিকেট যুদ্ধ' তার মূলে হ'চ্ছেন মাসাই। ১৮৮২ সালের ওভালে মাসাই না খেল্‌লে 'ছাই নিয়ে যুদ্ধে'র কথা হয়ত আমরা শুনতে পেতুম না। ১৮৮২ সালের আগষ্ট মাসের কথা। খেলা হ'চ্ছে ওভালে। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে মোট রান সংখ্যা হয়েছে মাত্র ৬৫, মাসাই একাই ৫৫ রান করেছেন। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'ল ৭৭ রানে। খেলার শেষ দিকে উত্তেজনা এত প্রবল হ'ল যে একজন লোক ভিড়ের মধ্যে ওপর থেকে পড়ে গেল; তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল না। আর একজন লোক তো ছাতার বাঁটই চিবুতে আরম্ভ ক'রে দিলে। স্কোরাররাও উত্তেজনা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তাঁদের একজন খাতার ওপর লিখে ফেলেছেন 'Geese'। ইংলণ্ড হেরে গেল মাত্র ৭ রানে। ইংলণ্ডের ক্রিকেটের গর্ব্ব এইরূপ বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীদের কাছে অসহ্য ঠেকতে লাগলো, পরের দিন Sporting Timesএ এই খবরটি বেরুল ;—

"In affectionate remembrance of English cricket which died at Oval on 29th August, 1882."

Deeply lamented by a large circle of sorrowing friends and acquaintances

R. I. P.

N. B. The body will be cremated and the Ashes taken to Australia.

ওল্ডফিল্ডের অবসর গ্রহণ ঃ

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উইকেট-রক্ষক ওল্ডফিল্ড প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রলেন। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচে তিনি সবশুদ্ধ নব্বই জন ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট ক'রেছেন। ৩১ জনকে ক'রেছেন ষ্টাম্পড, আর ৫৯ জনকে উইকেটের পেছনে লুফেছেন।

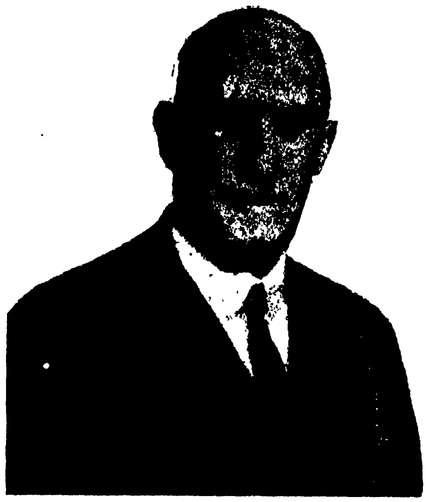


ওল্ডফিল্ড

১৯২৮-২৯ সালে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট খেলায় চার ইনিংসে ইংলণ্ডের সবশুদ্ধ রান সংখ্যা হ'য়েছিল ১৯০৮। ওল্ডফিল্ড উইকেট রক্ষা করে বাই দিয়েছিলেন মাত্র তিন রান। তিনি ব্যাটস্‌ম্যানও ভাল ছিলেন।

লর্ড হক ঃ

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লর্ড হকের মৃত্যু হয়েছে। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেষ্টে পাঁচবার ক্যাপ্‌টেন হন, সে কয় বারই ইংলণ্ড বিজয়ী হয়েছিল।



লর্ড হক

তিনি ইয়র্কসায়ার কাউন্টির ক্যাপ্‌টেন ও এম সি সির ট্রেজারার হয়েছিলেন এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্য্যন্ত এম সি সির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ক্রিকেট শিক্ষক ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত স্লো বোলার গ্রিমেট্ জাঠের মহারাজার 'কোচ' হয়ে ভারতবর্ষে এই প্রথম এসেছেন।



গ্রিমেট

বোম্বেতে ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়া বনাম ডাঃ কাঙ্গের একাদশের প্রদর্শনী ম্যাচে তিনি ডাঃ কাঙ্গের একাদশ দলের হ'য়ে খেলে ৭৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

জে, ডবলিউ, হিচ, যিনি সারের বিল হিচ নামে পরিচিত, বাঙ্গলা ও আসাম ক্রিকেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তরুণ খেলোয়াড়দের 'কোচ' হ'য়ে সস্ত্রীক কলিকাতায় এসেছেন।

বাঙ্গলার ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষতা লাভের জন্য

এসোসিয়েশনের এ প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার হিচ বিভিন্ন ক্লাবের উদীয়মান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন।

টেনিস ঃ

বর্ত্তমান বৎসরের বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়ের কোন সরকারী তালিকা প্রকাশিত না হ'লেও অনেক বে-সরকারী তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হ'য়েচে। ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকা 'লা অটোর', বিলাতের বিখ্যাত সমালোচক ওয়ালিস মায়ারের (ডেলি টেলিগ্রাফ) এবং ফরাসী টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি পেরী গিলোর তালিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনটি বিষয়ে তাঁরা একমত। তাঁরা প্রত্যেকেই ডোনাল্ড বাজ ও শ্রীমতী উইলিস্-মুডিকে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বলে স্বীকার করেছেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় যুগোশ্লাভিয়ার পুনসেক তিন জনের তালিকাতেই দশম স্থান অধিকার করেছেন। দু'জনের মতে পুরুষদের দ্বিতীয় স্থান পাইবার যোগ্য ব্রমউইচ। 'লা অটো' যেমন অষ্টিনকে ষষ্ঠ স্থান দিয়ে তাঁর উপর অবিচার ক'রেচে তেমনি আবার ডেলি টেলিগ্রাফের ব্রমউইচের স্থলে তাঁদের অষ্টিনকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া পক্ষপাতিত্ব ব'লে মনে হয়। মোটের ওপর এবারের পৃথিবীর টেনিস ক্রমপর্য্যায়ে আমেরিকা খেলোয়াড়দের নাম সুউচ্চে। যে কোন অপক্ষপাত তালিকায় আমেরিকার পুরুষ ও মহিলায় অন্ততঃ দশজন খেলোয়াড় তাঁদের নাম পেতে পারেন।



উইলিস্-মুডি



ডোনাল্ড বাজ

ছোট বেলায় টেনিস খেলাটা যাঁর সব থেকে খারাপ লাগতো তাঁরই নাম আজ সখের টেনিস খেলার জগতে সবচেয়ে উপরে। ডোনাল্ড বাজ জন্মগ্রহণ করেন কালিফোর্ণিয়া সহরে। ছোট বেলায় তাঁর টেনিস মোটেই ভাল লাগতো না, কিন্তু তাঁর দাদা লয়েড বাজ দিন দিন বাক্স ভর্ত্তি নূতন নূতন বল ঘুস দিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে টেনিস কোর্টে নিয়ে যেতেন। ১৯৩৫ সালে ডোনাল্ড মাত্র আঠার বছর বয়সে প্রথম ইউরোপে খেলতে আসেন। তখন তাঁর খেলার ভেতর কতকগুলো খুঁত ছিলো, কিন্তু তবুও তিনি ইংলণ্ডের সেরা খেলোয়াড় অষ্টিনকে উইম্বলডনে আর জার্ম্মাণীর সেরা খেলোয়াড় ভন্‌ক্রামকে ডেভিস কাপে হারিয়ে দেন। তারপর ১৯৩৭ সালে আবার যখন বাজ এলেন, তখন তাঁর সুন্দর 'ষ্ট্রোক', তীব্র ও নিখুঁত 'সার্ভিস', চমৎকার 'ব্যাক হাণ্ড ড্রাইভ' আর ততোধিক চমৎকার ভঙ্গির সামনে কোন খেলোয়াড়ই দাঁড়াতে পারলো না। বাজ একের পর এক ক'রে উইম্বলডন্, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। টেনিস খেলোয়াড়দের নাম ক'রতে গেলে তাঁর নামই আগে মনে পড়ে। গত ১০ই অক্টোবর কালিফোর্ণিয়ায় প্যাসিফিক্ কোষ্ট চ্যাম্পিয়ানসিপে হফ্‌ম্যানের নিকট পরাজিত হওয়া ছাড়া গত দু' বছরের মধ্যে বাজ ইংলণ্ড বা আমেরিকার কোন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় কারও কাছে পরাজিত হন নি। একুশ বছর বয়সের খেলোয়াড় বাজ টেনিস জগতে আজ যে রেকর্ড ক'রেছেন তা' ভাঙ্গতে অনেক দিন লাগবে। পুরুষদের মধ্যে যেমন বাজ তেমনি মহিলাদের মধ্য থেকে শ্রীমতী উইলিস্-মুডি টেনিস জগতে নূতন নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচেন। কুমারী ও পরিণীতা অবস্থায় সর্ব্বশুদ্ধ তিনি ন'

বার উইম্বলডনে খেলতে নামেন এবং মাত্র একবার ছাড়া সব বারই বিজয়িনী হ'য়েছেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম নেমে হেরে যান কিটি ম্যাক্কানের কাছে। পরে তাঁকে আর কেউই উইম্বলডনে হারাতে পারেন নি। গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শ্রীমতী অনেক দিন আর খেলা-ধূলোর দিকে মন দিতে পারেন নি। এবার যখন আবার তিনি নতুন ক'রে উইম্বলডনে নামবার মনস্থ ক'রলেন সকলেই সেটা 'courageous come-back' ব'লেছিলেন, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে উইম্বলডন বিজয়িনী হওয়া অসম্ভব বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী মুডি প্রমাণ ক'রে দিলেন অনেকদিন প্রথম শ্রেণীর খেলার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রলেও তাঁর পুরাতন দিন এখনও চ'লে যায় নি; এখনও তিনিই পৃথিবীর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

ডোনাল্ড বাজ পেশাদার ঃ

ডোনাল্ড বাজ শেষ পর্য্যন্ত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হ'তে রাজী হ'য়েছেন। ৭৫০০০ ডলার চুক্তিতে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভাইন্‌সের সঙ্গে আগামী বৎসরে খেলবেন। তাঁদের প্রথম খেলা হ'বে ৩রা জানুয়ারী ম্যাডিসন স্কোয়ারে।

বিখ্যাত টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের আগমন ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বিশ্বের টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরির গিয়াজো ভিক্টর বার্ণা এবং তাঁর সঙ্গী বেলাক্ ভারতে এসেছেন, এই মাসেই কলিকাতায় আসবেন। ভিক্টর বার্ণা ১৯১১ সালে হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলার সিঙ্গলসে ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় এ এ হেডনের কাছে সেমিফাইনালে হেরে যান। ১৯৩০ সালের সিঙ্গলস খেলায় জাবাডোসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ পান। পর পর তিন বৎসর বিশ্বের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসিপে তিনি জয়ী হন। জাবাডোস এবং কেলেনের জুটী হ'য়ে তিনি সাতবার ডবলসে বিশ্বের চ্যাম্পিয়ানসিপ পান। এ ছাড়া হাঙ্গেরী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, জেকোশ্লোভাকিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হ'য়েছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় দলভুক্ত হন। পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলায় বেলাক্ তিনবার 'রানার্স আপ' হন। কলিকাতায় এসে তাঁরা কয়েকটি প্রদর্শনী খেলা খেলবেন।

বার্ণা ও বেলাক্ বোম্বাইয়ের টেবিল টেনিস খেলা সম্বন্ধে বলেছেন যে অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা এখানের খেলা উন্নত ধরণের, তবে আরো অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে ভাসিন, ২১-১২, ২১-১৭, ২১-১০ সেটে হান্সলেকে হারিয়ে বেঙ্গল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছে। হান্সলে যে এরকম শোচনীয় ভাবে হারবে তা' কেউ ভাবতে পারে নি। পুরুষদের ডবল্‌সে কে, গাঙ্গুলি ও এস, ব্যানার্জ্জি ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪, ১৩-২১, ২১-১৩ সেটে ভাসিন ও ঘোষকে হারিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে কুমারী বান্নি সেন ২০-২১, ২১-১৭, ২১-২০ সেটে কুমারী এস্লা ডিডি কে হারিয়ে বিজয়িনী হ'য়েছেন। এই বৎসর তাঁর প্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান।



বেঙ্গল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিত খেলোয়াড়গণ ; (বাম থেকে) এম কে হান্সলে (রাণার্স আপ), ডি আর ভাসিন (বিজয়ী), মিস্ বান্নি সেন (বিজয়িনী), মিস্ লুডিড (বিজিতা) ছবি—জে কে সান্যাল

কলিকাতায় আমেরিকার টেনিস দল ঃ

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলিকাতা সাউথ ক্লাবের উদ্যোগে এবার আমেরিকা থেকে একদল টেনিস খেলোয়াড় এখানে আসবেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপে খেলতে। পরে তাঁরা ভারতবর্ষের সব বড় বড় টেনিস প্রতিযোগিতায় নামবেন। এই দলে আছেন,—চার্লস্ হ্যারিস, ডন্ ম্যাকনীল, আওয়েন এণ্ডারসন ও ডবলিউ রবার্টসন। রবার্টসন ছাড়া দলের সকলেই তরুণ। হ্যারিসের বয়স এখন তেইশ। তিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তিন নম্বর খেলোয়াড়। রিগস্‌কে হারিয়ে বেশ সুনাম অর্জ্জন ক'রেচেন। এণ্ডারসনের বয়স বাইশ বছর। ইনি ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদকে Reveiraতে হারিয়েছিলেন। ম্যাকনীলের বয়স এখন মাত্র একুশ। ফ্রান্সের এক নম্বর খেলোয়াড় Petra সম্প্রতি আমেরিকা পরিভ্রমণ ক'রে এসে এই অভিমত জ্ঞাপন ক'রেচেন যে, আমেরিকায় যেমন নূতন নূতন খেলোয়াড় তৈরী হ'চ্চে এমনটি পৃথিবীতে আর কোথাও হয় না। টেনিস জগতে চমক্ লাগিয়ে দিতে আমেরিকার কাছে অন্য কোন দেশ দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং সাউথ ক্লাবের আমেরিকা থেকে টেনিসদল আনানোর এই প্রচেষ্টা খুব সময়োপযোগী হ'চ্চে সন্দেহ নেই। প্রতি বৎসর বহু অর্থ ও সামর্থ্যের বিনিময়ে টেনিস খেলার উন্নতির জন্য সাউথ ক্লাবের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

নিউজিল্যাণ্ডে মানাভাদার হকি ঃ

মানাভাদার হকি দল নিউজিল্যাণ্ড অভিযান শেষ করে ভারতে ফিরে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ডে সর্ব্বসমেত ৩১টি খেলা হয়। অক্‌ল্যাণ্ড প্রদেশ দলের কাছে মাত্র একটি খেলায় তাদের হার হয়, বাকি ত্রিশটিতে তারা জয়ী হয়েছে। বে-সরকারী তিনটি খেলাতেই ভারতীয়রা জয়লাভ করে। মানাভাদার দল এ অভিযানে সর্ব্বসমেত গোল ক'রেছে ২৩২, আর বিপক্ষ দল গোল দিয়েছে মাত্র ১৯টি। অষ্ট্রেলিয়াতে ৮টি খেলা হয় এবং সকলগুলিতেই ভারতীয়রা জয়ী হয়েছে, তাদের পক্ষে গোল হয়েছে ৫৮টি। তাদের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া দল মাত্র ৬টি গোল দিতে পেরেছে।

ভারতের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ঃ

গাউস মহম্মদ এবার একা প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং সোহানী দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলেন। কাপুর তৃতীয়ই রইলেন। গত বৎসরের প্রথম স্থান অধিকারী বব্ ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শোভনলালের নাম তালিকার কোন স্থানেই নেই।

মেয়েদের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন মিসেস বোলাণ্ড; গত বৎসরের প্রথম স্থান অধিকারিণী মিস লীলা রাও ও মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌সের মধ্যে মিস লীলা রাও দ্বিতীয় হলেন, মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌স কোন স্থানই পেলেন না।



অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রত্যাগত মানাভাদার হকি দল। সকল খেলাতেই জয়ী হয়েছে, মাত্র একটি খেলায় পরাজিত হয়েছে



সোহানী গাউস মহম্মদ

মিসেস লেকম্যান তৃতীয় স্থানে নামলেন। মিস ডুবাস চতুর্থই রইলেন।

(১) গাউস মহম্মদ, (২) এস এল আর সোহানী (৩) ডি এন কাপুর (৪) রণবীর সিং (৫) যুধিষ্ঠির সিং (৬) বি টি ব্লেক এবং জে এম মেটা (৭) এস সি বিটী (৮) এস এ আজিম এবং এইচ এল সোনী (৯) টি কে রামা নাথম্।

মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ঃ

(১) মিসেস বোলাণ্ড (২) মিস লীলা রাও (৩) মিসেস জে সি লেকম্যান (৪) মিস এম এইচ ডুবাস (৫) মিস এম উডকক (৬) মিসেস আর এম ফ্রুটিট (৭) মিস এল, উডব্রিজ।



মিসেস্ বোলাণ্ড

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "কবে তুমি আসবে"—১৷৷৹
শ্রীজ্যোতিবাচস্পতি প্রণীত নাট্যনিকেতনে অভিনীত নাটক "সমাজ"—১৷৹
শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অজানা পথে"—২৲
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "রসের নাড়ু"—।৴৹
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুই প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "ডানপিটে"—।৵৹
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "স্মৃতির বিড়ম্বনা"—৸৹
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "পাতালপুরী"—৷৷৵৹
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়"—১৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন"—।৵৹
শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী প্রণীত (কবিতা পুস্তক) "জলের লিখন"—২৲
শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "ভক্তের ভগবান"—।৴৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অদৃষ্টের ইতিহাস"—২৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "তরঙ্গ রোধিবে কে" দ্বিতীয় খণ্ড—২৲
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র প্রণীত কবিতা পুস্তক "চন্দ্রমল্লিকা"—১৲
অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সেন প্রণীত "যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পদ্ধতি"—।৵৹ ও "যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ পদ্ধতি"—৷৷৹
শ্রীজীবানন্দ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "অসমতল"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "সাটিরার নবরূপ"—১৷৹
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "সিরাজদ্দৌলা"—।৵৹
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "রত্নদ্বীপের বিভীষিকা"—৷৷৵৹
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ছেলেদের পুজার উপহার "যাদুঘর"—১৷৹
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের "শত্রু সংঘর্ষ"—৸৹
শ্রীজ্যোতির্ব্রহ্ম যোগাধ্যায়ী প্রণীত মূল ও পদ্যানুবাদ "গীতা"—।৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে যাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মনিঅর্ডার করিলে ৩৶৫ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৷৹ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। —কার্য্যাধ্যক্ষ, ভারতবর্ষ

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

ষড়বিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

[illegible]

চিত্র সূচী—মাসানুক্রমিক

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৪৫

দ্বিবর্ণ-চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৪৫

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

দ্বিবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র





ম-খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

জৈন দর্শনে জ্ঞান

প্রিন্সিপাল শ্রীকালীপদ মিত্র

নে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে। যথা—
ত (২) শ্রুত (৩) অবধি (৪) মনঃপর্যায় (মনঃ-
ও (৫) কেবল।

র্তিশ্রুতাবধিমনঃপর্যায়কেবলানি জ্ঞানম্।
——তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ।১।৯॥

ইন্দ্রিয় ও (২) মনের সাহায্যে সাধারণ মানব যে
করে, তাহাকে মতিজ্ঞান কহে। মনের অপর
নিন্দ্রিয় বা নো-ইন্দ্রিয়। প্রমাণ মীমাংসাবৃত্তিতে উক্ত
—"মনোঽনিন্দ্রিয়মিতি নো ইন্দ্রিয়মিতি উচ্যতে।"
দর্শনে ইন্দ্রিয় পাঁচ—শ্রোত্র, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা,
(স্পর্শরসগন্ধরূপশব্দ গ্রহণলক্ষণানি স্পর্শনরসনঘ্রাণ-
শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি—১, ১, ২২—প্রমাণ-মীমাংসা)।
জ্ঞানের অপর নাম—অভিনিবোধ বা অভিনিবোধিক
সমবায়াঙ্গ সূত্র (আগমোদয় সমিতি সংস্করণ, (৩) ইহার
রে। আবশ্যক সূত্র বলে—

নো-আগমতঃ পঞ্চপ্রকারং জ্ঞানং, তচ্চেদম্—
আভিণিবোহিমনাণং সুগনাণং চেব ওহিনাণং চ।
তহ মণপজ্জবনাণং কেবলনাণং চ পংচময়ং॥

ভাষ্যকার অভিনিবোধিক জ্ঞানের যে ব্যাখ্যাগুলি দিয়াছেন তাহার একটিমাত্র দিতেছি—"ইন্দ্রিয়মনোনিমিত্তো যোগ্য-দেশাবস্থিত বস্তুবিষয়ঃ স্ফুটপ্রতিভাসো বোধবিশেষ ইত্যর্থঃ"।

মতিজ্ঞানের চারিটা ক্রম আছে—যথা (১) অবগ্রহ (২) ঈহা (৩) অবায় (অপায়) ও (৪) ধারণা।

(১) অবগ্রহ

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সামান্য জ্ঞান হয় তাহাকে অবগ্রহ কহে। আবশ্যকসূত্র বলে—

অত্থাণং উগ্গহণং অবগ্গহং তহ বিআলণং ইহং।
ববসায়ং চ অবায়ং ধরণং পুণ ধারণং বেতি॥

জৈন প্রাকৃতে 'অবগ্রহ', 'উগগহ' (বিশেষাবশ্যক ভাষ্য) বা 'ওগগহ' (সন্মতি সূত্র, ৭৫ গাথা', উবগ্রসসীলা, (বৃহৎ)